৫৭৬/২

মর্ম্মবাণী

সাহিত্য-বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
সম্পাদিত

১৪এ, রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেস" হইতে
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ষাণ্মাসিক সূচী

শ্রীঅকিঞ্চন দাস
- পাশ্চাত্যজগতে বহু-বিবাহ-বিভ্রাট — ৯৭
- ইব্‌সেনের প্রকৃতি ও প্রভাব — ৩৬০
- ইব্‌সেনের নাট্যপরিচয় — ৪০৬
- পুতুলঘরের সারাংশ — ৪৩৪
- ইব্‌সেনের "প্রেত" নাটকের দার্শনিক ভিত্তি — ৪৬৪

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
- কীর্ত্তনীয়া প্রেমদাস — ১৬৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল্‌.
- বর্ত্তমান শিক্ষাবিভ্রাট ও স্বেচ্ছাচারিতা — ২৫৬
- মেরী বেগম — ৪২৫

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
- সূচনা — ৪
- মূর্ত্তি-পরিচয় — ১৯
- গৌড়ের কথা — ১৯৫, ২৩৬
- মেঘের কথা — ২৪৯

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
- দাদার বুদ্ধি (গল্প) — ২৪৫

শ্রীআব্‌দুল করিম
- চট্টগ্রামের মুসলমান — ৩৪৩, ৪৭৭

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
- তোমরা (কবিতা) — ৫৯৬

শ্রীবৃন্দা... ী কমলা দেবী
- শেষ রক্ষা (গল্প) — ১১০

শ্রীব্যো... কাঞ্চনমালা দেবী
- অধিকারে বঞ্চিতা (গল্প) — ৩৫

শ্রীযুক্ত ভূ...
- স...সির ডায়ারী (গল্প) — ১৩৯
- ...র সাথী (গল্প) — ৩৭৭

স্বর্গীয় মন্মথনা...
- সাহি... বি, এ,

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চ...
- ...প্রথম দিবসে (কবিতা) — ১১৫
- চাটুনি ... ং ত্বমসি শরণং " — ১৬৫
- ...ইনীমোহন " — ২৭৯
- হরি... " — ৩২০
- ...র্পণং " — ৩৬৮
- ধন্যা " — ৩৮১
- অপরাজিতা (সমালোচনা) — ৩৯৩
- সাধনার মূল্য (কবিতা) — ৪১৭
- আশার তপন " — ৪৩৭
- গোকুল ও নদীয়া " — ৪৫৭
- আমাদের কানু " — ৪৫৯
- চিরবন্দী " — ৪৭৯
- চিরশ্যাম " — ৪৮৬
- মানভঞ্জন " — ৫০২
- অনুশোচনা " — ৫২৮
- পিউ পিউ ও কুহু কুহু (কবিতা) — ৫৪৯
- আড়ি " — ৫৯৮

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,
- যূঁই (পদ্য) — ২২

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম, এ
- বারুণী (সমালোচনা) — ৩৪৬

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ
- অপরাধ ও শাস্তি — ৫০

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ
- সাহিত্য-সংবাদ — ৩৪৮
- ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কলেজের ইতিবৃত্ত — ৩৯২
- বনবিভাগীয় বিদ্যালয় সমূহ — ৪৬২

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়
- প্রার্থনা (কবিতা) — ৩১২

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ
- পাকবিদ্যা — ৮৭

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম, এ, বি, এল
- সমালোচনা — ৩০০, ৫১৯, ৫৮৯

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়
- মরণ (কবিতা) — ২২৬
- প্রত্যাবর্ত্তন (কবিতা) — ৩৯১

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল বি, এ
- প্রাচীন ভারতের সমর-নীতি — ৪৮০
- জার্ম্মানির বীরপূজা — ৫৪৩

শ্রীজগৎতারণ দাস
- তুমি (কবিতা) ২২৮

মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়
- সে দোষ আমারি (কবিতা) ১৮
- ফিরে এস (কবিতা) ২৫
- সিদ্ধার্থের প্রতি " ৪৯
- শেষ নিমেষ " ১৫২
- বিবাদ " ১৮৮
- চিরবাধা " ২৫৮

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা
- সূক্ষ্মলোম পরিণয় (নাটক) ৫, ২৯, ৫৫, ৯০, ১১৩, ১৩৬, ১৫৭, ১৮৯, ১৯৭, ২৩১

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
- ঝাড়া ও জলপড়া ১০৬

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম, এ
- গুলিস্তানের গল্প ৫৩০, ৫৫৬, ৫৭৬,৫৯৯

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
- পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু বিবাহ ৩৩৩

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়
- হিমালয় দর্শণে (কবিতা) ৭৮
- বর্ষা " ১০২
- বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা ১০৩
- সূক্ষ্ম-সময় নির্দ্দেশ যন্ত্র ১৫৯
- ধূমপান ৩০৯
- ষ্টেশন-মাষ্টার (গল্প) ৩১৩
- উদ্ভিদের কর্কট-রোগ ৩৬৯
- কথিত ভাষায় ই-কারের প্রভাব ৩৯৯
- অভিনব পরিণয় (চিত্র) ৪০১
- পাহাড়ে "ডায়েরীর" দুই পাতা ৪৩৭
- বৈজ্ঞানিকের সহিত দুই ঘণ্টা ৪৪১
- মৃত্যু-বিহার (কবিতা) ৪৭২
- সুর-মিলান ৫০৫
- সমর্পণ (কবিতা) ৫২৯
- সৃষ্টির কেন্দ্র ৫৭৩
- সন্ধ্যা ৬০৫

অনারেবল ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই
- ত্রয়ী (কবিতা) ৩১৭

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল
- সনেট্ রূপসী (কবিতা) ২৬২

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব
- যশোহর খুলনার ইতিহাস (সমালোচনা) ১২৪

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার এম, এ, বি, এল,
- অগ্নিহোত্র ১৭৩

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ
- গান (কবিতা) ১০২
- গান ১৮৬
- বেসুর বীণ্ (কবিতা) ২১৯
- পুত্রহারা " ৩৬৭
- সন্ধ্যায় " ৪৬৩
- অসাধুতা " ৫০৫

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন
- কবি (কবিতা)

শ্রীনরেন্দ্র দেব
- আধ মিনিটের গল্প

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল
- সাহিত্য-সঙ্গত

শ্রীনলিনী রায়
- একটি গান

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত
- কুমায়ুনে কয়েকদিন

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ
- ভুল (গল্প)

শ্রীপুলিন বিহারী দত্ত
- রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তিপূজা কতদিনের ?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র আঢ্য
- বংশী-তান (কবিতা)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- সেকালের দুর্গোৎসবের আরম্ভে পল্লীচিত্র

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু বি, এস-সি
- আকাশ-বাতি (গল্প)
- পরিচয়
- রহস্য-বিভ্রাট (গল্প)

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী
- ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (গল্প)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ—বার-অ্যাট-ল
- চন্দ্রের কলঙ্ক
- "সাহিত্যে যথেচ্ছাচার" ও "সবুজ পত্র"

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ
- সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী বি, এ
- মাতৃ-মূর্ত্তি (গল্প)

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
- খোদার মিনার (কবিতা)

শ্রীপ্রসাদ দাস
- সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীপ্রসাদদাস রায়
- দিল্লীর দুর্গ
- সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত
- ইন্দ্রধনু (কবিতা)

শ্রীপাঁচুগোপাল নন্দী
- ভিক্ষা (কবিতা)

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বিদ্যুৎ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি, এ
- আশার পথে (গল্প)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ
- শত্রু (গল্প)

কুমার চট্টোপাধ্যায়
- বর্ষায় (কবিতা) ১৮৩
- তপোবিনিময় (গাথা) ২০৪
- প্রতীক্ষা (কবিতা) ২৮৮
- ভারত-তীর্থ " ৩৬৮
- আমারি সে বাড়ীখানি ৫৯২
- বঙ্গভাষায় বিশেষণ ৫৯৩

ন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
- জিনৎ উন্নিসা ২০৬

য়গোপাল ঘোষ
- পায়ের ধূলি ৫২৯
- শ্যামের বাঁশী ৫৭৯

চন্দ্র মজুমদার বি, এল
- ষড়্-ঋতু (কবিতা) ২১১
- খেলা (গান) ২১৭
- ঐশী লীলা (করিতা) ২৫২
- ভিক্ষা (গান) ৩৪৪

রত্ন মজুমদার
- বঙ্কিমের উপন্যাসে হাস্যরস ১২৫
- সহধর্ম্মিনী (গল্প) ২২৮
- দীনবন্ধু ও হাস্যরস ৪৩২

জয়লাল
- সাহিত্যে যথেচ্ছাচার ২২৩

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ
- জাপানী জাহাজে দশদিন ২৮৯

দবিহারী গুপ্ত
- চরিত্র-বল ৩৮২

চরণ লাহা বি, এ
- জাতকে তক্ষশিলা ১২৯

পতি চৌধুরী
- দেউল (কবিতা) ৪২০
- কবে ? " ৪৩৮
- পলাতক (গল্প) ৪৩৮
- তুমি ও আমি (কবিতা) ৪৫৫
- চণ্ডিদাসের প্রতি " ৪৮৩
- মেঘ " ৫০৯
- প্রশ্রয় " ৫৫৬
- প্রতীক্ষা " ৫৮৮
- বীণার কথা (গল্প) ৬০৬

বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
- প্রাচীন মুদ্রার পরিচয় ৬০৪

ব্যোমকেশ মুস্তফী
- সাহিত্য-সংবাদ ২৪

শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ চক্রবর্ত্তী
- সম্রাজী বনাম সম্রাজ্ঞী ৫৬৩

স্বর্গীয় মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,
- সাহিত্যিক পঞ্চরং (নক্সা) ২৫৮

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ
- চাট্‌নি ৪৪৯

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়
- হরিহর (করিতা) ৭৫

মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ব্যস (কবিতা) ৯২

শ্রীমতী মৃণালমালা দেবী
- বিচার (গল্প) ২১২

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র
- শিল্পের উপকারিতা ৩০৩
- মানব-সভ্যতার একপৃষ্ঠা ৪৩১
- চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্প ৪৫৫
- সমাজবন্ধন ৫০৭
- সমালোচনা ৫৫৮

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
- রহস্য ২৩
- জার্ম্মানীর সমর-প্ররোচক কে ? ৭৬

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
- পল্লীবীর (কবিতা) ৮৪

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
- বোঝা-পড়া (কবিতা) ২২৮
- বাবার কাজ (কবিতা) ২৭১
- জ্যোৎস্নাময়ী " ৩৪২
- সাহিত্য-চর্চ্চার উপায় ৩৯৫
- হলাম নাক' মেয়ে (কবিতা) ৪১৩
- বধূর প্রতি " ৪৬১
- সার্থকতা " ৫০৬

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি, এ,
- মিনতি (কবিতা) ১১
- সাধনা " ৪০
- গান " ৭২
- সেবাহীন " ১০৯
- রাধা " ১৫৪
- বঙ্গবধূ " ২২৩
- স্বপ্নরাণী " ৩২২
- পাখী " ৫৪৮

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী
- স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র ১৬১

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এফ, আর, এইচ, এস,
- আধুলি (গল্প) ২০৩

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এল,
- মর্ম্মবাণী (কবিতা) ৫
- ব্যর্থপ্রেম " ৩১
- মেঘদূত " ৬২
- সন্ধ্যাসঙ্গীত " ১৫৬
- রাঙাগোলাপ " ২৫৫
- কর্ম্মকথা " ২৯৭
- তৃণফুল " ৪২৭

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ
- হিতসাধন ৩১

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস
- পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন ১৮৭, ২১৭
- প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত ৫৪৪

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ
- মায়া ও প্রকৃতি ২৮
- স্মৃতি ৮৫
- মর্ম্মবাণী ১০৬

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,
- সঙ্কলন ২২, ৪৪
- সাহিত্য-সংবাদ ৭১

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ
প্রাচীন প্রসঙ্গ ২১৫, ২২৬, ২৬১, ৩২৩, ৪০৪
৪৯৬, ৫৬০, ৫৭১, ৫৯৭
শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা
আর্য্যদিগের আদি জন্মভূমি ৪৮৬
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ,
আলোচনা ২৪
শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকঙ্কণ
জ্যোতিষ-তত্ব-বিজ্ঞান ৫৬৯
শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম, এ, বি, এল,
শুষ্কপত্র (গল্প) ৫২১
শ্রীশশীভূষণ বিশ্বাস
জন্মাষ্টমী ২০৮
বাঙ্গালা সংবাদপত্রের একাল ২২০
শোভাসিংহের বিদ্রোহ ৩১৮
বিজয়ার প্রণাম (গল্প) ৩২১
শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মাতুরা ২৭৫
শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী
বুদ্ধের মৃত্যু ৫৬১
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক বি, এল,
পথ ৩৩
শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ভারতের ইতিহাসের উপকরণ ও ইতিহাস রচনা ৩৫১
ইতিহাসের রমণীয়তা ও ইতিহাস পাঠের উপকারিতা ৪০৮
শ্রীসরোজনাথ ঘোষ
বিসর্জ্জন (গল্প) ৭৮
শ্রীসাতকড়ি মিত্র
সেকালের কলিকাতা ৯৩
উদ্ভিদের অনুভূতি ১৫২
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার বি, এ,
জৈনমূর্ত্তি ৫১০
শ্রীসুবোধকুমার পাঠক
প্রভাতে (কবিতা) ৫১৫
শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,
রেণু (সমালোচনা) ৭
মৃত্যু ১৮৪
শালগাছ ২০৬
নিয়তি ২১৯
ক্ষণিকা (গল্প) ২৭২
ভাল-মন্দ ২৮৫
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
যুদ্ধে ৩৪৫
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র
বৌদ্ধযুগের মথুরা ১৬৯
প্রসঙ্গ ৩৯০, ৪৫৮, ৫০৬
বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার ইতিহাস ৪২৭
সমালোচনা ৫০৯
শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত
লৌহের শ্রেষ্ঠত্ব ৩০৬
ওঙ্কারের যাত্রী ৩২৭
ওঙ্কারের শিল্প ৪৭১
জাপানি বাণিজ্যশিক্ষা ৫৩৯
শিল্পসম্পদে রাজপুতানা ৫৮৪, ৫৯১
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র
মহম্মদ তকি খাঁ ১১৫
ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাপানিদিগের মত ৩৩৬
প্রাচীন গৌড় ৫১৩

শ্রীসুশীলগোপাল বসু
সমালোচনা ৪
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
অভিসার, মোহভঙ্গ (কবিতা)
শ্রীহরনাথ বসু
পারের ঘাটে (কবিতা) ১
শ্রীহরিচরণ মিত্র
কাণের প্রসঙ্গ ৪
নবাবী আমলের গল্প ৪৮৩, ৫
শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়
সাহিত্য-সংবাদ
শশাঙ্ক (সমালোচনা) ১
শ্রীহরিপদ দে
প্রবাহিণী
ফটিকজল (চিত্র) ১
সন্ধ্যায় (কবিতা) ১
বনফুল " ২০
করুণার জয় (চিত্র) ৩
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়
সোণার চুড়ী (গল্প)
আগ্রার স্বপ্ন (ভ্রমণ কাহিনী)
সমালোচনায় মাসিক সাহিত্য
হৃদয় বর্ষা
জীবন-সংগ্রামে (কবিতা)
বারাণসী
আমার কুঁড়ে (কবিতা) ১
দেবী (গল্প)
তোমার ভুবনে (কবিতা)
বিধবা (গল্প)
সাহিত্যে ব্যভিচার
নিয়তি (গল্প)
নবাবের দেশে
কবির ঘরকন্না (কবিতা)
নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর (সমালোচনা) ৩৯০
পাতাঝরা (কবিতা) ৪২
দুই যাত্রী (কবিতা)
বিবাহ-বিপ্লব (নক্সা)
ললিত কলায় মাতৃমূর্ত্তি
শ্রীহৃষীকেশ মিত্র
স্থাপত্যে গান্ধার ১১৭,
শ্রী—
মঙ্গলাচরণ
আর্ত্তের আবেদন
প্রণয়ের পরিণতি
ভারতীয় ভাষা ১৩৩, ১৫
সাহিত্য সংবাদ ৪৮, ১৪৩, ১৬৮, ১৯২, ২
২৩৯, ৩৭২, ৪৬৮, ৪৯৫, ৫
৫৬৪,
বাঁকীপুরে নাটোরাধিপতির অভ্যর্থনা ২
নিবেদন ২
প্রশ্নোত্তরী ২
আলোচনা ৩৪৭, ৩
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা
'বর্ত্তমানজগৎ' সম্বন্ধে একটি কথা
অরুণা (নাটক) ৫০৩, ৫৩৮, ৫৪৫, ৫
বিবিধ
তিলোত্তমা (কবিতা)

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ১৩ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

মঙ্গলাচরণ

যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাগিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্ নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্ ।

শ্রীভাগবত ৪।৯।৬

যিনি আমার অন্তরে প্রবেশ করিয়া চিৎ-শক্তিবলে আমার প্রসুপ্তা বাণীকে সঞ্জীবিত করিলেন, এবং আমার হস্তচরণত্বগাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে ও প্রাণসকলকে কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিলেন, সেই অখিল শক্তিধর শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম তুমি—তোমায় প্রণাম করিতেছি।

আমাদের বাণী এতাবৎকাল কার্য্যশক্তিহারা হইয়া মৃতবৎ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, হে অখিলশক্তিধর শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম, আজ তুমি তোমার অমোঘ চিৎ-শক্তিবলে সেই মৃতবৎ প্রসুপ্তা বাণীকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিলে, হে দয়াময়! ইহা তোমারই দয়া; তাই আজ ভক্তিভরে তোমার ঐ ভক্তবৎসল শ্রীচরণযুগলে প্রণত হইতেছি। তুমি আমাদের বাণীকে চিরদিন সঞ্জীবিত রাখিও, তুমি আমাদের নয়নকরচরণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে চিরদিন কার্য্যক্ষম রাখিও। তোমারই কৃপাবলে যেন আমাদের বাণী জগতের হিতসাধনব্রতে দীক্ষিত হয়।

মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্বিস্ময়পদম্
মম ত্বেতাং বাণীং গুণ-কথন-পুণ্যেন ভবতঃ
পুণামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথনবুদ্ধির্ব্যবসিতা।

শিবমহিম্নস্তোত্রম্

হে ব্রহ্মন্! তোমার নিজ নিঃশ্বসিত মধুস্ফীত বেদবাণীসমূহ মধুর অপেক্ষাও সুমধুর, সুরগুরু ব্রহ্মার বাক্যও তাহার নিকট কিঞ্চিন্মাত্র আদরাস্পদ নহে। হে পুরমথন, আমার বাক্য যে তোমার চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইবে, আমি এই বুদ্ধিতে তোমার গুণকথনে প্রবৃত্ত হই নাই, আমার অভিপ্রায় যে, তোমার গুণবর্ণনে যে পবিত্রতা আছে, তাহাদ্বারা যেন আমি আমার বাণীকে পবিত্র করিয়া লইতে পারি।

ব্রহ্মন্, পুষ্পদন্তের ন্যায় আমাদেরও এই প্রার্থনা, আমরা যেন তোমার এই বিচিত্রসৃষ্টির ভোগ্য-প্রপঞ্চ ও ভোক্তৃ-প্রপঞ্চের কথা বলিয়া বলিয়া আমাদের **মর্ম্মবাণীকে** পবিত্র করিতে পারি, যেন তোমারই মহীয়সী মহাশক্তির বলে এই মৃতপ্রায় সুষুপ্তা বাণীকে সঞ্জীবিত ও কার্য্যসমর্থ করিয়া তুলিতে পারি এবং তাহার ফলে যেন জগতের হিতসাধনে সমর্থ হই—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

আর্ত্তের আবেদন

জ্ঞানীর মুখে শুনিয়াছি মহাকালকে আশ্রয় করিয়া মহাশূন্যের মহা-অন্ধকারে যুগযুগান্ত ধরিয়া লক্ষকোটি গ্রহ উপগ্রহ নিত্যনিয়ত ঘুরিয়া মরিয়াছে, এবং আজও ঘুরিতেছে। এ ঘোরার অন্ত নাই, নিবৃত্তি নাই, সীমা নাই, শেষ নাই! এই অফুরন্ত দীর্ঘপথে কেন এ অন্তহীন ঘোরা, কি আশায়, কাহার জন্য, কিসের কাঙ্গাল হইয়া, কাহার কাছে হাত পাতিয়া, এই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরা-কে জানে? যে ঘোরায় হয়ত সেই জানে। বুঝি বা বিষম অন্ধকারে পথ দেখিতে পায় না, তাই একটুখানি আলোর কাঙ্গাল হইয়া বার বার ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারই দ্বারে আসে, যে আলো দিয়া এ দীর্ঘ পথের ঘনান্ধকার উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারে। জানি না অতি বৃহৎ সৌর-মণ্ডলের বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র, শশী সূর্য্যের কি অভাব, জানি না, সে অভাবজনিত দুঃখের মর্ম্মবাণী তাহারা তাহাদের অন্তবিহীন নৃত্যচ্ছন্দের তালে তালে সর্ব্ব-অভাব-মোচনকারীর চরণ-তলে কেমন করিয়া পঁহুছাইয়া দেয়!

আমি সেই অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রহবাসী, অশরণ অসহায় নিরাশ্রয় জীব, আমারও পথ অফুরন্ত, আমারও পথ আজ অন্ধকার! সেই অন্ধকারে অফুরন্ত দীর্ঘপথ বাহিয়া চলিয়াছি, কণ্টককঙ্করময় বন্ধুর পথের আজও সীমারেখা ত দেখিতে পাইলাম না, সূচীভেদ্য অন্ধকার পথে অন্ধের মত হাতড়াইয়া চলিয়াছি, আমার সকল আঁধার উজল-করা মণিদীপখানি কোথায় তাহা জানি, একবার বুঝি তাহার আনন্দময় স্নিগ্ধ জ্যোতি চক্ষেও দেখিয়াছি, সেই আলোক-বর্ত্তিকা আমার শেষ বিশ্রাম কোথায় তাহারও আভাস আমায় বুঝি দিয়াছিল, সেই আনন্দালোক-উদ্ভাসিত পথে যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলাম, কোথা হইতে নির্ম্মম নৃত্যপরা কাল-বৈশাখী আসিয়া চিরবঞ্চিত উপায়হীন কাঙ্গালের সুখ-কল্পনার সুবর্ণ-সৌধ ধূলায় ফেলিয়া দিয়া গেল, দিগ্‌ভ্রান্ত নৌযাত্রীর ধ্রুব-নক্ষত্রের অমলিন স্থির জ্যোতিটুকু কোন্ আঁধারে মিশাইয়া গেল; হায়, তা ত জানি না। আজ যে আর পথ দেখিতে পাই না! ওগো তুমি কোথায়, তুমি কোথায়! কোন্ দুরারোহ শিখরীর কোন্ অজ্ঞাত শিখরে, কোন্ অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালপুরে, কোন্ নির্ঝরিণী-পরিবেষ্টিত পল্লীনিকেতনের শ্যামায়মান তটতরুর স্নিগ্ধচ্ছায়ায়, কোন্ দুর্ভেদ্য প্রাকার-পরিবেষ্টিত পাষাণ-মন্দিরের মর্ম্মর-বেদিকায় বসিয়াছ, জানিবার উপায় নাই। এ চতুর্দ্দশ ভুবনে কোথায় তোমার বসতি, তাহা জানি না এবং জল স্থল অন্তরীক্ষ কোথায় আছ সে কথা আমায় কেহ বলিয়া দিতে পারে না। কেবল অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে অস্খলিত, অভ্রান্ত, অশরীরী বাণী আমায় বলিয়া দিতেছে যে, তুমি আমার বিশ্ব জুড়িয়াই আছ। নিদাঘের মলয়-সম্পৃক্ত মৃদু সান্ধ্য সমীরণে তুমি বিরাজমান, প্রাবৃটের শ্যাম শোভাময় জলদজালের স্নিগ্ধতায় তুমি বিরাজিত, সুনির্ম্মল শরতের সন্ধ্যাকাশের বিচিত্র বর্ণবিভায় তুমি বর্ত্তমান, নব বসন্তের প্রভাতারুণ-স্পর্শে স্ফুটনোন্মুখ অরবিন্দের অপূর্ব্ব লাবণ্যের মধ্যে তোমার চিরনিবাস, শিশিরাশ্রুসিক্ত শারদ শেফালির অপরূপ সুষমায় তোমায় দেখিতে পাই, কিন্তু হায় সে দেখায় তৃপ্তি যে পাই না। হে নয়নাতীত, হে মায়ামোহের একান্ত অতীত, হে আমার নির্লিপ্ত নিরাসক্ত চিরমুক্ত বৈরাগী, তোমার ত কাহাকেও প্রয়োজন নাই, কিছুই তোমার আবশ্যক নাই; কিন্তু তোমাকেই কেন্দ্র করিয়া জন্মজন্মান্ত ধরিয়া দুঃখ-সুখের যে অফুরন্ত লীলা বহিয়া চলিয়াছে সে লীলার অবসানের জন্য, যুগযুগান্তের অনির্ব্বাণ দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরমা নিবৃত্তির জন্য, তোমার রাতুল চরণে প্রাণের অবিচ্ছেদ মিলনের জন্য—ওগো এই অন্ধকারে, এই হিমানী-সঞ্জাত-বিদ্রুত ভয়সঙ্কুল, নিবিড় সূচীভেদ্য অন্ধকারে, পথ চলিবার জন্য তোমার রত্নপ্রদীপটি তুলিয়া ধর, অনন্যশরণকে পথ বলিয়া দাও, এ প্রাণস্পন্দনহীন বার্ত্তাবিহীন, চিরান্ধকারে ডুবিয়া আমার নিঃশ্বাস যে রুদ্ধ হইয়া যায় গো!

ওগো বিশ্ব-বিমোহন, ওগো আমার চির মনোমোহন, ওগো আমার হৃৎপদ্মের চিরভাস্বর ভাস্কর, তুমি ত মায়ামোহের পরপারে, কিন্তু চরণলগ্ন চিরাশ্রিতকে দুই পায়ে ঠেলিয়া দিলে সে তার মিলনাকাঙ্ক্ষী, জন্ম-জন্মান্তের চির-উপবাসী অন্তরকে কেমন করিয়া শান্ত করিবে, কি দিয়া সান্ত্বনা দিবে, বলিয়া দাও। ওগো এ মেঘ-দুর্দ্দিন জীবনে বসন্তের কলকণ্ঠ পিক যে তুমিই, এ তৃণহীন দগ্ধমরুর হৃদয়ক্ষেত্রে নন্দন-মালঞ্চ যে তুমিই বসাইয়াছ, এ চির অন্ধকারে স্থিরজ্যোতি মণিদীপ-খানি যে তুমিই জ্বালিয়াছ, আজ অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত-দীপ ঘনান্ধকারে, বায়ুবার্ত্তাবিহীন অন্ধ গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইলে সব যে অচল হইয়া উঠে, শ্বাস যে রুদ্ধ হইয়া যায়, ওগো, চলিবার পথ বলিয়া দাও, কোনমতে পথ চলিয়া বৈতরণীর তীরে গিয়া দাঁড়াইতে দাও, সে দুর্দ্দিনের শুভ মুহূর্ত্তে, সেই জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে সেই মৃত্যু-মহোৎসবের আনন্দ-মুহূর্ত্তেই, সেই ইহ-পরলোকের সীমান্তে দাঁড়াইয়া যখন আর্ত্তকণ্ঠে তোমায় ডাকিব তখন তোমার খেয়া পারের নৌকাখানিতে কর্ণধার হইয়া বসিও হে নাবিক, সে দিন আমার এ জীর্ণ বোঝা, আমার এ অনাবশ্যক ভার পরপারে পঁহুছাইয়া দিও—সেদিন যেন বাধাবিহীন মিলন-মন্দিরে, বাসর-বাতির স্নিগ্ধালোকে, হৃদি-নন্দনের গন্ধামোদে, চিরাকাঙ্ক্ষিত "মুখ-চন্দ্রিকা" সুসম্পন্ন হইয়া যায়। হে আমার চিরারাধ্য দেবতা, এ মহাশূন্যে

সোণার স্বপন তুমিই সৃজন করিয়াছ, এ অন্ধকারের অনির্ব্বাণ সোহাগ-প্রদীপ তুমিই জ্বালিয়াছ, এ ঊষর ভূমির মরুমালঞ্চ তোমারই স্নেহধারবর্ষণে প্রাণ পাইয়াছে, এ শুষ্ক শাখার মল্লিমালতী তোমারই যাদুমন্ত্রে মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে, এ অন্ধ নয়নে অমৃতাঞ্জন তুমিই পরাইয়া দিয়াছ, হাটের পশরা মাথায় তুলিয়া দিয়া তুমিই আমায় "বিকিকিনি" করিতে আদেশ দিয়াছ, সব লীলা যে তোমারই, হে লীলাময়! হে প্রিয়, হে আমার পরম প্রিয়, হে আসক্ত, হে অনাসক্ত, হে অনুরাগি, হে বৈরাগি, এ আরব্ধলীলা যে তোমাকেই শেষ করিতে হইবে, তাহার পরম পরিণতি তোমাকেই দিতে হইবে। হে আমার পরম দেবতা, দুঃখ সুখ, হর্ষ শোক, বিষ অমৃত, কুসুম কণ্টক, সকলেরই মধ্য দিয়া অন্ধকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইতে তোমাকেই যে হইবে; এ দুস্তর দুঃখবারিধি, এ অসীম অন্ধকারের পাথার পার করিতে তোমা ভিন্ন আর যে কেহ নাই! হে আমার গতিমুক্তিদাতা, হে আমার অদৃষ্ট-বিধাতা, তোমার কর্ত্তব্য তুমি ত বিস্মৃত হও না, তোমার ন্যায়বিচারে অবিচারের কলঙ্ক-স্পর্শ ত কোন দিন করে না, হে করুণা-নিদান, তোমার করুণায় অন্ধ আতুর কেহই ত কোন দিন বঞ্চিত হয় নাই, সেই একমাত্র আশাই আজ এ উপায়হীন আর্ত্তের একমাত্র অবলম্বন, তাই এ ভ্রষ্ট নষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত অন্ধ আজ বিষম অন্ধকারে পথ হারাইয়া বড় কাতরে তোমায় ডাকিতেছে, এস ওগো, এস, তোমার করুণ বাহু বাড়াইয়া এ নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, এ অন্ধের অন্ধকার-পথ তোমার মণিদীপের দীপ্তালোকে উদ্ভাসিত করিয়া তোল, হে দয়ানিদান!

শারদ সূর্য্যাস্তের পশ্চিমাকাশের মত জীবনের প্রথম বাসন্তী মুহূর্ত্তে এক শুভসন্ধ্যায় তোমারই মধুরালোকের অপূর্ব্ব পুলকে আমার হৃদয়গগন একদিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জীবনস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া সে অমলিন মণিদীপ-দীপ্তি হইতে সুদূরে সরিয়া গিয়াছিলাম, তারপর এই বিচিত্র ধরণীর বৈচিত্র্যময় ব্যাপারের মধ্য দিয়া সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কি প্রাণপণ আশায় ও বিপুল আশ্বাসের বলে আবার তোমার করুণ চরণের সুশীতল ছায়ায় শরণ লইয়াছিলাম, তাহা হে আমার সর্ব্বজ্ঞ, তুমি সবই জান। কত সুখ, কত দুঃখ, কত আশা, কত নিরাশা, কত পতন, কত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া, হে জগজ্জ্যোতি, তোমারই জ্যোতি লক্ষ্য করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছি। সমাগতপ্রায় রজনীর অন্ধকার অঞ্চলতলে চিরদিনের জন্য এ চক্ষুর নিমেষপাত হইবার পূর্ব্বে, হে জগজ্জীবন, তোমারই পাদপীঠতলে এ জীবনের পরম পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে, তোমার করুণার অনির্ব্বাণ স্নিগ্ধ জ্যোতি আমার জীবন-গোধূলিকে আরাত্রিকের পঞ্চপ্রদীপালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, এ আশ্বাস, এ বরাভয় যে আমি পুনঃ পুনঃ পাইয়াছিলাম! জন্ম-জন্মের সেই আকাঙ্ক্ষা ও আশা যে আমার বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে বাসা বাঁধিয়াছে। হে আমার দিনযামিনীর অন্তর্যামী, ইহাকে উৎখাতমূল করিবার সাধ্য আমার নাই, তোমারও কি আছে?

হে আমার চিরদিনের বিচারপতি, অনন্যশরণের সব ভার তোমারই হাতে, সুবিচার করিও, দয়া করিও। সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসানে আনন্দলগ্ন আসিবেই, আকাঙ্ক্ষিত চরণাশ্রয়লাভে দুঃসহ দুঃখ-রোদনের চিরনিবৃত্তি হইবেই, এ আশা কি নিতান্তই দুরাশা? হয় হউক দুরাশা, তথাপি তাহাকেই বক্ষে চাপিয়া এ দুস্তর অশ্রুসাগর সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, নতুবা হে জগদানন্দ, এ "আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ" অবস্থায় নিঃশ্বাস যে রুদ্ধ হইয়া যায়।

যাহা ধ্রুব, যাহা সত্য, যাহা চিরন্তন তাহা একদিন স্বপ্রকাশ হইয়া দেখা দিবার বল পাইবেই,—হে আমার চিরানন্দ, তোমার চরণারবিন্দে আমার হৃৎপদ্মের সাযুজ্য কোন প্রকারেই নিবারিত হইতে পারিবে না। আমার চিরমুগ্ধ মানস-মধুকর তোমার চরণকমলের সুধাস্বাদলোভে তোমারই পাদপীঠ সন্নিধানে মত্ত গুঞ্জনে বারবার ঘুরিয়া আসিবে, নতুবা হে প্রিয়, হে চির-সুন্দর, হে জগন্মনোমোহন, এ-জীবন-রহস্যের সমাধান যে আর কোন প্রকারেই হয় না এবং হইতে পারে না।

শ্রী—

সূচনা

শ্রীভগবানের পুণ্যনাম স্মরণ করিয়া আজ আমরা আমাদের ‘মর্ম্মবাণী’ লইয়া বাগ্দেবীর মন্দির দ্বারে ভক্তিভরে উপস্থিত হইলাম। কেন উপস্থিত হইলাম, সে কথা খুলিয়া বলিবার অবসর এখনও হয় নাই,—অনুগ্রাহক পাঠকবর্গের নিকট কার্য্যে সে উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব। এখানে কেবল এইমাত্র বলিয়া রাখি যে. আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া দেশের এই দুর্দ্দিনে এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই—ইহা অতি সত্য কথা। যে অশেষ কল্যাণগুণময় নিখিলশক্তিনিলয় বিশ্বনিয়ন্তার প্রেরণা ব্যতিরেকে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটি পরমাণুও বিকম্পিত হইতে সমর্থ হয় না ; সেই বিশ্বান্তর্যামী পুরুষোত্তমেরই পরিস্ফুট প্রেরণায় আমরা আমাদের এই ‘মর্ম্মবাণী’-প্রকাশের পুণ্যব্রত গ্রহণ করিলাম। কর্ম্মে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু, ফল মানব-প্রযত্নের আয়ত্ত নহে,—আমরা কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি, কর্ম্মপথে বিচরণ করিব—কর্ম্ম করিব—ইহাই আমাদের অধিকার। আমরা ফলাসঙ্গবর্জ্জিত কর্ম্মে তাঁহার যে প্রেরণা, যে ইঙ্গিত, তাঁহার আদেশের যে নিদর্শন পাইয়াছি,—সেই করুণাময়ের কৃপাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ‘মর্ম্মবাণী’ প্রকটনরূপ কর্ম্মভার গ্রহণ করিতেছি।

এই নবপ্রবর্ত্তিত পত্রিকা “মর্ম্মবাণী” নামে অভিহিত হইল কেন ? বাণী—বাক্—বাগ্দেবী—সরস্বতী—এই চিরগৌরবার্হ শব্দের সহিত সমগ্র জ্ঞানবৈভবের যে বিশাল ভাব বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ঋগ্বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। ঋগ্বেদেও স্থানে স্থানে আমরা এই শব্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখিতে পাই [১।১৬৪।২৪ ; ৯।১০৩।৩ প্রভৃতি ঋক্ দ্রষ্টব্য]।

তৎপরবর্ত্তী গ্রন্থনিচয়ে আর্য্যগণের এই পবিত্রতাপূর্ণ জ্ঞানৈশ্বর্য্যের বিপুল ভাণ্ডারবিদ্যোতক শব্দের বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। আমরা আর্য্যগণের চিরগৌরবার্হ এই “বাণী” শব্দটীকে মন্ত্রশক্ত্যাত্মক বলিয়াই বিশ্বাস করি। এই শব্দটী ভারতীয় আর্য্যগণের হৃদয়ে যে বিপুল ভাবসমুদ্রের তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও উপাসনাশক্তিসমূহকে জাগাইয়া তুলিত, আমরা তাহারই স্মরণে, মননে ও অনুধ্যানে এই শব্দটীকেই পত্রিকার নামরূপে গ্রহণ করিলাম। সকল শক্তির আশ্রয়-ভূমি—সমগ্র শক্তির গূঢ় গভীর নিলয়—‘মর্ম্ম’ হইতেই সমগ্র শক্তির স্ফুরণ, বিকাশ ও বিবর্দ্ধন সংঘটিত হয়। মর্ম্মের বাণীই প্রকৃতপক্ষে শক্তিময়ী বাণী। যে বাণী মর্ম্ম হইতে স্ফুরিত হয়, মর্ম্ম হইতে শক্তিসহ বহির্নিষ্ক্রান্ত হয়, অপর হৃদয়ে তাহার প্রতিধ্বনি অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য—মর্ম্মবাণী সর্ব্বত্রই মর্ম্মস্পর্শী। এই সকল কারণে আমরা ‘মর্ম্মবাণী’ নামেরই পক্ষপাতী।

সুসাহিত্যের পুষ্টির জন্য, জ্ঞান ও সত্যের প্রচারের জন্য, সুনীতির উপচয়ের জন্য, সুরুচির উৎকর্ষসাধনের জন্য যে চেষ্টা, তাহাই সাহিত্যসেবা। সেই সেবাদ্বারা মনুষ্যত্বলাভের পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে। যাহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যায়, এই সেবাদ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে। সাহিত্যের উৎকর্ষ হইলে সমাজের মঙ্গল হইবে, দেশের ও দশের কল্যাণ হইবে। এই মহান্ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা ‘মর্ম্মবাণী’-প্রচারে অগ্রসর হইলাম। ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা সমাজের উন্নতিসাধন মর্ম্মবাণীর প্রধানতম উদ্দেশ্য। দেশের বিশেষজ্ঞ সুপণ্ডিত সুলেখকগণ আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের সহায় হইবেন, আমরা স্পষ্টতঃ সে ভরসা প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্যক্তিগত, সমাজগত, ধর্ম্মসম্প্রদায়গত কোনও বাদ-বিবাদের প্রশ্রয় দিয়া সঙ্কীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর গোলযোগে যাহাতে আপতিত হইতে না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। রাজনীতির দলাদলির সহিত ‘মর্ম্মবাণীর’ কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। যাহাতে বাঙ্গালার সর্ব্বসাধারণ জগতের আধুনিক চিন্তাধারা ও ভাবরাজ্যের সহিত সুপরিচিত হইতে পারে, আমরা তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকিব। বিংশ শতাব্দীর এই উন্নত সভ্যতার যুগে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত পরিচয়সাধন না হইলে আধুনিক মানবের জীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় ; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনের যে ধারা চলিয়াছে, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের জীবনেই তাহার প্রভাব অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হইতেছে। তাই কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, আমাদের বর্ত্তমান যুগ, সার্ব্ববর্ণিক যুগ। এই অপূর্ব্ব বিচিত্র যুগের যাহা বিশেষত্ব, যাহা সার কথা, যাহা জাগতিক বুধমণ্ডলীর চিন্তার বস্তু, যাহা মনকে উন্নত করে, হৃদয়কে প্রশস্ত করে, চরিত্রকে সবল করে, জীবনকে উদার করে, আমাদের মর্ম্মবাণীর ভিতরে পাঠকেরা তাহার সন্ধান পাইবেন। ‘মর্ম্মবাণী’ শুধু আমাদের ‘মর্ম্মবাণী’ বা পাঠকদের মর্ম্মবাণী হইবে না ; তাহা বিশ্বের মর্ম্মবাণী হইবে। ফলতঃ মর্ম্মবাণী অনেক নূতন কথা, নূতন তথ্য ও নূতন বিষয়ের সংবাদ দিতে সচেষ্ট থাকিবে।

তবে কেবল গুরুবিষয় লইয়া মানুষের প্রাণ ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না ! বিশ্বের বাণী, পণ্ডিতের চিন্তা ও জ্ঞানের বৈচিত্র্য আমাদের জ্ঞাতব্য হইলেও সকল সময়ে তাহাই উপভোগ্য নহে। এজন্য আমরা মর্ম্মবাণীর পাঠকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য লঘু সাহিত্যেরও ব্যবস্থা করিয়াছি। যাহাতে সকল শ্রেণীর পাঠকবর্গ গল্প, কবিতা, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও সমালোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সকল পাঠ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান ও বিমল আনন্দলাভ করিতে পারেন, মর্ম্মবাণী যাহাতে প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকগণের মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে, তৎপক্ষে প্রযত্ন ও প্রয়াসের কোনও ত্রুটী করা হইবে না। ইহাতে প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির ন্যায় প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইবে, অথচ সাহিত্য-রসপিপাসু পাঠকগণকে তজ্জন্য মাসাধিককাল ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। মর্ম্মবাণী প্রতিসপ্তাহেই তাঁহাদের নিকট চিত্তাকর্ষিণী মর্ম্মস্পর্শিনী মনোমদ ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিবে। ইহাতে সরলভাবে সারগর্ভ বিষয়েরই আলোচনা করা হইবে ; ফলতঃ মর্ম্মবাণী যাহাতে পাঠকমাত্রেরই প্রীতিপদ হয়, সে দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে।

মর্ম্মবাণীর নূতনত্ববিধানের জন্য যে সকল আয়োজন করা হইয়াছে, তাহার দীর্ঘ তালিকা দিয়া এই সূচনাটিকে প্রলোভনপূর্ণ বিজ্ঞাপনে পরিণত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সূচনায় আমাদের কার্য্যপন্থা কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই সূচিত করিলাম। “ফলেন পরিচীয়তে।” গ্রাহক ও পাঠকবর্গের মনঃপূত হইলে, ‘মর্ম্মবাণী’—বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, নতুবা ইহার বিসর্জ্জন কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

মর্ম্মবাণী

১

শ্যামল পত্র পুষ্পভূষণা
দিব্য শোভনা ধরা,
শান্ত সুনীল অসীম আকাশ
দীপ্ত আলোক-ভরা,
নব নব শোভা করিয়া চয়ন
যতনে গাঁথিয়া হার—
আসে প্রতিদিন মানবের দ্বারে
সঁপিতে অর্ঘ্যভার।
তবুও ক্ষুদ্র মানুষের মন
নিত্য কাঁদিয়া কহে—
“আমি চাহি যাহা চিরসুন্দর,
—এ নহে, এ নহে, নহে।”

২

বিশ্ব-বীণার অগণিত তারে
কত বিচিত্র সুর,
দিবসে-নিশীথে উঠে শত গীতে
ঝঙ্কারি’ সুমধুর।
সিন্ধুর চির কল্লোল-গাথা,
নির্ঝর-কলতান,
ঘন অটবীর মর্ম্মর-রব,
বন-বিহগের গান।
সঙ্গীতময়ী ধরণীর মাঝে
মানব-চিত্ত কহে—
“কোথা সেই সুর অমৃত-মধুর
—এ নহে, এ নহে, নহে।”

৩

চির অতৃপ্ত মানব-হৃদয়ে
চির-অপূর্ণ আশা,
প্রকাশিতে তারে চিরদিন সে যে
খুঁজিয়া ফিরিছে ভাষা।
তাই যুগে যুগে কতনা ছন্দে
কতনা কাব্যছলে,
চাহে সে ফুটাতে যে বাণী নীরবে
ধ্বনিছে মর্ম্মতলে।
নিষ্ফল, হায়, সকল প্রয়াস ;
অশান্ত হিয়া কহে—
“মর্ম্মের বাণী মরমেই ফুটে,
—এ নহে, এ নহে, নহে।”

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

নাট্যোল্লিখিত জন্তুগণ।

পুরুষগণ।

বানর মহারাজা।
মহিষ মহারাজা।
কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায় ... জনৈক মধ্যবিত্ত বনস্থ।
সূক্ষ্মলোম মেষোপাধ্যায় ... কৃষ্ণলোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায় ... কৃষ্ণলোমের প্রতিবেশী।
শৃগাল ভট্টাচার্য্য ... ... কৃষ্ণলোমের কুলপুরোহিত।
নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায় ... সূক্ষ্মলোমের বন্ধু।
স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায় ... বনান্তরবাসী ভদ্রজন্তু।
ভোলা গর্দ্দভ ... ... স্থূলপুচ্ছের ভৃত্য।

স্ত্রীগণ।

গাঢ়লোমা ... ... স্থূলপুচ্ছের পত্নী।
শ্বেতলোমা ... ... ঐ কন্যা।

বানর-সভাপণ্ডিত, বানরসেনাপতি, বানরমন্ত্রী, মহিষমন্ত্রী, সভাসদ্ ও পাত্রগণ, সৈন্যগণ, প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বন।

তৃণচর্ব্বণরত কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায় দণ্ডায়মান।
ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায়ের প্রবেশ।

কৃষ্ণলোম। বন্ধু, কোথা যাও ?

ঋজুশৃঙ্গ। কেও, কৃষ্ণদাদা নাকি ?
নমস্কার। যাব বহুদূর। আজি ভাই
মনে করিয়াছি, বড় ঝরণার জল
আসিব করিয়া পান। সকলেই বলে
সেই জল স্বচ্ছ অতি, নিতান্ত নির্ম্মল,
যত সুশীতল, তত নাকি স্বাস্থ্যকর।
যাবে ত চল না—বল দাঁড়াইব ?

কৃ। ভাই
মোরা বৃদ্ধ, অত সখ্ রাখিবার মত
শক্তি নাই, অবকাশ নাই। সংসারের
যাহা না করিব আমি, তাহাই হবে না।

গৃহিণীর বহুকাল কাল হইয়াছে।
ছেলে দুটি—ছোটটি ত শিশু ; বড় ছেলে
নব্য সভ্য ফুলবাবু। এতটুকু ধূলা
পুচ্ছে যদি লাগিল তাহার, লাফাইয়া
চেঁচাইয়া অনর্থ সে করে। সংসারের
কিছুই দেখে না ; মত্ত শুধু তাস পাশা
গীতবাদ্য লয়ে। আমি না থাকিলে বাড়ী
দুই দণ্ড চলেনাক ভাই।

ঋজু। কিন্তু দাদা,
পুত্রটি তোমার অতি বিনয়ী, সরল,
বুদ্ধিমান, খাসা তার কথাবার্ত্তাগুলি।
আজিকার দিনে এমন বিনয়ী ছেলে
দেখা নাহি যায়।

কৃষ্ণ। কিছু না কিছু না ভাই—
তোমাদের আশীর্ব্বাদ।—ভাল, এক কথা
মনে পড়ে গেল, বড় ঝরণার কাছে
বাস করে আমাদের জাতি-ঘর এক-
জনা, স্থূলপুচ্ছ নাম। তার কন্যাটির
সাথে, আমার ছেলের বিবাহের কথা
হইতেছে। তুমি যদি একবার ভাই
মেয়েটারে দেখে এস, বড় উপকার
হয় তবে। আমি আর এ বৃদ্ধ বয়সে
ছুটিতে হাঁটিতে নাহি পারি।

ঋজু। আ-হা-হা-হা
তার জন্য কেন এত অনুরোধ করা ?
অবশ্য আসিব দেখে ; এটা কি আবার
বড়-কায হল ? বড় উপকার ? হা হা (হাস্য (

কৃষ্ণ। আমি জানি ভাই, তুমি পর-উপকারী,
বিচক্ষণ, অতি যোগ্য লোক। তোমা পরে
ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হলেম। আর শুন—
(এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, নিম্নস্বরে)
শুনিয়াছি বেয়াইয়ের হাতে কিছু আছে—
জামাতা হইবে তার উত্তরাধিকারী—
সে গুজব সত্য কি না, গোপনে গোপনে
একবার লইও সন্ধান।
(স্বর তুলিয়া)
তাহা যদি
সত্য হয়, মেয়েটি তেমন সুশ্রী নাহি
হইলেও চলিবে রে দাদা। রূপ নিয়ে
কি কাযে লাগিবে বল ? আখেরটা ভাবা
নিতান্ত উচিত।

ঋজু। আহা, সে কথায় আর
সন্দেহ কি ? দাদা, বেলা হল, তবে আসি।
নমস্কার।

কৃষ্ণ। এস ভাই, এস, নমস্কার।
(দুই ভিন্নদিকে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পার্ব্বত্য ভূমি।

বাটীর সম্মুখভাগ। স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায় আসীন।
অদূরে শ্বেতলোমা ফড়িং লইয়া খেলা করিতেছে।

স্থূলপুচ্ছ। ওরে শিতি—কোথা গেলি ?

শ্বেতলোমা। কি বাবা ? কেন গা ?

স্থূল। এখনও কি তোর কিছু বুদ্ধি জন্মিল না ?
মাঠে মাঠে পথে ঘাটে সারাদিন শুধু
ছুটে ছুটে খেলিয়ে বেড়াস ? গৃহস্থালী
কাযকর্ম্ম হবে না শিখিতে ? আজ বাদে
কাল তোরে শ্বশুরের ঘরে যেতে হবে।
রান্নাবান্না কিছু কিছু শিখে টিখে নে।
কাল থেকে ওঁর কাছে—

শ্বেত। কেন বাবা, আমি
রান্না করা রোজই শিখিতেছি।

স্থূল। বলিস্ কি ?
আচ্ছা নাম কর কি কি শিখেছিস্।

শ্বেত। দুধ
জাল দিতে পারি।

স্থূল। এক।

শ্বেত। ঘাস-পিঠা
রাঁধিতে শিখেছি।

স্থূল। দুই।

শ্বেত। তেঁতুল পাতার
চাটনি করিতে জানি।

স্থূল। তিন।

শ্বেত। কচি কচি
কুলপাতা বেটে তার বড়া ভাজিতেও
পারি।

স্থূল। চার।

শ্বেত। মহুয়ার কাঁচা কাঁচা ফলে
দাল্না রাঁধিতে জানি।

স্থূল। পাঁচ।

শ্বেত। আর কিছু
শিখিনি এখনও। বলেছেন মা, পদ্মের
বীচির পোলাও রাঁধা দিবেন শিখায়ে।

স্থূল। (আহ্লাদে কন্যার পিঠ চাপড়াইয়া)
বেশ বেশ—এত রান্না শিতুমণি তুই
শিখে ফেলেছিস্ ? আচ্ছা একদিন তোর
পরীক্ষাটা হবে। ঐ কে আসিছে বুঝি—
যা তুই ভিতরে।
(শ্বেতলোমার প্রস্থান)

ঋজুশৃঙ্গের প্রবেশ।

ঋজু। স্থূলপুচ্ছ মহাশয়ের
এইটি কি বাড়ী ?

স্থূল। হাঁ—কেন মহাশয় ?

ঋজু। স্থূলপুচ্ছ বাবু কোথা ?

স্থূল। আমারই ত নাম।
কোথা হতে আসা হইতেছে মহাশয় ?
প্রয়োজন কিবা ?

ঋজু। নমস্কার।

স্থূল। নমস্কার।

ঋজু। আমার পরম বন্ধু কৃষ্ণলোম বাবু
পাঠাইয়া দিয়াছেন মোরে, আপনার
কন্যারে দেখিতে—তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রটির
সাথে যার বিবাহের কথা হইতেছে।

স্থূল। (গাত্রোত্থান করিয়া)
বটে ! বটে ! ভাল—ভাল। আসুন আসুন।
বস্‌তে আজ্ঞা হৌক ঐ পাথরখানায় !
ওরে ভোলা, কোথা গেলি ? শীঘ্র গাড়ু ভরে
পা ধোবার জল নিয়ে আয়—গামছা খানা—
(ভোলা গর্দ্দভের প্রবেশ ও প্রস্থান)
তার পর মহাশয়, ভাল ত আছেন ?
ভাল আছে ছেলে-পিলে সব ? কৃষ্ণলোম
বাবু, সূক্ষ্মলোম বাবাজীউ, সকলের
মঙ্গল ত ?

ঋজু। আজ্ঞে হাঁ—তা সকল মঙ্গল
আপনার আশীর্ব্বাদে।

(ভোলা গর্দ্দভের গাড়ু ও গামছা লইয়া প্রবেশ)

স্থূল। জল আনিয়াছ ?
দাও—এইদিকে আন।
(গাড়ু লইয়া পদপ্রক্ষালন)

স্থূল। (জনান্তিকে ভৃত্যের প্রতি)
ওরে ভোলা শোন্—
চট্ করে গিন্নীকে বলে আয় গিয়ে
শিতুকে তারা দেখিতে এসেছে। গহনা
টহনা পরাইয়া প্রস্তুত যেন রাখে।

ভোলা। এজ্ঞে।

স্থূল। আর জলখাবারের বেশ ভাল
করে আয়োজন হয়, বুঝেছিস্ ?

ভোলা। এজ্ঞে। (প্রস্থান)

ঋজু। (গামছায় পা মুছিতে মুছিতে)
আঃ—পা চারিটা ধুয়ে বড়ই আরাম
পাওয়া গেল।

স্থূল। আহা, বড় কষ্ট হইয়াছে।
আসুন—আসুন—যাই বাড়ীর ভিতর,—
এইদিকে—থাক্ থাক্ গাড়ু ঐখানে।
(উভয়ের প্রস্থান)

ক্রমশঃ

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা।

রেণু *

(সমালোচনা)

সাহিত্যক্ষেত্রে রমণীর অধিকার কতখানি ও সে অধিকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাহা লইয়া কেহ বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তবে এ আলোচনার দিন আসিয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে সাহিত্যে লেখিকার অভাব, তাহার নানাদিক্ অসম্পূর্ণ থাকাই সম্ভব।

ইংরেজি সাহিত্যে লেখিকার অভাব নাই, সমাজ তাহাদের সুবিধা দিয়াছে, সাহিত্যচর্চ্চার পথে আমাদের দেশের লেখিকার চেয়ে তাঁহাদের বিঘ্ন অনেক কম। যে স্বাধীনতার সহিত উন্নতির পথে আপনাদের পরিচালিত করিতে সমর্থ, আমাদের দেশের মহিলারা তাহা পারেন না ; সুতরাং তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র বলিয়া মানিতে হইবে।

তবুও বঙ্গদেশের মহিলাদের সাহিত্য-চর্চ্চার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমাদের অন্তরে শুধু নিরাশাই পুঞ্জিত হইয়া উঠে না। প্রাচীনাদের কথা আমরা বলি না, আধুনিক যুগে যে সকল মহিলা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের রচনা পড়িলে মনে হয় আমাদের সাহিত্যে একটা নূতন শক্তি দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক যুগ তাহার শিক্ষা ও সভ্যতায় মণ্ডিত করিয়া বঙ্গরমণীকে যে পদে উন্নীত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, আমাদের দেশে এলিজাবেথ ব্রাউনিং বা জর্জ্জ এলিয়টের আবির্ভাব অসম্ভব নয়।

আজ বঙ্গলেখিকার স্থান কোন্‌খানে, তাহার কতকটা আলোচনা করিবার জন্য পাঠক-সমাজে একখানি গ্রন্থের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানি নূতন নয় ; অনেকেই তাহা পাঠ করিয়াছেন। বঙ্গদেশে কবিতাপুস্তকের বড় একটা কাটতি হয় না। এ গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। ইহার আদর আছে। তবুও ইহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা সাধারণের নিকট পরিস্ফুট করিতে চাই। গ্রন্থটিতে কতকগুলি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই চতুর্দ্দশপদী।

আজকাল আমরা কথা কই ইংরেজিতে, ভাবি ইংরেজিতে। প্রাণের কথাটি সরলভাবে প্রকাশ করিতে গেলেও তাহার মধ্যে জাতীয়তার লেশটুকু থাকে না। কিন্তু এই গ্রন্থখানি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় ইহা বঙ্গরমণীর রচনা। গ্রন্থকর্ত্রী ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াও তিনি আপনার স্বাতন্ত্র্য ইহার মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এ স্বাতন্ত্র্য বঙ্গরমণীর স্বাতন্ত্র্য—কোমলতা ইহার প্রধান উপাদান, ভক্তি ও প্রেম ইহার আভরণ, মিলনের আনন্দ ও বিরহের দুঃখ ইহার প্রাণ। পুত্রের জন্য মাতার আত্মত্যাগে, পতির দুঃখে পত্নীর আকুলতায়, পাপীর জন্য খৃষ্টের আত্মবিসর্জ্জনে যে স্বাতন্ত্র্য, এ স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি তাহারই অনুরূপ।

আরম্ভে গ্রন্থকর্ত্রীর মনে হয়—তাঁহার অস্পষ্ট আশ্বাস-বাণী সকলকে শুনাইতে যাওয়া দুরাশামাত্র। কবি ধ্যানতঃ বিরহাকুল। আত্মাভিমান তাঁহার নাই, আত্মবিসর্জ্জন করিয়াই তিনি সুখী ; মরণেই তিনি আপনার জীবনী-শক্তি অনুভব করেন।

মৃত্যুশোক কবিকে কাব্য লিখিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কয়টি কবিতায় যে দুঃখ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা পরিণত ; নূতন শোকের আকুলতা বা উচ্ছ্বাস এখানে নাই। কবি শান্ত, তিনি বলিতে চান—

---

* কাব্যগ্রন্থ, দ্বিতীয় সংস্করণ, গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, প্রকাশক—দি ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং হাউস, মূল্য এক টাকা।

অশান্ত একাগ্র চিত্তে নিশ্চল সাধনা
শীর্ণ করি অঙ্গশোভা, যৌবন-বাসনা
ভস্ম করি উগ্র তপে, যোগী মহেশ্বর
যাচিব দর্শনসুখ মাগি লব বর।

সব কবিতাগুলি পাঠ করিয়া বুঝিলাম তাহাদের মধ্যদিয়া একটি ভাব ক্রমশঃ পরিণত হইয়া উঠে নাই। কতগুলি বিক্ষিপ্ত ভাব ছন্দোবন্ধে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে। তবে গ্রন্থখানি ভাল করিয়া পড়িলে গ্রন্থকর্ত্রীর অন্তরের কথাটা যে ধরিতে পারা অসম্ভব, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না।

স্বামী ও পুত্রের অকালমৃত্যু কবির মনে যে নিদারুণ রেখাপাত করিয়া গিয়াছে, তাহাই তাঁহার বিদ্যা, ভাবুকতা ও অনুশীলিত মনোবৃত্তির মধ্যদিয়া কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যেও এই দুঃখের আভাস, প্রকৃতি নানারূপে তাঁহার মনে এই দুঃখকেই সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। আসন্ন বসন্তে, নববর্ষায়, স্নেহদৃষ্টি-শরতে, সন্ধ্যায়, মেঘে ও রৌদ্রে, সেই দুঃখেরই অভিব্যক্তি। এই দুঃখ তাঁহার অন্তরে বাহিরে কি পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, তাহারও বর্ণনা কাব্যরসে স্নিগ্ধ ও মনোরম।

রবীন্দ্রনাথ পরলোকগত পত্নীর উদ্দেশে যে কয়টি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও এই সুরটা আছে। তবে তাঁহার প্রেমের কল্পনা ভিন্নরূপ। তিনি বলিয়াছেন—

"এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ ভুবননাথ! সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ।"

অন্যত্র তিনি লিখিতেছেন—

প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা কূপে
এক ধরাতলমাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে! নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

তাঁহার প্রেম সংসারের মধ্য দিয়া অনন্তের অভিমুখে স্বতঃই ছুটিয়াছে, সেই জন্য মৃত পত্নীর জন্য শোকগীতি গায়িতে গায়িতে একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে
তোমার করুণাপূর্ণ সুধাকণ্ঠ-স্বরে।
আজ তুমি বিশ্বমাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্বমাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে

এই যে ঘর হইতে বাহিরের দিকে, সীমা হইতে অসীমের দিকে আকর্ষণ, ইহা কবির পক্ষে স্বাভাবিক, তাঁহার প্রেম যেদিকেই ছুটিয়া যাক, তাহা যে অনন্তের দিকেই গতিলাভ করিবে, সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত, এ প্রেম কবি-দার্শনিকের, ভাবুকের এ প্রেমে পাণ্ডিত্য বর্ত্তমান।

সমালোচ্য গ্রন্থে যে প্রেমের বর্ণনা আছে, তাহার সম্বন্ধে লেখিকা বলিতেছেন—

পৃথিবীর মত নহে সে যে গুরু অতি
নহে তাহা সিন্ধুপ্রায় উচ্ছ্বসিত গতি
উন্মাদ তরঙ্গপূর্ণ কল্লোল ক্রন্দনে,
তাহার তুলনা নহে অনন্ত গগনে
শব্দহীন মহাব্যোম শূন্য চিরদিন
নহে ধ্রুবতারাপ্রায় হয় না মলিন
প্রভাত আলোকে, নহে গো কনক-রবি
কভু অস্ত নাহি যায় শ্রান্ত ম্লান ছবি
সন্ধ্যার আঁধারে, সে শুধু ফুটিয়া উঠে
তোমারি মিলনে মোর দুটি ওষ্ঠপুটে
শুভ্র হাসিরূপে, তোমারি বিদায়কালে
কাতর নয়নজল অঞ্চল আড়ালে।"

এ প্রেমকে সংকীর্ণই বল আর সীমাবদ্ধই বল, ইহারও একটা গতি আছে, তবে রবীন্দ্রনাথের প্রেমের মত ইহা আপনার গতিতেই মত্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন,

"গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে"

কিন্তু আমাদের কবি অসঙ্কোচে বলিতে চান্—

ওহে সর্ব্বময়, যদি তোমারে হরিয়া
সর্ব্ব বিশ্ব হতে আমি মূরতি গড়িয়া
স্থাপন করিয়া থাকি এ গৃহ-মন্দিরে,
অসীম আকাশ হতে অতি ধীরে ধীরে
নামাইয়া আঁখিদুটি ধরণীর পরে
রেখে থাকি বড় স্নেহে, বড় যত্ন ভরে
বেঁধে থাকি বক্ষমাঝে দুর্ব্বল মানবে,
ভুলি লোক লোকান্তের বিপুল গৌরবে
তাহারি দর্শন লাভ হয়ে থাকে মনে
সার্থক জনম মোর, তাহারি আননে
হেরে থাকি অনন্তের শোভা নব নব
ক্ষমা কর মোরে, অক্ষয় মহিমা তব
নাহি সাধ ম্লান করি; জানিও নিশ্চয়
অক্ষম ধারণা মোর সংকীর্ণ হৃদয়।

এই প্রেমে যে সন্দেহ, যে সঙ্কোচটুকু মাধুর্য্য ও কোমলতার সহিত বিকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলার ও বঙ্গরমণীর বিশেষত্বটুকু যে অক্ষুণ্ণ আছে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবে।

প্রেম আপনার গতিতে অনন্তে গিয়া পৌছিতে পারে, কিন্তু আমরা সব জিনিষকে প্রথমেই অনন্তের নামে উৎসর্গ করি, তারপর সে জিনিষটাকে দৈনিক কাজে প্রয়োগ করা হয়। তখন আর সেটা কোন উৎপাত করিতে পারে না, তাহার গতিকেও খর্ব্ব করা হয় না, কারণ তাহা অনন্তে সীমাবদ্ধ। অনন্তের সহিত তাহার সম্পর্ক রাখায় আমরা তাহাকে লইয়া মানুষের মত কাজ করিতে পারি, অনন্তের সহিত তাহার সম্পর্ক না রাখিলে তাহা আমাদের অমানুষ করিয়া তুলিতে পারে। ইহাই আমাদের প্রাণের কথা, আমাদের সভ্যতার ইতিহাসেও এই কথাই পরিস্ফুট হইতেছে। কবির 'অক্ষমতা'-শীর্ষক কবিতাটিতে এই ভাবই দেখিতে পাই। অনন্তের নামে তাঁহার প্রেম উৎসৃষ্ট, সেই প্রেম স্বামীকে অবলম্বন করিয়াও সার্থক, এই কথাই কবি কাব্যের মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন—

ভেবেছিনু প্রেমখানি দিবনা কাহারে;
সাবধানে লয়ে গিয়ে মরণের পারে
সঁপি দিব পূর্ণপ্রাণে বিশ্বরাজ-পায়ে
তাই যত্নে রেখেছিনু অন্তরে লুকায়ে।
তুমি কেন এলে সখা, যৌবনের প্রাতে
বক্ষ আবরণ খুলি ধরি দুটি হাতে,
তাহারে লইয়া গেলে আপনার ঘরে;
মোরে কাঙ্গালিনী করি চিরদিন তরে!
তাই একা কাঁদি বসে দিবসে সন্ধ্যায়,
ব্যাকুল প্রয়াসে ভাবি ফিরে নিব তায়
যখন দাঁড়াবে আসি নয়ন-সম্মুখে,
স্বপন-নয়ন মেলি হাসিভরা মুখে!
দেখা হলে সব কথা কেন ভুলে যাই?
আরো কি আনিয়া দিব শুধু ভাবি তাই!

এ প্রেমও গতিশীল, "সম্মুখ পানে চলিতে, চালাইতে নাহি জানে" এমন কথা বলিতে পারি না। এ প্রেম তনুহীন সুখ, ইহার মৃত্যু নাই। এ প্রেম প্রেমাস্পদকে মানুষের মতই ভাবে, তাহাতে দেবত্বের আরাধনা করিয়াও ইহা প্রেমিকের প্রাণে অনন্তের অনুভূতি আনিয়া দেয়। আবার ইহা কখন কখন পৃথিবীর দিকেও ঝুঁকিয়া পড়ে। কবি বলিয়াছেন—

এই প্রেমগীতিখানি বহে যাক ধীরে
নির্ঝর-ধারার মত * * * *
* * * * * দরিদ্র কুটীরে
লয়ে যাক্ ক্ষুধাশান্তি, * * *
* * * * গ্রামে গ্রামান্তরে
নগর নগরী বক্ষে অরণ্যে প্রান্তরে
দিক স্নেহ, দিক দয়া, দিক শান্তিবারি
নিরন্তর সুনির্ম্মল লাবণ্য বিস্তারি
আপন অতল বক্ষে, ক্রমে একদিন
মহাসিন্ধুগীতমাঝে হইবে বিলীন!

রবীন্দ্রনাথের ভাবের সহিত কোন-কোন স্থলে সাদৃশ্য থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারা যায়, কবি এই গ্রন্থে আপনার জন্য একটা স্বতন্ত্র পথ ধরিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ভাব পূরামাত্রায় দেশী। ইংরেজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াও কবি-প্রতিভার প্রাখর্য্যের দিনে তিনি যে আপনার বিশেষত্বটুকু রক্ষা করিয়াছেন, ইহা অল্প শক্তির কথা নয়।

সমস্ত গ্রন্থটির মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মধুর, আত্মসমর্পণেই তাহার জীবন—আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াই তাহার বিকাশ। একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—

মৃদঙ্গের রব তুমি গম্ভীর বিশাল,
আমি তারি মাঝখানে মন্দিরার তাল,
তুমি সুধু গুরু গুরু একাগ্র নিস্বন,
আমি তারি মাঝখানে তরল নিক্কণ
মৃদুল মধুর ধ্বনি নিত্য রিণি রিণি,
সমুদ্রের কোলে যেন নাচে নির্ঝরিণী।
অনন্ত আকাশ তুমি ব্যাপ্ত দিগন্তরে,
শান্ত সরসীর বুকে আমি তারি ছায়া,
সম্পূর্ণ রাগিণী তুমি, শুধু ক্ষণতরে
আমি তারি মাঝখানে মূর্চ্ছনার মায়া!

ছন্দের ঝঙ্কার, কবিতামাধুর্য্য ও সরল অনুভূতির মধ্য দিয়া যে কথাগুলি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা শুধু সুন্দর নয়, আমাদের দেশের পতিপত্নীর সম্পর্ক যে আদর্শস্থানীয়, তাহারও আভাস এখানে দেখিতে পাই।

কবি যে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ, তাহা গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সংস্কৃত কাব্যের ছায়া গ্রন্থের অনেক স্থলেই আছে, তবে কবির অনুকরণ-চেষ্টা কোথাও নাই। যাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিজস্ব হইয়াছে, তাহাকে আর পরের জিনিষ বলিয়া বোধ হয় না। কবির শব্দ ও সমাস-নির্ব্বাচনেও এই সংস্কৃত-বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির বিষয় সংকীর্ণ, একপ্রকার দুঃখ তাঁহার সকল শক্তিকে এই গ্রন্থে সংযমিত করিয়াছে। তাঁহার ভাবুকতা শুধু এই দুঃখকেই প্রস্ফুট করিতেছে। তাঁহার প্রকৃতির কাজ শুধু এই দুঃখেই সাড়া দিয়া ওঠা। কবির ক্ষেত্র অল্পপরিসর; সেই জন্য এই গ্রন্থে তাঁহাকে পূর্ণভাবে দেখা অসাধ্য।

বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনায় কবি বিচিত্র বর্ণের তুলিকা ব্যবহার করিয়া খুব একটা বর্ণোজ্জ্বল চিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি উচ্ছল আনন্দ, তীব্র হতাশ্বাস ও নিবিড় বেদনার কবি নন, প্রকৃতি নানা ভাবে জীবন্ত হইয়া তাঁহার বর্ণনায় স্পষ্ট হইয়া ওঠে না, তিনি ভাবনার কবি। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা তাঁহার অন্তরের পরিচয়ই এই গ্রন্থে স্পষ্টতর হইয়াছে। দুটি বর্ষাবর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম—

(১)

আবার এসেছে বর্ষা, দিগন্ত আঁধার
নৃত্যপ্রিয়া সৌদামিনী মুক্ত-কেশ-ভার!
নিবিড় তিমির মেঘে ছেয়েছে গগন
ঝঞ্ঝাঘন বজ্ররব উদ্দাম পবন!
সেই কেকা কলরব শ্যাম তরুশাখে
কেতকী-কুসুম সেই পূর্ণ করে রাখে
মদগন্ধ দীর্ঘশ্বাসে বিশ্ববসুন্ধরা;
তরঙ্গিণী সিন্ধুপানে ধেয়ে চলে ত্বরা,

(২)

মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশ,
নবস্নিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্র বক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদ্দাম হরষে
ছোটে গর্ব্বভরে, বজ্র ডাকে বারে বারে
প্রদীপ্ত অনলশিখা বিদ্যুৎ-প্রিয়ারে
আপন বক্ষের মাঝে, শ্যাম তরুগুলি
সুঠাম বঙ্কিম বাহু উর্দ্ধপানে তুলি
আরক্ত চুম্বন-পুষ্প দেখায় কাহারে!
পূর্ণা তরঙ্গিণী ধায় দূর পারাবারে
মিলন-ব্যাকুল;

উপরের দুটি কবিতাতেই প্রকৃতির একটা প্রাঞ্জল চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা অনুভূত হয়। শব্দনির্ব্বাচনের নৈপুণ্য, ছন্দের সৌন্দর্য্য, ভাবের বিচিত্রতা ও কল্পনার শক্তি দেখিয়া কবির চেষ্টা সফল হয় নাই একথা বলিতে পারি না। তবে এরূপ চিত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ একটা আকর্ষণ নাই। তিনি তুলিকায় দু' একটি

আঁচড়ে অল্পবর্ণে এমন একটি চিত্র আঁকিয়া ফেলেন, যাহা সাধারণের কাছে সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার চিত্র ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইবার নয়। সে চিত্রের সম্মুখে চক্ষু-কর্ণ নিরাশ হইয়া পড়ে; কেননা সেই চিত্রে যাহা আছে, তাহা চক্ষু-কর্ণের অতীত—দর্শকের অন্তর তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ থাকিতে পারে। একটু নমুনা দিলাম—

দ্রুত রথে, দৃপ্ত বেগে পথে যেতে যেতে
ধনী যথা চেয়ে দেখে কৌতুক-নয়নে
ভিক্ষাজীবী রমণীর সুন্দর মুখেতে;
তেমনি দোঁহার দেখা চকিত মিলনে।
উল্লাসে গরবে ধনী, হেসে ফিরে যায়
জীবনের চিরোৎসবে আনন্দ-আগারে;
ক্ষণিকের সুখস্মৃতি পলকে মিলায়,
ক্ষুদ্র বুদ্বুদের মত অতল পাথারে।
দীপনেবা, ভাঙ্গাঘরে পরিশ্রান্ত দেহে,
কাঙালিনী পশে ধীরে কাতর হৃদয়ে,
উজ্জ্বল দর্শন-স্মৃতি চিরদিন বহে
ক্ষুধিত জীবন মাঝে অপূর্ব্ব বিস্ময়ে।

পূর্ণ প্রাণশক্তি চাই, তবে সুন্দর কবিতা জন্মিতে পারে। যে দুঃখ, আঘাতের বেদনার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর নিরাশায় আচ্ছন্ন হইয়া মানুষের প্রাণশক্তি স্তম্ভিত করিয়া ফেলে, তাহা হইতে কোন ভাল কবিতা জন্মিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না। গ্রন্থকর্ত্রীর দুঃখ তাঁহার প্রাণশক্তিকে স্তম্ভিত করে নাই। কবিতার পর কবিতা পড়িতে ভাল লাগে, কোথাও কবির দুঃখ একঘেয়ে হইয়া পড়ে নাই, ক্রমশঃ সেটা ভাবুকতা, শান্তি, এমন কি আনন্দের মধ্যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া প্রাণশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আধ্যাত্মিকতার শিখরে উঠিয়া সান্ত্বনা চান নাই, যে অনন্তের জন্য তিনি বহুপূর্ব্বে আপনার যথাসর্ব্বস্বে উপহার-পাত্র পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্ত তাঁহাকে যে শক্তি দান করিয়াছেন এবং সেই শক্তিবলে তিনি আপনার অন্তরে যে "পরশ পাথরখানি" গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা আধ্যাত্মিক নয়, প্রাণ ও প্রেম তাহার উপাদান, তাহাই তাঁহার দুঃখে সুখ, বিরহে মিলন, তাহাই তাঁহার শোকের শান্তি, বেদনার নির্ব্বাণ।

গ্রন্থের সব কবিতাগুলির ভিতর দিয়া যে সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা পবিত্র, নির্ম্মল।

পুলক-আকুল বিশ্ব মিলনকাতর
তোমারি কারণে তব চঞ্চল অন্তর
চাহেনা কাহারে, তুমি চির উদাসীন
অপরে বাঁধগো প্রেমে আপনি স্বাধীন।

বসন্তের এরূপ চিত্র আর কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না:—

গত বসন্তের স্মৃতি শ্যাম পত্ররাজি
শুষ্ক জীর্ণ পাঁণ্ডু হয়ে ঝরিতেছে আজি
পথ-তরুতলে, নব শরত পবনে
সেই জীর্ণ পত্রগুলি ম্লান ধূলিসনে
যেতেছে উড়িয়া, শেষস্মৃতি বরষার
ক্ষীণ অশ্রুবিন্দুভরা ফুল্ল সুকুমার
শরতের মেঘ, মিলাতেছে ধীরে ধীরে;
আমি ভাবিতেছি আজ নয়নের নীরে

প্রিয়তম, মিলনের সুখস্মৃতিগুলি
এমনি কি দিতেছ ছড়ায়ে, * * * ?

এমন স্নিগ্ধ, শান্ত, গম্ভীর, প্রাণপূর্ণ বর্ণনা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। পড়িতে পড়িতে ভাষা শেষ করা যায়, কিন্তু ভাষার অন্তর্নিহিত ভাবটি পাঠকের চিত্তকে বড় অল্প সময়ের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখে না।

প্রিয়তমের প্রতি নিবিড় প্রণয়ের এমন সুন্দর ও সহজ কবিত্ব-পূর্ণ ব্যাখ্যা বড় দেখিতে পাওয়া যায় কি?—

ছিলে বুঝি প্রিয়তম, আমার এ প্রেমে
বীজে অঙ্কুরের মত; স্নিগ্ধ বারিধারা
মেদুর মেঘের তলে; * * * *
আশৈশব ছিলে যেন বক্ষেতে আমার,
অনাদৃত সুপ্তগীতি নিলীন ঝঙ্কার
পরাণ-বীণার মত; বসন্ত-প্রদোষে
অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত যৌবন পরশে
আনন্দে উঠেছ বাজি, সহজে অক্লেশে
তোমারে বুঝেছি তাই বরিয়াছি হেসে!

নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় একটি গানের সুর বর্ত্তমান রহিয়াছে।

তুমি জীবনের রাজা অসীমপ্রতাপ,
চিরদীপ্তি হাসিমুখ উজ্জ্বল নয়ন
আমারি হৃদয় তব স্বর্ণ-সিংহাসন;
তবু চির-ভিখারিণী দ্বারের সম্মুখে
দাঁড়ায়ে রয়েছি আমি দুঃখম্লান মুখে
তোমার সৌভাগ্যমাঝে চির পরিতাপ।
নিষ্ঠুর হৃদয় তুমি নিদারুণ ব্যাধ,
দুটি দৃঢ় করপুটে রেখেছ ভরিয়া
আমার জীবনখানি, পাখা ঝাপটিয়া
ত্রাসে থর থর ছোট পাখীটির মত
উড়িয়া পলাতে আসি ব্যাকুল সতত
স্বাধীন ইচ্ছার তুমি চির পরমাদ।

উপরের অংশে স্ত্রী-সুলভ অভিমানের সহিত বিরহ, দুঃখ ও আত্মসমর্পণের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বিপরীত ভাবগুলি খুব স্পষ্ট—সহজেই হৃদয়ে আঘাত করে। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়।

এরূপ অংশ অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। সুন্দর রচনা-নৈপুণ্য, মনোরম উপমা, প্রাণময় ভাবসমাবেশ, কল্পনার নূতনত্ব ও বর্ণনার চাতুর্য্য অনেক স্থলেই পাঠককে এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে, গ্রন্থের সামান্য ত্রুটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর সে পায় না।

গ্রন্থের আংশিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিবার আবশ্যক নাই; পাঠক-পাঠিকামাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। শব্দের ও শব্দ-সংহতির দ্বারা কবি এক-একটি সুন্দর চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এ ক্ষমতা শব্দনির্ব্বাচনের উপরই নির্ভর করে। শব্দ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের গভীরতা কবিতায় যে সৌন্দর্য্য আনিয়া দেয়, তাহারও উদাহরণ এ গ্রন্থে বিরল নয়। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

১। বাছা মোর এলোথেলো চুলে
কত ফুল দেবে গো পরায়ে, তার পরে
দণ্ড দুয়ে সব ফুল খুলে
হাসিয়া ছড়ায়ে দেবে সারা ঘর ভরে।

২। সীমাহীন করি আপনা বিস্তারি
দিগন্তে মিশায় ধীরে
ভগ্নতট রেখা শুধু যায় দেখা
প্রশান্ত জীবন-তীরে।

পূর্ণ কবিতা উদ্ধার করিবার স্থান নাই; সেই জন্য অংশই উদ্ধৃত হইল। পাঠক উপরের কবিতা পড়িয়া বুঝিবেন, উহাদের মধ্যে কতকটা প্রচ্ছন্ন অথচ পরিস্ফুট হইয়া আছে। পুত্রের সামান্য কাজটুকু কত মধুর, বিশেষতঃ পুত্রশোকাতুরা জননীর লেখনীতে সেই কাজটুকুর কতটা সার্থকতা ফুটিয়াছে, তাহা বিশদরূপে বলিতে হইবে না। দ্বিতীয় কবিতাটিতে একটি উপমায় দুজনের মিলনের অবসানে একজনের কি দশা হইতে পারে, তাহার বর্ণনাটি অতি সুন্দর।

গ্রন্থখানি সুন্দর, মনোরম হইলেও শুধু এটিকে লইয়া আমরা গ্রন্থকর্ত্রীর জন্য বঙ্গসাহিত্যে একটা স্থাননির্দ্দেশ করিতে চাই না। কবি-প্রতিভা গ্রন্থকর্ত্রীর আছে, এবং তাহা বিদ্বৎসমাজে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে। তিনি শুধু কবি নন, তিনি ভাবুক। তাঁহার রচনায় শুধু মার্জ্জিত বুদ্ধি ও শিক্ষার পরিচয় নাই, তাঁহাতে শুধু প্রদীপ্ত প্রতিভা নাই, তাহাতে একটি অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা ও কোমলতাও বর্ত্তমান। তাঁহার কবিত্বশক্তি, কল্পনার সজীবতা ও ভাষার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হয়, তিনি আধুনিক যুগের কবিগণের মধ্যে একটা উচ্চস্থানই অধিকার করিয়াছেন। নানা শক্তি সঞ্চয় করিয়া বঙ্গভাষার জন্য উপহার-পাত্র পূর্ণ করিয়া যখন তিনি খ্যাতির মন্দির-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখন সে দ্বার মুক্ত হইবেই। তবুও আমরা শুধু এই কাব্যখানি পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। বঙ্গসাহিত্যে কবির শ্রেষ্ঠ দান এখনও ভবিষ্যতে। আমরা তাহারই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

'রেণু' পাঠ করিয়া যাহা মনে আসিয়াছে, তাহাই লিখিলাম। পাঠকগণ তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ করিবেন। প্রবন্ধপাঠে ক্লান্তি আসিতে পারে মনে করিয়া 'রেণু' হইতে দু'টী কবিতা তুলিয়া দিলাম। আশা করি, কবিতাদুটী তাঁহাদের শ্রান্ত মনকে পরিতৃপ্ত করিবে।

হায় সখা, বিন্দু বিন্দু কৃপাবারি-পানে
মেটেনা জীবনভরা তৃষিত বেদনা।
ক্ষণিক মিলন-সুখ ব্যথিত পরাণে
কই আনে তৃপ্তিময়ী মধুর সান্ত্বনা?
এস তুমি তটপ্লাবী মহাসিন্ধুপ্রায়,
নিত্য নব সোহাগের বিপুল উচ্ছ্বাসে,
তরঙ্গে বেষ্টিয়া ধরি, ডুবায়ে আমায়
দ্রবিয়া মিটায়ে দেও অনন্ত পিয়াসে।
ওগো সুগম্ভীর শান্ত জলদ সুন্দর,
আমারে লুকায়ে লও বক্ষের মাঝারে—
বজ্র চিরদিন যথা দীপ্ত চপলারে
বেঁধেছে অসীম প্রেমে বক্ষের ভিতর!

গিয়াছ বিদায় নিয়ে জানিবে না আর,
কবে বসন্তের প্রাতে হৃদয় আমার
জাগিবে আনন্দ নব মধুগন্ধভরা
আম্রমুকুলের মত, বিষাদ-পাশরা
উল্লাসে উন্মুখ পিক প্রচ্ছন্ন ছায়ায়
গাহিয়া হইবে সারা ডাকিয়া তোমায়।
গিয়াছ বিদায় নিয়ে জানিবেনা আর
শারদ নিশীথে যবে অকূল অপার
জাগিবে মন্দ্রের আলো বিমল আকাশে,
হৃদয় উদাসকরা উত্তর বাতাসে,
তোমারি সোহাগ আর তোমারে স্মরিয়া
তিতি বক্ষ অশ্রুজল পড়িবে ঝরিয়া।
গিয়াছ বিদায় নিয়ে জানিবে না আর
আজিও স্নেহের ভুলে হৃদয় আমার
সে কথা মানে না তবু; তাই ঘুরে-ফিরে
কভু হাসিমুখে, কভু নয়নের নীরে
রচি গান, গাঁথি মালা, আশা করে মনে
সকলি জানিছ তুমি না জানি কেমনে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিনতি

ছিছি! সবল পুরুষ মানুষ তুমি
শক্তি তোমার আছে,
এমনতর কাঙালপনা কেন
ক্ষুদ্র নারীর কাছে?
অমন করে' কাতর করুণ চোখে
তাকিয়ে বারম্বার
কি চাও তুমি শক্তিহীনার কাছে—
জানিওনাক আর।
কতটুকুন্ সাধ্য আমার আছে,
যদি বা নাই পারি;
কঠিন সবল পুরুষ মানুষ তুমি—
আমি তুচ্ছ নারী!

সন্ধ্যা হ'ল, উঠ্‌ল দখিন হাওয়া
অজানা কোন্ মাঠে,
কলস-ভরার ঢেউ মিলিয়ে এল
শূন্য দীঘির ঘাটে;
পায়ে পায়ে আল্‌তা-পরা সারা
খোঁপায় বাঁধা কেশ,
গৃহে গৃহে সাঙ্গ শয়ন পাতা
সন্ধ্যা-দেওয়া শেষ;
অভাগিনীর নাই যদিও বটে
প্রসাধনের কাজ,
তাড়াতাড়ি সারতে তবু হবে
শূন্য ঘরের সাজ!

সে সর কথা তুল্‌বনাক আর
সন্ধ্যা বেড়ে যায়;
আঁধার রাতে অচিন-দেশের পথে
রাজ্‌বে তোমার পায়।
বলেইছি ত, একটি কথাও আর
শুনবনাক মোটে,
অবশ নারীর শেষ মিনতি তোমার
পায়ের 'পরে লোটে।
ঐ শোন্‌না শাখা-নীড়ের 'পরে
রাতের পাখী ডাকে—
এমন সময় দুয়ার আড়াল করে'
অতিথ কি কেউ থাকে?

ওগো তুমি যাওগো তুমি যাও,
দুয়ার ছেড়ে যাও,
চাইতে কিছু পাবে না আর মোটে
আমার মাথা খাও;
আঁধার-ঢাকা নিরাশ চোখের দিঠি
ভুলায় যদি মোরে,
পার্‌ব না সে—বলুব যে কোন্‌ মুখে—
বল্‌ব কেমন করে'?
ভাঁটের বুকের গন্ধ-ব্যথা বহি'
উঠ্‌ল পাগল বায়,
এর পরে আর আকুল আবেদন
ফিরিয়ে দেওয়া যায়?
চক্ষু মুদি' কর্ণ রুধি' আমি
পাষাণ হয়ে রব'—
পায়ে পড়ি চেওনা আর কিছু
প্রেমের দোহাই তব।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সোণার চুড়ী

লু

ক

অমলা যখন এতটুকু মেয়ে, তখন এক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল, "এ মেয়ে রাজরাণী হবে।" অমলার রাণীর মত রূপ দেখিয়া দৈবজ্ঞ একথা বলিয়াছিল, না তা'র ভাগ্যলিপি পড়িয়া এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, সেটা আগে কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। তবে কথাটা শুনিয়া অমলার বাপ হাসিয়াছিলেন, তার বিধবা পিসী অমলার মৃত মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছিলেন এবং "দক্ষিণায় পূর্ণহস্ত" হইয়া দৈবজ্ঞ ঠাকুর সহর্ষে গৃহে ফিরিয়াছিলেন।

কলিতেও ব্রাহ্মণ-বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। তবে কল্পনার রাজা, বাস্তবে রাজেন্দ্রে পরিণত হইল। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার কন্যার করপ্রার্থী রাজামহারাজার অন্যায় এবং আশ্চর্য্যরকমের অভাব দেখিয়া অমলার পিতা শেষটা বাধ্য হইয়া রেলোয়ে অফিসের পঁয়ত্রিশটাকা মাহিনার কেরাণী রাজেন্দ্রবাবুর হাতে মেয়েকে সঁপিয়া দিলেন। কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইয়া অমলার বাপ আর একবার হাসিলেন। অমলার মৃত মাকে স্মরণ করিয়া পিসীমা আর একবার কাঁদিলেন, এবং লুচির কোণ্‌ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে পাড়ার দৈবজ্ঞঠাকুর আর একবার ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, "দেখে নিও, ঐ রাজেন্দ্রই পরে রাজরাজেন্দ্র হবে। আমার গণনা মিথ্যা হবার নয়!"

সে আজ আট বৎসরের কথা।

খ

সেদিন মাসকাবার।

অফিস হইতে ফিরিয়া রাজেন্দ্র, মাসের খরচ দেখিতেছিল। "বাড়ী-ভাড়া আঠার টাকা, ঝী'য়ের মাহিনা তিনটাকা, দুধ-বার্লি চার টাকা, মাসকাবারি জিনিষ-পত্রের জন্যে মুদির দোকানে কম করে ধরেও অন্ততঃ ছয় টাকা, সকলকার জলখাবার চার টাকা। মাইনে পাই চল্লিশ টাকা—হাতে রইল পাঁচ টাকা। আর কি কি খরচ বাকী রইল গা?"

অমলা বলিল, "বাজার খরচ ভুলে গেলে বুঝি?"

রাজেন্দ্র বলিল, "কিচ্ছু ভুলিনি—আমি ভুল্‌লেও তোমরা ভুল্‌বে কেন? তবে কথাটা কি জান? আর আর খরচের কথা মনে কর্ত্তেও আমার ভয় হচ্চে।"

অমলা বলিল, "এমাসে অন্ততঃ দুজোড়া কাপড় না হলে চল্‌বে না, তা জান?"

মুখ বেঁকাইয়া রাজেন্দ্র বলিল, "জানি না আবার! খুব জানি! তা'র পর?"

"রজকের তিন মাসের পাওনা বাকী আছে। এবারে দাম চুকিয়ে না দিলে সে আর কাপড় কাচ্‌বে না।"

"বলে যাও—"

"খুচ্‌রো খরচ আছে।"

"যথা—?"

"সে কি আর হিসেব করে বলা যায়? হঠাৎ আপদ-বিপদ, কোথাও যাওয়া-আসা, আত্মীয়-কুটুম্বিতে (রাজেন্দ্র হতাশভাবে আড়্‌ হইয়া মাদুরে শুইয়া পড়িল) নাপিত-নাপ্‌তিনী, ছেলের স্কুলের মাহিনা—এমন্‌ আরো কত কি?"

শুইয়া শুইয়া দুইচোখ বুঁজিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "ওগো, একটা হিসাব ভুলেছ।"

"কি?"

"অর্দ্ধেক রাজত্ব কেনার কথাটা। এ মাসে সেটাও ত' অবিশ্যি করে কেনা চাই?"

অমলা স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তা'র পর হাসিয়া বলিল, "চাই বই কি! জ্যোতিষ ঠাকুর বলেছিল, তুমি নিশ্চয় রাজা হবে—মনে নেই? রাজত্ব নইলে চল্‌বে কেন?"

রাজেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া মুখভার করিয়া বলিল, "তোমার হাসি আস্‌ছে অমলা? আমার ত' কান্না পাচ্চে!"

অমলা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "এখনি কান্না? এখনো যে চাল আর কয়লার ফর্দ্দ বাকী আছে!"

রাজেন্দ্র গুম্‌ হইয়া বসিয়া রহিল। মাঝে মাঝে ঘরের এদিকে

ওদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যে দিকে চায়, সেই দিকেই সে এক একটা নূতন অভাবের চিহ্ন দেখে, আর তা'র বুকটা ধড়াস্‌ করিয়া ওঠে। ঐ ও-দিকের কুলঙ্গিতে একটা চিম্‌নিহীন ল্যাম্প্‌ রহিয়াছে; চিম্‌নিটা কাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আজ আর একটা না কিনিলে নয়। এদিক্‌কার দেওয়ালে একখানা ছেঁড়া কুটি-কুটি গামোছা ঝুলিতেছে। এখানে একখানা ভাঙ্গাচোরা আয়না, ওখানে একটা ছেঁড়া কামিজ। সমস্ত অভাব যেন মূর্ত্তি ধরিয়া রাজেন্দ্রকে ভয় দেখাইতে লাগিল। হাতে পয়সা না থাকিলেও মাসের অন্যান্য দিনগুলা যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া যায়; কিন্তু কেরাণীর সংসারে যেদিন টাকা আসে, সেই কাঙ্ক্ষিত মাসকাবার অতি—অতি ভয়ানক!

অমলা বলিল, "কি ভাব্‌চ?"

তিক্তস্বরে রাজেন্দ্র বলিল, "চিতার আগুনের কথা।"

"ভাব্‌লে আগুন জ্বল্‌বে বৈ নিব্‌বে না।"

"জ্বলুক। সমস্ত জ্বলে পুড়ে খাক্‌ হয়ে যাক্‌। আমি বাঁচি।"

"ছিঃ, তুমি না পুরুষ?"

"ভগবান্‌, আস্‌চে জন্মে আমি যেন স্ত্রীলোক হয়ে জন্মাই। কি বল অমলা, স্ত্রীলোক হলে আর ত আপিসে কেরাণীগিরি কর্ত্তে আর কলম পিষে মর্ত্তে হবে না?"

"হ্যাঁগো, আমরা কি বড় সুখে আছি?"

"সুখে নেই? যে হাস্‌তে পারে, তা'র আবার দুঃখ কি? তুমি হাস্‌ছ, আমি হাস্‌তে পার্‌চিনে কেন?"

"ও-সব কথা আর ভেব না। এখন কি কর্ব্বে, বল?"

"কর্ব্ব আমার মাথা আর মুণ্ডু। বাকী আছে বাজার খরচ, কাপড়, ধোপার মাইনে, খুচরো খরচ, আর চাল, কয়লা। অন্য খরচ ক'রে হাতে থাকে পাঁচ টাকা—সে ত' সমুদ্রে শিশির। আমার অবস্থায় পড়্‌লে অন্য কেউ কি কর্ত্ত জান?"

"জানি।"

"কি?"

অমলা দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, "স্ত্রীকে চুম্বন।"

"আত্মহত্যা—আত্মহত্যা কর্ত্ত! এখনো ঠাট্টা? এই রইল তোমার পাঁচ টাকা—তোমার যা খুসী কর!" বলিয়া, রাজেন্দ্র একখানা পাঁচটাকার নোট অমলার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারিদিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া সন্ধ্যা আজ শুধু পৃথিবীতে নামিয়া আসিল না;—নামিয়া আসিল অমলার অন্ধকার প্রাণের ভিতরেও। হাতের উপরে মুখ রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে অমলা সেইখানে মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার মুখে তখন হাসি নাই, চোখে অশ্রু।

গ

অমলা তিন সন্তানের মা, কিন্তু তা'কে দেখিলে সে কথা বলিবার যো ছিল না। তার গড়ন ছিল পাত্‌লা, ছিপ্‌ছিপে; রং টক্‌টকে গৌর, মুখচোখ প্রতিমার মত। মাতৃত্বের পূর্ণগৌরব তা'র দেহ থেকে যৌবনকে শুক্‌না ফুলের মত খসাইয়া দিতে পারে নাই।

কিন্তু দরিদ্রের ঘরে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অবকাশ কোথায়? যেখানে অর্থ নাই, সেখানে রূপযৌবন সব ব্যর্থ। রাজেন্দ্র তাহাকে ভালবাসিত; কিন্তু নিত্য-নূতন গহনায়, বিলাসের উপহারেও মিষ্ট কথায় সে ভালবাসাকে জাহির করিবার সময় তা'র ছিল না। সংসারের টানাটানিতে তা'র মন সর্ব্বদাই তিতবিরক্ত হইয়া থাকিত;—এমন-কি, অমলাকে ভালকথা বলিতে গেলেও, তা'র জিভ্‌ ফস্কাইয়া মন্দকথা বাহির হইয়া যাইত। এর জন্যে পরে সে নিজেই মনে মনে দুঃখিত হইত। অমলাও মুখ বুজিয়া এই ভালবাসার অত্যাচার সহিয়া থাকিত।

মন তবু বুঝিয়াও বোঝ মানে না। আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ীতে একরকম খালি হাতে খালি গায়েই সে নিমন্ত্রণে যাইত। তাহার স্বভাব-সুন্দর রূপ গহনা না-থাকার দরুণ বড়বেশী কমিয়া যাইত না বটে, কিন্তু যখন কোন ধনীর ঘরণী, গায়ের জড়োয়া গহনায় আলোর ঢেউ তুলিয়া, চোখে অবজ্ঞার বিদ্যুৎ হানিয়া, দেমাকে ডগমগ হইয়া অমলার নিরলঙ্কার দেহের দিকে বাঁকা চোখে চাহিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিত, অমলার তখন মনে হইত, সে যেন সকলকার পায়েয় তলায় ধূলার মত মিশিয়া আছে।

কোন কোন মুখরা আবার আত্মীয়তা জানাইয়া বলিত, "তোমার বর কি কাজ করে ভাই?"

অমলা মৃদুস্বরে বলিত, "কেরাণীগিরি।"

"তা এমন রাঙ্গা বৌয়ের গায়ে দুখানা সোণা-দানাও দিতে পারে না গা? আহা—"

অমলা অতিকষ্টে বলিত, "আমি কখনো চাই নি"—

"ওমা, চাইতেই বা যাবে কেন? চাইলে দেবে, নইলে দেবে না, এমন কথাও ত' কখনো শুনিনি! আমরা যে গয়না পরি, এ কি ভিক্ষে ক'রে পরা? এমন মেয়ে আমরা নই—জিভ্‌ কেটে ফেল্‌ব, তবু সেধে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারব না"—

অমলা ম্রিয়মাণ হইয়া উত্তর দিত, "সংসারে গয়নাই ত' সব নয়! আর, আমার স্বামীর এমন অবস্থা নয় যে, তিনি আমাকে"—

"তাই বল বাছা, তাই বল! ওসব"—

কথা শেষ হইবার আগেই অমলা সেখান হইতে চলিয়া যাইত।

ঘ

মুখে অমলা যাই বলুক, মনে মনে সে বড় সুখী ছিল না। হাজার হোক মানুষের মন ত!

সেদিন অমলার এক আত্মীয়ের বাড়ী হইতে বিয়ের এক নিমন্ত্রণ আসিল।

রাজেন্দ্রের কাছে গিয়া অমলা বলিল, "ওগো, আইবুড়ো ভাতের কাপড় আর মিষ্টি পাঠাতে হবে যে!"

রাজেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল, "পয়সা কোথায়?"

অমলা বলিল, "সংসার কর্ত্তে গেলে এ রকম দু-একটা বাজে-খরচ না কর্‌লে চল্‌বে কেন? মান বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে ত!"

"চুলোয় যাক্‌ মান! মান কি আছে, যে রাখ্‌বে? লেখাপড়া শিখে যেদিন সায়েবের বুটের তলায় দাসখৎ লিখে দিয়েছি, সেইদিনই যে মানে ছাতা ধরে গেছে! তোমার পয়সা থাকে, তুমি আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব পাঠাও!"

"আমি কোথায় পয়সা পাব?"

"তবে তত্ত্বের কথা ভুলে যাও।"

"তা'রা কি মনে কর্‌বে?"

"গণৎকার হলে সে কথা আগে থাক্‌তে তোমাকে গুণে বলে দিতে পার্ত্তাম।"

অস্তগামী সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলো অঙ্গে মাখিয়া দীপ্ত-নীল আকাশের তলায় একঝাঁক পায়রা একছড়া উড়ন্ত যূঁইফুলের মালার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া যাইতেছিল।

ছাদে কাপড় তুলিতে গিয়া, অমলা সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হঠাৎ অমলার পায়ের কাছে সশব্দে কি একটা জিনিষ আসিয়া পড়িল। অমলা, চমকিয়া দেখিল, একটা ঢিল। তার সঙ্গে খানিকটা সুতা বাঁধা। সুতার ডগায় একখানা কাগজ ঃ—

এর মানে কি ?

অমলা হেঁট হইয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল। তাহাতে ভুর্-ভুরে এসেন্সের গন্ধ। কাগজের ভাঁজ খুলিয়া অমলা দেখিল, ভিতরে পরিষ্কার হাতের অক্ষরে কয়ছত্র লেখা ঃ—

"তোমার জন্য আমি পাগল। আমার দিকে মুখ তুলে তাকালে তুমি যা চাও তাই দেব। গরীব কেরাণী তোমার কদর বুঝ্‌বে না।

দয়া করো। নইলে আমি বাঁচ্‌ব না।"

অমলা, চিঠি পড়িয়া মনে মনে বলিল, "তোমার পক্ষে মরাই ভাল।"

এ চিঠি কার ? কে লিখিতেছে ? পত্রে কাহারও নাম ছিল না।

আমার পায়ের কাছে কাগজখানা আসিয়া পড়িল কেন ? তবে কি—

অমলা এক পলকে সব বুঝিল।

গোধূলির আলো তা'র গৌর বাহুকে কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। অমলার চোখ তা'র উপরে পড়িল। সে হাতদুটি কেমন নধর, কেমন নিটোল !

এ চিঠি লইয়া কি করিবে সে ? ছিঁড়িয়া ফেলিবে, না স্বামীকে দেখাইবে ? অমলা ভাবিতে লাগিল।

অমলাদের বাড়ীর সুমুখে একটা রাস্তা। ওপারে, ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি একখানা মস্ত বাড়ী। পল্লীগ্রামের কোন ধনী জমিদার মাসখানেক হইল, এই বাড়ীখানা ভাড়া লইয়াছেন।

অমলার দৃষ্টি আচম্‌কা সেই বাড়ীর ছাদের উপরে পড়িল।

সে দিকে চাহিয়াই, মাথায় ঘোমটা টানিয়া অমলা তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া গেল।

সে বাড়ীর ছাদের উপরে এক সুশ্রী যুবা, নিষ্পলক নেত্রে হাস্যমুখে অমলার দিকে তাকাইয়া, নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

যাইবার সময়ে অমলা, চিঠিখানা রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গেল।

কিন্তু, স্বামীকে সে কোনকথা বলিল না।

ঙ

অমলা, কয়দিন আর ছাদে উঠে নাই।

সে দিন বৈকালে সে রুটি সেঁকিতেছিল আর তাহার ঠিকা ঝী রুটি বেলিয়া দিতেছিল।

বেলিতে বেলিতে ঝী বলিল, "একটু হাত চালিয়ে নাও দিদিমণি !"

অমলা বলিল, "ক্যান্ লা, তোর এত তাড়াতাড়ি কিসের বল্ তো ?"

ঝী বলিল, "এই মাগ্যির বাজারে এক জায়গায় ঠিকে কাজ করে তো পেট চলেনা দিদি ! কাজেই আর এক জায়গায় কাজ না কর্‌লে পোষায় না।"

অমলা, উনানের আঁচ্ একটু কমাইয়া দিয়া বলিল, "আর কোথায় কাজ করিস তুই ?"

"এই, তোমাদের সামনের বাড়ীতে।"

অমলা চমকিয়া উঠিল। উনান হইতে 'চাটু' খানা নামাইয়া, মনের চাঞ্চল্য মনেই চাপিয়া সহজ স্বরে সে বলিল, "ওখান থেকে কত মাইনে পাস্ ?"

"সকালে-বিকেলে যাই, পাঁচটাকা করে দেয়।"—

অমলার চম্‌কানি ঝীয়ের নজর এড়ায় নাই। কিন্তু সে কথা নিয়া কিছু বলিল না—আপন মনে সে মৃদু মৃদু হাসিল মাত্র।

অমলা খুন্তি দিয়া একখানা রুটি কড়ার উপরে উল্টাইয়া দিতে লাগিল। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হ্যাঁরে, ও বাড়ীতে কে থাকে ?"

"এক জমিদারের ছেলে গো !"

"আর কে ?"

"বাবুর মা, বিধবা বোন আর এক খুড়্‌তুতো ভাই।"

"বাবুর বৌ থাকে না ?"

"বাবুর বিয়ে ত হয় নি।"

"অত বয়েস হয়েছে, বিয়ে হয়নি কিলো ?"

"বাবুকে তুমি কি করে দেখ্‌লে দিদি ?"

অমলার মুখ কালিপানা হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "হ্যাঁরে, ওরা বুঝি খুব বড়মানুষ ?"

ঝী চোখ ঘুরাইয়া বলিল, "ওমা, তা আবার নয় দিদি ! বড় মানুষ বলে বড় মানুষ ? বাসাবাড়ী, তবু লোকজন চারিদিকে রৈ-রৈ করছে ! গাড়ী-ঘোড়া জিনিষপত্তর দেখ্‌লে চোখ যেন জুড়িয়ে যায় ! শুনলে অবাক্ হবে দিদি, ওরা সব রূপোর বাসনে 'সরে' !"

অমলা আনমনা হইয়া বলিল, "তা হবে না কেন ; বড় লোকের ভিন্‌গোত্তর ! একি আর আমরা, যে ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়াতেই জীবন কেটে যাবে ?"

ঝী দরদ দেখাইয়া বলিল, "তা সত্যি দিদিমণি ! তোমার অমন প্রতিমের মত রূপ, অমন নিটোল গড়ন, ওতে কি দুখানা সোণাদানা না পর্‌লে মানায় ?"

"কোথায় পাব বাছা, সোণাদানা ত' পথের ধূলো নয় !"

"কেন, দাদাবাবুকে বল্‌তে পার না ?"

"বলে কি হবে ? খেতে-পর্‌তেই কুলোয় না, তা আবার সোণাদানা !"

"হ্যাঁ দিদিমণি, দাদাবাবু তোমায় আদর-আয়িত্তি করে ত ?"

অমলা কৌতুকভরে হাসিয়া বলিল,

"আলুনি আদর ট্যাপের খৈ—

"আদরের কথা কার কাছে কই !"

বলিয়াই হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, "নে, রুটি ব্যাল্—উনুন যে কামাই যাচ্চে !"

কিছুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না। রুটি-বেলা শেষ হইয়া গেলে পর, বেলুন ও চাকীখানা সরাইয়া ঝী অমলার মুখের ভাবখানা খানিকক্ষণ নীরবে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল, "পুরুষগুলো কি-রকম বে-আক্কেল দিদিমণি !"

অমলা চাটু হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, "পুরুষগুলো আবার কে ?"

"এই ও-বাড়ীর জমিদারের ছেলে গো, এতক্ষণ যার কথা হচ্চিল !"

"কেন, সে কি করেচে ?"

"বল্‌ব ?"

"বল্।"

"আমরা গরীব মানুষ, গতর খাটিয়ে খাই—কারুর সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না। বল্‌লে শেষটা ত' আমার ওপরে রাগ কর্‌বে না ?"

অমলা চকিতে ফিরিয়া, ঝীয়ের দিকে তীক্ষ্ণনেত্রে চাহিল। বলিল, "বুঝেচি। কি বলেচে, সব খুলে বল্।"

অমলার কণ্ঠস্বর কঠোর !

ঝী থতমত খাইয়া গেল। সে যা বলিতে যাইতেছিল তা আবার চাপা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অমলার দৃষ্টি যেন তার মনের কথাগুলাকে হিড়্‌হিড়্ করিয়া টানিয়া তাহার জিভের ডগায় আনিয়া দিল। কলের পুতুলের মত সে বলিয়া গেল, "ও-বাড়ীর বাবু কাল আমাকে ডেকে বল্‌লে, 'ঝী, ঐ সামনের বাড়ীর বৌ'কে তুমি যদি আমার কথা জানিয়ে আস্‌তে পার, আমি তোমাকে এক-শো টাকা দেব।'—আমায় বল্‌লে. আমি কি কর্‌ব দিদি ?"

অমলা কিছু বলিল না। উত্তেজিতভাবে ফিরিয়া, সে উনানে কড়া চড়াইয়া দিতে গেল ; কিন্তু তাহার হাত ফস্কাইয়া কড়াখানা ঘিয়ের কেঁড়ের উপরে পড়িল। কেঁড়েটাও সশব্দে উল্টাইয়া গেল। সেই শব্দে উপর হইতে রাজেন্দ্র নামিয়া আসিল। মেঝেতে তখন ঘি গড়াইতেছে। রাজেন্দ্র বিরক্ত স্বরে বলিল, "কাজ যত না হোক্, অকাজ কর্‌তে তোমরা খুব মজ্‌বুৎ ! বেশ যাহোক্ !"

উত্তেজিত অমলা আরও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "পুড়ে্ মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেলুম, আর তুমি কিনা উল্টে ক্যাট্‌কাঁট্ করে কথা শুনিয়ে দিতে এলে ?"

রাজেন্দ্র চটিয়া উঠিয়া বলিল, "কথা শোনাব না কেন ! অতটা ঘি যে থাম্‌কা নষ্ট হ'ল, এই মাগ্যির বাজারে সেটা কোথা থেকে আসে শুনি ?"

অমলার মন সেদিন হঠাৎ আগুন হইয়া উঠিল। স্বামীর অন্যায় ও নিষ্ঠুর কথা সে কিছুতেই মুখ বুজিয়া সহিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি কি সাধ করে তোমার লোক্‌সান করেছি ? খেটে খেটে দেহ ক্ষয়ে গেল, বল্‌তে তোমার লজ্জা হচ্চে না ?"

রাজেন্দ্র তখন সবে আপীশ থেকে ফিরিয়াছে, তাহার মেজাজটাও বিলক্ষণ চড়া ছিল। সেও মহা খাপ্পা হইয়া বলিল, "বড় যে লম্বা লম্বা কথা হচ্চে, ওসব আমার বাড়ীতে বসে চ'বে না—বুঝলে ? এটা তোমার বাপের বাড়ী হলে, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাক্‌তুম্।"

"কি ! তুমি আমার বাপ তুল্লে ? এতবড়"—

অমলা আর কথা শেষ করিতে পারিল না। ঝড়ের মত সেখান হইতে চলিয়া গিয়া আপনার ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া দুম্ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

চ

অমলার চোখ সুমুখের বাড়ীর উপরে পড়িল।

সেখানে, বাড়ীর এক জানালায় দুটি ক্ষুধিত নয়নের লোলুপ দৃষ্টি অমলার ঘরের দিকে স্থির হইয়া ছিল।

অমলা সে দৃষ্টি দেখিল। যাহার সে দৃষ্টি, সেও অমলাকে দেখিল।

অমলা ছবির মত নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে দৃষ্টি যেন সর্পের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে ! কিন্তু, তবু সে সেখান হইতে এক পাও নড়িতে পারিল না।

ছুটিয়া গিয়া সামনের জানালাটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য, তাহার মনের ভিতরে একটা ইচ্ছা জাগিয়া উঠিতেছিল ; কিন্তু কেমন একটা অন্যায় দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয়ের মধ্যে সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল।

জানালা খোলাই রহিল !

সে দৃষ্টি তখনও স্থির—এবং, তেমনই ক্ষুধিত, তেমনই ব্যগ্র !

সে যেন অমলাকে গ্রাস করিতে চায়, তাহার অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে চাহে !

সে দৃষ্টির কি মোহ !—চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপ্ত অগ্নির মত সে দৃষ্টি জ্বলিতেছিল, জ্বলিতেছিল !

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে অমলার মেয়ে কাঁদিয়া উঠিল। সেই কান্নায় অমলার সাড়্ হইল।

থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অমলা মেঝের উপরে বসিয়া পড়িল।

সেদিন স্বামী-স্ত্রীতে আর কথাবার্ত্তা হইল না ; তার পরদিন না—তার পরের দিনও না ! অভাবের সংসারে ঝগড়া কিছু নূতন ব্যাপার নয় ; তার আগেও অনেকবার ঝগড়া করিয়াছে। কিন্তু এবারকার ঝগড়ার এই নীরবতা কিছু নূতনতর।

মুখ ফস্কাইয়া হঠাৎ একটা খারাপ কথা বাহির হইয়া গিয়াছে বলিয়া রাজেন্দ্র এখন মনে মনে অনুতপ্ত। স্ত্রীর সঙ্গে আবার মিট্‌মাট্ হইয়া গেলে সে বর্ত্তিয়া যায় ; কিন্তু আগে থাকিতে সাধিয়া কথা কহিলে পাছে তাহার স্বামিত্বগৌরব খর্ব্ব হইয়া পড়ে, সেই ভয়ে সে আপনার মৌনব্রত ভঙ্গ করিল না।

সংসারে কোন বড় ঘটনার কারণ খুঁজিতে গিয়া আমরা ছোট ঘটনাকে অবহেলা করিয়া এড়াইয়া যাই। কিন্তু সাংসারিক ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি সাধারণের চোখে তুচ্ছ হইলেও অনেক সময়ে তাহারাই বড় ঘটনার জন্ম দেয়—বীজ যেমন ছোট হইয়াও বড় গাছের জন্ম দেয়। আমরা এটা বুঝি না বলিয়াই অনেক সময়ে অনেক বড় ঘটনার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না।

ছ

এ কয় দিন অমলা রোজ ছাদে উঠিয়াছে, আর রোজ চিঠি পাইয়াছে।

চিঠিগুলা যখন সে কুড়াইয়া লইত, তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত, অন্য বাড়ীর ছাদ হইতে আর একজনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাহার উপরে স্থির হইয়া আছে। অমলার মনে হইত, সে দৃষ্টি হইতে যেন একটা অসহ্য উত্তাপ আসিয়া তাহার দেহের মাংস ভেদ করিয়া বুকের ভিতরে গিয়া স্পর্শ করিতেছে। পাছে চোখোচোখি হয়, সেই ভয়ে সে আপনার দৃষ্টিকে নত করিয়া রাখিত।

কতবার সে মনে করিয়াছে, চিঠি পাইলেই ছাদের উপরে দাঁড়াইয়াই কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে ! কিন্তু চিঠি পাইয়া তাহার মনে হইত, ভিতরে না জানি কত রহস্যই আছে ; একবার না পড়িয়া কি ফেলিয়া দেওয়া যায় ?

তাহার রূপ নিয়া যতটা অত্যুক্তি প্রকাশ করা যাইতে পারিত,

পত্রলেখক তাহা করিত। সে সব পড়িয়া অমলা খুসী হইত এবং মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিত। পত্রে আরও কত কথা ছিল,—প্রেমের কথা, নিরাশার কথা, মিলন ও বিরহের কথা!

কথাগুলা অমলার মন্দ লাগিত কি? বোধ হয়, না। কারণ, সেইটেই স্বাভাবিক। অমলা দরিদ্র-ঘরণী, সংসারের অভাব ও জ্বালাঝঞ্ঝাটের ভিতরে তাহার রূপ বনফুলের মত অনাদৃত হইয়া থাকিত, একথা আগেই বলা হইয়াছে। আপনার যৌবন-বসন্তে ভাল করিয়া কোকিলের সাড়া সে কখনও শুনিতে পায় নাই—তাহার জীবনের একটা মধুর অংশ অনেকটা অপূরন্ত হইয়া ছিল। আজ এক ধনীর নন্দন তাহার চরণ-পূজা করিতে চাহিতেছে, ইহাতেও অবিচল থাকা অমলার পক্ষে বড় শক্ত কথা। হয়ত তেমনধারা মনের বলও তাহার নাই। আর এই সঙ্গীন মুহূর্ত্তে তাহাকে সৎপরামর্শে সাবধান করিবার লোকও সংসারে স্বামী ছাড়া আর কেহ ছিল না। কিন্তু, স্বামীর সঙ্গেও তাহার কথা বন্ধ!

* * *

আরসিতে অমলা মুখ দেখিতেছিল,—হাঁ, তাহার চোখের কোণ্ হইতে অটুট যৌবনের চঞ্চল বিদ্যুৎ এখনও সরিয়া যায় নাই; কপোলের গোলাপী রং অযত্নে একটু মলিন হইলেও এখনও বিবর্ণ হইয়া যায় নাই। ঝী-মুখপুড়ী ঠিক বলিয়াছে,—প্রতিমার মত রূপই বটে! এ রূপ কি দু'খানা সোণাদানা না হইলে মানায়?

আপনার হাত দু'খানি সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। ক-গাছা কালোরংয়ের 'জলতরঙ্গ' চুড়ী রিণি রিণি ক'রে তাহাকে যেন উপহাস করিতেছিল। চুড়ীগুলাকে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তাহার মনে একটা দুর্দ্দম বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু এ চুড়ী ভাঙ্গিলে ফের কাচের চুড়ী কেনাও যে তা'র পক্ষে শক্ত কথা!—ভ্রূসঙ্কোচ করিয়া অমলা বিরক্তিভরে হাত নাড়া দিল,—কাচের চুড়ীগুলা কৌতূহল হাস্যে কলধ্বনি করিয়া উঠিল, রিণিঝিণি রিণিঝিণি রিণি-ঝিণি!

পরণের কাপড়খানা ছেঁড়া-খোঁড়া, রান্না ঘরের ধোঁয়া মাখানো। ছেঁড়া মেঘের চাঁদের আলোর মত, ছিন্নবস্ত্রমধ্য দিয়া তাহার শুভ্র দেহের লাবণ্য স্থানে স্থানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার স্বামীর সকল ব্যবহারের ভিতরে আজ সে একটা গভীর অবহেলা অনুভব করিল। সকলেই কিছু বড়লোক হয় না, মুখের দুটো মিষ্টি কথাতে ত' আর পয়সা লাগে না! তার স্বামী যে তাতেও নারাজ!

তিক্তবিরক্ত চিত্তে অমলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘোরঘটা করিয়া সেদিন অবিরাম বাদল নামিয়াছে। শূন্যপথে ধূর্জ্জটী যেন আজ মহা তাণ্ডবে মাতিয়া আছেন,—ঐ নিকষ-কালো মেঘপুঞ্জ যেন তাঁহারই নৃত্যোৎক্ষিপ্ত জটাজুটের রুদ্রলীলা প্রকাশ করিতেছে এবং বিদ্যুতে বিদ্যুতে যেন তাঁহারই নেত্রবহ্নি রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! পথ প্রায় জনশূন্য, কেবল মাঝে মাঝে এক একজন পথিক ছাতিতে কোন রকমে কাঁধ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া নির্জ্জীবের মত আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতেছে। দূরের বাড়ীগুলা অস্পষ্ট, তাহাদের পিছন হইতে দুই তিনটি তালগাছের ঝাপসা-সবুজ মাথা ঝোড়ো বাতাসে হেলিয়া হেলিয়া পড়িতেছিল। কতকগুলা কাক উড়িয়া উড়িয়া তালগাছের উপরে বসিতেছিল, আবার উড়িতেছিল,—অমলা উদাসচোখে তাহাই দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ পিছনে দরজা খোলার শব্দ হইল। অমলা ফিরিয়া দেখিল, ঝী।

একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই বৃষ্টিতে তুই কোথা থেকে এলি?"

মুখ টিপিয়া টিপিয়া একটু রহস্যের হাসি হাসিয়া ঝী বলিল, "আকাশ থেকে পড়্‌লুম দিদিমণি!"

অমলা বেশ বুঝিতে পারিল, ঝীয়ের এই হঠাৎ আবির্ভাব ও ধরণ-ধারণে একটা কিছু ব্যাপার লুকোনো আছে। সন্দিগ্ধস্বরে সে বলিল; "তোর কি দরকার রে?"

"একজন পাঠিয়েচে।"

অমলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। আস্তে আস্তে সে বসিয়া পড়িল।

ঝী বলিল, "আমি কি কর্‌ব বল দিদিমণি! আমরা চাকরি করি, যা বলে তা দাঁতে কুটো নিয়ে তখনি কর্‌তে হয়।"

অমলা চুপ করিয়া রহিল।

ঝী ভরসা পাইয়া বলিল, "আর তাও বল্‌তে হবে দিদি, মানুষটা তোমাকে দেখে পাগলের মত হয়ে গেছে।"—কথাটা শুনিয়া অমলার মুখ কি-রকমধারা হয়, তাহা দেখিবার জন্য সে সুমুখে ঝুঁকিয়া পড়িল।

কিন্তু অমলার মুখ একেবারে ভাবশূন্য, সে একেবারে চুপচাপ।

"শুধুকি তাই দিদি? আবার দেখনা কি সব পাঠিয়েচে!" বলিয়া ঝী তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে একটি মখ্‌মলের বাক্স বাহির করিল। বাক্সের ডালা খুলিয়া আবার বলিল, "দেখ্‌চ দিদি, কেমন সব ভারি ভারি গয়না! এই দেখ চন্দ্রহার, এই দেখ তাগা, বালা, আর এগুলো কি দেখচ? পালিসপাতার চুড়ী! আরো কত গয়না গড়্‌তে দিয়েচে,—ভাল সাঁচ্চাসল্‌মা-চুম্‌কীর কাপড়ের ফর্‌মাজ দিয়েচে! কিগো! অমন ক'রে বসে রইলে যে? একবার তবুও জিনিষগুলো নেড়েচেড়ে দেখ!"

অমলা নড়িল না। সে গহনার বাক্সের দিকে তাকাইয়া স্থিরনেত্রে কাঠের মত বসিয়া রহিল।

জ

ঝী যখন অমলাকে ঘরের ভিতরে একলা রাখিয়া চলিয়া গেল, তখনও সে তেমনি আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

তাহার সাম্‌নে সেই গহনার বাক্স। বাক্সের ডালা খোলা; ভিতর হইতে গহনাগুলা বর্ষার ম্লান আলোকেও ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিতেছিল। অমলা নিষ্পলকনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

এ গহনা তাহার! অমলার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু কে দান করিতেছে, আর—আর কেন এ দান? সে কথা ভাবিবামাত্র তাহার বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিল।

আস্তে আস্তে সে হারছড়া কম্পিত হস্তে তুলিয়া নিল। এ হার কত ভরির, কত দামের?—কে জানে! হারছড়া গলায় পরিলে কেমন মানায়, একবার সেটা পরখ্ করিয়া দেখিবার সাধ হইল,—কিন্তু সাহসে কুলাইল না। যদি কেহ দেখিতে পায়!

বাক্সের ভিতরে ওটা কি? চিঠি বুঝি?—হুঁ, তাই বটে।

অমলা চিঠিখানা খুলিয়া, পড়িল:—

"সামান্য উপহার পাঠালুম, না নিলে আমার কষ্ট হবে। পরে আরও পাঠাব, তুমি যা চাও, তাই দেব। এখনও কি তুমি আমায় দয়া কর্‌বে না? স্বপ্নে আমি তোমাকে দেখি, তোমা বই আমি আর কিছু জানি না। আর চুপ করে থেকো না,

চিঠির উত্তর দিও। উত্তর না পেলে আমি আত্মহত্যা কর্‌ব।"

আবার উত্তর চায়! উত্তর? হাঁ, উত্তর না পেলে আত্ম-হত্যা কর্‌বে!

আচ্ছা, মানুষটা যদি উত্তর পেলেই তুষ্ট হয়, তা'হলে দু-লাইন লিখ্‌তে দোষ কি? তাতে কি পাপ হবে? অমলা আপনাকে আপনি প্রবোধ দিয়া বলিল, না, পাপ আর কি? সেত' অন্য কিছু করিতেছে না—শুধু দু-লাইন উত্তর দিতেছে। কিন্তু না,—সে পরস্ত্রী হইয়া পরপুরুষকে কি কথা লিখিবে? তাহার লিখিবার কথা কি আছে?

হালভাঙ্গা নৌকার মত অমলার মন, তাহার বুকের ভিতর দোলা খাইতে লাগিল। কি যে করিবে, কিছুই সে ঠিক করিতে পারিল না। নৌকা যখন এমনি লক্ষ্যহীন, তখন সে সহজেই ডুবুডুবু হয়।

গহনাগুলা যেন অমলাকে আপনাদের মৌন ভাষায় ডাক্ দিয়া বলিতেছিল, "ওগো রাণী, আমাদের প্রতি বিমুখ হয়োনা—তোমার দেহখানিকে সুন্দর কর্‌তে পার্‌লেই আমাদের জীবন সার্থক হবে! তোমার ঐ পেলবশুভ্র কণ্ঠ, বাহু ও হস্তের স্পর্শ পেলে আমরা ধন্য হয়ে যাব!"

কি করিব? চিঠি লিখিব, না গহনা ফিরাইয়া দিব?—এতগুলা গহনা!

অমলার মাথা ঘুরিতে লাগিল; সে আর ভাবিতে পারিল না। হঠাৎ সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হইল। অমলার মুখ মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। এ পদশব্দ তাহার স্বামীর!

অমলা হুম্‌ড়ি খাইয়া বাক্সের উপরে পড়িল। তাড়াতাড়ি ডালা বন্ধ করিয়া বাক্সটা আপনার কোলের ভিতরে টানিয়া নিয়া তাহার উপরে আঁচল-চাপা দিল।

ঝ

রাজেন্দ্র, একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকিল। তাহার মুখ আজ প্রফুল্ল।

অমলা তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল। রাজেন্দ্র অমলার প্রতি চাহিয়া আপনমনে মৃদুহাস্য করিল। তা'র পর আল্‌নার সুমুখে দাঁড়াইয়া আপিসের জামাকাপড় খুলিতে লাগিল।

জামাকাপড় ছাড়িয়া রাজেন্দ্র আস্তে আস্তে অমলার পাশে গিয়া বসিল।

অমলার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। তাহার প্রাণ যেন কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিল।

স্ত্রীর মুখের দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রাজেন্দ্র কহিল, "ইস্, আর কতদিনে এ দুর্জ্জয় মান ভাঙ্‌বে?"

অমলা মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। রাজেন্দ্র যে হঠাৎ কেন তাহার সহিত সাধিয়া কথা কহিতে আসিল, সেটা সে আদোপেই বুঝিতে পারিল না।

রাজেন্দ্র, অমলার এই স্তব্ধভাব দেখিয়া বোধ হয় ব্যথিত হইল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে সে ধীরে ধীরে বলিল, "দেখ অমলা, আমাদের মত গরীব কেরাণীর সংসারে দুজনেই দুজনার মন বুঝে চলা উচিত। দেখ্‌চ ত', গাধার মত খেটেখেটেও সায়েবের মন পাই না, সর্ব্বদাই বকুনি খাই। এর পরে সংসারের টানাটানিতে বাড়ী এসেও মনে কোন সুখ নেই। এ খাটুনি, এ কষ্ট একলা হ'লে কি এতদিন সহ্য কর্‌তাম? খালি তোমাদের মুখ চেয়ে এত অপমান আর কষ্ট স'য়ে আছি বইত' নয়! সময়ে-অসময়ে মুখ দিয়ে যে ছোট অকথা-কুকথা বেরিয়ে যায়, একি আমি ইচ্ছে করে করি, অমল?"

অমলার মাথা ক্রমেই নীচু হইয়া পড়িতেছিল।

রাজেন্দ্র বলিতে লাগিল, "তোমাকে যে আমি ভালবাসি, এটা আমি মুখের কথায় বা কাজে প্রকাশ কর্‌তে পারি না ব'লে আমাকে তুমি সন্দেহ কো'র না। দেখ, আপিস থেকে আসি তোমারই মুখ ভাব্‌তে ভাব্‌তে, রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে এই ভেবে শান্তি পাই যে, বাড়ীতে আমার অপেক্ষায় একজন যত্ন কর্‌বার লোক পথ চেয়ে ব'সে আছে! তোমাকে আমি যত্ন কর্‌তে পারি না, এ জন্যে আমিও মনে মনে কষ্ট পাই; কিন্তু, কি করব, উপায় নেই—উপায় নেই।"—একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আজ চার বছর আমি আমার জলখাবারের চারটি ক'রে পয়সা জমিয়ে আস্‌চি। এ কথা তুমি জান না। আজ ক'দিন হ'ল, আমার মাইনে বেড়েচে, এ কথা শুন্‌লে তুমিও বোধ করি সুখী হবে, তাই সাহস করে সেই জমানো টাকার ওপরে আরও কিছু টাকা ধার ক'রেচি। কেন জানো? এই জন্যে।"—বলিয়া, রাজেন্দ্র কাপড়ের ভিতর হইতে একটি বেগুণি রংয়ের কাগজের মোড়ক বাহির করিল। মোড়কটি খুলিলে দেখা গেল, তাহার ভিতরে ক'গাছা নূতন সোণার চুড়ী রহিয়াছে।

অমলার মনে হইল, কে যেন তাহাকে খুব একটা উঁচু জায়গা হইতে ধাক্কা মারিয়া নীচে ফেলিয়া দিল। যে স্বামীর ভালবাসাকে এতদিন সে সন্দেহ করিয়াছে, সেই স্বামী যে তাহাকে মৌখিক ভালবাসা জানাইতে না পারিলেও, তাহার জন্য নিজের সামান্য জলখাবারের পয়সা কয়টিও বাঁচাইয়া আসিতেছেন, এই অজ্ঞাত সত্যকথাটা আজ অমলার সারা জীবনটাই যেন মিথ্যা করিয়া দিল। স্বামীর উপরে মিছা অভিমানে ও সয়তানের প্রলোভনে এখনি সে হয়ত' কি করিতে কি করিয়া বসিত! তাহার মন যে এত সহজে বেঁকিয়া যাইতে পারে, এটা সে আদোপেই জানিত না;—ভাগ্যে এখনও এই মুহূর্ত্তের ভুলকে শোধ্‌রাইবার উপায় আছে! অমলা আপনার রূপকে ধিক্কার দিল, আপনার মনকে ধিক্কার দিল, আপনার অভিমান ও সন্দেহকে ধিক্কার দিল! সোণার চুড়ী পাইয়া অমলার প্রাণে আজ কোন আনন্দই হইল না; তাহার নারী-হৃদয়ের গোপন দুর্ব্বলতা এমন ভাবে ধরা পড়িয়া যাওয়াতে, সে আর আপনাকে সাম্‌লাইতে পারিল না; নিজের কোলের ভিতরে মুখ লুকাইয়া অমলা একেবারে শিশুর মত ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাজেন্দ্র অবাক্ হইয়া গেল। ভাবিল, সেদিনকার কটু কথা অমলা বুঝি এখনও ভুলিতে পারে নাই। অত্যন্ত দুঃখিত স্বরে সে বলিল, "মুখ ফস্‌কে একটা কথা হঠাৎ বেরিয়ে গেছে বলে' কতদিন আর এমন ক'রে থাক্‌বে অমল?"

অমলা প্রায়-রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওগো আমার বুকটা তুমি দু'পায়ে দ'লে পিষে দিয়ে যাও—তোমার পায়ের তলায় আমি ধূলোর মত গুঁড়ো হ'য়ে ম'রে যাই।"

রাজেন্দ্র অমলার কথার আসল মানে আদোপেই বুঝিতে পারিল না। বোকা বনিয়া, মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল, "অমল, তুমি কি বল্‌চ?"

অমলা বুঝিল, সে যদি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে

চায়, তাহা হইলে আর লুকাচুরি করিলে চলিবে না। এটা বুঝিয়া সে শক্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। তা'রপর চোখের জল মুছিয়া স্বামীর দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "আমার আর চুড়ী চাই না।"

"অ্যাঁ,—সে কি?"

"হাঁ,—আমার গয়না আছে।"

"কি?—কি?"—

"আমার গয়না আছে। এই দেখ।"—বলিয়াই, অমলা তাহার কাপড়ের ভিতর হইতে গয়নার বাক্সটা বাহির করিয়া দুম্ করিয়া মেঝের উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। গহনাগুলা চারিদিকে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র প্রথমটা হতভম্বের মত গহনাগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর জড়িত স্বরে কহিল, "এ সব কি অমলা? গয়না তুমি কোথা থেকে পেলে?"

অমলা সহজস্বরে বলিল, "একজন দিয়েচে।"

"দিয়েচে!—কে?"

"ঐ চিঠিখানা প'ড়ে দেখ।"

গহনাদাতার পত্রখানা তুলিয়া নিয়া রাজেন্দ্র বিস্ফারিত নেত্রে তাহা পাঠ করিল। তা'রপর জিজ্ঞাসা করিল, "এ চিঠি লিখ্‌লে কে?"

অমলা নিজেই বুঝিতে পারিল না, তা'র এত জোর, এত সাহস কি করিয়া আসিল? সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্পষ্টস্বরে বলিল, "যে চিঠি লিখেচে, তা'কে দেখ্‌বে?"

বিবর্ণ ও চিন্তিত মুখে রাজেন্দ্র বলিল, "হুঁ।"

জানালার কাছে আগাইয়া গিয়া অমলা বলিল, "এদিকে এস।"

সুমুখের বাড়ীর জানালায় সেই হিংস্র চক্ষুদুটো জলন্ত অগ্নির মত তেমনি সজাগ হইয়া ছিল। অমলাকে দেখিবামাত্র সে চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু অমলার পাশে রাজেন্দ্রকে দেখিয়াই হঠাৎ আবার কুঞ্চিতফণা সর্পের মতই নত হইয়া পড়িল।

রাজেন্দ্র এতক্ষণে সব ব্যাপারটা আন্দাজ করিতে পারিল। সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

* * * * *

অমলা ঘরের মেঝে হইতে একে একে গহনাগুলা কুড়াইয়া আনিয়া, জানালা গলাইয়া অবজ্ঞাভরে রাস্তার উপরে ফেলিয়া দিল। সয়তানের চোখ দেখিয়া আজ সে একটুও ভয় পাইল না।

তাহার অশান্ত বুকটা যেন এতক্ষণ ভারি পাথর হইয়া ছিল; এখন সে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল,—তাহার মনের সকল ময়লা একেবারে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। * * *

গৃহতলে হাঁটু গাড়িয়া, সে স্বামীর দেওয়া সোণার চুড়ী পরিতে বসিল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সে দোষ আমারি

ফল্গুরাগে আসে ধীরে ফাল্গুনের ফুলময় ঊষা,
শারদ নিশীথ আসে সুলগনে পরি চন্দ্র-ভূষা,
বার বার আসে যায়—
তবু যদি হায়,
নিমেষের ভুলে
প্রিয়েরে আমার বক্ষে তুলে
না লইতে পারি,—
সে দোষ আমারি।

মলয়ের পুলক-পরশে,
পরম হরষে,
নিকুঞ্জ-বিতানে
কল-কণ্ঠ বিহঙ্গের ব্যাকুল আহ্বানে,
হয় গাঁথা মালতীর স্বয়ম্বর-মালা;
বরণের ডালা
শরৎ সাজায়ে তুলে,
হৃদয়-শোণিত-রাঙ্গা-বৃন্ত-শোভা শেফালির ফুলে;
তবু যদি আমি,
হে প্রিয় দয়িত মোর, হে জীবন-স্বামি,
বরণের শুভ আয়োজনে
আনন্দ-লগনে
সে মালা তোমার গলে দোলাতে না পারি,—
প্রাণাধিক, সে দোষ আমারি।

ফুটাইয়া লক্ষ মল্লিরাশি,
মধু হাসি,
রমার আনন-অনুকারী,
তারা-মনোহারী,
রাস-রজনীর পূর্ণচাঁদ,
পাতি মর্ম্মচোরা ফাঁদ,
কতবার আসে যায়,
তবু হায়!
তব সনে,
আনন্দ-বাসর সম্মিলনে
তৃষার্ত্ত বুকের আশা,
হৃদয়ের সব ভালবাসা,
তৃপ্ত যদি না করিতে পারি,—
ওগো প্রিয়তম, সে দোষ আমারি।

বিধাতার আশীষ সমান
হৃদয়ের বান
নন্দন হইতে নামে,
মূর্খ মোরা চেয়ে থাকি দক্ষিণে ও বামে,
অভ্যাসের সুজীর্ণ নিগড় দিয়া
জীবনেরে রেখেছি বাঁধিয়া,
আনন্দের উন্মাদিনী ধারা,
মন্দাকিনী পারা,
ঐরাবত মত
ভাসাইয়া নিতে চায় মিথ্যা দ্বিধা দ্বন্দ্ব শতশত;

নিয়মের হেরি রক্ত আঁখি
দুর্ব্বল এ বক্ষ মাঝে থরথরি কাঁপে প্রাণ-পাখী;
প্রাণ যাহা প্রাণপণে চায়,
বাধা-বিঘ্ন চরণে দলিয়া হায়!
তারে যদি বক্ষে তুলে নিতে নাহি পারি,—
হে প্রিয়, পরম বন্ধু, সে দোষ আমারি।

ওগো মোর চিরানন্দ, ওগো প্রিয়তম,
তুমি যে গো একমাত্র মম,
তোমারে বিদায় দিনু বিস্মৃতির মাঝে!
প্রভাতে ও সাঁঝে,
যে অশ্রু ঝরিছে তোর,
সে বেদনা ঘোর—
বক্ষে মোর করিছে আঘাত
চির দিনরাত।
দাঁড়ালে দুয়ারে দুঃখী দু'হাত বাড়ায়ে,
দিনু তবু সুদূরে তাড়ায়ে:
অন্নপূর্ণা ভেবে এসে অনশন পেলিরে ভিখারি,—
প্রাণ-বঁধু, ক্ষমা কর, সে দোষ আমারি।

অবিচ্ছেদ মিলন মাগিয়া,
বর্ষ বর্ষ জাগিয়া জাগিয়া,
করেছিলি কত আবেদন—
দু'হাত ভরিয়ে পেলি "নির্ব্বাসন" "বিরহ-বেদন"!
কাণে কাণে ছিল কত কথা,
দিলাম, পেলাম শুধু ব্যথা!
প্রিয়তম, তুই যে রে একান্ত আমারি,
জানিনা কেমনে তোরে নিজ হাতে সাজানু ভিখারী!
এ নহে অস্নেহ প্রাণধন,—
অন্যায় পীড়ন-পদে দুর্ব্বলের প্রাণ বিসর্জ্জন;
নাহি মুখ কিছু বলিবার,
তবু বার বার,
এখনও যে মনে হয়
"আসিবে সময়"—
"প্রণয়ের পরিণাম নহে পরাজয়"—
"এ প্রেম সার্থক হবে" রে ভিখারি, নাহি তোর ভয়।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

মূর্ত্তি-পরিচয়

গণেশ-মূর্ত্তি

হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তিরই বহু-প্রকার ভেদ আছে। প্রকারভেদ অনুসারে প্রত্যেক দেবদেবী বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এক এক নামের দেবদেবীর স্বতন্ত্র ধ্যানাদি শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেক সময় হিন্দুমূর্ত্তিকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া এবং বৌদ্ধমূর্ত্তিকে হিন্দুমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম হয়। জৈন ও বৌদ্ধমূর্ত্তির পার্থক্য সকল সময় ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই ত্রিবিধ মূর্ত্তির ধ্যান স্বতন্ত্র। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত তাহা অপরে জানেন না। হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলির ধ্যান ও নাম প্রভৃতি যাহাতে অনায়াসে সাধারণের বোধগম্য হয়, তজ্জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। সর্ব্বাগ্রে আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিঘ্নবিনাশন গণেশমূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রবন্ধের নামই যখন ইহার উদ্দেশ্য সূচিত করিতেছে, তখন কোনও মুখবন্ধ না করিয়াই আলোচ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পূর্ব্বে গণপতির কোথাও উল্লেখ আছে বলিয়া মনে হয় না। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (১।২১) গণপতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বলিয়া ঈরিত হইয়াছেন! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে গণেশ পূর্ব্বে মানব-আকারে কৃষ্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। স্কন্দপুরাণ, বরাহ-পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, শিবপুরাণ, লিঙ্গ-পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং সুপ্রভেদাগমে গণেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক রকমের বিবরণ আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে গণেশজন্মবিবরণ পাঠ করিতে পারেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে যে বিনায়ক সূর্য্যমন্দিরে পূজিত হইতেন। নেপাল-রাজ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই অদ্যাপি সকল কার্য্যে সিদ্ধিলাভের জন্য কার্য্যের প্রারম্ভে বিনায়কের আরাধনা করিয়া থাকে। নেপালে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরে, চীন, জাপান ও মঙ্গোলিয়ায় এবং যবদ্বীপে গণেশমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। বৌদ্ধশাস্ত্রে গণেশের নাম বিনায়ক;—জাপানীরা তাঁহার নাম দিয়াছে—'বিনয়কিয়'। কতদিন হইতে গণেশপূজার আরম্ভ হইয়াছে, তাহা স্থির করা সহজসাধ্য নয়; তবে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্বে যে গণেশ-পূজার আরম্ভ হইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। নেপালের সুবিখ্যাত পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তরে একটি অতি প্রাচীন গণেশমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটা অশোকের এক কন্যা চারুমতী খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পুরাণে ও তন্ত্রে ৫৪ প্রকারের গণেশমূর্ত্তি পরিচয় পাওয়া যায়। যবদ্বীপে বহুবিধ গণেশমূর্ত্তি আছে। এ পর্য্যন্ত যতগুলি গণেশ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়্ভুজ ও অষ্ট-ভুজবিশিষ্ট গণেশমূর্ত্তিই দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টভুজের অধিক ভুজবিশিষ্ট মূর্ত্তি অদ্যাপি কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। নামভেদে গণেশের মূর্ত্তিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বাল-গণেশ, তরুণ-গণেশ, ভক্তি-বিঘ্নেশ্বর, বীর বিঘ্নেশ, প্রসন্ন-গণেশ, উচ্ছিষ্ট-গণেশ, কেবল-গণেশ, হেরম্ব-গণেশ, নৃত্ত-গণেশ, লক্ষ্মী-গণেশ প্রভৃতি

গণদেবের ৫৪ প্রকার-ভেদ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে গণেশ-মূর্ত্তির কয়েকটি প্রকারের আলোচনা করিব।

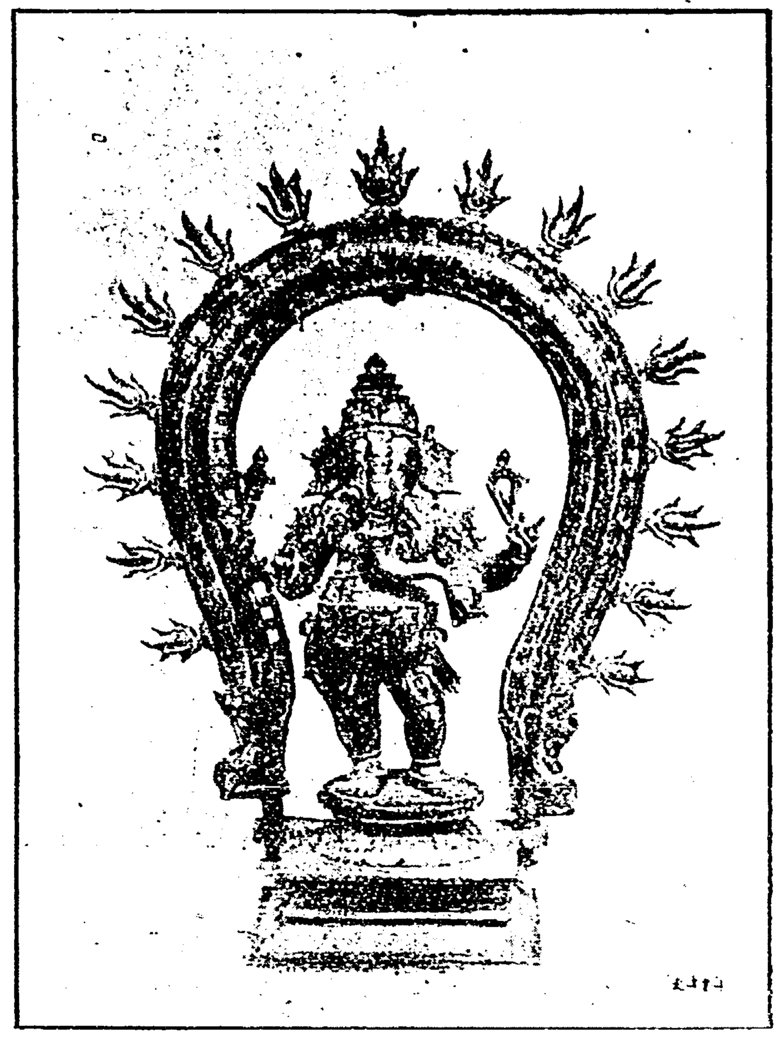

(ত্রিভঙ্গ) প্রসন্ন-গণেশ

প্রসন্ন-গণেশের মূর্ত্তি সর্ব্বত্রই দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গণেশের শরীর ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন—কিন্তু কোথাও কোথাও আবার এই মূর্ত্তি সরলভাবে দণ্ডায়মান থাকে। গ্রন্থবিশেষের মতে মূর্ত্তিটী 'অভঙ্গ' হওয়া আবশ্যক, গ্রন্থান্তর মতে ইহা 'সমভঙ্গ'। যখন ভঙ্গ হইবে তখন সাধারণতঃ ত্রিভঙ্গ। মূর্ত্তি পদ্মাসনে স্থিত। প্রসন্ন-গণেশমূর্ত্তি তরুণ অরুণের ন্যায়

প্রসন্ন-গণপতি (সমভঙ্গ)

রক্তাভ ও রক্তবস্ত্রপরিহিত। ইহার দুহস্তে 'পাশ' ও 'অঙ্কুশ', অপর দুই হস্তে 'বরদ' ও 'অভয়' মুদ্রা। গ্রন্থে যদিও দুই মুদ্রার কথা লিখিত আছে, কিন্তু কোথাও তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুতঃ ঐ দুই হস্তে 'দন্ত' ও 'মোদক' থাকে। যেন শুণ্ডে করিয়া তুলিয়া মুখে দিতেছেন এইরূপ ভাবে মোদকটী স্থিত।

"উদ্যদ্দিনেশ্বররুচিং নিজহস্তপদ্মৈঃ
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্দধতং গজাস্যম্।
রক্তাম্বরং সকলদুঃখহরং গণেশং
ধ্যায়েৎ প্রসন্নমখিলাভরণাভিরামম্॥

(মন্ত্ররত্নাকর)

নৃত্ত-গণেশ—ইহা নর্ত্তনশীল গণেশের মূর্ত্তি। ইনি অষ্টভুজবিশিষ্ট। ইঁহার সাত হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, অপূপ, কুঠার, দন্ত, বলয় ও অঙ্গুরীয়। নৃত্যকালে হাবভাবের সুবিধার জন্য এক

নৃত্ত গণেশ

হস্ত শূন্য থাকে—ইহাতে কিছুই থাকে না। ইঁহার বর্ণ পীতপ্রভ। নৃত্তমূর্ত্তি বুঝাইবার জন্য ইঁহার বামচরণ ঈষৎ বক্রভাবে স্থিত। মূর্ত্তিটী পদ্মাসনে আসীন, দক্ষিণ চরণ বক্রভাবে শূন্যে অবস্থিত। সাধারণতঃ নৃত্ত-গণেশের যে সমুদয় মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিতে চতুর্ভুজই আছে, গ্রন্থোক্ত অষ্টভুজ নয়। ধ্যান যথা ঃ—

"পাশাঙ্কুশাপূপকুঠারদন্তচঞ্চৎকরং বলয়·· ···মঙ্গুলীয়কম্।
পীতপ্রভং কল্পতরুরুহস্তং ভজামি নৃত্তৈকপদং গণেশম্॥"

কেবল-গণেশ—নৃত্তগণেশের হস্তে পাশাঙ্কুশাদি যেমন থাকে, কেবল-গণেশের হস্তেও সেইগুলি বিদ্যমান থাকে। কেবল-

কেবল-গণপতি

গণেশের প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরের মূর্ত্তিটী গজদন্তনির্ম্মিত। ইঁহার ধ্যান পাই নাই।

হেরম্ব-গণেশ

বিঘ্নেশ্বরের অন্যান্য মূর্ত্তি হইতে হেরম্বমূর্ত্তি সম্পূর্ণ পৃথক্। ইঁহার পাঁচটী করিমুণ্ড। চারিটী মুখ চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছে, ইঁহার পঞ্চম মুখ চারিটী মুণ্ডের উপরে অবস্থিত বলিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। হেরম্বমূর্ত্তি শক্তিশালী সিংহোপরি অবস্থিত। ইঁহার হস্তে পাশ, দন্ত, অক্ষমালা, পরশু এবং ত্রিমস্তকবিশিষ্ট মুদ্গর। এক হস্তে মোদক থাকিবে, অপর দুই হস্তে 'বরদ' ও 'অভয়' মুদ্রা। বর্ণ—পীতপ্রভ। ধ্যান এইরূপ ঃ—

"সিংহোপরি স্থিতং দেবং পঞ্চবক্ত্রং গজাননম্।
দশবাহুং ত্রিনেত্রঞ্চ জাম্বুনদসমপ্রভম্॥
প্রসাদাভয়দাতারং পাত্রং পূরিতমোদকম্।
স্বদন্তং সব্যহস্তেন বিভ্রতং চাপি সুব্রতে॥
······করং চাক্ষসূত্রঞ্চ পরশুং মুদ্গরং তথা।
পাশাঙ্কুশকরাং শক্তিং দেবং লম্বোদরং শুভম্॥
পীবরং চৈকদন্তঞ্চ তুম্বুরূণাং গণান্বিতম্।"

(শিল্পরত্ন)

বরং তথাঙ্কুশং দন্তং দক্ষিণে চ পরশ্বধঃ।
বামে কপালং বাণাক্ষপাশং কৌমোদকীং তথা॥
ধারয়ন্তং করৈরেভিঃ পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
হেরম্বং মূষকারূঢ়ং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থকামদম্॥"

(রূপমণ্ডন)

"অভয়বরদহস্তং পাশদন্তাক্ষমালা—
পরশুমথ ত্রিশির্ষৈর্মুদ্গরৈর্মোদকঞ্চ।
বিদধত্ববরসিংহ পঞ্চমাতঙ্গবক্ত্রঃ
কনকরুচিরবর্ণঃ পাতু হেরম্বনামা॥"

(ক্রিয়াক্রমদ্যোতি)

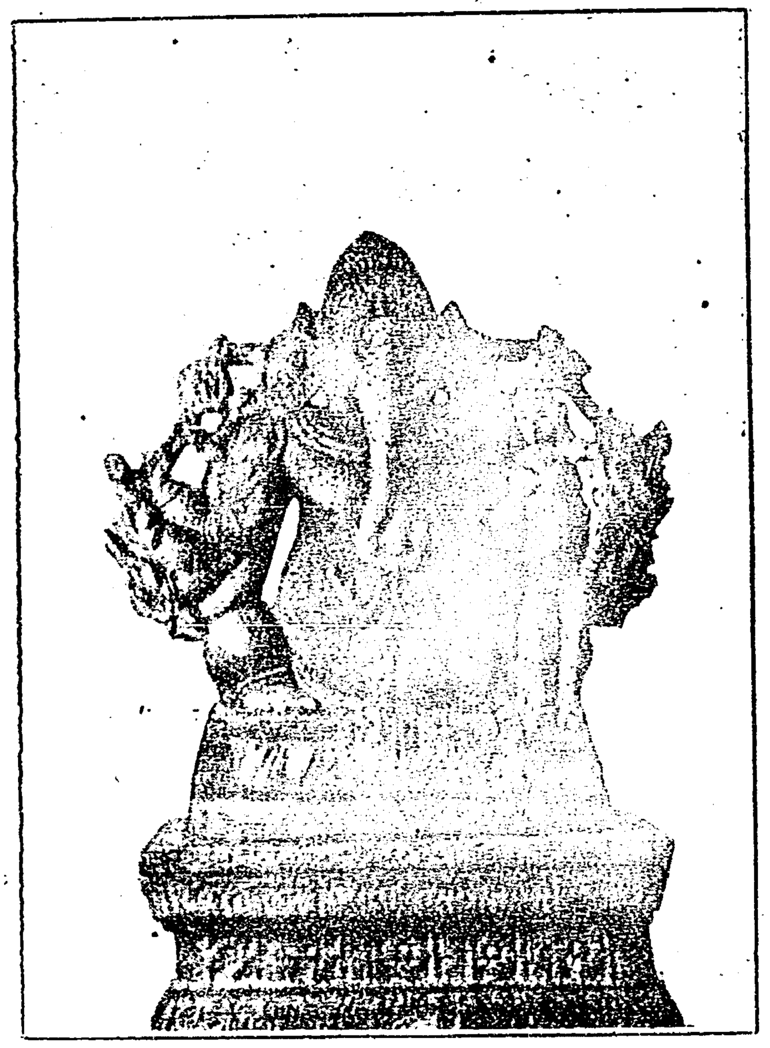

লক্ষ্মী-গণেশ

লক্ষ্মীগণেশ—অষ্টভুজমূর্ত্তি।

শুক, দাড়িম, পদ্ম, রত্নখচিত স্বর্ণজলপাত্র, অঙ্কুশ, পাশ, কল্পকলতা ও বাণের কোরক অষ্টভুজে অবস্থিত। বর্ণ—শ্বেত। অঘোর শিবাচার্য্য ক্রিয়াক্রমদ্যোতিতে এই বর্ণনাই করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রমহোদধিকার বলেন, লক্ষ্মী-গণপতির ত্রিনেত্র, দুই হস্তে দন্ত ও চক্র, এক হস্তে 'অভয়' মুদ্রা—চতুর্থ হস্তসম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই; বর্ণ—সুবর্ণাভ; লক্ষ্মী এক হস্তে গণেশকে ধারণ করিয়াছে, অপর হস্তে পদ্ম। লক্ষ্মী-গণেশের ধ্যান এইরূপ ঃ—

"দন্তাভয়ে চক্রধরৌ দধানং করাগ্রগস্বর্ণঘটং ত্রিনেত্রম্।
ধৃতাব্জয়ালিঙ্গিতমব্ধিপুত্র্যা লক্ষ্মীগণেশং কনকাভমীড়ে॥" (মন্ত্রমহোদধি)

"বিভ্রাণশ্ শুকবীজপুরকমলং মাণিক্যকুম্ভাঙ্কুশান্—
পাশং কল্পলতাঞ্চ বাণকলিকাস্রোতস্সরোনিস্সরঃ (?)।
শ্যামো রক্তসরোরুহেণ সহিতো বিদ্বন্নয়েনান্তিকে (?)
গৌরাঙ্গো বরদাদিহস্তকমলো লক্ষ্মীগণেশো মহান্॥"

(ক্রিয়াক্রমদ্যোতি)

উচ্ছিষ্টগণেশ—বহুবিধ অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অনেকে উচ্ছিষ্টগণেশের পূজা করিয়া থাকে। উচ্ছিষ্টগণেশ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। ক্রিয়াক্রমদ্যোতির বচনানুসারে এই মূর্ত্তির হস্তে---পদ্ম, দাড়িম্ব, বীণা, ধান্য ও অক্ষমালা থাকিবে, মন্ত্র-মহার্ণব-মতে উচ্ছিষ্ট-গণেশের হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ থাকিবে। এই মূর্ত্তির বর্ণ ঈষৎরক্তাভ হইবে। মূর্ত্তিটী পদ্মাসনে সমাসীন। এই গণেশের অঙ্কে দেবীমূর্ত্তি। দেবীমূর্ত্তি সর্ব্বাভরণভূষিতা, নগ্না, দ্বিভুজা, নাম—বিঘ্নেশ্বরী। উত্তরকামিকাগমে এই মূর্ত্তির যথাযথ বর্ণনা আছে। এতন্মতে মূর্ত্তিটি সমাসীন অবস্থায় থাকিবে, ইহা চতুর্ভুজ। তিন হস্তে পাশ, অঙ্কুশ ও ইক্ষুদণ্ড, এক হস্ত নগ্না দেবীকে ধারণ করিয়া আছে। মূর্ত্তি—কৃষ্ণ ও ত্রিনেত্রবিশিষ্ট। উচ্ছিষ্টগণেশ মস্তকে মুকুট ধারণ করিবে। গ্রন্থে উচ্ছিষ্ট-গণেশের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহার সহিত ক্ষোদিত মূর্ত্তির বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্ছিষ্ট-গণেশের যতগুলি মূর্ত্তি আছে তাহাদের সকল-গুলিতেই গণেশের অঙ্কে নগ্না দেবী-মূর্ত্তি—গণেশের দুই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ—একহস্তে লড্ডুক এবং অপর হস্ত দেবীর কটিধারণ করিয়া আছে। দেবীর হস্তে পদ্ম। ধ্যান যথা—

লীলাব্জং দাড়িমং বীণাশালী পুচ্ছাক্ষসূত্রকম্।
দধদুচ্ছিষ্টনামানং গণেশং বীরদেব চ॥

(ক্রিয়াক্রমদ্যোতি).

"শরং ধনুঃ পাশসৃণী স্বহস্তৈর্দধানমারক্তসরোরুহস্থং।
বিবস্ত্রপত্ন্যা সুরতপ্রবৃত্তমুচ্ছিষ্টমম্বাসুতমাশ্রয়েঽহং॥
চতুর্ভুজং রক্ততনুং ত্রিনেত্রং পাশাঙ্কুশৌ মোদকপাত্রদন্তৌ।
করৈর্দধানং সরসীরুহস্থমুন্মত্তমুচ্ছিষ্টগণেশমীড়ে॥

(মন্ত্রমহার্ণব)

উচ্ছিষ্টগণেশ

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

যূঁই

রে ফুল, কেন আজকে তারে
মনে পড়ালি,
শুষ্ক নয়ন এমন করে'
জলে ভরালি,
করবে কে আর আদর তোরে
নেইরে সে যে নেইরে ঘরে,
মাধুরী তোর বৃথায় আজি
হেথায় ছড়ালি।

বহুদিনের ভোলা চেনা
গানটী গাহিয়া,
হারা তরী উপকূলে
আনলি বাহিয়া,--
নিরুদ্দেশের পত্রখানি
হঠাৎ দিলি আজকে আনি,
তুই কি আমার প্রিয়ার সখী
শুভ্র মরালী!
রে ফুল, কেন আজকে তারে
মনে পড়ালি।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সঙ্কলন

১। ১৩২২ সালের মাঘ মাসের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ডাইরেক্টর-জেনারেল তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ খননকালে একখানি নূতন শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন তক্ষশিলা নগরীর ধ্বংসাবশেষ রাওলপিণ্ডীর পশ্চিমে সরাইকালা নামক ষ্টেশনের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সরাইকালা অথবা কালাতিসরাই মোগল বাদশাহদিগের রাজত্বকালে কাবুলের পথে একটি প্রসিদ্ধ সরাই অথবা চটি ছিল। স্যার্ জন্ মার্সাল তিন বৎসর ধরিয়া এই স্থান খনন করিতেছেন, তিনি বহু প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা ও খোদিতলিপি বাহির করিয়াছেন। তন্মধ্যে একখানি প্রস্তর-লিপি অতি আশ্চর্য্য-জনক। এই জাতীয় প্রস্তর-লিপি ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের কোনস্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা মলিন শ্বেত-মর্ম্মরের উপরে আরামীয় অক্ষরে উৎকীর্ণ এবং ইহার ভাষাও

আরামীয়। পূর্ব্বে পারস্য দেশে আরামীয় অক্ষরে উৎকীর্ণ বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মিসর দেশে আরামীয় ভাষায় লিখিত অনেক পাপীরস (Papyrus ভূর্জ্জপত্রের ন্যায় লেখা বস্তু) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ইঁহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ না হওয়ায় সার্ জন মার্সাল এই খোদিত-লিপির ফটোগ্রাফ ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। ব্রিটিস মিউজিয়ামের ডাঃ বার্ণেট এবং অধ্যাপক কাউলি এই খোদিত লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আর্থার ভিনিস্ এই খোদিতলিপির চিত্র দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহা আরামীয় অক্ষরে লিখিত। শ্রীযুক্ত বার্ণেট ও কাউলি অধ্যাপক ভিনিসের মতই সমর্থন করিয়াছেন। ডাঃ বার্ণেট অপেক্ষা, অধ্যাপক কাউলির উদ্ধৃত পাঠ ও অনুবাদ অধিকতর শুদ্ধ হইয়াছে। অনুবাদ ঃ—

১। স্মৃতিচিহ্ন
২। থির্কি কে ?
৩। ……উপরে খোদিত
৪। সেতার কাষ্ঠ এবং গজদন্ত
৫। ……এবং এই গুলি তাহার পিতার ছিল
৬। দেখ ইহা আমার রক্ষণীয় বস্তু
৭। এই বোহুবর্দ্ধ
৮। দান করিতেছিলেন যখন সে (স্ত্রী)
৯। আমাদিগের ভট্টারক পদিহ্
১০। তাঁহার রাজ্য
১১। এবং তাঁহার পুত্রগণও
১২। আমাদিগের ভট্টারক পুইদ্দশ্।

খোদিতলিপিটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ইহা কিসের খোদিত লিপি, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। অধ্যাপক কাউলি অনুমান করেন যে, খোদিতলিপিটি খৃঃ পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পারস্যের হতামানীয় বংশের রাজত্বকালে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। হতামানীয় রাজগণের কার্য্যালয়ে আরামীয় ভাষা ও লিপি ব্যবহৃত হইত, ফরাসী পণ্ডিত ক্লার্মঁত গাঁনো ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ পারসিক রাজ্যভুক্ত হইলে আরামীয় ভাষা ও বর্ণমালা এই দেশেও প্রচলিত হইয়াছিল এবং আরামীয় অক্ষর হইতে ভারতীয় প্রাকৃত ও সংস্কৃত লিখনের জন্য যে পরিবর্ত্তিত বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছিল, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের নিকটে তাহাই খরোষ্ঠী লিপি বলিয়া পরিচিত।

২। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন আহম্মদ-শাহ আব্দালীর বংশধর কাবুলরাজগণের সহিত সন্ধি-বন্ধনে উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেসন্ (Masson) নামক একজন ইংরেজ-দূত রণজিৎ সিংহের রাজ্য পার হইয়া কাবুলে গমন করিয়াছিলেন। মেসনই সর্ব্বপ্রথমে কাবুলের নিকট বেগ্রাম নামক স্থানে ভারতের গ্রীক রাজগণের প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মেসন কাবুল-যাত্রা-কালে বহু প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া প্রাচীন শিলালিপি ও মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংগৃহীত দ্রব্যাদি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিত-প্রবর হোরেস হেম্যান উইলসন্ এরিয়ানা য়্যান্টিকোয়া (A·i na An iqua) নামক আর্য্যাবর্ত্তের পুরাবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মেসনের কাবুল-যাত্রা সম্বন্ধীয় কাগজ-পত্র এখন বিলাতের লণ্ডন নগরে ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত আছে। গত বৎসর ইণ্ডিয়া আফিসের লাই-ব্রেরিয়ান বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ডাঃ টমাস্ এই সকল কাগজ-পত্রের মধ্যে একখানি নূতন খরোষ্ঠীলিপির সন্ধান পাইয়াছেন। মেসন লিখিয়া গিয়াছেন যে, জললাবাদের নিকট হিদ্দা গ্রামে একটি পার্ব্বত্য নদীর পার্শ্বে এক বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষের মধ্যে এই লিপিটি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কতকগুলি শুষ্ক জীর্ণ ভূর্জ্জপত্রে একটি মৃন্ময় ঘট জড়িত ছিল। এই ঘটটির পার্শ্বে কালি দিয়া খরোষ্ঠী লিপিটি লিখিত হইয়াছিল। পাছে কাবুল যাত্রাকালে ঘটটি ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে মেসন খরোষ্ঠী লিপিটির নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই নকল হইতে ডাঃ টমাস লিপিটির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ঘটটি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহা ভারতবর্ষের কোন মিউজিয়ামে অথবা লণ্ডনের ব্রিটিস মিউজিয়ামে নাই। মেসন নকল করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই এই খোদিত লিপিটির উদ্ধার হইল।

ইহা ২৮শ সংবৎসরে, বোধ হয় ২৮শ শকাব্দে (১০৬ খৃঃ অঃ) লিখিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত বর্ষে আপেলাইওস্ (Ap·llaios) মাসের ১০ম দিবসে সঙ্ঘমিত্র নামক জনৈক নবকর্ম্মিক অর্থাৎ মিস্ত্রী বা শিল্পী একটি রাজবৎ স্তূপে শরীর অর্থাৎ বুদ্ধের অস্থি বা ভস্মাবশেষ স্থাপনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্য

সহৃদয়তা।

গাড়োয়ান। দিন বাবু, আপনার ব্যাগটাও গাড়ীর ছাতের উপর রেখে দিই।

সহৃদয় ব্যক্তি। না হে না, তোমার ঘোড়ার যে রকম চেহারা, তার উপর আর বেশী ভার চাপাতে আমার মায়া হচ্ছে, এটা বরং আমিই কোলে নিয়ে বসি।

বিষম সমস্যা।

পুত্র। বাবা, মিশনরীরা কি স্বর্গে যায় ?

পিতা। নিশ্চয়।

পুত্র। আর যে সব অসভ্য লোক মানুষ খায়, তারা স্বর্গে যাবে না ?

পিতা। কখনই না।

পুত্র। এই যে কাগজে লিখেছে একটা অসভ্য লোক একজন মিশনরী সাহেবকে খেয়ে ফেলেছে, তবে ঐ অসভ্য লোকটা স্বর্গে না গেলে সাহেব যাবে কি করে ? সাহেব যে তার পেটের ভিতরে আছে !

বাবার বিদ্যা।

শিক্ষক। সতীশ, তোমার এই রচনা এত বিশ্রী হয়েছে যে, আমি এটা তোমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেব, এবং এর জন্য তোমাকে শাস্তি দিতে তাঁকে অনুরোধ ক'রব।

ছাত্র। স্যার, বাবাই ত ওটা লিখে দিয়েছেন !

কারও সর্ব্বনাশ কারও পৌষ মাস

গৃহকর্ত্রী। ডাক্তার বাবু, কাল আপনি আমার ভোজে এলেন না, এলে বেশ ভাল হ'ত।

ডাক্তার। সে জন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না—ভাল আমার এমনই হয়েছে, যে কালকের ভোজের পর তিন চারজন ভদ্রলোক আমার কাছে আজ ব্যবস্থা নিতে এসেছিলেন।

উভয়তঃ

ভৃত্য। রামবাবু আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন।

প্রভু। বটে ! বাঁচা গেল, বাড়ী ছিলুম না !

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনিও ঐ কথা বল্লেন !

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

আলোচনা

বাঙ্গালায় কর্ত্তৃক *

বাঙ্গালায় কর্ত্তৃকের ব্যবহার কোথা হইতে কিরূপে আসিল তাহা আমি বলিতে পারিব না। সম্ভবতঃ উহা ইংরেজি তর্জ্জমার খাতিরে হালের আমদানী। ইংরেজি edited by, printed by প্রভৃতি তর্জ্জমা করিবার জন্য ইহার ব্যবহার আসিয়া থাকিতে পারে। সংস্কৃতে যতগুলি বিভক্তি আছে, ইংরেজী বা বাঙ্গালার মত চলিত ভাষায় ততগুলি বিভক্তি নাই। বিভক্তির কাজ পৃথক্ শব্দ দ্বারা চালাইতে হয়। ইংরেজিতে এজন্য prepositon এবং বাঙ্গালাতে post-position ব্যবহার হয়। বাঙ্গালা pos-positon কথাগুলির ইতিহাস হয় ত আবিষ্কার করা যাইতে পারে। হইতে, চাইতে, দিয়ে প্রভৃতি এখন post-position রূপে ব্যবহৃত হয়। গোড়ায় হয় ত ইহারা অসমাপিকা ক্রিয়া ছিল। বহুকাল হইতে উহারা ভাষার সহিত মিশ খাইয়া গিয়াছে। আধুনিক কালের সাহিত্যের জন্য সাধু ভাষা গড়িতে গিয়া হেতু, জন্য, নিমিত্ত প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ সাধুভাষায় প্রবেশ করাইতে হইয়াছে। এই শব্দগুলিও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে post position এর কাজ করে। দ্বারা এবং কর্ত্তৃক শব্দ ঐরূপে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালা সাধুভাষা-গঠন-কার্য্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে পড়ায় এইরূপ ঘটিয়া থাকিতে পারে। 'Written by Jogendra' ইহার বাঙ্গালা তর্জ্জমা দরকার হইলে 'যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক লিখিত' এইরূপ বাক্যবিন্যাসই চলিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত গোড়ায় মিল রাখিবার চেষ্টা ছিল। লেখন এই ক্রিয়ার কর্ত্তা যোগেন্দ্র; অতএব যোগেন্দ্র কর্ত্তা যে ক্রিয়ার সেই ক্রিয়া যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক ক্রিয়ার। এইরূপে যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়া দাঁড়ায়।

উক্ত দৃষ্টান্তে লিখিত ক্রিয়ার বিশেষণ যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক। সংস্কৃতের নিয়মানুসারে উহাকে ক্রিয়ার বিশেষণই বলিতে হয়। আজকাল অবশ্য 'কর্ত্তৃক' একটা স্বতন্ত্র শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা, হইতে, চেয়ে প্রভৃতির মতন post-positon এর কাজ চালাইতেছে। ইংরেজি grammar-এর হিসাবে parse করিতে হইলে, বোধ হয় বলিতে হইবে যোগেন্দ্র is an objective case governed by the post position কর্ত্তৃক। ইংরেজিতে এইরূপ শব্দগুলি আগে বসে বলিয়াই উহাদের নাম preposition বাঙ্গলায় আগে না বসিয়া পরে বসাই রীতি। সেই জন্য post position বলাই উচিত। যে সকল পণ্ডিতেরা প্রথমে এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই যোগেন্দ্র কর্ত্তৃককে একটা সমস্ত বা সমাসবদ্ধ পদ বিবেচনা করিতেন এবং তদনুসারে উহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার ধাতু সমাসবদ্ধ পদের বড় একটা প্রশ্রয় দেয় না। এখানে বরং বাঙ্গালার সহিত ইংরেজির মিল অধিক আছে। এখন কর্ত্তৃককে একটা স্বতন্ত্র অব্যয়রূপে গণ্য করিলে বোধ হয় বিশেষ হানি হইবে না। দ্বারা শব্দটিও সংস্কৃত হইতে আসিয়া উহার পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত সমাসবদ্ধ হইত। আজ কাল উহা instrumental case বা করণ কারক সূচক post position এর কার্য্য করিতেছে। একালের লেখকেরা কর্ত্তৃক এবং দ্বারা এই দুই পদের ব্যবহারে বড় একটা ভেদ রাখেন না; এটা আমার অনুচিত বোধ হয়। আমার বিবেচনায়, ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব বুঝাইবার জন্য কর্ত্তৃক এবং করণত্ব বুঝাইবার জন্য দ্বারা ব্যবহার করা উচিত। 'যোগেন্দ্র দ্বারা মুদ্রিত' না লিখিয়া 'যোগেন্দ্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত' লিখিলেই ভাল হয়।' যোগেন্দ্রের মতন জীয়ন্ত মানুষটা করণ কারকে পরিণত না হইয়া উহার কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহাতেই তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাহিত্য-সংবাদ

পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারও অবস্থা ভাল ছিল না। পিতার অভাবে তাঁহার বিধবা কন্যার অন্নাভাব উপস্থিত হইয়াছে। সাহিত্য-সভা এই কর্ম্মী পুরুষের স্মৃতিরক্ষা ও ইঁহার কন্যার সাহায্যের জন্য অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথের পরিচিত বন্ধুমণ্ডলী ও ছাত্রমণ্ডলী বহুবিস্তৃত। তাঁহারা এই সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিলে, সাহিত্যের সৎচেষ্টা সফল হইবে, সন্দেহ নাই। ১০৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীট সাহিত্যসভার সম্পাদকের নামে যাঁহার ইচ্ছা সাহায্য পাঠাইতে পারেন।

—০—

এবার কুমিল্লাসহরে ত্রিপুরা-সাহিত্য-সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নব্যভারতের প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণ গত মাসের "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছে। এখানকার ভূকৈলাস রাজষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় বিএ মহাশয় একজন সাহিত্যানুরাগী ও ইতিহাস-প্রিয় ব্যক্তি। তিনি ইতোমধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রাচীন প্রস্তর-মূর্ত্তি ঢাকা মিউজিয়মে উপহার দিয়াছেন।

—০—

গত আষাঢ় মাসে লর্ড কারমাইকেল ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের নূতন বাটীর ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্কুলের দক্ষিণে এই নূতন বাটী হইবে। ছাত্রদিগের মেলামেশার এই প্রধান আশ্রমটি এতদিন পরে যে একটি প্রশস্ত বাটীতে পরিণত হইতে চলিল, ইহা বিশেষ সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। রাজপুরুষগণের এবং অধ্যাপকগণের পরিচালনগুণে এই ছাত্র-সঙ্ঘটি ছাত্রদের অনেক উপকারে লাগিতেছে। এখানকার ছাত্র-সদস্যেরা চাঁদা করিয়া অনেকগুলি দরিদ্র ছাত্রের পড়ার বহির দাম ও পরীক্ষার ফি দিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, এখানকার ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি ও বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চারও বেশ সুযোগ আছে।

—০—

গত ইষ্টারের ছুটিতে বর্দ্ধমানে যখন সাহিত্য-সম্মিলন হয়, সেই সময় বর্দ্ধমানের উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে একটি প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। এটি গুপ্তবংশের রাজা নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের মুদ্রা। সাহিত্য-পরিষদে বালাদিত্যের মুদ্রা এই প্রথম সংগৃহীত হইল।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু মোদক মহাশয় আমাদিগকে বাঙ্গালার 'কর্ত্তৃক' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে গুটিকত প্রশ্ন করেন। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার প্রশ্নের একাংশের উত্তর-স্বরূপ আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিমত প্রকাশ করিলাম।— মঃ সঃ

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ২০এ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

ফিরে এস

শুনেছি ধরায়
কিছুই নিষ্ফল নাহি যায়,
আমারি কি ব্যথাভরা বাণী
হে জীবন-রাণি,
চিরদিন হইবে নিষ্ফল,
দীর্ঘ পথে অশ্রু শুধু হবে কি সম্বল?
সারা পথ চলিব একেলা,
তুমি আসিবে না মোরে হাত ধ'রে নিতে সন্ধ্যাবেলা?

অন্তহীন বায়ুস্তর-তরঙ্গের পরে,
রাত্রি-দিন ধ'রে,
চলিছে যে দীর্ঘশ্বাস
বার মাস,
ওগো প্রিয়তম,
সে দুঃখ-বারতা মম
যায় না কি তব পদে জানাইতে বেদনা বিষম?

জানত গো, সুদীর্ঘ জীবন ভরি,
কি তপস্যা করি,
ফুটেছিল জীবনের আনন্দ-মঞ্জরী;
তাপ-তপ্ত দিবসের শেষে
সঞ্জীবন বেশে
তোমার আশ্বাস
এনেছিল প্রাণে মোর মলয়ের মৃদুল নিঃশ্বাস।

যবে যায়, যায় দিন,
স্বর্ণ সন্ধ্যার আলো হ'য়ে আসে ক্ষীণ,
অলিকলগুঞ্জনমুখর,
মধুমধ্যাহ্নের রৌদ্রে কবোষ্ণ মন্থর
মোর দিবা, অস্তগিরি-শিরে,
পরিম্লান হয় যবে ধীরে,
তুমি লক্ষ্মী-পূর্ণিমার চাঁদ,
তৃষার্ত্ত হৃদয়-সিন্ধু করিয়া উন্মাদ,
হইলে উদয়,
শঙ্কিতেরে দিলে বরাভয়;
ওগো মোর হৃদয়-রঞ্জন,
আঁখিতে পরায়ে দিলে অমৃত-অঞ্জন,
নব চক্ষে হেরিনু সংসার,
হৃদয়-মন্থন-ধন, প্রেয়সি আমার।

অকস্মাৎ তার পরে,
এ হৃদয়-অমৃত-নির্ঝরে
চাপাইয়া পাষাণের ভার,
হে প্রিয় আমার,
দিয়াছ বিদায়!
নিঃস্ব নিরালম্ব হ'য়ে নিরাশ্রয়ে দিন কি গো যায়?
সারা জীবনের যত আশা,
দুঃখভরা এ বুকের যতেক দুরাশা,
তব হৃদয়ের অনুরাগে,
তোমারি সোহাগে,
পেয়েছিল প্রাণ,
রেখেছিলে, হে দেবতা, চিরভক্ত সেবকের মান।
কোন্ অপরাধে নাহি জানি,
হৃদয়ের রাণি,
তপঃসিদ্ধি আসিবার ক্ষণে,
হ'ল "নির্ব্বাসন" মোর সুদূরে নির্জ্জনে।
তব প্রাঙ্গণের পাংশু বুকে করি নিয়া
সমীরণ যেত যবে দিয়া,
সে ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মোর নিতাম যতনে,
বৈরাগীর সুবিমল বৃন্দাবন-রজঃ ভেবে মনে।

জন্ম-জন্মান্তের পুণ্যার্জ্জনে,
এ জীবনে,
পরাইলে মন্দারের স্বয়ম্বর-মালা,
বেঁধেছিলে হাতে মোর "রাখীর" সে চিরন্তন বালা ;
সব যে টুটিয়া প'ল হায়
ধরণীর ধূলি'পরে ! বল মোরে দিন কিসে যায় ?
যে দিন যে ভার,
বহিতে দিয়াছ মোরে, দেবতা আমার,
অতি সযতনে,
প্রাণপণে,
করেছি বহন,
জান তাহা হৃদয়-রতন।

আজ শিরে দিলে তুলে বড় গুরুভার
বহিতে পারি না পারি শঙ্কা তাই হয় বার বার,
হে প্রিয় আমার !
এ বুকে আশ্বাস আশা করেছিল ভিড়,
কুলায়-বিহীন তরে কল্পনা বাঁধিতেছিল নীড়,
নিমেষে সকলি চুকাইয়া
নয়নের অন্তরালে লুকাইলে প্রিয়া ?
মোর চক্ষে নিবাইলে চন্দ্র তারা রবি,
সম্বল দিলেগো শুধু নেত্রনীর—আর ক্ষুদ্র ছবি !
ওগো এস, এস তুমি, এস একবার,
হে প্রিয়, জীবন-বন্ধু, দেখে যাও কি দুঃখ আমার।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

প্রণয়ের পরিণতি

কোন্ এক গতযুগের বহু পুরাতন এক দিনে প্রথমাষাঢ়ের নব-বারিদ-সমাগমে স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষের প্রিয়া-বিয়োগবেদনা অন্তরের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল—সমস্ত দেহ-মন-অন্তর দিয়া যে পরম-আকাঙ্ক্ষিত ধনের ধ্যাননিরত হইয়া রামগিরির অচল শিখরে প্রিয়বিরহকাতর কুবেরানুচর স্থাণুর ন্যায় বসিয়াছিল, আজ এই সঞ্চরণশীল নব মেঘের শ্যামকান্ত নধর মূর্ত্তি তাহার সেই একান্ত মনের বিরামবিহীন একাগ্র তপস্যা ভঙ্গ করিয়াছিল ; প্রত্যাসন্ন শ্রাবণের অবিশ্রাম বর্ষণাশ্রুসিক্ত বিপুল বিরহের দিন কেমন করিয়া কাটিয়া যাইবে ভাবিয়া সে তাহার কূলকিনারা করিতে পারিল না। অচেতন মেঘ সন্দেশ বহন করিতে পারে কি না, ধূমজ্যোতি সলিল-মরুতের সন্নিপাতজাত বিচেতন বারিধর বাক্-পটু কিনা, সে বিবেচনা বিরহীর মনে আসে নাই, সে কুটজ কুসুমের অর্ঘ্য রচনা করিয়া স্বাগত প্রশ্নের দ্বারা সম্ভাষিত পুষ্করা-বর্ত্তকের বংশধরকে অলকার মণিহর্ম্ম্যতলে ভূ-শয়ানা বিরহিণী প্রিয়ার কুশলবার্ত্তা আনিতে পাঠাইয়া দিল। বর্ষমাত্রভোগ্য বিরহের বেদনায় যক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছে—সে মন্দা-ক্রান্তার সীমাবদ্ধ মর্ম্মবাণী কবিগীতির মধ্যে আশ্রয় পাইয়া বিশ্বের সমস্ত বিরহীর অশ্রুজলসেকে আজও প্রাণবান্ হইয়া রহিয়াছে। অনিয়ত সময়ের জন্য, অবশিষ্ট জীবনকালের জন্য, যদি প্রিয়বিরহ সহ্য করিয়া যক্ষকে দিন কাটাইতে হইত, তবে জানিনা সে কি করিত, উজ্জয়িনীর রাজকবিও সে ব্যথার বর্ণন কেমন করিয়া শ্লোকের মধ্যে বাঁধিতে পারিতেন, তাহাও বলিতে পারি না। অনির্দ্দিষ্ট বিরহের মর্ম্মান্তিক বেদনা যদি ব্যক্ত করিতে হইত, সে বার্ত্তা যদি প্রাণপ্রিয়তমার নিকট বহন করিবার মত দূত কল্পনা করিতে হইত, তবে কেবল প্রথমাষাঢ়ের নবজলধরে কুলাইত না, অনন্ত সৌরমণ্ডলের, অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, সমস্ত শশিসূর্য্যতারকা, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ, ভূধরার্ণবনদী, ঝঞ্ঝামারুত চন্দ্রমা সকলকে একবাক্যে সকাতর মিনতি করিয়া বলিতে হইত, "ওগো বন্ধু, ওগো পরহিত-ব্রতধারী মহাজন, দয়া কর, দয়া কর, এ দুঃসহ বেদনাতুর চক্ষুতারকাহীন আলোকবিহীন অন্ধের দিন যে যায় না, ওগো তোমরা যাও, কৃষ্ণপক্ষের বিশীর্ণা শশাঙ্ক-লেখার ন্যায় ক্ষীয়মাণা, বিরহবেদনাবিধুর ভূলুণ্ঠিতা প্রাণপ্রিয়া আমার কেমন আছে, আমায় বলিয়া যাও।"

যক্ষের বক্ষের এই বর্ষব্যাপী বিরহের বিপুল বেদনা,—জন্ম-জন্মান্তের একান্ত প্রার্থনীয়া পরমসম্পদরূপিণী জীবনাধিক প্রিয়ার বার্ত্তাবিহীন দিন-যামিনীর নিষ্ঠুর দুঃখ, সেই জানে যে এই নিবিড় প্রেম-নিবদ্ধ প্রাণিযুগলের অন্তরের বারতা নিজের অন্তর দিয়া অনুভব করিতে পারে। উজ্জয়িনীর মহাকবি মন্দাক্রান্তার মধ্যে তাঁহার কল্পনার ছবি আঁকিয়া যান নাই, যাহার বিহনে বিশ্ব বৃথা, জন্ম ব্যর্থ, দেহধারণ নিষ্প্রয়োজন, জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক সেই পরমনিধি হারা হইয়া বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে বাণ-বিদ্ধ শকুন্তের মত রক্তাক্ত কলেবরে অন্তর কেমন করিয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে, কবিগুরু তাহা জানিতেন। প্রাণাধিক, দ্বিতীয় হৃদয়তুল্য, নয়নের কৌমুদীস্বরূপিণী, অঙ্গের অমৃতলেপসদৃশ, প্রিয়দয়িতার বিয়োগদুঃখ যে কত বড় দুঃখ, কবি তাহা সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করিয়াই যক্ষ-বিরহের করুণগাথা গাইয়া গিয়াছেন ; তাই আজ বিশ্বের সমস্ত বিরহাকুল অন্তর দুর্দ্দিনের অশ্রু-অন্ধ গগনের কোথাও কোন আলোক-রেখা যখন দেখিতে পায় না, তখন মর্ম্মতলের পুঞ্জীভূত হাহাকার কবি-বর্ণিত বিশ্ব-বেদনার উপলক্ষস্বরূপ যক্ষ-যাতনার রোদন-ছন্দের মধ্যে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া উপায়হীন অন্তরের নীরব চীৎকারে সমস্ত আকাশ-বাতাস ব্যথায় ভরিয়া তোলে। হায়রে, অনাদিকাল হইতে এই বিয়োগ-বেদনায় উপায়হীন জগৎ আর্ত্তরোদনে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, এ আর্ত্তির উপশমের জন্য সমস্ত পরমায়ু দিতেও কেহ কুণ্ঠিত হয় না, তবুও এ বিশ্বব্যাপী ব্যাধির ঔষধ আজও কেহ বলিয়া দিল না ! আকাশভরা তেত্রিশ কোটি মিথ্যার নিকটে আবেদন যে ব্যর্থ অপেক্ষাও ব্যর্থ, তাহা এতদিনে আর্ত্তমানব বুঝিয়াছে, কিন্তু চিরহৃদয়াসীন পরম সত্য অন্তর-দেবতা যে পরম দুঃখের সকাতর নিবেদনে দয়ার দৃষ্টি দেন না, দুঃসহ বিরহের মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতে হয়, এ দুঃখ যে বড় দুঃখ ! যাঁর বিরহের বিপুল বেদনা অন্তরের দুঃসহ তাপে দ্রবীভূত হইয়া চির নিশিদিন নয়ন-পথে নদী বহাইয়া দিতেছে, যাঁর প্রেম-দৃষ্টির পরম সম্পদের আশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার অসহ যাতনা সারাজীবন ভরিয়া বহিয়া আসিয়া অমৃত, সিদ্ধি, মাহেন্দ্র প্রভৃতি সকল শুভলগ্নের একত্র সমাবেশের আশ্বাসে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া যখন তরী ভাসাইয়া আনন্দের কূলে উত্তীর্ণ হইবার উদ্যমের মধ্যে দিন

কাটিতেছে, তখন যদি চড়ায় ঠেকিয়া নৌকাডুবি হইয়া যায়, তবে সে মজ্জমান হতভাগ্যের হাহাকার শুনিবার কে আছে গো বলিয়া দাও ; আর্ত্ত, উপায়হীন, অসহায়, নিরাশ্রয়ের সে দিনের গতি কে করিবে, তাহাকে বল। বিশ্বমঞ্চে এ বিচিত্রলীলা কে সৃষ্টি করিয়াছে, উপায়হীনের এ মরণাভিনয় অন্তঃপটে বসিয়া কে দেখিতেছে, কেহ জানে না। হর্ষে বা শোকে, সুখে বা দুঃখে, আনন্দে বা নিরানন্দে কোথায় কেমন করিয়া এ নাট্যলীলার পরিণতি হয়, তাহাও কেহ বলিতে পারে না, তবে আমার সুখ-দুঃখ; হাস্য-রোদন, জীবন-মরণ যাঁর হাতে একান্তভাবে সমর্পণ করিয়া, জীবনান্ত-কালের ঘনায়মান অন্ধকারে যাঁর প্রসন্ন প্রেম-দৃষ্টিপাতের মধ্যে মরণাহত স্থির চক্ষুতারকা চিরদিনের জন্য স্থির হইয়া যাইবে আশা করিয়া বসিয়া আছি, তাঁর চিরকরুণার বরাভয়বাণী যদি চিরবিরহের মধ্যে ব্যর্থ হইবার উপক্রম হয়, তখন সে নিরালম্ব জীবনের অনাবশ্যক ভার বহন করা যে বড় কঠিন হইয়া পড়ে !

যক্ষের আজ সেই কঠিন দিন সমুপস্থিত ; প্রিয়-বিরহ-ক্লেশে বিশীর্ণ-দেহ বাতুলপ্রায় যক্ষ আজ চেতনাচেতন জ্ঞান হারাইয়া তাহার জীবনধন, স্পর্শ-মাণিক, একমাত্র প্রাণারাম, প্রিয়জনের বার্ত্তা বহন করিবার জন্য প্রাণপণে স্বেচ্ছাসঞ্চরণশীল বারিবাহের শরণাপন্ন হইয়াছে। হরিশয়নের অবসানে যে তাহার বিরহান্ত হইবে, সে তাহা জানিত, আজ সে শুধু তার বিরহাকুল পরম-প্রিয় প্রণয়িণী, একাকিনী কেমন করিয়া দিন যাপন করিতেছে, সেই সংবাদটুকুর কাঙ্গাল ! হায় দুরদৃষ্ট, সেটুকুও আজ শুধু দুর্লভ নয়, বুঝিবা তাহার ভাগ্যদোষে আজ তাহা অপ্রাপ্যই হইয়া উঠিয়াছে ! দিবারাত্রির এক মুহূর্ত্তও যাহাকে নয়নান্তরাল করিতে যম-যাতনা হইত, চক্ষু ভরিয়া যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তি নাই, প্রতি অঙ্গে পরম স্নেহে হাত বুলাইয়া যার সান্নিধ্যের বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে হয়, প্রগাঢ় পরিরম্ভের মধ্যে পরমাগ্রহে ধরিয়াও যার ভাবী বিরহ-কল্পনায় বক্ষ-স্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়, হে জীবন-দেবতা, স্বেচ্ছায় বিরহলীলার সৃষ্টি করিয়া চরণাশ্রিত মূকের মাথায় যে মৃত্যুর বোঝা তুলিয়া দাও, এ ভার সে কেমন করিয়া বহন করিবে, বহন করিতে পারিবে কি না, তাহা কি ভাবিয়া দেখ ? হে সর্ব্বশক্তিমান্, সকলের শক্তি যে সমান নয়, অন্ধের একমাত্র অবলম্বন-যষ্টি অপহরণ করিলে তার পথ চলা যে একে-বারেই বন্ধ হইয়া যায়, সে চিন্তা তুমি না করিলে কে আর করিবে বল ? সকল চিন্তা তোমায় দিয়া যে জগৎ নিশ্চিন্ত আছে সে কথা তুমি ভুলিলে অন্ধ জগতের দিন যে যায় না, হে চিন্তামণি ! কেবল যক্ষ নয়, বিরূপাক্ষ নয়, রতি নয়, রাধা নয়, অকারণ বিরহের দুর্ব্বার বেদনার পদতলে লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের নিত্য বলি হইতেছে তাহা জানি, লোকধর্ম্মের নিকট সত্যধর্ম্ম নিত্য পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে দেখিতেছি, কিন্তু হে আমার পরম দেবতা, লাঞ্ছনাই কি পরম সত্যপ্রেমের চরম পরিণতি ? ওগো, সংসারের স্বার্থপরতায় অবমানিত সত্যধর্ম্মকে ধূলা ঝাড়িয়া অন্দরের মধ্যে ডাকিয়া লইবার কেহ কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই ? মেঘনির্ম্মুক্ত শারদ চন্দ্রমা একদিন তাহার নির্ম্মল চন্দ্রিকাপ্লাবনে ভুবন আলো করিয়া দিবেই, ততদিন তাহাকে রাহুর কবল হইতে রক্ষা করিবার উপায় তুমিই করিও, হে আমার দয়ার দেবতা !

অশ্রুসাগরের বালুবেলায় ব্যর্থ জীবন বৃথাই কাটিয়া যাইবে, চিরজীবন ভরিয়া এই ভাবনাই আসিত, তার মধ্যে জীবনসন্ধ্যার স্তিমিতালোকে ধূলি-বিমলিন ম্রিয়মাণ হৃদয়-মঞ্জরীর উপরে তোমার রাতুল রাঙ্গা চরণ দুখানি রাখিয়া চির-অগৌরবের গরব যে বাড়াইয়াছে, চির-অদর্শনের দুঃসহ দুঃখের মধ্যেই কি তাহার অবসান ঘটাইবে ? যে জীবন তোমারই স্নেহরক্ষিত, তোমার চরণ-কমলের রত্ন-রেণুকায় যে জীবনের চির-দীনতা এক নিমিষে ঘুচিয়া যায়, একটি দিনের জন্যও তার সব দৈন্য দূর করিয়া দাও, তোমার চরণের কল্পপাদপ-ছায়ায় তার চির-বিরহের জীবনভরা দাহন-দুঃখ একটি দিনের জন্যও ঘুচাও হে দুঃখহারি ! হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্ত-বিন্দুটুকু পর্য্যন্ত দিয়া জীবন ভরিয়া যে হৃদয়-দেবতার চরণ-পদ্ম রঙ্গিয়া দেয়, সংসারের ক্ষুদ্রতার বেষ্টন সে মণিমন্দিরের দ্বাররোধ করিয়া অকৃত্রিম চিরাশ্রিত ভক্তকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখে, এ যে বড় অবিচার, হে বিচারপতি !

"* * * * যে তোমারে ডাকে
"জীবন অধিক" ব'লে, সেই ভক্ত থাকে
মন্দির বাহিরে প'ড়ে, পুরোহিতে ডাকি
"মোর নামে পূজা দাও" কহে অশ্রু-আঁখি।"

এ অবিচার দিনেকের জন্যও ঘুচাইয়া তোমার ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া দাও, হে আমার প্রিয় প্রভু ! অন্তর অহরহঃ বলিতেছে বিচ্ছেদ, বিরহ, নির্ব্বাসনের মধ্যে চিরন্তন সত্য প্রেমের পরিণতি নহে, তাই দাক্ষায়ণীর বিয়োগ-বেদনায় পাগল ভোলা যখন উন্মত্ত তাণ্ডবে মত্ত হইয়াছিলেন, তখন গিরিনন্দিনীর মিলন-মহোষধেই, উমাসঙ্গের অমৃত-লেপেই, নীল-কণ্ঠের সকল জ্বালার অবসান করিয়া দিল।

হে আমার চির-আরাধনার রাধা, হৃদয়-যমুনার তীরে, চির-ধীর-সমীরে চির-বংশী-বটের মূলে, অনন্ত প্রেমময় ব্রজনাথের ব্যাকুল বাঁশরী যে তাহার বিরহাকুল অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, রাধা নামের সাধা সুরে আকুল রবে নিত্য বাজিয়া উঠিতেছে। কনক-চম্পক-গৌরী, রাসেশ্বরী, "ব্রজরাণীর" অখণ্ড মিলন-মাধুরীর মধ্যে সে চিরব্যাকুল রোদনের আনন্দময় পরিসমাপ্তি না হইলে নয়ন-জলের মহাপ্রলয়ে বিশ্ব যে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

শ্রী—

মায়া ও প্রকৃতি

(১)

মায়া কি, তাহা ব্যক্ত করা সহজ নহে। বেদান্ত বলেন, মায়া অনির্ব্বচনীয়া। প্রথমেই গোলযোগ। অথচ ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্র কিংবা বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র পড়িতে হইলে মায়া শব্দটীর মর্ম্ম পরিগ্রহ না করিলে একবারেই ঐ সকল গ্রন্থের স্থলবিশেষের মর্ম্ম পরিগ্রহ করা যায় না। মায়া না বুঝিলে ব্রহ্ম বুঝা যায় না, জীব বুঝা যায় না, এই জগৎ-প্রহেলিকার কিছুই বুঝা যায় না। কিন্তু যাহা জড় নহে, চিৎ নহে, অথবা চিৎ ও জড়পদার্থ হইতে বিভিন্নও নহে, এমন অনির্ব্বচনীয় পদার্থের জ্ঞান দুরবগাহ ও দুরধিগম্য। মায়া যদি সৃষ্টা হয়, তবে এই কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মায়া অগ্রে ছিল না, পরে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। ছিল যাহা, তাহা চিরসৎ তুরীয় চিদানন্দ ব্রহ্ম। শ্রুতিমূলক শ্রীভাগবত বলিতেছেন ঃ—

"অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যতেদচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥"

শ্রীভাগ—২।৯।৩০

অর্থাৎ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ যে প্রকৃতি, তাহাও তখন ছিল না, পরন্তু ঐ সময়ে আমি ছিলাম সত্য, কিন্তু কোন কর্ম্ম করি নাই, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় তুরীয় অবস্থায় ছিলাম। সৃষ্টির পরেও আমি আছি, এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ দেখিতেছ, ইহাও আমি এবং প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাও আমি; ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত এবং অদ্বিতীয়; অতএব পূর্ণস্বরূপী। এই কথার অর্থে আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রলয়ে যখন মায়ার ধ্বংস হয়, তখন মায়ার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবিনী। আরও একটুকু চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, এই বাক্যের অর্থ অত সহজ নহে। আধুনিক জড়-বিজ্ঞান পদার্থের অবিনাশিত্বসম্বন্ধে যথেষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং প্রলয়ে প্রকৃতির ধ্বংস হয়, ইহা সম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ আমাদের শাস্ত্রেরও সেরূপ অভিপ্রায় নহে। এই শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "তস্যাপ্যন্তর্মুখতয়া তদামযোব লীনত্বাৎ।" অর্থাৎ প্রলয়সময়ে প্রকৃতির অন্তর্মুখতানিবন্ধন প্রকৃতি আমাতে বিলীনভাবে অবস্থান করেন। ফলতঃ প্রকৃতির বা মায়ার বিনাশ-কল্পনা করা যায় না। মায়ার সৃষ্টি আছে, তাহাও বলা যায় না। মায়া ব্রহ্মের পরিচ্ছেদিকা-শক্তি, ব্রহ্ম সেই শক্তিদ্বারা অবিশেষ-সত্তাকে নানারূপে পরিচ্ছিন্ন করেন।* সুতরাং বেদান্তের মায়া অজা। এইরূপে "অজামেকাং লোহিতশুক্ল-কৃষ্ণবর্ণাং" প্রভৃতি শ্রুতিদ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, প্রকৃতিও অজা।

শব্দমহোদধি, মায়া শব্দের এইরূপ অর্থ-বিচার করিয়াছেন ;—"ত্রিগুণাত্মিকামজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ। মায়া-শব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিঃ ॥" পঞ্চদশীতেও মায়াকে পরব্রহ্মের অন্তরঙ্গা-শক্তি (Inh rent force) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি আছে, অথচ দাহিকাশক্তি স্বয়ং অগ্নি নহে, এবং অগ্নি হইতে দাহিকাশক্তিকে যেমন পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ পরব্রহ্ম মায়াময় হইয়াও স্বয়ং মায়া নহেন,—নানারূপে পরিচ্ছিন্ন বা মায়াময় ব্রহ্মতনুই জগৎ—"রূপং রূপং মঘবাবোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানস্তন্ব পরিস্বাম্।" (ঋগ্বেদ-সংহিতা)। কিন্তু মায়া হইতে বিবিক্ত করিয়া পরব্রহ্মের পৃথগস্তিত্বও প্রমাণগ্রাহ্য হইতে পারে না। পরব্রহ্ম হইতে বিবিক্ত করিলে মায়ার আর পৃথক্ অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং মায়া পরব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয়া শক্তি। ম্যাটার এবং ফোর্স অথবা বস্তু এবং বস্তুশক্তির অস্তিত্ব যেমন জ্ঞানের গ্রাহ্য নহে, সেইরূপ ব্রহ্ম ও তাঁহার মায়াশক্তি পৃথক্‌রূপে অননুমেয়। অথচ Matterকে যেমন Force বলিতে পারি না, তদ্রূপ ব্রহ্মকেও মায়া বলিতে পারি না।

বেদান্তমতে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্ বিশ্বের অনন্ত লীলা কিছুই নহে। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়ার প্রহেলিকা মাত্র। এই পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যপ্রবাহ অসার, অসৎ ও নশ্বর ; একমাত্র ব্রহ্মই সার, সৎ ও নিত্য। মায়া হইতে বিশ্বের উৎপত্তি। মায়ামুগ্ধ জীব সংসারপ্রবাহে পড়িয়া পরিবর্ত্তনশীল সংসারতরঙ্গে সুখে দুঃখে ও সহস্র বাসনায় বিচলিত হইতেছে। কিন্তু মায়ার বাহিরে যে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শাশ্বতভাবে অবস্থান করিতেছেন, মোহান্ধ জীব তাঁহার অন্বেষণ করে না।

এই মায়া শব্দ হইতেই Magic বা ইন্দ্রজাল শব্দের উৎপত্তি। যাহা বস্তুতঃ যাহা নহে, তাহাকে তদ্বৎ প্রতীয়মান করিয়া প্রদর্শন করা যেমন ইন্দ্রজালের কার্য্য, মায়াও সেইভাবে এই বিশ্বনাট্য আমাদের প্রত্যক্ষের গোচরীভূত করিতেছেন। কোন কোন উপনিষদে মায়ার বিষয় আদৌ উল্লিখিত হয় নাই। মূল বেদান্তসূত্রেও মায়াবাদের ঘটা বিশেষরূপে লক্ষিত হয় না। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মায়াবাদের সূত্র দেখা যায়। শেষে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই মায়াবাদের অত্যন্ত বিকাশ সাধন করেন।

যখন মানবের জ্ঞানতৃষ্ণা অসীম হইয়া উঠিল, অনন্তোন্মুখী আত্মবৃত্তি যখন প্রত্যক্ষ কোন পদার্থেই তৃপ্তিলাভ করিল না, তখন "নেতি নেতি" বলিয়া বিশ্বের সমস্ত পদার্থ অগ্রাহ্য করিল ; সুতরাং আমরা বলিতে পারি, মায়া হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার যে চেষ্টা, আত্মার ক্রমোন্নতির পক্ষে তাহা একটা স্বাভাবিক সাধন।

গ্রীকগণের হার্মিসের মাতা যেমন দেবগণের সংবাদ বহন করিতেন, অথচ তাঁহাদিগকে প্রতারণাও করিতেন, মায়াও আমাদিগকে সংসারে নশ্বরত্ব ও অনিত্যত্ব দেখাইয়া এক "সত্যং শিবং সুন্দরং" পদার্থের দিকে পরিচালিত করিতেছেন। বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞানে Transformation of Ene gy এবং Correlation of forces প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতেও মায়ার লীলা দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত আছে।

আমরা এই যাহা দেখিতেছিলাম, চক্ষের সমক্ষে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে—একরূপ দেখিতে দেখিতে তাহা অন্যরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।† আমাদের জ্ঞানের কি স্থিরতা আছে? আমাদের জ্ঞান কি আপেক্ষিক নয়? যে বস্তু যেমন, আমরা তাহাকে কি ঠিক সেইরূপই দেখি? যে অন্ধকারে আমাদের চক্ষু কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, পেচক ও বিড়াল সেই অন্ধকারে কত কি দেখিয়া থাকে, মানবের ঘ্রাণশক্তি যেখানে কোন বস্তুর অস্তিত্বসম্বন্ধে অজ্ঞ, কুক্কুরের ঘ্রাণশক্তি সেখানে তাহা অনুভব করে। গৃধ্র-শকুনির চক্ষু দূরবীক্ষণসহায় দর্শনের ন্যায় দূরবর্ত্তী বস্তু বহুদূর হইতে নিরীক্ষণ করে ; সুতরাং আমরা যে আমাদিগের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দম্ভ করিয়া থাকি, ফলতঃ তদ্দ্বারা জগতের অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। জগতের প্রত্যেক পরমাণু প্রতি-মুহূর্ত্তে অনন্তবার প্রকম্পিত হইতেছে, নয়নসমক্ষে অনন্ত কীটাণু নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে—সে সকল আমরা দেখিতে পাই কি? বাহ্যপ্রতীয়মান নীরব স্থানেও হয়ত অদৃশ্যভাবে কত প্রাণী শব্দ করিতেছে—আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। আবার এই জগতের যে সকল বস্তু যেরূপ দেখিতেছি, বাস্তবিক তাহা ঠিক সেইরূপ কি না, তাহাই বা কি করিয়া বলিব? দেখিতেছি, পৃথিবী নিশ্চলা, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হইতেছে, পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে। বিজ্ঞান বলিতেছেন, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে এক নির্দ্দিষ্ট পথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন ; একথা বিশ্বাস না করিলেও স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং বিশ্ব যে একটী মায়ার প্রহেলিকা মাত্র, একথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নহে।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

* "মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তেঽনয়া পদার্থাঃ"—নির্ঘণ্ট।

† কোন প্রাকৃতিক বস্তুই ক্ষণকালের জন্য একভাবে থাকিতে পারে না। "জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ"—পাতঞ্জল-যোগসূত্র-ভাষ্য।
"The homogeneous is instable and must differentiate itself." H. Spencer's First Principles

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায় বিপত্নীক, তাঁহার দুইটি পুত্র। বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্বেতলোমার সহিত কৃষ্ণলোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীউর বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে। স্বয়ং না যাইতে পারিয়া, বন্ধু ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায়কে কৃষ্ণলোম মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়াছে। স্থূলপুচ্ছের অনেক ধনসম্পত্তি আছে, এইরূপ গুজব। সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিবার জন্য কৃষ্ণলোম বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছেন। ঋজুশৃঙ্গ আসিয়াছেন—স্থূলপুচ্ছ তাঁহাকে আদর-অভ্যর্থনা করিয়া, বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া বসাইয়াছেন।)

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থূলপুচ্ছের বৈঠকখানা।

স্থূলপুচ্ছ ও ঋজুশৃঙ্গ আসীন।

স্থূল। তার পর, জলথল কেমন ওদিকে?

ঋজু। আরে মহাশয়, সে কথা জিজ্ঞাসা আর
কেন করিছেন? জলাভাবে পাতা ঘাস
সব মরে গেল। আহা, বড় বড় মাঠে
ধূলা উড়িতেছে—দেখে চোখে জল আসে।

স্থূল। এ দিকেও ঐ মত প্রায়। তবে দিন
চারি হল, হয়েছে একটা জল ; যদি
তাতে কতকটা রক্ষা হয়ে যায়।

ঋজু। ভাল,
তবু ভাল ; একবারে যায়, তার চেয়ে
কিছু যায় কিছু থাকে, অনেক মঙ্গল।
প্রাণীগুলো পেট পূরে খেতে নাই পাক্—
জীবনটা বাঁচিবে ত?

স্থূল। তাতে সন্দেহ কি?

ঋজু। আমাদের দেশে, খাদ্যাভাবে এ বৎসর
হা হা কার হবে। যারা ধনী, বলবান,
উঁচু উঁচু গাছ হতে পাতা পাড়াইয়া
সুখে করিবে ভক্ষণ। গরীবের হবে
আগাছা ভরসা।

স্থূল। (বাহিরের পানে চাহিয়া বেলা দেখিয়া)
মহাশয়, একবার
দেখে আসি বাড়ীর ভিতর, ও দিকের
কতদূর হল। (প্রস্থান)

ঋজু। (স্বগত) কৃষ্ণলোম ভেড়া ভারি
সুচতুর। মৌখিক দেখায়, কত বন্ধু
যেন সে আমার। অন্তরেতে বিষভরা।
এখনও ছয়মাস হয় নাই, গিয়ে
তার কাছে, গলবস্ত্র হয়ে ক্ষুরযোড়ে
বলিয়াছিলাম—"দাদা, পিতৃদায় হতে
উদ্ধার করিতে হবে।—আদ্যশ্রাদ্ধ কালি,
লোকজন কোথা থেকে খাওয়াইব বল?
ঘরে নাই কাণাকড়িটিও। সমুদয়
খরচ হইয়া গেল বাবার ব্যারামে।
বেশী নয়—ধার দাও এক শত টাকা,
শুধিয়া ফেলিব আমি বছর খানেকে।
ভেড়া কহিল কাতরে—"দাদা, অত টাকা
কোথা পাব বল? আমি নিতান্ত গরীব।"
আমি বলিলাম—"তুমি গরীব? তা হলে
আমরা কি?—সুদ দিব যা চাহিবে তুমি,
এ দায়ে উদ্ধার কর।"—স্নেহময় দাদা
লাগিল কাঁদিতে শুনে ভ্যাহা ভ্যাহা করে ;
বলিল—"কি বল্লি হাঁরে—সুদ নিব আমি?
তোরা কি আমার পর? এ শক্ত কথাটা
বলিতে পারিলি আমি গরীব বলেই!"
বাক্যব্যয় না করিয়া উঠে আসিলাম।
নির্জ্জন পাইয়া দাদা (দেখিনি যদিও)
নিশ্চয় হেসেছে আর বলেছে আপনি—
"তোর চাল নাই, চুলা নাই, এক কাঠা
ভূঁই নাই—কি দেখে অতটা টাকা তোরে
ধার দেব? কাল তুই মরে যদি যাস্,
কি করে আদায় হবে টাকাটা আমার?"
ভেড়া বেটা প্রতিদিন ফুলিয়া উঠিছে
সুদ খেয়ে খেয়ে। টাকার কমি কি তার?
সে আবার ভাবে, ছেলেটার বিয়ে দিয়ে

হাতাইবে কিছু। শুনিলাম এ ব্যক্তির
বিস্তর সম্পত্তি, একমাত্র কন্যা ; এর
টাকা তার ঘরে গেলে, আর কি থাকিবে
রক্ষা ?—তা হতে দিব না। সম্বন্ধ করিব
পণ্ড—প্রতিশোধ নেব।

(স্থূলপুচ্ছের প্রবেশ)

স্থূল। সকলই প্রস্তুত।
প্রতিবেশী ভদ্রজন্তু তুই চারি জনে
গিয়াছে ডাকিতে—তাঁরা এলেই যে হয়।

(গড়গড়াহস্তে ভোলা গর্দ্দভের প্রবেশ)

মশায়—তামাক ইচ্ছা করুন।

ঋজু। মশায়
খান্ খান্, আমি প্রসাদ পাইব।

স্থূল। দে রে—
আচ্ছা, ধরাইয়া দিই। (ধূমপান)

(চারিজন প্রতিবেশী ভদ্রজন্তুর প্রবেশ)

এস দাদা, এস।
ভায়ারা এস। (সকলে উপবেশন করিলেন)

(গড়গড়ার নল প্রদান)

১ম প্রতিবেশী। ইনিই বুঝি—

স্থূল। ঋজুশৃঙ্গ-
বাবু, অনুগ্রহ করে শিতুরে আমার
এসেছেন দেখিবারে।

সকল প্রতিবেশী। বেশ বেশ। বড়
সৌভাগ্য আমাদের।

স্থূল। ওরে ভোলা, ঝিকে
বল গিয়ে সিতু-মাকে আনে এইখানে। (ভোলার প্রস্থান)
কৃষ্ণলোমবাবু অতি মহাশয় লোক।
ও-অঞ্চলে সকলেই মান্য করে তাঁরে।

(সুসজ্জিতা শ্বেতলোমাকে লইয়া ঝির প্রবেশ)

সকলে। এস মা—এস মা।

স্থূল। বাছা, ঐ বাবুটিকে
প্রণাম করিয়া তুমি বস এইখানে।

(শ্বেতলোমার তথাকরণ)

ঋজু। বেঁচে থাক—সুখে থাক মা।

(মনোযোগের সহিত কন্যার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া)

বা—বা—বা—বেশ
মেয়ে—খাসা মেয়ে। মা, তোমার নামটি কি ?

শ্বেত। (সলজ্জভাবে)
ছিরিমতী ছেতলোমা।

ঋজু। কন্যা দেখে আমি
হলাম অত্যন্ত খুসী। কৃষ্ণদাদা যদি
হেন পুত্রবধূ পান, বড় ভাগ্য তাঁর।

স্থূল। সূক্ষ্মলোম বাবাজীউ কেমন দেখিতে ?
লেখাপড়া কতদূর ? স্বভাব-চরিত্র
কিরূপ ঋজুবাবু ?

ঋজু। হা হা হাঃ—সে যেমন
দেখিতে, তেমনি প্রায় লেখা-পড়াতেও,
স্বভাব-চরিত্র—হুঁ-উ—সেটা—(ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা)

প্রতি। মোট কথা
ঐ মেয়ের উপযুক্ত কি না ?

ঋজু। উ—প—যুক্—ত
কি—না—(চিন্তা) সে বড় বিষম কথা। চাল ডাল
হত—বলিতাম ওজন করিয়া দেখে
কে বেশী কে কম।—উপযুক্ত—কি—না ?—হুঁ—উ

(মুখ শিট্‌কাইয়া)

তা বটে।

স্থূল। তেমন কোনও দোষ-টোষ আছে ?
যদি কিছু থাকে তাহা খুলিয়া বলুন।
এ ত অন্য কিছু নয়—চিরজীবনের

প্রতিবেশিগণ। তা বই কি, বলুন খুলিয়া সত্য কথা।
উনি ভদ্রজন্তু—আমরাও ভদ্রজন্তু।

ঋজু। নাঃ—তা এমন কিছু দোষ-টোষ নাই।
একটু-আধটু যদিও বা থাকে—তা সে
কিছুই না। চেহারাটা চোয়াড়ে-চোয়াড়ে,
নাক কিছু মোটা, দাঁতগুলি উঁচু উঁচু ;
শিঙ্ দুটা খুব সোজা নয়—কিছু বাঁকা,
পিছনের বাঁ-দিকের পায়ে আধখানা
ক্ষুর, গিয়েছিল ভেঙ্গে পাথর লাগিয়া
ছেলেবেলা। ভারি দুরন্ত সে ছিল ; মাসে
কুড়ি দিন পাঠশালা পলাইয়া, মাঠে
মাঠে বেড়াত খেলায়ে—দেখে শুনে
বাপ তার নাম কাটাইয়া দিল রেগে।
সে অবধি আছে ফূর্ত্তিতেই—তাস পাশা
গীতবাদ্য লয়ে। গান সে যে করে—
চমৎকার—বাড়ী হতে পলাইয়া গিয়া
ছিল কি না মাস ছয় যাত্রার দলেতে—
গান তার যে শুনিবে, মোহিত হইবে।

(সভাস্থ সকলে দুশ্চিন্তামগ্ন)

স্থূল। হাঁ—তা মন্দ হবেনাক। লেখা-পড়া বেশী
শেখেনি যদিও—নিতান্ত মূর্খ ত নহে।
বাপের বিষয় আছে, ভাবনা কি তার ?
আচ্ছা, তবে ঋজুবাবু, পাকা কথা আমি
দিতেছি—যেন কৃষ্ণলোমবাবু দিনটা
করিয়া স্থির সংবাদ পাঠান।

(জলযোগাদি লইয়া ভোলার প্রবেশ)

ঋজু। (লোলুপনেত্রে সেগুলির প্রতি চাহিয়া)
এ সব
আবার কেন ?

স্থূল। বিলক্ষণ! চিরদিনের
যা নিয়ম-টিয়ম আছে, সে সব রক্ষা
করিতে হবে ত ? মিষ্টমুখ করা চাই।

ঋজু। (উদরে হাত বুলাইয়া)
মিষ্ট ফিষ্ট আমি বেশী খাইনা কখনও
—বিশেষতঃ সন্ধ্যাবেলাটায়। স্থূলবাবু
আজিকে করুন ক্ষমা। ভগবান্ যদি
সম্পর্ক ঘটান—তবে কত খাব।

স্থূল। না—না—
তাহা শুনিব না। বেশী না পারেন—কিছু
যৎকিঞ্চিৎ আহার করুন ঋজুবাবু।
এস দাদা, এস ভায়া, তোমরাও নাকি
সন্ধ্যাবেলা মিষ্ট নাহি খাও ? বসে যাও।

(সকলে আহারে প্রবৃত্ত)

পটক্ষেপণ। ক্রমশঃ

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা

ব্যর্থ প্রেম

হে প্রেম, এসেছ স্বর্গ ত্যজিয়া
ধন্য করিতে মর্ত্ত্যভূমি,
রুদ্ধ হৃদয়-নিলয়ে আমার
বন্দী কি হেথা রহিবে তুমি!

ওই আষাঢ়ের নব মেঘরূপে
আবরি দীপ্ত রবির কায়া
বিস্তারি' দাও গগনে তাহার
তোমার সজল স্নিগ্ধ ছায়া।

কুসুমের বেশে বিমল শোভায়
ফুটিয়া প্রভাতে কাননে তা'র,
নিঃশেষে তা'রে দাও উপহার
সঞ্চিত তব সুরভি-ভার।

শ্যামল কোমল তৃণদলে মিশি
রাখ পথ তা'র যতনে ঢাকি',
সমীরের সাথে বহি ধীরি ধীরি,
বুলাও পরশ অমিয় মাখি।

জোছনায় মিশি লয়ে যাও তা'রে
ভাসায়ে সুদূর স্বপন-দেশে,
ধ্রুবতারা হয়ে মুখপানে তার
জেগে চেয়ে থাক নির্ণিমেষে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

হিতসাধন

কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিত হইয়া "হিত-সাধন-মণ্ডলী" গঠন করিয়াছেন। সংবাদপত্র পাঠে জানা যায় যে, মণ্ডলীর কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা মণ্ডলীর বাহিরে আছেন, কলিকাতার বাহিরে আছেন, স্বদেশসেবায় এই নূতন উদ্যমের সুসমাচার প্রচার করা, এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের অবতারণা।

"পল্লীর উন্নতি" নামক প্রসঙ্গে স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিত-সাধনের মূলসূত্র বুঝাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে একটা কথা প্রচলিত আছে, "তোলা দুধে ছেলে বাঁচে না"। মায়ের দুধ না পাইলে শিশুর জীবনধারণ কঠিন। গোরুর দুধে যেমন মায়ের দুধের কাজ হয় না, তেমনই পল্লী-জননীর স্তন্য না পাইলে পল্লীর পুষ্টি অসম্ভব। সহর হইতে বদান্য ব্যক্তিদিগের সময় সময় যাইয়া পল্লীর উন্নতির চেষ্টা, তোলাদুধে ছেলে বাঁচাইবার চেষ্টার তুল্য। তাহাতে উপকার না আছে এমন নয়, কিন্তু স্থায়ী ফল আশা করা যায় না। পল্লীকে আত্মহিতসাধনের উপায় শিখাইতে হইবে। পল্লীকে শুনাইতে হইবে "তত্ত্বমসি," তুমিই তোমার মুক্তিদাতা ; পল্লীকে সেই মুক্তির সাধনা-পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই মহাবাক্য শুনাইবে কে ? এই সাধন-পথ দেখাইবে কে ? স্যর রবীন্দ্রনাথের উত্তর, সহরবাসী—কলিকাতাবাসী—এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র একদল যুবক।

কেন যে একদল কলিকাতার লোক—কলিকাতার শিক্ষিত একদল যুবক পল্লীর উদ্ধারে ব্রতী হইবেন, কোন্ মন্ত্রের দ্বারা এই উদ্ধার-কারীদিগকে উদ্বোধিত করিতে হইবে, তাহা স্যর রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেন নাই, অন্যান্য বক্তারা বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, সেই মন্ত্র,—পরার্থপ্রাণতা, বেদ—বেদান্ত—গীতা। এ সকল ত বড় কথা। অধিকাংশ সহরবাসীরও অন্নচিন্তা চমৎকারা। অধ্যাপক শীলের বা পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের মত কয়জন কলিকাতা-বাসীর পরার্থপ্রাণতা-প্রণোদিত হইয়া হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইবার অবসর আছে ? অবশ্যই "একদল যুবক" প্রস্তুত হইতে থাকিবে। সেই যুবকদিগেরও ত অন্ন-বস্ত্র চাই ; তাঁহাদের আত্মীয়-কুটুম্বদের জন্যও কিছু চাই ; যুবকেরা যখন বৃদ্ধ হইবেন, তখনকার জন্যও কিছু সঞ্চিত করার ব্যবস্থা চাই। এ খরচা যোগাইবে কে ? স্যর রবীন্দ্র-নাথের ইঙ্গিত! এই খরচা যোগাইবে পল্লী। এই যুবকেরা গ্রামের ডাক্তার ও শিক্ষক হইবেন। কিন্তু যাঁহারা এখন গ্রামের ডাক্তার বা শিক্ষক আছেন, তাঁহাদিগকে চট্ করিয়া সরাইয়া দিয়া কলিকাতার প্রস্তাবিত নৈশ বিদ্যালয়ের যুবকদিগের সেই স্থান অধিকার করা সকল স্থানে সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। পল্লীতে গিয়া তাঁহাদিগকে কিছুদিন দাতব্য চিকিৎসালয় এবং অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া পসার প্রতিপত্তি করিয়া লইতে হইবে। পল্লীর হিতসাধনক্ষম ডাক্তারের এবং শিক্ষকের ব্যয়ভার কিছুদিন কলিকাতাবাসীদিগকে চালাইতে হইবে। সেই ব্যয়ভার যে তাঁহারা শুধু পরার্থপ্রাণতার প্রণোদনায় এবং জীবে জীবে ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়াই বহন করিতে প্রস্তুত হইবেন, তাহা মনে হয় না। এই ব্যয়ভার বহন করিলে কি লাভ হইবে, তাহা না বুঝিতে পারিলে লোকে টাকা দিতে সম্মত হইবে না। সুতরাং বুঝাইতে হইবে, যদি সহরবাসীরা আত্মহিতকামনা করেন, তবে সময় থাকিতে পল্লীর হিতসাধনে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। পল্লী উৎসন্ন গেলে সহর টিকিবে না। পল্লীর রুধিরে সহর পরিপুষ্ট। পল্লীর টাকায় সহরবাসীর বাবুয়ানা। পল্লীর চাউলে সহরের ভাত, পল্লীর দুধের ছানায় সহরের সন্দেশ-রসগোল্লা ; পল্লীর ছাগল-ভেড়ার মাংসে সহরের কালিয়া-কোপ্তা। পল্লীর হিত-

সাধনে উদ্যোগী না হইলে সহরকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং হিতসাধনমণ্ডলীর নায়কগণের "চাচা আপনা বাঁচা" এই সুর ধরিয়া সহরবাসীর সকল শ্রেণীর লোকদিগকে জাগাইবার এবং পল্লীহিতে লাগাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

হিতসাধনমণ্ডলীর নায়কেরা "জীবন-সংগ্রাম" কথাটার উপর যেন নারাজ—জীবন-সংগ্রামের হিসাবে হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইতেও নারাজ! তাঁহারা এ সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং তাহার যথোচিত সমালোচনা করিতে পারিব না। কিন্তু নিজের জীবন এবং অধিকাংশ প্রতিবেশীর জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলিব। যখন দেশময় পতিত জমি ছিল, কোন দৈবদুর্ব্বিপাক না ঘটিলে আবাদ করিলে সোণা ফলিত, যখন গোরুটাকে মাঠে ছাড়িয়া দিলেই স্বচ্ছন্দে পেট-ভরা ঘাস খাইয়া গৃহস্থের গোয়ালে ফিরিয়া আসিয়া অমৃতধারা বর্ষণ করিত,—তখন জীবনটাকে লীলা বলিলেও বলা যাইত। কিন্তু অনেকের পক্ষেই যখন জীবনের ভার দুর্ব্বহ এবং স্ত্রী-পরিজনের ভবিষ্যৎ ভাবিতে গেলে মৃত্যু-চিন্তাও দুঃসহ, তখন দারিদ্র্যের এবং ব্যাধির দারুণ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত-দেহ ব্যক্তিগণের জীবনকে সংগ্রাম—নিষ্ঠুর সংগ্রাম বলিব না ত কি বলিব?

জীবন-সংগ্রাম কথাটা শুধু সমুদ্রের ওপারের কথা নয়, এ পারের কথা। এ দেশে সাধকের সাধনা সংগ্রাম বলিয়াই কথিত হইয়াছে। মদন ভস্ম করিয়াই শিবের শিবত্ব; মার জয় করিয়া বুদ্ধের বুদ্ধত্ব। উপনিষদের স্থলবিশেষ পাঠ করিলে মনে হয়, আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। সাংখ্যের মূলে দুঃখবাদ। বেদান্তেও দুঃখবাদের ভাঁজ আছে।

এখন যেভাবে জীবন-সংগ্রাম কথাটা য়ুরোপীয় সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে, প্রাচীনকালে এ দেশে কথাটা সে ভাবে ব্যবহৃত হইত না। তাহার কারণ, তৎকালে এরূপ জীবন-সংগ্রাম পদার্থটাই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু এইদেশে নয়, সেকালে য়ুরোপেও তাহা ছিল না। এই নিমিত্ত প্রাচীন য়ুরোপে কথাটা ফোটে নাই বা উঠে নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কথাটার প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে। তাই বলিয়া এদেশের কেহ কখন দুনিয়াদারিকে সংগ্রামের হিসাবে দেখেন নাই এমন নহে। সাহিত্যদর্পণে ধৃত একটি শ্লোকে একজন কবি তাঁহার দারিদ্র্যকে রামরাবণের যুদ্ধের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যথা—

"জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্ধিতধিয়া
বচো বৈদেহীতি প্রতিপদমুদশ্রু প্রলাপিতম্।
কৃতা লঙ্কা ভর্ত্তুর্ব্বদনপরিপাটীষু ঘটনা
ময়াপ্তং রামত্বং কুশলবসুতা নত্বধিগতা।"

রামের ন্যায় আমিও কনকমৃগলাভের (ধনলাভের) ইচ্ছায় অন্ধ হইয়া জনস্থানে (জনসমাজে) ভ্রমণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রতি-পদক্ষেপে বৈদেহি (বা বৈদেহী দাও দাও) বলিয়া, লঙ্কাপতির (বা অলং কা ভর্ত্তুঃ) বদন-পংক্তিতে বাণনিক্ষেপ (বা ধনীর সন্তোষসূচক মুখভঙ্গী উৎপাদনের অত্যন্ত চেষ্টা) করিয়া রামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি; রাম যেমন কুশলব-জননী সীতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি তেমন কুশলবসুতা অর্থাৎ কল্যাণকর ধনবত্তা প্রাপ্ত হই নাই।"

য়ুরোপের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের কৃত জীবন-সংগ্রামের ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত ব্যাখ্যাও বলা যাইতে পারে না। এই শ্রেণীর কথার কোন স্থায়ী অভ্রান্ত ব্যাখ্যা অসম্ভব। য়ুরোপীয় সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সমাজ-তত্ত্বজ্ঞগণ জীবন-সংগ্রামের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ভিন্ন-সমাজের বা বিভিন্নযুগের হিসাবে প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমাজের হিসাবে ভ্রান্ত অর্থাৎ অবস্থা-বিরোধী নহে, কারণ তাহা হইলে কখনই এই ব্যাখ্যা সমাদর লাভ করিত না। "জীবন-সংগ্রামের" মত সামাজিক কথার ব্যাখ্যা যদি সমাজের অবস্থানুগত হয়, তবেই তাহা সত্য, নতুবা ভ্রান্ত। এক্ষেত্রে চিরস্থির (absolute) সত্য দুষ্প্রাপ্য, অবস্থাসাপেক্ষ (relative) সত্য অনুসন্ধেয়। মালথাসের মতটা এবং জনন-বিদ্যাটাও (Eugenics) একেবারে উড়াইয়া দিবার বস্তু নয়। এদেশে "বহু গোষ্ঠীর দরিদ্রতা" প্রবাদটি মালথাসকে সমর্থন করিতেছে। দেশের যে যে অংশে আবাদের জমীর অনুপাতে জনসংখ্যা বেশী, সেখানে পোষ্যবৃদ্ধি কৃষকসমাজে দরিদ্রতা-বৃদ্ধির সর্ব্বপ্রধান কারণ। হিন্দু সমাজে অসবর্ণ-বিবাহের অপ্রচলন এক প্রকার জননবিদ্যানুশীলনেরই ফল বলা যাইতে পারে। মালথাস, গ্যালটন্ প্রভৃতি কবিগণ সমাজশরীরের ব্যাধির যে নিদান স্থির করিয়াছেন, তাহা ভুল বলা কঠিন। তাঁহাদের ঔষধবিধানে ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ব্যবস্থা উড়াইয়া দিবার বিষয় নয়, সাবধানে বিচার করা কর্ত্তব্য। য়ুরোপে বর্ত্তমান কুরুক্ষেত্রের দায়িত্ব ঊনবিংশ শতাব্দের সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের ঘাড়ে চাপাইলে তাঁহাদের উপর ঘোর অবিচার করা হয়। Nationalism সমাজ-বিজ্ঞান অপেক্ষা প্রাচীন এবং Deutschland uber allis তাহার বীভৎস বিকার মাত্র। সমাজবিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও য়ুরোপে এই শ্রেণীর যুদ্ধ অনেকবার হইয়া গিয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞান বস্তুতন্ত্র, কাব্য বা পরাবিদ্যার (metaphysics) মত কর্ত্তৃতন্ত্র নহে। সমাজের হিতসাধন করিতে হইলে সমাজ-বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না, বিজ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিক রীতির অনুসরণ করিতে হইবে। বিজ্ঞান এবং সভ্যসমাজের ভূয়োদর্শন উপেক্ষা করিয়া শুধু দয়ার প্রণোদনায় সমাজের হিতে রত হইলে বেশী কিছু ফল হইবে না। জন রস্কিন এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া বহু ত্যাগ, বহু শ্রম স্বীকার করিয়াও বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। জন রস্কিনের মহৎ দৃষ্টান্ত চিত্তশুদ্ধিকর এবং স্মরণীয়, কিন্তু অনুকরণীয় নহে।

স্যর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কর্ত্তৃতন্ত্র কাব্য বা পুস্তকাগার-তন্ত্র, সমাজতত্ত্ব নহে, তাহা বস্তুতন্ত্র, কাজের কথা। তাঁহার "কবির কৈফিয়ৎ"এর সহিত আমাদের স্থানে স্থানে বিরোধ থাকিতে পারে, কিন্তু কর্ম্মী রবীন্দ্রনাথের সহিত কাহারও বিরোধ থাকা উচিত নহে। কথায় তিনি জীবন-সংগ্রাম না মানিলেও কাজে তিনি সংগ্রামক্ষেত্রে সর্ব্বাগ্রগামী; সুতরাং পল্লীর উন্নতিসাধনে সকলেরই তাঁহার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য এবং সকলের সর্ব্বদা মনে রাখা এবং সকলকে মনে করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য—

"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা হিতমাচরেৎ"

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

পথ

হে পথ, তুমি জগতের সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমান। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আমরা সর্ব্বত্রই তোমাকে দেখিতে পাই। তুমি আকাশে ছায়াপথ, ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ-পথ এবং পথহারা সমুদ্রেও জাহাজের পথ বলিয়া পরিচিত। কোথাও তুমি সরল স্বচ্ছন্দ গতিতে সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছ—কোথাও-বা আঁকিয়া বাঁকিয়া উচ্চাবচ্চ গতিতে পর্ব্বত-গাত্রে আরোহণ করিয়াছ, কোথাও তুমি দুর্দ্দমনীয় তেজে পর্ব্বত-সানু বিদীর্ণ করিয়া 'টনেল্' উপাধি লাভ করিয়াছ। আবার কোথাও-বা অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে দুঃসাহসিকের ন্যায় খনির তিমির-গর্ভে নামিয়া গিয়াছ। নদী ও খাল তোমারই বালময়ী মূর্ত্তি; কিন্তু যাঁহারা সে মূর্ত্তিকে বিভীষিকার চক্ষে দেখেন, তাঁহাদের জন্য তুমি আপনাকে সেতু-মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছ।

পথ না থাকিলে আমাদের উপায় ছিল না। পথের উপর দাঁড়াইয়াই যখন আমরা পথ হারাইয়া ফেলি, তখন একটা অনিশ্চিন্ত আশঙ্কা ও ব্যাকুলতা আমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে। পাছে আমরা সর্ব্বদাই পথ হারাইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হই, তাই বোধ হয় পথগুলির নামকরণ করা হইয়াছে এবং পাছে কতটা পথ অতিক্রম করিলাম তাহা না বুঝিতে পারিয়া হতাশাপন্ন হই, তাই বোধ হয় পথের মধ্যে 'মাইল-পোষ্টের' অবতারণা করা হইয়াছে। 'মাইল-পোষ্ট' প্রায় সকল পথেই আছে। বিদ্যার পথে 'মাইল-পোষ্ট'—বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা, ধনসঞ্চয়ের পথে 'মাইল-পোষ্ট' কোম্পানীর কাগজ এবং সম্মান-লাভের পথে 'মাইল-পোষ্ট' গবর্ণমেণ্টের খেতাব।

স্থলপথ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—কাঁচা গ্রাম্যপথ, যাহা কেবল গমনাগমনের দ্বারাই নির্ম্মিত এবং পাকা রাজপথ, যাহা নির্ম্মাণের জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন। এই রাজপথ একটি অপূর্ব্ব পদার্থ। ইহার নির্ম্মাণ দূরে থাক্, সংস্কারের জন্যও প্রচুর অর্থ-বৃষ্টি করিতে হয়। এই অর্থবৃষ্টির ফলে পথ বর্ষাকালেও ততটা পিচ্ছিল হয় না। সংস্কারকালে ইনি দরিদ্রের কুটীরের নিকট যেমন সংহারমূর্ত্তি ধারণ করেন, ধনীর প্রাসাদের নিকট ইনি তেমনই সংযত, শান্ত ও সংকীর্ণ। ইনি একদিকে যেমন 'ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের' হাতে পড়িয়া ১০০ফিট পর্য্যন্ত পরিসর গ্রহণ করেন, অপর দিকে তেমনই 'ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে'র হাতে পড়িয়া জেটীনিবদ্ধা স্রোতস্বিনীর ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষীণ-কলেবর হন। আবার রাজ-প্রসাদসৌভাগ্যে এখানে ইঁহার নৈশকলেবর যেমন মণিমুক্তাসদৃশ আলোকমালায় জ্বলিয়া উঠে, গ্রাম্য কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্যে ইঁহার দরিদ্রা পল্লিবাসিনী ভগিনী সেইরূপ আভরণ-হীন অন্ধকারময়ী মূর্ত্তিতে পথিকের বিভীষিকা উৎপাদন করেন। এখানে ইঁহার অঙ্গে একটি তৃণ পতিত হইলেও তাহা তৎক্ষণাৎ অপসারিত হয়, কিন্তু সেখানে তাঁহার ভগিনীকে দূর্ব্বা-কণ্টকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেও কেহ সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না। এখানে ইঁহার দেহ নিয়তই তৈলমার্জ্জিত ও 'রোলার' সাহায্যে সমতলীকৃত; কিন্তু সেখানে তাঁহার অঙ্গ ধূলিধূসরিত ও অর্দ্ধোদ্গত ইষ্টক-প্রস্তরে শোভিত। স্থানভেদই এইরূপ দশাবিপর্য্যয়ের একমাত্র কারণ।

ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিশেষ বিশেষ স্থলপথ আছে। যথাঃ—রেলপথ, ট্রামপথ, অন্যান্য শকটের পথ ও চরণ-পথ। যাহার যে পথ, সে সেই পথেই যাইবে, অন্যপথের পথিক হইলেই তাহার বিপদ। অথবা যেরূপ অঙ্কের ও পুরুষের "বামা গতিঃ" ঐ সকল পথে শকটগুলিকেও সেইরূপ "বামা গতিঃ" অবলম্বন করিতে দেখা যায়।

গ্রাম্য স্থলপথের অস্তিত্ব অনেকটা গতায়াতের উপর নির্ভর করে। মনুষ্যের পদাঘাত ভিন্ন উদ্ভিদ্-শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর অন্য উপায় উহার নাই। তাই প্রাণের মমতায় সে নিরীহ বাঙ্গালীর মত সকলের পদাঘাত আপনার অঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছে, দিবারাত্র আপনার বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করিয়া পাতিয়া রাখিয়াছে, অথচ তাহার ক্রোধ নাই, বিরক্তি নাই, ক্লান্তি নাই।

পথের অস্তিত্ব রক্ষা করায় আমাদেরও স্বার্থ আছে। পথে পড়িয়া মরা অপেক্ষা বিপথে পড়িয়া মরা অধিক শোচনীয়। পথে দুর্ঘটনা ঘটিলে লোকে সন্ধান পাইবে, কিন্তু বিপথে দুর্ঘটনা ঘটিলে সাহায্যের আশা কোথায়? অতএব কি করিলে কোন্ পথ বজায় থাকে, তাহা সর্ব্বদাই চিন্তা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, চাকরীর পথ বজায় রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে মুরুব্বীর সহিত দেখা করিতে হইবে এবং পত্রিকা-প্রচারের পথ বজায় রাখিতে হইলে মধ্যে মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের পদতল চিক্কণ করিবার জন্য তৈলের ভাণ্ডার খুলিতে হইবে।

পথের উন্নতিবিধানও আমাদের একটি প্রধান কার্য্য। আমরা প্রতিদিনই পুরাতন পথকে নূতন করিতেছি, দুর্গম পথকে সুগম করিয়া তুলিতেছি। পূর্ব্বে মহেশের ব্যাকরণ লোকে আজীবন পড়িয়াও শেষ করিতে পারিত না, তাই পাণিনি আসিয়া মহেশকে সংক্ষিপ্ত করিলেন; তা'র পর আবার মুগ্ধবোধ আসিয়া পাণিনিকে সংক্ষিপ্ততর করিলেন এবং অবশেষে ব্যাকরণ-কৌমুদী ও উপক্রমণিকা আসিয়া মুগ্ধবোধকে সংক্ষিপ্ততম করিলেন, এবং ফলে ব্যাকরণবাগীশ উপাধি শিশুর পক্ষেও সুলভ হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপ দর্শন-শাস্ত্রের দুর্গম পথকে সুগম করা হইল ভাষ্য দিয়া, তা'রপর টীকা-টিপ্পনী ও উপটিপ্পনী যথাসময়ে আসিয়া সেই ভাষ্য-পথকেও সুগমতর করিয়া তুলিল।

পথ সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু আবিষ্কার করিতে জানেন অল্প লোকে। অধিকাংশ লোকেই চলেন আবিষ্কৃত পথে, সেটা অভ্যাসের দোষেই হউক, জীবনী-শক্তির মিতব্যয়িতার জন্যই হউক বা উপযুক্ত সাহসের অভাবেই হউক। জাতীয় জীবন-নেমি যে পথে বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছে, সেই ক্ষুণ্ণ পথে চলিলে আর কিছু না হউক, চক্রে ঘর্ষণজনিত ক্ষয়টা অল্পই হইয়া থাকে এবং পরিচালনের শক্তিও বড় বেশী প্রয়োগ করিতে হয় না। তা' ছাড়া বন-জঙ্গল কাটিয়া শ্বাপদসরীসৃপ তাড়াইয়া একটা নূতন পথ প্রস্তুত করা মূর্খ দুঃসাহসিকের কার্য্য বলিয়াই অনেকে মনে করেন। যখন 'সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং' তখন গণের অগ্রে যাইয়া লাভ কি?

আমার মত ঠিক তাহা না হইলেও আমি প্রত্যেককে একটা নূতন পথ কাটিয়া বাহির হইতে বলি না; কারণ, তাহা হইলে ভাল পথ অপেক্ষা মন্দ পথই বাহির হইবে অধিক। আমি শুধু বলি, সকলকে চেষ্টা করিয়া দেখিতে। যদি ভাল ও সহজ পথ

বাহির করিবার শক্তি নাই বুঝিতে পার, পুরাতন পথেই চল, কিন্তু এইটুকু যেন ভুলিয়া যাইও না যে, পুরাতন ভিন্ন অন্য ভাল পথ থাকা অসম্ভব নয়।

পথ কাণাতেও চলিতে পারে, কিন্তু সে অভ্যস্ত পথে; অনভ্যস্ত পথে চলিতে হইলে দৃষ্টি-শক্তি যত তীক্ষ্ণ হয়, ততই ভাল। যদি শেষ লক্ষ্য পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, তাহা হইলে পথ চলিতে যেমন উৎসাহ হয়, তেমনই পথ চলিবার উদ্দেশ্যটা কখনও:ভুলিয়া যাইতে হয় না। তবে প্রায় অনেক সময়েই আমরা পথের সবটা দেখিতে পাই না; কখনও পরিধি বাধা দেয়, কখনও কুয়াসা চক্ষের সম্মুখে যবনিকা টানিয়া দেয়; কিন্তু অগ্রসর হইলেই পথ পাইব, এই বিশ্বাসে চলিলেই দেখা যায় যে, বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। পথের মাঝে বসিয়া পড়িয়া হতাশভাবে রোদন করা অপেক্ষা বরং স্থির-ভাবে একজন পথ-প্রদর্শকের প্রতীক্ষা করা উচিত। প্রদর্শিত পথে চলাই নিন্দনীয় নয়। অনেক সময় প্রদর্শিত পথে চলিতে আমরা বাধ্য; সৈন্যদিগের পথ-প্রদর্শক পাইওনিয়ার, যুদ্ধ-বার্ত্তা-বাহকদিগের পথ-প্রদর্শক সেন্‌সার।

স্থলপথের বিষয় অনেক বলিয়াছি, কিন্তু জলপথের বিষয় কিছুই জানি না; কারণ, জলপথে ভ্রমণ আমাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ জলপথেই অধিক ভ্রমণ করেন সত্য, কিন্তু সে নেশার রাজ্যে। আকাশ-পথে উড়িবার সাহসও আমাদের নাই, চেষ্টাও নাই; সেটা পৌরাণিক যুগের রাক্ষস-বালকদিগের উপর নিক্ষেপ করিয়াই আমরা সন্তুষ্ট আছি। তবে যদি কখনও আকাশ-পথে উড়ি, সে ঘুঁড়ির মত, কল্পনা-সূত্র ধরিয়া অথবা স্বপ্ন-লোকে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া।

যে পথে আমি পাঠকবর্গকে এতদূর আমার পশ্চাৎ লইয়া আসিয়াছি, সে পথ আর বেশী দীর্ঘ করিব না; কারণ, ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। হাসির ওয়েসিস্‌শূন্য নীরস মরুভূমির উপর দিয়া বেশী-দূর আসিয়া রিক্তহস্তে ও বিনামিষ্টমুখে ফিরিতে হয়ত অনেকেই আপত্তি করিবেন। তাই আর দুই-একপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া বিদায় লইব।

এ সংসারে পথ অনেক আছে, কিন্তু গন্তব্য পথ লইয়াই গোলমাল। সকলেই পথের অনুসন্ধানে ব্যস্ত, সকলের মুখেই এই রব,—“পথ কৈ? কোন্ পথে যাইব?” “বাঁশবনে ডোমকাণা” হয়, প্রবাদ আছে; কিন্তু এ পথারণ্যে আমরা সকলেই কাণা, পথ-নির্ণয়ে অশক্ত। আমরা সকলেই অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি, পরস্পরকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছি এবং শেষে জড়াজড়ি করিয়া গর্ত্তে পড়িতেছি। অপথ, বিপথ, কুপথ, সুপথে ভাষারও যেরূপ নানা পথ, আমাদিগেরও সেইরূপ। মতের ঠিক্ নাই বলিয়া ভবলীলা সাঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কেবল একপথ ছাড়িয়া অন্যপথ ধরিতেছি, কখনও চৌমাথা-পথে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি, কখনও গোলকধাঁধায় পড়িয়া একই পথে ঘুরপাক খাইতেছি। সংসার-ব্যূহে প্রবেশ করিবার পথটা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু অভিমন্যুর মত নির্গমের পথটা কেহই জানিনা। সকল পথ যদি একই স্থানে সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে যে কোন পথ ধরিয়া চলিলেই চলিত; কিন্তু কতকগুলি পথের শেষে নাকি চিরন্তন শান্তি এবং কতকগুলি পথের শেষে অনন্ত জ্বালা। তাই এত বিপত্তি, এত সংশয়। বাইবেল বলিলেন, “প্রশস্ত শ্যামল পথ পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ, কণ্টকাকীর্ণ পথের অনুসরণ কর।” ছায়া-সুশীতল, সলিল-সরস, পুষ্পাস্তৃত সুন্দর পথ পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম বনপথ বা বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে গমন না করিলে যে শান্তি-লোকের সন্ধান পাওয়া যায় না, একথা মন কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। উপনিষদ্ বলিলেন, “যে পথ ক্ষুরধারের ন্যায়, তাহাই প্রকৃত পথ।” কোন্ পথের ধার ক্ষুরের মত, কোন্ পথের ধার করাতের মত, তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে দুর্ব্বোধ। সুতরাং আর একজন মনীষী সোজাপথ দেখাইয়া বলিলেন, “যে পথে মহাজনেরা গমন করিয়াছেন, সেই পথে গমন কর।” মহাজন কাহারা? তাঁহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছেন? যদি মহাজন অর্থে ব্যবসায়ী হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি যে, আমরা সামান্য ব্যাপারী, সামান্য পুঁজি লইয়া কারবার করি, বড় বড় মহাজনদিগের পথে যাইব কি করিয়া? যদি মহাজন অর্থে বড়লোক ধরি (যেরূপ মহানগরী অর্থে বৃহৎ নগর,) তাহা হইলে মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা বিপজ্জনক। হয়ত আপনি যে মহাজনের পশ্চাদ্‌গামী হইলেন, তিনি অপর একজন মহাজনের উৎসব-দীপাবলিশোভিত হর্ম্ম্যমধ্যে অবলীলাক্রমে প্রবেশ করিলেন, সকলেই তাঁহার নিকট শির অবনত করিল, কিন্তু আপনাকে দ্বার-বানের নিকট হইতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। যদি মহাজন অর্থে বহুলোক বুঝা যায়, তাহা হইলেও মহাজনের অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না, কারণ, তাহাতে নিমন্ত্রিতের দলে মিশিয়া ফলাহারেরও যতটুকু সম্ভাবনা, অবৈধ জনতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পুলিসের দ্বারা লাঞ্ছিত হইবারও ঠিক ততটুকু সম্ভাবনা। আর যদি মহাজন অর্থে উত্তমর্ণ বুঝা যায়, তাহা হইলে মহাজন যে পথে গমন করেন, সে পথ প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই পরিবর্জ্জনীয়। তাই বক যুধিষ্ঠিরকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নই আমাদিগকে বারবার ব্যাকুল করিয়া তুলে;—“কঃ পন্থাঃ?” কোন্‌টা প্রকৃত পথ? কোন্ পথ সরল অথচ নিশ্চিত, সুগম অথচ শীঘ্রই পরিসমাপ্ত? আদি-অন্তহীন অফুরানো পথে অবসন্ন দেহে, নিস্তেজ মনে, ক্ষত-বিক্ষত চরণে আর কতকাল ভ্রমণ করিব? যদি কেহ প্রকৃত পথের সন্ধান জান, এই সময় বলিয়া দাও।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক

অধিকারে বঞ্চিতা

(গল্প)

(১)

(ক)

প্রিয়তম,

১৬ই বৈশাখ।

তুমি আমার দেবতা। শুনিয়াছি দেবতারা অন্তর্যামী। ভক্তের অস্ফুট অব্যক্ত প্রার্থনা তাঁহাদিগের সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিচলিত করিয়া তোলে। তুমি যদি আমার দেবতা হও, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনাও তুমি শুনিতে পাইবে। আমি লিখিয়া রাখি মাত্র, লজ্জায় তাহা তোমার কাছে পাঠাইতে পারি না। কিন্তু তুমি ত অন্তর্যামী, সুতরাং পাঠান না হইলেও ইহা তোমার কর্ণগোচর হইবে।

আমি কাল সকালে আসিয়াছি, আজ সন্ধ্যা হইয়া গেল, তুমি ত এখনও আসিলে না। আগে ত তুমি এমন ছিলে না? কেন আসিলে না? কি জন্য আসিলে না? কবে আসিবে? আমি আসিয়াছি বলিয়া কি আসিতেছ না? পূর্ব্বে ত এত ঘৃণা করিতে না? আমি কি তখন এত কালো ছিলাম না, আমার মসীকৃষ্ণ বর্ণ কি তবে এবারে গাঢ়তর হইয়াছে? তুমি সুন্দর, তুমি কালো দেখিতে পার না, কিন্তু তথাপি আমাকে একেবারে পায়ে ঠেল নাই। তোমার রূপ ভুবনমোহন, তোমার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তুমি কেননা কালোকে ঘৃণা করিবে? কিন্তু যেদিন এই মসীবর্ণ নববধূ লাল চেলী মণ্ডিত হইয়া, তোমার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে দিন ত ইহাকে পায়ে ঠেল নাই, তাহার পরদিন ত ইহাকে পায়ে ঠেল নাই!

আগে ত আসিতে! তখন আমি দূর হইতে তোমাকে দেখিয়া জীবন সার্থক করিতাম। কখনও চরণস্পর্শের অধিকার দাও নাই, সেই জন্যই সে সুখ জীবনে আস্বাদন করি নাই। মানুষের পক্ষে বৈকুণ্ঠ যেমন দুর্ল্লভ, তাহা আমার পক্ষেও তেমনই দুর্ল্লভ জানিয়া কখনও ত তাহা কামনাও করি নাই। দূরে থাকিয়া তোমায় দেখিয়াছি, ইহাই তোমার কাছে অপরাধ? আমার কালো দেহের কালো চোখের কাতর চাহনি, তোমার শুভ্র, সুন্দর চরণপ্রান্তে পড়িয়া কি তাহা মলিন করিয়া দেয়?

ইহাই যদি আমার অপরাধ হয়, তবে আর চাহিব না, আর কখনও কালোর কালো চোখের চাহনি তোমার জ্যোৎস্নাবরণ কলঙ্কিত করিবে না। সত্য বলিতেছি, আর চাহিব না। তুমি যখন আসিবে, তখন আমার মলিন চাহনি নয়নপল্লবের কারাগারে বাঁধিয়া রাখিব। তবে যখন তোমাকে দেখিবার জন্য আমার কালো হৃদয়ের ভিতরটা আকুল হইয়া উঠিবে, তখন নয়ন মুদিয়া প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিব, তখন আমার কারাবদ্ধ নয়নতারার সম্মুখে তোমার মূর্ত্তি স্থির হইয়া থাকিবে। তাহাতেও কি অপরাধ হইবে?

তুমি আসিও, আগে যেমন আসিতে, তেমনই আসিও, আমি তোমার পানে চাহিবও না। তুমি আসিও, তোমার ঘরে তুমি বসিও, আমি আগেকার মত মল্লিকা ও চামেলীর তোড়া বাঁধিয়া, মেজে ফুলদানিতে রাখিয়া দিব। তোমার জন্য বিছানায় আগে-কার মত রাশি রাশি বেল আর গোলাপ ছড়াইয়া রাখিব। তুমি যখন আসিবে, তখন আমি দূরে তোমার নয়নপথের বাহিরে থাকিব। পরদিন প্রভাতে আসিয়া দলিত কুসুমের ক্ষীণ গন্ধের সহিত তোমার দেহের গন্ধের আঘ্রাণ পাইব।

চন্দনা মরিয়া গিয়াছে, বিড়ালটাকেও আর দেখিতে পাই না, বেজিটা একবারও আসে না। তুমি তাহা দেখ নাই? তোমার জন্য তাহাদিগকে লালনপালন করিতাম, তোমার বলিয়া তাহা-দিগের জন্য পরিশ্রম করিতাম, আমি চলিয়া গেলে তুমি কি তাহাদের খোঁজ লও নাই? পাখীটার দাঁড়টা পড়িয়া আছে, বিড়ালের শুইবার বাক্সটাকে কে ফেলিয়া দিয়াছে, বারান্দায় বেজির শিকলটা ভিজিয়া ভিজিয়া মরিচা ধরিয়া গিয়াছে, তুমি কতদিন আস নাই!

তুমি আসিও, আমি ঘর-দুয়ার সাজাইয়া বসিয়া আছি, তুমি আসিও। বিড়ালটাকে আর বেজিটাকে ধরিয়া আনিব, তুমি আর একটা পাখী কিনিয়া আনিও। আমি আর কখনও যাইব না, আমি গিয়াছিলাম বলিয়াই কি তুমি রাগ করিয়াছ? তুমি আসিও, আমি আর কখনও যাইব না, তুমি আসিও।

তোমার

সেবিকা।

(খ)

প্রিয়তম,

তুমি আস নাই, আমি সমস্ত রাত্রি বসিয়াছিলাম। পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে অন্ধকারে বসিয়াছিলাম, তোমার ঘরে বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, কিন্তু তুমি যদি হঠাৎ আসিয়া পড়, যদি হঠাৎ আমাকে দেখিয়া ফেল, সেই জন্য পাশের ঘরে অন্ধকারে লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু তুমি ত আসিলে না!

বাড়ীর আলো নিবিয়া গেল, কিন্তু তোমার ঘরের আলো কেহ নিবাইতে আসিল না। আমার মনে ভরসা হইল, তবে বুঝি তুমি আসিবে, আমি অন্ধকারে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। তুমি যে যে ফুল ভালবাসিতে, সেই সেই ফুল তুলিয়া মালা গাথিয়া, তোড়া বাঁধিয়া ঘরময় সাজাইয়া রাখিলাম, এখন তাহা শুকাইয়া গিয়াছে, তুমি ত আসিলে না!

তুমি কতদিন আস নাই জানি না, কেহ আমার কোন কথার উত্তর দেয় না, জিজ্ঞাসা করিলে হাসে, আর আমার লজ্জা করে। তোমার ঘর আমার দেবমন্দির; তাহা ধূলিময় আবর্জ্জনাময়, দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল; মর্ম্মরের গৃহতল ধূলিধূসর হইয়া গিয়াছে; ঘরময় মাকড়সার জাল, শয্যা ইন্দুরে কাটিয়া শতখণ্ড করিয়াছে, ছবিগুলা ছিঁড়িয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দরজাগুলা খোলা, সার্সিগুলা প্রায় সবই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বৃষ্টির জল আসিয়া সাদা পাথরের উপর কাদা মাখাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা আবার শুকাইয়া গিয়াছে। দাস-দাসী আছে, কিন্তু থাকিয়াও নাই, আমার কথা তারা কেন শুনিবে, আমি কে? আমি যে কালো বলিয়া দাসীরও অধম! একা তোমার মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছিলাম, দেবতার বেদী সজ্জিত করিলাম, পূজার আয়োজন করিলাম, কিন্তু দেবতা, তুমি আসিলে কই?

তুমি যাহা থাইতে ভালবাসিতে, তাহা নিজে হাতে রাঁধিয়া আনিয়াছিলাম; তুমি যেথানে বসিয়া থাইতে ভালবাসিতে, সেইখানে তোমার ভোগ সাজাইয়া রাথিয়াছিলাম, তাহা এথনও সেইভাবে আছে। সেইভাবেই থাকিবে, যতদিন তুমি না আসিবে, ততদিন তাহা তেমনই থাকিবে। আমার কাজ দেথিয়া, তোমার গৃহসজ্জা, ভোগসজ্জা দেথিয়া সকলেই মৃত্মৃত্ হাসিয়াছিল, তথন বুঝিতে পারি নাই যে তাহা বিদ্রূপের হাসি!

আলো নিবিয়া গেল, একা আমি ব্যতীত আর কেহ তোমার গৃহে জাগিয়া রহিল না, পাড়া ঘুমাইল, নগর ঘুমাইল, দেশ ঘুমাইল। উত্থানে বটগাছে যে ঘুঘুটা ডাকিয়া উঠিত, আর তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, সেটা ডাকিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, পথ দিয়া কে একজন জুতা পায় দিয়া আসিল, আমি ভাবিলাম, এতক্ষণে বুঝি তুমি সত্যসত্যই আসিলে। না, সে চলিয়া গেল। সে নয়। একটা মাতাল পথ দিয়া গান গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল।ঃ—

তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুথ পানে চেয়ে হাসিয়ো!

বেশ গানটি। আমাদের প্রতিবেশী যুবকেরা পথ দিয়া কোলাহল করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে, তথনও আমার তন্দ্রা আসে নাই, কেবল তোমার জন্য ভয় হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, হয়ত তোমার কোনও বিপদ্ হইয়াছে, সেই জন্য তুমি আসিতে পারিলে না। রাত্রি তিন প্রহর, কে আসে? কে যেন পা টিপিয়া টিপিয়া আসিতেছে; তবে কি তুমি আসিতেছ?

একজন পুরাণো লোক আসিতেছে; মেনি বিড়ালটা কোথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে মাথা ঘসিতেছে। সেকি নিত্যই স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া নিত্যই ফিরিয়া আসে? তুমি যতদিন আস নাই, ততদিন সে নিত্যই তোমার সন্ধানে আসে এবং নিত্যই ফিরিয়া যায়? সে আজ আমাকে কত আদর করিল, আমাকে পাইয়া সে যেন বড়ই আনন্দিত হইয়াছে, তাহাই জানাইল. তাহার পর একবার ঘরময় তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াইল। তুমিত আসিলে না, সে সমস্ত রাত্রি আমার সহিত জাগিয়া বসিয়াছিল, প্রভাতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

আর একজন আসিয়াছিল, সেও তোমারই সন্ধানে। সেও বোধ হয় নিত্য আসে, তোমার সন্ধান না পাইয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়। সেটা সেই বেজি, কতদিন তাহাকে দেথি নাই। সেও আমাকে চিনিল, আগেকার মত তাহার ভিজা নাকটা আমার বুকের মধ্যে লুকাইল। থাইতে চাহিল, তাহাকে আর মেনিকে আমার থাবারগুলা ধরিয়া দিলাম।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। হঠাৎ হু হু করিয়া একটা হাওয়া দিল, সার্সিগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল, থড়থড়িগুলা থট্ থট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল, তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কে যেন থিল-থিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভাবিলাম, হয়ত তুমি আসিয়াছ, হয়ত তোমার দয়া হইয়াছে, তুমি সত্যসত্যই গৃহে ফিরিয়াছ এবং আমাকে অন্ধকারে বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতে দেথিয়া দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া হাসিতেছ!

না, ভুল, থেয়াল, মনের একটা থেয়াল। না হয় চিত্ত-বিকার! তুমিত আস নাই, তুমিত হাস নাই, তোমার শয্যা যেমন রাথিয়া দিয়াছিলাম তেমনই আছে। তবে কে হাসিল? মনে হইল, কে যেন আমার অবস্থা দেথিয়া প্রত্যূষের আলো আঁধারে লুকাইয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে। বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল, সমস্ত আলোগুলা জ্বালিয়া দিয়া সকল ঘরগুলা দেথিয়া আসিলাম, কেহইত আসে নাই। একটু একটু করিয়া আলো ফুটিতেছে, মেনি চলিয়া গেল, বেজিটা আগেই গিয়াছে। তাহারা এতক্ষণ ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল যেন আমি একা নাই। তুমি আস নাই, ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইলাম, আলোটা তথনও জ্বলিতেছে, ফুলগুলা শুকাইয়া গিয়াছে। বড় আর্শিথানা আমাকে দেথিয়া অবজ্ঞায় হাসিয়া উঠিল, ছবির ফ্রেমের কাঁচগুলাও যেন হাসিয়া উঠিল। আমি লজ্জায়, ঘৃণায়, মরমে মরিয়া গেলাম।

দেবতা, তুমি আমার দেবতা, আমার হৃদয়ের বেদনা তুমি ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারিবে? তুমি একবার আসিও। আমি এথানে থাকিলে তুমি যদি বিরক্ত হও, তোমার গৃহ যদি তোমার অসহ্য বোধ হয়, তাহা হইলে আমি থাকিতে চাহি না। কোথায় যাইব বলিয়া দিও, আমি সেইখানে যাইব। তবে তুমি একবার আসিও, আমাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে একবার আসিও। বিশ্বজগৎ আমাকে দেথিয়া অবজ্ঞাভরে হাসিয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিয়া আমার প্রাণমন লজ্জা-ঘৃণায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুমি আমার নারায়ণ, লজ্জা-নিবারণ, তুমি আসিয়া সে লজ্জা নিবারণ করিয়া যাইও।

আসিও, একবার আসিও, লোকে অনুরোধে, উপরোধে, দয়া করিয়া কত কাজ করে। তুমি দয়া করিয়া একবার আসিও, আমাকে বিদায় দিবার আগে একবার আসিও।

তোমারই
পদাশ্রিতা।

(গ)

১০ই বৈশাথ,
মঙ্গলবার।

দিদিমণি,

আমরা সকলে নিরাপদে আসিয়া পৌছিয়াছি, পথে কোন কষ্ট বা অসুবিধা হয় নাই। আমাদের বাড়ীটি বেশ নির্জ্জন জায়গায়, সম্মুথে একটা ছোট রাস্তা আর তাহার আড়পারে একটা প্রকাণ্ড বাড়ী, পিছন দিকে একটা বড় মাঠ, তাহাতে কেবল কচুগাছ। কাছে আর কোন বাড়ী-ঘর নাই। এ পাড়াটা বড় নির্জ্জন, কল্‌কাতা সহরের মত মোটেই নয়, এ যেন একটা পাড়াগাঁ। এত বড় কল্‌কাতা সহর, তার মধ্যে বাড়ী পাওয়া গেলনা, এই এক লক্ষীছাড়া জায়গায় এসে বাড়ী করেছেন। ভেবেছিলাম উনি কল্‌কাতায় বদলী হচ্ছেন, সহরে যাব, কত গাড়ী, ঘোড়া, ট্রাম, মোটর্‌কার দেথ্‌তে পাব, তা' আমার যেমন বরাত, এমন অথদ্দে জায়গায় বাড়ী নিয়েছেন যে, দেশের মত কেবল ছেকড়া গাড়ী আর গরুর গাড়ী। প্রথম-প্রথম দুই-একদিন এই কথা বলাতে হেসে ওঠেন, আর আমি অপ্রস্তুতে পড়ি।

এতবড় দিনটা আর কাটেনা। আমার সংসারের যা কাজ, তা' দু-তিন ঘণ্টাতেই হয়ে যায়; উনিত আপিস চলে যান্, বামুন্‌টা মুথে আট-দশটা পান গুঁজে বেড়াতে বেরোয়, বুড়ো ঝি আর হিন্দুস্থানী চাকরটা সারাদিন ঘুমোয়। আমি কি করি বল দেথি? কোন উপায় না পেয়ে হাঁ করে সারাটি দিন ঐ বড় বাড়ীটার পানে চেয়ে বসে থাকি। আজ আর সেদিকপানে চাইতে

পারছি না, প্রাণটা যেন হাঁফিয়ে উঠ্‌ছে, তাই তোমাকে একথানা লম্বা-চৌড়া পত্র ফেঁদে বসেছি।

বাড়ীথানা প্রকাণ্ড, দু-মহল। সম্মুথে আর পিছনে মস্ত পুকুর আর বাগান, কিন্তু কেমন যেন শ্রী-ছাঁদ নাই। বাড়ীতে লোক আছে, তারা ফটক দিয়ে যাওয়া-আসা করে, কিন্তু ঠিক যেন চোরের মত। বাড়ীর মালিকদের কাউকে দেথ্‌তে পাওয়া যায় না। অন্দরমহলের একটা অংশ ঠিক আমাদের বাড়ীর সম্মুথে, কিন্তু সে অংশটায় এথন কেউ থাকে না। তার সমস্ত দরজা-জানালাগুলো দিনরাত্রি থোলা থাকে। সম্মুথে দু'তিনটি ঘর; একটা শোবার, একটা বসবার, আর একটা পড়বার। শোবার ঘরটি মার্ব্বেল পাথর দিয়ে মোড়া, একপাশে একথানি প্রকাণ্ড মেহগিনির থাট, আর এককোণে একটা মেজ। ঘরের দেওয়ালে পাঁচ সাতথান দামী-দামী ছবি ছিল, সেগুলো সব দড়ি ছিঁড়ে পড়ে ভেঙ্গে গেছে। একথানা বড় দাঁড়ানো আরসী আছে, রাত্রিতে চাম্‌চিকাগুলো তার উপরে বসে থাকে; ঘরে বিদ্যুতের আলো, পাথা, কিন্তু এসে অবধি একদিনও আলো-জ্বালা দেথ্‌তে পাই নি। সমস্ত দিন-রাত্রি ধরে ইঁদুরের রাজ্য, থাটের বিছানা-পত্রগুলা ত কেটে-কুটে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে। এইত গেল এক ঘর, এর পাশে বসবার ঘর, তাতে অনেক টাকার দামী-দামী আসবাব ছিল, পাথীতে আর ইঁদুরে নিত্য-নিত্য তার সর্ব্বনাশ করেছে। ঘরের দেওয়ালে সাত-আট-থানা খুব বড়-বড় ফটোগ্রাফ আছে, তার কাঁচগুলো সব ভেঙ্গে গেছে, ঝড়ে বিদ্যুতের আলোর ঝাড়টি ভেঙ্গে পড়ে গেছে, পাথীর পালক, ধূলো, কাদা আর ময়লায় দামী-দামী মথ্‌মল্ মোড়া কেদারাগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বড়লোকের ত আর জিনিষে দরদ নেই, আমাদের ভাঙ্গা কাঠের চৌকীগুলো নিয়ে আমি তিনবেলা ধূলো ঝেড়ে মরি। গদীগুলা, কেদারাগুলা একেবারে গেছে, চামড়ার গুলো এথনও মেরামত চল্‌তে পারে। এই ঘরের মাঝথানে একথানি সুন্দর মেজ, তার উপরে একটি ছোট সোণার (কি সোণালি রং করা) ঘড়ি, মস্ত মস্ত বেলোয়ারীর দোয়াত আর কলমদান, জরির কাজ-করা একথানা বেলাটিনের থাতা, পাথরের ছোট-বড় অনেকগুলো কাগজ-চাপা। ঘরটি দেথলে মনে হয়, কে যেন একদিন হঠাৎ ঘর থেকে চলে গেছে, তা'র পর যেন আর এদিকে আসেনি।

বস্‌বার ঘরের পাশেই পড়বার ঘর। সমস্ত ঘরটিতে কেবল বইএর আলমারি। এত বই কথনো একসঙ্গে দেথিনি। হায় হায় দিদিমণি, আমার যদি এতগুলা বাঙ্গলা বই থাকত, আর সবগুলা যদি টিক্‌টিকির নভেল হ'ত, তাহলে কি আর দিন কাটাবার ভাবনা থাকে? না, তোমাকে চারপাতা চিঠি লিথ্‌তে গিয়ে ঘেমে মরি! তোমার দাদা একধরণের মানুষ। যদি কোন দিন বাঙ্গলা বই আন্‌তে বলি, তাহলে বলেন, "কাশীদাসের মহাভারত পড়বে?" আমি গড় করি আর বলি, "বেশ আছি ঠাকুর, আর দয়ায় কাজ নেই।"

ঘরের মাঝথানে একটা বড় কালো মার্ব্বেল পাথরের মেজ আছে, তা'র উপর একথানা বই থোলা পড়ে আছে, আর তা'র কাছেই একথানা গদী-আঁটা কেদারা আছে। ঠিক যেন একজন পড়্‌তে পড়্‌তে উঠে চলে গেছে, আর ফেরেনি। রোজ সন্ধ্যা-বেলায় একটা কালো বিড়াল ঘরময় কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, বোধ হয় সমস্ত রাত্রি থাকে, ভোরের বেলায় চলে যায়। এক-একদিন একটি ছোট বেজি এসে ঘরগুলাতে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে কেমন-একরকমভাবে ডাকে, শুন্‌লে বড় দুঃথ হয়!

বাড়ীটা যেন একথানা উপন্যাস। আহা, কোন্ হতভাগীর সোণার সংসার, কে এমন করে ছারেথারে দিয়েছে। আমরা ভাল আছি, তুমি আর ঠাকুরজামাই কেমন আছ লিথো। খুব শীঘ্র পত্রের জবাব দিও, তা' নইলে তোমার ভাজটি একে-বারে ক্ষেপে যাবে।

স্নেহের
ছোট-বৌ।

(ঘ)

দিদিমণি, ২৬শে বৈশাথ।

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আমাকে ভুলেই গেলে। আজ কয়দিন থেকে আমার বাসার সম্মুথের ঘর কয়টায় লোক এসেছে। একদিন দেথি শোবার ঘরে একটা ছায়া, দেথেই ত আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তার-পর ভাল করে দেথি যে ছায়া নয়, একটি বউ, দিব্বি ছোট-থাট বেঁটে বউটি। তুমি ভাই রাগ ক'র না, আমি সাত হাত লম্বা ধেড়ে বউ দুচোথেই দেথতে পারি না।

বউটি এসে ঘর-দুয়ার দেথে যেন অবাক হয়ে গেল, ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল, তারপর বারান্দার দিকে এল। বাবারে, কি কালো, এমন কালো ত জন্মেও দেথিনি ভাই! হয় হাড়ী, না হয় তেঁতুলে বাগ্দীর মেয়ে। আমরা অবশ্য ডানা-কাটা পরী নই, কিন্তু ভাই তাবলে অমন বিদ্‌কুটে কালোও নই। বারান্দায় এসে বৌটি মুথ থুল্‌ল, কালো বটে কিন্তু মুথথানি বেশ। তার চোথ-ভরা জল, স্রোতের জলের মত গালদুটি বয়ে পড়্‌ছিল। দেথে বড় কষ্ট হল ভাই!

সমস্তটি দিন বউটি সেই ঘর-দুয়ার সমস্ত মুক্ত করিয়া ফেলিল, বিছানা-মাদুর সারিয়া-সুরিয়া গোছাইয়া রাথিল। তারপর বাগান হইতে রাশি রাশি বেল, যুঁই আর চামেলি তুলিয়া আনিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। ঘরময়, বিছানাময় ফুল ছড়াইয়া রাথিল, আমি অবাক হইয়া বসিয়া তাহার কাণ্ড-কারথানা দেথিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সংসারের কাজে চলিয়া গেলাম, রাত্রি দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়া দেথি যে, অন্ধকার ঘরগুলা বিদ্যুতের আলোকে দিনের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ঘর-দুয়ার বাসর-সজ্জায় সাজাইয়া সেই কালো বৌটা কোথায় বসিয়া আছে।

সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিয়াছে, একবারও নিবে নাই, বৌটা বোধ হয় সারারাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিল। কেন বসিয়াছিল, কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল, তাহা ত বুঝিলাম না। সকালবেলায় তোমার দাদাকে সকল কথা থুলিয়া বলিলাম, তিনি কেমনধারা মানুষ তা' জান ত? তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন, আর আমি বেকুব বনিয়া বসিয়া রহিলাম।

আজ আর কোন কাজ ভাল লাগিতেছে না। বৌটার জন্য মন বড়ই থারাপ হইয়া আছে। বৌটি বড় শান্ত, বড় সুলক্ষণা, তাহার জলভরা চোথদুটি দেথিলে বড় দুঃথ হয়, কি জানি কেন. মনটা তার জন্য থাকিয়া-থাকিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। বেলা হইয়া গিয়াছে, তোমার দাদা আপিসে গেছেন, আমি থাওয়া-দাওয়া করিয়া উপরে উঠিয়াছি, কিন্তু এথনও ঘর-দুয়ার সাফ্ হয়নি। সাদা পাথরের উপরে ফুলের রাশি শুকাইয়া পড়িয়া আছে, থাটের উপরে রাশি রাশি ফুল আর মালা পড়িয়া আছে, শোবার ঘরের

এককোণে রূপার বাসন-ঢাকা খাবার পড়িয়া আছে, কিন্তু ঠাকুরঝি, সে বৌটিকে এখন আর দেখিতে পাইলাম না।

বারান্দায় বসিয়া তোমায় চিঠি লিখিতেছি, আর ঠায় বড় বাড়ীর দিকে চাহিয়া আছি। খানিক পরে দেখি, পড়িবার ঘরে বৌটি মেজের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কি লিখিতেছে; তাহার গায়ের কাপড় ভিজা, মাথার চুল ভিজা, চুলগুলা সাদা পাথরের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

বৌটি একখানি চিঠি লিখিতেছে; অনেকক্ষণ ধরিয়া চিঠিখানা লিখিল, তাহার পর খামে বন্ধ করিয়া রাখিল। তা'রপর সেইখানেই আবার শুইল। সেই টেবিলটার উপর একখানা খোলা বই পড়িয়াছিল, সেই টেবিলটার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। সন্ধ্যা অবধি সেইভাবে পড়িয়া রহিল। আজ বড় গরম, হু হু করিয়া আগুনের মত হাওয়া দিতেছে, সেই হাওয়ায় তাহার ভিজা কাপড় শুকাইয়া গেল, মাথার চুল শুকাইয়া উড়িতে লাগিল, কিন্তু বৌটি সেই একভাবে পড়িয়া রহিল। বাড়ীর লোকই বা কেমনতর, একটা ঝি কি চাকর একবারও বৌটাকে ডাকিল না।

ঠাকুরঝি, এই পাড়ায় আসিয়া আমায় যেন কিসে পাইয়াছে, আমি সারাটি দিন ঘর-সংসার ফেলে এই বারান্দাটিতে পা ছড়িয়ে ব'সে থাকি, আর বড় বাড়ীটা আর সেই কাল বৌটিকে দেখি। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, উনি আসিয়াছেন, কাজে যাই। আজ আর ঘরে আলো জালে নাই, বৌটি এখনও সেইভাবে পড়িয়া আছে।

তোমার ভালবাসার
ছোট-বৌ।

(ঙ)

দেবতা,

তুমি কোথায় আছ, তাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তুমি কেন আস না তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু সব দেখিয়া, সব জানিয়া মনে কেমন ধাঁধা লাগিয়া গিয়াছে, সে সন্দেহ যে কিছুতেই মিটিতেছে না। তুমি আসিলে না, আবার সারা রাত্রি তোমার প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিলাম, তবুও তুমি আসিলে না। এবার আর বাসর সাজাইয়া বসি নাই, সকালবেলায় স্নান করিয়া আসিয়া যে চেয়ারখানায় তুমি বসিতে, তাহারই পায়ের তলে মাথা রাখিয়া শুইলাম, সারাটি দিন কাটিয়া গেল। সারাদিন সারারাত্রি অতি দীন ভক্তের মত তোমার মন্দিরতলে একাগ্রচিত্তে তোমারই ধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তোমার সিংহাসন ত টলিল না! তোমার দেখা ত পাইলাম না! কালও তাহারা আসিয়াছিল, কালও মেনি বিড়াল ও রূপি-বেজি তোমার জন্য বসিয়াছিল, তাহারা সমস্ত রাত্রি আমার সেবা করিয়াছিল। আবার রাত্রি প্রভাত হইল।

দেবতা, প্রিয়তম! তোমাকে দেখিয়াছি, নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছি, দেখিয়া যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছি। তুমি ত আসিলে না, বুঝিলাম তুমি আসিবে না। তখন একবার তোমাকে দেখিবার জন্য পাগল হইয়া উঠিলাম। কতদিন দেখি নাই—সে কতদিন! সেই তুমি "ক্ষুধিত পাষাণ" পড়িতেছিলে, আমি তোমার জন্য পান লইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। পাছে আমার পদশব্দে তোমার পড়ার ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়ে তোমার নিকট আসিতে পারিতেছিলাম না। আর কি জান? লজ্জা করে, আমার এই কুৎসিত কদাকার কালো মূর্ত্তিটা তোমার ভুবনমোহন রূপের সম্মুখে আনিতে লজ্জা করে। তুমি বড় সুন্দর, তুমি কত সুন্দর তাহা কি জান? দর্পণে সে সৌন্দর্য্য প্রকৃতরূপে প্রতিফলিত হয় না, সে হয় কেবল আমার চোখে। আমার এই কাল মুখের সাদা চোখের কালো তারাদুটিতে তুমি কত সুন্দর তাহা কি জান? তুমি বিরক্ত হইলে আমার বড় অভিমান হয়। বড় সাধ করিয়া গিয়াছিলাম, আমার এ কালো-রূপ চিকণ করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সাধ মিটিল কই? ভাবিয়া-ছিলাম তুমি হয়ত ডাকিবে। চিরদিন দীর্ঘ বরষ-মাস আমার কি একই ভাবে কাটিবে?

তুমি আমার, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তুমি আমার, তবু তুমি আমার নহ। ভাবিয়াছিলাম হয় ত আজ ডাকিবে, আজ তোমার নিকটে যাইব, আজ তোমাকে স্পর্শ করিব, আজ তোমার চরণতলে লুটাইয়া পড়িব, সঞ্চিত হৃদয়-বেদনা ঢালিয়া দিব। বলিব তুমি আমার, তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই; বলিব তোমায় ভালবাসি, তোমায় বড় ভালবাসি; বলিব যে আর কখনও তোমায় ছাড়িব না, আমার কালো হৃদয়ের পিঞ্জরে তোমার আলো-করা রূপ ধরিয়া রাখিব।

তুমি ডাকিলে না, যাওয়া হইল না, বলা হইল না, স্পর্শ করা হইল না, সব সাধ অপূর্ণ রহিয়া গেল। বড় অভিমান হইল, হৃদয় শূন্য হইয়া গেল, কে যেন আমায় ঠেলিয়া দিল, আমি চলিয়া গেলাম। আমার পদশব্দে তুমি চাহিয়া দেখিলে, কি ভাবিলে জানি না, কিন্তু মেজের উপরে "গল্পগুচ্ছ" এখনও পড়িয়া আছে, তাহার পর কি আর আস নাই?

দারুণ অভিমানভরে চলিয়া গিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তুমি না ডাকিলে আর আসিব না। কাহার জন্য আসিব? কিসের জন্য আসিব? কেন আসিব? তুমি আমার, সংসার আমার, ঘর-দুয়ার, ধন-দৌলত সব আমার, অথচ কিছুই আমার নয়, কেহই আমার নাই। ইহা অসহ্য!

চলিয়া গেলাম, কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই? তোমার মূর্ত্তি আমাকে টানিয়া আনিল, কিন্তু আসিয়া ত আর দেখিতে পাইলাম না। তোমার জন্য আসিলাম, কিন্তু তুমি কোথায়? আজ কয়দিন তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, কিন্তু তুমি ত আসিলে না! তোমাকে দেখিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল; তুমি কোথায় আছ, কি ভাবে আছ, কেন আস না, ইহাই জানিবার জন্য বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

এ বাড়ীতে ত আমি কেহ নই, সুতরাং আমার কথা শুনিবে কে? কে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবে? অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিব বলিয়া একজন দাসীকে বশীভূতা করিলাম। আমার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমার অলঙ্কারগুলি তাহাকে দিয়া গেলাম, তাহা যেন আর ফিরাইয়া লইও না। তাহার নাম বলিব না, বলিলে হয় ত সে আর তাহা রাখিতে পারিবে না। সে দরিদ্র, সে অর্থলোভে আমার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহার ত কোনও অপরাধ নাই।

সে আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল; তুমি যেখানে আছ, সেইখানে লইয়া গিয়াছিল। আমি দূর হইতে তোমাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, সেইজন্য তুমি তাহা জানিতে পার নাই। ভাবিয়া-

ছিলাম, দূর হইতে একবার নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখিয়া আসিব, তাহা হইলেই আমার প্রাণের পিপাসা মিটিবে।

কে সে? কি করিয়া সে তোমার হৃদয় অধিকার করিল? সেও ত কালো। সে যদি সুন্দর হইত, তাহা হইলে আমার মনে ধাঁধাঁ লাগিত না। সে কি আমা অপেক্ষা সুন্দরী? আমার নয়ন বলিল, "না"।

সে কি আমা অপেক্ষাও তোমায় ভালবাসে? কখনই না। আমার মন বলিল, "কখনই না"। প্রিয়তম, তুমি আমার দেবতা আমার আরাধ্য, উপাস্য দেবতা; অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান আমার নাই। আমার সকল অঙ্গের কেশাগ্র হইতে নখ পর্য্যন্ত তোমার, তোমারই সেবায় নিয়োজিত। তবে কেন?

কেমন করিয়া সে তাহার কালো দেহ লইয়া তোমার সুরবাঞ্ছিত রূপের কাছে অগ্রসর হইল, কেমন করিয়া তাহার কুৎসিত আকার তোমার হৃদয়-মন অধিকার করিল? তাহার কোটরগত নয়নে বিষ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত, তাহা কি তুমি দেখিতে পাও নাই?

তোমাকে দেখিয়াছি, নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছি। তোমার—সে তোমার হৃদয়ে। আমিও তোমার, কিন্তু দূরে। তর্কের অধিকার নাই প্রভু, আর কিছু বলিব না। আমিই তোমার পথের কণ্টক—আমিই তোমার সুখের পথে বাধা। সে কণ্টক, সে বাধা রাখিব না প্রভু, তুমি ফিরিয়া আসিও।

যাহাকে লইয়া সুখী হইয়াছ, তাহাকে লইয়া আসিও। তাহাকে লইয়া তোমার গৃহে, তোমার মন্দিরে ফিরিয়া আসিও। তুমি যেমনটি চাহিতে, যেখানে যাহা ভালবাসিতে, আমি তেমন করিয়া সেইখানে তাহা সাজাইয়া রাখিয়া যাইব। তুমি ফিরিয়া আসিও।

দেবতা! কালোর হৃদয়-বেদনা কি একদিনের তরেও তোমার সিংহাসন কম্পিত করে নাই? একদিন, এক মুহূর্ত্তের তরেও কি তাহাকে মনে পড়ে নাই? আমি চলিলাম, আর তোমাকে দেখিতে পাইব না, ইহাই দুঃখ। হে বাঞ্ছিত, হে দুর্লভ, যদি কোন দিন মনে পড়ে, হে পাষাণ, যদি তোমার পাষাণ হৃদয় কোনও দিন বিগলিত হয়, তাহা হইলে ঐ মেজের পার্শ্বে শুভ্র মর্ম্মরের শীতল গৃহতল একবার আলিঙ্গন করিও। আমার কালো হৃদয়ের সঞ্চিত বেদনা, চিরজীবনের সঞ্চিত প্রেমরাশি, তোমার বক্ষঃস্থল মনে করিয়া ঐ শুভ্র, কঠিন, শীতল, চেতনাহীন পাষাণে ঢালিয়া রাখিয়া গেলাম। বিশ্বজগতের যে স্থানে যেভাবে থাকি, আমার হৃদয় শীতল হইবে।

হে নিষ্ঠুর! কোনও দিন যদি আমার কুৎসিত আবরণ স্মরণ করিয়া তোমার নীলাভ নয়নকোণে জলবিন্দু সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে তাহা ঐ পাষাণের উপরে ফেলিও, আমার কালো হৃদয়ের দারুণ জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে।

তুমি আসিও, তোমার শুভ্র চরণ আবার যেন মর্ম্মরের গৃহতল স্পর্শ করে। যেখানে অসহ্য জ্বালায় অস্থির হইয়া আমার কালো বুক দিয়া কঠিন পাষাণ আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া থাকিতাম, একবার তোমার শুভ্র কোমল চরণ দুখানি তাহার উপরে রাখিয়া দাঁড়াইও।

আমি চলিলাম, তুমি আসিও। হে দেবতা! তোমার শূন্য মন্দির তুমি আসিয়া পূর্ণ করিও।

তোমার জীবনে মরণে
কালো।

চ

ঠাকুরঝি,

আজ সব শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ কয়দিন ধরিয়া বৌটাকে দেখিতে পাই নাই। সকালবেলায় দেখি ঘরময়, বাড়ীময় লোক। পড়িবার ঘরে মেজের পায়ার কাছে বৌটি নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া আছে, তখনও শুইবার খাটে শুক্‌নো ফুলের মালা ঝুলিতেছে, ঘরময় শুক্‌নো ফুল, এককোণে সাত দিনের বাসি খাবার ঢাকা পড়িয়া আছে, আর সেই কালো বিড়াল আর ছোট বেজিটা বাড়ীময় কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

বৌটা জুড়াইয়াছে, কিন্তু আমার চক্ষে কেবল জল আসিতেছে। আহা, সব ফুরাইল, অভাগিনী জ্বলিতে আসিয়াছিল, চিরজীবন জ্বলিয়াই গেল, জীবনে আর সুখ-শান্তির মুখ দেখিতে পাইল না! আর এ পাড়ায় থাকিব না, তোমার দাদাকে বলিয়া-কহিয়া কালই চলিয়া যাইব।

তাহাকে বাহির করিয়াছে; বারান্দায় দেখিতে গেলাম। উনি সবে আপিস্ হইতে আসিতেছেন। হাতীর দাঁতের খাটে তাহাকে শোয়াইয়াছে, পরণে বেনারসী শাড়ী, হাতে দুগাছি শাঁখা, কপাল-ভরা সিন্দূর, মাথায়, গলায়, হাতে আর খাটে রাশি রাশি ফুল। আজ যেন তার বাসর। বৌটি যেন ঘুমাইয়া আছে, মুখখানি এখনও তেমনই ঢলঢলে হাসিহাসি আছে। হরি-সংকীর্ত্তন আনিল, দেশের লোক আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল,—ভাবিলাম স্বামী-পুত্র রাখিয়া যদি এমন করিয়া মরিতে পারি!

এই সময় ভোঁ-ভোঁ করিয়া একখানা মোটরকার না কি গাড়ী সেই পথ দিয়া গেল। তাহাতে দিব্য সুন্দর একটি বাবু, আর তাহার পাশে জুতা-মোজা-পরা একটা কালকিষ্টে মেয়ে। তোমার দাদা বলিলেন, "ঐ দেখ, ঐ বৌটির স্বামী—।" মরণ—মুখে আগুন!

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিবোল দিতে দিতে বৌটিকে লইয়া গেল।

তোমার স্নেহের
ছোট-বৌ।

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী

সাধনা

নিন্দা হবে জানি—
তবু রাণী, তোমার দ্বারেই সাধ্‌ব সেতারখানি।
আঙুল আমার বশ মানেনা, সুর ফোটেনা তারে,
অধীর আবেগ আঘাত সুধু করে বুকের দ্বারে;
তুমি তারে গুছিয়ে বেঁধে বশ-মানিয়ে নিয়ে
সফল করে তোল তোমার ভাবের আবেশ দিয়ে।
মর্ম্মরিয়া বাজুক সেতার মর্ম্ম-তারের মত,
গুঞ্জরিয়া উঠুক বুকের গোপন ব্যথা যত,
করুক লোকে কাণাকাণি, হাসুক যে বা হাসে—
তোমার চোখের দীপ্তিতে আজ দীক্ষা দেহ দাসে।

শঙ্কা তোমার নাই—
নিভৃত যে কুটীরখানি গ্রামের সীমানায়;
উদার মাঠে নদীপারের পথটি গেছে বাঁকা,
শিয়রে তার নিঃশ্বসিছে বুনো আউয়ের শাখা।
এদিক্ বড় লোক চলেনা—ভাবে, যে জন যায়—
এমন সাঁঝে মাঠের মাঝে গজল্ কে বাজায়!
পথিক জানবে কেমন করে' কে লাগায় সে সুর,
কাহার দেওয়া ব্যথায় হেথা সেতার ভরপুর।
না হয় হেথায় নাইক প্রাসাদ, যন্ত্রী নাকি আছে,
একটি ভক্ত জাগে তবু একটি দেবীর কাছে!

বিজন নদীতীর—
ঝাউ-শাখাতে ঘনায় ধীরে নিশীথ সুনিবিড়;
দুয়ার না হয় খোলাই থাকুক, কিসের ক্ষতি তার!
ভয় করোনা ভৃত্য দ্বারে রইল প্রতীক্ষায়।
দখিণ বায়ে গৃহচ্ছায়ে কাঁপছে যে দীপখানি,
সেই কাঁপনের সুরটি ধ'রে গমক যাব টানি।
থর্ থরিয়ে কাঁপবে আঙুর, বক্ষ কাঁপ্‌বে সাথে,
অশ্রু কাঁপ্‌বে নয়ন-পাতে ব্যাকুল বেদনাতে।
মূর্চ্ছামগ্ন মৌন রাতি, প্রহর বেড়ে যায়,
ঝিঁঝির ঝুমুর সঙ্গে কাঁদে সেতার মূর্চ্ছনায়।

বাতাস যদি থামে,—
ভোরের রাতে হঠাৎ ছাদে বাদল যদি নামে;
দুয়ার ফাঁকে হাওয়ার হাঁকে প্রদীপ যদি নিবে,
ভক্ত তোমার বহির্দ্বারে, আগলটি কি দিবে!
দীপ নিবে যায়, কি ক্ষতি তায়, কি ফল বল লাজে,
মল্লারেতে মীড় মিলিয়ে সেতার যে তার বাজে।
মেঘের পর্দ্দা ঘনায় যদি অন্ধ রাতের পরে,
কি প্রয়োজন, দুয়ার-দেওয়া রইল কি না ঘরে!
অশ্রু নামে বর্ষাসম—হায় গো রাণী হায়,
মূর্ত্তিমতী সিদ্ধি কি আর ফলবে সাধনায়?

ঐরে এল আলো—
রক্ত উষা পরল ভূষা সাদার সাথে কালো
বায়ুর কণ্ঠে নাই গরজন, ভজন গাহে পাখী,
পূর্ব্বাচলের তোরণ-দ্বারে অরুণ মেলে আঁখি;
উদাস তব নয়ন-তারায় শান্ত-করুণ ছবি,
এইবেলা তার সুর মিলিয়ে বাজা রে ভৈরবী।
সাধক, তুমি সিদ্ধ আজি, পূর্ণ-মনোরথ,
ঐ সুরে তোর যায়রে দেখা নূতন পুরের পথ!
যে যা বলে বলুক লোকে, ভক্ত তোরই জয়,
বাণীর সাথে বীণার আজি নিবিড় পরিচয়।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

দিল্লীর দুর্গ

কীর্ত্তির শ্মশান জ্বলিতেছিল,—তাহার আলোকে মানস-নেত্রে স্মৃতির পুঁথিখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এ সেই যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ, দিলীপের দিল্লী ও সাজাহানের সাজাহানাবাদ!

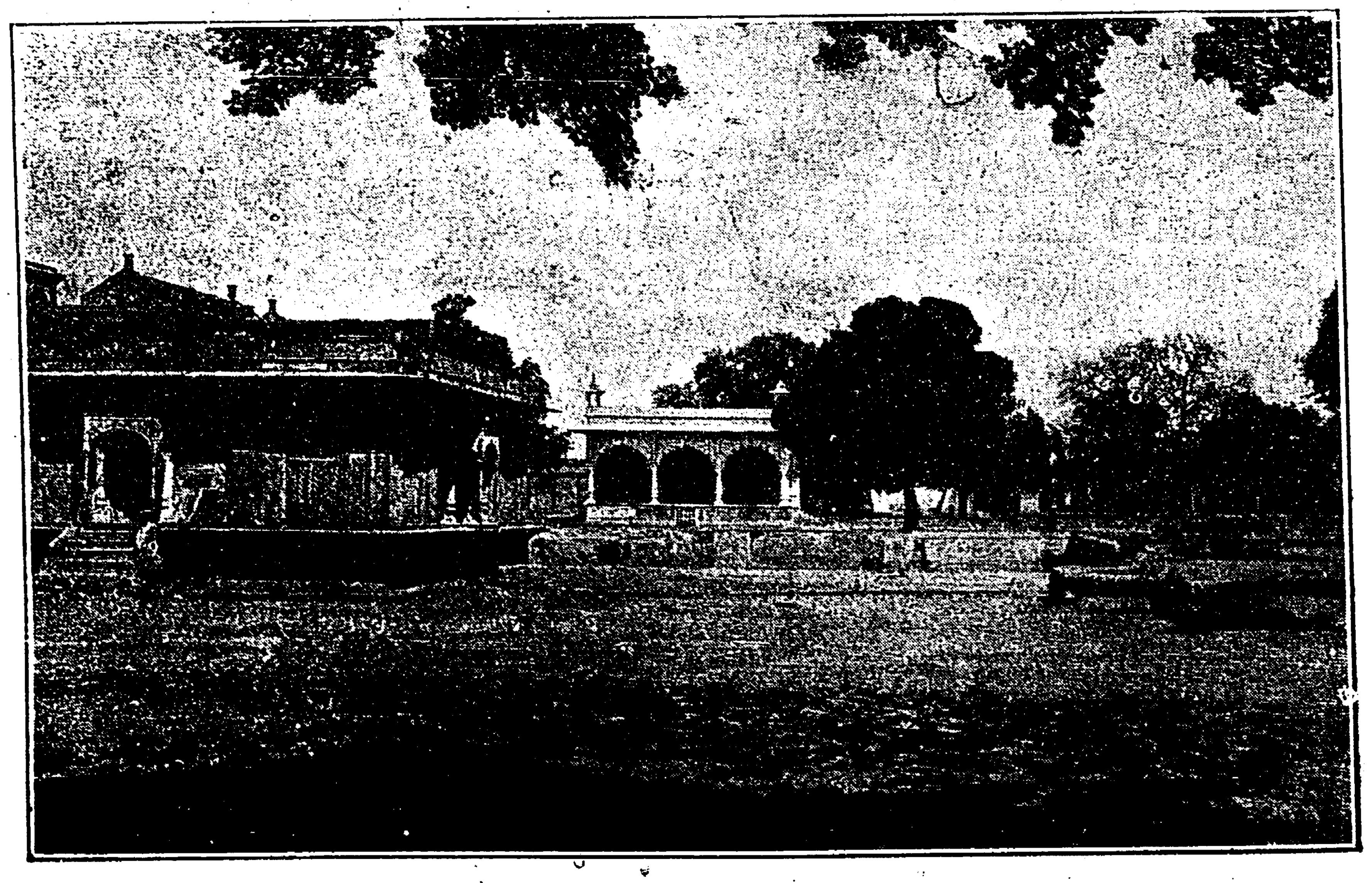

হয়তবক্স-বাগ

এ সেই দিল্লী, যেখানে সম্রাটের পর সম্রাট্, রাজার পর রাজা আপনাদের মহিমা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ সেই দিল্লী, যেখানে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য কালস্রোতে বাসি ফুলমালার মত ভাসিয়া গিয়াছে! এ সেই দিল্লী, যেখানে পৃথ্বীরাজের বুকের রক্ত এখনও তপ্ত হইয়া আছে! চুম্বনোন্মত উচ্চচূড়ার উপরে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে তাঁহার ক্রীড়নকের মত ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়াছিলেন। তাঁহ কোথায়? ঐ হুমায়ুনের সমাধিমন্দির, সমাধি হইয় বিলাসীর বিরামসদনের মত সুন্দর ছিল এবং প্র সাজাহানের তাজের পরিকল্পনা, এই সমাধিভবন হই

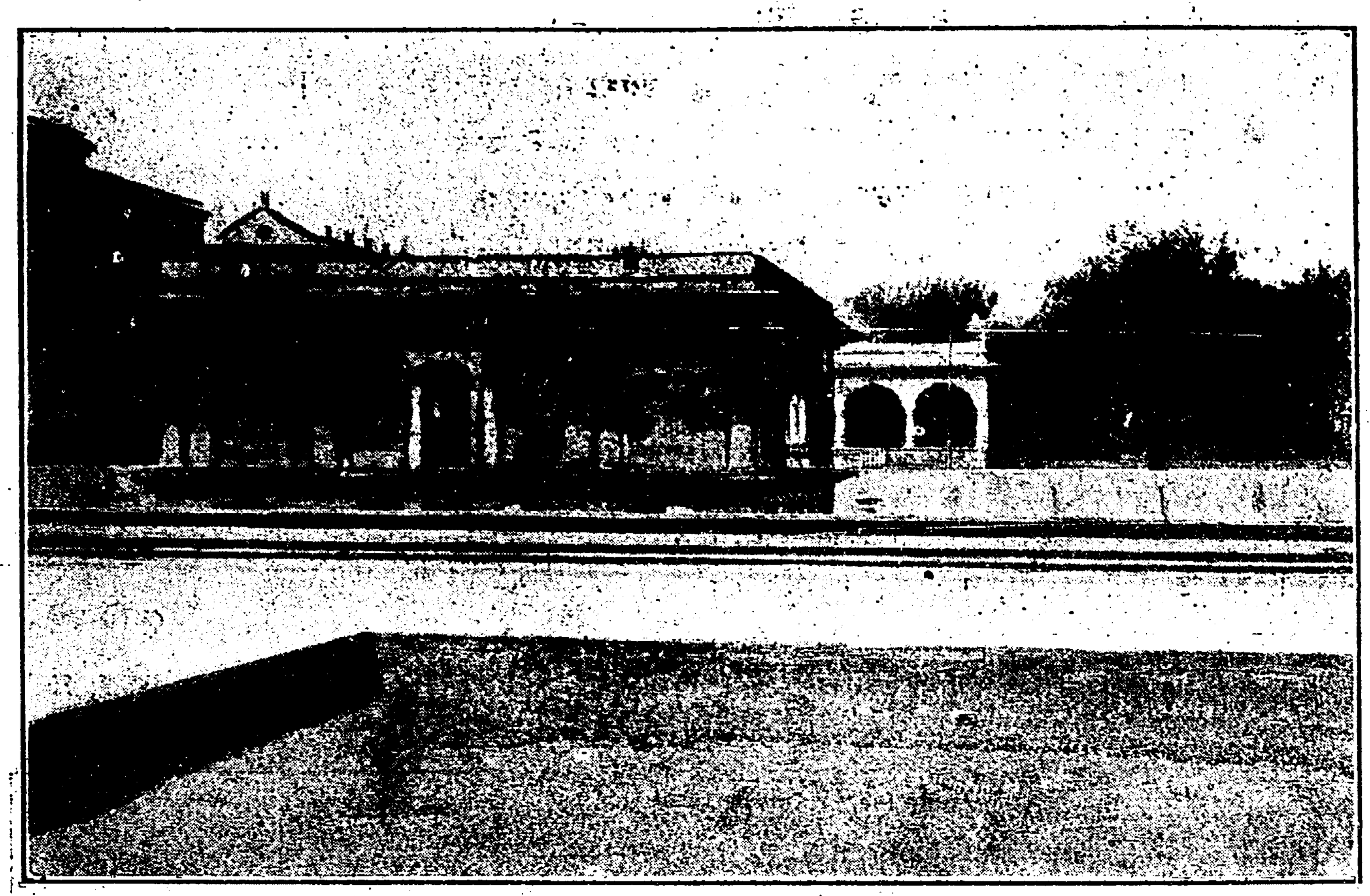

জাফর-মহল

রাবণের চিতার মত এই কীর্ত্তির শ্মশান যুগের পর যুগ জ্বলিয়া আসিতেছে, আর কতকাল ধরিয়া জ্বলিবে, কে তাহা জানে! এখানে দাঁড়াইয়া যেদিকে তাকাইবে, সেইদিকেই যেন সাশ্রুনেত্রা স্মৃতিকে শরীরিণী দেখিতে পাইবে। ঐ কুতব-মিনার, ঐ হুমায়ুনের সমাধিমন্দির, ঐ ধ্বংসভগ্ন দুর্গ, ঐ চূর্ণবিচূর্ণ প্রাসাদ— লাভ করিয়াছিল, আজ তাহার সে পূর্ব্বসৌন্দর্য্য কো ধ্বংসধ্বস্ত দুর্গ আজ জনশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে একদিন গিয়াছে, যে-দিন উহার প্রাকারতলে অস্ত্রে অ চমকিয়াছিল, যোদ্ধায় যোদ্ধায় যুদ্ধ বাধিয়াছিল—আজ পুরুষেরা কোথায়? ঐ ভগ্নচূর্ণ প্রাসাদ, একদিন যাহা

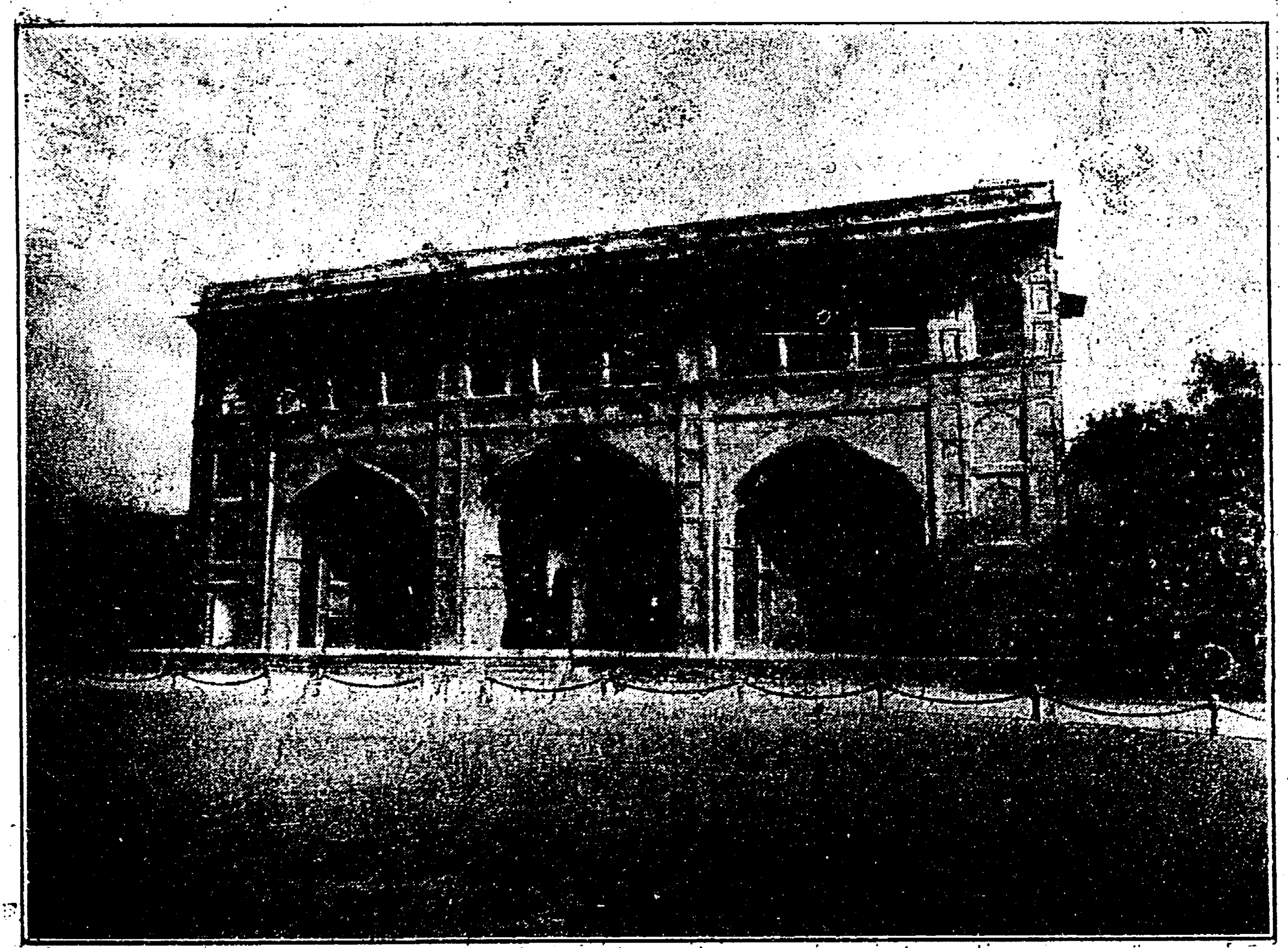

নকর-খানা

একটা বিশাল নগরের বিরাট্ কঙ্কাল এখানে স্তব্ধ হইয়া ধূলায় পড়িয়া আছে। ঐ কুতব-মিনারের উপরে এককালে কত ক্ষমতাগর্ব্বী রাজ্যেশ্বরের বিজয়-কেতন উড়িয়াছিল, উহার মেঘ- মত দীপোজ্জ্বল হইয়া পথিকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষ যাহার কক্ষে কক্ষে কত প্রেমলীলা, কত মান-অভি বিরহ-মিলনের সুখ-দুঃখের অভিনয় হইয়া গিয়াছে,

পেচক, বাদুড় ও শৃগালের নিরাপদ বিশ্রামাগার। যে সকল তন্বঙ্গীর সুগন্ধ অঞ্চল সঞ্চালনে ও সুরভি নিঃশ্বাসে প্রাসাদের সমীর আলোড়িত ও ভারাক্রান্ত হইয়া থাকিত, যাহাদের ভূষণের মধুর নিক্কণে এবং নূপুরশিঞ্জনে কক্ষগুলি সর্ব্বদাই মুখরিত হইয়া থাকিত, তাহারাই বা আজ কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আজ কেহ নাই। এই বিরাট্ ধ্বংসস্তূপপুঞ্জের উপর দিয়া, বিশাল প্রান্তর পার হইয়া, কুতবের উচ্চ মিনার চুম্বন করিয়া, পাগল পবনও যেন এ সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া দিবারাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের সহিত কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে,—"কোথায়, ওগো কোথায়, কোথায়? কোথায় যুধিষ্ঠির, কোথায় দিলীপ, কোথায় পৃথ্বীরাজ, কোথায় শাজাহান—জীবন-নাটকের সে সকল চির-স্মরণীয় মহা অভিনেতা আজ কোথায়, ওগো কোথায়?"—স্তব্ধ-রাত্রে সে বুকফাটা ক্রন্দন শুনিয়া ভগ্ন অট্টালিকার অলিন্দে অলিন্দে পেচক ও বাদুড়েরাও হাহাকার করিয়া উঠে, কবরে কবরে সুপ্ত আত্মারাও সে ভীষণ হাহাকারে শিহরিয়া উঠিতে থাকে! এবং বহুদূর হইতে শীর্ণ-বিশীর্ণা, দুঃখিনী যমুনাও সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া, অতীতের স্মৃতি বুকে চাপিয়া তীরে তীরে উছলিয়া পড়িয়া মাথা কুটিয়া মরে!

কেল্লা ও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট বাড়ীগুলি ...	৬০ লক্ষ টাকা
রাজপ্রাসাদ ...	২৮ " "
শা-মহল বা দেওয়ান-ই-খাস (রৌপ্যমণ্ডিত ছাদসমেত) ...	১৪ " "
ইমতিয়াজ মহল বা রঙ্গমহল ...	৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
দেওয়ান-ই-আম ...	২ লক্ষ টাকা
হয়ত্বক্স-বাগ ...	৬ " "
বেগমদের মহল ...	৭ " "
বাজার প্রভৃতি ...	৪ " "
বাহিরের কেল্লা ও তাহার পরিখা ...	২১ " "
মিস্ত্রীদের মাহিনা প্রায় ...	১ কোটি টাকা

মোট দুই কোটি, সাত চল্লিশ লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার টাকা।

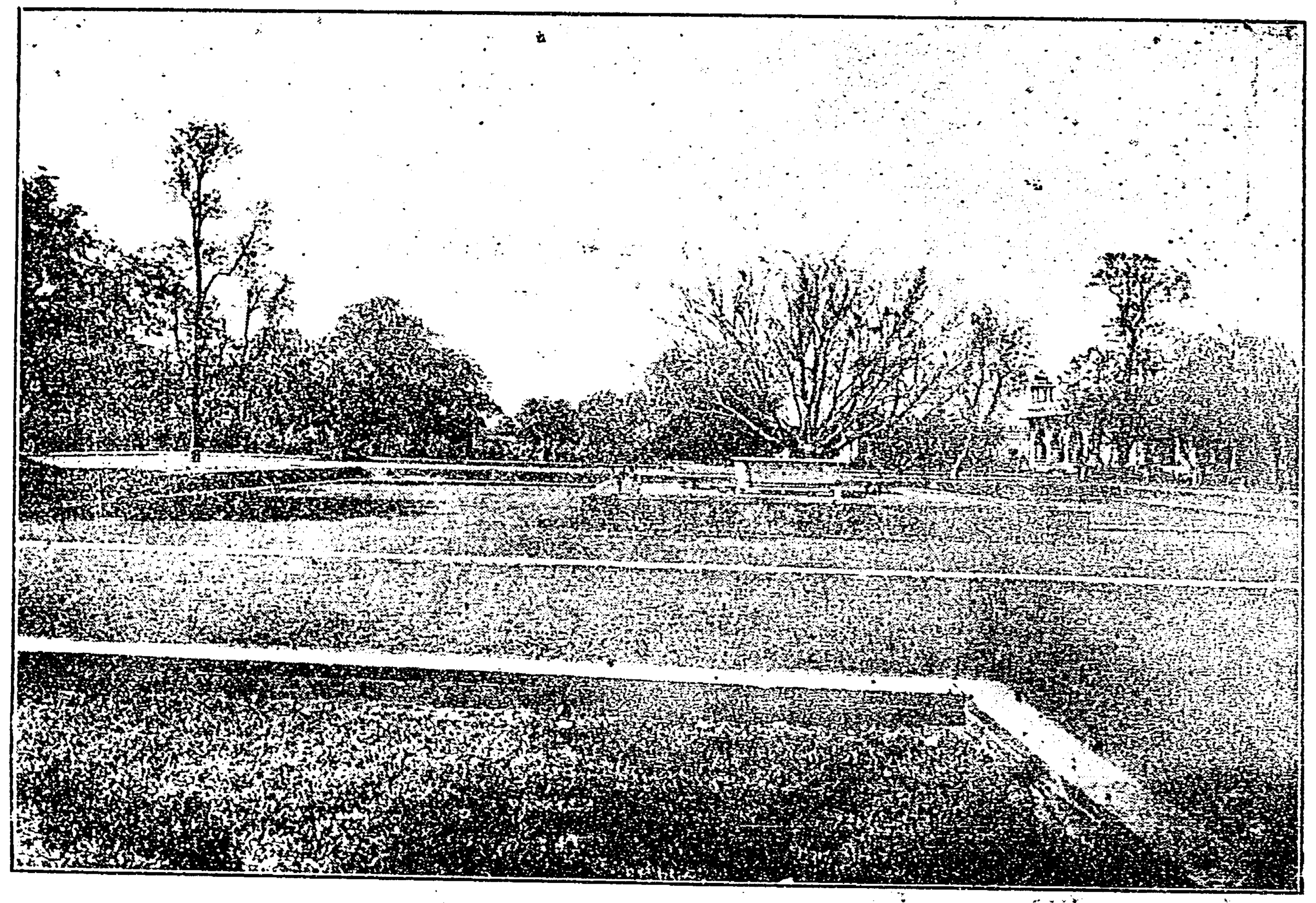

রঙ্গমহলের সম্মুখস্থ উদ্যান

এই শ্মশানের পাশে, ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলোর মত, বিধবার বুকে সন্তানের মত, জীর্ণ কন্থায় হীরার হারের মত দিল্লীর দুর্গ আজিও দাঁড়াইয়া আছে। বাহির হইতে দিল্লীর দুর্গ অনেকটা আগ্রার দুর্গের মতই দেখিতে। আগ্রাদুর্গে স্থানাভাব হওয়াতে শাজাহান দিল্লীর দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা হয়। নির্ম্মাণকাল, বার বৎসর। কুড়ি বৎসরব্যাপী রাজত্বের পরে, শাজাহান আগ্রা ত্যাগ করিয়া, এই সদ্যঃসমাপ্ত দুর্গে আগমন করেন।

আগ্রা দুর্গে যেমন, দিল্লীদুর্গেও তেমনই শুধু অস্ত্রাগার বা সৈন্যাগার নাই,—পরন্তু, রাজপ্রাসাদও আছে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই দুর্গের নির্ম্মাণে কত খরচ পড়িয়াছিল, বাক্তোয়ার খাঁ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

কেল্লার চারিপাশে বাগান এবং পাথরে-বাঁধান খাল ছিল। খালটি প্রস্থে পঁচিশ গজ ও গভীরতায় দশ গজ। খাল সর্ব্বদাই জলভরা থাকিত। কেল্লার লাহোর ও দিল্লী গেটের পাথরের সাঁকোদুটি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় আকবরের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দিল্লী ও লাহোর গেটের সাম্নে যে দুটি উপদুর্গ আছে, তাহা ঔরঙ্গজেবের দ্বারা নির্ম্মিত। এই উপদুর্গের কথা উল্লেখ করিয়া আগ্রাদুর্গের বন্দী শাজাহান, কবিত্বময়ী ভাষায় ঔরঙ্গজেবকে লিখিয়াছিলেন।—"প্রিয় পুত্র, আমার দুর্গকে নববধূ সাজাইয়া, তাহার মুখে তুমি ঘোমটা টানিয়া দিয়াছ!"

কেল্লার চারিদিকে যে ঢালুজমি আছে, তাহা সিপাহীযুদ্ধের পরে নির্ম্মিত হয়।

দৈবদুর্ব্বিপাকে ও শত্রুদের আক্রমণে শাজাহানের দুর্গের বড় কম দুর্গতি হয় নাই। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে দুর্গের প্রাচীর ও প্রাসাদগুলির যথেষ্ট অনিষ্ট হইয়াছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দুর্গের বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন এবং অন্যান্য ধনরত্নাদি কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মোগলসাম্রাজ্য বলিতে দিল্লীর চারিপাশের কয়েকটি মাত্র জেলা বুঝাইত। এই দুঃসময়ে আবার জাঠ ও মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লী আক্রমণ করিল। আক্রমণকারীদের অগ্নি-বর্ষণে আসাদ বুরুজ, মুসম্মন বুরুজ ও অন্যান্য প্রাসাদগুলির অনেক জায়গা ভাঙ্গিয়া গেল; কেল্লা খুব শক্ত ছিল, তাই সে আক্রমণের পরেও টিকিয়া আছে। নাদির শা ও আহম্মদ খাঁ আব্দালীর লুণ্ঠনের পরে কেল্লায় যাহা-কিছু মূল্যবান্ জিনিষ ছিল, তাহা জাঠ ও মহারাষ্ট্রীয়দের হাতে পড়িল। দেওয়ান-ই-খাসের রৌপ্য-মণ্ডিত ছাদ এবং অমূল্যরত্নখচিত মর্ম্মর-প্রাচীর তাহাদের হস্তে

"শা বুরুজ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত ও নির্জ্জন এবং কাঠের টুক্‌রা ও জঞ্জালে ভরা। মোতি মস্‌জিদের দশাও ঠিক তেমনই। তাহার দেওয়ালে দেওয়ালে পিপুল গাছ শিকড় রোপন করিয়াছে এবং ডোমের সোণালী কারুকাজ স্থানে স্থানে খসিয়া পড়িয়াছে। কোন কোন দরজা ইঁট দিয়া ভরাট করা, সে ইঁটের উপরে বালির প্রলেপও নাই। দেওয়ানী আমও কাঠ-কুটা-জঞ্জালে, ভাঙ্গা বাক্স ও পাল্কীর টুক্‌রায় ভরা; সিংহাসন কপোতের বিষ্ঠায় এমন অপরিষ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার সমস্ত কারুকার্য্য একরকম ঢাকিয়াই গিয়াছে।"—যেমন প্রাসাদের দশা, তেমনই তাহার অধিকারীদেরও! কোন লেখক লিখিয়াছেন, প্রাসাদের এক রাজকুমার তখন সাংসারিক খরচ চালাইবার জন্য বারো টাকা করিয়া মাসোহারা পাইতেন। (১৮৩৮ খৃঃ অঃ)

ইংরাজদের হাতে আসিয়াও প্রথম প্রথম কেল্লার অনেক

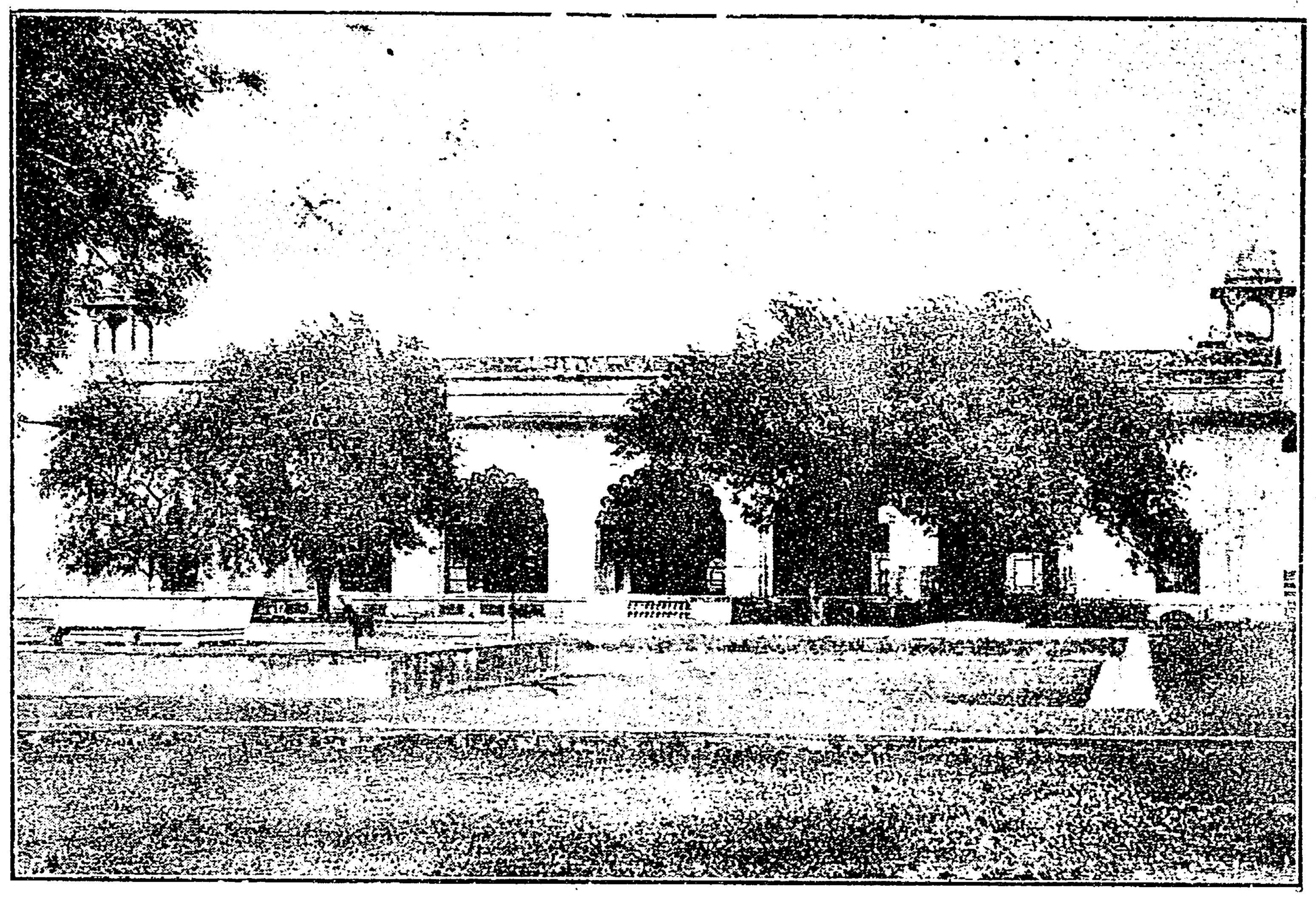

রঙ্গ-মহল

পড়িয়া একেবারে লুপ্তশ্রী হইয়া গেল। রোহিলা-দস্যু, গোলাম কাদির খাঁ গুপ্ত ধনরত্নাদির সন্ধানে প্রাসাদ ও কারুকার্য্যের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। হতভাগ্য শাহ আলমকে, এই নিষ্ঠুর দস্যু-সর্দ্দার অন্ধ করিয়া দিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া কাদির খাঁকে দুর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া শাহ আলমের জন্য একটি বার্ষিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করে। রোহিলা-সর্দ্দার পলায়নকালে দুর্গের বারুদ-ভাণ্ডারে আগুণ লাগাইয়া দিয়া যায়; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধিত হইবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা আগুন নিবাইয়া দেয়।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণকে পরাজিত করিয়া ইংরাজেরা দুর্গ অধিকার করেন। এক বৎসর পরে যশোবন্তরাও হোলকার নামক মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দার দিল্লী দুর্গ অবরোধ করিয়া বসেন। অক্টোরলোনীর বীরত্বে অবরোধ ব্যর্থ হয় বটে, কিন্তু ভীষণ অগ্নিবর্ষণের ফলে দুর্গের প্রাসাদাদির নানাস্থান ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া যায়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিসপ হিবার, অযত্নে শ্রীহীন দিল্লীর দুর্গের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চোখে জল আসে। তিনি লিখিয়াছেন :—

দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। দুর্গের অনেক শিল্পসৌন্দর্য্য নষ্ট এবং অনেক মূল্যবান্ জিনিষ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সেনানিবাসে পরিণত হওয়াতে, দুর্গের প্রতি যত্ন করিবার লোকও আর বড় কেহ ছিল না। অবশ্য, মাঝে মাঝে কোন কোন বাড়ী-ঘর মেরামত করা হইত বটে, কিন্তু সে বোধ হয় সৈন্যগণের সুবিধার জন্য,—দুর্গের শিল্পশ্রী রক্ষার জন্য নহে।

রূপের দুলাল, প্রেমিক শাজাহান,—পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট্, ভারতের অধীশ্বর শাজাহান বড় সাধে যে স্বর্গের হুরীর মত সুন্দর দুর্গ গঠন করিয়াছিলেন, তাহারই যে এমন শোচনীয় অবস্থা, তাহা কল্পনাও করা যায় না। অবশেষে এই ঐতিহাসিক স্মৃতির অতুল নিদর্শনের দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ফলে, বহু অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে বিগতশ্রী দিল্লীর দুর্গ আবার অনেকটা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু যাহা গিয়াছে, তাহা আর আসিবে না। কারণ, সে শাজাহান নাই, সে কুবেরের ভাণ্ডার নাই, সে সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই এবং সর্ব্বোপরি,—সে মনও আর নাই।

তবে, স্থানকালপাত্র হিসাবে যতটা করিতে পারা যায়, আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট তাহা করিয়াছেন। দুর্গ হইতে যে-সকল জিনিষ স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি আবার ফিরাইয়া

আনিয়া গবর্ণমেণ্ট যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। ইংরাজ-আমলে যে-সকল আধুনিক বাড়ী-ঘর নির্ম্মিত হইয়া মোগল শিল্পাদর্শকে বিকৃত এবং তাহার সৌন্দর্য্যকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছিল, সেগুলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে। বাগানগুলিকে আবার যতটাসম্ভব সাজাইয়া, তাহাদের ভিতরে নূতন গাছ রোপণ করা হইয়াছে। ফলে, দিল্লী দুর্গ আবার অনেকটা রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। হয়তবক্স বাগ, জাফর মহল, রঙ্গমহলের সম্মুখস্থ উদ্যান, রঙ্গমঙ্গল, নকরখানা ও দেওয়ান-ই-আমের বর্ত্তমান রূপ কিরূপ, তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এখানে তাহাদের ছবি দিলাম। বলা বাহুল্য, গবর্ণমেণ্টের লুপ্ত-সৌন্দর্য্য-উদ্ধার-চেষ্টার ফলেই ইহাদের বিনষ্টপ্রায় শ্রীছাঁদ আবার সংস্কৃত হইয়াছে।

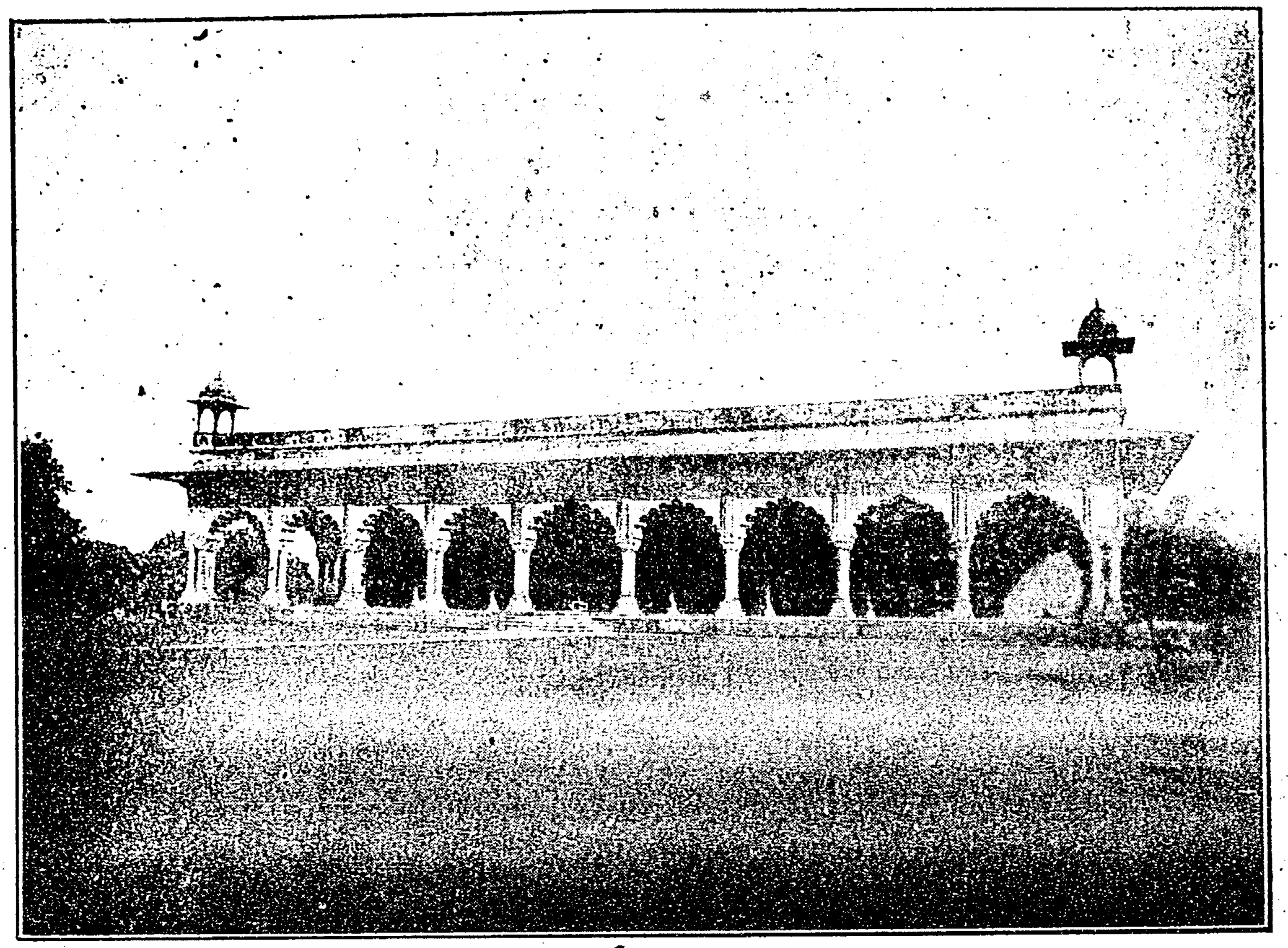

দেওয়ান-ই-আম

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

সঙ্কলন

বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় উক্ত সভার সুযোগ্য সম্পাদক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ফ্লিট্ প্রাচীন ভারতের ঘটিকা-যন্ত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ইহার সাধারণ নাম জলযন্ত্র। বরাহমিহির, বৃহৎ সংহিতায় ইহা অম্বুযন্ত্র নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সূর্য্য-সিদ্ধান্তে ইহা তোয়যন্ত্র বা কপালক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহা ঘটী বা ঘটিকা-যন্ত্র নামে খ্যাত। বাঙ্গালা দেশে ইহার নাম ছিল 'তাঁবী'। এখনও অনেক প্রাচীন বংশে দুর্গোৎসবের সময়ে 'তাঁবী' বা ঘটিকা-যন্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মহাষ্টমীর দিন সন্ধি-পূজার সময় নির্ণয়ের জন্য 'তাঁবী' বা ঘটিকা-যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটি ছিদ্রযুক্ত তাম্র-কুণ্ড বা তাম্র-ঘট জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এইটি পাত্র-ঠিক এক দণ্ডে জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যায়। ৩৷৹ মাসা ওজনের সোণা হইতে চারি আঙ্গুল দীর্ঘ তার তৈয়ারি করিলে যে পরিমাণ মোটা হয়, তদনুসারে পাত্রের নিম্নে ছিদ্র করিতে হয় এবং দশ পল ওজনের তাম্রের দ্বারা অর্দ্ধ হস্ত প্রস্থ পাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর জ্যোতিষ-শাস্ত্রকার লল্ল এই সকল মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে এবং জ্যোতিষ-বেদাঙ্গে ঘটিকা-যন্ত্রের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় পণ্ডিত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, ৺মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী এবং লালা ছোটেলাল, জ্যোতিষ-বেদাঙ্গ হইতে ঘটিকা-যন্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। ডাঃ ফ্লিট বলেন যে, তাম্র-পাত্র হইতে তিনকুটপ কম এক দ্রোণ জল বাহির হইতে যে সময় লাগে, তাহাই এক দণ্ড এবং জল বাহির করিয়া দণ্ড মাপা হইত, জল ভরিয়া নহে। বাঙ্গালা দেশে কিন্তু জল ভরিয়াই দণ্ড মাপা হইত। জ্যোতিষবেদাঙ্গে কিন্তু ঘটিকাযন্ত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ নাই। 'দিব্যাবদান' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের ত্রয়স্ত্রিংশৎ অধ্যায়ে ঘটিকাযন্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। দিব্যাবদানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘটিকাযন্ত্রে এক দ্রোণ জল ধরিত। ডাঃ ফ্লিট্ গণনা করিয়া দখাইয়াছেন যে, $১০\frac{১}{৪০}$ পাইণ্ট জল ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহারকালে পাত্রে দেওয়া হইত। সৌরাষ্ট্রে ২৪৭ শকাব্দে (৫৬৬।৬৭ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত একটি মৃন্ময় ঘটিকাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা বল্লভীরাজা গুহসেনের প্রাসাদে সময়-নিরূপণের জন্য ব্যবহৃত হইত।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যুৎ

(১)

যেদিন বিধাতা তাঁর লীলানিকেতন, রম্যভবন এই পৃথিবীতে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, সেদিন তিনি নারীজীবন-যাত্রার সর্ব্বপ্রধান পাথেয়—অপরূপ বিশ্ববিমোহন রূপ আমাকে দিয়াছিলেন। দরিদ্র পিতামাতার আলোক-বাতাস-বিহীন ক্ষুদ্র সূতিকা গৃহের ক্ষীণ দীপালোক সহসা উজ্জ্বল করিয়া মর্ত্ত্যের বাতাসের সহিত আমার প্রথম নিঃশ্বাস মিলিত হইয়াছিল। শঙ্খধ্বনি করিয়া যখন আমার আগমন-বার্ত্তা দরিদ্রগৃহের চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল, তখন আমার স্নেহময়ী জননীর আননে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরশ্মি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমার শিশুহৃদয়ের উপর নিত্য অমলিন কনকোজ্জ্বল আলোক-জ্যোতি ঢালিয়া দিয়াছিল। শৈশব অনুভূতির মধ্য দিয়া সে জ্যোতি আমার ভবিষ্যৎ-জীবনে পরিপূর্ণ অবয়ব ধারণ করিয়া, নিত্য-সহচরীর মত আমার সুখে, দুঃখে, আনন্দে, অবসাদে, বিরহে, মিলনে সঙ্গে সঙ্গে আজিও ফিরিতেছে। কন্যার জন্মে শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া অনেকে মনে মনে হাসিয়াছিলেন।

ছয় দিনের দিন 'বিধাতা' পুরুষ সকলের অলক্ষ্যে আমার ভাগে যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহার কতকটা জানিতে পারিলেও অবশিষ্টটুকু জানিবার আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহ মনের মধ্যে কেবল ব্যর্থতার বোঝা-ই বহিয়া আনিয়াছে। আমার পাথেয়, আমার রূপ আজ্য বিধাতার গৌরবকে খর্ব্ব করিয়া আমার যাত্রাকে অর্দ্ধপথে প্রতিহত করিয়াছে। তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল বারিধিবক্ষে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের ব্যর্থ আশা ও উদ্যমের ন্যায় আমারও জীবনযাত্রার সকল আশা, সকল আয়োজন নিষ্ফলতায় পরিণত হইয়াছে।

এক ভা'য়ের কোলে আমি জন্মিয়াছিলাম, সুতরাং পিতামাতার আদর আমার উপর যথেষ্টই ছিল। গ্রামের বয়োবৃদ্ধাগণ আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া বলিতেন যে, আমি রাজরাণী হইব। এত রূপ কি আর কোথাও শোভা পাইবে? 'রাজরাণী' হইব শুনিয়া আমার কিশোর হৃদয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিত। আমি ছুটিয়া দর্পণের কাছে গিয়া আমার নিজের মুখ বারংবার দেখিতাম। আমার নাক সুন্দর, কি চোখ সুন্দর কিংবা আমার মুখখানি চাঁদের মতন, এমন কথাও ভাবিতাম। আমি যে সুন্দরী—শুধু সুন্দরী কেন, খুব সুন্দরী, সচরাচর এমন সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না, হাজারে একটা মিলে কিনা, এমন তর্ক প্রায়ই প্রতিবেশিনীগণের মধ্যে বিপুল আগ্রহে বাড়িয়া উঠিত। কখনও কখনও তাঁহাদের বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে তাঁহারা আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেন। কেহ আমার মস্তকের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশকলাপ দেখাইতেন, কেহ আমার আকর্ণবিস্তৃত কুরঙ্গ-নয়নের কালো তারাটীর কথা বলিয়া কতই আস্ফালন করিতেন, কেহ আমার তিলফুলের মত নাসিকা দেখাইয়া এমনভাবে, তাঁর নাক নাড়িতেন, যে প্রতিপক্ষ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেন। কেহবা আমার মুক্তার মত শুভ্র দশন-পংক্তি দেখাইয়া এমনভাবে অন্যের প্রতি দশন প্রদর্শন করিতেন যে, প্রতিবাদিপক্ষ তদ্দণ্ডেই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। এই সকল ব্যাপারে ক্রমেই আমি বড় লজ্জা পাইতাম। বয়স হইলে একথা ভাবিয়াছি; তখন বোধ হয় এমন করিয়া ভাবিতে পারিতাম না,—পারিলে, কখনই যাইতাম না।

আমি গরীবের ঘরের মেয়ে, কিন্তু জানি না, আমার মধ্যে কখন্ কে আমার অজ্ঞাতে আত্মসম্মানের বীজ বপন করিয়া দিয়াছিল! আমি বড় কাহারও অন্যায় কথা কোন দিন সহ্য করিতে পারিতাম না। বাল্যকাল হইতেই সামান্য অপরাধ আমার নিকট অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে হইত। কাহারও কোন কথা, সহজে হজম করিয়া লওয়া আমার অভ্যাসের বাহিরে ছিল। মা বলিতেন যে, এরূপ স্পষ্টবাদী হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ের কারণ। আমি বলিতাম, "মা, অন্যায় করিবে, আবার সত্যকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহার উপর তাহার কৃতকর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করিতে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বড়াই করিবে, এতটা অন্যায় সহ্য করা আমার মনে হয় গুরুতর মহাপাতক। যা' সত্য, যা' ন্যায়, তাহার পক্ষসমর্থন করার জন্য যদি সকলে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তা'তে আমাদের কি ক্ষতি হবে? মানুষের গড়া রীতি-নীতির ভিতর দিয়ে চলতে, না হয় আমরা দিনকতকের জন্য হটে যেতে পারি, কিন্তু সত্য ও সুন্দরের ভিতর দিয়ে আমরা যে বিশ্বজয়ের শক্তি লাভকরব, তা'কে হটাতে পারে, এমন কেহ ত্রিভুবনে নাই।" মা বলতেন, "তোমার কথা সত্য, কিন্তু আমরা দরিদ্র, সকলের কথাই মাথা পেতে নেওয়াই দরিদ্রের ধর্ম্ম। বিবাদ ক'রে বাঁচার শক্তি আমাদের কোথায় মা? দরিদ্রের গুণ অনেক সময় তার অপরাধ হইয়া উঠে। দরিদ্রের কোন গুণই বড় মানুষের চক্ষে মোটেই সহ্য হয় না; সুতরাং সহজেই তাঁহারা বিদ্রূপ ক'রে থাকেন। তাঁ'রা যে সমাজের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের ও গৌরবের উচ্চাসন লাভ করছেন, এটা যেন তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য; সুতরাং সে ক্ষেত্রে তাঁহারা যে কা'রও কাছে কৃতজ্ঞ, তা মোটেই ভাবেন না। এই না ভাবার ফলেই তাঁহাদের চক্ষে অপরের দৈন্য এবং অভাব সহস্র অন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" মায়ের কথার উত্তরে কতদিন বলিয়াছি, "এটা মা তোমার ঠিক বলা হ'ল না, বড়মানুষে যা করবেন, গরীব চিরদিনই তা মাথা পেতে অম্লানবদনে সহ্য করবে! এ রকম সহ্য করবার জন্য যদি কোন দিন কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সে কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য গরীবই দায়ী হইবে মা! ঐশ্বর্য্য-সম্পদমদ-গর্ব্বে যদি পৃথিবীটা চলে, তবে মানুষের মনুষ্যত্ব ও প্রাণের প্রয়োজন কি ছিল? সেদিন যে একটা পাখী উড়তে উড়তে আমাদের উঠানে ঝট্ করে পড়ে গেল, তুমি রাঁধতে রাঁধতে ছুটে গিয়ে সেটাকে তাড়াতাড়ি তুলে ফেল্লে, আদর ক'রে তা'র মুখে জল দিলে, তা'র মুখে মুখ দিয়া ফুঁ দিলে এবং তা'কে বাঁচাবার জন্যে তুমি কত চেষ্টাই না করতে লাগ্‌লে! তোমার সে চেষ্টা ও যত্ন দেখে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, তা' কি তোমার মনে আছে না? আমার কান্না দেখে তুমিও কেঁদেছিলে মা। সেই বাক্-শক্তিবিহীন মরণাপন্ন পক্ষীটি যখন তার ক্ষুদ্র চোখদুটি নিরুপায়-ভাবে আমাদের মুখের উপর তুলে আমাদের করুণাভিক্ষা করেছিল, তখন কি মনে হয় নি যে, সে যদি বাঁচে তা' হ'লে তা'কে আর কোথাও যেতে দেব না, আমাদের কাছে রেখে দেব। আর আকাশের ঐ বড় বড় দুরন্ত চিলগুলাকে যদি বাগে পাই, তবে আমি কিছুতেই প্রতিশোধ নিতে কুণ্ঠিত হব না। সেই পর্য্যন্ত চিলগুলাকে আমি কিছুতেই মোটে দেখতে পারি না। বড় মানুষদের দেখলেই কেমন একটা আশঙ্কা

আপন হতে মনের মধ্যে তাল পাকিয়ে উঠে। সেই আশঙ্কাটাকে আমি কোন রকমেই মন থেকে তাড়াতে পারি না।" মা বলতেন, "বিদ্যুৎ তুই অতটা কঠিন হস্ নি, তোর সামনে প্রকাণ্ড সংসার-যাত্রার অফুরন্ত পথ পড়ে রয়েছে। অনেক সহ্য কল্লে মা—তবে সংসারে টেঁকতে পারবি।" আমি বলতাম, "মা আমি সংসারে টেঁকতে পারি, আর না পারি, অন্যায় কোনদিনই মাথা পেতে অম্লানবদনে সহ্য করতে পারব না।"

(২)

এখন বড় হইয়াছি। বয়োবৃদ্ধাগণের ভবিষ্যদ্বাণী, মায়ের আশীর্ব্বাদ আজ সফল হইয়াছে। আজ আমার বয়স ২২ বৎসর। ভরা গাঙ্গের উপর শারদ প্রভাতের রৌদ্র পড়িলে কাঁচাসোণার মত সে যেমন ঝলমল করিতে থাকে, আজ আমার যৌবন-জোয়ারের উপর যে রূপের লাবণ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আমার সর্ব্বশরীর যেন টলমল করিতেছে। আজ আমি সত্যসত্যই রাজার ঘরের রাণী। আজ আমার জীবনযাত্রার পাথেয়, বিধাতার অপূর্ব্ব দান 'রূপ'—সে আমার মনের সঙ্গে মিল না রাখিয়া, আমার প্রাণের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, রাজার ঘরের ঐশ্বর্য্যের দাসী সাজিয়া বেশ আনন্দে গৌরবের আসন পাতিয়া বসিয়াছে। ইহাতে তাহার কতখানি গৌরব বাড়িয়াছে, সে কতটুকু সুখী হইয়াছে, সেই বলিতে পারে। তবে আমি ভাবি যে কেমন করে আমার সেই বাল্যজীবনে আমার মায়ের সঙ্গে অমন সব কঠিন কথা নিয়ে তর্ক কর্‌তে পারতাম, সে কথাগুলি ভাব্‌তে, আজ আমি বিশ্বসংসার শূন্য দেখ্‌চি। দারিদ্রের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের যে সম্বন্ধ, দরিদ্রের কন্যার রাজরাণী হওয়ার সঙ্গে, রাজার সেই সম্বন্ধ, এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

যে দিন আমার রূপের গৌরব জয়ডঙ্কা বাজাইয়া রাজার দরবারে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহার কিছুদিন পরেই আষাঢ়ের এক মেঘলাদিনে রাজা তাঁহার ঐশ্বর্য্য, লোক-লস্কর হাতী-ঘোড়া, পাল্কী লইয়া আমাদের ভাঙ্গা কুটীরের দ্বারে মহাসমারোহে আমার রূপের পূজা করতে আমার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। পিতা যে মনে মনে আমার রূপের গৌরবে বিশেষভাবে গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম। রাজা আমাকে দেখিলেন—বুঝি ভাল করিয়াই দেখিলেন। তিনি আমার রূপ দেখিলেন এবং সেই রূপের মাদকতায় তিনি মুগ্ধ হইলেন। রূপের পাহারার অন্তরালে আমার যে একটা প্রাণ আছে কি না, আমি মূক কি বধির তাহার কোন সন্ধান লইলেন না। ইঁহারা রূপের উপাসক—ইঁহারা মানুষের প্রাণের বা মনের কোন সন্ধান রাখিতে চান না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এমন একটা ধারণা তৎক্ষণাৎ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। আমি মুখ তুলিয়া তাঁহার চোখের দিকে চাহিলাম। আমার দেহলাবণ্য দেখিয়া তাঁহার চোখ শুধুই কি রূপের নেশায় ভরিয়া গিয়াছে? না চোখের মধ্য দিয়া তাহার অন্তরের মর্ম্মবাণীর সন্ধান পাওয়া যায়? কিন্তু সে চোখে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে সেরূপ কোন আভাষই ছিল না। আমি কিছুমাত্র লজ্জা করি নাই। খুব স্পষ্টভাবে তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়াছিলাম, তিনি তখন আমার রূপমাধুর্য্য নয়ন ভরিয়া পান করিতেছিলেন। আমার এই চাহনিতে তিনি যেন আরও সুখী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বাহির হইতে আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিল না। তিনি আমার হাতে কতকগুলা মোহর ও আমার কণ্ঠে একটি মুক্তার মালা দিয়া আমাকে দেখিয়া গেলেন। উঃ—সে স্বর্ণমুদ্রার কি উত্তাপ!—সে মুক্তার মালার কি বিষজ্বালা! এতদিন ধরিয়া যে কুমারীব্রত করিয়া শিব-পূজা করিলাম, ওগো বরদাতা, বিশ্বপিতা, আজ একি করিলে! তুমি ত আমার অন্তর জান, তবে কেন আমার প্রাণের বিনিময় না করিয়া রূপের বিনিময় করিতে বসিলে? বাবা, মা কন্যার এই অভাবনীয় সুখ-সম্পদ লাভ মনে করিয়া একরূপ পাগল হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না। আমি যে তাঁহাদের সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছিলাম, তাঁহারা ভাবিলেন, আমি স্বর্গের দেবী শাপগ্রস্ত হইয়া তাঁহাদের মত দরিদ্রের ঘরে আসিয়াছি এবং আমার জন্ম তাঁহাদের দুঃখ-মোচনের জন্যই! তাঁহারাও আজ ফিরিয়া আমার মনের মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন। আমার মনে তখন কতখানি ব্যথা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারও সন্ধান তাঁহারা রাখিলেন না। কেবল আমি রাজরাণী হইতে চলিয়াছি, এই গৌরব তাঁহাদিগকে সর্ব্বদিক্ হইতে অধীর করিয়া তুলিল। তাঁহাদের এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া আমি আমার মনের কোন কথাই তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিলাম না; প্রকাশ করিলেও যে কোনরূপ ফলোদয় হইবে, এমন কোন আশ্বাসেরও আভাষ দেখিলাম না।

জোয়ারের জলের মত অল্পদিনের মধ্যেই আমার স্বামীর রূপের নেশা কাটিয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'আজ আমি রাজরাণী,'—সত্যসত্যই আমার স্বামী রাজা; তিনি আমায় বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, সুতরাং, আমি রাজরাণী নয় ত কে রাজরাণী? আমি আজ রাজরাণী না হইয়া যদি কোন দরিদ্রের হৃদয়রাণী হইতে পারিতাম, তাহা হইলে যে কত সুখী হইতাম, তাহা মুখ ফুটিয়া বলা নারীর পক্ষে অসম্ভব। দাস, দাসী, গাড়ী ঘোড়া, হাতী, পাল্কী, অলঙ্কার ও ঐশ্বর্য্য—কিছুরই আমার অভাব নাই। এই সকল যদি নারীর জীবনধারণ পক্ষে যথেষ্ট এমন ভাবিতে হয়, তাহার সহিত যদি দিনান্তে একবারও সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলেও হৃদয়-দেবতাকে দূর হইতে পূজা করিবার অবসর পাইয়া আমার নারীজন্ম সার্থক করিতাম। আমরা যে কেবল রূপের দাবী বা যৌবনের সম্বন্ধ লইয়া তাঁহাদের প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিব এত, বড় একটা লজ্জা ও অপমানের কথা ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। কিন্তু আমার মর্ম্মবাণী যদি অকপট হৃদয়ে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে হয়, তবে সত্যের মুখ চাহিয়া, সমাজের খাতির না রাখিয়াই বলিব। আমাদের সেই রাং-চিত্রার বেড়া-দেওয়া কুটীরখানির মধ্যে আমরা সুখ ও শান্তি রাখিয়া আসিয়াছি। সেই সন্ধ্যার সময় সঙ্গিনীদের সঙ্গে কলসীকক্ষে পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে যাওয়ার মধ্যে কতখানি উৎসাহ ও আনন্দের সাক্ষাৎ পাইতাম, তরুচ্ছায়া-সমন্বিত আলোক-আঁধার-মিশ্রিত সেই পল্লীগ্রামের অপরিসর পথটীর মধ্য দিয়া যাতায়াত, দীপ্তনীল গগনে রক্তিম রবিচ্ছটার অপূর্ব্ব সুষমা অবলোকন করিয়া নয়ন-মন একসঙ্গে অভিভূত হইয়া যাওয়া! তাহাদের ত্যাগ করিয়া এই উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে অচঞ্চল শৈবালের মত স্থির হইয়া পড়িয়া থাকা কি কষ্টকর, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের বাড়ীতে আসা কাহারও বারণ ছিল না, সকলে নির্ব্বিবাদে আসিত। আপনার জনের মত কত কথাই বলিত, কত গল্পই করিত, কত কৌতুক রসালাপের অনাবিল আনন্দো-

চ্ছ্বাসের মধ্যে আমাদের দীর্ঘ দিনগুলি স্বল্পায়ু হইয়া চলিয়া যাইত, তাহারা কি আর ফিরিয়া আসিবে না? আর এখানে, কবে সেই বিবাহের পর আসিয়াছি, আর ত আমাদের বাড়ী যাইবার অনুমতি পাই নাই। যাঁহার নিকট অনুমতি-ভিক্ষা করিতে হইবে, তিনি রাজা,—তিনি আমার স্বামী, তিনি রূপের পূজা করেন। রূপের পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তিনি ত কাহারও প্রাণের কথা শোনেন না। ইহা ছাড়া আমি ত কোন-দিন তাঁহার নিকট অনুমতি-ভিক্ষা করিবার জন্য নিজের আত্ম-মর্য্যাদা বলিদান দিতে পারিব না। আমি কয়েদীর মত এখানে আছি—কয়েদীর মতই আমার ব্যর্থজীবন বিসর্জ্জন দিব। দাসদাসীরা মাঝে মাঝে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করে। বলে, বাবা আসিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার জামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই; সুতরাং তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি চাহিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র আমার সমস্ত দেহ-মন যেন একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া যায়। আমি নিরুপায়! সুতরাং অত্যন্ত কঠিন হইয়া জনকের এই অনুমতি-ভিক্ষায় লজ্জায় মরমে মরিয়া গিয়া তাঁহাকে দেখা করিতে নিষেধ করি এবং দেখা করিবার অনুমতি দিই না। কারণ, এই কর্ত্তৃত্বটুকুর মধ্যে স্বতঃই একটা অপমানের আবছায়া আমার মনের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। তিনি বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া যান, আমি রাজপ্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের মন্থর গতিতে গমন অনিমেষনয়নে যতই দেখি, অঞ্চলে ততই নয়নাশ্রু মুছিতে থাকি। ওগো! তোমরা আমাকে বলিয়া দাও, এইরূপ অধীনতার নামই যদি নারীজীবনের সার্থকতা হয়, তবে এই দণ্ডেই, ওগো বিশ্বনিয়ন্তা! তোমার যাত্রীর যাত্রা নিরুদ্ধ করিয়া দাও!

(৩)

আর একদিনের কথা বলি,—সেদিন তিনি আসিলেন, আমি তাঁহার জন্য খাবার লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"তুমি এখনও শোও নাই?" আমি বলিলাম—"তোমার খাওয়া হয় নাই, আমি কেমন করিয়া শুইতে পারি? আমি তোমার জন্য যে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।" সেদিন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া আমার নারীহৃদয়ের আত্মমর্য্যাদা বলি দিয়া যদি তাঁহার করুণালাভ করিতে পারি—যদি তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে পারি, যদি আমার মর্ম্মব্যথাটা জানাইয়া তাঁহার মর্ম্মের দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারি, সেইজন্যই সেদিন অমন করিয়া বসিয়াছিলাম। কিন্তু, তিনি কি উত্তর দিয়াছিলেন শুনিবে? না, না, আমি বলিতে পারিব না, বলিতেও আমার অপমানে মাথা কাটা যায়। দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়াই কি এত ঘৃণা! এত হেয়, এত দূরে প'ড়ে বেঁচে থাকার মত সামগ্রী! এত অবহেলা! তিনি বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া অত্যন্ত অমনোযোগের সহিত বলিয়াছিলেন, বাঃ বাঃ বেশ কথাবার্ত্তা শিখেছ ত দেখচি! আমার জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছ? এ আবার কবে থেকে হল? আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল, আমি আর কোন কথার উত্তর দিতে পারিলাম না। তিনি আবার বলিলেন, "এতটা সাধ্যসাধনার এক অংশ সে যদি করিত, তা'হলে আজ আমি কত সুখী হইতাম।" আমি নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হইয়া গেলাম; তারপর সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিছুদিন পরে যখন আমার জ্ঞান হইল, দেখিলাম আমি শয্যায় শুইয়া আছি, পার্শ্বে আমার জননী বসিয়া আছেন। আমার দুর্ব্বল হৃদয়ের মধ্যে রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আমি গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম,—আমি রাজপ্রাসাদের মধ্যে তখনও রহিয়াছি। গৃহের আসবাবপত্র যেন তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ করিতে লাগিল। সব চেয়ে জননীকে আমার শয্যার পার্শ্বে দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত মর্ম্মাহত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, তাহা প্রকাশ করিবার মত শক্তি তখন আমার ছিল না। অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলাম "মা, তুমি, এখানে কেন আসিলে? যদি এই দণ্ডে না চলিয়া যাও, তবে আর আমায় দেখিতে পাইবে না।" মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি তাঁহার হাতটী টানিয়া আমার মাথার উপর চাপিয়া ধরিলাম ও অশ্রুবিগলিত নয়নে বলিলাম,—"তুমি যদি তোমার কন্যাকে কোনদিন ভালবাসিয়া থাক, তবে এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে চলিয়া যাও।" মা বুঝি আমার মনের কথা, প্রাণের বেদনা বুঝিতে পারিলেন, আমার মস্তকে হাত বুলাইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। একজন দাসীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজা কোথায় জান?" দাসী উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার কোন আশঙ্কা নাই। তুমি বল রাজা কোথায়?" দাসী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, "আজ একমাস আপনার অসুখ করিয়াছে, রাজা ইতিমধ্যে অন্দরে একবারও অসেন নাই।" আমি বলিলাম, "তিনি কি আমার সংবাদ লইতেন?" দাসী চুপ করিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভাবিলাম, মানুষ জীবনে এমন করিয়া কত ভুলই করিতেছে। এই ভুল কে সংশোধন করিবে? ওগো বলিয়া দাও, এই ভুল কে সংশোধন করিবে? তারপর বিদ্যুৎ পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িল, আমরা জানি কয়েকদিন বিদ্যুতের ভাল করিয়া সংজ্ঞা হইল না। সে অজ্ঞান অবস্থায় কত কথা বলিল। কিন্তু দাসদাসীগণ সে সকল অসংলগ্ন কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিল না, হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকের মধ্যে অকস্মাৎ ঝড়ের মত রাজা বিদ্যুতের কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাহারা বিদ্যুতের পরি-চর্য্যা করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা কক্ষত্যাগ করিয়া বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। রাজার সহসা আগমনে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া গেল। রাজা বিদ্যুতের কঙ্কালসার দেহ ও রক্তহীন বিশীর্ণ নিষ্প্রভ মুখের দিকেচ চাহিবামাত্র তাঁহার বুকের মধ্যে একটা ঝড় তুমুল বেগে বহিয়া গেল। তিনি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিলেন, "বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ!"

বিদ্যুৎ অচৈতন্য অবস্থায় উত্তর দিলেন "কেন? ওগো, কে তুমি আমায় ডাক? রাজা! স্বামী!" তারপর অত্যন্ত করুণকণ্ঠে বলিলেন, "রাজা ভুল করিও না—বিদ্যুৎ অনেক দিন মরিয়াছে।"

রাজা নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার রুগ্নশয্যার উপর উপবেশন করিলেন। কিন্তু সেদিন সত্যসত্যই বিদ্যুতের পুনরায় আর জ্ঞান হইল না। মেঘ কাটিয়া গেল সত্য, কিন্তু, হায়! বিদ্যুৎ আর চম্‌কাইল না!

শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। সংপ্রতি তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা ভাষান্তরিত করিয়াছেন। তাঁহার এই ইংরেজী অনুবাদের নাম, "Chaitanya's Pilgrimages and Teachings।" ইহাতে শ্রীচৈতন্যের ভারতের নানা তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী, তাঁহার ঈশ্বরজ্ঞান, তাঁহার নীতি-প্রণালী এবং তাঁহার জীবনকথামূলক নানা কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার সেই বিশ্বাস, ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবনে গত চারি শতাব্দ ধরিয়া অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। যদুনাথবাবু, তাঁহার ইংরেজী অনুবাদ-গ্রন্থে একটি ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যদিও যদুনাথবাবুর অনুবাদে ও ভূমিকায় কতকগুলি বিশেষ ভুল আছে, তথাপি ইংরেজিতে যাঁহারা বৈষ্ণব-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে চান, তাঁহারা তাঁহার ভূমিকা ও অনুবাদ পাঠ করিয়া যথেষ্ট উপকার-লাভ করিবেন। যদুনাথবাবু চৈতন্য-চরিতামৃতের অবশিষ্টাংশ অনুবাদ করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

—০—

যদুনাথবাবুর "ইংরেজাধিকৃত ভারতের অর্থবিজ্ঞান" (Economics of British India) নামক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণে পুস্তকখানির বহুলাংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এই তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভারতের আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যায়। যদুনাথবাবুর লেখার আসল গুণ এই যে, তাহাতে যুক্তিতর্কের অভাব এবং পক্ষপাতিতার প্রভাব নাই। দরকার হইলে, তিনি সরল ও নির্ভীকভাবে আপনার মনের কথা দেশের লোকের সাম্‌নে খুলিয়া বলিতে পারেন। ভারতীয় কথা লইয়া যাঁহারা নাড়া-চাড়া করেন, এই বইখানি তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

—০—

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের "The Fundamental Unity of India" নামক নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা পড়িয়া ইহাই মনে হয় যে, তিনি হিন্দুত্বের একতা লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন।

—০—

শ্রীযুক্ত এইচ, হারগ্রীভস্ "পাথরে খোদিত বুদ্ধের কথা-চিত্র" (The Buddha-story in stone) নামে একখানি ছোট বই লিখিয়াছেন। লাহোরের যাদুঘরে ভারত-ভাস্কর্য্যের গান্ধার-পদ্ধতি-মূলক যে চৌত্রিশখানা প্রস্তর-পট আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-চিত্র খোদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হারগ্রীভস্, লাহোরের সেণ্ট্রাল মিউজীয়মে উক্ত খোদন-চিত্রগুলি লইয়া যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। খোদন-চিত্রগুলির সমস্তই যে প্রথম শ্রেণীর পাকা ওস্তাদ কারিগরের হাতের কাজ, তাহা নয়; তাহাদের ভিতরে ভাল-মন্দ-মাঝারি সকল শ্রেণীর শিল্পীরই হস্তচিহ্ন আছে। কিন্তু শিল্পীরা অবলম্বিত বিষয়গুলি ছবিতে বেশ ভাল করিয়াই ফুটাইতে পারিয়াছে। পরন্তু, সেকালকার বৌদ্ধসমাজ বই না পড়িয়া ছবি দেখিয়াই ধর্ম্মশিক্ষা-লাভ করিবার জন্য অধিক উৎসুক ছিল,—এই খোদন-চিত্রগুলির আসল সার্থকতাই এইখানে। শ্রীযুক্ত হারগ্রীভ্‌সের পুস্তক বিশেষজ্ঞগণকে যে উপকৃত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

—০—

এবার সাহিত্য-পরিষদে অনেকগুলি প্রাচীন দেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে বীরভূম হইতে সংগৃহীত দুইটি বরাহ-অবতারের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে দেবগ্রাম-বিক্রমপুর লইয়া সেন-রাজধানী বিক্রমপুরের বিবাদ চলিতেছে, সেই দেবগ্রাম-বিক্রমপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি, মাহেশ্বরী-মূর্ত্তি প্রভৃতি সাহিত্য-পরিষদের মূর্ত্তি-ভাণ্ডারে আসিয়াছে। উৎকটিকাসনে অবস্থিতা, জীর্ণা-শীর্ণা কঙ্কালা-বশিষ্টদেহা, কৌপীনধারিণী, স্মেরাননা, শুষ্কোদরী যে অজ্ঞাত দেবীমূর্ত্তিটি ভাস্কর্য্য-কলায় অদ্ভুত কীর্ত্তি বলিয়া বহু দেশী ও বিদেশী শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসালাভ করিয়াছে, অট্টহাস গ্রামে প্রাপ্ত সেই দেবীমূর্ত্তি সাহিত্য-পরিষদের মূর্ত্তিভাণ্ডারে স্থান পাইয়াছে। এইটি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের শিল্প-ভাণ্ডারে ৫টি অপূর্ব্বমূর্ত্তি সঞ্চিত হইল। এই পাঁচটির জোড়া আর কোথাও নাই।

—০—

এবৎসর সাহিত্য-পরিষদের আরও তিনটি শাখা বাড়িয়াছে। মেদিনীপুরের বঙ্গসাহিত্য-সমাজকে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, মেদিনীপুর-শাখা" করিয়া লওয়া হইয়াছে। মীরাটের বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনকে মীরাট-শাখা এবং মানভূমের বঙ্গসাহিত্য-সমিতিকে মানভূম-শাখা করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই তিনটি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের পনরটি শাখা হইল। এতদ্ভিন্ন পাবনা, কৃষ্ণনগর, কুমিল্লা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে শাখাস্থাপনের কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

—০—

সাহিত্য-পরিষৎ গতবৎসরে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ ছাপিয়াছেন,—তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের পদাবলী, সঙ্গীতরাগ-কল্পদ্রুম ও দুর্গামঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আটশতের অধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে চণ্ডীদাসের এত পদ আর কেহই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' কৃষ্ণানন্দ ব্যাসজীর একখানি অদ্ভুত সংগ্রহ-গ্রন্থ। গ্রন্থখানিতে হিন্দু-সঙ্গীতশাস্ত্রের বহুবিধ বিষয় সঙ্কলিত হইয়াছে এবং বহু ভাষার বহুবিধ গান ইহাতে রাগরাগিণীর উদাহরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। এই গানগুলির মধ্যে বহু লুপ্তপ্রায় গানের সংগ্রহ আছে। এই গ্রন্থখানি প্রায় লোপ পাইয়া গিয়াছিল। লাল-গোলার রাজা বাহাদুর প্রায় ১২০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থখানিকে উদ্ধার করিয়াছেন। "দুর্গামঙ্গল"—ময়মনসিংহের একজন জন্মান্ধ কবির রচনা। তাঁহার নাম ভবানীপ্রসাদ রায়। তিনি শুনিয়া শুনিয়া সংস্কৃত শিখিয়া মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বন করিয়া এই দুর্গামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন।

—০—

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির "বাঙ্গালা শব্দকোষ" ছাপা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার পরিশিষ্ট ও ভূমিকাদি ছাপা হইতেছে। কেবল বাঙ্গালা শব্দের এত বড় অভিধান ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। সাহিত্য-পরিষদের আজন্ম একটা সঙ্কল্প ছিল যে, একখানি প্রকৃত বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলন করিতে হইবে। এই অভিধানখানিতে পরিষদের সেই সঙ্কল্প অনেকটা অগ্রসর হইল। "প্রবাসী" পত্রে মধ্যে মধ্যে এই শব্দকোষের বিস্তৃত আলোচনা থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যানিধি মহাশয়ের চেষ্টাটা নিতান্ত "বেনা-বনে মুক্তা ছড়ান" হইতেছে না। এই অভিধানও সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া বাহির হইতেছে।

—০—

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ২৭এ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

সিদ্ধার্থের প্রতি

হে কুমার,
জয় করি 'মার'
বিশ্বহিত করিবে সাধন ?
এ যে মহাভ্রম !
বিশ্বদেব স্থজিয়াছে যা'রে
বধ করি তা'রে
সাধিবে বিশ্বের হিত ?
এ যে বিপরীত !
জন্ম তা'র জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন সাধিবারে
কার সাধ্য, কে নাশে তাহারে ?
অঙ্গহীন অনঙ্গ সে, ভ্রমে চরাচরে
ত্রস্ত, ব্যস্ত, বিশ্ব তা'র কার্ম্মূক-টঙ্কারে।
প্রভাবে তাহার
নন্দনে আনন্দ ঢালে মন্দারের ভার,
উর্ব্বশীর চটুল নয়ন
মুগ্ধ করে ঊর্দ্ধরেতা তপস্বীর মন,
আনন্দে অঞ্জলি দেয় সে তাহার তপোলব্ধ ধন।

মলয়ের সুদক্ষিণ বায়,
গগনের অফুরন্ত স্নিগ্ধ নীলিমায়
বিহঙ্গের আনন্দ-কাকলি মাঝে
বাসন্তী ঊষায় আর শরতের সাঁঝে
মধুবক্ষ মাধবীর মঞ্জরী-বিতানে,
মধ্যাহ্নে বিরহক্লিষ্ট কপোতীর গানে
যে দিকে যেখানে
ফিরাইবে আঁখি নরপাল
হেরিবে হে অনঙ্গের প্রতাপ বিশাল।

নবোদ্ভিন্ন পল্লবের মর্ম্মরিত গানে,
উচ্ছ্বসিত সিন্ধুবক্ষে পূর্ণিমার বানে,
পুষ্পাসব লুব্ধমত্ত মধুপ-গুঞ্জনে,
হৃদিপদ্ম নিষণ্ণার নূপুর-শিঞ্জনে
যখন যেখানে
ফিরাইবে আঁখি নরপাল
হেরিবে হে অনঙ্গের প্রতাপ বিশাল।

হে রাজতনয়,
এ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যর্থ কিছু নয়,
এ বিশ্ব-স্থজন
মিথ্যা নহে, নহে কদাচন।
এই যে অপার
হৃদিস্থিত প্রণয় দুর্ব্বার,
এই মায়া বুকভরা স্নেহ,
এ সুন্দর দেহ,
বিরহের নিবিড় বেদন,
অবিচ্ছেদ মিলনের লাগি' প্রাণপণ,
করোনা করোনা এরে হেলা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি এরে নিয়া করে নাই খেলা।
কত লক্ষ জন
আজীবন
করি প্রাণপণ,
রেখেছে সঞ্চিত প্রেম, প্রিয়-পদে করিতে অর্পণ,
সে মুগ্ধ প্রণয়,
নয় নয় কভু ব্যর্থ নয়,
পরিণাম তা'র
নহে শুধু নয়ন-আসার,
মিলনের মাঝে তা'রে দিতে হবে আনন্দ অপার।

যে প্রেম সঞ্চিত করি',
বুকে ধরি',
ধ্যানরত আছে সারাবেলা,
ভেবনা, ভেবনা তা'রে খেলা।
যে আনন্দ লাগি'
নির্নিমেষ বসুন্ধরা রহিয়াছে জাগি'
সে অমূল্য ধন,
সুখভরা আনন্দের মৃত-সঞ্জীবন,
তোমারে যে দিতে নিতে হবে,
আত্মনির্ব্বাসিত হ'য়ে অরণ্যে বসিয়া কেন রবে?
জীবনের আন সার্থকতা,
অসাড় ও-হৃদয়ের চির-দুর্ব্বলতা
কর পরিহার
হে রাজকুমার,
তোমারে চাহিয়া যে গো আছে চিরদিন,
অখণ্ড মিলনে তা'র বিরহেরে করহ বিলীন।
আন আগে আপনার মনে
যে আনন্দ দিতে চাও বিশ্বের সকল দুঃখীজনে।
বরষার বারিভরা নদী
দুই কূল শস্যপূর্ণ করে নিরবধি।
আত্মনির্যাতনে আর বিরহ-বেদনে,
অবিরাম নিরাশায়, সজল নয়নে,
আনন্দ বিপণিক্ষেত্রে নাহি অধিকার
হে রাজকুমার!

প্রকৃতি আপন করে ধরি'
তুলিয়া দিতেছে দেখ পানপাত্র সুধারসে ভরি,
করোনা করোনা তারে হেলা,
হৃদয়-সঞ্জাত স্নেহ নহে কভু বিধাতার খেলা;
প্রথম প্রভাতে
সস্নেহ শিশির-পাতে
বিকসিত কুসুমের বুকের গোপন গন্ধ দিয়া,
অমার আঁধার নাশি পূর্ণিমার আলোক আনিয়া,
একত্রে বন্ধন করি' সম্মোহিত দু'জনার হিয়া।
মানবের আনন্দ-কারণ
নিরলস প্রকৃতির চলিতেছে শত আয়োজন
সে আনন্দ সুদূরে সরা'য়ে
আপনি পরিয়া আর প্রিয়জনে গৈরিক পরায়ে
কি ফল লভিবে হে কুমার?
"মায়া মোহ" যাই বল মিথ্যা কভু নহে এ সংসার।
আছে হেথা মরুর তিয়াষ,
আশার লতায় হেথা মঞ্জরীর অপূর্ণ বিকাশ,
সর্ব্বনাশা স্বার্থ আসি রুদ্ধ করে দুর্ব্বলের শ্বাস,
তবুও কুমার
মিথ্যা নয় বিচিত্র সংসার;
মিথ্যা নয় হৃদয়ের কাণে কাণে কথা
মিথ্যা নয় বিরহের সুখময় ব্যথা,
খণ্ডিত সে ক্ষণিকের বড় প্রাণপণ,
অপূর্ব্ব পুলকভরা, চকিত দর্শন,
মিথ্যা নহে, হে রাজকুমার,
দুই প্রাণে গ্রন্থি বাঁধা মিথ্যা নহে বিশ্ব-বিধাতার।

নিয়েছ যে স্নেহ-ঋণ
শোধিতে হইবে তাহা আয়ুর প্রত্যেক নিশিদিন;
একান্ত আশ্রিতজনে,
অনন্যশরণে,
যে তোমারি মুখ চেয়ে আছে
চরণের স্নেহাশ্রয় বিনা সে কি বাঁচে?
নিশি দিন,
অশ্রুভারে দৃষ্টি যার ক্ষীণ,
অনাদৃত সে স্নেহ-সম্ভার
বক্ষে তুলে লও হে কুমার!
একান্ত:শরণ যে গো মাগি',
বর্ষ বর্ষ যোড়করে রহিয়াছে জাগি',
করোনা করোনা তা'রে হেলা,
এ যে তা'র জীবন-মরণ, নহে খেলা।
'স্বার্থে'র হেরিয়া রক্ত আঁখি,
ক্ষুধিত রেখনা তব স্নেহ-পিঞ্জরের পোষা পাখি,
বাহুর বেষ্টনে তারে নিও
যে তোমার প্রাণাধিক প্রিয়,
সার্থক প্রেমের বলে আনন্দ আসিবে প্রাণে নেমে
মিথ্যা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যত, নিরানন্দ, সব যাবে থেমে।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

অপরাধ ও শাস্তি

মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসের কোন্ স্তর হইতে অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি আবির্ভূত হইল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। খুব সম্ভব, সভ্যতার আদিযুগ হইতেই মানুষ অপরাধ করিয়া আসিতেছে এবং সেই অপরাধের শাস্তিবিধান করিবার জন্য অতি পুরাকাল হইতেই বিবিধ বিধি উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে। ইডেনের উদ্যানে, নিষিদ্ধ ফল-ভক্ষণের পূর্ব্বে, যখন অপাপবিদ্ধ আদিমানব নির্ম্মোহকরী নারীর সঙ্গে সূর্য্যালোক-ঝলকিত প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিয়া খেলিয়া বিচরণ করিতেছিল, তখন সভ্যতার সূত্রপাত হয় নাই। মানবীয় শৈশবের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় সেই একবারমাত্র মানবজাতিকে অপরাধনির্ম্মুক্ত শুচিস্মিত অবস্থায় দেখিতে পাই। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই বোধ হয়, এই স্বচ্ছ, শুভ্র, অকলঙ্ক পবিত্রতা বিদায়গ্রহণ করিয়াছে। সভ্যতার সঙ্গে অপরাধের কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা বলিতে পারি না। তবে, জ্ঞানোন্মেষের সহিত ন্যায়ান্যায় বিচার-শক্তির সম্পর্ক থাকায়, আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝিতে পারি যে, কোনও কালেই সভ্য মানব দোষ-সম্পর্কশূন্য ছিল না।

অপরাধ করিবার সম্ভাবনা হইতে মানুষ কেবল সেই সময়েই বিচ্যুত হয়, যে সময়ে তাহার জ্ঞানজ্যোতিঃ উন্মেষিত হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও তাহা ক্ষণিক বা চিরান্ধকারে অস্তমিত হইয়াছে। অজ্ঞ শিশু ভাল মন্দ বুঝে না, সে আবার অপরাধ করিবে কি? কাজেই পিতামাতা-পরিজনের হাস্যোচ্ছল অবহেলায় অথবা স্নেহের শত চুম্বনে দুর্বৃত্ত শিশুর অপরাধের দণ্ড-বিধান হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি শৈশবের সীমা অতিক্রম করিয়াও অপরাধ করিবার সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত, সে নিশ্চয়ই কোন না কোন গতিকে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে।

উন্মাদগ্রস্ত মাদক-সেবনে হৃতচৈতন্য এবং কখনও কখনও ক্রোধাদি বশে হতজ্ঞান ব্যক্তিকে হিতাহিত জ্ঞানের অনধিকারী বলিয়া ধরা হয়। এরূপ ব্যক্তি দণ্ডযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয় না। সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, অপরাধের সম্ভাবনার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ রহিয়াছে। জ্ঞান থাকিলে হিতাহিত বিবেক থাকিবে এবং হিতাহিত-বিচারের সদ্ভাব থাকিলেই অপরাধ-ক্ষমতা থাকিবে। ইহার দ্বারা অবশ্য এরূপ প্রতিপন্ন করা আমার অভিপ্রেত নহে যে, জ্ঞানীমাত্রেই অপরাধী। অপরাধের সম্ভাবনা এবং অপরাধ এক বস্তু নহে। অতি সাধু, বিশুদ্ধস্বভাব, চিত্তবিকারশূন্য যোগীরও অপরাধ করিবার শক্তি আছে; যদিও সেজন্য তাঁহাকে যে অপরাধ করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ইংরেজিতে সেইজন্য একটি কথা চলিয়া আসিতেছে, "Potentially even a saint is a sinner." যাহা হউক, তর্কের রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবজগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, saint-এর সংখ্যা বড় বেশী নহে। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, চিন্তা ও কার্য্যে কদাচ স্খলিত নহে, এরূপ লোক মিলে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনু দণ্ডের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"সর্ব্বোদণ্ডজিতো লোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।···৭ম অধ্যায়

টীকাকার আরও বিশদ করিয়া বলিতেছেন ঃ—

"সর্ব্বোহয়ং লোকঃ দণ্ডেনৈব নিয়মিতঃ সন্মার্গেঽবতিষ্ঠতে স্বভাববিশুদ্ধোহি মানুষঃ কষ্টেন লভ্যতে"।

বস্তুতঃ, স্বভাববিশুদ্ধ লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। দণ্ডের ভয়ে লোক অপমার্গ হইতে নিরত হয়। সেইজন্য জগতের সমস্ত শাসন-নীতির মধ্যে দণ্ড-নীতির স্থান উচ্চে। অনেক স্থলে রাজকীয় শাসন-নীতি পৌঁছিতে পারে না। মানুষের সমস্ত অপরাধই যে রাজকীয় দণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, তাহা নহে। একদিকে রাজকীয় শাসন-নীতি-বিগর্হিত কর্ম্মমাত্রই যেমন অপরাধ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে, তেমনই আবার রাজকীয় শাসন-নীতির বাহিরে যে মন্দ কর্ম্মকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না, এমন নহে। বস্তুতঃ, অপরাধ কাহাকে বলে? ইহা লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা রহিয়াছে। ইংরেজি 'crime' শব্দের প্রতিশব্দ বাঙ্গালায় আছে বলিয়া জানি না। 'Crime'কে অপরাধ এবং 'criminal'কে অপরাধী বা দোষী বলিয়া আমরা সারিয়া লইয়া থাকি। কিন্তু 'crime' সম্বন্ধে জগতে যে বিপুল সাহিত্য জন্মিয়াছে, এ দেশে তাহার আলোচনা একেবারেই হয় নাই বলিয়া এই সকল একান্ত আবশ্যক কথাগুলির প্রতিশব্দ বা পরিভাষা আমাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত হয় নাই। 'অপরাধ' শব্দটি 'crime' অপেক্ষা অনেক ব্যাপক। সাধারণতঃ রাজকীয় বিধির (Law) অননুমোদিত কর্ম্মকেই 'crime' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য দেশেও 'crime' কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে অদ্যাপি পণ্ডিতগণের মধ্যে ঐকমত্য দেখা যায় না। কেহ বলেন, রাজকীয় শাসন-নীতির দ্বারা নিষিদ্ধ যে সকল কাজ, তাহা করা এবং বিহিত যে কাজ তাহা না করাকে 'অপরাধ' বলে।

আবার কেহ বলেন যে, রাজশক্তির দ্বারা দণ্ডযোগ্য অন্যায় কর্ম্মকেই 'অপরাধ' বলে।

আবার কেহ কেহ বলেন, "যে সকল কার্য্য হইতে মুখ্য বা গৌণভাবে জনসাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে এবং যাহা করিলে রাজকীয় দণ্ড-নীতির দ্বারা দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহাই 'অপরাধ'।"

এই সকল সংজ্ঞা হইতে মাত্র ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, 'অপরাধে'র সহিত রাজশক্তির বা শাসন-নীতির এবং জনসাধারণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অপরাধের প্রকৃতিগত পরিচয় আমরা সংজ্ঞা হইতে প্রাপ্ত হই না। রাজশক্তি হিতাহিত-জ্ঞানের যথার্থ পরিমাণ করিয়া দেয় না। রাজকীয় বিধি রাজা অথবা রাজকীয় সংবাদ দ্বারা প্রবর্ত্তিত। শাসন-সংরক্ষণ-নীতি এখন আর দেববুদ্ধিসম্ভূত বলিয়া কীর্ত্তিত হয় না। মানুষের গড়া বিধি মানুষে ভাঙ্গিতে কতক্ষণ? দণ্ডবিধির অনুশাসনে যতপ্রকার কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সমস্তগুলি কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবার জন্য যেন মানবের প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা নিয়োজিত রহিয়াছে। আধুনিক কালে এই অনুশাসনগুলিকে কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টিবিশেষের দ্বারা উদ্ভাবিত মনে করিয়া অনেকেই তাহা ভঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ করে না। বস্তুতঃ, আমরা দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির দণ্ডবিধি স্বতন্ত্র। কোনও জাতির মধ্যে এক-স্ত্রী জীবিত থাকিতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও দণ্ডার্হ। আবার কোনও জাতির মধ্যে উপর্য্যুপরি চারিবার দারপরিগ্রহ করা অবিধিসঙ্গত নহে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত জাতির অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি সুবিধা পাইলে রাজশক্তির চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া যদি দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হয়, তবে তাহাকে যে নিতান্ত নিরয়গামী হইতে হইবে, একথা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। আমাদের একটি আশৈশব-বদ্ধমূল বিশ্বাস, যে নরঘাতীর ইহকাল-পরকাল ব্যর্থ। কিন্তু যখন এই বহু:শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানালোকের প্রখর কিরণে নবীন সভ্যতার মাতৃ-অঙ্ক নরকঙ্কালে স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন কি কেহ বলিতে পারে যে, নরহত্যা একেবারেই অপরাধজনক? যুদ্ধে নরহত্যা করা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে শ্লাঘার বিষয় বলিয়া ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধে অরাতি-নিধন করিয়া মরিলে, সে হেলায় স্বর্গে গমন করে। তাহা হইলেই ফলে দাঁড়াইতেছে যে, 'অপরাধ' একটি আপেক্ষিক শব্দমাত্র। সুযোগ, সুবিধা, প্রয়োজন ইত্যাদি বুঝিয়া কোনও কর্ম্মকে কখনও বা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণনা করা হয়, কখনও বা বিহিত কর্ম্ম বলিয়া সুখ্যাতি করা হইয়া থাকে।

এই সকল কারণেই রাজকীয় দণ্ড ব্যতীত আর কোনও ইতর-বিলক্ষণতার দ্বারা যে অপরাধের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট করা যায়, তাহা ত আপাততঃ বুঝা যায় না। কিন্তু যখনই আমরা আবার রাজদণ্ডের মূল অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই অপরাধের যাহা মূলগত প্রকৃতি, তাহার কতকটা আভাস প্রাপ্ত হই। দণ্ডবিধির দ্বারা রাজা যে সকল কর্ম্মের নিষেধ বা বিধি প্রদান করেন, সে সকল কর্ম্ম কেনই বা নিষিদ্ধ হইল, কেনই বা বিহিত হইল? এই প্রশ্নের মীমাংসায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দণ্ডবিধির মধ্যে যে অপরাধের তালিকা আমরা প্রাপ্ত হই, সেজন্য রাজকীয় উদ্ভাবনী বা কল্পনা-শক্তি দায়ী নহে। প্রত্যেক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে,

সভ্যতার তারতম্য অনুসারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা-সম্বলনের ফলে, একটি নৈতিক বোধশক্তি দেখা দিয়া থাকে। সে নৈতিক বোধশক্তি বা ন্যায়ান্যায়-সদসদ্বিবেক কোনও চিরন্তন সংস্কারের ফল বা স্বাধীন চিৎশক্তির বিকাশ, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। তবে, এমনই একটা জাতীয় বোধের উপর যে প্রত্যেক জাতির দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠিত, সে বিষয়ে সন্দেহলেশ নাই। অবশ্য এমন অনেক দোষ আছে, যাহা সামাজিক সুবিধা-অসুবিধার উপর নির্ভর করে। মনে করুন, যে সমাজে জনসংখ্যা কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় প্রত্যেক নরনারীর বিবাহ করা বাঞ্ছনীয়, সে সমাজে চিরকৌমার্য্য দোষাবহ। অনেক স্থলে এইরূপ সামাজিক সুবিধা-অসুবিধা রাজকীয় দণ্ডবিধির অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ত্রুটিসমূহের সাধারণ নাম 'দোষ' বলা যাইতে পারে। যে দোষগুলি চারিত্র-নৈতিক নিয়মের ব্যভিচার, সেগুলিকে আমরা অসৎকর্ম্ম বা অন্যায় বলিয়া থাকি। রাজকীয় দণ্ডের দ্বারা শাসিত দোষগুলিকে বলা যাইতে পারে—'অপরাধ'। এবং ধর্ম্মতত্ত্বের নিষিদ্ধ কার্য্যকে অর্থাৎ ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কর্ম্মকে সাধারণতঃ 'পাপ' বলা হয়।

আমরা এস্থলে রাজকীয় দণ্ডযোগ্য 'অপরাধ'গুলির সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব। অপরাধের শাস্তিবিধান করাই দণ্ডবিধির কার্য্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ ফল—দণ্ডের নিষ্ঠুরতা হ্রাস করা। পূর্ব্বে যেরূপভাবে অপরাধীর সাজা দেওয়া হইত, তাহাতে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির ন্যায় সমাজের দ্বেষই অধিক পরিমাণে সপ্রকাশ হইত। অপরাধীর প্রতি ঘৃণা দেখাইবার জন্য তুচ্ছ অপরাধেও গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও জাল করা অপরাধে ফাঁসি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কবুল-জবাব বাহির করিবার জন্য নানা নিষ্ঠুর উপায় আবিষ্কৃত হইত। এখন এ সকল আর আইনের নামে চলে না, এগুলি আজকাল অত্যাচার, উৎপীড়ন নামেই বাখ্যাত হইয়া থাকে। অপরাধের তুলনায় যে দণ্ডের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত, ইহা নিতান্ত আধুনিক ধারণা নহে। আমরা মনুতেও দেখিতে পাই ঃ—

সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥

সেই (দণ্ড) সমীক্ষাপূর্ব্বক (শাস্ত্রানুসারে, সম্যক্ নিরূপণ করিয়া, অপরাধের অনুপাতে) ব্যবস্থিত হইলে, প্রজাদিগকে রঞ্জন করে (অর্থাৎ রাজার প্রতি তাহাদিগের অনুরাগ থাকে); আর অবিচারপূর্ব্বক ব্যবস্থিত হইলে, সমস্ত (রাষ্ট্রার্থপুত্রাদি) নাশ করে।

এই সমীক্ষাই দণ্ড-নীতি বা 'criminal justice'এর মূল সূত্র। দণ্ড প্রণয়ন করিবার সময় সমীক্ষার প্রয়োজন। দণ্ডবিধান করিবার সময়ও সমীক্ষার প্রয়োজন। অতীত যুগে যখন অপরাধের মধ্যে বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান ছিল, তখন দণ্ডের মধ্যেও যথেষ্ট তীব্রতা ও প্রতিহিংসা পরিলক্ষিত হইত। বর্ত্তমান যুগে দণ্ডবিধানের মধ্যে যত প্রতিহিংসার ভাব বা অযথা পারুষ্য না থাকে, ততই বিচারের নিরপেক্ষতা ও সাম্য সূচিত হইয়া থাকে। অপরাধকে এখন কেবল ইচ্ছাকৃত সমাজদ্রোহ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। যে সমস্ত অবস্থা ও কারণ পরম্পরার সংঘটন হইলে অপরাধে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে, সেই সকল অবস্থা ও কারণের সম্যক্ আলোচনা না হইলে অপরাধের প্রকৃতি বুঝিতে পারা অসম্ভব। জীবদেহে যেরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা যায়, সমাজদেহেও সেইরূপ অপরাধের উদ্ভব হইয়া থাকে। দূষিত বায়ু, পানীয় ইত্যাদি বর্জ্জন করিলে যেমন অনেক সময়ে মনুষ্যদেহে রোগের সম্ভাবনা কমিয়া যায়, সেইরূপ অবস্থা পরম্পরার পরিবর্ত্তন ঘটিলে অপরাধের সংখ্যা ইত্যাদিও কমিতে দেখা গিয়া থাকে। অপরাধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে, অপরাধীর পারিপার্শ্বিক, দৈহিক ও বংশক্রমিক বৈচিত্র্যগুলির সন্ধান করিতে পারিলে, তবেই এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নিরূপিত হইতে পারে। আমরা কেবল অপরাধকে এবং অপরাধীকে ঘৃণা করিতেই জানি এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা রাজার প্রতি তাহার ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকি; কিন্তু, অপরাধের উদ্ভবে আমাদের এবং সমাজের কতখানি দায়িত্ব আছে, তাহা প্রণিধান করিবার বিষয় নহে কি?

অপরাধের প্রকৃতি, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য সব দেশে এবং সব যুগে একরূপ নহে। অবস্থার সমবায়ে যখন অপরাধের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এক দেশের দণ্ড-নীতি অন্যদেশে খাটিতে পারে না। মধ্য যুগে যখন রেল ও টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হয় নাই, যখন কল-কারখানায় লক্ষ লক্ষ লোকের অন্ন-সংস্থান হইত না, যখন অনেক স্থল জঙ্গলে ঢাকা ছিল, তখন দল বাঁধিয়া ডাকাতি, পথিকের সম্পত্তি-লুণ্ঠন, স্ত্রীলোক-অপহরণ ও অসহায় নর-নারীকে দাস-দাসীরূপে গোপনে ক্রয়-বিক্রয় করা খুব প্রচলিত ছিল। এখন সে সকল অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; সে সকল অপরাধও কমিয়া গিয়াছে। এখন আবার কতকগুলি অপরাধ দেখা যাইতেছে, যাহা পূর্ব্বে ছিল বলিয়া মনে হয় না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে ডাকাতির যেরূপ প্রসার বাড়িতেছে এবং যেরূপ অভিনব উপায়ে কর্ত্তৃপক্ষের চোখে ধূলি দিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন কতকগুলি লোক এই সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহার বিষয় চিন্তা করিলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে।

এই সকল কারণে, অপরাধ ও অপরাধীর প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে এবং সমাজদেহের আবর্জ্জনা ও ব্যাধি দূর করিতে হইলে, প্রত্যেক দেশের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবস্থা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অন্য দেশের অবস্থা হইতে, আমাদের দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কতকটা ধারণা যে না হইতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু, তাহার মূল্য খুব বেশী নহে। অপরাধসংক্রান্ত ঘটনাবলীর অনুশীলন করিতে হইলে, আমাদের দেশের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাধারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার জ্ঞানলাভ করা একান্ত আবশ্যক।

গত শতাব্দীতে ইউরোপমহাদেশে এই বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। ইটালীর অধিবাসী বেকারিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে "অপরাধ ও শাস্তি" (Crimes & Punishments) সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। এই প্রসিদ্ধ পুস্তকের প্রচলন হইতেই প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। যে সকল সামাজিক ও আর্থিক অবস্থাবিশেষ হইতে অপরাধীর প্রাদুর্ভাব হয়, বংশপরম্পরানুক্রমিক যে সকল কারণ অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি জন্মায়, শিক্ষা ও শাসনসংক্রান্ত যে সকল অসুবিধা সেই প্রবৃত্তি পোষণ করে, সেই সমস্ত বিষয়ের নিরাকরণ করিতে ইউরোপ ও আমেরিকার অনেকস্থানে অনেক মনস্বী তাঁহাদের মনীষা নিয়োজিত করিয়াছেন। বেকারিয়ার পুস্তকের ফলে দণ্ড-বিধি ও দণ্ড-নীতির অনেক সংস্কার হইয়াছে। অপরাধীকে এখন কেবলমাত্র ঘৃণার

চোখে না দেখিয়া, তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে—দণ্ডের প্রাখর্য্য কমিয়া গিয়াছে। আমেরিকায় কারারুদ্ধ অপরাধীদিগের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে। আমেরিকাবাসীরা অপরাধের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণসমূহের আলোচনায় তাদৃশ মনোযোগী না হইয়া, বরং যাহাতে অপরাধীর শাস্তির ক্লেশ ও কঠোরতার লাঘব হয়, কারারুদ্ধগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং পরে তাহারা সৎপন্থা অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়, সেইদিকে অধিকতর মনোযোগ করিয়াছেন।

আমাদের দেশেও যদি এইরূপ অলোচনা হয়, তবে সমাজের প্রকৃত সংস্কার হইবে, সমাজ-ব্যাধি নিরাকৃত হইবে এবং লোকের জীবন-যাত্রাও অধিকতর শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার সহিত নির্ব্বাহিত হইবে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সাহিত্য-সঙ্গত *

সাহিত্য-সঙ্গতের জন্ম হইয়াছিল প্রাসাদের মর্ম্মর-অঙ্গনে, অচঞ্চল বিজলীর উজ্জ্বল আলোকে, নহবতের স্বরমুখরিত, চন্দন-কুসুম-সুরভিত এক সন্ধ্যায়। আজ সে আসিয়া পৌঁছিয়াছে দীনের কুটীরে, গরীবের ভাড়াটিয়া ঘরে। অঙ্গ হইতে তা'র অলঙ্কার খসিয়া পড়িয়াছে, বিজলীর সে স্থির হাস্য ঝরিয়া পড়িয়াছে, দীনবেশে দীনের ঘরে আজ সে দেখা দিয়াছে। রাজার ভূষণ নামাইয়া আপনাদের প্রিয় সঙ্গতকে আমি ভিখারীর বেশ পরাইতে স্পর্দ্ধা করিয়াছি, কিন্তু আপনারা সকলে পদধূলি দিয়া আমার এ ধৃষ্টতাকে ধন্য করিয়াছেন। দীনের ঘরে সঙ্গত আজ আপনাদের অনুগ্রহে, বিদুরের ঘরে ভগবানের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়াছে। সুধীমণ্ডলীর মহত্ত্বে আজ আমার গৃহ রাজার প্রাসাদের মত সুন্দর, ইন্দ্রের সভার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে। এখানে আর আমার দীনতার আস্ফালন করা চলে না। তাই শুধু বলি, আমি আপনাদের অনুগ্রহে ধন্য হইয়াছি।

সাহিত্য-সঙ্গত সম্বন্ধে আমি অনেকের মুখে অনেক কথা শুনিয়াছি;—যাঁহারা সুখ্যাতি করিয়াছেন বা ইহার প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও কিছু বলিব না; আর যাঁহারা নিভাঁজ নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদের কথাও কিছু বলিব না। কিন্তু, কতক লোক হিতৈষিতা বা বৈরভাব গ্রহণ না করিয়া, ইহার উদ্দেশ্য, ইহার উপকারিতা, নামের সার্থকতা বা ইহার প্রয়োজন সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন। ইঁহাদের সমালোচনা দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচনা হইতে বাছিয়া লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না; কেননা, অসূয়ার উপর যুক্তির যত বড় মোটা আবরণ দেওয়া যাক্ না কেন, তাহা অন্ততঃ সুরের ভিতর ফুটিয়া উঠিবেই। যাঁহারা নিন্দা করিতে হয় বলিয়া নিন্দা করিবেন, তাঁহাদের কথার আলোচনার স্থান ইহা নহে; কারণ, সঙ্গত মিলনের ক্ষেত্র, ভেদের নহে। কিন্তু, যাঁহারা আমাদিগকে বুঝিতে চান, তাঁহাদিগকে সঙ্গতের বিষয় ভাল করিয়া বুঝান দরকার মনে করি।

প্রথম কথা, কিসের জন্য আমাদের এ অনুষ্ঠান, একথা বুঝিতে বা বুঝাইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইবার কারণ নাই; কারণ, সঙ্গত সেই শ্রেণীর বস্তু, যাহার চরিত্র চেহারায় ফুটিয়া রহিয়াছে। আমাদের এখানে আসিয়া চারিদিকে চাহিলেই ইহার স্বরূপ বুঝিতে বাকী থাকে না। ইহার তটস্থ ও কূটস্থ লক্ষণে কোনও ভেদ নাই।

সোজাকথাটা এই যে, আমাদের এই অনুষ্ঠান আনন্দের জন্য—আনন্দ মানে বৈদান্তিকের সুখ-দুঃখের অতীত অনির্ব্বচনীয় ভাব নয়, আমাদের চিরপরিচিত নিতান্ত সাদাসিদে আমোদ-আহ্লাদ। কিন্তু, কথাটা এত সোজা বলিয়াই এত গোলযোগ।

আপনারা মানুষের চরিত্রের ভিতর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সোজাকথাটা সোজা করিয়া বুঝিতে সে কিছুতেই চাহে না, তাই জগতে বিবাদ-বিসংবাদ, মতামত, সন্দেহ, সংশয় প্রভৃতি দুঃখের যত কারণ। গৌতম মানুষের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া এ সোজাকথাটা না দেখিয়া বাঁকাপথে গেলেন বলিয়াই দুঃখ পাইলেন।

এমন আমাদের চিত্তবিকৃতি যে, যেখানে দেখি 'ক' এর পর 'খ' চলিয়াছে, সে ব্যাপারটাকে সেইখানেই সমাপ্ত না করিয়া আমরা স্থির করি যে, 'ক'র পরে 'খ' যাওয়ার কোন একটা গূঢ় কারণ আছে; আমরা আবার সেই কারণ লইয়া heory রচনা করি, তর্কবিতর্ক করি, গালিগালাজ,—চাইকি হাতাহাতি পর্য্যন্ত করিয়া ফেলি।

তুমি বলিবে, এই অসন্তোষই ত মানুষের বিশেষত্ব, ইহাই তাহার উন্নতির বীজ। নিউটন যখন বাগানে আপেলটাকে পড়িতে দেখিলেন, তখন যদি তিনি সেই ব্যাপারটাকে সেইখানেই সমাপ্ত করিতেন, তবে কি আজ বিজ্ঞান এতটা অগ্রসর হইতে পারিত? হয়ত পারিত না। তাহা হইলে আমাদের সুখ বাড়িত কি কমিত, সেটা খুব জটিল হিসাবের কথা। সে কথা না তুলিয়াও তোমার ওই নিউটন সাহেবের কথা দিয়াই ত দেখা যায় যে, এই সোজাপথের প্রতি বিদ্বেষ স্থানে স্থানে অপূর্ব্ব আহাম্মুকিতে প্রকাশ পাইতে পারে। নিউটনের সে পাণ্ডিত্যের কথা কে না জানে? পণ্ডিতবর একটী বিড়ালের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি তাঁহার পাঠ-গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া, স্থাবর-জঙ্গমের সকলকে বাহিরে রাখিয়াও, তাঁহার সেই পোষা বিড়ালটির যাতায়াতের জন্য একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে সেই বিড়ালের একটা ছানা হইল। পণ্ডিতবর ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছোট ছানাটির আসিবার জন্য আর একটি ছোট গর্ত্ত করিতে হইবে, নহিলে সে আসিবে কিরূপে? বড় গর্ত্ত দিয়া যে ছোট বিড়ালের আসিতে কোনও বাধা হইবে না, এই সোজাকথাটা তাঁহার মাথায় আসিল না।

যে যত বেশী বুদ্ধিমান্, বাঁকাপথের দিকে তা'র তত বেশী ঝোঁক্। আমাদের দেশে তাই এই সোজাপথের বিদ্বেষ সব চেয়ে বেশী। সেকালে আমাদের ঋষিরা—সেকালে অবশ্য এ দেশে ঋষি ও মহাপণ্ডিত ছাড়া আর কেউ ছিলেন না—কত সব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তা'র মধ্যে বেশীর ভাগ দেখিয়া সকলেই বুঝিবেন যে, সে একরকম শিরোবেষ্টন করিয়া নাসিকা স্পর্শ করিবার চেষ্টা। আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি যে, তাঁহারা যে গার্হপত্যাগ্নির প্রতিষ্ঠা করিতেন, তা'র উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড আগুন রাখিয়া বাড়ীটাকে Disinfect করা। উঠানের ভিতর একটি অগ্নিকুণ্ড

* সাহিত্য-সঙ্গতের বিগত অধিবেশনে পঠিত

জ্বালাইয়া রাখাই যদি এই প্রকার বীজাণুনাশের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তবে তা'র জন্য এত মন্ত্র-তন্ত্র, এমন বিরাট্ অনুষ্ঠান করিবার কি প্রয়োজন ছিল? আর কিছুই নয়, সোজাপথে যাইব না বলিয়া তাঁ'রা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, কেবল এইজন্যই ঐ সব জটিলতা।

তাই বলিতেছিলাম, সঙ্গতের উদ্দেশ্য এত সুস্পষ্ট ও সহজ বলিয়াই আমাদের যত গোলযোগ। আমরা এতগুলি দেশের গণ্যমান্য সুপণ্ডিত একসঙ্গে বসিয়া কেবল আমোদ-আহ্লাদ করিব, এই জন্যই সাহিত্য-সঙ্গত—এটা কি একটা কথার কথা! নিশ্চয়ই ইহার ভিতর একটা গূঢ় উদ্দেশ্য আছে; এত সহজ উদ্দেশ্য হইলে যে সঙ্গতের জাতি থাকে না! জ্ঞানী, পণ্ডিত, মহান্, আমরা কি করিয়া ইহাতে যোগদান করি? কতকটা এই ভাব যেন অনেকের ভিতর প্রচ্ছন্ন আছে, তাই কেউবা জিজ্ঞাসা করেন, "এ অনুষ্ঠানের কি প্রয়োজন?" কেউবা সে প্রশ্নটা মানিয়া লইয়া তাহার উত্তরে সঙ্গতের মহত্ত্বের এক উচ্চ আদর্শ চিত্রিত করেন। আজকাল খাওয়া, পরা, নাওয়া, শোয়া, সকল জিনিষেরই এক একটা আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির হইতেছে, আর সঙ্গতের কপালে একটিমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও জুটিবে না?

কেবলমাত্র আনন্দের জন্য আমরা সঙ্গত করি, একথা স্বীকার করিবার পক্ষে একটি অন্তরায় আছে। একথা স্বীকার করিতে আমরা একটু লজ্জাবোধ করি। আনন্দেই যে কোনও জিনিষের পরিণতি বা সার্থকতা হইতে পারে, এমন কি, আনন্দ যে কোনও গুরুতর হিসাবের ভিতর আসিতে পারে, এটা আমরা মনে মনে কিছুতেই মানিতে চাহি না। আমাদের এ দেশকে একজন বিদেশী বলিয়াছেন "The Peninsula of the Pessimist." কথাটা ঠিক। আদর্শ কুলীন-সমাজে এদেশে আনন্দের ঠাঁই নাই; কর্ত্তব্য এখানে সর্ব্বদাই মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন; তা'র বাড়ীর চতুঃসীমার ভিতর হাসিমুখ আসিতে পারে না; সে অন্ত্যজ! কর্ত্তব্যের অবতার রামচন্দ্র আনন্দস্বরূপিণী সীতাদেবীকে বর্জ্জন করিয়া আমাদের দেশে চিরকাল 'বাহবা' পাইয়া আসিয়াছেন। একালের ব্রজেশ্বরও কতকটা সেইরূপ করিয়া ঘরে ঘরে ফুলচন্দন পাইয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনসকল দর্শন-সমাজের চারিদিকে পাহারায় বসিয়া আনন্দকে তাড়াইতেছে। চার্ব্বাক বেচারা তা'কে বরণ করিতে গিয়া অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। মোটের উপর একথা সুস্পষ্ট যে, খুব বেশী দিন হইল আনন্দ আমাদের আদর্শের সমাজে অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু দার্শনিক সন্ন্যাসী কর্ত্তব্য লইয়া যতই কেন চোখ রাঙ্গান না, একঘরে' করিয়া তিনি আনন্দকে বাস্তবজগতে কোণঠেসা করিতে পারিয়াছেন, এতবড় দাবী কেহ করিতে পারেন না। দর্শন মুখভার করিয়া বাড়ীর বৃদ্ধ কর্ত্তাটীর মত বসিয়া আছেন, কিন্তু পরদার আড়ালে দুষ্ট ছেলের হাসির ফোয়ারা ছুটিয়াছে। সন্ন্যাসী-ঠাকুর শিখাইতেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", কিন্তু লৌকিক ধর্ম্মের দেবতার স্বর্গে অপ্সরার রূপযৌবনের সংযোগ মহা গোলযোগ ঘটাইতেছে। বনবাসী ঋষির প্রাণে ফল্গুর মত আনন্দের শাশ্বত ধারা বহিয়া চলিয়াছে, তাই তা'রা চিরন্তন উর্ব্বশীকে,

"ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।"

কণ্বের তাপস-আশ্রমে ভোগের কন্যা, ভোগের দেবী শকুন্তলা প্রতিষ্ঠিতা। কাব্য, নাটক ভোগের কথায় ভরপুর, বৈষ্ণবের ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দ-লীলার রসে মধুর!

আসল কথা এই যে, চক্ষু বুজিলেই সত্য সরিয়া দাঁড়ায় না। তাহা যদি হইত, তবে উটপক্ষী বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হইত। আমাদের স্বীকার-অস্বীকারের উপর যদি আনন্দের জীবন-মরণ নির্ভর করিত, তবে সে বেচারা আমাদের দেশ হইতে বহুদিন পূর্ব্বে বিদায় লইত। আনন্দ একটা নিত্য বস্তু; তুমি তাহাকে চাও বা না চাও, সে তোমার সঙ্গে থাকিবেই। তোমার ধর্ম্ম বা সমাজনীতি যদি তাহাকে অস্বীকার করে, আনন্দ তাহাতে মরিয়া যাইবে না, সমাজকেই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যেখানে সামাজিক ধর্ম্ম আনন্দকে অস্বীকার করিয়াছে, দুদিন বাদে ধর্ম্মই সেখানে কোণঠেসা হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম যদি আনন্দকে আশ্রয় না দেয়, পাপ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লইবে; আর পাপ-পুণ্যের সংগ্রামে সেই পক্ষই চিরকাল জয়ী হইয়াছে, যে আনন্দকে স্থান দিয়াছে। কেননা, আনন্দ সত্য; সত্য ছাড়িয়া ধর্ম্ম হয় না।

সুতরাং আনন্দ কিছু নিন্দার কথা নয়। আমরা সর্ব্বদা যা' করিতে যাই, যা' না করিয়া পারি না, তাহা যদি নিন্দার কথা হয়, তবে আনন্দময়ের দান যে এই জীবন, তাহাও যে নিন্দনীয় হইয়া দাঁড়ায়! তবে, আমরা আনন্দ করি এবং তাহার জন্যই আমরা এখানে মিলিত হই, এই সাদামাটা অলঙ্কারবর্জ্জিত কথাটা বলিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিব কেন? দশটা "কিন্তু" জোড়া দিয়া নানাবিধ সম্ভব-অসম্ভব আদর্শ ঢকাইয়া এই কথাটা না বলিলে আমাদের সঙ্গত যে কুলীন-সমাজে প্রতিষ্ঠার যোগ্য বলিয়া গণিত হইবে না কেন, আমি ত তাহা বুঝিতে পারি না।

তাই বলি, আমাদের সঙ্গতের উদ্দেশ্য সাহিত্যের উন্নতি, কি জ্ঞানের বিস্তার, কি বিরোধের সমন্বয়, কি অন্য কোনও উচ্চ আদর্শ-লাভ নহে। যাঁহারা বাগ্দেবীর সেবা করেন এবং যাঁহারা সে সেবায় প্রসাদ পান, তাঁহারা সবাই মিলিয়া মাঝে মাঝে একসঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করিবেন, ইহাই সঙ্গতের একমাত্র লক্ষ্য। ইহাতে সাহিত্যের বা সমাজের কোনও উপকার হয় হউক, আমাদের লক্ষ্য তাহা নয় এবং সে উপকারের খাতিরে আমরা আনন্দকে কোনও মতে খর্ব্ব করিতে পারি না।

তবে আনন্দদানবিষয়ে আমাদের দু' একটা বিশেষত্ব আছে। যে আনন্দ মার্জ্জিতরুচি ব্যক্তি উপভোগ করিতে পারে, আমরা তাহারই আয়োজন করিব। ফলে, আনন্দকে আমরা জাতে তুলিয়া আমাদের নৈতিক ও মানসিক উন্নতির যোগ্য করিয়া লইব। দশজন সুধীব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে আলাপে যে আনন্দ পান, উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত শুনিয়া যে সুখলাভ করেন বা লঘু সাহিত্যের আলোচনায় যে প্রীতিলাভ করেন, তাহা সাধারণ লোকের আনন্দ অপেক্ষা অনেক উচ্চ। আমরা সঙ্গতে পরস্পরকে সেইরূপ আনন্দ দান করিতে চেষ্টা করিব এবং লাভ করিব, এই জন্যই এ সঙ্গতের প্রতিষ্ঠা।

সাহিত্য-সঙ্গত রসিক ও রসজ্ঞের, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-প্রেমিকের, লেখক ও পাঠকের চিত্তের অপূর্ব্ব সঙ্গত; সুতরাং, আনন্দের উপকরণ যোগাইবার প্রধান ভার সাহিত্যের উপর। চিত্তের এ আনন্দভোজে সাহিত্য বড়কর্ত্তা এবং তাহারই হাতে পরিবেষণের ভার। কিন্তু বড়কর্ত্তা বলিয়া তা'র এখানে জ্যাঠামি চলিবে না। পরিবেষণের ভার আছে বলিয়া যে তিনি দাঁতভাঙ্গা লোহার কড়াই-ভাজা পরিবেষণ করিবেন, এমন অধিকার তাঁহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। হাঁড়িমুখো, পায়াভারি কর্ম্মকর্ত্তার স্থান এখানে নয়; এখানে যে আসিবে তার চরণ লঘু হইবে, অধরে

মধুর হাসি খেলিবে, সকল অঙ্গ তরল ভঙ্গীতে নাচিবে, কারণ, এখানে আমরা মনের বোঝা বাড়াইতে আসি নাই, নামাইতে আসিয়াছি। আনন্দ এখানকার হৃদয়ের রাজা, তাহার শাসন সকলকে মানিতে হইবে—সাহিত্যকেও।

আনন্দ যা'র একমাত্র লক্ষ্য এমন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য, কাব্যের বাহিরে আমাদের ভাষায় বেশী নাই। কিন্তু অন্য সাহিত্যের ত কথাই নাই, কাব্যবিষয়েও আজকাল কথা উঠিয়াছে যে, তাহার কেবল আনন্দ লইয়া পড়িয়া থাকিবার অধিকার নাই। সমাজের মাষ্টার মশাইরা বেত লইয়া তাহাকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, কেবল নাচিয়া, গায়িয়া বেড়াইলে চলিবে না, মাষ্টার মহাশয়ের ঘরের কাজও সারিয়া দিতে হইবে। এ শাসন কাব্য মানিবে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু যদি কাব্য বা সাহিত্যের অপর কোনও অঙ্গ এ শাসনে বাঁধা পড়ে, তবে বড় দুঃখের কথা হইবে—আনন্দের পক্ষে ত বটেই—হয়ত সাহিত্যের পক্ষেও। সাহিত্য-সম্মিলনের গত অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন যে, সাহিত্যের একটা সাধনা চাই ও ইহার একটা উচ্চ লক্ষ্য থাকা উচিত। কেবল চুট্‌কী লইয়া যদি সবাই পড়িয়া থাকি, তবে আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি কোনও বিষয়েই আমরা অগ্রসর হইতে পারিব না। কিন্তু তাহার মানে যদি ইহাই হয় যে চুট্‌কী লেখা নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র আনন্দদায়ক লঘুসাহিত্যের জগতে স্থান নাই, সাধনার চাপে পড়িয়া সাহিত্যের আনন্দকে দম ফাটিয়া মরিতে হইবে, তবে সে বড় দুঃখের বিষয় হইবে।

লঘু সাহিত্য, যাহাতে মনের উপর কোনও মহার্ঘ ভার চাপায় না, কেবল আনন্দের একটা পাত্‌লা বার্ণিশ লাগাইয়া দেয়, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। এই একশ্রেণীর সাহিত্য আছে, যা'র এই সঙ্গতের মত আনন্দবিধানই একমাত্র লক্ষ্য। এ যেন কুস্তির পর গা-টেপা, দৌড়ের পর ঘোড়ার গড়াগড়ি। চড়া-সুরে-বাঁধা মনের তারগুলি এলাইয়া দিয়া এই সাহিত্য মনের tone বৃদ্ধি করে। আমাদের এ সঙ্গত ঠিক এই সাহিত্যের উপযোগী এবং এইরূপ সাহিত্যে চিত্তবিনোদনই আমাদের চেষ্টার বিষয়। ইহাতে লঘুসাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, কে বলিতে পারে? আমাদের সাহিত্যরথীরা যদি এ সঙ্গতের জন্য এই শ্রেণীর রচনা লেখেন, তবে সাহিত্যের এ অঙ্গটা পুষ্ট হইবে। আর সমাজেরও যে উপকার হইবে না, তা'ও বলা যায় না। কারণ, আমাদের সমাজে হাসির মাত্রা বা তা'র বিশুদ্ধ উপাদান অত্যধিক, এরূপ বলা যায় না। সঙ্গতের উপলক্ষে যদি দেশে হাসির সাহিত্য ও হাসির কোন কিছু বাড়িয়া যায়, তবে তাহাতে সমাজের কিছু উপকার হইবে বৈকি? প্রাণ খুলিয়া হাসিতে শিখিলে, আমরা মানুষ হইবার কাছাকাছি যাইব।

অযোগ্য হইলেও আপনারা আমাকে সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সেই ভরসায় সঙ্গতের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝি, তাহা আপনাদিগকে নিবেদন করিতে সাহসী হইয়াছি। কিন্তু হয় ত আপনারা ইতিমধ্যেই লোহার কড়াইয়ের আস্বাদ পাইতেছেন, সুতরাং, আমি আর আপনাদের পীড়া বাড়াইব না। উপসংহারে কেবল একবার আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া, আমার বিদুরের খুদ আপনাদের দয়ায় সুধাময় করিয়া উপভোগ করিতে আহ্বান করিতেছি।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বক ঃ—কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়ের পুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীবনের সহিত, বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্বেত-লোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল। কৃষ্ণলোম স্বীয় বন্ধু ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায়কে কন্যা দেখাইতে পাঠাইয়াছিলেন। ঋজুশৃঙ্গ গিয়া দেখিল, স্থূলপুচ্ছ ধনীব্যক্তি, বিবাহ হইলে পরে স্থূলপুচ্ছের সমস্ত সম্পত্তি কৃষ্ণলোমের ঘরে আসিবে। কৃষ্ণলোমের উপর ঋজুশৃঙ্গের রাগ ছিল; পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার জন্য রিক্তহস্ত ঋজুশৃঙ্গ, কৃষ্ণলোমের নিকট পূর্ব্বে ঋণপ্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হয়। সেইজন্য, স্থূল-পুচ্ছের নিকট গিয়া ঋজুশৃঙ্গ পাত্রের রূপ ও গুণ এরূপভাবে বর্ণনা করিল, যাহাতে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু তথাপি স্থূলপুচ্ছ বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য।

বন।

সূক্ষ্মলোম মেষোপাধ্যায় ও নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায় আসীন।

সূক্ষ্ম। কি ভাই, কেমন দেখে এলে?

নীল। আগে বল,
পুরস্কার কি দিবে আমারে?

সূক্ষ্ম। সে যখন
পাকাপাকি হ'য়ে গেছে, আর ফিরিবে না,
ভাল হয়, ভাল—মন্দ হয়, উপায় কি
তার? তবে, তুমি বন্ধু মম, আর আমি
নিতান্ত অধীর, তাই গুপ্তচর ক'রে
পাঠায়েছিলাম তোমা। বল বন্ধু বল,
কেমন দেখিলে? (সহাস্যে) পুরস্কার বিবেচনা
করা যাবে বিবাহের পরে। বল, বল।

নীল। সংক্ষেপে বলিয়া যাব—অথবা—

সূক্ষ্ম। সংক্ষেপে।

নীল। বিদায় লইয়া ভাই তোমার নিকটে,
বরাবর পূর্ব্বমুখে চলিলাম আমি।
কত মাঠ, কত বন-উপত্যকা দিয়া
কত গিরি, নদী, কত তড়াগের শোভা
দেখিতে দেখিতে শ্রান্ত হ'লে, ঘনপত্র
সুচ্ছায় তরুর তলে করিয়া বিশ্রাম—

সূক্ষ্ম। সর্ব্বনাশ!—বন্ধুবর, এই কি তোমার
সংক্ষেপ করিয়া বলা? কেন আর মিছে
পোড়াইয়া মার সখা? বলিয়া ফেলিয়া
আসল কথাটা, তা'রপর সবিস্তারে
ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তব করিও বর্ণনা,
আমি পরম নিশ্চিন্ত হ'য়ে, শুনিব তা'
সপ্তাহ ধরিয়া।

নীল। ভাই, উপন্যাসে যদি
একেবারে মধ্যভাগ খুলি দুইপাতা
পড়া যায়, সে কি মিষ্ট লাগে?

সূক্ষ্ম। মিষ্ট লাগে,
যদি হয় নায়িকার রূপ-বর্ণনার
পরিচ্ছেদ। আহারে বসিয়া যদি কেহ
একেবারে পায়সের বাটি মুখে তুলে,
লাগে না কি মিষ্ট তাহা?

নীল। ভাল, তাই হোক্।
তোমার শ্বশুর-বাড়ী পৌঁছিতে সে দিন
প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। গুপ্তচর আমি,
আনাচে-কানাচে লাগিলাম বেড়াইতে।
দেখিলাম এক শিরীষ-বৃক্ষের তলে
জনকত স্ত্রীজন্তু বসিয়া করিতেছে
বাক্যালাপ। কাণ পাতি রহিলাম; তা'রা
তোমার বধূর বিবাহের কথাবার্ত্তা
কহিতেছে সবে। কেহ বলিতেছে—"শ্বেতী
সুরূপা হ'লেও—তা'র রঙ্‌টা ফ্যাকাসে।"
কেহ বলিতেছে—"রঙটি নিন্দার নয়
কিন্তু চোখদুটো তা'র বড় ড্যাবা-ড্যাবা—
মা গোঃ—।" কেহ বলিতেছে,—"যা' বল তা' বল
ন্যাজের বাহার আছে তা'র।"—এইরূপ
ক্রমে রাত্রি হ'ল, সবে চ'লে গেল গৃহে।

সূক্ষ্ম। আর তুমি চ'লে এলে পরের কথায়
বিশ্বাস করিয়া? নিজে দেখিলে না?

নীল। আঃ,
কি বিপদ! কে বলিল চলিয়া এলাম?
সারারাত্রি কাটালাম গাছতলে শুয়ে।
প্রভাত হইল, পূর্ব্বদিকে নব রবি
উঠিল উজলি। মন্দানিল—

সূক্ষ্ম। আবার কি
বক্তৃতার ভূত, ঘাড়ে তব চাপিল হে?

নীল। এবার আমি শুনিব না। নায়িকা স্বয়ং
নামিছেন রঙ্গমঞ্চে।—মন্দানিল সুখে
বহিতে লাগিল, ফুটাইয়া নানাবর্ণ
নানা গন্ধফুল। বৃক্ষপত্রে সারানিশি
জাগিয়া শিশির, এইবার দল বাঁধি
লাগিল ঝরিতে নিম্নে প্রস্ফুট কুসুমে।
নবরৌদ্রবিভা আসি' যবে তা' দেখিয়া
হাসিয়া উঠিল—হাসিল ফুল, হাসিল
শিশির।

সূক্ষ্ম। ভাই, ক্ষমা কর—এবে যথেষ্ট হ'য়েছে।

নীল। ভাল, শুন মন দিয়া। এহেন
প্রভাতে কোন বালিকা আসিয়া, চিবাতে
লাগিল যত শিশিরার্দ্র ফুল? কি রূপ!
দেবকন্যা অথবা এ মেষের নন্দিনী
বুঝিতে লাগিল ধাঁধাঁ।

সূক্ষ্ম। যাও যাও, মিছে
জ্বালায়োনা।

নীল। সখা, আমি সত্য বলিতেছি—
বধূটি তব পরম রূপসী।—না হে না,
পরিহাস নহে। তাহার মত রূপের
বালিকা আমি দেখি নাই কভু। এ যদি
তোমার প্রেয়সী হয়, বহু ভাগ্য তব।

সূক্ষ্ম। ধন্যবাদ—শত ধন্যবাদ—লও বন্ধু
আপাততঃ। বহুক্ষণ বাহির হ'য়েছি,
চল ফেরা যাক্। আজ আমার ওখানে
নিমন্ত্রণ রহিল তোমার সন্ধ্যাবেলা।

নীল। নিমন্ত্রণ করিলে ত এককথা বলি।
আমি ঘোর মাংসপ্রিয়, তোমাদের মত
নিরামিষে রত নহি। মাংস-টাংস কিছু
করিও সংগ্রহ।

সূক্ষ্ম। ভাই, চেষ্টা ক'রে দেখি।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শৃগাল ভট্টাচার্য্যের বহির্ব্বাটী।

কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায় ও শৃগাল ভট্টাচার্য্য আসীন।

কৃষ্ণ। তা' হ'লে ভট্‌চায্‌ ভায়া, শুভবিবাহের
দিনস্থির করে ফেল।

ভট্টা। (পাঁজি বাহির করিয়া) আঃ—কি মুস্কিল!
চশমাটা এসেছি হে ফেলে।

কৃষ্ণ। (নিজের চশমা দিয়া) এই নাও।

ভট্টা। (চশমা পরিয়া) সূক্ষ্মলোম (আঙ্গুল গণিয়া)
এক দুই তিন চার—আর
শ্বেতলোমা—এক দুই তিন চার—চার
আর চারে আটটি অক্ষর হ'ল।
তবে আটুই প্রশস্ত দিন।

কৃষ্ণ। এ মাসের
উনিশে যে আজ—আটুই কেমন
ক'রে হবে? পর মাস ভাদ্র মাস;
তবে ত দেখি অগ্রহায়ণের এ দিকে
হয় না আর। আটুই ছাড়া কি শ্রাবণে
আর কোন দিন নাই?

ভট্টা। থাকিবে না কেন?
অগাধ এ জ্যোতিষ-সমুদ্র, যা' খুঁজিবে
তাহাই মিলিবে। ভাল, আটুই না হয়
আঠারই, আটাশে, আটত্রিশে—

কৃষ্ণ। সে কি হে,
আটত্রিশে মাস হয় নাকি? আমরা ত
শুনিনি কখনও।

ভট্টা। দাদা, কেমনে শুনিবে?
কলিকালে হয়নাক বটে। সত্যযুগে
আটত্রিশে কেন, কখনও কখনও
আটাত্তর দিনে মাস পূর্ণ হইত যে!

কৃষ্ণ। না না না ভট্‌চায্‌ ভায়া, সে কি হয় কভু?
ঠাট্টা করিতেছ তুমি। কর ঠাট্টা ভাই—
মুখ্যু-সুখ্যু লোক—

ভট্টা। (সরোষে) আহা, মূর্খ হবে কেন?
কিন্তু বুদ্ধি যদি থাকে, ভেবে দেখ তবে,
সেকালে মানুষগুলা শতহস্ত ছিল,
পরমায়ু ছিল পূরা সহস্র বৎসর—
তবে কি হিসাবে দাদা অনুমান করি
মাসগুলা ছিল মাত্র ত্রিংশ দিবসের?
(কৃষ্ণলোমের পরাস্তভাব দেখিয়া, সগর্ব্বে নস্য লইয়া)
আচ্ছা, কলিকাল—আটত্রিশে নাই হ'ল,
আটাশে ত আছে, তবে আটাশেই হোক্।

কৃষ্ণ। সে ত হে অনেক দেরী, আচ্ছা দেখদেখি
দিন দুই চারে কোনও দিন আছে কি না?

ভট্টা। দিনের অভাব? রাজার ঘরে মোতির
দুঃখ? জ্যোতিষবেত্তার কাছে কভু দাদা
দিনের অভাব ঘটে?—আটাশেতে যদি
বাধা থাকে—তিন আষ্টে চব্বিশ হইল;
চব্বিশেই ধার্য্য কর।

কৃষ্ণ। তবে সেই ভাল।
ঠিক হবে। চব্বিশেই ঠিক। এখনও
পাঁচ দিন বাকী। সব যোগাড়-যন্তর
এরই মধ্যে হ'য়ে যাবে। তুমি তবে ভায়া
মেয়েটির আশীর্ব্বাদ করিয়া এসগে।
আমি এ-দিকের সব বন্দোবস্ত করি।
বাড়ীতে স্ত্রীলোক নাই, মাসীমাকে আর
তাঁ'র ছেলে-মেয়েদি'কে আনিতে পাঠাই।
ভট্‌চায্‌,—কখন্ তবে যাত্রা করিতেছ?
কাল ভোরে, সূর্য্য না উঠিতে—

ভট্টা। দাদা, সে ত
অল্পদূর নয়—অনেকটা পথ—দেখি—
কালকে আবার ওদের বাড়ীতে কিছু
ক্রিয়া-কর্ম্ম আছে—সেটা কারে ভারার্পণ
করি—(চিন্তাযুক্ত)

কৃষ্ণ। তুমি না যাইলে ভায়া, আর বল
কাহারে পাঠাই? এই নাও যৎকিঞ্চিৎ
পথের খরচ।

ভট্টা। (টেঁকে গুঁজিয়া) আহা, আমি না গেলে কি
ভাল হয়? তোমরা আমার বনিয়াদি
যজ্‌মান, পুরুষানুক্রমের সম্বন্ধ—
আমি পুরোহিত—তোমার হিতের কার্য্য
না সাধিয়া আগে, অন্য কর্ম্মে হাত দিতে
পারি কভু দাদা?

কৃষ্ণ। তাহা কি জানি না? তবে
এখন বিদায় হই—প্রণাম।

ভট্টা। জয়োঽস্তু।

(উভয়ের প্রস্থান

ক্রমশঃ

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা

আগ্রার স্বপ্ন

তখন ভোরের কনকপ্রভা উদয়পুরীর উপরে নীলাম্বরীর সোণার পাড় বুনিয়া দিতেছিল। এ এক ঘুমন্ত নগরী,—আমার সাম্‌নে নিসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। প্রশস্ত রাজপথগুলি অজানা সব পথিকজনের চরণচিহ্ন বক্ষে লইয়া নীরবে প্রভাতালোকের স্বপ্ন দেখিতেছে—এখনও নূতন আগন্তুক আসিয়া তাহাদের মৌনব্রত ভঙ্গ করে নাই। দুধারে সারি-সারি দোকান,—পসারীর টাকা-আনা-পয়সার হিসাব, এখনও বিহঙ্গের ভোরের ভৈরবী থামাইয়া দিতে পারে নাই। মুক্ত জনতার মুখর কণ্ঠ স্তব্ধ,—যমুনার বীণা তাই এখনও শোনা যাইতেছে—তালে তালে, মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায়, অনুলোমে, বিলোমে!

ঐ আগ্রা-দুর্গ! কি বিশাল, কি কঠিন, কি উচ্চ! তরুণ অরুণকিরণে তাহার লোহিত পাষাণ-তনু আরও রাঙ্গা দেখাইতেছে, সে যেন আহত মোগল-গৌরবের শেষ শোণিত-ধারা! ভিখারীর মাথায় রাজমুকুটের মত, 'সম্মন বুরুজের' খণ্ডমেঘশুভ্র মর্ম্মর-শিল্প, দুর্গের রক্তললাটে জাগিয়া রহিয়াছে।

সেই অতি উচ্চ পাষাণ-প্রাচীরের দীর্ঘ ছায়ার ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলে, হৃদয় যেন কি এক অজ্ঞাতভাবে অভিভূত হইয়া যায়! 'গাইড্' তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। তাহার মাথায় সাদা মস্ত পাগ্‌ড়ী, তার তলায় দুটি তীক্ষ্ণ নেত্রের চতুর দৃষ্টি, দীর্ঘ বক্র নাসা, যত্নরক্ষিত শ্মশ্রু-গুম্ফ! তাহার গায়ে 'পাঞ্জাবী,' পায়ে শুঁড়্‌ওয়ালা জুতা! সে আগে তোমার সঙ্গে কথা কহিয়া, তুমি কি প্রকৃতির, কোন্ শ্রেণীর লোক, তাহা ঠিক্ বুঝিয়া লইবে। তাহার পর, সবিনয়ে বারংবার সেলাম্ করিয়া সত্য-মিথ্যা নানান্ গল্প একেবারে তোমার মনের-মত-করিয়া বলিয়া যাইবে। তোমার চাতুর্য্য এখানে নিস্ফল। তাহাদের লোক চিনিবার অসীম ক্ষমতা।

এ দুর্গ, না সহর? ইহার বিশালতা দেখিয়া মনের ভিতরে বারংবার এই প্রশ্নের উদয় হয়। রাজ্যরক্ষার শুষ্ক-কঠোর চিন্তার মধ্যে, সমরাস্ত্রের কর্কশ ঝঞ্ঝনার মধ্যে শিল্প-রসিক মোগল সম্রাট্‌গণ যে পেলব সৌন্দর্য্য-চর্চ্চাকে অবহেলা করেন নাই—আগ্রা-দুর্গের রাজপ্রাসাদ তাহার প্রধান প্রমাণ। দুর্গমধ্যে বিলাসিতার এ হেন

উপকরণ, শিল্পকরের এ হেন পরিকল্পনা, গদ্যের কঠোরতার মধ্যে এ হেন পদ্যের ছন্দ পৃথিবীর অন্য কোথাও পাইবে না।

প্রাসাদের ছাদে ফুলের ঐ মোহন বাগান, তন্বঙ্গীগণের স্নানোৎসবের জন্য নির্ম্মিত ‘শীশ-মহলে’র ঐ দর্পণগ্রথিত স্ফটিক ভিত্তি, শ্বেত মর্ম্মররচিত শয়ন-গেহের দেয়ালে-দেয়ালে প্রস্তরীভূত পুষ্প-মালার ঐ রঙ্গিন্ আল্পনা—এ সকলই এক রূপের পূজারীর কোমল প্রাণের পরিচয় দেয়; এবং ইহারই পাশে এই যে অস্ত্র-শালা,—যেখানে গণনাতীত আগ্নেয়াস্ত্র আর বল্লম আর কৃপাণ, রক্ত-পিপাসায় উন্মুখ হইয়া আছে—ইহা দেখিতে বড়ই অশোভন। আবার, প্রাসাদের উপরে দেববাঞ্ছিত সৌন্দর্য্যকে যেমন শরীরী দেখা যায়, নিম্নে তেমনই তাহার বিপরীত দিক্‌টা চোখের সাম্‌নে প্রকট হইয়া ওঠে। সেখানে অমা’র অনন্ত রজনী যেন আপনার নিবিড় তিমির-কেশের বেণী মুক্ত করিয়া দিয়াছে! সেই আন্ধিয়ারে সম্রাটের বিশ্বাসঘাতিনী নর্ম্ম-সঙ্গিনীগণকে টানিয়া আনিয়া তাহাদের পুষ্প-কোমল সুন্দর-গৌর কণ্ঠে মরণ-ফাঁস দিয়া ছাদ-তলে বিলম্বিত করিয়া দেওয়া হইত। সেখানে দাঁড়াইলে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া ওঠে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে এবং নেত্র অন্ধ হইয়া যায়। মনে হয়, আজিও যেন সেই একদা-সমাদৃত হতভাগিনীদের দেহমুক্ত অভিশপ্ত আত্মা আমার চতুর্দ্দিক্ হইতে নিঃশ্বসিয়া নিঃশ্বসিয়া উঠিতেছে এবং এখনই হয়ত তাহারা তীব্র এক হাহাকারে বিদীর্ণ হইয়া যাইবে! আহা, অভাগীরা!

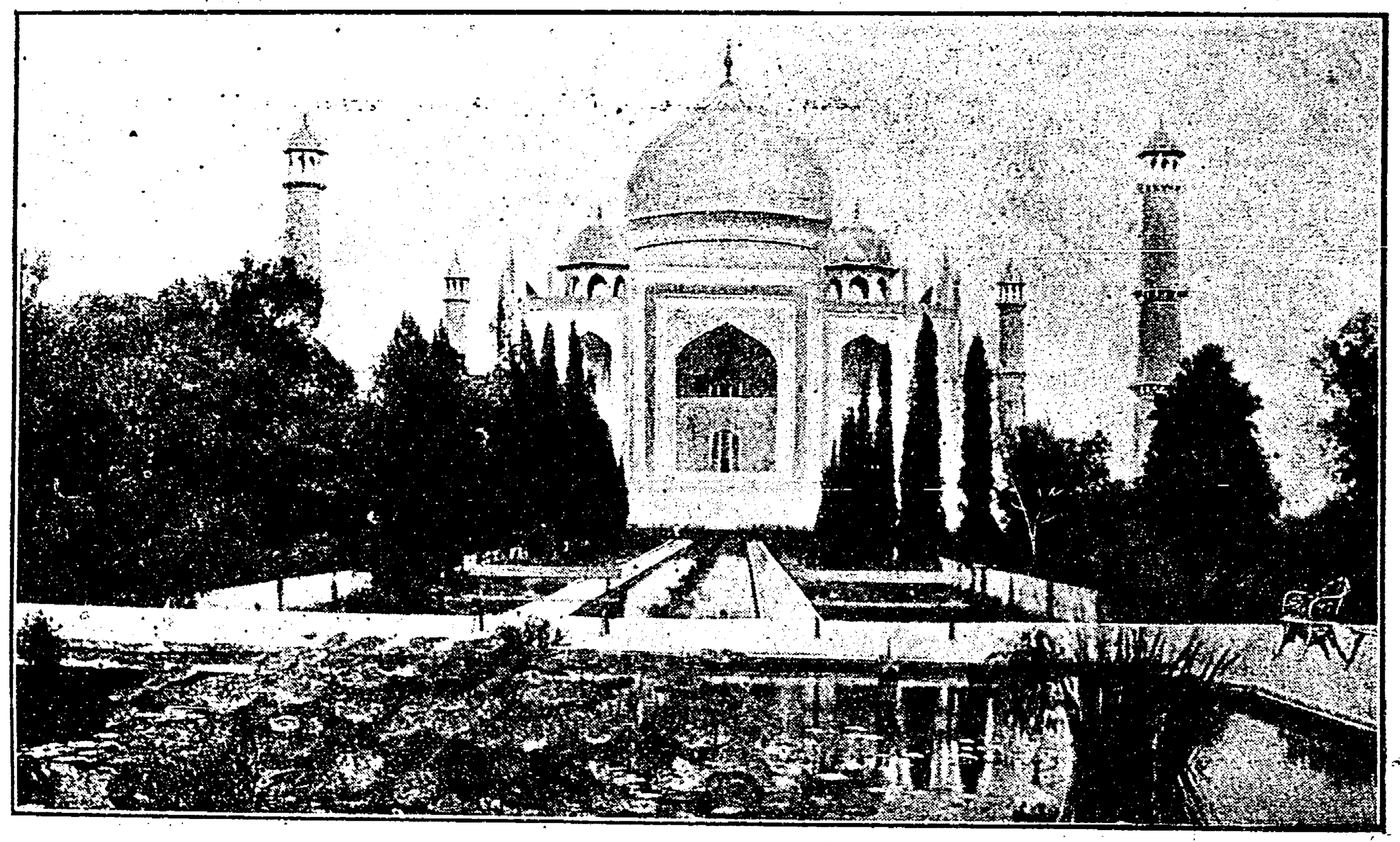

তাজমহল

“সম্মন-বুরুজে”র উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরটির ভিতর-বাহির নিষ্কলঙ্ক ‘মার্ব্বেল’ দিয়া গঠিত। ভিত্তিতে পাথরের উপরে শিল্পীর সুনিপুণ হস্ত কি চমৎকার পুষ্প লতা রচনা করিয়াছে! দেখিলেই মনে হয়, তাহারা যেন পাথর-দিয়া-তৈরী নয়,—মাখন-দিয়া-গড়া!

প্রদর্শক কহিল, “বাদ্‌শা শাজাহান, মরিবার সময় এই ঘরে ছিলেন।”

সত্য?

মুক্ত গবাক্ষ-পথে দৃষ্টি ছুটিয়া গেল।

কি দেখিলাম!

দূরে, আরও দূরে—যমুনার কালো জলে সাদা রাজহাঁসের মত প্রেমিক শাজাহানের মর্ম্মর-স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে! “সম্মন-বুরুজে”র ভিত্তির উপরে বক্ষঃস্থাপন করিয়া চাহিয়া রহিলাম—সেইদিকে চাহিয়াই রহিলাম! অজ্ঞাতসারে কল্পনা আসিয়া আমার মনোরথের সারথী হইল। পলকে একাল ভুলিলাম এবং আত্মহারা দৃষ্টির সাম্‌নে ভাসিয়া উঠিল, মোগল ‘রাজ-শ্রী’র সেই মহিমময় যুগ, সেই সুদূর-অতীত, সেই স্মরণীয় সেকাল!

মনে হইল, আমি যেন বহুপূর্ব্বে অভিনীত এক বিয়োগান্ত মহানাটকের অশরীরী দর্শক!

নীরবতা ঘুমাইয়া আছে। নীল-সায়রে চাঁদের রজত-তরণী ভাসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে! হেথা-হোথা আলোছায়া-মাখা মেঘদ্বীপগুলির কূলে-কূলে মায়াময়ী জ্যোৎস্নার রূপের ঢেউ উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে।

নিম্নে যমুনা। তাহার দোদুল জল-বেণী রূপালী ‘ফিতা’য় বাঁধা। নিভৃত কূলে স্মৃতির তীর্থ ‘তাজমহল’ চির-নীরবতার মধ্যে আত্ম-মহিমসুপ্ত। তাহার তুহিন-শীতল শিলা-সমাধির ভিতরে আজ যেন বিরহিণী মমতাজের তৃষিত আত্মা প্রিয়ের আশায় জাগিয়া উঠিয়াছে!

শাজাহানের কাতর প্রাণও আজ যেন গোপন মর্ম্ম-কুহর ছাড়িয়া তাঁহার স্তিমিত দৃষ্টির ভিতর হইতে অশ্রুধারার সহিত বাহির হইয়া যাইতে চাহিতেছিল।

চরণতলে বাদ্‌সাজাদী জাহানারা নীরবে, সাশ্রুনেত্রে বসিয়া পিতার আসন্নমরণমলিন মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন।

ধীরে ধীরে ধীরে শাজাহানের আত্মা-বিহগী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। দুগ্ধধবল-চন্দ্রলেখার অনুসারী হইয়া তাঁহার শেষ দৃষ্টি মমতাজের স্মৃতি-মন্দিরের পেলব শুভ্রতার ভিতরে হারাইয়া গেল। সৌন্দর্য্য-সাধকের মৃত্যু!

* * * *

প্রশস্ত রাজপথ। দুধারে সারি-গাঁথা বাড়ী,—ছোট, বড়, মাঝারি। কোনখানিতে মোগল স্থাপত্যের অভিরাম আদর্শ নয়ন-মন মুগ্ধ করিয়া দেয়; কোনখানির উপরে আধুনিক পাশ্চাত্য আদর্শের ‘ছাপ্’ পড়িয়াছে; আবার কোনখানিতে বা সেকাল ও একালের বিচিত্র সমীকরণ-চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়া বাড়ীর ‘মালিকে’র বিকৃত রুচির পরিচয় দিতেছে।

সুধু বাড়ী বলিয়া নয়, ‘চকে’র ভিতরে ঢুকিলেও একাল-সেকালের অমনই যুগল-মিলন দেখা যায়। দোকানে দোকানে

সূক্ষ্ম মোগল-শিল্পের নানান্ উপকরণের আশে-পাশে কারুকার্য্যশূন্য কলের তৈয়ারি বিবিধ বিলাতী দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে। “জুম্মা মস্‌জিদের” উচ্চ চূড়ার ছায়ায় এখনকার ফ্যাশনের এক মস্ত হোটেল দিবারাত্র সরগরম হইয়া আছে। প্রাচ্য নগরীবধূ আগ্রায় বসিয়াও যেদিকে ফিরিয়া চাই—আগ্রাকে দেখি না,—ইংলণ্ডকে দেখি, জার্ম্মানীকে দেখি, অষ্ট্রীয়াকে দেখি! হায়রে কপাল!

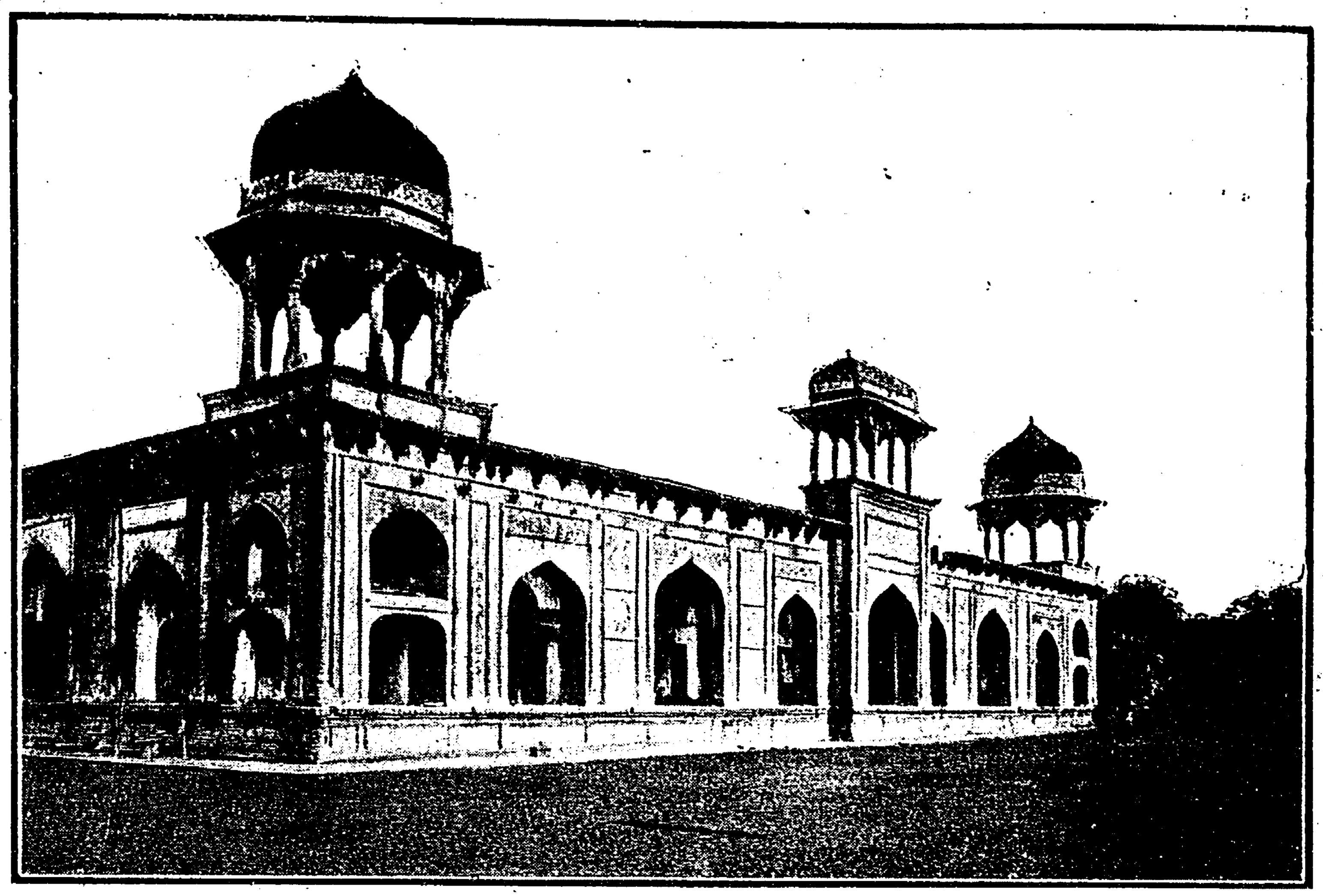

পূর্ব্বদিক হইতে কবরের দৃশ্য

রাস্তা দিয়া লোক চলিয়াছে—লোকের পর লোক! অনেকের মাথায় অসম্ভব-রকম বৃহৎ, হরেকরকম রংএর পাগ্‌ড়ী এবং তাহার তুলনায় লোকগুলির মুখ যথেষ্ট ছোট। অনেকে পায়জামার উপরে বিলাতী ছাট্-কাটের সস্তা-দরে-কেনা কোট চড়াইয়া দিয়াছে। তাহাদের খোলা বুকের ভিতর হইতে, সাদা জমির উপরে সাদা ফুল-

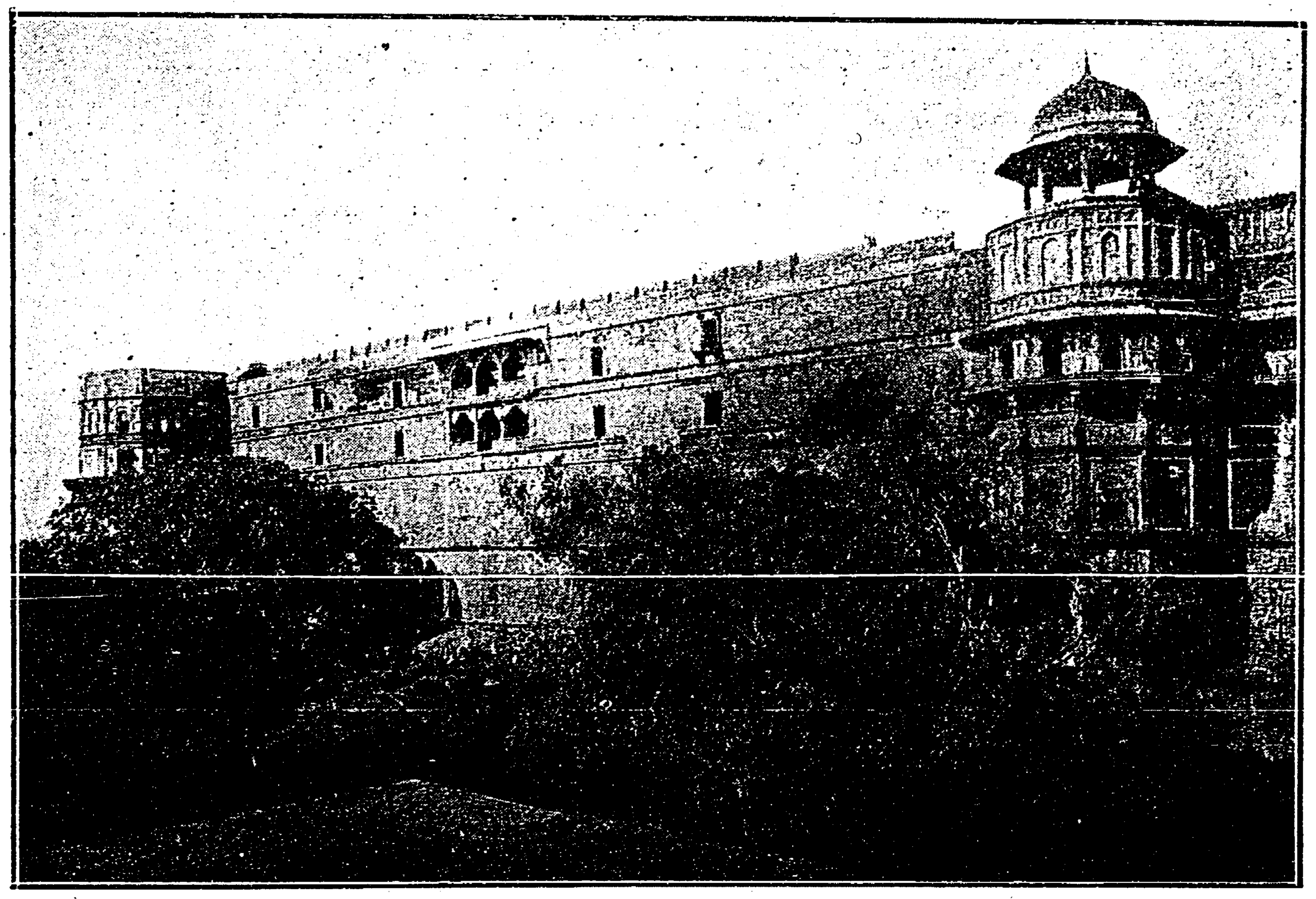

আগ্রা-দুর্গ—সম্মন-বুরুজ

তোলা ময়লা চুড়ীদার পাঞ্জাবীগুলা দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ আদুড় গায়েই ‘ওয়েষ্ট-কোট’ পরিয়া চলিয়াছে।

আগ্রার ষ্টেশনে প্রথম পা ফেলিবামাত্র, আগে তোমাকে পাকড়াও করিবে, ‘তোতারাম বাড়ীওয়ালা’র দূতেরা। তোতা-রামের লোকগুলাও তোতাপাখীর মতই বাক্যে ‘দড়’! তাদের কথার মার-প্যাচ্ হইতে যদি ‘বাঁচোয়া’ চাও, তবে লক্ষীছেলেটির মত সিধা তোতারামের বাসায় গিয়া উঠিও। বাসায় আদর যত্ন এবং আয়োজনের কিছুমাত্র অসম্পূর্ণতা নাই। ইঁদুর-ভরা বড় বড় ঘর, ছারপোকা-ভরা বড় বড় খাট এবং পায়া-ভাঙ্গা সারি সারি চেয়ার—রোসো, আরও আছে! ঘরের মেঝেগুলি আদুড় নয়—মাদুরপাতা। তুমি যদি তেমন অনুসন্ধিৎসু হও, তবে খোঁজ করিলে অবিলম্বে-টের্ পাইবে যে, তথাকথিত ‘মাদুর’ নামে পরিচিত বিবর্ণ জিনিষটির তলায় সেই ‘ston age’এর পুরু ধূলা জমিয়া আছে। আহা, সে ধূলায় কি চমৎকার ভুর্‌ভুরে গন্ধ! আবার, রাত্রিকালে ঘরের ভিতরে বিনি-পয়সায় মশকের ‘ব্যাণ্ড’ শুনিবার আশা করিতে পার। সে ‘ব্যাণ্ড’ এত শ্রুতিমধুর যে, তুমি রাত-ভোর না ঘুমাইয়াই কাণখাড়া করিয়া সুধুই তাহা শুনিতে থাকিবে।

ইতোমধ্যে আগ্রার অনেক লোক তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিবে। প্রথম, নরসুন্দর ভায়া। তিনি তোমাকে ভরসা দিয়া বলিবেন, "বাবুজী, আপনার কাণে বহুৎ পোকা আছে, আসুন, আমি বা'র করে দি।"

সাবধান, কাণের পোকা বাহির করিতে নরসুন্দর ভায়ার শরণাপন্ন হইও না! হইলে, তোমার কাণে পোকা থাক্ আর না থাক্, বাহিরের পোকাই তোমার কাণের ভিতরে ঢুকিবে। পোকাগুলি নরসুন্দরেরই পোষা। তারপর আসিবেন, যিনি, তাঁর ইচ্ছা তোমার গা টিপিয়া দেন। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর হাড় ভগ্নপ্রবণ, অতএব ইঁহার ইচ্ছাও পূর্ণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

ছাড়িবার জন্য বারান্দায় গিয়া ব'স, তাহা হইলেও নিস্তার পাইবে না। সেখানে গিয়া বসিলে, তুমি পথচারিণী 'বাঈজী'দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। তাহাদের গায়ে বিবর্ণ 'নিমা', পরিধানে রাঙ্গা 'ঘাগ্‌রা', হাতে রূপার গহনা। পিছনে-পিছনে একব্যক্তি গম্ভীর-মুখে ঢোল বাজাইতে বাজাইতে যায়। তোমাকে দেখিয়া "বাঈজী" ঊর্দ্ধমুখে বলিবে, "বাবুজী, নাচ?"—বলিয়াই, তোমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না করিয়া, সে একহাত চিবুকে ও একহাত কোমরে রাখিয়া দু-এক পাক্ ঘুরিয়া তাদের নাচের নমুনা দিয়া, হঠাৎ থামিয়া আবার বলিবে, "বাবুজী, নাচ?"

* * * * *

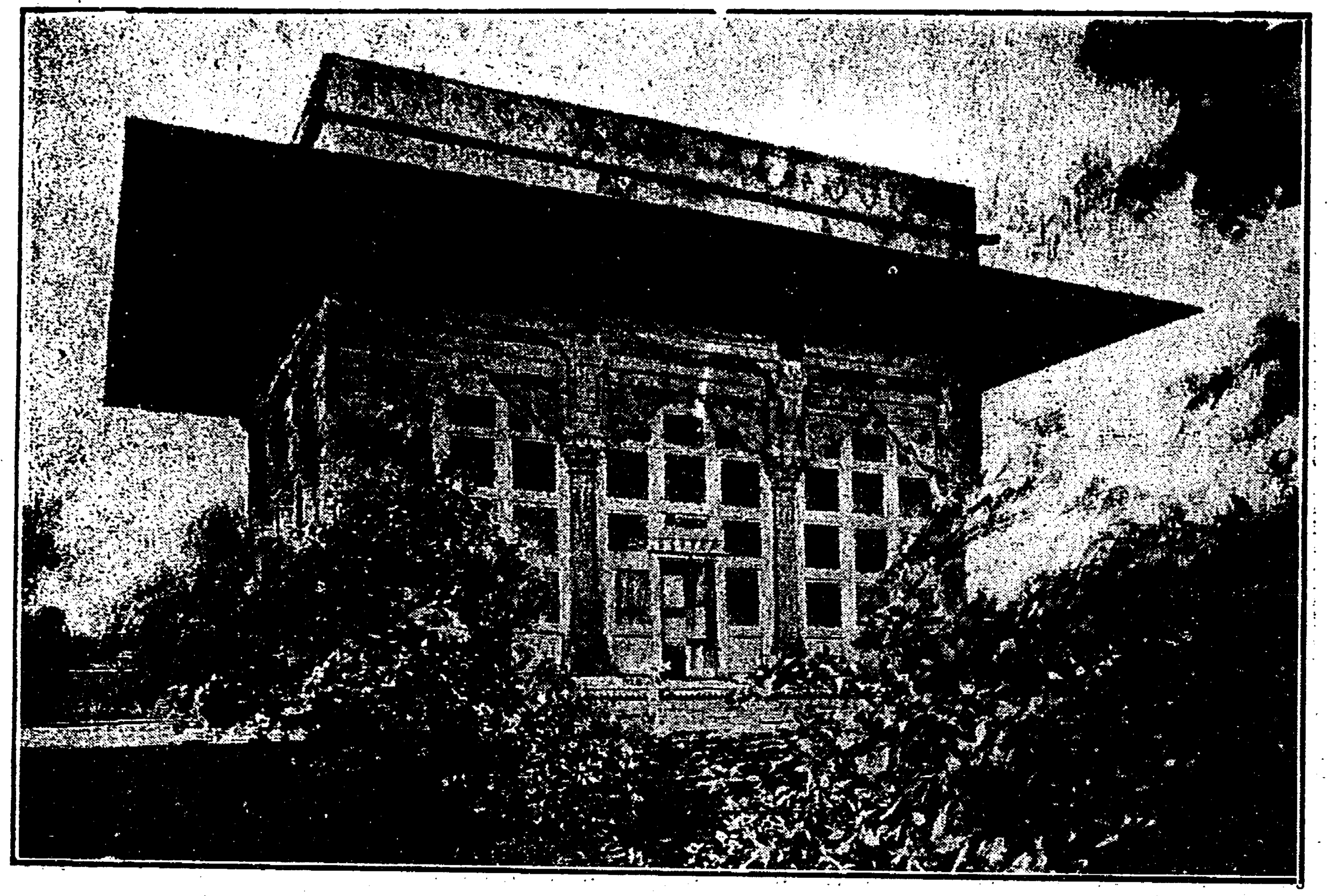

যশোবন্ত সিংহের ছত্রী

অতঃপর আসিবেন, সাদা পাথরের খেলানাওয়ালা এবং এই শ্রেণীরই অন্যান্য দ্রব্য-বিক্রেতা। হয়ত তুমি শুইয়া আছ,—সহসা ইঁহাদের একজন গম্ভীর বদনে আসিয়া তোমাকে মস্ত একটি সেলাম ঠুকিবেন। এ ব্যক্তির মুখখানিও হাসি-হাসি, কিন্তু খবর্দ্দার! ইহার সেলাম বা হাসি কিছুতেই যেন ভুলিও না। তবে কি করিবে? শুন—

খেলানাওয়ালা যখন বলিবে, "পাথরের খেলানা চাই, বাবুজী?"

তুমি যেমন শুইয়া আছ, তেমনই শুইয়া থাকিও; খেলানা-ওয়ালা যাহাই জিজ্ঞাসা করুক্, তুমি কোন উত্তর দিও না। তোমার যদি খেলানার দরকার থাকে, তবে বাজারে গিয়া কিনিবে—ইহাদের কাছে না। খেলানার দরকার না থাকিলেও, ইহাদের কাহাকেও মুখ ফুটিয়া 'না' বলিবে না। ইহাদিগকে তাড়াইবার সোজা উপায়, একেবারে চুপটি করিয়া থাকা। মুখ ফুটিয়া 'না' বলিয়াছ কি,—ইহারা তোমাকে পাইয়া বসিয়াছে। এ বড় বিষম সমস্যা! অমত বা অসন্তোষ,—কিছুই ইহাদের মুখের হাসি মুছিয়া দিতে পারিবে না। ইহারা সহিষ্ণুতার এক-একটি অবতার-বিশেষ; রাগ কর, গালি দাও, তাড়াইতে যাও—ইহারা এক-পা নড়িবে না, সবিনয়ে হাসিমুখে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

তুমি বলিবে, "ভাগো ইহাঁসে"—

ইহারা বলিবে, "জী, হাঁ!"

এরা মনে মনে বেশ ভালরকমই জানে, লোক ঠকাইতে গেলে বিনয়ী হওয়া দরকার। অতএব, সাবধান!

ঘরের ভিতরে এইসব গোলমাল দেখিয়া তুমি যদি একটু হাঁফ্

তাজকে দেখিতে গেলাম। অনেক জিনিষ দেখিবার আগে আমরা মনে মনে কল্পনাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকার দি। পরে বাস্তবের কঠোর আঘাতে কল্পনার উচ্চতা একেবারে খর্ব্ব হইয়া যায়। আমরাও মনে মনে কল্পনায় তাজের একটা আকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রথমে যখন দূর থেকে তাজকে দেখিলাম, তখন তাহাকে চিত্রার্পিতের মত সুন্দর মনে হইল বটে, কিন্তু তাহার ভিতরে মহৎ কোন ভাব পাইলাম না। একটু হতাশভাবে বাগান পার হইয়া তাহার কারুকার্য্যময় সিংহদ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াই-লাম। সেখান হইতে তাজকে দেখিয়া মনে আর একরকম ভাব আসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে যতই তাজের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, এই অপূর্ব্ব বাস্তবের ইন্দ্রজাল, ততই আমার কল্পনার সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল,—আমার মনে হইল, আমি যেন এ পৃথিবীতে আর নাই, আমার পা যেন আর মাটিকে ছুঁইতেছে না!

আমি তাজের শিল্পের কথা বলিব না, তাহার ইতিহাসের কথা বলিব না। সে-সব কথা রেলগাড়ীর দৌলতে ও মাসিকের ভ্রমণ-কাহিনীর কল্যাণে একেবারে পুরাণ' হইয়া গিয়াছে। মানুষের মনে তাজ, কোন ভাবের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়, আমি সেই কথা—যতটুকু পারি—বলিতে চেষ্টা করিব।

* * * * *

চাঁদের আলো! চাঁদের আলো! তাজের চূড়ায় চাঁদের আলো, তাজের গায়ে চাঁদের আলো, তাজের পায়ে চাঁদের আলো, তাজের

চারিপাশে চাঁদের আলো! তাজমহল আর চাঁদের আলো মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—কে বলিতে পারে সে আলো চাঁদের, কি তাজের?

যমুনার জলে স্বপ্নবালারা আলোর ফুলঝুরি ফুটাইতেছিল। জ্যোৎস্নায় ডুবিয়া যমুনা বহিয়া যাইতেছিল,—ধীরে, ধীরে, ধীরে। তা'র কণ্ঠে আজ যে সঙ্গীত শুনিতেছি, তাহা অতীতের বিলাপ-গাথা—না পরীলোকের রহস্যগীতি?

কি বিরাট্, কি মহান্, কি অতুল, তুমি তাজ! মোগল-মুকুটের গৌরব তোমার মাঝে যেন জাগিয়া আছে। বর্ত্তমানের ভিতরে অতীতের মত, সে যেন মৌন-স্তম্ভিত হইয়া আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। হে তাজ, তোমার স্মৃতির শ্মশানে এখনও কি আগুন আছে?

তাজের মর্ম্মর-চত্বরে বসিয়া কে আপনমনে বাঁশী বাজাইতে-ছিল। সে অজানা-অচেনা বিদেশী। চন্দ্রকরময়ী যমুনার দিকে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া বাঁশীতে সে এক-একটি ফুঁ দিতেছিল, আর বাঁশী যেন বিরহীর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

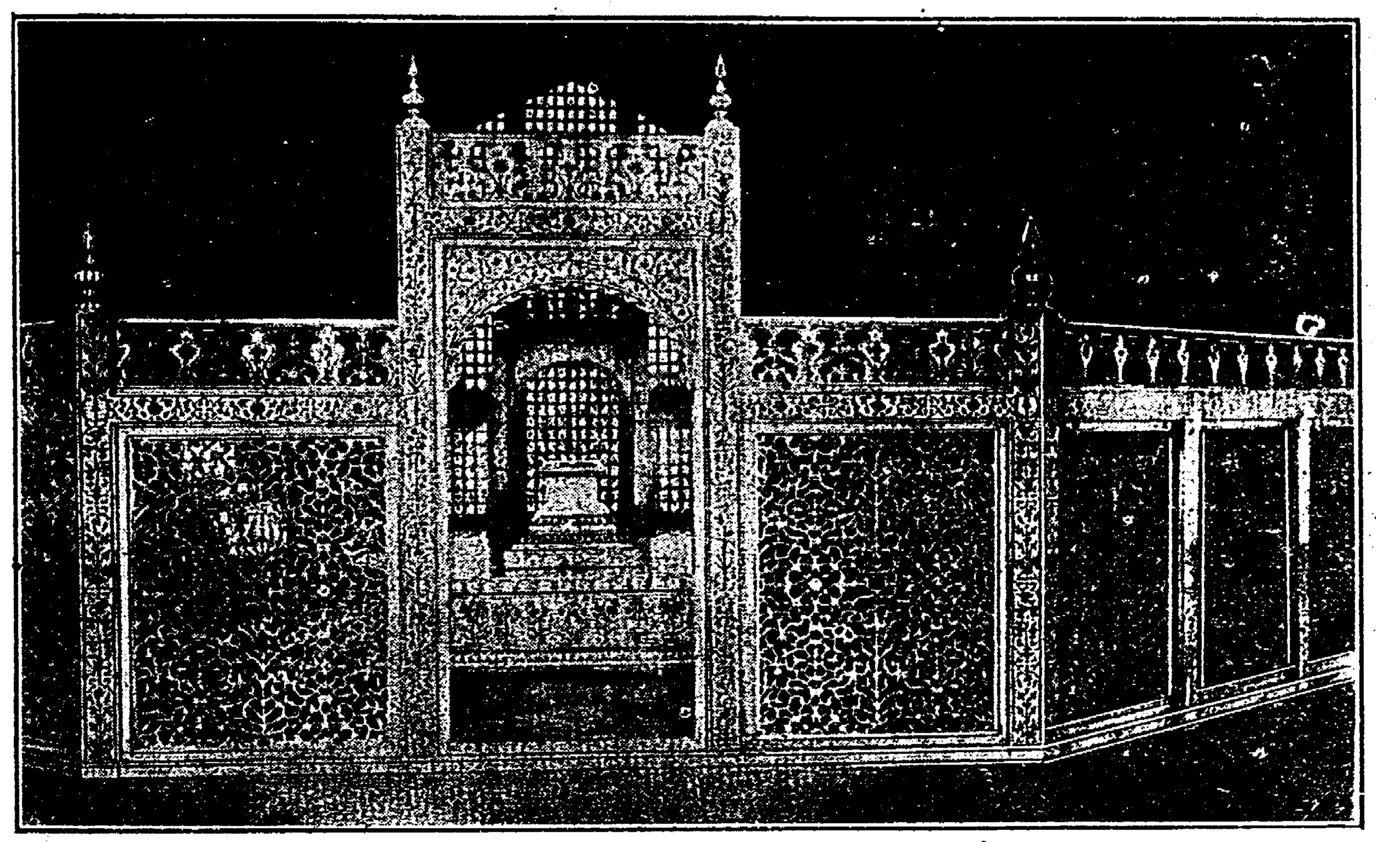

তাজের মর্ম্মর-যবনিকা

বাঁশী কি বলিতেছে, কে জানে! সে যেন কাকে চাহিতেছে, সে যেন কাকে ডাকিতেছে, কিন্তু সে কোথা গো, সে কোথা? বাঁশীর সুর দিশাহারা হইয়া যমুনার ওপারে ছুটিয়া গেল, কিন্তু হতাশ হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। ক্রমে সুর ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। তারপর একবারে থামিয়া গেল।

স্বপ্নমুগ্ধের মত বসিয়া ছিলাম। মুখ তুলিয়া দেখি, বংশীবাদক বাঁশী ফেলিয়া দু-হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কিছুই বুঝিলাম না। কিন্তু মনে কেমন কৌতূহল হইল। আস্তে আস্তে তা'র কাছে গিয়া তা'কে ডাকিলাম।

প্রথম ডাক সে শুনিতে পাইল না। দ্বিতীয় ডাকে চমকিয়া সে মুখ তুলিল। বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তা'র মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সে বিরক্ত হইয়াছে। ক্ষমা চাহিলাম।

সে মৃদু মৃদু হাসিল। কিন্তু চাঁদের আলোয় দেখিলাম, তা'র চোখে ও গালে অশ্রুবিন্দু চক্‌চক্ করিতেছে।

তা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করিয়া কোনরকমে যাহা জানি-লাম, তাহা এই।

সে মান্দ্রাজী। মা, বাপ, ভাই, বোন, ছেলেপুলে তা'র কিছুই নাই—সংসারে আপন বলিতে তা'র একটিমাত্র লোক ছিল,—সে তা'র স্ত্রী। আজ তিনমাস হইল, তা'র বুক থেকে প্রাণের নিধিকে যম কাড়িয়া নিয়াছে। শূন্যগৃহে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সে এখন দেশবিদেশে ছুটিয়া বেড়ায়। আজ কিন্তু, তাজমহল দেখিতে আসিয়া স্ত্রীকে আবার তা'র মনে পড়িয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক, তাজের ভিতরে কি আছে জানিনা, কিন্তু তা'কে দেখিলেই হারাণ মুখ মনে পড়ে। কিছুদিন আগে আমি আমার এক ভগিনীকে অকালে হারাইয়াছিলাম। তাজকে দেখিয়া আজ আমারও সেই স্নেহের বোনকে বারবার মনে হইতেছে। তার ভালবাসা স্মরণ করিয়া চোখে জল আসিতেছে।

যে কখনও শোক পায় নাই, তাজের মহিমা সে ঠিক বুঝিবে না। কলাবিদ্, শিল্পের নমুনা দেখিতে—বিলাসী, মোগল বাদশাহের ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমক দেখিতে—বিদেশী, "জগতের অষ্টম আশ্চর্য্য" দেখিতে—তাজের কাছে যায়। কিন্তু তাজের যথার্থ গৌরব ত সুধু শিল্পের বা সৌন্দর্য্যের জন্য নয়! তাজের ভিত্তি যে শাজাহানের অশ্রুসিক্ত প্রাণের উপরে!

আমি তিনবার তাজমহলকে দেখি-য়াছি। একবার সকালে, একবার দুপুরে, একবার সাঁঝে। তিনবারেই তা'র তিনরকম রূপ দেখিয়াছি। তাহার শীতল ললাটে প্রাতঃসন্ধ্যার স্নেহ-কিরণ যখন প্রথম চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দেয়, তখন মনে হয়, যেন স্বর্গপুরীর সুখস্বপ্নের এক টুক্‌রা কোনগতিকে খসিয়া পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নে সে জাগ্রৎ স্বপ্নের মত। তাহার ছায়া হইতে বাস্তব যেন দূরে সরিয়া যায়। তাহার গায়ে হাত দিলেও ভ্রম হয়, যেন অশরীরীর স্পর্শশূন্য তনুকে স্পর্শ করিতেছি! রজনীতে আলো-আঁধারে তাজের চির-নীরবতার দিকে তাকাইলে মনে হয়, তাহার আত্মা আছে। তাহার নিষ্কলঙ্ক ইন্দুধবলকান্তি যেন সেই আত্মারই বহির্বিকাশ! তাজমহলের, মমতাজের, না শাজা-হানের,—সে আত্মা কাহার কে জানে? কে বলিতে পারে? মহাকালের ত্রিশূলাহত মোগলরাজ শ্রীর এই দুঃখ-রাত্রে, অশ্রুর এই নিস্তব্ধ সমাধি-ক্ষেত্রে, এই স্তম্ভিত বিজনতার মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে, কে—কে—কে? প্রান্তর—মহাপ্রান্তর বহিয়া, গিরি-কান্তার পার হইয়া, ক্রন্দনপরায়ণা অসিতাঙ্গী যমুনার উপর দিয়া এই যে উদ্দাম হাওয়া হু হু হু হু ছুটিয়া আসিয়া তাজের গম্বুজ-মিনারকে পাগলের মত চুম্বন করিতেছে, উহাকে জিজ্ঞাসা কর,—শুন, ও কি বলে? চারিদিকের এই বৃদ্ধ বৃক্ষদলের ডালে ডালে কঙ্কালের মত যে আওয়াজ হইতেছে, তাহাদের শতাব্দীব্যাপী অশ্রান্ত মর্ম্মরের মাঝে যে দিগন্ত-বিসারী হাহাকার জাগিতেছে, কাণ পাতিয়া শুন,—দেখ এ সকলের কিছু বুঝিতে পার কিনা! তাজের উচ্চ—অতি উচ্চ চূড়ায় ডানার ঝাপটে রজনীর রহস্যকে আন্দোলিত করিয়া আর্ত্তনাদ, শ্রান্ত ঘনীভূত অন্ধকারের মত ঐযে পেচক-বাদুড়ের দল আসিয়া বসিতেছে, উহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, হয়ত উহারা অতীতের কিছু-কিছু ব্যাপার জানে!

শাজাহান! শাজাহান!—প্রেমিক শাজাহান! এ তাজকে তুমি শিল্পীর পরিকল্পনায় গড় নাই; পীরিতির অমিয়া দিয়া

প্রেমের কোমলতা ছানিয়া, স্মৃতির মধু-চক্র চুনিয়া চুনিয়া গড়িয়া তুলিয়াছ। মোগল রাজান্তঃপুরের নিত্য যেখানে রূপের বিকিকিনি

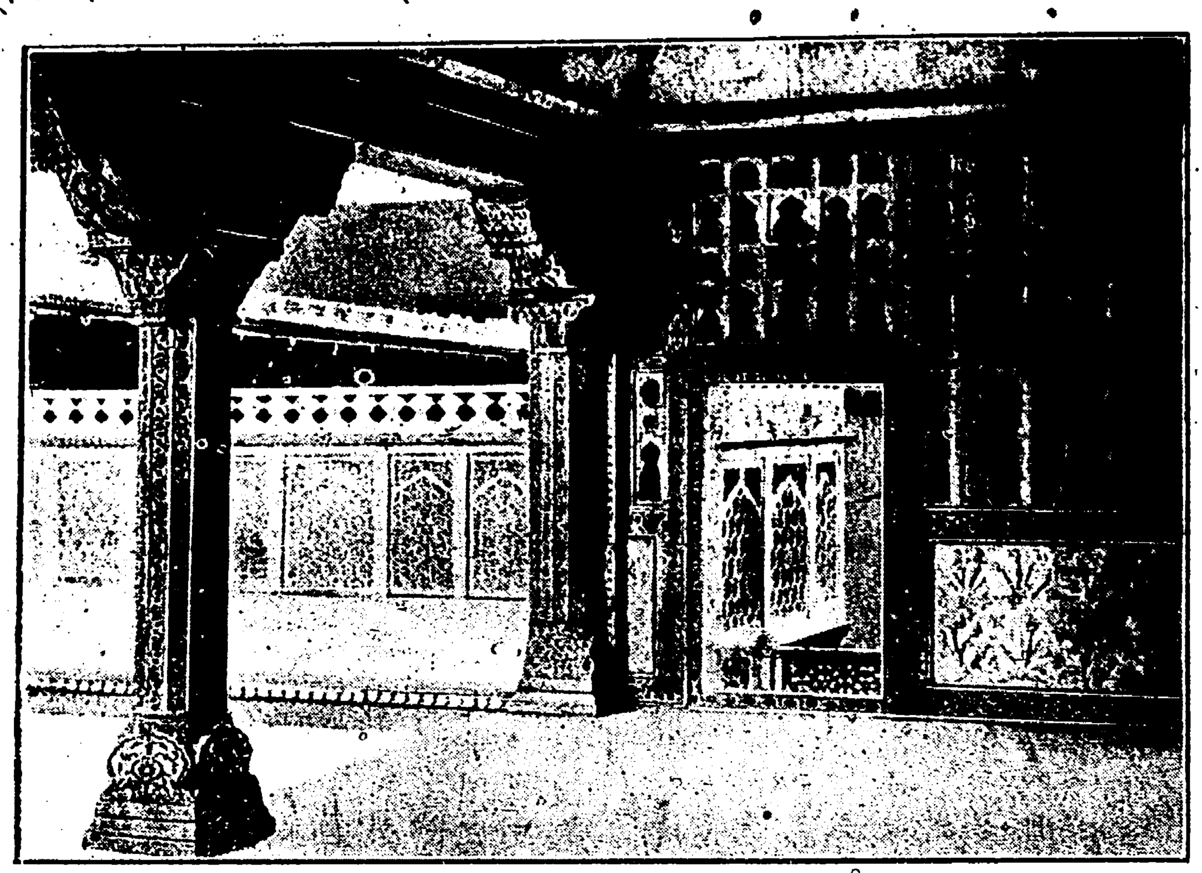

আকবরি মহল—আগ্রাদুর্গ

চলিত, চতুরঙ্গে যেখানে রমণী খেলনার বস্তু ছিল, চোখের কোণের এতটুকু চাহনির জোরে খোসরোজের সুন্দরী যেখানে একটুক্‌রা মিছ্‌রির লাখ টাকা দাম হাঁকিত, সেই অবিরাম যৌবন-বিলাসের অভিরাম রঙ্গভূমিতে যে এ-হেন প্রেমামৃত সঞ্চিত ছিল, বা থাকিতে পারে, আগে কে তাহা জানিত? তাজের এই অপূর্ব্ব শুভ্র মর্ম্মরের শীতলতা আজিও শাজাহানের সেই সাগরসমান গভীর প্রেমের স্নিগ্ধতাকে জাগাইয়া রাখিয়াছে; তাজের ঐ ননির মত নরম শিলাপট, ঐ নয়নমোহন রঙ্গিল পুষ্পলতার আল্পনায়, ফুলের ভাষায় শাজাহানের প্রেমের ভাষা, প্রাণের আশা, বুকের ভালবাসাকে প্রকাশ করিতেছে, তাজের ঐ আকাশ-ছোঁয়া শরতের হাল্‌কা মেঘের মত সাদা গম্বুজ শাজাহানের প্রেমের উচ্চতাকেই ফুটাইয়া তুলিতেছে,—

আর, তাজচরণচুম্বিনী গতগৌরববাহিনী, অতীতস্বপ্নময়ী যমুনা! ভারতের আর কোন্ নদীর তটে তোমার মত স্মৃতির চিতাভস্ম সঞ্চিত আছে? তোমার তটে কতবার ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে! তোমার কালো জলে হাত দিলে কত কথাই মনে হয়,—পাণিপথ, ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনাপুর, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা! তুমি শ্যামসুন্দরের মুরলীগুঞ্জন শুনিয়াছ, পাণিপথে বারংবার রক্তরঞ্জিতা ভারতলক্ষ্মীর করুণ ক্রন্দন শুনিয়াছ, দিল্লীর মহাপ্রান্তরে হিন্দুর হাহাকার শুনিয়াছ, আগ্রার প্রাসাদে বিরহী শাজাহানের দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিয়াছ। তোমার এজল নদীর জল নয়,—যুগযুগান্তরের চোখের জল! শ্যাম-বিরহিণী শ্রীরাধার অশ্রু, কান্তাগতপ্রাণ শাজাহানের অশ্রু, হিন্দু-মোগল-পাঠানের অশ্রু,—হে অশ্রুময়ী যমুনা, কত কাতর নয়নের অশ্রু তোমার বুকে পড়িয়াছে! আর,—আজ যে এই চির-মৌন তাজের মর্ম্মরে পরিণত প্রেমাশ্রুর ছায়া তোমার অশ্রুজলে ছবির মত জাগিয়া আছে, ইহা দেখিয়া যাহার চোখের পাতা ভিজিবে না, এই কালজয়ী রাজসমাধিপুরীর সিংহদ্বারে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মেঘদূত

ওগো নীলাঞ্জন মেঘ—বন্ধনবিহীন
অতিথি নবীন,
অনন্ত অম্বরপথে কোথা হ'তে ভেসে
এসেছ এ দেশে?

সুদূরে ধূলায় লুটি' যেথা একাকিনী
কাঁদে বিরহিণী,
সেথা হ'তে এনেছ কি বারতা তাহার—
দিতে উপহার?

২

বাদল-ধারায় এ কি ঝরে অবিরল
তা'রি আঁখিজল?
তাহারি মরমব্যথা ফুটে কি আকাশে
বিদ্যুৎ-বিকাশে?

একি তা'র ব্যাকুলতা আজি হেথা আসে
ব্যাকুল বাতাসে?
তাই রবিহারা দীর্ঘ শ্রাবণের দিন
বিষাদ-মলিন!

৩

হে মেঘ, অশ্রান্ত তব বারি-বরিষণে
যেন এ ভুবনে
যত বাধা-ব্যবধান—অচল-কঠিন
হয়েছে বিলীন।
এ বাদল-ঘেরা বিশ্বে একান্তে বিজনে
সজল নয়নে
দু'টি পিপাসিত চিত্ত মিলনের লাগি'
রহিয়াছে জাগি'।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

শত্রু

(গল্প)

(১)

গ্রামের মধ্যে হরিজীবন ভট্টাচার্য্য বেশ অবস্থাপন্ন লোক। চাষ-আবাদ, ভূ-সম্পত্তি ত তাহার বেশ ছিল; কিন্তু তাহাতে সে সন্তুষ্ট ছিল না। কি উপায়ে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, এই চিন্তায় অহরহঃ সে ব্যাপৃত থাকিত এবং ঐ চিন্তারই ফলস্বরূপ সে গ্রামের মধ্যে একটি 'হাট' বসাইল। আশে-পাশের পাঁচ ছয়টি গ্রামের মধ্যে হাট ছিল না। কাজেই এই নূতন হাটটি শীঘ্রই বেশ জমিয়া উঠিল; তাহারও অর্থাগমের পথ সুগম হইল।

কিন্তু তাহার দুই তিন জন নিকট-আত্মীয়ের মনের মধ্যে ঈর্ষার আগুন্ জ্বলিয়া উঠিল! তাহাদের চোখের সাম্‌নে আর একজন এত টাকা রোজগার করিবে! অসহ্য!

ঐ গ্রামের ধার দিয়া একটী ক্ষীণা তটিনী তর্‌তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। যেখানে হরিজীবন ভট্টাচার্য্যের হাট, ঠিক তাহারই লাগওয়া সেই নদীর উপর অনেকখানি খোলা জমি পড়িয়াছিল। সে জমির মালিক চারু দত্ত। সে বেশ একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। নির্ব্বিরোধ, সদানন্দ। এমন লোক গ্রামের মধ্যে ক্বচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

হরিজীবনের আত্মীয়েরা গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিল। ঐ খোলা জমির উপর হাট বসাইতে হইবে।

চারু দত্ত তাহাদের প্রস্তাবে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আবার হাট কি হবে? দেশের লোকের খুব অভাব ছিল বটে, তা' হরিদা'র হাটটা হ'য়ে লোকের আর কোন কষ্ট নেই।"

কুঞ্জ ভট্টাচার্য্য কহিল, "ও হাটটার কত লাভ হয় জান হে?"

চারু কহিল, "তা' জানিনে, কিন্তু কিছু হ'লেই ভাল, হরিদা' যে এত খেটে-খুটে গ্রামের লোকের এতবড় একটা অভাব দূর কর্‌লে, তা'তে যদি সে কিছু পায়, সে ত খুব আহ্লাদের বিষয়, আমার ভয় হচ্ছিল, তা'র না কিছু নোকসান হয়।"

শিব ভট্টাচার্য্য মাথা নাড়িয়া কহিল, "আরে রাম, নোকসান! হরিখুড়ো খরচ যা', করেছিল, তা' ত এক মাসেই তুলে নিয়েচে। বছরের শেষে কত লাভ হ'য়েচে জান? পাঁচ শ' টাকা! কত টাকা খরচ কর্‌লে তবে পাঁচ শ' টাকা আয়ের সম্পত্তি হয়!"

কুঞ্জ ভট্টাচার্য্যের বুকের মধ্যে জ্বালা করিয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি কহিল, "ওসব কথা যেতে দাও হে শিবু। এখন কাজের কথা হ'ক, দেখ চারু তোমাকে আমাদের একটা উপকার কর্‌তে হবে।"

চারু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "তোমরা ও কি বলচ? ব্রাহ্মণ পূজনীয়। কি কর্‌তে হবে আমাকে আজ্ঞা কর।"

কুঞ্জ ভট্টাচার্য্য মহাখুসী হইয়া বলিল, "তোমার ঐ খালি জমিটায় একটা হাট বসাতে হ'বেই—আগে শোন, তোমার কোন খরচ-পত্র হ'বে না, সে সব আমরা ভার নেব, শুধু তোমার নামে হাটটা আমরা চালাতে চাই, হরি ত জান আমাদের একেবারে নিকট আত্মীয়, এক বাড়ীতে থাকি বল্‌লেই হয়। আমরা রটিয়ে দেব, তুমি আর একটা হাট বসাবে—বুঝ্‌লে, তা' হ'লে গ্রামের পাঁচ জনে, আমাদের অত্মীয়-কুটুম্বেরা আর কিছু বল্‌তে পারবে না"—চারু কি বলিতে যাইতেছিল, কুঞ্জ বাধা দিয়া কহিল, "আহা অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আগে শোনই সব—এর জন্যে বৎসরান্তে ঘরে বসে' তুমি দু' শ' টাকা করে' পাবে। ব্যস্, আর কি চাই! কাল থেকেই আমরা তবে লেগে যাই?"

শিবু কহিল, "ঘরে বসে' দু' শ' টাকা, এক পয়সা খরচ নেই,—এ ত মস্ত ভাগ্যের কথা—এতে চারু আর বল্‌বে কি, তুমি লেগে যাও ঠাকুর্দ্দা।"

চারু মহা ভীত হইয়া উঠিল। সে কখনও কাহারও 'সাতে-পাঁচে' থাকে নাই। আজ এ কি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল! কি করিয়া সে উদ্ধার পাইবে! হাত জোড় করিয়া সে কহিল, "কুঞ্জখুড়ো আমায় মাপ কর,—হরিদা'র ওতে ক্ষতি হ'বে, আমি অমন কাজ করতে পার্‌ব না।"

কুঞ্জ ভট্টাচার্য্যের মুখ গম্ভীর আকার ধারণ করিল, সে খানিকক্ষণ 'গুম্' হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, "যা'তে তোমার দু'পয়সা হয়, তা'র চেষ্টা কর্‌চি বলে' আমরা হ'লাম তোমার পর, আর হরিজীবন যে তোমাকে ডেকে দুটো কথা বলে না, সেই হ'ল আপনার, কলির ধর্ম্মই বটে!"

চারু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "একি কথা বল্‌চ কুঞ্জখুড়ো? তোমরা আমার পর? আমি শুধু বল্‌ছিলাম হরিদা'র ক্ষতি হ'বে, মিছামিছি ও হাঙ্গামার মধ্যে গিয়া আমার কাজ নেই।"

কুঞ্জ একটু নরম হইয়া কহিল, "আমি কি তোমায় চিনিনে হে চারু? তা' আমি খুব ভালই জানি,—ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলে' ফেলেচি, কিছু মনে ক'র না। তা' হ'লে কাল থেকেই হাট বসাবার বন্দোবস্ত করে' ফেলিগে।"

আবার সেই কথা! চারু প্রমাদ গণিল। কাতরকণ্ঠে কহিল, "কুঞ্জখুড়ো, ওতে কাজ নেই; ওসব হাঙ্গামে যেতে চাইনি—দোহাই তোমার, তুমি রক্ষে কর।"

শিবু দেখিল, সোজা কথায় কাজ হইবে না। সে একটু চড়া গলায় কহিল, "তা' হ'লে সোজা কথা বলে' দাও না হে, তুমি একলাই হাট বসাবে, আমাদের ওর মধ্যে নেবে না।"

চারু শিহরিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! ভয়-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আমি ত স্বপ্নেও ও-কথা ভাবিনি শিবু।"

কুঞ্জ দেখিল, তাহারা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহা এত সহজে সিদ্ধ হইবার নহে। চারু দত্তকে সহজে ইহার মধ্যে ভিড়ান যাইবে না। টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া বলিলেও সে স্বীকৃত হইবে না। অথচ হরিজীবন যে নির্ব্বিবাদে তাহাদের চোখের উপর এতগুলো টাকা ভোগ করিবে, ইহা কিছুতেই হইতে পারে না। উপায় একটা করিতেই হইবে। কিন্তু কি করা যায়? কুঞ্জ ভট্টাচার্য্য মহা সমস্যার মধ্যে পড়িল। দুই চোখ মুদিত করিয়া ভাবিতে লাগিল, তা'ই ত! হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। অকূল সাগরে সে যেন এতক্ষণে কূল পাইল। তাহার বিষণ্ণ মুখের উপর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "যা'ক্ হে চারু, ও-কথা যা'ক্, তোমার যখন ওতে আপত্তি, তখন আর ওতে দরকার নেই, তুমি তবে এই কাজটা কর, এতে ত তোমার কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে না, তুমি ঐ জমিটা আমাদের জমা দাও, যা' ন্যায্য খাজনা তা'ই

নিও। হাট আমরা বসাবই,—তোমার নামে নাই-ই হ'ল, না হয় আর একজনের নামে করা যা'বে, টাকা পা'বে—লোকের আবার অভাব!"

শিবু কহিল, "তুমি ঠিক মতলব বের করেচ ঠাকুর্দ্দা। হাট বসিয়ে হরিদা' অহঙ্কারে মাটিতে পা ফেলে না। আমাদের শুনিয়ে'-শুনিয়ে হাটের জাঁক করা হয়! সে জাঁক ভাঙ্‌তেই হ'বে। আর দেরী করা নয়, কাল সকালেই লেখাপড়া করে' নাও।"

কুঞ্জ কহিল, "সেই ভাল, তবে আজ এক কাজ কর চারু। আমরা পাঁচটা টাকা বায়না বলে' এখনই দিয়ে যাচ্চি, তুমি একটা রসিদ দিয়ে দাও।" বলিয়া তখনই পাঁচটী টাকা বাহির করিল।

চারু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল চারিদিক্ হইতে বিপদের মেঘ যেন ক্রমান্বয়ে ঘনাইয়া আসিতেছে। জমি খালি পড়িয়া আছে, জমা না দিলে কুঞ্জখুড়ো বিষম চটিয়া যাইবে, আর জমা দিলে কুঞ্জখুড়ো নিশ্চয়ই হাট বসাইবে, হরিদা' মনে করিবে ভিতরে ভিতরে তাহারও সহিত এই নূতন হাটের সম্বন্ধ আছে, সে শত্রু হইবে। চারু দত্ত উভয় সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়া হতবুদ্ধির মত হইয়া গেল। কুঞ্জখুড়ো ভাবিবার অবধি সময় দিবে না। এখনই পাঁচ টাকা বায়না লইয়া রসিদ দিতে হইবে।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কুঞ্জ বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "চুপ করে' রইলে যে, দেবার মতলব নেই—সোজা কথা বলে' দাও আমরা চলে যাচ্চি।"

চারু পুনরায় জোড়হস্তে কহিল, "তুমি, হরিদা', দু'জনেই আমার আপনার।"

কুঞ্জ এবার বিষম চটিয়া উঠিয়া কহিল, "সব বুঝেচি, আর বল্‌তে হ'বে না। কা'র সঙ্গে চালাকি কর চারু, আমরা সাত-পুরুষে জমিদার, তোমার মত লোকের কাছে আসাই আমাদের অন্যায় হয়েচে। অধমের কাছে যাজ্ঞা করতে নেই—সে কথা ত আমরা মানিনে, তা'ই এই অপমান মাথা পেতে নিতে হ'ল। আচ্ছা দেখে নেব, এর শোধ নিতে পারি কি না।"

শিবু দুই চোখ ঘুরাইয়া কহিল, "আমাদের অপমান করা! তোমার এই সাত-পুরুষের বাস উঠিয়ে তবে ছাড়্‌ব। শিবু ভট্‌চায্যিকে ত চেন না! ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন দিয়ে তবে অন্য কাজ।"

এই বলিয়া তাহারা দুইজন ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। চারু কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

চারুর স্ত্রী সুহাসিনী আসিয়া কহিল, "আচ্ছা তা'র জন্যে অমন মুখ ভারি করে' বসে' রইলে কেন? আমি ত সব শুন্‌লাম, তুমি ত ঠিকই করেচ,—আমরা খেয়ে-দেয়ে এককোণে পড়ে' আছি, আমাদের ওসব হাঙ্গামে যাওয়ার দরকার কি বল? তুমি বুঝি অমনই ওঁদের কথায় ভয় পেয়ে গেছ? আমরা কিছু কর্‌লাম না, আর শুধু-শুধু আমরা ভিটে-ছাড়া হ'ব? ভগবান্ ত আছেন, তিনি আমাদের রক্ষা করবেন, অত ভাবনা কিসের?"

চারু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি ঠিক বলেচ সুহাস, আমি ত কখনও কারো ক্ষতি করিনি, ভগবান্ কি এটা দেখবেন না?"

সুহাসিনী কহিল, "নিশ্চয়ই দেখ্‌বেন। হ্যাঁ গো ভাল কথা, গোলমাল শুনে রাঁধ্‌তে রাঁধ্‌তে আমি তাড়াতাড়ি উঠে এসেচি, চারিদিকে সব ছড়ান পড়ে' আছে—খোকা এখনও পড়ে' ফেরেনি, তুমি চল, রান্নাঘরে গিয়ে একটু বস্‌বে, আমি তাড়াতাড়ি রান্নাবান্নাগুলো সেরে নিই গে।"

(২)

পরদিন সারা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, চারু দত্ত এক নূতন হাট বসাইবেন। হরিজীবন ভট্টাচার্য্যকে জব্দ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

হরিজীবন স্বয়ং আসিয়া চারু দত্তের গৃহে উপস্থিত হইল। চারু দত্ত তখন ফুল তুলিতেছিল। হরিজীবনকে দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, "এস হরিদা' এস।"

হরিজীবন গম্ভীরমুখে কহিল, "এ সব কি চারু? এক গ্রামে বাস করি, এতটা করা কি ভাল? তোমাকে ত আমি বরাবর ভাল লোক বলে'ই জান্‌তাম, কালে সবই সম্ভব হয়। তুমি এখন স্বীকার কর্‌তে না পার, কিন্তু গ্রামের অনেকেই জানে তোমার বাপ-ঠাকুর্দ্দা আমাদের খেয়েই মানুষ, তোমার না হয় দু'-পয়সা হয়েচে, তা'ই বলে' এমনই নেমকহারামি কর্‌তে হয়! একবছর আগে হাট বসালেই ত পার্‌তে, এখন আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটা জিনিষ গড়ে' তুল্‌লাম, আর তা'ই কি না তুমি ভেঙ্গে দেবার মতলব করেচ! বলে' রাখচি চারু, এত অন্যায় ধর্ম্মে স'বে না। শুধু তা'ই নয়, তুমি আমার সেজখুড়ো, আর নখুড়োর ছেলে শিবুকে তোমার দলে ভেড়াতে চেষ্টা করেছিলে! ছি, ছি! এ যে হাড়ি-ডোমের-বেহদ্দ কাজ!"

চারু নির্ব্বাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এক-রাত্রের মধ্যে এতবড় একটা মিথ্যা আপনা-আপনি গড়িয়া উঠিয়া, মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে! হায়, সে কি করিবে! কেমন করিয়া বুঝাইবে ইহার অতি বড় মিথ্যা কথা!

তাহাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া হরিজীবন জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "পরশুই হাট বসাবে না কি? কাল রাত থেকেই লোক লাগান হয়েচে, দোকান ভাঙ্গিয়ে আন্‌বার জন্যে। আচ্ছা দেখা যাবে তুমি কত বড় খেলওয়াড়। জেলে যেতে হয় তা'ও স্বীকার, তবু তোমাকে হাট বসা'তে দেব না। দেখি, কোন্ দোকানদার তোমার জায়গায় গিয়ে বসে। ভট্টাচায্যিদের ত চেন না। এইবার বেশ করে' চিনিয়ে দেব। কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে' জলে বাস কর্‌বে ঠাওরেচ?" এই বলিয়া ক্রোধান্ধ হরিজীবন দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

চারু দত্তর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! এ কি ষড়যন্ত্র! যে হরিদা'র অনিষ্ট হইবে জানিয়া সে জমি অবধি জমা দিতে চাহে নাই, আর সেই হরিদা' কি না তাহাকে এমন কথা বলিয়া গেল! এই সাত পুরুষের ভিটা তাহা হইলে সত্যই কি ছাড়িয়া যাইতে হইবে? দেখিতে দেখিতে গ্রামের অনেকে চারু দত্তর বাড়ী আসিয়া জমা হইল।

একজন বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "আমাদের চারুবাবুর হাটটাই খুব জম্‌বে ভাল, মস্ত জমিদার লোক।"

আর একজন কহিল, "তা' বটেই ত, হরি ভট্‌চায্যি একজন হেজি-পেজি লোক বইত নয়, সে কি চারুবাবুর মত অতবড় লোকের সঙ্গে টক্কর দিয়ে পার্‌বে?"

অপর একজন কহিল, "তা' জান না হে, ভট্‌চায্যি ম'শাই যে চারুবাবুর ভয়ে এরি মধ্যে হাটের ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেল্‌তে হুকুম দিয়েচেন।"

চতুর্থ ব্যক্তি অমনই কহিল, "বেচারী তা' না করে' আর

কি করে বল? চারুবাবু হাট বসালে, তার হাটে লোক আস্‌বে কেন?"

পঞ্চম এক ব্যক্তি কহিল, "দোহাই চারুবাবু, আমি গরীব মানুষ, ভট্‌চায্যি ম'শায়ের কাজ করে' পেট ভরে না। আমায় আপনার হাটের গোমস্তা করে' দেবেন।"

ষষ্ঠ ব্যক্তি উচ্চ হাসিয়া কহিল, "ওহে থাম থাম, আমার কথাটা আগে বলে' নি, দেখুন চারুবাবু, আপনি ওসব কথায় কাণ দেবেন না, আপনার হাটের জন্যে ত খুব বড় বড় ঘর হ'বে—দয়া করে' আমায় তার কণ্ট্রাক্টারি দেবেন, খুব সস্তায় করে' দেব।"

বেচারী চারু দত্ত! এমনই করিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে একেবারে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তুলিল। বেলা প্রায় এগারটা অবধি এইভাবে চারু দত্তের উপর অবিশ্রান্ত বিদ্রূপের বাণ বর্ষিত হইতে লাগিল। তবে গ্রামে চারু দত্তর বন্ধুর সংখ্যাও কম ছিল না। তাহারা ঐ সংবাদ শুনিয়া তাহাকে উৎসাহিত করিতে আসিল। এ কথার মূলে যে কোন সত্য নাই, ইহা অনেক করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের সে নিরস্ত করিল।

একজন চাষা অদূরে নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। সকলে চলিয়া যাইবার পর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সে কহিল, "কর্ত্তা, তুমি হাট বসাবে, এইবার আমাদের ছেলে-পুলে দুটো খেয়ে বাঁচ্‌বে—ক্ষেতের ফল বেচে যে কয় পয়সা পাই, তা'র অদ্দেকের ওপর ভট্‌চায্যি ঠাকুরকে দিয়ে আস্‌তে হয়, তুমি হাট বসালে, ও-হাটে কেউ যা'বে না কর্ত্তা।"

প্রায় দুই ঘণ্টা হইল চারু দত্তর পুত্র শিশিরকুমার স্কুলে চলিয়া গিয়াছে। সুহাসিনী হাতের কাজ সারিয়া স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া ঘর-বাহির করিতেছিল। একরাত্রের মধ্যে এ কি কাণ্ড বাধিয়া বসিল! এই ব্যাপারে তাহার স্বামী যে কতবড় আঘাত পাইয়াছেন, তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া সে অন্তরের মধ্যে ক্ষুব্ধ ও পীড়িত হইয়া উঠিল। যে কলহ জিনিসটাকে তাহার স্বামী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয় করিত, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যে জিনিসটাকে সে এতদিন প্রাণপণ শক্তিতে পরিহার করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা সেইটাই যে এমনভাবে আসিয়া তাহার উপর চাপিয়া পড়িল, একথা ভাবিয়া সুহাসিনী অন্তরের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল! এই বিপদ হইতে কি করিয়া উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে, গালে হাত দিয়া বসিয়া সে এই কথাই চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় চারু বিষণ্নমুখে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ডাকিল, "সুহাস!"

সুহাসিনী মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "এই যে এসেচ, আমি ভেবে-ভেবে একেবারে সারা হচ্ছিলাম। কখন্ রান্না হ'য়ে গেছে বল ত। লোকগুলোর কি একটু মায়া-দয়া নেই! চান ক'রে খেয়ে নেবে চল।"

(৩)

প্রতিদিন এই কলহটা বেশ আপনা-আপনি পাকিয়া উঠিতে লাগিল। এই ঘটনার পরদিন প্রাতঃকালে হরিজীবন গ্রামের পাঁচ-জন মাতব্বর লোককে ডাকিয়া দেখাইল, চারু দত্ত এক রাত্রের মধ্যে তাহার জমির উপর দুই তিনখানি চালা বাঁধিয়াছে। তাহার পর কহিল, চারু লোকটা মুখে খুব সাধুগিরি ফলায়, কিন্তু পাকা ধড়িবাজ্। ভেতরে-ভেতরে সব জোগাড় ক'রে ফেলেচে, অথচ কেউ আগে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পারেনি। উচ্ছন্ন যাবে, ব্রাহ্মণের অন্নে হাত দেওয়া!"

চারু দত্ত এ সংবাদ পাইল। সে বুঝিল, এটা কুঞ্জ ও শিবু ভট্টাচার্য্যের কাজ। তাহাকে জব্দ করিবার জন্য তাহারাই গোপনে গোপনে এই কাজ করিয়াছে। সারাদিন সে বিষম উদ্বেগে কাটাইল। রাত্রে গিয়া কুঞ্জ ভট্টাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "খুড়ো, রক্ষে কর।"

কুঞ্জ কহিল, "সবই ত তোমার হাতে বাপু। তুমি এখনও রাজি হও, দেখ আমরা কি করি। তুমি যে হাট বসাচ্চ, এ-কথা ত চারিদিকে রটে'ই গেছে। হরি যা' রাগবার তা'ও রেগেচে। এখন জমিটা আমাদের ছেড়ে দাও। সেই দু' শ' টাকা ক'রেই আমরা দেব।"

চারু নীরব হইয়া রহিল। জানিয়া-শুনিয়া সে কিছুতেই অপরের ক্ষতি করিতে পারিবে না। সত্য একদিন আপনিই আত্মপ্রকাশ করিবে। হরিদা' নিশ্চয়ই একদিন বুঝিতে পারিবে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ—পাঁচজনে চক্রান্ত করিয়া তাহার নামে মিথ্যা কথা রটাইয়াছে। কুঞ্জ ভট্টাচার্য্যের কাছে দয়ার প্রত্যাশা করা নিষ্ফল। এই ভাবিয়া চারু প্রকাশ্যে কহিলেন, "যা' আমার অদৃষ্টে আছে হ'বে। আমি ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি, এতবড় অন্যায় আমি কিছুতেই কর্‌তে পার্‌ব না। হরিদা'র ক্ষতি আমি কর্‌তে পার্‌ব না।

কুঞ্জ ভট্টাচার্য্য গর্জ্জিয়া উঠিল, "বটে! ধর্ম্মজ্ঞান যে দেখ্‌চি খুব টন্‌টনে! দাঁড়াও!" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "হরি—হরি, দেখ্‌বে এস, চারু দত্তটার আক্কেল দেখ্‌বে এস। বলে কি না পঞ্চাশ টাকা এখনই দিচ্চি, তুমি কালই হাটটা যা'তে জমে তা'র চেষ্টা কর। খুড়ো-ভাইপো এক ভিটের বাস করি—আর কি না এমনই করে' ঝগড়া বাধাস। সাহস দেখে যাও, বাড়ীর ওপর বসে' কি না এই কথা!"

এই চীৎকারে বাড়ীর অনেকে আসিয়া সেখানে জমা হইল। হরিজীবনও আসিল। দেখিল, চারু দত্ত মুখটী নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত দেহ তখন ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। চোখ-মুখ-কাণ দিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতেছিল।

ক্রোধান্ধ হরিজীবনের আর সহ্য হইল না। সে পায়ের খড়ম্ খুলিয়া চারু দত্তর পিঠের উপর সজোরে আঘাত করিয়া কহিল, "পাজি, নচ্ছার, বাড়ীর ওপর এসে ঘর-ভাঙ্গান! সর্ব্বনাশ হবে, সর্ব্বনাশ হবে!" এই বলিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার ঘাড় ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিল।

অপমানিত, লাঞ্ছিত আহত চারু দত্তর চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেই অন্ধকারের মধ্যে খানিকক্ষণ সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চিন্তাভারাক্রান্ত-হৃদয়ে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। খড়মের আঘাতে পিঠের যে জায়গায় কাটিয়া গিয়াছিল, সেই জয়গা ফুলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তখনও রক্ত একেবারে শুকাইয়া যায় নাই।

পরদিন হাট-বার। হরিজীবন ভট্টাচার্য্য সদলবলে হাটে উপস্থিত রহিল। তাহাদের দেখিয়াও দুই তিনজন কৃষক তরি-তরকারীর ঝুড়ি লইয়া চারু দত্তর জমির উপর গিয়া বসিল। তাহাদের দেখাদেখি দুই একজন বেপারী ভট্টাচার্য্য-দের হাট হইতে উঠিয়া নূতন হাটে জমা হইতে লাগিল। হরিজীবন সকলকে প্রথমে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায়, তা'রপর শাসাইয়াও যখন দলে আনিতে পারিল না, তখন শেষে তাহাদের

'তোলা' লইব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া নিজের হাটে লইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে বিষম গোল বাধিয়া গেল। ঝড়ের মুখে হাটের মধ্যে ঐ কথা প্রচারিত হইয়া গেল। কাহারও নিকট হইতে হরিজীবন সে দিন এক পয়সা আদায় করিতে পারিল না। উপরন্তু সারাদিন বেপারীদের মনস্তুষ্টির জন্য তাহাকে নানারূপ তোষামোদ করিতে হইল। সমস্তদিনের ক্লান্তি, অবসাদ, অপমান বহন করিয়া বাটী ফিরিবার সময় হরি-জীবন প্রতিজ্ঞা করিল, পরের হাটের আগে এর প্রতিশোধ লইয়া তবে অন্য কাজ।

গোলযোগের ভয়ে চারু দত্ত সেদিন হাটে যায় নাই। বাড়ী বসিয়া সে সমস্ত খবর পাইল। এ কথাও শুনিল, হরিজীবন আস্ফালন করিয়া বলিয়াছে, তাহাকে খুন করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবে।

সুহাসিনী এ সংবাদ পাইয়া ভয়ে একেবারে ম্রিয়মাণা হইয়া গেল! কি সর্ব্বনাশ! তবুও স্বামীকে ভরসা দিবার জন্য সে প্রকাশ্যে কহিল, "এ কি মগের মুলুক, বল্লেই একজনকে খুন করা যায়! তা' ছাড়া ভগবান্ ত আছেন, তাঁ'র চোখের উপর তিনি এতবড় অত্যাচার করতে দেবেন! কখ্খন না। তুমি অমন করে' ভেব না।" সে মুখে এই কথা বলিল বটে, কিন্তু সে মনে মনে বিষম শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই তিনদিন আগে বাড়ীর উপরে পাইয়া যে বিনা অপরাধে তাহার স্বামীকে নির্দ্দয়ভাবে খড়ম্-প্রহার করিয়া বহিস্কৃত করিয়া দিতে পারিয়াছে, সে ত রাগের মাথায় অনায়াসে খুনও করিতে পারে! বিধাতার পায়ে তাহারা এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যাহার জন্য, ভগবান্ এমনই বিপদের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন! কি করিয়া স্বামী তাহার এ বিপদের হাত হইতে মুক্ত হইবে! এই ভাবিয়া সে একবার স্বামীর মুখের দিকে কাতরভাবে চাহিল।

চারু দত্ত হাসিয়া বলিল, "দেখ, আমি ওজন্যে ভাব্‌চি না। হরিদা' হয় ত রাগের মাথায় বলেছে, সত্যিই কি সে আমায় খুন করতে যাবে!"

সুহাসিনী কহিল, "অতি বড় শত্তুরকে বাড়ীতে পেলে লোকে একটা কড়া কথা অবধি বলে না, আর সে কি না তোমায় অমন-ভাবে খড়ম দিয়ে মারলে, দেখদেখি সেই জায়গা লাল হ'য়ে ফুলে রয়েছে। ওদের কি মায়াদয়া আছে!"

চারু কহিল, "দোষ ত সেদিন কুঞ্জ খুড়োরই বেশী, সেই ত অতবড় মিথ্যে কথা বলে' চেঁচাতে লাগ্‌ল, তা'ই শুনে ত হরিদা' রেগে ছুটে এল। অমন কথা শুন্‌লে কা'র না রাগ হয়?"

সুহাসিনী কহিল, "আচ্ছা, মানুষের ত আগে জানা উচিত তুমি সত্যি ওসব কথা বলেচ কি না, কোথায় কিছু নেই অমনই মার, সে কি যেমন-তেমন মার, পিঠ ফেটে একেবারে চৌ-চাক্‌লা হ'য়ে গিয়েচে!"

চারু কহিল, "সে যা' হ'বার তা' ত হয়েছে, এখন এ হাঙ্গাম মেটাই কি করে' বলদেখি, কি করে' হরিদা'কে বিশ্বাস করাই আমার কোন দোষ নেই। কুঞ্জখুড়ো আর শিবু যেসব কাণ্ড আরম্ভ করেচে, তা'তে শেষে হয় ত বেশীরকম একটা হাঙ্গামা হ'তে পারে, সেইটে আমি সব চেয়ে বেশী ভয় করচি।"

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সম্মুখের নদীর উপর জ্যোৎস্নার প্লাবন নামিয়া আসায় নদীর রূপ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তখনও দুই একজন গ্রাম্যবধূ সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিত নদীর জলে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া একদৃষ্টে নদীর রূপ দেখিতে-ছিল—কেমন করিয়া মৃদু-প্রবাহিত বায়ুর সংস্পর্শে নদীর জল আঁকিয়া-বাঁকিয়া নৃত্য করিতেছে!

তাহার স্বামীর কথার উত্তরে সুহাসিনী কহিল, "আমারও বড্ড ভাবনা হয়েচে—তা দেখ, আমি একটা কথা ভাব্‌ছিলাম, তোমার কি মনে হয়?"

চারু কহিল, "কি বল ত? হাঙ্গামাটা মিটে গেলেই বাঁচি।"

সুহাসিনী কহিল, "আমি ভাব্‌ছিলাম একবার ভট্‌চায্যি-গিন্নীর সঙ্গে দেখা করে' সব কথা খুলে বলি, তা' হ'লে কি তিনি বিশ্বাস কর্‌বেন না?"

চারু কহিল, "বিশ্বাস কর্‌বে কি না তা' জানিনে, কিন্তু যদি তোমায় ওরা কেউ অপমান করে?"

সুহাসিনী দৃপ্তকণ্ঠে কহিল, "আমায় অপমান কর্‌বে, এ গ্রামে এমন কেউ নেই।"

চারুও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল, "আমাকে মারুক, অপমান করুক, সব মুখ বুজে সইব, কিন্তু তোমাকে কেউ যদি অপমান করে, কিংবা আমার শিশিরকে এই জন্যে যদি কেউ কিছু বলে, তা' কিন্তু আমার সহ্য হ'বে না।"

এমন সময় বই-শ্লেট-খাতা লইয়া শিশির সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

সুহাসিনী তাহার দিকে চাহিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো দেখ না কে এমন করে' আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে!"

শিশিরের কপালটা কে যেন কি দিয়া ছেঁচিয়া দিয়াছে! তাহারই ফোঁটা-ফোঁটা রক্তে বালকের দুই ভ্রূ রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, দুই তিন ফোঁটা রক্ত চোখের কোণ্ বাহিয়া গালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। সে তখনও ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল!

চারু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার একবার মনে হইল, হয় ত সে রাস্তায় হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হইলে এমনভাবে কপাল ছেঁচিয়া যাইত না।"

শিশির ততক্ষণে বই-শ্লেট মেঝের উপর ফেলিয়া জননীর কোলের উপর আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সুহাসিনী তাহাকে দুই হাতে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে কহিল, ওগো দেখ না, বাছা আমার অমন করে' প'ড়ল কেন!

চারু নিকটে আসিয়া শিশিরের গায়ে হাত দিয়া ডাকিল, "শিশির, বাবা!"

শিশির এবার হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তেমনই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "কপালটা জ্বলে' গেল বাবা!"

চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটু রেড়ীর তেল আনিয়া—সেই ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিতে দিতে কহিল, "এইতে জ্বালাটালা সব কমে যা'বে'খন। অমন কর' না বাবা, এখনি সেরে যাবে।"

শিশির চীৎকার করিয়া উঠিল, "ও বাবা, আর দিও না, বড্ড জ্বালা কর্‌চে, ওমা, মাগো জ্বলে' গেল যে মা!"

সুহাসিনীর মুখ দিয়া একটা সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না। সে শুধু তাহার কম্পিত হাতখানি আহত বালকের মাথায়, গায়ে বুলাইতে লাগিল। জননীর কোমল স্পর্শে তাহার যন্ত্রণা যেন বেশ কমিয়া আসিতেছিল।

শিশির ধীরে ধীরে কহিল, "আমি মা কিছু করি নি—তবুও আমায় মাল্লে।"

সুহাসিনী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে মার্‌লে বাবা?"

চারু দত্তর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইতেছিল।

শিশির ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে কহিল, "হরিজেঠাম'শায়।"

চারুদত্তর দুই চোখ দিয়া আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে চাহিল।

শিশির আবার কহিল, "আমি যখন মা হরিজেঠা'মশায়ের পুকুরের কাছে দিয়ে আসচি, হরিজেঠাম'শায় তখন পুকুর থেকে বাড়ীর দিকে যাচ্ছিল—আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়্‌ল—সত্যি বাবা আমি তা'কে ছুঁই নি, হরিজেঠা বল্‌লে, বাপ-বেটা দুইই সমান, পাজি, নচ্ছার আমায় ছুঁলি কেন রে? আমি ত ছুঁই নি মা, আমি তাই বল্‌লাম; হরিজেঠা বল্লে, আবার মিথ্যা কথা, আজ সারাদিন ওর বাপবেটা অপমান করেচে, আবার সন্ধ্যের সময় হতভাগা ছোঁড়াটার এই কাণ্ড, দাঁড়া, মজা দেখাচ্চি,—এই বলে' আমার ঘাড় ধরে' শিমুলগাছে মাথা ঠুক্‌তে লাগল। আমি যখন খুব চেঁচিয়ে কেঁদে উঠ্‌লাম, হরিজেঠা ছেড়ে দিয়ে চলে' গেল—বল্লে, আজ তোর শাস্তি হ'ল, কাল তোর বাবাকে—আমি বাবা আর কিছু শুন্‌তে পেলাম না—চোখেও কিছু দেখ্‌তে পেলাম না—পালিয়ে আস্‌তে গেলাম, তা'ও পার্‌লাম না, তা'ই রাস্তার ওপর বসে' প'ড়্‌লাম। এইটুকু আস্‌তে আজ এমনই কষ্ট হয়েচে মা! বড্ড জলতেষ্টা পেয়েচে, একটু জল দাও না মা!"

চারু তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল আনিয়া দিল। আজ তাহার সমস্ত সহ্য-সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। এতদিন সমস্ত অপমান, সমস্ত আঘাত সে নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে এবং হয় ত ভবিষ্যতেও করিত, কিন্তু তাহার শিশুপুত্রের উপর এই পশুজনোচিত নির্ম্মম ব্যবহারে তাহার অন্তর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিদ্রোহী অন্তরের মধ্যে কে যেন খোঁচা দিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল—শাস্তি চাই, শাস্তি চাই। সে আজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, হরিজীবনের হাট ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিব—যে গাছে সে তাহার পুত্রের মাথা ছেঁচিয়া দিয়াছে, সেই গাছে তাহার মাথা ছেঁচিয়া ইহার প্রতিশোধ লইব।

(৪)

রাত্রি একটা অবধি শিশির বেশ ঘুমাইল। তাহার পর হইতে সে যেন কেমন অস্থির হইয়া উঠিল। চারু দত্ত গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছে। এতবড় আঘাতের পর জ্বর! তাহার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। স্বামী স্ত্রী উৎকণ্ঠিত হইয়া শিয়রে বসিয়া রহিল। ঘণ্টা দুই জ্বরভোগের পর, শিশির যেন ক্লান্ত হইয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

সুহাসিনী কহিল, "হ্যাঁ গা যা'দের ছেলে-পুলে আছে, তা'রা পরের বাছাকে এমন করে' মার্‌লে—মার্‌বার সময় একবার নিজের ছেলের কথা মনে প'ড়্‌ল না!"

চারু কহিল, "ওরা কি মানুষ!"

সুহাসিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি জানি, ওদের প্রাণটা কেমন! কারুর ছেলের অসুখের কথা শুন্‌লে, আমার বুকটা কেঁপে ওঠে! হ্যাঁ গা তোমার ওঠে না, বল ত, তোমার ওঠে না!"

শিশির আবার 'উঃ' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। চারু তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা যেন আরও গরম!

তখন বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে; সূর্য্যদেবও সারারাত্রির অনুপস্থিতির পর ধীরে ধীরে দিনের হাজিরা দাখিল করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। এমন সময় বাহিরে কে একজন "চারু-বাবু, চারুবাবু" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। চারু কক্ষের বাহিরে গিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। থানার জমাদার, দুই জন পাহারাওয়ালা, চৌকিদার, তাহা ছাড়া তাহাদের পিছনে গ্রামের অনেকগুলি লোক জনতা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জমাদারের মুখে চারু শুনিল, কাল রাত্রে চৌকিদার মাল-সমেত একটি চোর গ্রেপ্তার করিয়াছিল। চৌকিদার থানায় গিয়া নালিশ করিয়াছে, চারু দত্ত চৌকিদারকে মার-পিট করিয়া চোরকে ছাড়িয়া দিয়াছে। হরিজীবন ভট্টাচার্য্য ও গ্রামের আরও তিন চারিজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন। চারুকে তাঁহারা অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন। চারু দত্ত তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপও করে নাই।

* * * * *

চারু এ কয়দিন জামিনে খালাস ছিল। কাল তাহার অপরাধের বিচারের দিন। আজ তাহাকে রাত্রেই রওনা হইতে হইবে, না হইলে ঠিক সময়ে সে আদালতে পৌছিতে পারিবে না।

শিশিরের তখন ভয়ানক জ্বর। দেহে এত বেশী উত্তাপ, হাত দিলে মনে হয় যেন হাতে ফোস্কা পড়িয়া যাইতেছে! তাহার উপর সে অনবরত ভুল বকিতেছে! পুত্রকে এমনই অবস্থায় ফেলিয়া তাহাকে আজই রওনা হইতে হইবে! ডাক্তার বলিয়াছে, আর তিনদিন না কাটিলে কিছুই বলা যাইতেছে না! মৃত্যু-শয্যায় পুত্রকে ফেলিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হইবে!

চারু যখন বিদায় লইয়া বাহির হইবে, সুহাসিনী তাহার পায়ের উপর আছ্‌ড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "ওগো আমি কি ক'র্‌ব?"

চারু আজ আর চোখের জল রোধ করিতে পারিল না। ঐ যে অদূরে তাহার স্নেহের দুলাল বিকারের প্রলাপ বকিতেছে, পায়ের নীচে পড়িয়া আদরের পত্নী ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছে! তবুও তাহাকে যাইতে হইবে! বিনাদোষে তাহাকে কাঠ-গড়ায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে!

চারু দুই হাতে পত্নীকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "এখন তুমিই শিশিরের বাপ-মা, ভগবান্‌কে ডাক, প্রাণভ'রে ডাক, আর ওকে যত্ন কর—আর কিছু তোমার কর্‌বার নেই। যদি খালাস পাই, এম্‌নই হ'ক আর জরিমানা দিয়েই হ'ক, ভোররাত্রে এসে পৌছব—আর যদি জেল হয়, তবে কবে ফির্‌ব তা' ভগবান্ জানেন। আমি ফিরে আসা অবধি তুমি শিশিরকে বাঁচিয়ে রেখ। ফিরে এসে যেন তা'কে দেখ্‌তে পাই।" এই বলিয়া দ্রুতপদে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুহাসিনী মুমূর্ষু পুত্রকে লইয়া সেই নির্জ্জন পুরীর মধ্যে পড়িয়া রহিল। চারুর বিধবা ভগিনী তাহার একমাত্র সহায়।

(৫)

বিচারে চারুর একমাস জেল হইয়াছে। এ এক মাস সে পুত্রের কোন সংবাদ পায় নাই। কে তাহাকে সংবাদ দিবে? আজ সে মুক্তি পাইয়াছে; মুক্তিলাভের পর এক মাস পূর্ব্বের সেই পোষাক পরিয়া সে যখন পথের উপর আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার মনের ভিতর যেন কেমন খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল! তাহার মনে হইল, জেলের মধ্যে কয়েদীর জাঙ্গিয়া পরিয়া বন্দী হইয়া থাকাই তাহার

ভাল ছিল। বাড়ী গিয়া তাহাকে ত শূন্য গৃহ দেখিতে হইবে না! এখন বাড়ী গিয়া সে কি করিবে! কি দেখিবে! পুত্রহারা জননী হয় ত উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে! শিশিরের ছোট-ছোট কাপড়-জামাগুলি ঘরের চারিদিকে ঝুলিয়া রহিয়াছে; বই-শ্লেট-খাতা তক্তপোষের একধারে পড়িয়া আছে, কিন্তু শিশির নাই! সে আর ভাবিতে পারিতেছিল না। তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল! হঠাৎ তাহার মনে হইল, আহা শিশির আমার মরিবে কেন? সে নিশ্চয়ই সারিয়া উঠিয়াছে, জননীর কোলে বসিয়া তাহার অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া আছে! সে আর বিলম্ব করিল না—তখনই স্বগ্রামাভিমুখে রওনা হইল।

হরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ী পার হইয়া তাহার বাড়ী যাইতে হয়। হরি ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর নিকট আসিয়া পৌছিতেই চারুর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! ঐ সেই শিমূল গাছ না,—যে গাছে হরিজীবন শিশিরের মাথা ঠুকিয়া ছেঁচিয়া দিয়াছিল! এই ত সেই রাস্তা,—এক-মাস আগে ঠিক এমনই সময় শিশির আমার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, এই রাস্তার ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল! সবই ত তেমনই পড়িয়া আছে! আর আমার শিশির! চারু যেন আর চলিতে পারিতেছিল না,—পথের ধূলায় তাহার দুই পা যেন আবদ্ধ হইয়া যাইতেছিল! গভীর কাদার ভিতর দিয়া মানুষ যেভাবে অগ্রসর হয়, চারু ঠিক সেইভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হরিজীবনের বাড়ীর ঠিক পিছনে আসিয়া সহসা সে একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, সেই সদাকোলাহলমুখরিত বাড়ীটি যেন নির্জ্জন প্রেতপুরীর মত পড়িয়া আছে! শুধু যেন কাহার কাতর কণ্ঠস্বর, কাহার মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদ ঐ নির্জ্জন পুরীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া রহিয়া রহিয়া তাহার কাণের মধ্যে বাজিতেছে! পুত্রের আশঙ্কায় তাহার মনটা আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তবে কি সে নাই! চারু দ্রুতপদে সেস্থান অতিক্রম করিয়া গেল।

ঐ যে দূরে তাহারই গৃহে আলো জ্বলিতেছে! ঘরের সম্মুখে রাস্তার উপর কে একজন দাঁড়াইয়া আছে না।—তাহার জন্য দুইটী ব্যাকুল নয়নের দৃষ্টি লইয়া কে একজন দাঁড়াইয়া আছে না! ভাল করিয়া দেখিবার জন্য চারু দাঁড়াইয়া পড়িল। সত্যই সে যে একা! সঙ্গে ত ছেলে নাই! তবে আর গৃহে ফিরিয়া কি হইবে! শূন্য গৃহ দেখিতে পারিব না—সুহাসিনীর বুক-ভাঙ্গা কান্না শুনিতে পারিব না! কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল, সুহাসিনী হয় ত শিশিরকে এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—আমার সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার জন্য মৃত্যুশয্যায় আটকাইয়া রাখিয়াছে! দেরী হইলে হয় ত শিশির অবাধ্য হইয়া চলিয়া যাইবে, তা'ই অত ব্যাকুল হইয়া সুহাসিনী পথপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে! এই ভাবিয়া চারু নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া এক-রকম ছুটিয়া গৃহদ্বারে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া ও কে! সুহাসিনী ত নয়! তবে আমার শিশির নিশ্চয়ই নাই! সে বাঁচিয়া থাকিলে সুহাসিনী নিশ্চয়ই আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত! আমি যে তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলাম, আমি ফিরিয়া আসা অবধি সে যেন শিশিরকে বাঁচাইয়া রাখে! আমার কথা রাখিতে পারে নাই বলিয়াই সে বোধ করি লজ্জায় আমার সম্মুখে আসিতে পারে নাই!

চারু দত্তর তখনকার মূর্ত্তি দেখিয়া সেই রমণীটি ভীতা হইয়া উঠিয়া কহিল, "বাবু, আমায় চিন্‌তে পার্‌চেন না? অমন করে' দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? ঘরে চলুন।"

চারু চীৎকার করিয়া কহিল, "আমার শিশির, সুহাস?"

রমণীটি কহিল, "তা'রা ভাল আছে গো বাবু, আপনি একটু ঠাণ্ডা হ'ন, সব কথা বল্‌চি।"

চারু দত্ত দ্রুতপদে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল, দেখিল, শিশির তক্তপোষের উপর শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে। কিন্তু সুহাসিনী নাই। তবে কি সে-ই চলিয়া গিয়াছে! না হইলে, আজ এক-মাস পরে আমি জেল হইতে ফিরিয়া আসিলাম, সে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল না, একবার আমার সঙ্গে দেখা অবধি করিল না! চারু মাথায় হাত দিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

রমণীটি কহিল, "বাবু অমন কর্‌চেন কেন? উঠে মুখে-হাতে জল দিন।"

চারু আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, যদোর মা, সত্যি বল্, তোর বউদিদি কি নেই?"

রমণীটি কহিল, "ষাট্ ষাট্, অমন কথা বল্‌বেন না বাবু! সুহাসদিদি আমাদের ভাল আছেন। আপনি তা'র জন্যে ভাব্‌বেন না বাবু! তিনি যে এখন হরি ভট্‌চায্যির বাড়ী।"

চারু স্তম্ভিত হইয়া গেল। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "হরি ভট্‌চায্যির বাড়ী!"

যদুর মা কহিল, "হ্যাঁ গো বাবু, আজ যন্ত্রণা বড্ড বেড়েচে বলে' সুহাসদিদি আপনি আস্‌বেন জেনেও তা'কে ফেলে আস্‌তে পার্‌লেন না। আপনি এসে পৌছুলেই খবর দিতে বলেচেন।"

চারু অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের যন্ত্রণা, কার যন্ত্রণা?"

যদুর মা কহিল, "তুমি কি করে' জান্‌বে বাবু? ঐ যে হরি-ভট্‌চায্যির ছেলে রাম ভট্‌চায্যি, সে কল্‌কাতায় পড়্‌ত না, তা'র যে ভারি ব্যামো, আজ তিনদিন হ'তে মার অনুগ্রহ হয়েচে, সারাগায়ে যেন একেবারে ঢেলে দিয়েছে বাবু! সে যে কি যন্ত্রণা, তা' আর কি ব'ল্‌ব বাবু! ঐ ভয়েতে বাড়ীর সবাই পালিয়ে গেছে—আহা! হরিঠাকুরের অমন জলজ্যান্ত বউটা কি না আজ চা'র দিন হ'ল ওলাউঠায় মারা পড়েচে। রোগীর মুখে জল দেয় এমন একজন লোক নেই—হরিঠাকুর ত পাগলের মত হ'য়ে গেছে, কেবল মাথা খুঁড়্‌চে। আমাদের সুহাসদিদি না তাই শুনে ছুটে চলে' গেল, আমায় বলে' গেল—'তুমি আমার শিশিরকে দেখ, সে ত সেরে উঠেছে! আহা, রামের যে মা নেই!' বলিতে বলিতে যদুর মার চোখ দিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল।

সমালোচনায় মাসিক-সাহিত্য

কাককে যদি কোকিল বলিয়া ডাকা যায়, তবে যথেষ্ট হাস্য-রসের সৃষ্টি করা হয়; আমাদের মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনাও তেমনই একটা হাসি-তামাসার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যতদূর জানি, নিয়মিত মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার প্রথম সূত্রপাত হয়, "সাহিত্য"-পত্রে। বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনে" মাসিক-পত্রের সমালোচনা বারকয়েক হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা নিয়মিত ছিল না।

কিন্তু আজকাল মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা একটা সংক্রামক রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গালাগালি দিবার এ-হেন অস্ত্র হাতছাড়া করিতে পারেন, এমন সুবোধ সমালোচক বোধ করি, বাঙ্গালায় "কোটিকে গোটিক" পাওয়া যাইবে না!

সমালোচনা, লেখক তৈয়ারি করে; কিন্তু, আমাদের মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনায় লেখকসৃষ্টি না হইয়া শত্রুসৃষ্টি হয়। অসভ্য ভাষা, কুৎসিত ইঙ্গিত ও কর্কশ কথা আজকাল মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনার বিশেষত্ব। সমালোচকদের ভাষায় যে-সব শব্দ যখন তখন নজরে পড়ে, তাহার দু-চারিটির নমুনা দিতেছি:—"ন্যাকামি, দূতিগিরি, বেয়াদপ, তেহাই মারা, বাঁদরামি ও বানর" প্রভৃতি। কোন কোন সমালোচক অপরকে 'বখা ছেলে', 'চাষা লেখক', 'পেটে বোমা মারিলে বাজে বুকনি বাহির হয়,' বলিয়া পরম আপ্যায়িত করিয়াছেন। কেহ কেহ অপরকে 'ঘরজামাই' বলিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন, লেখকের মা-বাপ পর্য্যন্ত তোলেন! আসল কথা, যিনি নিজে মানী নন, তিনিই অপরকে অপমান করিতে পারেন, যাঁহার নিজের বিদ্যার 'ভাঁড়ে মা-ভবানী', তিনিই অপরকে মূর্খ বলিতে সাহস করেন। এমন প্রহসন অন্যদেশে অভিনীত হইলে, অভিনেতা বোধ করি হাত-পা হারাইতেন। প্রমাণ, গোল্ডস্মিথের 'সত্যিকার' চাবুক!

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা কিছু একটা সাহিত্য-ছাড়া জিনিষ নহে; বরঞ্চ সাহিত্যের একটা প্রধান বিভাগ। যদিও, ইহার মধ্যে স্থায়ী সাহিত্যের সম্পূর্ণ উপাদান নাই, তবু স্থায়ী সাহিত্যে এবং মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনায় একটা নিকট-সম্পর্ক আছে। কারণ, মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা মুখ্যভাবে না হউক, গৌণভাবে স্থায়ী সাহিত্য গঠন করে।

বাগানের মালীর যে কাজ, সমালোচকেরও সেই কাজ। নিপুণ মালী যেমন বাগানে আগাছা হইলে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দেয় এবং ভাল ফুলের গাছকে নানা যত্নে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে, সমালোচকও তেমনই সাহিত্যোদ্যান হইতে অক্ষমকে বিদায় দিয়া প্রতিভার ফুল ফুটাইয়া জগদ্‌বাসীর সঙ্গে তাহাকে পরিচিত করিয়া দেন। মাসিক-সাহিত্য-সমালোচকের কাজে যথেষ্ট দায়িত্বজ্ঞান, সাবধানতা ও সূক্ষ্ম বিচার-শক্তির আবশ্যক। মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা শত্রু-নিপাত বা প্রতিযোগীকে অপদস্থ করিবার জন্য নহে,—সমালোচক যেন এ কথা পদে পদে স্মরণ রাখেন।

যাঁহারা সাহিত্য-সেবা করেন, তাঁহাদের সামর্থ্য থাকুক আর নাই-ই থাকুক, তাঁহারা যে ভদ্রসন্তান এ কথাতে ত আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না! লিখিতে না পারিলেও লিখিতে যাওয়াটা অবিবেচনার কাজ হইলেও, তাহা একটা মহাপাপ নহে এবং তাহাতে কাহারও ভদ্রতাগৌরব কর্পূরের মত উবিয়াও যায় না। ভাল কথায় কাণ না দিলে, সমালোচক অক্ষম লেখকের প্রতি তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে 'ন্যাকা' বা 'বাঁদর' বলিয়া গালাগালি দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তবে যদি কেহ বলেন যে, 'The ' Ethiopian will not change his skin,''—তাহা হইলে আমরা অবশ্য নাচার! একথা ঠিক, এরূপ গালাগালি, যুক্তিহীনতা এবং ধৈর্য্যশূন্যতার ফল। কারণ, এটা আমরা ভালরকমেই জানি যে, তর্ক বা আলোচনায় যেখানে যুক্তি থাকে না, সেখানেই লাঠালাঠির হাঙ্গামা এবং গালাগালির তুবড়ী ফুটিতে সুরু হয়। তারপর, সমালোচনায় যখনই ধৈর্য্যহীনতা দেখা যায়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, সমালোচক একেবারেই শক্তিশূন্য, কারণ, স্থৈর্য্য এবং ধৈর্য্য না থাকিলে বিচার-কার্য্য চলে না।

মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনাকে রসরচনা বলিয়া ভ্রম করিলে চলিবে না। আমাদের মাসিক-সাহিত্যে যতটা রসিকতাপ্রকাশের চেষ্টা দেখি, ততটা আলোচনার প্রবৃত্তি কৈ? রস জিনিষটা যে খুবই ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু অস্থানে রস ছড়ানর মত বেরসিকতাও পৃথিবীতে বড় বেশী নাই। যুক্তির নিক্তিতে সমালোচক মাল ওজন করেন—রসরাজ সাজিবার অবকাশ তাঁহার কোথায়? নির্ম্মল কৌতুকহাস্যের সঙ্গে বিচার করিতে পারিলে সমালোচনা রসাল হয় বটে, কিন্তু যেখানে বিচারের বদলে সমালোচনায় রসিকতাই প্রধান হইয়া উঠে, সেখানে বাধ্য হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করিতে হয়! বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙ্গালায় আর বড় কেহ ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ কৌতুকহাস্য ও যুক্তিপূর্ণ বিচারকে এক জায়গায় দেখাইতে পারগ হন নাই। "সাহিত্য"-পত্রের উজ্জ্বল ও মধুর অতীতকালে হাস্যরসসিক্ত বিচার দেখিয়াছি বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে তথায় পুরাণ কাসুন্দির 'আচার' এবং সমালোচনার ব্যভিচার ছাড়া বিচার বা ভদ্রতার কিছুমাত্র নাই। পরন্তু, আধুনিক সমালোচনার ব্যভিচারে সাহিত্যের সমালোচক যতটা অনুকৃত হইয়াছেন, ততটা আর কেহ নন; সুতরাং বর্ত্তমান সমালোচনার অনাচারের জন্য আমরা কতক পরিমাণে 'সাহিত্য' সমালোচককে দোষী এবং দায়ী করিতে পারি।

আমাদের মাসিক সমালোচনার গলদ আছে ঢের। তাহার প্রধান দোষ, সমালোচক যুক্তিতর্কের ধার না মাড়াইয়া একেবারেই নিজের মতপ্রকাশ করেন। চিরপ্রসিদ্ধ কাজীর বিচারও এতটা উদ্ভট নহে। সমালোচকমাত্রেই, সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা সবজান্তা নন। মাসিক-পত্রে প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের প্রবন্ধই বাহির হইয়া থাকে। যে-কোন একজনমাত্র সমালোচক,—তা' তিনি যতবড়ই পণ্ডিত হউন না কেন,—সেই সকল বিষয়ের উপরে মতপ্রকাশ করিবার অধিকারী নন। বিশেষ, যেখানে আবার কারণ না দেখাইয়া মত জাহির করা হয়, সেখানে সমালোচকের অপরাধও অমার্জ্জনীয় হইয়া উঠে।—"অমুক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য,"—"অমুক প্রবন্ধটি মন্দ নহে,"—"অমুক প্রবন্ধটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে," "অমুক প্রবন্ধটি জঘন্য,"—"অমুক প্রবন্ধটি নগণ্য!"—জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সংক্ষিপ্ত ও অকারণ মতপ্রকাশের মূল্য কি? অমুক

প্রবন্ধটি কেন উল্লেখযোগ্য, অমুক প্রবন্ধ কেন সমালোচকের ভাল লাগিয়াছে, অমুক প্রবন্ধ কিসের জন্য জঘন্য বা নগণ্য?—ইহার উত্তর দিবে কে? আমাদের সমালোচক ইহার উত্তর দেন না। কারণ, সে প্রবন্ধ আলোচনা করিবার বিদ্যা বা শক্তি হয়ত তাঁহার নাই। সমালোচক হয়ত বিজ্ঞানের বিষয়ে কিছুই জানেন না। এখন, কোন বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে বসিয়া তিনি যদি আলোচনা না করিয়া সুধুই বলেন যে, 'এ লেখাটি ভাল,' বা 'এ লেখাটি মন্দ,'—তাহা হইলে আমরা এই অকারণ ব্যক্তিগত ভাল-লাগা বা না-লাগাকে কি সমালোচনা বলিয়া মানিয়া লইব? তা ত নয়! আমরা প্রথমে দেখিব, যে বিষয়ের সমালোচনা হইতেছে, সে বিষয় লইয়া সমালোচকের ঃ—

১। কিছু বলিবার অধিকার আছে কিনা?
২। সমালোচনায় যুক্তিতর্ক আছে কিনা?

আসল কথা, লেখা জিনিষটা প্রাণ দিয়া বুঝিতে হয়। বুঝিয়া যিনি আলোচনা করেন, তাঁহারই বিচার ও মতপ্রকাশ করিবার অধিকার আছে। পাঠকেরা খোকা নন; জলকে ডাঙ্গা এবং ডাঙ্গাকে জল বলিলেই তাঁহারা তাহার তলায় ঢ্যারা-সই দিবেন না।

আমাদের মতে, মাসিক-সমালোচনার পক্ষে নিম্নলিখিত পদ্ধতিটিই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকর। সমালোচক আগে সমালোচ্য কাগজখানির আগাগোড়া পড়িবেন। কাগজে লেখা থাকে চারিরকম। খুব ভাল, খুব খারাপ; মাঝারি-রকমের ভাল ও মন্দ লেখা।

যেগুলি খুব ভাল লেখা এবং যাহা পড়িলে বাস্তবিকই কিছু শেখা যায়, সমালোচক আগে সেগুলির সারোদ্ধার করিয়া দিবেন। তাহার পর সংক্ষিপ্তভাবে সেগুলির আলোচনা করিয়া মতপ্রকাশ করিতে হইবে। খুব খারাপ লেখা,—যাহাতে দুর্নীতি বা অশ্লীলতা বা অন্যায় কথা আছে এবং যাহা পড়িলে সমাজ বা দেশের বা সাহিত্যের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সমালোচক সেরূপ রচনার আলোচনাকালেও পূর্ব্ব-পদ্ধতি গ্রহণ করিবেন। কারণ, এই প্রণালীতে কাজ করিলে, পাঠকেরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারেন যে ঃ—

ক।—লেখক কি বলিতে চান?
খ।—সমালোচক, লেখকের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যে আলোচনা করিতেছেন, তাহা যথার্থ হইতেছে কিনা?
গ।—সমালোচকের আলোচনা ও মতে সঙ্গতি আছে কিনা?

সাধারণতঃ বাঙ্গালী পাঠকেরা সাহিত্যসম্বন্ধে বড়ই মিতব্যয়ী,—তাঁহারা দুই-একখানির বেশী কাগজের খরিদ্দার হন না। সুতরাং যে সমালোচনায় সমালোচ্য রচনার সংক্ষিপ্তসার থাকে না,—কেবল সমালোচকের মত এবং বড়-জোর অনিয়মিত আলোচনা থাকে, তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা "অন্ধকার হইতে আলোকে" আসিতে পারেন না। তাহাতে সমালোচ্য রচনারও বিশেষ উপকার বা অপকার হয় না; কারণ, সমালোচ্য রচনার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় নাই। কেবল সমালোচনা পড়িবার জন্য সমালোচনা নয়। সমালোচক, সাহিত্যের লুকান' শ্রী-টি দেখাইয়া দিবেন, পাঠকের চিন্তাশক্তি এবং সৌন্দর্য্যবোধকে বর্দ্ধিত ও বিকসিত করিবেন। যে-সকল পাঠক চিন্তাশীল, তাঁহারা কেবল সমালোচকের মত ও আলোচনাকে সমালোচ্য রচনার চেয়ে বড় মনে করেন না। অবশ্য, মাসিক-সমালোচনার সংক্ষিপ্তসারে মূল রচনার সমগ্র রসধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব; তবু উক্ত অসমগ্রতাকে যতটা-সম্ভব পূরণের চেষ্টা করিলে, লেখক ও পাঠক উভয়ের প্রতিই সুবিচার করা হয়। এই সুবিচারের জন্য প্রতিমাসে রাশীকৃত মাসিকপত্রের সমালোচনা করার চেয়ে, একখানি বা দুইখানি কাগজের আলোচনা করা ভাল। মাসিকপত্রের সমালোচনা কালীঘাটের হাঁড়িকাঠ নয় যে, পাঁঠার পর পাঁঠা ধরিয়া বলি দেওয়ার মত, মাসিকপত্রের পর মাসিকপত্র ধরিয়া দুদণ্ডে সব কাজ হাসিল করিয়া ফেলিতে হইবে।

তারপর, মাঝারি-রকমের ভাল ও মন্দ লেখা। একশ্রেণীর লেখক আছেন, যাঁহারা বিশেষ জোর করিয়া কিছুই বলিতে পারেন না। এরূপ লেখকের দল সাহিত্যক্ষেত্রে চিরকাল আছেন এবং থাকিবেনও। শক্তিধর লেখকেরা যদি কোন মন্দ বা দুর্নীতিমূলক লেখা লেখেন, তবে তাহাতে সাহিত্যের অনিষ্টভয় আছে। তাই সেরূপ লেখককে সাবধান করিতে হয়। কিন্তু শক্তিহীন লেখকের জঘন্য রচনার জন্য সমালোচককে কলম উঁচাইতে হইবে না,—পাঠকেরা আপনা-আপনিই তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইবেন। আর, যে-সব সাধারণ লেখকের চলন-সই লেখা বাঙ্গালার ডবল "ব"-এর মত, মাসিকের পৃষ্ঠায় বাহির করিলেও চলে না, করিলেও চলে, তাঁহাদিগকে লইয়াও সমালোচককে মাথা ঘামাইতে হইবে না। অতএব তথাকথিত ভাল-মন্দ লেখাকে প্রশংসা বা নিন্দা না করিয়া সমালোচকের পক্ষে মৌন থাকাই উচিত। সাহিত্যের বাগানে এ-ধরণের ফুলগুলির পরমায়ু season flower-এর মত। "ঋতু-পুষ্পে"র মত রূপ না থাকিলেও তাহারা অমনিধারা দুদিনের তরে ফুটিয়া উঠিয়া দুদিনেই ঝরিয়া পড়ে। তাই বলিয়াছি, সমালোচককে এখানে তাঁহার তীক্ষ্ণ ইস্পাতের কলম উঁচাইতে হইবে না,—কারণ, কাল-নামে মহাসমালোচক এখানে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও ব্যস্ত হইয়া আছেন এবং তিনি তাঁহার অন্ধকার-ঝুলিতে প্রায় প্রতিদিনই এমন দু'একজন লিখিয়েকে ঝপাঝপ্ পূরিয়া ফেলিতেছেন!

অনেক সমালোচককে লিখিতে দেখি, "অমুক প্রবন্ধ অমুক লিখিয়াছেন", "অমুক কবিতা অমুকের রচিত"—ব্যস! সমালোচক এইখানেই হাত গুটাইয়া নিশ্চিন্ত। লেখা ও লেখকের নাম ছাড়া সমালোচনায় সারোদ্ধার বা আলোচনা বা মতামত কিছুই থাকে না। সমালোচনা কি সূচীপত্র?

মাসিকপত্রে সমালোচনার ভার লওয়া এক বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখকেরা প্রায়ই সমালোচনা সহিতে পারেন না। জনকত দায়িত্বশূন্য সমালোচক পক্ষপাতিতামূলক এবং হিংসাপূর্ণ সমালোচনা করিয়া লেখকদের মনে এমন একটা বদ্ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন যে, বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখিলেই লেখকেরা সন্দেহ করেন, সমালোচক নিশ্চয়ই তাঁহার শত্রু। বাঙ্গালাদেশে ভাল লেখকের সংখ্যা বেশী নয়। কয়েকজন পরিচিত লেখকের কলমের জোরে বাঙ্গালার মাসিক-সাহিত্য টিকিয়া আছে। এখন, সমালোচনা করিতে বসিয়া এমন-সব লেখকের লেখা হাতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের লেখা যে কাগজে সমালোচনা করিব, সেই কাগজেই বাহির হয়। এক্ষেত্রে যথার্থ খারাপ লেখার নিন্দা করিলেও লেখক চটিয়া গিয়া সমালোচকের কাগজে লেখা বন্ধ করিয়া দেন। এ-শ্রেণীর কাপুরুষ লেখককে যিনি ভয় করেন না,—মাসিকপত্রের সমালোচক যেন তিনিই হন। নহিলে, সমালোচনা ভাল হওয়া পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের মত অসম্ভব।

মাসিকপত্র-সমালোচককে কলমের কালোয়াত হইতে হইবে। কারণ, তাঁহার জায়গা আর সময় দুই-ই কম। তাঁহাকে অল্প কথায় বেশী চিন্তা প্রকাশ করিতে হয়। ভাষার উপরে যাঁহার

রীতিমত দখল নাই, ভাষার সঙ্গে ভাব ও চিন্তাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিতে তিনি একেবারেই অপারগ।

হ্যাজলিট্ যাঁহাদিগকে 'Verbal critic' নাম দিয়াছেন, বাঙ্গালা মাসিক-সাহিত্যের আসরে তাঁহাদিগকে যখন-তখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা কোন একটি লেখা হইতে ব্রণ-প্রিয় মক্ষিকার মত দু'একটি দুর্ব্বল পংক্তি উদ্ধার করিয়া সমস্ত লেখাটিকে গালাগালি দেন। যে-সকল পাঠকের মূল লেখাটি পড়িবার সুযোগ থাকে না, তাঁহারা সমালোচনা পড়িয়া লেখকসম্বন্ধে একটা কুধারণা করিয়া লন। এরূপ প্রতারণার চেষ্টা সাহিত্যকে কলঙ্কিত করে। সমালোচক খালি ভাল বা খালি মন্দ দেখিবেন না। কোন রচনার একাংশ ভাল হইলে যেমন অধিকাংশ ভাল হয় না, তেমনই কোন লেখার একাংশ মন্দ হইলে অধিকাংশ মন্দ হয় না;—এত বড় সোজাকথাকে যাঁহারা বুঝিতে চান না, তাঁহারা ভাবের ঘরের চোর। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, "সাহিত্য"-পত্রের সমালোচক অনেকবার এইরূপ "শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার" চেষ্টা করিয়াছেন। লেখকদের প্রতি তিনি যেমন অন্যায়রূপে নৃশংস, তেমন আর কেহ নন।

বাস্তবিক, বাঙ্গালা মাসিক-সাহিত্যের সমালোচকেরা দিন দিন যেরূপ destructive criticism-এর ভক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তাহাতে নবীন লেখকদের আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে। ধ্বংসপ্রিয় সমালোচকেরা এটা বোঝেন না যে, তাঁহারা কি সাহিত্য, কি লেখক আর কি পাঠক,—কাহারও কোনই উপকারে লাগিতেছেন না। পাথরেও যখন ফুল ফোটে, বাঙ্গালী সমালোচকের হৃদয় হইতে তখন ন্যায়সঙ্গত সহৃদয়তার আশা করা কি অন্যায়?

সমালোচকেরাই ইহার উত্তর দিন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সাহিত্য সংবাদ

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিঃ স্মিথ্ মোগল সম্রাট্ আকবরের কোষাগারের ধনরত্নের হিসাব সংকলনের চেষ্টা করিতেছেন। রোমান ক্যাথলিক পাদরি সিবাষ্টীয়ান ম্যানরিক (Sebastian Manrique) ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশে ভারতবর্ষে ১৩শ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন। তিনি ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে রোম নগর হইতে স্পেনীয় ভাষায় তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত-সম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক স্মিথ্ রাজমহলের কোষাধ্যক্ষ মীরজা কামরাণের নিকট হইতে ম্যানরিক যে হিসাবের নকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন; সেই সময়ে আগ্রার খাজনা-খানায় সর্ব্বসমেত ১৯৮১৪৬৬৬৬৷৹ টাকা মজুত ছিল। ১০০ তোলা, ৫০ তোলা এবং ২৫ তোলার মোহর, সর্ব্বসমেত ৬৯৭০০০০ মাসার সুবর্ণমুদ্রা ছিল, ১ মাসার দর ১৪৲ হিসাবে ধরিয়া মোট ৯৭৫৮০০০০৷৹ টাকার সুবর্ণমুদ্রা ছিল। এতদ্ব্যতীত ১০০০০০০০০ আকবরী টাকা মজুত ছিল। সর্ব্বসমেত ২৩০০০০০০০ আকবরী পয়সা ছিল, এই সকল পয়সার ওজন ১৷৹ তোলা হইতে ২ তোলা এবং ইহার ৩০ টিতে একটি আকবরী টাকা পাওয়া যাইত। ইহার মূল্য মোট ৭৬৬৬৬৬৲ টাকা ছিল।

সেই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের প্রধান খাজনাখানা আগ্রানগরে অবস্থিত ছিল, এতদ্ব্যতীত সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছয়টি প্রধান কোষাগার ছিল—গোয়ালিয়র, নারোয়ার, রাজপুতানায় রণস্তম্ভপুর বা রণথম্ভোর, দক্ষিণাপথের পথে আসিরগড়, বিহারে রোহিতাশ্ব বা রোহতস্ এবং পঞ্জাবে লাহোর। স্মিথ্ অনুমান করেন যে, এই ছয়টি কোষাগারে ১৮০০০০০০ সুবর্ণমুদ্রা সঞ্চিত ছিল। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। এই সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের কোষাগারসমূহে নগত ৪০০০০০০০ টাকার সুবর্ণমুদ্রা সঞ্চিত ছিল।

আগ্রার কোষাগারে এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি সঞ্চিত ছিল ঃ—

১।	হীরা, চুনি, পান্না, মুক্তা ইত্যাদি	৬০৫২০৫২১
২।	বহুমূল্য রত্নখচিত সুবর্ণের পাত্র	১৯০০৬৭৪৫
৩।	সুবর্ণের পাত্র	৯৫০৭৯৯২
৪।	রূপার বাসন	২২২৫৮৩৮
৫।	তামার বাসন	৫১২২৫
৬।	চীনামাটীর বাসন	২৫০৭৭৪৭
	মোট—	৯৩৮২০০৬৮৲ টাকা

আগ্রার কোষাগারের সন্নিহিত তোষাখানা এবং কিতাবখানায় নিম্নলিখিত বহুমূল্য দ্রব্যাদি সঞ্চিত ছিল ঃ—

৭।	পারস্য, তুরস্ক, গুজরাট, এবং বিলাতের বহুমূল্য সোণা-রূপার কামদার, তামা, কিংখাব এবং রেসমের পোষাক, বাঙ্গালা দেশের শবনম এবং মলমলের পোষাক	১৫৫০৯৯৭৯
৮।	পশমী কাপড়	৫০৩২৫২
৯।	তাম্বু ও গালিচা	৯৯২৫৫৪৫
১০।	বহুমূল্য হস্তলিখিত পুথি	৬৪৬৩৭৩১
১১।	তোপখানার কামান	৮৫৭৫৯৭১
১২।	শেলেখান বা অস্ত্রাগারের অস্ত্র	৭৫৫৫৫২৫
১৩।	হাতী ও ঘোড়ার হাওদা ও জিন	২৫২৫৬৪৬
১৪।	পরদা ও হাতী-ঘোড়ার পোষাক	৫০০০০০০
	মোট—	৫৬০৫৯৬৪৯৲ টাক

সুতরাং আকবরের মৃত্যুকালে সর্ব্বসমেত ৩৪৮২২৬৬৬৪৷৹ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আগ্রার দুর্গে রক্ষিত ছিল। দেলাএ, (De'aet), ম্যানরিক এবং মাণ্ডেলসো একবাক্যে বলিয়া গিয়াছেন যে, আগ্রার কিতাবখানায় ২৪০০০ হস্তলিখিত পুথি রক্ষিত ছিল, এইগুলির মূল্য মোট ৬৪৬৩৭৩১৲ টাকা, সুতরাং প্রত্যেক পুথির মূল্য ২৭০৲ টাকা। পুথিগুলি বহুমূল্য চর্ম্মে বাঁধান হইত এবং দেশবিখ্যাত চিত্রকর ও লেখকগণদ্বারা চিত্রিত ও লিখিত হইত। সিপাহীবিদ্রোহের পরে দিল্লীর বাদশাহী কিতাবখানা লুট হইলে হাইদ্রাবাদের নিজাম ও রামপুরের নবাব বহুলক্ষ টাকার পুথি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ এখন বাঁকীপুরের খোদাবকস্ গ্রন্থাগার ও হাইদ্রাবাদের ফলকনামা প্রাসাদের গৌরবস্বরূপ। শাহজাহান আগ্রা ত্যাগ করিয়া নূতন দিল্লী নির্ম্মাণ করিলে বাদশাহী কিতাবখানা দিল্লীতে আনীত হইয়াছিল। নাদীরশাহের দিল্লী ধ্বংসকালে বহু অমূল্য গ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্ত রাঘোবা, নাজব খাঁ রোহিল্লা, মাহদালি সিন্ধে এবং জাঠরাজা চূড়ামণ, বাদশাহী কিতাবখানা হইতে বহু মূল্যবান গ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর ২০০ বৎসর পরে দিল্লীনগরী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর দখলে আসিলে অন্ধ বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা আকবর, কিতাবখানা রক্ষায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। দিল্লীতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার সঞ্চিত গ্রন্থরাশি ১৮৫৮ সালে লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের গত ১৮ই জানুয়ারি তারিখে "কৃত্তিবাস-স্মৃতি-সমিতি"র যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা হইয়াছিল।:—

ক। ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখানে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ একটি প্রস্তর-ফলকের প্রতিষ্ঠা হইবে।

খ। উক্ত দোলমঞ্চ এবং কৃত্তিবাসের স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কূপ যাহাতে বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইতে না পারে, সেজন্য যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

গ। সংগৃহীত অর্থভাণ্ডারের কতকাংশ, কৃত্তিবাসের নামরক্ষা করিবার জন্য কোন জনহিতকর কার্য্যে দান করিতে হইবে।

উপরি-উক্ত কার্য্যসাধনের জন্য "কৃত্তিবাস-স্মৃতি-সমিতি" ইতোমধ্যেই কিঞ্চিদধিক ২,১৭৭টাকা দান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অপ্রাপ্ত ও স্বীকৃত দানের পরিমাণ ৪৫০৲ টাকা।

বোইরা গ্রামের "মধ্য-ইংরাজী-স্কুল," "কৃত্তিবাস-ভিটা"র স্থানান্তরিত হইয়া "কৃত্তিবাস-মেমোরিয়াল স্কুল" নামে প্রসিদ্ধ হইবে—স্থানীয় অধিবাসিগণের ইহাই ইচ্ছা। আশা করা যায়, উক্ত স্কুল ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড হইতে সাহায্যলাভ করিবে। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পাকা ইমারত তৈয়ারি করা হইবে। সমস্ত বন্দোবস্ত যদি সন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে "কৃত্তিবাস-স্মৃতি-সমিতি" হইতে উক্ত বিদ্যালয় সম্ভবতঃ ৬০০৲ শত টাকা সাহায্যলাভ করিবে।

—০—

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই দার্শনিকতা ও বিজ্ঞানের জন্য জার্ম্মাণীর নাম সভ্যজগতে অপরিচিত না থাকিলেও, বর্ত্তমান যুদ্ধব্যাপারে সকলের নিকটে সে বিশেষরূপে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সভ্যতা সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতার কতখানি অংশ পূর্ণ করিয়াছে, সংপ্রতি সে সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। গত এপ্রেল মাসে 'Quarterly Review' নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত "জার্ম্মাণীর সভ্যতা" শীর্ষক প্রবন্ধে সেই তথ্য লইয়া আলোচনা হইয়াছে। প্রবন্ধলেখকগণ বলেন, জার্ম্মাণীর আধুনিক সাহিত্যসেবিগণের সাধনার ফলে তাহাদের সাহিত্য অত্যল্পকাল-মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, য়ুরোপের জনসাধারণ সেই বিচিত্র ও বিশাল সাহিত্যের সহিত একান্ত অপরিচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দু-একখানি যুদ্ধ-সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যতীত, যে গভীর চিন্তাশীলতা ও মানবচরিত্র-বিশ্লেষণ প্রভৃতি গুণ আধুনিক জার্ম্মাণ-সাহিত্যকে সাফল্যদান করিয়াছে, তাহার সংবাদ অনেক শিক্ষিত ইংরেজও রাখেন না! সত্য বটে, সংপ্রতি নীট্সে, ট্রায়টস্কে ও বার্ণহার্ডি প্রভৃতির রচনা সভ্যজগতের দৃষ্টি জার্ম্মাণ সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে, কিন্তু জার্ম্মাণ-ভাষা যে যুদ্ধসম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যতীত দর্শন, সাহিত্য ও কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে গরীয়সী, এ কথা অনেকেই জানেন না।

কার্ল হউপ্টমান নামক নাট্যকার-রচিত নাটকগুলি সংপ্রতি ইংরাজি সাহিত্যে অনূদিত হইয়াছে, এবং সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া জার্ম্মাণীর সামাজিক অবস্থা সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। এই নাটকগুলি জার্ম্মাণ সমাজের নিখুঁত চিত্র; এবং ইহাদিগের সাহিত্যিক মূল্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না। কার্ল হউপ্টমান ব্যতীত জুডেরমান, ক্লারা ফীবিক, রিকার্ডো হুক্ প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের নাম সভ্যজগতে আজকাল সর্ব্বত্রই পরিচিত। কিন্তু ইঁহারাই জার্ম্মাণীর সর্ব্বস্ব নহেন। শত শত জার্ম্মাণ-সাহিত্য-সেবক বাণীর সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। রাজ্য-লিপ্সার নেশা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের শোণিতপ্রবাহ, তাঁহাদের গভীর ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারে নাই। তাঁহাদিগের কোমল রচনার মাধুরী ইংরেজ, ফরাসী ও রুষিয়া-সাহিত্যের অপরূপ সৌন্দর্য্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

জার্ম্মাণীর উপন্যাস বিবিধ গুণের আধার: কিন্তু দুঃখের বিষয় জার্ম্মাণ ঔপন্যাসিকগণের গ্রন্থ ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে বিশেষ সমাদরলাভ করিতে পারে নাই। বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে ওয়ালজোজেন, আডাম মুলার—গুটারমান, অটো রিউলিংস্, ডেরটোর ও ডের্ টুনেল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদিগের রচিত উপন্যাসগুলি জার্ম্মাণীর প্রতি গৃহে নিত্য পঠিত হয়, কিন্তু ইংলণ্ডের অনেকেই ইঁহাদের নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের ন্যায় জার্ম্মাণীতেও উপন্যাস লিখিবার নানা প্রণালী (school of fiction) প্রচলিত আছে। দেশের সমস্ত সমস্যার আলোচনা, নির্ভীকভাবে প্রচলিত রীতিনীতির দোষগুণ-বিচার, মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞতা, স্পষ্টবাদিতা, ঐকান্তিকতা এবং বর্ত্তমান সভ্যতার পেষণে মানব-চরিত্রের বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য বর্ত্তমান জার্ম্মাণ উপন্যাসের সৃষ্টি।

জার্ম্মাণ-উপন্যাসের একটা প্রধান দোষ এই যে, ফরাসী ও ইংরেজী উপন্যাসের মধ্যে যে ভাষার ঝঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়—জার্ম্মাণীর কথা-সাহিত্যে সে ঝঙ্কারের একান্ত অভাব। জার্ম্মাণ উপন্যাসের দ্বিতীয় দোষ, তাহার ভাষার ভিতরে সংযমের পরিচয় বড় অল্প।

জার্ম্মাণ-ঔপন্যাসিকগণ অনেক সময়ই পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য ভাষার লালিত্য পরিহার করেন। কিন্তু, তাঁহাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য অন্যান্য দেশের ঔপন্যাসিকগণকে পরাজিত করিয়াছে।

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

গান

সাহানা—একতালা

জীবন আমার নিষ্ফল যদি, মরণ যেন না হয়,
শেষের সে দিনে পাই যেন প্রভু তব প্রিয় পরিচয়।
অর্থ ও মান স্বাস্থ্য ও প্রাণ
মনের যা-কিছু বড় অভিমান
সকলি চূর্ণ ধূলির সমান মিছে পড়ি' পিছে রয়॥
সেই সব ধূলা প্রাণে করি' জড়
এক আশা নাথ করে' আছি বড়
চরণে তোমার ছোঁয়াইয়া লব বিদায়ের সে সময়
সেই পদধূলা সব মলা মোর পূত যেন করি লয়॥

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

চন্দ্রের কলঙ্ক

চন্দ্র, সকল দেশের কবিগণেরই বর্ণনার প্রিয়বস্তু; কিন্তু চন্দ্রের কলঙ্ক লইয়া সংস্কৃত কবিগণ যে প্রকার মস্তিষ্কচালনা করিয়াছেন, অন্য কোনও ভাষার কবি সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রিয়ার মুখচন্দ্রখানি নিষ্কলঙ্ক, আকাশের চন্দ্রমা কলঙ্কযুক্ত—এই কথা বলিয়া বলিয়া সংস্কৃত কবি-সম্প্রদায় চাঁদকে যে কত ধিক্কার দিয়াছেন, তাহার আর সীমা নাই। তাই কি সরলভাবে বলিয়াছেন?—কেবল ঠেস্ দিয়া দিয়া কথা। একজন বলিলেন—

"কস্তূরীতিলকং বালে ভালে মা কুরু মা কুরু।
অদ্য সাম্যং ভজামীতি জৃম্ভতে শশলাঞ্ছনঃ॥"

—ওগো বালা, কস্তূরী দিয়া কপালে তুমি টিপ্ কাটিও না কাটিও না। "এতদিন পরে আজ আমি উহার সমান হইলাম"—এই বলিয়া চাঁদ মুখবিকাশ করিতেছে, ঐ দেখ।

অপর এক কবি প্রেয়সীর ব্যাজস্তুতি করিয়া বলিলেন—

"লোকে কলঙ্কমপহাতুময়ং মৃগাঙ্কো
জাতো মুখং তব পুনস্তিলকচ্ছলেন।
তত্রাপি কল্পয়সি তন্বি কলঙ্করেখাং
নার্য্যঃ সমাশ্রিতজনং হি কলঙ্কয়ন্তি॥"

—চন্দ্রকে লোকে কলঙ্কী কলঙ্কী বলে, সেই মনের দুঃখে বেচারী তোমার মুখ হইয়া আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তুমি টিপ্ কাটিয়া, সে যে কলঙ্কী ছিল আবার তাহাকে সেই কলঙ্কীই করিয়া দিলে?—রমণীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে কলঙ্কিত হইতেই হয়, ইহা ত জানা কথা।

স্বয়ং কালিদাস বলিলেন—

"প্রবিশ ঝটিতি গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে
গ্রহণসময়বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
তব মুখমকলঙ্কং বীক্ষ্য নূনং স রাহু
র্গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়॥"

—হে প্রিয়ে, চন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে, তুমি শীঘ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ কর। তোমার অকলঙ্ক মুখখানি দেখিলে কি জানি রাহু যদি পূর্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া তোমার মুখচন্দ্রখানিই গ্রাস করিয়া বসে!

সত্য কথাই ত! ভাল জিনিষটি খাইতে পাইলে মন্দটি আর কে চায়?

শশলাঞ্ছনের এবম্প্রকার লাঞ্ছনা ত বিস্তরই হইয়াছে—আবার কেহ কেহ তাঁহাকে "বিনামূল্যে উপদেশ" দিয়া, ইংরাজিতে যাহাকে বলে, 'adding insult to injury'—তাহাও করিয়াছেন—

"অভিলষসি যদিন্দো বক্ত্রলক্ষ্মীং মৃগাক্ষ্যাঃ।
পুনরপি সকৃতদঙ্কৌ মজ্জ সংক্ষালয়াঙ্কম॥"

—ওহে ইন্দু, তুমি যদি মৃগনয়নার মুখশোভা লাভ করিতে অভিলাষ করিয়া থাক, তবে তোমার গায়ের ঐ ময়লাটুকু ধুইয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু বলিয়া দিতেছি, দুই চারি বাল্‌তী জলের কর্ম্ম নয়। যে সমুদ্র হইতে উঠিয়াছিলে, আবার একবার সেই সমুদ্রে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়—চেষ্টা করিয়া দেখ, যদি সফল হও।

এ ত গেল চন্দ্রের "তুলনায় সমালোচনা।"—কলঙ্ক জিনিষটা কি, আর কেমন করিয়াই বা হইল, এ সম্বন্ধেও কবিগণ প্রভূত গবেষণা করিয়াছেন। একজন কবি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন—

মন্থানভূমিধরমূল শিলাসহস্র-
সংঘটনব্রণকিণঃ স্ফুরতীন্দুমধ্যে।
ছায়া মৃগঃ শশক ইত্যতিপামরোক্তি-
স্তেষাং কথঞ্চিদপি তত্র হি ন প্রসক্তিঃ॥"

—মন্দরপর্ব্বত দিয়া যখন সমুদ্রমন্থন করা হইয়াছিল, সেই সময় হাজার হাজার পাথরের খোঁচা লাগিয়া চাঁদের গায়ে ঐ দাগগুলা হইয়া গিয়াছে। যাহারা বলে, ওটা ছায়া অথবা মৃগ অথবা শশক, তাহারা নিতান্তই গণ্ডমূর্খ—কিছুই জানে না।

অপর একজন বলিলেন—না তা নয়—

"মধুব্রতৌঘঃ কুপিতঃ স্বকীয় মধুপ্রপাপদ্মনিমীলনেন।
বিম্বং সমাক্রম্য বলাৎ সুধাংশোঃ কলঙ্কমঙ্কে ক্রবমাতনোতি॥"

—ভ্রমরেরা সারাদিন ধরিয়া পদ্মে মধুপান করিতেছিল, চন্দ্রোদয় হইবামাত্র পদ্মদলগুলি মুদ্রিত হইয়া গেল। ভ্রমরগণ তাই কুপিত হইয়া চন্দ্রকে গিয়া দংশন করিতেছে।

আর একজন কবি বলিলেন—তাহাও নয়—ওটা "শিবভালানলোত্থেন ধূমযোগেন কালিমা।" মদনভস্ম করিবার সময় মহাদেবের ললাট হইতে ধক্ করিয়া যখন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন মদন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল; আর তাহার পর সেই অগ্নি হইতে যে ধূম উঠিতে লাগিল, সেই ধূম লাগিয়াই চাঁদের ওখানটা কালো হইয়া গিয়াছে। সকলেই জানেন, যাহারা দোষী তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে 'aiders and a'ettors'রাও শাস্তি পাইয়া থাকে। চন্দ্র যে একজন সিধা লোক নন, মদনদেবের সঙ্গে মিলিত হইয়া লোকের উপর সর্ব্বদাই যে নানা অত্যাচার করিয়া থাকেন, এ কথা অনেক কবির সাক্ষ্য হইতেই পাওয়া যায়। একজন কবি চন্দ্রকে বলিয়াছেন, "শাণোপলং মন্মথশায়কানাং"—মন্মথ বাণগুলিতে ধার দিবার জন্য শাণপাথর; আর একজন তাঁহাকে বলিয়াছেন, "অনঙ্গভুজঙ্গমস্তকমণি"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

নৈষধকার দময়ন্তীর রূপবর্ণনা করিবেন—গরজ বড় বালাই—সুতরাং তিনিও বেচারী চাঁদকে এক ঠোকা দিলেন—

"হৃতসারমিবেন্দুমণ্ডলং
দময়ন্তী বদনায় বেধসা।
কৃতমধ্যবিলং বিলোক্যতে
ধৃতগম্ভীরখনীখনীলিম॥"

দময়ন্তীর মুখ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, বিধাতার এই এক মহা ভাবনা পড়িয়া গেল। মনের মত মাল-মসলা ত্রিভুবন খুঁজিয়া কোথাও না পাইয়া, শেষে চাঁদটিকে বেওয়ারিশ্ দেখিয়া, তাহারই সারভাগটুকু হরণ করিয়া লইলেন। চাঁদের মাঝখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ব্রহ্মা যে ফুটা করিয়া দিয়াছিলেন, সেই ফুটা দিয়া নীল আকাশ দেখা যায়—অঙ্কটা আর কিছুই নহে।

আর এক কবি ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অয়ং পুরঃ পার্ব্বণশর্ব্বরীশঃ
কিং দর্পণোঽয়ং রজনীরমণ্যাঃ।
যতস্তদীয়ঃ প্রতিবিম্বমস্মিন্
সংলক্ষ্যতে লাঞ্ছনকৈতবেন॥"

—পূর্ণচন্দ্র, রজনীর গোল আর্সিখানি নহে ত? রজনী মেয়েটি কিঞ্চিৎ কালো, ইহা সকলেই জানেন। চাঁদখানি হাতে লইয়া সে নিজের মুখ দেখিতেছে, তা'রই প্রতিবিম্ব পড়িয়া বোধ হয় চাঁদের ওখানটা কালো দেখাইতেছে।

ধারা নগরীতে রাজা ভোজ যখন রাজত্ব করিতেন, তখন তাঁহার সভায় নানা দেশের শত শত কবি সর্ব্বদাই গিস্-গিস্ করিত। "ভোজপ্রবন্ধ" পাঠ করিলে জানা যায়, দুই চারিটা কবিতা মুখে মুখে রচনা করিয়া দিতে পারিত না, রাজ্যে এমন লোক খুব অল্পই ছিল। সে সময়কার আব্‌হাওয়া এমনি হইয়া উঠিয়াছিল যে, চোরেরা পর্য্যন্ত কবিতা করিতে পারিত। (যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এখনই কি পারে না?—তাহার উত্তর এই যে, আমি কোনও মাসিকের মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা করি না, সুতরাং বলিতে অক্ষম)। একদিন রাত্রে রাজা ভোজ ছাদের উপর শুইয়া শুইয়া চাঁদ দেখিতেছিলেন—তখনকার ফ্যাসান অনুসারে হঠাৎ তাঁহার সখ্ চাপিল, চাঁদের কলঙ্ক সম্বন্ধে একটা নূতন তথ্য স্থির করিবেন। সুতরাং শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন। অনেক মাথা ঘামাইয়া শেষে স্থির করিলেন, শশক-টশক লোকে যাহা বলে, তাহা কিছুই নহে, চাঁদের মধ্যে অল্প এক টুকরা মেঘ কেমন করিয়া আটক পড়িয়া গিয়াছে। মনে মনে কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন—ক্রমে দুই লাইন তৈয়ারি হইল। বলিলেন—

"যদেতচ্চন্দ্রান্তর্জলদলবলীলাং বিতনুতে
তদাচষ্টে লোকঃ শশক ইতি নো মাং প্রতি তথা।"

—বাকী দুই লাইন মনে মনে রচনা করিবেন বলিয়া যাই নীরব হইলেন, তাই নিম্নে—যে ঘরে টাকা, মোহর, হীরা, মাণিক থাকে—সেই ঘর হইতে কে একজন বলিয়া উঠিল—

"অহং ত্বিন্দুং মন্যে ত্বদরিবিরহাক্রান্ততরুণী-
কটাক্ষোল্কাপাতব্রণকণকলঙ্কাঙ্কিত তনুম্॥"

—আমার মনে হয়, তুমি যুদ্ধে যে সকল শত্রুকে বধ করিয়াছ, অথবা যাহাদের ধরিয়া আনিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তাহাদের বিরহিণী যুবতী স্ত্রীরা চাঁদের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া যে কটাক্ষরূপ উল্কাপাত করিতেছে, তাহাতেই চাঁদের বুকে ওরূপ ক্ষতচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে।

রাজা ত শুনিয়া ভাবে গদ্গদ হইয়া পড়িলেন। নিজে তিনি ভাল কবিতা করিতে পারুন আর নাই পারুন, সমজদার ছিলেন। বলিয়া উঠিলেন—"অহো মহাভাগ, কস্ত্বমর্দ্ধরাত্রে কোষগৃহমধ্যে তিষ্ঠসি?"

চোর বেটা দেখিল, মহা বিপদ। ঝোঁকের মাথায় কবিতা করিতে গিয়া শেষে ফাঁসিই যাইতে হয়, না শূলেই যাইতে হয়। মহা ভীত হইয়া বলিল,—"দেব, যদি অভয় দেন ত বলি।"

রাজা বলিলেন—"আচ্ছা, অভয় দিলাম।"

চোর তখন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিয়া আসিল। রাজাকে এক প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল—"আজ্ঞে, আমি একজন চোর, আর কেউ নয়।"

বলা বাহুল্য, গুণগ্রাহী রাজা তাহাকে ফাঁসিও দিলেন না, শূলেও দিলেন না। তাহাকে আটটা "উন্মত্ত গজেন্দ্র" (তখন মোটরকার উঠে নাই) এবং দশকোটি সুবর্ণমুদ্রা বখ্‌শিস্ করিলেন। একটা 'নোবেল প্রাইজে'র মূল্য আট হাজার স্বর্ণমুদ্রা। দশকোটি স্বর্ণমুদ্রায় কয়টা 'নোবেল প্রাইজ' হয়, পাঠকগণ হিসাব করিয়া দেখিতে পারেন।—আহা, সে সকল দিনকাল এক আলাহিদা রকমেরই গিয়াছে!

আর একদিন ভোজরাজ ঐরূপ চন্দ্রের পানে চাহিয়া কাগজ-কলম লইয়া লিখিলেন—

"অঙ্কং কেঽপি শশঙ্কিরে জলনিধেঃ পঙ্কং পরে মেনিরে
সারঙ্গং কতিচিচ্চ সংজগদিরে ভূচ্ছায়মৈচ্ছন্ পরে।"

—কেহ আশঙ্কা করে ওটা চিহ্নমাত্র, কেহ বলে সমুদ্র হইতে উঠিবার সময় চাঁদের গায়ে যে পাঁক লাগিয়া গিয়াছিল উহা তাই, কেহ কেহ বলে ওটা হরিণ, কেহ বলে চন্দ্রের বক্ষে পৃথিবীর ছায়াটা পড়িয়াছে—"

পরদিন সভায় আসিয়া রাজা কাগজখানি কালিদাসের হস্তে দিলেন—অর্থাৎ ভাবটা যেন, অনেকেই ত অনেক রকম বলে, তুমি কি বল তাহা শুনি।

কাগজখানি পড়িয়া, তাহার নিম্নে কালিদাস শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ লিখিয়া দিলেন—

"ইন্দৌ যদ্দলিতেন্দ্রনীলশকলশ্যামং দরী দৃশ্যতে
তৎ সান্দ্রং নিশি পীতমন্ধতমসং কুক্ষিস্থমাচক্ষ্মহে॥"

—দলিত ইন্দ্রনীল-মণির মত, শ্যামবর্ণ পর্ব্বত-গুহার মত ঐ যে চন্দ্রে দেখা যাইতেছে, ওটা আর কিছুই নয়, রজনীর নিবিড় অন্ধকার চন্দ্র পান করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই জমাট অন্ধকারটাই চন্দ্রের কুক্ষিমধ্যস্থ হইয়া ওরূপ দেখাইতেছে।

এই চারিটি পদ পাঠক একত্র করিয়া একবার পড়িয়া দেখিবেন। প্রথম দুইটি পদে যেন ঠ্যাঠ্যাঠ্যাং করিয়া ঢোলক বাজিতেছিল, শেষের দুইটিতে পাখোয়াজের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি উঠিল। অথচ পণ্ডিতেরা বলেন, রাজা ভোজ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক, কালিদাস অন্ততঃ তাহার পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন, ভোজ-প্রবন্ধের এ কালিদাস কাল্পনিক, কুমারসম্ভবপ্রণেতা কালিদাস নহেন—কেবল ভোজরাজাকে খোসামোদ করিবার জন্য ভোজ-প্রবন্ধকার পাঁচশত বৎসর ডিঙ্গাইয়া কালিদাসকে তাঁহার সভায় আনিয়া হাজির করিয়া দিয়াছেন। রাজা ভোজের যে সভাসদ্ কবি কালিদাসের নামে ভোজ-প্রবন্ধে জালগুলি করিয়াছেন, তাঁহার বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে।

সংস্কৃত কবিগণের পদানুসরণ করিয়া তুলসীদাসও তাঁহার রামায়ণের একস্থানে এই "অঙ্কতত্ত্ব" আলোচনা করিয়াছেন। রামচন্দ্র লঙ্কায় পৌঁছিয়াছেন, শিবির সন্নিবেশ প্রভৃতি হইতেছে, তখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রিকালে সকলে শয়ন করিয়া আছেন। তখন

পূরব দিশা বিলোকি প্রভু
দেখা উদিত ময়ঙ্ক।
কহেউ সবহিঁ দেখহু শশীহি
মৃগপতি সরিস অশঙ্ক॥
পূরবদিশি গিরিগুহানিবাসী।
অতুল প্রতাপ তেজবলরাশি॥
মত্তনাগ-তম-কুম্ভ-বিদারী।
শশী কেহরী গগন-বন-চারী॥
বিথুরে নভ মুকুতা হল তারা।
নিশি সুন্দরীকের শৃঙ্গারা॥
কহ প্রভু শশী মহ মেচকতাই।
কহহু কহা নিজ নিজ মতি ভাই॥
কহ সুগ্রীব শুনহু রঘুরাই।
শশী মহ প্রগঠ ভূমিকি ছাই॥
মারেউ রাহু শশীহি কহ কোই।
উর মহ পরি শ্যামতা সোই॥
কোউ কহ যব বিধি রতিমুখ কীন্হা।
সারভাগ শশীকর হরি লীন্হা॥
ছিদ্র সো প্রগঠ ইন্দু উর মাহি।
তেহি মগ দেখিয় নভ পরিছাহি॥
কহ প্রভু গরল বন্ধু শশীকেরা।
অতি প্রিয়তম উর দীহ্ন বসেরা॥
বিষসংযুত করনিকর পসারি।
জারত বিরহবন্ত নর-নারী॥
হনুমান কহ শুনহু প্রভু
শশী তুম্হারি প্রিয় দাস।
তব মূরতি তেহি উর বসত
সোই শ্যামতাভাস॥

পাঠক দেখিবেন, বানরগণের কথিত অঙ্কতত্ত্বগুলি প্রায়ই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। হনুমান যে তত্ত্বটি বলিলেন, তাহারও অনুরূপ শ্লোক সংস্কৃতে আছে—

"নেদং নভোমণ্ডল মম্বুরাশি-
র্নৈতাশ্চ তারা নবফেনভঙ্গাঃ।
নায়ং শশী কুণ্ডলিতঃ ফণীন্দ্রো
নাসৌ কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ।"

—ইহা নভোমণ্ডল নয়, সমুদ্র—এগুলি তারা নয়, নবফেনভঙ্গসকল দেখা যাইতেছে—উহা চন্দ্র নহে, কুণ্ডলিত শেষনাগ এবং ঐ চিহ্ন চন্দ্রের কলঙ্ক নহে—শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

তবে রামচন্দ্রের মুখে তুলসীদাস যে তত্ত্বটি দিয়াছেন, আমার কাছে উহা নূতন, কারণ ঐ ভাবের কোনও সংস্কৃত শ্লোক অদ্যাপি আমার চক্ষে পড়ে নাই। আর, কেমন স্বাভাবিক!—রামচন্দ্র এ সময়ে সীতাদেবীর বিরহে জর্জ্জরতনু—তাঁহার ত মনে হইবেই, ভাই বলিয়া অতি স্নেহবশতঃ গরলকে চন্দ্র বুকে করিয়া রহিয়াছেন—আর বিষমাখা কিরণধারা ঢালিয়া সমস্ত বিরহী ও বিরহিণীগণকে দগ্ধ করিয়া মারিতেছেন!

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

হরিহর

(১)

পাগল ভোলার বিহ্বল আঁখি
পরাণ নির্ব্বিকার,
মালতীর মালা মোহন জটায়
সর্প কণ্ঠহার;
দুখে সম্পদে অটলচিত্ত,
সমাধি-মগ্ন প্রাণ,
কপালে ভাতিছে ইন্দু-কিরণ,
একি অনন্ত ধ্যান!
দেবতা আমার হৃদয়-দেবতা,
শান্তি-মন্ত্র মোর,
দাও সে সাধনা, দাও সংযম,
ঘুচাও এ মোহ-ডোর।

(১)

বনফুলমালা কণ্ঠে দোদুল
অধরে বংশী-গান,
পদে চঞ্চল নূপুর-আলাপ,
চির-বসন্ত-প্রাণ,
শ্যাম কলেবর, প্রোজ্জ্বল আঁখি,
আধ-বঙ্কিম ঠাম,
রাধার হৃদয়ে বাধা দূরে দিতে
ব্রজরাজ অভিরাম;—
দেবতা আমার, হৃদয়-দেবতা
প্রেমের মন্ত্র মোর,
দাও সে পীরিতি—মধুর গরিমা,
নয়নে স্বপ্নঘোর।

শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়

জার্ম্মাণীর সমর-প্ররোচক কে?

যে অভূতপূর্ব্ব সমরানলে আজ সমগ্র ইউরোপ এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূখণ্ড দগ্ধ মরুভূমির আকার ধারণ করিতেছে, ইহার একমাত্র প্রবর্ত্তক জার্ম্মাণ-সম্রাট্ দ্বিতীয় উইলিয়ম নহেন, এ কথা সপ্রমাণ হইয়াছে। যে আদর্শের পশ্চাতে উইলিয়ম এবং সমগ্র প্রুসিয়ানগণ ও তাহাদের পশ্চাতে অন্যান্য জার্ম্মাণ জাতি মনুষ্যত্বের সমস্ত নীতি বর্জ্জন করিয়া দ্রুত ধাবিত হইয়াছে, তাহা তিন চারি জন মনস্বী জার্ম্মাণের মস্তিষ্কসঞ্জাত। ক্ষোভের বিষয় এই যে, এই সকল মনস্বী ব্যক্তি মনুষ্যত্বের সর্ব্বদা-গ্রাহ্য 'আইডিয়া'র একান্ত প্রতিবাদী। আজ আমরা ইঁহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইঁহাদের অগ্রণীর নাম হাইনরিক ফন্ ট্রাইট্স্কে। ইনি একজন স্যাক্সন জেনারেলের পুত্র এবং ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ড্রেসডেন নগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিশুকাল হইতে একেবারে বধির ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশ বৎসর কাল ট্রাইট্স্কে বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালে জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ নিয়তির সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাদান করিতেন। জার্ম্মাণীর উপনিবেশ-প্রসারের বিষয় তিনি ক্রমাগত উপদেশ দিতেন। তিনি ধর্ম্মে প্রোটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টান ছিলেন এবং সমগ্র জার্ম্মাণজাতি একদিন উক্তধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, এ কথা তিনি একাগ্রচিত্তে বিশ্বাস করিতেন। সোসিয়ালিষ্ট না হইলেও তিনি প্রিন্স্ বিসমার্ক-প্রবর্ত্তিত বহুবিধ সাধারণ জনহিতকর সংস্কারের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। তিনি জার্ম্মাণ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন বটে, কিন্তু কোনও বাদানুবাদে যোগদান করেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে তিনি প্রায় অন্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ দুঃস্থ অবস্থায়ও তাঁহার রচনা-শক্তির হ্রাস হয় নাই। তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন।

ট্রাইট্স্কের ছাত্র ট্রয়েণ্ট্স্ কয়েক বৎসর হাইডেনবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। প্রতিভাবলে ট্রয়েণ্ট্স্‌কে জার্ম্মাণীর দ্বাদশজন মনস্বীর অন্যতম বলা হইয়া থাকে। ইঁহার লেখায় ট্রাইট্স্কের ন্যায় জ্বলন্ত বিদ্রূপ নাই। ইনি ধীর শান্তভাবে জার্ম্মাণীর কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার করিয়াছেন। ইনি "শাসন-প্রণালীর নীতি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম" সম্বন্ধে সুবিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান নৈতিক আদর্শের প্রবর্ত্তক ফ্রিড্রিক নীট্সে। ইনি জাতিতে পোল (পোলাণ্ড দেশীয়) ছিলেন এবং উক্ত জাতির স্বাভাবিক নৈরাশ্যের........অধিকারী হইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহাকে বিশেষরূপে গ্রীক এবং লাটিন শিক্ষা করিতে হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ এই শিক্ষার ফলে তিনি খ্রীষ্টীয় নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শের অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় নৈতিক আদর্শ প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীক এবং রোমান আদর্শ মানুষের মনে পাশব বল, ব্যক্তিগত প্রভুত্ব এবং ভোগ-লালসার বিষম স্রোত প্রবাহিত করাইয়াছিল, নীট্সের ধারণা এইরূপই ছিল।

সমগ্র ইউরোপ, খ্রীষ্টীয় সভ্যতা-বিস্তারের পর হইতে যে নৈতিক আদর্শ প্রায় দুই সহস্র বৎসর অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল, ফ্রিড্রিক নীট্সে তাহা ভাঙ্গিতে বসিলেন। তিনি পশুবল এবং নিষ্ঠুরতার উপাসনায় পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন এবং বিনয় ও কারুণ্য নিতান্ত তুচ্ছবৃত্তি এই মতের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই উপলক্ষে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম এবং তদুপরি প্রতিষ্ঠিত নৈতিক আদর্শকে আক্রমণ করিয়া এক "অতি-মানুষের" অবতারণা করিলেন, যে কেবল এই নবোদ্ভাবিত পাশব শক্তির উপাসনা করিবে। নীট্সের কল্পিত এই "অতি-মানুষ" সাধারণ জনগণের মত নহে। তাহার মনে দয়া-মায়া নাই, কালাকাল-জ্ঞান নাই, পাত্রাপাত্রভেদ নাই; সে কেবল আপনার প্রসার, তাহার জাতির প্রসার, কঠোরতা এবং আত্মরক্ষা-ধর্ম্মের প্রসার লইয়াই ব্যস্ত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, জার্ম্মাণ-সম্রাট্ নিজেকে তাঁহার এই গুরু-কল্পিত "অতি-মানুষ" বলিয়া ধারণা করেন। জেনারেল ফন্ বার্ণার্ডি, বর্ত্তমান যুদ্ধসম্বন্ধে যাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষজ্ঞদিগের মতে অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে, তিনিও বলেন, জার্ম্মাণ জাতির জীবন-রক্ষা ও জাতি-রক্ষার জন্য পাশব বলের উপাসনা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আত্ম-রক্ষার জন্য জার্ম্মাণ জাতিকে "অতি-মানুষ" হইতে হইবে।

অভিব্যক্তিবাদের একটি প্রধান ভিত্তি এই যে, জীবন-সংগ্রামে উপযুক্ত জীবকেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে দেখা যায়। এই চিরন্তন সত্যের "অতি-মানুষ" কল্পনারূপ বিকৃতি, স্বয়ং কল্পনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেও বোধ করি পরাস্ত করিয়াছে।

আশৈশব শিক্ষার ফলে নীট্সে গ্রীক এবং রোমান নৈতিক আদর্শের যে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা যে ভুল, তাহা তৎপরবর্ত্তী অনেক লেখক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তথাপি নীট্সের প্রচারিত অভিনব আদর্শ আজ শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানবের প্রাণবধকল্পে কৃতান্তের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

নীট্সে তৎপ্রচারিত এই অভিনব নীতির নাম রাখিয়াছেন, "সক্ষম-নীতি" এবং খ্রীষ্টীয় নীতির নাম রাখিয়াছেন, "দাস-নীতি" অর্থাৎ দুর্ব্বলের নীতি। তাঁহার মতের পোষকতাকল্পে নীট্সে কল্পনা করিলেন যে, একদল ক্ষমতাশালী বলবান্ লোক, যাহারা অক্ষম এবং শান্তিপ্রিয় লোকদিগের উপর প্রভুত্ব করিত, তাহাদিগের দ্বারাই ইউরোপীয় জনসঙ্ঘের সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত বলবান্ লোকদিগের আকৃতি তিনি কবিসুলভ কল্পনাবলে প্রাচীন দস্যুগণের ন্যায় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। উহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধে নীট্সে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"ইহারা দেশময় লুঠের উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহাদের প্রকৃতি নিতান্ত স্বাধীন এবং অপ্রতিহত ছিল। বন্যজন্তুসুলভ বিবেক-বুদ্ধির বশীভূত হইয়া ভীষণ হত্যাকাণ্ড, লুঠ-তরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রভৃতি সমাধা করিয়া ইহারা, স্কুলের ছাত্র যেমন সামান্য হুজুগে উল্লসিত মনে ফিরিয়া আসে, তেমনই দিগ্বিজয়ীর ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া ফিরিত। এই প্রকার ভীষণ বলশালী জাতি বিবেক-বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া, সুনিয়ন্ত্রিত সামরিক কৌশলে যখন কোন বিপুল জনসাধারণের মধ্যে অবতীর্ণ হইত, তখনই তাহারা একটি রাজ্যের সৃষ্টি করিত।"

রাজ্যের যখন সৃষ্টি হইল, তখন স্বভাবতঃই ইহাতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা গেল—এক বিজেতা প্রভু এবং অপর বিজিত দাস। এই সময়ে (নীট্সের মতে) এক দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইল। বিজিত দাসগণ কপটাচরণপূর্ব্বক এই তথ্য প্রচার করিল যে, মানুষের নৈতিক আদর্শের মূলাধার হইতেছে দীনতা, আত্মসংবরণ, ধৈর্য্য এবং পরদুঃখকাতরতা। এই তথ্য যখন বিজিত দাসগণের সংখ্যাধিক্য হেতু সার্ব্বজনীন সত্য হইয়া উঠিল, তখন বিজেতা প্রভুগণ অনন্যোপায় হইয়া পরাজয় স্বীকার করিল। এক কথায় তাহাদের চখে ধাঁধা লাগিল। নীট্সের মতে এই প্রকার প্রণয়-সাধনই খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের সার্থকতা

এখন, নীট্সের মতে খ্রীষ্টীয় নৈতিক আদর্শ অবনতির আদর্শ। ক্রীতদাস এবং রমণীগণ, অর্থাৎ যাহারা বস্তুতঃ দুর্ব্বল, তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে খ্রীষ্টানধর্ম্ম পরিগ্রহণ করে। সেই অবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমগ্র য়ুরোপীয় নীতির মূলে দুর্ব্বলতা এবং পরাধীনতার ভাব বিরাজমান। অতএব, এই খ্রীষ্টীয় 'আইডিয়া'র একটা মূল্য-নিরূপণ হওয়া আবশ্যক।

যাহা ক্ষমতার চৈতন্য-সম্পাদন করে, যাহাতে ক্ষমতার জন্য ইচ্ছাকে প্রবুদ্ধ করে, যাহা ক্ষমতাকেই পূর্ণাঙ্গ করে, তাহাই শুভ। দুর্ব্বলতা হইতেই অশুভের উৎপত্তি। সুখ কি? ক্ষমতা হইতে যে আনন্দের উৎপত্তি, তাহাই সুখ; বাধা-বিঘ্ন অবহেলা করিয়া ক্ষমতাবান্ অপার আনন্দলাভ করে। "খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি" বলিয়া নীট্সে সগর্ব্বে জগতে ঘোষণা করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার মতে ইহা অপেক্ষা অসৎ ব্যাপার আর নাই। সমগ্র মনুষ্যজাতির পক্ষে ইহা লজ্জা ও ঘৃণার বিষয়।

তিনি মানুষকে শিখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, আত্ম-রক্ষা করিবার ইচ্ছা অপেক্ষা ক্ষমতার ইচ্ছা প্রবলতর। তাঁহার রচনা-প্রণালী ক্ষুরধারশাণিত এবং অনুজ্ঞাজ্ঞাপক। এইরূপ রচনা-কৌশলের সাহায্যে তিনি তাঁহার অদ্ভুত নৈতিক রহস্যের বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করিয়া যে বিপুল দুর্নীতির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, "সত্য বলিয়া কিছুই নাই,—যাহা-কিছু আছে, তাহা থাকিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়াই আছে।" নীট্সে বলেন, "সানন্দ জীবন-যাপনের অর্থই হইতেছে, অপরের পক্ষে বিপজ্জনকরূপে বাস করা।" দুই হাজার বৎসরের মৃত "স্বাভাবিক মানুষকে" পুনর্জ্জীবিত করাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল। "স্বাভাবিক মানুষ" বলিতে তিনি হিংস্র জন্তু ভিন্ন বোধ করি আর কিছুই বুঝিতেন না। "নৈতিক বৃত্তি ত মানুষের রুচির উপর নির্ভর করে। সংস্কারই (instinct) হইতেছে, বিশুদ্ধ জ্ঞানের আধার। সকল সংস্কারই একমাত্র দুর্ব্বলের উপর অত্যাচারে পর্য্যবসিত হয়। প্রতিবেশীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিও না, সহজাত-সংস্কার যে পথ নির্দ্দেশ করে, সেই পথে চলিও।"

নীট্সে আরও বলেন, "জীবনটা একটা চির-আহরণ; সমগ্র বিশ্ব হইতে আমরা কেবল গ্রহণই করিতেছি।"

নীট্সের মতে খ্রীষ্টধর্ম্ম একটা চালাকির খেলা। দুর্ব্বলেরা সবলের বিরুদ্ধে এই খ্রীষ্টধর্ম্মরূপ কপটাচরণকে খাড়া করিয়া জীবন-সংগ্রামে কৌশলে আত্মরক্ষার আয়োজন করিয়াছিল। সমর্থের নীতি অন্যদিকে বলিতেছে, "জীবন আছে, ক্ষমতা আছে, অতএব হে বলবান্! আত্মম্ভরী হও!" যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল অর্থাৎ নীট্সের মতে উপযুক্ত, তাহারা শক্তিদ্বারা শাসন করিবে। দুনিয়ার দস্তুরই এই। প্রমাণ দেখ, বহুবিধ লাভজনক দুষ্কার্য্যের জন্য প্রতিদিন নৈতিক আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-সাধন রীতিমত দৃঢ়সঙ্কল্পিত পদ্ধতির অনুসরণসাপেক্ষ।

এই পশু-প্রবৃত্তি এবং পশু-শক্তির ন্যায়-দর্শন যে যুদ্ধনীতির অনুরাগী হইবে, তাহা ত স্বাভাবিক। নীট্সে বলেন, "জবরদস্তি করিয়া একটা যুদ্ধ জয় করিতে পারিলে, বহু উদ্দেশ্য সাধু হইয়া উঠে। যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীর যত প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, মনুষ্য প্রেম-দ্বারা তাহার কণামাত্রও করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহারা ভীরু, যাহারা কাপুরুষ এবং যাহারা দুর্ব্বল, তাহারাই সার্ব্বজনীন শান্তির জন্য চীৎকার করিয়া মরে।"

নীট্সের শেষ কল্পনা—"অতি-মানুষ।" মানুষ হইয়া এইরূপ পশু-শক্তির উপাসনা করিতে পারে না, একথা নীট্সে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি "অতি-মানুষে"র কল্পনা করেন। তুচ্ছ মানুষকে অতিক্রম করিতে না পারিলে উপায় নাই। "অতি-মানুষ" মানুষের উপরে। "অতি-মানুষ" অর্থে তিনি একটা অপরূপ জানোয়ারের কল্পনা করেন নাই। নীট্সের কল্পিত "অতি-মানুষ" আমাদেরই মত সাদা-সিধে মানুষ বটে, তবে সে কেবলমাত্র সংস্কার, ইচ্ছা এবং যথেচ্ছাচারিতার দাস। তাহার মূলমন্ত্র, "কঠিন হও।"

এখন একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। সমগ্র জাতিসম্বন্ধে নীট্সের নীতি খাটে কি না। আজ তাহা বলা কঠিন; ইহার মীমাংসা সময়ে হইবে। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে, ব্যক্তি-বিশেষ (individual) যে জীবন-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া হাহাকার করিয়া জীবন কাটায়, সে বিষয়ে খুব কম সন্দেহই আছে। "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (survival of the fittest) কথাটা আজকাল না মানিয়া উপায় নাই এবং উহা মানিতে গেলে এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল আগু বাড়াইয়া দিবার খ্রীষ্টনীতি পুস্তকের পাতাতেই চাপা দিতে হয়। পারিবারিক জীবনে নিত্য দেখিতে পাই, যাহারা সোরগোল, ডাক-হাঁক, তাড়ন-পীড়ন, আদেশ-উপদেশ দিতে পারে, তাহাদের প্রভুত্ব অব্যাহত থাকে; ফলে পরিবারের অন্য সকলের প্রাপ্য সুখ, আনন্দ, স্বেচ্ছা-বিচরণ, এমন কি দৈনিক আহার-আচার পর্য্যন্ত সব ব্যাহত হইয়া পড়ে। স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপর জীবকে ভয় করিয়া পরিবারস্থ দুর্ব্বলেরা মানবজীবনের বহু প্রাপ্য পদার্থ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়—এবং হয়ত কেহবা নিজের প্রাপ্য ছাড়িয়া দিয়া, নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, আত্মপ্রসাদ পাইতেছি বলিয়া আত্মবঞ্চনা করিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্য নহে; প্রমাণস্বরূপ দেখা যাইবে যে, সেই বঞ্চিত মানব তাহার আত্মবলিতে সুখ ও আত্মপ্রসাদই যদি পাইবে, তবে জীবনের অবশিষ্ট কালের জন্য সে অশ্রু-সাগরে ভাসিতে থাকে কেন? মানব যত বড়ই হউক, মানবের আত্মা যত উৎকর্ষই লাভ করুক, তাহার মধ্যে আদিম জীব-বৃত্তি কতক পরিমাণে থাকিবেই এবং সেই সকল প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হইলে মানবের পূর্ণত্বলাভ হয় না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও, বস্তুতঃ সত্য। মানবের অন্তরে নিত্য দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে; অসুরকে বঞ্চনা করিয়া মথিত সাগরের সব সুধা যদি দেবতাই ভোগ করেন, তবে অসুরেরা পুনরায় সমুদ্রমন্থন করিতে ছাড়িবে না, তাহাতে বিষ উঠিবেই এবং সে বিষ অসুরে নয়, দেবতার মধ্যে যিনি পরম দেবতা, সেই মহাদেবকে পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে হইবে। সে অবস্থা অপর দেবতাদিগের পক্ষে যতই আনন্দদায়ক হউক, বিষপানকারী মহাদেবের পক্ষে নিশ্চয়ই সুখদ নহে; তথাপি এই দেবাসুরের চিরন্তন দ্বন্দ্ব এইরূপই থাকিয়া যাইবে; দেশকালপাত্রভেদে যখন নৈতিক আদর্শের পার্থক্য এবং পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, তখন নীট্সের নীতি সৎ কি অসৎ, আজ আমরা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না। কারণ, আজ আমাদের বিবেক-বুদ্ধি বলিতেছে, "এ বিষম নীতির ফল বিষময়।"

এই বিকৃত নীতি-প্রচারক অনন্যসাধারণ মনস্বী ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাতুল অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন।

আজ এই সকল শিক্ষকের কু-শিক্ষার ফলে জার্ম্মাণী, সত্য শিব এবং সুন্দরকে ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে—সে ধর্ম্ম, "ক্ষমতার উপাসনা।" দুর্নীতির চরম সীমায় পৌঁছিয়া জার্ম্মাণী আজ যে যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে, তাহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে জীবনাহুতি দিতেছে, তবুও চাই—আরও চাই, জার্ম্মাণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু

হিমালয়-দর্শনে

(১)

প্রস্তরে গড়া শুধু এ উচ্চ তুচ্ছ পাথর নয়,
ধরণীর এ যে শ্যাম-মন্দির গম্ভীরভাবে রয় !
কঠিন দগ্ধ তৃষ্ণাকাতর পাদদেশ সমতল,
যুক্তহস্তে মাগিতেছে, "ওগো দাও, দাও তৃষা-জল !"
কাঁপা'য়ে পাষাণ অমনি জাগিল প্রপাত-পুণ্য-ধারা,
হাসির ফেনায় ভাসাইয়া ভূমি ছুটিছে আত্মহারা !
কৃষ্ণপাষাণে শ্যামলতা সাথে তাই ত ঝরণা বয় ;
কে বলে এ শুধু কঠিন পাষাণ !—নয় ওগো তাহা নয়।

(২)

মরুভূমি তা'রে পাঠা'ল খবর নব মেঘে ভারে ভারে,
বারি-বিরহীর নব মেঘদূত ঠেকিল পাহাড়-পারে।
অশ্রু-বাষ্প ঘনীভূত যেন উচ্চ এ বনপথ
কাঁপা'য়ে নিয়ে চলিছে গরজি ইন্দ্রদেবের রথ !
ইন্দ্রধনুর গাণ্ডীব হেথা, শরযোজনার ভূমি ;
শক্তি হেথায় প্রবাহ-মুক্ত উচ্চ পাহাড়চুমি' !
অধিবাসীরাও বলবান্ হেথা, সদা হাসি-খুসী রয়,
কে বলে এ শুধু কঠিন পাষাণ !—নয় ওগো তাহা নয় !

(৩)

শ্যাম-অরণ্য প্রবাহের মত চলিছে নিম্নে নামি'
সবুজ স্রোতের ধারা যেন ঠিক্ সমতলে গেছে থামি' !
ধ্যান-গম্ভীর সবুজ শাড়ীতে যেন এ গৌরী-দেহ,
অঞ্জলি তাঁ'র ঝরণার ধারা—মধুর কোমল স্নেহ !
নিত্যই নব বাষ্পবারিতে সুস্নাত তনুরাগ,
অঙ্গে অঙ্গে চিরবসন্ত—অনন্ত অনুরাগ !
বিরাট-হৃদয় মানব ও ব্যাঘ্রে দিয়াছে সমান ঠাঁই,
কে বলে এ শুধু কঠিন পাষাণ !—নাই যে কঠিন নাই !

* * * *

রহস্যের এ শুভ্র হাসি শ্যামল কিনারায়
মেঘের মত নিত্য এসে আপ্‌নি টুটে যায় !
মাথার 'পরে মুকুট জ্বলে দীপ্ত শশী-রবি ;
কল্পনা তোর, জল্পনা তোর থামিয়ে দে রে কবি !
বাস্তবে আর আদর্শে এ গোপন-পরিচয় ;
পাষাণ এরে বল তুমি !—নয় এ পাষাণ নয়।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

বিসর্জ্জন

(১)

চন্দ্রাতপতলে বিবাহসভা—আলোকমালায় উজ্জ্বল ! চারিদিকে গন্ধমাল্য দুলিতেছে। সভা-প্রাঙ্গণ নিমন্ত্রিত নর-নারীতে পরিপূর্ণ, কিন্তু কলরবে ভরা নহে। সুসজ্জিত মঞ্চের উপর সুখাসনে আচার্য্য মহাশয় উপবিষ্ট। তাঁহার একপাশে কন্যা, অন্য পাশে বর। মঞ্চের নিকটেই মহিলাদিগের আসন। উভয় পক্ষের মহিলারা সেখানে উপবিষ্ট। পুরুষদিগের আসন স্বতন্ত্র। সভা-প্রাঙ্গণে বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী ও প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ার সমাবেশ—সকলেই নিমন্ত্রিত। রবাহূত বা অনাহূতের সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। স্তব্ধপ্রায় সভাতল মুখরিত করিয়া অমৃতবর্ষী কণ্ঠে কোনও সুন্দরী সময়োপযোগী গান গাহিতেছিলেন।

সে কণ্ঠস্বর সত্যই মধুর, অপূর্ব্ব এবং মনোমোহন। বহু কৌতূহলী নেত্র গায়িকার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি। যাঁহারা দূরে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া সঙ্গীতকারিণীকে আবিষ্কার করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

ভুবনমোহন প্রথম পংক্তির একপার্শ্বেই ছিল। সে বন্ধুবর রসিকলালের কাণের কাছে মুখ রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বড় চমৎকার গলা ! উনি কে ভাই ?"

রসিক বলিল, "তুমি চেন না ? তোমাদের পাড়াতেই থাকেন যে ! আমাদের ইংরাজী অধ্যাপক হরনাথবাবুকে তোমার মনে পড়ে ? তোমায় খুব ভালবাসিতেন, মনে নাই ? তারপর ঢাকা-কলেজে তিনি বদ্‌লি হইয়া যান। সেই হরনাথ মিত্র মহাশয়ের উনি কন্যা, নাম সুবালা। সংপ্রতি হরনাথবাবু পেন্সন লইয়া তোমাদের পাড়াতেই বাড়ী ভাড়া করিয়া আছেন।"

গান তখন থামিয়া গিয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় গম্ভীরভাবে বক্তৃতা সুরু করিয়াছিলেন।

ভুবনমোহন বলিল, "হরনাথবাবুর এমন সুন্দরী মেয়ে আছে তা'ত জানিতাম না ! তুমি এত খবর পাইলে কোথা হইতে ?"

রসিক সংক্ষেপে বলিল, "জানইত আমি ভবঘুরে। বি, এ, পরীক্ষার পর ঢাকায় এক আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম, সেখানে হরনাথবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। দু'দিন তাঁ'র ওখানে নিমন্ত্রণ খাইয়াও আসিয়াছি। সেই হইতে তাঁ'দের পারিবারিক খবর আমি কিছু কিছু রাখি। হরনাথবাবুর স্ত্রী আমাকে একটু স্নেহও করেন।"

ভুবনমোহন মুগ্ধনেত্রে যুবতীর দিকে চাহিয়া রহিল। সুন্দরীর রূপের আকর্ষণে সে কি আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিল ?

রসিক, বন্ধুর নিবিষ্টভাব দেখিয়া সহাস্যে বলিল, "কিহে, তুমি একেবারে ভাবে গদ্‌গদ হইয়া পড়িলে যে !"

একটু উত্তেজিতভাবে ভুবনমোহন বলিল, "গ্রীক্ শিল্পীর রচিত মূর্ত্তির কথা কেতাবেই পড়িয়াছি ; ছবিতেই দেখিয়াছি, কিন্তু এমন জীবন্ত ছবি কখনও দেখি নাই। কাল হরনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইব, তুমি লইয়া যাইবে রসিক ?"

"সে আর বেশী কথা কি ? তিনি তোমায় পাইলে খুব সুখী হইবেন। তুমি তাঁ'র প্রিয়ছাত্র ছিলে। তোমাদের পাড়াতেই থাকেন, এতদিন তোমার দেখা করা উচিত ছিল।

আচার্য্য মহাশয় তখন দাম্পত্য-সম্বন্ধের মহান্ উদ্দেশ্যবিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিতেছিলেন।

ভুবনমোহন বলিল, "হরনাথবাবু এখানে আজ আসেন নাই ?"

রসিক ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কই, দেখিতে পাইতেছি না ত !"

"আচ্ছা, তবে ভাই কথা রইল, কাল তাঁ'দের ওখানে তুমি আমায় লইয়া যাইবে। বেলা তিনটার মধ্যে আমাদের ওখানে যাইও, একসঙ্গে যাওয়া যাইবে।"

বিবাহের আনুষঙ্গিক ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন সকলেই আহারের জন্য পার্শ্বস্থ পটমণ্ডপের দিকে ছুটিতেছিলেন। বন্ধুযুগলও সেইদিকে গেল।

(২)

অপরাহ্নের সূর্য্য নারিকেল-বৃক্ষের শীর্ষে স্বর্ণধারা ঢালিয়া দিয়া তখনও বিদায়গ্রহণ করে নাই। এমন সময় দুইবন্ধু একটি নাতি-বৃহৎ একতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাড়ীটি তেমন বড় না হইলেও, সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত। সম্মুখে একটি ছোট বাগান।

বাহিরের ঘরে একখানি সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একটি বয়স্ক পুরুষ ; তাঁহার পাশের একখানি আসনে একটি যুবতী বসিয়া কোন গ্রন্থ পড়িতেছিলেন।

রসিকলাল দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "মাষ্টার মহাশয়, ভিতরে যাইতে পারি ?"

যুবতী ধীরে ধীরে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল। রসিক তাহার কাছে অপরিচিত অভ্যাগত নহে।

"আজ আপনার একটি পুরাতন ছাত্রকে সঙ্গে আনিয়াছি, তিনি আপনাদেরই প্রতিবেশী। প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মোহিতবাবুর পুত্র। ভুবন, এদিকে এস।"

ভুবনমোহন বাহিরের 'রকে'র উপর দাঁড়াইয়াছিল। বন্ধুর আহ্বানে সে ভিতরে প্রবেশ করিল।

হরনাথ বলিলেন, "এস বাবা, বস, তোমাকে আমি খুব চিনি। তোমার বাবার সহিত ছেলে-বেলায় আমার বিশেষ জানা-শুনা ছিল। কতদিন একসঙ্গে খেলা করিয়াছি। সুবালা, যেও না মা ! লজ্জা কি ? ভুবন ত ঘরের ছেলে ; ওর কাছে লজ্জা করিবার কিছু নাই। ওঁকে বরং ডাক, ভুবনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দি।"

সুবালা মৃদুগমনে জননীকে ডাকিতে গেল।

হরনাথবাবু বলিলেন, "তুমি এবার এম, এ, পরীক্ষায় ইংরাজী-সাহিত্যে প্রথম হইয়াছ, না ?"

ভুবন সলজ্জভাবে বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"তুমি যে খুব ভাল ছেলে তা' আমি জানি। আমার বিশ্বাস ছিল, শেষ পর্য্যন্ত বরাবরই তুমি পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। এখন কি পড়িবে স্থির করিয়াছ ?"

রসিক বলিল, "ওর ইচ্ছা বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসে। সিবিল-সার্ভিস পরীক্ষা দিবার দিকে ভুবনের মোটেই ঝোঁক নেই। চাকরী ও করিবে না।

বৃদ্ধ বলিলেন, "সে বেশ কথা। চাকরীতে মনুষ্যত্ব বজায় রাখা বড় শক্ত। আর ভুবনের মত অবস্থাপন্ন লোকের চাকরী করিবার দরকারই বা কি ?

রসিক বলিল, "আজ্ঞে, সেত ঠিক কথাই। ওর বাবা যা' জমাইয়া গিয়াছেন, তা'তে ভুবন দুই পুরুষ পায়ের উপর পা রাখিয়া রাজার হালে কাটাইতে পারিবে।"

হরনাথবাবুর পত্নী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভুবন ও রসিক উভয়েই তাঁহাকে প্রণাম করিল।

পরস্পরের পরিচয় হইয়া গেলে, হরনাথবাবু বলিলেন, "সুবালা, এইবেলা চা লইয়া এস। এঁদের জন্যও এনো। ভুবন, তোমার বোধ হয় বিশেষ আপত্তি হইবে না ?"

সলজ্জভাবে ভুবন বলিল, "আজ্ঞে, আপনি এত কুণ্ঠিতভাবে বলিতেছেন কেন ? আপনি পিতৃতুল্য, আপনার এখানে আমার কোন বিষয়েই আপত্তি নাই।"

বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি জানিতাম নিকটেই তোমাদের বাড়ী। কতদিন ইচ্ছাও হইয়াছিল তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি। কিন্তু শেষে ভাবিয়াছিলাম, অনেকদিন আগের কথা, হয়ত তুমি আমায় চিনিতেই পারিবে না।

"আজ্ঞে, এমন আদেশ কেন করিতেছেন ? আপনি গুরু ; আপনাকে চিনিতে পারিব না, এমন হইতেই পারে না।"

সুবালা তিনজনের মত চা ও রেকাবী করিয়া কিছু ফলমূল এবং মিষ্টান্ন লইয়া আসিল।

তাহার লজ্জা-নম্র ব্যবহারে এবং গমন-ভঙ্গিতে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল যে, ভুবনমোহন একেবারে মোহিত হইয়া গেল।

চা-পান করিতে করিতে ভুবন বলিল, "আপনার কি এই একটিমাত্র সন্তান ?"

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে উপস্থিত ঐ-টুকুই সম্বল। এখন উহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে পারিলে, আমার মস্ত দুর্ভাবনা যায়। কিন্তু বুঝিয়াছ বাবা, যে কাল পড়িয়াছে, গরীবের মেয়ে হাজার গুণবতী ও সুন্দরী হইলেও ভাল পাত্র বড় একটা কাছে ঘেঁসে না। সর্ব্বত্রই এক কথা—যেখানে টাকা নাই,—তাহার ত্রিসীমানায় লোক আসিতে চায় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম সকলেরই ঐ এক বুলি। টাকাই সকলের মূলমন্ত্র !"

নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় ক্রমশঃ রাত্রি হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রসিক বলিল, "চল ভুবন, আজ যাওয়া যাক্।"

হরনাথ বলিলেন "এখন ত পরিচয় হইয়া গেল, মাঝে মাঝে এস।"

"যে আজ্ঞে," বলিয়া ভুবনমোহন বন্ধুর সহিত চলিয়া গেল।

(৩)

কিন্তু ক্রমশঃ এমন হইল যে, ভুবনমোহন প্রত্যহই হরনাথ-ভবনে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার অকপট আত্মীয়তা ও আনুগত্য দর্শনে বৃদ্ধ দম্পতী অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

প্রথম দর্শনেই সুবালার প্রতি তাহার হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইলে সে বুঝিতে পারিল, এই মিতভাষিণী, সেবা-পরায়ণা সুন্দরীই তাহার গৃহলক্ষ্মীর আসন অলঙ্কৃত করিবার একমাত্র যোগ্য পাত্রী। সুবালার ন্যায় রূপবতী, গুণবতী, সুগায়িকা নারী সহসা কি মিলে ? সে প্রতিজ্ঞা করিল, সুবালা ছাড়া জীবনে আর কাহাকেও পত্নীপদে বরণ করিয়া লইবে না।

প্রণয়-দেবতার অমোঘ সন্ধান সুবালার হৃদয়কেও বিদ্ধ করিয়াছিল। সুধু বিদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, যুবতীর হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে প্রহারের বেদনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভুবনমোহনের কান্তি, বিনয়-নম্র সরল ব্যবহার তাহাকে মুগ্ধ, অভিভূত করিয়াছিল। এই নবপরিচিত যুবকের ধ্যানে সে এখন এত তন্ময় হইয়া গেল

যে, সে বুঝিল ভুবনমোহন যদি তাহাকে ভবিষ্যতে জীবন-সঙ্গিনী না করে, তাহা হইলে তাহার জীবনধারণ ব্যর্থই হইবে। এমন প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী, চরিত্রবান্, শিক্ষিত যুবক কোন্ রমণীর না প্রার্থনীয়? কিন্তু ভুবনমোহন যে তাহার পাণিপ্রার্থী হইবে, সে যে তাহারই মত প্রেমের তপস্যা করিতেছে, এ চিন্তা, এ দুরাশা একবারও যুবতীর হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাহার পিতা সামান্য পেন্সন-প্রাপ্ত অধ্যাপক; প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী সম্ভ্রান্ত বংশের সুশিক্ষিত ভুবনমোহন কি দরিদ্র-কন্যার পাণিগ্রহণের কল্পনা করিতে পারে? তথাপি সে ভুবনমোহনের চিন্তা ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না।

অবশেষে মনের অবস্থা এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যে, ভুবনমোহন কথাটা আর মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে উত্তেজিতভাবে একদিন বন্ধু রসিকলালের কাছে হৃদয়ের কামনা ব্যক্ত করিল। বন্ধু এ সংবাদে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না। ভুবনের গতি-বিধির চাঞ্চল্য, অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন, কার্য্যে অনাস্থাভাব প্রভৃতি সে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। বন্ধুবর যে দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত, সে তাহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল।

কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল, "সত্য বলিতেছ?"

ভুবনমোহন দৃঢ়স্বরে বলিল, "এমন সত্য জীবনে কখনও বলি নাই।"

"তা'রপর?"

"তা'রপর এখন তোমাকে ঘটকালীর ভারটা লইতে হইবে। আমার বিলাত-যাত্রার দিন ক্রমশঃ নিকট হইতেছে, তাহার আগে তাঁহাদের অভিপ্রায়টা আমি জানিতে চাই।"

রসিক মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা করিল, তা'রপর বলিল, "আর কা'রও উপর ভারটা দিলে হইত না? আচ্ছা, থাক্, আমিই বলিব।"

(৪)

প্রস্তাব উঠিবামাত্র হরনাথবাবু হাত বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ যেন হাতে পাইলেন। এ যে দরিদ্রের কোহিনূর-লাভের মত অবিশ্বাস্য ব্যাপার! সংবাদটা কি সত্য? বৃদ্ধ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অধ্যাপকের মানসিক চাঞ্চল্য কিছু সংযত হইলে, রসিকলাল যখন সবিস্তারে বাল্যবন্ধুর অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিল, তখন হরনাথের মনে আর সন্দেহের অবকাশমাত্র রহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি এই শুভসংবাদ গৃহিণীকে জ্ঞাপন করিলেন। স্বামীর আনন্দ পত্নীর হৃদয়ে প্রবাহিত হইল। উভয়েই সে আনন্দের বেগ দমন করিতে পারিলেন না। নিকটেই সুবালা নতশিরে বসিয়াছিল। তাহার সুগৌর কপোলের রক্তরাগ দেখিয়া রসিক বুঝিল, সুবাতাস যেভাবে বহিতেছে, অনুকূল স্রোতে নৌকা ছাড়িয়া দিলে, অবিলম্বেই তাহা তটলগ্ন হইবে।

উভয় পক্ষের যখন সম্মতি আছে, তখন শুভকার্য্যের আর বাধা কি? কিন্তু ভুবনের জননী বলিলেন যে, পুত্র বিলাত হইতে ফিরিবার পর বিবাহ হইবে। তৎপূর্ব্বে পাত্রী-আশীর্ব্বাদ বা বাগ্‌দান-ক্রিয়া হইয়া থাকুক। এই সঙ্গত প্রস্তাবে কাহারও কোন আপত্তি হইল না। হরনাথবাবুও সানন্দে সে প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

শুভদিনে পাত্রী-আশীর্ব্বাদ উপলক্ষে হরনাথবাবুর বাড়ীতে একটি ছোট-খাট উৎসবের আয়োজন হইল। উভয় পক্ষের মিত্র এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন সে উৎসবে নিমন্ত্রিত হইলেন।

সুবালার লজ্জানম্র, স্মিত হাস্যেও তাহার অন্তরের চাঞ্চল্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠিতেছিল। শত চেষ্টাতেও সে আত্মগোপন করিতে পারিতেছিল না। কোন বিচক্ষণ দর্শক তাহার নয়নযুগলের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারিত, যুবতীর হৃদয়ে ক্ষীরোদ-সমুদ্র আলোড়িত হইতেছে।

রসিকলালের মুখেও প্রসন্নতার বিমল দীপ্তি। তাহার অকৃত্রিম সুহৃদ পরম স্নেহের পাত্র ভুবনমোহন তাহার বাঞ্ছিতার সহিত ভবিষ্যতে যে তীর্থে সম্মিলিত হইবে, আজ সেইখানে স্বর্ণ-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, তাহারা যেন চিরসুখী হইয়া মিলন-মন্দিরে প্রেমের রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারে!

আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া যথারীতি সমাপ্ত হইল। সমবেত আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের সমক্ষে কন্যা-আশীর্ব্বাদ বা বাগ্‌দান-ক্রিয়া শেষ হইল। ভুবনমোহন, এই শুভদিনে একটি হীরকখচিত বহুমূল্য অঙ্গুরীয় সুবালাকে উপহার দিল।

একটি কক্ষমধ্যে ভুবনমোহনকে লইয়া বয়স্যগণ জটলা করিতেছিল। রসিক সেখানে যাইবামাত্র সকলে ধরিয়া বসিল, "রসিকদা, একটা গান গাও।" সুকণ্ঠ বলিয়া রসিকের প্রতিপত্তি ছিল। একটা হারমোনিয়ম লইয়া সোৎসাহে রসিক গায়িল—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!"

অনাথ বলিল, "কবি যথার্থই বলিয়াছেন, আমাদের ভুবনের পক্ষে কথাটা কত সত্য!"

রসিক কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া গায়িল—

"গরব সব হায়! কখন্ টুটে যায়—
সলিল বহে' যায় নয়নে।"

চন্দ্রনাথ বলিল—"এ ত সলিল নহে; সুধুই হাসির ফোয়ারা!"

রসিক বলিল, "কবি ভুল লিখিয়াছেন; সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত।"

(৫)

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিবা শেষ হইতেই চাহে না। সুবালা শুইয়া, বসিয়া, বই পড়িয়া, কিছুতেই শান্তি পাইতেছিল না। একা একা কি ভাল লাগে? বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পিতা বৰ্দ্ধমানে গিয়াছেন, কখন্ ফিরিবেন, তাহার স্থিরতা নাই। মাতা, তাঁহার ভগিনীর আকস্মিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া, বেলা একটার সময় বালিগঞ্জে গিয়াছেন। সুবালাও তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু স্বামীর অসুবিধা হইবে ভাবিয়া তিনি তাহাকে সঙ্গে ল'ন নাই। তিনি ক্লান্তদেহে গৃহে ফিরিলে, কে তাঁহার পরিচর্য্যা করিবে, জলখাবার দিবে? পরিচারিকা দ্বারা তাহা হয় না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষে সুবালাকে তিনি বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ভুবনমোহনও আজ দুইদিন আসিতে পারে নাই। তাহার বিলাত-যাত্রার আর চারিদিনমাত্র বাকী আছে। তাহারই আয়োজনে সে ব্যস্ত। আজও আসিতে পারিবে কি না, কে জানে!

সুবালা বাহিরের ঘরে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রাজপথের দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার আর বেশী বিলম্ব নাই। আকাশে মেঘের সঞ্চারও

দেখা গেল। পরিচারিকা কক্ষে কক্ষে আলোক জ্বালিয়া দিয়া গেল।

সহসা সুবালার নয়নে আনন্দ-কিরণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। 'গেটে'র বাহিরে প্রিয়জনের পরিচিত মূর্ত্তি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি সে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভুবনমোহন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সুবালাকে একা দেখিয়া বলিল, "এঁরা কোথায় গেলেন?"

সুবালা প্রসন্নমুখে বলিল, "বাবা বৰ্দ্ধমানে। মাসীমার ভারী অসুখের কথা শুনে মা বালিগঞ্জে গেছেন।"

"তুমি তা' হ'লে দেখিতেছি সারাদিন একা বাড়ীতে আছ? ভারী কষ্ট ত?"

সুবালা মৃদু হাসিল। সারাদিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে বড় কষ্ট পাইয়াছে সত্য; কিন্তু সে ক্লান্তি ও অবসাদের চিহ্ন এখন এতটুকুও নাই।

মৃদুস্বরে যুবতী বলিল, "আপনি বসুন, আমি চট্ করিয়া খানকয়েক লুচি ভাজিয়া আনি।"

ভুবনমোহন বাধা দিয়া বলিল, "না, না, তোমার আর কষ্ট করিয়া কাজ নাই। আমারও তেমন ক্ষুধা নাই।"

মিথ্যা কথা। সারাদিন ঘুরিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু পাছে সুবালা ব্যস্ত হয়, এজন্য সে কথাটা গোপন করিল।

সুবালা বলিল, "কষ্ট আবার কি? আপনি বসুন। আমার সব গোছান আছে, দশ মিনিটের মধ্যে আমি আসিতেছি।"

ইহারই মধ্যে তাহার সেবা ও পরিচর্য্যার জন্য সুবালার এরূপ আগ্রহ সে তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিল।

অবিলম্বে চা, পটল-ভাজা, গরম লুচি ও খানিকটা হালুয়া পাত্রে করিয়া লইয়া সুবালা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ভুবনমোহন আর দ্বিরুক্তি করিল না; তৃপ্তিভরে সে জলযোগের সদ্ব্যবহার করিল।

পকেট হইতে একখানি সোণার জলে বাঁধান' "সোণার তরী" বাহির করিয়া সে সুবালার হাতে দিল। সলজ্জভাবে সেই বইখানি লইয়া পাতা উল্টাইতেই, সুবালা দেখিল প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে, "আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী, শ্রীমতী সুবালাকে শ্রদ্ধা ও প্রণয়ের নিদর্শনস্বরূপ উপহৃত হইল।"

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। টেবিলের ধারে উজ্জ্বল আলোকের সম্মুখে বইখানি খুলিয়া উভয়ে কাব্যপাঠ ও আলোচনা করিতে লাগিল। তাহারা এতই নিবিষ্টভাবে কাব্যালোচনায় মগ্ন যে, আষাঢ়ের আকাশ কখন্ মেঘে ছাইয়া গিয়াছিল, সেদিকে তাহাদের লক্ষ্য ছিল না। অবশেষে যখন মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ হইল তখন তাহাদের চৈতন্য হইল।

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া সুবালা বলিল, "তাইত, সাড়ে-সাতটা বাজিয়া গেল, বাবা এখনও আসিলেন না ত! বোধ হয়, রাত্রির ট্রেনে ফিরিবেন। ন'টার আগে দেখিতেছি তিনি আসিতে পারিবেন না। বুড়ামানুষ, এই জল-ঝড়ে বড় কষ্ট পাইবেন দেখিতেছি। মাও বোধ হয় বেরুতে পারেন নি।"

ভুবনমোহন বলিল, "তা'তে তোমার ভয় কি সুবালা? তাঁ'রা যতক্ষণ না আসিবেন, আমি তোমায় একা রাখিয়া বাড়ী যাইব না। বিবাহের বাহ্য অনুষ্ঠানগুলা বাকী থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে তুমি আমার স্ত্রী। তোমার শুভাশুভ এবং রক্ষার ভার সমস্তই আমার উপর।"

কৃতজ্ঞ নয়নে সুন্দরী, ভাবী স্বামীর পানে চাহিল। তাহার দৃষ্টি যেন বলিতেছিল, "তুমি যে এমনই মহৎ, তাহা কি আমি জানি না?"

শীঘ্র বৃষ্টি ধরিবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, ভুবনমোহন বলিল, "আজ একটা গান গাও ত সুবালা! অনেকদিন তোমার গান শুনি নাই। কতকাল এখন শুনিতে পাইব না।"

ভুবন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

সুবালা উঠিয়া ভিতরে চলিল। তাহার শয়ন-কক্ষে টেবিল হারমোনিয়ম ছিল। ভুবনমোহনও তাহার অনুবর্ত্তী হইল।

ঝরঝর বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, গাছপালা বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে, সমস্ত প্রকৃতি তখন শব্দময়ী। বর্ষার সে বিচিত্র রাগিণী কি মধুর, কি সুন্দর! আকাশের বক্ষে মাঝে মাঝে দীপ্ত দামিনীর বিলাস-নৃত্য, সঙ্গে সঙ্গে মেঘের বিষাণ গুরুগর্জ্জন বাজিয়া উঠিতেছে! কোমলে কঠোরে কি বিচিত্র সম্মিলন!

সেই শব্দতরঙ্গ সুরময় করিয়া সুবালার সুধাবর্ষী কণ্ঠের অপূর্ব্ব, মধুর সঙ্গীতধ্বনি কক্ষতল পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। সুরের ঝঙ্কার, রাগিণীর মূর্চ্ছনা, ছন্দের দ্রুত-ললিত গতি কি বিচিত্র! সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে ভুবনমোহন কোন্ ত্রিদিব রাজ্যে উপনীত হইল, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিতেছিল না।

বর্ষাধারাসিক্ত বাতাস হেনার ঘন সুগন্ধ বহন করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশও দীপালোক-শিখা কম্পিত করিতেছিল। ভুবনমোহন মুগ্ধভাবে পলকহীন নেত্রে গায়িকার ভাববিহ্বল মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। যুবতীর নিটোল দেহে রূপের জ্যোৎস্না তরঙ্গিত, কমনীয় আননে প্রেম ও করুণার রসমাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত। বিশাল ইন্দিবরযুগলে ও কি দৃষ্টি!

সুবালা গান শেষ করিয়া মৃদুহাস্যে ভুবনমোহনের দিকে চাহিল।

যুবকের সর্ব্বদেহে তড়িৎ-স্রোত বহিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে সুবালার পাশে বসিয়া তাহার বাম হাতখানি আপনার দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "তোমাকে ছাড়িয়া আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা হইতেছে না। কতকাল, কতযুগ তোমায় দেখিব না! শত শত যোজন দূরে, সাত সমুদ্র তের নদী পারে চলিয়া গেলে তুমি আমায় মনে রাখিবে, সুবালা?"

সুবালা ভাবী স্বামীর দিকে অতি কোমল, অতি সরল দৃষ্টিপাত করিল। তাহার হৃদয়ে কত দুঃখ, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। দীর্ঘকাল আশায় বুক বাঁধিয়া সে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিবে। হায়! মিলনের পথে কত বাধা, কত বিঘ্ন! কিন্তু পৃথিবী সুধু কল্পনার ক্ষেত্র নহে, মানবজন্ম কেবল স্বপ্নময় নহে। কর্ত্তব্য অতি কঠোর, প্রত্যেককেই তাহা পালন করিতে হয়।

দুই তিন বৎসর, দীর্ঘ হইলেও সীমাবদ্ধ। কোনরূপে সেই প্রাচীর-রেখা পার হইতে পারিলে মিলন-মন্দিরের যে স্বর্ণ-সিংহাসনে তাহারা চাপিয়া বসিবে, এক মৃত্যু ব্যতীত তথা হইতে আর কেহ তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না।

কোমল কণ্ঠে সুবালা বলিল, "অধীর হইলে চলিবে না। ধৈর্য্য হারাণ' আমাদের উচিত নয়। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সময় শীঘ্র কাটিয়া যাইবে।"

মুখে সে আশ্বাস-বাণী শুনাইল বটে, কিন্তু দীর্ঘদিনের শূন্যতা মনে হইবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল!

ভুবনমোহন বলিল, "তুমি ঠিক কল্পনা করিতে পারিতেছ না সুবালা! এতদিন কি করিয়া তোমায় ছাড়িয়া থাকিব, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যে আমার, তা' জানি; কিন্তু তবু ভয় হয় পাছে তোমায় হারাই! কিন্তু তবু যাইতে হইবে! তবে, তোমার পবিত্র প্রণয়ের একটা বিশেষ স্মৃতি আমার সম্বল চাই।"

এই বলিয়া ভুবনমোহন সুবালার মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিল।

বৃষ্টি আরও বেগে নামিয়া আসিল। বাতাসের বেগও বাড়িতেছিল। আলোক-শিখা বায়ুতাড়নে নির্ব্বাপিতপ্রায়। কিন্তু প্রণয়ীযুগলের সে দিকে দৃষ্টি নাই।

ভুবনমোহন প্রগাঢ় প্রেমভরে যুবতীর কপোলে, ওষ্ঠে সহস্র চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিয়া দিল। সে অভিনব স্পর্শে উভয়েরই দেহে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, শিরায় শোণিতস্রোত চঞ্চলভাবে নৃত্য করিয়া উঠিল।

(৬)

সময় দাঁড়াইয়া কাহারও অপেক্ষা করে না। সুবালার তীব্র বিরহের দীর্ঘ দিনগুলিও চলিয়া যাইতেছিল! আজ তিনবৎসর ভুবনমোহন বিলাতে গিয়াছে। সুবালা তাহার আশাপথ চাহিয়া দিন গণিতেছিল।

ইদানীং উভয়ের মধ্যে পত্র-ব্যবহার কমিয়া আসিয়াছিল। পরীক্ষার তাড়নায় প্রতি মেলে ভুবনমোহন তাহাকে কবিত্বপূর্ণ পত্র লিখিবার অবকাশ পাইত না। হরনাথবাবুও কন্যাকে পত্রাদি লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরীক্ষার সময় অন্যদিকে মন গেলে ফল ভাল হয় না। আজীবন শিক্ষাবিভাগে থাকিয়া এ বিষয়ে তাঁহার পর্য্যাপ্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল।

রসিকলাল মাঝে মাঝে আসিয়া হরনাথবাবুকে ভুবনমোহনের সংবাদ জানাইয়া যাইত। বিলাত-প্রবাসী অন্যান্য বন্ধুর পত্রে সে ভুবনমোহনের অনেক সংবাদ জানিতে পারিত। পরীক্ষার জন্য সে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছে, তাহাতে বিশেষ প্রশংসার সহিত সে উত্তীর্ণ হইবে, এইরূপ সকলের ধারণা।

কিছুদিন পরেই একদিন হঠাৎ সে আসিয়া প্রকাশ করিল যে, ভুবনমোহন পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত ডিক্রী পাইয়াছে। সংপ্রতি সে ইউরোপে পর্য্যটন করিতেছে। ব্যস্ততাপ্রযুক্ত বন্ধুবান্ধবকে সে এই আনন্দ-সংবাদ জানাইতে পারে নাই। রসিকের উপর হরনাথবাবুকে সংবাদ দিবার ভার দিয়াছে।

ভাবী জামাতার সাফল্যলাভের সংবাদে হরনাথবাবু আনন্দিত হইলেন। সুবালার ক্ষুদ্র হৃদয়টিও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দ-বেগ সহস্র চেষ্টাতেও সে দমন করিতে পারিতেছিল না।

একমাস পরে হরনাথ একদিন রসিকের নিকট শুনিলেন, আগামী সোমবার বোম্বাই-মেলে ভুবন কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিবে। তাহাদের বাড়ীতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে।

সুবালা সে সংবাদে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ভুবনমোহন তাহাকে ইদানীং একখানিও পত্র লিখিল না কেন, ইহা মনে করিয়া তাহার হৃদয়ে আশঙ্কার মৃদু ছায়াপাত হইল। অভিমানও যে না জন্মিল, তাহা নহে। "আঁখির আড় মনের বার" পুরুষজাতির পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

নির্দ্দিষ্ট দিনে হরনাথ বেশভূষা করিয়া ভুবনমোহনের অভ্যর্থনার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে চলিলেন। আজ তাঁহার উৎসাহ আর ধরিতেছিল না। কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি যাইবে মা?"

সুবালা সলজ্জভাবে বলিল "না, বাবা।"

ষ্টেশনে গিয়া হরনাথ দেখিলেন, বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও তিনি ট্রেণের পূর্ব্বে পঁহুছিতে পারেন নাই। যাত্রীরা সকলেই প্লাটফরমে নামিয়াছেন। অসম্ভব জনতা। সাহেব, মেম ও বাঙ্গালীর ভিড়ই বেশী। অদূরে একস্থলে অনেকগুলি বাঙ্গালীকে দেখা যাইতেছিল, হরনাথ ভিড় ঠেলিয়া যথাসম্ভব দ্রুতপদে সেইদিকে চলিলেন। একজন সাহেববেশী বাঙ্গালীকে অনেকে ঘিরিয়া কুশলসম্ভাষণ করিতেছিল। দূর হইতে দেখিয়াও তিনি তাহাকে চিনিলেন, সে ভুবনমোহন!

ভুবনের আকৃতির বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার রূপ আরও বাড়িয়াছে। উৎফুল্লভাবে সে আত্মীয়-স্বজনের সহিত কথা বলিতে বলিতে সম্মুখবর্ত্তী গাড়ীতে আরোহণ করিতে যাইতেছিল।

বৃদ্ধ হরনাথ যেমনি গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনই কোচম্যান গাড়ী চালাইয়া দিল। বন্ধুবর্গের কর-মর্দ্দন করিতে করিতে সে একবার বৃদ্ধের পানে চকিতে চাহিল। আবার তখনই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল। সে কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল?

বোধ হয়, নয়। নহিলে সে নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত আলাপ করিত। হরনাথ মনকে এইরূপ প্রবোধ দিলেন বটে; কিন্তু মনের একপ্রান্তে সন্দেহের একটা ছায়াপাত হইল। তাঁহার উৎসাহ ও উত্তেজনার অগ্নিতে কে যেন খানিকটা শীতল জল ঢালিয়া দিল।

স্তব্ধভাবে প্লাটফরমের উপর দাঁড়াইয়া তিনি কি ভাবিতেছেন, এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে বলিল, "ভুবনের সঙ্গে আপনার বুঝি দেখা হয়নি?"

চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বক্তা স্বয়ং রসিকলাল। সংক্ষেপে তিনি বলিলেন, "না।"

"সে আপনাকে বুঝি দেখিতে পায় নাই?"

"বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ তাই। তুমি ভুবনের গাড়ীতে গেলে না যে?"

"আমার একটা দরকার আছে, একবার রামকৃষ্ণপুরে যাইব। আপনি এখন বাড়ী যাইবেন ত?"

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ।"

এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, অথচ ভুবনমোহন যখন সুবালার সহিত দেখাও করিল না, তখন হরনাথ চিন্তিত হইলেন। ভুবনের কলিকাতা-আগমনের পরদিবস হরনাথ তাহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সে সময়ে নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুবালা অথবা বিবাহ-সম্বন্ধে কোন কথা সে একেবারেই উত্থাপন করে নাই। অনেক লোক তখন উপস্থিত ছিল বলিয়া হয়ত লজ্জাবশতঃ ভুবনমোহন সেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই, হরনাথ সে সময়ে এইরূপই ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু এখন যখন সে বিবাহ-প্রসঙ্গের কথা উত্থাপন করা দূরে থাকুক, একবারও সুবালার খোঁজ করিল না, তখন ব্যাপারটি আর উপেক্ষার বিষয় নহে বলিয়া তিনি মনে করিলেন। বিলাত-গমনের পূর্ব্বে সে প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা, কোনও কোনও দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সুবালার সহিত বসিয়া জটলা করিত, এখন সে একবারও তাহার কুশল পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিল না কেন? সুবালার মুখেও একটা ম্লান ছায়া পড়িয়াছিল। হরনাথের পত্নীও অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। কবে সুবালার বিবাহ হইবে, সে সম্বন্ধে আত্মীয়-স্বজনেরাও ইহার ভিতরে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে একটা অপ্রীতিকর জনরবও ক্রমশঃ রটিতে লাগিল। অস্থির হইয়া বৃদ্ধ হরনাথ রসিকের শরণাপন্ন হইলেন। রসিকলাল কয়দিন সে অঞ্চলে আসিতে পারে নাই, কাজেই সে কোন সংবাদ

রাখিত না। কিন্তু সে যখন শুনিল, বিলাত হইতে আসিবার পর ভুবনমোহন তাহার ভাবী পত্নীর সহিত একবার দেখাও করে নাই, তখন অত্যন্ত বিস্মিত হইল। আজ সকালে একটা জনরবও তাহার কাণে আসিয়াছিল; কিন্তু সে জনরবে সে আস্থা-স্থাপন করিতে পারে নাই। এখন বন্ধুর এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া সে তাহার কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যস্ত হইল।

সেইদিন তখনই সে ভুবনমোহনের সহিত দেখা করিতে গেল। নূতন ব্যারিষ্টার তখন ড্রয়িং-রুমে বসিয়া একখানি উপন্যাস পাঠ করিতেছিল।

রসিক বলিল, "বিলাত হইতে আসিবার পর হরনাথবাবুদের ওদিকে গিয়াছিলে?"

অকস্মাৎ বন্ধুর দ্বারা এইরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া ভুবনমোহন কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সহজভাবে বলিল, "না, সময় হয় নাই।"

রসিক অত্যন্ত বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "নির্জ্জনে বসিয়া যাহার উপন্যাস পাঠের অবসর হয়, সে বাগ্‌দত্তা পত্নীর সহিত দেখা করিবার সময় পায় না, এ কথাটা বড়ই হাস্যজনক। তোমার এ কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক নহে। ভাবীপত্নী-সম্বন্ধে এ যুক্তি, সমর্থনের অযোগ্য।"

ভুবনমোহন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "তোমার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।"

রসিক একটু বিরক্তভাবে বলিল, "হরনাথবাবুর কন্যা সুবালা তোমার বাগ্‌দত্তা পত্নী। তুমি তাকে নিজে মনোনীত করিয়াছিলে। বিলাত হইতে আসিবার পর তাহাকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে, এইরূপ অঙ্গীকার-পাশে তুমি আবদ্ধ; অথচ এতদিন আসিয়াছ তবু তাহার কোন সংবাদ লও নাই। এসব কথা ভাল নয়। পাঁচজনে এখনই পাঁচরকম কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তা'র খবর রাখ?"

"তা' আমি কি করিব বল? পাঁচজনের মুখ বন্ধ করিবার শক্তি আমার কি আছে? অপরিণত বয়সে চারিদিক না বুঝিয়া একটা শপথ করিলেই যে আত্মহত্যা দ্বারা সে শপথ পালন করিতে হইবে, এমন কি কথা?"

"এই কি তোমার চূড়ান্ত জবাব?"

"হ্যাঁ। 'সাধারণী'তে আমার বিবাহের চুক্তি বাতিল করিবার সংবাদ দিয়াছি।"

কঠোরস্বরে রসিক বলিল, "তবে আজ যে জনরব শুনিয়াছি, তুমি মিঃ মল্লিকের কন্যাকে বিবাহ করিতেছ, এ সংবাদ মিথ্যা নহে?"

"প্রতি বর্ণে সত্য।"

বিদ্রূপ-হাস্যে রসিক বলিল, "তিন বৎসরে তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতির বহর দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। জীবনে পূর্ব্বে তুমি কখনও শপথভঙ্গ কর নাই, মিথ্যাকথা বল নাই। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, বাঙ্গালীর ছেলে বিলাত যাইলে, অনেকেই বহু বিষয়ে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করেন। জড়বাদীর সংশ্রবে থাকিয়া কেবল অর্থ ও যশ কিরূপে অর্জ্জন করিতে হয়, ভোগ ও বিলাস কিরূপে চরিতার্থ করিতে হয়, তাহাই শিখিয়া আসিয়াছ। মিঃ মল্লিকের মেয়ের বিবাহে তিন লক্ষ টাকা যৌতুক পাইবে ত? বেশ, উত্তম! এখন হরনাথবাবুকে গিয়া সংবাদটা দিই?"

"তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছি। এতক্ষণে তাঁহারা সমস্তই জানিয়াছেন। লিখিয়াছি, কোন অনিবার্য্য সামাজিক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায়, বর্ত্তমানে আমি বিবাহ করিতে অসমর্থ।"

রসিকলাল আর দাঁড়াইল না।

(৮)

বৈদ্যুতিক আলোকে ব্যারিষ্টার মিঃ দত্তের সুদৃশ্য ভবন আলোকিত। কক্ষে কক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা চলিতেছিল। পিয়ানো, হারমোনিয়ম অতি মধুর বাজিতেছিল। অট্টালিকা আনন্দমুখর। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দত্তের গৃহে আজ বৌ-ভাতের উৎসব এবং ভোজের বিরাট্ আয়োজন। প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত মল্লিকের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ভুবনমোহন নিশ্চয়ই পার্থিব এবং অপার্থিব উভয়বিধ আনন্দের অধিকারী হইয়াছিল।

সন্ধ্যা হইতেই নিমন্ত্রিতগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন। ভুবনমোহন সকলকেই যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা করিতেছিল। বন্ধুবর রসিকলাল বিবাহের দিন আসেন নাই, সেজন্য ভুবনমোহন আন্তরিক ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। পাছে বৌ-ভাতের দিনও সে নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে, এজন্য ভুবন স্বয়ং রসিককে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু দুইবার চেষ্টা করিয়াও সে রসিকের দেখা পায় নাই। সে কোথায় যায়, কি করে, বাসার কেহ তাহা বলিতে পারিল না। অগত্যা সে রসিককে বৌ-ভাতের দিন আসিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

কিন্তু ক্রমে রাত্রি যখন নয়টা বাজিয়া গেল, অথচ রসিকলালের দেখা নাই, তখন ভুবনমোহন হতাশ হইল। নিমন্ত্রিতগণ সকলেই আসিয়াছেন, সুধু আসিল না তাহার প্রিয়তম বাল্য-সুহৃদ। ক্ষোভে ও অভিমানে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিতগণ ভোজনে বসিয়াছেন। ভুবনমোহন তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া দুইবার ঘুরিয়া আসিল। এখন তাহার আর বিশেষ কোন কাজ নাই। শ্রান্তদেহে সে নিজের পাঠাগারে প্রবেশ করিল। তাহার নবপ্রকাশিত কাব্য "মালতী," দপ্তরীর বাড়ী হইতে আনীত হইয়া টেবিলের উপর রক্ষিত ছিল। কাব্যখানি সে রসিকলালের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিল। একখানি বই লইয়া ভুবনমোহন নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। বিলাত-যাত্রার সময় জাহাজে বসিয়া সে কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিল।

এমন সময় ভৃত্য একখানি পত্র লইয়া আসিল। সে বলিল যে, এক ব্যক্তি রসিকবাবুর বাড়ী হইতে পত্রখানি আনিয়াছে।

ক্ষিপ্রহস্তে ভুবনমোহন খাম ছিঁড়িয়া ফেলিল। চির-পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা ছিল:—

"আমি তোমার বিবাহের দিন আনন্দ-মিলনের শুভক্ষণে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই বলিয়া তুমি হয়ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছ। শুনিলাম, তুমি অনেকবার আমার সন্ধানে আসিয়াছিলে, কিন্তু দেখা পাও নাই। তোমার বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছি; কিন্তু আজও তোমাদের বাড়ী গিয়া উৎসবে যোগ দিতে পারিলাম না। আমাকে ক্ষমা করিও। অবশ্য আমার না যাইবার কিছু কৈফিয়ৎ আছে।

একজনকে আমি ভাল বাসিয়াছিলাম। কত ভাল বাসিয়াছিলাম, তাহার পরিমাণ করিবার শক্তি আমার নাই। আমি তোমার মত কবি নহি, ভাষার উপর আমার তেমন অধিকারও নাই—তবে এইটুকু বলিতে পারি, সমস্ত অন্তর দিয়া তাহাকে পূজা

করিতাম। মনে মনে অনেক আশার স্বর্গ গড়িয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম, তাহার হৃদয়ের কোনও প্রান্তে আমার মত দুর্ভাগার স্থান নাই, আর একজনকে সে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসে এবং তাহার প্রণয়ভাজন আমারই কোন প্রিয়তম বন্ধু, তখন মনের এই কথা মনেই চাপিয়া গেলাম। দুর্ব্বল হৃদয়কে ফিরাইলাম। পরস্পর পরস্পরের অনুরক্ত; আমি কেন তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াই? তখন উভয়ের মিলনের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু বিধাতার লীলা বুঝিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। তাঁহার খেলা-ঘরে তিনি ইচ্ছামত পুতুল গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন। মানুষের গড়া পুতুল-খেলা তিনি বোধ হয় পছন্দ করিলেন না। উভয়ের মিলন ঘটিল না। কেন ঘটিল না, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।

কিন্তু সে নিদারুণ প্রত্যাখ্যানে আনন্দ-লতিকা এলাইয়া পড়িল! তাহার পিতা ভগ্নহৃদয়া কন্যাকে লইয়া বাটী-পরিবর্ত্তন করিলেন। সে স্থানের বায়ু পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছিল।

নূতন বাটীতে আসিবার পরেও সোণার প্রতিমা দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতেলাগিল। কোনওপীড়া নাই, অথচ মানুষ শুকাইয়া যায় কেন, ডাক্তার সরকার এবং ডাক্তার বসুও অনেক গবেষণার পর তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সপ্তম দিবসে সে শয্যায় আশ্রয়গ্রহণ করিল, আর উঠিল না। তাহার শরীরের ত্বক্ ক্রমশঃ স্বচ্ছ হইয়া উঠিল, কনকচাঁপার ন্যায় বর্ণ রক্তহীন বিবর্ণ হইয়া গেল। তুমি বিশ্বাস করিবে কি না জানি না, নয়দিনের দিন স্বর্ণের কুসুম শুকাইয়া ঝরিয়া গেল। আজ এইমাত্র তাহাকে শ্মশান-চুল্লীর ভস্মস্তূপে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই তপ্ত চিতাভস্ম এখনও শীতল হয় নাই; তাই বিবাহের আনন্দোৎসবে যোগ দিবার ইচ্ছা এবং শক্তি আমার নাই। আমার এ কৈফিয়তে যদি তৃপ্ত হও, তবে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিও।

এখনও ভুলিতে পারিতেছি না, তাহার অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী কে? মানুষ না দেবতা? কাহার অপরাধে, সংসারের সকল সুখ-সাধ-বঞ্চিতা হইয়া নিরপরাধা আনন্দ-প্রতিমা অসময়ে পরলোক তীর্থযাত্রী হইয়াছে?

আশা করি, এই অপ্রীতিকর শ্মশান-স্মৃতি তোমার শুভ-মিলনের বাসর-রজনীর আনন্দকে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন করিতে পারিবে না। ইতি।"

ভুবনমোহন দুঃস্বপ্নগ্রস্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার নব-পরিণীতা বধূসহ জননী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভুবনমোহনের বিবর্ণ মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাতা বলিলেন, "তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি?"

ওষ্ঠে অধর চাপিয়া মিঃ দত্ত বলিল, "না। বড় গরম, শরীরটাও বড় ক্লান্ত।"

সে অন্য দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ

পল্লীবীর

(১)

"আয়রে দুখীরাম!
সারাদিন তোর পাইনে দেখা,
—এতই পড়া—এতই লেখা!
কোথায় গেল মাণিক-মেসো,
কোথায় গেল শ্যাম?
কেষ্টা-কাকা, আন্‌গো ডেকে'
দেসোকে ঐ দোকান থেকে;
—মনের কথা চেপে রেখে',
ছুটছে গায়ে ঘাম।
এসেছ সব? উঠে ব'স।
—শঙ্করা তুই থাম।"

(২)

কাজ-কর্ম্মের আশায়,
জানইত সেই চলে' গেলাম,
মাস দুতিন দেখে এলাম,
সহরের সব ধরণ-ধারণ;—
বুঝ্‌বে কি তা' চাষায়?
নাইক তথায় তফাৎ জাতির,
বিদ্যে দেখেই করে খাতির,
সাহেব-সুবো সবাই।—এ ত
বদন বোসের বাসায়
কাল-কাটানো নয়ক বসে'
তাস-তামাক আর পাশায়!"

(৩)

"বন্ধু কয়েকজন,
গেলাম সেদিন বরযাত্রী
পাল্কী চেপে আধেক রাত্রি;
পাত্র রাজা, কনের পিতা
হীরার মহাজন।
কলের পাখায় চল্‌ল হাওয়া,
একত্রে সব বসে' খাওয়া
বাড়ীর মধ্যে;—বল্‌ব কি আর
কতই আয়োজন!—
কন্যাকর্ত্তা নিজেই দিলেন
যা'র যা' প্রয়োজন।"

(৪)

এষ্টেশনের পাছে,
শিষ দিয়ে আর চুরোট খেয়ে,
বেড়াচ্ছি আর দেখ্‌ছি চেয়ে;
সাহেব একজন টুপি খুলে'
হেসে এলেন কাছে;
Good morning Babu here,
আসুন বেঞ্চে বসি near,
কথা হ'ল ইংরাজীতে
সব বিলাতী ধাঁচে!
বড় ঘর্‌না বটেন সাহেব
বুঝে' নিলাম আঁচে।

(৫)

"জজ-সাহেবের ঘোঁড়া
ক্ষেপে' হঠাৎ গাছের ফাঁকে
ফেলে' হয় ত দিতই তাঁকে;
সাহেব হ'ত জখম, আর সে
নিজেও হ'ত খোঁড়া।
আমি গিয়ে ঘোঁড়া থামাই,
সাহেবকে হাত ধরে' নামাই,
লোকগুলো ত দেখে' অবাক্—
clap দিলে ক' ছোঁড়া।
সাহেব আমায় নিয়ে গিয়ে
বস্‌তে দিলেন মোড়া।"

(৬)

"দিয়ে আড়াই টাকা,
ইণ্টার-ক্লাসেই এলাম আমি;
সেই গাড়ীতে শ্রীমৎস্বামী
কর্ম্মানন্দ, কুবের বাবু,
কাশীশ্বরের কাকা
উঠেছিলেন;—কি সব গল্প!
—আমোদ-প্রমোদ—তাই কি অল্প!
হাসেন বসেন কাশেন
যেন সরস্বতীর 'থাকা'!
চেহারার কি চটক! যেন
চাল্‌চিত্তির আঁকা!"

(৭)

সে সব সঙ্গে মিশে'
পাড়াগাঁয়ে থাকৃতে আমার—
—(কেবল কলু কায়েত কামার!)—
মন ওঠে না; বসি কোথায়?
দিন কাটে বা কিসে?
পেলে না ত সে সব সঙ্গী,
কি সব কথা!—কি সব ভঙ্গী!
ভাব্‌ছ বুঝি গিছে?—আরে
হাস্‌ছ যে ন'পিশে!
—বুঝেছি, যাও।—আয়রে চেরো,
গড়্‌গড়াটা দিসে।

শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

স্মৃতি

স্মৃতির কথা বলিতে গেলেই অনুভূতির কথা আসিয়া পড়ে। স্মৃতি,সাধারণতঃ অনুভূতিরই প্রতিধ্বনিমাত্র। আমরা যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, যে আঘ্রাণলাভ করিয়াছি, ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের যে অনুভূতি জন্মিয়াছে, সেই সকল জ্ঞানের উদ্বোধক দ্রব্যাদির অবর্ত্তমানেও আমরা যখন মানসী প্রক্রিয়াবলে সেই সকল বিষয়কে আবার সংবিদ্ বা মানস-জ্ঞানের দ্বারে সমুপস্থাপিত করি, তাহাই সাধারণতঃ "স্মৃতি" নামে খ্যাত।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন,—

"স্মৃতির্নাম পূর্ব্বানুভবজন্যসংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানম্"; * সুতরাং পূর্ব্বানুভূতবিষয় উদ্বোধকসাহায্যে চিত্তক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারই—"স্মৃতি।"

পতঞ্জলি বলেন—

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ"—পাত সূ ১।১১

মহর্ষি কণাদ বলেন—

"আত্মমনসো সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ।"

বৈঃ ৯।৩।৬

এস্থলে আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ, স্মৃতির অসমবায়ি কারণ; সংস্কার উহার নিমিত্ত কারণ এবং আত্মাই সমবায়ি কারণ। মধ্বাচার্য্য সংস্কার স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে "মানস প্রত্যক্ষজা স্মৃতিঃ।"

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রে ভারতীয় দার্শনিকগণ স্মরণব্যাপার সম্বন্ধে বহুল আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকেই তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু একশ্রেণীর জড়বাদী, বৈজ্ঞানিক "স্মৃতি" ও "অনুভূতি" এই উভয়কেই "মাস্তিষ্ক ক্রিয়াবিশেষ" বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা 'শারীর বিষয়' (Physiology) বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। ইঁহাদের ধারণা এই যে, 'অনুভব' (Perception) 'স্মরণ','সঙ্কল্প-বিকল্প', 'ইচ্ছাদ্বেষ' প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়াগুলি মস্তিষ্ক-যন্ত্রেরই ক্রিয়াফল। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগই (Cerebrum) এই সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি ও বিকাশ-স্থল।

ইঁহারা মাস্তিষ্ক পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের পরীক্ষা করিয়াছেন; তাহার ফলে ইঁহারা ইহাই বুঝিয়াছেন যে, মাস্তিষ্ক পদার্থসমূহের মধ্যে 'নিউরণ' নামক পদার্থ (Neuron) † হইতেই মানসী ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

'নিউরণ' পদার্থ 'নার্ভের'ই সার—'নার্ভের'ই স্বতন্ত্র ব্যষ্টি। ইহারা আপন আপন কোষে (Cell) অবস্থান করিয়া স্বাধীনভাবে স্বকীয় কার্য্য নিষ্পন্ন করে। একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সংযোগ-সম্বন্ধ নাই, তবে প্রত্যেক 'নিউরণ'ই শাখাবিস্তার করে, সেই সকল শাখাও সংযোগ-সম্বন্ধে মুখে মুখে সংযুক্ত (joining at synopsis) নহে। বাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও ইন্দ্রিয়পথে

* Memory is the retention of the past. It is the record of the acted past of our experience, which we bear along with us and call to consciousness when occasion requires. —Dr. Wildon Carr.

† 'নিউরণ' পদার্থ 'নার্ভ' নামক দৈহিক সূত্রকার পদার্থেরই সার। "নার্ভ" শব্দের প্রচলিত বঙ্গানুবাদ "স্নায়ু"। কিন্তু, আমাদের বিবেচনায় এ অনুবাদ ঠিক নহে। আয়ুর্ব্বেদে যাহা 'স্নায়ু' নামে অভিহিত, তাহা 'Tendon' ও 'Ligament' হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদে স্পষ্টতঃই লিখিত আছে—'স্নায়বো বন্ধনানি স্যুঃ'। আয়ুর্ব্বেদে বায়ু নামে যে ধাতুর উল্লেখ আছে, তাহার সহিতই নার্ভের কার্য্যের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। মাংসপেশীসমূহের সঙ্কোচ-প্রসারণাদি গতি ও বোধাদি ব্যাপারগুলি বায়ুদ্বারা সংঘটিত হয়, পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 'নার্ভ'সমূহেরও এই সকল কার্য্য। এই নিমিত্ত আমরা 'নার্ভ'কে 'স্নায়ু' বলিতে রাজী নহি।

যে সকল বিকম্পন (vibrati m) উপস্থিত হয়, সেই বিকম্পনের প্রসার ও পরিব্যাপন (propagation) ব্যাপার হইতেই মানসী ক্রিয়ার উদ্ভব হইয়া থাকে। এই কার্য্যবিশেষের ফলেই 'মোটর নার্ভ'গুলি মাংসপেশী প্রভৃতির উপর আপন আপন ক্রিয়াবিস্তার করে; তাহা হইতেই সঙ্কোচ, প্রসারণ প্রভৃতি গতি-ক্রিয়ার উদ্ভব হয়। আবার অপর দিকে সংবেদক 'নার্ভ'গুলির (sensory nerves) ক্রিয়াপ্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও অনুভব এবং তদনুযায়ী কার্য্যাদি সংঘটিত হয়। *

ডাক্তার উইলডন কার বলেন, কেবল 'নার্ভ'নাড়িকাগুলির বিকম্পনে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও অনুভূতি প্রভৃতি কি প্রকারে ঘটিতে পারে, শরীররিচয়-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ (Physiologist) এখনও তাহার সদুত্তর দিতে সমর্থ নহেন। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"আমাদের অনুভূতির (Perception) সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের বাষ্টি-পদার্থে (Neuron) উহার রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। কোন উদ্বোধক বা উদ্দীপনার হেতু উপস্থিত হইলেই পূর্ব্বানুভূত জ্ঞান, স্মৃতির আকারে উপস্থাপিত হয়।" পাঠকগণ, 'ফনোগ্রাফে'র উদাহরণটিও এস্থলে ধরিয়া লইতে পারেন।

এইরূপ ব্যাখ্যার প্রতিকূলে অনেকপ্রকার বাদ-বিসংবাদ দৃষ্ট হয়। তবে একটি কথা এই যে, মস্তিষ্ক-যন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবরাজ্যে যে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। অনুভূতি ও স্মৃতি,—মাস্তিষ্ক পদার্থের বিকম্পনবিশেষের ফল কি না, ইহাতে সন্দেহ থাকিলেও, স্মৃতি ও অনুভূতির কার্য্য যে মস্তিষ্ক-যন্ত্রের সাহায্যমূলক, একথা অঙ্গীকার করা যায় না।

কিন্তু বার্গসন্ এই সিদ্ধান্তের ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলেন অনুভূতি ও স্মৃতির সত্তা ও বিকাশের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ নাই। মানসী বৃত্তির উদ্ভবস্থল স্বতন্ত্র ও উহা জীবাত্মারই ('Mind') বৃত্তি। তবে দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মস্তিষ্কের উপর এই সকল মানসী বৃত্তির ক্রিয়াপ্রভাব হয়, মস্তিষ্কমণ্ডলের সাহায্যে দৈহিক কার্য্যগুলি সম্পন্ন হয়।

বার্গসনের অভিমত আমাদের ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, স্মৃতি জীবাত্মারই ধর্ম্মবিশেষ; সুতরাং অনুভূতি অপেক্ষাও স্মৃতির সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর; আমরা পুরাণাদিতে যে জাতিস্মরত্ব প্রভৃতির কথা শুনিতে পাই। তাহার মূলে যে গভীর সত্য আছে, সম্ভবতঃ বার্গসনের এই অভিমত তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।

ডাক্তার উইলডন কার বলেন, স্মৃতি-সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, স্মৃতি ব্যাপারটাকে কার্য্যতঃ প্রকটিত করিতে হইলে মাস্তিষ্ক যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত আর কোনও ক্রমে তাহা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। শব্দ শুনিয়া যে পদার্থজ্ঞান হয়, মস্তিষ্কে সেই জ্ঞান-ক্রিয়াসাধনের একটি কেন্দ্র আছে। সেই কেন্দ্রের কার্য্যে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইলে কর্ণকুহরে শব্দ-তরঙ্গের কেবল নাদ-প্রবাহমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনও অর্থজ্ঞান হয় না—এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষার পরে এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়ভাবেই সংস্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং মস্তিষ্কের সহিত স্মৃতির একবারেই যে কোনও সম্বন্ধ নাই, একথা বলা সঙ্গত নহে। অনুভূতি ও স্মৃতির উৎপত্তির সহিত মস্তিষ্কের কোন সম্বন্ধ না থাকিতেও পারে; কিন্তু মস্তিষ্কের স্মৃতি-সাধক পথে বাধা ঘটলে, স্মৃতির উদয় অসম্ভব।

একথা যেমন সত্য, সেই প্রকার আর একটি বিষয়ও সত্য। সে বিষয়টি এই যে, স্মৃতির উদ্ভব-ক্ষেত্র স্বতন্ত্র—উহা আধ্যাত্মিক—ভৌতিক নহে। যাহা খাঁটি স্মৃতি, তাহা একবারেই আধ্যাত্মিক। অনন্ত অগণ্য স্মৃতি-তরঙ্গ মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিশেষে চিরদিন অবস্থান করিতে পারে, এ যুক্তির কোনও ভিত্তি নাই। বার্গসনের (Bergson) স্মৃতি-তত্ত্ব-বিচারের ইহাই বিশেষত্ব এবং উহা দ্বৈতবাদী বেদান্তদর্শনসম্মত। ডাক্তার উইলডন কার, বার্গসনের স্মৃতি-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ইতোমধ্যে বিলাতে রাজার কলেজে (King's College) বক্তৃতা করিতে গিয়া বার্গসনের অন্যান্য অভিমতের অংশবিশেষ প্রত্যাখ্যান করিলেও, খাঁটি স্মৃতির আধ্যাত্মিকতা-সম্বন্ধে স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন।

বার্গসন বলেন, অনুভূতি হইতে স্মৃতি স্বতন্ত্র। আমাদের অজ্ঞাতসারেও অতীত অনুভূতির সংস্কার আমাদের মনে বিদ্যমান থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানজন্য অনুভূতি, এই জগদ্রূপ কার্য্য-ক্ষেত্রের যে যে অংশ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তাহারই সংবাদ আমাদিগকে জ্ঞাপন করে; সুতরাং এই অনুভূতি বহিরঙ্গ জ্ঞানমাত্র। কিন্তু স্মৃতির ব্যাপার জীবাত্মা লইয়া—আমাদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব (Personality) লইয়া—উহা আমাদের অনুভূতিলব্ধ জ্ঞানকে আমাদের ব্যক্তিত্বের সহিত বিজড়িত করিয়া প্রকাশ পায়—উহা 'অহং-জ্ঞানে'র সহিত বিজড়িত। এই অবস্থায় অনুভূতিও যেমন নিয়ত-বর্ত্তমান জ্ঞান, স্মৃতিরও তেমনই নিয়ত-বর্ত্তমানত্ব প্রতীতি হইয়া থাকে। স্মৃতি যে অতীত অনুভূতির প্রতিধ্বনি-মাত্র, তাহা নহে। ইহাই বার্গসনের অভিমত। ইহা কিন্তু দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনিমাত্র।

বার্গসন দ্বৈতবাদী—তিনি জড় ও চিৎ, এই দুই পৃথক্ পদার্থ স্বীকার করেন। আমরা যাহাকে চিৎ বলি, তাঁহার ভাষায় উহা "Spirit"। স্মৃতি জীবাত্মার ধর্ম্ম, জড়ীয় পদার্থের অনুভূতির ফল নহে। স্মৃতি অতীত জ্ঞানের অভিনব অভিনয় নহে।

প্রকৃত কথা বলিতে কি, মহর্ষি কণাদ, পতঞ্জলি প্রভৃতি সাধারণ স্মৃতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, বার্গসনের অভিমত তাহার প্রতিকূল। য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতেরা, এ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনাচার্য্যগণের সাধারণ স্থূলস্মৃতি-সিদ্ধান্তের যে প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, বার্গসন তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় পণ্ডিতগণ জাতিস্মরত্ব স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণাদি পাঠে জানা যায়, কেহ কেহ পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিতেন—এমন কি, ভূতপূর্ব্ব অনেক জন্মের কথা তাঁহারা বলিতে পারিতেন। এই স্মৃতি যে আত্মারই ধর্ম্ম, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বার্গসন স্মৃতিকেও অনুভূতির ন্যায় সাক্ষাৎ সত্তাজ্ঞানগর্ভা বলিয়া মনে করেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের সমক্ষে এই সিদ্ধান্ত অভিনব বলিয়া অনুভূত হইয়াছে; কিন্তু যাঁহারা ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় সময় অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের নিকট ইহার কিছুই নূতন নহে। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন,—

* It begins with a sensation located in a sense-organ, becomes a perception, then a desire or volition or conation ending in a purposive action.

Dr. Wildon Carr's Lecture,
King's College

"সা চ স্মৃতিঃ, দর্শনসমানকারা"

এই স্মৃতি ধ্রুবা স্মৃতি। আর সেই ধ্রুবাস্মৃতি প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের (Present reality) তুল্যা।

তিনি আরও বলেন, "সেয়ং স্মৃতি দর্শনরূপা প্রতিপাদিতা, দর্শন-রূপতাচ প্রত্যক্ষতাপত্তিঃ।"

সুতরাং ধ্রুবা স্মৃতি (Pure memory) যে প্রত্যক্ষরূপা, শ্রীপাদ রামানুজ প্রভৃতি বহুকাল হইতেই এ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

অপিতু, স্মৃতিকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিলে, উহা যে অনুভূতি হইতে জ্যেষ্ঠ এবং আত্মার অধিকতর ঘনিষ্ঠ, ইহা সহজেই বুঝা যায়। বাহ্যজগৎই অনুভূতির বিষয়—বাহ্যজগৎ লইয়াই অনুভূতির খেলা,—কিন্তু আত্মার নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে ধ্রুবা স্মৃতি চিরাধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় স্বীয় মন্দিরে, স্বীয় মহিমায়, স্বীয় গরিমায়, স্বীয় প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে আপনি বিরাজমানা। এ অবস্থায় বাহ্য অনুভূতি, স্মৃতির জননী নহে। বার্গসন তাঁহার স্মৃতি-তত্ত্বের আলোচনায় ইহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, ইহারই অস্পষ্ট মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন—দার্শনিক য়ুরোপ অবনত মস্তকে তাঁহার এই অংশটুকু মানিয়া লইয়াছেন। ফলতঃ, ভারতীয় দর্শনাচার্য্যগণের এ-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষেই সর্ব্ব-সামঞ্জস্যপূর্ণ।

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

পাকবিদ্যা

আর্য্যসাহিত্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পাকবিদ্যার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি, স্বাধীন রাজা এবং রাজ-পরিবার-বর্গও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় আগ্রহের সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। পুণ্যশ্লোক নৈষধ এবং মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ উপন্যস্ত হইবার যোগ্য (১)।

বাৎস্যায়নের "কামসূত্রে" এবং তাহার টীকায় ও "শুক্রনীতিসার" প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিদ্যা চতুঃষষ্টি কলার অন্যতমরূপে কথিত হইয়াছে (২)। বিবিধ কাব্যগ্রন্থে রাজপুত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা-বর্ণনপ্রসঙ্গে কলাশিক্ষারও উল্লেখ দেখা যায়; সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে যেমন নিরক্ষর উড়ে-ঠাকুরের বা বিষ্ণুপুরের চাটুয্যে-পাচকের পাচকপদ একচেটিয়া হইয়াছে এবং বড় লোকের ভক্ষ্যান্নরস-পাচকতার ভার বাবুর্চির উপরই ন্যস্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে তেমন ছিল না। সেকালে অন্যান্য বিদ্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ নানাশ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত করিত, এবং তাহাতে নৈপুণ্য দেখাইয়া, সভ্য-সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ করিত।

খাদ্যের প্রস্তুত-প্রণালী সাধারণতঃ দুই প্রকার—"পাক ও তদতিরিক্ত প্রক্রিয়া।" তন্মধ্যে পাকের অনেকপ্রকার বিভাগ দেখা যায় এবং পাক-প্রণালীর ভেদানুসারে পক্কবস্তুরও প্রভূত বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, মুসলমানের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নানাশ্রেণীর উপাদেয় খাদ্য ভারতবাসীর রসনাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রস-বিতরণে মুগ্ধ করিয়াছে। পলান্ন প্রভৃতি নৈপুণ্যোদ্ভাবিত নরদুর্লভ অমৃতায়মান খাদ্য মুসলমান নরপতিবৃন্দের পরিপ্রীণন-সম্পর্কেই ভারতে সমাগত হইয়াছে। এই সকল কথা আপাততঃ অতীতযুগের অবস্থা-জ্ঞাপক ইতিহাসের উপাদান বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু, সুপ্রাচীন যুগের সংহিতা, পুরাণ, কাব্য, নাটক চিকিৎসাগ্রন্থ প্রভৃতির প্রতি মনোনিবেশ করিলে দেখা যায়, যাহা আমাদের নিজস্ব ছিল, তাহাই আজ ঘটনাচক্রে কালের আবর্ত্তনে 'বিদেশে উদ্ভাবিত শিল্প' বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কত জিনিষে যে এইরূপ বিদেশীয় স্বত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে দেখাইতে অনেক সময়ের ও যত্নের প্রয়োজন।

"পলান্ন" ও "পোলাও" এই উভয় শব্দের একার্থতায় কাহারও প্রায় বিপ্রতিপত্তি দেখা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে "পোলাও" পক্ক হয়, আমাদের পুরাতন যুগের "পলান্ন"ও সেই রীতিতেই প্রস্তুত হইত বলিয়া বোধ হয়। "পলান্ন" এই শব্দটি যোগরূঢ় 'পল'অর্থ মাংস, তাহার সহিত প্রক্রিয়াবিশেষে পক্ক 'অন্ন' "পলান্ন" নামে অভিহিত।

প্রচুর পরিমাণ ঘৃতের সহিত ইহার পাক নিষ্পন্ন হয়; ইহার সৌরভে সর্ব্বদিক্ আমোদিত হইয়া থাকে। ঘৃতের বাহুল্য-নিবন্ধন এই অন্ন "সর্পিষ্মৎ" নামে অভিহিত। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভবভূতির লেখনীতে এই "সর্পিষ্মৎ-ভক্তে"র মনমাতোয়ারা গন্ধ বাল্মীকির তপোবন সুরভিত করিয়া গিয়াছে (৩)।

এই "পলান্ন" যে কেবল মানবের উপভোগেই লাগিত, তাহা নহে; দেবপূজার উপকরণরূপেও ইহার ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। "যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা"র বিনায়কের শান্ত্যর্থ পূজায় যে সকল দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে "পললৌদনে"রও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"কৃতাকৃত (অর্দ্ধকৃত) তণ্ডুল, পললৌদন, পক্ক ও অপক্ক মৎস্য এবং মাংস, পুষ্প, চিত্র, সুগন্ধ দ্রব্য ও নানাপ্রকার সুরা" (৪)।

যদিও "অপরার্ক" এবং "মিতাক্ষরা"-টীকাকার "পললৌদন" শব্দের "তিলপিষ্টমিশ্র ওদন" (অন্ন) এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, (৫) তথাপি আমরা অবিচারিতভাবে তাঁহাদের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, অভিধানে "পলল" শব্দের তিলপিষ্টরূপ অর্থান্তর থাকিলেও, মাংস অর্থেই ইহার প্রসিদ্ধি দেখা যায়, অথচ পলান্নের সমানার্থ "পললৌদন" শব্দেরও প্রসিদ্ধার্থ-ত্যাগের কোনও হেতু দেখা যায় না। "পিষ্টতিলের সহিত মিশ্র ওদন"ও প্রসিদ্ধ নহে; সুতরাং "পললৌদন" শব্দের "দেবভোগ্য পলান্ন" অর্থই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। 'পলল' (মাংস) তাহার সহিত পক্ক 'ওদন' (অন্ন) "পললৌদন" নামেও পরিচিত ছিল।

(১) অমুষ্যবিদ্যারসনাগ্রনর্ত্তকঃ, এষীবনীতাক্ষগুণেন বিস্তরম্।
নৈষধ—১ম
বিরাটপর্ব্বের তৃতীয় অধ্যায়ে ভীমের পাকবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) বিচিত্র শাকযুষভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া। কামসূত্র, ৩য় অধ্যায়, (সাধারণ)

(৩) নীবারৌদন-মণ্ডমুষ্ণমধুরং সদ্যঃপ্রসূত প্রিয়া।
পীতাদভ্যধিকং তপোবনমৃগঃ পর্য্যাপ্তমাচামতি।
গন্ধেন স্ফুরতা মনাগনুসৃতো ভক্তস্য সর্পিষ্মতঃ
কর্কন্ধূফলমিশ্র-শাকপচনামোদঃ পরিস্তীর্য্যতে॥ উত্তরচরিত। ৪অ

(৪) কৃতাকৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদনমেবচ।
মৎস্যান্ পক্কাংস্তথৈবামান্ মাংসমেতাবদেবতু।
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ বিবিধামপি॥ ১অ। ২৮৭—৮৮

(৫) তিলপিষ্টমিশ্র দনঃ স্ত পললৌদনঃ। ৫৫৬ পৃঃ অপরার্ক,

এই অন্নে ঘৃতের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন কবিপ্রবর ভবভূতি "সর্পি"তেই (ঘৃতে) ইহার পাকের কল্পনা করিয়াছেন। পরন্তু বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে রামকে বলিতেছেন,—"সর্পিতে অন্ন পাক করা হইয়াছে, বৎসতরীর সংজ্ঞপন (হত্যা) করা হইয়াছে, তুমি শ্রোত্রিয়, শ্রোত্রিয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছ; আমাদের এই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ কর (৬)।

এই উক্তিতে বুঝা যায়, আজকাল যেমন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত হইলে, তাহার সংকারার্থ মাংস-পোলাওএর ব্যবস্থা করা হয়, পূর্ব্বকালেও এইরূপ অনুষ্ঠান করা হইত।

[কন্দুপক্ক]

প্রাচীন সাহিত্যে "কন্দুপক্ক" নামক একপ্রকার খাদ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। "কন্দুপক্ক" এই শব্দটি যৌগিক, অর্থাৎ দুইটি শব্দের মিশ্রণে নিষ্পন্ন। কন্দুতে পক্ক বস্তু "কন্দুপক্ক" নামে অভিহিত; সুতরাং "কন্দুপক্ক" চিনিতে হইলে, প্রথমতঃ "কন্দু" চেনা আবশ্যক।

অমরসিংহ একটি কারিকার অর্দ্ধাংশে "অম্বরীষ, ভ্রাষ্ট্র, কন্দু ও স্বেদনী" এই চারিটি শব্দ সন্নিবেশিত করিয়াছেন (৭)। আপাততঃ কারিকাপাঠে বোধ হয়, যেন এই চারিটি শব্দ একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত "অম্বরীষ ও ভ্রাষ্ট্র" এই উভয় শব্দকে "ভর্জন-পাত্রে"র সংজ্ঞারূপে নির্দ্দেশ করিয়া, "কন্দু" ও "স্বেদনী" এই উভয় শব্দকে অর্থান্তরে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শোষণার্থ 'স্কন্দ'ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'উ'প্রত্যয়ের দ্বারা এবং 'স'কার লোপের দ্বারা "কন্দু" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে (৮)।

"স্বেদনী"শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, 'স্বিদ্'ধাতুর উত্তর অধিকরণ-বাচ্যে লুট্ প্রত্যয়ের দ্বারা "স্বেদন" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। তৎপর স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' প্রত্যয় হইয়া "স্বেদনী" এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধাতু-প্রত্যয়ের মিলিত অর্থ—"স্বেদ করা হয় যাহাতে," অর্থাৎ যে পাত্রে পচনীয় দ্রব্য রাখিয়া তাপ দেওয়া হয়। "কন্দু" শব্দেরও ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ "শোষণ করা হয় যাহাতে"; সুতরাং "কন্দু"ও "স্বেদনী" সমানার্থক শব্দ। দীক্ষিত মহাশয় এই জিনিষটাকে "করাহী" নামে প্রসিদ্ধ মদ্যনির্ম্মাণোপযোগী পাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি যে এইস্থলে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আচার্য্য হেমচন্দ্র "ভক্ষকার ও কান্দবিক" এই উভয় শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া "কন্দু ও স্বেদনিকা" এই উভয়ের পর্য্যায়ক্রমে কীর্ত্তন করিয়াছেন (৯)। তাঁহার এই উক্তিতে "ভ্রাষ্ট্র" হইতে "কন্দু"র পার্থক্য সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের অতিরিক্ত "কন্দু"র স্বরূপ-জ্ঞাপক বিশেষ কিছু জানা গেল না। হেমচন্দ্র যে পর্য্যায়ে "ভক্ষকার ও কান্দবিক" এই উভয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অমরসিংহ সেই পর্য্যায়েই "আপূপিকের"ও উল্লেখ করিয়াছেন (১০)। এই "আপূপিক-ভক্ষকারে"র অন্তরালে অতীত সমাজ-তত্ত্বের এক গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যেমন "খাবার" বলিলে "লুচী," "কচুরী" প্রভৃতি খাদ্য বুঝায়, সেইরূপ পূর্ব্বকালেও "ভক্ষ্য" বলিলে "কান্দব" অর্থাৎ "কন্দুপক্ক খাদ্য"ই বুঝাইত। মহাভারতে ভীমের উক্তিতেও "অন্ন" হইতে "ভক্ষ্যে"র স্বাতন্ত্র্য-উল্লেখ দেখা যায় (১১)। এই শ্রেণীর খাদ্য পিষ্টক-সমানার্থক "অপূপ"পদবাচ্য খাদ্য হইতে স্বতন্ত্র বস্তু হইলেও, অমরসিংহ এই যৎকিঞ্চিৎ ভেদকে অগ্রাহ্য করিয়া, "কান্দবিকে"র পর্য্যায়ে "আপূপিকে"রও পাঠ করিয়াছেন।

"কান্দবিক" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থানুসারে বুঝা যায়, "কন্দুতে সংস্কৃত" (১২) এই অর্থে "কন্দু"শব্দের উত্তর "অন্" প্রত্যয় হইয়া, "কান্দব" এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। তৎপর "কান্দব" যাহার "পণ্য" অর্থাৎ "বিক্রেয়," এই অর্থে "কান্দব" শব্দের উত্তর "ঠক্"প্রত্যয় (১৩) হইয়া "কান্দবিক" এইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অমরের উক্তিতেই সাধারণ পিষ্টক হইতে "কান্দবে"র পার্থক্য প্রতিভাত হয়; কারণ, তিনি পিষ্টকের পাক-পাত্রকে "ঋচীষ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৪)। "পিষ্টক" এবং "অপূপ" একার্থক শব্দ। "পিষ্টকে"র ও "কান্দবে"র পাক-পাত্র এবং পাক-প্রণালী উভয়ই স্বতন্ত্র। "পিষ্টকে"র পাক সাক্ষাৎ অগ্নিসাপেক্ষ, "কান্দবে"র পাকে পাক-কালীন অগ্নির অপেক্ষা নাই, কেবল "কন্দু"টি উষ্ণ করিয়া স্বেদের উপযোগী করিতে অগ্নির অপেক্ষা। কারণ, "কন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ "শোষকযন্ত্র," তাহাতে সংস্কৃত খাদ্য "কান্দব"; সুতরাং "কান্দব-পিষ্টক" যে সাধারণ পিষ্টক হইতে ভিন্ন, তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অতএব, কান্দবমাত্রে "অপূপ"শব্দ প্রযুক্ত হইলেও, "অপূপ"মাত্রে কান্দবশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। আচার্য্য হেমচন্দ্র এই নিপুণোন্নেয়-ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কান্দবিকের পর্য্যায় হইতে অপূপিকের নির্ব্বাসন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে যেমন এক শ্রেণীর লোক রুটী বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং জীবিকার অনুসারে "রুটীওয়ালা নামে" পরিচিত হইয়া থাকে, এইরূপ পূর্ব্বকালেও কান্দব-বিক্রেতা "কান্দবিক" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

এই শ্রেণীর ভক্ষ্য পণ্যদ্রব্য বৈশ্যগণ বিক্রয় করিত। বৈশ্য দ্বিজাতি; সুতরাং তাহার পক্কদ্রব্য খাইতে কাহারও আপত্তির কারণ ছিল না। যখন শূদ্রগণও এই শ্রেণীর পণ্যে হস্তক্ষেপ করিল,—হয়ত সেই সময়ে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল,—"শূদ্রগৃহকৃত ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বিজাতির খাদ্য কিনা?" জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মশাস্ত্রকার মীমাংসা করিলেন,—"কন্দুপক্ক শূদ্র-গৃহকৃত হইলেও দ্বিজাতির খাদ্য (১৫)।"

এই শ্রেণীর কারখানাতে সর্ব্বতোভাবে শৌচাশৌচ বিবেচিত হয় না। তাহা দেখিয়াও সম্ভবত একটা আলোচনা হইয়াছিল। তাহার মীমাংসাপ্রয়াসী মহর্ষি শাতাতপ ব্যবস্থা করিলেন,—"গোকুলে, কন্দুশালাতে (অর্থাৎ কন্দুর কারখানাতে), তৈল-যন্ত্রে, ইক্ষুযন্ত্রে এবং স্ত্রীলোক-বালক-আতুরের সম্বন্ধে শৌচাশৌচ বিবেচ্য নহে (১৬)।"

(৬) সংজ্ঞপ্যতে বৎসতরী সর্পিষ্মন্নং বিপচ্যতে।
শ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়-গৃহানাগাতোঽসি জুষস্বনঃ।
বীরচরিত, ৩য় অঙ্ক

(৭) ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রো না কন্দুর্বা স্বেদনী স্ত্রিয়াম্।

(৮) স্কন্দেঃ 'স' লোপশ্চ উঃ ১।১৫

(৯) ভক্ষকারঃ কান্দবিকঃ কন্দুস্বেদনিকে সমে। মর্ত্ত্যকাণ্ড

(১০) আপূপিকঃ কান্দবিকো ভক্ষকারঃ। বৈশ্যবর্গ

(১১) ভক্ষ্যান্নরসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ। বিরাট্ পর্ব্ব, ৩য় অ ৫ শ্লোকঃ

(১২) সংস্কৃতং ভক্ষ্যাঃ। ৪।২।১৬।

(১৩) ৪।৪।৫১

(১৪) ঋচীষং পিষ্টপবনম্।

(১৫) কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥
(তিথিতত্ত্বে কূর্ম্মপুরাণ)

(১৬) গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥ শুদ্ধিতত্ত্ব

প্রায়শ্চিত্ত-বিবেককার শূলপাণি ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, অনাপদ্ অবস্থাতেও শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে "কন্দুপক্ক" দ্রব্য খাইতে পারেন, কিন্তু "কন্দুপক্কে"র অথবা কান্দবের পরিচয়প্রদান করেন নাই। তিনি যেভাবে প্রমাণগুলির বিন্যাস করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, তিনি যেন পিষ্টক-বিশেষকেই "কন্দুপক্ক" বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যথা, সুমন্ত বলিয়াছেন,—"গো-রস (দুগ্ধ), শক্তু, তৈল, খৈল, অপূপ (পিষ্টক) এবং দুগ্ধনির্ম্মিত অন্যান্য বস্তু শূদ্রের হস্তে খাইতে পারেন। যাঁহারা শূদ্রান্ন হইতে অনিবৃত্ত অর্থাৎ শূদ্র-স্বামিক অন্ন ভক্ষণ করেন, তাঁহারাই উক্ত বস্তু খাইতে পারেন।" ইহার পরেই আবার বলিয়াছেন, "এইজন্যই হারীতও মনুর দোহাই দিয়া স্নেহপক্ক (ঘৃত-তৈলাদিপক্ক) দুগ্ধনির্ম্মিত দ্রব্য, দধিমিশ্রিত ছাতু, এই সকল দ্রব্যকে শূদ্রান্নভোজীর ভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৭)।"

সুমন্ত-বচনে "অপূপ" উক্ত হইয়াছে, হারীত-বচনে অপূপের পরিবর্ত্তে "কন্দুপক্ক" পঠিত হইয়াছে; সুতরাং সুমন্তের অপূপ "কন্দুপক্ক অপূপ" বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু টীকাকার গোবিন্দানন্দ এক অদ্ভুত ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "অপূপ"শব্দে পয়োবিকারকৃত অর্থাৎ ছানা প্রভৃতি হইতে নির্ম্মিত অপূপ বুঝিতে হইবে; যে হেতু পরবর্ত্তী অংশে "যচ্চান্যৎ পয়সা কৃতং" (অন্যান্য যাহা কিছু দুগ্ধকৃত) এই উক্তির দ্বারা দুগ্ধকৃতেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উক্তির কতটুকু সারবত্তা, সুধীগণই তাহার বিচার করিবেন। "মালবিকাগ্নিমিত্র"নাটকে বিদূষকের মুখে "কন্দু"র কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা অগ্নিমিত্র বলিলেন, "অধিক আর বলিয়া ফল কি? আমার সম্বন্ধে তোমাকে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিতে হইবে।" উত্তরে বিদূষক বলিল, "আপনাকেও আমার বিষয়ে ভাবিতে হইবে, (কারণ) বিপণিস্থ "কন্দু"র ন্যায় আমার উদরের অভ্যন্তর দগ্ধ হইতেছে (১৮)।" এই বর্ণনায় বুঝা যায়, "কন্দু" সচরাচর বিপণিতে অবস্থিত হইত এবং তাহার অভ্যন্তর দগ্ধ হইত। চরক-সংহিতায় জেন্তাক-স্বেদপ্রসঙ্গে "কন্দু"র উল্লেখ দেখা যায়। তত্রত্য স্বেদোপযোগী যন্ত্রটি দ্বিপুরুষ-প্রমাণ মৃন্ময় "কন্দু"সদৃশ (১৯) বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এই সকল প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, জিনিষের ব্যবহার-সম্বন্ধে আর্য্যযুগেও নানারূপ আলোচনা হইয়াছিল। উণাদি সূত্রানুসারে যাহার বাচক-শব্দ-সাধনের প্রয়াস দেখা যায়, যাহার জন্য স্বতন্ত্র শালা বা প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই জিনিষটা যে অতি প্রাচীন এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ, সম্ভবতঃ কালের পরিবর্ত্তনে, অপরিজ্ঞাত কারণে আমাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত প্রাচীন "কন্দু"ই বর্ত্তমানে "তন্দু" নামে পরিচিত হইয়া আমাদের সম্মুখে বিদেশীয় আগন্তুকরূপে প্রতিভাত হইতেছে এবং "কন্দুপক্ক" বা "কান্দব," "পাঁউরুটী, বিস্কুট" প্রভৃতি অনার্য্যজুষ্ট নাম ধারণ করিয়া খাঁটী হিন্দুর অখাদ্য-বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কূর্ম্মপুরাণ-বচনের ব্যাখ্যায় "কন্দুপক্কে"র যে অর্থ স্থির করিয়াছেন, সেই অর্থ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মতে "জলোপসেক" ব্যতীত (কোনরূপ জলসম্পর্কবিনা), কেবল পাত্রে অগ্নির দ্বারা যাহা পাক করা হয়, তাহাই "কন্দুপক্ক" নামে অভিহিত;—যেমন ভাজা চাউল প্রভৃতি (২০)।

স্মার্ত্ত মহাশয় "কন্দুপক্ক" বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু "কন্দু"র অর্থ-নির্ণয়ে তাঁহাকে উদাসীন বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার এই ব্যাখ্যা দেখিয়া মনে হয়, তিনি অমর-কারিকার "অম্বরীষ" হইতে "স্বেদনী" পর্য্যন্ত চারিটি শব্দের "ভর্জন-পাত্র" অর্থই স্থির করিয়াছেন। "সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর" তত্ত্ববোধিনী-টীকাকারের উক্তিতে বুঝা যায়, তিনিও যেন চারিটি শব্দকে একার্থেই গ্রহণ করিয়াছেন (২১) এবং অদ্ভুত রকমের একটি ব্যুৎপত্তিও "জনান্তরের মত" বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনিই আবার মতান্তরে শোষণকারী লৌহ-পাত্রকে "কন্দু" নামে নির্দ্দেশ করিয়া, সমর্থনার্থ অমরের কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যা দেখিয়া বোধ হয়, কি স্মার্ত্ত, কি তত্ত্ববোধিনীকার, কেহই "কন্দু" চিনিতে পারেন নাই অথবা চিনিবার উপায়ও তাঁহাদের ছিল না।

তেঁতুল-পাতা সিদ্ধ খাইয়া, গৃহিণীর হস্তে রক্তসূত্র পরাইয়া, সাংসারিক সুখে অনাসক্ত মনীষিগণ নিরাপদে দার্শনিক কূট তত্ত্বের মীমাংসা করিতে পারেন। বাহ্য নিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক চিন্তায় লৌকিকবৃত্তান্ত-জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই, সত্য; কিন্তু যে সমস্ত শাস্ত্রের সহিত সমাজ-তত্ত্ব, শিল্পকলা প্রভৃতি সংসৃষ্ট, তাহাদের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে হইলে, তত্ত্বদ্বিদ্যা, সমাজের অবস্থা ও বিভিন্ন দেশের শিল্প, এই সকলের সহিত পরিচয় আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞগণ কেবল ব্যাকরণের এবং কোষের সাহায্যে যে কোন শাস্ত্রের ব্যাখ্যার উদ্ভাবন করিয়া, আরব্ধ গ্রন্থের সমাপ্তি-সাধন করিয়া গিয়াছেন। এই অপাটবের ফলেই আলোচ্য "কন্দু", কাহারও মতে মদ্যনির্ম্মাণোপযোগী পাত্র, কাহারও মতে ভোগস্থান এবং কাহারও মতে "তাওয়া," "লোহাক্ত" বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। "শব্দকল্পদ্রুম," "বিশ্বকোষ" প্রভৃতি আধুনিক কোষের নিবন্ধৃগণ গতানুগতিকভাবে অসন্দিগ্ধচিত্তে পুরাতন ব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিয়া সাহিত্যের পথ তমসাচ্ছন্ন করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তি-ব্যাখ্যানের উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর না করিয়া, যুক্তিবলে পদ-পদার্থের বিচারপূর্ব্বক তথ্য-নির্ণয়ে প্রয়াসী হইলে, হয় ত অনেকস্থলেই মধ্যযুগের সিদ্ধান্তের অন্যথা ঘটিবে। কারণ, পদার্থ না চিনিয়া, কেবল পদ-জ্ঞানের দ্বারা শিল্পের বা সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। এইস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। "মৃদঙ্গ যাহার শিল্প" এই অর্থে তদ্ধিত হইয়া, "মার্দ্দঙ্গিক" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ-নির্ণয়ে মহাভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন

(১৭) অনাপদ্যপি ভোজ্যবিশেষমাহ সুমন্তঃ
গো-রসঞ্চৈব শক্তঞ্চ তৈলং পিণ্যাকমেবচ।
অপূপান্ ভোজয়েচ্ছূদ্রো যচ্চান্যৎ পয়সাকৃতম্॥
এতানি শূদ্রান্নাদনিবৃত্তৈনৈব ভক্ষ্যাণি; অতএব হারীতঃ—
"কন্দুপক্কং" স্নেহপক্কং পায়সং দধি-শক্তবঃ।
এতানি শূদ্রান্নভুজো ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ।

(১৮) রাজা। কিং বহুনা সখে! চিন্তয়িতব্যোঽস্মিতে।
বিদূ। ভবদাবি অহং দিঢ় বিপণে কন্দুবিতমে উদরাভান্তরং
দজঝই। ২য় অঙ্ক

(১৯) দ্বি-পুরুষপ্রমাণং মৃন্ময়ং কন্দুসংস্থানম্। সূত্রস্থান, ১৪ অধ্যায়।

(২০) জলোপসেকং বিনা কেবল পাত্রে যদ্বহ্নিনা পক্কং ভৃষ্ট তণ্ডুলাদি।
তিথিতত্ত্ব

(২১) স্কন্দেঃ 'স' লোপশ্চ। উণাদি। ১।১৫। স্কন্দির্গতি শোষণয়োঃ। কন্দুরিতি, স্কন্দত্যস্মিন্ জলতাপ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভোগস্থানমিতি কেচিৎ, অন্যেতু স্কন্দতে শোষয়তীতি কন্দু লৌহাদি পাত্রমিত্যাহুঃ; অতএব ক্লীবেঽম্বরীষং ভ্রাষ্ট্রো না কন্দুর্বা স্বেদনীস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ।

করিয়াছেন যে, মৃদঙ্গ যাহার শিল্প সেই যদি "মার্দ্দঙ্গিক" নামে অভিহিত হয়, তবে ত মৃদঙ্গ-নির্ম্মাতাই "মার্দ্দঙ্গিক" সংজ্ঞা পাইবার যোগ্য, কারণ, মুখ্যতঃ মৃদঙ্গ তাহারই শিল্প। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে মৃদঙ্গ-বাদকেই "মার্দ্দঙ্গিক" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, লক্ষণার দ্বারা "মৃদঙ্গ-শব্দ" "মৃদঙ্গ-বাদনে" স্থিত হইয়াছে; সুতরাং "মৃদঙ্গ-বাদন যাহার শিল্প," তাহারই নাম "মার্দ্দঙ্গিক।" ভাষ্যকার রাজা পুষ্পমিত্রের সভায় থাকিয়া মৃদঙ্গ-মার্দ্দঙ্গিকের সহিত পরিচিত ছিলেন; সুতরাং বিচার করিয়া, প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি মৃদঙ্গ চিনে না, মার্দ্দঙ্গিককেও জানে না, সে যদি "মার্দ্দঙ্গিক" শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ব্যাকরণের সাহায্যে, তদ্ধিতের বলে, মৃদঙ্গনির্ম্মাতা কুম্ভকারকেই মার্দ্দঙ্গিকের আসনে বসাইয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আলোচ্য বিষয়েও এইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বকঃ—কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায় বিপত্নীক, তাঁহার দুইটি পুত্র। বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্বেতলোমার সহিত কৃষ্ণলোমের জ্যৈষ্ঠপুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীবনের বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে। স্বয়ং যাইতে না পারিয়া, কৃষ্ণলোম তাহার এক বন্ধুকে মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়াছিল। পূর্ব্ববৈরতাবশতঃ সে বন্ধু, কন্যার পিতার নিকট এমন ভাবে পাত্রটির রূপ-গুণের বর্ণনা করিয়া আসিয়াছে যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবারই কথা। তাহা সত্বেও স্থূলপুচ্ছ, সূক্ষ্মলোমের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার স্ত্রী গাঢ়লোমার এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি। ওদিকে কৃষ্ণলোম, শৃগাল ভট্টাচার্য্যের দ্বারা বিবাহের দিনস্থির করাইয়া মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা।

স্থূলপুচ্ছ ও গাঢ়লোমা।

গাঢ়। যত বল যত কও, কিছুতেই আমি
শুনিব না। সে পাত্রকে মেয়ে দিব? পোড়া
কপাল আর কি!

স্থূল। পাত্রটি নিন্দার কি গা?
লেখা-পড়া জানে—

গাঢ়। ছাই জানে, মাথা জানে
তা'র। চিরকাল কাটায়েছে পাঠশালা
থেকে পালিয়ে পালিয়ে—সে আবার কবে
লেখা-পড়া শিখিলে বল ত?

স্থূল। নিতান্তও
মূর্খ সে ত নহে। বি-এ, এম্-এ পাশ যেন
নাই সে করেছে—কি প্রয়োজন? চাকরি
করিয়া খেতে হবে না ত তা'রে। বাপের
অগাধ সম্পত্তি র'য়েছে—তা'র ভাবনা
কিসের?

গাঢ়। মূর্খ ছেলে সে সম্পত্তি যখন
পাইবে, তা'র দুইদিন পরে উড়াইয়া
দিবে। তা'র চেয়ে,—লেখা-পড়া জানে—

স্থূল। কি
বিপদ!—"লেখা-পড়া জানে"!—ঘরে যদি
অন্ন নাহি থাকে, কি হইবে তবে শুধু
লেখা-পড়া দিয়ে?

গাঢ়। শোন কথা! লেখা-পড়া
জানিলে কি অন্নের ভাবনা?

স্থূল। হা হা!—তুমি
ঘরে বসে থাক, বাহিরের কি ব্যাপার
কিছু ত জান না! কত শত শত
লেখা-পড়া-জানা লোক পেটের দায়েতে
পথে পথে কাঁদিয়া ফিরিছে।

(ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া)

লেখা-পড়া
জানে—মন্দ নয় দেখিতে শুনিতে—

গাঢ়। হা—হা—
দ্বিতীয় কার্ত্তিক! কার্ত্তিকের অবতার!
কার্ত্তিকেরই মত তা'র চোয়াড়ে চোয়াড়ে
চেহারাটি। কার্ত্তিকেরই মত দাঁতগুলি
মূলো মূলো। কার্ত্তিকেরই মত শিং দুটি
টেড়া-বেঁকা। কার্ত্তিকেরই মত পিছনের
বাঁ পায়ের খুরটি অর্দ্ধেক নাই।—

স্থূল। (সরোষে) দেখ
গিন্নী, পরের ছেলের অমন করিয়া
নিন্দা করিও না। তোমার মেয়েটি তা'রে
না দিলে, সে থাকিবে না আইবুড় হ'য়ে।
কত মহাকুলীন মেষেরা তা'র চারি
পায়ে ধ'রে কন্যা দিয়ে যাবে।

গাঢ়। যাক্ যাক্,
এখনই যাক্। তা' হলে আমার শিতু
বেঁচে যায়—হরিন্নুট দিই। গায়ে থেকে
সে মেয়েরে দুই একখানা অলঙ্কার
যৌতুক পাঠাই।

(নেপথ্যে)

ওগো স্থূলপুচ্ছবাবু,
বাড়ীতে আছ হে?

স্থূল। যাও যাও, কে এসেছে।

(অন্তর্দ্বার দিয়া গাঢ়লোমার প্রস্থান)

(বহির্দ্বার খুলিয়া)

আসুন আসুন—কোথা হ'তে আপনার
আগমন হ'ল?

(শৃগাল ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

শৃ। কৃষ্ণলোম পাঠায়েছে মোরে,
আমি ভট্টাচার্য্য। মেয়েটিকে আশীর্ব্বাদ
করিতে এসেছি।

স্থূল। প্রণাম প্রণাম। আজ
কি সৌভাগ্য আমার না জানি—আপনার
পদধূলি পড়িল এ দীনের কুটীরে।

(ভৃত্য ভোলা গর্দ্দভের প্রবেশ)

ওরে, খানিকটা উষ্ণজল শীঘ্র এনে
ভট্টাচার্য্য ম'শায়ের পাগুলি ধুয়ে' দে।

(ভোলা গর্দ্দভের প্রস্থান)

আহা, কত কষ্ট হয়েছে না জানি!

শৃ। আর
ভাই, কষ্টের কথা বলিও না কিছু। উঃ,
পথ কি ফুরায়? এই দুর্ব্বল শরীর
একেবারে ভেঙ্গে গেছে যেন।

স্থূল। আ-হা-হা-হা!
পাথুরে রাস্তায়, আরও কষ্ট হয়েছে ত!

শৃ। (পা দেখাইয়া)
এই দেখ, পা কি আর আছে? একবারে
বিনশ্যতি হয়ে' গেছে।

স্থূল। দিনকত তবে
এখানে বিশ্রাম ক'রে, বাড়ী যাইবেন।

শৃ। এ দিকে যে বিবাহের দেরী নাই বেশী।
এই চ'ব্বিশে শ্রাবণ দিনস্থির করা
গেছে।

স্থূল। চ'ব্বিশে? তা' হ'লে দেখিতেছি বড়
তাড়াতাড়ি হ'ল।

শৃ। ওহে, শুভস্য শীঘ্রং।
শুভকার্য্য যত শীঘ্র হয়। শাস্ত্র-কথা
ইহা। দেরী হ'লে পরে, অশুভ ঘটিবে।
অশুভস্য কালহরণং।

স্থূল। আজ্ঞে, সে কথা
নিতান্ত সত্য।

(ভোলা গর্দ্দভকর্ত্তৃক ভট্টাচার্য্যের পদধৌতি)

হাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
ছেলেটির কোষ্ঠীখানি দেখে' এসেছেন?

শৃ। আমি আর কি দেখিব? আমারই তৈয়ারি
সে ত! বড় ভাল দিনে জন্ম। হইবার কথা
—রাজা। কিন্তু কলিকালে ততটা না হোক্,
রাজার ঐশ্বর্য্য তা'র হইবে নিশ্চয়।

স্থূল। মেয়েটির কোষ্ঠীখানি দেখিবেন?

শৃ। আন।

(স্থূলপুচ্ছের প্রস্থান)

এ বেটার কাছ থেকে ভাল করে' কিছু
হাতাইতে হবে।

(স্থূলপুচ্ছের প্রবেশ ও কোষ্ঠীদান)

(বিশেষ মনোযোগের সহিত দৃষ্টি করিয়া সহাস্যে)
ইঃ!

(কিঞ্চিৎ পরে)

ওঃ!—(পুনরায় হাস্য। কিছু পরে)
বাঃ!—এযে,
জ্যোতিষের মতে রাজযোটক হ'তেছে!
সর্ব্ব সুলক্ষণ। এমন ঘটে না প্রায়।

স্থূল। (মহা আহ্লাদে)
আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই সম্ভব।

শৃ। যে পুরোহিত, রাজযোটকের বিবাহ
ঘটায়, সে নাকি শুনেছি আর দরিদ্র
থাকে না। দেখি, শাস্ত্রের বচন সত্য কি
অসত্য হয়।

স্থূল। আজিকে বড় পরিশ্রান্ত
হ'য়েছেন। সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া লইয়া,
আহার করিয়া, করুন বিশ্রাম। কাল
প্রভাত-সময়ে আশীর্ব্বাদ হবে।

শৃ। ভাল.
সেই ভাল কথা।

স্থূল। চলুন তা' হ'লে, সব
প্রস্তুত হ'য়েছে।

শৃ। চল। (খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে, মুখ শিটকাইয়া)
আঃ—পা-টা গেছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থূলপুচ্ছের অন্তঃপুর।

স্থূলপুচ্ছ ও গাঢ়লোমা।

স্থূল। শুনিলে ত রাজযোটকের কথা?

গাঢ়। রেখে
দাও যোটক ফোটক। সে পাত্রের সাথে
কখনও দিবনা আমি শিতুর বিবাহ।

স্থূল। আহা, অত রুক্ষ কেন? বিবেচনা—

গাঢ়। তুমি
বসে' বিবেচনা করগে ঠাকুর। আমি
ক'রেছি অনেক পূর্ব্বে।

স্থূল। দেখ গিন্নী, তুমি
স্ত্রীলোক। সবাই জানে স্ত্রী-বুদ্ধি নিতান্ত
লঘু।

গাঢ়। লঘু ত লঘু। তোমার ত গুরু—তা'
হ'লেই হ'ল।

স্থূল। বেশ করে' ভেবে দেখ।

গাঢ়। আঃ,
ভাল বিপদেই প'ড়েছি ত!

স্থূল। দেখ গিন্নী,
তুমি অতি বুদ্ধিমতী—সকলেই বলে।
স্থূলপুচ্ছদাদা স্ত্রীর বুদ্ধিজোরে সুধু
বড়লোক হ'য়ে গেল।

গাঢ়। কি বলিছ বল।
আমি কিন্তু প্রাণ গেলে সে বদ্ ছেলের
সাথে, শিতুর বিবাহে সম্মত হব না।

স্থূল। ভেবে দেখ, তুমি ত অবুঝ নও, এই
পাত্রটি পেয়েছি কত কষ্টে। হাতছাড়া
হ'য়ে গেলে, আবার যোটাতে কতদিন
যাবে বল দেখি? আজ কাল বিবাহের
পাত্র খুঁজে পাওয়া কত কষ্ট, সেই জানে
যে কখনও চেষ্টা করিয়াছে। তার'পর
কৃষ্ণলোমবাবুদের পাকাপাকিভাবে
কথাই দিয়েছি। দেখ, ভট্টাচার্য্য এসে
শু'য়ে আছে, আশীর্ব্বাদ করিতে শিতুকে।
দিনস্থির হ'য়ে গেছে—সব হ'য়ে গেছে—
এখন কি বলে' আমি বলিব তা'দের
"বিবাহ দিব না"? সেটা কি দেখায় ভাল?
তোমার কি মত?

গাঢ়। আমার মত, বরং
ভাল তা'দিকে বলিয়া ফেলা "হবে না মশাই"—
আপনার মেয়েটাকে হাত-পা বাঁধিয়া
জলে ফেলে দেওয়া কিছু নয়।

স্থূল। নিতান্তই
হ'ল না তোমার মত?

গাঢ়। না।

স্থূল। তোমারে আমি
কত আর বুঝাইব বল? তুমি যাও
তবে তাহাদের বাড়ী—বলে' এস গিয়ে
দিব না বিবাহ।

গাঢ়। আমি যেতে যাব কেন?
যা'র মেয়ে সে যাউক।

স্থূল। বেশ, বিলক্ষণ!
এর বেলা আমার উপর! ভাল' যদি
আমারই ও মেয়ে, তবে আমিই তাহার
বিবাহের বন্দোবস্ত করি। তুমি কেন
মাঝে থেকে ঘটাও উৎপাত? দেশসুদ্ধ
লোক জেনে গেল বিবাহ হইবে, কাল
কি বলিব সবে—"ওহে, স্ত্রী আমার
অনুমতি নাহি দিতেছেন?" সর্ব্বলোকে
স্ত্রৈণ বলে' জানিবে আমারে। বলিবে, এ
আহাম্মুক অতি—স্ত্রীর খেলার পুঁতুল—

গাঢ়। আহাম্মুক নও তুমি? আহাম্মুক তবে
কা'রে আর বলে? যেজন আপন কন্যা
মূর্খ গোঁয়ারের হাতে তুলে দেয়, সে কি
আহাম্মুক নহে?

স্থূল। (সরোষে) দেখ গিন্নী—আমি যাহা
খুসী তাহাই করিব। অনুগ্রহ করে'
জিজ্ঞাসি তোমার মত, তাহা জান তুমি?
আমি আহাম্মুক, উনি বড় বুদ্ধিমতী!
এ পাত্রের সাথে আমি দিবই বিবাহ।
দেখি, কে রোধ করিতে পারে?
(প্রস্থান)

গাঢ়। দেখ,
রোধ হয় কিনা। আমিও দেখিব। আমি
বাঁচিয়া থাকিতে হ'তে দিব না ত। দেখি।
(প্রস্থান)

ক্রমশঃ
শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা।

ব্যস্

সকাল হইতে র'য়েছে বসিয়া মেয়ের বাপ,
চাহেনা যাইতে কোনমতে—একি বিষম পাপ!
দিয়াছি বলিয়া যাহা বলিবার,
অনাহারে বসে' কিবা ফল আর!
ব'লেছি তোমারে দিইনি যখন অধিক চাপ,
তখন আমার টলিবে না কথা, হ'বে না মাপ।

একশত ভরী সোণার গহনা সঙ্গে তা'র—
চেয়েছি কেবল বেশী নয় টাকা পাঁচ হাজার,
বর-আভরণ, রূপার বাসন,
দেখাবার মত, মনের মতন,
চাই ঠিকঠাক্—ফর্দ্দ ধরিয়া বাকি যা' আর
লইব মিলায়ে; আবার আসার কি দরকার?

পায়ে-ধরা মিছে, কমিবে না তা'র একটি পাই,
চাহি না শুনিতে—"মশাই! আমার কিছুই নাই,
'ছাপোষা' মানুষ বড়ই গরীব,
দশটাকা দিতে বার হয় জিব,
একবেলা খেয়ে কোনরূপে মোরা দিন কাটাই,
ভাবিয়া দেখুন পনরটি টাকা মাহিনা পাই।"

'কাঁদুনী' শুনিয়া জ্বালাতন—দেহ হ'য়েছে 'খাক্,'
'ফ্যাল্‌ফেলে' চোখে দেখিলে কি হ'বে হ'য়ে অবাক্?
ঘরে গিয়ে ভাব দুঃখের সে কথা,
আমার তাহাতে কিবা মাথাব্যথা!
পার যদি আশা মিটা'তে—মিলিবে 'সাতটি পাক,'
নয় ভাল মেয়ে রূপ-গুণ নিয়ে ঘরেই থাক্।

শ্রীমৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সেকালের কলিকাতা

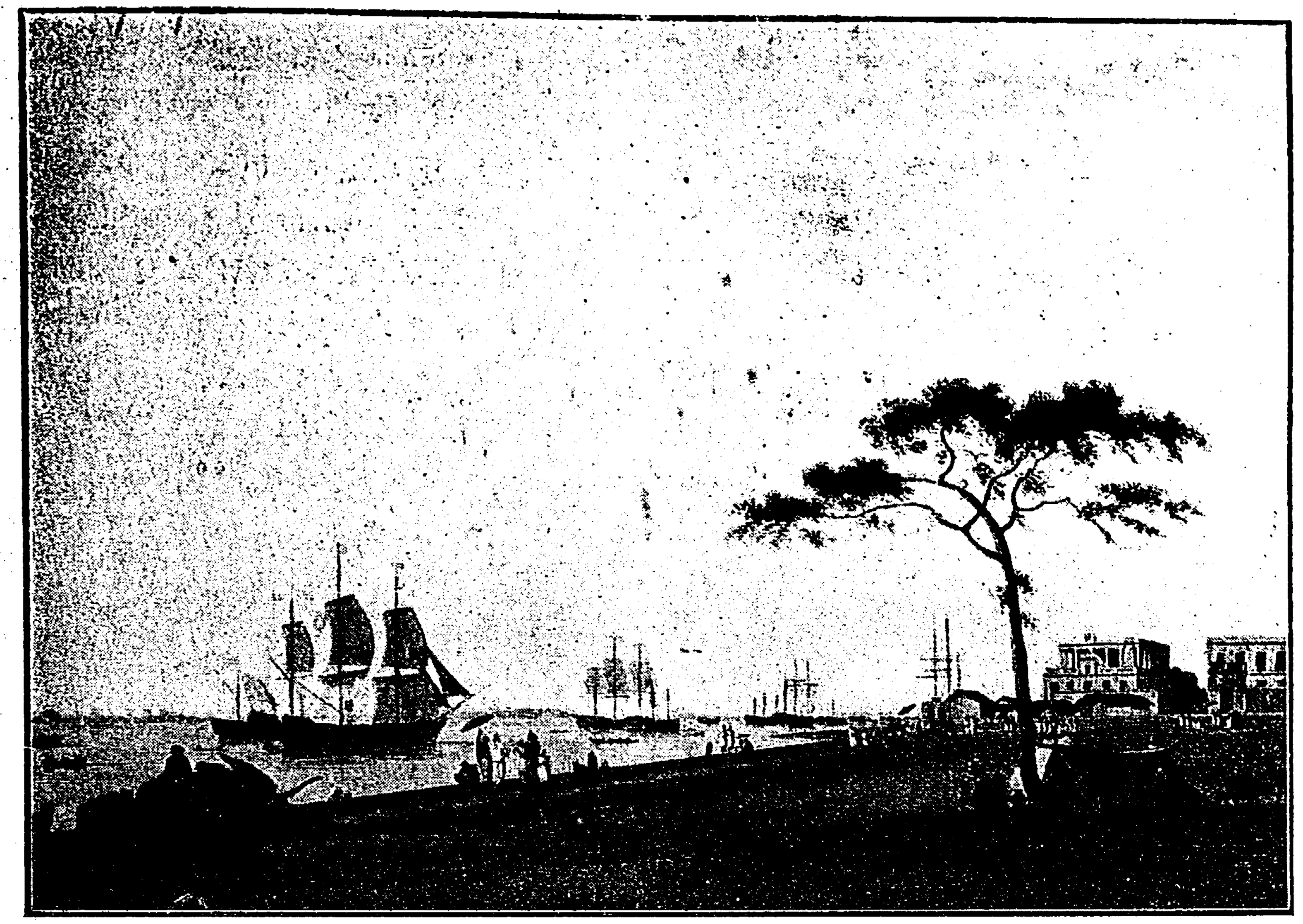

চৌরঙ্গী (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ)

সে অনেক দিনের কথা। জব চার্ণক নামে একজন ইংরেজ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর বাণিজ্যাগার বা কুঠী স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে চারি বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। শেষে কোথাও কুঠীর সুবিধা করিতে না পারিয়া, সুতানুটী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হ'ন। সুতানুটী গ্রামটী ছিল বর্ত্তমান কলিকাতার উত্তরে—হুগ্‌লী নদীর পূর্ব্ব তীরে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি এই স্থানে উপনিবেশ ও কুঠী সংস্থাপন করেন। প্রবাদ আছে, লালদীঘির ধারেই ইংরেজের প্রথম আড্ডা। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে মোগল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইংরেজ বণিকের মনোমালিন্য ঘটায়, তাঁহারা জব চার্ণকের নেতৃত্বে ২৬ মাইল নদী বহিয়া আসিয়া সুতানটীতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাই ইংরেজ ঐতিহাসিক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই কলিকাতার ইতিহাসের সূচনা করিয়া থাকে। ইংরেজ চার্ণককে কলিকাতার স্থাপনকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। চার্ণক যখন কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন কলিকাতায় সুরম্য অট্টালিকা ছিল না—তখন ইহা বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু চার্ণকেরও ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে সুকিয়া নামে একজন আর্মেনিয়ান কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম আগমন করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কলিকাতার সংস্থাপন করেন। আর্মেনিয়ানগণই কলিকাতার প্রথম সংস্থাপক। চার্ণক তাঁহার বহুপরে আসিয়াও লিপিকুশল ঐতিহাসিকের লেখনী-প্রভাবে সুকিয়ার স্থান অধিকার করিলেন। সেথ সাহেব, তাঁহার

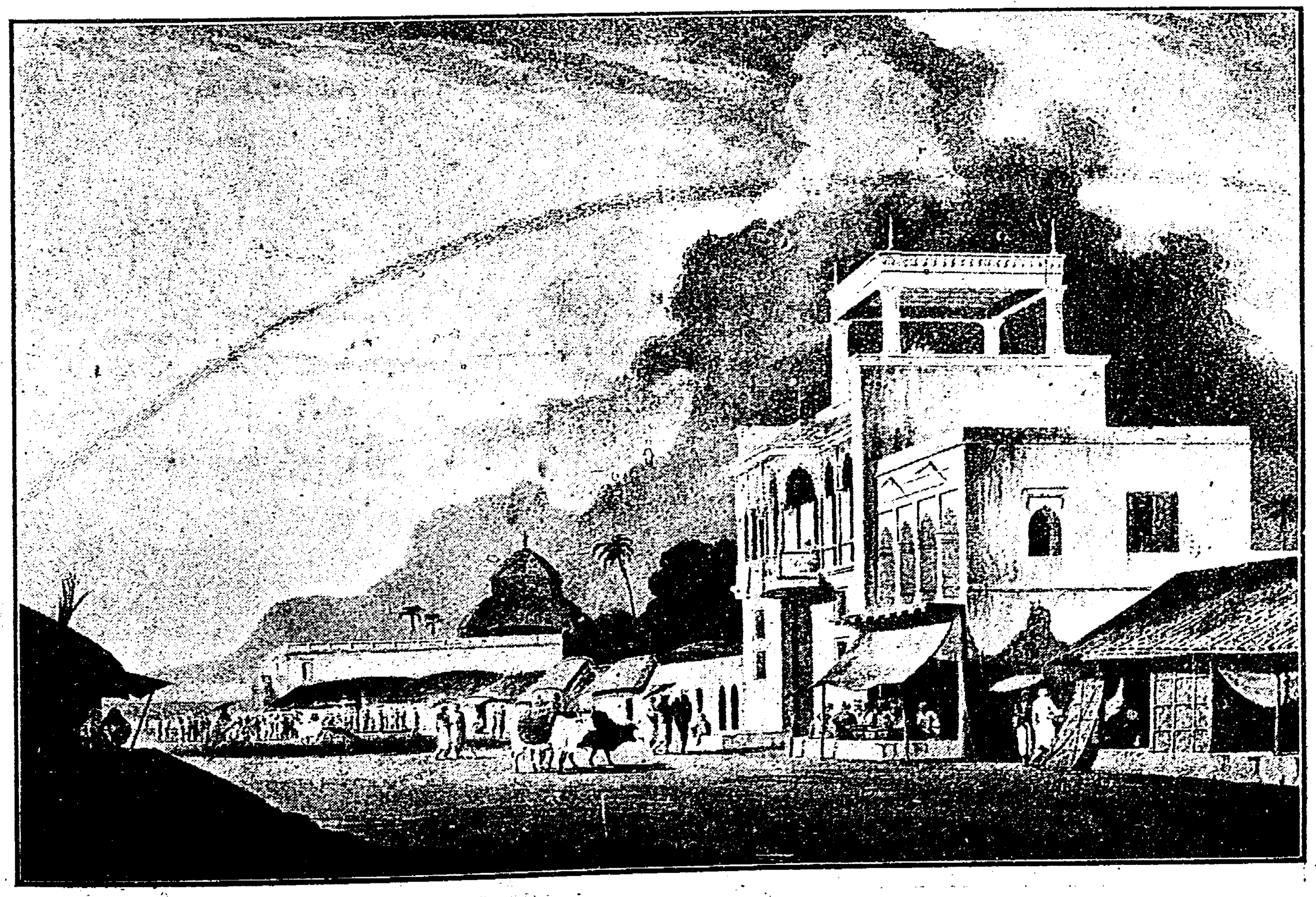

চিৎপুর-রোডের দৃশ্য (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ)

'History of th‌ Armenians' নামক ইতিহাস-গ্রন্থে ভ্রমটী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আইন-ই-আকবরিতে 'কলিকাতা' একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিয়াই সামান্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে (১৪৯৯ শকে) মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'কাব্যে কলিকাতার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকঙ্কণ লিখিতেছেন—

"ত্বরায় বাহিছে তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥"

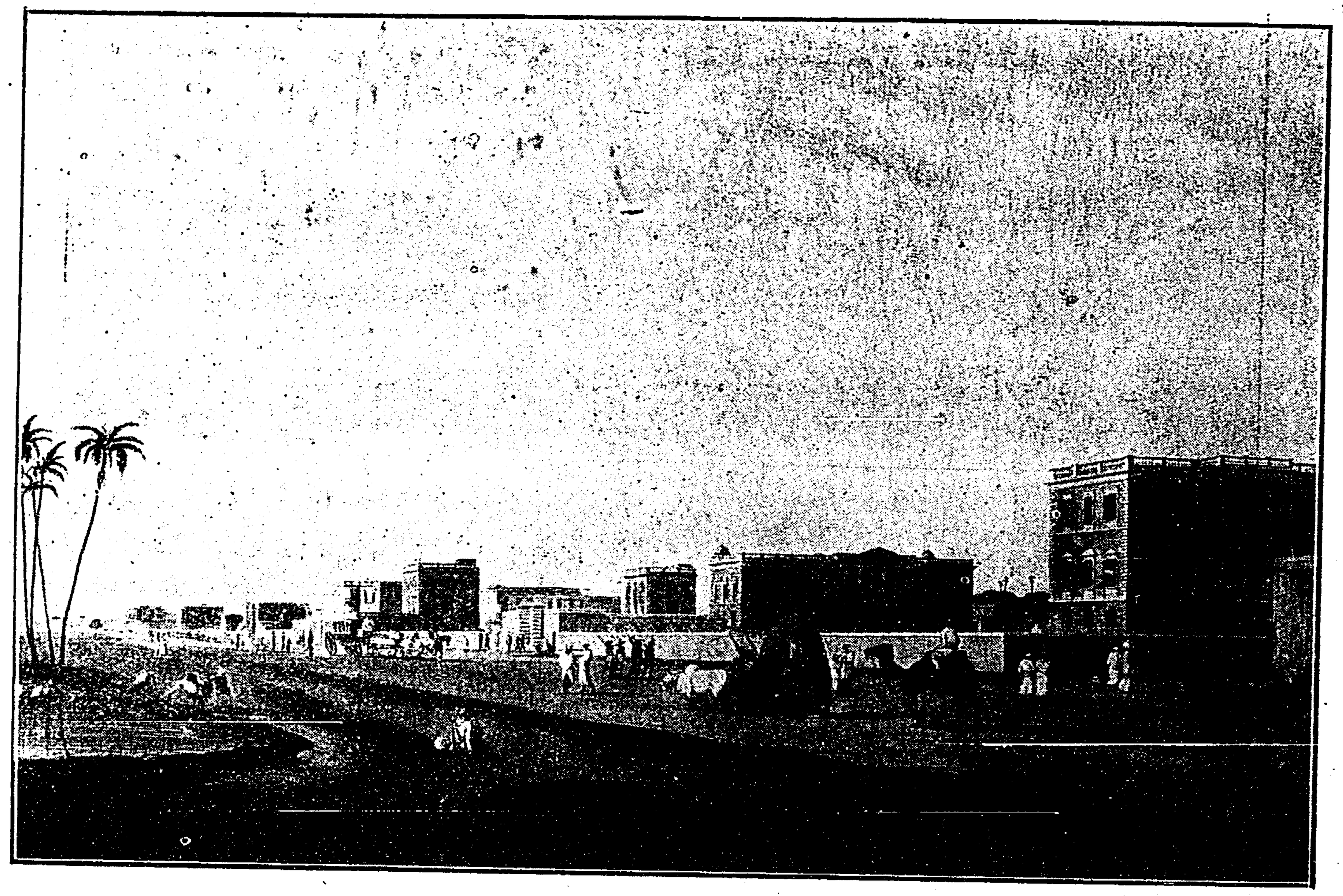

এস্‌প্লানেডের দৃশ্য (১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ)

যাহা হউক, ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই কলিকাতা ইতিহাসে প্রকৃত স্থান লাভ করিয়াছে। অতঃপর ইংরেজদের উপনিবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমান 'Customs House' ও টাঁকশালের মধ্যবর্ত্তী তৎকালীন কলিকাতা গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পরে গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত ইহারা অধিকার করিয়া বসিল। বর্ত্তমান 'Fort William'এর দক্ষিণাঞ্চলই তথনকার গোবিন্দপুর। গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই তিনটী ছোট গ্রাম (সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর) লইয়াই বর্ত্তমান কলিকাতা সহর। ১৬৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে East India Companyর বঙ্গদেশের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারিবৃন্দ কলিকাতাকে তাঁহাদের H‌ad Quarters করিবার সংকল্প করিলেন। ফলে, ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা Fort William নির্ম্মাণ করেন এবং ঔরঙ্গজেবের পুত্র আজিমের নিকট হইতে সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা এই তিনটী গ্রাম যথারীতি ক্রয় করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা কলিকাতাকে একটী স্বতন্ত্র বিভাগ বলিয়া

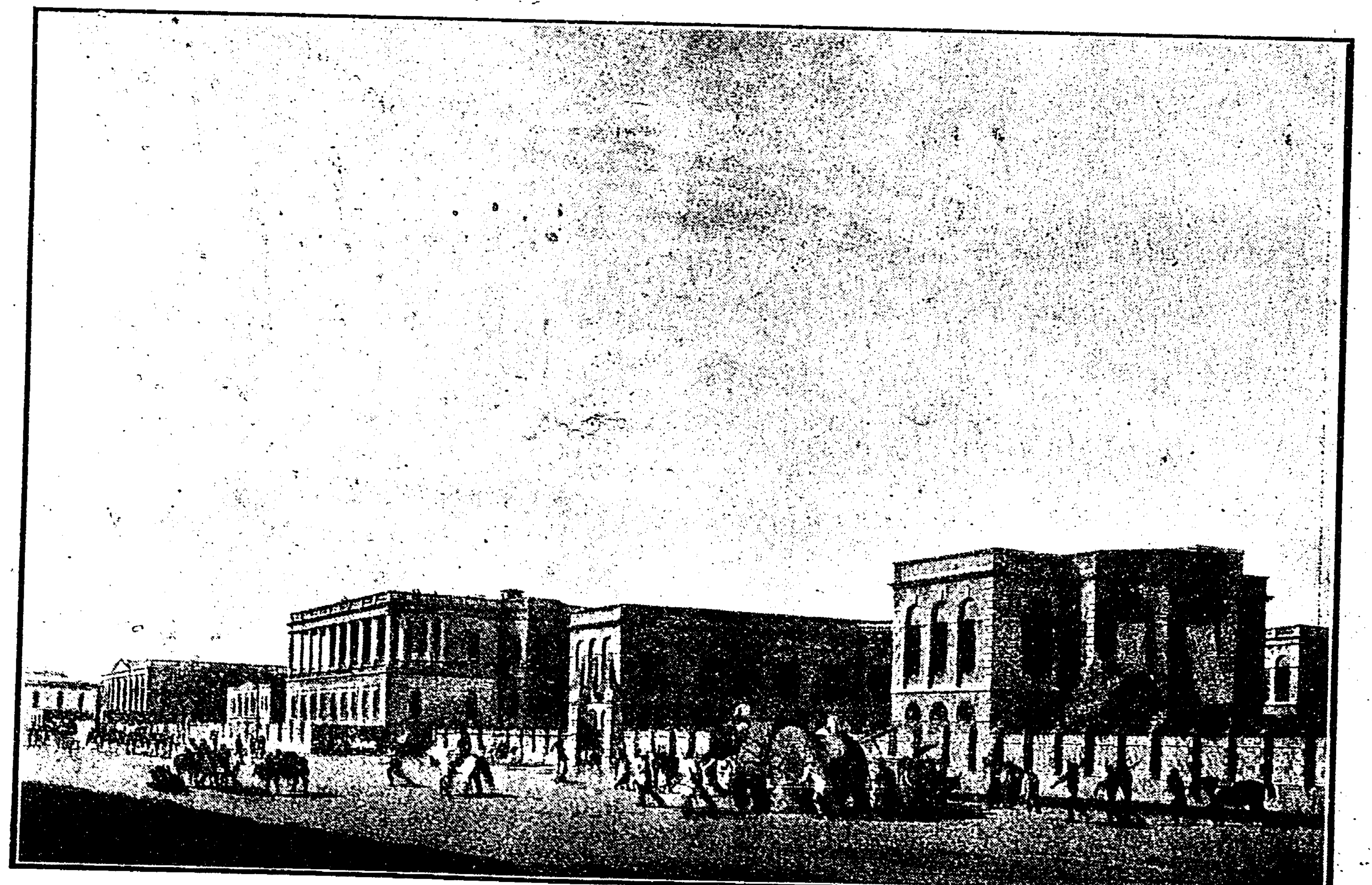

মন্ত্রণাগার (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ)

প্রচার করেন। তৎপরের ঘটনাবলী ইতিহাস-পাঠকদিগের নিকট অবিদিত নাই।

বর্ত্তমান কলিকাতার, সূচনা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে যে পুরাতন দুর্গ তাঁহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্জ্জিত হয় এবং একটী নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইতে থাকে। এই দুর্গ-নির্ম্মাণ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই সময় ময়দানের শ্রী ফিরে। ইতঃপূর্ব্বে বৎসরের মধ্যে প্রায় তিন মাস ময়দান (গড়ের মাঠ) জলাভূমিতে পরিণত থাকিত। এই ময়দানের দিকে ঝোঁক পড়ায়

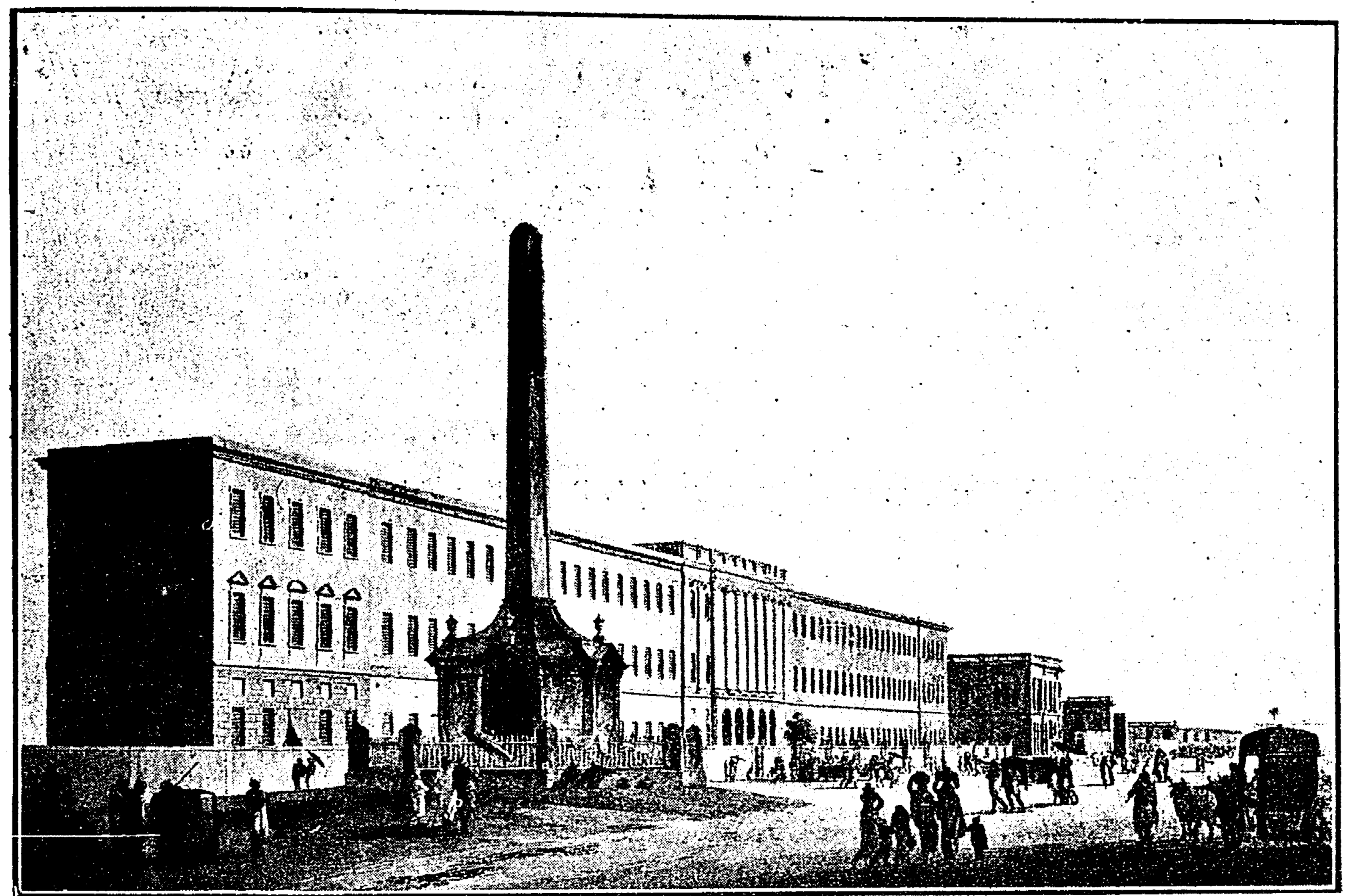

কেরাণী-বারিক (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দ)

য়ুরোপীয়গণ ক্রমশঃ ময়দানের দিকে তাঁহাদের আবাসস্থান সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ফলে, বর্ত্তমান চৌরঙ্গীর আবির্ভাব হয়।

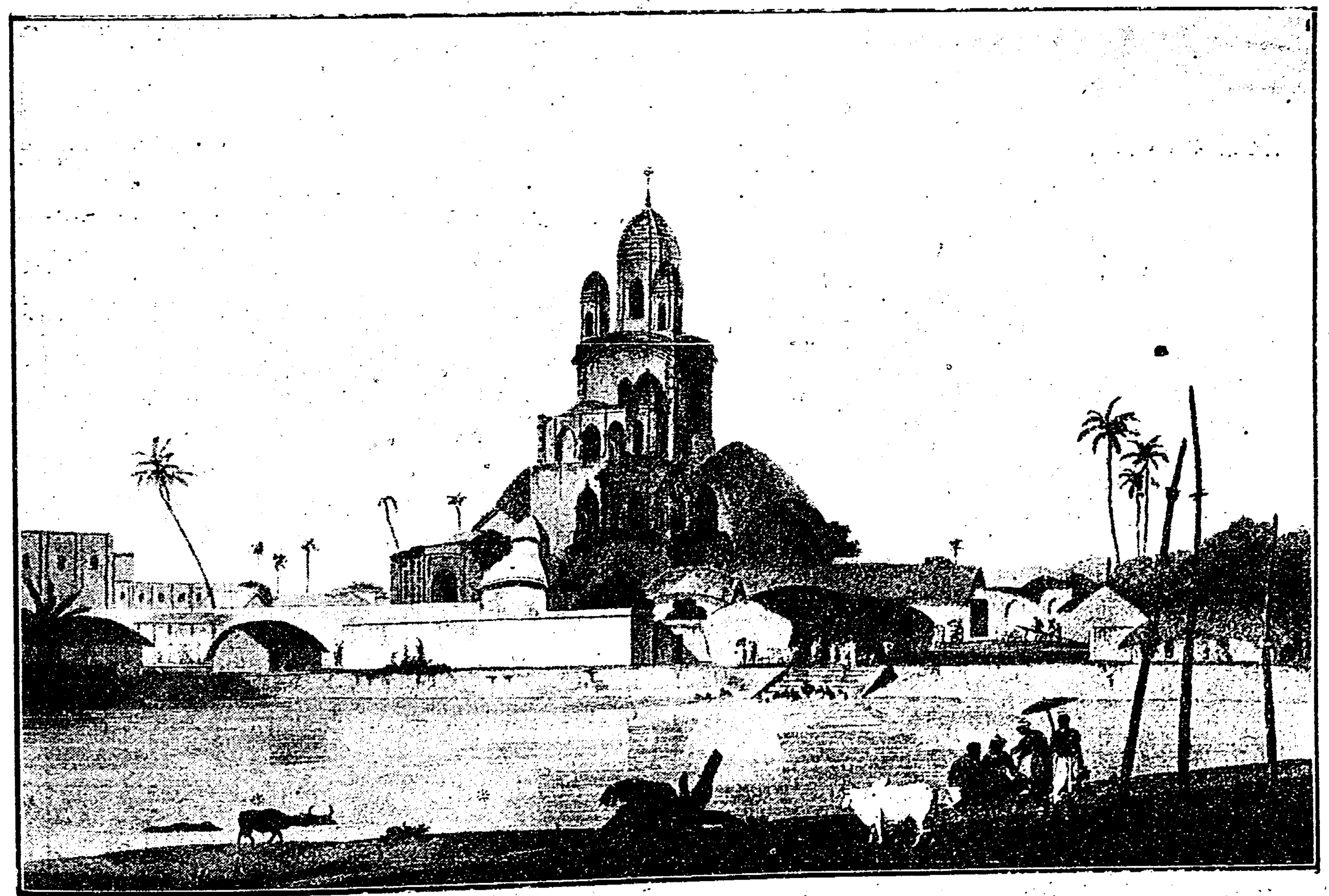

গোবিন্দরাম মিত্রের মন্দির (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ)

টমাস্ ডেনিয়েল সাহেব বহুযত্নে ১৭৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের কয়েকখানি সুদৃশ্য চিত্র আঁকিয়াছিলেন। সেই চিত্রগুলি দুষ্প্রাপ্য। আমরা সেই চিত্রকয়খানির মধ্য হইতে তৎকালীন কলিকাতার চিত্রগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদের একটী পরামর্শ-গৃহের নিতান্ত অভাব অনুভব করেন। ঐ বৎসর ২২এ জুন স্থির হয় যে, রিচার্ড কোর্ট সাহেবের বাড়ীটী ক্রয় করিয়া সেই স্থানে পরামর্শ-গৃহ নির্ম্মিত হইবে। অতঃপর ৬ বৎসর পরে এস্‌প্লানেডের উপর গভর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিম পার্শ্বে পরামর্শ-গৃহ (Council Hous‌) নির্ম্মিত হয়। এই মন্ত্রণাগৃহের নাম হইতেই বর্ত্তমান Council Ho‌se Streetএর নামের সৃষ্টি।

ডালহাউসী স্কোয়ারের উপরিস্থিত শতবর্ষব্যাপী অট্টালিকাটী 'Writers Buildings' বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। R. C. Sterndale

ইহার একখানি দলিল প্রাপ্ত হইয়াছেন ; তদনুসারে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে টমাস্ লোনকো কোম্পানীর কেরাণীদের জন্য একখানি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণের আদেশপত্র দেওয়া যায়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহাতে ১৯টী মহল আছে। এই ‘কেরাণী-বারিক’টী Berg l Secretariat Buildings নামেও পরিচিত।

৺গোবিন্দরাম মিত্র একজন বড় জমিদার ছিলেন। টাঁকশালের গোলমালের সময় তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া কোম্পানির কোষাগার নিরাপদ করিয়াছিলেন। চিৎপুর রোডের উপর কুমারটুলির সন্নিকটে ইঁহার এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটী ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। গোবিন্দরাম মিত্র মহাশয়ের কলিকাতায় সে সময় যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। বর্ত্তমান হাতীবাগানে তাঁহার প্রমোদোদ্যান ছিল। এইখানে তাঁহার হস্তীসকল রক্ষিত হইত।

শ্রীসাতকড়ি মিত্র

সাহিত্য-সংবাদ

শুনা যাইতেছে, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা নাকি বিক্রমাদিত্যের একটি প্রমাণ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। মূর্ত্তিটির নির্ম্মাণকাল ষষ্ঠ শতাব্দী। তাহার পাদপীঠে নিম্নলিখিত লিপিটি উৎকীর্ণ আছে। —“ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত-সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় কবি কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন।” লিপিটি কবে প্রকাশিত হইবে ?

* * *

এলাহাবাদের সন্নিকটে ভিটায় ভূগর্ভস্থ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া সেকালকার অনেক জিনিষ পাওয়া গিয়াছে। তাহার ভিতরে পোড়ানো মাটির তৈয়ারি খেলনার ত্রিচক্রযানের কথা উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ভোগেল এই সূত্রে বলেন যে, “এইরূপ সামান্য বিষয় হইতেই বিখ্যাত নাটক ‘মৃচ্ছকটিকে’র (অর্থাৎ খেলনার গাড়ী) নামকরণ করা হইয়াছে। এ ছাড়া আরও বোঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতবাসীরা দ্বিচক্র ও ত্রিচক্র যানের কলকব্জার নির্ম্মাণপদ্ধতি জানিতেন,—জনশ্রুতি ও রূপকথাতেও ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভিটা ছাড়া অন্য কোথাও খেলনার গাড়ীর নমুনা পাওয়া যায় নাই।”

* * *

অধ্যাপক র‍্যাপসনের “প্রাচীন ভারত” নামক পুস্তকের সমালোচনাকালে, ডাঃ ফ্লিট গ্রন্থকারের সহিত এক বিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ডাঃ ফ্লিট বলেন, “গার্গীসংহিতা” ও জৈন “কালিকাচার্য্য কথা”র ভিতরে প্রামাণিক ঐতিহাসিক মূল্য কিছুই নাই ;—অশোকের রাজ্যসীমা নর্ম্মদা ও মহানদীর উত্তরভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

* * *

মিঃ ভ্যালুয়ারি, রামচন্দ্রের “সত্যহরিশ্চন্দ্র” প্রকাশ করিয়া এক উদ্ভট মত প্রচার করিতেছেন। তিনি বলিতে চান যে, “সত্যহরিশ্চন্দ্র”-প্রণেতা রামচন্দ্র, হেমচন্দ্রের ছাত্র,—সুতরাং তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক। হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অনেকটা জবের (Job) গল্পের মত। অতএব, তাহা খৃষ্টান পাদ্রিদের কাছ হইতে ধার করা। মিঃ এ, বি, কেথ এই অপূর্ব্ব কল্পনাকে উড়াইয়া দিয়াছেন। (J. R. A. S. 1914. p 405.)

* * *

গুপ্তবংশের মুদ্রা-তালিকায় মিঃ জন আলেন, কতকগুলি নূতন ও চিত্তাকর্ষক সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা তাহার দু-চারিটি এখানে উদ্ধার করিলাম ঃ—

মুদ্রাবিষয়ক জনপ্রবাদগুলি প্রায়ই ছন্দোবিশিষ্ট হইত ; দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের “দেবরাজ” বলিয়া আর একটি নাম ছিল ; বাহ্লীকগণ, ‘বল্কে’র বাসিন্দা ছিল না—কারণ, তাহারা আরও ছয়শত মাইল দক্ষিণাংশে বাস করিত এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—পুরগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত এক ব্যক্তির নাম নহে। তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে আর একজন রাজা ছিলেন। দ্বাদশাদিত্য তাঁহার দ্বিতীয় নাম—

* * *

দিল্লীর নামকরণ লইয়া “শিখ রিভিউ” একটি গল্প বলিয়াছেন।

“সভাপণ্ডিতেরা যখন দিল্লীর লৌহস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন, তখন তাঁহারা রাজাকে বলিলেন যে, এই স্তম্ভের শেষদিকটা বাসুকীর মাথায় গিয়া ঠেকিয়াছে। রাজার সন্দেহ হইল। তিনি কথাটা সত্য কি না তাহা দেখিতে চাহিলেন। সভাপণ্ডিতেরা বাধ্য হইয়া লৌহস্তম্ভটি মাটির ভিতর হইতে পুনরায় টানিয়া বাহির করিলেন। তখন দেখা গেল, স্তম্ভের তলায় রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। অনুতপ্ত রাজা ভীত হইয়া স্তম্ভটিকে পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন,—কিন্তু, কিছুতেই সেটিকে আর আগেকার মত করিয়া রাখা গেল না—তাহা “ঢিলি” অর্থাৎ ঢিলা হইয়াই রহিল। অতএব, রাজার রাজধানী প্রথমতঃ “ঢিলি” এবং তাহার পরে “দিল্লী” নামে বিখ্যাত হইল।

* * *

শ্রীপ্রসাদদাস

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ৯ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

পাশ্চাত্য জগতে বহু-বিবাহ-বিভ্রাট্

সমাজ-প্রথা, ধর্ম্মবিধির কঠোর শাসনে পাশ্চাত্য প্রদেশে বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ। য়ুরোপ এবং আমেরিকার অধিকাংশ স্থলেই এক-বিবাহ প্রচলিত। কেবল যুক্তরাজ্যে এখনও বহু-বিবাহ চলিয়া থাকে।

বহু-বিবাহ পাশ্চাত্য সমাজে হেয় এবং দণ্ডনীয় হইলেও, গুপ্তভাবে ইহার প্রভাব কোনকালেই মন্দীভূত হয় নাই। কি পুরুষ, কি নারী, গুপ্ত-সম্ভোগের লালসাকে কেহই সংযমিত করিতে পারে নাই। আজিও বহু নর-নারী প্রকারান্তরে বহু-স্বামী বা বহু-স্ত্রী-সম্ভোগে গুপ্তভাবে লিপ্ত রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সভ্যতা যতই চেষ্টা করুক না কেন, বিবাহিত জীবনের এই কাম-বাসনা যে য়ুরোপ হইতে যাইবার নহে, আমরা তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে ব্যভিচারের ন্যায় পাপ আর কিছুই নাই। ধর্ম্মযাজক, বিশপ, পোপ প্রভৃতি সকলেই দাম্পত্য-ব্যভিচারকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিয়া থাকেন। এমন কি, এইরূপ ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীকে সামাজিক নির্যাতন হইতে মৃত্যু-দণ্ড পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছে ; কিন্তু একদল নর-নারী চিরকালই খ্রীষ্টধর্ম্মের এইরূপ কঠিন অনুশাসনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন। য়ুরোপীয় সমাজে বিবাহিত নর-নারীর গুপ্ত-সম্ভোগের অন্ত নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মে এক-বিবাহের কঠিন অনুশাসন আছে বলিয়াই পাশ্চাত্য জগতে গুপ্ত-সম্ভোগের বাসনা অধিকতর বলবতী। হিন্দু কিংবা মুসলমানধর্ম্মে বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে কোন কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই বলিয়াই, তাহাদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় ব্যভিচার তেমন প্রবলভাব ধারণ করে নাই।

পাশ্চাত্য নর-নারীর এই গুপ্ত-ভোগেচ্ছাকে অধ্যাপক Iwan Bloch “উদ্ভ্রান্ত প্রেম” (wild love) বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন। এক-বিবাহ-প্রথা উত্তম, কিন্তু মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বহু-বিবাহের দিকে। ইহা অনেক বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। Rev. Dr. Porkhurst “নিউ ইয়র্ক” সহরে বিবাহ-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন ঃ—“I do not know how many unfaithful wives and husbands there are in this city, but I calculate there might be a quarter of a million” এই উক্তি হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, বহু-বিবাহের পরিপন্থী পাশ্চাত্য সভ্যতার কি শোচনীয় অবস্থা !

তাহার পর Tolstoi কি বলিতেছেন, শুনুন—“In Russia, out of a hundred men there is hardly one, who has not been married before, and out of fifty hardly one who has not made up his mind to deceive his wife.”

Max Nordan মহোদয় জার্ম্মাণ-জীবন অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিত হইয়া বলিয়াছেন যে, মানব স্বভাবতঃই বহু-বিবাহানুবর্ত্তী (naturally polygamous)।

Letourneau সাক্ষ্য দিতেছেন যে,“In France, the proportion of marriage between bachelors from eighteen to forty years and women of fifty and beyond that age is ten times greater than in England. “এমন বীভৎস রাক্ষসী-লীলা কি বহু-বিবাহ-প্রচলিত দেশেও দৃষ্ট হয় ? আঠার বৎসরের যুবককে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধা অনায়াসে বিবাহ করিতেছে। লালসার কি জলন্ত ইতিহাস ! ধনশালিনী বৃদ্ধা কন্যার অর্থ-ভাণ্ডারের সহিত এরূপ অসম-বিবাহের সম্বন্ধ যতটা বেশী, প্রেমের সহিত তাহার সম্বন্ধ ততটা অল্প—এমন কি, প্রেমের সহিত সম্পর্ক এখানে যে একেবারেই নাই,—কিছুমাত্র অত্যুক্তি না করিয়া অনায়াসে এরূপ মতপ্রকাশ করা যাইতে পারে ; সুতরাং এই অসম-বিবাহের ফলে সেই তরুণ যুবকের লালসা নিবৃত্তির জন্য গোপনে আর একটি তরুণীর একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। যথার্থ প্রেমের জন্য বিবাহ-বন্ধন ফরাসী দেশে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। এক-বিবাহের বিরুদ্ধে য়ুরোপ ও আমেরিকার অনেক নর-নারী আন্তরিক যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন। Walter M. Gallichan তাঁহার “Women under polygamy” নামক পুস্তকে লিখিতেছেন ঃ—“There are discontented women and probably men in the polygamous societies but there is probably more dissatisfaction among both sexes living under indissoluble monogamic marriage.” এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদিগের পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত আলোকান্ধ সমাজ-সংস্কারীদের জ্ঞানোদয় হইবে কি ?

য়ুরোপের মধ্যযুগেও এই বহু-রমণী-সম্ভোগেচ্ছা বর্ত্তমান ছিল। ইংলণ্ডের রাজগণের মধ্যে অষ্টম হেন্‌রী এবং দ্বিতীয় চার্ল্‌স্ বহু-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। F. H. Jesse, তাঁহার "Memoirs of the court of England" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "George I. had the folly and wickedness to encumber himself with a seraglio." থ্যাকারেও তাঁহার "The Four Georges" নামক গ্রন্থে রাজ-ভোগ্যাগণের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। য়ুরোপের অপরাপর রাজগণও নানাপ্রকারে প্রাচ্য বহু-বিবাহ-প্রথার রস আস্বাদন করিয়া আসিতেছেন। শোপেনহাউর দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন যে, জীবনের কোন না কোন সময়ে মানবমাত্রেই প্রচ্ছন্নভাবেও বহু-রমণী-সম্ভোগের ইচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়। Alison, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগৎ তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য য়ুরোপে এই বহু-স্ত্রী-সম্ভোগেচ্ছা যত অবাধে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, এমন আর কোথায়ও নহে। Westermarck স্বীকার করিয়াছেন যে, আইন-সঙ্গত এক-বিবাহ প্রায়ই অনেক স্থলে এইরূপ অন্যায় সম্ভোগের কারণ হয়,—That polygamy is often the result of legal monogamy; —মানব-প্রকৃতি বুঝিয়া উঠা কঠিন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ এক-বিবাহের প্রবর্ত্তক হইয়াও বহু-রমণী-সম্ভোগের জন্য লালায়িত। রোমান-ক্যাথলিক-ধর্ম্মমতে বিবাহচ্ছেদ করিবার নিয়ম নাই; কেবল প্রোটেষ্টাণ্টগণই 'ডাইভোর্স'-প্রথার অনুমোদক। ক্রমশঃই খ্রীষ্টীয়-জগতে বিবাহ-বন্ধন-বিচ্ছেদ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক আবশ্যকীয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয়ত, কালে বিবাহ-বন্ধনও একটা আদিম যুগের অসভ্যতার মধ্যেই পরিগণিত হইবে।

ইংলণ্ডে এই বহু-রমণী-সম্ভোগের কারণ হইতেছে, জন-সংখ্যার মধ্যে স্ত্রীলোকের আধিক্য। ইংলণ্ডে বিবাহযোগ্যা অবিবাহিতার সংখ্যাও বড় কম নহে। ইহারা অবিবাহিতা অবস্থা হইতেই বিবাহিত নারী-জীবনের রসভোগ করিতে ভালবাসে। এই অবিবাহিতাগণের সংখ্যা-নির্ণয় করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, ইংলণ্ডে প্রকারান্তরে বহু-বিবাহ চলিতেছে কি না। প্রভেদ এই যে, প্রাচ্যে যাহা প্রকাশ্য, প্রতীচ্যে তাহা গোপনীয়। ফলে, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি জঘন্য মহাপাপের অতিপ্রসার হয়।

অনেক উচ্চস্তরের প্রতিভাসম্পন্ন নর-নারীও তথাকথিত গুপ্ত-সম্ভোগের পক্ষপাতী। Moore, তাঁহার "Life of Byron"এ লিখিয়াছেন, "That all the greatest artists and poets have been either strangers or rebels to domestic ties." কথা আমার নহে, সত্যাসত্য পাঠকেরাই বিবেচনা করুন।

গায়কমাত্রেই এক রমণীতে স্থির থাকিতে পারেন না। Bethov n মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন যে, একটি রমণীকে তিনি সাত মাস ধরিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার ধৈর্য্যের সীমার পক্ষে আশ্চর্য্যজনক! স্রষ্টা, কলাবিদ্‌মাত্রেই জীবনে সৌন্দর্য্য-উপভোগের জন্য পাগল এবং তজ্জন্যই তাঁহারা অলির ন্যায় এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বসিতে সতত তৎপর। গোএটে, হাইনে, শিলার, রুশো প্রভৃতি বহু কবিই চঞ্চল এবং রূপোন্মত্ত ছিলেন। নর-নারী স্বভাবতঃই ভোগবিলাসী; কেবল ধর্ম্ম, সমাজ এবং বিধি-নিয়মই তাহাদিগকে সংযত করিয়া রাখে। তাহার উপর অবাধ নর-নারী-সম্মিলনই লালসার আগুনে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। পাশ্চাত্য জগতের বহু অনুসন্ধিৎসু নর-নারী তুর্কী ও ভারতবর্ষের বিবাহ-পদ্ধতি দেখিয়া নাসিকা-কুঞ্চন করিয়া থাকেন; কিন্তু ঢালের অন্য দিকটা এই একচক্ষু হরিণদের চোখে পড়ে না।

Lucy Garn t মহোদয়া, তাঁহার "The women of Turkey" নামক পুস্তকে লিখিতেছেন :—

"Monogamy has in Christendom been a conventional fic'ion rather than a social fact. And Christianity, having denied to women all rights in sensual relations except under the sanction of indissoluble monogamous marriage, the social evil has in no civilisation whatever been so hideous in its degradation and mis ry as in Christhmdom." এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, পাশ্চাত্য জগৎ বহু-বিবাহ-প্রথা গোপনে প্রচলিত করিয়া মহা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে।

এক-বিবাহ-প্রথা যে বহু-বিবাহকে পরাজিত করিতে পারে না, আর একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত তাহা দেখাইয়াছেন। "At least 50 P. C. of the sexual intercourse that occurs in western nations is outside the bonds of wedlock." A. E. Crawley. (The Encyclopaedia of Religious Ethics.) এরূপ অবস্থায় এক-বিবাহের প্রচলনেও নর-নারীর ব্যভিচার-প্রবৃত্তির কখনই সঙ্কোচ ঘটিবে না।

এই অদ্ভুত সভ্য যুগের তুলনায় আদিম যুগের মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এতটা ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি ছিল না। তখনকার প্রাচীন জগৎ একটা নিয়মের বাধ্য হইয়া চলিত। পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে এক্ষণে ব্যভিচার যেভাবে সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে, বহু-বিবাহের পক্ষপাতী জাতিসমূহের মধ্যে ততটা ব্যভিচার কোথায়ও নয়ন-গোচর হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে জাতি যত অধিক সভ্য বলিয়া জগতে বিদিত হইতেছে, সেই জাতির স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গুপ্ত-প্রেম-প্রার্থিনী অবিবাহিতার সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে।

Sir Richard Burton বহুদিন প্রাচ্য জাতির সংশ্রবে আসিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বহু-বিবাহ একটা অবশ্য-প্রয়োজনীয় প্রথা। অনেক সময়ে বহু-বিবাহও যে একটা জাতি বা সমাজের কল্যাণসাধন করে, তাহা হয়ত এই মহাযুদ্ধের অবসানে প্রমাণিত হইয়া যাইবে। এই মহাযুদ্ধের ফলে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বহু-বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইবে কি না, কে বলিতে পারে?

অথচ বাহ্যভাবে দেখা যাইতেছে, জগৎ হইতে ক্রমশঃই বহু-বিবাহ-প্রথা বিলুপ্ত হইতেছে। চারিদিকে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তারহেতু স্ত্রী-জাতি ক্রমশঃই পুরুষের উপর প্রাধান্যলাভ করিতেছে এবং বিবাহ করাটা তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। বহু-বিবাহ-প্রথা উঠিয়া যাওয়ার প্রধান কারণ, পূর্ব্বের ন্যায় জগতের আর সে স্বচ্ছল অবস্থা নাই; শিক্ষা-দীক্ষার বিস্তারহেতু জগতে নানা অভাব ও অসন্তোষ চারিদিকেই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাচ্য জগতে স্ত্রীজাতি বহু-বিবাহ-প্রথাকে যত ঘৃণা করুক আর না করুক, অবরোধ-প্রথা যে তাহাদের জীবনকে বড়ই অবসাদগ্রস্ত করিয়া তুলে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নব্য তুর্কী-নারীগণের অসন্তোষের কারণ বহু-বিবাহ-প্রথা নহে, অবরোধ-প্রথাই তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে।

এক-বিবাহ-প্রথা য়ুরোপের জাতীয় ধর্ম্ম হইলেও, তাহার কোন মূল্য নাই; অথচ আমাদিগের দেশে বহু-বিবাহ-প্রথার প্রচলন থাকিতেও হিন্দু নর-নারীর বিবাহ-বন্ধনে জীবন-মরণ-সম্বন্ধ। Havelock Ellis মহোদয় বিবাহ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "It is not the legal or religious formality, which sanctifies marriage; it is the reality of the marriage, which sanctifies the form." বিবা-

হের এই সততা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের হিন্দু রমণীগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় যেরূপ স্ত্রী-প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমার মনে হয়, "বিবাহ" কথাটা উহাদিগের অভিধান হইতে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। আমেরিকায় পাঁচকোটী স্ত্রীলোক পুরুষের উপর নির্ভর না করিয়া, পুরুষোচিত কার্য্যে জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করে। জাপানের স্ত্রীলোকেরাও নানারূপ কারুকার্য্যে ও পুরুষ-জনোচিত কার্য্যেও জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে। এই পুরুষ-জনোচিত কার্য্যের ফলে, স্বাবলম্বন-প্রিয়া নারীজাতির মধ্যেও মহা নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে। পুরুষ-জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া অনেক স্বাধীন-স্বভাব নারীর স্বাস্থ্যহানি ও চরিত্রহানিও ঘটিতেছে।

কৃত্রিম এক-বিবাহ-প্রথার অন্তরালে য়ুরোপ ও আমেরিকায় কত যে মহাপাপ ঘটিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতীচ্য জগতে ব্যভিচার-জীবন-যাপনের যত সুবিধা, প্রাচ্যে তত নহে। কারণ, প্রাচ্য জাতির মধ্যে বহু-বিবাহে একটা ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, সকল স্ত্রীরই স্বামীর উপর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও ন্যায়সঙ্গত দাবী আছে; কিন্তু পাশ্চাত্য গুপ্ত প্রেম-বন্ধনে উপভোগ্যা নারী বা তাহার গর্ভজাত সন্তানের কোনরূপ দাবী নাই। পুরুষজাতির পক্ষে এইরূপ গুপ্ত-বিবাহে কোনরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই বলিয়াই য়ুরোপ ব্যভিচারের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। Charles Kingsley স্পষ্টই বলিয়াছেন, "There will never be a good world for women until the last remnant of the Canon Law is civilized off the earth"

Havelock Ellisও তাঁহার "Marriage" নামক প্রবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন যে, "In no part of the world is polygamy so prevalent as in Christendom." পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব-গতিক দেখিয়া অনেক বিচক্ষণ সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ বহু-বিবাহ-প্রথার প্রবর্ত্তনের জন্য মত দিয়াছেন। James Hinton নামে একজন চিকিৎসক ও সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ বলিয়াছেন যে, এইরূপ গুপ্ত-সম্ভোগ অপেক্ষা আইন-সঙ্গত বহু-বিবাহ-প্রথার প্রচলন সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; কারণ, নামমাত্র এক-বিবাহ ত জলের লিখন! তিনি বলিয়াছেন—"It would be better to admit and recognise polygamy in England than to pretend that we are strictly monogamous." Hinton বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহাতে সমাজের আরও সর্ব্বনাশ হইতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জাতীয় মঙ্গলের জন্য বহু-বিবাহের আবশ্যকতা আছে। আমাদের দুর্দ্দশাপন্ন দেশের জন্য বলিতেছি না, ভোগপ্রধান য়ুরোপকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছি। য়ুরোপের নারী-সংখ্যা শান্তির সময়েই পুরুষাপেক্ষা অধিক, এখন ত কথাই নাই। এবংবিধ অবস্থায় খ্রীষ্টীয় জগৎ যদি বহু-বিবাহ-প্রথার প্রচলন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিবেন।

আমার মনে হয়, বহু-বিবাহ-প্রথার প্রচলন হইয়াছিল, কেবল উদ্দাম ব্যভিচার ও গণিকাবৃত্তির প্রতিরোধের জন্য। সমাজে বরং বহু-বিবাহ ভাল, কিন্তু গণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া ভাল নহে। যুদ্ধ, বহু-বিবাহের আর একটি কারণ। যে সব জাতির মধ্যে ঘন ঘন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে নর-নারীর সামঞ্জস্য প্রায়ই রক্ষিত হয় না; তজ্জন্য জাতিরক্ষা-কল্পেও বহু-বিবাহ আবশ্যক হইয়া পড়ে। য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে, এ কথাটা সহজেই বোধগম্য হয়। য়ুরোপে নারীজাতির মাতৃত্বে পরিণতি একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইলেও, প্রাচ্যে তেমন নহে। প্রাচ্যে নারীজাতিকে মাতা হইতেই হইবে, ইহাই তাহাদের চিরপ্রচলিত বিধিলিপি। এক্ষণে যে সব জাতির মধ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক, তাহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা অন্যায় নহে। স্ত্রীজাতিকে মাতৃত্বে পরিণত করিতেই হইবে; তাহা না করিলে, অত্যধিক স্ত্রী-সংখ্যা-বশতঃ স্ত্রীজাতির চরিত্র দূষিত হইবে। অতএব, এরূপ স্থলে অর্থাৎ যথায় স্ত্রী-সংখ্যা অধিক, তথায় পুরুষের পক্ষে বহু-বিবাহ সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু যিনি বহু-বিবাহ করিবেন, তাঁহাকে স্বীয় অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে একটি স্ত্রী রক্ষা করিতেই মানুষ অসমর্থ! তাই প্রাচ্য জাতির মধ্যে বহু-বিবাহের রীতি থাকিলেও, অবস্থায় কুলাইয়া উঠে না। কোরাণে মহম্মদ স্পষ্টই বলিতেছেন, "If ye fear, ye cannot act equitably towards two, three or four wives; marry only one." এক-বিবাহ যে উত্তম এবং বহু-বিবাহ যে নানা অশান্তির কারণ, তাহা আমাদের রামায়ণেও দশরথের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচ্যে বহু-বিবাহ-প্রথা ধর্ম্মসঙ্গত হইলেও দেখিতে হইবে, এইরূপ অভাবের দিনে কয়টা বহু-বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর? আমি বহু-বিবাহের পোষকতা করিতেছি না, আমি দেখাইতে চাহি যে, বহু-বিবাহেরও সময়ে সময়ে প্রয়োজন হয়।

David Hume তাঁহার "বহু-বিবাহ" প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন :—"The republic of Athens, having lost many of its citizens by war, allowed every man to marry two women, in order the sooner to repair the waste, which had been made by this calamity" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধাদির দ্বারা জাতীয় খণ্ডপ্রলয়ের অপকারিতা দূর করিবার জন্যই সময়ে সময়ে বহু-বিবাহের আবশ্যকতা হয়।

মহম্মদ বলিয়াছেন, "বিবাহই মানব-জীবনকে সম্পূর্ণ করে।" তিনি ব্যভিচার একেবারেই দেখিতে পারিতেন না; তজ্জন্য তিনি সংযত বহু-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। নানা কারণে তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের এক-বিবাহবাদকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি তৎকালীন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ভিতর বহু ব্যভিচার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

একজন মুসলমান এক স্ত্রী থাকিতেও অনায়াসে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান-সন্ততিদিগকে কখনই পরিত্যাগ বা বঞ্চিত করিতে পারে না। খ্রীষ্টীয় জগতে এইরূপ অবৈধ সন্তান-সন্ততির পিতৃসত্বে কোন দাবী নাই। মহম্মদ বলিয়াছেন, "ঈশ্বরকে সতত স্মরণ রাখিয়া তোমার আত্মজগণের প্রতি ন্যায়প্রদর্শন কর।" তজ্জন্য প্রকৃত মুসলমান তাহার ঔরসজাত সন্তানদিগকে কোরাণানুসারে কখনই ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতায় এ দৃষ্টান্ত দেখা যায় কি? মোসলেম জগতে তজ্জন্য পরিত্যক্ত সন্তানাগার (baby-farms or maisons d' accouchments) এখনও দেখা দেয় নাই। খ্রীষ্টীয় জগতে দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অনায়াসেই নর-নারী নিষ্কৃতি পায়; কিন্তু মুসলমান-জগতে তাহা হইবার যো নাই। কোরাণের বজ্র-শাসন অমনই তাহাদিগের মনে ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা জাগ্রৎ করিয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় মুসলমান নর-নারী অনায়াসে বিবাহবদ্ধ হইয়া কৃত অপরাধ হইতে আপনাদিগকে পবিত্র রাখিতে পারে এবং পুত্রও স্বাধিকারে বঞ্চিত হয় না। মুসলমান সাম্য-তন্ত্রে এইরূপে কত উচ্চবংশীয় ব্যক্তি কত হীনবংশীয়া ক্রীতদাসীকেও বিবাহ করিতে কুণ্ঠাবোধ

করে না; আবার কত উচ্চবংশীয়া নারীও কত ক্রীতদাসকে বিবাহ করিয়া সমাজে পতিতা হয় না। সমগ্র মোগল ইতিহাস এইরূপ বিবাহের বহু-দৃষ্টান্ত-স্থল। য়ুরোপে কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে ভ্রূণহত্যা ও শিশুহত্যাই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

হালীল হালীড্ নামক একজন তুর্কী গ্রন্থকার, তাঁহার "The Crescent ve sus T ie C oss" নামক পুস্তকের "Polygamy and Divorce" নামক প্রবন্ধে বহু-বিবাহের আর একটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,"স্ত্রী-প্রকৃতি এবং পুরুষ-প্রকৃতি এক নহে। স্ত্রীজাতির গর্ভাবস্থায় কাম-প্রবৃত্তি কমিয়া যায়; কিন্তু পুরুষের ইন্দ্রিয়-ভোগেচ্ছা সমভাবেই বলবতী থাকে। সেই নিমিত্তই বহু-বিবাহ পুরুষের পক্ষে অন্যায় নহে; কারণ, স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় স্বামীর ব্যভিচার প্রায়ই দৃষ্ট হয় ও এই ব্যভিচারের ফলে সেই বিবাহিত পুরুষের, দুষ্টা-স্ত্রী-সংসর্গজনিত নানারূপ ইন্দ্রিয়-সংক্রান্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইবারও সম্ভাবনা এবং সেই ব্যাধিসমূহ যে তাহার ভবিষ্যৎ সন্তান-সন্ততির পক্ষে কিরূপ অশুভকর, তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তজ্জন্য স্বামীর পক্ষে দুইটি বিবাহ কখনই দোষাবহ নহে।" অবশ্য, গ্রন্থকার যথার্থ একনিষ্ঠা ও প্রেমের ভিতর দিয়া বিবাহকে বিশ্লেষণ করিতেছেন না; দুর্ব্বল-প্রকৃতি মানবের ভিতরে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে, তিনি তাহাই দেখাইতেছেন। বর্ত্তমান যুগের আব্‌হাওয়ায় সমগ্র মানব-সমাজের সংযম-বল কতটা, তাহাও দেখিবার বিষয়।

আমরা অগ্র-পশ্চাৎ না দেখিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণে তৎপর। পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃত্রিমতা ও ভ্রান্তি দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি নানা গ্রন্থ হইতে নানা উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। কারণ, ইহাতে রোগীর মুখে রোগের কথা ব্যক্ত হইবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

আমরা আরও দুইটি মত তুলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। Letourneau সাক্ষ্য দিতেছেন, "We perceive that in the present day, in countries reputed to be the most civilized and even in the classes reputed to be the most distinguished, the majority of individuals have polygamic instincts which they find it difficult to resist."

(The Evolution of Marriage, P. 136)

অর্থাৎ, বর্ত্তমান যুগে উচ্চশিক্ষিত সভ্য-সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই গুপ্ত-সম্ভোগে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। তাহারা এই প্রবৃত্তি হইতে আত্মদমন করা বড়ই কষ্টকর বলিয়া মনে করে।

অতঃপর Max Nordan, তাঁহার "Conventional Lies of our civilization" নামক অদ্ভুত সমাজ-রহস্যসূচক পুস্তকে লিখিতেছেন, "Man lives in a state of polygamy in the civilized countries in spite of the monogamy enforced by law; out of a hundred thousand men there woul l barely be one who could smear upon his death-bed that he had never known but one single woman during his whole life." P. 301.

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

পারের ঘাটে

পার করে দাও পাটনী!
বিদেশী পথিক,
পথ নাহি ঠিক,
সম্মুখে আঁধার রজনী।
শ্রাবণের শেষ,
এলাইয়া কেশ,
কেহ নাই এই বিজনে।
ভেসে গেছে মাঠ,
শূন্য পল্লী-বাট,
হু-হু করে প্রাণ হুতাশে।
হারাইয়া কূল,
তটিনী আকুল,
আছাড়িয়া পড়ে আকাশে।
পারে বন-রেখা
নাহি যায় দেখা,
বেলা শেষ হ'ল আজিকে।
ঘরে ঘরে যাই
মাগিলাম ঠাঁই—
কেহ নাহি চায় এদিকে।
অজানা এ দেশে
বসি দীনবেশে
হারায়েছি আশা ভরসা।

অকূল পাথার,
নাহি পারাপার,
ঘনা'য়ে আসিছে বরষা।
ঝটিকা-হিল্লোলে,
প্রলয়ের কোলে,
খল-খল হাসে দামিনী।
দূরে অতিদূরে,
শূন্য-দেশ পূরে
উঠেছে কাহার রাগিণী॥
সম্মুখেতে একি!
আচম্বিতে দেখি—
ভেসে আসে কা'র তরণী।
তুফানের 'পরে
সুখে নৃত্য করে
লহর কাটিছে ক্ষেপণী॥
কাছে আন নায়,
উঠাও আমায়,
পার ক'রে দাও পাটনী!
এপার ওপার
সব একাকার—
তা'র মাঝে শুধু রজনী!

শ্রীহরনাথ বসু

মর্ম্মবাণী

Rain, rain and sun! a rain-bow on the lea!
And truth is this to me, and that to thee;
And truth or clothed or naked let it be.

Tennyson

বাঙ্গারাম, তুমি মর্ম্মবাণী শুনিতে চাও, আমিও তোমাকে বলিয়া সুখী; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে কি, মনে যত কথা ওঠে, ভাষায় তত ফোটে না। ভাষা চিরদিনই ভাবের দাসী; কিন্তু সুনিপুণা বা স্বয়ং-সমর্থা দাসী নয়। আবার ভাব যখন অতি গাঢ়, ভাষা তখন একেবারেই নীরব; কাজেই মর্ম্মবাণী বলিতে সব সময়ে সকল কথা তোমায় বলিতে পারি না।

এই বরষার অবিরল বাদলে যখন শ্যাম যমুনার শ্যামল তটে লতা-বিতানের শ্যামল পত্রগুলি বারি-ধারা-সম্পাতে কলধৌত হইয়া তালে তালে নাচিতে থাকে, তখন আমার কুটীরের সম্মুখস্থ নিবিড় পত্রাবৃত তমাল-গাছটী আমার হৃদয়ে স্নিগ্ধমধুর ভাব ঢালিয়া দিয়া অতীতের কত কথা জাগাইয়া তুলে! উপরে মেঘ-মেদুর সহস্রধারাময় স্নিগ্ধ আকাশ, সম্মুখে শ্যাম-সোহাগিনী যমুনার কুল-কুল কল-কল নিনাদ, আর আমার সাধের কুটীরে একা আমি! —মরমের বাণী মরমে ফুটিয়া মরমেই ঝরিয়া পড়ে!

বাঙ্গারাম, সেই সকল মর্ম্মবাণী তোমায় বলিতে ইচ্ছা হয়, লিখিয়া জানাইতে সাধ হয়; কিন্তু বলিতে গিয়াও বলিতে পারি না, লিখিতে বসিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারি না,—উহারা দিশেহারা পথিকের ন্যায় মরমে মরমে ঘুরিয়া বেড়ায়—বাহির হইতে পথ পায় না। অতীত সুখের স্মৃতির ন্যায় স্মৃতিতেই মিশিয়া যায়, নিজে আস্বাদন করি, অপরকে বুঝাইতে পারি না। জান ত—সেই "মূকাস্বাদনবৎ"।

জ্ঞানীদের নিকট সারা বছরের সকল সময়ই একরূপ—এক অখণ্ড অদ্বৈত; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির, বসন্ত সকলই একরূপ—একই অখণ্ডকালের অবিদ্যাকল্পিত বিভাগ, উপভাগমাত্র। এ সকলই "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং অখণ্ডকালেত্যেব সত্যম্"; কিন্তু আসল কথাটা বলিতে কি, অদ্বৈত-সিদ্ধির ঝুলির ভিতরকার পদার্থবিশেষের ধূম-সংযোগ ব্যতিরেকে এরূপভাবে কেহই এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগৎটিকে একবারে উড়াইয়া দিতে পারে না। আমার ভাগ্যে সে কৃপা-প্রসাদ এখনও জুটে নাই, ভেদ-জ্ঞান পূর্ণমাত্রাতেই বিরাজমান। তাই অখণ্ডকালের খণ্ড-প্রভাবের হাত হইতে এখনও নিস্তার পাই নাই; পাই নাই বলিয়াই এক একটা কাল-বিভাগের এক একটী বিশিষ্টতা, স্বাতন্ত্র্য, প্রভাব ও আধিপত্য বিশেষরূপেই অনুভব করি। এই বর্ষাকালটী আমার পক্ষে বড় মধুর বলিয়া বোধ হয়—কেন এমন হয়—বলিয়াছি ত, তাহা বলিয়া তোমায় বুঝাইতে পারিব না।

গত মঙ্গলবার সকালবেলা হইতেই অবিরল বৃষ্টি হইতেছিল, একবারও রবির মুখ দেখিতে পাই নাই। বনভূমির বিশাল, বিপুল, স্নিগ্ধ সম্পত্তির মাঝখানে আমার প্রিয়তম কুটীর—আনন্দময়ের চিরহরিৎ, চিরশোভাময় বন-সম্পত্তির একবারেই মাঝখানে—তুমি এখানে না আসিলে, সে শোভা বুঝিতে পারিবে না। এই বাদলার দিনে শ্যামল লতা-বল্লরী সদ্যঃস্নাত হইয়া যে স্নিগ্ধ, সুন্দর শোভা বিস্তার করে, তাহা দেখিবার বিষয়—প্রকৃতপক্ষেই উপভোগের বিষয়। আমি একা—ধরিতে গেলে চিরদিনই একা। মনের মত দোসর খুঁজিয়া পাই নাই, কিন্তু তথাপি আছি ভাল। এখানে নর-নারী না থাকিলেও, তমাল ও মাধবীলতার নীরব মর্ম্মবাণী হৃদয়ে যে আনন্দ আনিয়া দেয়, মানব-সমাজে সে আনন্দ পাই নাই।

শ্যাম জ্যোতি স্নিগ্ধ হাসি, চিরানন্দ রূপরাশি,
মধুর মরম-বাণী নীরব ভাষায়,
সদ্যঃস্নাত নিরমল, প্রেমে আঁখি ছল-ছল,
তমাল-জড়িত অই মাধবীলতায়।

এই প্রকৃত মিলনের মধ্য দিয়া এক নিত্য-মিলনের ভাবের ছায়া সময়ে সময়ে দেখিতে পাই। তাহাতে যে আনন্দ, তোমার মানব-সমাজে সে আনন্দ নাই।

I find him in the shining of the stars,
I mark him in the flowering of His fields,
But in His ways with men I find him not.

কিন্তু তথাপি আমি মানব-সমাজের সেবা করিতে ভালবাসি।

জানত, আমার হৃদয়টা চিরদিনই এক মহাশুষ্ক গদ্য। কবিতা ফোটে না, কবিতার রসেও সিক্ত হয় না; কিন্তু এমনই এই স্থানের মাহাত্ম্য যে, আমার মর্ম্মবাণী ভাষায় আঁকিবার জন্য সেদিন আমাকেও কবিতা লিখিতে প্রয়াসী হইতে হইয়াছিল। যাহা আমার পক্ষে অসম্ভব,—Physic lly অসম্ভব, men ally ও অসম্ভব, তাহাই করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়ার ত অসাধ্য কিছুই নাই! লিখিতেছিলাম—

হেথা, শ্যামল বিপিনে নীরব কুটীরে
শত সুখ মনে মানি'
মরমে ফুটিয়া মরমে ফুটিয়া
উথলিছে মরম-বাণী।
নিঝুম ঝরিছে জলদ-ধারা,
আঁধারি গগন—সোহাগভরা,
আকাশে ভুবনে নাহিক সাড়া
মরম-বাণী,
নীরব সকল প্রাণী
সুধু, মরমের মাঝে মরমের গায়
গাহিছে মরম-বাণী।

সহসা লেখনী বন্ধ হইল, ভাষা ফুটিল না; কিন্তু ঝঙ্কারের মরণ নাই—উহা এখনও রহিয়াছে। আঁচলের ফুল খসিয়া পড়ে, আঁচলে-বাঁধা কর্পূর উবিয়া যায়; কিন্তু ফুলের ঘ্রাণ, কর্পূরের গন্ধ তখনও বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ করে না। ভাবের ঝঙ্কার এখনও মর্ম্মে মর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

বসন্তের প্রথম বিকাশে আমার এই লতাকুঞ্জ-কুটীরের চারিধারে যে সকল কলকণ্ঠ বিহগের কাকলি শুনিতে পাইতাম, এখন এখানে তাহার একটিও নাই। সে কোকিল নাই, দ'য়েল নাই, শ্যামা নাই, পাপিয়া নাই; সে ফুল নাই, সে ফলও নাই; তবুও কিন্তু এইস্থান আনন্দে ভরপুর—ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ন্যায় ভরপুর—আনন্দে স্ফীত, উন্নত ও উচ্ছ্বসিত—আকাশের সোহাগ-ধারায় চারিদিকেই শ্যামল স্নেহের সুধা-তরঙ্গ।

আমি তোমায় বলিয়াছি, এখানে আমি একা—দোসর কেহ

নাই। কথাটা একভাবে ঠিক্, অপরভাবে কিন্তু খাঁটি মিথ্যা। ভাষার এইরূপ প্রয়োগ দোষজনক বলিয়া মনে করিও না। জ্ঞান ত, সত্যেরও প্রকার-ভেদ আছে—ব্যবহারিক, প্রাতিভাসিক ও পারমার্থিক।

এই যে বিজন বিপিনের নীরব কুটীরে দিন-যামিনী যাপন করিতেছি, ইহাতে বাস্তবিকই কি আমি একা—বাস্তবিকই কি কথা বলিবার কেহ নাই—কথা শুনিবার কেহ নাই? মিছে কথা। সম্মুখে মৃদুল তরঙ্গময়ী শ্যামল যমুনা—দিন-যামিনী তরঙ্গের খেলা—এক আসিতেছে আর যাইতেছে—একের গায়ে অপরে ঢলিয়া পড়িতেছে—কুল-কুল কল-কল নাদে কত মর্ম্মবাণী বলিতে বলিতে তরঙ্গে তরঙ্গে যমুনা প্রবাহিত হইতেছে! যমুনার মর্ম্মবাণী গুলির সকল কথা বুঝিতে না পারিলেও, অনেক কথাই বুঝিতে পারি। সে অতীত ইতিহাসের অফুরন্ত কাহিনী—সে অতীত গৌরবের উদ্দীপনাময় উচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে বিস্মিত, স্তম্ভিত, সময়ে সময়ে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ি। কেমন করিয়া বলি, এখানে আমি একবারেই একা!

চারিদিকে নিবিড় বনের শ্যামল উৎসব—বৃক্ষ-লতা-বল্লরী সন্তঃস্নাত, কলধৌত; চিরপ্রফুল্ল ও চিরসুন্দর—দক্ষিণে, বামে ও যতদূর দৃষ্টি চলে, অনন্ত তীর্থযাত্রীর ন্যায় এই সকল সন্তঃস্নাত বৃক্ষ-লতা-বল্লরীর সারি—মহান্, অনন্ত ও অফুরন্ত এই বন-মহিমা! কেমন করিয়া বলিব, এখানে আমি একা!

ইহার উপরে অনন্ত জলধারা কি একটি মূর্ত্তিমান্ স্নেহের ন্যায় আমারই সমক্ষে এই বন-ভূমির বৃক্ষ-বল্লরীর কোলে নিপতিত হইয়া কত মর্ম্মবাণী বলিতে বলিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে! তবে কি করিয়া বলিব, আমি একা!

শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ

বর্ষা

তব কমল-কর-পরশ লভি'
চাঁপার কলি মুঞ্জরে,
আহা বরষাধারা বাঁধা এ বীণা
তোমারি সুরে গুঞ্জরে।
বকুলফুলে আঁচলখানা
পূর্ণ হ'ল, আর ধরে না,
ছাপিয়ে তাহা ছড়িয়ে গেল
গন্ধে ভরা কুঞ্জ রে!

তব বুকের বাসে তারার মালা
ঢাকিলে কেন নীলাম্বরী?
তব রূপের প্রভা সহিতে নারি'
সূর্য্য লাজে লুকা'ল মরি!
শ্যামল তৃণে চরণপাতে,
চল হে চল কমল-হাতে,
চিকুরে শোভে চন্দ্রকলা
গমন অতি মন্থরে!

অর্ঘ্য-ডালা তোমারে দিল
কদম্বেরি পুঞ্জ রে,
নদীর কূল-দু'কূলে আজি
কেতকীফুল মুঞ্জরে!
তড়িত-রেখা চকিতে হানি,'
সিঁথায় দিল সিঁদুর টানি,'
মেদুর-রবে নূপুর তব
চরণ ঘেরি' গুঞ্জরে!
অর্ঘ্য-ডালা তোমারে দিল
কদম্বেরি পুঞ্জ রে!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

গান

মনের যে সব গোপন কথা
মনেই ছিল ঢাকা,
চরণ-ধূলার তলে তোমার
ক'রব তা' আজ ফাঁকা।
সন্ধ্যা নামে ধূসর-বসন,
রক্তবরণ পটে আঁকা;
মনের যে সব গোপন কথা
মনেই ছিল ঢাকা।

জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে
শান্তি-নদীর নীর,
চন্দ্রালোকে তন্দ্রা আসে
কুঞ্জ-অটবীর।
এমন সুযোগ ব্যর্থ করে'
ভাসিওনাক অশ্রুলোরে,
দাঁড়াও হে নাথ নয়ন 'পরে
স্বপ্ন-আবেশ-মাখা।
মনের যে সব গোপন কথা
মনেই ছিল ঢাকা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বৈজ্ঞানিক বার্ত্তা

দেহের উত্তাপ ও বাহিরের উত্তাপ

দেহের উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা বাহিরের উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। বাহিরের অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) উত্তাপ বা শৈত্যকে মানুষ কম বা বেশী করিতে পারে না; কাজেই এ জায়গায় তাহাকে প্রকৃতির সহিত আপোষ করিয়া চলিতে হয়। আমেরিকার জন্ অস্‌বরন্ সাহেব একটি সহজ উপায়দ্বারা এই বিষয়টির মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মানব-দেহ ক্রমাগতই উত্তাপ ত্যাগ করিতেছে এবং বায়ুমণ্ডল তাহাকে উত্তাপ যোগাইতেছে। যেদিন বায়ুমণ্ডল শীতল, সেদিন আমাদের দেহের নষ্ট উত্তাপরাশি বায়ুমণ্ডলের কাছ থেকে পূরামাত্রায় আদায় করা যায় না; কাজেই শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। গরম অনুভব করিবার বেলাতেও ঠিক্ ঐ কথা। বায়ুমণ্ডল দুই একদিন শীতল থাকিলে, গরম জামা পরিলেও চলিতে পারে; কিন্তু যে দেশের বায়ু সাধারণতঃই শৈত্যময়, সে দেশে, দেহের নষ্ট উত্তাপ পূরণের জন্য কৃত্রিম উত্তাপের ব্যবস্থা করিতে হয়। সেই জন্যই পশ্চিমদেশে "Fire-place" বা অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কৃত্রিম জিনিষের একটি দোষ এই যে, সে ব্যবহারে অকৃতজ্ঞ। উত্তাপলাভের জন্য Fire-place ত সৃষ্টি হইল, কিন্তু লাভটার মাত্রা বেশী হইলেই যে মুস্কিল! যে শীত তাড়াইবার জন্য আগুন জ্বালাইলাম, সেই শীতকেই ডাকিবার জন্য আবার আগুন নিবাইতে হইবে! কারণ, মাত্রাটা যে ঠিক্ থাকিতেছে না। এই আগুন-জ্বালা ও আগুন-নিভানোকে জীবনের ব্রত করিয়া ত বাস করা যায় না, সুতরাং এক সমস্যা আসিয়া পড়িল।

অস্‌বরন্ সাহেব সেই মাত্রা স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন, যদি কোন রকমে দেহের নষ্ট উত্তাপের পরিমাণ অগ্নিকুণ্ড-প্রাপ্ত কৃত্রিম উত্তাপের পরিমাণের সহিত সমান করা যায়, তাহা হইলে আর উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে না। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হইতেছে, আবাসগৃহে বায়ু-সঞ্চালন (Ventilation) এইরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, যাহাতে গৃহমধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপের অতিরিক্ত অংশ বাহিরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

অস্‌বরন্ সাহেব, দুইটি থার্ম্মোমিটারকে ১১০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। উত্তপ্ত করিবার নিমিত্ত থার্ম্মোমিটার দুইটিকেই ফুটন্ত জলের আবদ্ধ পাত্রের বাষ্পের মধ্যে রাখা হইয়াছিল। একটি থার্ম্মোমিটারের পারদাধারের (bulb) গাত্র হইতে জল মুছিয়া এবং অপর থার্ম্মোমিটারের পারদাধার জলযুক্ত অবস্থায় রাখিয়া তিনি দুইটিকেই গৃহের বায়ু-সংস্পর্শে স্থাপিত করিয়াছিলেন। অতঃপর গৃহের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া বায়ু-চলাচল এইরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিলেন, যাহাতে উভয় থার্ম্মোমিটার একই সময়ের বিচ্ছেদে ১০০ হইতে ৯০ ডিগ্রি উত্তাপ-মাত্রা নির্দ্দেশ করে। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, পূর্ব্বোক্ত থার্ম্মোমিটার দুইটির মধ্যে একটি জলহীন ও অপরটি জলযুক্ত; সুতরাং জলযুক্ত থার্ম্মোমিটারটি "Evaporation" বা বায়ু-চলাচলজনিত শীতলতা এবং দ্বিতীয়টি "Radiation" বা স্বীয় উত্তাপ-ত্যাগজনিত শীতলতা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ যে সময়ের মধ্যে বায়ু নিজের চলাচলদ্বারা একটি থার্ম্মোমিটারের যতখানি উত্তাপ হরণ করিল, সেই সময়ের মধ্যেই অপর থার্ম্মোমিটার ঠিক ততখনি উত্তাপ পূরণ করিয়া দিল। অগ্নি আমাদের যে উত্তাপ দান করিয়া থাকে, তাহা "Radiation" এবং দরজা জানালা খুলিলে আমরা বায়ুস্পর্শে যে শীতলতা অনুভব করি, তাহার মূল "Evaporation" বা "Convention"; সুতরাং গৃহের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ ও বায়ু-চলাচলের পদ্ধতি যদি এমন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা যায়, যাহাতে ঐ দুইটি থার্ম্মোমিটার ঠিক একসময়ে একই হিসাবে শীতল হইতে পারে, তবেই দেহের উত্তাপের হরণ এবং পূরণ ঠিক সমান হইয়া যায়।

অস্‌বরন্ সাহেবের এই আবিষ্কার নিউ-ইয়র্ক নগরের প্রত্যেক গৃহে গৃহে পরীক্ষিত হইয়া, বায়ু-চলাচল ঠিক করা হইয়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্যের যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করাই বাহুল্য।

বানরের অনুকরণ-অপবাদ

পশুর মধ্যে বানরকে অনুকরণপ্রিয় বলিয়া জানা আছে। ই, এম্, স্মিথ (E. M Smith) নামক জনৈক ইংরাজ, তাঁহার নূতন গ্রন্থ "পশুর মনস্তত্ত্ব-আলোচনা"য় (Investigation of minds in animal.) স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, বানরজাতি মোটেই অনুকরণপ্রিয় নহে। ইহা তাহার জ্ঞাতি, মানবের অসত্য এবং অপরীক্ষিত সিদ্ধান্তের অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্মিথের কথা সত্য এই জন্য যে, তাঁহার মত পরীক্ষা এবং অনুসন্ধানের ভিত্তির উপর স্থাপিত।

তিনি বলেন, মানুষের সহিত বানরের হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুপ্রত্যক্ষ মিল আছে বলিয়া, বানরেরা যাহাই করে, তাহা মানুষের অঙ্গ-ভঙ্গির সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। এই মিলই বানরজাতির অনুকরণ বলিয়া ধরিলে, ভুল হয়। ঠিক মানুষের মত অঙ্গ-ভঙ্গি করা, পশু-শ্রেণীর মধ্যে একমাত্র বানরজাতি ব্যতীত অপর কোন জন্তুর মধ্যে সুপ্রত্যক্ষ নহে; কাজেই মানুষ বানরকে অনুকরণ-প্রিয় বলিয়া থাকে। কোন বিশেষ মানুষের মত অঙ্গ-ভঙ্গি করা, কথা-বলা, হাঁটিয়া যাওয়া ইত্যাদি মানব-জাতির মধ্যেই সুপ্রত্যক্ষ, বানর-জাতির মধ্যে নহে; সুতরাং এক হিসাবে মনুষ্য জাতিই অনুকরণ-অপবাদে দূষ্য, বানর জাতি নহে।

বানর-জাতি, মানুষের অঙ্গ-ভঙ্গির যতটুকু অনুকরণ করিতে পারে, তাহা বানরের নিছক্ অনুকরণ-বৃত্তি-সাধিত নহে; তাহার মধ্যে কতক পরিমাণে বানরের বুদ্ধির পরিচয়ও পাওয়া যায়। বানর চিরকালই মানুষের অনিষ্ট করে। মানুষের বাগানের আম, জাম, লাউ, কুমড়া, বেগুন, পেয়ারা ইত্যাদি সুফলের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি প্রলুব্ধ হইয়া আছে। মানুষের এমন শত্রু, বানরও যে মানুষের অনুকরণ করিবে, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না; ভক্ত হইলেও কতকটা বিশ্বাস্য হইত। কারণ, ভক্তের দলই পৃথিবীতে চিরকাল তাহাদের ভক্তির পাত্রটির হুবহু অনুকরণ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে। তবে তাহারা ভক্তির যোগ্য ব্যক্তিটির সংসারের লাউ-কুমড়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি না, জানি না।

যাহা হউক, স্মিথের পুস্তকখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। বঙ্গভাষায় উহার অনুবাদ করিলে অনেক উপকার হইবে।

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা রোগ-নির্ণয়।

সূর্য্যের আলোককে আলোক-বিশ্লেষণ-যন্ত্র (Spectroscope) দ্বারা বিশ্লিষ্ট করিলে, পর পর সজ্জিত সাতরঙ্গা যে বর্ণ-বিন্যাস দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহাকে বর্ণচ্ছত্র বা "Spectrum" বলা হইয়া থাকে। এই বর্ণ-বিন্যাস নিরবচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত নহে, মাঝে মাঝে কতকগুলি কালো দাগ (Da k lines) দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দাগগুলি বর্ণচ্ছত্রের মধ্যে অনেকগুলি বিচ্ছেদ রচনা করিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রবল উত্তাপে সতত দহ্যমান কতকগুলি পদার্থ আছে এবং সূর্য্যের বহিরাবরণেও ঐ পদার্থের কয়েকটা অপেক্ষাকৃত স্বল্প উত্তাপে দগ্ধ হইতেছে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ভীষণ উত্তাপে দহ্যমান জিনিষের বর্ণচ্ছত্র অবিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত থাকে, তাহাতে কোনরকম কালো দাগ দৃষ্ট হয় না; কিন্তু ঐ প্রবল উত্তাপে দহ্যমান পদার্থের কয়েকটি জিনিষকে যদি স্বল্প উত্তাপে প্রথমোক্ত পদার্থটিতে আবৃত করিয়া রাখা যায়, তবে প্রথম পদার্থের বর্ণচ্ছত্র আর অবিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় না। সেই সময়ে কতকগুলি কালো দাগ সেই পূর্ণ বর্ণচ্ছত্রকে খণ্ডিত করিয়া দিয়া যায়। এই কৃষ্ণবর্ণের রেখার উৎপত্তির একমাত্র কারণ, বাহিরের স্বল্প উত্তাপে দগ্ধ দ্রব্যগুলির উপস্থিতি; সুতরাং বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখার স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া দিতে পারেন; প্রবল উত্তাপে দহ্যমান পদার্থটিকে ঘিরিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপে কি কি দ্রব্য দগ্ধাবস্থায় রহিয়াছে। এই উপায়ে সূর্য্যের গঠনোপাদান-বিষয়ে নানা তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ণচ্ছত্র একমাত্র সূর্য্যদেহের নহে; প্রত্যেক দ্রব্যেরই বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যায়; আজকাল চিকিৎসকগণ বর্ণচ্ছত্রদ্বারা দুষ্ট রক্তের নাশ ও সূক্ষ্ম রোগানু-অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। ব্যাপারটা কিছুই নহে। মনে করা যাউক, সুস্থ এবং নীরোগ শরীরের তাজা রক্তের বর্ণচ্ছত্র গ্রহণ করা গেল। তাহা নিরবচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত থাকে। সুস্থ শরীরের শোণিতকে প্রবল উত্তাপে দগ্ধ করিয়া, তাহার পর দুষ্ট রক্তকে যদি স্বল্প উত্তাপে পুড়াইয়া, সুস্থ রক্তের দহ্যমান শোণিতের বাহিরে আবরণরূপে রক্ষিত হয়, তবে উভয় দ্রব্যের জন্য যে একটিমাত্র বর্ণচ্ছত্র পাওয়া যাইবে, তাহা অবিচ্ছেদে সজ্জিত থাকে না! কারণ, দুষ্ট রক্তে কতকগুলি রোগ-বীজানু আছে বলিয়া পূর্ণচ্ছত্রের স্থানে স্থানে কৃষ্ণরেখা (Dark Lin‹s) দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে উপায়ে পণ্ডিতগণ সূর্যের বহিরাবরণের স্বল্প উত্তাপে দহ্যমান ধাতু-পদার্থের অস্তিত্ব বলিয়া দিতে পারেন, ঠিক সেই উপায়েই তাঁহারা দুষ্ট রক্তের মধ্যে কোন রোগের কোন্ জীবানু আছে, তাহা সহজে বলিতে পারেন।

বর্ণচ্ছত্রের কৃষ্ণরেখাগুলির স্থান বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া পণ্ডিতগণ বিশ্বাসদ্বারা অপেক্ষাকৃত স্বল্প উত্তাপে দহ্যমান পদার্থের অস্তিত্ব ধরিতে পারেন। এই কৃষ্ণরেখাগুলি পণ্ডিতগণের হিসাবের একমাত্র সহায়।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

শশাঙ্ক *

(সমালোচনা)

গ্রন্থকার শশাঙ্কের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বহু উপন্যাস রচিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠ অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে মৃণালিনী ব্যতীত অপর সমুদায়গুলির আখ্যান-বস্তু মুসলমান-বিজয়ের পরবর্ত্তিকালের ইতিহাস হইতেই গৃহীত। আমরা মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে জীবিত ছিলাম, মুসলমানকর্ত্তৃক বিজিত হইয়া মরিয়াছি। ভারতবাসীর জীবনকালের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস রচনা হইতে পারে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ 'শশাঙ্ক' রচিত হইল।" বাঙ্গালা দেশে ঐতিহাসিক উপন্যাস বা ঐতিহাসিক নাটকের অভাব নাই। ইতিহাসের নীরস তথ্যগুলি ঐতিহাসিক গল্পের মধ্য দিয়া যত সহজে পাঠকের মনে প্রবেশ করিতে পারে, এমন সহজে আর কিছুতেই পারে না। এই জন্য 'প্রত্নবিদ্যা-ব্যবসায়ী' রাখালবাবুকে প্রত্নতত্ত্বের বন্ধুর পথ পরিত্যাগ করিয়া, কথা-সাহিত্যের প্রশস্ত সমতল পথ আশ্রয় করিতে দেখিয়া, আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই; বরং তাঁহার বিচিত্র কল্পনার দীপালোকে বিস্মৃতির গাঢ় তমসাচ্ছন্ন বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসকে জাতীয় চরিত্র-গঠনোপযোগী সমুজ্জ্বল আদর্শরূপে লাভ করিয়া, বর্ত্তমানের দুর্গম কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইবারই আশা করিয়া থাকি। নানা ঘটনার কর্ম্মজালে জাতীয় চরিত্র যুগে যুগে জড়াইয়া পড়িয়াও কেমন করিয়া বহু দ্বন্দ্ব ও প্রাণপণ সংগ্রামের ভিতর দিয়া, মহত্ত্বে ও স্বার্থত্যাগে গরীয়ান্ হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য ইতিহাস নয়; সমাজ-তন্ত্রের মূলে কোথায় একটি ছিদ্র আছে; ইহার মধ্য দিয়া প্রতিনিয়ত শনি প্রবিষ্ট হইয়া এক একটা জাতির মধ্যে নানা অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়া তাহার সমস্ত সাধনা পণ্ড করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। ইতিহাস এই দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া জাতির মঙ্গলের সন্ধান দিয়া থাকে। এইজন্য আমরা বলিয়া থাকি, 'History repe‹ts i'self'; জাতীয় সমস্যার সমাধান করিবার জন্য, ইতিহাসের উদাহরণ গ্রহণ করিয়া, যে জাতি অতীত ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে, আপনার কর্ত্তব্য-পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে পারে, সেই জাতিই জীবন-সংগ্রামে সহজে যশোলাভ করিয়া থাকে। এই জন্য ইতিহাসের এত উপকারিতা। আর উপন্যাস সেই সমস্যার কথাকে সমাধানদর্শনের কঠোরতা হইতে মুক্ত করিয়া, সহজ ও সরল কথায় সাধারণের বুঝিবার উপায় করিয়া দেয় বলিয়া তাহার মূল্য এত অধিক। এই জন্যই বর্ত্তমান সময়ে কোন সভ্য দেশই উপন্যাসের উপকারিতা-সম্বন্ধে সন্দিহান নহে। বিলাতের সার ওয়ালটার বেসাণ্ট্ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ইহাকে সাহিত্যের মধ্যে কত উচ্চস্থান দিয়াছেন, সে কথা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটে অজ্ঞাত নহে; সুতরাং রাখালবাবুর ন্যায় প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিককে উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত দেখিয়া কেহই তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বলিয়া মনে করিবেন না; বরং প্রত্নতত্ত্বের উত্তপ্ত সাহারার মধ্যে দীর্ঘকাল ভ্রমণের পর কথা-সাহিত্যের স্নিগ্ধশ্যামল 'ওয়েসিসে' ক্ষণকাল বিশ্রামের জন্য সকলে তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিবেন।

বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাসের বিজ্ঞান-সম্মত সমালোচনার একান্ত

* শশাঙ্ক—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত।

অভাব। বর্ত্তমান সময়ে কথা-সাহিত্যের স্তর ছাড়াইয়া উপন্যাস অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষিগণ উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দেন, তাহাতেই সে কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। Mr. G. K. Chesterton বলেন—"The novel is the art of sympathy and the study of human variations." মানব-মনের সংগ্রাম, আশা ও আকাঙ্ক্ষা উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত করাই উপন্যাসের প্রধান কার্য্য। যে উপন্যাসের মধ্য দিয়া একটা জাতি বা একটা মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, যাহার মধ্যে কোন জাতীয় প্রশ্নের বা মানব-জীবনের সমস্যার কোন সমাধান নাই, যাহা শুধু গাল-গল্প মাত্র, তাহা বর্ত্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে গৃহীত হইতে পারে না। উপন্যাস-রচনার সফলতা-বিচারের পক্ষে ইহাই একমাত্র মাপকাটী; আমরা এই মাপকাটীর সাহায্যে 'শশাঙ্কে'র বিচার করিয়া দেখিতে চাই, তাহার স্থান কোথায়?

পাঠক ও সমালোচক যাহাতে 'শশাঙ্ক'কে 'বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাস'রূপে গ্রহণ না করেন, সে বিষয়ে গ্রন্থকার সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গদেশ না হইলে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না। বঙ্গ-সাহিত্যে একদল সমালোচক আছেন, যাঁহারা উপন্যাসকেও ইতিহাসের মাপকাটীতে মাপিতে চান এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যেও ইতিহাসকে ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। উপন্যাস যে ইতিহাস নহে, এ কথা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে চা'ন না। রাখালবাবুর সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজি-সাহিত্যই তাঁহার আদর্শ। এই ইংরাজি-সাহিত্যেও উপন্যাস ও ইতিহাসকে এক করিয়া দেখিবার কোনদিন কোন চেষ্টা হয় নাই। কবি টেনিসনের ঐতিহাসিক নাটকের সমালোচনা করিতে গিয়া Sir Alfred Lyall বলিয়াছেন—"Tennyson himself perceived that the older chronicles, which preserved only the stirring features of the time, allowed greater scope to the creative faculty than a precise knowledge of men and events which binds a poet down to the facts, for the necessity being accurate impairs the ellusions; and the historiral dramatist finds himself more at ease in a distant half-known age or anywhere else than in his own country." সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাস বা নাটকের মধ্যে কল্পনার আশ্রয় লওয়া নিতান্ত দূষণীয় নহে। তাহার উপর রাখালবাবু সর্ব্বজনবিদিত ইতিহাসকে পশ্চাতে ফেলিয়া অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাসের রাজ্য হইতে আখ্যানবস্তু লইয়া, 'শশাঙ্ক' রচনা করিয়া, একদিকে যেমন সেই প্রাচীন সময়ের ইতিহাস সাধারণ পাঠকের নিকট সুপরিচিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উপকারসাধন করিয়াছেন, অপর পক্ষে তেমনই আবার সেই অজ্ঞাত ঐতিহাসিক যুগের আলোচনা-প্রসঙ্গের মধ্যে ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়া যাইলেও তাঁহার ত্রুটী তথাকথিত সমালোচকদিগের নিকট ধরা পড়িবার ততটা সম্ভাবনা নাই; তাহার ফলে ইতিহাসের 'ছাপরে' ফেলিয়া, কল্পনার রসান দিয়া, 'শশাঙ্ক'কে ইচ্ছামত সুন্দররূপে গড়িয়া তুলিবার তাঁহার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। এখন 'শশাঙ্ক' বাঙ্গালীর মনের মত হইয়া, বিমল কিরণপাতে বাঙ্গালীর দীনকুটীর আলোকিত করিয়া তুলুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

'শশাঙ্কে'র উপাখ্যান-ভাগ প্রায় তেরশত বৎসর পূর্ব্বেকার ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া রচিত। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত না হইলেও, বৌদ্ধগণ পাটলিপুত্র প্রভৃতি স্থানে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনাদিগের ক্ষমতা অটুট রাখিবার জন্য তাঁহারা ধর্ম্মের সরল ও উদার নীতি পরিত্যাগ করিয়া ষড়্যন্ত্র ও গুপ্ত মন্ত্রণার বক্র ও কুটীল পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রাচীন পাটলিপুত্রকে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করিবার জন্য তাঁহারা তখন হিংসাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দারুণ দুর্দ্দিনে সাম্রাজ্যের হিতাকাঙ্ক্ষী সামন্তগণ কি করিয়া প্রাচীন সাম্রাজ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের স্বার্থত্যাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় বাঙ্গালার ইতিহাস কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, 'শশাঙ্কে' নিপুণতার সহিত তাহাই দেখান হইয়াছে। আলোচ্য উপন্যাসে 'শশাঙ্ক' পূর্ণিমার সুবিমল শশধর; তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যশোধবল, বিনয়সেন, অনন্তবর্ম্ম, নরসিংহ প্রভৃতি তারকাগণ শোভা পাইতেছেন। সুখের বিষয়, 'শশাঙ্কে'র সমুজ্জ্বল কিরণের নিকট তাঁহারা নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন নাই। উপন্যাস বা নাটকের প্রধান চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রের প্রয়োজন হয়। অনেক সময়ে গ্রন্থকার এই সব চরিত্র লইয়াই অধিক বিব্রত হইয়া পড়েন। সুদক্ষ ব্যক্তির হস্তে না পড়িলে, এই সকল চরিত্র প্রায় প্রধান চরিত্রের আওতায় আসিয়া একেবারে বিশেষত্বহীন হইয়া পড়ে কিংবা নায়ককে কতকটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 'নবীন' এই জাতীয় একটি চরিত্র; কিন্তু 'নবীন' আপনার বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াও 'শশাঙ্ক'কে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত করে নাই।

Rev. J. Austin Leigh, মিস্ অস্টিনের জীবনীতে বলিয়াছেন—"Her simpie gallantry of portraits is certainly small and the same characters appear over again, but each figure is so distinctly drawn and has much marked individuality." ঔপন্যাসিকদিগের পক্ষে ইহা একটা মস্ত প্রশংসার কথা; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা রাখালবাবুর সম্বন্ধে এই কথাগুলি অসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে পারি না। তাঁহার স্ত্রী-চরিত্র—লতিকা, যূথিকা, তরলা ও চিত্রা কতকটা অনন্যসাধারণ হইলেও, তাঁহার পুরুষ-চরিত্রের মধ্যে যশোধবল ও নরসিংহ ব্যতীত প্রায় অন্য সমস্ত চরিত্রই একজাতীয়—বিশেষত্ববর্জ্জিত। রাখালবাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত ও কৃতী ব্যক্তির পক্ষে এ দোষ অমার্জ্জনীয় বলিয়া মনে করি। তবে 'শশাঙ্কে' কলঙ্ক থাকিবেই, এই যা সান্ত্বনা!

উপন্যাসের সমালোচনাকালে Sir Walter Beasant বলিয়াছেন—"Between Russia in the East and California in the West, it is the novelist who teaches. He is the fount of inspiration; he gives the world idea, he makes them intelligible: sometimes, in rare cases, he so touches the very depths of a people, that his words reverberate and echo as from rock to rock and from valley to valley far beyond the ear of him, who listens. In these cases he makes history, because he makes history to be made". কি পন্থা অবলম্বন করিলে, একটা মরণোন্মুখ জাতি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা 'শশাঙ্কে' আলোচিত হইয়াছে। তাহা একদিকে আরব্য উপন্যাসের ন্যায় মনোরম, অপর দিকে আমাদিগের ন্যায় অধঃপতিত জাতির পক্ষে প্রচুর শিক্ষাপ্রদ। কন্যা-কুমারিকা হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত সে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন আছে; এই ত্রিশকোটি নর-নারী যে স্বার্থের অকূল পাথারে নিমজ্জিত হইয়া আত্ম-বিদ্রোহিতার দুরপনেয় কলঙ্কে বিশ্ববাসীর চক্ষে একান্ত হেয় হইয়া উঠিয়াছে, আজ যদি তাহাকে তথা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া মুক্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে 'শশাঙ্কে'র আদর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। রাখালবাবু 'শশাঙ্কে' সেই আদর্শের কথা আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র জাতির হৃদয়কে

মথিত করিয়া, এই ত্রিশকোটী নর-নারীকে তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার আদর্শের পশ্চাতে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, এস্থলে তাহার বিচার না করিলেও চলিবে; তবে একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যদি তাঁহার আদর্শ অনুসৃত হয়—যদি এই ত্রিশকোটী নর-নারী 'শশাঙ্কে'র উদাহরণের ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় স্বার্থে আত্মাহুতি প্রদান করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 'শশাঙ্ক' যে সুধু ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে বিবেচিত হইবে তাহা নহে, পরন্তু আমাদের বংশধরেরা ইহাকে জাতীয় ইতিহাস-গঠনোপযোগী উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে ভক্তি-শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়

হৃদয়-বর্ষা

১

ওগো, আজ ফের্ বাজিয়ে মাদোল
ঝরিছে বাদল
গগন চিরে,
সরিষার ক্ষেতে ছায়ার স্বপন
মায়ার মতন
নামিছে ধীরে।

ডুবু-ডুবু পথ, বাঁধা বটতল,
থৈ-থৈ করে জল আর জল,
ধূ-ধূ ময়দানে করে, কল্-কল্—
ডিঙ্গা টল্মল্
তটিনী-তীরে।
মনে দেগে' দেয় অতীতের স্মৃতি
শ্যামলা প্রকৃতি
অশ্রু-নীরে।

২

ঝড়ে নিব'-নিব' দিনের মশাল,
নড়ে বাঁশডাল,
আঁধার আধা।
সজল আসরে হ'তেছে ভেকের
নবীন মেঘের
রাগিণী সাধা।

কদম্ব-বনে ওড়ে 'বালি'-হাঁস,
ঝরে ফুল-রেণু, দুলে ওঠে কাশ,
হা-হা করে' বায়ু ছাড়ে ঘন শ্বাস
ছুঁয়ে ভিজে ঘাস,
মানেনা বাধা।
বাজ্ চাহে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে;
ত্বরিত তড়িতে
নয়নে ধাঁধা।

৩

ওগো, এইমত নেমেছে শাঙন
ধরিয়ে 'ভাঙ্গন'
মরমে মোর।
মেঘে মেঘময় অন্তর-ব্যোম
ডুবে' গেছে সোম
আঁধার ঘোর।
নিঃশ্বাস-বায়ু করে হায় হায়,
চিন্তা-বলাকা কোথা উড়ে যায়,
চিত্ত-তটিনী ছুটে যেতে চায়,—
বুকে উছলায়
লোচন লোর—
করিয়াছে চুরি হৃদয়ের আশা,
পুলকের ভাষা,
নিয়তি-চোর।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ঝাড়া ও জলপড়া

মানুষ বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আমাদের এই মানব-দেহের ভিতর

(১) (od-force) স্নায়বিক শক্তি
(২) (will-force) ইচ্ছা-শক্তি
(৩) (Thought-force) ভাব-শক্তি
(৪) (clairvoyance) অতীন্দ্রিয় দর্শন-শক্তি
(৫) (clairaudience) অতীন্দ্রিয় শ্রবণ-শক্তি

প্রভৃতি কত যে অদ্ভুত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা হয় না এবং এই সকল শক্তিপ্রভাবে যে কত অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ঝাড়িয়া দিলে, জলপড়া খাওয়াইলে এবং তৈলপড়া মাখাইলে রোগ আরোগ্য হয়; অতি প্রাচীন কাল হইতে এই সকল ব্যবস্থা আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে।

ঝাড়িয়া রোগ আরোগ্য করার ব্যবস্থা যে কেবল আমাদের দেশেই আছে, তাহা নহে; যীশুখ্রীষ্ট রোগীর শরীরে হস্তচালনা করিয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। খ্রীষ্ট-জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনে গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। অতি প্রাচীন কালে হিব্রু ও এসিরিয়ানগণও গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দিতেন। রোমে Esculapius (এস্‌কিউলেপিয়স্) নামে কোন মহাপুরুষ এবং তাঁহার শিষ্যগণ ঝাড়িয়া ও রোগীর গায়ে ফুঁ দিয়া রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। গ্রীক্ বৈদ্যরাও ঝাড়িয়া দেওয়ার মত একপ্রকার ঐন্দ্রজালিক

প্রক্রিয়া অবলম্বনে রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। ফ্রান্সে "ড্রুইড্" রমণীগণও গায়ে হাত বুলাইয়া রোগ আরোগ্য করা সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ঝাড়িয়া দিলে রোগ আরোগ্য হয়; কেন হয়, তাহা আমরা জানি না। এজন্য একথা বিশ্বাস করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। কিন্তু ঝাড়ান, জলপড়া খাওয়ান, তৈলপড়া মাখান প্রভৃতি ব্যাপারগুলির ভিতর যদি কিছুই সত্য না থাকিত, কেবল মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর যদি এই সমস্ত ব্যবস্থার ভিত্তি সংস্থাপিত হইত, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোথাও ঝাড়িয়া, কোথাও বা গায়ে ফুঁ দিয়া রোগ আরোগ্য করার নিয়ম থাকিত না। এজন্য মনে হয়, এতকালের এই প্রক্রিয়াকে, কু-সংস্কারাপন্ন লোকের ভ্রান্তিমূলক একটি কুপ্রথা ভাবিয়া বা একটি প্রতারণামূলক ব্যাপার মনে করিয়া এককালে অগ্রাহ্য করা কখনও উচিত হয় না।

কোন একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন—

"Take any one of what are called popular errors or popular superstitions and on looking at thoroughly, we shall be sure to discover in it, a firm underlying stratum of truth. There may be more than we suspected of folly and of fancy; but when these are stripped off, these remains unyielding materials belong not to persons or periods, but is common to all ages, to puzzle the learned and silence the scoffer."

Rutter—Human Electricity.

জনসাধারণের মধ্যে যে সকল ভ্রান্তিমূলক কু-প্রথা বা কু-সংস্কার প্রচলিত আছে, স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে তাহার ভিতর অনেক সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ভ্রান্তিমূলক ব্যাপারে বা যাহা আমরা কু-সংস্কার বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি তাহার ভিতরে, আমাদের নির্বুদ্ধিতার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে অথবা তাহার ভিতরে আমাদের মনঃকল্পিত অনেক বিষয় প্রবেশলাভ করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু ভ্রম-প্রমাদ বা কল্পনার অংশ বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোন নির্দ্ধারিত যুগের কার্য্য বলিয়া প্রতিভাত না হইয়া, সাধারণতঃ সকল যুগের কার্য্য বলিয়াই অনুমিত হয় এবং বিদ্বান্ ও মূর্খ উভয় শ্রেণীর লোকের নিকটেই প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইলেও, তাহাদের নীরবে চিন্তা করিবার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।

ঝাড়িয়া দিলে রোগ কেন আরোগ্য হয়, এ বিষয় লইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে অনুসন্ধান হইয়াছে এবং ফলে "Human magnetism"এর (মানব-শরীরে যে এক প্রকার চুম্বক-শক্তি আছে) আবিষ্কার হইয়াছে।

Dr. Anthony Mesmer সাহেব সর্ব্বপ্রথমে এই চুম্বক-শক্তি আবিষ্কার করেন। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু রোগীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেই রোগ আরোগ্য হয় দেখিয়া, তিনি আর কাহাকেও কখনও ঔষধ পান করিতে দেন নাই। পীড়িত ব্যক্তিদের সম্মোহিত (mesmerise) করিয়া অর্থাৎ তাহাদের শরীরের উপর হাত চালাইয়া এবং mesmerised water পান করাইয়া দৈহিক চুম্বক-শক্তি উদ্বোধন দ্বারা তিনি রোগ আরোগ্য করিয়া দিতেন। Mesmer হইতে "**mesmerise**" কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে রোগীকে সম্মোহিত করিয়া রোগ আরোগ্য করার নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

'মেস্‌মেরাইজ' করা, আমাদের ঝাড়িয়া দেওয়ার এবং mesmerised water আমাদের জলপড়ার নামান্তর মাত্র। শরীরের উপর pass দিয়া অর্থাৎ হাত চালাইয়া 'মেস্‌মেরাইজ' করা হয়—আর আমাদের দেশের ওঝারা গায়ে হাত বুলাইয়া ঝাড়িয়া দেয়। ফুৎকার-সংযোগে mesmerised water প্রস্তুত করা হয়—আর ওঝারা ফুঁ দিয়া জল পড়িয়া দেয়।

আমাদের দেশের ওঝারা প্রায়ই অশিক্ষিত ইতর-শ্রেণীর লোক। তাহারা লেখা-পড়া জানে না, ভদ্র-সমাজেও স্থান পায় না; এজন্য তাহাদের কথায় বা তাহাদের কার্য্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় আস্থা-স্থাপন করিতে পারেন না। কিন্তু যে শক্তির বলে মেস্‌মার সাহেব 'মেস্‌মেরাইজ' করিয়া বা mesmerised water পান করাইয়া রোগ আরোগ্য করিয়া গিয়াছেন, সে শক্তি যে আমাদের ওঝাদের মধ্যে কাহারও নাই, একথা বলা যায় না; যাহার সে শক্তি আছে, তাহার দ্বারা ঝাড়াইয়া লইলে বা তাহার 'জল-পড়া' পান করাইলে যে রোগ আরোগ্য হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নয়।

আমাদের দেশের ওঝারা ঝাড়িয়া দেওয়ার সময়

(১) মন্ত্র পড়ে,
(২) নিজে "নাই" বলে,
(৩) রোগীকেও "নাই" বলিতে বলে।

এগুলি অনর্থক বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

আমাদের অধিকাংশ মন্ত্র দেবতাবিশেষের আবাহন—তাঁহার স্তব-স্তুতি ও উপাসনা। ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় যে মন্ত্র পড়া হয়, উহাও তাই; তবে ইতর এবং অশিক্ষিত ওঝার হাতে পড়িয়া এই সমস্ত মন্ত্রের বিকৃতি ঘটিয়াছে। অনেক স্থলেই এই সকল মন্ত্রের কোন অর্থ পাওয়া যায় না; কিন্তু যে সকল মহাপুরুষেরা ঝাড়িয়া বা জল-পড়া খাওয়াইয়া পীড়া-মুক্তির নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁহারা অর্থশূন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। যাহা হউক, শরীরের উপর হস্তচালনা করিলেই চুম্বক-শক্তি পরিচালিত হইয়া যখন রোগ আরাম হয়, তখন কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন, ঝাড়িয়া বা জল পড়িয়া দেওয়ার সময় দেব-দেবীর উপাসনা করিবার প্রয়োজন কি?

পীড়িত ব্যক্তিদের মঙ্গল-কামনায় ভগবানের আরাধনা করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; বোধ হয় সৃষ্টিকাল হইতেই লোকে ইহা পালন করিয়া আসিতেছে। উপাসনার ফলে রোগ মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত সকল জাতির সকল ধর্ম্ম-পুস্তকেই আছে। আমাদের দেশে কাহারও ব্যারাম হইলে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হয়; অনেক-দিন হইতে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

ব্যারাম হইলে আমরা যে শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া থাকি, তাহাকে দৈবকার্য্য বলি। হিন্দু-শাস্ত্রে এই সমস্ত দৈবক্রিয়া করিবার যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি আছে, তাহা এত বিশুদ্ধ যে, মনে করিলেও প্রাণে কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। অন্তরে বাহিরে শুচি হইয়া নিঃস্বার্থভাবে কেবল পরের মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত দৈবক্রিয়া করিতে হয়; কিন্তু পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে ইচ্ছুক, এমন পবিত্র-চরিত্র আচার্য্য ও পুরোহিত এখন আর নাই। পক্ষান্তরে লোকের মতি-গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; ভগবানে আমাদের ভক্তি নাই, স্বস্ত্যয়নেও আমাদের বিশ্বাস নাই—আমরা স্বস্ত্যয়ন করাইতে হয়, তাই করাই; সেই সঙ্গে ঔষধ, পাচন খাই। স্বস্ত্যয়নের উপর ষোলআনা নির্ভর করিয়া থাকিতে আমাদের ভরসা হয় না; কাজেই ভক্তিশূন্য ও বিশ্বাসশূন্য দৈবকার্য্যের দ্বারা কোন ফল পাওয়া যায় না।

'Prayer is the soul's sincere desire. Every prayer will be fulfilled, if we support our sincere desire with firm expectancy. When we confidently and continuously expect our desires to be fulfilled, they will be. We often 'desirs something quite strongly and yet fail to obtain it ; the reason for this is that, we do not expect to have our prayer answered, even while we try to hope that our prayer will be granted. If we do not sustain our desires with expectancy, they will not blossom in fruition." Mental Therapeutics. p. 3 W. I. Colville

ভগবানের নিকটে আমরা অনেক সময়েই অনেক বিষয় কামনা করিয়া থাকি। প্রাণের সহিত আমরা যে কামনা করি, তাহাই উপাসনা এবং ভক্তি ও বিশ্বাস এই উপাসনার প্রাণ। ভক্তিপূর্ব্বক কামনা করিতে ও ফল পাওয়ার আশায় একমনে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলে, বাঞ্ছাকল্পতরু কখনই আমাদের প্রত্যাখ্যান করেন না। কিন্তু তাহা প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। আমরা কত সময় ভগবানের নিকটে কাঁদি, তাঁহার নিকটে কত কি চাই, কিন্তু পাই না; কারণ, আমরা চাহিতে জানি না—মনের দ্বিধা ঘুচাইয়া আমরা চাহিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে আমাদের কোন প্রার্থনাই ব্যর্থ হইত না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস
ওরে মন হবেই হবে।"

এই মূল-মন্ত্র জপ করিয়া এবং এই সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, তাহার মনস্কামনা কখনও বিফল হয় নাই। শূল, কুষ্ঠ প্রভৃতি কঠিন কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ বৈদ্যনাথ বা তারকেশ্বরের মন্দিরে যাইয়া দেবাদিদেবের পূজা অর্চ্চনা করিয়া রোগমুক্তির কামনায় ভক্তি-নত শিরে সেখানে 'ধন্না' দিতেছে, এবং আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া অবিচলিত চিত্তে তাহারা ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে। যাহারা এ প্রকার কঠোর সাধনা করিতে পারে, তাহাদের কামনা কখনও নিষ্ফল হয় না; ভগবানের অনুগ্রহে তাহাদের উপর প্রত্যাদেশ হইতেছে এবং সেই আদেশপালন করিয়া কত শত লোক রোগের কঠোর যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।

রোগমুক্তির কামনায় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বা উপাসনাদি করিলে, তাহার ফল হয়। সে ফল কে দেয়? দেব-মন্দিরে গিয়া হত্যা দিলে যে দৈববাণী প্রচার হয়, তাহাই বা কে করে?

ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Sir Alfred Russel Wallace সাহেব বলেন:—

"The often-discussed question of the efficacy of prayer, receives a perfect solution by spiritualism. Prayer may be often answered, though not directly by the Diety. Nor does the answer depend wholly on the morality or religion of the petitioner ; but as men, who are both moral and religious and are firm believers in Divine response, will pray more frequently, more earnestly, and more disinterestedly, they will attract towards them a number of spiritual beings, who sympathise with them, and who, when the necessary mediumistic power is present, will be able, as they are often willing, to answer the prayer."

Moderns piritualism, p. 2-6.

আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট পরম কারুণিক আত্মিকসকল (spirits) বিরাজ করিতেছেন। উপাসকের ধর্ম্ম যাহাই হউক, ভগবানের প্রতি যাহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম, অকপট ভক্তি এবং অবিচলিত বিশ্বাস আছে, তাঁহারা একাগ্রতার সহিত কায়মনোবাক্যে উপাসনা করিলে, এই সকল আত্মিকেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ ও সকলপ্রকার দুঃখ দূর করিয়া থাকেন এবং ভগবান্ স্বয়ং সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু না করিলেও, এই সকল আত্মিকের দ্বারা নিজের মঙ্গল অভিপ্রায় জানাইয়া ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

দেব-মন্দিরে গিয়া হত্যা দিলে বা মর্ম্ম-পীড়ায় পীড়িত হইয়া ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিলে, সময় সময় যে প্রত্যাদেশ হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা এই সকল (Invisible helpers) অদৃশ্য-সহায় মহাপুরুষের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করার সময় বা ঝাড়িয়া কি জল পড়িয়া দেওয়ার সময় ভগবানের নামে দেব-দেবীর উপাসনা করা হইয়া থাকে। আচার্য্য বা ওঝা, যাঁহারা এই সকল দৈবকার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, তাঁহাদের এই সকল অদৃশ্য-সহায় দেবচরিত্র আত্মিককে আকর্ষণ করিবার শক্তি থাকিলে এবং তাঁহারা শুদ্ধাচারী হইয়া নিঃস্বার্থভাবে এই সকল দৈব ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিলে, অলক্ষ্যে কোন মহাপুরুষ আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করিবেন, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় ওঝারা "নাই" বলিয়া থাকে। এই "নাই" একটি সাঙ্কেতিক বাক্য; ইহার দ্বারা রোগীকে বলা হয় যে, তাহার রোগ আর নাই।

ওঝা "নাই" বলিলে "নাই" হইবে, একজনের মুখের কথায় অপরের রোগ আরাম হইয়া যাইবে, ইহা বিশ্বাস করা বড় কঠিন; কিন্তু বাক্য উপযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, তাহাতে না হয় এমন কাজ নাই। আমাদের মনে যখন যে ভাবের উদয় হয়, তাহা আমরা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকি; একজনের বাক্য অপরের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির কারণ হইতেছে এবং তাহাতেই সংসার চলিতেছে। বাক্যে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে।

"The 'power of the word' is a literal scientific fact. Through the operation of our thought-forces, we have creative power. The spoken word is nothing more nor less than the outward expression of the workings of the interior forces. The spoken word is then, in a sense, the means whereby thought-forces are focussed and directed along any particular line ; and this concentration, this giving them direction, is necessary before any outward or material manifestation of the powers can become evident."

In Tune with the Infinite. P. 25.

বাক্যের যে মহতী শক্তি আছে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য কথা। আমাদের মনে যে নানাপ্রকার ভাবের উদয় হইয়া থাকে, তাহারও একটা শক্তি আছে এবং আমরা যাহা-কিছু উদ্ভাবনা করি, এই ভাব-শক্তি তাহার প্রসূতি। আমাদের মনে কখন কোন একটী প্রগাঢ় ভাবের উদয় হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে কার্য্য যেরূপে করিতে থাকে, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে বাক্যই আমাদের একমাত্র উপায়। তবে শক্তিকে সংযত এবং কেন্দ্রীভূত করিয়া, বাক্যের দ্বারা কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিকে চালিত করিতে পারিলে, তখন তাহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় রোগীর রোগ আরোগ্য করার জন্য ওঝার মনে যদি প্রগাঢ় একটা ভাব বা ঐকান্তিক একটা ইচ্ছা জন্মায় এবং সেই সময়, তাহার রোগ আর নাই, এই কথাটা অন্তরের সহিত যদি বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ "নাই" কথার

দ্বারা ওঝার ভাব-শক্তি (thought-force) বা ইচ্ছা-শক্তি(will-force) রোগীর শরীরে চালাইয়া কার্য্য করিয়া থাকে; তদ্ভিন্ন কেবল মুখের কথায় কোন ফল দর্শায় না।

ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় যেমন রোগীর রোগ আর নাই বলিয়া তাহাকে সঙ্কেত করা হয়, 'মেস্মেরাইজ' (mesmerise) করার সময়ও সেইরূপ 'Suggestion' করা হইয়া থাকে। 'Suggestion' অর্থে Frederic W. H. Myers সাহেব, তাঁহার 'Human Personality' নামক পুস্তকে বলিয়াছেন, "The process of effectively impressing upon the subliminal citillijene the wishes of some other person" অর্থাৎ যে উপায়ের দ্বারা একজনের মনের ইচ্ছা অপরের মনে চালিত ও গভীরভাবে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহার নাম "Suggestion"। মেস্মেরাইজ করিয়া এই প্রকার 'Suggestion' দ্বারা যে রোগ আরোগ্য করা হয়, ইংরাজিতে তাহাকে 'suggestive treatment' বলে।

ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় ওঝারা যে "নাই" বলিয়া থাকে, তাহা যদি 'suggestion' বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, এই "নাই" কথাটা অনর্থক প্রয়োগ করা হয় না এবং 'suggestion' অর্থে যদি ইচ্ছা-পরিচালনা হয়, তাহা হইলে যে উদ্দেশ্যে "নাই" ব্যবহার হওয়ার কথা আমরা প্রকাশ করিয়াছি, তাহার সহিত এক অর্থই হইয়া দাঁড়ায়।

ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় ওঝা যখন "নাই" বলে, সেই সঙ্গে রোগীও "নাই" বলিয়া থাকে।

ঝাড়িয়া দেওয়ার প্রথা যখন আমাদের দেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময় 'ওঝা'পদবাচ্য কোন সাধুপুরুষ "নাই" বলিয়া তাঁহার ইচ্ছা-শক্তি রোগীর মনে পরিচালনা করিলে, সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মন হইতে তাহার মুখ ফুটিয়া সেই কথার প্রতিধ্বনি বাহির হইত কি না, তাহা আমরা জানি না। ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন, সে প্রকার ওঝা আর দেখা যায় না; সুতরাং রোগীর মন হইতে সে ঝঙ্কার, সে প্রতিধ্বনি আর বাহির হয় না। তাহা না হউক, ওঝা ঝাড়িয়া দিলে, তাহার কথায় এবং তাহার কার্য্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া রোগী যদি অন্তরের সহিত বলিতে পারে, তাহার কোন রোগ আর নাই, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, তাহার রোগ সারিয়া গিয়াছে।

বিশ্বাসে না হয়, এমন কাজ নাই—

"If ye have faith and doubt not ye shall not only do this ....but if ye shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall do done."

যীশুখ্রীষ্ট ঝাড়িয়া দেওয়ার সময় রোগীদের বলিতেন, "মনে মনে যদি বিশ্বাস করিতে পার, তোমার রোগ আর নাই, তাহা হইলে তোমার রোগ সারিয়া যাইবে; কিম্বা আমি ঝাড়িয়া দিলে তোমার রোগ আরাম হইবে, এ বিশ্বাস করিতে পারিলেও তুমি রোগমুক্ত হইবে।"

ইংরাজিতে ইহাকে "Faith-cure" বলে। সচরাচর আমরা যে সকল ওঝা দেখিতে পাই, তাহাদের মনে বল নাই, তাহাদের নিজের উপর নিজের বিশ্বাস নাই, তাহারা মন্ত্র ভুলিয়াছে, "নাই" শব্দের তাৎপর্য্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে, অনুষ্ঠান বজায় রাখার জন্য তাহারা মন্ত্রস্বরূপ কতকগুলি অর্থশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিতেছে, রোগীকে "নাই" বলিতে হয় তাই বলিতেছে এবং রোগীর প্রতিও "নাই" বলার জন্য আদেশ করিতেছে; কিন্তু কেবলমাত্র অনুষ্ঠানে কাজ হয় না; এইজন্যই আজকাল ঝাড়া, জল-পড়ায় তাদৃশ ফল পাওয়া যায় না।

ঝাড়িয়া দিলে রোগ আরোগ্য হয়, এ কথায় শিক্ষিত-সম্প্রদায় এতদিন নানাপ্রকার ঠাট্টা,—বিদ্রূপ করিয়া; আসিয়াছেন কিন্তু বিদ্রূপের দিন কাটিয়া যাইতেছে। 'মেস্মেরাইজ' করিলে রোগ আরোগ্য হয়, ইহা একপ্রকার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে যে সকল অদৃশ্য-সহায় (Invisible helpers) আত্মিকেরা বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের আহ্বান করার কথাও শুনা যাইতেছে এবং ভাব-শক্তি (Thought-force) ও ইচ্ছা-শক্তি (will-force) পরিচালনা করিবারও চেষ্টা হইতেছে।

ঝাড়িয়া দেওয়ার আমাদের যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি ছিল, ওঝারা যাহা এতকাল বজায় রাখিয়া আসিয়াছে, পাশ্চাত্য প্রদেশ হইতে নামান্তরমাত্র ধারণ করিয়া সেই সকল নিয়ম-পদ্ধতি আবার প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সেবাহীন

সকল কাজ সারিলে নিজে, রহিল কি যে বাকী?
আমার হাতে কি আর দিলে, কি নিয়ে বল থাকি?
দূর্ব্বাঘাসে দর্ভে গাঁথা,
প্রভাতে দেখি আসন পাতা,
কুসুম-বনে মালাটি গেঁথে রেখেছ দিয়ে ফাঁকি।
আমার তরে কি আর আছে—কিছুত নাহি বাকী?

সন্ধ্যাবেলা মনেতে ভাবি জ্বালাব নিজে বাতি;
চক্ষু মেলি' আকাশে হেরি জ্বলে তারার পাঁতি।
গভীর রাতে মেঘের মাঝে,
শয্যা পাতা নিরখি' লাজে,
বাক্যহারা বেদনা মোর আঁধারে দাও ঢাকি',
আমার সেবা পাবার তরে রাখনা কিছু বাকী?

নিশীথদিন শবদহীন এমনি তব কাজ—
সেবকে সুধু বসায়ে রাখি', দুয়ারে মহারাজ!
পূজার তরে পরাণ কাঁদে,
জানেনা পূজা কেমনে সাধে —
গুমরি' মরে সে অপরাধে, ঝুরিয়া মরে আঁখি,
সেবাধিকার ঘটেনা তা'র, রহেনা তা'ও বাকী!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

শেষ-রক্ষা

(গল্প)

(১)

তখন বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল। ঊষাপ্রভার বাটীর দ্বিতলের একটী কক্ষে, তিন জন যুবতী ও একজন প্রৌঢ়া বেশ ছোট-খাট-রকমের একটী মজ্‌লিস্ জমাইয়া তুলিয়াছিল।

ঊষার বড় ভগ্নী হেমপ্রভা দাসীকে আরও জোরে জোরে হাওয়া করিতে আদেশ করিয়া বলিল, "তা মা, ঊষার আমাদের সব হ'য়েচে ভাল, সুধু যা সে এখনও স্বাধীন হ'তে পারলে না। স্বাধীন না হ'তে পারলে কি আর মনে শান্তি পাওয়া যায়।" কথা শেষ করিয়া হেমপ্রভা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

তাহাদের জননী অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, "আমারও তাই দুঃখ হয়, দেখে-শুনে ভাল একজন চাক্‌রে জামাইএর হাতে মেয়েটাকে দিলাম, কে জানে বাপু, জামাই আমার অমন হ'বে,—বাপ-মা বল্‌তে যেন সে অজ্ঞান! বেশ ত বাপ-মাকে খেতে দাও, পর্‌তে দাও, তা অত বাড়াবাড়ি কেন!"

নীচের কক্ষে বৃদ্ধ সেনমহাশয় তখন কলিকায় ফুঁ দিতেছিল, আগুনটাও বেশ গম্‌গমে হইয়া উঠিয়াছিল। হুঁকার উপর কলিকাটি বসাইতে যাইতেছিল, এমন সময় দুষ্ট বাতাস উপরের ঘরের কথাগুলি বহিয়া আনিয়া সেনমহাশয়ের কানের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেনমহাশয়ের হুঁকার উপর কলিকা বসান বন্ধ হইল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আপন মনে কহিল, "তা বটেই ত!" বলিয়া হুঁকার উপর কলিকাটি বসাইয়া জোরে জোরে টানিতে লাগিল।

হেমপ্রভা কহিল, "সত্যিই, সুধীর যেন কেমনতর, সাধ, আহ্লাদ কিছুই নেই। এলাম, মনে করেছিলাম, ক'দিন থেকে একটু মানুষের মত ক'রে দিয়ে যাব, তা দেখ্‌চি আর হ'য়ে ওঠে না। কবে যে আস্‌বে তা'র ঠিকই নেই।"

পরিমল মুচকি হাসিয়া কহিল, "আমার কিন্তু দিদি ও সব আপদ নেই, ঐ একটা পয়সার জন্যে পরের মুখ চেয়ে থাক্‌ব, সে কি ভাল লাগে, শাশুড়ী ত আমার বিয়ের বছর না ঘুর্‌তেই সরে পড়েচেন,—এক শ্বশুর, তাঁ'কেও দেশে পাঠিয়ে দিয়েচি—মাসে মাসে দশটা করে টাকা পাঠিয়ে দিই। আমি দিদি, ঊষাকে রোজই একবার ক'রে বলি, অমন হ'য়ে থাক্‌লে আর এখন চল্‌বে না।"

(২)

শ্রীমতী পরিমলকুমারীও আর একজন নব্য ডেপুটির স্ত্রী। ঊষার সহিত তাহার ভারি বন্ধুত্ব জমিয়া উঠিয়াছে। এ বিদেশে ঊষা ছাড়া তাহার আর বড় কেহ মিশিবার মত সঙ্গী ছিল না। হাকিমের স্ত্রী ত আর দরিদ্র কেরাণীদের অশিক্ষিতা পত্নীদের সহিত মিশিতে পারেন না! ঊষার শাশুড়ী যতদিন ছিলেন, তখন ঊষাকে লইয়া তিনি ছোট, বড় সকলের বাড়ীই বেড়াইয়া আসিতেন। আজ একমাস হইল তাঁহারা তীর্থে গিয়াছেন, ঊষা এখন অনেকটা স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে। ঊষার শাশুড়ী চলিয়া যাইবার পরদিনই রাত্রে পরিমল আসিয়া ঊষাকে বলিয়া গেল, "তোমার শাশুড়ীর জন্যে ভাই, আমাদের অবধি মাথা হেঁট হবার জো হয়েচে,—কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাহিনার কেরাণী, তা'দের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া, কি ঘেন্নার কথা! আমাদের শাশুড়ীরা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেন না, তোমার ত ভাই সেটা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। যাক্ যা' হ'য়ে গেছে, তা ত আর ফিরবে না, এখন থেকে মনে রেখে চল্‌তে শিখ ভাই!"

এই ঘটনার দিন পনর পর ঊষার বড় ভগিনী হেমপ্রভা, তাহার দাদার স্ত্রী ও জননী তাহার নিকট বেড়াইতে আসিলেন। তাঁহারা আসিবার পরই ঊষার স্বামী কার্য্যগতিকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে চলিয়া গেলেন।

সেদিন পরিমলের কথার উত্তরে ঊষার জননী কহিলেন, "তোমরা পাঁচজনে বল ত মা, আজ প্রায় ছ বছর বিয়ে হ'তে চল্‌ল, ছেলে-পিলে হ'ল, এখনও আমার মেয়েটি নিজের বাড়ীতে পর হ'য়ে থাক্‌বে! কেন বাপু! মেয়ে আমার নিজে বাপের বাড়ী আস্‌বে যাবে, তা নয়, শাশুড়ীর কাছে দরবার কর্‌তে হ'বে তবে মেয়ে আন্‌ব, তাও মাগী তিনবার না ফিরিয়ে পাঠাবে না, বউয়ের ওপর ভারি টান!"

অদূরে তাঁহার বধূ বসিয়া নীরবে সব কথা শুনিতেছিল। শ্বশ্রূর কথা শেষ হইলে, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিল, "তবে আমার বেলা শ্বশ্রূ এত কঠোর কেন, তাঁহার বিনা হুকুমে আমার এক পা কোথাও যাওয়ার জো নাই।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত। সেনমহাশয় বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক টানিতেছিল। উপরের বারান্দা হইতে সুধীরের চারি বৎসরের পুত্র অনিলকুমার ডাকিল, "বুড়ো দাদু, আমি কোলে যাব।"

অনু তখন তাহার দিদিমার কোলে ছিল। তিনি কহিলেন, ঊষা তোর ছেলেটা কিন্তু ভারি বেয়াড়া হ'য়ে উঠেছে, এখন থেকে সাবধান কর, না হ'লে একেবারে বিগ্‌ড়ে যাবে—কোলে নিয়েচি, নামবার জন্যে কি কর্‌চে দেখ্‌না—দিনরাত কেবল বুড়ো দাদু, বুড়ো দাদু; ছেলে যেন কেমনতর!"

সেনমহাশয় উপরের বারান্দায় আসিয়া তাহার শীর্ণ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধরিল, অনু তাহার দিদিমার কোল হইতে নামিয়া ছুটিয়া বৃদ্ধের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কচি দুইখানি হাত দিয়া বৃদ্ধের গলাটি জড়াইয়া ধরিল। বৃদ্ধ তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রহিল। দুই ফোঁটা চোখের জল মেঝের উপর গিয়া পড়িল। যখনই অনু তাহার বুকের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িত, তখনই দুই ফোঁটা জল এমনই করিয়া মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িত! বহুদিনের পূর্ব্বের পুরাণ স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। এই বয়সে সুধীরকুমারও ঠিক এমনই করিয়া তাহার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িত!

অনু তাহার গলা ছাড়িয়া দিয়া মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, ঠামার কাছে নিয়ে চল না, গাড়ী করে' ঠামা-দাদুর কাছে যাব। অঃ বুড়ো দাদু, নিয়ে চল না।" বলিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

বৃদ্ধ তাহাকে আদর করিয়া কোলের উপর বসাইয়া ভুলাইতে লাগিল। অদূরে ঊষার জননী বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সেনমহাশয় ডাকিল, "বেয়ান ঠাক্‌রুণ!" বৃদ্ধের এই 'বেয়ান' সম্বোধনে ঊষার জননী মনে মনে আগুন হইয়া উঠিতেন। কোথা-

কার একটা চাকর তাহাকে কিনা বেয়ান বলিয়া সম্বোধন করে! কিন্তু হায়, তিনি জানেন না এই বৃদ্ধ সেনমহাশয় এ সংসারের কতখানি!

সেনমহাশয় একটু নীরব থাকিয়া কহিল, "দেখুন বেয়ান ঠাক্‌রুণ, আপনি ত আর সে সব দিনের কথা জানেন না—কি ক'রেই বা জান্‌বেন! আপনি আমাদের খোকাবাবুকে যখন পেলেন, তখন সে ত রাজা! জানেন বেয়ান ঠাক্‌রুণ, উঠানে যখন কয়লার ঢিপির ওপর চোখ পড়ে, তখনই সেসব দিনের কথা মনে পড়ে' যায়—আমরা যে পাড়ায় থাক্‌তাম, সেটা খুব বড়লোকের পাড়া, চারিদিকে বড় বড় বাড়ী, কত লোক-জন, হৈ-হৈ ব্যাপার! কর্ত্তাবাবু রোজ রাত থাক্‌তে উঠে, একখানি ভিজে গামছা পরে' ঐ সব বাড়ীর দোরে দোরে ঘুরে, ছা'য়ের ভেতর থেকে আস্ত কয়লা কুড়িয়ে আন্‌ত, সেইগুলো বাড়ী এনে ধোয়া হ'ত, তা'তেই আমাদের মা জননী কেমন গুচিয়ে রাঁধ্‌তেন। এখন ত রোজই কল্‌সি কল্‌সি দুধ আস্‌চে! সেদিন আমাদের খোকাবাবু প্রথম এক্‌জামিন দিতে যায়—বেলা সাতটা বেজে গেল, তবুও আধ-পোয়া দুধ জোগাড় হ'ল না—আমি ত জানি, ক'দিন থেকে ওঁরা দু'জন একবেলা খেয়ে কাটাচ্ছিলেন, রাত্তিরের চালের পয়সা বাঁচিয়ে খোকাবাবুর কলম, নিব-টিব কেনা হ'ল। আমি তখন ভারি ব্যায়রামে পড়ে'—হাঁ ক'রে চেয়ে এই সব দেখ্‌তাম! তা'রপর শোন বেয়ান ঠাক্‌রুণ—ভগবানের দয়ার কথা শোন, মা তখন সবে ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপিয়েচেন, এমন সময় শুন্‌লেন পাশের বাবুদের বাড়ীর গোয়ালের ঝি আসে নি, মহা গোলমাল বেধে গেছে, কি করে' এখন গোয়াল মুক্ত হয়! আমাদের মা-ঠাক্‌রুণের সঙ্গে ও বাড়ীর গিন্নির আলাপ হ'য়েছিল। আমাদের মা গিয়ে তাড়াতাড়ি গোয়াল মুক্ত করে' দিয়ে এলেন। ওবাড়ীর গিন্নি-মা ভারি খুসী হয়ে' একপোয়া দুধ পাঠিয়ে দিলেন। ঐ দুধটুকু পেয়ে মার আমার তখন কি আনন্দ—মুখখানি ছাপিয়ে আনন্দ যেন উপ্‌চে পড়্‌ছিল! এখন কল্‌সি কল্‌সি দুধ দেখি আর সেই দিনকার কথা মনে পড়ে।"

ঊষাও তাহার জননীর পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সরল বৃদ্ধের এই সব কথা তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। এতক্ষণ বৃদ্ধ অনর্গল বকিয়া যাইতেছিল, এইবার একটু থামিবামাত্র ঊষা কহিল, "আচ্ছা সেনমহাশয় তোমার কি আর কোন কাজ নেই, বসে' বসে' মাতালের মত মিছিমিছি বকে যাচ্চ! খোকা ঘুমিয়েচে, ওকে শুইয়ে দিয়ে তুমি নীচে যাও।"

বৃদ্ধ সেনমহাশয় বুঝিল, বউমার অভিপ্রায় নয়, এই সমস্ত কথা তাহার জননী ও ভগ্নীর সম্মুখে হয়। তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা হয় ত সময়ে অসময়ে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া কত ঠাট্টা-তামাসা করিবে। বৃদ্ধের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, সে সুধু ঊষার জননীকে জানাইতে চাহিয়াছিল, বাপ-মা বলিতে খোকাবাবু কেন এত অজ্ঞান—কেনই বা সে এত বাড়াবাড়ি করে!

(৩)

এক মাস পরে তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুধীরের জনক-জননী দেখিলেন, বাড়ীর যেন সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! তাঁহারা সংবাদ দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁহাদের জন্য কেহই বাড়ীর দরজায় অপেক্ষা করিয়া নাই। বৎসরখানেক পূর্ব্বে তাঁহারা আর একবার তীর্থে গিয়াছিলেন—সে মাত্র দশ দিনের জন্য। কিন্তু যখন তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তখন দরজার সম্মুখে তাঁহার পুত্র সুধীর দাদুকে কোলে লইয়া তাঁহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। দরজার ঠিক পাশেই তাঁহাদের বউমা পথের দিকে তাঁহার উৎসুক নয়ন দুইটী ন্যস্ত রাখিয়াছিল। গাড়ী আসিতেই দাস-দাসী, চাপরাসি-পেয়াদা যে যেখানে ছিল সকলে ছুটিয়া আসিয়া গাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা গাড়ী হইতে নামিবামাত্র সুধীর তাহার জননীর ক্রোড়ে দাদুকে তুলিয়া দিয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল, ভিতরে প্রবেশ করিতেই বধূমাতা গলায় অঞ্চল দিয়া নতজানু হইয়া তাঁহাদেব পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। আর আজ! গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তবুও একটা ঝি-চাকর পর্য্যন্ত আসিল না! আশঙ্কায় তাঁহাদের মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুধীর ভাল আছে ত! দাদুর আমাদের কোন-অসুখ বিসুখ হয় নি ত! গাড়ী হইতে নামিতে তাঁহাদের সাহস হইতেছিল না।

উপর হইতে তখন দুই-তিনটি রমণীর কণ্ঠস্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিল। ঊষারই ত কণ্ঠস্বর! তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকলে ভাল আছে। পত্র আসিবার কোন গোলোযোগ ঘটিয়াছে, না হইলে সকলে মিলিয়া এতক্ষণ ছুটিয়া আসিত। এই ভাবিয়া তাঁহারা দুই জনে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা উপরে যাইতেছিলেন, এমন সময় সেনমহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেখানে আসিয়া কহিল, "আমার ইষ্টিশনে পৌঁছতে দেরী হ'য়ে গেছ্‌ল। গিয়ে দেখ্‌লাম, লোক-জন সব চলে' গেছে; তাই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আস্‌চি।"

সুধীরের জননী বলিলেন, "কাউকে দেখ্‌তে না পেয়ে আমার ভারি ভাবনা হ'য়েছিল। সুধীর, বউমা, দাদু বেশ ভাল আছে ত?"

সেনমহাশয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভাল আছে।"

কর্ত্তা উপরে উঠিতেছিলেন, সেনমহাশয় বাধা দিয়া কহিল, "আপনাদের নীচের ঘরে শোবার জায়গা হয়েচে—বউমার মা-বোন সব যে বেড়াতে এসেছেন!"

এই সংবাদে সুধীরের জননীর ভারি আনন্দ হইল। হর্ষোদ্দীপ্ত মুখে কহিলেন, "বেয়ান বেড়াতে এসেছেন! বউমা যে আমার বুদ্ধি করে' শোবার এই ব্যবস্থা করতে পেরেচে, এতে সত্যি আমার ভারি আহ্লাদ হয়েচে। বেয়ান বেড়াতে এয়েচেন, কত আহ্লাদের বিষয়! বউমা নিশ্চয় একলা তেমন যত্ন-আত্তিস্ করতে পারচে না। বউমা আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

সুধীরের পিতা বিশ্রাম করিবার জন্য নীচের ঘরের অভিমুখে ও গৃহিণী তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া গেলেন। অনু তখন তাহার মাসির কোল হইতে নামিবার জন্য রীতিমত যুদ্ধ করিতেছিল। "ছেড়ে দাও না, আমি ঠামার কোলে যাব, আমি তোমার কোলে থাক্‌ব না।" কাঁদিতে কাঁদিতে সে এই কথা বলিতেছিল, আর মাসিমাকে দুই হাতে প্রহার করিতেছিল। সুধীরের জননী সেই সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; হাসিমুখে কহিলেন, "মা লক্ষ্মী, আমরা এয়েচি।"

ঊষা তখন জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্বশ্রূর কণ্ঠস্বর শুনিয়া খানিকক্ষণ তেমনিভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শ্বশ্রূকে প্রণাম করিল। শ্বশ্রূ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এই বুঝি তোমার দিদি—দু'টি বোন যেন ঠিক এক ছাঁচে ঢালা! বেয়ান বুঝি ঐ ঘরে?"

অনু ততক্ষণ তাহার ঠাকুরমার ক্রোড়দেশ অধিকার করিয়া

বসিয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দাদু কই, দাদু?"

(৪)

দিন পাঁচেক পরে সুধীরের পিতা কহিলেন, "সুধীর যতদিন না আসে, চল অন্য কোথাও চলে' যাই, এখানে আর থাকা হতে' পারে না।"

সুধীরের জননী কহিলেন, "বেয়ানরা দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এয়েচেন, তাঁ'দের যা' ইচ্ছে হয় করুন তা'তে আমরা বাড়ী ছেড়ে যাব কেন?"

সুধীরের পিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি বুঝ্‌চ না গিন্নি, এখনও মানে মানে বেরুতে পারতে, শেষে অপমানের একশেষ হ'য়ে বেরুতে হবে।"

সুধীরের জননী কহিলেন, "তুমি কি যে বল! আমাদের বাড়ী-ঘর, এখানে আবার কে অপমান করবে!" তিনি মুখে এই বলিলেন বটে, কিন্তু মনটা তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের মাত্র মাস দুই অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের বাড়ীটি যেন কেমন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। সতাই শ্রী ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি যত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, ততই যেন পাঁচজনে তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছিল। তবুও তিনি নিপুণ মাঝির মত বাহিরের ঝড়-ঝাপটার হাত হইতে নৌকাখানি রক্ষা করিতে যত্নবতী হইলেন।

সেদিন ঊষা, পরিমল ও তাহার দুইটী ভগ্নীকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইতেছিল।

সুধীরের জননী কহিলেন, "পেন্সারবাবুর স্ত্রী, ও তা'র দু'টি মেয়েকেও নেমন্তন্ন ক'রে এস বউমা!"

ঊষা গম্ভীর হইয়া কহিল, "ওদের নেমন্তন করতে গেলে লোকে বা কি বল্‌বে—আপনি ত সে সব বোঝেন না—তা ছাড়া ওরা আস্‌বে শুন্‌লে পরিমলই বা আমাদের বাড়ী আস্‌বে কেন"?

সুধীরের জননী অন্তরে আঘাত পাইলেন; কিন্তু সে আঘাত সামলাইয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "সেই ভাল বউমা, পেন্সারবাবুর স্ত্রীকে আর একদিন খাওয়ালেই হবে।"

তখন বাহিরের রোয়াকে বসিয়া সুধীরের পিতা তামাক খাইতে ছিলেন। গ্রীষ্মকাল। তাঁহার গায়ে কোন জামা ছিল না। এমন সময় পরিমলের গাড়ী আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। ঊষার ভগ্নী হেমপ্রভা তাহাকে নামাইয়া লইতে আসিল। তাহার দুই বোনের সহিত পরিমল বাড়ীর ভিতরে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "অসভ্যর মত খালি গায়ে বুড়োটা বসে' আছে, ও কে গা হেমদিদি, উনি কি ঊষার শ্বশুর না কি?"

হেমপ্রভা মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "ও কেন ঊষার শ্বশুর হতে যাবে—ওযে বাড়ীর চাকর।"

পরিমল ভিতরের উঠানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "চাকরের আস্পর্দ্ধা ত কম নয়, আমরা এলাম আমাদের দেখে হুঁকোটি অবধি নামালে না, সটাং টানতে লাগ্‌ল। আমি কখনও এসব বরদাস্ত করতে পারিনি, এমন বেয়াদব চাকরকে বাড়ীতে জায়গা দিতে আছে!"

হেমপ্রভা মহা দুঃখিত হইয়া উত্তর করিল, "ঊষা কেমন ন্যাকা মেয়ে—ওসব দেখেও কেমন চুপ করে থাকে—আর কদিন থেকে যেতে পারি—তা' হ'লে বোনটি একটু মানুষ হয়।'

তাহারা উপরে উঠিয়া গেল। সুধীরের পিতা হুঁকাটি দূরে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ বাড়ীতে আর জলস্পর্শ করিবেন না। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাগ হইল, গৃহিণীর উপর। তিনি ত পরশু এ বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, গৃহিণীই ত তাঁহাকে যাইতে দিলেন না! এখন তিনি তাঁহার বউ-বেয়ানের লাথি খাইয়া পড়িয়া—থাকুন, তিনি আর এক মুহূর্ত্ত এ বাড়ীতে থাকিবেন না।

সুধীরের পিতা নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি ব্যাগে জামা কাপড় গুছাইয়া লইয়া বাহির হইতে যাইবেন, এমন সময় সুধীরের জননী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হাঁ গা, তুমি নাকি রাগ করে' চলে যাচ্চ?"

সুধীরের পিতা কোন উত্তর করিলেন না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ফুলিতে লাগিলেন।

গৃহিণী ভারি গলায় কহিলেন, "হ্যাঁ গা, আমার উপর রাগ করে' তুমি নিজের বাড়ী ছেড়ে যাচ্চ!"

কর্ত্তা কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, "নিজের বাড়ী তুমি কা'কে বল্‌চ গিন্নি? সে দিন আর নেই—আমি যে এ বাড়ীর চাকর!"

বৃদ্ধ আর কিছু বলিতে পারিলেন না; গৃহিণীও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, উপরে দাঁড়াইয়া হেমপ্রভা ঊষাকে কহিল, "যাক্, বুড়োটাকে যা'হ'ক করে বিদায় করে', এখন বুড়ীটাকে বিদায় করে' দিয়ে যেতে পারলে হয়।"

ঊষা নিরুত্তর হইয়া রহিল। এত বাড়াবাড়ি তাহার ভাল লাগিল না। তাহার দিদি যে তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে এতটা অবহেলার চক্ষে দেখিবে, ইহা তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইল। বার বৎসর বয়সে সে এ বাড়ীতে আসিয়াছে, এখন তাহার আঠার বৎসর বয়স। এই ছয় বৎসর সে স্বামীর ঘর করিয়া একটু বেশ বুঝিয়াছে, তাহার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর উপর কোনরূপ অন্যায় ব্যবহারের কথা তাহার স্বামী জানিতে পারিলে তিনি কোনক্রমেই তাহা ক্ষমা করিবেন না। আজ এই ছয় বৎসরের সব কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর কি আদর কি যত্ন। আর সে কি না সেই শ্বশুরশ্বাশুড়ীকে অবজ্ঞা করিতে চলিয়াছে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অন্তর আজ সত্যই ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। নিজের উপর ধিক্কার জন্মিল। কেন পাঁচজনের কথায় সে কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিল। এখনও কি ফিরিয়া আসিবার সময় নাই? সে ব্যস্ত হইয়া তাহার দিদিকে কহিল, "দিদি, আমার শ্বশুর কি সত্যি সত্যিই রাগ করে' চলে' যাচ্চেন না কি?"

হেমপ্রভা হাসিয়া কহিল, "তোর মুখখানা অমন শুকিয়ে উঠেচে যে! শ্বশুরের ভয়েতে না কি? শুন্‌লাম গাড়ী ডাক্‌তে পাঠিয়েছে, এখনই বিদেয় হবে।"

ঊষা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। দেখিল তাহার শ্বশুর গাড়ীর অভিমুখে যাইতেছেন। তাহার শ্বাশুড়ী ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

ঊষাকে দেখিয়া তাহার শ্বাশুড়ী আজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঊষারও দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে শ্বশুরের নিকট অগ্রসর হইয়া গলায় আঁচল দিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া কহিল, "বাবা, আমায় মাপ করুন।" তাঁহার চোখের জলে বৃদ্ধের পায়ের চেটো ভিজিয়া উঠিল। বৃদ্ধও কোন কথা বলিতে পারিলেন না। নিষ্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় অদূরে সেনমহাশয়ের কোল হইতে অনিলকুমার জড়িতকণ্ঠে ডাকিল, "ও দাদু, দাদু!"

বৃদ্ধ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার কোলে যাইবার জন্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া আছে।

বৃদ্ধ সস্নেহে বধূমাতাকে তুলিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, আমি যাব না মা, তা' হ'লেই ত হবে?"

গৃহিণী এবার হাসিয়া কহিলেন, "কেন, যাও না!"

শ্রীমতী কমলা দেবী

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বকঃ—কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায় বিপত্নীক। বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্বেতলোমার সহিত কৃষ্ণলোমের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীবনের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। স্বয়ং যাইতে না পারিয়া কৃষ্ণলোম তাহার বন্ধু ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায়কে মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়াছিল। পূর্ব্ববৈরভাবশতঃ ঋজুশৃঙ্গ, কন্যার পিতার নিকট এমনভাবে পাত্রটির রূপ-গুণের বর্ণনা করিয়াছিল যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। তথাপি স্থূলপুচ্ছ, সূক্ষ্মলোমের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়। সূক্ষ্মলোম, তাহার বন্ধু নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায়কে গোপনে শ্বেতলোমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিল; নীলচক্ষু আসিয়া শ্বেতলোমার রূপ-বর্ণনা করায়, সূক্ষ্মলোম একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণলোম বিবাহের দিনস্থির করিয়া মেয়েটিকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য শৃগাল ভট্টাচার্য্যকে প্রেরণ করে। শৃগাল ভট্টাচার্য্য সেখানে পৌছিলে, অন্তঃপুরে স্থূলপুচ্ছ ও গাঢ়লোমার বিস্তর কলহ হয়। এ পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে গাঢ়লোমার ঘোর আপত্তি; অথচ স্থূলপুচ্ছ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, বিবাহ সে দিবেই। ভোরবেলা তাই গাঢ়লোমা কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া আসিতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য।

ঋজুশৃঙ্গের সহিত কৃষ্ণলোম বিবাহ-ভোজের ফর্দ্দ করিতে ব্যস্ত।
এককোণে বসিয়া সূক্ষ্মলোম বন্ধু-বান্ধবগণকে
নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিতেছেন।
অশ্বপৃষ্ঠে শৃগাল ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। প্রণাম, প্রণাম। একি ভট্টাচার্য্য ভায়া,
ঘোড়া কোথা পেলে?

শৃ-ভট্টা। কাল অত পথ গিয়ে
আজ কি আবার পায়ে হেঁটে ফিরিবার
শক্তি আছে দাদা? তা' হ'লে কি পা চারিটা
থাকিত আমার? সেই গ্রামে ছিল এক
বড় ঘর যজমান, তা'র কাছে গিয়ে
চাহিয়া নিলাম ঘোড়া। (অশ্ব হইতে অবতরণ)

কৃষ্ণ। তবে ও দিকের
সংবাদ কি? আশীর্ব্বাদ হ'ল? আর আর
সকল বিষয়ে মঙ্গল ত?

শৃ-ভট্টা। বড় নহে।

ঋজু। অাঁ! সে কি! সকলে ত ভাল আছে? আহা,
স্থূলপুচ্ছবাবু অতিশয় ভদ্রলোক।

শৃ-ভট্টা। ভাল সবে আছে, কিন্তু বিভ্রাট্ বেধেছে।

কৃষ্ণ। বিভ্রাট্! কি রকম? কি রকম?

শৃ-ভট্টা। আমি ত সারাদিন
পথ চলে', পৌঁছিলাম সন্ধ্যাবেলাটায়
তাহাদের বাড়ী। খুব খাতির করিল
স্থূলপুচ্ছ। বলিল—"আজিকে বড় শ্রান্ত
হ'য়েছেন, আহার করিয়া রাত্রিটুকু
বিশ্রাম করুন; কাল প্রাতে আশীর্ব্বাদ
হবে।" মেয়েটির কোষ্ঠীখানি দেখাইল;
বলিলাম—"রাজ-যোটকের বিবাহ এ"—
শুনে' ভারি খুসী হ'ল। পরে, আজি প্রাতে
আসিল যখন আমার নিকটে, শুষ্ক-
মুখ, ছল-ছল আঁখি,—শুধা'লাম আমি—
"কি হে, চেহারাটা কেন বিষণ্ণ এমন?"
সে কহিল—"মহাশয়, বিপদে পড়ে'ছি
বড়—গিন্নীটি মেয়েটিরে ল'য়ে, কোথায়
গেছেন চলে'। ভোরে উঠে আমি দেখিতে
না পেয়ে তাহাদিকে, ভাবিলাম, নিশ্চয়
এইখানে কোনখানে আছে। আশে-পাশে
কত খুঁজিলাম, কোথাও তাহারা নাই।
এ কেমন হ'ল! আজ আশীর্ব্বাদ হবে,
কোথায় গেলেন তিনি মেয়েটিরে ল'য়ে!"
আমি তাঁ'রে বলিলাম—"যাবেন কোথায়?
এখনিই আসিবেন—অপেক্ষা করুন।
বোধ করি, কোনরূপ সবিশেষ কাযে
গেছেন পাড়াতেই কাহারও বাড়ীতে।"
তা'রপর, দুইজনে বসিয়া রয়ে'ছি
গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ, এল এক
হরিণের মেয়ে। সে কহিল—"ওগো কাকা,

আজি খুব ভোরে আমি বাড়ীর বাহিরে
চরিতেছিলাম, দেখিলাম শ্বেতলোমা
কাকীমার সঙ্গে বেগে যেতেছে চলিয়া।
আমি ছুটে' গিয়ে শুধা'লাম—ও কাকীমা,
কোথায় চলে'ছ এত ভোরে?—কহিলেন
তিনি—যেদিকে দু' চক্ষু যায়, সেই দিকে
যাব। আমি ভয়ে ভয়ে করিনু জিজ্ঞাসা—
কতক্ষণে ফিরিবে আবার?—কহিলেন—
আর আসিব না ফিরে; তোর কাকা আজি
আমাদের দিয়েছে তাড়া'য়ে।"—এই কথা
বলিয়া সে হরিণের মেয়ে গেল চলে'।
স্থূলপুচ্ছ হ'য়ে গেল হতভম্বমত।
কহিল আমারে—"মহাশয়, কাল রাতে
কোন এক সাংসারিক ব্যাপার লইয়া
কলহ হইয়াছিল গৃহিণীর সাথে।
রাগের মাথায় আমি বলে'ছিনু তাঁ'রে
মুখে এসেছিল যাহা। সেই অভিমানে
গৃহত্যাগ করে' তিনি গেছেন চলিয়া।
কতদিনে আসিবেন ফিরে, কিম্বা আমি
কবে তাঁ'র সন্ধান পাইব, সে বিষয়ে
কিছুই স্থিরতা নাই—হেন অবস্থায়
এ বিবাহ ভঙ্গ হ'য়ে গেল। বলিবেন
কৃষ্ণলোমবাবুকে আপনি—অপরাধ
মম নিজগুণে যেন করেন মার্জ্জনা।
রহিলাম আমি নিতান্ত লজ্জিত। সব
দেখিলেন নিজচক্ষে; বুঝাইয়া তাঁ'রে
বলিবেন।"

কৃষ্ণ। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া)
বটে!

ঋজু। এমন ব্যাপার!

শৃ-ভট্টা। দাদা,
বিবাহ-কার্য্যটা নিতান্তই ভবিতব্য।
যা'র সঙ্গে যা'র লেখা আছে, কা'র সাধ্য
রদ করে তাহা? যা'র সঙ্গে লেখা নাই,
কা'র সাধ্য ঘটায় ঘটনা? প্রজাপতি
আপনার হাতে রেখেছেন ইহা, তবে
মিছে কেন হ'তেছ দুঃখিত?

কৃষ্ণ। যা'ক্ ভেঙ্গে।
না হোক্। অন্যত্র দিব ছেলের বিবাহ।

ঋজু। তা' বই কি। বাঁচিয়া থাকুক—বেটাছেলে,
বিবাহের ভাবনা কি?

কৃষ্ণ। সে জন্য ভাবি না।
তবে, সব আয়োজন হ'ল, দিনস্থির
হ'ল, এমন সময় ঘটিল বাধাটা!

ঋজু। আহা, তাহা নয়! দেখ, খরচ করিলে
এত টাকা, জিনিষে-পত্তরে বাড়ীখানা
ভরাইলে, আত্মীয়-বান্ধব-নিমন্ত্রণে
ব্যয় হ'ল, সব মাটী হ'ল!

শৃ-ভট্টা। কি করিবে
বল? জিনিষ-পত্তরগুলা মিছামিছি
নষ্ট না করিয়া, না হয় পাঠায়ে দাও
আমার বাড়ীতে। গৃহিণীর পঞ্চমীর
ব্রত-উদ্‌যাপন ঘনাইয়া এল, আমি
ও-গুলা লাগাইয়া দিব কাযে।

ঋজু। সে ভাল।

(ঋজুশৃঙ্গের প্রতি কৃষ্ণলোমের সরোষ কটাক্ষপাত)

শৃ-ভট্টা। এখনও যাই নাই বাড়ী—চলিলাম
তবে। (প্রস্থান)

কৃষ্ণ। আসুন, প্রণাম। আমারও মনটা
গেছে ভারি বিগড়িয়া। যাই কিছুক্ষণ
শুয়ে' থাকি।

ঋজু। আমিও তবে আসি, প্রণাম।

কৃষ্ণ। এস ভাই, এস।
লোকসান দেখ দেখি!
(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রস্থান)

ঋজু। কি হ'তেছে বাবাজীউ? আহা, আমি কেন
গেলাম দেখিতে মেয়ে! এমন আপ্‌শোষ
হইতেছে! মেয়েটি যেন পরী! আহা-হা!
এমন পোড়া অদৃষ্টটা আমাদের! ভাগ্যে নাই
তা'রে পুত্রবধূ করা।
যাই তবে বাবা! (প্রস্থান)

সূক্ষ্ম। এমন ব্যাপার!—হায় হায়, সার হ'ল
সুধু দিন গণা, নাম জপা! অহো লজ্জা,
পরিতাপ! মম হৃদি-উপবনে আজি
কি ভীষণ দাবানল উঠিল রে জ্বলি'!
অহো—সেই মুখখানি—সেই মুখখানি!
চর্ম্মচক্ষে দেখিনি যদিও—মনশ্চক্ষু
মম—রূপে তা'র বিভোর, পাগল! হা হা—
সেই প্রেয়সীর বিরহ দুঃসহ
কেমনে সহিব!—পারিব না—পারিব না।
এ হৃদয় আজি হ'তে ধূ-ধূ মরুময়
হ'য়ে গেল। উঃ, কি যন্ত্রণা! কি যন্ত্রণা!
গৃহে আর পারি না তিষ্ঠিতে। চলিলাম
বিবাগী হইয়া। দেশে দেশে, বনে বনে,
পর্ব্বতে পর্ব্বতে, খুঁজিয়া ফিরিব তা'রে।
এ জীবন বিসর্জ্জিব তা'রে না পাইলে।
(পতন ও মূর্চ্ছিত হইবার নিষ্ফল চেষ্টা)
(পটক্ষেপণ)

ক্রমশঃ

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে

নব আষাঢ়ে প্রথম দিন আবার এল ফিরিয়া,
নিবিড় হ'য়ে মদির-মোহ আসিল পুন ঘিরিয়া,
ভুবন-চোখে সলিল ঝরে,
আবেশে পাতা নামিয়া পড়ে,
ঘনায় মেঘ এমনি করে' অতীত স্মৃতি হরিয়া,
নব আষাঢ়ে প্রথম দিন আবার এল ফিরিয়া।

কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হ'তে জাগ'রে,
মেঘের তরী ভেসেছে আজ বেদনা-শোক-সাগরে,
কুটজ ফুলে ভরিয়া ডালা,
বকুলে আজি গাঁথিয়া মালা,
অর্ঘ্য রচি কাতরে আজি মেঘের কৃপা মাগ'রে,
কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হ'তে জাগ'রে।

দরদী সে যে ঘুনিয়ে তাই ঘনা'য়ে আসে পা টিপে',
ব্যথার মত আঁধার করি' নিভা'য়ে গৃহ-প্রদীপে।
জগতে যেন আড়াল করি,
নিভৃত রচি', দু'হাত ধরি'
শুধায় তোমা, কি কথা তুমি পাঠাবে প্রিয়া-সমীপে?
দরদী তাই ঘুনিয়ে সে যে ঘনা'য়ে আসে পা' টিপে'।

প্রিয়ার কথা বলিছে যবে তোমারো কথা বলিবে,
ভববিদিত বংশে জাত কখনো নাহি ছলিবে।
ন্যুব্জ হ'য়ে বারতা-ভারে,
চলে'ছে আহা, দেখ না তা'রে,
সবার লিপি বিদ্যুতেরি আখরে কিবা জ্বলিবে!
বলনি যাহা তাহাও সে যে আঁখির জলে বলিবে।

কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়ী কেবা রহে'ছ আজি পুলকে,
সুখীরও শুনি, হৃদয় টলে নামিলে মেঘ ভূলোকে।
বিরহী আজি রহে যে জনা,
তা'দের লাগি' অশ্রু-কণা
ফেলিতে আজি ভুলো না যেন রহিয়া সুখ দ্যুলোকে,
মুক্তা সম তুলিবে তাহা প্রেমের হারে পুলকে।

যক্ষ তুমি, বক্ষে আর পার নি ব্যথা পোষিতে,
মুখর হ'য়ে প্রাণের কথা পাঠা'লে তব যোষিতে।
মোদের আর কুণ্ঠা নাই,
তোমারি কর-রচনা তাই
নিজের বলি' প্রিয়ারে দেই কণ্ঠে রহি' তোষিতে
পার নি তুমি, মোরাও তাই পারিনা আরো পোষিতে।

নিখিল-হৃদি-রক্তে করি' সিক্ত তব লেখনী,
বিশ্ব তাই শিহরি' উঠে আষাঢ় আসে যখনি,
প্রিয়ারে তুমি পরম প্রিয়া
করিয়া দিলা মাতা'লে হিয়া,
নিখিলে কোনো দুখীর কথা বলিতে বাকি রাখ নি,
ত্রিলোক লাগি' লিখে'ছ তুমি, একের লাগি' লেখ নি।

হে কবি, তুমি জানিনা কোন্ অলকাপানে চাহিয়া,
করুণতম আবেদনের বেদনা গেছ গাহিয়া,
উজ্জয়িনী-সৌধ-শিরে,
কিসের ব্যথা? চাহিতে ফিরে
জুড়া'তে তাই কোন্ অলকানন্দা-নীরে নাহিয়া,
যক্ষ-অভিশপ্ত হ'য়ে কি গান গেলে গাহিয়া?

হে কবি, তাই শাপের কথা শিখে'ছি আজি ভাবিতে,
প্রতি আষাঢ়ে নব আশারে হৃদয়ে রহি সেবিতে,
অলকা-স্মৃতি স্বপনপ্রায়
নয়ন হ'তে মিলা'য়ে যায়,
শঙ্কা সুধু আবার কি গো পারিব তাহা লভিতে?
প্রতি আষাঢ়ে প্রথম দিনে রহি গো তাই ভাবিতে।

শ্রীকালিদাস রায়

মহম্মদ তকি খাঁ

মহম্মদ তকি খাঁ তাব্রিজ-দেশীয় জনৈক সাধারণ সৈনিক ছিলেন। তাব্রিজ হইতেই তিনি বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং বঙ্গের নবাব মীর কাসিমের অধীন সেনাদলের মধ্যেও সাধারণ সেনারূপেই প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। একজন সামান্য সৈনিক হইলেও তিনি অচিরকালমধ্যেই স্বীয় সাহস, কার্য্যদক্ষতা ও অসাধারণ প্রতিভাবলে নবাবকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়া ফেলেন যে, নবাব তাঁহাকে সৈনিক হইতে একেবারেই ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। বীরভূমের যুদ্ধে স্থানীয় জমিদার আসদ্ জমান খাঁকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া যে-সময় নবাব উক্ত স্থানের ও নিকটবর্ত্তী ভূভাগের সুব্যবস্থাকরণে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়েই তাঁহাকে বীরভূমের ফৌজদার-পদে বরিত করা হয় এবং এমন কি, রাজস্ব আদায়ের ভারও তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়।

বীরভূমের যুদ্ধে দেশীয় সৈন্যগণের বিশ্বাসঘাতকতা ও অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া মীর কাসিম বাঙ্গালার সৈন্য-বিভাগের সু-সংস্কার করিতে দৃঢ়ব্রত হন। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য, তিনি এ কার্য্যের ভারও মহম্মদের হস্তে সমর্পণ করেন। এই কার্য্যের সংসাধনে মহম্মদ এরূপ যত্ন ও উৎসাহ প্রদর্শন করেন, যে অত্যল্পকালমধ্যেই তিনি নবাবের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া পড়িলেন। প্রভুর প্রত্যেক আদেশ পালনে তকি জীবন-পণ করিতেন। প্রভুর আজ্ঞা তিনি দেবাজ্ঞা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। প্রভুর প্রত্যেক কার্য্যই তিনি বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে সম্পাদন করিতে চেষ্টিত হইতেন। ফলতঃ, তিনি প্রত্যেক কার্য্যেই প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার এক একটী কার্য্য এক একটী উদাহরণস্বরূপ।

ইংরাজ-বণিকগণের সহিত মীর কাসিমের যুদ্ধ আসন্নপ্রায় হইলে, তিনি সেনাপতি গুর্গিন খাঁর পরামর্শে জগৎ শেঠ-ভ্রাতৃদ্বয় মহতাব রায় ও রাজা স্বরূপচাঁদকে করায়ত্ত করিতে চেষ্টিত হইলেন এবং তদনুসারে বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকি খাঁকে এই আদেশপত্র দিলেন যে, তিনি যেন পত্রপাঠ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ-যাত্রা করিয়া শেঠ-ভবন অবরোধ করেন ও মুঙ্গের হইতে প্রেরিত সৈন্যদলসহ শেঠদ্বয়কে তথায় পাঠাইয়া দেন। তকি খাঁ আদেশ-

প্রাপ্তিমাত্র মুর্শিদাবাদে আসিয়া ছলনাপূর্ব্বক তাঁহাদের মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিলেন। নবাবও তথায় তাঁহাদিগকে সুখ-সম্পদে রাখিয়া স্বকার্য্য-সাধন-সঙ্কল্পে ব্রতী হইলেন।

ক্রমেই ইংরাজের সহিত মীর কাসিমের যুদ্ধ বাধিল। পাটনা-যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া, ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া পলাশীর দক্ষিণে তকি খাঁর শিবিরে সমবেত হইল। তকি খাঁ কিন্তু নিজ শিবিরে তাহাদের আশ্রয় দিলেন না; ভয়, পাছে এই দৃষ্টান্তে তাঁহার শিক্ষিত সেনাদলও কর্ত্তব্য-কার্য্য ভুলিয়া যায়। তাহারাও ঈর্ষান্বিত হইয়া বহুদূরে গিয়া শিবির-সন্নিবেশ করিয়া রহিল।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই ইংরাজেরা মহম্মদ তকি খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করেন। মহম্মদের অন্যান্য সৈন্যদল তখনও তাঁহার সহিত যোগদান করিতে পারে নাই; কাজেই তাঁহাকে তাঁহার অধীন মুষ্টিমেয় সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়াই যুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ মুষ্টিমেয় হইলেও, তিনি তাহাদের এরূপ সুন্দর যুদ্ধ-কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, তাহারা ইংরাজদিগের ভয়াবহ অগ্নিবৃষ্টি ও তজ্জনিত উপর্য্যুপরি আঘাত উপেক্ষা করিয়া, মরণ-পণে ভীষণ শার্দ্দূলের ন্যায় ইংরাজের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া প্রতিবারই শত্রু-সৈন্য বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। আর অসমসাহসিক বীর তকি খাঁ স্বয়ং অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে এবং স্বপক্ষের সৈন্যগণকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই সময় হঠাৎ ইংরাজ-সেনাদলের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রু-নিক্ষিপ্ত একটি গুলি আসিয়া মহম্মদের অশ্বটিকে নিহত করিয়া আবার তাঁহার পাদদেশ বিদ্ধ করিল। পরক্ষণেই আর একটী গুলি আসিয়া তাঁহার স্কন্ধদেশ বিদ্ধ করিল; কিন্তু মুসলমান বীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্রও না করিয়া তদ্দণ্ডেই স্বীয় মনোমত অশ্বারোহী সৈন্যগণকে অগ্রসর হইয়া ইংরাজ-সেনাদলের দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন এবং তাহাদের ভয়-নিবৃত্তির জন্য বস্ত্রাংশের দ্বারা ক্ষত স্থান ঢাকিয়া নিজেই তাহাদের অগ্রগামী হইলেন। এই আক্রমণেই তিনি যুদ্ধ-অবসানের আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সৈনাগণ বেগে অগ্রসর হইবা-মাত্রই দক্ষিণ পার্শ্বের খালের নিম্নে লুক্কায়িত ইংরাজ-সিপাহীগণ একযোগে তাহাদের উপর গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। অগ্রগামী সৈন্যের অনেকেই ইহাতে নিহত হয়; এমন কি, একটী গুলি আসিয়া তকি খাঁরও মস্তকে বিদ্ধ হয়; তাহাতেই তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হয়। মৃত্যুকালে তিনি সহযোগী সেনাপতিদিগের কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীনতার নিমিত্ত যে মর্ম্মন্তুদ দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইতিহাস পাঠ করিয়া তকি খাঁ-সম্বন্ধে মাত্র এই কয়টী কথা জানিতে পারা যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের পরমপূজ্য, সাহিত্য-সম্রাট্, ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার চন্দ্রশেখরের একস্থানে, মহম্মদ তকি খাঁর ন্যায় এরূপ উদার, উন্নত, সচ্চরিত্র ও প্রভুভক্ত বীরপুরুষের চরিত্র এরূপ কলুষিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেরই হৃদয়ে তকি খাঁর প্রতি ভক্তির পরিবর্ত্তে ঘৃণার উদ্রেক হয়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধের উপক্রম হইলে 'দলনী' নবাব মীর কাসিমকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করেন ও যুদ্ধকালে তিনি কোথায়, কি অবস্থায় থাকিবেন, তাহা নবাবকে গণনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। মীর কাসিম চন্দ্রশেখরের নিকট জ্যোতিষ-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং বেগমের অনুরোধে তিনি গণনায় ব্যাপৃত হইলেন ও গণনায় যাহা দেখিলেন, তাহাতে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। স্বীয় গণনায় সন্দিহান হইয়া তিনি চন্দ্রশেখরকে আনিবার জন্য লোক পাঠান। অতঃপর দলনী গুর্গিন খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ও দুর্ভাগ্যবশতঃ বিলম্ব হওয়ায়, পুনরায় দুর্গে ফিরিতে অসমর্থ হন। চন্দ্রশেখর তাঁহাকে প্রতাপের বাসায় লুকাইয়া রাখেন ও তাঁহার পত্র আনিয়া নবাবকে প্রদান করেন। নবাব দলনীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন; কিন্তু প্রেরিত লোক দলনীর পরিবর্ত্তে শৈবলিনীকে আনিয়া উপস্থিত করিল। নবাব শৈবলিনীর মুখে শুনিলেন যে, ইংরাজেরা দলনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই মীর কাসিম সেনাপতি গুর্গিণ খাঁকে ইংরাজদিগের নৌকা ধরিবার আদেশ প্রদান করেন; কিন্তু গুর্গিণ তাঁহাকে মিথ্যা করিয়া বলেন যে, ইংরাজেরা চলিয়া গিয়াছে। নবাব গুর্গিণের শঠতা বুঝিতে পারিয়া পুনরায় তকি খাঁকে এই আদেশ-পালনের জন্য পরোয়াণা প্রদান করেন। কিছুদিন পরে তকির মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হইয়া তিনি দলনীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন।" বাস্তবিক তকি খাঁর চরিত্র-সম্বন্ধে এরূপ কোন কলঙ্ক ইতিহাসের কুত্রাপি দেখা যায় না। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের নামে এরূপ অযথা কলঙ্ক আরোপ করা বস্তুতঃ দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

কোন কর্ত্তব্যপরায়ণ, সাধুচরিত্র ব্যক্তির চরিত্রে বৃথা কলঙ্ক-ঘোষণা করা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। আবার কোন লিপিকুশল শক্তিশালী লেখক যদি কোন নির্দ্দোষ চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করেন, তাহা হইলে নিষ্ঠুরতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়। অবশ্য উপন্যাস লিখিতে হইলে, উহাকে শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী করিবার নিমিত্ত, কাল্পনিক অনেক বিষয়ই উহার মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হয়; সুতরাং উপন্যাস-রচয়িতার কল্পনা ও ভাবের স্বাধীনতা খুব বেশী এবং তাঁহার এই স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই মার্জ্জনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া ঔপন্যাসিক যে সত্যকে কল্পনা করিয়া অসত্যে পরিণত করিবেন, আর তাঁহার স্বাধীনতা সর্ব্বত্রই মার্জ্জনীয় বলিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিবেন, তাহা হইতে পারে না। প্রত্যেক বিষয়েরই একটা সীমা আছে; ঔপন্যাসিকের এই স্বাধীনতার যে সীমা নাই, তাহা নহে; ইহারও একটা সীমা আছে। সে সীমার বাহিরে গেলেই অন্যায় হইয়া পড়ে। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য; সত্যের অপ-লাপ চিরদিনই অমার্জ্জনীয়। ঔপন্যাসিক যদি সাধারণ উপন্যাস লেখেন, তাহা হইলে তিনি উহার মধ্যে কাল্পনিক যাহাই লিখুন না কেন, কিছু আসে যায় না; কিন্তু তিনি যদি কোন ঐতি-হাসিক ঘটনাকে উপন্যাসে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে ইতিহাসের প্রত্যেক বিষয়ই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—তাহার এক বর্ণও এদিক্-ওদিক্ করিলে চলিবে না। যুধিষ্ঠিরের চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া উপন্যাস-রচয়িতা যদি তাঁহার প্রতি কংসের চরিত্র-দোষ আরোপ করেন, তাহা হইলে কি অন্যায় হয় না? ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি—ইঁহাদের স্বাধীনতা ভাষায়, ভাবে, কল্পনায়; কিন্তু সত্যে কাহারও স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

আজকাল ইতিহাস-পাঠকের সংখ্যা বড় বেশী নয়, কিন্তু উপন্যাস-পাঠকের অভাব নাই; সুতরাং ইতিহাস অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসের দায়িত্ব যে কত বেশী তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের বুঝা উচিত যে, ঐতিহাসিক কোন সত্য ঘটনাকে যদি উপন্যাসের মধ্যে বিকৃত-

ভাবে চিত্রিত করা যায়, তাহা হইলে অধিকাংশ লোকেরই সেই ঘটনা-সম্বন্ধে একটা অন্ধ বিশ্বাস দাঁড়াইয়া যাইবে, আর সেই অন্ধ বিশ্বাসের জন্য ঔপন্যাসিককেই দায়ী হইতে হইবে।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং বঙ্কিম বাবুর রচিত "চন্দ্রশেখর" পড়েন নাই, এরূপ লোকও খুব অল্পই আছে। তিনি "চন্দ্রশেখরে" তকির চরিত্র যেরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তাহা একেবারেই ইতিহাস বিরুদ্ধ। বঙ্কিম-বাবুর ন্যায় মনীষীর পক্ষে সত্যের এবংবিধ অপলাপ বড়ই দূষণীয়। ইহাতে যে তাঁহার উপন্যাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু একজন বীর—যিনি জীবনে কখনও অসৎ কর্ম্ম করেন নাই, প্রভুর ইষ্টের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে গুলির আঘাতকে যিনি পিপীলিকা-দংশনবৎ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া শত্রু-সৈন্য-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আপনার জীবন উৎসর্গ করিলেন—তাঁহাকে লেখনীর আঁচড়ে এপ্রকার কলুষিত করিয়া বঙ্কিমবাবু কতদূর সঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন, পাঠক তাহা বিচার করিবেন।

শ্রীসুশীলকুমার মিত্র

স্থাপত্যে গান্ধার

আজ গান্ধার প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির শ্মশানভূমি। কিন্তু, এমন দিন তাহার গিয়াছে, যখন কাশী, কোশল, কাঞ্চী হইতে পণ্ডিতগণকে গান্ধারের বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলায় বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া

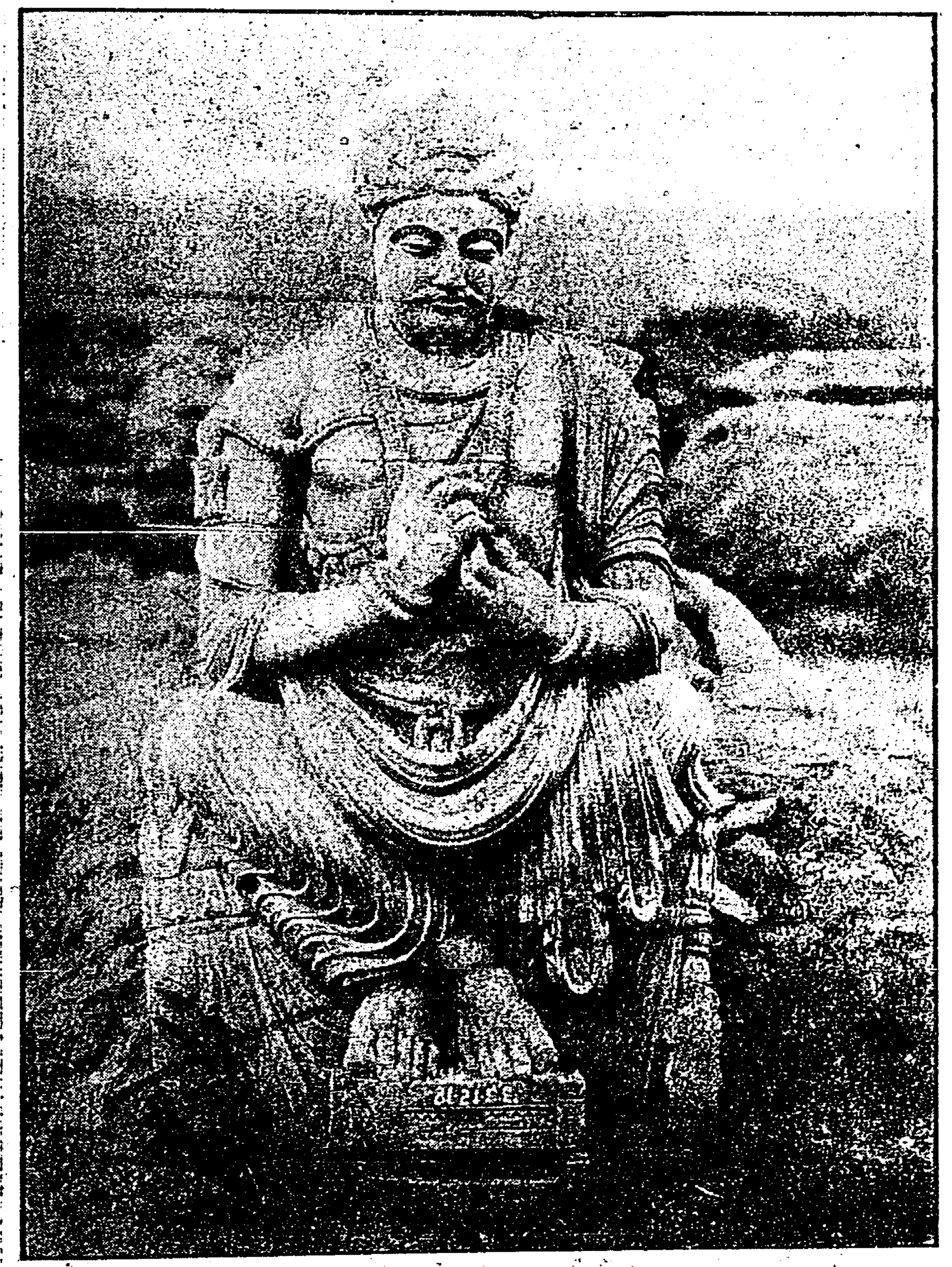

অবলোকিতেশ্বর

আসিতে হইত। গান্ধার তখন চতুঃষষ্টিকলার নিত্যলীলা-নিকেতন ছিল। হিন্দুযুগে গান্ধার একদিকে যেমন শৌর্য্য-বীর্য্যের দৃষ্টান্ত ছিল, পক্ষান্তরে শিল্পকলা-নৈপুণ্যেও ইহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। গান্ধার, গৌতম বুদ্ধের 'দন্ত' স্বীয় বক্ষে ধারণ করিল। রাজা অশোক পুষ্কলাবতীর নিকট দুইটী স্তূপ রচনা করিলেন। মহেন্দ্র এইস্থান হইতে 'উপসম্পদা' লাভ করিয়া সিংহলে যুগান্তর ঘটাইয়াছিলেন। কনিষ্ক গান্ধারের হৃদয়ের উপর মহা-স্তূপের বোঝা চাপাইয়া দিলেন। এইরূপে বৌদ্ধদিগের পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া জগতের হিতের জন্য গান্ধার আরও পাঁচশত বৎসর আপনার অক্ষয় জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞানরত্ন অবাধে বিতরণ করিতে লাগিল। যুগল-সহোদর অসঙ্গ ও বসুবন্ধু।—গান্ধারের দুইটী উজ্জ্বল মণি—ভারতের বৌদ্ধদের শিরোমণি হইয়া গান্ধারের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বসুবন্ধুর যোগ্য শিষ্য দিঙ্নাগ ন্যায়-শাস্ত্রের আলোচনায় অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। তা'রপর কত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে। মুসলমানগণ তাহার সকল গৌরবের উপর যবনিকা ফেলিয়া দিয়াছে। তা'রপর? তা'রপর এখন গান্ধার—তমসাচ্ছন্ন—পূর্ব্ব-স্মৃতির শ্মশান জাগাইয়া বসিয়া আছে। তার মান-

সম্ভ্রম, গৌরব সকলই গিয়াছে। দারুণ দুরবস্থার দিনে কে তাহার সংবাদ লইবে?

কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে ফুশে প্রভৃতি দুই চারিজন পণ্ডিত গান্ধারে কতকগুলি মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাদিতে গান্ধার-স্থাপত্যের বহু

বোধিসত্ত্ব

ধ্যান-নিরত বুদ্ধ

প্রশংসা করেন। সম্প্রতি ফরাসী-পণ্ডিত ফুশে গান্ধার-স্থাপত্যের উপর একখানি গ্রন্থও রচনা করিতেছেন। ১৯০৬-৭ এবং ১৯১০-১১ সালে ডাক্তার স্পুনার গান্ধারের দুইটী স্তূপ খননপূর্ব্বক বৌদ্ধকীর্ত্তির বহু নিদর্শন আবিষ্কার করিয়া ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন

মৈত্রেয়

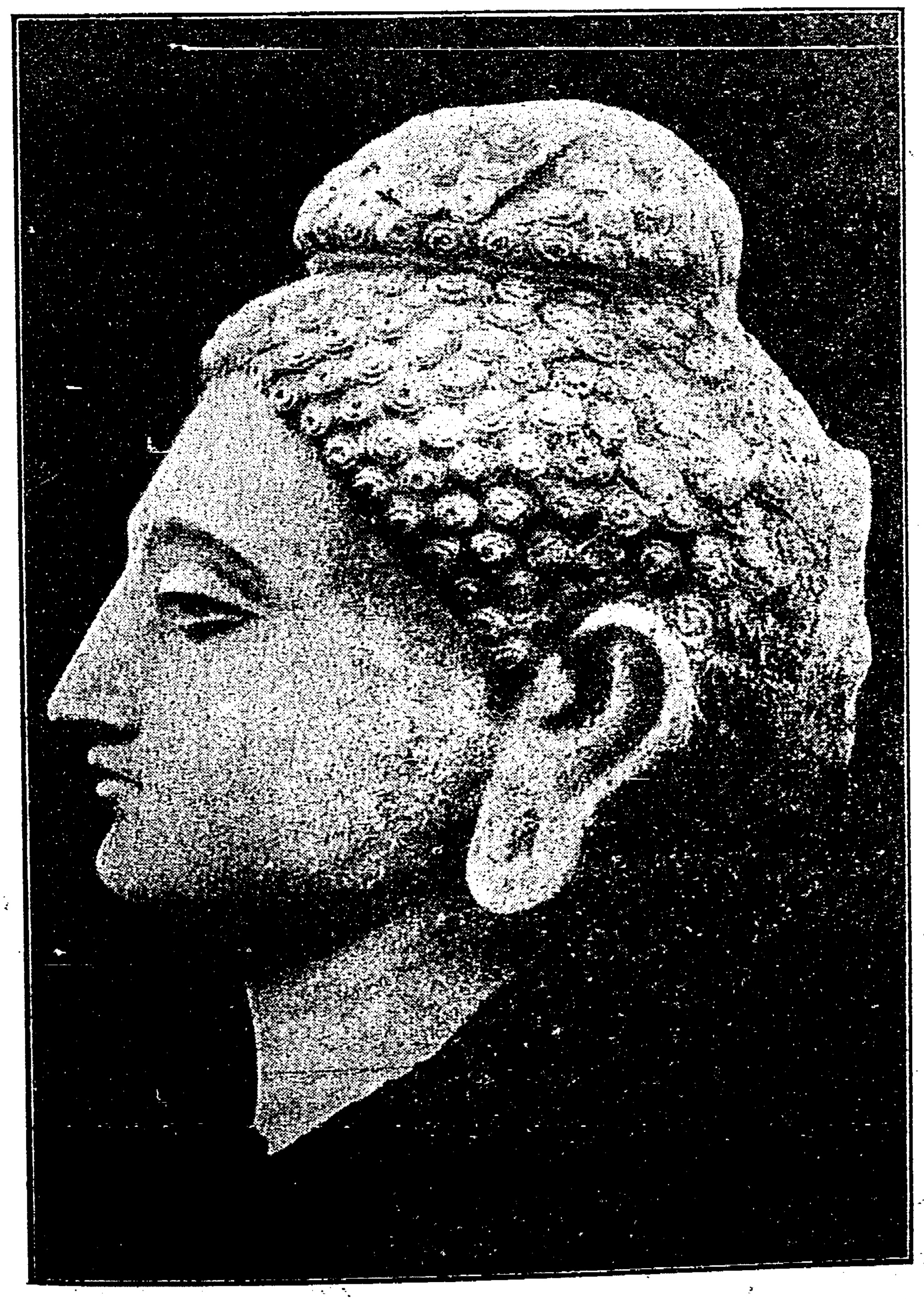

গান্ধারে গ্রীক্-পদ্ধতিক্রমে ঘোষিত মুখ

হইয়াছেন। ১৯১১ সালে গান্ধারে অবস্থানকালে স্যর ঔরেল ষ্টাইন ইহার প্রাচীন কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া পুরাকীর্ত্তি নিদর্শনের আবিষ্কার-কল্পে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। 'তখ্‌তে বাহি'র দক্ষিণে 'সহরে-বলোল' নামক স্থানে তিনি খনন-কার্য্য আরম্ভ করেন। ফলে, অনেকগুলি বৌদ্ধ কীর্ত্তির আবিষ্কার হইয়া পড়ে। তিনি স্থানে স্থানে খনন করিয়া বৌদ্ধদিগের উপাসনা-স্থানের ধ্বংসাবশেষ বাহির করিয়াছেন। ষ্টাইনের মতে এইগুলি কুষণদিগের সময় হইতে শ্বেত হূনদিগের সময় পর্য্যন্ত বরাবরই উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে তিনি অনেকগুলি গান্ধার-স্থাপত্যের নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইনি স্তূপের মধ্য হইতে অনেকগুলি মুদ্রাও পাইয়াছেন। ৬৭টী মুদ্রা পরিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ৪টী মাত্র মুদ্রা পাঠ করিতে পারা গিয়াছিল। তিনটী মুদ্রা কুষণ-রাজদিগের। স্থাপত্যের যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেগুলির অধিকাংশ মধ্য-গান্ধার যুগের। স্থাপত্যে নগ্নমূর্ত্তি প্রায়ই দেখিতেই পাওয়া যায় না। এমন কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকমূর্ত্তিও বস্ত্রাচ্ছাদিত। সমস্ত মূর্ত্তিগুলিতেই একটী মনোরম শ্রী ও সৌন্দর্য্য আছে। মূর্ত্তিগুলি যে খুব প্রাচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ষ্টাইন সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, সহরে-বলোল নিতান্ত প্রাচীন স্থান। ইহা কত প্রাচীন তাহা বলিবার উপায় নাই। তবে যে সময় গান্ধারের বৌদ্ধগণ বিদেশীয় পদ্ধতি দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত না করিয়া বরং অবাধে বিদেশীয় বিশিষ্ট প্রণালীর সম্যক্ সমাদর

অবলোকিতেশ্বর

করিতেন, অন্ততঃ সেই সময় হইতেই গান্ধার দেশ স্থাপত্যের মর্য্যাদা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ষ্টাইন সাহেব যে মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে কতকগুলি মূর্ত্তিতে গ্রীক্-পদ্ধতির যথেষ্ট অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্বে যে চিত্রটীর মুখ দেওয়া হইল, তাহা গ্রীক্-পদ্ধতির অবিকল অনুকরণ বলিতে পারা যায়। ষ্টাইন সাহেবের অনুমান যে, মূর্ত্তিটীর শিরোভূষণ অবলোকিতেশ্বরের উষ্ণীষের অনুকরণে খোদিত। ষ্টাইন বলেন "I should myself be inclined to put this type of headdress with pronouncedly Hellenistic motifs, back nearly to the true Bactrian period of Gandhara art in its origins, and as Avalokitesvara is one of the oldest of the Bodhisattvas, and the form of his head-dress conventionalized & stereotyped at a somewhat later date is only a variation of this type, I see no difficulty in identifying the are present figure with this divinity."

এখানে আর একটি গ্রীক্-পদ্ধতি-অনুকারী চিত্র দিলাম। গান্ধারবাসিগণ এরূপ মুখের অনুকরণ বেশ পছন্দ করিত। সম্প্রতি এই প্রকারের অনেকগুলি মূর্ত্তি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে চারিটী বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তির চিত্র দিয়াছি, তন্মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তিতে গ্রীক্-পদ্ধতির কথঞ্চিৎ ছায়া পরিলক্ষিত হয়। অপর তিনটী বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি সম্পূর্ণ গান্ধার-রীতি-অনুসারে খোদিত। আগামী সংখ্যায় গান্ধার-স্থাপত্য-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীহৃষীকেশ মিত্র

সাহিত্য-সংবাদ

নবাবিষ্কৃত অশোকের অনুশাসন

১০ই আগষ্ট তারিখের "মাদ্রাজ মেলে" প্রকাশিত হইয়াছে যে, হাইদ্রাবাদ ষ্টেটে, সুবিখ্যাত বৌদ্ধ-সম্রাট্ অশোকের আর একটি প্রস্তর-খোদিত অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের ধৌলী ও জৌগদা নামক স্থানে এবং মহীশূর রাজ্যের সিদ্ধপুর নামক স্থানে অশোকের তিনটি শিলালিপি রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান শিলাখণ্ড হুটি মাইনস্‌এর খুব নিকটেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। "মাদ্রাজ-মেলে" প্রকাশ যে, কতকগুলি লোক স্বর্ণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহা দেখিতে পায় ও সাধারণ্যে ইহার স্থায়িত্ব সংবাদ প্রচার করে। ইহাদিগের মধ্যে একজন, কিছুদিন পূর্ব্বে, একদিন হঠাৎ একটি পর্ব্বত-গাত্রে 'পুরাণ' ধরণে লিখিত, কতকগুলি অক্ষর-সন্নিবিষ্ট যেন একটা পদার্থ দেখিতে পায়; সেটা যে কি পদার্থ, তাহা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তাহার বিশেষ আগ্রহ হয়। সে তাই সেইস্থানে গিয়া উহার কতকগুলি নকল লইয়া আসে। এই সকল নকল সে 'অফিসিয়েটিং গবর্ণমেণ্ট এপিগ্রাফিষ্ট ফর ইণ্ডিয়া', রাও সাহেব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রীর নিকট প্রেরণ করে। রাও সাহেব, আবিষ্কৃত বস্তুর প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ উক্তস্থানে যাইবার জন্য হাইদ্রাবাদ ও মহীশূরের রাজ-সরকারের নিকট আদেশ-প্রার্থনা করেন। আদেশ মঞ্জুর হইলে, তিনি কয়েক দিবস মধ্যেই উক্তস্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। এস্থানে পৌঁছিয়া যখন তিনি সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তখন শিলালিপিটী যে মহারাজ অশোকের তাহা আরও বদ্ধমূল হইল। যে সামান্য স্থানে এই শিলাখণ্ডের আবিষ্কার হয়, সে স্থানটী সুবর্ণ-পর্ব্বত পরিবেষ্টিত রায়চর হুটি নামক স্থানের অতি নিকটেই অবস্থিত। অল্পদিন মধ্যেই রাও সাহেব কৃষ্ণ শাস্ত্রী সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। তিনি শীঘ্রই মাদ্রাজ-গবর্ণমেণ্টকে এই আবিষ্কার-সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত বিবরণী প্রদান করিবেন। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ মিঃ নিউইস্ রাইস্ ১৮৯২ খৃঃ অব্দে এইরূপ একটী শিলালিপির শেষ আবিষ্কার করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ আনন্দবর্দ্ধন ও উপকারসাধন করিয়াছেন।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ১৬ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্থাপত্যে গান্ধার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয়, চতুর্থ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্ম্মের একটা প্রবল তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। একে ভারত ধর্ম্মপ্রবণ ভূমি, তাহার উপর বৌদ্ধধর্ম্মের যে বিপুল বন্যা প্রবাহিত হইল, তাহাতে উত্তর-ভারত একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। গান্ধার হিন্দু-রাজত্ব,

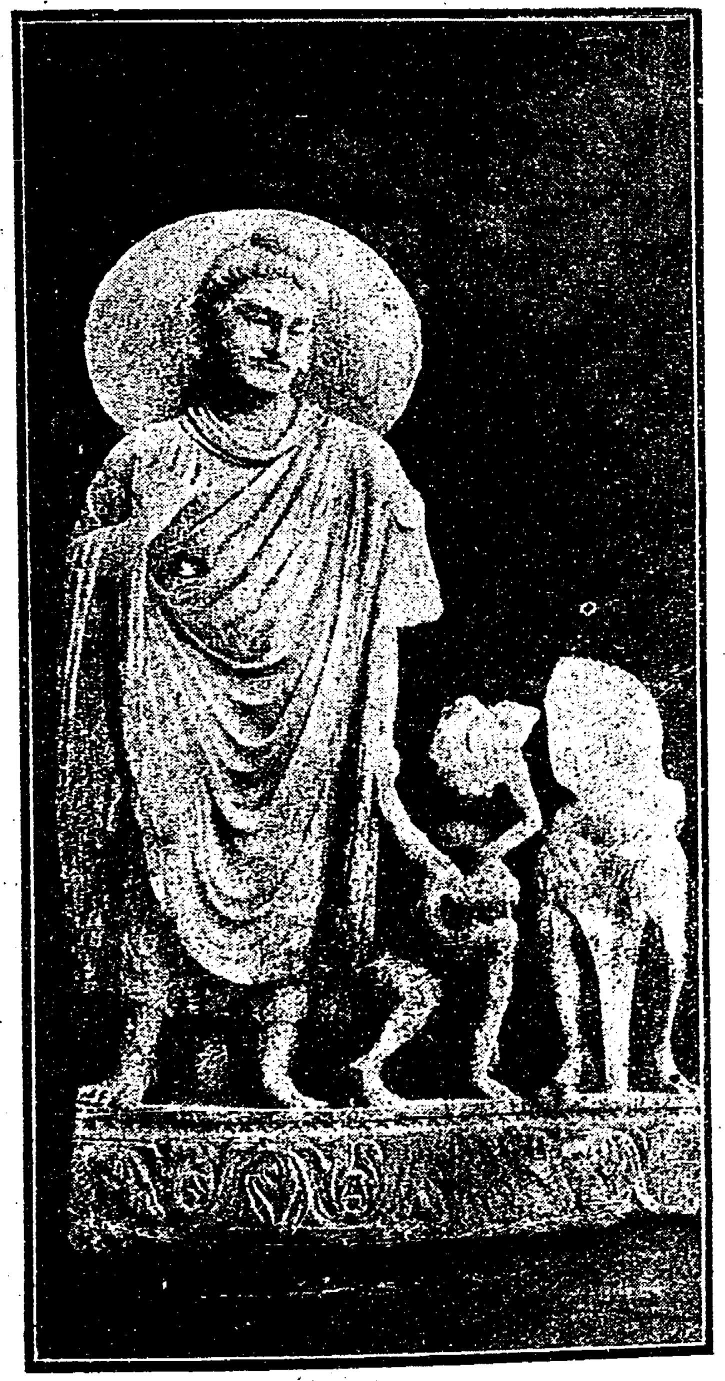

বুদ্ধ ও ব্রাহ্মণযুগল

তথাগত

বরাবরই জ্ঞান-বিস্তারের জন্য সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। ধর্ম্ম মাত্রেরই তুইটী শত্রু—এক প্রবল বিরোধী ধর্ম্ম, দ্বিতীয় জ্ঞান-বৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিস্তার। হিন্দু-ধর্ম্মের সম্বন্ধে এ উভয়বিধ শত্রুরই অভাব ছিল। এ পর্য্যন্ত এমন কোন ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত নাই, যাহা হিন্দুধর্ম্মের যথাযোগ্য ও প্রবল শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। কেন না, অন্য কোন ধর্ম্মই এমন বহুচিন্তা-প্রসূত, শত-ধৌত, শত-সংস্কৃত নহে! শতধৌত, শতমার্জ্জিত বলিয়াই এই মহিমময় ধর্ম্মের নিকট প্রবল বৌদ্ধধর্ম্মও পরাজিত হইয়াছে; কিন্তু, গান্ধারের তৎকালীন অবস্থানুসারে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম কিছুকালের জন্য গান্ধারকেও সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। গান্ধার চিরকালই জ্ঞানের পূজা করিয়া আসিয়াছে। গান্ধারবাসিগণ বাণিজ্যাদি ব্যপদেশে গ্রীকৃদিগের সংসর্গে আসিয়া তাঁহাদের নিকট যাহা শিক্ষিতব্য মনে করিয়াছিলেন, তাহা অবাধে সানন্দে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। গান্ধারবাসিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের

প্রভাবে একদিকে যেমন বুদ্ধোপাসনায় প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনই গ্রীক্-শিল্পের মোহন মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে হিন্দু-স্থাপত্য তাহাদের চিরাগত প্রথায় খোদিত হইতে লাগিল, কিন্তু বৌদ্ধব্যাপারগুলি তাহারা নূতন ছন্দে গ্রীক্-প্রণালীর ছায়াবলম্বনে অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিল। গান্ধারবাসী গুণের আদর বুঝিত—বুঝিত বলিয়াই সে বৌদ্ধদের সহস্র উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিল, বুদ্ধের পূজা করিয়াছিল; কিন্তু পরে আপনার হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়াছিল। তাহার ধর্ম্ম শত সংস্করণে সংস্কৃত, শত সংঘর্ষে দৃঢ়ীকৃত, শত বিচারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং শত পরীক্ষায় পরীক্ষিত; তাই পরিশেষে তা'র পুরাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইল। তাহার ধর্ম্ম, তত্ত্ব-জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার বিরোধী ছিল না, পরন্তু জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহ দিয়াই আসিয়াছে। তাহার ধর্ম্ম অনন্ত জ্ঞানের আকর : যে যে রত্নের অন্বেষণ করিবে, এ রত্না-

শ্রমণবেশ বুদ্ধ

করে সে তাহাই পাইবে। গান্ধারের ধর্ম্মের একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহার ধর্ম্ম কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে নাই, কাহারও চোখে ধূলা দেয় নাই, কাহাকেও অন্ধ করিয়া রাখিতে চাহে নাই, গান্ধারের এই ধর্ম্মভাব তাহার স্থাপত্যে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে। গান্ধারের সব গিয়াছে, কিন্তু নবাবিষ্কৃত স্থাপত্য তাহাকে চিরজীবিত করিয়া রাখিয়াছে। যদি তাহার ধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে চান, তাহা হইলে তাহার স্থাপত্য অনুশীলন করুন, স্তরে স্তরে তাহার সকল অবস্থার ইতিহাস হৃদয়-মুকুরে অঙ্কিত করিতে পারিবেন। যতই গান্ধার-স্থাপত্যের আলোচনা করা যায়, ততই তা'র গৌরব বাড়ে বই কমে না, মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হয় বই মলিন হয় না। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-মহিমা যে দেশ-দেশান্তরে

জিনভগবান্

বিকীর্ণ হইয়া পড়িবে, তাহার আভাস এখনই পাওয়া যাইতেছে। এখনই বৈদেশিক মনস্বিগণ ইহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। গান্ধার-স্থাপত্যের পরিচয় আর কি দিব? যিনি স্বয়ং দর্শন করিয়া নয়ন-সার্থক না করিয়াছেন, তিনি এ স্থাপত্যের কিছুই বুঝিবেন না। এ কয় বৎসর ধরিয়া স্থাপত্যের কত নিদর্শনেরই আবিষ্কার হইল। কত নূতন তথ্যের নব সন্ধানের পরিচয় মিলিল, তাহা অনুসন্ধিৎসু মুষ্টিমেয় প্রতীচ্য ও প্রাচ্য বিশেষজ্ঞই অবগত আছেন; সাধারণে তাহার খবর রাখে না।

ভারত-স্থাপত্যের সর্ব্বত্রই একটি মূল কথা পাওয়া যায়—ধর্ম্মকে সে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্থাপত্য আদিযুগে ধর্ম্মপ্রধান হইলেও, ধর্ম্মপ্রাণ নহে। ধর্ম্ম ছাড়া মানব-জীবনের অন্যান্য দৃশ্য, মানব-হৃদয়ের অন্যান্য বৃত্তি লইয়াও বিদেশীয় কলাবিদ্গণ আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের শিল্পিগণ বেশ ভালরকমেই জানিতেন যে, ধর্ম্ম ভিন্ন তাঁহাদের অন্য গতি নাই। একমাত্র ধর্ম্মের বাতাসেই তাঁহাদের সাধনা-মুকুল পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল; মানব-জীবনের সকল বৈচিত্র্য, সকল দিক্, সকল কথা তাঁহারা তাই গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া তাই তাঁহারা এ প্রলোভন অনায়াসেই সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন। গান্ধার-শিল্পে বিদেশীয় ভাব থাকিলেও, গান্ধারের শিল্পিগণ বিদেশীয় কলাবিদের বৈচিত্র্যাভিলাষী চঞ্চল হৃদয়কে অনুকরণ করেন নাই। স্বদেশের, স্বজাতির আদর্শ বজায় রাখিয়া, বিদেশ হইতে তাঁহারা যেটুকু গ্রহণীয়, কেবল সেইটুকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুধুই

যে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু, গ্রহণ করিয়া তাহার উপরে ভারতবর্ষের ছাপ্ মারিয়া দিয়াছিলেন। এইখানেই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। ভারত, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে পা বাড়াইলেও, আপনার বিশেষত্ব, আপনার নিজস্ব, আপনার ধর্ম্মকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না।

গান্ধারের ধ্বংস-স্তূপে শত শত বুদ্ধ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের কোনটি উপবিষ্ট, কোনটি শায়িত, কোনটি দণ্ডায়মান; কেহ যোগমগ্ন, কেহ নিমীলিতনেত্র, কেহ উপদেশদানরত; কাহারও মুখে প্রভাতের মত প্রসন্ন হাস্য, কাহারও মুখে সন্ধ্যার মত শান্ত ভাব, কাহারও মুখে স্তব্ধ রজনীর মত স্থির গাম্ভীর্য্য; কাহারও বিশাল দেহ অনাবৃত, কিন্তু অলঙ্কাররম্য, কাহারও দেহ সুন্দর ও কুঞ্চিত বসনে শোভিত, কাহারও দেহ বহুদিনের, বহুবর্ষের অনশনে ও কৃচ্ছ্রসাধনে ক্ষীণ---প্রকটাস্থি।--এই এক বুদ্ধ-মূর্ত্তির মধ্যেই গান্ধারের শিল্পী যত রূপের, যত ভাবের বৈচিত্র্য সম্ভব, তাহা দেখাইতে কোন ত্রুটি করেন নাই এবং বিষয় এক বলিয়া বৈচিত্র্যের জন্য তাঁহাদিগকে কখনই চিন্তা করিতে হয় নাই। মূর্ত্তি যখন বুদ্ধদেবের, তখন বুদ্ধের যাহা প্রধান ভাব—ধর্ম্মভাব, এই সকল মূর্ত্তিতে যে তাহারও অভাব নাই, একথা বলা বাহুল্য। আর, এই ধর্ম্মভাব ফুটাইতে গান্ধারের শিল্পিগণের যে কতটা কৃতিত্ব ছিল, ভাষায় তাহা বর্ণনা করা যায় না। বাটালির একটি আঘাতে, পাথরের উপরের দু'-চারিটি রেখা টানিয়াই এখানে ধর্ম্মের এমন স্বর্গীয়তা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যে, দেখিলে আপনাকে

মৈত্রেয়

মৈত্রেয়

ভুলিতে হয়, সংসারের জ্বালা-ঝঞ্ঝাট ভুলিতে হয়, পৃথিবীর শত পাপকে ভুলিতে হয় এবং সব ছাড়িয়া অভিভূত হৃদয়ে কেবল এক কামনাই জাগিয়া উঠিতে থাকে যে, যুগ যুগ ধরিয়া যেন ঐ প্রাণময়ী পাষাণ-মূর্ত্তির চরণেই মাথা লুটাইয়া পড়িয়া থাকি!

গান্ধার-শিল্পের আর একটি বিশেষত্ব আছে। ভারতের অন্যান্য স্থানের শিল্প-কার্য্যে স্বাভাবিকতার একেবারে অভাব না থাকিলেও তাহা দুর্লভ; গান্ধারে সেই স্বাভাবিকতা অত্যন্ত সুলভ। পণ্ডিতেরা বলেন, গান্ধার-শিল্পের এই অসাধারণ স্বভাবানুগামিতা পাশ্চাত্য—অর্থাৎ গ্রীক্-প্রভাবের ফল। এই মত কতটা ঠিক বা অঠিক, এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে গান্ধারের শিল্পিগণ যে প্রাকৃতিকতার একান্ত অনুরাগী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল অনুরাগী ছিলেন বলিলেই তাঁহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা হয় না;—তাঁহারা প্রকৃতির বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা স্বভাবের—শরীর-বিজ্ঞানের (anatomy) সমস্তই জানিতেন। এমন কি, এক একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তিতে মাংসপেশীর সংস্থান ও দৈহিক গঠন এতটা স্বভাবসঙ্গত ও নিখুঁত যে, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এ যেন পাষাণের মূর্ত্তি নহে—এ যেন রক্ত-মাংস-দিয়া-গড়া জীবন্ত মানবের মূর্ত্তি! বুদ্ধদেবের অঙ্গধৃত বসনের ভাঁজগুলিও এতটা চমৎকার যে, তাহা ছায়ালোকপাতে আসল কাপড় বলিয়াই ভ্রম হয়।

শ্রীহৃষীকেশ মিত্র

জীবন-সংগ্রামে

হৃদয়ে হৃদয়ে হের চির যুগ যুগ ধরে'
চলিতেছে একি অভিনয় !
কেহ কাঁদে, কেহ হাসে, কেহ ওঠে, কেহ পড়ে,
কা'র জয়, কা'র পরাজয় !
বলী চলে আগুসরি, পিছে থাকে দীন—
জগৎ-নাটকে এযে ভূমিকা কঠিন !

কেগো, চিতা-ভস্ম মেখে পড়ে' আছ বেঁচে-মরে',
ঈশ্বরেতে নাহিক বিশ্বাস !
হা বিরাগী, বুঝি তব বালুকার খেলাঘরে
মহাকাল ফেলেছে নিঃশ্বাস ?
বৃন্ত-ছেঁড়া পুষ্পহার শুষ্ক হোক্ ভূমে,
মালা গাঁথ, মালা গাঁথ, নবীন কুসুমে।

একি রাত্রি ! একি ঝঞ্চা ! পুঞ্জমেঘ ভস্মমাথা
অন্ধ সৃষ্টি, পড়ে বৃষ্টিধার,
যেন কোন অশরীরী অন্দোলিয়া বৃক্ষশাখা—
কেঁদে করে বিশ্ব তোলপাড় !
ভেব'না ব্যাকুল আত্মা ! ঘুমাও অঘোরে—
সূর্য্যোদয় হবে ফের কল্যকার ভোরে।

উঠ বন্ধু, প'ড়োনাক' শুষ্কপ্রাণে নুয়ে' নুয়ে'
দীর্ঘ পন্থা—নাহি বিন্দুনীর ?
মিছা কান্না ওরে শ্রান্ত, তাপপাণ্ডুতটে শুয়ে—
লবণাক্ত এযে সিন্ধু-তীর !
আছে দূরে স্রোতস্বতী,—হিল্লোলের খেলা,
উঠ, ভানু অস্তমান, আসে সন্ধ্যাবেলা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

যশোহর-খুলনার ইতিহাস *

কিছুদিন হইল, এই অমূল্য গ্রন্থখানি উপহার পাইয়াছি এবং পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার সতীশবাবু, এই গ্রন্থ সঙ্কলন-কল্পে কিরূপ সাধ্যমত পরিশ্রম করিয়াছেন, কিরূপ ভূয়োদর্শনের পরিচয় দিয়াছেন, যিনি এই গ্রন্থ না পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকে কি করিয়া বুঝাইব ?

উপন্যাস-নবন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশে যে এখন ধীরে ধীরে সু-বাতাস বহিতেছে—জননী জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় দিবার জন্য বা পাইবার জন্য অনেকে ব্যগ্র হইয়াছেন—তাহা আমাদের বড় আশার—বড় আনন্দের ও বড় গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। সুযোগ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় জননী জন্মভূমির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তিনি স্বাস্থ্য ও অর্থ-সঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া জন-মানবহীন দুর্দ্ধর্ষ হিংস্র ব্যাঘ্র ও বিষধর-সর্পাদির স্বচ্ছন্দ-লীলাভূমি সুন্দরবনের দুর্গম জঙ্গলে যে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া মহাবীরের ন্যায় যেরূপ অনুসন্ধানে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বঙ্গবাসী বিস্ময়-বিমুগ্ধ হৃদয়ে সেরূপ কৃতকার্য্যের অবশ্যই প্রশংসা করিবেন। আমি তাঁহার এই উপাদেয় গ্রন্থের প্রথমাংশ—সুন্দরবনের পরিচয়-প্রসঙ্গেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। বলিতে কি, এই অংশই তাঁহার পুস্তকের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। বলিতে কি, তৎপূর্ব্বে কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য কোন মনীষীই এরূপভাবে গবেষণা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হন নাই। বলিতে কি, তাঁহার এই অংশ পাঠ করিয়া সুন্দরবনের ভূ-তত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন জ্ঞানলাভ করিয়াছি। এজন্য সতীশবাবু এবং এই সঙ্গে তাঁহার সুন্দরবনের কাণ্ডারী রায়-সাহেব নলিনীকান্ত রায়-চৌধুরী মহাশয়ও আমাদের বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

এই উপাদেয় ইতিহাস হইতে আমরা সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিবরণী ও উত্থান-পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যেরূপ পাইয়াছি, সেরূপ আর কোথাও পাই নাই। এই অংশে গ্রন্থকার ১১৯ পৃষ্ঠায় বুঝি সহস্র পৃষ্ঠার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ আবার দুইখণ্ডে বিভক্ত—হিন্দু-বৌদ্ধ-যুগ ও পাঠান-রাজত্ব। হিন্দু-বৌদ্ধ-যুগে যশোহর-খুলনার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই যুগ-কাহিনীর মধ্যেও তিনি আদি হিন্দু-যুগ, জৈন-বৌদ্ধ যুগ, গুপ্ত-সাম্রাজ্য, পর্য্যাটকের কথা, পালবংশের অভ্যুদয়ের কথা, কোথায় কোথায় বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম ছিল, তাহার কথা, সেনবংশের উত্থান-পতনের কথা এবং বঙ্গের বিভিন্ন সমাজের কথা আলোচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালার ইতিহাসের এই অংশই নিতান্ত কণ্টকাকীর্ণ ও তর্কসঙ্কুল। গ্রন্থকার, সেই অতীতের অন্ধকারে আলোকপ্রদর্শনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণার ফলে কোথাও ঘন-ঘোর বিদূরিত হইয়া উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি-পাতের সূচনা হইয়াছে, কোথাও বা অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি বলিতে কি, তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব-আলোচনার অল্পদিন হইতে সূত্রপাত হইয়াছে; সুতরাং যে যে স্থানে পুরাতত্ত্ব উদ্ধারের এখনও উপযুক্ত আয়োজন হয় নাই, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পদে পদে যে আমাদিগকে ভ্রান্তি-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি ?

গ্রন্থকার পাঠান-রাজত্ব-সময়ের যশোহর-খুলনার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনেক নূতন কথা ও যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় পাইয়াছি। গ্রন্থমধ্যে ছয়খানি সুন্দর মানচিত্র ও উনচল্লিশখানি চিত্র শোভিত থাকায়, গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা, মিত্র মহাশয় নীরোগ থাকিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করুন। আমরা তাঁহার দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

* শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র বি, এ, প্রণীত,—১ম খণ্ড, প্রকাশক চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৩, কলেজ স্কোয়ার, মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র।

বঙ্কিমের উপন্যাসে হাস্য-রস

সাহিত্য ও সংসারে যে কয়টি রস আছে, প্রধান যাহাই হউক, হাস্য-রস যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং আদৌ উপেক্ষণীয় নহে, এ কথা বলিতে বেশী সাহসের আবশ্যক হয় না। সে হাস্য-রস-রচনায় যাঁহারা সাফল্য-লাভ করিয়াছেন, সাহিত্যে তাঁহাদের স্থান অস্থায়ী নহে। সংসারের পক্ষেও এ কথা খাটে। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা বলিতে পারি, গোপাল ভাঁড়ের নাম এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কতটা নিজস্ব হইয়া গিয়াছে। অবশ্য আমরা গোপাল ভাঁড়ের রসিকতার প্রশংসা বা সমর্থন করিতেছি না; সুতরাং শিহরিয়া উঠিবার কারণ দেখি না। তবে, রসিক ব্যক্তিরা কেমন স্বচ্ছন্দে সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন, কেবল তাহারই উল্লেখ করিলাম।

মনে হয়, ইংরেজী উপন্যাস-সাহিত্যে ডিকেন্স্ সে পথে প্রধান পথিক। রস-রচনায় তাঁহার সমকক্ষ লেখক য়ুরোপীয় সাহিত্যাকাশে কয়জন উদিত হইয়াছেন কি হন নাই, তাহার প্রমাণ ঐতিহাসিক দিতে পারেন; কিন্তু চার্ল্‌স্ ডিকেন্সের রসিকতা যে ভুবনবিখ্যাত, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

আমাদের দেশের সাহিত্যে যাঁহারা রস-রচনায় অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও নাট্যকার দীনবন্ধু অগ্রগণ্য। অধুনা বঙ্গসাহিত্যে অনেক রসিক লেখক ও কবির আবির্ভাব হইয়াছে। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবিতায় ও সঙ্গীতে হাস্য-রসের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়া গিয়াছেন; নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুও সেই কারণেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অন্যান্য লেখকের (রসিকের) রসিকতা—রসিকতা কি না, তাহা আমার অপেক্ষা কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির বিচার্য্য।

কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের যে যুগ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা আলোকিত হইয়াছিল, অনাবিল ও শ্লীল হাস্য-রস সে সময় ছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদের দেশের কোন শ্রেষ্ঠ কবি যে 'উচ্চাঙ্গের রসিকতার সৃষ্টিকর্ত্তা' বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জন-দোষে দুষ্ট নহে। বঙ্কিমের রসিকতা অতীব তীব্র হইলেও, তাহা গ্রাম্য নহে; অশ্লীল নহে; তাহা ভাঁড়ামি নহে; 'ভেঙ্গচানি'ও নহে—তাহা রসিকতা।

উপন্যাসে—কথায়, ভাবে, ভাষায় বঙ্কিম রস ফুটাইতেন, অথচ কোন রচনাই অস্বাভাবিক বা অসহনীয় নহে;—ইহাই বঙ্কিমের নিজস্ব ও বিশেষত্ব। আজকাল উপন্যাসে উদ্ভট্ হাস্য-রস কোথাও কোথাও এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, উপন্যাস ত দূরের কথা, সেই সকল রসিকের নাম শুনিলেই পাঠকের মনে হাস্য-রসের উদ্রেক হয়। জানি না, সে কি রস। তাহা কি হাস্য ? চার্ল্‌স্ ডিকেন্সের মত রসিকতা আজকাল ইংরেজী উপন্যাসে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়; বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট প্রকৃত হাস্য-রসের তুলনা আজকাল একেবারেই দুর্ল্লভ! বোধ হয়, ছোট গল্পে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনকার মধ্যে এদিকে প্রধান রথী।

আমার এ প্রবন্ধে আমি 'লোক-রহস্য,' 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'কমলাকান্ত' লইয়া আলোচনা করিব না; 'মুচিরাম'ও সেই পর্য্যায়ে পড়িয়াছে—কেবলমাত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে যে-কয়খানি রসপ্রধান, সেইগুলিরই একটু-আধটু আলোচনা করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। ভরসা আছে, সফল না হইলেও এ সান্ত্বনা আমি পাইব যে, সমুদ্র-গর্ভে রত্নান্বেষণে কত ডুবুরীই ত ডুব দেয়—কিন্তু কয়জনের অদৃষ্টে রত্ন মিলে !

(১) দুর্গেশনন্দিনী।

বঙ্কিমচন্দ্রের অল্প বয়সের প্রথম রচনা—'দুর্গেশনন্দিনী।' তাঁহার রসিকতা খুব জমাট বলিয়া মনে হয় না। যদিও লেখকের হাস্য-রসাবতরণ-জন্য 'সেখ-বাবু', 'খাঁ-বাবু',—পরিচয়-দান-কালে 'সেখ বিদ্যাদিগ্‌গজ' প্রভৃতি হাস্য-রসযুক্ত বাক্যাবলী পাওয়া যায়, তথাপি মনে হয়, অনেকাংশে সেগুলি 'হেটো' রসিকতা। অনেকে লোককে হাসাইতে না পারিয়া শেষে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া ও হাত-পা নাড়িয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। বিদ্যাদিগ্‌গজও সেই ধরণের লোক। তাহার রসিকতা বেশ প্রশস্ত (broad) নহে।

যখন 'দিগ্‌গজ হস্তভঙ্গীসহিত কহিলেন—

"যাবৎ মেরৌ স্থিতা দিবা—
যাবৎ গঙ্গা মহীতলে;
অসারে খলু সংসারে—
সারং শ্বশুর-মন্দিরম্।"

তখন কথাটা (শ্বশুরবাড়ী যে সার, এই কথা) ঠিক হইলেও, 'জগৎসিংহ' হাস্য-সংবরণ করিলেন। আমাদের মনে হয়, রাজপুত্র দুইটি কারণে হাস্য-সংবরণ করিয়াছিলেন:—(১) তাঁহার রসিকতা যা-তা ছেবলা-গোছের বলিয়া; (২) তাঁহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না। তথাপি তাঁহার মনের সে অস্থির গতির সময়েও তিনি হাস্য-সংবরণ করিতে পারিতেন না,—যদি দিগ্‌গজ গিরিজায়ার মত সাহস করিয়া হাসির কথা বলিতে পারিত।

দিগ্‌গজ যে 'রসিকরতন' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিমলা তাহার ঠিক নামই দিয়াছিল (আস্‌মানীও নামটা মনোনীত করিয়াছিল)। এই 'রসিকরতনে'র রসিকতা রমণী-সমাজেই ফুটিত ভাল; কিন্তু তাহাতে তাহাকে প্রেম-পীড়িত করিতে পারে নাই। আস্‌মানীকে না দেখিয়া 'রসিকরতন' বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল; আবার সংসারী লোক, তৈজস-পত্রগুলা যে ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছে, তাহাও সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। তাহার সেই প্রায়ান্ধকার, ধূম-মলিন গৃহের ভাঙ্গা ঘটি-বাটী ও মশলার কৌটাগুলির করুণ চিত্র তাহার মনের ভিতরে সকরুণ ভাবের উদ্রেক করিতে লাগিল। বিমলা যখন গজপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রসিক-রতন, কি ভাবিতেছ ?"

রসিকরতন বলিলেন,—"বলি, তৈজস-পত্রগুলা !"

বেচারার এই তৈজসের প্রতি স্নেহ-পরবশ-হৃদয়ের বিরহোচ্ছ্বাসে 'বিমলা উত্তর না দিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন।' অল্প বয়সেই বঙ্কিমচন্দ্র সূক্ষ্মদর্শী লেখক; তাই তিনি 'দিগ্‌গজ'-চরিত্র অস্বাভাবিক করিয়া তুলেন নাই। বিমলার কথার উত্তরে সে আস্‌মানীর বিরহ-বর্ণনা না করিয়া আপনার সাংসারিকতার পরিচয় দিয়াছে।

"ক্ষণকাল পরে বিমলা আবার কথা কহিলেন, "দিগ্‌গজ, তুমি ভূতের ভয় কর ?"

আর যায় কোথা! 'রাম, রাম, রাম-নাম বল'—বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইলেন।

একে পায়, আরে চায়। বিমলা কহিলেন—'এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।' দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন।

ব্রাহ্মণের ভয় বিদূরিত করিতে বিমলা কহিলেন—'রসিকরাজ, তুমি গাইতে জান?'

"রসিকপুরুষ কোথায় সঙ্গীতে অপটু?" দিগ্‌গজ যেই গীন ধরিলেন—'এ-হুম্ হুম্-উহুম্, সই কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যাম কদম্বেরি ডালে'—পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল। গাভী ত উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া চম্পট দিল, আর যেমন বিমলা কহিলেন—'গজপতি, (এবার আর রসিকরাজ নয়, 'তাহাকে দূর করিতে হইবে কি না) ইষ্টদেবের নাম জপ, বৃক্ষমূলে কি—দেখিতেছ?"

"ওগো বাবাগো"—বলিয়া দিগ্‌গজ একেবারে 'পগার-পার'; 'দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ,—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধক্রোশ পার।'

'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থে দিগ্‌গজ, আস্‌মানী ও বিমলা তিনজনেই রসিক। তবে সকলেই ভিন্ন রকমের। আস্‌মানীর রসিকতা—দুষ্টামির জন্য। সে এই দুষ্টামির জন্যই ব্রাহ্মণকে তাহার উচ্ছিষ্ট ভাত খাওয়াইয়াছিল এবং দিগ্‌গজকে বাঁদর-নাচ নাচাইয়াছিল। (ইহার মূলে যে শিক্ষাটি ছিল, দিগ্‌গজ তাহা লাভ করিতে পারে নাই; পারিলে তাহার অদৃষ্টে দুঃখভোগ কিছু কম হইত।) আর, দিগ্‌গজের রসিকতার কারণ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকট রহিয়াছে—সেই সকল দৃশ্য মনে করুন, দিগ্‌গজ যখন সংবাদ না দিয়াছে জগৎসিংহ তখন কিছুই জানিতে পারেন নাই,—পারিলে গ্রন্থও ভিন্নাকার ধারণ করিত। কেবল হিতার্থিনী, সদা-প্রফুল্লা, হাস্যময়ী বিমলার রসিকতা, অশ্রু ও ভাবের একটি বিশেষ ভাবান্তর। একটিকে চাপিতে আর একটি জাগিয়া উঠিত। তাহার ব্যঙ্গ, হাসি, রসিকতার মধ্যেও দুর্গেশ-নন্দিনী তিলোত্তমার মঙ্গলেচ্ছায় সে যত্ন-তৎপরা। তাহার হাসিও অধর-প্রান্তে একদিন শুকাইয়াছিল; হাস্যময়, চঞ্চল নেত্রে একদিন হিংসার জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কারণ, হাসির আড়ালে ব্যথাকে লুকান যায় বটে; কিন্তু ভোলা যায় না। যে মর্ম্মভেদী হৃদয়-জ্বালা বিমলা হাসির আবরণে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কতলু খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইতেই উছলিয়া পড়িল; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কতলু প্রেয়সীর অন্বেষণ করিবামাত্র, বিমলার সেই ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠ-স্বর শ্রুত হইল—'দাসী শ্রীচরণে'।—কিন্তু তখন 'দাসী শ্রীচরণে' নয়; কারণ, ক্ষণকাল পরেই স্বয়ং নবাব কতলু খাঁই বিমলার ছুরিকাঘাতে ছিন্নমূল বিটপীর মত বিমলার রাঙ্গা চরণে লুটাইয়া পড়িলেন!

বিমলার পরিবর্ত্তিত ও উচ্চ সংস্করণ (higher stan dard) দেখিতে হইলে,

(২) মৃণালিনীর

গিরিজায়াকে দেখিতে হয়। বেত্রাঘাতেও তাহার মুখের হাসি লুকায় নাই, অথচ সে বহুক্লেশ ভোগ করিয়া মৃণালিনীর কার্য্যে জীবন-যৌবন ব্যয় করিতেছিল। নিজমুখেই সে একদিন দিগ্বিজয়কে বলিয়াছে—'পরের জন্য মলেম'—এ কথা সে রাগে বলে নাই; সোহাগ করিয়া বলিয়াছিল।—হাসি তাহার প্রাণ ছিল; যেন সে হাসিতেই জন্মিয়াছিল, তাই হাসিয়াই আকুল; বুঝি হাসিতেই মরিবে। সে কথায় হাসিত, ভাবে হাসিত, ভঙ্গিমায় হাসিত, সকল অঙ্গে হাসিত। হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে।" সংসারে বীর ও রুদ্র-রসের অভিনেতাদের কি সুখ জানি না, দুঃখ অনেক দেখিয়াছি। শোক-তাপ-জীর্ণ সংসারে বাস করিতে আসা পর্ব্বত-গাত্রে চিত্র-খোদন করার মত। সেই অল্প সময়টুকু পূর্ণমাত্রায় উপভোগ যে না করিল, তাহার জীবন একেবারেই ব্যর্থ, বিফল। এ কথা আমি বলিতেছি না যে, শুধু হাসিয়াই জীবন ভোগ করা যায়; যদিও "হেসে নাও এ দু'দিন বৈ ত নয়"—কথাটা অতি প্রত্যক্ষ, তথাপি জীবনে যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করে নাই, সে মনুষ্যাধম। হাসির সঙ্গে কান্নার সম্বন্ধ এত নিকট। বাল্যকালে আমরা বলিয়া বেড়াইতাম—'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না!' 'রামসন্না'র বাণী কদাচিৎ বিফল হইতে দেখা গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গিরিজায়ার রূপের গর্ব্ব ছিল না, তাহার গৌরব হাস্য! নানাভঙ্গিতে সে হাসিয়াছে। বিপদেও সে পড়িয়াছে; কিন্তু বিপদের সময়েই করুণ-রস যেন তাহার বেশী করিয়া জাগিয়া উঠিত। হেমচন্দ্রের নিকট বেত খাইয়াই সে বলিয়া উঠিল,—'পুরুষ বটে!'

পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে, সে বেচারা সখী হইতেই জন্মিয়াছিল, হাসি ছাড়া তাহার আর পথ নাই; (বিদ্যারত্ন মহাশয় এ কথা বলেন নাই, সখী হওয়ার কথাই বলিয়াছেন) কিন্তু আমার মনে হয়, কোন এক সময়ে (মৃণালিনীর দুঃখের সময়ে) সে মৃণালিনীর গলা ধরিয়া কাঁদিলে, তাহাকে একটা দামী 'সার্টিফিকেট',—বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে দেওয়া যাইতে পারিত।

এখানে গিরিজায়ার প্রেমের কথা কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সখী হইলেও সে যে নারী! তাই প্রেম জিনিসটাকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সে দিগ্বিজয়কে ভালবাসিয়াছিল। গিরিজায়া স্থির করিল, দিগ্বিজয় তাহাকে ভালবাসে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। দিগ্বিজয় ঘরে লুকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া আছে। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্-দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আঃ ম'লো, ঘরগুলোয় ময়লা জমে' র'য়েছে দেখ,—এ কি! এক মিন্সে! চোর নাকি? ম'লো মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!" বলিয়া আবার সম্মার্জ্জনীর আঘাত! দিগ্বিজয়ের পিঠ ফাটিয়া গেল। সে বলিল—"ও গিরিজায়া, আমি! আমি!"

"আমি! আরে তুই বলিয়াই ত খাঙ্‌রা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।"—এই বলিবার পর আবার বিরাশী সিক্কা ওজনের ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

'ঝাঁটার বেগ আর থামে না। দিগ্বিজয় দেখিল, নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল।' গিরিজায়া শতমুখী-হস্তে তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

দিগ্বিজয়ের সন্দেহ হইল, গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে না। সন্দেহ হইবারই কথা। কিন্তু সে পোড়ারমুখী মৃণালিণীর কাছে গিয়া বলিল—"দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী, তাহা আমি জানিতাম না; এজন্য প্রভাতে আমি তাহাকে 'আচ্ছা করিয়া' ঘা-কত ঝাঁটা দিয়াছি। তা 'কাজটা' ভাল করি নাই।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন—"তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

গিরিজায়া কহিল—"ভিখারীর মেয়ের কি বিয়ে হয়?"

মৃণালিনী বলিলেন—"করিলেই হয়।"

গিরিজায়া কহিল—"তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব। আর কি করি?"

তখন—পূর্ব্বরাগ ঝাঁটার মুখে আরম্ভ হইলেও, বিবাহটা হিন্দুমতে হইল; মৃণালিনী তাহার গায়ে-হলুদ দিলেন।

সম্ভবতঃ পাঠক-পাঠিকাগণের বিলাতী রুচির পক্ষপাতিতা কল্পনা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র—

(৩) রাজসিংহ

উপন্যাসে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন—'বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসিবার কথা একটাও নাই, বহুকাল-সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—হে প্রাণ, হে প্রাণাধিক!—সে সব কিছুই নাই—ধিক্!'

ঔরংজীবের ন্যায় পাষাণ-হৃদয় বাদশাহও নির্ম্মলকুমারীর সরস বাক্-পটুতায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্য বোধ হয়, বঙ্কিমের এই ছিল যে, সকল হৃদয়ই রসের উৎসে উৎসারিত হইয়া উঠে। ঔরংজীব আপন মনে বলিয়াছিলেন—'এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না।' যিনি পৃথিবী-পতি বলিয়া ঘোষিত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব বিখ্যাত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি সেই অনাথা, নিঃসহায়া, অবলাকে 'পিয়ারী' বলিয়া বসিলেন। পরে সেই ক্রূরমতি নৃশংস বাদশাহ নির্ম্মলের 'ইম্‌লি বেগম' নামকরণ করিয়াছিলেন। (ইম্‌লি পশ্চিমদেশে তেঁতুলকে বলে শুনিয়াছি, যদি তাহা ঠিক হয়, খাট্টা-মিঠা-নির্ম্মলের নামটা ঠিক হইয়াছিল বলিতেই হইবে) তাহার বিদায়-কালে ঔরংজীব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন—"কেন যাইবে?……আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকে ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি।……তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নহ। যাই হৌক, আলম্‌গীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও চক্ষের কটাক্ষে কখনও বশীভূত হয় নাই। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না, ছাড়িয়া দিব।" নির্ম্মলকে বাদশাহ ভালবাসিয়াছিলেন। কেন বাসিয়াছিলেন, তাহা কি বলিতে হইবে? সৌন্দর্য্যে নয়—সাহসে! যৌবনে নয়—রসভাষে ও বাক্-চাতুর্য্যে! অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, 'যদি কোন রাজা—শিবাজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি—দিলির কি তকিয়ার, যদি কোন শাহজাদা—আজীম কি আকবর, এরূপ সাহসে, এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, ঔরংজীব তাহা সহ্য করিতেন কি না সন্দেহ।' কিন্তু সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে, রসিকতা করিতে হইলে সাহসের বেশীমাত্রার প্রয়োজন হয়—তাঁহাদের সে সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল কি না? এই জন্য বাদশাহকে বিশ্লেষণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"তিনি 'মার্ক-আন্তনি' বা অগ্নিবর্ণ না হইলেও, পাষাণ ছিলেন না; তিনিও মানুষ।"

নির্ম্মলকুমারী একটি বিচিত্র ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে বাদশাহকে দেখিবার আগে বলিয়াছিল—"আমি ঔরংজীবকে ভজিয়াছি, যেমন বিড়ালে ইন্দুর ভজে।" আর বাদশাহের সম্মুখেই বলিয়াছিল—"বাঘ পুষিবার সখ্ আমার মিটিয়াছে; বাদশাহকে বশ করিয়াছি।"

(৪) ইন্দিরা

বঙ্কিমচন্দ্র খুব ছোট কথায় হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি, একবার দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার রসালাপে কক্ষ হাস্য-মুখরিত করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকিলেও, কোন কারণে সে আলাপে যোগদান করেন নাই। অথচ দীনবন্ধুর কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন, এমন লোক কেহ ছিলেন না। হাসি চাপিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইল। দীনবন্ধু এক উপায় করিলেন; বঙ্কিমও শোধ লইলেন। তিনি একটা কি লিখিয়া আনিয়া দীনবন্ধুর পৃষ্ঠে আঁটিয়া দিলেন। রসিক দীনবন্ধু সকলের কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমায় বলে' দাও না গা, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ। তাই তা'র পিঠের কোথায় মশাটা-মাছিটা বসেছে, সে দেখ্‌তে পায় না।"

বঙ্কিম বলিলেন—"দেখতে পায় না বলে'ই ত আমরা তাহাকে হস্তিমূর্খ বলি।" ঘরশুদ্ধ লোক, এমন কি, দীনবন্ধু পর্য্যন্ত হাসিয়া আকুল।

গ্রন্থের প্রাণ হাসি। অবশ্য এ কথা আমি বলি না যে, উদ্ভ্রান্ত প্রেমে একজন জলধর কি একটা নিমচাঁদ থাকিলে ভাল হইত। তবে যে-সকল উপন্যাস বা গল্প বিশ্রামকালে পাঠ্য, সোজা কথায় যাহাকে শ্রান্তিনাশক (recreative) বলে, তাহার মধ্যে শুধু প্রেম, শুধু অশ্রু আর আত্মহত্যার ছড়াছড়ি থাকিলে, সে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের আত্মহত্যা করাই প্রশস্ত পথ। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সকল গ্রন্থে তিনি মনোরঞ্জন করিবার জন্য এ রসটুকুকে বিদায় দেন নাই। আজকাল যে সকল গ্রন্থকার সামরিক প্রথায় (military) গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁহারা সৈন্যসজ্জা বা কুচ-কাওয়াজ করাইবার সময় নায়ক বা নায়িকাকে একটু শান্ত (civil) করিয়া আঁকিলে মন্দ হয় না।

রসিকতা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কখন' পঙ্কিল পথে পা দেন নাই; তিনি আবিলতা পছন্দ করিতেন না। ইন্দিরা নিজেই বলিতেছে—'কামিনী কু-চরিত্রের লোক দেখিতে পারিত না।' আর একস্থলে বলিতেছে—"এ * পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু লোপ পাইয়াছে। ভালই হইয়াছে, কেননা, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটি চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম।"

রহস্যে বা ব্যঙ্গে তিনি কখন' অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন নাই। হারাণী হাসিয়া-হাসিয়া মরিতেছে, যেমন ইন্দিরা তাহার কাছে উ-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার প্রস্তাব করিল, অমনই সে গম্ভীর হইয়া পড়িল। সে পরিচ্ছেদটার নাম—'হারাণীর হাসি-বন্ধ।' সে ত আর জানিত না, যে উ-বাবু ইন্দিরার পরপুরুষ নয়, এই বলিল—'পারিব না।'

রহস্য-চিত্র অঙ্কিত করিতে ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার, বঙ্কিম তাহাই করিতেন। ইন্দিরার কাহিনীতে বামুন-ঠাকুরাণীর অভ্যুদয় একেবারে নিখুঁত ও সংসারে প্রতিনিয়ত যাহা ঘটে, তাহারই প্রত্যক্ষ ছবি। ইন্দিরার জীবন-কথা যখন রন্ধন-ঘরের অন্ধকারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবার যোগাড় হইতেছিল, তখনই বামনী চটিয়া লাল মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সেদিন ইন্দিরা রাঁধিয়াছিল। এখনও আমাদের দেশে (দু-পাঁচটি) স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা নিজের রন্ধনের প্রশংসা শুনিতে বড়ই ব্যগ্র। ইন্দিরা বামনীকে রান্না কেমন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল। বামনী চেঁচাইয়া

---

* একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

আর যায় কোথা! 'রাম, রাম, রাম-নাম বল'—বলিয়া দিগ্‌গজ বিমলার পশ্চাতে দুই হাঁত সরিয়া দাঁড়াইলেন।

একে পায়, আরে চায়। বিমলা কহিলেন—'এ পথে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য।' দিগ্‌গজ আসিয়া বিমলার অঞ্চল ধরিলেন।

ব্রাহ্মণের ভয় বিদূরিত করিতে বিমলা কহিলেন—'রসিকরাজ, তুমি গাইতে জান?'

"রসিকপুরুষ কোথায় সঙ্গীতে অপটু?" দিগ্‌গজ যেই গান ধরিলেন—'এ-হুম্ হুম্-উহুম্, সই কি ক্ষণে দেখিলাম শ্যাম কদম্বেরি ডালে'—পথের ধারে একটা গাভী শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছিল, অলৌকিক শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল। গাভী ত 'ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া চম্পট দিল, আর যেমন বিমলা কহিলেন—'গজপতি, (এবার আর রসিকরাজ নয়, তাহাকে দূর করিতে হইবে কি না) ইষ্টদেবের নাম জপ, বৃক্ষমূলে কি—দেখিতেছ?"

"ওগো বাবাগো"—বলিয়া দিগ্‌গজ একেবারে 'পগার-পার'; 'দীর্ঘ দীর্ঘ চরণ,—তিলার্দ্ধ মধ্যে অর্দ্ধক্রোশ পার।'

'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থে দিগ্‌গজ, আস্‌মানী ও বিমলা তিনজনেই রসিক। তবে সকলেই ভিন্ন রকমের। আস্‌মানীর রসিকতা—দুষ্টামির জন্য। সে এই দুষ্টামির জন্যই ব্রাহ্মণকে তাহার উচ্ছিষ্ট ভাত খাওয়াইয়াছিল এবং দিগ্‌গজকে বাঁদর-নাচ নাচাইয়াছিল। (ইহার মূলে যে শিক্ষাটি ছিল, দিগ্‌গজ তাহা লাভ করিতে পারে নাই; পারিলে তাহার অদৃষ্টে দুঃখভোগ কিছু কম হইত।) আর, দিগ্‌গজের রসিকতার কারণ গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রকট রহিয়াছে—সেই সকল দৃশ্য মনে করুন, দিগ্‌গজ যখন সংবাদ না দিয়াছে জগৎসিংহ তখন কিছুই জানিতে পারেন নাই,—পারিলে গ্রন্থও ভিন্নাকার ধারণ করিত। কেবল হিতার্থিনী, সদা-প্রফুল্লা, হাস্যময়ী বিমলার রসিকতা, অশ্রু ও ভাবের একটি বিশেষ ভাবান্তর। একটিকে চাপিতে আর একটি জাগিয়া উঠিত। তাহার ব্যঙ্গ, হাসি, রসিকতার মধ্যেও দুর্গেশ-নন্দিনী তিলোত্তমার মঙ্গলেচ্ছায় সে যত্ন-তৎপরা। তাহার হাসিও অধর-প্রান্তে একদিন শুকাইয়াছিল; হাস্যময়, চঞ্চল নেত্রে একদিন হিংসার জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কারণ, হাসির আড়ালে ব্যথাকে লুকান যায় বটে; কিন্তু ভোলা যায় না। যে মর্ম্মভেদী হৃদয়-জ্বালা বিমলা হাসির আবরণে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা কতলু খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইতেই উছলিয়া পড়িল; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; কতলু প্রেয়সীর অন্বেষণ করিবামাত্র, বিমলার সেই ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠ-স্বর শ্রুত হইল—'দাসী শ্রীচরণে'।—কিন্তু তখন 'দাসী শ্রীচরণে' নয়; কারণ, ক্ষণকাল পরেই স্বয়ং নবাব কতলু খাঁই বিমলার ছুরিকাঘাতে ছিন্নমূল বিটপীর মত বিমলার রাঙ্গা চরণে লুটাইয়া পড়িলেন!

বিমলার পরিবর্ত্তিত ও উচ্চ সংস্করণ (higher standard) দেখিতে হইলে,

(২) মৃণালিনীর

গিরিজায়াকে দেখিতে হয়। বেত্রাঘাতেও তাহার মুখের হাসি লুকায় নাই, অথচ সে বহুক্লেশ ভোগ করিয়া মৃণালিনীর কার্য্যে জীবন-যৌবন ব্যয় করিতেছিল। নিজমুখেই সে একদিন দিগ্বিজয়কে বলিয়াছে—'পরের জন্য মলেম'—এ কথা সে রাগে বলে নাই; সোহাগ করিয়া বলিয়াছিল।—হাসি তাহার প্রাণ ছিল; যেন সে হাসিতেই জন্মিয়াছিল, তাই হাসিয়াই আকুল; বুঝি হাসিতেই মরিবে। সে কথায় হাসিত, ভাবে হাসিত, ভঙ্গিমায় হাসিত, সকল অঙ্গে হাসিত। হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষু হাসিতেছে।" সংসারে বীর ও রুদ্র-রসের অভিনেতাদের কি সুখ জানি না, দুঃখ অনেক দেখিয়াছি। শোক-তাপ-জীর্ণ সংসারে বাস করিতে আসা পর্ব্বত-গাত্রে চিত্র-খোদন করার মত। সেই অল্প সময়টুকু পূর্ণমাত্রায় উপভোগ যে না করিল, তাহার জীবন একেবারেই ব্যর্থ, বিফল। এ কথা আমি বলিতেছি না যে, শুধু হাসিয়াই জীবন ভোগ করা যায়; যদিও "হেসে নাও এ দু'দিন বৈ ত নয়"—কথাটা অতি প্রত্যক্ষ, তথাপি জীবনে যে অশ্রু-বিসর্জ্জন করে নাই, সে মনুষ্যাধম। হাসির সঙ্গে কান্নার সম্বন্ধ এত নিকট! বাল্যকালে আমরা বলিয়া বেড়াইতাম—'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না!' 'রামসন্না'র বাণী কদাচিৎ বিফল হইতে দেখা গিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের গিরিজায়ার রূপের গর্ব্ব ছিল না, তাহার গৌরব হাস্য! নানাভঙ্গিতে সে হাসিয়াছে। বিপদেও সে পড়িয়াছে; কিন্তু বিপদের সময়েই করুণ-রস যেন তাহার বেশী করিয়া জাগিয়া উঠিত। হেমচন্দ্রের নিকট বেত খাইয়াই সে বলিয়া উঠিল,—'পুরুষ বটে!'

পূজনীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে, সে বেচারা সখী হইতেই জন্মিয়াছিল, হাসি ছাড়া তাহার আর পথ নাই; (বিদ্যারত্ন মহাশয় এ কথা বলেন নাই, সখী হওয়ার কথাই বলিয়াছেন) কিন্তু আমার মনে হয়, কোন এক সময়ে (মৃণালিনীর দুঃখের সময়ে) সে মৃণালিনীর গলা ধরিয়া কাঁদিলে, তাহাকে একটা দামী 'সার্টিফিকেট',—বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতে দেওয়া যাইতে পারিত।

এখানে গিরিজায়ার প্রেমের কথা কিছু বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সখী হইলেও সে যে নারী! তাই প্রেম জিনিসটাকে সে উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সে দিগ্বিজয়কে ভালবাসিয়াছিল। গিরিজায়া স্থির করিল, দিগ্বিজয় তাহাকে ভালবাসে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। দিগ্বিজয় ঘরে লুকাইয়া, চক্ষু বুজিয়া আছে। অকস্মাৎ তাহার পৃষ্ঠে দুম্-দাম্ করিয়া ঝাঁটার ঘা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আঃ ম'লো, ঘরগুলোয় ময়লা জমে' র'য়েছে দেখ,—এ কি! এক মিন্সে! চোর নাকি? ম'লো মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!" বলিয়া আবার সম্মার্জ্জনীর আঘাত! দিগ্বিজয়ের পিঠ ফাটিয়া গেল। সে বলিল—"ও গিরিজায়া, আমি! আমি!"

"আমি! আরে তুই বলিয়াই ত খ্যাঙ্‌রা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি!"—এই বলিবার পর আবার বিরাশী সিক্কা ওজনের ঝাঁটা পড়িতে লাগিল।

'ঝাঁটার বেগ আর থামে না। দিগ্বিজয় দেখিল, নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই পরামর্শ। দিগ্বিজয় তখন অনুপায় দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে পলায়ন করিল।' গিরিজায়া শতমুখী-হস্তে তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

দিগ্বিজয়ের সন্দেহ হইল, গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে না। সন্দেহ হইবারই কথা। কিন্তু সে পোড়ারমুখী মৃণালিণীর কাছে গিয়া বলিল—"দিগ্বিজয়টা তোমার হিতকারী, তাহা আমি জানিতাম না; এজন্য প্রভাতে আমি তাহাকে 'আচ্ছা করিয়া' ঘা-কত ঝাঁটা দিয়াছি। তা 'কাজটা' ভাল করি নাই।"

মৃণালিনী হাসিয়া বলিলেন—"তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে?"

গিরিজায়া কহিল—"ভিখারীর মেয়ের কি বিয়ে হয়?"

মৃণালিনী বলিলেন—"করিলেই হয়।"

গিরিজায়া কহিল—"তবে আমি সে অপদার্থটাকে বিবাহ করিব। আর কি করি?"

তখন—পূর্ব্বরাগ ঝাঁটার মুখে আরম্ভ হইলেও, বিবাহটা হিন্দু-মতে হইল; মৃণালিনী তাহার গায়ে-হলুদ দিলেন।

সম্ভবতঃ পাঠক-পাঠিকাগণের বিলাতী রুচির পক্ষপাতিতা কল্পনা করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র—

(৩) রাজসিংহ

উপন্যাসে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন—'বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব? ভালবাসিবার কথা একটাও নাই, বহুকাল-সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—হে প্রাণ, হে প্রাণাধিক!—সে সব কিছুই নাই—ধিক্!'

ঔরংজীবের ন্যায় পাষাণ-হৃদয় বাদশাহও নির্ম্মলকুমারীর সরস বাক্-পটুতায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্য বোধ হয়, বঙ্কিমের এই ছিল যে, সকল হৃদয়ই রসের উৎসে উৎসারিত হইয়া উঠে। ঔরংজীব আপন মনে বলিয়াছিলেন—'এ অমূল্য রত্ন, ইহাকে নষ্ট করা হইবে না।' যিনি পৃথিবী-পতি বলিয়া ঘোষিত, পৃথিবীময় যাঁহার গৌরব বিখ্যাত, যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের ত্রাস, তিনি সেই অনাথা, নিঃসহায়া, অবলাকে 'পিয়ারী' বলিয়া বসিলেন। পরে সেই ক্রূরমতি নৃশংস বাদশাহ নির্ম্মলের 'ইম্‌লি বেগম' নামকরণ করিয়াছিলেন। (ইম্‌লি পশ্চিমদেশে তেঁতুলকে বলে শুনিয়াছি, যদি তাহা ঠিক হয়, খাট্টা-মিঠা-নির্ম্মলের নামটা ঠিক হইয়াছিল বলিতেই হইবে) তাহার বিদায়-কালে ঔরংজীব একটু দুঃখিতভাবে বলিলেন—"কেন যাইবে?……আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখনও কাহাকে ভালবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালবাসিয়াছি।……তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নহ। যাই হোক, আলম্‌গীর বাদশাহ তোমার ভিন্ন আর কাহারও চক্ষের কটাক্ষে কখনও বশীভূত হয় নাই। তোমায় ভালবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না, ছাড়িয়া দিব।" নির্ম্মলকে বাদশাহ ভালবাসিয়াছিলেন। কেন বাসিয়াছিলেন, তাহা কি বলিতে হইবে? সৌন্দর্য্যে নয়—সাহসে! যৌবনে নয়—রসভাষে ও বাক্-চাতুর্য্যে! অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, 'যদি কোন রাজা—শিবাজী বা রাজসিংহ, যদি কোন সেনাপতি—দিলির কি তকিয়ার, যদি কোন শাহজাদা—আজীম কি আকবর, এরূপ সাহসে, এরূপ স্পষ্ট কথা বলিত, ঔরংজীব তাহা সহ্য করিতেন কি না সন্দেহ।' কিন্তু সন্দেহ করিবার পূর্ব্বে একটু ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে, রসিকতা করিতে হইলে সাহসের বেশীমাত্রার প্রয়োজন হয়—তাঁহাদের সে সুযোগ ও সুবিধা হইয়াছিল কি না? এই জন্য বাদশাহকে বিশ্লেষণ করিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"তিনি 'মার্ক-আন্তনি' বা অগ্নিবর্ণ না হইলেও, পাষাণ ছিলেন না; তিনিও মানুষ।"

নির্ম্মলকুমারী একটি বিচিত্র ও অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে বাদশাহকে দেখিবার আগে বলিয়াছিল—"আমি ঔরংজীবকে ভজিয়াছি, যেমন বিড়ালে ইন্দুর ভজে।" আর বাদশাহের সম্মুখেই বলিয়াছিল—"বাঘ পুষিবার সখ্ আমার মিটিয়াছে; বাদশাহকে বশ করিয়াছি।"

(৪) ইন্দিরা

বঙ্কিমচন্দ্র খুব ছোট কথায় হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্রের নিকট শুনিয়াছি, একবার দীনবন্ধু মিত্র বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহার রসালাপে কক্ষ হাস্য-মুখরিত করিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে উপস্থিত থাকিলেও, কোন কারণে সে আলাপে যোগদান করেন নাই। অথচ দীনবন্ধুর কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন, এমন লোক কেহ ছিলেন না। হাসি চাপিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইল। দীনবন্ধু এক উপায় করিলেন; বঙ্কিমও শোধ লইলেন। তিনি একটা কি লিখিয়া আনিয়া দীনবন্ধুর পৃষ্ঠে আঁটিয়া দিলেন। রসিক দীনবন্ধু সকলের কাছে গিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমায় বলে' দাও না গা, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ। তাই তা'র পিঠের কোথায় মশাটা-মাছিটা বসেছে, সে দেখ্‌তে পায় না।"

বঙ্কিম বলিলেন—"দেখতে পায় না বলে'ই ত আমরা তাহাকে হস্তিমূর্খ বলি।" ঘরশুদ্ধ লোক, এমন কি, দীনবন্ধু পর্য্যন্ত হাসিয়া আকুল।

গ্রন্থের প্রাণ হাসি। অবশ্য এ কথা আমি বলি না যে, উদ্ভ্রান্ত প্রেমে একজন জলধর কি একটা নিমচাঁদ থাকিলে ভাল হইত। তবে যে-সকল উপন্যাস বা গল্প বিশ্রামকালে পাঠ্য, সোজা কথায় যাহাকে শ্রান্তিনাশক (recreative) বলে, তাহার মধ্যে শুধু প্রেম, শুধু অশ্রু আর আত্মহত্যার ছড়াছড়ি থাকিলে, সে গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের আত্মহত্যা করাই প্রশস্ত পথ। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সকল গ্রন্থে তিনি মনোরঞ্জন করিবার জন্য এ রসটুকুকে বিদায় দেন নাই। আজকাল যে সকল গ্রন্থকার সামরিক প্রথায় (military) গ্রন্থাদি রচনা করেন, তাঁহারা সৈন্যসজ্জা বা কুচ-কাওয়াজ করাইবার সময় নায়ক বা নায়িকাকে একটু শান্ত (civil) করিয়া আঁকিলে মন্দ হয় না।

রসিকতা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কখন' পঙ্কিল পথে পা দেন নাই; তিনি আবিলতা পছন্দ করিতেন না। ইন্দিরা নিজেই বলিতেছে—'কামিনী কু-চরিত্রের লোক দেখিতে পারিত না।' আর একস্থলে বলিতেছে—"এ * পরিচ্ছেদটা না লিখিলেও লিখিতে পারিতাম। তবে এ দেশের গ্রাম্য স্ত্রীদিগের জীবনের এই ভাগটুকু লোপ পাইয়াছে। ভালই হইয়াছে, কেননা, ইহার সঙ্গে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, কদাচিৎ বা দুর্নীতি আসিয়া মিশিত। কিন্তু যাহা লোপ পাইয়াছে, তাহার একটি চিত্র দিবার বাসনায় এই পরিচ্ছেদটা লিখিলাম।"

রহস্যে বা ব্যঙ্গে তিনি কখন' অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন নাই। হারাণী হাসিয়া-হাসিয়া মরিতেছে, যেমন ইন্দিরা তাহার কাছে উ-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করাইবার প্রস্তাব করিল, অমনই সে গম্ভীর হইয়া পড়িল। সে পরিচ্ছেদটার নাম—'হারাণীর হাসি-বন্ধ।' সে ত আর জানিত না, যে উ-বাবু ইন্দিরার পরপুরুষ নয়, এই বলিল—'পারিব না।'

রহস্য-চিত্র অঙ্কিত করিতে ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার, বঙ্কিম তাহাই করিতেন। ইন্দিরার কাহিনীতে বামুন-ঠাকুরাণীর অভ্যুদয় একেবারে নিখুঁত ও সংসারে প্রতিনিয়ত যাহা ঘটে, তাহারই প্রত্যক্ষ ছবি। ইন্দিরার জীবন-কথা যখন রন্ধন-ঘরের অন্ধকারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবার যোগাড় হইতেছিল, তখনই বামনী চটিয়া লাল মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সেদিন ইন্দিরা রাঁধিয়াছিল। এখনও আমাদের দেশে (দু-পাঁচটি) স্ত্রীলোক আছেন, যাঁহারা নিজের রন্ধনের প্রশংসা শুনিতে বড়ই ব্যগ্র। ইন্দিরা বামনীকে রান্না কেমন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিল। বামনী চেঁচাইয়া

* একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

উঠিল, বলিল—"ওগো৹ বেশ রেঁধেছ গো, বেশ রেঁধেছ। আমরাও রাঁধ্তিতে জানি, তা বুড় হইলে কি আর দর হয়? * * * এখন রাঁধিতে গেলে রূপ-যৌবন চাই * * * "

ইন্দিরার বামনীকে নিয়া একটু রঙ্গ করিতে সাধ হইল। ইন্দিরা বলিল—"তা রূপ-যৌবন চাই বই কি বামন দিদি! বুড়ীকে দেখিলে কার খেতে রোচে?"

দাঁত বাহির করিয়া অতি কর্কশকণ্ঠে বামনী বলিল—"তোমারই কি রূপ-যৌবন থাকিবে? মুখে পোকা পড়বে না?"

এই বলিয়া রাগের মাথায় একটা হাঁড়ী চড়াইতে গিয়া, পাচিকা দেবী হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। ইন্দিরা বলিল—"দেখিলে বামন-দিদি, রূপ-যৌবন না থাকিলে হাতের হাঁড়ী ফাটে।"

ইন্দিরা সেই কালির বোতল, যাহার গলায় গলায় কালি, তাহার পাকা চুলের ক্ষেতে কলপ দিয়া তাহাকেও বশ করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র রহস্যের ভিতর ব্যক্তিগত আক্রমণ কদাচিৎ করিতেন বলিয়া শুনিয়াছি। তবে সামাজিক দুর্নীতি বা কু-রীতির প্রতি শর-নিক্ষেপ করিতে তিনি কখনই কৃপণতা করেন নাই। ব্রজসুন্দরী দাসী উ-বাবুর নিকট দশ টাকা ভিক্ষা পাইলেন। ফিরিবার সময় দ্বারবানদ্বয় (ইন্দিরা ও কামিনী দ্বাররক্ষা করিতেছিল) দ্বার আটকাইল। তাহাদের কিছু বখসিস্ চাই। কত? ষোল টাকা! না দিয়া গেলে দ্বার বন্ধ। লাভ মন্দ নয়! পেলাম দশটাকা, বখসিস্ দিতে হবে ষোলটাকা। বঙ্কিম বলিতেছেন—"বড় মানুসের বাড়ী ভিক্ষায় লাভালাভ ধরিতে গেলে চলিবে কেন? সময়ে অসময়ে ঘর থেকেও কিছু দিয়ে যেতে হয়।"

কেহ হাসির ঘটনা বলিয়া, কেহ বা ছোট ছোট কথায় হাসাইতে পারেন। ঘটনায় হাসাইতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিও প্রখর ও হাস্য-রসযুক্ত হওয়া চাই; আর কথায় হাসাইতে হইলে বাক্য-সংগ্রহ অধিক থাকা চাই। আধুনিক গল্প-সাহিত্যে প্রথমটিতে প্রভাতকুমারবাবু, দ্বিতীয়টিতে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ মজুমদার সিদ্ধ-হস্ত। বঙ্কিম দু'য়েতেই কৃতী ছিলেন। তাঁহার সকল উপন্যাসেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইখানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।—আমার পরিচিত কোন বন্ধু (সাহিত্যিক) বঙ্কিম-পদ-লোভী হইয়া উঠিয়াছিলেন; আমরা তাঁহার নাম দিয়াছিলাম—দ্বিতীয় বঙ্কিম।—একদিন তিনি ইন্দিরাকে মার্জ্জিত (chaste) করিতে চেষ্টা পাইতে-ছিলেন। বেচারা বড় গর্ব্ব করিয়া কোন সাহিত্যিকের নিকট সে গল্প করিতেছিল, তিনি তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া-ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি তদবধি বঙ্কিমকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। আরও শুনিয়াছি, শ্লীল হাস্য-রস দিয়া তিনি একখানি 'ইন্দিরা' রচনা করিবেন।

(৫) দেবী চৌধুরাণী।

যে কথাটি মনে রাখিলে, ঔপন্যাসিকের শ্রম সফল হয়, তাহা এই—'প্লটে' অত্যাশ্চর্য্য বা অসাধারণত্ব থাকিলেও যেন অস্বাভাবিক কিছু না থাকে; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের ইঙ্গিত। অন্য চিত্র-স্নেহ, ক্ষমা, দয়া, অনুকম্পা, ভক্তির চিত্র ত দূরের কথা, হাস্য-রস দেখাইতেও একটি ভাঁড় বা বিদূষককে তিনি নিকটে আসিতে দেন নাই। দু'-একস্থলে সখী প্রভৃতি আছে বটে, কিন্তু তদবস্থায় স্মরণ রাখিতে হইবে, সেই সখীরা গৃহস্থের ঘরে আসে নাই; তাহারা রাজার ঘরে, রাজকন্যার সখী হইয়া আসিয়াছে। সেখানে, রাজ-গৃহে বিদূষক আসিতে পারিত, কিন্তু মার্জ্জিত-রুচি ও বিদ্বান্ লেখক তাহাদের ভাঁড়ামী অসহনীয় জ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছেন। প্রফুল্লের সখী জুটিয়াছিল—একটি নহে, দুইটি। তবে প্রফুল্লের ভগ্ন-গৃহে তাহারা চাঁদের আলো ছড়ায় নাই। তখন প্রফুল্ল, তাহার মাতার ভাঙ্গা-ঘরের প্রদীপ নহে অথবা হরবল্লভ রায়ের পুত্রবধূ নহে, সে তখন রাণী। যে-সে 'হেঁজি-পেঁচি' রাণী নহে,—দেবী-রাণী,—যাহারন ামে সমস্ত বাঙ্গালা শিহরিয়া উঠিত। তবে একটা কথা বলিবার আছে। ব্রহ্ম-ঠাকুরাণী আর গোবরার মা, আমি এই দুইজনের কথাই বলিতেছি। ব্রহ্ম-ঠাকুরাণী ত বাঙ্গালার সকল গৃহেই আছেন। এখনও খুঁজিলে তেমনই সরল-হৃদয়া বিধবা ব্রাহ্মণী, রূপকথা বলিতে, আদর করিতে, ছেলে-পুলে ভালবাসিতে আছেন, দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আর গোবরার মার পরিচয়, গোবরার মা। তাহার কথায় যে লোকে হাসে, সে তাহার দোষ নয়—দোষ স্বভাবের। বদ্ধকালা বলিয়া সে কাজের কথা কিছুই শুনিতে পায় না; গালি দাও, সে সুদে-আসলের অনেক বেশী শোধ দিবে। এই স্বভাবের লোকের সংখ্যা যে খুব কম, এমন বিশ্বাস আমার ত নাই-ই, অন্যের আছে কি না জানি না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রথায় স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক অসাধারণ ও সেই সঙ্গে স্বাভাবিক ও নূতন। দু-একটা উদাহরণ দিই। সাগর-বৌ ও নয়ান-বৌকে বোধ হয় কেহ বিস্মৃত হন্ নাই। নয়ান, সাগরের সন্ধানে আসিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ। ডাকা-ডাকি করিলে সাগর উত্তর দিল। নয়ান জিজ্ঞাসিল, "সন্ধ্যে রাত্রে দোর দিয়েছিস্ কেন লা?"

সাগর বলিল—"ভাই, লুকিয়ে দু'টো সন্দেশ খাচ্ছি—তুমি কি খাও না?"

নয়ানের রসনা জলসিক্ত হইল, দু'-চারি বিন্দু বস্ত্রেও ঝরিয়া পড়িল। সে বলিল—"তা খা-খা।" (নয়ান নিজে সন্দেশ খাইতে বড় ভালবাসিত)।

দু'-চার কথার পর, সাগর দ্বার খুলিলে, সে ঘরে ঢুকিল। প্রফুল্ল ঘরে ছিল, তাহাকে দেখিবার আগ্রহে সে ঘরে ঢুকিল না। ঘরের ভিতর দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে, ইহা দেখি-বার একটু ইচ্ছা ছিল—আর সেও কিছু ভাগ পাইতে পারে কি না, ইহা জানাও তাহার উদ্দেশ্য ছিল।

দুই সতীন। তাহাদের ভাবটিও নূতন, (তাহা আমার দেখি-বার নহে, পূজনীয় অধ্যাপক বিদ্যারত্ন মহাশয় 'সতীন ও সৎমা' প্রবন্ধে সে সমস্তই দেখাইয়াছেন) তবে ঢিলটি মারিলে অপরে পাটকেলটি ফিরাইয়া তবে ছাড়ে। যথা—নয়ান জিজ্ঞাসিল, "কে গা ঘরে? কথা ক'স্নে কেন? যেন সাগর-বৌয়ের গলা শুনিলাম না?"

সাগর বলিল—"তুমি কে গা? যেন নাপিত-বৌয়ের গলা শুনিলাম না?"

"আঃ মরণ আর কি! আমি কি নাপিত-বৌয়ের মতন?"

সাগর বলিল—"বালাই, তুমি কেন নাপিত-বৌয়ের মতন হ'তে যাবে? সে যে একটু ফরসা।"

এই সংসারে একটি সখী না আসায়, বধূদের দ্বারাই লেখক কাজ সারিয়াছেন। দিবা ও নিশিও স্বাভাবিক রকমের রসিকতা করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রসিকতা অনেক রকমের হওয়াই স্বাভাবিক। শুনিয়াছি স্ত্রীর পদসেবা করিতে অনেকেই যত্নবান্,—তথাপি সাগরের সে রসিকতাটা যেন কেমন-কেমন!

(৭) রজনী।

সংসারে দু'-একটা ছোট-খাটো রসিকতা গুরুজনদের মধ্যেও হইয়া থাকে, শচীন্দ্র ও রজনীর কথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শচীন্দ্র দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল—"তোমরা যাহাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।"

ছোট-মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন—"তুমিও যাই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমায় এ বিবাহ দিবই দিব।"

শচীন্দ্র হাসিয়া বলিল—"তবে বোধ হয় তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমায় এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট-মা বলিলেন—"না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

ছোট-মা শচীন্দ্রকে যে খোঁচাটি দিলেন, শচীন্দ্রকে তাহাতে বাধ্য হইয়া নীরব হইতে হইল।

(৮) বিষ-বৃক্ষ।

বিষ-বৃক্ষে হাস্যময়ী, প্রফুল্লনলিনী, কমলমণি! সে হাসি মর্ত্তোর নহে, স্বর্গের; সে সংসারের শুষ্ক জীবনে একটি অমৃত-প্রবাহ; একটি আনন্দ-নির্ঝর।

আজ এই পর্য্যন্ত! যদি পারি, ভবিষ্যতে অন্য চরিত্র লইয়া আলোচনা করিব।

কয়েকটা কথা এই স্থানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। বঙ্গ-সাহিত্যে যাঁহাদের রস ও রসিকতা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, দীনবন্ধু মিত্র, পঞ্চানন্দ (ইন্দ্রনাথ) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় প্রভৃতির নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত কবি সারা বঙ্গে হাসির কবি বলিয়াই বিখ্যাত। আমরা টেকচাঁদকে (প্যারীচাঁদ মিত্র) বাদ দিতেছি না—কিন্তু তাঁহার রস অধিক মাত্রায় ব্যঙ্গ।

কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের রসিকতা অনেকে সমর্থন করেন না; আবার ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের রচনাকে অনেকে শ্লীল বলিতে রাজী নহেন;—যেমন ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রস আদি-রসকে অনেকে বিষ চক্ষে দেখেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রসিকতা কেহ যে কোন কু-পর্য্যায়ে ফেলেন নাই, তাহা সুখের কথা। আমাদের বরণীয় কবি স্যর রবীন্দ্রনাথও রসিকতা করিয়া হাসাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ও বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতা অনেকটা একই শ্রেণীভুক্ত। উভয়েই রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত, তবে প্রয়োজনমত রসিকতা উভয়েই করিয়াছেন। তাঁহারা রসিক সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইজন্যই তাঁহারা প্রসিদ্ধ নহেন। যেন তাঁহাদের হাস্য-রস গ্রন্থের একটা ভাগ; আরও অনেক ভাগ তাহাতে আছে। পঞ্চানন্দের রসিকতাকে তীব্র কশা বলিলেও চলে; তাহা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমুজ্জ্বল। সমাজ-শিক্ষা-দেশ-সংস্কারের পক্ষে যেন 'স্পেশ্যাল কমিশন'!

হাসাইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না; যাঁহাদের সে ক্ষমতা নাই, তাঁহারা যেন ঘরের খাইয়া বনের মহিষ না তাড়ান। তাঁহাদের সে বিকট 'জিমন্যাষ্টিক' কুস্তীর আখ্ড়ায় চলিতে পারে, সাহিত্যে নহে।—এই জন্যই, এই শ্রেণীর (এখানে উত্তম-পুরুষ-শ্রেণী-ভুক্ত বুঝিতে হইবে) লেখকগণকে সম্বোধন করিয়া বিখ্যাত মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না।…স্থানে স্থানে…ব্যঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে, লেখকের ভাণ্ডারে এ সামগ্রী থাকিলে প্রয়োজন মতে আপনিই আসিয়া পৌঁছিবে…ভাণ্ডারে না থাকিলে মাথা কুটিলেও আসিবে না। অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে…রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছু নাই।"—

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

জাতকে তক্ষশিলা

সুপ্রসিদ্ধ জাতক-গ্রন্থ, ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্র-পিটকের অংশ-বিশেষ। ইহা একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। ছোট, বড়, মাঝারি-রকমের ৫৫০টী গল্প ইহাতে আছে। কোন কোন গল্প অতি দীর্ঘ। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রাচীন জাতকের অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি। এগুলি অতি প্রাচীন প্রবাদমূলক গল্প। কতকগুলি জাতক বুদ্ধদেবেরও পূর্ব্বে রচিত। এই জাতকগুলি কথা বা কাহিনী হইলেও, এগুলিতে প্রাচীন বৌদ্ধযুগের আচার, সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। অনেক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ জাতক-নিচয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধ্র, অঙ্গ, মগধ, রাজগৃহ, ইন্দ্রপ্রস্থ, পাটলিপুত্র, কাশী, কোশল ও শ্রাবস্তী প্রভৃতি নগর ও জনপদসমূহের বিবরণ জাতকে সংগৃহীত হইয়াছে। আজ আমরা তক্ষশিলা-সম্বন্ধে জাতকে উল্লিখিত কথা-সাহিত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া, পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

স্থান-নির্দ্দেশ।

'সুসীম' জাতক পাঠে জানা যায় যে, বারাণসী হইতে ২,০০০ যোজন দূরে তক্ষশিলা অবস্থিত। ইহা গান্ধার-রাজ্যের রাজধানী ছিল। বারাণসীর সুসীম রাজার পুরোহিত-পুত্র একদিনে বারাণসী হইতে তক্ষশিলায় উপস্থিত হইয়া, তিন বেদ ও হস্তি-সূত্র শিখিয়া আসিয়াছিলেন। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের পুত্র জহ্নুকুমার, তক্ষশিলায় শিল্প-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আচার্য্যের নিকটে বিদায় লইয়া, গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনকালে অন্ধকার রাত্রিতে পথিমধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হওয়ায়, ব্রাহ্মণের ভিক্ষা-পাত্রটি ভাঙ্গিয়া যায়। ব্রাহ্মণ ভাতের মূল্য (ভত্তমূলং) দাবী করায়, তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি এখন নিঃস্ব; রাজা হইলে আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব। দীর্ঘকাল পরে একদিন ব্রাহ্মণ বারাণসীতে গিয়া নিজের পরিচয়প্রদানকালে বলিয়াছিলেন।ঃ—

"গান্ধার রাজস্স পুরমহিস্থয়রম্মে অবসিস্থসে তক্কসিলায় দেব, তথ অন্ধকারম্হি তিমিসিকায়ং অংসেন অংসং সমঘট্টয়িম্ হ।" এই গাথায় জানিতে পারা যায় যে, তক্ষশিলা গান্ধার-রাজের রাজধানী ছিল। 'পলায়ি' জাতক হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, "অতীতে গন্ধাররট্ঠে, তক্কসিলায়ং বোধিসত্তো রজ্জং কারেসি" অর্থাৎ অতীত কালে গান্ধার-রাজ্যে তক্ষশিলায় বোধিসত্ত্ব রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাবর্গ পরম সুখে বাস করিতেন। নৈতিক ও দৈহিক বলে তাঁহারা বলীয়ান্ ছিলেন। শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে

গান্ধার-রাজ্য অপরাপর প্রদেশের আদর্শস্থানীয় ছিল। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত অতিশয় লোভী ও কলহপ্রিয় ছিলেন। তিনি একে একে জম্বু-দ্বীপের অন্যান্য রাজগণকে পরাস্ত করিয়া, একছত্র আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্কল্প করেন। তাঁহার পুরোহিত পিঙ্গিয়ও অতীব দুরাকাঙ্ক্ষ ছিলেন। তাঁহারও ইচ্ছা ছিল যে, তিনি সমস্ত জম্বু-দ্বীপের একমাত্র পুরোহিত হইবেন। রাজার সঙ্কল্প জ্ঞাত হইয়া তিনি তাঁহাকে খুব উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহে নিয়োজিত করেন। রাজাও ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজ্য অধিকার করেন এবং পরাজিত রাজন্যবর্গকে স্বীয় অনুচর করিয়া লইয়া তক্ষশিলা আক্রমণ করেন। ক্রমে ক্রমে এক সহস্র নরপতি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। তিনিও অবশেষে এই সহস্র রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, তক্ষশিলা আক্রমণ করেন। কিন্তু, তিনি নগর অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি তাঁহার কূটবুদ্ধি মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে ভীষণ নর-হত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া নিহত হন।

(ধোনসাখ জাতক)

'পলায়ি' জাতক-পাঠে ইহাও জানা যায় যে, বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্ত বহু সৈন্য-সামন্ত লইয়া তক্ষশিলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানকার দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিয়া পরিশেষে তিনি ভীত হইয়া পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন; সুতরাং এক সময় গান্ধার-রাজ্যের রাজধানী যে শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিশ্ব-বিদ্যালয়।

এস্থলে বিশ্ব-বিদ্যালয়-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। 'তুন্নেব' জাতক পাঠ করিলে জানা যায় যে, ব্রহ্মদত্ত-রাজার পুত্র বোধিসত্ত্ব এই তক্ষশিলার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বেদত্রয় ও 'আঠার' প্রকার শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তথাকার আচার্য্যগণ দুই প্রকারের ছাত্র রাখিতেন। ছাত্রগণ গুরু-গৃহে বাস করিয়া অধ্যয়ন করিত। গুরু-গৃহে বাস অতি সম্মানজনক ছিল। রাজা-মহারাজগণ নিজ গৃহে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া কুমারগণকে অনায়াসেই শিক্ষা দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে না বলিয়া কুমারগণ গুরুগৃহেই প্রেরিত হইতেন। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই তক্ষশিলায় অধ্যয়ন করিতেন। যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন অন্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতেন, তাঁহাদিগকে আর গুরুর সেবা করিতে হইত না। যাঁহারা গুরু-দক্ষিণা দিতে অসমর্থ হইতেন, তাঁহারা "ধর্ম্মান্তেবাসী" হইয়া গুরুর সেবা করিয়া বিদ্যালাভ করিতেন। তৎকালে গুরু-দক্ষিণার পরিমাণও অত্যধিক ছিল বলিয়াই মনে হয়। জাতকে যে স্থলে গুরু-দক্ষিণার উল্লেখ আছে, তাহার কোনটিই সহস্র মুদ্রার ন্যূন নহে।

বারাণসীর পঞ্চাবুধ কুমার ১০০০৲ মুদ্রা গুরু-দক্ষিণ দিয়া শিক্ষালাভ করেন। তিনি গৃহে ফিরিবার সময়ে, তক্ষশিলা-দেশের প্রসিদ্ধ আচার্য্য তাঁহাকে বিষাক্ত বাণ, অসি, বর্শা, গদা ও জ্ঞানঅসি এই পাঁচপ্রকারের অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে এক রাক্ষসীর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। এই যুদ্ধে যখন অন্যান্য অস্ত্রসমূহ ব্যর্থ হইতে লাগিল, তখন তিনি অমোঘ জ্ঞানঅসির সাহায্যে ঐ রাক্ষসীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একসময় বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলার দেশপ্রসিদ্ধ আচার্য্য হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বারাণসীর কোন ব্রাহ্মণকুমার ১০০০৲ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া সকল শাস্ত্রে অধিকার লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। তাঁহার পিতা পুত্রের শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারেন যে, "অসাতমন্ত্র" তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি পুনরায় পুত্রকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া দেন। আচার্য্য, তাহাকে স্ত্রীলোকের চরিত্রের গূঢ় রহস্য-বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করিলেন। পুত্র শিক্ষান্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাতাকে এই বিষয় জ্ঞাপন করায়, তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

তক্ষশিলার আচার্য্যগণের বহুসংখ্যক শিষ্য থাকিত। কোন সময়ে বোধিসত্ত্বের শিষ্য-মণ্ডলী-সংঘ পাঁচশতেরও অধিক হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে বেদ-শিক্ষা দিতেন।

উত্তরদেশীয় শিক্ষার্থীরাও তক্ষশিলায় গিয়া শিক্ষা করিতেন। বোধিসত্ত্ব উত্তরদেশে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়াছিলেন। তক্ষশিলার কোন প্রতিভাশালী আচার্য্যের নিকট বেদত্রয় ও আঠার' প্রকার শিল্প-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি অন্ধ্র-দেশে গমন করেন। কোন কোন ছাত্র অধ্যয়ন সমাপন করিয়াই দেশাচার-শিক্ষার জন্য দেশবিদেশ-ভ্রমণের পরে গৃহে ফিরিতেন। দেশাচার-শিক্ষা না করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিত।

বারাণসীতেও একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য বাস করিতেন। তবে এই স্থান তক্ষশিলার মত প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। বারাণসীর আচার্য্য প্রধরও তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করিতেন। এক সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর একজন ধনী ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মিয়াছিলেন এবং তক্ষশিলায় শিক্ষা-সমাপনান্তে বারাণসীতে অধ্যাপনা করিতেন।

অন্য এক সময় বোধিসত্ত্ব ধনী ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মিয়া তক্ষশিলায় গিয়া মন্ত্র-শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বারাণসীতে প্রসিদ্ধ আচার্য্য হইয়াছিলেন।

ধনুর্ব্বিদ্যা।

বারাণসীর কুমারগণ, মিথিলা, ইন্দ্রপ্রস্থ, মগধ, কোশল, উত্তরদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতির রাজকুমারগণ, পুরোহিত, ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকের ছাত্রগণ সকলেই তক্ষশিলায় শিল্প ও বেদ-শিক্ষা করিতেন। তখন ক্ষত্রিয়ের সন্তানগণও বেদ-শিক্ষা করিতেন। বারাণসীর 'অসদিস'-কুমার তক্ষশীলার লোকপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকটেই তিন বেদ, আঠার' প্রকার শিল্প ও ধনুর্ব্বেদ (ইস্সাসসিপ্প) শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ধনুর্ব্বেদে আর কেহই তাঁহার 'সদিস' অর্থাৎ সমকক্ষ ছিল না। তিনি "অসদিস"-কুমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বার্ষিক শতসহস্র মুদ্রা বেতনে কোন একটি রাজার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হন।

তিনি 'আরোহণ' ও 'অবরোহণ'-শর পরিচালনদ্বারা লক্ষ্যবেধ করিতে পারিতেন। 'আরোহণ' অর্থাৎ ঊর্দ্ধগ শরেই সাধারণতঃ সকলে বিদ্ধ করিয়া থাকে। 'অবরোহণ' অর্থাৎ নিম্নগামী শরে আম পাড়িতে আদিষ্ট হইলে, তিনি ধনুর্ব্বাণ লইয়া জোরে ঊর্দ্ধদিকে শরনিক্ষেপ করেন; উহা খুব ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিম্নাভিমুখে পড়িবার সময় আমের বৃন্তটি ছিন্ন করিয়া ভূমিতে আসিয়া পড়িত। 'অসদিস'-কুমার এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত একহাতে শর ও অপর হাতে আম লইতে পারিতেন যে, তদ্দর্শনে রাজা, দর্শকগণ এবং উপস্থিত ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া কুমারকে বহুবিধ পুরস্কার ও অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইতেন।

নিধি-উদ্ধরণ-বিদ্যা।

কোশল-রাজার পুত্র ছত্তকুমার তক্ষশিলায় গিয়া তিন বেদ,

আঠার শিল্প, সর্ব্বসময়-শিল্প ও 'নিধি-উদ্ধরণ'-মন্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। "নিধি-উদ্ধরণ"-মন্ত্রবলে তিনি পিতার গুপ্তধন উদ্ধার করিয়া কোশলরাজার হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

জ্যোতিপাল নামক জনৈক বারাণসী-রাজের পুরোহিতের পুত্র, তক্ষশিলায় গিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া একশত মুদ্রা বেতনে রাজার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত হয়েন। তজ্জন্য রাজার পুরাতন কর্ম্মচারীরা বড়ই অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং জ্যোতিপালের ধনুর্ব্বিদ্যা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশে জ্যোতিপালের শিল্প-প্রদর্শন-সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করা হইল। সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদগণ এবং বারাণসীর শত শত ব্যক্তি ঐ শিল্প-কৌশল-দর্শনের জন্য সমবেত হইল। তিনিও আচার্য্যপ্রদত্ত খড়্গ-রত্ন, সন্ধিযুক্ত মেণ্ডকশৃঙ্গধনু, সন্ধিযুক্ত তুনীর, বর্ম্ম ও উষ্ণীষ-বিভূষিত হইয়া পরীক্ষামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। চারিজন ধনুর্ব্বিদ চারিদিক হইতে যুগপৎ শরনিক্ষেপ করিয়া জ্যোতিপালকে বিদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন। তিনি সকলের সন্ধান নারাচ-অস্ত্রে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। রাজার কথার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "এই বিদ্যার নাম 'সরপটি বাহন' (শর-প্রতিবাহন, শর-নিবারণ) মন্ত্র।" তা'রপর জ্যোতিপাল বলিলেন, "আমি এক শরে চারি কোণে স্থিত চারিজন ধনুর্ব্বিদকে বিদ্ধ করিতে পারি—অতএব আপনি তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে বলুন।" কিন্তু কেহ সাহস না করায় চারি কোণে চারিটী কদলী-বৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তিনি একমাত্র শরে বিদ্ধ করেন। ইহার নাম "চক্কবিদ্ধ" (চক্রবিদ্ধ) বিদ্যা। তা'রপর তিনি 'সরলট্‌ঠিং' (শর-যষ্টি), 'সর রজ্জুং' (শর-রজ্জু), 'সরবেণিং' (শরবেণী), 'সরপাসাদিং' (শর-প্রাসাদ), 'সরমণ্ডপং,' 'সরসোপানং' (শরসোপান), 'সরপোক্‌খরণিং' (শরপুষ্করিণী), 'শর-পদুমং' (শর-পদ্ম), 'সরবস্সং' (শর-বর্ষা) এই দ্বাদশ অসাধারণ বিদ্যা-কৌশল প্রদর্শন করিলেন। তাহার পর অপরাপর অসাধারণ বিদ্যা দেখাইয়া তিনি প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিলেন। তিনি স্থলে ৮ উসভ পরিমিত এবং জলে ৪ উসভ পরিমিত স্থানে শর-প্রবেশ করাইয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন। এক উসভের পরিমাণ ২০ যষ্টি, এক যষ্ঠি, ৭ হাত; সুতরাং এক উসভ ১৪০ হাত। বোধ হয় বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত "সবমেরিন" ও শেলের মত (টরপিডো) কোন জিনিস সেই সময়ে বিদ্যমান ছিল।

অঙ্গবিদ্যা।

'থুস' জাতক-পাঠে জানা যায় যে, বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলায় আচার্য্য হইয়া বহু রাজ-কুমার ও ব্রাহ্মণ-কুমারকে শিল্প-শিক্ষা দিতেন। বারাণসীর রাজপুত্র তিন বেদ ও অপরাপর শিল্প-শিক্ষা করিয়াছিলেন। আচার্য্য, অঙ্গবিদ্যা (সামুদ্রিক শাস্ত্র) জানিতেন। তিনি রাজ-কুমারের শরীর-লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র তাহার জীবন-নাশের চেষ্টা করিবে। নিজ জ্ঞানের দ্বারা শিষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি চারিটি গাথা রচনা করিয়া শিখাইয়া দিলেন এবং গাথাগুলি আবৃত্তি করিবার উপযুক্ত সময়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে চলিয়া কুমার চারিবার মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পুত্রও অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তিনি তাহার প্রাণবধ না করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন।

সর্প ধরিবার মন্ত্র।

কোন সময়ে বারাণসীর এক যুবক তক্ষশিলায় গিয়া দেশপ্রসিদ্ধ আচার্য্যের নিকট "আবলম্বন মন্তং" (সর্পবিদ্যা) শিখিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন। তখন অঙ্গ ও মগধের মধ্যস্থল দিয়া চম্পানদী প্রবাহিত হইত। চম্পানদীতে বহু নাগেরা বাস করিত। ঐ যুবক চম্পানদীবাসী নাগরাজকে মন্ত্রের দ্বারা রুদ্ধবীর্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীবিমলাচরণ লাহা

স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র

বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবকগণের মধ্যে আর একজন সম্প্রতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বরদাচরণ অপরিচিত নহেন। সরকারী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সম্মান ও প্রশংসার সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য-কার্য্য সম্পাদন করিয়াও তিনি ঐকান্তিকতার সহিত বঙ্গ-ভাষার সেবা ও সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ এবং 'অবসর' নামক কবিতা-গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের বাজারে বিশেষ সমাদরই লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু মাসিক-পত্রে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। নব্য-ভারতেই তাঁহার কবিতা বেশী প্রকাশিত হইয়াছে। আমি নব্য-ভারতেই প্রথম তাঁহার কবিত্ব-শক্তির সহিত পরিচিত হই এবং তাঁহার স্বাভাবিকতা-পূর্ণ বর্ণনা-শক্তিতে ও ভাষার পবিত্রতায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হই; কিন্তু তখনও তাঁহার সহিত পরিচয়-সৌভাগ্য আমার ঘটে নাই। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমি তাঁহার সমগ্র জীবনের কোন আলোচনা করিব না। তিনি যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন, ভারতীয় সিবিল-সার্ব্বিস পরীক্ষায় এদেশ হইতেই উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে জয়েণ্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তৎপরে জেলাজজের পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গের নানা জেলাতেই সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছেন, এ সকল সংবাদ অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু রাজকার্য্যের ভার বহন করিয়াও তিনি যে দুর্লভ অবসর-কালটা এইরূপ গুরুতর সাহিত্য-সেবাতেই প্রধানতঃ ব্যয় করিতেন, সেই বিষয়েই আমি সামান্য কিছু বলিব। অবসর-কালের ফল বলিয়াই তাঁহার কাব্য-গ্রন্থখানিকে তিনি 'অবসর' নাম দিয়াছিলেন।

তিনি যে সময় আমাদের জেলা ফরিদপুরে সেশন-জজ ছিলেন, সেই সময় আমি কয়েক মাসকাল কার্য্য-সূত্রে সেখানে অবস্থান করিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কৃষ্ণগোপাল চক্রবর্ত্তী তাঁহার প্রণীত 'মালা', 'অশ্রুমালা', 'অঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থ বরদাবাবুকে উপহার দিয়াছিলেন; তাহারই প্রসঙ্গে প্রথম আমি বরদাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সেই প্রথম সাক্ষাতে তিনি যেরূপ আগ্রহের সহিত আমার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, যেরূপ অমায়িকতার সহিত আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধুময়ী স্মৃতি চিরকাল আমার হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত থাকিবে। সে সময়ে আমি নানা মাসিক-পত্রে লিখিতাম। তদুপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল;—এই দীর্ঘ ১৫।১৬ বৎসর পরেও তাহার অধিকাংশ আমার মনে আছে। প্রথম সাক্ষাতের পর বিদায়-গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি আমাকে

সাগ্রহ অনুরোধ করেন যে, সময় সময় যেন তাঁহার সহিত আমি সাক্ষাৎ করি, তাহাতে সাহিত্যালোচনায় আনন্দে সময় ক্ষেপণ করা যাইবে। তাহার পর কয়েকবার আমি অবসরমত তাঁহার বাসাতে গিয়াছিলাম এবং বঙ্গ-সাহিত্যের নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া সুখলাভ ও জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভাষাতেই তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। আমি 'উৎসাহ' নামক (অধুনালুপ্ত) মাসিক-পত্রে সেক্স্‌পিয়রের 'জুলিয়াস্ সিজার' নাটকের 'পোরসিয়া'-চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। একদিন তাহা লইয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা হইল। তাহাতে প্রাচীন রোমান্ ও গ্রীক্ আদর্শ এবং ভারতীয় আদর্শ এই তিনের সমালোচনা-ক্রমে ইহাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য দেখাইয়া তিনি অতি সুন্দরভাবে সমন্বয়সাধন করিলেন। আমি বলিলাম, 'পোর্সিয়া'র উক্তিগুলি ভারতীয় আর্য্য-নারীগণের পক্ষে একটুও অসাধারণ নহে। এদেশের সামান্যা রমণীও ঐ সব কথা বলিতে পারেন। তিনিও সে কথা অনুমোদন করিলেন। তা'রপর তিনি বিশেষ স্নেহের সঙ্গে এইরূপ আরও সমালোচনা প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে বিশেষ রূপে উৎসাহিত করিলেন।

আমার লিখিত কতক গুলি কবিতা তাঁহাকে আমি দেখিতে দিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে রঙ্গ-রসের কবিতাও কয়েকটা ছিল। সেগুলি তিনি দেখিয়া পেন্‌সিল দিয়া তাহার স্থানে স্থানে দাগ কাটিয়া রাখেন। তা'রপর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, সে বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা হয়। আমি সানন্দে তাঁহার কতকগুলি উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করি। একটি কবিতায় প্রথম দুই চরণ ছিল ঃ—

"নিশীথে ঘুমন্ত মুখ প্রফুল্ল-কমল,
মাখা তায় অকপট রূপের জ্যোছনা।"

তিনি 'অকপট' কথাটার সার্থকতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, "জাগ্রদবস্থায় প্রায়ই মুখের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। নানারূপ মনোভাবের জন্য মুখে একটা অপ্রকৃত ভাবের ছায়াপাত হইয়া থাকে, নিদ্রিতাবস্থায় তাহা হয় না, সুতরাং মুখের প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও আকৃতি বুঝিতে পারা যায়।" তিনি সন্তুষ্ট হইলেন এবং এই প্রসঙ্গে আজ-কালকার কোন কোন প্রখ্যাতনামা কবির রচনাও যে অত্যধিক অস্পষ্টতা-দোষে দুষ্ট, তাহা বলিয়া আক্ষেপপ্রকাশ করিলেন। পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ কবি-প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া শেষে তিনি বলিলেন, "তবে তিনি সাধারণ লোকের নিকট চিরকালই অবোধ্য থাকিয়া যাইবেন। আমরাই অনেক সময় তাঁ'র কবিতার ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রকৃত রস উপভোগ করিতে পারি না। দুঃখের বিষয়, তাঁহার অনুকরণকারিগণের মধ্যে অনেকেরই তাঁ'র প্রতিভার অংশমাত্রও না থাকাতে, তাঁহাদের রচনাতে অনাবশ্যক অস্পষ্টতার ভাব আরও বেশী এবং সেজন্য তাহা অনেক সময়ই অপাঠ্য হইয়া পড়ে।"

একদিন পাশ্চাত্য মনীষিগণের রচনার আলোচনা হইতেছিল। তৎ-প্রসঙ্গে তিনি কার্লাইলের "Sartor Resurtus" নামক পুস্তকের বিশেষ প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, "কার্লাইল ও এমার্সনকে যে ঋষি আখ্যা দেওয়া হয়, সেটা বড় অত্যুক্তি নহে। তাঁহাদের লেখাতে আমাদের আর্য্য-ঋষিগণের ভাবের অনেক আভাস পাওয়া যায়, এজন্য আমার কাছে তাঁহাদের লেখাগুলি বড়ই ভাল লাগে।"

একদিন আমার লিখিত "পতিতা রমণী" নামক একটি কবিতার প্রসঙ্গে পতিতাগণের বিষয়েও অনেক কথা হয়। তাহাতে তিনি যে সমুদয় মহানুভব পৃথিবী হইতে একেবারে পতিতাগণকে উঠাইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "কিন্তু এ চেষ্টা কখনও ফলবতী হইতে পারে না। জগতে এই এক শ্রেণী চিরকাল আছে এবং চিরকালই থাকিবে, আমি ইহাদিগকে বরং 'Safety valves of the society' বলিতে চাই।" আমি বলিলাম, "যে সমুদয় পাষণ্ড কুল-নারীগণের সর্ব্বনাশসাধন করে, তাহাদের অপেক্ষা বেশ্যাগামিগণ অনেক গুণে ভাল বলিতে হইবে।" তিনি বলিলেন, "হাঁ, এ কথা সত্য। তবে কুৎসিত পীড়া-সংক্রমণে অনেক সময় তাহারা অধস্তন পুরুষের পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশসাধন করে, ইহা আরও দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, যাহারা নিতান্তই অসংযমী, তাহাদের পক্ষে আমি বরং পতিতা-সংসর্গ ব্যবস্থা করিতে পারি, কিন্তু কুল-নারীর সর্ব্বনাশ কোনক্রমেই, কোন কারণেই অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহি।"

পাশ্চাত্য সতীত্বের আদর্শ এবং আর্য্য-সতীর আদর্শ-সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। তাহাতে তিনি দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করেন যে, আর্য্য-আদর্শ পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চ। কোনও দেশে কোনও কালে এতদপেক্ষা উচ্চ আদর্শ কল্পিত হয় নাই—কখন' হইবেও না ; কারণ, তাহা হইতে পারে না।"

বরদাবাবুর আবৃত্তি অতি সুন্দর ছিল। একদিন তিনি তাঁহার রচিত 'চকোর' নামক কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমাকে শুনাইলেন ; তা'রপর তাঁহার ইংরাজি কবিতাও দুইটি আবৃত্তি করিলেন ; সেরূপ সুন্দর আবৃত্তি আমি অতি কমই শুনিয়াছি। আবৃত্তি-শ্রবণেই কবিতার ভাব যেন মনের মধ্যে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

ফরিদপুরে সে সময় 'সঞ্জয়' ও 'হিতৈষিণী' নামক দুইখানি সাপ্তাহিক-পত্র ছিল। উভয়ের মধ্যে রীতিমত বিদ্বেষ-ভাব ছিল। আমি প্রধানতঃ 'সঞ্জয়' পত্রেই লিখিতাম। এই প্রসঙ্গে একদিন আলোচনা হয় ; তাহাতে উভয় পত্রের বিদ্বেষ-ভাবের উল্লেখ করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখপ্রকাশ করেন আর বলেন যে, "যদি উভয়ে একত্র হইয়া একখানি কাগজ চালান, তবে দেশের জন্য অনেক কাজ করিতে পারেন।" দুঃখের বিষয় তৎপক্ষে আমাদের চেষ্টাতেও কোন ফল হয় নাই।

এইরূপে অনেক সময়ই তাঁহার সহিত অনেক কথা-বার্ত্তা হইয়াছে ; তাহাতে প্রতিবারই তাঁহার উদারতা, স্বদেশ-প্রীতি এবং বঙ্গ-সাহিত্যে অকপট অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছি। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র সাহিত্য-সেবককেও তিনি যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, যেরূপ আদর-আপ্যায়ন করিতেন, তাহা প্রকৃতই তাঁহার অমায়িকতা ও মহানুভবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

একবার ফরিদপুরের মেলার সময় স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রভৃতির সঙ্গে মেলার মাঠে বসিয়া বসিয়া আমাদের কথা-বার্ত্তাতে ইংরাজি বুকনি দিবার প্রসঙ্গ উঠে। সে সময় বরদাবাবু এমন সাবধান হইয়াছিলেন যে, একটা ইংরাজি কথাও তিনি ব্যবহার করেন নাই, অথচ তিনিই সে ক্ষেত্রে বেশী কথা বলিয়াছিলেন। আজ তাঁহার পরলোক-গমনের সংবাদে সেই সৌম্য ও সদা-সহাস্য বদন-মূর্ত্তি এবং তাঁহার নিরহঙ্কার অমায়িক ব্যবহারের কথা মনে পড়াতে বড়ই বেদনাবোধ করিতেছি ; তা'ই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁ'র স্মৃতি-তর্পণ করিয়া একটু শান্তি পাইতে প্রয়াসী হইলাম। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল ও শান্তিবিধান করুন, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী

ভারতীয় ভাষা

(সংগৃহীত সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

(১)

বররুচি, তাঁহার "প্রাকৃত-প্রকাশে" এবং তাঁহার টীকাকার ভামহ "মনোরমা"য় প্রাকৃতের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রাকৃত মুখ্য ও গৌণভাবে সংস্কৃত-সম্ভূত। বররুচি বলেন, প্রাকৃত চতুর্ব্বিধ—১। মাহারাষ্ট্রী—(প্রাকৃত ইহার নামান্তর) ২। পৈশাচী। ৩। মাগধী। ৪। শৌরসেনী। প্রথম নয়টী অধ্যায়ে তিনি প্রাকৃত বা মাহারাষ্ট্রীর ব্যুৎপত্তিগত নিয়মাবলীর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর দশম অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন যে, পৈশাচীর প্রকৃতি বা মূল শৌরসেনী—"পৈশাচীপ্রকৃতিঃ শৌরসেনী।" এই বচনের টীকায় ভামহ লিখিয়াছেন যে, পৈশাচী পিশাচদিগের ভাষা—"পিশাচানাং ভাষা পৈশাচী। অস্যা পৈশাচ্যাঃ প্রকৃতিঃ শৌরসেনী।" একাদশ অধ্যায়ে মাগধীকে বররুচি এই শৌরসেনীজাত বলিয়াছেন—"মাগধীপ্রকৃতিঃ শৌরসেনী।" দ্বাদশ অধ্যায়ে শৌরসেনী-ভাষাকে সংস্কৃত-ব্যুৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শেষে বররুচি ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, অন্যান্য বিষয়ে শৌরসেনী মাহারাষ্ট্রীর ন্যায়—"শেষং মাহারাষ্ট্রীবৎ।" দেখা যাইতেছে যে, বররুচি মাহারাষ্ট্রী ও প্রাকৃতকে একার্থবোধক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীধরের 'ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা'য়ও লিখিত আছে যে, প্রাকৃত মাহারাষ্ট্রী-সমুদ্ভূত—"প্রাকৃতং মাহারাষ্ট্রীভবম্।" শৌরসেনীকে যখন সংস্কৃতজ বলা হইয়াছে, তখন মাহারাষ্ট্রী বা প্রধান প্রাকৃতও সংস্কৃতজাত, ইহাও স্বীকার্য্য। বররুচি, ইহাই সপ্রমাণ করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। হেমচন্দ্রও (১।১) বলেন যে, প্রাকৃত সংস্কৃত-ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে—"প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্। তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতম্।" মার্কণ্ডেয়, ধনিক, সিংহদেবগণি, নরসিংহ, বাসুদেব, প্রভৃতি এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। (১)

হেমচন্দ্র প্রাকৃতকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—আর্ষ, চূলিকা পৈশাচিক ও অপভ্রংশ। ত্রিবিক্রম, সিংহরাজ, নরসিংহ এবং লক্ষ্মীধর হেমচন্দ্রের অনুবর্ত্তী। মার্কণ্ডেয়ের মতে প্রাকৃত চতুর্ব্বিধ ; যথা, ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচ।—মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, প্রাচ্য, অবন্তী এবং মাগধী। মার্কণ্ডেয় দাক্ষিণাত্য ও বাহ্লীকীকে মাগধীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ; কিন্তু অর্দ্ধমাগধীকে মাগধী হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শাকারী, চাণ্ডালী, সাবরী, আভীরিকী ও শাক্কীকে তিনি বিভাষার অন্তর্গত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু ওড্রী ও দ্রাবিড়ীকে বাদ দিয়াছেন। অপভ্রংশ ২৭ প্রকারের। এগুলি আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা,—নাগর, ব্রাচড় ও উপনাগর। কৈকেয়, শৌরসেন ও পাঞ্চাল নাগরের অন্তর্গত। তবে এই তিনটী নাগর অপভ্রংশের মধ্যে গণনীয় নয়, ইহারা একাদশবিধ পৈশাচ-রীতির মধ্যেই পরিগণিত হইয়া থাকে।

অপভ্রংশ—অধস্তন প্রাকৃত ভাষার পরবর্ত্তী স্তর অপভ্রংশ বলিয়া অভিহিত। অপভ্রংশ অর্থে "দুষ্ট" বা "বিকৃত" বুঝায়। ভাষা "সম্বন্ধে এশব্দের প্রয়োগ হইলে, "উন্নত" বা "বিকসিত" বুঝায়। যে সকল চলিত ভাষার উপর প্রাকৃত-ভাষা প্রতিষ্ঠিত, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে 'অপভ্রংশ' নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং এই অপভ্রংশ-ভাষার উন্নতি-কালে অনেক গ্রন্থ অপভ্রংশেই রচিত হইয়াছিল। অপভ্রংশ-সাহিত্যে আমরা ভারতবর্ষের তৎকালীন কথিত ভাষাসমূহের অনেক নিদর্শন পাই। কোন্ সময়ে এই ভাষার গ্রন্থাদি প্রণীত হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে আমরা ষষ্ঠ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অপভ্রংশ-ভাষায় লিখিত পদ্য দেখিতে পাই। ইহার পরে বোধ হয় এ ভাষার আর প্রচলন ছিল না। আধুনিক ভাষাসমূহের বা তৃতীয় স্তরের প্রাকৃতের নিদর্শন আমরা দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাই। অতএব, আমরা মোটের উপর বলিতে পারি যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে আধুনিক ইণ্ডো-এরিয়ান ভাষাসমূহের প্রচলন আরব্ধ হয়।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, প্রাকৃত কিংবা সংস্কৃত হইতে আধুনিক ভাষাসমূহ ব্যুৎপন্ন না হইয়া বরং এগুলির অপভ্রংশ হইতেই বিকাশ হইয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে আমরা এ বিষয়ে অনেক সাহায্য পাই সত্য, কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানের মূল অপভ্রংশ। এক্ষণে অপভ্রংশ হইতে যে সকল প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

সিন্ধু নদের নিম্নস্থ চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশে "ব্রাচড়" নামক একপ্রকার অপভ্রংশ প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে সিন্ধী ও লাণ্ডা (Lahnda) ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। কোহিস্থানী ও কাশ্মীরী ভাষাদ্বয় কোন্ ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে সম্ভবতঃ যে, ঐ ভাষার সহিত "ব্রাচড়" ভাষার অনেক সাদৃশ্য ছিল। নর্ম্মদা উপত্যকার দক্ষিণে আরব্যোপসাগর হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত প্রদেশে অনেকগুলি ভাষা ব্যবহৃত হইত। এইগুলির সহিত অপভ্রংশ-বৈদর্ভীর খুব নিকট-সম্বন্ধ। বৈদর্ভী ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপভ্রংশ-ভাষাসমূহ হইতে আধুনিক মারাঠী-ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে।

দক্ষিণাত্যের পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত অপভ্রংশ ওড্রি বা উৎকলী প্রচলিত ছিল। ইহা হইতে আধুনিক উড়িয়া-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ওড্রি উত্তরে বিহার, ছোটনাগপুর ও যুক্তপ্রদেশের পূর্ব্বার্দ্ধে মাগধী-ভাষা প্রচলিত ছিল এবং ইহা হইতে আধুনিক বেহারী-ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা একটী প্রধান ভাষা ছিল এবং পূরবী-প্রাকৃতের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল। ওড্রি গৌড়ী, ও ঢক্কী (Dhakki) ভাষাসমূহও ইহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মাগধীর পশ্চিমে প্রাচ্য অপভ্রংশ বা গৌড়ী প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক মালদা-জিলার অন্তর্ব্বর্ত্তী গৌড়ই ইহার কেন্দ্রস্থল ছিল। ইহা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে বিস্তৃত হইয়াছিল ও ইহা হইতে বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা, আরও পূর্ব্বে ঢাকার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং 'অপভ্রংশ-ঢক্কী' বলিয়া অভিহিত হইত। ময়মনসিংহ, ঢাকা, সিলহেট ও কাছাড়-প্রদেশে যে ভাষা

(১) প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্। তত্র ভবং প্রাকৃতমুচ্যতে—মার্কণ্ডেয় ১
প্রকৃতেরাগতং প্রাকৃতম্ প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্—(ধনিক) দশরূপ ২।৬০
প্রকৃতেঃ সংস্কৃতাদাগতং প্রাকৃতম্—বাগ্‌ভটালঙ্কার (সিংহদেবগণি) ২।২
প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্। তত্র ভবত্বাৎ প্রাকৃতং স্মৃতম্—প্রাকৃতচন্দ্রিকা (পিটারসনের সংস্করণ), Third report 343,
প্রকৃতেঃ সংস্কৃতায়াস্তু বিকৃতিঃ প্রাকৃতী মতা—(নরসিংহ) প্রাকৃত-শব্দ-প্রদীপিকা, পৃঃ ১
প্রাকৃতস্য তু সর্ব্বমেব সংস্কৃতং যোনিঃ—বাসুদেবকৃত প্রাকৃত সঞ্জীবনী, (কর্পূরমঞ্জরী, বোম্বাই সংস্করণ, ৯,১১)

ব্যবহৃত হয়, ইহাই তৎ-সমূহের আদি। গৌড়-অপভ্রংশ পূর্ব্বে আরও বিস্তৃত হইয়াছিল এবং উত্তর-বঙ্গের ও আমাদের ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা অপভ্রংশ-ভাষাসমূহের পরিচয় দিলাম। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পূরবী ও পশ্চিমী প্রাকৃতের মধ্যবর্ত্তী অর্দ্ধ-মাগধী বলিয়া আর একটী ভাষা আছে। এক্ষণে পূরবী-হিন্দী (Eastern Hindi) ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভাষা অযোধ্যা, বুন্দেলখণ্ড ও ছত্তিসগড় প্রদেশসমূহে প্রচলিত আছে।

আভ্যন্তরীণ ভাষাসমূহ (The Inner languages) যে "অপভ্রংশ" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নাগর-অপভ্রংশ বলিয়া অভিহিত। ইহা বোধ হয় পশ্চিম-ভারতে ব্যবহৃত হইত। আধুনিক ভাষা-সমূহ হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নাগর-অপভ্রংশ অনেকগুলি বিভিন্ন ভাষায় সমস্ত পশ্চিম-ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের মধ্যে শৌরসেন-অপভ্রংশ একটী। ইহা হইতে পশ্চিমী হিন্দী ও পাঞ্জাবী ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে। "আবন্তী"ও ইহাদের মধ্যে আর একটী। ইহা আধুনিক উজ্জয়িনীর চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশে ব্যবহৃত হইত এবং "রাজস্থানী"-ভাষা ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এক্ষণে উত্তর-ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। এই ভাষাসমূহ পূর্ব্ব-পাঞ্জাব হইতে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। এই সকল ভাষা রাজস্থানী-ভাষার সহিত অত্যন্ত নিকট-সম্বন্ধ এবং আমরা ইতিহাসপাঠে অবগত হই যে, এই প্রদেশস্থ কতকগুলি জাতি রাজপুতানা হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। অতএব ইহা সম্ভব-পর যে, "রাজস্থানী"-ভাষার ও সেই প্রদেশের ভাষার উৎপত্তি একটী ভাষা হইতেই হইয়াছে এবং এই ভাষা আবন্তী অপভ্রংশ।

ক্লাসিক্যাল বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত।—বিশুদ্ধ সংস্কৃত কোন মূল প্রাকৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পাণিনি ও অন্যান্য অনেক বৈয়াকরণের পরিশ্রমে এই ভাষা, ইহার বর্ত্তমান আকারে সীমাবদ্ধ হইয়াছে। এই ভাষা দ্বিতীয় স্তরের প্রাকৃত হইতে যথেচ্ছা শব্দ-গ্রহণ করিয়াছিল এবং উক্ত প্রাকৃত ও সংস্কৃত হইতেও অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল শব্দ "তৎসম" বা সংস্কৃতের ন্যায় একই বলিয়া প্রাকৃত বৈয়াকরণ-কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে এবং যে সকল প্রাকৃত-শব্দ মূল-প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা "তদ্ভব" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অর্দ্ধ-তৎসম (Semi-tatsamas) বলিয়া কতকগুলি শব্দের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ শব্দগুলি "তৎসম" বটে, কিন্তু লোকমুখে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈয়াকরণগণ "দেশ্য" (Desya) নামক আর এক-প্রকার শব্দের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে সকল শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত হইতে হয় নাই, সেইগুলিকে ঐ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছিল।

আধুনিক ভাষাসমূহের উপর সংস্কৃতের আধিপত্য।—অতএব আমরা দেখিলাম যে, অনেক শত বর্ষ ধরিয়া বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষা আধুনিক ভাষাসমূহের শব্দ-সমষ্টির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু এই সকল ভাষার ব্যাকরণে ইহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বৈদিক যুগ হইতে এই ভাষাসমূহ উন্নতির দিকে চলিয়াছে। সংস্কৃতের প্রভাবে ইহাদের গতির হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হয় নাই এবং সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মাদি এই সকল ভাষার বর্ত্তমান ব্যাকরণে আদৌ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বৈদেশিক শব্দগুলি আধুনিক ভাষাসমূহকর্ত্তৃক যেভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই সকল তৎসম শব্দও সেইরূপভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক ভাষাগুলির ধাতু-রূপ করিতে গেলে, সেই ধাতুর পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু বিশেষ্যগুলির প্রায়ই পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এজন্য তৎসম শব্দগুলি কখনও ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় না।

কিন্তু লেখকদিগের অজ্ঞতাবশতঃ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অনেকগুলি শব্দকে এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। মিশ্র দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষাসমূহ হইতেও কতকগুলি শব্দ লওয়া হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ শব্দই প্রাচীন সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা-সমূহ হইতেই আসিয়াছে। অতএব এইগুলিই বাস্তবিক-পক্ষে "তদ্ভব"; কিন্তু আমাদিগের বৈয়াকরণগণ যে অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহার করেন, এখানে উহা সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এই দেশ্য (Desya) শব্দগুলি স্থানীয় ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং গুজরাট প্রভৃতি দেশের সাহিত্যাদিতে এই ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক সংস্কৃত-ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষাসমূহেরও এই অবস্থা দেখিতে পাই। বিদেশী শব্দগুলি বাদ দিলে, এই ভাষাসমূহের শব্দ-সমষ্টিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়—তৎসম, অর্দ্ধ-তৎসম ও তদ্ভব। তদ্ভব শব্দগুলি মূল-প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আধুনিক তৎসম ও অর্দ্ধ-তৎসম শব্দগুলি সংস্কৃত হইতে লওয়া হইয়াছে। তদ্ভবগুলিই ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়।

মিশ্র দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষাসমূহের প্রভাব।—যে সকল আর্য্য উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শীঘ্রই অসভ্য জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। এই জাতিসমূহ মিশ্র দ্রাবিড় ও মুণ্ডা বংশ হইতে উৎপন্ন। নূতন আগমনকারিগণ তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের অনেক আচার অভ্যাস করিয়াছিলেন। ভাষা-সম্বন্ধেও তাঁহারা এই জাতিসমূহের অনেক-গুলি শব্দ লইয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সকলের ধারণা ছিল যে, এই প্রকার শব্দ-সমষ্টির সংখ্যা অনেক হইবে; কিন্তু মধ্যে আবার অনেকে বলিতে লাগিলেন যে, এই শব্দ-সমষ্টির সংখ্যা খুব অল্প। আমাদের মতে শেষোক্ত পণ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহা অপেক্ষা এই শব্দ-সংখ্যা অনেক বেশী। বর্ণমালায় মূর্দ্ধন্যবর্ণ লইয়াই তর্ক। আদিম আর্য্য অর্থাৎ ইণ্ডো-ইরাণীয়ান্ ভাষায় এই অক্ষরগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষাগুলিতেই এই অক্ষরগুলি প্রথম দেখা যায়। মিশ্র দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষাসমূহে এইগুলি সচরাচর দৃষ্ট হয় এবং খুব সম্ভবতঃ এখানেই ইহাদের উৎপত্তি। এক্ষণে বিচার করিতে হইবে যে, ইণ্ডো-এরিয়ান্গণ মিশ্র দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষা হইতে ঐ অক্ষরগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না।

কিন্তু এই বর্ণগুলি বিশুদ্ধ আর্য্য-ভাষা হইতে উৎপন্ন শব্দসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের মতে অনার্য্যদিগের সহিত সহবাসে আর্য্যদের উচ্চারণ-প্রণালী অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তবে যে সকল বস্তু-সম্বন্ধে আর্য্যগণের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, তাহাদের নামগুলি তাঁহারা এই অসভ্য জাতির ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা একটী ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইতেছে। যেখানে মিশ্র দ্রাবিড় ও মুণ্ডা ভাষার প্রভাব অল্প ছিল, সেইখানে এই সকল মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে তারতম্য ঘটিয়াছে। আধুনিক ভাষাসমূহের উপরে মিশ্র দ্রাবিড় ও মুণ্ডা আর একরকমে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যেখানে একটী বিষয়কে দুই তিন রকমে প্রকাশ করিতে পারা যায়, সেখানে যেটীর দ্বারা ভাবের ও শব্দের ঐক্য প্রকাশিত হয়, স্বভাবতঃ সেই বাক্য ব্যবহৃত হয়। দ্রাবিড় ভাষায় এই প্রকার বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়।

ইণ্ডো-চাইনিজ্ ভাষাসমূহের প্রভাব।—ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষা-সমূহের উপর ইণ্ডো-চাইনিজ্ ভাষাসমূহের প্রভাব অল্পই বলিয়া বোধ হয়।

আসামী-ভাষায় ও পূর্ব্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত দুষ্ট বাঙ্গালাতে কতকগুলি টিবেটো-বর্ম্মান্ এবং অহোম (Ahom) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। আসামী-ভাষায় "বিশেষ্যের" সহিত সর্ব্বনামের বিভক্তির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই প্রথা যদিও আর্য্য-ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তথাপি এস্থলে উহা টিবেটো-বর্ম্মান্-ভাষার প্রভাবেরই ফল। কারণ, অনেক পূর্ব্বে আর্য্য-ভাষাসমূহে ঐরূপ প্রথা রহিত হইয়াছে এবং এক্ষণে কেবল টিবেটো-বর্ম্মান্ ভাষাতেই উহা দৃষ্ট হয়।

এই ভাষাসমূহের প্রভাব-সম্বন্ধে আরও একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। প্রাচীন সংস্কৃতে অতীত কাল দুই প্রকারে প্রকাশ করা হইত। যথা,—১। আমি তাহাকে প্রহার করিয়াছিলাম; ২। সে আমার দ্বারা প্রহৃত হইয়াছিল। আধুনিক ভাষাসমূহে "অতীত কালকে" দ্বিতীয় প্রকারেই ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। প্রাচীন সংস্কৃতে অতীত কাল প্রকাশ করিবার আরও একটী উপায় ছিল; ইহা কেবল অকর্ম্মক ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হইত। যথা,—"আমি গিয়াছিলাম" (I went) এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, "আমার দ্বারা তথায় যাওয়া হইয়াছে" (It was gone by me) এইরূপ বলিতে হইত। তখন সকর্ম্মক ক্রিয়ার কখনও ঐরূপ ব্যবহার হইত না; কিন্তু আধুনিক ভাষাসমূহে সকর্ম্মক ক্রিয়ার দ্বারাও ঐরূপ ভাব ব্যক্ত করা হইতেছে। যেমন হিন্দীতে "আমি উহাকে মারিয়া-ছিলাম" বলিতে হইলে, "ময়নে উস্কো মারা" ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ শব্দ-যোজনা টিবেটো-বর্ম্মান ভাষার একটী সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব; সম্ভবতঃ ইণ্ডো-এরিয়ান্ জাতিসমূহ ভারতে আসিবার সময় উহা টিবেটো-বর্ম্মান্ ভাষা হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আধুনিক ভাষাসমূহের উপর বৈদেশিক ভাষাসমূহের প্রভাব।—ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষাসমূহের উপর বৈদেশিক ভাষাসমূহেরও অনেকটা প্রভাব দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ফার্সী ভাষার প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু এই ফার্সী প্রাচীন ইরাণী ভাষা নহে। মোগল-গণ যে আরবী-মিশ্রিত ফার্সী ব্যবহার করিতেন, ইহা সেই শ্রেণীর। এই ভাষাদ্বারা ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষাগুলি বহু-সংখ্যক আরবী, এমন কি, কতকগুলি তুর্কী-শব্দেরও সাহায্য পাইয়াছে। এই ফার্সী-শব্দগুলির উচ্চারণ মোগলদের উচ্চারণের ন্যায়। স্থানানু-সারে ও ধর্ম্মানুসারে উক্ত ভাষার প্রভাবেরও তারতম্য ঘটিয়াছে। তবে, সেগুলি এমন কতকগুলি শব্দ, যাহা প্রত্যেক স্থানে সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষাসমূহের শব্দ-বিন্যাস-প্রণালীর উপর ফার্সী-ভাষার প্রভাব মোটেই দেখা যায় না। কেবলমাত্র মুসলমানদের উর্দ্দূ ভাষার ফার্শী-ভাষাতেই শব্দ-বিন্যাস-প্রণালী দৃষ্টিগোচর হয়।

ফার্সী ও আরবী ভাষা ব্যতীত পর্ত্তুগীজ, ডাচ্ এবং ইংরাজি প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষাসমূহেব প্রভাব, ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় সৈনিক ও রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ-কর্ত্তৃক এই সকল ভাষায় ইংরাজী-শব্দের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ ভাষা-সমষ্টি।—এই ভাষা-সমষ্টি কাশ্মীরী, কোহিস্থানী, লাণ্ডা এবং সিন্ধী এই চারিটী ভাষা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই ভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে খুব নিকট-সমন্ধ বর্ত্তমান।

কাশ্মীরী।—কাশ্মীর-উপত্যকাতেই কাশ্মীরী-ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহার বহির্ভাগে ইহা জাতীয় ভাষায় ন্যায় ব্যবহৃত হয় না। পঞ্জাবে, কাশ্মীর হইতে আগত পণ্ডিত সূত্রধর বা শিল্পিগণকর্ত্তৃক কাশ্মীরী-ভাষা ব্যবহৃত হয়।

কাশ্মীরী-ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন; কিন্তু ইহার কতক-গুলি শব্দ সংস্কৃত-ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত-বর্জ্জিত (Non-sanskritic) ভাষাসমূহের শব্দাবলীর সহিত ঐ গুলির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কাশ্মীরী-ভাষার একটী সম্পূর্ণ ব্যাকরণ আছে ও একখানি শব্দকোষও প্রস্তুত হইতেছে। যদিও এই ভাষা অল্পস্থানে সীমাবদ্ধ, তথাপি ইহার তিনটী শাখা আছে।—১। কমরাজি (Kamrazi), ইহা উপত্যকার উত্তরে ব্যবহৃত হয়; ২। মারাজী (Maragi), ইহা উপত্যকার দক্ষিণে ব্যবহৃত হয়। এবং, জ্যামরাযি (Jamrazi), ইহা শ্রী-নগরের চতুঃপার্শ্বে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই তিনটী ভাষার মধ্যে পার্থক্য খুব অল্প। কাশ্মী-রের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে "খিস্তারী" নামক যে ভাষা চলিত আছে, তাহা কাশ্মীরীভাষা হইতে উৎপন্ন। বনিহাল নামক গিরিপথের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতসমূহে "পগুল" এবং "রামধানী" নামক যে দুইটী ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহারাও কাশ্মীরী-ভাষার শাখা।

কাশ্মারী-ভাষায় অনেক গ্রন্থ লিখিত আছে। এই ভাষার দুইটী বর্ণমালা। একটী ফার্সী-বর্ণমালা হইতে কিছু পরিবর্ত্তিত ও আর একটী প্রাচীন সারদা (sarada) বর্ণমালা। শেষোক্তটী অনেকটা সংস্কৃতের ন্যায়।

কোহিস্থানী।—সিন্ধু নদের বন্তিস্তান ত্যাগ করিয়া ও সিলা (Chilas) প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইয়া কাণ্ডিয়া (Kandia) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী সিলা এবং চিত্রল প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমষ্টি হইতে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান হইতে বৃটিশ্-সাম্রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত সিন্ধু নদ ইণ্ডাস্-কোহিস্থান নামক কতকগুলি পর্ব্বতের মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশের বন্যজাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহা "Indus Kohistani of Maiyan" বলিয়া পরি-চিত। এই ভাষা সংস্কৃত ইণ্ডো-এরিয়ান ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইণ্ডাস্-কোহিস্থানের পশ্চিমে সোয়াট্, পাঁজকোরা এবং কুনার উপত্যকাত্রয় পর পর অবস্থিত।

সোয়াট ও পাঁজকোরাস্থিত জাতিগণ পুর্ব্বে মইয়ান ভাষার সহিত সংশ্লিষ্ট একপ্রকার ভাষা ব্যবহার করিত; কিন্তু এক্ষণে উহারা পাঠানদের শাসনাধীন হওয়ায়, উহাদের ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এবং এক্ষণে তাহারা পুস্ত-ভাষা ব্যবহার করে।

গরওয়াই ও তরওয়ালি।—কেবল অতি অল্পসংখ্যক লোকই প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করে এবং তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহা গরওয়াই ও তরওয়ালি নামে পরিচিত। মইয়ান, গর-ওয়াই, তরওয়ালি এই তিনটী ভাষাকে একটী শ্রেণীর মধ্যে আনিতে পারা যায়। এই ভাষা-সমষ্টি সিন্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া (ভারতের) উত্তর-পশ্চিমস্থ ইণ্ডো-এরিয়ান্ ভাষাসমূহের সহিত কাশ্মীরী-ভাষার সংযোজনা করিতেছে। এই ভাষা-সমষ্টিকে 'কোহিস্থানী' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এ ভাষা-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বেশী কিছু জানা যায় নাই, তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, ইহার সাহিত্য প্রভৃতি কিছুই নাই।

লাণ্ডা।—লাণ্ডা-ভাষা অনেকদিন হইতে অনেক নামে পরিচিত। যাট্কী, মূলতানী ও পশ্চিমী-পাঞ্জাবী প্রভৃতি যে সকল

নামে ইহাকে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটীর দ্বারাও এই ভাষা যথার্থরূপে প্রকাশিত হয় না। ইহা কেবল যাট্‌গণ-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয় না ও একমাত্র মূলতান বা পশ্চিম-পাঞ্জাবেই প্রচলিত নয়; এজন্য এই ভাষার "লাণ্ডা" সংজ্ঞা দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এ ভাষার সাহিত্যাদি কিছুই নাই; প্রত্যুত: ইহা একটী ভাষা নয় কতকগুলি সংশ্লিষ্ট ভাষার সমষ্টি।

যে প্রদেশে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার পূর্ব্ব-সীমা—কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া রামনগরও চীনাব নদ পর্য্যন্ত। সেইস্থান হইতে এই সীমা মণ্টগোমরীর উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত সরলভাবে বিস্তৃত। তৎপরে এই সীমা ভাওয়ালপুরের উত্তরাংশ হইয়া সিরাকি-প্রদেশের মধ্য দিয়া সিন্ধীতে শেষ হইয়াছে। ইহার উত্তর-সীমা কাশ্মীর-উপত্যকার দক্ষিণ, সীমার পর্ব্বতরাজি। ইহার পশ্চিম দিক কোহিস্থান হাজরা জিলা ও সিন্ধু নদ দ্বারা বেষ্টিত।

যে প্রদেশে এক্ষণে লাণ্ডা ভাষার সমধিক প্রচলন, উহা পূর্ব্বে 'কৈকেয়' নামে অভিহিত হইত।

পিশাচ-ভাষা—যে সকল ইণ্ডো-এরিয়ান্ চিত্রল ও গিল্‌গিট প্রদেশে বসবাস করিয়াছিল, পিশাচগণও সম্ভবতঃ সেই জাতীয়। অন্ততঃ তাহাদের আবাস-স্থান ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল। হিন্দু বৈয়াকরণগণ এই ভাষার কতকগুলি প্রধান লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটী এই:—দুইটী স্বরবর্ণের মধ্যে "ও" এর ব্যবহার—যেমন পিতা, কিতা ইত্যাদি।

হিন্দকো—লাণ্ডা-ভাষার অনেকগুলি শাখা আছে। হাজরা জিলা ও সিন্ধু নদের পশ্চিমে যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহা হিন্দকো নামে পরিচিত।

শ্রী—

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বক:—বিপত্নীক কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীবনের সহিত বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্বেতলোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। বরপক্ষ হইতে ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায় মেয়ে দেখিতে গিয়া, পূর্ব্ববৈরতাবশতঃ বরের রূপগুণের এমন বর্ণনা সেখানে করিয়া আসিয়াছিল যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবারই কথা। তথাপি স্থূলপুচ্ছ বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়। সূক্ষ্মলোম, তাহার বন্ধু নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায়কে গোপনে শ্বেতলোমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিল, বন্ধুর মুখে কন্যার রূপ বর্ণনা শুনিয়া সূক্ষ্মলোম একবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। বিবাহের দিন স্থির করিয়া, মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য কৃষ্ণলোম তাহার পুরোহিতকে পাঠাইয়া দেয়। স্থূলপুচ্ছের স্ত্রী গাঢ়লোমার এ বিবাহে ঘোর আপত্তি—ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল কলহ হইল। বিবাহ দিতে স্থূলপুচ্ছ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ইহা জানিয়া গাঢ়লোমা কন্যাকে লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণলোমকে এ সকল সংবাদ দিলে, সূক্ষ্মলোম বিষম বিরহে ও মনস্তাপে গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য।

বানর-মহারাজার সভা।

পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ নতজানু হইরা আসীন।

বানর-মহারাজা। ওহে, এটা কি মাস?
সভাপণ্ডিত। (করযোড়ে) আশ্বিন, মহারাজ।
বা-মহা। কি তারিখ?
সভাপণ্ডিত। উনিশে আজিকে।
বা-মহা। তবে দেখি
শীতের বিলম্ব বেশী নাই।
(সভা নীরব)

বানর মহা। এ বছর
আমার একটা চাহি গরম পোষাক।
যদি কোনও মেষ পাও যা'র লোম ভাল
কোমল, চিক্কণ, শুভ্র—আনিও ডাকিয়া।
জনৈক পাত্র। মহারাজ, আজ্ঞা দেন যদি, কহি তবে—
আজি পথে আসিতে আসিতে দেখিয়াছি
একজন মেষযুবা, তা'র লোমে প্রভু
চমৎকার পোষাক হইতে পারে।
বা-মহা। কোথা
সে মেষ, আন ডাকি তা'রে। (পাত্রের প্রস্থান)
(জনৈক সভাসদের প্রতি) তুমি হে নাকি
কিছুদিন ছুটি ল'য়ে দার্জ্জিলিং যা'বে
বাসনা ক'রেছ?
সভাসদ। মহারাজ, সত্য কথা
ইহা। ভয়ে শুধু শ্রীচরণে নিবেদন
করিতে পারিনি।
বা-মহা। কেন, কি উদ্দেশ্য তব?
সভা। মহারাজ, বহুদিন হ'তে এ ভৃত্যের
গৃহিণীটি ভুগিছেন জ্বরে, সে কারণে,
ভাবিতেছি কিছুদিন তাঁ'রে লয়ে, থাকি
গিয়া কোনও ভাল স্বাস্থ্যকর স্থানে।
বা-মহা। কত
দিন ছুটি চাহ?
সভা। মাস ছয়, আজ্ঞা যদি
হয়। পূরা শীতকাল—
বা-মহা। ওহো, শীতকালে
এ বৎসর মনে করিতেছি, সেই দুষ্ট
মহিষ-রাজার মুণ্ড কাটিয়া আনিব।

যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে শেষভাগে
অগ্রহায়ণের। এই দুই মাসে সব
আয়োজন করিতে হইবে। এ বৎসর
শীতকালে কোনও ভৃত্য মোর, কোনমতে
পাইতে পারে না ছুটি।
সভা। (বিষণ্ণ হইয়া) যথা আজ্ঞা প্রভু।
বা-মহা। সেনাপতি—
সেনাপতি। (দণ্ডায়মান হইয়া) মহারাজ—
বা-মহা। এখন অবধি
প্রস্তুত হইতে থাক। বহুদিন হ'তে
মহিষ-রাজ্যের সঙ্গে বানর-রাজ্যের
শত্রুতা চলিছে। আমাদের কোন প্রজা
ভ্রমক্রমে যদি, তাহাদের মৃত্তিকায়
পদক্ষেপ করে—তখনই তাহারা তারে'
বন্দী করে' নিয়ে যায়। গত বৎসরের
কথা, মহারাণী তাঁ'র আপন দাসীরে
পিত্রালয়ে পাঠায়েছিলেন, সকলের
সংবাদ লইতে; দাসী ফিরিবার কালে
মহিষ-রাজ্যে বন্দিনী হইল। সংবাদ
পাইয়া আমি দূত পাঠালাম মহিষ-
রাজার কাছে, কহিতে, তাঁহার ভৃত্যেরা
যদি তাঁহার অজ্ঞাতে দাসীরে ধরিয়া
থাকে, পত্রপাঠ মুক্ত করে' দিয়ে, দোষি-
গণে দণ্ড দেন শিরশ্ছেদ করি। দাসী
মুক্ত হ'য়ে এল, কিন্তু শুনিতেছি, সেই
অপরাধিগণ লভিয়াছে উচ্চপদ
—রাজার প্রসাদ। এ বৎসর এ রাজ্যেতে
অনাবৃষ্টি। নদীতীরবাসী মহিষ-
রাজা অনুগ্রহ করে', এবার দিবেন
ছেড়ে তাঁহার রাজ্যের ফলভারে নত
অগণ্য কদলীকুঞ্জ, আম্রবন যত,
চিরদিন তরে।
সকলে মিলিয়া। জয় জয় মহারাজ!
এবার করিব যুদ্ধ, কি আনন্দ হ'বে!
(সূক্ষ্মলোমকে লইয়া পাত্রের প্রবেশ)
পাত্র। মহারাজ এই সেই মেষযুবা।
(সূক্ষ্মলোম নতজানু হইয়া প্রণাম করিল)
বা-মহা। ভাল।
কোথা হ'তে আগমন তব মেষ? তুমি
এ রাজ্যের প্রজা, অথবা বিদেশী?
সূক্ষ্ম। প্রভু,
এ দাস বিদেশী; আপাততঃ আপনার
দীন প্রজা।
বা-মহা। তুমি কি উদ্দেশ্য করি, নিজ
দেশ ছাড়ি আসিয়াছ?
সূক্ষ্ম। (সলজ্জভাবে, মৃদুস্বরে) মহারাজ, আমি
অন্বেষণ করিতেছি বাগ্‌দত্তা বধূরে।
বা-মহা। (হাসিয়া) প্রণয়ী তুমি? প্রণয়িনী তব কেমনে
হারায়ে গেল কহ সত্য করি।

সূক্ষ্ম। এ দাস,
রাজসভা মাঝে কহিবে কি আপনার
গোপন-কাহিনী?
বা-মহা। থাক্ তবে, অন্যদিন
নির্জ্জনে শুনিব। তুমি থাক আপাততঃ
আমার সভায়; আজ্ঞা দিব ভৃত্যগণে
অন্বেষণ করি দিবে প্রেয়সীরে তব
অচিরাৎ, থাকে যদি এ রাজ্য-সীমায়।
তোমার ও লোমগুলি চাহি আমি, শীত-
বস্ত্র হইবে আমার।
সূক্ষ্ম। মহারাজ, আমি
বড় ভাগ্যবান্, আমার এ তুচ্ছ লোম
রাজ-অঙ্গোপরে শোভা পাবে, এর চেয়ে
কি সৌভাগ্য অধিক হইতে পারে মম?
বা-মহা। ভাল। শুনে তব কথা হইলাম সুখী।
কাজ কর আমার হইয়া সভাসদ্!
আনি তব প্রেয়সীরে বিবাহ দেওয়াব
যত শীঘ্র হয়।
আজ বেলা হ'ল, তবে
সভা-ভঙ্গ হোক্।
সকলে। জয় মহারাজ, জয়!
(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থূলপুচ্ছের বহির্ব্বাটী।

স্থূলপুচ্ছ আসীন।

স্থূল। হায় হায়, একি দুর্ব্বিপাক! মেয়েটির
বিবাহের সব আয়োজন করিলাম; শেষকালে
কি ঘটিল দেখ! হায়, কেন বা সে দিন
গৃহিণীর কথা শুনে', ভট্টাচার্য্যটিকে
বিবাহ-ভঙ্গের কথা নাহি বলিলাম?
পুত্র নাই, আর কন্যা নাই, শ্বেতলোমা
সকলই আমার ছিল। হারাইয়া তা'য়
কি সুখে বাঁচিয়া আছি বলিতে পারি না।
গৃহিণীর এ কি ক্রোধ! আর কি তাহারা
বেঁচে আছে? এতদিন বাঘে তাহাদের
কোন্ কালে খাইয়া ফেলেছে। তাই যদি
না হইবে, কেন তবে বৃথা হ'ল এত
অন্বেষণ?
(কৃষ্ণলোমের প্রবেশ)
নমস্কার ভাই, এস এস।
ভাল ত সকলে? বস বস।
কৃষ্ণ। (উপবেশন করিয়া) নমস্কার।
স্থূল। শুনেছ ত আমার বিপদ?
কৃষ্ণ। শুনিয়াছি।
তুমি কিন্তু আমার বিপদ শোন নাই।
স্থূল। কি হয়েছে?
কৃষ্ণ। ভাই, আজ একমাস হ'ল

আমার ছেলেটি, গৃহত্যাগ করে' চলে'
গেছে। কত অন্বেষণ তা'র করিলাম—
সকলই বিফল।

স্থূল। গৃহত্যাগ করে' গেল ?
সে কি! বল কি হে! কেন? কারণটা কিছু
জানিতে পেরেছ ?

কৃষ্ণ। সে ত কোনও দিন কিছু
অসন্তোষ করেনি প্রকাশ। দেখিয়াছি,
বরং বিবাহ শুনে' আনন্দেই ছিল।
বন্ধুগণে পত্রাদি লিখিয়া, নিমন্ত্রণ
করেছিল। তা'রপর, শুনা গেল যবে
কন্যাটি করিয়া সঙ্গে তোমার পত্নীর
অন্তর্দ্ধান—পরদিন হ'তে তা'রে আর
পাওয়া নাহি গেল। যে যে তা'র বন্ধু আছে,
সকলের কাছে গিয়ে মিনতি করিয়া
শুধালাম যদি তা'রা জানে কোন কথা।
কেহ কিছু বলিল না, শুধু একজন
নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায় তা'র নাম,
স্পষ্ট কিছু বলিল না, ভাবেতে ভঙ্গীতে
জানাইল শুধু, তোমার কন্যার তরে
বিবাগী হ'য়েছে। বুঝি পণ করেছে সে,
তোমার কন্যারে যদি অন্বেষণ করি
বিবাহ করিতে পারে, তবেই ফিরিবে।
সেই কথা শুনে আমি মনে ভাবিলাম
একবার জেনে আসি এদিকের কোনও
সন্ধান হয়েছে কি না; হ'য়ে থাকে যদি,
তা' হলে সন্ধান পা'ব পুত্রেরও আমার।

স্থূল। হায় ভাই, সে কথা জিজ্ঞাস কেন আর ?
চারিদিকে কত লোক-জন পাঠালাম,
কেহ তাহাদের পারিল না কোনরূপ
সংবাদ আনিতে। নিজে গিয়ে কুটুম্বের,
আত্মীয়ের বাড়ী, প্রতি বন্ধু-গৃহে-গৃহে
দেখিলাম, কোথাও তাহারা নাই।

কৃষ্ণ। তবে
কি উপায় চিন্তা করিতেছ ?

স্থূল। কি উপায়
বল আছে আর ? ভাবিতেছি, কিছুদিন
অপেক্ষা করিয়া দেখি, নাহি যদি আসে,
তবে ঘরে-দ্বারে চাবি বন্ধ করে' রেখে
বাহির হইব; দেশে দেশে পর্য্যটন
করিয়া দেখিব কিছু পাই কি সংবাদ।

কৃষ্ণ। আমি ভাই একেবারে বাহির হ'য়েছি
ঘরে-দ্বারে চাবি বন্ধ করে', দেশে দেশে
ঘুরিয়া খুঁজিব তা'রে বাঁচি যতদিন।
ছেলেটা যে বৃদ্ধ বয়সে, এই শেল
হানিবে আমার বুকে, কে জানিত বল ?

(ক্রন্দন)

স্থূল। সে ত ভাই বালক, এ অপরাধ তা'র
শতবার ক্ষমা করা যায়। দেখ দেখি
অদৃষ্ট আমার! গৃহিণী ত বালিকাটি
ন'ন, তিনি কি করিয়া করিলেন বল
হেন কাজ ? আর যদি নাহি ফিরে তা'রা,
আমার জীবনে বল কি সুখ রহিল ?
সন্ন্যাসী হইয়া কোনও তীর্থস্থানে বসি
শেষ ক'টা দিন কাটাইব।

(ক্রন্দন)

কৃষ্ণ। আমি বলি,
সহজে সন্ধান যদি পাবার হইত,
এতদিন মিলিত সন্ধান। চল মোরা
দুইজনে বাহির হইয়া পড়ি, কাজ
নাই বিলম্ব করিয়া।

স্থূল। (চিন্তা করিয়া) যদি তাই ভাল
বোঝ—চল। কল্য প্রভাতেই যাত্রা করা
যাক্।

কৃষ্ণ। সেই ভাল।

স্থূল। ভাই, এস তবে আজ
আহার করিয়া কিছু, করিবে বিশ্রাম।

(গাত্রোত্থান)

বাড়ীর ভিতরে আর প্রবেশ করিতে
প্রাণ নাহি চায়,—যেন শ্মশান হয়েছে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বানর-মহারাজার প্রাসাদের কক্ষ।

বানর-মহারাজা অর্দ্ধশয়ানভাবে গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছেন।

কিয়দ্দূরে সূক্ষ্মলোম আসীন।

বা-মহা। কি হে, এখনও কিছু হ'লনা সন্ধান ?
তাই ত!—বড়ই আমি হ'তেছি লজ্জিত।

সূক্ষ্ম। (করযোড়ে) মহারাজ, যদি অনুগ্রহ করে' দাসে
কিছুদিন অবকাশ দেন, একবার
নিজে দেখি অন্বেষণ করে'।

বা-মহা। ফিরিবে ত
যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে ?

সূক্ষ্ম। মহারাজ,
নিশ্চয় ফিরিবে দাস।

বা-মহা। যদি ততদিন
কোন সন্ধান নাহিক পাও ?

সূক্ষ্ম। তথাপিও
ফিরিব রাজন্!

বা-মহা। তবে যাও, দেখো বেশী
বিলম্ব না হয়। সফলতা লাভ কর
আশীর্ব্বাদ করি।

(প্রণাম করিয়া সূক্ষ্মলোমের প্রস্থান)

(সেনাপতির প্রবেশ)

এস সেনাপতি এস।
বল কতদূর আয়োজন হল ?

সেনা। প্রভু,
সমুদয় আয়োজন দ্রুত চলিতেছে।

আর একমাসে বলিতে পারিব,
আমি প্রস্তুত হ'য়েছি।

বা-মহা। আর দুইমাস
আছে। সেনাগণে যুদ্ধের কৌশল যত
প্রত্যহ শিখান হোক্ প্রভাতে সন্ধ্যায়।
আমার ভাণ্ডার হ'তে প্রতিদিন সবে
প্রচুর আহার দেওয়া হোক্। বলবান্
সকলেই, হোক্ আরও বলী।

সেনা। মহারাজ,
আপনার মত দয়াবান্ ভূপতি কি
আছে ভূমিতলে ? ধন্য মোরা আপনার
প্রজা।

বা-মহা। সেনাপতি, আমি মনে মনে ভাবি,
আমার এ বিপুল সাম্রাজ্য, একখানি
গৃহ। আমি পিতা, আমার সকল প্রজা
সন্তান আমার। কেহ যদি কোনও দুঃখ
পায়—আমি তা'র জন্য দায়ী। যাও,
মন দিয়া কর গিয়া আপনার কাজ।

(সেনাপতির প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

(পটক্ষেপণ)

ক্রমশঃ

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা

রসির ডায়ারি

(আমি রসি। আমার ভাল নাম রসি, অন্যনাম মুখপোড়া, হারামজাদা, পাজী, শুয়ার, উল্লুক ইত্যাদি। আমি জাতিতে ফক্স-টেরিয়ার, আমার একটি কান কালো, সেই জন্য আমি ধরা-খানাকে সরার মত দেখি।)

সোমবার।
সকাল—৫টা।

সকালবেলা কাকের ডাকের চোটে একটু ঘুমাইবার যো নাই, শেষ-রাত্রিতে উঠিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বাড়ী চৌকি দিয়া মরিয়াছি, সে কথাটা একবার ভাবেও না। বেটাদের যদি একবার মুখের কাছে পাই, ত মজা দেখাইয়া দি। এখনও কেহ উঠে নাই, ভাবিয়াছিলাম এই ফাঁকে একটু ঘুমাইয়া লইব; কিন্তু তাহা আর হইল না দেখিতেছি।

৭টা।

লবা-বেটা উঠিয়াছে দেখিয়া বৈঠকখানার তক্তাপোসের নীচে একটু শুইয়াছিলাম, কিন্তু ছোটদাদার ছেলেটা লেজ ধরিয়া এমন টান দিয়াছে যে, সে রাগ সামলাইতে না পারিয়া তাহার হাতে এক ছোবল বসাইয়া দিয়াছি; অদৃষ্টে নিতান্তই প্রহার আছে দেখিতেছি।

এই লবা-বেটার এত স্পর্দ্ধা আমার সহ্য হয় না। আমি কর্ত্তা-বাবুর কুকুর, আর সে কর্ত্তাবাবুর চাকর। বড়দাদাবাবু কতদিন বলিয়াছেন, "চাকরে আর কুকুরে তফাৎ কি ?" তা'র উপর আমি খাস বিলাতী এলবিয়নের পুত্র, আর সে বেটা ড্যাম নিগার। আমার মনিব যদিও নিগার, তবু ত তাঁহার রংটা ফরসা আছে! আর লবা-বেটার গায়ে যেন আল্‌কাত্‌রা মাখান'। বাবু আমাকে 'রসি' বলিয়া আদর করিয়া ডাকেন, গিন্নী পোড়ারমুখো বলেন, দাদাবাবুরা হারামজাদা, পাজী, শুয়ার, উল্লুক বলে বলিয়া লবা-বেটাও কি তাই বলিবে ? যদি ছোটদাদাবাবুর চাবুকের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে বেটাকে ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিতাম। মোট কথা, কালা-আদ্‌মি এখনও খাস বিলাতী কুকুর পুষিবার যোগ্য হয় নাই।

মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছে। প্রথম শ্রেণীর লোক কুকুর দেখিলে ডরায়, তাহাদিগকে আমরা বড় ঘৃণা করি; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আমাদের ভালবাসে, আদর করে, আমরাও তাহাদের ভালবাসি। আমার বাবুর বাড়ী অনেক রকমের অনেক লোক আসে; কেহ-বা ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া আসে, কেহ-বা হাওয়া-গাড়ীতে চড়িয়া আসে, আবার কেহ-বা হাঁটিয়া আসে। ইহাদের মধ্যে আমরা কেবল ঐ উপরের দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এই সকল বাহিরের লোকের মধ্যে আমি একজনকে বড়ই ভাল-বাসি, সে আমার মনিবের দূর-সম্পর্কের ভাইপো। সে বেচারি বড় ভালমানুষ। লোকটা যদিও মোটা, বেঁটে, কালো, কিন্তু লবা-বেটার চাইতে কালো নয়। সে নিতান্তই গরীব; কারণ, আমার মনিব কখনই গরীব মানুষের সঙ্গে কথা কহেন না।

আমার মনিব-বাড়ীতে কতকগুলি বাঁধা-নিয়ম আছে। মটর-কার অথবা জুড়ি চড়িয়া আসিলে, বাবু তাহাকে বসিতে বলেন এবং লবাকে তামাক সাজিয়া দিতে হুকুম করেন। তাহারা আসিলে বাবু সন্তুষ্ট হন। আমি বাবুর পায়ের তলায় বসিয়া থাকি কিনা, সেইজন্য সমস্ত দেখিতে পাই ও বুঝিতে পারি। এক-ঘোড়ার গাড়ী অথবা ভাড়াটিয়া গাড়ী চড়িয়া আসিলে লোকে বেঞ্চিতে বসিতে পায়, কিন্তু তামাক পায় না; ইহারা চেয়ারে বসিলে বাবু ভারি বিরক্ত হন। যাহারা হাঁটিয়া আসে, তাহাদের অভ্যর্থনাও হয় না, তাহারা বসিতেও পায় না। তাহারা বসিয়া পড়িলে, বড়বাবুর যে বড় অপমান! অতিথি-অভ্যাগত কখনও আমাদের বাড়ীতে আসেনা, আসিলেও স্থান পায় না; তবে জনকতক লোক চির-অতিথির মত আসিয়া সংসারে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তাহারা নাকি দাদাবাবুদের মামার-বাড়ীর দেশের লোক। দাদাবাবুদের মামা বাঁচিয়া আছেন, তিনি যদি কখনও আসেন, তাহা হইলে দুই-একদিনের বেশী থাকেন না; কিন্তু ইহারা যেন আর নড়িতেই চায় না।

একবার সেই লোকটি আমাদের বাড়ীতে থাকিতে আসিয়া-ছিল। তখন আমার সঙ্গে তাহার বড়ই ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে আমাদেরই মত একপাশে চুপ্-চাপ্ পড়িয়া থাকিত এবং দু'বেলা দুই-মুঠা খাইতে পাইত। তখন আমার মনিবের ভগিনী-পতি কিছুকালের জন্য তাঁহার আতিথ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বড় বৈঠকখানায় শয়ন করিতেন এবং ঘরে অন্য কেহ থাকিলে তাঁহার

নিদ্রা হয় না বলিয়া সেখানে আর কেহ শুইতে পাইত না। ভাইপো-বেচারি দিনকতক উঠানে এবং গাড়ী-বারান্দায় শুইয়া অবশেষে— ঘেউ!

বিড়ালটা কথা শেষ করিতে দিল না। ঐ যে কালো বিড়ালটি দেখিলে, উহাকে দেখিলে আমি বেজায় চটিয়া যাই। উহার একশোটি করিয়া বোধ হয় চারিশো পা আর প্রতি পায়ে হাজারটি করিয়া নখ আছে। আমরা তিনজনে তিনদিক হইতে আক্রমণ করিয়াও উহার কিছুই করিতে পারি নাই। আমাদের নাকে, মুখে ও চোখে সেই যুদ্ধের কত ভীষণ চিহ্ন এখনও দেখিতে পাইবে। তথাপি, এখনও উহাকে দেখিলে আমি আক্রমণ না করিয়া থাকিতে পারি না।

৮টা।

ঐ দেখ, সেই লোকটি আসিতেছে। সে বড়-একটা আমার মনিবের নিকটে আসেনা। যখন আসে, তখন দুয়ারের একপাশে দাঁড়াইয়া থাকে এবং অপর কাহাকেও দিয়া কর্ত্তাবাবুকে তাহার উদ্দেশ্য জানাইয়া চলিয়া যায়। নিমন্ত্রণের সময়ে প্রায়ই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া যায়। যাহারা দরিদ্র, তাহাদিগকে কখনই আমার প্রভু-গৃহে নিমন্ত্রণ করা হয় না; কেবল এই লোকটার সহিত কিছু সম্পর্ক আছে বলিয়াই বোধ করি ইহাকে বলা হয় যে, নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

১০টা।

ঐ যে পেট-মোটা লোকটি আসিতেছে, উহাকে দেখিলে আমার হাড় যেন জ্বলিয়া যায়! উহার মত মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর মানুষ, এ পর্য্যন্ত আমি আর দেখি নাই। লোকটা নাকি দূর-সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তাবাবুর ভাই হয়। ঐ লোকটা যখনই আসে, তখনই একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা করে, দেশশুদ্ধ সকল লোকের নিন্দা করে, এবং বিশ্বজগতের মধ্যে তাহার মত ভালমানুষ যে আর কেহই নাই, ইহাই বার-বার করিয়া বলিতে থাকে।

আমার বন্ধুটিকে অর্থাৎ বাবুর ভাইপোটিকে এই লোকটা মোটে দেখিতে পারে না। সেদিন কি বলিতেছিল জান? বলে "বিষ নাই, কুলোপানা চক্র। পয়সা নাই, ভিক্ষা করিয়া খায়, তবু অহঙ্কারে মাটিতে যেন পা পড়ে না। লেখা-পড়া শিখিয়াছে ত মাথা কিনিয়াছে, এখন কি আর লেখা-পড়ার কোন দাম আছে? বি, এ পাশ করিলে মাসে ত্রিশ টাকা মাহিনা হয় না, তাহার জন্য এত অহঙ্কার কেন বাপু? আপনি দেশের মাথা, দশজনের মুরুব্বি, কতলোক আপনার সংসারে মানুষ হয়, সে কি একবার দিনান্তে আপনার দুয়ারে হাজির হইতে পারে না?"

লোকটার ঘ্রাণ-শক্তি অদ্ভুত, কতকটা আমাদের সারমেয়-জাতির মত। যেদিন আমার মনিব বাড়ীতে সমারোহ-ব্যাপার থাকে, সেদিন সে গন্ধে-গন্ধে ঠিক আসিয়া হাজির হয়। ভাই-পোটিকে প্রতিবারই নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া যায়, কিন্তু সে ঠিক আসিয়া চারিজনের খোরাক মারিয়া যায়।

ঐ শুন, আবার কি বলিতেছে। তাহারই নিন্দা করিতেছে আর কি? লোকটার কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান একেবারেই নাই। একবার বাবুকে খোসামোদ করিবার জন্য বলিয়াছিল যে, তাহার আপন ভাইয়ের মেয়ে কুলটা। সেখানে এক বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য বসিয়াছিল, সে রাগিয়া উঠিয়া এমন দু'-চার কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিল যে, দুই-তিন দিনের মধ্যে লোকটা আর আমাদের বাড়ীতে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে মাথা গলাইতে ভরসা করে নাই।

মনটা আজ বড়ই খারাপ। ছোটদাদাবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে চড়িয়া রোজ হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া মেজাজটা একদম বিগড়াইয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। আজ আর যাওয়া হইবে না, কারণ তাঁহার অসুখ করিয়াছে। এ বাড়ীর চাকর-বাকর বড়ই অভদ্র, আদব-কায়দা কিছুই জানে না। আমি দুয়ারে বসিয়া আছি দেখিয়া ঝি-বেটী বলে কি না, "আয় রসি, বেড়াতে যাবি?" দেখদেখি একবার আস্পর্দ্ধা! আমি কি না তা'র সঙ্গে বেড়াইতে যাইব? আমি রসি, খাস বিলাতি, আমি গাড়ী চড়িয়া ছোটদাদাবাবুর সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে যাই, আর সেই আমি কি না, এক বেটী ঝির সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া রাস্তায় বেড়াইতে যাইব? আমি রাগে তিনটা হইয়া ফুলিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা ৬টা।

মনটা বড় খারাপ, ছোটদাদাবাবু আজ আর নামিবেন না। সন্ধ্যা হইতে বড়দাদাবাবু পাশার আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। কর্ত্তাবাবু নিমন্ত্রণ গিয়াছেন, গোলমালে ঘুম হইতেছে না।

রাত্রি ৮টা।

আমার বন্ধু আসিয়া অপরাধীর মত বৈঠকখানার এক কোণে দাঁড়াইয়া আছে, কেহ একবার বসিতেও বলিল না। আমি উঠিয়া গিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার হাত চাটিয়া দিলাম, তিনি হাসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন।

আধঘণ্টা পরে একদফা খেলা হইয়া গেলে, বকুলবাবু (দাদাবাবুদের বহু দূর-সম্পর্কের মামাত ভাই) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, হাবু যে!"

তিনি ধীরে ধীরে বড়দাদাবাবুকে বলিলেন, "দাদা, মেয়েরা নিমন্ত্রণে গেছে, আমি আজ আপনার এখানে খাব।"

বড়দাদাবাবু অম্লান বদনে বলিলেন, "তাইত ভাই, আমাদের যে আজ খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেছে, হাঁড়ী উঠে' গেছে, বামুন-ঠাকুরও চলে গেছে।"

আমি ত অবাক্! রাত্রি একটার কমে এ বাড়ীতে হাঁড়ী উঠে না,—এখনও বোধ হয় রান্না চড়ে নাই। তিনি দুই-পাঁচ মিনিট হেঁট্‌মুখে চুপ্‌টি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষটা অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা হো-হো হাসির রোল উঠিল। আমি কুকুর, বড়লোকের ব্যবহারে আমি পর্য্যন্ত মরমে মরিয়া গেলাম, ল্যাজ গুটাইয়া লজ্জায় চৌকির নীচে গিয়া লুকাইলাম।

মঙ্গলবার।

সকাল ৬টা।

শরীরটা বড়ই খারাপ, মাথা তুলিতে পারিতেছি না, নাক দিয়া এখনও রক্ত পড়িতেছে। তাই কি ছোটদাদাবাবু ভাল আছেন যে, ধোয়াইয়া ঔষধ বাঁধিয়া দিবেন! কাল রাত্রি তিনটার সময় একটা ভয়ানক গোলমাল শুনিয়া কাঁচা ঘুমটা ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, কাহারা যেন সারি দিয়া রান্নাঘরে চলিয়াছে। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইলাম। দেখি, সামনেই কালো বিড়ালের মত মস্তবড় একটা জীব। দেখিয়াই আমার গা জ্বলিয়া গেল। আমি ভাবিলাম, ভগবান্ আমার শত্রু-নিপাতের বড় সুযোগই জুটাইয়া দিয়াছেন। একলাফে তাহার উপর পড়িয়া তাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিলাম। তাহাকে ধরিয়াই কিন্তু বুঝিতে পারিলাম এত বিড়াল নয়, এ একটা মস্ত ইঁদুর। ইঁদুরটা ডাকিয়া উঠিল, আমিও তাহার ঘাড়টা ভাঙ্গিয়া দিলাম। ইঁদুরগুলাও হটিবার পাত্র নয়—দলে ভারি কিনা! কিন্তু সেই সময়ে হাজার হাজার বড় বড়

হাতীর মত ইঁদুর আমাকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিল। কি করি? যেটাকে ধরিয়াছিলাম সেটাকে বুদ্ধিমানের মত ছাড়িয়া দিয়া মহাবিক্রমে লড়াই সুরু করিলাম। চারিদিক্ হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁদুর আসিয়া আমাকে কামড়াইতে লাগিল। দুই-দশটা মারিলাম বটে, কিন্তু অবশেষে একটা আমার নাক, আর একটা আমার লেজ কামড়াইয়া ধরিল; অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে কিছুতেই ছাড়াইতে পারিলাম না। নাক আর লেজ আমাদের বড় নরম জায়গা—তাই ত, কি করি? প্রাণ যে যায়! প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যে, কাপুরুষের মত চীৎকার করিব না, কিন্তু শেষটা আর থাকিতে পারিলাম না, প্রাণের দায়ে চেঁচাইয়া উঠিলাম। সকলের আগে লবা-বেটা জাগিয়া উঠিল; কিন্তু সে বেটা ড্যাম-নিগার, ভয়ানক কাপুরুষ। সে ঘরের ভিতরে থাকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল, "দরওয়ান্-জি, দরওয়ান্-জি, চোর আয়া, ডাকু আয়া।"

দরওয়ান্-জির 'বলিয়া' জেলায় ঘর, মস্ত কুস্তীগির জওয়ান্, একবেলায় একসের আটা এবং আটসের 'ঘিউ' খাইতে পারে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় যে একটি লোটা 'ভাং পিয়ে', তাহার ঘুম কি সহজে ভাঙ্গে?

লবা, বিছানায় শুইয়া শুইয়া ষাঁড়ের মত চেঁচাইতে লাগিল, "দরওয়ান্-জি, ভয়ানক ডাকু আয়া, রসি অনেকক্ষণ থেকে ভয়ানক চেঁচাতা হ্যায়, তোম্ শিগ্‌গীর ওঠ। নাহলে হাম্‌লোককো সব মেরে ফ্যালেগা।"

তাহার চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর অনেক লোক জাগিয়া উঠিল।

বিম্‌লি-ঝি, ঘরে দুয়ার দিয়া তারস্বরে বলিয়া উঠিল, "অগো কর্ত্তাবাবু, গেনু গো গেনু, মনু গো মনু, ডাকাত পড়েছে গো, এখুনি ওপরে এস্‌বে!"

এইবার অন্দরে কর্ত্তাবাবুর ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি ডাকিলেন, "পাঁড়ে!"

মনিবের গলার আওয়াজ পাইয়া পাঁড়েজীর নেশা কাটিল এবং ঘুমও ভাঙ্গিল। তিনি লাঠি হাতড়াইতে হাতড়াইতে বলিলেন, "হুজুর, আভি আতা হ্যায়, আরে এ মিশির!"

মিশ্র মহাশয় রাত্রি বারটার সময়ে উর্দ্দি চড়াইয়া বড়-দাদাবাবুর সঙ্গে স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ সেবন করিতে বাহির হইয়াছিলেন; সুতরাং উত্তর দিবে কে? যাক্, এতক্ষণে আমার নাকটা বাঁচিল, গোলমাল শুনিয়া অন্য ইঁদুরগুলো পলাইয়াছিল, আর পাঁড়েজির বাজ্‌খাই গলার মিঠা আওয়াজ শুনিয়া লেজের দিকের ইঁদুরটাও রণে ভঙ্গ দিতে গেল; আমিত তা'কে এক থাবা মারিয়া নাকে কামড়ের শোধ সুদে-আসলে তুলিলাম। পাঁড়ে, লাঠি লইয়া আসিয়া আলো জ্বালিল। আমি তখন বারটি ইঁদুর মারিয়া দেমাকে ডগমগ হইয়া লেজ নাড়িতেছি ও নাক চাটিতেছি। বেটা ছাতুখোর ভোজপুরী কিনা! হাসিয়াই আকুল, আমার বীরত্ব তাহার মর্ম্মস্পর্শ করিল না, বরং বেটা আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া যেন আহ্লাদে আটখানা! এমন রাগ হইতেছিল যে, কি আর বলিব। একবার মনে হইল, বেটার পায়ে দি এক কামড়! কিন্তু বেটার হাতে যে তেল্-চক্‌চকে লাঠি!

লবা-বেটা এতক্ষণে উঠিয়া আসিল, আমার দশা দেখিয়া সেও হাসিয়া উঠিল।

কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাঁড়ে কেয়া হ্যায় রে?"

পাঁড়েজি হাসি সামলাইতে গিয়া তিনবার বিষম খাইয়া বলিল, "হুজুর—মুসা—!"

গিন্নীর হুকুমমত বিম্‌লি জিজ্ঞাসা করিল, "ও ঠাকুর, মুসা কি? কাবুলী নাকি?"

পাঁড়েজি আকর্ণবিশ্রান্ত দশন-পংক্তি বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "নেহি নেহি, কুছ ডর্ নেহি, কাবুলী নেহি হ্যায়, মুসা। রসিনে দশ বার গো বড়া বড়া মুসা মারা।"

এইবার বিম্‌লি চটিল; সে বলিল, "আ মর্ মুখপোড়া, মুসা কি তাই জিজ্ঞেস্থুচ্ছি। তোর ছাতুখোরের ইঁক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি ছাড়্ না, মুসা কি? হতভাগার যেমন রূপ তেমনি গুণ, আর তেমনি মিষ্টি কথা কি গা! মুয়ে আগুন, মুয়ে আগুন।"

"এ বিম্‌লি—মুসা হ্যায়—ইয়ে হিন্দুর হিন্দুর—বড়া ভারি ভারি হিন্দুর।"

"তাই বল্‌না যমে-খেগো! তবে ডাকাত ডাকাত করে' চেঁচিয়ে পাড়া মাত্ কর্‌ছিলি কেন?"

"হাম্ নেহি বিম্‌লি, হাম নেহি। ইয়ে লবা ডাকু ডাকু বোল্‌কে চিল্লাতা থা।"

"যেমন লবা, তেমনি তুমি। বাবারে বাবা!"

বিম্‌লি ঘুমাইল, পাড়া জুড়াইল। আমিও ঘুমাইলাম। শেষ-রাত্রিতে লবা-বেটা উঠিয়া বড়দাদাবাবুকে দুয়ার খুলিয়া দিল, তা'ও ঘুম-চোখে দেখিলাম। সকল গায়ে বেদনা।

বেলা ৮টা।

লবা বলিল, ছোটদাদাবাবুর অসুখ বড় বাড়িয়াছে, তিনি আজিও নামিবেন না; সুতরাং চাটিয়া চাটিয়াই নাকের ঘা সারাইতে হইবে। আজ আর খাইতে পারিব না, দেহ-মন বড়ই খারাপ।

বেলা ৩টা।

আজ বড় চুপ্-চাপ্, ছোটদাদাবাবুর অসুখ বড় সাঙ্ঘাতিক, গাড়ী-গাড়ী ডাক্তার আসিতেছে। কর্ত্তাবাবুর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, বিম্‌লির গলা চড়িতেছে না, লবা বাজারে চুরি করিতে ভুলিয়াছে। মনের দুঃখে সমস্তটি দিন আমিও কিছু খাই নাই। ছোট-বৌমা একবাটি দুধ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তা'ও ছুঁই নাই।

সন্ধ্যা ৬টা।

আজ নূতন মজা দেখিতেছি। দাদাবাবুদের মামার বাড়ীর সম্পর্কে যে যে এখানে থাকিত, তাহারা সুড়্ সুড়্ করিয়া সরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্যাপারখানা যে কি, বুঝিতে পারিলাম না। রাম, সূর্য্য, হরি প্রভৃতি দাদাবাবুদের মামাত' ভাই সকলেই চম্পট দিয়াছে। রাম বলিল, তাহার ভা'য়ের বড় শক্ত ব্যায়রাম, সূর্য্যের মা মারা গিয়াছেন সংবাদ আসিয়াছে, হরির বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে, অন্য পুরুষ-মানুষ কেহ নাই, অতএব সকলকেই আজ যাইতে হইবে।

রাত্রি ৮টা।

ছোটদাদাবাবুর অবস্থা বড় খারাপ, ডাক্তার আসিয়া বসিয়া আছে, সমস্ত রাত্রি থাকিবে। এত বড় বাড়ীটা যেন খাঁ-খাঁ করিতেছে, লোক-জন বেশী নাই। কর্ত্তাবাবু একা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। লবা আসিয়া আমাকে খুলিয়া দিল, কিন্তু আমার আজ আর বাহিরে যাইতে মন সরিল না, ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিলাম, আজ আর আমাকে কেহ বারণ করিল না। ছোটদাদাবাবুর ঘরে আলো জ্বলিতেছে; ডাক্তারবাবু, আর বড়দাদাবাবু বসিয়া আছেন। ছোটদাদাবাবু অজ্ঞান হইয়া বিছানায় শুইয়া। ঘরের বাহিরের দুয়ারে গিন্নী-মা আর ছোট-বউদিদি

বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছেন। বৌদিদির কাছে গিয়া লেজ নাড়িলাম, হাত চাটিলাম, কিন্তু আজ বোধ হয় তিনি আর আমাকে চিনিতে পারিলেন না। মুখখানি ভার করিয়া চৌকীর নীচে ঢুকিয়া বসিয়া রহিলাম।

* * *

কাল রাতটা যেভাবে কাটিয়াছে, তাহাতে আর বোধ হয় না যে আজিকার দিনটা কাটিবে। বড়ই কঠিন পীড়া, ভয়ানক সংক্রামক, ডাক্তার রোগীকে স্পর্শ করিয়া প্রত্যেকবার ঔষধে হাত ধুইতেছে। বড়দাদাবাবুর সুখের শরীর কিনা! অনিদ্রায় তাই তাঁহার চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছে; বসিয়া বসিয়া তিনি ঢুলিতেছেন। গিন্নী-মা ও ছোট-বৌদিদির চোখে সুধু ঘুম নাই, আমারও তাই। বারান্দায় বসিয়া বসিয়া লবা ও বিম্‌লি ঘুমাইতেছে।

এমন সময়ে একটি পরিচিত মূর্ত্তি আসিয়া ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল। তিনি সেই! আমি ভাবিয়াছিলাম যে, তিনি আর এ বাড়ীর ছায়াও মাড়াইবেন না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া লেজ নাড়িয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং গিন্নী-মাকে বলিলেন, "কাকী-মা, আমাকে কি একটা খবরও দিতে নেই?"

গিন্নী-মা উত্তর দিলেন না, চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। তিনি খাটের উপর উঠিয়া বসিলেন এবং বড়বাবুকে ঘুমাইতে পাঠাইয়া দিলেন।

ইহার পর কয়দিন যে কোথা দিয়া দিন কাটিয়া গেল এবং কখন্ রাত্রি আসিল, আমি তাহা জানিতেও পারি নাই। আমিও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া খাটের নীচে বসিয়া রহিলাম। তিনি আর সেই ডাক্তার, ছোটদাদাবাবুকে লইয়া বসিয়া রহিলেন। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছিলাম যে, তাঁহারা মরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই কালো বিড়ালটা নিত্য দুই-তিনবার আমার দুয়ারের সম্মুখ দিয়া যাইত আসিত, রাত্রিতে ছোট-বড় অনেকগুলা ইন্দুর ঘরের ভিতরে খেলা করিত; এমন কি, একদিন একটা দেশী নেড়ী কুত্তাও সাহসে ভর করিয়া উপর পর্য্যন্ত উঠিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু আমি কাহাকেও কিছু বলি নাই; কেবল ছোটদাদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া এককোণে পড়িয়া থাকিতাম। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, শমনের দূত সেই রোগ-শয্যার চারিপার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুবর্ণ মুখখানির উপরে মাঝে মাঝে তাহাদেরই ছায়া পড়িতেছে। সেখানে যাহারা ছিল, তাহারা মৃত্যুর কবল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি বুঝিতে পারিয়া, চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতাম।

একদিন শেষ রাত্রিতে তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ মুখখানি নীলবর্ণ হইয়া গেল, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আর অধিকক্ষণ নহে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম, একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া লইব। এখন হইতেই রোগীর দেহের গন্ধ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আর রক্ষা নাই। ছোটদাদাবাবু আর কখনও হাতে করিয়া আমাকে ভাত মাখিয়া খাওয়াইবেন না, গাড়ীতে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইবেন না, অপরাধ করিলে মারিবেন না, এবারের মত এই শেষ। যদি জগতের পরে জগৎ থাকে, আর কুকুরের যদি সেখানে প্রবেশাধিকার থাকে, তবেই—

আর কি? শেষ—এই শেষ! রোগীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারের হাত কাঁপিয়া উঠিল, তাপমান যন্ত্র পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল, ঔষধ মাটিতে পড়িয়া গেল! নীরোদবাবু ঔষধ লইয়া মুখে ঢালিয়া দিলেন, তাহা গড়াইয়া পড়িয়া গেল, তিনি মস্তকে করাঘাত করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আবার তিনি উঠিলেন, ডাক্তারকে কি জিজ্ঞাসা করিয়া একটা পিচ্‌কারিতে ঔষধ লইয়া তা'র ছুঁচের মত মুখটা বুকের পাশে বিঁধিয়া দিলেন। যন্ত্রণায় রোগীর মুখ বিকৃত হইল!

* * *

ঔষধের আশ্চর্য্য ফল হইল, রোগীর বিকার কাটিয়া গেল, ধীরে ধীরে দেহের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল। ডাক্তারের মুখে হাসি ফুটিল, আনন্দে আমার বুকখানা সাতহাত হইয়া উঠিল!

ছোটদাদাবাবু ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমে দেহে বল হইল। চেতনা ফিরিল, একদিন ছোটদাদাবাবু বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, আমি লেজ নাড়িতে নাড়িতে স্বশরীরে যেন স্বর্গে চলিয়া গেলাম।

তাহার পর কখন্ যে সেই পরিচিত মূর্ত্তি সেবা-শুশ্রূষা সারিয়া, রোগীকে যমের মুখ হইতে ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই।

মঙ্গলবার।

বেলা ৩টা।

আবার আসিয়া জুটিয়াছে,—নির্লজ্জ, বেহায়া, তীর্থ-কাকের দল আবার আসিয়া জুটিয়াছে! ছোটদাদাবাবু পথ্য করিবার দুই দিন আগে হইতে কর্ত্তাবাবুর রাম, হরি, সূর্য্য আবার আসিয়া জুটিয়াছে! সূর্য্যের মা মরে নাই, বেশ আছে। হরির বাড়ীতে চুরি হয় নাই, সে বলিল, পার্শ্বের বাড়ীতে হইয়াছিল, কিন্তু তা'ও সত্য কি না, সন্দেহ! রামের ভাই তখন বাড়ী ছিল না, হাওয়া খাইতে পশ্চিমে গিয়াছিল; সুতরাং সে ভালই ছিল।

আজ অমাবস্যা। দাদাবাবুর মানসিক কালীপূজা। সকাল হইতে ঢাক-ঢোল বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে, ডাকিয়া ডাকিয়া আমার গলাটা ভাঙ্গিয়া গেল। আজ রামবাবু, হরিবাবু আর সূর্য্যবাবুর লাফালাফি দেখে কে? তাহারাই যেন ছোটদাদাবাবুকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে! নীরোদবাবুর রাত্রি জাগিয়া জ্বর হইয়াছে, তিনি মাথা তুলিতে পারিতেছেন না।

সন্ধ্যা ৬টা।

গিরিশবাবু মদ খান বটে, কিন্তু বড় মন-খোলসা লোক। আমাদের বড়ই ভালবাসেন। তিনি চাকরীর খাতিরে বিদেশে গিয়াছিলেন, সেইজন্য ছোটদাদাবাবুর অসুখের সময় একদিনও আসিতে পারেন নাই। গিরিশবাবু যে রকম বোলচাল দিতে সুরু করিয়াছেন, তাহা আর কি বলিব? তাঁহার বচনের চোটে রাম, সূর্য্য ও হরির মরমে মরিয়া যাইবারই কথা; কিন্তু ইহাদের যদি একটুও চক্ষুলজ্জা থাকে! থাকিলে, এতক্ষণ বাড়ী ছাড়িয়া পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাইত না!

সূর্য্য এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহার মা কয়বার মরিলেন, তাহার হিসাব দিতে আরম্ভ করিয়া গিরিশবাবু হাসাইয়া হাসাইয়া লোকের পেটে খিল ধরাইয়া দিলেন। তিনি রামকে বলিলেন যে, তাহার বাড়ীতে নিশ্চয়ই বহু ধন-দৌলত আছে, তাহা না হইলে এত ঘন ঘন চুরি হইবে কেন? সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার বিদেশে পড়িয়া থাকা একেবারেই উচিত নহে। হরি ছয়মাস পূর্ব্বে বাড়ী ত্যাগ করিবার সময় লাঠি মারিয়া ভা'য়ের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল; সুতরাং অকস্মাৎ তাহার এই বিচিত্র ভ্রাতৃ-স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠা বড়ই বিস্ময়কর।

অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, প্রায় সকলেই আসিয়াছে; কিন্তু কৈ, তিনি ত আসেন নাই! আমি সমস্ত বাড়ীটা ঘুরিয়া ছোটদাদাবাবুর ঘরে আসিলাম। সব অপমান ভুলিয়া যিনি দিনরাত মুখ বুজিয়া ছোটদাদাবাবুর সেবা করিয়াছিলেন, আমি আজ এই আনন্দের দিনে সেই নিরানন্দের বন্ধুকে ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না! ছোটদাদাবাবু কত আদর করিলেন, আমি লেজ নাড়িলাম, দুই পায়ে ভর দিয়া তাঁহার জানুর উপরে উঠিলাম। তিনি আসেন নাই, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাই নাই, বারবার আমার আপন ভাষায় তাঁ'কে এই কথা বলিলাম; কিন্তু ছোটদাদাবাবু ত বুঝিতে পারিলেন না! আমরা সব বুঝিতে পারি, কিন্তু মনের ভাব ত প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না!

রাত্রি ১০টা।

এত লোক, একটা পাঁঠা, সুতরাং আমাদের জন্য একখানা হাড়ও বোধ হয় পড়িয়া থাকিবে না। একবার একবার এই ভাবিতেছি, আর একবার একবার দুয়ারে গিয়া দেখিতেছি, তিনি এখনও আসিলেন কি না।

সকলে খাইতে যাইতেছে। এমন সময় গিরিশবাবু হঠাৎ বড় দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁগো বড়বাবু, হাবু যে এলনা?"

বড়দাদাবাবু বলিলেন, "তাই ত কাকা, হাবুকে বলিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।"

হুঁ,—সে যে নিরানন্দের বন্ধু! এ যে আনন্দের দিন!

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী

কবি

পরের দুঃখে ব্যথা লাগে যা'র,
কোমল যাহার প্রাণ;
উথলে যাহার মুক্ত কণ্ঠে
সরল প্রাণের গান;
আর্ত্তের সেবা লক্ষ্য যাহার,
তুচ্ছ যাহার হেম;
বাতাসের মত উদার যাহার
সহজ অমল প্রেম;
প্রভাত আলোকে যাহার পুষ্প
সিক্ত শিশির জলে;
সন্ধ্যা দেখায় মানসী যাহার
চিত্ত-তুলসী-তলে।
বরষা যাহার কুঞ্জ-কুটীরে
পরাণ ভরিয়া কাঁদে;
বসন্ত যা'র নিশিদিন ধরি'
যৌবন-রাগ সাধে;
কাব্য যাহার হৃদয়-সর্ব্ব
জীবন যাহার ছবি;
সকলি তাহার সুন্দর চির,
সুন্দর সেই কবি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন

সাহিত্য-সংবাদ

এখন ১৩২২ সাল চলিতেছে; সুতরাং বাঙ্গালা সাময়িক-পত্র-প্রকাশের আরম্ভ-কাল হইতে শতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্, এ মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় এই সূত্রে একটা শতবার্ষিক উৎসব ও সভা করিবার আয়োজন চলিতেছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই আয়োজনের ভার লইয়াছেন। সমস্ত বাঙ্গালা সাময়িক-পত্রের সম্পাদকদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক প্রভৃতি সকলপ্রকার লুপ্ত ও প্রচলিত সাময়িক-পত্রের একটি প্রদর্শনী করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রাচীন সাপ্তাহিক ও মাসিক-পত্রাদির সকলপ্রকার রচনার নমুনা উদ্ধার করিয়া সভায় শুনাইবার কল্পনা হইতেছে।

অধুনা যে সকল বাঙ্গালা মাসিক-পত্র বাঁচিয়া আছে, তাহাদের মধ্যে "তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা" ও "বামাবোধিনী-পত্রিকা"ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সাপ্তাহিকের মধ্যে বর্ত্তমান "এড়ুকেশন-গেজেট" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। দৈনিকের মধ্যে "সমাচার-চন্দ্রিকা" "দৈনিকে"র সহিত মিলিয়া "দৈনিক চন্দ্রিকা" নামে এখনও নামটা ও পুরাতন বয়সটা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে। "বাঙ্গালা-গভর্ণমেণ্ট-গেজেট" আর এক হিসাবে বড় অল্প দিনের কাগজ নহে। মফঃস্বলের সংবাদ-পত্রগুলির মধ্যে "ঢাকা-প্রকাশ," "বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী," "কাশীপুর-নিবাসী" "প্রচার" ও "হিন্দু-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি কয়েকখানি প্রাচীন সাপ্তাহিক পত্র বাঁচিয়া আছে। সাময়িক-পত্রের শতবার্ষিক উৎসবে এই সকল সাময়িক-পত্রের এবং অন্যান্য বহু সাময়িক পত্রের সম্পাদকগণের 'মিলন' হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রবাহিনী

দূর—কতদূর হ'তে লয়ে বুকে অনন্ত স্বপন
এসেছিলে কবে তুমি? কোন্ যুগে অয়ি প্রবাহিণি!
কি হরষে—কি আবেগে, মিলনের কি সুখ-কম্পন
তুলেছিল ক্ষুদ্র বুকে কত আশা নিরাশা-কাহিনী।
কোন্ রুদ্ধগিরি-শিরে, ছিলে তুমি চঞ্চলা তটিনী;
কি মহামিলন তরে, কি আহ্বানে এসেছ ছুটিয়া?
কার ডাক! কোন্ নূপুরের ওগো মৃদু রণরিণি,
মর্ম্মবাণী সম হৃদে উঠেছিল গোপনে ফুটিয়া?
কোথা তব বৃন্দাবন? প্রেম প্রস্রবণ কতদূর?
কত দূরে? কোথা গিয়ে হবে তব চির জাগরণ?
সে দিনের মধুমাখা, প্রেমময় বাঁশরীর সুর
শুনিতেছ কতদিন? শুনিবে কি তুমি আমরণ?
যাও মরু-বক্ষ প্লাবি হে তটিনী অনন্তের পানে,
ভক্তবৃন্দ তব কূলে চিরদিন রহিবে ধেয়ানে।

শ্রীহরিপদ দে

বিজ্ঞাপন

পোষ্টাফিসের মারফতে ভারত-গভর্ণমেণ্টের শতকরা বার্ষিক ৪৲ চারি টাকা স্নুদের ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে পরিশোধনীয় কোম্পানীর কাগজ-ক্রয়ের নিয়মাবলী।

শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা স্নুদে গভর্ণমেণ্ট এ বৎসরের ঋণ নূতন প্রণালীতে গ্রহণ করিতেছেন। ইহা ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাস মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা হইবে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পরে যে কোন সময়ে উহা পরিশোধ করিতে পারিবেন।

২। গভর্ণমেণ্ট-গেজেটে যে প্রণালী বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, তদনুসারে প্রচলিত উপায়ে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে এবং অন্যান্য বড় কেন্দ্রে দরখাস্ত গ্রহণদ্বারা ৪½ কোটী টাকার এই ঋণ গ্রহণ করা হইতেছে। অধিকন্তু, যাঁহারা অল্প টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পোষ্টাফিস-সেভিংস্-ব্যাঙ্কের ডিপজিটার হউন বা নাই হউন, নিকটবর্ত্তী যে পোষ্টাফিসে সেভিংস্-ব্যাঙ্কের কার্য্য হয়, তাহার যোগে উহা খরিদ করার জন্য টাকা জমা দিতে পারেন। এরূপ স্থলে সমস্ত টাকা একবারে গৃহীত হইবে।

৩। পোষ্টাফিসের মারফতে ২রা আগষ্ট হইতে ৩০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে। ইহার পর আর দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না।

৪। পূর্ণ শত-সংখ্যক টাকার জন্য দরখাস্ত করা যাইতে পারিবে; কিন্তু ১০০৲ টাকার কম অথবা একজন আবেদনকারীর পক্ষে ৫০০০৲ পাঁচ হাজারের অতিরিক্ত টাকার কাগজের জন্য দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

টীকা।—একজন আবেদনকারী পূর্ব্বে পোষ্টাফিসের মারফতে শতকরা ৩½ টাকা স্নুদের কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া থাকিলেও, এই নূতন ঋণের ৫০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত কাগজের জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

৫। পোষ্টাফিস হইতে ফরম্ লইয়া, তাহা পূরণ করিয়া আবেদনকারীকে দরখাস্ত করিতে হইবে এবং যিনি যত টাকার কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, দরখাস্তের সহিত তাঁহাকে তত টাকা দাখিল করিতে হইবে। তিনি যদি সেভিংস্-ব্যাঙ্কের ডিপজিটার হন, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দেশ্যে সেভিংস্-ব্যাঙ্কের জমা টাকা ব্যবহার করিতে পারিবেন অথবা তিনি নগদ টাকা দিতে পারিবেন অথবা আংশিক নগদ টাকা ও আংশিক সেভিংস্-ব্যাঙ্কের একাউণ্টের টাকা হইতে দিতে পারিবেন। আবেদনকারী স্বয়ং কিম্বা তাঁহার প্রতিনিধির দ্বারা দরখাস্ত পোষ্টাফিসে দাখিল করিবেন। যত টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা হেড্-আফিস পাশ-বহিতে প্রাপ্তি-স্বীকার করিবেন এবং সব্-ব্রাঞ্চ-আফিসে প্রদত্ত টাকার জন্য স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার একখানা স্বতন্ত্র প্রাথমিক রসিদ দিবেন।

৬। যিনি যত টাকার কোম্পানীর কাগজের জন্য দরখাস্ত করিবেন, তিনি তাহার প্রত্যেক ১০০৲ টাকার জন্য ১৭ই আগষ্টের পর যত শীঘ্র সম্ভব, একখানি করিয়া কোম্পানীর কাগজ পাইবেন। কখন্ কোম্পানীর কাগজ পাওয়া যাইবে, পোষ্টাফিস সে বিষয় তাঁহাকে জানাইবে। স্বয়ং উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে কোম্পানীর কাগজ দেওয়া হইবে।

৭। শতকরা বার্ষিক ৪৲ টাকা হারে স্নুদ, ছয় মাস অন্তর দেওয়া হইবে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে পর্য্যন্ত প্রথম ছয় মাসের স্নুদ শতকরা ২৲ টাকা হারে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে দেওয়া হইবে এবং দ্বিতীয় ছয় মাসের স্নুদ উক্ত হারে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর দেওয়া হইবে এবং পরেও এরূপভাবে চলিবে। ইহা ব্যতীত যদি টাকা ১৭ই আগষ্টের পরে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আবেদনকারী টাকা দাখিলের তারিখ হইতে ৩০শে নবেম্বর ১৯১৫ পর্য্যন্ত সময়ের যে স্নুদ, উহা কোম্পানীর কাগজ-প্রাপ্তির সময় নগদ পাইবেন এবং ১৬ই আগষ্টের পূর্ব্বে টাকা দাখিল করিলে, ১৭ই আগষ্ট হইতে ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত স্নুদ ঐরূপভাবে পাইবেন।

৮। আবেদনকারী যে নূতন কোম্পানীর কাগজ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা অতঃপর তিনি পূর্ব্বক্রীত সাধারণ কোম্পানীর কাগজের ন্যায় নিজের জিম্মায় রাখিতে পারিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় রাখিতে পারিবেন। যদি তিনি ইহা পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার ষাণ্মাসিক প্রাপ্য স্নুদ হইতে ইনকম্-টেক্স কাটিয়া লওয়া হইবে না। যদি তিনি কোম্পানীর কাগজ নিজের জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মানুসারে ষাণ্মাসিক স্নুদ দেওয়ার সময় ঐ স্নুদের টাকা হইতে ইনকম্-টেক্স কাটিয়া লওয়া হইবে।

৯। যদি আবেদনকারী তাঁহার কোম্পানীর কাগজ পোষ্টাফিসের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রত্যেক ছয় মাসে, তাঁহার জন্য স্নুদ রীতিমতভাবে তুলিয়া লইবেন এবং ঐ টাকা জমার উদ্দেশ্যে তাঁহার নামে সেভিংস্ ব্যাঙ্ক-একাউণ্ট খোলা হইবে, তাহাতে জমা দিবেন। এরূপভাবে যখন স্নুদ পাওয়া যাইবে পোষ্টাফিস তখন তাঁহাকে জানাইবে। এই কাজের জন্য কোন খরচ দিতে হইবে না।

১০। যদি কোন সময়ে কোন সেভিংস্-ব্যাঙ্ক-ডিপজিটার পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালী অনুসারে পোষ্টাফিসের মারফতে ক্রীত নূতন কোম্পানীর কাগজগুলির সমস্ত অথবা তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কোন দালালি অথবা অন্য কোন প্রকার ফিস্ না লইয়া, পোষ্টাফিস উহা বিক্রয়ের জন্য বন্দোবস্ত করিবে। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ যে কোন সময়ে পোষ্টাফিসে জানিতে পারা যাইবে।

কলিকাতা, সি, এইচ্, হ্যারিসন্,
২৮শে জুলাই, ১৯১৫ অফিসিয়েটিং ডাইরেক্টর জেনারেল।

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ২৩এ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা

বারাণসী

"জয় কাশীজি-কী জয়! জয় কাশীজি-কী জয়! জয় কাশীজি-কী জয়!"

গাড়ী হইতে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ট্রেণের কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, গাড়ী সেতুর উপর দিয়া ছুটিতেছে।

স্বর্গের সিঁড়ির মত "বেণীমাধবের ধ্বজা," আকাশের নীচে বিপুল শূন্যতাকে যেন চুম্বন করিতে চাহিতেছে! গঙ্গার ধবল স্রোতে তাহার ছায়া কম্পমান। দুধের ধারার মত সেই চপল জলের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, প্রাচীন সভ্যতার জননী বারাণসী যুগযুগ ধরিয়া আপন মুখ আপনি দেখিতেছে!

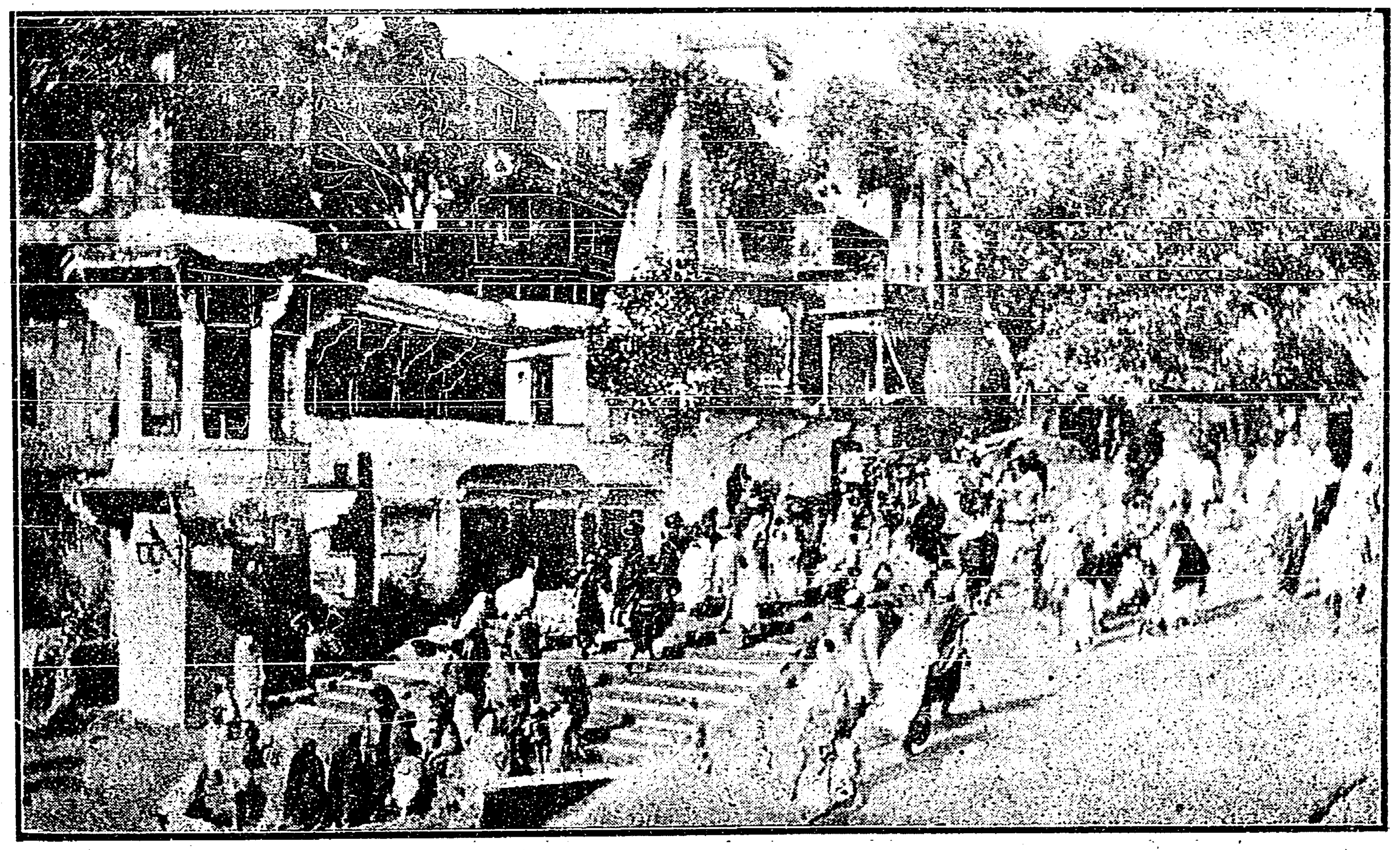

দশাশ্বমেধ ঘাট

প্রথম দৃষ্টিতেই সমস্ত সহরের আসল রূপটি যেন চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিল। একজায়গায়, একসময়ে চোখের পলক-না-পালটিতে নগরের সবটুকু যদি দেখিয়া লইতে চাও, তবে কাশীকে দেখ। কাশীর মত সহর, এই হিসাবে জগতের আর কোথাও আছে কিনা, জানি না; অন্ততঃ ভারতের অন্য কোথাও যে নাই, সে কথা ঠিক। আর, এইজন্যই কাশীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমরা এত উদ্‌গ্রীব।

এ বারাণসী মহাদেবের রাজত্ব; শুধু রাজত্ব বলি কেন, এখানে বারাণসীরূপে শিবই বুঝি মূর্ত্তিমান্! পিনাকীর ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং কাশীও ঠিক আধখানা চাঁদের মতই দুধারে বাঁকিয়া আছে। সেই চন্দ্রাকৃতি বারাণসীর শিয়রে বসিয়া গঙ্গা, দিবারাত্র জলক্রীড়া করিতেছেন।

চঞ্চল কালস্রোতের মাঝখানে গিরিদ্বীপের মত বারাণসী

স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া,—তাহার চরণ-তলে আসিয়া ধ্বংসের ঢেউ যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জগতে কাশীর মত প্রাচীন জীবন্ত নগর এখন আর কোথাও নাই। কাশী, ব্যাবিলন, চ্যালডিয়ার সভ্যতা দেখিয়াছে, মিশরের সভ্যতা দেখিয়াছে, রোমের সভ্যতা দেখিয়াছে,—ভাগ্য-নাট্যের কত বিচিত্র,কত বিখ্যাত, কত অশ্রুসিক্ত বিয়োগান্ত দৃশ্যের অভিনয় তাহার চোখের উপর দিয়া হইয়া গিয়াছে, লিখিত ও অলিখিত ইতিহাস তাহার সাক্ষী। হিন্দুধর্ম্মের মত হিন্দুসভ্যতাও নবীনের ভ্রূভঙ্গীতে কোনকালেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই! মৃন্ময়-পাত্র যদি কাংস্য-পাত্রের গায়ে পড়িয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায়, তবে কাংস্য-পাত্র কিছু না বলিলেও মৃন্ময়-পাত্র আপনা-আপনি পারি; কারণ, শিব যেখানে একচ্ছত্র অধিপতি,সেই বারাণসীতে অন্য ধর্ম্মেরও প্রবেশ-নিষেধ নাই। শিবের কাশীতে, বিশ্বনাথের পাশেই তাঁহার মন্দির ছাড়াইয়া মস্‌জিদের চূড়া আকাশ ছুঁইতে উপরে উঠিয়াছে। এখানে শিবমন্দিরের পাশে মসজিদ, মসজিদের পাশে বৈষ্ণব দেবতা, তাঁ'র পাশে রক্তের দেবী কালিকা, তাঁর পাশে খৃষ্টানের গির্জ্জা, তা'র পাশে জৈন-মন্দির এবং অদূরে থাকিয়া বুদ্ধদেবও শান্ত, নতনেত্রে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার যোগভঙ্গ করে এমন সাহস কাহারও নাই—এ এক বিচিত্র দৃশ্য, অদ্ভুত ব্যাপার! দেবতাদের মাঝে মানুষ যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে, মহাদেবের নামমাহাত্ম্যে সে ব্যবধানও যেন অনেকটা

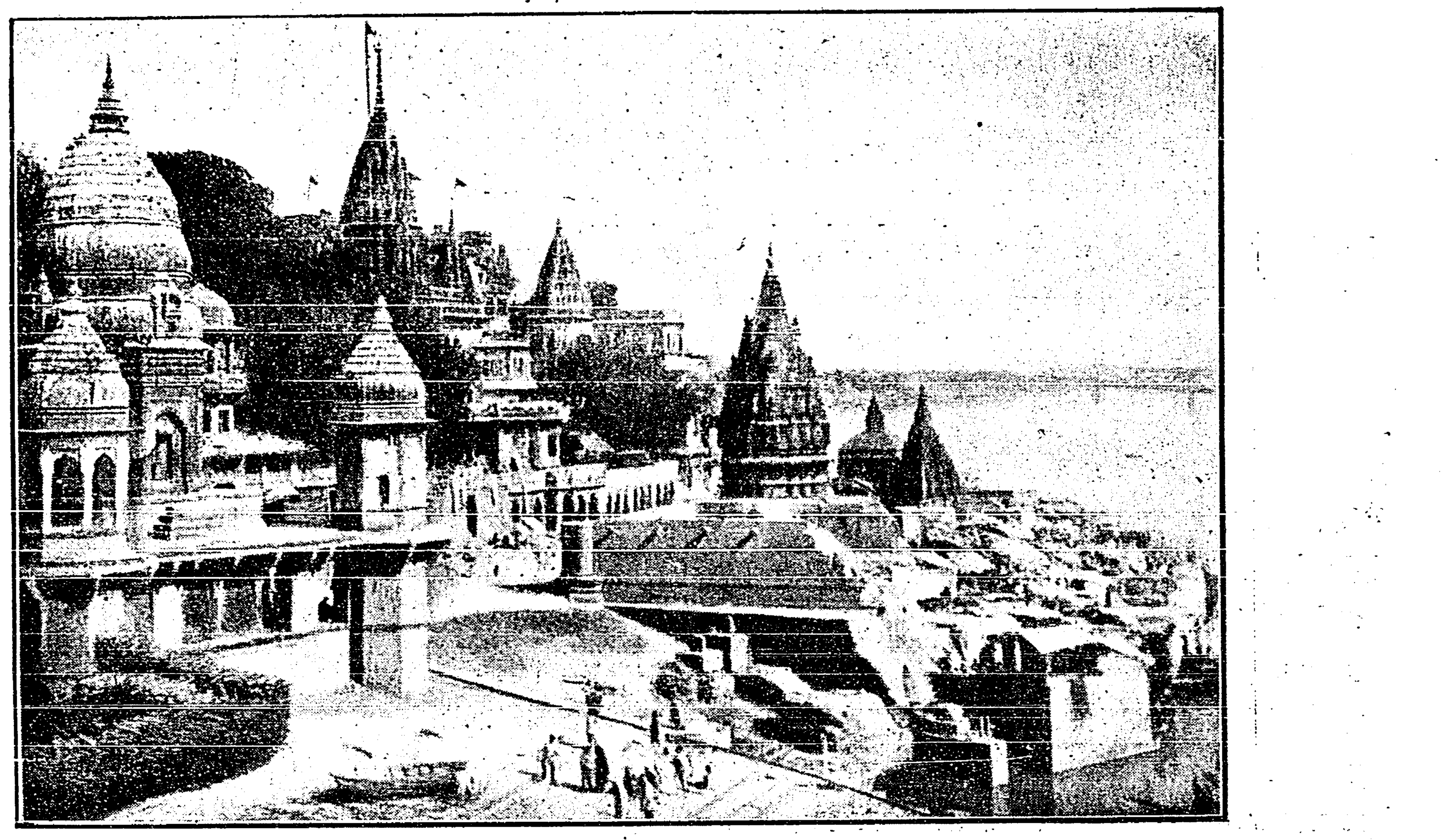

মণিকর্ণিকা ঘাট

চূর্ণমার হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতাকে ভাঙ্গিতে আসিয়াও অনেক ধর্ম্ম ও সভ্যতার ঠিক সেই দশাই ঘটিয়াছে। কাশীর সর্ব্বত্র তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। যাহারা হিন্দুধর্ম্মের এই দৃঢ় দুর্গকে আঘাত করিতে আসিয়াছিল, কাশী তাহাদিগকে বাধা দেয় নাই। কাশী জয় করিতে পারিলেই সমস্ত হিন্দুধর্ম্মকে জয় করা হইবে, এই সত্যটা বুঝিতে পারিয়া বুদ্ধদেব এইখানেই প্রথম 'ধর্ম্মচক্র' প্রবর্ত্তন করেন। তেমন আঘাত হিন্দুধর্ম্ম আর কখনও পায় নাই। সে আঘাতে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি নড়িয়াছিল বটে, কিন্তু আঘাতকারী আজ কোথায়? বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্ম আজ বাঁচিয়া নাই। আধুনিক সারনাথে সুধু তাহার কঙ্কাল পড়িয়া আছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পর আসিল মহম্মদের সশস্ত্র ধর্ম্ম। বারাণসী হইতে শিবের রাজ্যপাট তুলিয়া দিবার জন্য মোগলপাঠনেরা যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিল; এবং শিবকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও তাহারা যে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে নাই, এমনও নহে; কিন্তু এত চেষ্টার পরেও মহম্মদের ধর্ম্ম এখানে টিকিল কৈ?

দেবতাদের ভিতরে যথার্থ নির্ব্বিকার যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তবে তিনি মহাদেব। এক দেবতাকে বেশী আদর করিলে অন্য দেবতাদের মুখভার হয়, এ সম্বন্ধে পুরাণে ঢের গল্প আছে। পুরাণে মহাদেবেরও এমন বদ্‌নাম কেহ রটাইয়াছেন কিনা জানি না;—কেহ রটাইয়া থাকিলেও তাহা যে মিথ্যা, এ কথা নিশ্চয় বলিতে সরিয়া গিয়াছে! 'গড্', 'আল্লা', বিশ্বনাথ, জগন্নাথ, কালী, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জিন, এবং খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্ম, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত ও গাণপত্য, এখানে কাহারও ভিতরে ছাড়াছাড়ি নাই। হিন্দু যে কত উদার, তাহার ধর্ম্ম যে কূপমণ্ডুকের ধর্ম্ম নহে, বারাণসী ইহার সাক্ষ্য দিবে। ভেদ সুধু মূর্খ মানুষের মনে, জ্ঞানী ভেদজ্ঞানহীন, জ্ঞানের ক্ষেত্র বারাণসীতে তাই ঐক্যের পতাকা উড়িতেছে।

*   *   *   *   *

বারাণসী, মন্দিরের সহর। শিল্পচাতুর্য্যের জন্য হিন্দুর মন্দির-গুলি বিশ্ববিখ্যাত; কিন্তু এখানকার দেবালয়ে স্থাপত্যের বিশেষত্ব বা কারুকার্য্যের নমুনা বিশেষ কিছুই নাই। দু-চারটি হিন্দু-দেবালয়ে কিছু-কিছু কারুকার্য্য আছে বটে, কিন্তু ভারতের অন্য অন্য স্থানের মন্দির-শিল্পের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে, এখানকার মন্দির একেবারে কাহারও চোখেই লাগিবে না। বিশ্বনাথের নিজ মন্দিরে বড়মানুষী আছে—কলা-নিপুণতা নাই। তাহার চূড়া সোণায় বাঁধান', গৃহতল রৌপ্য মুদ্রায় বাঁধান'। কিন্তু, আর কোনদিকে—কি উচ্চতাগৌরবে, কি শিল্পগৌরবে—বিশ্বনাথের মন্দির কলারসজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না। স্থাপত্য-শিল্পের দিক্ হইতে বিচার করিয়া দেখিলে বলা যায়, সৌন্দর্য্যে অন্নপূর্ণার মন্দির বিশ্বনাথের মন্দির অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

ডাকাতে বিশ্বনাথের সর্ব্বস্ব বারংবার লুটিয়া লইয়াছে! বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির আর নাই। কিছুদিন আগেও, বিশ্বনাথের আধুনিক মন্দিরের পাশেই প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়াছিল, কিন্তু এখন সে চিহ্নটুকুও আর দেখা যায় না; পাণ্ডারা সে দুঃস্বপ্নের স্মৃতিকে সরাইয়া ফেলিয়াছে। অনেকে বলেন, বিশ্বনাথের মন্দিরে পুরাণ' বিগ্রহও আর নাই, নূতন বিগ্রহ আসিয়া পুরাতনের স্থান দখল করিয়াছেন।

কাশীধামে এখনও যে মন্দিরগুলি দেখা যায়, সে গুলিরও কথা কোন প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। দু-চারিটি মন্দির ছাড়া সেগুলির অধিকাংশই আধুনিক। প্রাচীন দেবধাম বারাণসীর এই অস্বাভাবিক আধুনিকতার কারণও,—দস্যুতা। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে

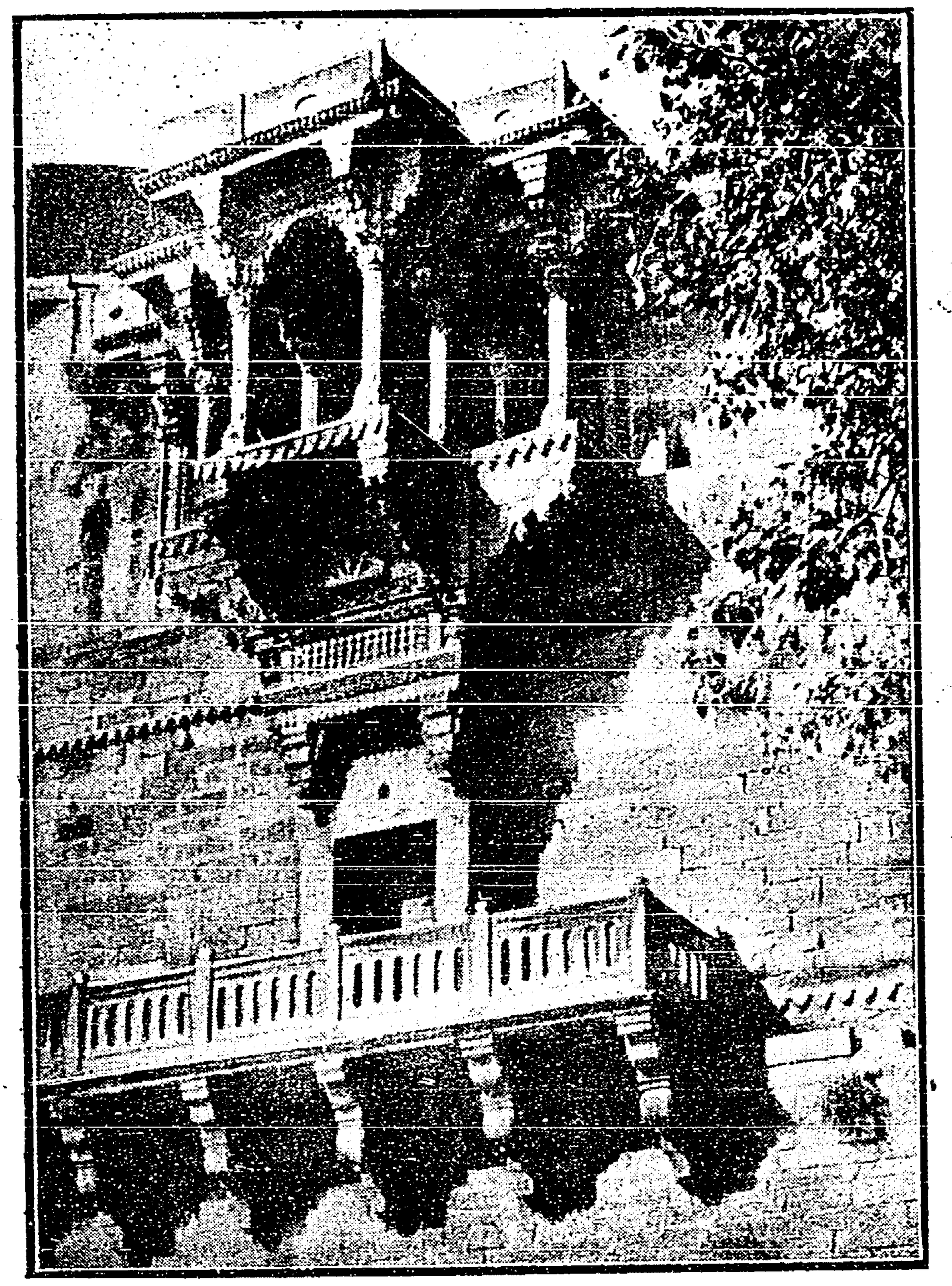

মানমন্দিরের অলিন্দ

আফগান দস্যুরা যখন সারনাথের বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ভস্মীভূত করিয়া দেয়, তখন বারাণসীর মন্দিরমালাও যে, তাহাদের শাণিত কৃপাণের আলিঙ্গন হইতে মুক্ত ছিল, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। মোগলদের প্রথম রাজত্বকালে এবং আকবরের সময়ে, কাশীধামের মন্দিরগুলিকে আবার নূতন করিয়া গড়া হইয়াছিল। কিন্তু, ধর্ম্ম-দ্বেষী ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে কাশীর সমস্ত মন্দির আবার ভূমিসাৎ করিয়া দেওয়া হয়। ভগ্ন মন্দিরের মাল্‌মস্‌লা লইয়া মুসলমানেরা মস্‌জিদ তৈয়ারি করে। পঞ্চগঙ্গা-ঘাটের প্রকাণ্ড মস্‌জিদটি এইরূপেই নির্ম্মিত।

কিন্তু, শিল্পের জন্য ত বারাণসীর গৌরব নয়! সমালোচকের চক্ষু লইয়া হিন্দু এ আনন্দধামে আগমন করে না। হিন্দু এখানে আসে, পথের ধূলায় মাথা লুঠাইয়া,—চোখে প্রেমের অশ্রু এবং প্রাণে ভক্তির আভাস লইয়া। এখানে পদার্পণ করিলে তাহার জন্ম সার্থক হয়, এখানে মরিতে পারিলে পরলোকের সব ভয় ঘুচিয়া যায়। এখানে মৃত্যুর অর্থ,—শবত্বপ্রাপ্তি নহে, শিবত্ব প্রাপ্তি।

শ্মশানেশ্বরের মহাশ্মশান হইতে ঐ যে অবিরত চিতা-ধূম উঠিয়া আকাশকে ধূমল করিয়া দিতেছে, উহা দেখিয়া হিন্দুর প্রাণ কখন' কাঁপিয়া উঠে না। তোমরা সবাই বাঁচিতে, হাওয়া খাইতে এখানে আসিয়া, শিক্‌রোলে স্বাস্থ্যনিবাসে বাস কর,—কিন্তু হিন্দু এখানে আসে বাঁচিতে নয়, মরিতে। একদিন দেখিলাম, রাস্তা দিয়া শব লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধের শব। ঘাড়টি একদিকে বাঁকিয়া আছে, হাতদুটি বুকের উপরে যোড়করা;—বৃদ্ধ প্রার্থনা করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। আর, তাঁহার সেই মুখখানি! সে মুখে যে সৌন্দর্য্য, যে শান্তি-তৃপ্তি, যে পবিত্র হাসি দেখিয়াছিলাম, আমি কি তাহা জীবনে ভুলিব? মরণের এমন রূপ আমি আর কখন' দেখি নাই। শববাহীরা ধীরে ধীরে যাইতেছে; দু'পাশ হইতে নর-নারীরা শবের মুখ দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িতেছে আর বলিতেছে, "জয় বাবা বিশ্বনাথ", "ওগো আমার কবে এমন দিন হবে!" "ধন্য মৃত্যু—ধন্য ভাগ্যবান্!"

শিবালয়গুলিতে কারুকার্য্য অল্প থাকিলেও, এখানকার অন্যান্য জায়গায় হিন্দুস্থাপত্যের অনেক নয়নমোহন নিদর্শন আছে। যেমন মহারাজ মানসিংহের মানমন্দির। ইহার গবাক্ষ-সংলগ্ন ছোট ছোট বারান্দাগুলি বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। আমরা বাড়ীঘর তৈয়ারি করিবার সময়ে এমন সুন্দর আদর্শ ফেলিয়া, কেন যে কুৎসিত পাশ্চাত্য আদর্শ গ্রহণ করি, তাহা বুঝিয়া ওঠা দায়। আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান কি একেবারে লুপ্ত হইয়াছে?

ভারতের অনেক বড় বড় সহরের নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য আদর্শের উৎকট অনুকরণ দেখা যায়, বারাণসীতে তাহা দুর্লভ; এ সহরটি একেবারে প্রাচ্য। পুরাতন বাড়ীঘরের কথা ছাড়িয়া দি, এখানে একালে তৈয়ারি বাড়ীগুলিতেও প্রতীচ্যের এতটুকু ভাব নাই। তবে, একটা বিষয়ে আমাদের রসগ্রাহিতা বড়ই ক্ষুণ্ণ হয়। তাহা আধুনিক শিল্পীদের মৌলিকতার অভাব। উপযুক্ত আদর ও উৎসাহের অভাবেই বোধ হয় আধুনিক শিল্পীদের পরি-কল্পনায় প্রশস্ততা ও নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা প্রাচীন আদর্শ হুবহু বজায় রাখিয়াছে বটে, কিন্তু সে আদর্শকে স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমোন্নত করিতে পারে নাই। তাহাদের কারুকার্য্যে প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির বাঁধা গৎ আছে, কিন্তু কল্পনার স্বাধীন স্ফূর্ত্তি নাই।

বারাণসীর রাজপথ কি বিচিত্র! দুর্গাপূজার সময়ে নানাদেশের যাত্রিসমাগমে সাধারণ জনতার স্রোত একেবারে বন্যায় পরিণত হয়। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, নেপালী, মারাঠি, উড়িয়া, মাদ্রাজী, গুজরাটি ও হিন্দুস্থানী,—ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোককেই এই বিপুল জনতার ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহাদের পোষাকে রঙ্গের কি বাহার! পথে পথে যেন চলন্ত রামধনু ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খালি পায়ে, পবিত্র কাপড় পরিয়া অনেকে বিশ্বনাথের মন্দিরের দিকে ছুটিয়াছে—সকলকার মুখেই এক রব,—"বোম্ বোম্ মহাদেব, বোম্ বোম্ মহাদেব!" রমণীরাও পূজা করিতে চলিয়াছেন। তাঁহাদের এক-একজনের রূপের 'ছটা' কি! রঙ্গিন্ কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে আলো-ছায়া নাচাইয়া, ভোম্‌রার মত কাল সদ্যঃস্নাত চুলের রাশ এলাইয়া, তালে তালে চরণতালে পথে পথে যেন পদ্ম ফুটাইয়া, হাতে রঙ্গ-বেরঙ্গা নানান্ ফুলের সাজি লইয়া নতনেত্রে এই পরমসুন্দরী বিদেশিনী মন্দির-গামিনীরা চলিয়া যান,—শরতের এক-একখানি হাল্‌কা মেঘের মত!

সময়ে সময়ে ভিড়ের ভিতরে ভক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি নজরে পড়িয়া যায়। রাজপথে একদিন এক-বুড়ীকে দেখিলাম। তাহার বয়স আশীর কম ত কিছুতেই হইবে না। কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পা পড়িয়া গিয়াছে, ঘাড় নুইয়া গিয়াছে; একটি চোখ কাণা, অন্য চোখটিতেও বোধ করি বুড়ী ভাল দেখিতে পায় না। তাহার পরণে কয়লার মত ময়লা কাপড়,—সমস্তটাই ছেঁড়াখোড়া।

দুই হাতে ভর দিয়া, রাস্তার পুরু ধূলার উপরে দাগ আঁকিয়া বসিয়া বসিয়া কোনমতে সে পথ চলিতেছে, আর ক্ষীণ, কাতর স্বরে বলিতেছে, "জয় বাবা বিশ্বনাথ", "দয়া করে পায়ে রেখ বাবা,"— "হ্যাগা, আমার বাবার মন্দির কোন্‌দিকে গা,—ওগো, দেখিয়ে দাও না গা।"

আমি তাহাকে ধরিয়া কোনরকমে ভিড় ঠেলিয়া মন্দির পর্য্যন্ত লইয়া গেলাম। শুনিলাম, সে পথের ভিখারিণী। ভিক্ষা মাগিয়া অনেকদিন হইতে বড় কষ্টে রেলভাড়ার টাকাকয়টি যোগাড় করিয়াছে,—বাবা বিশ্বনাথের পাদপদ্মে জন্মের শোধ জীবনের পাপের বোঝা নামাইয়া দিবার জন্য।

মন্দিরের আঙ্গিনায় ঢুকিয়া বুড়ীকে আমি ছাড়িয়া দিলাম। বুড়ী আর এক-পা আগাইতে পারিল না; বিশ্বনাথের মূলমন্দিরের দিকে ক্ষণিকের জন্য চাহিয়াই ধুপ্ করিয়া সে 'চাতালে'র উপরে সাষ্টাঙ্গে গড়াইয়া পড়িল; একবার ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, তারপর স্তব্ধভাবে স্থির হইয়া রহিল। অন্তরের মধ্যে সে বিশ্বনাথের সাড়া পাইতেছিল কি?

আমি যতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম, বুড়ীকে ততক্ষণ উঠিতে দেখি নাই। বোধ হয়, মনের মাঝে ভাবের ঘরে তখন সে বিশ্বনাথের পা জড়াইয়া মনেমনেই বলিতেছিল, "ঠাকুর! পা যখন ধরেছি, তখন আর ছাড়্‌ব না গো, ছাড়্‌ব না!"

মন্দিরে সেদিন অনেক ভক্ত আসিয়াছিল,—তাহাদের অনেকের মুখে চোখে ভক্তির আভাস ছিল যতটা কম, টাকার উত্তাপ ছিল তা'র চেয়ে ঢের বেশী; কিন্তু স্বর্গে যদি বিশ্বনাথের ভক্তের তালিকা লইবার কেহ থাকেন, তবে সেদিনকার তালিকায় সবার বাড়া ভক্ত বলিয়া প্রথম স্থান পাইয়াছিল, ঐ বৃদ্ধা ভিখারিণী!

* * * *

বিশ্বনাথের আরতির ঘটা, দেখিবার ব্যাপার বটে। অগস্ত্য-কুণ্ডে তাঁহার একদল সেবাইত বাস করেন। তাঁহাদের দেহ-মন-প্রাণ বিশ্বনাথের চরণে একান্তভাবে সমর্পিত। সারাদিন ধরিয়া তাঁহারা মহাদেবের আরতির আয়োজন লইয়া ব্যস্ত থাকেন। রাত্রিকালে তাঁহারা যখন আরতির উপকরণ লইয়া "বোম্ বোম্ মহাদেব" বলিয়া বিশ্বনাথের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন, তখন তাঁহাদের উদাত্ত কণ্ঠের অনাহত ধ্বনি বারাণসীর পথে পথে বহুদূরে ছুটিয়া যায়। সেই গম্ভীর আহ্বানে শত শত ভক্ত ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান এবং সেবাইতদের পিছনে পিছনে দলে দলে মন্দিরের দিকে গমন করিতে থাকেন।

বিগ্রহের মাথায় ঘড়া ঘড়া দুধ ঢালিয়া, আগে তাঁহাকে স্নান করান' হয়। তা'রপর বিশ্বনাথের মূর্ত্তিকে চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া রাশি রাশি বিল্বপত্র, ফুল ও ফুলের মালায় তাঁহাকে সাজাইয়া দেওয়া হয়। এত চন্দন আমি জীবনে কখন' এক জায়গায় দেখি নাই। তা'রপর, আরতি।

আরতির সময়ে মন যেন কেমন-কেমন করিতে থাকে! সে যে কি ভাব, তাহা লিখিয়া ফুটান' যায় না, যাঁ'র যথার্থ প্রাণ আছে, কেবল তিনিই তাহা অনুভব করিতে পারিবেন। চারিদিকে ভক্তেরা দাঁড়াইয়া, অনেক গৃহতলে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণত অবস্থায়, কেহ যুক্তকরে বিগ্রহের দিকে নিস্পলকনেত্রে চাহিয়া, কেহ দুইচোখ বুজিয়া প্রাণের ভিতরে ঠাকুরকে দেখিতেছেন, কেহ কেহ "বিশ্বনাথজী কী জয়" বলিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নৃত্য করিতেছেন, কেহ জপাসনে বসিয়া আপন মনে জপ করিতেছেন, কেহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শিশুর মত কাঁদিয়া ফেলিতেছেন! হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব দেবতা সেই কৈলাসপতি অথচ শ্মশানেশ্বর, গৃহস্থ অথচ বৈরাগী, শান্ত অথচ রুদ্র দেবাদিদেব মহাদেবের পূজামণ্ডপের ভিতরে দাঁড়াইলে সংসার-চিন্তা দূর হইয়া যায়, ধনের দামামা এবং অভাবের হাহাকার যুগপৎ থামিয়া যায়, ধূপধূনা-চন্দন-পুষ্প-সৌরভে, গম্ভীর-পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণে, আরতিবাদ্যনিনাদে স্বর্গ যেন নামিয়া আসিয়া মর্ত্ত্যকে 'রাখী'র বাঁধনে বাঁধিয়া দেয়।

আরতির বাজনা থামিয়া গেল। ভক্তদের ভক্তিনত ললাট মর্ম্মরবিচিত্র মন্দির-তলকে স্পর্শ করিল। চারিদিক স্তব্ধ।

যখন ফিরিলাম, কে তখন ধ্রুপদ ধরিল ঃ—

"মহাদেব শিবমঙ্গল
পিনাকী ত্রিপুরারে—"

* * * * * *

বাঙ্গালার বাহিরে কাশীধামে বাঙ্গালীর সংখ্যা যত বেশী, তত আর কোন সহরে নয়। বাঙ্গালার বাহিরে পা দিলে, বাঙ্গালীর প্রাণপাখী প্রায়ই খাঁচা-ছাড়া হইবার যোগাড় করে। বিদেশ বলিতেই আমাদের চোখে 'ডালপুরী' আর 'পুরী'র ছবি ভাসিয়া উঠে। কিন্তু কাশীতে সে সব আপদ-ল্যাঠা কিছুই নাই। বাঙ্গালীর যা-কিছু দরকার, কাশীতে সে সবই পাওয়া যায়। সুধু 'পাওয়া যায়' নয়, সব জিনিষই বেজায় সস্তা। তাই, ভুঁড়ি ক্ষীণ হইবার ভয়ে যাঁহারা বিদেশের প্রতি নেহাৎ নারাজ, কাশীর নামে তাঁহাদেরও জিভ রসাল' হইয়া উঠে। এখানে আসিয়া বাঙ্গালীরা সুধু যে পুণ্য-সঞ্চয় করেন, তা নয়; ঘি-দুধ-মাছ খাইয়া, আরামভরে ভরা পেটে হাত বুলাইয়া, দুদিন সুদীর্ঘ "আঃ!" উচ্চারণ করিয়া বাঁচেন।

বাঙ্গালায় বসিয়া চিরকাল শুনিয়াছি, কাশীধামে নাকি ভয়ানক গুণ্ডার উপদ্রব! কিন্তু, যতবার কাশীতে আসিয়াছি, গুণ্ডার উপদ্রব কখন' দেখি নাই,—দেখিয়াছি সুধু আমাদেরই স্বদেশী বাঙ্গালীর উপদ্রব!

জিনিষ-পত্র সুলভ ও তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বাঙ্গালী কেরাণীরা বুড়াবয়সে 'পেন্সন' লইয়া কাশীতে আসিয়া জীবনের শেষ ক'টা দিন বেশ শান্তি ও নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া দেন। প্রতি-মাসের পয়লা তারিখে যেদিন 'পেন্সন' আসে, স্থানীয় ডাকঘরের দৃশ্য সেদিন ভারি মজার হইয়া উঠে। ডাকঘরের সামনেটিতে সেদিন খালি বুড়া আর বুড়ালোকই দেখা যায়—সকলেরই মাথায় শাদা চুল, সকলেরই গা-মুখের চামড়ায় কুঞ্চন-রেখা পড়িয়াছে। তাঁহারা 'পেন্সন' লইতে আসিয়াছেন।

কাশীতে বড় রাজপথ গুটিকত; কিন্তু, সরু সরু গলি একেবারে অগুন্তি। গলিগুলি সব পাথরে বাঁধান', মাঝে মাঝে আবার সিঁড়ি আছে। সরু পথ বলিয়া জনতা কিছু কম হয় না। সময় সময় ভিড়ের ঠেলায় পথচলা দায় হইয়া উঠে। পথ যেমন ছোট, দু-ধারকার বাড়ীগুলি তেমনই বড় আর অত্যন্ত উচ্চ। কাশীতে যিনি নূতন আসিবেন ও একলা বেড়াইতে বাহির হইবেন, তিনি অন্ততঃ

একবার-না-একবার পথ হারাইতে বাধ্য! এই পথ-হারাণ' কাশীর একটি বিশেষত্ব!

কাশীর গলিপথে মহাদেবের প্রিয় বাহন ষণ্ডদলের বিষম আধিপত্য। বিনাশ্রমে দিব্য আহার পাইয়া ষাঁড়গুলি দিনে-দিনে মোটা-সোটা ও বেজায় বড় হইয়া উঠে। মনের খুসিতে তাহারা পথে পথে বেড়াইতে বাহির হয়। নেহাৎ-সরু গলির মাঝে যখন ষণ্ড-দেবতার 'নাদুস্-নুদুস্' চেহারাখানি নজরে পড়ে, পথিককে তখন প্রায়ই তাড়াতাড়ি সসম্মানে পিছু হটিয়া সে গলি ছাড়িয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। শিবের বাহন যতক্ষণ না দয়া করিয়া গলি ছাড়িয়া বাহিরে আসেন, গলির ভিতরে ততক্ষণ তোমার "no admittance!'

* * * *

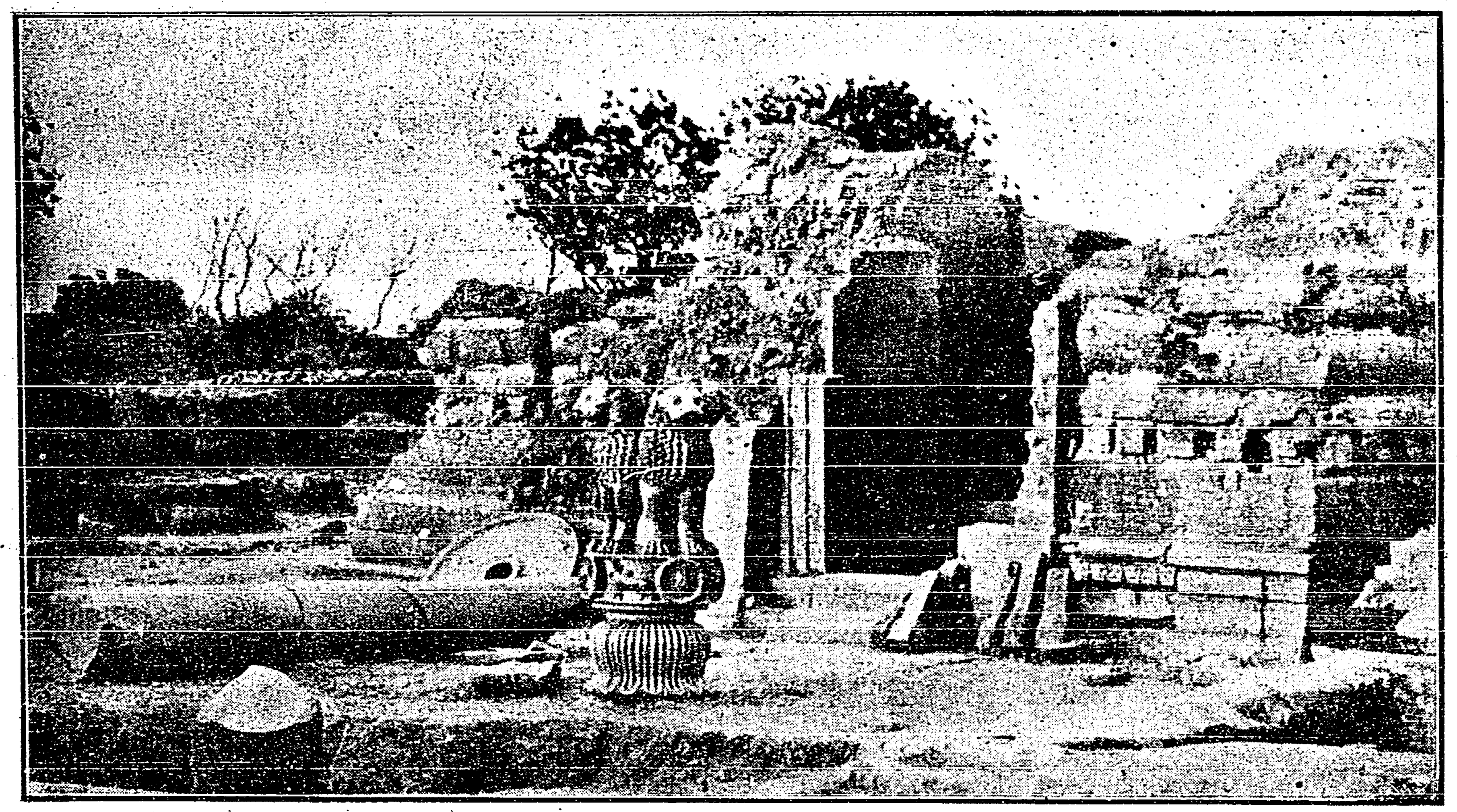

অশোক-স্তম্ভ

বারাণসীর অদূরে ঋষিপত্তন বা মৃগদাব-কানন বা সারনাথ। তাহা বৌদ্ধ-কীর্ত্তির মহা চিতা। সে চিতা কবে নিবিয়াছে; কিন্তু ভস্মকণা এখনও আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সারনাথের অনেক কথা বলিয়াছেন। পত্রান্তরে আমিও কয়েক বৎসর আগে সারনাথের একটি ধারাবাহিক বিস্তৃত ইতিহাস দিয়াছি; সুতরাং, উপস্থিত প্রবন্ধের সম্পূর্ণতাকল্পে পুনরুক্তি না করিয়া সংক্ষেপে দু'-চার কথা বলিব মাত্র।

যেখানে নদীর জল-বীণায় চপল বাতাস মধুর তান তুলিয়াছে, যেখানে শ্যামল বনের শীতল ছায়ায় দূর্ব্বাদলেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যেখানে তপোবনের শান্তিভঙ্গ করিবার ভয়ে পৃথিবীর কোলাহল আপনা-আপনি থামিয়া গিয়াছে, সেখানে 'ধামেকে'র উচ্চ ও প্রাচীন স্তূপ এখনও চারিদিকের ভাঙ্গা-চোরা বৌদ্ধ-মঠের মাঝখানে নীরব ও অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বুদ্ধদেব বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিতে হইলে, কোন্‌খানে তাহার হৃদয়, আগে সেটা দেখিতে হইবে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া বারাণসী চিরকাল বিখ্যাত। অতএব, বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথমে এখানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার সুরু করিলেন।

হরিণদলের বিচরণ-ভূমি বলিয়া তখন এ জায়গাটির নাম ছিল, 'মৃগদাব'-কানন। বুদ্ধদেবের অহিংসা-ধর্ম্মের আশ্রয়ে মৃগ-পরিবারেরা নির্ভয়ে এখানে বেড়াইয়া বেড়াইত; কিন্তু, এখন বৌদ্ধধর্ম্মের অতীত প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে, তাহার আশ্রিত মৃগকুলও অদৃশ্য হইয়াছে। শিকারীর নিষ্ঠুর আনন্দে তাহাদের অনেকে অন্তিম নিঃশ্বাস ছাড়িয়াছে; বাদ-বাকী যাহারা ছিল, নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিতে তাহারা যেখানে 'ঈশ্বরের সেরা সৃষ্টি' মানুষ নাই, সেইখানে পলাইয়াছে। মৃগদাব আজ মৃগহীন।

বুদ্ধদেবের পবিত্র স্মৃতি পূজা করিবার জন্য 'ধামেক'-স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সংস্কৃত 'ধর্ম্ম-দেশক' হইতে 'ধামেক'। স্তূপটির এখনকার উচ্চতা ১১০ ফিট। আগে হয়ত আরও উঁচু ছিল। স্তূপের উপরটা আগে ভাঙ্গা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু, এবারে গিয়া দেখিলাম, স্তূপ-শীর্ষ হইতে বন্য লতা-পাতার মুকুট সরাইয়া আবার তাহা মেরামত করা হইয়াছে।

এই স্তূপের ছায়ায়, সহরের মত বিশাল এক শিল্পবিচিত্র বৌদ্ধ-মঠ ছিল। সেখানে শত শত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বাস করিতেন। প্রাচীন ভ্রমণকারী এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পুস্তকে এই স্তূপ ও মঠের যে উজ্জ্বল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে পারি, ইহার শ্রী-ছাঁদের কাছে একদিন 'ময়দানবের পুরী'ও বুঝি হার মানিত। যুগ-যুগ ধরিয়া বৌদ্ধ রাজগণ মঠের গায়ে স্বপ্নের মত যে লাবণ্য দিয়াছিলেন, আজ তাহা কোথায়? অশোক ও কণিষ্কের এত যত্ন, এত চেষ্টা ও এত অর্থব্যয়—সব মিছা হইয়াছে। অতীতের সে 'কুসুমিত নাট্যশালা', বর্ত্তমানে ভগ্নচূর্ণ, দুঃখস্তব্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন!

বৌদ্ধ যতিরা আপনাদের "জপ-তপ আর যোগ-আরাধনা" লইয়াই তুষ্ট ছিলেন। ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন খাইয়া, জীবের সেবায় তাঁহারা প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, সংসারের সাতে-পাঁচে কিছুতেই তাঁহারা থাকিতেন না। সহসা একদিন নিয়তির কঠোর পরিহাসে সশস্ত্র পাঠান আসিয়া মঠের দরজা জুড়িয়া দাঁড়াইল। এই অপূর্ব্ব অতিথি, বৌদ্ধ যতিদের করুণ আবেদনে কর্ণপাত করিল না। মঠে তাহারা আগুন ধরাইয়া দিল এবং নির্ব্বিরোধ, অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত, বিশ্বপ্রেমিক ভিক্ষুগণের জীবন লইয়া তাহারা অগ্নিকে আহুতি-প্রদান করিল। ভিক্ষুরা নির্ভয়ে বুদ্ধের নামোচ্চারণ করিয়া আগুনের ভিতরে গিয়া পড়িলেন। তাঁহাদিগকে 'পরিনির্ব্বাণে'র পথ দেখাইয়া হুতাশনও নির্ব্বাণ লাভ করিল।

অগ্নি-স্রোত, মঠগাত্র হইতে সকল শ্রী ধুইয়া, তাহার যা-কিছু গৌরবের, সব নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। ধূ-ধূ প্রান্তর জুড়িয়া দগ্ধাবশিষ্ট বিশাল কঙ্কালের মত যাহা পড়িয়া রহিল, পৃথিবী তাহাকে সমাধিদান করিল। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট, এতদিন পরে মাটি খুঁড়িয়া সেই কঙ্কাল আবার আকাশের আলোকে বাহির করিয়াছেন। অতীতকে যাঁহারা ভালবাসেন, তাঁহাদের জন্য এখানে এক প্রশস্ত যাদুঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই ভীষণ দুর্ঘটনায় ও কালপ্রভাবে যে সকল জিনিষ এখনও নষ্ট হইয়া যায় নাই, এই অট্টালিকায় সেগুলি সারি সারি সাজান' আছে। কাপড়ের শুষ্ক রক্তে জলের ছিটা দিলে তাহা যেমন ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে, এই যাদুঘরের সজ্জা-কৌশল তোমার মনের পটে অতীতকে তেমনই করিয়া ফুটাইয়া তুলিবে। সেকালকার বৌদ্ধ-মঠের শিল্প-চাতুরী, যতিগণের নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, প্রতিদিনের জীবন-যাত্রা-প্রণালী প্রভৃতি যাহা-কিছু জানিবার, এখানে আসিলে সে সবই জানিতে পারা যায়।

'ধামেক'- স্তূপের গায়ে, দু'-এক জায়গায় সেই বিশ্বমোহন কারু-কার্য্যের চিহ্ন এখনও কিছু-কিছু আছে। আর, সেই অপূর্ব্ব-সুন্দর অশোক-স্তম্ভ! এখন তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু এ অবস্থাতেও তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। কঠিন পাথরের উপরে যে শিল্পীরা এমন দর্পণের মত মসৃণতা, এমন ফুলের মত কোমলতা, এমন মোহন-সুন্দর খোদন-পটুতা অর্পণ করিয়াছিল, ভারতবর্ষে তাহাদিগকে আর কখনও দেখিতে পাইব কি?

অদূরে আর একটি পাহাড়ের মত স্তূপ। তাহার উপরে হুমায়ূন একটি বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন। এই বাড়ীর ছাদে দাঁড়াইলে, চারিদিকের দৃশ্য ছবির মত জাগিয়া উঠে। সুদূরে চক্রবালের বক্র রেখায় বিন্ধ্যাচলের ধূমল ভিত্তি, চারিদিকে বৈচিত্র্যের রাজ্যের মত, বাতাসে রোমাঞ্চিত শস্যক্ষেত্রের পর শস্যক্ষেত্র, মাঝে মাঝে পাখী-ডাকা হাজার গাছের ছায়ামাখা রাঙ্গা রাঙ্গা মেঠো পথ। স্তব্ধ দুপুরে মাঠে মাঠে রোদ আর ছায়ায় যখন লুকাচুরি খেলা চলে, হাওয়া যখন নিজে ঘুমে ঢুলিয়া থামিয়া থামিয়া ঘুম-পাড়ানিয়া গান গায়িতে থাকে, ঘুঘুও তখন দূরের গভীর বন হইতে করুণ, ঘুমন্ত সুরে প্রাণ-মনকে উদাস করিয়া,—বুকের ভিতরে এলাইয়া দেয়।

* * * *

কাশীর গঙ্গা!

বিশ্বনাথের চরণে জলাঞ্জলি দিয়া দিবারাত্র পবিত্রসলিলা জাহ্নবী দুলিতে দুলিতে বহিয়া যাইতেছেন।

এধারে প্রাসাদের চূড়ার পর প্রাসাদের চূড়া, মন্দিরের পর মন্দির, ঘাটের পর ঘাট! ওধারে রবিকরোজ্জ্বল শুভ্র সিকতার দীর্ঘ বিস্তার, তা'র পাশে রামনগর যেন চিত্রে লেখা, তা'র পিছনে সবুজ বনের নতোন্নত চঞ্চল রেখা। উপরে আকাশের অগাধ নীলিমা, গঙ্গার ধবলতাকে আপন ছায়াপাতে রঙ্গিন্ করিয়া তুলিয়াছে।

নৌকার পর নৌকা, পাল তুলিয়া পরীর মত নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। নৌকার লোকেরা ঘাটের দিকে তাকাইয়া, ঘাটের লোকেরা নৌকার দিকে তাকাইয়া। কোন নৌকায় একজন সাহেব বসিয়া বিস্মিত নেত্রে বারাণসীর বৈচিত্র্য দর্শন করিতেছে, কোন নৌকায় বা একদল পুণ্যপ্রয়াসী বাঙ্গালী রমণী,—তাঁহারা কাশী প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন। কোন কোন নৌকা তালে তালে দাঁড় ফেলিয়া তীরে লাগে, আর ভিতর হইতে কতকগুলি পশ্চিমা পুরুষ ও রমণী বাহির হইয়া ঘাটে আসিয়া নামিয়া পড়ে, পুরুষগুলি লাঠির ডগায় ময়লা কাপড়ের পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া লয় এবং রমণীরা নীল ঘাঘ্‌রার উপরে, গোছা-গোছা রূপার চুড়ী-পরা, 'উল্কি'-আঁকা স্বাস্থ্যপুষ্ট হাত-দু'খানি আন্দোলিত করিয়া, জরি-বসান' লাল ওড়্‌নাখানি একবার শূন্যে ছড়াইয়া, টানিয়া দেয়; তারপর দল বাঁধিয়া ঘাটের সিঁড়ি পার হইয়া সাগরে বারি-বিন্দুর মত জনতার মধ্যে কোথায় মিশিয়া যায়। এদিকে মাঝিও নৌকাখানিকে গভীর জলে ঠেলিয়া দিয়া, নিজেও একলাফে তাহার উপরে চড়িয়া বসে।

নদীর জলে ডুবিয়া নদীকে যেমন দেখা চলে না, নদীকে দেখিতে হইলে জলের উপরে থাকিতে হয়, কাশীকে দেখিতে হইলেও তেমনই ভিতরে থাকিলে চলিবে না, দর্শককে বাহিরে আসিতে হইবে। গঙ্গার বক্ষে চলন্ত নৌকায় থাকিয়া কাশীকে যে কি চমৎকার দেখায়, তাহা আর বলিবার নয়। 'বায়স্কোপে'র ছবির মত কাশীর অভিরাম দৃশ্যাবলী তখন চোখের সুমুখ দিয়া ধীরে ধীরে, পরে পরে চলিয়া যাইতে থাকে।

ঐ দশাশ্বমেধ-ঘাট, ঐ মণিকর্ণিকা-ঘাট, ঐ শীতলা-ঘাট! ওখানে বিশ্বনাথের মন্দির, এখানে কেদারনাথের মন্দির (প্রবাদ

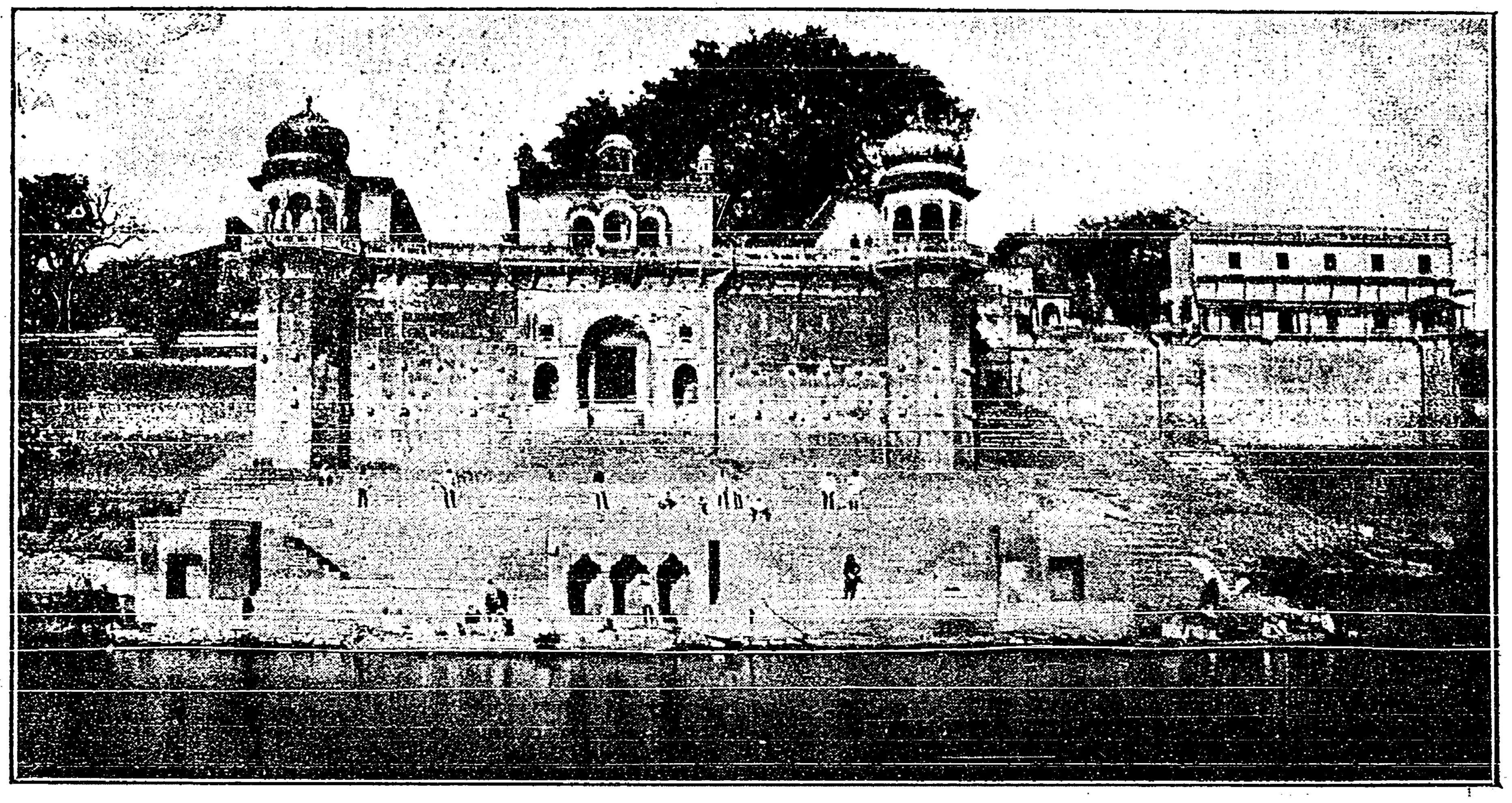

শিভালা ঘাট

বলে, কেদারনাথই আদি বিশ্বনাথ) সেখানে চেৎ-সিংহের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ ও দুর্গ! কোথাও একটি মন্দির আকণ্ঠ জলে ডুবিয়া আছে, কোথাও-বা একটি পুরাণ', উঁচু ঘাট ভাঙ্গিয়া পড়'-পড়' হইয়া জলের উপরে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে! ইহারই মাঝে মাঝে গবাক্ষের মত এক-একটি অবকাশ সহসা সাম্‌নে আসিয়া, পর-পলকেই সরিয়া যায় এবং সেই অল্প সময়ের ভিতরেই বর্ণবহুল-পরিচ্ছদধারী অসংখ্য জনতাপূর্ণ সজীব পথগুলি বিদ্যুতের মত নজরে আসিয়াই অদৃশ্য হয়। পর মুহূর্ত্তেই আবার যাদুকরের যাদুর মত নূতন ঘাট, নূতন মন্দির, নূতন প্রাসাদ, নূতন পথ! এ যেন ঠিক 'আরব্য-রজনী'র গল্পের পর গল্প-দৃশ্য,—একটি গল্প শেষ হইবার সঙ্গেসঙ্গেই আবার একটি গল্প—মন আর হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ পায় না!

ঘাটগুলিতে অসংখ্য তালপাতার ছাতা। তাহার ছায়ায় পাণ্ডারা বসিয়া আছে। যাত্রীরা দলে দলে আসিতেছে, প্রণাম করিয়া ভক্তিভরে জলে নামিতেছে, স্নান করিয়া আবার উঠিয়া যাইতেছে। কেহ কেহ নতশিরে, আকটি জলে দাঁড়াইয়া জপ করিতেছে, কেহ-বা ঊর্দ্ধমুখে বুক্তহস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া ভক্তিভরে গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছে।

ঘাটের চাতালে সন্ন্যাসীর দল বসিয়া আছেন—শরীর প্রায় উলঙ্গ ভস্মমাখা; মাথার পিঙ্গল জটা স্কন্ধচুম্বন করিতেছে। কোন সন্ন্যাসী ঘাড় বাঁকাইয়া, হাতে কলিকা লইয়া ধূমপান করিতেছেন, কেহ পদ্মাসনে সরল ও নিশ্চল হইয়া বসিয়া, দুই হাঁটুতে দুই হাত রাখিয়া মুদিতনেত্রে স্তব্ধভাবে ধ্যানমগ্ন,—হঠাৎ দেখিলে ভ্রম হয়, বুদ্ধের পাষাণ-মূর্ত্তি! কেহ এই কাঠ-ফাটা রোদে চারিদিকে অসহনীয় অগ্নিকুণ্ড রাখিয়া ভীষণ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন। কেহ কেহ শিষ্যবর্গের মধ্যে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেছেন।

এই বিচিত্র দৃশ্যাবলীর মাঝে, জাহ্নবীর অবিরত জল-কল্লোলের সঙ্গে, সম্মুখের মানব-মক্ষিকার ঐ বিরাট্-বিপুল মধুচক্র হইতে যে অনন্ত গম্ভীর গুঞ্জন উঠিতেছে, তাহা শ্রবণে পশিয়া কেমন এক অপূর্ব্ব বিস্ময়ের ভারে সমগ্র হৃদয়কে যেন আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়া দেয়!

বিশ্বনাথের বারাণসী! অন্নপূর্ণার আনন্দধাম! পৃথিবীতে এমন কোন্ লেখক আছেন, যিনি তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও রসকে নীরস ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে পারেন? যিনি পারেন, তিনি আসুন, আমার কলম এখানে শক্তিহীন।

* * *

সন্ধ্যাকাল। পশ্চিমে দিনের চিতা নিবিয়া গিয়াছে।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; সে আলো জলে পড়িয়া, জলকে যেন জ্যোৎস্না-স্রোত করিয়া তুলিয়াছে। ওপারের দীর্ঘ সৈকত চন্দ্রালোকে শাদা ধব্‌ধব্ করিতেছে।

মন্দিরে মন্দিরে ঘোর-রোলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, গভীর ফুৎকারে শঙ্খের কণ্ঠে সুদূর জলধির সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। আরতির পর চারিদিক স্তব্ধ।

বারাণসীর পথ

কেদারনাথ-ঘাটে কমল-করে প্রদীপ ধরিয়া মহিলারা জলের ধারে নামিয়া আসিলেন। দীপগুলি কাঁপিতে কাঁপিতে ভাসিয়া গেল। খানিকক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া, তাঁহারা একে একে ভরা কুম্ভ 'কাঁখে' করিয়া মধুর, ললিত ভঙ্গীতে সোপান বহিয়া উপরে উঠিয়া, গৃহপথে চলিলেন।

অদূরে ঘাটে বসিয়া কথক-ঠাকুর রামায়ণ-কথা সুরু করিলেন। তাঁহার চারিপাশে পুরুষ ও রমণী শ্রোতার দল যোড়হস্তে বসিয়া সীতা-রামের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গেল।

জলের উপরে এক উচ্চ ও প্রশস্ত স্তম্ভ রহিয়াছে। তাহার শীর্ষে মূর্ত্তিমান্ রহস্যের মত এক বিশালবপু পুরুষ উপবিষ্ট। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বসন ও উত্তরীয়। তাঁহার মুখের একদিকে চাঁদের আলো, অন্যদিকে ছায়া। তাঁহার পাশে কমণ্ডলু। একমনে, বক্ষের কাছে দুই হস্ত তুলিয়া, বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া স্থিরভাবে তিনি যোগমগ্ন। তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি যেন আমার প্রাণে আসিয়া জাগিয়া উঠিল! ভক্তি কি সংক্রামক?

চারিদিকে তপোবনের সেই গভীর শান্তি লইয়া, আকাশের চাঁদের সেই ঘুমন্ত 'চাদ্‌নী'র নীচে, গঙ্গার বুকে তরঙ্গের সেই তালে-তালে-করতালি শুনিতে শুনিতে এবং সম্মুখে ধ্যানী যোগীর সেই অটল অচল-মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, ঘাটের সোপানে ঠেলান্ দিয়া আমি ধীরে ধীরে ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া গেলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

শেষ নিমেষ

ফিরে ফিরে আসিতেছে মনে
আমার সে নব বৃন্দাবনে,
বসন্তের নবীন হিল্লোল
তুলে'ছিল একদিন আনন্দের শত কল্লোল,
জীবন-নিকুঞ্জ মাঝে ফুটেছিল ফুল,
গুঞ্জন-মুখর-মুগ্ধ মধুব্রতে করিয়া আকুল।

ফাল্গুনের ফল্গুরাগ সম,
নব-প্রেম ব্যথাতুর, বাসনা-বিহ্বল হৃদি মম,
চির-তৃষ্ণা-কাতর নয়ন,
প্রাণপণে যাচিয়াছে মোর প্রাণ-প্রিয়ের মিলন;
তিলেকের পরশ মাগিয়া
কত নিশি গিয়াছে জাগিয়া,

বসন্তে শরতে আর বর্ষণের মেঘ-ম্লান দিনে,
হৃদয়-মন্থন-ধন সে চির-বাঞ্ছিত-জন বিনে,
ঝরিয়াছে কত অশ্রুজল,
সমগ্র জীবন, জন্ম হ'য়েছে বিফল!

আজি সূর্য্য বসিয়াছে পাটে
রুদ্ধ বিপণীর দ্বার জীবনের হাটে;
সন্ধ্যা আসে সুধীরে নামিয়া
শ্রান্ত নয়নের 'পরে ধূসর অঞ্চল টানি' দিয়া।

মধুমত্ত মধুপের রব,
বিহঙ্গ-কাকলি গীতি, স্তব্ধ আজি সব;
আসে ওই আসন্ন আঁধার,
উচ্ছ্বসিত অশ্রু-সিন্ধু, নাই নাই, সীমা-রেখা তার!
হে প্রিয়, জীবনবন্ধু, এ দুস্তরে করিলে না পার!

মনে পড়ে আজি,
প্রভাতে ভরিয়া সাজি,
ও রাঙ্গা চরণ পূজিবারে,
জীবন-দেবতা মোর, এসেছিনু তোমারি দুয়ারে।

মুখে মোর ফোটে নাই কথা,
মরমের ব্যথা
ঢাকিয়া বিদীর্ণ মর্ম্মতলে,
বার বার গেছি ফিরে বেদনার তপ্ত অশ্রুজলে।

দিন যে ফুরায়ে যায় মম,
হে অন্তরতম,
আর যে গো, প্রতীক্ষার নাহি অবসর!
জীবন-দোসর,
মরণ-সাগর-বেলা-শুষ্ক বালুকায়,
তোমারে হেরিয়া যেন মোর শেষ নিমেষ ফুরায়!

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

উদ্ভিদের অনুভূতি

উদ্ভিদ্ যে সজীব, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যখন মৃত্তিকা হইতে রস আকর্ষণ করিয়া ইহা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, রস আকর্ষণ করিবার উপায় না থাকিলে, বিশুষ্ক হইয়া যায়; অন্যান্য সজীব প্রাণীর ন্যায় ইহারও আলোক ও বায়ুর প্রয়োজন হয়; ইহা ফল ও পুষ্পবান্ হয়; বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ইহা ক্রমশঃ ন্যগ্রোধে পরিণত হয়; তখন ইহা যে সজীব, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু উদ্ভিদ্ সজীব হইলেও, ইহার চৈতন্য থাকা সম্বন্ধে প্রায় সকলেরই সন্দেহ হয়। যাঁহারা জীবকে কষ্ট দিয়া জীব-হত্যা করিয়া জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া নিরামিষাশী হন, তাঁহাদের বিশ্বাস, উদ্ভিদের ক্লেশ-অনুভূতি নাই। তবে আমাদের শাস্ত্রকারগণ অনেক স্থলে আকারে ইঙ্গিতে উদ্ভিদের অনুভূতি-শক্তি থাকার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রমাণাভাববশতঃ সহজে কেহ তাহা স্বীকার করে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতীত এই সকল কথা স্বীকার করা মূর্খতার পরিচায়ক। ডাঃ জগদীশচন্দ্র বসু, সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে, উদ্ভিদ্ যে আমাদেরই ন্যায় অনুভূতি-শক্তিসম্পন্ন, এ কথা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং এখন ইহা স্বীকার করিতে কোনও দোষ নাই। কিন্তু মহাভারত-পাঠে দেখা যায়, অতি প্রাচীনকালে, কোনও এক ঋষি যুক্তির দ্বারা উদ্ভিদের অনুভূতি-শক্তির প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, বৃক্ষের শ্রবণ-শক্তি আছে, বৃক্ষ শুনিতে পায়; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, তিনি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তৎ-সাহায্যে এ বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। যাহা হউক, তিনি একটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যুক্তিটী এই ঃ—

তিনি বলেন, যদি নিকটে বজ্রপাত হয়, তাহা হইলে লক্ষ্য করিলে বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, নিকটস্থ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও পত্রাবলী বিশীর্ণ ভাব ধারণ করে। প্রস্তরখণ্ড, মৃত কাষ্ঠ বা অন্য কোন জড়-পদার্থের এরূপ ভাব দেখা যায় না। বজ্রপাত-শব্দ বৃক্ষ শুনিল কি না, ইহাতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যাইতে পারে, তবে এই ভীষণ শব্দ তাহার উপর যে একটা কার্য্য করিবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই বজ্রপাত-শব্দ যে বৃক্ষের উপর একটা কার্য্য করিল, সে কার্য্যটা কি? বলিতে পার না, শব্দজনিত বায়ু-কম্পনে বৃক্ষের অবস্থান্তর ঘটিল; কেন না, তর্কের খাতিরে যদি তাহাই মানা যায়, তাহা হইলে, বৃক্ষ কিছু নড়িয়া উঠিতে পারিত; তাহার পত্রাবলীর বিশীর্ণ ভাব হইবে কেন?—যেন শিহরিয়া উঠিল এমন ভাব হইবে কেন? অধ্যাপক বসু, সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং পরে সাধারণকে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে বুঝাইয়াও দিয়াছেন যে, আলোকপাত বৃক্ষপত্রে বিশেষ এমন একটা কার্য্য করে, যাহা আমাদের চক্ষের উপর সূর্য্য-রশ্মি-পাতের বা অন্য কোন আলোক-রেখাপাতের সমতুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাতে বসু মহাশয়ের ধারণা যে, উদ্ভিদের দর্শনেন্দ্রিয়

আছে। তিনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা বৃক্ষ-পত্রে স্নায়ুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছেন ও আলোক-রেখা যে ঐ স্নায়ুর উপর কার্য্য করে, তাহাও দেখিয়াছেন।

এখন উদ্ভিদ্‌কে জীব-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে জীবের ধর্ম্ম কি, তাহাই প্রথমে বুঝিতে হইবে। মোটামুটি বুঝিতে হইলে, যে শক্তির বলে বর্দ্ধন বা উৎকর্ষ সাধিত হয় ও যে শক্তির বলে অনুভূতি হয়, সেই শক্তিই জীবের ধর্ম্ম। এখানে ধর্ম্ম বলিতে শক্তি বুঝিতে হইবে। এই শক্তি বা ধর্ম্ম যাহার আছে, তাহাকেই জীব বলা যায়। যদি উদ্ভিদের এই শক্তি থাকে, তাহা হইলে উদ্ভিদ্‌কেও জীব-শ্রেণীভুক্ত বলা যাইতে পারে। কথাটা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আমরা আহার করি, আহার করিয়া বর্দ্ধিত হই; আঘাত পাইলে ব্যথা অনুভব করি, শব্দ হইলে শুনিতে পাই, অত্যধিক শৈত্যে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় হইয়া যায়, সুরাসার আমাদিগকে উত্তেজিত করে, দূষিত বায়ুতে আমাদের শ্বাসরোধ হয়, অতিরিক্ত শ্রমে আমরা পরিশ্রান্ত হই, সূর্য্যালোকে উৎফুল্ল হই, বৃষ্টিদ্বারা নিপীড়িত হই, বিষ বা বলপ্রয়োগে মৃত হই। এখন বাহ্য-জগতের এই সকল ক্রিয়া উদ্ভিদের উপরও যদি সমানভাবে কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে আমরা উদ্ভিদ্‌কেও প্রাণিমধ্যে গণনা করিতে পারি।

মৃত্তিকা হইতে খাদ্য আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদের কলেবর বৃদ্ধি হয়, দেখা গিয়াছে। যে জমিতে উদ্ভিদের খাদ্য থাকে না, সে জমিতে তাহার সম্যক্ বৃদ্ধি হয় না। শস্য উৎপাদন করিবার জন্য চাষীকে জমিতে সার দিতে হয়, এরূপ ব্যাপার ত আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিতেছি; একজন নিরক্ষর কৃষকেরও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তবে মাত্র এই ব্যাপারেই তাহাকে জীব-ধর্ম্মসম্পন্ন বলা যাইতে পারে না। ইহার অনুভূতি আছে কি না, তাহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া চাই। অধ্যাপক বসু, সে প্রমাণ যে ভাবে দিয়াছেন, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইল।

সম্ভবতঃ অধ্যাপক বসু, অন্য এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া এই তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন।

ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক Clerk Maxwell যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ করেন যে, আলোক-তরঙ্গ দৃশ্যমান বৈদ্যুতিক তরঙ্গমাত্র। তা'রপর, কেমন করিয়া বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে অদৃশ্য আলোক-তরঙ্গে পরিণত করিয়া আকাশে তরঙ্গায়িত করা যায়, জার্ম্মাণ-বৈজ্ঞানিক Hertz তাহা দেখাইয়া দেন। এই Hertzian আলোক-তরঙ্গকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, কৃত্রিম চক্ষুর প্রয়োজন। ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক Lodge ও ফরাসী-বৈজ্ঞানিক Branly সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে এক কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারসাধন করিয়াছেন। Lodge এই কৃত্রিম চক্ষুকে 'coherer' নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই কৃত্রিম চক্ষু লৌহ-কণাপূর্ণ একটি কাচের সূক্ষ্ম নল। যখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এই নলে আঘাত করে (সংলগ্ন হয়), তখন ঐ তরঙ্গ লৌহ-কণাগুলির উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে, তাহাদের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সঞ্চালিত করিবার শক্তি পরিবর্ত্তিত হয়। লৌহ-কণাগুলি যেন অসাড় হইয়া পড়ে; কিন্তু কাচের নলে একটি ছিদ্র করিয়া দিলে, উহাদিগের তরঙ্গ-সঞ্চালন-শক্তি পুনরায় দেখা দেয়।

কাচের নলে ছিদ্র করিবার প্রয়োজন কেন হয়? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য, ডাঃ বসু, অতি যত্নের সহিত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি দেখিলেন যে, (অত্যধিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গাঘাতে) "coherer" এর লৌহ-কণাগুলি অত্যধিক শ্রমবশতঃ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; তাহাদিগকে পুনরায় সতেজ করিবার প্রয়োজন হইল; তখন নলে একটি ছিদ্র করিয়া দেওয়ায়, যেন তাহাদিগকে উত্তেজনা দেওয়া হইল, আর তাহাতে তাহারা আবার সতেজ হইয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিয়া, এ-সম্বন্ধে আরও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিতে তাঁহার উৎসাহ জন্মিল। জড়-পদার্থ আশ্চর্য্যজনক খেয়াল-পূর্ণ বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তিনি electricityর সাহায্যে, জীব-তত্ত্ববিৎ যেমন মাংসপেশী বা স্নায়ু পরীক্ষা করেন, এই বিষয়ের সেইরূপ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জীব-শরীরের মৃত তন্তুর প্রতিক্রিয়া, সজীব তন্তুর প্রতিক্রিয়া হইতে স্বতন্ত্র। যখন একটি সজীব মাংসপেশী বা স্নায়ু উত্তেজিত হয়, galvanometer বা রাসায়নিক তড়িৎ-প্রবাহমান-যন্ত্রের সাহায্যে একটি বৈদ্যুতিক মোচড় (twitch) উপস্থিত হয়; কিন্তু জীব-শরীরের মৃত তন্তু বৈদ্যুতিক কার্য্যে এরূপ কোন সাড়া দেয় না। এইরূপভাবে পরীক্ষা করিয়া ডাঃ বসু দেখিয়াছেন যে, জড়-পদার্থ বাস্তবিকই সজীব। তিনি ধাতব পদার্থকে শৈত্যপ্রভাবে জমাইয়া দেখিয়াছেন যে, উহা শৈত্য-সংযোগে মাংসপেশীর ন্যায় অসাড় হইয়া পড়ে; বিষপ্রয়োগে ইহাকে মৃতপ্রায় করিয়া প্রকরণবিশেষদ্বারা পুনঃসঞ্জীবিত করিয়াছেন; অহিফেনদ্বারা অচেতন করিয়া, আবার তাহাকে সচেতনও করিয়াছেন; electricityর সাহায্যে ধাতব পদার্থকে চিম্‌টাইয়া দেখিয়াছেন, উহা মাংসের ন্যায় তাহাতে সাড়া দেয়; পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া দেখিয়াছেন যে, উহা ক্লান্ত হইয়া অবশেষে আর সাড়া দেয় না; তা'রপর উহাকে বিশ্রাম দিয়া দেখিয়াছেন যে, উহার সাড়া দিবার শক্তি উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ শত শত পরীক্ষাদ্বারা তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, আপাততঃ যাহা নির্জীব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তবিক নির্জীব নহে। 'coherer'-এর কণাগুলি, উক্ত যন্ত্রে একটি ছিদ্র করিলে, কেন পুনরায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রে সাড়া দেয়, পরীক্ষাদ্বারা বুঝিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, সজীব ও নির্জীব পদার্থের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা তিরোহিত হইল।

এই সকল পরীক্ষার জন্য ডাঃ বসু, "resonant recorder" নামে একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন। এখন সেই যন্ত্রটি কি, তাহা বুঝাইব। একটি সূক্ষ্ম রেশমের সূত্র, উদ্ভিদের কোন একটি পত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া একটি ক্ষুদ্র দণ্ড-যন্ত্র বা leverএর সহিত সংযুক্ত করা হয়। এই দণ্ড-যন্ত্র হইতে একটি সরু তার সোজাভাবে নীচের দিকে ঝুলাইয়া রাখা হয়। এই তারের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ধূম্রযুক্ত একটি কাচের plateকে এরূপ আল্‌গাভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে যে, ঘটিকা-যন্ত্রের সাহায্যে ইহা উক্ত plateএর উপর সমান গতিতে নামিতে থাকে। এই তারের অগ্রভাগটি কলম বা পেন্‌সিলের কার্য্য করে। পত্রের সহিত বৈদ্যুতিক চুম্বক সংযুক্ত করিলে, এই পেন্‌সিল plateএর উপর বিকম্পিত হইয়া কতকগুলি বিন্দুপাত করে। প্রত্যেক বিন্দু ১/১০০, ১/৫০, ১/১০ সেকেণ্ডে বা পরীক্ষকের যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ কাল-ব্যবধান নিরূপণ করে।

একটি পরীক্ষায় ডাঃ বসু বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় লজ্জাবতী জাতীয় একপ্রকার লতা-পত্রে ঘাত প্রদান করিয়া উক্ত যন্ত্রকে (যুগপৎ) পরিচালিত করিয়া দেখেন যে, কয়েকটি বিন্দুপাতদ্বারা কৌতুক-জনক একটি রেখাপাত হইয়াছে। লতা-পত্র সহসা উত্তেজিত হইয়া রেশম-সূত্রের দ্বারা দণ্ড-যন্ত্রের আকর্ষণ করায়, এই রেখাপাত হইয়াছিল,—মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে। তিনি রেখার বিন্দুগুলি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, তিন সেকেণ্ডের মধ্যে পত্রের আক্ষেপজনক

পতন সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাতে লজ্জাবতী-লতার ঘাত-অনুভূতি প্রতিপন্ন হয়।

পরীক্ষাদ্বারা জগদীশবাবু প্রমাণিত করিয়াছেন যে, উদ্ভিদ্ বিশ্রাম করে। এখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার বিশ্রামের প্রয়োজন হয় বা ইহা পরিশ্রান্ত হয়। অধ্যাপক বসুর হাতে, লজ্জাবতী-লতা যেন অসহিষ্ণু, উত্তেজিত ও ভয়প্রাপ্ত অশ্বের ন্যায় প্রকৃতি দেখায়।

শ্রীসাতকড়ি মিত্র

রাধা

বরণ কালো কি ধলো, চক্ষু তাহা না দেখে সন্ধানি',
বয়স বিশ কি ত্রিশ, মন যাহা বুঝে অনুমানি';
দীঘল বা খর্ব্ব কিবা পীনা তন্বী কে করে গণনা,
রূপের পরখ কোথা, যা'র যাহা মনের কল্পনা।
চটুলা, মুখরা কিংবা ধীরা কি গম্ভীরা একদিক্,
যৌবন আছে কি গেছে, অঙ্গ তা'র সাক্ষ্য নহে ঠিক!
শয়নে, স্বপনে, জ্ঞানে অন্তরে বেজেছে যা'র বাঁশী,
পিরীতি-মন্তরে যা'রে গৃহ-সুখে করে'ছে উদাসী,
কালিন্দী নাহি বা থাক্, কুম্ভ সদা ভরিতে ব্যাকুল,
দয়িত-মিলন-আশে দেহে ফুটে কদম্বের ফুল;
চলুক্ সে না চলুক্, অভিসারে মন আগুসরে,
বলুক্ বা না বলুক্, হিয়া যা'র লুটিছে অন্তরে;
ব্রজভূমে, বঙ্গভূমে যেখানেই হোক্ বা না কেন,—
যে নারী প্রেমের পায়ে করিতেছে আরাধনা হেন,
কৃষ্ণে বা গোরায় হোক্, যদি দিয়ে থাকে মন বাঁধা,
আধ অঙ্গ কাঁদে শুধু; কবি কহে সেই মোর রাধা!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভারতীয় ভাষা

পোথওয়ারী ও শিবানী—পোথওয়ারী-ভাষা গুজরাট, ঝীলাম ও রাওয়ালপিণ্ডি-প্রদেশের পূর্ব্বাংশ ব্যবহৃত হয়। মারি ও জাম্বু-প্রদেশের মধ্যে শিব (শিব) নামে যে জাতি আছে, উহার ভাষা 'শিবানী' বলিয়া পরিচিত। মিঃ ড্রু-ই এই আখ্যা দিয়াছেন। শীবানী-ভাষার অন্তর্গত দুইটী ভাষা আছে; ইহারা পাঞ্চি বা পাঞ্চদের ভাষা ও ঢুণ্ডি; ঢুণ্ডি গলিস ও মিরির চতুঃপার্শস্থ পার্ব্বত্য জাতিসমূহ-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়।

শিবানী ও লাণ্ডা-ভাষার প্রকৃত সম্বন্ধ এখনও নির্ণীত হয় নাই।

লাণ্ডা-ভাষার আর যে সমস্ত শাখা উত্তরদিকে ব্যবহৃত হয়, তাহারা 'টিনাসি,' 'বেত্রি' ও 'এওয়ানকারি' নামে পরিচিত। এই তিনটী ভাষা হাজরা, রাওয়ালপিণ্ডি ও ঝীলাম, এই তিনটী প্রদেশে প্রচলিত।

মূলতানী।—সেল্ফ্ রেঞ্জ্এর দক্ষিণে লাণ্ডা ভাষা "মূলতানী" নামেই পরিচিত। সিন্ধুর উত্তরে "উভেচি" নামক একটী ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার নাম পাওয়া যায়; কিন্তু সেগুলি তত আবশ্যক নয়। ইণ্ডাস্-নদের পশ্চিম-উপকূলে 'খেতরাণী' নামেও হিন্দকো ভাষার আর একটী শাখা প্রচলিত আছে।

লাণ্ডা-ভাষা পাঞ্জাবী হইতে অনেক পৃথক্; কিন্তু সিন্ধী-ভাষার সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার কতকগুলি শব্দের কাশ্মীরী-ভাষার শব্দের সহিত সাদৃশ্য আছে। লাণ্ডা ও পাঞ্জাবী-ভাষার ব্যাকরণে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। লাণ্ডা-ভাষার "স"দ্বারা ভবিষ্যৎ-কাল জ্ঞাপন করা হয়; কিন্তু পাঞ্জাবী-ভাষায় ইহার কিছুই নাই। কাশ্মীরী ও সিন্ধী-ভাষাদ্বয়ের ন্যায় লাণ্ডা-ভাষায়ও সর্ব্বনাম-সম্বন্ধী বিভক্তিসমূহ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পাঞ্জাবী-ভাষায় ইহাদের প্রচলন নাই।

আরব-ফার্শী-বর্ণমালা লাণ্ডা-ভাষায় ব্যবহৃত হয়। এক-প্রকার বিকৃত দেবনাগরী-বর্ণমালাও দেখিতে পাওয়া যায়।

সিন্ধী।—সিন্ধী-ভাষা সিন্ধু-প্রদেশেই ব্যবহৃত হয়। লাস-বেলা, কাচ এবং ভাওয়ালপুর ব্যতীত সিন্ধু-প্রদেশের বহির্ভাগে এই ভাষার প্রচলন নাই।

সিরৈকী, লারী ও থারেলী এই তিনটী সিন্ধী-ভাষার প্রধান শাখা। প্রথমটী সিরো বা আপার-সিণ্ড্ এবং ভাওয়ালপুরে ব্যবহৃত হয়; দ্বিতীয়টী লারু বা লোয়ার-সিণ্ডে প্রচলিত।

তৃতীয়টী থারু বা সিন্ধু-মরুভূমিস্থ শিকারী ও সমাজ-বহির্ভূত জাতিকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। এই ভাষাটী সিন্ধী ও মারওয়াড়ী-ভাষার মধ্যবর্ত্তী।

সিন্ধু-প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশসমূহ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায়, এই ভাষার ব্যাকরণ ও স্বর-সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিশেষত্ব এখনও বিদ্যমান আছে। বহু শত বর্ষ পূর্ব্বের ব্রাচড়-অপভ্রংশের কতকগুলি বিশেষত্ব ইহাতে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

কাচ্ছি।—দক্ষিণ-পূর্ব্বে সিন্ধী-ভাষা কাচ্ছি-ভাষার মর্য্যাদায় গুজরাটী-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। এইজন্য কাচ্ছি-ভাষাকে গুজরাটী-ভাষার একটী শাখা বলিয়া তৎ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু ইহাকে সিন্ধী-ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিলে ভালই হয়।

সাদার্ণ গ্রুপ বা দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ভাষা সমষ্টি।—দক্ষিণ-ভারতে যে সমস্ত ইণ্ডো-এরিয়ান ভাষাসমূহ প্রচলিত, সেগুলি একমাত্র মারাঠী-ভাষারই শাখা।

মারাঠী-ভাষা ও ইহার কতকগুলি শাখা প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত।

ইহা বম্বে হইতে আরম্ভ করিয়া গোয়ার দক্ষিণে একশত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা বেরার ও নিজাম-রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রচলিত। তদনন্তর মধ্য-প্রদেশের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাসটার-প্রদেশের অধিকাংশে ইহা বিস্তৃত হইয়াছে ও এখানে ইহা ওড়িয়া-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। মারাঠী-ভাষার উত্তরে গুজরাটী, রাজস্থানী, পশ্চিমী এবং পূরবী-হিন্দী প্রচলিত।

ইহার পূর্ব্বে হালবী-ভাষা প্রচলিত। এই ভাষার সহিত পূরবী-হিন্দীর কোন কোন স্থলে সংযোগ দৃষ্ট হয়।

মারাঠী-ভাষায় 'পাষ্ট-পার্টিসিপ্‌ল্' ও অতীত-কাল "ল"দ্বারা প্রকাশিত হয়।

যথা—উঠিলা। এ অঞ্চলের অন্যান্য ভাষাসমূহের মধ্যেও ইহা প্রচলিত। যথা, ওড়িয়াতে—"উঠিলা," বাঙ্গালা-ভাষায়—"উঠিল," বিহারী-ভাষায় "উঠল্" ও আসামীতে "উঠিল্" গুজরাটী-ভাষাতেও এইরূপ "ল"এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; অতএব দেখা যাইতেছে যে, বম্বে হইতে আরব্যোপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশের ভাষা-গুলির মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

মারাঠী-ভাষায় সাধারণের প্রিয় প্রচুর গ্রন্থাদি লিখিত আছে। ঐ প্রদেশের কবিগণ, তাঁহাদের নিজের ভাষাতেই পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা প্রকৃত "তদ্ভব" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ "তৎসম" শব্দের ব্যবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাষার উপরে উঁহারা তাদৃশ প্রভাব-বিস্তার করিতে পারেন নাই। এই প্রদেশ অনেক কাল পরে মুসলমানগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল এবং সে আক্রমণেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই। এজন্য মারাঠী ভাষায় খুব অল্প ফার্শী শব্দই প্রবেশ করিতে পারিয়াছে।

প্রাচীন মারাঠী-লেখকগণের মধ্যে নামজেব এবং জ্ঞানোবা বিশেষ বিখ্যাত। ইঁহারা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীধর, সংস্কৃত-পুরাণসমূহের অনুবাদজন্য বিশেষ বিখ্যাত। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু তুকারামই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। তিনি শিবাজীর সম-সাময়িক ছিলেন। তাঁহার রচিত "অভঙ্গ" বা বিথোবার উদ্দেশে লিখিত স্তোত্রগুলি মারাঠীগণের গৃহে গৃহে পঠিত হয়। তুকারামের পরে মোরাপান্ত বিশেষ বিখ্যাত।

মারাঠী ভাষার তিনটী প্রধান শাখা আছে। দেশী, কোকানী ও বেরার এবং মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত মারাঠী।

দেশী।—দেশী-মারাঠী পুণার চতুঃপার্শ্বে ব্যবহৃত হয়। মারাঠী-জেতৃগণের সহিত ইহা বরোদা এবং মধ্য-প্রদেশের কতক অংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই ভাষা আবার কতকগুলি বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গমেশ্বরী, বাঙ্কোটী, কুডালী ও মানওয়ানী উল্লেখযোগ্য। থানার নিম্নশ্রেণী ও খান্দেশের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহস্থ ব্যক্তিগণ "কুনবান" নামক একপ্রকার ভাষা ব্যবহার করে। ইহাও দেশী-মারাঠীর একটী শাখা।

কোকানী-ভাষা, কোকান, উত্তর-কাণাড়া ও বেলগাঁও-প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণে, কানারী এবং টুলু-ভাষাদ্বয়ের সহিত ইহা মিশ্রিত হইয়াছে।

ওয়ারহাদী বা বেরারী।—ওয়ারহাদী ও বেরারী ভাষা বেরার ও হায়দ্রাবাদের নিকটস্থ স্থানসমূহে ব্যবহৃত হয়। ওয়ারদা-নদী মধ্য-প্রদেশ হইতে বেরারকে পৃথক্ করিয়াছে ও সেই সঙ্গে নাগপুরী এবং ওয়ারহাদী-ভাষাদ্বয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। যাহা হউক, ওয়ারহাদী-ভাষা মধ্য-প্রদেশের "বেটুল" নামক স্থানে ব্যবহৃত হয়। আবার বাসিম ও বেরার-প্রদেশস্থ বুলদানার পশ্চিমাংশে যে মারাঠী-ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহার সহিত ওয়ারহাদী ভাষার কোন সাদৃশ্য নাই। পুনাতে যে মারাঠী-ভাষা ব্যবহৃত, তাহার সহিত এই ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।

নাগপুরী-ভাষা।—মধ্য-প্রদেশের দক্ষিণে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে "নাগপুরী" বলা হইয়া থাকে। ইহা একরকম ওয়ারহাদী-ভাষাই বটে; কিন্তু স্থানবিশেষে ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

নাগপুরের পূর্ব্বপ্রান্তে বা বালাঘাট-জিলায় এই ভাষার এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, ইহা "মারেঠী" নামক একটী ভিন্ন ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ইহার আরও পূর্ব্বে ছত্তিসগঢী-ভাষা প্রচলিত। ইহা পূরবী-হিন্দীর একটী শাখাবিশেষ। দক্ষিণে "মারাঠী"-ভাষা চান্দা-জিলার উত্তরাংশে বিস্তৃত ও অবশেষে হালবী-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। হালবী-ভাষা কোন একটী বিশেষ ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় নাই; ইহা কতকগুলি আর্য্য ও দ্রাবিড়-ভাষার সংমিশ্রণ। ইহা মারাঠী ও উড়িয়া ভাষার মধ্যবর্ত্তী।

এই ভাষা বাস্তারএর মধ্যাংশে ব্যবহৃত হয়। বাস্তারের উত্তর-পূর্ব্বাংশে "ভাত্‌রী" নামক একটী ভাষা প্রচলিত। হালবী ও ওড়িয়া ভাষাদ্বয়কে ইহা সংযোজনা করিতেছে। ইহার পূর্ব্বেই ওড়িয়া-ভাষা প্রচলিত।

এই পর্য্যন্ত আমরা মারাঠী-ভাষার বিস্তার দেখাইলাম।

পূর্ব্ব-ভারতের ভাষা।—পূর্ব্ব-ভারতে প্রধানতঃ চারিটী ভাষা ব্যবহৃত হয়। ওড়িয়া, বিহারী, বাঙ্গালা ও আসামী।

ওড়িয়া-ভাষা, উড়িষ্যা ও ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী দেশে প্রচলিত। উত্তরে ইহা মেদিনীপুর-জিলার কতকাংশে ব্যবহৃত হয়। ইহা সিংভূম ও ছোটনাগপুর-বিভাগের কতিপয় স্থানেও ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমে সম্বলপুর ও মধ্য-প্রদেশস্থ রায়পুর-জিলার কিয়দংশে ইহা ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণে গাঞ্জাম ও ভিজাগাপটামে পর্য্যন্ত এই ভাষার প্রচলন।

এই ভাষা, "ওড়িয়া," "ও," ওড্রী "উৎকলী" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই ভাষার প্রাচীন নিদর্শন ত্রয়োদশ শতাব্দীর খোদিত লিপিসমূহে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর খোদিত লিপি-সমূহ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ওড়িয়া-ভাষা সে সময় খুব উন্নত হইয়াছিল। আধুনিক ওড়িয়া হইতে তাহার সামান্যই পার্থক্য পরি-লক্ষিত হয়। ওড়িয়া-ভাষার উত্তরে বাঙ্গালা-ভাষা, উত্তর-পশ্চিমে বিহারী, পশ্চিমে ছত্তিসঘরী ও দক্ষিণে তেলেগু-ভাষা প্রচলিত। দক্ষিণ-পশ্চিমে হালবী-ভাষার সহিত ওড়িয়া-ভাষা মিশ্রিত হইয়াছে।

ওড়িয়া ও বাঙ্গালা-ভাষাদ্বয়ের ব্যাকরণ-সম্বন্ধে কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এজন্য কলিকাতার পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ওড়িয়া-ভাষা বাঙ্গালা-ভাষারই একটী শাখা; কিন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক। এই দুইটী ভাষাই প্রাচীন মাগধ-অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাদের মধ্যে কতক বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা-ভাষা অপেক্ষা ওড়িয়া-ভাষার একবিষয়ে অত্যন্ত সুবিধা আছে। ইহা যেরূপ উচ্চারিত হয়, বানানগুলিও সেই প্রকার। বাঙ্গালা-ভাষায় যেমন ব্যঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণগুলির অনেক-স্থলে অস্পষ্ট উচ্চারণ হয়, উড়িয়া-ভাষায় সেরূপ প্রায়ই হয় না। প্রত্যেক শব্দের প্রত্যেক বর্ণ সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালা-ভাষায় শব্দের প্রথম পদাংশগুলিই সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয় ও পরবর্ত্তী পদাংশগুলির উচ্চারণ অস্পষ্ট থাকিয়া যায়; কিন্তু বিশুদ্ধ ওড়িয়া-ভাষার প্রত্যেক পদাংশই সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয়। ওড়িয়া-ভাষায় অনেকগুলি "কালের" প্রচলন আছে ও প্রত্যেকের ব্যবহার-প্রণালী অতিশয় সরল ও সম্পূর্ণ। বাঙ্গালা-ভাষায় **Infinitive** ও **Gerund**এর সমষ্টি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ; কিন্তু ওড়িয়া-ভাষা **verbal noun** দ্বারা

এই অসম্পূর্ণতা দূর করিয়াছে। ওড়িয়া-ভাষায় Infinitive-এর ব্যবহার মোটেই দৃষ্ট হয় না।

ওড়িয়া-ভাষার উপর অন্যান্য ভাষাসমূহের প্রভাব।—উড়িষ্যা বহু শতাব্দী হইতে একটা পরাধীন দেশ। প্রায় আটশত বৎসর ইহা তেলেঙ্গী-রাজাদের অধীনে ছিল এবং অল্পদিন হইল ইহা নাগপুরের ভোঁসলাদের অধীনে আসিয়াছে। এজন্য ওড়িয়া-ভাষায় কতকগুলি তেলেগু ও মারাঠী শব্দ দৃষ্ট হয়। আবার মুসলমানদের নিকট হইতে কতকগুলি ফার্সী শব্দও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরাজের অধীন হওয়াতে, কতকগুলি ইংরাজি শব্দও ওড়িয়া-ভাষায় দেখা যায়। ওড়িয়া-ভাষায় অনেক পুস্তক লিখিত আছে। ইহার অধিকাংশই ধর্ম্মবিষয়ক কাব্য এবং শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধেই, অধিকাংশ পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ওড়িয়া-ভাষা সাধারণতঃ উড়িষ্যা-প্রদেশেই ব্যবহৃত হয়।

বিহারী-ভাষা।—বিহার-প্রদেশ, বাঙ্গালা-দেশ অপেক্ষা যুক্ত-প্রদেশের সহিত বেশী সংশ্লিষ্ট ছিল। এমন কি, রামায়ণে দেখা যায় যে, রামচন্দ্র অযোধ্যা হইতে আসিয়া সীতাকে মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া লইয়া যান। মিথিলা আধুনিক উত্তর-বিহার। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, বিহারী-ভাষা যুক্ত-প্রদেশে প্রচলিত হিন্দীর রূপান্তর মাত্র। বাঙ্গালা ও ওড়িয়া-ভাষার ন্যায় বিহারী-ভাষা ও মাগধ-অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই ভাষার অনেকগুলি বিশেষত্ব এখনও বিহারী ভাষায় বিদ্যমান। কেবলমাত্র উষ্মবর্ণের উচ্চারণ-সম্বন্ধে এই দুইটী ভাষার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানের পার্থক্য এই উষ্মবর্ণের উচ্চারণেই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালী "স"কে "ষ" এর মত উচ্চারণ করেন; কিন্তু বিহারীগণ সংস্কৃতের ন্যায় "স্" উচ্চারণ করেন।

বিহারী-ভাষা কেবলমাত্র বিহার-প্রদেশে সীমাবদ্ধ নহে। পশ্চিমে ইহা যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্বভাগে, এমন কি, অযোধ্যার কিয়দংশেও ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণে ইহা ছোটনাগপুরের দুইটী উপত্যকায় ব্যবহৃত হয়। উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সিংভূম পর্য্যন্ত এই ভাষা বিস্তৃত এবং দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও উত্তর-পশ্চিমে মানভূম ও বাস্তীর মধ্যে এই ভাষা সীমাবদ্ধ।

বিহারী-ভাষার তিনটী প্রধান শাখা আছে। মৈথিলী, মাগধী ও ভোজপুরী। ইহাদের প্রত্যেকেরও আবার কতকগুলি প্রশাখা আছে।

মৈথিলী।—মৈথিলী বা তিরহুতিয়া-ভাষা, তিরহুত, পূর্ব্বমুঙ্গের, ভাগলপুর, চম্পারন ও পূর্ণিয়ার পশ্চিমাংশে প্রচলিত। দারবঙ্গেই এই ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ প্রচলন দৃষ্ট হয়। এই ভাষার সাহিত্য অল্প। বিদ্যাপতি-ঠাকুর এই ভাষার প্রধান কবি। তিনি রাধা-কৃষ্ণের সম্বন্ধে যেসকল সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। বিহারে মৈথিলী-ভাষায় কতকগুলি নাটকও রচিত হইয়াছে। কতকগুলি মহাকাব্যও এই ভাষায় লিখিত ছিল। ইহার মধ্যে একটীর চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

মাগধী।—এই ভাষা হাজারিবাগ ও বিহারের দক্ষিণে ব্যবহৃত হয়। এ ভাষায় সাহিত্যাদি কিছুই নাই। অধুনা যেস্থলে মাগধী ব্যবহৃত হইতেছে, পূর্ব্বে উহা মগধ-রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

ভোজপুরী।—প্রকৃতপক্ষে ধরিতে গেলে এই ভাষা সাহাবাদ-জিলার উত্তর-পশ্চিমস্থ ভোজপুর-সহরেরই ভাষা; কিন্তু এই ভাষা এখন বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সমগ্র পশ্চিম-বিহার ও যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্বাংশে ব্যবহৃত হয়।

পালামৌ ও রাঁচি-জিলাতেই এই ভাষা প্রচলিত। স্থান-বিশেষে এই ভাষার কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এই ভাষা হইতে তিনটী প্রধান ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। একটী "নাগপুরিয়া" বলিয়া পরিচিত; অপর দুইটী "সাধারণ ভোজপুরী" ও "পূরবী ভোজপুরী" বলিয়া পরিচিত। ভোজপুরী-ভাষায় সাহিত্যাদি অল্পই লিখিত হইয়াছে।

মৈথিলী, মাগধী ও ভোজপুরী-ভাষাত্রয়কে দুইটী শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

মৈথিলী ও মাগধি একটী শ্রেণী ও ভোজপুরী আর একটী শ্রেণী। মৈথিলী ও মাগধীর উচ্চারণ-প্রণালী প্রায়ই একপ্রকার; কিন্তু ভোজপুরীতে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। মৈথিলী ও মাগধীতে স্বর-বর্ণের উচ্চারণ দীর্ঘ; কিন্তু ভোজপুরীতে উহার উচ্চারণ হ্রস্ব। কথোপকথনকালে মৈথিলী ও মাগধী-ভাষায় মধ্যমপুরুষে (আপনে) ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ভোজপুরীতে "রাওরে" ব্যবহৃত হয়।

মৈথিলী ও মাগধী-ভাষায় ক্রিয়ার রূপ-করণ প্রণালী অত্যন্ত জটিল; কিন্তু ভোজপুরী-ভাষায় ক্রিয়ার রূপ-করণ-প্রণালী অতি সহজ।

শ্রী—

সন্ধ্যা-সঙ্গীত

[F.ll rsleben হইতে]

সন্ধ্যা আসে ধীরে,
শান্তির নিবিড় ছায়া
ঘিরে ধরণীরে;
বিশ্বের বিরাম-বেলা
আসিয়াছে ফিরে'।
শুধু শিলা 'পরে
অশান্ত নির্ঝর হোথা
লুটি'—চিরতরে
বহে' যায় অবিরত
কুলু-কুলু-স্বরে।
দিবা অবসানে
তা'র লাগি' শান্তি-সুপ্তি
সন্ধ্যা নাহি আনে;
গাহেনা বিরাম-গীতি
কেহ তা'র কানে।

আমার অন্তর,
ওই নির্ঝরের মত
ক্ষুব্ধ নিরন্তর;
অমনি বিশ্রামহারা—
ব্যথায় কাতর।

ওগো অন্তর্যামি,
আসিবে সন্ধ্যার শান্তি
চিত্তে কবে নামি'!
এ আবেগ-আকুলতা—
কবে যাবে থামি'!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়।

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বক:—বিপত্নীক কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীবনের সহিত বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা শ্বেতলোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। বর-পক্ষ হইতে ঋজুশৃঙ্গ ছাগোপাধ্যায় মেয়ে দেখিতে গিয়া, পূর্ব্ব-বৈরতাবশতঃ বরের রূপ-গুণের এমন বর্ণনা সেখানে করিয়া আসিয়াছিল যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবারই কথা। তথাপি স্থূলপুচ্ছ বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়। সূক্ষ্মলোম তাহার বন্ধু নীলচক্ষু শৃগালোপাধ্যায়কে গোপনে শ্বেতলোমাকে দেখিতে পাঠাইয়াছিল। বন্ধুর মুখে কন্যার রূপ বর্ণনা শুনিয়া সূক্ষ্মলোম একবারে অভিভূত হইয়া পড়ে। বিবাহের দিনস্থির করিয়া, মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য কৃষ্ণলোম তাহার পুরোহিতকে পাঠাইয়া দেয়। স্থূলপুচ্ছের স্ত্রী, গাঢ়লোমার এ বিবাহে ঘোর আপত্তি—ইহা লইয়া স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল কলহ হইল। বিবাহ দিতে স্থূলপুচ্ছ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ইহা জানিয়া গাঢ়লোমা কন্যাকে লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। ভট্টাচার্য্য ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণলোমকে এ সকল সংবাদ দিলে, সূক্ষ্মলোম বিষম বিরহে ও মনস্তাপে গৃহত্যাগ করিয়া গেল। ক্রমে সে বানর-রাজ্যে উপস্থিত হইল। বানর-মহারাজা তাহার সকল কাহিনী শুনিয়া, তাহাকে নিজ সভাসদ করিয়া লইলেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থানের পর সূক্ষ্মলোম ছুটি লইয়া নিজ বাগ্‌দত্তা বধূকে অন্বেষণ করিতে বাহির হইল। এদিকে, কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছ উভয়ে একত্র হইয়া নিজ নিজ পুত্র ও কন্যাকে খুঁজিতে বাহির হইল। বানর-মহারাজা, মহিষ-মহারাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আয়োজনাদি করিয়াছেন।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মহিষ-মহারাজার সভা।

সিংহাসনে মহিষ-মহারাজা ও নিম্নে সভাসদ্‌গণ আসীন।

মহিষ-মহা। বানর-রাজার মরিবার শুভদিন
ঘ'নায়ে এসেছে।

১ম সভা। মহারাজ, যদি কেহ
আপনিই আপনার মৃত্যু ডেকে আনে,
অন্যে কি করিবে?

মহিষ-মহা। কি করিবে? যদি হয়
ভদ্রলোক-যথাসাধ্য সাহায্য করিবে
যা'তে তা'র বাসনার সিদ্ধিলাভ ঘটে
অবিলম্বে।

২য় সভা। নিশ্চিন্ত রহুন মহারাজ,
করিব আমরা তাহা।

মহিষ-মহা। জানি—জানি আমি
ভদ্রলোক তোমরা সকলে। আমাদের
সৈন্যগণ অতি ভদ্রলোক। আমি নিজে
ভদ্রতার চূড়ান্ত আদর্শ। এই দু'টি
শৃঙ্গ যে দেখিছ মোর—বক্র আপাততঃ—
ভদ্রভাব মনে যাই উথলি উঠিবে,
এই দু'টি সোজা হ'য়ে যাবে। তারপর,
(এমনি করিয়া প্রবলভাবে গুঁতাইবার মত মাথা-নাড়ন।
সিংহাসন পড়' পড়' হওন)
পাঠাইব বন্ধুগণে
সে দেশে, যেখানে আর কদলীফলের
প্রয়োজন নাহি হবে।

(সকলের হাস্য)

৩য় সভা। বহুদিন প্রভু,
যুদ্ধ না করিতে পেয়ে, শৃঙ্গগুলা সব
রোগা হ'য়ে গেল।

মহিষ-মহা। তাহা সত্য কথা বটে।
যে অঙ্গের চালনাটা বহুদিন ধরে'
নিরস্ত হইয়া থাকে, সে অঙ্গ ক্রমশঃ
ক্ষীণ হ'য়ে আসে।

১ম সভা। এইবার তা' হইলে
বিলক্ষণ সতেজ হইবে। তা'রপর
মহারাজ, যুদ্ধ শেষ হ'লে, একটিও
বানর না রহিবে যখন, তখন কি
দশা হবে? কা'র সঙ্গে আর যুদ্ধ করে'
এ শৃঙ্গগুলার স্বাস্থ্যরক্ষা হবে প্রভু?

মহিষ-মহা। তাই ত হে! এ ত বড় ভাবনার কথা!
সকল বানর না যায় মরিয়া, ইহা
স্বার্থ আমাদের নিতান্তই। অতএব
এ রাজ্যের সমুদয় ধর্ম্মের মন্দিরে
প্রতিদিন প্রার্থনা করা হউক, যেন
কিছু বৃদ্ধি হয় বানরকুলের শক্তি।

(সকলের হাস্য)

১ম সভা। মহারাজ, তাহা একান্ত উচিত। আর
এক পরামর্শ—তা'রা বড়ই দরিদ্র,
দুর্ভিক্ষ-পীড়িত—সুতরাং তাহাদের
বলাধান হেতু, হাজার দশেক গাড়ী
কদলী পাঠান হোক্ উপহার দিয়ে।

(সকলের হাস্য)

মন্ত্রীর প্রবেশ। (প্রণাম করিয়া)

মন্ত্রী। মহারাজ, বানর-রাজার পত্র এই
আনিয়াছে দূত।

মহিষ-মহা। যুদ্ধের ঘোষণা-পত্র।
(পত্র লইয়া পঠন ও পাঠান্তে তাচ্ছিল্যভাবে
ফেলিয়া দেওন)
অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে। একমাস

আর। আমাদের যত কিছু আয়োজন
করিবার, সব করা হোক্। আজ্ঞা দাও,
আমাদের সৈন্যগণ, পাহাড়ের গায়ে
প্রত্যহ ঘষিয়া শিঙ্, ধারালো করুক।
প্রত্যেকের তরে, এক এক পাত্র তৈল
পাঠাক্ ভাণ্ডারী প্রতিদিন, সৈন্যগণ
উত্তম করিয়া তাহা মাখুক্ হাঁটুতে।
আমাদের পা-গুলা খেলে না ভাল, এই
এক মহাক্রটি মহিষজাতির।

সকলে। কেন
খেলিবে না প্রভু? খেলালেই খেলে।
(সকলে মিলিয়া পা-ছুঁড়ন। ভীষণ শব্দ)

মহিষ মহা। দেখা
যাবে যুদ্ধকালে।

মন্ত্রী। মহারাজ, এক কথা
ভাবিতেছি; চিরদিন মোরা সহায়তা
করিয়াছি গর্দ্দভ-রাজার; যখনি সে
বিপদে পড়ে'ছে, আমাদের সেনাবল
করে'ছে প্রার্থনা। তা'ই মনে করিতেছি,
এ যুদ্ধে আহ্বান করি পাঠাই তা'দের।

১ম সভা। মন্ত্রি মহাশয়, আমরা কি হইয়াছি
এতই দুর্ব্বল, যে সে গর্দ্দভ-রাজার
সাহায্য চাহিব?

২য় সভা। এসে তারা চর্ব্ব্যচোষ্য
আহার করিবে, যুদ্ধকালে খুঁজে পাওয়া
হবে ভার। তাহাদের সাহায্য-গ্রহণে
মহিষ-সেনানীগণ অপমান বোধ
করিবে নিশ্চয়।

মন্ত্রী। প্রভু, আমাদের সেনা
চিরজয়ী রণে। যুদ্ধে সহায়তা নাহি
প্রয়োজন। কিন্তু তা'রা দক্ষ ভারবাহী
যুদ্ধের খাদ্যাদি যত বহন করিবে
সৈন্যগণ তরে।

মহিষ-মহা। তবে নিমন্ত্রণ কর
তাহাদের। আজ তবে সভাভঙ্গ হোক্।

সকলে। জয় জয় মহারাজ, মহিষ-ঈশ্বর।
(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বানর-রাজসভা।

সিংহাসনে বানর-মহারাজা, নিম্নে সেনাপতি ও সভাসদ্‌গণ আসীন।

সেনাপতি। মহারাজ, আমাদের সমস্ত প্রস্তুত।

বানর-মহা। সমস্ত প্রস্তুত?

সেনা। প্রভু, সমস্ত প্রস্তুত।

বানর-মহা। ভাল, শুনে' সুখী হইলাম। একপক্ষ
আছে আর যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বে।
এই একপক্ষ কাল সেনাগণ সবে
কি করান' হবে?

সেনা। তা'রা অতি পরিশ্রম
করিয়াছে দেড়মাস, এখনই হ'তে
লঘুকার্য্য দিব তাহাদের। যুদ্ধকালে
নব বলে বলীয়ান্ হইবে সকলে।

বানর-মহা। এ উত্তম করে'ছ প্রস্তাব; তা'ই হোক্।
যাও তবে সেনাপতি আপনার কাযে।
(প্রণাম করিয়া সেনাপতির প্রস্থান)
আমাদের পাত্র-মিত্র-সভাসদ্‌গণ,
তোমরা যাবে না যুদ্ধে?

১ম সভা। মহারাজ যবে
স্বয়ং যাইতেছেন, আমরা কি ছার,
অবশ্যই যাইব সকলে।

বানর-মহা। ভাল কথা!
সেই মেষ-সভাসদ্ আজিও ত কই
আসিল না? প্রতিজ্ঞা সে করিয়া গিয়াছে
যুদ্ধযাত্রা করিবার পূর্ব্বেই ফিরিবে।

জনৈক সভা। মহারাজ, ফিরে'ছে সে।

বানর-মহা। আসেনি সভায়?

সভা। প্রভু, অদ্য প্রভাতেই ফিরিয়া এসেছে
মেষ-যুবা। আনিয়াছে সাথে করি'
নববিবাহিতা বধূ। কিন্তু এ কন্যাটি
সে নয়, যাহার তরে গৃহ, দেশ ছাড়ি'
বিবাগী হইয়া যুবা বাহিরিয়াছিল।

বানর-মহা। বল কি! কবিত্ব এত বিসর্জ্জন দিয়া
করিল সে অন্যারে বিবাহ?

সভা। (হাসিয়া) দেখিতেছি
তা'ই।

বানর-মহা। যুবকগণের কিছু স্থির নাই
মতি। ভাল, কিরূপ অবস্থাক্রমে এই
বিবাহটি করিল সে, বলিয়াছে কিছু?

সভা। বলিল সে, দূরদেশে গিয়ে অকস্মাৎ
পীড়িত হইয়াছিল। দয়া করে' এক
মেষ-পরিবার তা'রে আপনার গৃহে
স্থান দেয়। তাহাদের একটি বালিকা
নিযুক্ত হইয়াছিল শুশ্রূষার তরে।
উভয়ের জন্মিল প্রণয়। সুস্থ হ'য়ে
বিবাহ করিল তা'রে।

বানর-মহা। (হাসিয়া) পাগলের ব্যাধি
এতদিনে আরোগ্য হইল।

সভা। তা'ই বটে,
মহারাজ!

বানর-মহা। বোধ করি, প্রণয়িজনের
চিরাদর্শ খর্ব্ব ও খণ্ডন করি', যুবা
হইয়াছে বিষম লজ্জিত—তা'ই আজি
রাজসভামাঝে মুখ নাহি দেখাইল।
কল্য তা'রে ডাকিয়া আনিও তুমি।

সভা। প্রভু,
অবশ্য আনিব।

বানর-মহা। আজি সভাভঙ্গ হোক্।

সকলে। জয় জয় মহারাজ, বানর-ঈশ্বর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা

"আচার্য্য জগদীশচন্দ্র"

বঙ্গীয়-মালিন্য-বিমুক্ত-চন্দ্রঃ
শশ্বৎ-সমুদ্ভাসিত-কীর্ত্তি-চন্দ্রঃ।
বিজ্ঞান-বিদ্যা-কুমুদীশচন্দ্রো
জীবাচ্চিরং শ্রীজগদীশচন্দ্রঃ॥ *

সূক্ষ্ম-সময়-নির্দ্দেশক যন্ত্র

(আচার্য্য বসু-মহাশয়ের আবিষ্কৃত)

শিঙ্গারের (Singer) শেলাইয়ের কল দিয়া খুব ঘন শেলাই করিবার আবশ্যক হইলে কলটিকে দ্রুত চালনা করিতে হয়। দ্রুত কল-চালনায় যন্ত্র-সংযুক্ত সূচটি ঘন ঘন উঠা-নামা করে এবং শেলাইয়ের ফোঁড়গুলি খুব কাছাকাছি হইয়া যায়। মনে করা যাউক্, খুব মোটা শেলাই করিবার সময় সূচটি মিনিটে ৩১ বার উঠা-নামা করে এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম শেলাই করিবার সময় উহা মিনিটে ৮১ বার উঠানামা করে। এখন মনে করা যাউক্, সূচের নিম্নে শেলাইয়ের কাপড়ের পরিবর্ত্তে একখানি কাগজ রাখিয়া কল-চালনার সহিত সেটিকে কাপড়ের মতই ধীরে ধীরে টানিয়া আনা হইতেছে। এক মিনিট পরে, সূচের মুখের আকার-অনুযায়ী কতকগুলি সরু ছিদ্র ঐ কাগজটিতে দেখা যাইবে। ঐ ছিদ্রগুলির সংখ্যা কলচালনার দ্রুততার উপর নির্ভর করে। একমিনিটে মনে করা যাউক, ৮১টি ছিদ্র হইল।

যদি পূর্ব্বোক্ত কাগজটিকে সূচের নিম্নে টেবিলের উপর দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট গতিতে ধীরে ধীরে সরাইয়া লওয়া যায় এবং সূচের উঠা-নামা যদি পূর্ব্বহিসাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে ঐ কাগজের উপরকার ৮১টি ছিদ্র একমিনিট সময়কে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কাগজটিতে যত হাজার ছিদ্রই হৌক্ না কেন, তাহাদের সংখ্যা দেখিয়া অনায়াসে বলিয়া দিতে পারা যায়, কতক্ষণ ধরিয়া শেলাইয়ের কল চলিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, যে কোন দুইটি ছিদ্রের মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু থাকে, তাহা একমিনিটের অতি সূক্ষ্ম অংশকে প্রকাশ করিয়া দেয়। মনে করা যাউক, কাগজে মিনিটে ৮১টি ছিদ্র হইল; সুতরাং ৮০টি সমান বিচ্ছেদের সৃষ্টি হইল। কারণ, কাগজের উপর তিনটি সরল রেখা টানিলে, তাহারা দুইটি বিচ্ছেদ-অংশ রচনা করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ৮০টি সমান আকারের বিচ্ছেদ-অংশের প্রত্যেকটি একমিনিটকে ৮০টি সমান ভাগে বিভক্ত

* প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-মহোদয়-রচিত শ্লোক।

করিয়া তাহাদের মধ্যে একটি অংশকে প্রকাশ করিয়া থাকে; সুতরাং আমরা শেলাইয়ের-কল দিয়া একমিনিটের ৮০ ভাগের এক ভাগ অথবা $\frac{৩}{৪}$ সেকেণ্ডকে মাপিতে পারি।

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সময় মাপিবার জন্য কাগজের গতিকে অপরিবর্ত্তিত এবং সরলরেখাক্রমে নিয়ন্ত্রিত করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথা, হিসাবে ভুল হয়। এখন মনে করা যাউক, পূর্ব্বোক্ত কাগজে আমরা একমিনিটে ৬০১টি সূক্ষ্ম ছিদ্র, অথবা ৬০০টি সমবিস্তৃত বিচ্ছেদ-অংশ দেখিতে পাইলাম। তাহা হইলে ঐ বিচ্ছেদ-অংশ-গুলির এক-একটি, একমিনিটের ৬০০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময়কে নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। সূচের উঠা-নামা দ্রুত করিলে আমরা অতি সূক্ষ্ম সময়ও পরিমাপ করিতে পারি। সূচটিকে মিনিটে ৬০০১ বার উঠা-নামা করাইলে আমরা উক্ত কাগজে ৬০০০ সমবিস্তৃত বিচ্ছেদ অংশ দেখিতে পাই। তাহার এক-একটি, একমিনিটের ৬০০০ হাজার ভাগের একভাগ অথবা একসেকেণ্ডের একশত ভাগের একভাগ সময় নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

কোন শেলাইয়ের কলকেই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দ্রুত চালনা করা যায় না। অন্যথা, আমরা একসেকেণ্ডের একশত ভাগের একভাগ সময়কে অনায়াসে ঐ উপায়ে পরিমাপ করিতে পারিতাম। মিনিটে ৮১ বারের বেশী সূচের উঠা-নামা দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ শিঙ্গারের কল অল্পই আছে। আচার্য্য বসু-মহাশয়ের যন্ত্রটি বুঝিতে হইলে পূর্ব্বলিখিত বিষয়-গুলি বুঝিবার আবশ্যক ছিল বলিয়াই আমরা এতক্ষণ সে বিষয়ে আলোচনা করিলাম। এইক্ষণে বসু-মহাশয়ের যন্ত্রটি বর্ণনা করিব।

উদ্ভিদের আঘাতজাত বা উত্তেজনামূলক সাড়া (Response) এত দ্রুত যে, তাহা সাধারণ কল-কৌশলে মাপিবার জো নাই। আচার্য্য বসু-মহাশয় সেই অতিসূক্ষ্ম সময় মাপিবার জন্য যে অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আবিষ্কর্ত্তার অসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

একটা দণ্ডকে যদি সোজাভাবে রাখিয়া তাহার একপ্রান্তকে কোন জিনিষের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রাখা যায়, তবে মুক্ত প্রান্তটিতে একটু হাত দিলেই দণ্ডটি ইতস্ততঃ কম্পিত হইতে থাকে। একটা মাছ ধরিবার ছিপকে যদি খাড়া করিয়া রাখিয়া তাহার অগ্রভাগ নিম্নদিকে এবং স্থূলতর অংশকে যদি ঘরের ছাদের সহিত দৃঢ়ভাবে গাঁথিয়া রাখা যায়, তবে ছিপটির অগ্রভাগে একটু হাত দিলেই ছিপটি ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে থাকিবে। কারণ, উহার গোড়ার দিক্‌টি ঘরের ছাদের গাঁথনির সহিত জোর করিয়া আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। এক্ষণে মনে করা যাউক্, ছিপটির খুব নিকটে একখানি কাঠের বোর্ড (Board) কে খাড়া করিয়া রাখা গেল। বোর্ডখানি ছিপের অবস্থিতির সরল রেখার অনুরূপ, ছিপের মুক্ত অংশের অগ্রভাগ হইতে অতি ধীরে ধীরে একটা নির্দ্দিষ্ট গতিতে উপর হইতে নিম্নদিকে নামিয়া (Slides) আসিতেছে। এইক্ষণে যদি ছিপ্‌টিকে কাঁপাইয়া দেওয়া যায়, তবে ছিপের নিকটবর্ত্তী চলন্ত বোর্ডটিকে, উক্ত ছিপের অগ্রভাগটি ঘন ঘন স্পর্শ করিবে।

মনে করা যাউক, কৃষ্ণবর্ণের বোর্ডের উপর ছিপের অগ্রভাগের স্পর্শ-বিন্দুগুলি কোন উপায়ে শুভ্রবর্ণের করা গেল। পূর্ব্বোক্ত শিঙ্গারের শেলাইয়ের কলের মতই এস্থানে কাগজের পরিবর্ত্তে কালো বোর্ডে ঘন-সন্নিবিষ্ট শেলাইয়ের ফোঁড়্ বা সূচের ভেদ-বিন্দুর পরিবর্ত্তে ছিপের স্পর্শজনিত শুভ্র-বিন্দু দেখিতে পাওয়া যাইবে। যদি বোর্ডটির মন্থরগতি এবং ছিপের কম্পন কোন নির্দ্দিষ্ট দুইটি গতি (Mo'ion) অনুযায়ী প্রথমটিকে চালিত এবং দ্বিতীয়টিকে কম্পিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বোর্ডটির নিম্নদিকে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার গাত্রে ছিপ্‌টি বারংবার স্পর্শ করিবে। ঠিক্ শেলাইয়ের কলের কাগজের মতই এস্থানে ঐ ঘন-সন্নিবিষ্ট শুভ্র বিন্দুর সংখ্যা এবং দুইটি শুভ্র বিন্দুর মধ্যে অন্তরের পরিমাণ দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া দিতে পারেন, উক্ত বিন্দুদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশটুকু একমিনিট অথবা একসেকেণ্ডের কত অংশকে প্রকাশ করিতেছে।

বসু-মহাশয়ের নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটি ঠিক্ পূর্ব্বলিখিত একখানি কালো বোর্ড ও একখানি কম্পন দণ্ড লইয়া গঠিত। বোর্ডখানি এবং কম্পন দণ্ড ইত্যাদি লইয়া যন্ত্রটি দুই ফিটের অধিক হইবে না। আমরা বুঝিবার জন্য ছিপ্ ও বোর্ডের উপমা দিয়াছিলাম। কম্পন দণ্ড এবং বোর্ড ব্যতীত যন্ত্রের অপরাপর অনেক জটিল অংশ আছে, সেগুলি পাঠকসাধারণের নিকটে বারান্তরে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, শিঙ্গারের শেলাইয়ের কল সাধারণতঃ মিনিটে ৮১ বারের অধিক উঠা নামা করিতে পারে না; সুতরাং শিঙ্গারের কলের সূচটির নিম্নে যে কাগজখানিকে সূচের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সরলরেখাক্রমে টানিয়া আনা হইয়াছিল, সেটি মিনিটে ৮১ ছিদ্রযুক্ত হইলে বুঝিতে পারিব, কলটি এক-মিনিটকাল চলিয়াছিল। ৮১টি ছিদ্রযুক্ত কাগজে ৮০টি সম-বিচ্ছেদ-যুক্ত অংশ দেখিতে পাই। সুতরাং ঐ ছিদ্ররাশির যে কোন দুইটি ছিদ্রের মধ্যে যে অক্ষত অংশটুকু থাকে, তাহা এক মিনিটের ৮০ ভাগের একভাগ অথবা $\frac{৩}{৪}$ সেকেণ্ডকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

সুতরাং শেলাইয়ের কলের মতই বসু-মহাশয়ের অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রটির কম্পন-দণ্ডটিকে যদি বোর্ডটির গতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর ঘন ঘন উঠা-নামা করান' অর্থাৎ স্পর্শ এবং বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিতে পারা যায়, তবে আমরা এক মিনিটের অতি সূক্ষ্ম অংশকে পরিমাপ করিতে পারি। সূক্ষ্ম সময়ের এই সূক্ষ্ম পরিমাপ, কম্পন-দণ্ডটির কম্পন-সংখ্যার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ দণ্ডটি মিনিটে যত অধিকবার কাঁপান যাইতে পারিবে, বোর্ডে মিনিটে তত অধিক স্পর্শজনিত শুভ্র বিন্দুর সৃষ্টি হইতে থাকিবে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কম্পন-দণ্ডটির আন্দোলন ও বোর্ডেব নিম্নমুখী গতিকে দুইটি বিভিন্ন দ্রুতগতি বেগদ্বারা চালনা করিতে হয়। বোর্ডে মিনিটে যত হাজার শুভ্র বিন্দুপাত হোক্ না কেন, তাহাদের যে কোন দুইটি বিন্দুর অন্তবর্ত্তী কৃষ্ণ অংশ দেখিয়া বলিয়া দিতে পারা যায়, তাহা একমিনিটের কি পরিমাণ ভাগকে সূচিত করিতেছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ক্ষুদ্র কালো বোর্ডটির উপর যখন এক সেকেণ্ডের অতি সূক্ষ্ম সময়ের মধ্যে ছয় সাতটি শুভ্র বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়, তখন দর্শকগণ আশ্চর্য্য হইয়া আবিষ্কর্ত্তার প্রতিভাতে মুগ্ধ হইয়া যান।

উদ্ভিদ-দেহে বিষ অথবা আফিম এবং অপরাপর উত্তেজক সংযোগে আচার্য্যেরা উদ্ভিদের বিকৃতির যে সকল সাড়া (Response.) পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাণী-দেহের সাড়া-প্রকাশের ভঙ্গীর সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়; কিন্তু উদ্ভিদ-দেহে উত্তেজক দিবামাত্র তাহারা যে প্রকার সাড়া দিয়া থাকে, তাহা এত দ্রুত যে, পূর্ব্বোক্ত

প্রকারের কোন সূক্ষ্ম-সময়-নির্দ্দেশক যন্ত্র ব্যতীত সেগুলিকে লোক-চক্ষুর গোচরীভূত করা অসম্ভব। এই জন্যই বসু-মহাশয় এই প্রকার অতিসূক্ষ্ম-সময়-নির্দ্দেশক যন্ত্র নির্ম্মাণ ও আবিষ্কারের দিকে মন দিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রটির কম্পন-দণ্ডটিকে নানা উপায়ে অতি দ্রুত কম্পিত করিয়াও বসু-মহাশয় স্বীয় অভিলষিত কম্পন-সংখ্যা লাভ করিতে পারেন নাই। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-যোগে চুম্বকের (Electro-magnet) সৃষ্টিদ্বারা দণ্ডটিকে ঘন ঘন আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ করিয়া কম্পনের সংখ্যা এত বৃদ্ধি করিলেন যে, তাহা এক সেকেণ্ডের প্রায় $\frac{১}{৭০}$ অংশকে সূচিত করে; কিন্তু বসু-মহাশয়ের ইহা অপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্ম-সময়-পরিমাপের আবশ্যক হইয়া পড়িল। বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য-জগতে যতগুলি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা উপায় ছিল, বসু-মহাশয় তাহাদের প্রত্যেকটিকে, স্বীয় যন্ত্রের কম্পন-দণ্ডটিকে দ্রুততর বেগে কম্পন করিবার কৌশলের জন্য প্রয়োগ করিলেন; কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিকের ঈপ্সিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিল না। কম্পন-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে; কিন্তু আজ বিজ্ঞানের এমন কোন উপায়ই নাই, যাহা তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক (হীরেন্দ্রবাবুর ভাষায় "প্রাজ্ঞানিক"), জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রের আবিষ্কারের জন্য আপনার প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিলেন। আপনার অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভা-বল এবং নিজের অন্তঃকরণের অসীম প্রজ্ঞানের জ্যোতি, ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিককে এই বিষম সমস্যা পূর্ণ করিবার পথ দেখাইয়া দিল। পরিশেষে বসু-মহাশয় কম্পন-দণ্ডটির কম্পন-সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে যে অত্যাশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করিলেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বসু-মহাশয় কম্পন-দণ্ডটিকে দ্রুততর বেগে কাঁপাইবার জন্য সঙ্গীত-বিদ্যার সাহায্য লইয়াছিলেন। পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বায়ুকে কোন নির্দ্দিষ্ট গতিতে কম্পিত করিলেই শব্দের উৎপত্তি হয়। মাছি বা অন্যান্য পোকার বন্-বন্ শব্দ বায়ু-তরঙ্গের দ্রুত কম্পনের ফল। উহারা নিজের মুখ হইতে কোন শব্দ উচ্চারণ করে না। শব্দের উচ্চতার হ্রাস-বৃদ্ধি, বায়ু-কম্পনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। চড়াসুর বলিলে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বায়ু-কম্পনের সংখ্যা-বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে। কোমল, নিখাদ ইত্যাদি ঐ প্রকার বায়ু-কম্পনের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। বায়ুকে কম্পিত করিতে পারিলেই যে শব্দের উৎপত্তি হইবে, এমন কোন কথা নাই। বায়ু-কম্পনের বিশেষ সংখ্যার উপর তাহার কম্পনজাত বিশেষ বিশেষ শব্দের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। 'প্রেয়ার' (Preyer) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, মানুষের শ্রবণ-শক্তি কেবলমাত্র কয়েকটি বায়ু-কম্পনের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সমর্থ; সুতরাং মানুষের কর্ণ বায়ু-স্পন্দনের সমস্ত কম্পনগুলিকেই গোচরীভূত করিতে পারে না। একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাহার শ্রবণ-শক্তি আবদ্ধ বলিয়া, মানুষের শ্রবণের ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ; কিন্তু বধিরতার তাহার ক্ষমতা অসীম। সাধারণতঃ সেকেণ্ডে একচল্লিশ হাজার বায়ু-কম্পনের ঊর্দ্ধে এবং ষোল হাজার বায়ু-কম্পনের নিম্নের কম্পন-জনিত শব্দ মনুষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে অক্ষম।

সুতরাং আমরা দেখিলাম যে বায়ুর কম্পন সংখ্যা অত্যন্ত অধিক! ডাক্তার বসু-মহাশয় এই বায়ু-কম্পনকে তাঁহার যন্ত্রের পূর্ব্বোক্ত কম্পন-দণ্ডের আন্দোলন-সংখ্যা-বৃদ্ধির কার্য্যে সুকৌশলে প্রয়োগ করিয়াছেন। কেমন করিয়া বসু-মহাশয় এই অসাধারণ উপায় উদ্ভাবন করিলেন, তাহা একমাত্র সঙ্গীত-বিদ্যা ব্যতীত অপর বিদ্যাদ্বারা প্রতিপাদ্য নহে। ইহা বুঝিতে হইলে শব্দ-শাস্ত্রের "Resonance" অথবা "Sympathetic vibration" অর্থাৎ "সহানুভূতিতে কম্পন" নামক বিষয়টি জানা আবশ্যক।

দুইটি এস্রাজ্ যদি একইভাবে বাঁধা থাকে, তবে একটিকে অপরটির নিকট গিয়া বাজাইলে দেখা যায় যে, নীরব এস্রাজের তারগুলিও শব্দিত যন্ত্রের অনুরূপ কম্পিত হইতেছে। এস্রাজের মোটা তারের নিম্নে তির্য্যক্‌ভাবে সজ্জিত অনেকগুলিতে বাদক কদাপি হস্তক্ষেপ করেন না; তথাপি তাহাদের অবস্থিতির সার্থকতা কি, জানিতে হইলে, "Sympathe ic vibration" বা "সহানুভূতিতে অনুরণন" বিষয়টি বুঝিতে হয়। এস্রাজের বড় তারটি যখন কাঁপিতে থাকে, তখন তাহার সেই কম্পন, নিকটবর্ত্তী সরু তার-গুলিকেও কাঁপাইয়া দেয়। কারণ, সরু তারগুলি এমন সুরে বাঁধা আছে যে, মোটা তারের কম্পন তাহাদের বিচলিত করে। বেহালা বাজাইতে বাজাইতে বেহালার কাঠের অনুগুলিও অনেক সময় ঐ "সহানুভূতিতে অনুরণন"-জনিত কম্পন-প্রভাবে এমন-ভাবে সজ্জিত হইয়া যায়, যাহাতে অনুগুলি ঠিক বেহালার সুরের অনুরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে সজ্জিত হইয়া পড়ে; সুতরাং বেহালার শব্দও খুব ভাল হয়। সেই জন্য পুরাতন বেহালা, বাদকের নিকট নূতন বেহালা হইতে বহুমূল্য। বেহালার এই গুণ একমাত্র "সহানুভূতিতে অনুরণন"-জনিত কম্পনদ্বারা সাধিত হইয়াছে। নানা বাদ্য-যন্ত্রদ্বারা ঐক্যতান-বাদনকালে যে শব্দের সমন্বয় হয়, তাহাও কতকটা "সহানুভূতিতে অনুরণন"-বিষয়টির প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

একটি এস্রাজ বা বেহালাকে যদি অপর একটি এস্রাজ বা বেহালার সমান সুরে বাঁধিয়া উভয়কে নিকটে রাখা যায়, তবে তাহাদের মধ্যে যে কোনটিকে বাজাইলে, অপরটিও বাজিতে বাধ্য হয়। একটির সুরে অপর একটি সম-সুর-বদ্ধ যন্ত্রের স্বতঃকম্পন-কেই বৈজ্ঞানিকেরা "sympahetic vibration বা "সহানুভূতিতে অনুরণন" নাম দিয়াছেন। ইহার উদাহরণ সাধারণতঃ বাদ্য-যন্ত্রেই লক্ষিত হয়। একটি যন্ত্রের সহানুভূতিতে অপরটি যেন গুঞ্জরণ করিয়া উঠে, এইভাব লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিষয়টিকে "সহানুভূতিতে অনুরণন" নাম দিয়াছেন। একজন শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি ক্রন্দন করিলে, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত করিবার জন্য যেমন দ্বিতীয় ব্যক্তি চোখের জল মুছে, ইহাও কতকটা সেইরকম; অথবা একটা শিয়াল ডাকিলে, যেমন অন্যগুলিও ডাকিয়া উঠে, ইহাও প্রায় তদ্রূপ।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার কম্পন-দণ্ডটিকে একখানি অতি সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ (Membran) দ্বারা আবৃত করিয়া অনেকটা এস্রাজের স্থূলতর নিম্নাংশের ন্যায় করিয়াছিলেন। ঐ চর্ম্মাবরণটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাতে খঞ্জনীর অতি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে পারা যায়। আচার্য্য বসু-মহাশয় অতঃপর ঐ সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণযুক্ত কম্পন-দণ্ডটিকে বাহিরের একটা সুরে বাঁধিয়াছিলেন। বসু-মহাশয় সাধারণতঃ সেটিকে "মা"-সুরে বাঁধিয়া থাকেন, তাহার পর বাহির হইতে ঐ "মা"-সুরেরই একটা ধ্বনি শব্দিত করিতে থাকেন; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "সহানুভূতিতে অনুরণন"-এর জন্য বসু-মহাশয়ের যন্ত্রের কম্পন-দণ্ডটি "মা"-সুরে কাঁপিয়া উঠে। বাহিরের "মা"-সুর মিনিটে যতগুলি কম্পন-সংখ্যায় গঠিত, বসু-মহাশয়ের কম্পন-দণ্ডটিও ঠিক্ সেই পরিমাণ কম্পন-সংখ্যায় মিনিটে কম্পিত হইতে থাকে।

এই কম্পন-সংখ্যা সেকেণ্ডে হাজারবারেরও অধিক হয়; সুতরাং দণ্ডটিও "সহানুভূতিতে অনুরণন"-শক্তির জন্য সেকেণ্ডে সহস্রাধিক বার কম্পিত হইতে থাকে। বাহিরের "মা"-সুরের প্রভাবে দণ্ড-স্থিত চৰ্ম্মাবরণটি সম-সুর-বদ্ধ বলিয়া আপনিই কম্পিত হইতে থাকে। এই স্থানে আচার্য্য বসু যে অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভা দেখাইয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণকেও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে।

দণ্ডটি সেকেণ্ডে হাজারবারের অধিক কম্পিত হইলে, কেমন করিয়া তাহার কম্পনজনিত বোর্ডের উপরের সহস্রাধিক স্পর্শ-বিন্দু দেখিয়া সেকেণ্ডের হাজারভাগের একভাগ সময় গণনা করা যাইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং আচার্য্য বসু-মহাশয়ের এই অতি সূক্ষ্ম-সময়-নির্দ্দেশক যন্ত্রটির মূলসূত্র অন্য পাঠক-সাধারণের নিকট বিবৃত করিলাম। উক্ত যন্ত্রটির একটি "মডেল" আজিও "প্রেসিডেন্সি কলেজের" নূতন বিজ্ঞান-গৃহের দ্বিতলের বারাণ্ডায় বৈজ্ঞানিকগণের পর্য্যবেক্ষণ জন্য রক্ষিত আছে। বিজ্ঞান-সন্ধানীগণ এই অত্যাশ্চর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রটি দর্শন করিয়া কৌতূহল-নিবৃত্তি করিতে পারেন। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যন্ত্রটি ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং আজ ভারতবর্ষের বিজ্ঞানগৃহে আবিষ্কর্ত্তার আবিষ্কার-স্থানের গৌরব-বৃদ্ধি করিতেছে, ইহা আমাদের পক্ষে অল্প আনন্দের কথা নহে। এই শ্রেষ্ঠ যন্ত্রটিকে অবলোকন করা এবং ইহার মূলসূত্রের সন্ধান পাওয়া, ভারতবর্ষীয়—বিশেষতঃ বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

ফটিক্‌জল

(চিত্র)

(১)

সে গরীব জেলের মেয়ে—নদীর ধারে এক ছোট্ট কুটীরে তা'দের বাস।

মেয়েটির নাম মিনুয়া।

দুধে-আল্‌তা বা গোলাপ-ফুলের মত তা'র নিখুঁত রং ছিল না বটে, তবু সে সুন্দরী ছিল; দেখ্‌লে কিন্তু কেউ তা'কে জেলের মেয়ে বলে' মনে কর্‌তে পার্‌ত না।

কুটীরের সাম্‌নে দিয়ে কি একটা নদী এঁকেবেঁকে চলে' গেছে। তা'র এপারে জেলেদের ছোট বস্তি—আর ওপারে উঁচু-নীচু বালির চড়া। এই নদী থেকে তা'র বাপ মাছ ধরে' আনে, আর সে সেই মাছগুলিকে নিয়ে গিয়ে গাঁয়ের হাটে বেচে আসে। তাইতেই তা'দের দিন চলে।

মিনুয়ার মা ছিল না। যখন সে খুব ছোট, তখন তা'র মা মারা গিয়েছিল। সুধু তা'র এক বুড়ী ঠাকুরমা ছিল, মিনুয়া তা'কে দাদী বল্‌ত, সেই বুড়ীই তাকে বুকে করে', মানুষ করে' তুলে'ছে।

ছেলে-বেলাকার কথা, তা'র মায়ের কথা, মিনুয়ার একটুও মনে ছিল না। কেবল এক-একবার ছেলে-বেলাকার কথা অস্পষ্ট ধোঁয়ার মত হঠাৎ তা'র মনে জেগে উঠ্‌ত। রাত্রে সমস্ত জেলে-পাড়া নিসুতি হ'লে, সে তা'র দাদীর কাছে তা'র ছেলে-বেলাকার গল্প শোন্‌বার জন্যে আব্‌দার ধর্‌ত। সে শুন্‌ত যে, অনেকদিন আগে, তা'দের সাম্‌নের ঐ সরু এঁকাবেঁকা নদীটি হঠাৎ একরাত্রে ছাপিয়ে উঠে,' আর আর অনেকের মত, তা'র মাও ছোট্ট ভাই দু'টীকেও, অতলে কোন্ অজানা জায়গায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে,—তা'র বাপ, পাগ্‌লা ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে', শেষটা মিনুয়া ও তা'র দাদীকে সুধু মরণের মুখ থেকে টেনে আন্‌তে পেরেছে; তা'র বাপের অক্লান্ত চেষ্টাতেও যখন সে মিনুয়ার মা ও ছোট ছোট ছেলে দু'টীকে জল থেকে বাঁচাতে না পেরে', পাগলের মত নদীর সেই ভীষণ ঘূর্ণিপাকের মধ্যে আপনাকেও তলিয়ে দিতে চাচ্ছিল, তখন পাড়ার আর আর সকলে তা'কে ধরে' রেখে' তা'র সে ভয়ানক চেষ্টাকে ব্যর্থ করে' দিয়েছিল—এই সব পুরাণ শোকের কাহিনী বল্‌তে বল্‌তে বুড়ী দাদীর বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হ'ত, মিনুয়ার চোখ দিয়েও উজ্জ্বল মুক্তার মত বড় বড় অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়্‌ত। সে তখন কাতরস্বরে বল্‌ত, "থাক্ দাদী! আর বলে' কাজ নেই।"

(২)

সেদিন কালো কালো মেঘ সমস্ত আকাশকে ঢেকে ফেলেছিল। সূর্য্যি-ঠাকুর রাগ করে' সেদিন একবারও মেঘের বাহিরে আসেন নি। জেলে-পাড়ার সাম্‌নের সেই ছোট্ট এঁকাবেঁকা নদীটি বাতাসের সঙ্গে লড়াই কর্‌বার জন্যে রাগে ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ছিল, সেই অন্ধকারে নদীর আরও অন্ধকার ঢেউগুলো তটের উপর আছ্‌ড়ে এসে পড়্‌ছিল। পাগ্‌লা হাওয়ার সঙ্গে সেই পাগ্‌লা নদীর লড়াই, সেই মেঘ-ঢাকা আকাশের তলায় ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছিল। এ ঝড়ে, এ দুর্য্যোগে জেলে-পাড়ার আজ কেহই বাহির হয় নি। মিনুয়ার বাপ সুধু তা'দের কুঁড়ের দরজার ধারের আম্র-গাছটির তলায় চুপ্‌টি করে' বসে' সেই ক্ষেপা নদীটির পানে চেয়ে আপন মনে কত কি ভাব্‌ছিল। সেই ঝড়, সেই তুফান, সেই আকাশভরা মেঘ, সেই অন্ধকার, এই সব দেখে' তা'র বার বছর আগেকার ঠিক এমনিধারা একটী প্রলয়-রাতের কথা মনে পড়্‌ছিল। সেদিনও এমনিতর আঁধার রাতে, আচম্‌কা ওই ছোট নদীটিতে বান এসে তা'র বুক ভেঙ্গে তা'র বুকের লক্ষ্মীটিকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল! তখন তা'র বয়স ছিল, বুকে সাহস ছিল, দু'হাতে অসুরের মত বল ছিল। তবু তা'রই চোখের সাম্‌নে ঢেউগুলি এসে, মিনুয়ার মাকে যেন হাঁ করে' গিলে' ফেলে'ছিল। অন্য সময় নদীতে খেয়া দিতে দিতে সে কত ডুবন্ত লোককে বাঁচিয়ে দিয়েছে, সেদিন কিন্তু সে তা'র স্ত্রীকে কিছুতেই বাঁচাতে পার্‌লে না; দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ রাক্ষুসে ঢেউগুলো যে তা'কে কোথায় লুকিয়ে ফেল্‌লে, সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে'ও তা'র কোনও কিনারা কর্‌তে পার্‌লে না। তা'র স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে সে ঐ ছোট্ট নদীটিকে কতদিন কত মিনতিই জানিয়েছে! কিন্তু নদীটি তা'র করুণ আবেদন মোটেই গ্রাহ্য করে নি। হায়, সে কি নিষ্ঠুর! অনেকদিন আগেই তা'র বুক ফাঁকা হ'য়ে গেছে; তবে কেন সে আজও বেঁচে আছে! সে আছে—সুধু তা'র বুড়ো মায়ের জন্যে, আর তা'র স্ত্রীর শেষ চিহ্ন মিনুয়ার জন্যে, নইলে অনেকদিন আগেই সে ঐ কালো জলে আপনাকেও মিশিয়ে দিতে পার্‌ত। সুধু এই দু'টি বাঁধনের জন্যে আজও তা'র বেঁচে থাকা দরকার হ'য়েছে। আজ সে এই দুর্য্যোগে

অনেকদিন আগেকার এই কথাগুলিই ভাব্‌ছিল। হঠাৎ দূরে একটা বাজ-পড়ার ভয়ানক শব্দে তা'র চমক ভাঙ্গ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে কে বাঁশীর মত মিঠে গলায় ডাক্‌লে—"বাবা!"

এ যে তা'র মিনুয়ার ডাক্!

"কেন মা? তুই এ ঝড়ে কেন বাইরে এলি?"

"বাবা! তুমি এখনও বাইরে কেন? ঘরে চল।"

আবার দূরে বাজ-পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে মেঘের স্তূপের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে গেল! সাম্‌নের নদীতে ঐ বিদ্যুতের আলোতে দেখা গেল, কে যেন একটা মানুষ সেই উন্মত্ত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে' বাঁচবার চেষ্টা কর্‌ছে! কিন্তু ঢেউয়ের উপর ঢেউ এসে তা'র ক্ষুদ্র চেষ্টা ও শক্তিকে ব্যর্থ করে' দিচ্ছে।

"বাবা! ওকে বাঁচাও!" মিনুয়া তা'র বাপের গলা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধর্‌লে।

একি! তা'র পাগ্‌লা মেয়ে বলে কি! অসম্ভব! এ সময়ে বাঘের মুখে যাওয়াও বুঝি সহজ, কিন্তু এই ঢেউয়ের মুখ থেকে লোক-বাঁচান' একেবারে অসম্ভব!

সে তা'র মেয়ের মুখের দিকে চাইলে, সেই করুণ বেদনা-পূর্ণ সজল চোখদু'টী দেখে' তা'র কোন আপত্তিই কিন্তু টিক্‌ল না। এযে তা'র মিনুয়ার অনুরোধ, এ যে স্নেহের আব্দার! সে কি না বল্‌তে পারে!

সেই অন্ধকারে সে ঢেউয়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল; মরণ-বাঁচনের কথা তা'র আর কিছু মনে হ'ল না। এ যে তা'র মিনুয়ার অনুরোধ!

* * * * *

অনেকক্ষণ মরণের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে' সে সেই লোকটিকে তীরে টেনে তুল্‌লে,—যেন এক অসুরের বল তখন তা'র গায়ে এসেছিল। অনেক কষ্টে মিনুয়া ও তা'র বাপেতে মিলে অসাড় লোকটিকে তা'দের কুটীরে নিয়ে গেল।

(৩)

সেই ঝড়ে, সেই বাদলায়, সেই তুফানে, মিনুয়ার বাপ সেই রাক্ষুসে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে' যে লোকটিকে বাঁচিয়েছিল, সে আর কেউ নয়, সেই দেশেরই রাজার ছেলে। নৌকা করে' শিকারে বেরিয়ে সেই বিষম ঝড়ে নৌকাডুবি; সঙ্গের লোক-জন, বন্ধুবান্ধবদের সেই ক্ষুধার্ত্ত নদী তা'র পেটের ভিতর কোথায় যে লুকিয়ে ফেলেছে, কেউ তা'র কোন ঠিকানা করে' উঠ্‌তে পারে নি। সুধু রাজকুমার একলাই সে মরণ-পথ থেকে কোনরকমে ফিরে এসেছিল। ঢেউয়ের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি কর', কখন্ যে সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে'ছিল সে কথা তা'র কিছুই মনে ছিল না; যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখলে, সে এক নূতন জায়গায় র'য়েছে; কা'রা তা'র হাতে-পায়ে আগুনের সেঁক দিচ্ছে। প্রথমে সে কোথায়, তা'র কি হ'য়েছে, কিছুই মনে পড়্‌ল না, ক্ষণিক পরে আস্তে আস্তে একটু একটু করে' যখন তা'র সব কথা মনে ফিরে এল, তখন সে বুঝ্‌তে পার্‌লে, তা'র কি হ'য়েছিল। মরণের সঙ্গে লড়াই! উঃ, সে কি ভীষণ! মিনুয়া ও তা'র বাপ-দাদীর শুশ্রূষায় রাজকুমার বেঁচে উঠ্‌ল। ভাল হ'য়ে উঠে সে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে যখন তা'র আঙ্গুলের বহুমূল্য হীরার আংটীটি খুলে মিনুয়ার বাপের হাতে দিতে গেল, তখন তা'রা বুঝতে পার্‌লে যে, কা'কে আজ ভীষণ মরণের মুখ থেকে কেড়ে এনেছে! তা'দের আজ কি সৌভাগ্য! তা'দের পর্ণকুটীরে রাজকুমার! একি স্বপ্ন, না সত্য!

মিনুয়ার বাপ তখন রাজকুমারকে মিনতি করে' জানালে যে, যদিও তা'রা গরীব, ক্ষুদ্র কুটীরে থাকে, তবু তা'রা উপকার বিক্রয় করে না, সে তাঁ'কে রাজপুত্র বলে' উপকারের প্রতিদান পাবার জন্যে বাঁচায় নি; সে তাঁ'কে সামান্য লোক মনে করে'ই বাঁচিয়েছে, সে মানুষের কর্ত্তব্যই করে'ছে আর ধর্‌তে গেলে সেও তাঁ'কে বাঁচায়নি, তাঁ'কে বাঁচিয়েছে সুধু তা'র মেয়ে মিনুয়ার করুণ মিনতিমাখা চোখদু'টী, নইলে মানুষের কি সাধ্য যে, মানুষকে অমন মরণের মুখ থেকে কেড়ে আন্‌তে পারে!

রাজকুমার, মিনুয়ার দিকে কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌লে। তাইত, কি সুন্দর মেয়েটি! জেলের মেয়ে কি এত সুন্দর হ'তে পারে? রাজার ঘরেও সে যে এত সুন্দর মুখ কখন' দেখে নি! না! বিধাতাপুরুষ তা'কে ভুল করে' জেলের ঘরে পাঠিয়েছে।

রাজকুমার, মিনুয়ার বাপের কাছে তা'র মেয়ে মিনুয়াকে বিয়ে কর্‌বার অনুমতি চাইলে।

একি রহস্য ভগবান্! জেলের মেয়ে রাজরাণী হবে, একি সত্য? যদিও মিনুয়ার বাপ জান্‌তো যে, মেয়ে রাজার ঘরে গেলে, সে আর জীবনে কখন' তা'কে দেখ্‌তে পাবে না, তবু সে মেয়ের সুখের জন্যে রাজকুমারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌লে না,—আর, তা' কর্‌বার ক্ষমতাও তা'র ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা যখন দিনের আলো গোধূলির আঁধারে ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌ছিল, যখন আকাশের বুকে, সন্ধ্যা-তারাটি হীরের কুঁচির মত সবপ্রথম ঠেলে' উঠ্‌ছিল, যখন আশ-পাশের বুনো ফুলের মিঠে গন্ধ ও গাঁয়ের ঠাকুরবাড়ীর সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি সাঁঝের হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছিল—ঠিক সেই সময়ে এই ক্ষুদ্র কুটীরে রাজকুমারের সঙ্গে মিনুয়ার বিয়ে হ'য়ে গেল। এ বিয়েতে কোন ধূমধাম হ'ল না, কেউ জান্‌তে পার্‌লে না,—জান্‌লে সুধু জেলে-পাড়ার কয়েকজন জেলে আর সেই উজ্জ্বল সন্ধ্যা-তারাটি।

মিনুয়াকে পরের হাতে সঁপে' দিতে বাপের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছিল; কিন্তু মেয়ে ত রাজরাণী হ'বে, নাই-বা পেলে সে তা'কে দেখ্‌তে, মেয়ের সুখের জন্যে সে কি এতটুকু আত্ম-ত্যাগও কর্‌তে পার্‌বে না? হায়! মিনুয়ার মা বেঁচে থাক্‌লে আজ কি কর্‌ত!

মিনুয়ার বুড়ী দাদী ভাব্‌ছিল যে, এতদিন সে মা-মরা মেয়ে মিনুয়াকে বুকে করে' মানুষ করে'ছে, কোথাকার কে এক রাজপুত্তুর এসে কিনা আজ তা'র বুক খালি করে' বুকের জিনিস কেড়ে' নিয়ে যাচ্ছে!

ঠিক এই সময়েই রাজকুমার আদর করে' মিনুয়ার আঙ্গুলে তা'র সেই হীরের আংটীটা পরিয়ে দিচ্ছিল।

(৪)

অনেকদিন কেটে গেছে। জেলে-পাড়ার সেই ছোট কুটীরের অনেক বদল হ'য়ে গেছে, তা'দের সে মিনুয়া আর নেই, সে এখন দেশের রাণী। হঠাৎ একদিন মিনুয়ার বাপের এ দুনিয়া ছেড়ে' যা'বার ডাক এল, সে তিনদিনের জ্বরেই তা'র ক্ষুদ্র কুটীরের সব মায়া-মমতা কাটালে। যে ডাকের আশায় এতদিন ধরে' বসে' আছে, যা'র ডাক আসবার সময়, তা'র ডাক আগে না এসে, আর একজন লোককে কাল এসে ডেকে নিয়ে গেল, আর মিনুয়ার বুড়ো দাদী, যা'র আগে যা'বার কথা, সেই পিছিয়ে পড়ে' রইল।

বুড়ী তখন কেমন একটা ঝোঁক্ ধর্'ল যে, সে মরবার আগে একবার তা'র মিনুয়াকে দেখে' যা'বে।

পাড়ার লোকেরা তা'কে কত বোঝালে, মিনুয়া এখন আর তা'দের নয়—সে এখন রাজরাণী, তা'র সঙ্গে দেখা হওয়া এখন অসম্ভব!

হ'লেই-বা সে এখন দেশের রাণী! সে যে মিনুয়াকে নিজের বুকে করে' মানুষ করে'ছে—সে তা'কে একবার দেখ্বেই দেখ্বে! কোন কথা সে শুন্বে না, কোন বাধা সে মান্বে না—মিনুয়া জান্তে পার্লে নিশ্চয়ই দাদীর বুকে এসে পড়বে, সেকি তা'কে ভুল্তে পারে? ওগো সে যে তা'র আদরের মিনুয়া!

এক্দিন কাউকে কিছু না বলে' বুড়ি তা'র কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে পড়্ল। সে জানত না যে তা'র মিনুয়া কোথায়? কোথায় তা'র ঠিকানা? সুধু সে জান্ত, মিনুয়া তা'র রাজরাণী, রাজবাড়ীতে গেলেই সে তা'কে দেখ্তে পাবে, এই ভরসাই তা'র মনে ছিল, তা'ই সে পথে যা'কে দেখ্ছিল, তা'কেই রাজবাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞেস কর্ছিল। অনেক কষ্টে ঠিক দুপুরবেলা সে রাজবাড়ীর মস্ত ফটকের সাম্নে এসে দাঁড়া'ল। ঝাঁ-ঝাঁ কর্ছে রোদ, চারিদিকে ঠিক যেন আগুনের হল্কা ব'য়ে যাচ্ছিল, তখন রাজপথের সেই তপ্ত বালির কণা সূর্য্যের তাপে উত্তপ্ত হ'য়ে, তপ্ত বায়ুর সঙ্গে মিশে' রাজপথের নাগরিকদের যেন দগ্ধে মার্বার চেষ্টা কর্ছিল, নগরময় সেই প্রচণ্ড দুপুরের কেমন একটা ঘুমন্ত ভাব ছড়িয়ে পড়ে'ছিল,—সুধু রাস্তা দিয়ে দু'-একজন পথক্লান্ত পথিক বা জনকয়েক লোক ঝিমুতে ঝিমুতে কোনরকমে পথ চল্ছিল। ঠিক সেই সময়ে বুড়ী রাজবাড়ীর বিশাল ফটকের সাম্নে এসে দাঁড়া'ল। রাজপ্রাসাদের প্রহরীদের গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে' প্রথমে পর্ণকুটীরবাসী বুড়ীর কেমন একটা ভয় বোধ হ'য়েছিল; কিন্তু এযে তা'র মিনুয়ার বাড়ী! তবে তা'র ভয় কি?

তিনদিনের অনশন, পথক্লান্তা বৃদ্ধার তখন তৃষ্ণায় ছাতি যেন ফেটে' যাচ্ছিল!

প্রহরীরা বলে কি! এ যে তা'র মিনুয়ার বাড়ী! তবে কেন তা'রা তা'কে ঢুক্তে বাধা দিচ্ছে?

বুড়ী তখন সেই প্রহরীদের অনেক কাকুতি-মিনতি করে' জানালে যে সে তা'দের কাছে ভিক্ষা কর্তে আসে নি; সে আর কিছু চায় না, চায় সুধু একবার তা'র মিনুয়াকে দেখ্তে, তা'দের রাণীই তা'র মিনুয়া—তা'কেই সে বুকে-পিঠে করে' মানুষ করে'ছে।

কোথাকার পাগল! সে বলে কি? সে তা'দের রাণীজীর ঠাকুরমা? উঁহু, হ'তেই পারে না, কোথাকার ভিখারী সে। না খে'তে পে'য়ে নিশ্চয়ই তা'র মাথা খারাপ হ'য়ে গে'ছে।

প্রহরীরা কিছুতেই তা'কে রাজপ্রাসাদে ঢুক্তে দিলে না, তা'রা কিছু দিতে চাইলে, বুড়ী ঘৃণাভরে ফিরিয়ে দিলে। সে চায় সুধু তা'র মিনুয়াকে দেখ্তে। কোথাকার পাগল রে! কোথাকার তা'র মিনুয়া! প্রহরীরা তা'কে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে।

হায়! তা'রা জান্ত না যে, সত্যই তা'রা তা'দের রাণীজীর দাদীকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

বুড়ীর তখন কি মনে হচ্ছিল, কে জানে! যে আশায়, যা'কে দেখ্বার জন্যে সে পৃথিবীর কা'রো বারণ না শুনে,' এতদূর ছুটে' এসেছে, আজ গোটাকত লোক মিলে তা'র সে বুকের নিধিকে দেখ্তে দিলে না, কি নিষ্ঠুর তা'রা!

বুড়ীর বুক নিরাশায় একেবারে ভেঙ্গে পড়ে'ছিল, তা'র আর এক পাও নড়্বার ক্ষমতা ছিল না, এতক্ষণ কি একটা অদম্য শক্তি তা'কে চলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, এখন সেটাকে হারিয়ে সে যেন একেবারে মুস্ড়ে' পড়ে'ছে, কে যেন তা'র সমস্ত শক্তিকে হরণ করে' নিয়ে গেছে!

বুকফাটা তৃষ্ণায়, অনশনে বুড়ীর চোখের সাম্নে একটা কালো পর্দ্দার মত পড়ে' আস্ছিল!

মাথার উপর দিয়ে আগুনের হল্কা তখনও বয়ে' যাচ্ছিল। সে আর বেশীদূর যেতে পার্লে না। রাজবাড়ীর খানিকটা তফাতে এক গাছের তলায় গিয়ে আস্তে আস্তে সে শুয়ে' পড়্ল। মৃত্যুর ছায়া তখন তা'র উপরে ঘনিয়ে এসেছিল।

হায়! এখনো যদি সে একবার তা'র মিনুয়াকে দেখ্তে পে'ত! আস্তে আস্তে একটা উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস বুড়ির বুক ফেটে বাহির হ'ল। তা'রপর সব ঠাণ্ডা! শান্তিময় মরণ, তা'র ঠাণ্ডা হাত, তা'র গায়ে বুলিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত তা'কেও ঠাণ্ডা করে' দিয়ে গেল।

ঠিক এই সময়েই একটা উত্তপ্ত বাতাস রাস্তার তপ্ত ধূলারাশি উড়িয়ে, সহরের উপর যেন বিধাতার জ্বলন্ত অভিশাপ ছড়িয়ে দিয়ে গেল!

(৫)

নগরের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে, সে বিশাল রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা, তোরণ, সে রাজপথ প্রভৃতির কিছুমাত্র চিহ্ন নাই, যাদুকরের যাদুমন্ত্রে সব যেন একটা খুব আশ্চর্য্যরকম বদল হ'য়ে গেছে; আছে সুধু মানুষের পরিত্যক্ত নগরের এক ভগ্নস্তূপ! আগে যেখানে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় মানুষের বাসস্থান ছিল, আজ সেখানে সেই পরিত্যক্ত ভগ্নস্তূপ শ্বাপদের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হ'য়েছে; মনে হয়, যেন কত যুগ কেটে গেছে, তা'ই এ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! আগেকার কোন-কিছু চিহ্নই নেই, আছে কেবল একটী গাছ,—পুরাতন জরাজীর্ণ গাছ, যে গাছের তলায় অনেকদিন আগে এক বুড়ী নিরাশায় দগ্ধ হ'য়ে, চির-অনন্তের কোলে মাথা রেখে চিরকালের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে'ছিল! কি যেন একটা কি ভয়ানক ভূমিকম্পের মতন কা'র জ্বলন্ত অভিশাপ, মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে অমন ছবির মত সহরটাকে আগাগোড়া ভেঙ্গে'-চুরে' দিয়ে গেছে, গাছটার পুরাণ' কোটরে কি একটা বিহগ-দম্পতী এসে বাসা বেঁধে'ছ, দারুণ গ্রীষ্মে ঠিক দুপুরবেলা যখন আকাশ থেকে সূয্যি-ঠাকুর অনলরাশি বর্ষণ করেন ও আস-পাশের হাওয়ায় আগুনের হল্কাগুলো মহা প্রান্তরের এদিক-ওদিক হু-হু করে' ছুটে' বেড়ায়,—সেই সময়ে ঐ পাখীদু'টি এক বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে', যেন কত জনমের অনন্ত তৃষা নিয়ে আকাশময় কাঁপ্তে কাঁপ্তে উড়ে' বেড়া'ত, তা'দের কাতর চীৎকার, সে ধূ-ধূ প্রান্তরের বুকে প্রতিধ্বনির মত থেকে' থেকে' বেজে' উঠ্ত—"ফটিক্জল"! "ফটিক্জল"!

হায়, মিনুয়ার মরণ-কাতর দাদীর শুষ্ক বুকের অতৃপ্ত তৃষা আজও কি ঐ বিহগ-দম্পতীর' বুকে রাবণের চিতার মত জেগে' আছে? কে জানে!

শ্রীহরিপদ দে

"সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণম্"

সন্তপ্তশরণ মেঘ, বন্ধু তুমি, দ্বিধা নাহি তা'য়,
একই দশা দু'জনের ব্যথাময় এই বরষায়।
তুমিও গাহিছ বন্ধু, মোরি মত বিরহের গান,
থেকে থেকে চপলায় চমকিয়া উঠে তব প্রাণ।
গুমরি' গুমরি' বক্ষে গুরু ব্যথা তোমারো বিহরে,
বজ্র-গর্জ্জে মোরি মত তোমারো ত হৃদয় বিদরে।
আমারি মতন তব বেদনায় সকলি আঁধার,
কালিমায় ডুবে' যায় কর্ম্মহারা নিখিল সংসার।

কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি মোরি মত ঘুমাইলে হায়,
সুখ-স্বপ্নে হের বন্ধু, ইন্দ্রধনু বর্ণের আভায়,
মুখ-চন্দ্রে বক্ষে ধরি' যামিনী তে বিনিদ্রনয়ন,
জ্যোছনায় রচ' তুমি কল্পনার মিলন-ভবন,
দূরে রহি', মোরি মত বিরহিণী তোমারো শিখিনী
মিলনের উৎকণ্ঠায় উৎকলাপা কাঁদে একাকিনী।

শ্রীকালিদাস রায়

কীর্ত্তনীয়া প্রেমদাস

কলিযুগ সকল দোষের আকর হইলেও এক অসাধারণ গুণে তাহার সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে। সে গুণটি হইতেছে,—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। ধ্যান বল, যজ্ঞ বল, অর্চ্চনা বল, যোগ বল, সকল যুগের সকল সাধনের ফল এই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সম্পুটিত-ভাবে অবস্থিত। তাই কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

"মানস-দর্পণ যেই করয়ে মার্জ্জন।
ভব-মহা-দাবানল করে নির্ব্বাপণ॥
কল্যাণ-কুমুদে করে জ্যোৎস্না-বিতরণ।
বিদ্যারূপা-বধূটীর যে হয় জীবন॥
আনন্দ-সমুদ্র যিনি করেন বর্দ্ধন।
যাঁ'র পদেপদে পূর্ণ সুধার স্বদন॥
সকল আত্মায় যিনি করান স্নপন।
জয় জয় সেই শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন॥"

পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয়ও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"সংকীর্ত্তন হৈতে—পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥"

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২০পঃ)

তা'ই বলিতে হয়—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের মত শ্রেষ্ঠতম সাধন আর নাই। এ সাধনের আরও এক বিশেষত্ব এই যে, অপর যত কিছু সাধন বল, সকল সাধনে কেবল সেই সাধননিষ্ঠ ব্যক্তিরই উপকার হইয়া থাকে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন-সাধনে—যিনি সাধন করেন, তাঁহারও উপকার, সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও উপকার হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিলেও উপকার, শুনিলেও উপকার; এমন সর্ব্বোপকারসাধক সাধন যদি শ্রেষ্ঠতম না হয়, তবে আর শ্রেষ্ঠতম সাধন হইবে কে?

জপ ও উচ্চ সংকীর্ত্তন—উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইহা লইয়া একবার বিচার উপস্থিত হয়। শ্রীভগবন্নামের শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বিচারদ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, উচ্চ-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সে মীমাংসা এই,—

"উচ্চ করি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয়॥
শুন বিপ্র! সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥
পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম তারা সব তরে'॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে'।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বোলে॥
উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ-সংকীর্ত্তন।
জন্তুমাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনে সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থজন্মা ইহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বোল দেখি কোন্ দোষ সে কর্ম্ম করিতে॥
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড়, ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ' উচ্চসংকীর্ত্তনে॥"

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, আদিখণ্ড, ১১শ অঃ)

তা'ই এদেশের অধিবাসী চিরদিবসই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের পক্ষপাতী। কেবল যাঁহারা আধুনিক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, প্রাচীন যাহা কিছু, সমস্তই কুসংস্কার-বিজৃম্ভিত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনকে একটা হৈ-হৈ হট্টগোল ভিন্ন অপর কিছু বলিয়া বুঝিবার অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, অধুনা তাঁহারাও এই সংকীর্ত্তনগানে মজিয়া গিয়াছেন।

শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্ত্তনে ত সকলেই অধিকারী; কিন্তু গুণ-লীলা-গানে রসজ্ঞ ব্যতীত কেহই অধিকারী নহেন। তা'ই শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ স্থলে শ্রীনামসংকীর্ত্তন করিতেন এবং শ্রীলীলা-সংকীর্ত্তন করিতেন—স্বরূপ রামানন্দের মত কতিপয় রসজ্ঞ সঙ্গীদের লইয়া অতি গোপনে। কেননা, অনধিকারী নিজের অনভিজ্ঞতা-

নিবন্ধন সে গানের মর্ম্মবোধ না করিতে পারিয়া এক বুঝিতে আর এক বুঝিয়া বসিবে, ফলে তজ্জনিত অপরাধে নিজের সর্ব্বনাশ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজ্ঞতাপ্রসূত অভিমত অপরের কাছে প্রকাশ করিয়া তাহারও সর্ব্বনাশ করিবে। এ হিসাবে অনধিকারীর পক্ষে এই লীলা-কীর্ত্তন বা রস-কীর্ত্তন না শুনাই ভাল। নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণই তাঁহাদের পক্ষে বিহিত; কিন্তু রস-কীর্ত্তন-গায়ক যদি সুনিপুণ হন,—ভাষা-ব্যাখ্যায় এবং অঙ্গ-চেষ্টায় তিনি যদি ভাব ফুটাইতে সমর্থ হন, তবে তিনি নিজগুণে অনধিকারীকেও অধিকারী করিয়া তুলিতে পারেন।

রস-কীর্ত্তন গান করা বড় যা'র তা'র কার্য্য নয়। ভাল রাগ-রাগিণী বোধ থাকা চাই, তাল-লয়ে দখল থাকা চাই, গলা থাকা চাই, স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলিবার যোগ্যতা থাকা চাই, পদাবলীর দুরূহ শব্দগুলির অর্থ-বোধ থাকা চাই, ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবারও ক্ষমতা থাকা চাই। সর্ব্বোপরি রস-শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা চাই-ই চাই। তা' না থাকিলে, কথায় কথায় রসাভাস-দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কেবল যে এই সকল গুণ থাকিলেই ভাল কীর্ত্তনীয়া হওয় যায়, তাহা নহে; কীর্ত্তনের যাহা প্রাণ—কীর্ত্তনীয়ার অন্তরে সেই ভক্তিও একটু থাকা চাই। তা' না থাকিলে তিনি গানের ভাবে আপনাকে ভাবিত করিতে পারিবেন না, কথায় কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই ভাব বুঝাইতে পারিবেন না; সুতরাং তাঁহার ভাবে বা পদাবলীর প্রকৃত ভাবে অপরকেও বিভাবিত করিতে সমর্থ হইবেন না। এই শ্রেণীর কীর্ত্তনীয়ার গান শুনা আর না শুনা সমানই কথা! বরং না শুনাই শ্রেয়স্কর।

কীর্ত্তনীয়া ভাবে বিভোর হইয়া পদাবলী গান করিতেছেন, তাঁহার অঙ্গ পুলকিত, বদন বক্ষ অশ্রুস্নাত, তিনি যখন যে লীলা গায়িতেছেন তাহাতেই যেন ডুবিয়া যাইতেছেন, এ লোকে থাকিয়াও তিনি যেন এ লোকে নাই। তাঁহার প্রাকৃত শরীর, প্রাকৃত মন যেন সবই অপ্রাকৃতভাবে মাখা-চোখা হইয়া গিয়াছে, এ অবস্থায় তাঁহার যে শক্তি, সে শক্তি বড় সাধারণ নহে। এ অবস্থায় তাঁহার সহিত একটু সংবন্ধ ঘটাইতে পারিলে অনধিকারীরও অধিকারী হইয়া যাইবার পক্ষে বোধ হয় বিশেষ সন্দেহের কারণ দেখা যায় না। বোধ হয় এই কারণেই গুহ্যাতিগুহ্য লীলা-কীর্ত্তনের জন্য কীর্ত্তনীয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সাধারণ্যে তাঁহাদের গান করিবার ব্যবস্থাও প্রদত্ত হইয়াছে।

ভাবের ত আর আলাদা ভাষা নাই, ভাবের ভাষাই ভাব। ভাবেই ভাব ধরা পড়ে, ভাবেই ভাব ফুটে উঠে, ভাবেই ভাব ছড়াইয়া পড়ে। আগে নিজের ভাব ফুটাও, তবেই ভাবস্বরূপ ভগবান্ তোমার হৃদয়-সিংহাসনে দেখা দিবেন, তবেই তুমি তাঁহার শক্তিতে সম্পন্ন হইতে পারিবে এবং অপরের হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার করিতে পারিবে। ভগবান্ ভাবের মানুষ, অ-ভাবে তাঁ'কে ধরা যায় না। তা'ই ভক্ত-কবি রামপ্রসাদ গায়িয়াছেন,—"সে যে ভাবের মানুষ, ভাব-ব্যতীত অ-ভাবে কে ধ'র্ত্তে পারে?" শ্বেতাশ্বতর উপনিষদও (৫।১৪) বলিয়াছেন—"ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্"। আগে ভাব দিয়া ভাবের মানুষকে ধরিতে না পারিলে, যাহার ভাব নাই, তাহাকে তুমি তোমার ভাবে সম্পন্ন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইবে না। তাহা যদি না পারিলে, তাহা হইলে তুমি যত-বড় সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়াই হও, তোমার রস-কীর্ত্তন-গান সাধারণের শ্রেয়স্কর হইতে পারিবে না। তাহাতে সেই অপ্রাকৃত রসের ভাব না জাগিয়া প্রাকৃত রসের ভাবই জাগিয়া উঠিবে। কেননা, তুমিই যে আপনার ভিতর সেই অপ্রাকৃত রস জাগাইতেই পার নাই, তা' তুমি অপরে তাহার সঞ্চার করিবে কি প্রকারে?

দুঃখের বিষয়, এরূপ কীর্ত্তনীয়া একালে বড়ই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। বড়-রসিকদাস রস-কীর্ত্তন গান করিত, দেখিয়াছি—তাহার সর্ব্বশরীর কথায় কথায় পুলকে পূরিয়া উঠিত, নয়নযুগল প্রেমের জলে ডুবিয়া যাইত, গদগদে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িত। আহা, তাহার সে গান কি মধুর, কি মধুর! হায়, ভাগ্যদোষে সে রসিকবর রসিক দাসকে আমরা সে দিন হারাইয়াছি! এখন কলিকাতায় যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে "লীলাগান-পদ্ধতি" নামক প্রণালীবদ্ধ চৌষট্টিরসের সুন্দর পদাবলীগ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাখালদাস চক্রবর্ত্তীরই নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার গানে আমরা ভাবের খেলা দেখিতে পাই, অমিত আনন্দও পাই। শ্রীমান্ রাধারমণ দাস, পণ্ডিত-বাবাজী মহারাজের নিকটে গান শিখিয়া সংপ্রতি এখানে আসিয়াছে, হৃদয়ে ভাব থাকায় তাহার গানেও এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারা যায়। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীমান্‌কে কলিকাতার কুসঙ্গ হইতে বাঁচাইয়া রাখুন, আমরা তাহার কাছে অনেক আশা করিয়া থাকি। আর সব যাঁহাদের দেখিতে পাই, তাঁহাদের হয় ত গলা ভাল হইতে পারে, কিন্তু রস-শাস্ত্র বা ভাবের সহিত তাঁহাদের সংবন্ধের পরিচয় বড় অল্পই পাওয়া যায়। সে ভাবহীন বা প্রাণহীন গানে প্রীতির পরিবর্ত্তে অপ্রীতিই লাভ হইয়া থাকে।

এ ত গেল পেশাদার রস-কীর্ত্তনীয়া-সংবন্ধে কথা। সৌখীন কীর্ত্তনীয়াগণের মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত রসময় মিত্র বাহাদুরই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহার রসময় নাম সার্থক, তিনি এই কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেই অপ্রাকৃত লীলারসে সতত অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মত একজন উচ্চশিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিকে আজ কীর্ত্তন-মণ্ডলীর মাঝে নিতাই-গৌর বলিয়া, রাধাকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে দেখিয়াই না আজ শিক্ষিত সম্প্রদায়—ইহার ভিতর একটা কিছু আছে—বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণে উন্মুখ হইয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহারই অসাধারণ শক্তি-সমন্বিত বিশুদ্ধ-ভাবাঞ্চিত কীর্ত্তন-গান-প্রভাবে এখন কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণের এক মধুময় লালসা দামোদরের বন্যার মত কলিকাতার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হু-হু করিয়া প্রসৃত হইয়া পড়িতেছে।

এই লালসার ফলেই আমরা সংপ্রতি আর একটী শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়াকে কলিকাতায় পাইয়াছি। ইঁহার নাম বিশ্ববিদিত। ৺রসিকদাসের পরে নাম করিতে হইলে, ইঁহার নামই করিতে হয়। রোগাক্রান্ত হইয়া ইনি সুদীর্ঘকাল কীর্ত্তন-গান করিতে অপারগ ছিলেন। কলিকাতা, কাঁসারি-পাড়া-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের সু-চিকিৎসায় ইনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভপূর্ব্বক আবার কীর্ত্তন-গান আরম্ভ করিয়াছেন। উক্ত কবিরাজ-মহাশয়ের বাটীতেই ইনি সংকল্পপূর্ব্বক এক পালা গান করেন। প্রায় একমাস কাল কবিরাজ মহাশয়ের বাটীতে এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে আমরা ইঁহার গান শুনিয়া বুঝিয়াছি,—হাঁ, রস-কীর্ত্তনে ইনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কি হরেকরকম সুরের কায়দা-করতপে, কি তাল-লয়ের সংরক্ষণ-সাবধানতায়, কি পদাবলীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এবং কি ভাবের বিকাশ-সাধনে তাঁহার মত নিপুণ ব্যক্তি একালে আর অধিক আছেন বলিয়া মনে হয় না।

ইঁহার নাম প্রেমদাস। এখন বয়স আন্দাজ ৫৫ বৎসর। এখনও যুবকের মত প্রফুল্লভাব এবং গলার জোর। কণ্ঠই বা

কি সুমিষ্ট! ইঁহার জন্মভূমি ভরতপুর। এই ভরতপুর শ্রীপাদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীপাট বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই ভরতপুর মুরশিদাবাদ-জেলায় অবস্থিত। হুগলি-কাঁটোয়া-লাইনের 'সালার' কিংবা 'বাজার-সহর' ষ্টেশন হইতে ৪ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। ইঁহার পিতা ৺নিত্যানন্দ দাস, ইনিও কীর্ত্তন-গায়ক ছিলেন, ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কীর্ত্তন-গানের ব্যবসা করিয়াছিলেন। প্রায় ১০।১২ বৎসর হইল, অনূন ৮৫ বৎসর বয়সে ইনি ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইঁহার চরিত্র বড়ই বিচিত্র; বৈষ্ণব-সেবার নিমিত্ত প্রাণ সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত, ইনি জীবনের উপার্জ্জন যাহা কিছু বৈষ্ণব-সেবাতেই ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

প্রেমদাস উক্ত ভরতপুরের ৺কিশোরীমোহন গোস্বামী মহোদয়ের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য ও রস-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারই নিকট কীর্ত্তন-গান শিক্ষা করেন। গোস্বামী মহাশয় গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর পরিবারভুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে এবং কীর্ত্তন-গানে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ইঁহার নিকট ছাড়া প্রেমদাস পণ্ডিত বাবাজী, বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী, কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র, বৃন্দাবন দাস বাবাজী, দামোদর কুণ্ডু, বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী, বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী এবং রাসবিহারী মিত্রঠাকুর প্রভৃতি অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়ার নিকটেও কীর্ত্তন-সংবন্ধে বিবিধ উপদেশ গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত বাবাজী এখনও জীবিত। সংপ্রতি শ্রীরাধা কুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার পূরা নাম শ্রীঅদ্বৈত দাস। গরাণহাটী সুরে কীর্ত্তন-গানে ইঁহার মত নৈপুণ্য আর কাহারও নাই। অল্পদিন পূর্ব্বে বৈষ্ণব-জগতের অকৃত্রিম বন্ধু কাশিমবাজারাধিপতি স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ইঁহাকে নিজ রাজধানী কাশিমবাজারে রাখিয়া উক্ত সুরের ছাত্র তৈয়ারি করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে কায়স্থ ছিলেন।

বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজী। ইনি শ্রীবৃন্দাবনবাসী; গোপাল কীর্ত্তনীয়ার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। প্রেমদাস বলেন, ইঁহার মত সুযোগ্য কীর্ত্তন-গায়ক তিনি আর দেখেন নাই। ১৫।১৬ বৎসর হইল ইনি শ্রীধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র। ইঁহার নিবাস মুরশিদাবাদ-জেলার অন্তর্গত পাঁচথুপী (পঞ্চতোপী)। ইনি জাতিতে সুবর্ণবণিক্, অনূন ত্রিশ বৎসর হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস বাবাজী। ইঁহার নিবাস মুরশিদাবাদ-জেলার অন্তঃপাতী পাঁচকেটে নামক স্থানে। এই স্থান শক্তিপুরের নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। ইনিও প্রায় ৩৪ বৎসর হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

দামোদর কুণ্ডু। জাতিতে তন্তুবায়। মুরশিদাবাদ-জেলার মধ্যবর্ত্তী 'কাঁদি' নামক গ্রামে বাটী। অনূন ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ইনি এ সংসারের সংবন্ধ ছাড়িয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক এবং কীর্ত্তন-গায়ক কুঞ্জদাসের নিবাস এই কাঁদী-গ্রামে। কুঞ্জদাসের বয়ঃক্রম এখন ৭৬; কিন্তু গত শ্রাবণ মাসে বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে আমরা তাঁহার যেরূপ অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহার এত অধিক বয়স বলিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আহা! সেই গান যেন এখনও আমাদের কাণে লাগিয়া রহিয়াছে!

বিশ্বম্ভর দাস বাবাজী। ইঁহার নিবাস দক্ষিণ-খণ্ডের নিকট—বহরাণ। এই দক্ষিণ-খণ্ডেই জগৎপ্রসিদ্ধ রসিকদাস কীর্ত্তনীয়ার বাটী। এখনও তাঁহার দুইজন কীর্ত্তনগায়ক কৃতী পুত্র তথায় বর্ত্তমান আছেন। হুগলি-কাঁটোয়া-লাইনের সালার-ষ্টেশনের অল্পদূরেই ঐ দক্ষিণ-খণ্ড গ্রাম অবস্থিত।

বৃন্দাবনচন্দ্র গোস্বামী। ইনি শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভু-সন্তান। কাঁটোয়া বড়প্রভুর আখ্‌ড়ায় অবস্থান করিতেন। হৃদয় বড়ই বৈরাগ্য-প্রবণ ছিল। 'উথলি' নামক স্থানে ইঁহার বংশ আছে। শ্রীগোপীনাথ জীউর সেবাও আছে।

শ্রীরাসবিহারী মিত্র-ঠাকুর। ইঁহারা ময়নাডালের মিত্র-ঠাকুর বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের বাটীর কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্তও কীর্ত্তন গায়িতে ও মৃদঙ্গ বাজাইতে সমর্থ, একথা একরূপ প্রবাদ-বাক্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বীরভূম-জেলার অন্তর্গত পোঃ আঃ পাঁচড়া, অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেল-লাইনের পাঁচড়া-ষ্টেশন হইতেই ময়নাডালে যাইতে হয়। ইনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া এখানকার অধিবাসিগণকে তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন-গানে পরম আনন্দ দান করিয়া থাকেন। সিদ্ধ বংশ বলিয়াই ইঁহাদের 'ঠাকুর'-উপাধি। ভক্তি ইঁহাদের সহজ সম্পত্তি।

প্রেমদাসের পিতা ভরতপুর হইতে 'সিঁজ' গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই গ্রাম ভরতপুর হইতে একক্রোশ দূরে। তথায় এখন প্রেমদাসের বিমাতা ভিন্ন অপর কেহ নাই। শ্বশুরালয়-সূত্রে তথা হইতে প্রেমদাস মালিহাটীতে আসিয়া বাস করেন। এই মালিহাটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। উক্ত সালার-ষ্টেশন হইতে এক-ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক প্রসিদ্ধ পদাবলী-গ্রন্থের রচয়িতা রাধামোহন ঠাকুরের গাদী এই মালিহাটী গ্রামে। তাঁহার বংশ অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান। এই মালিহাটী হইতে এক ক্রোশ পূর্ব্বে 'টেঁয়া' গ্রাম। এই 'টেঁয়া' গ্রামে মাধবদাস (সিদ্ধ নাম 'বৈষ্ণবচরণ') বাস করিতেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ 'পদকল্পতরু'-গ্রন্থের রচয়িতা। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোকুলানন্দেরও বাস এই গ্রামে ছিল, এখন ইষ্টক-স্তূপে পরিণত ভিটাই তাঁহাদের প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। প্রেমদাসের দুইটী বিবাহ; দুই পক্ষে দুইটী পুত্র। প্রথম পক্ষের স্ত্রী নাই; কিন্তু পুত্র পূর্ণানন্দ আছেন। ইনিও পিতার নিকট কীর্ত্তন-গান শিক্ষালাভ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা থাকিলে কালে ইনিও পিতার নাম বজায় রাখিতে পারিবেন, আশা করা যায়।

সংপ্রতি কীর্ত্তনীয়া প্রেমদাস ৮৬।৮৭ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কাঁসারীপাড়ায় মহানুভব ৺তারকনাথ প্রামাণিক মহোদয়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। কলিকাতাবাসীর পক্ষে সুসংবাদ, সন্দেহ নাই।

তাঁহার দেশের ঠিকানা—গ্রাম মালিহাটী, পোঃ মালিহাটী, জিলা মুর্শিদাবাদ।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

সাহিত্য-সংবাদ

রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সিংহল-শাখায়, সেখানকার গবর্ণর-বাহাদুরের সভাপতিত্বে, কিছুদিন আগে বুদ্ধদেবের মৃত্যু-তারিখ লইয়া একটি আলোচনা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বক্তা, Mr. Seneviratne বলেন, "Fleet, Geiger, Hultzsch, Wickremasinghe" প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ সাধারণ জন-শ্রুতিতেই বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া, খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দকেই বুদ্ধদেবের মৃত্যু-বৎসর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এই বিশ্বাস ভ্রান্ত; কারণ, বুদ্ধদেবের তিরোধান হয়, খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দে।" বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লইয়া পূর্ব্বকথিত ভ্রান্ত জন-শ্রুতির প্রচার কখন্ ও কিরূপে হয়, বক্তা নানা প্রমাণ ও শিলালিপি প্রভৃতি আলোচনা করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে, লঙ্কাদ্বীপে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল। তাহার কাল-গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দ হইতে। ওয়াং হিউএন সি'র (Wang Hiuen Tse) বিবরণ হইতে অধ্যাপক সিল্‌ভেঁ লেভি তাহার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন।

Wickremasinghe দেখাইয়াছেন, "চতুর্থ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও ঐ নূতন অব্দটি প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ভ্রান্ত জন-শ্রুতিটি বিখ্যাত হইয়া উঠে।" বক্তা বলেন, Wickramasinghe এখানে ভুল করিয়াছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেও ঐ নূতন অব্দটি প্রচলিত ছিল। বক্তৃতার উপসংহার-কালে বক্তা বলেন :—

১। সপ্তম পণ্ডিত পরাক্রম বাহু, অষ্টম বীর-পরাক্রম বাহু, নবম ধর্ম্ম-পরাক্রম বাহু, সপ্তম বিজয় বাহু ও সপ্তম ভুবনেক বাহু কোনকালেই স্বাধীন নৃপতিরূপে রাজত্ব করেন নাই।

২। ষষ্ঠ পরাক্রম বাহুর রাজত্বকালেই পর্ত্তুগীজেরা সিংহলে উপস্থিত হয়,—নবম ধর্ম্ম পরাক্রম বাহুর রাজত্বকালে নহে।

৩। সাপুমাল কুমারায়া,—যিনি ষষ্ঠ ভুবনেক বাহু নামে রাজা হন—তিনি ষষ্ঠ পরাক্রম বাহুর পুত্র এবং ডন-জুয়ান ধর্ম্মপালের পিতা।

৪। অম্বুলুগালা কুদা কুমারায়া ও মায়াডুন একই ব্যক্তি।

৫। তামিলরা যখন সিংহল আক্রমণ করে, তখন যে ভুবনেক বাহুর নাম শুনা যায়, তিনি চতুর্থ ভুবনেক বাহু—পঞ্চম ন'ন।

৬। চীনের অধীন যে বিজয়-বাহুর নাম শুনা যায়, তিনি পঞ্চম বিজয় বাহু—ষষ্ঠ ন'ন।

৭। খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দ হইতে সিংহলে যে নূতন কাল-গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। খৃঃ পূঃ ৪৮৩ অব্দেই বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ হয়।

* * * *

"বাসবদত্তা"র নূতন সংস্করণে ডাঃ গ্রে, সুবন্ধুর আবির্ভাব-কাল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। ডাঃ গ্রে বলেন, সুবন্ধু যখন উদ্যোতকরের (৫২০ ও ৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে যিনি দিঙ্‌নাগের মতখণ্ডন করিয়াছিলেন) নাম করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ডাঃ গ্রে সুবন্ধুর সঙ্গে ধর্ম্মকীর্ত্তির কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না; কিন্তু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া কেথ্ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি ও উদ্যোতকর দু'জনেই সম-সাময়িক এবং উভয়েই সুবন্ধুর উল্লেখ করিয়াছেন।

* * * *

প্রফেসর G. Jouveau Dubreuil প্রণীত "Archeologie du sud De L' Inde" নামক পুস্তকের সমালোচন-কালে স্যর আর, সিউএল, সমালোচ্য গ্রন্থখানির পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থকার, তামিল-দ্রাভিডিয়ান শিল্পকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রতি ভাগে ২৫০ বৎসর কাল ধরা হইয়াছে।—(১) পল্লব-পদ্ধতি, ৬০০—৮৫০ খৃষ্টাব্দ। (২) চোল-পদ্ধতি,—৮৫০—১১০০ খৃষ্টাব্দ। (৩) পান্দিয়া-পদ্ধতি, ১১০০—১৩৫০ খৃষ্টাব্দ। (৪) বিজয়নগর-পদ্ধতি, ১৩৫০—১৬০০ খৃষ্টাব্দ। (৫) মাদুরা-পদ্ধতি, ১৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত। তামিল-স্থাপত্যে বিদেশীয় কোন আদর্শ বা ভঙ্গী প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই,—তাহাই তাহার প্রধান বিশেষত্ব। তামিল-পদ্ধতিতে যে সকল মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের কারুকার্য্য একেবারে মৌলিক এবং বিদেশীয়-ভাববর্জ্জিত। সপ্তম খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তামিল-পদ্ধতিতে বৌদ্ধপ্রভাব ছিল; তাহার পরে স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলে তাহা আপনিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে ইহা কিরূপে আপনার রূপে বদলাইয়াছে, আমরা তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাই—অথচ এই ক্রম-পরিবর্ত্তনে যে বাহিরের কোন ছায়াপাত হয় নাই, এইটুকুই আশ্চর্য্যের কথা। প্রতি যুগের কারিকরদেরই নির্দ্দিষ্ট বিধি ছিল এবং সে বিধি ছাড়িয়া তাহারা গণ্ডীর বাহিরে খুব অল্পদূরেই যাইতে পারিত। প্রতি যুগের স্তম্ভগুলিতে পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-যুগের আদর্শ দেখা যায় এবং এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে না, যেখানে এই ক্রম-বহমান ধারা বাধা-প্রাপ্ত বা রুদ্ধ হইয়াছে। এক এক সময়ে মন্দিরের এক এক অংশ নির্ম্মাণকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য ইষ্টক ব্যবহৃত হয় নাই। দশম শতাব্দীর আগে মন্দিরের ভিতরে রাম, সীতা বা হনূমানের কোন মূর্ত্তি স্থাপিত হয় নাই। কোন প্রাচীন মন্দিরেই বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণ, বা বস্ত্রহরণকারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখা যায় না।

* * * *

Von Leopold Von Schroeder তাঁহার "Indian Religion and Literature" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণায় একটি স্পষ্ট সীমা-রেখা দেখা যায়। প্রাচ্য-দেশবাসীরা তাহাদের ঈশ্বরের ভিতরে কোমলতা দেখে এবং প্রতীচ্য-দেশবাসীরা ঈশ্বরের মধ্যে কঠোর রণোন্মাদনা দর্শন করে। শেষোক্ত জাতিগণের ভিতরে বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণদের নাম করা যায়। এই বিভিন্নতার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের রহস্য আছে; পরন্তু, এই বিভেদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ স্বভাবটি প্রকাশ করিয়া দিতেছে। লেখকের মতে, ঋগ্বেদের প্রণয়ন-কাল. খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসর।

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ৩০এ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা

বৌদ্ধযুগের মথুরা

হিন্দুর মধ্যে কে এমন হতভাগ্য আছেন যিনি মথুরার নাম শুনেন নাই? মোক্ষ-কামী নরনারীকর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত মথুরা আজিকার নগর নহে। কত রাজ্যের উত্থান-পতন হইয়া গেল,

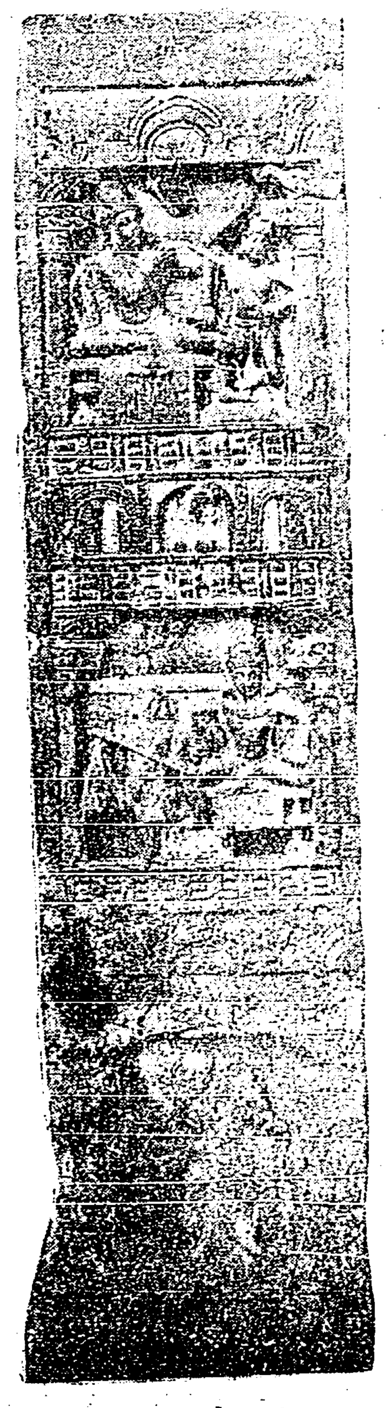

কত জাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিল, কিন্তু যশঃ-সৌরভে ও পবিত্রতায় চির-পূজিত মথুরা আজিও ভারতের নর-নারীর চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। ভগবানের পদরজঃস্পর্শে, পবিত্র ভারতের প্রাচীন মহানগরী, ঐতিহাসিকের গবেষণার সাধন-পীঠ, সেই বহুপুরাতন অথচ চির-আরাধ্য মথুরাসম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে যাঁহার পবিত্র নামের সহিত জড়িত হইয়া ইহা পবিত্রতায় ভারতে: অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভূভারহারী ভগবানকে শত শত প্রণাম করি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও বৌদ্ধ-যুগেও মথুরা বিশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল বলিয়া মনে হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পরিব্রাজক ফাহিয়ানের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা

যায় যে, তাঁহার সময়েও ইহার সুদৃশ্য দেবমন্দিরাদি দর্শন করিবার জন্য যাত্রিগণ ভারতের বহু স্থান হইতে তথায় সমবেত হইতেন। তাঁহার বিবরণ হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—মধ্য-দেশের অন্তর্গত মথুরা, যমুনার তরঙ্গ-চুম্বিত তীরভূমির উপর সংস্থাপিত। তথাকার অধিবাসিগণ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ফাহিয়ান্ মথুরাকে একটি বৌদ্ধজনপদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; তাঁহার এই উক্তি কতদূর সত্য, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার পক্ষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, স্বধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য

তিনি মথুরাকে যতটা বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে মথুরা ততটা প্রগাঢ় ভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কখন' গ্রহণ করে নাই। চৈনিক পরিব্রাজকের সময়ে হিন্দুধর্ম্মই প্রবল ছিল। তবে যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সহিত মথুরার কোনই সংশ্রব ছিল না, এ কথাও বলা চলে না। কারণ, ফাহিয়ানের সময়েই তথায় কুড়িটি বৌদ্ধ-মঠে প্রায় ৩০০০ শ্রমণ বাস করিতেন। ইহা ব্যতীত তথায় ছয়টি স্তূপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-প্রচারক বলেন, শরিপুত্রের চিতাবশেষ ইহাদের একটির মধ্যে নিহিত ছিল। অপর পাঁচটির মধ্যে একটি আনন্দ, ও অপরটি মুদ্গলপুত্রের নামের সহিত জড়িত ছিল।

ইহার দুই শত বৎসর পরে আর এক চৈনিক পরিব্রাজক ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া যান। হুয়েন্‌সাংএর বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে, মথুরায় তখনও বিংশটি মঠ শোভা পাইত, কিন্তু তৎকালে বৌদ্ধ-শ্রমণের সংখ্যা ছিল ২০০০ মাত্র। এই সময়েই আবার পাঁচটি নূতন হিন্দু দেব-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুই ঘটনার দ্বারা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ফাহিয়ানের ভারত-ত্যাগের পর হইতেই মথুরায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের আরম্ভ।

ইহার পর প্রায় চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত মথুরার নাম কোন সাময়িক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ১০১৭ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গজনীকর্ত্তৃক মথুরা-আক্রমণের কথায় আবার মথুরার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয়ের উপর বিশেষভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবার প্রধান কারণ এই যে, খাল্ উথবি নামক জনৈক মুসলমান, স্বয়ং বিজয়ী বীরের পার্শ্বচররূপে ভারতে আসিয়া যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যা'ন, তাঁহার সেই রচনার মধ্যে মথুরার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তিনি তাঁহার রচনার কোন স্থানেই মথুরা বা মহাবনের নাম করেন নাই। কিন্তু নাম না করিলেও তিনি যে মথুরার কথাই বলিতেছেন, তাঁহার রচনার একাংশ পাঠ করিয়া, এ-কথা ফেরিস্তা হইতে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে মথুরার সম্বন্ধে যাহা অবগত হইতে পারা যায়, তাহা এই :—মথুরা তৎকালে সুদৃঢ় প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত ছিল। ইহার অসংখ্য দেবমন্দিরের মধ্যে এমন একটি সুদৃশ্য দেবমন্দির বর্ত্তমান ছিল, যাহার সম্বন্ধে স্বয়ং সুলতান বলিয়াছেন যে, রাজ্যের সমুদায় শিল্পীর সমবেত চেষ্টাতেও দুইশত বৎসরের পূর্ব্বে ও এক কোটি দিনারের কমে এরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করা সম্ভবপর নহে। সুলতানের আদেশে ভারতের এই গৌরব ভষ্মীভূত হইয়া যায়। মথুরা-জয়ের পর, সুলতান বিংশ দিবস ধরিয়া ইহার ধনরাশি লুণ্ঠনপূর্ব্বক সুবর্ণময় ও রৌপ্যময় বিগ্রহ-মূর্ত্তিসমূহ চূর্ণীকৃত করিয়া শতাধিক উষ্ট্রপৃষ্ঠে স্বদেশে পাঠাইয়া দেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য আনুমানিক ৩০ লক্ষ রুবির সমতুল্য হইবে। এই ব্যাপার আরব্য উপন্যাসের ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

নাজিমুদ্দিন, ফেরাস্তা প্রভৃতি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মথুরা এই সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বিজয়ী মুসলমান যাঁহাদিগকে প্রতিমা-পূজকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যে বৌদ্ধ-প্রতিমার উপাসক কেহ ছিল না, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। সুতরাং এ সময়ে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রবল হইলেও, মথুরা হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল কি না, জোর করিয়া তাহা বলা বড়ই দুরূহ।

মুসলমান-শাসনের সময়ে মথুরার সম্বন্ধে বেশী কিছুই জানিতে পারা যায় না। মুসলমান-শাসনে মথুরা কোনদিন রাজধানীরূপে গণ্য হয় নাই। হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃই যে বিধর্ম্মী নরপতিগণ তাহাকে সমস্ত সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাঁহারা ইহার প্রতি কিরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মুসলমান-শাসনের প্রথমভাগে মথুরার দেব-বিগ্রহ-প্রতিপালকগণ এতই সন্তর্পণে বাস করিতেন যে, তাঁহারা যাত্রিগণের নিকট হইতে বহুমূল্য পূজাসম্ভারাদি গ্রহণ করিতেই সাহসী হইতেন না নূতন দেবমন্দির নির্ম্মাণ করা ত দূরের

কথা। এই কারণেই মথুরায় এখনও দুই-চারিটি বৌদ্ধ-যুগের নিদর্শনস্বরূপ বৌদ্ধ-মন্দির দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু মহম্মদ গজনীর আক্রমণ ও আকবরের শাসনকালের মধ্য বর্ত্তীযুগের নির্ম্মিত কোন দেবালয় দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুসলমান-শাসনে মথুরা অনেকবার ভীষণভাবে উৎপীড়িত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে সুলতান সিকান্দার লোদির শাসনকালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে লিখিত আবদুল্লার তারিখ-ই-দাউদী নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, তাঁহার শাসন-কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান মথুরার বহু দেব-মন্দির বিধ্বস্ত হয়, দেব-বিগ্রহের ভগ্ন প্রস্তরসমূহ কশাইয়ের দোকানে সুলতান

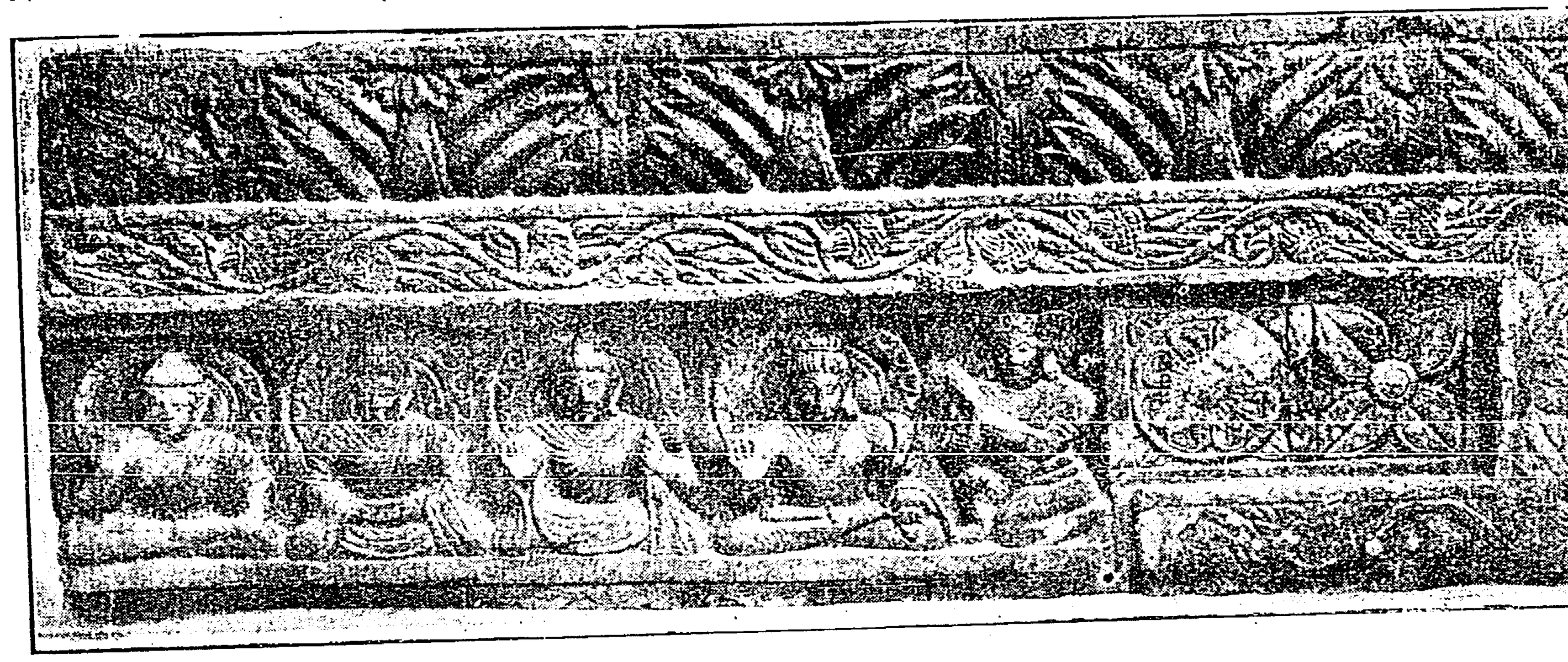

স্বয়ং পাঠাইয়া দেন এবং তৎকালে হিন্দুগণকে ধর্ম্ম-কার্য্য হইতে বিরত ও তাহাদের ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য মথুরা হইতে সমুদায় নাপিতকে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ইহার উপর টিপ্পনীর প্রয়োজন নাই।

মহামতি আকবরের শাসনকালে মথুরার হিন্দু-অধিবাসিগণ দিনকতক নিরূপদ্রবে দিন কাটাইতে পারিয়াছিল। তাঁহার সময়ে তাম্র-মুদ্রা-অঙ্কনের জন্য তথায় একটি অঙ্কশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বর্ষার নির্ম্মল আকাশের ন্যায় সে শান্তি ক্ষণিকের। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মথুরার উপর আর একবার অত্যাচার হয়। তিনি ইহার দেব-মন্দির ভাঙ্গিয়া মথুরার নাম পর্য্যন্ত উঠাইয়া দেন। তাঁহার সময়ে ইহার নাম হয় ইস্‌লামাবাদ। কাল যে ধ্বংস অসম্পূর্ণ রাখিয়াছিল, এইবারে বিদেশীর বিদ্বেষে তাহা সম্পূর্ণ হইল। এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে মথুরায় যে দেব-মন্দিরগুলি দেখা যায় তাহা নিতান্ত আধুনিক। মারহাট্টি ও জাঠগণ প্রবল হইয়া, তথায় আপনাদের শাসন-দণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন, মন্দিরগুলি প্রায় সেই সময়েই নির্ম্মিত হয়।

ইহার পর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ আর একবার মথুরা লুণ্ঠন করিয়া শত সহস্র নিরপরাধের প্রাণসংহার করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মথুরার উপর দিয়া যত ঝঞ্চা বহিয়াছে; তাহা সহিয়া কোন প্রাচীন নগরই আপনার গৌরব অটুট রাখিতে পারে না। চৈনিক পরিব্রাজকদ্বয়কর্ত্তৃক বর্ণিত বৌদ্ধ-মঠের সামান্য চিহ্নমাত্র আছে, আর সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম সাহেব কেশব-দেবের মন্দিরের নিকট কতকগুলি স্তম্ভ আবিষ্কার করেন। ইহার পর একটি কূপের মধ্য হইতে ৩১।২ ফুট উচ্চ একটী বুদ্ধ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। ডাক্তার প্লেফেয়ার-কর্ত্তৃক ইহা তৎকালে আগ্রার যাদুঘরে আনীত হয়। ইহার পর ১৭৬০ ও ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আরও দুইবার-কার অনুসন্ধানের ফলে বৌদ্ধ-যুগের কতিপয় দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয়।—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কতিপয় লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন যে, সেগুলি শাক্যাব্দের বা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর সাক্ষ্য। এই সঙ্গে আরও কতকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হয়। এই সমুদায় আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির সহিত এমন একটি লিপি পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে বোধ হয়, মথুরায় এক সময়ে গ্রীক্ শাসন-দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ হবিষ্ককে গ্রীক্ নরপতি বলিয়া মনে করেন। এক সময়ে তিনি মথুরা শাসন করেন, এ কথাও অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে। ইহা ব্যতীত খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫০ অব্দে লিখিত গার্গী-সংহিতা নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায় যে, গ্রীক্‌গণ সাকেত, পাঞ্চাল ও মথুরা আক্রমণ করিয়া পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। যথা,—

ততঃ সাকেতম্ আক্রম্য পাঞ্চালান্ মথুরাং স্তথা।
যবনাঃ দুষ্ট বিক্রান্তাঃ প্রাপ্সন্তি কুসুমধ্বজম্। ইত্যাদি।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৪ অব্দে মিলিন্দরের শাসনকালে গ্রীক্‌গণ সাকেত আক্রমণ করেন। পুষ্পমিত্র সে সময়ে পাটলিপুত্রের নরপতি।

গ্রীক্‌গণ পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেন। মথুরা হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, এক সময়ে তাঁহাদের রাজত্ব উত্তর-ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মথুরার ও হিন্দুনৃপতিগণের সহিত কাশ্মীরের গ্রীক্-নরপতির বিশেষ সৌহৃদ্য স্থাপিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, পৃথ্বা গ্রীক্ Pandecaর রূপান্তর মাত্র। কাশ্মীরের নরপতি ১ম গোনর্দ্দ মহাভারতের কৃষ্ণের সমসাময়িক। তিনি কৃষ্ণের চিরশত্রু জরাসন্ধের মিত্র ছিলেন এবং মথুরা-আক্রমণের তিনি বিশেষ পক্ষপাতীও ছিলেন। এই দুই রাজ্যের মধ্যে এই সখ্য বহুদিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। মহাভারতের মহাসমরে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক রাজকুমার, প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিতে না পারিলেও জরাসন্ধের রাজ্যের তাৎকালীন অধীশ্বর কর্ণ ও কাশ্মীরের শিশু-নরপতি, উভয়েই মহাসমরের প্রধান নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এমন প্রমাণের অভাব নাই।

মথুরার এখন সেই প্রাচীন সম্পদ আর নাই। যে নগরী, পবিত্রতায় ও প্রাচীনতায় কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারাবতী প্রভৃতি নগরের সমকক্ষ ছিল, আজ তাহার কথা গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মথুরার দুই-চারিটি দ্রষ্টব্য স্থানের বিষয় আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব :—

১। কেশব-দেবের মন্দির—১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব এই মন্দির ধ্বংস করেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই মন্দির অতি প্রাচীন ; বরাহ-পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। বার্ণিয়ারের সময়ে কেশব-দেবের মন্দির অটুট ছিল।

ট্রাভার্নিয়ারের সময়ে ভারতে ইহা অতি প্রসিদ্ধ দেবমন্দিররূপে পরিচিত ছিল। ঔরঙ্গজেব ইহাকে ভাঙ্গিয়া ইহার উপর এক মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেই মস্‌জিদ আজিও বিদ্যমান। ঔরঙ্গজেবের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিয়া মেবারের রাণা রাজ-সিংহ ইহাকে পূর্ব্বাহ্ণে সরাইয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া কেশব-দেব রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন। কেশব-দেব আজিও উদয়পুর হইতে ২২ মাইল পূর্ব্বে নাথদ্বারে বিরাজিত। মথুরা হইতে কিছুদূরে কেশব-দেবের একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

২। ভুটেশ্বর-মহাদেবের মন্দির—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণকর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহারই সন্নিকটে বলভদ্র-কুণ্ড বিরাজিত। F. S. Growse বলেন, মথুরায় কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই ভুটেশ্বর অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু, সেই পুরাতন মন্দির নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে ভারতে শৈব উপাসকগণ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কামেশ্বর, চক্রেশ্বর এবং সর্ব্বোপরি বৃন্দাবনের গোপেশ্বর প্রভৃতি শিবমূর্ত্তি ‘ব্রজধামে’ দৃষ্টিগোচর হয়।

৩। মহাবিদ্যা-দেবীর মন্দির—প্রবাদ এই যে, পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক এই দেবী প্রতিষ্ঠিত হন। বর্ত্তমান মন্দির পেশোয়াকর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত হয়। একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপরে এই মন্দির সংস্থাপিত।

৪। মথুরায় অনেকগুলি কুণ্ড ও পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে গোঘাট ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহারই সন্নিকটে অচলেশ্বরের এক ক্ষুদ্র শিব-মন্দির বিরাজিত। মথুরায় এইরূপ আরও ২৪টি প্রসিদ্ধ ঘাট বিদ্যমান।

৫। দীর্ঘ-বিষ্ণুর মন্দির।—প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এইখানে কংশ-নিয়োজিত চনূরকে বধ করেন। এই মন্দিরটি নিতান্ত আধুনিক।

৬। কংসের কেল্লা।—যমুনানদীর তীরে এই প্রাচীন দুর্গ অবস্থিত। প্রবাদ আছে, কংশ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গটি অত্যন্ত পুরাতন বটে। রাজা মানসিংহ দুর্গের জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন।

মথুরা ভক্ত হিন্দুর পুণ্য-তীর্থ হইলেও, এখানে শিল্পী হিন্দুর পরিচয় ততটা পাওয়া যায় না—শিল্পী বৌদ্ধের পরিচয় যতটা পাওয়া যায়। বারংবার বিদেশীর ধর্ম্মদ্বেষিতার নিষ্ঠুর কবলে পড়িয়া একদা-সুন্দরী মথুরা, প্রাচীন শিল্পের সকল অলঙ্কার, সকল শোভা, সকল শ্রী হারাইয়া ফেলিয়াছে, তাহার প্রাচীনতা বর্ত্তমানের নবীনতায় ডুবিয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ শিল্পের যে সকল মানসমোহন উপকরণ, প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যেও সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য নাই। বৌদ্ধ-ভাস্কর্য্যের প্রধান রচনা-বস্তু বুদ্ধ-দেবের অসংখ্য মূর্ত্তি, এখানে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের কাহারও দেহ আছে, লাবণ্য নাই ; মাথা আছে, পা নাই ; মুখ আছে, চোখ নাই। তবে গোলাপের একটি ছেঁড়া পাপ্‌ড়ী দেখিয়াও যেমন তাহার পূর্ব্বরক্ত-রাগের সুষমার কথা বলিয়া দেওয়া যায়, এই সকল দেহ-হীন বা মুণ্ড-হীন বা হস্ত-পদ-হীন বুদ্ধ-মূর্ত্তির খোদন-পটুতা দেখিয়াও তেমনই তাহাদের পূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য অনুভব করা, কলারসজ্ঞের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে।

আমরা কতকগুলি বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও অলঙ্কৃত শিল্পের প্রতিলিপি দিলাম। সিংহাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি-দ্বয়ের মধ্যে একটির মাথা আছে, অন্যটির নাই। অক্ষত মূর্ত্তিটি দেখিলেই বুঝা যায়, ইহা উপদেশ-দানরত বুদ্ধমূর্ত্তি। শিল্পী এখানে মূর্ত্তির মুখে-চোখে ও দেহ-ভঙ্গীতে যে কালোপযোগী ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যে সকলকেই মুগ্ধ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্রও এখানে দেওয়া গেল। গঠন-কৌশলে এই মূর্ত্তিটি অনায়াসে ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের প্রথম বিভাগে স্থানলাভ করিতে পারে। এমন স্বপ্নের মত সুন্দর, ধর্ম্মের মত গম্ভীর ও মূর্ত্তকাব্যের মত অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সহজে, যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। শিলা-রচিত এই ধর্ম্ম-কাব্য স্বদেশী-বিদেশী সকল দর্শককেই একেবারে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। কলমের আঁচড়ে ইহাদের সৌন্দর্য্য ফুটানো অসম্ভব,—যিনি ভাবুক, তিনি প্রাণ দিয়া অনুভব করুন ; আমরা তাঁহার রস-গ্রাহিতাকে ‘কথার উপরে কথা জড়’ করিয়া ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

উপনিষদে

অগ্নিহোত্র

উপনিষদ্‌সকল ব্রহ্ম-বিদ্যার সহিত অগ্নিহোত্রের মহিমা সর্ব্বদাই ঘোষণা করিয়া থাকেন। দেখা যায়, কোথাও ব্রহ্ম-বিদ্যা ও অগ্নি-হোত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে বিদ্যমান, কোথাও বা যজ্ঞবিধি পরা-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট এবং ক্বচিৎ শ্রুতি-নির্দ্দিষ্ট হুত হুতাশনের শিখর-শীর্ষ ও ঔপনিষদ্ ওঙ্কারই প্রজ্বলিত ও প্রকম্পিত হইতেছে। কর্ম্মনিষ্ঠ অগ্নিহোত্রীর যজ্ঞ-সাধনের মধ্যেই যে বিশুদ্ধ ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্ব-প্রথম পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং অপরা-বিদ্যার সাহচর্য্যেই যে পরা-বিদ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল, উপনিষদে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কয়েকখানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্-গ্রন্থ হইতে আমরা তাহার প্রমাণ উদ্ধার করিব।

ঈশ-উপনিষদের প্রথম মন্ত্র, “ঈশ বাস্যমিদং সর্ব্বং।” এই মন্ত্রেই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম ও প্রধানতম আচার্য্যের ব্রহ্ম-বিদ্যায় দীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছিল ; কিন্তু এই ঈশ-উপনিষদের ঋষি বলিতে-ছেন—“অবিদ্যা (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি) দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাতে (অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যাতে) অমৃত পান করিবে” এবং যাঁহারা অগ্নি-হোত্র-বর্জ্জিত ব্রহ্ম-বিদ্যা এবং ব্রহ্ম-বিদ্যা-বর্জ্জিত অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের উদ্দেশে ঋষি বলিতেছেন—

“অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥”

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য নিষ্কর্ম্মবাদী। তিনি ভাষ্যে উপরি-উক্ত মন্ত্রের স্পষ্টার্থ-গ্রহণে অত্যন্তই কুণ্ঠিত হইয়াছেন। বৈদান্তিক-দিগের মতে অগ্নিহোত্রাদি স্বর্গে ফলপ্রদ কর্ম্মের কোনই আবশ্যকতা নাই, মোক্ষলাভের পক্ষে জ্ঞানই যথেষ্ট, “জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ ;” সুতরাং আচার্য্য শ্রুতি মন্ত্রের সহিত বৈদান্তিক মতের বিরোধ পরিহার করিবার জন্য, দীর্ঘ ভাষ্যের পর এক পরিশিষ্ট “বিচারণা” দ্বারা “কেচিৎ” লোকের “সংশয় নিরাকরণ” করিয়াছেন ; কিন্তু মন্ত্র আপনার স্বচ্ছ সরলার্থদ্বারা বোধ হয় চিরদিনই “কেচিৎ” লোকের সংশয় দৃঢ় রাখিবে এবং কর্ম্মীর উপনিষদ্ বলিবে—“অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্ব৷ বিদ্যয়া-মৃতমশ্নুতে।”

এই গেল ঈশ-উপনিষদের কথা। তাহার পর কাঠক। ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থসকলের আপেক্ষিক উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টতা না থাকিলেও, ব্রহ্মবিদ্‌গণের মুখে প্রায়ই শুনা যায়, কাঠক ব্রহ্ম-বিদ্যার বিশদতম গ্রন্থ। ঋষির জাগ্রৎ প্রতিভা সেই অচিন্ত্য ও অব্যক্ত-স্বরূপের উপর কাঠকে কতদিক হইতে যে তড়িৎ-সম্পাত করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই কাঠকের উপনিষদ্-বক্তা নাচিকেত-অগ্নি-সম্বন্ধে বলিতেছেন, যিনি এই অগ্নির বিধিবৎ চয়ন করেন, তিনি

“স মৃত্যুপাশান্ পুরতঃ প্রণোদ্য
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।”

তৃতীয় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্ম-বিদ্যা উদ্‌ঘাটিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে।—তাহার প্রথম মন্ত্র—“যাঁহারা পঞ্চাগ্নি গৃহস্থ এবং যাঁহারা বিধিবৎ অগ্নিচয়ন করেন, তাঁহারা বলেন—ব্রহ্মই সুকৃত কর্ম্মের সত্যস্বরূপ অমৃত-ফল ভোজন করেন এবং ব্রহ্মই জীবের পরম হৃদাকাশে গুহ্য-প্রবিষ্ট ইত্যাদি।” সাগ্নিক ও গৃহস্থ ঋষিগণই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রথমে নিরূপণ করিয়াছিলেন, ইহাই কি ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে ?

তাহার পর অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডক দেখা যাউক। আমাদের দেশে যাঁহারা “ব্রহ্ম-জ্ঞান”রূপ খড়্গাঘাতে “কুসংস্কার”রূপ অজা-কুলের বিনাশ-সাধনে চিরদিন বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের অনেকেই প্রবন্ধের শিরোনামা ও বক্তৃতার সূত্রটুকু এই উপনিষদ্ হইতেই উদ্ধার করেন। সম্প্রদায়-বিশেষের চির-পরিচিত পরিভাষা, —যথা, “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি,” “ব্রহ্মৈবমিদমমৃতং”, “পুরস্তাৎ ব্রহ্ম, পশ্চাৎ ব্রহ্ম” ইত্যাদি বচন এই মুণ্ডকেরই অন্তর্গত। এ হেন মুণ্ডকও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বেদ-বিহিত ও ঋষিদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি সত্যকর্ম্ম-সম্বন্ধে বলিতেছেন—

“তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা
এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে।”

এবং অব্যবহিত পরেই অনুশাসন করিতেছেন—

“যদা লেলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে।
তদাজ্যভাগাবন্তরেণ আহুতীঃ প্রতিপাদয়েৎ॥”

সুতরাং মুণ্ডক এই পর্য্যন্ত অবস্থান করুন। তাহার পর “কেন”-উপনিষদে অগ্নিহোত্র দেখিয়া প্রমাণের উপসংহার করিলেই যথেষ্ট হইবে।

“কেন”-উপনিষদের মন্ত্রসকলও অনেকের মুখে শুনা যায়। “তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, চক্ষুর চক্ষু ও কর্ণের কর্ণ” এইরূপ বচন-নিচয় নানা প্রকার ছন্দে মন্দিরে, মঞ্চে ও উদ্যানে এত অধিকবার শ্রুত হয় যে, তাহাতে অনেকেরই উহার অর্থ-গ্রহণের বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধ বচন-নিচয়ের আকর-ভূমি কেন-উপনিষৎ মুখ্যকল্পে মনুষ্যের চেতনা ও বোধ-শক্তির মধ্য দিয়া ব্রহ্ম-নিরূপণ করিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

“তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা” ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের, ইহাও এই ঋষির মত।

এইরূপে দেখা গেল, উপনিষদ্‌সকল অগ্নিহোত্রের স্তুতি-গানে পরিপূর্ণ। এই অগ্নিহোত্রের উপরই ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। এখন আমরা কি করিয়া বুঝিব, অগ্নিহোত্র কি ছিল ? আমাদের উপনয়নাদি সংস্কারে যে এক মৃত অনুষ্ঠান অগ্নিহোত্র বলিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কি সেই সত্য-ধর্ম্মদ্রষ্টা ব্রহ্মবিৎ ঋষি-গণের অগ্নিহোত্র ? তাহা কখনই হইতে পারে না ; কারণ তাহা অগ্নিহোত্রের কষ্টানুমেয় বিকল্প মাত্র, অগ্নিহোত্রের “পৌত্তলিকতা” বলিলেও আমাদের ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই।

বহুকাল হইল, এ দেশ হইতে অগ্নিহোত্র চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। এক বিরাট্ বনস্পতি ছিল, যাহার দিগন্ত-ব্যাপী শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিচিত্র শক্তি স্পন্দিত হইত এবং যাহার ছায়ায় ভারতবর্ষীয় সমস্ত অনুষ্ঠান ও উদ্যম শান্তি ও ঋদ্ধি লাভ করিত,—আজ তাহা প্রলয়-জলধিমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। কে এখন যুগান্ত-শীর্ণ, প্রাণহীন শাখাগ্রভাগ দেখিয়া সেই মহৎ দ্রুমায়তনের অনুমান করিতে পারে ? আজি-কার সুলভ অগ্নিহোত্র, পূর্ব্বে নিশ্চয়ই অভিনয় ও খেলার বিষয় ছিল না।

তথাপি বুঝা যায়, তপোবনের যজ্ঞ-বেদিকায় এবং গৃহস্থের অগ্নি-শরণে অগ্নিহোত্ররূপে যে মহৎ কর্ম্ম প্রজ্বলিত হইয়াছিল, যাহা লেলিহমান সপ্তজিহ্বার স্নিগ্ধ সঙ্কেতে যজমানকে "এহ্যেহি" সম্ভাষণে, সূর্য্য-রশ্মি-পথে হোতৃগণকে স্বর্লোকে উপনীত করিয়াছিল, * তাহা সেই লুপ্ত ও কালান্তরিত জগতের অপূর্ব্ব রহস্যময় মহৎ কর্ম্ম ছিল। উপনিষদ্‌সকল সেই কর্ম্মের উত্তেজনায় ব্রহ্মকে জাগ্রৎ করিয়াছিলেন; কর্ম্মেই চিরদিন জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ হইতেছে, কর্ম্মফল-স্বরূপ অমৃত পুরুষই চিরদিন জগতের ললাটে মর্য্যাদার রাজ-টীকা অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন। বিশ্ব কর্ম্ম-সাহচর্য্যে জাগ্রৎ হইয়াছে। + কর্ম্মলোপে তাহা প্রলুপ্ত হইবে। শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে বলিয়াছেন, উদার কর্ম্মে সূর্য্য সমুদিত হইয়া, কর্ম্মেই অস্তমিত হইতেছেন। কর্ম্মদ্বারা জগৎ বিপুলা শ্রী ও মহৎ কল্যাণ লাভ করিতেছে। অধ্যবসায়ই জীবের চরম সুখের পরম নিদানভূত কারণ। জগদ্বাসীর অক্লান্ত কর্ম্মই, ইহলোক-পরলোক হইতে মনুষ্যের জন্য শান্তি ও ঐশ্বর্য্য বহন করিতেছে। প্রাচীন কালে যে সকল কর্ম্ম মনুষ্যের জন্য দ্যুলোক ও ভূলোক হইতে বিপুলা ঋদ্ধি দোহন করিয়া আনিত, যাহাতে ইহলোকের জন্য ঐশ্বর্য্য ও পরলোকের জন্য অক্ষয় লোকসকল লাভ হইত, তাহার মধ্যে সত্য ও যথাবিধি-আচরিত অগ্নিহোত্রই প্রধান কর্ম্ম ছিল। এইজন্যই শ্রুতির ভাষায় যজ্ঞ ও কর্ম্ম একার্থবাচক; পরন্তু যজ্ঞ-কর্ম্মের মধ্যেই ব্রহ্ম প্রথমে ঋষি-হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়াছিলেন এবং সেই কারণেই উপনিষদের ব্রহ্ম-বিদ্যার সহিত অগ্নিহোত্র চির-নিবদ্ধ।

যে প্রজ্বলিত হুতাশন-সমীপে সপ্রণব ব্যাহৃতি-মন্ত্র দুর্জ্জয়িনী শক্তিতে দ্যুলোক হইতে মহতী ঋদ্ধি আকর্ষণ করিয়া আনিত, সেই জ্যোঃতিক্লিপ্ত হব্যবাহনই জানাইয়া দিত—"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।" এইজন্যই জ্ঞানসমুজ্জ্বল অগ্নিহোত্রে ব্রহ্মচ্ছটা এবং ব্রহ্মে কর্ম্মচ্ছায়া পতিত হইত। ব্রহ্ম, কর্ম্ম-ফল-মধুপান করিতেন বলিয়া তিনি "মধ্বদ" নামে অভিহিত এবং ব্রহ্ম ও কর্ম্ম—"ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি।" যে দিন হইতে এ দেশে অগ্নিহোত্রের শিখা ম্লান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতেই "ব্রহ্ম-বিদ্যা"-ও কর্ম্মীর জাগ্রৎ চেতনার পরিধি পরিহারপূর্ব্বক দার্শনিকের "স্কুলে"—দ্বৈত, অদ্বৈত, মূর্ত্ত, অমূর্ত্তাদি নানা বিগ্রহ ধারণ করিয়া, নূতন কর্ম্ম-জগতের খরস্রোতের মধ্যে এক এক বিধি-বিড়ম্বিত অচলায়তন সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আমাদের এই নবীন যুগের নব অগ্নিহোত্রকে আবার কোন্ ঋষি আসিয়া অভিনব ব্যাহৃতি মন্ত্রে প্রজ্বলিত করিবেন?

শ্রীনগেন্দ্রনাথ হালদার

+ কেন,

+ মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব। ২৮ অঃ

আমার কুঁড়ে

১

পাহাড়ের নিথর ছায়ায়
বন যেথা করে মর্-মর্,
কচি কচি লতা-পাতা দিয়ে
বাঁধিয়াছি ছোট কুঁড়ে-ঘর।

কে চাহে গো নগরের
হাজার নাগের ঘের,
ঠোঁটে হাসি, চোখে জল-ঝরা?
ভালবেসে দেখে'ছি গো—
কেঁদে কেঁদে মরে'ছি গো—
প্রেম সুধু হাটের পসরা।

হেথা নাহি ধনীর শকট,
গরীবের বুকের উপর
ওঠেনাক অভাবের হা-হা—
এযে মোর ছোট কুঁড়ে-ঘর।

২

কূলে কূলে টলে' পড়ে নদী,
রোদ্‌মাখা শাদা বালু-তট,
থেকে থেকে হাসে রাঙ্গা ফুল
রাঙ্গা করে' নব-শ্যাম পট।

ওখানেতে বেলা-শেষে
বন যথা নভে মেশে,
রঙ্গে রঙ্গে ফোটে রস-রূপ;
এখানেতে ঘাসে ঘাসে
প্রজাপতি উড়ে আসে,
খুলে দেয় মনের কুলুপ।

চারিদিক নিঝুম—নিঝুম,
দূরে সুধু ঝরিছে নিঝর;
হরিণেরা করে আনা-গোনা,
একপাশে ছোট কুঁড়ে-ঘর।

৩

আকাশের মেঘ-পুরী থেকে
জ্বলে' ওঠে চাঁদের মশাল;
নিরালায় ঘুমায় বাতাস,
পাপিয়া সে, প্রেমের মাতাল।

এস তুমি হে কবিতা!
এস গো নগর-ভীতা,—
প্রেয়সীর রূপ ধরি' এস,
আ-জনম আমি প্রিয়া,
রয়ে'ছি তোমায় নিয়া,
ভালবাসি, তুমি ভালবেস!

ওগো মোর জীবন-সাধনা,
এস এস বুকের ভিতর,
দীনের এ অতি দীনধাম
এতটুকু ছোট কুঁড়ে-ঘর।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

দেবী

ক

ডেপুটিগিরির সচল পদ পাইয়া বাঙ্গলাময় চলিয়া বেড়াইতেছিলাম। সংপ্রতি ছ'-মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কিছু-দিনের জন্য চলা বন্ধ করিয়া অচল হইয়া বসিয়াছি।

বাড়ীর সাম্‌নেকার রোয়াকে বসিয়া সেদিন খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম। হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখি, আমার দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া একটা লোক চুপ করিয়া রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া আছে।

আমার চোখ তাহার চোখে মিলিবামাত্র সে থতমত খাইয়া মুখ নীচু করিয়া একদিকে চলিয়া গেল। খানিক দূর গিয়া মুখ ফিরাইয়া আবার সে আমার দিকে চাহিল। আমি তখনও কৌতূহলী হইয়া তা'র দিকে তাকাইয়া আছি দেখিয়া সে হন্ হন্ করিয়া খানিকটা আগে চলিয়া গেল। তা'রপর ফিরিয়া আবার আমার দিকেই আসিতে লাগিল।

একেবারে আমার সুমুখে আসিয়া দু'-চারবার ঢোঁক্ গিলিয়া সে দ্বিধার সহিত বলিল, "আপনি—আপনি কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌চেন?"

বাস্তবিক, লোকটাকে চিনি-চিনি মনে হইতেছিল; কিন্তু ঠিক স্মরণ না হওয়াতে আমি একটু বোকা বনিয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলাম।

সেও সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ত পূর্ণেন্দুবাবু?"

আমি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আর আমি হচ্চি জগাই—হা-হা-হা!"

খুব-খানিকক্ষণ হাসিয়া হঠাৎ হাসি থামাইয়া সে খপ্ করিয়া আমার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কি হে পূর্ণ,—'আউট্ অফ্ সাইট্, আউট্-অফ্ মাইণ্ড' নাকি বাবা? ক্লাশ-ফ্রেণ্ড না হ'লেও আমি ত তোমার ক্লাশ-ফ্রেণ্ড—সে কথাটা কি স্রেফ্ ভুলে' বসে' আছ—অ্যাঁ?"—বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া মুরুব্বিয়ানার সহিত পিঠ্ চাপ্‌ড়াইতে সুরু করিয়া দিল।

এতক্ষণে চিনিলাম,—জগাই বটে! ছেলেবেলায় তা'র সঙ্গে স্কুলে পড়িয়াছিলাম। তা'র মত ডান্‌পিটে ও বকাটে ছেলে ক্লাশে আর দু'টি ছিল না। দুষ্টামির নিত্য-নূতন ফন্দি চট্-পট্ আবিষ্কার করিতেও সে অদ্বিতীয় ছিল। আমরা তা'কে জুজুর মত ভয় করিতাম। যে পণ্ডিত মাথার টিকি বজায় রাখিতে চাহিতেন—তিনি সাধ্যমত জগাইচাঁদকে ঘাঁটাইতেন না। চেয়ারে চারিটা পায়ার তলায় চারিটা সুপারি রাখিয়া মাষ্টার-মশাইকে যে কতবার সে 'পপাত ধরণীতলে' করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। স্কুলের হেড্-মাষ্টার বেজায় কড়া ও গরম-মেজাজের লোক ছিলেন। প্রথম দিনকতক তিনি জগাইচাঁদকে শায়েস্তা করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু জগাইচাঁদ সপ্তাহখানেক ধরিয়া তাঁহার তামাকে লঙ্কাবাটা মিশাইয়া, চেয়ারে ষাট-সত্তরটি ছার-পোকা ছাড়িয়া এবং জুতার ভিতরে আলপিন ঢুকাইয়া তাঁহাকেই দস্তুরমত শায়েস্তা করিয়া দিল। হেড্-মাষ্টারের কড়া ও গরম-মেজাজ একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

এ সেই জগাই! আজ পনর-ষোল বৎসর তাহাকে দেখি নাই—এতদিন পরে এমন হঠাৎ তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাওয়াতে মনে মনে কিছু খুসি হইলাম। জীবনের মাঝপথে বাল্যের সাথীকে দেখিলে খুসি হয় না, এমন লোকও বোধ করি সংসারে নাই।

হাসিতে হাসিতে জগাইকে লইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলাম।

জগাইয়ের মাথায় লম্বা টেড়ি, চুলগুলা তেল-চক্‌চকে। গায়ে একটা আধ-ময়লা চুড়ীদার পাঞ্জাবী, জামাটা যে ইস্ত্রি করা হয় নাই, বাড়ীতেই 'জলকাচা' হইয়াছে, সেটা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। পরণে একখানা চওড়া-পাড়ের শাড়ী—নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোকের। পায়ে তালিমারা অনেক দিনের পরা এক-জোড়া পম্প্-সু,—ডান পায়ের জুতাটি মুখব্যাদান করিয়া হাওয়া খাইতেছে। বাঁ হাতে একগাছা পিচের ছড়ি,—মাথার দিক্‌টা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ডান হাতে একটা বিড়ি—সবটাই প্রায় পুড়িয়া গেলেও জগাই অতি সন্তর্পণে বিড়ির গোড়ার দিক্‌টা ধরিয়া যথেষ্ট উৎসাহের সহিত টানিতে ছাড়িতেছে না।

জগাই, জামার সাম্‌নেকার নীচের অংশটি কোলের ভিতরে গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। আমি লক্ষ্য করিলাম, জামার সেখানটায় লম্বা সেলাই করা; সেলাইটা যে আমার চোখে পড়ে, বোধ হয় জগাই সেটা পছন্দ করে না—তা'ই সেলাইটা কোলের ভিতরে ঢাকিয়া রাখিল। বুঝিলাম, জগাইয়ের মনে বাবুগিরির সখটুকু বিলক্ষণ, কিন্তু বেচারীর পয়সার ভারি খাঁক্‌তি।

সাম্‌নে টিনের বাক্সে ভাল ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট ছিল। বাক্সটি দেখিবামাত্র জগাই হাতের বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া, টপ্ করিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়া ফেলিল। তা'রপর চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া পরম আরামের সহিত হুহু করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "বাঃ বাঃ, বেড়ে সিগারেট ত!"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "তা'রপর জগাই, কেমন আছ, বল।"

জগাই টেবিলের উপরে নবাবের মত একখানা পা তুলিয়া দিয়া নাচাইতে নাচাইতে বলিল, "আছি ভাল। খাচ্চি-দাচ্চি বেড়িয়ে বেড়াচ্চি। তবে কি জান, যা কিছু কষ্ট অন্ন-বস্ত্রের।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কি রকম?"

জগাই চেয়ারের দু'-পাশে হাত দুলাইতে দুলাইতে বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, ব্যব্‌সা-ট্যাব্‌সা কি পুলিসের জ্বালায় আর কর্‌বার যো আছে! আরে ছিঃ ছিঃ! ঘেন্না ধরিয়ে দিলে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "পুলিসের জ্বালায় ব্যবসা বন্ধ! সে কি রকম ব্যবসা?"

জগাই সোজা হইয়া বসিয়া টেবিলে একটা চড়্ মারিয়া বলিল, "খুব ভাল ব্যবসা পূর্ণ, খুব ভাল ব্যবসা। পেটেণ্ট আর স্বপ্নাদ্য ওষুধের ব্যবসা করে' দিনকত দু'-হাতে টাকা লুটে' নিয়েছিলাম;—তা', তা'ই দেখে' টিক্‌টিকি-বেটাদের চোখ টাটিয়ে উঠ্‌ল।"

আমি কৌতূহলী হইয়া বলিলাম, "কেন?"

"আরে, সে কথা আর জিজ্ঞেস্ কর কেন? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, আমেরিকার জন সাহেবের আবিষ্কৃত অদ্ভুত দন্তমঞ্জন।" দিনকতক খুব বিক্রী হ'য়েছিল, এর মাঝে হঠাৎ টিক্‌টিকি-বেটারা কেমন করে' ধরে'

ফেল্লে যে, আমার অদ্ভুত দন্তমঞ্জনে স্রধু ইঁটের গুঁড়ো আছে। এই আর কি—অমনি মামলা রুজু। আমি কিন্তু সহজে ছাড়ি নি বাবা,—শত শত প্রমাণ দেখিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটকে প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতে চেষ্টা করে'ছিলুম যে, যে দন্তমঞ্জনে বিশুদ্ধ ইঁটের গুঁড়ো থাকে, সত্যসত্যই তা' অদ্ভুত কি না। ম্যাজিষ্ট্রেট শুনে' হেসে ফেল্লেন; কিন্তু হেসেই আমার দু'শো টাকা জরিমানা কর্‌লেন। সেইদিন থেকেই ব্যবসা বন্ধ।

বুঝিলাম, জগাইএর দুষ্টামি-বুদ্ধি এখনও যায় নাই; কিন্তু, সেইসঙ্গে তাহার সরলতাটুকুও আমার কাছে নেহাৎ মন্দ লাগিতেছিল না।

জগাই ততক্ষণে প্রথম সিগারেটটা পুড়াইয়া ছাই করিয়া আর একটা ধরাইয়া বলিল, "যা'হোক্, মাই ডিয়ার পূর্ণ, তোমাকে এতদিন পরে হঠাৎ আবিষ্কার করে' আমি মনে মনে বড়ই খুসী হ'য়ে উঠে'চি। ইচ্ছে হচ্চে গলা ছেড়ে গান গাই—" বলিয়াই বাঁ-হাতে টেবিল চাপড়াইয়া মাথা নাড়িয়া সে গান স্রুরু করিয়া দিল—

"ভোজন কর কৃষ্ণ জিরে,
ভজন কর কৃষ্ণজী রে-এ—এ—এ—"

গানের চোটে ঘরখানা যেন কাঁপিতে লাগিল। পাছে বাড়ীর ভিতর আমার স্ত্রী গান শুনিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠেন, সেইজন্য তাড়াতাড়ি আমি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "ও জগাই, থাম, থাম,—গান-টান পরে শোনা যাবে অখন।"

জগাই গান থামাইয়া দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ওই ত দাদা! ওস্তাদ্‌জী তাইতেই বলেন, রসজ্ঞ শ্রোতা দুনিয়ায় বড়ই কম পাওয়া যায়। এই দেখ না, এমন খাসা টপ্পাখানা ধরা গেল, কোথায় সমের ঘরে মস্‌গুল হ'য়ে মাথা নেড়ে সায় দেবে, তা' সে সব চুলোয় গেল—অন্তরাটা ধর্‌তে না ধর্‌তে তুমি কিনা আমাকে থামিয়ে দিলে! আরে ছ্যাঃ—ছ্যাঃ!"

জগাই সিগারেটে একটা দমভোর্ টান্ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে জড়িতস্বরে বলিল, "তুমি বোধ হয় পদ্য-টদ্য পড়ো না? এবার থেকে পড়্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। নইলে রসবোধ হবে না।"

আমি যে অরসিক নই, এটা প্রমাণিত করিতে গেলে, পাছে জগাইচাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া আবার 'কৃষ্ণ জিরে'র গান ধরিয়া বসে, সেই ভয়ে এ অপবাদ আমি মাথা পাতিয়া লইলাম।

আরও দু'-চারিটা কথার পর জগাই সেদিনকার মত বিদায় লইল। যাইবার আগে সে আর একবার আমার সিগারেটের তারিফ্ করিতে করিতে বেশ সপ্রতিভভাবেই কৌটা হইতে গোটা-কুড়ি ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেট লইয়া টপাটপ পকেটে পূরিয়া ফেলিল। তাহার এই সপ্রতিভ ভাবটাও খুব শিষ্ট না হইলেও আমার বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল; কিন্তু যতই মিষ্ট লাগুক্, এটা ঠিক যে, তা'র পরদিন হইতে আমি টেবিলের উপরে দামী ইজিপ্‌সিয়ান সিগারেটের বদলে হাওয়াগাড়ী সিগারেটের কৌটা রাখিয়া দিতাম।

কিন্তু জগাইচাঁদের অসাধারণ উৎসাহ তাহাতেও কিছুমাত্র দমিয়া যায় নাই; প্রতিদিন সে অন্ততঃ গোটা দশ-বারো সিগারেট না পুড়াইয়া ও গোটা পনর না পকেটস্থ করিয়া কোনদিন আমার ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া যাইত না।

খ

হ্যাঁ,—বাস্তবিক, জগাই আমাদের বেড়ে লোক। ছুটির একঘেয়ে দিনগুলা তাহাকে লইয়া হাসি-খুসিতে গোলে-হরিবোলে দিব্য একরকমে কাটিয়া যাইত।

তাহার কথাবার্ত্তার ভিতরে আমি একটা বিশেষত্ব সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতাম। যখন-তখন সে তাহার স্ত্রীর কথা পাড়িত ও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই জগাই সে কথাগুলা বলিত। সে যে তা'র স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসে, এটা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম।

মধ্যে জগাই একদিন আমাকে তা'র বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। লোকের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া হাঁ করিয়া লুচির আশায় বসিয়া থাকাটা আমি আদোপেই ভালবাসিতাম না; কিন্তু জগাই পাছে মনে করে যে, সে গরীব বলিয়াই আমি তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইতে নারাজ, সেই ভয়ে তাহার কথা ঠেলিতে পারিলাম না।

জগাই খাবারের বন্দোবস্ত বড় মন্দ করে নাই। তাহার স্ত্রীর রান্নাও বেশ হইয়াছিল।

খাইতে বসিয়া দেখিলাম, একটি গৌরাঙ্গী মহিলা আমাকে পরিবেশন করিতেছেন।

জগাই আমার স্রমুখেই, মেঝের উপরে উবু হইয়া বসিয়াছিল। মহিলাটি ঘরে আসিবামাত্র জগাই উচ্চকণ্ঠে বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, এস, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমাকে ইণ্ট্রডিউস্ করে' দি। ইনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী শ্রীমতী কমলা দাসী,—আর, ওগো! শুন্‌চো? ইনি হচ্চেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন—আমার গ্লাশ-ফ্রেণ্ড না হ'লেও ক্লাশ-ফ্রেণ্ড। ওকি, মুখে ঘোমটা কেন? পূর্ণর সাম্‌নে ঘোমটা! অ্যাঁঃ—বল কি! খোল, খোল—ঘোমটা খোল।"

মহিলাটি মুখের ঘোমটা আরও বেশী করিয়া টানিয়া, সলজ্জ, ত্রস্তপদে তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আমিও লজ্জায় অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলাম।

খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে পর বিদায় লইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময়ে জগাই আমার হাত ধরিয়া বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, তুমি কি আমার ওপর রাগ করে'চ?"

আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "রাগ! কেন?"

জগাই বলিল, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করে' দেবার সময়ে যে কথাগুলো বলে'ছিলাম,—সেইজন্যে? আমার স্ত্রী বল্‌লে, আমি নাকি ভারি অসভ্য ব্যবহার করে'চি আর তুমি তা'ই চটে' গিয়েছ। সে বল্‌লে, তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, না, আর ক্ষমা চাইতে হবে না,—আমি রাগ করি নি।"

গ

সেদিন জগাই হঠাৎ আসিয়া আমাকে বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, আমার একটা উপকার কর্‌তে হবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি উপকার?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া জগাই বলিল, "যদি—যদি আমাকে কুড়িটা টাকা ধার দাও! আমি তিনদিনের ভেতরে নিশ্চয় শোধ কর্‌ব। দেবে ভাই?"

তাহাকে কুড়িটা টাকা দিলাম। সে আমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

জগাই 'অগস্ত্য-যাত্রা' করিয়াছে। তিনদিনের ভিতরে টাকা শোধ করিবে বলিয়া সেই-যে সে চলিয়া গিয়াছে, আর তাহার টিকিটি পর্য্যন্ত দেখিবার যো নাই। অবশ্য, টাকার জন্য আমি

ব্যস্ত নই; কিন্তু জগাইয়ের অভাবে আমার দিনগুলা ভগ্নচক্র শকটের মত স্তম্ভিত হইয়া আছে, সময় আর কাটিতেই চাহে না। এই জন্যই বন্ধু বান্ধবকে টাকা ধার দিতে নাই; তা'তে টাকাও পাওয়া যায় না, বন্ধুত্বও থাকে না।

প্রায় কুড়িদিন কাটিয়া গিয়াছে। আমি জগাইয়ের আশা-ভরসা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছি। এক-একবার মনে করিয়াছি, জগাইয়ের বাড়ীতে গিয়া খোঁজ লইয়া আসি, কিন্তু পাছে সে ভাবিয়া বসে যে, আমি তাগাদা করিবার জন্য তাহার খোঁজ লইতেছি, সেই ভয়ে তাহার বাড়ীতে যাওয়াও আর ঘটিয়া উঠিল না।

কিন্তু, ইহার ভিতরে জগাই নিজেই একদিন আসিয়া হাজির।

আমি বলিলাম, "কি হে জগাই, একেবারে ডুমুরের ফুল হ'য়ে উঠে'চ যে!"

জগাই বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, আমি এখন আবার বিজ্‌নেস্‌ম্যান অর্থাৎ মাতৃভাষায়, কাজের লোক হ'য়ে উঠে'চি। আমার সময় এখন মূল্যবান্।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বল কি! 'অদ্ভুত দন্তমঞ্জন' ফের্ বাজারে চল্‌ছে নাকি?"

"আরে ছেৎ! 'অদ্ভুত দন্তমঞ্জনে'র নিকুচি করে'ছে! মাই ডিয়ার পূর্ণ, সে সব কিছু নয়—আমি এখন দালালী-ব্যবসা ধরে'চি।"

দালালীর গুপ্তরহস্য-সম্বন্ধে জগাইচাঁদ লম্বা এক বক্তৃতা ফাঁদিয়া বসিল, আমি চুপচাপ শুনিয়া যাইতে লাগিলাম।

বক্তৃতা শেষ করিয়া জগাইচাঁদ উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট হাত্‌ড়াইয়া একখানা নোট বাহির করিয়া জগাই বলিল, "মাই ডিয়ার পূর্ণ, তোমার টাকা কুড়িটা নাও। বিজ্‌নেসে বড় ব্যস্ত ছিলাম বলে' এদিকে আস্‌তে পারি নি, তোমার টাকাগুলোও সেইজন্যে আর দেওয়া হয় নি, কিছু মনে কর' না ডিয়ার!"

নোটখানা লইয়া আমি ব্যাগের ভিতরে রাখিয়া দিলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জগাই বলিল, "পূর্ণ, তোমাকে আর একটা কথা বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌চি, কিন্তু বল্‌তে পার্‌চি না।"

"কেন?

"পাছে তুমি কিছু মনে কর।"

"মনে আবার কর্‌ব কি? বল।"

"মাইডিয়ার পূর্ণ, আমার স্ত্রী আজ এক জায়গায় নিমন্ত্রণে যাবে, যদি একছড়া হার দাও, তা'হলে ভারি উপকার হয়। তা'র হারছড়া ছিঁড়ে গেছে। আজ নিয়ে যাব, কাল্‌কেই ফিরিয়ে দেব।"

জগাইয়ের আজকের প্রার্থনাটা আমার কাছে ভারি বেস্রুরো ঠেকিল; কিন্তু কি আর করি, চক্ষুলজ্জার খাতিরে মনে মনে বিরক্ত হইয়াও বাড়ীর ভিতরে গেলাম। পত্নীর কাছ থেকে তাঁহার হারছড়া চাহিয়া জগাইকে আনিয়া দিলাম।

গ

পরদিন বৈকালে কতকগুলা জিনিষ কিনিতে 'মিউনিসিপাল মার্কেটে' গিয়াছিলাম।

জিনিষ-পত্র কেনা হইয়া গেল। আমার কাছে খুচ্‌রা টাকা ছিল না, ব্যাগের ভিতর হইতে জগাইয়ের-দেওয়া নোটখানা বাহির করিয়া দোকানদারকে বলিলাম, "টাকা ভাঙ্গাতে হবে।"

দোকানদার নোটখানা আমার হাত হইতে লইয়া বিস্ফারিত চোখে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। তা'রপর আমার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "কি ম'শয়, এ সব জোচ্চুরী কতদিন শিখে'চেন?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভ্রূ-সঙ্কোচ করিয়া বলিলাম, "কি বল্‌লে?"

"ওঃ! বাবু যে একেবারে আকাশ থেকে পড়্‌লেন দেখ্‌চি! আমি হচ্চি লালু মিঞা, আমার কাছে এসেছ জাল-নোট চালাতে! পাজী, ত্যাঁদড়্ কোথাকার।"

"কি বল্‌ছিস্ উল্লুক?"

"চুপ রহো! ওরে, পুলিস ডাক্ ত!"

আমার চারিদিকে লোক জড় হইল। লজ্জায়, অপমানে যেন আমার মাথাকাটা গেল। নোটখানা দেখিয়া বুঝিলাম, দোকানদারের কথা মিথ্যা নয়।

বেগতিক দেখিয়া আমি নরম হইয়া বলিলাম, "দেখ, আমি জান্‌তুম না যে, নোটখানা জাল। আর একজন আমাকে এখানা দিয়েচে।"

দোকানদার গরম হইয়া বলিল, "হুঁ হুঁ চাঁদ! পথে এস! আমি হলুম লালু মিঞা, আমার কাছে এসেছ জাল-নোট চালাতে! ওরে পুলিস ডাক্ ত!"

কোনরকমে তাহাদের হাত হইতে ছাড়ান্ পাইয়া আমি সেখান হইতে মানে মানে সরিয়া পড়িলাম।

ওঃ! সে সময়ে যদি একবার জগাইয়ের দেখা পাইতাম!

পিছনে বাজারসুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল। দোকানদার গলা চড়াইয়া তখনও বারংবার গর্জ্জন করিতেছে, "আমি হলুম লালু মিঞা, আমার কাছে এসেছ জাল-নোট চালাতে! ওরে, পুলিস ডাক্ ত!"

ঘ

জগাই কোথায়?

বাজারের সেই ব্যাপারের পরে একমাস কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু জগাইয়ের দেখা নাই।

আমি তা'কে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম—এমন কি, তাহার বাড়ীতে পর্য্যন্ত গিয়াছি; কিন্তু, সে বাড়ী ছাড়িয়া জগাই যে সপরিবারে কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, কেহ তাহা জানে না।

বাড়ীওয়ালা আমাকে বলিল, "মশাই, সে আমার পাঁচমাসের ভাড়া দেয় নি। তা'র সঙ্গে যদি আপনার দেখা হয়, তা'হলে বলে' দেবেন, একবার যদি তা'র টিকিটি দেখ্‌তে পাই, তবে হয় তা'র মাথা নয় পাঁচমাসের ভাড়া না নিয়ে আর ছেড়ে দেব না। আমরা পাঁচপুরুষ কল্‌কাতা-সহরের বাড়ীওলা—আমাকেই ফাঁকি—অ্যাঁ! হয় ভাড়ার টাকা, নয় মাথা—একটা কিছু নেবই নেব,—বুঝে'চেন?"

বুঝিলাম, জগাইয়ের দেখা ত আর পাইবই না—সেইসঙ্গে আমার দামী সোণার হারছড়াও জন্মের মত গেল। জগাইয়ের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলাম বলিয়া এখন আমি মনে মনে অনুতপ্ত হইলাম। ওঃ! তা'র জন্যে সেদিন দশজনের সাম্‌নে কি অপমানিতই হইয়াছিলাম! আর একটু হইলেই হাতে হাতকড়ি পড়িত! ইচ্ছা ছিল, জগাইকে ধরিয়া সে অপমানের প্রতিশোধ লইব; কিন্তু মনের রাগ মনেই চাপিয়া গুম্‌রাইতে গুম্‌রাইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

* * * * *

আমার ছুটি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। সেদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি, এমন সময়ে খানিক তফাতে একটা লোককে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম!

কে ও? জগাই না! হ্যাঁ—তা'ই ত!

আমি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া একেবারে তাহার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্র জগাইয়ের মুখ ভয়ে কালিপানা হইয়া গেল। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "কি জগাই, চিন্‌তে পার্‌চ?"

জগাই থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ঢোক্ গিলিয়া বলিল, "কে মশাই, আপনি?"

আমি কঠোরস্বরে বলিলাম, "বটে! তুমি আমাকে চেন না—না?"

জগাই বলিল, "পথ ছাড়ুন মশাই, পথ ছাড়ুন। রাস্তার মাঝখানে আর অসভ্যতা কর্‌বেন না।"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না—তাহার মুখে সজোরে এক চড়্ বসাইয়া দিয়া বলিলাম, "নির্লজ্জ, চোর, জালিয়াত! দে, আমার হার দে।"

চড়্ খাইয়া জগাই ষাঁড়ের মত চেঁচাইয়া উঠিল। "পাহারাওলা, আমায় খুন কর্‌লে—পাহারাওলা, পাহারাওলা!"—বলিতে বলিতে সে ছুটিল। আমিও ছাড়িলাম না—তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। রাস্তার অনেক লোকও মজা দেখিতে আমাদের অনুসরণ করিল।

জগাই, ছুটিতে ছুটিতে হঠাৎ একটা বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঢুকিলাম।

জগাই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে গেল; কিন্তু হোঁচট্ খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল। আমি একেবারে তাহাকে মাটীর সঙ্গে চাপিয়া ধরিলাম।

জগাই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "খুন কর্‌লে, খুন কর্‌লে!"

গোলমালে একজন লালপাগড়ীও বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া বলিল, "কি হ'য়েচে বাবু?"

জগাই বলিল, "ও পাহারাওলা-জি, আমাকে বাঁচাও! এই হতভাগা গুণ্ডা আমাকে মেরে ফেল্লে!"

রাগে অজ্ঞান হইয়া আমি বলিলাম, "ষ্টুপিড্, আবার গালাগালি!"—আমি ঘুসি তুলিলাম।

হঠাৎ পিছন হইতে কে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। ফিরিয়া দেখি, একজন স্ত্রীলোক।

তাঁহার মাথার কাপড় খুলিয়া গিয়াছে, একরাশ এলোমেলো চুল কাঁধে-বুকে এলাইয়া পড়িয়াছে, মুখে-চোখে ভীতা হরিণীর মত অসহায়, কাতর ভাব!

আমার হাত অসাড় হইয়া পড়িয়া গেল।

মহিলাটি মিনতি-মাখা স্বরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইনি আমার—ইনি আমার স্বামী। এঁকে আপনি মার্‌চেন কেন?"

জগাইয়ের স্ত্রী? এত সুন্দরী!

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, "আপনার স্বামীর জন্যে আমি ভয়ানক অপমানিত হ'য়েচি। আপনার স্বামী আমার একছড়া হার নিয়ে এসে আর ফিরিয়ে দেয়নি। একে পুলিসে দেব।"

মহিলার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি জগাইয়ের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিলেন,—জগাই আস্তে আস্তে মাথা হেঁট করিল।

রমণী আবার আমার দিকে তাকাইলেন। সে চোখ কি ব্যথাভরা!

তিনি একবার পাহারাওয়ালার দিকে, ভিড়ের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দেহ লজ্জা-ভয়ে যেন কাঁপিয়া উঠিল। তা'রপর তিনি হঠাৎ গলা হইতে একছড়া হার খুলিয়া, আমার সুমুখে ধরিয়া বলিলেন, "আমার এই একছড়া হার আছে। আমাদের ঘরে আর হার নেই। এ হার কি আপনার?"

হ্যাঁ—এ হার ত আমারই বটে! আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম; কিন্তু তাঁহার চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলাম। সে চোখ যেন কথা কহিতেছিল, সে চোখ যেন বলিতেছিল, "ওগো, আমার স্বামীকে বাঁচাও,—ওগো আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

আমি কি বলিব?

রমণী আবার বলিলেন, "এ হার কি—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "না, এ হার আমার নয়—মাপ করুন, মাপ করুন—আমার ভুল হ'য়েচে।"

রমণী মাথায় ঘোমটা টানিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

জগাই, লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "শুন্‌লে ত পাহারাওলা-সায়েব, শুন্‌লে ত সব? মিছামিছি আমায় কি নাকালটাই কর্‌লে! আচ্ছা বাবা, ভগবান্ আছেন।"

৬

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, "বোঝা গেছে, ওরা স্বামী-স্ত্রীতে জোচ্চোর! সুন্দর মুখ দেখে' ভুলে' যাওয়াটা ঠিক হয় নি।"—এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া আমার হাতে একটা মোড়ক দিয়া দাঁড়াইল।

একটু বিস্মিত হইয়া মোড়কটা খুলিলাম। ভিতরে আমার সেই হারছড়া আর একখানা চিঠি। চিঠিখানা পড়িলাম ঃ—

"আমার স্বামীর অনেক দোষ,—কিন্তু তিনি আমাকে ভালবাসেন।

"আমি সামান্য স্ত্রীলোক,—তাঁ'কে একদিন বলে'ছিলাম, তুমি আমাকে ভালবাস না। ভালবাস্‌লে, আমাকে অন্ততঃ একখানা গয়নাও দিতে।

"তা'র পরের দিন তিনি আমাকে একছড়া হার এনে দিয়ে বল্লেন, 'একজন বেচ্‌তে চাচ্ছিল, তোমার জন্যে কিনে আন্‌লুম।'—তখন আমার একটু আশ্চর্য্য হ'লেও, আমি সন্দেহ করি নি।

"ভগবান্ আপনার মঙ্গল কর্‌বেন,—আপনি আমার স্বামীকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

"লজ্জাহীনাকে ক্ষমা কর্‌বেন, আপনার হার ফিরিয়ে দিলাম।"

আমার চোখের সুমুখে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী-প্রতিমা জাগিয়া উঠিল।

হে দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ভারতীয় ভাষা

বাঙ্গালা-ভাষা।—গঙ্গার উত্তরে এই ভাষার পশ্চিম সীমা, পূর্ণিয়া-জিলার পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত মহানন্দনদী পর্য্যন্ত ইহা পশ্চিমে ব্যবহৃত।

গঙ্গার দক্ষিণে ইহা ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সিংভূমের অন্তর্গত ডালভূম ও মেদিনীপুর-জিলার অধিকাংশ স্থানেই এই ভাষা প্রচলিত। পূর্ব্বে ইহা আসাম-উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সীলেট্, কাছাড়, ময়মনসিংহ, ঢাকা, সুরমা-উপত্যকা ও গোয়ালপাড়া-জিলার অর্দ্ধভাগে ইহা প্রচলিত। আরও দক্ষিণে নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও আরাকান-প্রদেশে ইহা ব্যবহৃত।

লিখিত বাঙ্গালা-ভাষা ও কথিত বাঙ্গালা-ভাষার মধ্যে এত প্রভেদ দৃষ্ট হয় যে, এই দুইটীকে দুইটী পৃথক্ ভাষা বলিলেও দোষ হয় না।

বাঙ্গালা-ভাষার দুইটী প্রধান শাখা—একটী পশ্চিম-বঙ্গে ও অন্যটী পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রচলিত।

হুগলী, মেদিনীপুর, পূর্ণিয়া এবং রংপুরে যে সকল ভাষা ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রথম শাখার অন্তর্গত।

পশ্চিম-বঙ্গের ভাষার উপর বিহারী-ভাষার প্রভাব দৃষ্ট হয়। পূর্ণিয়াতে যে বাঙ্গালা-ভাষা প্রচলিত, তাহাতে মৈথিলী-বিহারী-ভাষার সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি, কাইথি-বর্ণমালাও ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্ব-বঙ্গে যে শাখা প্রচলিত, ঢাকা তাহার কেন্দ্রস্থল। ব্রহ্মপুত্র-নদের পশ্চিমে এ ভাষার আর প্রচলন নাই। রংপুর ও ইহার উত্তর এবং পূর্ব্বে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা "রাজবংশী" নামে খ্যাত। এই ভাষাটী যদিও দ্বিতীয় শাখা হইতে উৎপন্ন, তথাপি ইহাদের মধ্যে এত প্রভেদ দৃষ্ট হয় যে, ইহাকে একটী পৃথক্ ভাষা বলা যাইতে পারে।

দার্জিলিং তরাই-এ ইহার নাম "বাহী।"

খুলনা এবং যশোর-জিলায় পূর্ব্ব-বঙ্গে প্রচলিত বাঙ্গালা-ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং গাঙ্গেয় ডেল্‌টার সমগ্র পূর্ব্বার্দ্ধে ইহা দৃষ্ট হয়। এখান হইতে ইহা ত্রিপুরা, ঢাকা, ময়মনসিংহ শ্রীহট্ট ও কাছাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুরমা-উপত্যকা এবং ময়মনসিংহে অসভ্য জাতিগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত "হাঙোঙ্গে" নামে একটী ভাষা প্রচলিত আছে। ইহা বাঙ্গালা ও 'তিব্বতী-ব্রহ্ম'-ভাষাসমূহের সংমিশ্রণ। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বদিকে "চাক্‌মা" নামে একটী অদ্ভুত ভাষা প্রচলিত। ইহা চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জাতিকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী আকিয়াব-জিলাতে "ডেনজ্‌নেট্" নামে একটী ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহা একপ্রকার বিকৃত বাঙ্গালা-ভাষা।

এক্ষণে বাঙ্গালা-ভাষায় অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ যে প্রকারে উচ্চারিত হয়, সে সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা আবশ্যক। যে সময়ে সমগ্র ভারতে প্রাকৃত-ভাষা প্রচলিত ছিল, তৎকালে ভারতীয় আর্য্যগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত অনেকগুলি বর্ণ বা শব্দ উচ্চারণ করা কঠিন বোধ করিতেন। তাঁহারা যে ভাবে উচ্চারণ করিতেন, শব্দগুলির বানানও সেই প্রকার হইত। "লক্ষ্মীর" "ক্ষ্মী" উচ্চারণ করিতে তাঁহারা কষ্টবোধ করিতেন, এজন্য "ক্ষ্মী"এর পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র "ক্ষী" ব্যবহার করিতেন এবং "লক্ষ্মী" শব্দ "লক্ষী"র মত উচ্চারণ করিতেন। অন্নকে তাঁহারা "ভক্ত" বলিতে পারিতেন না, "ক্ত" উঠাইয়া দিয়া "ত" ব্যবহার করিতেন। "ভক্ত"কে "ভাত" বলিতেন। তাঁহারা "স্" (s) উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, s বা স্ বলিতে তাঁহারা ষ্ বা sh বলিতেন। হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভাবে উচ্চারণ করিতেন, বাঙ্গালীগণ এখনও সেই প্রকার উচ্চারণ করেন। তবে লিখিবার সময় সংস্কৃত শব্দের বানান-বিকৃতি করেন না। এজন্য লিখিত ও পঠিত বাঙ্গালার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-ভাষার সাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর এই ভাষার সাহিত্যে একটী নূতন তরঙ্গের আবির্ভাব হয় এবং সেই সময় হইতে ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ইংরেজি ধরণে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও লোকপ্রিয় গ্রন্থ এই ভাষায় রচিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই ভাষার আদি কবি। ইঁহারা কাব্যে ও বর্ণনা-মাধুর্য্যে যথেষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

আসামী।—আসামী-ভাষা আসাম-উপত্যকাতেই প্রচলিত। পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জিলায় ইহা বাঙ্গালার সহিত মিলিত হইয়াছে। অন্য তিনদিকে ইহা ইণ্ডো-চাইনিজ্-ভাষাসমূহদ্বারা পরিবেষ্টিত। আসামী-ভাষার উপর এই ভাষাসমূহের বেশী প্রভাব দৃষ্ট হয় না। কতকগুলি শব্দ ইহাদের নিকট হইতে আসামী-ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে মাত্র।

মণিপুরে "ময়ঙ্গ"-ভাষা প্রচলিত। পণ্ডিতদিগের মতে এই ভাষাটী আসামী-ভাষার অন্তর্গত। কারণ, আসামী-ভাষার কতকগুলি বিশেষত্ব এই ভাষায় দৃষ্ট হয়। গারো শৈলশ্রেণীর নিম্নে "ঝারওয়া" নামক একপ্রকার ভাষা প্রচলিত আছে। ইহা বাঙ্গালা, গারো ও আসামী ভাষার সংমিশ্রণ!

আসামী-ভাষা, বাঙ্গালা-ভাষার একটী শাখা কি না, এই লইয়া মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল। কলিকাতার পণ্ডিতগণের মতে, আসামী-ভাষা বাঙ্গালা-ভাষারই একটী শাখা। বাঙ্গালা ও আসামী-ব্যাকরণের মধ্যে যদিও বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি ঐ ভাষার সাহিত্যাদি পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইহা একটী স্বাধীন জাতির স্বাধীনভাবে উৎপন্ন ভাষা।

উচ্চারণ-সম্বন্ধে, আসামী ও বাঙ্গালা-ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

আসামী-ভাষায় "অ", "ও"র ন্যায় উচ্চারিত হয়। হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরবর্ণের মধ্যে বেশী ব্যবধান নাই; দন্ত্যবর্ণ ও মূর্দ্ধণ্য বর্ণের উচ্চারণ-সম্বন্ধে অল্পই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। উভয়ই অর্দ্ধ-মূর্দ্ধণ্য বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। "চ"এর উচ্চারণ "স্"এর ন্যায় ও "ছ"এর উচ্চারণ "জ"এর ন্যায়।

আবার "স", "চ"এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। এই ভাষার বিশেষ্যের রূপ-করণ-প্রণালী প্রায় চলিত বাঙ্গালা-ভাষার ন্যায়। তবে ক্রিয়ার রূপ-করণ-সম্বন্ধে অনেকগুলি বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালা-ভাষা অপেক্ষা আসামী-ভাষায় "তৎসম" শব্দের সংখ্যা অনেক অল্প।

আসামীদের জাতীয় সাহিত্য যথেষ্ট আছে। ইহা তাহাদের একটী গর্ব্বের বিষয়, সন্দেহ নাই।

গত ছয় শত বৎসরের ইতিহাস, তাহারা সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। উক্ত ইতিহাসের যাথার্থ্যের উপর নির্ভর করিতে পারা যায়।

আসামী ভাষার বর্ণমালা প্রায় বাঙ্গালা-ভাষার ন্যায়। শ্রীশঙ্কর

দেব এই ভাষার একজন খ্যাতনামা কবি। তিনি চারিশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূরবী-হিন্দী।—আমরা এক্ষণে পূরবী-হিন্দী-সম্বন্ধে কিছু পরিচয় প্রদান করিব। ইহা জৈনগণের পবিত্র ভাষা। মহাবীর এই ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।

পূরবী-হিন্দীর তিনটী শাখা। যথা, আওয়াদী, বঘেলী ও ছত্তিসঘরী। এই ভাষা অযোধ্যা, আগ্রা, বঘেলখণ্ড, বুন্দেলখণ্ড, ছোটনাগপুর ও মধ্য-প্রদেশ, এই ছয়টী প্রদেশে ব্যাপ্ত। ফইজাবাদের কিয়দংশ ব্যতীত সমস্ত অযোধ্যাতে এই ভাষা প্রচলিত।

যুক্ত-প্রদেশে, বেনারসে ও হামিরপুরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহা বঘেলখণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচলিত। বুন্দেলখণ্ডের উত্তর-পূর্ব্বে, মিরজাপুরের কতকাংশে, চঙ্গ-ভাকর, শিরগুজা, উদয়পুর, কোরিয়া ও ছোটনাগপুরস্থ জামপুরের কতকাংশে এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। মধ্য-প্রদেশ, জব্বলপুর, মাণ্ডলা এবং ছত্তিসগঢ়ী ও তৎ-সংযুক্ত করদ-রাজ্য-সমূহে এই ভাষা প্রচলিত।

পূরবী-হিন্দীর তিনটী শাখার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বঘেলী-ভাষা ও আওয়াদী-ভাষার মধ্যে যৎ-সামান্য পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ছত্তিসগঢ়ী, নিকটবর্ত্তী মারাঠী ও ওড়িয়া-ভাষার প্রভাববশতঃ একটু বেশী পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আওয়াদীর সহিত ইহার নিকট-সম্বন্ধ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

আওয়াদী।—বাঘলী-ভাষা যুক্ত-প্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড, বাঘলখণ্ড, চঙ্গ-ভাকর, জব্বলপুর এবং মাণ্ডলা প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। ছত্তিসগঢ়ী,—উদয়পুর, কোরিয়া, শিরগুজা,জামপুর ও ছত্তিসগঢ়ের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত।

যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্বে ও বিহারের অধিকাংশ স্থলে আওয়াদী-ভাষা প্রচলিত।

পূরবী-হিন্দী, উত্তরে নেপাল ও হিমালয়স্থ পার্ব্বত্য ভাষাসমূহ-দ্বারা বেষ্টিত। ইহার পশ্চিমে, কনৌজী, বুন্দেলী প্রভৃতি পশ্চিমী-হিন্দীর শাখা প্রচলিত। ইহার পূর্ব্বে, ভোজপুরী ও ওড়িয়া-ভাষা প্রচলিত। দক্ষিণে ইহা মারাঠী-ভাষাদ্বারা বেষ্টিত।

পূরবী-হিন্দীর সহিত অন্যান্য ভাষার সম্বন্ধ।—উচ্চারণ-সম্বন্ধে পূরবী-হিন্দী, পশ্চিমী-হিন্দীর অনুকরণ করে; কিন্তু ইহার বিশেষ্যের রূপ-করণ-প্রণালী অনেকটা বিহারী-ভাষার ন্যায়। সর্ব্বনামের রূপ-করণ-বিষয়েও ইহা পূর্ব্বদিকস্থ ভাষাসমূহের অনুকরণ করে।

কিন্তু ক্রিয়ার রূপ-করন-সম্বন্ধে ইহা বিহারী ও পশ্চিমী-হিন্দীর মধ্যবর্ত্তী প্রণালী অবলম্বন করে। যথা ইংরেজি "str.ck" বুঝাইতে হইলে পশ্চিমী-হিন্দীতে "মারা" বা "মারিয়া" বলিতে হয়। বিহারীতে "মারি না" বলিতে হয়। "II s ruck" বুঝাইতে হইলে, বিহারী-ভাষায় "মারিলাস্" বলিতে হয়। "স্" বা "ঽ"ও ক্রিয়ার শেষে যোগ করিতে হয়; কিন্তু পূরবী-হিন্দীতে উহা বুঝাইতে হইলে "মারিয়াস্" বলিতে হয়; অতএব দেখা যাইতেছে যে, পূরবী-হিন্দী, পশ্চিম-হিন্দীর ক্রিয়া "মারিয়া" লইয়া, তাহাতে বিহারী-ভাষার "স্" যোগ করিয়া "মারিয়াস্" করিয়াছে।

আওয়াদী-সাহিত্য।—আওয়াদী ও বঘেলী-ভাষার যথেষ্ট সাহিত্যিক উন্নতি হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা আওয়াদী-ভাষারই বেশী উন্নতি হইয়াছে। মালিক মহম্মদ (১৫৪০খৃঃ) এই ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন কবি। তিনি "পদ্মাবতী" নামক একখানি সুন্দর মহাকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তুলসীদাস জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রতিভাবান্ কবি ও সংস্কারক ছিলেন। তুলসীদাসের পরিচয় বিশেষ করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। সমগ্র উত্তর-ভারতে তিনি যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার রচিত রামায়ণ ও দোঁহাবলী, ভগলপুর হইতে পাঞ্জাব ও হিমালয় হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে ধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার দ্বারাই আওয়াদী-ভাষা অধিকদূর বিস্তৃত হইয়াছিল।

বঘেলী-ভাষাতে যথেষ্ট গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। রেওয়ার রাজার আনুকূল্যে ইহার সাহিত্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে আভ্যন্তরীণ ভাষাসমূহের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

এই ভাষাগুলিকে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়—একটী পশ্চিমী ও একটী উত্তর-প্রদেশস্থ।

পশ্চিমী-হিন্দী, রাজস্থানী, গুজরাটী ও পাঞ্জাবী প্রথমটীর অন্তর্গত।

পশ্চিমী-হিন্দী।—সিরহিজ হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্রদেশে পশ্চিমী-হিন্দী প্রচলিত।

উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে যমুনা-নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত এই ভাষা বিস্তৃত। এই ভাষার আবার কতকগুলি শাখা আছে। ইহাদের মধ্যে হিন্দুস্থানী, ব্রজ-ভাষা, কনৌজ ও বুন্দেলী প্রধান এবং এইসঙ্গে পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ বাঁঝে-ভাষারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ব্রজ-ভাষা দিল্লী হইতে এটোয়া পর্য্যন্ত প্রদেশে প্রচলিত। মথুরার চতুঃপার্শ্বেই ইহা প্রধানতঃ কথিত হয়। ভরতপুর, করৌলী ও গোয়ালিয়র-রাজ্যেও ইহা প্রচলিত। দক্ষিণে ও পশ্চিমে ইহা রাজস্থানী-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে।

অন্ধ সুরদাস এই ভাষার প্রধান কবি। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তুলসীদাস যেমন রামের গীত গায়িয়াছিলেন, সুরদাস সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গীত গায়িয়াছিলেন।

কনৌজি।—কনৌজী-ভাষা নিম্নদোয়ারে প্রচলিত। ইহা এটোয়া হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গঙ্গার ধার দিয়া ইহা হায়দর এবং উনাওএর কিয়দংশে প্রচলিত হইয়াছে। ব্রজ-ভাষার সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই ভাষার সাহিত্য অল্পই রচিত হইয়াছে।

বুন্দেলী।—এই ভাষা বুন্দেলখণ্ড, জলন্, হামিরপুর, ঝান্সী এবং গোয়ালিয়রের পূর্ব্বাংশে প্রচলিত। ইহা আরও নিকটস্থ ভোপাল, দামো, সগর, সিত্তনী, নরসিংপুর, হোসাঙ্গাবাদ ও মধ্য-প্রদেশের চিন্দ্ওয়াদা-বিভাগসমূহে প্রচলিত। এই ভাষার সাহিত্য অতি অল্প।

বুন্দেলী, কনৌজী ও ব্রজ-ভাষা, এই তিনটীর পরস্পর খুব নিকট-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।

হিন্দুস্থানী।—এই ভাষা পশ্চিমী-হিন্দীর একটী শাখা। ইহার ব্যাকরণ পশ্চিমী-হিন্দীর ন্যায়। মিরাট্ ও মিরাটের উত্তরে এই ভাষা অতি বিশুদ্ধভাবে কথিত হয়। রোহিলখণ্ডে ইহা ক্রমশঃ কনৌজী-ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে এবং আম্বালাতে পঞ্জাবী-ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের অবশিষ্টাংশে বাঙ্গালা-ভাষা প্রচলিত। গুরগাঁওয়ে হিন্দুস্থানী-ভাষা ব্রজ-ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে।

হিন্দুস্থানী-ভাষা কয়েক প্রকার বিভিন্ন আকার ধারণ করি-

য়াছে। তাহাদের মধ্যে উর্দ্দূ, রেখ্তা, দক্ষিণী এবং হিন্দী এই চারিটী উল্লেখযোগ্য।

উর্দ্দূ ভাষা।—ইহা পশ্চিম-হিন্দুস্থানের মুসলমান ও হিন্দুকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়। এই ভাষায় ফার্শী ও আরবী শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এই ভাষার বর্ণমালা, ফার্শী। এই ভাষা মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের দ্বারা প্রচলিত হয় নাই; পরন্তু হিন্দুগণের, তাহাদের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদের ভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা ও উৎসাহের ফলে এই উর্দ্দূ-ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। বিশুদ্ধ উর্দ্দূতে ফার্শী শব্দ-সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়।

রেখ্তা।—উর্দ্দূ, পদ্যে ব্যবহৃত হইলে যে আকার ধারণ করে, তাহাকে রেখ্তা বলা হয়।

দক্ষিণী।—দাক্ষিণাত্যের মুসলমানসমূহ যে প্রকার হিন্দুস্থানী বলেন, তাহা "দক্ষিণী" নামে অভিহিত। উর্দ্দূর ন্যায় ইহারও বর্ণমালা ফার্শী; কিন্তু ইহাতে ফার্শী-ভাষার তাদৃশ প্রভাব দৃষ্ট হয় না। এই ভাষা আজমির, বরোদা, বেরার, বম্বে, মধ্য-প্রদেশ, কোচিন, কুর্গ, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, মহীশূর, পাঞ্জাব ও ত্রিবাঙ্কুরে প্রচলিত।

হিন্দী।—এই শব্দটী নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা একটী ফার্শী শব্দ এবং ইহাদ্বারা "ভারতবর্ষের অধিবাসী" বুঝায়। ইহা 'হিন্দু' হইতে পৃথক্; কারণ "হিন্দু" বলিলে যাঁহারা মুসলমান নহেন, কেবল তাঁহাদিগকেই বুঝায়। অন্যদিকে য়ুরোপীয়গণ "হিন্দী" শব্দটী দুইটী বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহার করেন। প্রথমতঃ, ইঁহারা S ns-kritised অথবা Non-Persianis d Hindustaniকে "হিন্দী" বলেন। আবার বাঙ্গালা হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত স্থানে যে সমস্ত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহৃত হয়, তৎ-সমুদায়কেও তাঁহারা "হিন্দী" আখ্যা দান করেন। আমরা প্রথম অর্থেই "হিন্দী" শব্দের ব্যবহার করিয়াছি। সকল হিন্দু, উর্দ্দূ-ভাষা ব্যবহার করেন না, তাঁহারা পদ্যে ও সাহিত্যে এই হিন্দী ব্যবহার করেন। এক্ষণে আমরা তিনপ্রকার "হিন্দুস্থানী" ভাষা দেখিলাম। প্রথম—হিন্দুস্থানী বা Northern Doabএ প্রচলিত প্রধান ভাষা; দ্বিতীয়—উর্দ্দূ; তৃতীয়—হিন্দী।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই হিন্দুস্থানী-ভাষায় কথা বলিতে পারা যায় এবং ইহা ফার্শী ও দেবনাগরী-বর্ণমালায় লিখিত হয়। সাহিত্যে এই ভাষা ব্যবহৃত হইলে, ইহাতে ফার্শী বা সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। যে হিন্দুস্থানীতে ফার্শী শব্দ অত্যধিক ব্যবহৃত হয় এবং তজ্জন্য ফার্শী-বর্ণমালায় লিখিত হয়, তাহা "উর্দ্দূ" বলিয়া খ্যাত ও যাহাতে সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দৃষ্ট হয় ও দেবনাগরী-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, তাহা 'হিন্দী" বলিয়া খ্যাত।

সাহিত্য।—হিন্দুস্থানী-ভাষার প্রাচীন সাহিত্যাদি, উর্দ্দূ অথবা রেখ্তা-ভাষায় লিখিত।

খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে দাক্ষিণাত্যে ইহার চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং একশত বৎসর পরে আওরাঙ্গাবাদের ওয়ালির হস্তে ইহা অনেক উন্নত হয় ও একটী নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়। ওয়ালির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দিল্লীতে একজন কবির অভ্যুদয় হইল। ইঁহাদের মধ্যে সন্দ ও মীরতগি প্রধান। উর্দ্দূ-গদ্য-লেখক-গণের মধ্যে সম্ভবতঃ মহম্মদ হোসেন ও পণ্ডিত রতন মেটা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দী-ভাষায় কাশীর হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বপ্রধান লেখক।

রাজস্থানী।—এই ভাষা রাজস্থানে ব্যবহৃত হয়। মধ্য-ভারত, সিন্ধু-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্য-প্রদেশের নিকটস্থ স্থানসমূহেও এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে ইহা ক্রমশঃ বুন্দেলী-ভাষার সহিত মিশিয়াছে। উত্তরে ইহা ব্রজ-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে মারাঠী-ভাষার সহিত ইহার সংযোগ দৃষ্ট হয়; কিন্তু এই ভাষার সহিত মিশ্রিত হয় নাই। পশ্চিমে ইহা পাঞ্জাবী, লাণ্ডা ও সিন্ধি-ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

রাজস্থান, অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ও অনেকগুলি জাতির আবাসভূমি। এজন্য ইহাদের মধ্যে ভাষার বিভিন্নতা যথেষ্ট। একমাত্র জয়পুরেই পঞ্চদশ প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়। যাহা হউক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য না ধরিলেও, রাজস্থানী-ভাষার ষোড়শ প্রকার শাখা রাজস্থানে প্রচলিত। এই ষোড়শ প্রকার শাখাগুলিকে চারিটী প্রধান শাখায় বিভক্ত করিতে পারা যায়; যথা;—মেওয়ারী, মালবী, জয়পুরী ও মারওয়াড়ী। ইহা ব্যতীত বাগরী, নিমারী ও গুজরী, এই তিনটী ভাষাও উল্লেখ করিতে পারা যায়।

মেওয়ারী।—মেওয়ারী বা বিঘোটা উত্তর-পূর্ব্ব রাজপুতানায় ব্যবহৃত হয়। ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও নিকটস্থ প্রদেশেও ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে যে ভাষা প্রচলিত, তাহা এই ভাষারই রূপান্তর মাত্র।

মালবী।—মালবী-ভাষা ইন্দোরের চতুঃপার্শ্বস্থ মালব-দেশে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা আরও অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহা ভূপাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং বুন্দেলী-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। দক্ষিণে ইহা উদয়পুরের পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মধ্য-প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকেও এই ভাষা প্রচলিত। এই ভাষা ও মারওয়াড়ী-ভাষার সংমিশ্রণে 'রাঙ্গরী' নামক একপ্রকার ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা রাজ-পুতগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়।

নিমারী।—উত্তর-নিমার ও মধ্য ভারতের ভোপওয়ার প্রদেশে এই ভাষা (মালবী) খান্দেশী-ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া "নিমারী" নামক একটী নূতন ভাষার স্বষ্টি করিয়াছে।

জয়পুরী—ইহা পূর্ব্বে রাজপুতানাতে প্রচলিত।

মারওয়াড়ী।—রাজপুতানায় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে মারওয়াড়ী সর্ব্বপ্রধান। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং এই ভাষার জন-সংখ্যাও অধিক। পশ্চিম-রাজপুতানায় এবং মারওয়াড়, মিবার, বিকানীর, জসল্মীর প্রমুখ কয়টী বৃহৎ রাজ্যে এই ভাষা প্রচলিত। এই ভাষা অনেকগুলি আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "থালী" সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত। ইহা সিন্ধু-প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মারওয়াড়ী-ভাষা উদয়পুর-রাজ্যে প্রচলিত। বাগরী উত্তর-পূর্ব্ব বিকানীর ও পাঞ্জাবে বিস্তৃত।

সাহিত্য।—রাজস্থানে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র মারওয়াড়ী-ভাষাতেই বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রাচীন মারওয়াড়ী-ভাষায় অনেক কাব্য প্রণীত হইয়াছিল; সেগুলি এখনও উত্তমরূপে পঠিত হয় নাই।

চন্দবর্দ্দীকর্ত্তৃক রচিত 'পৃথ্বীরাজ রসো' নামক বিখ্যাত ইতিহাসের কেবল সামান্য অংশ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত রাজস্থানী-ভাষায় প্রভূত ধর্ম্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

রাজস্থানী-ভাষার সাহিত্যে দেবনাগরী-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়; কিন্তু চলিত ভাষায় "মহাজনী"-বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়। ইহা দেব-নাগরী-বর্ণমালা হইতেই উৎপন্ন; কিন্তু ইহা এত জড়িত ও অস্পষ্ট যে, লেখক ব্যতীত আর কেহই প্রায় তাহা বুঝিতে পারে না।

গুজরি।—গুজর বা গুর্জর জাতি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। ইহার দুইটী শাখা।

একটী উত্তরে ও একটী দক্ষিণে। দক্ষিণ শাখা "গুজরাট" অধিকার করিয়া ঐ প্রদেশকে তাহাদের নাম দিয়াছিল; উত্তর শাখা পাঞ্জাব ও যুক্ত-প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহারা ভ্রমণশীল জাতি এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই পাঞ্জাবের উত্তরস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে বিচরণ করিয়া বেড়ায়।

আমরা এক্ষণে Gipsy dialectএর অন্তর্ভুক্ত লাভানী-ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। লাভানী-ভাষা যদিও রাজস্থানী-ভাষা-শ্রেণী-ভুক্ত নহে, তথাপি ঐ ভাষার সহিত ইহার সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। লাভানী-ভাষা কখন' কখন' লাবানী, লামানী ও বনজারি নামেও কথিত হয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম-ভারতের ভ্রমণশীল জাতিকর্ত্তৃক এই ভাষা ব্যবহৃত হয়। এই ভাষা উত্তরে পাঞ্জাব-প্রদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। বনজারি-ভাষা পূর্ব্বে বিহার পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়।

গুজরাটী।—এই ভাষা গুজরাট, বরোদা ও নিকটস্থ দেশীয় রাজ্যসমূহে ব্যবহৃত হয়। ইহা দক্ষিণে দামান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে ইহা কচ্ছি-ভাষার মধ্য দিয়া সিন্ধী-ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। গুজরাটী-ভাষার শাখা দৃষ্ট হয় না; তবে স্থানানুসারে এই ভাষার একটু তারতম্য দৃষ্ট হয়। গুজরাটী ভাষা পশ্চিম-ভারতের একটী বাণিজ্যের (Commercial) ভাষা।

ভিলী ও খান্দেশী।—গুজরাটী-ভাষার অন্তর্ভুক্ত দুইটী ভাষা আছে। যথা, ভীল ও খান্দেশী বা অহিরাণী।

ভীল-ভাষা আজমীর এবং আবু পর্ব্বতের (Mount Abu) মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য দেশে ব্যবহৃত হয়। এখান হইতে আবার গুজরাট, রাজপুতানা ও মধ্য-ভারতের মধ্যবর্ত্তী দেশসমূহে এই ভাষা প্রচলিত। এখান হইতে দক্ষিণে সাতপুরা পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত এই ভাষা বিস্তৃত।

সাতপুরা পর্ব্বতের দক্ষিণে খান্দেশ অবস্থিত। এখানে খান্দেশী-ভাষা ব্যবহৃত হয়। ভীল ও খান্দেশী-ভাষাকে পূরবী-গুজরাটী বলা যাইতে পারে। আমরা যত দক্ষিণে অগ্রসর হই, ততই দেখিতে পাই যে, এই ভাষাগুলি মারাঠী-ভাষার সংস্পর্শে আসিয়াছে; কিন্তু ইহাদের গঠন-প্রণালীর উপর মারাঠী-ভাষার কোন প্রভাব দৃষ্ট হয় না। উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর-জেলার কোন কোন জাতি ভীল-ভাষা ব্যবহার করে। ইহারা "সিয়ালগিরি" নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ, তাহারা নিজের দেশ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা-দেশে আসিয়া বাস করিয়াছে। পাঞ্জাবে "রাওয়ারী" নামক এক জাতি বাস করে। তাহারা যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহা একপ্রকার ভিলী। এই ভাষা "রাওরী" নামে পরিচিত। ভীলগণকে মুণ্ডা-জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভীলগণ যে পূর্ব্বে মুণ্ডা-ভাষা ব্যবহার করিত, তাহা কখন' অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, তাহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ মুণ্ডা-ভাষা হইতে উৎপন্ন, এইরূপ প্রমাণিত হইয়াছে।

আমরা এমন কতকগুলি পুরাতন লিপি প্রাপ্ত হইয়াছি, যদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক গুজরাটী-ভাষা অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গুজরাটী-ভাষার যথেষ্ট সাহিত্য নাই। নরসিং মেটা এই ভাষার আদি কবি। তিনি খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে এই ভাষার অনেকগুলি কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার-সম্বন্ধেও অনেক লেখক গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে পুস্তকাদি লিখিবার সময় এই ভাষায় দেবনাগরী-বর্ণমালা ব্যবহৃত হইত; কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ কাইথি-বর্ণমালাই প্রচলিত। অধুনা পুস্তক ও পত্রিকাদি এই ভাষায় মুদ্রিত হয়।

পাঞ্জাবী।—লাণ্ডা-ভাষার পরিচয়-কালে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজস্থানী এবং গুজরাটী-ভাষার ন্যায় পাঞ্জাবী-ভাষাও একটী বিশুদ্ধ Central language নহে। আমরা যতই পশ্চিম দিকে অগ্রসর হই, ততই outer circleএর ভাষার সহিত এই ভাষার সাদৃশ্য এবং অবশেষে ইহা লাণ্ডা-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে, দেখিতে পাই।

পাঞ্জাবী-ভাষা (অর্থাৎ যাহা কেবল পাঞ্জাবে ব্যবহৃত হয়) দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমটী অমৃতসরের চতুঃপার্শ্বে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা মান্‌ঝ্ বা মধ্যাংশের পাঞ্জাবী বলিয়া পরিচিত; অন্যটী দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ মালব (ইহা মধ্য-ভারতের মালব নহে) প্রদেশে প্রচলিত মালওয়াই। পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে যে পাঞ্জাবী ব্যবহৃত হয়, তাহা "পোয়াধি" নামে পরিচিত। দক্ষিণে পাঞ্জাবী-ভাষা "বাগরী" নামক একপ্রকার মারওয়াড়ী-ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। জম্মু-প্রদেশে "ডোগ্‌রী" নামক একপ্রকার ভাষা প্রচলিত। ইহা মালওয়াই হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইহার বর্ণমালা কতকটা কাশ্মীরী-ভাষার বর্ণমালার ন্যায়। পাঞ্জাবী-ভাষার প্রাচীন সাহিত্য যৎ-সামান্য ছিল। অধুনা মুদ্রা-যন্ত্রের প্রচলন হওয়াতে সাহিত্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে।

নর্দার্ণ্ গ্রুপ্।—এই সংখ্যাভুক্ত ভাষাগুলির এখনও সম্পূর্ণরূপ অনুসন্ধান হয় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই সংখ্যা-ভুক্ত ভাষাগুলিকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়: যথা,—পশ্চিমী-পাহাড়ী, মধ্য-পাহাড়ী ও পূরবী-পাহাড়ী। এইগুলি হিমালয়ের নিম্ন-প্রদেশে (Lower Himalaya) ব্যবহৃত হয় এবং যাহারা এই ভাষা ব্যবহার করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন খাস-জাতির বংশধর।

পশ্চিমী-পাহাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহ।—ভাদারওয়া ও চম্বা হইতে আরম্ভ করিয়া সিরমূর পর্য্যন্ত সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে যে সকল ভাষা প্রচলিত, তাহা পশ্চিমী-পাহাড়ীর অন্তর্গত। এই প্রদেশে ত্রিশটির অধিক ভাষা প্রচলিত। তন্মধ্যে ভাদার-ওয়াই, পাঙ্গওয়ালী (ইহা চম্বা-প্রদেশের উত্তরে প্রচলিত), চম্বালী (ইহা অবশিষ্ট চম্বা-প্রদেশে প্রচলিত), কুলুহি (ইহা কুলু-প্রদেশে প্রচলিত) বা কাঁদ্বরী (ইহা কাঁদ্বরী-প্রদেশে প্রচলিত), সিরমাউরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চাম্বিয়ালী-ভাষার একটী পৃথক্ বর্ণমালা আছে। ইহা কতকটা কাশ্মীরী-ভাষার সারদা-বর্ণমালার ন্যায়।

মধ্য-পাহাড়ীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহ।—গারওয়াল, কুমাউন এবং পশ্চিম-নেপালে যে সমস্ত ভাষা ব্যবহৃত, তাহা মধ্য-পাহাড়ীর অন্তর্গত। ইহার তিনটী প্রধান শাখা আছে।

১। গারওয়ালী।—ইহা গারওয়াল ও মুসৌরীর চতুঃপার্শ্বে ব্যবহৃত হয়। ২। যউনসারি। ইহা ডেরাডুনের জৌন্সা প্রদেশে ব্যবহৃত হয়। ৩। কুমায়ুনী।—ইহা কুমায়ুন, নাইনিতাল ও পশ্চিম-নেপালে প্রচলিত। এই সমস্ত ভাষার সাহিত্য কিছুই নাই। পাহাড়ী-ভাষাসমূহের মধ্যে কেবল মধ্য পাহাড়ীরই রাজস্থানী-ভাষার সহিত অনেক স্থানে ঐক্য দৃষ্ট হয়।

পূরবী-পাহাড়ী।—ইহা সাধারণতঃ "নেপালী" নামে পরিচিত। নেপালের অধিবাসিগণ ইহাকে "খাস" বলে। ইহা "গোরক্ষিয়া" ও "পর্ব্বতীয়া" নামেও পরিচিত। এই ভাষার সাহিত্য যৎ-সামান্য। রামায়ণ এই ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য পাহাড়ী-ভাষার ন্যায় ইহারও রাজস্থানী-ভাষার সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই ভাষার শাখা-সম্বন্ধে আমরা অল্পই জানি। "দধি" বা "দহি" নামক এই ভাষার একটী শাখা নেপালের তেরাইএ ব্যবহৃত হয়।

শ্রী —

বর্ষায়

শ্রাবণ-শেষ সজল নভে মেঘ-কাজল আঁকিয়া
উদাসী ও কে দয়িত-পথ চাহিছে?
আগত ভরা বাদরে মাহ ভাদরে থাকি' থাকিয়া
বিলাপী প্রিয় বিরহ-গীতি গাহিছে?
কবে এ নব স্নিগ্ধ-ঘন-শ্যামল শোভা নেহারি'
নিবেদি'ছিল প্রেমিক এক সুর যে—
আজি ও তা'রি করুণ গীতি তরুণ ভাব বিথারি'
জগৎ-নর-নারীর প্রাণে ঝুরছে।

সেদিন প'ল মেঘের ছাপ মানব-মনে যেমনি
নিবিড় করি' প্রাণের ঘন কালোতে,
ফুটিল সেই আঁধার-পটে অমর প্রেম অমনি
দুঃখে সুখে মিশিয়া কালো আলোতে।
চিত্ত-পুরে নিত্য-সেবা চলিল সারা নিখিলে,
মিলন-সুখ শতোপচার বিলাসে—
পঙ্ক পাছে লাগিবে বলি' অতুল হ'য়ে ফিরিলে
রূপেরে ছাড়ি', ধ্যানের রূপ-পিয়াসে।

বরষা-মেঘে জন্ম-তিথি, বোধন যা'র বেদনে
প্রিয়াৎ প্রিয়তরের মহা ধেয়ানে—
শূন্য চিত-মন্দির এ রহিবে তবে কেমনে
হৃদয়-গেহ-নিষণ্ণার বিহনে!
বিপুল ডাকে গগন হাঁকে, "কোথায় প্রিয়, কোথা হে"—
বিজলী-জলা হেসে সে বলে—"এই যে",
বক্ষে চাপি' আজিকে যা'রে মিটেনা তৃষা-ব্যথা যে
আমারি সুধু সেজনা আজি নেই রে।

এস গো এস, কক্ষে এস, চক্ষে, চির-বক্ষে,
কত বা রবে অপেখি' হেন নিজনে?
আড়াল আজি রবে না কিছু, দিব না দ্বার কক্ষে—
জীবন-দেবি, এস গো তব ভবনে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আধ-মিনিটের গল্প

১

এক চোর এক দরবেশের মাথার টুপি চুরি করিয়া পলাইয়াছিল। দরবেশ তা'কে ধরিতে না পারিয়া শেষে গোরস্থানে গিয়া বসিয়া রহিল। রাস্তার লোকেরা তা'কে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, চোর যে আপনার টুপি নিয়ে সহরের দিকে পালিয়েছে, আপনি গোরস্থানে এসে বসে' রইলেন কেন?' দরবেশ তখন গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'যেখানেই যাক্ না বাপু, একদিন ত তা'কে এখানে আস্‌তেই হবে।'

২

এক বণিক্ তাঁ'র ভৃত্যকে হুকুম দিয়াছিলেন, "যদি কোনদিন আমি সকালে উঠি, আর তুই যদি দুটো কাক একসঙ্গে বসে' আছে দেখ্‌তে পাস্, তা' হ'লে আমাকে ডেকে তুলে দিস্, দুটো কাক এক-সঙ্গে দেখ্‌লে দিন বড় ভাল যায়।" আদেশমত ভৃত্য একদিন সকালে দু'টী কাক একত্র বসিয়া আছে দেখিয়া প্রভুকে শয্যা হইতে উঠাইতে গেল। বণিক্ শশব্যস্তে যখন শয্যা হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন একটী কাক উড়িয়া গিয়াছে। বণিক্ একটীমাত্র কাক দেখিয়া বিষম ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভৃত্যকে ধরিয়া নির্দ্দয় প্রহার করিতে লাগিলেন; কারণ, একটী কাক দেখা বড়ই অলক্ষণ। ইতিমধ্যে বণিকের এক বন্ধুর বাটী হইতে সওগাত আসিয়া উপস্থিত। সেই বন্ধু সম্প্রতি বাণিজ্য হইতে ফিরিয়াছেন। ভৃত্য তখন করজোড়ে প্রভুকে বলিল, "হুজুর, জোড়া কাক দেখে' আজ আপনার কাছে আমার কি দুর্দ্দশা-টাই না হ'ল! কিন্তু আপনি উঠে একটা কাক দেখ্‌লেন আর আপনার কত লাভ হ'ল! বলুন দেখি, ভাগিস্ দুটো কাক দেখেন্‌নি, তা'হ'লে ত আমার মতনই আপনার দুর্দ্দশা হ'ত!"

বণিক্ খুসি হইয়া ভৃত্যকে পুরস্কৃত করিলেন।

৩

একদিন এক বাদশাহ, সহরের একজন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত লোককে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি এই সহরের কাজী কর্‌তে চাই।"

তিনি সবিনয়ে বলিলেন, 'জাঁহাপনা, আমি এ কাজের যোগ্য নই।"

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

তিনি বলিলেন, "দেখুন, আমি যা' বল্লুম, যদি আপনি তা' বিশ্বাস করেন, তা' হ'লে ত আমাকে রেহাই দেওয়া উচিতই, আর যদি মনে করেন আমি মিথ্যা বলিছি, তা' হ'লেও আমাকে কাজী করা আপনার উচিত নয়; কারণ, মিথ্যাবাদীরা কাজী হবার সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

বাদশাহ প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে রেহাই দিলেন।

৪

একদিন এক গণৎকার রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি আর একবৎসর বাঁচ্‌বেন।"

এই কথা শুনিয়া অবধি রাজার মন ভারি খারাপ হইয়া গেল। তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। রাজার মন্ত্রী খুব বুদ্ধিমান্ লোক। তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া তখনই সেই গণৎকারকে রাজার সাম্‌নে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওহে জ্যোতিষী! তুমি নিজে আর কতদিন বাঁচ্‌বে?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "হুজুর! আমি আর দশবৎসর বাঁচ্‌ব।"

মন্ত্রী তলওয়ার খুলিয়া তখনই জ্যোতিষীকে কাটিয়া ফেলিলেন। রাজা তখন এই জ্যোতিষীর গণনা মিথ্যা বুঝিতে পারিয়া খুব খুসি হইলেন ও তাঁ'র বুদ্ধিমান্ মন্ত্রীকে প্রচুর পুরস্কার দিলেন।

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মৃত্যু

যৌবনে সে ছিল একটি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত গোলাপের মত। তাহার হাসিটুকুতেও সেই রূপ, সেই লাবণ্য।

এই সময়ে আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে ভালবাসিয়াছিলাম।

শুধু আমি নই, অনেকেই তাহাকে দেখিয়াছে, অনেকেরই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের কল্পিত আদর্শ-প্রতিমাটি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে।

এত রূপ যদি তাহার না থাকিত, তাহা হইলে হয় ত সে পৃথিবীর মধ্যে একটা সাদা-সিদা পথ ধরিয়া চলিতে পারিত; কিন্তু তাহা হইল না।

একদিন যৌবনের উন্মত্ত প্রেরণায় সে অধীর হইয়া পড়িল। সংসার তাহাকে গৃহের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিল না, একটা অন্ধ রজনীতে তাহাকে রাজ-পথে বাহির করিয়া দিল।

যে ছিল সঙ্গী, সে তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া এমন একস্থলে তাহাকে পরিত্যাগ করিল, যেখানে তাহার আত্মীয়-বন্ধু কেহই আসিতে পারে না।

আমাদের ভাবনা ও কথোপকথনের একটা বিষয় কমিয়া গেল। আমরা দিনকতক একটু ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম।

সে কি সুন্দর! কি রূপ তাহার! নয়নে কি দীপ্তি, মুখে কি লাবণ্য, সর্ব্বাঙ্গে কি মোহিনী আভা!

প্রথম তাহাকে যখন দেখি—তখন মনে করিয়াছিলাম—স্বর্গের ঊষা মর্ত্ত্যে নামিয়াছে।

আর একদিন তাহাকে দেখিলাম—সেদিনও বুঝি তাহার মুখে হাসি ছিল; কিন্তু সে হাসি আমি দেখিতে পারি নাই, আমার অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

কেহ তাহার কথা কহিলে আমি সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইতাম; তাহার কথা মনে পড়িলে এই পৃথিবী আমার কাছে একটা ঘৃণ্য পদার্থ বলিয়া মনে হইত।

আমি তাহাকে ঘৃণা করিতাম, কিন্তু ঘৃণা করিতে গিয়া আমার দুই চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া যাইত।

একদিন শুনিলাম—তাহার রোগ হইয়াছে।

রোগ? হয় হোক্; সে মরে—মরুক্; পৃথিবীর একটা কলঙ্ক ঘুচিয়া যাক্।

পরদিন শুনিলাম—সে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম; ভাবিলাম, এইবার সে নিশ্চয়ই মরিবে।

কিন্তু পরদিন একবার তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইল।

তখন শেষরাত্রি; আমি শয্যা হইতে উঠিলাম। তা'রপর চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে তাহার গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দ্বার অতিক্রম করিলাম—পতিতা রমণীর গৃহদ্বার, শরীর শিহরিয়া উঠিল। কেবল ফিরিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল; কিন্তু কেমন করিয়া সে ইচ্ছা দমন করিলাম বলিতে পারি না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকে খুঁজিতেছ?"

আমি তাহার নাম করিলাম।

সে বলিল, "চলিয়া যাও, সে মরিয়াছে।"

কথাটা শুনিয়া আমার অন্তর একটা তীব্র উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার মুখে বিশেষ কোন ব্যাকুলতার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

কম্পিত পদে উপরে উঠিলাম। আমার অনুরোধে তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল। উপরে উঠিয়া দেখিলাম,—সে একটা জীর্ণ খাটের উপর পড়িয়া আছে। তাহার আকৃতি আজ শুষ্ক গোলাপের মত।

না, না, শুষ্ক কেন? তাহার মুখের হাসিটি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত গোলাপের মত।

তখন প্রভাতের আলোক জানালা দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমে তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজও সে আমার কাছে সেইরূপই বোধ হইল। আজও মনে হইল, যেন স্বর্গের ঊষা মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে!

তাহার জীবনের সব কলঙ্ক আজ একজন মুছিয়া দিয়াছে।

"সে কে?"

"সে মৃত্যু।"

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি-পূজা কতদিনের?

বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছেন, "ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর,—বাঙ্গালা-দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা-প্রদেশে কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্ব-ব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণ-গীতি, সকল মুখে কৃষ্ণ-নাম, কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণ-নামাবলী, কাহারও গায়ে কৃষ্ণ-নামের ছাপ। কেহ কেহ কৃষ্ণ-নাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না। কেহ কৃষ্ণ-নাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোনরূপ লেখা-পড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে-কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধা-কৃষ্ণ" বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি। বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধা-কৃষ্ণ"-নাম শিখাই, কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্ব-ব্যাপক।"

এ কথাটা যথার্থ, তাহার উপর "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী" লক্ষ্মণরাজ-সভাসদ বৃদ্ধ জয়দেব গোস্বামী, লছ্‌মী শিব-সিংহ-সভাসদ মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, রজকিনীরামী-সহচর বাসুলী-সেবক চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া "খৃষ্ট-চরণাম্বুজাশ্রিত মতি" মাইকেল মধুসূদন ও প্রতিমা-পূজা-বিবর্জ্জিত রাজকবি স্যর রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কতশত বাঙ্গালী কবি 'বৃন্দাবন-বিলাসিনী' বিরহিণী রাধার দুঃখে সমবেদনায় কাতর প্রাণে তপ্তশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রুমোচন না করিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই ত্রিভঙ্গমুরলীধর রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তির উপাসনা ভারতে অথবা বাঙ্গালায় কতদিন প্রচলিত হইয়াছে? কেন না, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে ও বঙ্গের নানা প্রাচীন নগরাদি হইতে ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া অথবা পুষ্করিণী প্রভৃতির অভ্যন্তর হইতে যে সকল মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, সে

সকলগুলি বিষ্ণু-মূর্ত্তি। তাহার উপর বঙ্গের বর্ম্ম-গুপ্ত-পাল-সেন-বংশীয় রাজগণের সময়ের যে সকল তাম্রশাসন বা শিলালিপি পাওয়া যাইতেছে তাহাতেও চতুর্ভুজ বিষ্ণুরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; কোথাও মুরলীধর ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণ-মূর্ত্তি আছে কি না জানিতে পারি নাই। অধিকাংশ বিষ্ণু-মূর্ত্তির একদিকে লক্ষ্মী, অপরদিকে বীণাধারিণী সরস্বতী। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্বতঃই যেন মনে হয় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ দেশে কৃষ্ণ-মূর্ত্তির উপাসনা আদৌ ছিল না। যদিই বা থাকে, তবে অতি বিরল-প্রচার ছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়, ৩৫ শ্লোকে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূয়িষ্ঠঃ" এবং তাম্রপর্ণী প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য (মাদ্রাজ উপকূলবর্ত্তী) নদীসকলে যাঁহারা জলপান করিয়া থাকেন, তথায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সমধিক প্রচলিত ছিল। এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, ভাগবত-গ্রন্থ যখন রচিত হইয়াছিল, তখন ভারতের অপর স্থানে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ততটা প্রচলিত হয় নাই। এখানে আমরা "বৈষ্ণব" শব্দে কেবল কৃষ্ণ-উপাসককে না বুঝাইয়া বিষ্ণুর যে কোন অবতার-পূজককেই "বৈষ্ণব" নামে অভিহিত করিতেছি। সেই জন্যই বুঝি শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে বৈষ্ণবপ্রধান দক্ষিণ-দেশে (দ্রাবিড়) তীর্থ সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণদেশের নানা মঠে যে সকল দেব-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে তাহার যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মূর্ত্তি কয়টীর পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি ৭টী, বরাহ-মূর্ত্তি ১টী, নৃসিংহ-মূর্ত্তি ৩টী, বামন-মূর্ত্তি ১টী, পরশুরাম-মূর্ত্তি ১টী, রাম-মূর্ত্তি ৯টী, কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ১টী, বুদ্ধ-মূর্ত্তি ১টী, অনন্ত-মূর্ত্তি ১টী, লক্ষ্মী-মূর্ত্তি ১টী, শিবলিঙ্গ বা মূর্ত্তি ১০টী, শক্তি-মূর্ত্তি ২টী, কার্ত্তিক-মূর্ত্তি ২টী, গণেশ-মূর্ত্তি ১টী, এইমাত্র।

চৈতন্যদেব নানা বৈষ্ণব-বিগ্রহের মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু ও রাম-মূর্ত্তি অধিক দেখিয়াছিলেন; সুতরাং এই দুই মূর্ত্তির উপাসকও অধিক ছিল, বুঝিতে পারা যায়। মধ্বাচারি-মঠে যে একটী মাত্র কৃষ্ণ-বিগ্রহ ছিল, সেটীকে মধ্বচারীজী একখানি ডিঙ্গার মধ্যে গোপী-চন্দন-রাশির ভিতর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাকে "উড়ুপী" কৃষ্ণ বলে। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক পুস্তকে মধ্বাচারী নামক প্রবন্ধেও উড়ুপী-কৃষ্ণের বিবরণ আছে। বর্ত্তমান বৎসরের (১৩২২) জ্যৈষ্ঠ মাসের "প্রবাসী" পত্রে তাহার চিত্র বাহির হইয়াছে; সেটী আমাদের দেশে প্রচলিত ত্রিভঙ্গ-মুরলীধর কৃষ্ণ-মূর্ত্তি নহে। যেন একটী তিন চারি বৎসরের বালক হাসিভরা মুখে সোজা দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণহস্তে গদা, বামহস্ত দেহ-পার্শ্বে বিলম্বিত। সেটী বাল-গোপাল-রূপ, সঙ্গে রাধিকা নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-মহাশয় মধ্বাচারি-সম্প্রদায়কে "তত্ত্ববাদী" বা "জ্ঞানবাদী" আখ্যা দিয়াছেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের লোকেরা ভক্তিবাদী; সুতরাং ইঁহাদের সহিত তাঁহাদের মতের ঐক্য নাই।

তাহার পর পুরুষোত্তমের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের রূপান্তর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। আবার শাক্তেরা জগন্নাথদেবকে বিমলাদেবীর ভৈরব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। সে সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা-মূর্ত্তিকে বৈষ্ণব-বিগ্রহ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, এ মূর্ত্তির সহিত রাধিকা নাই। সত্যভামা ও লক্ষ্মীদেবী আছেন; সুতরাং দ্বারকা-লীলা অথবা শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন লীলা-বিগ্রহ, ব্রজ-লীলা নহে। মূর্ত্তিটীও ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণ-মূর্ত্তি নহে। এবার উড়িষ্যার আর দুইটী প্রাচীন কৃষ্ণ-মূর্ত্তির কথা বলিব। একটী সাক্ষিগোপাল-অপরটী ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ। সাক্ষিগোপালটীকে ছোট-বিপ্র বৃন্দাবন-ধাম হইতে আনিয়াছিলেন; তাঁহার মূর্ত্তিটীও ত্রিভঙ্গ-কৃষ্ণ-মূর্ত্তি নহে, সঙ্গে রাধিকাও ছিল না।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথটী কিরূপ, তাহা আমি চোখে দেখি নাই; শুনিয়াছি, সেটীও সরলভাবে দণ্ডায়মান। সঙ্গে রাধিকা নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃতে যে সকল মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, আমি কেবল তাঁহাদেরই বিবরণ দিলাম। অপর কোথাও চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণ-বিগ্রহ থাকিলে, তিনি কখন' উল্লেখ করিতে বিরত থাকিতেন না।

এবার আমরা তাঁহার গ্রন্থ হইতে বৃন্দাবন-যাত্রার কথা বলিব। বাঙ্গালায় কোনও কৃষ্ণ বা বিষ্ণু-মূর্ত্তির কথা তাঁহার গ্রন্থে পাই নাই। কাশীধামে চৈতন্যদেব যে দুইটী বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন, তাহার একটী বিশ্বেশ্বর শিবলিঙ্গ, অপরটী চতুর্ভুজ বিন্দুমাধব। প্রয়াগে বেণীমাধব ও বিষ্ণু-মূর্ত্তি। মথুরাতে চৈতন্যদেব সাতটী দেব-মূর্ত্তি দেখিতে পান। তাহার তিনটী—ভূতেশ্বর, স্বয়ম্ভু ও গো-কর্ণেশ্বর। প্রথম দুইটী লিঙ্গ-মূর্ত্তি, তৃতীয়টী শিব-বিগ্রহ। "মহাবিদ্যা" নামে একানংশদেবীর (যোগমায়া) মূর্ত্তিটীও শক্তি-পূজার মূর্ত্তি। মথুরার অবশিষ্ট ৩টী বিগ্রহ কেশব, দীর্ঘবিষ্ণু ও বিশ্রামদেব। ৩টীই বিষ্ণু-রূপ; কৃষ্ণ-মূর্ত্তি নহে। রাধারও নাম-গন্ধ নাই।

খাস বৃন্দাবনধামে কোন' বিগ্রহ মোটেই ছিল না। এখান হইতে প্রায় ১২।১৩ মাইল দূরে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকট মানস-গঙ্গাতীরে সুপ্রাচীন হরিদেব-বিগ্রহটী কৃষ্ণ-মূর্ত্তি হইলেও ত্রিভঙ্গ ও মুরলীধর নহে। তাঁহার সহিত রাধাও নাই। পর্ব্বতোপরি যে গোপাল-বিগ্রহ আছেন, সেটীও ঐরূপ রাধাবিহীন। খদির-বনে ক্ষীর-সাগরতীরে যে 'শেষশায়ী'-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে অনন্ত-নাগের উপর লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের পদসেবা করিতেছেন; সুতরাং ইহাও রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি নহে। নন্দীশ্বর পর্ব্বত-গুহামধ্যে—

দুই দিকে পিতামাতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে হয় শিশু এক ত্রিভঙ্গ-সুন্দর॥

এই প্রথম ত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি পাইলাম বটে, কিন্তু সেটী রাধানাথ কিশোর কৃষ্ণ নহে; নন্দ-যশোদার মধ্যে বাল-গোপাল মাত্র। সমগ্র ব্রজমণ্ডলে এই তেরটী বিগ্রহের মধ্যে চৈতন্যদেব কোথাও রাধা-কৃষ্ণ-মূর্ত্তি সন্দর্শন করেন নাই। এই কারণেই ত্রিভঙ্গ মুরলীধর রাধা-সমন্বিত কৃষ্ণ-সেবা, তাহার পরবর্ত্তী কালেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলে অন্যায় হয় না।

চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন গৌড়-রাজ হুসেন শাহ, নবাবের ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষরূপে (দবির খাস) পূর্ব্ব-নির্দ্দেশমত তাঁহার সহিত প্রয়াগে সাক্ষাৎ করিলেন এবং কাশীধামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতন (সাকর মল্লিক) আসিয়া মিলিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের উভয়কে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিষয়ে নানা উপদেশ দিয়া 'শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক', ব্রজমণ্ডলের লুপ্ত তীর্থগুলি উদ্ধারজন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। তাঁহারা কিছুকাল বৃন্দাবনে থাকিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া পুরীধামে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৃন্দাবনে দ্বিতীয়বার ফিরিয়া আসিয়া লুপ্ত বিগ্রহগুলির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

১৫১৫ খৃঃ অব্দে, ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন দেখিতে যান। তখন দিল্লীর সিংহাসনে শেষ পাঠান-নরপতি ইব্রাহিম লোদী অধিষ্ঠিত। ইহার ২।৩ বৎসর পরে রূপ গোস্বামী 'গোমাটিলা' নামক স্তূপ-মধ্য হইতে গোবিন্দ-বিগ্রহ আবিষ্কার করিলেন। সনাতন-গোস্বামীও মথুরার কোন চৌবের বাটী হইতে মদনমোহন-বিগ্রহ লইয়া আসেন। মধুপণ্ডিত নামক একজন ব্রাহ্মণ বংশীবট-সমীপবর্ত্তী যমুনা-তট হইতে গোপীনাথ-বিগ্রহ উত্তোলন করিলেন। এই ৩টী, বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহ; চৈতন্য-চরিতামৃতে কেবল এই তিনটীর নামই আছে। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁহার প্রপৌত্র ব্রজনাথ শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচলিত করিবার জন্য ব্রজমণ্ডলে যে, সকল মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন, এই তিনটী মূর্ত্তি সেই প্রাচীন ত্রিভঙ্গ মুরলী-ধর শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি! এই ঘটনার পর আরও কয়েকজন ভক্ত-বৈষ্ণব আরও কয়েকটী কৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সহিত কোন' রাধা-মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। তখন কেবল কৃষ্ণ-বিগ্রহেরই সেবা চলিত। এই আবিষ্কারের সংবাদ পুরীধামে পৌঁছিলে, প্রতাপরুদ্র রাজার পুত্র পুরুষোত্তম আবিষ্কৃত তিনটী রাধা-মূর্ত্তি বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের একটী গোবিন্দদেবের রাধারূপে স্থাপিত হইলেন। অপর দুইটী নারী-মূর্ত্তি—একটী রাধা, অপরটী ললিতা নামে মদন-মোহনের উভয় পার্শ্ব শোভিত করিলেন। গোপীনাথের রাধিকা—নিত্যানন্দ-প্রভুর দ্বিতীয়-পত্নী জাহ্নবা-ঠাকুরাণী পাঠাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এই আখ্যান ভক্তি-রত্নাকর-গ্রন্থের ৬ষ্ঠ তরঙ্গে বিবৃত আছে। অনুমান ১৫১৯।২০ খৃঃ অব্দের মধ্যে এই ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। এই প্রথম রাধা-বিগ্রহ দেখিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিয়াই গিয়াছেন যে, মহাভারত, হরিবংশ বা ভাগবতে রাধার নাম নাই। ভাগবতের "অনযারাধিতো নৃণাং" এই শ্লোকাংশ হইতে কষ্ট-কল্পনায় গোস্বামী প্রভুরা রাধা-নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে, সর্ব্বকনিষ্ঠ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ হইতেই চৈতন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা রাধা-মাহাত্ম্য গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতেই দেখাইলাম যে, রাধাসমন্বিত কৃষ্ণ-পূজাও চৈতন্যদেবের সময় হইতেই প্রচলিত। বঙ্গদেশে তখনও রাধা-পূজা প্রচলিত হয় নাই। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, চৈতন্যদেবের তিরোধানের চারি বৎসর পরে ১৫৩৭ খৃঃ অব্দে যখন মুকুন্দরায় শেঠ নামক ধনী মহাজন কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বাস করেন, তখন তাঁহার সহিত কুলদেবতা চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন। তাহার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে তাঁহার বংশীয় কোন ব্যক্তি রাধা-কান্ত-বিগ্রহ বড় বাজারে ঠাকুর-বাড়ীতে স্থাপিত করেন। আজিও বড় বাজারে শেঠ-বংশীয়দিগের ঘরে সেই পুরাতন চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি কুলদেবতারূপে পূজিত হইতেছেন বোধ হয়। বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান হইলে, এরূপ বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পূজা অপরাপর প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণের গৃহে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। সে যাহা হউক, চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন-গমনের প্রায় শত বৎসর পরে জাহাঙ্গীর-বাদশাহের রাজত্বকালে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ-রত্নরাজি লইয়া আসেন, সেই সময় হইতেই রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ-স্থাপনা এদেশে বহুল পরিমাণে আরম্ভ হইল।

বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর, কালাচাঁদ-বিগ্রহ ও মদনমোহন-বিগ্রহ স্থাপিত করিলেন। পদ্মাবতী-তীরে নরোত্তম-ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্ত, খেতরী-গ্রামে একদিনে পাঁচটী রাধাকৃষ্ণ ও একটী চৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আর ঐ সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বে বা পরে (সম্ভবতঃ পরেই) খড়দহে শ্যামসুন্দর, মাহেশে বল্লভ-জী, সপ্তগ্রামে, বরাহনগরে, আঁড়িয়াদহে, ও কাঁচড়া পাড়া প্রভৃতি বঙ্গের অনেকস্থানে চৈতন্যদেবের পার্শ্বদ ও ভক্তগণের পাট-বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ-পূজা চলিতে আরম্ভ হইল। বীরভূম-কেঁদুলিতে কবি জয়দেব-গোস্বামীর পাট-বাড়ীতে যে রাধা-মাধব-বিগ্রহ আছেন, তাহা যে চৈতন্যদেবের পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে পাই নাই। অগ্র-দ্বীপের গোপীনাথ, তৎপূর্ব্বেই হয় ত স্থাপিত হইয়া থাকিবে। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অনুমান হয় যে, এই তিন বা চারি শত বৎসরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি-উপাসনা বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিল। *

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

গান

বাঁশীর তানে মজিয়ে এনে
এখন কেন গোপন রও?
ওগো আমার পরাণ-পাগল,
কোথায় তুমি? কথা কও।

আছ কি ওই নীল আকাশের
নিবিড়তার মাঝে—
আছ কি ওই আঁধার-আলোর—
মিলন-মধুর সাঁঝে?

যেথায় থাক, কাছে এস,
হৃদে বসে' কথা কও,
বাঁশীর তানে মজিয়ে এনে
এখন কেন নীরব রও?

গভীর সুরে বাজাও বাঁশী
বাজাও হিয়া আকুলিয়া,
দুলে উঠুক্ সুরের লহর
বিশ্ব-ভুবন উচ্ছ্বসিয়া,—

উদ্বেলিয়া সোহাগ-সিন্ধু
বন্ধু আমার কথা কও।
বাঁশীর তানে মজিয়ে এনে
এখন কেন গোপন রও?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

* রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি-পূজা সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানা মত প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক যে মত উপস্থাপিত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আলোচনা বাঞ্ছনীয়। যদি কেহ যুক্তিযুক্তভাবে এই প্রবন্ধের সমর্থন বা প্রতিবাদ কল্পে প্রবন্ধ প্রেরণ করেন তাহা আমরা সাদরে পত্রস্থ করিব।

পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন

[১]

গৌড়-লেখমালার গ্রন্থকার, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পরিচালক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনসম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন। পালরাজগণের ইতিহাস বাঙ্গালীমাত্রেরই অবশ্যজ্ঞাতব্য। অক্ষয়বাবুর বক্তৃতা-গুলি সারগর্ভ ও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে; সুতরাং সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা ইহার সার-সঙ্কলন করিয়া ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ করিব।

প্রথম বক্তৃতা :—

পালরাজগণের ইতিহাস বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ আদরণীয়। কারণ, পালরাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালী বাহুবলে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাতে কাহার না গৌরব বোধ হয়; কিন্তু এতদ্ব্যতীত গৌরবের আরও একটি কারণ আছে। সাধারণতঃ উত্তরাধিকার-সূত্রে অথবা যুদ্ধযাত্রাদ্বারা রাজ্যলাভ হয়—কিন্তু পালরাজগণ এতদুভয়ের কোনটি দ্বারাই রাজ্যলাভ করেন নাই। তাঁহারা বাঙ্গালার প্রজাসাধারণ-দ্বারা রাজপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ অরাজকতা নিবারণের জন্য বাঙ্গালী জনসাধারণ বপ্যটের পুত্র গোপালকে রাজপদে বরণ করেন। তিব্বতদেশীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথ ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতিসম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামে মহারাজ ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও এই ঘটনার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"মাৎস্যন্যায় মপোহিতুং প্রকৃতিভিঃ লক্ষ্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ শিরসাং চূড়ামণি স্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন যশোরাশি র্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥"

ইহার অর্থ :—

[দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারমূলক] "মাৎস্য ন্যায়" [অরাজকতা] দূর করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া [রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া] দিয়াছিল, পূর্ণিমা-রজনীর [দিঙ্মণ্ডল প্রধাবিত] জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুল-চূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রজাসাধারণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এই রাজবংশ প্রজাগণের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, খালিমপুর-তাম্রশাসনের নিম্নলিখিত শ্লোকেই তাহা বুঝা যায়

"গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈ র্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতি-চত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ।
লীলা বেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকৈ রুদ্গীত মাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়ত স্ত্রপা-বিবলিতা-নম্রং সদৈবাননং॥"

"সীমান্ত দেশে গোপগণকর্ত্তৃক, বনে বনেচরগণকর্ত্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণকর্ত্তৃক, [গৃহ] চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়-স্থানে বণিক্-সমূহ (?) কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণকর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া [এই নরপতির] বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে।"

বাঙ্গালার প্রজাসাধারণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং বাঙ্গালার জনসাধারণের অশেষ প্রিয়পাত্র পালরাজগণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের অধঃপতন বিবৃত করাই আমার উদ্দেশ্য; সুতরাং ইহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। পালরাজ্যসম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য জানা গিয়াছে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, যে প্রজাসাধারণের প্রীতির উপর ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সেই প্রজাসাধারণের অসন্তোষই ইহার ধ্বংসের মূল কারণ। অরাজকতা নিবারণের জন্য প্রজাগণ গোপালকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। কিন্তু এই গোপালের বংশধর যখন রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া অন্যায় উৎপীড়ন প্রভৃতি দ্বারা প্রজাগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তখন আবার তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল।

প্রজাগণের অসন্তোষ ব্যতীত পালরাজ্য ধ্বংসের আর একটি কারণ, কাম্বোজদেশীয় নরপতিকর্ত্তৃক বরেন্দ্র আক্রমণ। এ সমুদয় কারণ ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাসলেখকের পক্ষে প্রধান অবলম্বন, তাম্রশাসন ও রামচরিত-গ্রন্থ। এই রামচরিত-কাব্য একখানি অপূর্ব্ব জিনিষ। ইহার প্রত্যেক শ্লোক দ্ব্যর্থবোধক। এক অর্থে রামায়ণের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, অপর অর্থে রাজা রামপালের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং এই কাব্যের শ্লোক অতিশয় দুর্ব্বোধ এবং উপযুক্ত টীকার অভাবে ইহার সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করা নিরতিশয় কঠিন।

এই গ্রন্থের একখানি টীকা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত টীকা পাওয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট অংশের টীকা এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

রাজা মদনপাল দীর্ঘজীবন লাভ করুন, এইরূপ প্রার্থনা গ্রন্থশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এই কাব্য রাজা মদনপালের রাজ্যকালে লিখিত। রাজা মদন পালের রাজ্যের অষ্টম বৎসরের একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিতে রাজা মদন পালের কোন কীর্ত্তির উল্লেখ নাই। রাজার কোন উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি থাকিলে প্রশস্তিকার তাহা বর্ণনা করিয়া থাকেন, সুতরাং অনুমিত হয় যে, অষ্টম রাজ্য-সংবৎসর পর্য্যন্ত রাজা মদনপাল বিশেষ কোন কীর্ত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। রামচরিত-কাব্যে রাজা মদনপালের অনেক কীর্ত্তির উল্লেখ আছে, সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, রামচরিত-কাব্য রাজা মদনপালের অষ্টম সংবৎসরের পরে লিখিত। রাজা মদনপাল যে অন্ততঃ ১৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। লক্ষ্মীসরাই নামক স্থানে তাঁহার যে লিপি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার তারিখ ১৯ অথবা ১৪।

রামচরিত-কাব্যের প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী বরেন্দ্রের অধিবাসী। * তাঁহার পিতা প্রজাপতি নন্দী পালরাজের † অধীনে সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি পালরাজগণের শত্রুপক্ষেরও যেরূপ

* মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে "বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ"। অক্ষয়বাবু এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—ইহা হইতে অনুমিত হয়, তিনি ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

† শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই রাজা রামপাল। অক্ষয়বাবু কোন বিষয়ে রাজার নাম করেন নাই; সুতরাং এস্থলেও শাস্ত্রী-মহাশয়ের মত তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার গ্রন্থোক্ত উক্তিগুলি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

১৮৯৭ সনের পূর্ব্বে এই রামচরিত-কাব্যের অস্তিত্বপর্য্যন্ত কেহ জানিত না। ঐ বৎসর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে ইহার একখানি হস্তলিখিত পুথি আবিষ্কার করেন। এজন্য তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন, সন্দেহ নাই।

নেপালে আবিষ্কৃত এই পুথিখানি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। যে অংশের টীকা নাই, শাস্ত্রী-মহাশয় তাহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন নাই। অবশিষ্ট অংশের সম্পাদনও যে খুব সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পুথি শীলচন্দ্র নামে জনৈক ব্যক্তিকর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশ্বাস যে, এই শীলচন্দ্র কিছুমাত্র সংস্কৃত জানিতনা সুতরাং সে অনেক ভুল করিয়াছে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনেক স্থলে শীলচন্দ্রের লেখা সংশোধন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কোন কোন স্থলে শীলচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিল, তাহাই ঠিক, শাস্ত্রী-মহাশয়ের সংশোধিতপাঠই ভুল। একস্থলে শীলচন্দ্র লিখিয়াছিল, "অভিষেণমতঃ", শাস্ত্রী-মহাশয় ইহা সংশোধন করিয়া ছাপাইয়াছেন, "অভিসেনমতঃ। কিন্তু এখানে "অভিষেণমতঃ" পাঠ ধরিলেই সুসঙ্গত ব্যাখ্যা হয়; "অভিসেনমতঃ" পাঠ ধরিলে কোন ব্যাখ্যা হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রামচরিত-কাব্য রাঘব-পাণ্ডবীয় কাব্যের অনুকরণে লিখিত। রাঘব পাণ্ডবীয় কাব্যের তারিখ ঠিক জানা নাই, কাহারও মতে ইহা অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত—আবার কাহারও মতে ইহা দ্বাদশ শতাব্দীর কাব্য; সুতরাং এরূপ স্থলে রামচরিত-কাব্য রাঘব-পাণ্ডবীয়ের অনুকরণে লিখিত হইয়াছিল কি না, এ বিষয়ে কোন অনুমান করা সঙ্গত নহে। রামচরিত-কাব্যের যে অংশে টীকা নাই, তাহার মধ্যে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। আমি উহার অনেক স্থল ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

কি প্রণালীতে এই কাব্যের শ্লোকের দুই পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে হইবে, তাহার কতকগুলি মূলসূত্র, যে সকল শ্লোকের টীকা আছে তাহা হইতে পাওয়া যায়।

যেমন প্রথম শ্লোক

"শ্রীঃ শ্রয়তি যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং তং বিভ্রতং ভুজেনাগং।
দধতং কং দাম জটালম্বং শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে॥"

এখানে এক অর্থে কৃষ্ণের স্তব, অন্য অর্থে মহাদেবের স্তব। কৃষ্ণ-পক্ষে—তং কৃষ্ণং বন্দে, যস্য কণ্ঠং শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) শ্রয়তি। ভুজেন অগং (গোবর্দ্ধনাখ্যং) বিভ্রতং কং (শিরঃ) দামজটালং, বংশ শিখণ্ড-মণ্ডনং।

মহেশ্বর-পক্ষে—তং শশিখণ্ডমণ্ডনং বন্দে—যস্য কণ্ঠং কৃষ্ণং (শ্যামং) শ্রীঃ (শোভা) শ্রুতি। ভুজেন অসং (শেষং) বিভ্রতং কং দাম (কপালমালাং) জটালম্বং দধতং।

এখানে দেখা যায় যে, ক্রিয়াপদের অর্থ উভয়স্থলেই সমান। কেবলমাত্র পদবিন্যাসের ও শব্দার্থের বিভিন্নতাদ্বারা বিভিন্ন অর্থ সূচিত হইয়াছে।

অতঃপর এই নিয়ম অনুসারে আমি একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিব। এই শ্লোকের টীকা নাই এবং এ পর্য্যন্ত কেহ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই—কিন্তু, এই শ্লোকে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে।

শ্লোকটি এই—

"সুকলা পায়িত কুন্তলরুচি মাবিল-লাট কান্তিমবন মদঙ্গাং।
অধরিত কর্ণাটে ক্ষণ-লীলাং ধৃত মধ্য-দেশ তনি মনামপি।"

(তৃতীয় অধ্যায়, ২৪শ শ্লোক

এই শ্লোকের উদ্দেশ্য 'জনকভূঃ' বর্ণনা। 'জনকভূঃ'র এক অর্থ 'জনকনন্দিনী সীতা', অন্য অর্থ পাল-রাজগণের পিতৃভূমি 'বরেন্দ্রী' (উত্তর-বঙ্গ)

প্রথম ('সীতার বর্ণনা')-পক্ষে এই শ্লোকের অর্থঃ—

সু—কলাপায়িত-কুন্তল-রুচিং (উত্তম গুচ্ছবিশিষ্ট কেশদ্বারা যাহার শোভাবৃদ্ধি হইয়াছে) আবি—ললাটকান্তিং (যাহার ললাট-শোভা মহত্বচিহ্ন-শোভিত) অবনমদঙ্গাম্ (অবনমৎ + অঙ্গ যাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিপুণভাবে বিন্যস্ত) ধৃত-মধ্য-দেশ তনিমানম্ (যাঁহার কটিদেশ ক্ষীণ,) অধরিত-কর্ণাটে ক্ষণলীলাং (যাঁহার কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নয়নের দৃষ্টি অবনত)।

দ্বিতীয় (বরেন্দ্রভূমি) পক্ষে অর্থ—

সু-কলা—[অ] পায়িত কুন্তলরুচিং (যাহার উত্তম কলাকৌশল দ্বারা দাক্ষিণাত্য-স্থিত কুন্তলদেশের শোভা অন্তর্হিত) আবিল-লাট্-কান্তিং (লাট বা গুর্জ্জর দেশের সৌন্দর্য্য মলিনীকৃত) অবনমদঙ্গাং (অঙ্গ-প্রদেশ অবনমিত) ধৃত-মধ্য-দেশ তনিমানং (মধ্যদেশ বা তৎকালীন কান্যকুব্জ-রাজ্যের বিস্তার নিবারিত), অধরিত কর্ণাটে ক্ষণলীলাং (কর্ণাট-দেশের ঈক্ষণ-লীলা অর্থাৎ বরেন্দ্রের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি অধরিত বা বলপূর্ব্বক নিম্নাভিমুখকৃত)।

সম-সাময়িক লিপি হইতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন এই রাজ্যের বিবরণ সম্পূর্ণ সত্য। আরও জানা যায় যে, কর্ণাটের ঈক্ষণ-লীলাই পরিণামে পাল-রাজ্যের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বিবাদ

উপহার বলে "আমি বড় তোমা চেয়ে,"
স্নেহ বলে "তুমি বড় আমারেই পেয়ে"
"মূল্য মোর কত" উপহার বলে ডাকি,
স্নেহ কহে "অমূল্য যে আমি সঙ্গে থাকি,
উপহার ফিরাইতে পারে বার বার,
আমারে ফিরায় বল হেন সাধ্য কার?"

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বকঃ—কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীবনের সহিত বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের কন্যা শ্বেতলোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। নিজে না গিয়া, কৃষ্ণলোম এক বন্ধুকে মেয়ে দেখিতে পাঠায়। পূর্ব্ববৈরতাবশতঃ সে বন্ধু গিয়া বরের রূপ-গুণের এমন বর্ণনা করিয়া আসে যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। স্থূলপুচ্ছ তথাপি বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়; কিন্তু তাহার স্ত্রী গাঢ়লোমার এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি ছিল। এ কারণে গাঢ়লোমা এক রাত্রিশেষে কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এ দিকে সূক্ষ্মলোম, কোনও এক বন্ধুর মুখে শ্বেতলোমার রূপ-গুণের বর্ণনা শুনিয়া একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিবাহ না হওয়াতে মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া যায়। ক্রমে সে বানর-মহারাজার দেশে গিয়া উপস্থিত হয় এবং মহারাজার প্রিয় সভাসদ্-রূপে কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করে। সে সময় বানর-মহারাজার সহিত মহিষ-মহারাজার যুদ্ধের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। সূক্ষ্মলোম ছুটি লইয়া তাহার প্রণয়িনীকে অন্বেষণ করিতে বাহির হয়। বানর-মহারাজা যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার পর সূক্ষ্মলোম ফিরিয়া আসে। তখন প্রকাশ হয়, ভ্রমণকালে পীড়িত হইয়া কোনও এক মেষ-পরিবারে সে আশ্রয় লইয়াছিল। পীড়ায় সময় তাহাদের একটি মেয়ে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিল। আরোগ্যলাভ করিয়া সূক্ষ্মলোম সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে। এদিকে তাহার পিতা ও স্থূলপুচ্ছ, নিজ নিজ সন্তানকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য।

মহিষ-রাজ্যের সীমান্ত-বন।

কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। ভায়া, তা' হ'লে কি করা যায়?
স্থূল। তা'ই ত হে!
এ যে ভারি বিপদ হইল! আমাদের
এ অঞ্চলে যা'রা দু'টি বড় বড় রাজা,
যুদ্ধ তাহাদেরই মধ্যে।
কৃষ্ণ। তা' হ'লে কি করা
যায় বল?
স্থূল। আপাততঃ কিছুদিন তরে
অন্বেষণ বন্ধ করা যাক্। নহিলে ত
রক্ষা নাই! এ রাষ্ট্রবিপ্লবে কি সাহসে
পর্য্যটন করি? যদি বানর-সেনারা
ধৃত করে, ভাবিবে মহিষ-প্রজা এরা,
প্রাণনাশ করিতেও পারে। মহিষেরা
অবশ্য ভাবিবে এরা বানর-রাজার
গুপ্তচর—মাথা কাটি' ল'বে। তা'র চেয়ে
চল যাই মহিষ-রাজার রাজধানী,
খুঁজি' কোনও উকীল মোক্তার, আবেদন
করি, এ রাজ্যের প্রজা হইবার তরে।
যতদিন যুদ্ধ নাহি শেষ হ'য়ে যায়,
ততদিন বাস করি হেথা। যে কুলের
জয় হোক্, দেশমাঝে শান্তি ফিরে এলে
বাহিরিব অন্বেষণে পুনঃ।
কৃষ্ণ। সেই ভাল।
চল তবে যাই রাজধানী। না জানি সে
ক'দিনের পথ!—ও হো!—এ বৃদ্ধ বয়সে
এত দুঃখ লেখা ছিল এ পোড়া কপালে!
(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

বানর-রাজ-সভা।

সিংহাসনে বানর-মহারাজা ও নিম্নে সূক্ষ্মলোম
প্রভৃতি সভাসদ্গণ আসীন।

বা-মহা। সূক্ষ্মলোম, শুনিয়াছি সকল বৃত্তান্ত
তব। এ শুভ-বিবাহে আমি করিতেছি
আনন্দ-প্রকাশ। আশীর্ব্বাদ করি, যেন
দুইজনে চিরসুখী হও।
সূক্ষ্ম। মহারাজ,
এ দাসের প্রতি, আপনার অনুগ্রহ
আশার অধিক। আমি এ তুচ্ছ জীবন
সমর্পণ করিতেছি আপনার কাযে।
রহিলাম চির-ভৃত্য।
বা-মহা। শুনে' বড় সুখী
হইলাম। সেনাপতি—
সেনাপতি। (দণ্ডায়মান হইয়া) কি আদেশ প্রভু?
বা-মহা। আজি হ'তে কতদিন পরে, বল দেখি,
মহিষ-রাজার রাজ্যে যুদ্ধ-অভিযান
করিতে পারিবে তুমি?
সেনা। মহারাজ, আমি
প্রস্তুত হইয়া আছি। পাইলে আদেশ
কল্য প্রভাতেই যাত্রা করিবারে পারি।
বা-মহা। (চিন্তা করিয়া) কল্য নহে।—জ্যোতিষী-ঠাকুর—
জ্যোতিষী। মহারাজ—

বা-মহা। অদ্য হ’তে এক পক্ষ পরে, যুদ্ধযাত্রা
করিবার শুভ দিন-ক্ষণ, কবে আছে
দেখ্ ত পঞ্জিকা।
জ্যো। (পঞ্জিকা দেখিয়া) মহারাজ, আজি হ’তে
ষোড়শ দিবস, অতিশয় শুভদিন।
বা-মহা। ষোড়শ দিবস ?—তবে সেই দিন স্থির।
আমাদের সভাসদ্-পাত্র-মিত্রগণ
প্রস্তুত হইয়া থাক তোমরা সকলে,
যাত্রা করিবার তরে সে দিন প্রত্যূষে।
সূক্ষ্মলোম ভিন্ন সকলে। মহারাজ, প্রস্তুত রহিব মোরা।
বা-মহা। কি হে
সূক্ষ্মলোম—তোমার যে সাড়া-শব্দ নাই ?
সূক্ষ্ম। মহারাজ, কতদিনে যুদ্ধ হবে শেষ ?
বা-মহা। তাহা কে বলিতে পারে ?—দুই চারি মাস,
ছয় মাস, তা’র বেশী নহে।
সূক্ষ্ম। (মাথা চুল্‌কাইয়া) মহারাজ,
কিছুদিন পরে গেলে চলিতে পারে কি ?
বা-মহা। (সরোষে) পরে গেলে কেমনে চলিবে ?
সূক্ষ্ম। তবে—তবে—
বা-মহা। তবে কি যাবে না তুমি ? স্পষ্ট করি বল।
সূক্ষ্ম। যাব বৈকি মহারাজ—কিন্তু—কিন্তু—
বা-মহা। কিন্তু
না গেলেই ভাল হ’ত—এই বলিতেছ ?
সূক্ষ্ম। আজ্ঞা হাঁ—মুস্কিলে বড় পড়িয়াছি আমি।
বধূটি বালিকা, কা’র কাছে তা’রে রেখে
যাই--তা’ই ভাবিতেছি—
বা-মহা। তোমারই কি সুধু
অসুবিধা ?—এই সভামাঝে আছে হেন
বহুলোক—যাহাদের তোমা অপেক্ষাও
ঘোর অসুবিধা হবে বাড়ী ছেড়ে যেতে।
নববধূ তব নাহি যদি পারে গৃহে
একাকী থাকিতে, সেনাপতি আছে, মন্ত্রী
আছে--এত পাত্র-মিত্র-সভাসদ্ আছে,
তাহাদের একজন কাহারও বাড়ীতে
দিয়ে যাও—পুর-মহিলারা অতিযত্নে
রাখিবেন বধূরে তোমার—ভাবনা কি ?
সূক্ষ্ম। আজ্ঞা হ্যাঁ—তা’ বটে—কিন্তু—
বা-মহা। কিন্তু বধূ তব
একদণ্ড তোমা ছাড়ি’ পারে না থাকিতে--
এই কথা ?
সূক্ষ্ম। আজ্ঞা—
বা-মহা। আর তুমি তা’রে যদি
না দেখিতে পাও—মান পলকে প্রলয় ?
সূক্ষ্ম। মহারাজ—এ কথার—
বা-মহা। বল, খুলে’ বল।
বল, এ জগৎ মাঝে তোমার প্রেয়সী
একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত ধন। আর সব
তুচ্ছ ধূলিসম। কেবল সে যদি থাকে,
বাকী সব পুড়ে’ যায়, ধ্বংস হ’য়ে যায়,
বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই তাহাতে তোমার।
খুলে’ বল, স্পষ্ট বল—এ রাজ্য, এ দেশ,
হস্তগত হয় যদি মহিষ-রাজার,—
আমারে ধরিয়া নিয়া কারারুদ্ধ করে—
শূলে দেয় ;—তাহে তব দুঃখ নাহি কিছু।
পরম সুখেতে রবে দোঁহে দোঁহা হ’য়ে।
(দন্ত কড়মড় করিয়া)
তুমি রাজভক্ত প্রজা ! রাজভক্তি তব
অপরূপ ! এখনও অৰ্দ্ধ-দণ্ডকাল
হয়নি অতীত, তুমি না বলিয়াছিলে,
জীবন তোমার সমর্পণ করিয়াছ
আমাদের কাযে ?
সূক্ষ্ম। (কাঁদিতে কাঁদিতে) প্রভু, অপরাধ মম
করুন মার্জ্জনা। আমি অতি অভাজন।
অবশ্য যাইব যুদ্ধে মহারাজ-সাথে—
নিজের জীবন দিব আবশ্যক হ’লে।
বা-মহা। (সহাস্যে)
কায নাই, কায নাই যুদ্ধে গিয়া তব
ওহে নববিবাহিত মেষ-যুবা। নহি
আমি এমন নির্দ্দয়, তোমাদের এই
মধুচন্দ্রকালে ঘটাব বিচ্ছেদ। না—না
লজ্জিত হইয়া নত কোরো না মস্তক—
আমি সুধু পরিহাস করিতেছিলাম।
যাও বৎস, গৃহে যাও, যতদিন এই
যুদ্ধ নাহি শেষ হয়, ততদিন তুমি
কর অবকাশ-ভোগ। আর এই লও
তোমার বধূর তরে ক্ষুদ্র একখানি
অলঙ্কার—আশীর্ব্বাদসহিত আমার।
সূক্ষ্ম। (অলঙ্কার লইয়া)
প্রভু, এই রাজ-উপহার আমি কভু
পরিতে দিব না তা’রে। ল’য়ে যা’ব ইহা
মস্তকে ধরিয়া, দুইজন প্রতিদিন
পূজা করিবার তরে এই অলঙ্কারে।
বা-মহা। আজ বেলা হ’ল—তবে সভাভঙ্গ হোক্।
সকলে। জয় জয় মহারাজ বানর-ঈশ্বর।
(পটক্ষেপণ)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

মহিষ-রাজ্যে আম্রবন।

বানর-সৈন্যগণ কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ শুইয়া।

১ম। আঃ—এতদিনে যুদ্ধটা শেষ হল, বাঁচা গেল বাপ !—আজ পুরো একটি মাস—যুদ্ধ করে’ যুদ্ধ করে’ প্রাণান্ত হ’য়ে গেছে। না পেয়েছি শুতে, না পেয়েছি বস্‌তে, না পেয়েছি ধীরে-সুস্থে এক-মুটো খেতে। এই রকম পরিশ্রম না কর্‌লে কি আর যুদ্ধ জিৎ হয় দাদা ?

২য়। কবে ফেরা যাবে কিছু শুনে’ছ কি ?

১ম। কাল সকালবেলা মহারাজ সভা কর্‌বেন, সেই সভায় এটা স্থির হ’বে।

৩য়। আমি কিন্তু খালি ভাব্‌ছি, সেই মোষ-বেটাকে আচ্ছা নাকালটা করে’ছিলাম। (হি-হি করিয়া হাস্য)

৪র্থ। কি রকম ? কি রকম ভাই, শুনি।

৩য়। আরে ভাই, সে ভারি মজা হ’য়েছিল। একটা কেঁদো মোষ, বুঝ্‌লে কিনা, আমাকে দেখে’ তাড়া করে’ এল। আমি যেন কতই ভয় পেয়েছি, এই ভাণ করে’ ভোঁ-ভোঁ দৌড়তে লাগ্‌লাম।

১ম। পর্শু পর্য্যন্ত কিন্তু ভাই, আমার মনে ভয় হচ্ছিল, আমাদেরই হারালে বুঝি ! আমাদের কি কম লোকটা মরে’ছে ? দেশে ফিরে’ গেলে কান্না-হাটি পড়ে’ যাবে।

৪র্থ। ওদেরই কি কম লোক মরে’ছে না কি ?

৩য়। দৌড়তে লাগ্‌লাম—

৪র্থ। ‘ওদের যা’ মরেছে তা’র সিকিও আমাদের মরেনি।

২য়। পাগল আর কি ! সিকির সিকিও মরেনি।

৩য়। ভোঁ-ভোঁ করে’ দৌড়তে লাগ্‌লাম—

৪র্থ। হ্যাঁ—তা’র পর কি হ’ল ভাই ?

৩য়। শোন তবে ত বলি ; গল্পেই মত্ত !

৪র্থ। বল, বল।

৩য়। ভোঁ-ভোঁ করে’ দৌড়তে লাগ্‌লাম। আমিও ছুটি, সেও ছোটে—আমিও ছুটি, সেও ছোটে—আমিও ছুটি—

(৫ম বানর-সৈন্যের প্রবেশ)

৫ম। তুমিও ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছ না কি ? তোমারও শ্বশুর মরেছে ? তা’ হ’লেই হয়ে’ছে ! সবাই ছুটি চাইলে কেউ-ই পা’বে না, লাভে থেকে আমার শ্বশুরের বিষয়টা বারো ভূতে লুটে’ নেবে।

৩য়। না না, ভয় নেই। আমি ছুটি চাচ্চিনে। আমার শ্বশুর কেন মরবে ? বালাই ষাঠ্। আমি অন্য কথা বল্‌ছি, বিরক্ত কোরো না।

(চতুর্থের গায়ে হাত দিয়া, সে অন্যের গল্প শুনিতেছিল)

শোন হে ! তা’র পর ছুট্‌তে ছুট্‌তে, দেখ্‌লাম এক পেল্লায় বটগাছ। তা’ই না দেখে’, তা’র উপর উঠে’ পড়্‌লাম। মোষ-বেটা এসে, সেই গাছের তলায় ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। আমি ঝড়াক্ করে’ একটা মোটা ডাল ধরে’, মড়াক্ করে’ সেটা ভেঙ্গে নিয়ে, তড়াক্ করে’ মোষটার পিঠের উপর লাফিয়ে পড়্‌লাম। তা’র পিঠে না বসে’, বুঝ্‌লে কি না ভাই—এই মার ত এই মার। দেম্মার—দেম্মার—দেম্মার।

(সকলের হাস্য)

সে বেটা ত গাঁক্-গাঁক্ করে’ ছুট্‌তে লাগ্‌ল। আমি বল্লাম—কর তাড়া ! মার্‌তে মার্‌তে যখন বেটা আধমরা হ’য়ে গেল, পড়্‌বো-পড়্‌বো হ’ল, তখন প্যাঁক্-প্যাঁক্ করে’ বেটার চোখদুটো গেলে দিলাম। পড়ে’, ছট্-ফট্ কর্‌তে কর্‌তে মরে’ গেল।

অনেকে। মরে’ গেল ?

৩য়। মর্‌বে না ? এ কি সোজা কথা ?

১ম। দেখ ভাই, এ দেশটা মন্দ নয়। এখানে বাস কর্‌তে মজা আছে।

৫ম। চেষ্টা-চরিত্তির করে’ এইখানে বদ্‌লি হও না। এখানেও ত দলকতক আমাদের সৈন্য থাক্‌বে ?

২য়। থাক্‌বে না ? যদি যুবরাজের উপর মহারাজা এই দেশ শাসন কর্‌তে দেন, তবে তিনি কি নতুন জয়করা দেশ এক্‌লা শাসন কর্‌তে পারবেন ? সৈন্য চাই বৈকি।

৩য়। তবে ভাই, আমিও বদ্‌লির দরখাস্ত কর্‌ব। আর এখানে এসে সেই বটগাছটায় বাসা কর্‌ব—হি—হি—হি।

১ম। কোন্ বটগাছটা ?

৩য়। জান না ? শোননি ? সে ভারি মজার কথা।

১ম। কি রকম ? কি রকম ?

৩য়। এতক্ষণ ধরে’ সে গল্পই আমি বল্‌ছিলাম যে—ছিলে কোথা ?

১ম। কৈ ভাই, আমি ত কিছু শুনি নি। আমি ওদের সঙ্গে এদেশের জল-হাওয়া নিয়ে তর্ক কর্‌ছিলাম—ওরা বলে, এদেশের—

৩য়। শোননি যদি ত ফের বলি। সেদিন ভাই একবেটা মোষ—

১ম। বলে এদেশের জল-হাওয়া ভাল নয়। আমি বল্লাম, বিলক্ষণ ! এখানকার জল-হাওয়া ভাল হবে না ত কি আমাদের দেশের জল-হাওয়া ভাল হবে ?

৩য়। তা’ ত বটেই—সে কথা কি আর বল্‌তে ! ওরা নেহাৎ মুখ্যু—

২য়। কে রে ? কে মুখ্যু বলে রে ? কা’র এত বড়—

১ম। যে শুন্‌বে সেই বল্‌বে। এই ইনিই বল্‌ছেন—এদেশের জল-হাওয়ার তুল্য—

২য়। এদেশের জল-হাওয়ার তুল্য আর জল-হাওয়া নেই ? কি পণ্ডিত ! কি দেশ-হিতৈষী ! ফট্ করে’ বলে’ দিল, আমাদের দেশের চেয়ে এ দেশের জল-হাওয়া ভাল। এমন স্বদেশ-দ্রোহীর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

১ম। বিলক্ষণ ! এ দেশে নদী র’য়েছে, তা’র জল ভাল না হ’য়ে আমাদের দেশের পচা পুকুরের জল ভাল ?

২য়। আমাদের দেশের পুকুর পচা ? কি সর্ব্বনাশ ! কোন্-দিন ব’লে বস্‌বে, আমাদের দেশের আম তেতো, কলা টক্, দিনে অন্ধকার, স্ত্রীলোকদের মুখ পোড়া নয়, রাজার ল্যাজ্ নেই।

১ম। আমি ত আর তোমার মত পাগল হই নাই।

২য়। চোপ্‌রও। মুখ সাম্‌লে কথা কও, নৈলে দেখিয়ে দেব।

১ম। দেখি—দেখি—

(কিলা-কিলি ও চড়া-চড়ি)

অপর অনেকে। হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ—আঁচ্‌ড়া-কাম্‌ড়ি কোরো না—সেনাপতি জান্‌তে পার্‌লে আর রক্ষে থাক্‌বে না। কর কি—কর কি ?—

(তূর্য্য-নিনাদ)

সকলে। ঐ ভেঁপু বাজ্‌ল—চা-খাবার সময় হ’য়েছে। চল চল তাঁবুতে চল—নৈলে চা ঠাণ্ডা হ’য়ে যাবে।

(লম্ফে লম্ফে সকলের প্রস্থান)

ক্রমশঃ

শ্রীজানোয়ারমোহন শৰ্ম্মা

তোমার ভুবনে

তোমার সভায় প্রভু, আমি কি গায়িব গীত,
যন্ত্রে মোর তন্ত্রী ছিঁড়ে' যায়,
বিশাল আসরে তব নিয়ত সঙ্গীত উঠে,
কণ্ঠ মোর শুনে' লজ্জা পায়।

ভোরবেলা বিহঙ্গ-গায়ক
মুক্ত-প্রাণে তুলিছে কাকলী—
ছন্দে ছন্দে উন্মত্ত পবন
বংশবনে বাজায় মুরলী।

তোমার ভাণ্ডারে প্রভু, আমি কি করিব দান,
দরিদ্রের সাধ্য কি এমন!
দিতে আসি, নিয়ে যাই, যত পাই, তত চাই—
তুষ্ট তবু নহে দুষ্ট মন!

কুঞ্জ-ভরা পুঞ্জ পুঞ্জ ফুল,
অম্বরেতে সঞ্চরে চাঁদিনী—
মেঘাঙ্গনে রজত তারকা
স্রোতস্বতী মুকুতা-মালিনী।

তোমার সমুখে প্রভু, আমি কি কহিব কথা,
শক্তি নাহি,—বৃথা করি আশা!
বক্ষঃ-কমণ্ডলু-মাঝে রুদ্ধ ভাব-গঙ্গোদক
যাচে সদা প্রকাশের ভাষা।

চির-রুদ্র সমুদ্র-ধ্রুপদে
বিশ্ব-কাব্যে গম্ভীর উচ্ছ্বাস,
স্তোত্র রচে অরণ্য-পাদপ
প্রপাতের দুর্ব্বার উল্লাস!

হতাশ হইয়া প্রভু, ভাসিয়া চলে'ছি কোথা,
কাল-স্রোতে বাসি ফুলমালা,
গান যেন কান্না মোর, অর্ঘ যেন ভিক্ষা-নিধি,
ভাষা যেন শিশুর দেয়ালা!

দীন-নেত্রে মূকের মতন
নত শির, আরো করি নত,
'নিদারুণ দারুণ সংসারে'
আছি প্রভু, চরণে প্রণত।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সাহিত্য-সংবাদ

(ঐতিহাসিক যৎ-কিঞ্চিৎ)

মুসলমান-সতী

পূর্ব্বে হিন্দু-রমণীরা যেরূপ চিতায় আপনাদিগকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেন; মুসলমানদিগের মধ্যেও সেই প্রথার প্রচলন দেখা যায়। কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশে এই প্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল। ১৬২০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে জাহাঙ্গীর যখন কাশ্মীর-প্রদেশে গমন করেন, সেই সময়ে তথায় একটী দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা এইরূপে স্বামীর চিতায় আপনাকে বিসর্জ্জন দেয়। জাহাঙ্গীর এই প্রথার উচ্ছেদ-সাধন-কল্পে আদেশ প্রচার করিয়া দেন যে, যে কেহ এইরূপে জীবনদান করিতে সঙ্কল্প করিবে, তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান হইবে। উপরোক্ত বিষয়টী আমরা একখানি দুষ্প্রাপ্য বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিয়াছি। গ্রন্থখানি Gladwin সাহেবের ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "Reign of Jahangir" (পৃঃ ৫০)।

ভারতে গোলাপী আতরের উৎপত্তি

ব্লক্ম্যান সাহেবের "আইন-ই-আকবরী" (vol. I) হইতে জানা যায় যে, নুরজাহান হইতেই প্রথমে ভারতে আতরের উৎপত্তি হয়। জাহাঙ্গীরের "আত্ম-কথায় (Tuzuk-i-Jahangiri trans. by H. Beveridge, vol I, 270-71. লিখিত আছে, সম্রাটের বিমাতা সলিমা সুলতান বেগম, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৯ম বর্ষে (১৬১৪ খৃঃ) এই গোলাপ-সারের উদ্ভাবন করেন। আমাদের বিশ্বাস, ইহার পূর্ব্বেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল; কারণ সলিমা সম্রাটের রাজত্বের ৭ম বর্ষে (১৬১২ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিতা হন।

Gladwin সাহেবের "Jahangir" হইতে জানা যায় যে, ইহা সর্ব্বপ্রথম নুরজাহানের মাতা-কর্ত্তৃক ১৬১২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। সলিমা ইহার নাম রাখেন,—আতর-ই-জাহাঙ্গীরী।

তামাকের উৎপত্তি

জাহাঙ্গীরের "আত্ম-কথা" হইতে জানা যায় যে, তাঁহার শাসন-কালের প্রারম্ভভাগে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারাই তামাক সর্ব্বপ্রথম ভারতে আনীত হয়। ইহাতে সাধারণের স্বাস্থ্য-হানির সম্ভাবনা দেখিয়া, সম্রাট, ইহার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন। পারস্য-সম্রাট্ও তৎপূর্ব্বে পারস্যে ইহার ব্যবহার নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আনারসও প্রথমে পর্ত্তুগীজগণ-কর্ত্তৃক ভারতে আনীত হয়।

তামাকের প্রচলন ইহার বহু পূর্ব্বেই ভারতে ছিল—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যাঁহারা এ সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ১৯০৯ সালের "Indian Antiquary"তে প্রকাশিত শ্রীগণপতি রায়ের প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ৬ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা

গৌড়ের কথা

১

বর্ত্তমান মালদহ-জেলার মধ্যে মহানন্দানদীর উভয় তীরে অদ্যাপি গৌড়-নগরের ধ্বংসাবশেষ তাহার প্রাচীন গৌরবময়ী

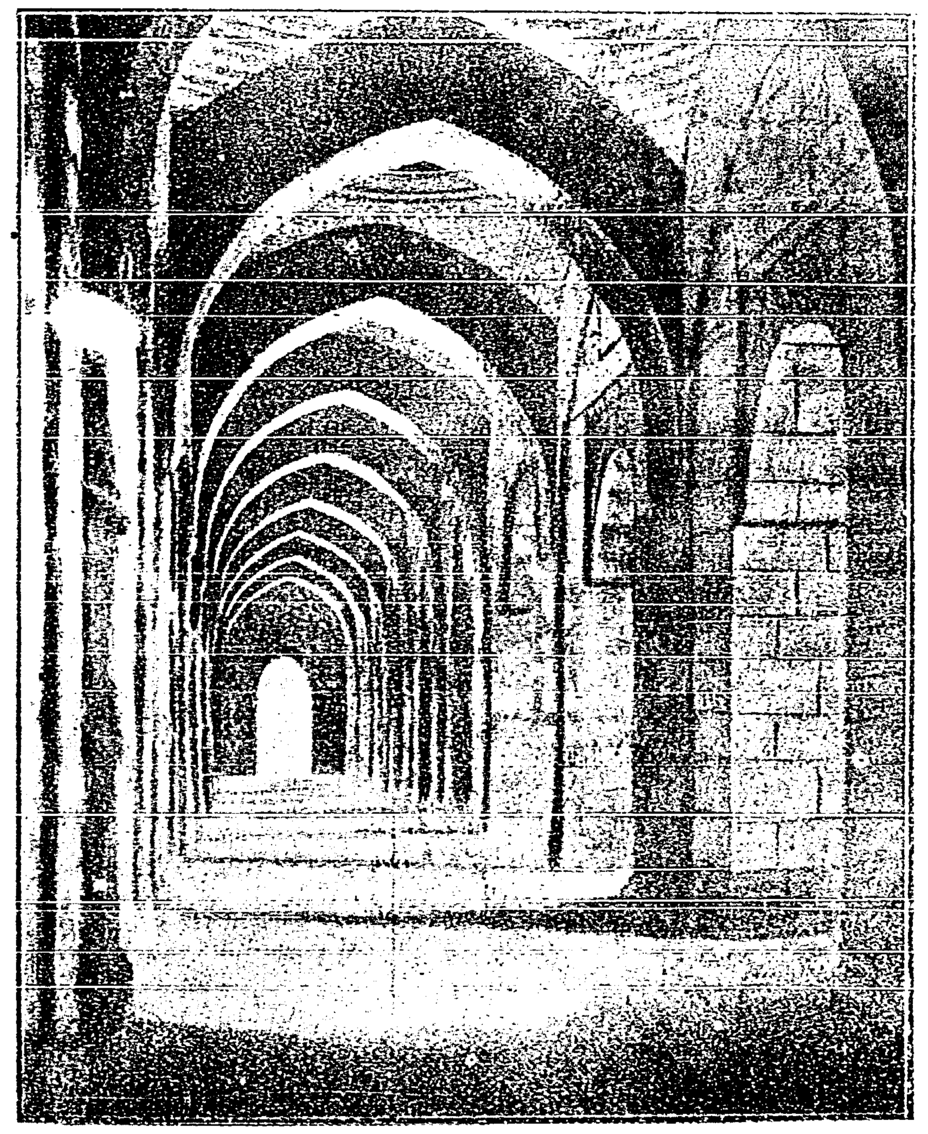

বড় সোণামসজিদের অভ্যন্তর

কীর্ত্তি বিঘোষিত করিতেছে। বিদ্যাপতির গানে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরাগলি ভারতে ও কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে পঞ্চগৌড়ের নাম দ্যোতিত হইয়াছে। গৌড়-নামের সঙ্গে বঙ্গবাসীর কি জানি কি এক প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। গৌড়ের প্রাচীন ইতিহাস প্রায় লোপ পাইয়াছে—কেবল তাহার কয়েকখানি ইষ্টক, কয়েকখানি ভগ্ন অট্টালিকা, দু-একটা দীর্ঘিকা, দু-চারিটা দুর্গ তাহার গৌরবের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত ক্ষুব্ধ বাঙ্গালীর প্রাণকে আরও শতধা বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। গৌড়-দর্শনে যিনি গমন করেন, আশে-পাশে লোকেদের মুখে তিনি শোনেন—কীর্ত্তি-কৌমুদী-সমুদ্ভাসিত সেই আদিশূরের নাম, সেন-বংশ-রবি বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেনের নাম। তাঁহাদের সমুদয় কীর্ত্তি চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে—স্মৃতির শ্মশান জাগাইয়া আছে, সুধু নগরের দক্ষিণাংশে 'পাতাল চণ্ডী', উত্তরাংশে 'ফুলবাড়ী দরজা' আর দরজায় এক অতি প্রাচীন দুর্গের জীর্ণ কঙ্কাল; ইহার ২ ক্রোশ উত্তরে একটা জায়গা পড়িয়া আছে, লোকে তাহাকে 'বল্লাল-বাড়ী' বলে। এই স্থানগুলির মধ্যবর্ত্তী আরও কয়েকটি স্থান হিন্দু-গৌরবের নিদর্শনমাত্র সূচিত করিয়া দেয়। সেগুলির নাম—গঙ্গাস্নান-ঘাট, লোহগড়, ধর্ম্মপুর, ব্যাসপুর ও রাজচন্দ্রপুর। গৌড়-নগরের মধ্যে প্রায় এক মাইল (১৬০০ গজ) বিস্তৃত একটী প্রকাণ্ড দীঘি আছে—নাম 'সাগর-দীঘি'। এ দীঘিটীও সেন-রাজগণের কীর্ত্তি। ইহার কিঞ্চিদ্দূরে 'গৌড়েশ্বরী'র মন্দির—এটী এখন মেলার স্থান, "দ্বারবাসিনী" নামে প্রসিদ্ধ।

গৌড় বহুদিন ধরিয়া জঙ্গল হইয়া পড়িয়া আছে। সেখানে

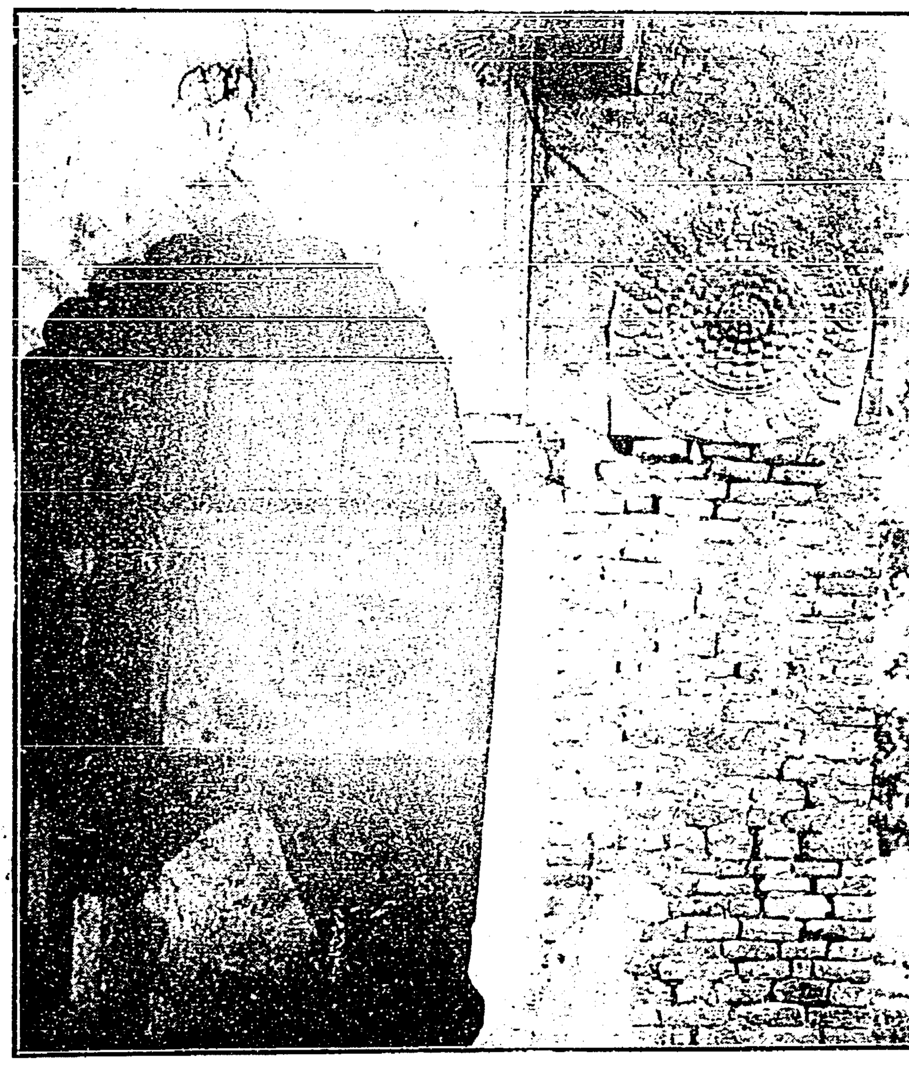

রামকেলির মন্দির-গাত্র

কেহ যাইত না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ক্রেটন সাহেব সর্ব্বপ্রথম গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তারপর ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার

বুকানন-হামিল্টন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ স্বয়ং দর্শন করিয়া একটী বিবরণ লিখিয়া যান। সেই সময় তিনি গৌড়ের যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, নিম্নে আমরা তাহার বর্ণনা হইতে কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

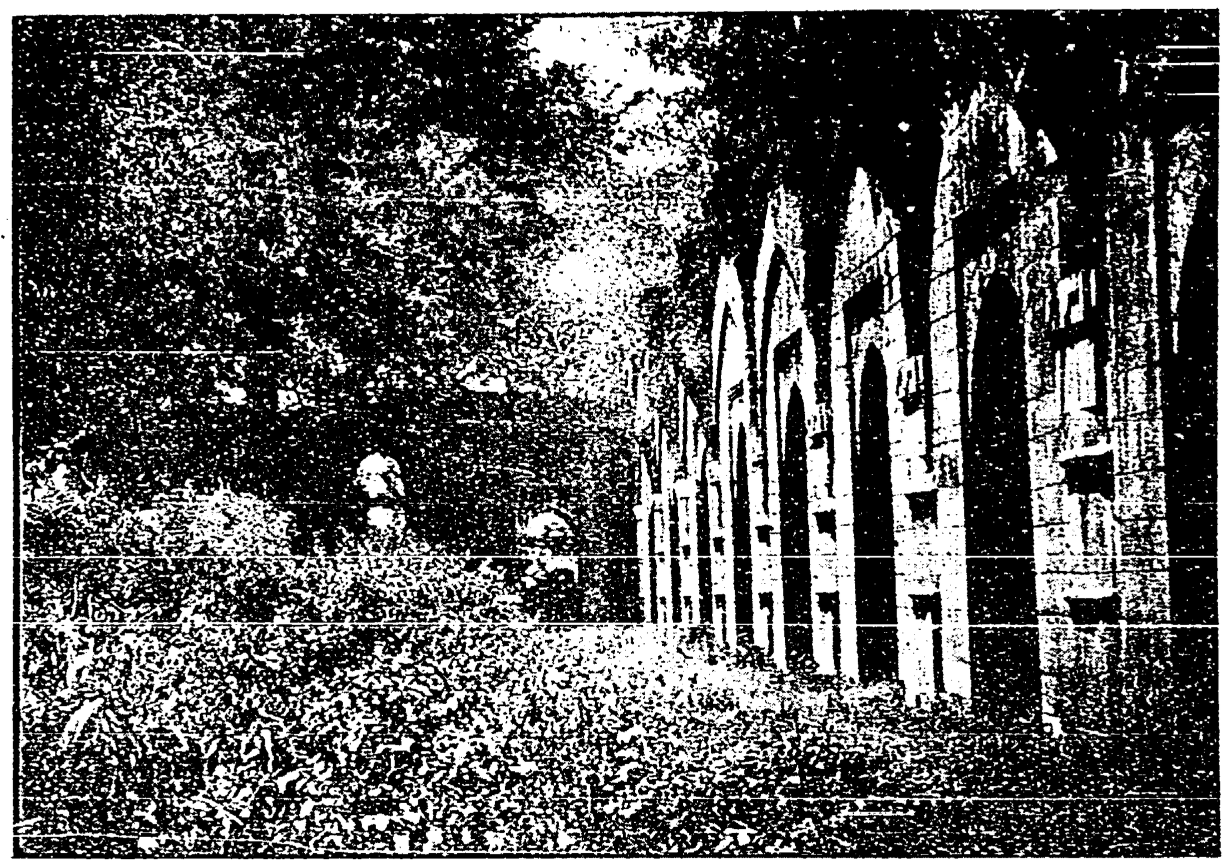

বড় সোণামস্‌জিদ—দক্ষিণদিকের দৃশ্য

বুকানন বলেন, সহরতলীসমূহ লইয়া এই নগরের পরিমাণ প্রায় ২০ হইতে ৩০ বর্গ-মাইল। স্থানটী কিছু উন্নত এবং উহার ভূভাগ কর্দ্দমাক্ত; সুতরাং নগরমধ্যস্থ গৃহগুলিও জলপ্লাবন হইতে সুরক্ষিত। নগরটী দৈর্ঘ্যে (উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত) ৭৷৷০ মাইল এবং প্রস্থে ১ হইতে ২ মাইল হইবে। ইহার পূর্ণ আয়তন প্রায় ১৩ বর্গ-মাইল। ইহার পশ্চিম দিকের সমস্তটাই গঙ্গানদীর স্রোতে বিধৌত এবং পূর্ব্ব সীমা, কতক মহানন্দানদীর দ্বারা ও কতক জলাভূমির দ্বারা সুরক্ষিত। দক্ষিণ দিক রক্ষার প্রয়োজন খুবই অল্প; কেন না, এই স্থানে গঙ্গা ও মহানন্দানদীর সংযোগ-স্থলটী ক্রমশঃ নিম্ন হইতে নিম্নতর হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং আক্রমণকারীর পক্ষে এই দিক্ দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া আক্রমণ করা বড় বিশেষ সুবিধাজনক নহে। নগর আক্রমণ করিবার পক্ষে উত্তর দিক্‌কার পথই বিশেষ প্রশস্ত; সুতরাং এইখানে একটী কৃত্রিম দুর্গ নির্ম্মাণ করার বিশেষ প্রয়োজন। প্রায় ছয় মাইল দীর্ঘ একটী দুর্গের সারি নির্ম্মিত হইল। এই দুর্গশ্রেণী সোন-তালায় ভাগীরথীর পুরাণ খাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভোলহাটে মহানন্দানদীর নিকট পর্য্যন্ত বক্র ও এলোমেলোভাবে বিস্তৃত। প্রধানতঃ ইষ্টকনির্ম্মিত এই দুর্গ-প্রাচীরের ভিত্তি প্রস্থে প্রায় একশত ফুট্। ইহার প্রত্যেক প্রান্তভাগই নদী স্পর্শ করিতেছে এবং সেই-খানেই একটী করিয়া ১২০ ফুট্ প্রস্থ খাত খনিত হইয়াছে। এই বক্ররেখার উত্তর-পশ্চিমাংশে একটী ফটক আছে। এই ফটকের শীর্ষদেশ, খিলানের আকৃতিবিশিষ্ট দুর্গ-বহির্ভাগস্থ একটী সুদৃঢ় চাতালের দ্বারা ঘেরা। ইহার ভিতর দিয়া নদীতীর-সংলগ্ন একটী রাস্তা বরাবর উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। এই রাস্তার স্থানে স্থানে অনেকগুলি পুষ্করিণী এবং জনৈক মুসলমান-সন্ন্যাসীর একটী স্মৃতি-স্তম্ভ বিরাজিত। এই স্থানটী বোধ হয়, নগরের এই অংশের তত্ত্বাবধায়ক কোনও পুলিশ-কর্ম্মচারীর কার্য্যালয় ছিল।

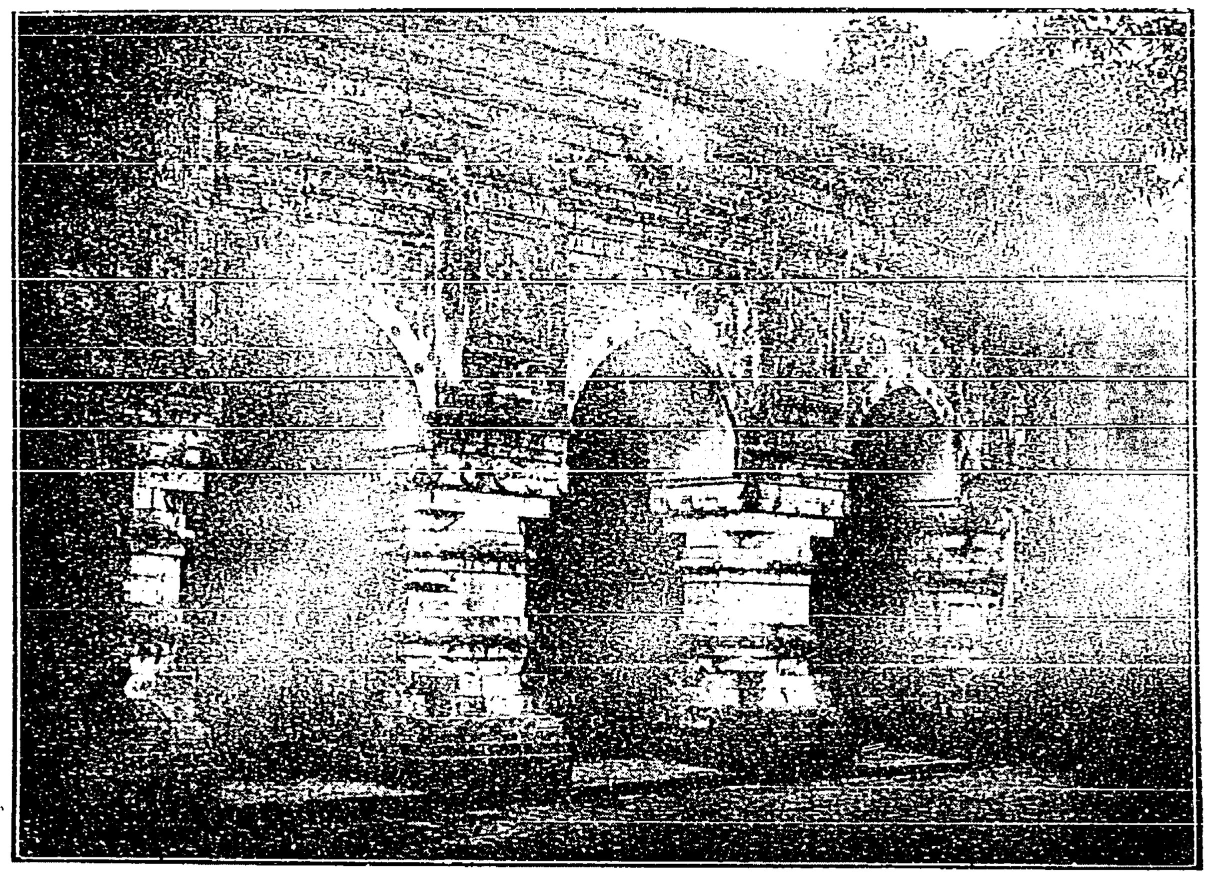

সংস্কারের পূর্ব্বে কদম রসুল

এই পথের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, কালিন্দী ও মহানন্দানদীর সংযোগ-স্থলে একটী সু-উচ্চ বুরুজ দণ্ডায়মান। অধুনা যদিও এই বুরুজটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি ইহা এখনও যেন মিনাসরাইএর পারঘাটস্থিত দর্শকমণ্ডলীর চক্ষুর সম্মুখে একটী হৃদয়গ্রাহী দৃশ্যের অবতারণা করে। প্রাচীরের উত্তরে এবং নগরের সম্পূর্ণ বাহিরে দুইটী বিচূর্ণিত ধ্বংস-স্তূপের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলির সহিত বাঙ্গালার প্রাচীন রাজা আদিশূর ও

বল্লাল সেনের নামের সংস্রব লক্ষিত হয়। ইহার অতি নিকটেই, বল্লাল সেন যে প্রাসাদে বাস করিতেন, সেই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। এই প্রাসাদের মধ্যে, ঢাকা-রাজপ্রাসাদের মত, চারিদিকে খাতবেষ্টিত প্রায় ৪০০ গজের একটী চতুষ্কোণ ভূভাগ পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীরের পশ্চাতে নগরের উত্তর সহরতলী। ইহা সুদূর-বিস্তৃত। ইহার আকৃতি একখানি চক্রের এক-চতুর্থাংশের মত এবং আয়তনের পরিমাণ প্রায় ৬০০০ গজ। এ সহরতলীতে যে কখনও তত বেশী লোকের বাস ছিল, এরূপ বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বাঞ্চল এক্ষণে জলাভূমির দ্বারাই আচ্ছন্ন; কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণের বাসোপযোগী মৃত্তিকা ও ইষ্টকনির্ম্মিত অনেকগুলি গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানেই বঙ্গের সুবিখ্যাত বৃহৎ "সাগর-দীঘি" অবস্থিত। এই দীঘির আয়তন উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় ১৬০০ গজ এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ৮০০ গজেরও অধিক হইবে। ইহার পাড়গুলি ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইহার জল আজিও বেশ নির্ম্মল ও সুপেয়। ইহা যে কোনও হিন্দুর দ্বারা কৃত, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। ইহার অতি নিকটেই দুইটি সুবিখ্যাত দেব-মন্দির আছে। এই মন্দিরদ্বয়ে হিন্দুগণের খুব বেশীরকমই যাতায়াত ছিল বলিয়া বোধ হয়। "সাগর দীঘি"র তীরগুলি এক্ষণে মুসলমান-সৌধশ্রেণীর দ্বারাই অধিকৃত। এই সৌধমালার মধ্যে মুখ্‌দম্ শাহ্ জালালের সমাধি-মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মুখ্‌দম্ শাহ্ জালাল একজন প্রখ্যাত-নামা মুসলমান সাধুপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে, ইনি নাকি বঙ্গের প্রাচীন মুসলমান-রাজগণের উপর বিশেষরকম প্রভুত্ব-বিস্তার করিয়াছিলেন। এই কবরের অনতিদূরেই একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ্ আছে। এই উভয় স্থানের খরচপত্র একটা নির্দ্ধারিত বৃত্তিদ্বারা চলিয়া থাকে এবং মুসলমানগণ ইহাদিগের প্রতি যথাযোগ্য ভক্তিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই সহরতলীর অপরদিকে, এক্ষণে "সাদুল্লাপুর" নামে অভিহিত বাজার-স্থানে প্রাচীন পবিত্রসলিল প্রধান ঘাট দৃষ্ট হয়। এই স্থানে এখনও বহুদূর হইতে আনীত হিন্দুদিগের বহু মৃতদেহের সংকার করা হয়।

বড় সোণামস্‌জিদ—দক্ষিণদিকের অপর দৃশ্য

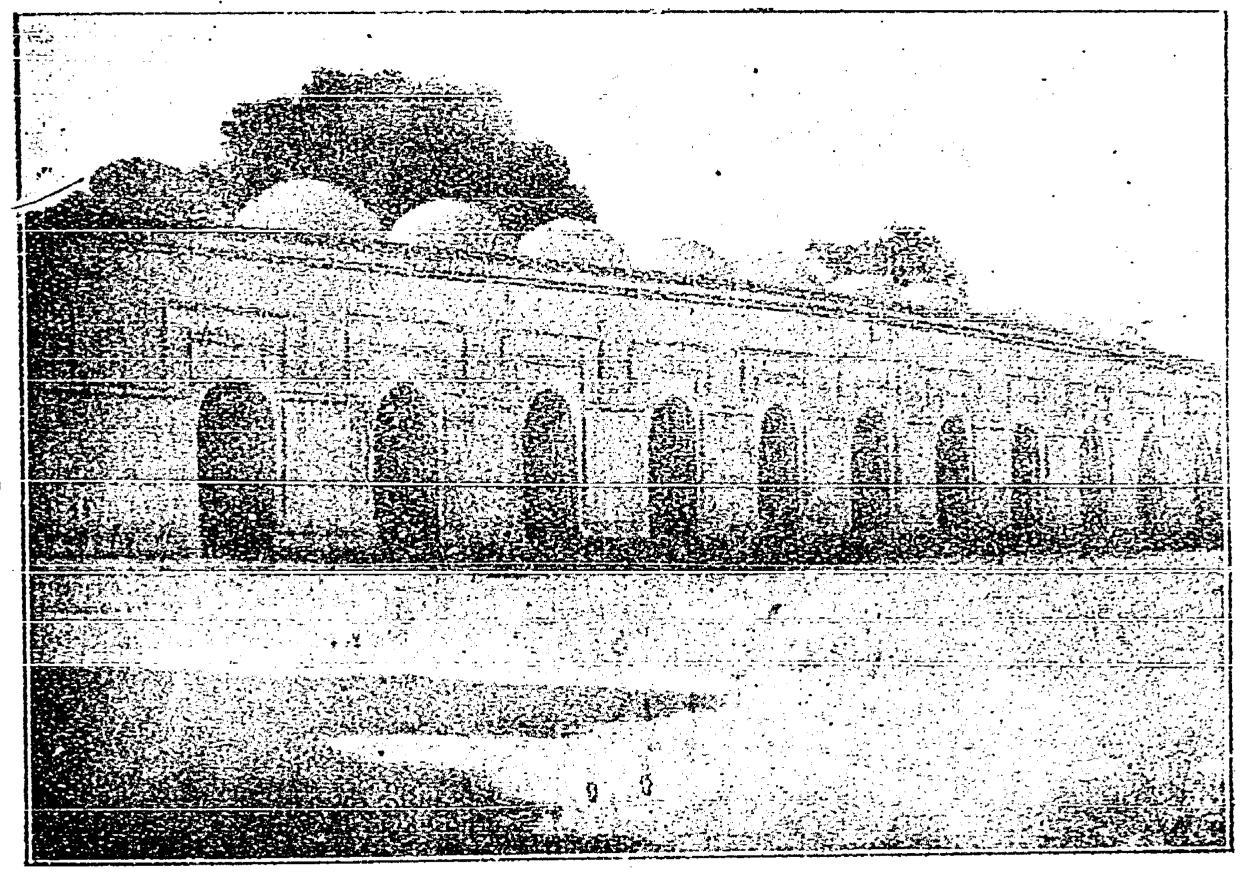

বড় সোণামস্‌জিদ (১৫২৪ খৃষ্টাব্দে)

গৌড়-নগর একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা, প্রত্যেক সহরতলীর দিকে ও গঙ্গার ধারে একটি সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাচীর ও খাতদ্বারা সুরক্ষিত। নগরের যে দিক্‌টা মহানন্দানদীর সম্মুখে অবস্থিত, সেই দিককার প্রাচীর দুই-ভাঁজ-করা এবং ঐ অঞ্চলের বহুস্থলেই দুইটা করিয়া অতি গভীর খাত আছে—কোথাও কোথাও আবার তিনটীও দেখা যায়। এই কার্য্যগুলি একপক্ষে যেমন দুর্গ-নির্ম্মাণ-উদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল, অপর পক্ষে যে আবার তেমনই, নদীর বাঁধ-নির্ম্মাণ ও জল-প্রণালী-খননেরও ইহার একটা উদ্দেশ্য ছিল, সে বিষয়ে

কোন সন্দেহই নাই। ক্রেটন সাহেব একবার এই বহির্দিকস্থ বাঁধের একস্থান পরিমাপ করিয়া দেখিলেন যে, উহার ভিত্তি প্রস্থে

দুর্গের পূর্ব্বদ্বার

১৫০ ফুট্। পূর্ব্বোক্ত ১৩ বর্গ-মাইল পরিবেষ্টিত এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশ স্থলেই বোধ হয়, বহু লোকের বসতি ছিল; কেননা, আজিও অনেকস্থলে, লুপ্ত মনুষ্যাবাসের চিহ্নস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও বাটীর ভিত্তি এবং ছোট ছোট পূজা-স্থানের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দক্ষিণাংশে অনেকগুলি সু-উন্নত ক্ষুদ্র ইষ্টক-বাটিকা, ইহা যে মনুষ্যাবাস ছিল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খুব সম্ভব, এগুলি ধর্ম্ম-মন্দির বা অন্য কোনও কার্য্য-ব্যপদেশে সাধারণের গতি-বিধির স্থান ছিল এবং বাসগৃহগুলি বিশৃঙ্খলভাবে পুষ্করিণীর তীরে তীরে একত্র সারি সারি নির্ম্মিত হইয়াছিল। আরও কিছু দক্ষিণে, ভাগীরথীর তীরে একটী গড় আছে—এটী মুসলমান-যুগেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা, দৈর্ঘ্যে (উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত) প্রায় এক মাইল বিস্তৃত এবং ইহার প্রস্থ প্রায় ৬০০—৮০০ গজ।

স্নানরত সাহিত্য-সেবী

এই বিস্তৃত স্থানটী, যে বর্ত্তুলাকার প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা ইষ্টকের দ্বারা খুব দৃঢ় করিয়া নির্ম্মিত; ইহার মধ্যে মধ্যে গোলাকার বুরুজ আছে; পার্শ্বদেশ হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিবার সুবিধাজনক স্থানও ইহাতে আছে। দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত আছে; এই প্রাসাদের চতুঃপার্শ্ব, ৪০ ফুট্ উচ্চ ও ৮ ফুট্ প্রস্থ একটী ইষ্টক প্রাচীর দিয়া ঘেরা। মধ্যে কতকগুলি প্রাচীর আড়া-আড়িভাবে দণ্ডায়মান; কিন্তু ঘরগুলি যে, কিরূপ কৌশলে সজ্জিত, তাহা এ পর্য্যন্ত নিরূপণ করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে ঐ স্থানের প্রায় সমস্তটাই শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রাসাদ হইতে অল্প উত্তরেই বাদশাহী কবর। এ গুলিতে হুসেন শাহ্ এবং বঙ্গের অন্যান্য নবাবের মৃতদেহ প্রোথিত হইয়াছিল। এই ইষ্টকালয়ের প্রায় সমস্ত অংশই যদিও এক্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এক সময়ে যে ইহার একটা বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ছিল, এ কথা, ইহার প্রতি একবার লক্ষ্য করিলেই বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইহার গৃহতল ও সমাধি-মন্দিরগুলি প্রস্তরাচ্ছাদিত ছিল; এক্ষণে কিন্তু সে প্রস্তরের একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুর্গমধ্যে আরও দুইটী মস্‌জিদ্ আছে। তন্মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সেটী ধ্বংসাবশেষ মাত্র। ছোটটী, হুসেন শাহ্ বা তাঁহার উত্তরাধিকারী নজারৎ শাহ্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এটী কদম-রসুল মস্‌জিদ্ নামে অভিহিত। এটীকে অদ্যাপি বেশ ভাল অবস্থাতেই দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য লইয়াই এই মস্‌জিদের খরচ চলে। দুর্গের পূর্ব্ব প্রাচীরের ঠিক্ বিপরীত দিকেই একটী গম্বুজ আছে। ইহার মধ্যস্থল দিয়া একটী ঘুরান সিঁড়ি উঠিয়াছে। এই সোপান-শ্রেণী ইহার শিখর-দেশস্থিত একটী কক্ষ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এটী "পীর অসাদ মিনার" নামে খ্যাত; কিন্তু এটী যে কোন দেশী ব্যক্তিদ্বারা নির্ম্মিত, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফরগুসন্ সাহেব, তাঁহার "প্রাচ্য স্থাপত্যের ইতিহাস" গ্রন্থে বলেন যে, দিল্লীর "কুতব মিনারে"র ন্যায় ইহাও নিশ্চয় একটী জয়-স্তম্ভ। দুর্গ হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তরে অনূ্যন ৬০০ বর্গ-গজ আয়তনের একটী স্থান আছে। এই স্থানটী একটী প্রাচীর ও খাত দ্বারা বেষ্টিত এবং "ফুল-বাড়ী" নামে পরিচিত। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে-পিয়াস "বাড়ী" নামক একটী দুঃস্বাদু ও ঈষল্লবণাক্ত জলপূর্ণ পুষ্করিণী আছে। কিংবদন্তী আছে, দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে এই জলাশয় ভিন্ন অন্য কোনও জলাশয়ের জল পান করিতে দেওয়া হইত না; সুতরাং তাহারা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইত। নগর-প্রাচীরাভ্যন্তরে আরও অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। উহাদের কোন-কোনটীর মধ্যে পোষা কুমীর বাস করে। ঐ স্থানবাসী মুসলমান ফকিরগণ এই সকল কুমীরকে আহার্য্য প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল জলাশয়ের মধ্যে "ছোট সাগর-দীঘি"ই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। পিয়াস বাড়ী ও দুর্গের ঠিক মাঝখানে "বড় সোণা মস্‌জিদ্" অবস্থিত। এই মস্‌জিদ্-গৃহখানি গৌড়ের মধ্যে অতুলনীয়। ইহা দৈর্ঘ্যে (উত্তর হইত দক্ষিণ পর্য্যন্ত) ১৮৭ ফুট্, প্রস্থে (পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত) ৬০ ফুট্ এবং উচ্চতায় ('কার্ণিশে'র শিখরদেশ পর্য্যন্ত) ২০ ফুট্।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বকঃ—কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সূক্ষ্মলোম বাবাজীবনের সহিত বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের কন্যা শ্বেতলোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। নিজে না গিয়া, কৃষ্ণলোম এক বন্ধুকে মেয়ে দেখিতে পাঠায়। পূর্ব্ববৈরবশতঃ সে বন্ধু গিয়া বরের রূপ-গুণের এমন বর্ণনা করিয়া আসে যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। স্থূলপুচ্ছ তথাপি বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয়; কিন্তু তাহার স্ত্রী গাঢ়লোমার এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি ছিল। এ কারণে গাঢ়লোমা এক রাত্রিশেষে কন্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এদিকে সূক্ষ্মলোম, কোনও এক বন্ধুর মুখে শ্বেতলোমার রূপ-গুণের বর্ণনা শুনিয়া একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিবাহ না হওয়াতে মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া যায়। ক্রমে সে বানর-মহারাজার দেশে গিয়া উপস্থিত হয় এবং মহারাজার প্রিয় সভাসদ্-রূপে কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করে। সে সময় বানর-মহারাজার সহিত মহিষ-মহারাজার যুদ্ধের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। সূক্ষ্মলোম ছুটি লইয়া তাহার প্রণয়িনীকে অন্বেষণ করিতে বাহির হয়। বানর-মহারাজা যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার পর সূক্ষ্মলোম ফিরিয়া আসে। তখন প্রকাশ হয়, ভ্রমণকালে পীড়িত হইয়া কোনও এক মেষ-পরিবারে সে আশ্রয় লইয়াছিল। পীড়ার সময় তাহাদের একটি মেয়ে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিল। আরোগ্যলাভ করিয়া সূক্ষ্মলোম সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে। এদিকে তাহার পিতা ও স্থূলপুচ্ছ, নিজ নিজ সন্তানকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়াছে। বানর-মহারাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন—একমাসেই মহিষগণ পরাজিত হইল—মহিষ-রাজ্য বানর-মহারাজার করতলগত হইল। ওদিকে কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছ অন্বেষণ করিতে করিতে মহিষ-রাজ্যের দিকে আসিতেছে। সূক্ষ্মলোম রাজার অনুমতি পাইয়া বানর-রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছিল।

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মহিষ-রাজ্য। বানর-মহারাজার শিবির।
বানর-মহারাজা ও পাত্র-মিত্র-সভাসদ্‌গণ।

বা-মহা। ভাই, বন্ধু, সভাসদ্-পাত্র-মিত্রগণ,
এতদিনে আমাদের যুদ্ধ অবসান
হল। কভু বানর-রাজ্যের ইতিহাসে
এত বড় বীরত্ব-কাহিনী স্থানলাভ
করে নাই। বরঞ্চ মহিষ-রাজা, বহু-
বার বানর-রাজ্যের বক্ষে, মহাগর্ব্বে
প্রোথিত করিয়াছিল বিজয়-নিশান।

মন্ত্রী। মহারাজ, যে রাজ্যের হেন রাজা, হেন
সেনাপতি, হেন যোদ্ধৃকুল—

বা-মহা। (সহাস্যে) হেন মন্ত্রী।

মন্ত্রী। (প্রণাম করিয়া)
হেন দেশভক্ত প্রজা, সে রাজ্য ছাড়িয়া
আর অন্য কোথা, গর্ব্বিতা বিজয়-লক্ষ্মী
পাতিবেন আপনার সিংহাসনখানি?

জনৈক সভাপণ্ডিত। ত্বৎকীর্ত্তিমৌক্তিকফলানি গুণৈস্ত্বদীয়ৈঃ
সন্দর্ভিতুং বিবুধবামদৃশঃ প্রবৃত্তাঃ।
নান্তো গুণেষু ন চ কীর্ত্তিষু রন্ধ্রলেশো
হারো ন জাত ইতি তাশ্চ মিথো হসন্তি॥

অস্যার্থঃ।

হে রাজন্, কীর্ত্তি তব মুক্তাফলচয়,
তব গুণ—অপরার্থ সূত্র যার হয়—
সেই সব লয়ে স্বর্গে দেবকন্যাগণ
মালা গাঁথিবার তরে করিল যতন।
কিন্তু না পাইল খুঁজি সে গুণের শেষ,
কোনও মুক্তামাঝে না পাইল রন্ধ্রলেশ।
না পারি গাঁথিতে মালা, সেই কন্যাসবে
নির্জ্জনে বসিয়া তাই হাসিছে নীরবে।

অনেকে। কি সুন্দর! ধন্য ধন্য পণ্ডিত-মশাই,
এমন কবিতা আর কভু শুনি নাই।

অন্য সভাপণ্ডিত। মহারাজ শ্রীমন্ জগতি যশসা তে ধবলিতে
পয়ঃ পারাবারং পরমপুরুষোঽয়ং মৃগয়তে।
কপর্দ্দী কৈলাসং সুরপতিরপি স্বং করিবরং
কলানাথং রাহুঃ কমলভবনো হংসমধুনা॥

অস্যার্থঃ।

শুভ্র যশোরাশি তব, ওহে মহারাজ,
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে দিকে দিকে আজ।
যেখানে যা কিছু ছিল ব্যাপি ত্রিভুবন,
অতি শুভ্রবর্ণ তাই করেছে ধারণ।
হয়ে গেছে একাকার শাদায় শাদায়,
পূর্ব্বে যাহা শাদা ছিল, খুঁজে পাওয়া দায়।
নারায়ণ, শয্যা তাঁর ক্ষীরোদ-সাগর
খুঁজে খুঁজে ফিরিছেন দেশ-দেশান্তর।
কৈলাস খুঁজিয়া সারা দেব ত্রিলোচন,
ইন্দ্র মরিছেন খুঁজি হাতীটি আপন।
শশধরে রাহু আর খুঁজিয়া না পায়,
ব্রহ্মা কন, হংস মোর গেল রে কোথায়?

অনেকে। সাধু, সাধু—এ কবিতা চমৎকার অতি,
ভট্টাচার্য্য-ঠাকুরের মুখে সরস্বতী।

বা-মহা। আমার কীর্ত্তির যাহা করিলে ব্যাখ্যান,
ওহে ভট্টাচার্য্যগণ, মনোহর তাহা
কবিত্ব-সম্পদে। একা আমি ভাগী নহি
কোন প্রশংসার,—তোমাদের আশীর্ব্বাদ,
দেশ-ভক্তি প্রজাসমূহের, রাজকার্য্যে

নিয়োজিত যারা, তাহাদের সকলের
প্রবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সমস্ত মিলিয়া
বানর-রাজ্যেরে এত করিয়াছে বড়।
যাই হোক্, তোমাদের রাজভক্তি আর
কবিত্বের পুরস্কার আগামী গেজেটে
ছাপা হবে। মহামহোপাধ্যায় উপাধি
দিনু দোঁহে।

(সভায় আনন্দ-কোলাহল)

সেনাপতি, তোমার সেনারা,
যারা যারা সমধিক বীরত্ব-প্রকাশ
করিয়াছে—তাহাদের নামের তালিকা
দিও মোরে। সবারে করিব পুরস্কৃত।

মন্ত্রী। মহারাজ, পুরস্কার করুন আদেশ
প্রথমে সেনাপতির।

বা-মহা। সেনাপতি, তুমি
বানর-রাজ্যের স্বধু ছিলে সেনাপতি,
আজি হতে এ যুক্তরাজ্যের সেনাপতি
হলে তুমি। আর লও—
(গলা হইতে মুক্তামালা খুলিয়া)
এই উপহার।

(সেনাপতির গলে মুক্তামালা-প্রদান)
(সভায় আনন্দধ্বনি)

সেনাপতি। (নতজানু হইয়া)
প্রভু, আজি ধন্য হইলাম।

মন্ত্রী। মহারাজ,
আমাদের যুবরাজ এ নবরাজ্যের
রাজপদে অভিষিক্ত হন, বাঞ্ছা ইহা
সকলের। সবার হইয়া তাই আমি
আবেদন করিতেছি পদে—রাজাদেশে
বাঞ্ছাপূর্ণ হোক্ আমাদের।

বা-মহা। তাই হবে।
আন ডাকি যুবরাজে। জ্যেষ্ঠপুত্রে তব
তাহার মন্ত্রিত্ব-পদে নিযুক্ত করিব।

মন্ত্রী। রাজ-অনুগ্রহে প্রভু, চরিতার্থ হল
কৃতজ্ঞহৃদয় দাস।

বা-মহা। আর আর যত
আমাদের হিতৈষী বান্ধব, সকলের
রাজভক্তি পুরস্কৃত হবে ফিরে গিয়ে
দেশে। যুবরাজে আজি অভিষেক করি
কালি প্রাতে আমরা করিব যাত্রা।

মন্ত্রী। এই
এসেছেন যুবরাজ। অভিষেক-ক্রিয়া
সম্পন্ন হউক।

বা-মহা। এস বৎস!
(নতজানু যুবরাজের মস্তকে হস্ত রাখিয়া)
অদ্য আমি
তব করে অর্পিলাম এ রাজ্যের ভার।
মনে তুমি রাখিও সর্ব্বদা, যারা প্রজা,
আপন সন্তান চেয়ে অধিক তাহারা।
কভু তারা দুঃখ নাহি পায়, সুখে থাকে
নিজ নিজ ধন-জন লয়ে, এই মতে
ব্যবস্থা করিবে তুমি। তোমার প্রজারা
যে যত হউক বড়, যত ক্ষুদ্র হোক্,
তুমি সকলেরে দেখিবে সমান চক্ষে।
ধনী হোক্, ধনহীন হোক্, বলবান্
অথবা দুর্ব্বল, সবে যেন সুবিচার
পায় রাজ্যে তব চিরদিন। শুভমস্তু।

(সভায় আনন্দধ্বনি)

যুবরাজ। মহারাজ, পিতৃদেব, এ দাসে করুন
আশীর্ব্বাদ, যেন আপনার আজ্ঞামত
সমস্ত করিতে পূর্ণ সমর্থ সে হয়।

বা-মহা। অন্তরের আশীর্ব্বাদ নিয়ত তোমারে
অর্পণ করিব আমি।
সভাভঙ্গ আজি
করিলাম। পাত্র-মিত্র-সভাসদ্গণ,
সারাদিন ভ্রমণ করিয়া দেখ-শোন
এ নববিজিত রাজ্য। কল্য উষাকালে
দেশযাত্রা করিব সকলে।

(গাত্রোত্থান)

মন্ত্রী। জয় জয়,
মহারাজ, যুবরাজ উভয়ের জয়।

সকলে। জয় জয় মহারাজ, জয় যুবরাজ।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মহিষ-রাজ্য।

সূক্ষ্মলোম।

সূক্ষ্ম।
(স্বগত) এ দেশ কি চমৎকার! আহা! এত ঘাস,
এত পাতা নধর-শ্যামল, দেখে দেখে
মুখে জল আসে! এ দেশেতে কখনও
দুর্ভিক্ষ হবে না। আমি পেয়েছি আদেশ,
এই দেশ যদি মনোনীত করি, তবে
থাকিব এখানে যুবরাজ-সভাসদ্-
রূপে। প্রেয়সীরে ফেলিয়া এসেছি একা,
কল্যই ফিরিতে হবে—কিছুদিন পরে
এ দেশে আসিব উঠি।

(চিন্তা)

হল কতদিন,
বাহির হয়েছি আমি নিরুদ্দেশ হয়ে,
পিতাকে ত লিখি নাই একখানি চিঠি!

(চিন্তা)

সেটা কিন্তু নিতান্তই অন্যায় হয়েছে।
মনে তাঁর অনর্থক দিয়েছি বেদনা।
নিতান্ত পাষাণ আমি—বড়ই নির্ব্বোধ।
তাই, যারে জন্মে দেখি নাই চক্ষু দিয়ে,
তার তরে একেবারে বিবাগী হইয়া
বাহিরিনু। বলেছিল নীলচক্ষু-ভায়া
তার তুল্য রূপবতী মেষকুলে নাই।

দেশে যদি ফিরি কোনদিন, একবার
এই প্রেয়সীরে দেখাইয়া দিব তারে।
কি বলে সে, শুনিতে হইবে।

(চিন্তা ও আপন মনে হাস্য)

যাহা হোক্,
রাজধানী ফিরে গিয়ে বাবাকে লিখিব
পত্র একখানি। সব কথা খুলিয়া কি
পারিব লিখিতে? এই বিবাহের কথা?

(চিন্তা)

বিবাহের কথা আপাততঃ রাখা যাক্
গোপন করিয়া। আমি প্রাপ্ত হইয়াছি
রাজকার্য্য—সেই কথা লেখা যাক্ স্বধু।
তাঁহার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করেছি,
সে কথা কেমনে লিখি? হয় না সাহস।

(চিন্তা)

তারপর, এইখানে আসিবেন যবে,
দেখে হেন রূপবতী বধূ—বেশী ক্রোধ
না হতেও পারে।

(দূরে কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছের প্রবেশ)

ওরা কারা আসিতেছে?
দেখিতেছি আমাদেরই জাতি। একজন
কালো,একজন শাদা।

(নিরীক্ষণ)

ও কি! বাবা নাকি!
উঁহু, তিনি নন—দূর থেকে দেখাতেছে
তাঁহারই মতন।

(তাহারা নিকটে আসিল)

ওরে বাবা!—বাবাই ত!
সর্ব্বনাশ, এখন কি করি? পলাইব?
না-না। শেষে ত হবেই দেখা। তার চেয়ে
এইবেলা মনে মনে স্থির করে রাখি
কি বলিয়া নিজদোষ করিব ক্ষালন।

(কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এই যে! হ্যাঁ বাবা, তুই এখানে আছিস্?
(ছুটিয়া আসিয়া আলিঙ্গন)
বুড়ো বাপকে কি এত কষ্ট দিতে হয়,
হাঁরে?

সূক্ষ্ম। বাবা, বড় অপরাধ করিয়াছি।
আমারে করুন ক্ষমা, পায়ে পড়িতেছি।

(পদতলে পতন)

কৃষ্ণ। (পুত্রকে উঠাইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে)
তোকে যে ফিরিয়া পাব, সে আশা ছিল না।
তোর এ কি রে আক্কেল?

সূক্ষ্ম। বাবা, আমি কিছু
অর্থ-উপার্জ্জন-তরে বাহিরিয়াছিনু।

কৃষ্ণ। তোর অর্থ নিয়ে আমি কি করিব বাপ্,
কে বা বসেছিল বল্, হাঁড়ি চড়াইয়া
তোর টাকার জন্য রে?

সূক্ষ্ম। বাবা, সর্ব্বদাই
বলিতে না তুমি, "আমরা নিতান্ত দুঃখী"?
দুই পয়সার স্থানে যদি কভু আমি
চারিটি করেছি ব্যয়, কি কাণ্ড বাধিত!
তাই আমি ভাবিলাম, আমাদের যদি
অবস্থাটা এত শোচনীয়, তবে আমি
কি লজ্জায় ধ্বংস করি ঘরে বসে বসে
ঘাস-পাতা? বিদেশেতে বাহির হইয়া
যোগাড় করিব কিছু চাক্‌রি-বাক্‌রি,
প্রতিজ্ঞা করিয়া মনে আসিয়াছিলাম।

কৃষ্ণ। ঘটেছে কি কিছু?

সূক্ষ্ম। বাবা, আমি আপনার
শ্রীচরণ-আশীর্ব্বাদে, বানর-রাজার
সভাসদ্ হইয়াছি।

কৃষ্ণ। (মহা আহ্লাদে) বটে—বলিস্ কি!

সূক্ষ্ম। হাঁ বাবা।

কৃষ্ণ। পাকা না এক্‌টিনি?

সূক্ষ্ম। পাকা, বাবা!
মহারাজা আমারে করেন অনুগ্রহ
অতিশয়।

স্থূল। (স্বগত) ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন,
এ ছেলেটি রাজা হবে। ততটা না হোক্,
রাজ-সভাসদ্ হইয়াছে। খাসা ছেলে—
যত রূপ, তত গুণ। যদি গৃহিণীকে
খুঁজে পাই—একবার স্বচক্ষে দেখিলে
অবশ্য ফিরিবে তাঁর মত। কে বলিল
দাঁতগুলি উঁচু-উঁচু, শিঙ্ দুটি বাঁকা,
চোয়াড়ে চেহারা—সেই ছাগল-বেটাই
এত কাণ্ড বাধায়েছে মিথ্যাকথা বলে।
আহা, কেন আমি গিয়ে দেখিয়া আসিনি
নিজচক্ষে! যাহা হোক্—যদি তাহাদের
খুঁজে পাই—এ আপ্‌শোষ মিটাইব তবে।
এমন জামাই পাওয়া বহু ভাগ্যে ঘটে।

কৃষ্ণ। শুনিলে? শুনিলে ভায়া, ছেলেটি আমার
কি বলিল?—এতদিন ছিল না ও বসে।

স্থূল। আমি জানিতাম তাহা—তোমারই ত ছেলে!
ও কি আর স্বধু স্বধু পলাইয়াছিল?
ও যদি বলিত—'বাবা, যাইব বিদেশে,
করিব চাক্‌রি'—তুমি দিতে কি আসিতে?

কৃষ্ণ। না ভাই,—সে সত্যকথা।
(সূক্ষ্মলোমের প্রতি) রাজধানী ছেড়ে
এখানে যে তুমি? শুনিলাম, মহারাজা
গিয়াছেন ফিরি কয়দিন হল। তুমি
যাও নাই?

সূক্ষ্ম। না বাবা, এখানে আমি যুদ্ধে
আসি নাই মহারাজা-সাথে। থাকিতাম
রাজধানীতেই। যুদ্ধশেষ হয়ে গেলে,
ফিরে গিয়ে সকলেই বলিতে লাগিল,
এ দেশটি চমৎকার অতি। তাই আমি

দেখিবার তরে কিছু ছিলাম উৎসুক।
ইতিমধ্যে যুবরাজ এখান হইতে
পাঠালেন চিঠি মহারাজার নিকটে,
খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি মহিষ-রাজার
কাগজ-পত্তর—পেয়েছেন পত্র এক
গর্দ্দভ-রাজার লেখা—গত যুদ্ধকালে
তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি।

কৃষ্ণ। বটে! কই গর্দ্দভেরা আসেনি ত কেহ!

সূক্ষ্ম। আসে নাই বটে—কিন্তু ছিল ত প্রস্তুত
আমাদের বিপক্ষতা করিবার তরে।
যুবরাজ তাই লিখেছেন, আমাদের
শত্রু তারা—বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধযাত্রা
করা একান্ত উচিত। মহারাজা, তাহা
পাঠ করি, যুবরাজে যুদ্ধ করিবার
দিয়াছেন অনুমতি; সেই পত্র আমি
আনিয়াছি।

স্থূল। কতদিনে ফিরিতে হইবে?

সূক্ষ্ম। তাহা স্থির নাই কিছু। মহারাজা মোরে
বলেছেন, এই দেশ লাগে যদি ভাল,
তবে মোরে যুবরাজ-সভাসদ্ করি
রাখিবেন হেথা।

কৃষ্ণ। তুমি করিলে কি স্থির?

সূক্ষ্ম। এখনও স্থির কিছু করি নাই আমি।
আপনি আসিয়াছেন—সব দেখে-শুনে
যেরূপ দিবেন আজ্ঞা সেরূপ করিব।

কৃষ্ণ। বেশ বেশ, ভাল কথা। আজি তবে এস
আমাদের সাথে—বাসা বেশী দূর নয়।

সূক্ষ্ম। চলুন।
(জনান্তিকে) ইনি কে বাবা?

কৃষ্ণ। (জনান্তিকে) জান না ইঁহারে?
স্থূলপুচ্ছবাবু। ইঁহারই কন্যার সাথে
তোমার বিবাহ স্থির করিয়াছিলাম।
আহা, বৃদ্ধ সহিছেন কি যে মনঃক্লেশ!
পান নাই স্ত্রী-কন্যার আজিও সন্ধান।
বাহির হইয়াছিনু মোরা দুইজনে
অন্বেষণ-ব্রতে। বিধি মিলালেন তোমা।
ওঁর স্ত্রী-কন্যারে যদি খুঁজে পাওয়া যায়,
তা হলে হইবে তুমি জামাতা উঁহার।

সূক্ষ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! কি বিপদ!

কৃষ্ণ। এস, যাওয়া যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

গর্দ্দভ-রাজ্য।

গাঢ়লোমা।

গাঢ়। (স্বগত) হায় হায়, শেষকালে অদৃষ্টে আমার
এই কি ছিল গো! যার জন্য হইলাম
গৃহত্যাগী, সেই গেল ছেড়ে! শ্বেতলোমা,
বাছা, আজিও কি তুই বাঁচিয়া আছিস্?
হায় হায়, কেন আমি বিবাহ তাহার
না দিলাম!—দিলে কভু হেন দুর্ঘটনা
ঘটিত না। কি কুবুদ্ধি হল! কেন আমি
শিতুরে ফেলিয়া একা গেলাম সেদিন
জলপান করিবার তরে! ফিরে এসে
আর না পেলাম দেখা। যারা সব ছিল
সেইখানে, কহিল তাহারা, দেখে বাছা
ফিরিবার বিলম্ব আমার, চলে গেছে
খুঁজিতে আমারে। কোথায় হারায়ে গেল
অজানা অচেনা দেশে! আমি পুনঃ তারে
খুঁজিবারে হলাম বাহির, কত দেশ,
কত বন খুঁজিলাম সংখ্যা নাহি তার।
আর কি পাইব?—আহা, সেই কচি মেয়ে
বেঁচে নেই আর। যদি খুঁজে পাই কভু,
তবে গৃহে ফিরে যেতে পারি। যার সঙ্গে
এবার বিবাহ দিতে বলিবেন স্বামী,
তারই সঙ্গে দিব। হায়, আসিবে কি কভু
এমন সুদিন! যদি পাওয়া নাহি যায়
তারে আর, গৃহে যাব কোন্ মুখ লয়ে?
ফিরিবার পথে তবে চিরদিন তরে
কাঁটা পড়ে গেল।

(প্রতিবেশিনীর প্রবেশ)

এস দিদি।

প্রতি। শুনিয়াছ
কিছু বোন? বড় যে বিপদ!

গাঢ়। কি হয়েছে?

প্রতি। বানরেরা আসিয়াছে আমাদের দেশে
যুদ্ধ করিবারে। তাহা শুনিয়া পূর্ব্বেই
রাজা কোথা গিয়াছে পলায়ে। বানরেরা
বলিতেছে, এ রাজ্যের যত প্রজা সবে
উঠিয়া যাইতে হবে রাজ্যে তাহাদের।
হুকুম হয়েছে আজি যাত্রা করিবার।
সারি বেঁধে চলিয়াছে যত জন্তু সব।
কাল প্রাতে যদি, এ রাজ্যের কোনও প্রজা
এখানে দেখিতে পায় তারা, গলা টিপি
তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে।

গাঢ়। কেন দিদি,
এমন আদেশ কেন হল? নিয়ে গিয়ে
সেখানে ত মেরে ফেলিবে না?

প্রতি। শুনিলাম
মহিষ-রাজ্যটা তারা করেছে দখল;
করিয়াছে পলায়ন সকল মহিষ।
তাই আমাদের সেখানে করাবে বাস।

গাঢ়। বটে! তবে চল, আমরাও যাই।

প্রতি। চল।

(প্রস্থান)

ক্রমশঃ

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা

একটি গান

বৈশাখের শীতল সন্ধ্যায়, কল্লোল-মুখর সাগর-বেলায় একদিন একটী সঙ্গীত শুনিয়াছিলাম—বড় মধুর লাগিয়াছিল; তা'ই আজও তাহা ভুলি নাই, আজও এই দূর-দূরান্তে ধূলিলিপ্ত নগরকোণে কোন' কোন' দিন বিরলে বসিয়া সে ললিত ঝঙ্কার যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনিতে পাই। সে স্বর সুমিষ্ট, সে সঙ্গীত-সুমধুর। গায়ক গায়িতেছিল—আর আমি শুনিতেছিলাম, বিভোর হইয়া আত্মহারা হইয়া উপভোগ করিতেছিলাম। সে সুধাকণ্ঠে গায়িতেছিল—

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি,
তুমি অবসর মত বাসিয়ো।
আমি নিশিদিন হেথা বসে' আছি,
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো।
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
র'ব বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমিষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে,
চির বিকসিত বনভবনে,
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজসুখ-স্রোতে ভাসিয়ো।
যদি তা'র মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো।

কি দীনতা! কি মিনতি! বন্ধু আমার সখা তুমি, সত্যই তুমি কহিয়াছিলে—কি humiliation—কি Submission! আমি তোমায় ভালবাসি; তুমি ভালবাসিবে বলিয়া বাসি না। তোমায় ভালবাসিয়া সুখ পাই, তা'ই তোমায় ভালবাসি! তোমার পায়ে নিজেকে বিকাইয়া দিয়া—তোমার পদ-রেণুর সঙ্গে নিজেকে মিশাইয়া দিয়া আমার তৃপ্তি হয়, সাধ মিটে, তা'ই তোমায় ভালবাসি। আমি সুধু ভালবাসি—বুকের মধ্যে তোমার প্রতিমাখানি গড়িয়া রাখিয়াছি—আমি নিশিদিন তা'কেই পূজা করি। সে যে আমার নিঃস্ব দেব! দিবার মত তা'র কিছুই বুঝি নাই! কি জানি, থাকিতেও বা পারে। থাকিলেও আমি জানি না—জানিতে চাহি না। চাহিব কি? চাহিবার যা' তা'ত চাহিয়াছি—তা'ত পাইয়াছি—আর আমি চাই না। ভালবাসিতে পাইয়াছি—হৃদয় দিয়া তোমার পূজা করিতে শিখিয়াছি, পাইবার আর বাকি কি আছে?—তোমার ভালবাসা? ওগো দেব, তোমার সে করুণা এ দীনের ভাগ্যে সহিবে কেন? জানি, তুমি অতি দয়াল—অতি করুণ; কিন্তু আমি কি গো সে দয়ার পাত্র—সে করুণার উপযুক্ত? তুমি ধনী—তুমি জ্ঞানী,—এ দীনের ঘরে—এ অজ্ঞের দ্বারে তুমি এস না গো, এস না! যেখানে তোমার সংবর্দ্ধনা আছে—যেখানে তোমার সম্মান আছে, তুমি সেখানে যাইও। আমি যে মূর্খ, আমি যে পথের কাঙ্গাল—তোমার সে রাজ-সম্মান আমি দিব কেমন করিয়া—হে আমার রাজাধিরাজ! তবে যদি কখনও 'মনে পড়ে' —যদি কখনও দূরকুটীরের দীনের উপর দৃষ্টি পড়ে—তবে এস। আমার এই ছিন্ন-মলিন আসনোপরি এসে বস'। দরিদ্রের যা' কিছু আছে, সর্ব্বস্ব দিয়া তোমার পূজা করিবে। জানি তা'তে তোমার তৃপ্তি হইবে না। হইবে কেন? রাজ-ভোগে তুমি যে অভ্যস্ত; ভিক্ষুকের ক্ষুদ্-শাকে তোমার তুষ্টি হইবে কেন? তুমি ত সবই জান! আমি যে নিঃসম্বল, তা'ওত তুমি জান! তবু যদি আসিতে চাও,—তবু যদি দরিদ্রের দুঃখ ভুলিতে চাও—তবে এস। আমি বারণ করিব না। আসিবার পূর্ব্বে সুধু বলিয়া রাখিব—সুধু জানাইয়া দিব—"আসিলে কষ্ট পাইবে।" সাধে তোমায় বারণ করি না! তোমাকে কি প্রাণ চায় না? চায় গো চায়—বড় চায়! কিন্তু তবু তোমায় আসিতে বারণ করি—প্রাণের পিপাসা রুধিয়া—তোমায় আসিতে নিষেধ করি! তোমাকে পাইলে—তোমাকে কাছে রাখিলে, তোমার যে কষ্ট হয়, তোমার যে যাতনা হয়! তা'ই তোমায় আসিতে মানা করি। তা'ই তোমায় কাছে ডাকি না! কি জানি, ডাকিলে যদি আসিয়া পড়' —আসিলে যদি তোমার অসুখ হয়, সে যে আমার অসহ্য হইবে—বুক ফাটিয়া যাইবে! তা'ই তোমায় কাছে ডাকি না, তা'ই দূরে থাকিয়া উদ্দেশ্যে তোমার পায়ে প্রেমের অঞ্জলি ঢালিয়া দিই! তা'ই বনান্তের পথের পানে তাকাইয়া নিশা-জাগরণ করি। বড় সাধের শয্যা রচনা করিয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া থাকি! তুমি আসিবে—এ আশায় বসিয়া থাকি। কি জানি, যদি তুমি আসিয়া পড়'—কি জানি, যদি আমায় সুপ্ত দেখিয়া তুমি ফিরিয়া যাও—সেই ভয়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকি। অর্দ্ধ-শায়িত হইয়া অনিমেষ চোখে মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকি। বসিয়া থাকি ত আমি থাকিব,—রাত্রি জাগি ত আমি জাগিব, তবু তুমি এ হিমে ঘরের বাহির হইয়ো না—পথ হাঁটিয়া রাত্রি জাগিয়ো না। এ ত আমার সেবা। সেবার জন সেবা করিবে; তোমার তা'তে কি? তুমি কেন বৃথা কষ্ট পাইবে? সে সেবার সিদ্ধি এ দারুণ হিমে না হয় নাই দিলে! যদি নিতান্তই দিতে হয়—না দিয়া যদি না পার, যদি একান্তই আসিবে—না আসিয়া যদি থাকিতে না পার, তবে হে প্রিয়, একটিবার,—সুধু একটিবার এস। ভোরের বেলা একটিবার দেখা দিয়ে যেয়ো। আমার এই ব্যর্থ বাসর-শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া—যখন আমি প্রভাতী তন্দ্রায় বিবশা হইয়া তোমার স্বপ্ন দেখিব—হে দয়িত, তখন তুমি একটিবার হাসিয়ো—সে হাসি যেন আমাকে স্বপ্নে স্পর্শ করে—সে স্পর্শে যেন আমি শিহরিয়া উঠি—উঠিয়াও যেন তোমার সেই মধুর স্মিতিটী দেখিতে পাই! ভালবাসা আমার সার্থক হইবে—আমার নিশা-জাগরণ ধন্য হইবে। এই সুখের জন্য—আমি নিত্য নিশি জাগিয়া থাকিব। সে জাগিয়াও কত সুখ—আমার বাঞ্ছিত আসিবে—আমার পানে চাহিবে—মৃদু মৃদু হাসিবে—আমি তাহাকে দেখিতে পাইব—তা'র সেই হাসিমাখা মুখখানি দেখিতে পাইব—এ আশায়ই আমি বসিয়া থাকিতে পারি—আমার তা'তে কষ্ট হয় না—বরং সুখ হয়। শবরীর মত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকি—নিত্যই সায়ং-সন্ধ্যা তোমার পূজার সত্ত্ব উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দ্বারের আড়ালে বসিয়া থাকি—যদি তুমি আস; কিন্তু জাগিয়া জাগিয়া যখন তন্দ্রা আসিয়া পড়ে—আর চাহিতে পারি না; আশায় আশায় যখন নিরাশ হইয়া পড়ি—বুঝি, তুমি আর আসিবে না—তখন হে আমার অন্তরঙ্গ! তুমি একটু স্পর্শ করিয়া আমাকে জাগাইয়া দিও, জাগিয়া থাকিবার শক্তি দিও; একটু দেখা দিয়া আশার সঞ্চার করিয়া দিও—জানাইয়া দিও, বুঝাইয়া

দিও—যে তুমি আস—যে তুমি ভুলিয়া যাও না। তা'রপর তুমি আবার চলিয়া যাইও—যাইতে যাইতে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিও। আমি "বাহিরের দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ মর্ম্মাহত" দীন নয়নে, যতদূর দেখা যায়, তোমার পানে চাহিয়া থাকিব। সুদূর পথের কোণে তোমার শেষ-দেখা দেখিয়া লইব। যখন আর দেখা যাইবে না—তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিব। তোমার সেই শেষ-দেখা যেন তখন আমার মনের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীরব ভঙ্গিতে বুঝাইয়া দেয়—"আমি আবার আসিব, আবার আমার দেখা পাইবে।" এই মৌন বাণী যেন আমাকে প্রবুদ্ধ করে। তুমি এই আঁধার-ভরা জীর্ণ ঘরে যেখানে দাঁড়াইয়াছিলে, আমি সেখানে লুটিয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে তোমার পদরজঃ মাখিব—আমার দেহ যেন শীতল হইয়া যায়! তুমি যেখানে বসিয়াছিলে, সেখানে মাথা গুঁজিয়া অশ্রুর ধারা খুলিয়া দিব—সে অশ্রুতে আমার বুকের বোঝা যেন নামিয়া যায়। যেখানে তুমি অর্দ্ধশায়িত হইয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়াছিলে, সেখানে আমি উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিব—তোমার স্পর্শ-শীতল শিলাতল যেন আমার সন্তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া দেয়!

আর তোমায় বেশী কি কহিব! কহিতে যে মুখ ফুটে না। কথায় কথায় অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে—ভাবি, সবগুলা বলিয়া ফেলি; বলিতে যাই, কে যেন মুখ চাপিয়া ধরে—আর বলিতে পারি না—বলি বলি করিয়া আর বলা হয় না। বলিবার জন্য মুখ তুলি, মুখ তুলিয়াই তোমার মুখখানি দেখিতে পাই—সেই শান্ত-কোমল দৃষ্টি আমার চোখের উপর উদ্ভাসিত হয়—আর বলা হয় না—মনের কথা মনেই রহিয়া যায়। মনের মাথা খাইয়া সব যেন ভুলিয়া যাই—কথার পর্য্যায় যেন বিষম গুলাইয়া যায়। পোড়া মুখেও তখন কথা ফুটে না—ঠোঁট-দু'টী আবার একটু নড়িয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠের মত জানাইতে চায়—"ওগো শুন, আমার একটি কথা আছে।" আরে হতভাগারা, কথাই যদি কহিতে না পারিলি, তবে আবার নড়িস্ কোন্ লাজে? এ মৌন অভিনয়ে আর কাজ কি? আর তোরা, আমার চোখ-দু'টি! তোরাই-বা নামিয়া পড়িস্ কেন? ইচ্ছা করে, তোদের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ফেলি—অত লজ্জা কিসের বাপু?—তোরা একটু চাহিয়া দেখিস্ না কেন? না, আর পারিয়া উঠি না—সকলে মিলিয়া এরূপ বাদ সাধিলে আর পারা যায় কিগো? বলিবার সময় বলিবে না—শেষে ব্রীড়াক্লান্ত কথায় বুক ভরিয়া উঠিবে—তখন আর শুনাইবার লোক পাইব না, দেখিবার জন্য অনিমিষে নির্নিমিষ চাহিয়া থাকিবে, অথচ যে দেখিবার ধন যখন চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তখন আর চাহিতে পারে না, দেখা হয় না। এমন করিয়া সকলে মিলিয়া খেয়ালের অভিনয় করিলে আর কি পারিয়া উঠা যায়? না-না, তুমি যাও—যেখানে সুখ পাও—যেখানে উন্মুক্ত আলিঙ্গন তোমার জন্য উৎকণ্ঠ রহিয়াছে—স্থির, লুব্ধদৃষ্টি দিগন্তের নীলিমা ভেদ করিয়া তোমাকেই ইঙ্গিত করিবার জন্য চাহিয়া আছে—কোকিল-কণ্ঠ তোমাকেই কথা-গীতি শুনাইবার জন্য সপ্তস্বর সাধিয়া রহিয়াছে—যাও, যাও প্রাণবঁধু, সেখানে যাও। পৃথ্বী তোমার পূজার মন্দির—প্রকৃতি তোমার পূজারিণী—হৃদয় তোমার পদ্মাসন—কণ্ঠ তোমার শঙ্খধ্বনি! হে আমার পূজার ঠাকুর, হে আমার আরাধ্য দেবতা, —জগৎ জুড়িয়া যে তোমার পূজা লাগিয়াছে—গগন ভরিয়া যে আজ তোমারই স্তুতি-গান উঠিয়াছে—অনন্ত শূন্যমণ্ডল যে আজ অনন্ত হোম-ধূমে পূরিয়া গিয়াছে—বিশ্ব প্লাবিত করিয়া যে আজ প্রেমের বন্যা ছুটিয়াছে! সে প্রেমের স্রোতে আমি গা' ভাসাইয়া দিয়াছি—ঐ যে আমার প্রেমের বিনোদ—ঐ যে সে "ভেসে যায় ভেসে যায়!" আমিও তা'কে লক্ষ্য করিয়াই ভাসিয়া চলিয়াছি—"জানি না কোথায়—কতদূরে—কোন্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরপারে।" প্রেমের ক্ষীরোদশায়ী ওগো আমার প্রাণের নারায়ণ, তুমি সুখে নিদ্রা যাও, বিশ্বপ্রেমের তরল শয্যায় শুইয়া তুমি সৃষ্টির স্বপ্ন দেখিতে থাক—আমি শুধু তোমার পায়ের কাছে কাছে থাকিব—চরণতলে মাথা রাখিয়া "স্থির চোখে ধীর মনে" তোমার ঐ প্রশান্ত আননের দিকে চাহিয়া থাকিব। যদি কখনও তোমা হইতে দূরে গিয়া পড়ি—তোমার চরণতল হইতে আমার স্থিতি খসিয়া পড়ে তখন হে অনন্ত স্বামি! স্থির করুণ দৃষ্টিতে জগতের পানে চাহিয়া থাকিও—শুধু আমার দিকে ফিরিয়াও দেখিও না—তোমার চক্ষু যেন অচঞ্চল থাকে—নয়ন যেন অশ্রুতে ভরিয়া না উঠে! আমার কথা ভাবিয়া—আমার গতি কি হইবে, এই ভাবনায় হে প্রশান্ত মহাজন—তোমার প্রাণ যেন ব্যাকুল না হয়! তুমিই বাঞ্ছিত—তুমিই ইষ্ট—তুমিই আরাধ্য—তবে ঠাকুর, অনুগতের মত আমার জন্য তোমার ভাবনা কেন? তোমার সেবার জন্য—পূজার নৈবেদ্য সাজাইবার জন্য আমার জন্ম। আমার সেবায় যদি তোমার তুষ্টি না হইয়া থাকে—আমার নৈবেদ্যে যদি তোমার তৃপ্তি না হইয়া থাকে, তবে হে নিরঞ্জন! আমার জীবন যে বৃথা গিয়াছে, সাধনা যে বিফল হইয়াছে। এ বৈফল্যের খোঁজ আমি ছাড়া কেউ যেন না জানে—ওগো আমার দয়াল ঠাকুর, তুমিও জেনো না। জন্ম ব্যর্থ হউক্—সে যাতনা আমি সহিতে পারিব; কিন্তু আমার বৈফল্যে তুমি কোমল প্রাণে ব্যথা পাইলে মর্ম্ম আমার চূর্ণ হইয়া যাইবে—হৃদয়ের পাঁজর ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি ডুবিতে পারি, আমি মরিতে পারি—শুধু, হে আমার চিন্ময় প্রিয়পুরুষ, তুমি শুধু দেখো না—তুমি শুধু চেয়ো না। তুমি দেখিলে আমার আর মরা হইবে না—আমি ত আর ডুবিতে পারিব না হে কৈবল্য-নিধান! যখন তুমি দেখিবে না, তখন সেই অদর্শনের সুযোগে আমি অবিনাশী কালের অতল সলিল-গর্ভে ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যাইব—তোমা হইতে বহুদূরে—তোমার পদাশ্রয় হইতে লক্ষ যোজন দূরে—বিস্মরণের ঐ নিবিড় নিথর ছায়ায়—"যেখানে ঐ অসীম ছায়ায় মিশেছে ঐ অসীম কালে!"

* * * * *

হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখি—গান থামিয়া গিয়াছে—গায়ক আমার কোলে মাথা রাখিয়া সাগরের অসীম সীমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—তাহার নয়ন-কোণে একবিন্দু অশ্রু! তখন সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছে—সিন্ধু-সৈকত জনশূন্য, সুগম্ভীর!

শ্রীনলিনী রায়

সন্ধ্যায়

ওই শুন, বাজে আজি বিশ্ব-দেবালয়ে
মঙ্গল-আরতি ওগো জীবন-সন্ধ্যায়!
গোধূলির ম্লান আলো লুকা'তেছে ভয়ে
আবিল আকাশ বুকে, মর্ম্মবেদনায়।
দীপ্তিহীন শ্রম-ক্লান্ত দেহখানি ল'য়ে
চলে' গেছে বহুক্ষণ তপন বিষাদে;
সন্ধ্যা-তারা দূর হ'তে আছে স্তব্ধ হ'য়ে,
শ্রান্তিহীন সমীরণ গুমরিয়া কাঁদে।

মর্ম্মোচ্ছ্বাস তটিনীর, হৃদয়-বেদনা,
জীবন-সঙ্গীত তা'র ভেসে আসে কানে;
এ সন্ধ্যায়, এ আঁধারে, ল'য়ে ভক্তি-কণা
কে আসিবি আজি ওরে, দেউল-বিতানে
সন্ধ্যারতি ডাকিতেছে সকরুণ-স্বরে,
হে পথিক, কাছে এস, কেন আছ দূরে?

শ্রী[illegible]

আধুলি

(সুপ্রসিদ্ধ গল্প-লেখক ম্যাসনের অনুমত্যনুসারে

অনূদিত)

একশ্রেণীর লোকের উপর ডাক্তার কিছু অধিকতর সুপ্রসন্ন ছিলেন। জাহাজের কাপ্তেন হইতে ক্ষুদ্র মৎস্য-তরীর ধীবর পর্য্যন্তও তাঁহার চোখে সম্মানের পাত্র ছিল। সাধারণে ইহার কোন কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। সময়ে সময়ে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা এজন্য তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। কাপ্তেনকে সম্মান করিতে হয় করুন, কিন্তু সামান্য মৎস্য-জীবীকেও যখন তিনি সম্মানের চোখে দেখিতেন—আর সে সম্মান যখন একটু অতিরিক্ত বলিয়াই বোধ হয়, তখন তিনি সাধারণের নিকট যে বিদ্রূপভাজনই হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? একদিন বন্ধুগণের বিশেষ অনুরোধ-উপরোধে তাঁহাদিগকে তিনি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন।

একবার তিনি হাঁসপাতালে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন যে, অদূরবর্ত্তী শয্যোপরি শয়ান অন্য একজন রোগী, শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীকে তাঁহার অক্লান্ত পরিচর্য্যার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

ধাত্রী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ইহাতে আবার কষ্ট কি? ইহা আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম।"

রোগীর স্বরে তাহাকে বিদেশী বলিয়া বোধ হইল।

ডাক্তার ধীরে ধীরে রোগীর নিকট উপনীত হইয়া রোগীকে তাহার পরিচয় ও অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রোগী বলিল, সে বিদেশী। বাল্যকাল হইতে এই ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে ইংরাজের জাহাজেই কাজ করিয়া আসিতেছে। সামান্য আজ্ঞাবহ বালক-ভৃত্য হইতে সে ক্রমে ক্রমে "মেট"র পদ পাইয়াছিল। পরে হঠাৎ একদিন সে দৈব-দুর্ঘটনায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মে অক্ষম হওয়ায়, হাঁসপাতালে রোগমুক্ত হইতে আসিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন যে, সামান্য একটু অস্ত্র করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তিনি নিজেই অস্ত্র করিলেন। রোগী ছয় সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্যলাভ করিল। আরোগ্যান্তে সে শুশ্রূষা-কারিণী এবং ডাক্তারকে প্রভূত ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

ডাক্তার বলিলেন, "বিলক্ষণ! ধন্যবাদ দিবার কোনই আবশ্যক নাই; কারণ, সাধারণ ছাত্রও এটুকু করিতে পারিত।"

"তবে ত আপনি আমার অধিকতর ধন্যবাদের পাত্র। শুশ্রূষা-কারিণীর মুখে আপনার সুনামের কথা শুনিয়াছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আমা[…] পরবশ হইয়া আমার চিকিৎসার ভারগ্রহণ করিয়াছেন[…]

ডাক্তার প্রসঙ্গ-পরিবর্ত্তনের জন্য জিজ্ঞাসা করি[…] তুমি কি করিবে?"

"চাকুরীর চেষ্টা করিব।" এই বলিয়া সে উঠ[…] এবং ধীরে ধীরে তাহার কটিবস্ত্র "শালে" হাত দি[…] পরে ডাক্তারকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকট[…] করিল।

তিন সপ্তাহের পরে রোগীটী পুনরায় ডাক্তারের […] উপস্থিত। ডাক্তার জানিতেন, হাঁসপাতালের রোগী […] করিলে প্রায়শঃই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হ[…] রাস্তরে ভিক্ষা প্রার্থনা করে; সুতরাং রোগীর আগমন[…] তিনি স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই সে ভিক্ষার্থ উপস্থি[…] যাহা হউক, বসিবার ঘরে গিয়া তিনি পা দিয়া চেয়া[…] তাঁহার পুরাতন রোগীটীকে আসন গ্রহণ করিতে বলি[…] কথা স্মরণ করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "তোমাকে ত […] দেখিতেছি। তোমার কি হইয়াছে?"

রোগীটীকে দুর্ভিক্ষের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ দেখাই[…] ধীরে ধীরে চেয়ারের একপ্রান্তে উপবেশন করিল[…] বোধ হইতে লাগিল, যেন সে না খাইতে পাইয়া […] হইয়া পড়িয়াছে।

"চাকুরী পাইতে কিছু কষ্ট পাইয়াছি। তা'ই […] করিতে পারি নাই।"

"তিন সপ্তাহ হইল, তুমি হাঁসপাতাল ছাড়িয়াছ।[…]

"আজ্ঞা হাঁ।"

ডাক্তারের বেশ মনে হইতেছিল যে, সে ভিক্ষার্থ[…] তথাপি তাহার পূর্ব্ব-ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া ও […] ক্লিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি না বলিয়া থাকিতে প[…] "তোমার পূর্ব্বেই এখানে আসা উচিত ছিল।"

"আজ্ঞা না। আমি চাকুরী পাই নাই বলিয়া এতদি[…] আসিতে পারি নাই। আজ প্রাতঃকালে চাকুরী[…] আগামী কল্য হইতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

"কিন্তু, তুমি এই তিন সপ্তাহ কি করিয়াছ?

তিন সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই অনাহারে কাটিয়াছে।" ডাক্তার নিজের পকেটে হস্তার্পণ করিলেন; কিন্তু, কিছু বাহির করিবার পূর্ব্বেই রোগী উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ, আমি অনশনে অর্দ্ধাশনেই কাটাইয়াছি বটে!" তাহার পর একটু থামিয়া সে সহাস্যে বলিল, "আমি যে কঙ্কালসার হইয়াছি, তজ্জন্য আমি গৌরব অনুভব করিতেছি।"

রোগী টুপীটী মাটিতে রাখিয়া পকেট হইতে ছুরি লইয়া ফস্ করিয়া নিজের "ঝালে"র শেলাই কাটিয়া ফেলিয়া একটী আধুলী বাহির করিল। এই আধুলিটি ডাক্তারকে দেখাইয়া সে বলিতে লাগিল, "চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি সর্ব্বপ্রথমে জাহাজে কাজ পাই, তখন যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার মা স্বহস্তে এই আধুলিটিকে টুপীর 'ঝালে'র মধ্যে পূরিয়া সেলাই করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনশনে কঙ্কালসার না হইলে ইহা ব্যয় করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। বহুদিন আমি অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটাইয়াছি; কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ দীর্ঘকাল দুর্দ্দশায় কাটাইতে হয় নাই। এক্ষণে আমি প্রকৃতই কঙ্কালসার হইয়াছি; এইবার আমাকে আমার চল্লিশ বৎসরের সঙ্গীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

ধীরে ধীরে সে তাহার চেয়ার হইতে উঠিয়া ডাক্তারের সম্মুখে তাহার সযত্ন-সঞ্চিত আধুলীটি রাখিয়া দিল। ডাক্তার কোন কথা বলিলেন না, আধুলীটিও স্পর্শ করিলেন না। তিনি রোগীর দিকে চাহিতেও পারিতেছিলেন না। ডাক্তার আধুলীটি লইতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে রোগী নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়িয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ডাক্তার বিচলিত স্বরে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর। এ তিন সপ্তাহ তুমি কোথায় কিরূপে কাটাইয়াছ?"

"নদীতীরে, গাছতলায় পড়িয়া কাটাইয়াছি; কোন কোন দিন 'বেঞ্চে' শুইয়াও কাটাইয়াছি; কিন্তু, এখন আর তাহা হইবে না। আমি চাকুরী পাইয়াছি। আর আমার কোন ভাবনা নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "তা হোক। চাকুরী পাইলেও, এ তোমার মাতৃদত্ত আধুলি। ইহা তুমি ফিরাইয়া লও।"

"না, না। মনে করিবেন না যে, আমি প্রতিদানস্বরূপ আপনাকে উহা দান করিতেছি। আপনি আমার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনায় ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর। আপনার নিকট ইহা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহা বহুমূল্যবান্। গত তিন সপ্তাহে আমি ইহা ব্যয় করিবার কত না চেষ্টা করিয়াছি—বৃক্ষতলে অনশনে রাত্রিবাস করিয়া প্রত্যূষে চায়ের দোকানের নিকট দিয়া যাতায়াত করিয়াছি—কতবার মনে করিয়াছি, ঐ আধুলিটির বিনিময়ে পেট ভরিয়া চা খাইয়া তৃষ্ণা-নিবারণ করি অথবা রুটী কিনিয়া ক্ষুধা উপশম করি। ক্ষুধার্থ আমি—কতবার আধুলিটিকে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। দুগ্ধের পাত্র কিনিয়া সুপেয় দুগ্ধপানে পুনর্জ্জীবন লাভের আশা করিয়াছি; কিন্তু কার্য্যতঃ করিতে পারি নাই। এ আপনার নিকট কিছুই নয়, তাহা আমি খুবই জানি; কিন্তু হাঁসপাতাল হইতে ফিরিবার পরের তিন সপ্তাহ ইহার মূল্য আমার নিকট কত অধিক!"

ডাক্তার রোগীকে তাঁহার সুসজ্জিত ভোজনাগারে লইয়া গেলেন। গৃহসজ্জার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ একটি রৌপ্যনির্ম্মিত কারু-কার্য্য-সমন্বিত পাত্র ছিল। ডাক্তার তাঁহার রোগীকে উহা দেখাইয়া বলিলেন, "ইহা দেখিতেছ?"

"আজ্ঞা হাঁ, উহা একটি উপহারের উপযুক্ত জিনিষই বটে।"

ডাক্তার হাস্য করিয়া ভোজনাগারের একটি জানালা উন্মোচন করিলেন। বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে এই পাত্রটিকে জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে পার। তোমার উপহারের নিকট ইহার মূল্য কিছুই নহে। তোমার আধুলির তুলনায় ইহা গোময়।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

তপোবিনিময়

(গাথা)

নারদ—

ছি ছি ঋষিবর, এতকাল, এত যত্নে
ব্রহ্মচর্য্য পালি,' হারাইলে সেই রত্নে?
কা'র কন্যা, কোথা জন্ম, তা'রে তপোধন,
ঠাঁই দিয়া কলঙ্কিলে পুণ্য তপোবন?

কণ্ব—

প্রাণের আদেশে মুনি, করিয়াছি যাহা,
পাপ হোক্, পুণ্য হোক্—ফিরাব না তাহা।

নারদ—

রজ্জুতে এ সর্পভ্রম! সংসারী অজ্ঞান
এই মায়া-মোহে মজে' ত্যজে ভগবান্।
তাপসের হৃদে এই স্নেহের প্রতাপ!
তপোবিঘ্নকারী এযে ক্ষমাহীন পাপ!

কণ্ব—

দয়ার জগতে ঋষি, স্নেহ-দয়া পাপ?
আত্মার এ আত্মহত্যা—এ যে অভিশাপ!
স্নেহ প্রেম মহী হ'তে যদি উঠে যায়,
সৃষ্টির তা'হ'লে আর কি র'বে সহায়?
জীব-রক্তে কলঙ্কিত ব্যাঘ্রীর অন্তর
বাৎসল্যের ফল্গু-স্রোতে পূর্ণ নিরন্তর।
সর্পমাতা ডিম্ব তা'র কেন আগুলায়?
স্নেহের কর্ত্তব্য তা'রে স্নেহই শিখায়।
হৃদিহীন স্বর্গ-নটী পণ্য-দেহা নারী,
সদ্যোজাতা বালিকারে বনমাঝে ছাড়ি'
স্বর্গে গেছে চলি', জননীত্বে পদাঘাতি—
অবনীতে রাখি' ঘোর স্বর্গের অখ্যাতি।
আপন সন্তান ত্যজে ত্রিদিব-পাষাণী,
পাখী ছল-ছল আঁখি, সে যে মর্ত্ত্য-প্রাণী!
স্বর্গ করে শিলাবৃষ্টি গভীর হুঙ্কার
মর্ত্ত্যে জাগে মাতৃস্নেহ স্থির নির্ব্বিকার।
সমর্পিয়া আপনারে মৃত্যুর কবলে
রক্ষিল শিশুরে পাখী ঢাকি' পক্ষতলে;

বুঝিনু ধরাই স্বর্গ—স্নেহ শেষ-দ্বার,
তির্য্যক্ দেবের বাড়া প্রণম্য আমার।
শুনিনু শকুন্ত-কণ্ঠে বিধাতৃ-আহ্বান—
অনাথ শিশুরে তা'ই দিনু গৃহে স্থান।

নারদ—

তপস্যা-রত্নের সেই মহা স্বর্ণকার
এইরূপে গড়ি'ছেন পুণ্য-অলঙ্কার।
ঝুটা, খাঁটি পরীক্ষার নিকষ-শিলায়
বিচ্যুতি-রসান্ হেন ধরা পড়ে' যায়।

কণ্ব—

হে-সত্তম, দয়া, প্রেম যদি চ্যুতি হয়,
তাঁহার দয়াল নাম কোথা তবে রয়?

নারদ—

বুঝেও না বোঝ' যদি, যাও তবে নামি'
ফেনিল পঙ্কিলাবর্ত্তে, নিরুপায় আমি।

কণ্ব—

কাঁদিলে পরের দুঃখে যদি পুণ্য যায়—
যাক্ পুণ্য, থাক্ পাপ—বরিব মাথায়।
তুমি বুঝি ভাব' মুনি,—তপঃশুষ্ক হিয়া
নির্ম্মম, কঠোর, আত্মমগ্ন স্বার্থ নিয়া
ব্যস্ত সদা, পরদুঃখে উঠেনা যা' কাঁদি',
সৌন্দর্য্যের পাদমূলে বিকায় না সাধি',
ত্যাগ-ভাণে এ সুন্দর জগতে বিমুখ,
সেই চিত্ত-শৈলে রচা স্বর্গের যা' সুখ?
ক্ষমা কর, হে দেবর্ষি, আমি ক্ষুদ্রমতি
কল্পনা করিতে নারি স্বর্গে সে দুর্গতি।
এতকাল, এতযুগ, দীর্ঘ এ জীবন
ব্যয় করি', ক্ষয় করি' করিব সৃজন
সে অনন্ত হৃদিহীন অবরোধ-লোক—
নাহি যেথা হাসি, অশ্রু, প্রেম, দয়া, শোক।
বৈচিত্র্যবিহীন সেই শুষ্ক স্তব্ধ পুরে
জানিনা আনন্দ কি যে বাঁধা কোন্ সুরে।

নারদ—

বুদ্ধিভ্রংশ মুনি তুমি উঠ উঠ জাগি',
কাচ পেয়ে অবহেল' কাঞ্চন কি লাগি?
স্নেহ—মোহ, এই শিশু টানিবে তোমারে
তপোহীন মুক্তিহারা মায়ার সংসারে।

কণ্ব—

দেবর্ষি, জানেন মন সেই অন্তর্যামী,
দেবতা দানব ন'ন, তিনি দীন-স্বামী।
তপঃ সাধি যাহা তুমি চাহ বিসর্জ্জিতে,
মহাপুণ্যফলে আমি পেয়েছি তা' চিতে।
—দীনে স্নেহ, হীনে দয়া, বিনিময়ে যা'র
দিতে পারি মোর সর্ব্ব ফল তপস্যার।

নারদ—

মুক্তি তব দূর-পরাহত, ঋষিরাজ,
লাজে হেঁট্-মাথা আজি তাপস-সমাজ
কলঙ্কে তোমার।

কণ্ব—

কেন হইব লজ্জিত?
এই যে অনন্ত বিশ্ব হেন সুসজ্জিত—
তরুলতা, ফুলে-ফলে, মরু, অটবীতে
জীবের সম্ভোগ্য করি', ব্যর্থ করি' দিতে
তা' সবারে শক্তি নাহি মোর। কোন্ প্রাণে
র'ব মুখ ফিরাইয়া সে কাহার ধ্যানে?
ধেয়াই সুন্দরে যেই সৌন্দর্য্য এ সব
সেই ধ্যেয় পুরুষের আনন্দ-আসব।
স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, দয়া বিসর্জ্জিয়া
শুষ্ক হিয়া দিব তাঁ'র চরণে অর্পিয়া?
কেবল আকাঙ্ক্ষা তীব্র, ব্যর্থ ও বিমুখ,
জীবনের শূন্য সাজি, শুষ্ক মন্ত্রটুক্
সম্বল করিয়া, দাঁড়াইব সেথা গিয়া?
উঠিবেনা দেবলোক টিট্কারী দিয়া?
ক'বে তীক্ষ্ণ উপহাসি—"যাও, পুনরায়
শুধিয়া জন্মের ঋণ আসিও হেথায়।
রে মূর্খ, বাস্তব স্বর্গ ধরণীতে ফেলি'
কা'র বাক্যে স্বর্গকামে মৃত্যুপুরে এলি?"
লাজে-দুঃখে নিরুত্তর ব্যর্থ সাধনায়
তখনি ফিরিতে হবে ঘোর নিরাশায়।
স্বর্গ যে আনন্দলোক, প্রীতি-রসায়নে
রঞ্জিত অমরপুরী! ধরণীর সনে
চিরযুক্ত সে যে! ওগো, করি তা' কেমনে
বিচ্ছিন্ন এ মহী হ'তে? মানুষের সনে
এতকাল একত্তরে রহি' যদি নারি
ভালবাসিবারে, স্বার্থের মমতা ছাড়ি'
সেবিতে, তুষিতে এই স্বল্পে-তুষ্ট জীবে—
কোন্ উচ্চতর পুণ্যে বাঞ্ছিব ত্রিদিবে?
স্বেচ্ছায় করিনি ব্যয় যেই বাক্য মোর,
পরদুঃখে স্ফুরে নাই যে কণ্ঠ কঠোর,
সে পরুষ নিষ্করুণ বাক্যে মন্ত্র-জপ
তুষিবে না হিয়া তাঁ'র জেনো মহাতপ!

নারদ—

স্তব্ধ হও, করিও না আর বাড়াবাড়ি—
ভ্রষ্ট ঘোর, ভণ্ড মুনি, মিথ্যা-পাপাচারী!

কণ্ব—

মুনি-ধর্ম্মে ভ্রষ্ট হই ক্ষতি নাহি বড়—
প্রেম-ধর্ম্ম শিখি যেন আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শালগাছ

তখন অপরাহ্ণ; আকাশে ধূসরবর্ণের একখানি মেঘ এমনভাবে জমিয়া বসিয়াছে যে; দেখিলেই বোধ হয়, অন্ততঃ তিন-চারি দিন বৃষ্টি ধরিবে না। এমন সময় আমাদের গাড়ী মধ্য-প্রদেশের একটি ছোট ষ্টেশনে থামিয়া দাঁড়াইল।

সামান্য একখানি ছোট ঘর; তাহারই ভিতর ষ্টেশন-মাষ্টার বসিয়া থাকেন; ঘরের পাশেই ফুলগাছের শ্রেণী। একপাশে একটি ছোট শালগাছ কে পুঁতিয়া দিয়াছে; দেখিলেই বোধ হয়, ষ্টেশনের লোকেরা সেটিকে খুব যত্ন করে; কিন্তু গাছটি তবুও শুষ্ক, শীর্ণ, ম্লান পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত অবসন্ন।

দৃষ্টি যখন ষ্টেশনের মধ্যে এই শালগাছটি ছাড়া আর কোন জিনিষের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইল না, তখন সে চারিদিকে লোভনীয় বস্তুর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

দেখিলাম—মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বিশাল প্রান্তর, বিপুল পাহাড়ের শ্রেণী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ষ্টেশনের একটু দূরেই পাহাড় কাটিয়া একটা নদী খরবেগে উপলখণ্ডের উপর দিয়া নৃত্যপরা পাহাড়িয়া রমণীর মতই ছুটিয়া চলিয়াছে।

দূরে, শস্যক্ষেত্রের মাঝখানে মাচা বাঁধিয়া কৃষকেরা বসিয়া আছে; আমাদের গাড়ী যখন ষ্টেশনে আসিতেছে, তখন দূর প্রান্তরে দণ্ডায়মানা একটি নাগপুরী রমণী করজোড়ে নমস্কার করিল। আমাদের গাড়ী কত লোক বহিয়া আনিয়াছে—এ সহিষ্ণু জীবটিকে হয় ত তাহারা দেবতা বলিয়াই মানে, তাহা না হইলে এ নমস্কার কেন?

কোথাও লোকালয় নাই; এখানে যেদিকে চাও, সেদিকে মেঘাবৃত আকাশ, উন্নত-অবনত প্রান্তর, স্নিগ্ধ-শ্যাম শস্যক্ষেত্র ও শালবৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

এখানে যে দু'-একটি এ-দেশীয় মানুষকে দেখিতেছি, তাহারা যেন সমাজের লোক নয়, মানুষের সঙ্গে তাহাদের যতটা সদ্ভাব, যতটা পরিচয়, তাহা অপেক্ষা অধিক সদ্ভাব, অধিক পরিচয় যেন এই আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বতের সহিত নিবিড়-ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে!

আমারও মনে হইল—এখানকার দিগ্ব্যাপিনী প্রকৃতি জীবন্ত; গাছ-পালা, আকাশ-বাতাস যেন কথা কহিতে জানে। নিরাশ্রয়, নিঃসঙ্গ মানুষ ইহার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সকল দুঃখ ভুলিতে পারে।

এতক্ষণ দেখি নাই। এইবার চাহিয়া দেখিলাম—ষ্টেশনের বিপরীত দিকেই, অতি নিকটে একটি উত্তুঙ্গ পাহাড় ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। সরল, সতেজ শালবৃক্ষের শ্রেণী সারি বাঁধিয়া দীপ্ত, চিক্কণ পত্রে শ্যাম শ্রীর বিজয়-নিশান উড়াইয়া বিপুল সমারোহে কোন্ সুরাধিরম্য দেবতার উদ্দেশে অচল গতিতে যাত্রা করিয়াছে। তাহাদের সর্ব্ব অঙ্গে প্রাণের স্পন্দন, ঈষৎ চাঞ্চল্যে আনন্দের অভিব্যক্তি, তাহাদের শান্ত মূর্ত্তিতে একটা বাধা-বন্ধন-বিহীন স্বাধীনতার আভা, তাহাদের উন্নত, উদ্ধত শীর্ষে একটা দৃপ্ত দুর্দ্দমনীয় তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এইবার পিছনে চাহিয়া দেখিলাম,—ষ্টেশনের সেই যত্ন-রক্ষিত বেড়ায়-ঘেরা পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত শুষ্ক, শীর্ণ, ম্লান শালগাছটি। হায়, তাহাকে যদি কেহ যত্ন না করিত, তাহা হইলে সেও ওই পাহাড়ের গাছগুলির মতই সতেজ, উৎফুল্ল হইয়া থাকিতে পারিত!

গাড়ী বহুদূর চলিয়া গেল। তখনও আমার প্রাণ গাছটির জন্য সমবেদনায় পরিপূর্ণ।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জিনৎ-উন্নিসা

(ঔরঙ্গজেব-দুহিতা)

জিনৎ-উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের দ্বিতীয়া কন্যা—দিলরাস্ বানুর গর্ভজাত। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর, (১লা সাবান, ১০৫৩ হিজিরা,) সম্ভবতঃ ঔরঙ্গাবাদে বেগমের জন্ম হয়। ইঁহার অপর নাম—পাদশা বেগম। জিনৎ-উন্নিসা, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ২৫ বৎসর দাক্ষিণাত্যে বৃদ্ধ পিতার অন্দর-মহলের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরেও তিনি বহু-দিন জীবিত ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের পরবর্ত্তী সম্রাট্গণও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। জিনৎ-উন্নিসা ধর্ম্মপ্রাণতা ও বহু দানাদি পুণ্য-কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে যমুনাতীরে যে বিশাল সৌধ"জিনৎ-উম্মস্জিদ"(১) নামে খ্যাত, তাহা এই বেগমের স্বীয় ব্যয়ে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে (২) নির্ম্মিত হইয়াছিল; মৃত্যুর পর জিনৎ-উন্নিসা এই মসজিদেই সমাহিতা হ'ন। সৈনিক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষেরা যখন এই মস্জিদে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তখন বেগমের সমাধি স্থানান্তরিত করা হয়। সমাধি-গাত্রে নিম্নলিখিত লিপিটি খোদিত আছে ঃ—

"মুনিসি মা দর্ লহদ্ ফজ্লে খুদা তন্হা বসস্ত্,
সায়া অজ অব্রে রহমৎ কব্র্ পোষে মাবসস্ত্
উমেদওয়ারে হুস্নে ফতিমাএ খাতিমা জিনতুন্নিসা বেগম্
বিন্তে বাদশাহ্ মুহিউদ্দীন মুহম্মদ অলম্গীর গাজি
অনারুল্লা বুরহানা হু

(১) Cunningham ভ্রমক্রমে তাঁহার Archaeological Survey of India (Vol. 1) পুস্তকের ২২৫ পৃষ্ঠায় ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) Fanshawe's Delhi : Past and Present (P. 68) Cunningham সাহেবের Arch Survey of India (Vol. 1) পুস্তকের ২২০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ঔরঙ্গজেবের অবিবাহিতা কন্যা জিনৎ-উন্নিসার ব্যয়ে জিনৎ-উম্মস্জিদ নির্ম্মিত হয় বলিয়া লোকে সাধারণতঃ ইহাকে 'কুয়ারী মস্জিদ'ও (অর্থাৎ অনূঢ়া কুমারীর মস্জিদ) বলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে, জিনৎ-উন্নিসা পিতার নিকট হইতে স্বীয় বিবাহের জন্য যে যৌতুক দাবী করেন, সেই যৌতুকলব্ধ অর্থ, তিনি বিবাহ না করিয়া এই মস্জিদের নির্ম্মাণকল্পে ব্যয় করেন।

সন ১১২২

অর্থাৎ—

নির্জ্জন কবরে ভগবানের অনুগ্রহই আমার সান্ত্বনা; (তাঁহার) করুণা-মেঘের ছায়াই আমার যথেষ্ট আবরণ; মুহম্মদ অলম্গীর গাজি ধর্ম্ম-সংরক্ষক সম্রাটের কন্যা জিনতুন্নিসা, ভূমানন্দ ফতিমার কৃপা-প্রার্থিনী—ঈশ্বর তাঁহার বোধোদয় করুন।

অহমদনগরে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে, জিনৎ-উন্নিসাও রাজ-শিবিরে ছিলেন। তিনি তাঁহার অন্য ভ্রাতা-দিগের অপেক্ষা আজম-শাহ্কেই বিশেষ স্নেহ করিতেন। আজম-শাহ্ যখন দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থানে অগ্রসর হ'ন, সেই সময়ে জিনৎ-উন্নিসা তাঁহার সহিত ছিলেন। পরে বেগমকে গোয়ালিয়রে রাখিয়া আজম শাহ্, জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহম্মদ মুয়াজিমের (বাহাদুর শাহ্) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গমন করেন। ঢোলপুর ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী 'জাজু' নামক স্থানে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন (১১১৯ হিঃ রবি) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ইহাতেই আজম শাহ্র পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। আজম-শাহ্,গোয়ালিয়রে যে সকল লোক ও আত্মীয়কে রাখিয়া গিয়াছিলেন, বাহাদুর শাহ্ অবিলম্বে তাঁহাদিগকে আনিতে পাঠাইলেন। অপরাপর লোক-জনের সহিত জিনৎ-উন্নিসাও ১৭০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে আগ্রায় উপস্থিত হ'ন। জিনৎ-উন্নিসা আজম-শাহ্র শোকে অধীর হইয়া পড়েন; এই কারণে তিনি বাহাদুর শাহ্র বিজয়-ব্যাপারে আনন্দ-প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ভগিনীর এই ব্যবহারে বাহাদুর শাহ্ মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তবুও তাঁহার বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে 'পাদশা বেগম' উপাধি প্রদান করেন; ইহার অত্যল্পকাল পরেই, আল্মগীরের উজীর আসাদ খাঁর তত্ত্বাবধানে বেগম দিল্লীতে প্রেরিত হ'ন—নূতন মন্ত্রী মুনিম্ খাঁও সঙ্গে থাকিয়া বেগমকে প্রায় দিল্লীর নিকট অবধি পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

১৭২১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে (১১৩৩ হিঃ) দিল্লীতে জিনৎ-উন্নিসার মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত বেগমের সমাধি-গাত্রে খোদিত লিপির তারিখ হইতে বহু ঐতিহাসিক, বেগমের মৃত্যুর কাল ১১২২ হিঃ (১৭১০-১১) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

Beale এই তারিখ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ORIENTAL BIOGRAPHICAL DICTIONARY পুস্তকের ৪২৮ পৃষ্ঠায় বেগমের মৃত্যুর তারিখ ১৭১০ খৃষ্টাব্দ (১১২২ হিঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Franklin সাহেবের SHAH AULUM (২০৭ পৃঃ) ও M·jor W. Thorn সাহেবের MEMOIR OF THE WAR IN INDIA (P. 164, Lond n 18.8) পুস্তকদ্বয় হইতেও এই তারিখ পাওয়া যায়। Carr S·e-]h n আবার তাঁহার ARCHAEOLOGY AND MONUMENTAL RUINS OF DELHI পুস্তকের ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,১৭০০? খৃষ্টাব্দে (১১২২ হিঃ) বেগমের মৃত্যু হয়। অপরপক্ষে আধুনিক গ্রন্থ—L·nepoole সাহেবের AURANGZEBএর (Rul rs of In ia S ri s) ২১ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা হইতে জানা যায়, ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে বেগম মৃত্যুমুখে পতিতা হ'ন।

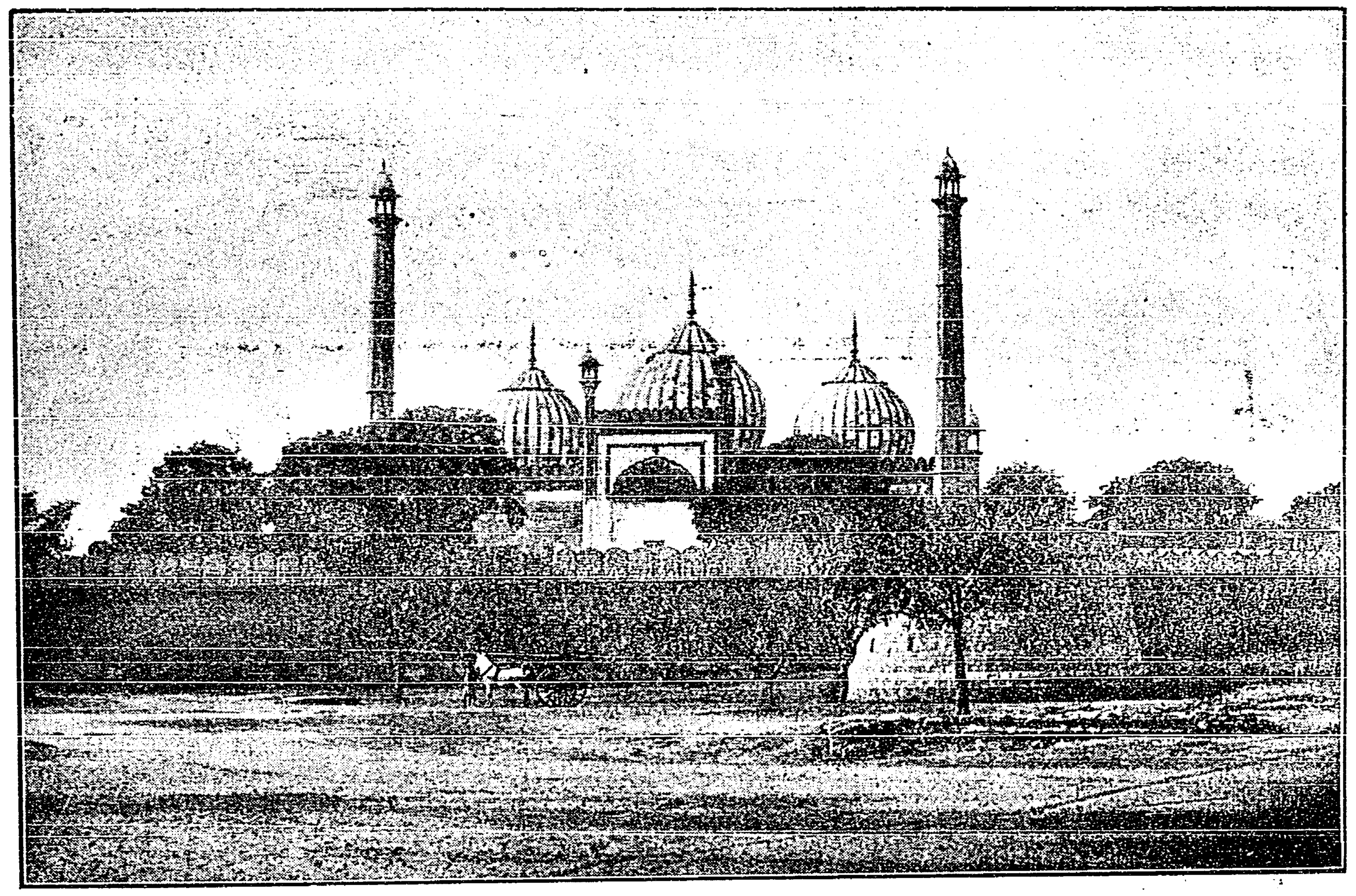

জিনৎ-উম্মস্-জিদ্

যদি কাহাকেও প্রমাণিত করিতে হয় যে, কোন ব্যক্তির কোন একটা বিশেষ বৎসরে মৃত্যু হয় নাই; তবে তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর তারিখের পরবর্ত্তী কালেও জীবিত ছিলেন। জিনৎ-উন্নিসার সম্বন্ধেও আমরা সেরূপ প্রমাণ দেখাইতে পারি। প্রথমে আমরা দেখি, (৩) জহান্দার শাহ্ ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ্চ হইতে ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। জহান্দার শাহ্র উপপত্নী লালকুয়রকে জিনৎ-উন্নিসা বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না; এই কারণে তিনি লালকুয়রের সহিত কখনও সাক্ষাৎ করিতেও যাইতেন না। লালকুয়রের প্ররোচনায় জহান্দার শাহ্ ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন। একবার এক বিশেষ ভোজে জিনৎ-উন্নিসা, ভ্রাতা জহান্দার শাহ্কে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু লালকুয়রকে

(৩) Memoirs of Iradat Khan in Jonathan Scott's HISTORY OF DEKKAN, Vol. 11. p 83.

নিমন্ত্রণ না করায় জহান্দার শাহ্ সে ভোজে যোগদান করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা কামার খাঁর "তাজকীরা-ই-সনাতিন-ই-চাগ্তাইয়া" গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, জহান্দার শাহ্র মৃত্যুর পর ফরখ্শিয়ার সিংহাসন লাভ করিলে, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী (২১ মহরম, ১১২৫ হিঃ) পাদশা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। জিনৎ উন্নিসা এই সময়ে জহান্দর শাহ্র উজীর জুলফিকার খাঁকে হত্যা করার অপরাধে ফরখ্শিয়ারকে বিশেষ তিরস্কার করেন। ফরখ্শিয়ার বলেন যে, তিনি বেগমের লিখিত পত্র পাইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। জিনৎ-উন্নিসা জানাইলেন যে, তিনি পত্রে ঠিক ইহার বিপরীত কথাই লিখিয়াছিলেন। শেষে প্রকাশ পাইল, জুলফিকার খাঁর শত্রু সায়িদুল্লা খাঁই গোপনে বেগমের পত্রখানির পরিবর্ত্তে অন্য একখানি পত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর John Surman সাহেবের (৪) দিল্লী-দরবারে দৌত্য-সংক্রান্ত পত্রাবলী হইতে উল্লিখিত ঘটনার পরবর্ত্তী কালেও আমরা বেগমের অস্তিত্বের সন্ধান পাইয়া থাকি। আর্ম্মিনীয় খোজা সরহাদ্ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে (১১২৫ হিঃ, জুমাদা ২, বা রজব) খোজা নাজির খাঁর ব্যাপারে মধ্যস্থতা করিবার অনুমতি পাইয়াছিল। ঔরঙ্গজেবের কন্যা পাদশা বেগমের আদেশাদি পালন করিবার জন্যই এই নাজির খাঁকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

অতঃপর আমরা একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতে বেগমের মৃত্যুর তারিখ অবগত হইতে পারি। গ্রন্থকার—মীর্জ্জা মহম্মদ—গ্রন্থখানি "তারিখ-ই-মহম্মদী"। এই গ্রন্থের ১১৩৩ হিজিরা তারিখের নীচে স্পষ্টই লেখা আছে,—"আলম্গীর-দুহিতা জিনৎ-উন্নিসা ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দিল্লীতে ২২শে রজব (অর্থাৎ ১৭২১ খৃষ্টাব্দ, মে) মৃত্যুমুখে পতিতা হ'ন।" আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'বাদশা-নামা'য় লিখিত আছে, জিনৎ-উন্নিসা ১০৫৩ হিজিরার ১লা সাবান জন্মগ্রহণ করেন। (৫) আমরা দেখিতেছি, 'তারিখ-ই-মহম্মদী' ও 'বাদশা-নামা'র তারিখের মধ্যে মিল আছে; কারণ, 'বাদশানামা'য় বেগমের জন্মের তারিখ ১০৫৩ হিজিরা বলিয়া লিখিত আছে। এই তারিখের সহিত 'তারিখ-ই মহম্মদী'তে উক্ত বেগমের বয়স ৮০ বৎসর যোগ দিলে আমরা ১১১৩ হিজিরাই (১৭২১ খৃঃ) পাইতেছি।

আমাদের বিশ্বাস, জিনৎ-উন্নিসার মৃত্যু ১৭১০-১১ খৃষ্টাব্দে (১১২২ হিঃ) না হইয়া যে ১১ বৎসর পরে ১৭২১ খৃষ্টাব্দেই (১১৩৩ হিঃ) ঘটিয়াছিল, এ-সম্বন্ধে বোধ হয় আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পরিশেষে আমি দুই একটী কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বেগমের সমাধি-গাত্রে ১১২২ হিজিরার যে উল্লেখ আছে, সে-সম্বন্ধে আমার দুইটি বক্তব্য আছে। প্রথম—এই তারিখটী সম্ভবতঃ বেগমের সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণের তারিখ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। দ্বিতীয়—তারিখের শেষ অক্ষর দুইটী হয় ত কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ١١٣٣॥ ১১৩৩ হিঃ) হইতে ١١٢٢॥ (১১২২) হিজিরাতে পরিণত হইয়া থাকিবে।

(৪) C. R. Wilson's Early Annals of the English in Bengal, Vol. 11, part I. p. 143, quoting the Bengal Consultations under the date of Octr. 19th. 1713.

(৫) Badshanama, Elliot, Vol. V11, p. 197.

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মাষ্টমী

(রাঙ্গামাটিতে নন্দোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতার সারাংশ)

কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানা রাজার রাজত্ব ছিল। কেহ ক্ষুদ্র, কেহ বৃহৎ; কেহ স্বাধীন কেহ মিত্র; কেহ সামন্ত, কেহ অনুসামন্ত; কিন্তু সকলেই রাজা—আপন আপন রাজ্যমধ্যে তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। ক্ষত্রিয়কুল দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল; ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও সম্মান হ্রাস পাইয়াছিল; বৈশ্য ও শূদ্রের ত কথাই নাই। Milit risui প্রবলরূপে তখন ভারত-সমাজে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিল। স্থানে স্থানে যবন, পহ্লব, হূনাদির উপনিবেশ। তথাকার অধিবাসিগণ অহিন্দু—কেহ বা হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবার জন্য অগ্রসর। কোন কোন হিন্দু আবার যবনাদি-সংস্পর্শে তাহাদের রীতি-নীতি ও শিক্ষা-দীক্ষার অনুগামী হিন্দুগণের মধ্যে অগ্নিসেবার ও সূর্য্য-পূজার প্রচলন অধিক। ইন্দ্রপ্রস্থে ক্ষত্রিয়-মহারাজা যুধিষ্ঠির, স্বীয় স্বগণ-সমভিব্যাহারে রাজত্ব করিতেছেন। মথুরা-প্রদেশের সিংহাসনে যিনি উপবিষ্ট, তাঁহার নাম কংশ। প্রজা-পীড়নাদি-দোষে দূষিত, সত্যাপলাপ-কলুষে কলুষিত, রাজ-নীতি-মার্গভ্রষ্ট মথুরাধিপতির প্রজাপুঞ্জের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। অবিচার ও অত্যাচার তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিতেছিল—রাজ-ধর্ম্মের অপব্যবহার তাহাদিগের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতেছিল—রাজ-সৈন্যের রক্ষণ-পোষণ, চলন-চালন-ব্যয় ও ব্যবহার সেই প্রজাপুঞ্জের বক্ষঃস্থলে পাষাণবৎ প্রতিঘাত করিতেছিল—কঠোর কংস-শাসন তাহাদিগের আপাদমস্তক যেন কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। কংসের অত্যাচার হইতে তাঁহার নিতান্ত অন্তরঙ্গগণেরও অব্যাহতি ছিল না। অত্যাচারী রাজার স্বভাবতঃ কথায় কথায় সন্দেহ। সন্দেহ হইল, আর কথা নাই; আন' ধরিয়া—পাঠাও তাহাকে কারাগারে। বলা বাহুল্য, কংসের 'সাইবিরিয়া' ছিল না; কংসের C. I. D. তাঁহার ভগ্নীর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা দৈবকী ও বসুদেবের সম্বন্ধে যে Confidential report পাঠাইল, তাহাতে কংস আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কংস যেন আপন ধ্বংস অদূর ভবিষ্যতের কুহেলিকাচ্ছন্ন সীমান্ত-রেখায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! রাজাদের প্রাণে বুঝি পারিবারিক স্নেহ ও রক্তগত মায়া নাই! নতুবা, বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যে প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া সভ্যতাভিমানী জ্ঞান-গৌরব-বিমণ্ডিত জাতিসমূহকে দগ্ধ করিতেছে—যাহার গুরু-গম্ভীর নির্ঘোষ ইংরাজ-রাজাশ্রিত ভারতবর্ষে প্রতিধ্বনিত হইতেছে—যে নিদারুণ হুতাশনের হুহুঙ্কার ও প্রখরোত্তাপ সমগ্র বসুন্ধরায় ব্যাপ্ত হইতেছে—তাহা যে সকল নৃপমণির মধ্যে, তাঁহারা ত নানারূপে পরস্পর পারিবারিক সংস্রবে সংস্পৃষ্ট। তা'ই বলিতেছিলাম,—মথুরেশ্বর, ভগ্নী দৈবকী ও তদীয় স্বামী বসুদেবের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁহাদিগকে কারানিক্ষিপ্ত করিলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের বক্ষের উপর পাথর চাপাইয়া এবং তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন কি না, তাহা যাত্রাওয়ালাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিতে পারি না। সম্ভবতঃ, বসু-দৈবকী Political prisoners রূপে কংস-কারাগারে একত্র অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের যাহা অপরাধ, তাহা পৃথিবীর অনেক রাজনৈতিক অপরাধের ন্যায় চিরকালই confidential রহিল। তবে কথিত আছে যে, দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র কংসবিনাশী হইবে বলিয়া মথুরাধিপতি জানিতে পারিয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে দৈবকীর অনান্য পুত্রদিগকে কংস নিহত করিলেন কেন? এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রচলিত আছে, তাহা সন্তোষজনক নহে এবং দৈবকীর পুত্রই যদি নিধনকর্ত্তা হন, তবে সেই বিষবৃক্ষ দৈবকীকেই কংস সমূলে উৎপাটিত করিতে পারিতেন। যে সহোদরাকে কারানিক্ষিপ্তা করিতে পারে, ভাগিনেয়ের বধ-সাধন করিতে পারে, তাহার ভগ্নী-হত্যাকে একটা গুরুতর পাপ বলিয়া ভয় করা সম্ভব নয়। যাহা হউক, ঘটনা এই ঘটিয়াছিল যে, কংশের আজ্ঞায় দৈবকীর সপ্তসন্তান নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

পুনরায় দৈবকী গর্ভবতী; এ গর্ভ, অষ্টমগর্ভ। হায়, হায়, উপর্য্যুপরি সপ্তসন্তান-বিয়োগ-বিধুরা বসুদেব-বধূর পঞ্জর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! ভ্রাতৃ-কারানিবদ্ধ পুত্র-নাশ-ভয়-ভীতা দৈবকীর প্রতি শ্বাস ও প্রশ্বাস সেই অজাতশিশুর মঙ্গল-কামনায় পরমেশ্বরের পদপ্রান্তে প্রেরিত হইতেছে—পতি-পার্শ্বেও সেই সহায়শূন্য নারীর প্রতি অশ্রুকণা পরম প্রভুর পবিত্র চরণাম্বুজ সিক্ত করিতেছে। সম্পদ অপেক্ষা বিপদই মানুষের প্রতি বিধাতার শ্রেষ্ঠতর দান; সম্পদে আমরা ভগবান্ ভুলিয়া যাই—বিপদে আমরা শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হই।

বারে বারে যত দুখ দিয়েছ, দিতেছ তারা।
দুখ নয় সে দয়া তব, জেনেছি গো দুখহরা॥

দেখিতে দেখিতে দৈবকীর প্রসবকাল সমুপস্থিত হইল। হায়, হায়! কি হইবে? গর্ভাবস্থায় ও প্রসবকালে জননীর যে যন্ত্রণা, তাহা সদ্যঃপ্রসূত শিশু-মুখাবলোকনে মাতা সব ভুলিয়া যান; কিন্তু হায়! দৈবকী কতক্ষণই বা সে মুখ দেখিতে পাইবেন! শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই যে কংস-কিঙ্করেরা তাহার বধ-সাধন করিবে! তাহারা যে সেই দারুণ কর্ম্মে সিদ্ধহস্ত—তাহাদের প্রতি মথুরেশের যে কঠোর অনুজ্ঞা! হায়! হায়! কি হইবে, কি হইবে? হে বিপদ্ভঞ্জন, রক্ষা কর, রক্ষা কর; হতভাগিনীর প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষ কর। কাতর বসু-দৈবকীর করুণ ক্রন্দনের রোল মথুরেশ্বরের নিকট কোন উত্তর পাইল না বটে, কিন্তু সর্ব্বরাজার রাজা—অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতির কমলাসন টলাইল। The ways of God are past finding out. জন্মের সহিত যিনি মৃত্যুর বীজ নিহিত রাখিয়াছেন—মৃত্যুর পূর্ব্বেই যিনি জন্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন—অমৃতের সহিত যিনি গরল লুক্কায়িত রাখিয়াছেন এবং বিষ মথিত করিয়া যিনি সুধা সমুৎপন্ন করেন—যিনি আমাদের শরীরে বলরূপে, হৃদয়ে ভক্তিরূপে ও মস্তিষ্কে বুদ্ধিরূপে বিরাজ করিতেছেন—যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত—যিনি অবিভাজ্য হইয়াও বহুধা—সর্ব্বব্যয়েও যিনি অব্যয়—যাঁহা হইতে সমস্ত বাদ দিলে সমস্তই অবশিষ্ট থাকে—তিনি বাসুদেব-রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

কংস-নিপীড়িত প্রজাকুল, তাঁহার সামন্ত ও অনুসামন্তগণ রাজদ্বেষী হইয়া উঠিতেছিল। কংসের সেনাদল ও গুপ্তচরগণের হৃদয়ে তখনও বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু বিদ্বেষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতেছিল। এই রাজদ্রোহিতা রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যেও ধীরে ধীরে আপন অধিকার বিস্তার করিতেছিল।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি সমাগত হইল। ঘোর ঘন বর্ষা—রাত্রিকাল। মুষলধারায় বৃষ্টি হইতেছে—আকাশে মেঘমালা পুঞ্জীকৃত—ঘন ঘন বায়ুর নিঃস্বন—মথুরা-নগরী ঘোর ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। তাহার সুন্দর সৌধমালা ও কারুকার্য্য-খচিত মন্দিরশিখর থাকিয়া থাকিয়া দামিনী-চমকে চক্মক্ করিয়া উঠিতেছে—আবার পলকে ঘনান্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছে। কড়কড় অশনিপাত—গুরু-গুরু মেঘ—গর্জ্জন, দর-বর বারি-সম্পাত। নিশিথীনির ভীম-ভৈরব মূর্ত্তি।

এ হেন দুঃসময়ে দৈবকী যে অনুপম শিশু প্রসব করিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতিচ্ছটায় কংস-কারাগার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—বসু-দৈবকীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-প্রান্তর আলোকিত হইল—পৃথিবী ধন্যা হইলেন।

বন্দী ও বন্দিনীর হৃদয় তখন ভয়বিরহিত হইয়া সেই নবজাত কুমার-রক্ষার আশা পোষণ করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ, পূর্ব্ব হইতেই স্থিরীকৃত ছিল যে, এবারকার শিশুকে বন্দীশালা হইতে যমুনাপারে ব্রজেশ্বরের আলয়ে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। সম্ভবতঃ, কারা-কর্ম্মচারিগণকে বশীভূত করা হইয়াছিল। নতুবা, কোন কথা নাই, বার্ত্তা নাই, কংসের বন্দী আপন সদ্যঃপ্রসূত পুত্রকে সেই নিশীথ-সময়ে সহসা অন্য এক রাজার নিকট লইয়া যাইতে চাহিবে কেন? নন্দের সহিত বসুদেবের সৌহার্দ্দ্য ছিল। সেই সৌহার্দ্দ্য-সূত্র-অবলম্বনে কংসারিগণ ষড়্যন্ত্র করিয়া বাসুদেবকে নন্দালয়ে লুক্কায়িত রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। কংসের গুপ্তচরদিগের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াইবার নিমিত্ত পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক নরপতির আশ্রয় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ঘটনার রাত্রের প্রাকৃতিক অবস্থা এই কার্য্যের অনুকূল হইয়াছিল; কিন্তু শিশু যে কবে কোন্ সময় ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহার ত স্থিরতা ছিল না; এই জন্য শিশুকে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, তাহা হইয়া উঠে নাই; কিন্তু রাত্রিকালে ঘোর দুর্য্যোগ-সময়ে দৈবকী প্রসব করায়, শিশু লইয়া যাইবার পক্ষে যৎপরোনাস্তি সুযোগ হইয়াছিল। প্রহরিগণ নিদ্রাগত বা নিদ্রার ভাণ করিয়াছিল; বন্দীশালার লৌহ-কবাট অর্গলবদ্ধ করা হয় নাই; তাই উহা স্পর্শ করিবামাত্র উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। দৈবকীকে কারাগারে রাখিয়া তাঁহার ক্রোড় হইতে নবজাত কুমারকে বক্ষে লইয়া শ্রীবসুদেব সাহসে ভর করিয়া সেই বন্দীশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাজপথে দাঁড়াইলেন। ঘোর তমিস্রা তাঁহাকে লোক-লোচনের অতীত করিয়া রাখিল—আর সেই দুর্য্যোগের রাত্রেই বা কোন্ নাগরিক আপন সুখ-শয্যা পরিত্যাগ করিবে?

পুত্রকে বক্ষে করিয়া বসুদেব যমুনাকূলে উপনীত হইলেন। দামিনী-চমকে তিনি তরঙ্গায়িত নদীবক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া ভীত হইলেন। কোন নৌকা নিকটে ছিল না যে, তাহাতে করিয়া যমুনা উত্তীর্ণ হন। পুনরায় বিদ্যুৎ হানিল; ইহার ক্ষণিক আলোকে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এক শৃগাল অবলীলাক্রমে নদী পার হইয়া যাইতেছে। তবে আর কি? নদীতে অধিক জল নাই; সন্তরণের প্রয়োজন হইবে না। মনে মনে "পরমেশ্বর রক্ষা কর, জয় জগদীশ হরে" বলিতে বলিতে বসুদেব জলে নামিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে,—হায়, এ কি হইল? কোথায় গেল সেই প্রাণ-

ধন? বসুদেবের বক্ষ হইতে পিছ্‌লাইয়া শিশু যমুনার জলে পড়িয়া গিয়াছে। ভয়, শোক, লজ্জা, আত্মগ্লানি-বিজড়িত ভাব, যাহা তখন বসুদেব-হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কি প্রকার আন্তরিকতার সহিত যে তখন তিনি পরমেশ্বরকে ডাকিতেছিলেন, তাহা বর্ণনা করিতে ব্যাসও পরাজিত হন। কিছুক্ষণ অন্বেষণের পর বসুদেব যমুনার জলে শিশুকে খুঁজিয়া পাইলেন। কি আশ্চর্য্য! যমুনা-জল-নিমজ্জন-নিবন্ধন সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুর প্রাণ-বিয়োগ হয় নাই! তখন আনন্দাশ্রু-বিগলিত-গণ্ডে পুলকিত প্রাণে শিশুসঙ্গে, বিবিধরঙ্গে বসুদেব নন্দের মন্দিরে সমাগত হইলেন। পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-অনুসারে নন্দ-মহাশয় সেই শিশুকে রক্ষা করিবার ভার লইলেন; কিন্তু এই শিশুর পরিবর্ত্তে বসুদেবকে আর একটি সদ্যোজাত শিশু না দিলে ত চলিবে না! নতুবা, পর-প্রভাতে কংস-কারাগারে দৈবকীর শয্যায় কোন্ শিশু দেখাইবেন? সে দুর্য্যোগের রাত্রে এরূপ শিশুই বা কোথায় পাওয়া যায়? সুযোগক্রমে সেই রাত্রে নন্দের মহিষী এক কন্যা প্রসব করিলেন। নন্দ সেই কন্যাকে বসুদেবের হস্তে দিয়া জগতে স্বার্থ-ত্যাগের এক জ্বলন্ত উদাহরণ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বৈষ্ণব-মহাশয়েরা বলেন যে, বসুদেব যাঁহাকে লইয়া বন্দীশালা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি অংশাবতার; কিন্তু যমুনা-সলিল হইতে যে শিশুকে পাইয়া ব্রজেন্দ্র নন্দ-ঘোষ-গৃহে রাখিয়া আসিলেন, তিনি পূর্ণব্রহ্ম—অযোনিসম্ভূত। তিনিই শ্রীকৃষ্ণ—তিনিই গোলোক, পতি—তিনিই গোকুলে নন্দ-নন্দন। আর, তিনিই ব্রজে বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীমতী রাধা। উভয়েই এক—অবিভাজ্য হইয়াও বিভক্ত।

ব্রজ-লীলা-কাব্যে ও পৌগণ্ডে—কেবল দ্বাদশ বর্ষ মাত্র। তাহার পর অপ্রকট। তবে সময় সময় প্রকট হন, বিশেষ কার্য্যানুরোধে—যথা, শস্ত্রত্যাগী, সন্দিহান অর্জ্জুনকে গীতা-কথন-কালে প্রভাস-তীর্থে, ইত্যাদি। সে যে প্রকট, তাহা অংশাবতার বাসুদেব-কৃষ্ণের শরীরে আবির্ভূত হইয়া। যমুনা-ক্রোড় ত্যাগ করিয়া বাসুদেব কবে উঠিলেন? যখন অক্রূর-ঋষি বৃন্দাবন হইতে পূর্ণব্রহ্মকে লইয়া মথুরা-যাত্রাকালে যমুনা পার হইতেছিলেন। সে এক অদ্ভুত কাহিনী। মথুরার ঐশ্বর্য্য-লীলা হইতে শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক প্রাণী; বৃন্দাবনে তিনি আধ্যাত্মিক সামগ্রী।

বাসুদেব ও নন্দ-নন্দনে পার্থক্য এবং প্রথমের শরীরে সময়-বিশেষে দ্বিতীয়ের আবির্ভাব—এই দুইটি কথা প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে, কৃষ্ণ-চরিত্রোপাখ্যান বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না।

পূর্ণব্রহ্ম নন্দ-নন্দনে এবং বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধায় যে কোন ভেদ নাই—ইহা যদি কেহ ভগবৎ-কৃপায় মনে গ্রথিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ব্রজ-লীলার রসাস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

মনে রাখিবেন, অংশ-পূর্ণতা, প্রকট-অপ্রকট, আবির্ভাব-তিরোভাব প্রভৃতি শব্দ যাহা পরমেশ্বর-সংস্রবে ব্যবহৃত হয়, তাহা-লৌকিক ও ব্যাবহারিক ভাষা মাত্র—অন্য ভাষার অভাবে ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। নতুবা, তিনি সর্ব্ব-ঘটে এবং সর্ব্ব-পটে। আমরা সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অস্ত, সূর্য্যের গতি বলিয়া থাকি এবং যাহা বলি, তাহা এক হিসাবে বুঝিয়াও থাকি, কিন্তু সূর্য্য যে নিশ্চল—পৃথিবীই যে সেই তেজঃপুঞ্জের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে—তাহাও ত বুঝি। পুনরায়, সূর্য্যের যে স্থিরতা, তাহা কেবল পৃথিব্যাদি গ্রহ-উপগ্রহের সহিত তুলনায়; নতুবা, সমগ্র সৌর-জগতকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্য ভীমতেজে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাও ত ঠিক। সূর্য্য-সংক্রান্তে আমরা এই ত্রিবিধ অবস্থা বুঝি। এই ত্রিবিধ অবস্থাই সত্য। এই ত্রিবিধ অবস্থা বুঝিবার ও বুঝাইবার ভাষাও যথার্থ। জ্ঞানের তারতম্যানুসারে মানুষ সূর্য্যের গতি-বিষয়ক এই অবস্থাত্রয় বুঝে। অজ্ঞানী বুঝে—সূর্য্যের উদয় হয়, অস্ত হয় অর্থাৎ সূর্য্য সচল। জ্ঞানী বুঝে—বই পড়িয়া—সূর্য্য নিশ্চল এবং পৃথিবী তাহার চারিদিকে আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে ঘুরিয়া অহোরাত্র এবং ষড়্ঋতু-সম্পন্ন বর্ষ-রচনা করিতেছে। বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত বুঝে, যে প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্যও গতি-সম্পন্ন। সূর্য্যগতি-বিষয়ে অতিজ্ঞানী ও অজ্ঞানীর জ্ঞান এক; গোলযোগ কেবল মধ্যজ্ঞানিগণের। ঈশ্বর-বিষয়েও জ্ঞানের গোলযোগ আমাদের মত লোকের—যাহাদের জ্ঞানও হয় নাই, অথচ অজ্ঞানিও নহে—এই মধ্য-জ্ঞানীদের। আমরা বেদ পড়িয়া মূর্খ হই, বেদান্ত পড়িয়া নাস্তিক হই, আমরা মীমাংসা পড়িয়া সকল মীমাংসা হইতে অযোগ্য হইয়া পড়ি।

সূর্য্য-সম্বন্ধে যদি এতগুলি অবস্থা সত্য বলিয়া বুঝা যায়, তবে পরমেশ্বর-সম্বন্ধে পূর্ব্বকথিত বিভিন্ন ভাব যে অসম্ভব নয়, তাহা কি বুঝিবে না? পরমেশ্বরকে বুঝিতে হইলে, পরমেশ্বরের করুণা প্রাপ্ত হওয়া চাই। তিনি গুরুরূপে অজ্ঞান তিমিরান্ধকে জ্ঞানরূপ অঞ্জনশালার দ্বারা দর্শন-শক্তি প্রদান করেন। ভাই, গুরুতে বিশ্বাস কর—তোমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইবে। ইহা কথার কথা নয়—শ্রুতি-সুখকর কবিতা নয়—ইহা ধ্রুব সত্য। ঈশ্বর জানিতে হইলে, ভক্তি চাই—আন্তরিক প্রগাঢ় ভক্তি। মনকে চোখ ঠারিও না—চক্ষে একটু জল আসিলেই, আপনাকে ভক্ত ভাবিও না—দিব্যজ্যোতির ক্ষণদা আভাস পাইলেও আপনাকে ভক্ত ভাবিয়া গর্ব্বিত হইও না। তাহা হইলে সমস্ত সাধন-ভজন ভাসিয়া যাইবে।

'ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর'। এস, আমরা ভক্তি-পূর্ণ হৃদয়ে ব্রজলীলার মধ্যে প্রবেশ করি। চল, আমরা ভক্তিভাবে সেই ভাবময়ের ভাব অবলোকন করিতে বৃন্দারণ্যে গমন করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নন্দ-নন্দনের বৃন্দাবন-লীলা দ্বাদশ বৎসর মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শ্রীমতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন, অথচ লোকাচারে বিভিন্ন। উভয়েই এক—পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে মধুর লীলা করিয়াছেন; গোপীগণ সেই রাধা-কৃষ্ণ-মিলনে প্রয়াসিনী—রাধা-কৃষ্ণ-মিলনে তাহারা সুখী—রাধা-কৃষ্ণ-মিলন-রসে রসবতী। পরমেশ্বরের সহিত কি ভাবে মিলিতে হয়, তাহা রাধাকৃষ্ণ-মিলনে; কি প্রকার আন্তরিকতায়, কি প্রকার রাগে ও রাগানুরাগে, তাহা রাধাকৃষ্ণ মিলনে; সংসারে স্বামী অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কে আছে? সেই স্বামী-ধনকেও ত্যাগ করিয়া যিনি পরমেশ্বর-পার্শ্বে আসিতে পারেন, তাঁহার মত ত্যাগী কে? লজ্জাপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর ভূষণ নাই; সেই লজ্জা যে গোপীগণ ঈশ্বর-সন্নিধানে (বস্ত্র-হরণ-লীলায়) ত্যাগ করিতে পারে, তাহারা কি না ত্যাগ করিতে পারে? কৃষ্ণ-প্রেম-পরায়ণা সে সকল সখী ও মঞ্জরী দ্বেষ-হিংসা বিরহিতা হইয়া পরমানন্দে রাধা-কৃষ্ণ-সেবায় কায়মনোবাক্যে নিরতা, তাহারা যেমন আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিয়াছিল, তেমন কে পারে?

ভক্তগণ নানা ভাষায় নানারূপে ব্রজ-লীলা-বর্ণনা করিয়াছেন—আপন আপন ভাবে ও সংস্কারে বিমিশ্রিত করিয়া আপন আরাধ্য দেবতাকে কবিতার ছন্দে, নাটকের অঙ্গে, নানা রঙ্গে সাজাইয়াছেন। সে কেবল তাঁহাদের ভক্তি-বিমিশ্রিত কল্পনা—সে কেবল বালিকার পুতুল-খেলা—আপন আপন প্রবৃত্তি ও সংস্কারমূলক।

যে বালিকার যেমন অভিরুচি, সে সেইরূপ করিয়া খেলিতে খেলিতে ভাত রাঁধে, খেলা-ঘর সাজায়, পুতুলের গাত্রে আভরণ দেয়, তাহাকে কাপড় পরায়, তাহার বিবাহ দেয়, ইত্যাদি। নতুবা, তাহা ত প্রকৃত নয়। কিন্তু তাহাতেই বালিকার আনন্দ; তাহাতেই সে তন্ময় হইয়া থাকে। সেই প্রকার রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বর্ণনা ভক্ত ও কবি-গণ, যিনি যেরূপ পারিয়াছেন, তিনি সেইরূপ করিয়াছেন। যাত্রায়, নাটকে, কথকতায়, তাহার পর গানে, গল্পে ও গীতি-নাট্যে তাহা আবার কত রকমে পরিণত! যিনি যেরূপেই তাহা বর্ণনা করুন না কেন, রাধা-কৃষ্ণে যে ভেদ নাই—এই যুক্ত যুগলই যে একমেবা-দ্বিতীয়ং, ইহা হৃদয়ঙ্গম হইলে এবং ব্রজলীলা যে দ্বাদশ বৎসর মধ্যেই সমাপ্ত হইয়াছিল, ইহা জানিলে সকলেই দেখিবেন যে, ব্রজ-লীলা-মধ্যে কোনপ্রকার পাপ নাই—ব্যভিচার নাই—অশ্লীলতা নাই।

ইহা রূপক নহে—কবি-কল্পনা নহে। যাহা নিত্য গোলোকে বিরাজমান, শ্রীবৃন্দাবনে তাহারই প্রতিবিম্ব-সম্পাত।

এই যে নিত্য-গোলোক, এই যে তাহার প্রতিবিম্ব বৃন্দাবন, তাহা তোমার ও আমার শরীরেও বর্ত্তমান,—নর-দেহ-ধারণের ইহাই মাহাত্ম্য। ব্রহ্মরন্ধ্রাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত হৃদয় কন্দর বাসিনী শ্রীরাধার যে মিলন, তাহার নাম যোগ। দেহ-মনকে এই ব্যাপারে উপযুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার ব্রতপূজা, নানাপ্রকার সাধন-ভজন, নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক কসরৎ।

কেহ তিলার্দ্ধ ভাবিবেন না যে, নর-দেহাভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝাইবার জন্যই নিত্য-গোলকের এবং ব্রজলীলার কল্পনা। সাধু-মুখে শুনি যে, আমাদের দেহে চন্দ্র-সূর্য্যও বিরাজিত, নদ-নদী, সাগর-গিরিও প্রতিভাত। তবে কি বাহ্য-জগতে কৌমুদী-কিরণে যামিনীর মধুরতা আনয়ন করে না—দিনমণির আগমনে বসুন্ধরার অন্ধকার তিরোহিত হয় না? অথবা পৃথিবীতে নদ নাই, নদী নাই, গিরি নাই, সাগর নাই? বাহিরে যাহা আছে, তাহা ভিতরে থাকিতে পারে না, এ logic ঠিক নয়। যাঁহারা বাস্তবিকই সাধু, তাঁহারা দেখিয়াছেন ও দেখেন—অনুভব করিয়াছেন ও করেন। তাঁহারা এই নশ্বর নর-দেহমধ্যে রাধা-কৃষ্ণ-মিলনের অপার আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে সারাৎসার শ্রীরাধা-কৃষ্ণে লীন হইয়া নির্ব্বাণত্ব প্রাপ্ত হন। এই রাধা-কৃষ্ণ-মিলন সর্ব্ব-ধর্ম্মসার।

জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন আমি, ভজন-সাধনহীন আমি, ধ্যান অনুধ্যানহীন আমি, ভক্তিহীন আমি; আমি কৃষ্ণকথা কি বলিব? আমি বুঝিই বা কি, যে তাহা বুঝাইব? আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জন করিবেন। আমি বঙ্গের প্রাচীন কবি ও ভক্ত লোচনদাসের এক অপ্রকাশিত কবিতা হইতে এক কথামৃত উপহার দিয়া আপনাদের চরণ হইতে বিদায় লইব—

"হরিনামামৃত অঙ্গে না লিখিয়ে
কি ভূষণ পরেচ গায়।
সোণাতে রূপাতে জড়িত থাকিলে
যম কি ভুলিবে তায়॥
ঘোড়াতে দোলাতে চড়িয়ে বেড়ায়
ভূমিতে না পরশে পায়।
যখন শমন করিবে দমন
ধূলাতে লুটাবে কায়॥
ঘরে বেরিইতে ডরে ডরাইছ
দোসর তেসর চাও।
শমন-ভবন করিলে গমন
তখন ক'জনা পাও॥
চিনি ফিনি কলা মিছরি আদি উলা
কি স্বাদ চেকেচ তার।
রাধাকৃষ্ণ-নাম জিহ্বাতে না চেকে
কি স্বাদ চেকেছ আর॥
রাধাকৃষ্ণ নাম ভজ অবিরাম
সাধু-সঙ্গে নিরবধি।
কবে যমরায় বাঁধি লয়ে যায়
হরি না ভজিবি যদি॥
দাস লোচন ভণয়ে ঐছন
হরিগুণ-গান সুখে।
হেন রসে যার রতি না জন্মিল
কালি চূণ তার মুখে॥"

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস

ষড়্ঋতু

গ্রীষ্মে আসে বিসূচিকা, বর্ষা ঋতুর খ্যাতি অতিসারে,
শরতে হয় বাতের বৃদ্ধি, কট্‌কটানি জানে প্রতি হাড়ে।
হেমন্তে হয় ম্যালেরিয়া, কাঁপুনিতে বাড়ে সেটা শীতে,
হাম-বসন্তে ঋতুপতি, ষড়্ঋতুর মাঝে গেছেন জিতে।
বার মাসের তের পার্ব্বণ কচ্চি মোরা তবু কপাল ঠুকে,
আধি ব্যাধি দিয়ে বিধি, সংসারটা চালাচ্চ খুব সুখে।

বাল্যে এবং যৌবনেতে পুঁথির বিদ্যায় বাড়ে খচমচ,
লব্ধ তাহে রাজ-সেবা, কিংবা যাহে নৈবচ নৈবচ।
প্রৌঢ়ত্বের গৌরবেতে তত্ত্ব-বিদ্যায় কর যদি যতন,
ফুটবে খাসা অন্তদৃষ্টি, চোখের আলো হবে কিন্তু খতম্।

কাজেই বৃদ্ধ চক্ষু বুজে মুনি-বৃত্তি করেন কিছু অধিক,
বোঁচ্‌কা ঘাড়ে চল্‌ছি খাসা, ভবের পথে আবাল-বৃদ্ধ-পথিক।

ষড়্ঋতুর কুঞ্জমাঝে আচ্ছা করে' চতুরাশ্রম বানাই,
উৎসবেতে গোল পাকিয়ে বাজারে ঢোল, বাজা কাঁসি শানাই।
"ঐ পাতে দই রসগোল্লা!" হল্লা করে' কাটাও আঁধার রাতি।
পরের কথা ভাব্‌বে পরে বংশক্রমে পুত্র এবং নাতি।
মহোৎসবের কলরবে এস সবে আকাশখানা ফাটাই।
গোলেমালে হরিবোলে ভাঙ্গা মাসের এই কটাদিন কাটাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

বিচার

"দোষী কি নির্দ্দোষী?"

জুরীদিগকে আসামীর অপরাধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বুঝাইয়া দিয়া বিচারপতি প্রচলিত প্রথামত জিজ্ঞাসা করিলেন—"দোষী কি নির্দ্দোষী?"

অভিযুক্ত বালিকার নয়ন-সমক্ষে সেই জনাকীর্ণ বিচারালয় বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই লোকারণ্য সন্ধ্যা-সমাগমের ছায়ায় দূরবর্ত্তী দৃশ্যের মত অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া আসিল।

বিচারপতি প্রশ্ন করিবার পর অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গিয়াছে। বিচারালয়ের সেই বিরাট্ জনসঙ্ঘ একটা রুদ্ধ ঔৎসুক্যে অধীর অথচ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল; কিন্তু বালিকার মনে হইতেছিল, চারিদিক হইতেই যেন প্রশ্ন-তরঙ্গ উঠিতেছে,—"দোষী কি নির্দ্দোষী?" সে প্রশ্নে বন্ধুর ব্যগ্রতার বা আত্মীয়ের সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না—তাহার প্রত্যেক শব্দে যেন একটা নিষ্ঠুর জিঘাংসাপূর্ণ বিদ্রূপ নিহিত ছিল।

"দোষী কি নির্দ্দোষী?" কাঠগড়ার সম্মুখের 'রেলিং'টা সে খুব দৃঢ়-মুষ্টিতে ধারণ করিল। তাহার শবের মত পাংশু মুখমণ্ডলে, অস্বাভাবিকরূপ সমুজ্জ্বল চোখছু'টীমাত্র জীবনের প্রমাণস্বরূপ সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাহার সমস্ত জীবনী-শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া যেন সেই চোখছু'টীতে আশ্রয় লইয়াছিল।

"দোষী কি নির্দ্দোষী?" এ কৌতূহল কেন? কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ত সকলেই এবং সেও জানিতে পারিবে যে, এই মুষ্টিমেয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের—জুরীদিগের চোখে সে তা'র একমাত্র ভাইএর জীবন স্বহস্তে গ্রহণ করার অপরাধে অপরাধিনী বলিয়া পরিগণিত হইবে কি না?

তা'র শ্রান্ত মস্তিষ্ক গত কয়দিনের ঘটনা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। মোটে এক সপ্তাহ—সাতদিন মাত্র সে এই লোকারণ্যের কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সেই আসামীর 'ডকে'র ভিতর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইখানে দাঁড়াইয়া এই সাতদিন সে তা'র পক্ষের এবং সরকারী উকীলের বাদানুবাদ শুনিয়াছে, তা'র জীবন-মরণ লইয়া যুদ্ধ দেখিয়াছে। সাতদিন মাত্র! তা'র বিশ্বাস হইতেছিল না। সাতদিন, এত সময়! এ যে অসীম, অনন্ত! ইহার কি শেষ আছে? সাতদিন! ইহার আগে ত কত-দিন সে কোন সখীর বাটীতে প্রমোদ-ভোজে গিয়া এক সপ্তাহ কাটাইয়া আসিয়াছে, তখন ত সপ্তাহ এত বড় বলিয়া বোধ হয় নাই! এখন কি কালের পরিমাণ বাড়িয়াছে?

হঠাৎ তাহার চোখের সম্মুখ হইতে কুজ্ঝটিকাময় আবরণটা সরিয়া গেল। সে দেখিল, যাহাদের হাতে তা'র জীবন-মরণ, সেই জুরীরা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন—সে বুঝিতে পারিল, তাঁহাদের পরামর্শ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আজ রাত্রে হয় তা'র মুক্তি—না হয়—একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেন তা'র বুকটা দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল—তা'র সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিল।

লজ্জা-ঘৃণা ত্যাগ করিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার নৈরাশ্যব্যঞ্জক চোখছু'টী সেই লোকারণ্যের ভিতরে একটু সাহায্য, একটু সহানুভূতি, একটু দয়া ভিক্ষা করিতেছিল।

এ সংসারে কি দয়া নাই? সুধু একদল নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, কৌতূহলপরায়ণ দর্শক লইয়াই কি এই সংসার গঠিত? সে যে কতবার মর্ম্মভেদী করুণস্বরে বলিয়াছে, "ওগো, আমি দোষী নই! আমি আমার ভাইকে দেখ্‌তে পাত্তুম না বটে, কিন্তু তা'কে আমি খুন করি নি। আমি দোষী নই, ভগবান্ সাক্ষী করে' বল্‌ছি, আমি দোষী নই।" এ কথায় বিশ্বাস করে, এমন একজন লোকও কি এই পাষাণ-হৃদয় দর্শকমণ্ডলীর ভিতর নাই?

তা'র উকীল—যিনি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন, যিনি বিপক্ষের সমস্ত প্রমাণ তিল তিল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহা কেবল অনুমানের উপর স্থাপিত,—তিনি কি তাহার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করেন? অথবা, যেমন অনেক উকীলই করিয়া থাকেন, মনে মনে তাঁহাকে দোষী জানিয়াও, সুধু নিজের উন্নতির জন্য, নিজের গৌরবের জন্যই তাঁহার এ অক্লান্ত পরিশ্রম? তাহার উকীল, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে জ্বলন্ত ভাষায় তাঁহার মর্ম্মস্পর্শিণী বক্তৃতায় সকলকে মোহিত করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বালিকা তাঁহার দিকে চাহিল। সে বুঝাইতে চায়, সে বাস্তবিক নির্দ্দোষী। তিনি কি তাহা বিশ্বাস করেন? উকীল মিঃ রেণল্‌ড্‌ এই সময় তাহার দিকে চোখ ফিরাইলেন। যেন তিনি তাহার নীরব প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিব্যঞ্জক, জ্যোতির্ম্ময় চোখছু'টী মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান ভেদ করিয়া আসামীর কাঠগড়াস্থিত পাংশুবদনা বালিকার চক্ষুর সহিত মিলিত হইল।

তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে সে কি ভাব দেখিতে পাইল? ইহার পূর্ব্বে যখন সেই অনুসন্ধিৎসু চোখছু'টী তাহার দিকে এমনি করিয়া চাহিয়াছে, তখন সে কি বুঝিয়াছে? সহসা তাহার পাংশুবর্ণ গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিল; তাহার ফুল্ল যৌবনের লুপ্ত-শ্রী ফিরিয়া আসিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য সে বিচারালয়, বিচার, জুরী, নিজের অবস্থা সব ভুলিয়া গেল!

"দোষী কি নির্দ্দোষী?" হঠাৎ তাহার কর্ণে আবার এই কথা-গুলি ধ্বনিত হইল। আবার তাহার মনে হইল যে, সেই বিচারালয়ের প্রত্যেক আসন হইতে এই বিদ্রূপপূর্ণ প্রশ্ন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইতেছে। এই প্রশ্নের কোলাহলে তাহার দ্রুত-স্পন্দিত হৃদয়ের শব্দ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত পৃথিবী লুপ্ত হইয়া আসিল, সকলই সে অন্ধকার দেখিল, তন্মধ্যে সুধু ছু'টীমাত্র চোখের দীপ্ত দৃষ্টি তাহার দৃষ্টিকে যেন মন্ত্র-শক্তিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল! তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত আলোক, মাত্র সেই ছু'টী চোখে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

কিন্তু, এ কি! তাহারাও যে জিজ্ঞাসা করিতেছে, দোষী কি নির্দ্দোষী? একটা অনির্দ্দেশ্য আতঙ্কে অভিভূত হইয়া সে তাঁহার চক্ষু হইতে নিজের চক্ষু ফিরাইয়া লইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু সে ক্ষমতা তা'র ছিল না। প্রশ্নের কোলাহলে তাহার কর্ণ-কুহর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তাহার মনে হইল, প্রত্যেক প্রশ্ন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার মাঝে ছু'টী প্রদীপ্ত চোখের নীরব প্রশ্ন কামানের গোলার মত তাহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সে দুই হাত দিয়া নিজের চক্ষু আবৃত করিল।

"আমি নির্দ্দোষী। ঈশ্বর জানেন, আমি দোষী নই।"

বালিকার করুণ আর্ত্তনাদে বিচার-গৃহের কলরব থামিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে বিগতচেতনা বালিকার দেহ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল।

(২)

মাতৃ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়া, মাতারই ক্রোড়ে মাতার আদর, চুম্বনের ভিতর জাগিয়া উঠিলে যেরূপ স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে, পরিস্কৃত-পরিচ্ছন্ন কোমল শয্যার উপর সেইরূপ স্বচ্ছন্দতা ও আরামের একটা অনুভূতি লইয়া বালিকা জাগিয়া উঠিল। এই আরামের অবস্থায় সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। তা'রপর হঠাৎ প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত সমস্ত স্মৃতি একসঙ্গে ফিরিয়া আসিল। অন্ধকারে হস্ত প্রসারিত করিয়া বিবর্ণ মুখে ও বিস্ফারিত চক্ষে বালিকা ধড়্‌মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল। এই এক সপ্তাহ, যে কথা সে নিশিদিন আলোচনা করিয়াছে, যে কথা তাহার হৃদয়ে এবং মস্তিষ্কে দৃঢ়রূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল, সেই কথাই প্রথমে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল —"ওগো আমি দোষী নই, আমি দোষী নই।"

পিছন হইতে কাহার কোমল হস্ত, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে, সস্নেহে শয্যার উপর শোয়াইয়া দিল এবং সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া দুইটী দয়ার্দ্র চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত হইল। সে একটী কোমল, মৃদুস্বর শুনিতে পাইল। রমণীর কণ্ঠস্বর—

"আর কোন ভয় নেই বাছা, তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। আদালতে জুরীরা যখন রায় দেন, সেই সময় তুমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলে। এখন কিছু ভাব্‌বার চেষ্টা কর' না, একটু ঘুমোও। তুমি এখন মিঃ রেণল্‌ডের বাড়ীতে আছ। তিনি তোমায় বেশ করে বুঝিয়ে বল্‌তে বলেছেন যে, তোমার আর কোন ভয় নেই, তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

রমণী এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন; তিনি যেন এই বাণীর পূর্ণ আনন্দটুকু তাহাকে উপলব্ধি করাইতে চাহিতেছিলেন!

নিরাপদ! ভয় নেই! আপনার নিরাপদ অবস্থাটা বালিকা ভালরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিল না। আর কোন ভয় নেই!' বালিকা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হাসি যেন একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের মত শুনাইল। অবশেষে তাহার বিস্ফারিত চক্ষুর অস্বাভাবিক ভাব কমিয়া আসিল, হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল এবং শ্রান্ত বালিকা দুর্ব্বল ও অবসন্ন দেহে ধীরে ধীরে বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল। বালিকা নীরবে চক্ষু নিমীলিত করিল।

রমণী কিছুক্ষণ বসিয়া বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কক্ষত্যাগ করিলেন।

বালিকা কিন্তু ঘুমায় নাই; তাহার মাথার ভিতর দিয়া চিন্তার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল।

সে মিঃ রেণল্‌ডের বাড়ীতে আছে। তিনি তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছেন। বিচারালয়ের সেই নির্ম্মম জনসঙ্ঘের ভিতর এক-মাত্র তিনিই তাহার দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। তা'রপর আশ্রয়হীনাকে আশ্রয় দিয়াছেন। বিচারালয়ে সে মূর্চ্ছিত হইয়া-ছিল—সেটা তাহার বেশ মনে আছে—কিন্তু সেই শত শত দর্শক-মণ্ডলীর ভিতর কি তাহার এমন একজনও পুরাণো বন্ধু ছিল না, যে তাহাকে এই দুঃসময়ে আশ্রয়দান করিতে পারিত! কেবল কি ইনিই ছিলেন? ইনি—যাঁহার নিকট সে একরকম অপরিচিতা বলিলেও হয়!

তিনি তাহার জীবনরক্ষা করিয়াছেন। যে দারুণ দুঃস্বপ্ন তাহার জীবনটাকে পিষিয়া বাহির করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তাহা হইতে তিনিই তাহাকে জাগাইয়াছেন। একটা লজ্জাকর এবং বীভৎস মৃত্যুর মুখ হইতে তিনিই তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং যখন জগৎ-সংসারে কেহই তাহাকে আশ্রয় দেয় নাই, তখন একমাত্র তিনিই সহৃদয় বন্ধুর মত তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন।

তাহার ভাইএর মৃত্যুর আগেকার কথাগুলি, একে একে সমস্তই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে কি সুখের দিন ছিল! কোন' চিন্তা, কোন' আশঙ্কা ছিল না। সম্পদের সূর্য্য-কিরণে তখন সে বসন্তের পুষ্পটীর মত ফুটিয়া থাকিত। তখন কত বন্ধু ছিল। প্রমোদ-ভোজে, নৃত্য-সভায় লোকে তখন তাহার অভাব অনুভব করিত। সেই সময় এক সখীর বাটীতে প্রমোদ-ভোজে মিঃ রেণল্‌ডের সহিত তাহার প্রথম পরিচয় হয়। প্রথম আলাপেই সে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, পৃথিবীর অপর লোক হইতে তাঁহাকে একটু স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়া, হাসিয়া সে আপনাকে আগেকার চেয়ে সুখী মনে করিয়াছিল। তা'রপর এই দুঃস্বপ্ন। নিজের ভাইকে হত্যা করার অপরাধে সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইল। তা'র সমস্ত বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ করিল। সে নিরপরাধা হইয়াও লোকাপ-বাদের প্লাবনে যখন ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন একমাত্র তাঁহারই সবল হস্ত তাহাকে টানিয়া কূলে তুলিল। এই দুঃসহ লজ্জা, এই অনপনেয় কলঙ্ক, এই ভীষণ রাজদণ্ডের হাত হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

একটা আনন্দের আবেগে তাহার হৃদয়ের শোণিত উচ্ছ্বসিত হইয়া শিরায় শিরায় খরবেগে প্রবাহিত হইল।

তিনি এই কয়েক বৎসর মাত্র উকীল হইয়াছেন—এখনও কৃতী আইনজ্ঞ বলিয়া সাধারণ্যে খ্যাত হ'ন নাই। তাহার মোকদ্দমা-জয়ই তাঁহার যশঃসৌধের প্রথম সোপান। তিনি তাহার জীবনদান করিয়াছেন। সেও তাঁহার উন্নতির সাহায্য করিয়াছে। তাহার আনন্দ হইল। তাহার কষ্ট হইয়াছে হৌক্, এরূপ শত শত কষ্ট সে সহ্য করিতে পারে, যদি—

হঠাৎ বিচারালয়ের স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও, অতীত দুশ্চিন্তায় তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল।

না, না, কিছুর জন্যই সে এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। স্বর্গের জন্যও নয়!

তাহার কক্ষের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। সেই অন্ধকারে সে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল!

"ঘুমুচ্ছে? ঘুমুতে দাও—জাগিও না। ঘুম ভাঙ্‌লে আমায় খবর দিও—আমার কিছু দরকার আছে।"

সেই কণ্ঠস্বর! যাহা সেই দিনই কিছু পূর্ব্বে বিচারালয়ের জনতার সম্মুখে তাহার নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত করিবার জন্য বজ্র-নিনাদে ধ্বনিত হইয়াছিল, এখন তাহারই স্বচ্ছন্দতার জন্য সে স্বর সমবেদনায় স্নিগ্ধ, ধীর ও মৃদু।

স্বচ্ছন্দতা ও নিরুদ্বেগের একটা মধুর শান্তিতে তাহার মন পরি-পূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে শুইয়া তাঁহার বিলীয়মান পদশব্দ শুনিতে লাগিল। তা'রপর কোন্ মুহূর্ত্তে যে গভীর নিদ্রা আসিয়া তাহার শ্রান্ত দেহটীকে অধিকার করিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

(৩)

একটা ঘড়ির টং টং শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যার

উপর অলসভাবে শুইয়া সে সেই শব্দ শুনিতে লাগিল। পাঁচ—ছয় সাত—আট। সে পূরা তিন ঘণ্টা ঘুমাইয়াছে। এখন রাত্রি আটটা। সেই ভয়ানক দিনের আর অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে।

চারিদিক নিস্তব্ধ। কাহারও সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না। সে কনুইএর উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিল এবং একমনে শুনিতে লাগিল।

তাহার কক্ষের অর্দ্ধ-উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নীচের ঘরের আলোকের আভা দেখা যাইতেছিল এবং নীচে হইতে যেন কথোপকথনের একটা অস্পষ্ট শব্দ আসিতেছিল।

সে আস্তে আস্তে বিছানা হইতে নামিয়া মেঝের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহার শরীরে কোন গ্লানি ছিল না, বরং শরীরের ভিতর সে বেশ একটা লঘুত্ব অনুভব করিতেছিল।

সে নিজের পরিধেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহারা তাহার পোষাক বদলাইয়া দেয় নাই। যে ময়লা 'ফ্রক্'টা পরিয়া সে এই সারা সপ্তাহটা কাটাইয়াছে, এখনও সেইটাই তাহার অঙ্গে রহিয়াছে।

সে লঘু পদক্ষেপে 'ড্রেসিং টেবিলে'র কাছে গিয়া গ্যাস্‌টা বাড়াইয়া দিল এবং তাহার বিশৃঙ্খল কুন্তলগুচ্ছ একটু গুছাইয়া লইয়া দর্পণে তাহার প্রতিবিম্বের দিকে চাহিল।

তাহার গণ্ডদেশে একটু লাল আভা দেখা যাইতেছিল এবং বিবর্ণ, শীর্ণ মুখমণ্ডলের ভিতর তাহার চক্ষুদু'টীর দীপ্ত দৃষ্টি অস্বাভাবিকরূপ উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে তাহার প্রতিমূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "তোমার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে যে গো!"

কিন্তু তাহার স্বরে দুঃখের কোন আভাস ছিল না। যিনি নীচে কথা কহিতেছিলেন, সে তখন তাঁহারই কথা ভাবিতেছিল।

হঠাৎ বহুদিন পূর্ব্বে শ্রুত একটা কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল, "হর্ষের পর বিষাদ……বিষাদের পর হর্ষ……।" এ কি দৈববাণী? তিনি তাহাকে বাঁচাইয়াছেন, নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন, আর কেহ তাহার নির্দ্দোষিতায় বিশ্বাস করুক্ বা না করুক্, তিনি তাহাকে নিরপরাধা বলিয়া জানেন। কৃতজ্ঞতার আবেগে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, এখনই তাঁহার চরণতলে নতজানু হইয়া নিজেকে কৃতার্থ করে। তাহার মনে হইল, এ জগৎ সুধু ইতর প্রাণীতে পরিপূর্ণ, তা'র ভিতর একমাত্র মানুষ—তিনি।

টেবিলের উপর পুষ্পাধারে সকাল-বেলার-তোলা কতকগুলি গোলাপ-ফুল সাজান' ছিল। সে তাহা হইতে বাছিয়া একটী সুন্দর লাল-রঙ্গের ফুল লইয়া নিজের বক্ষের মধ্যস্থলে 'পিন' দিয়া আট্‌কাইয়া দিল। তাহার কাল পোষাকের উপর সেই লাল ফুল বর্ষার ঘনমেঘাবৃত বিষন্ন আকাশে একবিন্দু উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণের মত বোধ হইতেছিল।

সে ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য ফিরিল; কিন্তু পার্শ্বদেশে হঠাৎ সূচীবেধের মত বেদনায় তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে টলিতে টলিতে গিয়া খাটের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে ছিল না যে, গত সপ্তাহের উদ্বেগ ও উত্তেজনা তাহাকে দীর্ঘকালের রোগীর মতই দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

একটু সামলাইয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইল।

নীচের কথার শব্দ এখন যেন আগেকার চেয়ে কাছে বলিয়া মনে হইতেছিল। বোধ হয়, কেহ একটা দ্বার খুলিয়া দিয়া থাকিবে। কথা বোঝা যাইতেছিল না—কিন্তু কথার স্বরে সে বুঝিতে পারিল, তিনি কথা কহিতেছেন এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র যে তাহার গণ্ডদেশ ও কর্ণমূলে আরও বেগে রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা বুঝিতেও তাহার কষ্ট হইল না।

"বিষাদের পর হর্ষ…হর্ষের পর বিষাদ।" কথাটা তাহার মাথার ভিতর নাচিয়া বেড়াইতেছিল। সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল।

তিনি কাহার সহিত কি বিষয় লইয়া কথা কহিতেছেন?—হঠাৎ কথার ভিতর নিজের নাম শুনিয়া সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

কে বলিল—বোধ হয়, মিষ্টার রেণল্‌ডের কোন বন্ধু—"অ্যাঁ, এই বাড়ীতে! বল কি! তোমার মতলবখানা কি বল দেখি?"

সে একটা মৃদু হাসির শব্দ শুনিতে পাইল—তাঁহার হাসি। তিনি বলিলেন—"তোমার ভয় নেই, সে এখানে থাকবার জন্যে আসে নি। জুরীরা যখন রায় দিতে এলো, সেই সময় সে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে' যায়। একজন লোকও তা'র সাহায্যের জন্য অগ্রসর হ'ল না। অবশ্য রক্ষীরা এসেছিল, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের ভেতর কাউকে দেখ্‌লুম না। অথচ এর সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন এর আর যা-ই অভাব থাক্, বন্ধুর অভাব ছিল, এমন কথা বল্‌তে পারি না।"

"কাজেই তোমাকে প্রিয় বন্ধুর কাজ কর্‌তে হ'ল!"

"কি ক'রব বল? তুমি যদি সে সময় উপস্থিত থাক্‌তে, তা'হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তে। তা'কে তখন ঠিক মড়ার মত দেখাচ্ছিল। তা' ছাড়া"—

মিঃ রেণল্‌ড একটু লজ্জার হাসি হাসিলেন। কথাটা আর শেষ হইল না।

"বল কি হে! তুমি অবশ্য বল্‌তে চাও না যে"—

"আমি ঠিক তা'ই বল্‌তে চাই।" বালিকার সারা শরীরটার ভিতর দিয়া একটা আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। তাহা হইলে সে ভুল বুঝে নাই! তিনিও তাহাকে ভাল বাসেন! সে দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া দ্বারে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে পড়িল—"বিষাদের পর হর্ষ…হর্ষের পর বিষাদ……।" এত সুখ তাহার সহ্য হইবে ত! তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল। আবার কথা আরম্ভ হইল। বন্ধুর কণ্ঠস্বর। সে শুনিতে লাগিল।

"তা' বেশ! মন্দ কি? তবে কি জান—সমাজ একে কি রকম চোখে দেখ্‌চে তা' বুঝতেই পাচ্চ? - নতুন উকীল, ক্রমশঃ পশার হচ্চে—বিবাহ কল্লে হত্যাপরাধা অভিযুক্ত বালিকাকে! নাম-যশ, পসার-প্রতিপত্তি সব একসঙ্গে খতম! তবে' রোম্যান্স্‌টা হ'বে মন্দ নয়।"

"ধীরে! বন্ধুবর, ধীরে! এর ভেতর বিবাহের কথা এল কোথা থেকে বল দেখি? আমার কথায় কি বিবাহ ছাড়া আর কোন'রকম কিছু মনে হ'তে পারে না? আমি বল্‌তে চাই যে, এর কেস্‌টা আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছে। আমি জান্‌তে চাই যে, সে সত্যি সত্যি খুন করেছে কি না। তা'র জন্যে আমাকে যে উপায় অবলম্বন কর্‌তে হয় তাই কর্‌ব—তা' সৎই হোক্ আর অসৎই হোক্।"

"তুমি তা'র উকীল, তুমি জান না, সে সত্যি খুন করেছে কি না?"

"আমি অবশ্য মনে মনে জানি যে সে-ই একাজ করেছে—কিন্তু সেটা আমি তা'র নিজের মুখে শুনি নি। সে বরাবরই বলে

এসেছে, সে নির্দ্দোষ। কথাটা আমি তা'র নিজের মুখ থেকে শুন্‌তে চাই।"

"তা'র উকীলকে যদি না সে বিশ্বাস করে বলে থাকে, তা'হ'লে আর কা'কে বল্‌বে আশা কর্‌তে পার?"

"বল্‌বে, একজনকে বল্‌বে—সে যাকে ভালবাস্‌বে তাকে বল্‌বে। আমি সেই 'একজন' হ'তে চাই।"

বন্ধুবর "অসৎ উপায়"-সম্বন্ধে কি-একটা বলিলেন, তাহা ভাল বোঝা গেল না।

বালিকার বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলে তিনি বিশ্বাস করেন না! এই কিছুক্ষণ আগেকার কথা মনে করিয়া তাহার লজ্জায় মাটীতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। সে নিজের হাতদু'টী দেখিল। এই কোমল, সুকুমার ক্ষুদ্র হাতদু'টী দিয়া সে তাহার ভাইকে হত্যা করিয়াছে—এই তাঁহার বিশ্বাস!

"হর্ষের পর বিষাদ………বিষাদের পর হর্ষ……।" তাহার মনে হইতেছিল, সে এখনই পড়িয়া যাইবে।

সহসা তাহার ভিতরে সে একটা জোর পাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া সে অকুণ্ঠিত মর্য্যাদার সহিত দৃঢ়পদক্ষেপে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তা'র পাংশুবর্ণ মুখমণ্ডলে রক্তের আভাসমাত্র ছিল না এবং তাহার কাল পোষাকের উপর লাল গোলাপ-ফুলটী বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্ত-বিন্দু বলিয়া মনে হইতেছিল। বালিকা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র মিঃ রেণল্‌ড এবং তাঁহার বন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমি আমার ভাইকে খুন করি নি।" বালিকার কণ্ঠস্বরে আবেগের চিহ্নমাত্র ছিল না। সে স্বর—ধীর, শান্ত, সংযত, অকম্পিত।

"ভগবানের সম্মুখে বল্‌ছি, আমি এ কাজ করি নি। যা'কে ভালবাসি, তা'র সাম্‌নেও বলছি, আমি এ কাজ করি নি।"

তাহার দেহ সহসা আন্দোলিত হইল। সেই মরণাহত বালিকা মুখের উপর ভর দিয়া তাহার প্রণয়-পাত্রের পদতলে পতিত হইল।

গোলাপ-ফুলের পাপড়িগুলি তাহার বুকের উপর হইতে ঝরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

শ্রীমৃণালমালা দেবী

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(ক)

১

ক্ষতিপূরণ

যে বিপুল সমর-তরঙ্গে এখন সমগ্র ধরণী কম্পিত হইতেছে, তাহাতে যুদ্ধের চিন্তাই একটী প্রধান চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এখন মানস-নয়নে দেখিতেছি, যে গ্রামের পর গ্রাম বিলুণ্ঠিত হৃতসর্ব্বস্ব দগ্ধশ্রী শ্মশানতুল্য হইতেছে। ক্ষেত্রের পর কর্ষিত ক্ষেত্র সেনা-পদভরে গোলা-গুলির আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হইতেছে—চূর্ণীকৃত শস্যরাশি পবন-সঞ্চালনে উড়িয়া যাইতেছে—অপক্ক শস্য নিষ্পিষ্ট হইয়া কৃষকের সকল আশা-ভরসার বিনাশ-সাধন করিতেছে। কে আর তাহাদিগের শস্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিবে—কে-ই বা তাহার শ্মশানে আবার কুসুমরাশি ফুটাইয়া তুলিবে! যুদ্ধকালে এরূপ দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। আজ সুধু য়ুরোপেরই যে এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা নহে। সকল দেশে, সকল কালে ইহাই ধ্বংস-নীতির রক্তরঞ্জিত লেখা। সে লেখা যুগ-যুগান্তরেও বিলুপ্ত হয় কি না সন্দেহ।

বাদশাহ আক্‌বর ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাই যখনই তিনি সানুচর একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতেন, তখনই বিশ্বস্ত রাজ-অমাত্যগণ বাদশাহ-পরিত্যক্ত স্থান বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। কোথাও কাহারও বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইয়া থাকিলেও রাজকোষ হইতে অর্থ দিয়া বাদশাহ অবিলম্বে প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতেন। হয় ত বা রাজস্ব আদায়ের সময়েও এই সকল বিশেষরূপে বিবেচিত হইত। এ ব্যবস্থা যুদ্ধকালে ছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। ইহা শান্তির কথা—শান্তির সময়েই সুধু বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জানা যায়।

[তবাকৎ-ই-আক্‌বরি]

২

খেয়াল

শুনিতে পাওয়া যায় (তবাকৎ-ই-আক্‌বরি) যে, বাদশাহ আক্‌বর একদিন দেখিলেন, তাঁহার একটী প্রজার কর্ণ নাই, কর্ণ-গহ্বরের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই, অথচ সে বেশ শুনিতে পায়। বাদশাহ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং রাজকোষ হইতে তাহার বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি আদেশ দিলেন—কতকগুলি দুগ্ধপোষ্য শিশু আনিয়া মনুষ্যাবাস হইতে বহুদূরে নির্জ্জন গৃহে রক্ষা কর; সুশিক্ষিতা ধাত্রী তাহাদিগের লালন-পালন-ভার গ্রহণ করুক্; কিন্তু কেহই শিশুদের নিকট বাক্যালাপ করিতে পারিবে না—তাহাদিগকে কথা কহিতে শিক্ষা দিবে না।

আদেশমাত্রেই বিংশতি সুস্থ ও সবল শিশু ক্রীত হইয়া আসিল। ধাত্রীগণ তাহাদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করিল। শিশুগণ যে গৃহে রক্ষিত হইল, লোকে তাহার নামকরণ করিল "মূক-মন্দির।"

বাদশাহ কহিলেন, লোকে বলে যে, মানুষ নাম গ্রহণ করিবামাত্রই কোন-না-কোন ধর্ম্মের দিকে তাহার একটু টান হয়। দেখা যাউক, "মূক-মন্দিরে"র শিশুগণ ইহার কি প্রমাণ দেয়।

তিন-চারি বৎসর পরে দেখা গেল, শিশুগুলি সকলেই মূক্ হইয়াছে—কেহ বা মরিয়া গিয়াছে।

[তারিখ-ই-বদাউনি]

৩

অসভ্য সেকাল ও সুসভ্য একাল

একাল নাকি কার্য্য-বিষয়ে সুসভ্য—আর সেকালের যাহা কিছু, সবই না হউক, তাহাদের অনেকই নাকি ছিল বর্ব্বরতা! একদল জর্ম্মাণ-সেনা যে গ্রামের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছে, সে গ্রামের শিশু, বৃদ্ধ, রমণী পর্য্যন্ত নিস্তার পাইতেছে না। এ-বিষয়ে যে অনুসন্ধান-'কমিটি' গঠিত হইয়াছে, তাহার মন্তব্য হইতেই সুসভ্য জর্ম্মাণের অসভ্য বর্ব্বরতার পরিচয়ই অত্যন্ত অধিক পাওয়া যাইতেছে। তবুও একাল সুসভ্য ও সুমার্জ্জিত!

সেকালে বাদশাহ আক্‌বর ছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন যে,

বিজেতা যেন বিজিতের পুত্র-পরিবারাদির উপর কোনরূপ অত্যাচার না করে। স্বামী, পিতা, ভ্রাতা সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে বলিয়া কি তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদিগকেও অপরাধী করিতে হইবে? উদ্ধতের দমন রাজার যেমন অবশ্যকর্তব্য, নিরপরাধে নিপীড়ন তেমনই একান্ত পরিত্যাজ্য। তবুও নাকি দেশের সেকাল অনেকাংশে অসভ্য ও অমার্জ্জিত ছিল!

[আকবর নামা]

॥

স্বর্ণ-বৃষ্টি

একালে যুদ্ধে সমানভাবেই অগ্নিময় গোলকের বৃষ্টি হয়। আজকাল অগ্নিবৃষ্টিও যুরোপে হইতেছে, গগনের খেলও পবন চালিত হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। এই বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যয় কত, তাহা আমাদের কল্পনা করিবারও সাধ্য নাই। একালে যুরোপে নরহত্যার জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইতেছে, সেকালে এদেশের যুদ্ধে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় নাই। কিন্তু সেকালের মহম্মদ আল্লাউদ্দীন কৌশলে যমুনা-বক্ষে খুল্লতাতকে নিহত করিয়া (খৃঃ পূঃ ১২৯৬) যখন দিল্লীর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। আল্লাউদ্দীন দুর্গে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে সকল গোলা একালের মত অপেক্ষাকৃত হীন ধাতুতে প্রস্তুত ছিল না—সেগুলি ছিল সত্য সত্য স্বর্ণ মোহর। কামানের মুখে স্বর্ণ মুদ্রা বর্ষিত হইতেছে দেখিয়া দুর্গরক্ষিগণ দ্বার ছাড়িয়া দিল। আল্লাউদ্দীন জয়-গর্ব্বে দিল্লীর সুলতানরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিহত খুল্লতাত জালাল ফিরোজের পুত্রদ্বয়কে মুলতান হইতে আনাইয়া অন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার সিংহাসন কণ্টকমুক্ত হইল। [তজিয়ৎ-উল্-অমসার]

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

সাহিত্য-সংবাদ

তর্কে যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, বাস্তব জগতে যে তাহা সব সময়ে Fact, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। আমেরিকার বিখ্যাত লেখক হোমসের 'Table Talk' নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে একটি মজার কথা আছে। তিনি বলেন, মনে কর, একখানি গাড়ীকে এমনভাবে নির্ম্মাণ করা গেল যে, তাহার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত অংশগুলি একইভাবে নির্ম্মিত; প্রত্যেক অংশ তুল্যরূপে ভার-বহনোপযোগী ও তুল্যরূপে ভঙ্গপ্রবণ। তাহার উপর যদি গাড়ীখানির নির্ম্মাণ কৌশল এমন হয় যে, তাহার প্রত্যেক অংশে একই কালে সমান ভার পড়ে, তাহা হইলে ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পর্ব্বত-পথে চালিত শকটখানি কোন কারণে ভগ্ন হইলে, তাহার প্রত্যেক অংশ একই সময়ে চূর্ণীকৃত হইয়া যাইবে। কোন অংশই অন্য অংশকে ছাড়িবে না। তর্কেতে একথা বেশ শুনায়, কিন্তু বাস্তব জগতে একপ ঘটনা ঘটিতে পারে না।

Landor বলেন, প্রশংসা ও সম্মান ভাল জিনিস, সন্দেহ নাই; কিন্তু অতিরিক্ত প্রশংসায় অনেক লেখকের সমূহ ক্ষতি করা হইয়াছে। উপযুক্ত প্রশংসার সহিত মৃদু ভর্ৎসনা সব সময়েই বাঞ্ছনীয়। শ্রেষ্ঠ লেখকের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাইবে; কিন্তু কখন' তাহাকে অন্ধভাবে পূজা করিও না। পূজার উপচার পুষ্প ধূনা ক্ষণিক সুগন্ধ বিতরণ করে সত্য, কিন্তু তাহারা আবার অতি শীঘ্রই পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তিনি আরও বলেন, কোন গ্রন্থের যথাযথ আলোচনা যিনি প্রথমে করিয়া থাকেন, সেই গ্রন্থকারের পরেই সমালোচকের আসন নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত।

ডাউডেন বলেন, সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকই 'আর্টে'র পক্ষপাতী। 'আর্ট' ব্যাপারটাকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা যায় না; কিন্তু তথাপি জগতের লেখকগণ দুইটি বিভিন্ন উপায়ে ইহাকে আয়ত্ত করিতে চান। একদল, আপনাদিগের সমস্ত অনুভূতি ও সত্তা ইহার মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া ফেলেন; আর একদল, ইহাকে আপনার আয়ত্তে আনিয়া থাকেন, কিন্তু কখন', ইহার আয়ত্তাধীন হন না। প্রথম দলের উদাহরণস্বরূপে ইংরাজ-কবি কীট্স্ ও শেলীর নাম করিতে পারা যায়; আর দ্বিতীয় দলের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সেক্সপিয়র 'আর্টে'র দ্বারা অভিভূত না হইয়া, তাহাকে আয়ত্ত করাকেই তিনি শ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করেন।

ইংরাজী 'ট্রাজিডি'র সম্বন্ধে Addison বলেন—অনেকের বিশ্বাস, পাপের পরাজয় ও ধর্ম্মের জয় দেখাইবার জন্যই ট্রাজিডির উৎপত্তি। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা নাটকের শেষে এমন একটি অঙ্ক জুড়িয়া দেন, যাহাতে নিগৃহীত সাধু ব্যক্তি সমস্ত দুঃখের হস্ত হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া অতুল সুখের অধিকারী হন; কিন্তু আসলে এই অঙ্কটির সহিত সমগ্র নাটকের কোন যোগ থাকে না। বাস্তব জগতে যখন আমরা সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় দেখিতে পাই না, তখন এরূপ করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই জন্যই গ্রীসের 'ট্রাজিডির' আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রীসীয় নাট্যকার ঘটনানুসারে কখন বা পাপের পরাজয় ও কখন বা ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়াছেন। স্বাভাবিক ঘটনাস্রোতে নাটকের যেখানে পরিণতি হওয়া সম্ভবপর, সেইখানেই ইহাকে শেষ হইতে দেওয়া উচিত। নতুবা নাটকের অনেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায়।

সার উইলিয়ম জোন্স বলেন, এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের সম্পূর্ণতার একটি ক্ষুদ্রতম চিহ্ন; আমাদের এই পৃথিবী তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্যময় উপবনের অস্ফুট গোলাপ, সূর্য্য তাঁহার অনন্ত জ্ঞানালোকের একটি ক্ষুদ্র রশ্মি; আর আকাশ তাঁহার অনন্ত ক্ষমতার একটি বুদ্বুদ মাত্র। আমাদের দেশের কবিরাও এই জগতের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়াছে এবং সেই সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিবার জন্য রমণীকেই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইহাকে অনেকে অতি-রসবর্ণিত কুৎসিত ব্যাপার মনে করেন; কিন্তু সমস্ত 'আর্টে'র মধ্যেই একটা বড় 'আইডিয়া'র প্রয়োজন আছে। শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের অবলম্বন, রমণীকে 'আইডিয়া' করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিগণের সৌন্দর্য্য বর্ণনার মধ্যে 'আর্ট' সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিয়াছে। নিম্নে বিদ্যাপতির একটি পদাবলী উদ্ধৃত করিলাম:—

"চাঁদ সার লয় মুখ ঘটনা করু লোচন চকিত চকোরে।
অমিয় ধোএ আঁচরে ধনি পোছল দহ দিশ ভেল উজোরে॥ ২
কামিনি কোনে গঢ়লী। রূপ সরূপ মোহি কহইতে অসম্ভব
লোচন লাগি রহলী॥ ॥
গুরু নিতম্বভরে চলএ ন পারএ মাঝ খীনিম নিমাই।
ভাঁগি জাইত মনসিজে ধরি রাখলি ত্রিবলি লতা অরুঝাই॥ ৬
ভনই বিদ্যাপতি অদভূত কৌতুক ই সব বচন সরূপে।
রূপনারায়ণ ই রস জানথি সিবসিংহ মিথিলা ভূপে॥ ৮

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ১৩ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা

স্নেহলতা

(গান)

তোমার দেওয়া চিত্রে অতুল পুতুল কোথায় ফেলেছি।
মনে পড়ে তোমার ঘরে তোমার সাথেই খেলেছি।
আলোর মালা উষার গাঁথা, সাঁঝের রঙ্গিন্ ছবির খাতা
চন্দ্রে তারায় জড়িয়ে বেঁধে কোন্ আঁধারে ঠেলেছি?

বুঝি আছে তোমার কাছেই, তোমার সাথেই খেলেছি।
ভাঙ্গা প্রাচীন যদি ঢাক, নূতন দিয়ে সাজিয়ে রাখ,
খেলার ঘরে আসবে আবার ঐ যে আঁখি মেলেছি।
চিরদিন যে তোমায় নিয়ে তোমার সাথেই খেলেছি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পাল-রাজগণের অধঃপতনের বিষয়ে এ যাবৎ চারিটী বক্তৃতা করিয়াছেন। পূর্ব্ব-সংখ্যায় আমরা তাঁহার প্রথম বক্তৃতার সারাংশ প্রদান করিয়াছি। নিম্নে তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতার সার সঙ্কলিত হইল।

দ্বিতীয় বক্তৃতা—পাল রাজগণ কোন্ জাতীয় ছিলেন, ইহা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে। রাম চরিতে পাল-রাজগণ সমুদ্রবংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামপাল দেবের পুত্র কুমারপাল দেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পাল-রাজগণ সূর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দুই বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যবিধান করিতে না পারিয়া, তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাসে" নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

"বৈদ্যদেবের প্রশস্তি-কার বোধ হয়, পাল-রাজগণের পূর্ব্ব-পরিচয় সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন না এবং হয় ত পাল-রাজগণের সমুদ্রকুলে উৎপত্তির কথা কখনও তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। সন্ধ্যাকর নন্দী, গৌড়বাসী এবং পাল-রাজগণের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পুত্র; সুতরাং পাল-রাজবংশের প্রকৃত পরিচয় তাঁহারই জানা সম্ভব। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পাল রাজগণের সূর্য্যবংশে উৎপত্তির বিবরণ নিঃসন্দেহ বৈদ্যদেবের প্রশস্তি-রচয়িতা মনোরথের অজ্ঞতার ফল।" (বাঙ্গালার ইতিহাস ১৬৬ পৃঃ ।)

পাল রাজগণের মন্ত্রী ও সেনাপতি বৈদ্যদেব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ পাল রাজগণের বংশ পরিচয় সম্যক অবগত ছিলেন না, ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কুমারপাল ও মদনপাল দুই ভ্রাতা। রাম চরিত মদনপালের রাজত্বকালে লিখিত হয় এবং বৈদ্যদেবের প্রশস্তি কুমারপালের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ হয়; সুতরাং রাম চরিতের লেখক ও বৈদ্যদেবের প্রশস্তি কার প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি, এরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পাল-রাজগণের সহিত সংসৃষ্ট সমসাময়িক দুই ব্যক্তি পাল রাজগণের বংশ সম্বন্ধে বিপরীত মত অবলম্বন করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ এই দুইটী মত যে পরস্পর-বিরুদ্ধ নহে, রাম-চরিত-গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ আছে। বৈদ্যদেবের প্রশস্তিতে পাল-রাজগণের সূর্য্যবংশে উৎপত্তি, এইরূপ পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। 'সূর্য্যবংশে উৎপত্তি' ইহার অর্থ এই যে, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। রাম-চরিতেও একথা স্পষ্ট লিখিত

আছে যে, পাল-রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। এই কাব্যের প্রথম অধ্যায়ের সপ্তদশ শ্লোকে আছে—

"বদন গত ভারতীকঃ কমলাসনতাং দধৎ প্রজানাথঃ।
বিধিরিব ধাতা জগতো যঃ শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ॥"

এই শ্লোকের নিম্নলিখিতরূপ টীকা দেখিতে পাওয়া যায়—"বদন ইত্যাদি। কমলায়াঃ শ্রিয় আসনমাশ্রয্য শ্রীপতিঃ পার্থিবো যো নাভিঃ ক্ষত্রিয়স্তস্মাৎ সম্ভূতঃ বিধিরিবেতি শ্লেষোপমা। অত্র শ্রীপতের্ব্বাসুদেবস্য নাভিতোঽবয়বাদ্ভূতঃ। শেষং সুগমং। উভয়ত্রাপি সমং।"

এই শ্লোকে রামচন্দ্র ও রামপাল এই উভয়কেই ব্রহ্মার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। "বদন গত ভারতীকঃ," "কমলাসনতাং দধৎ," "প্রজানাথঃ," "জগতো ধাতা," "শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ" প্রভৃতি বিশেষণ রামচন্দ্র, রামপাল ও ব্রহ্মা, এই কয় পক্ষেই প্রযোজ্য। টীকাকার এই বিশেষণগুলির দুই পক্ষেরই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "উভয়ত্রাপি সমং" এই দুইটী কথাদ্বারা টীকাকার স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, রামচন্দ্র ও রামপাল এই উভয়ের পক্ষেই বিশেষণগুলি তুল্য-অর্থবাচক। রামচন্দ্র ও রামপালের একটি বিশেষণ আছে—"শ্রীপতিনাভিসম্ভূতঃ"—টীকাকার নিজেই ইহার অর্থ করিয়াছেন, "শ্রীপতিঃ পার্থিবো যো নাভিঃ ক্ষত্রিয়স্তস্মাৎ সম্ভূতঃ" অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-রাজ হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং রামচন্দ্র ও রামপাল উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহাই টীকাকার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাল-রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। রাম-চরিতকার ও বৈদ্যদেবের প্রশস্তিকার উভয়েই এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই এবং থাকিতেও পারে না; কারণ, উভয়েই প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তি। ইঁহাদের উভয়ের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া, অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত পাল-রাজগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পাল-রাজগণের বংশাবলী-সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। প্রচলিত মতানুসারে রাজা বিগ্রহপাল (১ম), ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র; সুতরাং প্রথম তিনজন ব্যতীত সমস্ত পাল-রাজগণই বাক্‌পালের বংশসম্ভূত। এই মতটি সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার নবপ্রকাশিত "বাঙ্গালার ইতিহাসে" এই মতটি গ্রহণ করিয়াছেন (১৭৭পৃঃ)।

পাল-রাজগণের কয়েকখানি তাম্রশাসনে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মপালের গুণ-বর্ণনার পরে বাক্‌পাল নামক তাঁহার অনুজের বীরত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার পরই লিখিত হইয়াছে—

"তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য সুখান্যনৈষীৎ॥"

এখানে 'তস্মাৎ' শব্দ বাক্‌পালকে নির্দ্দেশ করিতেছে, ইহাই পণ্ডিতগণের মত; কারণ, ইহার পূর্ব্বের শ্লোকে বাক্‌পালের বিষয় কথিত হইয়াছে। এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা দেবপাল ও জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে দেবপাল দেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে জানা গেল যে, দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল, বাক্‌পাল নহে; সুতরাং এই আবিষ্কারের পরে উদ্ধৃত শ্লোকের 'তস্মাৎ' শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ধর্ম্মপালকে নির্দ্দেশ করিতেছে, এই অনুমান করিয়া দেবপাল ও জয়পাল উভয়কেই ধর্ম্মপালের পুত্ররূপে গ্রহণ করা সঙ্গত; কিন্তু এই মত সর্ব্বসাধারণকর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। অধিকাংশ পণ্ডিতগণই দেবপালকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলেও, জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকের 'তস্মাৎ' শব্দ। পণ্ডিতগণের মতে এই 'তস্মাৎ' শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্‌পালেরই নির্দ্দেশক। যদি তাহাই হয়, তবে দেবপালকেও বাক্‌পালের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়; কারণ, দেবপালকে জয়পালের পূর্ব্বজ বলা হইয়াছে এবং এই দুই ভ্রাতাকে ইন্দ্র, উপেন্দ্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইন্দ্র, উপেন্দ্র সহোদর ভ্রাতা ছিলেন; সুতরাং দেবপাল ও জয়পালও সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, শ্লোকের ইহাই স্পষ্ট ইঙ্গিতার্থ; কিন্তু দেবপাল যে বাক্‌পালের পুত্র ছিলেন না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে; ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় "তস্মাৎ" শব্দকে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্‌পালের নির্দ্দেশকস্বরূপ ধরিয়া লইয়া ধর্ম্মপালের সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত; কারণ, "তৎ" শব্দ যে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্যকে নির্দ্দেশ না করিয়া দূরবর্ত্তী বিশেষ্যকে নির্দ্দেশ করিতে পারে, দায়ভাগের অনেকস্থলে "তৎ"শব্দের ব্যবহারদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

রাম-চরিতের উক্তিদ্বারা আমার এই মত সমর্থিত হয়। রাম-চরিতে পাল-রাজগণ ধর্ম্মপালের বংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে "তৎকুলদীপো নৃপতিরভূৎ ধর্ম্মো……" ইত্যাদি বাক্যে, টীকাকার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই ধর্ম্ম ধর্ম্মপাল—"ধর্ম্মঃ ধর্ম্ম নামা ধর্ম্মপাল" ইতি যাবৎ। পঞ্চম শ্লোকে এই ধর্ম্মপালের গুণ-বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পরেই ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"বংশে তস্য বভূবুর্ভর্ত্তুর্ভুবনস্য ভূপতয়ঃ।"

এখানে 'বংশে তস্য' এই দুই শব্দে 'ধর্ম্মপালের বংশ' ব্যতীত আর কোন অর্থই সূচিত হইতে পারে না; কারণ, ইহার পূর্ব্বে আর কোন পাল-রাজার নাম উল্লিখিত হয় নাই; সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দীর মতানুসারে পাল-রাজগণ ধর্ম্মপালেরই বংশোদ্ভূত। প্রচলিত মতানুসারে বিগ্রহপাল প্রভৃতিকে যে বাক্‌পালের বংশরূপে গণ্য করা হয়, তাহা রাম-চরিতের স্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধ; সুতরাং সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; কারণ, ইহা কখনই সম্ভব নহে যে, রাম-চরিতের গ্রন্থকার পাল-রাজগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয়-বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন—"দেবপাল দেবের খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল, তাঁহার পিতা বাক্‌পাল দেবের শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহাদান উমাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উমাপতির উত্তরপুরুষ নারায়ণ, তদ্-রচিত "ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশ" নামক গ্রন্থে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।" প্রমাণস্বরূপ পাদটীকায় "ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশ" গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তস্মাদ্ভূষিত সাব্ধি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈর্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকর গ্রামনীঃ
ক্ষ্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহাদানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্।"

(বাঙ্গালার ইতিহাস, ১৮৫ পৃঃ)।

এই শ্লোকে দেবপাল ও জয়পাল দেবের সম্বন্ধ-বিষয়ে কোন কথাই বলা হয় নাই। যে জয়পালের নিকট হইতে উমাপতি মহাদান পাইয়াছিলেন, তিনি পালবংশীয় জয়পাল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়; কারণ, জয়পাল উক্ত শ্লোকে ক্ষ্মাপাল বা ভূপতিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু পালবংশীয় জয়পাল কখনও রাজত্বপদ লাভ করেন নাই। রাখালবাবু 'মহাশ্রাদ্ধং মহাদানং' এই পদের অর্থ করিয়াছেন—শ্রাদ্ধকালে প্রদত্ত মহাদান; কিন্তু 'মহাশ্রাদ্ধং' শব্দের অর্থ—শ্রদ্ধার সহিত দত্ত; ইহার সহিত শ্রাদ্ধ-প্রক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নাই। রাখালবাবু যে অর্থ ধরিয়াছেন (অর্থাৎ মহাশ্রাদ্ধের সময় দত্ত), তাহাতে পাণিনির সূত্রানুসারে পদটি 'মহাশ্রাদ্ধীয়' হইত, 'মহাশ্রাদ্ধং' নহে। আর মহাশ্রাদ্ধে মহাদান দেওয়া হইত কি না, সন্দেহের বিষয়; সুতরাং রাখালবাবু "ছন্দোগ-পরিশিষ্ট-প্রকাশে"র শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক এবং যে কথাটি তিনি ইহাদ্বারা প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই।

বরেন্দ্রে এখনও পাল-রাজগণের স্মৃতি বিদ্যমান। তাহার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়াই অদ্য প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "পাহাড়পুর" নামক স্থানে একটি উচ্চ মাটির ঢিপি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা এখনও উহাকে গোপালদেবের চিতা বলে। ইহা একটি স্তূপের ভগ্নাবশেষ। ইহা খনন করিলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কোন মহাত্মা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির হস্তে দশ সহস্র টাকা দিয়াছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি ইহা খনন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

একবার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে একটি মেলা বসিয়াছে দেখিতে পাইয়া, আমরা উহার তথ্য-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। স্থানীয় নিরক্ষর লোকেরা বলিল যে, পুরাকালে ঐ স্থানে দেবপাল নামে একজন রাজা ছিলেন; তাঁহারই স্মৃতির জন্য প্রতিবৎসর ঐ সময়ে ঐ গ্রামে একটি করিয়া মেলা বসে। পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরে দেবপালের কন্যার পূজা হয়। পূজারী-ঠাকুর বলিল, সে বিশেষ কিছুই জানে না, তবে পুরুষানুক্রমে তাহার বংশের লোকেরা ঐ পূজা করিয়া আসিতেছে। সহস্রাধিক বর্ষ পরেও পাল-রাজগণের স্মৃতি-চিহ্ন বরেন্দ্রভূমি হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। উপরোক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় তাহারই নিদর্শন।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

বেসুর বীণ্

আজ্‌কে তোমার আসরে মোর
আসন অনেক দূর,
সেথায় বাজে সারং, বীণার
হাজার রকম সুর।

কত মধুর রাগ-রাগিণী,—
ভৈরবী, মল্লার;
ভৈঁরো, বিভাস, গৌরী, বেহাগ,
বাগেশ্রী, বাহার!

নাইক তালের সীমানা তায়—
খেম্‌টা, কাফি, যৎ;
মাঝে মাঝে বাজ্‌ছে আবার
নূতন কত গৎ।

আমার বীণার কসুর নানা,—
বাজে না তায় সুর;
আজকে তোমার আসরে তাই—
আসন আমার দূর।

সবার পিছে দাঁড়িয়ে আছি—
করুণ-কাতর প্রাণ,
বেসুর বীণায় কবে আমার
উঠ্‌বে দুলে' তান!

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

নিয়তি

সে নির্ভীক, তেজস্বী; কর্ম্মে তাহার অসাধারণ নৈপুণ্য; সে বোঝে না, করিতে পারে না, এমন কাজ নাই বলিলেও চলে।

একদিন সে তা'র বন্ধুগণের নিকট সদর্পে হাতে চাপড় মারিয়া বলিয়া ফেলিল, "চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাহি ত্রিভুবনে।"

একজন বন্ধু অবজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিল, "পাগল, সব কাজ কি চেষ্টা করিয়াও সম্পন্ন করা যায়? স্বর্গের সিঁড়ি তৈয়ারি করিতে পার?"

সে বলিল, "কেন পারিব না?"

"তবে কর" বলিয়া বন্ধুবর্গ হাসিয়া উঠিল।

এ গল্পটা কত দিনের, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে বোধ হয়, সৃষ্টির আরম্ভ হইতেই মানুষের প্রাণে প্রাণে ইহা অনুস্যূত হইয়াছে।

তা'রপর "শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিব" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে সে একটা বিশাল তরু-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইল।

কি কাজ করিতে আরম্ভ করিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সে একটি ঝরণার পার্শ্বে একটা বৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল।

সে দেখিল—একটি গর্ত্তের মধ্য হইতে কতকগুলি পিপীলিকা দল বাঁধিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া যাইতেছে। সে বলিল, "তোমরা কোথায় যাইবে?"

দলপতি মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, বলিল, "এই পর্ব্বতের উপর।"

সে হাসিয়া বলিল, "পারিবে? সে কি সম্ভব? পথেই যে মরিয়া যাইবে!"

দলপতি বলিল, "এখানে কতকগুলা কীট-পতঙ্গ আমাদের

বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। শুনিয়াছি, পাহাড়ের উপর একটা নিরাপদ স্থান আছে, আমরা সেখানে নিশ্চয়ই যাইব, না যাইলে আমাদের নিস্তার নাই।"

সে বলিল, "মরিয়া যাইবে যে!"

দলপতি বলিল, "মরিবার কথাটা ভাবিয়া লইয়াই আমরা অগ্রসর হইয়াছি।"

সে বসিয়া রহিল; পিপীলিকার দল আঁকিয়া-বাঁকিয়া একটি সরল কৃষ্ণরেখার মত অগ্রসর হইতে লগিল।

সে উঠিল; বলিল, "ইহারা নির্ব্বোধ জন্তু, কাণ্ডজ্ঞানবিহীন—এইজন্যই ভগবান্ সৃষ্টির মধ্যে ইহাদের নিম্নস্থান দিয়াছেন—আর শ্রেষ্ঠ আসন লইয়াছে মানুষ।"

* * * * *

একদিন সে পাহাড়ের উপর উঠিয়া দেখিল—পিপীলিকাদের দলপতি একখানি পাথরের উপর পরিক্রমণ করিতেছে।

সে বলিল, "তোমরা কয়জন উপরে আসিয়াছ?"

"সিকি ভাগ।"

"বাকী মরিয়াছে?"

"হাঁ।"

"আছ কেমন?

"যেমন ছিলাম।"

"তবে কষ্ট করিয়া এখানে আসিলে কেন?"

"প্রয়োজন ছিল।"

"তোমরা খুব শক্তিমান্" এই কথা বলিয়া সে চলিয়া গেল।

পরদিন চারিদিকে রটিয়া গেল—সে স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিবে।

কেমন করিয়া কাজটা আরম্ভ হইল, বলিতে পারিব না; কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল—পাহাড়ের উপরে পাথরের পর পাথর গাঁথিয়া সে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছে।

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ কাটিয়া গেল, সে উঠিল, আরও উঠিল, ক্লান্তি নাই, বিরাম নাই, একাগ্রচিত্তে সে কর্ম্মে তন্ময় হইয়া পড়িল।

সোপান ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর হইতে লাগিল, পাখীরা যেখানে আসিতে পারে না, সেখানে প্রস্তর-ভূমির উপরে তাহার দীর্ঘমূর্ত্তি ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইল। একদিন নীচুদিকে বিদ্যুতের দীপ্তি দেখিয়া বুঝিল, মেঘলোক ছাড়াইয়াও সে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

একদিন তাহার বোধ হইল, যেন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। সে আর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিল না। অঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া সে কাঁদিতে বসিল; বলিল, "হায়, এত সাধের কাজ আমি আর করিতে পারিলাম না!"

সহসা শূন্যে একটি রমণীর ছায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া আসিল।

সে বলিল, "তুমি কে?"

রমণী বলিল, "আমি **নিয়তি**।"

সে বলিল, "আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে, আমি যে আর উপরে উঠিতে পারি না, তুমি কোন একটা উপায় বলিয়া দিতে পার?"

"উপায় বলিয়া দিবার অধিকার আমার নাই।"

"তুমি কি করিতে চাও?"

"আমি বলিতে চাই, তুমি শীঘ্রই তিন শত হাত নীচে নামিয়া যাও; কেন না, তোমার এই সোপানের ঊর্দ্ধভাগ ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কাল সমগ্র সোপান ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে।"

"তবে কি আমার এত চেষ্টা বৃথা?"

"হাঁ।"

"কখনই নয়, আমি তোমার কথা শুনিব না—সোপান যদি ভাঙ্গিয়া যায়, আবার গড়িব।"

"কিন্তু যতদূর উঠিয়াছ, ইহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না।"

"কেন? এখনও আমার চেষ্টা আছে, উদ্যম আছে।"

"আর ঊর্দ্ধে উঠিলে বাঁচিবে না। সোপান নির্ম্মাণ করিয়াই বা কি লাভ?"

"লাভ নিশ্চয়ই আছে। তবে মরিয়া গেলে তাহাতে লাভ কি?"

"প্রয়োজনটা কি, শুনি।"

"আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা পালন করা উচিত। এই জন্যই সোপান-নির্ম্মাণে প্রয়োজন আছে।"

"সে প্রয়োজন অতি সামান্য, তাহার অনুরূপ চেষ্টার ফল লাভ করিয়াছ। যেদিন সে সোপান নির্ম্মাণ করিতে গিয়া মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিতে পারিবে, সেদিন আবার এই কাজে হাত দিও।"

"তবে কি মানুষের কোন শক্তি নাই, সবই তোমার শক্তি?"

"না—চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই ত্রিভুবনে—একথা আমি ত জানি; তবে স্বর্গের সোপানের জন্য মানুষ বিশেষ কোন অভাব অনুভব করে না—তা'ই তোমার চেষ্টাটা নিতান্ত অল্পই হইয়াছে। যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, যাহা না পাইলে জীবন দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে, তাহাতে বাধা দিবার শক্তি আমার নাই।"

সে নামিয়া আসিল। পরদিন সমগ্র সোপান ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গালা-সংবাদ-পত্রের এককাল

ছেলেবেলা দেখিয়াছি 'সোম-প্রকাশ'; কিন্তু সোমবারে বাহির হইত বলিয়া উহার ঐ নাম ছিল কিম্বা উহা সূর্য্যোদয় বুঝাইত, তাহা বড় বুঝিতাম না। যখন 'নববিভাকর' হইল, তখন বুঝিলাম যে, 'সোম-প্রকাশে'র শেষোক্ত অর্থই কর্ম্মকর্ত্তাদের অভিপ্রেত ছিল। 'সোমপ্রকাশে'র আসরেই 'নববিভাকরে'র পসার। যাহা হউক, সে সময় কেশব সেনের 'সুলভ সমাচার' ছেলে-মহলে এক পয়সায় অনেক সমাচার দিত। সুধু অল্পবয়স্ক লোকের নিকট কেন, কলিকাতায় যত হউক না হউক, পল্লীগ্রামে তাড়া তাড়া 'সুলভ সমাচার' বিক্রয় হইত; এজেণ্টগণ একপয়সা করিয়া তাহা বিক্রয় করিত। পল্লীবাসীরা রুষ-তুরস্কের যুদ্ধের সময় ইহা আগ্রহের সহিত পড়িত; সমর-সমাচারের একটা চিত্তরঞ্জিনী শক্তি আছে।

ইতোমধ্যেই চুঁচুড়া হইতে 'সাধারণী' বাহির হয়। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'বঙ্গদর্শনে'র লিখিয়ে ছিলেন। ওকালতী না করিয়া তিনি সাহিত্য-চর্চ্চাতেই জীবনযাপন করিতেছেন। তাঁহার "গোচারণের মাঠ" নামক একটি পুস্তিকাতে একটিও যুক্তাক্ষর ছিল না, অথচ তাহার জন্য ভাবের ও ভাষার কোনরূপ গোলযোগও হয় নাই। তাই ইহার সমালোচনায় বঙ্গদর্শন (তখন নির্ব্বাণোন্মুখ এবং 'বিশেষ দ্রষ্টব্যে' খুব তাগাদা চলিতেছিল) অর্থাৎ বঙ্কিমবাবু

বলিয়াছিলেন, "অক্ষয়, এ পুস্তক বাহির করিয়া তুমি দেখাইতে চাহিয়াছ যে, বঙ্গভাষা তোমার করায়ত্ত, তোমার সে অভিপ্রায় সফল হইয়াছে।" ঠিক এই কথাগুলি না হইতে পারে; কিন্তু প্রায় এইরকম সমালোচনা হইয়াছিল। দিন-কয়েক পরে রবীন্দ্রনাথের কি একখানা পুস্তক-সমালোচনায় 'সাধারণী' লিখিয়াছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন 'উদীয়মান' কবি, তাঁহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে জয়দেবের লালিত্য, শেলীর কবিত্ব বিরাজ করিতেছে। ছেলেরা ইহা পড়িয়া ভাবিয়াছিল যে, শেলী বোধ হয় সেফালিকার খর্ব্বাভিধান। সে সময়ের লেখা সুসংযত ছিল; বঙ্গভাষা সন্তর্পণে পা ফেলিতেছিলেন; আপনার কাপড়-চোপড় বাগাইয়া-গুছাইয়া বাঙ্গালী বধূর ন্যায় নতমুখে ধীরে ধীরে চলিতেছিলেন।

'সাধারণী'র দপ্তরে ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের হাতে-খড়ি। তিনি তখন যাহা লিখিতেন, তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্ব কিছুই থাকিত না; পরাধীনতার যাহা দোষ ও যাহা গুণ, তাহাই সে লেখায় বর্ত্তমান থাকিত। এক শুভ মুহূর্ত্তে তিনি 'সাধারণী'র সংস্রব ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সঙ্গে আনিলেন—উগ্রক্ষত্রিয় উপেন্দ্রনাথ সিংহ-রায়কে। দুইজনে মিলিয়া কাগজ বাহির করিবেন, সংকল্প করিলেন। নূতন ধরণের কাগজ—তাহাতে যেমন রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ থাকিবে, তেমনই আবার নানা বিষয়ের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধও থাকিবে—দাম হইবে দুই পয়সা। সে সময়ের ভাল ভাল বাঙ্গালা-লেখককে তাঁহার কাগজে লিখিবার জন্য অনুরোধ করাতে, অনেকেই লিখিতে স্বীকার করিলেন। তাঁহাদের নাম ছাপাইয়া বরাট-প্রেস হইতে হ্যাণ্ডবিল বাহির হইল; দেশে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। যথাসময়ে 'বঙ্গবাসী' বাহির হইল। স্বত্বাধিকারীযুগল কাগজ লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া গ্রাহক যুটাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক শিক্ষিত লোকই 'বঙ্গবাসী'র শুভাকাঙ্ক্ষী হইলেন। ক্রমে গ্রাহক বাড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকদের স্বাধীনতাও বাড়িয়া উঠিল। কি কথা কি ভাবে লিখিলে খরিদ্দার বাড়ে, তাহা তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলেন—কি শ্রেণীর লোক কাগজ কিনিতেছে, তাহারা কি চায়—তাহা সম্পাদকে ও ম্যানেজারে একত্র দেখিতে লাগিলেন। ফলে গ্রাহক-সংখ্যা আরও বাড়িয়া উঠিল। কোন কোন লেখক এই সময়ে 'বঙ্গবাসী'তে লেখা বন্ধ করিলেন। 'বঙ্গবাসী' টাকার প্রলোভন দেখাইলেন। ৺রজনীকান্ত গুপ্ত প্রত্যেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধের জন্য দশ টাকা করিয়া পাইতেন; কিন্তু টাকার প্রলোভনেও কোন কোন ব্রাহ্ম-লেখককে 'বঙ্গবাসী' আটকাইয়া রাখিতে পারিল না।

৺দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে "সঞ্জীবনী" বাহির হইল। তিনি এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও উমাপদ রায় ইহার স্বত্বাধিকারী হইলেন। ইঁহারা লিখিতেন। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্মও তখন ইহার লেখক।

'সঞ্জীবনী' বাহির হইবার পর হইতে ইহার সহিত 'বঙ্গবাসীর' বেশ লড়াই চলিতে লাগিল। বোধ হয় এই সময়ই 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক বুঝিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মদিগকে গালাগালি দিলে এবং ব্যক্তিগত কুৎসা ছাপিলে, সাধারণ লোকে বেশ উপভোগ করে। এই জ্ঞান তাঁহারা আপনাদের ব্যবসায়ে খাটাইতে লাগিলেন। বৰ্দ্ধমান হইতে 'পঞ্চানন্দ' আসিয়া বঙ্গবাসীর সহিত মিশিলেন। "মুক্ত বেণী যুক্ত হইল।" এই সময় হইতে প্রায়ই 'বঙ্গবাসী'তে হিন্দু-ধর্ম্মান্দোলন হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির অভ্যুদয় হইল। 'বঙ্গবাসী' বেশ চলিতে লাগিল। এ দেশে বাঙ্গালীরা আজ-কাল খবরের কাগজে যে এত বিজ্ঞাপন দেয়—ইহাও যোগেন্দ্র বাবু শিখাইয়াছেন।

ক্রমে উপেন্দ্র সিংহ-রায়ের সহিত 'বঙ্গবাসী'র সংস্রব ছিন্ন হইল; ওদিকে উমাপদ রায়ের সহিতও 'সঞ্জীবনী'র সম্পর্ক রহিত হইল।

'সঞ্জীবনী'র দেখাদেখি 'সময়', 'শক্তি' ও 'ভারতবাসী' বাহির হইল। হরিদাস গড়গড়ি 'ভারতবাসী'র সম্পাদক এবং এখনকার শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ তাঁহার সহকারী ছিলেন। 'বঙ্গবাসী'-আপিস হইতে 'দৈনিক' বাহির হইল। একমাত্র 'সময়' ছাড়া ইহারা সকলেই জল-বুদ্বুদের ন্যায় কালস্রোতে মিশিয়া গিয়াছে। আর একখানা উল্লেখযোগ্য কাগজ ছিল—'সহচর'। মানচিত্র ও ভূগোলের জন্য বিখ্যাত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রাণ ছিলেন। 'এডুকেশন-গেজেট' ত ছিলই—গভর্ণমেণ্ট হইতে বেশ টাকা পাইয়া—মাষ্টারি-খালির বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া চলিত—একরকম ভালই ছিল। 'সমাচার চন্দ্রিকা' জরাগ্রস্ত ও শেরিফের বিজ্ঞাপনে কোনপ্রকারে বাঁচিয়া ছিল।

'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী'র পরস্পর সংঘর্ষে অনেক মানহানির মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর লেখায় একটা শক্তি ছিল; ভাষায় তিনি যে একটা নূতন জীবন দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। 'সঞ্জীবনী'র মন-মজান ভাষা ছিল না; বোধ হয় এখনও নাই; তবে আন্তরিকতা ও সাধুতা সকল দোষকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। অনেক সময় কৃষ্ণকুমারবাবুকেই আগাগোড়া লিখিতে ও প্রুফ দেখিতে হইত; তাহাও আবার সিটি স্কুলের মাষ্টারি করিতে করিতে। মাঝে মাঝে অপরেও লিখিতেন—অনেক সময় যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, আজ-কালকার বাজারে তাহা কদাচিৎ দেখা যায়। অনেক সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থকরী শিল্পাদি-সংক্রান্ত যে সকল প্রবন্ধ 'সঞ্জীবনী'তে বাহির হইয়াছে (এখনকার লেখকদল যখন পাঠশালাতে), তাহাই আজ-কাল বিভিন্ন লেখকগণের কলম হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের নাম জাহির করিতেছে। বাঙ্গালী যে একটা জাতি—ইহারও যে জাতীয়ত্ব ছিল, ইতিহাস ছিল, ভারত-রাজনীতিতে সুনির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল—তাহা 'সঞ্জীবনী' ধারাবাহিকভাবে ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন—স্বদেশী দ্রব্য-ব্যবহার-সম্বন্ধে অনেক কথাই 'সঞ্জীবনী' বহুপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছিলেন। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত বেদের তর্জ্জমা বাহির করিলেন; 'বঙ্গবাসী' তাঁহাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিল। রমেশবাবু তাহার একটি সুদীর্ঘ প্রতিবাদ লিখিয়া, সেটিকে সঙ্গে করিয়া 'সঞ্জীবনী'-আপিসে উপস্থিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র তখন গ্রীষ্মাবকাশে দেশে গিয়াছেন—কাগজের ভার তাঁহার তাৎকালিক এক 'সব্-এডিটারে'র উপর। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াই যুবক সহঃ-সম্পাদক বলিল যে, "দুই-একস্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।" রমেশবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সহকারীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যে যে স্থানে যোগেন্দ্রবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়া দিলে, রমেশবাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তা বেশ, ঐ অংশটুকু বাদ দিন।" এই কথা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবন্ধের কলেবর লাল কালিতে রক্তাক্ত হইয়া 'প্রিণ্টারে'র হাতে চলিয়া গেল। 'সঞ্জীবনী' ভিন্ন এ-প্রকার নির্ভীকতা আর কেহ দেখাইয়াছেন কি না, সন্দেহ। রমেশবাবুর মত একজন পদস্থ লেখকের লেখা, তাঁহার মুখের সম্মুখে কাটিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার আড়ালেও একালের কোন সম্পাদকই বোধ করি পারেন না। আজ-কাল

কোন সম্পাদকই যে একটু নামজাদা লেখককে কোনপ্রকারে অসন্তুষ্ট করিবার ক্ষমতা রাখেন, এরূপ মনে হয় না।

এ সময় ৺কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী'তে শিক্ষানবিশ; সংবাদ তর্জ্জমা করেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকারের তখন আবির্ভাব হয় নাই। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বোধ হয় স্কুলে পড়েন। ইঁহারা ক্রমে ক্রমে 'বঙ্গবাসী'তে কলম পাকাইয়াছেন।

'বঙ্গবাসী' হইতে বাহির হইয়া একদল যেমন 'সঞ্জীবনী' বাহির করিলেন, সেইরূপ অন্য একদল 'পতাকা' বাহির করিলেন। 'পতাকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়। তিনি বেশ লিখিতে পারেন,—'বঙ্গবাসী'তে তাঁহার লেখা বাহির হইলে, লোকে যত্ন করিয়া পড়িত; কিন্তু 'পতাকা' টিকিল না। ৺রাজনারায়ণ বসু-মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, দেওঘরে বসিয়া কলিকাতায় এক কাগজ বাহির করিতেন—নাম ছিল 'সুরভি'; বেশ লেখা—বেশ কাগজ; কিন্তু লাভ হইত না। এই 'সুরভি'-সম্পর্কে আর একজন যোগেন্দ্র বসুর সাক্ষাৎ পাই। ইনি 'সুরভি' ও 'পতাকা' দুইটি কাগজ লইয়া "সুরভি ও পতাকা" করিলেন। লোকটির মাথা ছিল; কিন্তু কপাল ছিল না! ইঁহারই প্রযত্নে আজ-কাল শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি একজন সাহিত্যপতি। যোগেন্দ্রবাবুই সুরেশচন্দ্রকে (তখন তাঁহার বয়স ২০ বৎসরেরও কম) লিখিতে উৎসাহিত করেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রবন্ধও ছাপিতেন। ইনি ভিন্ন আরও অনেক লোক তাঁহার কাছে লিখিতে শিখেন! এই তৃতীয় যোগেন্দ্রবাবু কাগজে স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় দিতেন না;—যাহাতে দেশের উপকার হয়—সাহিত্যের উন্নতি হয়—এই প্রকার সাধু উদ্দেশ্য লইয়া ইনি কাগজ চালাইতে লাগিলেন। অনেক ভাল ভাল লোক তাঁহাকে প্রবন্ধ পাঠাইতেন। বঙ্কিমবাবু তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। আজকাল যে "উপহার" দিবার প্রথা বহুল প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই মনে করেন যে, 'বঙ্গবাসী'র কর্তৃপক্ষদের মস্তক হইতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'সুরভি ও পতাকা'র যোগেন্দ্রবাবুই ইহার জন্মদাতা; কিন্তু লাভ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না; লাভ হইল 'বঙ্গবাসী'র। কিরূপে হইল, তাহা বলিতেছি।

'সুরভি ও পতাকা' স্থির করিলেন যে, নূতন গ্রাহকগণকে ভাল ভাল কয়েকখানি পুস্তক উপহার দিবেন; কেবল ডাকমাশুলের জন্য আট আনা লইবেন। বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দ মঠ', চণ্ডীদাসের 'পদাবলী' আর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দ্বারা 'কল্কীপুরাণে'র বাঙ্গালা-অনুবাদ। বই ছাপা হইল। যোগেন্দ্রবাবু 'বঙ্গবাসী'তে বিজ্ঞাপন দিতে গেলেন। বিজ্ঞাপন পড়িয়াই 'বঙ্গবাসী'র কর্ত্তাদের মাথার টনক্ নড়িল—তাঁহারা যোগেন্দ্রবাবুকে বলিলেন যে, এ বুদ্ধি ত মন্দ নয়। সে সময় 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয়ে অনেক পুরাণ ও অন্যান্য বই অবিক্রীত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা সেই সমস্ত পুস্তক উপহার দিবার জন্য আপনাদের কাগজে ভাল করিয়া বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন। তাহাতে 'সুরভি ও পতাকা'র বিজ্ঞাপন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেল। তৃতীয় যোগেন্দ্রবাবুকে পয়সা খরচ করিয়া বই ছাপাইয়া মজুদ রাখিতে হইয়াছিল; কিন্তু, গ্রাহক জুটিল না। 'বঙ্গবাসী'কে বই ছাপাইতে নূতন করিয়া খরচ করিতে হইল না—পুরাণো মাল সাবাড় করা হইল—অথচ রাশি রাশি গ্রাহক জুটিল; সেই হইতে 'সুরভি ও পতাকা'র পতন আরম্ভ হয়।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন লেখকের সংখ্যা অধিক ছিল না। যাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন, তাঁহারা নিয়মিতভাবে লিখিতেন না। এখন যেমন সম্পাদকদিগের ভাবিতে হয় যে, কোন্ প্রবন্ধটি বা এবার ছাপাইব এবং কোনটিই বা এখন রাখিয়া দিব, তখন সে সব ভাবনা ছিল না। উপযুক্ত প্রবন্ধ বাহির হইতে কবে পাওয়া যাইবে, তাহার স্থিরতাই ছিল না; কাগজের সম্পাদককে অনেক সময় প্রবন্ধাভাবে ব্যতিব্যস্ত হইতে এবং নিজেকেই ফাঁক্-পূরণ করিতে হইত। সে সময় কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের আবির্ভাব হয় নাই। শ্রীযুক্ত জলধর সেনের অস্তিত্ব ছিল না; শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বোধ করি স্কুলে; শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি একালের প্রবীণ লেখকগণও তখন কলেজে পাঠশিক্ষা করিতেছেন। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের এলাকা তখন 'পদার্থ-বিদ্যা' অঞ্চলে।

ভাল কথা; এরই মধ্যে দিনকয়েকের জন্য কলিকাতার 'ইংলিশম্যান'-আপিস হইতে ঐ কাগজের বাঙ্গালা-অনুবাদ করাইয়া এক দৈনিক কাগজ বাহির হইল। নাম হইল 'সুপ্রভাত'। শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় পণ্ডিত 'ভারতবাসী' বন্ধ হইবার পর হইতে বেকার ছিলেন। তিনি তাহাতে জুটিয়া পড়িলেন। 'পড়িলেন' কথাটাই ঠিক; কারণ, তাঁহাকে 'ইংলিশম্যান' পড়িতে হইত এবং তাহাতে বাঙ্গালীদিগের প্রতি যে সকল গালাগালি থাকিত, তাহা অনুবাদ করিয়া দিতে হইত।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে (আজকাল উদ্ভট্-সাগর) ইংরাজ-আমলের প্রথম-অবস্থা-ঘটিত প্রবন্ধ 'সঞ্জীবনী'তে বাহির করেন। অক্ষয় দত্তের মৃত্যু-সংবাদ যাহাতে 'সঞ্জীবনী'তে সর্ব্বাগ্রে ছাপা হয়, এই আশায় তিনি এক প্রভাতে উত্তরপাড়া হইতে 'সঞ্জীবনী'-আপিসে উপস্থিত হন। ইহাতে বুঝা যায় যে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীরাই যে 'সঞ্জীবনী'র হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাহা নহে,—হিন্দুরাও সঞ্জীবনীর হিত-কামনা করিতেন।

তখন মফঃস্বল হইতে কয়েকখানি কাগজ বাহির হইত। 'সাধারণী' ও 'এডুকেশন-গেজেটে'র কথা বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন 'ঢাকা-প্রকাশ', 'রঙ্গপুর-দিক্-প্রকাশ', 'প্রতিকার', 'হিন্দু রঞ্জিকা' ও 'কুশদহ' উল্লেখযোগ্য।

তখন ভাষা দেখিয়া ভাল লেখকদিগের মধ্যেও তাঁহাদের জন্মস্থান বুঝিতে পারা যাইত। প্রাদেশিক বা গ্রাম্যকথা ব্যবহার না করিলেও, এক 'যাবৎ' কথা পূর্ব্ববঙ্গের লেখকদিগের কলম হইতেই বাহির হইত। এখন পশ্চিমবঙ্গেরও কচি ও কাঁচা লেখকগণ ইহা ব্যবহার করেন। পূর্ব্ববঙ্গের লেখকগণের ভাষার উপর আধিপত্যের ইহা অন্যতম লক্ষণ। তবে এখন যেমন তাঁহাদের অনেকে 'ড়' এবং 'র' উল্টা-পাল্টা করিয়া ফেলেন এবং কলিকাতার ছোক্‌রারা ন্যাকা-ন্যাকা কথা লেখেন, তখন তাহা কেহ লিখিতে সাহস করিত না।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস

বঙ্গবধূ

ওগো বঙ্গের বধূ—
তরল মধুর ভাবখানি তোর মৌচাক-ভাঙ্গা মধু;
তুলনা তোমার ভুবনে মিলে না খুঁজি,
বসনে গোপনে লুকায়ে প্রাণের পুঁজি
পূজিছ পরাণবঁধু।

পরিহিত নীল বাস—
পাতাচাপা যেন জহুরি-চাঁপাটি—ঢেকে রাখে বারমাস;
গন্ধ তাহার লুকান সবার কাছে,
পূজার ফুলটি—অনাঘ্রাতই আছে
সুগোপন পরকাশ।

খয়ের-টীপ্‌টি ভালে—
পলকবিহীন তৃতীয় নয়ন চিরদিঠি সুধা ঢালে।
দু'টি চোখ—সে যে নিমেষে মুদিয়া আসে,
ঢলি' ঢলি' পড়ে পরাণ-প্রিয়ের পাশে—
নিভৃত নিশীথ কালে।

সিঁথায় সিঁদুর-রাগ—
হিঙ্গুল-ভাঙ্গা ওষ্ঠে শোভিছে তাম্বুল-রাঙ্গা দাগ।
রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী, রাঙ্গা রুলি দু'টি সাথে,
মর্ম্মরক্ত চরণেরও আল্‌তাতে
অনুরাগে রাঙ্গা ফাগ।

লুকান বনের পাখী—
রূপ দেখি নাই, স্বর শুনি নাই,—কি নামে যে তোরে ডাকি?
সবার আড়ালে থাকিয়া সবার সেবা,
দেবরও তোমার দেবতা - নহে বা কেবা,
ফির' তারও মন রাখি'।

অন্তঃপুর-কোণে—
কি বন্ধনে বাঁধিয়া রেখেছ গুরুজনে পরিজনে!
শিশু-ফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফুটে—
স্নেহের উৎস সবারে সমান ছুটে
বাণীহীন আরাধনে।

নিঃশেষে সুধু দান—
বলীর চেয়েও বলী তুমি, তবু নিরীহ নিরভিমান।
গৃহমন্দিরে একক পূজারী তুমি,
তব তর্পণে—সে আজি তীর্থভূমি,—
দেবের অধিষ্ঠান।

ওগো বঙ্গের বধূ—
মাধুরী তোমার মোমে-মাখা যেন মৌচাকভাঙ্গা মধু।
একে একে আমি খুঁজেছি সকল ঠাঁই,
নিখিল ভুবনে কোথা হেন হেরি নাই—
গৃহধর্ম্মের বঁধু।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

সাহিত্যে যথেচ্ছাচার

কিছুকাল হইতে বাঙ্গালা-সাহিত্যে ঘোর যথেচ্ছাচার আরম্ভ হইয়াছে; বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, সাহিত্যানুরাগী মহাশয়গণের তাহা নিবারণের পক্ষে বিশেষ যত্ন নাই। পূর্ব্বে যে সকল প্রবীণ ও ক্ষমতাশালী সমালোচকের তীব্র কশাঘাতের ভয়ে গ্রন্থে, সংবাদ-পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় অনেক সময় কুরুচি ও আবর্জ্জনাপূর্ণ অসার প্রবন্ধ স্থান পাইত না, সেই সকল সুদক্ষ সমালোচকের মধ্যে অনেকেই চিরদিনের জন্য সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া জীবনের পরপারে গমন করিয়াছেন; যাঁহারা জীবিত আছেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে তাঁহারা নীরব ও উদাসীন; সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যে স্বৈরাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের লেখকগণের মধ্যে অনেকেই স্ব-স্ব স্বাধীন ও স্ব-স্ব প্রধান। তাঁহারা চিরপ্রচলিত উদার নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে চলিতে এবং সাধারণের মতকে মান্য করিতে প্রস্তুত নহেন। অনেকে সাহিত্য-রচনায় ব্যাকরণের সর্ব্ববাদিসম্মত সরল সূত্র অমান্য করিয়া চলিতে উৎসুক। তাঁহারা বলেন যে, সাহিত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব-সম্পাদন ও অবাধ গতি-প্রবর্ত্তন-জন্য অনেকস্থলে ব্যাকরণের সুদৃঢ় গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া তাহার অনুশাসন মানিয়া চলিবার আবশ্যক নাই; ঐরূপ স্থলে ব্যাকরণ তাঁহাদের অবলম্বিত পথ ও প্রণালী অনুসারে তাহার সূত্রগুলির সংশোধন করিয়া লইবে। আজি যদি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ প্রভৃতি নির্ভীক ও সুকৃতিশালী সুলেখক ও সমালোচকগণ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত স্বাধীনতাপ্রিয় সাহিত্য-সেবিগণ তাঁহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট শিক্ষা পাইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ "নব্যভারত" ও "ভারতী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় আর পূর্ব্বের ন্যায় তেজের সহিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হয় না এবং সুবিজ্ঞ ও সুদক্ষ "সাহিত্য"-সম্পাদক দীর্ঘকাল হইতে নানা দুর্ব্বিপাক, দুর্ঘটনা ও দুর্ভাবনায় অস্থির ও অবসন্ন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার নিকট হইতেও কোনরূপ সহায়তা-লাভের আশা নাই। দেশের সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণের মধ্যে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে অনেকের প্রতি আক্রমণজনিত 'কবির লড়াই' লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত; সাহিত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা-রক্ষা ও গৌরব-বর্দ্ধন-বিষয়ে তাঁহাদেরও বিশেষ দৃষ্টি নাই। সাহিত্যের পরিচর্য্যা ও পরিপুষ্টি-সাধনে আর যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন সহৃদয় ও সুবিবেচক লেখক বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচার-নিবারণ-জন্য কখনও কোন কথা বলিলে, কেই-বা তাহা শুনে বা মানে? নানা বিষয়ে উদীয়মান জাতীয় সাহিত্যে দিন দিন স্বেচ্ছাচারজনিত নানা আবর্জ্জনা জন্মিতেছে। আর উহাকে প্রশ্রয়দান করা উচিত কি না, আমাদের বিবেচনায় সাহিত্য-সেবী মহাশয়গণের তদ্বিষয়ে একত্র সমবেত হইয়া বিচার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আর উদাসীনভাবে উপেক্ষা-প্রদর্শনের সময় নাই।

এতক্ষণ আমরা রচনা-প্রণালী-সম্বন্ধে সাধারণ উপায়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম; এক্ষণে সাহিত্যে কুরুচিপূর্ণ, কুৎসিত, জঘন্য, বীভৎস ও ন্যক্কারজনক গল্প-রচনা ও চিত্র-প্রদর্শন-প্রবৃত্তির প্রভাব-সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

কিছুদিন হইতে অনেকগুলি মাসিক-পত্রিকায় ও সাময়িক পত্রে নানা ভাব ও ভঙ্গিমাবিশিষ্ট প্রতিমূর্ত্তি-চিত্রাঙ্কনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক সময় অনেক কদর্য্য প্রতিমূর্ত্তি ঐ সকল সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোন কোন লেখক চিত্র-শিল্প ও আর্টের দোহাই দিয়া ঐ সকল অসার ছবির সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। আর্টের ধূয়া ধরিয়া যাঁহারা সাহিত্যে কুরুচির পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহাদের দ্বারা বিস্তর অপরিণতবয়স্ক পাঠক ও পাঠিকার কি বিষম ক্ষতি হইতেছে। কোন কোন স্থলে প্রতিমূর্ত্তি-প্রকাশের প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, তৎসম্বন্ধে কেহ কেহ সময় সময় প্রতিযোগিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাহা দেখিলে মনে হয়, বুঝি ছবি না থাকিলে ঐ সকল সাময়িক পত্রের গ্রাহক-সংখ্যা বাড়িবে না, তজ্জন্যই উক্ত প্রতিযোগিতা এতই প্রবল। আর্টের খাতিরে সময় সময় যে সকল রং-বিরংএর কুৎসিত ও কদর্য্য ছবি প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাদের সার্থকতা কোথায়?

কোন কোন মাসিক-পত্রে একদল অদূরদর্শী চুটকি-গল্প-লেখক দেখা দিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের যে কি ঘোর সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার বিচার কে করিবে? তাঁহারা বিস্তর অশ্লীলতাপূর্ণ ইংরাজী-গল্পের অনুবাদ এবং স্ব-স্ব বিকৃত কল্পনাসম্ভূত জঘন্য, কদর্য্য গল্প-রচনায় অসঙ্কুচিতভাবে দেশে কুরুচি ও অশ্লীলতা ছড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিছুকাল হইতে 'সবুজ পত্র' ও 'মালঞ্চ' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় এরূপ কুৎসিত ও অসার গল্প প্রকাশিত হইতেছে, যাহা সর্ব্বতোভাবে কুরুচি ও কুনীতিপূর্ণ; সুতরাং একান্ত অপাঠ্য ও পরিবর্জ্জনীয়। এই সকল মাসিক-পত্রের ক্ষমতাশালী পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে কেহ কেহ পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমুন্নত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবে অনুপ্রাণিত; অন্য পক্ষে তাঁহারা আবার সাহিত্য-রথী বলিয়াও বিখ্যাত। ইঁহারাও আর্টের ধূয়া ধরিয়া, ভাব-বৈচিত্র্য ও কল্পনা-চাতুর্য্যের দোহাই দিয়া, সাধারণের মত অগ্রাহ্য করিয়া, স্বাধীনভাবে স্ব-স্ব স্বাধীন চিন্তাপূর্ণ মত-প্রচলনের জন্য যত্নবান। জানি না, কয়জন সুশিক্ষিত লোক নিরপেক্ষ বিচারপূর্ব্বক তাঁহাদের মতের অনুমোদন করিবেন? এই সকল গল্প-লেখকদিগের কতদিনে যে সুমতি উপস্থিত হইবে, বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাগ্য-বিধাতা জগদীশ্বর তাহা জানেন। "সবুজ পত্র" ও "মালঞ্চের" আড়ালে থাকিয়া যে সকল লেখক অসার গল্প-রচনায় কৃতিত্ব-প্রদর্শন করিয়া যশঃ ও সম্মান লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সংপ্রতি একজন লেখক "নারায়ণে"র পূজার মন্দিরে বিষম উৎপাত ও ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা "নারায়ণে"র প্রধান পূজারী, তাঁহাদের কাহারও সহিত উক্ত লেখকের কোনরূপ আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি না; বাঙ্গালা-সাহিত্যে তিনি সুপরিচিত কি না, তাহাও আমরা জানিতে পারি নাই। তিনি যত বড়ই ক্ষমতাশালী গল্প-রচয়িতা হউন না কেন, তাঁহার বিকট কল্পনাসম্ভূত "আঁধার ঘরে" ও "হাসির দাম" নামক কথা-নাট্য গত আষাঢ় মাসে "নারায়ণে"র পূজার মন্দির কলঙ্কিত করিয়াছে। তিনি উক্ত গল্পে নির্ভয়ে কুরুচি, কুনীতি ও অশ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া স্বীয় যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। সহৃদয় ও স্বদেশানুরাগী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে মাসিক পত্রের সম্পাদক, তাঁহার পরমবন্ধু স্বদেশ-প্রেমিক সুলেখক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যাহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, অনেক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাগণ যাহার পাঠিকা এবং তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন সুশিক্ষিতা মহিলা যাহাতে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধও লিখিয়া থাকেন, সেই সুবিখ্যাত পত্রিকায় যিনি ঐরূপ কলুষিত, অশ্লীলতাপূর্ণ, জঘন্য ও ন্যক্কারজনক গল্প প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার দুঃসাহস ও বিকৃত রুচির পরিচয় পাইয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত দাশ মহাশয়-প্রণীত "সাগর-সঙ্গীতে" আমরা তাঁহার সহৃদয়তা ও বাঙ্গালা-সাহিত্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তাঁহার সম্পাদিত "নারায়ণে"র পবিত্র বক্ষ যে ওরূপ কদর্য্য ও জঘন্য প্রবন্ধে কলঙ্কিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের গভীর ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয়। যাঁহারা উক্ত গল্প পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ওরূপ অসার রচনার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। আমরা আর উহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি না। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছা করিলে "নারায়ণে"ই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইতে পারেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, উহাতে কিরূপ সসম্ভ্রমে আর্টের গৌরব পরিবর্দ্ধিত এবং কিরূপ সমারোহে পরিমার্জ্জিতরুচি, সুবিশুদ্ধ ও সমুন্নত নীতির শ্রাদ্ধ সম্পাদিত হইয়াছে।

নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় এই যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা প্রভৃতির অমনোযোগ ও উদাসীনতায় বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ বিষম জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা স্থান পাইতেছে। যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য-সংসাধন-জন্য উল্লিখিত পরিষৎ ও সভার জন্ম হইয়াছে, তাহার মধ্যে অন্যতর প্রধান উদ্দেশ্য—সাহিত্যে সুরুচি ও বিশুদ্ধ ভাব সংরক্ষণে উহার উন্নতি-সাধন এবং অবিবেচক ও অপরিণামদর্শী লেখকগণের যথেচ্ছাচার-নিবারণে উহার মর্য্যাদা-রক্ষণ ও গৌরব-সম্বর্দ্ধন। সাহিত্য-পরিষৎ ও সাহিত্য-সভা প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলে, এতদিন তাঁহাদের সমবেত শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া এই শ্রেণীর লেখকগণ বটতলার বিকৃত রুচিবিশিষ্ট লেখক-সমাজ-ভুক্ত হইতে বাধ্য হইতেন—সাহিত্যসেবী ভদ্রসমাজের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারিত না।

সাহিত্য, জাতীয় জীবনের প্রতিকৃতি এবং জাতীয় উন্নতির মূলভিত্তি। যাঁহারা সমুন্নত বিষয় পরিহারপূর্ব্বক কলঙ্কিত ও জাতীয় জীবনের অবনতিজনক অসার বিষয়ের অবতারণায় সাহিত্যের অঙ্গ-পুষ্টিসাধন করিতে প্রয়াসী, তাঁহারা নিঃসন্দেহ জাতীয় উন্নতির বিরোধী। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর দোষে এ দেশের বালক-বালিকাগণ বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষালাভের সুযোগ পায় না; সেইজন্যই এদেশের স্কুল ও কলেজের অধিকাংশ ছাত্র আদর্শ শিক্ষালাভে বঞ্চিত। মানুষ স্বভাবতঃই দুর্ব্বলচিত্ত; ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মশিক্ষা অভাবে অধিকাংশ নর-নারীর চিত্তের দুর্ব্বলতা দূর হয় না। উপযুক্ত সৎশিক্ষা ও ধর্ম্মভাবের অভাবে বিস্তর যুবক-যুবতীর মন দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী বয়ঃধর্ম্ম-অনুসারে অনেকের অন্তরে যৌবনকালে কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রবল থাকে। যে সকল বিষয়ের আলোচনায় তাহাদের সৎপ্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত ও পূর্ণবিকসিত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করে, সেই সকল বিষয়ই সর্ব্বথা আদরণীয়। জীবনের প্রভাতকালে যখন নর-নারী পাপ ও পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হয়, যখন তাহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রখরতালাভ করিতে পারে না, তৎকালে এবং জীবনের মধ্যাহ্ন-সময়ে যখন যুবক-যুবতী-

গণের অন্তরে কতকগুলি প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, সেই সময় তাহাদের মনে পাপ-বাসনা প্রজ্বলিত করিবার উদ্দেশ্যে পাপ-প্রসঙ্গের অবতারণায় যাহারা তাহাদের সুষুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহারা সমস্ত দেশের শত্রু—তাহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয়। বর্ত্তমান সময়ে বিস্তর সুকুমারমতি যুবক-যুবতী মাসিক পত্রের পাঠক-পাঠিকা। সকলের চিত্ত কখনই সুসংযত নহে। ধর্ম্ম-শিক্ষা-বিবর্জ্জিত দুর্নীতিপূর্ণ, কুৎসিত, অশ্লীল প্রবন্ধপাঠে সহসা তাহাদের চিত্ত বিচলিত ও মনের ভাব বিকৃত হইয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ-সাধন করিতে পারে, তাহা কি ঐ শ্রেণীর লেখকগণ বুঝিতে সমর্থ? যাঁহারা আর্টের দোহাই দিয়া ঐরূপ অসার গল্পের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্, তাঁহারা উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? যাঁহারা সৃষ্টির প্রাণরূপিণী সংসারের ললামভূতা মূর্ত্তিমতী কোমলতা ও সরলতার জননী রমণীকুলে মাতৃভাবের পরিবর্ত্তে নিকৃষ্ট ভোগ ও বিলাস-বাসনা চরিতার্থতার কলুষিত ভাব-পোষণের সহায়তা করেন, তাঁহাদের নীতিজ্ঞান, সুরুচি ও সহৃদয়তাকে আমরা কখনই প্রশংসা করিতে পারি না। এরূপ শ্রেণীর মর্কট-বৃত্তিপরায়ণ লেখকবৃন্দ ভদ্র-সমাজ পরিহারপূর্ব্বক যত শীঘ্র বটতলার বিকট ও বীভৎস রুচিসম্পন্ন লেখক-সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন, ততই মঙ্গলের বিষয়।

অল্পদিন হইল, আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু বাঙ্গালা-সাহিত্যের বর্ত্তমান দুর্দ্দিন ও ক্ষমতাশালী সমালোচকগণের উদাসীনতার বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর হইতে শ্রদ্ধাস্পদ স্যর রবীন্দ্রনাথ সাহিত-জগতে বিপুল যশঃ ও সম্মান লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি কেবলমাত্র বাঙ্গালার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, এখন তিনি সমগ্র ভারতের গৌরব-রবি। তৎ-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "গীতাঞ্জলি"র প্রসাদে "নোবেল"-প্রাইজ লাভ করার পর তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি দেশ-বিদেশে দ্রুতগতি বিস্তৃত হইতেছে। ভাগ্য-বিধাতা তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন; তিনি জীবনের মধ্যাহ্নকালে "চোখের বালি" ও "নৌকাডুবি" প্রভৃতি বিচিত্র কল্পনাপূর্ণ উপন্যাস-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যে সম্মান-লাভে সমর্থ হন নাই, এক "গীতাঞ্জলি"ই তাঁহাকে সেই বিপুল সম্মানের অধিকারী করিয়াছে। তিনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ, ক্ষমতাশালী সুলেখক। বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে এবং সাহিত্য-সমাজে তাঁহার প্রভাব সুদূরবিস্তৃত। তিনি জীবনের অপরাহ্নকালে আদর্শ পিতার আদর্শ পুত্রের ন্যায় পবিত্রভাবে আদর্শ জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব কঠোর সাধনাপ্রভাবে দিব্যজ্ঞানলাভে মহাযোগীর ন্যায় পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া "মহর্ষি"-পদলাভে অমর হইয়াছেন। সম্ভবতঃ, কিছুদিন পরেই তিনিও তাঁহার ভক্তজন-সমাজে "ঋষিকল্প স্যর রবীন্দ্রনাথ" নামে গৌরবান্বিত হইবেন। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ স্যর রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গদেশের ছাত্র-সমাজে ব্রহ্মচর্য্য ও আদর্শ পবিত্র শিক্ষা-প্রবর্ত্তন-জন্য, ঘোর কোলাহলময় অনন্ত প্রলোভনপূর্ণ কলিকাতা-নগরী হইতে দূরে বোলপুরে একটী আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া তত্রত্য শান্তি-নিকেতনে অবস্থানপূর্ব্বক স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু স্বনামধন্য রেভারেণ্ড য্যাণ্ড্রু সাহেব একরূপ সর্ব্বত্যাগী অবস্থায় একনিষ্ঠভাবে তাঁহার পবিত্র ও পুণ্যময় অনুষ্ঠানে সহায়তা-দান-জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি লোক-শিক্ষা-প্রভাবে স্বদেশের দুর্নীতি ও দুর্গতি-নিবারণ এবং শ্রীবৃদ্ধি-সাধন-জন্য যাহা করিতেছেন, ভারতের ভাগ্য-বিধাতা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে তাহা সফল হইলে, সমস্ত সভ্য-জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে তাঁহার অদ্ভুত কীর্ত্তি ও সুনাম সমুজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইবে। এত কথা বলার পর তাঁহাদের মধ্যে একজন বিস্ময় ও আক্ষেপসহকারে বলিলেন, যে বিপুল ক্ষমতাশালী বহুমানাস্পদ রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে দেশের উন্নতির জন্য এত কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি তিনি "সবুজ পত্রে"র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাহাতে কুরুচিপূর্ণ কুৎসিত গল্প-প্রচারের সমর্থন করেন কেন? বাঙ্গালা-সাহিত্যে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে যথেচ্ছাচার চলিয়াছে ও বিস্তর আবর্জ্জনা জন্মিতেছে, তাহার প্রতিবিধান-জন্য তিনি তাঁহার বিপুল ও অব্যর্থ শক্তির পরিচয়দান করেন না কেন? তাহার উত্তরে আমাদের আর একজন বন্ধু বলিলেন,—"সে এক হেঁয়ালি-নাট্য। বোধ হয় চক্ষু-লজ্জার খাতিরে অথবা অনাবশ্যক বোধ করিয়া এই আশঙ্কায় তিনি নীরব আছেন।" পূর্ব্ববক্তা বক্তা তখন পুনরায় বলিলেন, "বর্ত্তমান মাসিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রে যে সকল কলুষিত ও নিতান্ত জঘন্য গল্প প্রকাশিত হইতেছে, সেই সকল গল্প যদি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বিদ্যালয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয় ছাত্রগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে কিভাবে তাহারা উহার মধুর রসাস্বাদন করিবে, এই কথাটি একবার তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ বীরবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে হয়।" অনন্তর আমাদের বন্ধুগণ একবাক্যে উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিবেচনাপূর্ব্বক, কোন্ ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাবের ভার লইবেন, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহারা সকলে একবাক্যে এই অধমকে উক্ত কার্য্যের ভার-গ্রহণ-জন্য একান্ত আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিলেন। এই দীন, নগণ্য সাহিত্য-সেবক উক্ত গুরুতর কার্য্য-ভার গ্রহণের যে নিতান্ত অযোগ্য, তাহা প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিয়া তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের সমবেত অনুরোধ-রক্ষার জন্য পূর্ব্বপরিচিত এই দীন অকিঞ্চন আজি করযোড়ে নিতান্ত বিনীতভাবে মহাত্মা স্যর রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার প্রিয়সখা বীরবল-মহাশয়কে যথোচিত সম্মানসহকারে আলোচ্য প্রস্তাবের সদুত্তর দান করিতে অনুনয় করিতেছে। তাঁহারা কি তাঁহাদের ভক্ত, এই অধমের সকাতর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?

শ্রীবিজয়লাল

মরণ

কোথায় সে কোন্ অন্ধকারে
তোমার জন্মদেশ,
তুহিন্-শীতল কঠিন দেহ,
রুক্ষ দীঘল কেশ,
শ্মশ্রুরাশি উড়্ছে বায়ে,
রক্ত গড়ায় নগ্ন পায়ে,
চোখের কোণে তীক্ষ্ণ দিঠি
হাসির নাহি লেশ,
নিকষ-কালো অঙ্গে তোমার
রক্তবরণ বেশ।

তীব্র তব বিনাশ-ভেরী
হেথায় সদা বাজে,
রুদ্র তব মূর্ত্তি ভয়াল
সবার প্রাণে রাজে;
পাষাণ হিয়াও শিউরে ওঠে,
নিঠুর চোখেও অশ্রু ছোটে,
হর্ষ-হাসি ধূলায় লুটে
তোমার স্পর্শমাঝে,
চেতনা কাঁদে পাণ্ডু মুখে
বেদনক্লিষ্ট সাজে।

উঠ্‌ছে রবি, ছুট্‌ছে নদী,
ফুট্‌ছে এত ফুল,
গন্ধে ভরা কানন-রাণীর
শিশির-ভেজা চুল,
পৌর্ণমাসী চাঁদের হাসি
দিগ্বলয়ে লুট্‌চে ভাসি',
সৃষ্টি সারা তাদের লয়ে
এত শোভার মূল—
হঠাৎ তুমি তাহার মাঝে
দাঁড়াও এসে উগ্র সাজে—
করে করাল শূল;
নীরব আঁধার রথের 'পরে
ফের তুমি চরাচরে,
অলঙ্ঘ্য সে আদেশ তোমার
নাইক' ভ্রান্তি ভুল!

পৃথ্বীমাঝে নিত্যবিজয়
ঘোষে তব শূর!
জগৎ-নারী-নরের তুমি
কর্‌ছ গর্ব্ব চূর,—
চিত্ত শত দীর্ণ করি'
চরণ ফেল বিত্ত'পরি
শক্তি তব ব্যক্ত করি'
নিঠুর তুমি ক্রূর!
কেউ বা বলে দয়াল তুমি,
দুখীর নাকি নয়ন চুমি'
দৈন্য কর দূর।

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(খ)

অগ্নি-পরীক্ষা।

ইতিহাসের পরীক্ষা অগ্নি-পরীক্ষার ন্যায়। নিরপেক্ষ ইতিহাস বাদশাহও জানে না, ফকিরও জানে না। সেই অগ্নি-পরীক্ষায় যাঁহারা উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তাঁহারাই পৃথিবীতে অনশ্বর কীর্ত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ। আপন কু-কীর্ত্তি-কাহিনী কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত যে দশের মুখে মুখে ফিরিবে, দেশের বুকে শিলালিপির ন্যায় অমর হইয়া রহিবে, ইহা কে ইচ্ছা করে? ঔরঙ্গজেবও তাহা ইচ্ছা করেন নাই। তাই তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার রাজত্বে ইতিহাস-রচনা নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

ঔরঙ্গজেব একান্ত দুরাশয়। কালের স্রোত কে রোধ করিতে পারে? তাঁহার আদেশেও পিতা বা ভ্রাতার নয়ন-সলিল যেমন শুষ্ক হইতে পারে নাই, রক্তলিপ্ত রাজ-সিংহাসন যেমন অটল রহিতে পারে নাই, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম যেমন কৃপাণের ধর্ম্মে পরিণত হয় নাই, তেমনি ঐতিহাসিকের পথও অবরুদ্ধ হয় নাই। মুস্তাইদ্ খাঁর ন্যায় ঐতিহাসিক অতি সঙ্গোপনে, অতি সাবধানে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের শাসন-কাহিনী, সমরাভিযান প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাফি খাঁর ন্যায় প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক রাজ্য ও রাজত্বের বিবরণ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী না হইয়া, উহা স্মৃতির ফলকে ৩০।৪০ বৎসর মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরে "মুন্তখবুল্-হুবাব" নামক ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন।

ঔরঙ্গজেব যদি একদিনের জন্যও মৃত্যুর দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তির লিখিত ইতিহাস অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন। তাহাতে জীর্ণ ভূর্জ্জপত্রের গ্রন্থ পুড়িত বটে, কিন্তু হৃদয়-গ্রন্থ কি পুড়িত? প্রজার হৃদয়ের উপর যে রাজার অধিকার থাকে না, তিনি কি কখনও অমর হইতে পারেন?

২

ধর্ম্মের রূপ

১০৬৯ হিজিরার রমজান মাসে সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হয়। তাঁহার শুভকামনায় যখন দিল্লী-সাম্রাজ্যের নগরে নগরে 'খোতবা' পাঠ হইতেছিল, মস্‌জিদে মস্‌জিদে 'কোরাণ'

ধ্বনিত হইতেছিল, তখন তিনি আদেশ করিলেন—আমার মুদ্রায় 'কোরাণে'র ভগদ্বাক্য এবং প্রথম চারি 'খলিফা'র নাম থাকিতে পারিবে না। কাফেরগণ এই মুদ্রা ব্যবহার করে; উহা কখন কখন বা তাহাদের করচ্যুত হইয়া হঠাৎ চরণলগ্ন হয়। আমার মুদ্রায় তাই সুধু আমার নামই থাকুক।

বাদশাহের আদেশমাত্রেই মুদ্রার রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

বাদশাহ দেখিলেন, সৌর বর্ষের প্রথম দিনের উৎসব কাফেরদিগের উৎসব। এ উৎসবে তাহারা কেন যোগ দিবে—কেনই বা তাহারা সৌর মাসে বর্ষারম্ভ করিবে? অবিলম্বে রাজ-আজ্ঞা ঘোষিত হইল, অবিলম্বে মোগল-পঞ্জিকার কায়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রাজাজ্ঞায় এতটুকু পর্য্যন্ত সম্ভব বটে, কিন্তু যে ধর্ম্মনীতির দোহাই দিয়া বাদশাহ এই সকল শাসন-বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি কি উহাতেই অধিকতর দৃঢ় হইয়াছিল?

[মুন্তখবু-ল্-হুবাব]

৩

ভ্রাতৃ-প্রেম

সিংহাসনের প্রধান কণ্টক দারা। সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সঙ্গোপনে তাহারই নাম কীর্ত্তিত হইতেছে। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিলেন। দেখিলেন, শস্ত্রধারী মোগল যোধেরও সাধ্য নাই যে, প্রজার মুখ বন্ধ রাখিতে পারে। প্রজার অভিশাপ রাজ-প্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করিয়াও সম্রাটের কর্ণে আসিয়া তখন পৌছিতেছিল। সম্রাট্ মনে করিয়াছিলেন, দারাকে গোয়ালিয়রের দুর্গে চিরবন্দী করিয়া রাখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন; কিন্তু এখন শঙ্কা হইতে লাগিল, কি জানি, যদি কেহ পথিমধ্যেই দারার উদ্ধারসাধন করে!

সম্রাট্ কি জানিতেন না যে, বিপুল মোগল-বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া হতভাগ্য, বন্দীকৃত, হৃতবৈভব দারাকে মুক্ত করিতে পারে, এমন বন্ধু তাহার কেহই ছিল না? তবুও সম্রাটের শঙ্কা হইতে লাগিল। মন্ত্রিগণ একবাক্যে কহিলেন, দারার জীবন-ভিক্ষা দেওয়া হউক। একজন পারস্যবাসী হাকিম সেই সভায় কহিলেন—দারা ধর্ম্মত্যাগী, মৃত্যুই তাহার দণ্ড।

অমনি সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের বিচার শেষ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন—"তাই ঠিক। দারা আমার যে অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা আমি ক্ষমা করিতে পারি—কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি দারার অত্যাচার অমার্জ্জনীয়।"

সভাভঙ্গ হইল। নাজির এবং সইফ নামক দুইজন নৃশংস আফগানের উপর সম্রাটের পরওয়ানা চলিয়া গেল। * * *

নীরব অন্ধকার রজনী। ভারতের সম্রাট্ একা কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতেছেন। সামান্যমাত্র শব্দ শুনিলেই উৎসুক নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। প্রহরের পর প্রহর অতীত হইতে লাগিল। শেষে পূর্ব্বদিক্ যেন একটু কম অন্ধকার বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সম্রাটের নিদ্রা নাই—চিন্তার অবধি নাই। অভুক্ত শয্যা সায়ংকালেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই রহিয়াছে।

অকস্মাৎ নীরবে কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। নাজির কুর্ণিশ করিয়া একটী শোণিতলিপ্ত নরমুণ্ড লইয়া প্রবেশ করিল।

তবে কি সত্যই দারা নিহত হইয়াছে? দারাই ত!

সম্রাটের আদেশে নাজির সেই নরমুণ্ড নিকটস্থ একটী জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে স্থাপিত করিল। জলে শোণিতরাশি ধুইয়া গেল। সম্রাট্ মুণ্ডটী আলোকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন—রুমালে মুছিয়া পরিষ্কার ও শুষ্ক করিলেন। দেখিলেন, সে মুণ্ড দারারই বটে। সম্রাট্ চিনিতে পারিলেন।

দারার মুখের দিকে চাহিয়া গভীর দুঃখে কহিলেন—"হায়, হতভাগ্য!"

তাঁহার নয়নে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিল!!

[Dow's Hindoostan]

৪

ধূমপান

সম্রাট্ আকবরের একজন অমাত্যের নাম ছিল আসদ্‌বেগ। আসদ্‌বেগ সম্রাট্‌কর্ত্তৃক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের সুলতান আদিল খাঁর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে আদিল খাঁ তাঁহাকে কতকগুলি তাম্রকূট-পত্র উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আসদ্‌বেগ সম্রাটের জন্য তিনহস্ত পরিমিত দীর্ঘ, সুন্দর কারুকার্য্যখচিত, মূল্যবান্ প্রস্তরাদিদ্বারা সুশোভিত একটী নল প্রস্তুত করিয়া, সেই তাম্রকূট ও নল সম্রাট্‌কে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন।

সম্রাট্ আকবর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সব কি?

নবাব খান-ই-আজম উত্তর করিলেন—"ইহার নাম তামাক। মক্কা এবং মদিনায় ইহার বিস্তর ব্যবহার প্রচলিত আছে। ইহা একপ্রকার ঔষধ।"

সম্রাটের আদেশে আসদ্‌বেগ নলে তামাক-পত্র পূর্ণ করিয়া সম্রাটের হস্তে দিলে, তিনি ধূমপান করিতে লাগিলেন।

সম্রাটের চিকিৎসক আসিয়া সনির্ব্বন্ধে নিষেধ করিয়া কহিলেন—"এ ঔষধ আমাদের শাস্ত্রে লিখে না। সম্রাটের ধূমপান করা উচিত নহে।"

নবাব খান-ই-আজম কহিলেন—"ইহাতে আশঙ্কার কারণ নাই। চীন-দেশে এই ঔষধ যথেষ্ট পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ইহার গুণাবলীর অনেক প্রশংসা করিয়া থাকেন।"

সম্রাটের চিকিৎসক কহিলেন—"য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা ইহার ব্যবহার করে, করুক্। আমাদের কেতাবে-কোরাণে যখন ইহার উল্লেখ নাই, তখন না জানিয়া-শুনিয়া আমরা তাম্রকূট ব্যবহার করিব না।

বহুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। শেষে বাদশাহ আকবর কহিলেন—"অন্যান্য দেশের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যখন তাম্রকূট ব্যবহার করেন, তখন আমরাই বা কেন না করিব? আমাদের কোন পুস্তকে লেখা নাই বলিয়াই যদি আমরা কোন একটী জিনিষের ব্যবহার না করি, তাহা হইলে আমাদের উন্নতি হইবে কিসে—আমরা পৃথিবীতে অগ্রসর হইব কিরূপে?"

সম্রাটের আদেশে তখনই সভামধ্যে অনেকেই ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন—দিল্লীর দরবারে তাম্রকূটের প্রচলন হইল।

[হাসাৎ-ই-আসদ্‌বেগ]

জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে আদেশপ্রচার করিলেন—"অতিরিক্ত ধূমপানে অনেকেরই শরীর ও মন অসুস্থ হইয়া উঠিতেছে; সুতরাং অদ্য হইতে ধূমপান নিষিদ্ধ হইল।"

এ অনুশাসন যে সুধু বাদশাহী কাগজ-পত্রেই বর্ত্তমান ছিল, তাহা বোধ হয় সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

[ওয়াকিয়াৎ-ই-জহাঙ্গীরি]

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

বোঝাপড়া

খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা সকল রকম কাজে,
এই রাগিণী দিন-যামিনী বাজে—
বিশ্বজগৎ মস্ত-বড় ফাঁকি,
সবাই মিলে হট্টগোলে কর্‌ছি হাঁকাহাঁকি।
ছায়াবাজীর পুতুল মোরা এইটে জানি সার;
বোঁ বোঁ করে কালের চাকা চল্‌ছে অনিবার।
বেঁচে থাকার একটা মধুর আশা,
বুঝ্‌তে শুধু মায়ের স্নেহ, সতীর ভালবাসা!—

হা রে মানব, সকল রকম দুঃখ-জ্বালা সও।
ব্যথার বোঝা হাস্যমুখে বও!
নারী যেমন প্রসব-ব্যথা সয়,
তেম্‌নিধারা সজল চোখে সওগো সমুদয়!
অশ্রু মুছে আবার কাজে এগিয়ে চলে যাও!
মুক্তিকামি, দশের কাজে জীবন সঁপে দাও!
নইলে তোমার স্বার্থটুকু হায়,
মিথ্যা হয়ে মিশ্‌বে এবার ধরার মৃত্তিকায়!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

তুমি

তুমি চাঁদের মতন এসেছিলে হৃদয়-সাগর তীরে,
তুমি প্রভাত সম হেসেছিলে অরুণ-আলোয় ঘিরে।
মঞ্জরিত কুঞ্জতলে,
প্রস্ফুটিত পদ্মদলে,
পল্লবিত লতায়-পাতায় শিশির-কণার মত
হৃদয় আমার করে'ছিলে সিক্ত অবনত।

তুমি দুখের রাতে এসেছিলে সুখের স্বপ্ন সম,
তুমি হাসির মতন এসেছিলে শান্ত অনুপম।
গানের মতন গুঞ্জরিয়া,
ফুলের মতন প্রস্ফুটিয়া,
প্রেমের মতন সঞ্চারিয়া বিজন হৃদয়কোণে,
রাজার মতন এসেছিলে বুকের সিংহাসনে।

তুমি সুখের মতন এসেছিলে দুখের সমাধিতে,
তুমি বৃষ্টি হ'য়ে এসেছিলে দগ্ধ ধরণীতে।
পদ্ম-ফুলের গন্ধ ল'য়ে,
বাতাস-সম স্নিগ্ধ হ'য়ে,
জর্জ্জরিত হৃদয় 'পরে কেমন করে' এসে,
মুগ্ধ করে' নিয়েছিলে স্নিগ্ধ মধুর হেসে!

তুমি চলে' গেলে একটা যেন জলোচ্ছ্বাসের মত,
তুমি চলে' গেলে একটা যেন প্রলয় মেঘের মত।
ব্যর্থ করি' সকল আশা,
মৌন করি' সকল ভাষা,
দগ্ধ করে' রেখে গেলে মুগ্ধ হৃদয়-লতা,
প্রহেলিকার মতন এসে ফিরে গেলে কোথা?

শ্রীজগৎতারণ দাস

সহধর্ম্মিণী

(গল্প)

ক

সে ছিল কঞ্জুষের সর্দ্দার। যাক্—তাহাতে কাহারও আসিত যাইত না; সে এমন একটা রাজা, মহারাজা, রায়-বাহাদুরও নহে যে, তাহার কৃপণতায় অনেককে সহিতে হইবে বা সেজন্য কেহ তাহার নাম করিবে না কিংবা প্রত্যূষে তাহার মুখদর্শন করিবে না—এমন কিছুই নহে। বরং লোকের বিপদে-আপদে, সকালে-বিকালে মহেশ মণ্ডলের পরামর্শের দরকার কম-বেশী রামপুর-গ্রামের সকলেরই হইত।

তাহার কারণ ছিল দুইটি। মহেশ মণ্ডলের বয়স গ্রামের বড় বটগাছটির বয়সের মত সকলের অজ্ঞাত ছিল; বটের ভূ-লুণ্ঠিত জটাভার এবং মহেশের লোলচর্ম্ম গ্রামের অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিরাও আজন্ম দেখিতেছে, বলিয়া থাকে। দ্বিতীয় কারণ, মহেশ খুব আলাপী লোক ছিল; বুদ্ধি যতদূর জোগাইত, মহেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া যে পরামর্শ দিত, তাহা প্রায়ই ব্যর্থ হইত না। প্রশংসা শুনিলে, সে বলিত—শাদা চুলই তাহার বুদ্ধি।

মহেশ ছিল নির্ব্বিবাদ লোক,—ঝগড়া-ঝাঁটি করিতই না। আপনার ক্ষেত-খামার, ঘরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, দু'-তিনটি ছেলে ও বাঁশের চোঙ্গাভরা টাকা-নোট্ এবং গোলাপোরা ধান লইয়া সে চুপ-চাপ্ করিয়া কাটাইতেছিল।

লোকে যে তাহাকে কৃপণ বলিত, তাহা বাস্তবিক পক্ষে সত্য। একমুষ্টি চাল-ভিক্ষা সে ভিক্ষুককে দিত, তাহার ব্যতিক্রমে সে এ নাম ক্রয় করে নাই। গ্রামের লোকের আপদে-বিপদে সে মৌখিক পরামর্শ ব্যতীত অন্য সাহায্য করিতে বড়ই নারাজ ছিল। সে বলিত, তাহার অপোগণ্ড ছেলে-পুলে, "ছেলেমানুষ" পরিবার, তাহাতে তাহার বয়স যে পরিমাণ হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহাকে 'যাত্রা' করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইতেছে—এখন নাবালকদের জন্য সঞ্চয় করাই তাহার কাজ।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে সে বড় বড় গোলাগুলির পানে পলকশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। সে দৃষ্টিতে যেন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়িত; সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাতাস উতলা হইয়া পড়িত; সে স্তব্ধ হইয়া বসিত।

খ

একটা কি দায়ের মোকদ্দমায় হারিয়া নীলমণি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর ডিক্রীদারের দেনা পরিশোধ করিতে হইবে—নীলমণি অকূল পাথারে হাবু-ডুবু খাইতেছিল।

সন্ধ্যাবেলায় সে মহেশ মণ্ডলের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। মহেশ কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—তারপর, নীলু, কিছু খবর আছে?

নীলমণি কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—মোড়ল, তুমি যদি এবার না রাখ, ছেলে-পুলে নিয়ে একেবারে মরি।

মহেশ গম্ভীরভাবে তামাক টানিতে লাগিল।

নীলমণি বলিল—ডিক্রীদার ত আজ বাদে কাল টাকা চাইবে; ঘরে দুটি বই টাকা নেই—

মহেশ বলিল—সেই সময়ই বলেছিলাম ত আদালতে ঢুকো না; অমন সর্ব্বনেশে জায়গা আর নেই। অনেকদিনের কথা, একবার চুঁচ্‌ড়ো-হাঁসপাতালে ওষুধ আন্‌তে গিয়েছিলুম; আদালতের পাশেই হাঁসপাতাল, ভাব্‌লাম একবার আদালতটা দেখে যাই। ঢুকে, একজায়গায় বস্‌লুম। পানওলা পান বিক্রী কর্‌ছে, সবাই কিন্‌ছে, আমিও একপয়সার কিন্‌লুম; সবাই দাড়ী কামাচ্ছে—দুটোপয়সা দিয়ে আমিও কামালুম; বেরিয়ে আস্‌ছি—লাল-পাগ্‌ড়ী-মাথায় একটা লোক হাত পেতে দাঁড়াল। ভয়ে একটা টাকা তার হাতে ফেলে দিয়ে, ভোঁ দৌড় দিয়ে, গঙ্গায় এসে আঁজ্‌লা ভরে জল খেলুম। বিনিকাজেই একটাকা তিনপয়সা খরচ। আদালতের কড়িকাঠ, দেওয়ালের পর্য্যন্ত পেট আছে। —বলিয়া মহেশ আপনার মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া, হুঁকার মাথা হইতে কলিকা নামাইয়া নীলমণির সম্মুখে রাখিল। নীলমণি তাহা লইল না। সে বিমর্ষমুখে বলিতে লাগিল—যা হয়ে গেছে মোড়ল, তার ত আর চারা নেই।

মহেশ একটু উত্তেজিতভাবে বলিল—ছেলেবেলা থেকেই দেখে আস্‌ছি, যে কাজটি করে ফেলা যায়, তার ফলভোগ কর্‌তেই হয়। সব কাজ করা হয়ে গেলেই মনে হয়—না কর্‌লেই বেশ হত। আর যা হয়ে গেছে, তার ত হাত নেই।"

নীলমণি দেখিল, যুক্তি-তর্কদ্বারা মোড়লকে বুঝান যাইবে না। আসল কথাটা বলিয়া ফেলা যাক্।

বলিল—আমি তোমার কাছেই এসেছিলুম, সাতশো টাকা পেলে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার হই। আমাদের গ্রামে তুমি ছাড়'—

মহেশ বলিল—অন্য গ্রাম আছে ত।

নীলমণি বলিল—তা আছে; কিন্তু তারা কি দেখে আমায় এত টাকা দেবে বল? তুমি আমার গ্রামের লোক, একজাত, তোমার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্কও আছে—

মহেশ বলিল—তোমার বাবা আমার মাসীর দেওর হতেন।

নীলমণি বলিল—হুঁ। তুমি আমার অবস্থা জান, জমি-জারাত দেখেছ, তুমি টাকাটা দিতে পার। ধান কেটেই সব টাকা আমি শোধ কর্‌ব। সুদ, যে হারে বল্‌বে, দিতে রাজী আছি।

মহেশ একটু জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল—আমি ত সে ব্যবসা করি না।

নীলমণি দমিয়া গেল, বলিল—তা জানি। তবু বিনিসুদে এতগুলো টাকা পড়ে থাক্‌বে, তোমার পক্ষে সেটা ক্ষতি। তোমার ছেলে-পুলেকে ফাঁকি দেওয়া হয়, তাই ও কথা বল্‌লুম।

'হুঁ' বলিয়া মহেশ গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল, নীলু বলিল—মোড়ল, কি বল, পাব? বাঁচাবে আমাদের?

"অ্যাঁ!"

"ইচ্ছে কর্‌লেই তুমি দিতে পার।"

"ইচ্ছে কর্‌লেই দিতে পারি! আমি কি বর্দ্ধমানের মহারাজা যে, ইচ্ছে কর্‌লেই, কেউ হাত পাত্‌লেই অমনি দু'-পাঁচশো দিতে পারব!"—সে একটু হাসিল।

নীলমণি সবিস্ময়ে বলিল—দেবে না? সম্পর্ক রয়েছে, জাত-ভাই জেল খাট্‌ব, তাই দেখ্‌বে?

মহেশ বলিল—কি কর্‌ব বল? কাজের ফল আছেই।

নীলমণি দাঁড়াইয়া উঠিল, দীপ্তনেত্রে চাহিয়া, তীব্র কর্কশ কণ্ঠে কহিল—দেবে না, তাই বল।

মহেশ বলিল—তাই।

একমুহূর্ত্ত পরে, আত্ম-সম্বরণ করিয়া নীলমণি বলিল—জেলে যাব?

মহেশ উত্তর দিল না।

নীলমণি এবার মহেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—মোড়ল!

মহেশ ধরা, চাপা গলায় বলিল — পা ছাড়।

নীলমণি বসিয়াছিল, আবার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—তুমি আমার আপনার লোক,—

মহেশ বলিল—আমার ছেলে-পুলেও আমার পর নয়।

"আচ্ছা"—বলিয়া নীলমণি সশব্দ পদক্ষেপে সেস্থান ত্যাগ করিল।

গ

নীলমণি চলিয়া গেলে, মহেশ নিজের হাতে তামাক সাজিল। শীতকাল, অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি, বেশ শীত পড়িয়াছে। খরসান-তামাকে গলা গরম করিয়া লইয়া, মহেশ চালের গায়ে কাঠের তাকে সযত্নরক্ষিত মলিন বাসাচ্ছাদিত জীর্ণ রামায়ণখানি পাড়িয়া, খুলিয়া বসিল।

প্রদীপে অল্প তৈল ঢালিয়া উজ্জ্বল করিয়া দিল।

তারপর সুর করিয়া "মুনি বলে শুন, শুন"—ইত্যাদি পড়িয়া যাইতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে তাহার স্ত্রী একটি ছেলে কোলে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া মহেশ বইয়ের পাতা হইতে চোক তুলিয়া সুতা-বাঁধা চশ্‌মাখানি খুলিতে খুলিতে বলিল—নীলমণি এসেছিল। শুন্‌লে?

স্ত্রীর নাম—গিরিবালা।

গিরিবালা কহিল—শুন্‌লুম ত।

মহেশ জিজ্ঞাসা করিল—কি বল?

গিরিরালা কহিল— আমরা মেয়েমানুষ—কি আর বল্‌ব বল? আমরা ও-সবের বুঝিই-বা কি?

মহেশ বলিল—ওর ভেতর বোঝা-বুঝি কিছু নেই, এখন ঘর থেকে টাকা বের করে দিয়ে কি আমি তোমাদের পথে বসাব? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, একবেলা দু'টি করে খেয়ে, রোদ-বৃষ্টি না মেনে যা দু'পয়সা করেছি, রেখে যেতে পারি, ছেলেরা খেতে পাবে।

গিরিবালার বয়স পঁচিশ বৎসরের বেশী হইবে না, মনটি তাহার আরো কাঁচা, খুব হাল্কা। সে বলিল—সে সব কথা যাক্।

একটু পরে বলিল—এবার বেশী করে তেওড়া ছড়িও। ও বছর বিক্রী-সিক্রী করে ঘরে আর কিছুই ছিল না।

মহেশ বলিল—হ্যাঁ, এবার চল্লিশ বিঘেতেই ছড়াব। বীজ মজুত করে রেখেছি।

গিরিবালা বসিল, ছেলের মুখে স্তন্য দিতে দিতে বলিল—কবে ধান কাটা আরম্ভ হবে?

"ভট্‌চায্যি-মশায়কে পাঁজী দেখ্‌তে বলেছি। ভাল দিন পেলেই সুরু করে দেব। তুমি মুড়ি ভাজ্‌তে লাগাও; নাড়ুও করে ফেল।"

"দেখ, মাসের শেষে আমি যে একবার যাব। অনেকদিন

যাইনি ; আর দাদার প্রথম ছেলে, ভাত হবে, আমি না গেলে—”

“তা ত জানি। তবে কথা হচ্ছে কি না, গত বছর যা ফসল-কুটো হয়েছে, তাতে খর্‌চা তুলে বেশী কিছু পাই নি। এবার মা লক্ষ্মী দেন ত—পাব। সুধুহাতে ত যাওয়া হয় না। এক-খানা গয়না ত গোকুলের ছেলেকে দিতে হবে—ষাট-সত্তরের ধাক্কা।”

“সে তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। সেবার সর্ষে-বেচা টাকা তুমি আমায় দিয়েছিলে, আমার আছে, আমি খরচ কর্‌ব।”—বলিয়া গিরিবালা ঈষৎ হাসিল।

বৃদ্ধ হইলেও সে হাসির বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে, তাহার স্নিগ্ধ সারল্যে মহেশের অন্তর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ; সে-ও একটু হাসিয়া বলিল—তুমি যে আমার ঘরের লক্ষ্মী !

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব। গিরিবালার ছেলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া আসিয়া গিরিবালা বলিল—সেইখান্‌টা পড় আজ—সেই শক্তিশেলে পড়ে লক্ষ্মণের কি হল ?

“পড়্‌ছি ; তুমি একটু তামাক দাও দিকিন”—মহেশ চশ্‌মার সুতা কানে পরিতে লাগিল।

গিরিবালা তামাক সাজিতে উঠিল।

ঘ

একটি থেলো হুঁকা, মাটির হাঁড়িতে আগুন, হাতে একখানি কাস্তে লইয়া মহেশ ঘরের বাহির হইল। ইচ্ছা, ধানের জমি দেখিয়া, চড়া-মাঠে পটল নিড়াইয়া আসিবে।

তখন প্রত্যূষকাল : পাখীরা প্রভাত-কল-কূজনে লতা-বিতান মুখরিত করিতেছে। শীতের ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বরফের কণার মত হু-হু করিয়া ছুটিতেছে ; কোয়াসা সরিয়া তরুণ-অরুণা-লোকের পথ করিয়া দিতেছে। কালো কাপড়ের ঘোম্‌টার আড়াল হইতে ফুট-ফুটে রাঙ্গা মুখখানির মতই সূর্য্য-রেখা দেখা যাইতেছিল—মোড়ল ক্ষণমাত্রও সেদিকে চাহিল না ; এতখানি কবিত্ব বৃথায় গেল—তাহার কাছে যেন ইহার কোন মূল্যই ছিল না।

দুরন্ত শীত বলিয়া আজ তাহার বেশে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে—পায়ে কাদার বার্ণিশযুক্ত একজোড়া পুরাকালের চটিজুতা, গায়ে একখানি বোম্বাই চাদর—কতকাংশ মাথায় ফের্‌তা দিয়া জড়ান রহিয়াছে।

গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া সে মাঠে পড়িল। দুই ধারে যে হরিৎ-শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা রোজই মহেশ দেখে, আজও দেখিল। সঙ্গের আস্‌বাব মাটিতে নামাইয়া, করজোড়ে সে সেই মহান্ ও দিগন্ত-প্রসারিত অতুল ঐশ্বর্য্যময় দৃশ্যের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, সরঞ্জাম তুলিয়া লইয়া পুনরায় চলিল।

মা লক্ষ্মী এবার তাহাদের মাঠে মূর্ত্তিমতী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। মোড়ল যেন তাহার লক্ষ্মীর মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিল। তাহার মনের ভিতর যে ভাব হইতেছিল, তাহাকে সম্ভ্রম-ভক্তি, হর্ষ-গর্ব্ব, প্রীতি-আনন্দও বলা চলে না—সে ভাব আমাদের যেন একেবারেই অননুভূত, অবোধ্য !

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তাহার নিজের ক্ষেত। ব্যগ্র-ব্যাকুল দৃষ্টিতে মহেশ সেইদিকে চাহিয়া চলিতে লাগিল।

ও-কি-ও—গাছগুলি শুইয়া পড়িয়াছে না ? মাঝে মাঝে খালি খালি দেখাইতেছে না ? ও-কি ! তাই ত ! গাছ গরুতে খাইয়া গেল নাকি ?

মহেশের হাত হইতে হুঁকা, আগুন ধপ্ করিয়া পড়িয়া গেল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। ক্ষেত্রসন্নিধানে আসিয়া আলের উপর এক সুদীর্ঘ স্বরে ‘মা’ বলিয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িল।

‘পাকা ধানে মই’—কথাটা ছেলেবেলা হইতে সে শুনিয়াই আসিতেছিল, আজ স্বচক্ষে দেখিল। দেখিয়া পুত্রশোকাতুরা জননীর মত, নমিতশীর্ষ ধান্যগুলিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া হাহা-কার করিতে লাগিল। তাহার সেই বয়ঃবিকম্পিত দেহ হইতে যেন প্রবলবেগে একটা অগ্ন্যুৎপাত হইতেছিল !

একটানে চল্লিশ বিঘা জমির ধান্যের কতকাংশ কর্ত্তিত, কত-কাংশের উপর কে নির্ম্মমভাবে মই টানিয়া গিয়াছে। কর্ত্তিত অংশের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহেশ বাষ্পাকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিল, একস্থানে যেন জমাট রক্তের দাগ,—রক্তটা পুরাতন নহে।

কি সর্ব্বনাশ তাহার হইয়াছে ! তাহার বৎসরের আশা-ভরসা, ধন-মান, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব গিয়াছে।

করুণা-স্নেহ-বিগলিত নেত্রে, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—শস্যশূন্য শীর্ষগুলি যেন তাহারই মত দীন—অতি দীন হইয়া পড়িয়াছে !—তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ঙ

সুধু কাস্তেখানি হাতে লইয়া মহেশকে যে ছুটিতে দেখিল, সে আর কথা কহিতে সাহস পাইল না। কেহ কেহ ‘মোড়ল-মশাই’ বলিয়াই থামিয়া গেল, কেহই কোন কারণ জানে না—সকলেই অবাক্ হইয়া গেল।

বাড়ীর বাহির হইতেই সে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে !

সে স্বর শুনিয়া গিরিবালা আলু-থালু বেশে বাহির হইয়া আসিল। মহেশ ছুটিতে ছুটিতে বলিল—ঘরে চল, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে !

ঘরে ঢুকিয়া বাসি বিছানায় বসিয়া মাথায় হাতে দিয়া বলিল—একটু জল দে, মাথায়। পুড়ে গেল, পুড়ে গেল।

গিরিবালা জিজ্ঞাসিল—কি হয়েছে গা ? অমন কর্‌চ কেন ?

তাহার হাত হইতে জলের ঘটি লইয়া মহেশ নিজের মাথায় ঢালিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া গিরিবালা বলিল—এমন সর্ব্বনাশ কে কর্‌লে গা ?

মহেশ দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল—কালকের সেই সর্ব্বনেশে, গিরি, কালকের সে !

গিরিবালা শিহরিয়া, মহেশের হাত ধরিয়া বলিল—বস। একটু থামিয়া পুনরায় বলিল—কেমন করে জান্‌লে যে—সে ?

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত বসিয়া, মহেশ জোর গলায় বলিল—তারই কাজ, তারই কাজ ! কাল সে ‘আচ্ছা’ বলে গেছ্‌ল, গিরি, সেই নীলেই করেছে ! আমার সর্ব্বনাশ করেছে ! কেন আমি সাবধান হই নি ! কাল রাত্রেই কেন বুঝ্‌লুম না, সে টাকা না পেয়ে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বে। কর্‌লে, এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে !

গিরিবালা “হয় ত”—আরম্ভ করিবামাত্র কথায় বাধা দিয়া মহেশ বলিল—হয় ত নয়, সে-ই, সে-ই ! তাকে কি করি, গিরি ? তাকে কেটে ফেল্লেও ত আমার রাগ যাবে না।

“তাকে কেটে ফেল্লেও ত আর তোমার ফসল ফিরে পাবে না !”

“তা পাব না ! তবে—”বলিতে বলিতে তাহার মুখের উপর বর্ষার বারি-প্রপাতের মত সলিলরাশি নামিতে লাগিল।

গিরিবালা আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া, তাহার মুখ মুছাইয়া কহিল—দেখ, কি পাপ আমরা করেছিলুম, তাই সর্ব্বনাশ হল ; না জেনে একজনকে—ওকি, উঠ্‌চ কেন, বস, বস ; অত কেঁদো না। যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই দেবেন, এ বিশ্বাস ত তোমারই ; তবে আজ কেন তা ভুলে যাচ্ছ ? সে বিশ্বাস হারালে যে আরো কষ্ট পাব।

চ

গ্রামের লোক যখন সান্ত্বনা দিতে আসিল, মহেশ তখন ঘরে শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের ডাকা-ডাকিতে গিরিবালা তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়া দিল। মহেশ কাঁপিতে কাঁপিতে, শুষ্কমুখে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই বলিল—তাই ত ! এমন সর্ব্বনাশ !

মহেশ সকলের পানে চাহিয়া যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিল !

আগন্তুকগণ বলিল—উঃ, কি সর্ব্বনাশ !

মহেশ ভাঙ্গা গলায় কহিল—সর্ব্বনাশ বলে সর্ব্বনাশ !

“তাই ত এমনটা কে কর্‌লে ?”

মহেশ কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটি বৃদ্ধা রমণী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—মোড়ল ঠাকুর-পো, বড় বিপদ ! তুমি আমায় রক্ষে কর।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে গা সেনগিন্নি ?

সেন-গিন্নি মহেশের নিকটে আসিয়া বলিল—মোড়ল ঠাকুর-পো, নীলুর বড় বিপদ—প্রাণ যায় ! দোহাই ঠাকুর-পো, সব ভুলে যাও, আমার ‘মা’-ডাক-শোনা যাতে বজায় থাকে, তাই কর।

মহেশ বিস্মিত হইয়া বলিল—কি ভুলে যাব ? ভুল্‌ব কি ? শিগ্‌গির বল—

তাহার পায়ের কাছে পড়িয়া সেন-গিন্নি বলিল—হাত একে-বারে কাস্তেতে কেটে ফেলেছে, ঠাকুর-পো ! রাত থেকে রক্ত বন্ধ হয় নি।

“ভুল্‌ব কি, শিগ্‌গির তা বল—

“কেন আর লজ্জা দাও ঠাকুর-পো ! বুদ্ধির দোষে—”

মহেশ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—আমার সর্ব্বনাশ করেছে !

“দোহাই তোমার ঠাকুর-পো ! একবার এস। কোন ওঝা, ডাক্তার রক্ত বন্ধ কর্‌তে পার্‌চে না। তোমার সেই বাঁধন-মন্তরটা দিয়ে—”

মহেশের মনে পড়িল, ক্ষেত্রে জমাট রক্তের চিহ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। এক ঝলক উষ্ণ রক্ত তাহার মাথায় উঠিল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—গিরি, শুন্‌লে ?

সেন-গিন্নির পানে ফিরিয়া বলিল—ডাক্তার দেখাও গে।

সেন-গিন্নি তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—রক্ষে কর ঠাকুর-পো !

গিরিবালা ঘোম্‌টা টানিয়া আসিয়া মহেশের হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বলিল—এখনও কেন বুঝ্‌ছ না, যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই নিয়েছেন, আবার তিনিই দিবেন !

মহেশ স্তব্ধ হইয়া গিরিবালার মুখের দিকে কি-এক-রকম চোখে তাকাইয়া রহিল। গিরিবালার মুখে যেন স্বর্গের ছায়া পড়িয়াছে !

খানিকক্ষণ হেঁটমুখে ঘরের ভিতর পায়চারি করিয়া মহেশ আনমনে কি যেন ভাবিতে লাগিল। তারপর, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, মহেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেন-গিন্নীকে ডাকিয়া বলিল, “চল সেন-বৌ, আমি যাচ্ছি।”

গিরিবালা তখন গলায় আঁচল দিয়া স্বামীর মঙ্গলের জন্য ঠাকুরের পায়ে প্রণাম করিতেছিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সূক্ষ্মলোম-পরিণয়

(নাটক)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

চুম্বক :—কৃষ্ণলোম মেষোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সূক্ষ্মলোম রাবা-জীবনের সহিত বনান্তরবাসী স্থূলপুচ্ছ মেষোপাধ্যায়ের কন্যা শ্বেতলোমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। নিজে না গিয়া, কৃষ্ণলোম এক বন্ধুকে মেয়ে দেখিতে পাঠায়। পূর্ব্ববৈরবশতঃ সে বন্ধু গিয়া বরের রূপ-গুণের এমন বর্ণনা করিয়া আসে যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা। স্থূলপুচ্ছ তথাপি বিবাহ দিতে স্বীকৃত হয় ; কিন্তু তাহার স্ত্রী গাঢ়লোমার এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি ছিল। এ কারণে গাঢ়লোমা এক রাত্রিশেষে কন্যাকে লইয়া পলায়ন করি-য়াছে। এদিকে সূক্ষ্মলোম, কোনও এক বন্ধুর মুখে শ্বেতলোমার রূপ-গুণের বর্ণনা শুনিয়া একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে এবং বিবাহ না হওয়াতে মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করিয়া যায়। ক্রমে সে বানর-মহারাজার দেশে গিয়া উপস্থিত হয় এবং মহারাজার প্রিয় সভাসদ্-রূপে কিছুদিন সেখানে অবস্থিতি করে। সে সময় বানর-মহা-রাজার সহিত মহিষ-মহারাজার যুদ্ধের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছিল। সূক্ষ্মলোম ছুটি লইয়া তাহার প্রণয়িনীকে অন্বেষণ করিতে বাহির হয়। বানর-মহরাজা যুদ্ধ-ঘোষণা করিবার পর সূক্ষ্মলোম ফিরিয়া আসে। তখন প্রকাশ হয়, ভ্রমণকালে পীড়িত হইয়া কোনও এক মেষ-পরিবারে সে আশ্রয় লইয়াছিল। পীড়ার সময় তাহাদের একটি মেয়ে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছিল। আরোগ্যলাভ করিয়া সূক্ষ্মলোম সেই মেয়েটিকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে। এদিকে তাহার পিতা ও স্থূলপুচ্ছ, নিজ নিজ সন্তানকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়াছে। বানর-মহারাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন—একমাসেই মহিষগণ পরাজিত হইল—মহিষ-রাজ্য বানর-মহারাজার করতল-গত হইল। ওদিকে কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছ অন্বেষণ করিতে

করিতে মহিষ-রাজ্যের দিকে আসিতেছে। সূক্ষ্মলোম, রাজার অনুমতি পাইয়া বানর-রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছিল। মহিষ-রাজ্যে সভা করিয়া, বানর-মহারাজা নিজপুত্রকে ঐ দেশের শাসন-ভার দিয়া, পাত্র মিত্র প্রভৃতি সহ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। যুবরাজ পিতাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, মহিষ-রাজের কাগজ-পত্র অন্বেষণ করিতে করিতে গর্দ্দভ-রাজের একখানি পত্র পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি বিগত যুদ্ধে মহিষ-রাজকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন। যুবরাজ তাই, গর্দ্দভ-রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিয়াছেন। সেই অনুমতি-পত্র লইয়া সূক্ষ্মলোম মহিষ-রাজ্যে আসিয়াছে। কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছও সেখানে আসিয়া উপস্থিত। হঠাৎ পিতা-পুত্রে সাক্ষাৎ—কিন্তু সূক্ষ্মলোম নিজ বিবাহের কথা গোপন করিল। ওদিকে গাঢ়লোমা, কন্যা শ্বেতলোমাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। নানাদেশ অন্বেষণ করিয়া গর্দ্দভ-রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বানরেরা গিয়া সে রাজ্য জয় করিয়া আজ্ঞা দিয়াছে, গর্দ্দভ-রাজ্যের সমস্ত প্রজাকে মহিষ-রাজ্যে উঠিয়া যাইতে হইবে। অন্য সকলের সঙ্গে গাঢ়লোমাও তাই মহিষ-রাজ্যে আসিতেছে।

পঞ্চম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য।

মহিষ-রাজ্য।

স্থূলপুচ্ছ ও গাঢ়লোমা।

স্থূল। দেখ দেখি গিন্নি, ছি ছি, কি কাণ্ড করিলে!
গাঢ়। অদৃষ্টে আমার ছিল যাহা, কে খণ্ডাবে
বল?
স্থূল। হায় হায়, সে সময় যদি তুমি
শুনিতে আমার কথা, কত সুখ হত!
এমন সুন্দর ছেলে, শিক্ষিত, বিনয়ী,
সচ্চরিত্র, উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত,
ধনীর সন্তান, আর কোথা পাওয়া যেত?
গাঢ়। তখন ত দেখি নাই তারে, সুধু শুনে
পরের মুখের কথা, এ কাণ্ড বাধিল।
যদি জানিতাম ছেলে এমন সুন্দর,
এমন স্বভাব মিষ্ট, তা হলে কি কভু
পলায়ন করিতাম শিতুরে লইয়া?
আহা বাছা, কোথা গেলি তুই? (ক্রন্দন)
স্থূল। বাছা যে আমার আহা দুধের মেয়েটি,
কোথায় রহিল পড়ে? কেই বা তাহারে
দেখিতেছে-শুনিতেছে। হায়, এ সকল
তোমার বুদ্ধির ফল।
গাঢ়। ওগো, সত্য তাহা।
আমি সর্ব্বনাশী, মূল এ সর্ব্বনাশের।
আমার বাঁচিয়া থাকা সুধু বিড়ম্বনা;
কলঙ্কের বোঝা বহা সুধু এ জীবন।
ইচ্ছা হয়, ঝাঁপ দিই নদীজলে গিয়া
অথবা বাঘের মুখে যাই।
স্থূল। ও কি কথা?
ও কথা বলিতে নাই।
গাঢ়। না থাক্ বলিতে,
কিন্তু করিবই আমি। আপনার হাতে
সোণার প্রতিমাখানি দিয়ে বিসর্জ্জন,
হাসিব-খেলিব আমি, আহার করিব,
সুখে নিদ্রা যাব? না, না, তাহা পারিব না—
পারিব না। ওগো, তুমি বলিও না কিছু।
(ক্রন্দন)
স্থূল। না না গিন্নী—চুপ কর, চুপ কর, ছি ছি;
এক শোকে আজীবন মরিব পুড়িয়া,
তাহার উপর তুমি দিওনা জ্বালিয়া
নূতন আগুন।
(কৃষ্ণলোমের প্রবেশ। গাঢ়লোমার প্রস্থান।)
দাদা, এস এস, বস।
কৃষ্ণ। ভাই, কাঁদিয়া-কাটিয়া আর কি হইবে
বল? চুপ কর, স্থির হও। হারাইয়াছিল
আমারও সন্তান—ভাই, আমি কি কভুও
ছেড়ে দিয়ে সব আশা, এমন করিয়া—
স্থূল। তোমার ছিল যে পথ আশা করিবার।
তোমার জোয়ান ছেলে, লেখা-পড়া জানে,
বলবান্—তার জন্য কি ছিল এমন
ভাবনার কথা? প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে,
যেখানেই থাক্—ইহা জানিতে নিশ্চয়;
আমার যে অন্য কথা ভাই! শ্বেতলোমা
নিতান্ত বালিকা, ভীরু, বুদ্ধি-বলহীন,
কেহ তার সঙ্গে নাই, অতি অসহায়—
কেমনে করিব আশা বাঁচিয়া সে আছে?
কন্যাটি লইয়া সাথে গৃহিণী যখন
পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন ত
হয় নি ভাবনা এত!
কৃষ্ণ। দেখ ভাই, আমি
বলিতেছি, মেয়ে তব পাইবে ফিরিয়া।
এ প্রদেশ সুশাসিত, বাঘ-ভালুকের
ভয় তত নাই; কোনও ভদ্র-পরিবারে
নিশ্চয় তোমার কন্যা পেয়েছে আশ্রয়।
স্থূল। আহা, ভাই, সত্য হোক্ তোমার বচন।
যদি তারে একদিন খুঁজে পাওয়া যায়,
তা হলে যে কি আনন্দ হয়! সূক্ষ্মলোম-
বাবাজীরে জামাতা করিয়া, তুমি, আমি
দুই বুড়া—সুখে বসে হরিনাম করি।
কৃষ্ণ। তাই হবে—তাই হবে।—আমার ত মনে
দৃঢ় এ বিশ্বাস, ভাই, মেয়েটি তোমার
শীঘ্র ফিরে পাওয়া যাবে। ভাবিও না কিছু।
স্থূল। দেখি, অদৃষ্টে কি আছে।
কৃষ্ণ। আজ আসি তবে।
স্থূল। এত শীঘ্র? বস বস।
কৃষ্ণ। আসিব আবার।
আজ যাই, কায আছে কিছু। নমস্কার।
স্থূল। নমস্কার ভাই! (কৃষ্ণলোমের প্রস্থান)
(গাঢ়লোমার পুনঃপ্রবেশ।)

গাঢ়। আহা, কৃষ্ণলোমবাবু
বড় ভাল জানোয়ার। কিবা মিষ্ট কথা!
ওঁর কথা শুনে যেন হতেছে বিশ্বাস,
ফিরিয়া পাইব মেয়ে। উনি আমাদের
বেহাই হইলে, আহা, কি যে সুখ হয়!
কপালে কি আছে তাহা?
স্থূল। (দূরে দৃষ্টি করিয়া) গিন্নী—গিন্নী—ও কে?
গাঢ়। কই?
স্থূল। ঐদিকে দেখ। ও কে আসিতেছে?
ঠিক যেন আমাদের শিতুর মতন।
ও কি শিতু নয়?
গাঢ়। ও মা, শিতুই ত বটে!
বেহাই কি বাক্‌সিদ্ধ!—ফলে' গেল কথা
চক্ষুর পলকে।
(শ্বেতলোমার প্রবেশ।)
শ্বেত। মা! বাবা!
গাঢ়। (কন্যাকে বুকে লইয়া) এলি মা? বাছা,
কোথা ছিলি এতদিন? (ক্রন্দন)
স্থূল। (কন্যাকে কোলে লইয়া) হাঁরে বোকা মেয়ে,
এতদিন বাপ-মায়ে এমনি করিয়া
কাঁদাইতে হয়?
শ্বেত। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাবা, আমি পথ ভুলে
গিয়েছিনু হারাইয়া।
গাঢ়। (কন্যাকে কোলে লইয়া) বাছা, এতদিন
কোথায় ছিলি রে?
শ্বেত। বাবা, হারাবার পরে
ঘুরে ঘুরে দুই দিন গেল। তিন দিনে,
একটা গাছের তলে বসিয়া বসিয়া
কাঁদিতেছিলাম, এক বৃদ্ধ, ভদ্র মেষ
যেতে যেতে সেই পথে দেখিলেন মোরে।
কাছে আসি বলিলেন—"কে তুমি এখানে,
কেন কাঁদিতেছ এত?"—আমি কহিলাম
সব কথা খুলিয়া তাঁহারে। স্নেহস্বরে
বলিলেন—"ভাবনা কি? উঠ, কাঁদিও না।
চল গৃহে মোর—আমি কন্যার আদরে
পালন করিব তোমা।"—গেনু তাঁর সাথে।
যেমন বাবুটি ভদ্র, গৃহিণী তেমনি।
রাখিয়াছিলেন মোরে বড়ই যতনে।
স্থূল। কতদূরে থাকে তারা?
শ্বেত। এখান হইতে
দুদিনের পথ।
স্থূল। তবে এতদূরে তুই
আসিলি কেমন করে? কোথায় তাহারা?
(শ্বেতলোমা নীরব)
গাঢ়। দেখিছ না সীঁথিতে সিন্দূর?
স্থূল। (সবিস্ময়ে) কৈ, দেখি!
তাই ত গো!—শিতু, তোমার বিয়ে হয়ে গেছে?
কবে হল? কার সঙ্গে?
(শ্বেতলোমা নীরব)
গাঢ়। (জনান্তিকে) তুমি কি পাগল?
বলিবে কি তোমার সাক্ষাতে? যাও যাও।
(স্থূলপুচ্ছের প্রস্থান)
হাঁ মা—বল দেখি কি হয়েছে সব।
শ্বেত। (অবনত মুখে) তারা
বিবাহ দিয়েছে, নিজেদের মেয়ে বলে
পরিচয় দিয়ে।
গাঢ়। ইহা জামাই জানেন?
শ্বেত। না মা, কভু বলি নাই আমি।
গাঢ়। জামাইটি
দেখিতে কেমন?
শ্বেত। (নীরব)
গাঢ়। তিনি কালো না সুন্দর?
কালো বুঝি?
শ্বেত। না, মা।
গাঢ়। বেশ সুন্দর?
শ্বেত। (নীরবে হাস্য)
গাঢ়। বয়স
কত তাঁর?
শ্বেত। বড়।
গাঢ়। তিনি প্রথম পক্ষের?
নহেন ত দোজবরে?
শ্বেত। দোজবরে কেন
হতে যাবে?
গাঢ়। তোরে তিনি ভাল ত বাসেন?
শ্বেত। (নীরবে হাস্য)
গাঢ়। বেশ বেশ; বেঁচে থাক্ তোরা। জামাইটি
আছেন কোথায়?
শ্বেত। তিনি বানর-রাজার
সভাসদ্, থাকি মোরা রাজধানীতেই।
দশ দিন হল আজ, গৃহ হতে তিনি
এসেছেন এইখানে সরকারী কাযে।
কথা ছিল দুই দিনে যাইবেন ফিরে—
বিলম্ব দেখিয়া তাঁর, মনে মনে বড়
দুর্ভাবনা হল; তাই আসিয়াছি আমি
সন্ধান লইতে তাঁর। তোমরা কেমনে
এখানে আসিলে?
গাঢ়। বাছা, ক্রমে তা বলিব।
কত পথ এসেছিস্ চলে, কত ক্ষুধা
পাইয়াছে তোর। ঐ নদীটিতে নেমে
স্নান করে আয়। কিছু খেয়ে নিয়ে, শেষে
শুনিস্ সকল কথা। (শ্বেতলোমার প্রস্থান)
স্থূলপুচ্ছের প্রবেশ।
গাঢ়। শুনিলে?
স্থূল। শুনেছি সব। ভালই হয়েছে।
মেয়েরে যে পাওয়া গেল, বহুভাগ্য তাই।
জামাতার সন্ধান করিতে যাও তুমি,
দেরী করিও না। সে যখন সভাসদ্
বানর-রাজার, সূক্ষ্মলোম অবশ্যই

চিনিবে তাহারে। তার কাছে গেলে,
নিশ্চয় সন্ধান পাবে, কোথায় সে আছে।

স্থূল। তাহা যেন হল। আহা, কৃষ্ণলোম-ভায়া
বৈবাহিক হইল না—এই যা আপ্‌শোষ।
অমন স্থন্দর ছেলে—শিক্ষিত, বিনয়ী,
তাহারে জামাই করা অদৃষ্টে হল না।

গাঢ়। না হল—না হল। সেও রাজ-সভাসদ্
এও রাজ-সভাসদ্। কে বেশী স্থন্দর—
কে বেশী বিদ্বান্—তাহা নিয়ে তর্ক করা
নিষ্ফল এখন। যা হবার, হইয়াছে।

স্থূল। সে ত ঠিক কথা।

গাঢ়। আমি, শিতুর খাবার
যোগাড় করিয়া রাখি। তুমি যাও, যাও,
জামাইয়ের লওগে সন্ধান।

স্থূল। তাই যাই।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মহিষ-রাজ্য।

স্থক্ষ্মলোম।

স্থক্ষ্ম। (স্বগত) যার কথা বলিছেন স্থূলপুচ্ছবাবু,
সে ত নহে আমারই প্রেয়সী? আর কেহ
মেষ-সভাসদ্ আছে, তাহা ত জানি না।
আমিও ত এসেছি বলিয়া, "দুই দিনে
ফিরিয়া আসিব।"—যাই হোক্, তাঁহাদের
করা গেছে সকলেরে আজি সন্ধ্যাবেলা
নিমন্ত্রণ;—আসিলেই সব জানা যাবে।

(চিন্তা)

প্রেয়সীরে যতবার করেছি জিজ্ঞাসা
বাল্য-পরিচয় তার—কিছু সে বলেনি।
তা হলে কি স্থূলপুচ্ছবাবুর কন্যাই
হারাইয়া, সে দয়ালু মেষ-পরিবারে
আশ্রয় পাইয়াছিল—তাহারাই শেষে
নিজকন্যা-পরিচয়ে দিয়াছে বিবাহ
মোর সাথে?—কিছু নাহি আশ্চর্য্য তাহাতে।

(চিন্তা)

সন্ধ্যা হল। এখনও ত আসিল না তারা!
ক্রমেই যে অধীরতা বাড়িতেছে মোর!
ভাল, যাহা ভাবিতেছি তাই যদি হয়?
আমি যে বিবাহ-কথা গোপন করেছি
পিতার নিকটে,—তাহা প্রকাশ হইলে
নাহি জানি কি বিভ্রাট্ বাধাবেন তিনি।

(চিন্তা)

ঐ বুঝি আসিতেছে তারা। দূর হতে
ভাল নাহি দেখা যায়।

(নিরীক্ষণ)

স্থূলপুচ্ছবাবু,
বাবা তাঁর পাশে—বেশ চেনা যাইতেছে।
দুইটি স্ত্রীলোক ঐ আসিছে পশ্চাতে—
স্থূলপুচ্ছবাবুর গৃহিণী আর দাসী।
কে ঐ বালিকা সঙ্গে?—ডাকিল কুক্কুর,
ভয় পেয়ে বালিকাটি ছুটিয়া আসিল
অগ্রসরি পিতার নিকটে। আসিতেছে
ক্রমে আরও কাছে। যাহা ভাবিয়াছি তাই!
ঐ ত আমার নবপরিণীতা বধূ,
আসিতেছে ভ্যা-ভ্যা করি দুলাইয়া ল্যাজ্।
অমন মধুর ভ্যা-ভ্যা আর কার আছে?
অমন স্থন্দর ল্যাজ্—আহা মরি মরি—
কে কোথা দেখেছে আর? আঃ—কি আহ্লাদ
হইতেছে! আসিয়া পৌঁছিল।

(সকলের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। এস এস
স্থূলপুচ্ছবাবু—এস তোমরা সকলে।

(এক প্রান্তে পুরুষ-জন্তুগণ, অপর প্রান্তে স্ত্রী-জন্তুগণ দণ্ডায়মান)

গাঢ়। ওকি শিতু—ওঁকে দেখে ঘোম্‌টা দিলি যে!
জামাইয়ের বন্ধু উনি ভেবেছিস্ বুঝি?
উনি বলেছেন—"আমি সভাতে নূতন,
চিনি না সকল সভাসদে। আর কেহ
মেষ-সভাসদ আছে, জানি না ত আমি।"

শ্বেত। না মা, তা না থাকিতেও পারে।

গাঢ়। সে কি কথা?

শ্বেত। উনি তিনি।

গাঢ়। উনি তিনি? উনিই জামাই?

শ্বেত। হাঁ মা।

গাঢ়। অ্যাঁ! সত্য না কি?—ওগো শোন, শোন।
(স্থূলপুচ্ছের তথায় আগমন)
ওগো—আমি জামাইয়ের সকল সংবাদ
জানিতে পেরেছি।

স্থূল। কোথা? কোথা সে এখন?

গাঢ়। (অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া)
ঐ—উনিই জামাই।

স্থূল। ও ত স্থক্ষ্মলোম!

গাঢ়। হাঁগো—উনিই জামাই।

স্থূল। অ্যাঁ! অ্যাঁ! বল কিগো!

গাঢ়। শিতু—আয়, যাই মোরা বাড়ীর ভিতরে।
আয় দাসী!

(স্ত্রী-জন্তুগণের প্রস্থান)

স্থূল। (ফিরিয়া)
এ কি কাণ্ড জামাই-বাবাজী!

স্থক্ষ্ম। (স্বগত) দেখিতেছি সব কথা হয়েছে প্রকাশ।

কৃষ্ণ। পাগল হইলে না কি স্থূলপুচ্ছবাবু?
জামাই বলিছ কেন এরে?

স্থূল। (সহাস্তে) বলিতেছি
জামাই বলিয়া।

কৃষ্ণ। সে কি!

স্থূল। জিজ্ঞাসা কর না
নিজ পুত্রকেই।

স্থক্ষ্ম। (অবনতমুখে) বাবা, সত্য কথা ইহা।

কৃষ্ণ। বলিস্‌নি এতদিন আমারে ত কিছু!

স্থূল। ভয়ে বলে নাই। তোমার অজ্ঞাতসারে
বিবাহ করেছে—তাই সাহস করিয়া
পারেনি বলিতে।

কৃষ্ণ। তা—তা—ভয়টা কিসের?
একজন দূরবনে পড়ি বেয়ারামে
কিছুদিন ছিল এক মেষ-পরিবারে।
সে কি তুই?

স্থক্ষ্ম। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কৃষ্ণ। শক্ত বেয়ারাম?

স্থক্ষ্ম। আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনদিন ছিলাম বেহুঁস্।
জীবনের আশা কিছু নাহি ছিল আর।

স্থূল। আমার শিতুই ওরে করিয়া শুশ্রূষা
আরোগ্য করিয়াছিল। ভবিতব্যতার
আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত ইহা। মেয়েটি আমার
নিজ ভাগ্যবলে স্থধু বাঁচায়েছে ওরে—
তুমি কর উহাদের আশীর্ব্বাদ, যেন
দুইজনে বেঁচে থাকে দীর্ঘজীবী হয়ে
স্থখে ও সম্পদে।

কৃষ্ণ। আছে যতগুলি লোম
দেহেতে আমার—তত বর্ষ পরমায়ু
হোক্ উভয়ের। রাজা হোক্ স্থক্ষ্মলোম,
বধূমাতা শ্বেতলোমা হোন্ রাজরাণী।

স্থূল। অন্য বনে—অন্য বনে—এ বনেতে নহে।
(জনান্তিকে) বানরের রাজ্য ইহা—এখানে ও কথা
বলিও না দাদা—কোথা কে শুনিতে পাবে,
পড়ে যাব সবস্থদ্ধ রাজদ্রোহিতায়।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। ভিতরে ডাকিতেছেন জামাইবাবুকে।

কৃষ্ণ। যাও বাবা—যাও।

(সলজ্জভাবে স্থক্ষ্মলোমের প্রস্থান)

স্থূল। ভাই দেখ, শেষকালে
বেহাই হলাম দুইজনে। যে আহ্লাদ
হইতেছে! এতদিনে সার্থক হইল
সব দুঃখ, সব ক্লেশ, সব দুর্ভাবনা।

কৃষ্ণ। তা হল, বেয়াই।

স্থূল। আমি ভাবিতেছি ভাই,
গৃহিণীকে রেখে হেথা চলে যাব দেশে।
সেখানে যা-কিছু আছে বিষয়-আশয়,
জমি-জমা—সে সমস্ত বিক্রী করে ফেলে
এই দেশে উঠিয়া আসিব। স্থক্ষ্মলোম-
বাবাজীউ থাকিবে যেখানে, কাছাকাছি
তার, জমি লয়ে বিঘা দুই চারি, মোরা
বুড়া-বুড়ী সেখানে করিব বসবাস।
শ্বেতলোমা একমাত্র সন্তান আমার—
তারে ছেড়ে দূরে থাকা প্রাণে সহিবে না।

কৃষ্ণ। আমিও করিব তাই। স্থক্ষ্মলোম তবে
চলে যাক্ রাজধানী দিন-দুই পরে,
রাজ-অনুমতি লয়ে আস্থক এখানে
যুবরাজ-সভাসদ্ হয়ে। তারপর
একত্র করিব যাত্রা মোরা দুইজনে।

স্থূল। সেই ভাল পরামর্শ—ওহে ওহে ওহে—
সরে যাও—সরে যাও—বেয়ান তোমার
আসিছেন চূণে-হলুদের বাটি নিয়ে।

(গাঢ়লোমা কর্ত্তৃক চূণে-হলুদ নিক্ষেপ।
কৃষ্ণলোম ও স্থূলপুচ্ছের বস্ত্রাদি হরিদ্রারঞ্জিত হওন।)

যবনিকা।

শ্রীজানোয়ারমোহন শর্ম্মা

—*: সমাপ্ত :*—

গৌড়ের কথা

২

গৌড় অতি প্রাচীন স্থান। বৈদিক গ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত খুঁজিয়া 'গৌড়' নামের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গৌড়ীয়দিগের কেশ-রচনার পদ্ধতির কথা লিখিত আছে। বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রেও গৌড়ীয় রীতির উল্লেখ আছে। এই দুইখানি শাস্ত্রই অতি প্রাচীন। অতঃপর পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে (৬।২।১০০) 'গৌড়পুর' নামক নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ 'গৌড়পুরে'র নাম জৈন হরিবংশেও উল্লিখিত আছে। জৈন নেমিনাথ ও পার্শ্বনাথ অঙ্গ-বঙ্গাদি দেশে জৈনধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; জৈন হরিবংশে 'অরিষ্টপুরের' (রাঢ়দেশের) সহিত 'গৌড়পুরে'র নাম একত্র উল্লিখিত থাকায় গৌড়পুরকে সম্ভবতঃ আমাদের গৌড় বলিয়াই মনে হয়। ইহার পর দণ্ডীর কাব্যাদর্শে কাব্যের মার্গাবলীর মধ্যে 'বৈদর্ভ'ও 'গৌড়ীয়' মার্গ বিশেষ করিয়া আলোচিত হইয়াছে। কাব্যাদর্শ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রন্থ।

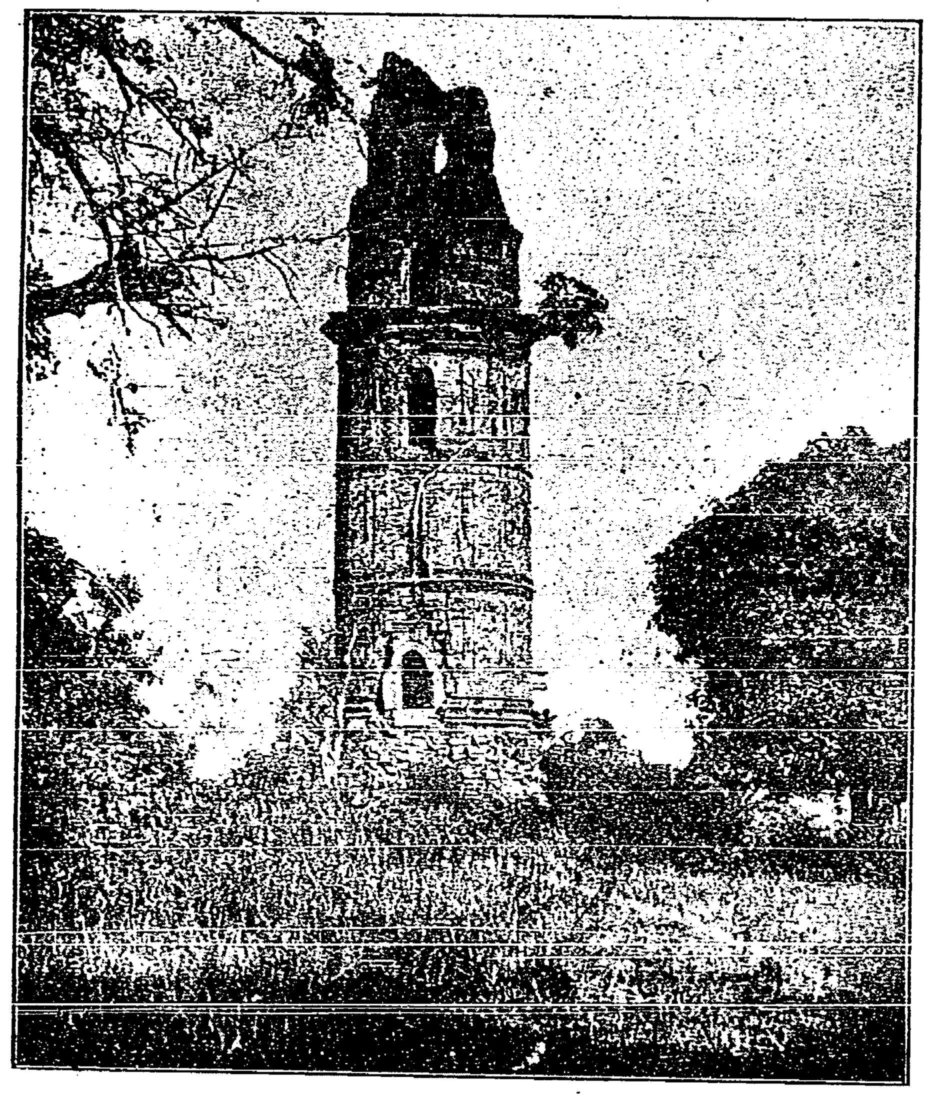

সংস্কারের পূর্ব্বে মিনার

আরিয়ান, গৌড়ের নাম 'গৌড়রসি' (গৌড়বর্ষ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। ডিওডোরাস্ ইহাকে 'গণডারিস্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। টলেমি ইহার নাম দিয়াছিলেন "গৌড়ীঘোস"। নেনাস গৌড়েশ্বরীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের জন্য ইহার নাম দিয়াছিলেন "গৌড়িয়ানডেস্"। শঙ্করাচার্য্যও "গৌড়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বহুকাল হইতে গৌড়-নগর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মতে গৌড়, খৃষ্ট জন্মিবার ৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাজধানী বলিয়া প্রখ্যাত ছিল। টলেসি ইহাকে "গেঞ্জিনা রিজিয়া" বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বদেশের নামই প্রকৃত বঙ্গদেশ। বর্ত্তমান Benga'এর পূর্ব্বাঞ্চল বঙ্গ, পশ্চিমাঞ্চল গৌড়।

ত্রেতাযুগে, গৌড় 'দশারণ্য' নামে পরিচিত ছিল। এখানে দশটি অরণ্য থাকাতে ইহার নাম দশারণ্য হইয়াছে। ঐ যুগে ইহা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ছিল: (১) মিথিলা—উত্তর-পশ্চিমভাগ; (২) প্রাগ্‌জ্যোতিষ উত্তর-পূর্ব্বভাগ। উৎকল ও গয়ের রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ত্রেতাযুগে পূর্ব্ব ও অন্যান্য ভাগে অসভ্যদিগের বসবাস ছিল।

পৌরাণিক গ্রন্থে "পঞ্চগৌড়ে"র দু'-একটি উল্লেখ আছে। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে (উত্তরার্দ্ধ ১ম অধ্যায়) সারস্বত-প্রদেশ, কান্যকুব্জ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড় এই পাঁচটি স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে "পঞ্চগৌড়" বলা হইয়াছে। স্কন্দপুরাণীয় এই উক্তি হইতে পাঁচটী গৌড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সরস্বতীনদী-প্রবাহিত কুরুক্ষেত্রে একটী, এলাহাবাদ ও কনৌজের মধ্যে একটী, অযোধ্যা-প্রদেশের মধ্যে একটী; মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যে একটী এবং বর্ত্তমান উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডবানার মধ্যে একটী। কেহ কেহ শ্লোকটির পাঠান্তর দিয়া সারস্বত-প্রদেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানই গৌড়দেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহাদের এ মত কতদূর সত্য, বলিতে পারি না। এখনও আমরা উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগকে 'পঞ্চগৌড়ীয়' বলিয়া থাকি, এবং পঞ্চগৌড়ীয় বলিতে কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল ও ঔৎকল ব্রাহ্মণই বুঝিয়া থাকি। দেখা যাইতেছে, এ হিসাবে 'গৌড়' বলিতে সমগ্র উত্তর-ভারতের অধিকাংশ ভাগই বুঝাইবে। রাজতরঙ্গিণী-কার কল্‌হন পণ্ডিতও পঞ্চগৌড়াধিপের কথা লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পঞ্চগৌড়াধিপগণকে জয় করিয়া তাঁহার শ্বশুরকে পঞ্চগৌড়েশ্বর করিয়াছিলেন। এই রাজতরঙ্গিণীর একস্থানে লিখিত আছে যে, জয়াপীড়ের শ্বশুর জয়ন্ত গৌড়েশ্বরের অধীনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাধীশ ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড়েতর প্রদেশ; সম্ভবতঃ আর তিনটী প্রদেশ রাঢ়, মগধ ও তীরভুক্তি—এই তিনটী গৌড়ের সংলগ্ন এবং গৌড়ের নামের সঙ্গে সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে। বঙ্গ, গৌড় হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই প্রায়শঃ বর্ণিত হইয়া থাকে; সুতরাং বোধ হয় ইহা পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত ছিল না। যাহা হউক, এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। আপাততঃ মিথিলা ও বঙ্গের মধ্যবর্ত্তী 'গৌড়'-রাজ্যই সকলের নিকট পরিচিত। তবে ইহার সীমা কতদূর ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের মতে বঙ্গদেশ হইতে 'ভুবনেশ' পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য বিস্তৃত। সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী-টীকাকার বলেন, ইহার বিস্তার প্রায় ৬ অক্ষাংশ, ১ কলা ও ৪০ বিকলা। পূর্ব্বে গৌড়ের রাজধানী ছিল দিনাজপুর, পরে আদিশূরের সময় বিক্রমপুরে রাজধানী হয়। কাহারও কাহারও মতে ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী স্থান বঙ্গ ও পশ্চিমতীরবর্ত্তী স্থান গৌড়। এক সময়ে সপ্তগ্রামও গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া প্রথমে বিহার ও নদীয়া লুণ্ঠন করে। ইহার কিছুকাল পরে, তাহারা গৌড়ের রাজধানী লক্ষ্মণাবতী নগরে তাহাদের সেনানিবাস স্থানান্তরিত করে। বঙ্গদেশের উর্ব্বরতা ও ঐশ্বর্য্য-সম্পদ তাহাদিগের হৃদয়ে দারুণ ঈর্ষ্যানল প্রজ্জলিত করিল। তাহারা লুণ্ঠনকার্য্য ভুলিয়া এখন হইতে বঙ্গদেশে স্বাধীন রাজ্য-স্থাপন-কল্পে বিশেষ মনোযোগী হইল। বীরত্ব

প্রভাবে তাহারা একে একে গৌড়ের আশ-পাশ সমস্ত দেশগুলিই অধিকার করিতে লাগিল। এইরূপে হুসামুদ্দিন্ ইওয়াজ্ সুলতান্ গিয়াসুদ্দিনের সময়ে গৌড়রাজ্য সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদিগের করায়ত্ত হইল। এই গিয়াসুদ্দিনই গৌড়-নগরের প্রথম একচ্ছত্র

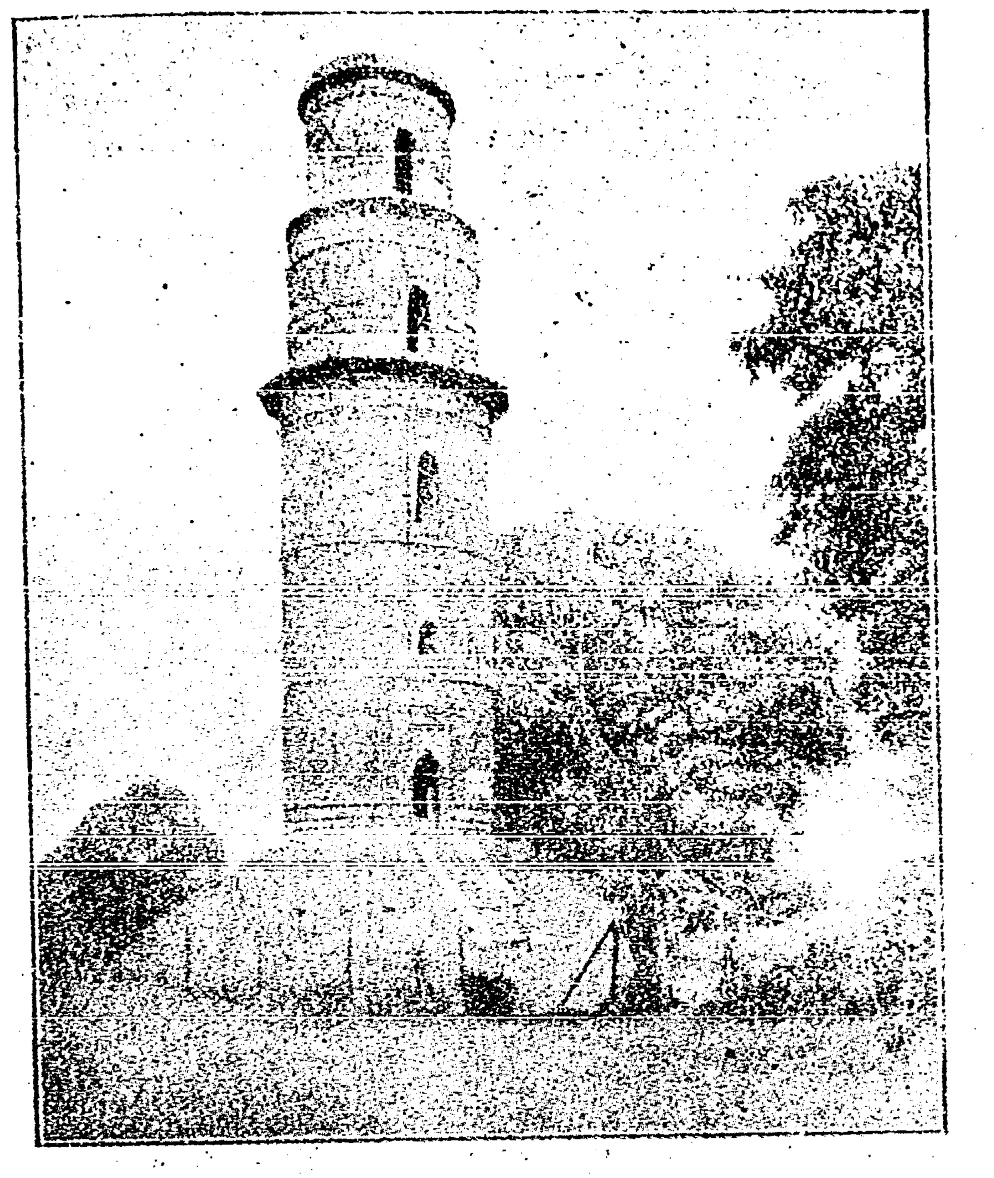

ফিরোজ-মিনার

অধিপতি। ৬১৬ হিজ্‌রার একখানি সুবর্ণ-মুদ্রা ও গৌড়ের একটী অতি প্রাচীন টঙ্কশালা ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। বঙ্গ এবং তিরভুক্তি যে গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই—"জাজনগর, বঙ্গ, কামরূপ, তিরভূত ইত্যাদি

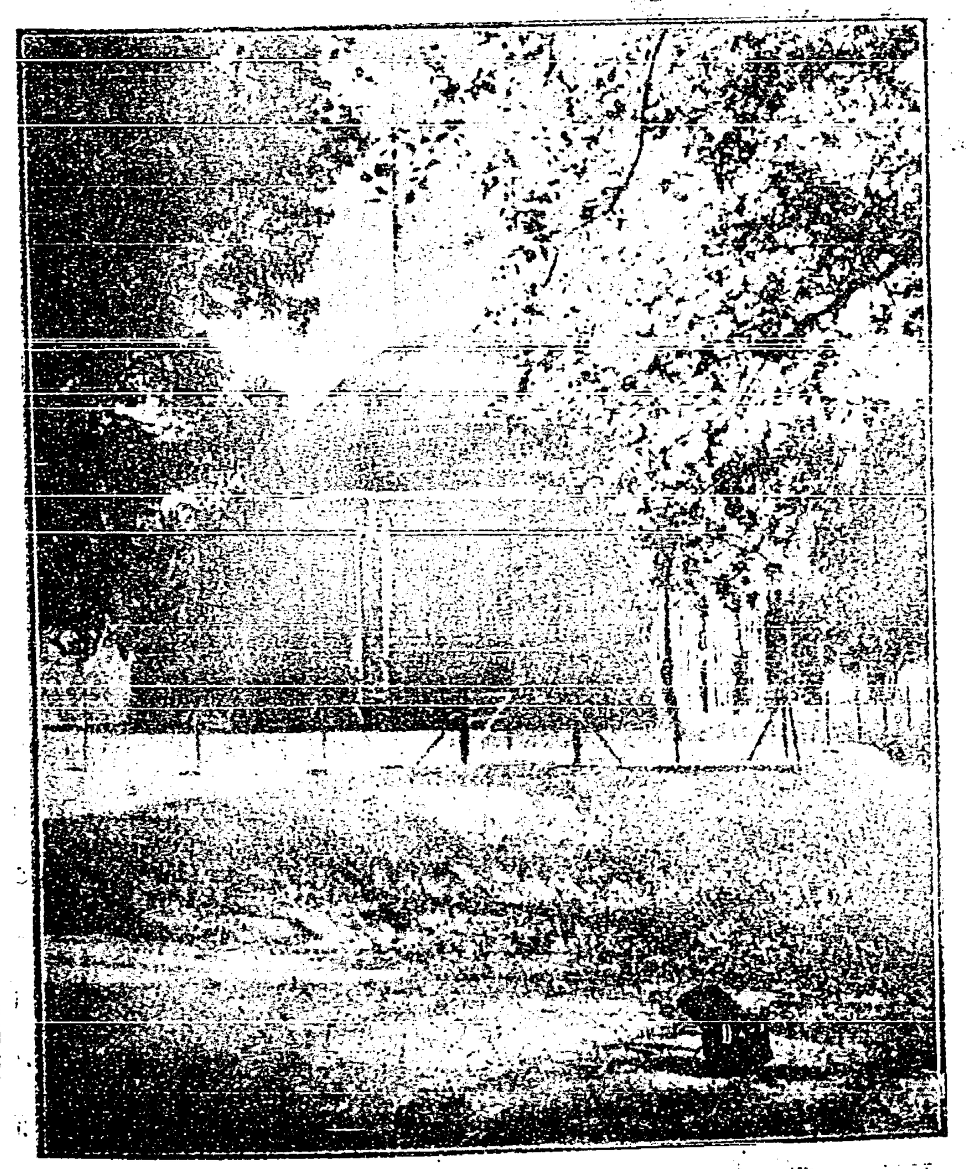

লুটন মস্‌জিদ

গৌড়ের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূভাগের রাজগণ গৌড়েশ্বরের নিকট যথারীতি রাজকর প্রেরণ করিতেন।" বিহার-প্রদেশ বোধ হয়, অতি প্রাচীনকাল হইতেই গৌড়ের অন্তর্গত ছিল; কারণ, "সুল্‌তান শামসুদ্দীন্-ওয়া-উদ্দুনিয়া রাজধানী দিল্লী-নগর হইতে লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে বহুবার অভিযান প্রেরণ করিবার পর, অবশেষে বিহার অধিকার করেন এবং স্বীয় আমীরগণের উপর উহার শাসন-কার্য্য-পরিচালনের ভার ন্যস্ত করেন।" ৬২২ হিজরায় তিনি পুনরায় অভিযান করিয়া গৌড়াধিপ গিয়াসুদ্দিনকে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

মুসলমান-রাজত্বকালের পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া এবং তাণ্ডা বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল; কিন্তু তাহা হইলেও গৌড়ের প্রাধান্য বঙ্গে চিরদিনই অক্ষুণ্ণ। টোডর মল্লের গৌড় দুইভাগে বিভক্ত ছিল; লক্ষ্মণাবতী এবং ওড়ম্বর অর্থাৎ তাণ্ডা। উত্তরে পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর জেলা; দক্ষিণে উত্তর-মুর্শিদাবাদ ও উত্তর-বীরভূম; পূর্ব্বে পুনর্ভবা ও মহানন্দা নদী এবং পশ্চিমে প্রাচীন কুশীনদী ও সোনতালা-পরগণার পর্ব্বতমালাদ্বারা গৌড়-প্রদেশ সীমাবদ্ধ। দেবীকোট, গৌড়ের একেবারে উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। মোগল-শাসনকালে, মাত্র দুইজন রাজার রাজত্বকাল ব্যতীত বরাবরই হয় মুর্শিদাবাদ, না হয় রাজমহল গৌড়ের রাজধানী হইয়া আসিয়াছে।

রাজ্যবর্দ্ধনের সমসাময়িক শশাঙ্কের উল্লেখমত কর্ণসুবর্ণই যদি গৌড়ের অন্য নাম হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মণাবতী ভিন্ন অন্য কোন নগরই উহার রাজধানী হইতে পারে না। প্রাচীন মুসল-

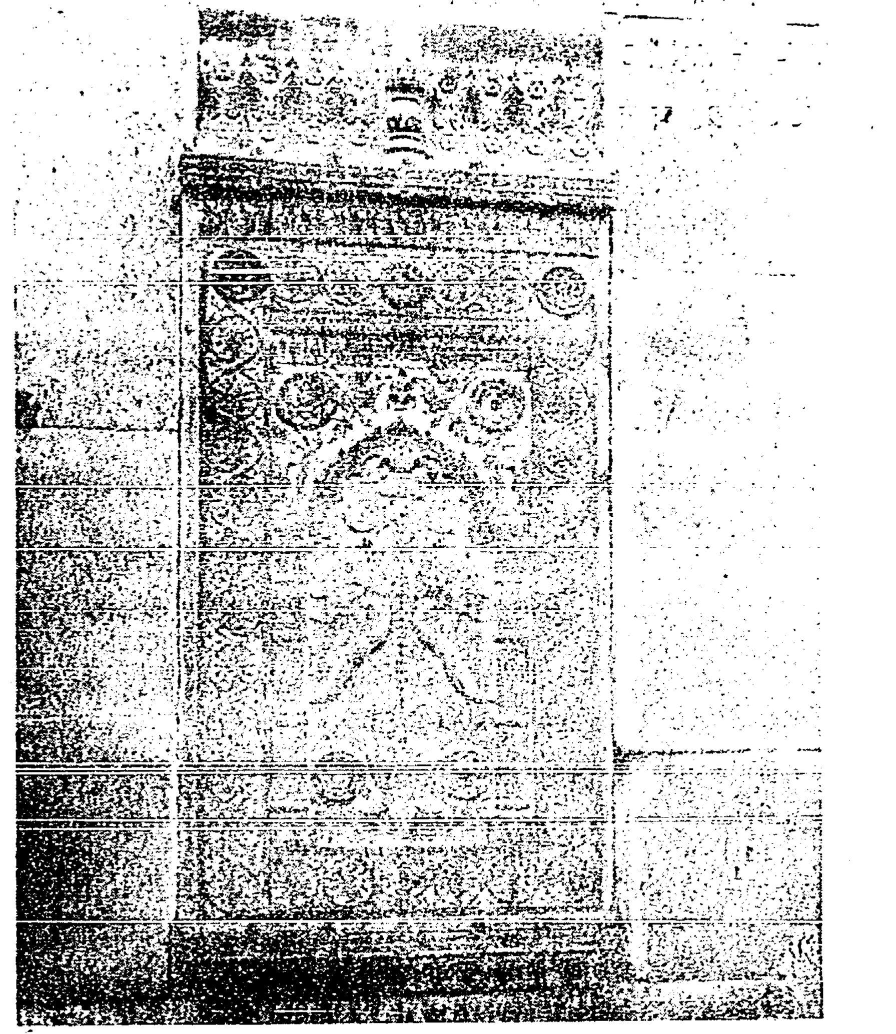

ফিরোজপুর প্রস্তরলেখ

মান-ইতিহাসের বঙ্গদেশ বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণাবতীই গৌড়ের রাজধানী ছিল। মহম্মদি বখ্‌তিয়ার স্বয়ং গৌড়-প্রদেশ অধিকার করিয়া লক্ষ্মণাবতী-নগরীতে উহার রাজধানী স্থাপন করেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, লক্ষ্মণাবতী-নগরী বখ্‌তিয়ারের পূর্ব্বেও ছিল। আবার "গৌড়ের দুর্গ বল্লাল সেন-কৃত"; সুতরাং নগরটী যে আরও প্রাচীন, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর জৈন-লেখকগণের মতে, বপ্পভট্ট সূরি (৭৪৪-৮৩৯খৃঃ অঃ) এবং যশোবর্ম্মনের পুত্র কান্যকুব্জাধিপতি আমর সমসাময়িক 'ধর্ম্ম'নামক কোন রাজা গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী-নগরীতে রাজত্ব করিতেন। এই সকল প্রমাণের উপর

নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, লক্ষ্মণাবতী-নগরী নিশ্চয়ই অষ্টম শতাব্দীতে ছিল এবং খুব সম্ভব সপ্তম শতাব্দীর যুয়ান-চোয়াং-এর সময়েও ইহার অস্তিত্ব এই নামেই ছিল।

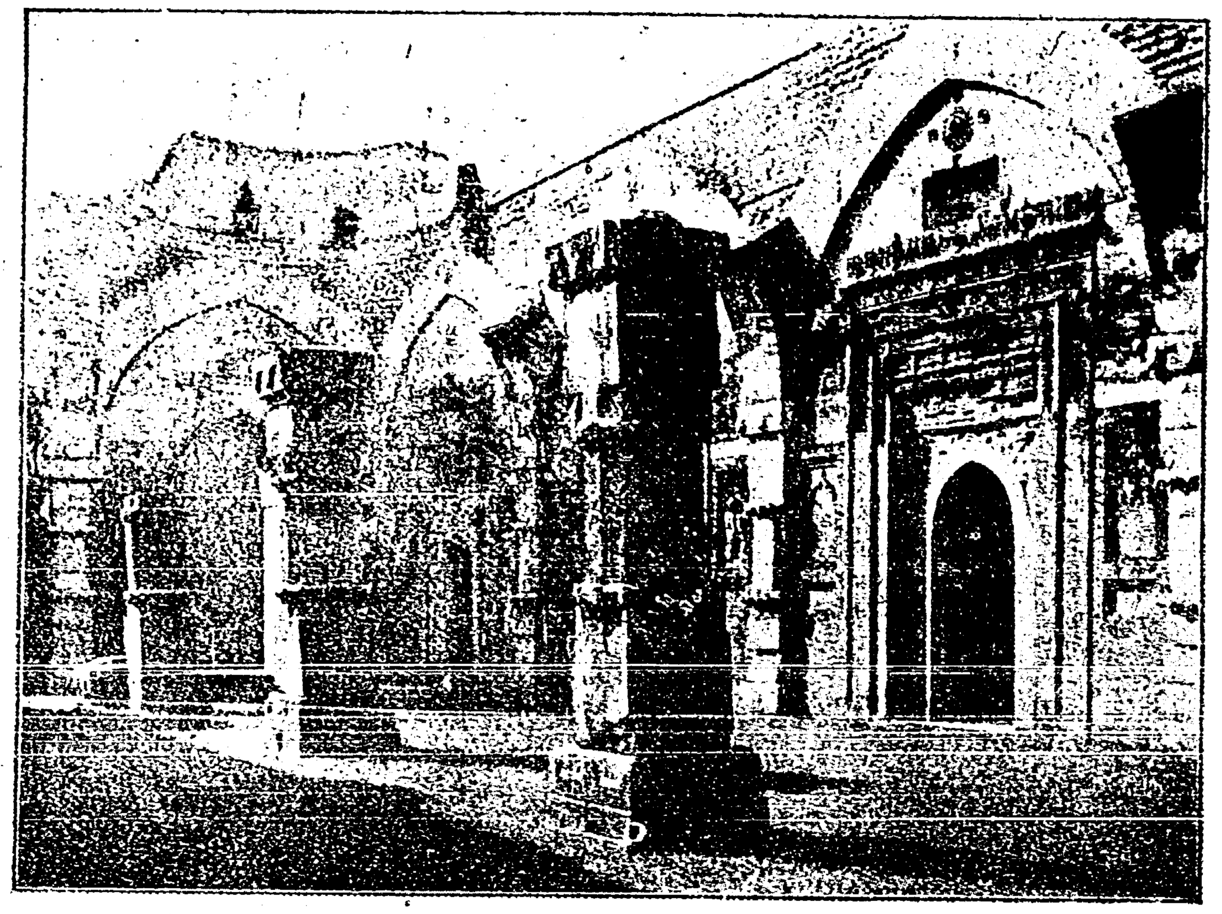

তাঁতিপাড়া-মস্‌জিদের অন্তর্দৃশ্য

যাহা হউক, মুসলমান-অধিকারের পর হইতেই গৌড়ের শ্রী-সম্পদ্ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ক্রমে ইহা সৌন্দর্য্যে বঙ্গীয় অন্যান্য নগরের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। সে সময়ে গৌড়ের জন-সংখ্যাও খুব বেশী ছিল। প্রায় ৬ লক্ষেরও অধিক লোক উহাতে বাস করিত। গৌড়-নগরের প্রথম শাসনকর্ত্তা

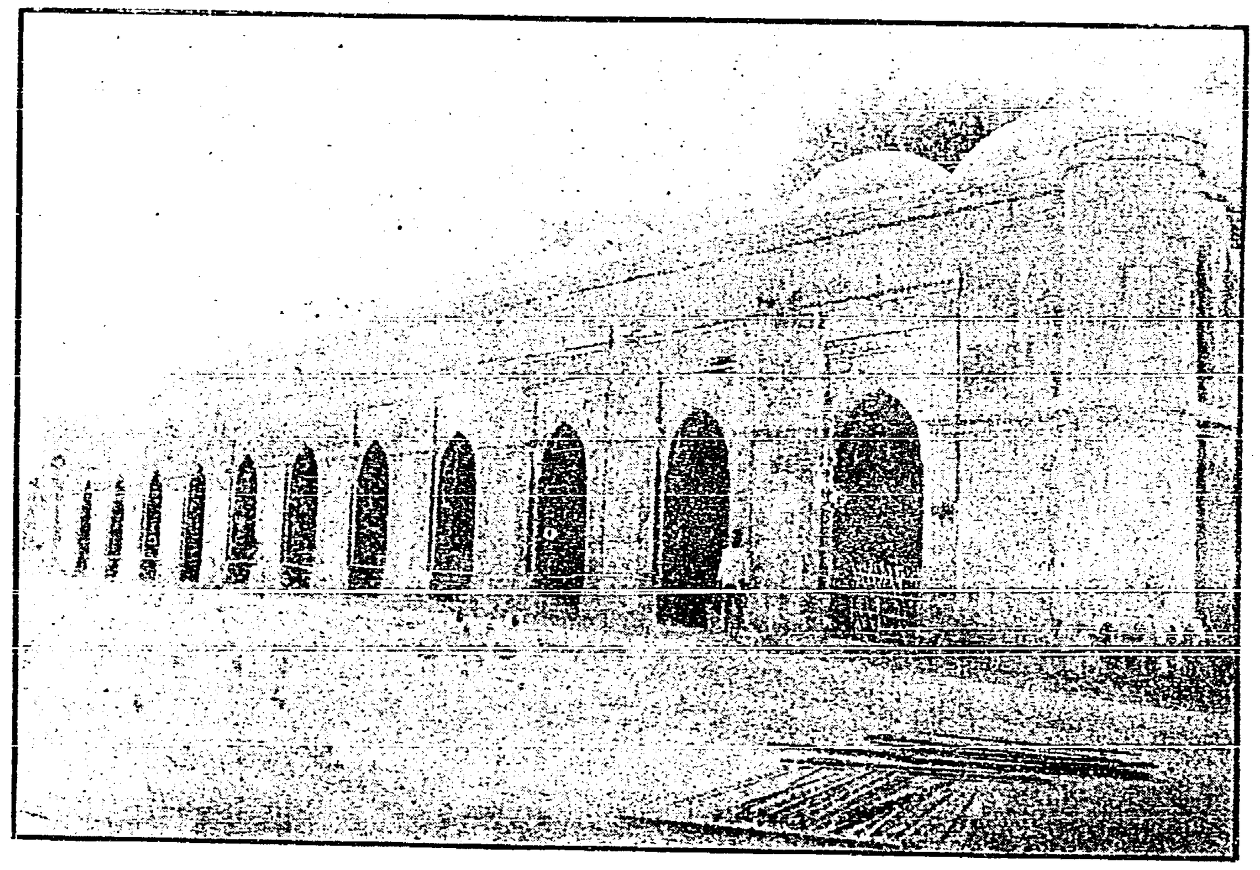

সংস্কারের পরে বারদ্বারির সম্মুখভাগ

বখ্‌তিয়ার ১১৯৮ খৃঃ অব্দে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন; কিন্তু তিনি বড়-বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই; কারণ, রাজ্যভার-গ্রহণের ৭ বৎসর পরেই অর্থাৎ ১২০৫ খৃঃ অব্দে তিনি কোন শত্রু-দ্বারা নিহত হন। এই সময় হইতে ৮১ বৎসর গৌড়ে কোনও স্বাধীন রাজা ছিলেন না—দিল্লীর সম্রাটের অধীন নবাবদিগের দ্বারাই ইহার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত। পরে, ১২৮৭ খৃঃ অব্দে নাসিরুদ্দিন্ বগ্‌রা খাঁ ইহাকে দিল্লীশ্বরের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ল'ন এবং স্বয়ং উহার স্বাধীন অধিপতি হ'ন। ইনি ফুলবাড়ীর ১ক্রোশ দক্ষিণে একটী দুর্গ ও দেবকোট হইতে কাঁকৃজোল পর্য্যন্ত ২৭ মাইল বিস্তৃত নদীতীর-সংলগ্ন একটী পথ নির্ম্মাণ করেন। ১৩২৬ খৃঃ অব্দে দিল্লীপতি মহম্মদ তোগ্‌লক, পুনরায় ইহাকে দিল্লীর অধীন করেন। ১৩৩৯ খৃঃ অব্দে হাজি ইলেচাস্ কর্ত্তৃক গৌড় আর এক-বার স্বাধীন হয়। দিল্লীশ্বর বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাকে তাঁহার হস্তচ্যুত করিতে পারেন নাই। ১৪১২ খৃষ্টাব্দে ১ম মামুদ গৌড়ে আগমন করেন ও ইহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, এই নগরটীকেই স্বীয় রাজধানী করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হন। এই সময় হইতে শের শাহ্‌র বাঙ্গালা-আক্রমণ-কাল পর্য্যন্ত গৌড় বরাবরই মুসলমান-নরপতি-গণের রাজধানী হইয়া আসিতেছিল। হুমায়ুনের সময় হইতেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়।

বঙ্গের শেষ নরপতি দাউদ্ খাঁর রাজধানী এই গৌড়-নগরেই ছিল; তবে তাঁহার সময়ে গৌড়ের আর সে অবস্থা ছিল না। জন-সংখ্যারও বহু হ্রাস হইয়াছিল। ১৫৭৫খৃষ্টাব্দে অক্‌বর-সেনাপতি মুনিম্ খাঁ কর্ত্তৃক গৌড় অধিকৃত হইলে, ঐ স্থানই শাসনদণ্ড-পরিচালনের প্রধান সদর হইবার কথা হয়; কিন্তু এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহ্ সুজা রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। এই সময়ে গৌড়ে যে অল্প কয় ঘর লোকের বসতি ছিল, তাহারাও গৌড় হইতে নিজ নিজ বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিল। বর্দ্ধিতশ্রী গৌড় এখন হইতে মানব-পরিত্যক্ত হইয়া ভীষণ শ্মশানভূমির আকার ধারণ করিল।

যে গৌড় একসময়ে শ্রী-সমৃদ্ধির সর্ব্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিয়া-ছিল, যাহা এককালে মুসলমানগণের গৌরবস্বরূপ ছিল, আজ তাহা জঙ্গলে পূর্ণ—শ্বাপদ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীর স্বাধীন বিচরণ-ক্ষেত্রে পরিণত!

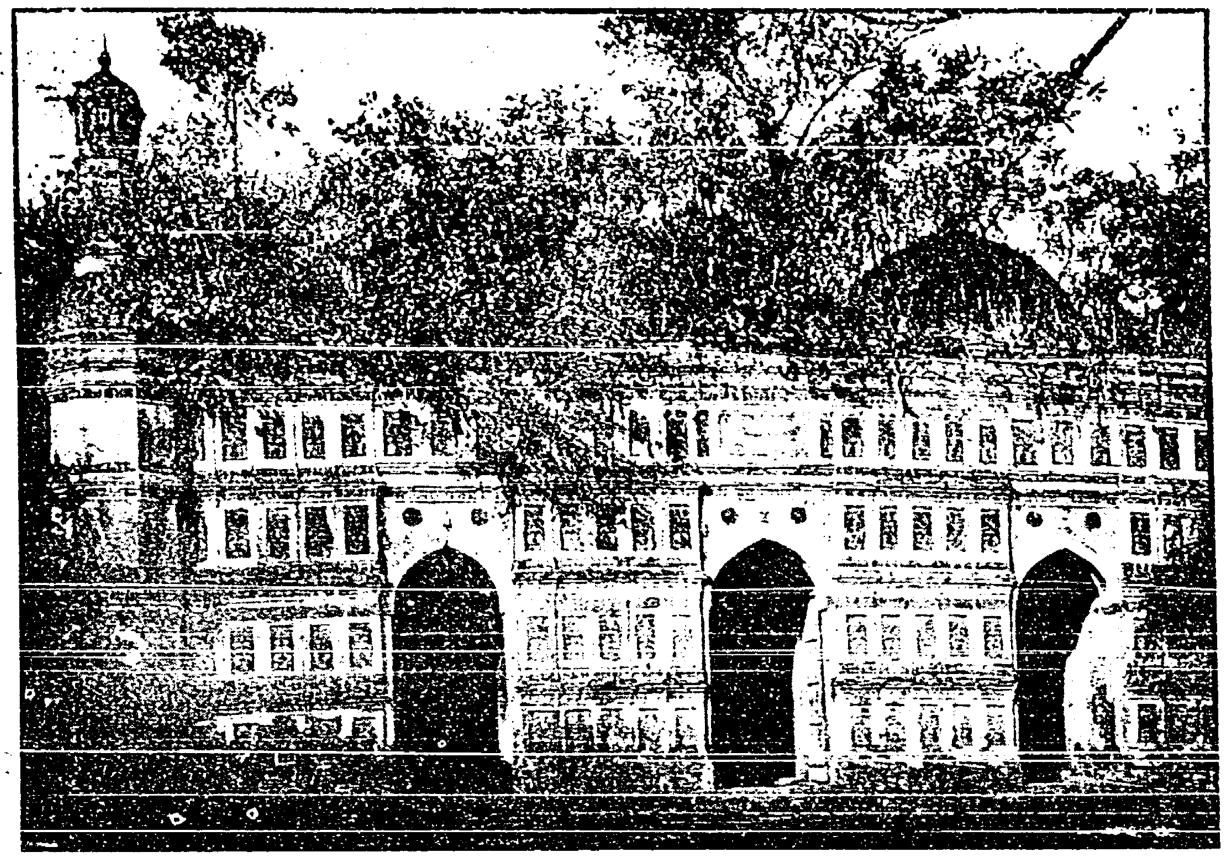

জন্ জন্ মিঞা মসজিদ্

বুড়ীগঙ্গার তীরে, ফুলবাড়ী ও কোতোয়ালী-দরজার মাঝখানে গৌড়ের প্রসিদ্ধ দুর্গ অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক্ ৩০ ফুট্ উচ্চ সুদৃঢ় ইষ্টক-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত; প্রাচীরের বহির্ভাগেই গভীর খাত। প্রাচীরের ভিত্তিগাত্রও প্রস্থে প্রায় ১৯০ ফুট্ হইবে। খাতটী এখন বড় বড় কুমীরের আশ্রয়স্থান হইয়াছে; প্রাচীর-টীও বড় বড় বৃক্ষ ও তৃণ-লতায় ভরিয়া গিয়াছে। এই দুর্গে প্রবেশ করিবার দুইটী প্রধান দ্বার আছে—একটী উত্তরদিকে ও আর একটী পূর্ব্বদিকে। উত্তরদিকের দরজার নাম "দাখিল বা সেলামী-দরজা" এবং পূর্ব্বের নাম "লক্ষছিপি-দরজা"। অধুনা দাখিল-দরজার অনেকস্থান যদিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবুও যাহা আছে, তাহা দেখিলে, যে শিল্পী ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার বিচিত্র শিল্প-কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

লক্ষ-ছিপি-দরজায় একখানি লিপি উৎকীর্ণ আছে। উক্ত লিপি পাঠ করিয়া জানা যায় যে, প্রবেশ-দ্বার গৌড়রাজ হোসেন শাহ্ কর্ত্তৃক ৯১৮ হিজিরার (১৫২২ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বদ্বার হইতে উত্তরদ্বারে যাইবার দুইটী প্রাচীন দ্বার আছে, চাঁদ-দরজা ও নিম-দরজা। এই উভয় দ্বারই সুলতান বারবক্ শাহ্ কর্ত্তৃক (১৪৬৬ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রাপ্ত একখানি প্রাচীন, পারস্য-ভাষায় খোদিত লিপিতে নিম্নলিখিত মস্‌জিদ্‌গুলির নির্ম্মাণ-কাল-সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায়—

বড় সোণা-মস্‌জিদ্ ও কোতোয়ালি-দরজা—৬২৭ হিঃ

তাঁতিপাড়া-মস্‌জিদ্—৮৮০ হিঃ

৬০০ বর্গগজ উচ্চ ফিরোজ-মিনার—৮৮৫ হিঃ

লুটন মস্‌জিদ্—৮৮৯ হিঃ এবং গুণবন্ত মস্‌জিদ্ ৯০২ হিঃ।

গৌড়ের পার্শ্ববর্ত্তী উপনগরেও মুসলমান-কীর্ত্তির পরিচয়-জ্ঞাপক অনেক বস্তুই পরিলক্ষিত হয়; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়টীর নাম ও নির্ম্মাণকাল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সাদুল্লাপুরের সেখ্ আজিম সিরাজের গোরস্থান—৭৫০ হিঃ

ফিরোজপুরের ছোট সোণা-মস্‌জিদ্ ও নিজামৎ উল্লার বার-দোয়ারী মস্‌জিদ্—৮৯৯—৯২৯ হিঃ এবং সুপ্রসিদ্ধ ফন্‌কনিয়া মস্‌জিদ—৯৪১ হিঃ।

গৌড়ের মস্‌জিদ প্রভৃতি প্রাচীন অট্টালিকাগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল, কেবল আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভারত-শাসনকর্ত্তা লর্ড কর্জ্জ-নের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে সেগুলি ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। আমরা বারান্তরে গৌড়ের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির সবিশেষ পরিচয় দিব।

শ্রী অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

সাহিত্য-সংবাদ

নূতন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ—"গ্রহ-নক্ষত্র"

বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথিতযশাঃ এবং বঙ্গভাষায় বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ-রচনায় অদ্বিতীয়-কুশল, শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিজ্ঞান-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে "আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার," "বৈজ্ঞানিকী," "প্রাকৃতিকী" ও "প্রকৃতি-পরিচয়" নামক যে চারিখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-রচনার অভাব দূর করিয়াছেন, তজ্জন্য বঙ্গ-সাহিত্য চিরকাল তাঁহার কাছে ঋণী। সম্প্রতি "গ্রহ-নক্ষত্র" নামক তাঁহার জ্যোতিষ বিষয়ক আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি তাঁহার "প্রাকৃতিকী"র আকারের এবং তিনশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে প্রায় শতাধিক ছোট-বড় জ্যোতিষ বিষয়ক চিত্র আছে। বঙ্গভাষায় সুলিখিত এবং সম্পূর্ণ জ্যোতিষের চিত্রসমন্বিত গ্রন্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জগদানন্দবাবু স্বীয় লিপি-কুশলতা-দ্বারা জ্যোতিষের তথ্যগুলি পাঠক-সাধারণের নিকট এরূপভাবে ধরিয়াছেন যে, তাহা গল্পের মতই মনোরম হইয়াছে। ছেলে-মেয়েদের কাছেও ইহা বোধগম্য হইবে এবং ছেলে-মেয়েদের অপেক্ষা যাঁহারা ঊর্দ্ধবয়সে উঠিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটও ইহা সমান লোভনীয়।

বঙ্গ-সাহিত্যের বিজ্ঞান-মন্দিরের সাধক অল্প ; আমাদের দেশে বিজ্ঞান-গ্রন্থের প্রচলন সেই জন্যই হয় ত নভেলের স্রোতে ঢাকা পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ লোক-সাধারণে বৈজ্ঞানিক তথ্যকে প্রকাশিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন ; কারণ, বিজ্ঞান জিনিষটার মর্য্যাদা আছে বলিয়া তাহাকে কানের কাছে সেতারের মত অবিরাম ঝঙ্কার করিতে বৈজ্ঞানিকেরা নারাজ। আমরা আশা করি, জগদানন্দবাবুর এই গ্রন্থের মর্য্যাদা নিশ্চয়ই বঙ্গ-সাহিত্যে থাকিবে। যে গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত আকাশ আমাদের মাথার উপর বিস্তৃত, সেই "গ্রহ-নক্ষত্রে"র কথা জানিবার জন্য মানুষ যখন আগ্রহহীন হয়, তখন বুঝিতে হইবে সেটা দেশেরই গ্রহ-দোষ। কাব্যরাজ্যের সেই "অনন্ত"কে অনন্তরাজ্যের সুরে বাঁধিয়া গ্রন্থকার "গ্রহ-নক্ষত্র" প্রকাশিত করিয়াছেন।

পূজার বাজারে আমরা "গ্রহ-নক্ষত্রকে" সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল।

গত বৎসর মাঘ মাসের ১৯শে তারিখে মহামান্য বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন ; তৎকালে মাননীয় শ্রীযুক্ত লায়ন, শ্রীযুক্ত গুর্‌লে, শ্রীযুক্ত মোনাহান প্রভৃতি রাজপুরুষেরা এবং পরিষদের পক্ষে নিমন্ত্রিত মহোদয়েরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় তিনি পুনরায় সাহিত্য-পরিষদে উপস্থিত হইবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে গত ৬ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার বেলা ১০-৪৫ মিনিটের সময় বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-মন্দিরে দ্বিতীয়বার পদার্পণ করেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সহকারী-সভাপতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পাইক-পাড়ার কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, পূর্ব্বতন সহকারী-সম্পাদক ও চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, বর্ত্তমান চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এবং গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

গবর্ণর-বাহাদুর দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পরিষদের চিত্রশালায় সংগৃহীত দ্রব্য-সম্ভার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি সভাপতি মহাশয়ের সংগৃহীত বৈদিক যজ্ঞের উপকরণ শ্রুক্, শ্রুব, চমস, সোমপাত্র প্রভৃতি যজ্ঞায়ুধগুলি দর্শন করেন। সভাপতি মহাশয় ও ত্রিবেদী মহাশয় এই যজ্ঞায়ুধগুলি ও তাহাদের ব্যবহার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেন। তৎপরে তিনি বঙ্গের প্রাচীন মন্দির-গাত্রের ইষ্টক-শিল্পগুলি দেখিয়া তাহাদের কারুকার্য্য ও শিল্পকলার বিশেষ সুখ্যাতি করেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালা, বিহার, গান্ধার ও নানাস্থান হইতে সংগৃহীত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু-শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ ধাতু-নির্ম্মিত ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি দর্শন করেন। এই মূর্ত্তিগুলির বিষয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় ব্যাখ্যা করিয়া দেন। এই মূর্ত্তিসকলের মধ্যে নিম্নলিখিত মূর্ত্তিগুলি গবর্ণর-বাহাদুর বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত দেখিয়াছিলেন,—(১) বৰ্দ্ধমান—অট্টহাসের—"কঙ্কালী যোগিনী-মূর্ত্তি", (২) মালদহ হইতে সংগৃহীত "বোধিসত্ত্ব"-মূর্ত্তি, (৩) "শিব-দুর্গার বিবাহ"-মূর্ত্তি, (৪) দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত "ব্রহ্মা"-মূর্ত্তি ও (৫) ঢাকা হইতে সংগৃহীত দ্বাদশভুজ "অবলোকিতেশ্বর"-মূর্ত্তি। পরিষদের পাঁচটি ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য তাঁহার মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির তিনটি মুরশিদাবাদ সাগরদীঘি হইতে ও দুইটি ভাগলপুর হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। অতঃপর গবর্ণর-বাহাদুর কতকগুলি বঙ্গীয় ও তিব্বতীয় প্রাচীন চিত্র ও পুথির পাটা দর্শন করেন। এই চিত্রগুলির সূক্ষ্ম অঙ্কন-সৌন্দর্য্য ও রং এবং পাটাগুলির শিল্প-নিপুণতার প্রতি তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বাঙ্গালা-ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন পুস্তকগুলি ও প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ দর্শন করেন। মুদ্রিত পুস্তকগুলি পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শন করেন ; পুথিগুলি সভাপতি মহাশয় ও পুথিশালার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত তিব্বতীয় ট্যাঙ্গুর পুথি ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত ক্যাঙ্গুর পুথিগুলি এবং লালগোলার রাজা বাহাদুরের প্রদত্ত বহুচিত্র-পূর্ণ শাহনামা পুস্তক দেখিয়া বঙ্গেশ্বর অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন। তৎপরে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখকগণের স্বহস্তলিখিত পত্র ও স্বাক্ষর দর্শন করেন। এই সংগ্রহমধ্যে ভারতচন্দ্রের পত্র ও তদুপরি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের টিপ্পনী, রাণী ভবানীর স্বাক্ষরযুক্ত ভূমিদান-পত্র, রাজা রামমোহন রায়ের স্বাক্ষর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতির নিজ নিজ হস্তলিখিত বহু পত্র ও রচনা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপরে রাজা রামমোহন রায়ের পাগড়ী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ব্যবহৃত দোয়াত, গাউন, হুড্ প্রভৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের দোয়াত, দীনবন্ধুর সোণার ঘড়ি, চেন প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। সভাপতি মহাশয় দ্রব্যগুলি প্রদর্শনকালে প্রত্যেক দ্রব্যের উপহার-দাতার নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

দুই ঘণ্টাকাল পরিদর্শনের পর বঙ্গেশ্বর-বাহাদুর বিশ্রামার্থ উপবেশন করিয়া বলিলেন যে, তিনি সাহিত্য-পরিষদের এই সমুদয় সংগ্রহ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন। এই সমস্ত দেখিবার জন্য তিনি আগামী শীতকালে পরিষদে পুনরায় আগমনের ইচ্ছা করিলেন। সভাপতি শাস্ত্রী মহাশয় কাশীমবাজারের মহারাজের প্রদত্ত পরিষদের মন্দির-সংলগ্ন সাতকাঠা ভূমি দেখাইয়া মহারাজ-দত্ত ভূমিদান-পত্র দলিলখানি উপস্থিত করিলেন এবং ঐ ভূমির উপর প্রস্তাবিত রমেশ-ভবনের প্ল্যান দেখাইলেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধের উত্তরে গবর্ণর-বাহাদুর বলিলেন যে, তিনি এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিবার সুযোগ পাইলে সুখী হইবেন। অতঃপর বেলা ১২-৪৫ মিনিটের সময় লর্ড কারমাইকেল পরিষৎ-মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হন। বঙ্গেশ্বরের সৌজন্যে উপস্থিত সকলে মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

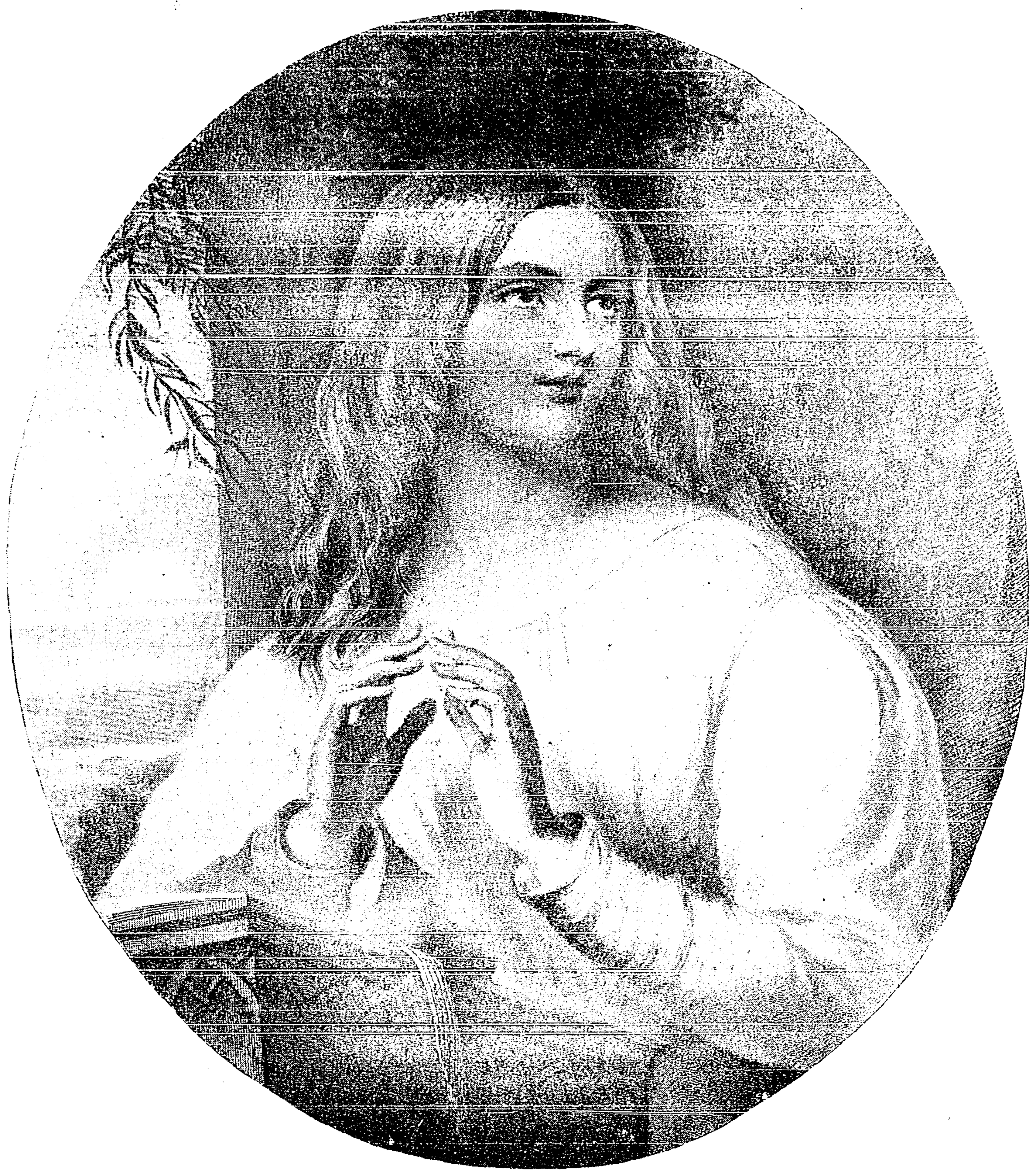

উপাসিকা

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ২০এ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা

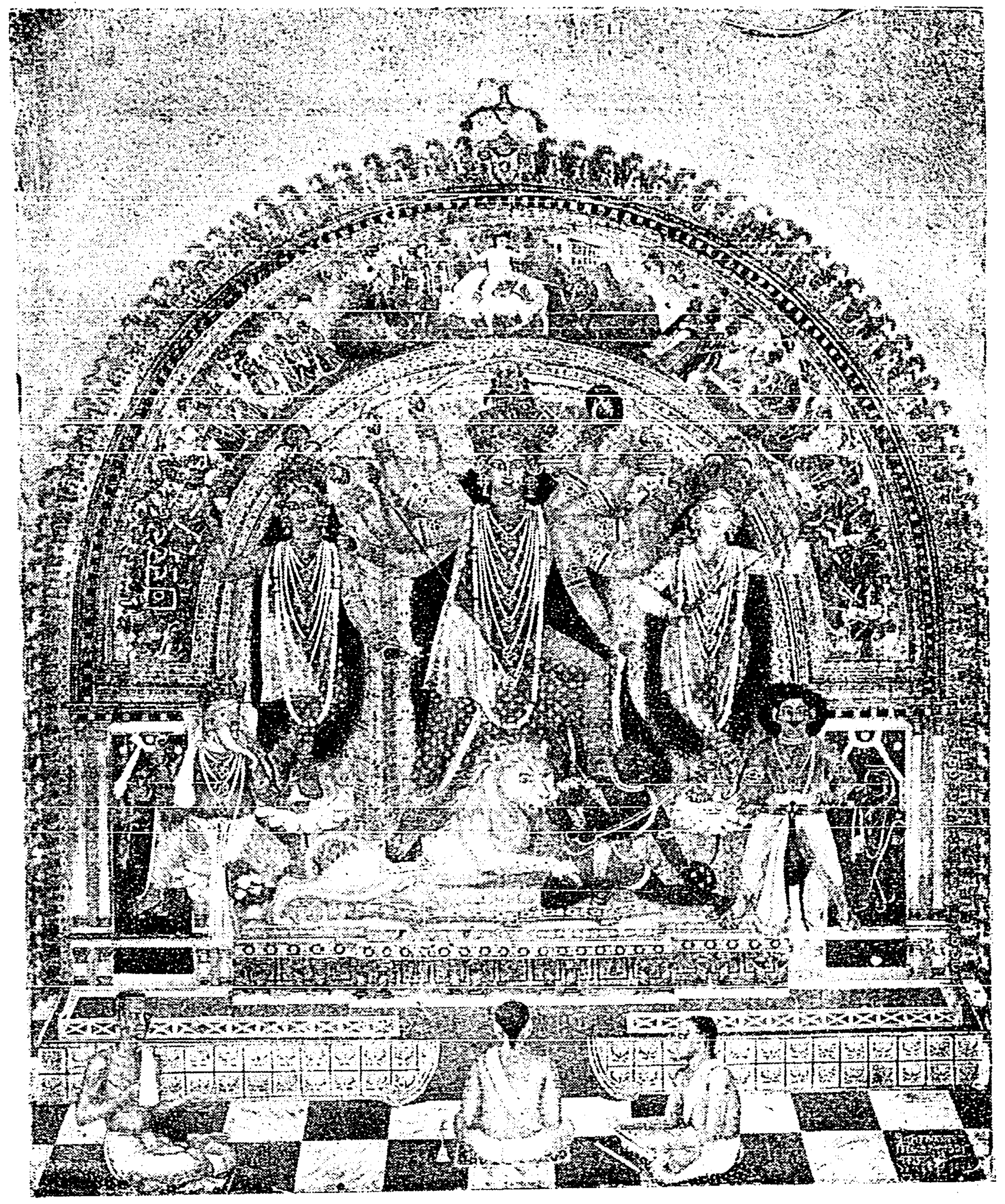

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

নিবেদন

আগামী ২৭এ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার হইতে দুই সপ্তাহ 'মর্ম্মবাণী'-কার্য্যালয় ও পত্রিকা-প্রকাশ বন্ধ থাকিবে। ১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার জগজ্জননী মহামায়ার আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া 'মর্ম্মবাণী' পুনরায় আপনাদের নিকট উপস্থিত হইবে।

চিরানন্দময়ী সর্ব্বসুখসৌন্দর্য্যবিধায়িনী পরমারাধ্যা চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি এই সৌর আশ্বিনে মৃন্ময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিসর্গ-সুন্দর বঙ্গভূমিতে শুভাগমন করিতেছেন, তাই আকাশ এত নির্ম্মল, জ্যোৎস্না এত শুভ্র, দিঙ্‌মণ্ডল এমন কৌমুদী-প্রফুল্ল। আনন্দময়ীর শুভাগমন হইতেছে; এখন সমস্ত দেশ আনন্দপূর্ণ না হইবে কেন?—সমগ্র বঙ্গবাসীর সারা বৎসর যেরূপেই অতিবাহিত হইয়া থাকুক্ না কেন, এখন যে তা'র সেই কত সাধের জাতীয় উৎসব, মহামহিমান্বিত মহোৎসব আসিতেছে; তা'র আনন্দ শত উৎসে উচ্ছলিত, শতধারায় প্রবাহিত, শত ভঙ্গীতে উৎসরিত। আনন্দময়ীর স্নেহময় আকর্ষণে শিশু উন্মত্ত, যুবা চঞ্চল, বৃদ্ধ বার্দ্ধক্য-বিস্মৃত। আনন্দ ও আগ্রহের তরঙ্গ বঙ্গদেশময় ছুটিয়াছে; সকলেই আত্মীয়-স্বজনের সংবর্দ্ধনার জন্য, প্রীতির পাত্র, স্নেহের পাত্রদিগকে নূতন বসনে, নূতন ভূষণে, নব-শোভায় সাজাইবার জন্য ব্যস্ত। যে হতভাগ্য, যাহার কিছু সংস্থান নাই, একবৎসর ধরিয়া যে অর্দ্ধাসনে কাটাইয়া আসিয়াছে, সেও আনন্দময়ীর আবির্ভাবে দুর্গোৎসবের দিনে একটু ভাল পরিবে ও পরাইবে, খাইবে ও খাওয়াইবে; নতুবা যে তাহাকে সারা-বৎসর অমঙ্গলের বোঝা বহিতে হইবে। অসুর-মর্দ্দিনী, সিংহপৃষ্ঠবিহারিণী, দানবদলনী, সর্ব্বসন্তাপহারিণী মা আমাদের বিক্রমাধার কার্ত্তিকেয়কে লইয়া, সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণপতিকে লইয়া, সম্পদ্‌রূপিণী লক্ষ্মীর সহিত, জ্ঞান-দায়িনী সরস্বতীর সহিত একাধারে সমস্ত মঙ্গল বহন করিয়া শুভাগমন করিতেছেন। তাঁহার প্রসাদে জনক-জননী, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামি-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবাসী পল্লীবাসী সকলে এই মহামহিমান্বিত উৎসব উপলক্ষে মিলিত হইবে; এ উৎসবে আনন্দ মূর্ত্তিমান্-মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী যতই হতভাগ্য হউক না কেন, তার সম্পূর্ণ নিজের জিনিষ বলিয়া গর্ব্ব করিবার, স্পর্দ্ধা করিবার জিনিষ আছে। নব্য ন্যায়-শাস্ত্র যেমন তাহার সম্পূর্ণ নিজের জিনিষ, নীরস শুষ্কপ্রাণে সরস প্রেমের বন্যা বহাইবার জন্য 'কীর্ত্তন-গান' যেমন তাহার একান্ত নিজের জিনিষ, তা'র জাতীয় মহোৎসব পরম মঙ্গলময় দুর্গোৎসবও তার তেমনই জাতীয় উৎসব—সম্পূর্ণ নিজস্ব-সম্পত্তি। করুণাময়ী কল্যাণ-দয়িনী জগদম্বা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা এ উৎসবের দায়িত্ব কখনও না ভুলিয়া ইহার সম্পূর্ণ সম্মান বজায় রাখিতে পারি!

দাদার বুদ্ধি

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দাদা অনেকদিন হইতেই সাহিত্য-সেবী। প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে। মাঝে মাঝে ফুট্-নোট্-কণ্টকিত দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধও মাসিক-পত্রে তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া বাহির হয়।

হঠাৎ তাঁহার রোখ চাপিল, 'ফটোগ্রাফী' শিখিবেন। উহা শিখিয়া, তুর্গম বন-জঙ্গল হইতে ভগ্ন ইমারৎ, স্তম্ভ, শিলালিপি প্রভৃতির ছবি তুলিয়া আনিয়া নূতন নূতন প্রত্নতত্ত্ব লিখিবেন। বৌদিদি কিন্তু এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না; কারণ, ব্যাপারটি ব্যয়সাধ্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। মা ষষ্ঠী, পুত্র-কন্যার দানে যেরূপ মুক্তহস্তা, আফিসের সাহেব বেতন-বৃদ্ধি-সম্বন্ধে মোটেই তাদৃশ নহেন, ইহাই বউদিদির আপত্তির প্রধান কারণ।

দাদা বলিলেন—"ওগো, তুমি সে জন্যে ভেব না। সে সব আমি খবর নিয়েছি। এখন কিছুদিন ত মক্স করতেই যাবে। এখন ৪।৫৲ টাকার একটি 'ক্যামেরা'তেই চলে যাবে। তারপর দেখ—শিখ্‌তে পারি না পারি—সবাই কিছু পারে না—যদি শিখ্‌তে পারি—টাকা যোটে, ভাল 'ক্যামেরা' কিনব; না যোটে দরকারমত লোকের কাছে চেয়ে-চিন্তেই কায চালিয়ে দেব। এখন শিখি ত।"

এই প্রকার অনেক বক্তৃতা শুনিয়া অবশেষে বউদিদি মত দিলেন।

যথাপরামর্শ প্রথমে দাদা কোন এক 'ফটোগ্রাফ'-কোম্পানীর দোকান হইতে একটি ৫৲ দামের ছোট 'ক্যামেরা' কিনিয়াই হাত মক্স করিতে আরম্ভ করিলেন। 'নেগেটিভ্'গুলি উক্ত কোম্পানীকেই দিয়া আসিতেন, তাহারাই 'ডেভেলপ্' করিয়া দিত। কিছুদিন পরে ইহা আর দাদার মনঃপূত হইল না। দাদাকে ইহারা বলিল—আপনার হাত দিন দিন যেরূপ সাফ্ হইয়া উঠিতেছে, নূতন শিক্ষার্থীর এরূপ সচরাচর দেখা যায় না—একটি ভাল 'ক্যামেরা' কিনিলে অতি অল্পদিনেই আপনি—ইত্যাদি। নানাপ্রকার 'ক্যামেরা' ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি দেখাইয়া দাদার লোভ তাহারা বৃদ্ধি করাইতে লাগিল। যাহা হউক, দাদা অবশেষে ঐ দোকান হইতেই পঞ্চাশ টাকা মূল্যের একটি 'ক্যামেরা' ক্রয় করিলেন! বউদিদি প্রথমে 'ক্যামেরা'র মূল্য শুনিয়া খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দাদা যখন আমাদের বাগানটির ছবি তুলিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন, তখন বউদিদির মন অনেকটা ভিজিল। দাদা তেতালার একটি ঘরে দরজা, জানালা কাগজ দিয়া বন্ধ করিয়া dark room তৈয়ারী করাইলেন এবং তাহার নাম দিলেন—'ষ্টুডিও'।

দাদার অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাড়ীর কেহ—এমন কি, কুকুর, বিড়াল অবধি বাদ গেল না। বাড়ীতে কোনও ভদ্রলোক কার্য্যোপলক্ষে বা বেড়াইতে আসিলে, দাদার 'ক্যামেরা' হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। ছবিগুলি একখানি বৃহৎ 'অ্যাল্‌বমে' তিনি গুঁজিয়া রাখিতে লাগিলেন। বাড়ীতে কেহ বেড়াইতে আসিলে, আগ্রহের সহিত সেগুলি দেখাইতেন। তাহাতেও নিস্তার নাই। পাছে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি 'অ্যাল্‌বমে'র পাতা উল্টাইয়া যান, এইজন্য তিনি নিজে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেন। বউদিদি মাঝে-মাঝে বলিতেন—"ওগো, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়।"

একদিন সন্ধ্যাবেলা দাদা গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিলেন—অন্যদিন ট্রামে আসিতেন। গাড়ীর ছাদ হইতে নামিল, একটি বৃহৎ 'প্যাক'-বাক্স—তাহার মধ্যে একটি নূতন বড় 'ক্যামেরা'। দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এটার দাম কত?" তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন—"তোর সে খোঁজে দরকার কি?"

বউদিদি যখন দাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন দাদা বলিলেন—"এটা থেকে যে রকম কায পাওয়া যাবে, তার তুলনায় দাম খুব সস্তাই বল্‌তে হবে।" অনেক বক্তৃতার পর শেষে বউদিদি যখন সেটার দাম শুনিলেন—তখন অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন—বলিলেন—"যদি আগে জান্‌তাম যে 'ক্যামেরা'তে টাকা এইরকমভাবে ওড়ে, তা হলে 'ক্যামেরা' বাড়ীতে ঢুক্‌তেই দিতাম না।" তাহার পর দাদার ও বউদিদির কি কথা হইল, জানি না—দাদা মুখখানি চুণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পরদিন শুনিলাম 'ক্যামেরা'টির মূল্য—তিনশত টাকা,—দাদার তুই মাসের মাহিনা।

ইহার পর অনেকদিন পর্য্যন্ত দাদা 'ফটোগ্রাফী'-সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আর কিছু কিনিলেন না। কোন কোন দিন দেখিতাম, দাদা 'পকেট' উঁচু করিয়া বাড়ী আসিয়া, বরাবর তাঁহার 'ষ্টুডিও'তে প্রবেশ করিতেছেন। যখন নামিয়া আসেন, তখন দাদার 'পকেট' স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করে। তাঁহার মুখের ভাব—ঠিক যেন চুরি করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেশ মনে আছে, সেদিন শুক্রবার। বিকালবেলা দাদা কয়েকখানি 'ফটোগ্রাফ', 'অ্যাল্‌বমে' সাজাইতেছিলেন, এমন সময় বাহিরের দরজায় কে ডাকিল—"বিহারীবাবু বাড়ী আছেন?"

দাদা চাকরকে বলিলেন—"দেখে আয় ত কে।"

চাকর ফিরিয়া আসিয়া দাদার হাতে একখানি কার্ড দিল, তাহাতে লেখা আছে—শ্রীকিশোরীমোহন সিংহ।

দাদা বলিলেন—"কৈ, নামটি ত পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে না! যা হোক্, বাইরের ঘরে ডেকে বসা। আমি এখুনি আস্‌ছি।" বলিয়া অল্পক্ষণ পরেই দাদা নামিয়া গেলেন—আমিও তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলাম।

লোকটির বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। মাথায় চেরা সীঁথি, চোখে সোণার চশমা, পায়ে 'পম্প্-সু', গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে ছড়ি। দাদা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র লোকটি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বিহারীবাবু!"

দাদা বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"নমস্কার। এতদিন মশায়ের নামই শুনে আস্‌ছিলাম—আজ আপনার সঙ্গে দেখা হল, আমার পরম সৌভাগ্য।" দাদা একটু হাসিয়া, "না, না—" বলিয়া বসিলেন।

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, সম্প্রতি—ওর নাম কি—মজুমদার-ব্রাদার্স একটি ছবির বই বের কর্‌তে সঙ্কল্প করেছেন। বড় বড় লোকেদের ছবি আর তাঁহাদের একটু একটু—ওর নাম কি—জীবনচরিত-তাতে থাক্‌বে। প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া, আবশ্যকমত অন্যান্য সেই সংক্রান্ত ছবিও থাক্‌বে—যেমন 'এই গৃহে অমুক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'—'যে পাঠশালায় অমুক ক খ লিখিতেন, তাহার ভগ্নাবশেষ'—এই বরঞ্চ আর কি। বইখানি 'আর্ট'-কাগজে ছাপা হবে; মলাট, বাঁধাই—ওর নাম কি—একেবারে প্রথম শ্রেণীর হবে। দাম হবে সাড়ে পাচ টাকা।"

দাদা বলিলেন—"ওঃ—তা বেশ। আগে বই বেরুক্‌ই—তখন কেনা না কেনা বিবেচনা করা যাবে।"

ভদ্রলোকটি হাসিয়া বলিলেন—"আহা, তা কেন? আপনি যে ভুল বুঝ্‌লেন। আমি ত আপনার কাছে—ওর নাম কি—বই বিক্রী কর্‌তে আসি নি। যাঁর যাঁর ছবি নিতে হবে, তাঁদের একটা 'লিষ্ট্' প্রকাশক আমার কাছে দিয়েছেন—তাতে আপনারও—ওর নাম কি—নাম-ঠিকানা রয়েছে।"

দাদা বলিলেন—"আমার ছবি!—আমি গরীব কেরাণী-মানুষ, আমাকে মজুমদার-ব্রাদার্স বড়লোক ঠাওরালেন কি হিসাবে?"

বাবুটি বলিলেন—"কেরাণী হলে কি হয়? আপনি যে একজন—ওর নাম কি—মস্ত লেখক—সাহিত্য-রথ!

"রথও নয়—'মোটর-কার'ও নয়—'ফিটন'ও নয়—'থার্ড-ক্লাস' ঠিকে-গাড়ী।"

বাবুটি বলিলেন—"ওটা আপনার বিনয়, বিনয়। 'থার্ড-ক্লাস' কেন হবেন—আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক। আপনার মত—ওর নাম কি—প্রত্নতত্ত্ব, আজকাল কজন লিখ্‌তে পারে? হেঁ হেঁ!"—

বলিয়া একখানি সুন্দর বাঁধান খাতার একটা পৃষ্ঠা খুলিয়া দাদার সম্মুখে ধরিলেন। বলিলেন—"এই দেখুন,—সাহিত্য-বিভাগে আপনার নাম রয়েছে।" আমি ও দাদা উভয়েই দেখিলাম—সে পৃষ্ঠাখানিতে যাবতীয় বিখ্যাত বিখ্যাত লেখকগণের নামের সহিত দাদার নামটিও রহিয়াছে।

বৈঠকখানা হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার দ্বারে পর্দ্দা ঝুলান ছিল। দাদা সেইদিকে চাহিলেন। বউদিদির চুড়ীর টুং-টাং শব্দ একটু শুনা গেল। দাদার মুখখানি প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল।

কিশোরীবাবু বলিলেন—"আপনি যদি দয়া করে আপনার ভাল 'ফটো' একখানি দেন, আর—ওর নাম কি—জীবন চরিতটি বলেন—তা হলে বড় উপকৃত হই। সেই উদ্দেশ্যেই আসা। বই বেরুলে একখানি আপনি অবিশ্যি বিনামূল্যেই উপহার পাবেন।"

দাদা বলিলেন—"না—না। আমি একজন সামান্য লেখক। আমার ছবি আর কেন?

বাবুটি বলিলেন—"সে কি হয় মশাই? সব বড়লোকের ছবি থাক্‌বে, আর আপনারটি বাদ যাবে? বইখানা—ওর নাম কি—বেজায় অঙ্গহীন হয়ে যাবে যে! না না, ছবি দিতে আপত্তি কর্‌বেন না। স্যার গুরুদাস, সুরেন বাঁড়ুর্য্যে, আশু মুখুর্য্যে, ছবি দিতে রাজী হয়েছেন। রবি-ঠাকুর নিমরাজী। ত্রিশবিঘার রাজা-বাহাত্বরের ছবির জন্যে প্রকাশক দিগম্বরবাবু আজ সকালের ট্রেণে ত্রিশবিঘা গেছেন। এ, চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, এস্, পি, সিঙ্গি এঁরা রবিবারে ডেকেছেন—বালিগঞ্জে গিয়ে এঁদের 'ফটো' তুলে নিতে হবে।"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে এ সব 'ফটো' তুল্‌বেন?"

"প্রকাশকদের পরিচিত একটি ইউরেশিয়ন সাহেব আছে—লোকটা আগে বোর্ণ শেফার্ডের বাড়ী কায কর্‌ত, খুব ভাল কারিগর; কিন্তু বড্ড মদ খায় বলে, তারা ছাড়িয়ে দিয়েছে। লোকটা নিজেই এখন বউবাজারে দোকান খুলেছে। তাকেই ছবি তোল্‌বার দিগম্বরবাবু একেবারে 'কণ্ট্রাক্ট্' দিয়ে দিয়েছেন।"

দাদা বলিলেন—"এত সব ভাল ভাল বাঙ্গালী 'ফটোগ্রাফার' থাক্‌তে ফিরিঙ্গি কেন?"

কিশোরীবাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"ওটা ব্যবসাদারী আর কি!—আমাদের দেশের লোকের—ওর নাম কি—শাদা কিম্বা ফ্যাকাশে চামড়ার উপর কতদূর ভক্তি তা জানেনই ত!—লোকে একটু খুসীও হবে—ভাব্‌বে আমার ছবি তোল্‌বার জন্যে—ওর নাম কি—একজন সাহেব এসেছে—এই আর কি!"

একটু থামিয়া বাবুটি বলিলেন—"আমার নিজেরই একটা 'ক্যামেরা' আছে, কিন্তু সেটি—ওর নাম কি—ছোট। বইয়ের জন্যে বড় ছবি চাই কিনা—তাতে হবে না; নইলে, আমিই ছবি তুল্‌তে পারতাম। কিছু রোজগারও হত।"

দাদা বলিলেন—"আপনারও ও সখ আছে না কি? বটে! বলুন ত—বলুন ত—কতদিন থেকে এ চর্চ্চা কর্‌ছেন?"

"বছর তুতিন। আর কিছু না হোক্—ওর নাম কি—বেশ আমোদ আছে।"

দাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন—"তা আর বল্‌তে? কিছুদিন থেকে আমারও মশায়, 'ফটোগ্রাফী'তে সখ্ হয়েছে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে আমার উদ্যম অনেকটা সফল হয়েছে বল্‌তে হবে।" বলিয়া হাঁকিলেন—"ওরে, আমার 'অ্যাল্‌বম' তুটো নিয়ে আয় ত।"

'অ্যাল্‌বম' আসিয়া পৌছিলে, দাদা অত্যন্ত বিনয়সহকারে বলিলেন—"আমার ছবি খানকতক দেখুন না!"

কিশোরীবাবু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ছবি দেখিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যেক ছবিটির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, বলিলেন—"সুন্দর! 'অ্যামেচার' যে—ওর নাম কি—এরকম ছবি তুল্‌তে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না।" দাদার বসিবার ঘরের ছবিখানি দেখিয়া বলিলেন—"এটি কেতাবে দিতে হবে—এর নীচে লিখে দেব—'এই কক্ষে বসিয়া বিহারীবাবু তাঁহার অধিকাংশ অমর প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন'।" বাগানের ছবিখানি দেখিয়া তিনি একেবারে উন্মত্ত। সজোরে 'টেবিল' চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন—"এঁঃ—এখানিও আপনি তুলেছেন? এ যে মশায় একেবারে—ওর নাম কি—প্রথম শ্রেণীর 'আর্টিষ্টে'র কাযের মত! বিউটিফুল, এখানি ত বসাতেই হবে। এর নীচে লিখে দেব—'প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে মাথা গরম হইয়া গেলে, লেখক-মহাশয় প্রায়ই এই বাগানে বসিয়া শ্রান্তিদূর করেন'।"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি মনে করেন যে ছবিগুলি প্রকাশকদের মনঃপূত হবে?"

একথা শুনিয়া বাবুটি যেন একটু দমিয়া গেলেন। একটু নীরব থাকিবার পর বলিলেন—"হ্যাঁ—তা বটে! প্রথম শ্রেণীর ছবি ভিন্ন—ওর নাম কি—অপর কিছু তাঁরা নিচ্ছেন না। যদি অনুমতি করেন, তা হলে এ তুখানি তাঁদের দেখাই।"

দাদা আগ্রহের সহিত বলিলেন—"বেশ ত—বেশ ত—তা নিয়ে যান।" বলিয়া ছবি তুখানি 'অ্যাল্‌বম' হইতে খুলিয়া দিলেন।

কিশোরীবাবু বলিলেন—"আপনার ছবি?"

দাদা বলিলেন—"গত বৎসর আমার ছবি তোলান হয়েছিল—কে কোথায় নিয়ে গেছে।" আমি বলিলাম—"আমার কাছে একখানা আছে।"

ছবি আনিয়া কিশোরীবাবুকে দিলাম। তিনি সেখানি 'পকেটে' রাখিয়া বলিলেন—"প্রকাশক দিগম্বরবাবু রাত্রের গাড়ীতে ত্রিশবিঘা থেকে ফির্বেন। কাল প্রাতে আমাকে যেতে বলেছেন। কাল বিকেলে এসে, কি হয়, আপনাকে বলে যাব এখন। আসল কথা কি জানেন, ছবিখানি যদি খুব ভাল হয়, তবেই—ওর নাম কি—প্রকাশক নেবেন; নইলে, নতুন করে আপনার ছবি তুল্তে হবে। প্রকাশকটি একজন দস্তুরমত সমজদার লোক। 'ফটোগ্রাফে'র দোষ-গুণ বিচার করতে ও-রকম ওস্তাদ আজকাল—"

দাদা বলিলেন—"বটে! তবে এক কায করুন না!"

"কি?"

"আমার 'অ্যাল্বম' সুদ্ধ তাঁর কাছে নিয়ে যান। আমার ছবিগুলো কেমন হচ্ছে—সে সম্বন্ধে তাঁর মতামতটা—"

বাবুটি বলিলেন—"বেশ ত। তা দিন। আর আপনার জীবন চরিত?"

দাদা আমার দিকে চাহিলেন। বলিলেন—"তুই-ই না হয় একটা লিখে রাখিস্?"

কিশোরীবাবু বলিলেন—"এটি কে?"

"আমার ভাই। লেখে মন্দ নয়। ওরও লেখা টেখা দু' একটা আজকাল কাগজে বেরুচ্ছে।"

কিশোরীবাবু আমাকে বলিলেন—"তা হলে মশায়, এ ভারটি আপনিই নিন্। 'ডবল ক্রাউন' ৮পেজি 'সাইজে'র—ওর নাম কি—পাতা দুত্তিন হয়, এ-রকম লিখে রাখ্বেন। বেশ সংক্ষিপ্ত—বুঝেচেন—অথচ, কোনও জরুরি কথা বাদ না যায়।"

আমি সম্মত হইলাম। বাবুটি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল বিকেলে কটার সময় এলে আপনাকে পাব?"

"কাল শনিবার। দুটোর পর আপিস থেকে ফির্ব। সন্ধ্যা অবধি বাড়ীতেই থাক্ব। আমার জন্য আপনি এত কষ্ট স্বীকার কর্বেন—many tha'ks."

কিশোরীবাবু বলিলেন—"কষ্ট!—আপনাদের মত লোকের সংসর্গ—ওর নাম কি—রোজ কি আমাদের ঘটে?—এই ঘণ্টাখানেক যে কি আনন্দে—"

দাদা বলিলেন—"সেটা আমার গুণে নয়—আপনার নিজগুণে। আমার 'ষ্টুডিও'টি একবার দেখ্বেন কি?"

বাবুটি আগ্রহ জানাইলেন। দাদা বাড়ীর ভিতর গিয়া মেয়েদের সরিয়া যাইতে বলিলেন। ফিরিয়া আসিয়া কিশোরীবাবুকে লইয়া তেতালায় গেলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তাঁহারা দুইজনে উপরে কাটাইলেন। দুইজনে নামিয়া আসিলে পর, কিশোরীবাবু নমস্কার করিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। দাদাকে ভারি খুসী-খুসী দেখাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"কিশোরীবাবু অতি সজ্জন ব্যক্তি। এ-রকম বিচক্ষণ ও সমজদার লোককে ছবি দেখাইয়াও তৃপ্তি আছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শনিবার বৈকালে কিশোরীবাবু আসিলেন। বলিলেন—দাদার 'ফটোগ্রাফ'গুলি দেখিয়া প্রকাশক বড়ই খুসী হইয়াছেন। বলিয়াছেন—"অ্যাঁ!—তিনি এমন 'ফটো'ও তুল্তে পারেন? 'অ্যামেচার' বলে বোঝ্বার যো নেই। আমরা মনে কর্তাম, তিনি বুঝি সুধু একজন ভাল লেখক! ভগবান্ যাকে প্রতিভা দিয়েছেন, সে যে কাযেই হাত দিক্—সেই কাযেই জয়-জয়কার!"

কিশোরীবাবুর নিকট আরও জানা গেল, দাদার-তোলা ছবি দুইখানির কল্যই প্রকাশক ব্লক করিতে দিবেন। তাঁহার নিজের 'ফটোগ্রাফ'খানি কিন্তু পছন্দ হয় নাই।

দাদা বলিলেন—"হ্যাঁ—ও 'ফটো'খানি তেমন সুবিধে হয় নি। আলো-ছায়াটা সব জায়গায় ঠিক হয় নি, তা আমিও দেখে বুঝেছি।"

কিয়ৎক্ষণ অন্যান্য কথার পর দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ত্রিশবিঘার খবর কি?"

কিশোরীবাবু বলিলেন—"হাঁ—সে ঠিক হয়ে গেছে। দিগম্বরবাবু গিয়ে রাজাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করাতে তিনি সম্মত হয়েছেন। তাঁর 'প্রাইভেট্ সেক্রেটারি' অনেকগুলি 'ফটো'ও এনে দিলেন। সে সব দেখে দিগম্বরবাবু রাজাকে বল্লেন—'আপনার রাজ-বেশের ছবি ত—ওর নাম কি—অনেক ছাপা হয়ে গেছে। এবার আপনাকে রাজা-হিসাবে নয়, সাহিত্যিক-হিসাবে ছাপ্তে চাই। আপনি একটি ফুর্ফুরে পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে, চটি-জুতো পরে টেবিলের কাছে বসে—ওর নাম কি—কবিতা লিখ্ছেন—এই রকম ছবিটি আমরা চাই। রাজা হেসে বল্লেন—আচ্ছা, রবিবারদিন আমি কল্‌কাতায় যাব, বিকাল পাঁচটার সময় ভবানীপুরে এসে আমার ঐরকম ছবি তুলে নেবেন।"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিশোরীবাবু, আপনি চা খান কি?"

"খুব খাই—তবে 'কোকো'টারই আমি বেশী পক্ষপাতী—ওতে 'ট্যানিন্' নেই।"

দাদা আমাকে বলিলেন—"অবিনাশ, কিশোরীবাবুর চা এনে দে।" আমি চাকরকে বলিলে—সে কিছু পরেই দুইথালা মিষ্টান্ন ও দুই পেয়ালা চা লইয়া উপস্থিত হইল।

কিশোরীবাবু ও দাদা উভয়ে গল্প করিতে করিতে চা-পান করিতে লাগিলেন। কিশোরীবাবু বলিলেন—"বিহারীবাবু, তা হলে আপনার ছবি তোল্বার জন্যে কাল সকালে ৮টার সময় আমাদের—ওর নাম কি—সেই সাহেবকে নিয়ে আস্ব, কি বলুন? আপনার কোনও অসুবিধা হবে না ত?"

দাদা বলিলেন—"বিলক্ষণ! আপনাদের অসুবিধা না হলেই হল।"

কিশোরীবাবু চা-পান শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, তা হলে এখন উঠি। কাল সকালে ৮টার সময় আস্ব—আপনি প্রস্তুত থাক্বেন—ঐ কথা রহিল।" বলিয়া নমস্কার করিয়া বিদায়-গ্রহণ করিলেন।

সেদিন রাত্রে আমরা খাইতে বসিয়াছি—বউদিদি পাখা হাতে করিয়া আমাদের কাছে বসিয়া আছেন—দাদা বলিলেন—"কিশোরীবাবু কাল আটটার সময় আমার ছবি তুল্তে আস্ছেন। তুমি যে বরাবর বল্তে—কি ছাই-পাঁশ, মাথা-মুণ্ড লেখ, কিছুই বোঝা যায় না—সেই লেখারই কদর দেখ্ছ এখন? লোকে বাড়ী বয়ে ছবি তুল্তে আসছে।"

বউদিদি মনে মনে খুব খুসী হইয়াছেন—তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল; কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া তিনি বলিলেন—"হ্যাঃ—ভারী ত লেখা! বরং অবিনাশের গল্প পড়ে বুঝ্তেও পারা যায়, আর লাগেও ভাল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রবিবারদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখি—দাদা ভৃত্যদের উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন—

"কাল রাত্রে পৈ-পৈ করে বলে দিলাম—আজ সকালে ঠিক সাড়ে-ছটার সময় আমার স্নানের জন্যে গরম জল চাই—এখনও জল হল না!"—ইত্যাদি।

অতি সাবধানে দাদা ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। আমাকে বলিলেন—"ওরে, তুই সেদিন কি একখানা সাবান মাখ্ছিলি না—বেশ গন্ধ বেরুচ্ছিল—সে রকম সাবান আর আছে?"

সাহেব-বাড়ীর 'সেলে' দুইটাকা চারিআনা মূল্যে তিনখানি 'ফ্রেঞ্চ্-সোপ' কিনিয়াছিলাম—তাহারই একখানি দাদাকে আনিয়া দিলাম। দাদা, স্নানের ঘরে বসিয়া অর্দ্ধঘণ্টাকাল সাবান ও গরম জলের শ্রাদ্ধ করিলেন। স্নানান্তে বউদিদির শিশি হইতে খানিকটা সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া লইয়া তাঁহার মস্তকে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে আর্শীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতি যত্ন করিয়া কেশ-বিন্যাস করিলেন। দাদার সে চুল কি সহজে বাগ মানিতে চায়! 'বুরুস' দিয়া অনেকক্ষণ ঘসিবার পর অনেকটা ঠিক হইয়া আসিল—তবুও মাঝে মাঝে চুল খাড়া হইয়া রহিল।

চা-পান করিয়া ঘড়ি দেখিলেন—সাড়ে-সাতটা। বউদিদির নিকট হইতে চাবি চাহিয়া লইয়া বাক্স হইতে একটি শাদা শিল্কের পাঞ্জাবী বাহির করিলেন। একখানি মিহি শান্তিপুরে ধুতি কোঁচান ছিল—তাহাই পরিলেন। বউদিদি একবার করিয়া ঘরে আসেন আর দাদার কেশ-বিন্যাস দেখিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যান। জামা প্রা হইয়া গেলে দাদা হাঁকিলেন—"ওগো, চাবীটা আর একবার দাও ত।" চাবি লইয়া দাদা বউদিদির বাক্স খুলিলেন। একটু পরে দেখি, দাদা আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গোঁফে 'কস্মেটিক্' লাগাইতেছেন।

বউদিদি বলিলেন—সব ত হল—চুলগুলো যে ঠিক হল না!"

দাদা বলিলেন—"প্রত্নতাত্ত্বিকের চুল এই রকমই হয় গো, এই রকমই হয়।

ঠিক আটটা বাজিলে, দাদা আমায় বৈঠকখানায় পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন—"ওরা এলেই আমায় খবর দিস্।" স-আটটা—ক্রমে সাড়ে-আটটা হইল—কৈ, কিশোরীবাবুর ত দেখা নাই! নটা বাজিলে, দাদা একটু অস্থির হইয়া উঠিলেন—বৈঠকখানায় আসিয়া বলিলেন—"তাই ত! কিশোরীবাবু এত দেরী কর্ছেন কেন? তাঁর কোনও অসুখ-বিসুখ হয় নি ত!" সাড়ে-নটা—দশটা—কাকস্য পরিবেদনা—কোথায়-বা কিশোরীবাবু আর কোথায়-বা সাহেব! দাদার মুখখানি ছোট হইয়া গেল।

অবশেষে দাদা স্থির করিলেন—নিশ্চয়ই কিশোরীবাবুর কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—কথা দিয়া, কথা না রাখার লোক ত তিনি নহেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈকাল চারিটার সময় আমাদের দ্বারে একখানি 'ট্যাক্সি'গাড়ী অসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে নামিলেন, কিশোরীবাবু। দাদা দাঁড়াইয়া উঠিয়া—"আসুন, আসুন, বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিশোরীবাবু আসিয়া একখানা চেয়ারে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"আর মশায়, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

দাদা উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা কলিলেন—"কি? কি?"

"সাহেব-বেটা ডোবালে—আমাদের ডোবালে! কাল দিগম্বরবাবু চিঠি লিখে, আজ ৭টার সময় তাকে আমাদের আপিসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমিও সেজে-গুজে বসে আছি—তাঁকে নিয়ে এসে ৮টার সময় আপনার ছবি তুল্‌ব—বেটা এলই না।

"আটটার সময় দিগম্বরবাবু দরোয়ান পাঠিয়ে দিলেন—সে ফিরে এসে বল্লে—'সাহেব কাল—ওর নাম কি—রাত তিন্‌টে অবধি মদ খেয়েছে—আজ এখনও শুয়ে ঘুমুচ্ছে।' তারপর আজ পাঁচটার সময় রাজা-বাহাদুর—ওর নাম কি—'টাইম্' দিয়েছিলেন—ভবানীপুরে গিয়ে তাঁর ছবি তুলে আন্বার কথা। সে কথাও কাল বিকেলে দিগম্বরবাবু সাহেবকে লিখে জানিয়েছিলেন। রাজা আবার কাল ভোরের গাড়ীতেই ফিরে যাবেন—ত্রিশবিঘা থেকে সিমলা-পাহাড়ে যাবেন—আর কোথায় কোথায় যাবেন।

"আসল কথা, আজ পাঁচটার সময় তাঁর ছবি তোলা হল ত হল—নইলে—ওর নাম কি—সাতহাত জলের নীচে পড়ে গেল। দিগম্বরবাবু বল্লেন—'তুমি একখানা 'ট্যাক্সি' নিয়ে যাও—সাহেবকে নিয়ে ভবানীপুর যাও।'—গেলাম সাহেবের বাড়ীতে—"

দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখনও ওঠে নি নাকি?"

"না মশাই, উঠেছে—আবার মদ খাচ্ছে। আরও দু-তিন বেটা এসে জুটেছে—সবাই বসে মদ খাচ্ছে। আমি গিয়ে 'কার্ড' পাঠিয়ে দিলাম—যেন বেটার খানা-বাড়ীর রেইয়ৎ! বেটা চোখ ঘুরিয়ে বল্লে 'Get out you—হাম রবিবারমে কাম নেহি কর্তা হ্যায়।'—গেলাম দিগম্বরবাবুর কাছে ফিরে। তিনি ত শুনে—ওর নাম কি—মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্লেন। আমি বল্লাম, 'আপনি অত ভাব্বেন না—আমি বরং বিহারীবাবুকে নিয়ে যাচ্ছি।' তিনি বল্লেন—'বিহারীবাবু কি যাবেন?'—আমি বল্লাম—'কেন যাবেন না? অতি ভদ্রলোক তিনি।' দিগম্বরবাবু বল্লেন, 'তবে ছুটুন—তিনি যদি এ বিপদে আমায় উদ্ধার করেন, ত সে উপকার ভুল্‌ব না।—এই ত অবস্থা মশাই। এখন আপনি যা করেন।"

দাদা বলিলেন—"কটার সময় রাজা 'টাইম' দিয়েছেন?"

"পাঁচটা। এখন সওয়া-চারটে। দশ মিনিটে বেরুতে পার্লেও সেখানে আমরা পৌনে-পাঁচটায় পৌঁছে যাব। মশাই, যদি দয়া করেন, তবেই—ওর নাম কি—আমাদের মান-ইজ্জৎ বজায় থাকে।"—কিশোরীবাবু কাঁদ-কাঁদ হইয়া শেষের কথাগুলি বলিলেন।

দাদা বলিলেন—"তার জন্যে আর চিন্তা কি, কিশোরীবাবু? আপনাদের এই সামান্য কাজটুকু করে দেব—এ আর বড় কথা কি? আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এখনই তৈরি হয়ে আস্ছি। বড় 'ক্যামেরা'টিই নেব ত?"

কিশোরীবাবু একমুহূর্ত্ত ভাবিয়া বলিলেন—"বিহারীবাবু! এক কাজ করুন, বড়টি,—মাঝারিটি দুটি 'ক্যামেরা'ই নিন্। অনেক সময়ে দেখা যায়, বেশী দামের 'ক্যামেরা'র চেয়ে কম দামের 'ক্যামেরা'তেই ছবি ওঠে ভাল। দুটো দিয়েই ছবি তুল্বেন—যেখানা—ওর নাম কি—ভাল হয়।"

"আচ্ছা বেশ" বলিয়া দাদা উঠিলেন। আমায় বলিলেন—"ওরে, আয় ত।"

পাঁচমিনিট পরে দাদা বড় 'ক্যামেরা'টি, আমি মাঝারিটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিলাম। 'ক্যামেরা' দুইটি সাবধানে 'ট্যাক্সি'তে রাখা হইল।

কিশোরীবাবু দাদার 'কোটে'র বক্ষঃস্থলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"আমি সঙ্গে ঘড়ি আনি নি—আপনি ঘড়িটি নিন্।"

দাদা আমাকে বলিলেন—"যা ত রে, ঘড়িটে নিয়ে আয়।"

আমি ঘড়ি আনিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বউদিদির নিকট হইতে চাবি লইয়া ঘড়ি বাহির করিবার জন্য দাদার বাক্স খুলিতেছি, এমন সময় দাদা প্রবেশ করিয়া বউদিদিকে বলিলেন—"কিশোরীবাবু বল্‌ছেন—ভবানীপুরের ফের্তা আজ ওঁদের

ওখানে খাওয়া-দাওয়া করে' তবে আস্‌ব। ফির্‌তে একটু দেরী হবে—এই বল্‌তে এলাম।"

ঘড়ি লইয়া দাদা প্রস্থান করিলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলাম।

আমরা যখন দরজার বাহির হইলাম—তখন দেখি—'ট্যাক্সি'-খানি অন্তর্হিত হইয়াছে।

দেখিয়াই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। তন্মুহূর্ত্তেই বুঝিলাম—জুয়াচোরের পাল্লায় পড়িয়া 'ক্যামেরা' দুইটি গেল। ভাবিলাম, দাদা এখনই হাঁক-ডাক করিয়া লোক জড়' করিবেন ও পুলিসে খবর দেবেন।

কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল যে, কিশোরীবাবু এখনই ফিরিয়া আসিবেন—নিশ্চয়ই কোনও দরকারী কাযে নিকটে কোথাও গিয়াছেন। মিনিট দশ অপেক্ষা করিবার পর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৌদিদিকে বলিলেন, "এরকমভাবে আমাকে বসিয়ে রাখা কিন্তু কিশোরী-বাবুর ভারি অন্যায়।—এদিকে সময় হয়ে এল।

বৌদিদি বলিলেন—"তুমি যেমন ভালমানুষ—সে বোধ হয় জুয়াচোর—তোমার দামী 'ক্যামেরা' নিয়ে পালিয়েছে।"

দাদা বলিলেন—"ক্ষ্যাপা না পাগল! তাও কি হতে পারে? কি যে বল, তার ঠিক নেই।"

আধ-ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও যখন, কিশোরীবাবু আসিল না, তখন দাদা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন—"তাই ত! মজুমদারব্রাদার্সের ঠিকানাটাও জানি না—নইলে, সেখানে গিয়ে খবরটা নিতাম, কি হল। আচ্ছা অবিনাশ তুমি এক কাজ কর। ভবানীপুরে ত্রিশবিঘার রাজার বাড়ী চেন?"

আমি বলিলাম—"চিনি। হরিশ মুখুয্যের রোডে ত?"

"হাঁ—চাদরটা নিয়ে বেরিয়ে পড়। কি জানি, যদি হঠাৎ কোনও খবর পেয়ে কিশোরীবাবু সেইখানে গিয়ে থাকেন?"

বউদিদি বলিলেন—"হঠাৎ কি খবর আর পাবে?"

"পেতে পারে না? কত রকম হতে পারে। ধর, সেই সাহেব-টাই যদি হঠাৎ এখানে এসে পড়ে থাকে? কিশোরীবাবু তাকে দেখে গাড়ীতে তুলে নিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেছেন। 'ক্যামেরা', সাজ-সরঞ্জাম সবই ত রয়েছে। আমার দেরী হচ্ছে দেখে হয়ত তিনি—"

আমি ট্রামযোগে ভবানীপুর গেলাম। দারোয়ানদের নিকটে জানিলাম—রাজা মাসখানেক হইতে দার্জ্জিলিঙ্গে।

রাত্রি নয়টার পর, দাদা বটতলা-থানায় গিয়া খবর দিলেন।

পরদিন উক্ত থানার 'ইন্‌স্পেক্টর' দাদার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—"দেখুন দেখি, এই লোক কি না?" বলিয়া 'পকেট' হইতে একখানি ছোট 'ফটো' বাহির করিয়া আমা-দের সম্মুখে ধরিলেন। দেখিবামাত্র আমরা উভয়ে কিশোরীবাবুকে চিনিলাম।

'ইন্‌স্পেক্টর'-বাবু চিন্তান্বিত স্বরে বলিলেন—"হাঁ, অনেকদিন থেকেই আমরা তাকে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। বড় ধড়িবাজ লোক সে। তার আসল নাম গোপীপদ, আর তার গণ্ডা গণ্ডা জাল নাম আছে। সাতবছর এই কাজ কর্‌ছে। কখনও শোনা যায়—'মোটর-কার' সরিয়েছে—কখনও ঘড়ী—আর দামী দামী 'ক্যামে-রার প্রতি তার বিশেষ লোভ। 'ক্যামেরা'-সম্বন্ধে লোকটা expert। ছবি তুল্‌তে ওস্তাদ। একটা 'ক্যামেরা' নিয়ে সেটাকে এমন বদ্‌লে দিতে পারে যে, আর চেনা যায় না। তাকে আমরা অনেকদিন থেকে ধর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি—আজও পারি নি। আপনার 'ক্যামেরা' পাবার আশা খুব কম বলে মনে হয়।"

দাদা বলিলেন—"বেটা জান্‌লে কি করে যে, আমার 'ক্যামেরা' আছে?"

'ইন্‌স্পেক্টর' বলিলেন—"দোকানে দোকানে সন্ধান রাখে, কে কবে কোথা থেকে কত টাকা দামের 'ক্যামেরা' কিন্‌লে।"

"সে কি সকলকেই ঐ একরকম গল্পই বলে?—কোন বই-এর জন্যে ছবি তোল্‌বার ভার দেওয়া?"

"না তা নয়। তার অনেক বাঁধা গল্প আছে—যার পক্ষে যেটা খাটে, তার ওপর সেটা চালায়।"

দাদা বলিলেন—"ভারি আশ্চর্য্য ত! কি রকম করে জান্‌লে—আমাকে কোন্ গল্প বলে ফাঁদে ফেল্‌তে পারবে? সে ইতি-পূর্ব্বে আমাকে কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না।"

'ইন্‌স্পেক্টর' বলিলেন—"সে একবার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌লে, একটা-না-একটা-কিছু না নিয়ে যায় না।"

দাদা দুঃখিত স্বরে বলিলেন—"তা হলে দেখ্‌ছি, 'ক্যামেরা' দুটি গেল!" 'ইন্‌স্পেক্টর'-বাবু বলিলেন—"একেবারে হতাশ হবেন না। শীঘ্রই সে ধরা পড়্‌বে। আমরা তার জন্যে দুই-একটি ফাঁদ পাত্‌ছি—যাক্ সে সব official secret. যদি আপনার জিনিষ নষ্ট করে না ফেলে, তা হলে ফিরে পেতে পারেন। তবে খুব আশা আছে, তাও বল্‌তে পারি নে।"

*　　　*　　　*　　　*

উক্ত ঘটনার পর ছয়মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। দাদা মধ্যে মধ্যে থানায় গিয়া খবর লন। কিশোরী আজিও ধরা পড়ে নাই।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

মেঘের কথা

বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে অনুদিন—অনুক্ষণ প্রকৃতির মনোরম অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; সেগুলি আমাদের চিরসহচর। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে,—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবের সহিত সেই দৃশ্যাবলীর এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা আছে। যতক্ষণ সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্ন, ততক্ষণ জীব জীবিত,—ততক্ষণ জীব 'জীব' নামে অভিহিত। যাহাদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা, এতখানি আত্মীয়তা—যাহাদের সহিত ক্ষণমাত্র সম্বন্ধ-বিরহিত হইলে, জীবের আর দেহধারণের উপযোগিতা থাকে না, সেই সকল পদার্থের পরিচয় কিছু-না-কিছু জানা সকলেরই কর্ত্তব্য। এরূপ আত্মীয়ের সংখ্যা অপরিমেয়; কিন্তু ইহাদের মধ্যে আবার ক্ষিতি, জল, বহ্নি, বায়ু ও আকাশ এই কয়টি আমাদের পরমাত্মীয়। আত্মীয়ের যে কুটুম্ব, সেও অবশ্য আত্মীয়; সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সহিত জল ও জলের সহিত সম্পর্কিত হওয়ায়—মেঘ আমাদের পরমাত্মীয়। আজ আমরা সেই মেঘের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের শৈশবকালে যে মেঘ পর্ব্বত-গাত্রের শালবনে শালপাতা খাইতে যাইত, যে মেঘের মুখনিঃসৃত লালা হইতে অভ্র জন্মিত, এ সে মেঘ নয়; মহাকবি কালিদাস যে মেঘকে বিরহ-ব্যথা-ব্যথিত প্রণয়ী যক্ষের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, এ সে মেঘ নয়। কলাশাস্ত্র-মতে যে ওড়বজাতীয় মেঘ ললিতা, গৌড়ী, মল্লারী, ভূপালী প্রভৃতি নায়িকাগণের অন্যতম নায়ক; জালন্ধর, সার, নটনারায়ণ, শঙ্করাভরণ, কল্যাণ, গজধর, গান্ধার ও সাহানা এই আত্মজাষ্টকের জনক এবং যে মেঘমল্লার-রাগের আবাহন করিয়া সিদ্ধ গায়ক তানসেনের কন্যা দীপক-রাগের শিখা-প্রজ্বলিত পিতাকে আসন্ন অপঘাত-মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াও সফলপ্রযত্ন হইতে পারে নাই, এ মেঘ—সে মেঘও নয়। যে মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া ত্রিভুবন-বিজয়ী অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ লোক-লোচনের অলক্ষ্যে বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেন, এ মেঘ—সেই মেঘ। তপনের তপ্তরশ্মি-শোধিত ভূ-পৃষ্ঠস্থ বারিরাশি ঘন বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া যে মেঘ আকাশে অবস্থান করে, এ সেই মেঘ। বারিবর্ষণে যে মেঘ এই পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করিয়া পরোক্ষভাবে জীবমাত্রেরই পালনকার্য্য করিতেছে, এ সেই মেঘ। সেই মেঘের কথাই আজ কিছু বলিব।

মহাকবি সেক্সপীয়র সত্যই বলিয়াছেন—

> "Men judge by the com; lexion of the sky
> The state and inclination of the day."
>
> Richard II, iii. ?.

ভূয়োদর্শন-ফলে মানব আকাশের মূর্ত্তি দেখিয়া দিনের অবস্থা বলিতে পারে। যখন বিজ্ঞানের জন্ম হয় নাই, যখন মানবকে আপনার অভিজ্ঞতা-বলে ঝড়, বৃষ্টি, বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইত, তখন হইতে মানব আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মেঘ-গুলি ও তাহার আনুষঙ্গিক কার্য্যাবলীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, আর তাহার অভিজ্ঞতার ফল—প্রবচন, ডাক ও প্রবাদে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কোন্ মেঘের কিরূপ প্রকৃতি এবং বর্ষণ-সম্ভাবনা কতটুকু, তৎ-সম্বন্ধে ইংরেজিতে পাশ্চাত্য দেশের বহুলোকের ভূয়োদর্শন-প্রসূত বচনমালা আছে। আমরা নিম্নে দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

> "The circle of the moon never filled a pond;
> The circle of the sun w ts a shepherd,"

পুনশ্চ—

> "The bigger the ring, the nearer the wet"

রিচার্ড ইওয়ার্ড (Richard Iward) সাহেব এইরূপ ডাকের বচন সংগ্রহ করিয়া "Weather lore" নামে প্রকাশ করিয়াছেন; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা পাঠ করিতে পারেন। আমাদের দেশেও এই প্রকার নানা বচন, নানা ছড়া প্রচলিত আছে। নিম্নে দু'-একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

> "পূর্ব্বেতে উঠিল কাঁড়।
> ডাঙ্গা ডোবা একাকার॥"
> "চাঁদের সভার মধ্যে তারা।
> বর্ষে পানি মুষলধারা॥"
> "দূর সভা নিকট জল।
> নিকট সভা রসাতল॥"

চন্দ্রমণ্ডল বহুদূরব্যাপী হইলে, শীঘ্র বর্ষণ আশা করা যায়। উল্লিখিত ইংরেজি-প্রবচনেও ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু আমাদের মনীষীরা এইখানেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া ভূয়োদর্শন-ফলে আরও বুঝিলেন যে, চন্দ্রমণ্ডল নিকটে হইলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হইবে ও মণ্ডলের মধ্যে তারা দেখিতে পাওয়া গেলে মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িবে।

> "কি কব শ্বশুর লেখা জোখা।
> মেঘেই বুঝ্‌বে জলের লেখা॥
> কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
> মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
> কৃষককে বল্‌গে বাঁধতে আল।
> আজ না হয় হবে কাল॥"

পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রধনু উঠিতে দেখিলে, প্রবল বর্ষণ হইবে বুঝিতে পারা যায়—

> "পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা।
> পূবের ধনু বর্ষে ঝড়া॥"

হাওয়ার গতি দেখিয়া বলা হয়—

> "বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়।
> সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কয়॥"

জীবদিগের মধ্যে ভেকের মকমকানি-ধ্বনি হইতে বর্ষা সূচিত হয়।

> "বেঙ্ ডাকে ঘন ঘন।
> বৃষ্টি হবে শীঘ্র জান॥"

এক্ষণে মেঘের জন্ম-সম্বন্ধে বিজ্ঞান কি বলে দেখা যাউক। বিজ্ঞান বলিতেছে, যে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলরাশি, সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত ও বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং বাষ্পের প্রকৃতি-ধর্ম্ম-অনুসারে উপরে উঠিয়া ঘনীভূত হইয়া থাকে, সেই ঘনীভূত বাষ্পের নাম মেঘ;

নৈসর্গিক কারণে ঐ বাষ্প পুনরায় দ্রবীভূত হইয়া যে বিন্দুরূপে ভূতলে পতিত হয়, তাহারই নাম বৃষ্টি।

মেঘ জলীয় বাষ্প। পৃথিবীর বহু উপরে বায়ুস্তরে ভাসিতে থাকে। কুয়াসাও জলীয় বাষ্প--তবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কুয়াসা মেঘের ন্যায় বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করে না আর ইহা মেঘের ন্যায় স্বচ্ছও নয়। এরূপ হইবার কারণ এই যে, ঊর্দ্ধের বায়ু যত সূক্ষ্ম, নিম্নস্তরের বায়ু তত সূক্ষ্ম নয়; কাজেই বাষ্প যত ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহার সূক্ষ্মাংশসকল ততই জমাট বাঁধিয়া গিয়া মেঘাকার ধারণ করে। মেঘ অনেক রকমের আছে। এক-রকমের মেঘ আকাশে ঘন কৃষ্ণবর্ণ পটমণ্ডপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আর এক রকমের মেঘ একটি সূক্ষ্ম আবরণের আকৃতি ধারণ করে; সে আবরণ এত সূক্ষ্ম যে, সূর্য্যরশ্মি সহজেই তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত মেঘে চতুর্দ্দিক অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন হয়, অপর মেঘ সূর্য্যালোকের কোনরূপ প্রতিবন্ধক হয় না।

মেঘের জন্ম-সম্বন্ধে বিজ্ঞান যাহা বলে, হিন্দুর পুরাণও ঠিক সেই কথাই রূপকচ্ছলে বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা সত্যগুলিকে যথাসম্ভব সরল ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন, আর পুরাণকারগণ ঐ গুলিকেই ধর্ম্মের সহিত অঙ্গীভূত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।

মেঘের উৎপত্তির নিদান ও উপাদান-সম্বন্ধে আমাদের কূর্ম্ম-পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে--

মধ্যাহ্নকালে তাপবৃদ্ধির সহিত মেঘগুলিকে সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। দিবাভাগে বাষ্পের সহিত মেঘগুলি ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। পরে ক্রমশঃ শীতল বায়ুস্তরে উপনীত হইয়া মেঘগুলি জলভারাক্রান্ত হয়। এইরূপ ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর স্তরে সমুত্থিত হইয়া সমধিক শীতল বায়ু-সংস্পর্শে মধ্যাহ্ন-গগন কখনও কখনও ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই মেঘসমূহকে সচরাচর সূর্য্যাস্তকালে অদৃশ্য হইতে দেখা যায় না। এগুলি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের সূচনা করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মেঘের নাম "Cumulo Stratus।" এই শ্রেণীর মেঘ কখন কৃষ্ণবর্ণ, কখন বা নীলবর্ণের আকার ধারণ করিয়া থাকে।

বিজ্ঞানের মতে বাষ্পাকারে ঘনীভূত মেঘ আকাশমার্গে বায়ু-ভরে উড়িতে উড়িতে কোন উচ্চস্থানে গিয়া বাধা পাইলেই তাহার গতিরোধ হইয়া যায়। রুদ্ধগতি না হইলে হয় ত সেই মেঘ চিরদিনই অনন্তপথ চলিতে থাকিত। চলিতে চলিতে যেখানে উপযুক্ত দেশ-কালের সংযোগ হইত, সেইখানেই বারিবর্ষণ করিত; কিন্তু রুদ্ধগতি হওয়ায়, যে প্রদেশে গিয়া আবদ্ধ হয়, সেই প্রদেশেই থাকিয়া যায় এবং উপযুক্ত সময়ে সেইখানে বর্ষণ করিতে থাকে।

মেঘ উড়িতে উড়িতে কোন এক উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে বাধা পাইয়া আট্‌কাইয়া যায়; আর পর্ব্বতগাত্রে অনেকস্থানেই বড় বড় শাল গাছ থাকে; সুতরাং শালবনে গিয়া মেঘ আটকা পড়ে এবং যথা-সময়ে সেই প্রদেশে বারিবর্ষণ করে। অধিকন্তু গাছের সবুজ পাতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র থাকায়, উহার মুখ হইতে প্রভূত পরিমাণে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। সেই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। এই কারণে বনবহুল প্রদেশে সচরাচর অধিক বৃষ্টি হয়। আর শৈশবের ঠাকুরমার নিকট শ্রুত মেঘের শালপত্র-ভক্ষণ-কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবতঃ এই বৈজ্ঞানিক সত্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে সুন্দরবন কাটিয়া ফেলাতে বাঙ্গালা-দেশে আজকাল আর পূর্ব্বের মত প্রচুর বৃষ্টি হয় না, প্রকৃতি-তত্ত্ববিদ্ আজ-কাল এই কথা বলিয়া থাকেন।

এইবার মেঘের আকৃতি-প্রকৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে যত কিছু বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, সকলই রঙ্গময়ী প্রকৃতির রঙ্গ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বায়ু, অগ্নি, অনল, সূর্য্য, মানবের হাসি-কান্না, হর্ষ-বিষাদ প্রভৃতি কত নাম করিব, সকলই অনন্তরূপিণী প্রকৃতির এক এক মূর্ত্তি। সেই একই মূর্ত্তি আবার রঙ্গালয়ে অভিনেত্রীর মত প্রয়োজন ও অবস্থানুসারে দেশ, কাল, অবস্থার পরিবর্ত্তনসহকারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত ও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি সর্ব্বরূপস্বরূপিণী হইলেও, অপ্রমেয়, অনন্ত আকাশই যেন তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া মনে হয় এবং বিবিধ বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত, বহুরূপীর মত ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল মেঘপুঞ্জ প্রকৃতি-জননীর অঙ্কে শায়িত শিশুর মত কখনও রাগিতেছে, কখনও হাসিতেছে, কখনও বা আবার কান্নার অভিনয় করিতেছে।

মেঘের নামকরণ এবং শ্রেণী-বিভাগেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দু পুরাণের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। শ্রেণী-বিভাগে হিন্দু-পুরাণ-মতে মেঘের সংখ্যা বহু হইলেও প্রধানতঃ চারিটী মেঘকে মেঘ-নায়ক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। জ্যোতিস্তত্ত্বে উল্লিখিত আছে—

"ত্রিযুতে শাকবর্ষেতু চতুর্ভিঃ শোধিতে ক্রমাৎ।
আবর্ত্তং বিদ্ধি সম্বর্ত্তং পুষ্করং দ্রোণমম্বুদং॥

হিন্দু-শাস্ত্র-মতে প্রধান চারি মেঘ-নায়কের নাম—আবর্ত্ত, সম্বর্ত্ত, পুষ্কর এবং দ্রোণ।

দেশ-কালভেদে যে মেঘের বর্ণ ও ক্রিয়া-ভেদ হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। সান্ধ্য গগনে দূর-বিসর্পিত মেঘের বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং প্রভাতকালীন মেঘের বহ্বারম্ভ লঘু-ক্রিয়া ত চিরপ্রসিদ্ধ। যেখানে কথার চোটে গগন ফাটে, কিন্তু আসল কাজ কিছু হয় না, সেইখানেই লোকে শারদ-মেঘের তুলনা দিয়া থাকে—গর্জ্জন আছে, বর্ষণ নাই। এইরূপ সকল মেঘের এক একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। ঈশান কোণে কাল মেঘ উঠিলেই, মাঝি-মাল্লাদের মধ্যে 'সামাল সামাল' ডাক পড়িয়া যায়। পশ্চিম গগনে মেঘ দেখা দিলেই বর্ষণ অনিবার্য্য। মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন—

"অমোঘা পশ্চিমে মেঘাঃ অমোঘা পূর্ব্ব বায়বঃ।
অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুৎ অমোঘা ব্রাহ্মণাশীষঃ॥"

নর নারীর চরিত্রে আর মেঘের চরিত্রে বেশ একটা সামঞ্জস্য আছে। অব্যবস্থিতচিত্ত মানবের সহিত শরতের মেঘের তুলনা করা যাইতে পারে। দেব-প্রতিম দুর্ব্বাসা-ঋষির সহিত বৈশাখের রুদ্রমূর্ত্তি প্রলয়ঙ্কর সাধু মেঘের তুলনা করা যাইতে পারে। আবার বৈশাখের প্রবল ঝড় ও বর্ষণের পরমুহূর্ত্তেই উজ্জ্বল-মধুর রৌদ্র-সমাগমে শান্তির মধুর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা প্রগল্‌ভা নারী-চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা উপলক্ষ ও সুযোগ ঘটিলে মিলাইয়া দেখিবেন যে, মধ্যাহ্নকালীন ক্ষণরৌদ্র ক্ষণবর্ষণশীল মেঘের সহিত 'খ্যাখন হাসি', 'ছিচ্ কাঁদুনী' নারীর সাদৃশ্য আছে কি না। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের প্রকৃতি ও বুদ্ধি গম্ভীর; যাঁহারা সময়ের অপব্যয় করেন না; যাঁহারা কর্ম্মী—যাঁহারা উপযুক্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত বর্ষাকালের মেঘের তুলনা হইতে পারে। আর এক প্রকৃতির লোক আছেন যাঁহারা

ইহার ঠিক বিপরীত। বয়োধর্ম্মে বা পদ-মর্য্যাদা-গৌরবে যাঁহারা সকলেরই নিকট অল্প-বিস্তর খাতির পাইবার দাবী রাখেন; কিন্তু "রীতে"র দোষে, বাচালতার জন্য—গাম্ভীর্য্যহীনতার জন্য আপনার মর্য্যাদা রাখিতে পারেন না; সেইরূপ প্রকৃতির লোকের সহিত বর্ষণলঘু, 'বাদুলে মেঘের' তুলনা অসঙ্গত নহে।

আবার ব্যক্তিবিশেষ আছে, যাহাদের পক্ষে ব্যক্তিবিশেষ বা প্রসঙ্গবিশেষের সংস্পর্শ অসহনীয়। যেমন ইষের মূলের ঘ্রাণ-মাত্র বিস্তৃতফণা দংশনোদ্যত ফণী, ফণা কুঞ্চিত করিয়া বিবরে প্রবেশ করে; গন্ধকের ধূম-গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে, বন্য করিযূথ যেমন দিগন্তরে পলায়ন করে; গন্ধ-দ্রব্যের সুঘ্রাণে আমোদিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ব্রণ-বিলাসী মক্ষিকার দল যেমন পূতিগন্ধময় স্থানের অন্বেষণে বিব্রত হইয়া পড়ে; কাগজ-পোড়ার গন্ধ পাইলে যেমন তৈলপায়িকা, বৃশ্চিকাদি কীট, আবর্জ্জনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুক্কায়িত হয়; 'বাদলের মেঘ' তদ্রূপ দক্ষিণা বাতাসের গন্ধ পাইলেই, শ্যেনপক্ষী-দর্শনে-পারাবতপুঞ্জের ন্যায় মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। বিজ্ঞান ইহার কি কারণ প্রদর্শন করে জানি না; প্রবাদ কিন্তু চিরদিনই ঘোষণা করিয়া আসিতেছে—

"বামুন বাদল বান,
দক্ষিণা পেলেই যান।"

বর্ণভেদে মেঘের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর অবশ্য, এ-সম্বন্ধে নানা মুনির যে নানা মত নাই, তাহা বলিতেছি না। তবে চাতুর্বর্ণ থাকুক্ আর নাই থাকুক্ বর্ণভেদ আছেই, আকাশের মেঘের মধ্যেও আবার সেইরূপ বর্ণভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নর-লোকে যেমন বর্ণভেদে বৃত্তিভেদ, মেঘলোকেও তেমনই বর্ণভেদে কর্ম্মভেদ আছে। সকল বর্ণের মেঘ একরূপ কর্ম্ম করে না। কোন মেঘ কেবল বারিবর্ষণ করে, কোন মেঘে ঝড় হয়, কোন মেঘে অশনিপাত হয়, কোন মেঘে শিলাবৃষ্টি হয়। আবার ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যেমন অনুলোমক্রমে ইতর বর্ণ বা বর্ণগণের সহিত মিলিত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া কোন বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হইতে পারে না,—মেঘের মধ্যেও তদ্রূপ অপর বর্ণত্রয় একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিলেও, ঝটিকাগর্ত্ত শূদ্র-জাতীয় মেঘ ব্যভিচার দোষ-দুষ্ট না হইয়া অন্য মেঘের সহিত মিলিত হইয়া একত্র কার্য্য করিতে পারে না।

ভূমিতল হইতে নগ্নদৃষ্টিতে দর্শন করিলে মেঘগুলিকে যেন একখানি সমতল ও সমান্তর বিস্তৃত ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, স্থূল, সূক্ষ্ম অনেক খণ্ড খণ্ড মেঘ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করে। বায়ুতাড়িত হইয়া কখন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড মেঘগুলি পরস্পর সংঘর্ষিত ও সংস্পৃষ্ট হইয়া এক অখণ্ড বিরাট্ আকার ধারণ করে। কখন বা সংযোগ, বিয়োগ উভয় শক্তিশালী ঐ বায়ু-প্রভাবেই এক অখণ্ড বিরাট্ মেঘ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতী-অঙ্গের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডম্বরে বিভক্ত হইয়া অনন্ত নভস্তলের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে; দূর হইতে কিন্তু তখনও যেন আমরা একখানি অখণ্ড মেঘ দেখিতেছি বলিয়াই মনে হয়। মেঘের আকারের রকমই বা কত। কোন মেঘ নিম্নপাদ স্থূলভূমি এবং ক্রমসূক্ষ্ম ঊর্দ্ধশীর্ষ, কোনখানি ঠিক তাহার বিপরীত ভাবাপন্ন, কোন মেঘ বস্ত্র-খণ্ডের মত সূক্ষ্ম এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-সমন্বিত, আবার হয় ত কোন মেঘ স্তরে স্তরে উপর্য্যুপরি স্তূপীকৃত স্থূলোদর বিশাল ঘনবপু পর্ব্বতের ন্যায় আপাদ-শীর্ষ দীর্ঘ ব্যবধান সমন্বিত। মেঘের হাসি-কান্নার লীলা তাহার অবয়বের স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার উপর নির্ভর করে। সূর্য্য-রশ্মি বা চন্দ্র-কিরণ সূক্ষ্ম মেঘের স্তর ভেদ করিতে পারিলেই মেঘের মুখে হাসি ফোটে আর স্তর স্থূল হইলে সে হাসির অভাব ঘটে। সকল মেঘের উপাদান এক নহে; সেই জন্য পুরাণ-বর্ণিত অস্তচূড়াবলম্বী আদিত্যদেবের সপ্তাসব বা সপ্তাশ্ব এবং বিজ্ঞান সম্মত সপ্তবর্ণ, ভিন্ন উপাদানে গঠিত ভিন্ন ভিন্ন মেঘের উপর পতিত হইয়া আকাশ-গাত্রে এককালে বিবিধ, বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ সম্পাদন করে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃত আকার ও বর্ণসহ মেঘের ছায়াচিত্র তুলিবার যন্ত্র আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন এবং এই কার্য্যে যে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হন নাই, তাহা নহে; তবে সে যন্ত্র এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই; কিন্তু এই বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে আশা করা যায়, অল্পকালমধ্যে জগতের লোক ঘরে বসিয়া ছায়াচিত্রে মেঘের আকার, তাহার প্রকৃত বর্ণ এবং প্রাকৃতিক আকর্ষণিক নিয়মানুসারে মেঘ হইতে মেঘান্তরে বিদ্যুল্লতার গতি-বিধি ও বিবিধ রঙ্গ-ক্রীড়া দেখিতে পাইবে।

মেঘের প্রকৃতি-সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা মেঘ দেখিলেই, সে মেঘের ফলাফল বলিতে পারেন। সেজন্য বিশেষ বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না; কেবল ভূরি দর্শনদ্বারা এই অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। মেঘ-সম্বন্ধে একস্থানের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যস্থানে কার্য্যকরী হয় না। একই প্রকৃতির মেঘ দেশ-ভেদে ভিন্নরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

মেঘের সকল কথা বলিতে গেলে, সকল পরিচয় দিতে গেলে, ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান সংকুলান হওয়া অসম্ভব; তবে আর একটা কথা বলিয়া আপাততঃ এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মেঘের অবস্থিতি-স্থানের কিছু স্থিরতা নাই। কুজ্ঝটিকা একপ্রকার মেঘ, এ মেঘ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাকারে নিম্ন প্রদেশে আমাদের চক্ষের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উচ্চতম শৈল হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া হয় ত দেখিতে পাওয়া যায় যে কখন বা মেঘ দর্শকের অনেক নীচে, কোথাও দর্শকের গায়ের উপর, আবার কোথাও বা দর্শকের মাথার উপর—এত উচ্চে যে, সে উচ্চতার পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন। মেঘ যত অধিক উচ্চে থাকে, ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ততই অল্প; মেঘ যত নীচে নামিবে, ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। এ সম্বন্ধে ইংরেজীতে একটী প্রবচন প্রচলিত আছে, "The higher the clouds, the finer the weather" মেঘের গতি-বিধি ও প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত গভরমেণ্টের একটি Meteorological observatetory নামে স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। ঐ বিভাগ হইতে, কোন্‌দিন কোথায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কিরূপ, কোথায় কত বারিপাত হইল, ইত্যাদি বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ বিবরণীর মন্তব্যে depression কথাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, অনেকেই তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অমুক স্থানের depression আর নাই, অমুক স্থানে depression দেখা গিয়াছে, অতএব সাবধান, ইত্যাদি সঙ্কেত-বাক্য Meteorological department-এর মন্তব্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এ সঙ্কেতের ভাবার্থ এই যে, the nearer the clouds, the fouler the weather, মেঘ নীচে নামিয়াছে; ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা অতএব মাঝি-মাল্লা সাবধান।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ঐশী লীলা

বাজাও গর্ব্বে বিজয়-ডমরু
সংহার পতি শঙ্কর !
ছড়াও শ্যামল প্রান্তরে মরু,
কুসুম-কাননে কঙ্কর।

স্পন্দনহীন অন্ধকারের
রন্ধ্রে ডুবেছে পৃথ্বী;
শূন্য মাঝারে খসিছে প্রাণের
চেতনারচিত ভিত্তি ;

নাহিক কণ্ঠে দাহ পিপাসার,
বুকে নিরাশার জ্বালা নাই ;
তীব্র তরল ধারা লালসার
কামনা-নদীতে ঢালা নাই।

বিনা সাধনায় বেদনার বলে
ছিঁড়েছি গ্রন্থি হৃদয়ের,
স্তব্ধ অন্ধ শূন্যের তলে
বাজুক ডমরু বিজয়ের।

একি নির্ব্বাণ আনিছ ঈশান !
পিষিয়া বিশ্ব পাষাণে ?
শুধু কি উড়িবে ফণীর নিশান
শব-সাধনার শ্মশানে ?

রুদ্ধ আঁধারে শ্বসে অনুভূতি,
ভস্মে বিলীন অম্বর।
মাখিয়া অঙ্গে বিশ্ববিভূতি
বাজাও ডমরু শঙ্কর।

শ্রীবিয়চন্দ্র মজুমদার

সেকালে দুর্গোৎসবের প্রারম্ভে পল্লী-চিত্র

শরতের শারদীয়া-পূজা, বঙ্গবাসিগণ আনন্দে পরিপূর্ণ। ঘরে ঘরে দশভূজার মূর্ত্তি গঠিত হইতেছে ; কোথাও বৃহৎ অট্টালিকার মার্ব্বেল মেঝেতে, কোথাও দালানের মাটীর মেঝেতে, কোথাও চণ্ডীমণ্ডপে, জগদম্বার মূর্ত্তি গঠিত হইতেছে। দেশে, বিদেশে কাছারী বন্ধ হইবে। চাক্‌রেরা বিদেশ হইতে বাড়ী আসিবে। পিতা-মাতা স্ত্রী-পুত্র, ও বন্ধু-বান্ধবের মুখ দেখিবে, আনন্দের সীমা নাই ; নগরে, পল্লীগ্রামে, সকল স্থানেই এইরূপ আনন্দ। বহুকাল পূর্ব্বে, যখন রেলগাড়ীর সৃষ্টি হয় নাই, দুই পয়সার টিকিট কিংবা পোষ্টকার্ডের সৃষ্টি হয় নাই, তখন বিদেশস্থ চাক্‌রেদের বাটী আসা সহজে ঘটিত না ; এমন কি পত্রের দ্বারা বাটীতে সংবাদ পাঠানও ঘটিয়া উঠিত না ; অধিকাংশ চাক্‌রেই একাকী বিদেশে জীবন কাটাইত। পথ দুর্গম, তাহার উপর আবার চোর-ডাকাতের ভয় ; সেইজন্য স্ত্রী-পুত্র লইয়া কর্ম্মস্থানে বাস করা চলিত না। জগদম্বার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের একটী বিশেষ কারণ এই যে, পিতা-মাতা বহুকালের পর ছেলের মুখ দেখিবেন ; স্ত্রী স্বামীকে দেখিবেন—সারা বছরের অদর্শনের দুর্ভাবনা ঘুচিয়া যাইবে। আর, ছেলেদেরও আনন্দ কম নয়—"বাবা আস্‌বেন, আমার জন্য কাপড়, জুতা, কত-কি আন্‌বেন !", স্বয়ং চাক্‌রেরও কি আনন্দের তুলনা আছে ? এইরূপ আনন্দ, নগর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে অধিক লক্ষিত হইত।

বৎসরের মধ্যে হিন্দুদিগের এই প্রধান মহোৎসবে কেহ বাটী সাজাইতেছেন, কেহ কাঙ্গাল, গরীব ও ব্রাহ্মণ-ভোজনের বেশ বন্দোবস্ত করিতেছেন, কেহ বা বাটীতে নাচ-গান, আলো-রোস্‌নাই কত-কি ধুম-ধাম করিবেন, তাহার আয়োজন করিতেছেন। যাহার বাটীতে পূজা নাই, যে দীন-দুঃখী, তাহারও আনন্দ আছে ও খরচ আছে। ছেলে-মেয়েদের এক একখানা কাপড় যেমন তেমন করিয়াও দিতে হইবে। যে বাটীর দালানে জগজ্জননীর আবির্ভাব হইবে, সে বাটী নব-কলেবর ধারণ করিতেছে। মাটীর উঠান চাঁচান হইতেছে—উঠানে 'মেরাপ' বাঁধা হইতেছে। বুড়া-কর্ত্তা হুঁকা হাতে করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের পৈটেয় বসিয়া তামাকু খাইতে খাইতে মজুর খাটাইতেছেন ও খক্-খক্ করিয়া কাসিতেছেন এবং সেইস্থানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেছেন। ছেলেরা বাটীর উঠানে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। বুড়া-কর্ত্তা, "ওরে দস্যিরা, থাম্ থাম্" বলিয়া ধমক্ দিতেছেন। ছেলেরা নিষেধ না শুনাতে বুড়া-কর্ত্তা তাহাদের শাসাইতেছেন, "রঃ ! ছুঁচোরা রঃ, আসুক্ তোদের বাপ আসুক, আমি বলে দেব, আর বাবা তোদের হাড় ভাঙ্গ্‌বে।" ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরদাদা, বাবা কবে আস্‌বেন ?" বুড়া-কর্ত্তা বলিলেন, "কাল কি পরশু আস্‌বেন।" ছেলেদের আনন্দ ও লাফালাফি বাড়িল।

তখন 'মিউনিসিপালিটী' ছিল না, তবু রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার ঝরঝর করিত। যাহার বাটীতে পূজা আছে, তাহার বাটীর সম্মুখে এবং উভয় দিকের কিছুদূর পর্য্যন্ত বন-জঙ্গল কাটা ও ঝাঁট দিয়া পরিষ্কৃত করা হইয়াছে ; এমন কি, রাস্তার ধারের বড় বড় গাছের ডাল, যাহা রাস্তার উপর ঝুলিত, তাহাও ছাঁটিয়া ফেলা হইয়াছে, পাছে বিজয়ার দিন গঙ্গাতে প্রতিমা লইয়া যাইবার ব্যাঘাত হয়। যে পাড়ায় বাঁধা-ঘাট নাই, সে পাড়ার পূজা-বাটীর কর্ত্তারা বড় বড় তালগাছ কাটিয়া, উহার ধাপ করিয়া ঘাট বাঁধিয়াছেন। এইরূপে সকল পূজা-বাটীর কর্ত্তারা রাস্তা-ঘাট, বন-জঙ্গল পরিষ্কার করাতে গ্রামের নব কলেবর হইয়াছে।

পূজার বাজারও বড় 'গুল্‌জার'। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি আনিয়া ব্যবসাদারেরা দোকান সাজাইতেছে। মুদি ও ময়রা বায়না লইতেছে, কাপড়ের ও জুতার দোকানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনতা। জুতাওয়ালারা খরিদ্দারের সঙ্গে বালক দেখিলেই চড়া-চড়া দর হাঁকিতেছে। কাপড়ের দোকানে গৃহস্বামিগণ নানাপ্রকার কাপড় দেখিতেছেন, দর করিতেছেনে, উঠিয়া যাইতেছেন, আবার ফিরিতেছেন।—একটী প্রাচীন লোক সপ্ততি বর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, তবুও কাপড়ের দোকানে

অনেকক্ষণ ধরিয়া মনোযোগের সহিত কাপড়-চোপড় দেখিতেছেন। তাঁহার কোনও কাপড় পছন্দ হইতেছে না। দোকানী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আপনি কাহার জন্য কাপড় চান ?"

বুড়া। -আমার গৃহিণীর জন্য।

দোকানী ষাটি বৎসরের বুড়ীর উপযোগী একখানি শাড়ী দেখাইল।

বুড়া।—না, না, না হে না, এ কাপড় নয়।

দো।—তবে কি কাপড় চান ?

বু।—খুব চাটাল পাড়, আর মাঝে সেইরূপ আর একটা পাড় থাকবে।

প্রাচীনের পরিধানের কাপড়ের দিকে চাহিয়া দোকানীর 'হরি-ভক্তি' উড়িয়া গেল। উহা কালাপেড়ে কাপড়।

দো। মহাশয় ! তবে আপনি পাছাপেড়ে কাপড় চান ?

বু। হাঁ, হাঁ। ওকে কি তাই বলে বটে ! তাই বাপু, তাই একখানা দাও।

উপস্থিত খরিদ্দারের মধ্যে একজন বুড়াকে জানিত, সে দোকানীকে চুপি চুপি বলিল, "উনি চতুর্থ পক্ষের স্ত্রীর জন্য কাপড় কিন্‌ছেন।"

প্রাচীন গৃহস্বামিগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণে একবার নদীর উপকূলে গিয়া তাঁহাদের চাক্‌রে ছেলেরা আসিতেছে কি না, দেখিতেছিলেন। নদীর এদিক্-ওদিক্ দেখিয়া, "কই আস্‌ছে না, কই আস্‌ছে না ?" বলিয়া, পরে নদীতীরে বসিয়া সায়ং-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া বাটী প্রত্যাগমনান্তর কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে নিকটস্থ গৃহস্থের বাটীতে, যেখানে প্রতিমা সাজাইতেছে, সেই দালানে বসিয়া গৃহস্থের তামাকুর শ্রাদ্ধ করিতে করিতে সাজের খুঁত ধরিতেন ও সাজওয়ালাকে গালি পাড়িতেন, আর দেশের সংবাদ লইয়া আলোচনা করিতেন। তখন সংবাদ-পত্র দুই-চারিখানি মাত্র ছিল। 'সাধু-রঞ্জন', 'প্রভাকর', 'গৌরীশঙ্কর' ওরফে গুড়-গুড়ে ভট্‌চাৰ্জ্জীর একখানা কাগজ আর মার্শম্যান সাহেবের 'সমাচার দর্পণ' এইরূপ কয়েকখানি কাগজ ছিল ; কিন্তু পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত এই সকল খবরের কাগজ পঁহুছিত না। পল্লীগ্রামের নিষ্কর্ম্মা প্রাচীনগণ সংবাদ-পত্রের কাজ করিতেন—আর যাঁহারা একবার কাশী, গয়া, বৃন্দাবন বেড়াইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের মুখের দাপটের সামনে টিকিয়া থাকা ভার হইয়া উঠিত। এখনকার 'Englishman ও Pioneer' তখন সকল দেশের সংবাদ বলিতেন। দেশের সংবাদ আলোচনা করিতে করিতে কোন প্রতিবেশীর চরিত্র-দোষ আলোচিত হইত বা দলা-দলির ঘোট হইত। কখনও বা ভূতের গল্প চলিত। পরে, কাহার ছেলের কবে বাটী আসা সম্ভব এইরূপ আলোচনা হইত। এইরূপে প্রাচীনদের দিনগুলি গল্প-গুজবে বেশ এক-রকমে কাটিয়া যাইত।

যুবতী রমণীগণ, অনেকদিনের পর স্বামীর মুখ দেখিবেন, এই আশায় গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইয়া পথপানে চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হইয়া বসিতেন, আবার উঠিয়া গিয়া দাঁড়াইতেন। এইরূপে যতক্ষণ না নিদ্রাভিভূতা হইতেন, ততক্ষণ দৌড়িয়া দৌড়িয়া গবাক্ষ-পথে যাইতেন। কতগুলি স্ত্রীলোক দল বাঁধিয়া প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে নদীতে স্নান করিতে আসিয়া নদীর দূর প্রান্তে চাহিয়া থাকিতেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, কোন্ দিক্ হইতে তাঁহাদের স্বামী আসিবেন। হয় ত একখানা নৌকা দেখিয়া কেহ বলিয়া উঠিতেন, "এই নৌকোয় বোধ হয় আমাদের কেউ আস্‌ছেন" ও গাত্র-মার্জ্জন বন্ধ করিয়া সকলে স্থির-নেত্রে সেই নৌকার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। নৌকাখানি সুবৃহৎ, মৃদু-গম্ভীর চালে আসিতেছিল। রমণীগণ আগ্রীব-নিমজ্জিতা হইয়া দেখিতে লাগিলেন। শরতের সমীরণ বসন্তের বায়ুর ন্যায় বড় মধুর, বৃহৎ নদীগর্ভে ঊষার সমীরণ খরতর বহিতেছে, তজ্জন্য ক্ষুদ্র বীচিমালা রমণীগণের মস্তকের বসন ও কেশগুচ্ছ সরাইয়া সরাইয়া খেলা করিতেছিল। নৌকাখানি গ্রামের নিকটে আসিলে সকলেই দেখিলেন, সেখানি মাল-বোঝাই। দেখিয়া সবাই হাসিয়া উঠিলেন। বৈকালে তাঁহারা কোন গৃহস্থের পূজার বাটীতে একত্র হইতেন ; কেহ বা সলিতা পাকাইতেন, কেহ বা সুপারি কাটিতেন, কেহ বা ধূপ-দীপ প্রস্তুত করিতেন, কেহ বা বরণডালার 'শ্রী' গড়িতেন। কোন বর্ষীয়সী অথবা গুরুজন উপস্থিত থাকিলে, বধূগণ অবগুণ্ঠনাবৃত হইয়া নীরবে আপনার আপনার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। গুরুজন উঠিয়া গেলে, মুখাবরণ খুলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিতেন। যদি হিন্দু-সমাজের কোন শ্রেণীর লোক অকারণ হাসি হাসিয়া থাকে, তবে সে হিন্দু নব-বধূগণ। যাহাদের চির অবরোধে বাস এবং বিবাহের দিন হইতে অবগুণ্ঠন ও চুপি-চুপি কথা যাহাদের ব্রত, তাহারাই দুই-চারিজন সমবয়সী একত্র হইলে, অকারণ হাসি হাসিয়া থাকেন। গুরুজন উঠিয়া গেলে, বধূগণ সকলে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। কোন যুবতী অপরের মুখের কাছে নব-গঠিত 'শ্রী' ঘুরাইতেছেন, যেন তাহাকে বরণ করিতেছেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "বোন্, আর কাজ নেই, একবার ঐরকম হয়েছিল, কিন্তু যার সঙ্গে হয়েছিল, সে যে কোথায়, কবে আস্‌বে, আমি তার জন্যে পথপানে দিনরাত্তির চেয়ে আছি।

রামমণি।—তিনি ঢাকায় না ? ঢাকা কোথা ?

মোহিনী।—ঢাকা বুঝি জিরেট বালা-গড়ের কাছে।

রমণী—না, না, ঢাকা শান্তিপুরের কাছে।

চাঁপা—না রে, না, পুরীর কাছে।

যাঁহার স্বামীর চাকুরী-স্থানের কথা হইতেছিল, তিনি বলিলেন, "ঢাকা সূয্যিমামার দেশে।" মোহিনী বলিল "সে কোথায় ? সূয্যিমামার দেশ কোথায় ?"

সরোজিনী। যে দিক্ থেকে সূয্যিদেব সিঁদুরের রং ধরে সকালে উঠেন।

মোহিনী। সে যে পূবে।

বিনোদিনী। খেঁদীর বাপ না ঐদিকে চাক্‌রী করে ? সে এর মধ্যে এলো কেমন করে ?

মোহিনী। সে বর্দ্ধমানে রাজার ইস্কুলে পণ্ডিতি করে। আহা, সে বড় গরীব। একখানি মাত্র মেটে-ঘর ও একখানি রান্না-চালা।

সরোজিনা। তিনি কবে এলেন ?

মোহিনী। আমাবস্যের দিন এসেছে। খেঁদীর মা, সেই দিন আপনি উপোস ক'রে তাকে খাইয়েছে।

বিনোদিনী। আপনি উপোস করে কেন ?

মোহিনী। খেঁদীর বাপ বর্দ্ধমান থেকে বরাবর হেঁটে এসে ঐ দিন বেলা একটার সময় বাড়ী পৌছোয়। তখন খেঁদী ও তার মা জ্ঞানদার বাড়ীতে কি কাজে নেমন্তন্ন গেছল। খেঁদীর বাপ আস্‌বামাত্তর খেঁদীর ঠাকুরমা তাদের খবর পাঠালে। খেঁদীর মা ত শুনেই না খেয়ে খেঁদীকে রেখে চলে আস্‌ছিল, কেন না সে খায় নি, আসবার সময় বাড়ীর গিন্নী তার খাবার জন্যে লুচি, সন্দেশ ও একটা ভাঁড়ে ক'রে দই দিলে। খেঁদীর মা তাই নিয়ে হন্ হন্ করে আস্‌ছিল। আমি তখন খিড়্‌কীর

পুকুরে আঁচাতে আস্‌ছিলুম। তার আঁচলে লুচি বাঁধা ও হাতে দইয়ের ভাঁড়। আমাকে দেখে তার হাসি আর ধরে না। আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, "হ্যারে বউ, অত হাসি কেন?"

বউ। তিনি এসেছেন।

আমি। মহিম-দাদা এয়েছেন? কখন্ এলেন?

বউ। এই মাত্তর।

"তোমরা জান ত, খেঁদীর মা রূপসী নয়; বেশ-ভূষো নেই, একখানি লাল-পেড়ে শাড়ী-পরা, হাতে শাঁখা, পায়ে আল্‌তা নেই, কিন্তু সিঁথিতে এককাঁড়ি সিঁদুর; আজ আমি ভাই তার যে কি অদ্ভুত রূপ দেখ্‌লুম, তা বল্‌তে পারি নি। আমি খেঁদীর মাকে বল্‌লুম, "দাঁড়া, দাঁড়া, মহিম দাদা এত বেলায় এসেছেন, ঘরে কি আছে না আছে আমাকে বল্, যদি থাকে ত কিছু পাঠিয়ে দেব।

বউ। কিছু ভাব্‌না নেই, সব আছে।

"পরে দু-এক পা গিয়ে বল্‌লে, ঠাকুর-ঝি—পা-পা-পান যদি—

আমি। পান, আমি পাঠিয়ে দোব।

বউ। সাজা পান।

আমি। আচ্ছা।

"পরে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে দেখি, আমাদের ঘরে পান নেই। বাজার থেকে পান আনিয়ে আমি সেজে নিজে নিয়ে গেলুম। দেখি যে, মহিম-দাদার নাক ডাক্‌ছে, বউ পা টিপ্‌ছে, খেঁদী বাতাস দিচ্ছে। আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে খেঁদী পাখা ফেলে উঠে এল।

আমি জিগ্যেস্ কর্‌লুম, বাবা ঘুমিয়েছে?

খেঁদী। হাঁ।

আমি। খেয়েছে?

খেঁদী। খেয়েছে। বল্লে, এমন খাওয়া অনেকদিন খাই নি।

"আমি বুঝ্‌লুম গরীব বামুণ, ১৫ টাকার পণ্ডিতগিরি করে; লুচি, সন্দেশ, বড় একটা খেতে পায় না। আজ স্ত্রীর আদরে পথ-শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ বড় তৃপ্তিতে আহার করেছে।

আমি। খেঁদী, তোর মা খেয়েছে?

খেঁদী। না।

আমি। কেন?

খেঁদী। ঘরে কিছু ছিল না।

আমি। লুচি, সন্দেশ?

খেঁদী। সব বাবা খেয়েছেন, বাবা জান্‌তেন, মা নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে।

আমি। তুই তোর ঠাকুমাকে বল্লি নি কেন?

খেঁদী। মা আমাকে বল্‌তে বারণ করে দিয়েছিল।

আমি। কেন?

খেঁদী। হ্যাঁগা, বাবা এসেছেন, মা কি বাবাকে ছেড়ে তাঁর নিজের জন্যে রাঁধ্‌তে যাবেন?

এই কথায় আমি বড় অপ্রস্তুত হয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। পরদিন শুন্‌লুম মহিম-দাদা ও খেঁদীর পেট ভার ছিল, রাত্তিরে রান্না হয় নি, কেউ খায় নি, কাজেই বউও খায় নি।

খেঁদীর মার পতি-ভক্তির কথা শুনিয়া বধূগণ সকলেই তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি তাকে একদিন পেট ভর খাওয়াব।

মোহিনী। সে আমার পড়্‌শী, আমি তাকে খুব চিনি; গরীবের মেয়ে ও গরীবের বউ বটে। কিন্তু বড় অহঙ্কেরে মেয়ে। যদি সে বুঝ্‌তে পারে যে, কি জন্যে তাকে খাওয়ান হচ্চে, তা হলে সে কখনও একটি কুটোও দাঁতে কাট্‌বে না।

বধূগণ খেঁদীর মাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বঙ্গ-মহিলাগণ, বিশেষতঃ খেঁদীর মা হিন্দুদিগের গৌরব। যতদিন হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সম্যক্ প্রচলিত না হইবে, ততদিন এইরূপ পতিপরায়ণা পতিব্রতা, 'খেঁদীর মা' বাঙ্গালার ঘর-সংসার আলো করিয়া থাকিবে।

এইরূপে স্বামি-সম্মিলন-আকাঙ্ক্ষায় যুবতীগণ নানাবিধ কথা-বার্ত্তাতে পূজার প্রারম্ভে কালাতিপাত করিতেন। আর বালকদিগের ত কথাই নাই, সন্ধ্যার সময় পাঠশালার ছুটী হইবামাত্র বাটী গিয়া পাত্‌তাড়ী ফেলিয়া এ বাড়ী, ও-বাড়ী ছুটাছুটী করিয়া তাহারা ঠাকুর দেখিয়া বেড়াইত। কোন বাটীতে গিয়া বাঁশের মেরাপের উপর উঠিয়া নৃত্য করিত। বাটীর কর্ত্তাদের ধমকে নামিয়া ঠাকুর-সাজান দেখিতে বসিত ও সাজওয়ালার এটী-ওটী নাড়িত। সেখান হইতে তাড়া খাইয়া ঢুলীর ঢোলে ঘা দিত। ঢুলীর নিকট তাড়া খাইয়া অন্য বাটীতে প্রবেশ করিয়া সেখানেও ঐরূপ উপদ্রব করিত। এই প্রকার একদল বালক ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। আর একদল বালক খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া বেড়াইত। যাহারা ইতোমধ্যে পূজার কাপড়, জুতা ও চাদর পাইয়াছে, তাহারা কোরা কালা-পেড়ে কাপড় পরিয়া, কোমরে চাদর বাঁধিয়া, নূতন জুতা পরিয়া ঠাকুর দেখিতে আসিত; কিন্তু অষ্টাবক্রের মত খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিত, পাছে নূতন জুতা কঠিন মৃত্তিকাস্পর্শে ছিঁড়িয়া যায়। দুষ্ট বালকেরা দৌড়াইয়া আসিয়া, "দেখি, দেখি, তোর কেমন কাপড় হয়েছে"—এই বলিয়া কাপড়ের কোঁচা ধরিয়া টানিত। কেহ কেহ আসিয়া, "দেখি, দেখি, তোর কেমন জুতো হয়েছে" বলিয়া জুতা ধরিয়া টানিত। অষ্টাবক্র চীৎকার করিয়া গালি দিত, কিল-চাপড় মারিত; দুষ্ট বালক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নূতন জুতার উপর ধূলা-কাদা মাখা চরণ দুইখানি ঘসিয়া দিয়া পলাইত; কিন্তু অষ্টাবক্র-বালক নূতন জুতার খাতিরে সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিত, দৌড়াইয়া দুষ্ট বালককে সাজা দিতে পারিত না।

এইরূপে ক্রমে ধীরে ধীরে শারদীয়া-পূজার ষষ্ঠী রাত্রি উপস্থিত হইল—সেদিনের আবির্ভাব বর্ষভোর ব্যগ্রতা-সহকারে প্রতীক্ষা করা যায়, যেদিন ধীরে ধীরে আসে। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার পর হইতে পূজার আনন্দ আরম্ভ হইল। আমরা, কোন একটী গৃহস্থের বাটীতে ঐ রাত্রে কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা এখানে বলিব। সন্ধ্যার পর 'বোধন' আরম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্বে ঢাক-ঢোল ইত্যাদির বাদ্য আরম্ভ হইল, সঙ্গে সঙ্গে 'সানাই' সুর ধরিল, উঠানের বৃহৎ চন্দ্রাতপের নীচে ঝাড়ের আলোকে বাটী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা নববস্ত্র পরিধান করিয়া একটী একটী শিশু কোলে লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতে লাগিল, ক্রমে উঠান ভরিয়া গেল; বাজনার সঙ্গে সঙ্গে বালকেরা নাচিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে, ভদ্র-লোকেরা আসিলেন। প্রাচীনেরা প্রতিমার নিকট দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে দেবীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পাড়ার ভদ্র-মহিলাগণ পরদার ভিতরে দাঁড়াইয়া প্রতিমা-দর্শন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে বাদ্য বন্ধ হইল, কাণের 'তালা' ছাড়িল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শব্দ আরম্ভ হইল—তন্ত্রধারের ও পুরোহিতের মন্ত্রো-চ্চারণ। তন্ত্রধারের শিক্ষানুসারে পুরোহিত মন্ত্রদ্বারা দেবীর চেতন করাইতে লাগিলেন। পরে আবাহন, তাহার পর তাঁহার

আরতি ও বরণ হইল। আবার ঢাক-ঢোল, কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে কাণ ঝালাপালা। কিছুক্ষণ পরে পুরী হঠাৎ নিস্তব্ধ হইল। অনতি-বিলম্বে সুকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনি হইল, সঙ্গে সঙ্গে তবলার টিং-টিং, খ্যান্-খ্যান্, ত্যালাং-ত্যালাং শব্দ শুনিলাম। বাল্যকাল হইতে আমি সঙ্গীত ভালবাসিতাম, দ্রুতপদে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম, ঘরটী সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত এবং অনেকগুলি আলোকে উজ্জ্বলিত। দশ-বার জন ভদ্রলোক ঐ ঘরে বসিয়া আছেন। আমি গিয়া একটী সুকুমার কিশোর বালকের নিকট বসিলাম; তাঁহার বয়ঃক্রম তখন ১৪।১৫ বৎসর হইবে। তিনি বঙ্গের সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত ছিলেন, পরে অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দেখি-লাম, একটি স্থানীয় পৌরাণিক কথক 'তম্বুরা' লইয়া গায়িতেছেন। অন্য রাত্রে সর্ব্বত্রই দেবীর আবাহন হইতেছে; এই গায়কও তাঁহার আগমনী-গীত গায়িতেছিলেন। অবশেষে, ঐ ঘরে যিনি কর্ত্তৃস্বরূপ ছিলেন (এক নবীন যুবক) তিনি গায়ককে একটি গীত গায়িবার ফরমায়েস করিলেন। গায়ক গীতটী গায়িতে লাগিলেন; কিন্তু সকলেই হাসি-হাসি মুখে ঐ কিশোর বালকের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। তিনি লজ্জায় মুখ নত করিলেন; কিন্তু মুখ বড় প্রফুল্ল; কেননা, ঐ গীতটি তাঁহারই রচিত। গীতটির আজ রাত্রে বড় আদর হইল; গায়কের মুখে একবার গানটি শুনিয়া কাহারও তৃপ্তি হয় নাই—তাঁহাকে বারংবার গাওয়াইয়া তবে সকলে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। গানটির প্রথমাংশ মাত্র আমার মনে আছে, নতুবা উহা একস্থলে প্রকটিত করিতাম।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাঙা গোলাপ

(Goethe)

১

বনের ধারে গোলাপ-ঝাড়ে
পাতার অন্তরালে
ফুটেছিল সে গোলাপ-কলি
কাঁটায় ভরা ডালে।

বালক সেথা ছুটে এসে—
তরুণ রবিকরে
উন্মেষিত মাধুরী তার
হেরে পুলকভরে।

রাঙা গোলাপ—রাঙা গোলাপ—
সবুজ পাতায় ঘেরা
রাঙা গোলাপ—বনের শোভা—
বন্য ফুলের সেরা।

২

বালক কহে, 'গোলাপ—ওগো
বনের গরবিনী,
ছিন্ন করি' বৃন্ত হ'তে
ল'ব তোমায় জিনি'।'

গোলাপ কহে 'কাঁটার ঘায়ে
বিঁধ্‌ব আমি তবে,
চিরদিন সে ব্যথার স্মৃতি
মনে তোমার রবে'

রাঙা গোলাপ—রাঙা গোলাপ—
সবুজ পাতায় ঘেরা
রাঙা গোলাপ—বনের শোভা—
বন্য ফুলের সেরা

৩

দুরন্ত সে বালক তবু
বারণ নাহি মানে,
কাঁটার বেড়া ভেঙে কোমল
ফুলটি তুলে আনে।

বিঁধ্‌ল করে বিষম কাঁটা—
ব্যথা দিয়ে আঁকি,'
ছিন্ন ফুল চিহ্ন তা'র
মর্ম্মে গেল রাখি'।

রাঙা গোলাপ—রাঙা শোভা—
সবুজ পাতায় ঘেরা
রাঙা গোলাপ—বনের শোভা—
বন্য ফুলের সেরা।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

বর্ত্তমান শিক্ষাবিভ্রাট্ ও স্বেচ্ছাচারিতা

একদিন বিশেষ কোন কার্য্যোপলক্ষে আমি ও আমার এক বন্ধু, স্বনামধন্য স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভ্রাট্-সম্বন্ধে যে গুটিকতক মহামূল্য কথা বলেন, তাহা জন-সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিতেছি। তিনি বলিলেন,—"আজ-কাল সবাই কলিকালের ছেলেরই দোষ দেয়, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। আমি অনেক সময় বাপ-মারও দোষ দিয়া থাকি। বাপ, ছেলের হিত-সাধনে সদাই তৎপর বটে; মা, যাঁর উপর আর কথা চলে না, তিনি সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারেন না। ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, যাঁহার সঙ্গতি আছে, তিনি এক private tutor রাখিয়া দিয়া মনে করিলেন, তাঁহার সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। তিনি কর্ম্মস্থল হইতে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদে, খোসগল্পে সময় কাটান, পুত্রের লেখা-পড়ার প্রতি তাঁহার আর লক্ষ্য থাকে না। জননীরা ত প্রায়ই পুত্রের লেখা পড়ার প্রতি নজর রাখেন না; আবার অনেকস্থলে ধাত্রী রাখিয়া তাহাদের দ্বারাই ছেলে-মেয়ের লালন পালন করাইয়া থাকেন। এমন কি, ছেলেকে দুধটুকু খাওয়ান পর্য্যন্ত দাসীতে করিয়া থাকে। তাহার ফলে এই হয় যে, দাসীরা ছেলের ক্ষুধা না থাকিলেও, জোর করিয়া সব দুধ খাওয়াইয়া দেয়; পাছে একটু পড়িয়া থাকিলে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী মনে করেন, দাসী কাজে অবহেলা করিয়াছে। ছেলে-পুলের মল-মূত্র পরিষ্কার করা ত অধিকাংশ স্থলেই দাসীর উপর ন্যস্ত।

কিন্তু বাল্যকালে আমরা ঠিক ইহার বিপরীত হইতে দেখিয়াছি। আমাদের বাপ-মা ছেলেদের 'মানুষ' করিতে জানিতেন। ছেলে পড়িতে পড়িতে ঘুমের ঘোরে ঢুলিলে, তাঁহারা বলিতেন, 'চোখে জল দে, ঘুম ছেড়ে যাবে।' আস্তে আস্তে পড়িলে বলিতেন, 'ডেকে পড়, তা না হলে পড়ার প্রণালী দুরস্ত হবে কেন?" আজকালকার বাপ-মার শাসনে কিন্তু, যত সব 'আদুরে' ছেলে গঠিত হইতেছে। পূর্ব্বে বাপ-মা বুঝিতেন যে, নিজের ছেলেপুলেকে সবাই ভালবাসে, আদর করে; কিন্তু ছেলেপিলেকে এমনভাবে তৈয়ারি করিতে হইবে, যাহাতে দেশের সবাই তাহাদের ভালবাসে। আজকাল পিতামাতা অতিরিক্ত আদর দিয়া ছেলেপিলের মাথা একেবারে খাইয়া দিতেছেন।

পূর্ব্বে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভক্তি ও স্নেহের বন্ধন ছিল। আজ-কাল ছাত্রেরও গুরুর প্রতি ভক্তি নাই, আর তেমন গুরুই বা কোথায়? আজকালকার শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা কেবল মুখস্থ বুলি আওড়াইয়া মনে করেন, ছাত্রদের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। Education মানে কি? মানুষের সৎ-বৃত্তিনিচয়, সম্যক্ বিকাশ লাভ করা—যাহার যাহা নাই, তাহাকে তাহা দেওয়াই যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারা তাহা বোঝেন না। বেশ মনে আছে, আমাদের সময় Cowell সাহেব পড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে পড়াইতে পড়াইতে তিনি এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইত। ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে—অন্য প্রফেসর আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তবুও তাঁহার হুঁস নাই। যেদিন তাঁহার তিনটা হইতে চারটা পর্য্যন্ত ক্লাস থাকিত, সে দিন আমরা ঠিক করিয়া রাখিতাম, সাড়ে চারটা ত বাজিবেই, পাঁচটাও হইতে পারে। সাহেবের মেম একদিন সাহেবকে লইয়া বেড়াইতে যাইবার জন্য গাড়ী লইয়া হাজির; তিনি সহিস্‌কে দিয়া সাহেবের নিকট 'স্লিপ' লিখিয়া পাঠাইলেন। সহিস টেবিলের উপর কাগজের টুক্‌রাখানি রাখিল। সাহেবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নাই। তিনি পড়াইয়াই যাইতেছেন। পরে যখন সহিস আবার আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত, তখন তিনি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিতেন—একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেন। তাও কথা বলিবার ফুরসুত ছিল না। এমন গুরুও আজ-কাল নাই, আর তেমন ভক্ত শিষ্যও নাই। অধিকন্তু, ছাত্রগণও পরীক্ষায় যাহা দরকার, তাহা ভিন্ন আর বেশী কিছুই শিখিতে চায় না।

আজ-কাল ছেলেদের মধ্যে সংযমের বড়ই অভাব দেখা যায়। চন্দ্রনাথবাবুর "সংযম-শিক্ষা" বইখানি পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হইলেও, কয়জন ছাত্র তাহা পড়িয়া থাকে? সংযম বলিতে কেবল যে ইন্দ্রিয়-দমন, তাহা ত নহে; আহারে, বিহারে, কথা বার্ত্তায় সব বিষয়েই সংযত হওয়া দরকার। এই যে আজ-কাল ৪৫ মিনিটে (৫০?) স্কুল-কলেজে ঘণ্টা হইতেছে, তাহার কি ফল হইবে, তাহা কি আমরা ভাবিয়াছি? ৪৫ মিনিটের মধ্যে ১৫ মিনিট ত নাম ডাকিতেই যায়; থাকে আধ-ঘণ্টা মাত্র। এই আধ-ঘণ্টার মধ্যে কতটুকু সময় পড়া হইতে পারে, তাহা ভুক্তভোগীরা বিশেষরূপেই জানেন, আমি আর কি বলিব? পড়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও, এর আর একটা দিক আছে। সেটা এই যে, এই নিয়মের কুফলে ছাত্রগণ সংযম হারাইতে বসিয়াছে। Experimental psychology, যাহার পরীক্ষার দ্বারা এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে, সে বিজ্ঞান-শাস্ত্র যে খারাপ, তাহা আমি বলিতে চাহি না; কিন্তু তদনুযায়ী সব কাজ করিতে গেলে, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এই শাস্ত্রে বলে, একবারে ৪৫ মিনিটের বেশী ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ থাকে না। এক ত প্রথম, তাঁহারা ঠাণ্ডা দেশে, জনকতক ছাত্র লইয়া পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; তাহার উপর যদি এই নিয়ম অনুসারে ছাত্রদের ছাত্র-জীবন গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহারা যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, কেরাণী বা মুনসেফ হইবে, তখনও যে ঐ অভ্যাস তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া থাকিবে। ৪৫ মিনিটের বেশী তাহারা কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না; কিন্তু তাহা করিলে ত চলিবে না। তাহাদিগকে ১০টা হইতে অন্ততঃ ৫টা পর্য্যন্ত একবারে কাজ করিতে হইবে। তখন তাহাদিগকে এই বদ অভ্যাস ত্যাগ করিতে যে কিরূপ কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহা বেশ ভালরকমেই বুঝা যাইতেছে। এটা Body র একটা whim; এটাকে সংযত করিতে হইলে ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া, প্রথম হইতেই দরকার।

আর একদল লোক, ছাত্রগণের মনে এই স্বেচ্ছাচারিতার কু-বীজ রোপণ করিতেছেন। একদল দেশের নেতা, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার দাস হইয়া পড়িয়াছেন; ছাত্রগণকেও তাঁহারা সেইরূপভাবে গড়িয়া তুলিতেছেন। এই যে এতগুলি political case হইয়া গেল, পথভ্রষ্ট ছাত্রগণকে কত যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করিতে হইল, কিসের ফলে? শিক্ষা-বিভ্রাট্ ও স্বেচ্ছাচারিতাই তাহার মূল কারণ। আমার এই ৭২ বৎসরের experienceএর ইহাই সিদ্ধান্ত। পুলিসে তোমাকে রাস্তায় একটু সরিয়া যাইতে বলিল, তুমি

চোখ-মুখ রাঙ্গাইয়া তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিলে; সে কি আর তখন তোমাকে 'বাপু-বাছ' বলিয়া আদর করিবে? সেও তখন নিজমূর্ত্তি ধরিবে। সে যদি দেখে, তুমি বেশ ধীর ও শান্ত, তাহা হইলে সে নিজেই মৃদুস্বরে তোমাকে বলিবে, "বাবু, থোড়া হট্ যাও।" পুলিস বা অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত এরূপ ব্যবহার করা কি স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত, না স্বেচ্ছাচারিতার জ্বলন্ত নিদর্শন? গীতায় বলে, তুমি যদি নিজে সংযত হও, ধীর হও, শান্ত হও, তাহা হইলে কাহাকেও তোমার ভয় করিতে হইবে না।

এই দেখ, Calcutta University Instituteএর সভ্যগণ এবার garden party করিবেন। গত বৎসর, 'টাউন-হলে' উঁহারা যেরূপ অসংযমের পরিচয় দিয়াছেন, খাবার, মাটির থালা সব ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া যেরূপ একাকার করিয়া আসিয়াছেন, তাতে মনে হয় না যে, তাঁরা একবারও ভাবিয়াছেন, কাহাদের এই সব পরিষ্কার করিতে হইবে। ইংরাজীতে ইহাকে "rowdyism" বলে। সেইজন্য এবার gardenparty উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত আমি সব বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই বলিয়া, তাঁহারা আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমার কথা তাঁহাদের তিক্ত লাগিতে পারে; মা যখন সন্তানকে ঔষধ খাওয়ান, মায়ের উপর ছেলের রাগ হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু, মাকে ঔষধ খাওয়াইতেই হইবে।

এই Institute কত সাধু উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, প্রতাপ মজুমদার, কালী বাঁড়ুয্যে প্রমুখ দেশের গৌরব-স্থানীয় ব্যক্তিগণের দ্বারা ইহা স্থাপিত হয়। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যুবকগণকে সৎ-শিক্ষা দেওয়া—তাহাদের চরিত্র-গঠন করা। স্কুল-কলেজে এসব শিক্ষা কঠোর প্রণালীতে দেওয়া হইয়া থাকে—এখানে তাহাই ধীরে ধীরে তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইবে; কিন্তু এখন সেই সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে! জনকতক বিলাত-ফেরত লোক ইহার ভিতর আছেন। তাঁহারা অন্য বিষয়ে যতই ভাল হউন না কেন, কিন্তু মন তাঁহাদের অনেকটা westernised হইয়া গিয়াছে। "Surroundings"এর প্রভাব হইতে তাঁহারা একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। মিঃ টি পালিতের বিষয় আপনারা বোধ হয় জানেন, বেশী করিয়া আর বলিতে হইবে না। W. C. Bannerjeeর চাল-চলন, আদব-কায়দা সব ঠিক বিলাতী রকমের হইলেও, তাঁহার মন easternই ছিল। কেশব সেন একজন genius ছিলেন, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিন। ব্যারিষ্টার আনন্দমোহনের উপরও পাশ্চাত্য প্রতিবেশের প্রভাব পড়িয়াছিল। ডাক্তার পি, কে, রায়, ডাক্তার পি, সি, রায়, ইঁহারা সব খাঁটী দেশী লোক। বিদেশ-ভ্রমণে, বা বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়াও ইঁহাদের মন eastern—বাহ্য আচরণও আমাদের দেশের সভ্যতার অনুযায়ী; কিন্তু অধিকাংশ বিলাত-ফেরতই westernised হইয়া আসেন, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। গীতায় কতকগুলি দেশের নামোল্লেখ আছে; সেই সেই দেশে তীর্থ-ভ্রমণ ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে গেলে, ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; কারণ, সেই সেই দেশের প্রতিবেশ-প্রভাব আমাদের মনের ও কাজের উপর আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারে। দেখুন, গীতাখানি খুব ভাল করিয়া পড়িবেন; অমন ধর্ম্মপুস্তক আর নাই। এই কিছুদিন আগে একজন বিখ্যাত শিক্ষিত ইংরাজ আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই, 'বর্ত্তমান ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়া আমার মনে হয়, তোমাদের আদর্শ আমাদের আদর্শ অপেক্ষা উচ্চতর।' ইহা কি আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা? তিনি একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষিত ইংরাজ; তাঁহার মুখে একথা শুনিয়াও আমরা কেন পাশ্চাত্য আদর্শ অনুসরণ করিতে যাইব?

তারপর আজ-কালকার যুবকবৃন্দ পিতা-মাতার অবাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে চায় না। Marriage-Leagueএ নাম লেখাইয়া মনে করে, দেশের ও জাতির মস্ত একটা উপকার করিলাম। ইহাও কুশিক্ষার ফল। তোমরা বড় হইয়া বিবাহ করিতে চাও; কেন না, নিজের পছন্দমত বিবাহ করিতে পারিবে। দাম্পত্য-জীবনে সুখভোগ করিবে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, এখানেই তোমাদের স্বার্থ বর্ত্তমান।

যাঁহারা এদেশে এই কুশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে, কুশিক্ষার ফল হয় ত অনেকে বুঝিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা ইহার প্রণালী পরিবর্ত্তন করিতে একেবারেই ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা বলেন,—'আমরা নিজেরাই ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছি, নিজেরাই কিরূপে ইহার পরিবর্ত্তন করি?' তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, দোষ মানিয়া তাহার সংশোধন করা, কতটা গৌরবের কথা। তাঁহাদের সে সৎ-সাহস নাই। মহাত্মা Gladstone কত-বার নিজের মত প্রকাশ্যভাবে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা ইতিহাস-পাঠে অবগত আছেন। অনেকে এত দাম্ভিক, অহঙ্কারী যে, তাঁহাদের কোনপ্রকার ভ্রম হইতে পারে, একথা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না। Newton, Plato, Aristotle, এঁরা সব কিরূপ বিনয়ী ছিলেন, সকলেই জানেন। নিউটনই না বলিয়াছিলেন,—'I am only counting pebbles on sea-shore?' আমাদের কুশিক্ষার ফলে তেমন বিনয়ী অথচ পণ্ডিত লোক আর গড়িয়া উঠিতেছে না।

আপনাদের উপর আমি এই ভার অর্পণ করিতে চাই। আপনাদের younger generation-দের এসব কথা বুঝাইয়া বলিবেন। 'বাইবেলে' Cain বলিতেছেন,—'Am I very brother's keeper?' আমাদের ভাইদের সৎপথে টানিয়া আনিতে হইবে। তাহাদের বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, 'We are on the verge of a pitfall.' প্রথম প্রথম তাঁহারা রাগ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদের তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না। সকলকে মিষ্ট কথায় তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিবার অধিকার আমাদের আছে। মিষ্ট কথায়, যোগ্য অবসর বুঝিয়া, তাহাদের বুঝাইয়া দিলে, তাহারা আর রাগ করিতে পারিবে না। প্রথম প্রথম অকৃতকার্য্যও হইতে পারেন; তাহাতে নিরাশ হইবেন না। স্থানে স্থানে কোথাও বা একটু বল-প্রয়োগও করিতে হইবে। ঘোঁড়া খানিকটা আগাইয়া গেলে, তাহাকে যদি অন্যপথে ফিরাইতে হয়, তবে রাশ খুব জোরে টানিয়া ধরিতে হইবে। এই কথা-গুলি আপনারা বাড়ীতে গিয়া চিন্তা করিবেন এবং যাহাতে এই অনুসারে কিছু কাজ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন। আমার আর বেশী কিছু বলিবার নাই।"

তাঁহার মুখে এই সব কথা শুনিতে শুনিতে আমরা এত তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম যে, কর্ম্মস্থলে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, ইহা ক্ষণেকের জন্যও আমাদের মনে হয় নাই। সেই মহাপুরুষের চরণধূলি লইয়া ধন্য হইয়া, তাঁহার উপদেশামৃত ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিরবাধা

বিয়োগ-বিধুরা রাধা বিরহের বিপুল বিকারে
কেঁদে কেঁদে ফিরিয়াছে যমুনার কিনারে কিনারে ;
কবে কে লেপিয়া দিল নভস্থলে নব নীলাঞ্জন,
কোন্ সূর্য্য ছড়াইল কবে সে গো গলিত কাঞ্চন ?
কবে কোন্ চাঁদে সুধা ঢেলেছিল কুমুদের বুকে,
মালঞ্চ-অঞ্চলে কবে চামেলী মেলিল আঁখি সুখে ?
মল্লিকা ফুটিয়া কবে বনান্তরে ছড়াল সৌরভ,
শেফালীর বৃন্তে কবে রাঙা হল প্রেমের গৌরব ?
মাধবের মনে কবে রাধার বেদনা দিল ব্যথা,
মুরলী কহিল কবে মনসিজ-মন্ত্র-পড়া কথা ?
রাসের সঙ্কেত করি কবে যে গো ডেকেছিল কালা,
বনপথে কবে গেল অধীরা, বিধুরা ব্রজবালা ?
আজিও বনের মাঝে ফুটে ওঠে শেফালীর ফুল,
এখনো অন্তরে কোন্ রাধা কেঁদে নিয়ত আকুল,
আজিও আকাশে হেরি শরতের সুনীলিম ছায়া ?
এখনো ঝরিয়া পড়ে চাঁদের পাগলকরা মায়া,
আজিও সঙ্কেত-বাঁশী শতবার ডাকে রাধিকায়,
পল্লব-মর্ম্মরে আজও কে আসিছে বলে পথ চায় ;
জীবন-বন্ধুর সনে রাসের উৎসব লাগি হিয়া
গোপন বক্ষের তলে নিশি-দিন মরিছে কাঁদিয়া,
পথের কণ্টক বুঝি কুটিলার রয়েছে জীবন,
বিরহের অশ্রুধারে তাই আজো ভাসে বৃন্দাবন।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়

সাহিত্যিক পঞ্চরং

(নক্সা)

[স্বর্গীয় মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ লিখিত]

সম্প্রতি কিছু বেশীরকম ব্যায়রামে ভুগেছিলাম—শরীরটাকে বেশ প্রবলরকমের ঝাঁক্‌রানি দিয়ে গিয়েছিল, এখনও তার ধাক্কা সাম্‌লাতে পারিনি। আপনারা হয় ত বল্‌বেন, কি এমন ব্যায়রাম হে বাপু তোমার, যে আশীর্নমস্কার ছেড়ে, ঠাকুর-দেবতার নাম ছেড়ে, এক ব্যায়রামেরই অত গৌর-চন্দ্রিকা ভাঁজ্‌তে সুরু কর্‌লে ? কিন্তু আমার (কন্যা-কর্ত্তার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রের ন্যায়) "সবিনয় নিবেদন" যে, আপনারা একবার প্রণিধান করে শুনুন, ব্যায়রামটা যে-সে-রকম মামুলি ব্যায়রাম নয়—এর ভেতর বিলক্ষণ একটু তেরেকেটে ছিল। এ থেকে যত শিক্ষা পাওয়া গেছে, পাঁচ বছর কলেজে পড়ে তা পাওয়া যায়নি। প্রথমে হ'ল জ্বর—হ'ল ত তার আর ক্ষয় নেই, একভাবেই কয়েক সপ্তাহ রইল ; আর তার সঙ্গে উপসর্গ রাশ রাশ ; সুতরাং তার নাম রাখা গেছ্‌ল অব্যয় জ্বর—তার ব্যয় ত নেই-ই, বরঞ্চ দিন দিন বিবর্দ্ধমান উত্তাপাদি দেখে বিলক্ষণ আয়যুক্ত বলেই বোধ হচ্ছিল। তারপর অন্ততঃ কুড়িটী উপসর্গ; সুতরাং তাকে অব্যয় বল্‌ব না ত কি তদ্ধিত-প্রত্যয় বল্‌ব ? ব্যাকরণের (ব্যা) উপসর্গটাই কোন গতিকে রপ্ত ছিল ; কেন না, দিনকতক গানের চর্চ্চা করা হয়েছিল—এখন এই ব্যায়রামটার কৃপায় যা হ'ক আর এক পৈঠা অগ্রসর হওয়া গেল।

তারপর ব্যাকরণের শিক্ষার পালা গিয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পালা। যখন ক্রমে ক্রমে কোন গতিকে ত্রিপদী অবস্থায় (লাঠি ও ভগবদ্দত্ত দুইটী) আস্‌তে লাগ্‌লাম অর্থাৎ লাঠিতে ভর করে দাঁড়াতে ও "হাঁটী-হাঁটী পা-পা" কর্‌তে লাগ্‌লাম, তখন এক এক সময় চতুর্দ্দিকে প্রবলবেগে ঘূর্ণ্যমান দুনিয়া, পৃথিবীর আহ্নিক গতি-সম্বন্ধে আর কোনই দ্বিধা রাখ্‌ত না। তার পরেই মাধ্যাকর্ষণের পালা—ধন্য নিউটন ! একটী আপেল্‌ দেখে তুমি যে কাণ্ড করে গেলে, আমরা শত শত বার **Municipal Market** দেখেও তার এক-তিলও পার্‌লাম না ; কিন্তু এই সময়টাতে তিনি আমাকে তাঁর আবিষ্কৃত নিয়মটী বিধিমতে শেখাবার জন্যে আড়ে-হাতে লাগ্‌লেন। কেমন করে যে মধ্যে মধ্যে তাঁর পাল্লায় পড়ে সেই পক্ক আপেলটীর মত তাঁর মাধ্যাকর্ষণের বিপুল শক্তির জলজ্যান্ত সশরীর উদাহরণে পরিণত হতাম, তা আর আপনাদের বল্‌ব না। এখনও মাথায়, হাতে, পায়ে, সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতগুলি তার মূক সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান। পরিশেষে ত্রিপদিত্ব ঘুচে দ্বিপদিত্বে বিবর্ত্তিত হয়ে, মহানুভব জার্ব্বিনের মহাশিক্ষাও কিছু লাভ করা গেল। আবার চেহারা দেখে অনেকে সেই 'জ্যামিতি'র **Line**এর **length without breadth**এর বেশ **Kindergarten**-শিক্ষা লাভ কর্‌লেন। এক ব্যায়রামের কৃপায় এতগুলি বৈয়াকরণিক, বৈজ্ঞানিক ও জ্যামিতিক শিক্ষা আপনারা কেউ লাভ করেচেন কি ? এই বৈজ্ঞানিক যুগটী বিলক্ষণ দীর্ঘ-কালব্যাপী হবার উপক্রম দেখে, আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শমতে কবিরাজী-চিকিৎসা সুরু করা গেল। কলেজেতেই বিজ্ঞান ও কবিত্বে যে অহি-নকুল-সম্বন্ধ তা হৃদয়ঙ্গম করা গেছ্‌ল—আর এক্ষেত্রে তার ফলও পাওয়া গেল। কবিরাজ-মশাইটী যে ঔষধের ব্যবস্থা কর্‌লেন, তাতে করে তিনি অন্ততঃ যে কবি, তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না,—অর্থাৎ মধু ও আর-একটা-কি সংযোগে মকরধ্বজ। যে দেবতার নামে ত্রিভুবন কম্পমান, একে তিনি, তার উপরে আবার মধু দোসর ; সুতরাং এহেন কবিত্বময় ঔষধে যে বৈজ্ঞানিক বিষ কাট্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

যাক্‌, কোন গতিকে এহেন ব্যায়রাম থেকে ওঠ্‌বার কিছুদিন পরেই পূজা এল। পূজার তিনদিন খেচরান্ন-সংযোগে নানাবিধ খেচর, ভূচর উদরস্থ করে 'গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে' করা গেল। খেচর, ভূচর শুনে আপনারা চম্‌কাবেন না। সেগুলি নিষিদ্ধ নহে, বেশ সুসিদ্ধ—আর নামেতে বেশ সাত্ত্বিক অর্থাৎ ভগবানের যে অবতার-

বিশেষের নাম-সংযোগে দ্বিপদবিশেষ ধন্য হয়েচে, খেচরগুলি সেই নামাত্মক। আর ভূচরগুলি তাঁরই পিতামহের নামধারী ; সুতরাং কুল-শীল-হিসাবেও পরম পবিত্র।

বিজয়া-দশমীর দিন মিষ্টমুখ ও সিদ্ধিপানের ঘটাটা সমান অম্বু-পাতেই চলেছিল; সুতরাং মস্তিষ্কটী সেই যুগল-মিলনের কৃপায় বেশ-একটু কৈলাস-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। রাত্রি ১১টার পর সকলের সঙ্গে কোলাকুলি শেষ করা হয়ে গেলে, শয্যার সঙ্গে যে কোলাকুলির আবশ্যক, এটা আমার নিদ্রাতুর নয়নযুগল বেশ করে স্মরণ করিয়ে দিলে। শয়নান্তে নিদ্রার আবেশ টেবিলস্থ ল্যাম্প্‌টীর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ বঙ্গ-সাহিত্যের দিকে মনটা ধাবিত হইল। কিছুদিন আগেই কয়েকটী বন্ধুর সহিত একটা মাসিক-পত্র বার কর্‌বার সম্বন্ধে বঙ্গ-সাহিত্য-চর্চ্চাটা কিছু প্রবলরকম হয়েছিল ; সুতরাং সেই চর্চ্চা এই মস্তিষ্কটীর উপর যে ছাপ্‌ দিয়ে গেছ্‌ল, সেটা সময় পেয়ে বেশ ফুটে উঠ্‌ল।

ক্রমে দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। দেখি, টেবিলের চারধারের চেয়ারগুলি সব ভর্ত্তি। দীর্ঘ নাসিকাপুট, তীক্ষ্ণ-চক্ষু ও ক্ষৌরিত-বদন একজন ; তাঁর পাশে নস্যডিপা-হাতে সটীক (অনুবাদ কি না, ঠিক বুঝ্‌লাম না) একজন ; তৎপার্শ্বে 'বেনিয়ান'-পরা ক্ষুদ্রদেহ শীর্ণকায় আর একজন ; তাঁহার পাশে আবার উৎকল-বিনিন্দিত মস্তক ও চটীশোভিত পদযুগল অপর এক ব্রাহ্মণ ; সর্ব্বশেষে কুঞ্চিত কুন্তলদাম, সরল সিঁথি-শোভিত-মস্তক, পরম রমণীয়-কান্তি এক প্রৌঢ়।

দিব্যচক্ষুর পর দিব্যকর্ণও ফুটিল। প্রথমে যে ক্ষৌরিত-বদনটী বসেছিলেন, তিনি বলিলেন, "এ বেচারা একখানি মাসিক-পত্র বার কর্‌বে, ঠিক করেচে ; কিন্তু উপযুক্ত লেখকাভাবে কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েচে আর ঘন ঘন আমাদের স্মরণ কর্‌চে—তবে আসুন না, যখন বহুকাল পরে ধরাধামে একবার নামাই গেছে, এ বেচারার একটু উপকার করেই যাই না কেন ? তর্কালঙ্কার-মশাই আছেন, বিদ্যাসাগর-মশাই আছেন, দত্তজা-মশাই আছেন, রবীন্দ্রবাবু আছেন, আর আর সকলে মিলে একে একটু সাহায্য করি।

বি। তা কি রকম সাহায্য কর্‌তে হবে বঙ্কিমচন্দ্র ?

ব। এই এর বিশেষ ইচ্ছে যে, এই কার্ত্তিক মাসের 'ইস্যু'-তেই একটা গল্প বার করে—আসুন, সকলে মিলে চাঁদা করে একটা গল্প লিখে দেওয়া যাক্‌।

বি। চাঁদা করে গল্প ? সে কি রকম হে বাপু ?

ব। আজ্ঞে—এই ধরুন, তর্কালঙ্কার-মশাই খানিকটা সুরু করে ছেড়ে দিলেন ; তারপর আপনি আর খানিকটা লিখে বাড়িয়ে দিলেন ; তারপর দত্তজা-মশাই আর খানিকটা, তারপর রবীন্দ্র-ভায়া আর খানিকটা—এইরকম—

অ। বেশ, তা হলে জ্যেষ্ঠ হতে আরম্ভ হোক্‌—তর্কালঙ্কার-মশাই গোড়াপত্তন করুন।

ত। (নস্য-গ্রহণান্তে) তা, যদিস্যাৎ এতে করে আপনাদের চিন্তানুবর্ত্তন ও গৃহস্বামীরও উপকার যুগপৎ সাধিত হয়, ত আমার কিঞ্চিন্মাত্র আপত্তি নাই। কি সম্বন্ধে লেখা যাবে ?

ব। কোনও একটা গল্প আপনি সুরু করুন।

তারপর তর্কালঙ্কার-মশাই খানিকক্ষণ ধরে খস্‌-খস্‌ করে লিখ্‌লেন। লিখে বল্লেন, "দেখ"—বঙ্কিমবাবু পড়িতে লাগিলেন।

"সার্দ্ধ শতাব্দী বিগত হইল, একদা কাচিৎ নিদাঘ-রজনীতে বারাণসী-জেলান্তর্গত কশ্চিৎ নাতিপ্রশস্ত রাজ-বর্ত্মাবলম্বন করিয়া জনৈক সশস্ত্র অশ্বারোহী যাইতেছিল। নভোমণ্ডল সজল-জলদ-পটলাবৃত ও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুদ্দাম-বিস্ফুরিত হইতেছিল : সুতরাং গৃহগন্তুকাম পথিকমাত্রেই গতি-বেগ-বৃদ্ধির নিমিত্ত বহ্বায়াস করিতেছিল। অশ্বারোহীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। যথাপূর্ব্ব মন্দ মন্দ গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। ক্রমশঃ সুচিক্কণ, চিত্ত-রঞ্জন পণ্যপরিপূর্ণ আপণশ্রেণী ও বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত হর্ম্ম্যা-বলী অতিক্রম করিয়া নগরের প্রান্তভাগে উপনীত হইলেন। তথায় ঘনসন্নিবিষ্ট সৌধাবলী ও আপণশ্রেণীর পরিবর্ত্তে কোথাও সুপ্রশস্ত শস্যক্ষেত্র, কোথাও ধনাঢ্যদিগের উদ্যান-বীথিকা ও কোথাও-বা তৎ-সংলগ্ন প্রোৎফুল্ল পঙ্কজ-কূজৎ-কলহংস-কারণ্ডবাদি-বিহঙ্গমাভিরাম জলাশয় ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনীর ক্ষণ-প্রভায় বিচ্ছুরিত হইয়া তাঁহাকে নগরের অবসান জ্ঞাপন করাইয়া দিতে লাগিল।"

পাঠান্তে বঙ্কিমবাবু বল্লেন, "বেশ আরম্ভ হয়েছে। এইবার দত্তজা-মশাই ধরুন।" তখন দত্তজা-মশাই খানিকক্ষণ ধরে লিখে, কাগজ বঙ্কিমবাবুকে পড়্‌তে দিলেন। তিনি পড়্‌তে লাগ্‌লেন—

"রাজবর্ত্ম, গহন কাননবৎ নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ। অশ্বারোহীর চিত্ত এখনও অজ্ঞাত চিন্তাসাগরে সন্তরমান, বহির্জগতের পরিবর্ত্তনের প্রতি সম্পূর্ণরূপে উদাসীন, অশ্বের বল্গামাত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তেজস্বী ও মনোজব তুরঙ্গমপ্রবর প্রভুর মনোভাব অনুধাবন করিতে পারিয়া কৃচ্ছ্রসম্বৃত বেগে গমন করিতেছিল ও ক্বচিৎ উৎকর্ণ হইয়া হ্রেষারবদ্বারা দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতেছিল। এমন সময়ে অকস্মাৎ পথিপার্শ্ব হইতে অস্ফুট রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া অশ্বারোহীর চিন্তাস্রোতকে প্রতিহত করিল। রোদনের ধ্বনি অনুসরণ করিয়া, ত্বরায় সুচতুর অশ্বকর্ত্তৃক যেস্থান হইতে রোদন উত্থিত হইতেছিল, তথায় নীয়মান হইলেন ও যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের উদয় হইল। দেখিলেন, এক উদ্ভিন্ন-শতদল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারিণী লাবণ্যময়ী তরুণী এক অটবীমূলে হস্ত-পদ-বদ্ধাবস্থায় রোদন করিতেছেন। শশব্যস্তে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ও রমণীর বন্ধন মোচন করিয়া অশ্বা-রোহী সসম্ভ্রম মধুর বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে ভামিনি, আপনি কে ? কি নিমিত্তই বা এবম্ভূত নির্জ্জন স্থানে ও ভয়াবহ সময়ে ঈদৃশী অবস্থাপন্ন হইয়াছেন ? সত্বর উত্তর-সুধা-প্রদানে আমার কৌতূহল-চকোরের পিপাসা-শান্তি করুন।'

'আর না—যথেষ্ট হয়েছে ; এইবার বিদ্যাসাগর-মশায় কলম গ্রহণ করুন'—এই বলে বিদ্যাসাগর-মশাইকে কলম দিলেন। বিদ্যাসাগর-মশাই আবার খানিকক্ষণ লিখে বঙ্কিমবাবুর কাছে কাগজ ফেলে দিলেন—বঙ্কিমবাবু পড়্‌তে লাগ্‌লেন—

"কামিনী, রোদনরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—আর্য্য ! অধিনী ব্রাহ্মণ-কন্যা—সুরূপনগরে আমার পিত্রালয়—আমার পিতৃদেব আর্য্য বিষ্ণুপ্রিয় তথাকার রাজ-পুরোহিত। পিতৃব্য-কন্যার বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিতা হইয়া পিতৃব্যদেব ও দাস-দাসীর সহিত পিতৃব্যালয় বারাণসী-নগরে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে দুর্বৃত্ত দস্যুদলকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পিতৃব্যদেব ও দাস-দাসীগণ নিহত হইয়াছেন। এই হতভাগিনীকে নিধন না করিয়া, আভরণাদি লুণ্ঠন করিয়া এই বৃক্ষমূলে আবদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। এ গহন কানন হইতে কে আমাকে উদ্ধার করিবে ? আর আমি পিতৃদেবের ও মাতৃদেবীর চরণযুগল সেবন করিতে পারিব না। আর আমি কনিষ্ঠ সোদর ও সোদরার মুখচন্দ্রমা অবলোকন

করিতে পারিব না। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা ভগিনি! তোমরা তোমাদের মাধুরীর মায়া ত্যাগ করিয়া কোথায় রহিলে?—এই বলিয়া সেই তরুণী অজস্র অশ্রুপাতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে লাগিলেন। তখন অশ্বারোহী ব্যগ্র-ভাবে বলিলেন—অয়ি শোকাকুলে! আর শোক করিও না। পুণ্ডরীকাক্ষের হস্ত যতক্ষণ অসিকে মুষ্টিবদ্ধ রাখিতে পারিবে, ততক্ষণ ভূমণ্ডলে কাহারও সাধ্য নাই যে, তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করে। আমি তোমাকে পিতৃ-নিকেতনে নিরাপদে উপস্থাপিত করিয়া, তবে আমার গন্তব্য পথে গমন করিব। আইস, কিছুমাত্র শঙ্কিতা না হইয়া আমার এই অশ্বে আরোহণ কর।—এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনা, কৃতজ্ঞতা-রুদ্ধবাক্ সেই সুন্দরীকে স্বীয় অশ্বোপরি উপবেশন করাইয়া, স্বয়ং অশ্বরল্গা ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া স্বরূপনগরাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।”

“এইবার তোমার পালা” ব’লে বিদ্যাসাগর-মশাই বঙ্কিমবাবুকে কলম দিলেন। বঙ্কিমবাবুও খানিকক্ষণ ধরে লিখে, তারপর পড়্‌তে লাগ্‌লেন।—

“স্বরূপনগরের একটী সুন্দর দ্বিতল গৃহ-সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান। মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত সকুসুম পুষ্পবৃক্ষসকল বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-পল্লবে শোভা পাইতেছে। চারিপার্শ্বে নয়ন মনোরম সুকোমল তৃণ-পুষ্পময় ভূমিখণ্ড, যেন একটী নানাবর্ণের সুচিত্রিত ‘অয়েলপেন্টিং’ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা আছে। আজ পুণ্ডরীকাক্ষ মাধুরীর পিতার আতিথ্য ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া নিজের অভীষ্ট স্থানে যাইবেন বলিয়া মাধুরীর নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছেন। বিদায় লওয়া ত ভারি! ‘মাধুরি’ তবে আমি চলিলাম।’ বলিয়া একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর-প্রাপ্তির আশায় মাধুরীর মাধুরীমাখা আরক্তিম বদনমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। হাঁ, না, কিছু না বলিয়া, মাধুরী অন্যমনস্কভাবে মাটীর দিকে চাহিয়া বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া মাটী খুঁড়িতে লাগিল। কতক্ষণ এইরূপে কাটিল। পাপিয়া, স্বর-লহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ সাগ্রহে আর একবার বলিলেন—‘তবে আসি মাধুরি—এই দরিদ্র ব্রাহ্মণকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিবে কি?’ মাধুরী একটু ছোট “হাঁ” বলিয়া, পুনরায় ভূমি-কর্ষণে মনোনিবেশ করিল। তাহার পর কখন্ যে পুণ্ডরীকাক্ষ চলিয়া গিয়াছে ও সই মালতী আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া টিপি-টিপি হাসিতেছে, তাহা মাধুরীর জ্ঞান ছিল না। যখন মালতী নিকটে আসিয়া তাহার গাল দুটি টিপিয়া উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল—‘এই যে লো! ওষুধ ধরেচে দেখ্‌চি!’ তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল ও সামলাইয়া লইবার জন্য কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক চম্পক-কলিকাবদ্ধ একটী ছোট-খাট কীল উঁচাইয়া—‘তবে রে পোড়ার-মুখি’ বলিয়া গাল-টেপার শোধ দিতে উদ্যত হইল।

“আর না, এইবার রবীন্দ্র-ভায়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করুন” বলে, রবীন্দ্রবাবুর হাতে কলম দিলেন। তিনি তাঁহার কুঞ্চিত অলকদাম সরিয়ে, নাক-টেপা চশমাটী একটু খুলে, আবার পরে একটু চোখ বুজে নিয়ে, তবে খানিকক্ষণ লিখ্‌লেন—তারপর কাগজখানা বঙ্কিমবাবুর হাতে দিলেন। বঙ্কিমবাবু পড়্‌তে লাগ্‌লেন—

“তাহার পর তিন বৎসর গড়াইয়া গিয়াছে। সেই বিদায়ের দিনের স্মৃতিটা মাধুরীর মনের চারিদিকে ঘেরিয়া যেন একটা কবিত্বের রশ্মিমণ্ডল রচিয়া গিয়াছিল। সেটা যেন সর্ব্বদাই মনটার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। যেমন কার্ত্তিক মাসের নির্ম্মল, সুনীলবৃক্ত আকাশটাকে সিউলি-ফুলের সুরভি, উষার সোণার আঁচল ও ঝর্-ঝরে শিশির মাখান হাওয়াতে ভরিয়া রাখে, সেইরূপ সেই স্মৃতিরহিত রশ্মিমণ্ডল নানা ভাষায়, নানা ছন্দে, নানা সুরে তাহার জীবনাকাশকে ভরাট্ করিয়া রাখিতে পারিল। এক এক দিন ঝিল্লী-মুখরিত জ্যোৎস্না-স্নাত সন্ধ্যাবেলায় যখন মাধুরী ফুল-বাগানের সেই স্থানটীতে বসিয়া নীরবে প্রকৃতিদেবীর সঙ্গীত-টাকে পরিপাক করিতে চাহিত, তখন সেই রশ্মিমণ্ডলটা যেন ‘সোণার কাঠি’র পরশচকিত রাজকন্যার মত জাগিয়া উঠিয়া নিজের অপূর্ব্ব রাগিণীর সুর সেই প্রকৃতি-সঙ্গীতের সুরে মিশাইয়া দিত ও মাধুরীর মনটা একটা অব্যক্ত বেদনার তীব্র-মধুর সত্ত্বায় ভোরপুর হইয়া উঠিয়া সেই যুগল সঙ্গীতের সঙ্গম-তীর্থে গা ঢালিয়া দিত। মানুষ যখন”—স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম, বিদ্যাসাগর-বুড়ো চট্‌চে, চটী ফট্-ফট্ কর্‌চে—এই পর্য্যন্ত শুনে বলে উঠ্‌ল—“আরে বাবা থাম,—যার সাপ-ব্যাং, মাথা-মুণ্ডটা বুঝ্‌ছি না, তা আর ছাই শুন্‌লে কি, না শুন্‌লেই কি?”

বঙ্কিমবাবু একটু কুটিল হাসি হেসে বল্লেন, ‘এটা হচ্চে Psychological development দেখান।’

বি। কচু পুড়িয়ে খাকৃগে অমন Psychology! যে ভাষা আমার বাপ-পিতামো বুঝে এলো, সেই ভাষা বল; তা নয় কেবল ঘোর-ফের, মার-প্যাঁচ—চল হে ওঠ—ঢের হয়েছে—বঙ্গভাষাটাও কি মাথার চুল যে, তা নিয়ে যা তা কর্‌বে?

এই বলে বুড়ো যেমন তাড়াতাড়ি সচটি পদযুগল টেবিল থেকে নামাতে যাবে, অমনি ঝন্-ঝন্ শব্দে টেবিলস্থ লাণ্ঠানটী ভূমিসাৎ।

চমকে ঘুমটাও (বা আবেশটা যাই বলুন) ভাঙ্গল, আর দেখ্‌লাম লাণ্ঠানটীও ভেঙ্গেছে—উপরে শর্ম্মার বলাধানের জন্য যে দুধের বাটিটী গরম কর্‌তে দেওয়া হয়েছিল, সেটীর অঙ্গ আধার-মুক্ত হয়ে, জীর্ণদেহমুক্ত আত্মাটীর মত ধরণীতলরূপ জন্মান্তর গ্রহণ করেচেন। আর মার্জ্জার-শিশু লক্‌লকায়িত রসনায় সেটি সশব্দে অবলেহন কর্‌তে কর্‌তে কর্ম্মফল-আইনের কড়াক্কড়ি জারি কর্‌চেন।

ব্যাপারটা শুনে, ভাল লোকে বলেন—আবেশ, মাঝারি লোকে বলেন—স্বপন, আর মন্দ লোকে বলেন—সিদ্ধির নেশা, আপনারা বলুন ত; এটা কি?

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(গ)

১

দন্তগ্রন্থি

মর্ম্মবাণীর পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই হয় ত দেখিয়া থাকিবেন যে, দন্ত শিথিল হইলে তাহা বন্ধন করা হইয়া থাকে। গো-খাদক জাতির মধ্যেই এই প্রথা অধিক বর্ত্তমান। এইরূপে দন্ত-বন্ধন করার প্রথা ইংরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; কিন্তু সে বিশ্বাস ভ্রমাত্মক।

খৃঃ পূঃ ১১৯৪ সালে কাশীর রাজার সহিত সাহাবুদ্দিন ঘোরীর বিষম সমর ঘটিয়াছিল। কাশীরাজ তখন একটি ক্ষুদ্র জনপদের অধিপতি ছিলেন না। তাঁহার অসীম প্রতাপ, অগণিত ধনরত্ন, অতি বৃহৎ চমূ ছিল। মুসলমান-ঐতিহাসিক ইবন্ অসির কহিয়াছেন, কাশীরাজের রাজ্য চীন-প্রান্ত হইতে মালব এবং সমুদ্র-বেলা হইতে দশদিনের পথ দূরে অবস্থিত লাহোর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সাহাবুদ্দিনের ক্রীতদাস এবং সেনাধ্যক্ষ কুতবুদ্দিন, হিন্দু-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অশেষ অত্যাচার করিয়াছেন শুনিবামাত্র কাশীরাজ অগণিত সৈন্য লইয়া মুসলমানাধিকৃত রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সাহাবুদ্দিন স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। যমুনার তীরে উভয় সৈন্যে সাক্ষাৎ ঘটিল। কাশীরাজের সহিত তখন সপ্তশত করী ও দশ লক্ষ যোদ্ধা উপস্থিত ছিল।

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে কত যে হতাহত হইল, কে তাহার সংবাদ লয়? হিন্দু-সৈন্য—যাহারা মরিল না—পলায়ন করিল। ঘোরী-সৈন্য কেবল হিন্দুদিগের রমণী ও বালকগণকে হত্যা করিল না—তদ্ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িল না। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কাশীরাজের সন্ধান হইতে লাগিল। অগণিত শবরাশির স্তূপ-মধ্য হইতে কে একজন তাঁহার মৃতদেহ বাহির করিল। তাঁহার শিথিলমূল দন্তগুলি সুবর্ণ তারে আবদ্ধ ছিল। তাহা দেখিয়াই শত্রুগণ বুঝিল, কাশীরাজ সত্যই হত হইয়াছেন।

সাহাবুদ্দিন ঘোরী তখন জয়-গর্ব্বে কাশী-নগরে প্রবেশ করিয়া রাজকোষ লুণ্ঠন করিলেন এবং চতুর্দ্দশ শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে লুণ্ঠিত দ্রব্য তুলিয়া গজনি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

[কামিলু-ৎ-তারিখ]

২

দুরাশা

সে আজ কত কালের কথা, যখন পাঠান আলাউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেকালের দিল্লীর সাম্রাজ্য আর মোগলের দিল্লীর সাম্রাজ্য এতদুভয়ে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মোগল-বাদশাহ বলিতে গেলে একরূপ সমগ্র ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়াছিলেন; পাঠান-সম্রাটের অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই।

স্থানে স্থানে কয়েকটী যুদ্ধ জয় করিয়াই আলাউদ্দিন মনে করিলেন, তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। তিনি আপনাকে দ্বিতীয় “আলেকজান্দার” নামে পরিচিত করিলেন এবং অমাত্য-দিগকে ডাকিয়া কহিলেন—

“দেখ, আমার দুইটী সঙ্কল্প আছে। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে তাহা সাধন করিতেই হইবে। পয়গম্বর মহম্মদের চারিজন মাত্র প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের শক্তি ও উৎসাহে মহম্মদ যে ধর্ম্মমত প্রচারিত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর মানুষ তাহা গ্রহণ করিয়া মহম্মদের নাম কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত অমর করিয়া দিয়াছে। আমারও চারিটী বন্ধু আছে। সেই বন্ধু চতুষ্টয়—উলুঘ খাঁ, জাফর খাঁ, নস্রৎ খাঁ এবং আলপ খাঁ। আমারও ইচ্ছা হয় যে, ইহাদের সাহায্যে আমি পৃথিবীতে একটী নব ধর্ম্মমত সংস্থাপন করি। আমার শাণিত কৃপাণ, সেই ধর্ম্মমতের বিস্তারে সহায়তা করিবে—বন্ধুদিগের কোষমুক্ত তরবারি পৃথিবীকে সেই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে। তাহা হইলে মহম্মদের ন্যায় আমারও নাম অমর, অক্ষয় হইয়া রহিবে।”

ধন্য দুরাশা! আলাউদ্দিনের নামও ইতিহাসে অমর হইয়াছে বটে, কিন্তু সে তদনুষ্ঠিত শোণিত-তর্পণের জন্য—ধর্ম্ম ও সত্য-বিস্তারের জন্য নহে।

আর একদিন আলাউদ্দিন তাঁহার অমাত্যবর্গকে কহিলেন—“আমার বিপুল অর্থ আছে, অগণিত হস্তী আছে, বিরাট্ বাহিনী আছে। আমি কেন দিল্লীর দুর্গদ্বারে প্রহরী-কার্য্য করিয়া বৃথা কালহরণ করিব? শাসন-ভার একজন অমাত্যের উপর অর্পণ করিয়া, চল আমরা অলেকজান্দারের মত পৃথিবী-জয় করিতে অগ্রসর হই।”

আলাউদ্দিনের পক্ষে ইহাও আর একটী দুরাশা ছিল বটে; কিন্তু তিনি তৎ-প্রচলিত মুদ্রায় আপনাকে দ্বিতীয় অলেকজান্দার বলিয়া পরিচিত করিয়া, সেই নামেই ‘খোত্‌বা’ পড়াইয়াছিলেন।

দিল্লীর বৃদ্ধদিগের কর্ণে যখন এই সংবাদ পৌঁছিল, তখন তাঁহারা একটু হাসিলেন। কেহ বা সভয়ে কহিলেন—ভগবানের কি বিচার! এত দৌলত, এত বল শয়তানের হাতে পড়িয়াছে!”

[তারিখ-ই-ফিরোজশাহী]

৩

সন্তরণে সিন্ধু-পার

খৃঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সিন্ধুনদের বেগ ও বিক্রম, বর্ত্তমান-কাল অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। তাহার ঘূর্ণাবর্ত্ত বিপুল নাদে ডাকিত, তাহার তরঙ্গ-ভঙ্গ-রব দশদিক্ কম্পান্বিত করিত, তাহার ক্ষুর-ধার-সদৃশ খর বেগে কুটা পড়িলেও দুইখান হইয়া যাইত। সেই সিন্ধুনদের তীরে সুলতান জালালুদ্দিনের সহিত প্রখ্যাত চেংগিজ খাঁর ঘোর সমর হইয়াছিল। চেংগিজ আদেশ করিলেন—সুলতানকে বধ করিও না, বন্দী কর।

সুলতান প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন দেখিলেন আর

উপায় নাই—তখন অশ্বসহ বেগে সিন্ধুগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিলেন এবং মধ্যনদ হইতে চেংগিজকে লক্ষ্য করিয়া শরনিক্ষেপ করিলেন।

এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া চেংগিজ পুত্রকে কহিয়াছিলেন—'সত্যই এতদিনে একটা মানুষ দেখিলে!'

সুলতান নির্ব্বিঘ্নে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া কাননে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। আর রক্তপিপাসু চেংগিজ, সুলতানের আত্মীয়স্বজন সকলকে আনাইয়া, রমণী ভিন্ন পুরুষমাত্রকেই হত্যা করিলেন; এমন কি, দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্য্যন্ত বাদ গেল না।

[জহান্-কুষা]

ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে নসীরুদ্দিন কুবাশের সহিত যুদ্ধকালে সামসুদ্দিন আল্‌তামাশও সন্তরণে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সিন্ধুনদের যেস্থান অপেক্ষাকৃত অগভীর, মহারাজা রণজিৎ সিংহ সেইস্থান দিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদ অতিক্রম করিয়াছিলেন।

৪

মনুষ্যের মূল্য

সুলতান আলাউদ্দিন যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন তাঁহার আদেশে বাজার-দর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কোন বিক্রেতার সাধ্য ছিল না যে, সেই নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অধিক গ্রহণ করে। বিপণী-পরিদর্শক প্রত্যহ সুলতানের নিকট বাজার-দর জ্ঞাপন করিতেন। সংবাদ-সংগ্রাহকগণ সুলতানের অবগতির জন্য প্রত্যহ বাজার-দরের অনুসন্ধান করিতেন। গুপ্তচরগণও এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। এই তিনশ্রেণীর সংবাদ ঠিক একরূপ না হইলেই, বিপণী-পরিদর্শকের দণ্ড হইত। বাজার-দর সর্ব্বদা একই থাকিত দেখিয়া নাগরিকগণ অতিমাত্র বিস্মিত হইত। মস্তকের শিরস্ত্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া চরণের পাদুকা পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যেরই নির্দ্দিষ্ট দর ছিল। কোন একটী তুচ্ছ দ্রব্যেরও মূল্য অনির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুলতান স্বয়ং তাহা করিতেন।

যে সকল বিক্রেতা জিনিষ মাপিয়া দিবার সময় কম দিয়া ক্রেতাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিত, ধরা পড়িলে শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে দেহের মাংস কাটিয়া ক্রেতাকে ওজন বুঝাইয়া দিতে হইত; সুতরাং বিক্রেতৃগণ বরং একটু বেশীই দিত, তবুও কিছুতেই ওজনে কম দিতে সাহস করিত না।

সুলতানের আদেশে গমের মণ ৭॥০ জিতাল, যবের মণ ৪ জিতাল ও চাউলের মণ ৫ জিতাল নিরূপিত হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, রাজ-ভাণ্ডার হইতে নির্দ্দিষ্ট বাজার-দরে শস্য বিক্রয় করা হইত। এই উদ্দেশ্যে সুলতান আলাউদ্দিন নানা স্থান হইতে রাজকরস্বরূপ শস্যগ্রহণ করিতেন। উহা আপৎ-কালের জন্য রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষিত হইত।

যেমন খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য স্থির ছিল, পোষাক পরিচ্ছদের মূল্য স্থির ছিল, তদ্রূপ মনুষ্যের মূল্যও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে, সেকালে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় নর-নারীও বিক্রীত হইত। সুলতান সেইজন্য নিম্নলিখিত দর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—

একটী দাসীর মূল্য—৫ হইতে ১২ টাকা
একটী স্বৈরিণীর মূল্য—২০, ৩০ অথবা ৪০ টাকা
একজন দাসের মূল্য—১০০ অথবা ২০০ টাকা
একটী সুন্দর বালকের মূল্য—২০ হইতে ৩০ টাকা
একটী দাস-মজুরের মূল্য—১০ হইতে ১৫ টাকা
অল্পবয়স্ক ভৃত্যের মূল্য—১৭ অথবা ১৮ টাকা

[তারিখ-ই-ফিরোজশাহী]

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

সনেট্-রূপসী

সনেট্-রূপসী আমি, আসিয়াছি নববধূ-সাজে—
চতুর্দ্দশ বসন্তের আধা নারী, আধেক বালিকা!
বসোরা গোলাপ জিনি, আধা ফুল আধেক কলিকা,
শিশিরেতে ঢল ঢল! ছ'-চরণে কি শিঞ্জিনী বাজে
রিণিকি-রিণিকি-রিণি! কবি-চিত্ত-পিঞ্জরের মাঝে
হইয়াছি চিরবদ্ধ—অপরূপা ভাবের সারিকা
মুখে গালভরা হাসি, ভালে মোর তারকা বিরাজে—
বাজাও, বাজাও শঙ্খ, গলে দাও মঙ্গল-মালিকা!
শিল্পকলা এয়োগণ ঝঙ্কারিয়া করে উলুধ্বনি;
বলে তারা "কি সুন্দর বধূটীর চাঁদপারা মুখ!"
কি আনন্দে ভরপূর আমার এ সুধাভরা বুক—
করিতেছে লাজ-বৃষ্টি রতি জিনি শতেক রমণী।
চিরসুন্দরের কণ্ঠে অরপিনু স্বয়ম্বর-মালা—
একি সাহানার সুর! কি মধুর শর্ব্বরী-উজালা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বিধবা

(চিত্র)

গঙ্গার ঘাটে জটলা

সেনেদের বাঁধা-ঘাটে পাড়ার মেয়েরা স্নান করিতে আসিয়াছেন। কেহ বৃদ্ধা, কেহ প্রৌঢ়া, কেহ যুবতী, কেহ কিশোরী, কেহ বালিকা।

ঘোষ-গিন্নীর সাম্‌নে তামার টাটে মাটির শিব, পঞ্চপাত্রে গঙ্গাজল, ছোট্ট একটি ঝাঁপিতে ফুল আর বেলপাতা।

ঘোষ-গিন্নী যে পূজা করিতেছিলেন না, তাঁহাকে এমন অপবাদ যে দেয়, সে নিশ্চয়ই চোখের মাথা খাইয়াছে। তিনি অবশ্যই পূজা করিতেছিলেন, তবে তাঁর চোখ-কাণ-মন ছিল ঘাটের জটলার দিকে। একসঙ্গে যদি রথও দেখা যায়, কলাও বেচা হয়, তবে সেটা আর বিশেষ মন্দ কথা কি?

বামুন-দিদি স্নান সারিয়া ভিজা কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে যখন ঘরমুখো হইলেন, ঘোষ-গিন্নীর শিব-পূজা তখন আশ্চর্য্যরূপে হঠাৎ সাঙ্গ হইয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি শিবের মাথায় কুশি কবিয়া একটু গঙ্গাজল ছিটাইয়া, চারিদিক্‌টা সতর্ক দৃষ্টিতে একবার দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "ও বামুন-দিদি, বলি, চল্লে নাকি?"

বামুন-দিদি বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই, বেলা হল—বৌ-ঝিগুলো ছেলেমানুষ, আমি না গেলে হয় ত হাঁড়িই চড়্‌বে না—ছেলেদের আপিসের ভাত দিতে হবে ত!"

সেনেদের বাড়ীর দিকে আর একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘোষ-গিন্নী, হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "বলি, শোনই না, কথা আছে।"

ঘোষ-গিন্নীর রকম-সকম দেখিয়া বামুন-দিদির মাথার টনক নড়িল। তিনি ফিরিতে ফিরিতে কহিলেন, "তা বল্ বাপু বল্, কি বল্‌বার আছে বল্।"

ঘোষ-গিন্নী চাপা গলায় বলিলেন, "আর শুনেছ,—সেনেদের বাড়ীতে বিধবা-বিয়ে হবে যে!"

বামুন-দিদি কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "কার লো—কার? নলিনীর ঠাকুমার নাকি?"

ঘোষ-গিন্নী হাসিয়া ঢলিয়া পড়িয়া বলিলেন, "দিদির কথা শুনে আর বাঁচি না! ও আমার পোড়া কপাল! ঠাকুমার কি আর সে বয়স আছে? তোমাদের নলিনীর গো—নলিনীর!"

বামুন-দিদি ছেলেদের আপিসে যাওয়ার কথা বেবাক্ ভুলিয়া ঘাটের চাতালে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "এ কথা কার মুখে শুন্‌লি রে?"

ঘোষ-গিন্নী বিনাইয়া বিনাইয়া বলিলেন, "আমার কামিনী যে নলিনীর সই,—আমি যে সব শুন্‌ব, তাতে আর আশ্চর্য্য কি বল! কামিনী কাল সন্ধ্যাবেলা আমাকে ডেকে চুপি-চুপি বল্‌লে, 'কাউকে বল' না মা, সইয়ের ফের, বিয়ে হবে'—আমি ত গালে হাত দিয়ে একেবারে অবাক্!"—বলিতে-বলিতে ঘোষ-গিন্নী সেনেদের বাড়ীর দিকে সন্দিগ্ধ নয়নে আবার চাহিয়া দেখিলেন। ঘাট-সুদ্ধ মেয়ে ততক্ষণে ঘোষ-গিন্নীর ঘাড়ের উপরে হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়াছে।

বামুন-দিদি ভাল করিয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিলেন, "তারপর?" তাঁর ভাব দেখিলে বোঝা যায়, ছেলেদের আজ অন্নাভাবে আপিস কামাই গেলেও, তিনি সব কথা না শুনিয়া এখান থেকে এক-পা নড়িবেন না।

ঘোষ-গিন্নী ভিজা চুলগুলা লইয়া, মাথার সাম্‌নের দিকে চূড়া করিয়া ঝুঁটি বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, "কামিনীকে আমি জিজ্ঞেস্ কর্‌লুম, 'কে বল্‌লে তোকে?' কামিনী ফিক্ করে একটু হেসে বল্‌লে, 'কেন, সই নিজে।'—নলিনী-ছুঁড়ীর বেহায়াপনাটা দেখ একবার! শুন্‌লুম, বিয়ের কথা শুনে অবধি ছুঁড়ী নাকি ধিঙ্গী হ'য়ে বাড়ীময় নেচে নেচে বেড়াচ্চে।"

বামুন-দিদি নাক শিকায় তুলিয়া বলিলেন, "টাকার দেমাক্ বাছা, টাকার দেমাক্! কিন্তু বলে রাখ্‌লুম, বোন, ধর্ম্মে এত সইবে না। এখনও সূয্যি উঠ্‌চে, দিন-রাত হচ্চে!"

যাত্রার বীরপুরুষ যেমনভাবে দু'হাতে ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তেম্‌নিভাবেই পুরুত-বৌ এই অবকাশে অগ্রসর হইয়া হাত ও মাথা ঘন ঘন নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ওমা, যাব কোথা! কালে কালে এ হল কি! যাই, মিন্সেকে বলে' দিই গে, ওদের বাড়ী যেন আর না মাড়ায়।"

ঘোষ-গিন্নী ত্রস্তভাবে বলিলেন, "তা, যা কর তা কর বাছা, আমার নামটি যেন করে বস না। জানত, আমার কামিনী নলিনীর সই।"

মুখ বাঁকাইয়া পুরুত-বৌ বলিলেন, "অমন স'য়ের মুখে ছাই! তোমার কামিনীকে বলে দাও, ম্লেচ্ছের বাড়ী গেলে তারও জাত্ যাবে।"

ঘোষ-গিন্নী বিরক্ত হইয়া কহিলেন "বালাই, কামিনী আমার তেমন মেয়েই নয়—তার জাত্ যাবে কেন? ওদের বাড়ীর চাল-কলা খেয়ে আর শাঁখ-ঘণ্টা নেড়ে যারা মানুষ, জাত্ যাবার ভয় তাদেরই বেশী—"

পুরুত-বউ বাধা দিয়া খন্‌খনে গলা তুলিয়া বলিলেন, "চাল্-কলা আর শাঁখ-ঘণ্টার খোঁটা, কাকে ঠেস্ দিয়ে বলা হল শুনি? জাতের ডব্-ডবানি আমাদের আর দেখিও না গো ঘোষ-গিন্নী, দেখিও না। জাত রাখ্‌তেও আমরা—মারতেও আমরা।"

ঘোষ-গিন্নী বলিলেন, "থাম পুরুত-বৌ, থাম—এখানে দাঁড়িয়ে আর দশ-বাই-চণ্ডীর মত চেঁচিও না!'

মুখঝাম্‌টা দিয়া পুরুত-বৌ বলিলেন, "চেঁচাব না! কেন চেঁচাব না? আমি কি কোন শতেকখোয়ারীর আটচালায় বাস করি যে, ভয় করতে যাব? আ মর! আবার বলা হচ্চে, চেঁচিও না! চেঁচাব—খুব চেঁচাব! আমি জোর-গলায় বল্‌চি, মিন্সেকে দিয়ে সেনেদের আর তোমাদের জাত্ মার্‌ব, মার্‌ব, মার্‌ব—তবে ছাড়্‌ব।"

আসল কথা চাপা পড়িয়া গেল দেখিয়া বামুন-দি... ...শেষ একটা পরামর্শ
হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা! আ...
তোমার অন্যায় বাছা! কেউ ত ... খানিকক্ষণ আনমনে সিগার
পড়ে তুমি কোঁদল করতে আস ... হঠাৎ চেয়ারের উপরে সিধা হইয়া
পুরুত-বৌ আরও উঁচু পর্দ্দায় ...শ, বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে তোমার
শেয়ালের এক রা! আচ্ছা, মিন্সেকে

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বলিল, “আচ্ছা, জাত্ মার্তে হয় বাড়ীতে গিয়ে মের’—এখন একটু থাম, কথাটা ভাল করে শুন্তে দাও।”

পুরুত-বৌ বলিলেন, “তোমরাও ঐ দলে? আচ্ছা, মিন্সেকে গিয়ে বল্‌ব, বল্‌ব, বল্‌ব—এই তিন সত্যি কর্‌লুম, তোমাদের সব্বারই জাত্ মার্‌ব তবে ছাড়ব।”

এমন সময়ে দেখা গেল, সেনেদের বাড়ীর ভিতর থেকে একটি যুবতী বাহির হইয়া এই দিকেই আসিতেছেন। বোধ হয়, পুরুত-বৌয়ের মিষ্ট গলার স্বর বাড়ীর ভিতরেও গিয়াছিল।

ঘোষ-গিন্নী থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওমা, নলিনী যে!”

বামুন-দিদি চট্ পট্ উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, “গঙ্গা, গঙ্গা, গঙ্গা! যাই মা, বেলা হল, আপিসের ভাত দিতে হবে।”

পুরুত-বৌ গজ্-গজ্ ও ফোঁস্-ফোঁস্ করিতে করিতে—বোধ করি, “মিন্সে”র কাছে নালিশ জানাইতেই চলিলেন।

ঘোষ-গিন্নী ততক্ষণে (এবারে চোখ চাহিয়া নয়) ভক্তিভরে আবার শিবের ধ্যানে বসিয়াছেন। অন্যান্য রমণীরাও—কেহ গঙ্গায় গিয়া ডুব দিলেন, কেহ একান্তমনে কাপড় কাচিতে লাগিলেন, কেহ “বাজার বড় মাগ্গি, চারটে ক্ষুদে ক্ষুদে চিংড়ীমাছের ভাগা পাঁচ পয়সা—গেরস্তের দিন চলা ভার হয়ে উঠ্‌ল দেখ্‌চি”—বলিয়া অতিশয় নিরীহের মত ঘর-কন্নার কথা পাড়িলেন।

নলিনী ঘাটে আসিয়া দেখিল, অভিনয়-শেষে রঙ্গালয়ের মত সব একেবারে চুপ্-চাপ্ হইয়া গিয়াছে। একবার সকলকার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, “হ্যাঁগা, পুরুত-বৌ ‘জাত্ মার্‌ব, জাত্ মার্‌ব বলে’ চেঁচাচ্ছিলেন কেন?”

কাপড়-কাচা বন্ধ করিয়া একজন যেন আকাশ থেকে পড়িয়া বলিলেন, “কই, আমরা ত শুনিনি বাছা!”

নলিনী বিস্মিতস্বরে বলিল, “সে কি গো, পুরুত-বৌয়ের গলার চোটে আকাশ ফেটে যাচ্ছিল, আর তুমি শোন নি কি রকম?”

“জানিনে বাপু, আমরা কারুর সাত-পাঁচে থাকিনি, কে কি বল্লে না বল্লে আমরা তা কি জানি? ঐ ঘোষ-গিন্নীকে জিজ্ঞেস্ কর।”

ঘোষ-গিন্নী তাড়াতাড়ি পূজার জিনিষ-পত্র তুলিতে তুলিতে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন মেয়ে গা, কন্যে-বউ! আমি কচ্ছিলুম পূজো, কে কার জাত্ মার্‌বে, আমি তার কি ধার্ ধারি? মুখ দিয়ে ফস্ করে একটা কথা বলে ফেল্লেই হল!”—বলিতে বলিতে তিনি তাঁর নাদুস্-নুদুস্ মোটা দেহখানি লইয়া, যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, সরিয়া পড়িলেন।

একটি বালিকা নলিনীর কাছে গিয়া বলিল, “হাঁ, নলিনী-মাসী, তুমি নাকি আবার বিয়ে কর্‌বে?”

নলিনীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা যে কি, সে কথা বুঝিতে আর তার দেরি হইল না। কোন কথা না কহিয়া মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে আবার সে ফিরিয়া গেল।

ঘাটের রমণীরা পরস্পরের দিকে চোখ-ঠারাঠারি করিয়া নীরবে হাসিতে হাসিতে এ-উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সে হাসি দেখিয়া বোঝা যায়, নলিনীর প্রাণের ব্যথাটা তাঁহারা বেশ ভালরূপেই উপভোগ করিতেছিলেন।

একালের সুসংস্কার

আমরা সবাই গোলাপ-ফুলটিকে চাই—কিন্তু কাঁটা বাদ।

সুরেশবাবুও কলিকাতার সুবিধাটুকু ষোল আনা ভোগ করিতে চান; কিন্তু কলিকাতার রাস্তার ধূলা, গাড়ীর ঘড়্-ঘড়ানি আর লোকজনের হট্টগোল সহ্য করিতে একেবারেই নারাজ।

অতএব, কলিকাতার কাছাকাছি গঙ্গার পারেই তিনি বাড়ী তৈয়ারি করাইয়াছেন। কলিকাতার কোন কোর্টের তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর পিতাও, যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় না করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়া পুত্রকে ইহলোকে বিপদ্‌গ্রস্ত করেন নাই।

বিলাতের মাটী না মাড়াইয়াও যে কতটা পূরো সাহেব হওয়া যায়, তার প্রমাণ দিতে হইলে লোকে সুরেশবাবুর নাম করিত। বাড়ীর ভিতরে বা বাহিরে সুরেশবাবুকে কেউ কখনও বাঙ্গালীর পোষাক পরিতে দেখে নাই। আকারে-প্রকারে, আহারে-বিহারে সুরেশ বাবু একেবারে ‘কেতা’দুরস্ত খাঁটি সাহেব।

সুরেশবাবু বিপত্নীক। বিবাহের ফলে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা লাভ হইয়াছিল। ছেলের নাম রমেশ, মেয়ের নাম নলিনী।

রমেশ সম্প্রতি বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছে। এখনও ব্যবসায় আরম্ভ করে নাই।

নলিনী বিধবা! বিবাহের এক বৎসর পরেই তার স্বামী মারা যান। ‘খাও দাও—আনন্দে রহো”—সুরেশবাবুর জীবনে এইটিই মূলমন্ত্র হইলেও, নলিনীর ঐ কাতর মুখখানি তাঁহার বুকের ভিতরে সর্ব্বদা একটা খোঁচার মত লাগিয়া থাকিত।

সংসারে আর একটি লোক ছিলেন, তিনি সুরেশবাবুর বৃদ্ধা মাতা। নলিনীর এই ঠাকুরমাটি একেবারে সেকেলে হিন্দু-মহিলা; আপনার ঠাকুর-ঘরে বসিয়া সারাদিন তিনি দেবতার সেবা ও পূজা-অর্চ্চনা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, সন্ধ্যাবেলায় প্রতিদিনই নলিনীর মুখে গলদশ্রুলোচনে রামায়ণ-মহাভারতের অমৃত-কথা শ্রবণ করিতেন। পড়িতে বসিবার আগে নলিনীকে রোজ কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া আসিতে হইত। যে কাপড় পরিয়া নলিনী তার বাপকে ছুঁইয়াছে, সে কাপড়ে ঠাকুরমাকে ছুঁইলে, তিনি তখনই “রাম রাম” বলিয়া গঙ্গায় গিয়া ডুব দিয়া আসিতেন।

সুরেশবাবু মেয়েকে সকলরকমে নিজের আদর্শমত গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। আবার, ঠাকুরমা তাহাকে নিজের দলে টানিতেন। তিনি বলিতেন, “দেখ্ মা নলিনী, তুই হিন্দুর ঘরের বিধবা, বাপের কথায় যেন ম্লেচ্ছ আচার শিখিস্ নি। ঠাকুর তা হলে রাগ কর্‌বেন।”—নলিনী, হাসিয়া ঠাকুরমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, “না ঠাকুরমা, আমি তোমার কথা শুন্‌ব।”

এই দোটানায় পড়িয়া নলিনীর চরিত্রে একাল-সেকালের অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছিল। বাপের যত্নে একালের শিক্ষিতা মহিলার মত সে বিদুষী হইয়া উঠিয়াছিল; আবার ঠাকুরমার সংস্কার ও প্রভাবও তাহার জীবনের পরতে পরতে মিশিয়া গিয়াছিল। ফলে, সে তার বাপকেও খুসি রাখিত, ঠাকুরমাকেও খুসি রাখিত।

* * * *

রমেশের সহপাঠী অমিয়কুমার ছেলেবেলা হইতেই সুরেশ-বাবুর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করিত, এমন সুশ্রী পুরুষ বাঙ্গালীর ভিতরে বড় একটা দেখা যায় না।

রমেশের সঙ্গে অমিয়ও বিলাতে গিয়াছিল,—ডাক্তারী পড়িতে। অল্পদিন হইল, সে দেশে ফিরিয়াছে। অমিয় অবিবাহিত।

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথম যেদিন শ্বেতবসনা নলিনীকে

দেখিল, সেদিন সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নলিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল সে চপলা কুমারীর বেশে, বাতাসে উড়ন্ত ফুলের একটি পাপ্‌ড়ির মত, তখন সে মনের খুসিতে বাড়ীময় ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইত,—আর আজ, সেই হাস্যময়ী চঞ্চলার একি রূপ, একি বেশ! এই দু’দিনের ভিতরে সংসারের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে তাহার মুক্ত সুখের নির্ঝর একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে? অমিয়ের চোখ সজল হইয়া উঠিল,—সে প্রথমে কোন কথাই কহিতে পারিল না।

নলিনী তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, “ভাল আছেন ত অমিয়বাবু? আপনার চেহারা যে একেবারে বদ্‌লে গেছে!”

অমিয় জোর করিয়া মুখে হাসি আনিয়া বলিল, বদ্‌লে গেছে! কি-রকম বল ত!”

নলিনী বলিল, “বিলেত যাবার আগে আপনি বেশ ছেলে-মানুষটির মত দেখ্‌তে ছিলেন; আর এখন—”

“একেবারে জোয়ান পুরুষ-মানুষ হয়ে উঠেচি—না নলিনি? ভগবান্ এম্‌নি করে ছেলেকে যুবা আর যুবাকে বুড়ো করে চির-কালই খেলায় মেতে আছেন—মানুষ বড় হইলেই যুবা হয়, নাকের তলায় গোঁফ গজায়, মাথায় লম্বা হয়ে ওঠে—উঃ! সৃষ্টির কি ভীষণ হেঁয়ালি! কিন্তু তোমার আমার ত আর এতে কোন হাত নেই, কি কর্‌ব বল, এজন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত।”

নলিনী হাসিয়া বলিল, “অমিয়বাবু, চেহারা বদ্‌লালেও আপনার কথা কইবার ধরণটুকু একেবারেই বদ্‌লায় নি।”

অমিয় বলিল, “এককথা বল্‌লে দশকথা শুনিয়ে দি? হাঁ—ও রোগটা আমার বরাবরই আছে—তবে আশা করি, বরাবর থাক্‌বেও।”

“আচ্ছা অমিয়বাবু, বিলেত কেমন জায়গা?”

“সেকথা ত আমাদের এক কবি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন, ‘বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোণা-রূপোর নয়, তার আকাশেতে সূর্য্যি ওঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়’, ব্যস্! এই দু’লাইনেই বিলেতের অবিকল ‘ফোটো’। তবে কিনা, তফাৎ কি জান? সে দেশের মেয়েরা তোমার মতন এমন শাদা কাপড় পরে, এমন মুখ শুকিয়ে থাকে না—একটু থামিয়া, গম্ভীর হইয়া অমিয় বলিল, “নলিনী, তোমাকে এমন দেখ্‌তে হবে, এটা কখন স্বপ্নেও মনে করি নি!”

নলিনী মুখ ফিরাইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, “অমিয়বাবু, ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না?”

অমিয় বলিল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠাকুরমার ঠাকুরের প্রসাদ অনেক খেয়েছি,—তাঁর সঙ্গে দেখা না কর্‌লে মস্ত অকৃতজ্ঞতা হবে। চল।”

ঠাকুরমা, তখন ঠাকুর-ঘরে বসিয়া নৈবেদ্যের চাল সাজাইতে-ছিলেন। অমিয় ঠাকুমার শুচিবাইএর কথা জানিত। তাই সে বাহির হইতেই ডাকিল, “ঠাকুরমা—অ-ঠাকুরমা।”

অমিয়ের গলা শুনিয়াই ঠাকুরমা ধড়্-মড়্ করিয়া উঠিয়া বলি-লেন, “কে রে, ‘ওমে’ এলি নাকি? কেমন, ভাল আছিস্ ত?”

অমিয় বলিল, “তোমায় প্রণাম কর্‌তে এসেছি ঠাকুরমা! হুকুম দাও—ঘরে ঢুকে পা ছুঁয়ে দণ্ডবৎ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম কর্‌ব, না এইখানে দাঁড়িয়ে তফাৎ থেকেই প্রণামটা আল্‌গোছে সেরে নেব?”

ঠাকুরমা তাড়াতাড়ি দরজার কাছে আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, “না বাবা, ঘরে আর ঢুকতে হবে না, ঐখান থেকেই কর, ঐখান থেকেই কর।”

“যো হুকুম”—বলিয়া অমিয় ঠাকুরমাকে প্রণাম করিল।

“বেঁচে থাক বাবা, চিরজীবী হও; সংসারে আমাদের দিন ত ফুরিয়ে এসেছে, এখন তোমরা ঘর-সংসার পেতে, বিয়ে-থা করে’ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক—মা-কালী যেন এই করেন।”

অমিয় বলিল, “সে কি ঠাকুরমা, তোমার দিন ফুরুবে কেন? বালাই, মা কালী তোমার জন্যে এত শীঘ্র যদি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তা হলে তিনি ভুল কর্‌বেন। দাঁড়াও, আগে তোমার রমেশের একটি টুক্‌টুকে রাঙ্গা বউ দেখ, তার নাতি দেখ।”

ঠাকুরমা বলিলেন, “না বাবা, তা আর দেখ্‌তে চাই না, এখন তোমাদের রেখে যেতে পার্‌লেই বাঁচি।”

“যেতে পার্‌লে ত বাঁচ,—কিন্তু তোমাকে ছাড়ে কে? রমেশের নাতির বিয়েটা দেখ।”

“না বাবা, তোমার অমন কামনায় আর দরকার নেই।”

“উঁহু! রমেশের নাতির খোকাকে দেখ্‌বে—”

“না বাবা—”

“সে কি হয়, নাতির নাতি দেখ্‌লে স্বর্গে দেদার বাতি জ্বলে, জান ত?”

দেখ্ ওমে, থাম্ বল্‌চি, নইলে ঠাকুরের পেসাদ পাবি নি।”

“পেসাদ না পেলে তোমাকে ছুঁয়ে দেব। জান ত, আমাদের পেটের ভেতর আস্ত আস্ত রামপাখী সর্ব্বদাই ক্যাঁচর-ম্যাচর কর্‌চে?

ঠাকুরমা ভয়ে ভয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া বলিলেন, “তা তুই পারিস্ বাবা! আচ্ছা, এখন বাইরে গিয়ে রমেশের সঙ্গে গল্প-টল্প কর্‌গে যা। আগে পূজো হোক্, তারপর পেসাদ পাঠিয়ে দেব। আর দেখ্ ও-সব অখাদ্য-কুখাদ্য খাস্‌নে, ঠাকুর রাগ কর্‌বেন।”

“ঠাকুর যদি রাগ করেন, তা হলে তাঁকে স্বর্গে গিয়ে বেশী করে ভাত খেতে ব’ল’; কিন্তু রেগে যেন পেসাদের ভাগ কমিয়ে না দেন, এটুকু দেখো”—বলিয়া হাসিতে হাসিতে অমিয় বাহিরে চলিয়া গেল।

নলিনী এতক্ষণ একপাশে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে-ছিল। এখন অমিয় চলিয়া গেলে পর বলিল, “কেমন ঠাকুরমা, অমিয়বাবুর কাছে তুমি ভারি জব্দ হও।”

ঠাকুরমা সস্নেহে বলিলেন, “আহা, অমিয় বড় ভালছেলে রে, মা দুর্গা ওর ভাল করুন!”—বলিয়া, ঠাকুরমা একবার নলিনীর দিকে চাহিলেন। তারপর চুপিচুপি বলিলেন, “নলিনী, মা, একে তোমার সোমত্ত বয়েস, তাতে তুমি বিধবা। একটু সাবধানে থেক’ বাছা, পুরুষের সঙ্গে বেশী মিশ-টিশ না।”

* * * *

অমিয় দেশে আসিবার মাসখানেক পরে সুরেশবাবু একদিন রমেশকে নিজের ঘরে ডাকিলেন।

রমেশ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, পিতা ‘ইজি-চেয়ারে’ শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। রমেশ বলিল, “বাবা কি আমাকে ডাক্‌চেন?”

খবরের কাগজখানা সম্মুখের ত্রিপায়ার উপর রাখিয়া দিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, “হাঁ, তোমার সঙ্গে বিশেষ একটা পরামর্শ আছে। ঐ চেয়ারখানায় বস’।”

রমেশ বসিল। সুরেশবাবু খানিকক্ষণ আনমনে সিগার টানিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ চেয়ারের উপরে সিধা হইয়া বসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা রমেশ, বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?”

রমেশ বিস্মিত-নেত্রে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরেশবাবু বলিলেন, "ভেব না, এ কথাটা আমি তোমাকে কথাচ্ছলে হাল্‌কাভাবে জিজ্ঞাসা করছি। আমি তোমার ঠিক মতটি কি, তাই জান্‌তে চাই।"

রমেশ বলিল, "আপনি কি জিজ্ঞাসা কর্‌চেন? বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত,—এই ত?"

"হ্যাঁ।"

"আমার বিশ্বাস, দেওয়া উচিত। বিশেষ, আমাদের দেশে।"

"কেন?"

"এদেশে বিধবার জীবন,—লক্ষ্যশূন্য জীবন। সংসারের একজন হয়েও তিনি সংসারের বাইরে থাকেন। আমরা তাঁকে মানুষ বলে' জানি; কিন্তু তাঁকে মানুষের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখি। এখানে বালিকা-বিধবাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করানো হয়; কিন্তু সেই বালিকার সাম্‌নে বসে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা জীবনকে যতটা পারেন, হাসিমুখে ভোগ করে নেন।"

সুরেশবাবু চুপ করিয়া কিছুকাল বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আচ্ছা রমেশ, নলিনীর যদি আবার বিবাহ দি, তা হলে তোমার কোন আপত্তি-টাপত্তি আছে?"

তাহার পিতা যে এই কথা বলিবেন, রমেশ তাহা তাঁহার কথা কহিবার ধরণ-ধারণ দেখিয়া আগে থাকিতেই আন্দাজ করিতে পারিয়াছিল। এদিকে তারও একটা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু ভরসা করিয়া এতবড় কথাটা সে পিতার সুমুখে তুলিতে পারে নাই। সে পুলকিত হইয়া বলিল, "আমার এতে কোন অমত নেই বাবা!"

"দেখ, নলিনীর জন্যে দিন-রাত আমার মনে শান্তি নেই—তার শুষ্কমুখ দেখ্‌লে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে তবে আমি ঠিক করেচি যে, নলিনীর আবার বিবাহ দেব। এতে তোমারও মত আছে জেনে আমি সুখী হলাম;—কিন্তু, এখন একটা কথা। বিধবা বলে ত নলিনীকে যার তার হাতে সঁপে দিতে পারি না—ভাল পাত্র না পেলে তার বিবাহ কিছুতেই দেব না; কিন্তু তেমন পাত্র পাই কোথায়?"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা বাবা, অমিয় যদি নলিনীকে নিতে রাজী হয়, তা হলে আপনার কোন অমত হবে কি?"

সুরেশবাবু বলিলেন, "অমিয়! বল কি! এমন ভাগ্য কি আমার হবে?"

রমেশ বলিল, "কেন, অমিয়ের অমত হবার কারণ দেখ্‌চি না। নলিনীর মত শিক্ষিতা আর সুন্দরী স্ত্রী কি যার-তার ভাগ্যে ঘটে? বিশেষ, অমিয়ের বাপ-মা নেই, সে একেবারে স্বাধীন; সুতরাং সেদিক থেকেও কেউ তাকে বাধা দেবে না। আর তার নিজের কথা যদি ধরেন, আমি তা হলে বল্‌তে পারি, তার কোনরকম কুসংস্কার নেই।"

সুরেশবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি তাহলে অমিয়ের মতামত জেনে এস। অবশ্য, এ বিবাহ হলে আমাদের আত্মীয়-স্বজনেরা চটে যাবেন; কিন্তু, কি করব, তাঁদের খুসি রাখ্‌বার জন্যে ত ঐ নির্দ্দোষ মেয়েটার সারা জীবন নষ্ট করে দিতে পারি না। আর এক বিপদ হবে, আমার মাকে নিয়ে; কিন্তু সেকেলে বুড়ীদের কুসংস্কার মেনে চল্‌তে গেলে সংসারটা পদে পদে অচল হয়ে উঠ্‌বে। যাক্—যাই হোক্ তাই হোক্—এ বিবাহ আমি দেবই-দেব।"

আলো ও ছায়া।

নলিনী যখন কথাটা শুনিল, তখন তার প্রাণ-মন হঠাৎ কেমন একটা অজানা বিদ্রোহী ভাবে অভিভূত হইয়া গেল।

আমার বিবাহ! আপনার পোড়াকপালের কথা ভাবিয়া সে অনেক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে; কিন্তু তার মনের ব্যথা সুধু মনই জানিত, সে গভীর ব্যথার কথা ত ঘুণাক্ষরেও বাহিরে প্রকাশ পায় নাই! সে বিধবার জীবন যাপন করিতেছিল, বিলাসিতাকে সকল দিক্ দিয়া পরিহার করিয়া চলিতেছিল; তার যে আবার বিবাহ হইবে, সেটা যে সম্ভব, এমন ব্যাপার সে স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করে নাই।

কথাটা শুনিয়াই তার মন যেন ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "না, না, না!"—তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল—তখনই সে ছুটিয়া গিয়া পিতার দুটি পায়ে পড়িয়া বলে, "ওগো সে হবে না, সে হবে না, বাবা, সে হবে না।"—কিন্তু সে পিতার দৃঢ়তা জানিত। বুঝিল, এমন অনুরোধে তাহার নিজের লজ্জাহীনতাই প্রকাশ পাইবে,—পিতা তাহার কাকুতিতে কর্ণপাতও করিবেন না।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত রবি-চিতার আকাশ-ভরা আলো অনেকক্ষণ নিবিয়া গিয়াছে, দু-চারিটা দলছাড়া বক তখনও তাড়াতাড়ি উড়িয়া যাইতেছিল এবং রহিয়া রহিয়া দূর মন্দির হইতে আরতির শঙ্খ-কাঁসরের গম্ভীর নিনাদ এলোমেলো বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল। অস্পষ্ট ছায়ালোকে সঙ্গীত-মুখর গঙ্গার ও-পারের গাছ-পালার সবুজ রঙ্গের সঙ্গে একটু একটু করিয়া অন্ধকার জমাট বাধিতেছিল। একখানা পান্‌সী শাদা পাল তুলিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল,—তাহার দাঁড়ী-মাঝীগুলাকে দেখাইতেছিল, ঠিক যেন জীবন্ত ছবির মত! নলিনী বাষ্পাকুল চোখে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল; তাহার উদাসী মন যেন ঐ পান্‌সীখানার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চাহিল।

অনেকদিন আগেকার এক শুভদিনের কথা তাহার স্মরণ হইল,—আলো আর হাসি আর গানের মাঝে যেদিন এক নবীন অতিথি আসিয়া নিজের জীবনের সহিত তাহার জীবনকে এক করিয়া দিয়াছিল। হায় রে, অকাল শীতের উদয়ে সে বসন্তের পাখী আজ মৌন হইয়াছে বটে,—কিন্তু দুদিনের তরে ডাকিয়া তাহার সারা জীবনকে সে যে বিচিত্র রাগিণীতে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে, আর কি তাহা ভোলা যায় গো, আর কি ভোলা যায়? সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি! শ্মশানের নিষ্ঠুর চিতা তাহা স্পর্শ করিতেও পারে নাই, নলিনীর স্মৃতির তীর্থে আজও তাহা স্বর্ণ রেখায় তেমনই উজ্জ্বল হইয়া আছে,—নির্ব্বোধ পৃথিবী, নির্দ্দয় সংসার এ সত্য বুঝিতে পারে না কেন, কেন পারে না? জীবনে-জীবনে, জন্মে-জন্মে, ইহলোকে-পরলোকে দেবতা সাক্ষী করিয়া চিরসম্বন্ধ যাহার সঙ্গে,—ছার রক্ত-মাংসের তুচ্ছ উপভোগের জন্য আজ কি সে সম্বন্ধকে অস্বীকার করিতে হইবে?—নলিনী ভাবিতে লাগিল।

বাহির হইতে রমেশ ডাকিল, "নলি, ঘরে আছিস্?"

নলিনীর সাড় হইল। তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচলে মুছিয়া সে উত্তর দিল, "দাদা ডাক্‌চ?"

"হ্যাঁ, বাইরে চল্—অমিয় এসেছে।"

নলিনীর বুকটা ধড়্‌-ফড়্ করিয়া উঠিল। বুকে হাত দিয়া খানিকটা সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, "দাদা, আমার বড় মাথা ধরেচে, বাইরে যেতে ইচ্ছে কর্‌চে না।"

"মাথা ধরেচে ত ঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে আছিস্ কেন? ওতে যে অসুখ বাড়্‌বে! আয়, আয়—বাইরে আয়।"

নলিনী ক্ষীণস্বরে আরও দু-চারবার আপত্তি জানাইল; কিন্তু

রমেশের জেদের কাছে তাহার কোন আপত্তিই টিকিল না। অগত্যা তাহাকে দরজা খুলিয়া অপ্রসন্ন মনে রমেশের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইল।

বাহিরের ঘরে গিয়া সে দেখিল, অমিয় একেলা বসিয়া আছে। নলিনী ঘরে ঢুকিতেই অমিয়ের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে হাসিয়া বলিল, "এই যে নলিনি, কখন্ থেকে তোমার জন্যে হা-পিত্তেস্ করে বসে আছি, কিন্তু তুমি যে দেখ্‌চি বেঁটে লোকের কাছে উঁচু দরজার শিক্‌লির মত একান্ত দুর্লভ হয়ে উঠেছ!"

উত্তরে নলিনী হাসিবার চেষ্টা করিল,—চেষ্টামাত্র; কিন্তু সে চেষ্টায় তার মুখে হাসির চেয়ে কান্নার ভাবটাই বেশীমাত্রায় প্রকাশ পাইল। সে এতদিন অমিয়ের সঙ্গে অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিয়াছে,—আজ কিন্তু কথা কওয়া দূরে থাক, অমিয়ের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তার ঘাড় যেন নুইয়া নুইয়া পড়িতেছিল।

অমিয় বলিল, "নলিনি, আজ যে দেখ্‌চি তুমি মিশরের 'স্ফিংক্সে'র চেয়েও, পাথরের প্রতিমার চেয়েও বেশী নীরব। ব্যাপার কি?"

রমেশ বলিল, "নলির আজ ভারি মাথা ধরেচে। ও ত কিছুতেই আস্‌বে না, আমি একরকম জোর করে ধরে নিয়ে এসেচি।"

অমিয় বলিল, "তুমি অতিশয় পাষণ্ড, রমেশ! না নলিনি, তোমার শরীর যদি ভাল না থাকে, তবে তুমি ভেতরে যাও। (নলিনী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল) দাঁড়াও, আর একটা কথা।"

নলিনী কোনরকমে বলিল, "কি?"

অমিয় সুমুখের টেবিলের উপর হইতে একখানা চক্‌চকে, নূতন বাধান' বই তুলিয়া লইয়া বলিল, "নলিনী, আমার একখানা কবিতার বই বেরিয়েছে। যে দেবীর নামে বইখানা উৎসর্গ করা হয়েছে, সে দেবী যদি প্রসন্না হন, তবেই আমার কলম ধরা সার্থক।" বলিয়া, অমিয় বইখানি নলিনীর হাতে দিল।

বইখানি হাতে করিয়া লইবার সময়ে নলিনী দেখিল, অমিয় কাতর অথচ মধুর মিনতিভরা চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে। সে দৃষ্টি যেন তীরের ফলার মত নলিনীর প্রাণের মাঝখানে গিয়া বিঁধিল। বইখানা লইয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আপনার ঘরে গিয়া নলিনী মেঝের উপরে বসিয়া পড়িল। তাহার বুক তখনও ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে তার বুকের কাঁপন থামিল। তখন সে আস্তে আস্তে অমিয়ের বইখানা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল। প্রথম দুই পৃষ্ঠা উল্টাইতেই দেখিলে, উৎসর্গ-পত্র। সেখানে বড় বড় হরফে লেখা রহিয়াছে ঃ—

"স্নেহ ও ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ আমার এই কবিতাগুলি শ্রীমতী নলিনী দেবীর নামে উৎসর্গ করিলাম।"

উৎসর্গ-পত্রের দিকে নলিনী শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সে বইখানা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের এককোণে কেরোসিনের উজ্জ্বল 'ল্যাম্প্' জ্বলিতেছিল। নলিনী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বইখানা চিম্‌নির উপরে ধরিল।

অমিয়ের সাধের উপহার লইয়া নলিনী অগ্নিদেবকে উপহার দান করিল। অগ্নিদেব সর্ব্বভুক্—এ উপহারে তাঁহার অরুচি হইল না।

* * * * *

বুড়াবয়সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঠাকুরমার চোখ বুঝি গেল। যেদিন থেকে নলিনীর বিয়ের কথা শুনিয়াছেন, সেইদিন থেকে তিনি যেন পাগলের মত হইয়া উঠিয়াছেন।

ছেলেকে তিনি অনেক বুঝাইলেন, তাহার কাছে অনেক কান্না-কাটি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রাণের বেদনা সে ত কিছুতেই বুঝিল না!

চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঠাকুরমা বলিলেন, "তবে আমাকে কাশীতে পাঠিয়ে দে বাবা! আমি থাক্‌তে সংসারে এতবড় অধর্ম্ম কখনই ঘট্‌তে দেব না।

'হাভানা'-চুরুটে একটা টান দিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, "সে ভাল কথা। তোমাকে আমি কাশী পাঠাতেও রাজি আছি মা, কিন্তু নলির বিয়ে বন্ধ কর্‌তে কোনমতেই রাজি নই।

ঠাকুরমা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি অমিয়কে একবার বলে-কয়ে দেখ্‌ব, আমার কথায় হয় ত নলিকে সে বিয়ে না কর্‌তেও পারে।"

সুরেশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সে সব কিছু ক'র' না মা, তাতে কোন ফল হবে না। অমিয় যদি নারাজ হয়, আমি তা হলে অন্যত্র নলির বিয়ে দেব।"

ঠাকুরমা হতাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর-ঘরে গিয়া কুল-দেবতার উদ্দেশ্যে তিনি যোড়হাতে কাতরে বলিলেন, "হে ঠাকুর, সুরেশের মতি-গতি ফিরিয়ে দাও, সংসারে এতবড় পাপকে ঢুক্‌তে দিও না, হে মা কালি, হে মা দুর্গা!"

ঠাকুরমা যে বংশের মেয়ে, সে বংশ সতীত্বের খ্যাতির জন্য বিখ্যাত। ঠাকুরমার দিদিমা স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গমন করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সেই পরমা সতী আত্মীয়-স্বজনের কোন মানা না মানিয়া অটল পদে, একমাথা সিন্দূর ও সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া হাসিতে হাসিতে চিতায় গিয়া উঠিয়াছিলেন, নলিনীর কাছে ঠাকুরমা কতবার উজ্জ্বল ভাষায় সেই বর্ণনা বর্ণন করিয়াছেন। ঠাকুরমার মাও বিধবা হইবার পর 'তেরাত্রি' পোহাইতে না পোহাইতে বিনা অসুখে কেবল মনের জোরে, প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন! সে সব পুণ্যকথা বলিতে বলিতে ঠাকুরমার চোখ দিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িত। "এমন বংশের রক্ত যার দেহে আছে, সেই কি না আজ বিধবার বিয়ে দিতে চায়! হে হরি, হে দয়াময়, সুরেশকে সুমতি দাও ঠাকুর, আমি থাক্‌তে তার যেন এ দুর্ম্মতি না হয়!"

* * * * *

সেদিন গঙ্গার ঘাটে নলিনী যে কানাকানির আভাস পাইয়া আসিয়াছিল, সে কথাগুলা ক্রমে বড় হইয়া তাহার কাণে প্রবেশ করিল। নলিনী শুনিল, পাড়ার বুদ্ধিমতীরা স্থির করিয়াছেন, এই বিবাহে সকলকার চেয়ে বেশী আগ্রহ, নলিনীর। কথাগুলা শুনিয়া লজ্জায় যেন নলিনীর মাথা-কাটা যাইতে লাগিল। মুখে যারা হাসিয়া কথা কয়, বন্ধুত্ব জানায়, সুযোগ পাইলে তাহাদের জিভ্ যে কতটা নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতে পারে, নলিনী সেদিন তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

এদিকে সুরেশবাবু বিবাহের দিনস্থির করিয়া ফেলিলেন।

রমেশ ঠিক করিল, বিবাহের আগে একবার নলিনীর মতটা জানা দরকার। তাই, সেদিন বৈকালে যখন অমিয় তাহাদের

বাড়ীতে আসিল, রমেশ তখন বলিল, "দেখ অমিয়, নলিকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি, এ বিবাহে তার মত আছে কি না।"

অমিয় বলিল, "না ভাই, ও-কাজটার ভার তোমরা কেউ নিলেই ভাল হয়। নলিনী যতই লেখা পড়া শিখুক্, সে বাঙ্গালীর মেয়ে;—সে যদি বিড়ালাক্ষী মেরি হোত, তা হলে আমি 'প্রপোস্' কর্‌তে পার্‌তুম। মিছামিছি বেচারীকে লজ্জা দিয়ে লাভ কি?"

রমেশ বলিল, "না না, সে যখন তোমার পত্নী হবে, তখন তোমার পক্ষে বিবাহের আগে ভাল করে তাকে বোঝা দরকার। তুমি বোস, আমি নলিকে ডেকে আন্‌ছি।"

অল্পক্ষণ পরেই নলিনীকে সঙ্গে করিয়া রমেশ ফিরিয়া আসিল। নলিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে টেবিলের সাম্‌নের একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

অমিয় বলিল, "কেমন আছ, নলিনি? আজ ত তোমার মাথা ধরে নি?"

নলিনী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, "না।"

টেবিলের উপরে একখানা বাঙ্গালা মাসিক-পত্র পড়িয়াছিল, নলিনী হেঁট হইয়া অন্যমনস্কভাবে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। একজায়গায় একখানা ছবি রহিয়াছে, নাম 'বিধবা'। বিবাহ-বাড়ী, চারিদিকে হাসিমাখা মুখ। 'এয়ো'রা সাজ-গোছ করিয়া, কেহ শাঁখ, কেহ বরণ-ডালা, কেহ থালা লইয়া বর-কন্যাকে ঘিরিয়া উৎসবানন্দে মাতিয়া আছেন,—কাহারও মুখে বিষণ্ণতার চিহ্নমাত্র নাই।—এদিকে আঙ্গিনার পাশে অন্ধকার ঘরে, মলিন শ্বেতবাস পরিয়া, এক নিরলঙ্কারা বিধবা যুবতী একাকী দাঁড়াইয়া, কাতর চোখে বাহিরের সেই বিবাহ-সমারোহের দিকে তাকাইয়া আছেন। হায়, ঐ উৎসবের মধ্যে তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, তাঁহার স্পর্শে নব-দম্পতীর অকল্যাণ হইবে!

নলিনী আগ্রহের সহিত ছবিখানি দেখিতে লাগিল।

এই অবসরে রমেশ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল,—নলিনী কিছুই জানিতে পারিল না।

অমিয় বসিয়া বসিয়া নলিনীর মুখের দিকে—ভক্ত যেমন করিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, তেমনই করিয়া—চাহিয়া রহিল।

নলিনী তাহার সুমুখে কখনও মাথায় কাপড় দিত না—আজও দেয় নাই। সে তার কালো চুলগুলিকে এলাইয়া দিয়াছে,—কতক চুল তার পিঠে, কতক বুকের উপরে, কতক-বা কাঁধের উপরে আসিয়া ঘুমন্ত সাপের মত এলাইয়া আছে। পরণে তার থান্-কাপড়,—সেই শ্বেতবস্ত্রে তাহার সৌন্দর্য্যের দীপ্তি ও পবিত্রতা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল!

বিলাত যাইবার আগে অমিয় যখন নলিনীকে দেখিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার বয়স কৈশোর ও যৌবনের মাঝামাঝি; কিন্তু ভরা যৌবন আসিয়া নলিনীর সেই ফুটন্ত দেহ-লতাকে এখন অপূর্ব্ব শ্রী-ছাঁদে বসন্তের নবীন মালঞ্চের মত পূরন্ত ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। নলিনীর সুডৌল নাসিকার ছায়ায় অধরের উপরে শিশির-বিন্দুর মত ঐ যে ঢল্-ঢলে ঘামের ফোঁটাগুলি, ডানদিকের ফুলের মত রাঙ্গা নধর কপোলে ঐ যে একটি ছোট কালো তিল,—ও-গুলি দেখিলে মনের ভিতর দিয়া যেন কিসের একটা প্রাণ-পাগল-করা ঝড় বহিয়া যায়!

নলিনী অত মনোযোগ দিয়া অবাক্ হইয়া কি দেখিতেছে? অমিয় একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিয়া লইল। ছবিখানি সে আগেই দেখিয়াছিল; সুতরাং নলিনীর এই মনোযোগের কারণ বুঝিতে তাহার দেরি হইল না।

সে বলিল, "বাস্তবিক নলিনি, আমাদের দেশে বিধবাদের যে দুঃখ, তা ভাব্‌লেও প্রাণ কেঁদে ওঠে।"

নলিনী লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি মাসিক-পত্রখানা মুড়িয়া বলিল, "ভগবানের দণ্ড যারা মাথা পেতে নিতে জানে না, তাদের দুঃখ কে ঘোচাবে বলুন? পৃথিবীর দুঃখকে সহ্য কর্‌তে পারা, তাকে অস্বীকার কর্‌তে পারা, যে একটা মহা গৌরবের কাজ, এ কথা কি আপনি মানেন না অমিয়বাবু?"

অমিয় নলিনীর মুখ হইতে এরূপ উত্তরের প্রত্যাশা করে নাই। সে খানিক চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, "কিন্তু ততটা মনের জোর, ততটা সহ্য কর্‌বার শক্তি এই দুর্ব্বল পৃথিবীতে ক-জনের আছে?"

নলিনী, মুখ না তুলিয়াই তেমনইভাবে বলিল, "হ্যাঁ, যারা সহ্য কর্‌তে পারে না, যারা মনুষ্যত্বকে কলঙ্কিত কর্‌তে পারে, তাদের জন্য সমাজ একটা উপায় স্থির করুক্।"

"কি উপায়, বল।"

"ধরুন, বিধবা-বিবাহ।"

"এতে তোমার মত আছে?"

"আমার মত নেই; কারণ, মানুষের এমন শোচনীয় অবস্থা, আত্মার এমন অধঃপতন আমি কল্পনাও কর্‌তে পারি না; তবে এইটুকু বল্‌তে পারি যে, যারা দুঃখকে দুঃখ বলে' স্বীকার করে না, যারা বৈধব্যকে ব্রত বলে, পূর্ব্বজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলে' গ্রহণ করে, তাদের যিনি বিবাহ দিতে চান, তিনি মহা অধর্ম্ম করেন। আপনিও কি তাই বলেন না, অমিয়বাবু?"

অমিয় সোজাসুজি কোন জবাব না দিয়া বলিল, "দেখ, বিধবাদের বিবাহ দিলে, দেশ থেকে অনেক গুপ্ত পাপের বীজ নষ্ট হয়ে যায়।"

নলিনী মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "দেখুন অমিয়বাবু, কম পাওয়া যায় বলেই জগতে ভাল জিনিষের আদর বেশী। সবাই সীতা-সাবিত্রী হলে, কবিরা আর বিশেষ করে সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী রচনা কর্‌তেন না। বিধবাদের ভিতরেও হয় ত সকলে মনের মধ্য থেকে বল পান না, হয় ত কারুর কারুর পদস্খলন হয়, হয় ত এমনই দুর্ব্বলা বিধবার সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আমার ত মনে হয়, প্রকৃত বিধবার দেবীত্বও এইখানে; কিন্তু আদর্শ বিধবা অল্প বলে, আপনি সকলকার উপরে এক আইন জারি করে আদর্শের অপমান কর্‌তে পারেন না। কেমন, পারেন কি?"

অমিয় মৃদুস্বরে বলিল, "না, তা পারি না।"

নলিনী বলিল, "আদর্শ বিধবা দুঃখকে দুঃখ বলে স্বীকার করেন না। আপনারা যাকে দুঃখ বলে মনে কর্‌চেন, বিধবা হয় ত তাকে ব্রত বলে, কর্ত্তব্য বলে, অগ্নি-পরীক্ষা বলে হাসিমুখে সব সহ্য করে থাকেন। আপনি বল্‌বেন, এ-রকম দুঃখ-কষ্ট সওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। আমি বলি, স্বাভাবিক নয়, তাই বিধবার গৌরব। ইন্দ্রিয়-সংযম করে লোকে যে সন্ন্যাস-ব্রত নেয়, বৈধব্য-ব্রতের চেয়ে তাতে কি কম কঠোরতা? নিশ্চয়ই নয়। বিধবাদের বৈধব্য-ব্রত পালন কর্‌তে হয় বলে

আপনাদের যখন কান্না পায়, তখন সন্ন্যাস-ব্রতের বেলায় আপনারা বিদ্রোহিতা করেন না কেন? আমি ত বলি, সন্ন্যাস-ব্রতকে যাঁরা সম্মানের চোখে দেখেন, বৈধব্য-ব্রতকেও তাঁদের সেইভাবে দেখা উচিত।"

অমিয় বলিল, "এইখানে তুমি মস্ত ভুল কর্‌চ নলিনি! মানুষ সন্ন্যাস-ব্রত নেয়—স্বেচ্ছায়। আর অসহায়া রমণীর উপরে বৈধব্য-ব্রত এসে পড়ে—বজ্রাঘাতের মত—তার অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে। যাতে ইচ্ছা নেই, তাকে কি সহ্য করা চলে?"

নলিনী বলিল, "কেন চল্‌বে না? গোড়া থেকে আমরা যদি তেমন শিক্ষা পাই, এই দুঃখের পৃথিবীতে সকল রকম দুঃখের জন্য সর্ব্বদাই যদি আমরা প্রস্তুত থাক্‌তে পারি, সর্ব্বত্রই আমরা যদি ভগবানের মঙ্গল হস্ত, কর্ম্মফলের পরিণাম দেখ্‌তে পারি, তা হলে আর দুঃখ কি, দুঃখ কোথায়? যারা এমন শিক্ষা পায় নি, সংসারে ইন্দ্রিয়ই যাদের কাছে বড়, তারা আপনাদের বিধানমত চল্‌তে চায়, চলুক্ অমিয়বাবু! কিন্তু এক কাঠগড়ায় সকলকে পূরে বিধবার অপমান কর্‌বেন না, কর্‌বেন না।"

নলিনী, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া এতক্ষণ পরে মাথা তুলিয়া অমিয়ের দিকে চাহিল; দেখিল, অমিয়ের নিষ্পলক মুগ্ধনেত্র তাহার মুখের উপরে চিত্রের মত স্থির হইয়া আছে। সে দৃষ্টিতে নলিনী তর্কের কোন ভাব পাইল না—যাহা পাইল, তাহাতে সে চকিত, ভীত ও স্তব্ধ হইয়া গেল;—আর, একি! দাদা কোথায়?

রমেশ তাহাকে এখানে একেলা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর সে এতক্ষণ ধরিয়া অমিয়বাবুর সঙ্গে নিজে বিধবা হইয়াও বিধবা-বিবাহ লইয়া তর্ক করিতেছে! নলিনী বুঝিল, রমেশের চলিয়া যাওয়ার কোন গূঢ় অর্থ আছে।—কি অর্থ? নলিনী একেবারে বোবা হইয়া আবার মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

কেহ কোন কথা কহিল না,—এমনই অনেকক্ষণ গেল। অমিয় একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল, তর্কের তাপে নলিনীর কপোলে যে গোলাপী আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এখন কেমন করিয়া সে রংটুকু অল্পে অল্পে মিলাইয়া যাইতেছে!

নলিনী বলিল, "আমি এখন আসি অমিয়বাবু!"

অমিয় একটু দুঃখিতভাবে বলিল, "তোমার দাদা চলে গেছেন বলে, তোমারও পালাবার কোন দরকার নেই। আমি নরমাংসপ্রিয় রাক্ষস নই, মানুষকে ভক্ষণ করা আমার অভ্যাস নয়।"

নলিনী উঠিতে-উঠিতে অপ্রস্তুত হইয়া আবার বসিয়া পড়িল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অমিয় বলিল, "নলিনি, ভাল করে শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

কথা! এই কথাটার ভয়েই নলিনী যে এখান হইতে পলাইয়া বাঁচিতে চায়! সে কোন জবাব দিল না, চেয়ারের উপরে জড়-সড় হইয়া বসিয়া বসিয়া ঘামিতে লাগিল।

চেয়ারখানা সরাইয়া নলিনীর আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া অমিয় বলিল, "তোমার পিতা, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চান, একথা তুমি নিশ্চয়ই জান।"

নলিনী মুখ তুলিতে গিয়া পারিল না। সে কাপড়-চোপড়গুলো ভাল করিয়া গায়ের উপরে টানিয়া দিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

অমিয় তাহার সুমুখে হেঁট্ হইয়া বলিল, "এ বিবাহে আমার দিক্ থেকে কোন আপত্তি নেই; কিন্তু বিবাহের আগে তোমার মত জানাটা দরকার মনে করি।

নলিনী মৃদু, অস্পষ্ট, কম্পিতস্বরে থামিয়া থামিয়া বলিল, "কি জান্‌তে চান?"—তাহার পর ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে লাগিল।

অমিয় একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, নলিনীর পাত্‌লা পাত্‌লা ননির মত নরম ঠোঁট দুখানি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে আর ফাঁকে ফাঁকে কর্পূরের মত ধব্-ধবে, মুক্তার মত সার-গাঁথা দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে। সে মিনতিপূর্ণ কোমলস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে বিবাহ কর্‌বে কি না, আমি তাই জান্‌তে চাই নলিনি! মনে রেখ, তোমার একটি 'না' কি 'হাঁ'র উপরে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর কর্‌চে। চুপ্ ক'রে থেক না—বল, বল, বল!"—অমিয় হঠাৎ আবেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া, দুইহাতে নলিনীর দুইহাত চাপিয়া ধরিল।

নলিনীর মুখ একেবারে মড়ার মত শাদা হইয়া গেল এবং প্রথমটা সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুক একবার উঠিতে ও একবার নামিতে লাগিল,—হৃদয়ের ভিতরে তার বন্দী-প্রাণ তখন যেন গভীর যন্ত্রণায় ছট্-ফট্ করিতেছিল! কিন্তু তাহার পরেই চকিতে আপনার হাত টানিয়া লইয়া উচ্চ, তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে নলিনী বলিল, "অমিয়বাবু!"

অমিয় মূঢ়ের মত চাহিয়া দেখিল, নলিনীর কুপিত নয়ন যেন বাজের মত আগুনভরা!

নলিনী দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "অমিয়বাবু! জানেন, আমি বিধবা! আপনি আমাকে অপমান কর্‌তে সাহস করেন?"

অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া জড়িতস্বরে অমিয় বলিল, "আমাকে মাপ্ কর নলিনি! আমি তোমাকে অপমান কর্‌তে যাই নি।"

নলিনী নীরবে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

অমিয় সকাতরে বলিল, "যেওনা নলিনি! আমার কথার একটা উত্তরও দিয়ে যাও।"

"আপনি আমার গায়ে হাত দিয়ে উত্তর চান্! আপনার যা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন—আমাকে নয়!"

না দাঁড়াইয়া, পিছনপানে না তাকাইয়া, এই কথা বলিতে বলিতে নলিনী রাজ্ঞী-মহিমায় বিদ্যুতের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেকেলে ঠাকুরমা

সাঁঝের সময়ে ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যা দিয়া, ঠাকুরমা দরজার চৌকাঠের পাশটিতে বসিয়া হরিনামের মালা ফিরাইতেছিলেন।

নলিনী আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল, "ঠাকুরমা, আজ একবার তোমার দিদিমার সহমরণের গল্প বল।"

হরিনামের ঝুলিটি তিনবার কপালে ছুঁয়াইয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "যে পাপ সংসারে এসে পড়েচি, এখানে সে সব পুণ্যের কথা বল্‌তে আমার মন সরে না বাছা!"

নলিনী ঠাকুরমার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "যেখানে পাপ, সেইখানেই ত পুণ্যের কথা বল্‌তে হয় ঠাকুরমা!"

ঠাকুরমা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তবে শোন্ বাছা!"

হরিনামের ঝুলিটি দেয়ালের একটি পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ঠাকুরমা আরম্ভ করিলেন, "দাদাবাবু যখন বিদেশে মারা পড়েন, আমরা তখন জন্মাই নি। মারা যাবার আগে দাদাবাবু, দিদিমাকে আন্‌বার জন্যে ছেলেকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এদিকে রাতে কু-স্বপন দেখে দিদিমা সারা সকালটা কারুর সঙ্গে

কথা-বার্ত্তা কন নি। ছেলে যখন কাঁদো-কাঁদো মুখে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌লে, তখন কিছু বল্‌বার আগেই দিদিমা বল্‌লেন, ‘বুঝেচি বাবা, আমার পোড়াকপাল পুড়েচে। চল, এখুনি আমি তোমার সঙ্গে যাব।’—ছেলের সঙ্গে দিদিমা দাদাবাবুর কাছে গিয়ে দেখেন, সব শেষ। দেখে তিনি কাঁদ্‌লেনও না, একফোঁটা চোখের জলও ফেল্‌লেন না। খালি বল্লেন, তোমরা সব যোগাড়-যন্ত্র কর, আমি সহমরণে যাব।’ তাই শুনে, সেখানে আত্মীয়-স্বজন যাঁরা যাঁরা ছিলেন, সবাই মিলে দিদিমাকে হাতে-পায়ে ধরে মানা কর্‌তে’ লাগ্‌ল। দিদিমা প্রথমে কারুর কোন কথায় জবাব দিলেন না। শেষটা বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, ‘তোমরা আর আমায় জ্বালার ওপরে জ্বালা দিও না। আমি ওঁর সঙ্গে না গেলে, স্বর্গে গিয়েও উনি শান্তি পাবেন না।’—এ-কথার ওপরে কেউ আর কোন কথা কইতে পার্‌লে না। দিদিমা নতুন লালপেড়ে-শাড়ী পর্‌লেন, এক-গা গয়না পর্‌লেন, ভাল করে মাথায় জ্বল্‌-জ্বলে সিঁদুর, পায়ে টক্‌-টকে আল্‌তা পর্‌লেন; স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে যাবেন, মুখে হাসি আর ধরে না! চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল, রাজ্যের যে যেখানে ছিল, সবাই শ্মশানের ওপরে ভেঙ্গে পড়ে দো-সারি কাতার দিয়ে দাঁড়াল, সবাই ধন্যি-ধন্যি কর্‌তে লাগ্‌ল; কেউ এসে পায়ের ধূলো নেয়, এয়োরা এসে দিদিমার মাথার সিঁদুর চেয়ে নেয়, ঢুলিরা ঢাক-ঢোল বাজাতে সুরু কর্‌লে, চন্নন-কাঠের চিতায় ঘড়া ঘড়া ঘি ঢালা হ’ল, ধূপ-ধূনো জ্বেলে দেওয়া হ’ল,—আহা, কে বল্‌বে সে শ্মশান, যেন রাজ-অট্টালিকা! দিদিমার মুখে কথা নেই, কিন্তু হাসি আছে,—হাস্‌তে হাস্‌তেই তিনি শ্মশানে এসেছিলেন, হাস্‌তে হাস্‌তেই চিতায় গিয়ে উঠ্‌লেন, হাস্‌তে-হাস্‌তেই স্বামীর পায়ে প্রণাম করে’, তাঁর পাশে গিয়ে শুলেন। ধূ-ধূ করে আগুন জ্বলে’ উঠ্‌ল—কিন্তু দিদিমা একটুও নড়্‌লেন না, একটুও শব্দ কর্‌লেন না—তিনি সতীত্বের জোরে ডঙ্কা মেরে হাস্‌তে-হাস্‌তেই স্বর্গে স্বামীর সেবা কর্‌তে চলে গেলেন। চারিদিক্‌ থেকে এয়োরা সব প্রণাম করে বল্‌তে লাগ্‌ল, ‘এমন মরণ যেন জন্মে জন্মে মরি’!”

বলিতে বলিতে চোখের জলে ঠাকুরমার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল,—সেই পবিত্র, স্বর্গীয় দৃশ্য তাঁহার চোখের সাম্‌নে যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সন্ধ্যার আধ-অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া বসিয়া তিনি যেন তাহাই দেখিতে লাগিলেন! অবশেষে হঠাৎ তিনি নলিনীর দুইহাত চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিলেন, “কি বংশের রক্ত তোর গায়ে আছে, একবার ভেবে দেখ্‌ দেখি বাছা! তোর কি হবে নলি, তোর কি হবে!

নলিনীও কাতরস্বরে ঠাকুরমার কথার প্রতিধ্বনির মত বলিল, “আমার কি হবে ঠাকুরমা, আমার কি হবে!”

ঠাকুরমা দুঃখের সহিত বলিলেন, “তুই ত এ-বাড়ীর মত নস্‌ নলি! তবে বিধাতাপুরুষ তোর কপালে এমন কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিচ্চেন কেন?”

নলিনী সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, “না ঠাকুরমা, না! কলঙ্কের কালি যে মাখে সে মাখুক্‌, আমি মাখ্‌ব না—কখ্‌খনো না, কখ্‌খনো না!”

ঠাকুরমা নলিনীর চোখের উপরে স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “তাই হোক্‌ বাছা, তাই হোক্‌! দেখ্‌ মা নলি, তুই আমার বুকের নিধি—দেবতা ছাড়া তোর মত আর কাউকে আমি এত ভালবাসি না; তোর পায়ে কাঁটা ফুট্‌লে মনে হয়, সে আমার প্রাণে বিঁধ্‌ল! কিন্তু আজ যদি তুই মরে’ যাস্‌, তা হলে আমার মত সুখী আর কেউ হয় না, আর কেউ হয় না!”

নলিনী ঠাকুরমার বুকের ভিতরে মুখ লুকাইয়া, দুইহাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিল, “সত্যি ঠাকুরমা, আমি যদি মরি, তুমি তা হলে কাঁদ না—তুমি হাস?”

ঠাকুরমা নলিনীর গালে সস্নেহে চুমা খাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “হ্যাঁ মা, কলঙ্কের চেয়ে বিধবার মৃত্যু ভাল!”

নলিনী ঘুমাইতে গেল।

ঘরের দেওয়ালে তাহার স্বামীর একখানি ‘ফটো’ টাঙ্গান আছে, নলিনী অপলক ঊর্দ্ধনেত্রে সেই চিত্রের দিকে তাকাইয়া, দাঁড়াইয়াছিল। ছবির মূর্ত্তির মুখে সেই সরল, মধুর হাসি,—যে হাসি দেখিয়া একদিন সে বিশ্বের সমস্ত ভুলিয়া যাইত।

নলিনী ছবিখানি দেওয়াল হইতে নামাইয়া প্রাণপণে আপন বুকের উপরে চাপিয়া ধরিল,—এত জোরে যে,—কাঁচখানা ‘ফ্রেম’ হইতে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ঘরের মেঝেতে ছড়াইয়া পড়িল; কিন্তু সেদিকে নলিনী ভ্রূক্ষেপও করিল না,—দুই চক্ষু বুজিয়া গভীর শান্তিতে যেন সে অনেকদিন পরে আবার হারিয়ে-যাওয়া দুখানি বাহুর নিবিড় আলিঙ্গনের ফিরিয়ে-পাওয়া স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে লাগিল।

নলিনীর মনে পড়িল, বিবাহের কিছুদিন পরে স্বামীর সঙ্গে একদিন তার তর্ক বাধিয়াছিল যে, আগে কে মরিবে?

তাহার স্বামী বলিয়াছিলেন, “দেখ’, তোমার আগে আমি যাব, আমাকে তুমি ফাঁকি দিতে পার্‌বে না।”

নলিনী, স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া জোরের সহিত বলিয়াছিল, “আমি যদি সতী হই, তবে আমি তোমাকে রেখে যাব-ই-যাব।”

তার সে জোর আজ কোথায়? যে সতীত্বের বড়াই সে করিয়াছিল, আজ যে তাতেও কলঙ্কের ছাপ্‌ পড়িবার যো হইয়াছে! তিনি যখন গিয়াছেন, শূন্য প্রাণের মায়া তখনও সে ছাড়িতে পারে নাই; আর আজ, কলঙ্কের আশঙ্কার ভিতরেও সে এই অন্ধকার, নিঃসঙ্গ জীবনকে এখনও আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিয়া আছে,—হা রে ছার মায়া!

নিঝুম রাতে ঘরের চির-জাগন্ত ঘড়ীটা অশ্রান্তভাবে আওয়াজ করিতেছিল,—টিক্‌, টিক্‌, টিক্‌। নলিনীর বোধ হইল, ঘড়ী যেন টিট্‌কারি দিয়া তাহাকে বলিতেছে,—ধিক্‌, ধিক্‌, ধিক্‌!

আস্তে আস্তে সে বাক্সটা খুলিল। ভিতরে লাল, রেশমী সূতায়-বাঁধা একতাড়া কাগজ,—সেগুলি তার স্বামীর চিঠি। নলিনী বাঁধন খুলিয়া এক-একখানি করিয়া চিঠিগুলি পড়িতে লাগিল,—আর সঙ্গে সঙ্গে অতীত যেন জীবন্ত হইয়া তাহার প্রাণের লুকানো ঘরটি ভরিয়া তুলিল। এই চিঠিগুলির প্রত্যেকখানি কত আশার, কত অপেক্ষার, কত পথ-চাওয়ার পর ডাক-পিয়নের ‘ব্যাগ’ হইতে তাহার হাতে আসিয়া পড়িত! এগুলি পড়িতে পড়িতে প্রেমের সোহাগে কতদিন সে না কাঁদিয়া থাকিতে পারিত না,—কোন কোন চিঠির হরফে এখনও সেই শুষ্ক অশ্রুর দাগ লাগিয়া রহিয়াছে। পত্রপাঠ করিতে করিতে অশ্রুজলে আজও তাহার চোখ ছাপিয়া উঠিল;—কিন্তু সে ছিল আনন্দের অশ্রু; আর এযে আজ নিরানন্দের নয়ন-ধারা!……

নলিনী ঘরের সাম্‌নের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

উপরে ঘুমন্ত নীলিমা—সুমুখে চঞ্চল গঙ্গা। আকাশ উপ্‌ছাইয়া চাঁদের আলো পৃথিবীতে ঝরিয়া যেন মৌন গীতিময়ী স্বপ্নপুরী রচনা করিতেছে; গঙ্গাজলে তরঙ্গদল দীপালি-উৎসবে

মত্ত হইয়া কলহাস্যে নৃত্য করিয়া তীরে তীরে টলিয়া পড়িতেছে!

দূরের কোন্‌ নৌকা হইতে দখিনা বাতাস এক মেঠো সুর বহিয়া আনিল—

“যা রে কোকিলা তুই
আমার প্রাণপতি গেছে যে দেশে,—
শুনে তোর কুহুস্বর
উষ্‌কে ওঠে পরাণ আমার,
প্রাণপতি মোর গেছে গাঙ্গের পার—
(ও তুই) ছাড়্‌গে তথা কুহুস্বর—”

কিন্তু, পোড়া কোকিল তবু থামিল না; কোথায় লুকাইয়া সে অবোধ আপনমনে যেমন ডাকিতেছিল, তেমনই ডাকিতে লাগিল, কুহু কুহু কুহু!

আর একদিন অমনই কোকিল ডাকিয়াছিল। নলিনীর প্রাণ-পটে স্মৃতি কবেকার এক ছবি আঁকিয়া দিল। এমনই এক পূর্ণিমার রাতে, এমনই দল্‌মলে জ্যোৎস্নায়, এমনই ঝল্‌মলে গঙ্গাজলে স্বামীর সঙ্গে বোটে করিয়া, তীর ছাড়িয়া সে কতদূর চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া নলিনী চাঁদকে দেখিতে দেখিতে, ঢেউএর হাসি, হাওয়ার গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—তারপর স্বামীর আদর-ভরা চুম্বনে আবার সে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

নলিনী আজ আবার ঘুমাইবে। হাঁ, মনকে শক্ত করিয়া অনেকক্ষণ থেকে সে প্রস্তুত হইয়া আছে। আর দেরি নয়।

স্বামীর ছবি বুকে চাপিয়া, নলিনি পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে নীচে নামিয়া গেল।………

এই ত গঙ্গার ঘাট! কোনদিকে কোন সাড়া-শব্দ নাই—সুধু গঙ্গাজলে মৃদু মৃদু ঢেউএর বীণায় রহিয়া রহিয়া জ্যোৎস্না-রাগিণী বাড়িয়া উঠিতেছে।

রাত্রি যেন স্তব্ধ হইয়া নেত্রহীন নেত্র মেলিয়া নলিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আছে!

নলিনী ঘাটের সোপান দিয়া নামিতে লাগিল,—ধীরে, ধীরে, ধীরে। মৃত্যু-ঘুমে তাহার আত্মা আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। এই নিরালা জগতে, এই ফুট্‌-ফুটে চাঁদের আলোকে, এই সঙ্গীতময়ী রজনীতে স্বামীর ছবি বুকে করিয়া এবার ঘুমাইবে, সে ঘুমাইবে!… ……

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বাবার কাজ

১

স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ীর মধুর সাড়ায়,
বাবা ভোরে খুব সকালে উঠে
বেরিয়ে পড়েন ছেলে পড়াতে পাড়ায়,
ন-টা যখন বাজে, আসেন ছুটে।
বাড়ী এসেই তেলটি মাথায় মেখে,
কলতলাতে ঝট্‌পটিয়ে যান,
মনের ব্যথা মনের মাঝে ঢেকে,
দুই মিনিটে সারেন কাকের স্নান!

২

তাড়াতাড়ি কাপড়-চোপড় পরে’,
নাকে-মুখে দুই মুঠো ভাত গুঁজে,
পান চিবিয়ে চরণ-রথে চড়ে’,
বাঁধা কাজে বেরিয়ে পড়েন সেজে।
রোগ তো বাবার লেগেই আছে দেহে,
মাথাধরা বুক-জ্বালাটাই বড়,
কাজে কদিন কামাই হলে গেহে—
আমরা সবাই ভাবি হয়ে জড়’!

৩

পর্শু বাবার শরীর ছিল খারাপ,
আজ নাগাদ্‌ও হাসি নাইক মুখে!
আজ নাগাদ্‌ও যায়নি মনস্তাপ,
মাকে বলেন—“বেশ তো আছি সুখে।”
উদ্‌লা বাতাস বইচে বড় আজ,
ডাক্‌ছে দেয়া মুহুর্মুহু ভীষণ,
তবু তাঁহার কর্ত্তে হবে কাজ,
ছেলে পড়াতে বাঁধ্‌তে হবে মন!

৪

রুগ্ন শরীর, ভগ্ন হৃদয় নিয়ে,
বিকেল-বেলা খাবার খেতে এলেন,
গ্রীষ্মকালে র‍্যাপার গায়ে দিয়ে,
পেটের দায়ে ‘টিউসনি’তে গেলেন!
হাজার বৃষ্টি ঝড়, তুফানের দিন,
দেখ্‌ছি বাবার কাজটা সমান চলে,
বাবা আমার মানুষরূপী ‘মেসিন্‌,’
খাটেন সুধুই ভাব্‌না-‘ষ্টিমে’র বলে!

৫

রাত্‌টা যখন দুকুর হতে চায়,
ফেরেন তখন ক্লান্ত দেহ নিয়ে;
আমরা প্রায়ই ঘুমিয়ে বিছানায়,
বেড়াই তখন আর এক রাজ্যে গিয়ে।
মা তখনো জেগে জেগে কেবল,
বসে’ বসে’ ভাবেন কতই কথা!
বাবা এলেই মুছে চোখের জল,
তাড়ান মনের সকল ব্যাকুলতা।

৬

রোজই রাতে দোরের কড়া বাজান্‌,
এটা বাবার নিত্যিকারই কাজ,—
ধন্য বাবার কর্ম্ম-কেঠার প্রাণ!
কাজ চলে’ছে সকাল, দুকুর, সাঁজ।
খাটা এবং খাটা এবং খাটা,
বাবা যেন খাটতেই সুধু জানে!
অত রাত্রে মাসিকের পাত ঘাঁটা,
জানিনে কি লেখা-পড়ার মানে!

৭

রাতে একটু আরাম করেই খান,
সত্যি তখন তাড়া হুড়ো নেই,
দম ফেল্‌তে একটু সময় পান,
মানব-জীবন এম্‌নিধারা, এই !
বাবার বুঝি শান্তি নাইক মোটে !
ঘুমিয়ে বুঝি ছেলে-পড়ানোই কাজ !
নইলে মোদের অন্ন কি আর জোটে ?
পড়ুক্ পোড়া পেটের ওপর বাজ !

৮

পড়ে' শুনে কলম পিষে পিষে,
দেখ্‌তে বাবা চিররুগ্নপ্রায় !
চশমা চোখে, তবু হারান্ দিশে,
অভাব কভু ফুরোতে না চায় !
বাবার দুখে বুক যে ফেটে যায় !
সব ঋতুতে কাজ চলে'ছে তাঁর,
তবু কি গো স্বস্তি আছে, হায় !
চাক্‌রি, তোমায় কোটি নমস্কার !

৯

ভাব্‌না সদাই দিচ্ছে ভীষণ তাড়া,
বাবার প্রাণে এতই কি গো সয় !
জগৎটাকে দেখ্‌তে যেমনধারা,
দেখ্‌তে পাচ্ছি তেমন ধারা নয়।
দুনিয়াটাকে খারাপ করে' দেখা,
দেখ্‌তে যেন চাইছে নাক' প্রাণ !
জানিনে কি ভাগ্যে আছে লেখা,
হেসে-খেলেই শুনিয়ে যাব গান।

১০

কিন্তু বাবার হাড়-ভাঙ্গা এই কাজে,
হা ভগবান্, এই করুণাই যাচি !—
শান্তি বাবার দিও প্রাণের মাঝে,
আমরা যেন হাওয়া খেয়েই বাঁচি !
নইলে বাবার শুক্‌নো মুখটি দেখে,
নয়ন-কোণে অশ্রু বাহিরায় !
সাঁইত্রিশেতে বুড়ো হলেন বেঁকে,
হায় দয়াময়, বুক যে ফেটে যায় !

১১

আমরা বাবার ছেলে এবং মেয়ে,
মাকেই আমরা বিশেষ করে' চিনি,
মানুষ নাকি তারই খেয়ে-দেয়ে
পাইনে বড়—ব্যস্ত এতই তিনি !
বাবা মোদের খাট্‌তেই সুধু জানেন,
মার আদেশে আমরা ঘুমোই, পড়ি ;
বাবা, ঘরে অসুখ হলেই থাকেন,
তখন ক'দিন আলাপ-সালাপ করি।

১২

এই জ্যোছনা—আকাশভরা তারা,
গাছে-বসা পাখীর মিষ্টি গান,
দেখে-শুনে আমরা পাগলপারা,
বাবা দেখার সময় কোথা পান !
হাজার বৃষ্টি, ঝড়-তুফানের দিন,
বাবার কিন্তু কাজটা সমান চলে,
বাবা আমার মানুষরূপী 'মেসিন্,'
খাটেন সুধুই ভাব্‌না-'ষ্টিমে'র বলে।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ক্ষণিকা

ছুটী

রবিবারের দ্বিপ্রহর, হাতে কোন কাজ নাই, আহারাদির পর জানালার ধারে একা বসিয়া আছি।

বর্ষার আকাশে কখন' একখানি শাদা, কখন' একখানি কালো মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, কখন'-বা সাম্‌নেকার ঘন-সবুজ গাছগুলির উপর তরল রৌদ্রের প্রবাহ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

পথ দিয়া দু'-একজন লোক মাঝে মাঝে চলিয়া যাইতেছে। ঘাট হইতে স্নান করিয়া একটি রমণী সিক্তবস্ত্রে বনতুলসী ও কাল-কাসন্দ-বনের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। গতি ও শব্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি; কিন্তু যতদূর দেখা যায়, তাহার মধ্যে তাহারা বিশাল গতিহীনতা ও নীরবতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়াই রহিয়াছে।

দূরে, বাঁশের মাচার উপর ছেলের দল বসিয়া আছে ; কিন্তু তাহারা নীরব, মুখে কথাটি নাই। মাঠের উপরে একটা গাভীর নিকট দুইটি কাক নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিয়াছে।

আজ যেন কাহারও হাতে কোন কাজ নাই। ওই যে মহাজন লাল খাতা বগলে করিয়া রাস্তার উপর দিয়া চলিয়াছে, উহাকেও উদাস বলিয়া বোধ হয়—ও যেন এখন টাকা-কড়ির ভাবনায় ব্যস্ত নয়।

কর্ম্মক্ষেত্র চলিতেছিল ; কি একটা প্রবল তাড়নায় সকলে জ্ঞানশূন্য হইয়া নানা কাজে মাতিয়াছিল। হায় রে, কিসের কাজ, তাহারা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই !

আজ এই নীরব মধ্যাহ্নে তাহারা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এতদিন যে কাজ তাহারা করিয়া আসিতেছে ও করিবে, তাহার কথাটিও মনে করিতে আজ ইচ্ছা নাই।

কর্ম্মক্ষেত্রের পেষণে তাহারা সর্ব্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিল, এখন এই অবকাশে তাহারা অশক্ত, অক্ষম, অজ্ঞান।

এইবার ডাক পড়িল। ওই দেখ, ছেলের দল খেলায় মাতিয়াছে। বধূরা কলসী-কক্ষে ঘাটের দিকে চলিয়াছে। যাহাকে দেখিতেছি, বোধ হয় তাহারই যেন একটা না একটা উদ্দেশ্য আছে। কর্ম্মযন্ত্রের ঘর্ঘরে মানুষ সাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

কর্ম্মযন্ত্রের বিরাম নাই। জানি না, কেমন করিয়া হঠাৎ আজ একটুখানি বিরামের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই—কে মাতা, কে পিতা, কে আত্মীয়।

এখন দেখিতেছি, আমার আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে। ওই শুন কর্ম্মযন্ত্র বলিতেছে—তুমি একা নও, তোমার আশা আছে, তুমি বিশ্বের মধ্যে একজন, তোমার অধিকার, তোমার প্রাপ্য, তোমার সম্পদ চিনিয়া লও।

আমি জানালার ধার হইতে চলিয়া আসিয়া একটি বন্ধুর সহিত সাংসারিক কথার আলোচনায় নিরত হইলাম।

মর্ম্মবাণী

সে উদাসীন, সন্ন্যাসী ; পৃথিবীর দুঃখ-শোক, আশা-নিরাশার বাহিরে। সমগ্র বিশ্ব তাহার করায়ত্ত।

সে বিদ্বান্, সরস্বতী তাহার কণ্ঠে সমাসীন ; সে যশস্বী, জ্ঞান-সম্পন্ন, সমাধিমান।

তাহার প্রতাপ অসীম ; সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র তাহার অবাধ্য হইতে পারে না। তাহার শরীর বল্কলে আবৃত, তবুও তাহাতে অসামান্য স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বর্ত্তমান।

সে ব্রহ্মানন্দে বিভোর ; তাহার প্রার্থনীয় কিছুই নাই।

সে অনেক কর্ম্ম সম্পন্ন করিল, অনেক শিষ্যকে শিক্ষা দিল। কেহ তাহার কথা শুনিল, কেহ শুনিল না।

যাহারা তাহার কথা শুনিল, তাহারা ভবিষ্যতে তাহা ভুলিয়া যাইবে, এইরূপে কিছুকাল পরে হয় ত তাহার নাম পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইতে পারে, এ আশঙ্কা সন্ন্যাসীর মনে উদিত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে শীঘ্রই এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে সে আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পাইবার একটুও অবকাশ লাভ করিল না।

একদিন সে প্রসন্নসলিলা তমসার তীরে স্নান ক
উপস্থিত হইল।

শিষ্যের নিকট হইতে বল্কল গ্রহণ করিয়া সে বিপ
নীর চতুর্দ্দিক্ পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

একটি বৃক্ষে ক্রৌঞ্চ-দম্পতীর মধুর নিঃস্বন শ্রবণ করি
সে তন্ময় হইয়া পড়িল।

এমন সময় একটি ব্যাধ, বাণ-নিক্ষেপ করিয়া এ
প্রাণ-সংহার করিল।

যে নিহত হইল, সে পতি ; পতিকে মৃত দেখিয়
করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী তাহা শুনিল, ক্রৌঞ্চ-বধূর প্রতি সহানুভূ
উদাসীন প্রাণ ভরিয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ-বধূর বিরহ-দু
ঋষি অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না।

তারপর তাহার প্রাণ মথিত করিয়া, মর্ম্মের কথা
অতি সরলভাবে সকলের চিত্ত সমানভাবে আকর্ষণ ক
শ্লোক প্রকাশ পাইল।

এই মর্ম্মবাণী সকলের প্রাণে একটা তুমুল আন্দো
দিল। অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতে আর নির্জীব হইয়
সন্ন্যাসী আজ অমর। একটি কথা তাহাকে চি
করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যো

"সাহিত্যে যথেচ্ছাচার" ও "সবুজ পত্র"

বিগত ১৩ই আশ্বিন সংখ্যা "মর্ম্মবাণী"তে "সাহিত্যে যথেচ্ছাচার" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধকর্ত্তা, প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত। "বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যে লেখকগণের স্বৈরাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে যে সকল প্রবীণ ও ক্ষমতাশালী সমালোচকের তীব্র কশাঘাতের ভয়ে লেখকগণ সিধা থাকিতেন, তাঁহারা সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া এখন জীবনের পরপারে" এই বলিয়া লেখক দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। দত্ত-মহাশয়ের প্রধান অভিযোগ এই যে, 'আর্টে'র ধুয়া ধরিয়া মাসিক-সাহিত্যে কুরুচিপূর্ণ, কুৎসিত, জঘন্য, বীভৎস ও ধিক্কারজনক গল্প-রচনা ও চিত্র-প্রকাশের প্রবৃত্তি আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তিনি বলেন—

"বর্ত্তমান সময়ে বিস্তর সুকুমারমতি যুবক-যুবতী, মাসিক-পত্রের পাঠক-পাঠিকা।......জীবনের প্রভাতকালে যখন নর-নারী পাপ-পুণ্যের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হয়, যখন তাহাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রখরতা লাভ করিতে পারে না, তৎকালে এবং জীবনের মধ্যাহ্ন-সময়ে...তাহাদের মনে পাপ-বাসনা প্রজ্বলিত করিবার উদ্দেশ্যে পাপ-প্রসঙ্গের অবতারণায় যাহারা তাহাদের সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগরিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহারা সমস্ত দেশের শত্রু—তাহাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

প্রথমেই বলিয়া রাখি, উদ্ধৃত অংশে লেখক-মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। 'আর্টে'র দোহাই দিয়া নগ্নকায়া যুবতীর ছবি কিংবা কুৎসিত প্রণয়ের গল্প মাসিক-পত্রে প্রকাশ করা নিতান্তই অন্যায় কার্য্য।

তাহার পর লেখক-মহাশয় বলেন—

"কোন কোন মাসিক-পত্রে একদল অদূরদর্শী চুটকি-গল্প-লেখক দেখা দিয়াছেন...তাঁহারা বিস্তর অশ্লীলতাপূর্ণ ইংরাজী গল্পের অনুবাদ এবং স্ব-স্ব বিকৃত কল্পনাসম্ভূত জঘন্য, কর্দর্য্য গল্প-রচনায় অসঙ্কুচিতভাবে দেশে কুরুচি ও অশ্লীলতা ছড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিছুকাল
পত্র' ও * * * প্রভৃতি মাসিক-পত্রিকায় এরূপ কুৎসিত ও
প্রকাশিত হইতেছে, যাহা সর্ব্বতোভাবে কুরুচি ও কুনীতিপূর্ণ ;
অপাঠ্য ও পরিবর্জ্জনীয়।"

উদাহৃত অংশের প্রথমে লেখক যাহা বলিতেছেন
যথার্থ। কিছুদিন হইতে ঐ প্রকার নিন্দনীয় গল্প
মাসিক-পত্রে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে বটে। ইহা
একান্ত বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু শেষভাগে "সবুজ পত্র"-সম্বন্ধে
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে এব
এই উক্তিটুকুর প্রতিবাদ করিবার জন্যই আমার এ
অবতারণা।

গতবর্ষের বৈশাখ মাস হইতে "সবুজ পত্র" বাহির
প্রথম বর্ষে এই পত্রে সর্ব্বসুদ্ধ এগারোটি গল্প প্রকাশিত
এই এগারোটি গল্পই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশ
এ বৎসর "সবুজ পত্র" আশ্বিন সংখ্যা অবধি বাহির
এ নাগাইদ তিনটিমাত্র গল্প দেখিতেছি—

আষাঢ়-সংখ্যায়—"সুরো।"

শ্রাবণ-সংখ্যায়—"অনাদৃতা।"

ভাদ্র ও আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যায়—"চোর।"

প্রথম গল্প দুইটি মৌলিক, শেষেরটি ডিকেন্সের এ
ছায়াবলম্বনে রচিত। তিনটি গল্পের নিম্নেই স্বাক্ষ
"শ্রীমতী মাধুরীলতা দেবী।"

"সবুজ পত্রে" প্রকাশিত রবীন্দ্রবাবুর কোনও গল্প লে
আক্রমণের বিষয় নহে, ইহা স্থির। রবীন্দ্রবাবুকে
"অদূরদর্শী চুটকি-গল্প-লেখক"-দলের মধ্যে ফে
বিশেষ এই প্রবন্ধের শেষাংশে লিখিত রহিয়াছে—

"বিপুল ক্ষমতাশালী বহুমানাস্পদ রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে দেশের উন্নতির জন্য এত কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তথাপি তিনি 'সবুজ পত্রে'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাহাতে কুরুচিপূর্ণ কুৎসিত গল্প-প্রচারের সমর্থন করেন কেন?"

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, রবীন্দ্রবাবুকে লেখক-মহাশয় Sin of ommissionএর জন্যই অনুযোগ করিতেছেন, Sin of commissionএর জন্য নহে; সুতরাং শ্রীমতী মাধুরীলতা দেবী-স্বাক্ষরিত গল্প তিনটিই তাঁহার আক্রমণের বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

এই লেখিকা, সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগতা—বিগত আষাঢ় মাসের পূর্ব্বে কেহ কখনও তাঁহাকে ছাপার অক্ষরে দেখে নাই; সুতরাং তিনি দূরদর্শিনী নহেন, খুবই নিকট-দর্শিনী। নূতন আরম্ভ করিয়াই হঠাৎ তিনি ভুঁইফোঁড় শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখিকা হইয়া দাঁড়াইবেন, এমন আশা করাও অসঙ্গত; সুতরাং তাঁহার গল্প স-সার কিংবা অসার, তাহাও বিচার্য্য নহে। বিচার্য্য—এই গল্পগুলির কোনওটি অশ্লীল, কুৎসিত বা কুনীতিপূর্ণ কি না।

গল্প তিনটি সংক্ষেপতঃ এই—

১। সুরো।

এক ছিলেন বৃদ্ধ ডেপুটি—তাঁহার নাম হরপ্রসাদবাবু। তাঁহার টাক-পড়া মাথায় সামান্য যে চুলগুলি আছে, তাহা বিলকুল পাকা। পান, ছেঁচিয়া খাইতে হয়। দেহের স্থানে স্থানে বাতও ধরিয়াছে। এমন সময় তিনি গৃহহীন হইলেন এবং অল্পদিন পরেই সুরোকে বিবাহ করিয়া আনিলেন (এইখানেই গল্পারম্ভ)।

বিবাহের পর তাঁহার চুল প্রথমে কটা তাহার পর কি করিয়া কালো হইয়া গেল। তাঁহার "টোল-খাওয়া গালদুটি দাঁতের চাড়া পাইয়া সাম্‌লাইয়া উঠিল।" সাবান-খরচ অসম্ভবরকম বাড়িয়া গেল। তিনি মিশিতে লাগিলেন, ছোক্‌রা-উকীলদের দলে। তাহাদের মধ্যে নলিন চৌধুরীই তাঁহার প্রাণের বন্ধু হইল।

ক্রমে হরপ্রসাদবাবু রোগমুক্ত হইলেন—নলিন তাঁহার ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। তিনি অল্পে অল্পে নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া জাহির করিতে আর আপত্তি করিলেন না—এমন কি, আবশ্যক সময় ভিন্ন দাঁত-জোড়াটির খবরও লন না। সুরো খুসী হইয়া তাঁহার খুব সেবা ও যত্ন করিতে লাগিল।

কয়েক বৎসর কাটিল। সে বছর পাড়ায় বসন্তের মহামারী দেখা দিল। হরপ্রসাদ নিজের প্রাণের ভয়ে অস্থির। হঠাৎ একদিন সুরোর দেহে এই ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিল। তাহার দেবর, তাহাকে তেতালার চিলের ছাদের ঘরে লুকাইয়া রাখিল ও শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইল। পরে সুরো যখন হরপ্রসাদের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া হরপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন।

২। অনাদৃতা।

নীলু, সামান্য বেতনে সরকারী ছাপাখানায় চাকরি করিত। তাহার স্ত্রী হরিমণি, দুইটি কন্যা এবং তিনটি পুত্র রাখিয়া চক্ষু মুদিল।

নীলুর বিধবা শালী শঙ্করী আসিয়া দিনকতক ভগ্নীপতির সংসার চালাইল। কোলের ছেলেটি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে মায়ের অনুসরণ করিল। বড় মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী গেল। শঙ্করী তাহার রুগ্না মাতাকে ফেলিয়া বেশীদিন থাকিতে পারে না। নীলু বলিল—"তুমি ছোট খুকী টুলিকে লইয়া যাও, আমি পটলাকে লইয়া মেসের বাসায় থাকি"; কিন্তু শঙ্করী শুনিল না, একেই ত সে পূজা-আহ্নিকের সময় পায় না—আবার টুলিকে লইয়া গেলে—ইত্যাদি।

কিছুদিন পরে নীলুর আপিস দিল্লীতে উঠিয়া গেল। টুলিকে তাহার মাতামহীর বাড়ীর দ্বারে নামাইয়া দিয়া, কাহারও সহিত দেখা না করিয়া, পটলাকে লইয়া সে দিল্লী রওয়ানা হইল।

মামারা ক্রমে টুলির বিবাহ দিলেন। টুলির শাশুড়ী হইল ভয়ানক দুর্দ্দান্ত। অসাবধানে একটা কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া, টুলিকে সে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল। টুলির শ্বশুর তাহাকে মামার বাড়ী ফিরিয়া দিয়া গেলেন।

৩। চোর।

কলু-জাতীয় এক বিপত্নীক ব্যক্তি একটি বোবা-কালা মেয়েকে আনিয়া নিজের কন্যার মত প্রতিপালন করিতেছিল। ক্রমে, মেয়ে বড় হইলে, তাহাকে সে বোবা-কালাদের ইস্কুলে পাঠাইয়া দিল; দুই বৎসর পরে মেয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

একদিন বিকালে, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর বয়স, নধরদেহ, গৌরবর্ণ এক যুবককে, সেই বিপত্নীক নিজের বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় দেখিতে পাইল। "ও মশায়" বলিয়া তাহাকে ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

ইহাও বিপত্নীক লক্ষ্য করিল, মেয়েটির মুখে আর হাসি নাই। সকালবেলা সে বাঁশতলায় চুপটি করিয়া বসিয়া খিড়কীর পুকুরটার দিকে চাহিয়া থাকে।

একদিন বিকালে বিপত্নীক বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, সেই নধরদেহ, গৌরবর্ণ যুবক বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে। চোর মনে করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল; দেখিল, মেয়েটির আংটি তাহার হাতে। পুলিস ডাকিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জানিতে পারিল, যুবক চোর নহে—সেও বোবা-কালা, বোবা-কালার ইস্কুলে পড়িত এবং "সেইখানে দূরের থেকে বোবায় বোবায় চোখে চোখে দেখা এবং শোনা দুই-ই। নিঃশব্দে সব কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে। অন্তর্য্যামী ছাড়া কেউ শোনে নি।

"আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, জাত কি?—জাতে মেলে না। পণ্ডিতের কাছে গেলেম, সে বলে—বিয়ে ত চল্‌বে না।

"ফুলুকে এসে বল্লুম,—ও ফুলু, জাতে বাধে যে! তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে দিনটা আর কিছু বল্লুম না। রাতও গেল কেটে। পরের দিন তার চোখদুটো দেখি ফুলে লাল হয়ে উঠেছে।

"তখন তার চোখদুটি থেকে বিধেন পেলেম। যারা বোবা-কালা, তারা সবাই এক জাতের; যারা কথা কয়, তাদের জাতের আর সীমা সংখ্যা নেই।

"ছোঁড়াটা সাহেবের বাগানের মালী। আমার ফুলরাণী সেই ফুলের দেশে রাজত্ব কর্‌তে চল্‌ল।

"তারপরে দিনকতক আমি কাঁদ্‌লেম। তারপরে ভাব্‌চি, আর যাই হোক্, মর্‌তে পার্‌ব নিশ্চিন্ত হয়ে।"

গল্প তিনটি ত এই। কোনও গল্পের আখ্যান-ভাগে কোনও কুরুচি বা কুনীতি বা অশ্লীলতা আমি ত দেখিতে পাইতেছি না। শেষের গল্পটির সম্বন্ধে যদি কেহ আপত্তি উত্থাপন করেন—উহাদের দুজনের বিবাহ হইল কৈ?—বিবাহের কথাটা স্পষ্ট করিয়া লেখা নাই বটে। হিন্দুমতে বিবাহ না হইতে পারিলেও, অন্যান্য মতে বিবাহ মানুষের হইতে পারে। এ গল্পে বক্তা যখন মেয়ের বাপ, তখন অন্যমতেই মেয়ের বিবাহ হইল ধরিয়া লইতে হইবে। মেয়ের অবৈধ প্রণয়ের ইতিহাস সে কিছু আর বলিতে বসে নাই।

আখ্যান-ভাগে কুরুচি বা অশ্লীলতা না থাকিলেও, গল্পের বর্ণনায় তাহা থাকিতে পারে বটে; কিন্তু তিনটির কোনওটিতেও সেরূপ কিছু আমি ত কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। বিজয়লালবাবু কোথায় অশ্লীলতা দেখিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

"সুরো" গল্পটির মধ্যে একস্থানে আছে—

"কত কথাই আজ বলিতে হইবে স্থির করিয়া সুরো আস্তে আস্তে হরপ্রসাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু সে একগাল হাসিয়া, মালাছড়াটি তার গলায় পরাইয়া হাত ধরিয়া যখন কাছে টানিয়া লইল, তখন সুরো মাথা হেঁট করিয়া অঞ্চলের প্রান্ত খুঁটিতে লাগিল; যা বলিতে আসিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

হর। সুরো, প্রাণ আমার, তুমি ফুল ভালবাস বলে আমি কতদূর থেকে নিজে গিয়ে ফুলের মালাটি আন্‌লুম আর তুমি আমাকে তার বদলে কিছু দিলে না ভাই?

সুরো। কি চাও? পাখার বাতাস দেব? গরম হচ্ছে?

হর। আঃ! ঐ এক কথাতে সব মাটি করে দিলে! এত করে মনে মনে সব জপ্‌তে জপ্‌তে এলুম, সব ভণ্ডুল হয়ে গেল! পাখার বাতাস কি আমি চেয়েছিলুম? নলিনের বউ বলে, 'প্রাণনাথ'---

সুরো। সে যা খুসী বলুক্, ও সব আমার ভাল লাগে না।

হর। কেন তোমার ভাল লাগে না ভাই? আমার ত বেশ লাগে। কি বল্‌ছিলুম, ঐ নলিনের বউ বলে 'প্রাণনাথ! হৃদয়েশ্বর!'---

সুরো। দেখ, কাল থেকে তুমি আর নলিনের বাড়ী যেও না, সত্যি সত্যি যদি ওর বউ ও সব ছাই-ভস্ম বল্‌ত, তা হলে কি ও তোমার সাম্‌নে সে কথা বল্‌তে পার্‌ত? তোমাকে নিয়ে তামাসা করে বোঝ না? নাও, ছাড়, কে এসে পড়্‌বে!"

এই অংশটিই কি বিজয়লালবাবু অশ্লীল বলিয়া মনে করেন? তাহা যদি হয়, তবে-নাচার। ইহার মধ্যে আদিরসের কোনও সন্ধান ত আমি পাইলাম না—হাস্যরস কিছু আছে বটে। লেখক-মহাশয় এই প্রবন্ধের আরম্ভ-ভাগে লিখিয়াছেন—

"আজ যদি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র····· জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে উল্লিখিত স্বাধীনতাপ্রিয় সাহিত্যসেবিগণ···যথেষ্ট শিক্ষা পাইতেন"—সেই বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে শ্রীশচন্দ্র ও কমলমণির যে দাম্পত্য-লীলার "মহাসমর" বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা যদি সুরুচি-সম্মত হয়, তবে এই চিত্র কি দোষ করিল?

অশ্লীলতা কি, কাহাকে বলে? সাহিত্য-দর্পণের টীকাকার রামচরণ তর্কবাগীশ বলেন—"অসভ্যার্থান্তরব্যঞ্জকমশ্লীলং"—সভ্য বক্তার অনভিমত, অসভ্য সমাজে প্রচলিত কুৎসিত অর্থের প্রকাশকে অশ্লীলতা কহে। সাহিত্য-দর্পণকার অশ্লীলত্বকে ত্রিবিধ বলিয়াছেন—"অশ্লীলত্বং ব্রীড়াজুগুপ্সাঽমঙ্গলব্যঞ্জকত্বাৎ ত্রিবিধম্।" —যাহা লজ্জা বা ঘৃণা বা অমঙ্গলাশঙ্কা মনে আনে, তাহাই অশ্লীল। ব্রীড়া কি? জুগুপ্সা কি? "স্বচ্ছন্দক্রিয়াসঙ্কোচো ব্রীড়া"—"অপ্রিয়দর্শনস্পর্শনস্মরণজনিতা মনোবিকৃতি পরিপূর্ণা জুগুপ্সা।"—(রসতরঙ্গিণী)। এখন দেখিতে হইবে, বৃদ্ধের ঐ প্রেমালাপ-বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাদের মন কি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে অথবা একটা কোনও অপ্রিয় দর্শন, স্পর্শন বা স্মরণ করিলাম বলিয়া মনে হয়?—অবশ্য না। তবে যদি লেখক বলেন, "অলঙ্কার-শাস্ত্রের ও নির্দ্দেশ আমি মানি না—এখন অশ্লীলতা বলিতে উহার চেয়েও গুরুতর একটা ব্যাপার বুঝায়", তাহা হইলে দেখা যাউক, আজিকালি অশ্লীলতা বলিতে আমরা কি বুঝিয়া থাকি? "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব" প্রবন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন,—"যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা।" সে হিসাবেই ধরুন, উদ্ধৃত বর্ণনাটি কি অশ্লীল?

বৃদ্ধের দাম্পত্য-লীলার ঐ বর্ণনা ছাড়া গল্প তিনটির মধ্যে আমি এমন একটি স্থানও খুঁজিয়া পাইলাম না, যাহা লইয়া তর্ক চলে। সুতরাং বিজয়লালবাবু কেন যে লিখিলেন—"কিছুকাল হইতে সবুজপত্র * * * প্রভৃতি মাসিক-পত্রে এরূপ কুৎসিত ও অসার গল্প প্রকাশিত হইতেছে, যাহা সর্ব্বতোভাবে কুরুচি ও কুনীতিপূর্ণ, সুতরাং একান্ত অপাঠ্য ও পরিবর্জ্জনীয়"—তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

"সবুজ পত্র" আমার কেহ নহে, আমিও "সবুজ পত্রের" কেহ নহি—গ্রাহক নহি, লেখক নহি,—পাঠকমাত্র; কিন্তু রবীন্দ্রবাবু আমাদের সকলের, তাঁহার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরবান্বিত। তিনি "সবুজ পত্রে"র সহিত নিজেকে একীভূত করিয়াছেন—তাই 'সবুজ পত্র'-সম্বন্ধে এই অকারণ কলঙ্কারোপের প্রতিবাদ করিতে হইল।

আমার কিন্তু একটা সন্দেহ আছে। বিজয়লালবাবু অন্য কোন কাগজের নাম করিতে গিয়া ভুলক্রমে "সবুজ পত্রে"র নাম করেন নাই ত? কারণ, 'সবুজ পত্রে'র ঐ গল্প তিনটির রুচি সম্বন্ধে মতভেদের কোনও স্থান আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার বোধ হয়, এটা একটা case of mistaken identity.

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মাদুরা

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণে মাদুরা অবস্থিত। মাদুরায় অনেক পাহাড় আছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোন দেশই মাদুরা অপেক্ষা প্রাচীন নহে। গ্রীক্-ভৌগোলিকদিগের 'পাণ্ড্য' সাম্রাজ্যের ইহাই রাজধানী ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে

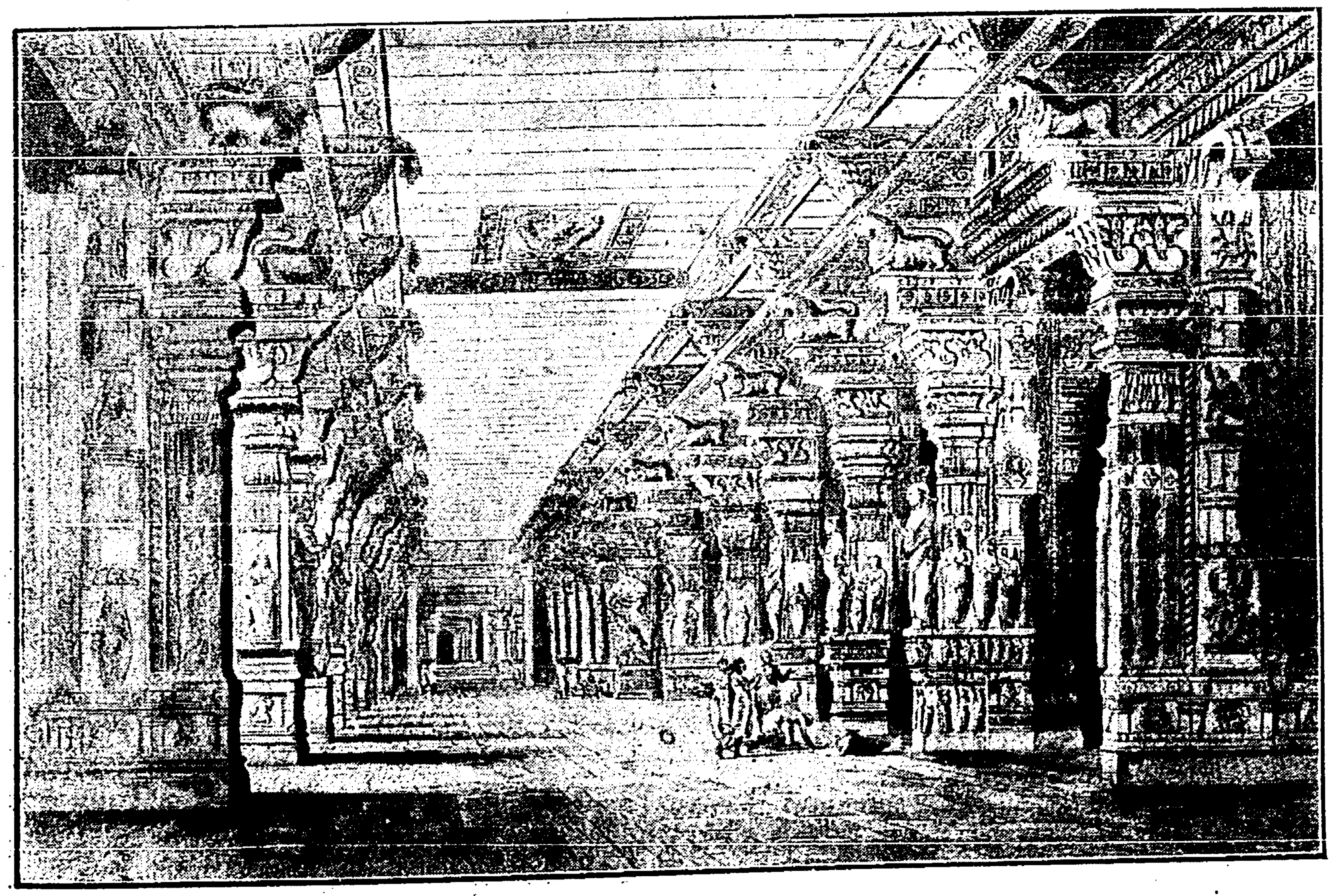

মাদুরার তিরুমলনায়কের প্রাসাদ

ইহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে। মুসলমান-আক্রমণকারী দ্বারা ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। পরে 'নায়ক'গণ এই সাম্রাজ্যের অধিনায়ক হ'ন। ইঁহাদের মধ্যে তিরুমল নায়কের (১৬২৩—১৬৫৯) রাজত্বকালে অনেক কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে 'জেস্থুয়িট' পাদ্রীগণ মাতুরায় আসিয়াছিলেন। Robert De Nobilibus ও De Biitte পাদ্রীদের নেতা ছিলেন। ইঁহাদের লিখিত বর্ণনা-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মাতুরার মন্দির ও প্রাসাদগুলি এরূপ সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন যে সেগুলির

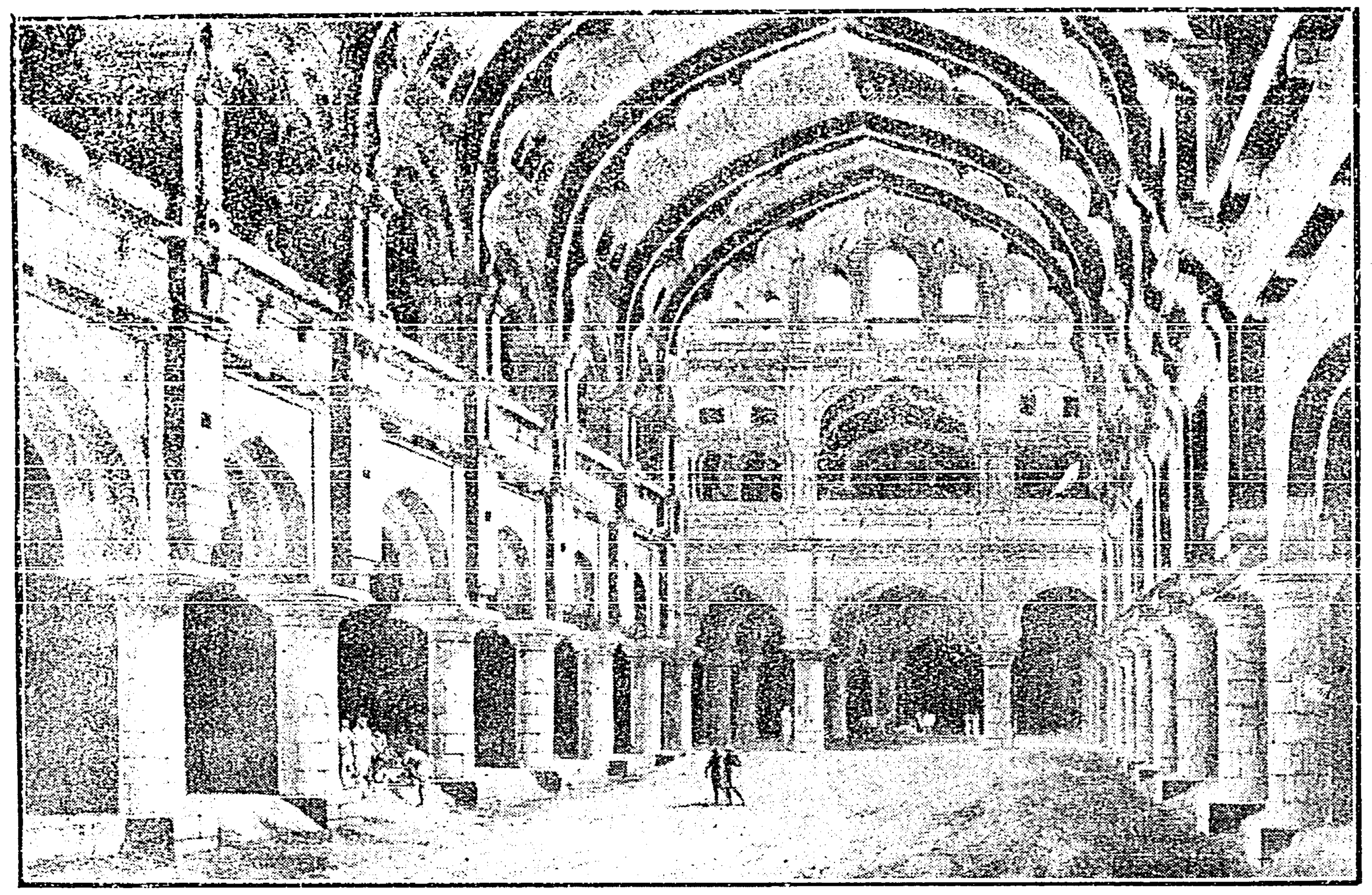

মাতুরা-রাজ-প্রাসাদের আভ্যন্তর দৃশ্য

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। ইহাদের শিল্প-চাতুর্য্য এরূপ কৌশলময় যে, দেখিলে প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের কলা-নৈপুণ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

পাথরগুলির মধ্যে এমন নিপুণ হস্তের সূক্ষ্ম কারিকুরি

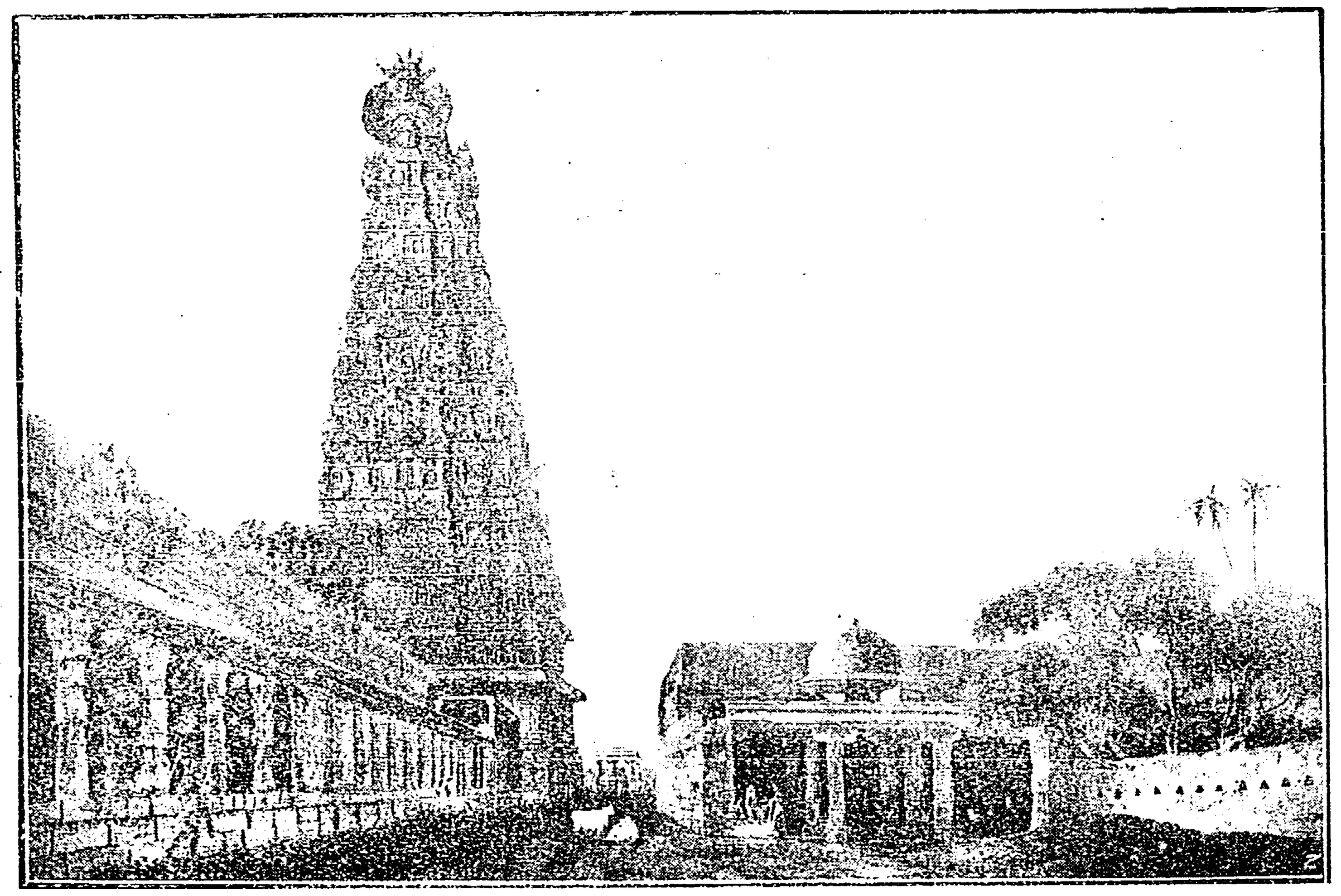

মাতুরার হিন্দু-মন্দির

যে তাঁহারা কতদিন ধরিয়া কত অর্থ ব্যয়ে একার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাসাদ ও মন্দিরগাত্রের খোদিত মূর্ত্তিগুলি যেন জীবন্ত ছবি। পাদ্রিগণ বলেন যে, এই সমস্ত শিল্পীদিগের ভাস্কর্য্যের সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলিও নখদর্পণের ন্যায় আয়ত্ত ছিল। ৮০০ বৎসর পূর্ব্বের 'মধুরাস্থলপুরাণ'

পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের মতে পাণ্ড্যগণ শৈব ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিগণ গবেষণাবলে স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে পাণ্ড্যগণ মাতুরায় প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহাদের শেষ রাজা সুন্দর পাণ্ড্য—চোল-রাজ্য জয় করিয়া জৈনদিগের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের মালিক নায়েক কাফের, মাতুরা অধিকারপূর্ব্বক পঞ্চাশ বৎসর হিন্দুদিগকে নির্য্যাতিত করিয়াছিলেন। পরে মাতুরা বিজয়নগরের হিন্দু-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নায়ক-বংশ-প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ, বিজয়নগর হইতে মাতুরার শাসনকর্ত্তৃরূপে নিয়োজিত হন। বিশ্বনাথ ১৫৫৯ হইতে ১৫৬৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

তাঁহার বংশের গৌরব-রবি ছিলেন তিরুমল। জেস্থুয়িট-দিগের বর্ণনায় তাঁহার প্রশংসা যথেষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মাতুরার অতি মনোরম কারুকার্য্যসম্পন্ন বহু প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলী নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত প্রাসাদ ও মন্দিরের চিত্র আমরা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিলাম, পাঠকগণ দেখিবেন, এ গুলিতে তিরুমলের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তিরুমল স্বর্গে গিয়াছেন বটে, কিন্তু এই প্রাসাদগুলি তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিকে চিরজীবিত রাখিয়াছে।

মর্ম্মবাণী

আনন্দ-দুলালী

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ১১ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা

বিজয়ার আহ্বান

আজি এস, ওগো এস বুকের নিকট, কে আছ দাঁড়ায়ে দূরে,
মিল' রে শূন্য বেদীর পার্শ্বে জননীশূন্য পুরে।
ভাল হয় মিল' আঁখির সলিলে,
ভাই বলে আজি ভায়েরে ডাকিলে,
আজিকে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিলে কভু নাহি ভাঙ্গে চূরে,
আজি এস, ওগো এস বেদীর নিকট, কে আছ দাঁড়ায়ে দূরে।

ওরে রে কাঙ্গাল কে আছ তুয়ারে নয়ন করিয়া নীচু
কে রে শোকাতুর মুছিছ অশ্রু দাঁড়ায়ে সবার পিছু ?
ধনী, দীন আজি নাহি ব্যবধান,
সকলের আজি হৃদয়ে যে স্থান,
আজি—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জাতি, মান, প্রভেদ নাহিক কিছু
ছাড় সঙ্কোচ, মুছ আঁখি ভাই, নয়ন ক'রনা নীচু।

ওগো, স্থধু কথা নয়, রীতি-প্রথা নয়, এ যে গো প্রাণেও টানে,
'সবি তোর ভাই, সবি প্রিয়,' মায়ে কয়ে গেছে কানে কানে।
তাই,—মনের কালিমা সব গেছে দূরে,
পুলকিত তনু থর-থর ফুরে,
তাই,—শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, গৌরব জাগিছে হিন্দু-প্রাণে,
তাই,—আকুল হৃদয় ছুটিছে আজিকে স্থধু হৃদয়ের পানে।

তব—এখনো যজ্ঞ-বিভূতির ফোঁটা ললাটে বিতরে ভাতি,
শোভিছে হস্তে অপরাজিতার শ্যামল-বলয়-পাঁতি।
এখনো মায়ের অঞ্চল-বায়
পুলকাঞ্চনে শিহরিছে কায়,
চন্দন-রেখা প্রায় উজলি' এখনো রয়েছে রাতি,
জননীর স্নেহ হবে আমাদের সারা বরষের সাথী।

শূন্য যদিও বাহিরের বেদী, অন্তরে তা' ত নয়,
বসায়ে মায়েরে হৃদিমাঝে, কর পুণ্য-আলোকময়!
অশ্রু-সলিলে ধৌত করিয়া
সকল কালিমা দাও বিদূরিয়া,
জননী-চরণে ফুটাও ভক্তি-রক্ত-কমলচয়,
শূন্য যদিও বাহিরের বেদী, তাহে কিবা ক্ষোভ, ভয় ?

আজি—লয়ে এস স্থধু প্রেমের বন্যা, লয়ে এস কোলাকুলি,
পুণ্য-পরশে হউক ধন্য শিরা, উপশিরাগুলি।
দেশান্তরের বন্ধু যে জন,
স্নেহভরে তারে করহ স্মরণ,
লোকান্তরের প্রিয়জনটিকে স্মরিতে যেও না ভুলি,'
সব বিদ্বেষ ঘুচায়ে আজিকে লয়ে এস কোলাকুলি।

শ্রীকালিদাস রায়

প্রশ্নোত্তরী

"হিন্দু" শব্দ

প্রশ্ন—"বাঙ্গালা ভাষায় 'হিন্দু' শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক সংস্কৃতেও পণ্ডিতগণ 'হিন্দু' শব্দ লিখিয়া থাকেন। এ শব্দটী মূলে সংস্কৃত কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে 'মর্ম্মবাণী'তে আলোচনা দেখিতে পাইব কি?"—শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

উত্তর—'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বড়ই গোলে পড়িতে হয়। সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও 'হিন্দু' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না; কাজেই মনে হয়, শব্দটী সংস্কৃত শব্দ নয়; যদি শব্দটী সংস্কৃত হইত, তাহা হইলে সংস্কৃত-সাহিত্যে কোন না কোন স্থানে ইহার অস্তিত্ব থাকিত। 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধানে কিন্তু 'হিন্দু' একটু স্থানলাভ করিয়াছে। সুধু তাহাই নয়। 'মেরুতন্ত্র' নামক একখানি অর্ব্বাচীন তন্ত্রের ২৩শ অধ্যায়ে 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ আছে বলিয়া শব্দকল্পদ্রুমকার বচন উদ্ধার করিয়া শব্দটীর সংস্কৃত-প্রকৃতি-প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু 'মেরুতন্ত্রে' ইহার উল্লেখ থাকায়, ইহা আধুনিক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে।

'হিন্দু' শব্দটী সংস্কৃত নয় বলিয়া আমরা শব্দটীকে আধুনিক বলিতে প্রস্তুত নই। জেন্দ-ভাষায় একটী শব্দ আছে, তাহা হিন্দু-ধ্বন্যাত্মক। Esther (১।১; ৮।৯) নামক হিব্রু ধর্ম্মশাস্ত্রের একাংশে ইহা 'হোদ্দু' বলিয়া অভিহিত। 'হোদ্দু'—সিরীয়ক 'হেন্দু' এবং আরব 'হিন্দু' শব্দের সমার্থক। হেরোডোটস্ হিন্দুদিগকে 'Indoi' এই সাধারণ নামে পরিচিত করিয়াছেন (৪।৪৪; ৫।৩); কিন্তু এই শব্দটীর প্রথম প্রয়োগ Æschylusএ দেখিতে পাওয়া যায়। 'হিন্দু' শব্দ 'সিন্ধু' হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল, আর প্রাচীন পারসীকগণ প্রথমেই তাহা ব্যবহার করে। জেন্দ-ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে 'হিন্দু' শব্দ 'সিন্ধু' অথবা 'হিন্ধু' শব্দজাত। ইরাণের আশপাশের ইংরাজী-ভাষা-ভাষী সকলেই 'স'-বর্ণকে 'হ'-বর্ণের ন্যায় উচ্চারণ করিতেন (Pliny, Hist Nat VI, 22, 91; Indus in colis Sindus appollapes); এইরূপে 'সিন্ধু' শব্দ 'হিন্দু' শব্দে (হিধু) পরিণত হইল; তারপর 'হ'-বর্ণের লোপ হইয়া 'Indu' শব্দ গঠিত হইল। সম্ভবতঃ প্রথমে অর্থ ছিল 'বিভাগকারী', রক্ষক, এটী 'সিধ্' ধাতুনিষ্পন্ন, ইহার অর্থ 'রক্ষণ করা'। সিন্ধু নদের নাম Hec ta us of Miletusএর লেখায় সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায়। H c t eus Herodotusএর পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

গ্রীক-ভাষায় 'হিন্দু' বুঝিতে "In os" দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'In os' শব্দই লাটিনে 'Sindus' আকার ধারণ করিয়াছে। বেন্দিদাদের (১।৭৩) "হপ্তহেন্দু" নিশ্চয়ই সংস্কৃত "সপ্ত-সিন্ধবঃ" পদের রূপান্তর। "সপ্ত-সিন্ধবঃ" বলিতে সপ্তসিন্ধু-প্রবাহিত ভূমি, বৈদিকযুগের ভারতবর্ষই বুঝাইত। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের চৈনিক সাহিত্যে "শিন্তু" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় (বিশেষ বিবরণ Journal Asi ique, Nov 1839, p 384 দ্রষ্টব্য। অগষ্টকের সময় রোমানগণও এই শব্দটীর সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল (Vi gil s Æn id, IX 30)। কিউনিফরম্ শিলালেখে 'Hi lus' যে 'সপ্ত সিন্ধবঃ' বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত, তাহা Spiegelএর আবেস্তায় (i p 66, note 3) বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (D tius Hys as esএর কিউনিফরম্ শিলালেখ এবং জেন্দাবেস্তা-পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে, 'হিন্দু' or 'হেন্দু'-নদী-প্রবাহিত ভারতের একাংশকে প্রাচীন পারসীকগণ 'হিন্দু' বা 'হেন্দু' নামে অভিহিত করিতেন। আরবগণও মহম্মদের বহুপূর্ব্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে 'হিন্দ্' নামে আখ্যাত করিয়াছিলেন; পরে ইঁহারাই সিন্ধুনদ-প্রবাহিত প্রদেশকে 'সিন্দ্' এই বিশেষ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন। এই 'সিন্দ্' শব্দ এবং প্রাচীন পারসীক শব্দ 'হিন্দু' এই উভয় শব্দই সংস্কৃতমূলক 'সিন্ধু' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। 'হিন্দুস্থান' আধুনিক যুগের পারসী নাম।

আমরা অনুসন্ধানদ্বারা 'হিন্দু' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি। 'হিন্দু' শব্দ-সম্বন্ধে যদি কোন বিশেষজ্ঞ অনুগ্রহপূর্ব্বক নূতন সংবাদ দেন, আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

'কায়স্থ' শব্দ

প্রশ্ন—"আজকাল নানা প্রবন্ধে কায়স্থদিগের নানাবিষয়িণী উন্নতি-সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে; কিন্তু 'কায়স্থ' শব্দের নিরুক্তি-বিষয়ক আলোচনা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্প্রতি 'প্রবাসী'পত্রে পাঠ করিলাম যে, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'কায়স্থ' শব্দের নিরুক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, 'ব্রহ্মর্ষি দেশের অন্তর্ভূত 'কায়' নামক জনপদের ক্ষত্রিয়গণ, যাঁহারা বেদমন্ত্রে ক্ষত্রিয়ত্ব-বিজ্ঞাপক "রাজক" আখ্যায় সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী নগরাদির শাসন-পালন করিতেছিলেন, তাঁহারাই কায়স্থ জাতি এবং তাঁহাদের রক্ষক ঐ চিত্র নামক নরপতিই চিত্রগুপ্ত বলিয়া লোক-সমাজে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। "ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে" ইহাই কায়স্থের নিরুক্তি! শাস্ত্রী মহাশয়ের এই মত কতদূর যুক্তিসহ জানিতে পারি কি?"—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

উত্তর—শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় বিগত বৈশাখ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহার যুক্তিগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তাহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে 'কায়স্থ' শব্দের নিরুক্তি তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহা যুক্তিসহ কি না, তাহাই বিচার্য্য। শাস্ত্রী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে মতামতের জন্য তাঁহার প্রবন্ধ বঙ্গদেশের বিশেষজ্ঞদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। মতামত যাহা পাওয়া গিয়াছে, প্রথমে সেইগুলির আলোচনা করিয়া পরিশেষে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, " 'কায়স্থ' শব্দের যথার্থ ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অনেক পণ্ডিত বহু প্রয়াস করিয়াছেন; কিন্তু এ-পর্য্যন্ত কাহারও সিদ্ধান্ত সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। বর্ত্তমান যুগের প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতের সহিত প্রাচীন শাস্ত্রাধ্যাপকগণের মতের সামঞ্জস্য করা অতি দুরূহ ব্যাপার। উপেন্দ্রবাবু উভয় মতেরই সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পঞ্জাব-প্রদেশের 'কায়থল' নামক স্থান হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই কায়স্থ। এই মতের সম্যক্ আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।" বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজে কোন অভিমত না দিয়া ফাঁকিতে কাজ সারিয়াছেন। অনেকেই এইরূপ মতই দিয়াছেন। যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের অভিমতে যুক্তি বা নূতন তথ্য দিয়াছেন, আমরা আগামী বারে কেবল সেইগুলিরই সম্যক্ আলোচনা করিব।

আশার পথে

(চিত্র)

(১)

বৃদ্ধ জিমান, তার শীর্ণ শরীরখানি লয়ে গ্রামের একপ্রান্তে নির্জ্জন সমুদ্র-তীরের কুটীরখানিতে বাস করে। কতদিন থেকে সে এখানে বাস কর্‌ছে, তা কেউ বল্‌তে পারে না। গ্রামের কেহই তাকে দু'চোখে দেখ্‌তে পারে না বা তার সম্পর্কে আস্‌তে চায় না। সে যে কোন্ দেশের মানুষ, তা তারা জানে না। রবিবার সকলেই গির্জ্জায় উপাসনা কর্‌তে যায়; কিন্তু জিমানকে কেউ একদিনের জন্যও গির্জ্জায় দেখে নাই। সে মস্ত একটা নাস্তিক—ভূত-প্রেত নিয়ে বাস করে। পাড়ার ছেলেরা জিমানের নাম শুন্‌লে ভয়ে জড়সড় হয়।

সারাদিন যে তার কি কাজ, তা কেউ বল্‌তে পারে না। কি শীতকাল, কি গ্রীষ্মকাল,—ভোর হতে না হতেই জিমান কিসের একটা বড় বোঝা পিঠে বেঁধে গ্রামের পথ বেয়ে মাঠের দিকে চলে। কোথা যায় সেই জানে। গ্রামের সকলে কুকুর ডেকে তার দিকে ইসারা করে লেলিয়ে দেয়—একপাল কুকুর এসে দাঁত বার করে জিমানের পথরোধ ক'রে দাঁড়ায়। পাড়ার ছেলেরা আড়াল থেকে ইঁট ছুড়ে তার গায়ে মারে;—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত জিমানকে এতে একটুও বিরক্ত হতে কেউ দেখে নাই। এই অস্বাভাবিক নীরবতার জন্যই ত সকলে জিমানকে আরও সন্দেহের চোখে দেখে! এত বড় বড় ইঁটগুলো গায়ে গিয়ে পড়্‌ল, অথচ তার শরীরের কোথাও চোট্ লাগ্‌ল না! নিশ্চয়ই সে যাদু-বিদ্যা জানে। এই সেদিন ফ্যারেন দিব্যি করে বলেছে যে, সে নিজের চোখে দেখেছে, জিমান ইঁটগুলো ফুঁ দিয়ে দূরে ফেলে দিতে লাগ্‌ল!—আবার মেসি নাকি ভগবানের নামে শপথ করে বল্‌তে রাজী হয়েছিল যে, সে স্বচক্ষে দেখেছে, জিমান কুকুরগুলোর দিকে চেয়ে বিজ্ বিজ্ করে কি বক্‌তে লাগ্‌ল আর কুকুরগুলো ল্যাজ্ গুটিয়ে সব যে যেদিকে পার্‌লে চট্‌পট্ ছুটে পালাল'। ফ্যারেন, মেসি আপনার লোক; তাদের কথা কি করে অবিশ্বাস করা যায়। আবার সেদিন অস্‌গুডের ছোট ছেলেটী সকালবেলা দোরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রুটী খাচ্ছিল—জিমান তখন বাড়ী ফির্‌ছে। অস্‌গুডের ছেলেটীকে দেখে কি জানি তার মনে কি হ'ল—সে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আনন্দে জিমানের জীর্ণ প্রাণটুকু ভরে গেল—কিন্তু তারপরই তার মুখখানা কেমন বিশ্রী রকমের হয়ে উঠ্‌ল। ছেলেটা ত সেই দেখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ীর ভিতর ছুটে চলে' গেল। তখন জিমান অতি কষ্টে বুকের উপর তার শীর্ণ হাত দু'খানি চেপে ধরে' আকাশের দিকে চেয়ে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার আপনার পথে চলে' গেল। শুন্‌তে পাওয়া যায় নাকি সেই রাত্রেই অস্‌গুডের ছেলেটীর কম্প দিয়ে জ্বর এসেছিল—কত-কি ভুল বক্‌তে লাগ্‌ল। বাড়ীসুদ্ধ লোক ভয়ে অস্থির। 'নিশ্চয়ই সেই বেদে-বেটা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে'—এই কথা সকলে বলাবলি করেছিল। যাই হোক্, ছেলেটী ত অতিকষ্টে সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছে।

বৈকালে জিমান কুটীরের বাহিরে এসে সমুদ্রের তীরে বসে সম্মুখের অগাধ জলরাশির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—মুখে কোনও শব্দ নাই, শরীরে স্পন্দন নাই—স্থির, নিশ্চল হয়ে যে কি দেখে, তা সেই জানে। দূরে জাহাজের মাস্তুল দেখ্‌তে পেলে, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে—শীর্ণ মুখখানি তার হাসিতে ভ'রে যায়। তারপর ধীরে ধীরে জাহাজখানা যখন দূর হতে এসে আবার দূরে চলে' যায়, তখন বুড়োর মুখখানি পাংশু হয়ে যায়। বুকে হাত চেপে ধরে' অতি কষ্টে সেখানে আবার বসে' পড়ে—চোখ বুজে কিছুক্ষণ কি ভাবেতে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে আকাশের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুটীরের মধ্যে চলে যায়।

আবার শুন্‌তে পাওয়া যায়, জিমান নাকি ইচ্ছা কর্‌লে যাদু-মন্ত্রের বলে অনেক কঠিন রোগ আরাম কর্‌তে পারে; কিন্তু সে সহজে রাজী হতে চায় না। এটা তার একটা মস্ত দোষ।

(২)

দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখের সাম্‌নে দিয়ে আর একটা বছর চলে' গেল। কত যুগ এমনই করে চলে' গেছে—কত লোকের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে—কত জিনিষ নূতন ক'রে গড়া হয়েছে আবার কত গড়ে ভাঙ্গাও হয়েছে; কিন্তু বৃদ্ধ জিমানের জীবনের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—সে তার সেই বহুকালের পুরাণ একঘেয়ে জীবন সমানভাবেই একটানা বহন করে আস্‌ছে; কিন্তু তার জন্য সে বড় বেশী দুঃখিত নয়।

আজ নব-বর্ষের প্রথম দিন। রাত্রি ৪টা হতেই গির্জ্জার ঘড়িতে নানা সুরের বাজনা কতলোকের প্রাণের তারের সঙ্গে নানান ভাবের সুর মিশিয়ে বাজ্‌ছে; কিন্তু যাদের প্রাণের তার ছিঁড়ে গেছে, তারা শত চেষ্টা করেও বাজনা সুরে আন্‌তে পার্‌ছে না। বৃদ্ধ জিমানের জীবন-তারও একদিন ঠিক এম্‌নইভাবে কত সোহাগমাখা সুরে বেজেছিল; কিন্তু যেদিন থেকে তার ছিঁড়ে গেছে, সেদিন থেকে সেও জীবন্তে তা'র সাধের বীণার সমাধি দিয়েছে—ছেঁড়া তার জোড়া দিবার চেষ্টাও করে নাই।

সকালবেলা। দলে দলে লোক নূতন নূতন পোষাক পরে' গির্জ্জায় শ্রীভগবানের চরণে শান্তিপূর্ণ নব-বর্ষের জন্য প্রার্থনা কর্‌তে চলেছে। সকলের প্রাণে আজ কত আনন্দ—কত আশা; কিন্তু হতভাগা বুড়ো জিমান—সে যেন মনুষ্য-জগতের বাহিরে—সে যেন প্রভাতের এই বৈচিত্র্যের কিছুই অনুভব কর্‌তে পার্‌ছে না। ভোরে উঠেই কুটীরের বাহিরে এসে সেই প্রতিদিনকার মতই বুকে হাত দিয়ে আকাশের পানে চেয়ে সে একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটা বড় বোঝা পিঠের উপর ফেলে বাহির হল। পথের মাঝে শাদা রংএর মস্ত গোঁফ-দাড়ীওলা পাদ্‌রীর সঙ্গে দেখা। পাদ্‌রী তাকে মোটেই দু'-চোখে দেখ্‌তে পার্‌তেন না—সে যে একটা মস্ত নাস্তিক—গির্জ্জায় যায় না—ধর্ম্ম-পুস্তক যে তার একখানাও নাই। দূর হতে জিমানকে দেখেই পাদ্‌রী চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌লেন—"আরে মলো হতভাগা বুড়ো, আজ বছরের প্রথম দিন, তোর কি উপাসনা কর্‌বার কিছুই নেই: তুই যে পাপের অন্ধকারে পচে মর্‌বি। সরে যা আমার সাম্‌নে থেকে। তোর মত নাস্তিকের ছায়া মাড়ালেও আমার পবিত্র আত্মায় পাপ স্পর্শ কর্‌বে।" বৃদ্ধ জিমান পাদ্‌রীর মুখের দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে

৭১

চেয়ে রইল। তার মুখ দেখে বোধ হ'ল, যেন সে পাদ্রীর একটা কথাও বুঝ্তে পারে নাই! তারপর সে মনে মনে কি ভাবলে—হাত দুখানি বুকের মধ্যে নিয়ে আকাশের পানে তাকিয়ে অভ্যাসমত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপনার পথে চলে' গেল; কিন্তু কে জানে, সেই ফাঁকা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত তার প্রাণের কত কথা, কত বেদনা জড়িত আছে! পথে কত রং-বেরংএর চোখ-ঝল্সানো পোষাক-পরা ছেলে-মেয়ে আহ্লাদে পাখীর মত নাচ্তে নাচতে তার সাম্নে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে—কত সুন্দরী স্ত্রী মুখভরা হাসি নিয়ে স্বামীর হাত ধরে মৃদুপদে চলেছে। বৃদ্ধ জিমান সকলই দেখিতেছে—আর কেবলই তার শীর্ণ খস্খসে হাত দু'খানি আপনার বুকের উপর চেপে ধর্ছে। তারও জীবনে ত ঠিক এমনই দিন গিয়াছে, তারও হৃদয় ত ঠিক একদিন এমনই-ভাবে আরও কয়েকটা হৃদয়ের সঙ্গে এক হয়ে গাঁথা ছিল—কিন্তু পোড়া কাল এসে একদিন সব শেষ করে দিয়ে গেছে! 'যা গেছে সে কি আবার হবে—সেদিন কি আর আস্বে'—এই সব ভাব্তে ভাব্তে জিমান বুকে হাত দিয়ে রোজ কোনও রকমে প্রাণের চঞ্চলতাকে থামিয়ে রাখে। নৈরাশ্যের শত কশাঘাতের মাঝখানেও মানুষের অন্তরের অন্তরালে ঠিক এমনই একটা আশার ভাব জমানো থাকে—তা না হলে মানুষ যে বাঁচ্তে পারে না!

সারাদিনটা জিমান কুটীরের মধ্যে বসে' আপনা-আপনি প্রাণের সঙ্গে কত কথা বলেছে—তাকে কত বুঝিয়েছে, কিন্তু আজ যেন সে আর প্রবোধ মান্তে চায় না! সে আজ বিদ্রোহী হবে বলে ভয় দেখিয়েছে। কত বৎসর ত এমনই করে তার জীবনের মাঝখানে এসেছে—আবার অজ্ঞাতসারে চলে' গেছে! কিন্তু কই, কেউ ত তাকে একটুও অধীর কর্তে পারে নাই! আজ তার এ কি হ'ল! তার ভাঙ্গা হৃদয় আবার কেন জোড়া লাগ্তে চায়—তার বেসুরো বীণা আবার সুরের সঙ্গে সুর মিলাতে আকুল হয়ে ওঠে কেন? কিন্তু হায়, সেদিন যে চলে গেছে! জিমান আর কুটীরমধ্যে বসে থাক্তে পার্লে না। কি যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ তাকে সেই পুরাণো সমুদ্রের তীরের কাছে জোর করে টেনে নিয়ে গেল! সে ঠিক পূর্ব্বের মত সমুদ্রের সেই গভীর, অকূল, অগাধ নীলিমার দিকে চেয়ে রইল। আর অতীতের সব দিনগুলো যেন একে একে ঠিক ছায়াবাজীর ছবির মত, পরে পরে তার চোখের সাম্নে দিয়ে ভেসে ভেসে যেতে লাগ্ল! যতই সে দেখ্তে না চায়, ততই যেন ছবিগুলো স্পষ্টতর হ'য়ে জেগে ওঠে! আজ বৃদ্ধ জিমান নিরুপায়!—সেই মধুর বাল্যকাল! যখন বাপ-মার স্নেহভরা কোলে, সোণার স্বপনের মাঝে দিনগুলি কেটে যেত—সেই যেদিন প্রিয়তমা এড্রিথের সঙ্গে প্রথম দেখা—ওঃ, সে দিনটা যে তার সব স্মৃতি লয়ে আজ জিমানকে চেপে ধর্ছে। তারপর সেদিনও ক্রমে অনন্তের পথে চলে গেল, আর জিমানের জীবনের উপর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা নৈরাশ্যের ছায়া এসে তার সাম্নের পথটা অন্ধকার করে' ঢেকে দিয়ে গেল! এই রকম কতদিন এসেছে, কতদিন চলে গেছে, হয় ত আবার কতদিন আস্বে!—বৃদ্ধ জিমান বসে বসে আকাশ-পাতাল এই সব চিন্তা কর্ছে—কোনও দিকে তার খেয়াল নাই—সে আপন চিন্তায় বিভোর।

ধীরে ধীরে কর্ম্মক্লান্ত পৃথিবীর মুখে সুষুপ্তির হাত বুলিয়ে, চারিদিক্ আচ্ছন্ন করে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। প্রচণ্ড শীত; বরফ-পাতের সম্ভাবনা খুবই। কোথাও জন-মানবের সাড়া-শব্দ নাই। স্থানটা হঠাৎ দেখ্লে মনে হয়, পৃথিবীটা কোন্ আদি যুগ থেকে যেন এইভাবে আরম্ভ হয়েছে—আবার এমনইভাবে বুঝি শেষ হবে!

ঢং ঢং করে সেই ভীষণ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গির্জ্জার ঘড়িতে বারটা বাজ্তে লাগ্ল। তখন জিমানের চমক হল। এত রাত্রি অবধি সে ত কোনওদিন এখানে এরকমভাবে বসে থাকে না; কিন্তু আজ কে যেন তাকে ধরে রেখেছে! কেন যে সে বসে আছে, তা সে জানে না, অথচ বসেই আছে। শেষটা সে জোর করে উঠে দাঁড়াল। এমন সময় জলের ধার থেকে কি-একটা শব্দ তার কাণে গেল। 'ঐ না কি-একটা আওয়াজ আস্ছে—ছোট ছেলের কান্না না? না, না, ওটা নিশ্চয়ই মনের ভুল—ছোট ছেলের কান্না হতে যাবে কেন? আচ্ছা, ভাল করে শোনা যাক্—তাই ত, স্পষ্ট শুন্তে পাচ্ছি যে—কি-একটা শাদা রংএর জিনিষ না?'

বৃদ্ধ জিমান আবার বুকে হাত দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠ্ল—'প্রভু, তাই যেন হয়!' তারপর হাত দু'খানা আরও জোরে বুকের উপর চেপে ধরে আস্তে আস্তে সেদিকপানে যেতে লাগ্ল। তার প্রাণের মধ্যে তখন যে কি একটা গোলমেলে ভাব ছুটো-ছুটি কর্তে লাগ্ল সে তা ঠিক বুঝ্তে পার্লে না। আশা তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আবার নৈরাশ্যের একটা অস্পষ্ট ছায়াও মাঝে মাঝে তার পাশে উঁকি মার্ছে। 'যদি না হয়, তা হলে—' জিমান বাকীটুকু আর ভাব্তে পার্লে না। সে কথা সে কিছুতেই ভাব্বে না—তা হলে সত্যই যে তার প্রাণ আজ বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াবে! এই রকম একটা আবল-তাবল ভাব নিয়ে জিমান যেখান থেকে শব্দ আস্‌ছিল, সেইখানে গিয়ে উপস্থিত হল। তাড়াতাড়ি শাদা রংএর জিনিষটা বুকের মাঝে জড়িয়ে ধর্লে—সেটা যে কি, তা ভাব্বারও দরকার মনে কর্লে না। সে জান্ত সুধু তার বহুদিনের পুরাণো স্মৃতি, একদিন যা তাকে ছেড়ে বহুদূরে চলে গিয়েছিল, সেটা আজ আবার তার আছে ফিরে এসেছে। কত বৎসর ধরে জিমান তার একঘেয়ে জীবন বেয়ে আস্ছে—তাই সে আজ বুঝ্তে পার্লে না, এই এক মুহূর্ত্তে তার জীবনের কতটা পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। তার হৃদয় এককালে কত মহামূল্য রত্নে পূর্ণ ছিল—কিন্তু হায়, সকলেই আজ তাকে ছেড়ে কোথায়, কোন্ অন্ধকারে চলে গেছে!

(৩)

তার পর কতদিন চলে গেছে। বুড়ো জিমানকে কেউ এখন আর চিন্তে পার্বে না। তার মুখে সদাই হাসি লেগে আছে—সে যেন সকল সময়েই বড় ব্যস্ত! তার বয়সও যেন ক্রমে উল্টোদিকে চলেছে! লোকে বলে—আর সে দিন-রাত ভূত-প্রেত নিয়ে বাস করে না। তাদের বদলে এখন চাঁপাফুলের রংএর মত কচি কচি নাদুস-নুদুস ফুট্-ফুটে 'মিলি' তার সঙ্গী হয়েছে। জিমানকে আজকাল অধিকাংশ সময়ই লোকালয়ে দেখ্তে পাবে। কিসে মিলির কোনও কষ্ট না হয়, কিসে মিলি ভাল থাকে, বুড়ো সর্ব্বদা তাই দেখ্তেই ব্যস্ত! মিলি যখন ঘুমোয়, জিমান সাম্নে একটা ভাঙ্গা টুলের উপর বসে এক-দৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে। আর একগাল হাসি নিয়ে মিলির কচি ঠোঁট দু'খানি চুমোতে চুমোতে আচ্ছন্ন করে দেয়। মিলি যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, ঘরের চারিদিকে শরতের হাল্কা মেঘের মত ছুটে ছুটে বেড়ায়, বুড়ো তখন ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়ে,—কি জানি, যদি সে আগুনে শেষটা হাত-পা পুড়িয়ে বসে। দুপুরবেলা মিলিকে পায়ের উপর বসিয়ে মিলির সঙ্গে সে কত খেলা করে—মিলির সঙ্গে তার সারাদুপুর কত কথা হয়। বুড়ো মিলির হাতদুটো ধরে বলে—'ও পাগলী, এতদিন বুড়োকে ফেলে কোথায় ছিলি?' মিলিও তার বড় বড় টানা চোখ দুটো নিয়ে ঘাড় একটু বাঁকিয়ে কত মনোযোগের সহিত বুড়োর কথা শোনে, তার পর নিজের ভাষায় কত কথা বলে, বুড়োর কথার জবাব দেয়। তার সে আধ আধ ভাষা সুধু বুড়োই বুঝ্তে পারে। বৈকালে জিমান, মিলিকে কোলে করে গ্রামের মধ্যে নিয়ে যায়—গ্রামের লোকে জিমানের কোলে ফুলের মত টুক্‌টুকে মেয়েটীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। মিলি পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের দেখে তাদের সঙ্গে খেলা কর্তে বুড়োর কাছে আব্দার করে—তার ফুলের পাপ্‌ড়ির মত কচি কচি হাত দু'খানা দিয়ে তাদের ইসারা ক'রে ডাকে—তারাও ফুট্‌ফুটে মেয়েটীর সঙ্গে খেলা কর্বার জন্য মিশ্তে চায়। গ্রামের মধ্যে যাবার জন্য মিলি জিমানকে কেবলই ব্যতিব্যস্ত করে—জিমানও প্রাণপণে তার আব্দার রক্ষা কর্তে বাধ্য হয়। ক্রমে ছোট ছোট ছেলেরা বুড়োকে দেখে আর ভয় পেত না। বুড়ো জিমান যখন কোলে করে মিলিকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসে, তখন তার শীর্ণ মুখ-খানিতে হৃদয়ের একটা অস্পষ্ট ভাব ফুটে উঠ্তে চায়—সে যেন সকলকে ডেকে বল্তে চায়—'ওগো, তোমরা এসে দেখে যাও, আমার সোণার পুতলীকে!'

সারা গ্রামখানির মধ্যে সুধু একটি পরিবারের সঙ্গে জিমানের সম্পর্ক ছিল—সে হচ্চে গ্রামের মুচি রড্‌নি-পরিবার। একবার রড্‌নির স্ত্রী জ্বর-বিকারে প্রায় মর-মর হয়েছিল। ডাক্তারেরা সকলে জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছে—এমন সময় জিমান কোথা হতে এসে পড়ে' তাকে আরাম করে দিয়ে গেল। সেই-দিন হতে এই পরিবারটীর সঙ্গে জিমানের আলাপ হয়েছিল। তার সঙ্গে যে একটা পরিবারের বেশী ঘনিষ্ঠতা থাকে, জিমান এটা বড় পছন্দ করিত না—কিন্তু যেদিন হতে মিলি এসে তার বুক জুড়ে বসেছে, সেদিন হ'তে এই রড্‌নি-পরিবার তার অনেক উপকার করেছে। মিলির জন্য ছোট ছোট ফ্রক, পেনি, মোজা—রডনি-বৌ নিজে হাতে সেলাই ক'রে দিয়ে যায়, তার জন্য কত খাবার আনে। কি কর্‌লে মিলি ভাল থাকে, সে বিষয়ে জিমান, রড্‌নি-বৌএর নিকট হতে উপদেশ লয়। কোনও দিন দূরে সহরে যেতে হলে জিমান মিলিকে তাদের বাড়ী রেখে যায়। রড্‌নি-বৌএর ছোট ছেলে জেম, মিলির প্রায় সমবয়সী। দু'জনে বড় ভাব, দিন-রাত্রি তারা একসঙ্গে থাক্তে আর খেলা কর্তে চায়। একদিন জিমান সহর থেকে ফির্‌বার পথে রড্‌নিদের বাড়ী থেকে মিলিকে নিয়ে যেতে এসেছে; মিলি তখন জেমের সঙ্গে খেলায় মাতোয়ারা। অন্যদিন জিমানকে দেখ্তে পেলে, সে দু'হাত তুলে 'দাদু, দাদু' বলে তার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে; কিন্তু সেদিন সে খেলায় এত মত্ত ছিল যে, সে জিমানকেও দেখ্তে পায় নাই। জিমান দু'তিন-বার ডাকও দিয়েছে; কিন্তু মিলি শুন্তে পায় নাই। অমনই বৃদ্ধের প্রাণের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠ্‌ল। সেদিন হতে বুড়ো ভালবাস্ত না যে, মিলি ওদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি করে। কি জানি, তারা যদি আবার মিলির ভালবাসার ভাগ নিতে চায়!—কি জানি, যদি ওরা জিমানকে মিলির কাছে পর করে দেয়! মিলি কিন্তু কিছুতেই জিমানের মানা মান্তে চায় না। সে এখন ভারী দুষ্ট হয়েছে। সারারাত্রি ধরে' এই কথা ভাব্তে ভাব্তে বুড়ো শেষটা স্থির কর্‌ল, 'মিলিকে এখন থেকে একটু কড়া শাসন করা যাক্—সে যে ওদের সঙ্গে এত বেশী মেশামিশি কর্‌বে, সে আমার সহ্য হবে না।' পরদিন মিলি জেমদের বাড়ী যাবার জন্য জিমানকে আবার বড় জ্বালাতন কর্তে লাগ্‌ল। জিমান মুখখানা গম্ভীর করে ঠোঁটের উপর দাঁত চেপে মিলিকে ভয় দেখাতে গেল। মিলিও 'দাদু'র মুখ দেখে মুখখানি নীচু করে পা দিয়ে মাটী খুঁড়্তে লাগ্‌ল। সে তার দাদুর ও-রকম ভাব আর কখনও দেখে নাই। তার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল টস্ টস্ করে মাটীতে পড়্‌ল। তাই দেখে জিমান আর স্থির থাক্তে পার্‌লে না,—বালির বাঁধের মত তার সকল শাসন, সকল কঠোরতা কোথায় ভেসে গেল। সে যে সারারাত্রি ধরে স্থির করেছে, মিলিকে একটু শাসন কর্তে হবে—রড্‌নি-পরিবারের সঙ্গে তাকে বেশী মিশ্তে দেবে না—কিন্তু তা বল্লে কি হয়! মিলি যে তার কচি মুখখানা মলিন করে থাক্‌বে, বুড়ো কোন্ প্রাণে সেটা সহ্য কর্‌বে? তখনই সে মিলিকে বুকে করে তাড়াতাড়ি রড্‌নিদের বাড়ী ছুট্‌ল। মিলিও বুড়োকে একগাল হাসি মজুরী দিয়ে বল্লে—"দাদু, তুমি ভারী দুষ্টু।" এই কচি মুখের হাসিটুকুই বোধ হয় অভাগা জিমানের সারাজীবনের পারিশ্রমিক। সে মিলির ননীর মত নরম ছোট ছোট হাত দু'খানির আঙ্গুলগুলো ধরে বল্লে—"দেখিস্ দিদি, এমনই করে খেল্তে খেল্তে তোর বুড়ো দাদুকে যেন ভুলে যাস্ নি।" মিলি, নাচ্তে নাচ্তে দৌড়ে জেমের কাছে চলে গেল। তার ঝাঁক্‌ড়া-ঝাঁকড়া সোণালী রংএর চুলের গোছা, তার নাচের সঙ্গে যোগ দিল, আর বৃদ্ধ জিমান আকুল নয়নে বসে বসে তাই দেখ্তে লাগ্‌ল। মিলি কিন্তু বুঝ্তে পার্‌ল না তার দাদুর কথাগুলোর সঙ্গে কত গভীর একটা বেদনা-কাহিনী জড়িত আছে!

(৪)

"হ্যাঁরে হতভাগা বুড়ো, তুই যে একেবারে অধঃপাতে গেছিস্। তোর কি ভয়-ভাবনা কিছুই নেই? এই যে মেয়েটার ভার নিয়েছিস্—তার ধর্ম্মের পথে যে তুই কণ্টক হয়ে দাঁড়িয়েছিস্! মেয়েটার দীক্ষা হল না। বলি, তোর আক্কেলটা কি? এর জন্য তোকে সেই বিচারের দিনে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, অনন্তকাল ধরে নরকে পচে মর্তে হবে, তা জানিস্?"

মস্ত মস্ত শাদা গোঁফ-দাড়ীওলা পাদ্রী একদিন জিমানের বাড়ী এসে এই কড়া কথাগুলো বল্লেন। জিমান অধোবদনে চুপ করে রইল আর মনে মনে বল্তে লাগ্‌ল "তাই ত, 'দীক্ষা'—সে আবার কি? দীক্ষা না নিলে কি মানুষ ভগবানের পূজা-অধিকার পায় না?" প্রকাশ্যে পাদরীকে বলিল,—"মহাশয়, আপনার 'দীক্ষা' কথাটির অর্থ আমি ভাল বুঝ্তে পার্‌লাম না। দীক্ষা না হলে কি আপনারা আমার মিলিকে ভাল চোখে দেখ্‌বেন না?"

জিমান কিছুই বুঝতে চায় না, সে সুধু চায় যাতে কেউ মিলির উপর না রাগ করে—মিলির না অনিষ্ট করে। পাদরী জিমানের কথা শুনে রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ কর্তে কর্তে বল্লেন,—"আমলো যা, তোর কি বাপ মা কেউ ছিল না রে? তারা যে তোকে দীক্ষিত করেছিল! তুই কি জানিস্ না, দীক্ষা না নিলে মানুষ-জন্ম পশু-জন্মের সমান হয়?"

জিমান উত্তর কর্‌লে,—'হ্যাঁ মশাই, দীক্ষার কথা আমি কিছু কিছু শুনেছি বটে, কিন্তু তার আসল মানেটা যে কি, তা কিছুই

বুঝি নি। যাই হোক্, আপনি যা বল্‌ছেন আমি কর্‌তে রাজী আছি—আমার নিজের জন্য বল্‌ছি না, মিলির মঙ্গলের জন্য আমি সব কর্‌তে পারি।”

“আচ্ছা, আস্‌ছে রবিবারদিন সকালে আমিই ওকে দীক্ষিত কর্‌ব—পবিত্র জর্ডন-জলে ওর পাপ আত্মা ধৌত ক’রে দিতে হবে—” এই বলে পাদরী-সাহেব বিদায় হইলেন। তখন জিমান ভাব্‌তে লাগল,—‘কি অদ্ভুত ধারণা, এই বৃদ্ধ পাদরীর আর এই দেশের লোকের! মিলির নির্ম্মল আত্মা, সেও পাপময়—”

যথাসময়ে মিলির দীক্ষা-কার্য্য হয়ে গেল। তার পর পনেরো বৎসর গত হয়েছে। আজ রবিরার। প্রভাতের উপাসনা শেষ ক’রে দিয়ে গির্জ্জার ঘড়ি মধুর রাগিণীতে ঝঙ্কার দিচ্ছে। হত-ভাগ্য জিমান একদিন শত চেষ্টা ক’রেও তার হৃদয়ের মধ্যে এই ঝঙ্কার ধর্‌তে পারে নাই। কিন্তু আজ বোধ হয়, সেই-ই সকলের চেয়ে বেশী উপভোগ কর্‌ছে। দলে দলে নরনারী হাত ধরা-ধরি ক’রে প্রফুল্ল অন্তরে উপাসনা হ’তে ফির্‌ছে। তাদের মাঝখানে আমাদের বৃদ্ধ জিমান ও মিলিকে দেখ্‌তে পাবে। মিলি এখন ষোড়শী—সে সুন্দর একটী কালো রংএর পোষাক পরে তার দাদুর হাত ধরে চলেছে। মিলির সুন্দর মুখ-খানি,—তার গালভরা হাসি, তার স্নেহমাখা আব্দার জিমানের ভঙ্গুর জীবনকে আজ ঘিরে রেখেছে।

এই রকমে বড় শান্তির মাঝখানে জিমানের জীবনের দিন-গুলো কেটে যেতে লাগল। আজ তার মত সুখী কে? সারা জীবন ধরে সমুদ্রের তীরে বসে দূরে জলের দিকে আকুল চোখে চেয়ে চেয়ে সে যা দেখ্‌ত—বুকে শূন্য হাত চেপে ধরে আকাশের দিকে চেয়ে সে যা চাইত, ভগবান আজ তাকে তাই যুটিয়ে দিয়ে তার জীর্ণ হৃদয় পূর্ণ ক’রে দিয়েছেন। কিন্তু এত সুখের মাঝখানেও জিমান তার কর্ত্তব্য ভোলে নাই। সে জান্‌ত, তার দিন ফুরিয়ে আস্‌ছে। কিন্তু সে চলে গেলে তার সাধের মিলিকে কার কাছে রেখে যাবে? তার অন্তর কিন্তু এ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে চাইত না। যখনই একথা তার মনে হ’ত, তখনই তার হৃদয়ের অন্তরালে কিসের একটা কালো ছায়া দেখা দিত—একটা গোল-মেলে হাওয়া বয়ে যেত—সে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ত।

(৫)

আজ আবার সেই নববর্ষের প্রথম দিন। বৃদ্ধ জিমানের জীবনের উপর এমনই আশীটী বৎসর চলে গেছে। ঠিক এমনই একটি দিনে মিলি এসে তার বুকের মাঝখানে চাঁদের মত উদয় হয়েছিল। তারপর আজ ষোলটি বৎসর সে মিলিকে বুকে ক’রে আঁক্‌ড়ে ধরে আছে। জিমান তার জীবনের বাকী কয়েকটা দিনও এমনই ক’রে কাটাতে চায়। মিলি যে তার জন্মজন্মান্তরের তপস্যার বস্তু। সে যে তার জাগ্রতের সোণার স্বপ্ন!

মানুষের জীবনটা যে কি জিনিষ, তা উপলব্ধি করা বড় কঠিন। একটী দিনের একটী ঘটনা এসে জীবনের গতি নির্দ্ধারণ ক’রে দিয়ে যায়। সেই একটি দিনের একটি ঘটনার সঙ্গে সমগ্র জীবনের একটা অতি নিকট সম্বন্ধ। জিমানও জীবনের সমগ্রটা সেই একটী নববর্ষের প্রথম দিন দিয়ে নির্দ্ধারিত হয়েছিল। আর সেই দিনটার সঙ্গেই তার বাকী জীবনটুকুর অতি নিকট-সম্বন্ধ।

* * * *

কিন্তু কতকাল পরে, জিমান আজ আবার সেই সেকালের মত বিমর্ষ মুখে সমুদ্রের ধারে বসে আছে কেন? মিলি,—জিমানের মিলি কোথায়?

জিমানও আনমনে বসে বসে সেই কথাই ভাব্‌ছে!

মিলি নাই! সাগরের ঐ অগাধ জল, যে মিলিকে স্রোতের ফুলের মত ভাসিয়ে এনে তাকে উপহার দিয়ে গিয়েছিল, একদিন ঝড়ের মুখে অশান্ত হয়ে উঠে সেই মিলিকে আবার সে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! ওপারের ঐ চির-অদৃশ্য, রহস্যময় অস্তমান সূর্য্যের রাজত্বে, না, ঐ অসীম নীলিমার অতলে,—শীতল, শান্ত, স্তব্ধ পাতালের মায়াপুরীতে? কে জানে গো, সে কথা কে জানে? মিলি যে তার আঁধার হৃদয়ে এককণা প্রভাতী আলোর মত হেসে উঠেছিল—হায় রে, সে হাসি কি এত ক্ষণিকের জন্য?

জিমানের মনে পড়িল, যাবার আগে মিলি কি কাতর আর্ত্তনাদ করে তাকে ডেকেছিল, “দাদু—দাদু!” জিমান পাগলের মত ছুটে সমুদ্রের ধারে গেল—কিন্তু মিলি তখন তার নাগালের বাহিরে! উন্মত্ত তরঙ্গদলের উপরে মূর্ত্তিমান জ্যোৎস্নার মত মিলির ঊর্দ্ধবাহু দেহখানিকে দেখা গেল—পলকের জন্য! পরমুহূর্ত্তে বিশ্বকে যেন ঝল্‌সাইয়া দিয়া ঘোররবে বজ্র হেঁকে উঠ্‌ল—কক্কড়্‌-কড়্‌! সঙ্গে সঙ্গে জিমানও মূর্চ্ছিত হয়ে বালুতটের উপর লুটিয়ে পড়্‌ল।

হায়, তার সারা জীবনের কামনা, সারা জনমের বাসনা, তার সকল আশা-আকাঙ্খা মহাকালের নিষ্ঠুর যাদুমন্ত্রে এক লহমায় আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়ে গেছে, এই দেওয়া-নেওয়ার ভিতর সৃষ্টির কি সার্থকতা, নিয়ন্তার কি রহস্য লুকানো আছে, কে তাহা বল্‌তে পারে? এতকাল খুঁজে খুঁজে জিমান সহসা যে পরশ-মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছিল, তার তুচ্ছ জীবন সেই মাণিকের মায়া-স্পর্শে সোণা হয়ে উঠ্‌বার আগেই আবার তা হারিয়ে গেল! কিন্তু জিমান এখনও হতাশ হয় নাই—সাগরের ঐ অবিরাম তরঙ্গোচ্ছ্বাসের ভিতরে এখনও সে আশার বাণী শুন্‌তে পাচ্ছে,—তাই আজ হতে সে আবার নূতন করে খোঁজা আরম্ভ করেছে—তাই তেমনই করে আবার সেই বিপুল বারিধির দিকে নিষ্পলক, আশান্বিত নেত্রে চেয়ে আছে—মনে মনে তাহার দৃঢ় ধারণা—আবার আসিবে, মিলি আবার আসিবে!

শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভাল ও মন্দ

প্রতি জিনিসেরই দু’টি দিক আছে—একটি ভাল, একটি মন্দ। এমন ত কিছু দেখি না, যাহাকে সুধু ভাল বা সুধু মন্দ বলিতে পারা যায়। যিনি একটি জিনিসের উপকারিতা দেখাইতেছেন, তাঁহার মনে করিয়া রাখা উচিত যে, আর একজন সেই জিনিসেরই অপকারিতাও বর্ণন করিতে পারেন।

চন্দ্রেও যখন কলঙ্ক বিদ্যমান, তখন আর এ কথাটা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, তোমার নিয়ম, যতই সুচিন্তিত হোক্ না কেন, তাহা কোন না-কোন উপায়ে একটা অনর্থপাত করিতে পারে। প্রাচীন যুগের মনীষিগণ যে দার্শনিক ও নৈতিক আলোচনার জন্য বিশ্বের বিদ্বৎ-সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, বিদেশীরাও যাঁহাদের পূজা করিতে কুণ্ঠিত ন’ন, তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক আজ দেশবাসী মানিতে চান্ না। যদি কেহ মানেন, তাঁহাকে আমরা নানা যুক্তিদ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত করিতে চাই।

আমরা যে অযৌক্তিক কথা বলি, তাহা নহে। সত্য সত্যই যে সভ্যতা, যে জ্ঞান, যে সমৃদ্ধি, যে নিত্যস্ফুরিত শক্তির মধ্যে আমাদের দেশ ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার স্বাদু, সুগন্ধি সলিল-ধারা কোন্ যুগে, কোন্‌খানে প্রতিহত হইয়া আবিলতা ও মালিন্যকে আশ্রয় দিতে স্বভাবের নিয়মেই বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল অথবা কালক্রমে তাহা আমাদের স্বাস্থ্য ও উন্নতির অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে এখন পরের কথা শুনিয়া কিংবা নবাগত সভ্যতার পক্ষপাতী হইয়া অথবা অতীতের একটা তমঃপ্রধান যুগে অবিরাম বেদনার অনু-জাত অসাড়তার পর কর্ম্মশক্তি, উত্তেজনা ও মনুষ্য-জীবনের স্বাতন্ত্র্যকে পদদলিত করিয়া আজ হঠাৎ মনে করিয়াছি, আমাদের অতীতের বিষবৃক্ষ ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

এ কথা মনে হইবার কারণ আছে। আমরা কি একটা নিবিড় মোহে আচ্ছন্ন হইয়া অচেতনভাবে পড়িয়াছিলাম, এমন সময় সমুদ্রের পর-পার হইতে য়ুরোপীয় সভ্যতার একটা প্রমত্ত তরঙ্গ আমাদের গভীর প্রসুপ্তির আবেশ ঘুচাইয়া দিল। আমরা জাগিলাম; বোধ হয় একেবারে নূতন প্রাণ লইয়া জাগি নাই, সেইজন্য তরঙ্গের গতি-রোধ করিতে না পারিয়া নিঃসহায়ভাবে ভাসিয়া গেলাম; ভাসিয়া যাওয়ার আনন্দই আমাদের মাতাইয়া তুলিল। য়ুরোপ গর্জ্জন করিয়া বলিল, “তোমরা পৃথিবীকে তুচ্ছ করিতে চাও, সমগ্র বিশ্ব তোমাদের কাছে একটা মায়া, তা’ই তোমরা পার্থিব কাজে অব-হেলা করিয়া মড়ার মত পড়িয়াছিলে”—গানের মত সে সুর আমাদের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিল। আমরা ভাবিলাম—কথাটা ত মিথ্যা নয়, এখন উপায় কি? সুধু ভাসিয়া চল, তরঙ্গের আস্ফালনের মধ্যে তীব্র, তীব্রতর বেগে সুধু ভাসিয়াই যাও। আমাদের আচার-পদ্ধতি, শাস্ত্র-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সমাজ, সংসার চারি-দিকে তৃণখণ্ডের মত ভাসিতে থাকুক্।

তা’রপর তরঙ্গ সংখ্যায় বাড়িয়া উঠিল; প্রমত্ত হইয়া যখন তাহারা তীব্র আঘাতের পর তীব্রতর আঘাত করিয়া বলিতে লাগিল, “সুধু ভাসিয়া গেলে চলিবে না, তোমরা নিজের দিকে চাও,” তখন আমরা মাথা তুলিলাম; অনুকূল তরঙ্গ, পর্ব্বতের গুহা ও মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে দেশের অতীত কাহিনী ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমাজ-পদ্ধতি, আচার-নিয়ম, ধর্ম্ম-শাস্ত্র সংগ্রহ করিতে সহায়তা করিল। তবুও আমরা ভাসিলাম, আপনাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র পথ কাটিয়া লইতে পারিলাম না।

এখন আমাদের অবস্থা এইরূপ। যে ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের বহু-কাল ধরিয়া রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারই দোহাই দিয়া আমরা সঙ্কীর্ণতা, আলস্য ও নীচতাকে প্রশ্রয় দিয়াছি। এই সেদিন পর্য্যন্ত, এমন কি, এখনও আমাদের শাস্ত্রে, আমাদের দর্শনে সবই আছে বলিয়া য়ুরোপীয় শাস্ত্র ও ধর্ম্মে অনভিজ্ঞতাসত্বেও আমরা একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দেশ যখন অজ্ঞান-তমসায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, আলস্য যখন অস্থিমজ্জাগত হইয়া মানুষের সকল প্রকার স্ফূর্ত্তি, সকল প্রকার উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, তখন আপনার কার্য্যকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত করিবার জন্য মানুষ কত অদ্ভুত, কত অসম্ভব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়া থাকে, আপনার সহস্র ভুল দেখিতে পাইলেও, কত অসার তর্ককে আশ্রয় করিয়া তাহাদের উড়াইয়া দিতে চায়, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া বলিবার কোন’ আবশ্যকতা দেখি না।

পাপী যখন পাপ করিতে যায়, তখন তাহার অনুকূল যুক্তির অভাব হয় না। কত রক্তপিশাচ, মনুষ্য-মুণ্ডের পর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়া বলিয়াছে, ইহা তাহার বীরত্বের নিদর্শন। মনুষ্য-রক্তে জাতীয় তরণী ভাসাইয়া দিয়া অনেকে মনে করিয়াছে, তাহারা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরাও সেইরূপ গাঢ় অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে করিতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, রীতি নীতির অর্থকে আমাদের কর্ম্মের প্রতিকূল করিয়া গঠন করি নাই, অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলিয়াছি—“বিশ্বের মধ্যে আমাদের সভ্যতা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; ওরে মন, আমরা ভীরু নই, কাপুরুষ নই; আমরা যাহা করিতেছি, তাহা অনুচিত নয়। এ বিশ্ব একটা মায়া, পার্থিব বিষয়ে যদি মনোযোগ না কর, তাহাতে তোমার প্রকৃত ক্ষতি কিছুই হইবে না।”

মন এই কথাটা এতদিন শুনিয়া আসিতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাচীন সভ্যতা, প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞান একটা ঘৃণ্য সঙ্কীর্ণতা, অসভ্য অপবাদ ও জঘন্য আত্ম-বিস্মৃতিকে প্রশ্রয় দিয়া ফেলিল। আমরা চক্ষু মুদিত করিলাম, ঘুম অথবা অচৈতন্য আসিয়াছিল কিংবা চক্ষু চাহিয়া দীপ্ত ভাস্বর সত্যের দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবার সাহস আসে নাই। যাহা আমাদের সচেতন করিয়া, আমাদের কাজ কর্ম্মে চেষ্টা-যত্নে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাই আমাদের অক্ষম, অসাড় করিয়া ও সর্ব্বকর্ম্মে, সর্ব্বযত্নে নিয়ন্ত্রিত করিয়া একটা গভীর মোহে অচেতন করিয়া ফেলিল।

সহসা অন্ধকার দেশের পূর্ব্বাকাশে ঊষার প্রথম আলোকের মত কি যেন দেখিতে পাইয়া আমরা যখন সুপ্তির আবেশ একটু কাটাইয়াছি, তখন সত্যের সমস্তটা না হোক্, কতকটা, আমরা শতবার চক্ষু ফিরাইয়া লইলেও, দৃষ্টিগোচর না হইয়া ছাড়িল না।

দেশের বড় বড় লোক নানা কথা বলিতে লাগিলেন। কেহ আপনার ভিতর একটা গভীর সত্যের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া, তাহা প্রকাশ করিলেন। কেহ তাহা শুনিল, কেহ শুনিল না। আর একজন বীরের মত সমাজের মধ্যে একটা নূতন প্রাণ-সঞ্চারের আশায় পুরাতন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়াও একটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে অচিরেই অকৃতকার্য্যতার দুঃখ সহিতে হইল। কেহ বলিলেন—“য়ুরোপীয় সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়া যাও, অতীতের কথা ভুলিয়া নূতন করিয়া নিজের জীবন গঠন কর।” কেহ-বা আপনার বিচার-বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার

একটা অবসর পাইয়া, অদম্য উৎসাহে বাক্য-জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বাক্যের অন্ত নাই, তবুও পথহারা পথিক পথ খুঁজিয়া পায় না। এখনও আমরা য়ূরোপীয় সভ্যতায় মাতিয়া দীন, দুর্ব্বল চাটুকারের মত আপনাদের সমস্ত স্বাতন্ত্র্যটুকু নিঃসঙ্কোচে বিসর্জ্জন দিয়াও বেশ একটা গর্ব্ব, সাধারণের মধ্যে বেশ একটা প্রাধান্য অনুভব করিতে দ্বিধা করি না। যে গুণ, যে মত, যে কথা, যে কাজ লইয়া পরের কাছে আপনাকে একটা মস্তবড় জীব বলিয়া প্রচার করিতে যাই, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরের নিকট হইতে গৃহীত—তাহাতে নিজের, দেশের বা সমাজের সামান্য ছাপ্‌টুকুও থাকে না। অথচ পরের দিকে চাহিয়া বলি, "তোমরা স্বতন্ত্রতাই বিসর্জ্জন দিয়া দেশটাকে উৎসন্ন দিতে বসিয়াছ।" ইহা অপেক্ষা হাস্যকর বিষয় কিছু আছে বলিয়াও মনে হয় না।

য়ূরোপ ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার পক্ষপাতী; আমরাও কতকগুলি বেষ্টনীর মধ্যে এই স্বতন্ত্রতাকে সমাজে প্রশ্রয় দিয়াছি; শাস্ত্র আমাদের নিষেধ করে নাই। এককথায় বলিতে পারা যায় যে, য়ূরোপ সমাজের মধ্যেই মানুষের পূর্ণ পরিণতি দেখাইয়াছে, আমরা সমাজের পরেও একটা সুদূর লক্ষ্যের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছি। য়ূরোপ বলিবে, এই ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার সহিত সমাজ-প্রাণের প্রকৃত বিরোধ নাই; আমরা বলিব—তাহা হইতে পারে; এটাকে সমাজ-রোগের একটা সাময়িক ঔষধ বলিয়াও মানিয়া লইতে পারা যায়।

কিন্তু যাঁহারা বলিতে চান্, এই স্বতন্ত্রতা আমাদের মুক্তির উপায়, তাঁহাদের বাণী সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হোক্, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়ুক্, দেশবাসী বুঝিতে চেষ্টা করুক্, প্রকৃত স্বতন্ত্রতা কি,—কোন্‌খানে তাহার প্রয়োগ আবশ্যক।

মানুষ যখন ভীরু, নিস্তেজ হইয়া পড়ে, যখন সে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বা মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না, অথচ বিনা-আপত্তিতে অস্ত্রগ্রহণ করিয়া যেখানে-সেখানে বিচরণ করিতে পারে, তখন তাহার হাতে যে অস্ত্রের অপব্যবহার হইবে, একথা মনে করা বিচিত্র নয়। দেশে Arms-Act ছিল, সেইজন্যই এখনও অনেক পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, শিক্ষক, বিচারক দেশের কল্যাণ-সাধনে নিরত আছেন। যেখানে দেব-বিগ্রহ নাই, সেখানে সুগন্ধি কুসুম বিলাসিতারই উপকরণ হইয়া পড়ে। কোন অশিক্ষিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তির হাতে ভাগ্যক্রমে যদি অগাধ ধন-সম্পত্তি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে সুধু ধনের অপব্যবহার করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় না,—আত্মীয়, সমাজ, সংসার ও দেশের গভীর দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

য়ূরোপে প্রাচীনকালে গ্রীক্-দার্শনিকগণ মনুষ্যের নীতি-শাস্ত্রকে রাষ্ট্রনীতির অন্তর্গত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অনেকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রনীতিতে যে গুণগুলি প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবে, মানুষের জীবনে তাহাদেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। তা'র পর ক্রমশঃ মানুষের স্বতন্ত্রতা লইয়া একটা তর্ক বিতর্ক উঠিল, খৃষ্টের ধর্ম্মনীতি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল—মানুষ আপনার মুক্তির জন্য আপনি চেষ্টা করিবে; সে সমাজের দাস নয়, তবে সমাজের সহিত তাহার একটা দৃঢ় সম্পর্ক আছে। তা'র পর কিছুকাল পরে মানুষের স্বতন্ত্রতার কথাটা লইয়া বড় কেহ গোলযোগ করিল না, মানুষ যে সমাজ ছাড়া থাকিতে পারে না, তাহার ভাল-মন্দ আর সমাজের ভাল-মন্দ যে একই জিনিস, এইরূপ তর্ক-বিতর্কের মাত্রাই বাড়িয়া গেল। অবনত সমাজের উন্নতির জন্য সময়ে সময়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের আবশ্যক হইত। সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষ যদি আপনার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া উন্নত হইত, তাহা হইলে ধর্ম্মনীতি তাহা অনুমোদন করিত না, এমন নয়; কেন না, প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতির উপর সমাজের উন্নতি নির্ভর করে ও নিজের উন্নতির জন্য যে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা, তাহার সহিত সমাজ-প্রাণের বিরোধ থাকিতে পারে না। দেশে যখন কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া পড়িল, যখন বাঁধা-ধরা নিয়ম মানিয়া চলিতে গেলে সব সময়ে কাজে সাফল্যলাভ করা যায় না, দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন যখন ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া পড়িল, তখন অনেকে স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিল; কেহ তাহাদের বাধা দিল না,—যেখানে তাহারা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে চাহিল, সেইখানেই তাহা প্রযুক্ত হইল। অভাবের দিনে যাহা লাভ করা যায়, তাহা'র অপপ্রয়োগ হয় না; য়ূরোপেও তাহা হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবুও য়ূরোপে এমন একদল লোক আছেন, যাঁহারা, ব্যক্তিত্ববাদিগণ কোন্ সময়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অধঃপাতে যান্, তাহার জন্য নিস্পন্দভাবে অপেক্ষা করিতেছেন।

আমাদের দেশ, সমাজের মধ্যে মানুষের জন্য যে নিগড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা তাহার মনুষ্যত্বের বিরোধী নয়; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানুষ যেমনভাবে উন্নত হইয়াছে, সমাজও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইয়া অনুকূল রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছে। তা'র পর কোন' কারণে সমাজের ঊর্দ্ধগতি প্রতিহত হইল; মানুষের অন্তরে যে জীবন্ত প্রাণধারা প্রবাহিত হইত, তাহা স্তব্ধ হইয়া গেল,—রহিল কেবল সমাজের নিগড়গুলি। যাহা মানুষের কর্ম্ম-শক্তি ও ঊর্দ্ধগতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই তিরোহিত হয়, অবনত মানুষ তাহার তিরোভাবের আবশ্যকতা বুঝিল না। আকাশে একটা নিবিড় মেঘখণ্ড ঘনাইয়া আসিল, তা'র পর অবিরাম বজ্র, বিদ্যুৎ ও বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা অমাবস্যার রাত্রি আমাদের ভীত, ত্রস্ত ও চকিত করিয়া যখন কাটিয়া গেল, তখন প্রভাতের আলোক-স্পর্শে সবেমাত্র আমরা একটু চঞ্চল হইয়াছি, এমন সময় য়ূরোপীয় ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতার কথা আমাদের কাহারও কাহারও কাণে প্রবেশ করিল।

কেহ অগ্রগামী হইলেন, কেহ তাঁহার পার্শ্বচর, কেহ অনুচর হইয়া দাঁড়াইলেন। অগ্রগামী ও তাঁহার সঙ্গীর কেহ কেহ হয়ত যে অবস্থায় সমাজের নিগড় শিথিল হইয়া থাকে, সেই অবস্থার উপযোগী কর্ম্ম ও শক্তি লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ নিঃশব্দে সুধু একটা দীপ্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অগ্রসর হইলেন, আর একজন দুই-একটি কার্য্যে আপনার অসীম শক্তির পরিচয় দান করিলেন। কাহারও কাছে সমাজের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলির নিন্দা করাই জীবনের ব্রত বলিয়া গৃহীত হইল। যাঁহাদের কোন শক্তি নাই, অথচ অগ্রগামীদের অনুচর বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা সুধু নিন্দাবাদ ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিলেন না।

য়ূরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও একটা উন্নতির উপায় বলিয়া এ দেশেও পরিগণিত হইল, তখন দেশের শিক্ষিত লোকগুলি তাহার মোহে আচ্ছন্ন হইলেন না, এমন নয়। যাঁহারা উন্নত, তাঁহারা এই স্বাতন্ত্র্যকে উপযুক্ত কার্য্যেই প্রয়োগ করিলেন; যাঁহারা অনুন্নত, যাঁহাদের কার্য্য-ক্ষেত্র প্রসারিত নয়, তাঁহারা এই স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োগ করিলেন—সংসারে, বন্ধু-সমাজে। পুত্র এম্, এ, পাশ করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসেন, তখন গ্রামটা তাঁহার কাছে নিতান্ত ঘৃণ্য বলিয়া বোধ হয়, আচারনিষ্ঠ পিতা তাঁহার চক্ষুশূল হইয়া উঠে। যখন কোন বৃদ্ধ লোক

তাঁহার নিকটে বসিয়া আপনার ক্ষমতার কথা কহিতে থাকেন, তখন তিনি বৃদ্ধের বিদ্যা কতদূর, তাহা না জানিয়াও ওষ্ঠপ্রান্ত সম্মতিসূচক ঈষৎ হাস্যে রঞ্জিত করিয়া গম্ভীরভাবে শুনিয়া যান; কেন না, যতটুকু তাঁহার প্রাপ্য, তাহা গ্রহণ করিতে তিনি সদাই স্বীকৃত। বন্ধু, বন্ধুর নিকটেও এমন একটা কর্ম্মে সজ্জিত হইয়া দাঁড়ান, যাহা ভেদ করিয়া কোনমতেই তাঁহার অন্তরটি তলাইয়া দেখা যায় না। আগে বৃদ্ধ ও যুবক যখন কোন' ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের আলাপ-পরিচয় অতি সহজে আপনারাই করিয়া লইতেন; এখন একজন মধ্যবর্ত্তী না থাকিলে চলে না। কাহারও কাহারও কাছে মিথ্যাকথার অলঙ্কার; পাছে তাঁহার হীনতা কোথাও প্রকাশ হইয়া পড়ে, পাছে তাঁহার আসন একজন নব-পরিচিতের নিকট একটু নামিয়া যায়, এইজন্য তিনি নির্ব্বিচারে সকলপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন না; গুরু ও বৃদ্ধের প্রতি যে সামান্য সম্মানটুকু প্রদেয়, তাহাও লোপ করিয়া তাঁহারা সাম্যের পরিচয় দেন। কোথা হইতে নমস্কার করা একটা প্রথা উড়িয়া আসিয়াছে, যাহা ত্যাগ করিবার উপায় নাই; কিন্তু তাহার মধ্যে সবটাই কৃত্রিমতা—আন্তরিকতার কিছু আভাস আছে বলিয়া মনে হয় না। এমন অনেক জীব আছেন, যাঁহাদের কথা কহিবার, হাসিবার, চলিবার ভঙ্গীটি অনেক চেষ্টা করিয়া শিখিতে হইয়াছে; যাঁহাদের গলার সুর, চাল-চলনে, আকার-ইঙ্গিতে ধার করা জিনিসের মাত্রাই সব, কোথাও সফলতার একটুও আভাস নাই। সকলেই স্বতন্ত্র, নিজের ভাবে বিভোর, কস্তুরী-মৃগের মত নিজের পাণ্ডিত্য-গন্ধে মাতোয়ারা। এক নিগড় ভাঙ্গিতে গিয়া তাঁহারা অন্য নিগড়কে প্রশ্রয় দিতেছেন, এক মিথ্যাকে দূর করিতে গিয়া লক্ষ মিথ্যা মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। নূতন আলোকে কেহ কেহ ঠিক পথ ধরিয়া যাইতেছেন; কিন্তু অনেকে যে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

বেশী দিনের কথা নয়—সেদিনকার স্নিগ্ধ-শ্যাম পত্রচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন পল্লীর হৃদয়ে যে সভ্যতা বিরাজ করিতেছিল, এখনও যাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, তাহার কথা আজিকার এই রুক্ষ সূর্য্যকর-দীপ্ত নগরীতে বসিয়া একবার মনে করিতে বাধ্য হইতে হয়। গ্রামের অপ্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপে শুভ্রকেশ, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে নীচ-জাতীয় লোক ও মুসলমানদিগের সহিত একত্র বসিয়া আত্মীয়তা-সূচক সম্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরটিকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। তখন মনে হইয়াছে, তাহাদের ভিতর-বাহির এক, অখণ্ড অবারিত সরলতার কাছে তাহারা সকল গর্ব্ব, সকল অভিমান বিসর্জ্জন করিতে একটুও কুণ্ঠিত নয়। বন্ধু, বন্ধুকে সুধু নমস্কার করিয়া একটু মৃদু হাসিয়া চলিয়া যায় না; যে বন্ধু, বন্ধুর জন্য প্রাণ-পণ করিতে পারে, তাহাকে নগরের দৃপ্ত শিক্ষা, নবাগত সভ্যতা, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও অন্তরবিহীন কৃত্রিমতার আশ্রয়ে দেখিতে পাওয়া যায় না,—সে কোন' সুদূর, সঙ্কীর্ণ, নিরালোক, নির্জ্জন পল্লীর মধ্যে গ্রাম্য শিক্ষা, গ্রাম্য সভ্যতা, নিরভিমান ও বাধাহীন সরলতার আশ্রয়েই বর্দ্ধিত হয়। তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে জানে, অবাধে কথা কহিয়া রুদ্ধ প্রাণের সব অর্গলগুলি খুলিয়া দেয়। তাহারা আধুনিক আদর-অভ্যর্থনা জানে না; কিন্তু ঘরে যাহা আছে, তাহা দিয়াই অভ্যাগতকে পরিতৃপ্ত করে। তাহারা নব-শিক্ষায় চিত্তকে প্রসারিত করিতে পারে নাই, তবুও তাহাদের ভালবাসা নিবিড়—একটি কথায় তাহারা নিজের প্রাণ খুলিয়া দেয় ও অন্যের প্রাণকে আকর্ষণ করে। অশ্বত্থের স্নিগ্ধচ্ছায়ায়, তরুচ্ছায়ামণ্ডিত কুঞ্জে, নদীর তৃণ-শস্যাচ্ছন্ন সৈকতে, পুষ্করিণীর শৈবালসম্বদ্ধ তটে, তাহারা প্রাণ খুলিয়া যে গানের সুরে আকাশ, কানন পূর্ণ করিয়া তোলে, তাহা বড় অল্পদূর অগ্রসর হয় না।

আমাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, একটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দোষের জন্য সুধু তিরস্কার বা সুধু গালাগালিতে কিছুই হয় না, দোষক্ষালনের উপায়ও দেখাইয়া দেওয়া উচিত। স্বতন্ত্রতা বলিয়া যে একটা কথা য়ূরোপের কাছে আমরা শিক্ষা করিতেছি, তাহা উপকারী; কিন্তু আমরা বোধ হয় এখনও তাহার উপযুক্ত হই নাই। সতেজ শরীরে যে ঔষধ উপকারী, নিস্তেজ শরীরে তাহার প্রয়োগ অপকারীও হইতে পারে।

তর্ক-বিতর্কের শেষ নাই। অনেকের কথা, অনেকের যুক্তি আমরা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কোন'টাই আমাদের প্রাণে লাগিতেছে না। তর্ক-বিতর্ক মানুষকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে, একটা সিদ্ধান্তের পথে এখনও আমরা আসিয়া দাঁড়াই নাই। আমাদের দেশের সমাজের সংস্কার, ব্যক্তিত্বকে জাগ্রৎ করিয়া individualistic methodএ অথবা সমাজকে বজায় রাখিয়া সকলের একটা কর্ত্তব্য-পথ নিরূপণ করিয়া সাধারণ হিতের জন্য সকলকে জাগ্রৎ করিয়া Socialistic methodএ করিতে হইবে, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই।

তবুও আমরা জাগিয়াছি, আমাদের শিরায় শিরায় নূতন রক্ত, নূতন তেজ সঞ্চার করিয়া একটা নূতন প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, তবে এখনও তাহার 'কার্য্য' আরম্ভ হয় নাই। শীতের শেষে বিষণ্ণ-মলিন গাছগুলি আসন্ন স্ফূর্ত্তিকে অন্তরে স্তম্ভিত করিয়া যেমন একটা বসন্ত-বাতাসের জন্য নিস্পন্দ হইয়া অপেক্ষা করে, তা'র পর একটি রজনীতে তাহারই সঞ্চালনে পুলকাঞ্চিত হইয়া প্রভাতে সহসা নব পত্র-পুষ্পে মণ্ডিত হইয়া উঠে, আমরাও সেইরূপ অন্তরের সমগ্র জাগ্রৎ শক্তি স্তম্ভিত করিয়া একজন মহা-পুরুষের কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠুক্, অভাব দিন দিন গুরুতর হোক্, মহাবাণী শীঘ্রই শুনিতে পাইব, আর বিলম্ব নাই। দেশের মধ্যে সতী-দাহ-প্রথাটা অবাধে চলিয়া আসিতেছিল; প্রথাটার বিপক্ষে কখন্ যে সকলে খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মানুষের প্রাণ কখন্ যে সকলের অজ্ঞাতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা কেহ জানিতে পারি নাই। Lord Bentinck যখন সেই প্রথাটার বিপক্ষে কথা কহিলেন, তখন সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা মানিয়া লইল। আধুনিক মিথ্যা, কৃত্রিমতা ও অসারল্যের দিনে আমরা ব্যস্ত, বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের মন প্রতিক্ষণে তাহাদের অত্যাচার হইতে মুক্ত থাকিতে চায়, আমরা সর্ব্বপ্রাণ দিয়া আমাদের অভাব, আমাদের যন্ত্রণা বুঝিয়াছি। এখন এমন একজন মহাপুরুষ চাই, যিনি অসংখ্য তর্ক-বিতর্ক, অশেষ বাগ্-বিতণ্ডা, শত্রুর তীব্র কটাক্ষ, পাণ্ডিত্যের অভিমান, নেতার প্রলোভন, সমালোচকের শ্লেষ ও বিদ্বেষীর অন্তর্দ্দাহের মধ্যে আমাদের জন্য একটা পথ নির্দ্ধারণ করিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন—

রম্যান্তরঃ কমলিনী হরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্ক ময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয় রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ।

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতীক্ষা

(গাথা)

দিক্‌পরীগণ করে যেথা নিতি কেশ-বেশ-প্রসাধন,
কিরণ-ডুরির দোলার তলায় মহীর রোমাঞ্চন,
অস্ত-তপন যাহাদের পায় নিবেদিয়া অনুরাগ,
ফুল হয়ে প্রাতে বিকসে নিত্য, হিমে থুয়ে প্রেম-দাগ,
শত ধারে ছুটে নদীর হৃদয়ে যাহাদের স্বেদ-নীর,
যে নীল আঁখির আওতাতে এই শ্যামলেখা সুগভীর,
যেথায় ধরণী পত্রে পুষ্পে রচিয়া তিলক চারু,
পুষ্প-আসবে মত্ত, বিহগ ঝক্কৃত লতা-দারু—
জলদ-বলভী গিরিপুরে হেন একদিকে একপাশে
আছে খান কয় পাতার কুটীর ; কোলেরা সেথায় বাসে।
উঠানে তাদের মহুয়ার গাছ, ফলে ভরা তার তল,
চরিছে অদূরে পরিবারপ্রিয় গো-মহিষ-ছাগদল।
ঝাঁক্‌ড়া চুলের গোছাটি পিছনে নড়ি-বাঁধা পুরুষেরা
বসন-বয়ন-নিরত ; নারীরা সুতা কাটে লয়ে চেড়া।

আঙ্গিনা ছাড়িয়া যায়নিক' আজ কোথা কোন' নর-নারী,
আসিয়াছে রাজা শিকার করিতে, তাম্বু পড়েছে তারি।
দেখেনিক' তারা এত লোক-জন, কাপড়ের হেন ঘর,
শোনেনি কখন' মারণ যন্ত্রে অমন বিরাট্ স্বর।
ভয়ে ভয়ে তাই বিরস-মলিন পাণ্ডুর মুখে সবে
গাছের লতার ঝোপের ফাঁকেতে দেখিছে কি জানি হবে!
শঙ্কিতা নারী যায়নিক' আজ ঝরণায় নিতে জল,
মাথায় পাগড়ি কটি কটি ধরি, গানে ছেয়ে বনতল ;
পুরুষেরা কেউ গুঁজেনিক' ফুল বাঁধা কুঞ্চিত কেশে—
বাজেনি মাদল, নাহিক শব্দ, কোলের কানন-দেশে।
যায়নি বনেতে কাল' কাল' ছোট কোলেদের ছেলে-মেয়ে,
চকিত আঁখির কুতূহলী দিঠি দেছে সারা তাঁবু ছেয়ে।
অকারণ ভয়ে যত নর-নারী রুদ্ধ আপন ঘরে,
সুধু গৃহে নাই মনিয়া পাগলী, বসে আছে পথ'পরে।

সে এক কাহিনী। হ'ল আজ প্রায় অতীত বছর চার,
মনিয়ার স্বামী শমরু গিয়াছে পাহাড়ের পর-পার।
পাহাড়-তলীতে বড় বড় কোঠা হেথা হতে দেখা যায়,
শমরু প্রায়ই যেত সেথা, কেউ রাখিতে নারিত তা'য় ;
মনিয়া সেদিন থাকিত বিরস করিত পথ ও ঘর,
না-ফেরা অবধি মনিয়ার কেউ শোনেনি কণ্ঠ-স্বর।
সমবয়সীরা করিত ঠাট্টা, গুরুজনে দিত গালি,
অটল সে তা'তে, ঘর ছাড়ি পথ চেয়ে বসে র'ত খালি।
ছিল কোলেদের এ উপনিবেশে মনিয়ার খ্যাতি প্রিয়,
ছল-চাতুরী, হেঁয়ালীতে, গীতে, নাচে সে অদ্বিতীয়।
বয়সমাত্র ষোলটি বছর তখনি হয়েছে বিয়ে,
বিবাহ করিয়া ছিল সে যে মোটে দু'বছর স্বামী নিয়ে।
তা'রি পর সেই গিয়াছে শমরু আজও ফিরেনি দেশ
মনিয়াও মুখ করেছে বন্ধ পথ চেয়ে এক-বেশ।
ঘর-সংসার সকলি ছেড়েছে, ছাড়িতে পারেনি পথ,
যে পথে গিয়াছে দয়িত তাহার ফিরে পাবে মনোরথ!

কাঠ-ফাটা রোদ, অঝোর বাদল, কন্‌কণে হিম-হাওয়া—
একটি দিনের তরেও মনিয়া ছাড়েনি পথটি চাওয়া।
ধূলা, জল, রোদে পিঙ্গল চুল, কোটর-নিলীন আঁখি,

চিত্ত-সুখের অরুণ-আভায় শাঁওল কান্তিখানি
শীতে পড়'-পড়' পাতার মতন পতনেরে আহ্বানি ;
বালকেরা তারে ডাকিত 'পাগ্‌লী' তাই থেকে সবে তার
'পাগ্‌লী' আখ্যা দিয়ে ভুলে গেছে তাহার গুণের ধার।
ধা-ধং ধা-ধং ধিয়া-ধিয়া-ধং এখনো মাদল বাজে,
মনিয়ার কথা কারু মনে নাই—সে থাকে পথের মাঝে।
জ্ঞাতি-বন্ধুরা দিয়ে যেত নিতি ভাত দু'টি রাখি পাশে—
কহিল তা'রাই আসি আজি সবে—"রেতে যেন বাড়ী আসে!
এসেছে কাহারা, কেমন মানুষ, কি জানি কি আছে ভাগে,
আবার আসিস্ করিস্ যা' খুসী, চলে যাক্ এরা আগে।"
আনমনে নারী মাথাটি নাড়িয়া জানাল' অস্বীকার,
করুণ বারণ, সাধাসাধি, সেই "না"র কাছে চূরমার।

রাজার আদেশে জ্বলিল না বাতি সে রাতি কোলের ঘরে,
সকল শব্দ স্তম্ভিত হয়ে রহিল রাজার ডরে।
বন-বিহঙ্গ জাগেনি তখন, শুক্র-তারাটি সুধু
আঙ্গিনার পাটে নিরত যেমন একেলা বঙ্গবধূ ;
তিমির-রাণীর বসনাঞ্চল জড়িত হাজার পাকে
তরু-লতাদের কাঁটায় খোঁচায়—শিশু যেন ধরে' মাকে ;
যামিনী তখন বিদায়ের ক্ষণে তন্ময় প্রেমাবেশে,
রুদ্ধ শ্বাসে চুম্বন-মূক প্রভাতের আশ্লেষে।
বলিয়া উঠিল বজ্র আবার সচকিয়া বনভূমি,
আর্ত্ত নিনাদে কাঁদিয়া উঠিল পাখীরা পক্ষ ধূনি।
বাহিরিল যত কোলের মরদ্ মুছিতে মুছিতে আঁখি,
নারীরা সামালি ছেলে-পিলেগুলি, দেখে আঙ্গিনায় থাকি।
রাজার সহিত ছুটিল তাঁহার অনুচরগণ যত,
দেখিল আসিয়া সে নহে হরিণী, মনিয়া হয়েছে হত।

রুষিয়া উঠিল কোলেরা ভীষণ, তীরেতে বিঁধিব কয়—
নিবারিয়া এক বৃদ্ধা দিল এ মনিয়ার পরিচয় :—
"দয়িতের পথ করি প্রতীক্ষা ছিল এ হতভাগিনী,
নহে একদিন, চারিটি বছর, এমনি দিন-যামিনী।
উচ্ছৃঙ্খল ছিল এর স্বামী, শমরু তাহার নাম,
এমন পত্নী চিনিতে নারিল, বিধি তারে হেন বাম!
জানি মনিয়ার সব কথা আমি, কত কয় শুনি লোকে,
চারটি বছর পূরেছে কালিকে—দেখেনি পতিরে চোখে!"
ছিল সেথা রাজ-ভৃত্য শমরু, শুনিতেছিল সে কথা,
খুলি বেশ-ভূষা পাগলের মত লুটায়ে পড়িল তথা।
নগরের মোহ-বিলাস-লালসে অর্থের আশে ভুলি,
গেছিল শমরু যাহারে ফেলিয়া, নিল তারে কোলে তুলি।
মরণ-সীমায় নিমেষ-নিহত মনিয়ার আঁখিপাতে
পুণ্যের মত শুভ্র বাষ্প ভাসিয়া মিলাল' তা'তে।
ক্ষীণ-দুর্ব্বল অসাড় বাহুটি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠি,
জড়াল' আসিয়া স্কন্ধ পতির, নড়িল ওষ্ঠ-দু'টি।
আধখানি আঁখি দিয়ে চেয়ে দেখে মনিয়া স্বামীর মুখ
আর আধখানি দেবলোকে গেল আদায় করিতে সুখ।

*　　*　　*

বসিত যেখানে মনিয়া তাহারি নিকটে দেখিল ভূপ,
চৌদ্দ-শো-ষাট্ ইঁটের ঘুটির রয়েছে একটি স্তূপ।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাপানী-জাহাজে দশদিন

(১) স্বাধীন এসিয়ার জাহাজ-কোম্পানী

হনলুলু পর্য্যন্ত ইয়াঙ্কি-জাহাজে আসিয়াছিলাম। এখান হইতে জাপানী-জাহাজে উঠিলাম। এই জাহাজ স্যান্ ফ্রান্‌সিস্কো ও এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করে।

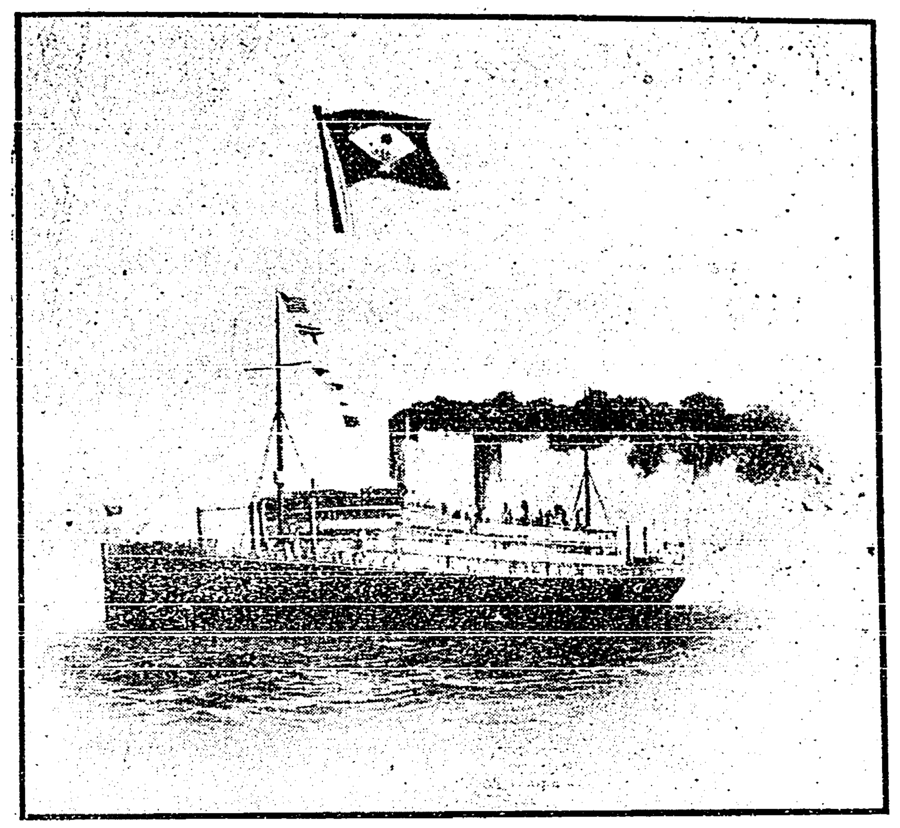

জাপানী-জাহাজ

সর্ব্বসমেত দুইবার ফরাসী-জাহাজে, দুইবার বিলাতী-জাহাজে এবং চারিবার ইয়াঙ্কি-জাহাজে পর্য্যটন করা হইয়াছে। এইবার এসিয়াবাসী জাহাজ-কোম্পানীর আশ্রয় লইলাম। জাহাজের নাম Tanyo Maru—কোম্পানীর নাম Toyo kisen kaisha.

এই নাম দুইটা জাপানী-ভাষায় লিখিত—ফরাসী-জাহাজ-কোম্পানী এবং জাহাজের নামও ফরাসী-ভাষায় লিখিত দেখিয়াছিলাম ; তাহা ছাড়া বিভিন্ন জাতির জাহাজে অন্য কোনও প্রভেদ দেখিতে পাই না। প্রাচ্য-প্রতীচ্য শ্বেতাঙ্গ-পীতাঙ্গ সকল কোম্পানীরই অর্ণবযান এবং নৌ-চালন একপ্রকার।

"টেনিও মারু"তে পোতাধ্যক্ষ জাপানী। তাঁহার কয়েকজন সহকারীও জাপানী ; কিন্তু কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমেরিকান্। খালাসী, বাবরচি ইত্যাদির অর্দ্ধেক জাপানী এবং অর্দ্ধেক চীনা।

জাহাজের পতাকা যে জাপানী তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এই পতাকা না দেখিলে বাহির হইতে এই জাহাজের "জাতি"-নির্ণয় করা অসম্ভব। ভিতরের বন্দোবস্তও ফরাসী, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি-বন্দোবস্তেরই অনুরূপ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, নাচ-গানের ব্যবস্থা, ধূমপানের ব্যবস্থা, ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা, ধোপা-নাপিতের ব্যবস্থা—সবই অন্যান্য জাতীয় জাহাজে যেরূপ দেখিয়াছি, পীতাঙ্গ-কোম্পানীর জাহাজেও সেইরূপই দেখিতেছি। এই জাহাজ দেখিলে—East is East and West is West ; the twain will never meet—একথা বলা চলে না ; বরং সর্ব্বদাই মনে হইতেছে, পূর্ব্বই বা কোথায় আর পশ্চিমই বা কোথায়? সর্ব্বত্রই ত একাকার দেখিতে পাইতেছি। সকলকেই এক শ্রেণীর অন্তর্গত বলা উচিত—সেই শ্রেণীর বা জাতির নাম "বর্ত্তমান," "নবীন" বা "আধুনিক"। প্রভেদ যদি করিতেই হয়, তবে রাষ্ট্রীয় পতাকা অনুসারে পার্থক্য করা যাইতে পারে। ইংরাজ-পতাকার অধীন জাহাজও যেরূপ আধুনিক, ফরাসী, ইয়াঙ্কি, জাপানী-পতাকাসমূহের অধীন জাহাজগুলিও সেইরূপ আধুনিক। ইহাদের কোনটায় জাতীয় বিশেষত্ব কিঞ্চিন্মাত্র নাই। ভারতবাসীরাও যদি কোনদিন স্বকীয় বন্দরে জাহাজ প্রস্তুত করিয়া সাত সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার উপযুক্ত হয়, তাহা হইলে তখন তাহাদের ব্যবস্থাও অবিকল এই ধরণের হইবে। ভারতীয় স্বদেশী জাহাজ এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাহাজে কোনপ্রকার প্রভেদ থাকিবে না।

কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে চিরকাল এইরূপ সার্ব্বজনীনতাই দেখিতে পাই। বিদ্যার রাজ্যে দেশী, বিদেশী প্রভেদ নাই। যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিলে, মানুষের সুখ বৃদ্ধি হয়, সেই কার্য্য-প্রণালী দুনিয়ার সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইয়া থাকে। প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতবর্ষের কার্য্য-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনুসৃত হইয়াছে—আবার বহু বিদেশীয় কার্য্য-প্রণালীও ভারতবর্ষে আমদানি করা হইয়াছে। হিন্দু-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কথাই ধরা যাউক। এই বিদ্যাটা কি ভারতবাসীর খাঁটি স্বদেশীয়? আমাদের আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, বস্তুবিদ্যা ইত্যাদিও কি একমাত্র ভারতীয় পণ্ডিতগণেরই উদ্ভাবিত? গ্রীক্-জাতি হইতে, মুসলমান-জাতি হইতে, মঙ্গোলীয়-জাতি হইতে আমরা কত জিনিষই না গ্রহণ করিয়াছি? বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহার বিখ্যাত "বৃহৎ-সংহিতা"-গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন—"ম্লেচ্ছ ঋষিগণও সর্ব্বথা পূজার পাত্র।" য়ুরোপীয় রসায়ন, গণিত, জ্যামিতি, শিল্প-কলা ইত্যাদির বিকাশেও ভারতীয় প্রভাব যথেষ্টই রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় জাহাজ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত হইত, তাহা দেখিয়া ইংরাজ-জাতিও লাভবান্ হইয়াছে। ইহা ফরাসীদের মত। বস্তুতঃ মানব-সমাজে আদান-প্রদান, বিনিময় ও অনুকরণ অহরহঃ চলিতেছে। এইরূপ চলিতেছে বলিয়াই দুনিয়ার সভ্যতা উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। কোন যুগেই কোন বিদ্যা বা কৌশল, ম্লেচ্ছ বা "alien" বা বিদেশীজ্ঞানে বর্জ্জিত হয় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজেরা বাষ্প-পোত ও বাষ্প-শকট আবিষ্কার করিয়াছেন, ইয়াঙ্কিরা বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কার করিয়াছেন এবং ফরাসীরা 'এরোপ্লেন' আবিষ্কার করিয়াছেন। বিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মানীরা 'জেপেলিন' প্রবর্ত্তন করিলেন ; কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটাই প্রত্যেক দেশে প্রবর্ত্তিত হয় নাই কি? জার্ম্মাণ 'জেপেলিন' ৮।১০ বৎসরের বালক মাত্র। অল্পকালের ভিতরেই দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই সমুদয়ও দেখিতে পাইব।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই সকল নব নব আবিষ্কারের সূত্রপাত ও প্রথম প্রবর্ত্তন হয়। তাহার পূর্ব্বে ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী, ভারতবাসী সকলেই আদিম ধরণের শিল্প-বাণিজ্য-বিজ্ঞানের অধিকারী ছিল ; কিন্তু যখনই আবিষ্কারগুলির প্রভাব বুঝিতে পারা গেল, তখনই প্রত্যেক জাতি সেই আদিম ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া নবীন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সুরু করিল। ঠিক এই সময়েই এসিয়ার পীতাঙ্গ জাপানীও স্বদেশে বর্ত্তমান বা আধুনিক বিদ্যা প্রচার করিতে লাগিয়া যায়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কিদের এক জাহাজ জাপানী-বন্দরে প্রবেশ করে। তখন হইতে জাপানীরা নবীন যুগের নবীন অস্ত্র-হাতিয়ার বুঝিতে অভ্যস্ত

হয়। তাহার ফলে ১৯০৫ সালে বৌদ্ধ জাপান, খৃষ্টান্ রুষিয়াকে পদানত করে। আজ দেখিতেছি, জাপানী-জাহাজে বর্ত্তমান যুগের সকল প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা, কার্য্য-ক্ষমতা, বিদ্যা-বুদ্ধি পুঞ্জীকৃত। ইংরাজের আবিষ্কার, জার্ম্মাণের আবিষ্কার, ফরাসীর আবিষ্কার, ইয়াঙ্কির আবিষ্কার—সকল আবিষ্কারই বরাহমিহিরের সূত্র অনুসারে জাপানীরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগের বরাহমিহির এখনও আবির্ভূত হইতে পারেন নাই কেন? যে দেশে যুগে যুগে নূতন নূতন বরাহমিহিরের জন্ম হইয়াছে, সেই দেশে উনবিংশ শতাব্দী বন্ধ্যা হইয়া রহিল কি করিয়া? তথাকথিত জাতিভেদই কি ইহার একমাত্র কারণ?

(২) জাপানী-'ভাইস্রয়ে'র পুত্র

জাহাজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণীতে বহুসংখ্যক জাপানী-যাত্রী। তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অগণিত জাপানী নর-নারী ফুলের মালা লইয়া 'ডকে'র উপর দণ্ডায়মান।

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। একজন নাতিযুবক, নাতিপ্রৌঢ় জাপানী দেখিলাম, জলের ভিতর ভিক্ষার্থী বালকগণের জন্য ইয়াঙ্কি-টাকা, আধুলি ইত্যাদি ফেলিয়া দিতেছে। বালকেরা ডুবিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতেছে। এই উপায়ে জাপানী প্রায় ৫০৭৲ খরচ করিয়া ফেলিল। পরিচয়ে জানিলাম, ইনি একজন 'ব্যারণ'। ইঁহার পিতা বিজিত কোরিয়া-প্রদেশে জাপানের 'ভাইস্রয়' ও বড়লাট ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, জাপান-দ্রোহী কোরিয়াবাসী তাঁহাকে হত্যা করে। স্লাভ-যুবক অষ্ট্রীয়ার ভাবী সম্রাটকে যে উদ্দেশ্যে হত্যা করিয়া বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়াছে, কোরিয়ার স্বদেশ-সেবকও সেই উদ্দেশ্যেই 'প্রিন্স্' ইতোকে হত্যা করিয়াছিলেন। 'ব্যারণ' ইতো বলিলেন, "আজকাল কোরিয়ার রাজদ্রোহ বা বিপ্লব নাই; সকল গণ্ডগোল মিটিয়া গিয়াছে।"

জাপানী 'ভাইসরয়'—রাষ্ট্রবীর প্রিন্স্ ইতো

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনার বংশ কি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ও ধনী 'জমী'-জমিদার-বংশসমূহের অন্যতম? আপনার 'ব্যারণ' উপাধি দেখিয়া সেইরূপ মনে হইতেছে।" 'ব্যারণ' বলিলেন—"না। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ নিতান্ত নগণ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। আমার পিতা, স্বকীয় কার্য্য-ক্ষমতায় জাপান-রাষ্ট্রের উচ্চতম সোপানে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন। সম্রাট্ তাঁহাকে 'প্রিন্স্' বা রাজকুমার উপাধি দিয়াছেন। এই কারণে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই খেতাবের অধিকারী—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রও 'প্রিন্স্' নামে অভিহিত হইবে।" আমি বলিলাম—"দেখিতেছি, জাপানে বিলাতী 'লর্ড'-খেতাবের রীতি অনুসৃত হইয়াছে। ইংলণ্ডে 'লর্ড'দিগের একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রই উপাধি প্রাপ্ত হন—অন্যান্য সন্তানেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে সমভাগ্যে গ্রথিত।" 'ব্যারণ' বলিলেন—"জাপানে আমরা British constitution বা ইংরাজ-রাষ্ট্র-শাসন-প্রণালীর যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকি।"

'ব্যারণ' বহুদিন পূর্ব্বে একবৎসর বিলাতে কাটাইয়াছেন—এক্ষণে আমেরিকা হইতে আসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি জাপান-সাম্রাজ্যের পর-রাষ্ট্র-বিভাগে কোন কর্ম্ম করেন?" ইনি উত্তর করিলেন—"আমি স্যান্ ফ্রান্সিস্কোর বিশ্বমেলায় আমাদের গবর্ণমেণ্টের একজন প্রতিনিধি ছিলাম। তিন চারিমাস পরে দেশে ফিরিতেছি।" আমি বলিলাম—"এত শীঘ্র যে?" 'ব্যারণ' বলিলেন—"স্ত্রীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আজকাল আপনাদের দেশে রাষ্ট্রীয় দলাদলি ত বেশ চলিতেছে। আপনি কোন্ Partyর অন্তর্গত?" 'ব্যারণ' বলিলেন—"এখনও আমি কোন দলে প্রবেশ করি নাই। আট-দশ বৎসর-কাল স্ফূর্ত্তি করিয়া বেড়াইব, স্থির করিয়াছি। আমি মদ্যপান বড় ভালবাসি। অবশ্য, একদিন-না-একদিন দল পাকাইয়া দলপতি হইয়া বসিব।"

বিশ্বমেলায় দেখিয়াছিলাম—জাপানী-মহাল্লার ভিতর একটা Band-stand আছে। তাহাতে জাপানী-বাদকেরা যন্ত্র-সঙ্গীত করিত। এই সঙ্গীত শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছিলাম। "জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালীয়ান্ সঙ্গীত জাপানীরা আয়ত্ত করিল কি করিয়া?"—এই প্রশ্নই মনে হইতেছিল। জাহাজেও দেখিতেছি, জাপানীরা ইয়োরামেরিকান সুরই আহারের সময়ে বাজাইয়া থাকে। রাত্রিকালে শ্বেতাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গিনীরা নৃত্য করিল—জাপানী-বাদকেরাই যন্ত্র বাজাইল।

একজন ইয়াঙ্কি পাদ্রী-চিকিৎসক চীনের কোন খৃষ্টান-হাঁসপাতালে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, জাপানীরা বিদেশী সুর-তাল-মানে পারদর্শী হইতে পারিয়াছে কিরূপে? অথচ ইহারা গানের তাল হয় ত কিছুই বুঝে না!" ইনি বলিলেন "গৎগুলি পুস্তকে যেরূপ লেখা আছে, অন্ধের মত এবং বধিরের মত ঠিক সেইরূপ বাজাইয়া গেলে, সকলেই দক্ষতা লাভ করিতে পারে। আমাদের সমাজে সঙ্গীত-বিদ্যা এই কারণে নিতান্ত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। যে কোন ব্যক্তি পুস্তকের স্বরলিপি দেখিয়া সুর বাজাইয়া যাইতে পারে। তাল-মান-লয়ের জ্ঞান না থাকিলেও ক্ষতি হয় না। অবশ্য, অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কান ঠিক হইয়া আসে।"

(৩) পীতাঙ্গ-জাহাজে সামাজিক জীবন

প্রথম শ্রেণীর আরোহীদিগের মধ্যে অর্দ্ধাংশ মাত্র জাপানী—অপরার্দ্ধ শ্বেতাঙ্গ। একজনও চীনা বা ফিলিপিনো নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে অধিকাংশই জাপানী। এতগুলি জাপানী, হনলুলু ও হিলোর বন্দর ছাড়া পূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই।

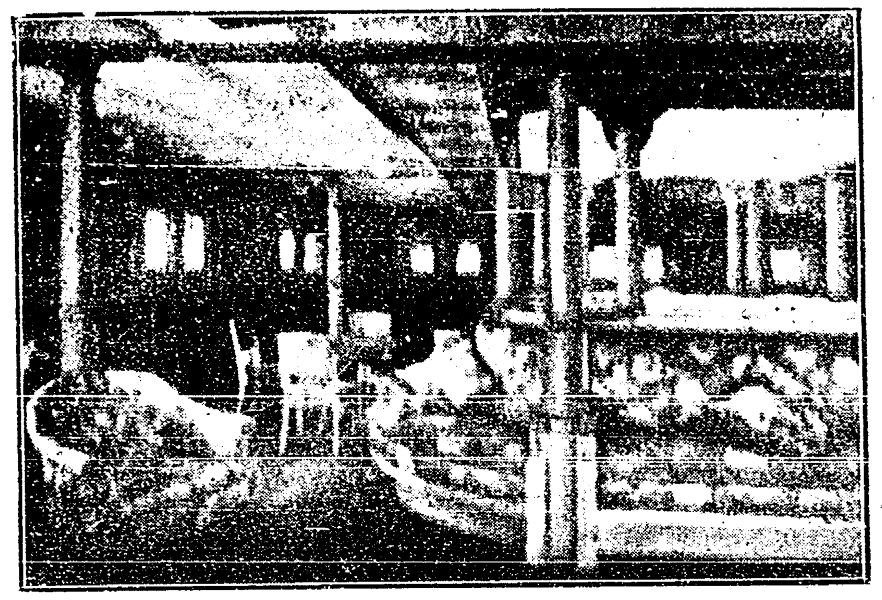

জাহাজে সঙ্গীত-ভবন ও পাঠাগার

জাপানী-স্ত্রীলোকেরা ঘোম্টা দিয়া মুখ ঢাকিয়া চলে না; কিন্তু ইয়োরামেরিকান্দিগের স্ত্রী-স্বাধীনতা, জাপানী-সমাজে নাই বোধ হইতেছে। এই জাহাজে জাপানী-রমণী কয়েকজন আছেন দেখিতেছি; কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনীদের পার্শ্বে ইঁহারা নিষ্প্রভ। নীরবে নিঃশব্দে চলা-ফেরা করা জাপানী নারীদিগের স্বভাব দেখিতেছি। পাশ্চাত্য নারীর মুখরতা ও অসংযত চঞ্চলতা ইঁহাদের নাই। দেখিয়া-শুনিয়া ভাবিতেছি, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে যতটা স্ত্রী স্বাধীনতা আছে, জাপানী-সমাজেও হয় ত ততটুকু মাত্র।

আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলাম। প্রতিদিন যত শ্বেতাঙ্গ-সহযাত্রীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে স্ত্রী দেখিয়াছি। অবশ্য, যাঁহারা অবিবাহিত, তাঁহাদের কথা ধরিতেছি না; কিন্তু বিবাহিত কোন শ্বেতাঙ্গকেই "অস্ত্রীক" দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ"—নিয়মটা শ্বেতাঙ্গ-মহলে যথেষ্টই প্রচলিত। সহধর্ম্মিণীকে দেশে রাখিয়া কোন ব্যক্তিই বাহিরে বেড়াইতে আসে না। পুরুষ যেখানে যাইবেন, স্ত্রীও সেইখানে যাইবেন—ইয়োরামেরিকান্-সমাজের ইহা দস্তুর; কিন্তু এই জাহাজে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ ধনী জাপানী দেখিতেছি—তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে পত্নী নাই। সহধর্ম্মিণীকে ঘরে রাখিয়া স্বামীর বিদেশ-ভ্রমণ কি এসিয়াবাসীর রীতি?

এই জাহাজে আসর ভাল জমিতেছে না। এতদিন যতগুলি শ্বেতাঙ্গ-জাহাজ দেখিয়াছি, সেগুলি সর্ব্বদাই গুল্‌জার হইয়া থাকিত। ফরাসীই হউক বা গ্রীক্-ইতালীয়ই হউক, জার্ম্মাণই হউক বা ইংরাজই হউক—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেই মিলিয়া-মিশিয়া সুখে সময় কাটাইত। ঐ সকল জাহাজে দুই-একজন কৃষ্ণাঙ্গ, পীতাঙ্গ নর নারীর দুরবস্থা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা কাহারও চোখে পড়িত না।

আজ জাপানী-জাহাজে গঙ্গা-যমুনার প্রভেদ যেন বুঝিতে পারিতেছি। জাপানীরা তাহাদের স্বদেশী জাহাজে চলা-ফেরা করিতেছে; সুতরাং তাহাদের দুরবস্থা এখানে বিন্দুমাত্র নাই। আর শ্বেতাঙ্গেরা ত অহঙ্কারী জাতি—তাহারা যেখানেই যাউক, কর্ত্তামি করিবে—কোন ভ্রূক্ষেপ নাই; সুতরাং জাপানী-জাহাজে তাহাদেরও কোন অসুবিধার কারণ নাই। বিশেষতঃ ইয়োরামেরিকান্ সমাজের সকল প্রকার বিলাস-সামগ্রীই অন্যান্য জাহাজের মত এই জাহাজেও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে।

তথাপি দেখিতেছি, জাহাজে সেই স্বাভাবিক উল্লাস-উচ্ছ্বাস, আমোদ-প্রমোদ নাই। শ্বেতাঙ্গেরা যেন অনেকটা নিস্তেজ-ভাবে মুসরিয়া রহিয়াছে। যেন কোনমতে দিন কাটিতেছে মাত্র। প্রাণ খুলিয়া, মন ভরিয়া কথা-বার্ত্তা, চলা-ফেরা যেন শ্বেতাঙ্গ-সমাজের স্বভাব নয়। এদিকে জাপানীরা বড়ই স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়। তাহারা একত্র বসিয়া জটলা করে—নিজেদের ভাষায় কথা বলিয়া নিজেদের মধ্যে গল্প করে—নিজেদের গণ্ডীর ভিতর তাস-দাবা খেলে। শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে পীতাঙ্গ মিশিতেছে না—পীতাঙ্গের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মিশিতেছে না। তেলে-জলে কি মিশিবে না?

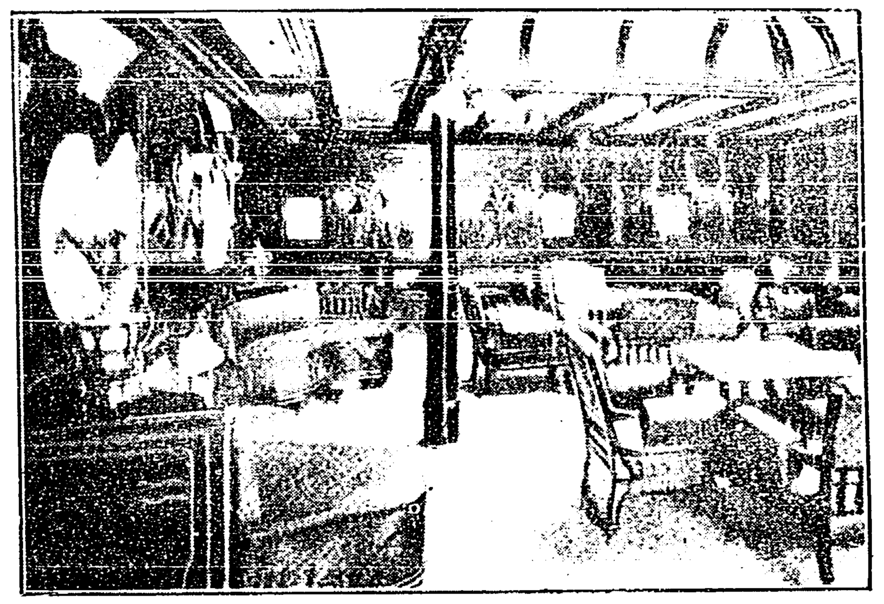

জাহাজে গল্প-গুজবের আড্ডা

দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন ফিলিপিনো যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি ম্যানিলায় শিক্ষকতা করেন। শুনিলাম, যুক্ত-রাষ্ট্র বহুসংখ্যক ফিলিপিনোকে স্যান্ ফ্র্যান্সিস্কোর বিশ্বমেলা দেখিবার জন্য বৃত্তি দিয়াছেন। যুবককে ইয়াঙ্কি-শাসন-কর্ত্তাদের উপর সন্তুষ্ট দেখিলাম; কিন্তু ইনি বলিতে লাগিলেন—"ইয়াঙ্কিরা ফিলিপিন-দ্বীপে আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করিয়া থাকেন; কিন্তু জাহাজে, রেলে, পথে দেখা হইলে, ইহাদের প্রাচ্য-বিদ্বেষ বাহির হইয়া পড়ে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইয়াঙ্কি-রাষ্ট্র আপনাকে যাওয়া-আসার খরচ, খাওয়া-খরচ ইত্যাদি দিয়াছেন; তথাপি আপনি ইয়াঙ্কি-জাহাজে না আসিয়া জাপানী-জাহাজে আসিলেন যে?" ফিলিপিনো বলিলেন—"ইয়াঙ্কি-জাহাজে শ্বেতাঙ্গ আরোহী হইতে কাপ্তেন, খালাসী পর্য্যন্ত সকলেই এসিয়াবাসীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে। তাহা ছাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য কোম্পানীর ব্যবস্থা নিতান্ত জঘন্য; কিন্তু জাপানী-জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণী অনেক জাহাজের প্রথম শ্রেণীর সমান এবং এখানে জাপানীরা পরজাতি-বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেয় না। 'টেনিও-মারু'তে বেশ মনের সুখে চলা-ফেরা করিতেছি। সহযাত্রিগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিয়া উঠিতেছে।"

আজ প্রথম শ্রেণীর 'ডেকে'র উপর জাপানী-খালাসীরা কয়েকটা স্বদেশী অভিনয় করিল। জাহাজের দৈনিক সংবাদ-পত্রে এই অভিনয়ের কথা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। নৈশ-ভোজনের পর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সকল আরোহী 'ডেকে' আসিয়া বসিলেন। 'ডেক্' যথারীতি সাজান হইয়াছিল। একটা ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চও প্রস্তুত ছিল। একজন নানাপ্রকার হাতের সাফাই

দেখাইল। থলিয়া হইতে ডিম বাহির করা, মুখ হইতে সুতা বাহির করা, আগুন গিলিয়া খাওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার বাজি দেখান হইল। ভারতবর্ষে এই সব নূতন নয়। ইয়াঙ্কিরা, ভারতবর্ষের আর কোন কথা না জানিলেও, অন্ততঃ magicএর দেশ বলিয়া জানে।

এতদ্ব্যতীত কয়েকপ্রকার নাচ দেখান হইল। নাচের ঢং দেখিয়া আমাদের ভারতীয় কথাই মনে পড়িল। জাপানী-বাজনাতে এবং গানের সুরেও ইয়োরামেরিকান রীতির কোন প্রভাব নাই। নর্ত্তক ও গায়কদিগের চেহারা না দেখিলে, মনে হইবে, ভারতবর্ষেরই অন্যতম প্রদেশবাসী জনগণের অভিনয় দেখিতেছি। নাচ, গান, বাজনায় ভারতে ও জাপানে ঐক্য আছে। দুই সমাজকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা সহজ।

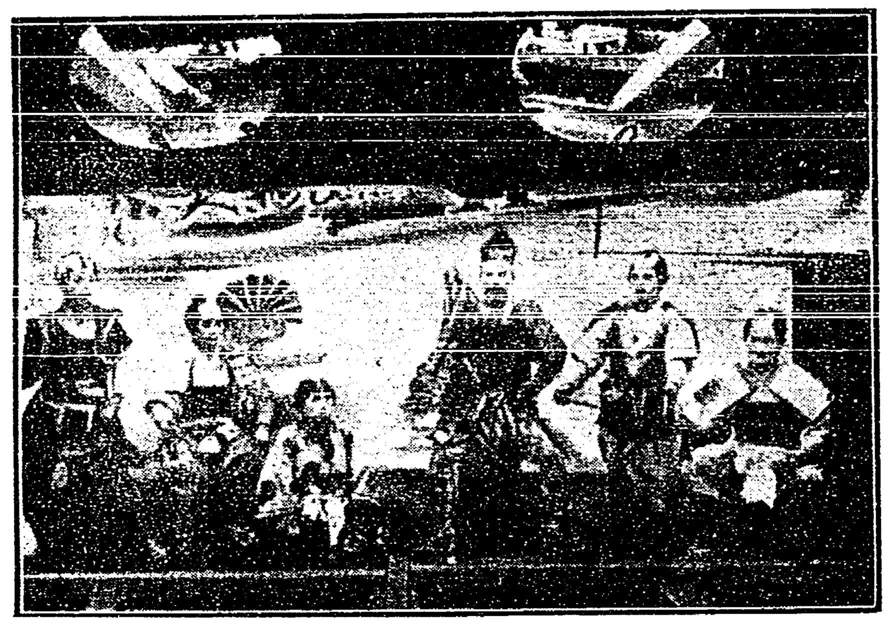

জাহাজে জাপানী-নাট্যাভিনয়

ছোট ছোট দুইটা নাটকের কিয়দংশ অভিনীত হইল। অভিনয় দেখিয়া বিশেষ-কিছু বুঝা গেল না। ইংরাজীতে নাটক-দ্বয়ের সারাংশ জানান হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীরা Oriental magic বেশ উপভোগ করিলেন, বুঝিলাম; কিন্তু নাচ-গান ইত্যাদি প্রাচ্য দেশীয় curi মাত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

(৪) জাপানী-চারণের 'কোদান' বা কথকতা

জাপানীরা আপন মনেই চলা-ফেরা করিতেছে। ইহাদের গল্প-গুজবে বাহিরের লোক যোগ দিতে পায় না। ইয়োরামেরিকানেরা কি এই জন্য জাপানকে inscrutable বলে? সেদিন একজন জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মহাশয়, আপনি কখনও কোন জাপানীকে মন খুলিয়া হাসিতে দেখিয়াছেন কি? ইহারা প্রত্যেক কথায় মুচ্‌কে হাসে; কিন্তু এই মুচ্‌কে-হাসির অর্থ বুঝা অসম্ভব। জাপানীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নিতান্ত কঠিন।"

নৈশ-ভোজনের পর 'ডেকে' দাঁড়াইয়া চাঁদ দেখিতেছি। একজন খালাসী আসিয়া জাপানী-ভাষায় কি যেন বলিল—অমনি জাপানীরা, যে যেখানে ছিলেন, সেখান হইতে নীচের তলায় যাইতে লাগিলেন। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, ব্যাপার কি? একসঙ্গে হঠাৎ সকলে মিলিয়া কোথায় চলিয়াছেন?" ইনি ইংরাজী কিছু কম জানেন—সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "কোদান, কোদান।" আমি বলিলাম, "আমি আসিতে পারি কি?" উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভোজনালয়ে একটা সভার ব্যবস্থা হইয়াছে—জাপানী পতাকা ঝুলিতেছে—প্রায় একশত জাপানী-পুরুষ ও রমণী উপস্থিত। একজন প্রবীণ ব্যক্তি আগন্তুককে দেখিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি জাপানী-ভাষা বুঝেন কি?" আমি বলিলাম, "না"। সকলে হাসিয়া উঠিল।

জাহাজের কাপ্তেন আসিয়া এক ব্যক্তিকে সভাস্থলে পরিচিত করিয়া দিলেন। আমার সঙ্গী বলিলেন, "এই ব্যক্তির বয়স ৭৫ বৎসর—ইনি বক্তৃতা করিবেন।" বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একজন আসিল। তাহার হাতে একটা বাদ্য-যন্ত্র, তিনটা তারের সেতার—জাপানী নাম "সেম্‌সেন।"

বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া, বসিয়া নানা ভঙ্গীসহকারে কথকতা সুরু করিয়া দিলেন। এক অক্ষরও বুঝিলাম না; কিন্তু ধরণ-ধারণ দেখিয়া দেশীয় কথক ঠাকুরের দৃশ্য মনে পড়িল। কথা বলিতে বলিতে গান আরম্ভ করিয়া দেওয়াও জাপানী-কথকের রীতি। দুনিয়ার সর্ব্বত্রই "কোদান" প্রচলিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই সমুদয় বেশী দেখা যাইত। বর্ত্তমান যুগে সংবাদ-পত্র সকলপ্রকার লোক-শিক্ষার ভার লইয়াছে। বিলাতী minstrel, ফরাসী troubadour ও trouvere, জার্ম্মাণ minnesinger, olksdichter, wanderlehrer এবং ভারতীয় চারণ, কথক, পাঠক সবই এক গোত্রের অন্তর্গত।

জাপানী-বাজনায় ও গানের সুরে অনেকটা ভারতীয় বাজনা ও সুরের ইঙ্গিত পাইলাম। ইয়োরোমেরিকান সঙ্গীতে আমাদের পরিচিত কোন লক্ষণ পাই না; কিন্তু জাপানের গান-বাজনায় বেশ বুঝিতে পারি যে, ভারত ও জাপান একই পরিবারের অন্তর্গত।

কোন্ বিষয়ে কথকতা হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—শ্রোতৃমণ্ডলীর সকলেই নির্ব্বাক্ হইয়া শুনিল। সঙ্গীর কথায় আভাস পাইলাম—Russo-Japanese war ইহার নিকট সুবিধা না পাইয়া আর একজন ইংরাজীজ্ঞ জাপানীর নিকট গেলাম। ইনি বলিলেন—"রুষ-জাপানের যুদ্ধে পোর্ট আর্থার দখল করিবার সময়ে জাপানী সৈনিকপুরুষদিগের যৎপরোনাস্তি কষ্ট-স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই পোর্ট আর্থারের বীরত্ব-কাহিনী এই 'কোদানে'র আলোচিত বিষয়। অগ্রগামী কর্ম্মবীর-গণের স্বার্থত্যাগ, সমাজে প্রচারিত করা কথক-মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ইনি জাপানে বিশেষ প্রসিদ্ধ।"

বাঙ্গালায় "স্বদেশী অন্দোলনে"র সময়ে দেখিতাম, বরিশাল হইতে একাধিক কথক আসিয়া কলিকাতায় স্বদেশীর ইতিহাস শুনাইতেন। জাপানের এই প্রবীণ কথককে দেখিয়া সেই কথা মনে পড়িল। ইনি হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের জাপানী-সমাজে কয়েক মাসকাল এইরূপ "কোদান" প্রচার করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছেন। একজন জাপানী বলিলেন, আমরা militarism বা ক্ষত্রধর্ম্ম ফেনাইয়া বাড়াইয়া, ঘনাইয়া তুলিবার জন্য এইরূপ "কোদান" পছন্দ করি, ভাবিবেন না। আমরা বড় শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ আদৌ পছন্দ করি না; কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের আত্ম-বলিদান সর্ব্বদা মনে রাখিতে চাহি। আমরা স্বদেশ-সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভাবিয়া থাকি—"দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।"

(৫) সাগরে তারিখ-বিভ্রাট

৩১শে মে তারিখের রাত্রিকালে কাপ্তেন একটা বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—"কল্য মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৯৷৷০টার সময়ে আমাদের জাহাজ ১৮০ 'ডিগ্রি' পশ্চিম-'লঙ্গিচিউডে' উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমরা বিলাতের গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দির হইতে পশ্চিম দিকে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ অতিক্রম করিব।"

আমরা দেখিতে পাই, সূর্য্য প্রতি ২৪ ঘণ্টায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসে। অবশ্য সূর্য্য ঘুরে না—ঘুরে পৃথিবী; কিন্তু আমরা সূর্য্যের গতিই দেখিতে পাই। সমস্ত পৃথিবীর পরিধি গণিতের ভাষায় ৩৬০ 'ডিগ্রি'তে বিভক্ত; সুতরাং, যদি লণ্ডনের সমীপবর্ত্তী গ্রেনীজ-নগরে বসিয়া থাকি, তাহা হইলে দেখিব যে, সূর্য্য পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ২৪ ঘণ্টা পরে ৩৬০ 'ডিগ্রি' ঘুরিয়া আসিবে—আমার একদিবস পূর্ণ হইবে। গ্রেনীজে যখন ১লা জুন সকাল ৯৷৷০টা, তখন প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থিত ১৮০ 'ডিগ্রি' পশ্চিম-'লঙ্গিচিউডে' ৩১শে মে রাত্রি ৯৷৷০টা। এই দুই কেন্দ্রে সময়ের ব্যবধান ১২ ঘণ্টা; সুতরাং স্বভাবতঃই দুই স্থানের তারিখ ও দিন একরূপ হইতে পারে না।

জাহাজে জাপানী কস্‌রৎ

তাহার উপর আর এক কথা। সূর্য্য (পৃথিবী) চলিতেছে—এদিকে আমাদের জাহাজও চলিতেছে। আমরা যখন স্থল ছাড়িয়া আসি, তখন দিন ও তারিখের নাম জানা ছিল। ইতি-মধ্যে গ্রেনীজ হইতে ১২৫০০ মাইল পশ্চিমে চলিয়া আসিয়াছি। জাহাজে বসিয়া সূর্য্যের অস্ত উদয়-অনুসারে যদি দিন ও তারিখ গণনা করি, তাহা হইলে গ্রেনীজবাসিগণের দিন ও তারিখের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য থাকিবে না। অঙ্ক কষিয়া ঠিক করা হইয়াছে যে, জাহাজে পশ্চিম দিকে যাইতে ১৮০ 'ডিগ্রি' পশ্চিমে আসিবামাত্র পূরা একদিন বেশী গণনা করা কর্ত্তব্য এবং পূর্ব্বদিকে যাইতে হইলে, ১৮০ 'ডিগ্রি' পূর্ব্ব-'লঙ্গিচিউডে' পৌছিবা-মাত্র পূরা একদিন কম গণনা করা কর্ত্তব্য।

এই হিসাবে জাহাজের গণনায় যেদিন ১লা জুন মঙ্গলবার হইত, তাহা ২রা জুন বুধবার হইল।

একজন ফরাসী 'ব্যারণ' জাপানে যাইতেছেন। আর একজন ইংরাজ-ব্যবসাদার চীনে চলিয়াছেন। ইঁহারা দুইজনে প্রায় সকল সময়ে একসঙ্গে কাটাইয়া থাকেন। ইংরাজ একদিন বলিলেন—"মহাশয়, আমেরিকার অত্যুক্তিপ্রিয়তা দেখিয়া আমি বিরক্ত হইয়া গিয়াছি।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দেখিয়াছেন?" ইনি উত্তর করিলেন—"আরে মহাশয়! ইয়াঙ্কিদের যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! সেদিন নিউ-ইয়র্কের কয়েকজন উচ্চপদস্থ লোক বলিতেছিলেন—'এবার ফ্রান্সের বিশেষ ক্ষতি হইল।' আমি প্রশ্ন করিলাম—'কেন?' ইয়াঙ্কিরা বলিলেন—'আমেরিকার পর্য্যটকেরা প্রতিবৎসর ফ্রান্সে বেড়াইতে যান। তাহার ফলে ফরাসীদের যথেষ্ট টাকা রোজগার হয়। রেল-কোম্পানী, হোটেল-কোম্পানী ইত্যাদি সকলেই ইয়াঙ্কি-'টুরিষ্ট্'দের অর্থে বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে। এই বৎসর যুদ্ধের জন্য আমেরিকা হইতে পর্য্যটকগণ ফ্রান্সে যাইতে পারেন নাই—ফরাসীদের লোকসান হয় নাই কি'?"

কয়েকজন ইয়াঙ্কি-পণ্ডিত ম্যানিলায় চলিয়াছেন। একজন কীট-তত্ত্ববিৎ (Entomologist), একজন 'ব্যাক্টিরিয়লজিষ্ট্' এবং একজন রসায়নাধ্যাপক। আমেরিকা হইতে এসিয়ার দিকে যত জাহাজ আসে, প্রত্যেক জাহাজেই দুই-চারি-দশজন পণ্ডিত ফিলি-পিনের যাত্রী থাকেন।

কীট-তত্ত্ববিৎ বলিলেন—"হনলুলুতে ইক্ষুক্ষেত্রে নানাপ্রকার অনিষ্টজনক কীট দেখা দিয়াছে। সেইগুলি নিবারণ করার জন্য আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়। আমি এখান-কার Experimental Stationএর পরীক্ষা-কার্য্যে ১০।১২ বৎসর নিযুক্ত আছি। সম্প্রতি শুনিলাম—ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে এক-প্রকার কীট দেখা দিয়াছে। সেগুলি ইক্ষু-কীটের শত্রু; সুতরাং সেই কীট যদি হনলুলুতে আমদানী করা যায়, তাহা হইলে অল্প পরিশ্রমে হাওয়াই-দ্বীপপুঞ্জের ইক্ষুক্ষেত্রসমূহ বাঁচান যাইতে পারে। এই অনুসন্ধানে আমি এ-যাত্রায় বাহির হইয়াছি।"

(৬) জাপানী কুস্তী-কস্‌রৎ

জাপানী-আরোহীরা শ্বেতাঙ্গের নাচ-বাজনায় যোগ দিলেন না। জাপানী-জাহাজে শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, রমণীগণও কিছু নির্জীব ও স্ফূর্ত্তিহীনভাবেই চলিতেছেন। শ্বেতাঙ্গ-জাহাজে শ্বেতাঙ্গদিগের যেরূপ জীবন দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে এই জাহাজে ইহাদের চলা-ফেরার তুলনা করা চলে না। বিদেশী জাহাজে সকল জাতিই সঙ্কোচ বোধ করে। আপন ও পর, স্বদেশী ও বিদেশী ইত্যাদি ভেদজ্ঞান মানুষমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। ভারতবাসী প্রায় কোন কার্য্যেই স্বদেশীর কর্তৃত্ব দেখিতে পায় না। বিদেশীর প্রভাবেই চিরজীবন কাটিতেছে। এই কারণে স্বাভাবিক মানুষের চিত্তে সাধারণতঃ যে সকল সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, গৌরব-নিন্দা ইত্যাদি দেখা দেয়, ভারতবাসীর হৃদয়ে সেই সমুদয়ের কোন স্থান নাই। ভারতবাসী একপ্রকার সৃষ্টিছাড়া জীব; কাজেই ইয়াঙ্কি, ইংরাজ, ফরাসী ও রুষ-যাত্রীরা জাপানী-জাহাজে কেন নিস্তেজভাবে জীবনযাপন করিতেছে, তাহা ভারতবাসীরা সহজে না বুঝিতেও পারে।

আজ নৈশ-ভোজনের সময়ে টেবিলের উপর একখানা মুদ্রিত বিজ্ঞাপন দেখিলাম। লেখা আছে যে, জাপানী নাবিক ও ভৃত্যেরা প্রধান 'ডেকে' স্বদেশী পালোয়ানী লাঠি-খেলা, ছোরা-খেলা ইত্যাদি দেখাইবে। জাপানীর প্রসিদ্ধ 'জিউজিৎসু'-কস্‌রৎও প্রদর্শিত হইবে। জাহাজে চীনা-সেবকগণের সংখ্যাও কম নয়; কিন্তু তাহাদের নাম কোন কাজেই দেখিতে পাই না। চীনাদের অবস্থা দেখিয়া কষ্ট হয়।

ভোজনান্তে 'ডেকে'র উপর আসিলাম। একটা সুবৃহৎ আখ্‌ড়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের দেশে মাটী কটিয়া কোদ্‌লাইয়া কুস্তীর ক্ষেত্র তৈয়ারী করা হয়। জাপানী-কস্‌রতেরও সেই ব্যবস্থা দেখিতেছি। তবে জাহাজে কাঠের 'ডেকে' মাটি বা বালু কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই মোটা দড়ির গালিচা বা চটের উপর মাদুর জড়াইয়া 'ডেকে'র উপর ফেলা হইয়াছে। মুখা-মুখি দুইদিকে এক এক বাল্‌তি জল এবং এক এক ভাঁড় নূণ রাখা হইয়াছে।

কুস্তীগিরেরা একে একে মল্লক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমাদের দেশী অনাবৃতদেহ জাঙ্গিয়া-পরা পালোয়ানের মূর্ত্তিসমূহ যেন সম্মুখে দাঁড়াইল। জাপানীদের শারীরিক গঠনে কোন সৌন্দর্য্য নাই দেখিতেছি। ইহাদের মুখ দেখিয়াও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জাহাজে যে কয়জন জাপানী-আরোহী আছেন, তাঁহাদের মুখে-চোখে বুদ্ধিমান্ জাতির লক্ষণ দেখি নাই; অথচ ইয়োরামেরিকান জাতীয় প্রায় অধিকাংশ লোকের মুখে-চোখে তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির ইঙ্গিত পাই। চেহারামাত্র দেখিলে, জাপানীকে কদাকার হাস্য-রসহীন নির্ব্বোধ জাতির অন্তর্গত, বিবেচনা করিতে প্রবৃত্তি হইবে। ভারতবাসীর চেহারা ও মুখ-শ্রী কিরূপ, বিদেশীয়েরাই ভাল বলিতে পারিবে।

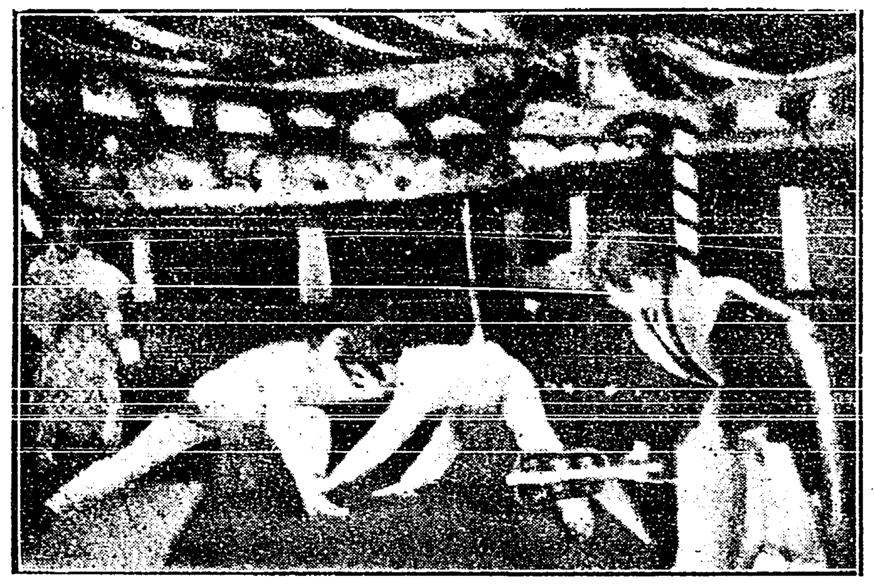

জাহাজে জাপানী কস্‌রৎ

দুইদল পালোয়ান দুইদিকে মুখামুখি হইয়া বসিল। এক-ব্যক্তি চীৎকার করিয়া প্রত্যেক দলের একজনকে আহ্বান করিল। প্রত্যেক লড়াই একমিনিট, দুইমিনিটের ভিতরই সমাপ্ত হইয়া গেল দেখিলাম। কুস্তী করিতে করিতে নুণ খাওয়া ও জলপান করা ইহাদের অভ্যাস। জাপানীরা ওস্তাদী চালে 'পাঁয়তারা' বেশী করে না। তবে ইহাদের চীৎ করিয়া ফেলিবার মধ্যে একটু কায়দা আছে। তাহাই প্রধানভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারতীয় কুস্তীগিরদিগের মার-প্যাঁচ এখানে দেখিলাম না।

যাহা হউক, শ্বেতাঙ্গেরা সেদিনকার অভিনয় অপেক্ষা আজকার কুস্তীতে বেশী আনন্দ উপভোগ করিল। তবে সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ইহাদের ধারণাও জন্মিল—"জাপানীরা আদিম অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য লোহিতাঙ্গ বা মাওরি-জাতীয় লোকদিগেরই মাস্‌তুত ভাই।" ইহাদের ভাব-ভঙ্গী, ধরণ-ধারণ সবই Primitive savage অথবা mediaeval; তবে আজকাল ইহারা রুষিয়াকে হারাইয়াছে, আমেরিকাকে ভয় দেখাইতেছে, প্রশান্ত মহাসাগরকে জাপানী-সাগরে পরিণত করিয়াছে, সেনা-বিভাগে জার্ম্মাণীর সমকক্ষ হইয়াছে, প্রবল পরাক্রান্ত ইংরাজ-জাতিকেও বন্ধুত্ব-প্রার্থী করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং জাপানকে অসভ্য বলা ধৃষ্টতামাত্র।"

একটা ব্যবসায়ের কথা মনে হইতেছে। ভারতবাসীরা এই দিকে ঝুঁকিলে, লাভবান্ হইতে পারেন। ইয়োরামেরিকার লোক-জন নাচ-বাজনা, কুস্তী, যাদু ইত্যাদি বড় ভালবাসে। নূতন ধরণের যে কোন দৃশ্য অথবা অভিনয় দেখা, ইহাদের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক সহরে Shows, Moving pictures ইত্যাদি দেখাইবার জন্য বহু আয়োজন আছে। কুলী, মজুর, কেরাণী, দোকানদার, 'ব্যাঙ্কার' ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লোকেই প্রায় প্রতিদিন এই সকল স্থানে যাইয়া সময় কাটায়। কোন নাটকের অভিনয় দেখিতে যত লোক অগ্রসর হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী লোক এই ধরণের চিত্রগৃহে বা নাচঘরে আসিয়া থাকে। হাসি-ঠাট্টা, গল্প-কৌতুক, বিস্ময়জনক দৃশ্য, লোমহর্ষণকারী ঘটনা, লাফালাফি, শারীরিক কৌশল ইত্যাদি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও রমণীগণের অত্যন্ত প্রিয়-বস্তু। ভারতবর্ষের কুস্তীগির, হরবোলা, বাঙ্গী, যাদুকর ইত্যাদি মিলিত হইয়া যদি একটা কোম্পানী গঠন করেন, তাহা হইলে ইয়োরামেরিকার নানাস্থানে ইঁহাদের পসার জমিতে পারে। শ্বেতাঙ্গেরা কোন এক বস্তু বেশী চাহে না—দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে "পাঁচফুলের সাজি" দেখিতে পছন্দ করে। প্রত্যেক দৃশ্যে একটা নূতন-কিছু চিত্তাকর্ষক সামগ্রী থাকিলেই হইল; কাজেই ভারতীয় কোম্পানীকে খানিকটা নাচ, খানিকটা বাজনা, খানিকটা গান, খানিকটা ক্রীড়া-কৌতুক-ব্যায়াম, খানিকটা বাজি, খানিকটা ছবি, খানিকটা রসিকতা, খনিকটা Ventriloquism ইত্যাদি মিলাইয়া 'প্রোগ্রাম' প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয়ও চলিতে পারে। এইরূপ একটা কোম্পানী তৈয়ারী করা বোধ হয় বেশী কঠিন নয়।

(৭) এসিয়ার শ্বেতাঙ্গ

ভারতবাসীরা বোম্বাই হইতে য়ুরোপ যাইবার সময়ে Peninsular and Oriental Navigation Companyর জাহাজের যাত্রী হইতে ইচ্ছা করে না। এই কোম্পানীর স্বত্বাধিকারিগণ ইংরাজ। ইহাদের জাহাজে ইংরাজ শাসন-কর্ত্তারা এবং বণিকগণ বেশী যাওয়া-আসা করেন। ভারতীয় যাত্রীদিগের বিশেষ লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। প্রশান্ত মহাসাগরের এসিয়াবাসী যাত্রীরাও এইরূপ লাঞ্ছনাই ইয়াঙ্কি-জাহাজে সহ্য করে।

ইয়াঙ্কিই হউন আর ইংরাজই হউন, ফরাসীই হউন আর জার্ম্মাণীই হউন—ইঁহারা সকলেই নিজকে এসিয়াবাসী অপেক্ষা উন্নত বিবেচনা করিয়া থাকেন। ন্যূনাধিক পরিমাণে ইঁহাদের সকলেরই রাজ্য এসিয়ায় রহিয়াছে। সমবেতভাবে ইঁহারা এসিয়ার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। সমগ্র এসিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে ইয়োরামেরিকার অধীন। একমাত্র জাপানের পূরাপূরি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আছে; কিন্তু এসিয়ার অন্যান্য স্থান ভারতবর্ষের মত পূরাপূরি পরাধীন না হইলেও, যথার্থ স্বাধীনতাশীল নয়। চীনের 'রিপাব্লিকে' বিদেশীয় রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতা অত্যধিক। চীনা 'স্বরাজে' ইংরাজ, ইয়াঙ্কি, ফরাসী, রুষ, জাপানী ও জার্ম্মাণ এই ছয় রাষ্ট্রের ষড়্‌যন্ত্র সর্ব্বদা চলিতেছে। ইহার নাম 'স্বরাজ'; কিন্তু পররাজ বা অরাজ বলিলেই প্রকৃত বিবরণ দেওয়া হয়। শ্যাম-রাজ্য ইংরাজ ও ফরাসী-সাম্রাজ্যদ্বয়ের ভিতর চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। আফ্‌গানিস্থান ও পারস্য, ইংরাজ ও রুষ-সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী Buffer State মাত্র। এই সকল দেশকে বিদেশীয় রাষ্ট্র-সমূহের sphere of influence এবং sphere of interestরূপে বিবৃত করা হয়। প্রত্যেক জনপদই একাধিক জাতির "প্রভাবমণ্ডলের" অথবা "স্বার্থমণ্ডলে"র অন্তর্গত। আর তুরস্ক ও মিশরের ত কথাই নাই। আজকাল বৌদ্ধ চীন যেরূপ অসংখ্য জাতির প্রভাবমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে, মুসলমান-সাম্রাজ্যে সেইরূপ পরজাতিপুঞ্জের প্রভাবমণ্ডল দুই-তিন শত বৎসর ধরিয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয়ের দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের ন্যায় পূরাপূরি পরাধীন; কাজেই পীকিং, ব্যাঙ্কক, ব্যাটেভিয়া হইতে কন্‌ষ্টান্টিনোপল, ক্যাইরো, মক্কা পর্য্যন্ত ৯০ কোটি নর-নারীর বাসস্থান-সম্বন্ধে বলা যায়—"স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছি স্ তোরা, স্বদেশ তোদের নয়।" এই বিরাট্ মহাদেশ বর্ত্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার জমিদারীস্বরূপ—বৃহত্তর ইয়োরামেরিকার ভোগভূমিমাত্র।

জাপান, রাষ্ট্রীয় হিসাবে পূরা-পরাধীন, অর্দ্ধ-পরাধীন, Buffer State অথবা sphere of influence মাত্র নয়। জাপান, দুনিয়ার রাষ্ট্রমণ্ডলে ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী ইত্যাদি ৬।৭ বনিয়াদী ঘরের মর্য্যাদা পাইয়া থাকে। ১৯০৫ সাল হইতে জাপান কুলীন-সমাজে আসন পাইতেছে।

রাষ্ট্রমণ্ডলে জাপানের স্বাধীনতা ও কৌলীন্য দেখিতেছি; কিন্তু বিদ্যার ক্ষেত্রে, সারস্বতমণ্ডলে, বিজ্ঞান-রাজ্যে জাপানের এই পদ-মর্য্যাদা আছে কি? রাষ্ট্রবীরগণ জাপানকে sovereign state, first-class power, world-power ইত্যাদির সম্মান প্রদান করিতেছেন; কিন্তু অন্যান্য সকল বিভাগে জাপান ইয়োরামেরিকার অধীন—কৃষি, শিল্প-বিজ্ঞান, ব্যবসায়, শাসন-প্রণালী, শিক্ষা-পদ্ধতি, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই জাপানকে শ্বেতাঙ্গগণের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইয়াঙ্কি-অর্ণবযানাধ্যক্ষ কমডোর পেরি আসিয়া জাপানে বিদেশীয় প্রভাব প্রবর্ত্তন করেন। তাহার ১৫ বৎসর পর হইতে জাপানে নবীন জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইতে থাকে। শিক্ষা, রাষ্ট্র, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা, সকল বিষয়ে পুরাতনের স্থানে নূতন প্রবর্ত্তিত হয়। যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্য জাপানীরা জার্ম্মাণীকে গুরু মানিয়া লইয়াছিল; আইন প্রস্তুত করিবার জন্য ফরাসীর শরণাপন্ন হইয়াছিল; জাহাজ তৈয়ারী করিবার জন্য ইংল্যাণ্ডের 'শাগ্‌রেতি' স্বীকার করিয়াছিল এবং বিদ্যালয় গঠন করিবার জন্য ইয়াঙ্কিস্থানকে পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে জাপান ইয়োরামেরিকার শিষ্য, ছাত্র ও সন্তানমাত্র। জাপানীরা ইহা বেশ জানে; এজন্য ইহারা শ্বেতাঙ্গের নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ। আজ ইহারা ইয়াঙ্কিস্থানকে চোখ রাঙ্গাইয়া ভয় দেখাইতেছে, ইয়ারোপকেও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে; কিন্তু ইয়োরামেরিকার অধীনতা জাপান এখনও মর্ম্মে মর্ম্মে স্বীকার করে। ইয়োরামেরিকার শিক্ষক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক 'এঞ্জিনীয়ার' ইত্যাদির সাহায্য জাপানীদের এখনও আবশ্যক।

এই হিসাবে পরাধীন ও অর্দ্ধ-পরাধীন এসিয়া-মহাদেশের সঙ্গে ইয়োরামেরিকার যে সম্বন্ধ, পাঁচকোটি জাপানীর বাসস্থান স্বাধীন এসিয়ার সঙ্গেও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। বর্ত্তমান যুগে শ্বেতাঙ্গেরা সমগ্র এসিয়ার শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু—ইহারা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ, তাহার নৈসর্গিক অধিকার ছাড়িবে কেন? এইজন্যই শ্বেতাঙ্গ নর-নারীগণ যে-কোন এসিয়াবাসী অপেক্ষা নিজকে মহত্তর ও উন্নততর বিবেচনা করে। ইহাদের বিবেচনায় জাপানী, ভারতবাসী, চীনা, পারসিক সকলেই শূদ্র—নগণ্য ছাত্র বা শিষ্য—অর্দ্ধসভ্য নাবালক। এই কারণেই জাপানেরও বেশী সম্মান ইয়োরামেরিকায় নাই।

সুয়েজ-খাল অতিক্রম করিয়া এসিয়ায় পড়িবামাত্র য়ুরোপীয়েরা তাহাদের ব্রাহ্মণোচিত গুরুগিরি ফলাইয়া থাকে। হনলুলু ছাড়িবার পর হইতে ইয়াঙ্কিরা ঠিক সেই মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক—আমাদের দুঃখ করিলে কি হইবে?

জাপানী ও ইয়াঙ্কি দুই জাতীয় জাহাজেই দেখিলাম,—প্রথম শ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ যাত্রিগণ সকলেই উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। শ্বেতাঙ্গ-সমাজের ইঁহারা গণ্যমান্য লোক। কেহ ধর্ম্ম-প্রচারক, কেহ শিক্ষা-প্রচারক, কেহ সমাজ-সেবক, কেহ বৈজ্ঞানিক;—প্রত্যেকেই এসিয়ায় কিছু-না-কিছু দান করিবার জন্য চলিয়াছেন। কয়েকজন শাসন-কর্ত্তার সঙ্গেও দেখা হইল। এই শ্রেণীর লোক এসিয়াবাসীকে কি চোখে দেখিবেন? প্রাচীন যুগে এসিয়া দুনিয়ার গুরু ছিল—একথা বলিয়া ইঁহাদের সম্মান বা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা চলে কি? কাজেই লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া থাকিতে হয়—জাপানীদের মাথাও ইঁহাদের নিকট হেঁট থাকিতে বাধ্য।

ইয়াঙ্কি-জাহাজের ভোজনালয়ে ভাল ভাল টেবিলগুলি শ্বেতাঙ্গদের জন্য বাছিয়া রাখা হয়—কোন এসিয়াবাসীকে সেই সকল স্থানে বসিতে দেওয়া হয় না। ইয়াঙ্কিরা চীনা বা জাপানীদের সঙ্গে একাসনে খানা খাইতে চাহে না; কাজেই জাপানীরা ইয়াঙ্কি-জাহাজে চলা-ফেরা করে না। এদিকে জাপানী-জাহাজেও শ্বেতাঙ্গেরা বেশী আসে যায় না—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাহারা জাপানী-কোম্পানীর আশ্রয় লইয়া থাকে। জাপানী-জাহাজেও শ্বেতাঙ্গেরা জাপানীদের সঙ্গে আহারে বসে না; এইজন্য কোম্পানী প্রথম হইতেই গোলযোগ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইয়াঙ্কি-জাহাজে সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত টেবিল ভোজনালয়ের মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত—ইহাই "কুলীন"দিগের আসন। পাশে পাশে কতকগুলি ছোট ছোট টেবিল থাকে—সেইগুলিতে কুলীন, অকুলীন বিচার করা হয় না। জাপানী জাহাজের ভোজনালয়ে একটাও সুবৃহৎ টেবিল নাই—মধ্যস্থলেও কোন সম্মানসূচক (Place of honour) আসন পাতা হয় না—সকল টেবিলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; সুতরাং কুলীন-অকুলীন, উচ্চ-নীচ, শ্বেতাঙ্গ-পীতাঙ্গ ইত্যাদি জাতিভেদ বুঝা যায় না। এই উপায়ে শ্বেতাঙ্গদের অহঙ্কারও রক্ষিত হয়, জাপানীদের ইজ্জৎও মারা যায় না। জাপান, লড়াই করিয়া জিতিয়াছে বলিয়া কি জাতিতে উঠিয়াছে? জাপানী, যে এসিয়াবাসী সেই এসিয়াবাসী—জাপানীর সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের পংক্তি-ভোজন এখনও সুদূরপরাহত। চীনা-বেচারাদের ও ভারতবাসীর কথা ত এক্ষেত্রে উঠিতেই পারে না।

জাহাজে ভোজনালয়

কোন কোন শ্বেতাঙ্গ পণ্ডিত প্রাচ্য সভ্যতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রশংসা আন্তরিক হইতে পারে এবং হয় ত প্রশংসা নিতান্ত অমূলক না হইতেও পারে; কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ইত্যাদি দেশে নব্য বিদ্যাসমূহ প্রচার করিতে আসিতেছেন, তাঁহাদের মুখে এসিয়ার গৌরব শুনিলে, "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" সহ্য করিবার অবস্থা উপস্থিত হয়। একজন পাদ্রী-চিকিৎসক বলিলেন—"মহাশয়, এসিয়াবাসীদের মস্তিষ্ক অতিশয় তীক্ষ্ণ। সাধারণ জার্ম্মাণ, ইংরাজ, ইয়াঙ্কি অপেক্ষা চীনা ও ভারতীয় ব্যক্তির মাথা উন্নততর। আপনারা যত শীঘ্র য়ুরোপ ও আমেরিকার দর্শন, বিজ্ঞান বুঝিতে সমর্থ, আমরা তত শীঘ্র এসিয়ার মর্ম্মকথা বুঝিতে সমর্থ নহি। আপনাদের লোকেরা ইংরাজী, জার্ম্মাণ, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন ইত্যাদি ভাষা অতি সহজেই

দখল করিয়া ফেলে—আর আমরা আপনাদের চীনা বা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য কয়জনে সত্যভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি? বিলাতী 'ব্রাউনিং' ভাতবাসীর পক্ষে দুর্ব্বোধ্য নয়—অথচ আপনাদের ঠাকুরকে আমরা কেহই বুঝি না। এসিয়ার সেরা ছাত্রেরা য়ুরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল শ্বেতাঙ্গ ছাত্রকেই হারাইয়া দিতে পারে। আমি আমেরিকার একজন শিক্ষিত চীনার কথা জানি। সে চিকিৎসা-বিদ্যার শেষ পরীক্ষায় সকলপ্রকার উচ্চতম মেডেল ও পারিতোষিক পাইয়াছিল। অথচ একজন ইয়াঙ্কি, ত্রিশবৎসর চীনে বাস করিয়াও চীনা-ভাষা শিখিতে পারিলেন না।"

(৮) রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রশান্ত মহাসাগর

বড়ই বিস্ময়ের কথা—এ কয়দিনের ভিতর কোন জাপানীর সঙ্গে কোন শ্বেতাঙ্গের বাক্যালাপ হইল না। জাপানী জাহাজ-কোম্পানীর ব্যবস্থায় আজ জাপানী থিয়েটার, কাল জাপানী-ব্যায়াম, পরশু জাপানী-Cinematograph-প্রদর্শন ইত্যাদি কত কি হইল। ফরাসী, ইয়াঙ্কি ও ইংরাজ জাহাজ-কোম্পানীর ব্যবস্থায় এই সকল অনুষ্ঠান দেখি নাই। মিলা-মিশার এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গে-পীতাঙ্গে করমর্দ্দন পর্য্যন্তও হইল না। হায় জাপান, তুমি শ্বেতাঙ্গের হিংসা-দ্বেষ ও ঘৃণা এড়াইয়া কতদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? আর হায় এসিয়া!

জাপানের কয়েকজন ব্যবসায়ী এই জাহাজে আছেন—কেহ কেহ ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সঙ্গে কারবারও আছে। সকলেই আমেরিকার বিশ্বমেলা দেখিয়া ফিরিতেছেন। ইঁহাদের দ্রব্যাদি মেলায় প্রদর্শিত হইয়াছে। রেশমী-বস্ত্রের মহাজনই এই জাহাজে বেশী।

একজন দেখিলাম, পাঠাগারে বসিয়া জাপানী-অক্ষরে লিখিতেছেন। ইনি কলযন্ত্রের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। ইয়াঙ্কিস্থানের বড় বড় শিল্প-কেন্দ্রে 'ফ্যাক্টরী' পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। পরিদর্শনের ফল জাপানের কল-কারখানা-বিষয়ক সংবাদ-পত্রের জন্য লিখিত হইতেছে।

জাপানীরা, তাঁহাদের মাতৃভাষায় লিখিত 'নভেল' পাঠ করিয়া দিন কাটাইতেছে, জাহাজে উপন্যাস-পাঠ শ্বেতাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গীদিগেরও দস্তুর। 'ব্যারণ' ইতো বলিলেন—"আমি ইতিহাস ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনা করিতে ভালবাসি। আমার সঙ্গে কয়েকখানা ইংরাজী ও জাপানী-ভাষায় প্রণীত ইতিহাস-গ্রন্থ রহিয়াছে।"

ইয়াঙ্কি-জাহাজের মত জাপানী-জাহাজেও দৈনিক সংবাদ-পত্র বাহির হয়। Wireless telegraphyর সাহায্যে যুদ্ধের খবর জাহাজে বসিয়া প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরকে সত্য সত্যই প্রশান্ত দেখিলাম। মাত্র একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য সমুদ্র উন্মত্ত ছিল। শীতকালে শুনিতে পাই, প্রশান্ত মহাসাগর সর্ব্বদাই ভীষণ আকার ধারণ করিয়া থাকে। এত বড় ঢেউ অন্য কোন সাগরে দেখা যায় না—তখন জাহাজের তালহীন নৃত্য আরোহীদিগের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়; কিন্তু এ-যাত্রায় সৌভাগ্যক্রমে "All was tranquil as the summer-sea" কাহাকে বলে, বেশ বুঝিতে পারিলাম।

আটলান্টিক পার হইতে মাত্র সাতদিন লাগিয়াছিল—প্রশান্ত মহাসাগর পার হইতে সতের দিন লাগিল। ঠিক যেন নৌকা-বক্ষে নদী পার হইতেছি। হনলুলুতে যত গরম ছিল, জাহাজে উঠিবার পর আর তত গরম নাই। জাহাজ বহু উত্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। জাপানের দিকে অগ্রসর হইবার সময়ে আবার গরম সুরু হইল।

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রমণ্ডলে প্রশান্ত মহাসাগরের স্থান অতি উচ্চ হইবে। এই সাগরে একটা বড় বন্দর লাভ করা চিরকালই রুষিয়ার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। জাপানের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া রুষিয়া আজকাল কিছু নতশির; কিন্তু রুষিয়ার গোঁ শীঘ্র যাইবে না। ইংরাজ ত এসিয়ার সর্ব্বপ্রধান বিদেশীয় প্রভু—সম্প্রতি চীনে সাম্রাজ্য-বিস্তার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের উপর কতকগুলি বর্দ্ধিষ্ঠ চীনা-বন্দরও ইংরাজের আয়ত্ত রহিয়াছে। এদিকে ইংরাজের অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যানাডা, প্রশান্ত মহাসাগরের দুই সীমায় জাপানের আক্রমণকে সর্ব্বদা ভয় করিতেছে। ওশিয়ানিয়ার দ্বীপপুঞ্জে নানা য়ুরোপীয় ও ইয়াঙ্কি জাতির আধিপত্য জাপান-সাম্রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ। হাওয়াই ও ফিলিপিন লইয়া জাপান ও ইয়াঙ্কিস্থানের মনোমালিন্য শীঘ্র ঘুচিবার নয়। অধিকন্তু প্যানামা-খাল কাটার ফলে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরদ্বয় যুক্ত হইয়া গেল। তাহার প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে ইয়োরামেরিকার কার্য্যক্ষেত্র এবং আটলান্টিক মহাসাগরে জাপানের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃতরূপেই প্রস্তুত হইবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণ দ্রুতবেগে সাধিত হইতে থাকিবে।

জাহাজে শয়ন-কক্ষ

আমেরিকা-আবিষ্কারের পর হইতে আটলান্টিক মহাসাগরে রাষ্ট্রমণ্ডলের ভার কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। ষোড়শ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আটলান্টিকের দুই পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহই দুনিয়ার হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা রহিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগরের ভিতর রাষ্ট্রমণ্ডলের ভার-কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরের যে স্থান ছিল, কলাম্বসের পর আটলান্টিকের সেই স্থান রহিয়াছে। ১৯০৫ সালে জাপানের বিজয়লাভ এবং ১৯১৫ সালে প্যানামা-খাল খোলার পর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরেরও সেইস্থান হইবে। বর্ত্তমানে জাপান, নৌ-বলে Command of the Pacific বা প্রশান্ত মহাসাগরের আধিপত্য ভোগ করিতেছেন। দেখা যাউক, এই আধিপত্য কোথায় গিয়া ঠেকে। সম্প্রতি ইংরাজ ও ইয়াঙ্কি এই আধিপত্য-ভোগে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী। ফ্রান্স এবং রুষিয়া কিছুকাল হত-প্রভ থাকিতে বাধ্য; কিন্তু প্রতিভাবান্ জার্ম্মাণীর উদীয়মান নৌ-বল কখন্ কি মূর্ত্তি ধারণ করে, বলা যায় না।

এইরূপে সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তরে যুগে যুগে মানবজাতির লীলাক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। যখন ইয়াংসিকিয়াং, গঙ্গা, টাইগ্রিস

ও নীল নদী চতুষ্টয়ের কূলে মানব-সভ্যতার বিকাশ সাধিত হইতেছিল, তখন ভারত-মহাসাগর দুনিয়ার কেন্দ্র ছিল। সেই প্রবীণ জগতের মধ্যবর্ত্তী জনপদ ছিল ভারতবর্ষ। যখন একদিকে মিশর, অপরদিকে চীন এবং এই দুই জনপদের মধ্যে ভারতবর্ষ আদান-প্রদান ও বিনিময়ের উপায়স্বরূপ বিরাজ করিত, তখন ভূমধ্যসাগরের গৌরব আরব্ধ হয় নাই। সেখানে মানবজাতির নূতন কর্ম্মকেন্দ্র-স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছিল মাত্র।

সাগরাধিপত্য বা Command of the sea কাহাকে বলে, ভারতবাসীর পক্ষে আজকাল তাহা বুঝা অসাধ্য। বিশেষতঃ, সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধের শাস্ত্রবাণী পণ্ডিত-মহাশয়গণ জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন। ইংরাজেরা বর্ত্তমান যুগের সাগরাধিপতি। "Britannia rules the waves" আধুনিক জগৎ এই সূত্র একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ গ্রহণ করিয়া লইয়াছে। জার্ম্মাণেরা ইংরাজকে বেশীদিন এই গৌরবের অধিকারী থাকিতে দিবে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। জার্ম্মাণেরা বলে—"আমরা দুনিয়ার জাতিপুঞ্জকে freedom of the seas প্রদান করিবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে লড়িতেছি। জগতের সকল সমুদ্রের চাবিই ইংরাজের হস্তগত। ইহাতে দুনিয়ার লোককে ইংরাজের নিকট অবনত থাকিতে হয়। আমরা ইংরাজের এই আধিপত্য ভাঙ্গিয়া, জগদ্বাসীর সাগরাধিকার প্রবর্ত্তন করিতে চাহি। এই হিসাবে আমরা মানবজাতির উদ্ধারকর্ত্তা। ইংরাজ-জাতির একচ্ছত্র সাগর-ভোগ না থাকিলে, জগতের সকল জাতিই স্বাধীনভাবে, স্বচ্ছন্দে সমুদ্রে চলা-ফেরা করিতে পারিবে।"

ইংরাজ যে হিসাবে সপ্ত সমুদ্রে সাগরাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন, জাপানীরা সেই হিসাবে প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য-ভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমান যুগের ভারতবাসী এই সাগরাধিপত্য কবিতায় ভোগ করিতে শিখিতেছে:—

"একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত, চীন, জাপানে গঠিল উপনিবেশ।"

সেদিন ছিল "Command of the Indian Ocean"এর যুগ; সুতরাং ভারতবাসী "Command of the Pacific" সমস্যা বুঝিতে পারিবে না কেন?

(৯) "সায়োনারা" বা বিদায়

ইয়োকোহামায় পৌঁছিবার আগের দিন রাত্রে জাহাজের কর্ম্মচারীরা নানাপ্রকার কাগজের ফুল ও পতাকায় ভোজনালয় সাজাইয়া দিলেন। নৈশ ভোজনের সময় বেশ হাসি-ঠাট্টা চলিতে লাগিল। প্রত্যেক আরোহীর মাথায় একটা করিয়া 'গাধার টুপি' দেওয়া হইল। এক টেবিল হইতে অপর টেবিলের দিকে লোকেরা কাগজ ছোঁড়া-ছুঁড়ি করিতে থাকিলেন। জাপানী-কোম্পানীর জাহাজে প্রতিদিনই একটা-না-একটা উৎসব লাগিয়াই আছে।

আজকার menu বা খাদ্য-তালিকা ভাল কাগজে ছাপান হইয়াছে। মাথায় লেখা "সায়োনারা" বা বিদায়। মাঝে মাঝে উচ্চ সাহিত্য হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে; যথা—

My appetite comes to me while eating—Montsigue
Can we desire too much of a good thing?—Don Quixote
My good digestion waits on appetite and health, on both—
Macbeth

হনলুলুর কীট-তত্ত্ববিদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল। ইনি বলিলেন—"জাপানের Anthropology বা নৃ-তত্ত্ব বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। জাপানীরা তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার সকল অঙ্গই চীন, কোরিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে লাভ করিয়াছে। অথচ ইহাদের উৎপত্তি বোধ হয় এসিয়া-মহাদেশে হয় নাই। শারীরিক গঠন, মুখ-চোখের আকৃতি ইত্যাদির প্রমাণে ইহাদিগকে মলয়-দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের জ্ঞাতি বলা কর্ত্তব্য। জাপানী-জাতিকে মঙ্গোলিয়-জাতির অন্তর্গত বিবেচনা করা যাইতে পারে। জাপানীরা দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তরে অগ্রসর হইয়াছে।

"তয়ো কাইসেন কায়সা" বা প্রাচ্য জাহাজ-কোম্পানীর 'প্রেসিডেণ্ট' আজ তারহীন বার্ত্তাবহের সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর যাত্রিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার টোকিও-নগরস্থ গৃহে একদিন সকলকে চা-পান করান হইবে। সভাপতি-মহাশয় প্রত্যেকবার জাহাজ পৌঁছিলে আরোহীদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। জাপানীরা খরিদ্দারদের মন রাখিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

মর্ম্ম-কথা

কা'র বাঁশরীর আহ্বান শুনি'
দ্বিধা, ভয়, লাজ, পরিহরি'
ছুটিয়াছে কোথা অনন্ত নব-
যৌবনা ধরাসুন্দরী?
নিশিদিন রচি' প্রেমের অর্ঘ্য
কত বিচিত্র ফুলভারে,
তারকা-দীপ্ত অজ্ঞাত পথে
চলেছে কাহার অভিসারে?
দীর্ঘ পথের নাহি হেরে শেষ
অসীম শূন্যে যত ঘুরে,
মর্ম্মের বাণী উঠিছে নীরবে
"কত দূরে—আর কত দূরে?

সন্ধানে কা'র মানব যাত্রী,
ধরাতলে যুগ যুগ ধরি'
চলিয়াছে কোন্ তীর্থের পানে
অন্তর-আলো অনুসরি'?
কত না জনম, কত না মৃত্যু,
সঙ্কট কত হ'য়ে পার,
কত দুখ-শোক দলিয়া চরণে
চলিয়াছ সুধু অনিবার।
মর্ম্মের মাঝে ধ্বনিয়া নিয়ত
যত গান উঠে যত সুরে,
প্রকাশিছে চির- দিবসের বাণী
"কত দূরে, ওগো, কত দূরে?

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

বাঁকিপুরে নাটোরাধিপতির অভ্যর্থনা

বিগত ৭ই আশ্বিন তারিখে বাঁকিপুর Anglo-Sanskrit Schoolএ একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার উদ্দেশ্য—নাটোরের মাননীয় মহারাজা বাহাদুরের অভ্যর্থনা। এই অভ্যর্থনা-সভায় প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ সিংহ, শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায় এবং বহুসংখ্যক ব্যারিষ্টার ও উকীল প্রভৃতি আগমন করিয়া সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে মাননীয় মহারাজা বাহাদুর, তাঁহার স্বভাবসুন্দর ভাষায় যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল। সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সুকবি শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাখালরাজ রায়-মহাশয়ের রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীত দুইটি গীত হইয়াছিল :—

১

যেথা শিল্প-কলা-লক্ষ্মী একদিন ছিল বন্দী-সাজে, ওহে মহাত্মন্,
ভারতের সে অতীত-স্বর্ণ-যুগ-রাজ-পুরী-মাঝে স্বাগত রাজন্!
কলা-শ্রীর রক্তপদ-লেখা আছে যেই দেশ ভরি তিলকের মত,
ধ্বনিল নির্ব্বাণ-সাম যেই সঙ্ঘারামে পুণ্য-প্রাতে উদ্বোধি' জগত;
ভিক্ষা ত্যজি' অর্থনীতি নিরূপিলা যেথায় ব্রাহ্মণ স্বীয় মনীষায়,
তরুণ কুমার পুন পরমার্থে অর্থে দিল বলি— স্বাগত সেথায়।

২

শত নৃপ নৃপেন্দ্রের কীর্ত্তি-কর-আকর-কিরণে উজ্জ্বল যে দেশ
তরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধ-পথে ঘোষে যেই অশোক-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্য্য অশেষ,—
এস সেথা হে রাজেন্দ্র, বাঙ্গালার বাঙ্গালীর রাজা, হে প্রিয়দর্শন!
এস কবি, কাব্য-শিল্পি, স্বাগত হে সুরস-রসিক বাঙ্গালীর ধন!
অভিন্ন যে বাক্য অর্থ, করে' দেছ সার্থক তা' তুমি, হে রাজরতন,
কমলা কমলাসনা এ দুয়ের চির-কলহের ঘটায়ে মিলন।

৩

সাক্ষাৎ ভবানী, রাণী ভবানীর গৌরব-কাহিনী অবিদিত কার—
শত ছন্দে, কত গীতে, ঢালে সবে শ্রীচরণে যাঁর পূজা-অর্ঘ্য-ভার:
দান-ব্রতা রাজেন্দ্রাণী পুণ্যশ্লোকা মহা-মহিয়সী জগতে অতুল।
যে রাজর্ষি রামকৃষ্ণ তেয়াগিয়া বিলাস বিপুল বাঞ্ছিল যে মূল,
মহাশক্তি নাম, আর শেষ-শয্যা বালুকা-সৈকতে— সে কুলের আর
কোথায় তুলনা ভবে? তুমি সেই বংশধুরন্ধর, যোগ্য অলঙ্কার।

৪

বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ-পতি, হে বরেণ্য, চিরদিবসের লহ নমস্কার,
হে কবি, বাণীর পুত্র, মানসীর মানস-দুলাল, লহ নমস্কার,
হে রাজন্, স্মিত হাস্য, চির-প্রীতি-পুলকিত-প্রাণ, লহ নমস্কার,
হে কবি, হে দ্বিজরাজ, সহৃদয় সুমধুর-ভাষী লহ নমস্কার,
তব চির-অনুরক্ত প্রবাসী এ বঙ্গ-পুত্রদের লহ নমস্কার,
সর্ব্বশেষে অকিঞ্চন তব ভক্ত-কুণ্ঠিত কবির লহ নমস্কার।

মিশ্র ঝিঁঝিট—একতালা

আজি ধর প্রীতি-ফুল-হার-চন্দন।
এস রাণী ভবানীর কুল-গৌরব হে বাণীর প্রিয় নন্দন!
আজি প্রবাসী বাঙ্গালী-মাঝে
যদি এলে দয়া করি বস হৃদাসনে
মধুর শারদ সাঁঝে।
মোরা বাঙ্গালী কাঙ্গালী কিবা দিব আজ
হে ভক্তিভাজন, হে বরেন্দ্ররাজ,
সুধু লহ নমস্কার, নীরব প্রণাম
করি তব অভিবাদন।

(মহারাজা বাহাদুরের বক্তৃতা)

কেবলমাত্র শঙ্করের জটাটবীচারিণী এই নগরীর প্রান্ত-বিহারিণী বলিয়া, ইহা তীর্থসদৃশ পুণ্যভূমি হয় নাই—বর্ত্তমান বিহারের রাজধানী একদিন বহু 'বিহার', বহু 'সঙ্ঘারাম' বুকে করিয়া ভারতের প্রান্তে প্রান্তে জ্ঞানরশ্মি বিকীরণ করিয়াছে—সেইজন্য ইহা পুণ্যভূমি; দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে দুঃখক্লিষ্ট রাজকুমারের শ্রবণমূলে এই ভূমির জড় বনস্পতি অপূর্ব্ব সুধাময়ী দুঃখহারিণী অমৃতবাণী বলিয়া একদিন প্রায় সমগ্র জগতের দুঃখ-ব্যথা অপহরণ করিয়াছিল—সেইজন্য ইহা পুণ্যভূমি; যে ভূমির উপর একদিন ভারতের বোধ করি সর্ব্বপ্রথম সার্ব্বভৌম নরপতির নানা বিচিত্র রত্নখচিত স্বর্ণ-সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল—এ ভূমি সেই তীর্থসদৃশ প্রার্থিত ভূমি বলিয়া ইহা পুণ্যভূমি; কুশ-মূল নিম্মূলপরায়ণ ব্রাহ্মণের অপরিসীম জ্ঞান ও বুদ্ধির লীলাভূমি বলিয়া, এই ভূমি আজ গৌরবের ভূমি; আজও পর্য্যন্ত যে ভূমির পূর্ব্বগৌরব ইতিহাস বা কিংবদন্তিগত পুরাতন কথা নয়, আজিও শোকহীন অশোকের কীর্ত্তি-স্তম্ভ যে ভূমি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে—এই সেই ভূমি বলিয়া ইহা পুণ্যভূমি; প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র বিদ্যার্থীর একত্র বিদ্যার্জ্জনের উপযোগী চতুষ্পাঠী 'নালন্দে'র আনন্দময় ভূমি বলিয়া, ইহা পরম প্রার্থিত পুণ্যভূমি।

সেই মহা গৌরবের পবিত্র ভূমির উপর দাঁড়াইয়া, এতগুলি স্বদেশবাসীর অহেতুকী স্নেহবেষ্টনে আজ বদ্ধ হইয়া নিজকে কত ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছি, তাহা বলিবার সাধ্য আমার নাই।

জন্মাবধি প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে আমরা সকলেই অনর্গল বহু কথা বলিয়া থাকি; কিন্তু জীবনে দুটি-একটি পরম মুহূর্ত্ত আসে, যখন জীবন-শেষের সেই চরম দিনের মতই বাক্য রুদ্ধ হইয়া যায়; আজ আমার সেই অবস্থা। এই সমবেত সজ্জন সুধীবৃন্দের মধ্যে আমার প্রতিবেশী অনেকে আছেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে সমবয়স্ক সতীর্থও দুই-একজনকে দেখিতে পাইতেছি, যাঁহাদিগকে বহুবর্ষ পরে আজ দেখিলাম। জীবনারম্ভের বন্ধু-প্রীতি জীবন-শেষের দিনে প্রায়ই আশা করা যায় না—জীবন-যাত্রার ঘুর্ণায়মান চক্রে পড়িয়া, কত দুঃখ-শোকের অগ্নিদাহে জীবনের সরসতা শুকাইয়া যায়—জীবনাপরাহ্নে অস্তমান আয়ুঃ-সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া সকলকেই প্রত্যাশাকে যথাসাধ্য খর্ব্ব করিতেই হয়—তখন যদি জীবন-বসন্তের বান্ধবতার মলয়-মারুত-হিল্লোল-স্পর্শ কাহারও শুভাদৃষ্টে অপ্রত্যাশিতরূপে ঘটিয়া যায়, সেদিন তাহার মনঃকাননে অন্তরোল্লসিত কুসুমাবির্ভাবের যে আভাস আসে, তাহা অনুভবের জিনিষ—বলিবার নহে।

যে ভূমিতে আজ দাঁড়াইয়াছি, সেই পুণ্যভূমিতে কপিলাবস্তুর রাজকুমার শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে এবং তাহার পরেও হিন্দু-'দর্শন' সেকথা পুনঃপুনঃ দুঃখক্লিষ্ট ধরণীর মানবসন্তানকে জানাইয়া দিতে ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু আজ আমার

স্বদেশবাসিজনের অকারণ স্নেহস্পর্শে আমার আনন্দ-বিগলিত অন্তরে—বারংবার মনে হইতেছে—স্নেহের শৃঙ্খল ভগবান্ বুঝি কাটিবার জন্য মানবের মনে বল দেন নাই।

এ সংসারে যোগ্য সকলেই নহে; যোগ্যতার অনুপাতে দেনা-পাওনা বুঝিয়া লইতে হইলে, হয় ত আমাদের অনেককেই নিরাশ হইতে হইত। প্রজাপতির আনন্দময় বিশ্ব-সৃষ্টির অভ্যন্তরে নিরানন্দের বিষ-জর্জ্জর অন্তর লইয়া কেহই ম্লানমুখে বিদায় হইয়া যায়, ইহা বিধাতার ইচ্ছা নহে; তাই মানবের মনে অকারণ স্নেহ-প্রীতির সৃজন করিয়া আমার মত অকিঞ্চনকেও বিশ্বের আনন্দ-ভোজে পাতা পাড়িবার সুযোগ মধ্যে মধ্যে দিয়াছেন; নিতান্ত অন্ধ, আতুর, কাঙ্গালও যেন এই আনন্দ-যজ্ঞের প্রাঙ্গণ হইতে রিক্তহস্তে, তৃষিত কণ্ঠে, ক্ষুধিত মনে ফিরিয়া না যায়—এই বুঝি ইচ্ছাময় যজ্ঞেশ্বরের ইচ্ছা।

আজকার মত দিন জীবনে বহুবার ত আসে নাই, আসিবার মত প্রত্যাশা করিতেও ভরসা পাই নাই; অযাচিতে যাহা আসিয়াছে, অপ্রার্থিতভাবে যাহা পাইয়াছি, তাহা আজ বড় সত্য বলিয়া মনে হইতেছে এবং সত্য বলিয়াই তাহা চিরন্তন হইবে, এ আশাকে দুরাশা বলিতে আজ ইচ্ছা হইতেছে না।

নানা মোহময় মিথ্যাজালের মধ্যে জড়িত থাকিয়াও মানবের মন আবহমান কাল হইতে সত্যেরই অনুসন্ধানে ফিরিতেছে; যে পর্য্যন্ত সত্যের সন্ধান না পায়, ততদিন মনের বিরাম নাই, বিরতি নাই, 'নেতি' 'নেতি' করিয়া অন্বেষণেরও নিবৃত্তি নাই। সেই চরম সত্য, সেই পরম পদার্থ যতদিনেই অন্তরের মধ্যে ধরা দিক্ না কেন, তাহারই অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে; যেদিন সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, যেদিন সেই আরাধ্য সত্যকে প্রাণের মধ্যে বরণ করিয়া নিতে পারিবে, সেইদিনে মানবের জন্ম, জীবন সফলতার চরম তীর্থে গিয়া তাহার অবিশ্রামগতি যাত্রার অবসান হইয়া যাইবে।

যে সত্য জীবনের সার্থকতা আনিয়া দিবে, তাহা দুঃখের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া দুঃখেই বর্দ্ধিত হইয়া, দুঃখেরই মধ্যে পরিণতিকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। সার্থকতা যাহার চরম পরিণতি, আনন্দে তাহার জন্ম এবং আনন্দের মধ্যেই তাহার পরিবর্দ্ধন অপরিহার্য্য; সেইজন্য কবি, তাঁহার কাব্যে আনন্দ-সৃজনের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; ভাস্কর, তাঁহার আনন্দোত্থিত কল্পনাকে অপার, অসীম আনন্দের মধ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করিবার অধিকার দিতে প্রয়াসের অবধি রাখিতেছেন না; চিত্রকর, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানসীর অমূর্ত্ত রূপের পদতলে ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে বসিয়া রহিয়াছেন; সকলেরই ধ্যেয় ধন, সেই সত্যেরই আবিষ্কার করা একমাত্র উদ্দেশ্য। আনন্দের মধ্যেই তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। ভুল পথে যাত্রা করিলে, যেমন গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার শত বিঘ্ন ঘটে, তেমনই নিরানন্দের মধ্যে সত্যের উপলব্ধির চেষ্টা, ব্যর্থ চেষ্টা; যদি সেই অমূল্য স্পর্শমণির সন্ধান কোনদিন পাওয়া যায়, তবে আনন্দের মধ্যেই পাইতে হইবে—দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুজলের প্লাবনের মধ্যে নহে। আনন্দস্বরূপ সেই অখণ্ড, অনন্ত, অব্যয়, অরূপ ও অনির্ব্বচনীয় অপরূপকে প্রাপ্ত হইতে হইলে, জীবনের এই খণ্ড খণ্ড আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না,—সীমার মধ্যেই অসীমকে, অন্তের মধ্যেই অনন্তকে ধরিবার জন্য আকুল বাহুকে ব্যগ্রভাবে বাড়াইয়া দিতে হইবে।

অপরিণত বয়সে বুলবুলের লড়াই আমার পরম প্রীতি উৎপাদন করিত। বিদ্যালয়ের অবসরে আত্মীয়গণের-স্নেহ পরিবেষ্টনের মধ্যে যখন আসিতাম, তখন এই ক্ষুদ্র পাখীর যুদ্ধোদ্যম আমার বালক-মনকে বড় আনন্দই দিত। বুলবুল্-লড়াইয়ের একটি পদ্ধতি আছে— প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষিদ্বয়কে পূর্ব্বাহ্নে অভুক্ত রাখিয়া ক্ষুধাতুর এবং সচেষ্ট রাখিতে হয়; অপরাহ্নে ছাতুর গোলা তাহাদের মধ্যে ধরিলে, তাহারা সক্তু-ভোজনের আনন্দলাভের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে। মনে হয়, এই নানা দুঃখ, দৈন্য, শোকে পরিম্লান সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের মুহূর্ত্তগুলি সেই ছাতুর গোলা। অণুপরিমিত আনন্দের আস্বাদ পাইলে, আমরা আনন্দের অফুরন্ত আকরের অনুসন্ধান করিব; তাই বুঝি অপরূপ ঐন্দ্রজালিক অন্তঃপটে বসিয়া আনন্দের পরম মাধুর্য্যময় আভাস আমাদের নয়ন-মনের সম্মুখে বারংবার ধরিতেছেন! সেই দেব-প্রসাদে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলে, জীবনের সার্থকতালাভ হয় কি না, পরম সমস্যার কথা; কিন্তু বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা যে করেই না, একথা আমার মন দিয়া আজ অস্ফুটস্বরে নহে, উচ্চকণ্ঠে, প্রগল্ভের মত বার-বার করিয়া বলিব। জীবনের মধ্যে কখনও কখনও যে আনন্দময় সত্যকে আমরা উপলব্ধি করি, জগতের কাব্য, সাহিত্য-পরিকল্পনার প্রভাবে সেই সত্যের নানা অপরূপ স্ফুরণ নানাভাবে আমাদের মনের সম্মুখে ধরিয়া আমাদের সত্যানুসন্ধান-স্পৃহা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। যেদিন আমরা আনন্দকে হৃদয়ে স্থান দিবার মত হৃদয়কে প্রশস্ত করিতে পারিব, যেদিন নির্ভয়ে পরম সত্যকে বরণ করিয়া নিবার মত সাহস হৃদয়ে সঞ্চয় করিতে পারিয়া জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব, সেদিন জগতের সাহিত্য ধন্য হইবে এবং আমাদের জীবনও সার্থক হইবে। এমন কথা সাহস করিয়া বলিতেছি না যে, কাব্য, সাহিত্য পাঠশালার গুরুমহাশয়ের মত বেত্রাঘাতে আমাদিগকে আনন্দময় সত্যের উপলব্ধির পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কবি, তাঁহার কাব্যের মধ্যে আনন্দ-লোক সৃজন করিতেছেন। আমাদের কাজ, সেই কাব্য-জগতের কল্পিত সত্যের সহিত জীবনের সত্যের সামঞ্জস্য উদ্ঘাটন করিয়া লওয়া; যদি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বুঝিতে পারি, তবে যেদিন তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া, তাহার গলায় বরণ-মাল্য পরাইতে পারিব, সেইদিন এ জীবনব্যাপী দুঃখ, দৈন্য, হাহাকার নিঃশেষে মরিয়া না গেলেও, জীবন যে বহনীয় হইবে, তাহাতে সন্দিহান হইবার বলবৎ কারণ আছে কি না, আমি জানি না। সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে বহুদিনের বহু সাধনার প্রয়োজন—হয় ত বা এক জীবন, জন্মে তাহা না হইতেও পারে; একাগ্রমনে, একনিষ্ঠ হৃদয়ে, অসীম আগ্রহের সহিত হয় ত বা জন্ম-জন্মের আরাধনায় আরাধ্য ও ঈপ্সিত পদার্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, ততদিন ধ্যান-মগ্ন চিত্তে নবোদিত ঊষার অরুণালোকের জন্য প্রতীক্ষা ছাড়া মানবের গত্যন্তর নাই; কিন্তু জীবন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য, এই সংসারের দুর্ব্বহ দুঃখ-ভার-প্রপীড়িত জীবনকে বহনীয় করিবার জন্য অনায়াসলব্ধ, স্বেচ্ছাগত, স্বল্প আনন্দের অমলিন স্বচ্ছ ধারাকে বুক পাতিয়া নিলে, তবেই এ সংসারের মরু-বালুকায় কোনমতে বিচরণ করিতে পারা যায়।

আমার জীবনের আজকার এই পরম স্মরণীয় দিনের অপ্রত্যাশিত প্রচুর আনন্দের সুখ-স্মৃতিকে কৃপণের ধনের মত হৃদয়তলে পরম আগ্রহের সহিত সঞ্চিত করিয়া রাখিলাম; কারণ, স্নেহ-সম্পদকে হেলায় যদৃচ্ছস্থানে ফেলিয়া রাখিতে পারি, এমন স্নেহ-ধনে ধনী আমি নই। আপনাদের এ স্নেহ-ঋণের গুরুভারে আজ আমার মস্তক নত হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু বিশ্বাস করিবেন, আনন্দের উন্মাদনায় হৃদয় আজ অবনত নহে, উচ্ছ্বসিত।

সমালোচনা

"প্রাচীন ভারত"—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

বিদেশীয় পর্য্যটকগণ প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যাহা-কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুবাদকার্য্যে অনন্যকর্ম্মা যোগীন্দ্রবাবু মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন; এজন্য তিনি বঙ্গবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। বাঙ্গালা-সাহিত্যের পাঠকদিগকে তাঁহার পরিচয় দিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তাঁহার লিখিত শত শত সুন্দর মৌলিক গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, অনূদিত প্রবন্ধ ও মনোজ্ঞ ভ্রমণ-কাহিনী বাঙ্গালীর চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। ভারতের ইতিহাস নাই, এই কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। মাতৃভাষার সেবা করিয়া সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসকল আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়া তিনি নিজেও ধন্য হইয়াছেন; আমাদিগকেও কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত সমসাময়িক ভারত সম্পূর্ণ হইলে এক অভিনব বস্তু হইবে। তাঁহার সংগৃহীত উপাদানসকলের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া ভবিষ্যতে ভারতের ইতিহাস লিখিত হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ-সকলের রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। সুপ্রাচীন হেরোডোটাস্, ষ্ট্রাবো, প্লিনি, আরিয়ান, মেগাস্থিনিস্ প্রভৃতি জনকয়েক মনীষীর গ্রন্থের বা তাঁহাদের গ্রন্থের অংশবিশেষের অনুবাদ ব্যতীত পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় এরূপ ধারাবাহিক বিবরণ আর বাহির হয় নাই। এই সকল বিক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়—অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ জানিতে পারা যায়—তখনকার ভারতবাসীদের আচার,ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ও জানা যায়। অবশ্য ভ্রমণকারীদের সকল বৃত্তান্তই যে অভ্রান্ত, একথা কেহই স্বীকার করিবেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই ভ্রম নিরাকরণ মানসে আলোচনা করিয়া সত্য-নির্দ্ধারণের অনেকটা উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন। কোন্ কথাটা আমরা বিশ্বাস করিব আর কোন্ কথাটা অবিশ্বাস করিব তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কতকগুলি উপায় ও নির্দ্ধারিত আছে। যে সকল বৃত্তান্ত প্রকৃতির অনুকূল নহে—যে সকল তথাকথিত সত্য অবিসংবাদী প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত তাহা কখন সত্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। ভূয়োদর্শন ফলে আমরা যে সকল সত্যে উপনীত হই, সে সকল সত্যের বিপরীত কোন কিছু সত্য হইতে পারে না; তবে যদি এরূপ বহুতর নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন আমরা পূর্ব্ব সত্যের প্রতি সন্দিহান হইতে পারি। আরোহ-পদ্ধতিক্রমে (inductive generalisation) যে সকল সত্যে উপনীত হওয়া যায় কোনস্থলে তাহাদের ব্যতিক্রম দেখিলে আমরা সে ঘটনার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হই। ভ্রমণকারীদের কথিত সেই সকল নূতন বৃক্ষ বা জীবজন্তুর বর্ণনা আমরা বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি সেগুলি কার্য্য-কারণ-পরম্পরার বিপরীত নহে বা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অভিজ্ঞতার বিপক্ষে যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন (২য় খণ্ড ৬৭ পৃষ্ঠা) ষ্ট্রাবো বলিতেছেন,—দেশের কোন কোন স্থলে বাদুড়ের ন্যায় পক্ষ-বিশিষ্ট দ্বিহস্তদীর্ঘ সর্প আছে। তাহারা রাত্রিকালে উড়িয়া বেড়ায় এবং অসতর্ক ব্যক্তিগণের গাত্রে ঘর্ম্ম বা মূত্র নিক্ষেপ করিয়া গলিত ক্ষত উৎপাদন করে। অত্যন্ত বৃহদাকারের পক্ষবিশিষ্ট বৃশ্চিকও দেখিতে পাওয়া যায়।" ইলিয়ান ও সর্প-সূত্রের বিষয় ঠিক পূর্ব্বোক্ত রূপই লিখিয়াছেন। অন্যত্র ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন (২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১০১২) "এই উপত্যকার নিম্ন ভাগে সুবর্ণের খনি আছে, এবং তজ্জন্যই এই স্থানে সুবর্ণ খননকারী পিপীলিকা দৃষ্ট হয়। এই সকল পিপীলিকা আকারে বন্যশৃগাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগামী এবং মৃগয়ালব্ধ দ্রব্যে জীবন ধারণ করে।" এ সকল কথায় কি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়? এ পর্য্যন্ত ভারতে কেন জগতে কুত্রাপি এরূপ পিপীলিকার বিদ্যা শ্রুত হওয়া যায় নাই অথবা তাহাদের জীবাস্থিও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মেগাস্থিনিস নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, পিপীলিকা সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি প্রকৃতপক্ষেই সত্য (পৃষ্ঠা ১০৩)। আবার দেখুন আরিয়ান শিলাস নদী সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইহাতে কোন জন্তুই সন্তরণ করিতে পারে না এবং কোন দ্রব্যই ইহাতে ভাসমান থাকে না; ইহার মধ্যে যে সকল দ্রব্য পড়ে, তাহাই নদীর তলদেশে পতিত হয়।" (পৃষ্ঠা ৮৩)। লঘু দ্রব্য জলে ভাসিবে; ইহা জলের স্বধর্ম্ম ইহার বিপরীত কথাতে কি বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। অন্যত্র ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন—"মেগাস্থিনিস বলেন যে, যে সকল জাতি ককেসাস পর্ব্বতে বাস করে, তাহারা আত্মীয় স্বজনের দেহ ভক্ষণ করে।" হেরোডোটাস বলিয়াছেন যে, ভারতীয় জাতির মধ্যে মনুষ্য-মাংস আহার প্রচারিত আছে। অসভ্য বর্ব্বর জাতিদের ভিতর নর-মাংস ভক্ষণ প্রচলিত আছে সত্য, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের দেহ ভক্ষণ করাটা শীঘ্র বিশ্বাস করা যায় না। সকলেই যদি আত্মীয়-স্বজনের মাংস ভক্ষণ করিতে তৎপর হয়, তবে জাতিটা কতদিন টিকিতে পারে? অন্যত্র ভারতীয় দার্শনিক প্রবন্ধে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ষ্ট্রাবো বলিতেছেন—"ইহারা ঔষধপ্রয়োগে রমণীগণকে বহু সন্তানবতী করিতে পারেন এবং ইচ্ছামত সন্তানদিগকে পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় করিতে পারেন।" (১৮০ পৃঃ) ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রমণীগণকে বহুসন্তানবতী করা সম্ভবপর; কিন্তু ইচ্ছামত সন্তানদিগকে পুরুষ বা স্ত্রীজাতীয় করা কিরূপে সম্ভবপর, তাহাত বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য জগতে জনন-বিদ্যা সম্বন্ধে এখন খুব আলোচনা চলিতেছে, দেখা যাউক; তাহারা এরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন কি না? তবে একথা ঠিক, নানা মুনির নানা মত হইলেও যত্ন ও পরিশ্রম করিলে আমরা যে সে সকলের মধ্য হইতে সামঞ্জস্য করিয়া সত্যে উপনীত হইতে পারিব তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আর যোগীন্দ্রবাবুও তাঁহার পুস্তকের পাদটীকায় ও ভূমিকায় এ সকল গণ্ডগোলের মীমাংসা করিয়া দিবার কতকটা চেষ্টা করিয়াছেন এবং আমাদের মনে হয়, অনেকস্থলে তিনি সফলকামও হইয়াছেন।

পাদটীকাগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়. যোগীন্দ্রবাবুর ঐতিহাসিক জ্ঞানের গভীরতা কতদূর। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ-শক্তিও যে তাঁহার বেশ আছে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। সত্যের প্রতি তাঁহার অচলা নিষ্ঠা। সত্য-প্রতিষ্ঠায় তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন আছে। একটা নূতন কিছু করার মোহে তিনি পড়েন নাই। নূতন অভিমত প্রচার করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই—করিয়াছেন সত্যের উদ্ধার-চেষ্টা।

"প্রাচীন ভারত" বিদেশীয় মূল-গ্রন্থের অনুবাদ নহে—অনুবাদের অনুবাদ; অবশ্য, এরূপস্থলে ভ্রম-ভ্রান্তি অনিবার্য্য। কথায় বলে,—"সাত নকলে আসল খাস্তা।" সময়ে সময়ে দুগ্ধের অভাব সেরূপ তক্রের দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়, এ-ক্ষেত্রে আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। মূল গ্রন্থ হইতে অনূদিত হইলে পুস্তকের উপযোগীতা আরও বৃদ্ধি পাইত সত্য, তবে আশার বিষয় এই, যে সকল পাশ্চাত্য মনীষীরা এই অনুবাদকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহারা তত্তৎ ভাষায় সকলেই সুপণ্ডিত। যে সকল পুস্তকের ২।৩খানি অনুবাদ আছে, যোগীন্দ্রবাবু তাহাদের মতের উল্লেখ করিয়া, কোন্ মতটী তাঁহার মতে গ্রহণযোগ্য, কারণসহ তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। আর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিত বিবরণগুলির মূল হইতে অনুবাদ, একের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, তাহা যখন সম্ভবপর নহে, তখন আমরা যাহা পাইতেছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট। এই বহু আয়াসসাধ্য ব্যাপারে অধ্যাপক সমাদ্দার-মহাশয় যেরূপ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন, তাহাতে তিনি যেন কৃতকার্য্য হন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

তাঁহার পুস্তকের চারি খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে হেরোডোটাস, ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রভৃতি ৩৭ জন গ্রীস্ রোম ও এসিয়া মাইনর প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন গ্রন্থকারগণের ভারত-বিবরণ অনূদিত হইয়াছে। অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ-খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

২য় খণ্ডে মেগাস্থিনিসের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মেগাস্থিনিসের মূল গ্রন্থ একরূপ বিলুপ্ত হইয়াছে। খণ্ড অংশবিশেষ সংগৃহীত হইয়া জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; তাহারই ইংরাজী-অনুবাদের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতেই ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ মৌর্য্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসন-প্রণালীর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩য় খণ্ডে আরিয়ান-লিখিত আলেকজান্দারের ভারত-বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

৮ম খণ্ডে চৈনিক পরিব্রাজকগণের বৃত্তান্ত আরম্ভ হইয়াছে। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই মহাশয় এই খণ্ডের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

২য়, ৩য় ও অষ্টম খণ্ডে তিনখানি প্রাচীন ভারতের মানচিত্র দিয়া ও পুস্তকগুলিকে সচিত্র করিয়া যোগীন্দ্রবাবু "প্রাচীন ভারতের" উপাদেয়তা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। পুস্তকগুলির ছাপা ও কাগজ সুন্দর; তবে লেখক-মহাশয় ব্যস্ততাপ্রযুক্ত বোধ হয় ভাষার সৌন্দর্য্যের দিকে ততটা মনোযোগ দিতে পারেন নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে এদিকে তিনি একটু অবহিত হইবেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমরাও একবাক্যে বলি—"অবশ্য তাঁহার এই সংগ্রহ ভারত-ইতিহাসের উপাদানমাত্র। * * * তিনি রত্নের সন্ধান দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অদম্য উৎসাহে ভারত ইতিহাসের উপাদান-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রত্ন আহরণ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিতেছেন। জানি না করে কাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়নাভিরাম ভারত-ইতিহাস-সৌধ নির্ম্মিত হইবে? তবে যাঁহার দ্বারাই এই কার্য্য সুসম্পন্ন হউক না কেন, যোগীন্দ্রবাবু তাঁহার পথ সহজ সরল করিয়া দিয়া যাইতেছেন তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ভগবানের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, তিনি সুস্থ শরীরে আরব্ধ কার্য্যে সাফল্য লাভ করুন।"

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

মর্ম্মবাণী

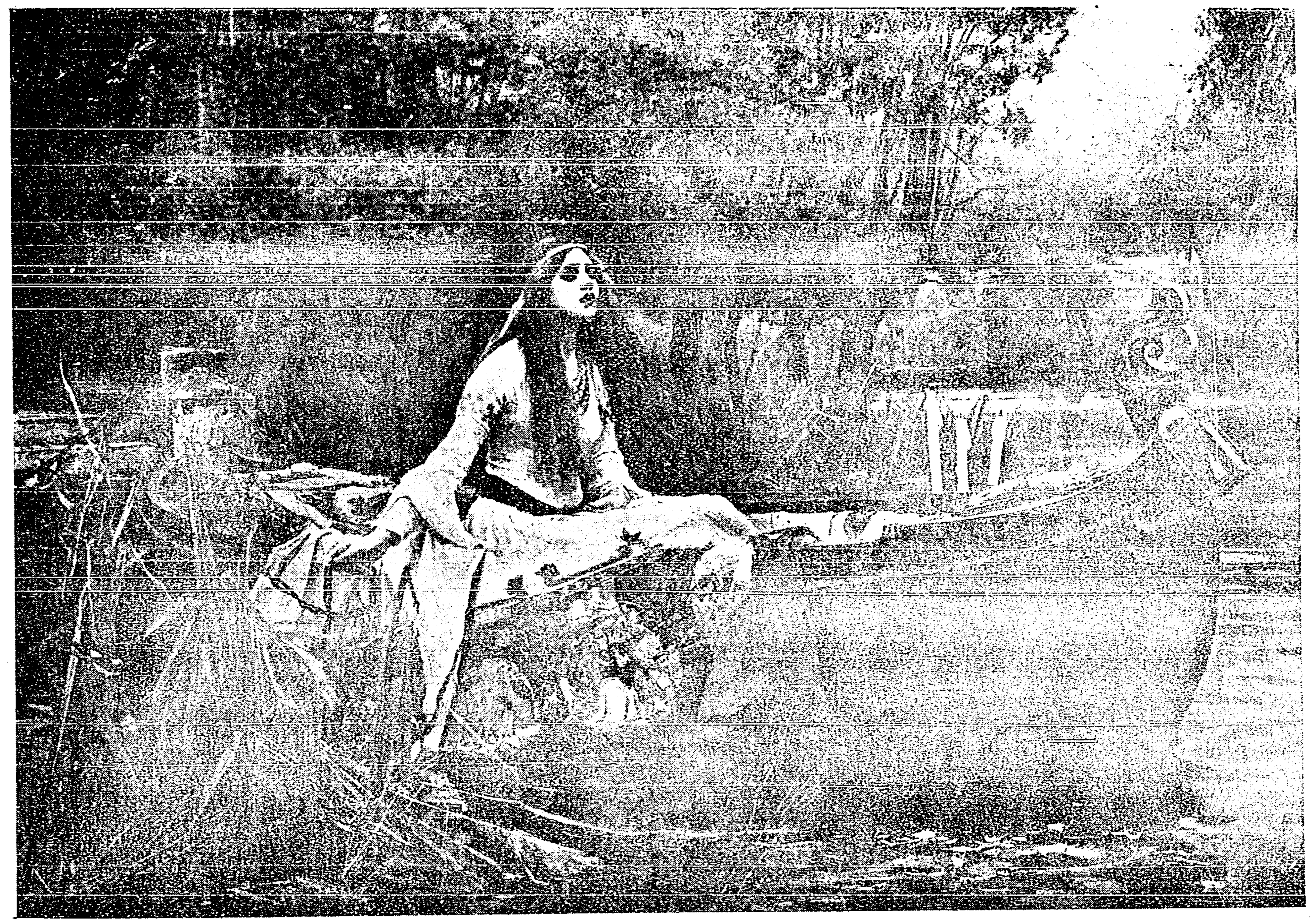

লেডি স্যালট

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ১৮ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ১৩শ সংখ্যা

আলোচনা

শিল্পের উপকারিতা

য়ুরোপের কর্ম্মবিপুলতা আমাদের সুপ্ত চিত্তকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। আমরা হঠাৎ বিজ্ঞান ও কল-কারখানার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। বিজ্ঞানের উপাসনা ও কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভারতের উন্নতির যে অন্য কোন উপায় নাই, একথা আজ-কাল আমরা যখন-তখনই শুনিতে পাই। ইহার যাথার্থ্য-সম্বন্ধে যে আমার কোন বিশেষ সন্দেহ আছে, সে কথা বলিতেছি না। তবে আমার বক্তব্য কি তাহাই নিবেদন করিতেছি ঃ—

অতীত কালের ইতিহাস আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জাতির মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্প একত্র উন্নতিলাভ করিয়াছে, সেই জাতিই অতি অল্পকালমধ্যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। গ্রীসের কথাই প্রথমে বলি। গ্রীসের উন্নতির কথা তুলিলেই, এক-সঙ্গে তাহার দর্শন ও শিল্পের কথা মনে হয়। গ্রীস, তাহার উন্নতির জন্য উভয়ের নিকটই তুল্যরূপে ঋণী। ভারত-ইতিহাসের জীর্ণ পৃষ্ঠা উল্টাইলে, তাহার গৌরবময় যুগের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই যুগের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ভারতের স্থাপত্য-শিল্প তাহার কতটা স্থান পূর্ণ করিয়াছিল। সত্য ও সুন্দর, এই দুইটি পদার্থের একত্র যোগ না হইলে, কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর নয়। এই দুইটি পদার্থের মধ্যে যেখানে একটির অভাব হয়, সেইখানেই জাতীয় উন্নতি খর্ব্ব ও পঙ্গু হইয়া পড়ে।

জাতিগত উন্নতি সম্বন্ধে যেমন একথা সত্য, ব্যক্তিগত উন্নতি সম্বন্ধে তেমনই আর এক কথা সত্য। জ্ঞান ও বুদ্ধি মানব-চরিত্রের একভাগ প্রকাশ করে মাত্র; তাহার অপরভাগ আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও অনুভূতিদ্বারা গঠিত। ইহাদের তৃপ্তি ও সার্থকতার জন্য সৌন্দর্য্যের উপাসনা আবশ্যক। এই উপাসনার অর্থ—সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুভূতি।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্থ-চিন্তামগ্ন কর্ম্মময় জীবনের দ্বারা বর্ত্তমানকালে য়ুরোপ হইতে হৃদয় নামক পদার্থটা ক্রমশঃই নির্ব্বাসিত হইয়া পড়িতেছে। যে মনোবৃত্তির জন্য মানুষ পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পদবীর অধিকারী, তাহার অনুশীলন করিবার পথে নানা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।

কিন্তু সুখের বিষয়, ভারতবাসী স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ জাতি; তাই তাহাকে এই তথ্যটি বুঝাইবার জন্য বিশেষ পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষ কখনই পারত্রিক সাফল্য পরিত্যাগ করিয়া ইহ-জগৎকেই সর্ব্বস্ব করিয়া লয় নাই। এই য়ুরোপীয় সভ্যতার দিনেও কোলাহলময় নগর ছাড়িয়া, ছায়া-শীতল গ্রামের মধ্যে আজিও ভারতের সেই প্রাচীনতম প্রকৃতিটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ভারত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাক্ষেত্র; এত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে লালিত হইয়া, ভারতবাসী স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়া উঠে। সৌন্দর্য্যকে প্রাণ দিয়া অনুভব করিবার পক্ষে ভারত-বাসীর যত সুযোগ আছে, পৃথিবীর অপর কোন জাতির এত সুযোগ আছে কি না, জানি না।

এত সুবিধাসত্ত্বেও ভারত হইতে বর্ত্তমান সময়ে শিল্প নামক পদার্থটি একেবারে নির্ব্বাসিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহার কারণ কি? অন্য দেশের শিল্পের কথা বলিতেছি না। যে শিল্প একান্ত ভারতীয় এবং যাহার পুষ্টি ও পরিণতি একমাত্র ভারতেই সম্ভবপর, যাহা সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীকে আশা ও আনন্দ দান করিয়াছে, আজ আর তাহা আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া তুলিতে পারে না কেন? ইহার একমাত্র প্রধান কারণ—ইহার প্রতি আমাদিগের একান্ত অমনোযোগিতা। আমাদের সন্তানগণ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-সমুদ্র পার হইয়া, জগতে কৃতিত্বলাভ করিতে পারে, তাহার প্রতিই আমাদের মনোযোগ করিতে হয়,—কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি-অনুশীলন ব্যতীত শিক্ষার যে আরও একটা অংশ আছে, একথা আমাদের মনেই পড়ে না। অত্যধিক বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন-ফলে আমরা হৃদয় নামক পদার্থটাকে একেবারে 'জবাই' করিয়া, আত্ম-সুখান্বেষী, নাস্তিক ও হৃদয়হীন হইয়া উঠি—আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়। নিতান্ত অশিক্ষিত ব্যক্তিও যে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়া, সহস্র

চেষ্টাতেও তাহা অনুভব পর্য্যন্ত করিতে পারি না। তাহার কারণ আমরা মনে করি, বুঝি-বা পৃথিবীতে সমস্ত পদার্থ হিসাব করিয়া, আইনের খুঁটি-নাটি ও বুদ্ধির দ্বারা আয়ত্ত করা যায়; কিন্তু সৌন্দর্য্যকে আয়ত্ত করিতে হইলে যে, হৃদয় নামক পদার্থটার অনুশীলন প্রয়োজন, একথা ভুলিয়া গিয়াই যত গোল বাধাইয়া বসি।

ইহাতেই আমাদের দেশের শিল্প নষ্ট হইয়াছে। এই জন্যই আমরা 'ঢাকাই মস্‌লিন্' ছাড়িয়া 'জর্ম্মাণ-সিল্কে'র প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি। 'মছলন্দ' ও 'সতরঞ্চ' ছাড়িয়া নয়ন-তৃপ্তিপ্রদ বিলাতী শয্যা রচনা করিয়াছি, 'সট্‌কা' ছাড়িয়া বিলাতী 'চুরুট' ধরিয়াছি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও এই দোষ অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু তথাকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, ইহার পরিণাম চিন্তা করিয়া, আজকাল সাধারণ শিক্ষার সহিত শিল্প-শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন। এ-সম্বন্ধে Miss Freducisca Arundale বলেন, "The lack of the sense of beauty and ever-mastering pressure of commercialism has brought about so terrible a state of things in England, that some of the more fore-seeing minds, trembling for their country's future, have at last, awakened to its realisation, that something nobler is required for their children's development than dreary school-rooms and well-arranged time-tables" কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প-শিক্ষা এখনও হতাদৃত; ইহার চর্চ্চা অল্পবুদ্ধিতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত।

আমাদের দেশ হইতে শিল্প-চর্চ্চা উঠিয়া যাওয়ায়, আমরা যে সুধু আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্প হইতে আর রসগ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তাহা নয়; বুদ্ধির দ্বারা শিল্পকে আয়ত্ত করিতে গিয়া, তাহাকে বিকৃত করিতেছি। অবশ্য, আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অন্যদেশেও আছেন। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও আজকাল শিল্পের অদ্ভুত সমালোচনা হইয়া থাকে। তথায় এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে, যাঁহারা মনে করেন যে, চিত্র বুঝি-বা প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ। এইজন্য তাঁহারা চিত্র-শিল্পকে নিয়মের নিগড়ে বাঁধিতে চান। নিয়মের একটু ইতর-বিশেষ হইলেই, তাঁহারা কঠিন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, প্রতিভা সর্ব্বত্র নিয়ম মানিয়া চলে না; এবং আমরা যাহাকে প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলি, তাহা নিয়মের অতীত। চক্ষু লইয়া বিচার করিলে, সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না,—ভক্তের হৃদয় চাই। এ-সম্বন্ধে Sir John Reynolds বলেন,—There is another kind of critic still worse who judges by narrow rules and those too often false, and which, though should be true and founded on nature, will lead him but a very little way towards the just estimation of the sublime beauties in works of genius, for whatever part of an art can be executed or criticised by rules that part is no longer the work of genius which implies excellence but of the reach of rules. For these rules being always uppermost, give them such a propensity to criticise that instead of giving up the reins of their imagination into their author's hands, their frigid minds are employed in examining whatever performance be according to the rules of art.

আমাদের প্রাচীন চিত্রের আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন চিত্রকরগণ প্রায়ই নিয়ম মানিয়া চলিতেন না। তাঁহাদের চিত্রে semetryর একান্ত অভাব। এই জন্যই কিছুদিন আগে আমরা সেগুলিকে অসার বলিয়া মনে করিতাম; কিন্তু আজকাল ইংলণ্ডের কলা-সমালোচকগণের সমালোচনা পাঠ করিয়া দেখিতেছি যে, সেগুলি একান্ত অসার নয়, অধিকন্তু উচ্চ শিল্পের পরিচায়ক; কারণ, যাঁহারা চিত্রের মধ্যে হৃদয়-ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন, তাঁহারা যে ইচ্ছা করিলে নিয়মের খুঁটি-নাটি মানিয়া চলিতে পারিতেন না, এমন নয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই সে সব নিয়ম পরিহার করিয়াছিলেন; কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, নিয়মের খুঁটি-নাটি ও আইনের বাঁধাবাঁধিতে শিল্প পঙ্গু হইয়া পড়ে। এ-সম্বন্ধে একজন সমালোচক বলেন, "যেমন অতিরিক্ত অলঙ্কারে কবিত্বের প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টত্ব চলিয়া যায়, তেমনই এই সব নিয়ম মানিয়া চলিলে, চিত্র-শিল্প নিতান্ত নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্য পদ্যে ও চিত্রে নিয়ম পরিহার করা উচিত।" কল্পনাকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য পদ্যে অলঙ্কারের প্রয়োজন; কিন্তু অলঙ্কারের চাপে পদ্যকে মুহ্যমান করিয়া তুলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে। সেইরূপ প্রাকৃতিক নকল করিতে গিয়া যদি অন্তর্নিহিত ভাবকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্রে প্রাকৃতিক নিয়ম বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয়। এইজন্য মাইকেল, এঞ্জিলো ও রাফেল প্রভৃতি চিত্রকরগণের চিত্র সর্ব্বত্র নিয়মসঙ্গত নহে; সমালোচকগণ, ইঁহাদের চিত্রে তাই নিয়ম-বিদ্রোহিতা লক্ষ্য করিয়া প্রায়ই খেদ করিয়া থাকেন। অন্য পরে কা কথা।

উপসংহারে বলিতে চাই যে, বিদ্যালয় হইতেই বালকগণের চিত্র-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইতে চেষ্টা করা উচিত। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে আজকাল বালকদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান অনুশীলন করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হইতেছে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে তপোবনে গুরুর পার্শ্বে বসিয়া উন্মুক্ত প্রকৃতি-রাজ্যে ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষা করিত। আজকাল য়ুরোপেও এই ভাবের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিদ্যালয়ের কারাগৃহ ছাড়িয়া স্বাধীন বাতাসে ও সুন্দর উপবনের মধ্যে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার আয়োজন হইতেছে। বিদ্যালয়, নানা উচ্চ শিল্পীর চিত্রে সুশোভিত হইয়াছে; অবকাশকালে ছাত্রদিগকে নিয়মিতভাবে প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ দেখাইয়া আনিবার কথা হইতেছে; কিন্তু আমাদের দেশে এরূপ চেষ্টার কোন আয়োজনই দেখা যাইতেছে না। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

সাহিত্যে ব্যভিচার

প্রথম :—একালের কবিতা

কবিতা লেখা খুব ভাল। আর, ভাল বলিয়াই বোধ হয়, এত বাঙ্গালী কবিতা লিখিতে ভালবাসেন।

কিন্তু ভালবাসা হ'চ্ছে দু-রকম। এক প্রেমের ভালবাসা; আর এক কামের ভালবাসা। আজকাল মাসিক-পত্রাদিতে যখন-তখন রাশি রাশি যে-শ্রেণীর কবিতার ছড়াছড়ি হয়, সূক্ষ্ম সমালোচনার অনুবীক্ষণেও তাহাদের ভিতরে 'প্রেমে'র অস্তিত্ব পাওয়া যায় না; সে সকল পড়িলেই বুঝা যায়, কাব্য-রাণীকে কবিরা কেবল কামের চোখেই নিরীক্ষণ করিয়াছেন। নবীন

কবিদের ভিতরে দু-চারজন খাঁটি কবি আছেন বটে, কিন্তু ঐই সকল পচা, ঝরাফুলের বিষম দুর্গন্ধে তাঁহাদের কবিতা-কুসুমের গন্ধ প্রায় ঢাকা পড়িবার যো হইয়াছে।

আমাদের নবীন কবিরা চারিদিক্ হইতে কেবল মিঠা শব্দ জোগাড় করিয়া কবিতার 'কাঠামো' তৈয়ারি করিতে চান— চিন্তাশীলতা বা কল্পনার স্ফূর্ত্তি তাঁহাদের ভিতরে প্রায় কাহারও কবিতাতে নাই। মানে হ'ক্ আর নাই হ'ক্—তাঁহারা খালি শব্দেরই মধুচক্র লুঠ্ করিবেন। ভাল কবিদের রচনা মাঝে মাঝে দুর্ব্বোধ হয় বটে,—কিন্তু সে হয় ভাবের গভীরতায়; আর নবীনদের কবিতা দুর্ব্বোধ হইতেছে ভাবের অস্পষ্টতায়, প্রকাশ করিবার অক্ষমতায়। শক্তিধর কবির কাব্যে যখনই একটি মিঠা, মোলায়েম শব্দ পাওয়া যায়, তখনই সেটি চুরি করা হয়,—তারপর একেবারে বে-মানান হইলেও কবিতার যেখানে সেখানে সেই শব্দটি বসাইয়া দেওয়া হয়,—(আমাদের নবীন কবিরা এমনই শব্দপাগল হইয়া উঠিয়াছেন); সুতরাং কবিতায় খালি পাঠক-জব্দ-করা শব্দের ঝুম্‌ঝুমিই বাজিতে থাকে—অর্থ বা ভাব একেবারেই মাঠে মারা যায়।

আপাততঃ আঁধারে ঢিল না ছুঁড়িয়া, আমি কি-রকম কবিতার কথা বলিতেছি, তাহার একটি চমৎকার আদর্শ দেখাইব। যে আদর্শের কথা বলিতেছি, তাহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিতেছি না; আমার লক্ষ্য একালের অধিকাংশ উদীয়মান কবিদের প্রতি। বলিতে কি, আলোচ্য আদর্শ আধুনিক কাব্যের ভূমিকাস্বরূপ,—এই একটিমাত্র কবিতায় একালের সমস্ত দোষ একেবারে খোলসা করিয়া দেখান' হইয়াছে।

'একালের দোষ' বলিতে কি বুঝায়?—ব্যর্থ অনুকরণ, অস্পষ্টতা, ভাবহীনতা, আড়ষ্ট ভাষা, পুনরুক্তি, অস্থানে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং কবিতার সঙ্গে কবির সহানুভূতিশূন্যতা প্রভৃতি।

কবিতার নাম "লক্ষ্মী-পূর্ণিমা।" আরম্ভ এইরূপ—

"আজ্‌কে ঐ আকাশ হতে সোণার রথে ঝর্‌ল কে?
দিগ্বিদিকে ভাসিয়ে দিয়ে হাসির ঝোরা খুল্‌লে কে?
খুল্‌ল কে ঐ গলা-মোতির লক্ষ নদীর ঝর্‌ণাটা?
উড়িয়ে দিলে চূর্ণ হীরার রেণুর গড়া ওড়্‌নাটা?
লক্ষ্মীদেবীর আড়ৎ আজি মুক্ত বুঝি আশ্‌মানে,
ঝর্‌ঝরিয়ে ছড়িয়ে গেল তাই এ ধরার মাঝ্‌খানে।"

আরম্ভ দেখিয়াই বুঝা যাইতেছে, ইহা সুকবি সত্যেন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ। উপরের কয় পংক্তিতে মিঠা মোলায়েম শব্দ দিয়া কবি এক কোমল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে চাহিয়াছেন; কিন্তু মিষ্ট শব্দগুলির মধ্যে যখন 'আড়ৎ' দেখি, তখন কাণের কাছেও খড়াৎ করিয়া হঠাৎ কি একটা বেসুরো আওয়াজ বাজিয়া উঠিয়া সব রস 'পান্‌সে' করিয়া দেয়। এ যেন বীণার মধুর আলাপ করিতে করিতে কিছু না বলিয়া-কহিয়া দুটো খড়ম লইয়া আচম্‌কা খট্‌খট্ শব্দ করিয়া বসা। Musicএ কবির যে কতটা বোধ, এই একটিমাত্র শব্দপ্রয়োগে তাহা টের পাওয়া যায়।

কবিরা ক্রমেই ভগবানের মত সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া উঠিতেছেন; সুতরাং আলোচ্য কবিতার কবিও বড়কে ছোট না করিয়া ছাড়েন নাই। 'গাঁ' বলিতে আমরা গ্রাম বুঝি। গ্রাম বা গাঁ নগরের চেয়ে ছোট; কিন্তু কবির কল্পনা এমনই তাড়াতাড়ি দৌড় মারিয়াছে (ঘণ্টায় কত মাইল, তাহা জানি না) যে, এত বড় 'মর্ত্ত্য'টা একেবারে একরত্তি 'গাঁ'য়ের মত ছোট্ট হইয়া গিয়াছে। যদি কোন বদ্‌রসিক জিজ্ঞাসা করেন, "মর্ত্ত্য, গাঁ হবার কারণ কি?" কবি তবে উত্তর দিবেন, "কারণ আছে।"— "কারণটা কি শুনি না মশাই!"

"এই যে বল্‌ছি—

'পরীর দেশে ধরায় আনি, মর্ত্ত্যে করি পরীর গাঁ,
লক্ষ্মীদেবী জ্যোস্নাধারায় ধুলেন তাঁরি জরির পা;'

—অর্থাৎ, লক্ষ্মীদেবী পা ধুলেন কিনা, তাই মর্ত্ত্য একেবারে গাঁ হয়ে গেল।" উঃ! কার্য্য-কারণের কি অপূর্ব্ব দুর্ব্বোধ সম্বন্ধ! আর একটা নূতন ব্যাপারের সঙ্গে কবি আমাদিগকে পরিচিত করিয়াছেন— লক্ষ্মীদেবীর পা রক্ত-মাংসের নয়,—জরির! কবির প্রতিভা আছে; কারণ প্রতিভার লক্ষণ মৌলিকতা।

"ঘরের মাঝে আট্‌কে তোরা বন্ধ হয়ে রোস্‌না রে,
রোস্‌না রে আর বন্ধ হয়ে অন্ধ ঘরের মাঝ্‌খানে,
উছ্‌লে উঠে, পিছ্‌লে পড়ে, আয় রে ছুটে বা'র পানে।"

প্রথম দুটি পংক্তিতে পুনরুক্তি যে কতটা ভীষণ হইতে পারে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। কবি বলিতেছেন, "ভাই-সব! ঘরের মাঝে আর আট্‌কে থাকিস্ না। তোরা উছ্‌লে ওঠ্ এবং (উছ্‌লের সঙ্গে অনুপ্রাসের জন্য) পিছ্‌লে ধুম্ করে পড়ে (গড়াইতে গড়াইতে?) ছুটে আয়!"

"কেন?"

"না—

"লক্ষ্মীমাতা পা ধুয়েছেন ঝর্‌ছে তারি জ্যোৎস্না রে!"

জিজ্ঞাসা করি, এখানে 'উছ্‌লে, পিছ্‌লে' এসব কথার সার্থকতা কি? 'পিছ্‌লে' না আছাড় খাইলে কি জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য বুঝা যায় না? অথবা, এ সকল কথা কেবল পাদপূরণার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

তারপর কবি কড়া হুকুম-জারি করিতেছেন :—

"সাম্‌নে হ'তেও চোখদুটোরে একেবারেই তুলিস্‌নে"—

অথচ আগের লাইনেই বলিয়া রাখা হইয়াছে,

"বাঁয়ের দিকে চাস্ রে আজি, ডানেও চেতে ভুলিস্‌নে!"

"সাম্‌নে হ'তে" চোখ তুলিব না, অথচ ডাইনে, বাঁয়েও চাহিয়া থাকিব,—এমন অপূর্ব্ব বিদ্যা কোন্ মায়া মন্ত্রে শিক্ষা করা যায়?

"নীল-সায়রের সবুজ গা"—যদি সম্ভবপর হয়, তবে কৃষ্ণবর্ণ গৌরাঙ্গী সুন্দরী দেখাও বোধ করি আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে?

"আয় রে ছুটে মাঠের মাঝে জেগে স্বপন দেখ্‌বি কে,
হীরের গুঁড়ো ঝর্‌ছে আজি পা ঝেড়েছেন লক্ষ্মী যে!"

আমাদের মনে মনে লক্ষ্মীদেবীর যে স্থিরা, ধীরা মূর্ত্তি জাগিয়া আছে, আপনারা কল্পনা করুন, সেই মূর্ত্তি আকাশে বসিয়া বসিয়া একটা চপল ছোঁড়ার মত পা ঝাড়িতেছেন। লক্ষ্মীদেবীর পা-ঝাড়ার মধ্যেও যিনি সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিতে পারেন, বিজ্ঞাপন তাঁহাকে কবি বলিয়া ঘোষণা করিবে; কিন্তু তথাপি কাক কখনও রাজহংস হয় না।

গীতি-কবিতা রচনাকালে অত্যন্ত সাবধানতার দরকার; কারণ, এখানে ছোটর ভিতর দিয়া বড়কে ফুটাইতে হয়। একটি গোঁজামিলে কবিতার অনেকখানি লাবণ্য নষ্ট হইয়া যায়। গীতি-কাব্যে ভাবের পুনরাবৃত্তি, একটি কথার (বিশেষ কারণ ভিন্ন) দ্বিতীয়বার ব্যবহার, অকারণে একটিও শব্দ-সন্নিবেশ চলিবে না; অথচ দেখা যাইতেছে, আলোচ্য কবিতার কবি ভাবের পুনরুক্তি ত বারংবার করিয়াছেনই, বেশীর ভাগ একটি কবিতায় "চূর্ণহীরা" ও

"হীরার গুঁড়ো" পাঁচবার, "মোতি" তিনবার ও "জ্যোৎস্না" তিনবার করিয়া বসাইয়াছেন। শব্দের প্রতি অকবির মত বেশী ঝোঁক্ থাকাতে, ভাষার প্রতি এই অত্যাচার ঘটিয়াছে। মিলে দুই জায়গায় "মাঝখানে" ব্যবহৃত হইয়াছে। নবীন কবিরা যদি কথার ওজন বুঝিতেন, তাহা হইলে এরূপ লঘুপ্রাণ ও মহাপ্রাণ শব্দের মিলন দেখিতাম না ঃ—

"লঙ্ক রাজার সোণার ভাঁড়ার দেখেওনিকো চক্ষে যা,
মোতির ঝারা, হীরের গুঁড়ো বিকোয় রাতে আজ্‌কে তা"

"চক্ষে যা" ও "আজ্‌কে তা"—এখানে মিলের দোষ ধরিতেছি না—কিন্তু শব্দের ওজন একেবারেই সমান নাই।

কোন একটি নির্দ্দিষ্ট রসরূপ ফুটান'ই প্রত্যেক কবির প্রত্যেক কবিতায় প্রধান কাজ; কিন্তু এখানে ত কোন ভাব, রসের কোন রূপ, কবির কোন প্রধান কথা বিকাশলাভ করিতে পারে নাই! সবই যেন এলোমেলো, সবই যেন ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা—আসল কথা, মনের মাঝে কোন একটা বিশেষ ভাব মূর্ত্তি ধরিবার আগেই কবি কলম লইয়া লিখিতে বসিয়া গিয়াছেন; ফলে, কবিতা হয় নাই—অর্থশূন্য মিঠা বুলির একখানি অভিধান রচিত হইয়াছে।

দেখা গেল, কবির বলিবার ভঙ্গীটি পরের কাছ হইতে ধার-করা। কথার ওজন তিনি বুঝেন না। কোন ভাবকে তিনি আকার দিতে পারেন নাই, বরং সর্ব্বত্রই ভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছেন। শব্দের দিকে কবির অকারণ ঝোঁক্ আছে। ভাল লাগিয়াছে বলিয়া বারংবার তিনি একই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; অথচ একটিও শব্দচিত্র আঁকিতে পারেন নাই। অনেক জায়গায় কবিতার কোন অর্থও পাওয়া যায় না। এখন জিজ্ঞাস্য, এরূপ নগণ্য লেখকের জঘন্য লেখা বাঙ্গালার একখানি শ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় কোন্ গুণে? সুধু একখানি কাগজে নয়, বাঙ্গালার যে কোন মাসিক কাগজ বাহির করুন, দেখিবেন, তাহার অধিকাংশেরই পাতায় পাতায় কবিতার নামে বালকের হাতের এমনই হিজিবিজি দাগা আছে। সম্পাদকেরা কি চোখ বুঁজিয়া লেখা ছাপান? পাঠকদের উপরে এরূপ অত্যাচার আর কতদিন চলিবে? আমার ত মনে হয়, এমন কবিতা ছাপান'র চেয়ে পদ্যের পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিলেও বীণাপাণির কমলাসন একটুও টলিবে না এবং পাঠকদের দিক্ থেকেও কোনরূপ আপত্তির সাড়া পাওয়া যাইবে না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

লৌহের শ্রেষ্ঠত্ব

বর্ত্তমান সময়ে বিভিন্ন যুধ্যমান জাতির ক্ষমতা কোথায় নিহিত আছে, তাহার নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। জনসংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, নৌ-বল ও সৈন্য-বলের উপর যুদ্ধ করিবার শক্তি নিহিত থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান কালে বিভিন্ন জাতির যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা লৌহ-সংস্থানের উপরই নির্ভর করে।

প্রাচীনকালে মনুষ্যগণ ভালরূপ লৌহাস্ত্র তৈয়ারী করিতে পারিত না; * কিন্তু অধুনা প্রতিনিয়তই নানারূপ লৌহাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া জনসমাজে বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে। অস্ত্রই আধুনিক সভ্যতার সারভাগ এবং সেইজন্যই অস্ত্র-আবিষ্কারকগণই সমাজে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য। আমরা Iron-ageএর (কলিযুগ) কথা বলিয়া থাকি; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, সত্যসত্যই Ironage-এর (লৌহ-যুগের) সময় আসিয়াছে;

যে সকল দেশে লৌহের খনি সমধিক রহিয়াছে এবং যথায় অধিক পরিমাণে লৌহের আমদানী হয়, সেই সকল দেশের লোকই অন্য জগতের মধ্যে অত্যন্ত সুসভ্য ও উন্নতিশীল বলিয়া পরিগণিত।

যুদ্ধের সমস্ত আবশ্যক দ্রব্যের মধ্যে লৌহই যে সর্ব্বপ্রধান, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কামান, গোলা, গুলি লৌহনির্ম্মিত—এমন কি, সৈন্য-সজ্জাতেও লৌহের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। লৌহ না থাকিলে রেলগাড়ী চলিত না, লোকে এক দেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে পারিত না; গাড়ীর চাকা, বড় বড় গাড়ী, জাহাজ এবং অস্ত্র-শস্ত্র—কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভবপর হইত না। এমন কি, গৃহনির্ম্মাণকালে কাষ্ঠ ও প্রস্তরের পরিবর্ত্তে লৌহ ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং যে দেশে লৌহ অত্যন্ত অল্প পাওয়া যায় এবং যে স্থানের অধিবাসিগণ লৌহের ব্যবহার অতি অল্পই জানে, তাহারা সকল শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে অতি নিম্নস্থান অধিকার করিতে বাধ্য হয়।

কোন্ দেশে কি পরিমাণ লৌহ এবং ইস্পাত পাওয়া যায়, তাহার একটী তালিকা দিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, এ বিষয়ে কোন্ দেশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কোন্ দেশ সর্ব্বনিম্নস্থান অধিকার করিয়াছে।

	লৌহপিণ্ড	ইস্পাত
যুক্তরাজ্য	২৪০২৭৭৩৩ টন	২৪০১৯৩০৯ টন
জার্ম্মানী	১৫২৮০৫২৭ "	১৫০১৯৩৩৩ "
ইংলণ্ড	৯৮৭৪৬২০ "	৬৫৬৫৩২১ "
ফ্রান্স	৪৪১০৮৫৬ "	৩৬৬৮৬৭৮ "
রুষিয়া	২৮৬৫০০০ "	২৫১৯০০০ "
বেলজিয়াম	২১০৩১২০ "	২৪৭৫৪৩৭ "
অষ্ট্রীয়া	২০৯৫০০০ "	১৫৩৭০০০ "
কেনেডা	৮৩৭৫৭৫ "	৮৮০২৮৭ "
সুইডেন	৬৩৩৮০০ "	৬৪৬৫০০ "
স্পেন	৩৫৩৫০০ "	৪৫৮২০০ "
ইটালী	২৮৫০০০ "	২২৮২৩০ "
জাপান	২০১০৯ "	১৯১৮৫৮ "

* অতি প্রাচীনকালে আমাদের ভারতে লৌহের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ঋগ্বেদে তাহার ভূয়োভূয়ঃ প্রমাণ পাওয়া যায়। অয়স্ অর্থে লৌহ বুঝায়। কিন্তু Macdonell, Keith ও Vincent Smith প্রমুখ কয়েকজন প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন যে, 'অয়স্' অর্থে ঠিক লৌহ পূর্ব্বে বুঝাইত না। ঋগ্বেদ-ভাষ্যে 'অয়স্' লৌহ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা নিম্নে ঋগ্বেদ-সংহিতার কয়েকটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন যে তখন লৌহের যথেষ্ট প্রচলন ছিল।

অচ্ছিদ্রা সূনো সহসো নো অদ্য স্তোতৃভ্যো মিত্রমহঃ শর্ম যচ্ছ।
অগ্নে গৃণং তমংহস উরুষ্যোর্জো নপাৎপূর্ভিরায়সীভিঃ॥ ১।৫৮।৮
তস্মৈ তবস্য মনু দায়ি সত্রেংদ্রায় দেবেভিরর্ণসাতৌ।
প্রতি যদস্য বজ্রং বাহ্বোর্ধুর্হত্বী দস্যূনপুর আয়সীর্নি তারীৎ॥ ২।২০।৮
গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসানিরদীয়ং॥ ৪।২৭।১
যথা বঃ স্বাহাগ্নয়ে দাশেম পরীলাভির্ঘৃতবদ্ভিশ্চ হব্যৈঃ।
তেভির্নো অগ্নে অমিতৈর্মহোভিঃ শতং পূর্ভিরায়সীভির্নি পাহি॥ ৭।৩।৭
অধা মহী ন আয়স্যনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে।
পূর্ভবা শতভুজিঃ॥ ৭।১৫।১৪
প্রক্ষোদসা ধায়সা সস্র এষা সরস্বতী ধরুণমায়সী পূঃ।
প্রবাবধানা রথ্যেব যাতি বিশ্বা অপো মহিনা সিংধুরন্যা॥ ৭।৯৫।১
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপানং বর্ম সীব্যধ্বা বহুলং পৃথূনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীরধৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসো দৃংহতা তং॥ ১০।১০১।৮

লেখক—

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, যুক্তরাজ্য এবং জার্ম্মাণীতে যত অধিক পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়, এত অধিক পরিমাণ লৌহ আর কোনও দেশে পাওয়া যায় না।

হিসাব করিয়া দেখিলে আরও বুঝিতে পারা যাইবে যে, সমস্ত দেশের সম্মিলিত লৌহের পরিমাণ ৫৮৫৬৯১৪৪টন; কিন্তু তন্মধ্যে

ছাঁচে ঢালা শ্বেতবর্ণের লৌহ

যুক্তরাজ্য এবং জার্ম্মাণীতেই ৩৯০৭০০০০টন লৌহ পাওয়া যায়, অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে যে পরিমাণ লৌহ পাওয়া যায়, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ কেবল যুক্তরাজ্য এবং জার্ম্মাণী হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। যুক্তরাজ্যে এত অধিক পরিমাণ লৌহ পাওয়া যায় বলিয়া, লোকের বিস্ময়-প্রকাশের কোনও কারণ নাই—কারণ, যুক্ত রাজ্যের সীমা অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; কিন্তু জার্ম্মাণী য়ুরোপ-মহাদেশের একটী সামান্য অংশ—সেস্থানে এত অধিক পরিমাণ লৌহ কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? অন্যদেশের তুলনায় জার্ম্মাণীর অস্তিত্ব অতি অল্পদিন হইতেই গণনা করা যাইতে পারে; কিন্তু সেখানে ইস্পাত যে পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাতে লোকে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে জার্ম্মাণী যে ফ্রান্স এবং রুষিয়ার নৌ-বলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইয়াছে, তাহা যে কেবল ভাগ্যবলে, তাহা নহে—ইহার মূলে লৌহই একমাত্র নিদান। লৌহ এবং ইস্পাতনির্ম্মাণে উন্নতিলাভ করিয়াছে বলিয়াই, জার্ম্মাণী আজ তাহার আবিষ্কৃত নূতন প্রণালীর কামানের সাহায্যে বেলজিয়মের সুদৃঢ় দুর্গ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বেলজিয়ামের কথা ভাবিলে দেখা যায় যে, বেলজিয়াম অনেক অংশে ইটালী হইতে হীন; কিন্তু তথায় যে পরিমাণে লৌহ ও ইস্পাত পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় ইটালী হইতে বেলজিয়ামই শ্রেষ্ঠ এবং এই কারণেই বর্ত্তমান যুদ্ধে সে জার্ম্মাণীর ভীম আক্রমণ হইতে কিছুকালের জন্যও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, বেলজিয়ামের শক্তি-সামর্থ্যও লৌহের মধ্যে নিহিত ছিল। বাৎসরিক ১৯০০০০টন ইস্পাত জাপানে পাওয়া যায়। যে দেশে এত অল্প পরিমাণ ইস্পাত পাওয়া যায়, সে দেশ কখনও সৈন্য-বলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

বর্ত্তমান যুদ্ধের উভয়পক্ষের সহিত আমাদিগের তালিকাটি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, বাৎসরিক ১৫৪৯৫৭৭০টন ইস্পাত জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার হস্তগত হয় এবং ১৫৩১২১৩৫টন ইস্পাত মিত্রপক্ষের আয়ত্ত থাকে; সুতরাং মিত্রপক্ষীয় ছয়টি জাতি অপেক্ষা জার্ম্মাণী এবং অষ্ট্রীয়া এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। যদিও বর্ত্তমান যুদ্ধ ইহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে না, তথাপি চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট ইহা একটি ভাবিবার বিসয়।

মহাবীর নাপেলেওঁর মত দুরাশায় প্রণোদিত হইয়া জার্ম্মাণী সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবার কল্পনা করিতেছে। জার্ম্মাণীর ইস্পাত-উৎপাদনকারী শক্তিই যে জার্ম্মাণ-সম্রাট্ কাইজারের এই অপরিমেয় দুরাশায় ইন্ধন-প্রদান করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে? লৌহ-উৎপাদন-বিষয়ে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া যে জার্ম্মাণী অন্যান্য বিষয়েও শ্রেষ্ঠ, কাইজারের এই ধারণার মূলে কোনওরূপ ভিত্তি দেখা যায় না। রাইন নদীর তীর হইতে ওয়েষ্টফেলিয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অনেক লৌহের খনি আছে এবং সেই সকল খনি হইতে জার্ম্মাণী বহু পরিমাণে লৌহ পাইয়া থাকে। এসেনের সুবিখ্যাত ক্রাপ কোম্পানীর নূতন কামানগুলি যে য়ুরোপের কত রাজ্য, কত সম্পত্তি, কত লোক ধ্বংস করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। য়ুরোপের এই প্রলয়ের রুদ্রমূর্ত্তি কবে যে শান্তভাব ধারণ করিবে, তাহা বলা অসম্ভব। যে শক্তি আজ য়ুরোপের প্রায় সমগ্র শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, সে যে ধ্বংসের মুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ছয় কোটি চল্লিশ লক্ষ জার্ম্মাণের মধ্যে প্রায় দুই কোটি লোক লৌহের কারখানায় কার্য্য করিয়া জীবিকা-উপার্জ্জন করিতেছে—এই লৌহের কারখানাগুলিই বর্ত্তমান যুদ্ধের জীবনস্বরূপ। লৌহ এবং ইস্পাতের উপরই জার্ম্মাণীর জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে।

চিরকাল কখন কাহারও সমান যায় না। দুঃখের পর সুখ ও সুখের পর দুঃখ, ইহাই সনাতন নিয়ম—জার্ম্মাণীও এই নিয়মের অধীন। জার্ম্মাণীর সৈন্য-বল যে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমানকে যুদ্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা কাইজারের অন্তঃকরণ

ছাঁচে ঢালা ধূসরবর্ণের লৌহ

হইতে দূরীভূত হইবে। ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় অধুনা যে পরিমাণে লৌহ ব্যয় হইতেছে, তাহাতে অনূ্যন ২৭বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণীর সমস্ত লৌহখনি একেবারে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ ও ইস্পাত পাওয়া

যায়, সেই পর্যান্ত জার্ম্মাণী প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে—কারণ, সে জানে যে, লৌহ ও ইস্পাত ফুরাইয়া যাইলেই, জার্ম্মাণীর এই সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবার আশা, ছায়াবাজীর ন্যায় আকাশে মিলাইয়া যাইবে। যদিও মিত্রপক্ষের সমবেত চেষ্টায় জার্ম্মাণীর সমগ্র লৌহ-কারখানা বন্ধ হইয়া নাই-ই যায়, তাহা হইলেও অন্যূন ত্রিশ বৎসরের মধ্যে কালের করাল গ্রাস হইতে সে আপনাকে রক্ষা করিতে কখনই সমর্থ হইবে না; কারণ, যে দুই কোটী লোক লৌহ-কারখানায় কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাদিগকে এই সময়ের মধ্যে কার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই জার্ম্মাণীর এই যুদ্ধপ্রিয়তা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। জার্ম্মাণী জানে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য; তথাপি মলিন-নেত্রে আপনার ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিয়া সে

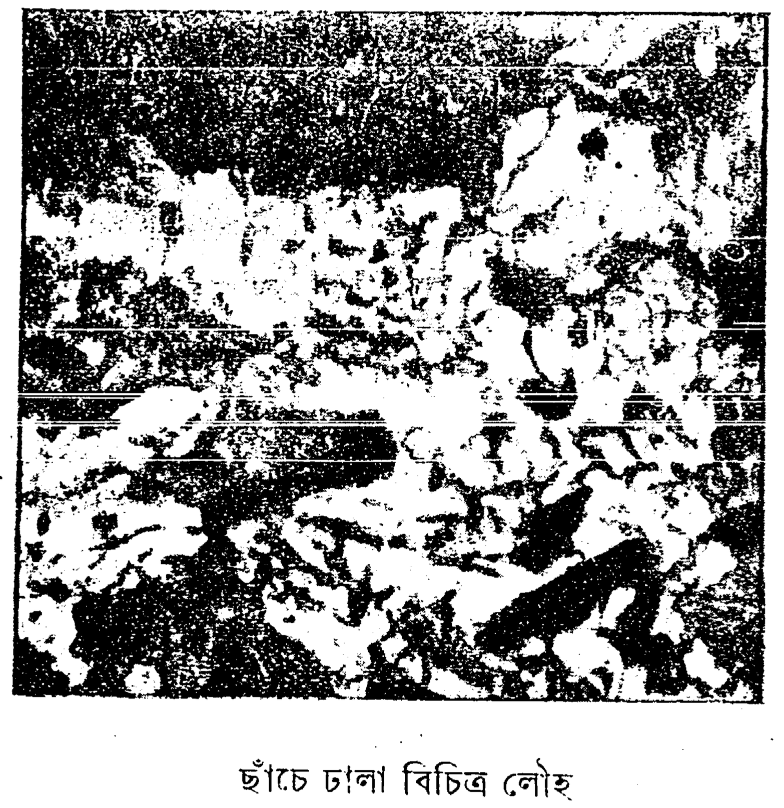

ছাঁচে ঢালা বিচিত্র লৌহ

সমগ্র শক্তির সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। জার্ম্মাণী এখন জরাগ্রস্ত এবং তাহার আসন্ন দিন অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কবলগ্রস্ত

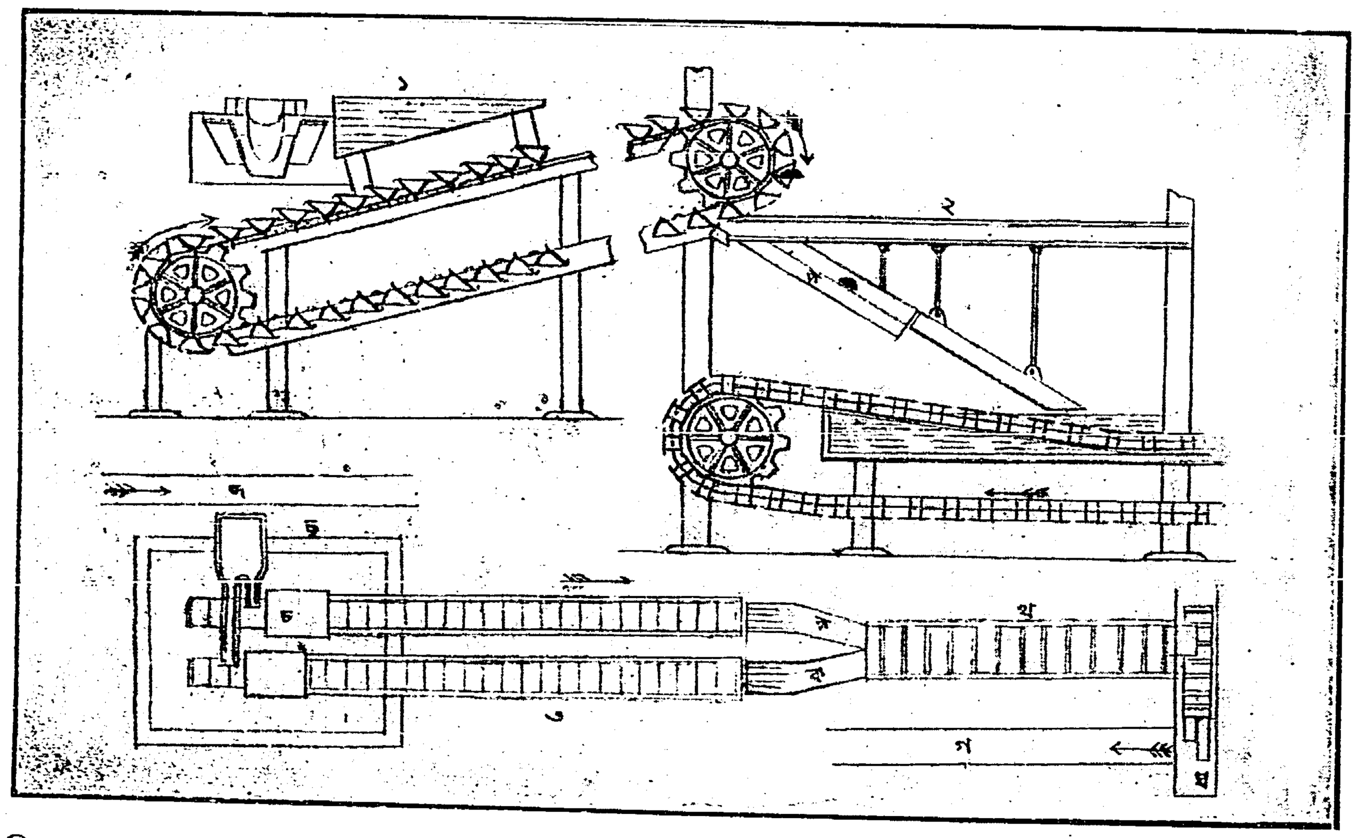

১। ঢালিবার পাত্র ও ছাঁচ। ২। জিনিষ বহিয়া লইয়া যাইবার কল। ৩। যন্ত্রের নক্সা।
ক। বহনকারী যন্ত্র। খ। জলসেক দ্বারা লৌহ শীতল করা হয়। গ। বোঝাই মাল বহনকারী যান।
ঘ। তির্য্যক্‌ভাবে লৌহ সমানয়ন। চ। শীতলকারী পাত্র। ছ। ঢালিবার পাত্র। জ। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে ধাতু গলিয়া আসিতেছে।

ব্যক্তি যেমন 'মরিয়া' হইয়া কার্য্য করে এবং অনেক সময় নিজের কার্য্যাবলী নিজেই বুঝিতে পারে না, জার্ম্মাণীও সেইভাবে যুদ্ধ করিতেছে। যদি সে কখনও বৃটীশ-সিংহকে পরাজিত করিয়া বৃটীশের সমস্ত লৌহখনি অধিকার করিতে পারে, তবেই আবার বাঁচিবার আশা করিতে পারে—কিন্তু সে আশা দুরাশা! বৃটীশ-সিংহকে পরাজিত করিতে না পারিলে, তাহাকে বাধ্য হইয়া ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের লৌহখনি অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; কিন্তু সেখান হইতেও জার্ম্মাণীকে বিতাড়িত হইতে হইবে। নিকটবর্ত্তী কয়েকটী রাজ্য, জার্ম্মাণীতে লৌহ আমদানী হইতে বাধাপ্রদান করিতেছে বলিয়া জর্ম্মাণী তাহাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুইডেন এবং স্পেনের উপর জার্ম্মাণী আর নির্ভর করিতে পারে না—কারণ য়ুরোপের সকল জাতিই জার্ম্মাণীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে। এই কারণেই কাইজার অপরাপর জাতির উপর ক্রুদ্ধ হইয়া য়ুরোপে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন। লৌহের জন্যই যে মরক্কোর উপর জার্ম্মাণীর সতৃষ্ণ দৃষ্টি ছিল, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়—এবং ফ্রান্স ও ইংলণ্ড তাহার এই সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করিয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান সমরের অবতারণা। লৌহখনির জন্যই জার্ম্মাণী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লোরেন অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু পরে যখন বুঝিতে পারিল যে, ভাল খনিগুলি ফরাসীদের অধিকারে রহিয়াছে তখন সে ঐগুলি নিজের আয়ত্তীভূত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল এবং বর্ত্তমান সমরে জার্ম্মাণী সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বর্ত্তমান সমরে যদি জার্ম্মাণী জয়লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে যে সকল দেশে প্রচুর পরিমাণে লৌহ পাওয়া যায়, সেই সকল দেশ সে নিজের আয়ত্তে রাখিবার চেষ্টা করিবে; কারণ, সমস্ত লৌহের খনি নিজের আয়ত্তে থাকিলে, কোনও জাতি কখনও তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় জার্ম্মাণীর আশা অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায়। চীন-সাম্রাজ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া বহুদিবস হইতে চীনের উপর জার্ম্মাণীর লোলুপ-দৃষ্টি রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সিংটাউয়ে জার্ম্মাণগণ নূতন রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিল; কিন্তু জাপান জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াই জার্ম্মাণীকে সিংটাউ হইতে দূরীভূত করিয়াছে। জাপানের যদি অধিক পরিমাণ লৌহের সংস্থান না থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্রশক্তি জাপান জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ কখনই সহ্য করিতে পারিবে না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

ধূমপান

পান-দোষ দূষণীয়, নিঃসন্দেহ; কিন্তু ধূমপানকে দূষ্য বলা চলে কি না, সে বিষয়ে একটু সুবিচারের আবশ্যকতা আছে; কারণ, 'ধূমপানে'র ভিতর 'পান'-জিনিষটা মোটেই নাই, অধিকন্তু ধূম্রের পরিমাণ সুপ্রচুর এবং সেই প্রচুর ধূম্রকে পান করার পরিবর্ত্তে সাধারণতঃ লোকে তাহাকে মুখ দিয়া, নাক দিয়া উদ্গারই করিয়া থাকে। তথাপি লোকে যখন তাহাকে 'ধূমপান' বলিয়া থাকে এবং তথাকথিত ধূমপানে, পান-পরিতৃপ্তির কথঞ্চিৎ নেশায় বিভোর হয়, তখন সেটাকে নেশার রাজ্য হইতে আর নির্ব্বাসন করা চলে না; কারণ, যে অভ্যাস মানুষকে ক্রীতদাস করিয়া রাখে, তাহাই কু-অভ্যাস বা 'নেশা',—তাহা পানে উদর পূর্ণ হউক্ অথবা উদ্গারে পরিসমাপ্ত হউক্, ইহাতে আসে যায় না।

'তাম্রকূট'কে বিষ বলিয়া ধরিয়া লইলেও, আজকাল সোণার 'পাইপে'র স্পর্শে তাহা যেন অমৃতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয় অথবা 'হুঁকা'র শীর্ষে আরোহণ করিয়া, তাহা কলিকালে 'কল্কি-অবতার'রূপে বিরাজিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু কোন্ যুগে এই 'কল্কি-অবতার' অথবা 'পাইপ-অবতার' পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তন্ত্র-পুরাণের শরণাপন্ন হইলে, বিপন্ন হওয়া ব্যতীত অপর কোন লাভই হয় না। মহেশ্বর চিরকাল ভস্মই গায়ে মাখিতেন এবং বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিতেন। এই ভস্মও নিঙ্ড়াইয়া, তাহা হইতে যাঁহারা এই 'ধূম্র-রসে'র অবতারণা করিয়াছিলেন, নীলকণ্ঠের ডম্বরু-রব নিশ্চয়ই তাঁহাদের বিজয়-বাদ্য বাজাইবে। আজকাল পাশ্চাত্য দেশ ধোঁয়ার নেশায় একেবারে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। এ ধোঁয়া তাম্রকূটের নহে—বারুদের। প্রাচ্য দেশও আর এক ধোঁয়ায় মশ্‌গুল্ হইয়া আছে—সে ধোঁয়া শান্তিময়ী, ঘর্ঘর-রবা হুঁকার তামাকের ও 'সম্ফোষিত' সিগারেটের। তাহা হইলেও, যাঁহারা বর্ত্তমান যুদ্ধের খবর রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন যে, বারুদের ধোঁয়ার পাশে যুদ্ধক্ষেত্রে তাম্রকূটের ধূম্র সমানে টেক্কা দিতেছে। সৈন্যগণ মুখে সিগারেটের এবং হাতে কামানের ধোঁয়া লইয়া লড়াই করিতেছেন। কথাটার ভিতর যে একটু সত্য নিহিত আছে, তাহা এই ধূম্র-রাজ্যের দ্বৈতবাদী ব্যতীত আর কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

যুদ্ধক্ষেত্রের প্রবল ক্লান্তির মধ্যে সৈন্যগণ মুখে একটা সিগারেট্ ধরাইয়া যে আরাম লাভ করেন, সে আরাম বড় মধুর। সে আরাম 'দাওয়া'য় বসিয়া মুদিত নয়নে গুড়ুক্-টানার আরাম হইতে সহস্রগুণে সুন্দর। যে সৈন্যগণ জীবনটাকে ধোঁয়ার মত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া রণক্ষেত্রে ঝাঁপ দেয়, তাহাদের ত আরাম নাই; তথাপি এই স্বার্থ-ত্যাগের মধ্যে তাহাদের ধূমপান, হৃদয়ের আনন্দ এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। আমাদের মহামতী ভারত-সম্রাজ্ঞী সেইজন্য এইবার সৈন্যগণকে তদীয় 'ক্রিস্‌মাস্'-উপহারের (Christmas Presents) সুদীর্ঘ তালিকার মধ্যে অত্যুৎকৃষ্ট তামাক ও সিগারেটের প্রচুর ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা তাম্রকূটের আদিকাল খুঁজিতে গিয়া রণাঙ্গনে আসিয়া পড়িয়াছি; সুতরাং এইবার তত্ত্বে পৌঁছিব।

সর্ব্বপ্রথমে কাহারা ধূমপান করিয়াছিল বা ধূমপান করিতে শিক্ষা দিয়াছিল, তাহা খুঁজিতে যাইলে, আমেরিকার আবিষ্কর্ত্তা ক্রিষ্টোফার কলম্বাসের ভ্রমণ-বিবরণের শরণাপন্ন হইতে হয়। কলম্বাস্ ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর তারিখে তদীয় সুদীর্ঘ জলযাত্রাকালে একটি নূতন দ্বীপে জাহাজ নোঙ্গর করেন। দ্বীপটিকে কলম্বাস্ San Salvador নামে অভিহিত করেন; দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই কলম্বাস্ ও তাঁহার সহযাত্রিগণ দেখিলেন, উক্ত দ্বীপের অধিবাসিগণ মুখ এবং নাসিকামূল হইতে প্রচুর ধূম্র বাহির করিতেছে। অন্বেষণ করিয়া তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, দ্বীপবাসিগণ লতা-জাতীয় উদ্ভিদ্‌বিশেষকে শুষ্ক করিয়া একজাতীয় বৃক্ষের ত্বক্-দ্বারা সেগুলিকে পাকাইয়া অগ্নি-সংযোগে মুখ দিয়া ধূম্র টানিতেছে ও পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উদ্গার করিতেছে। চুম্বকে বলিতে গেলে,—তাহারা সিগারেট্ টানিতেছিল। San Salvador-দ্বীপবাসিগণ ঐ লতা-জাতীয় উদ্ভিদ্‌কে 'তামাক' বা Tobacco নামে অভিহিত করিত। কেহ কেহ বলেন, সভ্য-সমাজে ধূমপানের এই প্রথম অবতারণা। সভ্য-সমাজের ধূমপানের এই দ্বিতীয় "Paradise lost."

তত্ত্বান্বেষিগণের অনেকে বলেন যে, কলম্বাসের এই ধূমপান-দর্শনের পূর্ব্বেও পাশ্চাত্য দেশে ঐ অভ্যাস প্রচলিত ছিল। প্রাচীন পর্ব্বত-গাত্রে-খোদিত বহুপুরাতন মূর্ত্তিতে তাম্রকূট-সেবনের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মিডিস্ (Medes) এবং পারশ্যদেশে, কলম্বাসের জল-যাত্রার বহুপূর্ব্বেও তাম্রকূট-সেবনের সুব্যবস্থা ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, কলা-বিদ্যার চরমোৎকর্ষে শীর্ষস্থানীয় গ্রীস্ এবং নীতি ও আইন-তন্ত্রের আদিম জন্মভূমি রোম-রাজ্যেও বহুপূর্ব্বে তাম্রকূট ব্যবহৃত হইত।

য়ুরোপে কোন্ সময়ে সর্ব্বপ্রথম ধূমপান প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল লিখিতে গেলে, স্যর জন্ হকিন্সের (Sir John Hawkins) নাম মনে আসে। ইনিই ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে ধূমপান-পদ্ধতি প্রচলিত করেন। অতঃপর স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে, প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী স্যর্ ফ্র্যান্সিস্ ড্রেক্, এই তাম্রকূটের বিষকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ওয়াল্টার র‍্যালের সিগারেট্ খাইবার সময় ধূম্র-দর্শনে তাঁহার এক প্রভুভক্ত ভৃত্য, কর্ত্তার গায়ে আগুন ধরিয়াছে ভাবিয়া কিরূপভাবে ওয়াল্টার র‍্যালের মস্তকে বাল্‌তীপূর্ণ জল ঢালিয়া দিয়াছিল, সে গল্প সকলেই জানেন।

যে কোনও বিষয়ই হউক না কেন, তাহা লইয়া জন-সমাজে এবং পৃথিবীতে একাধিক বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিজয়-লক্ষ্মী চঞ্চলা; সুতরাং তিনি নানা সময়ে নানা দলের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। ধূমপান প্রচলিত হইবার পর ইংলণ্ডে প্রথম জেমস্‌এর (James I.) রাজত্বকালে, "ধূমপান নিষিদ্ধ" এই-প্রকার একটা রাজ-আজ্ঞা ঘোষিত হয়। ধূমপানাসক্ত নিরীহ ব্যক্তিগণকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হয়; কারণ, ধূমপানকারী অপরাধীকে তখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। মুখে বা নাকে কোনরকম ধোঁয়ার চিহ্ন দেখিলেই, তাহাকে বিচারালয়ে আনা হইত এবং তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করা হইত। এই সময়ে কেবল ইংলণ্ডে নহে, পশ্চিম দেশের সর্ব্বত্রই ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার মহাধূম পড়িয়া গিয়াছিল। সুইজারল্যাণ্ডের ধর্ম্ম-গ্রন্থের "দশ উপদেশে"র

(Ten Commandments) মধ্যে "ধূমপান করিবে না" বা "Thou shalt not sm ke," উপদেশটি অন্যতম ছিল।

ধূমপানের বিরুদ্ধে যখন এই মহা-আন্দোলন পশ্চিম-রাজ্য তোলপাড় করিতেছিল, তখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া উঠিলেন,—"ধূমপান অনিষ্টকর বটে, কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট উপায়ে তামাকের পাতা শোধন করিয়া লইবার পর, উহার ব্যবহার শরীরের যন্ত্রকে দুষ্ট করে না; পরন্তু নানা রোগ-বীজাণু বিনাশ করিতে সমর্থ হয়।" বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিয়া বলিলেন, "আমরা পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি যে, শোধিত তাম্রকূট অনেকস্থলে শরীরকে বাহিরের অসংখ্য ভয়াবহ রোগ-বীজাণুর প্রবল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া মানুষকে অকাল-মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারে। পরীক্ষাদ্বারা আরও জানিয়াছি যে,তাম্রকূট-ধূম ওলাউঠার বীজকে বিনষ্ট করিতে পারে।" বৈজ্ঞানিকগণের উক্তি শুনিয়া সকলে চুপ্ করিল। ভাবিল, "তাই ত, কি ভুলই করিয়াছিলাম! হ্যাঁ, ধূমপান উপকারী। ওলাউঠা এবং নানা সংক্রামক ব্যাধি-বীজাণু সত্যই তাম্রকূট-ধূম্র নিরস্ত করিতে পারে।"

বৈজ্ঞানিকের উক্তি সত্য হইল। ইহার কয়েক বৎসর পরে গ্রেনিজের কারখানায় নিযুক্ত প্রধান চিকিৎসক, একবার সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপকালে নগরের মৃত্যু-হার আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে, কারখানার যে সকল মজুর ও কর্ম্মচারিগণ ধূমপানাসক্ত, তাহাদের মধ্যে প্রায় কাহাকেও সংক্রামক ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে নাই।

হাম্বার্গ (Hamburg) নগরে একবার 'কলেরা'র প্রকোপ হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন যে, স্থানীয় সিগারেটের কারখানায় যে সকল ব্যক্তি কর্ম্ম করিত, তাহাদের একজনও ঐ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হয় নাই।

জন-সাধারণের ভ্রম দূর হইল—সিগারেটেরই জয় ঘোষিত হইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, যুবক-যুবতী সকলেই উল্লাসের সহিত সিগারেট্ ধরিলেন; সুতরাং সিগার ও তামাকের ইন্ধন যোগাইবার জন্য কারখানা বসিল, কল আবিষ্কৃত হইল, দৈনিক লক্ষ লক্ষ সিগারেট্ জন-সাধারণের ওষ্ঠদ্বয়ের অন্তরালে নববধূ-বেশে আবির্ভূতা হইলেন। বদন-গহ্বর এবং নাসিকা-গহ্বর হইতে সিগারেট্, স্বীয় শুভ্র ধূম্রের লঘু-চঞ্চল অঞ্চল উড়াইয়া আকাশে পরি-রাজ্যে উড়িয়া যাইতে লাগিল।

ইহার পর তামাকের উপর শুল্ক বসিল। জন-সাধারণের মধ্যে সিগারেটের প্রচলনও কমিয়া যাইতে লাগিল। এমন কি, সিগারেট্-পান-অভ্যাসকে তখন 'ফ্যাসনে'র বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইত। পয়সার জন্যই 'ফ্যাসনে'র বদল হইল, নিঃসন্দেহ। উচ্চহারে সিগারেটের শুল্ক-প্রদানে কারখানায় সিগারেটের দাম চড়িয়া গেল। লোকে ভাবিল, "সিগারেট্ ত মুখ দিয়া টানি; কিন্তু উচ্চ-শুল্কের জন্য ত আমরা সে সুখে বঞ্চিত! আচ্ছা, নাক্ দিয়া টানা যায়, এমন কোন সিগারেট্-জাতীয় অভিনব বস্তু আবিষ্কার করিলে হয় না!" পাঠকগণ হয় ত তখনকার লোকের কথা শুনিয়া হাসিতেছেন, ভাবিতেছেন,— নাক দিয়া টানিবে কি? কিন্তু তখনকার লোকেরা "নাক-দিয়া-টানা সিগারেট্" আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। পাঠকগণ হয় ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহা আমাদের ভারতবর্ষের পুরাতন "নস্য" বা snuff. যাঁহারা ভারতবর্ষের "নস্য-তত্ত্ব" আলোচনায় ব্যস্ত আছেন, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, নস্য-ব্যবহার কেবলমাত্র আমাদের দেশে নহে, সুদূর পাশ্চাত্য দেশেও প্রবর্ত্তিত ছিল। যাহা হউক, নস্যেরই জয় হইল; লোকে, পথে-ঘাটে নস্য লইয়া নাক দিয়া টানে, হাঁচে, কাসে; এ উহার নাকে হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া নস্য দিয়া পলায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা নস্য আবিষ্কার করিয়া একটা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিল বলিয়া আমার মনে হইতেছে। যাঁহারা পাশ্চাত্য জাতিকে "বস্তুতন্ত্র" বলিয়া থাকেন, এই নস্য-আবিষ্কার তাঁহাদের বস্তু-তন্ত্র-প্রমাণের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত; কারণ, তাহারা পূর্ব্বে সিগারেটের ধোঁয়াটা টানিয়া ছাড়িয়া দিয়াই খালাস পাইত। সিগারেটের মধ্যে বস্তুজাতীয় যে কোন পদার্থ আছে, তখন সাহেবেরা সেটা বুঝিতেই পারিত না। সেটা যেন একান্ত অবহেলায় মুখ বাঁকাইয়া অলস কবিত্বের সুপ্রচুর ব্যর্থ ধূম্রোদ্গার! সেটা যেন কবিত্ব-কল্পনার লঘু মাদকতার একটুখানি গন্ধমাত্র! হায়! 'বস্তু'-বেচারী ছাই হইয়াই ধূলায় লুটাইয়া পড়িত! লোকের প্রাণে লাগিত—কেবল সেই ভস্ম-নিঃসৃত একটা গন্ধ-গহন-সুষমার অস্পষ্ট স্পর্শ! আর নস্য, যখন তাহার কণিকাবহুল সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট বস্তুভারগুলিকে লইয়া, নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মস্তকের আঘ্রাণ-স্নায়ুকে চঞ্চল করিয়া হাঁচির পর হাঁচির সৃষ্টি করিয়া দিল, তখন মন বলিল,"হ্যাঁ, বস্তু বটে, 'এর সার আছে গো, এর ভার আছে'।" বস্তুর স্পর্শে সমস্ত প্রাণটা হাঁচির পালার শেষে হাঁক্ ছাড়িয়া বলে,—"আছে গো বস্তু আছে; আমি বস্তুতন্ত্র মানি গো, মানি; নইলে যে প্রাণসুদ্ধ এই বস্তুর উত্তেজনায় হাঁচিয়া ফেলিবার জোগাড় হইতেছিল! কে বলে যে বস্তু নাই?"

কিন্তু আমাদের দেশে কি এই উৎকৃষ্ট বস্তুতন্ত্র নাই? হায়! কে বলে যে নাই? আজও ছাত্র, যুবক, আবালবৃদ্ধের জামার জেবে নস্যাধার, শামুকের খোলায়,এক 'আউন্স'শিশিতে, অমৃতাদি-বটিকার কৌটায়, মহিষের শিংএর ক্ষুদ্র পাত্রে বিরাজিত। বস্তুর স্বাদ তাহারা আজও নিত্য নিত্য লাভ করিতেছে। আর ভট্টাচার্য্য-মহাশয়গণের ত কথাই নাই। কলিকাতার ভট্টাচার্য্য-কোম্পানী-কেও ধন্যবাদ!

যাহা হউক, বস্তুতন্ত্র ছাড়িয়া আমরা এখন সিগারেটের ইতিহাসে মন দিব। নস্য গ্রহণ-অভ্যাস প্রথম প্রথম খুব জোর চলিলেও, কয়েকদিন পরে তাহা বন্ধ হইয়া গেল। সরকার, সিগারের উপর শুল্ক কমাইয়া দিলেন। হয় ত এই ভাবিয়া যে, এত হাঁচি হাঁচিলে, লণ্ডনের বায়ুতে 'কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড্' (Carb n Dioxide) নামক প্রশ্বাস-ত্যাগজনিত দূষিত গ্যাসের পরিমাণ বেশী হইবে। সিগারেট্ পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সিগারেটের উপর সরকার পূর্ব্বোক্ত যে শুল্ক কমাইয়া দিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত সেই অল্প-শুল্ক-প্রদান-প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

কোন্ দেশে বাৎসরিক কি পরিমাণ সিগারেট্ ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা কৌতূহলজনক। ইংলণ্ডে বাৎসরিক বারোহাজার কোটী ১২০০,০০০০,০০০ সিগারেট্ ব্যয় হইয়া থাকে। জনৈক ইংরাজ-বৈজ্ঞানিক এই প্রকাণ্ড ব্যয়ের তালিকা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, মানুষের ভবিষ্যৎ বংশ একটা ধূমপানাসক্ত জাতিতে পরিণত হইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বাৎসরিক নয় কোটী 'পাউণ্ড' ওজনের সিগারেট্ ব্যয় হইয়া থাকে। এই নয় কোটী 'পাউণ্ড' সিগারেট্ হইতে তথাকার সরকার যে শুল্ক লাভ করিয়া থাকেন,

তাহার মূল্য,—বাৎসরিক আঠারো লক্ষ 'পাউণ্ড' অর্থাৎ মাসিক এক কোটী ত্রিশলক্ষ 'পাউণ্ড' মূল্যের শুল্ক সরকারের হস্তগত হইয়া থাকে। গত বৎসর যুক্তরাজ্যে সিগারেট্ ও নস্যের উপর নির্দ্দিষ্ট শুল্ক সংগ্রহ করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ এক কোটী আশী লক্ষ 'পাউণ্ড'।

আর কিছু হউক আর না হউক, সিগারেট্-ব্যয়ে জর্ম্মাণী অপর সকল দেশকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে জর্ম্মাণগণের মত অত ধূমপানাসক্ত অপর কোন জাতিই নহে। ইহা লইয়া জর্ম্মাণী জাঁক করিতে পারে বটে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণীতে ১০০,০০০,১০০,০০০,০০০ (one billion one hun ired mi lion) সিগারেট্, তাহার সমস্ত সিগারেটের কারখানা জোট্ বাঁধিয়া প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জর্ম্মাণ-রাজ্যে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যার পাঁচগুণ সিগারেট্ প্রস্তুত হইয়াছিল। জর্ম্মাণী এই মহাসমরের রণাঙ্গনে নামিবার পূর্ব্বে, তাহার দেশে যে অত্যাশ্চর্য্য বৃহৎ-সংখ্যক সিগারেট্ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। পাঠকগণ শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহার যে সুবৃহৎ সিগারেটের সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ববৎসরে জর্ম্মাণীতে তাহার নয়গুণ সিগারেট্ প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এতবড় "সিগারেট্-খোর" জাতি পৃথিবীতে আর নাই। ধূম্র-উদ্গারে জর্ম্মাণী যে "সিদ্ধমুখ" * তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধূমপান যদি দূষণীয় হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে জর্ম্মাণীকে এই মহা অভিযোগে অভিযুক্ত করা প্রয়োজন; কিন্তু সে যখন মনুষ্যত্বের বড় বড় অভিযোগকে স্বীয় অমানুষিক বর্ব্বরতায় অস্বীকার করিয়াছে, তখন এই ক্ষুদ্র অভিযোগ তাহার পক্ষে যে একান্ত অযোগ্য, তাহা পৃথিবীর সভ্য জাতির মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নাই, যিনি অস্বীকার করিতে পারেন।

বৃটিশ সৈন্যকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম 'পাইপ্'-আবিষ্কার।

'পাইপে'র আবিষ্কার-বিষয় লইয়া যে গল্প প্রচলিত আছে, তাহা সিগারেটের তত্ত্ব-আলোচনায় বাদ দিতে পারা যায় না। কথিত আছে, গত বুয়র-যুদ্ধের (Boer war) সময় জনৈক ইংরাজ-সৈনিক সমর-অভিযানের পথে যাইবার সময় অনবধানতাবশতঃ আপনার সিগারেটের পূর্ব্বপ্রচলিত নল হারাইয়া ফেলেন। নলের কেবলমাত্র গোড়ার দিক্‌টা তাঁহার কাছে ছিল। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে সৈনিকটি দেখিতে পাইলেন, এক কৃষকের ক্ষেত্রে একটা কাঁচা, ফাঁপা, ডাঁটা-জাতীয় উদ্ভিদ্ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি ঐ ফাঁপা ডাঁটাটিকে সংগ্রহ করিয়া তাহার ভিতরটি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিলেন। তাহার পর তাঁহার 'পকেটে' যে mouth-pieceটি ছিল, সেটিকে ডাঁটাটির এক প্রান্তে সংলগ্ন করিলেন। সৈনিকের নিকট আধুনিক কালের সিগারেট্-প্রস্তুতের 'জিগ্‌জ্যাগ্' কাগজ (Zigz g Paper) বা অপর কোন জিনিষই ছিল না, যাহাতে তিনি গুঁড়া সিগারেট্‌কে পাকাইয়া লইতে পারেন; সুতরাং বাধ্য হইয়া তিনি ঐ ফাঁপা ডাঁটাটির ভিতর সিগারেট্ ভরিয়া তাহার একপ্রান্তে mouth-pieceটি সংলগ্ন করিলেন এবং অপর প্রান্তে অগ্নি-সংযোগপূর্ব্বক স্বীয় ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে m u h-pieceটি সংরক্ষণপূর্ব্বক সজোরে টান্ দিয়া প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিয়া সহযাত্রিগণের ধন্যবাদভাজন হইয়া পড়িলেন। এই প্রথম 'পাইপে'র শুভ্র ধূম্র পৃথিবীর আকাশকে আচ্ছন্ন করিল। সে ধূম্রের আবরণ আজও সভ্য-সমাজ হইতে ক্ষয় হইল না—হইবে বলিয়াও মনে হয় না।

* "সিদ্ধহস্তে"র অনুরূপ করিয়া "সিদ্ধমুখ" লিখিত হইল।
—লেখক

সৈনিকপুরুষ যে ডাঁটাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা সবেমাত্র গাছ হইতে কাটা হইয়াছিল; সুতরাং সেটি একেবারে সদ্যঃ-কর্ত্তিত লাউ-ডগার মত সবুজ এবং কাঁচা ছিল; অতএব অগ্নির উত্তাপে উহা সহজে দগ্ধ হইল না। এই ডাঁটা-জাতীয় উদ্ভিদের নাম—"ব্রায়ার" (Bri r)। যুদ্ধশেষে সৈনিক যখন তাঁহার স্বদেশ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন সঙ্গে ঐ "ব্রায়ার"-জাতীয় প্রচুর ডাঁটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে, আসিবার সময় সুদীর্ঘ বলিয়া, কাঁচা ডাঁটাগুলি শুষ্ক হইয়া গেল। ইংলণ্ডে ফিরিয়া ঐ ডাঁটার ফাঁপা অংশে সিগারেট্ ভরিয়া ধূমপান করিবার আশা তখন দুরাশা হইয়া উঠিল; কারণ, সিগারেটে আগুন ধরিবার পূর্ব্বে তাহার আধার, শুষ্ক ডাঁটাটিই আগুনে জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজিতে প্রবাদ-বাক্য আছে, "প্রয়োজনেই আবিষ্কার" (Nece s-sity is the mother of invention,) সেই প্রবাদ-বাক্য যখন সিগারেটের ক্ষেত্রে এতদূর ফলিল, তখন শেষভাগে আসিয়া তাহাকে থামাইয়া রাখিবে কে?

ডাঁটাটির অন্তর্ব্বর্ত্তী ফাঁপা অংশে প্রথমে যসদের (zinc) প্রলেপ লাগাইয়া অগ্নি-উত্তাপ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইল। অতঃপর "Meerschaum" নামক একপ্রকার শুভ্রোজ্জ্বল 'সিমেণ্ট্'-জাতীয় পদার্থদ্বারা 'পাইপে'র ভিতরটি প্রলেপযুক্ত করা হইয়াছিল। এই "Meerschaum" জিনিষটি একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম এবং খাঁটি কর্দ্দম (clay) জাতীয় পদার্থ। কেহ কেহ বলেন, গভীর সমুদ্রতলের উৎকৃষ্ট কর্দ্দম হইতেই ইহার সৃষ্টি। ইহাই 'পাইপে'র চরম-পরিণতি। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই 'পাইপে'র মধ্য-ভাগ, ঐ কর্দ্দম-জাতীয় পদার্থদ্বারা প্রলেপ-সংযুক্ত করা হইয়া থাকে। ইহাতে অগ্নি-উত্তাপ মোটেই 'পাইপে'র দারু-গাত্রে আসিতে পারে না। আজকাল সমস্ত 'পাইপ'ই ঐ পদার্থ দিয়া প্রস্তুত।

রাজ-সম্রাট্‌গণের সিগারেটের বিবরণ

১। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড্।

আমাদের স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড্, সম্রাট্‌গণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মোটা সিগারেট্ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার জন্য ফরমাইস্ দিয়া সাড়ে আট ইঞ্চি লম্বা ও আড়াই ইঞ্চি মোটা উৎকৃষ্ট সিগারেট্ প্রস্তুত হইত। একটা পয়সা প্রস্থে এক ইঞ্চি; সুতরাং দুইটী পয়সাকে গায়ে গায়ে সাজাইয়া রাখিলে যতটা লম্বা হয়, সম্রাট্ এডওয়ার্ডের সিগারেট্ তদপেক্ষাও মোটা ছিল। সাড়ে আট ইঞ্চি, সাধারণতঃ এক 'বিগতে'র কিছু বেশী হইয়া থাকে; সুতরাং পাঠকগণ বুঝিয়া লউন যে, সে সিগারেট্ কিরূপ ধরণের। সম্রাটের জন্য হ্যাভেনা হইতে এই সিগারেট্ প্রস্তুত হইয়া আসিত। এই সিগারেটের এক একটির মূল্য চারি-টাকা ছিল। গুণে এবং মূল্যে ইহা যে সম্রাটের ব্যবহারের উপযুক্ত সিগারেট্, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

২। জর্ম্মাণ-মার্কণ্ড কাইসর্।

হ্যাভেনায় সম্রাট্ এড্‌ওয়ার্ড্ যে কারখানা হইতে তাঁহার পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিগারেট্ আনাইতেন, জর্ম্মাণ-সম্রাট্ কাইসর্‌ও কিছুকাল সেই কারখানা হইতে সিগারেট্ আনাইয়া ব্যব-

হার করিতেন; কিন্তু দ্রব্যগুণে বা মূল্য-পরিমাণে কাইসরের সিগারেট্ সম্রাট্ এড্ওয়ার্ডের সিগারেট্ হইতে যথেষ্ট নিকৃষ্ট। তাহার এক একটির মূল্য সাড়ে-বারো আনা মাত্র। ইহা যে রাজোচিত মূল্য নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইংলণ্ডের যে-কোন বড়লোক সাড়ে-বারো আনা মূল্যের সিগারেট্ দিবারাত্র ভস্ম করিয়া ফেলিতেছেন। জর্ম্মাণ সম্রাটের এই কার্পণ্য দরিদ্রতা কি না, জানি না। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধ বাধিয়াছে দেখিয়া, তিনি সিগারেটের মূল্য আরও কমাইয়া দিতেছেন। সে সিগারেটের এক একটির মূল্য কত, জানি না; তবে সাড়ে-বারো আনা হইতে অল্প নিশ্চয়ই; কিন্তু নেহাৎ "হাওয়াগাড়ী"ও নয়।

৩। রুষ্-সাম্রাজ্যের জার। (CZAR)

রুষ্-সাম্রাজ্যের জার, যে সিগারেট্ ব্যবহার করেন, তাহা কাইসর-ব্যবহৃত সিগারেট্ হইতে শতগুণে উত্তম এবং মূল্যবান্। তুর্কি (Turkey) হইতে তাঁহার জন্য অত্যুত্তম সিগারেট্ প্রস্তুত হইয়া আসে। বর্ত্তমান সময়ে ত তুর্কির সুলতানের সৈন্যগণ তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে; এখন তিনি কোন সিগারেট্ ব্যবহার করেন, ঠিক্ জানি না।

৪। বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ মহামতি পঞ্চম জর্জ্জ।

বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ রাজ-রাজেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জও সিগারেট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিগারেট্ যে পৃথিবীর মধ্যে মূল্যে এবং দ্রব্যগুণে সর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ, সে কথা আর বলিতে হইবে না। তিনি দৈনিক ত্রিশটি করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট সিগারেট্ ব্যবহার করিয়া থাকেন। বহুদিন হইল, তিনি 'পাইপ'ও ব্যবহার করিতেন। 'পাইপে'র জন্য তিনি যে সিগার ব্যবহার করিতেন, তাহা নানা মূল্যবান্ সিগারেটের সংমিশ্রণে প্রস্তুত হইত।

পুরাতন ইংরাজ-সাহিত্যিকগণের ধূমপান।

প্রাচীন ইংরাজ-সাহিত্যিকগণ যে ধূমপান করিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম অধিক পাই নাই। পাঠক-পাঠিকাগণ সন্ধান পাইলে, "মর্ম্মবাণী"তে প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক লুই ষ্টিভেন্সন (Ro'ert Louis stev(n-son) একজন পূরা "সিগারেট্-খোর" ছিলেন। সিগারেট্ না হইলে তিনি বলিতেন, "আমার গল্পের 'প্লট্' (Plot) জমে না।" তিনি 'নন্দন-কাননে'র লতা-গুল্মকে (Devine weed) যেন সিগারেট্-রূপে আদর করিতেন। তিনি দৈনিক কি পরিমাণ সিগারেট্ ভস্মসাৎ করিতেন, তাহা আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই; হয় ত সংগ্রহ করিবার উপায়ও নাই।

একবার লুই ষ্টিভেন্সনের জনৈক অন্তরঙ্গ সাহিত্যিক-বন্ধু, তাঁহার অপর্য্যাপ্ত সিগারেট্-ব্যবহারে স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"তুমি করিতেছ কি? উহা যে দেহের পক্ষে অপকারী!" বন্ধুর কথায় ষ্টিভেন্সন্ উত্তর করিয়াছিলেন, "অপকারী! ওঃ, তাও ত বটে! কিন্তু শীঘ্রই এমন কিছুদ্বারা আমি মরিব, যাহা সিগারেট্ অপেক্ষা কম অনিষ্টকর নহে।" "এমন-কিছু"-জিনিষটা কি, পাঠকগণ অনুমান করিয়া দেখুন।

বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে ধূমপান।

বর্ত্তমান এবং বিগত সাহিত্যিক মনীষিগণের মধ্যে কাহারা অতিমাত্রায় সিগারেট্ বা চুরুট্ ব্যবহার করেন বা করিতেন, তাহার সঠিক্ খবর আমি রাখি না—রাখিবার আবশ্যকতাও হয় নাই। অবশ্য, হুঁকা-কলিকায় "তামাক-খাওয়া" লইয়া আলোচনা করিলে সাহিত্যিক এবং অসাহিত্যিক সকলেই হয় ত তাম্রকূট-সেবনের 'লিষ্টে'র নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবেন। সিগারেট্ বা চুরুট লইয়াই আলোচনা করিতেছি। আমার ইচ্ছা যে, কৌতূহলী পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ এই বিষয়ে তত্ত্বান্বেষী হইয়া স্বীয় অন্বেষণের ফল "মর্ম্মবাণী"তে পত্রস্থ করেন, তবে আমার অজ্ঞতা-দোষ কতকটা কাটিয়া যাইতেও পারে। এই বিষয়ে পাঠক-সাধারণের মধ্যে নিশ্চয়ই কেহ-না-কেহ মৎ-অনুসন্ধান-স্পৃহা হইতে অধিক কৌতূহলী আছেন; সুতরাং আজ এইখানেই কলম রাখিলাম।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

প্রার্থনা

১

চিন্তাকাশে তুমি ধ্রুবতারা;
জীবনের ঝঞ্ঝা-ঝড়ে
পড়ে বজ্র কড় কড়ে,
থাক যদি, অন্তরের আলো,
কেন ভীত—হ'ব পথ-হারা?

২

দিয়ো দৃষ্টি—ক'র' না আঁধার;
লক্ষ্য যদি হয় ভুল,
দেখাইয়া দিয়ো কূল,
হে আমার অকূলে কাণ্ডারি,
বিশ্বাসে হইব প্রভু, পার!

৩

শত কৃচ্ছ্র—শত ক্লেশ সহি'—
লইব তোমার দান—
হোক্ মান, অপমান,
হোক্ দৈন্য—হোক্ তাপ, শোক,
অশোক অন্তরে ল'ব বহি'।

৪

সেই প্রেম দিয়ো মোরে নাথ,
দুঃখে হ'বে পরিচয়,
বিরহে রবে না ভয়,
তত কাছে নিয়ে যাবে তব,
যত পা'ব বেদনা-আঘাত!

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়

ষ্টেশন-মাষ্টার

(গল্প)

নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই রেলের লাইনের চাকুরীতে ঢুকিয়াছিলাম। ছেলেবেলা যে 'ট্রেনে' উঠিবার জন্য প্রাণ ছট্ফট্ করিত, এখন সেই 'ট্রেনে'র কবল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। রেলের গাড়ীগুলা যেমন 'লোহার লাইন' ও চাকার মধ্যে সময় জিনিষটাকে অবিরাম নিষ্পেষিত করিয়া সশব্দে ছুটিতে থাকে, আমাদের 'ষ্টীল পেনে'র 'নিব'ও তেমনই সুবৃহৎ বাঁধা খাতার কাগজের উপর দিয়া দিন এবং রাত্রি আমার শরীরের সমস্ত শক্তিকে পিষিয়া নিঃশব্দে হু-হু করিয়া ছুটিয়া চলিত। পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে সময়ের মূল্য যদি কেহ বুঝিতে চান, তবে এই দীন 'ষ্টেশন-মাষ্টারে'র অনুরোধ, তিনি যেন রেলের চাকুরীটা একটু 'পরখ্' করিয়া দেখেন; একমাসের ভিতর সময়ের মূল্য কড়ায়-গণ্ডায়, কাক-ক্রান্তিতে আপনিই বুঝিতে বাকি থাকিবে না। এখন মনে হইতেছে, কি কুক্ষণেই রেলের কাজের জন্য মামাকে ধরিয়াছিলাম!

মামা ছিলেন 'বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে'র 'হেড্ক্লার্ক'। তখনও ডুয়ার্সের 'লাইন'-পাতা শেষ হয় নাই, সবে আরম্ভ হইয়াছিল। 'টি-কোম্পানি'র সাহেবদের ভিড় ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছিল এবং রেলের 'লাইন'-পত্তনও সাপের গতির মত মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল।

আমি 'সেকেণ্ড ক্লাস্' পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। তারপর পাঠে 'ইস্তফা' দিয়া মামার পরামর্শ-অনুযায়ী কয়েক মাস 'টেলিগ্রাফ্ প্র্যাক্টিসে'র যন্ত্রে দিনরাত টকাটক্ শব্দ করিয়া বিদ্যাদেবীর ভজন-গান করিলাম। মামার ধারণা, সরস্বতীর বাহনের ঠোকর খাইয়া যাহারা বিদ্যায় বীতরাগ, বিদ্যাদেবীর আরাধনা করিলে তাহারা লক্ষ্মীর পেঁচাকেও বশ করিতে পারে; কিন্তু আমার প্রতি বিদ্যুৎ-দেবীও বীতরাগী হইলেন। 'সিগ্নালে'র পরীক্ষক আমায় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আজ পর্য্যন্ত আমার বর্ণ-ভেদ-জ্ঞান হয় নাই অর্থাৎ নীল, লাল, সবুজ, বেগুণিয়া ইত্যাদি বর্ণের আলোক চকিতে দেখিয়া আমি দ্রুত বলিতে পারি নাই,—কোন্টি কি বর্ণের; সুতরাং 'সিগ্নালি'তে জলাঞ্জলি দিয়া আমি মামার সুপারিসের জোরে 'ডুয়ার্সে'র এক 'ষ্টেসন-মাষ্টারে'র পদে নিযুক্ত হইলাম। আমার 'ইষ্টিসানে'র নাম ছিল 'বাগ্রাকোটা'।

'ডুয়ার্স-লাইন' তিস্তানদীর তীর ছাড়াইয়া, জলাজমি, বাঁশবন কাঁপাইয়া, অরণ্যসঙ্কুল পার্ব্বত্য ভূমিতে আসিয়া আর উঠিতে পারে নাই। বাগ্রাকোটা-'ষ্টেশন'টি ছিল, একেবারে পাহাড়ের নীচে—চারিদিকে চায়ের বাগান ও চা-'ফ্যাক্টরী' এবং সাহেবদের 'বাংলো'তে স্থানটি ছবির মত দেখিতে; সুতরাং মনে হইল, আর যাহা হউক্ আর না হউক্, পাহাড়ের দেশে শরীরটাকে ত সুস্থ রাখা যাইবে।

আমি আমার একমাত্র শিশুকন্যা কল্যাণী ও সহধর্ম্মিণী শৈলজাকে লইয়া 'ডুয়ার্সে'র বাগ্রাকোটায় রওনা হইলাম; কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে কোনই ভরসা পাইলাম না। পর্ব্বত 'হাতের পাঁচ' বলিয়া জায়গাটিতে যথেষ্ট বাঘ ও ভালুকের আবির্ভাব আছে। এখানেও ছেলে-বুড়া সকলেরই 'ম্যালেরিয়া'-পুষ্ট সমুচ্চ প্লীহা। সাধারণ লোকেরা চায়ের বাগানে কাজ করিতে করিতে জীবন্মৃত হইয়া আছে। প্রত্যেক চায়ের মজুরকে দৈনিক কুড়ি সের চায়ের পাতা তুলিয়া দিতেই হয়, নচেৎ কুড়ি বেতের ব্যবস্থা। সাহেবদের ওজনের 'স্প্রিং-ব্যালেন্স' এমন সুনিপুণভাবে রচিত যে, আধমণ চায়ের ওজন সে 'ব্যালেন্সে' কুড়ি সের নির্দ্দেশ করে; সুতরাং লোকের খাটুনি ও পারিশ্রমিকের অনুপাত বুঝিয়া দেখুন। ভদ্রাভদ্র সকলেরই প্রাতরাশ—গরম চা ও 'কুইনাইনে'র দুইটি বটিকা। চা-'ফ্যাক্টরী'র যাবতীয় কর্ম্মচারী ও 'ষ্টেশন-ষ্টাফে'র প্রত্যেকেই বিনা অর্থব্যয়ে অজস্র 'কুইনাইন অফ্ সাল্ফেটে'র বটিকালাভ করিয়া থাকেন। আমি আসিতেই চতুর্দ্দিক্ হইতে সকলে 'কুইনাইন'-অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিলেন। দেখিলাম, বাঙ্গালা-দেশের আফিমের বড়ী, 'ডুয়ার্সে'র 'কুইনাইন্'-বড়ীর আকার ধারণ করিয়া আছে; এ এক নেশার মতই লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহা হউক্, স্থির করিলাম, আসিয়াই যখন পড়িয়াছি, তখন জায়গাটা একবার 'পরখ্' না করিয়া ফিরিব না। বিশেষতঃ, মামা বলিলেন, "রেলের কাজে উন্নতি আছে হে, উন্নতি আছে। মন দিয়ে বছর পাঁচেক কাজ করে নাও ত।"

মামা যেমন করিয়া বলিলেন, তাহাতে মনে হয়, পাঁচটা বছর, পাঁচ আঙ্গুলের মত এক নিঃশ্বাসে গণনা করা চলে; কিন্তু সেকেণ্ডের কাঁটা হইতে মিনিটের কাঁটা, মিনিট হইতে ঘণ্টা, ঘণ্টা হইতে দিন, মাস ও বৎসরের কাঁটা যে কত ধীরে ধীরে যায়, তাহা মামা হয় ত 'কুইনাইনে'র ঝোঁকে বুঝিতে পারেন নাই।

ষ্টেশন-মাষ্টার বলিয়া 'বাগ্রাকোটায়' একটী ছোট 'কোয়ার্টার' পাইলাম। 'কোয়ার্টার' বা কোটরের একটু বর্ণনা আবশ্যক। কবি হইলে, আমি হয় ত ঐ 'কোয়ার্টারে'র উপর পি, এম্, বাগ্চির এক 'কোয়াটার' কালি ও এক 'রিম্' বালি-কাগজ খরচ করিয়া কাব্যজাতীয় একটা কিছু জিনিষ লিখিতাম; কিন্তু মা ভৈঃ—সংক্ষেপে সারিব।

আকণ্ঠ বন্যঘাস ও ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে আমার 'কোয়ার্টার'টি 'চিম্নি'র শুঁড় উঁচু করিয়া জলমগ্ন হস্তীর মত কদাকারভাবে বিরাজিত। দুইখানি ছোট ঘর,—এক একটি করিয়া জানালা ও দরজা। জানালাটি রেলের 'লাইনের' দিকে ফোটান'; কিন্তু গৃহে আলোকাভাব বলিয়া সেই বাতায়নটিকে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রাখিতে হইত। 'রেলওয়ে'-যাত্রিগণ 'ট্রেন' হইতে আমার গৃহের বিছানা, দেওয়ালের 'ফটোগ্রাফ' ও ছবি, জানালার ধারে আমার স্ত্রীর সদ্য-স্নান-ত্যক্ত বিস্তৃত লাল-পাড়যুক্ত সিক্ত শাড়ীর শুষ্কতালাভের উদ্দেশ্যে সুন্দর বিস্তার, আমার নিশ্চিন্ত-উপবিষ্ট শিশুকন্যার হাস্য-বিস্ফারিত মুখচ্ছবি—এ সমস্তই দেখিতে পাইত। কখন কখন আমার অদূরদর্শিনী কন্যা বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া, যাত্রিগণকে চলন্ত 'ট্রেন' হইতে তাহার দুই ক্ষুদ্র হস্তের দ্রুত আন্দোলনদ্বারা আমার ক্ষুদ্র আবাস-গৃহে আহ্বান করিতেও ছাড়িত না। ঘরটি অত্যন্ত স্যাঁত্সেতে, ভূমিও ততোধিক। 'ম্যালেরিয়া' যেন তাহার জ্বরাসন বিছাইয়া আছে! এইরূপে আমার পারিবারিক এবং 'ষ্টেশন-মাষ্টারিক' জীবন লোকচক্ষুর গোচরে সতত পরিদৃশ্যমান ছিল।

আমাকে সকলে 'মাষ্টারবাবু' বলিয়া ডাকিত। পৃথিবীতে

তিনরকম 'মাষ্টার' আছে। ১ম, 'স্কুল-মাষ্টার', ২য়, 'পোষ্ট-মাষ্টার' এবং তৃতীয়, 'ষ্টেশন মাষ্টার'। এই তিনটির মধ্যে, 'মাষ্টারি' বা কর্ত্তৃত্বের চিহ্ন শেষোক্তটিতে বিন্দুমাত্র নাই; অন্ততঃ, আমি ত খুঁজিয়া পাইতাম না। সত্যকথা বলিতে হইলে,অন্যান্য 'ষ্টেশনে'র 'কোয়ার্টার'গুলি যে আমার 'কোয়ার্টার' হইতে যথেষ্ট ভাল ছিল একথা স্পষ্টই স্বীকার করিতে হয়। আমার বাগ্রাকোটার কোটরের যে কেন এমন দুরদৃষ্ট, তা জানি না। ডুয়ার্সের 'রেলওয়ে'র প্রত্যেক আরোহীই এই বাসস্থান ও বাসগৃহ দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিত।

আমার স্ত্রী প্রায়ই বলিতেন, "ওগো, কল্যাণীর শরীর যে ভাল থাকিতেছে না।" দেখিলাম, সুধু কল্যাণীর নহে, কল্যাণীর মাতারও শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্য ষ্টেশনে বদ্‌লি হইবার জন্য আবেদন করিলাম; কিন্তু যে অভিপ্রেত ষ্টেশনটিতে আমি বদ্‌লি হইতে চাহিয়াছিলাম, তাহার ষ্টেশন-মাষ্টারটি ছিলেন, বড় সাহেবের (D. T. S) প্রিয়পাত্র; সুতরাং উত্তর আসিল—"হাঁ, তথায় তুমি বদ্‌লি হইতে পার বটে, কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টারের পদে নহে; মালবাবুর (goo's-clerk) স্থানে। আর ৩০৲ স্থলে ১৫৲ পাইবে।" উত্তর দেখিয়া ত আমি স্থির করিলাম—"নাঃ, আর পরিবর্ত্তনে কাজ নাই, পাহাড়ের নীচে পাহাড়ের মত অচল হইয়াই থাকিব।"

মনে করিলাম, বলুক্ লোকে যাহা ইচ্ছা! স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিলাম, "দেখ, একস্থানে কিছু বেশীদিন থাকিলে, পরে উন্নতি আছে।" উপমা দিয়া বলিলাম, "যেমন ধর, চারাগাছ, যদি মাটীতে বেশীদিন তাহাকে রাখা যায়, তবে সে সেই মাটীতে শিকড় গাড়িয়া 'রস'-শোষণ করিয়া পুষ্ট হইতে পারে।" স্ত্রী উত্তর করিলেন, "কেবলমাত্র চায়ের রসেই যদি মানুষ পুষ্ট হইতে পারে, তবে আর ভাবনা ছিল না। অন্ন-ব্যঞ্জনের রসও ত আস্বাদন করিতে হইবে।" উত্তরটি শুনিয়া আর প্রত্যুত্তরের জন্য উচ্চবাচ্য করি নাই।

স্ত্রী এবং কন্যার শরীর যে 'ম্যালেরিয়া'য় দিনদিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতাম, কিন্তু তবুও অবুঝ হইবার ভাণ করিতাম; সুতরাং আমায় বুঝাইবার জন্য বিধাতা কড়ারকমের বিধান করিতেছিলেন।

ছয় বৎসরের কল্যাণী, আমাদের সৌভাগ্য-গগনে কল্যাণের ধারার মত আসিয়াছিল। গাছ অনুভব করিতে পারিলে, পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পুষ্পের জন্য তাহার যে আনন্দ হইত, কল্যাণী আমাদের মনে সেই আনন্দ জাগ্রৎ করিয়া দিয়াছিল। সমস্ত স্নেহ-প্রেম ও আনন্দ-উৎসের প্রবাহে সে যেন আমাদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া দিয়াছিল! শিশুর সেই পূর্ণ আনন্দময়, সরল, ভরাট্ মুখখানি ও সুপ্রশস্ত ললাট আমার মনের মাঝে হিমালয় পর্ব্বতের ঔজ্জ্বল্যের মত রমণীয় ও মহীয়ান্ ছিল; কিন্তু দিনে দিনে কল্যাণীর মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার অমন কুঞ্চিত কেশ রোগের তাড়নায় ঝরিয়া পড়িল। কেন, জানি না, কল্যাণীকে দেখিলে বোধ হইত, সে যেন, সমস্ত হৃদয় দিয়া, তাহার এই নরাধম পিতৃ-হৃদয়ের অসীম দুঃখ অনুভব করিতেছে।

* * * *

একদিন রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রাত্রি একটা। চাহিয়া দেখিলাম, পার্শ্বের জানালা দিয়া চাঁদের আলো বিছানায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শৈলজা গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। রাজপুত্রের উপকথায়, রাজবালা রূপার কাটীর স্পর্শে যেমন অচৈতন্য হইয়া যাইত, মনে হইল, শৈলজাও তেমনই চাঁদের রূপালী আলোয় অচৈতন্য। না না, চাঁদের আলোয় না—আমার এই অক্ষম জড়জীবনের স্পর্শে সে যেন সংজ্ঞাহীন। মনে পড়িল, কতদিন হইল, শৈলজাকে এমনই একদিন চাঁদের আলোয় দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার রূপ শতধারায় উছলিয়া উঠিত; কিন্তু এখন আর তাহার সৌন্দর্য্যের সে দীপ্তি নাই। তাহার সেই কাঁচা সোণার মত ঢল্‌ঢলে রং এখন যেন মলিন পাণ্ডুর আভা ধারণ করিয়াছে! প্রদীপ-হাতে মানুষ যেমন দেবতার মুখ দেখে, আজ এই বিশ্ব-প্রকৃতির নিজের-হাতে-জ্বালা চাঁদের প্রদীপে শৈলজার সমস্ত মনকে আমি যেন স্পষ্ট চোখে দেখিতে পাইলাম। রোগের তাড়নায় স্ত্রীর স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, কন্যা শয্যাশায়ী; তবুও আমার মনে এমন বল নাই যে, এখনই বাগ্রাকোটা ছাড়িয়া চলিয়া যাই। চাকুরী ত হাজার হাজার মিলিতে পারে; কিন্তু শৈলজা একবার চলিয়া গেলে, হায়! আর ত সে ফিরিবে না!

জানালার দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, চাঁদের আলো হঠাৎ একটা মেঘে চাপা পড়িয়া গেল। পুনর্ব্বার মেঘ-নিঃসৃত কৌমুদী আমার অন্ধকার গৃহে একটা নিঃশব্দ কৌতুক-হাস্যের মত ছড়াইয়া পড়িল। মনে হইল, শৈলজা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তাহার হাস্যকে যেন এমনই করিয়া আমার চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছে! নিজের দুর্ব্বল, অপদার্থ জীবনটার উপর একটা দারুণ ধিক্কার আসিয়া বারংবার আঘাত করিতে লাগিল।

কল্যাণী, প্রত্যহ বৈকালে আমার জন্য 'কোয়ার্টারে'র সঙ্কীর্ণ দ্বারপ্রান্তে জড়সড় হইয়া বসিয়া অপেক্ষা করিত। তাহার কমনীয় শিশু-আননের বেদনাক্লিষ্ট অনুজ্জ্বল হাসি এবং সরল মুখচ্ছবি মনের মধ্যে আঁকিতে আঁকিতে আমি ষ্টেশনে আসিয়া বসিতাম। কাজের ভিড়ের মধ্যে—মাঝে মাঝে আমার চোখের সাম্‌নের স্তূপীকৃত খাতা ও কাগজ, কাণের কাছে 'টেলিগ্রামে'র টকাটক্ ও টিকিটবিক্রয়ের খটাং খটাং শব্দ এবং আসন্ন 'ট্রেনে'র জন্য 'লাইন্‌ম্যান্'কে সজাগ করাইবার 'পাঁড়েজী'র ভীষণ চীৎকার।

এই ভিড়ের মধ্যে আমার অন্তরের ভিতর মাঝে মাঝে কে যেন কল্যাণীর সেই কোমল, শান্ত মুখচ্ছবিখানি জাগাইয়া দিত! আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া, কলম কাণে গুঁজিয়া ভাবিতাম, "যাই বাড়ী চলিয়া, ষ্টেশন-মাষ্টারীতে আর কাজ নাই"। কিন্তু পরক্ষণেই যখন আবার মনে হইত, "এত শীঘ্র রণে ভঙ্গ দিব —তাহা হইতে পারে না," বিদ্রোহী মনকে বশ করিয়া পুনর্ব্বার কাজের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতাম।

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ব করা এবং তাহাকে হজম করিয়া ফেলাটা দিন দিন এতই সোজা হইয়া আসিল যে, অসুবিধাটা আর গায়ে লাগিত না। খেলার পুঁতুলের বুক টিপিয়া ধরিলে, সে যেমন হাতজোড় করে, কিন্তু টিপুনি ছাড়িয়া দিলেই যেমন আবার পূর্ব্বেকার মত হইয়া যায়, আমার দশাও ঠিক সেই রকম হইল। বাড়ী ফিরিবার জন্য আকুলতা শৈলজার সংসারের কষ্ট, কল্যাণী ও শৈলজার স্বাস্থ্যহানির কথা, উপদেশ ও সেই উপদেশমত কাজ করিবার জন্য মনের ক্ষণিক ইচ্ছা এ সকল যখন আমার বুকে সজোরে চাপ দিত, তখন মনে করিতাম—আজই কাজে জবাব দিব; কিন্তু কাজের ভিড়ে বুকের চাপ্‌টা হাল্কা হইয়া আসিলেই আবার মনে হইত,—এই-ই বা মন্দ কি আছি?

ক্রমে কল্যাণীর শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেজন্য দোষ, আমায় দেওয়া চলে না। সন্ধ্যার আলোক ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর

হইয়া রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেলে, চোখে যেমন সে পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না, আমার কন্যার স্বাস্থ্যের পূর্ণতাও তেননই আমার অগোচরে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল; কিন্তু আমি সে পরিবর্ত্তন ধরিতে পারি নাই। মামা একদিন আমার বাসায় আসিয়া কহিলেন, "এ করিয়াছ কি! মেয়েটিকে যে মারিয়া ফেলিবে! উহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দাও না কেন? কল্যাণীর সে দেহ, সে আনন্দ গেল কোথায়?" আমি কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম "করিব কি?"

মামা রাগিয়া বলিলেন,"কেন তুমি আগে আমায় একথা জানাও নাই যে, ইহাদের শরীর ভাল থাকিতেছে না?"

* * * * * *

সেদিন খুব কম্প দিয়া কল্যাণীর জ্বর আসিয়াছিল। ডুয়ার্সের 'ম্যালেরিয়া,' নদীয়ার বা যশোহরে 'ম্যালেরিয়া' জাতি হইতে একটু আধ্যাত্মিক-রকমের অর্থাৎ শরীরের মধ্যে তাহার বিষের দ্বারা ক্ষয়কার্য্যটা এমনই সতর্কভাবে চলিতে থাকে এবং তাহার গতি এমন সূক্ষ্ম যে, বাহিরের চেহারা দেখিয়া যতটা অনুমান করিতে পারা যায়, আসলে সে দুর্ব্বলতা আনুমানিক দুর্ব্বলতার পাঁচগুণ হইবে; সেইজন্য হঠাৎ অক্কা পাইলে মনে হয়, "তাই ত, ভিতরে ভিতরে এমন কার্য্যও ইহা করিয়াছিল!"

যাহা হউক, কল্যাণীর জ্বর-আসা-যাওয়াটা আমার কাছে 'ট্রেণ-' যাওয়া-আসার মত নগণ্য ছিল; কিন্তু, কেন জানি না, সেদিন আমার মনটা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। গরম কম্বল, লেপ ইত্যাদির উষ্ণ আবরণের মধ্যেও বালিকার ক্ষীণতনু তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া কপালে উঠিল। শৈলজা অবলার মত কাঁদিয়া উঠিল। সত্য বলিতে কি, আমিও চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। বাগ্রাকোটার একমাত্র চিকিৎসককে আহ্বান করা হইল। তিনি আসিয়া বলিলেন, "সাধারণ জ্বর, কোন ভয়ের কারণ নাই।" আমি কল্যাণীর পাশে বসিয়া আছি, তাহার উত্তপ্ত দুইহস্ত আমি আমার করতলের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছি, এমন সময় বাহির হইতে ভীমনাদে কে ডাকিল, "মাষ্টারবাবু! বড় সাহেব (D. T. S.) আসিয়াছেন, আপনার তলব পড়িয়াছে।" বুঝিলাম, 'পাঁড়েজী'র কণ্ঠ! সেই ভীষণ পশ্চিমা-গলার স্বরে কল্যাণী ভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া আমার পানে দৃষ্টিবদ্ধ করিল। আমি তাহাকে অভয়বাণীদ্বারা শান্ত করিয়া স্ত্রীকে কহিলাম, "বড় সাহেব আসিয়াছে, যাইতে ত হইবে!"

"এমন অবস্থায় মেয়েটাকে ফেলিয়া কেমন করিয়া যাইবে?"

"চাকুরী যে যাইবে!"

"চাকুরীর কপালে আগুন! চাকুরীই কি বড় হইল?"

স্ত্রীর বাক্যে আহত হইয়া আমি ঠিক করিলাম, যা হয় হইবে, আমি যাইতে পারিব না। একটা চিঠি লিখিয়া 'পাঁড়েজী'র হাতে দিলাম। লিখিলাম, "আমি যাইতে অক্ষম। কন্যা মৃত্যু-মুখে। বিশ্বাস না হয়, দেখিয়া যাইতে পারেন।" চিঠিটা লইয়া 'পাঁড়েজী' দৌড় দিল।

চিঠি পাইয়া সাহেবপ্রবর কি মনে করিলেন, জানি না। পরদিন রাত্রি-জাগরণ-ক্লিষ্ট দেহে ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে, বড় সাহেব অত্যন্ত রাগিয়া আমায় একরকম বিদায়-বাক্য দিয়াছেন; কিন্তু বিদায়-লিপি দেন নাই; সুতরাং মনে আশা হইল, চাকুরী যায় নাই।

ইতিমধ্যে এক উপসর্গ জুটিয়া গেল। প্রতি বৎসরই ষ্টেশনের বাবুরা মিলিয়া সরস্বতীপূজার দিন একখানি নাটক অভিনয় করিয়া থাকেন। সেবার ঠিক হইয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত'-অভিনয় হইবে। আমায় 'চাণক্য' সাজিতে হইবে। শুনিয়া, প্রথমটা আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। চাণক্যের বুদ্ধিতে, আকৃতিতে বা অপর যে-কোন-বিষয়ে আমি যে কোন্‌খানে চাণক্যের সহিত ঐক্য-রক্ষা করিয়াছি, তাহা এ পর্য্যন্ত আমার কাছে রহস্যময় হইয়া আছে। বাবুদের সকলেই বলিতে লাগিলেন, আমি চাণক্যের অংশ অসম্ভব-রকম স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করিতে পারি। আজ মনে হইতেছে, সংসারে একটা জিনিষের জন্য ত লোকের কাছে সম্মান পাইয়াছিলাম!

খুব ধূম করিয়া অভিনয়ের আয়োজন হইল। বড় সাহেব পাঁচশত টাকা চাঁদা দিলেন আর বাবুদের গাঁট কাটিয়াও অনেক টাকা জমিয়া উঠিল। 'থিয়েটার' হইবে বড় সাহেবের 'হেড্ কোয়ার্টারে'। বাগরাকোটা-'ষ্টেশন' হইতে তিন ষ্টেশন পরে। চা-'কোম্পানির' সাহেব ও মেম এবং বাঙ্গালীগণও নিমন্ত্রিত হইলেন। রেলের সাহেবেরা এই বিষয়ে দেখিলাম, বেশ উৎসাহী। আমি যে এ-হেন বিদ্বান্-সমাজে এবং বড় সাহেবের সেই জ্বলন্ত দুই চক্ষুর সম্মুখে হাত-পা নাড়িয়া অভিনয় করিব, মনে করিয়াও প্রাণটা নাচিয়া উঠিল! বাবুদের মধ্যে আমার নাম "চাণক্য" এবং বড় সাহেবের অবাধ্য বলিয়া রটিয়া গেল। সমস্ত আনন্দের মাঝখানে আমার মনের মধ্যে ঐ একটি কাঁটা বিঁধিয়া থাকিত যে, কল্যাণীর শরীর অসুস্থ; কিন্তু আনন্দের জারকরসে সে দুঃখকে হজম করিয়া ফেলিলাম। শৈলজার শরীরও তেমন ভাল ছিল না; মনে করিলাম, 'থিয়েটার'টা ত হইয়া যাক্, তারপর অন্য কথা।

* * * *

অভিনয়ের দিন বাগ্রাকোটা উজাড় করিয়া লোক 'থিয়েটার' দেখিতে চলিয়া গিয়াছিল। আমি শৈলজাকে কল্যাণীসহ 'থিয়েটার' দেখিতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। কিন্তু কল্যাণীর সেই দিনই প্রত্যূষে ভয়ানক জ্বর আসিল। স্ত্রী বলিলেন, "কাজ নাই তোমার অভিনয়ে; অন্য কাহাকেও দিয়া কাজ সারিয়া লইও। আজ কল্যাণীর জ্বর দেখিয়া আমার কিন্তু ভয় হইতেছে।" জ্বর ক্রমশঃ সূর্য্যের তেজের সহিত বৃদ্ধি পাইয়া দুপুরে ১০৬ 'ডিগ্রি' উঠিল। ডাক্তার আসিলেন। বলিলেন, "তাই ত হে! 'থিয়েটারে'র দিনটায় আজ মেয়েটাকে বিছানায় শোয়ালে! যা' হোক্, যে রকম দেখিতেছি, ভয় হইতেছে। জ্বর বাড়িবার সময় তত ভয় নাই বটে, কিন্তু জ্বর কমিবার সময় নাড়ী ঠিক থাকিলে হয়! রোগী ঐ সময় হঠাৎ collapse করে।"

ডাক্তারের বাক্য আমার "কাণের ভিতর দিয়া মরমে" পশিয়া প্রাণটাকে আকুল করিয়া দিল। ভয় আছে?—এতদিন ভয় ছিল না, আজ ডাক্তার কেন বলিলেন যে ভয় আছে? মনটা অত্যন্ত দমিয়া গেল। কোথা হইতে চক্ষুপ্রান্তে জল আসিয়া পড়িল। শৈলজা সমস্ত দিনরাত্র কল্যাণীর সেবা করিয়া অনাহারে রুগ্নপ্রায়; সমস্ত সংসার আষাঢ়দিনের মেঘাবৃত দিবসের মত অশ্রুভারাবনত। আর আমি 'থিয়েটারে' "চাণক্য" সাজিয়া অভিনয় করিতে যাইতেছি! সংসার এবং অন্তরাত্রের "চাণক্য"-অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে প্রকৃত অভিনয়, তাহা আমার পক্ষে ঠিক করা কঠিন হইয়া উঠিল। মনে করিলাম, যা হয় হইবে, যাইব না আজ অভিনয় করিতে; কিন্তু পরক্ষণেই কে যেন কাণে কাণে বলিয়া গেল, "ও বাবাঃ! সে কি হয়? সমস্ত বি, ডি,

আর, আজ আমার অভিনয় দেখিবার জন্য সমাগত; সে কি প্রত্যাখান করা যায়?”

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাগ্‌রকোটার ডাক্তার হইতে আরম্ভ করিয়া শয্যাশায়ী রোগী পর্য্যন্ত সকলেই ‘থিয়েটার’ দেখিতে রওনা হইতে দেখিলাম। বৎসরে একদিন এই আনন্দ ভোগ করিবার জন্য সকলেই সচেষ্ট ছিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমার প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহাকে আজ আটক করা কঠিন দেখিলাম। যে জিনিষের অভ্যাস হইতে মানুষ নিজেকেই নিজে আটক্ করিতে পারে না, সেই জিনিষের মাত্রাটা তিনি কিছু বেশী-রকমই চালাইয়াছিলেন।

কল্যাণীর জ্বর দুপুরের পর হইতে কমিতে লাগিল। শৈলজা সমস্ত দিন একটু জল ও কয়খানি বাতাসা খাইয়া ছিল। আমার অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া শৈলজা কল্যাণীর সেবা করিয়াছে। আর আমি—কেমন করিয়া ‘থিয়েটারে’র ‘পার্ট’ বলিব, বারংবার তাহাই অভ্যাস করিতেছিলাম। উদরটিও মধ্যাহ্ন-নিমন্ত্রণের সুপ্রচুর আয়োজনে ভরপূর ছিল।

শৈলজা বলিল, “কল্যাণীর জ্বর যখন কমিতেছে তখন তুমি যাও; অভিনয়টা সারিয়া শীঘ্র করিয়া আসিও।”

আমি যে আজ ‘থিয়েটার’ করিবই, তাহা মনের কোণে বহু আপত্তির ভিতরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম; সুতরাং স্ত্রীর সম্মতিসূচক বাক্যে ততটা আশ্চর্য্য হইলাম না। অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর করিলাম,—“তাই ত দেখিতেছি! না যাইলেও ত নয়, সমস্ত লোক জুটিয়াছে!” এইরূপ নানা যুক্তি-তর্কের দ্বারা স্ত্রীকে সম্‌জাইয়া দিলাম যে, আমার ‘থিয়েটারে’ উপস্থিত থাকাটা আজ সব চেয়ে বেশী আবশ্যক! স্ত্রী তাহাতে যে খুব তারিফ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাই হোক্, রঙ্গালয়ে “চন্দ্রগুপ্ত”-অভিনয়ে “চাণক্য” সাজিয়া অভিনয় করিবার জন্য ‘কোয়ার্টার’ ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। তখন অপরাহ্ন। শৈলজাকে আশ্বাস দিয়া বলিলাম, “কোন ভয় নাই, আজ নিশ্চয়ই কল্যাণী ভাল থাকিবে। আমি রাত্রি, নাগাৎ দুইটার মধ্যে ফিরিতে পারি।”

আমায় দ্রুত চলিয়া যাইতে দেখিয়া শৈলজা বলিল, “ও কি করিতেছ! চারটি ভাত খাইয়া যাও। কখন দুপুরে নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলে! আর আজ সমস্ত রাত্রি অনাহারে থাকিবে কেমন করিয়া?” এই বলিয়া শৈলজা গরম ভাতের থালা আনিয়া দিল। এত পরিশ্রমের উপর কেমন করিয়া জানি না, শৈলজা আমার জন্য পাক করিয়া রাখিয়াছিল। আমার সান্ধ্য আহারের এই অপ্রত্যাশিত আয়োজনে কতকটা মুগ্ধ হইলাম। বঙ্গ-রমণীর রূপ ছাড়াও যে তাহার গুণ দিয়া মানুষ মুগ্ধ হইতে পারে, সেটা সেদিন আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। নিজে সমস্ত দিন কেবলমাত্র কয়খানি বাতাসা ও জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া আজ বাঙ্গালীর রমণী তাহার চাকুরে-স্বামীর পদতলে নিজের সমস্ত সেবার ভার অর্পণ করিল। মনে করিয়া আমার সমস্ত গা কাঁটা দিয়া উঠিল। মনে হইল, শৈলজা দেবী; কিন্তু সেই দেবীকে এই অধম ভক্ত কেমন করিয়া প্রসন্ন করিতেছে, সে চিন্তাটা আমার মত দেবী-পূজোর মনে স্থানও পাইল না।

যাহা হউক, আমি দুর্গা বলিয়া বাগ্‌রাকোটা হইতে রওনা হইলাম। যাইবার সময় ‘ট্রেন’ হইতে দেখিলাম, জানালা দিয়া শৈলজার অবগুণ্ঠিত মাথার অর্দ্ধেকটা দেখা যাইতেছে। একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম মাত্র। গাড়ী হইতে যখন নামিলাম, তখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। লাল, নীল, শাদা আলো ষ্টেশনে সদ্য জ্বালা হইয়াছে। আমার এই বিলম্বের জন্য রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষের নিকট হইতে যে বিশেষ সুমধুর সম্বোধন শ্রবণ করিলাম, তাহা বলিতে পারি না। তিনি ত জোর করিয়া আমায় ‘গ্রীন্ রুমে’ পাঠাইয়া দিলেন। ‘চাণক্যে’র সাজে সজ্জিত হইলাম।

এমন সময় হঠাৎ বাহির হইতে একজন ভৃত্য হাঁকিল, “বাবুজী, ‘টেলিগ্রাম’ আছে।”

আমরা ‘গ্রীন্‌রুমে’ সকলেই বাবুজী, সুতরাং ‘টেলিগ্রাম’টি জনৈক আদর্শ বাবুজী হাতে করিয়া লইয়া আমাদের সকলের সম্মুখে হাজির হইলেন। খামের উপরে ইংরাজিতে যে শিরোনামা লেখা ছিল, তাহাতে আমাকে কবুল করিতেই হইল যে, আমার নাম অমুক মুখোপাধ্যায় এবং আমারই কন্যা কল্যাণী আজ মৃত্যু-শয্যায়।

মঞ্চাধ্যক্ষকে বলিলাম, “আমায় ত যাইতে হইতেছে।” তিনি একটু কড়া ও তরল মেজাজে ছিলেন। রুখিয়া বলিলেন, “Non-sense! কেমন ক’রে তুমি এই packed house ফেলে যাবে? This is simply impossible!”

আমি তখন অসম্ভব এবং সম্ভবের তর্কে কাল না কাটাইয়া, গা হইতে চাণক্যের সাজ সজ্জাকে ঝাড়িয়া ফেলিলাম। তাহার পর মামার কাছে চলিলাম।

একমুহূর্ত্তের মধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল যে, অমুক বাবু বড় সাহেবের উপর রাগিয়া ‘পার্ট’ অভিনয় না করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। সকলে ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, “হইতেই পারে না।” মামার কাছে গিয়া সমস্ত খুলিয়া বলায় তিনি বলিলেন, “রমাভূষণের চাণক্যের ‘পার্ট’ মুখস্থ আছে, সে হয় ত পারিবে।” রমাভূষণ আমার ছোট-মামা। কলিকাতায় কোন এক আফিসে কাজ করে, ‘থিয়েটারে’র গন্ধ পাইয়া ডুয়ার্সে আসিয়াছে। কলিকাতায় ‘থিয়েটার’ দেখিয়া তাহার মনটা একেবারে ‘থিয়েটারি ষ্টাইলে’র হইয়া গিয়াছে। সে দিবারাত্র দানীবাবু ও অমর দত্তের কণ্ঠস্বরে অনুকরণ লোকের কাছে বাহাদুরী লইত। এমন কি, কথা-বার্ত্তা বলিবার সময়ও সে থিয়েটারি টোনে’র শরণাপন্ন হইত। এককথায় বলিতে গেলে, রমাভূষণকে “থিয়েটারে পাইয়াছিল”। চাণক্যের ‘পার্ট’ তাহার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ; সুতরাং সে নিঃসঙ্ক চিত্তে আমায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সম্মত হইল।

আমি হাঁপ্ ছাড়িয়া অথবা হাঁপাইতে হাঁপাইতে ‘ষ্টেশনে’র দিকে রওনা হইলাম। দেখিলাম, একটা মালগাড়ী তখনই বাগ্‌রা-কোটায় ছাড়িবে-ছাড়িবে করিতেছে। আমি ‘গার্ডে’র সঙ্গে সেই গাড়ীতেই উঠিয়া পড়িলাম। মনে হইল, কি-না-জানি হইয়াছে।

বাগরাকোটা-‘ষ্টেশনে’র নিকটবর্ত্তী হইয়া, গাড়ী ধীরে ধীরে চলিতেছিল। আমি গাড়ীর জানালা দিয়া প্রায় শরীরের অর্দ্ধেকটা বাহির করিয়া আমার ‘কোয়ার্টার’ দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়াছিলাম। গাড়ী ধীরে ধীরে আমার ‘কোয়ার্টার’ ছাড়াইয়া গেল। বাতায়ন দিয়া দেখা গেল, ভিতরে নিস্তেজভাবে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। মনে হইল, যেন কয়েকজন লোক নীরবে কালযাপন করিতেছে!

‘ষ্টেশনে’ গাড়ী থামিলে, দ্রুত নামিয়া ‘কোয়াটারে’র দিকে ছুটিলাম। গিয়া দেখিলাম, সমস্ত নীরব। বর্ষণের পর পৃথিবীতে যেমন একটা সজল মৌনের ভাব দেখা যায়, ‘কোয়ার্টার’টি তেমনই নীরব। কয়েকজন লোক আসিয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে। ঘরের ভিতর হইতে শৈলজার ক্রন্দনের স্বর, জলভারগ্রস্ত মেঘের আরাবের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। আমি চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—“কল্যাণী!”

শৈলজা গৃহ হইতে স্খলিতপদে বাহিরে আসিয়া কহিল, “ওগো, কল্যাণী আর নাই!”

শৈলজা আমার পদতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

প্রদীপের স্তিমিত শিখায় কল্যাণীর শেষ মুখচ্ছবি দেখিয়া লইলাম। বহুকষ্টে শৈলজার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আর কি বলিব? সেই রাত্রেই শৈলজাকে লইয়া বাড়ী রওনা হইলাম। বড় সাহেবের আজ্ঞাও আর আমাদের থামাইতে পারিল না।

* * * *

ভুল ভাঙ্গিল; কিন্তু অত্যন্ত দেরীতে। ‘ট্রেণ’ যখন ‘হেড্‌ কোয়ার্টার’ ছাড়িয়া যাইতেছিল, তখন দেখিতে পাইলাম, দূরে বহুদীপমালায় সজ্জিত চন্দ্রাতপের নীচে ভয়ানক রকমের জন-সমাগম হইয়াছে। থিয়েটার হয় ত তখন শেষ হইয়া আসিতেছিল। সুধু কাণে গেল, চাকার ঘর্ঘর-রব-মিশ্রিত একটা গানের ক্ষীণ সুর।

বাগ্‌রাকোটা যখন ছাড়িতেছিলাম, তখনও ‘ট্রেণ’ হইতে ‘কোয়ার্টারে’র দিকে একবার তাকাইয়াছিলাম। তখনও মনে হইল, একটা প্রদীপ নিস্প্রভ হইয়া জ্বলিতেছে। চক্ষু হইতে ঝর্ঝর করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া গেল। তাহার পর আবার অন্ধকারের মধ্যে ‘ট্রেণে’র সেই দ্রুত-মন্থর গতির একঘেয়ে শব্দ।

বাড়ীতে আসিয়াও শৈলজার শরীর ভাল থাকিল না। যে ‘ম্যালেরিয়া’ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহা আর ছাড়িল না। ভয় হইল, কি হইবে?

তাহার পর?—

তাহার পর যাহা হইল, বলিয়া কাজ নাই—থাক্। তবে জানিয়া রাখুন, আমি আজও দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করি নাই। খুব বড় বড় পণ-ওয়ালা পাত্রীর সন্ধান জুটিয়াছিল; কিন্তু, হায়! শৈলজাকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

ত্রয়ী

অপরূপ নেহার নয়ন

১ম চিত্র—

পথ দেখাইয়া—
আগে চলে বর্ষিয়সী;
অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি প্রায় জীর্ণতনু।
চিন্তাভারে অবনত—ভগ্ন মহীরুহ সম
প্রসিব সুফল—যেন ফুরায়েছে কায!
(তবু) ভবিষ্যৎ আশা ক্ষীণ আলো রেখেছে ঢাকিয়া;
শুষ্ক ছবি ম্লান আজ
মহিমার শ্বেত ছত্র আবরি গৌরবে।

২য় চিত্র—

“ভূত”, “ভবিষ্যৎ” মাঝে সধবার স্থির জ্যোতিঃ,
স্নিগ্ধ কান্তি—অচঞ্চল শোভা।
ভুলেছে “অতীত”, “ভবিষ্যতে” নাহি ভয়,
কঠোর কর্ত্তব্য সুধু স্থির “বর্ত্তমান”।
ব্রীড়া-লীলা যুগলের অপূর্ব্ব মিলন!
শ্রমক্লান্ত সংসারীর জুড়াবার স্থান।
গুরু ভার বহি শিরে সহি গুরু ক্লেশ
সুখ, শান্তি দিয়া বলিদান,
পরহিতে নিত্য রত
বিশ্ব-শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃজন।
সম্মুখে চলিছে জীবন্ত “অতীত”
পিছে আসে “ভবিষ্যৎ”,
“বর্ত্তমান” চলে ধীরে স্থির লক্ষ্যে,
মুখে বাণী, মনে আশা,
“যদ্ভাব্য তদ্ভাবী”,
সংসারের শ্রেষ্ঠ রত্ন
(তাই) ভক্তিভরে পূজে নারী মহাষ্টমীদিনে “সধবা” দেবতা।

৩য় চিত্র—

পিছে যায় “কুমারী”র কম মূর্ত্তি
ভবিষ্যৎ আশা,
গেছে “ভূত, যাবে “বর্ত্তমান”
ভবিষ্যৎ একই ভরসা।
তেঁই পূজাস্থানে—
ছিলে মাতা, আছ মাতা, হবে মাতা।
অপরূপ মাতৃ-পূজা-অভিনয়
বিশ্বমাতা পূজা-দিনে।

* * *

কেন তবে ভ্রম?
কেন নাহি “অতীতে” আদর
বিধবার শুভ্র জ্যোতিঃ কেন অপূজিত?
পথ দেখাইয়া আনে
“ভবিষ্যৎ”, “বর্ত্তমানে” দুই হাতে ধরি।
“অতীতে”র কেন তবে অগৌরব?
“সধবা”, “কুমারী”সনে বিধবার পূজা হোক্ বিধি—
তিনই মাতৃপূজা-রূপান্তর-ভেদ।
(হোক্) সাম, ঋক্, যজু তিন সম্মিলন।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

শোভাসিংহের বিদ্রোহ

মেদিনীপুর-জেলায় চেতুয়া ও বর্দ্দা নামক পরগণা এখনও বিগ্যমান। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে তথায় শোভাসিংহ রাজত্ব করিতেন। তখনকার রাজত্ব কখন স্বাধীনভাবে এবং কখন-বা করদরূপে। "ধ'রলি ত তোর, না ধ'রলি ত মোর" নীতিই তখন প্রধান। নবাব যদি রাজাকে শাসনে রাখিতে পারিলেন, তবেই কিছু কর পাইলেন; নচেৎ কিছুই পাইলেন না। সকল সময়েই তাহাই ঘটে। তবে এখন শাসনের রকম-ফের হইয়াছে।

সে যাহা হউক, শোভাসিংহ বিগ্যোৎসাহী এবং দাতা বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর জমি এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। একবার শোভাসিংহ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাকার রাজা দুর্জ্জন সিংহ তাঁহাকে পরাভূত করেন। মল্লভূমির পটিদারগণ (১) এই যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাজা দুর্জ্জন সিংহ মল্লাব্দ ৯৮৫ হইতে ১০০৮ শাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন (২)। ইহার কোন্ সময়ে এ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। তবে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভাসিংহ যে প্রবল বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা। বোধ হয়, ইহারই সংস্রবে কিম্বা ইহারই পূর্ব্বে শোভাসিংহ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বিদ্রোহের অব্যবহিত কারণ কি, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে, ইহা নিশ্চয় যে, শোভাসিংহ আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। উড়িষ্যা-প্রদেশের আফ্‌গান-নেতা রহিম খাঁও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ের মিলিত সেনা উত্তর ও পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইল। সরস্বতী-তীরে সপ্তগ্রাম লুণ্ঠিত হইল। দলে দলে লোক বিদ্রোহীর দলে যোগ দিতে লাগিল। তাহারা হুগলি দখল করিয়া লইল; কিন্তু চুঁচুড়ার ওলন্দাজ-কুঠীর জাহাজ গঙ্গার মধ্যস্থল হইতে তীরে গুলি ছুঁড়িতে লাগিল; তাহাতেই ওলন্দাজ-কুঠী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান রক্ষা পায়। একদল বিদ্রোহী, থানার (Tanna) মুসলমান-দুর্গ অবরোধ করিল; কিন্তু দুর্গের একদিকে গঙ্গা। গঙ্গায় ইংরাজ বণিকগণের "টমাস" নামক জাহাজ। পাছে বিদ্রোহীদল আরও উজানে গঙ্গা পার হইয়া সুতানুটির হাট এবং কলিকাতার কুঠী আক্রমণ করে, এই ভয়ে "ডায়মণ্ড" জাহাজ সুতানুটির সম্মুখে নঙ্গর করিয়া থাকিল।

বিদ্রোহীর দল পূর্ব্বদিক্ ছাড়িয়া দিয়া অন্যপথ ধরিল। তাহারা বর্দ্ধমান আক্রমণ করিল। তথাকার রাজা কৃষ্ণরাম বাধা দিতে যাইয়া যুদ্ধে হত হইলেন। রাজকুমার জগৎরায় প্রাণ লইয়া রাজধানী ঢাকায় পলাইয়া গেলেন। নবাব ইব্রাহিম খাঁ বিদ্রোহীদিগের উৎপাতের কথা শুনিয়াছিলেন। যাহা শুনিতে বাকি ছিল, তাহা জগৎরায়ের নিকট শুনিলেন; কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? তিনি বিদ্রোহ-দমনের জন্য কিছুই করিলেন না। কেহ কিছু বলিলে, তিনি নাকি বলিতেন যে, বিদ্রোহীরা আপনা-আপনিই ক্লান্ত হইয়া নিরস্ত হইবে; অনর্থক সমর-সজ্জা করিয়া প্রাণীক্ষয় করিয়া লাভ কি? আমাকে নিরাপদে 'গুলিস্তানে'র রসাস্বাদন করিতে দাও। বিলাতী বণিক-দল যখন আপনাদিকে আপনারাই রক্ষা করিতে অনুমতি চাহিয়া পাঠাইল, তখন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দিলেন—তথাস্তু! তখন এই 'তথাস্তু'র উপর নির্ভর করিয়া ইংরাজ, পুরাতন 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গের রচনা আরম্ভ করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, কোনপ্রকার দুর্গ-নির্ম্মাণ করিবার জন্য তাঁহারা খোলসা হুকুম পান নাই।

নবাব ইব্রাহিমের শৈথিল্যে বিদ্রোহীদল প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজা কৃষ্ণরামের মৃত্যু ও কুমার জগতের পলায়নের কথা বলিয়াছি; কিন্তু এই ক্ষত্রিয় রাজ-পরিবারের কুলমহিলাগণ কি করিলেন?

পাছে শত্রুর হস্তে পতিত হইতে হয়, এই ভয়ে সকল ললনা বিষপান করিলেন। কেবল রাজকুমারী-কৃষ্ণকুমারীকে বিষ ধরিল না। তিনি শোভাসিংহের বন্দিনী হইলেন। তখন সেই প্রাচীন নাটক—পুরুষের পাশব :বৃত্তি ও নারীর সতীত্ব—উভয়ের সংগ্রাম—পুনরায় বর্দ্ধমানে অভিনীত হইয়া উহার প্রতি ধুলিকণাকে পবিত্র করিল। প্রথমে মিনতি, মর্ম্মবেদনা, দীর্ঘনিঃশ্বাস—আকিঞ্চন, অনুযোগ, প্রেমভিক্ষা—পূরাদস্তুর সকলই হইল। তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া শোভাসিংহ রাজকুমারীর প্রতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলেন। কৃষ্ণকুমারী তখন আপন বস্ত্রাঞ্চলের অভ্যন্তর হইতে এক সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া তাহা শোভাসিংহের বক্ষে বসাইয়া দিলেন। এবং সেই ছুরিকা বক্ষ হইতে উঠাইয়া লইয়া আপনার বক্ষে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। (৩)

শোভাসিংহ মরিলেন; কিন্তু রহিম খাঁ রহিলেন। তিনি একাই, বঙ্গদেশের রাজা হইয়া বহুকাল পরে তথায় আফ্‌গান-পতাকা প্রোথিত করিবেন, এই আশায়, দ্বিগুণিত উৎসাহে

(১) ইহারা রামলীলা ও কৃষ্ণলীলার চিত্র এবং বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র লম্বা লম্বা কাগজে নানাবর্ণে আঁকিয়া কোষ্ঠীর মত জড়াইয়া রাখে। কাগজের অপরদিকে কাপড় লাগাইয়া উহাকে দৃঢ় করে। চিত্রের দুইপার্শ্বে বাঁশের দুইটি চেয়াড়ি (কাটি) দিয়া আবদ্ধ করে। দুইহাতে দুইটি চেয়াড়ি ধরিয়া চিত্রের প্রথম হইতে দেখাইতে দেখাইতে, সুর করিয়া তাহা বর্ণনা করিতে করিতে এবং বর্ণিত অংশ দেখাইতে দেখাইতে, চিত্র-প্রদর্শন সমাপ্ত করে। পটিদারগণের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। পদ দেখাইয়া পেদ চলে না বলিয়া, পুরাতন পটিদারের পুত্রেরা পৈত্রিক পেশা ছাড়িয়া দিতেছে। পুরাতন অনেক পদ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহাদের পদে চিত্রকলা বোধ হয় পূর্ব্বে ভালই ফুটিত। আমি যতদিন (প্রায় চল্লিশ বৎসর) ইহাদের যে সকল পদ দেখিতেছি, তাহাতে 'আর্ট' তত দেখি নাই অথবা আমার দেখিবার শক্তি নাই। কিন্তু এই সকল পদ ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের অন্যতম সহায় বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। এই সকল পদ সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হওয়া উচিত।

(২) ইহা স্থির যে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই যুদ্ধ হইয়াছিল।

(৩) স্যর উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব, তাঁহার Orrissa Vol. 2 গ্রন্থের ২৭শ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, এই গল্প তিনি মহারাজাধিরাজ মহাতাপ-চন্দের নিকট শুনিয়াছেন। তিনি ইহাও শুনিয়াছিলেন যে, শোভাসিংহ ও কৃষ্ণকুমারী ঘটিত বৃত্তান্তের জন্য এই রাজ-পরিবারের রমণীগণ প্রতি বসন্তকালে এক ব্রতোৎসব করিয়া থাকেন।

সম্পাদক মহাশয়গণ চেষ্টা করিলে, আশা করি, এই ব্রত কাহিনী প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

নগরের পর নগর, বন্দরের পর বন্দর অধিকার করিতে লাগিলেন—মুরশিদাবাদ, মালদহ, রাজমহল তাঁহার পদানত হইল—ইংরাজের কাশিমবাজার-কুঠী আপনা হইতে তাঁহার অধিকারে আসিল।

এখনও বিদ্রোহ-দমনের কোন চেষ্টা নাই; নবাব ইব্রাহিম তখনও 'গুলিস্তান' পড়িতেছেন।

সেকালে সংবাদ-পত্র ছিল না; থাকিলেও, হয় ত বা সেন্সর বিদ্রোহের ব্যাপার লিখিতেই দিতেন না। যাহা হউক, রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহা, বাদশাহ ও প্রধান ওমরাহগণের জানাইবার জন্য সংবাদদাতা ছিল; তাহাদেরই 'রোবকারি' কতকটা সংবাদপত্রের কার্য্য করিত। এইপ্রকার এক 'রোবকারিতে' বাদশাহ-জানিতে পারিলেন যে, বঙ্গদেশে কিরূপ বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালা শাসন করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, বাদশাহ আপন পৌত্র আজিমুশ্‌শানকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া, পাঠাইলেন এবং ইব্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বিদ্রোহীদিগের দমনের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন।

'গুলেস্তান'-পাঠ-পটু পিতার শৈথিল্যের জন্য এতদিন জবরদস্ত কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না—আভ্যন্তরীণ তাপরাশিকে যে শীতল ভূপৃষ্ঠ চাপিয়া রাখিয়াছিল, বাদশাহাদেশে সে ভূপৃষ্ঠ বিদারিত হইলে, সে তাপরাশি বিদ্রোহীগণকে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল— জবরদস্তের জবরদস্তি দিন দিন প্রকাশ হইতে লাগিল।

বৈশাখমাসে জবরদস্ত, ঢাকা হইতে সেনাদল লইয়া প্রবল উৎসাহে বিদ্রোহ-দমন করিতে বহির্গত হইলেন। অশ্বারোহীর দল সর্ব্বাগ্রে প্রেরিত হইল। পদাতিকগণের কোন দল পদব্রজে ছুটিল, কোন দল নৌকাযোগে পদ্মা উজাইয়া চলিল। কামান-সকল নৌকায় উঠাইয়া লওয়া হইল।

অশ্বারোহীর দল সর্ব্বাগ্রে পৌছিল এবং রাজমহল ও মালদহ বিদ্রোহীগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। পদ্মার উত্তরদিক্ হইতে রহিমের দল বিতাড়িত হইল। পশ্চিমে রাজমহলের দিক্ হইতে বাধা পাইয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া তাহারা ভগবানগোলার নিকট ছাউনি করিয়া বসিল। এইখানে জবরদস্তের সমগ্র সেনার সহিত বিদ্রোহীগণের ঘোর যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষই উৎসাহ ও পটুতার সহিত যুঝিতে লাগিল। উভয় পক্ষই বুঝিয়াছিল যে, এ যুদ্ধ জয়ের উপর বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার রাজত্ব নির্ভর করিতেছে।

কয়েক দিবসের পর জরবদস্তের সেনাদলের সুবিধা হইয়া উঠিল। এতদিন তাহারা কখন আত্মরক্ষা করিতেছিল, কখন-বা আক্রমণ করিতেছিল। এক্ষণে তাহারা অগ্রসর হইতে হইতে রহিম-শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইয়া গোলা ছুঁড়িতে লাগিল। রহিম-সৈন্য তাহা বোধ করিতে পারিল না। জবরদস্তের সেনা নিকট হইতে অধিকতর নিকটে আসিল। তখন প্রজ্জ্বলিত শিবিরশ্রেণী পশ্চাতে ফেলিয়া রহিম অবশিষ্ট সেনা লইয়া বর্দ্ধমানের দিকে পলাইয়া আসিল। জবরদস্তও তাহার অনুসরণ করিলেন। তখন আফ্‌গানেরা তাহাদের চিরন্তন রীতি অবলম্বন করিল; তাহারা প্রকাশ্য যুদ্ধের আয়োজন না করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এবং সুবিধা পাইলেই জবরদস্তের সেনাদলের উপর অতর্কিতভাবে আপতিত হইয়া প্রমাদ ঘটাইতে লাগিল। ক্রমে ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইল যে, উত্তরে পদ্মার উপকূলে জবরদস্তের প্রধান আড্ডা হইল এবং দক্ষিণে মহানদীর উপকূলে বিদ্রোহী রহিমের প্রধান আড্ডা হইল এবং উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের উপর মোগল ও আফগানে নানাস্থানে নানাবিধ খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয় দলেই বাঙ্গালী-অশ্বারোহী, বাঙ্গালী-পদাতি, বাঙ্গালী-ধনুর্ধারী এবং বাঙ্গালী-গোলন্দাজ ছিল; কিন্তু ঐতিহাসিক ভাষায় মোগলের অধীন সমুদয় সেনাকে মোগল বলিতে হয় এবং আফ্‌গানের অধীন সমুদয় সেনাকে আফ্‌গান বলিতে হয়।

সে যাহা হউক, জবরদস্ত ভগবানগোলার যুদ্ধে জয়লাভ করিলে পর, অধিবাসীবৃন্দের যাহারা শোভাসিংহ ও রহিমের পক্ষ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা নির্ভয়ে জবরদস্তের পক্ষে আসিল। জবরদস্ত এই সুবিধা যুদ্ধজয় অপেক্ষা মূল্যবান্ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন; কেন না, এই জনসাধারণের সাহায্য পাইয়া আফ্‌গান-সৈন্যগণের যে যে দল যেখানে যেখানে লুক্কায়িত থাকিত, তাহার সন্ধান তিনি পাইতেন, এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া নিপাত করিতেন। এইরূপে দিন দিন বিদ্রোহীদের দল পাত্‌লা হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদিগের সমূল বিনাশের আর বিলম্ব নাই বুঝিয়া নবাব আজি-মুশ্‌-শান সংবাদ পাঠাইলেন—"যুদ্ধ-বিগ্রহ স্থগিত রাখ; আমি স্বয়ং যাইতেছি।" জবরদস্ত বুঝিলেন যে, নবাবের ঈর্ষ্যানল জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি বাদশাহের পৌত্র ও বাঙ্গালার নবাবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, আজিমুশ্‌-শানকে কুর্ণিশ করিয়া পিতাকে লইয়া বাঙ্গালা-দেশ পরিত্যাগ করিলেন।

মহাসমারোহে আজিমুশ্‌-শান বর্দ্ধমানে আপন শিবির-সংস্থাপন করিয়া রহিমের নিকট দূত পাঠাইলেন। রহিমও সন্ধি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া দূতকে বিদায় দিলেন। উভয় পক্ষে নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল; কিন্তু আজিমুশ্‌-শানকে রহিম চিনিয়া লইয়াছিলেন। বিজেতার পক্ষ হইতে বিজিতপ্রায় বিদ্রোহীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব!

কথাবার্ত্তায় সময়ক্ষেপণ করিয়া, রহিম আপন বিধ্বস্ত সেনাদলকে সুস্থ হইবার সময় দিতেছিলেন এবং নূতন সেনাদল গঠন করিতেছিলেন। যে দীর্ঘসূত্রতা দোষে আজিমুশ্‌-শান উত্তরকালে বাদশাহের সিংহাসন লাভ করিতে পারেন নাই, তাহাই এক্ষণে রহিমের সুযোগ প্রদান করিল। রহিম খাঁ পুনরায়নবাব-সৈন্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু জবরদস্ত খাঁ রহিমের বিষদন্ত এইরূপই ভাঙ্গিয়া দিয়া গিয়াছেন যে, তাহা আর উঠিল না। রহিমের উচিত ছিল যে আজিমুশ্‌-শানের সহিত একটা সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে কিছু লাভ করা; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সকল সময়ে শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায় না।

খণ্ডযুদ্ধ চলিতে লাগিল; আফ্‌গানের সেনা পুনরায় মাথা তুলিয়া উঠিল; কিন্তু একদিবসের যুদ্ধে নবাবের এক আরব সেনানী, খুঁজিয়া খুঁজিয়া রহিম খাঁর সম্মুখীন্ হইয়া তাঁহার সহিত তরবারিযুদ্ধ আরম্ভ করিল। হঠাৎ রহিম অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন এবং সেই আরব তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। আফ্‌গান-দল ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পারিল, পলাইতে লাগিল। পলাইতে পলাইতে কত লোক অনুসরণকারী মোগল-সেনার বর্শার আঘাতে মরিল—কত লোক গুলি খাইয়া মরিল।

আজিমুশ্‌-শানের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আপনাকে জবরদস্ত অপেক্ষা সমর-নিপুণ বিবেচনা করিলেন। দরবার করিয়া তিনি অধীন সেনানীগণকে খেলাৎ ও পারিতোষিক বিতরণ করিলেন।

রহিম খাঁ যে সময় মুরশিদাবাদ দখল করেন, সে সময়ের এক গল্প আছে। মুরশিদাবাদের নিকট নিয়ামৎ খাঁ নামক এক জাইগিরদার বাস করিতেন। আপন দলে তাঁহাকে আসিবার জন্য রহিম খাঁ সংবাদ পাঠাইলেন; কিন্তু নিয়মাৎ উত্তর দিলেন যে যাঁহার জাইগির ভোগ করিতেছি, তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না; সুতরাং রহিম নিয়ামৎকে দণ্ডপ্রদান করা কর্ত্তব্য ও আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। একদল সেনা লইয়া তিনি নিয়ামতের জাইগির লুণ্ঠন করিতে গেলেন। ইহাদিগকে দেখিয়া নিয়ামতের এক ভ্রাতুষ্পুত্র সজ্জিত হইয়া রহিম খাঁর সহিত দ্বন্দযুদ্ধ করিতে চাহিল; কিন্তু রহিমের সেনাগণ এই উদ্ধত যুবককে বেষ্টন করিয়া অনতিবিলম্বেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। নিয়ামৎ এই সংবাদ পাইবামাত্র যুদ্ধ-সজ্জা করিবার জন্য যে সময়ক্ষেপ করিতে হইবে, তাহাও অসহ্য ভাবিয়া সামান্য এক 'কুর্ত্তা' পরিয়াই তরবারি হস্তে আপন অশ্বে আরোহণ করিলেন; এবং দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া রহিম খাঁর সম্মুখীন হইয়া ভীমতেজে তাঁহার মস্তক তরবারি-বসাইয়া দিলেন; কিন্তু রহিমের মস্তক কঠিন শিরস্ত্রাণে সুরক্ষিত থাকায় নিয়ামতের তরবারি ভাঙ্গিয়া গেল। ভগ্ন তরবারির যে অংশ তাঁহার হস্তে রহিল, তাহাই তিনি ভীমতেজে রহিম খাঁর প্রতি ছুড়িয়া মারিলেন। রহিম খাঁ তাঁহার অশ্ব হইতে ভূপতিত হইলেন। নিয়ামৎ তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়া রহিমের বর্শা কাড়িয়া লইলেন এবং উহা তাঁহার গলদেশে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু এবারও চেষ্টা বিফল হইল; রহিমের গলদেশও সুদৃঢ় লৌহপাশে রক্ষিত ছিল। তখন ক্ষিপ্তের ন্যায় নিয়ামৎ আর একবার বর্শা উত্তোলন করিলেন; কিন্তু উহার ফলক রহিমের দেহে পতিত হইবার পূর্ব্বেই রহিম-সেনা (যাহারা এতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল) নিয়ামতের নিপাতসাধন করিল। (৪)

রাজমহল ও মালদহে ইংরাজ-'কোম্পানি'র যে সকল দ্রব্য জবরদস্ত খাঁ বিদ্রোহীগণের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা পাইবার নিমিত্ত 'কোম্পানি'-বাহাদুর খোজা সর্হদ (৫) নামক জনৈক আর্ম্মানী বণিককে উপঢৌকনসহ জবরদস্তের শিবিরে পাঠাইয়াছিলেন। 'কোম্পানি'-বাহাদুরের লোক ভিন্ন অন্য বাজে ইংরাজ (৬) বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতে না পায়, সে প্রার্থনাও ছিল। এ সকল কোন কথাতেই জবরদস্ত খাঁ কর্ণপাত করেন নাই; কিন্তু জবরদস্তের সূর্য্য বঙ্গদেশ হইতে অস্তমিত হইলে, বর্দ্ধমানে আজিমুশ্-শানের শিবিরে ষ্টান্‌লি ও ওয়াল্‌শ সাহেবদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া সর্হদ উপনীত হইলেন। ইংরাজের দ্রব্য ইংরাজকে প্রত্যর্পণ করিতে আজিমুশ্-শান হুকুম দিলেন এবং ষোল হাজার টাকা পাইয়া অনুমতি দিলেন যে, 'কোম্পানি' সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক গ্রামত্রয় ক্রয় করিতে পারেন। (৭) দেখ, কোথাকার জল কোথায় গড়াইল।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস

(৪) ষ্টুয়ার্টস্ বেঙ্গল, ২০৭ হইতে ২০৯ পৃষ্ঠা।

(৫) খোজা সর্হদ অনেকবার 'কোম্পানির' দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাব-দরবারে ও বাদশাহ-দরবারে ইংরাজের পক্ষ হইতে তিনি অনেকবার গিয়াছিলেন। পাছে তিনি অধিক ব্যয় করেন অথবা উৎকোচ ও উপঢৌকনের কিয়দংশ আত্মসাৎ করে, এইজন্য তাঁহার সহিত দুই-একজন ইংরাজও যাইতেন।

(৬) ইহাদের সাধারণ আখ্যা ছিল—Interlopers.

(৭) সুতানুটি-'ডায়েরি' ১৬৯৬-৯৭ India office Records.

তৃষ্ণা

একটি যুগের তব আয়োজন প্রিয়া,
কত যে যুগের মোর চিত্ত-ব্যাকুলতা
দুটীমাত্র কর্ণ তব একখানি হিয়া
কোটী বরষের মোর বুকভরা কথা!
অযুত চকোর ঘুরে হৃদয়-গগনে,
দ্বাদশীর চাঁদ তব কতটুকু সুধা?
ক্ষুদ্র যে থালার অন্ন তোমার ভবনে
শতেক দুর্ভিক্ষজাত মোর যে গো ক্ষুধা!

দুইটী কমল মাত্র তব সরোবরে,
শত লক্ষ অলি মোর নয়ন-তারায়!
শত নিদাঘের জ্বালা মোর বক্ষ ভরে,
ক'টি বিন্দু করুণায় কিবা হবে হায়?
তব সপ্তসিন্ধু মাত্র ব্যাপি দশ দিশা,
আমার যে সর্ব্বগ্রাসী অগস্ত্যের তৃষা।

শ্রীকালিদাস রায়

বিজয়ার প্রণাম

(১)

একে জর্ম্মাণ-যুদ্ধ, তাহাতে আবার দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ; সুতরাং খরিদ-বিক্রয় প্রায় বন্ধ। দত্ত এণ্ড দত্তর অবস্থা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতেছে। অথচ বাজারের সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাহার যে পরিমাণ বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন, তাহা করিতেই হইতেছে। বাড়ী-ভাড়া, মটর গাড়ি, 'ফ্যান', 'লাইট্,' লোক-জন সবই আছে; যথাসময়ে 'হুণ্ডি' আসিতেছে, যেমন করিয়াই হউক, তাহার Payment আছে; যুদ্ধের জন্যই রকম-বেরকমের চাঁদা আছে, তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষের চাঁদা আছে, 'কংগ্রেসে'র চাঁদা আছে; এ সকলই রক্ষা করিতে হয়। কাজেই দত্ত এণ্ড দত্তের মালিক মিঃ বিনয় দত্ত বড়ই বিব্রত। এমন সময় পূজা আসিল; মা আনন্দময়ী অতি নিদারুণভাবে বাঙ্গালীর দ্বারে আঘাত করিলেন; সকলের সহিত হিসাব মিটাইতে, নানাজনকে পারিতোষিক ও উপহার দেওয়াইতে, নানাস্থানে তত্ত্ব করাইতে দশহাত লইয়া দশভূজার বাঙ্গালা-দেশে আগমন হইল।

(২)

যেন-তেন-প্রকারেণ বাজার-সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া ও কর্ম্মচারীদিগকে ছুটি দিয়া মিঃ বিনয় দত্ত 'হৌস' বন্ধ করিয়া গৃহে আসিলেন। পিতা যে পূজার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন এবং যাহা তাঁহার অবর্ত্তমানে তিনি মহাসমারোহের সহিত কয়েক বৎসর চালাইয়া আসিতেছেন, তাহা ত একেবারে বন্ধ করা যায় না। বিনয় দত্তের পূজার বিবরণ, তাঁহার বাড়ীর প্রতিমার 'হাফ্‌টোন্' ইংরাজি দৈনিক কাগজে পর্য্যন্ত উঠে। তাঁহার পূজায় ব্রাহ্মণ-ভোজন যেমন হয়, সেইপ্রকার সাহেব-মেমদের 'ডিনার' হয়; বাইজীদের যেমন নাচ হয়, সেইপ্রকার 'বলে'র বন্দোবস্তও আছে। তাহার পর আবার 'সুধী-সমাগম' নামক মজ্‌লিসে কলিকাতার ছোট-বড় সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্যিকদিগকে নিমন্ত্রণ ও আদর-আপ্যায়ন আছে। কাজেই বিনয় দত্তের যথেষ্ট নাম ও প্রতিপত্তি। হায়, সময়ে নাম ও প্রতিপত্তি বড়ই মর্ম্মপীড়ক! বিনয় দত্তের মনে হইতেছে যে, তাঁহার অপেক্ষা 'ফুটপাথে'র ঐ ঝাঁকামুটে আজ কত সুখী—সে আজ চারি পয়সার পরিবর্ত্তে মোট নামাইয়া 'পূজার বখ্‌শিস্'-হিসাবে আর দুইটি পয়সা পাইয়া কেমন হাসি হাসিতেছে!

(৩)

বিনয়—নামেও বিনয়, কাজেও বিনয়ী; কিন্তু নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে—মোটাকথায়, মাতার সহিত স্ত্রীর বনি-বনাও না হওয়ায় —পিতার মৃত্যুর একবৎসরের মধ্যেই মাতা, তাঁহার বহুবাজারস্থ গৃহ ত্যাগ করিয়া পৃথক্ বাটিতে বাস করিতে লাগিলেন। বিনয়ের পিতা বিনয়ের মাতার নামে শ্যামবাজারে যে বাটি খরিদ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই বাটিতেই এক্ষণে তিনি বাস করেন। বিনয়ের মাতার যে সকল কোম্পানির কাগজ আছে, তাহারই সুদে তাঁহার চলিয়া যায়। একমাত্র পুত্র বিনয়—কিন্তু তাঁহার ভরসা তাঁহাকে করিতে হয় না। বিনয়, স্ত্রীর নিকট প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ যে, তিনি মাতার সহিত কখন দেখা করিবেন না। এ প্রতিজ্ঞা বিনয় বৎসরে কেবল একদিন ভাঙ্গেন। তাহা বিজয়া-দশমীর দিন। সেদিন তিনি কাহাকেও না বলিয়া, ভাড়াটিয়া গাড়ি করিয়া মাতার চরণে উপস্থিত হন। সারা বৎসরের মধ্যে মাতা সেই কয়েক ঘণ্টাই স্বর্গ-সুখ উপভোগ করেন। এইরূপে বিশ বৎসর কাটিতেছে। ইহার মধ্যে মাতার কতবার অসুখ হইয়াছে; কিন্তু বিনয়কে কেহ সে সংবাদ দেয় নাই; ইহার মধ্যে বিনয়ের যে সকল পুত্র-কন্যা হইয়াছে, মাতা তাহাদিগকে কোনদিনও দেখিতে পান নাই।

(৪)

এ-বৎসর এক গোলযোগ বাধিল। পঞ্জিকায় লিখিল যে, নবমীর দিনই বিজয়া। মাতা মনে করিলেন যে, বিনয় আমার নবমীর দিনই আসিবে। তিনি কতবার জানালা দিয়া রাস্তার দিকে চাহিতে লাগিলেন। পথে কোন গাড়ীর শব্দ পাইলেই ভাবেন যে, ঐ বিনয় আসিতেছে; কিন্তু গাড়ী থামে না। বৃদ্ধার উৎকণ্ঠা বাড়ে। এইরূপে সেদিন গেল।

(৫)

পরদিন। আজ ত সামাজিক হিসাবে বিজয়া। বিনয় যদি কাল আসিল না, তবে আজ নিশ্চয় আসিবে; কিন্তু দুইটা বাজিয়া গেল; বিনয় আসিল না।

(৬)

প্রায় আড়াইটার সময় বিনয় দত্তের খিড়্‌কির দ্বারে এক গাড়ি লাগিল। 'কোচ-বক্স' হইতে একজন সরকার-শ্রেণীর লোক নামিয়া গাড়ির দ্বার খুলিয়া দিল; কিন্তু শকটোপবিষ্টা বৃদ্ধা গাড়ি হইতে নামিলেন না। সরকার দরজার কড়া নাড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক দাসী আসিয়া কপাট খুলিল। সরকার সরিয়া গেল। সম্মুখে গাড়ি ও তন্মধ্যে বৃদ্ধাকে দেখিয়া ঝি ভাবিল যে, কোন কুটুম্বিনী আসিয়াছেন। সে বলিল, "আসুন"। বৃদ্ধা বলিলেন যে, বাড়ীর গিন্নিকে খবর দাও। যে সাহস করিয়া বৃদ্ধা আপন বাটি হইতে বাহির হইয়াছিলেন, সে সাহসে ভর করিয়া তিনি বিনয়ের বাটিতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি গৃহকর্ত্রীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কিছুক্ষণ পরে বেশ-ভূষায় ভূষিতা এক গতযৌবনা রমণী আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা তখন ধীরে ধীরে শকট হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারদেশে যাইয়া কহিলেন, "বৌমা, তোমার বাড়ীতে এসে পাঁচমিনিটের জন্যে আমার বিনয়কে দেখে যেতে পাব?"

(৭)

বৌমা কোন উত্তর করিলেন না। বোধ হয়, কোন উত্তর মুখে ফুটিল না। তিনি বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া উপরে লইয়া চলিলেন। বিশ বৎসরের পরে মাতা আজি গৃহে পদার্পণ করিলেন। যে কক্ষে বিনয় এক 'সোফা'য় অর্দ্ধোপবিষ্ট অবস্থায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, তথায় তাঁহাকে লইয়া গিয়া বৌমা বিনয়কে উঠাইবার উপক্রম করিলেন। "না মা, উঠাও না, বাছার আমার দশায় দশা নেই; আহা, দেখ্‌চ না, কত চিন্তার রেখা এখনও আমার ঘুমন্ত শিশুর মুখে ঘুরে বেড়াচ্চে; বাছার কি আমার ঘুমিয়েও সোয়াস্তি আছে?" বৃদ্ধা চক্ষের জল চাপিয়া ভাঙ্গা গলায় ধীরে ধীরে আরও বলিলেন, "বৌমা, আমি আর একটু দেখে তোমার বাড়ী হতে চলে যাচ্চি।"

(৮)

বিশ বৎসরের অপকর্ম্ম বৌমার মনে কখন কখন ধাক্কা দিত; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দেখা যাইত না। তাহা অলক্ষিতভাবে সঞ্চিতই থাকিত। বৃদ্ধার আজিকার আচরণ

এবং অনুভূতি বৌমার হৃদয় চূর্ণ করিয়া দিল। বৌমা ভাবিলেন —স্ত্রী আমি, সর্ব্বদা সঙ্গে থেকেও তাঁর হৃদয়ের কষ্ট বুঝিতে পারি নাই, আর মাতা ঘুমন্ত :অবস্থায় দেখিবামাত্রই তাঁহা বুঝিতে পারিলেন—আমি আহারে উন্মনা দেখিয়াছি, বিহারে অযত্ন দেখিয়াছি, সময়ে চাপা-চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিয়াছি, আঙ্গুল কামড়াইয়া ভাবিতে দেখিয়াছি—কিন্তু তবুও স্বামীর মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কিছুই দেখিতে জানি নাই ;—আর এই মাতা, ইনি নিদ্রিত মুখ দেখিয়াই সন্তানের মনের সব বৃত্তান্ত জানিলেন ; —হায়, হায়, স্ত্রী আমরা, মায়ের তুলনায় আমরা কে ?

(৯)

এই ভাবিতে ভাবিতে, অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে করিতে বধূ-মাতা শ্বশ্রূর গলদেশ ধারণ করিয়া কতই যে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তাহা কে লিখিবে ? পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, বৃদ্ধার চক্ষু ফাটিয়া তখন যে অশ্রুরাশি নির্গত হইতে লাগিল, তাহাই-বা কে বর্ণনা করিবে ? এই দুই অশ্রুধারা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম-সদৃশ শুভ সংযোগে সেই কক্ষ পবিত্র করিয়া তুলিল। তাহার কলনাদে বিনয়ের কষ্টনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি "মা, মা," বলিয়া বৃদ্ধার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন। ইহাই তাঁহার বিজয়ার প্রণাম।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

স্বপ্নরাণী

(১)

মনের বনের গহন-কোণে
আছে যে এক দেশ,
স্বপনরাণী থাকেন সেথায়
মেঘের মত কেশ ;
হস্তীশালায় অশ্ব বাঁধা
অশ্বশালায় হাতি,
অলিন্দেতে অচেনা সব
পাখী নানান্ জাতি ;
বাগানভরা পদ্ম সেথায়
গোলাব-পুষ্করিণী,
মালিনী সব দাঁড়িয়ে যারা
চিনেও নাহি চিনি ;
প্রাসাদে সব দুয়ার খোলা,
বাতাস বেড়ায় মাতি',
শূন্যে দোলে হাজার ঝাড়ে
কালো আলোর বাতি ;
রাণী থাকেন বাহির-বাড়ী,
রাজা অন্তঃপুরে,
নহবতে জলতরঙ্গ
বাজ্ছে কোথা দূরে ;
সূর্য্য ডোবার আগেই সেথা
চাঁদটি উঠে হেসে,
ঝিল্লি-ডাকা তন্দ্রা-ঢাকা
স্বপ্নরাণীর দেশে।

(২)

স্বপনরাণীর আবাসখানি
আব্ছায়াতে ঢাকা,
দ্বারের কাছে জড়িয়ে আছে
কল্প-গাছের শাখা ;
মেয়েরা সব গাঁথ্ছে তলে
মুক্তাফলের মালা,
ছেলেরা সব প্রবাল তুলে
ভর্ছে সোণার ডালা ;
জান্লা-পাশে ঊর্ণনাভের
ঝুল্ছে সরু পর্দা,
সুর-বাহারে কাঁপ্ছে যেন
জংলা, সরফর্দা !
স্বপনরাণী হাওয়ার মত
ঘুরে বেড়ান পাশে,
অঙ্গ হতে পারিজাতের
গন্ধ ভেসে আসে ;
পরণে তাঁর ঝিকিমিকির
বসনখানি ঝলে,
জ্যোৎস্না-রাতের আলোক যেন
আমলকির তলে ;
হাতে দু'টি পরশকাটী
মুখে নাইক বাণী,
কাঁকনখানি ঝিঁঝির সুরে
তন্দ্রা আনে টানি' ;
সন্ধ্যালোকের ওড়্নাখানি
উড়্ছে কালো কেশে
কুজ্ঝটিকার পর্দা-ঢাকা
স্বপ্নরাণীর দেশে।

(৩)

নাইক সেথা গৃহী, গরীব,
নাইক বড় লোক,
সত্য বাঁধা স্বপ্নজালে,
মিথ্যা মায়ালোক ;
মাটীর কোঠা, ইঁটের দালান,
খড়ের চালা ঘর,
নাই সে কিছু ; নাইক নিকট,
সুদূর দূরান্তর ;
মেঘের ঘরে দুয়ার কোথা ?
বাঁধা-বাঁধন নাই,
পথ-হারান' হাওয়ার মত
সবাই ভেসে যায় ;
আপন-পরের প্রভেদ কিছু
যায় না সেথা জানা,
পরে যাহার নাইক বাধা
আপনে তাই মানা ;
যে প্রিয়জন-মিলন-পথে
জগৎ রুধে পথ,

সেখানে সে তোমার দ্বারেই
এগিয়ে আনে রথ ;
ধরায় যারা হারিয়ে গেছে,
যায় না পাওয়া কাছে,
তারা সেথায় হয় ত পাশে
আপনি মিলিয়াছে ;
যে প্রতিমা হেথায় ডোবে,
ওঠে সেথায় ভেসে,
নিখিলছাড়া বিধানহারা
স্বপ্নরাণীর দেশে।

(৪)

এ জগতের চরম তথ্য,
সত্য বল যারে,
সেই যদি হায়, মিথ্যা হয়ে
মিলায় অন্ধকারে !
কঠিন মাটীর অটুট বাঁধন—
সেও যে তাসের ঘর !
জীবন-অধিক সম্বন্ধ সে,
ঠকায় পরস্পর !
যুক্তি যখন কহে—জীবন,
পদ্মে বারিকণা,
অলীক অসার মায়া সবই
অবিদ্যা কল্পনা ;
প্রাণের অধিক ভালবাসা
রাখ্তে পারে কারে—
মৃত্যু যেদিন হাত বাড়িয়ে
দাঁড়ায় এসে দ্বারে ?
জ্ঞানই যখন অজ্ঞানাধিক
আলোর বেশী কালো,
সত্য যখন মিথ্যা এত,
স্বপ্ন—সে ত ভালো !
জাগার চেয়ে সুপ্তি তখন
শাপের মাঝে বর,
ওরে ক্ষ্যাপা, তার মাঝে তাই
তোল্ রে আজি ঘর ;
হাসি যখন অশ্রুজলে
যায় রে হেথায় ভেসে',
কিসের ক্ষতি—বাঁধ না বাসা
স্বপ্নরাণীর দেশে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(ঘ)

১

ময়ূর-সিংহাসন

বাদশাহ শাজাহান সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রাজকোষ মণি-মাণিক্যে পরিপূর্ণ। সম্রাট্ ভাবিলেন, এই সকল বহুমূল্য হীরক-মরকতাদির যদি যথাযোগ্য ব্যবহারই না হইল, তাহা হইলে এগুলি রাজ-ভাণ্ডারের পাষাণ-কারায় আবদ্ধ রাখিয়া ফল কি ?

সম্রাট্ স্থির করিলেন, রাজ্যের সিংহাসনের শোভা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই, মণি-মাণিক্যাদির উপযুক্ত ব্যবহার হইবে। প্রতিদিন শত সহস্র লোক দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইবে এবং সেই সিংহাসনে যিনি আরোহণ করিবেন, তিনিও সকলের চক্ষে অধিকতর মহিমান্বিত বলিয়া প্রতিভাত হইবেন।

রাজকোষের সমুদয় মণি-মাণিক্য তৎক্ষণাৎ বে-বদল খাঁর হস্তে প্রদত্ত হইল। বে-বদল খাঁ স্বর্ণকারদিগের অধ্যক্ষ ছিল। নানা-স্থান হইতে বিংশ কোটী মুদ্রা মূল্যের হীরক, মুক্তা, চুনি, পান্না, মরকতাদি সম্রাটের পর্য্যবেক্ষণের জন্য আনীত হইল। উহাদের মধ্যে সম্রাটের যেগুলি মনোমত হইল, তাহা সিংহাসনের জন্য ক্রীত হইল। নানাস্থানে সন্ধান করিয়া ৮৬ লক্ষ মুদ্রার অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের হীরকাদি সংগৃহীত হইয়া আসিল। চতুর্দ্দশ লক্ষ মুদ্রার স্বর্ণ [একলক্ষ তোলা] এবং এই সকল বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া স্বর্ণকারাধ্যক্ষ এক বিচিত্র সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল।

সে সিংহাসন দৈর্ঘ্যে ৩ গজ, এবং প্রস্থে ২॥ গজ ছিল। উহা উচ্চতায় ছিল ৫ গজ। ["শাজাহান-নামা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ময়ূর-সিংহাসন দৈর্ঘ্যে ৩॥ গজ ছিল]

হরিণমণি-নির্ম্মিত দ্বাদশটী স্তম্ভ, সিংহাসনের সহিত সংযুক্ত হইল। সিংহাসনের উপর যে চন্দ্রাতপ স্থাপিত হইল, তাহার বহির্ভাগ 'এনামেল'-করা। 'এনামেলে'র উপর স্থানে স্থানে মণি-মুক্তাদি-বসান'। চন্দাতপের নিম্নতল অতি বিস্তৃতরূপে নানা-প্রকার পদ্মরাগ ও অন্যান্য প্রস্তরাদিদ্বারা সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

হিরণমণির স্তম্ভগুলির শিরে মরকত, হীরক, পদ্মরাগ ও মুক্তার নির্ম্মিত যুগ্ম ময়ূর বসিল। ময়ূরযুগলের মধ্যস্থলে পদ্মরাগ ও হীরক-নির্ম্মিত এক একটী বৃক্ষ শোভা পাইতে লাগিল। উৎকৃষ্ট মণি-মুক্তায় গ্রথিত তিনটী সোপান সিংহাসনে আরোহণ করিবার জন্য সংযুক্ত হইল।

সিংহাসনে বসিবার জন্য বৃত্তাকারে ১১টী আসন ছিল। তাহাদের বলিত "তখ্তা"। ঠিক মধ্যস্থলের আসনটী সম্রাটের জন্য। উহার ব্যয়ই দশ লক্ষ মুদ্রা হইয়াছিল। এই আসনে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের একটী পদ্মরাগ মণি গ্রথিত হইয়াছিল। ইরাণের বাদশাহ শা আব্বাস্, উহা সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে উপহার দিয়াছিলেন। শাজাহান দাক্ষিণাত্যে সমর-বিজয় করিয়া উহা জাহাঙ্গীরের নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার গাত্রে তৈমুর, মীর শা রুখ, মির্জ্জা উলুঘ বেগ, শা আব্বাস্, জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের নাম খোদিত ছিল।

সম্রাটের আদেশে হাজি মহম্মদ জান একটী কবিতা রচনা করিয়া চন্দ্রাতপতলে লিখিয়া দিয়াছিলেন।

এইরূপে সপ্ত কোটী মুদ্রা-ব্যয়ে সপ্ত বৎসরের সুদীর্ঘ চেষ্টায় মোগল-সাম্রাজ্যের ময়ূর-সিংহাসন বিরচিত হইয়াছিল। সম্রাট্ শাজাহানের অষ্টম বর্য রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ১৬৩৪) 'নৌরাজা'র দিন তিনি বিপুল আড়ম্বরে এই ভুবনবিখ্যাত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তখন কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন যে, একদিন আগ্রা-দুর্গের পাষাণ নির্ম্মিত কক্ষতলে বসিয়া তাঁহাকে রোদন করিতে হইবে?

[বাদশা-নামা]

["শাজাহান-নামা"-গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ময়ূর-সিংহাসনের ব্যয় ১০ কোটী নহে, ১ কোটী মুদ্রা]

ময়ূর-সিংহাসন-নির্ম্মাণের কিঞ্চিৎ অধিক শতবর্ষ পর যখন নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন, তখন মহম্মদ শাহ দিল্লীর সম্রাট্। নাদির শাহের আদেশে মুহূর্ত্তে চাঁদ্‌নি-চক্, দরিবা-বাজার, মস্‌জিদ্-ই-জামের নিকটবর্ত্তী গৃহাদি ভস্মীভূত হইয়া গেল। নাগরিক্‌দিগের রুধির-স্রোতে রাজপথ কর্দ্দমাক্ত হইল। অর্দ্ধদিবসব্যাপী হত্যাকাণ্ডের পর নাদির শাহ, তাঁহার ক্ষিপ্ত সৈনিকদিগকে নিরস্ত করিলেন।

রাজকোষে তখন যত অর্থ ও মণি-মুক্তাদি ছিল, নাদির শাহ সমস্তই গ্রহণ করিলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আনন্দরাম মুখ্‌লিম্ এই হত্যা ও লুণ্ঠনকালে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"নাদির শাহ, বহুসহস্র আশরফি, কোটী টাকা মূল্যের সুবর্ণ-পাত্রাদি, পঞ্চাশ কোটী টাকার মণি-মুক্তাদি এবং ৬০ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। ময়ূর-সিংহাসনের মূল্যই ত কোটী টাকা হইবে। হয়, হস্তী যাহা দেখিয়াছিলেন, তিনি সমস্তই লইয়া গিয়াছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ৩৪৮ বৎসরের ক্রমশঃ-সঞ্চিত ধনরাশি সমস্তই মুহূর্ত্তে হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

'জৌহর-ই-সম্‌সান' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহম্মদ শাহ নিজেই বিদায়কালীন উপঢৌকনস্বরূপ নাদির শাহকে ময়ূর-সিংহাসন দান করিয়াছিলেন। এই সিংহাসনে এক 'গিরা'র অধিক প্রস্থের একখানি পদ্মরাগ মণি বসান' ছিল।

[তজ্‌কিরা]

২

স্বর্ণ-ঘণ্টা ও দাঁড়কাক

কবি আমির খুস্রুর নাম ভুবনবিখ্যাত। তিনি "হিন্দুস্থানের তোতা" নামে পরিচিত। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি ৫ লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী কবিতার নাম "নৌ-সিফির"। এই কবিতার চতুর্থ স্তবকে তিনি কহিয়াছেন—

"শুনিলাম, ৫।৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে অনঙ্গপাল নামে দিল্লীতে একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। শৈলোৎকীর্ণ দুইটী সিংহ তিনি তাঁহার সিংহদ্বারে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সিংহের পার্শ্বে একটী ঘণ্টা ছিল। রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া এই ঘণ্টা বাদন করিলেই, রাজা তাহাকে ডাকিয়া অভিযোগ শ্রবণ করিতেন এবং যথোপযুক্ত বিচার করিয়া প্রজার মনোরঞ্জন করিতেন। একদিন একটী দাঁড়কাক আসিয়া ঘণ্টার উপর বসিল। ঘণ্টা ঢং-ঢং শব্দে বাজিয়া উঠিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—কে ঘণ্টা বাজায়?

শুনিলেন, একটী দাঁড়কাক।"

রাজা মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, এমন অনেক সাহসী দাঁড়কাক দেখা যায়, যাহারা সিংহের মুখ হইতেই আহার কাড়িয়া লইয়া যায়। শৈল-সিংহ ত আর শিকার করিতে পারে না—দাঁড়কাক তাহার মুখের আহার কি পাইবে? কাকটী নিশ্চয়ই ক্ষুধাতুর হইয়া সিংহের নিকট আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশে কতকগুলি ছাগ ও ভেড়া বলি দেওয়া হইল এবং বায়সকুল অনেকদিন ধরিয়া পরমানন্দে আহার করিয়া বাঁচিল।"

৩

বাদশাহী স্বর্ণ-শৃঙ্খল

বাদশাহ জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খৃঃ অব্দের ১২ই অক্টোবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর তিনি প্রথমেই আদেশ দিলেন, ৩০ গজ দীর্ঘ একটী স্বর্ণ-শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া তাহার একপ্রান্ত আগ্রা-দুর্গের গাত্রে এবং অপর প্রান্ত যমুনা-তীরে একটী শৈল-স্তম্ভের সহিত দৃঢ়রূপে গ্রথিত হউক। শৃঙ্খলের সঙ্গে ৬০টী ঘণ্টা সংযুক্ত করিয়া, বাদশাহের আদেশানুরূপ স্থানে উহা গ্রথিত হইল। বাদশাহ কহিলেন, বিচারকগণ কোন বিষয়ের বিচার করিতে অসমর্থ হইলে, বিচারপ্রার্থী যেন এই শিকল নাড়ে। তাহা হইলেই, বাদশাহ ঘণ্টা-নিনাদ শ্রবণ করিয়া উপযুক্ত বিধান করিবেন। এই বাদশাহী স্বর্ণ-শৃঙ্খল ওজনে ৪মণ ছিল। কেহ কোনদিন এই ঘণ্টা বাজাইয়াছিল কি না, ইতিহাসে তাহা লেখে না। ইংরাজ-ঐতিহাসিক [Modern Universal History] বলেন, এই স্বর্ণ-শৃঙ্খল সুধু বাদশাহী ঠাটমাত্রই ছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, চৈনিক নরপতি ইউ-তু এইরূপ একটী শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

[তারিখ-ই-সলিমশাহী]

৪

প্রাচীন শিল্পশালা

সুলতান মহম্মদ তোঘলক ১৩২৫ খৃঃ অব্দে তুঘলিকাবাদে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনারোহণের ৪০ দিন পরই তিনি দিল্লীতে গমন করিয়া সুলতানরূপে ঘোষিত হইয়াছিলেন। এমন একটী দিনও যাইত না, যেদিন তাঁহার সিংহদ্বার নরশোণিতে কলঙ্কিত না হইত। সপ্তবিংশতি বর্ষমধ্যেই তাঁহার রাজত্ব হিন্দুস্থান, গুজরাট, মালব, মহারাষ্ট্র-প্রদেশ, তিলাং, কাম্পিল্য, দ্বারসমুদ্র, লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম, সোণার গাঁ এবং ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

সুলতান মহম্মদ প্রতিবর্ষে বিংশতি সহস্র পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া অমাত্য ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিতরণ করিতেন। পরিচ্ছদগুলি রেশমে নির্ম্মিত হইত। এইজন্য তিনি একটী শিল্পশালা স্থাপিত করিয়া ৪০০ তন্তুবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা রেশম বয়ন করিত। কখন কখন চীন এবং ইরাণ হইতেও রেশমী বস্ত্র আনীত হইত। রেশমের উপর স্বর্ণের ফুল তুলিবার জন্য স্বর্ণ-সূত্র আবশ্যক হইত বলিয়া, সুলতান ৫০০ স্বর্ণকার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা সুলতানের শিল্পশালায় স্বর্ণ-সূত্র প্রস্তুত করিত।

[মনালিক]

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

মর্ম্মবাণী—

মৃত-সন্নিধানে

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ২৫এ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ১৪শ সংখ্যা

ওঙ্কারের যাত্রী

সায়াম ও কাম্বোডিয়ার অধিবাসী ব্যতীত অন্যান্য স্থানের অতি অল্প লোকই ওঙ্কারের নাম শুনিয়াছে—এমন কি, 'খমের' নামক কোনও জাতি এই চিরশ্যামল বসুন্ধরার সূর্য্যালোকদীপ্ত বক্ষে বিচরণ করিত কি না, তাহারা কি কি কার্য্য করিয়াছে, তাহারা কিরূপে এই শ্যামা ধরিত্রীর অঙ্ক হইতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, তাহা কেহই জানে না। বর্ত্তমান সুসভ্য জাতিগণের মধ্যে অত্যল্পজাতিই ওঙ্কার টম ও ওঙ্কার ওয়াটের নাম শুনিয়াছেন। হায়, কালের প্রচণ্ড প্রতাপে ওঙ্কার টমের সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য ও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি কাম্বোডিয়ার বিজন অরণ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে! প্রকৃতিদেবী যেন সেই চিরসুন্দর প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি ও বর্ত্তমান সভ্যতার মধ্যে একটি সুদৃঢ় বেষ্টনী রচনা করিয়াছেন!

আজ পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকই ওঙ্কর দেখিতে গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে দুই-একজন স্ব-স্ব পিতৃ-পিতামহের পুণ্যবলের নিমিত্তই প্রাণ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন;—ইহার কারণ এই যে, সেই প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ অভ্যাগত জনসমূহের উপর একেবারেই বিরূপ। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, যখন রোমীয়দিগের ক্ষমতা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহারা ওঙ্কারধামে রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। চীনগণ প্রায়ই রাজদূত পাঠাইতেন এবং সন্ধিস্থাপন করিতেন—ওঙ্কার টমের পূর্ব্ববিবরণ তাঁহারা যতটা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আর লোক-সমাজে প্রকাশিত করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ মার্কো পোলো স্থানটির নামোল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে সে স্থান কখনও দেখেন নাই।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে 'ডাচ'গণ ওঙ্কারে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু ঐ স্থানের জনসমূহের নিকট হইতে তিনি প্রাণ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। পরে পর্ত্তুগীজ ও স্পেন-দেশীয়গণ ক্রমে ক্রমে তথায় গমন করেন; কিন্তু কেহই ইহার তথ্য-আবিষ্কারে সমর্থ হন নাই। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীগণ কাম্বোডিয়ায় গমন করিয়া এখনকার ভৌগোলিক সীমা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

বহুশতাব্দী যাবৎ জনশূন্য অবস্থায় পরিত্যক্ত থাকায় কাম্বোডিয়ার অপূর্ব্ব প্রাচীন কারুকার্য্য-সম্বলিত গৃহগুলির শোচনীয় দুর্দ্দশা হইয়াছে। নির্ম্মাতার ভাষা সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বলিয়া, কাম্বোডিয়ার বিষয় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সত্ত্বেও সেই স্থানের বিস্ময়প্রদ অট্টালিকাসমূহ স্ব স্ব মৌলিকতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। কাম্বোডিয়ার পূর্ব্বরহস্যগুলি যদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনুসন্ধিৎসা উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে এবং সেই অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া যদি তাঁহারা ইহার সমস্ত বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এই বিবরণ যে শিল্পীর সমধিক আগ্রহের বস্তু হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ওঙ্কারে যাইবার কোনও প্রশস্ত পথ নাই—কেবল একটিমাত্র কর্দ্দমপরিপূর্ণ জঘন্য পথ; তাহাও তিন-চারি মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনীর তটপ্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া ধ্বংসাবশেষের সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জলপথ ভিন্ন ওঙ্কারে গমন করিবার আর অন্য পথ নাই—তাহাও আবার বহু আয়াসসাধ্য। একটী প্রাকৃতিক ক্ষুদ্র হ্রদ পথিমধ্যে অবস্থিত থাকায়, সাধারণের গমনাগমন বিশেষ শ্রমসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষার শেষভাগ হইতে প্রায় তিনমাস পর্য্যন্ত তরণী-সংযোগে পারাপার হওয়া যায়; কিন্তু যাঁহারা ইহার পরে পার হইবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

আজ পর্য্যন্ত কেবল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলি ওঙ্কারের পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্যস্বরূপ রহিয়াছে,—তথায় আহার্য্য সামগ্রী নাই—এমন কি, পিপাসায় যদি মর্ম্মভেদী স্বরে চীৎকার কর, তাহা হইলেও একঘটি জল লইয়াও তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইবে না; কারণ সে স্থান নির্ব্বান্ধব—জনশূন্য ভীষণ জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ। বিশ্রামের জন্য পথিপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গৃহ আছে। গৃহখানি ইষ্টকনির্ম্মিত। সংস্কারাভাবে প্রাচীরের স্থানে স্থানে চূণ উঠিয়া গিয়াছে, মেঝেটি স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে; ফলে, গৃহটি একরূপ অব্যবহার্য্যরূপে পড়িয়া রহিয়াছে।

ওঙ্কারে যাইতে হইলে, প্রথমতঃ কাম্বোডিয়া হইতে ৪৪ মাইল রেলে চড়িয়া মাইথোয় যাইতে হয় এবং পরে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাল প্রশস্ত মিকং নদীর বক্ষে নৌকাযোগে গমন করিতে হয়। যদি মিকং নদীর উপর দিয়া ইহার উৎপত্তি-স্থানে যাওয়া যায়,

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায় যে, মিকংএর উৎপত্তি-স্থান এসিয়ার সমতল ক্ষেত্রের অতি নিকটবর্ত্তী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কুম্ভীর ও গণ্ডার মিকং নদীর উভয় তটে বিচরণ করিত—কিন্তু মানুষের গমনাগমনেয় জন্য তাঁহারা এখন সে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

নদীটি প্রস্থে প্রায় দেড়মাইল বিস্তৃত। উভয় তটই সবুজ তৃণ-সমাচ্ছন্ন—দেখিলেই বোধ হয়; কে যেন একখানি সবুজ গালিচা তটের পার্শ্বে বিছাইয়া দিয়াছে! দুইধারেই নারিকেল, খর্জ্জুর, কদলী, লেবু, নাসপাতি প্রভৃতি ফলের বৃক্ষ সারি দিয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে বিশালকায় বটবৃক্ষ স্বীয় শাখা-প্রশাখা বিস্তার

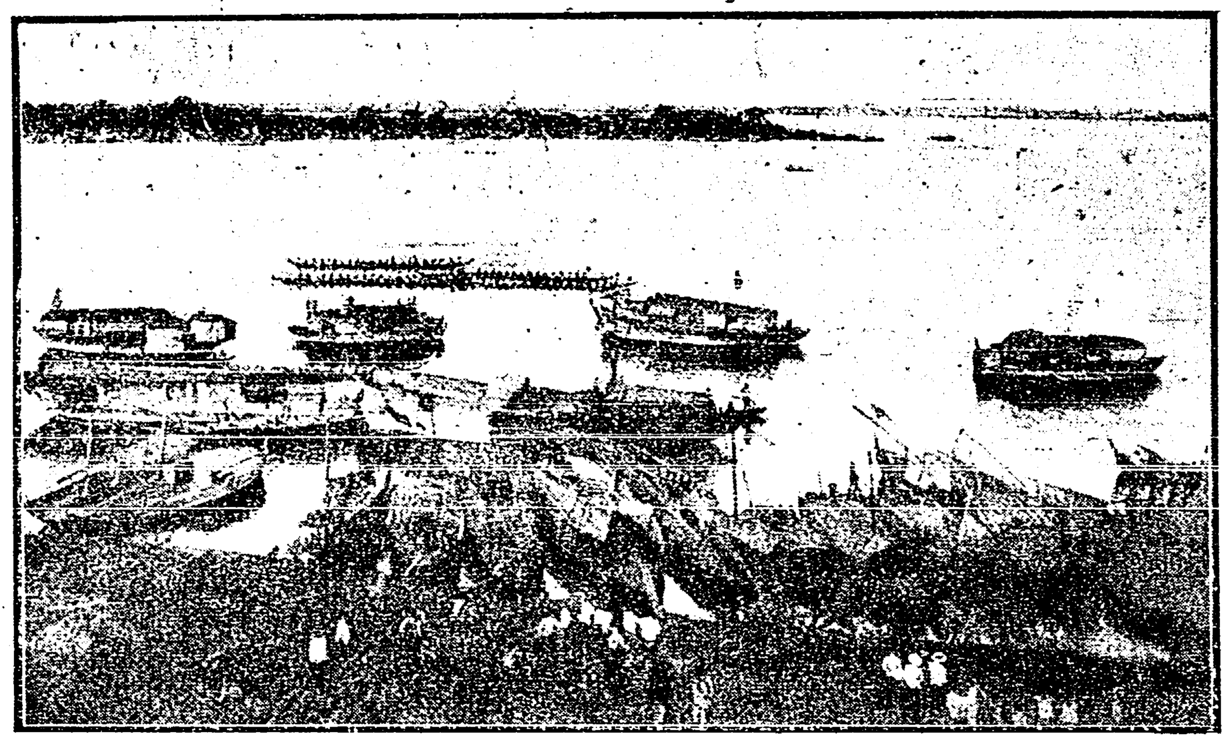

সমুদ্রতটবর্ত্তী 'নম্‌পেন'

করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পক্ষিগণ তাহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধুর বিরাবে নির্জ্জন বনভূমি ধ্বনিময় করিতেছে।

নৌকাযোগে একদিবস গমন করিবার পর কাম্বোডিয়ার আধুনিক রাজধানী "নমপেনে" উপস্থিত হওয়া যায়; "নমপেনে"র দৃশ্য সহজেই লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ। নমপেনের রাস্তাগুলি পাকা ও সুন্দর। কাম্বোডিয়া-রাজের কয়েকখানি নয়নানন্দদায়ক ভগ্নপ্রায় অট্টালিকা এখনও নম্‌পেনের পূর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতেছে। একটি প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির এখনও নম্‌পেনে বর্ত্তমান আছে। মন্দিরের মেঝে রোপ্যমণ্ডিত। মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধের কাচনির্ম্মিত উদাসীন প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—পুরোহিতগণ স্বর্ণ ও হীরকখচিত অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবার্চ্চনায় রত—ধূপ-ধূনা-গুগ্‌গুলের গন্ধে গৃহ আমোদিত। একটি পুস্তকাগার দেখিলাম, কিন্তু গৃহে কোন পুস্তক দেখিতে পাইলাম না। বৌদ্ধ পুরোহিতগণ পীতবর্ণের পরিচ্ছদ এবং নাগরিকগণ উজ্জ্বল-বর্ণবিশিষ্ট সজ্জায় সজ্জিত হইয়া শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন। এরূপ শোভাযাত্রা জীবনে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

Anuamiteএর শব্দ ও চীন-ভাষায়-অভ্যস্ত কোনও লোক যদি একদল কাম্বোডিয়াবাসীকে একত্র আমোদ-আহ্লাদ ও কথাবার্ত্তা কহিতে শোনে, তাহা হইলে সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না; কারণ চীন-ভাষা একস্বরবিশিষ্ট ও এক-ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়—উচ্চারণের পার্থক্যের সহিত অর্থ বদ-লাইয়া যায়; কিন্তু জগতের অন্যান্য ভাষায় এরূপ বাধা দেখা যায় না। কাম্বোডিয়াবাসিগণের ভাষা শ্রবণ করিলেই আমার উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

আর্য্য মঙ্গোলিয়াবাসিগণের সীমান্তে ইহারা অবস্থান করিতেছে। হিন্দুদিগের আচার ও ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ভাষা হইতেই ইহাদিগের ভাষা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার উৎপত্তি। ইহারা কোন্ জাতির বংশধর, তাহা গবেষণার বিষয়।

নমপেনে উপস্থিত হইলে মিকং পরিত্যাগ করিয়া উহার একটি শাখা বাহিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এতক্ষণ একভাবের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গমন করিতে বড়ই কষ্টবোধ হইতেছিল। অকস্মাৎ দৃশ্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নদীটি প্রস্থে বাড়িতে লাগিল। অদূরে সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল—আর আমি মন-প্রাণ ভরিয়া অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলাম। অবশেষে আমরা কম্-পং-চনং গ্রামে উপস্থিত হইলান।

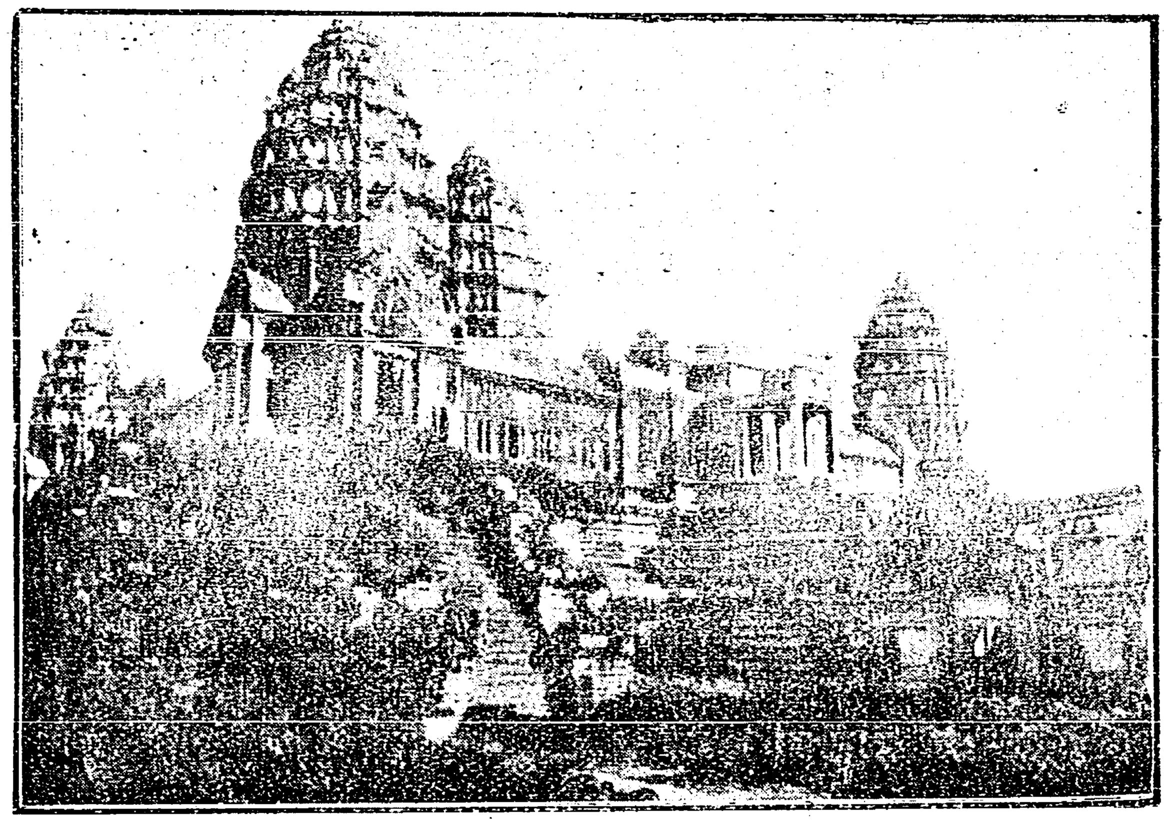

স্তূপমধ্যস্থ বৌদ্ধ-মন্দির

গ্রামটি জলের উপর ভাসিতেছে—নদী-তরঙ্গের সহিত গ্রামটি নৃত্য করিতেছে। গৃহগুলির নির্ম্মাণ-পদ্ধতি কতকটা য়ুরোপীয় ধরণের ও কতকটা প্রাচীন প্রথানুযায়ী। গ্রামটি

বেশ পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন ও গৃহগুলি নয়নানন্দদায়ক—মনোরম—প্রাণারাম।

যখন হ্রদবক্ষে প্রবেশ করিলাম, তখন সূর্য্যদেব নদীবক্ষ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তগিরির পাদমূলে অবতরণ করিলেন। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় ধরণী অন্ধকারে ঢাকিয়া আসিল, রৌদ্রতাপদগ্ধ ধরণী আলো ও আঁধারের সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল।

দিনান্তকালের সেই গভীর নীরবতার মধ্য হইতে রজনীভীত নানা পক্ষীর কল-কাকলি আমার শ্রবণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কমিয়া গেল মনে হইল, পৃথিবী যেন ধ্যানের মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তরণী বাহিয়া চলিতে লাগিলাম —মাঝে মাঝে কেবল দুই-একটি পেচকের গম্ভীর ধ্বনি সুষুপ্ত ধরণীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

বেলা দ্বিপ্রহরে আমরা নৌকা ত্যাগ করিয়া সায়েমরিপ-পল্লীতে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বব্যবস্থানুসারে আমাদিগের জন্য গো-শকট প্রস্তুত ছিল; আমরা তাহাতে আরোহণ করিলাম। পথটির দুইধারে নানা জাতীয় বৃক্ষ থাকায়, পথিকগণকে মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড প্রতাপ অতি অল্পই সহ্য করিতে হয়। বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া মৃদুমন্দ সমীর বহিয়া যাইতেছিল। আমরা সেই ছায়াশীতল পথ দিয়া আমাদিগের গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বৃক্ষরাজির অন্তরাল হইতে ওঙ্কার ওয়াটের মন্দিরের গগনস্পর্শী শিখর মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, আর আমাদিগের দেহ ও মন বিস্ময় ও আনন্দে ভরপূর হইয়া উঠিল। ক্ষণপ্রভার মুহূর্ত্তমাত্র আলোক-স্ফুরণ, ভীষণ দুর্যোগের ঘোর তামসী রজনীতে পথভ্রান্ত পথিককে যেমন ব্যাকুল করিয়া তুলে, সেইরূপ মন্দিরটি ঘন-সন্নিবিষ্ট বিটপীশ্রেণীর অন্তরাল হইতে ক্ষণমাত্র আমাদিগের নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া পরক্ষণেই অন্তর্ধান করায়, উহাকে আবার দেখিবার একটা আগ্রহ আমাদিগের মনকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ওঙ্কার টম ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অসংখ্য ধ্বংসাবধ্বস্ত গৃহ রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি তাহাদিগের চূড়া উচ্চ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মধ্যবর্ত্তী অট্টালিকাটি ২১৩ 'ফুট' উচ্চ। ধ্বংসাবশেষ অট্টালিকা ও মন্দিরসমূহ এরূপভাবে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে যে,

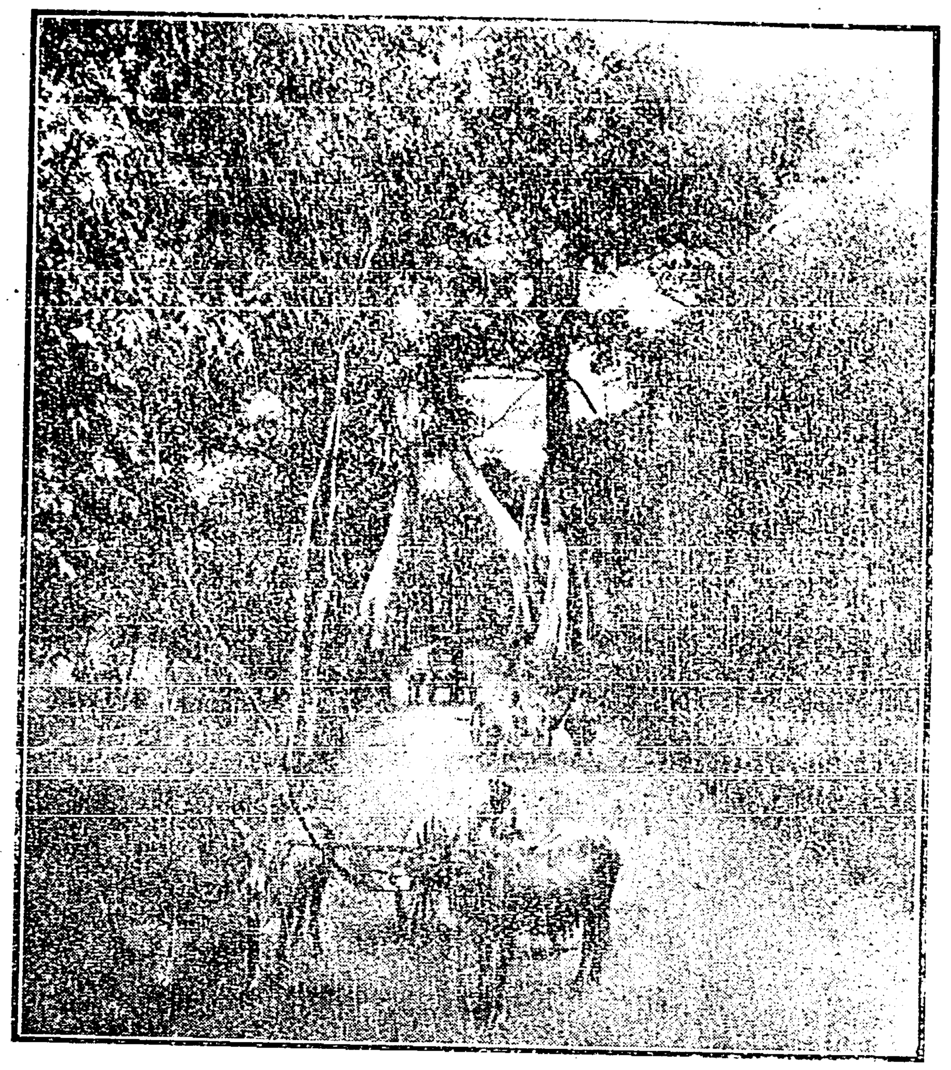

সায়েমরীপের পথ

কোনও ব্যক্তি স্তূপের মধ্যে প্রবেশ না করিলে, তাহার লুপ্ত-প্রায় সৌন্দর্য্যের গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। মধ্য-বর্ত্তী মন্দিরটি দুইপার্শ্বস্থ মন্দিরদ্বয়ের শিখরদেশে অবস্থিত।

একপ্রকার মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় ধূসর বর্ণের প্রস্তরে এই সকল মন্দির ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঋতু-পরিবর্ত্তনে

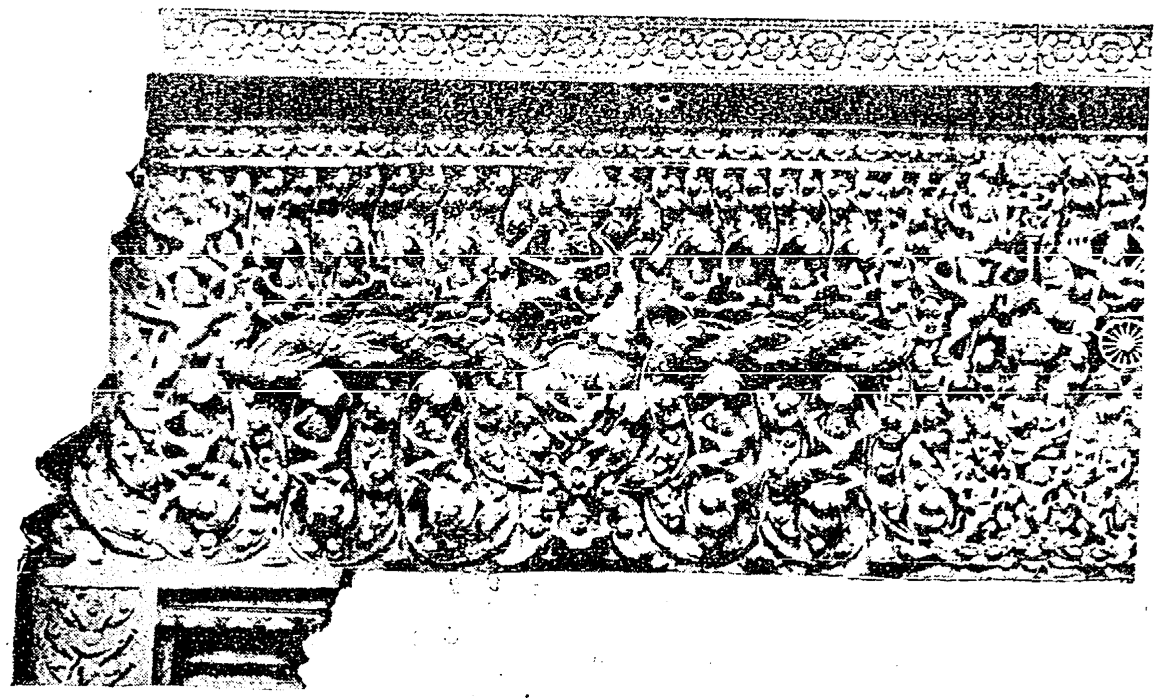

কারুকার্য্য-সমন্বিতপ্রাচীরের অংশ

কিন্তু ওঙ্কার ওয়াটের অট্টালিকাসমূহে উত্তমরূপে রক্ষিত হওয়ায়, উহা এখনও কালের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। মন্দিরটি একটি বিস্তৃত পরিখাদ্বারা বেষ্টিত। একটি লম্বা প্রস্তর সাঁকোর ন্যায় থাকায়, মন্দির-প্রবেশের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম। সম্মুখ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি অপেক্ষা-কৃত ছোট দ্বার আছে। ভিতরে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুসংখ্যক অসমান প্রস্তরখণ্ড পতিত এবং

এই প্রস্তর নষ্ট হয় নাই। মন্দির-নির্ম্মাণে ও প্রস্তর-সন্নিবেশে শিল্পীর অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এমন বর্ণ সমাবেশ, এমন কারুকার্য্য, এমন নয়নাভিরাম মন্দির ও অট্টালিকা-সমূহ যে কালের করাল দ্রংষ্টা হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হয় নাই, তাহা দেখিলে কেহই অশ্রুধারা রোধ করিতে সমর্থ হইবেন না।

উনিশ মাইল দূরবর্ত্তী নম কুলেন হইতে এই সমস্ত প্রস্তর আনীত হইয়াছে। কিরূপে তাহা আনীত হইল তাহা বিবেচনার

বিষয়। যদি ঐ অৰ্দ্ধ-নিমজ্জিত বনভূমি স্বীয় ইতিহাস বর্ণনা করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে বোধ হয় জানিতে পারিতাম যে কোনও প্রাচীন সময়ে নম কুলেন ও ওঙ্কার টন্‌লিসেপ-নদীর তীরে অবস্থিত ছিল এবং প্রস্তরপূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ নৌকা সর্ব্বদা যাতায়াত করিত; কিন্তু এই পরিত্যক্ত বনভূমি বিজয়ী সৈন্যের ন্যায় নদীকে বিতাড়িত করিয়া 'ম্যালেরিয়া'পূর্ণ জলা-ভূমিতে পরিণত রইয়াছে।

মূর্ত্তি এবং কারুকার্য্যের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা দর্শন করিলে মন বিস্ময় ও পুলকে পরিপূর্ণ হয়।

সমস্ত মূর্ত্তি ও কারুকার্য্যের মধ্যে B ss-el·iই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বোধ হয়। নিম্নে কতকগুলি খোদিত শোভাযাত্রার বিবরণ দেওয়া গেল।

১। ১৬০'ফুট্'-ব্যাপী নর-বানরের যুদ্ধ-চিত্র।
২। ১৬০'ফুট্'-ব্যাপী হিন্দু ও অজ্ঞাতনামা শত্রুর যুদ্ধ-চিত্র।

হনূমানের বিরাট্‌মূর্ত্তি

এই সকল ধ্বংসধ্বস্ত মন্দির যে বৌদ্ধ মঠ ছিল, তাহা ওয়াটের পাদদেশবাসী কাম্বোডিয়ান্‌গণের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ও পূজা-পদ্ধতি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তাহাদিগের ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠের মধুর স্বর প্রতিনিয়তই দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিতেছে। হায়, সময়ের গুণে ওয়াট এখন জনপরিত্যক্ত—পশু-পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল! এই জনমানবশূন্য ওয়াটে যে কত শত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কোনও মূর্ত্তি যোগাসনে রহিয়াছে, কোনও মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে, কোনও মূর্ত্তি হস্ত উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে—সেই বিজন ভূমির যুগব্যাপী নিস্তব্ধতা ও শান্তি ভঙ্গ করিতে নিষেধ করিবার জন্যই যেন হস্ত উত্তোলন করিয়া আছে! ধ্বংসাবশেষের সমস্ত প্রস্তরেই নানরূপ কারুকার্য্য ও বিভিন্ন মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

মন্দির ও অট্টালিকায় বসিবার মঞ্চগুলি গোলাকৃতি ও চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। এই সমস্ত স্তম্ভের উপর যে সকল কারুকার্য্য খোদিত আছে, সেরূপ কারুকার্য্য আর কোথাও আছে বলিয়া বোধ হয় না। স্তম্ভের পাদদেশের কয়েক ইঞ্চি উপরেই বুদ্ধমূর্ত্তি এবং তাহার উপরের অংশগুলিতে অতিশয় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খোদিত রহিয়াছে। প্রবেশ-দ্বারের উপরের প্রাচীরে প্রায়ই নৃত্যপরায়ণা স্ত্রী-মূর্ত্তি অথবা বন্দী বানর-মূর্ত্তি খোদিত আছে। প্রাচীরের কোথাও কারুকার্য্যশূন্য একটি স্থানও দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও স্থানে স্থানে একই মূর্ত্তির পুনঃপুনঃ আবির্ভাব দেখা যায়, তথাপি এই সকল

৩। ৩২৪'ফুট্'-ব্যাপী শিকার চিত্র।
৪। ১৭১, ২১৯ ও ৩২০'ফুট্'-ব্যাপী বিভিন্ন যুদ্ধ-চিত্র।
৫। সপ্তমস্তকবিশিষ্ট সর্প-আনয়নের শোভাযাত্রা।
৬। অন্যূন ১৬০'ফুট্'-ব্যাপী স্বর্গ ও নরকের চিত্র।

এই সকল চিত্র হইতে শিল্পী কোন্ সময়ের লোক ও সেই সময়ের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার কতক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। যুদ্ধ-চিত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অজ্ঞাত সৈন্যদিগের মধ্যে কেহ-বা হিন্দুদিগের ন্যায় মস্তকে পাগড়ী পরিধান করিয়াছে, কেহবা অন্যপ্রকার সজ্জায় সজ্জিত রহিয়াছে এবং অনেক সৈন্য গ্রীকদিগের ন্যায় শিরস্ত্রাণ পরিধান করিরাছে। উভয় পক্ষের সৈন্যই বর্ষা, ঢাল ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু সর্দ্দার ও সেনাপতিগণ তর-বারি, তীর ও ধনুকে সুসজ্জিত—এমন কি, তাঁহারা রণক্ষেত্রে নিজেকে সূর্য্যের উত্তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছত্রতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহারা হস্তী, অশ্ব, ষণ্ড, গণ্ডার, সারস-পক্ষী ও হরিণ-পৃষ্ঠে অধিরূঢ় হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। মধ্যে মধ্যে খোদকগণ এই সকল বাহন ব্যতীত স্ব-স্ব কল্পনা-প্রসূত অদ্ভুত আশ্চর্য্য জন্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন।

অট্টালিকার সম্মুখে যে সকল Bass-relief আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। সেই সকল মূর্ত্তিতে একটা সজীবতার লক্ষণ দেখা যায়। মূর্ত্তির সমস্ত অংশ অত্যন্ত নিপুণতার সহিত খোদন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উপরে শিল্পীর তত মনোযোগ

না থাকাতে মূর্ত্তিগুলির সৌন্দর্য্য অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে—চক্ষুগুলি পিণ্ডাকারে এবং পদদ্বয় বিপরীতভাবে অবস্থিত।

স্বর্গ ও নরকের চিত্রটি তিন অংশে বিভক্ত। নিম্নস্তরে পাপিগণের শাস্তি দিবার কতরূপ বিভিন্ন ও যন্ত্রণাদায়ক উপায় চিত্রিত রহিয়াছে। মধ্যস্তরে অল্প পুণ্যবান্ এবং সর্ব্বোচ্চ স্তরে ধার্ম্মিক, পুণ্যবান্ ও সদ্ব্যক্তিবর্গ অবস্থান করিতেছেন।

'বেয়নে' ৫৩টি প্রাসাদ আছে এবং প্রতি প্রাসাদে চারিটি বুদ্ধমুখ পূর্ব্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ দিকে ফিরান আছে।

কেবলমাত্র 'বেয়ন'ই ওঙ্কার-ওয়াটের সমান। এই সমস্ত স্তূপ-মধ্যে উন্নতশীর্ষ বৃহৎ বৃহৎ তরুগুলি দণ্ডায়মান রহিয়াছে—বানর ও কাঠবিড়ালসকল নিঃশঙ্কচিত্তে এই সমস্ত বৃক্ষে ক্রীড়া করিয়া থাকে।

নর-বানরের যুদ্ধ

শিকার-চিত্রে প্রত্যেক রাজার নিম্নভাগে এক-একখানি শিলালিপি আছে। এখন পর্য্যন্ত এই সমস্ত শিলালিপির পাঠো-দ্ধার হয় নাই। কবে যে তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গোচরীভূত হইয়া লোকসমক্ষে প্রকাশিত হইবে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

'পিমিয়ন একাস' একটি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট অতীব উচ্চ ভীমদর্শন চতুষ্কোণ 'পিরামিড্'।

কে বলিতে পারে যে, এই শিল্প-মন্দিরের নির্ম্মাতা কে এবং কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল?

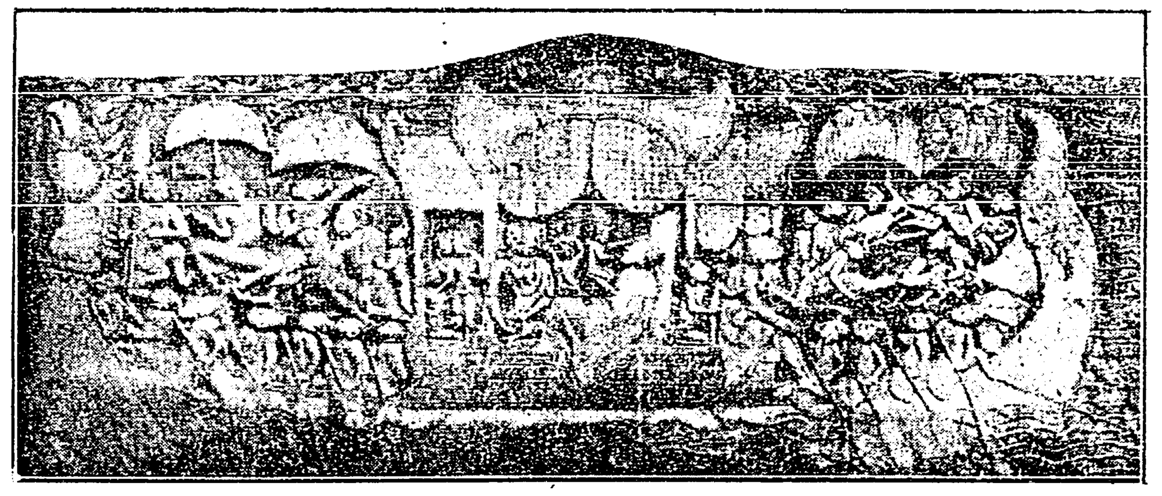

প্রাচীরে খোদিত তরণী-বিহার

ওঙ্কার ওয়াট অপেক্ষা ওঙ্কার টম ১৯গুণ বিস্তৃত; ইহা একটি প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত এবং গমনাগমনের নিমিত্ত প্রাচীরে একটি দ্বার বর্ত্তমান আছে। 'বেয়ন' 'বেপুয়ন' ও বহু ধ্বংসাবশেষ বিশিষ্ট 'পিমিয়ন একাস' এই প্রাচীরমধ্যে অবস্থিত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, খমের-জাতিই ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা কে, কোথা হইতে আসিল, কেন এইসকল সুন্দর সুন্দর মন্দির ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিল এবং অবশেষে কিরূপে এই ধরাধাম হইতে লোপ প্রাপ্ত হইল?

কিংবদন্তীতে বিশ্বাসস্থাপন করিলে জানা যায় যে, অতি বলশালী কোনও রাজার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোনও এক বলশালী রাজা ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া ঐ স্থানে রাজত্ব-স্থাপন করেন। তিনি ইতস্ততঃ যে সমস্ত স্থান জয় করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণকে এই কারুকার্য্যময় প্রস্তর-মন্দির ও অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মাণ করিতে আদেশপ্রদান করিয়াছিলেন।

স্তম্ভ-গাত্রের খোদিত লিপিসমূহ কোনও সময়ে নিশ্চিত উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া জনসমাজে স্বীয় ইতিহাস প্রচার করিবে।

শ্যামদেশবাসী ও আধুনিক কাম্বোডিয়াবাসীর ভাষার সহিত শিলালিপির অক্ষরগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে। আর এক কথা—Bass-r.li fএর মূর্ত্তির সহিত আধুনিক কাম্বোডিয়াবাসীর সহিত অনেক আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে—এমন কি, ভবিষ্যতে কাম্বোডিয়াবাসীর মঠ হইতেই এইসকল ধ্বংসাবশেষের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে পারা যাইতে পারে। তবে অনুমানে এখন এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ওঙ্কার-টম ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ওঙ্কার-ওয়াট নির্ম্মিত হইয়াছিল!

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দিল্লীর এক যুবরাজ বিদ্রোহী হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন এবং সহস্র সহস্র অনুচরবৃন্দের সহিত নির্ব্বাসিত হন। তাঁহারা পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া গঙ্গা, ইরাবতী ও মেনাম পার হইবেন এবং প্রাচীন অসভ্য জাতি কাম্বোডিয়া ও সায়ামের অধিবাসিবৃন্দ অ্যানামাইট্‌গণ ও অন্যান্য জাতিকে অনায়াসে পরাস্ত করিয়া বহু পরাক্রমশালী ও ধনশালী হইয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করেন। কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তাঁহাদের যত্নে অনেক বৃহৎ বৃহৎ নগরী নির্ম্মিত হয় এবং সে সকলের মধ্যে বোধ হয় ওঙ্কার-ওয়াটই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ-খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন চীনা ঐতিহাসিক ওঙ্কার-ওয়াট ও ওঙ্কর-টম দেখিতে গিয়াছিলেন।

এখন এই চীনা-ঐতিহাসিকের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলে, ওঙ্কার-টম ও ওঙ্কার-ওয়াটের পূর্ব্ব-ইতিহাস কথঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়—নতুবা যতদিন সেই প্রাচীর-গাত্রস্থ শিলালিপি উদ্ধারপ্রাপ্ত হইয়া জন-সমাজে প্রকাশিত না হইবে, ততদিন আমাদিগকে অন্ধকারে বসিয়া ভবিষ্যৎ-আলোকের অপেক্ষা করিতে হইবে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

বিদায়

ডুবিয়াছে দ্বাদশীর চাঁদ,
তবু রাত থাকিবার কথা;
না না, হায়, শুকতারা জাগে,
জ্বলিয়াছে মূর্ত্তিমতী ব্যথা।

জ্বলিয়াছে শুকতারা বটে,
তবু প্রিয়ে রয়েছে সময়,
না না, হায়, ডাকিতেছে পাখী,
প্রতি রবে মর্ম্ম বিদরয়।

পাখী যদি না ডাকিত হায়,
তবে রাত্রি হত নাক' ভোর;
পক্ষী কি গো সৃষ্ট বিধাতার
ঝরাইতে স্রধু আঁখি-লোর?

পাখীগুলি ডাকিতেছে বটে,
ঘোর ঘোর এখনো রয়েছে;
না না, এ যে গৃহের আঁধার,
বাহিরে যে প্রভাত হয়েছে!

গাঢ় হতে আরো গাঢ়তর
আলিঙ্গন লাগিল ঘনা'তে;
বজ্রগ্রন্থি প্রচণ্ড প্রয়াসে
গ্রন্থিটিকে শিথিল করা'তে।

আলো আসে দুয়ারের ফাঁকে,
রক্ত-চক্ষে চাহিছে প্রভাত;
সংসারের তোরণের 'পরে
ডঙ্কা'পরে পড়িল আঘাত।

আর নয়—বিদায়, বিদায়,
গৃহেতেও আসিয়াছে ঊষা;
গণ্ডে তব অশ্রুর শিশির,
শুকতারা সিন্দূরের ভূষা।

তব কেশ তম পিছে করি
ব্যথারুণ তোমার বদন,
ক্ষীণালোকে অরুণের সম
উদিল যে আমার সদন!

দাও দাও—বিদায়, চুম্বন,
সকলের ঊষা এল সই!
আমার এ নহে ত প্রভাত,
একেবারে সন্ধ্যা আসে ঐ!

শ্রীকালিদাস রায়।

পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু-বিবাহ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে পরস্পরের জাতিগত, ভাষাগত, বর্ণগত এবং প্রকৃতিগত প্রভেদ যত অধিক দেখা যায়, পৃথিবীর আর কোনও দেশে তত বেশী দেখা যায় না। পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগণ আমাদেরই প্রতিবেশী—একই আর্য্য-বংশসম্ভূত—একই হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত এবং একই শাস্ত্রীয় বিধানে অনুশাসিত; কিন্তু দেশভেদে ইহাদের সহিত আমাদের রীতি-নীতির কত প্রভেদ। একই বৈদিক মন্ত্রে ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুগণের বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু অনুষ্ঠানাদিতে বিবাহ-প্রথা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার। বঙ্গদেশের ন্যায় পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুগণও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং কায়স্থ, এই চারি শ্রেণীই প্রধান এবং বলা বাহুল্য ইহারাই সমাজের শীর্ষস্থানীয়। অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের বিবাহ-পদ্ধতি অনেক বিষয়ে বিভিন্ন হইলেও, তাহাতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণেরই অনুকরণ দেখা যায়। আবার এতদ্দেশে উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও বিবাহপদ্ধতি যদিও স্থূলতঃ প্রায় একপ্রকার, কিন্তু কুলাচার এবং কোথাও বা গ্রাম্য সংস্কার-হেতু সেই পদ্ধতিতে স্থানে স্থানে অল্প বিস্তর তারতম্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্রাহ্মণাদি চারি প্রধান শ্রেণীর বিবাহ-সংক্রান্ত বিষয়টির, সকল স্থানের অনুষ্ঠান-ক্রিয়াদির যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রাখিয়া আলোচনা করা যাইতেছে।

বাল্য-বিবাহ-প্রথা এতদ্দেশীয় সমাজে পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত। সাধারণতঃ সাত হইতে দশ বৎসরের মধ্যেই বালক-বালিকাগণকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করা হয়। এই কারণে অনেক সময়ে পাত্র ও কন্যায় বয়স প্রায় সমান সমান হইয়া থকে। আবার কোথাও-বা কন্যার বয়স পাত্রের অপেক্ষা দুই-এক বৎসর বেশীও দেখা যায়। এইপ্রকার বাল্য-বিবাহ-প্রথা ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যগণের মধ্যে যত অধিক প্রচলিত, কায়স্থগণের মধ্যে ততটা নহে। কায়স্থসমাজে পাত্রের বয়স সাধারণতঃ ষোল হইতে বিশ বৎসর এবং কন্যার বয়স বার হইতে পনের বৎসর হইয়া থাকে। শিক্ষিত ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বাল্য-বিবাহ ততটা প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু অশিক্ষিত ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা পূর্ণরূপে বিরাজমান। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল কায়স্থদিগের অনুকরণে বিবাহযোগ্য বয়সে সন্তানাদির বিবাহ দিতেছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যাও অতি অল্প। চিরাগত প্রথানুযায়ী কুলমর্য্যাদা রক্ষাই এতদ্দেশে বাল্য-বিবাহ-প্রচলনের একটী প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। কন্যা সপ্তম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই, তাহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিয়া নিজ নিজ কুল-গৌরব রক্ষা বা বৃদ্ধি করিতে সকলেই ব্যগ্র হইয়া থাকেন। মনোমত পাত্র পাইলেই, অভিভাবকগণ কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া ফেলেন;—পাছে পাত্রটী হাতছাড়া হইয়া যায়। এমন কি, পাত্রের বয়স কন্যা অপেক্ষা কম কি বেশী, তাহা বিবেচনা করিবারও অবসর হয় না। কোনও প্রকারে কৌলিক প্রথা রক্ষা হইলেই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। যুক্ত-প্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পুরাতন 'বাগ্‌দান'-প্রথা এখনও প্রচলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা সন্তানাদির বয়স উর্দ্ধসংখ্যা দশবৎসর অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই বিবাহের বাগ্‌দান করেন এবং পনেরষোল বৎসরের মধ্যেই বিবাহ-কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া ফেলেন।

এদিকে যাহাই হউক, এক বিষয়ে কিন্তু ইঁহাদের নিয়ম অতি চমৎকার। বাঙ্গালীদের মত বিবাহে পণ-গ্রহণের রীতি এতদ্দেশীয় সমাজে প্রায় নাই বলিলেও চলে। ইঁহাদের উভয় পক্ষই সাধ্যানুরূপ খরচ করেন; কিন্তু কোন পক্ষই কোনপক্ষের নিকট কোনওরূপ দাবী-দাওয়া উত্থাপন করেন না; সুতরাং বাঙ্গালা-দেশের ন্যায় এদেশে কাহাকেও কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া অহর্নিশ চিন্তা-জ্বরে জর্জ্জরিত হইতে হয় না বা পিতাকে কন্যাদায়ের বিপদ হইতে মুক্তি দিবার জন্য কোনও বালিকাকে আত্মবলি দিতে হয় না। ইঁহাদের একটী বিশেষ গুণ এই যে, অন্যক্ষেত্রে যাহাই হউক, বিবাহ-উপলক্ষে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন; কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিতে যান না। সাধারণতঃ যে সকল লোক কৃপণ বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও পুত্র-কন্যার বিবাহ-উপলক্ষে মুক্তহস্ত হইয়া থাকেন। একশ্রেণীর বৈশ্য-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা প্রায় পনের-ষোল বৎসর পর্য্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়া দেন। কোনও বিগতদার ব্যক্তির বয়স্থা কন্যার প্রয়োজন হইলে, তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া পণগ্রহণ করিয়া থাকেন। কোনও কোনও স্থানে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও এরূপ পণ-গ্রহণ-প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণে ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে।

এতদ্দেশীয় বিবাহের রীতি-নীতি ও আচার-পদ্ধতি বাঙ্গালা-দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নাপিতই এদেশে ঘটকের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। প্রথমে কন্যাকর্ত্তা পাত্র অন্বেষণার্থ তাঁহার নিজের নাপিতকে নিয়োজিত করেন এবং তাহার নিকট নিজের গোত্রাদি লিখিয়া দেন। নাপিত মনোমত পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া, তদ্বিবরণ কন্যাকর্ত্তাকে জ্ঞাপন করে এবং কন্যাকর্ত্তা নাপিতের মুখেই বিবরণ শুনিয়া পাত্র মনোনীত করেন, স্বচক্ষে পাত্র দেখিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। ইচ্ছা করিলে তিনি স্বয়ং পাত্র দেখিতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা কিছু ব্যয়সাপেক্ষ। পাত্রকে মর্য্যাদা-হিসাবে কিছু অর্থ দিতে হয়। অপরপক্ষে বরকর্ত্তাও নাপিতের মুখে বিবরণ শুনিয়া কন্যা পছন্দ করেন; স্বয়ং কন্যা দেখিবার তাঁহার কোনও অধিকার নাই। এইরূপে পাত্র-পাত্রী-নির্ব্বাচনে নরসুন্দরের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে প্রতারিত হন বটে, কিন্তু উপায় নাই,—ইহাই সামাজিক নিয়ম। অনেকে গোপনে ও অন্যান্য উপায়ে কন্যা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহা সমাজানুমোদিত নহে। কন্যাপক্ষ ইহা জানিতে পারিলে, সাবধান হন; সুতরাং নাপিতের বর্ণনাই শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়। বিবাহে বরকর্ত্তার সম্মতি-গ্রহণার্থ কন্যাকর্ত্তা নাপিতকে দ্বিতীয়বার তাঁহার গৃহে প্রেরণ করেন এবং এই বিবাহে তাঁহার সম্মতি থাকিলে, নাপিত কন্যাপক্ষের প্রতিনিধিস্বরূপ বরের গৃহে ভোজন করে। ইহা একটী মাঙ্গলিক প্রথা। ইহাকে এতদ্দেশীয় ভাষায় বলে—"নাই রোটী জিম্ গিয়া" অর্থাৎ বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক্ হইয়া গেল। কোনও কোনও স্থানে ক্ষত্রিয়সমাজে কুলাচার-অনুসারে নাপিত মারফত নারিকেল বা অন্য কোনও ফল পাঠান'র পদ্ধতি আছে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা সহরাঞ্চলে অনেক সময়ে কন্যাকর্ত্তা স্বয়ং বরকর্ত্তার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রথমতঃ সম্বন্ধ ঠিক করেন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রথা বজায় রাখিবার জন্য পরে তাঁহার নাপিতকে বরের বাটীতে ভোজন

করিতে পাঠাইয়া দেন। আজকাল কায়স্থগণের মধ্যে অনেকে এ-প্রথা একেবারেই তুলিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেলে এদেশে "সাগাই" নামক একপ্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কন্যাকর্ত্তা একটী শুভদিন স্থির করিয়া তাঁহার নাপিতকে, কিছু মিষ্টান্ন ও অর্থাদি দিয়া বরের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। বরকর্ত্তাও সেইদিন তাঁহার আত্মীয়-কুটুম্ব ও বিশিষ্ট প্রতিবেশিগণকে লইয়া নিজ বাটীতে একটী সভার অনুষ্ঠান করেন। বর "চাপ্‌কানে"র মত একপ্রকার পোষাকে সজ্জিত হইয়া সভায় উপস্থিত হয়। এই পোষাকের কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহা বোতাম-বিহীন এবং কোমর বাঁধিবার জন্য পোষাকের দুইপার্শ্বে দুইগাছি সূতা ঝুলিতে থাকে। ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদের কটীদেশে তরবারি (অধুনা অস্ত্র-আইনের ভয়ে একপ্রকার লৌহদণ্ডবিশেষ) ঝুলাইয়া দেন। বিবাহের সময়ও ইঁহারা এই অদ্ভুত অস্ত্র পরিত্যাগ করেন না। নাপিত, সভাস্থ সকলের অনুমতি লইয়া বরের কপালে "রুলি"র (সিন্দূরের ন্যায় একপ্রকার পদার্থের) টিপ্ দিয়া তাহার হস্তে মিষ্টান্ন ও অর্থাদি প্রদান করে এবং তৎপরে তাহার 'চাপ্‌কান'-সদৃশ পোষাকের দুইপার্শ্বের সূতা লইয়া কোমরে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া দেয়। ইহাকে কেহ কেহ "তালিকা-গাঁট" আবার কেহ কেহ-বা "টিক্কা"ও কহিয়া থাকেন। এই রীতি প্রায় সকল শ্রেণীর মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ব্রাহ্মণ-গৃহে নাপিতই এই সকল কার্য্য করে এবং অন্যান্য শ্রেণীর পুরোহিত-ব্রাহ্মণকেই সমস্ত করিতে হয়; নাপিত সঙ্গে থাকে মাত্র। বিবাহের কতদিন পূর্ব্বে এই "সাগাই" করিতে হইবে, তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় ধার্য্য নাই। তবে কায়স্থেরা সাধারণতঃ বিবাহের বেশীদিন পূর্ব্বে কোনও অনুষ্ঠান করেন না। বিবাহের দিনে বা তৎপূর্ব্বদিনে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার অনেকের "তালিকা-গাঁট", বা কোমরে গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিবার রীতিও নাই। কেবল বরের কপালে "রুলি"র টিপ্ ও তাহাকে মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়াই অনেকে কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। ইহার পর বরকর্ত্তাও নাপিত মারফত কন্যার জন্য তাঁহার সাধ্যানুরূপ বস্ত্রালঙ্কার পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।

বিবাহের অন্ততঃ একমাস পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তা, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও পুরোহিতাদি লইয়া এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ঐ সভায় বর ও কন্যার জন্মকোষ্ঠী-বিচারও বিবাহের দিনস্থির করা হয় এবং নির্দ্ধারিত দিনে বরকর্ত্তার বিবাহ দিতে মত আছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহাকে একখানি পত্র লেখা হয়। এই পত্র-খানিকে এতদ্দেশীয়গণ "পিলী-চিঠি" কহেন। এই চিঠিখানি "রুলি", হরিদ্রা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যে সিক্ত করিয়া নাপিত মারফত পাঠান হয়। বরকর্ত্তা, তাঁহার নিজ পুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া এতৎ-সম্বন্ধে সম্মতি প্রদান করিলে, কন্যা-পক্ষ হইতে তাঁহাকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুমোদিত বিবাহের একখানি কার্য্য-বিবরণী পাঠান হয়। ইহাকে "লগ্‌ন্" (লগ্ন) কহে। ইহাতে বিবাহ-লগ্নকালীন গ্রহগণের সংস্থান, বর-কন্যার জন্ম-কুণ্ডলী ও তৎ-সম্বন্ধে বিচার এবং কোন্ দিবস কি কি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ থাকে। কন্যাকর্ত্তা বিবাহে কিরূপ অর্থব্যয় করিতে এবং কতগুলি বর-যাত্রীর অভ্যর্থনা করিতে সমর্থ, সে সকল বিষয়ও কোনও কোনও দেশে এই "লগ্‌ন্"-পত্রিকায় লিখিত হয় দেখা গিয়াছে। এই পত্রিকা ইঁহাদের নিকট অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। বরকর্ত্তা ইহাকে কুলাচারা-নুযায়ী নানা মঙ্গলাচরণ করিয়া গ্রহন করেন এবং পণ্ডিত-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের বিচার করেন। অতঃ-পর বিবাহের উদ্যোগাদি আরম্ভ হয়। পুরাঙ্গনাগণ নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যে রত হন; বিবাহ-উপলক্ষে গীত-বাদ্যে ইঁহাদের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। বিবাহের বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রায় প্রতিনিয়ত ইঁহাদিগের মিলিত কণ্ঠের সমবেত সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠে। বিবাহের কোনও একটী সামান্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার সময়ও ইঁহাদের গীত-বাদ্যের প্রয়োজন। স্ত্রী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সমবেত সঙ্গীত বোধ হয় বিবাহের একটী প্রধান অঙ্গ।

ইঁহাদের অনেকের মধ্যে গাত্র-হরিদ্রার পদ্ধতি নাই; তবে যাঁহারা গাত্র-হরিদ্রার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের ইহা একদিনেই শেষ হয় না। পাত্র-কন্যার কোষ্ঠী হইতে বিচার করিয়া কত-দিন ধরিয়া গাত্র-হরিদ্রার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার সংখ্যা পুরোহিত পূর্ব্বোক্ত "লগ্‌ন্"-পত্রিকাতেই লিখিয়া দেন। এই সংখ্যাকে "বান" বলা হয় এবং ইহার সংখ্যা প্রায় বিজোড়ই হইয়া থাকে। কন্যার "বান" পাত্রের অপেক্ষা সচরাচর অধিক সংখ্যার হইয়া থাকে অর্থাৎ কন্যার যদি সাতদিন ধরিয়া গাত্র-হরিদ্রার অনুষ্ঠান হয়, সেস্থলে পাত্রের পাঁচদিন হইবে। সাতজন সধবা স্ত্রীলোক প্রত্যেকে সাতমুষ্টি করিয়া যব জাঁতায় পিষিয়া লন। পরে ঐ যবচূর্ণ ও হরিদ্রা তৈলমিশ্রিত করিয়া পাত্র ও কন্যার গাত্রে "বান"-নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক দিন অনুসারে মাখাইয়া তাহাদিগকে স্নান করান হয়।

ইঁহাদের অনেকের মধ্যে লৌকিকতার প্রথাও বর্ত্তমান আছে। আত্মীয়-কুটুম্বগণ কেহ বস্ত্র, কেহ মিষ্টান্ন, আবার কেহ-বা কেবল অর্থাদি দিয়া লৌকিকতা করিয়া থাকেন; কিন্তু বরের মাতুলকেই বিবাহ করিতে যাইবার পোষাক দিতে হয়। তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে, বিবাহের যাবতীয় পোষাক ও তৎ-সঙ্গে লৌকিকতা-হিসাবে কিছু অর্থপ্রদান করেন; কিন্তু অক্ষম হইলে, বিবাহের কোনও একটী পোষাক তাঁহার দেওয়া প্রকান্ত প্রয়োজন। বরের আপনার মাতুল না থাকিলে, দূর-সম্পর্কীয় মাতুলকেও বিবাহের পোষাক দিতে দেখা গিয়াছে।

বিবাহের দিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া, বর শুভক্ষণে মাতুল-প্রদত্ত পোষাক পরিধান করিয়া, অশ্বারোহণে শোভাযাত্রাসহ বিবাহ করিতে যাত্রা করে; তাহার মস্তকে উজ্জ্বল টোপর শোভা পাইতে থাকে, টোপরের নিম্নদেশে সূত্র-গ্রথিত লম্বমান চাকচিক্যময় অসংখ্য পুষ্পগুচ্ছ বরের মুখ-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাখে এবং বরযাত্রিগণ বরের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া গমন করিতে থাকে। এতদ্দেশে প্রায় অনেকেই —বিশেষতঃ সহরাঞ্চলে প্রায় সকলেই শোভাযাত্রার সহিত বিবাহ করিতে যায়। ক্ষমতানুসারে শোভাযাত্রার ইতর-বিশেষ হয় বটে, কিন্তু বরকে তুরঙ্গম ব্যতীত অন্য কোনও যানে যাইতে দেখা যায় না। শোভাযাত্রায় সর্ব্বাগ্রে উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দূত হিসাবে একজন লোক গমন করে। সে কন্যাকর্ত্তার গৃহে পৌঁছিলে, কন্যাকর্ত্তা দুই-চারিজন বিশিষ্ট কুটুম্বসহ বরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হন। কন্যার বাটির সন্নিকটে বরযাত্রিগণের থাকিবার জন্য একটী বাটী নির্দ্দিষ্ট থাকে। বর-

যাত্রিগণ স্বদলে আসিয়া পৌঁছিলে, তথায় তাহাদের অভ্যর্থনাদি করা হয়। সায়ংকালে বরযাত্রিগণের সহিত বরকে একবার কন্যার গৃহের দ্বারদেশে লইয়া গিয়া তাহার কপালে "রুলি"র টিপ ও কিছু অর্থ দিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত বাটীতেই রাখিয়া যাওয়া হয়। লগ্নকাল উপস্থিত হইলে, কন্যাকর্ত্তা বরকে স্বগৃহে বিবাহ-সভায় লইয়া যান। এই সময় বরকর্ত্তা ও তাঁহার নিকট-আত্মীয়-স্বজন, পুরোহিত এবং নাপিত ব্যতীত অপর কাহারও তথায় যাইবার রীতি নাই। বিবাহ-ক্রিয়া বৈদিক মন্ত্রাদির দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের কুশণ্ডিকা এই রাত্রেই হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অন্যদিন উহা করিবার রীতি নাই। ইঁহাদের স্ত্রী-আচার-পদ্ধতি না থাকায়, বরকে "ছাদ্‌নাতলা"য় চোরের শাস্তি ভোগ করিতে হয় না। বঙ্গ-দেশের ন্যায় ইহারা বরকে সমস্ত রাত্রি 'বাসর'ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া নাচ-গান করিয়া কাটান না, বরকে নির্দ্দিষ্ট বাসবাটীতে আসিয়া বরযাত্রিগণের সহিত রাত্রিযাপন করিতে দেওয়া হয়। বরের সহিত রসালাপ ও আমোদ-প্রমোদের রীতি ইহাদের মধ্যে অবশ্যই আছে। বিবাহের পর স্ত্রী-সম্প্রদায় যখন বরকে লইয়া আমোদে ব্যস্ত থাকে, সে সময় বরের কোনও এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া তাহার মাথার টোপর খুলিয়া লয়। তখন ভ্রাতৃপ্রবরকেও নারীগণের হস্তে কিঞ্চিৎ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

উভয় পক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যাহাতে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতে পান, তদ্বিষয়ে কন্যাকর্ত্তা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এবং সেই-মত প্রচুর আয়োজনও করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ভোজ-সম্বন্ধে কিছু বিশেষত্ব আছে। ইঁহারা সর্ব্বপ্রথমে মিষ্টান্ন, তৎপরে পুরি, কচুরি, তরকারী ও আচার এবং সর্ব্বশেষে 'কুল্‌পী'-বরফ ভোজন করেন। কি শীত আর কি গ্রীষ্ম, সর্ব্ব-সময়েই ভোজনের শেষে বামহস্তে কুল্‌পী-বরফের কৌটা এবং দক্ষিণ হস্তে চামচ্ লইয়া বরফ খাওয়া চাই। তাহা না হইলে ইঁহাদের ভোজন বোধ হয় সর্ব্বাঙ্গীণ হয় না।

বিবাহের পর কন্যার বাটীতে বরযাত্রিগণের তিনদিন থাকিবার নিয়ম; কিন্তু সহরাঞ্চলে বরযাত্রিগণের সংখ্যা সাধারণতঃ বেশী হয় বলিয়া কন্যাকর্ত্তা তিনদিন ধরিয়া ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে অপারগ হন; সুতরাং বিবাহের পরদিনই বরবিদায় হইয়া থাকে। কন্যার সঙ্গে একজন মাত্র পরিচারিকা গমন করিয়া থাকে। বর-বধূ গৃহাগত হইলে, বরকর্ত্তা স্বগৃহে একটী ভোজের অনুষ্ঠান করেন। ইহা বঙ্গদেশের পাকস্পর্শেরই অনুরূপ; এই ভোজে কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। বধূ এই সময় স্বামিগৃহে সাতদিনের অধিককাল থাকিতে পান না।

বাঙ্গালা-দেশের ফুলশয্যার অনুরূপ ইঁহাদের কোনও অনুষ্ঠান নাই বা বিবাহের অব্যবহিত পরেই বর-বধূর মিলিত হইবার কোনও অবসর দেওয়া হয় না। কন্যা প্রথম ঋতুমতী হইলে বিবিধ মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও আত্মীয়-কুটুম্বগণের নিমন্ত্রণ করিয়া উৎসব ও ভূরি ভোজনের আয়োজন হয়। ইহাকে এতদ্দেশীয় ভাষায় "গণা" বলে। বর ও বধূর প্রথম সাক্ষাৎ এই সময়েই হইয়া থাকে। সচরাচর "গণা"র পূর্ব্বে কন্যার শ্বশুরালয়ে আসিবার বিধি নাই। 'গণা'র পরেই দ্বিরাগমন হইয়া থাকে।

এতদ্দেশে বিবাহের অনুষ্ঠান ক্রিয়াদি অনেকদিন ধরিয়া চলিতে থাকে; তবে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সমাজে যতদূর আড়ম্বর হয়, কায়স্থগণের মধ্যে ততদূর হয় না। কায়স্থেরা প্রত্যেক অনুষ্ঠান নিয়মমাত্র রক্ষা করিয়া অতি সংক্ষেপেই সারিয়া লন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে "পিলি-চিঠি"রও অনুষ্ঠান করেন না। "গণা"র পর দ্বিরাগমন বা তৎপূর্ব্বে বর-বধূর মিলিত না হইবার প্রথা প্রচলিত থাকায় বাল্য-বিবাহে এত-দ্দেশীয় সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু কন্যার বয়স পাত্রের অপেক্ষা সময় সময় অধিক হওয়া যে সমাজের অনিষ্ট-কারক, তাহা ইঁহারা—বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-সমাজের অনেকে একবারও ভাবেন না। অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষানবীশগণ বাল্য-বিবাহ-প্রথা রোধ করিবার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু কন্যার বয়স-সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে একেবারে উদাসীন বলিয়া বোধ হয়। অন্য বিষয় যাহাই হউক, ইঁহাদের বিশেষ গুণ,—কুটুম্বের সহিত সরল ব্যবহার, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির অনুকরণীয়। বিবাহে পণ-গ্রহণ ইঁহাদের নিকট অতি ঘৃণিত কার্য্য। অধুনা বঙ্গদেশে, বিবাহে পণ-গ্রহণ-প্রথা রোধ করিবার জন্য অনেক স্থলে সভার অধিবেশন ও প্রবন্ধাদিতে আলোচনাদি হইতেছে বটে, কিন্তু যতদিন না বঙ্গদেশ ইঁহাদের ন্যায় এই প্রথাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে শিখিবে, ততদিন ইহার সমূল বিনাশ সম্ভব নহে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বনফুল

নিঝুম সবুজ বনে কেগো আছ ফুটে,
লয়ে তব ক্ষুদ্র বুকে, অমরার হাসি?
লুব্ধ অলিদল কি গো, আসেনিক' ছুটে
বারেক গুঞ্জরি কাছে, হেরি রূপরাশি!
দিনান্তের ক্ষীণ আলো নিবিয়াছে সাঁঝে,
মিশিয়াছে শেষ রেখা সুনীল বিতানে;
রাখি' দূরে শ্রমক্লান্তি জগতের কাজে,
ফিরেছে কৃষাণদল কুটীরের পানে।

আছ তুমি মন-সুখে স্তব্ধ নিরালায়,
ঐশ্বর্য্য-গরিমা তব কভু নাহি হেরি;
কাননের চারু বক্ষে মাধুরী-লীলায়,
কোমল অমল প্রাণে রাখ তুমি ঘেরি!
নীরবে নিজনে থাকি করিছ আকুল,
সরলতা-মাখা ওগো ক্ষুদ্র বনফুল!

শ্রীহরিপদ দে

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জাপানীদিগের মত

"Ja:an Advertiser" পত্রিকার জনৈক লেখক বলেন যে, জাপানিগণ "ধর্ম্ম" বলিতে যাহা বুঝিয়া থাকে, তাহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য অভিমত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এ দুইএর ভিতর এতটা পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, উহাদের মধ্যে কোনরূপ তুলনাই চলে না। জাপানবাসিগণ যাহাকে "ধর্ম্ম" বলেন, প্রতীচী তাহাকে "কুসংস্কার" আখ্যা প্রদান করেন। "ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি" অর্থে জাপানিগণ, কুসংস্কারপূর্ণ কোন পৌত্তলিক-ধর্ম্মোপাসক ব্যক্তিকেই বুঝিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য জগৎ কিন্তু এ শব্দের এ অর্থ একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, যে ব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও দেশবাসী জনসাধারণের হিতার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহাকেই "ধার্ম্মিক" বলা যায়। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মই প্রাণ অর্থাৎ মহৎ প্রাণ এবং মানব কুসংস্কারপূর্ণ হইলেও, তাহার ভিতর যদি মহত্ব না থাকে, তবে সে ধার্ম্মিক-পদবাচ্য হইতে পারে না। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, নিজের জীবন ভগবানের ন্যায় পবিত্র ও তাঁহার চক্ষে প্রীতিকর করিবার উদ্দেশ্যে স্বতঃই স্রষ্টার পূজা ও সেবা করিবে। অন্যত্র, উপরিউক্ত লেখকের মতে জাপানীদিগের ধর্ম্ম, মাত্র কতকগুলি কুসংস্কারপূর্ণ বৃদ্ধা নারী, দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা ও যে সকল দুষ্টলোক পার্থিব সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে নিজেদের দূরে রাখিতে চায়, তাহাদের মধ্যেই আবদ্ধ। তাহাদের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় এ ধারণা পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় ধারণা হইতে বহুদূরে অবস্থিত; খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী উচ্চশ্রেণীর নেতৃবর্গ ও ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ধর্ম্মকে নৈতিক চরিত্র ও হিতকর জীবনের অংশস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। এ কথা অবশ্য-স্বীকৃতব্য যে, জাপানীদিগের ধর্ম্মসূত্রে অজ্ঞতাবাদী সম্প্রদায়ের কোন কোন বিচারকের ধর্ম্মসূত্রের সহিত সাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অজ্ঞতাবাদী সম্প্রদায়দিগের মতে ধর্ম্ম মহৎ প্রাণের কোন আবশ্যক অংশ নহে। জাপানবাসিগণের এরূপ ধারণার প্রতি আসক্ত থাকার কারণ এই যে, আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম দেখা যায়, সে সমস্তগুলিকেই উহারা এতাবৎকাল নিজেদের শিক্ষা-প্রণালীর বহির্ভূত বলিয়া লক্ষ্য পথের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছিল। "দৈহিক ও মানসিক উন্নতিই যথেষ্ট, আধ্যাত্মিক অনুশীলন কিছুই নহে"—এই বিশ্বাসে অন্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সংপ্রতি মীমাংসা হইয়াছে যে, তাহাদের এ ধারণা ভ্রমাত্মক এবং যে শিক্ষা পরবর্ত্তী বংশধরগণের জন্য যুগ-যুগান্তর-সঞ্চিত জাতীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষমতা রাখিয়া যাইতে অসমর্থ, সে শিক্ষা কোনক্রমেই বিজ্ঞানসম্মত বা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ইহা হইতে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সভ্যতা ও উন্নতির মূলতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অযথার্থ সূত্র হইতে একটা জাতির জীবনী-শক্তির কতটা ক্ষতি হইতে পারে। য়ূরোপ মধ্যযুগে যে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তাহার একমাত্র কারণ, এই ধর্ম্ম ও কুসংস্কারের অন্যায় সংমিশ্রণ। খ্রীষ্টধর্ম্মই, ইহার উন্নত, উজ্জ্বল ও পবিত্র শিক্ষাদ্বারা সমগ্র য়ূরোপবাসিগণকে সেই অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানালোকে লইয়া আসে।

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম

ইতিহাসে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে চীন ও কোরিয়া-প্রদেশের মধ্য দিয়া জাপানে বিস্তৃতিলাভ করে। জাপানে এই নূতন ধর্ম্মের প্রচলন-সম্বন্ধে দেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণী প্রদান করেন, তাহা এই :—

"৫৩২ খৃঃ অব্দে কোরিয়ার অন্তর্গত হাকুসাই (Hakusai) নামক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা, সম্রাট্ কিম্মীকে একটী সুবর্ণনির্ম্মিত বৌদ্ধমূর্ত্তি ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মমত-সম্বলিত তাড়া-বাঁধা কতকগুলি লিপি উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। জাপান-সম্রাট্, এই নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, প্রচলিত ধর্ম্মপ্রথা-সংরক্ষণে অধিকাংশ শিণ্টো-সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, একটী নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে, তিনি যে কেবল বিশেষরূপ লাভবান্ হইতে পারিবেন না, তাহা নহে; অধিকন্তু তাঁহাকে জাতীয় দেবগণের ক্রোধভাজনই হইতে হইবে। উক্ত প্রতিমূর্ত্তির সহিত এই মর্ম্মে একখানি আদেশপত্রও আসিয়াছিল যে, যাঁহারা বুদ্ধের এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন, তাঁহারা অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদের কোন' প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকিবে না। মিক্যাডো (জাপান-সম্রাট্) এই বাক্যের প্রতি সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সভাসদ্‌মণ্ডলীর অনিচ্ছাসত্বে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি সোগ-নো-ইনমে (Soga-no-Inme) নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত বিগ্রহটী দান করিতে স্বীকৃত হ'ন। এই সোগ্-নো-ইনমে, বিগ্রহটী প্রাপ্তিমাত্র তাঁহার দেশের বাটীখানি উঁহার মন্দিরে পরিণত করেন ও সেই অবধি উঁহার যথাবিধি পূজার্চ্চনা করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। জাপানে, ইহাই বুদ্ধের প্রথম মন্দির।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজ্যের সর্ব্বত্র ভীষণ মড়কের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। শিণ্টোবাসী সমস্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ এক-বাক্যে প্রচার করেন যে, ধর্ম্মের এই নূতন সংস্কারই জাতীয় দেবগণের ক্রোধ ও সেই ক্রোধের ফলস্বরূপ এই মড়কের উৎপত্তির একমাত্র কারণ। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক মড়কের এইরূপ কারণ নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, শীঘ্রই বৌদ্ধ-মন্দিরটী ভূমিসাৎ করা হয়। ফলে মড়ক পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া প্রত্যহ শত শত নিরীহ প্রজাপুঞ্জকে কালের করাল গ্রাসে পাতিত করিতে আরম্ভ করে। তখন ইহাও যে পবিত্র বস্তুর অপব্যবহারে সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে আর কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না; সুতরাং মন্দিরও পুনর্নির্ম্মিত হইল। এই ঘটনার কিছুকাল পর হইতেই কোরিয়া হইতে দলে দলে, বর্দ্ধিতসংখ্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ জাপানে আসিয়া বাস করিতে ও উহার সর্ব্বত্র তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।"

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, সেই সময়ে য়ুরোপবাসিগণ যেরূপ আদর ও উৎসাহের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ আদর ও উৎসাহের সহিত এই নূতন বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র জাপানবাসিগণকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইতে লাগিল। জাপানের অধিকাংশ সম্রাট্‌গণই বুদ্ধের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত হইয়া পড়িলেন। সম্রাট্ শীব (৮৫৯—৮৭৬) এবং সম্রাট্ উদসিঙ্গন্-সম্প্রদায়ের সভ্য ছিলেন। সম্রাট্ শিরকর যে, কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসই করিতেন, তাহা নহে; পরন্তু অনেকগুলি বৌদ্ধ মন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র

ইন্দ্রধনু

বিশ্ব ব্যেপে রাজ্য যাহার,
যাহার রূপের নাই তুলনা,
তারই ধ্যানে ডুব্ দিয়েছে
বিরাট্ যোগী আকাশখানা।
ধ্যানের মাঝে
রূপের স্বপন
ফুটিয়ে তোলে
রূপের ছটা;
সেই স্বপনের
সোহাগ নিয়ে
ইন্দ্রধনুর
এতই ঘটা!
ভাব-সেঁচা ধন
ইন্দ্রধনু,
ধ্যানের গভীর
নীরব ভাষা।
অরূপের রূপ
আঁক্‌তে গিয়ে
ফুটন্ত এক
কোমল আশা।

ধনু ত তুমি—
নও হে সখা,
ভাবের প্রাণের
এক রাগিণী!
পাগল আকাশ
তোমার রঙে
রঙিয়ে তোলে
ধ্যানের বাণী।
ভোলানাথের
ভুলের ছবি,
ধ্যানের প্রাণের
নীরব কবি!
সৃষ্টি হতে
আকাশখানা
কর্‌ছে ব'সে
যাহার ধ্যান,
তুমিই তাহার
চরম আশা,
তুমিই তাহার
পরম জ্ঞান।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আকাশ-বাতি

(চিত্র)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিসর্জ্জনের পরদিন যখন মাণিকলাল তাহাদের উঠানের মাঝখানে বাঁশের কঞ্চি পুঁতিয়া দড়ি ও কপিকলের সাহায্যে কাচের লণ্ঠনটা আকাশের দিকে তুলিতেছিল, তখন পিছন হইতে একটি ফুট্‌ফুটে-সুন্দরী বালিকা মেঘের মত কৃষ্ণকেশগুচ্ছ নাচাইতে নাচাইতে আসিয়া সোল্লাসে বলিল—"আকাশ-বাতি দিচ্ছ মাণিক-দা, বেশ ত!"

মাণিক দড়ি টানিতে টানিতে একবার ঘাড় ফিরাইয়া তাকাইয়া বলিল—"হাঁ। তোমাদের বাড়ী বাতি দেয় নি বাণি?"

বালিকা ঊর্দ্ধমুখে বাতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল—"দিয়েছে,—তে-তলার উপর;—কোন কাজেরই নয়, এক্কেবারে ছাই। আর বাবা আমায় সেখানে উঠ্‌তে দেন না—বলেন 'পড়ে যাবি'। আমি তোমার সঙ্গে বাতি দেব,—কেমন?"

দড়িটা বাঁশের গোড়ায় জড়াইতে জড়াইতে মাণিক বলিল, "আচ্ছা"।

বালিকা আহ্লাদে হাততালি দিয়া বলিল, "বাতি জ্বাল্‌বে কখন্ মাণিক-দা?

"এই আর একটু অন্ধকার হলেই,—আমি তোমাকে ডাক্‌ব-'খন। বাজী ছাড়্‌ব। আমি বাজী কিনে এনেছি,—দেখ্‌বে এস।"

মাণিক, বাণীকে লইয়া তাহাদের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং চৌকির নীচে থেকে একগাদা তুবড়ি, চর্‌কী ও লাল-নীল বাতি বাহির করিয়া বলিল, "এই চর্‌কী, তুবড়ি আমার। লাল-নীল বাতি তোমার,—তুমি ছেলেমানুষ কিনা"।

বালিকা হৃষ্টচিত্তে বাজীগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া খাট'-গলায় বলিল, "তোমায় বাজী ছাড়্‌তে কেউ বারণ করে না"?

মাণিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "না, বারণ কর্ব্বে কেন?—আজ ত সবাই বাজী ছাড়ে"।

বালিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ম্লানমুখে বলিল, "তবু বাবা আমায় বাজী ছাড়্‌তে দেন না, ছাদে উঠে আকাশ-বাতি দিতে দেন না, তোমার সঙ্গে খেলা কর্ত্তে বারণ করেন। তোমাকে ত বাজী ছাড়্‌তে, আমার সঙ্গে খেলা কর্ত্তে কেউ বারণ করে না,—আমাকে করে কেন মাণিক-দা"?

এ প্রশ্নের সদুত্তর মাণিক খুঁজিয়া পাইল না। পৃথিবীতে ধনী পিতা-মাতা যে দরিদ্র বালকের সহিত নিজ সন্তানের অবাধ মেলা-মেশা আদৌ পছন্দ করেন না, সরল-হৃদয় বালক তাহা কি বুঝিবে? অনেক চিন্তার পর সে বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ কিনা"।

মাণিক ও বাণীর বয়সের পার্থক্য—দেড় বৎসর মাত্র।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাছের আড়াল ও পাতার ফাঁক হইতে পৃথিবীতে নাবিয়া আসিলে পর, মাণিক ও বাণী বাজীগুলি উঠানের

মাঝখানে স্তূপ করিয়া রাখিয়া আকাশ-বাতি জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। মাণিক কাচের লণ্ঠনটা জ্বালিল, বাণী দড়ি টানিয়া বাতিটা বাঁশের আগায় তুলিল। বাতিটা শূন্যের উপর ঝুলিতে লাগিল। বাণী আনন্দে হাততালি দিয়া, খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "বাঃ! কেমন সুন্দর,—দেখ মাণিক-দা!" বাতি ও বাজী জ্বালিবার সময় খেলার সঙ্গিনীটিকে পাইয়া মাণিক পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতেছিল। সে সোৎসাহে কোমর বাঁধিয়া চর্‌কীর চাকাগুলি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতে লাগিল—ঠিক আছে কি না।

সহসা বাণী কি ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আকাশ-বাতি দেয় কেন মাণিক-দা"?

মাণিক তাহা জানে না; কিন্তু নিজের অজ্ঞতার কথা বাণীর কাছে প্রকাশ করা চলে না; বিজ্ঞভাবে বলিল—"আমাদের ভাই-বোন যারা মরে' গেছে, তারা স্বর্গে গেছে কি না,—তাদেরই বাতি দেখান হয়"!

"ও তাই!" বলিয়া বাণী আকাশের দিকে তাকাইল। শূন্যে একটা ফানুস ছুটিয়াছিল, সেই ফানুসের বাতিটি অন্ধকারে উল্কার মত দেখাইতেছিল। বাণী সোল্লাসে বলিল, "বাঃ, ঐ দেখ, স্বর্গ থেকে ওরা ও কেমন বাতি দেখাচ্ছে!"

তারপর কেরোশিনের বাতি আনিয়া তাহারা বাজী জ্বালিবার উদ্যোগ করিল। সহসা কে লণ্ঠন হাতে আসিয়া ডাকিল "বাণি!"

বালিকা ফিরিয়া দেখিল, তাহাদের চাকর যজ্ঞেশ্বর। সে ভীত হইয়া বাজীগুলি হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিল,—"যাও তুমি,—আমি এখন যাব না।"

যজ্ঞেশ্বর আলোর সাহায্যে দেখিল, বাণীর পায়ের কাছে চর্‌কী, তুব্‌ড়ি প্রভৃতি বাজী পড়িয়া আছে। কঠোরস্বরে বলিল—"ফের এখানে লুকিয়ে এসে বাজী ছাড়া হচ্ছে! দাঁড়াও, বাড়ী ফিরে দেখ্‌বে এখন।"

বালিকা ভীতকণ্ঠে বলিল—"সত্যি যগে, আমি বাজী জ্বালি নি।"

যজ্ঞেশ্বর মাণিকের পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইয়া বলিল—"তুমি ছোক্‌রাই যত নষ্টের গোড়া। তুমি ওকে আগুন নিয়ে খেল্‌তে প্রশ্রয় দাও; হাত-পা পোড়ে ত টের পাবে। ওর সঙ্গে মিশ্‌তে তোমার ভয় হয় না? ও কে—আর তুমি কে!" তারপর রোরুদ্যমানা বালিকাকে জোর করিয়া কাঁধে' তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

মাণিক হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রোদন-শব্দে মাণিকের মাতা গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদে কে রে মাণিক?"

রুদ্ধকণ্ঠে মাণিক বলিল, "বাণী। যগে ওকে জোর করে' নিয়ে গেল।"

মাতা ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "কেন তুই ওর সঙ্গে মিশ্‌তে যাস্। ওরা বড়লোক, আর তুই গরীব। তোতে আর বাণীতে আকাশ পাতাল তফাৎ; ওর সঙ্গে খেলা করা তোর সাজে না; কিন্তু তোদেরও ত এ অবস্থা ছিল না; গাড়ী-ঘোড়া, ধন-দৌলত সবই ছিল, কপালের দোষে সব গেছে।" তাঁহার চক্ষু হইতে টস্‌টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, বালকের হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। মাণিকের বাজীগুলি উঠানে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাণীর পিতা দীনেশবাবু খুব ধনবান্ ব্যক্তি; আর মাণিক পিতৃহীন দরিদ্র বালক, মা ছাড়া তাহার আর কেহ ছিল না। তৈল ও জল একসঙ্গে থাকিলেও যেমন একেবারে মিশে না, ধনী ও দরিদ্র তেমনই বহুকাল একস্থানে থাকিলেও, তাহাদের ভিতর আত্মীয়তা জন্মে না। পৃথিবীর ইহাই রীতি এবং এই রীত্যনুসারে বাণীর পিতা দীনেশবাবু দরিদ্র প্রতিবেশী মাণিকদের সহিত বড় একটা সংস্রব রাখিতেন না। বাড়ীর কেহ উহাদের সহিত মেলা-মেশা করে, ইহাও তিনি পছন্দ করিতেন না, কাজেই দরিদ্র মাণি-কেরা আর সাহস করিয়া তাঁহাদের কাছে ঘেঁসিত না; কিন্তু শিশুরা পৃথিবীর রীতি-নীতির ধার ধারে না। যেদিন বাণী তাহাদের ত্রিতল অট্টালিকার উন্মুক্ত গবাক্ষপথে দেখিল,—পার্শ্বের জীর্ণ কুটীরে তাহারই মত একটি সরল শিশু কেমন সুধা-হাসি ছড়াইয়া, রূপে উঠান আলো করিয়া খেলিতেছে, সেদিন হইতে তাহার কচি হৃদয়ের কচি ভালবাসা সেই শিশুর দিকে উছলিয়া চলিল। দীনেশবাবুর প্রস্তর-প্রাচীর শিশু-হৃদয়ের অপর্য্যাপ্ত প্রেমে বাধা দিতে পারিল না। লৌহ যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, বাণীও তেমনই মাণিকের প্রতি আকৃষ্ট হইল;—কিন্তু দীনেশবাবুর চোখে এ দৃশ্য বড়ই বিসদৃশ বোধ হইল;—তাঁহার মেয়ে একটা দরিদ্র বালকের সঙ্গে মিশিলে তাঁহার গৌরবের হানি হইবে যে! বাণীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইলেন—"শিশুর প্রতি শিশুর আকর্ষণ স্বাভাবিক। মেয়েটা খেল্‌বার সঙ্গী পায় না,—তাই মাণিকের সঙ্গে খেল্‌তে চায়; খেলুক না! এতে পদমর্য্যাদার হানি হবে না।" তাঁহার মাতৃ-হৃদয়ও বুঝি ঐ সরল, সুন্দর শিশুটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল!

অগত্যা দীনেশবাবু মাণিককে ডাকিয়া আনিলেন। মাণিকের মাতা সারাদিন মাণিককে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না; মাণিক ছাড়া তাঁহার আর কেহই ছিল না; কাজেই বাণীও সময় সময় মাণিকদের ভাঙ্গা কুঁড়েতে খেলিতে যাইত। ক্রমে মাণিকদের বাড়ীই বাণীর খেলিবার স্থান হইয়া দাঁড়াইল। বাণী প্রায় সমস্তদিনই সেখানে খেলা করিত; তাই বাণীর মাতাও দিনের ভিতর দশবার এই দরিদ্র-গৃহে যাতায়াত করিতেন। এইরূপে বাণী এই দুটি ধনী ও দরিদ্র পরিবারকে একটা স্বর্ণ-সূত্রে গাঁথিয়া ফেলিল।

মাণিকের পিতা হরপ্রসাদবাবু সম্ভ্রান্ত ও অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। জীবিতকালে দাতাকর্ণের মত দুইহাতে অর্থ বিলাইয়া যখন তিনি 'মহাসিন্ধুর ওপারে' চলিয়া গেলেন তখন এই ক্ষুদ্র পরিবারটা অকূল পাথারে ভাসিল। উপকৃত ব্যক্তিদের ভিতর কেহ একটু সাহায্য করিল না, সহানুভূতি জানাইল না;—মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ! মাণিকের মাতা ঘর-বাড়ী ও গায়ের অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া পতির ঋণ শোধ করিলেন। তাহার পর মাণিকের হাত ধরিয়া এই কুঁড়ের নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সকল কাহিনী শুনিয়া বাণীর মাতার মাণিকদের উপর বড়ই সহানুভূতি হইল। আহা, ইহারা ত এককালে ধনী ছিল, সুখী ছিল! কালের আবর্ত্তে পড়িয়াই ত আজ ইহাদের এই দুর্দ্দশা! তিনি মাণিককে ডাকিয়া খাওয়াইতেন, ভাল কাপড়-চোপড় কিনিয়া দিতেন; দেখিয়া কৃতজ্ঞতায় মাণিকের মাতার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত।

কিন্তু দীনেশবাবু দয়ার ধার ধারিতেন না। তিনি অন্যের ওজন তাহার বর্ত্তমান অবস্থাদ্বারা নিরূপণ করিতেন। সেই হিসাবে বিচার করিয়া তিনি দেখিলেন "—মাণিকেরা দরিদ্র, কাজেই তাঁহার সহানুভূতি বা সমাদরের অযোগ্য। পৃথিবী অতীতের দোহাই দিলে চলে না। বর্ত্তমান সময়ে তাহারা গরীব,—কাজেই তাদের সংস্পর্শে গেলে 'মানহানি' হইবে।—" কন্যার এতটা বাড়াবাড়ি তাঁহার চোখে ভাল লাগিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল মাণিক বাণীর খেলিবার সহচর মাত্র,—যেমন হরিণ, কুকুর বিড়াল প্রভৃতি। উহারা বাক্যহীন, মাণিক কথা বলিতে পারে এইটুকু মাত্র প্রভেদ;—কাজেই বাণী উহাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে মাণিকের প্রতি ও সেইরূপই করিবে—তাহার বেশী নয়। কিন্তু যখন দেখিলেন বাণী নিজে না খাইয়া মাণিককে খাওয়ায়, খেলিতে খেলিতে মাণিক শ্রান্ত হইলে বাণী অঞ্চলদ্বারা ব্যজন করে, মাণিক আঘাত পাইলে বাণী কাঁদিয়া ফেলে, তখন তাঁহার মনে হইল মাণিকের প্রতি বাণীর আকর্ষণ সাধারণ রকমের নহে। দীনেশবাবু নাটক নভেল যথেষ্ট পড়িয়াছিলেন,—এই কথাগুলি ভাবিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। বাল্যের ভালবাসার অঙ্কুর যৌবনে বৃহৎ প্রণয়-বৃক্ষের আকার ধারণ করে এবং তাহাতে বিষফল ধরে একথা তিনি অনেক উপন্যাসে পড়িয়া-ছিলেন। মাণিক ও বাণীর শৈশবের প্রণয় যদি অঙ্কুরে বিনষ্ট না করা হয় তাহা হইলে ফল যে কালে 'প্রতাপ' ও 'শৈবলিনীর' মত দাঁড়াইবে একথা তিনি পত্নীকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেন। ইংরাজী বহির দোহাই দিয়া বলিলেন 'প্রেম অন্ধ, ইহা অর্থমর্য্যাদা, বংশমর্য্যাদা, পদমর্য্যাদা—কোন মর্য্যাদারই তোয়াক্কা রাখে না।' দীনেশবাবু পত্নীকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিলেন "এখন হইতেই মাণিক ও বাণীর মেলামেশা বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। তার পর ওরকম একটা কাণ্ড হ'লে আমার আর মুখ দেখাবার যো থাক্‌বে না,—বংশে কলঙ্ক হ'বে।"

পত্নী হাসিয়া বলিলেন—"তুমিও যেমন পাগল! আট বছরের মেয়ে আর দশ বছরের ছেলে—এরা প্রণয়ের কি জানে? কেমন সুন্দর পবিত্র ভাব এদের,—মিছে এরূপ উদ্ভট কল্পনা করে এক বিতিকিচ্ছ কাণ্ড বাধান!—আর যদি তোমার এই উদ্ভট কল্পনা সত্যি হয়ে দাঁড়ায়, তবে এই জোড়াফুলে না হয় একটা সুন্দর মালা গেঁথে ফেল্‌ব। কেমন সুন্দর সরল ছেলেটি!"

দীনেশবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিভরে বলিলেন, "ঐ রাস্তার ভিখারীর সঙ্গে বাণীর বিবাহ!—তার চেয়ে মেয়েকে জলে ডুবিয়ে মারা ভাল।"

পত্নী। "কেন মাণিক ত সদ্‌বংশজাত,—আর ওদের আগের অবস্থাও ভাল ছিল। আমাদের ত টাকার অভাব নেই,—ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলি, তার পর বাণীর সঙ্গে—"

দীনেশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "থাক্ থাক্, আর বলে দরকার নেই। তার আগে যেন ছোক্‌রাটা বজ্রাঘাতে বা জলে ডুবে—"

পত্নী শিহরিয়া বলিলেন, "—কি সাংঘাতিক লোক তুমি!—"

পত্নীকে বলিয়া কিছু হইবে না দেখিয়া তিনি বাণীকে মাণিকের সঙ্গে খেলিতে বারণ করিলেন, মাণিককেও এ বাড়ীতে আসিতে মানা করিলেন; কিন্তু বালক-বালিকা তাহা মানিবে কেন? তাহারা অবাধভাবে খেলিতে লাগিল। তখন দীনেশবাবু মাণিককে শাসাইলেন, বাণীকে তাড়া করিলেন। তবু তারা বোঝ মানিল না।

কিন্তু নদীকে শত বাধা দিয়া আটকাইয়া রাখিলেও সে নানা সুযোগে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, সাগরে গিয়া মিশে,—নতুবা উপল-খণ্ডে আছাড়িয়া রোদন করিতে করিতে শুকাইয়া যায়। এ-দুটি বালক-বালিকাও সুযোগ খুঁজিয়া একে অন্যের সহিত মিশিত। মাণিকের গৃহের পশ্চাতে, ঝোপের অন্তরালে বা উদ্যানস্থ আম্র-কাননে, দ্বিপ্রহরে যখন দীনেশবাবু নিদ্রিত থাকিতেন, তখন তাহারা গল্প করিত। সে গল্প অর্থশূন্য, ভাবশূন্য—তবুও তাহাতে মনে কত সুখ, কত আনন্দ হইত! কিন্তু এমন করিয়া আর ক'দিন চলিবে? চাকর যজ্ঞেশ্বর গোপন-অনুসন্ধানের ফলে তাহাদের গোপন-মিলনের কথা জানিয়া ফেলিল এবং প্রভুভক্ত ভৃত্যের ন্যায় যথাসময়ে এই মারাত্মক কথা কর্ত্তার কর্ণগোচর করিল।

দীনেশবাবু রাগে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন, মাণিককে ও বাণীকে আবার কঠোরভাবে শাসন করিলেন। বালক-বালিকা গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহাদের কাচের মত স্বচ্ছ, নির্ম্মল হৃদয়ে একটা দাগ পড়িয়া গেল।

তদবধি তাহাদের দুজনের আর সাক্ষাৎ হইত না। বিসর্জ্জনের পরদিন সন্ধ্যার সময়, যখন দীনেশবাবু এক ধনী বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, বাণী তখন লুকাইয়া লুকাইয়া একটী বারের জন্য মাণিকের আকাশ-বাতি দেখিতে আসিয়াছিল। আসিয়াই, এই বিপদ!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া মাণিক কুয়াসায়-ভিজা বাজীগুলি রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিতেছিল, আর নীরবে গত রজনীর কথা ভাবিতেছিল।—এই লাল, নীল বাজীগুলি সে কত আশা করিয়া বাণীর জন্য কিনিয়াছিল!—সুযোগমত বাণীর হাতে দিবে। বাণী এই বাজী জ্বালিবে, আনন্দ করিবে,—দেখিয়া সে সুখী হইবে; কিন্তু উহারা সে সুখে বাদ সাধে কেন? বাণীর সহিত সে ঝগড়া করে না, মারামারি করে না,—সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহাকে ভালবাসে, নিজে না খাইয়া, বাণীকে খাওয়াইয়া সুখী হয়; তবে—তবে কেন উহারা বাণীর সহিত তাহাকে খেলিতে দেয় না? কেন উহারা এরূপ করে? বালক উঠানে বসিয়া নীরবে ভাবিতেছিল, এমন সময় কঠোর-কণ্ঠে কে ডাকিল, "মাণিক!"

ত্রস্তভাবে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, দীনেশবাবু ও যজ্ঞেশ্বর দাঁড়াইয়া। তাহার বুক দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, ভয়ে মুখ শুকাইয়া গেল।

দীনেশবাবু কঠিনভাবে বলিলেন, "তোমাকে না বাণীর সঙ্গে খেলা কর্ত্তে বারণ করেছি? ফের কাল তাকে ডেকে এনেছ,—এসব আগুন নিয়ে খেল্‌বার জন্য! তোমার ভয় নেই, আক্কেল নেই! বুড়োধাড়ী ছেলে, এতটুকু বুদ্ধি নেই যে, তুমি কে—আর বাণী কে! ওর সঙ্গে মিশ্‌তে তোমার লজ্জা হয় না, —ভয় হয় না?—তুমি ত ওর চাকরের সমান!—"যজ্ঞেশ্বর, বাবুর কথার ধূয়া ধরিয়া বলিল, "আমিও ত সেই কথাই বলি মহারাজ! ও কেন নরকের কীট হয়ে আস্‌মানের চাঁদের সঙ্গে মিল্‌তে চায়? ওর কি একটু আক্কেল বুদ্ধি নেই! আর ওর কথা বল্‌ব কি হুজুর,—ওর মা বেটীই যত নষ্টের মূল। ভেবেছ, ছেলে অতবড়

রাজকন্যার খেলার সঙ্গী হলে দেদার টাকা পাবে। কি সাহস! বাণীর খেলার সঙ্গী হবে ওর মত ছোটলোকের ছেলে!—"

দীনেশবাবু তোষামোদে প্রীত হইয়া বলিলেন "তা, গরীব মানুষ বড় মানুষের ঠাঁই আশা-ভরসা করবেই ত। আমাদের সাহায্য ছাড়া ওরা বাঁচ্‌বে কি করে? কিন্তু আমার মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলে মিশ্‌বে, এ ত কম স্পর্দ্ধার কথা নয়!—সব সইতে পারি, কিন্তু অন্যায় সইতে পারি না"।

তৎপরে মাণিকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি হে ছোক্‌রা, আর কখনও মিশ্‌বে বাণীর সঙ্গে?" মাণিক ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "না"।

দীনেশবাবু। "না, না ত ফি বারেই বল্‌ছিস্‌। একবার, দুবার, তিনবার ক্ষমা কর্‌লাম। এর পর কিন্তু এই লাঠি তোর পিঠে ভাঙ্গ্‌ব"।

মাণিক সভয়দৃষ্টিতে দীনেশবাবুর হস্তধৃত যষ্টির দিকে তাকাইল; ভয়ে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল—নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

দীনেশবাবু ও যজ্ঞেশ্বর প্রস্থান করিলে পর, মাণিক ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তারপর বাজী-গুলি দূরে ফেলিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতরে কাঠের মত দাঁড়াইয়া মাণিকের মাতা দীনেশবাবু ও যজ্ঞেশ্বরের শ্লেষপূর্ণ নির্ম্মম ভৎর্সনা শুনিতেছিলেন ও নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন। মাণিক ঘরে প্রবেশ করিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া অভিমানভরে কাঁদিতে লাগিল। মাতা ও পুত্রের অশ্রুধারা একত্র মিলিয়া ঘর মেঝে ভাসাইয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন মাণিকের মাতার শরীর একটু অসুস্থ হইল। অর্থের অনাটনে ক'দিন যাবৎ তিনি অনশনে দিন যাপন করিতেছিলেন। হাতের পুঁজি সমস্ত ব্যয় করিয়া যখন দেখিলেন, ঘরে কেবল দুজনের চারিদিনের আন্দাজ চাল আছে, তখন হইতে তিনি নিজে আহার বন্ধ করিয়া দিলেন,—তবুও এইরূপে মাণিকের ত আটদিনের খোরাক হইবে! কিন্তু সেই আটদিনের পর যে কি হইবে, তাহা আর ভাবিতে পারিলেন না,—তাহা ভাবিতে গিয়া দেখিলেন,—সমস্ত বিশ্বে যেন একটা বিরাট্‌ প্রলয়-কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে, কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় সমস্ত বিশ্বটা যেন প্রবলবেগে রসাতলের দিকে চলিয়াছে! মাণিকের মাতা ভয়ে চক্ষু মুদিলেন, আর ভবিষ্যতের দিকে চাহিলেন না। বর্ত্তমানের বিমল দীপ্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসাইয়া গেল,—মাণিকের আটদিনের খোরাক আছে,—নিজে উপবাসে থাকিবেন।

তিনি উপবাস করিতে লাগিলেন, বাণীর মাতাকে কিছু জানিতে দিলেন না,—ছিঃ, অবশেষে ভিক্ষা করিবেন! কিন্তু তিন-দিনের পর আর পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। সেইদিনই দীনেশবাবু ভৃত্যসহ আসিয়া মাণিকের প্রতি কটূক্তি করিলেন। দুর্ব্বলদেহে এ বেদনা মাণিকের মাতা সহিতে পারিলেন না,—পরদিনই তিনি বিছানা লইয়া পড়িলেন।

বালক কি করিবে বুঝিল না—আত্মীয় বলিতে তাহার কেহ নাই।—এক বাণী ও তাহার মাতা; কিন্তু দীনেশবাবু ত সেদিক মাড়াইতেই দিবেন না। নিরুপায় বালক মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল,—মাতাও কাঁদিতে লাগিলেন।

চিকিৎসা চলিল না, পথ্য চলিল না। মা যে তিনদিন অনাহারে আছেন, বালক তাহা জানিত না; তাই জ্বরের উপর মাকে কিছু খাইতে বলিল না। কেবল সারারাত্রি মায়ের পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিল। শেষরাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিলে, মাণিক এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিল, 'মা এক উজ্জ্বল হৈমরথে চলিয়াছেন। সে একা পড়িয়া আছে। সে যাইতে চাহিল, মা বারণ করিলেন, তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।' বালক কাঁদিয়া জাগিয়া উঠিল, ডাকিল, "মা, মাগো!—কেহ উত্তর করিল না। বাতি জ্বালিয়া দেখিল—মায়ের চক্ষু অর্দ্ধোন্মীলিত, ওষ্ঠ বিভক্ত।

মার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, দেহ তুষার-শীতল। মাণিক চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা, মাগো, মা আমার!—কিন্তু আর কেহ ক্রন্দনে সান্ত্বনা দিল না, বুকে তুলিয়া লইল না,—হতভাগা চিরকালের জন্য সে আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইল! * * *

ভোরবেলা বাণীর মাতা মাণিককে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। নিষ্ঠুর দীনেশবাবু বাধা দিলেন। বাণীর মাতা বলিলেন, "বাড়ীর পাশে একটী অনাথা বালক অনাহারে, অবহেলায় মারা যাবে, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমরা মানুষ ত,—আমাদেরও ত সন্তান আছে! দু'দিন থাক্‌, মায়ের শোকটা একটু ভুলুক,—তার পর না হয় ওকে তাড়িয়ে দিয়ে দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখিও।—"

অগত্যা দীনেশবাবু স্বীকৃত হইলেন। কি করিবেন, পত্নীর এ কথার উপর আর কথা চলে না।—মাণিক দীনেশবাবুর বাড়ীতেই রহিল; কিন্তু বাহির বাটীতে থাকিতে হইল। বাণীর মাতার স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে ক্রমে ক্রমে সে মাতৃশোক ভুলিল। বাণীও সুবিধামত গোপনে গোপনে দেখা করিত। এত দুঃখেও মাণিকের এই একটু সুখ যে, তবু ত বাণীর সঙ্গে এক বাড়ীতে আছে।

ইহার কিছুদিন পর চারিদিকে বড় জ্বরের ধুম পড়িল। জ্বরে অনেক লোক মরিতে লাগিল। একদিন বৈকালে মাণিকও জ্বরে পড়িল। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। বাণীর মাতা চিন্তিতা হইলেন,—তিনি ভাল ডাক্তার ডাকাইলেন, নিজে মায়ের মত শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। দীনেশবাবু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "এত লোক জ্বরে মরিল, এই ছোঁড়াটা কত পরমায়ু নিয়ে এসেছে যে ওর—"। ভগবান্‌ বোধ হয় প্রার্থনা শুনিলেন,—মাণিকের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল। একদিন রোগশয্যায় পড়িয়া মাণিক ক্ষীণস্বরে বলিল, "মা, (মাণিক বাণীর মাকে মা বলিত) বাণীর সঙ্গে গল্প কর্‌তে ইচ্ছা হয়। মাথাটা বড্ড ব্যথা কর্‌ছে—আর যে জ্বালা সইতে পারি না মা। বাণীকে ডাক,—যদি গল্প করে একটু আরাম পাই"।

বাণীর মাতার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, "উনি যে কেমন মেজাজের লোক! তোমার কাছে বাণী আস্‌লে রাগ করেন"।

মাণিকের রোগক্লিষ্ট মুখখানি আরও মলিন হইয়া গেল, কাতরভাবে সে বলিল, "তুমি যাও না মা,—একবার লুকিয়ে লুকিয়ে নিয়ে এস।"

বাণীর মাতা বলিলেন, "যে বদ্‌রাগী, টের পেলে বাণীকে মেরে গুঁড়ো কর্‌বেন। আচ্ছা যাই, যা হ'ক হবে।—"

বালকের মুখে একটা সংযমের রেখা ফুটিয়া উঠিল, সে স্থিরকণ্ঠে বলিল, "তবে থাক্‌ মা!"

বাণীর মাতা তাহার হৃদয়ের গভীর ব্যথা বুঝিলেন, তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া গেলেন ও বাণীকে পাঠাইয়া দিলেন।

বাণী আসিলে পর মাণিক বলিল, "তুমি যাও বাণী, তোমার বাপ মার্‌বেন"।

বাণী বলিল, "বাবা শিকারে গেছেন মাণিক-দা, বেশ হয়েছে। আমরা আজ সারাবেলা গল্প কর্ত্তে পার্‌ব। তোমার জ্বর, বড্ড মাথাব্যথা, না?"

মাণিক কিছু বলিতে পারিল না, আনন্দের আতিশয্যে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল,—কেবল চক্ষু হইতে দর-দর ধারে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। বাণী তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কেঁদ না মাণিক-দা,—শিগ্‌গিরই সেরে যাবে। তুমি শিগ্‌গির সেরে ওঠ। বাবা এখন প্রায়ই শিকারে যাবেন। কি মজা! আমরা রোজ রোজ গল্প কর্‌ব।—"

মাণিক উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "তুমি কাছে বস্‌লে যেন সব ভুলে যাই; জ্বরের জ্বালা, মাথাব্যথা সব সেরে যায়। তুমি রোজ রোজ এস,—তা হলে আমি শিগ্‌গিরই সেরে উঠ্‌ব"।

বালক-বালিকা প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতে লাগিল। "আবার পূজা আস্‌ছে। মা বলেছেন, তোমায় রাজার পোষাক, আর আমায় রাণীর পোষাক কিনে দেবেন। কি সুন্দর হবে,—আমাদের রাজা-রাণীর মত দেখাবে। আচ্ছা মাণিক-দা, রাজা-রাণীরাও ত আমাদের মত মানুষ,—আমরাও বড় হলে রাজা-রাণী হব,—কেমন?"

মাণিক অতৃপ্তনয়নে বাণীকে দেখিতে দেখিতে বলিল, "আচ্ছা"।

তারপর পূজার সময় তাহারা কি কি খেল্‌না ও খাবার কিনিবে, কি কি বাজী কিনিবে, বিসর্জ্জনের পর লুকাইয়া লুকাইয়া কিরূপে আকাশ-বাতি জ্বালিবে, সেই সব পরামর্শ করিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সহসা দীনেশবাবু এই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হাতীটা পীড়িত হওয়াতে শিকারে যাওয়া হয় নাই। তিনি দেখিলেন, বাণী মাণিকের মাথায় হাত বুলাইতেছে—উভয়ে তন্ময় হইয়া গল্প করিতেছে। তিনি রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন। এতদূর স্পর্দ্ধা, তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া আবার বাণীর সঙ্গে মেশা!

তিনি ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত পীড়িত মাণিকের উপর লাফাইয়া পড়িলেন। বামহস্তে দুর্ব্বল মাণিকের চুলের মুষ্টি ধরিয়া দক্ষিণ হস্তধৃত 'হাণ্টার'দ্বারা শপাশপ্‌ প্রহার করিতে লাগিলেন। বালিকা বাণী বিস্ময়ে, ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দীনেশবাবু যখন দেখিলেন, মাণিক প্রায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি যজ্ঞেশ্বরের সাহায্যে তাহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিলেন। পীড়িত, প্রহৃত, হতভাগ্য মাণিক মাতালের মত টলিতে টলিতে একদিকে চলিয়া গেল,—কি হইল, কোথায় চলিল—সে জ্ঞান তাহার ছিল না। বাণীর মাতা সব শুনিয়া গোপনে মাণিকের খোঁজ করিলেন; কিন্তু তাহার খোঁজ মিলিল না। তিনি বড় আঘাত পাইলেন। হায়, স্বামী—যিনি ইহ-পরকালের দেবতা, তিনি এমন হৃদয়হীন, এমন নিষ্ঠুর! আর যে তাঁহার উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা যায় না! তাঁহার ভয় হইল—বুঝি ভগবান্‌ এত পাপ সহিবেন না! না জানি, এ পাপের কি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত হইবে!

এই তীব্র আঘাত বালিকা বাণী সহিতে পারিল না। মাণিকের স্মৃতি তাহাকে তিল তিল করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। বাণী বৃন্তচ্যুত কুসুম কলিকার মত শুকাইতে লাগিল। রাত্রিতে জ্বর হইত, সারাদিন কি এক অসহনীয় যাতনায় সে ছট্‌ফট্‌ করিত! বাণীর মাতা বুঝিলেন, কি রোগ। তিনি ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "ভগবান্‌, পাপের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত কি এরূপে হইবে? আমাকে দয়া কর দেবতা!"

দীনেশবাবু কন্যাকে অলঙ্কার, খেলনাদ্বারা ভুলাইতে চাহিলেন, বড় বড় ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন, 'চেঞ্জে' গেলেন,—কিন্তু তবুও বাণী সারিল না।

একদিন ডাক্তার তাঁহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "বাণীর এক type এর যক্ষ্মা হয়েছে। অবিকল এই typeএর যক্ষ্মা-রোগী কিছুদিন আগে আমার হাতে পড়েছিল,—symptomsগুলো একেবারে এক।—সেই ছোক্‌রাটার অল্প বয়স—আর এমন lovely চেহারা ছিল যে, এখনও আমার চোখে ভাস্‌ছে।"—

দীনেশবাবু পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাণীর যক্ষ্মা!—ডাক্তারবাবু একে বাঁচাও, যত টাকা লাগে আমি দিব।"

ডাক্তার আপন মনে বলিতে লাগিল "বাণী? হাঁ হাঁ, ঐ ছোক্‌রাও ত এই নাম বলেছিল—বাণী"।

দীনেশবাবু উন্মত্তের মত বলিলেন "ছোক্‌রা, ছোক্‌রা—কে ও?"

ডাক্তার। "তা জানি না,—সেদিন হরিপুরের জমিদারবাড়ীতে একটা 'কলে' গিয়েছিলাম। রাস্তায় ক'জন ভদ্রলোক বল্লেন, গাছতলায় একটি অল্পবয়স্ক ছেলে পড়েছিল, তাকে তাঁরা তুলে এনেছেন। ছেলেটির চেহারায় সদ্‌বংশজাত বলে' মনে হয়। আমি দেখ্‌তে গেলুম,—তখন তার শেষ অবস্থা। দেখ্‌লেম, যক্ষ্মার পূর্ব্বলক্ষণ। সর্ব্বদেহে চাবুকের দাগ, বোধ হয় কোন নিষ্ঠুর লোক ঐ সোণার অঙ্গে চাবুক মেরেছিল। আমার কান্না আস্‌তে লাগ্‌ল। ডাক্তাররা রোগীর কষ্ট দেখে কাঁদে না; কিন্তু আমি নিজের দুর্ব্বলতা দমন কত্তে পাল্লুম না,—আহা, সহায়হীন গরীব বেচারা,—কার কোল খালি করে' এসেছে!... কিন্তু বাঁচাতে পাল্লুম না। এখনও তার শেষ কথাগুলো কানে লেগে আছে—"বাণী, চল যাই! যেখানে যাব, সেখানে তোমার বাবা নেই—আর আমাকে কেউ মার্‌তে পার্‌বে না।" ডাক্তারের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

দীনেশবাবু দুইহাতে চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিলেন, "আঃ, ছোক্‌রা সেখানে যাবার সময়ও বাণীকে ডেকে গেছে,—না, এবার আর বাধা দিতে পার্‌ব না"।

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি? কাকে ডেকে গেছে?"

দীনেশবাবু পাগলের মত সমস্ত কথা বলিলেন।

ডাক্তারবাবু বিস্মিতভাবে সমস্ত শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "দেখুন, আপনার পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত! ভগবানের সূক্ষ্ম বিচারে কারুর পার পাবার উপায় নেই। নিষ্পাপ নিরীহ বালককে যে যাতনা দিয়েছেন, তাহা আজ আপনার কাঁধে এসে পড়েছে।

আশ্চর্য্য! বাণীর অবিকল সেই ty eএর যক্ষ্মা হয়েছে। এ রোগ সারে না।"

দীনেশবাবুর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, চক্ষুদুটা রক্তবর্ণ পলকহীন হইল। তিনি ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে চাহিয়া জড়িতস্বরে থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "হুঁ—প্রায়শ্চিত্ত—কঠিন প্রায়শ্চিত্ত!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আবার শারদীয় পূজা শেষ হইল,—যেন একটা বিরাট্ আনন্দের বন্যা ক'দিনের জন্য পৃথিবীকে ভাসাইয়া দিয়া আবার বৃহৎ একটা বৎসরের জন্য কোথায় চলিয়া গেল; কিন্তু এবার এই আনন্দ-বন্যা দীনেশবাবুর গৃহে আসিল না। বাণী মৃত্যু-শয্যায় শায়িত,—সমস্ত আত্মীয়-পরিজন তাহার শোকে ম্রিয়মাণ, উৎসাহহীন। কোনওপ্রকারে নিয়মরক্ষা করা হইল মাত্র।

বিসর্জ্জনের পরদিন বাণীর ইচ্ছায় আকাশ-বাতি জ্বালান হইল। মাণিকদের শূন্য কুটীরে আর বাতি জ্বলিল না। ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে এমনই একদিন বাণী ও মাণিক তাহাদের উঠানে আকাশ-বাতি জ্বালিয়াছিল।

বাণী শয্যায় শুইয়া শুইয়া আকাশ-বাতি দেখিল। সেই অতীত কথা তাহার মনে ছবির মত জাগিয়া উঠিল। সেদিন বাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আকাশ-বাতি দেয় কেন মাণিক-দা?"

মাণিক বলিয়াছিল, "আমাদের ভাই-বোন যারা মরে গেছে, তারা স্বর্গে আছে কিনা,—তাই তাদের বাতি দেখান হয়।"

বাণী ভাবিতে লাগিল—"আজ মাণিক-দাও ত স্বর্গে; সে কি এই বাতি দেখিতে আস্‌বে না? নিশ্চয়ই আস্‌বে। তা হ'লে আজ ত মাণিক-দাকে দেখ্‌তে পাব। ইস্, কতদিন দেখিনি তাকে!—"

বালিকা স্থিরদৃষ্টিতে গবাক্ষপথে নীলাকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা তাহার সারা মুখখানি কেমন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অস্তোন্মুখ রবির শেষ কিরণ-রেখায় উদ্ভাসিত সান্ধ্য গগনের মত তাহার মুখে কেমন একটা উল্লাস-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল! বাণী ঊর্দ্ধে চাহিয়া সানন্দে বলিল—"এসেছ মাণিক-দা, তুমি এসেছ? আমায় নিতে এসেছ? আচ্ছা দাঁড়াও, যাচ্ছি—একবার মাকে বলে আসি।—"বলিতে বলিতে কোনও রকমে কাঁপিতে কাঁপিতে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; কিন্তু বসিয়াই আবার ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। বাণীর মাতা, দীনেশবাবু প্রভৃতি শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন, ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বাণীকে ধরিলেন;—কিন্তু তখন তাহার আত্মা কোন্ মহাশূন্যে উড়িয়া গিয়াছিল--রহিয়াছিল কেবল কীটদষ্ট বোঁটা-ঝরা শুষ্ক ফুলের মত তাহার শোণিতহীন, বিবর্ণ, ক্ষীণ দেহখানি।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

জ্যোৎস্নাময়ী

১

ফুট্‌ফুটে এই চাঁদের আলোয় হায় কি হল আজ!
বুকের মাঝে কেমন করে, বল্‌তে লাগে লাজ!
ঘরের ভেতর যায় না থাকা, লাগ্‌ছে কেমন ফাঁকা ফাঁকা,
বাইরে এসে দেখি তোমায় বেশ ত দেখা যায়
এই ভুবনে, ওই গগনে বিরাট্ আঙ্গিনায়!

২

কাছে থেকে সুদূর থাক, সুদূর থেকে কাছে;
যেথায় থাক, পাব বলেই জীবনে প্রাণ আছে।
তুমি আমার চির-চাওয়া, স্বর্গ আমার তোমায় পাওয়া,
আবেশ আমার ছুট্‌ছে না গো, অটুট পরশ চাই;
খানিক পরশ দেয় না হরষ—দুঃখ বড় তাই!

৩

মনের মাঝে তোমার স্মৃতি সত্যি অফুরান্;
ভুল্‌তে গেলেই আকুল করে, ব্যথায় ভরে প্রাণ।
আবেগ ভরে ডাক্‌লে পরে, হৃদয় কাঁপে পুলকভরে,
রূপ-সাগরে তলিয়ে গিয়ে জুড়াই হৃদয়-মন;
কোথায় তখন যায় গো ভেসে সকল জ্বালাতন!

৪

কেমন করে কর্‌লে এমন কইব কেমন করে?
তোমার কথা ভাব্‌তে গেলেই চোখটি আসে ভরে।
কেঁদে যখন ফির্‌তেছিলাম, তখন তোমায় দেখ্‌তে পেলাম,
অম্‌নি বুকে ঠাঁই দিলে গো, সে সব মনে জাগে;
ঘোর কুয়াসার ঝাপ্‌সা কাটে গভীর অনুরাগে।

৫

অতীত কথা কইব না আর—চাঁদ উঠেছে অই!
জ্যোৎস্না-রাতে দু'জনাতে এস কথা কই!
কাজ-ভুলানো কাজের কথায়, যা পাওয়া যায় ঢের পাওয়া যায়,
রাত কাটাব গল্পে-গানে তোমার সনে আজ;
শুন্‌বে সে সব তরু-লতা বিশ্বজগৎ-মাঝ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

চট্টগ্রামের মুসলমান

সুপ্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম বাণিজ্যের জন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইহার বাণিজ্য-খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে বণিগ্‌গণ এখানে আসিয়া বাণিজ্য করিত। ওদিকে সোণার গাঁও, আর এদিকে চট্টগ্রাম বাঙ্গালার মধ্যে বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। আর্ম্মানী, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইহুদী, ইংরেজ, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার ও আরব প্রভৃতি জাতীয় বণিকেরা এখানে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন বলিয়া মহাকবি আলাওল তাঁহার রচিত 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি কাব্যে বারংবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আজও চট্টগ্রাম ভারতের মধ্যে একটা অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান।

আরব, ইংরেজ ও পর্ত্তুগীজ বণিগ্‌গণ এখানে যত আগমন করিতেন, অপর কোন জাতীয় বণিক তত আগমন করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। আরবগণের পরে ও ইংরেজগণের পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ (ফিরিঙ্গি) বণিগ্‌গণ এখানে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সুধু বাণিজ্যে নহে, দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও তাহাদের অসীম প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস ও অত্যাচার দমন করিবার জন্য বাঙ্গালার নবাবকে সময় সময় বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ছিল দেখিয়া তাহারা চট্টগ্রামকে Porte grande (grand port) আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। ইংরেজগণ আসিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত না করিলে, তাহারাই যে এদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই পর্ত্তুগীজগণ এখন "মেটে ফিরিঙ্গি" নামে অভিহিত হইয়া চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানে নগণ্যভাবে জীবনযাপন করিতেছে।

একসময়ে আরবেরা বাণিজ্যে এবং নৌ-বিদ্যায় অতি উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। 'মৌসুম'-বায়ুর বিষয় সর্ব্বপ্রথম তাঁহারাই অবগত ছিলেন বলিয়া বাণিজ্য-পথ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের নিকটেই উন্মুক্ত হইয়াছিল। এই কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। হস্তিদন্ত, মণি-মুক্তা ও মসলা ইত্যাদির বাণিজ্য করিবার জন্য তাঁহারা বাণিজ্য-পোত লইয়া ভারত-মহাসাগরের তীরস্থিত নানা বন্দরে গমনাগমন করিতেন। ইস্‌লাম-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা বাণিজ্যার্থ ভারতে আগমন করিতেন বলিয়া জানা যায়। সিংহলে হজরত আদমের সমাধি অবস্থিত থাকায়, অনেকে তথায় 'জেয়ারত' করিতেও আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ অনেকেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়া সিংহলে থাকিয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের বংশধরেরাই 'মোপলা' নামে আখ্যাত।

আরবগণ বাণিজ্যব্যপদেশে এই চট্টগ্রামেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই দলে দলে আগমন করিতেন বলিয়া জানা যায়। চট্টগ্রামের নৈসর্গিক অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া অনেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া এ দেশেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের প্রচলিত ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইহাতে আরব্য ভাষার শব্দরাজির * যতটা ভূরিপ্রয়োগ আছে, আর কোন ভাষার শব্দসমূহের ততটা প্রয়োগ নাই। আরবদের সহিত বিশেষ সংস্রব না থাকিলে, এদেশের ভাষায় এত অধিক পরিমাণে আরব্য শব্দ কখনই প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। এসব বিবেচনা করিয়া সহজেই অনুমান করা যায়, চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আরবদিগের বংশধর।

কেবল ভাষার দিক দিয়া নহে, আরও কয়েকটা কারণে চট্টগ্রামের মুসলমানদিগকে আরবদিগের বংশধর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। অনেকেই জানেন, আরবদিগের মধ্যে 'সেখ' উপাধির ব্যবহার খুবই বেশী। চট্টগ্রামে উক্ত উপাধি-ধারী লোকদের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া তাহাদিগকে সহজেই আরব-সেখদিগের বংশজাত বলিয়া বিনিশ্চিত করা যায়। সকলেই জানেন, হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র হজরত ইমাম হোসেনের বংশধরগণই 'সৈয়দ্' নামে আখ্যাত। চট্টগ্রামের বহুস্থানেই সৈয়দ্-বংশ বিদ্যমান। তাঁহারা এদেশে পীর বা দীক্ষাগুরুর সম্মানিত কার্য্য করিয়া থাকেন। আরবগণ এদেশে আসিবার সময় তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। সমগ্র ভারতের কথা বলিতে পারি না, বঙ্গদেশে যদি কোথাও খাঁটি ইস্‌লাম বলিয়া কিছু থাকে, তাহা এই চট্টগ্রামে ভিন্ন আর কোথাও নাই। চট্টগ্রামের সীমা পার হইয়া গেলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া লওয়া একরূপ কঠিন ব্যাপার বলিলেই হয়। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের জন্মস্থান-সঞ্জাত আরব-গণ পৃথিবীর সকল মুসলমান হইতেই বেশী খাঁটি মুসলমান হইবেন, ইহাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই। অধিকাংশ লোক সেই আরবদিগের বংশজাত না হইলে, চট্টগ্রামে এতটা ইস্‌লাম-প্রভাব কখনই থাকিতে পারিত না, একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে চট্টগ্রাম সুধু নামে নহে, কাজেও ইস্‌লামাবাদ বটে।

স্ত্রীলোকদিগের 'আব্‌রু'-রক্ষা ইস্‌লামের একটা কঠোর অনুশাসন। সেই অনুশাসনমূলক অবরোধ-প্রথা অদ্যাবধি চট্টগ্রামে যেরূপ কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, অন্ততঃ বাঙ্গালার আর কোথাও সেরূপভাবে প্রতিপালিত হয় কি না, জানা যায় না। ইহাও আরবদিগের সংস্রবের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চট্টগ্রামকে 'আউলিয়া দরবেশে'র লীলাস্থল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমার এই পর্ব্বত-মেখলা সাগরাম্বা জন্মভূমির গর্ভে একসময়ে বহু আউলিয়া ও দরবেশের আবির্ভাব হইয়াছিল।

* দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে আমরা কয়েকটি মাত্র শব্দের উল্লেখ করিতেছি; যথা :—

প্রচলিত শব্দ	অর্থ	আরবী শব্দ
ইন্দি	নিকট দিয়া	ইন্দি
বাইন্দুয়ার	ঘরের পিছনের দরজা	বাইনদ্বার
মোহামন্ত্যা	দরজার খুঁটি	মামনিয়া
খন্দক	গড়খাই	খন্দক
কদ্দা	মাটীর বাটি বা পেয়ালা	কদা
লব্বয়	আহ্বানের জবাব—যেমন 'আজ্ঞা'	লব্বয়েক

সময়ান্তরে আমরা এ-বিষয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা করিব বলিয়া আজ আর বেশী দৃষ্টান্ত দিলাম না।

তাহা ছাড়া দেশ-দেশান্তর হইতে কত সিদ্ধপুরুষ এদেশের শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতে আসিয়াছিলেন, কে তাহার খোঁজ রাখে? একথা লোকপ্রসিদ্ধ যে, সুপ্রসিদ্ধ বদর আউলিয়া সাহেব আসিয়া পরীগণ হইতে একটা চাটির (প্রদীপের) স্থান চাহিয়া লইয়া চট্টগ্রামে লোকাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন; তাই ইহার এক নাম 'চাটিগাঁও'। ইরাণের অন্তর্গত বোস্তাম হইতে সুলতান বায়োজিদ বোস্তামী আসিয়া এ দেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বার-আউলিয়াগণ অবশেষে এই দেশেই যোগাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ আর কত মহাত্মার নাম করিব? এই সব মহাপুরুষদের প্রভাবেই সম্ভবতঃ একসময়ে এখানে দরবেশী ভাবের বড়ই ছড়াছড়ি ছিল এবং বহু পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞ কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল। আলিরাজা ওরফে কানু ফকিরের 'জ্ঞান-সাগর' ও 'যোগ কালন্দর,' সৈয়দ্ সুলতানের 'জ্ঞান-প্রদীপ,' মোহম্মদ সফির 'নূর কন্দিল,' সেখ ফয়জুল্লার 'গোরক্ষ-বিজয়' প্রভৃতি অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থ ঐরকম ফকিরী কথায় পরিপূর্ণ। একদিকে ইহার স্বাভাবিক মনোহারিত্ব, অন্যদিকে আরবদিগের সংস্রবে ইহার পুণ্যময়ত্ব—এই দুই গুণে আকৃষ্ট হইয়াই প্রাগুক্ত মহাত্মগণ সম্ভবতঃ এখানে সাধনার্থ আগমন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন এ 'মগের মুল্লুকে' তাঁহাদের আগমনের অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

চট্টগ্রাম যে কেবল বাণিজ্যোপযোগী ও বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল, এমন নহে; ইহা জাহাজ-নির্ম্মাণের জন্যও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। এবিষয়ে তখন চট্টগ্রাম ভারতের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানকার নির্ম্মিত জাহাজ দেশ-দেশান্তরে গিয়া বাণিজ্য করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। বাষ্পীয় পোত আসিয়া আমাদের দেশী জাহাজগুলিকে এখন একরূপ সমূলে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অশিক্ষিত দেশীয় কারিগরেরা যেরূপ নিপুণতাসহকারে বড় বড় জাহাজ নির্ম্মাণ করিত এবং এখনও করে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে অতি কম খরচেই জাহাজাদি নির্ম্মিত হইতে পারিত। কথিত আছে, এরূপ সুবিধা পাইয়াই তুরস্কের সুলতান চট্টগ্রাম হইতেই জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন। চট্টগ্রামের খালাসী ও লস্করগণের নৌ-চালন-বিদ্যায় দক্ষতা সর্ব্বলোকবিদিত। এখনও এখানকার অনেক মুসলমান বিলাতী জাহাজে 'সারাঙ্গ,' 'টেণ্ডল,' 'মালুম' ও 'লস্করে'র কাজ করিয়া থাকে। আরবদিগের সংস্রবে এবং তাহাদের নিকট হইতেই চট্টগ্রামবাসিগণ এই জাহাজ-নির্ম্মাণের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

চট্টগ্রামে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশী। কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, হিন্দুগণকে জোর করিয়া মুসলমান করা হইয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। এরূপ অপবাদ একেবারে ভিত্তিহীন। কেবল জোর-জবরদস্তিতে কোন ধর্ম্ম এতটা প্রচারিত হইতে পারে না। মুষ্টিমেয় ইস্লাম-সন্তানগণ কেবল জোর করিয়া পৃথিবীময় তাহাদের ধর্ম্মবিস্তার করিয়াছিল, ইহা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের উক্তি। জোর করিয়া বরং রাজ্যবিস্তার করা যাইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবিস্তার করা যায় না। মুসলমানগণও তাহাই করিয়াছিল। আজ মুসলমানের গায়ের জোর কোথায় যে, তাহারা বিলাতে, জাপানে ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত ইস্লামের স্নিগ্ধজ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে পারিতেছে? আজ ইস্লামের কোন্ তরবারি আফ্রিকায় খৃষ্টান-শক্তি প্রতিহত করিয়া তথাকার লোকদিগকে ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছে? বস্তুতঃ ইস্লামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ একেবারে অসার ও বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত। অনেক বিধর্ম্মী লোক ইস্লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার কথা নহে; কিন্তু তাহারা জোরে মুসলমান হয় নাই, স্বেচ্ছায়—ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আরব-বণিগ্গণ সুধু বাণিজ্য-কার্য্যেই লিপ্ত ছিলেন না, তাঁহারা দেশ-বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াও বেড়াইতেন। বোগদাদের খলিফাগণ দেশ-বিজয়ের জন্য যেমন সেনাদল প্রেরণ করিতেন, ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য তেমনই ধর্ম্মপ্রচারকও প্রেরণ করিতেন। চট্টগ্রামেও যে হিন্দু হইতে মুসলমান একেবারে হয় নাই, আমরা এমন কথা বলিতেছি না। তবে সেরূপ লোকের সংখ্যা এখানে খুব কম। এখানকার বহু-সংখ্যক সম্ভ্রান্ত বংশ গৌড় হইতে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন এবং অধিকাংশ লোকই আপনাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বলিতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, এই সকল লোকের মধ্যে অধিকাংশই আরব-বণিক্দিগের ও তাঁহাদের সংস্রবে সমাগত আরবীয়দের বংশজাত। অনেক বংশ যে গৌড় হইতে এখানে আগমন করিয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করিবার কথা নহে। বলিয়া রাখা উচিত যে, এদেশে সেখ ও সৈয়দ্ ব্যতীত পাঠান ও মোগল-বংশীয় মুসলমানও অল্প-বিস্তর আছেন। পাঠান-টুলী ও মোগল-টুলী প্রভৃতি গ্রামের নাম আজও তাঁহাদের অস্তিত্ব সূচনা করিতেছে।

আবদুল করিম

ভিক্ষা

(গান)

হাত পেতেছি তোমার কাছে, দুটি দানা দিতেই হবে;
আবেদনের বেদনটুকু, খুঁটিয়ে দেখে নিতেই হবে।
এক মুঠা প্রেম যদি মেলে,
তোমার পায়ে দিব ঢেলে,
জীবন-ভরা দুঃখ-সুখের যত আছে পুঁজি-পাটা;
ছাড়্ব নাক ওগো প্রভু, বিনিময়ের এমনি দাঁ-টা।
ঝুলির ধূলা নিতেই হবে, খাঁটি সোণা দিতেই হবে।
ওগো দাতার মত দাতা,
তোমার পায়ে বিকিয়ে মাথা,
তোমার দাস্যে ছুট্‌ব আমি, তোমার অন্ন নিয়ে হাতে;
বিলিয়ে দিব ক্ষুধায়-কাতর, জগৎ-বাসীর পাতে পাতে।
আমায় তুলে নিতেই হবে, তোমায় দানে দিতেই হবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

যুদ্ধে

বর্ত্তমান য়ুরোপের মহাসমরে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স কিরূপ অসাধারণ উদারতা, সাহস এবং বীরত্বের সহিত যোগ দিয়াছে, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রসঙ্গ-পত্র হইতে বেশ বুঝা যাইবে। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা ইংরাজি সংবাদ-পত্র হইতে সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি।

(১)

[দৃশ্য—ফ্রান্সের একটি রেল-ষ্টেশন।]

একদল সৈন্য ঠাসা-ঠাসি করিয়া একখানি গাড়ীর মধ্যে বসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আনন্দ-ধ্বনি উঠিতেছে—বাকি সময়ে তাহারা পরস্পর বাক্যালাপ করিতেছে। জনৈক অজাত-শ্মশ্রু যুবক—"বন্দুকের গুলিকে শর্ম্মা মোটেই ডরায় না। আরে—তুমিও যেমন, কে জীবনে সাতবার মরেছে—সব মিঞাকেই একদিন খাস-মোলাকাতিতে যেতে হবে ত? ফ্রান্সকে উদ্ধার করতে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে আর বেশী কি হতে পারে?"

বেঞ্চের একধারে একমুখ-দাঁড়ি-গোফ—পিয়ার একটু নীরবে বসিয়াছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া—

"এই দেখ পিয়ার—তার স্ত্রী আর তিন-চারিটি কাচ্চা-বাচ্চা রেখে চল্‌ল। ভাব্‌চ—সে দমে আছে? মোটেই না। সে বেশ জানে যে, তাদের ভার খোদা আর দেশের উপর রইল। আরে, খোদ ফ্রান্সের ভার যে এখন তার কাঁধে—তার কি আর ভাব্‌বার-চিন্তিবার সময় আছে!—কি বল দাদা?

পিয়ার একটু হাসিয়া—"ছোকরা বল্‌ছে ঠিক।"

যুবক—"ফিরে ত আস্‌বই—আর যদি নাই ফিরি ত জান্‌ব যে এই দেহখানা সব চেয়ে জরুরি কাজে লাগিয়ে দেওয়া গেছে।"

প্লাটফর্ম্মের উপর কর্ণেল—"শীগ্‌গির শীগ্‌গির রে ভাই—দেরি কর্‌লে জার্ম্মাণ-ঠেঙ্গানর মজাই যে খোয়াবি।" পিছন হইতে একজন—"ঘাব্‌ড়ো না দাদা—সব তড়াতড় চলে আস্‌চে।"

(২)

জর্ম্মাণ-খাত হইতে একটা শাদা নিশান ধীরে ধীরে উড়িতে লাগিল। ইংরাজ-সৈনিকদিগের নজর পড়িতেই সহস্র বন্দুক সেইদিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া রহিল।

"নিশানের পিছনে ঐ যে একখানা হাত—একটা মাথা যে—ওকি কাঁধ দুটোও—আরে, একটা আস্ত মানুষ যে উঠে এল!—একজন জার্ম্মাণ-সৈন্যাধ্যক্ষ।"

"নিশান দুলিয়ে এ দিকেই ত আস্‌চে! বা এযে নদারত ভাব। সব বন্দুক ঠিক রাখ—কিন্তু সবুর কর।"

"কে তুমি? দাঁড়াও ঐখানে।"

জার্ম্মাণ খাঁটি ইংরাজিতে উত্তর দিল:—"তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে ভাই—কিছু প্রার্থনা আছে।"

"বগলে ও-দুটো কি? মতলব খুলে বল। (স্বগত) বোমা নয় ত?"

"আরে ও কিছু না—ভয় নেই।"

"সাবধান—প্রাণ হারাবে।"

কাপ্তেন একলম্ফে খাতের মধ্যে নামিল।

কা। বাবা বাঁচাও, আজ পনর দিন চা খেতে পাই নি। কিছু চা দাও দাদা—পায়ে পড়্‌চি।

খাতের মধ্যে হাস্যধ্বনি।

কা। এই নাও—দু'বাক্স ভাল সিগার আছে—আমি জানি তোমরা এ পছন্দ কর্‌বেই। আমি এরই ব্যবসা কর্‌তুম—খাস লণ্ডনের বণ্ড ষ্ট্রীটে আমার দোকান।—তৈরী আছে?—তবে এক কাপ খাইয়ে দাও।"

"ওহে, দুটো চায়ের টিন এনে দাও।"

জ-কা। (বগলে পুরিয়া)—ধন্যবাদ—ধন্যবাদ তবে এখন চলি। (কয়েক পা অগ্রসর হইয়া) তোমাদের মধ্যে হয় ত কেউ কেউ শীঘ্রই লণ্ডনে যাচ্চ?

জনৈক সৈনিক। আমি ছুটি পেয়েছি— আজ-কালের মধ্যেই যাব।

জ-কা। বটে—বটে! বেশ হয়েছে—ভাই যদি অবসর করে একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পার। সে বেচারি—আর ছ'টি ছেলে-পুলে—কি ভাবে দিন কাটাচ্চে—বুঝ্‌তেই পার্‌চ—একখানা চিঠি দেবারও উপায় নেই। ব'ল—যে আমাকে অক্ষত দেহেতে দেখেছ।

সৈ। নিশ্চয় বল্‌ব—কি ঠিকানা তাদের?

জ-কা। নং—হলওয়ে রোড।

* * * *

এই গল্প শুনিয়া ইংরাজ-সৈনিকের বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল,—"দেখা করেছ?"

"নিশ্চয়—হল্‌ওয়ে রোডে—আমার মা যে বাড়ীতে আছেন—তার পাশের বাড়ী।"

(৩)

"ডাক এসেছে? এই যে—আমার চিঠি আছে? আঃ—আঃ! পর্দ্দা টেনে দি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই আধ ঘণ্টা—কি আনন্দ! এ চিঠিগুলো কি মিষ্টি—অক্ষরের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি—কাণের মধ্যে সেই পরিচিত সুর বেজে উঠ্‌ছে—সুদূর নীল আকাশ ভেদ করে এ কার গলার আওয়াজ! এ কি শুন্‌তে পাচ্চি আমি (চোখ মুছিল)? স্বপ্ন! তাই ত, এতক্ষণ কামানের আওয়াজ পর্য্যন্ত শুন্‌তে পাই নি!"

"চট্ করে চিঠিটার জবাব লিখে ফেলি—হয় ত দু-চার দিনের মধ্যে আর অবসর হবে না।"

পত্র

"তোমরা যে সকলে আমার কথা ভাব, তা আমি জান্‌তে পারি, আর তাই আমাকে আমার দেশের প্রতি কর্ত্তব্যে প্রবুদ্ধ করে তোলে। আমি ভাবি যে, যদি জার্ম্মাণেরা আমাদের প্রিয় পরিচিত ইংলণ্ডের উপর প্রভাববিস্তার করত, তা হলে আমাদের আত্মীয়-স্বজন প্রিয় পরিজনদের কি দুর্দ্দশাই না হত! ঈশ্বরের করুণায় তা হবেই না। এখন পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করেছি।"

* * * *

(Extract from the letter of a private in D company of the 1st Royal Warwick-shires)

(৪)

নিম্নলিখিত পত্রটি ফরাসী-লেফ্‌টেনাণ্ট সাটেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পকেটে পাওয়া গিয়াছে; ইহা তাঁহার পত্নীর উদ্দেশ্যে লিখিত:—

"এই চিঠিখানি লিখ্‌চি, তার কারণ মানুষের কখন্ কি হয়, ঠিক নেই। এখনই যদি তুমি পাও ত জান্‌বে যে, আমি ফ্রান্সের দাবী সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়েছি। আমার জন্য শোক ক'র না। আমি সুখেই মরব। যা-কিছু আমার চিন্তা—ছেলে-পুলে নিয়ে তোমার অবস্থাটা ভেবে। মেয়েদের মানুষ করার জন্য আমি একটুও ভাবি না। তুমি তা বেশ পার্‌বে। আমার হয়ে তাদের চুমো দিও আর ব'ল' যে, তাদের বাবা—অনেক দূরের পথে বেরিয়েছে—কিন্তু তাদের ভুলে নি।

আর একটি সন্তান হবে—যার সঙ্গে আমার পরিচয় হবে না। যদি ছেলে হয় ত আমার ইচ্ছায় সে যেন ডাক্তার হয়—অবশ্য এই যুদ্ধের পর যদি ফ্রান্সের সৈনিকের প্রয়োজন না হয়। তার বুদ্ধি হলে তাকে ব'ল' যে তার বাবা তার দেশের জন্য জীবন দিয়েছে। বোধ হয় সব কাজের কথাই বলা হ'ল। ফ্রান্স আমাকে নিলে বলে' তার উপর রাগ ক'র' না। আশা করি, আবার একদিন দেখা হবে। তবে এখন বিদায়—দীর্ঘ দিনের জন্য বিদায়! ভয় কি? সাহসে বুক বাঁধ।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বারুণী

(সমালোচনা)

'বারুণী' একখানি গল্পের বই। লেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল এম্, এ, বি, এল্, সরস্বতী মহাশয় এই পুস্তকে একাদশটি গল্প আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন। গল্পগুলি আমাদের কেমন লাগিয়াছে, তাহা বলিবার আগে আমরা একটী কথা বলিয়া রাখিতে চাই। এক শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচক আছেন, যাঁহারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই সুকুমার সাহিত্যের—কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও গল্পের—চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করেন এবং উচ্চ অঙ্গের আনন্দদান ব্যতীত তাহার আর কোন উদ্দেশ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। মোটের উপর কথাটা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সৎ-সাহিত্যমাত্রেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ এবং তাহারই ফলে পাঠকের চিত্ত আনন্দে উদ্ভাসিত থাকে। ইহাও অবশ্য সত্য যে, অনেক ভাল ভাল কাব্য, নাটক, উপন্যাসে লেখকের কল্পনালোকে উজ্জ্বলীকৃত বাস্তব চিত্র ব্যতীত আর কোন অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে, এই আপাত-প্রতীয়মান উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যেরও তারে তারে একটা চিরন্তন সত্যের সুস্পষ্ট সুর নিরন্তর ধ্বনিত হইতে থাকে? এই কথাটা আজ একটু জোর করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে; কারণ, বঙ্গ-সাহিত্যে সম্প্রতি এমন দু-একজন লেখক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা এই চিরন্তন সত্যের দোহাই দিয়া এমনই উদ্দেশ্যহীন জঘন্য নরক-চিত্র অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, পাঠককে তাহা হইতে ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লইতে হয়; সুতরাং সাহিত্যের উক্ত আদর্শ ভ্রান্ত না হইলেও, উহা যে লেখক-বিশেষের হাতে দুর্নীতি-প্রচারের উপায়স্বরূপ হইতে পারে, তাহার উদাহরণের অভাব নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও আনন্দ-দানের অন্তরালে লেখকের যদি কোন একটী হিতকর উদ্দেশ্য নিহিত থাকে এবং সেই উদ্দেশ্যসত্বেও যদি তিনি তাঁহার রচনায় স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে যে আদর্শের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও তাহার পরিসর বৃদ্ধি করিতে পারা যায় এবং তাহাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

শরৎবাবুর গল্পগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক; কিন্তু এই উদ্দেশ্য এত বেশী প্রকট নহে যে, তাহাতে সৌন্দর্য্যের কোন হানি হইয়াছে। গল্প শেষ না হইলে, তাহা পাঠকের কাছে ধরা পড়ে না এবং তাহাতে আনন্দোপভোগের কোন ব্যাঘাত হয় না। বাস্তব জীবন লইয়াই গল্পগুলি লিখিত হইয়াছে এবং এই বাস্তব চিত্রগুলি লেখকের সহানুভূতিতে এমনই স্নিগ্ধ ও আন্তরিকতায় এমনই উজ্জ্বল যে, পাঠকের মন তাহাতে স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে; সুতরাং যদি গল্পগুলির অন্তরালে একটা না-একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তবে তাহা ফুলের পরিণতি ফলের ন্যায় স্বাভাবিকতায় সার্থক হইয়াছে।

দু'-একটা উদাহরণ দিই, অভিমান স্ত্রীজাতির একটী সাধারণ দোষ, কিন্তু বঙ্গ-রমণীর এ দোষটা বোধ হয় কিছু বেশীমাত্রায় থাকে। যখন ইহা প্রবলাকার ধারণ করিয়া ঘোর দাম্পত্য-কলহের কারণ হয় এবং যখন সেই অভিমানিনী নারী ক্রোধবশে তাহার কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়—এমন কি, পতিপ্রেম ও সন্তান-বাৎসল্যও যখন সেই অভিমানের আগুনে ভস্মীভূত হইবার উপক্রম হয়, তখন যে সেই অশান্তিপূর্ণ সংসারে একটী ঘোর অমঙ্গলের ছায়া পতিত হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। শরৎবাবু 'বারুণী' গল্পে তাহারই এক অতি উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক চিত্র দেখাইয়া বঙ্গ-রমণীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

'আমার চাকরি' গল্পে দুর্ভিক্ষের হৃদয়বিদারক দৃশ্য।—এক-দিকে নিরন্ন হতভাগ্যদের করুণ হাহাকার, অপর দিকে 'রিলিফ্ ওয়ার্ক্‌সে'র বাবুদের নির্ম্মম ব্যবহার! একদিকে ক্ষুধার তাড়নায় মাতা পুত্রের অন্ন কাড়িয়া খাইতেছে, অপর দিকে লোভের তাড়নায় কর্ম্মচারীবাবু দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের জন্য সংগৃহীত চাউল বিক্রয় করিয়া আত্মোদর পূর্ণ করিতেছে! দুর্ভিক্ষের সময় 'রিলিফ ওয়ার্কস্' প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের 'প্রচেষ্টা'সমূহ প্রায়ই কিরূপ ব্যর্থ হয়, তাহা অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে এবং ইহাই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। বাস্তব চিত্র হিসাবে এই গল্পটি অতি সুন্দর—শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকের আর্টও ইহাতে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান।

অন্যান্য সমস্ত গল্পগুলিই এইরূপ সুন্দর ও উপভোগ্য। 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী'-নামক গল্পটি বঙ্কিমবাবুর একটা অসমাপ্ত ভূতের গল্পের উপসংহার। গল্পটি আগাগোড়া হাস্যরসাত্মক। লেখকের হাস্যরসের অবতারণা-চেষ্টা সফল হইয়াছে; কিন্তু এই একটিমাত্র গল্প ব্যতীত অপর সমস্তগুলির মধ্য দিয়া করুণরসের এক নির্ম্মল ধারা অব্যাহতভাবে বহিয়া চলিয়াছে। জগতের দুঃখ-কষ্টই যেন লেখককে বেশী করিয়া বিচলিত ও ব্যথিত করিয়াছে! তাই তিনি আন্তরিকতায় আপ্লুত ও কারুণ্যে স্নিগ্ধ করিয়া দুঃখের চিত্রই আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসে এবং সহানুভূতির করুণ বেদনা হৃদয়ে বাজিতে থাকে।

গল্পগুলির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে উৎকট প্রেমের ঘৃণ্য আবিলতা নাই। পাঠে মধুর ও পবিত্র ভাব ব্যতীত অন্য কোনরূপ ভাব মনে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এই গল্পগুলি কন্যা পিতাকে অকুণ্ঠিতভাবে পড়িয়া শুনাইতে পারে; ভ্রাতা-ভগিনী একত্রে বসিয়া পাঠ করিতে পারে—এ-কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়।

ভাষাটিও বেশ ছোট গল্পের উপযোগী হইয়াছে—স্বচ্ছ এবং তরল স্রোতের ন্যায় আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে অপ্রতিহতভাবে বহিয়া চলিয়াছে। আমরা গল্পগুলি পাঠ করিয়া অতীব আনন্দলাভ করিয়াছি। কোন কোন গল্প বঙ্গ-সাহিত্যে চির-স্থায়ী আসন পাইবার যোগ্য বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। আশাকরি, লেখক আরও এইরূপ গল্প লিখিয়া আমাদিগের আনন্দবিধান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

আলোচনা

প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ

The So.hist এর অক্টোবর-সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত পি, এল নরসিংহম প্রাচীন হিন্দুগণের নৌ-চালন-পটুতা ও তাঁহাদিগের ঔপনিবেশিক রাজত্বের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। যবদ্বীপ (জাভা), সুমিত্রদ্বীপ (সুমাত্রা), ভরণীদ্বীপ (বোর্ণিও), ও শলভ্যদ্বীপ (শিলিবিশ) প্রাচীন ভারতের প্রবাসী হিন্দুগণের আবাসভূমি ছিল। সুমিত্র নামক এক ব্যক্তির অধিনায়কত্বে সর্ব্বপ্রথমে একদল ভারতবাসী সুমাত্রাদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ-স্থাপন করেন। সুমাত্রার পশ্চিমাংশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহাদের নির্ম্মিত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। খ্রীষ্টাব্দের কাল-গণনা আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে ভারতবাসীরা যখন সুমাত্রায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন উক্ত দ্বীপের অধিবাসিগণকে তাঁহারা "দাস" ও "রাক্ষস" বলিয়া ডাকিতেন।

৭৮ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপে হিন্দুদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের মতে খৃঃ পূঃ ৭৫ অব্দে সুমাত্রাদ্বীপ হিন্দুগণের সংস্পর্শে আসে। চতুর্থ শতাব্দীতে গুর্জ্জর ও সিন্ধুদেশ হইতে বৌদ্ধগণ প্রথমে সিংহল এবং তাহার পরে সুমাত্রায় গমন করিতেন। সুমাত্রা তখন অসংখ্য হিন্দুর আবাসভূমি; কিন্তু এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে কোনপ্রকার সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই; পরন্তু, হিন্দু ও বৌদ্ধেরা পরস্পরের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিয়া একত্র মিলিয়া মিশিয়া মন্দিরাদি শিল্পকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; যেমন,—শিব-বুদ্ধ, ধ্যানী-রুদ্র প্রভৃতির দেবালয়। এখানে শিব-মন্দিরের আধিক্য দেখিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, বহুকাল ধরিয়া এখানে শৈবধর্ম্মেরই প্রভুত্ব অটুট ছিল। তবে শৈবগণের প্রাধান্যকালে বৌদ্ধধর্ম্মও এখান হইতে নির্ব্বাসিত হয় নাই। সুমাত্রার পশ্চিমাংশে হিন্দুগণের প্রাধান্য পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু তাহার পর সশস্ত্র ইস্‌লামধর্ম্ম আসিয়া হিন্দুগণের মস্তক নত করিয়া দেয়।

ভারত-ইতিহাসে জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্ম

Jou-no l of the Royal Asiatic society র গত জানুয়ারি ও জুন-সংখ্যায় ডাঃ স্পুনার সাহেব মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত ধর্ম্মে জোরোয়াস্ত্রীয় ও জাতিতে ইরাণ; মেগাস্থিনীস, চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার যে সকল কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে ইহা নিশ্চিতরূপে সপ্রমাণ করা যায়। পারসীয় M-ru ও M.u এর সহিত "মৌর্য্য" কথাটির সম্পর্ক আছে—শ্রীযুক্ত জয়্সওয়াল এইরূপ বলেন। মুদ্রাবিজ্ঞানেও প্রমাণিত হয় যে, মৌর্য্যগণের সহিত জোরোয়াস্ত্রীয় ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিল; হিন্দুদের পুস্তকাদিতে মৌর্য্যগণের কোন উল্লেখ নাই,—ইহা হইতেও বুঝা যায়, মৌর্য্যেরা বিদেশী। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে চন্দ্রগুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে আলেকজান্দারের সহিত উদিত হন। মুদ্রারাক্ষসে উল্লিখিত আছে, তিনি প্রধানতঃ পারসীয় সৈন্যগণের সহায়তায় মগধ জয় করেন। তিনি পারস্য আদর্শে প্রাসাদ ও মূর্ত্তি প্রভৃতি গঠন করেন এবং রাজসভায় পারস্য রীতি-পদ্ধতি স্থাপন করেন। বিদেশী সেলিউকসের কন্যার সহিতই তিনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। নন্দ-বংশের সহিত চন্দ্রগুপ্তের সংস্রব ছিল এবং ব্রাহ্মণ চাণক্য তাঁহার রাজ্যের প্রধান পুরুষ ছিলেন বলিয়া এখানে আপত্তি উঠিতে পারে; কিন্তু নন্দগণও সম্ভবতঃ বিদেশী—কারণ মৌর্য্যগণের ন্যায় তাহাদের কথাও বেশী কিছু জানা যায় নাই। চাণক্যের সহিতও পারস্য দেশের যাদুবিদ্যায় পারদর্শী মেজিয়ান (Magian) পুরোহিতের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। মগধও পারসীয় নাম—যেহেতু, এই শব্দটির সংস্কৃত কোনও ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। পারস্যের মগগণ ও যোদ্ধৃজাতিরাই মগধের সকল গৌরবের কারণ। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় ও ভবিষ্য-পুরাণেও লিখিত আছে যে, মগধ-দেশ বিদেশীগণের দ্বারা আবিষ্কৃত; পরন্তু, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের ভাষা হইতে মগধ দেশের প্রচলিত ভাষাও যে ভিন্ন ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। ডাঃ স্পুনার আরও বলিতে চান যে, ভারতের শক্তি উপাসনা ও বৌদ্ধ ধর্ম্মমতের উৎপত্তিও পারস্য-দেশ হইতে। জোরোয়াস্ত্রীয়ানদের নিকট হইতেই গৌতমের উপদেশমূলক গল্পগাথাগুলি ধার করিয়া লওয়া হইয়াছে বুদ্ধ-সংক্রান্ত সমস্ত গল্পের ঘটনাগুলিই যে পারসীয় কাহিনী হইতে লওয়া, তাহারও প্রমাণ আছে। ডাঃ, স্পুনার এইরূপ নানা আলোচনা ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া বলিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধদেব ভারতের অধিবাসী নন—তিনিও পারসীয়!

হিন্দুসমাজের মহিলা

East and wes এর সেপ্টেম্বর-সংখ্যায় শ্রীযুক্ত কান্নুমল হিন্দু-মহিলাগণের একাল ও সেকাল লইয়া একটি সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। "সমাজে হিন্দু-মহিলাদের আসন অতি নিম্নস্থানে" বলিয়া যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্তঃপুরে যাঁহারা প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন যে, আধুনিক কালের মত প্রাচীন ভারতে হিন্দু-মহিলাদের চারিদিকে সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর ছিল না। এখনকার কমল-বিলাসিনী মহিলাদের মত প্রাচীন হিন্দু-মহিলারা উচ্চতর শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা চরিত্রবতী হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বদিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য যত্নবতী ছিলেন এবং তাঁহাদের পূত চরিত্রও গভীর প্রেম ও পতি-ভক্তিতে সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। আমাদের জ্ঞান ও বিদ্যার দেবতাও পুরুষ নন,—তিনি দেবী সরস্বতী। হিন্দু-সমাজে মহৎ, উচ্চ ও পবিত্র যাহা-কিছু আছে, সে সকলের মূলও রমণী হইতে। পুরুষ ও রমণীর অধিকার যে সমান ছিল, মনু-সংহিতাতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনু মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সকল কার্য্যের উন্নতি ও স্বর্গলাভ রমণীর প্রীতির উপরই নির্ভর করে। হিন্দুগণ রমণীর চরিত্রকে এতটা স্বর্গীয় বলিয়া জানিতেন যে, রমণীকে তাঁহারা মোহকারিণী ও পাপের পথে উত্তেজনাদায়িনীরূপে চিত্রিত করেন নাই; পরন্তু কঠোর বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-ব্রতেও সর্ব্বদা তাঁহার সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। রমণীর প্রতি যাহারা অপমানকর ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা বা একসহস্র বেত্রাঘাতের দণ্ড দেওয়া হইত। মাতা বা পত্নীকে যে ত্যাগ করিত, আইনের কবল হইতে কিছুতেই সে মুক্তি পাইত না। আবার রমণীর উচ্চ আদর্শ যে সকল কুচরিত্র স্ত্রীলোক ক্ষুণ্ণ করিত, সমাজ-রক্ষার জন্য তাহাদিগকেও দণ্ড দেওয়া হইত। উপসংহারে লেখক বলিয়াছেন যে, মনু হিন্দু-মহিলার যে আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন, আজিও তাহা অমলিন আছে; এই চিত্র সম্মুখে রাখিয়া আধুনিক মহিলাগণের চরিত্র যাহাতে আবার সেই পুরাতন গৌরব-শ্রীতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারা যায়, হিন্দু-সমাজের হিতৈষিগণের কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য।

সাহিত্য-সংবাদ

বাঙ্গালা-দেশে শিক্ষার প্রসার

পূর্ব্বে যাহাকে সদরবঙ্গ বলা হইত, আমরা তাহাকেই বঙ্গদেশ নামে অভিহিত করিতেছি; সুতরাং পাঠকগণ বর্ত্তমান ভৌগোলিক হিসাব ত্যাগ করিয়া এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বাধিত হইব। পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালার সদর বলিলে বঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যাকেই বুঝিতাম; অতএব বাঙ্গালা-দেশ এই চারি প্রদেশের সমষ্টি বুঝিতে হইবে।

বাঙ্গালার অধিবাসিগণ—ছোটনাগপুর-বিভাগ, ভাগলপুর বিভাগ, উড়িষ্যা করদমহলসমূহ, বীরভূম, বাঁকুড়া-জেলা (বর্দ্ধমান-বিভাগ) নসিরাবাদ বা ময়মনসিং জেলার উত্তরাংশে (ঢাকাবিভাগ) তন্মধ্যে মুণ্ডাজাতির ময়ূরভঞ্জ, রাঁচি, মেদিনীপুর,মানভূম (হাজারিবাগ-জেলা, সাঁওতাল-পরগণা, বীরভূম, রাঁচি-জেলার মুণ্ডা-কোলজাতি, সিংহভূমের হস্ বা লাব্কা-কোলজাতির বাস। বাঙ্গালার অপর অপর স্থানে খেরিয়া, ভুঁইয়া, তামারী (ছোটনাগপুর-বিভাগে), খন্দ, পান, গন্দ, সাভারা (উড়িষ্যা-বিভাগে) বাস করে। পূর্ব্বোক্ত জাতিগণের জন্য সাঁওতালপরগণার স্কুলসমূহ এবং চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আদিম জাতি প্রভৃতির শিক্ষালয়। উক্ত জাতিগুলির শিক্ষাকল্পে ২৩৭টি বিদ্যালয় আছে। ঐ বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-সংখ্যা ৬৭৬৬ জন। তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ জেলা-বোর্ড সাহায্য করেন।

গভর্ণমেণ্ট নিম্নশ্রেণীর শিশু ও মূক, বধির এবং খঞ্জ প্রভৃতির শিক্ষাকল্পে যথেষ্ট যত্নস্বীকার করিতেছেন এবং কতিপয় শিক্ষালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতায় এই শ্রেণীর একটি বিদ্যালয় আছে। আলিপুরে একটি চরিত্র-সংশোধনী বিদ্যালয় আছে। তাহার দৈনিক কার্য্যাবলীর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

শীতঋতু

প্রাতঃকাল ৫-৩০ হইতে ৬টা পর্য্যন্ত—শৌচক্রিয়াদি এবং স্বল্প প্রাতরাশ।

৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত—'ড্রিল' ব্যায়াম (একদিন অন্তর; 'ড্রিল' যেদিন ব্যায়াম সেদিন নহে)।

৭টা হইতে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের কার্য্য। স্কুল)

১০—১১টা—ভোজন এবং বিশ্রাম।

১১—২টা—কারখানার কার্য্য; ২টা—৩টা—বিশ্রাম; ৩—৪-৩০টা—আবার কারখানার কার্য্য; ৪-৩০—৫-৩০—সান্ধ্য ভোজন এবং ৫-৩০ হইতে সন্ধ্যা না হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম, বক্তৃতা, আহার এবং সদুপদেশ গ্রহণ।

গ্রীষ্মঋতু

কারখানার কার্য্য ৪॥ ঘণ্টা; বিদ্যালয়ের কার্য্য ৩ ঘণ্টা; 'ড্রিল' ও 'জিম্‌নাষ্টিক্' ১ঘণ্টা; ভোজন এবং বিশ্রাম ৪ঘণ্টা। পূর্ব্বে এই বিদ্যালয়ে শাস্তি-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; এখন প্রায়ই তাহার আবশ্যকতা হয় না।

বিগত ১৯০৬-৭ হইতে ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর সরকারী 'রিপোর্টে' প্রকাশ, বঙ্গদেশে

	লোকসংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	ব্যয়
১৯০৬—৭	৫৪৬৬২৫২৯	১২৬৯০৩৮	১১৬৬৩৲ টাকা
১৯০৭—৮	৫ ৭৭১৯১৪	১৩৩৮১৯০	১২৫৫৬৲ "
১৯০৮—৯	৫৩৭৭২৫৮৬	১২২১৩৮৯	১৪৪৫৮৲ "
১৯০৯—১০	৫২৬৬৯৮৬৯	১৪৭৫৩৭৬	১৫০৮৯৲ "
১৯১০—১১	৫৫০২৩৩৪০	১৫১৪২৩৯	১৬০৭১৲ "

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে

	লোকসংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	ব্যয়	
১৯০৬—৭	৩০৭৮৮১৩৪	৮১৫৫৯৯	৫১২৪৲	"
১৯০৭—৮	"	৮৮০৬৩১	৫৮২৯৲	"
১৯০৮—৯	"	৯৫৩১২৩	৬৬৩৪৲	"
১৯০৯—১০	"	৯৫৪৮৮৩	৬৫৯৪৲	"
১৯১০—১১	৩৪৫৯৪৩৬২	৯৮৪২১৩	৭৩০৫৲	"

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি সহস্র ছাত্রমধ্যে বঙ্গদেশেই অধিক পরিমাণে ছাত্র বিদ্যালয়ে গমন করে। তুলনার সুবিধার জন্য নিম্নে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ—

বঙ্গদেশ	২৩২	জন (প্রতি হাজার বালকেরর মধ্যে)
মুম্বাই	২২৫	"
মান্দ্রাজ	১৯৮	"
আসাম	১৯৭	"
ব্রহ্মদেশ	১৬৭	"
মধ্য-প্রদেশ (সি, পি)	১৩৭	"
যুক্ত-প্রদেশ	৮৭	"
পাঞ্জাব	৮৬	"

	১৯০৯-১০	১৯১০-১১
বঙ্গদেশে	৩২০	৩১১
পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে	৩৩৪	৩০৩

বঙ্গদেশে বালকগণের জন্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা

	১৯০৯-১০	১৯১০-১১	ছাত্রসংখ্যা -১০	ছাত্রসংখ্যা -১১
আর্ট কলেজ	২৯	২৯	৭১০৭	৮২৫৫
উচ্চবিদ্যালয় (স্কুল)	৩৯৬	৩৯৯	৮৭১৭২	৯৪৮৪৪
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫২০১	৩৫৪৩৭	৯৯২১০৩	৯৯৭৯৫৩

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে

আর্ট কলেজ	১১	১০	২০৩৪	২৪১৮
উচ্চ বিদ্যালয় (স্কুল)	২১৫	২১৭	৫৬৯৯২	৬৪৩৪৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩২৫	১৭২৯২	৬২১০৮৭	৬২৩৯২৫

বঙ্গদেশে বালিকাগণের জন্য আর্ট কলেজ তিনটি মাত্র আছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে একটীও নাই। হাই-স্কুল ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে ১৭টি ছিল, পর বৎসর উহার সংখ্যা ২১টি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে মাত্র তিনটি রহিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩০৬৫টি (১৯১০) এবং ৩০৫২ (১৯১১) পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় এবং আসামে বালিকাগণের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪২২০ (১৯১০); কিন্তু ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৪৫২৭টি হইয়াছে।

আর্ট কলেজে বঙ্গদেশের ছাত্রী-সংখ্যা কেবলমাত্র ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৪৭ জন ছিল; পরে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ৬৩ জন হইয়াছে! উচ্চ স্কুলের ছাত্রী-সংখ্যা ২০৪৬ (১৯১০) এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২৩০, জন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৩৮৩ এবং পর বৎসর ৪৭৮ জন হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী, সংখ্যা ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ১৪৫২৩৩ এবং পর বৎসর ১৪৬২২৩ জন হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ঐ ঐ বৎসর ১১৯৯৭৯ যথাক্রমে এবং ১২৮৭২৭ ছিল। বঙ্গদেশে শতকরা ৪২ জন স্কুলে যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে শতকরা ৫২ জন। গড়ে বাঙ্গালা-দেশে শিক্ষার প্রসার কি বালক, কি বালিকা, সকলের মধ্যেই উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে; ইহাও অতিশয় আনন্দ-সংবাদ বলিতে লইবে। জনসমাজে যতই শিক্ষার বিস্তার হয়, ততই মঙ্গলের বিষয়।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

মর্ম্মবাণী—

শোকান্বিতা

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ২রা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা।

ভারতের ইতিহাসের উপকরণ ও ইতিহাস-রচনা

'ইতিহাস' বলিতে গদ্যে-লিখিত কাল-বিশেষের যথার্থ ঘটনা-মূলক ধারাবাহিক বিবরণ বুঝায়। দেশের সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক প্রভৃতি অবস্থার সহিত দেশের রাজগণের বংশ-তালিকা-সংযুক্ত এবং রাজ্য-শাসন-কাল-নিরূপিত ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস। ইতিহাসে অত্যুক্তি কিছুমাত্র থাকিবে না, কেবলমাত্র যথার্থ ঘটনা যথাযথভাবে বিবৃত হইবে। প্রমাণাদি সহকারে আলোচ্য বিষয়ের যথার্থ সময়-নিরূপণ থাকিবে। সত্য ঘটনাই ইতিহাসের আলোচ্য; কিন্তু মাত্র কতকগুলি সত্য ঘটনা সংগৃহীত হইলেই, দেশের প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ধারের উপায় হয় না। কেবলমাত্র কতকগুলি সত্য ঘটনামূলক আখ্যান ইতিহাস-পদবাচ্য নহে! অনেক প্রাচীন দেশেই প্রাচীন কালের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন হইতে প্রাচীন যুগের এমন অনেক ঘটনার বিবরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বা হইতে পারে। আবিষ্কৃত হইতে পারে যে, একজন নরপতি অতি প্রাচীন যুগে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি তৎকালে পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ-সমূহের রাজগণকে পরাজিত করিয়া খুব পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন অথবা যুদ্ধে কোনও বৈদেশিক আক্রমণকারীর হস্তে প্রাণ ও রাজ্য হারাইয়াছিলেন; কিন্তু এইরূপ দুই চারিটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে কোনও দেশেরই প্রাচীন ইতিহাস-উদ্ধারের আশা নাই। যতক্ষণ না ঐ সকল ঘটনার ও আখ্যানের পৌর্ব্বাপর্য্য স্থিরীকৃত হয় এবং পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের ঘটনা-পর্য্যায়ের সহিত ঐ সকল ঘটনা-সময়াদি নিরূপণসহকারে যতক্ষণ সংযোজিত না হয়, ততক্ষণ তাহা ইতিহাস নহে। বংশ-ক্রমানুসারে ঐ সকল রাজগণ যদি পরস্পর সংযুক্ত না হয়, তবে ঐ সকল রাজার আখ্যান ইতিহাসের উপকরণ হইতে পারে না। ঘটনা ধারাবাহিক না হইলে, তাহা ইতিহাস বলিয়া অভিহিত হইতেই পারে না। চীন, মিশর, আসিরীয়া, ব্যাবিলন, এমন কি, ভারতেও পূর্ব্বোক্তরূপ আখ্যান প্রত্ন-তাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের চেষ্টায় আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে এবং কোনও কোনও ঘটনার যথার্থ সময়-নিরূপণও হইয়াছে; কিন্তু এই সকল নবাবিষ্কৃত ঘটনাগুলি সময়-নিরূপক তালিকা (chronology) হিসাবে মূল্যবান্ হইলেও ইতিহাস পদবাচ্য হইতে পারে না।

ইতিহাসে এইরূপ ঘটনার বিবরণের সহিত দেশের সমসাময়িক আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাজ-নৈতিক অনুষ্ঠানের যথাযথ বিবরণ থাকিবে। কোন্ সময়ে, কোন্ কারণে, কোন্ রাজার রাজত্বকালে, রাজার কোন্ অনুষ্ঠানে দেশের কোন্ সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার অনুষ্ঠান বা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বর্ণনা থাকিবে। প্রাচীনকালের কোন্ কোন্ ঘটনা পরবর্ত্তী সময়ে জনসাধারণের রীতি-নীতি-অনুষ্ঠানের উপর কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছিল, প্রভৃতি বিষয়ই ইতিহাসের প্রতিপাদ্য।

আবার ইতিহাসের যেমন লক্ষ্য থাকিবে দেশের বীর, ধর্ম্ম-প্রাণ, মহাপুরুষ ও সমাজের প্রাণস্বরূপ সমাজ-সংস্কারকগণের কার্য্য ও চরিত্র বিশ্লেষণ করা, তেমনই ইতিহাস দেশের ও জনসাধারণের দোষগুলি উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করিবে। কোন্ উপায় বা কোন্ নীতি অবলম্বনে সেই দোষের নিরাকরণ হইয়াছিল বা নিরাকরণ সম্ভব, ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার বিচার করিবে। ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ বিপদে পড়িলে, যাহাতে ইতি-হাস পাঠে, ইতিহাসের সহায়তায় আর সেরূপ বিপদে পতিত না হয় বা হইলেও ইতিহাসের সাহায্যে ও শিক্ষায় সেই বিপদ নিরাকরণে সমর্থ হয়, এইরূপভাবেই ইতিহাস রচিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতে এই জাতীয় ইতিহাসের অভাব ছিল বলিয়াই ভারত শত্রুর উৎপীড়নে বার বার বিপন্ন হইয়াছিল।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে ভারতের নানা প্রদেশে প্রচলিত নানাপ্রকার রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠানের মূলের অনুসন্ধান করিতে হইবে। ঐ সকল অনুষ্ঠানের উৎপত্তি-স্থান কোথায়? কোন্ সময়ে, কোন্ ঘটনায়, কোন্ নীতির প্রবর্ত্তন বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল; কোন্ রাজার কোন্ রাজ্য-জয়ে কোন্ দেনবাসীদিগের সংস্পর্শে বা কোন্ ধর্ম্মের উদ্ভবে কোন্ অনুষ্ঠানের প্রচলন হইয়াছিল এবং কোন্ বৈদেশিক জাতির আক্রমণে বা বংশাধিকারে কোন্ রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়া-ছিল, আবার এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে কিরূপে বর্ত্তমান

অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এইরূপে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির কারণ অনুসন্ধান করিলে, ভারতের ইতিহাসের অনেক দুরূহ তত্ত্ব মীমাংসিত হইতে পারে।

আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যেমন একদিকে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ ও জৈন কীর্ত্তি, স্থাপত্য, ও ভাস্কর্য্য হইতে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের একজাতীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, তেমনই অপর একদল ঐতিহাসিককে এইরূপ জনসাধারণের আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতি-নীতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের নানা-প্রকার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বোক্তরূপ বিশ্লেষণে লাগিয়া যাইতে হইবে। এই উভয় শ্রেণীর উপকরণ সংগৃহীত হইলে ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারিবে; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইতিহাস কেবলমাত্র ঘটনার সমষ্টি নহে। জনসাধারণের অনুষ্ঠান-সকলের ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির বিবরণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণের আবিষ্কৃত ঘটনার সহিত পৌর্ব্বাপর্য্যানুক্রমে সন্নিবেশিত হইলে, ঐ সকল নবাবিষ্কৃত ঘটনাসমূহের বিবরণ ইতিহাস নামের যোগ্য হইবে। ঐতিহাসিক বাক্‌লে (Bucklay) বলেন, "ইতিহাস কেবল-মাত্র ঘটনাবলীর সমাবেশ নহে। কি কারণে, কোন্ ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য।" গিবন (Gibbon) বলিয়াছেন, "মনুষ্য-সমাজের দুর্ভাগ্য, পদস্খলন এবং দুষ্ক্রিয়ার ধারাবাহিক বিবরণই ইতিহাস।"

প্রাচীন যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, প্রাচীন যুগে প্রচলিত মুদ্রা এবং প্রাচীন কালের সাহিত্য ও ধর্ম্মমূলক গ্রন্থাদি যেমন ভারতের প্রাচীন কালের ইতিহাস-উদ্ধারে অনেক সহায়তা করিয়াছে, তেমনই যদি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নানাপ্রকার সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ ও ক্রমপরিণতির কারণ অনুসন্ধান করিলে, অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু বলেন যে, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতে রক্ষণশীলতা-নিবন্ধন সামাজিক রীতি-নীতির বিশেষ পরিবর্ত্তনই লক্ষিত হইত না। পিতামহের সময়ে যে সকল নিয়ম, রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, পৌত্র বা পৌত্রের সময়েও সেইসকল রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না। এই রীতিনীতির পরিবর্ত্তনই জাতীয় ইতিহাসের প্রধান উপকরণ। ভারতে এই রীতি-নীতি-পরিবর্ত্তনের অভাব-নিবন্ধন ভারতের ইতিহাস লিখিবার আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের এই ধারণা আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সময়ের আবর্ত্তনে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ভারত রক্ষণশীল বটে, কিন্তু কালের গতি রোধ করিতে ভারতের ক্ষমতা হয় নাই। ভারতবাসী স্বাভাবিক রক্ষণশীলতায় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি অবিকৃত রাখিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকিলেও, কালের কুটিল গতিতে ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভারতে বহুবার সমাজ ও ধর্ম্মনীতির বিপ্লব ঘটিয়া-ছিল। আবার সময় হইতে সময়ান্তরে বৈদেশিকদিগের ভারত-শাসনে বৈদেশিক প্রভাব ভারতবাসীর বৈদেশিক রীতি-নীতি প্রতিরোধ করিবার শত চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছিল। এই বৈদেশিক প্রভাব ভারতের রক্ষণশীলতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভারতে প্রচলিত আচার, রীতি-নীতি ও প্রথা মধ্যে মধ্যে অল্প-বিস্তর বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল।

আর্য্য-জাতির ভারতাগমনের পূর্ব্বে ভারতে অনার্য্যজাতি বাস করিত। তাহাদের একরূপ রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ছিল। বীভৎসমূর্ত্তি দেব-দেবী ও প্রস্তর-খণ্ডের তাহারা পূজা করিত। নানাবিধ পশু বলি দিয়া তাহারা তাহাদের দেব-দেবীর সন্তুষ্টি-সাধন করিত। যুদ্ধাদিতে তাহারা সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। মৃগয়ালব্ধ পশু-পক্ষীর মাংসই তাহাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল। পরে উত্তর-দেশ হইতে আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিলে, আর্য্যদিগের সভ্যতাব্যঞ্জক রীতি-নীতি ভারতে প্রচলিত হইল। আর্য্যগণ আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতে জনপদের পর জনপদ অধিকার করিতে লাগিলেন। দেশ-অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্যগণ আদিম নিবাসীদিগের বীভৎস আচরণ নিরাকরণ করিয়া বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদি আর্য্যাধিকৃত ভারতে প্রবর্ত্তন করিলেন। জীবিকা-অর্জ্জনের সভ্যতর উপায় কৃষিকার্য্য ও পশু-পালন ভারতে প্রবর্ত্তিত হইল। ক্রমশঃ আর্য্যগণ আদিম নিবাসি-গণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। আদিম নিবাসীদিগের অধিকাংশ জেতা আর্য্যদিগের অধীনে থাকিয়া ক্রমশঃ আর্য্য-ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। আবার কতকাংশ বা তাহাদের প্রাচীন রীতি-নীতিগুলি অবিকৃত অবস্থায় লইয়া পর্ব্বতে ও অরণ্যে গিয়া লুক্কায়িত রহিল। কিছুকাল এইভাবে গত হইলে, আর্য্যগণ বিজিত অনার্য্যদিগের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে প্রাচীন আর্য্য রীতি-নীতিও স্বভাবতঃই কিছু বিকৃত হইল। আর্য্যগণ আদিম নিবাসী-দিগের কোনও কোনও রীতি-নীতি এবং এমন কি, দুই-একটি দেবতাও গ্রহণ করিলেন।

কালসহকারে আর্য্যগণ ভারতে বদ্ধমূল হইলে, নিয়মিত রাজ্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজ্য-শাসনের সৌকর্য্যার্থে ও জন-সাধারণের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ব্যভিচার প্রভৃতি দোষ দৃষ্ট হইলে, সমাজ-শাসনের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র বা অনুশাসন-পুস্তক (মন্বাদি-প্রণীত 'স্মৃতি-সংহিতা' প্রভৃতি) রচিত হইল। সম্প্রদায় ও লোকবিশেষের কার্য্য-কুশলতা বিচার করিয়া জাতি-বিভাগ অনুষ্ঠিত হইল। আর্য্য ও অনার্য্য-জাতির ব্যভিচার ও স্বেচ্ছা-চারিতায় উৎপন্ন সঙ্করজাতির নাম ও কার্য্যাদি নির্দ্দিষ্ট হইল এবং সমাজে তাহাদের স্থান নির্ণীত হইল। এইরূপে প্রাচীন আর্য্য রীতি-নীতির একবার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

'পুরাণ' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতে জাতি-ভেদ-প্রথা বদ্ধমূল হইয়াছিল; ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। 'রামায়ণ'-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতে আর্য্যজাতি তখন খুব বিস্তৃতিলাভ করে নাই। আর্য্যাবর্ত্তের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া আর্য্যজাতি তখনও দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ-স্থাপন করে নাই। প্রাথমিক রীতি-নীতি হইতে এইসময়ে আর্য্য-রীতি-নীতির কতকাংশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। রামায়ণে 'আর্য্য'-জাতি আদর্শ বীরত্ব, সত্যপরায়ণতা, ভ্রাতৃপ্রেম ও আর্য্য-নরপতির আদর্শ প্রজা-বাৎসল্য প্রভৃতি চিত্রিত হইয়াছে। আবার 'মহা-ভারত'-পাঠে বুঝা যায় যে, 'মহাভারতে'র ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অসংখ্য স্বাধীন আর্য্য নরপতি রাজ্যশাসন করিতেছেন। ক্বচিৎ দুই-একটী অনার্য্য রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক অবস্থা অনেকাংশে উন্নত এবং কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং জনসাধারণ যেন প্রাচীন আর্য্যজাতির আদর্শ হইতে হীন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। 'মহাভারতে' অনেক আদর্শ চরিত্র চিত্রিত হইলেও, 'রামায়ণে'-বর্ণিত চরিত্র হইতে যেন অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ

বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' বিশেষ-ভাবে পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, 'রামায়ণে'র যুগ হইতে 'মহাভারতে'র যুগে সামাজিক রীতি-নীতির কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর ভারতের ক্ষত্রিয়-শক্তির অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ভারত-যুদ্ধে ক্ষত্রিয়জাতি একপ্রকার নির্ম্মূল হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজগণের দৌর্ব্বল্য হইতেই 'মহাভারতে'র যুগে সূচিত গৃহ-বিবাদ কালে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভারতবাসীর মজ্জাগত হইয়াছিল। শক্তি-হীনতা ও দৌর্ব্বল্যের সহচর মানসিক হীনতা ভারতবাসীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। আবার 'মহাভারত'-রচনার পর উপর্য্যুপরি কয়েকখানি 'পুরাণ'-রচনা দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতবাসী 'বেদ' অনাদর করিয়া ক্রমশঃ পৌরাণিক আখ্যানে অনুরক্ত হইতে-ছিল। ভারতবাসী, 'বেদ' ও 'উপনিষদু'ক্ত ধর্ম্ম অবজ্ঞা বা অনাদর করিয়া 'পুরাণো'ক্ত নানা দেব-দেবীর পূজায় রত হইয়া-ছিল। প্রাচীন আর্য্য-ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত যাগ-যজ্ঞাদিতে পশু-বধের অনুষ্ঠানের সহিত আদিম অনার্য্যজাতিরও পশু-হিংসা-বৃত্তি মিলিত হইয়াছিল। এই আর্য্য ও অনার্য্যের পশু-বিদ্বেষ হইতে ভারতবাসী ক্রমশঃ সাত্ত্বিক ভাব হারাইল; ক্রমশঃ পশু-বধই দেব-সন্তুষ্টির একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। এইরূপে প্রাচীন যুগের সেই সাত্ত্বিক বৈদিক ধর্ম্মে ও নির্ম্মল আচারে পশু-বিদ্বেষ প্রবেশলাভ করিয়াছিল। যাগ-যজ্ঞ ও পূজাদিতে শত শত পশুবধ হইতে লাগিল।

কিন্তু সাত্ত্বিকভূমি ভারত মানবের এই অতিরিক্ত পশু-বিদ্বেষ সহ্য করিতে পারিল না; তাই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল। জীবের ক্লেশ দেখিয়া ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ সেই অমৃত-ময়ী বাণী 'অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ' ভারতে প্রচার করিলেন। ভারতের নির্ম্মল আকাশে, নির্ম্মল বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, "জীবের ক্লেশ নিবারণে ভগবান্ ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন"। ভারতবাসী কিছুকালের জন্য হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া গেল। ভারতে পশু-বধ নিবারিত হইল। সাত্ত্বিক ভারত আবার সাত্ত্বিক গুণ লাভ করিল। ভারতবাসী অত্যধিক পশু-বধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যেন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া দেশে দেশে গৌতম বুদ্ধের অমর বাণী "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিতে লাগিল। ভারত-বাসীর সেই অমৃতমাখা বাণী শ্রবণ করিয়া জগৎ চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে সমস্ত ভগবান্ গৌতম বুদ্ধের সেই অমর ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

এইরূপে ভারতের রীতি-নীতি আর একবার আমূল পরি-বর্ত্তিত হইল; কিন্তু একদল ভারতবাসী, যাহারা বৌদ্ধমত গ্রহণ করিল না, তাহারা ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতিগুলি লইয়া প্রাচীন কালের অনার্য্যদিগের ন্যায় নিবিড় অরণ্যে ও দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য-প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। আবার সমাজমধ্যে যাহারা রহিল, তাহারা আত্ম-গোপন ও মন্ত্রগুপ্তি করিল।

বৌদ্ধ যুগ হইতেই বৈদেশিকগণ ভারতাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে আলেক্‌জান্দারের অধীনে গ্রীকগণ ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। আলেক্‌জান্দার ভারত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও, একদল গ্রীক ভারতের পঞ্চনদ, সিন্ধু, ও বহ্লীক (Bactria) প্রদেশে উপনিবেশ-স্থাপন করিয়াছিল। এই গ্রীকদিগের ভারতাগমনের পর হইতেই শক ও হূনগণ ভারতা-গমন করিতে আরম্ভ করে। নগরের পর নগর রাজ্যের পর রাজ্য, ধ্বংস করিয়া যথাক্রমে শক ও হূনগণ ভারতে রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিল। ভারতে বসবাস করিয়া তাহারা ক্রমশঃ ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতের জনসঙ্ঘের মধ্যে মিশিয়া গিয়া-ছিল। শক ও হূনদিগের এই বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রহণের ফলে কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হইয়া গেল। দুর্দ্ধর্ষ, দুষ্ক্রিয়াপরায়ণ মদ্যপ হূনগণ ভারতে রাজ্যাধিকার ও ভারতে বসবাস করিলে, ভারতবাসী বৌদ্ধগণও তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া ক্রমশঃ কুক্রিয়া-পরায়ণ হইয়াছিল। ভিক্ষু-সম্প্রদায়ে মদ্যের প্রচলন, স্ত্রীলোক-দিগের সন্ন্যাসিনীরূপে প্রবর্ত্তন ও ভিক্ষু-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোক-দিগের অবাধ-সংস্পর্শ-হেতু বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ভিক্ষুগণ মহা-স্বেচ্ছাচারী ও ব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রীক, শক, হূন-গণের দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়াগুলি যদি বৌদ্ধ ভিক্ষু-সম্প্রদায়ে সংক্রামিত না হইত, তাহা হইলে ভগবান্ বুদ্ধের সেই নির্ম্মল, পবিত্র ধর্ম্ম কখনও কলুষিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদেশিক-সংস্পর্শে ভারতের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির আবার কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিল।

এইরূপে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম এবং কাপালিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিকৃত অনুষ্ঠান ও অত্যাচারে ভারত উৎসন্ন যাইতে অগ্রসর হইলে, ধর্ম্মপ্রাণ, কাতর ভারতবাসী আবার ভগবানের আশীষ বাণী শ্রবণ করিল। সেই রুদ্রাবতার আজন্মকুমার সন্ন্যাসী মহাপ্রাণ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া ভারত হইতে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকগণের উচ্ছেদসাধন করিলেন। "সৃষ্ট পদার্থ—সকলই মায়া—সকলই সেই এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই সত্তা নহে। এই মত প্রচার করিয়া তিনি ভারতে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিলেন। তাহার ফলে ভারতে আজ লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী। লক্ষ লক্ষ মানব, আত্মার অবিনশ্বরত্ব অনুভব করিয়া শারীরিক সমস্ত ক্লেশ, শীতাতপ-সুখ-দুঃখের সমতা করিয়া থাকে। সকল কষ্ট উপেক্ষা করিয়া সাংসারিক সুখ স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়া সানন্দে ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ভারতে এইরূপে 'বেদো'ক্ত সনাতন আর্য্যধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল; কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ভারত এড়াইতে পারিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক অনুষ্ঠান হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বৈরাগ্য ও উদাসীনতা শঙ্করাচার্য্য-প্রচারিত ধর্ম্মে মায়াবাদরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে বুদ্ধদেব, ভগবানের দশাবতারের এক অবতার বলিয়া হিন্দুগণকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। বুদ্ধ-দ্বাদশী-ব্রত হিন্দুর অবশ্য-অনুষ্ঠেয় ব্রত বলিয়া পরিগণিত হইল। ভারত বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম ভুলিল; কিন্তু সেই মহাপ্রাণ গৌতম বুদ্ধকে ভুলিতে পারিল না।

মহাপ্রাণ শঙ্করাচার্য্য 'বেদ' ও 'উপনিষদু'ক্ত ধর্ম্মের চরমোৎকর্ষ সাধন করিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত মায়াবাদের প্রভাবে ভারতের সামাজিক জীবন ঐতিহাসিক হিসাবে দিন দিন হীন হইতে লাগিল। এই মায়াবাদ ভারতের জাতীয় জীবনে অবসাদ আনিয়া দিল। এই মায়াবাদের অবসাদেই ভারতবাসী তাহাদের কীর্ত্তি-কলাপের কোনও নিদর্শন রাখিতে চাহিল না। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে ইতিহাসের বিশেষ ক্ষতি হইল। এই যুগের ইতিহাসের উপাদান—স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কিছুই নাই। ভারতবাসী দিন দিন সাংসারিক ও সামাজিক বৈভবে বিতৃষ্ণ

হইল ; দিন দিন উদাসীন হইতে লাগিল। কয়েকশত বৎসরে মায়াবাদের অবসাদ ভারতবাসীকে জাতীয় জীবনে হীন এবং ক্রমশঃ শক্তিহীন করিয়া ফেলিয়াছিল। এমনই সময়ে ধর্ম্মোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান যুদ্ধার্থে ভারতের দ্বারে উপস্থিত হইল এবং অবলীলাক্রমে হতবীর্য্য ভারতবাসীকে পদানত করিয়াছিল।

মুসলমানকর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, ভারতে এক মহাধর্ম্ম ও সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। শত শত, সহস্র সহস্র ভারতবাসী মুসলমানের উৎপীড়নে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আবার লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ধন-প্রাণ উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিল। তাহারা শত উৎপীড়ন ও অত্যাচারেও শতপ্রলোভনকর ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয় নাই ; তবে মুসলমান-রাজগণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মুসলমান-সমাজের অনেক রীতি-নীতি প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুর আচার-ব্যবহারে প্রবেশ করিয়াছিল।

মোগল-কুলতিলক আক্‌বরের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়ে ভারতে ইলাহী নামক এক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। এই ধর্ম্মপ্রচারে তৎকালে ভারতে হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মের পরস্পর বিদ্বেষভাব অনেকাংশে বিদূরিত হয়। সম্রাট্ শাজাহানের রাজত্বকালেই সম্রাট্-পুত্র দারার সবিনয় চেষ্টায় ও যত্নে এই ধর্ম্মটি বিস্তৃতি লাভ করে। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই সময়ে বিশেষ সদ্ভাব লক্ষিত হয়। এই ইলাহী ধর্ম্মমত-প্রচারেই ক্রমশঃ ভারতে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়েই রীতি-নীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এইরূপে যতই আমরা ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, ততই দেখিতে পাই যে, যুগে যুগে ভারতে ধর্ম্ম ও সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার-রীতি-নীতির অল্পাধিক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিল।

মুসলমান-শাসনের যুগে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ ও বঙ্গদেশে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈদান্তিক ধর্ম্ম ক্রমশঃ নাস্তিকবাদে পরিণত হইতেছিল। ন্যায় ও দর্শনের বহুল আলোচনার ফলে ভারত হইতে ভক্তি-ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছিল। তাই ভক্তির অবতার নদীয়াচাঁদ শচীর দুলাল গৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-ধর্ম্ম-প্রচারে ভারত প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। ন্যায়, দর্শন-মীমাংসার কূট তর্ক ছাড়িয়া পণ্ডিতগণ হরিভক্তির স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে ভারতে, বিশেষতঃ বঙ্গে এক ঘোর সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালে, রীতি নীতি, আচার-ব্যবহারের এইরূপে আরও একবার বিশেষভাবে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

মোগল-সম্রাট্ ধর্ম্মান্ধ ঔরঙ্গজেব হিন্দুজাতির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে, ভারতবাসী প্রমাদ গণিয়াছিল। অত্যাচারে ও করভারে নিপীড়িত হইয়া বহুসংখ্যক ভারতবাসী মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। আবার অধিকাংশ হিন্দু প্রাণপণে অত্যাচার সহ্য করিল, সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কোনরূপে 'জিজিয়া' কর দিল ; কিন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না। এই অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলেই পঞ্চনদ ও মহারাষ্ট্র-প্রদেশে দুইটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। প্রথম—পঞ্চনদে গুরু নানক-প্রচারিত শিখ-ধর্ম্ম ; অন্য—মহারাষ্ট্রে গুরু রামদাসজী ; প্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্ম। এই দুই গুরুর প্রচারিত ধর্ম্মনীতির ফলে দুই দেশে দুই দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতির উদ্ভব হইল। এই দুই সামরিক জাতির কার্য-কলাপ ভারতে তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক, ও ধর্ম্মনৈতিক রীতি-নীতি-অনুষ্ঠানের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।

মুসলমান-আধিপত্যের অবসান ও মহারাষ্ট্র এবং শিখ-বিক্রমের খর্ব্বতা হইলে, ভারতে য়ুরোপীয় খৃষ্টানগণের রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। য়ুরোপীয়দিগের বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-প্রচারকগণ ভারতে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। গোয়ার পর্ত্তুগীজগণ ভারতে রোমান-ক্যাথলিক-ধর্ম্ম-প্রচার-কালে ভারতবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন। অন্যান্য য়ুরোপীয় শক্তিগণ কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ভারতে কোনওরূপ অত্যাচার করেন নাই। প্রাথমিক ফরাসী ও ইংরাজ বণিক্‌গণ আবার ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টাই করে নাই। বাণিজ্য ও ক্ষমতা-বিস্তারের চেষ্টাতেই তাহারা ব্যস্ত থাকিত। দিনেমারগণই প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। আর তাহার ফলে অনেক বঙ্গবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে। ভারতে ইংরাজ-শাসন বদ্ধমূল হইলে, ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের কয়েকটি ধর্ম্ম-প্রচারক সম্প্রদায় পৌত্তলিক ভারতবাসীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে অনেক ইংরাজি-শিক্ষিত বঙ্গবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভারত-গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এই খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করেন নাই। সেইজন্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টকে দেশবাসী ধার্ম্মিক লোকদিগের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ও বাক্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে (See Nolan's History of the British Empire in India and the East. Vol. 1. p. 473). যাহা হউক এই প্রচারক-সম্প্রদায়ের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারে ও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গে প্রাচীন রীতিনীতি ও সামজিক প্রথা সমস্ত বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে কি এক মহা সামাজিক বিপ্লবই না সূচিত হইয়াছিল। ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকগণ হিন্দুর ধর্ম্মসঙ্গত আচার-ব্যবহারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিবার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইল। হিন্দু-সমাজ যুবকগণের সেই স্বেচ্ছাচারিতা অনুমোদন করিল না। সমাজের রক্ষণশীলতায় অনেক বঙ্গ-সন্তান খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হিন্দু শাস্ত্রের ও ধর্ম্মের কর্ণধারগণ প্রাচীন রীতি-নীতি হইতে এক পদও বিচ্যুত হইবেন না ; আর পাশ্চাত্য বিদ্যা ও ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকগণ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহে। উভয় বিপরীত মতের সংঘর্ষে ভারতে এক মহা সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লব সূচিত হইল। অনেক দূরদর্শী পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন যে, এইভাবে কিছুদিন গত হইলে, ইংরাজি-শিক্ষিত জনসাধারণ খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

এমন সময়ে একটি ঘটনায় ভারত খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিল। এই ঘটনা বঙ্গে রাজা রামমোহন রায়-অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও পঞ্চনদ-প্রদেশে দয়ানন্দ স্বামি প্রবর্ত্তিত আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা। এই ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজের রীতি-নীতি, হিন্দুর রীতি-নীতি হইতে অনেকাংশে পৃথক্ হইলেও, তাহারা হিন্দুধর্ম্মেরই সম্প্রদায়-বিশেষ মাত্র। তাহারা খৃষ্টান্ নামে

গণ্য হইতে পারে না। আবার আধুনিক কালে এই ব্রাহ্ম ও আর্য্যধর্ম্মের রীতি-নীতির কিয়দংশ প্রচ্ছন্নভাবে হিন্দুর রীতি-নীতিতে প্রবেশ করিয়াছে এবং করিতেছে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, পূর্ব্বাপর ভারতে কতই না সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়াছে। যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। তাহার প্রয়োজনও ঘটিয়াছিল। সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই সেই বিশ্ব-নিয়ন্তার হস্ত আমরা দেখিতে পাই।

ভারতে সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইত না ; সুতরাং ভারতে ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন নাই, এরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের এই মন্তব্য ভারতের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতি প্রযুজ্য হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু সাধারণ হিসাবে এরূপ ধারণার কোনও মূল্য নাই বলিয়াই মনে হয়। ভারতের ন্যায় পরিবর্ত্তন কোনও দেশে কোনও কালে ঘটে নাই। কি সামাজিক, কি ধর্ম্মনৈতিক, কি রাজনৈতিক সকল বিষয়েই ভারতের যত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, পৃথিবীর কুত্রাপি তাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ভারতে বহু প্রাচীন যুগে ছিল আদিম অসভ্য জাতি, আসিয়াছিল মধ্য আসিয়াবাসী আর্য্য। আসিয়াছে যবন (গ্রীক্), শক, হুন। আসিয়াছিল ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান, পাঠান, তুর্কী, খোরাসানী, ইরাণী মোগল। আবার আসিয়াছে য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন জনপদের অধিবাসী পর্ত্তুগীজ ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরাজ। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল আদিমনিবাসী-দিগের বীভৎস দেব-দেবীর পূজা। পরে প্রচলিত হইয়াছিল আর্য্যজাতির বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম—অহিংসাময় জৈনধর্ম্ম, জীবে প্রেম এবং কার্য্যের শ্রেষ্ঠতা-মূলক ভগবান্ বুদ্ধদেবের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম। বিকৃত বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্মের নিরাকরণ করিতে উদ্ভব হইয়াছিল শঙ্করাচার্য্য-উদ্ভাবিত অদ্বৈতবাদ বা বৈদান্তিক ধর্ম্ম। আবার কালসহকারে শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ নাস্তিকবাদে পরিণত হইলে, ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল রামানুজ-প্রচারিত ভক্তিধর্ম্ম এবং ভগবান্ গৌরাঙ্গের জীবন-প্রতিফলিত ভাগবতোক্ত গোপীর প্রেম-ধর্ম্ম। মুসলমান-শাসনে, মুসলমান-অত্যাচারে, ভারতবাসী হিন্দু প্রপীড়িত হইলে মুসলমান-বিদ্বেষ দূরীভূত করিতে প্রচারিত হইয়াছিল ইলাহী-ধর্ম্ম। মোগল-সাম্রাজ্যের পতনের দিনে মুসলমানের ধর্ম্মান্ধতা প্রবল হইলে পঞ্চনদে প্রচারিত হইয়াছিল গুরু নানক-প্রচারিত শিখধর্ম্ম। আবার ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারে উদার, নীতি-পরায়ণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া সমাজ মধ্যে তাহাদের স্থান করিবার জন্য ভারতে প্রচারিত হইয়াছিল আর্য্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। প্রত্যেক জাতিই প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের জনসাধারণের উপর অল্পাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তনের কারণ হইয়াছিল।

ভারতে অতি প্রাচীনকালে একজন নরপতির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহারই বংশধর অদ্যাপি ভারতে রাজত্ব করিতেছে, এমন নহে। অতি প্রাচীন কালে যে রীতি-নীতি ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাই অবিকৃত অবস্থায় ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও নহে। ভারতে বহুবার রাজকীয় শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বহুবার আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতে ঘটনার বৈচিত্র্যও কম নহে। এই ভারতে বহুসংখ্যক সম্রাট্ আবির্ভূত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক অশ্বমেধ ও রজসূয়-যজ্ঞও এই ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দেশবাসী পরদেশ জয় করিয়াছিল এবং উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছিল। আবার বার বার বিদেশীর দ্বারা বিজিতও হইয়াছিল ; সুতরাং ইতিহাসের উপকরণের অভাব ইতিহাসের অভাবের কারণ নহে। ভারতবাসীর ইতিহাস-প্রণয়নের পদ্ধতি ও ইতিহাসের উপকারিতার অজ্ঞতাই ইহার জন্য দায়ী।

ভারতে শত শত ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সৃষ্ট ও প্রাদুর্ভূত হইয়া ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মমত ও আচার-ব্যবহার সময় হইতে সময়ান্তরে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল। বার বার বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হইলেও, অতি প্রাচীন যুগে উদ্ভূত ভারতের সেই প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের প্রবর্ত্তিত বেদোক্ত সনাতন ধর্ম্ম কিরূপে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা এক অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার। অত্যাচার, উৎপীড়ন, শাসন ও প্ররোচনাসত্ত্বেও অধিকাংশ ভারতবাসী তাহাদের ধর্ম্মমত ও সামাজিক রীতি-নীতি একেবারে হারায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন বৈদেশিক জাতির বার বার আক্রমণে ভারতবাসী রাজনৈতিক শক্তি হারাইয়াছে সত্য—তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি নীতি বিকৃত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু এখনও একেবারে হারায় নাই।

প্রাচীন দেশগুলির মধ্যে একমাত্র ভারতই তাহার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত ও আচার-ব্যবহার লইয়া এখনও বর্ত্তমান। কই আর্য্যজাতির অন্যান্য আবাস-ভূমি, মিশর, পারস্য, ক্যালডিয়া, ব্যাবিলন প্রভৃতি সেই প্রাচীনদেশগুলির প্রাচীনকালের আচার,-ব্যবহার, ধর্ম্ম ও সমাজ-নীতি আজ কোথায় গেল ? সেই জ্ঞানগরিমমণ্ডিত প্রাচীন জাতিগুলিই বা আজ কোথায় ? সে দেশগুলিও আছে, দেশের অধিবাসীও আছে ; কিন্তু নাই তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম, নাই তাহাদের প্রাচীনত্বের নিদর্শন প্রাচীন রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার। সেই সর্ব্বগ্রাসী বিশ্ববিজয়ী রোমের দিগ্বিজয়ে, খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারে ও প্রসারে তাহারা নিজেদের অস্তিত্ব হারাইয়াছিল। তাহাদের প্রাচীনত্বের শেষ চিহ্ন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। কালের কুটিল চক্রে তাহাদের প্রাচীনত্বের নিদর্শন আজ বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত রহিয়াছে ; কিন্তু ভারত, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সংঘর্ষে আসিয়াও, সহস্র অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও, আজও তাহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন ও পরিচয়-পত্রগুলি লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই বহুবিধ ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সহিত ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মমতের সংঘর্ষ ও হিন্দুমতের শেষ প্রাধান্য, ভারতের এই সামাজিক বিপ্লবের বিবরণ ঐতিহাসিকের বিশেষ গবেষণার বিষয় এবং ভারতের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট উপকরণ। এই জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ ভারতে রক্ষিত হইলে, ভারতের ইতিহাস বিশেষ সমৃদ্ধ হইতে পারিত।

সুতরাং ভারতে ঘটনার বাহুল্য বা বৈচিত্র্য নাই বা আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন হইত না বলিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিত হয় নাই ; যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। ভারতে ইতিহাসের উপকরণের অভাব ছিল না। ভারতবাসীর ইতিহাসের উপকরণ ও ইতিহাস-

লিখন-প্রণালীর অজ্ঞতাই ভারতের ইতিহাস লিখিত না হইবার কারণ।

সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্ত্তন ক্রম-বিকাশ ও ক্রমোন্নতির ন্যায় জাতীয় জীবনের সজীবতাও ইতিহাসের এক উপকরণ। মনুষ্যের জড়তা যেমন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সজীবতাকেই সাধারণে পূজা করে, তেমনই জাতির জড়তা ইতিহাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, জাতির বা জনসাধারণের সজীবতাই ইতিহাসের মূল, ইতিহাসের অঙ্গ, ইতিহাসের উপকরণ ও ইতিহাসের আলোচ্য। পৃথিবীতে এইরূপ জাতি-বিশেষ, ধর্ম্মবিশেষ ও সম্প্রদায়বিশেষের সজীবতাই ইতিহাস ও ইতিহাসের উপকরণের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাচীনকালে ফিনিসিয়া ও কার্থেজের বাণিজ্য-কুশলতা, গ্রীসের জ্ঞান-গরিম-দীপ্তি, কার্য্যতৎপরতা ও দিগ্বিজয়, রোমকদিগের বিজিগীষা, মহাপ্রাণ যীশুখৃষ্টের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত নবীন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের ধর্ম্ম-প্রাণতা, আরবের মরুস্থান হইতে উত্থিত মহম্মদীয় বীরগণের একেশ্বরবাদ-প্রচার ও দিগ্বিজয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য জাতিগণের ভারতের পথ-আবিষ্কারের চেষ্টা, পরবর্ত্তী সময়ে ইউরোপীয়গণের আমেরিকা-অধিকার ও উপনিবেশ-তৃষা লুথর, ক্যাল্‌ভিন্ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিকৃত ও কলুষিত আচার ও অনুষ্ঠান হইতে য়ুরোপ-বাসীকে পরিত্রাণ-করণেচ্ছা প্রভৃতি জাতি ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়-বিশেষের সজীবতা ইউরোপের সভ্যতার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল। সর্ব্বোপরি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক ঘটনা, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-বিপ্লব জাতীয় জীবনের সজীবতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই ঘটনার পূর্ব্বে ইউরোপের জনসাধারণের সজীবতা লক্ষিত হইত না। রাজপুরুষ অভিজাতবর্গ ও ধর্ম্ম-যাজকদিগের হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা ছিল। এই বিপ্লবেই ফ্রান্সের, শুধু ফ্রান্স নয় সমগ্র ইউরোপের, সমস্ত প্রচলিত রীতি নীতি ও অনুষ্ঠানের আমূল সংস্কার হইয়া গিয়াছিল। এই বিপ্লবে প্রাচীন রীতি-নীতি অনুষ্ঠান পর্য্যুদস্ত করিতে লক্ষ লক্ষ মানব প্রাণ দিয়াছিল। ইউরোপে রক্তস্রোত বহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই রক্ত-পাত বৃথায় যায় নাই। এই ঘটনায় ইউরোপ সভ্যতার ৫০০ পাঁচশত বৎসর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনায় ইউরোপবাসী সহস্র বৎসরের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। এইরূপ সজীবতাই ইতিহাসের প্রাণ; ইহাই ইতিহাসের মূল। উপরি উক্ত এক একটী ঘটনায় ইউরোপ দ্রুত পাদবিক্ষেপে সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের এই সজীবতাই ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ ও উপাদান।

ভারতে এই প্রকার সজীবতার একান্ত অভাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কালে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ধর্ম্ম-প্রচার, পৃথিবীময় পর্য্যটন ও উপনিবেশ পূর্ব্বক ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার, উপনিবেশ ও রাজ্যস্থাপন, ভারতের সর্ব্বত্র বৌদ্ধ স্তূপ মন্দির ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ ও কীর্ত্তিরক্ষণ-স্পৃহা, শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদলের প্রবর্ত্তন, হিন্দুর তীর্থপ্রতিষ্ঠা, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় প্রভৃতি জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক সজীবতার লক্ষণ আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখিতে পাই। আবার মুসলমানদিগের প্রথম আক্রমণ কালে আমরা ভারতের সজীবতার চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম। মুসলমানগণ দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইলে কোনও দেশ, কোনও জাতিই মুসলমানগণকে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। নব-ধর্ম্ম-দীপ্ত মুসলমানগণ যে দেশে সশস্ত্রে গমন করিয়াছিল, সেই দেশই অচিরে মুসলমানের পদানত হইয়াছিল; কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান ভারত আক্রমণ করিলেও এবং প্রথম যুদ্ধে সিন্ধুপতি পরাজিত হইলেও সিন্ধু-রাজের বংশধরগণ ভারতের সমগ্র ক্ষত্রিয়শক্তি একত্র করিয়া মুসলমান-আক্রমণকারীদিগকে পরাজিত করিয়াছিল। এই যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হইলে তাহারা প্রায় চারিশত বৎসর ভারতাক্রমণে বিরত ছিল। ভারতে মুসলমান-শাসনের যুগে রাজবারা, রাজস্থানের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, মুসলমান-শাসনের অধঃপতনের যুগে শিখ-ধর্ম্মের উদ্ভব এবং শিখ ও মহারাষ্ট্রীয় জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রভৃতি কয়েকটী সজীবতার চিহ্ন আমরা ভারতে দেখিয়াছি।

সুতরাং ভারতে যে কেবল এই সজীবতার অভাবে ইতিহাস লিখিত হয় নাই, একথাও আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যে সকল পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতে জাতীয় জীবনের সজীবতা ছিল না বলিয়া ভারতের ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন হয় নাই, তাঁহাদের সহিতও একমত হইতে পারি না।

একজন পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতে ইতিহাসের উপকরণের অভাব হয় নাই। ভারতবাসীর ইতিহাস প্রণয়নের প্রণালী ও ইতিহাস পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব হইয়াছিল।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাচীন কালে গ্রীক্‌দেশে ইতিহাসের প্রথম সৃষ্টি হয়। গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাসই আধুনিক ইতিহাস লিখন-পদ্ধতির পিতৃ-স্বরূপ। অধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, য়িহুদিদিগের ধর্ম্মপুস্তকই গদ্যে লিখিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তক। বাণিজ্য-সূত্রে য়িহুদি ও ফিনিকগণের গ্রীসে যাতায়াত ছিল। এই সূত্রেই গদ্য-পুস্তক-প্রণয়ন-প্রণালী প্রচলিত হইয়াছিল। এই সূত্রেই হেরোডোটাস্ নাকি য়িহুদি-দিগের ধর্ম্মপুস্তকের অনুকরণে তাঁহারা ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিল।

হেরোডোটাসের পর হইতেই গ্রীক পণ্ডিতগণ বহুসংখ্যক ইতিহাস, ভূ-বৃত্তান্ত ও প্রাণিবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ এই বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর ইতিহাসের শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক জাতির সহিত সংস্পর্শ সত্ত্বেও ভারতে এই বিদ্যার প্রচলন হয় নাই।

পরবর্ত্তী সময়ে গ্রীকদিগের পতনের পর রোমকদিগের সমৃদ্ধি ও সভ্যতার, সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হইয়াছিল। রোমক সমৃদ্ধির সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের কল্যাণে আমরা রোমক সাম্রাজ্যের অদ্ভুত বিস্তৃতি, ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি এবং সর্ব্বোপরি অদ্ভুত পতনের ইতিহাস পাইয়াছি। এই সময়ের ইতিহাস যদি না থাকিত তাহা হইলে রোমের গৌরবও ভারতের গৌরবের ন্যায় বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত থাকিত।

পাশ্চাত্য দেশে পরবর্ত্তী সময়ে যে দেশ যখন ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিল, সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই দেশে নানা প্রকার বিদ্যা

ও সাহিত্য আলোচনার সহিত ইতিহাসেরও বহুল আলোচনা ও প্রচলন হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণও তৎকালের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন জাতিগুলির বিবরণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণই আধুনিক কালের পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিক-গণের ইতিহাস-প্রণয়ন ও ঐতিহাসিক গবেষণার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

আধুনিক কালে পাশ্চাত্যদেশে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জারমানী সমৃদ্ধি ও সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশে ইতিহাসের বহুল প্রচলন হইয়াছে। ভারতে কি উন্নতির যুগে, কি পতনের যুগে, কোন যুগেই কিন্তু ইতিহাসের আদর ও প্রচলন হয় নাই। প্রুশিয়া ও ইংলণ্ড ইতিহাসের আলোচনা ও শিক্ষাতেই আজ এত উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইংরাজের এই ইতিহাসের আদরের ফলে ইংরাজি ভাষায় আজ সকল দেশের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। এত অধিক ইতিহাস, শুধু ইতিহাস কেন, সকল প্রকার পুস্তকই, পৃথিবীর আর কোন ভাষায় কখন লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইংরাজি ভাষার এরূপ সমৃদ্ধির একটি বিশিষ্ট কারণ আছে। বিস্তৃত আমেরিকা মহাদেশের প্রায় অর্দ্ধেকের উপর লোক ইংরাজি ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ইংরাজি ভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া থাকে। তাই ইংরাজি ভাষায় যত ইতিহাস আছে তত ইতিহাস পৃথিবীর আর কোন ভাষায় নাই।

ইংরাজ-শাসনে ভারতে ইংরাজি ভাষার প্রবর্ত্তনে ইংলণ্ডের বহু পরিশ্রম-লব্ধ বহু দিনের সঞ্চিত ঐতিহাসিক জ্ঞানভাণ্ডার আজ ভারতবাসীর নিকট উন্মুক্ত। ভারতের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে অগ্রে পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস পাঠ করিয়া ইতিহাস লিখিবার প্রণালী ও পদ্ধতি ঠিক করিয়া লইতে হইবে। ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহের নিয়ম ও ঐতিহাসিক উপকরণের ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। পরে ভারতের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হইতে হইবে।

ইতিহাসের উদ্ধার কল্পে আজ বঙ্গের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বঙ্গের সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় অচিরে বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধৃত হইবে আশা করা যায়; কিন্তু "ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ভার কে লইবে? কে আমাদিগকে সেই আশার বাণী শুনাইবে; কবে আমরা পাশ্চাত্য প্রণালীতে লিখিত ভারতের যথার্থ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস দেখিতে পাইব।"

ইতিহাসের আলোচনা এখন অনেকেই করিতেছেন। ইতিহাস প্রণয়নের চেষ্টাও করিতেছেন অনেকে। কিন্তু সাধারণে ইতিহাস প্রণয়ন যেরূপ স্বল্পায়াসসাধ্য মনে করে, বাস্তবিক ইহা সেরূপ সহজ নহে। ঐতিহাসিকের কার্য্য বড়ই দুরূহ, পথ বড়ই পিচ্ছিল, কর্ত্তব্য বড়ই দায়িত্বপূর্ণ! তাঁহার লেখনির উপর, তাঁহার বিচার শক্তির উপর, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার পথ বিশেষতঃ বিশেষ কণ্টকময়। একে ইতিহাসের উপাদান ও উপকরণ স্বল্প ও সংশয়জনক, তাহার উপর দেশের গৌরব-কাহিনী লিপিবদ্ধ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার! দেশের গৌরবের বিবরণও পূর্ব্ব-পুরুষগণের গৌরব-গাথা স্মরণে হৃদয় স্বভাবতই স্বদেশ-প্রেমের উত্তেজনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ঐতিহাসিককে তাই স্বদেশের ইতিহাস লিখিবার কালে যত্নের সহিত সংযত হইতে হইবে। মধ্যযুগের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা মৌর্য্য সম্রাট্‌গণের সমসাময়িক দেশের অবস্থার কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলে চলিবে না। অতি সাবধানে ঐতিহাসিক উপকরণের ব্যাবহার করিতে হইবে।

কর্ণেল গরউড তাঁহার ডেস্‌পাচেস্ অব ওয়েলিংটন (Col. Gurwo..'s Despatches of wellington) গ্রন্থে ইতিহাস সম্বন্ধে এই মন্তব্যপ্রকাশ করিয়াছেন।

'The great end of history is the exact illustration of events as they occured; and there should neither be exaggeration nor Concealment,to omit angry feelings or personal disappointment. History Should contain the truth, the whole truth and nothing but the truth.

ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে ঐতিহাসিককে অতি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। পণ্ডিতগণ বলেন ঐতিহাসিকের প্রথম কর্ত্তব্য, তাঁহার সংগৃহীত ইতিহাসের উপকরণের মধ্য হইতে অনিশ্চিত বলিয়া যাহা তাঁহার ধারণা হইয়াছে, তাহা স্থির করা। পরে তাঁহার উচিত সেই অনিশ্চিত বা কল্পিত অংশের মধ্যে যাহা কিছু সত্য নিহিত আছে, তাহা সংগ্রহ করা, অনিশ্চিত অংশের মধ্যে যেটুকু নিশ্চিত বলিয়া তাঁহার ধারণা আছে, সেই টুকু বাছিয়া লওয়া, আর যে অংশটুকু সন্দেহ-জনক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, তাহার মধ্যে কোন্ অংশ গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ অংশ একেবারে পরিত্যাজ্য তাহা স্থির করা।

গেটে বলিয়াছেন "ঐতিহাসিক তাঁহার কার্য্যে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে নিজেকে মনে করিবেন যেন তিনি জুরীর আসনে বসিয়াছেন। তাঁহার বিচার-বুদ্ধির উপর একজনের ধন প্রাণ মান সকলই নির্ভর করিতেছে। তিনি বিচার-কালে দেখিবেন যে, সাক্ষ্য দলিল-পত্র ও ঘটনা-পরম্পারর দ্বারা বিচার্য্য বিষয় ঠিক প্রমাণিত হইল কিনা। পরে তিনি তাঁহার মন্তব্য স্থির করিবেন। অনুমান বা কল্পনার আশ্রয় লইবেন না। কেবল মাত্র সাক্ষ্যাদির দ্বারা যাহা প্রমাণিত হইল, তাহাই নিজ মতের মূল ভিত্তি করিবেন। তাঁহার মত অন্যান্য জুরী বা তাঁহাদের দলপতির মতের সহিত মিলিল কি না গ্রাহ্য করিবেন না। ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত যাহা তাহাই তিনি বলিবেন মাত্র।"

জুরীদিগের উপর যেমন বিচারাধীন মানবের জীবন নির্ভর করে, তেমনই ঐতিহাসিকের উপর জাতির মঙ্গলামঙ্গল সুনাম ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করে; সুতরাং ঐতিহাসিককে এই কণ্টক-সঙ্কুল পথে অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। জাতি-বিশেষের, দেশ-বিশেষের, সুনাম, ভদ্রাভদ্র ও ভবিষ্যৎ যাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে তাঁহার দায়িত্ব বড়ই গুরুতর। অতি সাবধানে তাঁহাকে বিচার করিতে হইবে। অতি সাবধানে তাঁহাকে দেশের ইতিহাসের উপকরণ ব্যবহার করিতে হইবে! তিনি স্বজাতি বলিয়া গুনগান করিবেন না, বিদেশী বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। যাহার মধ্যে যে গুণ আছে ও যে দোষ আছে, যে ঘটনার মধ্যে যেটুকু সত্য ও মিথ্যা আছে, নির্ভীক চিত্তে তিনি তাহার বিশ্লেষণ করিবেন। কর্ত্তব্য বড়ই কঠোর। পক্ষপাত পরিহার করিয়া অপ্রমত্ত চিত্তে ন্যায় ও ধর্ম্ম সঙ্গত যাহা তাহাই তিনি লিখিবেন। সাক্ষী—সকল কর্ম্মের সাক্ষী—সেই ভগবান্।

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নিয়তি

(গল্প)

রাত বারটা।

ঐ পোড়ো-বাড়ীর ভাঙ্গা, কালো প্রাচীরের উপরে আধখানা চাঁদ বাঁকিয়া আছে। চাঁদ কি পাণ্ডুর—যেন মড়ার মুখের মত!··· আর, আর—অন্ধকার কি গাঢ়,—যেন মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর মত! ও কিসের ডাক? পেচকের? না অন্ধকারের?

নবীন সে স্তব্ধতা, সে অন্ধকার সহিতে পারিল না—সেদিক-কার জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সে আর একদিকে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিককার জানালা খুলিয়া দিতে-না-দিতেই আলোর ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিয়া তার ঘর যেন ভাসাইয়া দিল!

সুমুখেই বিবাহ-বাড়ী—উজ্জল আলোয় ঘরে ঘরে হাসিমাখা মুখ দেখা যাইতেছে। কেহ প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, কেহ আনন্দের গান গায়িতেছে, কেহ ছুটাছুটি করিতেছে। চারিদিকে জীবনের লক্ষণ—পৃথিবীতে যেন দুঃখ-বিষাদ বলিয়া কোন কিছু নাই!

নবীনের মনে হইল, সাম্‌নের বাড়ীখানা যেন তাকে আর তার অদৃষ্টকে কঠোর উপহাস করিতেছে;—এর চেয়ে অন্ধকার যে ঢের ভাল! সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিল। ঘর আবার অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে খানিকক্ষণ সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া মাটির প্রদীপটি জ্বালিয়া দিল। প্রদীপে তৈল ছিল খুব অল্প। মিট্‌মিট্ করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া দীপ জলিতে লাগিল,—আসন্নমৃত্যু রোগীর মত!

দরিদ্রের ঘর,—চারিদিকে দারিদ্র্যের চিহ্ন! প্রদীপের ম্লান শিখা চারিদিকের দীনতা ও মলিনতা যেন আরও বেশী করিয়া প্রকাশ করিয়া তুলিল!

কতকগুলা ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়া ও তুলার স্তূপে পরিবারের আর সকলে শুইয়া আছে—একটি রমণী, দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। তাহাদের দিকে তাকাইয়া নবীন শিহরিয়া উঠিল।

রমণী তাহার স্ত্রী। অভাগীর ঘুমন্ত মুখ হইতেও দুশ্চিন্তার রেখা সরিয়া যায় নাই। তার চোখের কোলে কালি, গালের হাড় উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, আর মুখে যেন হল্‌দে রং মাখান! নবীনের মনে পড়িল, যেদিন উৎসবের বাঁশী ও আনন্দের হাসির মাঝে এই রমণীর সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পুরোহিত তাহার অদৃষ্টসূত্র বাঁধিয়া দিয়াছিল, সেদিন এই মুখেই, এই নয়নেই, সে কি সুষমা ও কি নবীনতা দেখিতে পাইয়াছিল!

নবীন ঘাড় হেঁট্ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘরের ভিতরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আজ তিনমাস হইল, তাহার চাকুরীটি গিয়াছে। সে মাহিনা পাইত কুড়িটাকা। তাতেই কোনরকমে অর্দ্ধাহারে পেট চলিয়া যাইত।

গেল তিনমাস ধার করিয়া, তৈজস-পত্র বিক্রয় করিয়া কোন-ক্রমে সে দিন কাটাইয়াছে। সকাল-সন্ধ্যা সে চাকুরীর জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছে; কিন্তু কোথাও চাকুরী পায় নাই। আজকাল পথে বাহির হইলে পাওনাদারেরা তাকে অপমান করে,—ধার চাহিতে গেলে সকলে তাকে তাড়াইয়া দেয়। এক-খানি ভাড়াঘরে তারা কয়টি প্রাণী মাথা গুঁজিয়া থাকিত; কিন্তু বাড়ীওয়ালা অনেকদিন ভাড়া না পাইয়া আগুন হইয়া আছে। কাল নূতন মাসের ১লা—তাহাদের এ ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু, কোথায় যাইবে সে? স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়া'ন ছাড়া আর ত—কোন উপায় নাই!—আর, খাব কি? পথের ধূলা?

নবীন, দুইহাতে মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল। ঘরের কোণ হইতে একটা কুকুর এতক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার গতিবিধি দেখিতেছিল। কুকুরটা বুড়া হইয়াছে। সে যখন একমাসের, নবীন তখন তাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল; সেইদিন থেকে সে সুখে-দুঃখে নবীনের পরিবারেরই একজন হইয়া আছে।

নবীনকে বসিয়া পড়িতে দেখিয়া, কুকুরটা আস্তে আস্তে উঠিয়া প্রভুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আপনার বড় বড় চোখদুটি মেলিয়া নবীনের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। তার পশু-নেত্রে যে দুঃখ ও সমবেদনার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, অনেক সময়ে নর-নেত্রও তেমন গভীর ভাব প্রকাশ করিতে পারে না।

নবীন বলিল, "কি রে ভুলো, তুই যে উঠে এলি বড়?"

ভুলো ল্যাজ্ নাড়িতে নাড়িতে নবীনের একখানা হাত আদর করিয়া চাটিয়া দিতে লাগিল; সে যেন নবীনকে সান্ত্বনা দিতে চায়!

নবীন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ভুলো, যা—আজ্‌কের রাতটা ঘুমিয়ে নে রে! কাল থেকে তোকেও পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। আহা, এ বুড়োবয়সে এত কষ্ট তুই সইতে পার্‌বি ত?"

ভুলো, নবীনের মুখের দিকে চাহিয়া একটা অস্ফুট ধ্বনি করিল;—যেন সে সব কথা বুঝিতে পারিয়াছে!

ঘরের ভিতরে হঠাৎ শিশুর কান্নার শব্দ হইল। সে নবী-নের সবচেয়ে ছোট মেয়ে—সবে আজ ছয়মাস পৃথিবীতে আসিয়াছে। নবীন তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাকে কোলে তুলিয়া নিল।

মেয়েটিকে দেখিতে খুব সুন্দর। কোঁক্‌ড়া-কোঁক্‌ড়া চুল, ড্যাব্‌রা-ড্যাব্‌রা চোখ, ফুলো-ফুলো গাল, রাঙ্গা-রাঙ্গা ঠোঁট; কিন্তু মরুভূমিতে ফুলের মত, গরীবের ঘরে দিন দিন সে শুকাইয়া যাইতেছে। আজ কয়দিন সে অর্দ্ধাহারক্লিষ্টা জননীর স্তন্যপান করিয়াই কাটাইয়াছে,—অন্য দুগ্ধ তার অদৃষ্টে জুটে নাই।

আলোর দিকে মেয়ের মুখ ফিরাইয়া নবীন খানিকক্ষণ এক-দৃষ্টিতে শিশুর মুখ নিরীক্ষণ করিল। তারপর খুকির ননীর মতন নরম গালে একটি চুমো খাইয়া বলিল, "খুকি, আর জন্মে তুই কি মহাপাপ করেছিলি যে, এ জন্মে আমার ঘরে জ্বলে-পুড়ে মরতে এলি?"

খুকি ঘন ঘন হাত-পা নাড়িতে নাড়িতে হাসিয়া বলিল, "অক্ক, অক্ক, অক্ক!"

নবীন, মেয়েকে নাচাইয়া নাচাইয়া ঘুম পাড়াইল। শেষে, স্ত্রীর বুকের উপরে খুকিকে শোয়াইয়া দিল। সেই স্পর্শে তাহার স্ত্রী জাগিয়া উঠিল। চোখ মেলিয়া, সুমুখেই স্বামীকে দেখিয়া সে

ঘুমের ঘোরেই হাত বাড়াইয়া নবীনের গলা জড়াইয়া ধরিল এবং পাশ ফিরিয়া সেই অবস্থায় আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

নবীন ধীরে ধীরে আপনার গলা হইতে স্ত্রীর হাতখানি নামা-ইয়া, তার ওষ্ঠে একটি চুম্বন দিয়া আপন মনে বলিল, "ঘুমোও, ঘুমোও—যতটুকু পার ঘুমিয়ে নাও। কাল থেকে ভিখারীদের সঙ্গে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পথে শুয়ে ঘুমোতে হবে, লোকের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইতে হবে! কেউ একমুঠো চাল দেবে, কেউ দূর্-দূর্ করে তাড়িয়ে দেবে। আমার মুখের দিকে ছল-ছল চোখে তাকালেও কোন ফল হবে না; কাঁদলেও—কেঁদে কেঁদে মরে গেলেও ভগবান্ মুখ তুলে চাইবেন না।"

টং করিয়া ঘড়ী বাজিয়া উঠিল।

টং! টং!—রাত দুইটা!

নবীন আপনমনে হিসাব করিয়া বলিল, "দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা—আর চার ঘণ্টা! ভিখারী সেজে পথে দাঁড়াতে আর চার ঘণ্টা বাকি! আর চার ঘণ্টা আমি ভদ্রলোক আছি! মাগো—ওমা! আমার মত অভাগাকে তুমি গর্ভে ধরেছিলে কেন? আজ কি আমার কান্না তুমি শুন্‌তে পাচ্ছ না?"—নবীন অশ্রুভরা চোখে স্ত্রীর মুখের উপরে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রদীপটা দপ্ করিয়া একবার জ্বলিয়া উঠিয়া প্রাণপণে খানিকটা হল্‌দে আলো বিকীর্ণ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল।

ঘর আবার অন্ধকার।

সেই অন্ধকারে, নবীনের ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া চাপা কান্না শুনিয়া, ভুলো অস্থিরপদে ঘরের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

* * * *

পরদিনের বেলা আটটা।

বাড়ীওয়ালা ঘরের বাহিরে একখানা কাগজ মারিয়া দিতেছে; তাতে লেখা:—

ঘর-ভাড়া

এই ঘর ভাড়া দেওয়া যাইবে।

ভাড়া-পত্র টাঙ্গাইয়া বাড়ীওয়ালা ঘরের ভিতরে ঢুকিল। ঘর তখন খালি। দরজার কাছে একখানা খাম পড়িয়া রহিয়াছে। বাড়ীওয়ালা সেখানা তুলিয়া লইল। খামখানা কেহ খুলে নাই, উপরে ডাকঘরের ছাপ্‌মারা। বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষের নামে আসিয়াছে।

বাড়ীওয়ালা বুঝিল, তাহার ভাড়াটেরা উঠিয়া যাইবার পর ডাক-হর্‌করা কখন্ আসিয়া চিঠিখানা এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িল।

কোন সওদাগরি অফিসের সাহেব, বাবু নবীনচন্দ্র ঘোষকে লিখিতেছে:—

"তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল। এই মাসের ১লা তারিখ হইতে আমাদের অফিসে তোমাকে একটি কুড়িটাকা মাহিনার কাজ দেওয়া গেল। ইত্যাদি।"

কিন্তু, নবীন তখন কোথায় বসিয়া স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছিল? বাড়ীওয়ালা সে খোঁজ নেওয়া দরকার মনে করিল না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বংশী-তান

কতদিনে—কতদিনে বাজিবে সে বংশী
স্থগভীর উদাত্ত সে স্থরে,
পরশিবে কতদিনে হৃদয়ে সে আসি
মিলাইতে কঠোরে মধুরে!
ব্রজের যে বাঁশরীর ধ্বনি, এসেছিল
নবদ্বীপে, নিমাই-পাগল
জ্ঞানান্ধে চৈতন্য দিল; নিজে বিতরিল
হরিনাম বাজায়ে মাদল;
যেই বংশী-তানে একস্রোতে বহেছিল
প্রেমবারি হৃদি-যমুনায়,
তাপদগ্ধ নর-নারী আসি ডুবেছিল,
সুশীতল হয়েছিল যায়;
কালিন্দীর বক্ষ হতে যে বাঁশরী-তান
ভাগীরথী বক্ষে বহি আনি,
উচ্ছ্বসিয়া প্রেমরসে তুলি কলতান
পূত হল যেই প্রেম দানি;

কতদূরে সে বাঁশরী, কোথায় সে তান,
কতদিনে উন্মাদি আমারে,
জগতের বৃন্দাবনে শুনাইবে গান,
ভাসাইবে প্রেম-অশ্রু-ধারে?
কবে পুনঃ এ নিখিল-ব্রজ-মহাপুরে
গোপ-গোপী ছুটে যাবে, হায়!
ভিন্নভাব ছিন্ন করি দিবে ফেলে দূরে,
একই প্রেমে খুঁজিবে তাঁহায়?
কবে গো মধুররবে বাজিবে সে বাঁশী,
জ্ঞান-মোহ কবে যাবে টুটি,
বিশ্ব-প্রেমে নর-নারী হইবে উদাসী,
কবে আলো উঠিবে গো ফুটি?
কই বাঁশী, বংশীধর, কোথায় সে গান?
বাজাও হৃদয়ে একবার,
আশাপথ চেয়ে আছি, জগতের প্রাণ,
কোথায় সে কতদূরে আর?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র আঢ্য

ইব্‌সেনের প্রকৃতি ও প্রভাব

স্কাণ্ডিনেভিয়া যে আজ সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, ইহা তাহার জাতিগত সাধনার বলে নহে—কেবল কতকগুলি ব্যক্তিগত ক্ষণজন্মা সাহিত্যিকের অমর লেখনীর বলে। এখনও স্কাণ্ডিনেভিয়া জাতি অর্দ্ধবর্ব্বর; তাহাদিগের ভাষাও সভ্য-জগতের চক্ষে বর্ব্বরতার কিঞ্চিৎ উপরে বলিয়াই বিবেচিত হয়। স্কাণ্ডিনেভিয়ার জাতি ও ভাষার কোন সার্থকতা না থাকিলেও, ইহার কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিকে জগৎ চিরদিনই পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিবে। স্কাণ্ডিনেভিয়ার সাহিত্য-সাধনার দিক্‌টা এক অভিনব সত্যের আলোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিতেছে। নাটক এবং উপন্যাস বলিতে আমাদিগের মনে যেমন একটা কু-ধারণা জন্মায়, আজ সে ধারণা স্কাণ্ডিনেভিয়ার কতিপয় সাহিত্যিক সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন। নাটক ও উপন্যাসের অনুশীলনদ্বারাও যে যথার্থ মনুষ্যত্ব গঠিত হইতে পারে, আজ স্কাণ্ডিনেভিয়ার রঙ্গভূমি তাহাই বিশ্বকে উপলব্ধি করাইতেছে। আমরা স্কাণ্ডিনেভিয়ার মানব-প্রকৃতি ও দেশ-প্রকৃতির বিষয় সম্পূর্ণভাবে অপরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার বিরন্সন (Bironson), জোনাস্ লাই (Jonas Lie) এবং সর্ব্বোপরি এ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ইব্‌সেনকে (Ibsen) কে না জানি? তাঁহাদের নাম আজ বঙ্গের সাহিত্যিকমাত্রেই শুনিয়াছেন; কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী তাঁহাদের গ্রন্থসমূহের সঙ্গে সুপরিচিত, তাহা বাস্তবিকই নির্ণয় করিবার বিষয়; অথচ এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী নাই, যিনি ইব্‌সেনের নাম শোনেন নাই। সাহিত্যিকদিগের ভিতরেও কয়টী বাঙ্গালী ইব্‌সনকে প্রাণ দিয়া বুঝিয়াছেন? ইব্‌সেন, নাট্য-সাহিত্যের একটী সাগরবিশেষ, আমাদের অধিকাংশ কূপ-মণ্ডূক সাহিত্যিক তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তাঁহার গ্রন্থ হইতে অমৃত-মন্থনের পরিবর্ত্তে কেবল হলাহলই মন্থন করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে, ইব্‌সেন একজন নীতিহীন নাট্যকার; কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন। ইব্‌সেন য়ুরোপীয় সমাজের কৃত্রিমতা ও ভণ্ডামিকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তিনি উক্ত সমাজকে সায়েস্তা করিবার জন্যই অনেক অপ্রিয়কর রহস্যভেদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি নীতি-শক্তির (moral spirit) বিন্দুমাত্র হানি করেন নাই।

ইব্‌সেনকে বুঝিবার অগ্রে প্রথমতঃ আমি একটী কথা বলিয়া রাখি। তিনি যাহা-কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, সে কেবল প্রতীচ্য খ্রীষ্ট-সমাজকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন। তিনি প্রাচ্য রীতি-নীতির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিছুই লিখেন নাই। তিনি নিজ সমাজের ছিদ্র অন্বেষণ করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন—অপর সমাজের উপর কোনরূপ সংস্কারের করাঘাত করিয়া অনধিকার-চর্চ্চা করেন নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গের কতকগুলি অর্ব্বাচীন সাহিত্যিক ইব্‌সেনের উদ্গার উদ্গীরণ করিয়া আমাদিগের সমষ্টিপ্রাণ সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন। তাঁহারা জাতীয় ভাবের ধারা না বুঝিয়াই, একটা নূতন-কিছু করিবার লোভে খাল কাটিয়া কুম্ভীর-আনয়নে সতত তৎপর। এই সব হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য লেখকদিগকে আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বাঙ্গালী-জাতির প্রকৃতি না বুঝিয়া, অপর জাতির বিশেষত্বগুলিকে অনুকরণ করিতে গিয়া বাঙ্গালীর অধঃপতনের পথ সমধিক উন্মুক্ত না করেন।

আমি নিরপেক্ষভাবেই ইব্‌সেনের নাট্য-প্রকৃতি পাঠক-সমক্ষে ধরিব; কিন্তু ইব্‌সেনের ব্যক্তিত্ববাদ, বাঙ্গালীর রক্ষণশীল একান্ন পরিবারের মধ্যে চালাইবার জন্য কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করিব না; কারণ, পাশ্চাত্য আদর্শ ও প্রাচ্য আদর্শ এক নহে।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। নরওয়ের সাহিত্য-প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইলে, অগ্রে তাহার দেশ-প্রকৃতির অলোচনা আবশ্যক। বসন্ত ও গ্রীষ্মের আবির্ভাব এই ভূমিতে খুব অল্প ও ক্ষণস্থায়ী, বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহা রাত্রির তমসা এবং প্রকৃতির ভীষণতার দ্বারা আবৃত। এমন নিরানন্দ ভূমি আর দ্বিতীয় নাই। ইব্‌সেন তাহা অন্তরঙ্গভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন; তাই তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল প্রবাসে পরিভ্রমণেই কাটাইয়াছিলেন। কবি-প্রকৃতি এখানে বর্দ্ধিত হইবার কোন অনুকূলতাই লাভ করে না। এখানে দেশ-প্রকৃতি যেমন বিরস, মানব-প্রকৃতিও তেমনই অনেক কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণায় পূর্ণ। জোনাল্ লাইয়ের (Jonas Lie) কথায় বুঝা যায় যে, এখনও তথায় মৎস্যকুমারী, পরী ও ভূত-প্রেত মানবের পালিত পশুর ন্যায় বিচরণ করে। এখনও প্রাচীন অপদেবতায় বিশ্বাস তথায় কম নহে এবং এই সব 'আজগুবী' বিশ্বাস হইতেই তথাকার অধিবাসিগণের মনে নানারূপ গল্পের উদ্ভব হইয়া থাকে। নরওয়ের দেশ-প্রকৃতি কারা-কক্ষের ন্যায় হইলেও, কবি-প্রকৃতি তাহার গবাক্ষদ্বার দিয়া বহির্দৃশ্যের যে কনক-দৃশ্যটুকু বৎসরের কয়টা দিন দেখিতে পান, তাহা তাঁহার কল্পনার পক্ষে বড় কম উপাদান নহে। যে দেশের কবিরা প্রতিদিন সূর্য্যদেবকে দেখেন, চিরবসন্তে বিহার করেন, সে দেশের সূর্য্য ও বসন্ত তাঁহাদের কল্পনাকে তেমন আন্দোলিত করিতে পারে না, যেমন করে যেখানে তাঁহারা এ সকল অতি অল্পদিনই দেখিতে পান। রুষ-কবিদিগের প্রকৃতি আলোচনা করিতে গিয়া আমি এই কথাই বলিয়াছিলাম (গত বৎসরের ফাল্গুন ও চৈত্রের 'গৃহস্থ' দ্রষ্টব্য)। দেশ-প্রকৃতির নানারূপ বিভিন্নতাবশতঃ নরওয়ের কবিদিগের চিত্তেও নানারূপ ভাবের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়। একদিকে তাঁহাদিগের কল্পনা যেমন উদ্দাম এবং উন্মত্ত, অন্যদিকে তেমনই আবার প্রত্যক্ষবাদ ও স্বভাববাদের উপর সমধিক অনুরাগ সমন্বিত; একদিকে তাঁহাদিগের রচনায় যেমন প্রচ্ছন্নভাব (mysticism) দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই স্বাভাবিকতায় তাঁহাদের রচনা সজীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। বিশেষতঃ, ইব্‌সেনের রচনায় এই অপূর্ব্ব ভাব-বৈপরীত্য সমধিক প্রকট।

ইব্‌সেন নরওয়ে-দেশে জন্মিলেও, কি পিতা, কি মাতা, উভয় দিক হইতেই তাঁহার মধ্যে জার্ম্মাণ-রক্ত প্রবাহিত হইয়া-

ছিল; সেই জন্য আন্তরিকাতা এবং দার্শনিকতা তাঁহার জীবনে বিশেষভাবে মিলিত হইয়াছিল; অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা তাই জার্ম্মাণীতে ইব্‌সেনের অধিকতর আধিপত্য ও আদর।

ইব্‌সেনের মাতা M ria Corn lia Attemburgএর প্রকৃতি বড়ই গম্ভীর, নির্জ্জনতাপ্রিয় এবং নীরব ছিল; ইব্‌সেনও মাতার স্বভাব পাইয়াছিলেন। ইব্‌সেনের একজন ভগ্নী এইভাবে তাঁহার মাতৃ-প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন—

"She was a quiet, lovable woman, the soul of the house, devoted to her husband and children. She was always sacrificing herself. There was no bitterness and reproach in her."

ইব্‌সেনের পিতা Kneed Ibsen যদিও সুরসিক ও সুনাগরিক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিদ্রূপবাণ বড়ই তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যে সমাজে মিশিতেন, কোনরূপ অন্যায় দেখিলে তখনই তাহার প্রতিবাদ করিতেন ও অপ্রিয় সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; তাঁহার নিকট হইতে ইব্‌সেন এই গুণটী পাইয়াছিলেন।

ইব্‌সেন প্রকৃতির বিশালতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনবৃত্তান্তকার Iaegerএর গ্রন্থ হইতে আমরা কবির স্বমুখের এই উক্তিগুলি পাই:—

"I was born in a house in the market-place..... ...This prospect was the first view of the earth that presented itself to my eyes...........All buildings; no green, no rural open landscape."

তাঁহার জন্মস্থানের আবেষ্টনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার তিনটী দৃশ্য সর্ব্বদা নয়নগোচর হইত—একটী গির্জ্জাঘর, একটী পাগলা-গারদ ও একটী কয়েদখানা। এইসব বীভৎস অকরুণ দৃশ্যের মধ্যে ইব্‌সেন তাঁহার শৈশবকাল কাটাইয়াছিলেন। এইসব দৃশ্য তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন-গঠন-কল্পে অল্প সহায়তা করে নাই। তাঁহার নাট্যসমূহেও এইসকল প্রতিবেশ-প্রভাব তাঁহার প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে। তিনি ভবের হাটে (market-place) জন্মিয়াছিলেন, ভবের হাটের কেনা-বেচার মধ্যে বাস করিয়া জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকগুলিকে এক একটী ভবের হাট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিয়রন্সন এবং লাইয়ের রচনায় আমরা যেমন পদে পদে সাগর এবং অরণ্যের দৃশ্য-সম্পদ দেখিতে পাই, ইব্‌সেনের রচনায় তাহার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। সমাজ এবং নর-নারীর ব্যাবহারিক জীবন লইয়াই ইব্‌সেনের নাট্য-কলার লীলাভিনয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমাজের কল্যাণ এবং উন্নতিবিধান তাঁহার দিবারাত্র চিন্তার বিষয় হইলেও, বাল্যকাল হইতেই নির্জ্জনতা-প্রিয়তা তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি বড়ই গম্ভীর থাকিতে ভালবাসিতেন—একমাত্র অধ্যয়নেই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। সংসারের খেলা-ধূলা, আমোদ-প্রমোদ তাঁহার জীবনে ভার বলিয়া বোধ হইত। "An enemy of the society" নামক নাটকের Dr, Stockmanএর চরিত্রে, ইব্‌সেন অনেকটা আপনাকেই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। জনতা হইতে দূরে থাকাটা তিনি পুণ্যকর বিবেচনা করিতেন—নির্ব্বাসনে তিনি একটা গর্ব্ব অনুভব করিতেন। বাল্যকাল হইতেই এ ভাব তাঁহার জীবনে দেখা গিয়াছিল।

যাঁহারা সমাজের স্তম্ভ তাঁহাদের দন্ত-চূর্ণত-কল্পে তিনি অস্ত্রধারণ করিলেও, নিতান্ত কৃপার পাত্রী স্ত্রীজাতি ও দুর্দ্দশা-নিপীড়িত শ্রমজীবিগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অন্ত ছিল না। একদা Drontheim নামক স্থানে তিনি শ্রমজীবীদের 'ক্লবে' নিম্নলিখিত বক্তৃতা দিয়াছিলেন:—

"Mere democracy cannot solve the social question. An element of aristocracy must be introduced into our life. Of course, I do not mean the aristocracy of birth or of the purse or even the aristocracy of intellect I mean the aristocracy of character, of will, of mind. That only can free us. From two groups will this aristocracy, I hope, forecome to our people—from our women and our workmen. The revolution in the social condition, now preparing in Europe, is chiefly concerned with the future of the workers and the women. In this I place all my hopes and expectations; for this I will work all my life and with all my strength."

চরিত্রের আভিজাত্য, মনের বল এবং ইচ্ছা-শক্তি-বৃদ্ধিই ইব্‌সেনের সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। আবার এইসব সদ্‌গুণের উৎকর্ষ তিনি নারীজাতি ও শ্রমজীবিগণের জীবনে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। জন্ম, অর্থ বা বুদ্ধির অহঙ্কার তিনি দেখিতে পছন্দ করিতেন না; একমাত্র চরিত্রের আভিজাত্যই তাঁহার আদর্শের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি জানিতেন, কেবল গণ-তন্ত্রবাদে সমাজের কাজ হইবে না—আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ব্যতীত মানবজীবন সফল এবং সম্পূর্ণ হইবে না। জীবনের মর্য্যাদা অনুভব না করিলে মানুষ পশুরও অধম হইয়া পড়ে। এই মর্য্যাদার উদ্রেক-কল্পেই ইব্‌সেনের জীবনব্যাপী সাধনা। ইব্‌সেনকে যাঁহারা নীতিহীন, অশ্লীল বলেন ও অশ্লীলভাবে অনুকরণ করেন, তাঁহারা ইব্‌সেনকে তলাইয়া বুঝেন নাই।

ইব্‌সেনের প্রকৃতির আভাষ দিয়া রাখিলাম; এইবার তাঁহার আকৃতির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। তাঁহার ছায়াচিত্রখানি দেখিলেই মনে হয়, তাঁহার চিত্তের দৃঢ়তা তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে চাপিয়া বসিয়া গিয়াছে—যেন একটা প্রতিজ্ঞার ভাব তাঁহার সংনিবদ্ধ ওষ্ঠদ্বয়ে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে! তিনি স্ত্রীজাতির কবি (woman's poet) বলিয়া পরিচিত হইলেও, তাঁহার স্বভাব এবং আকৃতি রমণীজনসুলভ ছিল না—তিনি রমণীজনসুলভ কোন ঠামই লাভ করেন নাই; অথচ তিনি স্ত্রীজাতির জন্য আজীবন যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু এবং কঠিন প্রকৃতির লোক ছিলেন; অথচ দরিদ্র ও অবলাদিগের জন্য সর্ব্বদাই করুণায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি কোনরূপ কামনার বশে কামিনীর উদ্ধারসাধনে ব্রতী হন নাই,—যথার্থ কর্ম্মীর ন্যায় নিষ্কাম অনুপ্রেরণা লইয়া মাতৃমূর্ত্তি নারীজাতির চরিত্রোন্নয়নের জন্য লেখনী-সঞ্চালন করিয়াছিলেন। তিনি নারীজাতিকে চুম্বনের সামগ্রী বা সোহাগের পুত্তলী করিয়া গড়েন নাই—তিনি আমাদিগেরই ন্যায় নারীজাতির ভিতর এক অভিনব আদ্যাশক্তির প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ বড়ই তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি যাহা দেখিতেন, যেন তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে পারিতেন—"Which (তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়) seem to penetrate into the heart of things." তাঁহার একজন দেশীয় ব্যক্তি তাঁহাকে "The man of the iron-will" বলিয়া গিয়াছেন।

বিয়রন্সন, ইব্‌সেনের আকৃতি-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত দুইটী চরণ উপহার দিয়া গিয়াছেন।

"Tense and lean, the colour of gypsum,
Behind a vast coal-black beard."

Henrik Ibsen.

সচরাচর কবিদিগের যেমন সৌখীন চেহারা (pure, extravagant, yearning, questioning artists' face) হয়, ইব্‌সেনের তাহা ছিল না। আনন-বিজ্ঞান (physiognomy) যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ইব্‌সেনকে একজন সুবিখ্যাত অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়াই মনে করিবেন। বাস্তবিকই তিনি সামাজিক বিস্ফোটকের অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন। তিনি তেমন বাক্যবীর ছিলেন না—যখন বাক্যালাপ করিতেন, তখন ওজন করিয়া কথা কহিতেন। কথিত আছে যে, "He talks like a wholesale tradesman." পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার জন্মস্থান বাজারে,—তিনি সংসারের দোকানদারীটা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সমাজের মাথাওয়ালাদের বিধিমতে চিনিয়াছিলেন ; এইজন্যই তিনি গরীব শ্রমজীবীদিগের সঙ্গে মিশিতে বড় ভালবাসিতেন ; কিন্তু বড়লোকদিগের সঙ্গে বড়-একটা মিশিতেন না। Society কথাটীকে তিনি বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। বাহিরে তিনি socialistএর ভাব দেখাইতেন বটে, কিন্তু সামাজিক সংস্রব তাঁহার জীবনে কতটা, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ সমস্যার বিষয়।

এইবার আমরা ইব্‌সেনের নাট্যলীলার রঙ্গভূমি পরিদর্শন করিব। নাট্যসমূহের মধ্য দিয়াই তাঁহার আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলি অন্বেষণ করিয়া বাহির করিব। তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই এত অধিক গবেষণামূলক তত্ত্ব নিহিত থাকে, যাহা আমাদিগের অনভ্যস্ত মনকে একটা গহন অরণ্যের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া যেন বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাই না! এই কবির লিখন-ভঙ্গীর প্রকৃতি নির্ণয় করিতে গিয়া চিন্তাশীল Havelock Ellis মহোদয় বলিতেছেন— 'Wild and fantastic imagination stands beside an exact realism and a loving grasp of nature ; a tendency to mysticism and symbol beside a healthy naturalism. We find these characteristics variously combined in Ibsen." ইব্‌সেনের নাট্য-প্রকৃতি-সম্বন্ধে ইহার উপর আর সুন্দর মীমাংসা চলে না।

যাউক সে কথা। এক্ষণে আমরা তাঁহার প্রথম, প্রধান নাটক "Hærmændene paa Helgeland" অর্থাৎ 'হেলগেল্যাণ্ডের বীরগণে'র কথা উত্থাপন করিব। ইব্‌সেনের অধিকাংশ নাটকই অসম্পূর্ণতা-দোষগ্রস্ত ; কিন্তু এখানি তেমন নহে। অন্যান্য নাটকগুলিতে তাঁহার গতি যেমন উদ্দাম এবং ভাঙ্গিতেই ব্যস্ত, এ নাটকটী তেমন নহে ; কারণ, এই নাটকখানি ঐতিহাসিক উপাদানে রচিত, ইহাতে ইব্‌সেনের স্বাধীনতা অনেক হ্রাস হইয়াছে। স্বাধীনতা খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়াই, তাঁহার এই পুরাতত্ত্ব-সম্বলিত নাটকটী সংযতভাব ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ইব্‌সেনের গঠিবার প্রয়াস আছে, ভাঙ্গিবার প্রকৃতি নাই। ইব্‌সেনের অধিকাংশ নাটকই destructive বা ধ্বংসমূলক। সৃষ্টির অগ্রে সংহারের প্রয়োজন, ইহা তাঁহার অভ্রান্ত ধারণা ছিল। আমাদিগের রবীন্দ্রনাথ এই iconclasmএর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ; তাই তাঁহার হিন্দুর 'অচলায়তন' ভাঙ্গিবার প্রয়াস। দেখা যাউক কি হয়।

এই প্রাচীন নাটকে ইব্‌সেনের স্বাধীনতা খর্ব্ব হইলেও,তাহাতে বর্ত্তমানের সুর আমরা কিছু কিছু শুনিতে পাই, ইব্‌সেনের প্রকৃতিও অনেকটা ধরা পড়ে। ইব্‌সেনের প্রকৃতি হইতেছে, নারীজাতির মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্ববাদকে জাগাইয়া তোলা। এই নাটকটীও সেই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। Hjordis (ঝুর্ডীস্) ইহার বলদর্পিতা নায়িকা। এইরূপ তেজস্বিনী নারী প্রকৃতই ইব্‌সেনের সমুদয় সামাজিক নাটকগুলির ভিতর নানাভাবে বিচরণ করিতেছে। তাঁহার নাটকের নারী-চরিত্র Selma, Lona, Nora, Mrs. Aluing, Rebecca একই ছাঁচে গঠিত—সকলেই ব্যক্তিত্ববাদ ও তেজস্বিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ, শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন নারীভাবাপন্ন ঔপন্যাসিক আমাদিগের সাহিত্যক্ষেত্রে—অতএব সমাজক্ষেত্রে এই অনুকরণ-স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন ; কিন্তু অনুকরণ বন্ধ্যা নারীর জন্য ; তাহাতে কোন সুফল ফলিবে কি ? ইব্‌সেনের দেশে ইব্‌সেনকে যাহা সাজে এবং শোভা পায়, তাহা সর্ব্বত্র এবং সকলকে সাজে না, বা শোভা পায় না। 'Imitation is barren'. V. Hugo

যাহা হউক, এই Hjordis একজন আত্ম-বিকাশ-প্রিয়া নারী, যাহার নারী-হৃদয়, আপনাকে ব্যক্ত করিবার ইচ্ছাসত্ত্বেও, পুরুষের অযথা অবহেলায় অবশেষে আগ্নেয়গিরির ন্যায় গৈরিক-স্রাব উদ্গীরণ করিয়াছিল। ঝুর্ডীস্ বলিয়াছিল—"A woman, a woman, there is no one, who knows what a woman can do." ঝুর্ডীসের পিতা সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে পর, ঝুর্ডীস্ বিজেতার গৃহে পালিতা হয়। এই পরাধীনতার মধ্যে একমাত্র শারীরিক ব্যায়াম করিয়া ঝুর্ডীস্ আপনার বন্দী অবস্থাকে ভুলাইয়া রাখিত। যোদ্ধা Sigurd এবং তাহার বন্ধু Gunnar উভয়েই ঝুর্ডীস্‌কে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। ঝুর্ডীস্, সিগুরকেই মন-প্রাণ অর্পণ করিয়াছিল ; কিন্তু গুণারও যে ঝুর্ডীস্‌কে আপনার করিতে চায়! অগত্যা স্থির হইল, উভয়ের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ বলের পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে, ঝুর্ডীস্ তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিবে ; কিন্তু আপনার স্বার্থহানি করিয়া সিগুর বন্ধুকেই জয়যুক্ত করিয়া দিল। ঝুর্ডীস অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুণারকে আত্মদান করিল। সিগুর ঝুর্ডীসের সখী Dagnyকে বিবাহ করিয়া অদ্ভুত নিঃস্বার্থপরতার পরিচয় দিল। সিগুরও যে ঝুর্ডীস্‌কে ভালবাসিত, ইহা ঝুর্ডীসের অবিদিত ছিল। গুণারকে বিবাহের পর ঝুর্ডীসের হৃদয়ের ভিতর তুষের আগুন জ্বলিতে লাগিল। হায়, সে যাহাকে মন-প্রাণ দিয়াছিল, সে ব্যক্তি কেন তাহার হইল না! অতঃপর যখন জানিতে পারিল, সিগুড়ও একসময় তাহাকে ভালবাসিত—তখন সেই আহতা নারী দলিতা ফণিনীর ন্যায় সিগুরকে বলিয়াছিল—

"I have been homeless in the world from the day that you took another to wife. Ill was that deed of yours. All good gifts may man give to his truthful friend,—all,but not the woman he holds dear. When he does, he breaks the thread that the Norns have spun and wastes two lives."

অর্থাৎ "যেদিন হতে তুমি আর একজনকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছ, সেদিন হতে এ জগতে আমি গৃহহীনা হইয়াছি। সে কাজ তোমার পক্ষে বড়ই অসৎ হয়েছে। মানুষ তাহার বিশ্বস্ত বন্ধুকে যা'-কিছু উত্তম দ্রব্য উপহারপ্রদান করতে পারে, সব দিতে পারে, কেবল দিতে পারে না সেই নারীকে, যাহাকে সে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে। যদি সে তেমন কায করে, অদৃষ্ট যে সূত্রকে বেঁধেছিল, সে তা' ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং দুটী জীবনকে ধ্বংসের ভাগী করে।"

ঝুর্ডীস্ কিন্তু ইব্‌সেনের প্রকৃত নারীর স্বরূপ নহে। সে ভালবাসিয়া ক্রীতদাসী হইতে চায়,—প্রেমের দুর্ব্বলতা লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। তাহার অপোষ্য প্রকৃতিতেও একটা ভালবাসার কোমলতা ছিল। সিগুরকে পাইলে সে সুখী হইত—সিগুরের দাসী হওয়াই তাহার সাধ ছিল ; কিন্তু দাসীত্ব ইব্‌সেনের আদর্শ নহে।

"Emperor and Galilean" নাটকটী তেমন শৃঙ্খলাবদ্ধ না হইলেও, ইহার কয়েকটী অংশ বড়ই সুন্দর। ইহাতে গেলিলিয়ানগণের দ্বারা দার্শনিক সম্রাট্ Julianএর পরাভব-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার জীবদ্দশায় পৌত্তলিকতা উঠিয়া গিয়া খৃষ্টধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তৃত হইতেছিল ; কিন্তু Julien আর একটী ধর্ম্মের সার্থকতা খুঁজিতেছিলেন এবং তিনিই যে সেই নব ধর্ম্মের একমাত্র স্বর্গীয় প্রতিনিধি, ইহাও কল্পনার চক্ষে দেখিতেছিলেন। ইঁহার তৃতীয় ধর্ম্ম হইতেছে—'the reconciliation between nature and spirit, the return to nature through spirit : that is the task for humanity.' অর্থাৎ প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে একটা সম্মিলন বা সামঞ্জস্য এবং আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করা, ইহাই হইতেছে মানবতার প্রকৃত কর্ত্তব্য। "Retournou's a la nature."

অতঃপর Julianএর বন্ধু Maximus এই মর্ম্মে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন যে, সেই তৃতীয় রাজ্য আসিবে ; মানবের আত্মা আর একবার তাহার উত্তরাধিকার গ্রহণ করিবে। Julian কৃতকার্য্য হন নাই ; কারণ, তিনি দুর্ব্বল এবং তাঁহার উদ্দেশ্য-সফলতার সময় তখনও আসে নাই। 'Thou hast conquered,O Galilean !' এই বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন।

এইবার আমরা ইব্‌সেনের নাট্য-কাব্য 'Brand'এর বিষয় উল্লেখ করিব। ইহাতে তাঁহার অসাধারণ কল্পনা-শক্তি বিশেষ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। য়ূরোপে 'Brand'এর আদর সর্ব্বত্র। এক জার্ম্মাণীতেই ইহার অনুবাদক চারিজন। নায়ক Brand আদর্শরক্ষার জন্য কিরূপভাবে আত্মবলি দিয়াছিলেন, তাহারই জ্বলন্ত নিদর্শনে ইহা পূর্ণ। সকল বাধা-বিঘ্নের মাঝে Brandএর আদর্শ ছিল,"All or nothing." এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া Brand কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হইয়াছিলেন। তিনি বিবেক-প্রবুদ্ধ কর্ত্তব্যপালনে সকলরকম সাংসারিক সম্বন্ধও ত্যাগ করিতে বিচলিত হইতেন না। এই নাট্যকাব্যের প্রারম্ভেই আমরা চরমপন্থী Brandকে এক তুষারাবৃত বিষাদান্ধকারময় অসূর্য্যম্পশ্য উপত্যকাভূমির যাজক-(pastor) রূপে দেখিতে পাই। তিনি তথাকার অধিবাসীদিগের ভিতর তাঁহার নব ধর্ম্মাদর্শ বিস্তার করিতেছিলেন। সেই কার্য্যে Agnesনামক এক ভক্তিমতী ও প্রেমময়ী নারী তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। তথায় Brand, Agnesকে বিবাহ করেন ও তাঁহাদের একটি সন্তান জন্মে ; কিন্তু সেই সূর্য্যালোকহীন স্থানে শিশু-সন্তানটি অল্পকালমধ্যেই তাঁহাদের ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। ইহার চতুর্থ অঙ্কটীর একটী দৃশ্য বড়ই করুণ রসে পূর্ণ। প্রথম-বাৎসরিক স্মৃতিরক্ষার দিবসে বড়দিনের এক সন্ধ্যায় Brand তাঁহার স্বর্গগত সন্তান Alfএর শেষ স্মরণ-চিহ্নটুকুও এক ভিখারিণীর শিশুর জন্য বিলাইয়া দিতে Agnesকে অনুরোধ করেন। Ibsen এমনইভাবে এই দৃশ্যটী বর্ণনা করিয়াছেন যে, পড়িলে বাস্তবিকই চক্ষে জল আসে। কর্ত্তব্যের কাছে Brand দাতাকর্ণের ন্যায় সকলই দিতে সমর্থ ছিলেন। সেই ভিখারিণীর পরিচ্ছদহীন শিশুটীকে শীতার্ত্ত দেখিয়া Brandএর মনে কর্ত্তব্য ও করুণা জাগরূক হইল এবং আপনার শিশুর সযত্নরক্ষিত শেষ স্মৃতিটুকু বিসর্জ্জন দিয়া তবে তিনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে সন্তান-স্নেহ-কাতরা Agnes ইহলোক হইতে বিদায়গ্রহণ করেন। অবশেষে Brand সেই পার্ব্বতীয় দলের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পর্ব্বতের মধ্যে আশ্রয় লন। তথায় তিনি এক নিরাশ্রয়া পাগলিনীকে দেখিতে পান। পাগলিনী তাঁহাকে কণ্টক-মুকুট-মণ্ডিত খ্রীষ্ট ধারণা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। অতঃপর এই ত্যাগী বীর ভগ্ন হৃদয়ের অসম্পূর্ণ আদর্শ লইয়া বরফ-স্তূপ-দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শেষ দৃশ্যে তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস একমাত্র Learএর মর্ম্ম-বেদনার সঙ্গেই তুলিত হইতে পারে। আদর্শের জন্য আত্মদানই এই নাটকটীর নীতি এবং ভিত্তি। চরমপন্থী হইলে সৎকার্য্যেও যে বিফল হইতে হয়, ইহাই ইব্‌সেনের ইহাতে দেখাইবার উদ্দেশ্য।

এইবার আমরা নরওয়ের জাতীয় কাব্য "Peer Gynt"এর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। ইহার নায়কের নামই Peer Gynt. ইনি অধিক মাত্রায় কাল্পনিক ও নিজের বুদ্ধির উপর বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। তাঁহার উচ্চাভিলাষের কূল-কিনারা ছিল না ; অথচ তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধিও বড় কম ছিল না। ইনি আমেরিকায় যান এবং দাস-ব্যবসা ও চীনদেশে পুতুল প্রেরণ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। এই অসৎ উপায়দ্বারা ধনী হওয়ার জন্য তিনি আর একটি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই সৎকর্ম্মের অন্তরালেও তাঁহার ব্যবসায়িক বুদ্ধি সুন্দরভাবে ও বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল। তিনি 'রম'-মদ্য ও 'বাইবেল'সহ ধর্ম্ম-প্রচারক (missionaries) পাঠাইয়া, দাস-ব্যবসা ও চীনদেশে পুতুল-প্রেরণরূপ অধর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিবেককে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। এইরূপ ব্যবসা চালাইয়া নানারূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনের পর Cairo নগরের পাগলা-গারদে তাঁহার দিন কাটিতে থাকে। জীবনের সেই কল্পনাতীত পরিণামে তিনি বুঝিতে পারেন যে, একমাত্র আত্মম্ভরিতা এবং অপরের বাক্য-অবহেলাই তাঁহার এবম্বিধ দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে। তিনি তথায় সম্রাট্ (emperor of himself) বলিয়া ঘোষিত হন এবং শিরোদেশে খড়ের মালা-দ্বারা সম্মানিত হন। এইরূপে এখানে তাঁহার আত্মশক্তি ও দম্ভের চূড়ান্ত হইয়া যায়। শেষদশায় পক্ককেশ-সম্বলিত বার্দ্ধক্য লইয়া তিনি নরওয়েতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া Solvieg নামে তাঁহার যৌবনকালের পরিত্যক্তা এক বালিকাকে বিবাহ করেন। অবশ্য Solvieg তখন বালিকা ছিল না ; সে বৃদ্ধা হইয়াও Peer Gyntএর আশাপথ চাহিয়াছিল। বৃদ্ধা Solvieg তাহার এই বৃদ্ধ প্রিয়তমটীকে অভ্যর্থনা করিতে মৃত্যু-দোলার একটী ঘুম-পাড়ান গান (cradle-song) গাহিয়া এই কাব্যের শেষ দৃশ্য পূর্ণ করেন। নরওয়েতে "Peer Gynt" কাব্যের বিশেষ আদর। ইহা 'স্কাণ্ডিনেভীয়ান ফাউষ্ট' (faust) নামে অভিহিত হয়। কাব্য হইলেও, ইহা নাট্যাকারে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। স্বয়ং ইব্‌সেন Peer Gyntকে নরওয়েনিবাসিগণের প্রতিনিধি বলিয়া গিয়াছেন। তিনি এই কাব্যে অত্যধিক কল্পনা-প্রিয়তা ও দুর্ব্বল-চিত্ততার যথাবিহিত পরিণাম দেখাইয়া গিয়াছেন।

"The young men's league" নামক নাটকে Stensguard নামক এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাভিলাষী ব্যক্তির গতিবিধি

পর্য্যালোচিত হইয়াছে। Stensguardএর প্রকৃতি এবং চরিত্র নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির অনুরূপ হইলেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকারলাভ করিবার জন্য তাহার সমধিক উচ্চাভিলাষ ছিল; অথচ তাহার কোনরূপ কার্য্য-নির্ব্বাহ-শক্তি বা যোগ্যতা ছিল না। একমাত্র 'ভোট' সংগ্রহ করিয়া উচ্চ রাজনৈতিক অধিকারলাভ করিব, ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল। Young Men's Leagueই তাহাকে 'ভোট' দিত। Stensguard খুব বক্তৃতাবাগীশ ছিল ও বড় বড় কথাদ্বারা লোক নাচাইতে পারিত। এইরূপে কেবল বাক্যবীর হইয়া সে উচ্চ রাজপদ চালাইয়া আসিতেছিল। বলা বাহুল্য, আমাদের বঙ্গদেশেও আজ Stensguardএর ন্যায় বাক্যবীর ও 'ভোট'-প্রার্থীর অভাব নাই। ইব্‌সেন এই নাটকে রাজনৈতিক কৃত্রিমতা ও কপটতার বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ 'ভোট'দাতার দল ও Stensguardএর ন্যায় নেতাদ্বারা গণ-তন্ত্রের কোনপ্রকার উপকার না হইয়া বরং অনিষ্টই হইতেছে। এইস্থলে তাঁহার "An Enemy of Society" নামক নাটকের Dr. Stockmanএর উক্তিটী আমাদের স্মরণ হইতেছে। Dr. Stockman বলিয়াছেন—"A party is like a sausage-machine; it grinds all the heads together in in one mash." অর্থাৎ দলবিশেষের অভিমতের কোন মূল্য নাই; দল সব মস্তকগুলিকে একত্র করিয়া একই সংমিশ্রণে নিষ্পেষিত করে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং ইব্‌সেন য়ুরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা-সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যে উপনীত হন:—

"The coming time—how all our notions will fall into the dust then! And truely it is high time. All that we have lived on up till now, have been the remnants of the revolutionary dishes of the last century and we have been long enough chewing these over and over again. Our ideas demand a new substance and a new interpretation. Liberty, equality and fraternity are no longer the same things that they were in the days of the blessed Guillotine; but it is just this that the politicians will not understand and that is why I hate them. These people only desire partial revolutions, revolutions in internals—in politics; but these are mere trifles. There is only one thing that avails—to revolutionize people's minds."

অর্থাৎ, এমন যুগ আসিতেছে, যখন আমাদের বর্ত্তমান ধারণাগুলি সব ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে; বাস্তবিকই তাহা শ্রেষ্ঠ যুগ। বিগত শতাব্দীর বিদ্রোহসূচক খাদ্যাবশিষ্টের উপরই আমরা এক্ষণে জীবনধারণ করিতেছি এবং বহুকাল হইতে সেই সব উপাদান-সামগ্রী লইয়াই বারংবার চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছি। আমাদিগের আদর্শ এক্ষণে নূতন সত্তা ও নূতন ভাবের অভাব অনুভব করিতেছে। গিলোটীনের আশীর্ব্বাদের দিনে সাম্যমৈত্রী স্বাধীনতার যে অর্থ ছিল, এখন আর সেরূপ নাই; কিন্তু এইটাই রাজপ্রতিনিধিগণ বুঝিতে পারে না; তজ্জন্যই আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকি। এই সমস্ত ব্যক্তি কেবল আংশিক আন্দোলন—বহির্ম্মুখীন রাজনৈতিক আন্দোলনই জল্পনা করে; কিন্তু এসব অতি তুচ্ছ বিষয়। কেবল একটী বিষয় পাইলেই হইবে, তাহা মানবের মনকে উত্তেজনায় জাগ্রত করা।

ইব্‌সেনের এই কথাগুলিতে একটা গভীর অনুসন্ধিৎসা ও অন্তর্ম্মুখীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা, গণতন্ত্রবাদের দোহাই দিয়া কেবল মৌখিকতা ও কৃত্রিমতাকেই প্রশ্রয় দিয়াছে। স্বার্থসিদ্ধি এবং বিদ্বেষ-বুদ্ধিই এই সভ্যতার প্রাণ। ইহাতে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কেবল আবরণের উপর আবরণেই—ছদ্মবেশের উপর ছদ্মবেশেই ইহার পরিপুষ্টি। ইব্‌সেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই এই সব রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণের উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। তিনি জানিতেন, দল কেবল হুজুগের সৃষ্টি করে—ব্যক্তির শক্তি না পাইলে দল অগ্রসর হয় না। 'ডেমক্রেসি' কেবল মুখের কথা নহে—গণতন্ত্রবাদ-গঠনের অগ্রে ব্যক্তিত্ববাদ ফুটাইতে হইবে।

গণতন্ত্রবাদের (democracy) প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে, রাজ্যের প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যোচিত গুণে উন্নত করা। "To make every man in the land a nobleman" এই উক্তি আমরা ইব্‌সেনের "Rosmersholm" নাটকে Rosmerএর মুখে শুনিতে পাই; ইহাই তাঁহার ব্যক্তিত্ববাদের প্রকৃত সংজ্ঞা।

ইব্‌সেন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে G. Brandesকে লিখিয়াছিলেন—"The State must go. That will be a revolution, which will find me on its side. Undermine the idea of the state, set up in its place spontaneons action of the idea that spiritual relationship is the only thing that makes for unity and you will start the elements of a liberty which will be something worth possessing."

অর্থাৎ 'রাজ্যের প্রভাব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে' কেবল এইরূপ আন্দোলনের পক্ষেই আমাকে পাওয়া যাইবে। রাজধর্ম্মের আদর্শকে রসাতলে দাও এবং তাহার স্থলে আধ্যাত্মিক আদর্শ ও কর্ম্মানুরাগকে স্থাপন কর। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধই একমাত্র একতা-গঠন করিতে সমর্থ। এইরূপ করিলে তোমরা এমন একটি স্বাধীনতার উপকরণ লইয়া জীবন আরম্ভ করিবে, যাহা একটা পাওয়ার-মত-পাওয়া হইবে।

ইব্‌সেন য়ুরোপের বর্ত্তমান মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহা অনেকের পক্ষে রূঢ় হইলেও, সত্যের অপলাপ করিবার উপায় নাই। আমরা ইব্‌সেনের অনেক বাক্যের সঙ্গে একমত না হইতেও পারি এবং তাঁহার সম্প্রদায়হীন সত্য কালে প্রতিষ্ঠা না পাইতেও পারে; কিন্তু তিনি যে একজন নির্ভীক, স্পষ্টবক্তা ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর ভুল কি?

গণতন্ত্রবাদকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, অগ্রে উন্নত-স্বভাব নর-নারীর গঠন প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার অধিকার না দিলে ও তাহাদিগের বিকাশের পথ উন্মুক্ত না করিলে, গণতন্ত্রবাদ কখনই সার্থকতালাভ করিবে না—ইহাই ইব্‌সেনের ধারণা। আমেরিকান্ দার্শনিক কবি Walt Whitsmanএর এই মত। তাঁহার "Leaves of grass"এর অধিকাংশ স্থলেই বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য তাঁহার করুণ আবেদন।

"The pillars of the society" নামক নাটকে ইব্‌সেন য়ুরোপের বর্ত্তমান সামাজিক এবং পারিবারিক কপটতার উপর কশাঘাত করিয়াছেন। তথাকথিত যাজক ও শিক্ষক প্রভৃতি ধর্ম্মধুরন্ধর ও সমাজপতিদিগকে লইয়া তিনি তাঁহাদের কৃত্রিমতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "Love's comedy"তে, "Straamand" ও "Ghosts" নাটকে, "Manders" এবং "The pillars of the

society"তে Rorlund-চরিত্র একই ছাঁচে গঠিত; বিশেষতঃ, যাজক (clergyman)-চরিত্রকে ইব্‌সেন যৎপরোনাস্তি অপদস্থ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যতরূপ মিথ্যা ও ধর্ম্মভাণ যাজকগণের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

"The clergyman is for Ibsen the supreme representative and exponent of conventional morality." Havelock Ellis.

Rorland সৎ এবং বিবেকী ব্যক্তি হইলেও, নীতি-সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান নিতান্ত মামুলী ও বাহ্য ধরণের ছিল। কোনরূপ নূতন চিন্তা বা আদর্শকে সে ধারণা করিতে পারিত না। পুঁথিগত বিদ্যায় যাহা চিরদিন হইয়া আসিতেছে, তাহাতেই সে অভ্যস্ত ছিল—তাহার অতিরিক্ত সে জানিবার আবশ্যকতা মনে করিত না।

"Ghost" নাটকের Pastor Manders-চরিত্রটী Rorlandএর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়। সমাজ-নীতিতে তাহার নানারূপ পড়া-শুনা ও বাহ্য অভিজ্ঞতা-অধিকার থাকিলেও, জীবনের কোনরূপ সত্য ঘটনার মধ্যে পতিত হইলে কিংবা কাহারও মহৎ চিন্তা বা আবেগ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সে অমনই তাহাতে কাপুরুষতা প্রকাশ করিত। এই জন্যই Mrs Alving, যাজকপ্রবর Mandersকে বালকের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। (আমার "Ghost"এর বিস্তৃত সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। খ্রীষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধে ইব্‌সেনের ধারণা বড় প্রীতিদায়ক নহে; বিশেষতঃ, পাদ্রীর পৌরহিত্যের উপর তিনি একান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। একমাত্র খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মের অন্তরালে এত পাপ আর কোন ধর্ম্মে অনায়াসে এবং নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয় না, ইহাই ইব্‌সেনের অভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল। "Emperor and Galilean" নাটকে Julianএর মুখ দিয়া ইব্‌সেন খ্রীষ্টধর্ম্মের অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন; যথা,—

"You can never understtnd it—you, who have never been in the power of this God-man. It is more than a doctrine, which he has spread over the world; it is a charm, which has fettered the senses. Whoever falls once into his hands, never becomes quite free again. We are like vines planted in a foreign unsuitable soil; plant us elsewhere and we shall develop; we degenerate in this new earth."

"A Doll's House" নামক নাটকে ইব্‌সেন য়ুরোপের বিবাহ-প্রথার কৃত্রিমতা দেখাইয়াছেন। স্বামীর দুর্ব্বলতা নারীজাতিকে কিরূপ আত্মসম্মানহীনা করিয়া তোলে, এই নাটকের নায়িকা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ নারীদিগের দুর্গতির কথা এই নাটকে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে এই নাটকের নায়িকা লোরা স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহের মিথ্যাদর্শ হইতে অব্যাহতি পান। (মল্লিখিত ইহার বিস্তৃত সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। ইব্‌সেনের সকল নারী-চরিত্রগুলিই অপূর্ব্ব প্রতিভাসমন্বিত। পুরুষের অধীনতায় পড়িয়া স্ত্রীজাতি জীবনে প্রকৃত বিকাশের সুবিধা পায় না—ইহাই নাট্যকার লোরা-চরিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন।

"A Doll's House" যেমন বিবাহ-বিভ্রাটের ইতিহাস, "Ghosts" নাটকটী তেমনই বিবাহজনিত বিষময় ফলের সকরুণ পরিণাম। পিতৃদত্ত পাপের উত্তরাধিকারী হইয়া পুত্রের যে কি পরিণতি ঘটে, তাহারই মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে এই প্রেত-নাটক পূর্ণ। এই প্রেত-চিত্র যেন ঐ পুতুল-ঘরেরই পরিণাম! Oswald ধরাতলে যে কয়টা দিন বাঁচিয়াছিল, তাহার পিতার প্রেতমূর্ত্তিতেই বিচরণ করিয়াছিল। "Ghosts" নাটকেই ইব্‌সেনের নাট্য-প্রতিভার চরম বিকাশ। এই জগৎটাই যে কেবল ভূতের নর্ত্তনাগার, ইব্‌সেন ইহার ভিতর হইতে এই বৈজ্ঞানিক রহস্যও ভেদ করিয়াছেন। Mrs-Alving, Pastor Mandersকে বলিয়াছিল—

"I almost think that we are all ghosts, Pastor Manders: It is not only what we have inherited from our father and mother that 'walks' in us,—it is all sorts of dead ideas of lifeless old beliefs and so forth."

এই সব সংস্কারসমূহের কোন প্রাণ না থাকিলেও, আমরা তাহাদের মোহ ছাড়িতে পারি না—জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই সব বংশগত পাপ ও দেশগত কুসংস্কার স্রোতের ন্যায় আমাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করে।

"An enemy of society" নামক নাটকে Dr. Stockmanএর চরিত্র একটী আদর্শ। যখন তিনি শাস্ত্রাধ্যক্ষ হইয়া দেখিলেন, Bathsএর জল বিষাক্ত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা নগরের অধিকারিগণের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতে পারে, তখন তিনি তাহা গোপনে রাখিলেন না; তিনি স্বার্থের দিকে না চাহিয়া সাধারণকে জ্ঞাপন করিলেন। এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কটী Dr. Stockmanএর হৃদয়ের মহত্ত্বের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয়। "The strongest man is he, who stands alone"—ইব্‌সেনের এই উক্তিটী Dr. Stockman-চরিত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

'The wild duck' নাটকখানি ইব্‌সেনের অন্ধ ভক্তদিগের উদ্দেশ্যেই লিখিত। "An Enemy of the People" পর্য্যন্ত ইব্‌সেন পুরাতনের সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। "The wild duck" নাটকে কবি নূতনের উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহা কবির একটী আত্ম-পরীক্ষা-বিশেষ; কারণ, তিনি তাঁহার ভ্রান্ত, পক্ষপাতী Ibsenitদিগকে ইহাতে বিশেষভাবে হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। আশাকরি, বাঙ্গালী Ibseniteরাও এই 'বন্য হংসী'টীকে তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিবেন। যে কবি নিজের উপর কলম চালাইতে পারেন—নিজের প্রসার-প্রতিপত্তির হানি করিয়াও সত্যের অনুসন্ধান করেন, তিনি একজন সাধারণ কবি নহেন। 'বন্য হংসী' রচনা করিয়া ইব্‌সেন যেন আপনার পূর্ব্বরচিত নাটকগুলিকেই পরিহাস করিয়া গিয়াছেন। তিনি খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কবিতা বা নাটক লিখিতেন না; তিনি বলিতেন—"To write poetry is to hold a doomsday over oneself." তিনি আর একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন—"All that I have written corresponds to something that I have lived through, if not actually experienced. Every new poem has served as a spiritual process of emancipation and purification." কবে বাঙ্গালার উদীয়মান কবিরা ইব্‌সেনের আদর্শে এইরূপ আধ্যাত্মিক মুক্তি ও পবিত্রতার বশবর্ত্তী হইয়া যথার্থ সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হইবেন! ইব্‌সেনের অনুকরণ করিতে হয় ত এইরূপভাবেই করা উচিত। হায় দুরাশা! অনেকেই ইব্‌সেন হইতে চায়, কিন্তু ইব্‌সেনের ন্যায় হৃদয় খুলিয়া দেখাইবার ক্ষমতা বাঙ্গালার কয়জন শক্তিধর লেখকের আছে? এই 'বন্য-হংসে' ইব্‌সেন তাঁহার শত্রুদের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে যেন তিনি তাঁহার 'পুতুল-ঘরে'র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন! তিনি দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাকে ভুল করিয়া বুঝিলে, সংসারে বড়ই অনর্থ উপস্থিত হয়। Gregers

Werle এই নাটকের নায়ক ; ইনি একজন ইব্‌সেনের অন্ধ ভক্ত। বহুদিনের পর তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অবগত হন যে, তাঁহার পিতারই একজন প্রণয়-পরিত্যক্তা রমণীর বিবাহ তাঁহার এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রমণী, তাহার পুরাতন বন্ধুর নিকটে বিবাহের অগ্রে এ ব্যাপারের কিছুই উদ্ঘাটিত করে নাই। Gregers বুঝিলেন, ইহা বড় অন্যায় ; এইরূপ বিবাহ সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। Gregers তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি এই মিথ্যা বিবাহের নিশ্চয়ই মূলোচ্ছেদন ঘটাইবেন এবং প্রকৃত বিবাহ কাহাকে বলে, তাহারই নিদর্শন প্রদান করিবেন। ঐ নারীর উদ্ধারসাধন করিবার অভিপ্রায়ে ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শ দেখাইতে গিয়া Gregers উহাদের সাংসারিক অশান্তি আনয়ন করিলেন। ঐ নারীর দুর্ব্বলচিত্ত স্বামী Gregersএর আদর্শ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইল। সে Gregersএর মুখে তাহার স্ত্রীর বিষয় অবগত হইয়া বড়ই অসম্মান বোধ করিল। তাহার স্ত্রীও অবশেষে স্বামীর বিরক্তি-ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া আত্মহত্যা করিল। Gregrsএর বিবাহাদর্শের পরিণাম এইরূপে বিষাদে পরিণত হইল। এই নাটকে ইব্‌সেন দেখাইতেছেন যে, একই আদর্শ সকল পাত্রে খাটে না ; আদর্শ চালাইতে হইলে, অগ্রে ব্যক্তির প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। ইব্‌সেনের দৃঢ় অভিজ্ঞতা এই যে, "All vital development must be spontaneous and from within, conditioned by the nature of the individuals." এইটী আমাদের তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেবল পুরাতনেরাই নারীজাতির শত্রু নহে, নূতনেরাও নারীজাতির শত্রু। ইব্‌সেনের Gregers Werle ও Bernick-চরিত্রদ্বয় তাহার জলন্ত-নিদর্শন। ইব্‌সেনের ইংরাজ-সমালোচক, "The Quintessence of Ibsenism"এর গ্রন্থকার Bernard Shaw এই তথ্যটী বিশেষরূপে ধরিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন—"Woman has two enemies to deal with—the oldfashioned one, who wants to keep the door locked and the new-fashioned one, who wants to thrust her into the street before she is ready to go." বঙ্গীয় অনভিজ্ঞ সমাজ-সংস্কারকদিগকে আমি Shaw-এর এই সৎযুক্তিটী তলাইয়া বুঝিতে অনুরোধ করি। হঠকারিতার বশে Gregersএর ন্যায় ভাল করিতে গিয়া তাঁহারা অধিকাংশ স্থলে সমাজের মন্দ করিয়া বসেন। পুরাতনের সঙ্কীর্ণতা এবং নূতনের উচ্ছৃঙ্খলতা, এই উভয়-ভাবই যে নারী-জীবনের ; সুতরাং সমাজ-জীবনের প্রধান অন্তরায় ; ইহা আমিও স্বীকার করি। পরবর্ত্তিকালে এই নাটকগুলি বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করিবার আমার বাসনা রহিল ; কারণ, ইহা ইব্‌সেনকে বুঝিবার একটী প্রধান সহায়।

ইব্‌সেনের আরও অনেকগুলি নাটক আছে ; কিন্তু তাহাদিগের ভিতর ইব্‌সেনের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিবার বিশেষ কিছুই নাই ; তজ্জন্য আমি তাহাদিগের বিষয় উত্থাপন করিয়া প্রবন্ধ দীর্ঘ করিতে চাহি না।

ইব্‌সেনের নাট্য-রচনা-পদ্ধতির একটী রহস্য এই যে, তিনি যে-কোন চরিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই জ্বলন্ত এবং জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক চরিত্রই যেন পাঠকের সম্মুখে অভিনয় করিয়া থাকে—পাঠকও যেন দর্শক হইয়া যায়! এক একটী নাটক যেন পড়িবার কালেও রঙ্গভূমির আকার ধারণ করে এবং পাঠকও যেন অভিনেতা হইয়া যান! ইব্‌সেনের সামান্য চরিত্রটীও পাঠক বা দর্শককে ভাবিবার অনেকখানি বিষয় দিয়া যায়। ইব্‌সেন স্বয়ং তাঁহার নাট্য-সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "The illusion, I wish to produce is that of truth itself. I want to produce upon the reader, the impression that what he is reading is actually taking place before him. কেবল ব্যঙ্গ-রসিকতাতেই ইব্‌সেনের নাট্যসমূহ উদ্ভাসিত নহে ; তিনি তাঁহার প্রত্যেক রচনার ভিতর দিয়া সমাজকে তন্ন তন্ন করিয়া উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন এবং পরিহাসের পরিবর্ত্তে অনেক অট্টহাসি হাসিয়া গিয়াছেন—তাঁহাকে ব্যঙ্গচ্ছলে অনেক অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হইয়াছে। তাঁহার প্রকৃতি হাস্য-রসের আদৌ পক্ষপাতী ছিল না—তাঁহার হাসিতেও একটা তীব্র কশাঘাত অনুভূত হইয়া থাকে এবং সেই হাসির বিষে সামাজিক ভণ্ডদিগকে ছট্‌ফট্ করিতে হয়।

তাঁহার প্রত্যেক নাটকখানিই অতি গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তিনি স্বমুখেই তাঁহার গ্রন্থসমূহকে 'Deeds of night' বলিয়া গিয়াছেন। যাহা তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা-ধ্বনিত উত্থিত হইয়াছেই, নিন্দাবাদও বড় কম হয় নাই। বিয়রন্সনের ন্যায় তিনি স্বদেশে তেমন বিমল খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। বিয়রন্সন তাঁহার স্বদেশের উজ্জ্বল দিকটাই ফুটাইয়া গিয়াছেন ; কিন্তু ইব্‌সেন্‌কে মানব-জীবনের হাহাকার, দুর্ব্বলতা ও অন্ধকারের দিকটাই ফুটাইতে হইয়াছিল। বিয়রন্সন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের ভূমিতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ; ইব্‌সেন দ্বন্দ্বের সন্দেহ-দোলায় আপনাকে আজীবন দোদুল্যমান রাখিয়াছিলেন। তিনি ঘড়ীর Pendulumএর ন্যায় স্থিরতালাভ করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে তাঁহার চিন্তাগুলি য়ূরোপীয় খৃষ্টীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে কার্য্যে পরিণত হইবে কি না বলিতে পারি না—হয় ত Brand বা Julianএর মত তাঁহার আদর্শগুলি হতাশার আক্ষেপে পর্য্যবসিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে সদুদ্দেশ্য লইয়া জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য এবং শুভকামী ব্যক্তিদিগকে আজিও যেমন আকর্ষণ করিতেছে, ভবিষ্যতেও তেমনই করিবে।

আর একটী কথা—মানুষ যদি মানুষ হয়, তবেই ইব্‌সেনের আদর্শে সুফল ফলিবে। সে অনেক দূরের কথা। 'ব্যক্তিত্ববাদ' কথাটী বড় মিষ্ট শুনায় ; কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে পরিণত করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। ব্যক্তিত্ববাদের দোষ-গুণ অনেক। তাহাতে হয় মানুষ দেবতা হয়, নয় হিংস্র পশুরও অধম হইয়া থাকে। আবার এই ব্যক্তিত্ববাদ নারী-জীবনের ভিতর দিয়া বিকসিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ব্যক্তিত্ববাদ যতই প্রবল ভাব ধারণ করে, ততই পারিবারিক ও সামাজিক জীবন শিথিল হইয়া পড়ে, স্বার্থপরতা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে সর্ব্বব্যাপী ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে। ব্যক্তিত্ববাদে সহধর্ম্মিণী গঠিত না হইয়া বরং প্রতিধর্ম্মিণী গঠিত হয়—সহযোগিতার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতা পাইয়া বসে—সমগ্র য়ুরোপ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ব্যক্তিত্ববাদ-আদর্শের অধিকারী অনধিকারী-ভেদ আছে—ইব্‌সেন তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মানবের স্বভাবই বহির্মুখীনতা, বিষয়াসক্তি। প্রকৃত ব্যক্তিত্ববাদ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান সকলের সৌভাগ্য নহে ; উহা আয়াস-লব্ধ সাধনা। ইব্‌সেনের ব্যক্তিত্ববাদ চরিত্রের আভিজাত্যের (aristocracy of character) উপরই প্রতিষ্ঠিত। সে চরিত্রের

বল রক্ষা করিতে য়ুরোপের নারী-সমাজ কতদূর অগ্রসর ও উন্নত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু ভারতবর্ষের পর্ণ-কুটীরে আজিও সতীর তেজের অভাব নাই। সতীত্বের মর্য্যাদা ভারতের হিন্দুনারী যতটা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে, এমন বোধ হয় আর কোন সমাজে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইব্‌সেন কি চাহিয়াছেন? ইব্‌সেন যাহা চাহিয়াছেন, ভারতবর্ষ তাহা বহুপূর্ব্বেই সফল করিয়াছে। ইব্‌সেন বলিতেছেন—"I do not mean the aristocracy of birth or of the purse or even the aristocracy of intellect. I mean the aristocracy of charecter, of will, of mind. ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় অন্বেষণ কর, দেখিবে ইব্‌সেনের স্বপ্ন এই নিষ্কাম ধর্ম্মরাজ্যে কিরূপ সত্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখনও অগণ্য সাধু ও সতীর পদধূলায় এই ভারতভূমি পবিত্র রহিয়াছে। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল বন্যায় ও মারীচী মায়ায় আমাদের কুটীর হইতে অনেক ধর্ম্মভাব শিথিল হইতে বসিয়াছে, তবুও এখানে চরিত্রের আভিজাত্য এখনও যেরূপ রহিয়াছে, পৃথিবীর আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় না। ভারতের একটা বারবিলাসিনীর মনেও যে ধর্ম্মভাব আছে, একটা আণ্ডামানের কয়েদীর মনেও যে ঈশ্বর-ভক্তি আছে, তাহা অন্যত্র বিরল, কল্পনাতীত সমস্যা। য়ূরোপে যে ব্যক্তিত্ববাদের ধুয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকৃত ব্যক্তিত্ববাদ নহে, ব্যক্তিত্ববাদের বিকার।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিবাহাদর্শে সহস্র শিক্ষা-দীক্ষা সত্বেও 'বিশ্বাস'-বস্তুটা ক্রমশঃই উঠিয়া যাইতেছে। নর-নারী-মিলন-ক্ষেত্রে পুতুল-ঘরেরই সৃষ্টি হইতেছে। বিবাহদ্বারা জগতের কল্যাণ যত হউক আর না হউক, যে যাহার নিজের দাবী লইয়াই ব্যস্ত ; অথচ ইব্‌সেনের মতে পরস্পরের বিশ্বাস এবং সম্মতি ব্যতীত প্রকৃত বিবাহ হয় না।

এই বিশ্বাস এবং মনোভাব এক করিবার জন্য আমাদিগের দেশে নর-নারী-হৃদয়কে যৌবনের প্রারম্ভেই ব্যথার ব্যথী, সাথের সাথী করিয়া দেওয়া হয়—দায়িত্ব এবং সতীত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। স্বামীর দায়িত্বজ্ঞান এবং স্ত্রীর সতীত্বজ্ঞান বিকাশলাভ করিলেই, তাহা হইতে বিশ্বাস এবং সহযোগিতা (Co-operation) ফুটিয়া উঠে। নর-নারীর মধ্যে এই জীবন-মরণ-সম্বন্ধ ও বিশ্বাস জন্মাইতে য়ূরোপকে অনেক বেগ পাইতে হইবে। নারীকে সহস্র অধিকারে ভূষিত করিলেও, এই সুদুর্লভ বিশ্বাস য়ূরোপে ফুটিয়া উঠিবে না। আমরা মূর্খ এবং ভিখারী হইয়াও আমাদের স্ত্রীকে যতটা বিশ্বাস করিতে পারি, পাশ্চাত্য জাতি আমাদের অপেক্ষা সহস্রগুণ চতুর ও বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও, তাহাদের স্ত্রীকে বিশ্বাস করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারে না ; কারণ, তথায় doll's houseএরই মাহাত্ম্য অধিক—'সখি, আমায় ধর ধর' এই ভাবই তথাকার নারী-সমাজের জীবনে সমধিক ; কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুনারীর ভাব সেকালের 'নিধুর টপ্পা'য় সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমারও স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে ॥"

হিন্দুনারীর প্রেম-ধর্ম্মের এই সুমহান্ আদর্শ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ নিঃস্বার্থ-প্রেম-ধর্ম্মই নারীর সতীত্বকে সুদৃঢ় করে—এইরূপ প্রেম-ধর্ম্মই নারীকে বিশ্বহিতে নিয়োজিত করে। সতীর তেজে স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, স্বাতন্ত্র্য আছে। সতী-নারীর প্রভুত্ব বা আধিপত্য হিন্দু-সংসারে বড় কম নহে। চরিত্রের অভিজাত্যই যদি ইব্‌সেনের ব্যক্তিত্ববাদের প্রধান লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে ভারতের হিন্দুনারী অনাদিযুগ হইতে তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আসিতেছে।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

পুত্রহারা

সেদিন শ্রাবণ-নিশি নিবিড় ভীষণ ;—
বাদলের গলা ধরি মত্ত প্রভঞ্জন
করে সে কি দৈত্য-লীলা! আতঙ্কে গভীর
শিহরে চরণে ধরা চঞ্চল অধীর।
বক্ষে শত মহীরুহ সুবিপুল কায়
ঘূর্ণবায়ে বিপর্য্যস্ত আছাড়ি লুটায়।
সে কি ছবি ভয়ঙ্কর! নিবিড় আকাশ
বিলসি বিদ্যুৎ-নাচে, হাসে অট্টহাস।
অমনি অশনি হানে। চূর্ণিতে বিমান,
একত্রে হুঙ্কারে যেন হাজার কামান!
অদূরে ভীষণ মূর্ত্তি ভৈরব উন্মাদ,
উত্তুঙ্গ তরঙ্গমুখে গরজে নিনাদ ;
প্রলয়ের শঙ্খ যেন ফুকারে শঙ্কর!
তীরভূমি ভীতিমূঢ় কাঁপে থর থর।
* * *
অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাময়ী এ ঘোর নিশায়
কে আসি বিজন তটে থমকি দাঁড়ায়!
রণমত্ত বায়ুবেগে শিথিল অঞ্চল
চঞ্চলি উড়িয়া যায়। দৃষ্টি অচঞ্চল।
মুখে সুধু—'বাছা মোর ওই ভেসে যায়'—
বলিয়া অমনি নারী মিলা'ল কোথায়!
উল্লাসে নাচিল ঊর্ম্মি ঊর্ম্মির উপর,
উপরে গর্জ্জিল ব্যোম প্রলয়ের স্বর।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারত-তীর্থ

১

কৈলাস ত্যজি যেথায় কাশীতে শম্ভু রচিল নিত্যধাম,
ললাটিকা শিশু শশীর বৃত্তে মণিকর্ণিকা নয়নারাম,
বৈকুণ্ঠের বৈভব হরি গয়ায় পঙ্গু বিলায়ে পদ,
বায়ান্ন পীঠে দেহ রাখি দেবী সাজাল' যে দেশ মনের মত,
রাস-রসালস প্রেমিক-প্রধান কৃষ্ণের-রচা বৃন্দাবন,
মথুরা, দ্বারকা, গোকুল, যমুনা যে দেশের সেরা তীর্থধন,
মন্দাকিনীর জল-তরঙ্গ শিব-জটা হতে ধরণী'পর,
হরিদ্বারের শিলায় লুটায়ে বহায় যেথায় পাবন বর—
যে দেশে দেউল, মঠ, মন্দির, মস্‌জিদ্, কোটি গির্জ্জা আর,
জগতের প্রেমরসায়ন সেই শ্রেষ্ঠ তীর্থে নমস্কার।

২

ধর্ম্মের গ্লানি নাশিয়া কৃষ্ণ স্থাপিতে জগতে পুণ্য-সেতু,
পাপীর শোণিতে রঞ্জিল মহী রোপিয়া বিশ্বে ধর্ম্মকেতু,
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম নিল যুগব্যাপী কানন-বাস,
দ্বিজ-চণ্ডাল, কপি-রাক্ষসে বুকে চাপি যার মেটেনি আশ,
দয়াপ্রবুদ্ধ করিতে অবনী রাজার পুত্র বুদ্ধ-রূপ,
করুণা-নিষেকে নির্ব্বাণ-বেদ রচিয়া উঠা'ল হিংসা-যূপ,
যেথায় তরুণ শঙ্কর এল মোহ-মুদ্গর হস্তে সেজে,
'সোহহং'-মন্ত্রে বিশ্ব-বীণায় নবসুর এক উঠিল বেজে—
যে দেশে দেউল ইত্যাদি

৩

তুণীর, কৃপাণে পথ কাটি এল মোহম্মদের দীক্ষা-দান,
রাজার মতন নিল ঠাঁই, হ'ল শান্ত অযুত পিপাসু প্রাণ,
তারপর সেই প্রেমের বন্যা সমভূমি করি উচ্চ-নীচে,
প্রচারিল গোরা নূতন তন্ত্র সুধু হরিনাম-মন্ত্র-বীজে,
নানক-বীরের শিরায় রক্ত, করে দিয়া অসি অলাঞ্ছন,
দানিল শিখেরে গুরু গোবিন্দ ধ্বনিতে অলখ নিরঞ্জন,
যবন কবীর হিন্দুর সেরা দোঁহায় বাঁধিল একত্তরে,
চির-হিংসিত দ্বিষ্ট দু'জাতি পরমানন্দ গানের স্বরে—
যে দেশে দেউল ইত্যাদি

৪

শ্রীরামমোহন, ঋষি দেবেন্দ্র, কেশব ত্রিধারা প্রয়াগ-রূপ,
ছুটাইল মহা ত্রিবেণী যেখানে ধূয়ে পঙ্কিল আবিল স্তূপ,
অদ্বিতীয়ের ওঙ্কার-গীতি বেদের সূক্তি গায়িল যেথা,
দয়ানন্দের আর্য্যধর্ম্ম নব গৌরবে গড়িল হেথা,
রামকৃষ্ণের সকল ধর্ম্ম মথিত সুধা অমৃত-বাণী,
সৃজিল বিপুল ধর্ম্মক্ষেত্র লয়ে অবনীর সকল প্রাণী,
আলোড়ি বিশ্ব বিলাসী প্রাচ্যে বেঁধে আনি দিল যে গুরু-পায়,
জগজ্জয়ী সে বিবেকানন্দ এ মহাতীর্থে প্রকাশ পায়—
যে দেশে দেউল ইত্যাদি

৫

অৰ্দ্ধ পৃথিবী ব্যাপিয়া যাহার শাসন-রাজ্য-আসন পাতা,
হেথা সে খৃষ্টে পূজার লাগিয়া গৌরবে নত অযুত মাথা,
আদিম বন্য ওড্র জাতির মাঝারে কুম্ভ পটিয়া গুরু,
ভীম বৈ নামে গহন সর্জ্জ বিপিনে রচিল মন্ত্র চারু,
যেথায় সকল ধর্ম্ম মিলেছে উদ্গীত সব মন্ত্র সাম,
ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বেদী সে—শ্রেষ্ঠ তীর্থ ভারত-ধাম!
সকল মার্গ ভক্তি-পূজার নর-নারায়ণে ব্যাখ্যাকার,
জগতে শ্রেষ্ঠ তীর্থ-পীঠ সে, তীর্থমণি সে, নমস্কার।—
যে দেশে দেউল, মঠ, মন্দির, মস্‌জিদ্, কোটি গির্জ্জা আর,
জগতের প্রেমরসায়ন সেই ভারতবর্ষে নমস্কার।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তদর্পণং

সব আয়োজন সফল হল বৃন্দাবনের বনে—
কতক ছিঁড়ে, কতক ভেঙ্গে, কতক বিদলনে।
ফুলের মালা গেঁথেছিলাম সারা প্রভাত ধরি,
সফল হল রাধাশ্যামের বুকের মাঝে পড়ি।
গণ্ড'পরে পত্র-লেখা,
ললাট'পরে তিলক-রেখা,
চুম্বনেতে মুছে গিয়ে সফল হল, আহা!
যতন-করে-রচা বেণী,
ভালের 'পরে অলকশ্রেণী,
সফল হল শিথিল হয়ে,—রচেছিলাম যাহা।
আজ্‌কে শুভক্ষণে,
সব আয়োজন সফল হল বৃন্দাবনের বনে।

শ্রীকালিদাস রায়।

উদ্ভিদের কর্কট-রোগ

(CANCER).

কর্কট-ব্যাধি বা Cancer মানবজাতির মধ্যে যেরূপভাবে অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহা আলোচনা করিলে সত্যই শঙ্কিত হইতে হয়। সামান্য ক্ষত হইতে কিরূপভাবে "নালি-ঘা" হইয়া পরে Cancerএ পরিণত হয়, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই অবগত আছেন; কিন্তু অদ্যাবধি চিকিৎসা-শাস্ত্রে ইহার উৎপত্তি বা প্রতিকার-সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কোন তথ্যের কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পৃথিবীর চিকিৎসকগণ সেইজন্য গত দশবৎসরকাল যাবৎ বিশেষভাবে উক্ত ব্যাধি-নির্ণয়ে এবং তাহার প্রতিকারের আবিষ্কার-চেষ্টায় আপনাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। পৃথিবীর বিখ্যাত চিকিৎসকগণ স্ব স্ব বীক্ষণাগারে (Laboratory) এই অনির্দ্দিষ্ট এবং অজ্ঞাতকারণসম্ভূত ব্যাধির বিষয় লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। য়ুরোপ, আমেরিকা, জার্ম্মাণী ইত্যাদি বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ হইতে চিকিৎসকগণ কোন একটি বিশেষ সময়ে একত্র হইয়া উক্ত ব্যাধি নির্ণয়ের নিমিত্ত স্ব-স্ব পরীক্ষা-ফল ও গবেষণার সংবাদ ঐ মণ্ডলীতে জ্ঞাপন করিতেন। সুবৃহৎ পরীক্ষাগারে এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষকগণ এই কর্কটব্যাধির মূল কারণ অনুসন্ধানকল্পে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রচুর পরীক্ষাদ্বারা এবং পৃথিবীর নানা স্থানের নানা চিকিৎসকগণের গবেষণাদ্বারাও উক্ত ব্যাধির মূল তথ্য অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের রাজ্যে এতবড় একটি ভয়ানক ব্যাধির কারণ অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে মনে করিয়া আশ্চর্য্য হইবারই কথা; কিন্তু পণ্ডিতগণের গবেষণা ও প্রভূত ব্যয়সাধ্য পরীক্ষা ক্ষান্ত হইবার নহে।

Cancer জনসমাজে কিরূপ দ্রুতগতিতে প্রাণহানি করিয়া চলিয়াছে,তাহা আলোচনা করিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের জনসমাজের মৃত্যুহার পর্য্যালোচনা করিলে, কর্কট-রোগদ্বারা বাৎসরিক প্রতি দশ হাজার লোকসংখ্যায় যে নির্ভুল মৃত্যু-তালিকা পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইংরাজি ১৮৭১-১৮৭৫ সালে ৪৪৫ জন
" ১৯০১-১৯০৪ " ৮৬১ "।

পূর্ব্বোদ্ধৃত মৃত্যু-সংখ্যা লক্ষ্য করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ক্রমশঃই এই ব্যাধিজনিত মৃত্যু-সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯০১ সাল হইতে ১৯০৪ সালের ভিতরের মৃত্যু-সংখ্যা, ১৮৭১-১৮৭৫ সালের মৃত্যু-সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ; সুতরাং পাঠক-পাঠিকাগণ এই মৃত্যুহার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন, Cancer বা কর্কটরোগ কি অনুপাতে প্রতি দশহাজার জনসংখ্যায় বাৎসরিক বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। তথাপি ইহার কারণ চিকিৎসকগণের নিকট অবিদিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ পর্য্যন্ত এই রোগের বিষয়ে যে আলোচনা হইয়াছে, আমরা আজ তাহারই আলোচনা করিব।

কর্কটরোগ প্রাণীর দেহের সূক্ষ্ম জীবানুকোষের ব্যাধি। সমস্ত প্রাণীর দেহ অতি ছোট ছোট জীব-কণিকার (Protoplasm) সমষ্টিদ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। জীবের ভ্রূণ বা আদিজন্মাবস্থা ঐ Protoplasm নামক দুইটি বিভিন্ন জীবকোষের সমবায়দ্বারা একটি পূর্ণ জীবকোষের সংঘটন ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটী পূর্ণ জীবকোষ সঞ্জাত হইবামাত্র সেটি স্বতঃই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি নূতন জীবকোষকে জন্মদান করে। এই দুইটি নবজাত জীবকোষ পুনর্ব্বার স্বতঃই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া চারিটি নূতন জীবকোষ উৎপন্ন করিয়া দেয়। এইরূপে জীবকোষ বা Protoplasmএর জন্মসংখ্যা Arithmetical progressionএ ২, ৪, ৮, ১৮, ৩২,......অনুপাতে ক্রমশঃই দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সূক্ষ্ম জীবকোষ ভ্রূণ-অবস্থায় দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া, একটি পূর্ণাবয়ব জীব-শরীরের সৃষ্টি করিয়া দেয়। এই জীবকোষ কি পরিমাণ সূক্ষ্ম, তাহা অনুমান করিবার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়টি লিখিতেছি:—

দুইটি বিভিন্ন জীবকোষের প্রথম-মিলনের দশদিবস পর অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অনুপাতে দশদিবস জীবকোষ বৃদ্ধি পাইবার পর, ভ্রূণটি একটি ছোট আলপিনের মাথার অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে; অতএব পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন, উক্ত জীবকোষগুলি কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম।

জীবকোষের সমস্তগুলিই একটা নির্দ্দিষ্ট আকারের হইয়া থাকে; কোন জীবকোষ ক্ষুদ্র, কোনটি অনতি বৃহৎ এইরূপ ব্যাপার প্রাণী-শরীরের জীবকোষে সঞ্জাত হইলে সে শরীর তখন Cancer বা কর্কটরোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। প্রবন্ধের তৃতীয় চিত্রে বিষয়টি বিশদরূপে প্রত্যক্ষীভূত করান হইয়াছে।

Cancer বা কর্কটব্যাধি জীবকোষ বা Protoplasm এর অসম বৃদ্ধির জন্য সংঘটিত হয়। এইস্থানে জানা আবশ্যক যে, জীবকোষের এই স্বতঃ-জননের জন্য বাহির হইতে একটা কোন উত্তেজনা উপলক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। একটি পুং-জীবকোষ একটি স্ত্রী-জীবকোষের সহিত সম্মিলিত হইবার পর, তাহারা যখন বারংবার দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ বহুসংখ্যক জীবকোষের সৃষ্টি করিতে থাকে, সেই সৃজনের মধ্যেও একটা উত্তেজনার প্রয়োজন হয়। কোথা হইতে এই উত্তেজনা আসে, প্রশ্ন করিলে, পণ্ডিতগণ কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। সম্প্রতি নিউ-ইয়র্কের ডাক্তার ক্যারেল্ (Dr. Alexis Carrel) প্রমুখ চিকিৎসকগণ বলেন যে, সুস্থ জীবকোষের উত্তেজক পদার্থ মনুষ্য শরীরেরই যকৃৎ ইত্যাদি যন্ত্র হইতে রসাকারে নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই উত্তেজক পদার্থের উপর জীব-শরীরের গঠন ও অবয়ব-সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি উত্তেজক রস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তবে জীবকোষগুলি অসাধারণরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাহাদের জন্মের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাও প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়া যায়। কর্কটরোগ এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি-হেতু জীবকোষের অসাধারণ আকারলাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কেবল যে ভ্রূণ অবস্থাতেই এই জীবকোষের জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তাহা নহে। মনুষ্য-শরীর যে কোন সময় বৃদ্ধি পাইবার কালে, জীবকোষগুলির ঐ স্বতঃ জননের পৌনঃপুনিক গুণসম্ভূত জন্ম-সংখ্যার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, কোন কারণে জীবকোষগুলি অস্বাভাবিকরূপে উত্তেজিত হইলে Cancer এর সৃষ্টি হইতে থাকে। এই অস্বা-

ভাবিক বর্দ্ধনশীল জীবকোষগুলি হইতে অঙ্গের যে অংশ সংগঠিত হইয়া উঠে, তাহাই রোগাক্রান্ত দেহের অংশবিশেষ। এই ব্যাধি-গ্রস্ত জীবকোষগুলি কেবলমাত্র নিজেদের অস্বাভাবিক দেহাংশের অস্বাবিক সৃজন-কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; সুস্থ জীবকোষ-গুলিকেও ইহারা নিজেদের সংস্পর্শে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া দেয়। এইরূপে দেহের অংশ বিশেষের ব্যাধি-প্রকোপ ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়।

এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ-সম্বন্ধে নানা সিদ্ধান্ত প্রকাশিত আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পণ্ডিতগণ বলেন যে ভ্রূণ-অবস্থায় জীব-দেহের সমস্ত জীব-কোষগুলি যদি সমান মাত্রায় নিয়মমত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে নীরোগ শরীরের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কারণে যদি কয়েকটি জীবকোষের বর্দ্ধন-শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তবে জীব-শরীর-গঠনে উপস্থিতমত কোন অনিষ্ট সাধিত না হইলেও, পরে ঐ সংহত-বর্দ্ধন-শক্তিযুক্ত জীবকোষগুলি পুনর্ব্বার বর্দ্ধনশক্তি লাভ করিলে, অকস্মাৎ অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধির সূচনা করিয়া দেয়; কারণ, যে জীবকোষগুলি ইতঃপূর্ব্বে বর্দ্ধন-শক্তি বিলুপ্ত করিয়া নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা অকস্মাৎ কোন কারণে উত্তেজিত হইতে পারিলে, তাহাদের সুপ্ত শক্তির বিকাশ, সাধারণ শক্তি-বিকাশের দুই, তিন বা চারিগুণ আকারে প্রকাটিত হইয়া উঠে; সুতরাং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। Cancer বা কর্কট রোগের ইহাই মূল কারণ। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, ম্যালেরিয়ার রোগ-বীজাণু যেমন মশকদ্বারা মনুষ্য-শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, কর্কট-ব্যাধি-বীজাণুও নানা প্রাণী দ্বারা মানব শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে।

জীবকোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত অতিবৃদ্ধিই যে কর্কট-রোগের একমাত্র কারণ,সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। আধুনিক নানা উদ্ভিদ্-বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ব্যাধি কেবলমাত্র প্রাণি-শরীরে নহে, উদ্ভিদ্-দেহেও ইহার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ডাক্তার আরয়ূন্ (Erwin) ও ডাক্তার স্মিথ্ (Dr. F. Smith) নামক আমেরি-কার যুক্তরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্-শাস্ত্রবিদ্ তথাকার কৃষি-বিভাগের উন্নতি-কল্পে স্ব স্ব সুবৃহৎ বীক্ষণাগারে উদ্ভিদের কর্কট-রোগ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, CROWN GALL নামক এক উদ্ভিদ্-ব্যাধির দ্বারা কৃষকগণ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। Daisy-জাতীয় পুষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া পিচফল, বাদাম, আখরোট ইত্যাদি কঠিন আবরণযুক্ত ফলও এই ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না। তা' ছাড়া আপেল, 'রোজবের ইত্যাদি সুফল এবং খেজুর, গোলাপ, কার্পাস, বিট্ চিনি ইত্যাদি লতা-জাতীয় নানা উদ্ভিদও প্রতি বৎসর এই ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়; কিন্তু এই ব্যাধি যে কি' তাহা তখন কেহই জানিত না। কৃষকগণের এবং দেশের ক্ষতির কথা চিন্তা করিয়া ডাক্তার স্মিথ্ এই অজ্ঞাত ব্যাধির কারণ অনুসন্ধানের জন্য স্বীয় বিরাট বীক্ষণাগারে পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কয়েক বৎসর পরীক্ষা করিয়া তিনি বলেন যে, উদ্ভিদের এই ব্যাধি জীব-শরীরের Cancer বা কর্কটরোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীবকোষগুলির অস্বাভাবিক উত্তেজনামূলক অতিবৃদ্ধিই এই রোগের মুলসূত্র। ডাক্তার স্মিথ্ যখন প্রবন্ধ-প্রারম্ভ-লিখিত মতবাদ প্রচারিত করিলেন, তখন চিকিৎসকগণের নিকট কর্কট-রোগ-নির্ণয় ও তাহার প্রতিকার-উদ্ভাবনের নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হইত। স্মিথের এই আবিষ্কার চিকিৎসাশাস্ত্রে নবযুগের সূত্রপাত করিয়া দিল। জগতের সমস্ত চিকিৎসকগণ স্মিথের আবিষ্কার লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দিলেন। জীবরাজ্যে এবং উদ্ভিদ রাজ্যে একই প্রবল ব্যাধির সন্ধান পাইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য চিকিৎসকগণ গবেষণা করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার স্মিথ স্বয়ং এই উদ্ভিদ্-ব্যাধি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি নানা পরীক্ষায় প্রমাণিত করিয়াছিলেন

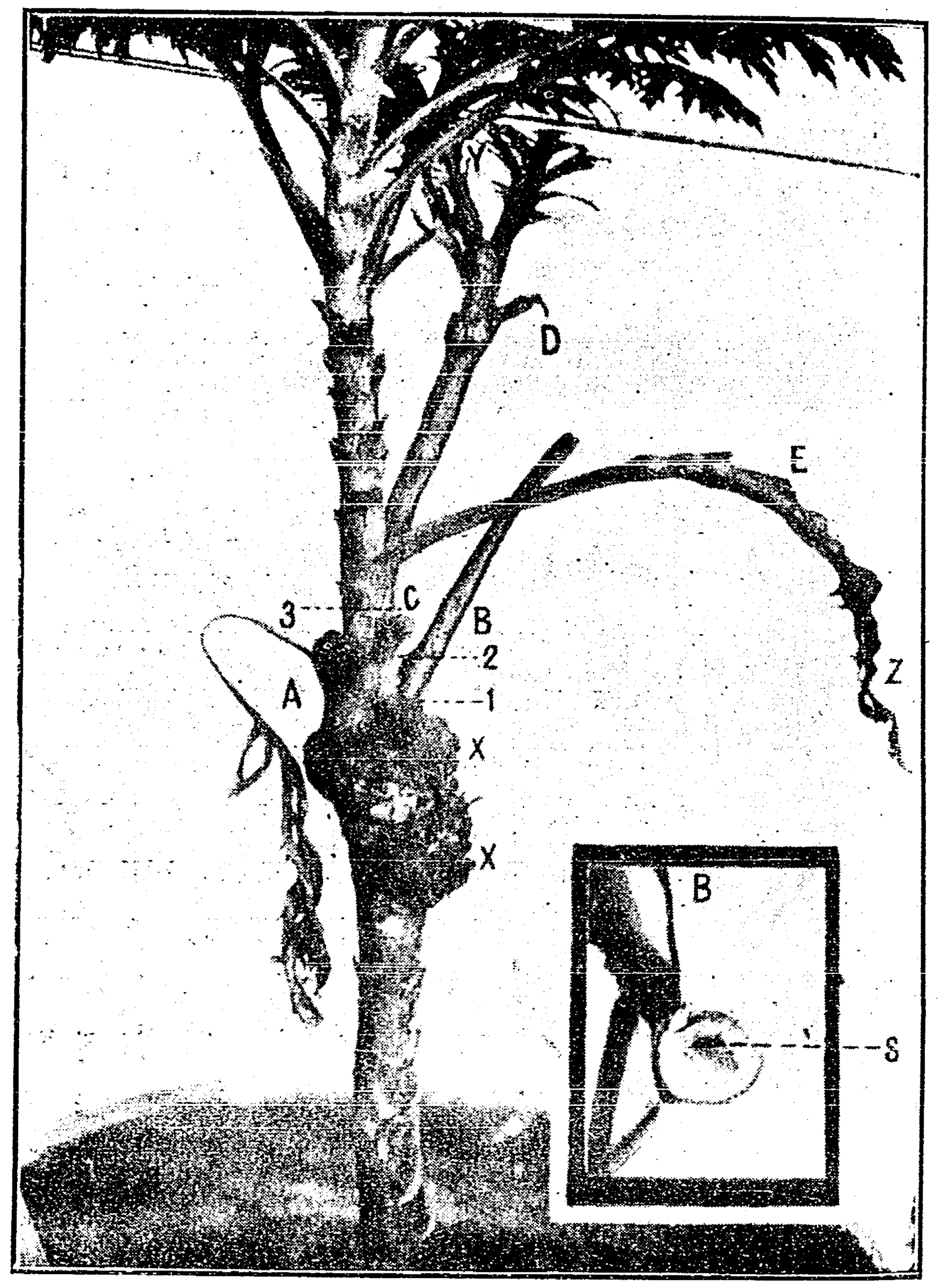

১ম চিত্র। "ডেজি"বৃক্ষের কাণ্ডে Cancer বিষ প্রবেশ করাইবার কয়েকদিন পরের অবস্থা। বৃক্ষটি পূর্ব্বে নীরোগ ছিল। * চিহ্নিত অংশে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

যে, এই ব্যাধি উদ্ভিদ্-দেহে কীটের আক্রমণ অথবা Tungous জনিত বৃদ্ধি নহে। পরন্তু বাক্টিরিয়া (Bacteria) নামক সূক্ষ্ম জীবাণু দ্বারা এই ব্যাধি সংক্রামিত হইয়া থাকে ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত ছিল। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে সুস্থ উদ্ভিদ্ দেহ ক্ষত করিয়া বাহির হইতে Cancer Bacteria দিয়া অনায়াসে তাহা কর্কটরোগযুক্ত করা যাইতে পারে। ডাক্তার স্মিথ্ বহু চেষ্টাতেও এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বহু চেষ্টার পর ডাক্তার স্মিথ শুভ্রবর্ণের কর্কটরোগের বিষয় আবিষ্কার করিলেন। টিকার (Vaccination) বীজের ন্যায় ঐ বিষের সামান্য অংশ সুস্থ দেহে প্রবেশ করিলেই সে দেহ Cancer বা কর্কটরোগযুক্ত হইয়া থাকে। এই বীজকে স্মিথসাহেব Bacterium tumefacious নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বিষ এত উগ্র যে ডাক্তার স্মিথ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা

সুস্থ উদ্ভিদ্-দেহে সংক্রামিত করিলে শতকরা একশত উদ্ভিদই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ করাইবার আট দশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত এই বিষ সতেজ থাকে।

আমরা ছবির সাহায্যে বিষয়টি সহজবোধ করিতে প্রয়াস পাইব। ১ম চিত্রে একটি কর্কটরোগাক্রান্ত ডেজি (Daisy) পুষ্পবৃক্ষের ছবি দেওয়া হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বৃক্ষটী নীরোগ ছিল। টিকার বীজের ন্যায় কর্কটরোগের বীজাধার হইতে একটা সূচের অগ্রভাগ দিয়া অতি সামান্য পরিমাণ বিষ লইয়া সুস্থ বৃক্ষটির কাণ্ডে ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকদিন পর ক্ষতস্থানে ঐ প্রকার সুবৃহৎ "গোদ্"-এর সৃষ্টি হইয়া পড়ে। ছবির X-চিহ্নিত অংশে সর্ব্বাগ্রে রোগবিষ প্রয়োগ করা হইয়া-ছিল। তাহার পর ঐ বিষ দ্রুত উদ্ভিদ-শরীরে বিস্তৃত হইয়া A. B. চিহ্নিত অংশদ্বয়ে নূতন রোগগ্রস্ত অংশের সূত্রপাত করিয়াছি। অতঃপর D. F. Z অংশেও এই রোগের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। বুঝিবার পূর্ব্বেই মৃত্যুর কঠিন হস্ত তাহাদিগকে ইহলোক হইতে অপহৃত করিয়া লয়।

কর্কটরোগের দ্রুত বিস্তার দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় চিত্রে বিট্ চিনির (Sugar-beets) দুইটি মূল অঙ্কিত হইল। এই মূলদ্বয় কর্ককরোগের বিষদ্বারা দুইমাস পূর্ব্বে বিষাক্ত করা হইয়াছিল। এই মাসদ্বয়ের মধ্যে সুস্থ বিট্ চিনির মূল দুইটি কিরূপ ভাবে ব্যাধি-পীড়িত হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহা চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। সুস্থ মূল দুইটি ছোট মূলার ন্যায় দেখিতে ছিল। টিকার বীজের ন্যায় সূচ্যগ্র পরিমাণ ব্যাধি বীজাণু প্রয়োগে অকস্মাৎ এই ব্যাধি-প্রকোপ মূলদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। অঙ্গের এই অস্বাভাবিক স্ফীতি বা বৃদ্ধিই যে কর্কটরোগ, তাহা প্রবন্ধের প্রথমেই বলা হইয়াছে। কেমন করিয়া শরীরের জীবকোষের কয়েকটি স্বাভাবিক বৃদ্ধি ছাড়াইয়া অকস্মাৎ অসাধারণভাবে বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া শরীরের

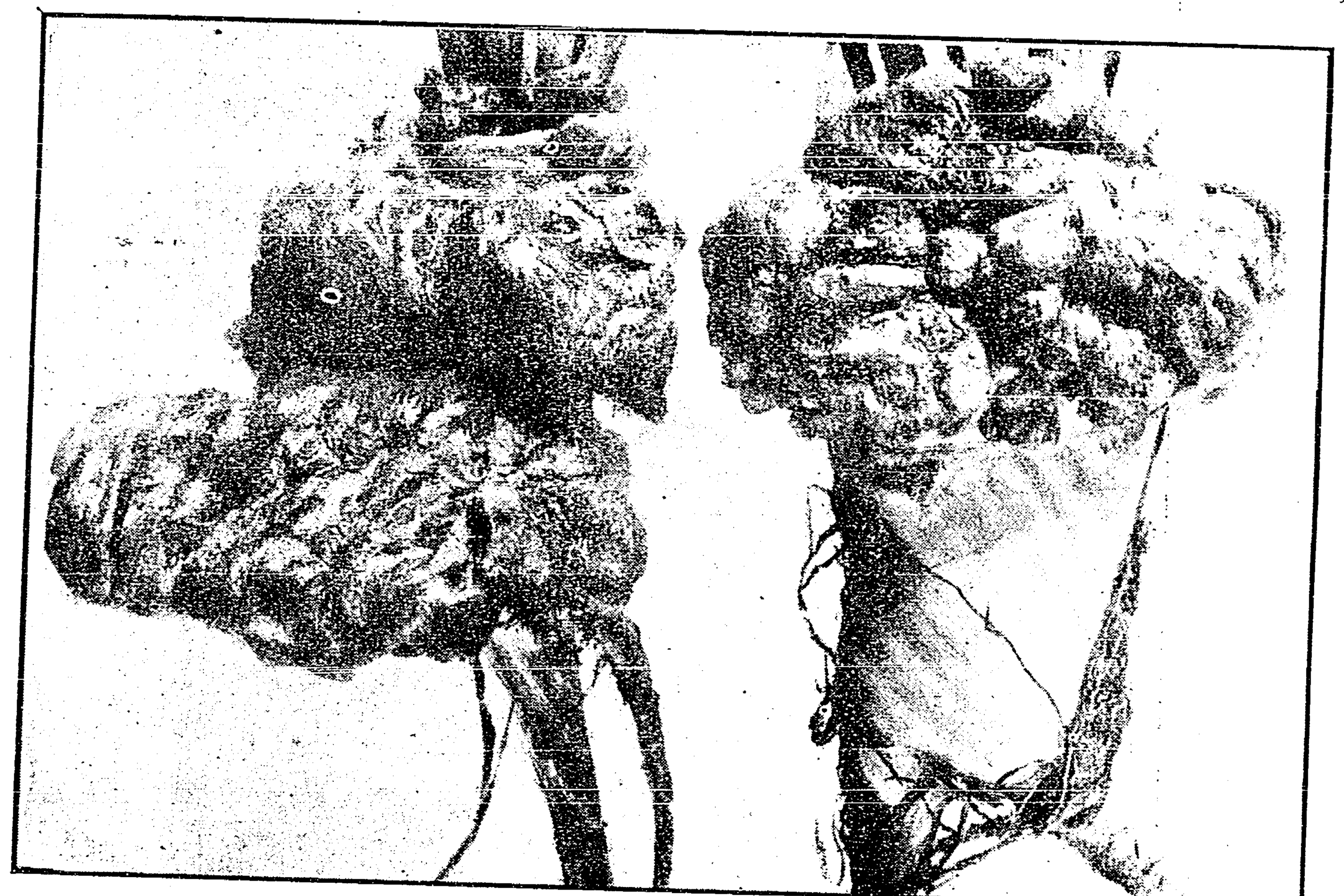

২য় চিত্র। বিট্‌চিনির মূল দুইটি কর্কটরোগের বিষযুক্ত করবার দুইমাস পরের অবস্থা। পূর্ব্বে মূল দুইটি মূলার মত ছিল। বিষপ্রয়োগে অকস্মাৎ স্ফীতি কর্কটরোগের সূচনা করিয়া দিয়াছে।

কেমন করিয়া অতি দ্রুতগতিতে Bacterim tumefacieus-জীবাণু উদ্ভিদ্-শরীরে কার্য্য করে, ১ম চিত্রে তাহা স্পষ্ট দেখান' হইল। উদ্ভিদ্-দেহের ন্যায় জীব-শরীরেও কর্কট-রোগের বিষ-বীজাণু অনু-প্রবিষ্ট করাইলে, তাহাতে বৃক্ষের অনুরূপ কর্কট রোগের দ্রুতলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই রোগ মানব অঙ্গের যে কোন অবয়ব হইতে সংক্রামিত হইয়া সর্ব্বশরীরে বিস্তৃত হইয়া থাকে। কেবলমাত্র অঙ্গের ত্বকের উপর প্রভাববিস্তার করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হয় না। ত্বক্-নিম্নবর্ত্তী মাংস ও অস্থিকেও এই ব্যাধি অচিরে আক্রমণ করিয়া শরীরকে অক্ষম করিয়া দেয়; অবশেষে মৃত্যুর আহ্বান ব্যতীত অপর কোন উপায়ই শরীরকে শান্ত করিতে পারে না। যেমন—মনে করা যাউক, প্রাণীর বক্ষ-দেশের কর্কটব্যাধি বক্ষের ত্বক্ আক্রমণ করিয়া বক্ষস্থ মাংস ও অস্থিপঞ্জরকে জরাজীর্ণ করিয়া দেয়; পাকস্থলীর কর্কটরোগ পাকা-শয়, উদর-নলীসমূহ ধ্বংস করিয়া প্লীহা ও যকৃতের বিনাশ-সাধন করিয়া মানবের অকাল-মৃত্যুর ধ্রুব কারণ হইয়া উঠে। কর্কটব্যাধির বিস্তার এত দ্রুত যে, মানুষ তাহার বিষময় ফল স্ফীতির সৃষ্টি করিয়া Cancerএর সূচনা করিয়া দেয়, তাহা প্রবন্ধ প্রারম্ভেই কথিত হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে তৃতীয় চিত্রের প্রতি মনোযোগ দিব। এই চিত্রে সাধারণ বৃদ্ধিশীল জীবকোষগুলির মধ্যে অতি বৃদ্ধিশীল রুগ্ন জীবকোষগুলির অস্বাভাবিক স্ফীতি চিত্রের চতুঃপার্শস্থ জীবকোষে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বৃক্ষ দেহের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ অনুবীক্ষণ যন্ত্রযোগে সুবৃহৎ করিয়া যে ছবি তোলা হইয়াছে, ৩য় চিত্রখানি সেই ছবিরই ফোটো। পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, কোন অস্বাভাবিক উত্তে-জনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্কটরোগাক্রান্ত জীবকোষগুলির স্বীয় অসাধারণ স্ফীতিদ্বারা সুস্থ এবং সাধারণ আকারের জীবকোষ গুলিকেও ধীরে ধীরে রোগযুক্ত করিয়া দিতেছে।

ডাক্তার স্মিথ্ বলেন যে, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি ব্যাধি-বীজাণু হইতে এই কর্কটরোগের বিষ-বীজাণু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত সংক্রামক ব্যাধিবীজাণু জীব-শরীরে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, দেহের রক্তজ লোহিত কণিকার সহিত

ঐ সকল ব্যাধি বীজাণুর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই পরস্পর বিরোধী বীজাণু-দলের মধ্যে উভয় দলই পরস্পর পরস্পরকে লড়াইয়ে হটাইতে প্রয়াস পায়; কিন্তু কর্কটরোগের বীজাণু রক্তজ লোহিত কণিকাগণের সহিত কদাপি পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে যুদ্ধ করে না। তাহারা দেহের সুস্থ জীবকোষগুলিকে ব্যাধিবিষে স্পর্শ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হয়।

উদ্ভিদ্‌দেহের কর্কটরোগের যে গবেষণামূলক এবং পরীক্ষালব্ধ তথ্যসমূহ ডাক্তার স্মিথ্ কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই যে প্রাণি-দেহে প্রযোজ্য, এমন কোন কথা নাই; কারণ এ পর্য্যন্ত পরীক্ষাদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয় নাই; সুতরাং স্মিথসাহেবের সমস্ত আবিষ্কার উদ্ভিদ্ দেহে সত্য হইতে পারে, কিন্তু প্রাণি-দেহে উহা দ্বারা সমান ফল প্রত্যক্ষ করা যাইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ডাক্তার স্মিথ অদ্যাপি উদ্ভিদ্-দেহের পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত আছেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে,—

"আমার এই আবিষ্কারাবলী প্রাণি-দেহে তুল্যরূপে প্রযোজ্য

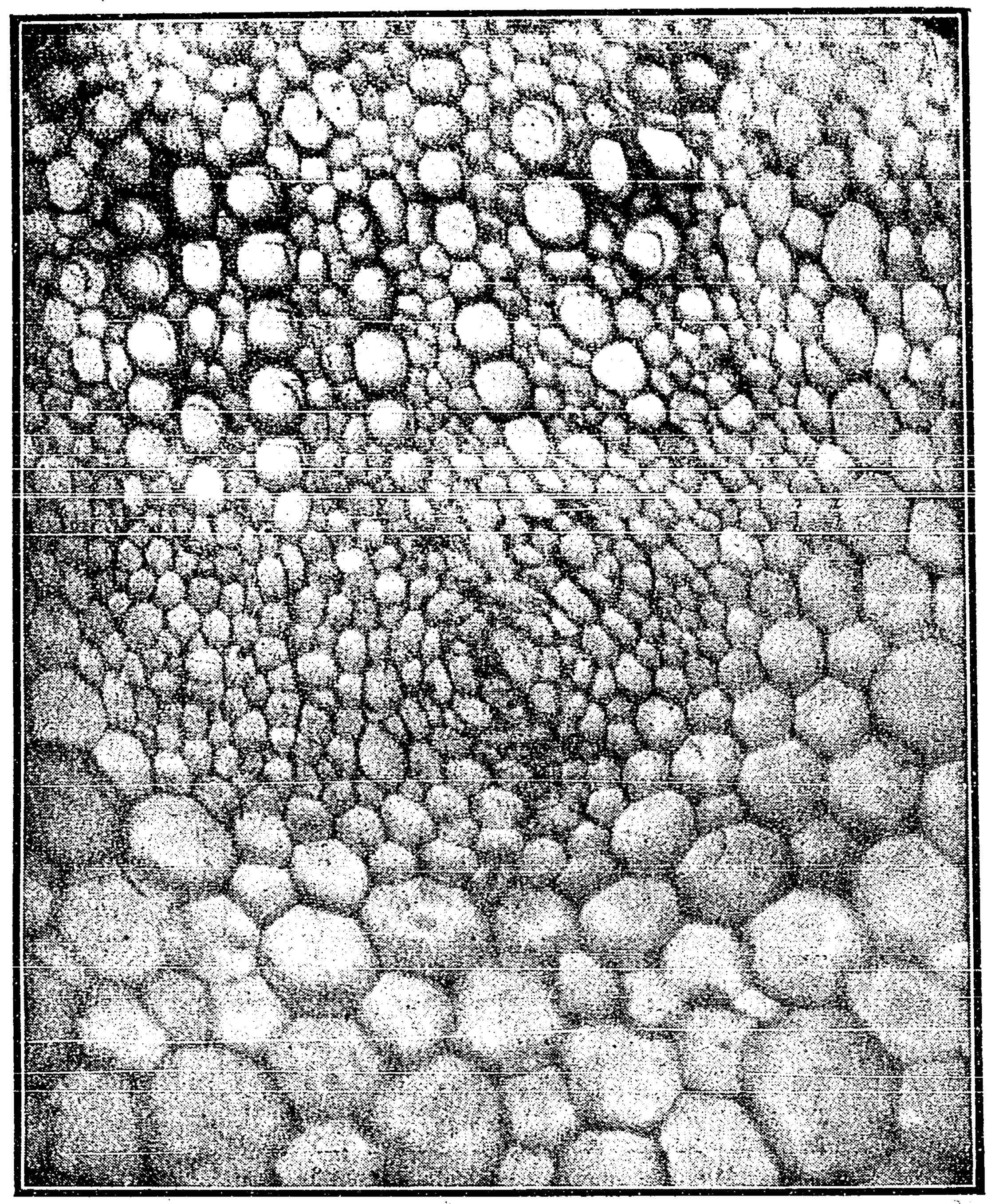

৩য় চিত্র। Cancer রোগযুক্ত স্ফীত জীবকোষগুলি সুস্থ এবং স্বাভাবিক আকারের জীবকোষ সকলের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া আছে। উভয়ের আকারগত বিভেদ লক্ষণীয়।

কি না তাহা বলা কঠিন। উদ্ভিদ্-দেহে যে ফল পাওয়া যায়, জীব-শরীরে সেই ফলই লক্ষ্য করিলে, Cancer-এর মূলসূত্র ও তাহার নিরাময়-উপায় নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইবে না।"

স্মিথের এই বাক্য হইতে এই আভাষ পাওয়া যায় যে, কর্কট-রোগের ঔষধ আবিষ্কার হইতে পারে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অদ্যাপি জীব-দেহে ও উদ্ভিদ্ দেহে যখন বিভেদ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রাণি-শরীরে এই ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী স্মিথের আবিষ্কার-দর্শনের ইচ্ছায় উৎসুক হইয়া আছে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

সাহিত্য-সংবাদ

স্বনামধন্য কর্ম্মবীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার, এম্, এ, মহোদয় প্রতীচ্য-প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া সগৌরবে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান জগতের অবস্থা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টিসমন্বিত ভূয়োদর্শনের ফলস্বরূপ দুই খণ্ড 'বর্ত্তমান জগৎ' তিনি দেশবাসীকে উপহার দিয়াছেন। 'বর্ত্তমান জগতে'র পরিচয় 'মর্ম্মবাণী'র আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

মর্ম্মবাণী—

আবেশময়ী

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ৯ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ১৬শ সংখ্যা

আলোচনা

হায়দ্রাবাদে সাহিত্য-প্রচার

গত বৎসর হায়দ্রাবাদে সর্ব্বসমেত ২২৬ দুইশত ছাব্বিশখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইশত ছাব্বিশখানি পুস্তকের মধ্যে ১৬৩ খানি উর্দ্দু, ১৩ খানি আরবি, ৪ খানি পারস্য, ১৯ খানি মারাঠী, ২৪ খানি তেলুগু ও ৩ খানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। কোন্ কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া কতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—আইন (৩৪), ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্র (৬২), ইতিহাস (১৭), কাব্য ও নাটক (৪৮), শিক্ষা (২৫), কথাগ্রন্থ (৫) ও বিবিধ (৩৭)।—গত বৎসরের সাহিত্য-প্রচার-কার্য্য নিজাম গভর্ণমেণ্টের মতে সন্তোষজনক হয় নাই। দেখা যাইতেছে, হায়দ্রাবাদের সাহিত্য-রসিকগণের উপরে ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিশাস্ত্রের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; কারণ, ঐ বিভাগের পুস্তক-সংখ্যা অন্যান্য বিভাগের পুস্তক-সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অধিক। তাহার পর কাব্য ও নাটক। কথা-সাহিত্যের প্রতি নিজাম-বাহাদুরের প্রজাগণের ততটা ঝোঁক নাই; কারণ, এ বিভাগে অন্য সকল বিভাগ অপেক্ষা পুস্তক-সংখ্যা অল্প। এইখানেই হায়দ্রাবাদ ও বঙ্গদেশের মধ্যে রুচি-পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়!

বরোদায় স্ত্রী-শিক্ষা

হিন্দু-মহিলাদের ভিতরে যাহাতে ভাল করিয়া শিক্ষার প্রসার হয়, বরোদার দানশীলা মহারাণী সেই উদ্দেশ্যে দেড়লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। উপযুক্ত বিদুষী মহিলাগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনের জন্য এই টাকার আয় হইতে 'স্কলারশিপ' প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইবে। স্কলারশিপে'র সংখ্যা ২৯। তন্মধ্যে পাঁচটাকা করিয়া ষোলটি, দশটাকা করিয়া আটটি, পঁচিশ টাকা করিয়া চারিটি ও পঁয়ত্রিশ টাকার একটি 'স্কলারশিপ' আছে। ভারতবর্ষের বাহিরে শিক্ষালাভের জন্য যে হিন্দু-মহিলা যাইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিবেন, বাকি টাকায় "মহারাণী চিম্‌নানন্দ গায়কুবাড় ষ্টুডেণ্টশিপ্‌স্" নামক বৃত্তি তাঁহাকে দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষের মধ্যে বরোদা-রাজ্য অন্য সকল দেশ অপেক্ষা শিক্ষা-প্রচারে অগ্রগামী। বরোদার মহারাণীর সদাশয়তায় অতঃপর বরোদা-প্রদেশের স্ত্রী-শিক্ষার গৌরবও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে, আমরা একান্ত আনন্দিত হইব। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যেও বরোদার এই মহৎ আদর্শ কি অনুসৃত হইতে পারে না?

খনি-সংক্রান্ত শিক্ষা

ভারত-গভর্ণমেণ্ট খনি-সংক্রান্ত শিক্ষার জন্য একটি মন্ত্রণা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। উক্ত সমিতি (১) ধানবাদের নিকটে একটি খনি-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে এবং (২) খনি-বহুল প্রদেশগুলিতে সান্ধ্য পাঠ-শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। প্রথম প্রস্তাবটি আর্থিক কারণে আপাততঃ কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে না। তবে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের সম্মতি ও আগ্রহ আছে।

ভারতে 'নভেল'-ভক্ত

বিলাতের একখানি কাগজে প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, পৃথিবীতে এমন কোন দেশ আছে, কি যেখানে G. W. M. Reynoldsএর প্রণীত 'নভেল'গুলি পাঠক-সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করে?—এই প্রশ্নের উত্তরে "The Indian Review" বলিতেছেন, হাঁ, আছে। বাৎসরিক Bluebookএর "Statement exhibiting the Moral and Material Progress and Condition of India" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ত্তমান বৎসরের সাহিত্য-সম্বন্ধীয় আলোচনায় লিখিত হইয়াছে :

"G. W. M. Reynolds-প্রণীত 'নভেলে'র সমাদর হইতে ভারতীয় পাঠক-সাধারণের ভিতরে অনেকেরই উপন্যাস-সম্বন্ধে অপূর্ব্ব রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এ বৎসর উক্ত লেখকের দুইখানি পুস্তক দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।"

কথিত "দেশীয় ভাষা"টির নাম "হিন্দী"।—ধরা পড়িয়াছে হিন্দী-ভাষা; কিন্তু যে বঙ্গভাষা লইয়া আমরা গর্ব্ব করি, তাহাও কি উক্ত কলঙ্ক হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে?

প্রাচীনতম তামিল পুঁথি

বরোদার গায়কুবাড়-মহোদয় Tolkappiam নামক প্রাচীনতম তামিল পুঁথির একখানি ইংরাজী-অনুবাদ-পুস্তক-রচনার জন্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত পোন্নামবালম পিলেকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তামিল-ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দুইখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যেখানির নাম 'তোল্‌কাপ্পিয়াম, সেখানি তামিল-ব্যাকরণ। দ্বিতীয়খানির নাম 'কুরাল,'—এই পুস্তকে সাংখ্য-দর্শনকে রাজনৈতিক সূত্রে পরিণত করা হইয়াছে। কথিত আছে, 'পারিয়া'-সমাজের জনৈক কবি 'কুরাল' রচনা করিয়াছিলেন। এই দুইখানি পুস্তকের কাল-নির্ণয়ে সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ, 'কুরালে'র রচনা-কাল দশম শতাব্দীর পরে নহে। 'তোল্‌কাপ্পিয়াম' আরও পূর্ব্বে প্রণীত হয়। অগস্ত্য মুনির শিষ্য তোল্‌কাপ্পিয়াম শেষোক্ত পুস্তকের প্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত।

হিন্দুস্থানী-ছাত্রগণের উৎসব-সভা

আমেরিকার "প্যানামা-প্যাসিফিক সার্ব্ববর্ণিক প্রদর্শনী"র (Panama-Pacific International Exposition) আনুকূল্যে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে গত ১৫ই

আগষ্ট তারিখে "সার্ব্ববর্ণিক হিন্দুস্থানী-ছাত্রগণের মিলন-সমিতি"র (The International Hindusthanee Students' Convention) এক উৎসব-সভার অনুষ্ঠান হয়। পুর্ব্বে আর কখনও অন্য কোন সার্ব্ববর্ণিক প্রদর্শনীতে ভারতবর্ষ এরূপ উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। গত বৎসরে ভারতের কয়েকজন সুযোগ্য সন্তানের একান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে এই "P. P. I. E. Exposition Commission of India." গঠিত হয়। অধিবেশন-দিবসে সভায় যেরূপ অসাধারণ উৎসাহের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, যেরূপ জীবনের সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, ভাষায় তাহা অবর্ণনীয়। উচ্চ আনন্দধ্বনির মধ্যে মিলন-সমিতির সভাপতি ডাঃ কে, ডি, শাস্ত্রী P P I. E র 'প্রেসিডেণ্ট' মুরের প্রতিনিধি 'কমিশনার' চার্লস্ এ, ভোগেলসাং-মহোদয়কে সমবেত জনমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন। 'কমিশনার' ভোগেলসাং দশমিনিটব্যাপী একটি সুন্দর বক্তৃতার পর মিলন-সমিতির সভাপতিকে প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে Commemorative Bronze Medal নামক একটি গৌরবজনক স্মারক চিহ্ন উপহার দান করিয়াছেন।

সভাপতির বক্তৃতা

"সার্ব্ববর্ণিক হিন্দুস্থানী-ছাত্রগণের মিলন-সমিতি"র সভাপতি ডাঃ কে, ডি, শাস্ত্রী-মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় যে স্থানোপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন, আমেরিকার "The Hindusthani student" এ সেপ্টেম্বর মাসে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা স্থানাভাবের জন্য কেবল তাহার সারমর্ম্ম দিলাম—

"মানব-সমাজের ইতিহাসে একটি মহৎ অনুষ্ঠানের সাফল্য-উপলক্ষে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। এই বিরাট্ স্থাপত্যকার্য্যের অপূর্ব্বতা ইতোমধ্যেই পৃথিবীর সকল প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ আগ্রহবান্ দর্শককে এখানে আনয়ন করিয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই সার্ব্বজাতিক নগরে আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে। এমন কি, প্রাচীন ভারতবর্ষও এই বিশাল প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয় নাই।

"ভারতবর্ষের অগাধ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী আমরা অবগত আছি; কিন্তু তাহার কৃষি-বৈভব, তাহার খনিজ পদার্থ এবং অন্যান্য নানাবিধ বিষয় লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এখনও আলোচনার সূত্রপাত হয় নাই। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত, বৃহত্তম নদ-নদী, রত্নাকর আরণ্য প্রদেশ ও সুজলা সুফলা ভূমি—ভারতের এ সকল ঐশ্বর্য্য অক্ষয়। তথাপি তাহার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র সন্তান অনাহারে, অন্নাভাবে, দুর্ভিক্ষে ও সংক্রামক ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিতেছে। আধুনিক ভারতকে সকল দিক দিয়া আবার নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তাহার শত শত সুসন্তান হৃদয়ে নূতন আশা লইয়া এবং সংস্কার-ব্রত গ্রহণ করিয়া বিদেশের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র অসাধারণ ব্যক্তিগত ত্যাগ-স্বীকার করিয়া ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্য নানাস্থানের শিক্ষাক্ষেত্রে একান্ত কষ্ট-যাতনার ভিতরে এখনও বাস করিতেছেন। আরও কত সহস্র উৎসাহী যুবক, তাঁহাদের প্রবাসী ভ্রাতৃগণের সহিত অবিলম্বে যোগদান করিবার জন্য এখনও উন্মুখ হইয়া আছেন।

"আমেরিকার অধিবাসিগণ আমাদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহপ্রকাশ করিতেছেন এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সদাশয়তার সহিত ব্যবহার করিয়া তাঁহারা ভারতীয় ছাত্রগণকে অচ্ছেদ্য ঋণ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের সহিত তাঁহারা যে কতটা বেশী ব্যবসায়-সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন, এ সত্যটা তাঁহারা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। একালের অবস্থা-গতিকে তাঁহারা এমন অনেক দ্রব্য ভারতের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে বাধ্য,—যাহা কেবল ভারতবর্ষেই উৎপন্ন হয়। সত্য বটে, ভারতবর্ষ শিল্প-দ্রব্য-নির্ম্মাণে পরিপক্ক নহে; কিন্তু ভারতে যে সমস্ত কাঁচা মাল পাওয়া যায়, আমেরিকা নিজে যদি ভারতের বাজার হইতে তাহা ক্রয় করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে অন্য দেশের মধ্যস্থতায়ও তাহাকে সে সকল জিনিষ গ্রহণ করিতে হইবে।

"আমেরিকার শিক্ষা-ক্ষেত্র যে কতদূর প্রশস্ত, প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ছাত্রগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে হিন্দুস্থান হইতে দলে দলে ছাত্রগণ আমেরিকায় আসিতে আরম্ভ করেন। গত বৎসর এখানে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ছিল একশত পঞ্চাশ—এত বেশী ছাত্র এখানে আর কোন বৎসরে হয় নাই। এ-দেশের কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়-পরিদর্শনকালে 'প্রফেসর'দের মুখে আমি আমার স্বদেশী ছাত্রগণের অসাধারণ সাফল্য-লাভের কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়াছি। আর এক কারণে আমেরিকাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। ভারতীয় ছাত্রগণকে আমেরিকার কল-কারখানায় হাতে-নাতে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়;—প্রতীচ্যের আর আর সকল দেশেই ভারতবাসীকে এ সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। সামাজিক, নৈতিক ও ব্যবসায়িকভাবে লাভের সম্ভাবনা থাকিলে, আমেরিকাবাসীরা সাধারণতঃ ভারতীয়গণকে জাতিগত কোনরূপ বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন না,—বা দেশভেদহেতু সঙ্কীর্ণ কুসংস্কারের মোহে তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধত্যাগ করেন না।

বঙ্গেশ্বরের নব উপাধি

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বড়লাট বা অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণকে প্রায়ই আইন বা সাহিত্যে Doctorএর 'ডিগ্রী' প্রদান করে; কিন্তু এতদিন কোন শাসনকর্ত্তাকে হিন্দু-পণ্ডিতগণ সংস্কৃত কোন উপাধি দান করেন নাই। সংপ্রতি বঙ্গদেশে সংস্কৃত-শিক্ষার পীঠস্থান নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ, বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলকে "নীতিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের উদারতায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত

দানবীর তারকনাথের সুযোগ্য পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিতের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। লোকেন্দ্রনাথ "ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ব্বিস"-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গদেশে বহু বৎসর "ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজে"র কর্ম্ম সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারী-ব্যবসায়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিয়মিতভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা না করিলেও, বঙ্গ-সাহিত্যে তিনি আপনার হস্তচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসীম পাণ্ডিত্যের কথা সুধী-সমাজের অজ্ঞাত নহে। ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ও অপরিচিত যে-কেহ তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছিলেন, তিনি আর কখনও তাঁহার সদাশয়তা, ভদ্রতা ও অমায়িকতা ভুলিতে পারেন নাই। আপনার চরিত্রের উদারতায় শত্রু-মিত্র সকলকেই তিনি মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। গত শুক্রবার রাত্রি নয়টার সময়ে বারাণসীর পুণ্যক্ষেত্রে লোকেন্দ্রনাথের আত্মা সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে। ভগবান্ তাঁহার শোকগ্রস্ত সহধর্ম্মিণী, কনিষ্ঠ সহোদর ও অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে সান্ত্বনাদান করুন।

ননীর সাথী

(গল্প)

জনশূন্য ক্যালকাটা রোডের পাশে একখানা পাথরের উপরে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিলাম। ঘন কুয়াসায় পর্ব্বত, উপত্যকা, বন ঢাকিয়া গিয়াছিল। মনে হইতেছিল যে, বদ্রাওনের নবাব-নন্দিনী এই বুঝি কুয়াসার যবনিকা সরাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল! সেদিন শরীরটা কেমন করিতেছিল বলিয়া টিপি-টিপি-বৃষ্টি ও কুয়াসা সত্ত্বেও একটা 'বর্ষাতি' মুড়ি দিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। সিগারেটের রাশি রাশি ধূম কুয়াসার সহিত মিশিয়া গেল; কিন্তু তথাপি বদ্রাওনের নবাবনন্দিনী আসিল না দেখিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিতেছিলাম, এমন সময় পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, "মেদ মামা, ও মেদ মামা, বাড়ী আয়।"

যেদিক হইতে শব্দ আসিল, সেইদিকে ফিরিয়া চাহিলাম, কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ হইল, "মেদ মামা—আয় বাবা—আয় বাড়ী—আয়।" দেখিলাম, জলা-পাহাড়ের রাস্তা দিয়া একটি জরাজীর্ণ, কঙ্কালসার কুকুর লইয়া একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ চলিয়াছেন। কুকুরটি এককালে লোমশ ছিল, এখনও তাহার লেজে ও দেহের স্থানে স্থানে লোম লাগিয়া আছে। সেটি আকারেও বড় ভাল জাতের মনে হইল এবং এককালে দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল। ভদ্রলোকটি অত্যন্ত কৃশ ও দীর্ঘকায়; কিন্তু তাঁহার পোষাকটি বড়ই আশ্চর্য্য রকমের। একটি শাদা পরিষ্কার 'ফ্লানেলে'র কামিজের উপরে একটি মলিন শতছিন্ন, শাদা চাপকান, তাহার উপরে একটি ততোধিক জীর্ণ শালের চোগা, তাহার উপর বিবর্ণ, বোতামশূন্য 'ওয়েষ্ট কোট' এবং সকলের উপর একটি নূতন 'ওভার কোট'—সকল জামারই বোতাম খোলা। তাঁহার এক পায়ে বাদামী রংয়ের বুট; কিন্তু আর এক পায়ে ছেঁড়া, শাদা 'ক্যাম্বিসে'র জুতা। ময়লা, শাদা মোজা দুইটা ঢিলা হইয়া জুতার উপরে উল্টাইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধের একহাতে বেতের একগাছি মোটা লাঠি ও আর একহাতে কুকুরের শিকল। বুড়া কুকুরটিকে অত বড়, মোটা একগাছি শিকল দিয়া বাঁধিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বৃদ্ধ আমাকে দেখিতে পাইলেন না। পথের ধারে 'রেলিং' ধরিয়া দাঁড়াইয়া ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন, "মেদ মামা—আয় বাবা—বাড়ী আয়—আর কখনও কিছু বল্‌ব না—" কথাটা শেষ হইল না, বুড়া শেষটা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, চাহিয়াই আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমি ভাবিলাম, তিনি হয়ত আমাকে দেখিয়াই লজ্জিত হইয়াছেন। আমি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম; কিন্তু বৃদ্ধ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের ননীকে দেখিয়াছেন কি?"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ননী কে?" তখন তিনি বলিলেন, "ওঃ, ভুল হইয়াছে, মাপ করিবেন।" বৃদ্ধ ধীরে ধীরে জলা-পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিলেন, কুয়াসা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, আর দেখিতে পাইলাম না। অল্পক্ষণ পরে পাহাড়ের উপর হইতে শব্দ হইল, "মেদ মামা—আয় বাড়ী—আয়।"

জনশূন্য ক্যালকাটা-রোড ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম। জলা-পাহাড় হইতে একজন পাহাড়ী সহিস একটা ঘোড়া লইয়া আসিতেছিল, তাহাকে বৃদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, সে বলিল যে, সে পথে কাহাকেও দেখে নাই। সহসা কুয়াসা কাটিয়া গেল, উজ্জ্বল সূর্য্যালোক প্রকাশ পাইল, উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, জলা-পাহাড় রোডে কেহই নাই।

কি হইল? স্বপ্ন দেখিলাম না কি? মিশরদেশীয় সিগারেটের ধূম আর হিমালয়ের ঘন, তরল কুয়াসা মিশিয়া কি বৃদ্ধের মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছিল? না। তাহাকে স্পষ্ট দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছি; সে ত প্রেত নহে, সে ত ছায়া নহে। বদ্রাওনের নবাব-নন্দিনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া শেষটা কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এই স্বপ্নটা দেখিলাম? এই-সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখি, আপনার অজ্ঞাতসারে জলা-পাহাড়-রোড বহিয়া উপরে উঠিতেছি। এমন সময়ে পিছনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ হইল, আমি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম যে, দশ-বার বৎসরের একটি বালক ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে। তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিলাম; কিন্তু সে আমার নিকটে আসিয়া ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি মেদ মামাকে—ছেঁড়া-পোষাক-পরা একটি বুড়া ভদ্রলোককে কুকুর সঙ্গে লইয়া এই পথে যাইতে দেখিয়াছেন কি?" তাহার প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমে কি উত্তর দিব, স্থির করিতে পারিলাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, বৃদ্ধকে ঠিক দেখিয়াছি ত? নিশ্চয় দেখিয়াছি, বৃদ্ধ কবি-কল্পনার প্রতিধ্বনি নহে; তাহা হইলে এই বালক কখনও তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিত না। তাহাকে বলিলাম, "দেখিয়াছি।" সে আমার বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইতেছিল, উত্তর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কোন্ পথে গিয়াছেন?" বলিলাম, "এই পথে।" বালক ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়া জলা-পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল।

আকাশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আর একটু বেড়াইতে ইচ্ছা হইল। জলা-পাহাড়ের পথ ধরিয়াই উঠিতে লাগিলাম। সহরের বসতি ছাড়াইয়া আসিয়া, পথের ধারে একটি বড় অরোকেরিয়ার ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিলাম। এমন সময়ে কাহার স্পর্শে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম; দেখিলাম, সেই লোমবিহীন, গতযৌবন, অস্থি-চর্ম্মসার কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে আমার হস্তলেহন করিতেছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে বৃদ্ধ নাই। আমাকে উঠিতে দেখিয়া কুকুরটি অরোকেরিয়ার বনের ভিতর প্রবেশ করিল; কিন্তু আমি অগ্রসর হইতেছি না দেখিয়া ফিরিয়া আসিল। আমি চারিদিক ভাল করিয়া দেখিলাম, কোথাও বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলাম না। কুকুরটিকে বনের ভিতর হইতে দুই-তিন বার আসা-যাওয়া করিতে দেখিয়া বড়ই সন্দেহ হইল। অরোকেরিয়ার বন পাহাড়ের গা বহিয়া নামিয়া গিয়াছে। কুকুরটির সহিত নীচে নামিলাম, পাহাড়ের বন অন্ধকার, বন্ধুর লতা, গুল্ম ও শুষ্ক পত্রে পরিপূর্ণ, তাহার উপর বৃষ্টি হইয়া সমস্ত পচিতে আরম্ভ হইয়াছে, পথ ভয়ানক পিচ্ছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বৃষ্টিতে পাহাড়ের কতকটা ধসিয়া গিয়াচে, তাহার নীচে নূতন

রাঙ্গা মাটির উপরে বৃদ্ধের শীর্ণ দেহখানি পড়িয়া রহিয়াছে। কুকুরটা এই সময়ে জোরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, বড়ই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, কারণ, আমার কেবল মনে পড়িতে ছিল।—

"বন-ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।"

বহু চেষ্টা করিয়া কিছুতেই লক্ষ্মীছাড়া গানটাকে মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। বহুকষ্টে নামিয়া গিয়া বুড়াকে উপরে তুলিয়া আনিলাম, পোষাকটা কাদা-মাখা হইয়া গেল, নূতন দামী বর্ষাতিটা ছিঁড়িয়া গেল, নিজেই নিজের উপরে ভয়ানক চটিয়া উঠিলাম। স্থির করিলাম, আর কখনও বদ্রাওনের নবাব-নন্দিনীর কথা ভাবিব না।

বৃদ্ধ আঘাত পাইয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে শোয়াইয়া রাখিয়া জলের চেষ্টায় বাহির হইলাম। পথের ধারে নর্দ্দামায় নূতন টুপিটা ডুবাইয়া কাদা-ভরা বৃষ্টির জল ধরিয়া আনিলাম। আমি ফিরিতে ফিরিতে আবার বৃষ্টি আসিল। ফিরিয়া গিয়া দেখি, বৃদ্ধের জ্ঞান হইয়াছে,তিনি ক্ষীণস্বরে বলিতেছেন, "মেদ মামা—আয় বাবা—আয় বাড়ী আয়—আয় ফিরে আয়।" বৃদ্ধকে তুলিয়া আনিয়া পথের ধারে একটা বড় অরোকেরিয়ার গাছের তলে বসাইলাম এবং তাঁহাকে বর্ষাতি চাপা দিয়া নিজে ভিজিতে লাগিলাম। এই সময়ে আবার কে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, মেদ মামাকে—সেই ভদ্রলোকটিকে আর দেখিয়াছেন কি?"

২

নামটি বেশ, করবী চট্টোপাধ্যায়, হাতের লেখাটীও বেশ। চৌরাস্তার বেঞ্চির উপরে একখানি বই কুড়াইয়া পাইলাম, বই খানির ভিতর-বাহির সবই ভাল। নাম "আলো ও ছায়া," ভাল মরক্কো-চামড়া-দিয়া বাঁধান, তাহার উপরে সোণার জল দিয়া নাম লেখা। করবী কি পুরুষমানুষের নাম, না স্ত্রীলোকের নাম? হায় হায় যদি ভাল করিয়া সংস্কৃত পড়িতাম? তাহা হইলে কি আর এত ভাবিতে হয়? মনে মনে বড়ই আপ্‌শোষ হইল। কেন নন্দ পণ্ডিতকে ফাঁকি দিয়াছিলাম? উঁহু, ব্যাকরণ পড়িলেও ছাই হয়, নাম দেখিয়া সহজে স্ত্রী কি পুরুষ তাহা বুঝিবার জো-টি নাই। পুরুষের নাম দেখিলে একরকম মোটামুটি বলা যায় যে, ইহারা পুরুষ; কিন্তু স্ত্রীলোকের নাম এখন অনেক পুরুষে ব্যবহার করিয়া থাকে। যেমন ব্যারিষ্টার শান্তা, তার পূরা নামটি শান্তত্রয় ভাড়ুড়ি; কিন্তু সে নামসই করে, "শ্রীশান্তা ভাড়ুড়ি" আর দেশশুদ্ধ লোকে তাহাকে তাই বলিয়া ডাকে। সুতরাং—

করবী কি স্ত্রীলোকের নাম? এই ভাবিতে ভাবিতে 'বেঞ্চ' ছাড়িয়া উঠিলাম, বইখানা অবশ্য হাতে ছিল, ছাড়ি নাই। ম্যালের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। কিছুদূরে একটা হাওয়া-ঘরের ভিতরে একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা ও বালক বসিয়াছিল, সুতরাং আমার আর বসা হইল না। আমি হাওয়া-ঘরটা ছাড়িয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে কে পিছন হইতে ডাকিল, "মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন, আপনি কি ম্যালে একখানি বই কুড়াইয়া পাইয়াছেন?" আমি বলিলাম "হাঁ, কেন?" বলিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলাম, সে সেই বৃদ্ধের ভাগিনেয়, ঘোড়ায় চড়িয়া মেজ মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। সেও বলিয়া উঠিল, "ওঃ, আপনি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাল তোমার মামা ঠিক বাড়ীতে পৌঁছিতে পারিয়াছেন ত? তিনি কেমন আছেন?"

"ভাল আছেন, আপনার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করি নাই বলিয়া বাবা বড় বকিয়াছেন।"

এই সময়ে হাওয়া-ঘরের ভিতর হইতে আহ্বান হইল "পন্নগ!" সে তাহা শুনিয়া বলিল, "মা ডাকিতেছেন, আপনি দাঁড়ান, আমি এখনই আসিতেছি, যেন চলিয়া যাইবেন না, তাহা হইলে মার খাইব।" বালক চলিয়া গেল, ২।৩ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা আসিতেছেন।" মহিলাটি হাওয়া-ঘর হইতে বাহির হইয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আপনি কাল দাদাকে বড় বাঁচিয়েছেন, আপনি না থাকিলে দাদাকে হয়ত আর পাওয়া যেত না। পন্নগ ছেলেমানুষ, আপনার নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা কর্‌তে ভুলে গিয়েছিল। উনি বল্‌ছিলেন যে, আপনার সন্ধানে বাহির হবেন।" পন্নগ অমনি বলিয়া উঠিল,"মা, তোমরা দাঁড়াও, আমি বাবাকে ডেকে আনি।" সে এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। ঘোড়াটা কোথায় ছিল, তাহা এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই।

পন্নগ চলিয়া গেলে,তাহার মাতা নানাকথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দিয়া সারিতেছিলাম। বলিতে কি, আমি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলাম। এই কি করবী? চৌরাস্তার বেঞ্চের উপর বইখানা পাইয়া মনে যাহা একটু স্ফূর্ত্তি আসিয়াছিল, তাহা ত উড়িয়া গেল। পন্নগের মাতার রংটি বাদামী, বয়স চল্লিশের ঊর্দ্ধ, দীর্ঘাকার, স্থূলাঙ্গী, মুখময় বসন্তের দাগ। তবে মুখখানি সদাই হাসি-হাসি, দেখিলেই বোধ হয় তিনি সদানন্দময়ী, কাপড়-চোপড়, পোষাক-আশাকের তেমন আড়ম্বর বা বাহুল্য নাই। গিন্নী-মানুষের মত চাল-চলন। তাহা হইলে কি হয়, এই কি আমার কল্পনার করবী? মনে মনে শপথ করিলাম, আর কখনও কবিতা পড়িব না।

পন্নগের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আর কতদিন থাক্‌বেন?" আমি বলিলাম, "এখনও একমাস, নীচে বৃষ্টি আরম্ভ না হলে যাব না।"

"তবে আজ সন্ধ্যার সময়ে আমাদের বাড়ীতে আহার কর্‌বেন।"

একবার ভাবিলাম, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি; কিন্তু মন কিছুতেই লাগাম মানিল না—তখন সবই বেসুরা লাগিতেছে। বলিলাম,"ক্ষমা করিবেন, আজ আসিতে পারিব না, অন্য একজায়গায় নিমন্ত্রণ আছে।" কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

পন্নগের মাতা বলিলেন, "তবে কাল? একদিন আসিতেই হইবে, না আসিলে আমরা বড়ই দুঃখিত হইব।" কি করি? বলিলাম,"কাল আসিব"। এমন সময়ে পন্নগ তাহার পিতাকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি বেশ মানুষ, তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে আমরা সকলে চৌরাস্তায় আসিলাম। চৌরাস্তায় আসিয়া তিনি পন্নগের মাতাকে কহিলেন, "করু! মেজদাদার রক্ষাকর্ত্তাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ ত?" তিনি বলিলেন "হাঁ।"

"কবে?"

"কাল সন্ধ্যার সময়।"

"মহাশয়, নিশ্চয় আসিবেন?"

আমি বলিলাম, "অবশ্য আসিব।" বলিয়াই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। এতক্ষণ কিছু কিছু আশা ছিল; কিন্তু যখন 'করু' বলিয়া ডাকিয়াছে, তখন আমার আশালতার মূলে কুঠারাঘাত হইল। ইনিই করবী? হা অদৃষ্ট!

একটু পরে শুনিলাম, পন্নগের পিতা বলিতেছেন, "বড় আশ্চর্য্য ঘটনা, ঠিক ছোট গল্পের মত। কাল আপনি একটু সকাল-সকাল আসিবেন, সন্ধ্যার সময়ে বলিতে আরম্ভ করিব। আর আমার মেয়েটি আপনাকে দেখিবার জন্য বড়ই উৎসুক হয়েছে। আপনি তার মেজমামাকে বাঁচিয়েছেন শুনে সে নাম-না-জানার অপরাধে তিনবার পন্নগের সঙ্গে ঝগড়া করেছে আর অন্ততঃ বিশবার আপনার চেহারার আর ঘটনার বিবরণ শুনেছে, তবুও তার আশা মেটেনি।"

ভাবিলাম, 'ছোট গল্পের মত? হয়ত রোমান্স?' না আর কখনও এমন কাজ করা হইবেনা, ম্যালে বই কুড়াইয়া পাইয়া মনে মনে যে কল্পনার স্বর্গ-রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলাম, সত্যের কঠোর করাঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আর কল্পনায় কাজ নাই। পন্নগের ভগিনীটি হয়ত নিতান্ত শিশু, এবং মেজমামা হয়ত অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, খাইতে দিতে হইবে বলিয়া প্রথমে হয়ত কুকুর পুষিতেন না, পরে এক সলাঙ্গুল চতুষ্পদের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সন্ধ্যা হইল, চৌরাস্তায় বাতি জ্বলিয়া উঠিল, লোক বাড়ী ফিরিতে আরম্ভ করিল, আমিও ফিরিলাম। 'স্যানিটারিয়ামে' আসিয়া দেখি, বাড়ী হইতে একখানি চিঠি আসিয়াছে। মা লিখিয়াছেন—

"চিরজীবেষু,

"বাবা, তুমি পত্রপাঠ বাড়ী চলিয়া আসিবে। নিজে তোমার জন্য একটি পরমসুন্দরী পাত্রী দেখিয়া রাখিয়াছে। তাহারা জমিদার, বড়লোক, বেশ দিবে-থুবে। তুমি আমার কথা রাখ, আর পাগলামো করিয়া বেড়াইওনা। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, তোমার বিবাহ দিয়া একটি বউ আনিয়া চিরজন্মের সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করিব। বাবা, আমার মুখ রাখিও। পত্রপাঠ চলিয়া আসিও। কোনও ওজর বা আপত্তি করিও না।—"

আর পড়া অসম্ভব। দুইটি কারণ আছে; প্রথম কারণ, 'স্যানিটারিয়'মে ঘণ্টা দিয়াছে এবং দ্বিতীয় কারণ, মায়ের আবদার অসম্ভব! আমি কখনই লাল-চেলী-মোড়া নোলকপরা একটি জড়পিণ্ডকে বিবাহ করিতে পারিব না। কি অন্যায়? এদেশের মা-বাপেই দেশের সর্ব্বনাশ করে। যাহা আমি সহিতে পারি না, আমাকে কিনা চিরদিন তাহাই সহিতে হইবে, বিশেষ যখন হিন্দুর বিবাহে 'ডাইভোর্স' নাই। সেকেণ্ড-বেল হয়ে গেল যে!

৩

"আমার স্ত্রীর একটি বিশেষ দোষ আছে, তিনি কুকুর দেখিলে ভয়ানক চটিয়া যান; অথচ এই যে বুড়া কুকুরটী দেখিতেছেন, ইহাকে তিনি বড়ই ভালবাসেন।"

"এটি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীর স্মৃতি-চিহ্ন। কুকুরটাও অনেক দিন বাঁচিয়া আছে, ইহার বয়স প্রায় বিশ বৎসর হইল। সাধারণতঃ কুকুর দশ-বার বৎসরের বেশী বাঁচে না; তবে কোন কোন জাতের কুকুর কুড়ি বৎসর অবধি বাঁচিয়া থাকে।"

"প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্বশুর নদীয়া-জেলায় রঘুনাথপুরের 'সব-রেজিষ্ট্রার' ছিলেন। আমার বড় শ্যালী তখন পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহার তখন একটিমাত্র পুত্র। তাহার বয়স তখন তিন বৎসর। অতি অল্প বয়সে আমার স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছিল; সেইজন্য ইঁহারা মধ্যম ভ্রাতাকে মেজদাদা বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। তখন একপুত্র ও দুইকন্যা ব্যতীত আমার শ্বশুর-মহাশয়ের অন্য কোন সন্তান ছিল না। তাঁহাদিগের মধ্যে আমার স্ত্রীই সর্ব্বকনিষ্ঠ।"

"তখন নদীয়া-জেলায় খুব নীলের আবাদ হইত। অনেক বড় বড় কুঠিয়াল-সাহেবের সহিত আমার শ্বশুরের পরিচয় ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন তাঁহাকে দুইটি খুব ভাল কুকুরের ছানা উপহার দিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর ব্যতীত তাঁহার বংশে কেহ কুকুর দেখিতে পারিত না। আমার শ্বাশুড়ী ত কুকুর স্পর্শ করিলে স্নান করিতেন। ইনি, ইঁহার মেজদাদা এবং ইঁহার দিদিও তদ্রূপ। কেবল আমার শ্বশুর ছানা-দুইটিকে বড় ভালবাসিতেন। আমার বড় শ্যালীর ছেলেটিও সর্ব্বদা আমার শ্বশুরের নিকটে থাকিত বলিয়া তাঁহাদিগের বড় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

"চিনি, চিনি, এইদিকে আয়।"

এককোণ হইতে সেই বৃদ্ধ কঙ্কালসার কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে উঠিয়া আসিল। অতুলবাবুর গৃহে আহারান্তে আমরা সকলে বসিয়া আছি, অতুলবাবু সেই গল্পটি বলিতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "এই দেখুন, এত অধিক বয়সেও জায়গায়, জায়গায় ইহার গায়ে কত বড় বড় লোম রহিয়াছে। এককালে চিনি দেখিতে বড়ই সুন্দর ছিল, কেমন চিনি? তখন ইহার গা-ভরা কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া কালো চুল ছিল, আবার মাঝে মাঝে শাদা দাগ থাকায় সৌন্দর্য্য আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল, চিনির কাণদুটি ঘোর কালো ছিল, কেমন গো?"

পন্নগের মাতা মাথা নাড়িলেন, পন্নগ বলিল,"আমাদের বাড়ীতে চিনির বড় 'ফটো' আছে, তাহাতে উহার কাণের চুল কালোই আছে।" অতুলবাবু বলিতে লাগিলেন,"আমার বড় শ্যালীর ছেলের নাম ছিল ননী। ননী দেখিতে তার মাতার মত সুন্দর ছিল, তাহার সুন্দর নীল চক্ষু দুইটি, আর তাহার কোঁক্‌ড়া চুলের রাশি চিরদিন আমার মনে থাকিবে। ননী, চিনির ভাই নিনিকে বড় ভালবাসিত। চিনি আমার শ্বশুরের নিকটে থাকিত, নিনি দেখিতে ঠিক চিনির মতই ছিল।"

অতুলবাবুর মুখের চুরুটটা নিবিয়া গিয়াছিল, তিনি তাহা ধরাইয়া একটান দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "করু, করবী কোথায়?" পন্নগের মাতা বলিলেন, "তুমি ননীর গল্প বলিবে বলিয়া সে আগে থাকিতে শুইয়া পড়িয়াছে।" অতুলবাবু আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন, "করবী আমার মেয়ে, আমার প্রথম সন্তান। তাহার মন বড়ই কোমল, সে কখনই ননীর ও নিনির কাহিনী স্থির হইয়া শুনিতে পারে না।"

আমি ভাবিলাম, "করবী তবে একজন আছে।—কিন্তু 'রোমান্স' কিছুতেই না,ঠেকিয়া শিখিয়াছি—মাতাকে দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছি, কন্যা-দর্শনে স্পৃহা নাই। শুনিলাম, অতুলবাবু বলিতেছেন, "শুনুন না মহাশয়! এ কাহিনীর প্রথমটা নীরস বটে, কিন্তু শেষটা বড়ই করুণ-রসাত্মক। ননীর বয়স তখন তিন বৎসর এবং নিনির বয়স তিন-চারিমাস, এই সময়ে তাহাদিগের প্রথম আলাপ হয়। নিনি বড় গম্ভীর-প্রকৃতির কুকুর ছিল। কে তাহাকে ভালবাসে, এবং কে তাহাকে দেখিতে পারেনা তাহা সে বুঝিত। সে প্রাণান্তেও আমার স্ত্রীর নিকটে কিংবা আমার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণীর নিকটে অথবা আমার সম্বন্ধীর নিকটে যাইত না। কখনও কখনও আমার শ্বশুর-মহাশয় ডাকিলে তাঁহার নিকটে যাইত। সে ননীর নিকট থাকিত, ননীর সঙ্গে খাইত এবং ননীর

কাছেই শুইয়া থাকিত। আমার শ্বশুর-মহাশয় বলিয়াছিলেন, যে ননীর সহিত নিনিকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। রাত্রিতে ননী অবশ্য তাহার মাতার নিকট শয়ন করিত, নিনি তখন তাহাদিগের পায়ের তলায় শুইয়া থাকিত।

"তখন আমার শ্বশুর-গৃহের দিনগুলি এমন সুন্দর কাটিতেছিল যে কেহই তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, এত শীঘ্র তাহা শ্মশানে পরিণত হইবে। আমার শ্বশুর-মহাশয় শিক্ষিত লোক ছিলেন, ধর্ম্মের নামে তাঁহার নিকট মেকি চলিত না। গুরু-পুরোহিতের অত্যাচার তাঁহার গৃহিণীই সহ্য করিতেন। আমার শ্বশুর-বংশের কুলগুরু আসিয়াই সর্ব্বনাশ করিয়া গেলেন।

"গুরু আসিয়াছেন, অন্দর-মহলে মহাগোলযোগ উপস্থিত। কেহ পাদপদ্ম পূজা করিবে, কেহ ব্রতগ্রহণ করিবে ইত্যাদি। গুরু-ঠাকুর আমার শ্বশুর-মহাশয়কে দীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া বড়ই দুঃখিত ছিলেন এবং তাঁহাকে যাবনিক আচার পরিত্যাগ করাইয়া, দীক্ষা দিয়া তাঁহার কলুষিত দেহখানা মন্ত্রশুদ্ধ করিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র ছিলেন।

"ঠাকুর-মহাশয় আসিলে চিনি ও নিনি বড়ই বিপদে পড়িল। তাহাদিগকে চিরাভ্যস্থ বাস-গৃহ ত্যাগ করিতে হইল। শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী তাহাদিগকে আস্তাবলে নির্ব্বাসিত করিলেন। সেই সময়ে ননী বড় বিপদে পড়িল। সে তখন আর নিনিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। খাইবার সময়ে, শুইবার সময়ে ও বেড়াইবার সময়ে নিনিকে না পাইয়া সে বড় কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সহস্র অনুরোধ ও অনুনয় সত্ত্বেও কেহই চিনিকে ও নিনিকে গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে আসিতে দিত না। ননী বাধ্য হইয়া সমস্ত দিনটি আস্তাবলে বসিয়া থাকিত এবং সন্ধ্যার সময়ে দাসীর কোলে কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের নিকটে ফিরিয়া আসিত। তাহার কোনও অপরাধ ছিল না; কারণ আমার শ্বশুর-গৃহে বা নিকটে সে সময়ে তাহার সমবয়স্ক বালক-বালিকা ছিল না। ননী এই মূক বন্ধুটিকে পাইয়া সমস্তটি দিন তাহার সহিত খেলা করিত। নিনি তাহার সহিত লাঠি মুখে করিয়া বেড়াইতে যাইত, বল ছুড়িয়া দিলে ছুটিয়া গিয়া লইয়া আসিত, জলে লাঠি ফেলিয়া দিলে সাঁতার দিয়া ধরিয়া আনিত, আবার কখনও কখনও কিছু খেলিবার সামগ্রী না পাইলে ননীর কোলের কাছে চিৎ হইয়া শুইয়া আদর করিয়া হাত কামড়াইত।

"গুরুদেব দীক্ষা-গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিলে আমার শ্বশুর-মহাশয় মফঃস্বলে যাইবার অছিলা করিয়া শিকারে বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুর-মহাশয়ও অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও উপায় না দেখিয়া গৃহে ফিরিতে উদ্যত হইলেন। তিনি যেদিন ফিরিবেন, সেইদিন আমার শ্বশুর-গৃহে আগুন লাগিল।

"দিনের বেলায় ঠাকুর-মহাশয় যখন আহারে বসিয়াছেন, ননী তখন আস্তাবলে চিনি ও নিনির সহিত খেলা করিতেছিল। খেলা করিতে করিতে নিনি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া পলাইল। ননী তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিল; কিন্তু সে অত দৌড়াইতে পারিবে কেন? নিনি পলায় নাই, সে প্রভু-গৃহের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল। সে যে ঘরে ননীর সহিত খেলা করিত, সেই ঘরে গুরুদেব আহারে বসিয়াছিলেন। নিনি ছুটিতে ছুটিতে সেই ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তখন ঠাকুর-মহাশয়ের আহার প্রায় শেষ হইয়াছে। তিনি এই অপবিত্র সারমেয় শিশুটিকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অন্ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সকলে "হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল। নিনি পলাইল না। সে নিতান্ত অপরাধীটির মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া সকলের রাগ আরও বাড়িয়া গেল, গুরুদেব সারমেয়-পালন চণ্ডালের কার্য্য, ব্রাহ্মণের অনুচিত, এই কথা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় কেহই কর্ণপাত করিল না। আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে, আপদটাকে মেরে ফেল্, মেরে ফেল্। ঠাকুর-মহাশয়ের খাওয়া নষ্ট করে দিলে?'

"নিকটে একখানা বড় ইষ্টক পড়িয়াছিল, মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া মেজদাদা সেখানা নিনির দিকে ছুঁড়িয়া মারিলেন, নিনি সে আঘাতে পড়িয়া গেল। এই সময়ে ননী ছুটিতে ছুটিতে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিল, এবং তাহার মাতুলের হস্তে ইষ্টক দেখিয়া আধ আধ কথায় বলিয়া উঠিল, 'মেদমামা, মেয়োনা, ময়ে যাবে! মেদমামা, ময়ে যাবে!' সে হাঁপাইতেছিল, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। ইষ্টক, নিনির ক্ষুদ্র মস্তকটি চূর্ণ করিয়া দিল, ননী "নিনি গো" বলিয়া খেলার সাথীর দেহের উপর লুটাইয়া পড়িল। নিনি তখনও মরে নাই, একবার ক্ষীণভাবে লেজ নাড়িল, ননীর হাতখানি চাটিল, তাহার পর তাহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষুদ্র নয়নদুটি হীনপ্রভ হইল।

৫

"কাঁদিয়া কাঁদিয়া সেই রাত্রিতেই ননীর জ্বর হইল। পরদিন প্রাতে শ্বশুর-মহাশয় যখন গৃহে ফিরিলেন তখন গুরুদেব চলিয়া গিয়াছেন, ননী তখন বিকারে অচেতন। সে কেবল বলিতেছে "মেদমামা, মেয়োনা—ময়ে যাবে।" তাহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। দুইদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় ননী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "নিনি, নিনি, আয় আয়।" তাহার মাতা ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি বাবা, কোথায় নিনি? ওকথা বলিতে নাই, তুমি ঘুমাও।" ননী বলিল, "না, মা, নিনি। মেদমামা মাবে, নিনি আবেনা।" চোখের জল মুছিতে মুছিতে মাতা বলিলেন, "ছি বাবা, ঘুমাও।" ননী পুনরায় বলিল, "মা, ঐ নিনি।"

"শেষ রাত্রিতে ননীর জ্বর ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। বাড়ীর সকলে তাহার শয্যা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ননী মুদিতনয়নে বলিল, "মেদমামা মাবে, নিনি আবেনা।" তাহার মাতা ছেলের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িলেন, ননী আবার বলিল, "মেদমামা দুষ্টু, মাবে, মা নিনি—যাই।" তাহার রোগক্লিষ্ট মুখখানিতে একটি সুন্দর অথচ ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল, ননী তাহার সখার সন্ধানে চলিয়া গেল।

"ননীর মাতা তাহার জন্য পাগল হইলেন, শ্বশুর-মহাশয় তাঁহাকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িলেন। সন্তানসম্ভবা জননী পুত্রশোকে পীড়িতা হইয়া পড়িলেন, একমাসের মধ্যে ননীর মাতাও ননীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। আমার শ্বশুর-মহাশয় ছুটি লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সেই অবধি মেজদাদা কেমন হইয়া গিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, নিনি মরে নাই, ননী তাহাকে খুঁজিতে গিয়াছে এবং তিনি নিনিকে মারিয়াছেন বলিয়া সে কোথায় অভিমান করিয়া বসিয়া আছে। তিনি সকল সময়ে এমন থাকেন না, সময়ে বেশ ভাল থাকেন,

আবার যখন ঝোঁকটা আসে, তখন ননীকে খুঁজিয়া বেড়ান। শ্বশুর-মহাশয় ও শাশুড়ী-ঠাকুরাণী তাহার পরে একবৎসরও বাঁচেন নাই। মেজদা ও চিনি সেই অবধি আমাদের এখানে আছেন। গুরু-ঠাকুরটি এখনও যমালয়ে যান নাই, তিনি বলিয়া বেড়ান যে, অনাচারে অনাচারে বংশটা উচ্ছন্ন গেল।"

পন্নগের মাতা এতক্ষণ আঁচল দিয়া মুখ ঢাকিয়াছিলেন, তিনি এই সময়ে বলিয়া উঠিলেন, "ওঁর ঐসকল কথা, গুরু-ঠাকুরের আর দোষ কি?" অতুলবাবু বলিলেন, "না দোষ আমার"।

অনেক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া উঠিলাম। অতুলবাবু ও তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আর একদিন আসিবেন"। আসিব, স্বীকার করিয়া দ্রুতপদে স্যানিটারিয়মে, ফিরিয়া আসিলাম। পথে কেবল মনে হইতে লাগিল, "কি কুক্ষণেই বদ্রাওনের নবাব-নন্দিনীর প্রতীক্ষায় জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে বসিয়াছিলাম! আর কখনও রবিঠাকুরের গল্প পড়িব না।

ঘরে আসিয়া দেখি অনেক পত্র আসিয়াছে, মা লিখিয়াছেন—

"বাবা, পত্রপাঠ রওনা হইবে। ১৪ই আষাঢ় বিবাহ। তোমার শ্বশুর-মহাশয় একা মানুষ, তাঁহার একটীমাত্র পুত্র। তিনি লিখিয়াছেন যে, আমাদের দুইপক্ষেরই আয়োজন করিতে হইবে। নূতন বৌমার ছবি পাঠাইলাম; দেখিয়া ফেরৎ দিস।"

দেৎ—মাটা নেহাৎ সেকেলে। ছবি পাঠাইয়াছে লিখিয়াছে—কোথায় ছবি, তার ঠিক নাই। যদি-বা বিবাহ করিতাম, আর কখনই করিব না।

বাবা লিখিয়াছেন ঃ—

"ললিত, ১৪ই আষাঢ় তোমার বিবাহ। তোমার গর্ভধারিণী, তোমার মাতামহী, নরেন এবং সুধা পাত্রী পছন্দ করিয়াছে। কন্যাপক্ষের সমস্ত আয়োজন আমাদিগকে করিতে হইবে। বৌমার অলঙ্কার-খরিদের জন্য বৈবাহিক-মহাশয় টাকা পাঠাইয়াছেন। অদ্য কলিকাতায় তোমার নামে দশহাজার টাকার 'হাফ নোট' পাঠাইলাম, তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। খবরদার, হ্যামিল্টনের বাড়ী পয়সা নষ্ট করিও না, পূরণচাঁদের দোকান হইতে কিনিও।"

নরেন আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। সে লিখিয়াছে ঃ—

"তোর বিবাহের সমস্ত ঠিক। সুধা আর আমি পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছি। তোর জন্য একখানা ছবি পাঠাইলাম। ১৪ই আষাঢ় বিবাহ। পত্রপাঠ নামিয়া আসিবি, অনেক কাজ আছে।"

যাক্ নরেন ছবিখানা পাঠাইতে ভোলে নাই। নাঃ, নোলক-পরা পেনপেনে মেয়ে নয়। রং 'ফটোগ্রাফ' দেখিয়া বুঝিবার যো নাই। চেহারা মন্দ নয়। এখন উপায়? বাবা যখন লিখিয়াছেন, তখন ত আর উপায় নাই, নামিতেই হইবে। আমার বাবাটির সঙ্গে ট্যাঁ-ফুঁ করিবার উপায় নাই।

সকালে উঠিয়াই অতুলবাবুদের বাড়ী ছুটিতে হইল, রাত্রিতে 'ওয়াটার প্রুফ' ফেলিয়া গিয়াছি। অন্ধকারে বাড়ীটা ভাল দেখিতে পাই নাই; সাম্‌নে একটি বেশ সুন্দর ছোট বাগান। বর্ষা পড়িয়াছে, গোলাপ-গাছগুলা শুকাইয়া গিয়াছে, অসংখ্য নানাবর্ণের ডালিয়া ফুটিয়াছে। বাগানে একখানি বেঞ্চের উপর কে বসিয়া আছে। সুরসুন্দরী, অপ্সরী, না কিন্নরী? পাথরের মূর্ত্তির মত বাগানের দুয়ারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সময়ে দূরে শুনিতে পাইলাম কে বলিতেছে, "মেদমামা—আয় বাবা—আয় ফিরে আয়।" সর্ব্বনাশ স্বপ্ন বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়—আবার সেই! হে স্বপ্নের ঠাকুর, তুমি এক মুহূর্ত্ত থাক। আমি প্রাণ ভরিয়া একবার দেখিয়া লই।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল—আমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। পন্নগের মেজমামা বাহির হইয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। বাড়ীর ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সমস্ত জিনিষ-পত্র বাঁধা। অতুলবাবু 'লগেজে'র 'লেবেল' লাগাইতেছিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আমরা আজই কলিকাতায় যাইব, ১৪ই আষাঢ় করবীর বিবাহ।" 'আলো ও ছায়া' খানা সেদিন ফিরাইয়া দিই নাই। সেখানা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম, "বইখানা সেদিন ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।"

"তাহাতে আর কি? আপনিও যাইবেন? কেন?

"বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

বহরমপুরের গিরিজানাথ রায়-মহাশয়ের পুত্রের সহিত করবীর বিবাহ। আপনি কি তাঁহাদিগকে চেনেন?

কি সর্ব্বনাশ! তিনিই যে আমার পিতাঠাকুর! মুখের সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া ফেলিলাম।

শ্রীকাঞ্চনমালা দেবী

ধন্যা

কুণ্ঠা কিসের বঁধু?
জ্বালা কোথায়? কুসুম-রসের
আগাগোড়াই মধু!
হে শ্যাম, আমার প্রাণের নাগর,
তোমার সোহাগ, তোমার আদর,
সইতে যদি না পারি ত বৃথাই নারী-প্রাণ।
সুখের কুসুম-শয্যা'পরে
মধু-রাতে শয়ন করে
একটি কি না কাঁটার লাগি কর্‌ব অভিমান?
আত্মহারা সোহাগ তোমার
গর্ব্বে বহি অঙ্গে আমার
প্রাণ,বসন্তে আধফুটন্ত কিংশুকেরি দ্যুতি,

গণ্ডে ঠোঁঠে দিলে এঁকে
চুম্ব, তাহার চিহ্ন রেখে
ক্ষণে ক্ষণে স্মরায় যে মোর অবশ অনুভূতি!
নিবিড় বাহু-বাঁধন-ঠাঁয়ে
অঙ্কুরিছে পুলক গায়ে,
সফল হ'ল বেণী-রচন শিথিল হয়ে খুলে,
ফুটাইলে অশ্রু যাহা,
কোরক-ব্যাথার নীহার, আহা!
বিজয়িনীর জয়-মালিকায় মুক্তা হয়ে দুলে।
কুণ্ঠা কেন প্রভু,
প্রেমের জয় চিহ্ন-ধরি
মলিন কে বা কভু?

শ্রীকালিদাস রায়

চরিত্র-বল

চরিত্র মানুষের সর্ব্বপ্রধান বল। চরিত্রবান্ পুরুষ অবলীলা-ক্রমে সংসার-সমুদ্র পার হইয়া যায়। বাষ্পীয় রথ যেমন শত শত লোক ও দ্রব্য-সম্ভার লইয়া বায়ুগতিতে গন্তব্য পথে চলিয়া যায়, সেইরূপ একজন চরিত্রবান্ লোক শত শত লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া শত শত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া সংসারের সকল কার্য্য হেলায় সম্পন্ন করিয়া চলে: সহায়, সম্পদ, সম্ভ্রম সকলই কাল-চক্র-পেষণে কালের করাল কবলে পড়িয়া জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় ফুটিতে না ফুটিতে সংসার-সমুদ্রে মিলাইয়া যায়; কিন্তু চরিত্রের পবিত্রতা-বিলোপের শক্তি কালের নাই। কাল চিরকাল সে পবিত্র মূর্ত্তি, সে পবিত্র স্মৃতি বুকে করিয়া রাখে। চরিত্র মানব-জীবনের কর্ণধার; তাই চরিত্রবান্ মানবের কথার উল্লেখে মহাত্মা শঙ্কর বলিয়া গিয়াছেন যে, ক্ষণেক সজ্জন-সঙ্গলাভও ভবপারের বিশেষ সহায়ক।

এই মহাবল লাভ করিতে হইলে, আত্ম-সংযম অভ্যাস করিতে হয়; আত্ম-সংযম অভ্যাস করিতে হৃদয়ের বল আবশ্যক হয়; হৃদয়ের বল-সঞ্চয় করিতে হইলে, আত্ম-ত্যাগ শিক্ষা করিতে হয়। হৃদয়-বল, আত্ম-সংযম এবং আত্ম-ত্যাগ শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলে চরিত্র-বল লাভ করা যায় না। সমাজের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া, সমাজের কঠোর শাসনে অনুশাসিত হইয়া সংযমের অভ্যাসে যাহারা সচ্চরিত্র হয়, তাহারা প্রশংসার যোগ্য বটে, এবং চরিত্র-গঠনের প্রধান উপায়ও বটে, কিন্তু যাহারা শত সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, প্রলোভনে আকৃষ্ট হইবার সুযোগ-সুবিধা উপেক্ষা করিয়া, বিলাস-বাসনার সমস্ত আকর্ষণ অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের সেই পূত চরিত্রকে দেব-চরিত্র বলিয়া মানব-জগৎ স্বীকার করে। এইজন্যই যতি রামকৃষ্ণ দেবতারূপে পূজিত; ভিখারীবেশী বিবেকানন্দের আনন্দসুন্দর আত্মার নিকট জগদ্‌বাসী অবনতমস্তক। বাল্যের চাপল্য, যৌবনের মোহ যে চিত্ত-বিপ্লব উপস্থিত করে, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার পক্ষে হৃদয়ের বল প্রধান সহায়। স্বার্থপরতায় হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া যায় এবং স্বার্থত্যাগে হৃদয়ের বল বাড়িয়া চলে।

"অভাবে স্বভাব নষ্ট" এই প্রবাদ বাক্যটী আমরা সচরাচর শুনিতে পাই। কথাটি বড় সত্য। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে লোকাচার সমাজেক যেভাবে আলোড়িত করিতেছে, তাহাতে চরিত্র-বল লাভ করা কত শক্ত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। হৃদয়-বল মনে করিলেই লাভ করা যায় না। যে সাধনায় এ শক্তি লাভ করিতে পারা যায়, তাহার শিক্ষা প্রথমে পিতামাতার নিকট পাওয়া যায়। পিতামাতা যদি সন্তানের নিকট আপনাদের গাম্ভীর্য্য-রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তবে সন্তান পিতা-মাতার আদর্শে প্রথমে সংযমের অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে। এই সংযম তাহাকে হৃদয়ের বল আনিয়া দেয়, এবং তাহা হইতেই পরিশেষে সে আত্ম-ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে; কিন্তু আজকাল পিতামাতা আর সন্তানের নিকট উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য রাখিয়া চলিতে পারেন না, ফলে সন্তানও আর সংযম-শিক্ষার অবসর পায় না। তাহার পর যাহাকে শিক্ষাগার বলিয়া সন্তানদিগকে শিক্ষার জন্য পাঠান হয় তাহা শিক্ষাগার নহে পরীক্ষাগার। সেখানে সন্তানদিগকে পরীক্ষা দিবার জন্য যাইতে হয়, শিক্ষা লাভ করিবার জন্য নহে। ছেলেরা যেখান হইতে হউক তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিয়া লইয়া যাইবে, কেমন করিয়া, কোথায়, কিভাবে সে তাহার পাঠ প্রস্তুত করিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিবার কেহ নাই, আছে শিক্ষকের নামে পরীক্ষক, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, বালক তাহার পাঠ প্রস্তুত করিয়াছে কি না। এই যে নীতিতে এখনকার শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালিত, ইহাপেক্ষা নৈতিক দুর্গতির সহায়ককরী আর কিছুই দেখা যায় না, আর তাহারই ফলে শিক্ষিত নামে অভিহিত ব্যক্তিগণের নৈতিক দুর্ব্বলতার আজকাল আর তুলনা মিলে না।

আত্ম-মর্য্যাদার অভাব হইলে হৃদয়-বল থাকিতে পারে না। ইদানীন্তন শিক্ষা আত্মমর্য্যাদার স্থলে আত্মম্ভরিতাকে আরাধনা করিয়া আনিয়াছে; তাই নির্ভীকতা, ন্যায়পরতা, উদারতার স্থলে জড়তা এবং দাম্ভিকতা এত প্রসার-লাভ করিয়াছে। গৃহে যাহার সংযম-শিক্ষা হইল না, শিক্ষালয়ে যাহার আত্ম-মর্য্যাদা বিকসিত হইল না, সেই উদ্দাম যুবক অল্পবয়সে বিবাহিত জীবন লাভ করিয়া, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-পণ্ডিতগণের ছাড়পত্রের প্রভাবে সে নিজেকে সর্ব্বজ্ঞ স্থির করিয়া প্রাণের উন্মুক্ত আবেগে উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিবার জন্য পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে বাঁধিয়া গৃহ, পরিজন ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায়, এবং বিদেশে বিদেশে জীবনের উৎকৃষ্ট অংশ ব্যয় করিয়া অবসন্ন দেহ-ভার লইয়া চরিত্রহীনতার আদর্শরূপে বিরাজ করিতে থাকে। সংসারের কর্ম্মকঠোর প্রাণ তাহার প্রতি তীব্রদৃষ্টিপাত করিলেও, তাহার ন্যায় আত্মসম্মানবর্জ্জিত হীনের সাহচর্য্যে অনেক তরল-মতির দুর্গতি ঘটে।

সংসারের নানা ব্যাঘাত-বিপর্য্যয়ের মধ্যে দশের ভার লইয়া, সমস্ত ঝঞ্ঝাটের তাড়নায় মানবের যথেচ্ছগতি অনেক পরিমাণে বোধ হয় মানুষকে পরার্থের উচ্চ আদর্শে গঠিত করে; কিন্তু সেই দশের ভার অল্পবয়সে স্কন্ধে চাপিলে, হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। সন্তানের পাঠ্য দশা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহার পিতৃ-বিয়োগে তাহাকে অভিভাবকরূপে তাহার পিতৃ-সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য মাথায় তুলিয়া লইতে হয়। ইহাতে একদিকে অনাহার অনিদ্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ব্যাকুলতা, এবং অন্যদিকে বিধবা মাতা ও ভ্রাতা-ভগ্নী-গণের চিন্তা তাহাকে পলে পলে, তিলে তিলে এমন ক্ষয় করিয়া দিতে থাকে যে, তাহার আত্ম-সম্মান বা ব্যক্তিত্বজ্ঞান ফুটিবার অবকাশই তাহার ঘটে না। এমন অবস্থায় আবার যদি তাহার বিবাহ হয়, তবে এই পিতৃ-সংসারের সহিত নিজের সংসারের বিশেষ ভার-বহনের সাফল্য লাভের পূর্ব্বে তাহার সালোক্যলাভ ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক হইয়া পড়ে; সুতরাং মানব-চরিত্র-গঠনে মানবের সমাজ কত বেশী দায়ী, তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

এইজন্য পূর্ব্বকালে আমাদের সন্তানেরা অভিভাবকগণের নিকট দেব-দেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিত। অভিভাবকগণ নানারূপ সহজবোধ্য স্তবস্তোত্রে তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়া তাহাদিগকে উত্তরকালে মানুষ হইবার জন্য সাহায্য করিতেন। এখনকার শাস্ত্র-শাসনের বহির্ভূত পিতা নীতি-শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াও আত্ম-সংযমের অভাবে সন্তানগণের চরিত্র-গঠনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

মানুষ জ্ঞানের সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মলাভ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। প্রতিষ্ঠার প্রবল আকর্ষণে মানুষ আপনা হারাইয়া ভাসিয়া চলে এবং প্রতিষ্ঠার মোহন রূপের প্রলোভনে ক্রমে ক্রমে দাম্ভিক হইয়া মানুষ প্রতিষ্ঠার নামে দীনতার পথে আসিয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে এই যে গৌরবময় উদ্দেশ্য মানুষকে আশ্রয় করিয়া সংসারে শান্তোজ্জ্বল মূর্ত্তির বিকাশে যত্নবান্, ইহার তত্ত্ব না জানিলে চরিত্র-গঠন সম্ভবপর হয় না। আত্ম-বিসর্জ্জনের নাম আত্মপ্রতিষ্ঠা এ জ্ঞান না থাকিলে আত্ম ত্যাগ শিক্ষা করা যায় না; আত্ম-ত্যাগ না শিখিলে চরিত্র-বল লাভ করা যায় না। যে পরার্থে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিয়াছে ভয়ে বা প্রলোভনে সে কখনও আত্মহারা হয় না। সেই সাধুর সরল অথচ সতেজ ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হয়। তাহাকে অনাহারে অনাশ্রয়ে ফেলিয়া অন্যায়ে বাধ্য করিতে কেহ পারে না। সে পাষাণ-অপেক্ষাও কঠোর অথচ কুসুম-অপেক্ষাও কোমল মূর্ত্তির অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ জগৎকে মাতাইয়া দেয়—জগৎ সে পবিত্র চরিত্রের পূজা করে।

আত্ম-সম্মান-জ্ঞান না থাকিলে, আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না, এইখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনও বিশেষ কার্য্যের জন্য একবার তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সাহেব তাঁহার বসিবার আসনের ব্যবস্থা না করিয়া নিজে চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া গান করিতেছে ও পদদ্বারা তাল দিতেছে। পাদুটী বিদ্যাসাগর, মহাশয়ের সম্মুখে রক্ষিত। ইহার কিছুদিন পরে সেই সাহেবের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হয় এবং সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে আসেন। সাহেবের আগমন-সংবাদ পাইয়া বিদ্যাসাগর-মহাশয় একখানি চেয়ার ও টেবিল লইয়া চেয়ারে নিজে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া গান আরম্ভ করিয়া সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান। সাহেব এইভাবে নিজেকে অবমানিত বিবেচনা করিরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন। এই ঘটনার কৈফিয়ৎ তলব হইলে, তিনি সাহেবের তাঁহার প্রতি এইরূপ ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহা বিলাতী সভ্যতা ও শিষ্টাচার ভাবিয়া তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইলেও, বিশেষ চেষ্টা করিয়া সাহেবের প্রতি এইরূপ শিষ্টাচার-প্রদর্শনের জন্য উক্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই কৈফিয়তে সাহেবের দোষ জানিয়া, ঘটনা সেইখানেই চাপা পড়িয়া যায়। এইরূপ আত্ম-সম্মান-জ্ঞান ছিল বলিয়াই বিদ্যাসাগরমহাশয় এমনভাবে প্রাধান্য-রক্ষা করিতে পরিয়াছিলেন। এইখানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, এইরূপ ব্যবহার কোনও বাঙ্গালীর প্রতি হইলে এবং বাঙ্গালী ঊর্দ্ধতন কেহ ইহার বিচারক থাকিলে, সেই-দিনই হয় ত ইহা অহঙ্কারের বা মূঢ়তার নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভাতের থালাখানি সরাইয়া দেওয়া হইত, ইহাই আমাদের জাতীয় দীনতা এবং এইখানেই ইংরেজের চরিত্রের উৎকর্ষ। বাঙ্গালার সমাজ বাঙ্গালীর চরিত্র-গঠনের আশ্রয়রূপে এখনও দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, কখনও আত্মাভিমান ভুলিয়া ইহাকে আশ্রয় দিতে পারিবে কি না, তাহাও বলা সহজসাধ্য নহে; কিন্তু প্রকৃত চরিত্রবান্ লোক এ-সকলের অপেক্ষা রাখিয়া চলে না। তাহার আত্ম-নির্ভরতার জ্ঞান তাহাকে মুটের সাজ পরাইতেও লজ্জা বোধ করিবে না এবং ভাতের থালা ও আশ্রিত জনের মুখ চাহিয়া সে হীনতাকে বরণ করিয়া লইবে না। সে নিজের জন্য মোট বহিবে—রাস্তায় খবরের কাগজ ফেরি করিবে, তথাপি অন্যের নিকট অন্যায় দীনতা স্বীকার করিবে না। ইহাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

শিক্ষায় উদারতা না আসিলে, তাহা কখনও মঙ্গল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না; এইজন্য এদেশের 'ভদ্র' বলিয়া পরিচিত লোকদিগকে দেশের জনসাধারণ ভালবাসিতে চায় না। দেশের ভদ্রলোককে তাহারা শিক্ষার জন্য ভক্তি করে, শক্তির জন্য ভয় করে; কিন্তু তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না—এই সরলতার অভাবের জন্য, কথায় এবং কাজে অমিলের জন্য। তুমি দেশের একজন উচ্চশিক্ষিত, উচ্চপদধারী ব্যক্তি, রাজ-সরকারে তোমার নাম, তোমার খেতাব ধরে না; কিন্তু দেশের লোক তোমাকে জানে না। জানে না তোমার সঙ্কীর্ণতার জন্য—তোমার বৃথা আত্মাভিমানের জন্য।—আর তোমারই মাথার মণি বিদ্যাসাগরকে তুমিও যেমন ভক্তি ও বিশ্বাস কর, দেখিবে দেশের আপামর সাধারণও তাহাদের প্রাণের ভক্তি ও বিশ্বাস এই মহাপ্রাণে অর্পণ করিয়াছে। কেন করিয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, তিনি তোমার ন্যায় ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না—তিনি তাঁহারই প্রতিকৃতি ইহাদিগের মধ্যে দেখিয়া ইহাদিগকে কোল দিতেন।

বল না থাকিলে কিছুই রক্ষা করা যায় না। ধন-বল, জন-বল বাহু-বল, বুদ্ধি-বল:চরিত্র-বল প্রভৃতির মধ্যে চরিত্র-বল মানব-জাতিকে যত উন্নত, যত কর্ম্মঠ করিয়া তুলিতে পারে, এমন আর কিছুতে পারে না। আজকাল অনেক organisation অনেক agitation, আরও কতক পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত কত প্রকারের আন্দোলন, আলোচনা বাঙ্গালীর জাতীয়তাকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কত জন, কত মতে এই বিমূঢ়, বিভ্রান্ত বাঙ্গালী-জাতিকে জ্ঞানোন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু চরিত্র-বল অভাবে মনুষ্যত্ব, ত্যাগ ও সংযমের অভাবে এইসকল জনমণ্ডলী বাঙ্গালী-জাতির জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করাইতে পারিতেছে না। জাতির পাতিত্যের মুকুর জাতির সম্মুখে তুলিয়া দিয়া জাতীয় দৌর্ব্বল্য মুছাইতে হইলে, রামদাস, রামানন্দ, চৈতন্য ও গুরুগোবিন্দের ন্যায় ত্যাগ এবং সংযমের আদর্শ-সাধক-চরিত্র হওয়া চাই। চৈতন্য বা রঘুনন্দন আধুনিক ধরণের organisationএর ধুয়া ধরিয়া একটা উদ্ভট, বিকট কিছুর সৃষ্টি না করিয়া যে অটুট শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অধুনাতন শ্মশানের দগ্ধকাষ্ঠবিশেষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলী বা সুবিধাবাদী সর্ব্ববিশিষ্টতাশূন্য দুর্ব্বলচরিত্র বাবুর দল তাহা কোথায় পাইবে?

চরিত্র-কথায় অনেক অবান্তর কথার আলেচনা করিয়া ফেলিয়াছি। জাতীয়-চরিত্রে, দৌর্ব্বল্য আমাদের কত বেশী, তাহাই কিছু কঠোরভাবে আলোচনা করিয়াছি। "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ" এই শাস্ত্র-বচন স্মরণ করিয়া আশা করি, পাঠক-বৃন্দ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমাদের সমাজে কি ব্যক্তিগতভাবে, কি সমষ্টিগতভাবে, যেরূপেই দেখা যাক, স্ত্রীলোকের পবিত্রতার তুলনা নাই। ইহারই একটি ঘটনার উল্লেখে, পূত চরিত্রের

প্রভাবে মানবের কি মহামঙ্গল সাধিত হয়, তাহা আজ আপনাদিগকে বলিয়া এ-প্রবন্ধ শেষ করিব।

আজ প্রায় তিন বৎসর গত হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় আমি নিমতলার ঘাটে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম একটি ঘোড়ার গাড়ী Strand Roadএর পথ দিয়া শব-দাহ-ঘাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীটির মাথায় একটি মড়া এবং ভিতরে কতকগুলি রমণী কাঁদিতেছে। ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দিক হইতে একটি বাবু সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাবুটীর গায়ের এসেন্সের গন্ধে, ধুতি, চাদর, ছড়ি, টেরির বাহারে এবং চাল-চলনের কায়দায় একদিকে লোকে যেমন চকিত, অন্যদিকে এই করুণ দৃশ্যে তেমনই ম্রিয়মাণ। পথে বেশ জনতার আবির্ভাব হইয়াছিল। সকলেই এই মৃতের আত্মীয়গণের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল। সেই বাবুটী ও আমি কিছু দূরে দাঁড়াইয়াছিলাম। বাবুটীর পথশ্রম তখনও দূর হয় নাই। তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিলেন—"উঃ, কি heart-rending আমি "তাই ত" বলিয়া চুপ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি দূর হইতে এই হৃদয়ভেদী শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। একবার অনুসন্ধান করা যাক্ না, ইহারা কাহারা।" বলিয়াই তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া সেই গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ইতোমধ্যে সেই রমণীগণ মড়াটিকে গাড়ী হইতে নামাইয়াছে। তাহারা সংখ্যায় চারিজন। তিনজনের বয়স ৪০হইতে ৬০এর মধ্যে এবং একজন ১৫।১৬ বৎসরের। এই বালিকাই আলু-থালু-বেশে উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করিতেছিল। ইহারা জাতিতে কায়স্থ। মৃতব্যক্তি এই বালিকার স্বামী ও এই স্ত্রীলোকগণের একমাত্র অভিভাবক ছিল। বাকী তিনজনের একজন মাতা ও অন্য দুইটীর একটী ভগ্নী এবং একটি বিধবা ভ্রাতৃজায়া। উঃ, কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! পরিচয় শুনিয়া আমার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। মৃতব্যক্তি সওদাগরি আপিসে ৮০৲ টাকা বেতনের কেরাণী ছিলেন। বয়স ২৭।২৮ মাত্র। সেই বাবুটী সমস্ত শুনিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন—"উঃ, কি heart-rending!" আমি নিস্তব্ধ। বাবুটী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেন এবং তাহাদিগকে কিছু সাহায্য করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। বালিকা সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। অনেকে সাহায্য-দানে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বালিকা আপত্তি করায়, কেহই কিছু করিতে পারিল না। তাহারা ধীরে ধীরে মড়াটিকে শ্মশানে লইয়া গেল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই জনমণ্ডলী, সেই বাবুটী ও আমি চলিলাম। এখন আর সেই বালিকার চক্ষে জল নাই; সে স্থির, ধীরভাবে সমস্ত কার্য্য করিয়া চলিয়াছে। মৃতের জন্য অগ্নি-শয্যা রচিত হইল। তাহাতে মৃতকে শয়ন করাইয়া ধীরে ধীরে সেই বালিকা হিন্দুর সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিল। যখন বুভুক্ষু অনল আপন লেলিহান্ জিহ্বা বিস্তার করিয়া বুভুক্ষা মিটাইতে লাগিল, বালিকা তখন আপনা হারাইয়া একদৃষ্টে সে দৃশ্য দেখিতেছিল! তাহার পর সমস্ত শেষ হইলে, বালিকা একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"যাক্, আমার সমস্ত শেষ হয়ে গেল।" তাহার চক্ষে জল নাই, মুখে সে কি যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বালিকার সেমূর্ত্তি দেখিয়া সমস্ত শ্মশান স্তম্ভিত। ঠিক সেই সময় সেই বাবুটী আবার বলিয়া উঠিলেন—"উঃ, কি heart-rending! কিছুক্ষণ আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইল। তাহার পর সেই বালিকা ও তাহার সঙ্গিনীগণ চলিয়া গেলে, দর্শকবৃন্দ, যাহার যে যেদিকে ইচ্ছা চলিয়া গেল। আমি ও সেই বাবুটী ধীরে ধীরে আসিয়া গঙ্গার ধারে বসিলাম। দূরের ঘড়িতে রাত্রি ২টা বাজিয়া গেল।

সেদিনকার সে দৃশ্যে সেই বাবুটীর প্রাণের কপাট খুলিয়া গিয়াছিল। তিনি আমাকে তাঁহার প্রাণের যে সকল কথা বলিয়া গেলেন, তাহাতে জানা গেল যে, তিনি বড়লোক লম্পট, মদ্যপ এবং চরিত্রহীন। সেইদিন সচ্চরিত্র হইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই ঘটনার ১০।১২ বৎসর পরে একদিন গয়ায় ব্রহ্মযোনি-পাহাড়ে বিস্ময়-পুলকিত চিত্তে দেখিলাম, সেই মদ্যপ ও চরিত্রহীন ব্যক্তিটি গেরুয়া-বসন-ধারী সন্ন্যাসীর বেশে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কত আনন্দপ্রকাশ করিলেন—কত ধর্ম্ম কথার আলোচনা হইল!

মানুষ ষড়্‌রিপুর প্রভাবে বিপাকে পড়িয়া পাপ করিয়া ফেলে; কিন্তু পরেই তাহার অনুশোচনা আসে। দেখিলাম, এই সন্ন্যাসীর কি অনুশোচনা—কি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে! তিনি সেদিন কথা-প্রসঙ্গে দুই-তিনবার আমায় সেই নিমতলার শ্মশান-দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেনঃ—

"So sweet was never so fatal."

"তাহার এমন বৈধব্য যে জগতে, সে জগতে আমার থাকা হইল না।" আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! মানুষের চরিত্রের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিলে, দেখা যায়, প্রথমে কাম, পরে কামনার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন, শেষে উদার শান্তি। চরিত্র, প্রাণের উদারতায় উদ্বোধিত, পরার্থ-প্রীতিতে বিকসিত এবং সংযমের দৃঢ়তায় প্রস্ফুটিত হয়। এই লম্পট বাবুটীর অবস্থা আর সেই মহিমমণ্ডিত পবিত্র মূর্ত্তি আজিও ভুলিতে পারি নাই। কিশোরীর সে পূত চরিত্র আমার জীবনে ছাপ দিয়া গিয়াছে। জানি না, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে আর কাহারও স্মৃতিতে সে দেবী-প্রতিমা বিরাজিতা আছেন কি না; তবে আমি তাহার পর কত দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়াছি, কত লোকের আংরার বিছানা সাজাইয়াছি, কত বিয়োগ-কাতর মুখ আমার নয়নে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তেমন দীপ্তি আর কোথাও দেখিলাম না—সে দর্শকমণ্ডলীও দেখা দিল না। ইহাই চরিত্র-বল। এমন বল না থাকিলে, এতটা কখন সম্ভবপর হইত না—লম্পটের এমন পরিবর্ত্তনও দেখিতাম না। সেই বালিকা তাহার অতবড় বিপদের দিনে কাহারও দয়া বা করুণার অপেক্ষা না রাখিয়া, চরিত্রের উৎকর্ষের যে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহার বিয়োগান্ত নাটক শেষ করিয়া গিয়াছিল, তাহার তুলনা এ সংসারে মিলে না। এমন পবিত্র চরিত্রের পূজা এ-জগৎ না করিয়া থাকিতে পারে না। এমনই ধৈর্য্য, সংযম এবং ত্যাগ শিক্ষা করিয়া এ জাতি উন্নত হউক ইহাই ভগবানের নিকট কামনা করি।

শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত

নবাবের দেশে

এ হচ্ছে বাগানের সহর,—এক জায়গায় এত বাগান বুঝি আর কোথাও নাই! কোন উঁচু বাড়ীর 'টঙ্গে' বসিয়া সুন্দরী লক্ষ্ণৌ-নগরীকে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্রার্পিতবৎ দৃশ্য দেখিলে, দর্শককেও একেবারে চিত্রার্পিতের মত হইয়া যাইতে হইবে—সে দৃশ্য অতুল, মোহন, অপূর্ব্ব! চারিদিকে বাগান আর বাগান, সে অভিরাম স্নিগ্ধ-শ্যামল বর্ণ মাধুরীতে নয়ন-মন যেন স্বপ্নাবেশে এলাইয়া আসে! কবির সৌন্দর্য্য-প্রতিমা এখানে যেন শরীরিণী হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে!

আর 'কেশর-বাগে'র মত বাগানও একসময়ে ভারতবর্ষে আর বোধ করি ছিল না। আজিকার এই 'কেশর-বাগ' দেখিয়া তাহার পূর্ব্বরূপ-সম্বন্ধে কোন-একটা ধারণা করিতে পারা অসম্ভব। অতীত-শ্রী, লোল্-চর্ম্মা বৃদ্ধাকে দেখিয়া যেমন তাহার পুষ্পিত যৌবনের মধুর লাবণ্য কল্পনায় আসে না, এ 'কেশর-বাগ' দেখিয়া তেমনই ওয়াজিদ আলি শার নিজের-হাতে, বড়-সাধে, সযতনে-গড়া সে 'কেশর-বাগে'র মহিমা বুঝা যায় না। এমন দিন ছিল, যেদিন হেথায় রূপার গাছে সোণার ফুল ফুটিত! রূপকথার স্বপ্ন নবাবীর দৌলতে বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। এই বাগানের "লক্ষ তোরণ" তৈয়ারি করিতে লক্ষটাকা খরচ হইয়াছিল। যে বাগানের একটিমাত্র তোরণ-নির্ম্মাণে এত ব্যয়, সে বাগানের সমস্তটা গড়িতে যে আশীলক্ষ টাকা 'খোলামকুচি'র মত খরচ হইয়া যাইবে, তা আর এমন বিচিত্র কথা কি? এই বিশাল উদ্যান রচনা আরম্ভ হয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে, আর সমাপ্ত হয় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে। সেকালের বাদ্‌শা-নবাবেরা চোখ বুজিয়া টাকা খরচ করিতে জানিতেন, তাঁহারা টাকার মায়ায় সৌন্দর্য্যকে কোথাও খর্ব্ব হইতে দিতেন না; ভারতবর্ষে আজ তাই দিল্লী ও আগ্রার দুর্গ, 'তাজমহলে'র মত প্রেমের অমর-মর্ম্মর-স্মৃতি, 'জুম্মা'র মত মস্‌জিদ, 'কুতব-মিনারে'র মত অপূর্ব্ব স্তম্ভ ও 'কেশর-বাগে'র মত অদ্বিতীয় উদ্যান, আমরা সকলে চর্ম্মচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইতেছি। বাদশা-নবাবের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তায় ও বিলাসিতায় ভারতের শিল্প সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল, শিল্পিগণের অন্ন-চিন্তা দূর হইয়াছিল এবং কলা রাজ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। হায়, ভারতে আজ সে শাজাহানও নাই, আর সে ওয়াজিদও নাই! তাই তেমন সমাধি-ভবন, তেমন ভজনালয়, তেমন নন্দন-কানন আর নূতন করিয়া কেহ গড়িতে পারে না। সে কুবেরের ভাণ্ডার এখন শূন্য, সে শিল্পিগণের বংশধরেরা এখন মূর্খ ভিখারী! এ শিল্প-সুষমার খাঁটি সমজদারও বড়-বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না—কদর বুঝিলে, আজ কি আমরা "প্রাচ্য কলা"র নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠি?

বলিয়াছি, 'কেশর-বাগে'র পূর্ব্ব-গরিমা আর বড় নাই। ব্যবসায়ী ইংরাজ এখানকার মর্ম্মর-শিল্পের অনেক নিদর্শন অন্যত্র চালান দিয়াছে। তবে, এখনও যাহা আছে, তাহা বড় সামান্য নয়। চারিদিকে 'সাটিনে'র মত চিকণ-সবুজ ঘাসের নরম বিছানা, মাঝে মাঝে মার্ব্বেলের বিরামাসন, কৃত্রিম উৎস, কুঞ্জ-বিতান, জলাধার। একটি দীর্ঘ জলাধার দেখিলাম—সেটিকে ছোট-খাট পুষ্করিণী বলিলেও হয়—তাহার দুপাশ হইতে তলা পর্য্যন্ত পাথরে বাঁধান'। এধার-ওধার যাওয়া-আসার জন্য মাঝখানে মর্ম্মর-সেতু—তাহার সর্ব্বাঙ্গে খোদিত কুসুমিত লতা-পাতা—সুন্দর!

ধর্ম্মে মুসলমান হইলেও, নবাব ওয়াজিদ আলি শা 'হোলি'র মত অতবড় উৎসবটা তাঁহার নাগালের বাহির দিয়া কাটিয়া যাইতে দিতেন না,—বেগমদের লইয়া এই নন্দন-কাননে তিনি ফাগুয়ালীলায় একেবারে মাতিয়া উঠিতেন। তখন বাগানভরা গাছে গাছে হাজার হাজার রাঙ্গা ফুলের পাশে ফাগে-রাঙ্গা জীবন্ত কামিনী-ফুলগুলিও ফুটিয়া উঠিত—সে দৃশ্য সত্যই শোভন ছিল।

ওয়াজিদ আলি শা'র মত বিলাসী নবাব, লক্ষ্ণৌএর মস্‌নদে আর কখনও বসেন নাই। তিনি ভাল গায়ক ছিলেন এবং কবিত্বেও বড় কম যাইতেন না। তাঁহার রচিত সঙ্গীত অন্ততঃ দু-একটি জানেন না, ভারতে এমন ওস্তাদ গায়ক বোধ করি একজনও নাই। 'কেশর-বাগে'র একধারে তাঁহার কর্প্পূর-ধবল, সুবৃহৎ ও সুনির্ম্মিত নাচঘর দেখিবার মত ব্যাপার বটে। এই নাচঘরে নবাবের গানের মজ্‌লিস্ বসিত। তব্‌লার তালে তালে সেখানে সেতার, এস্‌রাজ, বীণ্, বেহালা তারে তারে বাজিয়া উঠিত; তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিত তন্বঙ্গী নর্ত্তকীদের কিন্নরী-কণ্ঠের তান-লয়-সঙ্গত সঙ্গীত; তাহাদের ভঙ্গি-বঙ্কিম কণ্ঠে দুলিত মুক্তামালা, রত্নহার; তাহাদের লীলা-বিচিত্র বাহুতে কাঁদিত শিঞ্জিত ভূষণ; তাহাদের চঞ্চল চরণে বাজিত মুখর মঞ্জীর—সে যেন সর্ব্বাঙ্গে-আন্দোলিত তৃষিত যৌবনের মধুর আর্ত্তরোল!—তাহাদের সুগন্ধ অঞ্চল-তাড়নে আহত হইয়া আকুল সমীর সঙ্গীতের অনুরণন লইয়া বাহিরের রাজপথে পলায়ন করিত—সেখানে পথ চলিতে চলিতে পথিকেরা সব মুরলী-গুঞ্জন-মুগ্ধ মৃগের মত হঠাৎ পথ-চলা ভুলিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হয় ত মনে মনে ভাবিত যে, "প্রাচীরের আড়ালে স্বর্গ বন্দী হইয়া আছে,—হায় রে নসীব, আমাদের সাম্‌নে তার দ্বার কি কখনও খুলিবে না!"

কিন্তু হঠাৎ একদিন ইংরাজ আসিয়া ওয়াজিদ আলির এমন জম্‌কালো গানের আসর ভাঙ্গিয়া দিলেন; রূপসীদের চপল নয়নের দীপ্ত বিদ্যুৎ অকস্মাৎ নিবিয়া গেল; ভয়-ত্রস্ত কণ্ঠভূষণ ও নূপুর একসঙ্গে থামিয়া গেল; তবলা, এস্‌রাজ, বীণ, মুরলী কাঁদিতে কাঁদিতে নীরব হইয়া গেল; 'কেশর-বাগে'র রূপার গাছে সোণার ফুল ঝরিয়া পড়িল; সেই স্বপ্নসম্ভব বিচিত্র নাট্যশালার পুষ্প-পতাকা ছিঁড়িয়া পড়িল; নবাবীর মহার্ঘ মুকুট রাজপথের ধূলায় খসিয়া পড়িল এবং প্রেয়সীর প্রেমতপ্ত বক্ষ হইতে আলিঙ্গনচ্যুত বিলাসী রাজ্যেশ্বর রাজাহারা হইয়া ভগ্নপ্রাণে ক্রন্দন-রাগিণী রচিয়া আপনার সাধের রাজধানী হইতে বিদায় লইলেন:—

"যব্ ছোড়ি চলে লক্ষ্ণৌ-নগরী!"

* * * *

দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ—এ সহর তিনটি যেন একই শিল্পীর দ্বারা একই আদর্শে গড়া। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই মোগল-শিল্পের অসংখ্য নমুনা আছে; কিন্তু দিল্লী-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা মোগল শিল্পের সকল বিশেষত্ব, সকল অপূর্ব্বত্ব, সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া লইয়াছেন, এ-কথা বলা যায়। সেই একরকমের ঘর বাড়ী, সেই এক-ধাঁজের পোষাক-পরা লোক-জন, সেই ধূলায়-ধূসরিত প্রশস্ত রাজপথ!

দিল্লী-আগরায় পাথরের উপরে মানুষের হাতের কায়দা যত-

রকমে পারা যায়, দেখান হইয়াছে—মানুষের কৌশলে কঠিন পাষাণ সেখানে মাখনের মত নরম হইয়া উঠিয়াছিল। শাজাহানের দুর্গ-প্রাসাদ, জুম্মা-মস্‌জিদ্‌, মোতি-মসজিদ্‌, দেওয়ানী-খাস, দেওয়ানী-আম, সমন-বুরুজ, তাজমহল, ইতমত্‌উদ্দৌলা প্রভৃতিতে পাষাণের কাঠিন্য কেহ দেখে না, দেখে—জীবন্ত, কোমল, শরীরী কবিতা! লক্ষ্ণৌ-নগরে পাথরের কাজ বড় নাই, শিল্পীরা এখানে ইটের আশ্চর্য্য ঘর বাড়ী বানাইয়া আপনাদের বাহাদুরী দেখাইয়াছে।

লক্ষ্ণৌএর মাটির পুতুলের কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই মৃৎ-শিল্প এদেশ হইতে প্রায় অদৃশ্য হইয়া যাইতে বসিয়াছে; কেবল লক্ষ্ণৌ ও বাঙ্গালার কৃষ্ণনগরে এখনও ইহার কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। লক্ষ্ণৌএর কারিকরদের কাজ বাঙ্গালী-কারিকরদের চেয়ে ভাল বলিয়া মনে হইল। পুতুলগুলির গঠন-পিটন একেবারে স্বাভাবিক ও জীবন্তের মত। এই কারিকরেরা উৎসাহ ও যথার্থ শিক্ষালাভ করিলে, নিশ্চয়ই ভাস্কর-কার্য্যে নাম কিনিতে পারে।

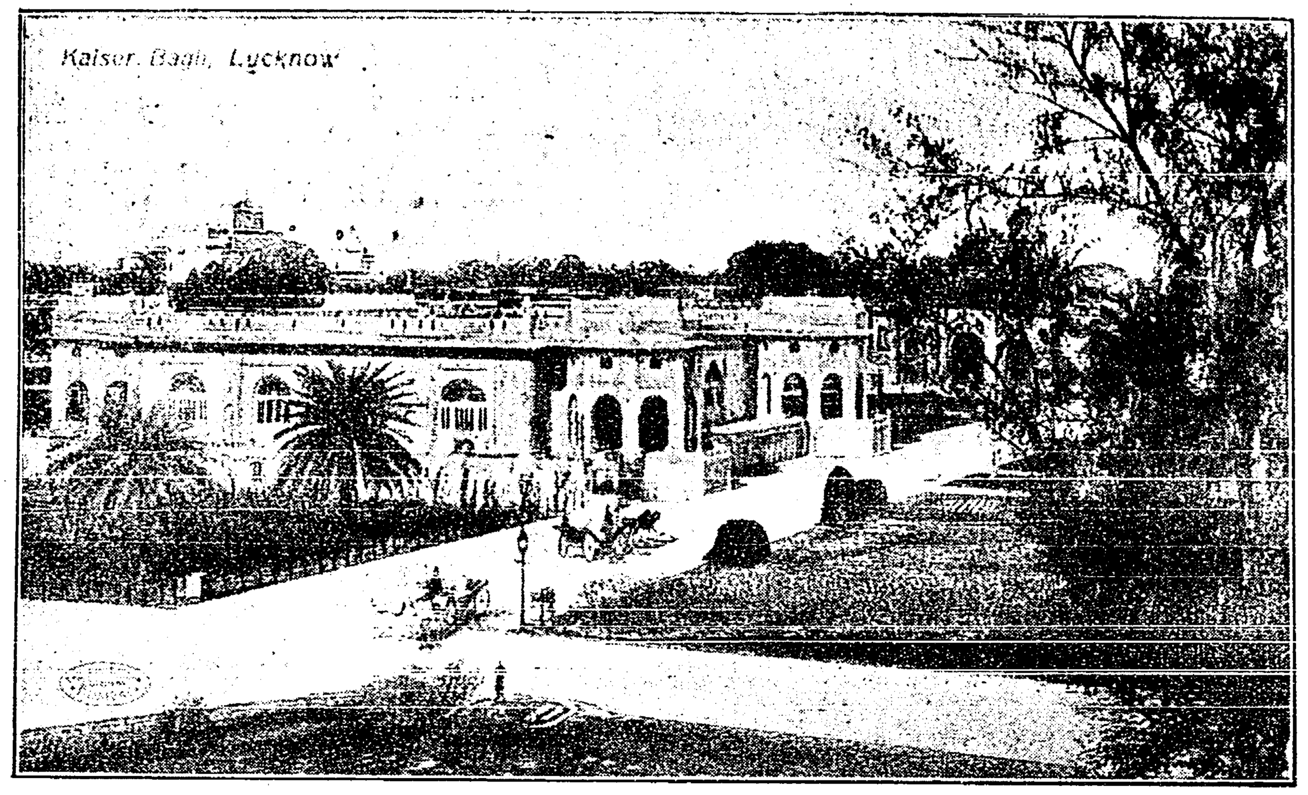

কেশর-বাগ (বামে নাচঘর)

সহর-হিসাবে দিল্লী ও আগ্রার চেয়ে লক্ষ্ণৌ একেবারেই হীন নহে। আয়তনে ইহা প্রকাণ্ড, লোক-সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষের কাছাকাছি।

পশ্চিমে অনেকদিন হইতেই বাঙ্গালীর বসবাস আছে। সম্প্রতি দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগরে কলিকাতা হইতে কয়েকটি কোম্পানীর আফিস উঠিয়া আসাতে, এদিকে বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবন পশ্চিমের আর আর জায়গায় যেমন,—এখানেও ঠিক তেমনই। সেই

অশিক্ষা বা কুশিক্ষার জন্য ইহাদের কাজে এখন অনেক দোষ আছে। ইহারা স্বাভাবিক মূর্ত্তি গড়িতে পারিলেও, শিল্প-রাজ্যে খুব উচ্চস্থান দখল করিতে পারিবে না; কারণ, ইহাদের পরিকল্পনায় প্রশস্ততা নাই। ইহাদের তৈয়ারি মূর্ত্তিগুলি জীবন্ত হইলেও, তেমন ভাবপ্রকাশ করিতে পারে না। তবে, আমরা যদি উৎসাহ দিই, তাহা হইলে এই দেশীয় শিল্পের উন্নতি হইতে বড়-বেশী দেরি লাগিবে না।

সঙ্গীত-সাধনার জন্য লক্ষ্ণৌ অনেকদিন হইতেই বিখ্যাত। 'লক্ষ্ণৌ

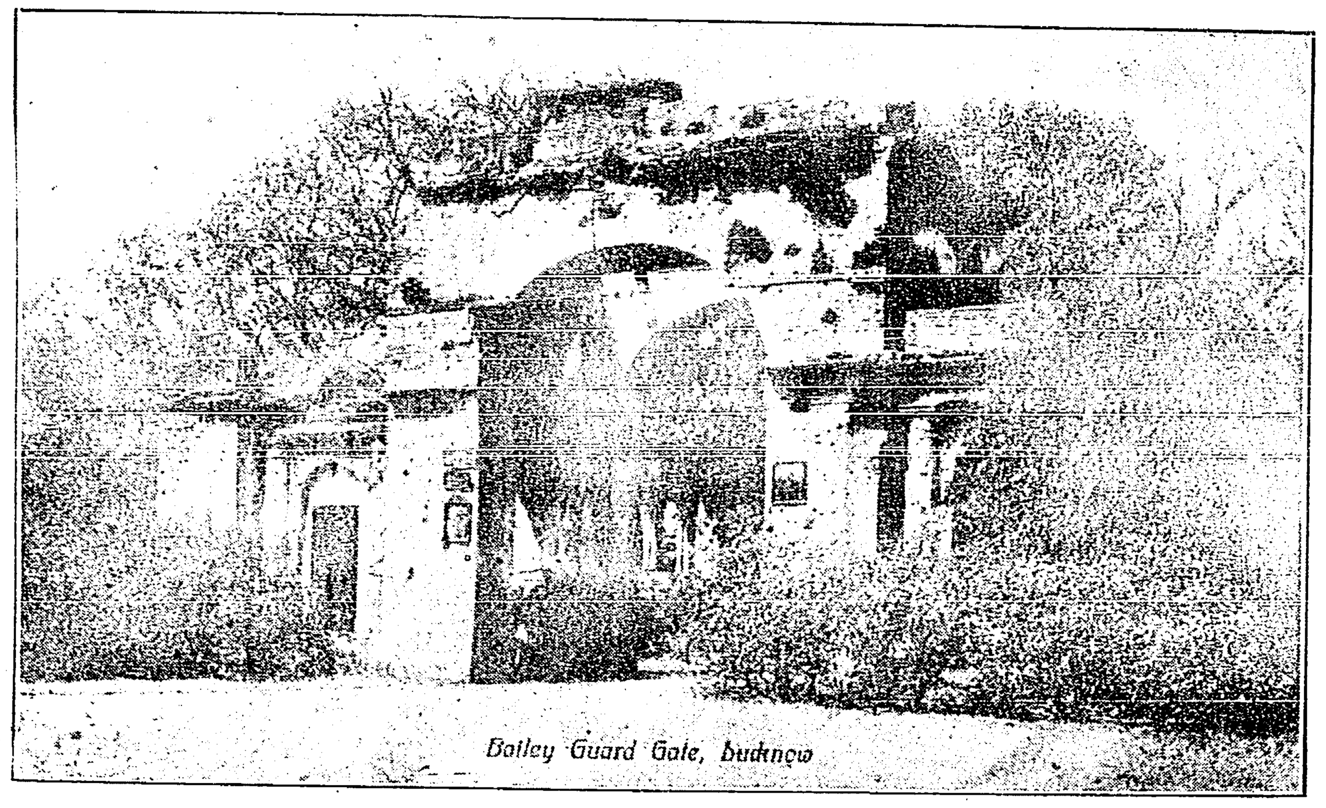

বেলিগার্ড-গেট্

অফিসে-যাওয়া-আসা, সন্ধ্যাবেলায় পাঁচজনে মিলিয়া-মিশিয়া তাস-দাবা-পাশার আড্ডা, পূজা-পার্ব্বণে কালীবাড়ীতে ধুম-ধাম, নাচ গান, থিয়েটার! যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য-চর্চ্চার জন্য পশ্চিমের অন্যান্য সহরের মত এখানেও 'লাইব্রেরী' আছে।

ঠুংরি'র কথা কে না জানে? 'লক্ষ্ণৌ ঠুংরি' রচনা করিয়াছিলেন গোলাম নবী ওরফে শোরী মিঞা; তাঁহার সুর ও নাচ ভাঙ্গিয়াই বাঙ্গালী 'নিধুর টপ্পা'। 'ঠুংরি' বিলাসের সুর। তাহার জন্ম হইয়াছিল তাই বিলাসপ্রধান লক্ষ্ণৌ-নগরে।

লক্ষ্ণৌ এখন অযোধ্যার রাজধানী। ভারতের রাজধানী দিল্লীতে কুরু-পাণ্ডবের স্মৃতি আছে এবং অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌতে রাম-লক্ষ্মণের স্মৃতি আছে। আধুনিক লক্ষ্ণৌ-সহরের কাছেই প্রাচীন অযোধ্যার তোরণ ছিল; কিন্তু কালের নিঃশ্বাসে রামায়ণী যুগের সে পবিত্র চিহ্ন এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

অযোধ্যার সুবাদারের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাই ১২৪০ খৃষ্টাব্দে। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসক যথার্থ সুবাদারের উপাধি পান।

লক্ষ্ণৌএর রাজতক্ত পান। ওয়াজিদ আলি অযোধ্যার শেষ রাজা। ইংরাজ তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন।

* * * *

লক্ষ্ণৌএ দেখিবার জিনিষ অনেক। একখানি এক্কা ভাড়া করিলে একদিনেই দ্রষ্টব্য যাহা-কিছু মোটামুটি দেখিয়া লওয়া যায়। ভাল করিয়া সব দেখিতে-শুনিতে চাহিলে, অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল লাগিবে। প্রধান দ্রষ্টব্য এই গুলি—

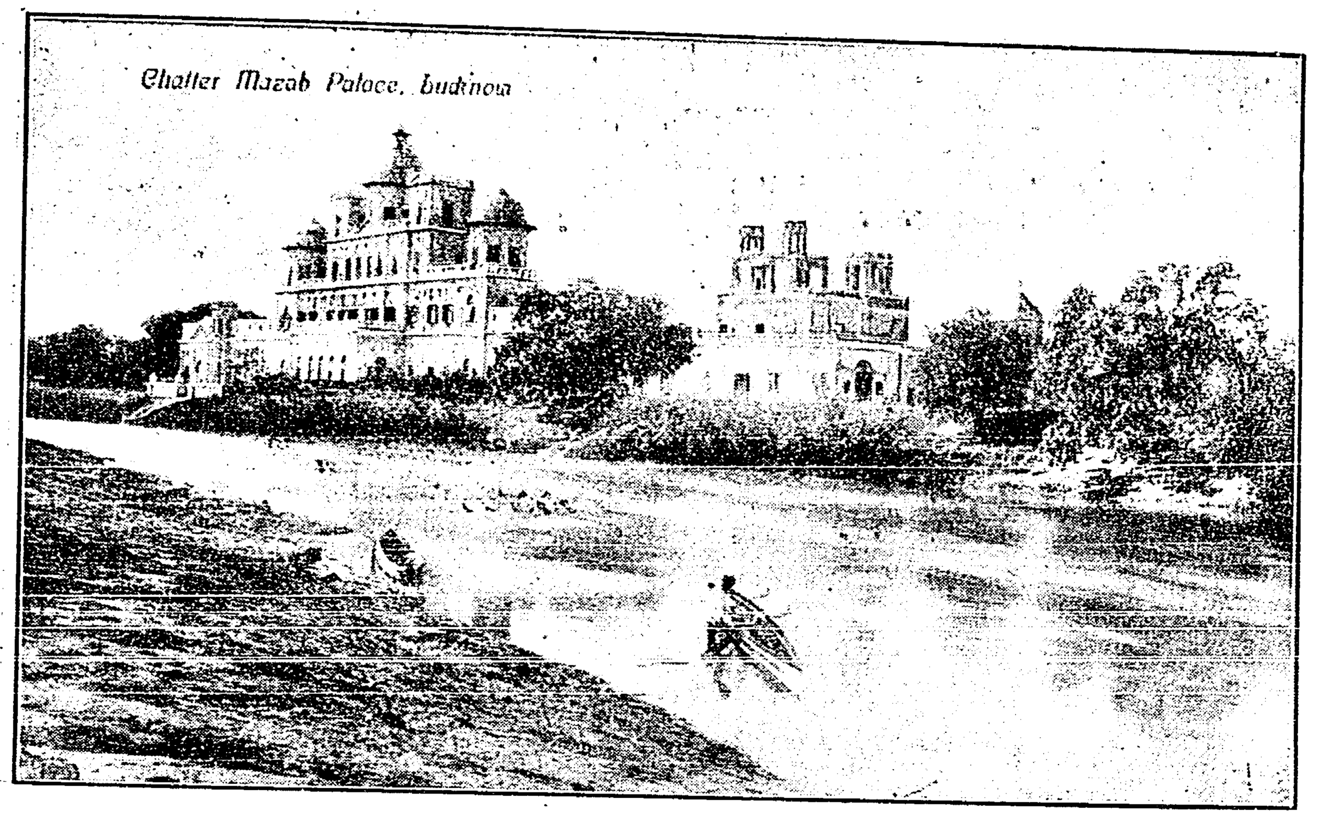

গোমতী-তটে ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদ

লক্ষ্ণৌ, আকবরের দ্বাদশ সুবার অন্যতম। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ-এর শাসক 'নবাব-উজির'-উপাধিলাভ করেন। নবাব সফ্‌দর জঙ্গ ফইজাবাদ-সহরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পর সুজাউদ্দৌলা সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। বাঙ্গালার ইতিহাসে সুজাউদ্দৌলার নাম আছে। তাঁহার পুত্র আসফ্‌উদ্দৌলা। তাঁহার পোষ্যপুত্র ওয়াজির আলি শা। সিংহাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া ইংরাজের দ্বারা তিনি নির্ব্বাসিত হন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সাদত্‌ আলি খাঁ নবাবী

১। কেশর-বাগ। ২। ইমাম্‌বাড়া ও মস্‌জিদ্‌। ৩। হোসেনাবাদ-ইমাম্‌বাড়া। ৪। সেকেন্দার-বাগ। ৫। দিল-খুসা। ৬। শা নজুফের কবর। ৭। কেশর-পসিন্দ্‌। ৮। মার্টিন-কুঠী। ৯। রেসিডেন্সি। ১০। তস্‌বিরখানা। ১১। যাদুঘর। ১২। ছত্রমঞ্জিল। ১৩। চক্‌।

ইমাম্‌বাড়া ও মস্‌জিদ্‌ নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা নির্ম্মাণ করেন। এই শিল্প-কীর্ত্তির কাহিনীর সঙ্গে নবাবের সৌন্দর্য্য বোধ ও

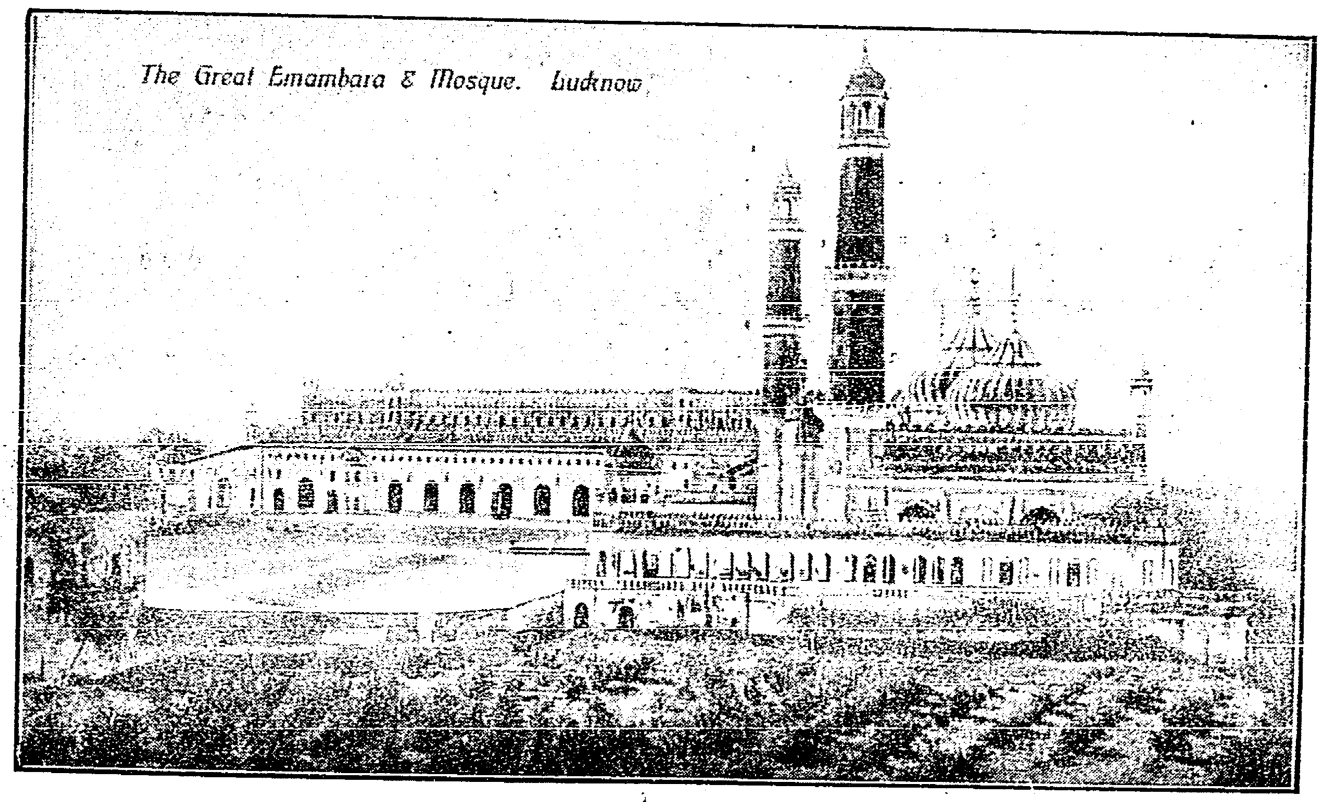

ইমাম্‌বাড়া ও মস্‌জিদ্‌

পান—তাঁহার মত সুশাসক নবাব লক্ষ্ণৌএ আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার শিল্প-প্রিয়তা বিখ্যাত। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে গাজিউদ্দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে অযোধ্যার শাসকগণকে 'নবাবে'র বদলে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়। নাসিরুদ্দিন (১৮২৭), মহম্মদ আলি (১৮৩৭), আজিদ আলি ও তাঁহার পর ওয়াজিদ আলি

সদাশয়তার কথা জড়িত আছে। কাজ যাহাতে একেবারে নিখুঁত হয়, নবাব সেইজন্য চারিদিক হইতে শিল্পিগণকে ডাকিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, যাঁহার পরিকল্পনা উৎকৃষ্ট হইবে, তিনি যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিবেন। প্রতিযোগিতায় শিল্পী কায়ফিতুদ্দৌল্লা জয়ী হইলেন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে কার্য্য আরম্ভ হইল।

এমনই সময়ে রাজ্যে তুর্ভিক্ষ হওয়াতে, দরিদ্রের অন্নদায় হয়। নবাব তাঁহার তুর্ভিক্ষ-কাতর প্রজাগণকে ইমাম্‌বাড়ার গঠনে নিযুক্ত করিলেন। পারিশ্রমিক পাইয়া তাঁহার বহুসহস্র দরিদ্র প্রজা সে যাত্রা প্রাণরক্ষা করে।

ইমাম্‌বাড়া ১৬৭ 'ফুট' দীর্ঘ ও ৫২ 'ফুট' চওড়া। উপরে বেগমদের বসিবার জায়গা। বাড়ীট যেমন মস্ত, তাহার কারু-কাজও তেমনই চমৎকার। উচ্চতাও যথেষ্ট। নীচের দিকটির

আমাদের একটু একটু শীতবোধ হইতে লাগিল। বাহিরের উত্তাপ যখন অসহনীয় হইয়া উঠিত, নবাবেরা তখন এই পাতাল-প্রাসাদে সুন্দরীকুলের মাঝখানে বসিয়া যৌবন-বিলাসে ও হাস্য-পরিহাসে কালযাপন করিতেন।

তাহার পর হোসেনাবাদ-ইমাম্‌বাড়া। এই প্রাসাদটি তাজ-মহলের চেয়ে ঢের ছোট ও সূক্ষ্ম শিল্পে তাজের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট হইলেও, ইহার মূল পরিকল্পনা তাজের চেয়ে বড়

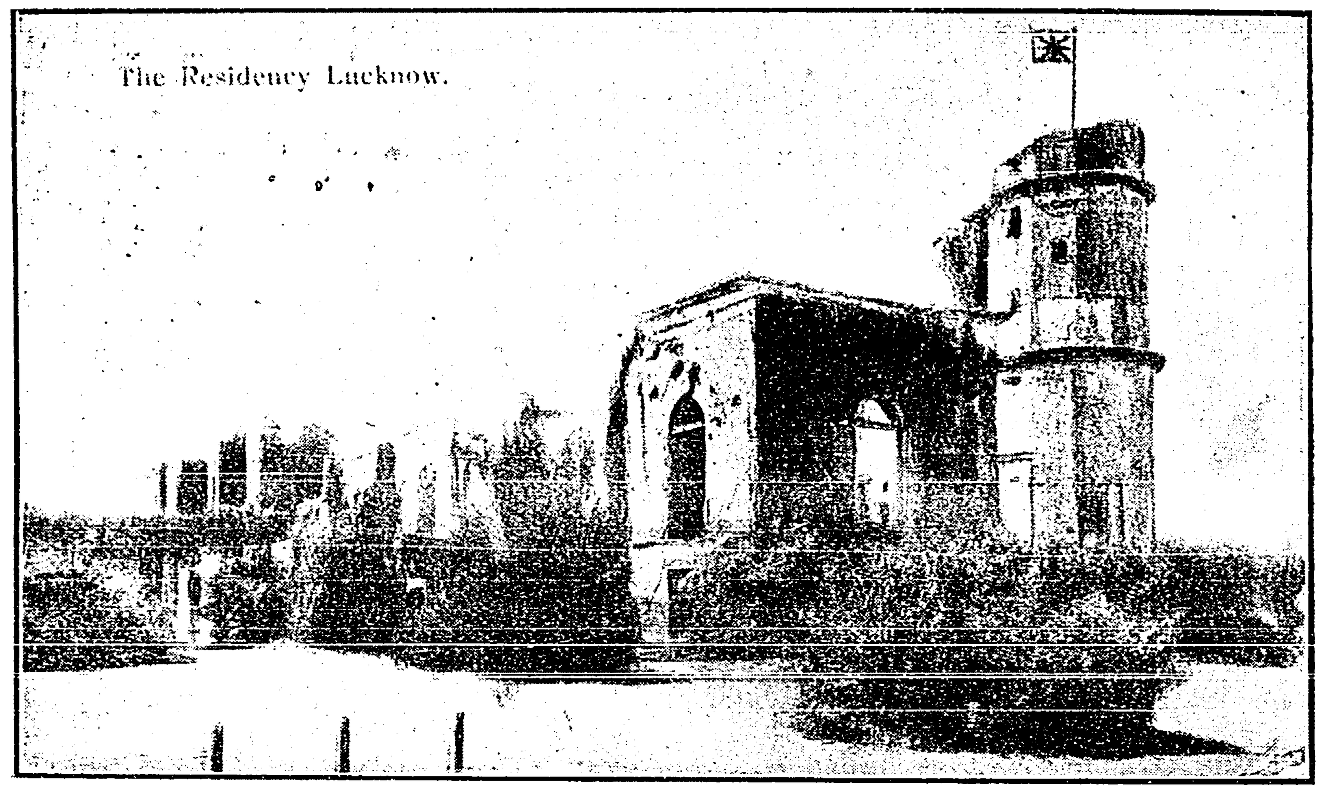

রেসিডেন্সির ভগ্নাবশেষ

চেয়ে উপরের অংশই দেখিতে ভাল। সাম্‌নে প্রকাণ্ড আঙ্গিনা। তার একদিকে একটি বৃহৎ মস্‌জিদ্‌, আর একদিকে পাতাল-গৃহ। পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অনেক 'ফুট' নীচে এই পাতাল-গৃহ বা প্রাসাদ। চারিদিকে 'চক্‌'মিলানো ঘর—থিলান-করা থামের সার। মাঝখান দিয়া নামিবার সোপান-শ্রেণী। সকলের নীচে একটি ইদারা—আগে সুবাসিত জলে ভরা থাকিত। ইদারার উপর-দিকটা খোলা—সেই অবকাশ দিয়া বাহিরের মুক্ত আকাশের আলো আসিয়া পাতাল-গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

বেশী খারাপ নয়। দূর হইতে ইহাকে দেখিতে ঠিক যেন ছবির মত; কিন্তু ইহার সাম্‌নের বাগান ও সরোবর তাজের ব্যর্থ অনুকরণ। যে ধাঁজের বাগান আর জলাধার তাজের মত বিশাল সৌধের পক্ষে মানানসই, হোসেনাবাদের মত ছোট-খাট প্রাসাদের সম্মুখে তাহা একেবারেই খাপছাড়া বলিয়া মনে হইল।

কানপুরে আসিলে ইংরাজের প্রাণ যেমন স্বজাতীয়ের শোচনীয় হত্যা-কাহিনী স্মরণ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, লক্ষ্ণৌতে আসিলে ইংরাজের হৃদয় তেমনই গর্ব্বোৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠে।

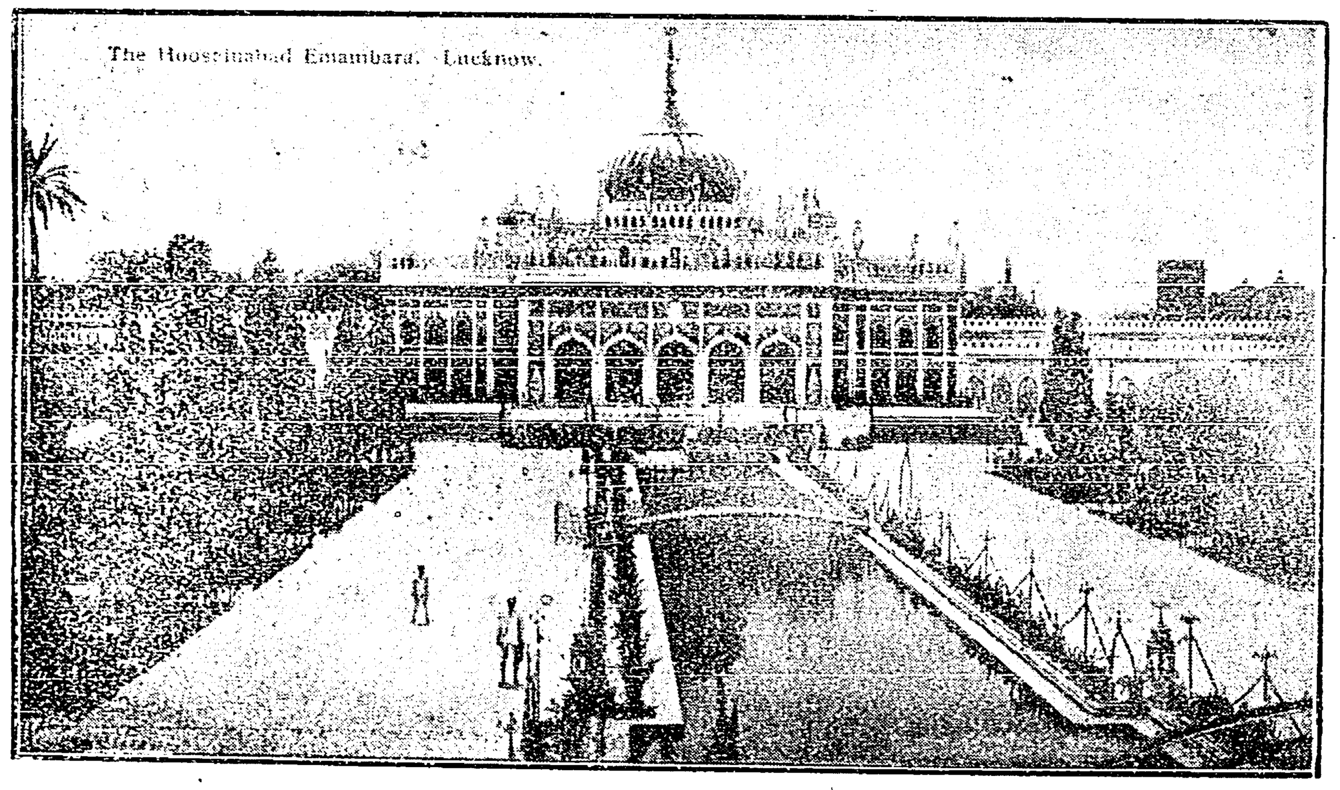

হোসেনাবাদ-ইমামবাড়া

বর্দ্ধমানের মহারাজার বাগানেও এমনই একটি পাতাল-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আছে; কিন্তু ইমাম্‌বাড়ার পাতাল-প্রাসাদের তুলনায় সেটি ঢের ছোট। এই পাতাল-গৃহে আমরা যখন নামিয়াছিলাম, তখন গ্রীষ্মকাল; কিন্তু জায়গাটি এমনই ঠাণ্ডা যে,

লক্ষ্ণৌএর 'রেসিডেন্সি'তে ইংরাজের জাতীয় নাটকের এক গৌরবোজ্জ্বল ও বীরত্বপূর্ণ দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল। আমি তুইবৎসর পূর্ব্বে পত্রান্তরে এ-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এখানে তাহারই পুনরুক্তি করিয়া বিদায় লইব।

লক্ষ্ণৌএ আসিয়া যিনি 'রেসিডেন্সি' দেখেন নাই, তাঁহার লক্ষ্ণৌএ আসাই মিথ্যা। আসফ্‌উদ্দৌলার দৌলতখানার একটী বাড়ীতে ইংরাজ-'রেসিডেণ্টে'র থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আগে এখানে সৈন্য থাকিত না; কিন্তু 'কর্ণেল' বেলির অবস্থান-কালে, এখানে সৈন্য থাকিবার ব্যবস্থা হয় এবং 'রেসিডেন্সি'র তোরণ-সমীপে সদৎ আলি একটী বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন। তার নাম হইল, "বেলি-গার্ড-গেট"। এ নাম আজ সারাজগৎ জানে। (Si ge of L"cknow.)

এই 'রেসিডেন্সি'তে একদিন যে বীরত্বের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে ভাষা মূক হইয়া যায়। সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। লক্ষ্ণৌ-সহর সেই বিদ্রোহ-দাবাগ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়াছিল।

চিন্‌হাটের যুদ্ধের পরে, পরাজিত ইংরাজ-সেনা 'রেসিডেন্সি'তে আশ্রয়গ্রহণ করে। বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গ জ্বলিবামাত্র লক্ষ্ণৌবাসী ইংরাজগণ আত্মরক্ষার জন্য 'রেসিডেন্সি'র ভিতরে প্রবিষ্ট হন এবং তন্মধ্যে বালক ও রমণীর সংখ্যাও বড় অল্প ছিল। তাঁহাদের সমস্ত সম্পত্তি বিদ্রোহিগণের করতলগত হইল।

অতঃপর অবরোধ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণের সংখ্যা অগণ্য ছিল আর ইংরাজ-সৈন্য মুষ্টিমেয়। বিশেষ সেই কয়েক শত সৈন্যের মধ্যে অনেকেই রণ-ব্যবসায়ী নন। প্রাণের দায়, বড় দায়। সেই দায়ে তাঁহারা অস্ত্র ধরিয়াছিলেন।

'রেসিডেন্সি' যে যুদ্ধের পক্ষে সুদৃঢ় স্থান—তা নয়। বিদ্রোহী-দের ভিতরে শৃঙ্খলা এবং বিজ্ঞ সেনাপতি থাকিলে 'রেসিডেন্সি'র চিহ্ন সেই সময়েই ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইত। একপক্ষ বিশৃঙ্খল এবং অপরপক্ষ সুশৃঙ্খল ও 'মরিয়া'। এমন অবস্থায় শেষোক্তের জয় অনিবার্য্য।

প্রায় তিনমাস ধরিয়া গজ-কচ্ছপের এই অসম যুদ্ধ চলে। আবদ্ধ ইংরাজগণের কষ্টের অবধি ছিল না। স্যর হেন্‌রি লরেন্স সেনা-নায়ক—শত্রুহস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। আরও অনেকে—কেহ-বা হত এবং কেহ-বা আহত হইলেন। সঞ্চিত খাদ্য ক্রমে ফুরাইয়া আসিল; যা' ছিল—তাও অর্দ্ধাহারের পক্ষে প্রচুর নয়। সঙ্গে আবার ভয়-কাতর রমণী, বালক ও শিশুর দল। তদুপরি আশ্রয়স্থান তুর্ভেদ্য এবং নিরাপদ নয়। অন্যদিকে, বিদ্রোহীরা নিয়মিত পানাহারে পরিতৃপ্ত এবং নিত্য নূতন সৈন্যদলে পুষ্ট হইতেছে। এমন অবস্থায় কিরূপে যে ইংরাজেরা শেষ বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এবং তাঁহাদের অসীম বীরত্বের শত প্রশংসা করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না।

অবরোধকালে ইংরাজের দৈনিক আহার ছিল—কিছু আটা, কিছু মাষকলাই এবং একদিন অন্তর ছোট একটুকরা অস্থি-সর্ব্বস্ব মাংসমাত্র। অবশ্য, পরে ইহারও অভাব হইয়াছিল। এখানে আহার্য্য-দ্রব্যের একটা মূল্য-তালিকা দিতেছি :—

আটা	একসের	১৲ টাকা
ঘি	„	১০৲ „
চিনি	„	১৬৲ „
একটী শূকর		৯০৲ „
তামাকের একখানি পাতা		২৲ „
এক ডজন 'ব্রাণ্ডী'		১৫০৲ হইতে ১৮০৲ টাকা
„ „ 'বিয়ার'		৭০৲ টাকা

এ সকল জিনিষ তুর্গের ভিতরেই পাওয়া যাইত। আটা, ঘি, চিনি, প্রভৃতি এখনকার তুলনায় তখনকার বাজারে মাটীর দরে বিকাইত; সুতরাং এক টাকায় একসের আটা তখনকার পক্ষে খুবই চড়া দর ছিল, সন্দেহ নাই।

এখানে আমরা একজন অবরুদ্ধা মহিলার 'ডায়ারি' হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

লক্ষ্ণৌ,
৩০শে জুন, ১৮৫৭,
মঙ্গলবার।

"চিনহাটের যুদ্ধের পরে দেখা গেল, আমাদের তিনশত সৈন্যের ভিতর তুইশত মারা গিয়াছে।

৯টার সময় অবরোধ এবং বিপক্ষের ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। 'বেলি-গার্ড-গেটে'র উপরে শত্রু-সেনা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

প্রথমে কামানের আওয়াজ শুনিবামাত্র স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ তুর্গমধ্যে মৃদ্‌গর্ভস্থ একটী ঘরের ভিতরে তাড়াতাড়ি নামিয়া গেলেন। এই অন্ধকার, অপরিষ্কার ও স্যাঁতসেতে ঘরটার নাম 'টাইখানা'।

এই ঘরের ভিতর আমরা সমস্তদিন, একান্ত দীনভাবে এবং উৎকণ্ঠার সহিত বসিয়া রহিলাম। মাঝে মাঝে আমরা নিরাপদে আছি কি না, তাহা দেখিবার এবং বাহিরের কথা বলিবার জন্য এক এক জন ভদ্রলোক আমাদের কাছে আসিতে-ছিলেন,—আমরা তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছিলাম না—ভয়ে আমাদের বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল।

২রা জুলাই। বৃহস্পতিবার। স্যর হেন্‌রি লরেন্স বিছানায় শুইয়া-ছিলেন এবং কাপ্তেন উইলসন কতকগুলি কাগজ পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিলেন—অকস্মাৎ শত্রুপক্ষের গোলায় তিনি আহত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ পদখানি উরুর তল হইতে প্রায় বিচ্ছিন্নবৎ হইয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীর উপরে তুলিয়া আনা হইল। * * * যাতনায় তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছিল—তবু তিনি জ্ঞান হারান নাই। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের সম্বন্ধে আপনার শেষ ইচ্ছাগুলি জানাইবার জন্য দিব্য শান্তভাবে তিনি প্রায় এক-ঘণ্টা ধরিয়া বাক্যালাপ করিলেন।

(৪ঠা জুলাই, শনিবারে এই বীরের মৃত্যু হয়)

২৬শে সেপ্টেম্বর। শনিবার। গতকল্য, আমাদের দীর্ঘ আশার দীপ—"সাহায্য" আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আনন্দ-মুহূর্ত্তের স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারিব না। এ আনন্দ অদমনীয়।

আমরা কল্পনাও করি নাই যে, আমাদের বন্ধুগণ আমাদের এত কাছে। * * সহসা অতি নিকটে আমরা অগ্নেয়াস্ত্রের ভীষণ ধ্বনি শুনিতে পাইলাম, তারপরেই এক উচ্চ জয়নাদ, ক্ষণপরে 'ব্যাগ্‌পাইপে'র সুর এবং তৎপরে রাস্তার উপরে সৈনিক-গণের দ্রুতধাবন। আমাদের মুক্তিদাতারা বারান্দা ভরিয়া ফেলিলেন এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের কর-নিপীড়ন করিতে করিতে ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলাম, 'ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।' * * *

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে কর্কশশ্মশ্রু বিরাট্‌দেহ সৈন্যগণ

আমাদের কোল হইতে শিশুগুলিকে কাড়িয়া লইয়া, সাশ্রুনেত্রে তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে লাগিল।”

(Lady's Diary of the Seige of Lucknow দ্রষ্টব্য)

আমরা কেবল অতীতের কাহিনী লইয়া গর্ব্ব করিতে জানি, আর অতীতের তর্পণ করিতে জানে, এই ইংরাজজাতি। ভারতের অতীত কীর্ত্তির অবশেষ রক্ষা করিতে কয়জন ভারতবর্ষীয় অগ্রসর হইয়াছে? ইংরাজের যত্ন ও পরিশ্রমে তাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি—ইংরাজেরই বিপুল অর্থে অদ্যাবধি তাহা সুরক্ষিত। জানি না, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য! কিন্তু তবু গর্ব্ব!

অতএব, অতীতপ্রিয় ইংরাজজাতি যে 'রেসিডেন্সি'র ধ্বংসাবশেষ রক্ষা করিতে শৈথিল্য প্রকাশ করিবেন না, তাহা জানা কথা। বাস্তবিক, বিদ্রোহের অবসানকালে এই সৌধ যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটই আছে। সেই অগ্নিবর্ষণের ফলে, ছাদশূন্য গৃহ, চূড়াশূন্য স্তম্ভ, দ্বারশূন্য প্রবেশপথ। কোন স্থানের ইট খসিয়া গিয়াছে; কোথাও-বা ধ্বংসভগ্ন প্রাসাদস্তূপ পড়িয়া আছে; এমন কি, ভিত্তি-গাত্রে বিপক্ষ-নিক্ষিপ্ত অসংখ্য গোলাগুলির দাগগুলি পর্য্যন্ত এখনও ঠিক স্পষ্ট বিদ্যমান। দেখিলেই বোঝা যায়, এখানে একদিন এক বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হইয়াছিল; তাহার অভিনেতারা আজ কোথায়, কেহ তাহা জানিতে পারে না,—সুধু জানিতে পারে তাহাদের অতুল ধৈর্য্য, অপূর্ব্ব সাহস, অদ্ভুত শক্তি এবং অসীম বীরত্বের জলন্ত কাহিনী! এবং তাহার অসংখ্য প্রমাণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া বুঝিতে পারে যে, কেন ইংরাজ স্বাধীন আর আমরা অধীন—ইংরাজ রাজা আর আমরা প্রজা।

একজন ফিরিঙ্গি-ভদ্রলোক—যথেষ্ট বৃদ্ধ—আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া সমস্ত ঘরগুলি দেখাইলেন। তাঁহার মুখে আরও শুনিলাম যে, তিনি 'রেসিডেন্সি'র অবরোধকালে ইহারই ভিতরে থাকিয়া স্বহস্তে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে কোলরিজের Ancient Marinerএর "Long grey be rd ani gli tering eyes"এর কথা উদিত হইল।

'রেসিডেন্সি'র ভিতরে যুদ্ধকালে উভয়পক্ষের দ্বারা ব্যবহৃত পুরাতন গোলাগুলি এবং কামান প্রভৃতি এখনও রক্ষিত আছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কবির ঘর-কন্না

পুষ্প, তুমি দুষ্ট মেয়ে, ওই দুটো চোখে
রাজ্যের ফ্যাসাদ যত করে আছে বাসা;
নাচার হলাম বাছা, বকে আর 'ঝকে'—
ধমক মান না তুমি, খালি জান হাসা।
খোকা, তুই ন'স্ বোকা, খুব জানি তোকে,
টানিবি আমার গোঁফ, মনে এই আশা।
শোন গো! এখনি দাও বার করে ওকে—
ক্ষুদে ওর দুধে বুক বিদ্রোহেতে ঠাসা।

দম্‌কা বাতাস এসে খুলে দেয় দ্বার,
সজনি, কপাটে তুমি এঁটে দাও খিল;
গোলমাল কোরনাক—কথা নহে আর,
এখন খুঁজিব আমি ভাব, ভাষা, মিল।

তারপর? পাশে বসে গলা তোর ধরে
সবে-লেখা কবিতাটি যাব আমি পড়ে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রসঙ্গ

য়ুরোপীয় সভ্যতা যদি এক কথায় প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলেও বলিতে হয় যে, তাহার ভক্তি পার্থিব উন্নতি বা আর্থিক উন্নতিতে প্রথিত। আমরা বিদ্যালয়ে গুরুমহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়াছি যে, ভারতীয় পণ্ডিতগণ ভারতবাসীকে বাহ্যবস্তুর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিয়া ও অর্থের প্রতি আপনাদিগের অনাসক্তি প্রকাশ করিতে গিয়াই, ভারতের অবনতি ঘটাইয়াছেন। অর্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টাতেই সমস্ত মানবজাতির যাবতীয় চেষ্টা নিয়োজিত হইলেই যে জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর, অন্যথা ইহা সুদূরপরাহত, আজকালকার দিনে য়ুরোপীয় বহু চিন্তাশীল লেখকও তাহা স্বীকার করেন না। ইংরাজী-সাহিত্য আমি যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে মনে হয়, রস্‌কিন্‌ই প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, বর্ত্তমান ধন-বিজ্ঞানের নিয়মগুলি প্রকৃত উন্নতির সহায়ক নহে এবং য়ুরোপীয় উন্নতি কৃত্রিম, ইহা স্বাভাবিক নিয়মে স্থায়ী হইতে পারে না। গল্প ও উপন্যাসের মধ্যেও আজকাল এই মত আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুইডেনের বিখ্যাত লেখক অগষ্ট ট্রিণবার্গ তাঁহার সুপরিচিত "There are crimes and crimes" নামক পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চিন্তাশীল ব্যক্তি ও লেখকগণের জীবন বিলাসের জীবন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অনুবাদক উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "Strindberg has more and more come to se that a mode a ion verging c'ose'y on asc ticism is wi e for most men and essential to the man of genius, who wants to fulfill his devine mission" অর্থাৎ "তাঁহারা যদি সন্ন্যাসীর ন্যায় সুখ-লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া কঠোরতার মধ্যে জীবনযাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবনের মহৎ কার্য্য-সাধনের পথে আর কোন অন্তরায় থাকে না; নতুবা তাঁহাদের বিলাসিতার মধ্যে পড়িয়া পথভ্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।" বোধ হয়, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধা ঔপন্যাসিকা শ্রীমতী মেরী করেলীও তাঁহার বিখ্যাত "Sorrows of satan" নামক পুস্তকে এই মত প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, ভারত-সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ কেন স্বেচ্ছায় বিলাসিতায় জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর জীবনযাপন করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন।

* * *

"মহাভারতে"র ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থেও যবন নামক এক প্রাচীন জাতির কথা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহাদিগের ইতিহাস বেশ সুস্পষ্ট নহে। হরিবংশ হইতে ইহাদের সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ এই:—শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লব, কোলসর্প, মহিষ, দার্ব্ব, চোল, কেরল, খশ, তুখার, চীন, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, বঙ্গ শাল্ব, কোঙ্কণগণ প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়। বাহু নামক আর্য্য-নৃপতি ব্যসনাসক্ত হইলে, শক, যবন, পারদ, কাম্বোজ ও পহ্লব এই পাঁচ সম্প্রদায়, হৈহয় ও তালজঙ্ঘের সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট করে। তিনি দুঃখিত-চিত্তে অরণ্যবাস গ্রহণ করেন। তৎপুত্র সগর পিতৃশত্রুগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। এই সময় হইতেই তাঁহাদের বেশ ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হয় এবং বেদপাঠ ও বেদ-মন্ত্র-উচ্চারণের অধিকার চলিয়া যায়। শকগণ অর্দ্ধমুণ্ডিতশির, যবন ও কাম্বোজ মুণ্ডিত-মুণ্ড, পারদগণ মুক্তকেশ এবং পহ্লবগণ শ্মশ্রুধারী। এই যবন-বংশের একজন নৃপতি কৃষ্ণের সমসাময়িক; তাঁহার নাম কালযবন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মথুরা হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি একজন প্রবল নৃপতি ছিলেন; শক, তুখার, দরদ, তঙ্গন, পারদ, খশ ও পহ্লব প্রভৃতি শত শত জাতি তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে একপ্রকার ম্লেচ্ছ রাজ-চক্রবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছিল। হরিবংশে এই সব জাতি পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

* * *

সাহিত্যের উন্নতি করিতে হইলে, প্রাণ-মন সাহিত্য-সেবায় নিয়োগ করিতে হয়। তাহার সহিত সাহিত্য-সেবীর প্রতিভা ও প্রগাঢ় বুৎপত্তি থাকা চাই; কিন্তু ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেই যে সব সময়ে সাহিত্য-সেবা করিতে পারা যায়, তাহা নহে। সাহিত্য-সাধনার পথে আরও কতকগুলি অন্তরায় আছে। নবীন লেখকগণ তাহা অতিক্রম করিতে বিশেষ বেগ পাইয়া থাকেন। সব দেশেই সেই সব অন্তরায় অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ-কবি গোল্‌ড্‌স্মিথ্ তাঁহার "Enquiry into the present state of polite learning in Europe" নামক গ্রন্থে জাতীয় অন্তরায়ের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সমালোচকগণ নবীন লেখকগণের প্রধান শত্রু; তাঁহাদিগের দ্বিতীয় শত্রু পুস্তক-প্রকাশকগণ। দেশের ধনিগণের উদাসীনতা, পুস্তক-প্রকাশকগণের অত্যাচার এবং সমালোচকগণের ঈর্ষা লেখকগণ দলিয়া-পিষিয়া নষ্ট করিয়া দেন। যাঁহারা উৎকটতর প্রতিভা ও একাগ্রতার দ্বারা সেই ঈর্ষা ও অত্যাচারকে উপেক্ষা করিতে পারেন, পরিশেষে তাঁহাদিগকে উদরান্নের জন্য মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় লিখিত অর্থহীন, আড়ম্বরপূর্ণ ও লোকরঞ্জনকর ক্ষুদ্র সাহিত্য-সেবা অথবা পুস্তক-প্রকাশকগণের অদ্ভুত ফরমায়েস-মত রচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইহার ফলে এই হয় যে, সাহিত্যের সেবায় বহুদিবস অতিবাহিত করিয়াও, তাঁহারা কয়েকজন সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের গণ্ডীর বাহিরে আপনাদিগকে পরিচিত করিতে পারেন না। বহির্জগতের বিপুল জনসাধারণ তাঁহাদের সংবাদ অল্পই রাখে এবং যাঁহারা তাঁহাদের রচনা সর্ব্বদা পাঠ করেন, তাঁহারাও যে তাঁহাদের রচনার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়েন, তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরিশেষে তিনি সম্পাদকগণের ও পুস্তক-প্রকাশকগণের উদ্দেশে বলিয়াছেন, "His reputation never spreads in a wider circle than that of the trade, who generally value him, not for the fitness of his Composition but for the quanitty he works off at a given time." দুই মুঠা উদরান্নের জন্য সাহিত্য অবলম্বন করায়, শেষে ফল এই দাঁড়ায় যে, তাঁহাদের রচনা কখন শ্রেষ্ঠ রচনারূপে গণ্য হইতে পারে না। তাহার কারণ, সাধারণের মনের গতি ও চিন্তার অনুকূলেই তাঁহাদিগকে লেখনী পরিচালন করিতে হয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রকৃত ভাবগুলিকে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিবার অবকাশ তাঁহাদিগের একেবারেই থাকে না। ধনিগণের সামান্য সহায়তা ও আনুকূল্য পাইলে, যাঁহারা চিন্তার জন্য যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিতেন, তাঁহারা দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া উদরান্নের জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাকে পণ্ড করিতে বাধ্য হন;—পরিশেষে তাঁহাদের সহিত একজন মজুরেরও বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না; কারণ, উভয়েই উদর পূর্ণ করিবার জন্য সদাই ব্যগ্র ও কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত। তাঁহার নিজের কথা এই:—"Thus, the man, who under the protection of the great, might have done honor to hamanity, when only patronised by the book-seller, becomes a thing little superior to the fellow, who works at the press" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সব দেশেই সাহিত্য-সেবীর দুর্দ্দশা প্রায় একজাতীয়।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রত্যাবর্ত্তন

জীবনের বেলা অবসান প্রায়, ম্লান হয়ে আসে রবি,
মর্ম্ম-মুকুরে উঠিছে ফুটিয়া শত পুরাতন ছবি;
যৌবন-মদ-মত্ত জীবনে মুগ্ধ যখন আঁখি,
নূতন করিয়া হেরেছিনু ধরা আঁধারে 'আলোক' মাখি;
পিতামহদের প্রাচীন শিক্ষা লই নাই মাথা পাতি—
মূরতি বিহীন দেবতার ধ্যানে কাটায়েছি দিবা-রাতি;
আজি জীবনের সান্ধ্য দুয়ারে দাঁড়াইয়া আঁখিনত,
'আয় ফিরে আয়'—কে যেন আমায় ডাকিতেছে অবিরত;
প্রভু পরমেশ, শপথ করিয়া দীক্ষা লভেছি আমি,
বিগ্রহ-পদে নোয়াব না মাথা, হে মোর জগৎ-স্বামি!

তবু কেন আজ আপনা হইতে নত হয়ে আসে শির?
প্রতিমা-চরণে ভক্তেরে হেরি ঝরে কেন আঁখি-নীর?
শৈশব হতে কৈশোর শেষ দেব-দেউলের মূলে,
মাথা নত করে ধূলা মাখিয়াছি, অর্ঘ্য দিয়াছি তুলে;
শিশু-দিবসের মার-কাছে-শেখা ঠাকুরে করিতে 'নম',
মধু-বাণী আজ আলোড়িয়া দেয় আমারে তড়িৎসম;
বৃথা ঘুরিলাম এতদিন সুধু বাহিয়া শূন্য তরী,
বিফল আমার এতটা জীবন মিলিল না কোথা হরি;
আর যে পারি না, উঠ উঠ ওগো, খোল দ্বার দয়া করি—
কাতর তনয় এসেছে ফিরিয়া জননীর মুখ স্মরি।

শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কলেজের ইতিবৃত্ত

বোম্বাই-প্রসিডেন্সী

পুণা-কলেজ অধুনা ডেকান-কলেজ (Deccan-College) নামে অভিহিত। প্রাচ্য শিক্ষার প্রসারণ-কল্পে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের কমিশনর-সাহেবকর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠাপিত হয়। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত কলেজে কোনপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় নাই বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ উহা তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু মন ষ্টুয়ার্ট এন্‌কিনি ষ্টোন উক্ত কলেজ সযত্নে রক্ষা করিতে প্রয়াস পান। কলেজে সকল শ্রেণীই খোলা হইল। পুণার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী ও নর্ম্মান বিদ্যালয় ১৮৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত হয়। উক্ত কলেজও এই কলেজের সহিত যুক্ত হইল। উহার কার্য্য ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। তখন হইতে উহা মুম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকাধীন হয়। উক্ত কলেজের পরীক্ষা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ অথবা প্রেসিডেন্সী-কলেজে গৃহীত হয়। তখন এদেশে ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের নিতান্ত অভাব ছিল বলিয়া, এই কলেজের অনেক অধ্যাপক ইংলণ্ড হইতে লইয়া আসা হইত; এইপ্রকারে ইংলণ্ড এবং স্কট্‌লণ্ড-হইতে-আনীত অধ্যাপকদ্বারা কলেজের অধ্যয়নের কার্য্য সম্পন্ন হইত। যাহা হউক এই অসুবিধা আর অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না; কারণ, ভারতীয়গণ ক্রমে শিক্ষিত হইয়া অধ্যাপকের পদগ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নাম হইল "এল্‌ফিন্‌ষ্টোন প্রফেসর বা অধ্যাপক।" দেখিতে দেখিতে সাড়েচারিলক্ষ টাকা চাঁদা উঠিল। মুম্বাই-গভর্ণমেণ্টই উহার আংশিক পরিচালক। সর্ব্বপ্রথমে উহার উন্নতি হয় নাই। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ-শ্রেণীর সহিত ভারতীয় শিক্ষা-সমিতি মিশিয়া গেল। তখন উহা 'বোর্ড' বা সমিতির হস্তেই রহিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে স্কুলটি পৃথক্ হইয়া গেল; সেইজন্য প্রেসিডেন্সী-কলেজ ও এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ স্কুল স্বতন্ত্র ব্যয়ে পরিচালিত হইতে লাগিল। ইহার অব্যবহিত পরেই দেশীয়গণের ইংরাজী-শিক্ষার জন্য উইল্‌সন-কলেজ, মুম্বাই স্থাপিত হইল। ইডেন উইল্‌সন্ (Eden Wilson) উহার স্থাপনকর্ত্তা। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা স্থানীয় লোকের সাহায্যেই চলিত। চার্চ্চ অব্ স্কট্‌লণ্ড ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়; কিন্তু ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা ফ্রি-চর্চ্চের সহিত মিশিয়া গেল। ক্রমে এমন দিন আসিল যে, 'বর্ণ-পরিচয়' যে স্কুলে পড়িতে হইবে, 'সেক্সপীয়র'ও সেই বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতে হইত; গণিত যে স্কুলে পড়িতে হইত, 'স্মিথ্‌স্ ওয়েল্‌থ্ অব্ নেসন্‌স্'ও সেই বিদ্যালয়েই অধীত হইত; অধিকন্তু 'রামায়ণ-মহাভারত'ও তথায় পাঠের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে ইংরাজী উপায়ে ইংরাজী ও দেশীয় উপদেশ প্রদান করা হইত।

যুক্ত-প্রদেশ ও আগ্রা।—যুক্ত-প্রদেশ ও আগ্রায় কলেজ স্থাপিত হইল। তাহার পরিচালন-ভার প্রাদেশিক ছোটলাটের উপর ন্যস্ত হইল।

মান্দ্রাজ। মান্দ্রাজে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে গভর্ণমেণ্ট-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহাই মান্দ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজ-মেডিকেল কলেজ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সেই সময়ে পুণা-কলেজে মেডিকেল-বিভাগ খোলা হইয়াছিল। মুম্বাইএর 'গ্রাণ্ড্ মেডিকেল কলেজ' দেশীয় ছাত্রগণের জন্য ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়। রুড়্‌কীর 'টম্‌সন্ সিভিল ইঞ্জিয়ারীং কলেজ' ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়। টম্‌সন্-সাহেব উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের ছোটলাট ছিলেন। তাঁহার নামে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। ইংরাজ ও দেশীয়গণের স্থপতি-বিদ্যায় জ্ঞানলাভের জন্য উক্ত কলেজ স্থাপিত হয়। অধুনা তথায় বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার নাই। তবে যে সকল বাঙ্গালী বহুবর্ষ ধরিয়া উক্ত প্রদেশে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের সন্তানগণই উক্ত স্থপতি-বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার-লাভে সমর্থ। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্-কলেজে 'সার্ভে' ও 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগ খোলা হইল। উক্ত কলেজে একজন প্রফেসর 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টার' নিযুক্ত করিবেন, এইরূপ নিয়ম আছে। তদনন্তর আইন-কলেজ খোলা হয়। তাহার পর কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহাতে 'চ্যান্সেলার', 'ভাইস্-চ্যান্সেলার' এবং 'সিনেট'-নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ (Fellows) থাকিবেন।

পাঞ্জাব। পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়। একপ্রকার ধরিতে গেলে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সামন্তবর্গ ও ধনীদের জন্য।

এলাহাবাদ। এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট্রাল-কলেজ ছোটলাট উইলিয়ম মুর, সামন্ত ও করদ-রাজগণের সহযোগে ১৮৭২ খ্রীঃঅব্দে স্থাপিত করেন। সর্ব্বপ্রথম উহা একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থাপিত হয়। উক্ত কলেজ মুর সাহেবের নামানুসারে মুর-কলেজ বলিয়া বিখ্যাত। ভারতবর্ষের গভর্ণর বা বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে উহার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেন। এই নব-অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠিত কলেজ ভারতের বড়লাট লর্ড ডফ্‌রিন্‌দ্বারা খোলা হয়। উহা ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের কথা। তাহার পরবৎসর এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জর্ম্মাণীর আদর্শে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

বঙ্গ-প্রেসিডেন্সী। সংস্কৃত-কলেজ :—সংস্কৃত-কলেজ বঙ্গদেশের শিক্ষা-সমিতিদ্বারা স্থাপিত হয়। সংস্কৃত-কলেজে কেবল হিন্দুগণই সংস্কৃত পড়িতে পারে। পূজ্য ও স্বনামধন্য রামমোহন রায় প্রমুখাৎ ব্যক্তিবৃন্দ এইরূপ বিদ্যালয়-স্থাপনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "West rn l arning must be estab-lsh d in its place" অর্থাৎ "পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা এইস্থান অধিকৃত হউক"; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বাক্যানুসারে কার্য্য না করিয়া সংস্কৃত-কলেজ স্থাপন করিলেন। সংস্কৃত-শিক্ষার নিতান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল বলিয়া এই কলেজ স্থাপিত হইল। এই কলেজে টোলের প্রথায় সংস্কৃত-শিক্ষা প্রদান করা হয়। ডফ্-সাহেব ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথম "স্কটিস্ মিশন কলেজ" স্থাপন করেন। ইহার নাম Gen ral A sembly's Institution (জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউসন্)। ডাফ্-কলেজও ডাফ্-সাহেবেরই কীর্ত্তি। অবশেষে এই দুইটি কলেজ মিশিয়া Scottish Churches College (স্কটিস্ চার্চ্চেস্ কলেজ) হইয়াছে। হুগলী-কলেজ ১৪৩৬ সালে স্থাপিত হয়। একজন শিক্ষা-

সম্প্রদায়ভুক্ত মহৎচরিত্র মুসলমান দানবীর মৃত্যুকালে গভর্ণমেণ্টের হস্তে একটি বৃহৎ সম্পত্তি প্রদান করেন। প্রদানকালে গভর্ণমেণ্টের নিকট এইপ্রকার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন যে, তৎপ্রদত্ত সম্পত্তির অর্থ হইতে যেন একটি সুমহৎ কার্য্য সংসাধিত হয়। হুগলী-কলেজই উক্ত মহৎ কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে হুগলী-কলেজ তাঁহারই দ্বারা স্থাপিত। উক্ত মহাত্মার ১৮০৬ খ্রীঃ মৃত্যু হয়। ১৮১৬ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট উক্ত সম্পত্তির "ট্রষ্টী" হন। কোন বিষয় যাহার নিকট বিশ্বাস করিয়া রাখা হয়, তাহাকে 'ট্রষ্টী' কহে। উক্ত সম্পত্তির যে "ফণ্ড্" হইল, তাহা "মসীন-ফণ্ড্" নামে অভিহিত। এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে, উক্ত অর্থদ্বারাই হুগলী-কলেজ স্থাপিত ও পরিচালিত হইতে লাগিল। উক্ত কলেজে ইংরাজী ও পূর্ব্বদেশীয় বিভাগও খোলা হইল। ১৮৬৮ খ্রীঃ ভবানীপুর-মিশনরী-কলেজ খোলা হয়। উক্ত কলেজই লণ্ডন-মিশনরী-কলেজ বলিয়া খ্যাত। স্কটিস্ চর্চ্চের বিভিন্ন বিভাগ হওয়ায়, ১৮৪৩ খ্রীঃ ফ্রি-চর্চ্চ-ইন্‌ষ্টিটিউসন্ স্থাপিত হয়। উহাই ডাফ্-কলেজ নামে প্রসিদ্ধ। জেনারেল-এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্ ১৮৪৪ খ্রীঃ একবার বন্ধ হইয়া যায়। পরে ১৮৪৬ খ্রীঃ উক্ত কলেজ পুনর্ব্বার খোলা হয়।

যথাকালে বাঙ্গালার মফঃস্বলে তিনটি গভর্ণমেণ্ট-কলেজ স্থাপিত হইল।

(ক) ঢাকা-কলেজ।—ঢাকা-কলেজ ১৮৩৫ খ্রীঃ স্থাপিত। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন কলেজের কার্য্য যথারীতি নির্ব্বাহিত হইত না। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত কলেজ ১৮৪১ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। তখন হইতে সুচারুরূপে কলেজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে থাকে।

(খ) কৃষ্ণনগর-কলেজ। কৃষ্ণনগর-কলেজ ১৮৪৫ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ (গ) বহরমপুর-কলেজ প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

ইংরাজ ও য়ুরেসিয়ান্ বালকগণের শিক্ষা-বিধানজন্য তিনটি কলেজ স্থাপিত হইল। (১) ১৮২৩ খ্রীঃ ডভ্‌টন-কলেজ স্থাপিত হয়। এই ডভ্‌টন-সাহেব হায়দ্রাবাদের নিজাম-বাহাদুরের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন। এই কলেজ তাঁহারই স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। (২) মার্টিনিউ-ইন্‌ষ্টিটিউসন্, লক্ষ্ণৌ। উক্ত কলেজ একজন দেশীয় লোকের দ্বারা ১৮৩৮ খ্রীঃ স্থাপিত। ইনি অযোধ্যা-রাজের কর্ম্মচারী ছিলেন। (৩) সেণ্ট্ পল্‌স্ কলেজ, কলিকাতা। ১৮৪৫ খ্রীঃ স্থাপিত। উক্ত কলেজ ১৮৬৩ খ্রীঃ দারজিলিঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে; উত্তর-প্রদেশের দ্বিতীয় কলেজ বারাণসীর সংস্কৃত-কলেজ। উক্ত কলেজ ১৭৯১ খ্রীঃ বারাণসীর রেসিডেণ্ট্ মিঃ জোনাথান ডান্‌কান্‌দ্বারা স্থাপিত। এই কলেজ-স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, য়ুরোপের জজদের হিন্দু সহকারী হইবে। উক্ত কলেজ স্থানীয় লোকের চাঁদায় চলিত; কিন্তু ৬০ বৎসর কলেজ সুবিধারূপে চলে নাই। তৎকালে হিন্দুগণ এখানে পাঠ করিতে পারিত না; ১৮৪৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত জন মুর এবং ডাক্তার বলেনটাইন ইহার সংস্কার করেন। অতঃপর উক্ত বিদ্যালয়ে য়ুরোপবাসীর জন্য শ্রেণী খোলা হইল। সংস্কৃত-কলেজ-শ্রেণীও রহিল। উক্ত শ্রেণী গভর্ণমেণ্ট কুইন্স্-কলেজ-গৃহে বসিত। কাশীতে ছাত্রগণকে ইংরাজী পড়াইতে হইলে, আগে অর্থ দিয়া পড়াইতে হইত। এখন এ প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আগ্রা-কলেজ—আগ্রা-কলেজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর শাস্ত্রীর অর্থদ্বারাই চলিত। তিনি ১৮১৮ খ্রীঃ মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে ইষ্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীকে স্বীয় ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিয়া যান। উক্ত সম্পত্তির অর্থদ্বারা কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। ক্রমশঃ দিল্লী-কলেজ বিখ্যাত হইয়া উঠিল। তথায় বহুদেশ হইতে বিদ্যার্থী আসিয়া অধ্যয়ন করিত। অবশেষে ১৭৯২ খ্রীঃ তথায় কতিপয় মুসলমান-ভদ্রলোকের সাহায্যে ও ব্যয়ে পূর্ব্ব-দেশীয় উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া পরিচালিত হইতে লাগিল।

মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সী।—মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বে কলেজ স্থাপিত হয় নাই। তথাকার প্রেসিডেন্সী-কলেজ ১৮৪১ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল, "হায়ার স্কুল অব্ দি ম্যাড্রাস্-ইউনিভারসিটী।" উহার দুইটি ভাগ ছিল; একটি কলেজ ও অপরটি স্কুল।

শ্রীগণপতি রায়

অপরাজিতা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী

(পরিচয়)

রবীন্দ্রনাথের জয়-ভাস্বর সিতাতপত্রতলে যে কয়জন কবি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ভবিষ্যতের আশা-নিকেতন হইয়াছেন, কবি যতীন্দ্রমোহন তাঁহাদের মধ্যে একজন। "অপরাজিতা" কবির তৃতীয় গ্রন্থ।

কাব্যখানিতে ভূমিকা বা উৎসর্গ-পত্রের কোন আড়ম্বর নাই—ইহা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির পক্ষে বেশ শোভন হইয়াছে।

"অপরাজিতা"র আত্ম-পরিচয়ের পরই—"আগমনী"। এই কবিতাটির রচনা-ভঙ্গী সম্পূর্ণ নূতন। কবি শরৎ-সৌন্দর্য্যের চপল লীলায় জননী শারদীয়া সারদার আগমনের আভাস পাইতেছেন—আপনা-মূর্ত্তিতে তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া ব্যথিত হইয়া পড়িতেছেন—

"তোর রক্ত-চরণ-তল
মনে হলো যেন ছুঁইলাম বুঝি, মুদিল কমলদল!
ব্যথায় ফিরাবো মুখ
সন্ধ্যা-হাওয়ায় পরশিলি গায় জ্যোৎস্না-চীনাংশুক।"

তাই আকুল হইয়া ডাকিতেছেন—

"একবার কাছে আয়,
দেখা দে মা আজ, দেখা দে মা আজ, মূর্ত্তির মহিমায়।"

Sense of su limityর সহিত ব্যথার ভাব জড়িত থাকে,—সান্ত অনন্তের সহিত আত্ম-তুলনায় এইরূপই অধীর হয়,—তার ফলে, হয়—"সীমা অসীমের মাঝে হারা হইতে চায়—নয়,—অসীমকে নিজের নিবিড় সঙ্গে আনিতে চায়।" এই কথাই কবি অসীমের পক্ষ হইতে বলিতে চাহেন।

শরৎ-সৌন্দর্য্যের স্থির মূর্ত্তি কোজাগর-লক্ষ্মী—

"কোজাগরের লক্ষ্মী হের এলেন আজি মূর্ত্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ' ভাগ্যবতি;

গাঁথ মালা শুভ্র ফুলে সাজাও ডালা লাজের রাশে ;
শ্বেত-পাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে ;
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর,
শঙ্খ-পরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে ধর ;
আত্মা 'পরে দৃষ্টি রাখ, মনের মলা ফেল ধুয়ে,
শুভ্র প্রাণে শুক্ল বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।"

শরৎ-সৌন্দর্য্যের চটুল লীলার সপ্তবর্ণ কোজাগরের শুভ্র আলোকে কেন্দ্রীভূত ও অচপল হইয়াছে। রূপ ও অরূপের এমন শুভ্রতার বৈচিত্র্যের সমাবেশ একটি কবিতায় আর কেহ দেখেন নাই ; কিন্তু অত্যুজ্জল শুভ্র আলোকের প্রতি-ফলনে মূর্ত্তিখানি ঈষৎ অস্পষ্ট হয় নাই কি ? মূর্ত্তিখানি যদি কেহ ভাল করিয়া না দেখিতে পান, তবে সে আলোকের দীনতায় নহে—আলোকের অতিরিক্ততায়।

কিন্তু শুভ্রতার যে মূর্ত্তি পরে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বড় স্পষ্ট—বড় পরিচিত—তাহা হিন্দুর গৃহে গৃহে মঙ্গল বর্ষণ করিয়া সমাজকে জাগ্রৎ ও পবিত্র রাখিয়াছে। কবি তাহাকে বলিতেছেন--

"কণ্ঠ বেড়ি টানিয়া বাস কাহারে কর প্রণতি ?
দেবতা নিজে তোমার কৃপা যাচে গো !"—

তাহার গরিমায় দেবতার মহিমাও যে ম্লান !

"জীবন ও মৃত্যু" তাহার পরেই। সহসা কবির অন্য মূর্ত্তি-দর্শনে ব্যথা বোধ হয়। কবিকে সমস্যা লইয়া পড়িতে দেখিলে, আশঙ্কা জন্মে। সুখ ও দুঃখকে নানা জন নানা ভাবে দেখিয়াছেন। কেহ বলেন—জগৎ দুঃখময়—সুখ নাই ; কেহ বলেন, জগৎ আনন্দময়—দুঃখ নাই—দুঃখ ভ্রান্তি—মায়ামাত্র ; কেহ বলেন, সুখ ও দুঃখ দুই-ই আছে—দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে—একটি ব্যতীত অন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব—সুখ-দুঃখ একটি জিনিষের দুইটি দিকের মত—দুইয়ের মিলনেই জগৎ-সৃষ্টির রক্ষা ও বিশ্বের o der ও harmony সম্ভব হইয়াছে। এই কথাই আবার অপরে ঘুরাইয়া বলেন, "ভগবান্ সুখকেই জয়ী করিয়া সম্পূর্ণ করিবার জন্য দুঃখকে সৃষ্টি করিয়াছেন—সৃষ্ট সন্তানকে সুখদানই তাঁহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।"

দুঃখ তাহার করণ ও উপকরণ। "S veet are the uses of adversity." কবি শেষোক্ত মতই কাব্যে ফুটাইয়াছেন। ইংরাজ-কবি কীট্‌স্ ও পারস্য-কবি জালালুদ্দিন রুমিও এই কথাই এক-দিন বলিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আরও উচ্চস্তরের কথা —"প্রেমানন্দের মধ্যে সুখ ও দুঃখ দুই-ই মগ্ন হইয়াছে—সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্বের a pear nceও নাই।"

কবি যতীন্দ্রমোহনের গাথা-রচনায় বিশেষত্ব আছে। রবীন্দ্র-নাথের গাথার ভঙ্গী হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নূতন পথ,—সেজন্য তাঁহার প্রাপ্য গৌরব আমরা তাঁহাকে দিতেছি—কিন্তু নূতন পথে বিঘ্ন-ত্রুটিরও অভাব নাই। এই গাথাগুলি পাঠক-সাধারণের তত প্রিয় হইবে না। তাহার প্রথম কারণ—গাথাগুলি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক বিষয় অবলম্বন করে নাই ; দ্বিতীয় কারণ—গল্পাংশ অপেক্ষা চিত্রাংশই বেশী—আখ্যান-কেন্দ্রের আশে-পাশে প্রত্যেক অংশের কারুকার্য্যে অনেকটা শক্তি ব্যয়িত হইয়াছে। এইরূপ গাথায় অংশবিশেষের দীর্ঘ-বর্ণনা ও বিস্তৃত-অলঙ্কারের অবসর আছে কি না, তাহা বিবেচ্য ; কিন্তু চিত্র হিসাবে এগুলি চমৎকার। এই চিত্র-রচনায়ও অপূর্ব্ব কুশলতাই কবির বিশেষ কৃতিত্ব। দুর্ভিক্ষের ছবি, হিন্দুর তীর্থ-মন্দিরের ছবি, নাটমন্দিরের নৃত্য-গীতের ছবি, ভ্রমণকারী যাযাবর-সম্প্রদায়ের ছবি, পল্লীর ছবি, কসাড়-ঘেরা কাঁসাই-নদীর বাঁকে গাঙ-শালিকের কোটর-বেড়া,—রাঙ্গামাটির বাঁধ—ঘেরা-দেওয়া পল্লী-স্নানের ঘাটটির ছবি—সবই যেন হুবহু সুস্পষ্ট।

তিনটি গাথার ভিতর "জটাই" নামক গাথাটি সর্ব্বা-পেক্ষা লঘু, সরল, অনায়াসগতি—বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু। সাঁওতাল ও সাঁওতাল-পল্লীর বর্ণনা অতি মনোরম। মনস্তত্ত্বে কবির যে অধিকার আছে, তাহা গাথাগুলি বেশ প্রমাণ দিবে। "মঙ্গুর" সম্বন্ধেও প্রায় ঐরূপ বলা যায়। "ময়না" কবিতাতে স্থলে স্থলে যেন কৃচ্ছ্র-চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে আমরা একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া থাকি—ইঁহারা কাব্যের প্রত্যেক পংক্তির উপর অধিক মনোযোগ দেওয়ার জন্য সমগ্রের সৌন্দর্য্যের প্রতি সকল সময় লক্ষ্য করেন না। এ বিষয়ে শিষ্যগণ গুরুর অনুকরণ করেন নাই। ফলে, কাব্যের অংশগুলির মধ্যে organic rel tionএর অভাব হয় এবং কাব্যের জীবনী-শক্তির দীনতা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। অন্যান্য শিষ্য অপেক্ষা যতীন্দ্রবাবুর এ দোষ কম।

তিনটি পুষ্প-কবিতা—"অপরাজিতা", "কাঞ্চন" ও "সন্ধ্যামণি"। তিনটিতেই দীনতাগত কারুণ্য-রস ঢল-ঢল করিতেছে। "কাঞ্চন" পড়িয়া Wordsworthএর "To a lit le Cylen ine"কে মনে পড়ে।

কবি বলিতেছেন—"ফুল ন'স তুই—রঙীন স্মৃতির আলো।" কবি Wordsworth cuckooকে বলিয়াছিলেন—"Bird, thou never wert a voice—a mystery." কবি shellyর "Sky'arkও winged desire"—এ সকল একই ভাবের কথা।—"হারান' হৃদয়ের ধন কেমনে ফিরিয়া আনার কথা অথবা নাসিকা, চক্ষু বা শ্রবণের আগে মনের ভরিয়া উঠার কথা।" কবির "সন্ধ্যামণি"র তুলনা নাই—

"যখন—ঝিল্লী-মুখর সন্ধ্যা-ধূসর পল্লী-প্রাঙ্গনে,
ফিরে—তরুণী বাজায়ে জলতরঙ্গ কলস কঙ্কনে,
তখন—পাশে মধুমালতীর নব বল্লরী হরষে ফুল্লাসে,
পুর-লক্ষ্মীর কর-পরশ-আশায় কাঁপে সে উল্লাসে।"

আর গন্ধহীনা, জন্মদীনা সন্ধ্যামণি তখন তাহার জীবনের দুটি ভুল লইয়া, বিরহী রাধার বিরহ-বেদনা কহিয়া, প্রতিবেশিনী মধুমালতীর প্রণয়োৎসব-রাসলীলা দেখিতে বাধ্য হয়—তখন তাহার যে কি বেদনা, তাহা তুলসীমূলে দীপটি রাখিয়া, ধূলায়-লুণ্ঠিতা, বেদনায়-কুণ্ঠিতা দরদীয়া বঙ্গ-বিধবাই জানে। আর সেই জানে, যার বঁধুয়া আঙ্গিনা দিয়া আনঘরে যায়।

কবির শরৎ-সৌন্দর্য্য প্রথমেই দেখিয়াছি। নববর্ষায় কবি মহানন্দে বিহ্বল হইয়া সৃষ্টির মহাপ্রাঙ্গনে বৃষ্টির 'হোরী'-খেলায় 'ধারা-পিচ্‌কারী' খাইতে নিখিল নর-নারীর সহিত 'মিলন দোলের মেলা' জমাইয়াছেন। বসন্তে কবি উৎফুল্ল হইবার জন্য জগৎকে আহ্বান করিতেছেন। বসন্তে আকাশে-বাতাসে, মাঠে-ঘাটে কোথাও ত প্রসন্নতার অভাব নাই—

"পলাশের বন ফুলে ফুলে হের ফুলন্ত,
বুল্‌বুল্ তায় কূলে কূলে হলো সারা ;
চৈতালি-ক্ষেতে রূপের আগুন জ্বলন্ত,
সৌরভে হলো মৌমাছি মাতোয়ারা।
শুষ্ক শিমুল—সেও আনন্দে মস্‌গুল্,
রাঙা হাসি-ধারা ঝরিতেছে শাখা বেয়ে ;
ভাঙা বেড়াখানি—তারো গায়ে উঠে ঝিঙাফুল,
মঞ্জরী দিয়ে জীর্ণতা দিল ছেয়ে।"

'বাতায়নের দীপ' পড়িয়া বেদনায় গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে—অনেক কথাই মনে পড়িয়া যায়।

'সন্তানক,' 'পূজাগৃহে,' 'দল ও পরিমল,' 'অভিশাপ,' 'নিবেদন' ইত্যাদি কয়টি কবিতা কবির গৌরবহানিকর না হইলেও, বিশেষ গৌরববৃদ্ধি করিতে পারে নাই।

কবি—"রবীন্দ্রনাথে" যে উন্নত আদর্শ লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত বুঝি তাহা রক্ষা করেন নাই ! 'প্রতিভার সহস্র কিরণ' তাঁহার অর্ঘ্যের দেবতা। জ্ঞান-জগতের সবিতার অপরূপ রশ্মিচ্ছটায় তাঁহার কল্পনা ক্লান্ত হইয়া সাহিত্যের পুণ্য ভাগীরথীতে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে।

কবি—বঙ্গের সাহিত্যাকাশে সত্যের আলোকের সঙ্গে কল্পনার-মিশ্রণে-রচিত যে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সেতু সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু দেখিয়াছেন—তাই দেখিয়াই তাঁহার ক্ষান্ত হইবার কথা।

'দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভা'—'বাতায়নের দীপে'র মতই দুদিন জ্বলিয়া-ছিল। বঙ্গের অন্ধকার বাতায়নপানে চাহিয়া কবি যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন, তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। "রঙ্গ-রসে সারা বঙ্গ মাতাইয়া যেন অর্দ্ধপথে, বঙ্গ-বৃন্দাবনচন্দ্র আরোহিলা অক্রূরের রথে"—উপমাটি অপূর্ব্ব।

তারপর অনুবাদের কথা—Tennysonই কবির অধিক প্রিয়। অনুবাদগুলির মধ্যে, ছন্দ-মিলের ২।১টি দোষ থাকা সত্ত্বেও "L dy Clara vere de vere" এর অনুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। শিশুর সরল প্রাণের ভাব-ব্যঞ্জনায় যতীন্দ্রবাবুর স্থান রবীন্দ্রনাথের নীচেই ; কিন্তু কবির "বাঁশ-বাগানের মাথার 'পরে চাঁদ উঠেছে ঐ" কবিতাটী প্রাণকে এত ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে যে, এই গ্রন্থের শিশু-কবিতার প্রত্যেকটিকেই তাহার নিম্নে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়। শিশু-কবিতার এই সারল্য ও স্বভাব-সৌন্দর্য্য-চিত্রণ অনেক সাধনা ও জটিল শিল্পের সরল পরিণতি। শিশুর চিত্তের সহিত আপন চিত্ত মিশাইতে হইলে, কত পাক, কত গ্রন্থি খুলিয়া যে চিত্তকে মুক্তি-পথে ফিরাইয়া আনিতে হয়, তাহা কবিরা ভাল বুঝেন। এ হিসাবে যতীন্দ্রবাবুর ক্ষমতা অদ্ভুত।

ভাবকে সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে মূর্ত্তি দান করিতে যতীন্দ্রমোহনের সমকক্ষ বঙ্গ-সাহিত্যে দুর্ল্লভ। শিল্পাংশ ও ভাবাংশ দুই দিকের ভারকেন্দ্র রক্ষা করিয়া বলিতে পারিলে, তবেই শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ নিরাভরণ ভাবের নগ্ন সৌন্দর্য্যকেই কবিতার প্রাণস্বরূপ মনে করেন ; কবি সত্যেন্দ্রনাথ শিল্পাংশ কাব্যের সর্ব্বপ্রধান উপাদান মনে করেন ; কবি চিত্তরঞ্জন কাব্যে ছন্দো-মাধুর্য্য ও ঝঙ্কারের প্রতিপত্তি ভালবাসেন—কবি রমণীমোহন তাহাকেই কবিতার প্রধান ঐশ্বর্য্য মনে করেন। কেবল কবি যতীন্দ্রমোহন ও করুণানিধানে আমরা সেই দুই দিকের সুনিপুণ সমন্বয় ও শুভ-সম্মিলন দেখিতে পাই। 'অপরাজিতা'র ভাব ও শিল্পের এই সামঞ্জস্য সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান।

পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ অতি পরিপাটি ; মলাটটিও বিশেষ মনোরম। সর্ব্বত্রই রুচি ও সৌন্দর্য্যের পরিচয় সুপ্রতিভাত। কবির নূতন কাব্য "নাগকেশর" যন্ত্রস্থ ; আমরা সাগ্রহে তাহার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

শ্রীকালিদাস রায়

সাহিত্য-চর্চ্চার উপায়

সাহিত্য সম্ভোগের বস্তু। যাঁহার হৃদয় আছে, কেবলমাত্র তিনিই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে পারেন। হৃদয় যাঁহার অত্যন্ত নীরস হইয়া পড়িয়াছে, তিনি হাজার চেষ্টা করিলেও, সাহি-ত্যের মাধুরী-রস-ধারার কণিকামাত্র গ্রহণ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। সাহিত্য-চর্চ্চার উপায় খুঁজিবার আগে হৃদয় সাহিত্য-রস-লিপ্সু কি না, তাহা হৃদয়কেই সুধাইয়া জানিতে হয়। দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি হাত আর দুটি পা থাকিলেই যেমন সকলকেই মানুষ বলা যায় না, সেইরূপ হৃদয় থাকিলেও সবাই হৃদয়বান্ নন। হৃদয়ের চর্চ্চা না হইলে, হৃদয় ভাল-মন্দ বাছিয়া লইতে পারে না ; আর পারিলেও, যতটুকু পারা উচিত, আদৌপেই ততটুকু পারিয়া উঠে না। যে হৃদয় জ্যোৎস্নার আবেশভরা, প্রাণ মাতানো পুলক-হিল্লোলে কল্লোলিয়া না উঠে, হাওয়ার ঘুম-পাড়ান' মিঠে গানে ঘুমাইয়া না পড়ে, ফোটা-ফুলের নীরব মৃদুহাস্যে আনন্দে আকুল না হয়, তামসী রজনীর কৃষ্ণগগণে লক্ষ তারকার দীপ্ত নেত্র দেখিয়া অবাক্ না হয়, সে রকম হৃদয়, সাহিত্যে ঐ জাতীয় মন-মোহনকর বর্ণনা পাঠ করিয়া কখনও পুলক পাইতে পারে না। যিনি নিখিল-বিশ্বের শোভাসমূহ নিরীক্ষণ করিবার মত চক্ষু পাইয়াও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে জানেন না, তাঁহাকে সাহিত্যের রুক্ষ অক্ষর-সাগরে দৃষ্টি বুলাইয়া রস বুঝিবার জন্য অনুরোধ করিতে গেলে, সাহিত্যের অপমান করা হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকেও বেশীর ভাগ বিড়ম্বিত হইতে হয়। তাই বলিতে চাই—সাহিত্য-রস ষোল আনা সম্ভোগ করিতে হইলে, হৃদয় ও মনকে ষোলআনা ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ; নচেৎ সাহিত্য-চর্চ্চার অন্য কোন উপায় নাই।

আমরা জীবনটাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারি না বলিয়াই, জীবনও ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে পারি না ; কাজেই কোনও জিনিসেরই যথারীতি চর্চ্চা করিতেও পারি না— সাহিত্য ত বহুদূরের কথা। যাঁহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ পাইয়া জাতীয় জীবন ফুটাইয়া তোলে, তাঁহাদেরই জাতীয় সাহিত্য বিকসিত পদ্মের মত ফুটিয়া না উঠিয়া পারে না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনগুলি কতকগুলি মরা কথার ফাঁকা দাপটে সদাই সঙ্কুচিত ও নানাপ্রকার বিধি-নিষেধে সর্ব্বদা বাধা পায় বলিয়াই, চিত্ত-পদ্মের দলগুলি বিকসিত হইবার অবকাশ লাভ করে না। ইহাতে যে দেশের কতখানি অনিষ্ট করা হয়, সেদিকে কাহারও দৃষ্টি পড়ে না। এই সব কারণেই সাহিত্যে ঘটনা-বহুল, বিচিত্র, জীবন্ত চিত্রাদিও ফুটিতে পারে না। তবে একটা সৌভাগ্য ও আশার কথা এই যে, আমাদের আধুনিক সাহিত্য দেশের মাঝে একটা বিশ্ব-মানবতার বন্যা প্রবাহিত করিতে পারিয়াছে। ইহাতে দেশের বদ্ধ, ক্ষুদ্র ও পঙ্কিল জলাশয়গুলিও কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়া নিখিল-ভাব-সাগরের সঙ্গে সঙ্গতি-সাধন করিতে পারিয়াছে। বান ডাকিলে সবই এক হইয়া যায় ; তাই ভরসা হয়, সাহিত্যই আমাদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে একদিন-না-একদিন বিশ্ব-মানবের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত করিয়া দিবে। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চিত্ত-বীণার মধুর ঝঙ্কারে সকল সভ্য-জগতে ইতঃ-পূর্ব্বেই আমাদের বরেণ্য কাব্য-লক্ষ্মীর বিজয়-গাথা প্রচারিত হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু, সেই সঙ্গে ইহারই ভিতরে জগতের বড় বড় দাম্ভিক জাতিরা আমাদের সমস্ত খুঁটি-নাটি বেশ করিয়া দেখিবার জন্য উতলা হইয়াছে ও ঘরোয়া ছোট ছোট সুখ-দুঃখের দৈনন্দিন কাহিনীগুলি পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য, কাণ পাতিয়া বসিয়া আছে। আমরা যদি এতটুকু গৌরবেই গৌরবান্বিত হইয়া আবার স্বভাব-সিদ্ধ উদাসীনতায় গা ঢালিয়া দিই, তবে বাঙ্গালীর গৌরব-রবি রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী বিপুল সাধনাকে অপমানিত করা হইবে

এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ললাটেও সেই অপমানের কালিমা অঙ্কিত হইয়া রহিবে; ফলে, যতটুকু আগাইয়া গিয়াছিলাম, ততোধিক পিছাইয়া পড়িব—আবার যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রাতকাণার মত কেবলই পথ হাৎড়াইতে থাকিব!

সমস্ত জাতিরই একটা-না-একটা-কিছু গৌরবের জিনিস আছেই-আছে। তাঁহারা সাহিত্যকে বাদ দিলেও, অন্যান্য ঢের গৌরবের বস্তু লইয়া গৌরব করিতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালীর সাহিত্য ছাড়া আর কিছু গৌরবের বস্তু আছে কি না, জানি না। বাঙ্গালীর সাহিত্যই বাঙ্গালীত্বের প্রধান পরিচায়ক। আমরা সাহিত্যকে অবহেলা করিলে, বিশ্ব-মানবের কাছে পদে পদে অবহেলিত হইব এবং মানব-জাতির মনুষ্যত্বের বিরাট্ দরবারে কিছুতেই আসন পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইব না। আমরা সমস্ত জাতির সঙ্গে সেই দরবারে ভাবের আদান-প্রদান করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই; নহিলে দিন দিন হীন হইতে হীনতর অবস্থায় যাইয়া পৌঁছিব। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য, কায়মনোপ্রাণে সাহিত্যকে অবলম্বন করা; নচেৎ অন্য পন্থা নাই।

একটা কথা এই, সময়োপযোগী নূতন-কিছু উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করিতে না পারিলে, জন-সাধারণের স্তরে স্তরে সাহিত্যের যথোপযুক্ত প্রচার হয় না; সুতরাং প্রচারের অভাবে চর্চ্চাও হয় না। কালোপযোগী নব নব জীবন্ত আদর্শ জাতির সম্মুখে ধরিতে না পারিলে, সব আয়াস ব্যর্থ। এদিকে লেখকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সজাগ কর্ণ ও বিপুল সাধনা থাকা দরকার; নতুবা অন্যের ভাবের ঘরে ঢুকিয়া, না বলিয়া তাঁহারই ভাবগুলি বেমালুম আত্মসাৎ করিয়া, তাহাই আবার লেখনীর ডগা দিয়া বাহির করিয়া দিলেই সাহিত্যে নব সৃষ্টি বা নব আদর্শ গড়া হয় না। নূতন সৃষ্টির জন্য প্রতিভা চাই। কাহারও কাহারও প্রতিভা থাকিতে পারে; কিন্তু সেই প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে একাগ্রতা, তন্ময়তা, অদম্য উদ্যম ও সাধনা আবশ্যক।

পরের মাথা দিয়া ভাবিতে গেলে, পরের কাণ দিয়া শুনিতে গেলে, আর পরের চোখ দিয়া দেখিতে গেলে, কাহারও ব্যক্তিগত পার্থক্য প্রস্ফুট হয় না। প্রত্যেক লেখকেরই একটা-না-একটা-কিছু বিশেষত্ব, তাঁহার ভাষা, ভাব ও চিন্তার ভিতর দিয়া বিকসিত হইয়া না উঠিলে, সকলে তাঁহার প্রতিভা-সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। এটাও স্বীকার করি যে, যাঁহার বিশেষত্ব আছে, তাঁহার ত্রুটিও থাকিতে পারে; কিন্তু তাহা সত্বেও আমরা তাঁহার বিশেষত্বের জন্য তাঁহাকে আদর না করিয়া থাকিতে পারি না। চিন্তা, কর্ম্ম, ভাব, ভাষা—এ সকল বিষয়েই কিছু-না-কিছু পার্থক্য লেখকদের ভিতরে থাকা চাই। অনুকরণ ও অনুসরণের ফলেই বাঙ্গালা-সাহিত্যে আজকাল তেমন কিছু বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় না; এইজন্যই অনেকের মুখে শুনিতে পাই—"সাহিত্য এখন বড্ড পান্‌সে হয়ে পড়েছে।" এই শ্রেণীর মুখখোলা পাঠকদের মুখবন্ধ করিতে হইলে, খালি চোখ রাঙ্গাইলেই চলিবে না; পরন্তু, লেখকদিগকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে; নতুবা, তাঁহাদের পরিণাম হইবে,—পদ্মপত্রের জলবিন্দুর মত!

আজকাল দু-চারজন বিশিষ্ট লেখক ছাড়া "প্রাণের টানে" আর বড় কেহ কলম ধরেন, বলিয়া মনে হয় না। মাসিক পত্রগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখিলেই, আপনারা তাহার প্রমাণ পাইবেন। সকলেই চান যশ, যশ,—জলের ফেনার মত ক্ষণিক যশ! লেখকদের ভাবের বিকাশ, ভাষার ভঙ্গী ও কস্‌রৎ দেখিয়া তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে লেখায় লেখকের প্রাণ গলিয়া বাহির হয় না, মনকেও তাহা অভিভূত করিতে পারে না। আজকাল এইসব কারণেই বহু কবিতা ও গল্প, কেবল মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা ভরাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইসব দুর্গতির জন্য পাঠকেরাও বর্ত্তমান চলিত সাহিত্যের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন। তাই সাহিত্যের যতখানি প্রচার হওয়া উচিত ছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহা হইয়া উঠিল না। জিনিষ থাকিলে লেখার প্রচার হইবেই হইবে। প্রচার সুরু হইলে, তাহার চর্চ্চাও সুরু হইবে। সাহিত্যে পোষাকি কান্না, পোষাকি হাসি, পোষাকি গবেষণার পরিবর্ত্তে যেদিন প্রাণের কান্না, প্রাণের হাসি ও প্রাণ-ঢেলে-দেওয়া গবেষণা আরম্ভ হইবে, সেদিন বঙ্গ-সাহিত্যে একটা খাঁটি বাস্তব কিছু পাওয়া যাইবে। তবেই বাস্তবিক প্রাণের ক্ষুধায়, প্রাণের টানে প্রতিদিন বাঙ্গালীর উচ্চশ্রেণী হইতে নিম্নশ্রেণীর স্তরে স্তরে সাহিত্য-রস ছড়াইয়া পড়িবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া যেদিন আমরা সমস্ত বাঙ্গালী-জাতির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতে পারিব, সেদিনই ঘরে ঘরে সাহিত্য-চর্চ্চার প্রকৃত বৈঠক বসিবে। হতাশ হইবার কারণ কিছু নাই; হাওয়া ফিরিয়াছে—বাঙ্গালী প্রাণ দিয়া সাহিত্যকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিবে।

বাঙ্গালী এখন আসল-নকল চিনিতে শিখিয়াছে। এখন কেহই আর মেকির আদর করিতে চান না; সব জিনিসই সকলে বেশ করিয়া বাজাইয়া দেখিয়া লন। এযুগে রামবাবু, মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামাইয়া মুরুব্বি-আনা চালে যাহা বলিবেন, যদুবাবু যে যুক্তি-তর্ক বিনা সুবোধ বালকের মত তাহার তলাতেই 'ট্যাঁরা সই' দিবেন—এটা আর কেহ মনে করিতেও পারেন না; কিন্তু ইহার চাইতে সুখের কথাও বুঝি আর কিছু নাই; কারণ, যখন লেখক ও পাঠক উভয়েই সজাগ থাকেন, তখন আসল বলিয়া সাহিত্যের বাজারে মেকির বিকি-কিনি আর চলিতে পারে না।

আজকাল সাহিত্যালোচনা করিতে হইলে, জগতের নানা দিককার নানা উচ্চ ভাবের সঙ্গে সকলেরই পূর্ব্ব হইতে কতকটা পরিচিত থাকা দরকার; নহিলে, এযুগের সাহিত্য সকল দিকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে না। বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য মানুষকে উপরে টানিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। সাহিত্যের শক্তি দেখিয়া একশ্রেণীর লোক ইতিমধ্যেই হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্যকে বস্তুতন্ত্রতাবিহীন বলিয়া হাজারবার হাঁকিয়া গালি পাড়িলেই, সে বস্তুতন্ত্র হইয়া পড়িবে না। যতই কেন গলা ফাটাইয়া চেঁচামেচি করা যাউক না, সাহিত্য যে পথে চলিয়াছে, চীৎকারকারীকেও সেই পথে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে। অন্যের নিকট হইতে সত্য যে ভাবেই আসুক না কেন, আমাকেও মাথা হেঁট করিয়া তাহা মানিয়া লইতে হইবে। আমারই যে সব ভাল, আর যে কাহারও ভাল, ভাল নয়, এরূপ একচোখো সংস্কারে এখন ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই।

এত কথা বলিতাম না; কিন্তু আজ বছরখানেক হইল, একদল লোক বড়-গলায় বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বস্তুতন্ত্রবিহীন। এরকম সাহিত্য লোকশিক্ষার আসন পাইতে পারে না। যে সাহিত্য জাতীয় সাহিত্যের দাবী করিতে পারে না, তাহা বালির ভিত্তির উপর গড়া। কাজেই নব্যবঙ্গের বাবু-সাহিত্য টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে না,—ও ত গেল বলে!" মোট কথা, তাঁহাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে—নব্যবঙ্গের সাহিত্য বস্তুতন্ত্রবিহীন; জাতীয়ের পোষাক-পরা বিজাতীয় সাহিত্য; অতএব তাহা কস্মিন্ কালেও স্থায়ী হইবে না। কথাটা প্রথম যেদিন শুনিয়াছিলাম ও প্রবন্ধে পড়িয়াছিলাম, সেদিন বাস্তবিকই অবাক্ হইয়াছিলাম। এসব কথার আদৎ জবাবটি কবি নিজেই 'সবুজ পত্রে' প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সত্য কথা বলিতে কি, এত দলাদলি হৈ-চৈ-এর ভিতরে মানুষ মন স্থির করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে পারে না। বিদ্বেষ থাকিলে প্রাণ খুলিয়া কেহ কাহারও ভালটা, হাজার ভাল হইলেও, গ্রহণ করিতে চান না। সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্রে চাই মহাপ্রাণতা, উদারতা ও প্রেম। সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিদ্বেষের বিষ-বপন করিয়া যাঁহারা 'সব-জান্তা' বলিয়া আপনাদের নাম রটাইয়া থাকেন, আশা করি, তাঁহারা মহাত্মা সক্রেটিসের অমর বাণী স্মরণ করিবেন:—"আর সকলে জ্ঞানের জাঁক করিয়া থাকে—যদিও তাদের ভিতরে সেইটিরই বিশেষ অভাব; কিন্তু আর সকলের চাইতে আমি, এইটুকুই জানি যে, আমার অজ্ঞতা নেহাৎ কম নয়।" ইঁহারা সক্রেটিসের এই কথাটা জোর করিয়া ভুলিয়া যান বলিয়াই যত গোলে পড়েন। আর এই কারণেই সাহিত্য-চর্চ্চা এখন পরচর্চ্চায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—এখন উদার-হৃদয় জনকতক সাহিত্য-প্রাণ সাহিত্য-সেবীর দরকার। তাহা হইলে, তাঁহাদের প্রাণ-মন-সমর্পিত সাহিত্য-সাধনায়, সাহিত্য-চর্চ্চার উপায় আপনা হইতেই ধীরে ধীরে নিরূপিত হইয়া যাইবে। প্রাণের কথা বলিতে আরম্ভ করুন, প্রাণ গ্রহণ করিবেই করিবে—ইহাই সাহিত্য-চর্চ্চার শেষ কথা।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মর্ম্মবাণী—

বিস্মিতা

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ১৬ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা।

কথিত ভাষায় "ই"-কারের প্রভাব

সংস্কৃতে 'ইন্' প্রত্যয় করিয়া বিশেষ্যপদ হইতে বিশেষণ করা হইয়া থাকে ; যেমন, গুণী, ধনী, প্রাণী, মানী ইত্যাদি। ইহা পদের শেষে দীর্ঘ 'ঈ'কাররূপে বর্ত্তমান থাকে ; কিন্তু চলিত কথায় আমরা দীর্ঘের উচারণ করি না; সুতরাং "গুণী" এবং "গুণি" একই হইয়া থাকে। আমরা "গুণী" না বলিয়া "গুণি" বলিয়া থাকি ; সুতরাং চলিত কথায় "গুণ" বিশেষ্যের উত্তর একটা "ই" বসাইয়া দিলেই "গুণি" বিশেষণ পাই। ইহা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-ভাষায় খুবই লক্ষ্য করা যায়। "ই" স্থানে সংস্কৃতে "ঈ" হয়। পূর্ব্বোক্ত পদগুলি দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা ভাষায় "ই"-কার দিয়া বিশেষণের সৃষ্টিতে সংস্কৃতের খুব প্রভাব দেখা যায়। আমি কথিত ভাষার কথাই বলিতেছি। এই বিশেষণের সৃষ্টি বাঙ্গালায় সাধারণতঃ ক্রিয়াপদ হইতেই সাধিত হয়। যেমন মনে করুন "চলা" তাহা হইতে বিশেষণ হইল "চল্‌তি"; কিন্তু পাওয়া যায় না। ইহাদের নিয়ম-সম্বন্ধে আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, ক্রিয়াপদের উত্তর "তি" বিভক্তি যোগ করিলে ঐ ক্রিয়ার বিশেষণ পাওয়া যায়।

ক্রিয়াপদ	তাহার বিশেষণ
উঠা	উঠ্‌তি
কমা	কম্‌তি
বৃদ্ধি পাওয়া বা বাড়া	বাড়্‌তি
বাছা	বাছ্‌তি
কাটা	কাট্‌তি
মানা	মান্‌তি
জানা	জান্তি বা জান্তা
বাস করা	বস্‌তি
ভাঙ্গা	ভাঙ্গ্‌তি
বৃন্তযুক্ত হওয়া	বিন্তি (তাসখেলায়)
চেনা	চিন্‌তি
ঘুরা	ঘুর্‌তি
গুপ্ত করা	গুপ্তি (সময় সময় বিশেষ্যও হয়)
রুক্ষ হওয়া	রুখ্‌তি
ফলা	ফল্‌তি
পড়া বা পতন হওয়া	পড়্‌তি
পাণ্ডিত্য ব্যবহার করা	পণ্ডিতি
ধরা বা ধারণ করা	ধর্‌তি, ধন্না।
বিরক্ত বা ত্যক্ত হওয়া	তিতি (বিরক্তি)
তোলা বা উঠান	তোল্‌তা (এ স্থানে ব্যতিক্রম আছে)
ঠেকা	ঠেকৃতি
মানা	মান্‌তা, জান্তার অনুরূপ
ভরা বা পূর্ণ করা	ভর্‌তি
গণনা করা	গুন্‌তি

স্থানে স্থানে "তি" বিভক্তিযোগে যে বিশেষ্যপদ সিদ্ধ হয়, তাহা সাধারণতঃ ক্রিয়াপদ হইতে হয় না ; তাহা বিশেষ্যপদেরই রূপান্তর মাত্র। যেমন, "খাঁকৃতি।" "খাঁক্" বা "ক্ষার" হইতে "খাঁকৃতি" শব্দ হইয়াছে, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।

ক্ষার খাঁক্ খাঁকৃতি

এইরূপ নিম্নে কয়েকটি বিশেষ্যপদের রূপান্তরের আকার "তি"-বিভক্ত্যন্ত শব্দ প্রদত্ত হইল।

বিশেষ্যপদ	বিশেষ্যপদের রূপান্তর
তক্তা	তক্তি
বসতি	বস্তী
*	নিখ্‌তি
ক্ষার	খাঁকৃতি
পার্শ্বস্থ ব্যক্তি	পড়্‌সি

এতদ্ব্যতীত "ই"-কার, পদের অন্তে থাকিলে, ক্রিয়াপদসিদ্ধ বিশেষ্যে বাহুল্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং বিশেষ্যের প্রথম শব্দের অগ্রবর্ত্তী ব্যঞ্জনে "ও"-কার যুক্ত হয়। যথা :—

ক্রিয়াপদ	তাহার বিশেষ্য
হুড়মুড় করা	হুড়োমুড়ি
লুকান	লুকোচুরি
তুলা	তোল্লাতুল্লি বা তোলো (ভাতের)
ঝুলা	ঝুলোঝুলি
ঘুসা মারা	ঘুসোঘুসি
কাড়িয়া লওয়া	কাড়াকাড়ি
ত্বরিত হওয়া	তাড়াতাড়ি
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত	বাড়াবাড়ি
ধরা	ধরাধরি
গড়াইয়া যাওয়া	গড়াগড়ি
মারা	মারামারি
সারবন্দী হওয়া	সারাসারি

বিশেষ্যপদের একই বাক্য দুইবার উল্লিখিত হইলে, কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যেমন লিখিত পদ-সংখ্যার শেষ সাতটি বিশেষ্য, সেইরূপ :—

হাতাহাতি, মাতামাতি, রাতারাতি, গড়াগড়ি, সাধাসাধি, চলাচলি, গলাগলি, নাড়ানাড়ি, ভাঁড়াভাঁড়ি ইত্যাদি।

চলিত কথায় "ই"-কারের প্রভাব যশোহর জিলায় যত শুনিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, "ই"-কার যশোহরের বিশেষত্ব।

যেমন "ফুলের মালা"কে যশোহরে বলে, "ফুলীর মালা"। "থাতি-নাতি বেলা গেল, শুতি পালাম না" নামক সর্ব্ববিদিত বাক্যও ঐ কথার প্রমাণ দান করে। ইহা অবশ্য আমার সিদ্ধান্ত। অন্যে কি বলেন, জানি না। কলিকাতায় "এ"-কারের প্রাধান্য অত্যন্ত বেশী ; যথা,"খেতে-নেতে বেলা গেল, শুতে পেলাম না।" কলিকাতার "গেলুম" "খেলুম" ইত্যাদি চলিত কথাকে পূর্ব্ববঙ্গের অনেকে দূষণীয় মনে করেন ; কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি যে, ইহা একমাত্র বাক্যোচ্চারণের সহজ পথসাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। "আমি গেলুম" এবং "মুই গেনু" এই দুইটির মধ্যে "মুই গেনু" সহজে এবং স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চারিত হয় বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গের চলিত কথায় ব্যবহৃত হয়।

"মুই"এর "মু" এবং "গেনু"-র "নু" সমোচ্চারক বলিয়া জিহ্বা সহজেই "উ"কারের দিকে ঝুঁকিয়াছে। কলিকাতায় এবং নদীয়া জেলায় "এ"-কারের প্রভাব নিম্নলিখিত পদগুলিতে প্রমাণিত হইবে ঃ—

ঢিলা	ঢিলে
জিলা	জেলা
মিলা	মেলা
গিলা	গেলা
প্লীহা	পিলে
দিয়া	দিয়ে
জ্যোতি (নাম)	জ্যোতে
বিশু (নাম)	বিশে ইত্যাদি

কলিকাতায় বলে, "তুই যাবি নি ?" নদীয়ায় বলে, "তুই যাবি নে ?" "যাবি নি" এবং "যাবি নে" বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথম বাক্য সহজে এবং জিহ্বার সহজ প্রয়াসে উচ্চারিত হয়। "যাবি" শব্দের "বি" এবং "নি" সমধ্বন্যাত্মক বলিয়া চলিত কথায় গ্রহণ করা হইয়াছে। জিহ্বা অতি সহজে যাহা উচ্চারিত করিতে পারে, তাহাই চলিত কথায় ক্রমশঃ প্রচলিত হয়। অবশ্য ভাষা ভাঙ্গিয়া শব্দোৎপত্তির তত্ত্বকথাকে আমি একেবারে উড়াইয়া দিতেছি না।

এই বিষয় পরপ্রবন্ধে:কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

সমালোচনা

"কর্ণাট-কুমার" শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল লিখিত। একখানি মিলনান্ত পঞ্চাঙ্ক নাটক—ছাত্র-জীবনের স্মৃতি ও ইতিহাসের ছায়া লইয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ইহা গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যমের ফল।

গ্রন্থকার এই পুস্তকে যেরূপ চিন্তাশীলতা, ভাবের সামঞ্জস্য, ভাষার পরিপাট্য ও ঘটনা-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং চরিত্র-অঙ্কনে যেরূপ নিপুণতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে না।

"কর্ণাট-কুমার" একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক, একথা আমরা বলি না ; তবে স্থানে স্থানে নাটকীয় সৌন্দর্য্যে ও নয়নাভিরাম ও প্রাণস্পর্শী ভাবের উৎকর্ষের অভাব নাই। অসমসাহসিক কার্য্যে মানসিক উন্মত্ততা, হাসির অন্তরালে অশ্রুকণা, আশার দিগ্বলয়ে নিরাশার তাণ্ডব নৃত্য-প্রদর্শনে আমাদের বর্ত্তমান নাট্যকার যেরূপ সফলকাম হইয়াছেন, তেমনই বিপদে ধৈর্য্য, নির্যাতনে সহিষ্ণুতা ও পুণ্যের বিমলালোকোদ্ভাসিত পবিত্র প্রণয়, অতুলনীয় পিতৃভক্তি ও অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য-প্রদর্শনেও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

যাবতীয় কলা-বিদ্যার মধ্যে নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত এবং তদনুসারে নাট্যকারের দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। নিকৃষ্ট বৃত্তির উন্মেষণে সাধারণের চিত্তরঞ্জন নাটকের অভিপ্রেত নহে। দর্শকের মনে উচ্চভাব ও উচ্চ আদর্শ জাগাইয়া তোলাই নাট্যকারের কৃতিত্ব। রুচি-বিকার মনোবিকারেব নামান্তর মাত্র ; "কর্ণাট-কুমারে"র লেখক যেরূপ উচ্চ কল্পনা ও মহৎ ভাবকে আশ্রয় করিয়া দেব, দানব ও মানব-প্রকৃতির নর-নারীর সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের অখণ্ডণীয় সূক্ষ্মগতিপ্রভাবে অধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দায়িত্ব-জ্ঞান সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

'কর্ণাট-কুমারে'র সর্ব্বপ্রধান চরিত্র কর্ণাট-কুমার বিজয়কুমার। কর্ণাটের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার গুণে মুগ্ধ ; বিশাল কর্ণাট তাঁহারই বিক্রমে স্বাধীন হইয়াছে। বিজয়নগর-রাজ, তাঁহার পরম সুহৃৎ অরঙ্গল-রাজের দুহিতা কমলার পরিবর্ত্তে অরঙ্গল-রাজের সচিব-কন্যা সারদাকে বন্ধুকন্যাভ্রমে প্রতিপালন করিতেছিলেন ; তাঁহার অন্তরের সাধ, সারদার সহিত আপনার সর্ব্বগুণান্বিত পুত্র বিজয়ের বিবাহ দিয়া বন্ধুর মৃত্যুকালীন বাসনা চরিতার্থ করেন। ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতিপ্রভাবে মুমূর্ষুর বাসনা ফলবতী হইয়াছিল। ধূর্ত্তের শঠতায় ও দুরাত্মার দৌরাত্ম্যে বিজয়কুমার বারনারী-আসক্ত, রাজদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহী সাব্যস্ত-হইয়া রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাসিত ও পিতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেন। কঠোর নির্যাতনে বিজয়ের বীর-হৃদয় বিচলিত হয় নাই। তাঁহার হৃদয় যেমন অনাবিল "শুভ্রশান্ত প্রেমে" উদ্ভাসিত, তেমনই গভীর পিতৃভক্তিরসে আপ্লুত ও সমুজ্জ্বল ছিল। "পরিত্যক্ত" হইয়াও বিজয়কুমার পিতৃপদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন ; বিজয়ের অতুলনীয় পিতৃভক্তি নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে।

"পিতৃপদস্পর্শে শুদ্ধ এ রম্য প্রদেশ।
যাগ-যোগ-তপস্যার এই যোগ্য স্থান।
পুণ্য কুরুক্ষেত্র এই, এই বারাণসী,
গোমুখী-কৈলাসভূমি, এই হিমাচল।"

সবিশেষে:উল্লেখযোগ্য ও উপলব্ধি করিবার দ্বিতীয় চরিত্র সারদা-চরিত্র। পদাহতা ফণিনীর ন্যায় উপেক্ষিতা রমণী কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা অতিশয় দক্ষতা সহকারে সারদা-চরিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। সারদার "সাধের বিহঙ্গ সুবর্ণ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কাননে" উড়িয়া গিয়াছে। যাহার "রাজীব চরণ পূজা" করিবে বলিয়া সে পণ করিয়াছিল, "যাদুমন্ত্র বলি কুহকের ছলে" তাহার হৃদয় কে কাড়িয়া লইয়াছে ; এই "মর্ম্মভেদী যাতনা জুড়াইবার" জন্য সারদা "প্রতিহিংসাকে জপমালা" করিল। "রমণীর কোমল হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত করিয়া, দাক্ষিণ্য, মমতা, মায়া জলন্ত অনলে ভস্মীভূত" করিয়া সে "প্রতিহিংসা-ব্রত উদ্‌যাপন" করিবার জন্য যক্ষ, রক্ষের আশ্রয়ভিক্ষা করিল। সারদা ক্ষিপ্তা, উন্মত্তা, স্বীয় ইষ্টমন্ত্র সাধনের জন্য রাজার ব্যসনী ভ্রাতুষ্পুত্র উদয়কে "ক্রীড়ার পুতলি সম" নাচাইবারর জন্য করজোড়ে অপ্সরা-কিন্নরীকে ডাকিতেছে। কমলাকে বিজয়ের অঙ্কচ্যুত করিবে, তাহার পাগলিনী-বেশ দেখিবে, বিজয়কে বিপদজালে ফেলিবে, ইহাই তাহার মূলমন্ত্র হইল। উদয় ও এক অবধূতের সহায়তায় ষড়্‌যন্ত্রজাল বিস্তৃত হইল। মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছায় ঘটনার স্রোত অন্যদিকে ফিরিল। অবধূতের কন্যা রমা রাজসভায় সমস্ত রহস্য-জাল ভেদ করিয়া দিল। ঘটনাচক্রে পরপুচ্ছসুশোভিতা সারদার প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপিত হইল। ভ্রান্ত নরপতি অনুতপ্ত চিত্তে বিজয় ও কমলার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ অনুমোদন করিলেন। পুণ্যের জয় হইল। রোষে, ক্ষোভে সারদা আত্মহত্যা করিল।

অবধূতের ন্যায় বিড়াল-তপস্বী ও উদয়চাঁদের ন্যায় কচুবনের কালাচাঁদ আমাদের সমাজে অনেক আছে ; তাহাদের পূর্ণ আলেখ্য "কর্ণাট-কুমারে" সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে ; বিজয় ও মাধবের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য সর্ব্বতোভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

"কর্ণাট-কুমারে"র কোন কোন অংশ পরিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের মতে পঞ্চম অঙ্কে, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সারদা-সুন্দরীর স্বগত উক্তি অতিশয়:দীর্ঘ হইয়াছে ; প্রথম অঙ্কে, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বিজয়ের প্রবেশকালে কমলার স্বগত উক্তি অপ্রাসঙ্গিক। স্বাস্থ্যব্যপদেশে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য রাজার নৌকাযাত্রা সম্পূর্ণ আধুনিক প্রথাদ্যোতক।

শ্রীসুশীলগোপাল বসু

অভিনব পরিণয়

(সচিত্র)

বেশী বয়সে বিবাহ বা পাণিগ্রহণ করিবার শক্তি যদি পাণিতে বর্ত্তমান থাকে, তবে সেটা নিন্দনীয় বা দূষণীয় বলিয়া ইংরাজেরা গণ্য করেন না। একশত বৎসর বয়ঃক্রমকালে উদ্বাহ-বন্ধনে বন্দী হইবার কথা শুনিলে, বৃদ্ধগণ হয় ত বলিবেন, "কারাগারের শৃঙ্খল-বন্ধন অপেক্ষা ব্যাপারটা বড় কম আপশোষের নয়।" যুবকগণ বলিবেন, "বৃদ্ধের কালধর্ম্ম যে বয়সে রেখা-গণ্ডীদ্বারা আবদ্ধ করা হইয়াছিল, যেব্যক্তি সেই রেখাও উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছে, সে নিশ্চয়ই দ্বিজের ন্যায় যৌবনের দ্বিতীয় স্বর্গে পদার্পণ করে ; সুতরাং সেটা ভয়াবহ নহে। ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পার হইলেই আবার অন্যদিনের বারোটার ঘরের দিকেই ঝুঁকিয়া ঘুরিয়া চলে ; সুতরাং যাহার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, ও বার্দ্ধক্য-চক্রের নেমী

কর্ণেল ওভার্টন—একশত বৎসর বয়সে

কর্ণেল-পত্নী—৭৭ বৎসর বয়সে

একবার আবর্ত্তন সম্পূর্ণ করিয়াছে, সে আবার বাল্যকাল না পাইলেও, যৌবনে 'রাজটীকা' দিতে সমর্থ হয়।" আমেরিকায় একশত বৎসর বয়ঃক্রমকালে একজন ব্যক্তি আয়ুশ্চক্রাবর্ত্তন শেষ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ-বন্ধনে বন্দী অথবা বার্দ্ধক্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন। কথাটা শুনিলে, বিশ্বাস করিবেন না জানি ; সুতরাং 'ফটোগ্রাফ'-সহ তাহার সাক্ষ্য কবুল করা গেল। যিনি শতাতীত বয়ঃক্রমকালে একজন ছিয়াত্তর বৎসর বয়স্ক যুবতীর (?) পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম Colon·l Overton of St Jose h. যে গির্জ্জার এই শতাব্দী ও অর্দ্ধাতীত-শতাব্দী বয়স্ক নবদম্পতী মিলিত হইয়াছিলেন, সে গির্জ্জার পুরোহিত ছিলেন, ডাক্তার সি, এইচ্ ষ্টকিং (Dr. C. H. stocking)

কর্ণেল ওভার্টন্ পেন্‌সিল্‌ভেলিয়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বহু সভাপতির (Presiden) অভিষেক দর্শন করিয়াছিলেন। বাল্যে ও যৌবনে তিনি চিত্রাঙ্কন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তখনও 'ফটোগ্রাফি' সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিব্যক্ত হয় নাই ; সুতরাং ইহাতে ওভার্টনের ব্যবসা-হিসাবেও লাভ ছিল।

দেখিতে তিনি বেশ ছিপ্‌ছিপে—অবশ্য রুগ্ন নহেন। একটা বেতের ছড়ি হাতে করিয়া লোকটি অপ্রতিহত প্রতাপে পদব্রজে ভ্রমণে অদ্বিতীয়। তাঁহার কেশদাম একেবারে শুভ্র ; কিন্তু শুভ্র হইলেও সেগুলি শ্লথ নহে। একশত বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্তও তিনি চসমা ব্যবহার করেন নাই ! এখন তিনি মাঝে মাঝে ঐ কৃত্রিম চক্ষুর স্মরণাপন্ন হইয়া থাকেন। তাও কেবলমাত্র গ্রন্থপাঠকালে। তিনি জীবনে ধূমপান অথবা মদ্যজাতীয় কোন পান-পদার্থও গ্রহণ করেন নাই। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি কখনও একবিন্দু ঔষধ ব্যবহার করেন নাই অথবা একপয়সা 'ভিজিট্' কোন চিকিৎসকের হস্তে দান করেন নাই এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের দৈন্য ও কুফল তিনি বন্ধুগণের নিকট খুব জোর করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তিনি প্রায় সমস্ত দিনই কার্য্য করিতে পারেন—একটুও ক্লান্তি বোধ করেন না। মদনদেব 'কর্ণেল'-জাতীয় মানবের প্রতি নিশ্চয়ই প্রসন্ন ; নচেৎ এমন অদ্বিতীয় কর্ম্মঠ ও শক্তিবান্ মনুষ্য দুর্ল্লভ। তিনি দুই বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ তাঁহার ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সম্পন্ন হয় ও প্রথম পত্নীর মৃত্যুর অল্প পরেই তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় বিবাহের তারিখ জানি না ; তবে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ৭৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। ইহলোক ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তিনি ইহলোকের কি পরিমাণ ভার-বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তাঁহার ১০টি সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ; তন্মধ্যে ৭জন পুরুষ। আমরা, পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য কর্ণেল ওভার্টন্ ও তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর (যিনি ৭৭ বয়সে ধরাধাম ত্যাগ:করিয়া গিয়াছেন) ছবি এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিলাম।

এই অভিনব বিবাহ-ব্যাপারের সহিত এস্থানে আরও দুই-একটি অভিনব বিবাহ-পদ্ধতির কথা কৌতুহলোদ্দীপক হইবে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের কেণ্ট্ (Kent) নগরে একটি অদ্ভুত উপায়ে বিবাহের শোভাযাত্রা ও বর-কন্যার জুড়িগাড়ী টানা হইয়াছিল। রাস্তা সারাইবার 'এঞ্জিন্' ছিল সেই বিবাহের বর-কন্যার জুড়িগাড়ীর

বাহক। অশ্বহীন জুড়িগাড়ী এই অদ্ভুত আকারের 'এঞ্জিন'দ্বারা চালিত হইবে, এই ব্যাপারটা দেখিবার জন্য বহু জন-সমাগম হইয়াছিল।

কিছুদিন হইল, আমেরিকার এক নবদম্পতী 'বেলুনে' চড়িয়া বিবাহ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। অবশ্য, এই ব্যোম-

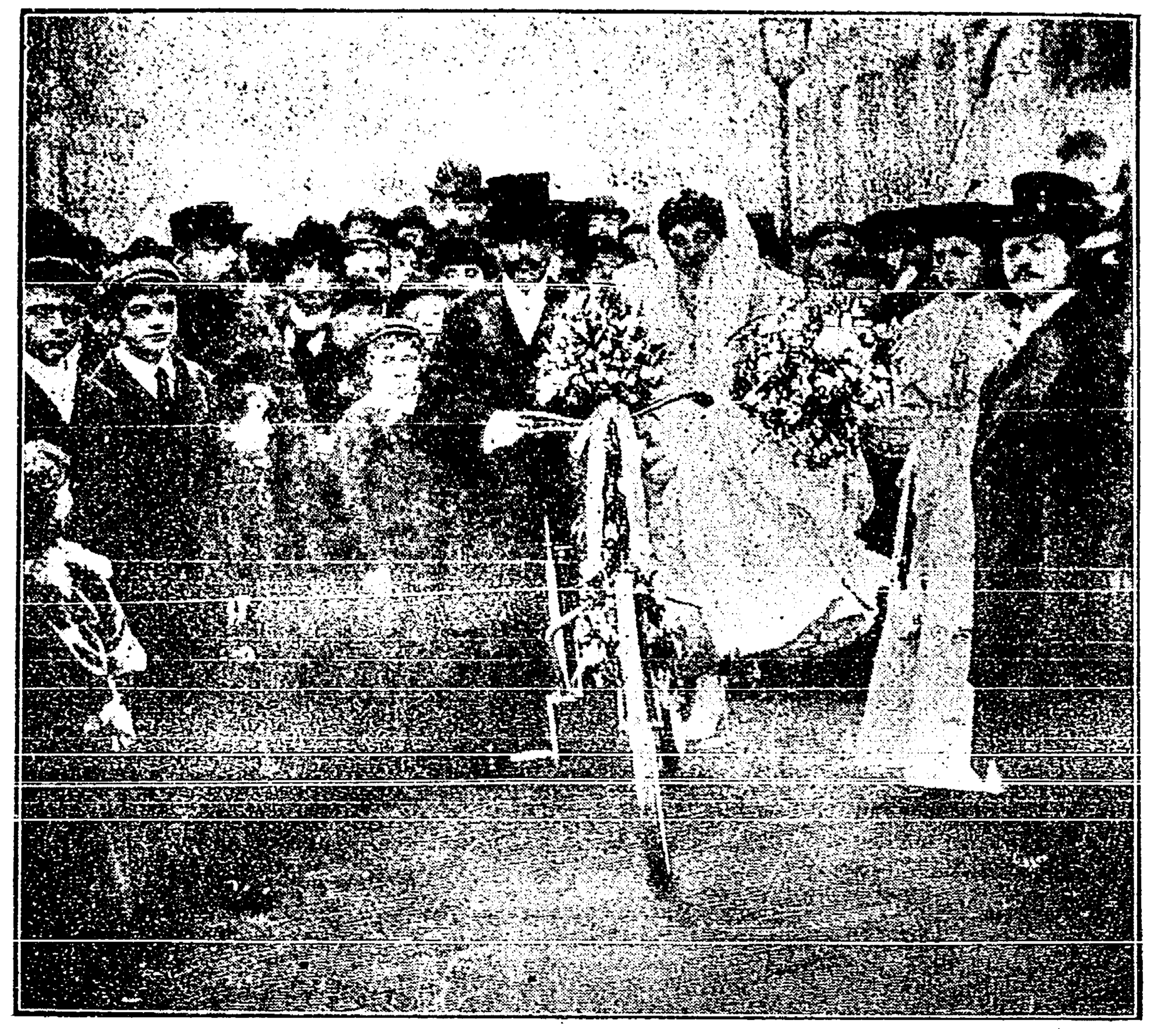

সাইকেলে নব-দম্পতী

যান-আরোহণরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য, প্রণয়ী বা প্রণয়িণীর কেহই, একজন অপরের নিকট ভালবাসার পরিচয়ের সাক্ষীরূপে কবুল করেন নাই—ইহা একটা আনন্দমাত্র! ব্যোমযানে উঠিয়া বিবাহ হইবে, কথাটা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া যাওয়ায়, বহুলোক এই বিবাহ সন্দর্শন করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছিলেন। অবশেষে 'দুর্গা' বলিয়া প্রণয়ী-প্রণয়িনীকে লইয়া ব্যোমযান ত আকাশে প্রয়ান করিল। আকাশপথে-বাহিতা, ভীতা প্রণয়িনী প্রাণভয়ে অকস্মাৎ ব্যোমযান হইতে ঝম্পপ্রদান করিলেন। ব্যোমযান তখন উঠিয়াছিল একশত ফুট্ উপরে। প্রণয়িনী পড়িলেন এক নদীর উপর। অর্দ্ধমজ্জমান্ আবস্থায় এক নাবিকের দল এই অভাগিনীকে রক্ষা করে। ব্যোমযান-ভ্রমণ যদি প্রণয়ের 'কষ্টি-পাথর' হয়, তবে প্রণয়িনীটি যে খাঁটি সোণা নয়, তাহা আর বলিতে হইবে না। যাহা হউক, ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল পাশ্চাত্য দেশে; সুতরাং আমাদের দেশের মাপকাঠিতে মাপিলে ত চলিবে না!

তৃতীয় চিত্রটিতে একটি 'সাইকেলে'র উপর বর-কন্যার দুইটি পৃথক্ বসিবার স্থানসহ 'ফটো' প্রদত্ত হইল। এই 'সাইকেলে'র উপরই তাঁহারা পরিণীত হন। হাসির গানের কবির "নূতন কিছু কর" কথাটা এক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। আর একটা "নূতন কিছু কর" রীতির অনুরূপ বিবাহের ব্যাপার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

আমরা এখন যে বিবাহের বিবরণ দিব, তাহা একটা সিংহ-দম্পতীর সুবৃহৎ খাঁচার মধ্যে সম্পন্ন হইয়াছিল। অমেরিকার ওহিও (Ohio) নগরস্থ বৃহৎ পশুশালার যে খাঁচাটিতে একজোড়া তেজাল' ও রোখাল' সিংহ বাস করিত, মিস্ কারলোট্ ও মিষ্টার আর্থার সেই খাঁচাটিতে শুভ-বিবাহের মঙ্গল-বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন, ঠিক্ হইয়াছিল। নবদম্পতী স্বেচ্ছায় এই ভয়াবহ স্থানে বিবাহ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ওহিও-নগরের প্রধান পুরোহিত রেভারেণ্ড জর্জ্জ রিডার (Rev. George Reader) খাঁচার বাহিরে দাঁড়াইয়াই বিবাহের অনুষ্ঠান-মন্ত্র পাঠ করিয়া নবদম্পতীর উদ্বাহ বন্ধনের গ্রন্থি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। বর

সিংহ-পিঞ্জরে বিবাহিত দম্পতী

এবং কন্যাকে সিংহের খাঁচায় পূরিয়া চাবী দেওয়া হইয়াছিল। সেই খাঁচায় ক্লিয়োপেট্রা ও সিজার নামক দুইটি সিংহ ব্যতীত অপর কোন প্রাণীই বর্ত্তমান ছিল না।

এই নূতন ধরণের বিবাহ-পদ্ধতির সংবাদ ওহিওর প্রত্যেক

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় সুবৃহৎ হরফে বিজ্ঞাপিত হওয়ায়, ওহিও পশুশালায় কি পরিমাণ জন-সমাগম হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রায় ছয় হাজার লোক এই সিংহের খাঁচায় উদ্বাহ-ব্যাপার দেখিতে আসিয়া প্রত্যেকে পাঁচটাকা করিয়া টিকিট্ কিনিয়াছিলেন। পশুশালায় স্থানাভাব হওয়ায়, এ ছাড়াও অনেক আহূত ও রবাহূতকে পশুগৃহের বহির্ভাগে সতৃষ্ণ নয়নে সন্দর্শন-মানসে দণ্ডায়মান থাকিতে হইল।

বেলা নয় ঘটিকার সময় ওহিও-পশু-আগারের সুবৃহৎ "অর্গান্"টি বিবাহের মঙ্গল-সঙ্গীত ঘোষিত করিল। ২০জন বালক খাঁচার বহির্ভাগে থাকিয়া উদ্বাহ-সংগীত গান করিল। অতঃপর নবদম্পতী ধীরপদে মুক্তদ্বার সিংহের খাঁচার মধ্যে

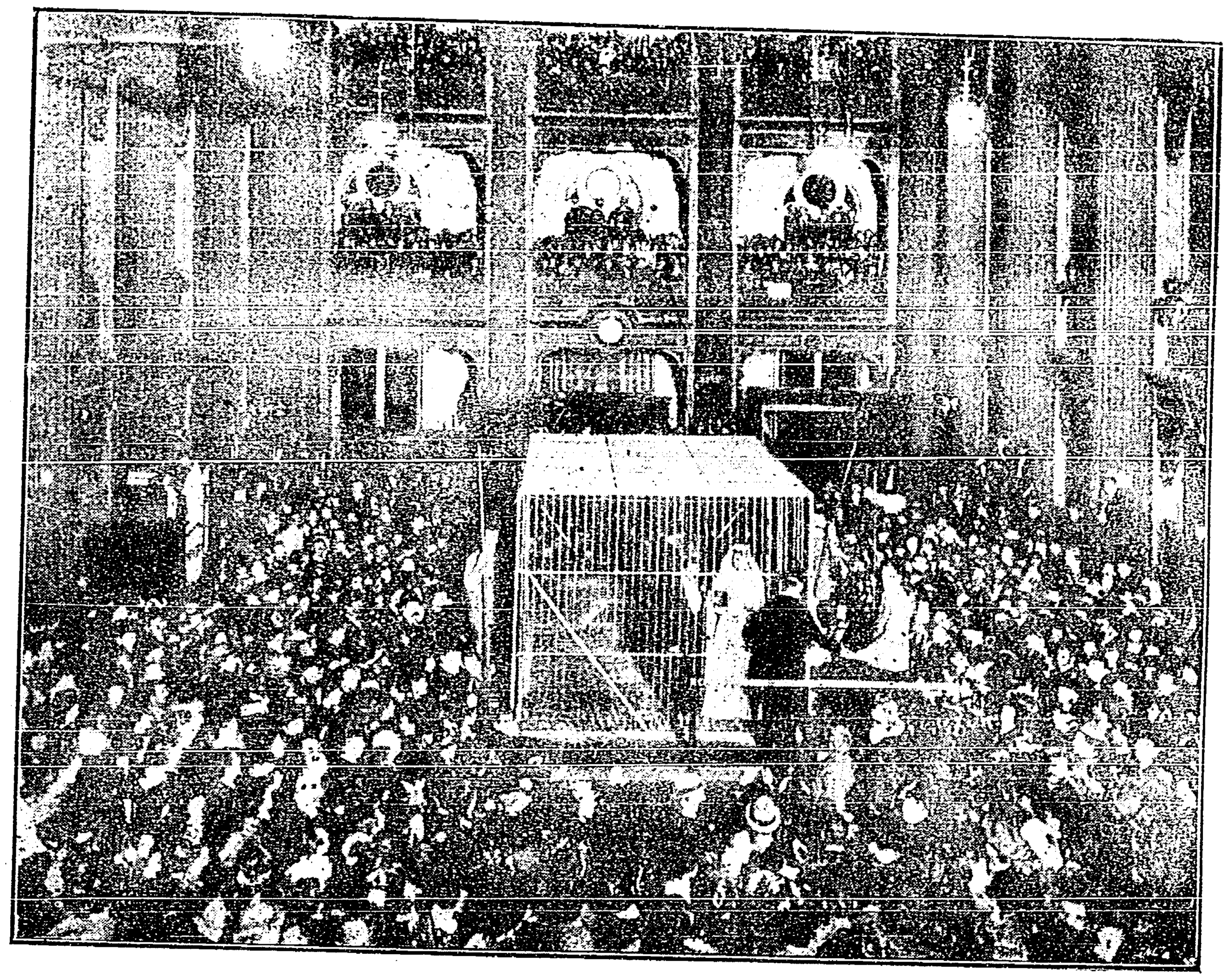

সিংহ-পিঞ্জরে বিবাহ-দৃশ্য

প্রবেশ করিলেন। শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, খাঁচায় প্রবেশ-কালে নবদম্পতী এক সেকেণ্ডের জন্যও ভীত অথবা দ্বিধাযুক্ত হন নাই। প্রেমের রাগিণী যদি সত্য হয়, বোধকরি, নবদম্পতী বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, সে রাগিণী অপ্রেমী হিংস্র জন্তুর লালসা-বহুল ক্ষুধাবৃত্তিকে কথঞ্চিৎ সুশান্ত করিয়া দিবে। আমাদের দেবী যখন সিংহমর্দ্দিনী, তখন দেবীর দৈবশক্তি যে সিংহ-বিক্রমের হিংস্রতার উপর বিজয়ী হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?—হইলও তাহাই। চারজন প্রহরী সমুচ্চ লৌহ-দণ্ড-হস্তে খাঁচার বাহিরের চার কোণ ঘিরিয়া সিংহের অকস্মাৎ-আক্রমণের বাধারূপে দণ্ডায়মান ছিল। এতদ্ব্যতীত সিংহদ্বয়কে রাগান্বিত করাইবার জন্যও দর্শকমণ্ডলীর অনেকে ছড়ি দিয়া খাঁচার ভিতরে সিংহের গায়ে বারংবার আঘাত করিতেছিলেন। নবদম্পতী খাঁচায় প্রবেশ করিবার পরমুহূর্ত্তেই সিংহের রক্ষকটি সশব্দে খাঁচার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

নবদম্পতী সোৎসাহে খাঁচার মধ্যস্থানে গিয়া বাহিরের পুরোহিতের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হঠাৎ এই সময় 'সিংহ দুইটি নাতিউচ্চ গর্জ্জন করিয়া চঞ্চল হইয়া বাহিরের অসম্ভব জনতার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাহাদের লৌহ-কারাগারের চতুর্দ্দিকে চঞ্চল পদক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাদের আবাসগৃহের নূতন অতিথি দুইটির প্রতিও মাঝে মাঝে তাহারা ভ্রুকুটী-কুটিল তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কি মনে করিয়াছিল, তাহা সিংহকে যিনি সিংহবিক্রম প্রদান করিয়াছেন, সেই চিরবিক্রমশালী শক্তিসিংহ এবং জ্ঞানসিংহ ব্যতীত মনুষ্যশক্তির অজ্ঞাত। যাহা হউক, সিংহের রক্ষকটি কোনক্রমে তাহার বাহন-দ্বয়কে মাংসাদি দিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত করিলে, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল।

নবদম্পতী নির্ভীক চিত্তে এবং অচঞ্চল-ধীরকণ্ঠে বিবাহের মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিলেন। বিবাহের পুরোহিত স্বয়ং, নবদম্পতীর এই ভয়সঙ্কুল স্থানে নির্ভীকতার পরিচয় পাইয়া যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিবাহকালে চতুর্দ্দিক্ স্তব্ধ ছিল। জনতার অস্পষ্ট নিঃশ্বাস-ধ্বনি এবং সিংহ-দম্পতীর ধীর-মন্থর পদশব্দ ও ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের নাসিকা-নিঃসৃত বায়ুর শব্দ ব্যতীত অপর কিছুই কর্ণগোচর হইবার উপায় ছিল না। বিশাল জনতা নীরব হইয়া এই অত্যাশ্চর্য্য বিবাহ-ব্যাপার দেখিতে মনোযোগী ছিল। অবশেষে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নবদম্পতী যখন সিংহের খাঁচা হইতে বাহির হইলেন, তখন জনতার মধ্যে যেন হঠাৎ দখিণে-হাওয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কিরূপ আনন্দ হইয়াছিল, তাহা দর্শক ব্যতীত অপর কেহ বুঝিতে পারিবেন না। নবদম্পতীর সম্মান তখন সমস্ত আমেরিকা জুড়িয়া ছড়াইয়া গেল। বিবাহক্ষেত্রেই বহুসহস্র লোক বর-কন্যাকে নানারূপ উপহার-সামগ্রী প্রদান করিলেন। সেগুলির তালিকা দিয়া প্রবন্ধের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি করিব না। ওহিও-নগরের পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষ এই আশ্চর্য্য বিবাহ-ব্যাপার দেখিয়া

বর-কন্যাকে একপ্রস্থ রূপার চায়ের সরঞ্জাম উপহার দিয়াছিলেন। টিকিটের মূল্যে, উপহারের দ্রব্য-সম্ভারে এবং ভোজন-ব্যাপারে বর-কন্যা যে একটু বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন তাহা হিংসার সহিত স্বীকার করিতে লজ্জিত হইলে, অন্যায় হইবে।

বিবাহ-কার্য্য সম্পাদনকালে ওহিও-পশুশালার খাঁচা এবং তন্নিকটস্থ জনতার অংশটুকুর যে 'ফটো' গ্রহণ করা হইয়াছিল, আমরা তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের বিশ্বাস এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিলাম।

এই বিবাহ-ব্যাপার লইয়া আমেরিকায় যে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বোষ্টনের (Boston) 'থিয়োলজিক্যাল্ সোসাইটি'র কর্ত্তৃপক্ষগণ এই বিবাহ-ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। মানুষদের, কেবলমাত্র তাহার কৌতূহল-চরিতার্থ কল্পে গ্লাডিয়েটারের মত, সিংহের খাঁচায় একজন নিঃসহায় মানবীর সহিত ছাড়িয়া দেওয়াটা তাঁহারা একমাত্র বর্ব্বরতা ব্যতীত আর কিছুই মনে করেন না। তাহার উপর বিবাহ নামক একটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল-অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়া এই ভয়াবহ কার্য্য করাটাও দ্বিগুণ দূষণীয়। আমেরিকা এবং য়ুরোপ আমাদের দেশের মত নিস্তেজ দেশ নহে। সেখানে কেবল 'মলয়' বহে না এবং কেবলমাত্র 'চাঁদ ও চকোরে অধরে অধরে মধুপান' করে না। সে দেশের লোক প্রাণের মধু, জীবনের মধু পেয়ালা ভরিয়া পান করিয়া থাকে বলিয়া এই অদ্ভুত বিবাহ-ব্যাপার দেশকেও মাতাইয়া তুলিয়াছিল। 'থিয়লজিক্যাল্ সোসাইটি' এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, এই বিবাহের পুরোহিত রেভারেণ্ড মিষ্টার রিডারের (Rev. Mr. Reader.) পৌরোহিত্য পদ কাড়িয়া লওয়া হইল। তাঁহারা একটী প্রধান কারণ দর্শাইলেন যে, রেভারেণ্ড্ রিডার বোষ্টন য়ুনিভর্সিটির একজন এম্, এ উপাধিধারী; তিনি যদি এমন বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া জনগণসম্মুখে তাঁহার পৌরোহিত্য-পদ-গ্রহণে দুঃসাহসী হইয়া উঠেন, তবে তাহা কেবলমাত্র যে,তাঁহার নিজের দুর্নাম,তাহা নহে, পরন্তু উহা 'বোষ্টন্ য়ুনিভার্সিটি'র কলঙ্কস্বরূপ। অতএব রিডারের পৌরোহিত্য পদ অপহৃত করা হউক্—ইত্যাদি ইত্যাদি। 'য়ুনিভার্সিটির' ডিন্ (Dean) পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবের ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যবশতঃ রিডারের পৌরোহিত্য পদচ্যুতি ঘটিল।

ইহার পর ওহিওর পশুশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ জনসাধারণ্যে এইরূপ বিজ্ঞাপন দেন যে,বিবাহোন্মুখ ভাবী দম্পতী যদি সিংহের খাঁচার মধ্যে পূর্ব্বোক্তপ্রকারের বিবাহ-পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভাবী দম্পতীর জীবন্ত সিংহের খাঁচায় প্রবেশ করিবার মত সাহস আছে কি না, তাহা একবার পরীক্ষা করা হইবে। পাঠকগণ শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, এই বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বহুসংখ্যক ভাবী দম্পতী জুটিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই প্রথম পরীক্ষাতেই রণে ভঙ্গ দিয়াছিলেন; সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষকে নিরাশ হইতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে ভাবী দম্পতীর অভাব না থাকিলেও,সে দাম্পত্য-প্রেম যে কতটা ভাবী এবং অভাবী,তাহা পাঠকগণ বিচার করুন্। পুরাকালের সহমরণের কথাটা এই সঙ্গে হঠাৎ মনে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা ঠিক্ অনুরূপ না হইলেও, কথঞ্চিৎ সমান্তরাল (parallel)। এই ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে দাম্পত্য-প্রেমে অভাবী বলিলে ভুল হইবে। হয়ত ভারতবর্ষের ভামিনীর ভাবী পতি নাই, তাহার ললাট-ফলকে একজনের নাম পতিত্বের রক্ত দিয়া আঁকা থাকে; সেইজন্য ভারত-ভামিনীকে ভাবী পতির সন্ধানে ঘুরিয়া মরিতে হয় না। ভাবী সেখানে বাস্তবী হইয়া আছে এবং সেই বাস্তবিকের জন্য ভাব-সংগ্রহের অভাবও ভারত-মানবীকে খুঁজিতে হয় নাই; অথবা পশুশালার সিংহের খাঁচার ভিতর সে প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষারও আবশ্যকতা হয় নাই।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(৬)

শূল

সেকালের যতগুলি পাশব দণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায় তন্মধ্যে শূল অন্যতম। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর যত লোককে এই দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে, তাহার অর্দ্ধেক সংখ্যাও হয় কি না সন্দেহ। জাহাঙ্গীর-কর্ত্তৃক এই ভীষণ দণ্ড-প্রদানের প্রধান কারণ বাদশাহ-পুত্র খুস্রুর রাজদ্রোহ।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নিজেই বলিয়াছেন—

"লাহোর-দুর্গের যেস্থানে বসিয়া পিতা হস্তীর যুদ্ধ দেখিতেন, আমি সেইস্থানে আসন গ্রহণ করিলাম। আমার আদেশে নদী-বক্ষে কতকগুলি তীক্ষ্ণ শূল প্রোথিত হইয়াছিল। যাহারা খুস্রুর সহিত ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, আমি তাহাদের ৩০০ শত জনকে সেই শূলে তুলিলাম। ইহা অপেক্ষা কষ্টকর দণ্ড আর নাই। যাহাদের শূল হয়, তাহারা যন্ত্রণা পাইতে পাইতে ধীরে ধীরে মরে।

[তারিখ-ই-সলিম-শাহী]

অন্যত্র—

আইজাক্‌গণ খুস্রুর সহায়তা করিয়াছিল। খুস্রুর সেনাধ্যক্ষ-দ্বয় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে পর, ৭০০শত আইজাক্-বন্দীর শূলের আদেশ হইয়াছিল। রাভিনদীর গর্ভে শূল প্রোথিত হইলে পর, সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আপনার নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, সেই ৭০০শত হতভাগ্য আইজাক্ শূলের উপর মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদ জাহাঙ্গীরের হৃদয় স্পর্শ করে নাই!

[তারিখ ই-সলিম-শাহী]

তখন সুলতান আলাউদ্দিন দিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দিল্লী-সাম্রাজ্য তখন তাঁহার করতলগত। মুসলমান-ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক বলিয়া তখন সুলতানের নাম মস্‌জিদে মস্‌জিদে ধ্বনিত হইতেছে। সেই সময় আলি বেগ সসৈন্যে অযোধ্যার

নিকটবর্ত্তী এক মুক্ত প্রান্তরে শিবির-সংস্থাপন করিলেন। মনে করিলেন, অনায়াসে অযোধ্যা জয় করিবেন।

সুলতান আলাউদ্দিন অবিলম্বে অশীতি সহস্র দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যসহ সেনাপতি মালিক কাফুরকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলেন। নিশা-যোগে যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল, তাহাতে মোগল-সৈন্য একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, আলি বেগ এবং অন্যান্য কতকগুলি সেনা-নায়ক বন্দীকৃত হইলেন।

যুদ্ধান্তে আলাউদ্দিনের আদেশে সমর-প্রাঙ্গণে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত নরমুণ্ডগুলি একত্রিত করা হইল। আলাউদ্দিনের পদতলে ষষ্ঠীসহস্র নর-কপাল এইরূপে আনীত হইলে পর, তিনি আদেশ দিলেন—"বদাউন্-সিংহদ্বারের সম্মুখে নর-কপালের স্তম্ভ নির্ম্মাণ কর। যতদিন উহা বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মোগল সাবধান রহিবে।"

[তজ্‌জিয়ৎ-উল্-অম্‌সার]

নর-কপালের দুর্গ

ইহার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুতীরে ইক্‌বাল মুদ্‌বির এবং মুদাবির তৈ-বউলএর সৈন্যের সহিত আলাউদ্দিনের প্রবল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। বিজয়ী আলাউদ্দিন আদেশ প্রচার করিলেন, "বন্দীকৃত শত্রুদিগকে নিহত করিয়া তাহাদিগেরই নিষ্পেষিত মাংস,মেদ মজ্জা, অস্থিদ্বারা দুর্গ-প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর।

সুলতানের আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইল। বন্দীর শির পলকে দেহচ্যুত হইল—তাহাদের শোণিতে তপ্ত নদী বহিল এবং নর-কপালের দুর্গ শির উত্তোলিত করিয়া আলাউদ্দিনকে রাক্ষসেরও অধম বলিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে প্রচারিত করিল!

[তারিখ-ই-আলাই]

আলাউদ্দিন, ইতিহাসে নর-শোণিত-পিপাসু বলিয়া পরিচিত; কিন্তু ইতিহাস-বিশ্রুত সম্রাট্ বাবর ও আকবর পর্য্যন্ত মৃত শত্রুর কপাল লইয়া স্তম্ভ বা মন্দির গঠন করিয়াছেন। বাবরের চরিত্র-সমালোচনাকালে তাই একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক কহিয়াছেন—"Yet there are trans of Aciatic ferocity-and of a hard-hearted wasetfulness of life, which remind us that we are beyond the pale of European gallantry and compassion." মোগল এবং পাঠানের ইতিহাস আলোচনা করিলে, এই কথা বস্তুতঃই মনে হয়। ভারতের হিন্দু-সাম্রাজ্যের ইতিহাস এই কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে।

বাবর যুদ্ধে জয়ী হইয়া পটমণ্ডপে বিশ্রামলাভ করিতে লাগিলেন আর তাঁহার সম্মুখে শত শত, সহস্র সহস্র বন্দীদিগের বধ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। শোণিত-স্রোতে পটমণ্ডপ সিক্ত হইয়া উঠিল। আবার উহা স্থানান্তরিত করিলেন। আবার নরহত্যা আরম্ভ হইল। রুধির-ধারায় আবার সম্রাটের পটমণ্ডপ ভিজিয়া উঠিল। আবার স্থানান্তরিত হইল এবং বন্দীর পর বন্দীর ছিন্নমুণ্ড সম্রাটের পদতলে নিপতিত হইতে লাগিল। শুষ্কভূমি দেখিতে দেখিতে নর-শোণিতে সিক্ত হইয়া উঠিল—পুনরায় পট-মণ্ডপ স্থানান্তরিত করিতে হইল!!

বুঝিতে পারি না, কেন বাবরের নাম আলাউদ্দিনের সহিত একত্রে গ্রথিত হয় নাই।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

ভিক্ষা

(১)

দীন যে আমি, দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে ভিক্ষা মাগি';
ওগো পথিক, দাওনা কিছু, বসে আছি তোমার লাগি'।
ধনী তুমি? দিবে তোমার টাকা কিছু পয়সা-কড়ি?
সুখে থাক, চাই না তাহা, আমি এখন বেড়াই ঘুরি'।

(২)

প্রণমি আজ ভক্তিভরে হে ঋষিবর, তোমার পায়,
দাও গো কিছু দয়া করে, অভাবগ্রস্ত ভিক্ষা চায়।
কি বল্‌ছ? দিবে তুমি ফলাহার আর দীক্ষা মোরে?
ক্ষম যোগি, তোমার কাছে আসিনি আজি ইহার তরে।

(৩)

আচার্য্য হে! অভাব মম নিবেদিনু তোমার কাছে;
হীন যে অধম, তাই ত আজি তোমার কাছে ভিক্ষা যাচে।
বিনা মূল্যে বল্‌ছ তুমি শিক্ষা তোমার ভিক্ষা দিবে?
মাপ করিও, বিদায় এখন, অভাগা তা নাহি লবে।

(৪)

নতজানু পীঠের তলে দাঁড়িয়ে আছি যুক্তকরে;
দেবতা মোর, দানটি তব লব বলে আঁচল ভরে।
কি জানালে পূজারিকে? দিবে তোমার আশীর্ব্বাদ?
তবে বুঝি ধরা'পরে মিট্‌ল না আর মনের সাধ!

(৫)

রিক্তহাতে ফিরি এখন, কে গো তুমি দাঁড়িয়ে দ্বারে?
দিবার কিছু নাই বলে তাই দু'নয়নে অশ্রু ঝরে?
পেলাম এখন মাগি' যাহা, শান্ত আমার হৃদয়তল;
যেচেছিনু একটি বিন্দু অনুভূতির অশ্রুজল।

শ্রীপাঁচুগোপাল নন্দী

ইব্‌সেনের নাট্য-পরিচয়

এই প্রবন্ধে আমি ইব্‌সেনের কতিপয় প্রসিদ্ধ নাটকের সহিত পাঠকগণকে পরিচিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিব। ইব্‌সেন অনেক নাটক প্রণয়ন করিয়া যান। তাহার সবগুলির বিশিষ্ট সমালোচনা ও মর্ম্ম বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিতে হইলে, আমার এ ক্ষুদ্র বিদ্যায় ও ক্ষুদ্র আয়োজনে কুলাইবে না। তবে যতগুলি পারি, ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সুধী পাঠকমণ্ডলীকে উপহার দিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। ইব্‌সেনের ন্যায় কবির পুস্তক-সম্বন্ধে আলোচনা করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই সবিশেষ অবগত আছেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা বড়ই ধৃষ্টতার বিষয়। পাঠকগণ, আমার সহস্র ত্রুটিসত্ত্বেও আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা। আমি প্রথমেই সদাশয় পাঠকমণ্ডলীকে ইব্‌সেনের "নোরা" (Norah) নাটকটীর পরিচয়প্রদান করিব। য়ুরোপের বর্ত্তমান বিবাহ-সম্বন্ধে এই নাটকে ইব্‌সেনের অনেক অভিজ্ঞতা দৃষ্ট হয়।

ইব্‌সেনের নোরা-চরিত্র।

(বিশিষ্ট সমালোচনা)

নোরা-চরিত্রে ইব্‌সেন মনুষ্য-সমাজে নারী-জাতির একটা সুসঙ্গত স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইব্‌সেন দেখিয়াছিলেন যে, জগৎটা কেবল পুরুষজাতির অধিকারেই ভরিয়া উঠিয়াছে এবং নারীজাতির প্রকৃত বিকাশ হইতেছে না—পুরুষের একাধিপত্যে নারীর প্রকৃত গুণরাশি যেন চাপা পড়িয়া গিয়াছে! তিনি নর-নারীকে অন্ধপ্রেমে মুগ্ধ হইতে বলিতেছেন না—তিনি বুঝিয়া ভালবাসিতে বলিতেছেন, Love and Understand উভয়ের মধ্যে প্রেম তখনই যথার্থ সার্থকতা লাভ করে, যখন উভয়ে উভয়কে বুঝিবার সুবিধা পায়—যখন উভয়ের চিন্তা, অনুভূতি,ইচ্ছা ও কার্য্য-শক্তি একই প্রকৃতির হয়। তখনই তাহারা সংসার-সংগ্রামে, জীবনের সুখ-দুঃখে উভয়ে উভয়কে পূর্ণ করিতে পারে। সহধর্ম্মিণী বলিতে প্রকৃত যাহা বুঝায়, ইব্‌সেন তাহাই চাহিয়াছিলেন—তিনি নারীজাতির হইয়া কোনরূপ অন্যায় দাবী করেন নাই। তিনি নারীজাতিকে যথার্থ নারীধর্ম্মে বিকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং নর-নারীর বিবাহ-ব্যাপারে বিশ্বাসকেই ভালবাসার মূলে রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

সত্য এবং বিশ্বাসই তাঁহার প্রেমাদর্শের পথ-প্রদর্শক ছিল। অবিশ্বাসই যে সকল অশান্তি ও বৈষম্যের মূলীভূত কারণ, তাহা ইব্‌সেন তাঁহার এই অদ্ভুত নারী-চরিত্র নোরায় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। প্রেম জিনিষটা যৌবনের সামগ্রী নহে, যৌবনকালের একাধিপত্য নহে। যৌবনের ব্যাঘাত অনেক ; তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যাঘাত আত্ম-প্রতারণা ; কিন্তু প্রেম আত্ম-প্রতারণা নহে, প্রেম অমোঘ বিশ্বাস। একদিকে এই নাটকে ইব্‌সেন Nora ও Helmer-চরিত্রের যেমন অপূর্ণতা দেখাইয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে আবার Mrs. Rinden ও Krogstad-চরিত্র প্রেমাদর্শে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। Nora ও Helmerএর ভিতর একটা অবিশ্বাসের ব্যবধান ছিল,একটা ভুল ছিল ; কিন্তু Mrs Rinden ও Krogstad-এর প্রণয়-মিলনে একটা পরস্পর বুঝিবার চেষ্টা ছিল। ইব্‌সেনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে, Nora ও Helmer-চরিত্রের মর্ম্মে মর্ম্মে অন্বেষণ করিতে হইবে। কেবল শাদা চোখে দেখিয়া গেলে চলিবে না, একটা সূক্ষ্মতর অভিজ্ঞান ও অণুবীক্ষণের সাহায্য লইতে হইবে। যাঁহারা বহির্দেশ হইতে বুঝিতে যাইবেন, তাঁহাদের চক্ষে ইব্‌সেন দোষী বলিয়াই সাব্যস্ত হইবেন। খৃষ্টীয় জগৎ এতদিন কেবল নারীকে উচ্ছৃঙ্খল বা সঙ্কীর্ণ করিয়াই গড়িতেছিল ; কিন্তু যেইদিন হইতে ইব্‌সেন নারীজাতির স্বরূপ বুঝিতে পারিলেন, সেইদিন হইতেই পাশ্চাত্য জগৎ নারীজাতির একটা সম্পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে শিখিল। এই নাটক লিখিয়া তিনি Woman's Poet নাম পাইলেন। এই নাটক হইতেই ইব্‌সেনকে সকলে চিনিল। ইব্‌সেনের অগ্রে নারীজাতি-সম্বন্ধে তেমন গভীরভাবে জগতের আর কোন কবিই ধারণা করিতে পারেন নাই। অবশ্য, আমি ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিদের কথা বলিতেছি না ; কারণ, একদিন ভারতে নারীজাতি যে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, জগতের কোথাও তাহার তুলনা বা কল্পনা হয় না।

ইব্‌সেন নারীজাতির সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশকে অতীব গম্ভীরভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ভাবুকতার চক্ষেই নারীজাতির কল্যাণ-চিন্তা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—তিনি সত্যসত্যই ব্যথিত প্রাণে নারীজাতির দুঃখে আজীবন কাঁদিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই উদ্দীপণায় আজ নরওয়ের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। কেবল নরওয়ে কেন, তাঁহারই তেজব্যঞ্জক শ্লেষবাক্যে, তাঁহারই কষাঘাতে আজ সমগ্র জগৎ নারীজাতি-সম্বন্ধে প্রবুদ্ধ। নারীজাতির ভিতর যেন আজ একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছে! Ibsen's Correspondenceএ তাঁহার এক স্বদেশবাসী বন্ধু লিখিতেছেন—

"Ibsen's 'Dolls' House' acted like a bomb on every-body. There was no party, no discussion and no news-paper in those days, in which Nora's behaviour was not discussed. The result was that Norwegian women were let loose all at once, so to speak. As for Ibsen himself, he is one of the severest moralists of our times. Always in earnest, he shows us the inevitable consequences of our deeds and almost of our thoughts. He urges upon us the truth that what we sow, that we shall also reap and that punishment will assuredly follow if we trample our ideals beneath our feet, he teaches us that humanity must be true to his inner-self"

ইব্‌সেন বুঝিয়াছিলেন, নারী কেবল ভোগের সামগ্রী নহে, মাতৃত্বই নারীজাতির চরম পরিণতি নহে,একমাত্র সতীত্ব ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানই নারীজাতির সম্পূর্ণতার কারণ। আবার এই সতীত্ব পুরুষের দাসীত্ব নহে, সহযোগিত্ব।

"সতী যে হইবে আগুনি খাইবে
না হইবে অন্যের বশ।"

যথার্থ সতী নারীর ভিতর একটা স্বাধীনতা থাকে, একটা নিজের সতীত্বের প্রতি বিশ্বাস ও প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে। যথার্থ সতী নারী যেন সাক্ষাৎ বহ্নিস্বরূপ! ভয় হইতেই যত গোপন-প্রিয়তার উৎপত্তি—ভয়ই যত অবিশ্বাসের কারণ। নারীজাতির এমন একটা স্বাধীনতা থাকা উচিত, যদ্দ্বারা তাহার স্বামীর প্রতি সতীত্ব স্ফূর্ত্তি পায়, স্বামীকে তাহার মনের সব কথা খুলিয়া বলিতে পারে। যে স্ত্রীলোক স্বামীকে গোপন করিয়া চলে, সে সব

করিতে পারে। ইব্‌সেন সতীত্বরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতারই পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নারীকে হেয় কামিনী-মূর্ত্তিতে দেখেন নাই, তিনি নারীজাতির ভিতর যথার্থ প্রেমাদর্শ ও সতীত্বকে প্রস্ফুটিত করিতে চাহিয়াছিলেন। স্বাধীনতা ও আত্মবিশ্বাস ব্যতীত সতীত্ব মাথা তুলিতে পারে না। এখানে স্বাধীনতা অর্থে যথেচ্ছাচারিতা নহে ; ইব্‌সেনের স্বাধীনতার অর্থ কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও সত্যানুরাগ।

নোরার ভিতর এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি পূর্ণমাত্রায় ছিল। ইব্‌সেন সংসারকে চাপা দিয়া চলিতে ভালবাসিতেন না, তিনি সংসারের সকল অবয়বগুলিরই একটা বেশ সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রীর নিষ্কলঙ্ক অসন্দিগ্ধ ভালবাসা,প্রভু-ভৃত্যের ভিতর একটা খোলাখুলি ভাব, সরলতা, আনন্দ, ধর্ম্মে অনুরাগ,সদাশয়তা, ভক্তি ও সৌজন্য, বালক-বালিকার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এবং শিশুর হাস্যাধর তিনি সংসারের অলঙ্কারস্বরূপ মনে করিতেন।

ইব্‌সেন নূতন কিছুই সৃষ্টি করিতে যান নাই,তিনি নারীর আসল মূর্ত্তিটাকে কোটী কোটী মানবের চক্ষে প্রতিভাত করিয়া গিয়াছেন। নারী-সম্বন্ধে জগতে উপদেশের অভাব নাই, বিধি-নিয়মের অভাব নাই ; কিন্তু ইব্‌সেনের ন্যায় নারীত্বের আদর্শ খুব অল্প লোকই দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইব্‌সেন নোরা-চরিত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্বাধীনতা ব্যতীত প্রকৃত ভালবাসা জন্মায় না। যতক্ষণ না পতি-পত্নীর ভিতর হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে না পারে, ততক্ষণ সে বিবাহে প্রেম আদৌ জন্মায় নাই। বিশ্বাস হইতে প্রেমের সৃষ্টি। ভক্ত-ভগবানের মধ্যে এই বিশ্বাসই প্রেমের রাজ্য সৃষ্টি করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই বিশ্বাসই জীবনে-মরণে সম্মিলিত করে।

অনেকে আপত্তি করেন, "তবে নোরা কেন অমন সর্ব্বগুণময় স্বামী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, স্বামীকে সতর্ক করিয়া দিলে পারিতেন ত?" নোরা-চরিত্র উপলব্ধি করা বড় কঠিন ব্যাপার। কবি এখানে কি যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ অনুভূতি ব্যতীত কথায় বুঝান যায় না। কবি কি উদ্দেশ্যে নোরাকে সংসার-ত্যাগিনী করিলেন, তাহা সহজে সাধারণকে বুঝান বড়ই সুকঠিন।

Helmer নোরাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিতেন, নোরাও হেল্‌মারকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিতেন। যুবক-যুবতীর অন্ধ রূপোন্মাদ নহে—পরিণত বয়সের প্রেম। সে প্রেম আবার তিনটি সন্তানের স্নেহপাশে বদ্ধ। যে নোরা অর্থ ঋণ করিয়া স্বামীকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন,সেই নোরা, সুধু স্বামী নয়, সন্তানদিগকেও কিছুকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন কেন? একমাত্র বিবেকের জন্যই নোরা বিবাগিণী হইলেন। নিজের আত্মার প্রতি তাঁহার একটা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগরিত হইল। সেই কর্ত্তব্যের তাড়নায়ই তিনি এতাদৃশ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

"To thine own self be true,
And it shall follow, as the night the day,
Thou canst not then be false to any man."

ইহাই নোরা বুঝিলেন এবং এই স্থানেই ইব্‌সেনের ব্যক্তিত্ববাদ সার্থক হইল। গোপীরা জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের জন্য পতি-পুত্র থাকিতে কেমন করিয়া কুলত্যাগিনী হইতে সক্ষম হইত? কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই নোরার জগৎপতি। ব্যক্তিত্ববাদই সেই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে।

ইব্‌সেন নোরা-চরিত্রে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, নারী কেবল খেলার পুতুল বা পুরুষের বিলাসের বস্তু নহে। তাই হেল্‌মার অবশেষে বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—

"A woman too, is intended to be a human being. Am I a human being? Have I not made a slave of her, who might have helped me to freedom?"

হেল্‌মার এবং নোরা সাধারণ-চক্ষে আদর্শ দম্পতী ছিলেন বটে ; নোরা এবং হেল্‌মারের ভিতরে যে বিচ্ছেদ হইতে পারে, ইহা সাধারণের চক্ষে আশ্চর্য্য বটে ; কারণ, পত্নীকে সুখী করিবার জন্য কিছুই তাঁহার অদেয় ছিল না। পত্নীর স্বাধীনতার হানি করিতেও হেল্‌মার ইচ্ছুক ছিলেন না। কল্পনা ও স্বপ্নের রাজ্যেই হেল্‌মার তাঁহার প্রিয়তমাকে বসাইয়াছিলেন, নয়নের পুত্তলী করিয়াছিলেন। কেবল একটী জিনিষ হইতে হেল্‌মার নোরাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন—তাহা সত্য। হেল্‌মার সর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন, কেবল দেন নাই—বিশ্বাস। হেল্‌মারের স্ত্রীকে গোপন করিবার কিছু না থাকিলেও নারী, বলিয়া তিনি নোরাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের দ্বার খুলিয়া দিতে পারেন নাই। মূলেই তাঁহার ভুল ছিল। এই ভুল হইতেই ইব্‌সেন দেখাইয়াছেন,নর-নারীর প্রণয়-ধর্ম্ম সার্থক হয় না। অনেকে, নোরা-চরিত্র ইব্‌সেনের একটা বাড়াবাড়ি (exaggeration of genius) বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যান। সে যাহা হউক, নোরা-চরিত্রে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসার জন্য ইব্‌সেনকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। ইব্‌সেন এই নাটকে বিশ্বাস এবং সত্যের মর্য্যাদা বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের মোহের বন্ধন ছিন্ন করাই ইব্‌সেনের লেখনীর সার্থকতা। তিনি সত্যের জন্য শক্তিমানের ন্যায় সহস্র মিথ্যার বিরুদ্ধে যে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কম সাহসের পরিচয় নহে।

নোরা ও হেল্‌মারের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। হেল্‌মার বলিয়াছিলেন—

"I have power to become another man"

নোরা উত্তর দিয়াছিলেন :—"Yes, when your doll is taken from you."

সাধারণের চক্ষে হেল্‌মার আদর্শ স্বামী হইলেও, প্রেমের যথার্থ নীতি কি, তাহা তিনি তিন ছেলের পিতা হইয়াও ধরিতে পারেন নাই। যথার্থ সহধর্ম্মিণীরূপে তিনি নোরাকে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—তিনি নোরাকে কৃপার পাত্রী মনে করিতেন,নিতান্ত অবলা ও পোষা পাখীর ন্যায় ভালবাসিতেন। নারী যে শান্তির প্রতিমূর্ত্তি, নারী যে জগদম্বার অংশ, নারী-জীবনের যে একটা সুগভীর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য-বোধ আছে, নারীর হৃদয়েও যে একটা অপোষ্য স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, ইহা হেল্‌মার তলাইয়া বুঝেন নাই। A doll's House নাম দিবার কারণও ঐ। হেল্‌মার নোরাকে dollই ভাবিতেন। নোরা হেল্‌মারের খেলার পুতুল ছিলেন বলিয়াই ত এই খেলাঘরের পরিণতি 'হরিষে-বিষাদ' হইয়াছিল। হেল্‌মাররূপী স্বামিগণের চৈতন্য সঞ্চার করিবার জন্যই ইব্‌সেনর এই নাটকের অবতারণা।

নোরা যখন স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তিনি তাঁহার স্বামীর ক্রীড়া-পুত্তলী ব্যতীত আর কিছুই ন'ন, তখন তিনি স্বামীকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—

Torvald, in that moment it struck me that I had

been living here, all these years, with a strange man and had borne him three children. Oh I cannot bear to think of it. I could tear myself to pieces.

তাহার পর নোরা, তাঁহার 'ব্যাগ' লইয়া রাত্রেই প্রস্থানোন্মতা হইলেন।

হেল্‌মার বলিলেন, "Nora, Nora, not now. Wait till to-morrow."

নোরা বলিলেন—I c nnot sr end the night in the house of a man, who is a stranger to me.

হেল্‌মার এতদিনের পর নোরার চক্ষে এক অচেনা পথিক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। নারীর ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্বের এমন পরাকাষ্ঠা আর কোন কবিই ইব্‌সেনের পূর্ব্বে দেখান নাই। আজকাল তাঁর নকল চলিতেছে বটে, এমন কি, বঙ্গদেশের সাহিত্যেও সে নকল দেখা দিয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালার ধেনোক্ষেতে আঙ্গুর ফলিবে কি?

নোরার চরিত্রে একটা আপোষ্য বন্য ভাব ছিল। তাঁহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ ও গঠিবার পরিবর্ত্তে ভাঙ্গিবার চেষ্টা ছিল। এই রূঢ়তাই নোরা-চরিত্রকে সাধারণ স্ত্রী-চরিত্র হইতে ভিন্ন এবং অপূর্ব্বভাবে গঠিত করিয়াছে। এক কথায়, নোরা সাধারণ রমণী ছিলেন না; অথচ নোরা আজ কালকার মত আদৌ উচ্চশিক্ষিতা, পরিমার্জ্জিতা ও হাব-ভাবশালিনী রমণী নহেন। নোরার ভিতর এক অসামান্য প্রতিভা ছিল; কিন্তু ছলনা ছিল না; এইজন্যই নোরা-চরিত্র আমার এত ভাল লাগিয়াছে।

ইব্‌সেন এই নাটকে ইহাই প্রতিপাদ্য করিতে চাহিয়াছেন যে, মানব স্ত্রীলোকের অবলা নামটি ত্যাগ করুক। মানব যতই স্ত্রীলোককে দুর্ব্বলতার আধার বলিয়া বিবেচনা করিবে, ততই সে অলক্ষ্যে স্ত্রী-জাতির চিন্তা-শক্তি ও কার্য্য-শক্তি হরণ করিতে থাকিবে। স্ত্রী-জাতির ভিতরের শক্তিকে জাগাইতে না পারিলে, মানবের প্রকৃত কল্যাণ আসিবে না। স্ত্রী-জাতির দুর্ব্বলতার জন্যই মানবের দুর্ব্বলতা, স্ত্রীজাতিকে পদে পদে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলেই মানবের দুর্দ্দশা। স্ত্রীজাতির দেহের স্বাধীনতা অপেক্ষা আত্মার স্বাধীনতা বাড়াইতে হইবে। প্রকৃত স্বাধীনতা ও প্রকৃত বিশ্বাস যতদিন না নর-নারীর মধ্যে স্থাপিত হইতেছে, ততদিন সংসারের দৈন্য ও হাহাকার ঘুচিবে না। স্ত্রীজাতির প্রতিভাকে ইব্‌সেন অন্বেষণ করিয়াছেন; এই নাটকে তিনি নারী-জীবনের আসল মূর্ত্তিটাকে দেখিয়াছেন। তাহাতে ছলা নাই, কলা নাই, অন্ধ রূপোন্মত্ততা নাই—আছে প্রেম, আছে কর্ত্তব্য, আছে প্রেমাস্পদকে বুঝিবার চেষ্টা।

ইব্‌সেন ব্যক্তিত্ববাদকেই হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতেন এবং সর্ব্বাগ্রে সেই ব্যক্তিত্ব তিনি নারীর ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; কারণ, মাতৃমূর্ত্তি যথার্থ নারীমূর্ত্তিতে ফুটিয়া না উঠিলে, মানব-শিশুর প্রকৃত বিকাশ ঘটিবে না। ইব্‌সেনের ধ্যান-কল্পিত সে মূর্ত্তি অপূর্ব্ব! ইব্‌সেন যেন নোরা-চরিত্রে প্রকৃত নারী-মূর্ত্তিকে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন! ইব্‌সেনের এই আবিষ্ক্রিয়া আজ সমগ্র নারী-জগতে এক অপূর্ব্ব স্পন্দন আনিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু দেখিতে হইবে যে, এই নারী-স্পন্দন বুঝিবার দোষে বিকৃত হইয়া না পড়ে—উদ্দাম স্রোতে ভাসিয়া না যায়; কারণ, নারী-জাতিকে ভুল করিয়া বুঝিলে, সেই ভ্রান্তি হইতে নারী-রূপ অমৃতই আবার গরল হইয়া দাঁড়াইতে পারে। নারী-জাতির প্রকৃত উন্নতিই বা কি এবং তাহার স্বাধীনতাই বা কি, তাহা আমাদিগকেও বুঝিতে হইবে এবং আমাদিগের নারী-জাতিকেও বুঝিতে হইবে। ইব্‌সেনের নোরা-চরিত্র-পাঠে যেন নারী স্বরূপকে ফিরিয়া পায়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমি পাঠকবর্গকে ইব্‌সেনের এই নাটকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

ইতিহাসের রমণীয়তা ও ইতিহাস-পাঠের উপকারিতা

ইতিহাস-পাঠে যেমন উপকারিতা লাভ করিতে পারা যায়, এমন উপকারিতা আর কোন পুস্তক-পাঠে হইতে পারে না। ইতিহাসে-বিবৃত পূর্ব্বাপর মানব-সমাজের কার্য্যাদির পর্য্যালোচনা-দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞান আর কোনও জাতীয় পুস্তক হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইতিহাসেই সকল তত্ত্বের সার নিহিত আছে। এক ইতিহাস-পাঠেই সকল শাস্ত্র-পাঠের কাজ হইয়া থাকে। কত দেশের, কত জাতির, কত ধর্ম্মের উত্থান, ক্রম-বিকাশ, ক্রমোন্নতি ও পতনের কাহিনীতে ইতিহাস পরিপূর্ণ। ভগবানের বিশ্ব-রাজ্যের কত অদ্ভুত, কত রমণীয় কাহিনীই না ইতিহাসে বিবৃত রহিয়াছে।

ইতিহাসে কত মনোমুগ্ধকর আখ্যানই না লিখিত রহিয়াছে। কত গৌরবময় রাজ্যের, কত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কালের কুটিল গতিতে পতন হইল, আবার কত সামান্য, নগণ্য ক্ষুদ্র দেশ ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর নিয়ন্তা হইয়া দাঁড়াইল। কত গৌরব-মণ্ডিত প্রাচীন জাতি, যাহারা একদিন জ্ঞান-গরিমায় সমৃদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়াছে, আজ তাহারা মূর্খ, অধঃপতিত বলিয়া গণ্য। আবার কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে যাহারা অসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য হইত, আজ তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। হায়, পৃথিবীতে কত শক্তিশালী জাতিরই না উদ্ভব হইয়াছিল! একদিন যাহাদের সিংহ-নাদে, যাহাদের অসির ঝনৎকারে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছে, আজ তাহারা পৃথিবী-পৃষ্ঠে দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী বলিয়া গণ্য। ভারত, মিশর, গ্রীস্, ক্যালডিয়া ও ব্যাবিলন একদিন পৃথিবীর শিক্ষা ও জ্ঞানের আকর ছিল। আজ সেই সকল গৌরবময় জাতি কোথায়? একমাত্র ভারত তাহার প্রাচীন সভ্যতার কতকগুলি নিদর্শন-পত্র লইয়া কোনক্রমে এখনও বর্ত্তমান আছে। অন্যান্য প্রাচীন জাতিগুলির চিত্র পর্য্যন্ত নাই। কালের দুরতিক্রম্য নিয়মানুসারে সময় হইতে সময়ান্তরে বহু বৈদেশিক অসভ্য জাতির আক্রমণে বা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভবে তাহারা তাহাদের প্রাচীনত্ব ও প্রাচীনত্বের নিদর্শন-পত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে। বৈদেশিকদিগের প্রভাব

এড়াইতে পারে নাই বলিয়া, বৈদেশিকদিগের রীতি-নীতি ও ধর্ম্ম হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই বলিয়া, প্রাচীন গ্রীস্, মিসর, পারস্য, কাল্‌ডিয়া ও ব্যাবিলনবাসীদিগের বংশধরদিগকে আজ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। প্রাচীনকালের সেই বাণিজ্যে-অদ্বিতীয় ফিনিসিয়া ও কার্থেজ আজ কোথায় গেল? একদিন যে রোমের বীরত্ব ও শৌর্য্য জগতের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল, সেই জগদ্‌বিশ্রুত, বিশ্ব-বিখ্যাত রোমক-সাম্রাজ্য আজ কোথায়? যে মুসলমানগণ একদিন বীরদর্পে পৃথিবীতে একেশ্বরবাদ প্রচার-কল্পে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, যাহারা অত্যল্পকালমধ্যেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু দেশ অধিকার করিয়াছিল, যাহাদের প্রবল প্রতাপে রোমক-সাম্রাজ্যও প্রবল স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল, সেই দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান আজ এত হীনবল কেন? আজ তাহাদের সে বল, সে তেজ কোথায় গেল? আজ য়ূরোপে কোনরূপে তাহারা আত্মরক্ষা করিতেছে মাত্র। সেই সমুদ্র-গর্ভোত্থিতা, সমুদ্র-মেখলা, আদ্রিয়াতিকের রাজ্ঞী, স্বপ্নসুন্দরী নগরী ভিনিসের আজ সে সুখ, সে সৌভাগ্য কোথায়? যে ভিনিস একদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্যের বাণিজ্যে কল্পনাতীত সমৃদ্ধি ও শক্তি লাভ করিয়াছিল, যে ভিনিসের বণিক্‌গণ একমাত্র বাণিজ্যের কল্যাণে ভূমধ্য-বক্ষে একদিন প্রভূত সম্পদ ও অসীম ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল, য়ুরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে সেই ভিনিসের স্থান আজ কোথায়?

যে স্পেন একদিন সৌভাগ্যে ও ক্ষমতায় য়ুরোপীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় হইয়াছিল, যে স্পেন অদ্ভুত অধ্যবসায় সহকারে আমেরিকায় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, যে স্পেনের নবাবিষ্কৃত, নববিজিত আমেরিকার সাম্রাজ্য হইতে রাশি রাশি সুবর্ণ ও রৌপ্য সংগৃহীত হইয়া অনতিকালমধ্যে য়ূরোপকে পৃথিবীর মধ্যে মহা-সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিল, সেই স্পেনের সে গৌরবময় সাম্রাজ্য আজ কোথায় গেল? আর সেই নির্ভীক স্পেনবাসীই বা আজ কোথায়? য়ূরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে স্পেনের স্থান আজ কত নিম্নে! যে পর্ত্তুগাল, যে হলণ্ড একদিন ভারতীয় বাণিজ্যে অদ্ভুত সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিত্র, যাহাদের ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া ফরাসী ও ইংরাজ বাণিজ্যার্থ ভারতে আগমন করিয়াছিল, সেই অমিততেজ দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজগণ আজ কোথায়? এইরূপ কত জাতির উত্থান ও পতন-কাহিনীর কি অদ্ভুত অদ্ভুত বিবরণই ইতিহাসে বিবৃত রহিয়াছে।

আবার ক্ষুদ্র জাতি ও ক্ষুদ্র দেশগুলি কিরূপে শৌর্য্যে-বীর্য্যে ও জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীতে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে, ইতিহাস তাহার কাহিনী গাঁথিয়া রাখিয়া মানব-সমাজকে কত শিক্ষা দান করিতেছে। ক্ষুদ্র ইংলণ্ড আজ কোন্ গুণে, কি আশ্চর্য্যজনক অধ্যবসায় ও যত্নে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে? দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে প্রুশিয়া নগণ্য ছিল। কোন্ মন্ত্রে অনুপ্রাণিত, কোন্ শক্তিতে উজ্জীবিত হইয়া সে আজ য়ুরোপে অদ্বিতীয় হইল? কোন্ গুণে সে য়ূরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে আজ শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতেছে? ক্ষুদ্র জাপান অত্যল্প সময়ের মধ্যে কি প্রকারে এতাদৃশী শক্তি লাভ করিল? কোন্ মন্ত্রবলে ক্ষুদ্রকায় জাপান অতিকায় চীন ও রুষ-ঋক্ষকে অবলীলাক্রমে পরাজিত করিল? কোন্ গুণে আজ সে প্রাচ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে? মুষ্টিমেয় সুইস্‌গণ কি অদ্ভুত বীরত্ব ও কৌশলে য়ূরোপে ভিন্ন ভিন্ন প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তির মধ্যে তাহাদের নিজেদের ক্ষুদ্র দেশটির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছে! ভারতে রাজপুতানায় ক্ষুদ্র এক জনপদ মেবার কি অপূর্ব্ব সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখাইয়া প্রবল পরাক্রান্ত মুসলমান-সাম্রাজ্যের সেনানায়কগণকে পরাজিত করিয়া নিজের অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। কোন্ শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষিজীবী শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়গণ ভারতে মুসলমান-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল? ইতিহাস জনসাধারণের শিক্ষার জন্য এইসকল বিস্ময়কর ও রমণীয় কাহিনী লিখিয়া রাখিয়াছে।

আবার ইতিহাসে উত্তর-আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণের কি অদ্ভুত কাহিনীই না লিখিত রহিয়াছে। যাহারা একদিন কেহ প্রাণভয়ে, কেহ প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ধর্ম্মমত-সংরক্ষণে, কেহ-বা কৃষিকার্য্যের দ্বারা লাভবান্ হইবার জন্য আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারা আজ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। কোন্ শক্তির বলে আজ তাহারা এমন হইল?

সেই অতিবৃদ্ধ, মহাস্থবির, 'জরদ্গব' চীন—যে এতদিন অথর্ব্ব অবস্থায়, অহিফেন-সেবনে, নিদ্রালস নয়নে উপবিষ্ট হইয়া কোনও-রূপে দিন গণনা করিয়া কাল কাটাইতেছিল—সেই চীন আজ হঠাৎ কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত ও কোন্ শক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞানলাভের জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে? আধুনিক ইতিহাসের ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও রমণীয় আখ্যান।

ইতিহাসে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনারই না সমাবেশ রহিয়াছে! এক একটী ঘটনা পাঠ ও আলোচনা করিতে বসিলে, তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। আহার-নিদ্রার কথা আর মনে থাকে না। রোমের সেই অদ্ভুত আখ্যান। রোমের সহিত কার্থেজের সংগ্রাম। হ্যানিবলের অদ্ভুত সমর-কৌশল ও কূট রাজনীতি। রোমের বিপদ, অবশেষে রোমের সেনা-নায়কগণের অদ্ভুত বীরত্ব ও কৌশলে রোমের বিজয়লাভ এবং কার্থেজের ধ্বংস। রোমের দিগ্বিজয়-কালে রোমের সেই পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ ও সেনা-নায়কগণের অদ্ভুত শৌর্য্য ও বীরত্বের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিতেছে। সিজার, সিপিও, এণ্টনী, অগষ্টস্, পম্পি প্রভৃতি রোমের সেনা-নায়কগণের কি অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনীই না ইতিহাসে বিবৃত রহিয়াছে। কালসহকারে গথ ও ভাণ্ডালগণকর্ত্তৃক রোমের ধ্বংস এবং প্রাচ্য বৈজন্তিয়ম্ নগরে পূর্ব্ব রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কি হৃদয়স্পর্শী ও আশ্চর্য্য ঘটনাই ইতিহাসে লিখিত রহিয়াছে।

মুসলমানগণের দিগ্বিজয়-কাহিনী কতই না অদ্ভুত! মহম্মদের নবপ্রচারিত ধর্ম্মের কি এক অদ্ভুত শক্তিতে বলীয়ান্ হইয়া মেষ ও উষ্ট্রপালক আরববাসিগণ এক দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে পরিণত হইল। মহম্মদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী খলিফাগণের আদেশে নবধর্ম্ম-দীপ্ত মুসলমানগণ নবধর্ম্ম-প্রচারে বদ্ধপরিকর হইল। খালেদ, আবু, ওবিদা, অমরু, মুশা, তারেক্ প্রভৃতি মোস্‌লেম সেনা-নায়কগণ কি অদ্ভুত বীরত্বসহকারে অত্যল্প সময়ের মধ্যে আরব, পারস্য, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিসর, সমস্ত উত্তর-আফ্‌রিকা ও স্পেন জয় করিয়াছিল। আবার স্পেনের পীরিনীস্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণ ফ্রান্স এবং এমন কি, অবশিষ্ট য়ুরোপ-জয়ে কৃতসঙ্কল্প হইল। ফ্রান্স অধিকারকালে মুসলমানগণ যদি চার্ল্‌স্-দি-মার্টেলের হস্তে পরাজিত না হইত, তাহা হইলে কে বলিতে পারে য়ূরোপের ইতিহাস আজ কোন্ আকার ধারণ

করিত? কালসহকারে মুসলমান-পরাক্রম খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইল। খৃষ্টানগণ ক্রমে ক্রমে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে স্পেন উদ্ধার করিয়া লইল। ইতঃপূর্ব্বেই মুসলমানদিগের মধ্যে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই মুসলমানের পতন-চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে অভাবনীয়ভাবে এক নূতন শক্তি মুসলমানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুসলমানকে আবার পুনরুজ্জীবিত করিল। তাতার ও তুর্কীস্থানবাসী দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানগণ আবার সারাসেন বা মুরগণের দুর্ব্বলতা দেখিয়া শতে শতে, সহস্রে সহস্রে আসিয়া মুসলমান-সাম্রাজ্য অধিকার করিল। বোগ্‌দাদ, ডামাস্কস্ প্রভৃতি ইতিহাস-বিশ্রুত মুসলমান-সাম্রাজ্যের নগরগুলি তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিল।

এই তাতার ও তুর্কিগণের পরাক্রমে পূর্ব্ব রোমক-সাম্রাজ্যের পতন হইল। মুসলমানগণ শতে শতে, সহস্রে সহস্রে, বস্ফোরস্ প্রণালী অতিক্রম করিয়া য়ূরোপে প্রবেশ করিল। পূর্ব্ব রোমক-সাম্রাজ্যের রাজধানী, সেই ইতিহাস-বিশ্রুত মহা সমৃদ্ধিশালী নগর, বৈজন্তিয়ম বা কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ মুসলমানের পদানত হইল। গ্রীকগণ বহু চেষ্টাসত্ত্বেও এই নগর রক্ষা করিতে পারিল না। অবিলম্বে কন্‌ষ্টান্টিনোপ্‌ল্ বা রুম্ সমস্ত মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হইল এবং অনতিকাল-মধ্যে গ্রীস্, আলবেনীয়া, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, হারজিগোভ্‌নিয়া, হঙ্গেরী, রুমানিয়া, রুমেলিয়া ও আধুনিক রুষ-সাম্রাজ্যের সমস্ত দক্ষিণ ভাগ মুসলমান-সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া গেল। কোনও কালে, কোনও জাতি মুসলমানের ন্যায় এত অধিক রাজ্য-বিস্তার করিতে পারে নাই। পূর্ব্বে চীন-সাম্রাজ্যের পশ্চিম প্রান্ত হইতে, পশ্চিমে আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর এবং উত্তরে রুষ-সাম্রাজ্যের প্রান্ত সীমা হইতে, দক্ষিণে আরব ও আফ্‌রিকার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রুমের বা কন্‌ষ্টান্টি-নোপ্‌লের পাতশাহ এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। য়ূরোপে মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইলে, দলে দলে লোক খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মুসল-মানের নামে য়ূরোপের পরাক্রান্ত খৃষ্টান্ সম্রাট্‌গণও কম্পান্বিত হইতেন।

মধ্য যুগে মুসলমানদিগের হস্ত হইতে খৃষ্টান্‌দিগের পুণ্যতীর্থ জেরুসালেম নগর উদ্ধার-কল্পে য়ূরোপের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ধর্ম্মপ্রাণ যুবকগণ বারবার প্যালেষ্টাইন্-প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়া-ছিল। এই ধর্ম্ম-যুদ্ধের (Crus de) কাহিনী অতি মনোরম। কি অদম্য উৎসাহে, কি অদ্ভুত অধ্যবসায়সহকারে খৃষ্টান্ জনপদের জনসাধারণ ও অভিজাতবর্গ নিজ নিজ প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, ইতিহাস সাদরে সেই অপূর্ব্ব কাহিনীকে তাহার পৃষ্ঠায় স্থান দিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য তাহারা কি অসমসাহসিক কার্য্যই না করিয়াছিল!

আবার য়ূরোপের ধর্ম্ম-সংস্কারের কি বিচিত্র আখ্যান-ই না ইতিহাসে বিবৃত রহিয়াছে। রোমান্-ক্যাথলিক্‌ধর্ম্মে কলুষিত আচার লক্ষিত হইলে লুথর, ক্যালভিন্ প্রমুখ ধর্ম্ম-প্রচারকগণ কি অদম্য সাহসের সহিত-ই না ক্যাথলিক ধর্ম্মের দুষ্ট আচরণসকল জনসাধারণের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল। তাহার ফলে য়ূরোপে এক ভীষণ কালানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল। য়ূরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ স্বাধীন-মতাবলম্বী, ধর্ম্মপ্রাণ নর-নারী অত্যাচারী ক্যাথলিকধর্ম্মের ধর্ম্ম-যাজকগণের ও ক্যাথ-লিক ধর্ম্মাবলম্বী রাজগণের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিল। য়ূরোপের সেই সেই ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস কতই না অদ্ভুত। এই বিবরণ পাঠ করিতে করিতে কখন বিস্মিত, কখন ভয়ে স্তব্ধ, কখনও-বা বীভৎস অত্যাচার-কাহিনীতে অভিভূত হইতে হয়। আবার কখনও-বা নবীন ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ধর্ম্মপ্রাণতা ও অদ্ভুত নিষ্ঠা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতে হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কলম্বস্‌কর্ত্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কার ও ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনবাসীকর্ত্তৃক নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় দেশের পর দেশ আবিষ্কার, সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-স্থাপন পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কর্টিজ্, পিজারো প্রভৃতি সেনা-নায়কদিগের অধীনে মুষ্টিমেয় স্পেনবাসী কর্ত্তৃক মেক্সিকো ও পেরু-জয় এক অতীব বিচিত্র ব্যাপার। কি অদম্য সাহস, কি অপরিসীম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার বলে মুষ্টিমেয় স্পেন-বাসী আমেরিকায় এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, ইতিহাস তাহা সাদরে লিখিয়া রাখিয়াছে। দেশ-আবিষ্কার ও দেশ-জয়ের ইতিহাস-বিষয়ক এই কাহিনী এক চমৎকার ব্যাপার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর-আমেরিকার ঔপনিবেশিক-গণ ইংরাজ-গভর্ণমেণ্টের অনুদার নীতির ফলে কি প্রকারে তাহা-দের উপনিবেশ-ভূমি ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া-ছিল, ইতিহাস-পাঠে তাহা এবং তাহার মনোহারিত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার জন্য প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটিশ-গভর্ণমেণ্ট আমেরিকায় পরাক্রান্ত সেনা-নায়ক ও দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ঔপনিবেশিকগণ অসীম সাহস ও অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ের সহিত ইংরাজ-সৈন্যের গতিরোধ করিয়া অবশেষে বিজয়লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। লর্ড নর্থের মূর্খতার ফলে আমেরিকার বিস্তৃত রাজ্য ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল। প্যাট্‌রিক্ হেন্‌রী, ওয়াশিংটন্, ফ্রাঙ্কলিন্, জন্ য়্যাডাম্‌স্, জেফ্রিসন প্রভৃতি দেশ-নায়কগণ যেরূপ ঐকান্তিকতার বলে অবশেষে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহা চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

আবার সর্ব্বোপরি বিস্ময়কর, সেই বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী-বিপ্লবের বিবরণ। ইতিহাসের ইহা একটি প্রধান ঘটনা। অভিজাত-সম্প্রদায়ের বহু শতাব্দীব্যাপী অত্যাচারে জনসাধারণ পীড়িত হইয়া আসিতে-ছিল। রুষো, ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি স্বাধীন-প্রকৃতি লেখকগণের লেখনী হইতে স্বাধীনতার বাণী প্রচারিত হইলে, ফ্রান্সের জন-সাধারণ স্বাধীনতার আস্বাদ পাইয়া স্বাধীনতালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। উদারচিত্ত, দুর্ব্বল-প্রকৃতি ষোড়শ লুইয়ের রাজত্ব-কালে এই বিপ্লবের বীজ অঙ্কুর হইতে ক্রমশঃ পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া এক মহাদ্রুমে পরিণত হইল। জনসাধারণ স্বাধীনতা ও ক্ষমতার আস্বাদ পাইয়া উত্তরোত্তর ক্ষমতা ও স্বাধীনতালাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাই হঠাৎ একদিন জনসাধারণ তাহাদের বহুদিনের দৌর্ব্বল্য পরিহার করিয়া উত্থিত হইল। তাহাদের সেই আকস্মিক উত্থানে দেশের সকল প্রাচীন অনুষ্ঠান বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। রাজা ও রাজ-পরিবারবর্গ কারারুদ্ধ হইল এবং দেশের অভিজাতবর্গ বিতাড়িত হইল অথবা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। রাজা ষোড়শ লুই ও রাজ্ঞী মেরী এণ্টোনিয়েট্ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া পিতৃপুরুষদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিলেন। দেশের অভিজাতবর্গ বহুকাল ধরিয়া যে পাপ করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের রক্তে বুঝি-বা

তাহা ধৌত হইয়া গেল। জনসাধারণই রাজকীয় শক্তি অধিকার করিল। দুর্দ্ধর্ষ, অমিততেজ ফরাসিগণ রাজতন্ত্রের স্বর্ণ-সিংহাসন চূর্ণ করিয়া ফ্রান্সে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার আসন-স্থাপনে প্রয়াসী হইলে, য়ূরোপের ভিন্ন ভিন্ন জনপদের অধীবাসিগণও ফ্রান্সের জনসাধারণের প্রবর্ত্তিত পথ-গ্রহণে উদ্যত হইল। য়ূরোপের রাজগণ স্ব স্ব সিংহাসন-রক্ষায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জনসাধারণের এই স্বাধীনতা-স্পৃহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্য য়ূরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ একযোগে লক্ষ লক্ষ সৈন্য লইয়া ফ্রান্স অবরোধ করিল। জনসাধারণের সেই মহাজাগরণের যুগে, প্রজাশক্তির সেই মহোল্লাসের দিনে, ফ্রান্সের এই দারুণ বিপদ উপস্থিত হইলে, স্বাধীনতার জন্মভূমি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরে একই দিনে সহস্র সহস্র লোক দেশরক্ষী সৈন্যদল-(National Guards) ভুক্ত হইয়াছিল। একই দিনে সমগ্র ফ্রান্সে লক্ষ লক্ষ লোক দেশ-রক্ষা-কল্পে দণ্ডায়মান হইল। তখন জন-সাধারণ দেশের কর্ত্তা। যথার্থ দলপতি কেহই ছিল না। অবশেষে ফ্রান্সের এই সকল দেশরক্ষী সৈন্যগণ য়ূরোপের সম্মিলিত রাজ-শক্তির সৈন্যদলকে বার বার পরাজিত করিয়াছিল। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে কেহ কৃষি, কেহ শিল্পকার্য্য বা অন্য কোন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, কালে তাহারাই পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমর-নিপুণ জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ডুমারিজ, হোচি, মোরোঁ প্রভৃতি দেশরক্ষী সেনা-নায়কদিগের সম্মুখে য়ূরোপের সম্মিলিত রাজশক্তির বিখ্যাত সেনাপতিগণও দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। বিপ্লবের এরূপ অত্যদ্ভুত আখ্যান ইতিহাসে যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্সের জনসাধারণ এইরূপে সর্ব্বত্র বিজয়লাভ করিলেও, দেশ কিন্তু অরাজকতায় ভরিয়া গিয়াছিল। এক এক রাজনৈতিক সম্প্রদায় এক এক বার রাজ-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া রাজকীয় শক্তি পরিচালনা করিতে লাগিল। আবার প্রতিদ্বন্দ্বি-দলের অভ্যুত্থানে তাহাদের ক্ষমতা লোপ পাইল; এমন কি, তাহাঁদের জীবন-লীলাও সাঙ্গ হইল। যখন দল প্রবল হইল; তখনই তাহারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বি-দলের দলপতিগণকে নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এইরূপে দেশ নর-রক্তে প্লাবিত হইল। এই ভীষণ অরাজকতা নিবারণ করিবার জন্য একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাই বোধ হয়, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উদ্ভব হইল। নেপোলিয়নও প্রথমে বিপ্লবের একজন সেনা-নায়ক ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজা ও সম্রাট্‌দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ফ্রান্সের অধিকার বিস্তৃত করিলে, জনসাধায়ণ তাঁহাকে ফ্রান্সের সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। দেশে যখন আর কোনরূপ গোলমালের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল না, তখন নেপোলিয়ন যে শক্তির দ্বারা বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন, পরদেশ-জয়ে সেই শক্তি নিয়োজিত করি-লেন। দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য নেপোলিয়নের অদ্ভুত যুদ্ধ-কৌশলে, ফ্রান্সের অধীন হইল। নেপোলিয়নের রাজত্বকালে ফ্রান্স অদ্ভুত শক্তি ও সামর্থ্য লাভ করিল। য়ূরোপের রাজগণ বার বার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও, নেপোলিয়ন বার বার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি নিজেই পরাজিত হইয়াছিলেন। এককালীন স্পেন-যুদ্ধ ও রুষ-অভিযানই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। বহু যুদ্ধে বিজয়লাভ করিলেও, ওয়াটার্‌লুর যুদ্ধে তাঁহার পতন হইল।

ফ্রান্সের সম্রাট্, আধুনিক য়ূরোপের প্রসিদ্ধ বীর, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এই অদ্ভুত উত্থান ও পতনের ইতিহাস অতীব বিস্ময়-কর। যতদিন ইতিহাস থাকিবে, ততদিন নেপোলিয়ন অমর— ততদিন নেপোলিয়নের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে শত শত পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ইমারসন্ নেপো-লিয়নের অদ্ভুত জীবনীকেই ফ্রান্সের, কেবল ফ্রান্সের কেন, তৎ-কালীন সমগ্র য়ূরোপের ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যিনি অসংখ্য লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং যিনি তাহাদের আদর্শরূপে বিরাজমান ছিলেন, তাঁহার জীবনীই তৎকালীন জনসাধারণের ও দেশের ইতিহাস। তাহার কারণ এই যে, জনসাধারণের শক্তি তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

ভারতের ইতিহাসেও এমনই কত বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের পৃথিবীময় বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচার ও সম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের অদ্ভুত ধর্ম্মনিষ্ঠা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের কাহিনীও অতি মনোরম। ভিন্‌সেণ্ট্ স্মিথ্ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই সমুদ্রগুপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলিয়া উল্লেখ করিছেন। ইঁহার রাজত্বকালে উত্তরে অক্‌সস্ নদী হইতে দক্ষিণে সিংহল এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র হইতে পশ্চিমে বহ্লীক্ পর্য্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য ও থানেশ্বরের অধীশ্বর সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের কাহিনী অতীব হৃদয়গ্রাহী। প্রাচীন ভারতের কয়েকটি ঐতিহাসিক কাহিনী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের চেষ্টায় উদ্ধৃত হইয়াছে; আবার এমন অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার সম্যক্ অনুসন্ধান ও আলোচনাই হয় নাই। নিষ্ঠুর কালের আবর্ত্তনে পড়িয়া কত গৌরবময় কাহিনী বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে! ভারতের মুসলমান-আক্রমণের পূর্ব্বতন ঘটনারও বিশেষ আলোচনা হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী ও জটিল। ফরাসী-বিপ্লবের কালের য়ূরোপীয় ইতিহাসও বোধ হয় এত জটিল নহে। একদিকে ধীরে ধীরে প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন, অন্যদিকে মহা-রাষ্ট্র ও শিখজাতির অভ্যুত্থান ও রাজ্যবিস্তার। একদিকে য়ূ-রোপীয় বণিক্ ফরাসী ও ইংরাজের ভারতে আধিপত্যের জন্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সংগ্রাম, অন্যদিকে মহারাষ্ট্রীয় বীরগণের ভারতে সাম্রাজ্য-স্থাপনের চেষ্টা। মহারাষ্ট্রীয়গণ সত্য সত্যই একদিন মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানী অধিকার করিয়া ভারতে হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু মানুষ একরূপ মনে করে, ভগবান্ তাহা অন্যরূপে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাই ভারতে হিন্দু-সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল না। মুসলমান-দিগের সহযোগিতায় আমেদ-শা-আব্‌দালি ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহা-রাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রাধান্যের আশাও লুপ্ত হইল।

জাতীয় জীবনে ইতিহাসের প্রভাব বিশেষ লক্ষিত হয়। যে জাতির ইতিহাস নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। ইতিহাসে-লিখিত পূর্ব্বপুরুষগণের দয়া, দাক্ষিণ্য, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি ভবিষ্য-বংশীয়দিগকে ঐ সকল গুণে গুণান্বিত করে। ইতিহাসে-লিখিত পূর্ব্বপুরুষগণের বীরত্ব ও শৌর্য্যের কাহিনী পরবর্ত্তীকালের জনসাধারণকে সাহসিক কার্য্যে অনুপ্রাণিত করে। অতি-বড় কাপুরুষও পূর্ব্বপুরুষদিগের বীরত্ব-কাহিনী পাঠ

করিয়া নিজের দৌর্ব্বল্য ও কাপুরুষতা পরিহার করিয়া স্ফীতবক্ষে বিপদের সম্মুখীন্ হয়। অতি-বড় স্বার্থপর ও পরছিদ্রান্বেষীও পূর্ব্বপুরুষগণের গুণ স্মরণ করিয়া ঐ সকল দোষ পরিহার করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকে।

আবার রাজ্যের অধিপতি ও জনসাধারণ যখন কোনও আকস্মিক ঘটনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের পরিচালন করে এই ইতিহাস। এইরূপ ঐতিহাসিক স্মৃতিই জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। ইতিহাসের অভাবে ভারতের জাতীয় জীবন ভিত্তিহীন। তাই ভারত যখনই শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত বা কোন বিপদে পতিত হইয়াছে, তখন সেইরূপ বিপদে একমাত্র পরামর্শদাতা ইতিহাস খুঁজিয়া পায় নাই। সে দারুণ বিপদে স্বার্থান্ধ ব্যক্তিবিশেষের পরামর্শে ভুলিয়া সে সব হারাইয়া বসিয়া আছে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমবাবুও ইতিহাসের অভাব-সম্বন্ধে উপরি-উক্ত কথা বলিয়া গিয়াছেন।

ভারতের পুরাণাদিতে দয়া-দাক্ষিণ্য, নিঃস্বার্থপরতা, ধর্ম্ম-প্রাণতা ও সত্যবাদিতার অনেক উপাখ্যান আছে। সেই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতবাসী ঐ সকল গুণ কতকাংশে লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইতিহাসের অভাবে ভারতের জাতীয় জীবন অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের অভাবেই ভারত বার-বার শত্রু-হস্তে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, "যে জাতির পূর্ব্ব-গৌরবের ইতিহাস আছে, তাহারা সেই গৌরব-রক্ষার চেষ্টা পায়। হারাইলে, পুনঃ-প্রাপ্তির চেষ্টা করে। ইতিহাস-অনুপ্রাণিত ইতালী ও গ্রীস অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে।......ক্রেসী ও আজিন-কোর্টের যুদ্ধ ও যুদ্ধের স্মৃতি ইংরাজদিগকে ব্লেনহিম ও ওয়াটারলুর যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করিয়া অনায়াসে জয়ী করিয়াছিল।"

স্বদেশের ইতিহাসের অভাবে বৈদেশিক ইতিহাস-পাঠ ও অনুসরণেও বিপদ হইতে উদ্ধার ও পরিত্রাণের উপায় ও পন্থা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়ের অনুকরণে রোমকগণ দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এক বিরাট্ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রাচীনকালের ফিনিসীয়া ও কার্থেজবাসীর বাণি-জ্যের অনুসরণে মধ্যযুগে ভিনিসীয়গণ এবং আধুনিক যুগে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি যূরোপীয় বণিক্গণ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া অদ্ভুত সমৃদ্ধি ও শক্তি লাভ করিয়াছিল। গ্রীসের থারমপাইলির যুদ্ধের অনুকরণে সুইস্গণ সুইজারলণ্ডের গিরিসঙ্কটে প্রবল পরাক্রান্ত অষ্ট্রীয়ার সমস্ত বল প্রতিহত করিয়া স্বাধীনতা-রক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেশোদ্ধার-কল্পে ইটালির ত্রাণ-কর্ত্তা গ্যারিবল্ডি, স্কট্লণ্ডের রবার্ট ব্রুশের নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ফ্রান্সের সেই মহা বিপ্লবের দিনে জনসাধারণ রোমের এবং ইংলণ্ডের বিপ্লবের ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিল। মহাবীর নেপোলিয়ন, যুদ্ধে হ্যানিবল ও সিজারের নীতি অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। রোমের ইতিহাস তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি তাঁহার নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রোমের ইতিহাসের দৃষ্টান্তের অনুসারে নির্দ্ধারিত করিতেন। যে সকল মহাত্মা পৃথিবীতে বীর, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া যশ ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না, সকলেই ইতিহাসের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা পৃথিবীতে অত মহৎ হইতে পারিয়াছিলেন।

ভারতের নিজের ইতিহাস কিছু ছিলনা। আবার রক্ষণশীল ভারতে পর-বিদ্বেষ-নিবন্ধন বৈদেশিক জাতির সহিত তাহার সংস্রব ছিল না। সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অন্য দেশে গমন করিতে নাই, ম্লেচ্ছের ভাষা শিখিতে নাই, ম্লেচ্ছের বিদ্যা গ্রহণ করিতে নাই, এই সকল অনুদার নীতির ফলে ভারত বৈদেশিক ইতিহাস হইতে কোনরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই।

ভারতের ইতিহাস ছিল না; তাই ভারতের আজ এত হীনা-বস্থা। আর যে সকল প্রাচীন জাতির ইতিহাস ছিল, তাহারা ইতিহাসের প্রভাবে অধঃপতিত অবস্থা হইতেও আবার উত্থিত হইয়াছে। রোমের গৌরব ও সমৃদ্ধির ইতিহাস ছিল বলিয়াই প্রাচীন রোমকগণের বংশধর ইতালীয়গণ, যূরোপের কয়েকটি রাজকীয় শক্তির সহায়তায় তাহাদের স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়া-ছিল। যূরোপের রাজগণও, সেই প্রাচীন রোমকদিগের বংশধর বলিয়াই ইতালীয়গণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা-দিগকে স্বাধীনতালাভে সাহায্য করিয়াছিল। ইতিহাস না থাকিলে ইতালীর দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। আর সেদিনকার হীনবল গ্রীস—এই গ্রীক্ জাতি, তাহাদের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের খাতিরেই আজ স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে। নিজেদের চেষ্টায় তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই বা পারিত না। ইংরাজপ্রমুখ যূরোপীয় রাজগণ গ্রীকজাতির সেই পুরাতন কীর্ত্তির কথা স্মরণ করিয়া তুর্কীর গ্রাস হইতে গ্রীসের কতকাংশ উদ্ধার করিয়া গ্রীকদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছিলেন। গ্রীক-জাতির ইতিহাস না থাকিলে, তাহারাও আজ ভারতের মত "যে তিমিরে সেই তিমিরে"ই থাকিত। ইতিহাসের প্রভাবেই গ্রীক-জাতি আজ প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পরে আবার শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বীরত্বে অনুপ্রাণিত। তাই আজ আবার তাহারা নিজেদের বীরত্ব দেখাইয়া য়ুরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে উপযুক্ত আসন-সংগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়াছে।

জাতীয় জীবনে তাই ইতিহাসের এত প্রয়োজন। ইতি-হাসের অভাবে প্রাচীন দেশের প্রাচীনত্বও থাকে না, গৌরবও থাকে না। ইতিহাসের অভাবে আজ ভারত, রোম ও গ্রীসের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি (পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও কাব্য-নাটকাদি) ছিল, তাই রক্ষা; তাহা না হইলে, যূরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতকে আজ জুলুদেশ বা লাপ্-লাণ্ডের পর্য্যায়ের শ্রেণীবদ্ধ করিতেন।

জাতীয় জীবনের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সাধারণ শিক্ষা-হিসাবে ইতিহাসের আলোচনায় যে শিক্ষা লাভ হয়,এমন আর কিছুতেই হয় না। তাই পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, যদি সাহিত্য পাঠ করিতে চাও, ইতিহাস পাঠ কর—সাহিত্য-পাঠের কাজ হইবে; যদি উপন্যাস পাঠ করিতে চাও, ইতিহাস পাঠ কর—উপন্যাস অপেক্ষা মনোরম আখ্যান ইতিহাসে পাইবে; যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিতে চাও, ইতিহাস পাঠ কর, উভয়েরই সারতত্ত্ব ইতিহাসে নিহিত আছে; যদি সমাজ-সংস্কারক হইতে চাও, ইতিহাস পাঠ কর—শত শত সমাজ-সংস্কারের বিবরণ ইতিহাসে বিবৃত আছে; যদি ধর্ম্ম-প্রচারক হইতে চাও—ইতিহাস পাঠ কর—ধর্ম্ম-প্রচার-কল্পে কিরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, শিক্ষা কর—পূর্ব্বতন প্রচারকগণ ধর্ম্ম-প্রচারে কি কি পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে পাইবে। এইরূপে নিজের ঈপ্সিত কার্য্যের সুবিধা ও সুযোগের, বাধা ও বিপত্তির অনেক সন্ধানই ইতিহাসে পাইবে।

যদি রাজনৈতিক হইতে চাও, ইতিহাসে-বিবৃত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের কারণ অনুসন্ধান কর; দেখিবে রাজনীতির গূঢ় তত্ত্ব, সার ধর্ম্ম ইহাতে নিহিত আছে। যদি শিক্ষা চাও, ইতিহাস পাঠ কর; যদি জ্ঞান চাও, ইতিহাসের আলোচনা কর; জ্ঞানের সার সত্য ইহাতে নিহিত আছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

হলাম নাক' মেয়ে

১

ওরে, আমি কেন হলাম নাক' রূপসী এক মেয়ে!
তবে, মনের মাঝে মন হারাতাম পুলকে গান গেয়ে।
সদা, এলিয়ে দিতাম পিঠের 'পরে কোকিল-কালো চুল,
আর, ঢল্ঢলে এই মুখখানি রে হত গোলাপ ফুল।

(সমস্বরে)

হায়গো বিধি, কান্না আসে, অশ্রু পড়ে বেয়ে,
বড্ড আশা ছিল কিন্তু কল্লে নাক' মেয়ে।
এমন কিনা ঠোঁটে-গালে গড়্লে উপবন!
দাড়ি এবং গোঁফের জ্বালায় হচ্ছি জ্বালাতন।

২

ভাই, মেয়ে হ'লে সত্যি রূপে ভুবন হ'ত আলো,
ওরে, মিষ্টি হ'ত মুখের কথা, গড়ন কতই ভালো!
আর, হ'তই হ'ত ডাগর আঁখি, কপালখানি ছোট,
তাতে, দেখ্তে যেন হ'তাম, ওহোঃ, ফ্রেমে বাঁধা ফোটো!
হায় গো বিধি, কান্না আসে, অশ্রু পড়ে বেয়ে—ইত্যাদি।

৩

ওই, মৃণাল-বাহুর আঙ্গুলগুলি হ'ত চাঁপার কলি,
আর, মধুর লোভে গালের উপর বস্ত এসে অলি।
কচি, হাতের চুড়ি দিনে-রেতে বাজ্ত রিণি-ঝিনি,
শুনে, কতই খুসী হতেন প্রাণের প্রিয় হতেন যিনি!
হায়গো বিধি, কান্না আসে, অশ্রু পড়ে বেয়ে—ইত্যাদি।

৪

রাঙ্গা, আল্তা-পরা পা'র পরশে ধন্য হত বাড়ী,
আর, পিছ্লে-পড়া দেহের রূপে হাস্ত সুনীল শাড়ী।
ওরে, সোণার মাক্ড়ি বর্ত্তে যেত দুল্তে পেলে কানে,
আর, এর বেশী কি বল্ব রে ভাই, কে না এসব জানে?
হায়গো বিধি, কান্না আসে, অশ্রু পড়ে বেয়ে—ইত্যাদি।

৬

আরে, মেয়ে যদি হতাম এত সইত কে ভাই তবে,
এমন, মুখের ওপর ক্ষুরের লাঙ্গল কে চালাত কবে?
কেবল, হলাম নাক'—হলাম না তা বিধির মস্ত ভুলে,
তাই, মনের দুঃখ চাপ্তে গেলাম, হৃদয় গেল খুলে।
হায় গো বিধি, কান্না আসে, অশ্রু পড়ে বেয়ে—ইত্যাদি।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

পরিচয়

(গল্প)

(১)

একটিমাত্র পুত্র হরিশের বিবাহের সময় পিতা রামরতনবাবু একেলে প্রথায় অর্থ ও দান-সামগ্রীর সুদীর্ঘ ফর্দ্দ তৈয়ারী করিলেন না বটে, কিন্তু রায়-বাহাদুর বৈবাহিককে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, আজই হউক আর কালই হউক, হরিশকে ডেপুটী করিয়া দিতে হইবে। রায়-বাহাদুর যোগেশবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তা আর বিশেষ ক'রে বলে দিতে হবে না বৈবাহিক মহাশয়! জামাতাটি বড় চাকুরে হলে ত আমার মেয়েরই সুখ। একটিমাত্র মেয়ে আমার।"

ভবিষ্যদ্দর্শী রামবাবু বলিলেন, "হা হা, তা ত বটে-ই। তবে ওর ছেলেবেলা থেকেই ডেপুটী হবার সখ্। (যেন এমন সখ্ আর কাহারও হয় না) আপনারও ত নরেশ আছে। নিজের ছেলে থাক্তে জামাতা—।"

যোগেশবাবু উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "জামাতা পরের ছেলে হলেও, নিজের ছেলের চাইতে বড় কম নয়। জানেন ত, আমি ওর 'ফাদার-ইন্-ল' (Father-in-law)। আর ডেপুটী করা, সে ত সাহেবদের কাছে আমার একটা মুখের কথা।—"

অপ্রতিভ রামবাবু মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে বলিলেন, "তা ত বটে-ই, তা ত বটে-ই। তবে কি জানেন, বুঝ্লেন কি না, আমরা যেন দেখে যেতে পারি। খেয়া ঘাটে এসে পৌছেচি আমরা, কখন্ নেয়ে এসে তলব কর্বে, কে জানে?"

রায়-বাহাদুর আবার একটু হাসিলেন, একটু কাসিলেন। রামবাবু নিশ্চিন্ত হইলেন। যোগেশবাবুর ক্ষমতা অসীম।

যথাসময়ে বিবাহ হইল; কিন্তু রামবাবু ও তাঁহার পত্নী পুত্রকে ডেপুটীর আসনে বসিতে দেখিয়া সাধ মিটাইয়া যাইতে পারিলেন না। বিবাহের দুইমাস পরেই তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিল।

সংসারে আর কেহ না থাকাতে হরিশ শ্বশুর-গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিল। শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর আদর-যত্নে, ও নবীনা পত্নীর অপর্য্যাপ্ত প্রেমে অল্পকালের ভিতরই সে পিতা-মাতার শোক ভুলিল।

শ্বশুরালয়ে দূর-সম্পর্কীয় শ্যালক-শ্যালিকাগণ, 'রাম না হইতেই রামায়ণে'র মত, ডেপুটী হইবার পূর্ব্ব হইতে হরিশকে ডেপুটী বলিয়া ডাকিতে সুরু করিল। রায়-বাহাদুর যে তাহাকে ডেপুটী করিয়া দিবেন,গ্রামের লোকেরাও তাহা শুনিয়াছিল। তখনকার দিনে ডেপুটী হওয়া কম সম্মানের কথা ছিল না (অবশ্য এখনও উক্ত পদের গৌরব কম নহে)। গ্রামে একব্যক্তি ডেপুটী হইলে, তাহার কথা চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে আলোচিত হইত। যে গ্রামে ডেপুটী বাস করিত, সেই গ্রামের নাম হইত ডেপুটীপাড়া বা ডেপুটীগঞ্জ, বাড়ীর নাম হইত ডেপুটী-বাড়ী, ব্যক্তির নাম হইত ডেপুটীবাবু বা হাকিমবাবু। ডেপুটীবাবু বলিলে, আশ-পাশের দশ-বিশ-খানি গ্রামের লোক অমনই চিনিত 'অমুক বাবু।'

হরিশ শ্বশুরালয়ে আসিয়া সকলের নিকট এত সম্মান ও

সমাদর লাভ করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইল। বৃদ্ধেরা সর্ব্বদা তাহার মাথায় স্নেহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত, যুবকেরা তাহাকে দেখিলে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিত, বালকেরা তাহার প্রতি ঈষৎ ভীতিমিশ্রিত বিস্ময় ও কৌতূহলের সহিত চাহিয়া থাকিত। কেহ তাহার সহিত দু-একটা কথা বলিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করিত। হরিশ সর্ব্বদা শুনিত, স্থানে স্থানে গ্রামের যুবকেরা তাহার সম্বন্ধে নিম্নস্বরে আলোচনা করিতেছে, "ইনি ডেপুটীবাবু, রায়-বাহাদুরের জামাতা। মস্তলোক ইনি, কলে লাট সাহেবও হতে পারেন।" * * *

এইসকল কারণে হরিশ মনে মনে বড়ই কৌতুক বোধ করিত—ক্রমে একটু একটু করিয়া তাহার মনে দেমাকও হইতে লাগিল। সে ডেপুটী হইবে, পরে হয় ত একটা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটও হইতে পারে,—সে কি যে সে লোক! সাধারণ লোক হইতে তাহার আসন কত উচ্চে! সাধারণ লোক ত তাহার করুণাপ্রার্থী, ক্রীড়নক!"

এমন কি, সে তাহার পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তি ও সহপাঠীদের সহিত বাক্যালাপ করাও ছাড়িয়া দিল; পূর্ব্বে যাহারা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল, এখন হইতে তাহাদের সহিত চিঠিপত্র-ব্যবহার বন্ধ করিল। ছিঃ, ডেপুটী সে, সে কি হেজিপেজি যার-তার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে, তাহাতে তাহার পদগৌরব খর্ব্ব হয় যে! মানুষের এমনই পরিবর্ত্তন ঘটে!

২

সেদিন রাত্রিবেলা হরিশ শয়ন-কক্ষে পালঙ্কের উপর একাকী শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল। সে সব ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। "ডেপুটী ত সে হইবেই,—ধর যেন হইয়াছেই! তখন চোগা-চাপ্‌কান পরিয়া এজ্‌লাসে বসিয়া বিচার করিবে,—একটুও হাসিতে পারিবে না। ওরে ব্যস্‌ রে! কত লোকের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা সে,—তাহার হাসিলে চলিবে কেন?—ভাবিতে ভাবিতে তাহার মুখ ক্রমশঃই গম্ভীর হইয়া উঠিল। আরব্যোপন্যাসে কাজির বিচারের কথা সে অনেক পড়িয়াছিল। স্থির করিল, এই সাহেবী যুগে ঐ পুরাতন ভাব আবার নূতন করিয়া গড়িয়া লইয়া বিচার করিবে,—তাহাতে সকলের তাক্ লাগিয়া যাইবে! হয় ত, ধর, দুজন স্ত্রীলোক আসিয়া একে অন্যের নামে নালিশ করিল, 'হুজুর, ও আমার ছেলে চুরি করিয়াছে।' দেখ কি বিষম সমস্যা! অন্য কেহ কি এমন জটিল ব্যাপারের সঠিক বিচার করিতে পারিবে?—অসম্ভব; কিন্তু আমি কি করিব জান?—এ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই-ত,—আমিও ভুলে গেছি যে! সর্ব্বনাশ! এজ্‌লাসে এমন ভুল হইলে ত কর্ম্ম ফতে! দাঁড়াও, আরব্যোপন্যাসটা এবার কণ্ঠস্থ করিতে হইবে।—"

হরিশ আপনমনে এইরূপ আলোচনা করিতেছিল, এমন সময় পত্নী সরসী এক ডিবা পান হাতে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। দ্বার বন্ধ করিয়া কপালে সসম্ভ্রমে হেঁট হইয়া হাত ছুঁয়াইয়া, কৌতুক-হাস্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া সে বলিল, "সেলাম মহাশয়! বসে বসে কি ভাব্‌ছিলেন?"

হরিশ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। পরমুহূর্ত্তে গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিল, "সাবধান, হুজুর বল্‌বে, নতুবা জরিমানা ৫০০০ রূপেয়া।"

সরসী কৃত্রিম বিনয় দেখাইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে হুজুর! কিন্তু জরিমানা আদায় কর্ব্বে কে?"

গম্ভীরভাবে হরিশ বলিল; "চাপরাসী।"

"পার্‌বে না।"

"কেন?"

"তাড়িয়ে দোব।"

"তবে আমি স্বয়ং।"

সরসী কৃত্রিম ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "ঈস্।"

"কি, ডেপুটীকে অপমান!"—হাকিম এজলাস হইতে নামিয়া আসিয়া আসামীকে বাহুডোরে বদ্ধ করিয়া—জরিমানা আদায় করিল। উভয়ে হাসিয়া ফেলিল। সরসী হাসিতে হাসিতে বলিল, "ডেপুটী হয়ে বুঝি এমনই ভাবে আসামীর কাছ থেকে জরিমানা আদায় কর্‌বে? একি কাজির বিচার নাকি গো?"

হরিশ তাহার জমাট অন্ধকারের মত এলান' কেশদামে একটি দোল দিয়া বলিল, "যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।" তারপর তাহাদের অন্যান্য কথা আরম্ভ হইল।

নবীন যুবক-যুবতী,—প্রাণ প্রেমে ডগমগ,—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারের মত ইহাদের প্রেমালাপের অফুরান্ত ভাণ্ডার,—যুগ-যুগান্তরের আলাপেও সে ভাণ্ডার শূন্য হয় না।

৩

পরদিন দ্বিপ্রহরে হরিশ পালঙ্কে শুইয়া পান চিবাইতেছিল; সরসী পার্শ্বে বসিয়া মখমলের উপর রেশমের কাজ তুলিতেছিল। হরিশ একদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। সরসী কাজ করিতে করিতে মুখ তুলিয়া দেখিল, স্বামী তাহাকেই দেখিতেছে। লজ্জিত হইয়া বলিল, "কি দেখা হচ্চে?"

হরিশ হাসিয়া বলিল, "তোমাকে।"

"পুরাণ'তে এখন' মন মজে না কি?"

"এ পুরাণ' হয় না, যত দেখি ততই দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়,—যেমন পূর্ণিমার চাঁদ।"

"যেমন জুতো,—ছিঁড়ে গেলেই লোকে ফেলে দেয়।"

হরিশ পত্নীর রাঙ্গা গালে আল্‌তভাবে একটি টোকা মারিয়া বলিল, "স্ত্রী কি জুতো?"

"প্রায় সেই রকমই। জুতো ছিঁড়ে গেলে লোকে নূতন কিনে নেয়,—তেমনই আজ স্ত্রী মরে গেলে, কালই পুরুষেরা আবার বিয়ে ক'রে বসে। পৃথিবীর এই ত ধারা! কি বল,—তুমিও তাই কর্‌বে?"

হরিশের অভিমান হইল,—স্ত্রী তাহাকে এত নীচ মনে করে! স্ত্রীকে সে বড়ই ভালবাসিত—(কে না বাসে?); কিন্তু এরূপ অদ্ভুত কল্পনাও ত সে করিতে পারে না। হায়, সরসী এমন কল্পনাও মনে স্থান দেয়! সে ধীর-কম্পিতস্বরে বহুপুরাতন সেই কথাই আবার নূতন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সরু, তুমি সত্যি করে বল ত,—সব চেয়ে কাকে বেশী ভালবাস?"

সরসী এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিল; কিন্তু সে স্বামীকে রাগাইতে ভালবাসিত। তাহার সামান্য কথায় হরিশ অভিমান করিত, পরে সেই অভিমান ভাঙ্গিতে তাহাকেই বেগ পাইতে হইত,—তবুও সে তাহাকে রাগাইত। বিনা কারণে স্বামীর এরূপ অভিমানে সে বড়ই কৌতুক বোধ করিত। এই অভিমানের ভিতর, তাহার প্রতি স্বামীর অগাধ ভালবাসার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িত,—তাহাতে সরসীর প্রাণে কেমন একটু আনন্দ ও গর্ব্ব জাগিয়া উঠিত। স্বামীর এই অগাধ প্রেমের কথা শুনিবার জন্যই সে এইরূপ করিত; কিন্তু অন্ধ হরিশ ভাবিত অন্যরূপ।

সরসী বলিল "মাকে, বাবাকে।—"

হরিশের অভিমান বাড়িল।—তাহার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীতে সে যেমন পত্নীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, পত্নীও তেমনই কেবল তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। এই প্রেম অগাধ, অতলস্পর্শী,—এ প্রেমের আর সরিক নাই। অভিমান-ক্ষুব্ধস্বরে সে বলিল "তা-র-প-র? দুষ্ট সরসী বলিল "দাদাকে,—"

"তার-প-র?—" হরিশের স্বর কাঁপিতেছিল।

বহুকষ্টে হাসি চাপিয়া সরসী একনিঃশ্বাসে বলিল, "বৌদিদি, খুকুরাণী, মেনু (পোষা বিড়ালের নাম),—তারপর তোমাকে।"

হরিশ পরিহাস বুঝিল না; মর্ম্মাহত হইয়া বলিল, "আমায় এত কম ভালবাস?" সম্ভবরকম গম্ভীর হইয়া সরসী বলিল, "রাগ ক'র' না—সত্যি কথা বল্‌চি—তোমার ভালবাসা নিঃস্বার্থ ভালবাসা নয়। আজ যদি আমি মরি, কালই ফের তুমি বিয়ে করে বস্‌বে।—আমায় ভুলে ত যাবেই, হয় ত নতুন স্ত্রীর কাছে আমার কত নিন্দা-কুৎসাও কর্‌বে। বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই যদি আমি রোগে কুৎসিত বা পঙ্গু হই, তুমি আর ফিরে চাবে না। যদি কোন গুরুতর অপরাধ করি, তুমি ইহজীবনে আর ক্ষমা কর্‌বে না; কিন্তু ওঁরা জীবনে-মরণে সকল সময়ই আমায় মনে রাখ্‌বেন, পঙ্কে বা চন্দনে যেখানে থাকি, সমানভাবে কোলে তুলে নেবেন; কিন্তু তুমি——একি! তুমি কাঁদচ? না, না, আর এসব বিদ্‌কুটে প্রশ্ন ক'র' না। সত্যি কথা বল্‌লে তুমি রাগ কর?"

বাস্তবিকই হরিশ কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। বেচারা পত্নীকে বড় বেশী ভালবাসিত।

সরসী নানা উপায়ে স্বামীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু হরিশ তাহা বুঝিল কি না, জানি না।

সরসী আপনাকে স্বামিপ্রেমে ভাগ্যবতী মনে করিয়া মনে মনে বড় গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

(৪)

জুন মাসের প্রারম্ভে রায়-বাহাদুর বড় বড় সাহেব-সুবার দরবারে আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। এই বৎসর নরেশ বি,এ এবং হরিশ এম,এ পাশ করিয়াছিল। নরেশ ধনিপুত্র,—আবাল্য পিতা-মাতা ও পরিজনবর্গের আদরে বর্দ্ধিত;—কাজেই প্রত্যেক পরীক্ষা দু-তিনবার করিয়া পরিপাটিরূপে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পঁচিশবৎসর বয়সে বি, এ পাশ করিল। হরিশ গরীবের ছেলে,—বাল্যকালে মা-বাপের অত্যধিক আদরে বিগড়াইয়া যায় নাই। সে সসম্মানে একুশ বৎসর বয়সে এম্, এ পাশ করিল।

রায়-বাহাদুর কমিশনার সাহেবের সহিত দেখা করিয়া শুনিলেন, তিনি ছুটি লইয়া বিলাত যাইতেছেন। তাঁহার স্থানে যিনি আসিবেন, তাঁহার কাছে রায়-বাহাদুরের পরিচয়জ্ঞাপক চিঠি দিয়া যাইবেন। নিয়োগ-সম্বন্ধে তাঁহার কোনও হাত নাই।

যিনি আসিলেন, তিনি রায়-বাহাদুরের পরিচয় জানিয়া বিশেষ খাতির করিলেন; কিন্তু বলিলেন, এ বৎসর একজনকে মাত্র নিযুক্ত করিতে পারেন।

রায়-বাহাদুর ক্ষুণ্ণমনে গৃহে ফিরিলেন। এতদিন তাঁহার অসীম ক্ষমতা ছিল, সাহেবরা তাঁহার কথা ফেলিতে পারিতেন না; কিন্তু এখন পূর্ব্বকার বন্ধুদের ভিতর অনেকেই 'পেন্সন' লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। নবাগত ছোক্‌রারা আর তেমন খাতির করিতে চাহে না।

তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া পত্নীকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। পত্নীও মহা সমস্যায় পড়িলেন;—ছেলে ও জামাই কেহই ত কম নহে। এখন কাহার জন্য সাহেবকে অনুরোধ করা যায়? নরেশের এই চব্বিশ বৎসর পার হইতে চলিয়াছে, সে কি এক বৎসর অপেক্ষা করিতে স্বীকৃত হইবে? না হওয়ার ত কোনও কারণ নাই;—কিন্তু যদি না স্বীকৃত হয়? পরের ছেলে, কি জানি কোন্ ছুতায় বাঁকিয়া বসিবে,—মেয়েটাকে যে ওরই হাতে সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছে!

অবশেষে উভয়ে স্থির করিলেন,—সরসী বুদ্ধিমতী, সে হরিশকে বুঝাইয়া স্থির করিবে। এবার নরেশকেই ডেপুটি করা হইবে। পিতার ডাকে সরসী আসিল,—তাঁহারা তাহাকে আপনাদের সমস্যার কথা সমস্ত বলিলেন। সে চাবি নাড়িয়া মাতার গায়ে গা ঘেঁসিয়া, নখ খুঁটিয়া বলিল, "তবে দাদাকে দাও। ওর ত বয়স আছে,—একবছর আগে-পরে কাজ পেলে কিছু আসে-যাবে না; আমি ওকে সব বুঝিয়ে বল্‌ব এখন।" বাপ-মা নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাত্রি-কালে সরসী স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া আপনার ফুলের মত হাতখানি তাহার পায়ে বুলাইয়া দিতে দিতে কোমল স্বরে বলিল, "বাবা সাহেবের কাছে গিয়াছিলেন।" হরিশ চক্ষু বুজিয়া প্রেমময়ী পত্নীর পরিচর্য্যাটা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিতেছিল, চক্ষু মেলিয়া আগ্রহের সহিত বলিল, "সাহেব কি বল্লেন?"

"সাহেব বল্লেন, এবছর কেবল একজনকে কাজ দিতে পার্ব্বেন; কিন্তু বাবা ত তোমার ও দাদার দুজনের জন্যই গিয়াছিলেন, তিনি—"

হরিশ ব্যগ্রভাবে বলিল, "তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা বলেচেন? আমার বাবার কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সরসীর মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "কিন্তু বাবা ও মা আমার উপর ভার দিয়েছে। আমি—"

হরিশ উৎসাহের সহিত পালঙ্কের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "তুমি ত আমার কথাই বলেচ? তা হলে এবছরই আমি ডেপুটী হব—!"

একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সরসী অধীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আমি দাদার কথা বলেচি।"

"অ্যাঁ"—হরিশ উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিল।

ভীতা সরসী বলিল,—"শোন সমস্ত কথাটা আগে। দাদার এই পঁচিশ বৎসর বয়স। তিনি এবার যদি কাজ না পান, তা হলে এ জীবনে আর পাবেন না; কিন্তু তোমার এখন দু'-তিন বছর হাতে আছে। আস্‌চে বছরই তুমি কাজ পাবে,—তাতে কোনও বাধা নেই। এক বছর অপেক্ষা কল্লে তোমার কোন ক্ষতি নেই, অথচ দাদার কতটা উপকার হয়। এমন উপকার নেহাৎ পরের জন্যেও পরে করে। আমাদের কি এতটা স্বার্থান্ধ হওয়া উচিত? তাতে লোকে কি বল্‌বে, আর মা, বাবা, দাদার মনটাই বা কি রকম হবে? এখন বুঝেচ ত? বল, তুমি রাগ করনি?"

বিশেষ কথাগুলি হরিশের কাণে পৌঁছিল না। সে চক্ষু বুজিয়া অসাড়ের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর দারুণ অভিমান-বহ্নি জ্বলিতে লাগিল। অভিমানে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইল। সরসী তাহা জানিল না। সে বুঝিল, "স্বামী অবুঝ নহেন, সকলই বুঝিয়াছেন। তবে এ বছরেই কাজ পাবেন আশায় ছিলেন, তাই হয় ত একটু—তা কারুর কারুর অমন হয়। সকলেরই ত আর তেমন মনের বল নেই। সে যা হউক দুদিন

বাদেই সব সেরে যাবে।" সে মা-বাবাকে এই সুসংবাদ জানাইল।

যথাসময়ে নরেশ ডেপুটী হইল। হরিশ একটা মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, "হায়, এই ত প্রেমময়ী পত্নীর উপযুক্ত কার্য্য! এই ত তাহার ভালবাসা!"

পূর্ব্বকার কথাগুলি তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া রহিয়াছিল, আজিকার এই ঘটনা সেই অনলে আহুতিপ্রদান করিল;—হরিশের ধূমায়মান অভিমান-বহ্নি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এই পৃথিবীতে তাহার কেহই নাই। অভিমানে অন্ধ হইয়া সে পত্নীর পূর্ব্ব-পরিহাস বুঝিতে পারে নাই, এক্ষণে পত্নীর এই কার্য্য সুতীক্ষ্ণ সূচের মত তাহার হৃদয়টার ভিতর খোঁচা দিতে লাগিল। হায়, পৃথিবীতে প্রেমের প্রতিদান নাই! যাহাকে সে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসে, সেই পত্নীরও তাহার উপর এতটুকু মমতা নাই! শেষটা, যেদিন নরেশ, ডেপুটী হইয়াছে বলিয়া বাড়ীতে এক বৃহৎ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল, সেইদিন হরিশ চুপি চুপি শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

বাড়ীর সকলে বিস্মিত হইল। সরসী স্বামীর অন্তর্দ্ধানের কারণ একটু একটু বুঝিতে পারিয়া আকুলভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল।

যোগেশবাবু নানাদিকে খোঁজ করিতে লাগিলেন।

(৫)

কলিকাতায় পাঁচুধোবার গলিতে একটা স্যাঁৎসেতে খোলার ঘরের ভিতর একটা মলিন:চাদরের উপর শীর্ণকায়, শোণিতহীন এক যুবক পড়িয়াছিল। যুবক অর্দ্ধ-অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রোগের যাতনায় এক একবার মুখ বিকৃত করিতেছিল:ও পিপাসায় মুখব্যাদান করিতেছিল; কিন্তু তার শুষ্ক কণ্ঠে: এক ফোঁটা জল দিবার মত লোকও সেখানে কেহ ছিল না। এই যুবকই হরিশ। অভিমানভরে সে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। এম্, এ পাশ সে, ইচ্ছা করিলে ভাল কাজ পাইতে পারিত; কিন্তু কলের ভিতরের 'স্প্রিং' ভাঙ্গিয়া গেলে যেমন তাহা আর কোন কাজে লাগে না, ভগ্নহৃদয় হরিশেরও তেমনই উৎসাহ-উদ্যমে-ভরা বুকখানা দারুণ অভিমানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কোনওরূপ কাজ লইতে তাহার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইল না। সে একটি খোলার ঘর ভাড়া নিয়া পুঁজি টাকা ক'টিতে দিন কাটাইতে লাগিল। তখন শীত পড়িয়াছিল,—গরম কাপড়ের অভাবে ও স্যাঁতসেঁতে খোলার ঘরে থাকার দরুণ সে জ্বরে আক্রান্ত হইল। চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে ক্রমেই রোগ মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ীওয়ালা ভাড়ার তাগাদায় আসিয়া ভাড়াটীয়ার অবস্থা দেখিল। বাড়ীতে ভাড়াটীয়া মরিলে বাড়ীটার একটা দুর্নাম হইবে, এই ভয়ে সে হরিশকে অন্যস্থানে চলিয়া যাইতে বলিল; এমন কি, বাড়ীভাড়া দেড়টাকার ভিতর ক'গণ্ডা পয়সা ছাড়িয়া দিবে, এমন ভরসা পর্য্যন্ত প্রদান করিল; কিন্তু হরিশের তখন নড়িবার শক্তি ছিল না। তখন ধর্ম্মভীরু বাড়ীওয়ালা হরিশের পকেট 'খানা-তল্লাসী' করিয়া প্রথমে আপনার ভাড়া আদায় করিল এবং তাহার পর জামার পকেটে হরিশের :শ্বশুরের ঠিকানা ও নামাঙ্কিত একখানা কাগজ দেখিতে পাইয়া, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আসিয়া ভাড়া চুকাইয়া রোগী লইয়া যাইবার জন্য পত্র লিখিল। রায়-বাহাদুর এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র কন্যা ও লোকজন সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়িলেন।

তিনি অবিলম্বে জামাতাকে ভাল বাড়ীতে লইয়া গেলেন্। ভাল ডাক্তারের চিকিৎসায় ও সরসীর অক্লান্ত সেবা-সুশ্রূষায় হরিশ ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সরসী স্বামীর গৃহত্যাগের কারণ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়া মরমে মরিয়াছিল, তাহার উপর এখন স্বামীর অবস্থা দেখিয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল! হায়, কেন সে স্বামীকে সর্ব্বদা পরিহাস করিত! স্বামী, ইহ-পরলোকের দেবতা, তাহার সহিত পরিহাস! নারীর ইহা অপেক্ষা অধিক ধৃষ্টতা আর কি আছে! স্বামী ঐরূপ পরিহাসে সন্তপ্ত হন জানিয়াও কেন তাহার ওরূপ দুর্ম্মতি হইয়াছিল!

সরসী কাঁদিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে লাগিল এবং স্বামীর মঙ্গল-কামনায় সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল।

(৬)

ক্রমাগত রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ক্লান্ত হইয়া সেদিন ভোররাত্রে সরসী স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তখনও অন্ধকার ভাল করিয়া সরিয়া যায় নাই। পূর্ব্বাকাশে বিধবার হাসির মত একটা ম্লান আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। চারিদিক্ কুয়াশার জালে ঢাকা, গাছের পাতা হইতে মুক্তার মত শিশির-কণাগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া নীচের ঘাসের নীল মখমলের বিছানা ভিজাইয়া দিতেছিল।

সহসা হরিশ জাগিয়া উঠিল। পদতলে কাহার নরম হাতের মধুর স্পর্শ পাইয়া সে উঠিয়া বসিয়া দেখিল,—সেবাক্লান্তা পত্নী তাহার দুইপদ আপনার বুকের উপরে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমাইয়া আছে। প্রফুল্ল পদ্মকলিকার মত নয়নদুটি মুদিত, অধর-প্রান্তে তৃপ্তির বিমল রেখা প্রতিভাত, সরলতামাখা মুখখানি ভোরের পাণ্ডুর কিরণে অভিরাম। হরিশ মুগ্ধ হইল। জীবনে সময়ে সময়ে এমন একটা শুভ মুহূর্ত্ত আসে, যখন দুটি প্রাণীর ভিতরে ক্ষণিক মিলন এমন মধুর হয় যে, সারাজীবনের বহুকাল-স্থায়ী মিলনও সেই একটি মুহূর্ত্তের সাক্ষাতের মত মধুময় হয় না। আজ হরিশেরও সেই শুভ মুহূর্ত্তটি আসিয়াছিল। আজ সে পত্নীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, আজ তাহার মনে এক অজানা ভাব জাগিল। এতদিন তাহার পত্নীর প্রতি ভালবাসার সহিত কেমন একটা স্বার্থের সম্বন্ধ ছিল। পত্নী অন্যের সহিত আলাপ করিলে অন্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইলে, অভিমানে, দুঃখে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিত; আজ কিন্তু সে স্পষ্টই বুঝিল যে, ভালবাসা বাহিরের কিছু নহে, ইহা অন্তরের জিনিস। আজ পত্নীর মুখচ্ছবিতে দর্পণের মত তাহার হৃদয়ের ভাব প্রতিভাত দেখিল। আজ দেখিতে পাইল, পত্নীর সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া কেবল তাহারই আসন, তাহারই জন্য পূজার ভক্তি-প্রীতিপূর্ণ পুষ্পসম্ভার।…… হায়, এমন পত্নীর উপরও সে অভিমান করিয়াছিল! ছিঃ!

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে সহসা দুটি 'পদ্মকোরক' আপনা-আপনি খুলিয়া গেল। সরসী চক্ষু মেলিয়া দেখিল, স্বামী নিষ্পলকনেত্রে তাহাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন। যে বেদনারাশি এতদিন তাহার হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়া ছিল, আজ তাহা তরল হইয়া গেল; অশ্রু হইয়া সে বেদনা তাহার দুই গণ্ড ছাপাইয়া ঝরিতে লাগিল। সে ধীরে ধীরে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "না বুঝে তোমার প্রাণে কত কষ্ট দিয়াছি, ওগো, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

হরিশ পত্নীকে বুকে তুলিয়া লইল, তাহার জীবনে আজ এক

যুগান্তর উপস্থিত। এত আনন্দ সে জীবনে আর কখনও পায় নাই। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "কেঁদ না সরসী, অভিমানে অন্ধ হয়ে তোমার ঐ সুধার সমুদ্র হৃদয়টি চিন্‌তে পারি নাই, আজ বুঝি ওখানে রত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি—এ রত্নকে আর কি অবহেলা কর্‌তে পারি?" অজস্র হর্ষ ও অশ্রুধারার ভিতরে আবার তাহাদের মিলন হইয়া গেল।

পরবৎসর অক্টোবর মাসে হরিশ, সত্য সত্যই ডেপুটীর উচ্চাসনে চড়িয়া বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিল।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

সাধনার মূল্য

বক্ষে তোমায় পাওয়া প্রভু হয় ত সুখের হবে,
বড়ই সুখের পাওয়ার লাগি' পূজার আয়োজন;
তোমার প্রসাদবরের পরশ মধুর কহে সবে,
বড়ই মধুর—তাহার লাগি তপের আচরণ।
তোমায় প্রভু বক্ষে পাওয়া গর্ব্ব করার কথা,
পাওয়ার আগে গর্ব্ব আরো—গর্ব্ব নিরাপদ;
আজ্‌কে তুমি ক্ষমহ দীনের সাহস আকুলতা,
তখন পাব যোগ্য কোথা অর্ঘ্য, পরিচ্ছদ?
পাখীর সকল কূজন যদি শঙ্খ বুকে বাঁধে,
ফুল-বাগানের হাস্য লভে বেদীর অটলতা,
তখন সে যে নিত্য-সেবার নিত্য-অপরাধে
ভয়-গৃহিণীর পায়ে হবে ভক্তি-বধূ হতা।
একি প্রভু কম করুণা—কোথায় মিলিয়াছে?
অধিকারী করেছ যে তোমায় পূজিবার?
ভক্তি হতে ভক্তজনের কাম্য কিবা আছে?
পূজা হতে আবার কিবা পূজার পুরস্কার?
হারাব যে বক্ষে পেয়ে; যদিই পড়ে খসি,
বাহুর বাঁধন অবহেলায় প্রেমের ঘনতার;
সূর্য্যপাশে অর্ঘ্য রচি ঘুর্‌ছে ধরা শশী—
সৌরপুরে বাঁধন অটুট্ অন্য কিবা আর?

শ্রীকালিদাস রায়

কুমায়ূনে কয়েকদিন

ভারতের উত্তর প্রান্তে দৈর্ঘ্যে অন্যূন ৭৫০ এবং প্রস্থে ৭৫ হইতে ১০০ ক্রোশব্যাপী নগাধিরাজ হিমালয়ের নানা স্থান নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে পশ্চিমে গড়ওয়াল এবং পূর্ব্বে ভোট-রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূখণ্ড সাধারণতঃ কুমায়ূন নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের সর্ব্ব-প্রসিদ্ধ স্থান নৈনিতাল। ইহা আগ্রা, অযোধ্যা ও যুক্ত-প্রদেশের ছোটলাটের গ্রীষ্মাবাস; সুতরাং বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে কার্য্যানুরোধে নৈনিতাল যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে মোগলসরাই; মোগলসরাই হইতে বেরিলি; বেরিলি হইতে কাঠগুদাম; কাঠগুদাম হইতে টোঙ্গা যোগে নৈনিতাল রুয়ারী এবং অবশেষে রুয়ারী হইতে ডাণ্ডীতে, অশ্বপৃষ্ঠে অথবা পদব্রজে নৈনিতাল—এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী পরিব্রাজক বঙ্গদেশ হইতে নৈনিতালে গিয়া উপনীত হন। ভ্রমণের প্রথম দুইটি স্তর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তৃতীয় স্তরের কিয়দংশ অতিক্রম করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, এমন একটি দেশ আসিতেছে, যাহা বাঙ্গালা অথবা যুক্ত-প্রদেশের বিশাল, কর্ষিত সমতল-ক্ষেত্র-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; রোহিলখণ্ড-কুমায়ূন রেলের কয়েকটি ষ্টেশন পার হইলেই তরাই নামক অঞ্চল নয়নগোচর হয়। চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধশুষ্ক ঘাসের জঙ্গল; কোন স্থানে দুই-চারিটী বৃহদাকার বৃক্ষ। ভূমি সূর্য্য-কিরণ-দগ্ধ। উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের সানুদেশের প্রকৃতি সাধারণতঃ এইরূপ। শিবালিক পর্ব্বতমালার দক্ষিণদিকে উত্তাপ অধিক, বারিপাত কম; সুতরাং বুভুক্ষু 'ভাবর' দেশের উদ্ভিদাদির বৈচিত্র্যও সামান্য। কাঠগুদাম পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা অল্প-বিস্তর এইরূপ; হলদুয়ানী অঞ্চল হইতে কতকটা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হল-দুয়ানী অথবা 'হলদু-বনী' নামটার উৎপত্তি হলদু (কেলি কদম্ব) গাছ হইতে। রেল-পথের অথবা ষ্টেশনের নিকট বড়-একটা হলদু গাছ দেখা যায় না; কিন্তু পীতাভ হলদু কাঠ বহু পরিমাণে রেলের সন্নিহিত স্থানে স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের সিংহদ্বারের সোপান হইতেছে, শিবালিক গিরিশ্রেণী। প্রথমে শিবালিক অতিক্রম করিলে, তাহার পর প্রকৃত হিমালয়ে আসা যায়। হিমালয় ও শিবালিকের মধ্যে অনেক স্থানে বহু বিস্তৃত 'দূন' অথবা উপত্যকা আছে। তন্মধ্যে দেরাদূনের নাম সকলের নিকটই প্রসিদ্ধ। কুমায়ূনে সর্ব্বত্র এই শ্রেণীর উপত্যকা স্পষ্টরূপে দেখা যায় না বটে, তথাপি স্থানে স্থানে উহাদের অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। কাঠগুদাম-রেলগাড়ী হইতে অবরোহণ করিয়া টোঙ্গাযোগে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পার্ব্বত্য প্রদেশে উঠিতে আরম্ভ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, একটি পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতেছি। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পর্ব্বত-গাত্রে বড় বড় বৃক্ষ দেখা দিতে থাকে। গিরিশৃঙ্গবিচ্যুত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ও সাধারণ বন্ধুরপ্রকৃতি স্থানসমূহের মধ্যে কোথাও কোথাও চাষ-আবাদের

নিদর্শন নয়নগোচর হইতে থাকে ; কিন্তু কি প্রাকৃতিক দৃশ্যে, কি পর্ব্বতমালার গঠন-প্রণালীতে, কি তরু-গুল্মাদির প্রকারভেদে, কোন বিষয়েই নৈনিতাল রুয়ারী পর্য্যন্ত বড় একটা পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। রুয়ারী হইতে নৈনিতালের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, পর্ব্বতমালা বিশালতর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী খাতসমূহ গভীরতর হইয়া উঠিতেছে, নাতি-শীতোষ্ণ দেশের বৃক্ষাবলীর পরিবর্ত্তে দুই-একটি করিয়া শীত-প্রধান দেশের উদ্ভিদ্ দেখা দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বকায়, দৃঢ়পেশীবিশিষ্ট পার্ব্বত্য মানবগণেরও আবির্ভাব হইতেছে।

ফাল্গুন তখনও শেষ হয় নাই। শীতের প্রতাপ অনেক কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বসন্ত-সমাগমেরও বিলম্ব রহিয়াছে—এইরূপ সময়ে আমরা প্রথমে নৈনিতালে উপস্থিত হইলাম। অনেক পার্ব্বত্য সহরের ন্যায় নৈনিতালও একটি বক্র রাস্তা অতিক্রম করিলে হঠাৎ নয়ন-পথে আবির্ভূত হয়। প্রথমে গুর্খা 'ব্যারাক', দুই একটি সামান্য দোকান ও ঘন-সন্নিবিষ্ট দারুনির্ম্মিত বাস-ভবনাদি দেখিয়া সহরের সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝা যায় না। সহরের মধ্যবর্ত্তী হ্রদের নিকট উপস্থিত হইলেই চারিদিকের রমণীয় শোভা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বস্তুতঃ এই হ্রদ লইয়াই সহর এবং ইহারই নাম নৈনিতাল—অর্থাৎ নৈনী দেবীর তাল (হ্রদ)। হ্রদের উত্তর পার্শ্বে নৈনী দেবীর মন্দির। মন্দিরটি আধুনিক। দেবীর পুরাতন মন্দির, পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পাহাড় ধ্বসিয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। আয়তনে বড় না হইলেও, বিশেষ কোন শিল্প-নৈপুণ্য না থাকিলেও, মন্দিরটি সুগঠিত। মন্দির-গাত্রে ব্যাঘ্র প্রভৃতির মূর্ত্তি চিত্রিত। একটি কিংবদন্তী আছে যে, কুমায়ূন পার্ব্বতীর পিত্রালয় ; সুতরাং নৈনী দেবী (নারায়ণী ?) বোধ হয় পার্ব্বতীর রূপান্তরমাত্র। অতএব সে স্থলে পঞ্জিকার হিসাবে ব্যাঘ্রের পরিবর্ত্তে সিংহের মূর্ত্তিই অঙ্কিত হওয়া উচিত ছিল। তবে সিংহ আজকাল কুমায়ূন হইতে সুদূরে অবস্থিত গির্ণার পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে ; সেই-জন্য, বোধ হয়, কুমায়ূনের শিল্পীরা সহজলভ্য ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়াই সিংহের অভাব মিটাইয়া লইয়াছে। যাহা হউক, এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এতদঞ্চলে শৈবধর্ম্মের প্রচলন অধিক এবং নানা স্থানে শিব ও পার্ব্বতীর মন্দির প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়।

কুমায়ূন প্রদেশের একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা হ্রদবহুল। নৈনিতাল, ভীমতাল, সাততাল প্রভৃতি ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিরূপে এই সমস্ত হ্রদের উৎপত্তি হইল, তাহা ভূ-বিদ্যার অন্তর্গত ; সুতরাং তাহার সমালোচনা এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে ভ্রমণকারীর পক্ষে এই সমুদয় হ্রদ অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা, উন্নতাবনত বন্ধুর মৃত্তিকা ও ক্ষীণস্রোত গিরি-ঝরণা প্রভৃতির অন্তরালে ক্রোশব্যাপী গভীর, স্বচ্ছ জলরাশি দেখিলে মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব বিস্ময়ের উদয় হয়। নৈনিতাল হ্রদটিও সামান্য নহে। ইহার পরিধি এক ক্রোশের অধিক হইবে এবং গভীরতাও ২০ হইতে ৯০ ফুট। ইহা দক্ষিণে বিস্তৃত এবং লম্বাভাবে হ্রদ-খাতের মধ্যাংশ দুই পার্শ্ব হইতে উচ্চতর। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হ্রদটি সহরের কেন্দ্র। ইহার দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের নাম তল্লিতাল এবং উত্তর-পার্শ্ববর্ত্তী স্থান মল্লিতাল। এই দুইটি যথাক্রমে দেশীয় ও সাহেব পাড়া। হ্রদের পূর্ব্ব পার্শ্বে সাহেবদের দোকান ও পরিভ্রমণের বিস্তৃত রাস্তা। উত্তরে সাহেবদের 'ক্লব,' সমতল ক্রীড়া-ক্ষেত্র ও 'মিউনিসিপাল' বাজার ; পশ্চিমে Boat-house এবং দক্ষিণে দেশীয় বিপণিসমূহ, জল-নিকাশের পথ ও তদুপরি সেতু ; এতদ্ভিন্ন হ্রদের চারিদিকেই সুগঠিত রাস্তা আছে। হ্রদসম্মুখীন পর্ব্বত-গাত্রে ছোটলাটের বাস-ভবন, স্কুল, কলেজ, গির্জ্জা, হোটেল এবং স্থানীয় ও প্রাদেশিক আফিসসমূহ সহরটিকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। নৈনিতালে একটি 'ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট্' এবং পীড়িত সৈনিকগণের জন্য স্বাস্থ্যনিবাসও রহিয়াছে। উহা তল্লিতালের জলনিকাশী খাতের অপর পার্শ্বে। দুইটি পর্ব্বতশৃঙ্গ নৈনিতালের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ—আর্য্যপট্ট ও চীন ; ইহাদের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে ৭৪০০ ও ৮৫০০ ফুট হইবে। হ্রদপৃষ্ঠের উচ্চতা ৬৩৫০ ফুট।

নৈনিতালের জন-সমাবেশের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম নেপালীয় জাতিসমূহের প্রাদুর্ভাবই অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সাধারণ মজুর শ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ, ক্ষুদ্র দোকানী অথবা ব্যবসায়িগণ, ভৃত্য ও পাচকদের অধিকাংশের মধ্যে পর্ব্বত-বাসীদিগের বিশেষত্ব-জ্ঞাপক পোষাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের আকার খর্ব্ব, বর্ণ গৌর, অবয়ব নাতিস্থূল ও হস্ত-পদ এবং স্কন্ধদেশ দৃঢ়পেশীবিশিষ্ট। পুরুষের পরণে সাধারণতঃ ঢিলা পায়জামা, কুর্ত্তা ও টুপী ; স্ত্রীলোকের ঘাগ্‌রা, কুর্ত্তা ও স্থলবিশেষে টুপি। স্ত্রীলোকদিগের কুর্ত্তা অনেকটা 'জ্যাকেটে'র ন্যায়। সাদা-সিধা বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইলে, কুমায়ূনী ললনাগণকে সুন্দরীই দেখায় ; তবে অনেকের মধ্যে আড়ম্বরের জাঁক-জমকটাই অধিক। ভূষণের বাহুল্যে ও বেশের বৈচিত্র্যে এক এক সময়ে স্ত্রীলোকগুলি অদ্ভুত দৃশ্যে পরিণত হয়। এতদঞ্চলে হিন্দুর প্রাধান্যই অধিক ; সুতরাং আহারও অনেকটা সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মৎস্যের আদৌ প্রচলন নাই এবং মাংসও তেমন অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। অপরাপর জাতিগণও কতকটা স্ব-ইচ্ছায় এবং কতকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বাধ্য হইয়া অধিকাংশ সময়ে নিরামিষ ভোজনই করিয়া থাকে। মাদক দ্রব্য-সেবনের মাত্রাও সমতল দেশাদি অপেক্ষা কম। কতিপয় নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে—বিশেষতঃ পাঠান—তামাকের উপর অনুরক্তি কিছু অধিক। এমন কি, স্ত্রীলোকগণও রাস্তার উপর গোরা সৈনিকগণের নিকট হইতে সিগারেট-ভিক্ষা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। নৈনিতালে প্রকৃত কুমায়ূনী ভিন্ন আগ্রা, অযোধ্যা ও যুক্ত-প্রদেশবাসীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। তৎপরেই পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও বাঙ্গালী। কর্ম্মসূত্রে যে সমুদয় বাঙ্গালী আসিয়া এতদঞ্চলে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংখ্যা প্রায় একশত হইবে। ইঁহাদের একটি 'ক্লব', অভিনয়ের আখ্‌ড়া ও 'লাইব্রেরী' আছে ; কিন্তু স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল, উদ্ভিদ্, প্রাণী অথবা ভূ-তত্ত্ব-চর্চ্চায় কাহাকেও মনোনিবেশ করিতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

নৈনিতালের চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য যে অতীব মনোহর, তাহা বলা বাহুল্য ; তথাপি যে সময়ে আমরা ছিলাম, সে সময়টিতে নৈনিতালে ঠিক মরসুম (Season) পড়ে নাই। চৈত্র, বৈশাখ মাসে যখন পর্ব্বত-গাত্রস্থ তরু-গুল্মাদি অভিনব পত্র-পুষ্পে শোভন হইয়া উঠে, তখন চারিদিকে যেন স্বর্গ-মাধুরীর আভাস পাওয়া যায় ; কিন্তু বৎসরের কোন সময়ই এতদঞ্চলে প্রকৃতির নগ্নমূর্ত্তি দেখা যায় না। অধিকাংশ পর্ব্বতমালাই ওক্, রোডো-ডেণ্ড্রণ, চিল (Pine), বন্য চেরী, তেজপত্র, তাম্বুল, সেণ্টিম্, পিশুমার

প্রভৃতি ছোট-বড় বৃক্ষ, গুল্ম ও লতায় আচ্ছাদিত। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বত-গাত্রে স্তর-চাষের (terrace-cultivation) বাসেরও অভাব নাই। তাহার ফলে উপযুক্ত সময়ে কৃষিজাত উদ্ভিদাদিও প্রাকৃতিক শোভা যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে।

প্রাণিতত্ত্ববিদের পক্ষেও কুমায়ূন অঞ্চল অল্প কৌতূহলোদ্দীপক স্থান নহে। যাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ জীব-বিজ্ঞানবিদ্ জেম্‌স্ সাহেবের গ্রন্থাদির সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ অঞ্চলটি জীব-সমাবেশে (distribution of animals) কিরূপ বৈচিত্র্যময়। আমাদের এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সময় হইয়া উঠে নাই। সচরাচর যে সমুদয় প্রাণী নয়ন-গোচর হইয়াছে, তাহাদেরও সংখ্যা অথবা প্রকার-ভেদ নিতান্ত অল্প নহে। পশু-পক্ষি-পালন ও জনন-কার্য্যের উপযোগী স্থান কুমায়ূনে অনেক রহিয়াছে ; কিন্তু কি গো, ছাগ, মেষ, মৎস্য কুক্কুটাদি—কোনটি পালনেই যথোপযুক্ত প্রয়াস দেখা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায়, গভর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর হইতে কুমায়ূন হ্রদসমূহে বিলাতী ট্রাউট মৎস্যের চাষের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং স্থানে স্থানে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কতদূর উপকার হইবে, তাহা বলা যায় না। পক্ষান্তরে কুমায়ূনের সুবিশাল হ্রদগুলি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী-সমূহ অল্পায়াসেই দেশীয় মৎস্য-জননে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে। মৎস্য-ভোজীর সংখ্যা এ সকল স্থানে পূর্ব্বে কম থাকিলেও, এখন ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং রাস্তা-ঘাটের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়ায়, উৎপাদিত মৎস্য, ক্রেতার অভাবে যে পড়িয়া থাকিবে, তাহারও ভয় নাই।

ফল-বৃক্ষাদির চাষ, নূতন উদ্ভিদাদির প্রবর্ত্তন কিম্বা আরণ্য বৃক্ষাদির সদ্ব্যবহার-সম্বন্ধেও এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী উদ্ভিদ্-তত্ত্ব-বিষয়ক উদ্যান ও বন-বিভাগ কতিপয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেও, দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে সবগুলি যে উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না ; কিন্তু একটী বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উদ্যম অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছে—তাহা তার্পিণ-উৎপাদন। কুমায়ূনে চিলের জঙ্গল অনেক। পূর্ব্বে ইহা হইতে কেবল কাষ্ঠ ও সামান্য পরিমাণে গন্ধ-বিরোজা উৎপাদিত হইত। গন্ধ-বিরোজা অথবা চিল-গাছের নির্য্যাস হইতে যে রজন ও তার্পিণ তৈল যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাতে লোকে ততটা খেয়াল করিত না। সংপ্রতি কয়েক বৎসর হইতে ডাওয়ালা নামক নৈনিতালের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গবর্ণমেণ্টের প্রয়াসে একটি তার্পিণের কারখানা খোলা হইয়াছে। এখন পর্য্যন্তও উৎপাদিত তার্পিণ ও রজন, মার্কিন অথবা রুষীয় দ্রব্যের সহিত মূল্যে সমকক্ষ না হইলেও, বিশেষজ্ঞেরা আশা করেন যে, অদূরভবিষ্যতে সন্তোষজনক ফললাভ করা যাইবে। যাহা হউক, যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতেও কার-খানা একজাতীয় বন্য বৃক্ষের সদ্ব্যবহার করিতেছে ; কিন্তু আরও যে তৈল, তন্তুব্যঞ্জক পদার্থ, গন্ধ ও ভেষজ-দ্রব্যাদি-উৎপাদক অসংখ্য বৃক্ষ অরণ্যে জন্মিয়া, কোন ব্যবহারে না লাগিয়াই লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদিগকে লাভজনক পণ্যে পরিণত করিবার কোন চেষ্টাই হইতেছে না।

সংপ্রতি কাশ্মীর হইতে মরী পর্ব্বত অথবা জম্বু, দেরাদূন হইতে মুসূরী পর্ব্বত প্রভৃতির ন্যায় নৈনিতাল হইতে কাঠগুদাম পর্য্যন্তও বায়বা রেল কিম্বা রজ্জু-পথ প্রস্তুত হইবার কথা হইতেছে। এইরূপ রেল হইলে, যাত্রিগণের যতদূর সুবিধা হউক আর নাই হউক, পণ্যাদি-বিনিময়ের যে যথেষ্ট সুবিধা হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। হিমালয়ের উচ্চতর স্থানাদি হইতে দুর্গম গিরি-পথে যে সমস্ত দ্রব্যাদি (যথা পশম, মোম, সোহাগা প্রভৃতি) নৈনিতালে অথবা সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আইসে, সে সকল দ্রব্য আনিতে পূর্ব্বের ন্যায় আর কষ্ট ও অর্থব্যয় হইবে না ; অধিকন্তু কুমায়ূনের কৃষিজাত ও বন্য প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির সহিত সমতল দেশের শিল্পজাত পণ্যের বিনিময় হইয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিবে। আপাততঃ সকল শিল্পজাত দ্রব্যই নৈনিতালে মহার্ঘ এবং কৃষিজাত দ্রব্যও বিশেষ সুলভ বলিয়া বিবেচিত হয় না।

আমরা মাসাধিক কাল কুমায়ূনে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যে এবং কর্ত্তব্য-কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের সামাজিক অবস্থা অনুশীলন করিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই ; তবে কতিপয় বিষয় আমাদিগের বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্দেশের ব্রাহ্মণগণ অতিশয় নিষ্ঠাবান্। এমন কি, শুনিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ নিজের সহধর্ম্মিণীর প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনও স্পর্শ করেন না। সাধারণ বাঙ্গালীকে আচার-ব্যবহারে প্রায় ম্লেচ্ছগণের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। আমরা এখানে একটি সুপরিচিত ও ধনশালী ব্যক্তির গৃহে বিবাহের জন্য কন্যা ক্রয় করার প্রথা দেখিলাম ; তবে, এ প্রথা ব্রাহ্মণেতর জাতির ভিতরেই দেখা যায়। এইরূপ ক্রয়-প্রথা পণ-প্রথা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আগ্রা, অযোধ্যা ও যুক্ত-প্রদেশের ন্যায় এদেশেও উদ্বাহের ধার্য্য দিনের বহু পূর্ব্ব হইতেই নাচ, গান, তামাসা ও শোভাযাত্রা আরম্ভ হইয়া থাকে ; লোকেও অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করে। এখানে বঙ্গদেশের ন্যায় পর্দ্দার তত প্রাবল্য নাই। গ্রামবাসী মহিলাগণ অনেক সময় সুসজ্জিত হইয়া পদব্রজে অথবা অশ্বপৃষ্ঠে গমনাগমন করেন, দেখা যায়। স্ত্রী অথবা পুরুষ অনেকেরই ললাট রক্ত-চন্দন-টীকায় সুশোভিত। দেবমন্দিরসমূহে ঠিক দেবদাসীর প্রথা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই বটে, কিন্তু সাধারণ নর্ত্তকী ও গণিকাবৃন্দ যেরূপভাবে দেবালয়ে যাতায়াত করে, তাহাতে বোধ হয়, উক্ত প্রথা সেকালের মত চলিত না থাকিলেও, আজকাল একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই। নেপাল হইতে কুমায়ূন প্রায় এক শত বৎসর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। নেপালে উক্ত প্রথা এখনও বিদ্যমান। বস্তুতঃ, অনেক কুমায়ূনী আচার-ব্যবহারে গোঁড়ামির যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায় ; তাহা ভাল কি মন্দ, আমরা বলিতে পারি না।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত

দেউল

ঐ যে দেউল-শীর্ষ হোথায়—
    গগনপানে ঊর্দ্ধমুখে ;
যুগান্তবের লুপ্ত কথা—
    রাথ্‌ছে চেপে স্তব্ধ বুকে।
ও নহে রে ব্যর্থ দেউল,
    অর্থশালীর দম্ভ ঘেরা ;
ও নহে রে স্বদ্ধ কেবল—
    পাষাণ দিয়েই তৈরী করা।
হোথায় আছে পুত্রহীনার—
    আকুল প্রাণের আবেদন ;
হোথায় আছে লক্ষ প্রাণের—
    বক্ষ-ভরা নিবেদন।
হোথায় আছে লক্ষ সাধুর—
    শান্ত মধুর স্তোত্র-গান ;
অতীত যুগের ভক্ত-মুখের—
    শান্তি-দীপ্ত হরিনাম।
ভক্ত হোথায় প্রণাম করে,
    নিত্য আসি নম্রশিরে ;
কর্ম্মী হোথায় কর্ম্মশেষে—
    দাঁড়ায় এসে যুক্তকরে।
কবির প্রাণে হোথায় ফোটে—
    কাব্য-প্রসূন স্নিগ্ধ-ধীর ;
হোথায় এসে লুটিয়ে পড়ে
    দার্শনিকের উচ্চশির।
অবিশ্বাসীর তর্ক হোথায়—
    বিশ্বাসেরে বরণ করে ;
জ্ঞানের নদী হেথায় এসে—
    মিশায় ভক্তি-পারাবারে।
হোথায় এসে নিরাকারের—
    প্রচারকের গর্ব্ব টোটে ;
নাস্তিকেরো দম্ভ হোথায়—
    আপনা হ'তে ধূলায় লোটে।
কে বলে ও পাষাণ-দেউল,
    পাষাণ দিয়েই ভিত্তি তার ;
ঊর্দ্ধ চূড়া-শীর্ষ সুধুই—
    প্রচার করে অহঙ্কার।
নয় রে তাহা নয় রে কভু,
    ভিত্তি উহার পাষাণ নয় ;
নয় রে উহা স্বদ্ধ কেবল—
    অহঙ্কারের পরিচয়।
ভক্ত-দেহের বক্ষ'পরে—
    দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীর তার ;
ভক্ত-প্রাণের রক্ত-সরিৎ—
    বইছে হোথায় অনিবার।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

মর্ম্মগাথা

কাব্য। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ৮৮নং অপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল বাগচি বি, এ দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ আনা।

এই নবীন কবির 'মর্ম্মগাথা' আমাদের মর্ম্মে গাঁথিয়া গিয়াছে। যতীন্দ্রবাবু কেবল চাঁদ, ফুল আর দখিণ বাতাস নিয়াই মাতিয়া নাই ; দেশের দুর্দ্দশা ও সমাজের অনাচারে তাঁহার প্রাণে যে বেদনা জাগে, কয়েকটি কবিতায় তিনি তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। এইরূপ সামাজিক কবিতা-রচনার দিকে তিনি যদি অধিকতর মনোনিবেশ করেন, তবে ভবিষ্যতে তিনি যশের পথের পথিক হইতে পারিবেন। কবির আর একটি গুণ, তাঁহার লেখায় অসংযমের পরিচয় বড় নাই। এই কাব্য-সংগ্রহে কতকগুলি অনুকৃতি-কৌতুক আছে ; সেগুলিতে কবির হাস্য-রস-সৃষ্টি করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই অনুকৃতি-কৌতুকগুলিতে শক্তির পূর্ণবিকাশ নাই বটে,—কিন্তু আশা করা যায়, ভবিষ্যতে কবির এই রস-সৃজন-ক্ষমতার সম্পূর্ণ প্রকাশ দেখা যাইবে। নবীন কবির কাব্য-সাধনা সফল হউক, এই কামনা।

বেসুর বীণ্

কবিতা-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ নাথ, নৈহাটি-শ্রীরামপুর, খুল্‌না। মূল্য আট আনা।

এই কবিতা-পুস্তকের "বেসুর বীণ" নামকরণ হইয়াছে বিনয়ের অত্যাচারে ; কারণ, সমালোচ্য কবিতাগুলির অধিকাংশই মধুর সুরে ভরা। কবির ভাষা গীতি-কবিতারই উপযোগী, তাহার কোথাও একটু ভার নাই—শৈল-নদীর মতই স্বচ্ছন্দ আনন্দে ও লঘুগতিতে তাহা বহিয়া গিয়াছে। কবিতাগুলির ভাব সরল, গভীর ও পবিত্র। আজকালকার কবিতার 'অতিবৃষ্টি'র দিনেও কবি নিজস্ব বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন—এতটা আমরা আশা করি নাই। কোন কোন কবিতায় সামান্য যে দোষগুলি আছে, যে-কোন নবীন কবির পক্ষে তাহা অপরিহার্য্য ; সুতরাং আলোচনার অযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অনায়াসেই বলা যায়, "বেসুর বীণে"র বাদক, "কাব্য-রাজ্যের পথ কাটিয়া লইতে পারিবেন।"

ঢেউ

কবিতা-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ ; মল্লিকপুর, হিন্দু-লাইব্রেরী, যশোহর। মূল্য আট আনা।

আমরা এই কাব্যপটে নবীন কবির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি। 'ঢেউ'এর কবিতাগুলিতে স্ফুটনোন্মুখ কবিত্বের মাধুর্য্য আছে, অমল ভাব, সরল ভাষা, তরল ছন্দ আছে এবং সর্ব্বোপরি বর্ণিত বিষয়ের সহিত কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সহমর্ম্মিতা আছে। বাল্য-রচনাগুলি এই সংগ্রহে স্থানপ্রাপ্ত না হইলেই ভাল হইত। কয়েকস্থলে দু-চারিটি প্রাদেশিক ও গ্রাম্য শব্দ আছে ; ভবিষ্যৎ-সংস্করণে সেগুলি না থাকিলে সুখী হইব।

সৎসঙ্গ

সদ্‌বাক্য-সংগ্রহ। শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ দাস-ঘোষ দ্বারা সংগৃহীত। হরিনাভি 'বিদ্যাভূষণ-লইব্রেরী' হইতে প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

এই পুস্তকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের ৩৬৫টি মহাজন-বাক্য সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ সৎচেষ্টা এদেশে নূতন। যাঁহারা এই বাক্যগুলি পাঠ করিয়া স্মরণে রাখিবেন, তাঁহারা সংসারের জ্বালা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিয়াও অনেকটা সান্ত্বনালাভ করিতে পারিবেন, ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। এরূপ পুস্তকের আদর হইলে, আমরা সুখী হইব।

শ্রীপ্রসাদদাস রায়

হেন্‌রি ইব্‌সেন ও তাঁহার গ্রন্থের কতিপয় চরিত্র।

1. "Haermaendene paa Helgeland" নাটকের Dagny og Ornulf. 2. "Kejseer og Galilaeer" নাটকের Fyrstinde Helena. 3. ঐ নাটকেরই Maximos. 4. ঐ নাটকেরই Maximos. 5. "Haermaendene paa Helgeland" নাটকের Sigurd. 6. ঐ নাটকেরই Hjordis. 7. Kongsemnerne নাটকের Bisp. Nicolas. 8. Fru Inger lil Ostraat নাটকের Fru Inger. 9. Haermaendene paa Helgeland নাটকের Hjordis. 10. Keiseer og Galilaeur নাটকের Juliace. 11. Kongsemnerne নাটকের Hertug Skule. 12. Gengangere নাটকের Regine Engstrand. 13, De unges Forbund নাটকের Bogtrykker Aslaksen. 14. Peer Gynt নাটকের Peer Gynt og Aase. 15. Vildanden নাটকের Gamle Ekdal. 16. Kjearlighedens Komedie নাটকের Pastor Straaamand. 17. Lille Eyolf নাটকের Fru Rita Almers, 18. Hedda Gabler নাটকের Hedda Gabler. 19 Gengangere নাটকের Osvald. 20. Vildanden নাটকের Hjalmar Ekdal. 21 Brand নাটকের Agnes. 22 Gengangere নাটকের Fru Alving. 23 Et Dukkhjem নাটকের Krogstad. 24 De unges Forbund নাটকের Lundestad. 25 Bygmester Solness নাটকের Hilde. 26 Peer Gynt নাটকের Peer Gynt. 27 ঐ নাটকের Solveig. 28 ঐ নাটকের Solveig. 29 Brand নাটকের Agnes. 30 De unges Forbund নাটকের Kammerherre Bratsberg. 31 Peer Gynt নাটকের Peer Gynt. 32 Brand নাটকের Fogden. 33 Hedda Gabler নাটকের Eilert Lovborg 34 De unges Forbundএর Bastan Monsen. 35 ঐ নাটকের Selma. 36 Et Dukkehjem নাটকের Nora. 37 Rosmer holm নাটকের Rektor Kroll. 38 Bygmester Sliess নাটকের Bygmester Solness.

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ২৩এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ { ১ম খণ্ড, ১৮শ সংখ্যা

নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর*

(পরিচয় ।

এই উৎকৃষ্ট পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ হওয়াতে আমরা একান্ত আনন্দ-লাভ করিয়াছি। "গৃহস্থ" নামক মাসিক পত্রে যখন ইহা ধারাবাহিক-রূপে প্রকাশিত হইতেছিল, তখনই সকলে মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন ; অতএব, প্রশংসিতের প্রশংসা না করিয়া, আমরা এখানে ইহাই দেখাইতে চাহি যে, এই বইখানি প্রতি বাঙ্গালীরই পাঠ করা উচিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্-এ।

"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীরে" আমেরিকার পুরুষসিংহ, টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের স্থাপক বুকার টি, ওয়াশিংটনের আত্মকথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের কোনরূপ বংশ-গৌরব বা জাতিত্ব-গৌরব ছিল না। শ্বেতাঙ্গের ঔরসে ও কৃষ্ণাঙ্গ মাতার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াশিংটন তাঁহার পিতার নাম জানিতেন না—এমন-কি, তাঁহাকে কখন চোখেও দেখেন নাই! তাঁহার জন্মক্ষেত্র কোথায় সে কথাও তিনি ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না। আপনার কাহিনী তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন,—"আমি কেনা গোলাম—জাতিতে নিগ্রো" আরম্ভ যেমন করুণ, তেমনই বাহুল্যবর্জ্জিত।

গোলামাবাদে জন্মিয়াই ওয়াশিংটন অতি শৈশবেই তাঁহার জননীর সহিত শ্বেতাঙ্গ প্রভুর দাসত্ব করিতেন। দাসেদের উপর প্রভুরা তখন নানাবিধ অত্যাচার করিতেন, তাহাদের আহার-বিহার কিছুতেই তাঁহারা যত্ন লইতেন না। দাসেরাও আপনাদিগকে একান্ত হীন বলিয়াই মনে করিত। তাহারা নিরক্ষর ছিল। কোনরূপ উচ্চ লক্ষ্যের ধার ধারিত না। তাহাদের যে কতটা মানসিক অধঃপতন হইয়াছিল, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে :—

একজন ষাট-বছরের-বুড়ো নিগ্রোকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তার সঙ্গে কে কে বিক্রীত হইয়াছিল?—বৃদ্ধ নিগ্রো উত্তর দিয়াছিল, "আমরা সর্ব্বসমেত পাঁচজন ছিলাম—আমি, আমার ভাই এবং তিনটি খচ্চর।"

'মানুষ ও পশু যে একই শ্রেণীর অন্তর্গত হয়, এই বৃদ্ধ গোলামের চিন্তায় তাহা আসিত না।' বুকার ওয়াশিংটন যখন বালকমাত্র, তখন আমেরিকার নিগ্রোজাতি স্বাধীনতা লাভ করে।

কিন্তু বহুদিন-বদ্ধপক্ষ পক্ষীকে পিঞ্জরমুক্ত করিলে সে যেমন উড়িতে পারে না, দাসত্বে-অভ্যস্ত নিগ্রোরাও তেমনই এই নবলব্ধ আকস্মিক স্বাধীনতায় একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের বিদ্যা ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, স্বাবলম্বন-শক্তি ছিল না এবং অর্থবলও ছিল না!

এই সময়ে বালক ওয়াশিংটনের হৃদয়ে বিদ্যার্জ্জনের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি অনাহারেও অর্দ্ধাহারে নানা কষ্ট ভোগ করিয়া হাম্প্‌টনে গিয়া বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। হাম্প্‌টনের বিদ্যালয়ে সেনাপতি আর্ম্‌ষ্ট্রঙ্গ নামে এক শ্বেতাঙ্গ মাহাত্মা থাকিতেন,—নিগ্রোজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি কায়মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই শ্বেতাঙ্গ মহাত্মাকে গুরুর পদে বরণ করিয়া ওয়াশিংটন হাম্প্‌টনের বিদ্যালয়ে আপনার জীবন গঠন করিতে লাগিলেন।

এই জীবন-গঠনের কাহিনী উপন্যাসকেও হারাইয়া দেয়। জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইবার জন্য যাঁহার প্রাণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকে,—জগতের কঠিন সমর-ক্ষেত্রে একাকী হইলেও, পরিণামে তিনি কিরূপ সাফল্যলাভ করিতে পারেন, ওয়াশিংটনের অপূর্ব্ব আত্মচরিতে তাহার বর্ণনা আছে।

গোলামের জাতিতে জন্মিয়া, শ্বেতাঙ্গপ্রধান আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষের মধ্যে বাস করিয়া, দরিদ্র অপেক্ষাও দরিদ্র ওয়াশিংটন কিরূপে আপনার চরিত্র-বলে ও সাধনা-ফলে পরিশেষে জাগতিক মানব-সমাজে আপনাকে অমর করিয়া টাস্কেজীর মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে দুর্ব্বলের হৃদয়েও সিংহ-বলের সঞ্চার হয় ও বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে মানবের অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই।

'নিবেদনে' অনুবাদক বলিয়াছেন, "এই পুস্তকখানি যে-কোন দেশের যে-কোন কর্ম্মবীরের আত্ম-জীবন-চরিতরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

সত্য কথা। জগতের যে-কোন কর্ম্মবীরের জীবন দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, সকলকার ভিতরেই এই ওয়াশিংটনের মতই কঠোর সাধনা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অদ্ভুত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে ; সুতরাং যাঁহারা এই

---

* শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকারদ্বারা অনূদিত। ২৭৬ পৃষ্ঠা। শিল্কের বাঁধাই। মূল্য দেড় টাকা। "গৃহস্থ পাব্‌লিশিং হাউস্" হইতে প্রকাশিত।

পুস্তকখানি কোন দেশবিশেষের, কোন সম্প্রদায়বিশেষের বা কোন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্কীর্ণ আত্মচরিতমাত্র মনে করিয়া অবহেলা করিবেন, তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

বিশেষতঃ যাঁহারা শিক্ষাপ্রচারকার্য্যে ব্রতী বা উদ্যোগী, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের নিত্যসঙ্গী হওয়া উচিত। শিক্ষাপ্রচার-সম্বন্ধে ওয়াশিংটন যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অমূল্য। আমরা স্থলবিশেষ উদ্ধার করিলাম ঃ—

"অনেকস্থলে দেখিয়াছি, শিক্ষাপ্রচারকেরা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া বিদ্যাদানের বাবস্থা করেন না। অন্য এক সমাজে যে অনুষ্ঠানে সুফল-লাভ হইয়াছে, তাহাই অবনত সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন। তাঁহারা বুঝেন না যে, এক সমাজের যাহা শুভ, অন্য সমাজের তাহা অশুভও হইতে পারে। শিক্ষাবিস্তার-বিষয়ে আর একটা দোষও অনেক সময়ে লক্ষ্য করিয়াছি। শিক্ষকেরা মনে করেন যে, ছাত্রেরা সকলেই একরূপ, সকলকেই একই প্রণালীতে, একই আদর্শে, একই জীবনযাপন প্রথার ভিতর দিয়া মানুষ করা যায়। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, মানুষ বিচিত্র, ছাত্রগণের স্বভাব বিভিন্ন, এক একজনের এক এক-প্রকার মেজাজ, প্রবৃত্তি ও ধারণা; সুতরাং প্রত্যেকের অভাব বুঝিয়া শিক্ষা দিলেই সুফল ফলিতে পারে। সুখের কথা, হাম্প্‌টনে ছাত্রদের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা-বিষয়ে বেশ লক্ষ্য রাখা হইত। এক একজনকে এক একপ্রকার শিল্প, কৃষি ও পুঁথি শিখান হইত। ফলতঃ, ছাত্রেরা সজীবভাবে মনের আনন্দে বাড়িয়া উঠিত। লেখাপড়া শিখিয়া তাহাদের উপকার হইতেছে, প্রতিদিন তাহারা ইহা নিজেই বুঝিতে পারিত।"

নিগ্রোজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য ওয়াশিংটন যেরূপভাবে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে তাঁহার সাধনা যেরূপভাবে পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ইন্দ্রজালের মত অভাবনীয়। টাস্কেজীর একটি ক্ষুদ্র, ভগ্ন বাটীতে কয়েকজনমাত্র ছাত্র লইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্র-সংখ্যা যখন বাড়িল, তখন একটি আস্তাবলে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়। এই আস্তাবল ও আর তিনখানি ঘর ধার করিয়া দেড় হাজার টাকায় কেনা হইয়াছিল। ওয়াশিংটন এই সময়ের কথায় বলেন, "ইতিপূর্ব্বে আমি একসঙ্গে ২৫০।৩০০৲ টাকাও দেখি নাই!" কিছুদিন পরে আস্তাবলে কুলাইল না—একটি বড় বাড়ীর দরকার হইল; কিন্তু বড় বাড়ী তৈয়ার করিতে অর্থের আবশ্যক, অথচ ওয়াশিংটন রিক্তহস্ত। তিনি ভাবনায় পড়িলেন।

সৎকার্য্যে ভগবান্ সহায়। ওয়াশিংটনকে বেশী ভাবিতে হইল না; কারণ, তিনি আপনার প্রতিভার মহিমায়, চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও স্বার্থ-ত্যাগের দৃষ্টান্তে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সকল সম্প্রদায়েরই হৃদয় জয় করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের মুক্তহস্ততায় ওয়াশিংটনের বাসনা সফল হইল।

ওয়াশিংটনের শিক্ষাপ্রণালী একেবারে নূতন ছিল। আপনার ছাত্র-গণকে তিনি কেবল পুঁথিগত বিদ্যা দান করিতেন না; পরন্তু তাহাদিগের চরিত্র একেবারে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেন। ফলে, বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়াই তাঁহার ছাত্রগণ সংসারের যে-কোন কাজেই লাগিয়া যাইতে পারিত।

টাস্কেজীর বিশাল বিদ্যালয়-সৌধ-গঠনকালে রাজমিস্ত্রীর সাহায্য একপ্রকার লওয়া হয় নাই বলিলেই চলে। পাঁজা করিয়া ইট তৈয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া, ওয়াশিংটনের ছাত্রেরা প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়-বাটি, তাহার টেবিল, চেয়ার, থালা, বাটি, স্কুলের গাড়ী, জুড়ি প্রভৃতি সকল জিনিবই স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ওয়াশিংটন বলিতেছেন, "টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৪০টা গৃহ-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণ ঘরামি, মিস্ত্রী ও ছুতারের কাজে ওস্তাদ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বতন ছাত্রদের উত্তরাধিকারের সূত্রে নূতন নূতন ছাত্রেরা মাটি কাটা, গর্ত্তখুঁড়া, কাঠ চেরা, ইঁট গড়া, গৃহের চিত্র অঙ্কন করা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব করা হইতে আরম্ভ করিয়া 'গ্যাসে'র কল লাগান, 'ইলেক্‌ট্রিক' বাতীর ব্যবস্থা সবই শিখিয়া লয়।"

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন, "শারীরিক পরিশ্রম, স্বাবলম্বন এই দুইটি গুণই আমি প্রকৃত শিক্ষালাভের চিহ্ন মনে করি। ধর্ম্মভাবে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ কর, দেখিবে খাটিয়া খাওয়ায় কোন অপমান, কষ্ট ও লজ্জাবোধ হইতেছে না। পরিশ্রমের ফলে, তুমি প্রকৃত মানুষ হইতেছ, এই জ্ঞান থাকিবে। আমার নূতন আদর্শের শিক্ষা-প্রণালী-অনুসারে ছাত্রেরা শারীরিক পরিশ্রমের এইরূপ মর্য্যাদা ও গৌরব দান করিতে শিখে। সকলপ্রকার গৃহস্থলী, কৃষি ও শিল্পকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতে থাকিলে ছাত্রেরা বেশ পাকা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। নানাবিধ কারিগরি এবং শিল্পি-মহলের নূতন নূতন আবিষ্কারগুলি তাহাদের 'হাতে কলমে' শিক্ষা হইয়া যায়। অধিকন্তু তাহারা শারীরিক পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য অর্জ্জন করে ও কর্ম্মঠ হইতে থাকে; এবং নৈতিক চরিত্র-বিষয়েও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে।"

টাস্কেজীর ছাত্রাবাসের ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই ছাত্রেরা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, এমন-কি, রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মের ভারও ছাত্রগণের উপর ন্যস্ত ছিল। এই নব-আদর্শের শিক্ষা-পদ্ধতি আমেরিকার নিগ্রো-সমাজকে উন্নতি করিয়াছে।

একজন শিক্ষক ও ত্রিশজনমাত্র ছাত্র লইয়া একটা ভাঙ্গা, পোড়ো বাড়ীতে টাস্কেজী-বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। ১৯ বৎসরের পরিশ্রম ও সাধনার ফলে সেই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কিরূপ অসাধারণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আপনারা ওয়াশিংটনের মুখেই তাহা শ্রবণ করুন।

"আজ আমাদের ৬৯০০ বিঘা জমি। তাহার ৩০০০ বিঘা ছেলেরা চাষ করে আমাদের এখানে ৬৬টা বড় বড় ইমারত—ইহাদের ৬২টা ছাত্রদের নিজ-হাতে-গড়া। আজ এই বিদ্যালয়ে ৬০ প্রকার কৃষি ও শিল্প-বিষয়ক কাজ-কর্ম্ম শিখান হইতেছে। গৃহ-সম্পত্তি ইত্যাদির মূল্য সম্প্রতি ২,১০০,০০০৲। এতদ্ব্যতীত নগদ টাকা আছে ৩,০০০,০০০। বার্ষিক ব্যয় আজকাল ৪৫০,০০০। এই টাকার অধিকাংশই গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিয়া আদায় হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাদের ছাত্র-সংখ্যা ১৪০০। আমেরিকার ২৭ প্রদেশ হইতে ছাত্র আসিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আফ্রিকা, কিউবা, পোর্টোরিকো, জামেকা ইত্যাদি দূর প্রদেশ হইতেও আমরা ছাত্র পাই। আজকাল আমাদের কর্ম্মচারী ও শিক্ষকগণের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১১০। ইঁহারা স্বপরিবারে বাস করেন। বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে এইরূপ অন্ততঃ ৭০০জন লোকের বসতি।"

আজীবন এইরূপে নিঃস্বার্থভাবে স্বজাতির মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ওয়াশিংটন সম্প্রতি অনন্তধামে গমন করিয়াছেন আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় 'হার্ভার্ড য়ুনিভার্সিটি'র কর্ত্তৃপক্ষগণ এই মহাত্মাকে সম্মানের 'এম্-এ' উপাধি দান করিয়া আপনাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

আট্‌লাণ্টার বিরাট্ সম্মিলনে নিগ্রোজাতির প্রতিনিধিরূপে ওয়াশিংটন যে ক্ষুদ্র অথচ ভাবপূর্ণ বক্তৃতাদান করিয়াছিলেন, তাহাতে বক্তৃরূপেও তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া যুক্তরাজ্যের 'প্রেসিডেণ্ট' স্বহস্তে ওয়াশিংটনকে পত্র লিখিয়াছিলেন "কেবলমাত্র আপনার বক্তৃতার জন্যই যদি এই সম্মিলনের অধিবেশন হইত, তাহা হইলেও ঐ অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হইত না। আপনার বক্তৃতায় কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ উভয়েরই যথেষ্ট উপকার হইবে।"

ওয়াশিংটনের চেষ্টায় আমেরিকার শ্বেতাঙ্গগণের বিষম কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

স্বার্থত্যাগ করিতে না জানিলে পৃথিবীতে কোন মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। ওয়াশিংটন স্বজাতির উন্নতিসাধনের জন্য আপনার ব্যক্তি-গত স্বার্থ কিরূপে ত্যাগ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। একবার এক সম্প্রদায় তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"আপনি যদি আমাদের জন্য নানাস্থানে বক্তৃতা করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে এককালীন ১৫০,০০০৲ দিতে প্রস্তুত আছি অথবা প্রত্যেক রাত্রে ৬০০৲ করিয়া আপনার পারিশ্রমিক দিতে পারি।"—বলাবাহুল্য অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে পাছে "টাস্কেজী-বিদ্যালয়ে"র কোন ক্ষতি হয়, সেই ভয়ে ওয়াশিংটন অনায়াসেই এই আর্থিক উন্নতির প্রলোভন সংবরণ করিয়াছিলেন।

আমরা অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এইরূপ কর্ম্মবীর, এইরূপ নির্লোভ মহাত্মাকে দেখিতে চাই। আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষা-বিভাগে আজ যে-সকল তথাকথিত কমলবিলাসী বাবু নেতা সাজিতে চান, তাঁহারা ললাটে কেবল যশের তিলক ধারণ করিতে পারিলেই দেশের প্রতি, জাতির প্রতি আপনাদের সমগ্র কর্ত্তব্য নিঃশেষিত হইল বলিয়া মনে করেন—একটি নিষ্কলঙ্ক আদর্শ গঠন করিবার দিকে কাহারই আগ্রহ বা লক্ষ্য নাই; সেইজন্যই তাহাদের স্মৃতি সাগর-সৈকতে তরঙ্গ-রেখার মত দুদিনেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কর্ম্মে প্রবণ, কর্ত্তব্যে অটল, সাধনায় সমাহিত, আত্মত্যাগে মহান্—এমন একজন মহাপুরুষ কবে এই পতিত জাতির হৃদয়ে পরমাত্মার সিংহাসন পাতিয়া দিবেন, কে তাহা বলিতে পারে?

"নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীরে" সর্ব্বজাতির উপযোগী এক যথার্থ আদর্শ চরিত্র আছে। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় নৈতিক অবনতির কুক্ষণে এই কর্ম্মবীরের পবিত্র জীবন-কাহিনী সকল সমাজে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। এ পুণ্যকথা যিনি শ্রবণ করিবেন, জীবনের আঁধার পথেও তিনি ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবেন।

এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক যাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমে বাঙ্গলায় অনূদিত হইল, পরিশেষে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দান করিতেছি। বিনয়বাবুর অনুবাদ চমৎকার হইয়াছে! তাঁহার ভাষা সরল, সতেজ ও বাহুল্যবর্জ্জিত। বইখানি পড়িলে ইহা যে অনুবাদ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সাত সমুদ্র পার হইতে বিনয়বাবু সে অমূল্য রত্ন বাঙ্গালীর দুয়ারে বহিয়া আনিয়াছেন, আমরা নিশ্চয়ই তাহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিব,—ইহার অধিক প্রশংসা করিবার ভাষা আমাদের নাই।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মেরী বেগম

কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া গিয়াছেন, প্রবলপ্রতাপ মোগল-কুলতিলক সম্রাট্ আক্‌বর শাহের মেরী বা মরিয়ম নাম্নী একজন খৃষ্টান্ বেগম ছিল। বৎসর তিন পূর্ব্বে এ বিষয়ের একবার আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি ঐতিহাসিক নহি; কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই ইহার তথ্যাবিষ্কারে নিযুক্ত হইয়াছিলাম মাত্র। তখন যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম এবং তদবধি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই নিম্নে প্রকাশিত করিতেছি। আমার বড়ই আশা, কোন বিজ্ঞ ঐতিহাসিক এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা করিয়া আমাদের অজ্ঞতা দূর করিবেন। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ অধীন লেখকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া সকল ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক হাণ্টার সাহেব (W. W. Hunter), তাঁহার Indian Empire নামক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন,—"His (আক্‌বরের) favourite wife was a Rajput princess; another of his wives is said to have been a Christian, etc"* কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আর বিশেষ-কিছু বলেন নাই। জনপ্রবাদ এরূপ শ্রুত হয় যে, সম্রাটের প্রধান চিকিৎসক ডাক্তার মার্টিন জেলের (Dr. Martin Jail) মরিয়ম ও জুলিয়ানা নাম্নী দুই কন্যা ছিল। মরিয়মের প্রথম পক্ষের স্বামীর নাম ছিল আব্দুল মাসি। তিনি বোধ হয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাৎকালিক অপরাপর খৃষ্টানের ন্যায় অর্থ ও সম্মানলাভের জন্য মুসলমানদের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর কন্যা জুলিয়ানা চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করায়, সম্রাট্ তাঁহাকে বেগমগণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর পরে জন ফিলিপ বোরবোঁ (John Philip Bourbon) নামে এক-জন ফরাসী রাজবংশীয় যুবা স্বদেশে কোন গুরুতর রাজকীয় অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রাণহানি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ভারত-বর্ষে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী সম্রাট্ তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাইয়া তাঁহাকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পরে জুলিয়ানার সহিত তাঁহাকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, রাজ-পরিবারের চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মরিয়মের স্বামী আব্দুল মাসির অকাল-মৃত্যুর পর বোধ হয় মরিয়ম ভগ্নীর সহিত মধ্যে মধ্যে প্রাসাদে গমন করিতেন। সেই অবসরে সম্রাট্ মরিয়মের রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। যদিও খ্যাতনামা মিঃ ফ্যান্‌থমি এই জনপ্রবাদের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, তবুও ইহার সত্যাসত্য-বিচার বিশেষ প্রমাণ-সাপেক্ষ; কারণ, অপর কোন ইতিহাস-লেখকই এই জনশ্রুতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। †

মহামান্য Wheeler সাহেব বলেন,—"He (আক্‌বর) married a Christian wife known as Mariom or Mary and he built a palace for her at Fattehpore, which is to be seen to this day and was characterised by refinements, which in those days were only known toEuropeans. He entertained Christian Fathers from the portugese settlement at Goa. He permitted them to build a catholic chapel and set upon altar within the precincts of his palace at Fattehpore; to carry cross in procession through the streets and to preach Christianity wherever they pleased."

"বেগম মহল" নামক বাঙ্গালা পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই, "মরিয়ম বেগম, আক্‌বর বাদশাহের খৃষ্টান্ স্ত্রী ছিলেন বলিয়া বিখ্যাত। ফতেপুর সিক্‌রিতে তাঁহার এক সুন্দর প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ গঠিত হইয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সুন্দর ভগ্ন প্রাসাদ পরিত্যক্ত ফতেপুর সিক্‌রিতে বাদশাহ আমলের বিলাসিতা, গৌরব ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছে। মরিয়ম-প্রাসাদ প্রায় ফতেপুর সিক্‌রির মধ্যস্থানে স্থাপিত। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে দুর্গসম প্রাচীরে বেষ্টিত আক্‌বরের অন্যতমা স্ত্রী যোধবাঈর সৌধ।"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তারানাথ রায় মহাশয় ১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণের "ভারতীতে" সুলতানা মরিয়ম-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহার ভাবার্থ নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিলাম।

"মরিয়ম অর্থাৎ মেরী একজন পর্ত্তুগীজ রমণী। ইঁহার পিতা গোয়ার খৃষ্টান্-সম্প্রদায়ের নিকট ইঁহাকে বিক্রয় করেন। এই সময় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারার্থ খৃষ্ট-যাজকবর্গ য়ুরোপের যুবতী রমণী সংগ্রহ করিয়া ও সেই সমস্ত রমণীর লোভ দেখাইয়া নিরীহ দেশবাসীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। সম্রাট্ একবার গোয়ার সৌন্দর্য্য-পরিদর্শন-মানসে সেখানে আসেন। সেই সময় সুচতুর ধর্ম্মযাজকগণ মরিয়মকে সম্রাটের নেত্রগোচর করিলেন। গুণগ্রাহী সম্রাট্ও গুণবতী মরিয়মকে বিবাহ করিয়া স্বপুরে লইয়া গেলেন। পরে ফতেপুরে এক সুরম্য প্রস্তর-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পত্নীর বাসস্থান নির্দ্ধারিত করিলেন। ফতেপুরে এখনও বিদ্যমান এই প্রাসাদকে ঐতিহাসিক-বর্গ "মরিয়ম-কুঠী" বা "সোণার্হা মাখান" বলিয়া থাকেন। মরিয়ম বেগমই পরে সম্রাট্‌কে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহাকে "বাইবেল" ও মেরীর প্রতিকৃতি প্রদান করেন। তিনি ভক্তিভরে অতি সমাদরে সেই সব গ্রহণ করেন এবং সেই রাত্রে খৃষ্টধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করেন। পরে একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় সম্রাট্ প্রত্যহ খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তির প্রতি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেন। তবে তিনি সত্য সত্যই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয় এবং যদিও মধ্যে মধ্যে মরিয়মের উত্তেজনায় তিনি এই ধর্ম্মে অনুরক্তি প্রকাশ করিতেন, তথাপি নিজের অদ্ভুত বুদ্ধিবলে ও হিন্দু-মুসলমান মহিষীবর্গের ভর্ৎসনায়, তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই। পরে মরিয়ম বেগম মারা গেলে, সম্রাটের খৃষ্টধর্ম্মানুরাগও অন্তর্হিত হয়।" তিনি এই ঐতিহাসিক তথ্যটুকু কোথা হইতে পাইয়াছেন, তাহা জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব এবং তাহা একটা প্রমাণস্বরূপ হইয়া থাকিবে। তবে মিঃ কিনী তাঁহার Guide to Agra নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ফতেপুর-প্রাসাদের একাংশ "মরিয়ম-কুঠী" বা "সোণার্হা মাখান" নামে অভিহিত। এই প্রসিদ্ধ কুঠীর মধ্যস্থিত একটি প্রকোষ্ঠের প্রাচীরে The Annunciation of the Blessed Virginএর একখানি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে এবং অনেকে বলিয়া থাকেন যে, এই প্রকোষ্ঠ

* The Indian Empire, Vol. 1, page 350. এই রাজপুত-তনয়াই যোধপুররাজ বেহারীমলের কন্যা যোধবাঈ-বেগম।

* The Students' Magazine, August (1906).

সম্রাটের আমন্ত্রিত খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকগণের উপাসনা ও বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা হইতেও অনুমান হয়, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মরিয়ম নাম্নী সম্রাট্-মহিষী ঐ কুটীরের অধিকারিণী ছিলেন।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, প্রসিদ্ধ কবি, সম্রাটের বন্ধু ও বিখ্যাত ঐতিহাসিক শেখ আবুল ফাজেল,তাঁহার "আকবর-নামা" ও "আইন-ই-আকবরি" * নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ে এই খৃষ্টান বেগমের নামও উল্লেখ করেন নাই। এই কারণবশতঃ অনেকেই মেরীর অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ করেন। আক্‌বরের সমসাময়িক ইতিহাস-লেখক মহম্মদ কাসিম ফেরিষ্টা † এবং নিজামুদ্দিন আহমেদ বক্‌সী ‡ প্রমুখ প্রসিদ্ধ মুসলমানগণের রচিত আক্‌বরের ইতিহাসেও ইহার বিষয় কিছুই লিখিত হয় নাই। মিঃ এলফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি বিদেশীয় ইতিহাস-লেখকগণের পুস্তক-পাঠেও এই মহিষীর বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় না। ইহার দুইটি কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি। প্রথমতঃ, কেহই সম্রাটের সকল বেগমেরই নাম উল্লেখ করেন নাই; দ্বিতীয়তঃ, অনেকে অনুমান করেন যে, মহামতি আক্‌বর হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া তৎকালীন মুসলমান ফকিরগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন; সুতরাং আবার এই খৃষ্টান্ মহিষীর বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি ভক্তি দেখাইতে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না। হাণ্টার সাহেবও তাঁহার পুস্তকে এই শেষোক্ত কারণের আংশিক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন,—

"Akbar's conciliation of the Hindus and his interest in their literature and religion, made him many enemies among the pious Mussulmans." (Indian Empire, Vol. 1, Akbar, page 350)

কেহ কেহ বা যোধপুররাজ বেহারীমলের তনয়া যোধবাঈকে * এই খৃষ্টান্ বেগমের সহিত মিশাইয়া ফেলেন। তাঁহারা বলেন যে, আক্‌বর শাহের রাজত্বের সময় খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকগণ সর্ব্বপ্রথম আগ্রায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। গুণগ্রাহী, ধর্ম্মপিপাসু, উদারচরিত সম্রাট্ তাঁহাদের আবেদন-অনুসারে গির্জ্জা ও বাসস্থান-নির্ম্মাণের জন্য আগ্রা-নগরে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ফতেপুর সিক্‌রীর ইবাদত্‌খানায় (Ibadatkhanah) ও লাহোরের প্রকাশ্য সভায় তিনি খৃষ্টান্ ধর্ম্মযাজকগণের সহিত ধর্ম্মালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। খৃষ্টানধর্ম্মের প্রতি তাঁহার যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, নিম্নলিখিত লেখকের লেখাও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—"Akbar-nama records such a conference, in which the Christian priest Redif disputed with a body of Muhammadan mullahs before an assembly of the doctors of all religions and is given the best of the argument". † তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, সম্রাটের অনুমত্যানুসারে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী যোধবাঈ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেনন; কিন্তু ইহা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে; কারণ, রাজপুত-তনয়া যোধবাঈ যে অকস্মাৎ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন বা মহামতি, স্বাধীনতাপ্রিয় সম্রাট্ আকবরও যে তাঁহাকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অবশ্য সম্রাটের খৃষ্টধর্ম্মের উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু তিনি অন্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য কখন কাহাকেও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আদেশ করেন নাই এবং এই কারণ বশতঃই তাঁহার স্ব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম State Religion হইতে পারে নাই, তাহা আমরা বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি; পরন্তু তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান্, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, সকল ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই মানবের চরমোৎকর্ষ মোক্ষ লাভ হইতে পারে।

Frederick Augustus, Count of Noer বলিয়া গিয়াছেন,—"Of Akbar's wives, with the exception of Salim-at-Sultan Begum, the widow of Bairam Khan, we know little, but few names. * * * * Royal consorts maintained their own customs and unhindered observed their special and religious rites. Akbar used to join in Hindu worship of his Rajputani wives and with them celebrated the "Hom", a fire-worship of ancient date. * * * * Bedouni and strict mussulmans had certainly ground for exasperation in this." *

তবে মুসলমান ঐতিহাসিকেরা যোধবাঈকে "মরিয়ম উজামানি" বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন; * সেইজন্য বোধ হয় অনেকে ভ্রমবশতঃ তাঁহাকে খৃষ্টান্ মেরী বা মরিয়মের সহিত মিশাইয়া ফেলেন। মিঃ ফ্যানথমি বলেন, "সম্রাট্ আকবর যে তাঁহার প্রিয়তমা হিন্দু মহিষী যোধবাঈকে মেরী বলিয়া অভিহিত করিবেন, ইহাও তাঁহার রীতিবিরুদ্ধ; কারণ, তিনি হিন্দু ও মুসলমান বেগমগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যভাব-রক্ষা-হেতু প্রাসাদে তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।"

কেহ কেহ বলেন, সম্রাটের অন্যতমা মহিষী সুলতানা সালিমা বেগম, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই যুক্তি একেবারেই অসঙ্গত; কারণ, সালিমা বেগমকে আকবর শাহ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি বৈরাম খাঁর বিধবা-স্ত্রী ও মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন।

এই সমস্ত সংগৃহীত বিষয় একত্রিত করিলে আমরা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, সম্রাট্ আকবর শাহের মরিয়ম বা মেরী নাম্নী একজন খৃষ্টান্ বেগম ছিলেন। ইহার আর একটি শেষ প্রমাণ উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। সেকেন্দ্রায় আকবর শাহের সমাধি-মন্দিরের নিকট একজন খৃষ্টান চির-নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক মুসলমানের সমাধি-মন্দিরের নিকট মর্ম্মর প্রস্তর-খণ্ডে কোরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাদি খোদিত আছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কবরের কীর্ত্তি-স্তম্ভে সেরূপ কিছুই খোদিত নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, এই মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কোন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী নিহিত রহিয়াছেন; কারণ, সাধারণতঃ খৃষ্টান্ ও মুসলমানদের মৃতদেহই কবরিত হইত। তবে ইহা যে নিশ্চয়ই মেরী বেগমের সমাধি-মন্দির, তাহা বলিতে পারি না—একটা অনুমানমাত্র; কারণ, অপরাপর মুসলমান বেগমগণের মধ্যে সম্রাটের সমাধি-মন্দিরের অদূরে কোন বেগমেরই মৃতদেহ সমাহিত থাকা সম্ভব এবং সেই বেগম খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী।

শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

* Elliot's Translation. Vol. v.

† History of the rise of the Mahomedan power (Translated by John Brigg. vol. 11. "Feristha, was a contemporary of Akbar but was never brought into personal contact with him; he lived in the Deccan and visited Hindusthan only after the emperor's death."—John Briggs.

‡ Tobaqut-1-Akbari. Translated by Elliot and Dowson.

* "This Rajputani is probably the mother of Akbar's eldest son Selim (Jahangir)"—The Emperor Akbar, vol 1.

cf. also J. A. S. B. vol. L XV1. 164 (H. Beveridge Trs) কেহ কেহ ইঁহাকে যোধবাঈ বেগম বলিয়া অভিহিত করেন।

† The Emperor Akbar, vol 1.

* Emperor Akbar, vol. 1.

cf. Elliot, v, 531 and Blochmann also.

* Mahomedan historians mention her by the like of honour, Maryom Uzzamani"—Frederick Augustus.

তৃণ-ফুল

(GOETHE)

১

একটি নির্ম্মল শুভ্র ক্ষুদ্র তৃণ-ফুল
প্রান্তরের কোণে,
ছিল যেন আপনাতে লুকায়ে আপনি
ফুটিয়া গোপনে।
তরুণী কৃষক-বালা আপনার মনে
গান গাহি' সুখে,
আসিল সে পথে একা শারদ প্রভাতে
হাসিভরা মুখে।

২

ফুল ভাবে, 'আমি যদি না হয়ে নির্গুণ
ক্ষুদ্র তৃণ-ফুল,
হইতাম উদ্যানের পুষ্প মনোহর—
সৌরভে অতুল,
আমার বাঞ্ছিতা আজি সযতনে মোরে
তুলি' লয়ে করে,
রাখিত আদরে তার বক্ষের উপর
অর্দ্ধদণ্ড তরে।'

৩

ক্ষুদ্র সেই ফুল, হায়, হেরিল না বালা
বারেক নয়নে!
সে গেল চলিয়া—তুচ্ছ তৃণ-ফুলটিরে
দলিয়া চরণে।
কহিল কুসুম—'আমি মরিলাম, তাহে
ক্ষতি কিছু নাই;
তোমারি চরণতলে সঁপিনু পরাণ—
সুখী আমি তাই।'

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

বঙ্গদেশে ইংরাজি-শিক্ষার ইতিহাস

সূচনা:—শিক্ষা বলিতে কেবলমাত্র ইংরাজি-শিক্ষা বুঝায় না; যাহার দ্বারা মানব-মনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়, তাহাই শিক্ষা। এই শিক্ষা সভ্য-জগতে নানা ভাষার দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে; তথাপি শিক্ষা বলিতে আমরা যে কেন ইংরাজি-শিক্ষা বুঝি, তাহারও একটা সহজ কারণ আছে। নিষ্কম্প, নিশ্চেষ্ট, মৃতপ্রায় ভারতের ধমনীতে আজ আবার রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া, ভারতবাসীর চক্ষের সম্মুখে অদূর ভবিষ্যতের মধ্যে মহিমার স্বর্ণ-তুলিকায় একটা বিরাট্ আদর্শের চিত্র কেবল যে ইংরাজি-শিক্ষার সাহায্যে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা নয়; কিন্তু আজ সভ্যতার খরস্রোতা বন্যার যে বিপুলতা ভারতের দীন পর্ণ-কুটীরের দ্বার ভেদ করিবার উপক্রম করিতেছে, তাহার সহিত যোগ রাখিয়া কার্য্য করিতে হইলে, ইংরাজি-শিক্ষার আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই; এইজন্য ভারতবাসী শিক্ষা বলিতে অন্য শিক্ষার ধারণা সহজে করিতে পারে না; আর সেইজন্যই আজ শিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা-সমিতিতে আমি "বঙ্গে ইংরাজি-শিক্ষার ইতিহাস"-সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শিক্ষার সূত্রপাত:—পুরাণে লিখিত আছে যে, অভিশপ্ত সগর-কুলের জন্য কোন্ সুদূর অতীতে একদিন তপনিরত ভগীরথ, পতিতপাবনী সুরধুনীকে তপে তুষ্ট করিয়া, হিমালয়ের পাদনিঃসৃতা রজত-ধারা-রূপিণী গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়াছিলেন; আর আজ সেই ক্ষীণা ধারা লহরে লহরে, তরঙ্গে ও লাস্যে, উচ্ছ্বাসে ও প্লাবনে বিরাট্ হইতে বিরাটতর হইয়া বঙ্গের শ্যামল প্রান্তর ভাসাইয়া চলিয়াছে। ইহাকে পৌরাণিক উপাখ্যানই বলুন আর কবির কল্পনাই বলুন, তাহাতে কিছুই আসে-যায় না; কিন্তু বঙ্গে ইংরাজি-শিক্ষার ইতিহাসের গোড়ার কথা একটু অলঙ্কারের সহিত বলিতে হইলে, ইহার অধিক আর কিছু বলা যায় না। যখন অভিশপ্ত বঙ্গবাসী অজ্ঞানতার গভীরতম গহ্বরে ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে নির্জ্জন-সাধনায়-সমাহিত ভারতের উন্নতিলিপ্সু কতিপয় মহাত্মাগণের চেষ্টায় বঙ্গে ইংরাজি-শিক্ষার ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হয়। তাহার ক্ষীণাকৃতি দেখিয়া কেহ-বা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল, কেহ-বা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল; কিন্তু আন্দোলন ও প্রতিবাদ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল! রাজা রামমোহন রায় মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া যখন তাহাকে বরণ করিয়াছিলেন, তখন কেহ স্বপনেও ভাবে নাই, সূত্রপাতে যে এত ক্ষুদ্র, পরিণতিতে সে-ই একদিন সমস্ত বাঙ্গালীর শুষ্ক চিত্ত, সিক্ত করিয়া, শ্যামল করিয়া, উর্ব্বর করিয়া তুলিবে; সুতরাং আজ যাহা বিরাট্, একদিন তাহা ক্ষুদ্র ছিল; ক্ষুদ্র সূত্রপাতের ইতিহাসও নগণ্য—যৎসামান্য—ক্ষুদ্র।

কৃষ্ণবসনা রজনীর অবসানে যেমন বিস্তৃত পূর্ব্ব-গগনের এক ক্ষুদ্র কোণে লোহিতাভা ফুটিয়া উঠিয়া, দিনমণির আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করে, তেমনই আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের গগনপট হইতে তামসরূপী মুসলমান-শাসন অল্পে অল্পে অপসৃত হইবার পূর্ব্বাহ্নে, ক্ষুদ্র বঙ্গের ক্ষুদ্রতম পলাশী-প্রান্তরে ইংরাজের লোহিত বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়া ভারতে

নূতন যুগের আভাস দিবার পরও বহু বৎসর নিঃশব্দে অতিবাহিত হইয়া যায়। তারপর ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ হইতেই বর্ত্তমান ভারতের স্ত্রপাত হয়। ঐ সময়েই বঙ্গবাসিগণকে সুশিক্ষিত করিবার চিন্তা কর্ত্তৃপক্ষের মনে উঠে এবং তাহারই ফলে ভারতের শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌কর্ত্তৃক কলিকাতায় "Calcutta Madrasa" নামক ইংরাজি বিত্থালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে শিক্ষার স্ত্রপাত না বলিয়া ব্যক্তিগত খেয়াল বলিলে যদি আপনারা সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাই বলুন; কিন্তু শিক্ষার ইহাই স্থচনা; ইংরাজিতে বলিতে হইলে, The first stirring—জাতীয় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে কোমল সুরের একটি মরিচাধরা তার ছিল, তাহাতে এই প্রথম আঘাত পড়িল। আজ যদি আর কোন মধুর সঙ্গীত আপনাদিগের শ্রুতি-বিনোদন করিয়া থাকে, তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার সেই অনাদৃত তারটী হইতে উঠিতেছে।

কোম্পানী-রাজত্বের ইতিহাস-আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, ভারতে ইংরাজ-শাসন যে পরিমাণে বদ্ধমূল হইতে থাকে, সেই পরিমাণে দেশবাসীর মঙ্গলসাধনের চেষ্টা কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে দেখা যায়। ইহা স্তাবকতা নয়, সত্য। সপ্তদশ শতাব্দীর ঊষাকালে সাগর-চুম্বিত স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, বিরাট্ অম্বুরাশি মন্থন করিয়া, যে কতিপয় য়ুরোপীয় বণিক্, দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার পর দীনভাবে আড়ম্বর-প্রবণ মোগল-সম্রাটের দরবার-কক্ষে অতি সন্ত্রস্তভাবে দেখা দিয়াছিল, তাহারাই আবার বাণিজ্যের পসরা ফেলিয়া যখন বঙ্গের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া বসিল, তখনই ভারতের ইতিহাসে একটি অভিনব অধ্যায় যোজিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ সেই কৌতুককর অধ্যায়টি পাঠ করিয়া যত না পুলকিত ও বিস্মিত হইবেন, সেই বণিক্‌দলের রাজধর্ম্মের শ্রদ্ধা ও দেশবাসীর উন্নতি-চেষ্টার কথা পড়িয়া ততোধিক বিস্ময় বোধ করিবেন। অধঃপতনের গভীর গহ্বর হইতে উঠাইয়া লইয়া, আপনাদিগের সহিত সভ্যতার একই সিংহাসনে বসাইয়া, বিজেতা ও বিজেতৃ-ভাব গোড়া হইতেই দূর করিবার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে কত বড় হৃদয়ের প্রয়োজন, তাহা তুলনামূলক উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে যাইলেই Odious হইয়া উঠিবে। তথাপি বলি,—আজ আপনারা বিংশ শতাব্দীর কথা ভুলিয়া যান, মানস-দর্পণের সম্মুখে একবার ধরুন স্থষ্টির সেই প্রভাতের চিত্র—যখন গৌরবর্ণ আর্য্যঋষিগণ সামগানে আকাশ ভরিয়া তুলিয়া, সরস্বতীর লহর-চুম্বিত পবিত্র জনপদসমূহে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন কোথায় ছিল ভারতের গৌরবের ইতিহাস, কোথায় ছিল তাহার আর্য্য-সভ্যতা? অনার্য্য-সেবিত ভারত-ভূমিতে আর্য্যগণের পদার্পণে, ভারতের ললাটে গৌরব-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তপোবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঋষিগণের জ্ঞানানুশীলনে পরিবর্দ্ধিত আর্য্য-সভ্যতার বিরাট্ সিংহাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে যখন দেশে দেশে চঞ্চল বারতা প্রেরিত হইয়াছিল, তখন সেই সিংহাসনের পুরোভাগ সজ্জিত করিয়া দাঁড়াইবার জন্য, ভারত-জননীর বৃদ্ধ সন্তানগণ—ভারতের আদিম অধিবাসিগণের উদ্দেশ্যে প্রেমের আহ্বান, সে বারতা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরে নাই। তাহারা বর্ব্বর, হেয়, অস্পৃশ্য—আর্য্য-সভ্যতার কঠিন চাপে আজও তাহাদিগের জানু নত, মেরুদণ্ড ভগ্ন, পেশী দুর্ব্বল, চক্ষে অবিশ্বাসের চাহনি। আর এই গত বৎসর ইংরাজি-শিক্ষায় কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ভাবিয়া দেখুন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে Lord Minto ঠিক এই ভাবের পরিবর্ত্তনের আশা তাঁহার Minute এ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কতকটা তাঁহার চেষ্টায় ও কতকটা ইংরাজজাতির উৎসাহে শিক্ষার ক্রমশঃ সুবন্দোবস্ত হইতে থাকে। ব্যক্তিগত ও মিশনারিগণের চেষ্টার কথা পরে বলিতেছি। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে, প্রতি বৎসর একলক্ষ মুদ্রা সরকার হইতে শিক্ষার উন্নতি-কল্পে ব্যয় করিবার সংকল্প স্থিরীকৃত হইলে, A commitee of Public Instruction নামক একটি শিক্ষা-সমিতি গঠিত হয়। নিয়মিতভাবে প্রকৃতিপুঞ্জকে শিক্ষা দিবার ইহাই প্রথম ব্যবস্থা।

পর্ব্বত-নিঃসৃতা একটি ক্ষীণ ধারাকে দেখিয়া মনে হয়, ইহার গতি নির্দ্ধারণ করা কঠিন নয়; কিন্তু যখন আবার সেই ক্ষীণ ধারা স্ফীত হইয়া, শত মুখে সাগরের দিকে ছুটিতে থাকে, তখন আর কে তাহার গতি নির্দ্ধারণ করিবে? তখন একটি শাখার কথা বলিতে যাইলে, অপর শাখার কথা বলা হয় না। বঙ্গে ইংরাজি-শিক্ষার ইতিহাস দিতে যাইয়া, আমরা এইবার ঠিক এই অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। একদিককার ইতিহাস আলোচনা করিতে যাইলে অপর দিক বাদ পড়িতেছে। একদিকে সরকারের চেষ্টা, অপর দিকে দেশের নেতৃবৃন্দের উৎসাহ, আবার তাহার উপর মিশনারিগণের কর্ম্মকুশলতা বঙ্গে শিক্ষা-প্রচারের চেষ্টাকে সফলতা দিবার জন্য দেশে যখন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সংস্কারক ভাস্করগণ বিলাতী মাল-মসলা লইয়া বিলাতী ছাঁদে বীণা-বাদিনীর নব মূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতেছিল, প্রবীণগণ মাথা ঘামাইয়া সংজ্ঞা মিলাইয়া বড় বড় নক্সা প্রস্তুত করিতেছিল, স্থপতি-বিত্থা-বিশারদগণ বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় এক রাত্রের মধ্যে বড় বড় বিত্থামন্দির গড়িয়া তুলিতেছিল, আর সংস্কারক শিল্পিগণ বাটালির আঘাতে "নব্যভারত" গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত,—চারিদিকে একটা 'সাজ সাজ' ভাব। কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যে এই কর্ম্মকুশল যুগের ইতিহাস আলোচনা করা সহজ নহে।

শ্রীরামপুরে মিশনারি

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ভাগীরথীর পবিত্র উপকণ্ঠ-সংলগ্ন শ্রীরামপুর-সহরে মিশনারিগণের চেষ্টায় একটি কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতা হইতে দূরে বসিয়াও, মিশনারিগণ শিক্ষার বিস্তার-কার্য্যে দেশবাসী ও কর্ত্তৃপক্ষকে কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস অল্প-বিস্তর অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু এইটুকু কার্য্য করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই। যখন মাতৃপূজার মঙ্গল-বাদ্য বঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তখন যে কয়জন মাতৃপূজক মাতৃপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহারা অন্যতম। বঙ্গের প্রান্তরে মাতৃপূজার অত্যুচ্চ বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মাতৃপূজা দেখিবার জন্য সমবেত; মাতৃপূজার প্রধান পুরোহিত রাজা রামমোহন রায় অর্ঘ্য-হস্তে দণ্ডায়মান, ছোট-বড় আরও কত পূজক তাঁহাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে বাঙ্গালীর, বঙ্গভাষার, জননীর পূজার পুরোহিত বিদেশী—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

হিন্দু-কলেজ :—

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি কলিকাতায় হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হয়। Sir Edward Hyde, David Hare এবং রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই এই কলেজ স্থাপিত হয়। ক্ষুদ্র বীজটি যখন মাটির মধ্যে

মাথা গুঁজিয়া থাকে, তখন কেহ ভাবিতে পারে না যে, একদিন এই ক্ষুদ্র বীজ হইতেই বৃক্ষোদ্গম হইবে, আর তাহার শাখায় শত শত পক্ষী আশ্রয় পাইবে, তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় আতপক্লিষ্ট পথিকের শ্রান্তি দূর হইবে, তাহার সুমিষ্ট ফলে ক্ষুধার শান্তি হইবে। হিন্দু-কলেজ-স্থাপনের সময়ে কেহই ভাবে নাই, ইহার শক্তি কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে; কিন্তু আজ আমরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিতে পাইতেছি, এই বিত্থা-মন্দির-স্থাপনের পর ইহার প্রভাব পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর উপর অক্ষুণ্ণ ছিল। সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, বিত্থাপ্রচার প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ ইহার প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই।

যখন মেঘমালা পর্ব্বতের বন্ধুর অঙ্গে আপনার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম এলাইয়া দিয়া, দামিনীর কণ্ঠহারে ভূষিত হয়, তখন পর্ব্বতের নিম্ন হইতে মুহুর্মুহু মেঘের গর্জ্জন ও অশনিপাত শুনিয়া মনে হয়, বুঝি-বা অগ্নি উদ্গীরণ করিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি; কিন্তু বর্ষার আগমনে প্রকৃতির মধ্যে যখন সূর্য্যের লোহিত চক্ষু ফুটিয়া উঠে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়, পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া ক্ষীর-ধারাবৎ জলরাশি নিম্নভূমিতে আসিয়া বীজের পরিণতি সাধন করিয়া, ফল পাকাইয়া, সোণার ক্ষেত ভরিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজি-শিক্ষার প্রথম ইতিহাস অনেকটা এইরূপ। ইংরাজি-শিক্ষার প্রথম প্রচারের সময়ে, প্রথম ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পুরাতন সমাজ-রীতির প্রতি বিদ্যুৎতুল্য ভ্রূকুটি নেতৃদলের তিরস্কারের মেঘমন্দ্র-গর্জ্জন এবং ইংরাজি-শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের সর্ব্ববিধ অনাচার লক্ষ্য করিয়া দেশবাসিমাত্রই ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই নূতন শিক্ষা যে গরল-ভাণ্ড হস্তে অবতারিণী মূর্ত্তিতে বাঙ্গালায় উপনীত হইয়া, অশান্তির বজ্রাঘাতে বাঙ্গালীর গৃহের সকল সুখ চূর্ণ করিয়া দিবে, সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। ফলে ঘোর প্রতিবাদের স্থচনা হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

পাতা-ঝরা

১

কি শীতল শীতের বাতাস!
কুয়াশায় ঝাপ্‌সা আকাশ,
কানন মর্ম্মরে—
শিশিরেতে ভিজিতে ভিজিতে,
শূন্যপথে ঘুরিতে ঘুরিতে,
পাতাগুলি ঝরে।
শুষ্ক হয়ে শষ্প 'পরে পল্লব শুকায়,
সমীরের দীর্ঘশ্বাস করে হায় হায়।

২

এইমত অবনীর মাঝে
আঁধিয়ার জীবনের সাঁঝে
মোরা দীন প্রাণী—
মরমের ফুলের বাগানে,
মরণের হিমকর হানে
ভাঙ্গে ফুলদানী!
জীবন-পল্লব পড়ে চিতার উপর,
পিছে ঝরে স্বজনের নয়ন-নিঝর।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

করুণার জয়

(চিত্র)

বাসন্তী সন্ধ্যা। শাক্য-রাজধানী কপিলবস্তুর লুম্বিনী-রাজোদ্যানে বসন্তের সান্ধ্য সমীর গাছের পাতা, অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত পুষ্প-মুকুলগুলিকে স্নিগ্ধ ও আন্দোলিত করিয়া বহিতেছে।

রাজোদ্যানের তৃণ-শ্যামল চরণ ধৌত করিয়া জল-বেণী দুলাইয়া নৃত্যচঞ্চলা রোহিণী নদী অজানার উদ্দেশে বহিয়া যাইতেছে।

তখনও দূরে দূরে সেই পশ্চিমের দিক্-চক্রবালে তপনের শেষ কিরণ অলক্তরাগের ন্যায় ছড়াইয়া আছে। পশ্চিমের একখণ্ড রাঙ্গা মেঘান্তরাল হইতে কয়েকটী স্বর্ণ-কিরণ রোহিণীর নীল বুকে পতিত হইয়া, তাহার সৌন্দর্য্যরাশিকে আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল।

উদ্যানের মর্ম্মর-প্রস্তরের বেদিকায় একটী বালক উপবিষ্ট। এই বালকটিই শাক্যবংশের একমাত্র বংশধর, মহারাজ শুদ্ধোদনের নয়ন-পুতলী, কুমার শাক্যসিংহ। কুমারের মাতৃপ্রদত্ত আর এক নাম গৌতম।

কুমার সেই অস্তগমনোন্মুখ, তপন-কিরণ-রঞ্জিত, মেঘের শোভা দেখিয়া আত্মহারা হইতেছেন, কখন-বা অদূরে শীর্ণা রোহিণী নদীর অস্ফুট কলতানে মুগ্ধ হইয়া আপনার হৃদয়কে ভাব-রাজ্যে ডুবাইয়া দিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে সেই কয়েকটি অস্তগামী স্বর্ণ-কিরণও পশ্চিম-গগনে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গেল।

কুমার তখনও নিশ্চল—তখনও সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তন্ময় ও আত্মহারা। মাথার উপর নীলাকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে কত বন-বিহঙ্গ মধুর সঙ্গীতে উদ্যান মুখরিত করিয়া কুলায়ে ফিরিতেছে!

এমন সময় একটি পক্ষী বাণবিদ্ধ হইয়া বেদিকার অদূরে পতিত হইল।

কুমারের চমক ভাঙ্গিল।

কুমার ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, পক্ষীটি যাতনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। সে আপনার ক্ষুদ্র শক্তি—দেহের সমগ্র শক্তি এক করিয়া আপনাকে বাণ হইতে বিমুক্ত করিতে ব্যর্থ চেষ্টা পাইতেছে।

কিন্তু হায়! তাহার ক্ষুদ্র শক্তি সমস্তই বিফল হইতেছে! অভাগা পাখী কিছুতেই আপনাকে সেই প্রাণঘাতী অস্ত্রের নিদারুণ চুম্বন হইতে বিমুক্ত করিতে পারিতেছে না। বাণ পক্ষীর পাখায় বিদ্ধ—মৃত্তিকা শোণিতে রঞ্জিত।

এ দৃশ্যে কুমার আপনার সরল হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলেন। ক্ষুদ্র বিহঙ্গের অসহ্য যন্ত্রণা তাঁহার মর্ম্মে গিয়া আঘাত করিল। পক্ষীর এরূপ অবস্থা দেখিয়া দু'টী বিশালায়ত করুণ নয়ন সজল হইয়া উঠিল।

কুমার আর থাকিতে পারিলেন না; অতি যত্নে, অতি আদরে সেই মুমূর্ষু পক্ষীটিকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, কুমার সেই পক্ষীটিকে বাণ হইতে মুক্ত করিলেন।

পক্ষীটি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ডাকিয়া উঠিল, কুমার বোধ করিলেন যেন এ আঘাত তাঁহারই বক্ষে বাজিতেছে।

পক্ষীর শোণিতে কুমার গৌতমের রাজ-পরিচ্ছদের কিয়দংশ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। কুমার পক্ষীটিকে নিকটস্থ একটি কৃত্রিম নির্ঝরে লইয়া গিয়া, তাহার ক্ষতস্থান সযত্নে ধৌত করিয়া দিলেন। কুমারের শুশ্রূষায় আহত পক্ষীটি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

কুমার পক্ষীটিকে বক্ষে চাপিয়া নির্ঝর হইতে ফিরিতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে কহিয়া উঠিল, "একি গৌতম! এ পক্ষীটি যে আমার, আমি ইহাকে মারিয়াছি, আমার পক্ষী আমায় দাও।"

কুমার ফিরিয়া দেখিলেন, প্রশ্নকারী তাঁহারই জ্ঞাতি-ভ্রাতা, খেলার সঙ্গী দেবদত্ত।

কুমার সজল নয়নে আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই দেব! তুমিই কি এই পক্ষীটিকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে আহত করিয়াছ?"

উত্তর হইল, "হাঁ কুমার! আমি প্রাসাদের শিখরদেশে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য স্থির করিতেছিলাম; আমারই অব্যর্থ সন্ধানে এই পক্ষীটি আহত হইয়াছে। এটি আমার শিকার; সুতরাং আমারই প্রাপ্য। পক্ষীটি আমায় দাও।"

কুমার অশ্রুসিক্তনয়নে দেবদত্তের প্রতি চাহিলেন। সে সজল চাহনি যেন কত বেদনাপূর্ণ, মিনতিমাখা স্বরে বলিতে চাহে—কেন ভাই, তুমি ইহাকে নিষ্ঠুরভাবে আহত করিলে? এ কত ক্ষুদ্র! ইহারও ত আমাদের ন্যায় সুখ-দুঃখ-অনুভবের শক্তি আছে! কি হইবে ভাই, প্রাণিবধ করিয়া—দাও ইহাকে আমায় ভিক্ষা দাও।

দেবদত্ত বোধ হয় যেন এ বেদনামাখা চাহনির অর্থ বুঝিল। সে কহিল, "না কুমার, সে কি হয়! এ যে আমার শিকার, আমি কিছুতেই ইহা দিতে পারিব না; আমরা ক্ষত্রিয় রাজকুমার, রমণীর ন্যায় কোমল হইলে আমাদের চলিবে কেন? দাও ভাই, আমার শিকার আমায় ফিরাইয়া দাও।"

কুমার গৌতম সেই আহত পক্ষীটিকে জননীর ন্যায়, আরও নিবিড়ভাবে বুকের ভিতরে চাপিয়া কহিলেন, "না দেব! প্রাণ থাকিতে কিছুতেই এ পক্ষীটিকে তোমায় ফিরাইয়া দিতে পারিব না।"

তখন ভরা সাঁঝের গভীর আঁধার সেই পুষ্প বিচিত্র রাজোদ্যানকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

২

পাখী লইয়া কুমার গৌতম ও দেবদত্তের কলহ সহজে মিটিল না। যথাসময়ে এ কলহের বিষয় মহারাজ শুদ্ধোদনের কর্ণগোচর হইল।

তিনিও দুইজনের মধ্যে পক্ষী কাহার হওয়া উচিত, সে বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না।

তখন, রাজ-আজ্ঞায় এক পণ্ডিত-সভা আহূত হইল।

* * * *

মহারাজ শুদ্ধোদন সিংহাসনে উপবিষ্ট। পার্শ্বে একটি সিংহাসনে কুমার গৌতম সেই আহত পক্ষীটিকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্ট এবং অপরটিতে দেবদত্ত।

আজ উভয়েই পক্ষীটিকে লইয়া বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজ-সভায় আসিয়াছেন। বিশাল সভা।

পাত্র, মিত্র, অমাত্য, পণ্ডিতবর্গ সকলেই যথাস্থানে উপবেশন করিয়াছেন।

পুর-মহিলারাও আজ এই অদ্ভুত বিচার দেখিতে যবনিকার অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছেন।

মহারাজ শুদ্ধোদন মতামতের ভার উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলীর উপর প্রদান করিলেন।

বহু তর্ক-বিতর্ক, শাস্ত্রোক্তি, বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, প্রাণঘাতী অপেক্ষা প্রাণ-রক্ষাকারীর স্বত্বই অধিক।

কুমারের জয় হইল।

কয়েক দিবস পরে যখন সেই আহত পক্ষীটি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিল এবং যখন সে উড়িবার ক্ষমতা ফিরিয়া পাইল, তখন কুমার তাহাকে সেই উদ্যানে লইয়া গেলেন।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। অস্তগামী রবির সুবর্ণ-কিরণ, উদ্যানের দেবদারু, বকুলবৃক্ষের শ্যাম-চূড়ার উপর হইতে ধীরে ধীরে মায়া-দৃশ্যের মত সরিয়া যাইতে ছিল।

আকাশ নির্ম্মল কর্পূরের মত ধবল—সেখানে মেঘের চিহ্নমাত্র ছিল না। কেবল পশ্চিমাকাশে একখণ্ড চঞ্চল শুভ্র মেঘ, অস্তগামী রবি-করে রঞ্জিত হইয়া শরীরী জাগ্রৎ স্বপ্নের মত দেখাইতেছিল।

রবিকরগুলিও ঠিক এই মেঘের মধ্যেই লুকাইতে চেষ্টা করিতেছিল। উদ্যানের পাদমূল ধৌত করিয়া, এক অস্ফুট কল-তান বুকে ধরিয়া, রোহিণী নদীও ঠিক অন্যান্য দিবসের মতই ছুটিতেছিল।

আকাশের সেই মেঘখণ্ডের প্রতিবিম্ব রোহিণীর নীল জলে পড়িয়া, ঢেউয়ের তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল।

নীলাকাশ দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বন-বিহঙ্গ কুলায়ে ফিরিতেছে।

কুমার গৌতম ক্রোড়স্থিত পক্ষীটিকে ছাড়িয়া দিলেন।

পক্ষীটিও স্বাধীনতা পাইয়া একবার সেই করুণ-হৃদয় রক্ষকের প্রতি তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে ডাকিয়া উঠিল, যেন তাহার বিহঙ্গ-ভাষায় আপন ক্ষুদ্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা কুমারকে জানাইয়া দিল। তাহার পর সেই অসীম নীলাকাশের মাঝে মনের সুখে এক করুণ হৃদয়ের ভগ্ন গাথা গায়িতে গায়িতে পাখীটি এক অজানা প্রদেশে চলিয়া গেল। করুণার জয় হইল।

গোধূলির অস্পষ্ট আঁধার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দূরের রাজ-দেবালয়ে দেবতার মঙ্গল আরতি বাজিতেছে।

শ্রীহরিপদ দে

মানব-সভ্যতার একপৃষ্ঠা

আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, মানব ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিতেছে। কোন্ অতীতকালে, মানব যখন পশু-চর্ম্মে গাত্র আবৃত করিয়া, আম-মাংসে উদর পূরণ করিত, তখন মানব এবং পশুতে কোন পার্থক্য ছিল না। মানব পশুরই ন্যায় গুহার মধ্যে বা বৃক্ষ-গহ্বরে নিশাযাপন করিত। তাহার পর, কে জানে, কত বৎসর অতীত হইল, মানব সভ্য হইল। মানব বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিল, মানব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতে শিখিল, মানব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল, আম-মাংস ত্যাগ করিয়া সিদ্ধ মাংস খাইতে লাগিল; এক কথায় বলিতে গেলে, মানব সভ্য হইল। মানব যে সভ্য হইল, ইহার অর্থ কি?

পূর্ব্বে, মানব পশুদের ন্যায় আম-মাংস ভক্ষণ করিত, তাহাদেরই ন্যায় উলঙ্গ থাকিত; কিন্তু এখন তাহারা বস্ত্র বয়ন করিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে শিখিল এবং সিদ্ধ-মাংস খাইতে আরম্ভ করিল। এই দুইটী কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, মানব তাহার নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বেশ গুছাইয়া লইল এবং একটু আয়েসী হইল। তাহার পর? তাহার পর মানব দেখিল, পশু-হনন অপেক্ষা পশু-পালনই অধিক লাভজনক। তখন হইতে তাহারা গাভী ইত্যাদি যে সমস্ত জন্তু গৃহে পালিত হওয়া সম্ভব, তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিল। মানব এখন ভবিষ্যদ্-দর্শী। আদিম অসভ্য অবস্থায় মানব 'কল্য কি খাইব' ভাবিত না; যেখানে সেখানে শয়ন করিত; যাহা পাইত, আস্বাদহীন, কটু না হইলেই খাইত। তাহার পর মানবের ভবিষ্যৎ-চিন্তা আসায়, মানব কর্ম্মী হইল। কর্ম্ম-জীবনের প্রথম সোপান পশু-পালন।

এখন কথা হইতেছে, কে এই অসভ্য, জানোয়ার-প্রকৃতি মানবকে কর্ম্মী করিল এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তা হৃদয়ে পোষণ করিতে শিক্ষা দিল? তাহার জন্য আমাদিগকে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। নারী মানবকে মানব করিয়া গড়িয়া তুলিল। আদিম অসভ্য অবস্থার দুর্দ্ধর্ষ-প্রকৃতি মানব যখন স্বভাবের ন্যায় উদ্দাম স্বাধীনতায়, হেথা-সেথা ছুটিয়া বেড়াইত, তখন পশুদের ন্যায়, মানবে মানবে অনবরত খাদ্যদ্রব্য লইয়া লড়াই-হাঙ্গামা হইত। নম্র-প্রকৃতি রমণীগণ, সহজেই মানবের বশ্যতা স্বীকার করে। রমণীগণই জগতের প্রথম ক্রীতদাসী। মানব: রমণীগণকে বলে পরাস্ত করিয়া তাহাদের ভক্ষণ করিত। দুর্ব্বলা রমণী মানবগণের ভোজ্য দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হইত। এমন সময় আসিল, যখন স্বেচ্ছাচার মানব বুঝিতে পারিল, রমণীগণকে জিয়াইয়া রাখিলে তাহাদের দ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারিবে। এই চিন্তা আসিবামাত্রই মানব, রমণীগণকে ক্রীতদাসীরূপে পরিণত করিয়া তাহাদের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লইতে লাগিল। রমণীগণ, সকল জাতির ভিতরেই আদিম অবস্থায় ক্রীত-দাসীরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহার পর আর একটী ঘটনা ঘটিল, তাহাতে সৃষ্টি রক্ষা পাইল। মানব দেখিল যে, রমণীগণ যে সুধু তাহার গৃহের দাসী তাহা নহে, সে তাহার ভোগ্য বস্তুগুলির মধ্যেও একটী নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তু। এই প্রবৃত্তি মানবের স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তিই সৃষ্টি রক্ষা করে। তাহা না হইলে, কে বলিতে পারে, আজ মানব নামক কোন জীব, ধরা-বক্ষে বিচরণ করিত কি না?

তৃতীয় স্তর—পুত্র। পুত্র আসিয়া সংসার বাঁধিল। নিষ্ঠুর মানব-হৃদয়কে কোমল করিয়া দিল। দেবদুর্ল্লভ শিশুর হাস্য মানবের মস্তিষ্কে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ঢুকাইয়া দিল। মানব দেখিল, সে একা নয়; মানব দেখিল, খাদ্য আর প্রত্যহ জুটে না অথবা প্রত্যহ যাহা জুটে, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে; মানবের ভবিষ্যৎ-চিন্তা আসিল। বন্য মানব, সভ্য সংসারীতে পরিণত হইল।

এই অবস্থায়, মানব যে সমস্ত পশু পোষ মানিতে পারে, তাহাদিগকে পালন করিতে লাগিল। স্ত্রী, পুত্র, গোরু, বাছুর লইয়া মানব সংসারী হইল। সংসারী হইয়া দেখিল, সংসারে বিপদ অনেক। বন্য অবস্থায় সে যখন স্বাধীন ছিল, যখন তাহার ভবিষ্যৎ-চিন্তা ছিল না, তখন স্বাধীন বিহঙ্গমের ন্যায় সে যথা-ইচ্ছা বিচরণ করিত না। বন্য পশুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইত; কিন্তু এখন হাঙ্গাম যথেষ্ট। এখন তাহাকে, তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত, গৃহপালিত পশুদিগকেও রক্ষা করিতে হইবে। মানব দেখিল, সে একা এত কার্য্য করিতে পারিবে না; তাই সমাজের উৎপত্তি। মানব দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। পশু-চারণ অবস্থা হইতে মানব দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে শিখিয়াছে।

একজায়গায় একটী মানবের দল, তাহাদের পরিবারবর্গ এবং গৃহপালিত পশুদিগকে লইয়া থাকিলে, সেখানকার যা-কিছু খাবার শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; এই জন্য মানবকে যাযাবর হইতে হয়। পশু-চারণের জন্য ভাল জমির সন্ধানে তাহাদিগকে দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান আরম্ভ করিতে হয়।

মনুষ্যের বংশ-বৃদ্ধির সহিত মনুষ্যের অভাব বাড়িয়া চলিল। ক্রমশঃ জমির অকুলান হইয়া আসিতে লাগিল। মানব তখন আরও সহজ উপায়ে জীবিকা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন কৃষি-শিল্পের উৎপত্তি হয়। বন্য মানব এখন চাষী মানবে পরিণত হইল। কৃষিকার্য্যের সহিত, মানবের যাযাবর-বৃত্তি খসিয়া পড়িল। মানব স্থায়ীভাবে বাস করিতে লাগিল।

অভাব প্রথমে মানবকে কার্য্য করিতে শিখায়। দারুণ শীত-বায়ু যখন মানবের নগ্নগাত্রের উপর দিয়া চলিয়া যাইত, মানব তখন ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিত; বর্ষার অবিরাম বারিপাত যখন তাহার মাথার উপর স্রোতস্বতীর বন্যা চালাইয়া দিত, তখন তাহার কণ্ঠাগত-প্রাণ হইত। উন্নতিশীল মানব, এই সব নৈসর্গিক অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য, শীতবস্ত্র এবং গৃহ-রচনা করিল। এইরূপে বন্য মস্তিষ্ক, স্বভাবের পীড়নে সভ্য মস্তিষ্কে পরিণত হয়। সভ্য মস্তিষ্ক কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না—সভ্য মস্তিষ্ক কার্য্য চায়; তাই সভ্য মস্তিষ্ক নানাপ্রকার বাহারী শীতবস্ত্র রচনা করিল; অসভ্য কুটীরের পরিবর্ত্তে সুন্দর প্রাসাদাবলী নির্ম্মিত হইতে লাগিল; কাজেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, অসভ্য মস্তিষ্ক স্বভাবের নির্যাতনে সভ্য মস্তিষ্কে পরিণত হইয়া; কর্ম্মপটু এবং কর্ম্মপ্রিয় হইয়া উঠে।

এই কর্ম্মপ্রিয়তা এবং কর্ম্মপটুতাই মানবকে উন্নতির উচ্চতম

সোপানে লইয়া যায়। মানব দেখিল, সুখ দুঃখের জন্য বা ভোগ-সুখের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই সমস্ত দ্রব্যগুলি সে যদি একা উৎপাদন করিতে যায়, তবে আর তাহার পরিশ্রমের অবধি থাকিবে না; সেইজন্য সে কার্য্য ভাগ করিতে শিখিল। যে, যে কার্য্যের উপযোগী, সে সেই কার্য্য করিতে লাগিল। জগতের পরিবর্ত্তন চিন্তাশীলতা এবং একাগ্রতার দিকে ধাবিত হইল।

মানব এখন সমাজপ্রিয় হইয়া উঠিল। একই দেশে নানা সমাজ গঠিত হইল; একই সমাজে আবার নানা উপশাখার সৃষ্টি হইল। মানবের মানব-মিলন-ইচ্ছা এখানেই শেষ হয় না। ইহার পর সে, নানাদেশের মানবের সহিত সখ্য-স্থাপন, ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, নানাপ্রকার ভাবের আদান-প্রদান করিতে থাকে। তখন এক বিরাট মানব-সঙ্ঘ সংগঠিত হইয়া উঠে, ইহাই সভ্যতার ক্ষুদ্র ইতিহাস।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

দীনবন্ধু ও হাস্যরস

(নাটক)

দীনবন্ধু মিত্রের সহিত পরিচয় গ্রন্থের ভিতর দিয়া। অফুরন্ত হাস্যরস, যাহা আমরা বাস্তবিক অপূর্ব্ব বলিয়া মনে করি, তাহা তাঁহার গ্রন্থের ভিতরই দেখিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"তাঁহার (দীনবন্ধুর) প্রকৃত হাস্যরসপটুতার এক শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।" এমন একটী মনুষ্য আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কল্পনা ততদূর পৌঁছে না বলিয়া অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই; যেহেতু, কল্পনা কদাচিৎ-ই সত্য স্পর্শ করে। হাস্যরস-রসিক বলিয়া দীনবন্ধুর যে খ্যাতি আছে, তাহা বিনাতর্কেই সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। এখানে একটি 'তবে' আছে। দীনবন্ধুর রসিকতা অনেক সময়ে মার্জ্জিত নহে। মার্জ্জিত কেশগুচ্ছ, মার্জ্জিত বদনমণ্ডল, মার্জ্জিত বাক্যালাপের মত তাহা কর্ত্তিত, সজ্জিত ও রচিত নহে। শ্লীলবাদী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া সে রসে যদি বঞ্চিত হন, তজ্জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হইতে হইবে না; কারণ সে রস সঞ্চিত সমুদ্রবিশেষ; তাঁহাদের দৃষ্টি না পড়িলে, বৃষ্টির অভাবে জল কমিবে না। শ্লীলতার খাতিরে নিমচাঁদ দত্তকে বাদ দিলে রসের একাদশী হইয়া পড়ে। চিত্র আঁকিতে চিত্রকরের তুলিকা সকল স্থানই স্পর্শ করে; তজ্জন্য তাহা ঘৃণ্য হইয়া পড়িলে, তেমন রুচিবান্‌কে ঔষধ দিতে হয়। খাঁটী জিনিষ, প্রকৃত জীবন্ত চিত্র চাহিলেই তাহা সুধুই গোলাপী অধর, বিলোল নেত্র, বঙ্কিম গ্রীবা ও আরক্ত কপোল বুঝায় না;—সমাজের মধ্যে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, যেমন নিমের মাতলামি, ঘটিরামের হাকিমি, অটলের নেকামি, আর 'সারে'র (Sir) জোরে খেতাবের আসামী ভোলানাথের পাকামি—এ সকলগুলির চিত্রও থাকা চাই। অনেক নিমেদত্ত যে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত অটলের চৈতন্যোদ্রেক করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; ঘটিরাম যে 'ক্যাব্‌লা'জাতীয় ডিপুটির 'ফোটোগ্রাফ', তাহা অনেক ডিপুটিই গোপনে স্বীকার করিবেন; আর রাম-মাণিক্যকে দেখিয়াই যদি আমরা হাসি, তবে সে বলিবে—"হালা বালো কথা কইবার পারো না, ক্যাবল হাস্‌তিছ আর বাঙাল বাঙাল কর্‌তিছ!" হয়ত সে সত্যই পুঁটীমাছের কাঙ্গাল অথবা মিষ্ট কথার ভিখারী; কিন্তু তুমি যেইমাত্র বলিলে—'বাঙ্গাল পুঁটীমাছের কাঙ্গাল, বাঙ্গাল মিষ্টি কথার কাঙ্গাল'—শত 'বাগ্যধরী'র মাথার দিব্য দিলেও সে মেজাজ খাড়া রাখিতে পারিবে না; কাজেই বলিতে হইবে, চিত্র নিখুঁত।

মল্লিকার মত একটি চরিত্র কেবল সৌরভময় নহে, তাহার ভাব-ভঙ্গীটিও মধুময়। এখানেও একটু রুচির নথ-নাড়া আছে; তাহার কৈফিয়ৎ মল্লিকাই দিয়াছে। মালতী যখন স্বামীর সঙ্গে রঙ্গ করিয়া তিরস্কার করিল, অম্লান মল্লিকা কহিল—"তা রঙ্গ কর্‌বার জন্যে বুঝি পথের লোক ডেকে আন্‌ব? বলে, পরে দাঁতে মিশি, হ্যাখন হাসি, চুলে চাঁপা ফুল,—ধ'রে' পিরীত ক'রে' মজাবে দু'কুল।"

জলধরের মত মন্ত্রিপ্রবর 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা করিতে আসিয়া'—জগদম্বার হাতের খেঁড় বজায় রাখিতে 'হোঁদল-কুত-কুতে' সাজিয়া যে ঢোঁক্ গিলিয়া 'কোঁক্ কোঁক্' করিয়া-ছিলেন, তাহা মল্লিকারই শুভ্র চরিত্রের ও সূক্ষ্ম বুদ্ধির গুণে।

পদ্মলোচন যখন উচ্চাসনে-উপবিষ্ট জমিদারপুঙ্গবের সম্মুখে নিম্নাসনে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"ভদ্রতা রাখিতে অনেক বড়লোক খোঁড়া হয়ে পড়েন; গদী ছেড়ে ওঠেন না, পাছে (দীর্ঘ!) লাঙ্গুলটি বেরিয়ে পড়ে", তখন জমিদারবাবু গদী ছাড়িয়া উঠিলেন ও নামিয়া আসিয়া বলিলেন—মহাশয়, অসভ্যতা মার্জ্জনা কর্‌বেন।" এমন অবস্থায় পড়িলে অনেক জমিদারই গদী ছাড়িয়া উঠেন।

বৃদ্ধ বয়সে, যখন মানুষের তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকে, তখন কাহারও বিবাহ-'ফিবার' হইলে, সে রাজীব মুখোপাধ্যায়ের মত অবিকল বানর সাজে। তখনকার জন্য রতা নাপ্‌তে রূপ-'মিস্‌চারে'র বড় দরকার হয়। রতা নাপ্‌তের মতে তাহার গলায় 'জয় ট্যাম্‌টেমে' দিব্য সাজে। শ্মশান-যাত্রী হইয়া সে বরবেশে যাত্রা করিতে চায়, বিবাহের জন্য তাহার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ এত বেশী যে, ছাত্রদের মধ্যে পরীক্ষার ফল জানিবার জন্যও ততটা আগ্রহ দেখা যায় না। তাহাকে বুড়া বলিলে, সে হাড়ে চটিবে। কি অসামান্য পর্য্যবেক্ষণ-শক্তিবলে দীনবন্ধু রাজীব-শ্রেণীর হৃদয়ের ভাষা জানিয়াছিলেন—আশ্চর্য্য! নূতন বিবাহ করিলে, নবাগতা পত্নীকে তাঁহার কন্যা 'মা' বলিতে নারাজ দেখিয়া রাজীব চটিয়া লাল হইলেন, বলিলেন—"তুই তো তুই ছেলেমানুষ, তোর বাবা যে সে-ও তাকে মা বল্‌বে।" এর চেয়ে হাস্যকর, এর চেয়ে করুণ আর কি হইতে পারে?

রাজীব এক অদ্ভুত জীব। তাহার কথায় নেকামি, ব্যবহারে বাঁদরামি, কাজেও বোকামি। তাহাকে দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয়—"তোমা হেন গুণনিধি চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে হে!" রাজীবের মত জীবের অভাব সংসারে নাই; বরং দুঃখের কথা, যে রতা নাপ্‌তে ও ব্রাহ্মণ-পত্নী-পদ-প্রার্থিনী ডুমনীর প্রভাব কম হইয়াছে। সন্ধান করিলে অনেক রাজীবকে অনেক স্থানে বিরাজ করিতে দেখা যাইবে। দীনবন্ধু, বোধ করি, চিত্র সমধিক উজ্জ্বল করিতে রাজীবের সন্তানরূপে আনয়ন করিলেন—একটি খাস্ শূয়রের ছানা। কল্পনাকুশল চিত্রকর দেখিলেন—তাহার অন্য সন্তান হওয়া সম্ভব নয়; 'গঙ্গামুখো পা' করিয়া যাহারা গৃহে পত্নীস্থাপনা করেন তাহারা প্রায়ই শেষ গণ্ডুষজল ঐ অস্পৃশ্য জীবের হাতেই প্রাপ্ত হয়।

তারপর, জামাইবাবু পরিশোভিত, গঞ্জিকা-ধূম-পুঞ্জীভূত, নরলোকের অমরাবতীতুল্য "জামাই-বারিক।" কি বিচিত্র দেশ! গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে রসিক কবি তাঁহার বন্ধুকে লিখিয়াছেন—"তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ, সকলেরই অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই। বহুকালের পর তোমাকে একটি অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম।"—আজকাল বিবাহে কবিতার ছড়াছড়ি দেখিয়া কোন এক বৃদ্ধ শ্মশানে দাঁড়াইয়াও বিবাহ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি; "জামাই-বারিক" দেখিয়া উক্ত স্থানে অধিষ্ঠিত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা কাহারও মনে জন্মিলে বোধ করি, তাহা নিতান্ত দোষের হইবে না। একবার এক জামাইবাবুকে বলিয়া-ছিলাম—" 'জামাই-বারিক' পড়িয়াছেন?"

শিহরিয়া তিনি উত্তর দিলেন—"ভদ্রলোকে পড়ে!"

আমি উত্তর দিয়াছিলাম—"নিশ্চয়ই না; তাহারা যে বারিকে বার দিয়া বসে!"

অগ্নিতে ঘৃত দিতে দেখিয়াছি, কেমন জ্বলে! জামাইবাবু জ্বলিয়া উঠিলেন, কেরোসিনে আগুন লাগার মত। বলিলেন—"অশ্লীল! তোমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।"—পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি বারিকের গোরা সৈনিক। "জামাই-বারিকে"র যাহা উদ্দেশ্য, তাহা অতি স্পষ্টভাবেই ফুটিয়াছে; তাহাতে যাঁহাদের হুস হয় নাই, তাঁহারা পাষাণ নহেন, সেও তপ্ত হয়, তাঁহারা এঁদো পুকুরের পচা পাঁক। রৌদ্র তাঁহাদের গণ্ডার-চর্ম্ম ভেদ করিতে অক্ষম। অথবা তাঁহারা—

"বকো আর ঝকো আমি কাণে দিয়েছি তুলো,
আর মারো আর ধরো পিঠ করেছি কুলো"—

বলিয়া হাই তুলিয়া দেন। দিন্, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যখন হাতে কাজ-কর্ম্ম থাকিবে না, তখন "জামাই-বারিক" এক-খণ্ড লইয়া বসিবেন।

জামাই বারিকে কামিনীর মত মেয়ে থাকে; কিন্তু শেষে সে বৈষ্ণবী হয় কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে এই মাধুর্য্য রক্ষা করিয়া স্বর্গীয় কবি আমাদের দেশের মহিলাকুলকে ধন্য করিয়াছেন। কামিনী যে স্বামীর জন্য পাগলি ও বৃন্দাবনবাসিনী হইয়াছিল, সে যে বলিয়াছিল—"তোমার জন্য কষ্ট কর্‌ব না ত কার জন্য কর্‌ব"—তার কারণ, সে স্বামী-অদর্শন কাতরা ও জামাই বারিকে জামাই-পত্নী বলিয়া নহে, সে বঙ্গ-কামিনী ও বঙ্গ-ললনা বলিয়া। সে কথা যাক্—জামাই-বারিকের জামাইবাবুরা হাসির এক একটি ভাণ্ড। তাঁহাদের হাস্য দন্তজ ও বাহ্য এবং তাহা দুঃখে উৎপন্ন। ইহাকে সোজা কথায় বলে—দেঁতো হাসি। ভিতরে কিছু নাই। তার-পর, হর-গৌরীমূর্ত্তি পদ্মলোচন ও তাঁহার জুড়িগাড়ী। জুড়ী রাখায় বিলাস-সম্ভ্রম ও চাকচিক্য যতখানি, বিপদ যে তদপেক্ষা কম নহে, পদ্মলোচন-গৃহিণীদ্বয় তাহার প্রমাণ দিতেছে।

"লীলাবতী" নাটকে, হেম নদেরচাঁদকে পাখী পড়াইয়া আনিল, কি করিয়া কথা বলিবে, কি প্রশ্ন করিবে। নদেরচাঁদ মুখস্থ করিয়া আসিয়াছিল, মুক্তি-মণ্ডপ হইলে সে খুব বড় বড় বৃক্তৃতাও দিতে পারিত; কিন্তু "ভাল মান্‌ষের মেয়ে ও প্রিয় মেয়ে-মানুষে"র সম্মুখে আসিয়াই সব তাল পাকাইয়া গেল। হেম বলিতে শিখাইয়া দিয়াছিল—"অয়ি হরিণ-লোচনে, তুমি কি পড়?" সে কিন্তু লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আই মা হরিণের শিং, তুমি কি পড়?"

হেম রাগ সাম্‌লাইতে পারিল না, বলিল—"তোমার গুষ্টির মাথা পড়ে,—ঢেঁকিরাম, কি শিখিয়ে দেওয়া হল, কি বল্লেন—"

নদেরচাঁদ বিবাহ করিবে, হেম ত আর করিবে না, কাজেই সে বলিল—"আমার যা খুসী, আমি তাই বলি, তোর বাবার কি? তুই বিয়ে কর্‌বি না তোর বাবা বিয়ে কর্‌বে?"

নদেরচাঁদ ত নদেরচাঁদ! এখনও এমন অনেক সোণার চাঁদ বাঙ্গালার আকাশে চির-পূর্ণিমার আলো জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। শ্রীনাথের কথায় বলিতে গেলে, তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াই ডাল ধরে।

দীনবন্ধুর হাস্যরসের যাহা বিশেষত্ব, তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়; সরস কথায় তাহার উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি। তাহাদের বিকাশ বর্ণনপটুতার উপর নির্ভর করে না; যেমন-তেমন করিয়া বলিলেও, তাহা হাস্যপূর্ণ হইয়া থাকে। এই হাস্য-রস-রচনায় দীনবন্ধুর কাব্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন; দীনবন্ধু গুপ্ত-কবির সে রস অধিকার করিয়াছিলেন; অধিকন্তু নিজ প্রতিভাবলে চরিত্র সৃষ্টি ও বাক্যচ্ছটায় সেই হাস্যরসকে আরও প্রখর ও শাণিত করিয়া-ছেন। কাতুকুতু দিয়া হাসাইবার ব্যর্থ চেষ্টা তিনি কখনও করেন নাই—হাসাইবেন বলিয়াই হাসাইয়াছেন। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না, জানিনা, তবে সূচীতে পন্দিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এই যে, সমাজ-সংস্কারের সহায়তা বিশেষরূপে দীনবন্ধু মিত্রের হাস্যরসই করিয়াছে। আশ্চর্য্য নয়; কারণ, সহানুভূতিতে, বিগলিত-হৃদয় কবি যাহাকে হাসির পাত্ররূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে ঘৃণা করেন নাই—তাহাকে লইয়া কেবল একটু রঙ্গ করিয়াছেন মাত্র। তাই ঘটিরামও মিত্র-কবির সহিত অবিরাম মিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন—এই ইতিহাস প্রকৃত।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

‘পুতুল-ঘরে’র সারাংশ

ইব্‌সেনের ‘পুতুল-ঘর’ নামক নাটকের স্তম্ভ হইতেছেন—একজন পাশ্চাত্য সভ্যতানুরূপ আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা এবং আদর্শ নাগরিক। তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার মনোরমা পত্নীর প্রেমাদর্শে পূর্ণ ও তিনটী পুত্র-কন্যার কলহাস্যে সতত মুখরিত থাকিত। সংসারে সচরাচর যে সব সুখ-শান্তির প্রয়োজন হয়, সেই সব আয়োজনের এই গৃহস্বামীর কিছুরই অভাব ছিল না।

গৃহস্বামিনী নোরা সংসারকে মায়া এবং মোহের আগার জানিয়াও, জীবনের সেই ভ্রান্তিময় স্বপ্নরাজ্যকেও প্রকৃত সুখ বলিয়া মনে করিতেন। নোরা যে একজন আদর্শ সহধর্ম্মিণী এবং জননী এবং হেল্‌মার যে তাঁহার আদর্শ স্বামী, তাঁহার সম্মানরক্ষার জন্য, তাহার সুখবিধানের জন্য হেল্‌মার যে জীবন পণ করিতে পারেন, ইহাই বিবাহ হওয়া অবধি নোরার ধারণা ছিল।

কতকগুলি ঘটনাচক্রের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া নোরার এই ধারণাগুলি অবশেষে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বায়ু-পরিবর্ত্তনে স্বামীর ভগ্ন স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য নোরা স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। স্বামীকে বলেন যে, ঐ অর্থ তিনি স্বীয় পিতার নিকট হইতে দানস্বরূপ পাইয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ বাস্তবিক তাঁহার পিতার নহে, নোরা গোপনে Kragstad নামে এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে তাহা কর্জ্জ করিয়া আনিয়াছিলেন। প্রথমে এই পোদ্দার নোরার পিতার নামসহি ব্যতীত টাকা ধার দিতে অস্বীকৃত হয়; কিন্তু তাঁহার পিতা তখন মৃত্যুশয্যায়। নোরা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, নিজেই অবশেষে পিতার নাম সহি করিয়া কর্জ্জগ্রহণ করিলেন। পোদ্দার তাহাতে কোন অবিশ্বাসের কারণ দেখিল না; বরং ভাবিল, এই জাল ‘হ্যাণ্ডনোট’ আদায় হইবার অধিক সম্ভাবনা। তখন হইতে ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত নোরা স্বামীর অলক্ষ্যে আপনাকে ঋণদায়ে জড়ীভূত করিয়া ফেলিলেন ও একটা মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেল্‌মার, যে ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহার অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইলেন। উক্ত কর্জ্জদাতা নোরার স্বামীর ব্যাঙ্কে একটী কর্ম্মলাভের প্রত্যাশায় নোরাকে তাহার হইয়া তাঁহার স্বামীর নিকট জেদ করিতে বলে এবং তাহা না করিলে জাল ‘হ্যাণ্ড্‌নোটে’র ব্যাপার বলিয়া দিবে বলিয়া ভয় দেখায়; কিন্তু ইহাতে নোরা অই ব্যক্তির অনুরোধ রক্ষা না কয়িয়া বরং তাহার উপর ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং তাঁহার পিতার হইয়া তাঁহার নাম সহি করাতে আইনে তাঁহার কিছুই করিতে পারিবে না, ইহাও তাহাকে বুঝাইয়া দেন।

পরে ঐ জাল ‘হ্যাণ্ডনোটে’র হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য নোরা তাঁহাদের পরিবারের এক বিশিষ্ট বন্ধু Dr Rankএর নিকট বাকী টাকা ধার করিতে মনঃস্থ করেন।

পূর্ব্ব হইতেই নোরা তাঁহার স্বামির নিকট নানারূপ আব্দার করিতে বিশেষরূপে পারদর্শিনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে সেই আব্দার নোরা তাঁহার স্বামীর বন্ধুর নিকটেও করিতে লাগিলেন। তাহা হইতে হঠাৎ একদিন সেই বন্ধু নোরার প্রণয় প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। এতদিনে নোরা স্বকীয় অবস্থার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলেন।

তাঁহার গর্ব্ব এবং ভ্রান্তি চূর্ণ হইয়া গেল। নোরা বুঝিলেন, তিনি একজন বড়ই অশিক্ষিতা, দুর্ব্বলস্বভাবা, বুদ্ধিহীনা নারী, ভয়ঙ্করী মাতা এবং স্বামীর কেবলমাত্র কামনা চরিতার্থ করিবার জন্যই তাঁহার পত্নীত্ব; কিন্তু তখনও অবধি স্বামী-সম্বন্ধে নোরা অভ্রান্তচিত্ত—তাঁহাকে রক্ষা করিতে হেল্‌মার যে সর্ব্বস্বপণ করিতে পারেন, ইহাই নোরার অবিচলিত ধারণা। নোরা স্বামীর নিকট এ জাল-কলঙ্ক উদ্‌ঘাটন করা অপেক্ষা আত্মহত্যা শ্রেয় জ্ঞান করিলেন।

স্বামীর প্রতি নোরার যে অভ্রান্ত ধারণা ছিল, অবশেষে নোরার সে মোহও কাটিল। যখন নোরার এই জালিয়াতী ব্যাপার তাঁহার স্বামীর কর্ণে গেল, তখন হেল্‌মার পত্নীর এরূপ অসদ্ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি মনঃক্ষুণ্ণ ও অপমান অনুভব করিলেন। হেল্‌মার নোরার এই ঘৃণিত কার্য্য আদৌ পছন্দ না করিয়া তাঁহাকে নিদারুণভাবে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

তখন নোরা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের দাম্পত্য জীবন একটী স্বপ্নমাত্র—তাঁহাদের গৃহস্থালী যেখানে তাঁহারা আদর্শ পিতা মাতা ও আদর্শ স্বামী-স্ত্রী রূপে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, সেটা একটা ‘পুতুল-ঘর’ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তজ্জন্য তিনি তাঁহার স্বামীকেও পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং অবিলম্বে এতাদৃশ মোহের জগৎ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সত্যের স্বরূপের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তিনি তাঁহার সন্তানদিগকেও ছাড়িয়া গেলেন। তিনি মনঃস্থ করিলেন, যতদিন না প্রকৃত জননী, প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন ততদিন আর ফিরিবেন না; যতদিন তাঁহার স্বামীও তাঁহার উপযুক্ত হইতে না পারেন, ততদিন তিনি আর সংসারে পদার্পণ করিবেন না।

হেল্‌মার পত্নীর এতাদৃশ আকস্মিক বৈরাগ্যে ঘটনার গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না। পত্নীর এ আভাষকে পরিহাস বলিয়াই বিবেচনা করিলেন। হেল্‌মার পত্নীকে গৃহ পরিত্যাগ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং যাহাতে এ কলঙ্ক আর না বাহিরে যায়, তজ্জন্যও সবিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হেল্‌মার তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ে স্বামীর প্রতি, সন্তানগণের প্রতি এবং ধর্ম্মের প্রতি কর্ত্তব্য-বুদ্ধি জাগ্রত করিতে প্রয়াসী হইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ছদ্মবেশের এই আকর্ষণ নোরাকে আর ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। নোরা সংসারত্যাগিনী হইলেন। হেল্‌মার অবশেষে প্রকৃত অবস্থা বুঝিলেন এবং একাকী আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ মধ্যে অন্য কোনরূপ উন্নত প্রণালীতে তাঁহাদিগের এ জীবন স্থাপিত হইতে পারে কি না! ইব্‌সেন, তাঁহার নাটকের পাঠক ও দর্শকগণকেও শেষ দৃশ্যে একটা মহা আশ্চর্য্য ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে ফেলিয়া গিয়াছেন—The Greatest Miracle!

‘পুতুল-ঘর’ নাটকের সাধারণ সমালোচনা।

সূক্ষ্মদর্শী ইব্‌সেন, য়ুরোপের বর্ত্তমান বিবাহ-পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিজনক ও নারীত্বের উন্নতির অন্তরায়, ইহাই নাটকে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। হেল্‌মার এবং নোরা সাধারণের চক্ষে আদর্শ দম্পতি বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহাদের দাম্পত্য

জীবন যে আগাগোড়াই একটা মস্ত ভুল এবং অবিশ্বাসের মধ্যে গঠিত হইয়াছিল, ইহাই ইব্‌সেন বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

নোরাকে সুখে রাখিতে হেল্‌মারের কিছুই অদেয় ছিল না। তিনি যাহা কিছু বিলাসিতার উপকরণ ও ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাইতেন তাহাই নোরাকে দান করিয়া সুখানুভব করিতেন। স্বামীর উপর নোরারও আব্‌দারের সীমা ছিল না। এইরূপে আট বৎসর ধরিয়া তাঁহারা প্রেমান্ধ চক্রবাক-চক্রবাকীর ন্যায় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহাদিগের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটে নাই। কেবল বিলাস ও হাস্য-রসিকতায় তাঁহাদের লঘু দিবসগুলি এক এক করিয়া কাটিয়া যাইতেছিল। হেল্‌মার, নোরাকে তাঁহার নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রিয়তমাকে ·oll বা Lark বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাই নোরা তাঁহাদিগের এবম্বিধ মিলনে ভ্রান্তি নিরূপণ করিতে পারিয়া শেষ দৃশ্যে হেল্‌মারকে বলিয়াছিলেন—“Here I have even your doll-wife; just as at home, I used to be papa's doll-child. That has been our marriage, Torvall নোরা স্বামীকে আদর করিয়া To-vall বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

এই প্রেমান্ধতার ফলে তাহাদের বাহ্যিক জীবনের অন্তরালে ধীরে ধীরে দুই-একটা অবিশ্বাসের হেতু আসিয়া জন্মিতে লাগিল; কারণ হেল্‌মার ও নোরার প্রেম শৃঙ্খল এবং পিঞ্জরের মধ্যেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। নোরা হেল্‌মারের বিলাস-কন্দুক ও পোষা পাখী রূপেই গঠিত হইয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ আটবৎসরকাল তাঁহারা কেবল দেহ-সুখেই আবদ্ধ ছিলেন, আত্মার স্বাধীনতা তাহারা উপলব্ধি করিবার অবসর পান নাই। কেবল বড়দিনের আমোদ-প্রমোদ ও বহু নৃত্যে এবং দাস-দাসী-পরিবৃত হইয়া তাঁহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়পরবশ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। নোরা Dr. Rank নামে জনৈক পরিচিত বন্ধুর সহিত অবাধ মেলামেশা করিতেন। মেলামেশা করিলেও, নোরার এই গুণটি ছিল, তিনি কাহাকেও আত্ম-সমর্পণ করিতেন না। নোরার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। স্বামী ছাড়া অপর কাহাকেও চিন্তার মধ্যে স্থান দিতেন না।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নোরা-চরিত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার আব্‌-হাওয়ায় পুষ্টি-বিকাশের সুবিধা পায় নাই। স্বামীর পোষা পাখী এবং ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া তাহার নারী-চরিত্রের উৎকর্ষ হয় নাই। সেই অধীনতাবশতঃ নোরা-চরিত্রে দুর্ব্বলতা আশ্রয় করিয়াছিল। নোরা ক্রমশঃই মিথ্যাবাদিনী ও আত্ম-গোপন প্রিয়া হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

জীবনে তাঁহার প্রথম দুর্ব্বলতা—স্বামীকে না জানাইয়া স্বামীর জীবন-রক্ষার্থ গোপনে অর্থ কর্জ্জ করা; ২য় দুর্ব্বলতা—কর্জ্জকালে নিজের নামেই সহি করা; ৩য় দুর্ব্বলতা—কর্জ্জদাতাকে স্বামীর অগোচরে রাখা—এমনকি কর্জ্জদাতার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়াও স্বামীর নিকট কর্জ্জদাতার আগমন বার্ত্তা গোপন করা। এই স্থান হইতেই হেল্‌মার নোরাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; তবুও পত্নীর জন্য হেল্‌মারের প্রাণ অন্ধ ভালবাসায় পূর্ণ; হেল্‌মার পদে পদে নোরাকে মার্জ্জনা করিতে তৎপর।

কর্জ্জদাতা Kragstad যখন নোরাকে তাগিদ্ করিয়া চলিয়া গেল, তখন নোরা তাঁহার সন্তানদিগকে বলিলেন—“But dont tell any one about the strange man-Do you hear. Not even papa

এইস্থান হইতে দুর্ব্বল নোরা তাঁহার সন্তানদিগকেও মিথ্যা-কথা বলিতে শিখাইলেন। ইব্‌সেন দেখাইতেছেন যে, দুর্ব্বলতা ও পরাধীনতা হইতেই যত মিথ্যা এবং অনিষ্টের উৎপত্তি; তাই তিনি হেল্‌মারের মুখ দিয়া বলাইলেন “Nearly all men who go to ruin only, have had untruthful mothers.

ইব্‌সেন, কর্ম্মফল ও উত্তরাধিকারিত্বে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার অধিকাংশ নাটকগুলিতেই এই দুইটী বিষয়ের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। “What we sow, that we shall also reap” ইহাই ইব্‌সেনের চিন্তার নীতি ছিল।

নোরা, তাহারের উদ্ধত স্বভাব ও অব্যবস্থিত চিত্ত তাহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, ইহা হেল্‌মার নোরাকে বহুবার বলিয়াছিলেন। নোরাও বুঝিয়াছিলেন, “My father was the cause of my ruin”

নোরা, হেল্‌মারের দ্বারা unprincipled woman বলিয়া কথিত হইলেও, নোরায় একটি মহৎগুণ ছিল যে, তিনি নিজের ভুল নিজেই ধরিতে পারিতেন এবং নিজেকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন তাই নোরা নিজের অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন :—“I ruin my children, Poison my home.”

এই নাটকের Mrs. Linden-চরিত্রটী বড়ই সুন্দর। Mrs. Linden নোরার বাল্য সঙ্গিনী ছিলেন। হঠাৎ বিধবা হইয়া এই বুদ্ধিমতী নারী নোরার শরণাপন্না হইলেন ও তাহার স্বামীর আপিসে একটা চাকুরী প্রার্থনা করিলেন। Kragstadও উক্ত পদের আবেদনকারী ছিল; কিন্তু অবশেষে হেল্‌মারের আনুকূল্যে Mrs Lindenই সেই চাকুরী পাইলেন। Kragstad পূর্ব্ব হইতেই নোরাকে ঋণ-জালে জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। এইবার সে নোরার স্বামীকে নোরার পূর্ব্বেকার জালিয়াতী জ্ঞাপন করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

Dr. Rank হেল্‌মারের বন্ধু ছিলেন বটে, নোরার সঙ্গে অবাধে মিশিবার সুবিধাও পাইতেন বটে, কিন্তু লোকটার মনে মনে নোরার প্রতি একটা আসক্তি ছিল। নোরা তাহা এতদিন বুঝিতে পারে নাই কিন্তু বুদ্ধিমতী Mrs Linden দুই-এক দিনের আলাপেই Dr. Rankকে সবিশেষ বুঝিতে পারিয়া নোরাকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু নোরা সে সাবধান শুনিলেন নাই। অতঃপর যখন Kragstadএর তাগিদ্ ঘন ঘন হইতে লাগিল এবং নোরা আর কোনমতেই চাপিতে পারিবেন না, বুঝিতে পারিবেন তখন নোরা Dr. Rankকে মনের কথা বলিবার জন্য উদ্যত হইলেন। Dr Rank নোরার হাব-ভাব দেখিয়া মনে করিলেন নোরা বুঝি তাঁহারই হয়। নোরা তাঁহার ঋণ-দায়ে ব্যাপার উদ্‌ঘাটন করিবার পূর্ব্বেই Dr. Rank নোরাকে নিভৃতে পাইয়া, তাঁহার চির-পোষিত আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলেন। নোরা Dr. Rankএর বন্ধুত্বের এই অকৃত্রিমতা, ব্যবহারে বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

ইব্‌সেন দেখাইয়াছেন, নোরার এই সমস্ত গোপন-প্রিয়তা এবং দুর্ব্বলতা, তাঁহার নারী-জীবনের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা হইতেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহার জন্য তথাকথিত আদর্শ স্বামী হেল্‌মারই দায়ী। বিলাসিনী, হাব-ভাবশালিনী এবং ক্রীড়া-পুত্তলী হওয়াই নারী জীবনের যথার্থ বিকাশ নহে, তাহা বিকার। সহসা সভ্যা এবং উচ্চশিক্ষিতা হইলেও, সে নারী তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ খুজিয়া পায় নাই।

হেল্‌মারও অসম্পূর্ণ। হেল্‌মার ভদ্রব্যক্তি (gentleman)

হইতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ মানুষ (perfect man) নামের যোগ্য নন। এতদিন ধরিয়া তাঁহারা বিবাহ-জীবন অতিবাহিত করিয়া তিনটী সন্তানের পিতামাতা হইয়াও, উভয় উভয়ের নিকট অপরিচিত। কারণ তাঁহারা প্রেমকে ভোগের ও দেহের দিক্ দিয়া উপলব্ধি করিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রেম তাহা নহে, প্রকৃত প্রেম একটা ভিতরকার সামগ্রী—আত্মার সম্মিলন; বিশ্বাসই সেই প্রেমের জীবন-শোণিত। নোরা ও হেল্‌মারের ভিতর বাড়িয়া উঠিতেছিল কেবল সন্দেহ ও আত্ম-গোপন-প্রিয়তা। হেল্‌মারের ক্রমশঃই নোরার উপর সন্দেহ ঘণীভূত হইতেছিল, নোরাও গোপনে আগ্নেয়-গিরির সৃষ্টি করিতেছিল। এই ভ্রান্তি লইয়াই আজকাল অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীর জীবন-যাত্রা—এই ভ্রান্তি হইতেই সংসারে যত অশান্তির সৃষ্টি। শেষ দৃশ্যে নোরা হেল্‌মারকে বলিতেছেন— You don't understand me. And I have never understood you either, till to-night." এক্ষণে নোরা, তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ কেবল তাঁহার পিতাকেই মনে করিলেন না—তাঁহার স্বামীও যে তাঁহার অলক্ষ্যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ইহাও বুঝিলেন।

আট বৎসরের একটী দিনও নোরা স্বামীর প্রতি কঠিনা হন নাই; কিন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে নোরা তাঁহাদের জীবনের অসম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিলেন—বুঝিলেন তাঁহার স্বামীর আশ্রয় খেলাঘর ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং স্বয়ং তাঁহার লেখার সামগ্রী—দাঁড়ের পাখী, সেই দণ্ডেই নোরা শিকল কাটিলেন। নোরা বুঝিতেন তাঁহার স্বামীও তাঁহার শিক্ষকের উপযুক্ত নহেন, এবং তিনি নিজেও তাঁহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত নহেন। তিনি নিজেই ভ্রান্ত। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন না নিজকে সংশোধিত করিতে পারেন, আত্ম-চেষ্টায় আত্ম-শাসনে জয়ী না হন, ততদিন আর সংসারে ফিরিবেন না। নারীত্বের ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তোলা এই নাটকে ইব্‌সেনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ঘোর ব্যক্তিত্ববাদী ছিলেন; তিনি সাধারণ যুক্তি-তর্কে, পাদ্রীর বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মানবের আত্ম-প্রত্যয়কেই শ্রেষ্ঠ পৌরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

একদিকে নোরার চরিত্র যেমন ইব্‌সেন অসম্পূর্ণতা ও দুর্ব্বলতার আধার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই অন্যদিকে Mrs. Linden এর বৈধব্য-জীবনকেও অবশেষে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। Kragstadএর সহিত Mrs Lindenএর বাল্য হইতেই প্রণয় ছিল। কিন্তু সে প্রণয় বিবাহে পর্য্যবসিত হইবার সুবিধা হয় নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া এই নারী Mrs. Kragstad না হইয়া Mrs. Linden হইয়াছিল। আজ হেল্‌মারের Mrs Linden, Kragstadএর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। Kragstad বিতাড়িত। অবশেষে Mrs. Linden যখন নোরার মুখ হইতে নোরার Kragstad-সংক্রান্ত রহস্যগুলি শুনিলেন, তখনই তিনি নোরাকে বাঁচাইতে Kragstadএর কাছে ছুটিলেন। Kargstad পূর্ব্ব-পরিচিতাকে পাইয়া নোরার উপর সকল আক্রোশ বিস্মৃত হইল; কিন্তু বড় অসময়ে আসিয়া Mrs Linden Kragstadএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কারণ, তখন সে নোরার ব্যবহার তাঁহার স্বামীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য চিঠি ডাকে দিয়াছে—আর লুকাইবার উপায় নাই। স্বামী যাহাতে Kragstadএর চিঠি না পান, নোরা তাহার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। চিঠি হেল্‌মারের হস্তগত হইল। নোরা তখনই পলাইবার উপক্রম করিতেছিলেন; কিন্তু পলাইবার পূর্ব্বেই হেল্‌মারের রাশি রাশি তীব্র তিরস্কার আসিয়া নোরার উপর বানের ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। নোরার আত্ম-শোচনার আর বাকী রহিল না। কিন্তু Mrs Linden এর অনুরোধে কিয়ৎক্ষণ পরেই Kragstad ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আর একখানি চিঠি পাঠাইল।

আবার হেল্‌মারের ক্রোধাগ্নি শীতল হইয়া গেল; তিনি পত্নীকে অভয় সংবাদ দিলেন এবং ক্ষমা করিতে চাহিলেন।

কিন্তু নোরা আর ক্ষমা চাহিলেন না। পুনঃ পুনঃ স্বামীর এই ক্ষমাই তাঁহার জীবনের শিক্ষার মূলে এতদিন বাধা দিয়া আসিতেছিল। আজ নোরা তাঁহার আটবৎসরব্যাপী ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিতে ছুটিয়াছেন। আজ হেল্‌মারের শত বাধা, শত অনুরোধ, শত করযোড় অভিমানিনী নোরাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। নোরা সর্ব্বাগ্রে নিজের দুর্ব্বলতার প্রতিকার করিতে সর্ব্বত্যাগিনী হইলেন। নোরার চরিত্র অনেকের চক্ষে আশ্চর্য্য ঠেকিলেও, ইব্‌সেন তাঁহার নিজের জেদ্ বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিত্ব-বাদ সংস্কারের পক্ষে কতটা সাজে বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা যে সন্ন্যাসী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। নোরার শেষ অবস্থাও সেই একপ্রকার সন্ন্যাসের অবস্থা। নারী-প্রকৃতি নোরার সংসারের প্রতি এমন বীতশ্রদ্ধা ও উদ্ধতভাব সঙ্গত হইয়াছে, কি না, তাহা হেল্‌মারের ন্যায় অনেক স্বামীরই নির্জ্জনে ভাবিয়া দেখা উচিত।

আজ আমাদিগের সংসারেও হেল্‌মারের ন্যায় স্বামীর অভাব নাই। আমরা ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে Gentleman হইয়াছি বটে, কিন্তু perfect man হই নাই। পক্ষান্তরে আমাদিগের মহিলারাও ইংরাজী হাব-ভাবে উচ্চ শিক্ষিতা হইতেছেন বটে কিন্তু সুশিক্ষিতা হইতেছেন না। আমরা হেল্‌মারের ন্যায় আমাদের সুপবিত্র অন্তঃপুরে পাশ্চাত্য বিলাস-উপকরণ প্রবেশ করাইতেছি বটে—কিন্তু নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা যাহা, তাহা কি আমরা দিতেছি? কত দূরদর্শী স্বামী নারীর প্রকৃত শক্তির বিকাশ হইতে নারী-জাতিকে বঞ্চিত করিতেছে; তজ্জন্য আমাদিগের পুরাতনকে দোষ দিতে পারি না; নূতন ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। পুরাতন, নারীজাতিকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নারী-জীবনের কর্ত্তব্যের অনুকূল ছিল; নূতন অবরোধ-প্রথা উঠাইতেছে বটে, নারীর লজ্জা-ভূষণকে খুলিয়া লইতেছে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত কর্ত্তব্যের প্রতি যথেষ্ট অবহেলা করিতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা, প্রকৃত শিক্ষা নহে, মোহমাত্র; প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, বিলাস ও উদ্দাম প্রশ্রয়েরই অধীনতা। নারীর প্রকৃত স্বাধীনতা—তাহার সতীত্বে! তাই বুঝি বঙ্গের বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—

"সতী যে হইবে, আগুনি খাইবে,
না হইবে অন্যের বশ।"

প্রকৃত সতী নারীর ভিতর একটা তেজ, একটা সহিষ্ণুতা, একটা সাতন্ত্র্য থাকিবেই। সেই স্বাতন্ত্র্যই তাহাকে সাধারণ নারী হইতে বিশিষ্টা করিয়া দেয়। নারী-প্রতিভার যদি কোথাও বিকাশ হইয়া থাকে, তবে নারীর সতীত্বে। সেই সতীত্ব-ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া যদি আমরা নারীজাতিকে ছলা-কলায়, হাবভাবে আদব কায়দায় গঠন করিতে থাকি তবে আমরা ভুল বুঝিয়াছি। প্রকৃত

সে ভুলের প্রতিশোধ একদিন লইবেই। ইব্‌সেনের ব্যক্তিত্ববাদ বুঝিতে গিয়া, নোরার স্বাধীনতার অনুসরণ করিতে গিয়া, আমাদের উচ্চশিক্ষিতাগণ যেন ইব্‌সেনের মূল নীতিটি ভুলিয়া না যান। ইব্‌সেনকে য়ুরোপের অধিবাসীরাও ভুল বুঝিয়াছে; সুতরাং আমরা যে তাঁহাকে ভুল বুঝিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইব্‌সেনের একজন বিশিষ্ট সমালোচক ও তাঁহার স্বদেশবাসী বলিয়াছেন,—"As for Ibsen himself, he is one of the severest moralists of our times. Always in earnest, he shows us the inevitable consequences of our deeds and almost of our thoughts. He urges upon us the truth that what we sow that we shall also reap and that punishment will assuredly follow if we trample our deeds beneath our feet. He teaches us that humanity must be true to its innerself' ইব্‌সেনের এই উদার নীতির মর্ম্ম বুঝিয়া যেন আমাদের পাশ্চাত্য-আদর্শলোলুপ সংস্কারকগণ অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধান করেন—ইহাই আমার বক্তব্য।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

আশার তপন

(গৌরচন্দ্রের প্রতি)

প্রভু!
আমরা মূর্খ আঁধারের জীব পাইনিক' হায় জ্ঞানালোক,
বুঝিতে পারিনি, শিখিতে পারিনি শাস্ত্র-শ্রুতির কোন শ্লোক;
জ্ঞানীরা সকলে আমাদের পথে
ঘৃণা করি' ফেলে চলে গেছে রথে,
বলিয়া গিয়াছে "হায় রে তোদের আশা নাই, কোন আশা নাই"
যে কৃপা ক'রেছ—তাই প্রকাশের ভাষা নাই প্রভু, ভাষা নাই।

প্রভু!
মোরা হীন জাতি, আমাদের ছোঁয়া পায়ে লয়নাক' কেহ জল,
আমাদের ছায়া পাছে পড়ে পথে, সাবধানে ফেলে পদতল;
পথের কথাটি যদি গো শুধাই,
বলে "শুনিবার অধিকার নাই",
বলে, আমাদের মানব-জনমে "আশা নাই, কোন আশা নাই",
তোমার করুণা প্রকাশের তাই ভাষা নাই প্রভু, ভাষা নাই।

প্রভু!
আমরা কাঙ্গাল, ক্ষুধার অন্ন, তাও জুটেনাক' সব দিন,
লোকহিত, দান, তীর্থগমন আদি রাজসিক ক্রিয়াহীন;
মুচিরেও যাহা করে শুচিজন,
নাহি আমাদের সেই ধান, ধন,
পুণ্য-গরবী ধনীরা বলেন, "আমাদের কোন আশা নাই",
যে ধন দিয়াছ, তার কথা প্রভু, প্রকাশের তাই ভাষা নাই।

প্রভু!
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিচার জানি না মোরা পাপী দুরজন,
দূরে দূরে তাই নগর-বাহিরে রাখেন মোদের পুরজন;
পাপ করে' করে' নিশিদিন-মান,
কিণ-সুকঠোর হয়ে গেল প্রাণ,
নিজেই বুঝিনু আমাদের বুঝি "আশা নাই আর আশা নাই",
আমাদেরো লাগি ভরসা আনিলে? প্রকাশের আর ভাষা নাই।

শ্রীকালিদাস রায়

পাহাড়ে 'ডায়েরী'র দুইপাতা

পাহাড় দেখ্‌বার জন্য মনে ভারি একটা আগ্রহ ছিল। পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু যে জিনিষটা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমার মাথা নোয়াবার জন্য এ দেখা নয়; কিন্তু হৃদয় দিয়ে, আমার আনন্দের ক্ষুদ্র সীমা দিয়ে তাকে স্পর্শ কর্‌ব, এই আকাঙ্ক্ষা আমার মনে অনেকদিন ধরে ছিল। চোখ মেলে ত হিমালয়কে দেখ্‌লাম্; কিন্তু মন মেলে দেখ্‌বার শক্তি পাব কোথায়?—কাব্যের মিথ্যা কল্পনার ফাঁদে পড়ে এ দেখা যায় না; সে ফাঁকি দেয়। সমস্ত কাব্য-কল্পনার নেশাকে ঠেলে ফেলে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হিমালয় দেখ্‌বার আবশ্যক হলে আমার মনে হয়, তার আগে "ভারতবর্ষ"কে একবার ভারতবর্ষীয় ভাবে দেখ্‌বার আবশ্যকতা আছে; পাশ্চাত্যের শক্তি-মাহাত্ম্যে বিষদাঁতগুলোকে সেখানে পাথর দিয়ে ভাঙ্গ্‌বার দরকার আছে; নইলে দাঁড়াব কোথায়? পাহাড় দেখে কাব্য-সিন্ধু যে দুলে উঠেনি, তা বল্‌তে পারিনে। তার সাক্ষী আমার একটা কবিতায় আছে:—

"বাস্তবে আর আদর্শে এ গোপন পরিচয়;
পাষাণ এরে বল তুমি? নয় গো পাষাণ নয়!"

দেখা এবং অদেখা, জানা এবং অজানা, রহস্য এবং প্রকাশ, আলোক এবং অন্ধকার যেন পাহাড়ের চূড়ার সীমান্ত-রেখায় পরস্পর মিলিয়ে আছে। পৃথিবীর মাটী এবং সমুদ্রের অসীম বিস্তার অর্থাৎ জল এবং স্থল যেমন তীরের রেখায় মিলিয়ে আছে, এই অকল্পনীয় আকাশ, এই অনন্ত শূন্য, মনে হল এই প্রকাশমান্ বিশ্বজগতের পর্ব্বত-গাত্রের সঙ্কীর্ণ শেষ সীমায় তেম্‌নি করে মিলিয়ে আছে। অসীমকে মানুষ হঠাৎ পায় না, সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম। যা সসীম যা প্রকাশমান্, তা ক্রমশঃ অতি ধীরে ধীরে ঐ পাহাড়ের উচ্চতার মত উঠে গিয়ে শেষে নিঃশব্দে অসীমের দুর্গম রহস্যের শুভ্র বাষ্প-ঘন আবরণের সঙ্গে আকাশে মিশিয়ে যায়।

পাহাড়ের নীচে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। উপরে চেয়ে

দেখ্‌লাম,—পাহাড়ের শ্যাম স্তন-বৃন্তের মত উচ্চচূড়া বাষ্পের লঘু-চঞ্চল আবরণে ঢাকা; কিন্তু সে বাষ্প জমাট্ নয়—সর্ব্বদাই আসা-যাওয়া, নড়াচড়া কর্‌চে। বুঝ্‌লাম, এই চঞ্চলতা এবং অস্পষ্টতা মিলনমাত্রেরই অঙ্গ। যেমন ধরুন, প্রদীপের শিখা। যেখানে তার উজ্জ্বল আলোর শিখাটা অন্ধকারের সঙ্গে মিলেছে, সেইখানেই সে কেঁপে উঠেছে। এই কাঁপুনির ভিতরই অন্ধকার আলোর হাত ধরেছে এবং আলোক অন্ধকারের হাত ধরেছে। শব্দিত দুন্দুভির চর্ম্মাবরণ, নীরবতা এবং সরবতার মাঝখানে মিলন ঘটাইয়া দিয়াছে; সেইজন্য সে-ও কাঁপে; সুতরাং দুইটা পরস্পর-বিরোধী জিনিষ, সে প্রকৃতিতেই হউক্, আর মানব-হৃদয়েই হউক্, যখন মিলনের ক্ষেত্রে দাঁড়ায়, তখন দুই-ই চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই চঞ্চলতা, মেঘের বাষ্পের মত ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে বলেই তাকে দেখা যায় না; কাজেই সে রহস্য।

পাহাড় দেখে আমার মনে এইটে জাগ্‌ল যে, এই আমি রহস্যকে দেখ্‌লাম—অদৃশ্য এবং দৃশ্য যেখানে নিত্য বিবাহ-মিলনে এক আঁচলে গ্রন্থী দিয়েছে, তাকেই দেখ্‌লাম। পাহাড়ের বাষ্পের সেই সঘন আবরণ লঘু হতে লঘুতর হয়ে আকাশে মিশে গিয়েছে। সন্ধ্যার লাল আলো, কালো রাত্রিমধ্যে যেমন লাল হইতে কেমন অদৃশ্য হয়ে মিলিয়ে যায়; চোখে ধরা পড়ে না, এ ও সেইরকম। চোখে দেখে বুঝ্‌লাম দুই-ই মিলেছে; কিন্তু কোথায় মিল্‌ল জানি না। পাহাড় দেখে তখন মনে হয়নি যে, সে একটা উঁচু জিনিষ,—আকাশ থেকে পৃথক্। মনে হল, অনন্ত আকাশ যেন তাকে চুম্বন করে আছে!

সৌন্দর্য্যের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হল! সুন্দরী রমণীর লাবণ্যময় অঙ্গের লালিত্য যেমন গোলাপী শাড়ীর আবরণে আবদ্ধ হয়ে, নীরবে শূন্যের শুভ্রতার সঙ্গে থাপ্ খেয়ে যায়, এ-ও মনে হল তাই। এই সুন্দরী পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের সবুজ শাড়ী যেন তার গোলাপী গায়ের রক্তিম আভাকে আচ্ছাদিত করে দিয়ে, শাদা-সিধে শূন্যতার সঙ্গে থাপ্ খাইয়ে দিয়েছে। এই রহস্যকে অন্তর দিয়ে অনুভব কর্‌লাম—চোখ্ দিয়ে ত তাকে দেখ্‌তে পার্‌লাম না!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

কবে ?

সারাদিন বরষিয়া—
সব জল রাশি;
ঘন মেঘ মহাশূন্যে—
যায় যথা মিশি।

কবে প্রিয় সেই মত,
ছুটে ছুটে গিয়ে—
মিশে যায় তব সনে—
সব ঢেলে দিয়ে ?

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

পলাতক

(গল্প)

রায়েদের বাড়ীর পূজার ধূমটা এবার অন্যান্য বারের চেয়ে কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল; ফি-বারে যেমন যাত্রা, তর্জ্জা, বাউলের গান এবং এমনই আরও কত কি আমোদ-আহ্লাদের আয়োজন হয় এবারেও সে সব ত ছিলই, তার উপর আবার কল্‌কাতা থেকে সখের থিয়েটারের দল এসে পূজার আনন্দটার মধ্যে একটা নূতনত্বের সৃষ্টি করেছিল। আর এই নূতনত্বের নেশাটা আর সকলের উপর পড়্‌লেও বালক রামধনের উপর একটু বিশেষ-ভাবে পড়েছিল।

'কন্‌সার্টে'র তালে তালে যখন মিহি গলায় গানের ঢং উঠ্‌ছিল, আর সেই অস্পষ্ট মূর্চ্ছনা—নিদ্রালস কামিনীর দেহলতার মত বাতাসের উপর গা এলিয়ে দিয়ে একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছিল, একটির পর একটি করে যখন পট-গুলি স্বপ্নরাজ্যের খেয়ালভরা প্রহেলিকার মত তার চোখের উপর থেকে সরে সরে যাচ্ছিল, তখন তার ক্ষুদ্র বুকখানা যেন কি একটা অজানা আনন্দ-লহরের সঙ্গে সঙ্গে ঢিমে তালে নেচে নেচে উঠছিল! তার মনে হচ্ছিল, "কেমন সুখী এরা, কেমন সুন্দর এরা, কত মুক্ত এরা, কত স্বাধীন এরা!" সে তন্ময় হয়ে সমজদারের মত এই সব দেখ্‌ছিল; তারিফ্ কর্‌ছিল আর মনে কর্‌ছিল, "এদের সঙ্গে যদি সে থাক্‌তে পার্‌ত, তা হলে তার জীবনটা কত সুখেই না কাট্‌ত! কল্‌কাতায় যারা থাকে, তারা না-জানি কত সুখেই দিন কাটিয়ে যায়!" তার ধারণা ছিল, কল্‌কাতায় বুঝি দিন-রাতই কেবল থিয়েটারের হর্‌রা চল্‌ছে; সেখানের লোকগুলো বুঝি কেবল আনন্দ-স্রোতের মধ্য দিয়েই আপনাদের জীবনগুলোকে চালিয়ে নিয়ে যায়, সেখানে বুঝি অফুরন্ত আনন্দ, ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত নিরন্তর ঝরে ঝরে পড়্‌ছে, আর সেখানকার লোকগুলো সেই অনাবিল আনন্দ-স্রোতের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়ে বেশ সহজ এবং সরলভাবে ভেসে যাচ্ছে; কোথাও এতটুকু বাধা নেই, বিঘ্ন নেই!

এমনই করে কল্‌কাতার মোহ তাকে যেন পেয়ে বসেছিল, কল্‌কাতা দেখ্‌বার জন্যে তার প্রাণটা প্রায়ই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ত, আর নানান্ রকমের অদ্ভুত কল্পনা তার সেই ক্ষুদ্র বুক-খানার উপর দিয়ে খেয়ালের এক-একটা স্তরের মত ধীরে ধীরে বহে যেত। তাদের পাড়ায় ত যাত্রার দল রয়েছে, তাতেও ত নাচ-গানের অভাব নেই; কিন্তু কৈ তার ভিতর ত এমন

মাদকতা নেই! সে যেন কেমন খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া! এমন একসুরে বাঁধা ত নয়! তাতেও বাজ্‌না বাজে, গানের লহর ওঠে, নাচের ঢং ছোটে; কিন্তু তার ভিতর ত এমন প্রাণ-মাতান, এমন বুক-জুড়ান আবেশ নেই! যতদিন সে থিয়েটার দেখেনি, ততদিন যাত্রার উপর তার বেশ একটা শ্রদ্ধা ছিল, বেশ একটা আস্থা ছিল; সুধু তা নয়, একটা টান বলে যে জিনিষ সেটাও ছিল। এই অল্প বয়সেই সে পুরোদস্তুর সমজদারের মত আসরে বসে ওস্তাদ্‌দের গানের সঙ্গে সঙ্গে দুলে দুলে, তুড়ি দিয়ে দিয়ে তাল দিত, আর মনে কর্‌ত, কবে সেও মজ্‌লিসে বসে গান গাইবে, আর চারপাশের গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোকেরা এসে তার গান শোন্‌বার জন্যে ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি কর্‌বে।

এমনই একটা বুকভরা আকাঙ্ক্ষা, একটা প্রাণভরা সাধনা নিয়ে সে যখন বলাই সর্দ্দারের যাত্রার দলে গিয়ে 'হাজ্‌রে-খাতা'য় তার নামটি টুকিয়ে দিয়ে এসেছিল, তখন সে জান্‌ত না যে তাদের গ্রাম্য সঙ্কীর্ণতার বাইরে একটা আলাদা সভ্য-জগৎ আছে, আর সেখানে 'থিয়েটার' বলে একটা জিনিষ আছে, যেটা তাদের যাত্রার অসম্পন্ন সার্থকতাকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠ্‌তে পারে। সে নিজে বেশ ভাল সখী সাজ্‌তে পার্‌ত, তার মিহি গলার মিঠে সুর আসরকে একেবারে জম্‌কে তুল্‌ত, তার ঘুমুরপরা পায়ের চঞ্চল বিক্ষেপ সমস্ত মজ্‌লিস্‌টাকে একেবারে রম্‌রমে করে তুল্‌ত, তার গান শুনে কত রংদার মগজওয়ালা 'কাপ্তেন' বাবুরা 'দিল্‌দরিয়া'র হয়ে তাকে কতবার কত 'বক্‌শিস্' দিয়ে গেছে! এমনই করে উৎসাহ পেয়ে তার ঝোঁক্‌টা দিন-দিন বাড়্‌তেই চলেছিল। আজ হঠাৎ এই থিয়েটারের সখের দলটী আর তার আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো এসে তার যাত্রার প্রাণটাকে যেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

বয়স বেশী নয়, হদ্দ ১৪ কি ১৫য় পা দিয়েছে বই ত নয়! কিন্তু এই অল্প বয়সেই তার খ্যাতি তাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির নির্দ্দিষ্ট আয়তনটাকে ছাড়িয়ে উঠে আশ-পাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে পৌঁছেছিল। দু-এক জায়গা থেকে তাদের দলের ডাকও পড়েছিল; এবার পূজার সময় রায়েদের বাড়ীতে তাদের দলের বায়না ছিল আর সেই উপলক্ষেই তার এখানে আসা। সপ্তমী পূজার দিন তারা একটা পালা শেষ করেছে। সেদিন তার গলা শুনে বাবুরা খুব বাহবা দিয়েছিল—হাততালির চোটে আসরখানা একেবারে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। আর সকলের চেয়ে গৌরবের কথা, কল্‌কাতার সেই থিয়েটারেরই দলের একটা লম্বা-টেরী-কাটা, ঘাড়ছাঁটা ছোক্‌রা এসে তার পিঠ চাপ্‌ড়ে বলেছিল, "সাবাস ভাই, সাবাস!" সে মনে করে-ছিল, "এতদিনে তার এত গলাসাধা, এত শিক্ষা সার্থক হল।" আর মনে করছিল, সে যদি এমনই করে চিরদিন তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে, যদি এদেরই একজন হয়ে সে কল্‌কাতার বড় বড় আসরে নাব্‌তে পারে, তা হলে কত সুখেরই না তার জীবনটা হয়।

এমনই করে কল্‌কাতার মোহ এবং তার চেয়ে এই সখের থিয়েটারের আর ঘাড়ছাঁটা বকাটে ছোঁড়াগুলোর আকর্ষণ তার মনটাকে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মতই সর্ব্বদা টান্‌তে থাক্‌ত। তারপর একদিন এক আবেশমধুর ধূসর সন্ধ্যায় গঙ্গার তীরে সে যখন একমনে একটা পৈঠের উপর বসে বসে তার সেই সরু গলা ঢেউয়ের সেই চঞ্চল-বিক্ষুব্ধ বুকগুলোর উপর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিচ্ছিল; দূরে, অদূরে মন্দিরের মঙ্গল-আরতির ঘণ্টাধ্বনি যখন শ্রান্ত শিশুর অলস দেহের মত গঙ্গার সেই স্নেহময় মাতৃ-বক্ষের উপর এলিয়ে পড়্‌ছিল আর সেই মধুময় মুহূর্ত্তের আবেশ-পূর্ণ ক্ষণে কে এসে ধীরে ধীরে যখন তার পিঠে হাত দিয়ে বলে উঠ্‌ল, "বাঃ, বেশ গলা ত তোমার", তখন সে চম্‌কে উঠেছিল। এ যে সেদিনকার সেই টেরীকাটা ছোক্‌রা! সে তার গলার কত সুখ্যাতি করেছিল, তার গানের কত তারিফ্ করেছিল! তার-পর সে যখন তাকে বলেছিল যে, সে যদি ইচ্ছে করে ত তাকে তারা কল্‌কাতায় নিয়ে যেতে রাজি আছে, সেখানে তার কোন ভাবনা নেই, তাদের দলে সে থাকবে, তাদের সঙ্গে সে গাইবে, তখন তার বুকখানা আনন্দে নেচে উঠেছিল!

ছোক্‌রা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "যাবে ?" সে না ভেবে চিন্তেই একেবারে বলে ফেল্লে, "যাব।"

(২)

রামধন কল্‌কাতায় চলে এসেছে। তার বুড়ো মার চোখের মাণিক সে যে! কিন্তু তা বল্লে কি হয়, বুড়ো মাকে ত ইচ্ছে কর্‌লেই সে দেখ্‌তে পারে, কিন্তু কল্‌কাতা দেখ্‌বার অবসর ত আর সব সময়ে ঘটে উঠ্‌বে না। প্রথম কদিন কল্‌কাতার পথ-ঘাট, লোক-জন, গাড়ী-ঘোড়ার মধ্যে সে বেশ-একটু নূতনত্বের আস্বাদ পেয়েছিল বটে, কিন্তু সে কটা দিনের জন্যে বই ত নয়। তা ছাড়া কল্‌কাতা বল্‌তে যে স্বপ্নরাজ্যের কথা তার মনে পড়ে যেত, তেমনটী ত এ নয়! দিনগুলো যতই সেই একঘেয়ে কর্ম্মস্রোতের মধ্য দিয়ে কাদামাখা কচ্ছপের মত একই ভাবে এবং তারই মতন আস্তে আস্তে একটি একটি করে চলে যেতে লাগ্‌ল কল্‌কাতার আমোদ-আহ্লাদগুলো ততই তার পক্ষে একঘেয়ে হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এখানে সব কাজেই বাধা, সব কাজেই নিয়ম। এত-বড় একটা বাঁধা-ধরার ভিতর থাক্‌তে সে ত ছেলেবেলা থেকে কখনই অভ্যস্ত নয়! যখনই ইচ্ছে হয়েছে, সে নিজেদের পাড়ার বাইরে এদের বাগান থেকে কাঁচা আম, ওদের বাগান থেকে কাল জাম, এমনই করে কত-কি পেড়ে নিয়েছে; কেউ তাতে একটা কথাও বলে নি। আর এখানে পাশের বাড়ীর চৌকাঠ পার হবার আগে দরোয়ানজির কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

এমনই অসংখ্য বাধা, অসংখ্য নিয়ম তার জীবনের স্বাধীন গতিটাকে যেন জোর করে ধরে ফিরিয়ে দিতে লাগ্‌ল আর প্রাণের সেই প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতগুলো এসে তার বুকখানাকে একেবারে যেন পিষে দিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

এক-এক-দিন সন্ধ্যার সময় তার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ত; তার সেই বড় আরামের শান্তিময় গ্রাম-খানির স্নেহময় বুকটীর মধ্যে ধরা দিতে তার প্রাণটা যেন ব্যাকুল হয়ে উঠত; তাদের সেই আমবাগান, সেই শান্ত-মধুর গঙ্গাতীর, এবং এমনই আরও কত-কি তার সেই মুগ্ধ চোখের সুমুখে সত্যকারটির মত হয়ে ফুটে উঠ্‌ত; তারপর যখন তার হুঁস হত তখন দেখ্‌ত, সে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে তাদের সেই অন্ধকার আখ্‌ড়া-ঘরের একটা ছোট তক্তপোষের উপর শুয়ে আছে, তখন তার প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠ্‌ত! আহা, কেমন সুখের তার গ্রাম্য জীবন ছিল গো! সন্ধ্যার সময় সে যখন গঙ্গার তীরে বসে বসে গুন্ গুন্ করে গান গাইত আর অদূরে পালতোলা নৌকাগুলো একটির পর একটি করে যখন সেই

অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ার মত ভেসে যেত, তখন তার প্রাণটা যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের কুহেলিকাময় তন্ময়তার মধ্যে ডুবে যেত। সে স্থির হয়ে তাই দেখ্‌ত আর তার মিঠে গলার মিহিসুর ছড়িয়ে দিয়ে সেই শান্তিময় সন্ধ্যাটাকে আরও আবেশময় করে তুল্‌ত; তারপর বোসেদের ৮ বছরের ফুট্‌ফুটে মেয়েটি এসে যখন ঘাটে ও উপরকার অরথ তলায় ভরা সন্ধ্যার দীপটি জ্বেলে দিয়ে তার পাশে বসে তার সেই সুন্দর চল্‌ঢলে মুখখানিকে একটু হেলিয়ে বল্‌ত, "সেই গানটা গাও না রামু দা!' আর সে যখন তাকে আদর করে একটি চুমো খেয়ে তার গান শুনাত, তখন কত তৃপ্তিই না তার হত! হায়, আজ সে বন্দীর মত বসে আছে; সে কি আগে এমনটি জান্‌ত, না তা হলে সে তার পল্লীরাণীর বুক ছেড়ে চলে আস্‌ত? তার প্রাণের মাঝখান থেকে কে যেন কাতর কণ্ঠে বলে উঠেছে; "তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাকে ছেড়ে দাও গো আমাকে ছেড়ে দাও। বনের পাখী বনে ফিরে যাই!"

সে 'ম্যানেজারে'র কাছে একদিন কেঁদে কেটে গিয়ে পড়ল, "আমার মন কেমন কর্‌ছে, আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিন।" 'ম্যানেজার' বিরক্ত হয়ে উত্তর কর্‌লেন, "মিছে বারবার বিরক্ত করতে এস না। আজ বাদে কাল প্লে দেখাতে হবে এখন উনি চলে যাবেন!" কথা শুন একবার।" বালক কত কাঁদ্‌লে কত মিনতি করল কিন্তু কেউ তার কথায় কাণ দিলে না।

(২)

এর কিছুদিন পরে একদিন হঠাৎ তার ভারি জ্বর দেখা দিল—একেবারে ৪ 'ডিগ্রি' জ্বর। সে বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল, তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল অনেকদিন আগে যখন তার একবার এমনই করে জ্বর হয়েছিল, তখন একটী জীর্ণ হস্ত দিন-রাত তার সেই ক্ষুদ্র মস্তকটীর উপর যেন কোন্ স্বর্গরাজ্যের সুধা-নির্ঝর সঞ্চারিত করে দিত! একটী জীর্ণ বক্ষের যত্ন-সঞ্চিত স্নেহ নিরন্তর তার উপর যেন ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত ঝর্ঝর করে ঝরে পড়্‌ত।

আর আজ! একজন 'আহা' বলবার লোকও নাই। তার প্রাণের মাঝখানটা যেন 'খাক্' হয়ে যেতে লাগ্‌ল। সেদিন আবার একজায়গা থেকে তাদের দলের ডাক পড়েছিল; কাজেই সকলে চলে গেছ্‌ল; সে একাকী শয্যার উপর জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল; হঠাৎ তার মনে হল যেন তার মা তাকে ডাক্‌ছেন। 'যাই মা' বলে সে শয্যার উপর উঠে বস্‌ল, পরক্ষণেই যখন তার হুঁস্ হল, যখন তার সুখ-স্বপ্ন তাসের বাড়ীর মত অদৃষ্টের একটি ফুৎকারে ভেঙ্গে পড়্‌ল, তখন সে তার সেই উত্তপ্ত বুকখানাকে চেপে ধরে শয্যার উপর শুয়ে পড়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল, "ওগো, আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও গো! আমি তোমাদের পায়ে পড়ি গো!"

সে কিছুক্ষণ এই ভাবে পড়ে রইল তারপর তার মনে হল, "এক কাজ করি না, এখন ত আর কেউ নেই, এই বেলা পালালে ত বেশ হয়; কিন্তু পথ-ঘাট ত সব জানা নেই! তবে হাবড়ার—ঐ যে কি বলে—যেখান থেকে গাড়ী ছাড়ে—সে জায়গাটা কোনমতে চিনে যেতে পার্‌ব—তারপর কোন্ গাড়ীতে উঠতে হবে সে কাউকে না-হয় জিজ্ঞেস করে নেবে, তারা কি বলে দেবে না? দেবে বইকি, আমি ত আর তাদের কোন অনিষ্ট করি নি তবে—বল্‌বে না কেন? কিন্তু, কল্‌কাতার লোকেরা সকলেই যদি নিষ্ঠুর হয়, তারা যদি আবার আমাকে ধরে রাখে।

এমনই সাত-পাঁচ ভেবে সে ধীরে ধীরে উঠল তারপর তার জিনিষ-পত্তরগুলি সব একজায়গায় জড় করে একখানা ছোট কাপড়ে বেঁধে ফেল্লে। সবই ত হল, কিন্তু উঃ, শরীরটা যে কিছুতেই খাড়া হতে চায় না, টলমল্ করছে যে, মাথাটা যে বন্‌বন্ করে ঘুর্‌চে গা, তবে বুঝি তার যাওয়া হল না—না—না যে করে হোক্ তাকে যেতেই হবে, নিশ্চয়ই যেতে হবে; ঐ না কার পায়ের শব্দ, ঐ না কে আস্‌ছে, না না ও কিছু নয়, মনের ভুল। সে তখন আস্তে আস্তে ঘরের এক কোণ থেকে একটা ছোট শাল-কাঠের বাক্স অতি কষ্টে টেনে এনে, তার ডালাটা খুলে ফেল্লে। তারপর সেই বাক্সর ভিতর থেকে একখানি ছোট 'নামাবলী বার করে সে চোখের কাছে বেশ ভাল করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, "হাঁ, এই ত বটে! বেশ হয়েছে, মাকে এটা দিতেই হবে, মা এটা পেয়ে কত সুখী হবে, তাকে কত চুমো খাবে! কল্‌কাতায় এসেই সে এই নামাবলীখানি তার মার জন্যে কিনে রেখেছিল। সে সেই 'নামাবলী'খানিকে বেশ করে পাট করে তার সেই ছোট পুঁটুলিটির মধ্যে বেঁধে ফেল্লে। তারপর সন্ধ্যার সেই গা-ঢাকা অন্ধকারের মধ্যে আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়্‌ল।

উঃ, কি কন্‌কনে হাওয়া, গায়ে যেন সূঁচ ফোটাচ্ছে! আর উঃ, কি ভয়ানক মাথাটা টলছে, পড়ে যাব না ত? আর ত চলা যায় না, কিন্তু চলতেই হবে যে, না চল্লে যে চলবে না!

বালক অতিকষ্টে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। তার গাটা জ্বরের তাপে একবারে পুড়ে যাচ্ছিল, তবু সে অতিকষ্টে চল্‌তে লাগ্‌ল।

কিন্তু এমন করে ত আর চলা যায় না, ঐ ওখানে কাদের রক রয়েছে, ঐখানে গিয়ে একটু বস্‌লে হয় না—আঃ বাঁচলুম! সে তাঁর পুঁটুলিটী রেখে সেই রকেরই একটী পাশে বসে পড়্‌ল। কিন্তু হা রে কপাল; এখানেও কি তার ঠাঁই নেই! একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী-পরা দরোয়ান এসে হেঁকে উঠল, "কোন্ হ্যায় হুঁয়া, আভি উতারো।"

এইবার ত তাকে উঠ্‌তে হবে—হাঁ উঠতেই ত হবে; কিন্তু না—আর, কিন্তু না, এখানে কিন্তু বল্‌লে কেউ শুন্‌বে না গো কেউ শুন্‌বে না! পা ত আর চলে না—না চলুক্, উঠ্‌তে হবে, সে উঠ্‌তে বাধ্য যে!

সে ধীরে ধীরে উঠ্‌ল কিন্তু আর না এইবার বুঝি সে পড়ে যাবে! তার মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল, সে একটা বাড়ীর দেয়াল ধরে আস্তে আস্তে 'ফুট্-পাথে'র উপর বসে পড়্‌ল। তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে সেইখানেই শুয়ে পড়্‌ল। একে শীতকাল, তার উপর আবার কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস তার সেই ক্ষুব্ধ বুকখানাকে একেবারে পিষে ফেলে দিয়ে যাছিল। একজন বাবুকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে সে ক্ষীণকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল, "ওগো আমাকে একটু জল দাও গো, একটু জল দাও;" কিন্তু ও রে অবোধ, এ যে সভ্যজগৎ! এখানে ত তোর দিকে কেউ চাইবে না। বাবুটী তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে কি না জানি না; সে আপনার মনে শীশ দিতে দিতে চলে গেল, আর সেই বালক সেইখানেই সেই ভাবেই পড়ে রইল।

তখন অর্দ্ধ রাত্রি, কলকাতার মত সহরের পথ-ঘাটও একান্ত নির্জ্জন, জনমানব শূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করছে। কোথাও একটু সাড়া নাই, শব্দ নাই, কুয়াসার একটা গাঢ় আস্তরণ সমস্ত

সহরখানাকে একেবারে ঘিরে ফেলেছে আর সেই ঘন কুয়াসার পরদার ভেতর দিয়ে বড়রাস্তার আলোগুলো মিট্‌মিট্ করে জ্বল্‌ছে। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা হবে। একজন পাহারাওয়ালা 'ফুটপাথে'র উপর একটা ছোট বালককে পড়ে থাক্‌তে দেখে বলে উঠ্‌ল, "কোন্ হ্যায়?" সাড়া নাই। আবার হাঁক্ পাড়িল, "কোন্ হ্যায়?" এবারও সাড়া নাই, শব্দ নাই। এবার সে কাছে আসিয়া 'রুলে'র গুঁতা মারিল; কিন্তু কৈ এ ত নড়ে না! ওগো, মেরো না গো মেরো না, আর সে নড়্‌বে না। সে ঘুমিয়ে পড়েছে যে, তাকে ঘুমুতে দাও। পল্লীবাসীর বুকজোড়ান' ধন, বুড়ো মায়ের স্নেহের পুতলি অভিমান করে ঘুমিয়ে পড়েছে গো, তাকে ডেকো না, তাকে মেরো না! কল্‌কাতার মোহ একদিন তাকে তার স্নেহময়, শান্তময়ী পল্লীবাসীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল; আজ বুঝি আবার পরপারের কোন নূতনতর রাজ্য তার মনটাকে কেড়ে নিয়েছে গো, তাই সে আজ রাগ করে এখান থেকে চলে যাচ্ছে; তাকে ডেকো না গো, তাকে আরামে যেতে দাও।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

বৈজ্ঞানিকের সহিত দুইঘণ্টা

"The s cr.t is summed up in three words :
'Work', 'Finish,' 'Publish'."

—Faraday.

জৈব-রসায়নের স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানরথী ও 'অক্সিজেন্'-বাষ্পের আবিষ্কর্ত্তা ল্যাভোসিয়ার বলিয়াছিলেন, "রসায়ন-শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, যাবতীয় বস্তুকে ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া দ্বিধাবিভক্ত করা এবং বিভক্ত পদার্থকে পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া অণু-পরমাণুতে পরিণত করা; সুতরাং রসায়ন-শাস্ত্র, কেবল গঠিত দ্রব্যকে ধ্বংস-বিধ্বংস করিয়া তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মূর্ত্তিকে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে মানুষের চোখের সম্মুখে ধরাইয়া দেয়।" ল্যাভোসিয়ার বড় রাসায়নিক নিশ্চয়ই; কিন্তু তিনি যে বীক্ষণাগারে বসিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা রসায়ন-শাস্ত্রের একতলা; তাঁহার পর কত রসায়নবিদ্ ল্যাভোসিয়ারের 'ল্যাবোরেটারি'র একতলার উপর কত তলা বীক্ষণাগার নির্ম্মাণ করিয়া যে সুবৃহৎ হর্ম্ম্য রচনা করিয়াছেন, তাহা ল্যাভোসিয়ার হয় ত কল্পনাও করেন নাই। বৈজ্ঞানিকগণের হাতে এখনও হাতুড়ী এবং আগুনের শিখা থাকিলেও, সে হাতুড়ী ও সে আগুন এখন জিনিষের সাধন ধ্বংস করিয়া তাহার জটিল গঠনোপাদান দিয়া আবার সৃষ্টির কার্য্যে হাত দিতেছে। আজকাল বৈজ্ঞানিকগণের "একহাতে কৃপাণ" থাকিলেও, সে কৃপাণ বামহাতে; কিন্তু সৃষ্টি-রাজ্যের বিজয়চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে "হার" আছে। সে হার আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের হাতেই আছে। বিজ্ঞানের স্বয়ম্বরায় আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-বাঞ্ছিতা, যুগ-যুগ-বন্দিতা শ্রেষ্ঠ অনিন্দ্য সুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হন নাই।

বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বে জানিতেন, জৈব-পদার্থ বুঝি মানুষের আবিষ্কারের বাহিরে। অজৈব রসায়ন অথবা Inorganic chemistry তখন তাঁহাদের চরম লক্ষ্য ছিল। তাহার পর কোল্‌বা (Kolue) যখন carbon অথবা 'কৃষ্ণসার' হইতে 'এ্যাসিটিক্ এ্যাসিড' (Acetic Acid) তৈয়ারি করিলেন, তখন লোকের চমক ভাঙ্গিল। তাহার পর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বার্থেলট্ (P. E. Marcelin Berthelot) ঐ একই পদার্থ হইতে 'এ্যাসিটিলিন্' (Acetylene) বাষ্প প্রস্তুত করিলেন। M. Berthelot ইহার পর বহুসংখ্যক জৈব-পদার্থ রচনা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

আজ আমরা যে বৈজ্ঞানিকের কথা আলোচনা করিতেছি, তিনিই স্বনামধন্য Pie(re Engine Marcelin Berthelot। জৈব-রসায়নের মূলভিত্তি যে তিনি স্বহস্তে স্থাপিত করিয়া গিয়াছিলেন, সে কথা আজ সকলে জ্ঞাত আছেন কি না জানি না। আজ যদি তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যের উপযুক্ত সম্মান প্রদান করা না হয়, তবে জৈব-রসায়ন তাহার পূর্ব্ব পুরুষকে বিস্মৃত হইবে।

বার্থেলটের সহিত ফ্রেড্‌রিক্ লী (Ferderic Lees) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিকের দুইঘণ্টাব্যাপী যে কথোপকথন হইয়াছিল, অদ্য তাহাই পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট বিবৃত করিব। ইতঃপূর্ব্বে বার্থেলটের একটু পরিচয় আবশ্যক।

বার্থেলট্ এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, প্রবন্ধ-সংযুক্ত প্রথম ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পরিবেন। তাঁহার বয়স এখন ৮৮ বৎসর। তথাপি পরিশ্রমে তাঁহার সমবয়স্কগণের মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর তারিখে প্যারী-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এখন বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাসকাল স্থানীয় উদ্ভিদ্‌রাজি লইয়া পরীক্ষা করিয়া থাকেন। এইস্থানে আমরা ফ্রেড রিকের নিজের ভাষায়, তাঁহার বার্থেলটের নিকট গমন ও বার্থেলট্-দর্শন বিবৃত করিব।—

"প্যারী-নগরী হইতে অনেকদূরে বনানীর ঘন আবরণ ভেদ করিয়া একটা সৌধ-চূড়া উচ্চ হইয়া আছে। শুনিলাম, সেটাকে লোকে 'বার্থেলটের টাওয়ার' বলে; কারণ, বার্থেলট্ ঐ বহু উচ্চ 'টাওয়ারে' উদ্ভিদ্ লইয়া নানা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। চূড়াটি এত উচ্চ যে, দূর হইতে তাহা সর্ব্বপ্রথম স্থানীয় জন-সঙ্ঘের আবাসভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আমি সুরম্য উদ্যানের ভিতর দিয়া একটা বড় দেওয়ালে-ঘেরা বাড়ীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। দুয়ারে লেখা আছে—CHIMIE VEGETALE. তথায় বার্থেলট্ উদ্ভিদ্ লইয়া পরীক্ষা করেন। আমি সে বাড়ী ছাড়াইয়া বার্থেলটের স্বীয় বাসভবনে আসিয়া পৌঁছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি বার্থেলটের পাঠাগারে গিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ চেয়ারে বসিয়া আছেন। যে বৈজ্ঞানিক আজ ৫০ বৎসরকাল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-আবিষ্কারে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে একবারমাত্র দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম, লোকটির জ্ঞান কত সুদূরবিস্তৃত। তাঁহার নূতন পুস্তকগুলি থাকে থাকে 'সেল্‌ফে'র উপর সাজান' রহিয়াছে। সে দিকে তাকাইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে এই এক এক থাক্ পুস্তক কত না নূতন জ্ঞান দান করিয়াছে! মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-প্রয়োজনীয় কত দুষ্প্রাপ্য পদার্থ এই একমাত্র বৈজ্ঞানিক নিজের

অদ্ভুত আবিষ্কারদ্বারা কত সুলভ করিয়া দিয়াছেন! ব্যবসায়ের কত উন্নতির পথ বাধামুক্ত করিয়া দিয়াছেন! আমি একবার বৈজ্ঞানিকের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, তাঁহার সুতীক্ষ্ণ এবং পর্য্যবেক্ষণশীল চক্ষু দুইটি জল্ জল্ করিতেছে, উন্নত জ্ঞান-গরিমার নিদর্শন এবং চিন্তার প্রখর দীপ্তি তাঁহার সুপ্রশস্ত শুভ্র ললাটে মূর্ত্তিমান্। আমি কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার আবিষ্কার বহুমূল্য; আচ্ছা, বলুন দেখি, মানুষের খাদ্য-দ্রব্য কোনকালে কি জৈব-রসায়ন প্রস্তুত করিতে পারিবে?' প্রত্যুত্তরে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফরাসী-ভাষায় উত্তর করিলেন, 'Te suis entierement a votre disposition, Monsieur' অর্থাৎ "আমরা যখন জৈব-পদার্থ বীক্ষণাগারে বসিয়া প্রস্তুত করিতেছি, তখন তুমি সেই সময়ের কল্পনা করিতে পার না যখন, প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাস্য করি নাই। আমি ভাবিতেছিলাম যে, আজকাল 'পার্লামেণ্টে' বাণিজ্য লইয়া যে গোলযোগ হইতেছে, তাহাতে বাণিজ্য-ই-বা কোথায় যাইবে আর ব্যবসায়-ই-বা কোথায় যাইবে? তাই মনে করিয়াই আমার হাসি পাইতেছিল।"

বার্থেলট্ বলিতে লাগিলেন:—"আমি জানি, অনেকে আছেন, যাঁহারা রসায়নের গত ইতিহাসের কথাতেই উন্মত্ত থাকেন, ইহার ভূয়মান্ অবস্থা এবং ভাবী অবস্থার প্রতি তাঁহারা মোটেই নজর দেন না। তাঁহাদের নজরটা কেবল পথের উল্টাদিকে—সম্মুখে চাহিবার নজর তাঁহারা একেবারেই হারাইতে বসিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি এবং ভরসা করি যে, রসায়ন-শাস্ত্রের চরমোৎকর্ষ, কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্য-রচনায় নহে, অধিকন্তু জীব-সৃষ্টিতে সমাপ্ত হইবে। আমি নিজে যে সকল আবিষ্কার করিয়াছি, সেগুলি আমাকে

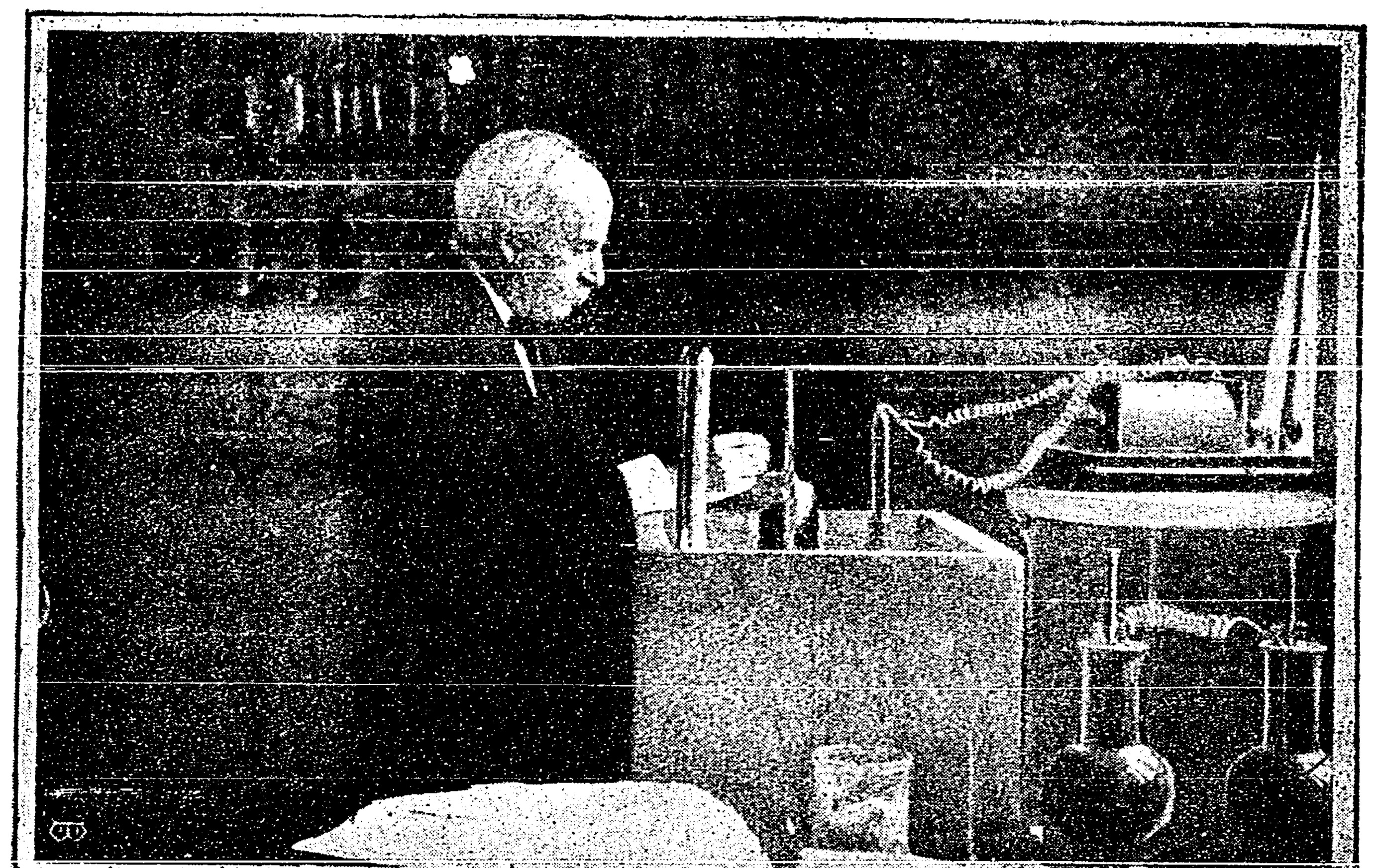

বীক্ষণাগারে বার্থেলট্

আমরা ঘরে বসিয়া খাদ্য-সামগ্রী তৈয়ারি করিব!' এই কথাগুলি বলিবার সময় মনে হইল, তিনি যেন পূর্ণ-যৌবনপ্রাপ্ত নবযুবক! বয়সের চিহ্ন যেন কোনখানেই রাখেন না! সুনিশ্চয়তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমার প্রতি চাহিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, 'কেন, আমরা ত এখন খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছি। এই দেখ না, চিনি ও নানারকম তৈলজ পদার্থ আমরা বীক্ষণাগারে তৈয়ারি করিতেছি। তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা লইয়া আমি সুদীর্ঘ গবেষণা ও কার্য্য করিয়াছি; সুতরাং ইহার উত্তর আমার হাতের মুঠার ভিতর। আমি বলিতেছি যে, সেদিন খুব নিকটে, যেদিন মানুষ ঘরে বসিয়া খাবার তৈয়ারি করিতে পারিবে। তুমি হাসিতেছ?—মনে করিতেছ বুঝি-বা অসম্ভব; কিন্তু সত্যই ব্যাপারটা 'ইউটোপিয়া' (Eutopia) বা আকাশ-কুসুম নহে। আমি জীবিত থাকিতে আবিষ্কার করিতে না পারি ত তোমরা রহিয়াছ। হাসিবার বিষয় কিছুই নাই। বয়সের জন্য আমি একটুও গ্রাহ্য করি না।' "

আমি দ্রুত উত্তর করিলাম,—

"আজ্ঞে না, না! আমি আপনার অপূর্ব্ব আবিষ্কারের ভাবী কল্পনার অসম্ভাবিত্বের জন্য কি আপনার ঋষিতুল্য সৌম্য মূর্ত্তির বারংবার ঐ কথাটাই স্মরণ করিয়া দেয়। ইহা বক্তৃতা নহে; পরন্তু ইহা আমার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফল।"

আমি উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "জীব-সৃজনের সম্বন্ধে আপনার কি মত তাহা জানিবার জন্য বড় ইচ্ছা হয়। আপনি কি মনে করেন যে, মানুষ একদিন তাহার 'ল্যাবরেটারী'তে বসিয়া প্রাণী তৈয়ারি করিতে পারিবে?"

বার্থেলট্। "ওঃ, তুমি এবার আসল কল্পবীর হইতে বসিয়াছ! আমি মনে করি না যে, বৈজ্ঞানিক কোনদিন মনুষ্য সৃষ্টি করিতে পারিবে। অন্ততঃ, আজ পর্য্যন্ত আমরা ততদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই; কিন্তু আমেরিকার 'ল্যাবরেটারী'তে যে সকল নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার খোঁজ রাখ কি?"

আমি উত্তর করিলাম:—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তার লোয়েব (Loeb) শুনিয়াছি, ডিম্বের ভ্রূণ-অবস্থাকে কৌশলে পূর্ণগঠিত সাধারণ আকার প্রদান করিয়াছেন।"

বার্থেলট্ বলিলেন, "এ ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্যজনক এবং উৎসাহদানের যোগ্য ব্যাপার, সন্দেহ নাই। আমি জানি না, কবে আমরা মনুষ্য-শরীরের জীবকোষ বা Protoplasm সৃষ্টি করিতে পারিব; কিন্তু আমি মনে করি না যে, বৈজ্ঞানিকের

এই জীব-সৃষ্টির প্রচেষ্টা একান্ত পণ্ডশ্রম; কারণ, আমি জানি, বৈজ্ঞানিকেরা এক উদ্দেশ্য লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলে, পরীক্ষার মধ্যে তাঁহারা কত অচিন্ত্য এবং স্বপ্নাতীত নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন এবং করিয়াছেন। তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়াটা খুব দুঃখের বিষয় হয় না; কারণ, তাঁহারা পথি-মধ্যে যে সকল নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহা সত্যই বিজ্ঞানের সামগ্রী ও বিশেষ আদরণীয়। যেমন মনে কর, 'রেডি-য়মে'র (Radium) আবিষ্কার। একটা জিনিষ আবিষ্কার করিতে গিয়া পথিমধ্যে অন্য জিনিষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। এটা বিজ্ঞানের রাজ্যে একটা খুব মজার ব্যাপার; কিন্তু তবুও ইহাতে ভারি একটা বিপদ আছে; পরীক্ষক বা বৈজ্ঞানিককে এই জায়গায় অত্যন্ত সুবিচারক হইতে হয়। আমরা এই জায়গায় খুব ধীরপদে অগ্রসর হইব, কখন তাড়াতাড়িতে একটা খাপ্ছাড়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইব না। কল্পনাকে যতদূর পারি নির্ব্বাসিত করিয়া পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত ছাড়া এই স্থানে চলিবার যো নাই।"

এই কথাগুলি বলিবার সময় আমি দেখিলাম, তিনি যেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার জ্বলন্ত প্রেরণায় বাক্যস্ফূর্ত্তি করিতেছেন। ইহাতে যে একটুও মিথ্যা নাই, তাহা বার্থেলটের মুখচ্ছবি এবং বাক্যের দৃঢ়তা ও সহজ অনুভূতিমিশ্রিত সরল কথোপকথনে খুব ধরা পড়িতেছিল। এই সময় রোমে Free thought congress বা "স্বাধীন-চিন্তা-সমিতি" নামক একটা বিরাট্ বৈজ্ঞানিকগণের সম্মিলনী হইয়া গিয়াছিল। বার্থেলট্ সেই বৎসর তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আদর্শ, উদার, চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশি-ষ্টতা কি? এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?"

বার্থেলট্ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন:—"সমস্ত বিষয় বিচারপূর্ব্বক বুঝিবার ক্ষমতা, কার্য্যক্ষেত্রে এবং চিন্তাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মুক্তির ভাব এবং সর্ব্বোপরি বৈজ্ঞানিক মনন-শক্তি-লাভ, উদার চিন্তাশীল ব্যক্তির আসল লক্ষণ। স্বাধীন চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক, তাঁহার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরীক্ষালব্ধ সুদৃঢ় সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন; তিনি যদি রসায়নবিদ্ হন, তবে তাঁহার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিবেন; তিনি যদি ঐতিহাসিক হন, তবে নিজের মনগড়া সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু অন্বেষণ-প্রাপ্ত সত্য সিদ্ধান্ত তাঁহার পদনির্দ্দেশক হইবে। সত্য এবং সৎপথে বিচরণ করা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান এবং নিশ্চিত ধর্ম্ম। তাঁহারা জীবনে সত্যবান হইবেন; তবেই সত্য লাভ করিতে সক্ষম হইলেন; নচেৎ মনগড়া মিথ্যার কুহকে তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।"

এইস্থানে বার্থেলট নীরব হইলেন। অতঃপর আমি তাঁহার বীক্ষণাগার (Laboratory) দর্শনেচ্ছু হওয়ায়, তিনি আমাকে তাঁহার বীক্ষণাগারে লইয়া চলিলেন। বহুবিধ বৃক্ষরাজি ও লতা-ওষধিজাতীয় নানাপ্রকার দুর্ল্ভ উদ্ভিদে তাঁহার একটি বাগান গঠিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, "এই বাগানে আমার পরীক্ষার গাছ-গাছড়া রহিয়াছে। নানাদেশ হইতে ইহাদের সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। আমি সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভিদ্ লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করি। উদ্ভিদ্-জীবনের নানা রহস্য ভেদ করিবার জন্য আমি হৃদয়ের মধ্যে প্রেরণা পাইয়াছিলাম। আমার এই ব্যয়বহুল প্রয়াসে "Ministry of Public Instruction" আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।" এই বলিয়া, বার্থেলট্ একটা লম্বা কাঁচের আবরণের মধ্যে একটা চারাগাছ দেখাইয়া বলিলেন, "এই যন্ত্রটা আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি; কেমন করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহদ্বারা উদ্ভিদ্-দেহের 'নাইট্রোজেনে'র অংশ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, এই যন্ত্রটি তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। কাঁচের আবরণের ভিতর চারাগাছটাকে একটা টিনের আবরণের ভিতর রাখিয়া, ঐ টিনে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিলে দেখিতে পাইয়াছি যে, উদ্ভিদ্, বিদ্যুৎ-সংযোগে মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে অধিক পরিমাণে 'নাইট্রো-জেন্' গ্রহণ করিতে পারে। মুক্তাবস্থায় রাখিলে উদ্ভিদ্ যে 'নাইট্রোজেন্' গ্রহণ করে, তাহার পরিমাণ পূর্ব্বোক্ত 'নাইট্রোজেন' হইতে অনেক অল্প।

বার্থেলট্ বিদ্যুদ্যোগে উদ্ভিদের নাইট্রোজেন-গ্রহণের শক্তিবৃদ্ধি দেখাইতেছেন

কেন বিভিন্ন প্রদেশে ভূমির উচ্চতা ও নিম্নতা-অনুসারে ফসলের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। এ ছাড়া ভূমিতে নানাজাতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীব-কণিকা কেমন করিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে, আমার আবিষ্কারের তাহাও একটা অঙ্গ ছিল। আমি ইহাতেও সফল-কাম হইয়াছি। বৃক্ষ-পত্রের সবুজবর্ণের উপর সূর্য্যালোকের প্রভাবের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। সে বিষয়েও আমি নানা নূতন রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছি; কিন্তু সে সকল বিষয় বলিতে এবং দেখাইতে গেলে আজ সমস্ত দিন চলিয়া যাইবে। অতএব আমার বীক্ষণাগারের অপর অংশ দেখাইব, চল।"

এই বলিয়া বার্থেলট্, তাঁহার বিশাল বীক্ষণাগারের বহুবিধ যন্ত্রাদি আমাকে আগ্রহসহকারে দেখাইলেন। যখন তিনি তাঁহার জটিল যন্ত্রসহিত বীক্ষণাগারের মধ্যে যাইতেছিলেন, তখন আমার মনে হইল, সমগ্র পৃথিবীকে তিনি এই যন্ত্রলব্ধ পরীক্ষা-

দ্বারা কত অজ্ঞাত এবং লাভজনক তথ্য জ্ঞাত করিয়াছেন। আর্থিক দিক্ দিয়া দেখিতে যাইলে, বার্থেলটের প্রত্যক্ষ নূতন আবিষ্কার সমাজের অর্থনীতিতে যুগান্তর আনয়ন করিবে; কিন্তু দেখিলাম, তিনি নিজে ধনবান্ হইবার জন্য একটুও উৎসুক নহেন। স্বাধীন চিন্তাশীল, জ্ঞান-গরিমায় শীর্ষস্থানীয় এবং সমাজের আর্থিক উন্নতির চরম আদর্শের পরামর্শদায়ী বার্থেলট্‌কে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অপর কিছুই নহেন। তিনি ধনী নহেন, যশ-ভিখারী নহেন; পরন্তু মহা সত্যের প্রেরণায় একাধারে দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক। সাধারণ্যে তিনি "দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক" বলিয়া আজিও বিখ্যাত। ঋষির ন্যায় তিনি সত্য-তত্ত্বের সাধক এবং ডুবারীর ন্যায় তিনি অতল রহস্যের রত্ন-সংগ্রাহক।"

* * * *

ফ্রেড্‌রিক লিয়ের শেষ কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই মহাজ্ঞানী বার্থেলটের কথা শেষ করিব।

"Though his social relations with men of the world have presented many an opportunity of doing so, he has wlways kept his mind clear of the "Practical interest of mankind. A SAVANT—in the opinion of the scientist and philosopher—a Savant, who is really worthy of the name, should elevate his life, without a thought of pecuniary profit, to the amelioration of the lot of all, rich and poor alike"

"পৃথিবীতে তিনি নিজের আবিষ্কারের দ্বারা ধনবান্ হইবার বহু সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু জন-সমাজের ধনবৃদ্ধির উপায় আবিষ্কারের মাদকতা হইতে তিনি স্বীয় চিত্তকে সতত দূরে রক্ষা করিয়াছিলেন। একাধারে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণ তাঁহাকে ঋষি বা মনীষী বলিয়া থাকেন। তিনি সত্যই ঋষি-পদ-বাচ্য। ধনপ্রাপ্তির সুবিধা ত্যাগ করিয়া তিনি মানব-হিতৈষীর ন্যায় ধনী-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে আপামর-সাধারণের উন্নতিকল্পে স্বীয় জীবন নিয়োজিত করিয়াছেন।"

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

বণিক্-বালা

উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা।

এই ৯৩ পৃষ্ঠার, সাধারণ কাগজে সাদাসিদে ছাপা ও কাগজের মলাটের পুস্তকখানির পক্ষে বার আনা দাম অত্যন্ত বেশী হইয়াছে।

লর্ড লিটনের পুস্তক অবলম্বন করিয়া এই কথাগ্রন্থ রচিত। লেখকের ভাষা ভাল; তবে তাতে প্রাচীনতার ছাপ্ কিছু বেশী! তাঁহার রসিকতাও একালের উপযোগী ও বেশ মার্জ্জিত নয়। আলোচ্য উপন্যাসে নাটকীয় রসের প্রাচুর্য্য আছে; মোটের উপর বলা যায়, হরনাথবাবুর লেখা সাধারণ পাঠককে তৃপ্তিদান করিবে।

ওডিসিউস

(ওডিসির গল্প)

বালক-পাঠ্য। শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত। সিটিবুক সোসাইটী; ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা। সচিত্র মলাট। ভিতরে চারিখানি 'হাফ্‌টোন্ ফটো' আছে।

বইখানির লেখা খুব ভাল—একেবারে শিশুদেরই উপযোগী। ছোটর ভিতরে গল্পটি দিব্য কায়দা করিয়া বলা হইয়াছে; কুলদাবাবুকে শিশুরা ঠাকুরদাদার মতই ভালবাসিবে। ছাপায় কতকগুলি ভুল বানান থাকিয়া গিয়াছে। শিশুদের পুস্তকে এদিকে একটু চোখ রাখা দরকার; কারণ, ছাপার হরফ তাদের কাছে অভ্রান্ত বেদ।

ষ্ট্রীণ্ডবার্গ্ ও তাঁহার গ্রন্থের চরিত্র

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ৩০এ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ {১ম খণ্ড, ১৯শ সংখ্যা

"বর্ত্তমান জগৎ" সম্বন্ধে একটি কথা *

"বর্ত্তমান-জগৎ" একখানি ভ্রমণ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রথম ভাগে লেখক ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার নিজের মিশর-যাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা অনাড়ম্বর। সুধু কাজের কথা ছাড়া লেখক অন্য কোন বাজে কথার অবতারণা কোথাও করেন নাই। তাঁহার মিশর-যাত্রার পথে যেখানে যেমনটী দেখিয়াছেন, তাঁহার এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থে 'ডায়েরী'র ধরণে সেইখানে ঠিক তাহাই অবিকল বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বিনয়বাবুর লেখার আন্তন্ত এমন একটা সুর আছে,যাহা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত কোন ভ্রমণ-পুস্তকে পাই নাই। যাঁহারা নিজের জন্য অথবা বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্য লইয়া ভ্রমণ করেন, তাঁহাদের ভ্রমণে যে একটা স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। যাঁহারা খেয়ালের বশে দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহারাও অনেক দেখেন-শোনেন, খাঁটি অ-খাঁটি অনেক রকমের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, একথাও সত্য। এরূপ ভ্রমণকারীদের ভ্রমণে যে স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব নাই, এ কথা বলি না ; কিন্তু যে স্বাতন্ত্র্য, যে বিশেষত্ব আমাদের একান্ত শিক্ষণীয় ও নিতান্ত অনুকরণীয়,এতাবৎকাল-প্রকাশিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তগুলির দুই-একখানি ব্যতীত কোন খানিতে আমরা তাহা পাই নাই। ভ্রমণ কিসের জন্য ? দেশ-বিদেশে নানাবিষয়িণী: অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজের জীবন তথা জাতীয় জীবন গঠন করিবার জন্য নয় কি ? তুমি ভ্রমণ করিবে কর—কিন্তু ভ্রমণ করিয়া দ্রষ্টব্য যাহা দেখিলে, শিক্ষিতব্য যাহা শিখিলে, সেইটুকুর উপর দেশবাসীর অধিকার আছে—দেশবাসী তোমার নিকট সেইটুকু দাবী করিবে, তোমাকে সেই দাবী পূরণ করিয়া দেশবাসীকে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তুমি যে জ্ঞানানন্দ উপভোগ করিবে দেশবাসীকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে নাই। বিশেষতঃ দেশের যিনি সুসন্তান, দেশ তাঁহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। যখন তিনি বিদেশে গমন করিয়া বিদেশের জ্ঞানরত্ন স্বায়ত্তীকৃত করিয়া, বিশ্বতোমুখ সার উজ্জল জ্যোতিরাভাসটুকু স্বদেশের কল্যাণের জন্য, দেশের অপূর্ণভাববিশেষে পূর্ণত্ব সমানয়নের জন্য স্বদেশে বিচ্ছুরিত করিতে সুচেষ্ট হ'ন, স্বদেশবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয় সাগ্রহান্তঃকরণ তখন আনন্দে উদ্ভাসিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে না কি ?

ভ্রমণ করিয়া বা না করিয়া, ইতিহাস-ভূগোলের দুই-চারি পাতা উল্টাইয়া অথবা 'গাইড্-বুকে'র কথঞ্চিৎ সাহায্য লইয়া আমাদের দেশে অনেক ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। আজকাল বঙ্গ-সাহিত্যে কেবল ভাবসর্ব্বস্ব (?) উচ্ছ্বাসময় ভ্রমণ-বিবরণেরও অসদ্ভাব নাই ; কিন্তু দেশের এই দুর্দ্দিনে, সাহিত্যের শত অভাব-সত্ত্বেও দেশবাসীর অনেক চেষ্টা কেন যে এইরূপ অসার আবর্জ্জনা-সংগ্রহে সংহত, তাহা বলিতে পারি না। বিনয়বাবু দেশের মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তান। তিনি দেশের জন্য সাহিত্যের সেবক; সাহিত্যের জন্য সাহিত্যের লেখক। শাস্ত্রে বলে, তিনিই প্রকৃত

মিশরীয় রমণী

সাহিত্যিক,যিনি সাহিত্য যথার্থরূপে অধিগমন করিয়া সাহিত্যকে রক্ষা করেন। বিনয়বাবু সাহিত্যকে স্তরে স্তরে বুঝিয়াছেন, সাহিত্যের বর্ত্তমান প্রয়োজন অনুধ্যান করিয়াছেন, পরে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া যাহাদ্বারা সাহিত্যকে রক্ষা করা যায়, তাহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। সাহিত্যের দ্বারা অনেক সময় অনেক বড় বড় কাজ দেশে সংসাধিত হইয়াছে ; তাই হিতের সহিত বর্ত্তমান যে সাহিত্য, তাহাকে অবলম্বন করিয়া তিনি দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। দেশের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে ; যে ধর্ম্মহীন হইয়া দেশ অধঃ-

* বর্ত্তমান-জগৎ (প্রথমভাগ)—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। মূল্য ১॥০ দেড়টাকা।

পাতে যাইতে চলিয়াছে, সেই ধর্ম্মকে পুনরুদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, একদিন বর্ত্তমান যুগের শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী বিবেকানন্দ যে বীণাধ্বনি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই প্রাণমাতান সুর বুঝি বিনয়বাবুর কর্ণে প্রবেশপূর্ব্বক মর্ম্মস্পর্শ করিয়া তাঁহার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। ব্যাকুল প্রাণের কথা যে ভাষায় নিগদিত হয়, "বর্ত্তমান জগৎ" বিনয়বাবুর সেই ভাষায় লিখিত।

'বর্ত্তমান-জগতে' আছে কি? জাহাজ-জীবনের কথা। বিদেশ-

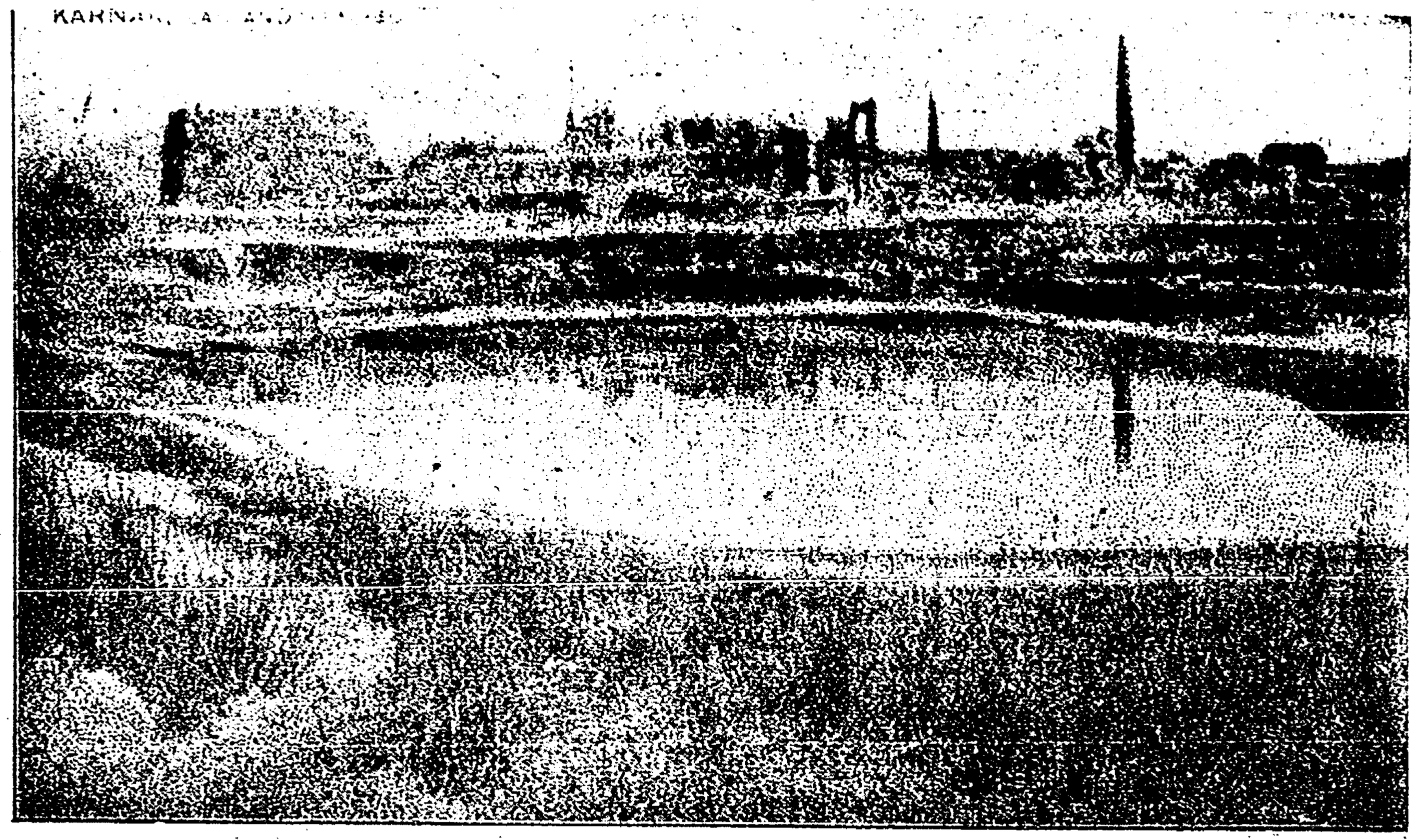

য়্যামন-পুরোহিতগণের সরোবর

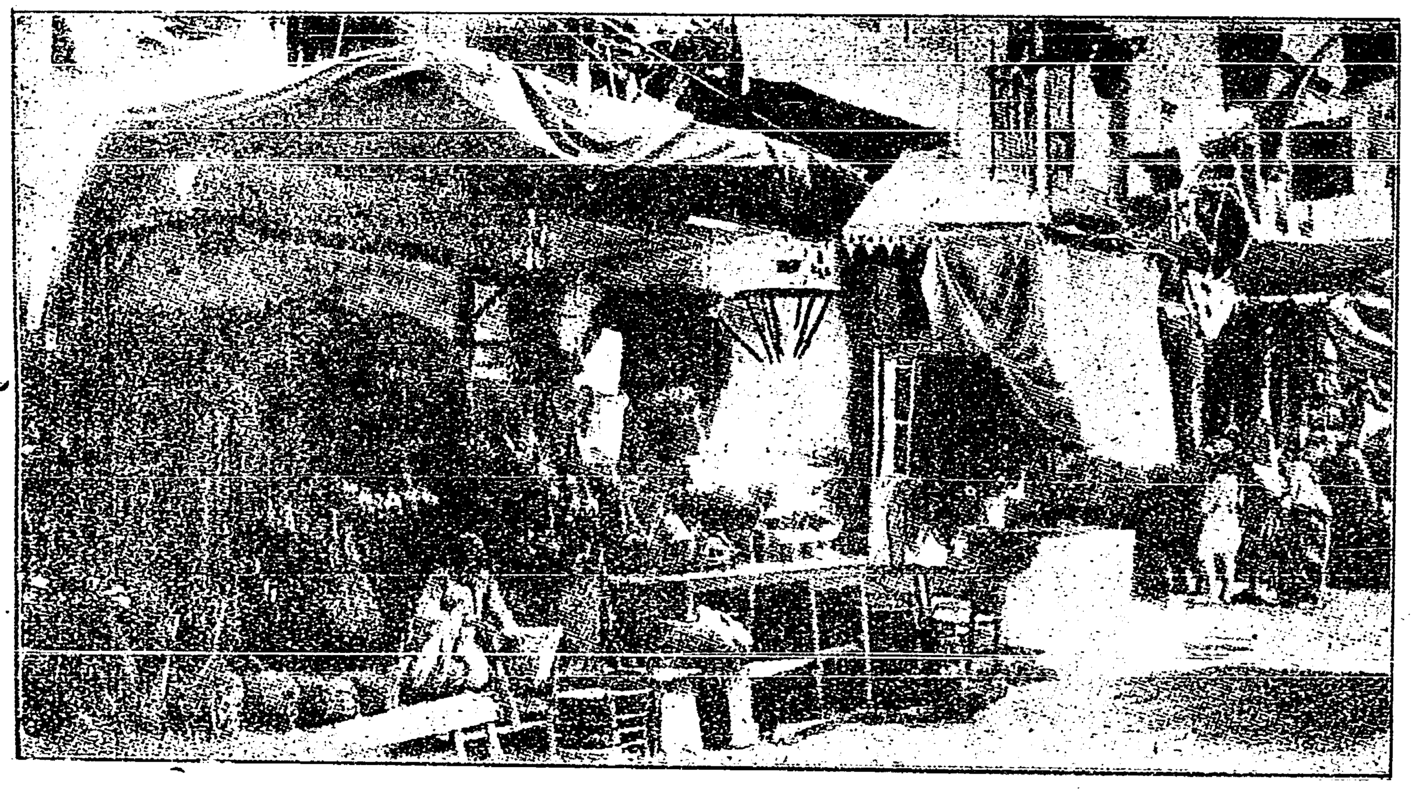
কাইরোর স্বদেশী বাজার

ছেন সত্য, কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয়ে বিনয়বাবু মিশরের অন্তরাত্মার যে চিত্র প্রতিফলিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, জগতের সর্ব্বপ্রধান archæologist ফ্লিণ্ডার্স্ পেট্রিও তাহা তাঁহার মিশরের ইতিহাসে চিত্রিত করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় নয়। আমরা বিনয়বাবুর এ পুস্তক-সম্বন্ধে অত্যুক্তি করি নাই। একবার

যাত্রার কথা, এলিফ্যাণ্টাইন দ্বীপের কথা, কবরের দেশ মিশরে তাঁহার অবস্থিতিকালে দিনপনরর কথা। ইহাতে তিনি মিশরীয় রমণীর কাহিনী, য়্যামন-পুরোহিতগণের সরোবর, কাইরোর স্বদেশী বাজার, কাইরোর জনসাধারণ প্রভৃতির বিবরণ যেরূপভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা মুর্ত্তাজী বা ম্যাস্পেরো, বেনসেন বা উইলসন পড়িয়া হয় না। বিনয়বাবু মিশরের যে চিত্র অঙ্কন

কাইরোর জনসাধারণ

করিয়াছেন, ভ্যালেনটিয়া, ম্যাক্‌ওয়ার্থ, স্কট বা স্পেনসর প্রভৃতির ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তাহা অঙ্কন করিতে সমর্থ হয় নাই। লেন, ভীডেমান, রলিনসন ও মিলনর মিশরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া-মনোযোগপূর্ব্বক 'বর্ত্তমান-জগৎ' পাঠ করিলে আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ গ্রন্থের অন্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

চাট্‌নি

(জামাই-ষষ্ঠীর বিপাক)

বড় বেশী দিনের কথা নয়, হদ্দ বছর বার-তেরো হবে,—আমি তখন খুলনা-থানার দারোগা। একটা চুরি-মোকদ্দমার তদন্ত উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। প্রায় এক সপ্তাহের চেষ্টাতেও চুরির কোন কিনারা করিতে না পারিয়া, অগত্যা জামাই-ষষ্ঠীর আগের রাত্রিতে কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া চলিলাম। সেদিন অসহনীয় গরম পড়িয়াছিল। রাত্রি ৯টার সময় ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলাম, মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী মাত্র আধখানা। সবে তিনখানা বেঞ্চি, তার দুখানা দুজন ভদ্রলোক আগেই অধিকার করিয়া শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন; কাজেই আমি অবশিষ্ট বেঞ্চিখানায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমার সঙ্গে একখানা শতরঞ্জি ও ছোট একটী বালিশ ছিল। উহা বেঞ্চির উপর পাতিয়া শয়ন করিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। দমদম-জংসনে আসিতে না আসিতেই উন্মুক্ত প্রান্তরের শীতল বাতাসে ভাসিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা আমার নয়নযুগলে আবির্ভূতা হইলেন। অজ্ঞাতসারে ধরণীর শোক-তাপ, দ্বন্দ্ব-কোলাহল, উন্নতি-অবনতি, আশা-নিরাশা সমুদয় বিস্মৃত হইয়া আমি অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ এইভাবে ঘুমাইয়াছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারিনা। হঠাৎ একটা প্রবল আলোড়নে আমার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। ব্যস্ত-সমস্তভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলাম, একজন নব্যবাবু,—মুখে চুরুট, পরিধানে কালো পা'ড় সিমলাই ধুতি, গায়ে কালো 'প্যানেলা'র ইংলিশ কোট—তাহাতে একটী নিকেলের চেন দোদুল্যমান, চোখে সবুজ রঙ্গের চশমা, হাতে একটী কুকুরমুখো ছড়ি, এবং অত গরমের মধ্যেও পায়ে একযোড়া ফুলদার 'ষ্টকিং,' বয়স আন্দাজ ২২।২৩ বৎসর—আমার অঙ্গে বামহস্তে কঠিন ভাবে ধাক্কা মারিয়া বলিতেছেন, "কে হে বাপু তুমি, বড় নবাবের মত একাই যে একখানা বেঞ্চি দখল করে শুয়েছ? গাড়ীখানা কি ইজারা নিয়েছ নাকি? আর কেউ বুঝি বস্‌বে না?—উঠে পড় দেখি,—বাড়ী গিয়ে এর পর ভাল করে ঘুমাবে এখন—"! লোকটার ব্যবহারে আমার আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ উহার দুইগণ্ডে দুইটী চপেটাঘাত করিয়া একটু সহবৎ শিক্ষা দেই। মনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া বসিবামাত্র, ফুটন্ত কুসুমের মনোহর গন্ধে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইয়া গেল,—বুঝিলাম, বাবুটী "H. Boseকে ধন্য" করিবার জন্য রুমালেতে,—কেবল রুমালেই বা কেন, সুধু রুমালে মাখিলে কি আর অত সুবাস ছড়ায়,—সমুদয় বস্ত্রে "দেলখোস" মাখিয়া আসিয়াছেন। কবি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে,—যদিও পুলিশে চাকুরী করিয়া হৃদয় আমার কুলিশ-কঠিন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি "সৌন্দর্য্যের চির উপাসক আমি—"! সৌন্দর্য্য-পিপাসা তখনও আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটু উঁকি-ঝুঁকি মারিত। সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীতধারা শ্রবণ-পথবর্ত্তী হইলে, নিসর্গ-সুন্দরীর মনোমোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, সুবাসিত কুসুমের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশলাভ করিলে, তখনও আমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া ফেলিত। প্রাণ যেন আমার ভাবাবেশে কোন্ লোক-লোকান্তরে, দূর-দূরান্তরে ভাসিয়া যাইতে চাহিত!

—কাজেই আমার উদ্দাম ক্রোধ বাড়িতে না পারিয়া হৃদয়েই বিলীন হইয়া গেল। বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, "দত্তপুকুর"* ষ্টেশন।

শান্তিভঙ্গের অভিপ্রায় প্রশমিত হইবামাত্র আমি আমার শতরঞ্জিখানা গুটাইয়া বাবুটীর বসিবার স্থান করিয়া দিলাম। চাহিয়া দেখিলাম, অপর দুখানা বেঞ্চিতে তখনও সেই এক একজন লোকই ঘুমাইয়া আছেন, বাবুটী তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার উপর এই অনুগ্রহ বর্ষণ করিলেন কেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; তবে ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে একটী ছড়া শুনিয়াছিলাম, "হাটের মধ্যে ডেলা মারে, অভাগার মস্তকে পড়ে"। সেই কথাটী মনে পড়াতে, "ইহা আমার হতভাগ্যেরই ফল" ভাবিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিলাম।

বাবুটী আমাকে উঠাইয়া দিয়া নিজের 'ট্রাঙ্ক' হইতে একখানা চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত, পরিষ্কৃত-পরিচ্ছন্ন 'কাঁথা' বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর বিস্তৃত করিলেন এবং বিনাবাক্যব্যয়ে আমার গুটাইয়া-রাখা শতরঞ্জি ও বালিশটীকে স্বীয় উপাধানে পরিণত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। মানুষ যে এত বেহায়া হইতে পারে, সে ধারণা আমার আগে ছিল না; কাজেই বাবুটীর আচরণের নূতনত্বে একটু বিস্মিত না হইয়া পারিলাম না।

আমাকে নীরব দেখিয়া বাবুটীর মেজাজ বোধ হয় শীতল হইয়া আসিয়াছিল; কাজেই কতকটা মুরুব্বিয়ানার ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে হে তুমি?" আমি একটু রগড় করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আজ্ঞে, যাব আমি খুলনায়,—আপনার যাওয়া হবে কদ্দূরে?" বাবুটী আমার দিকে ঈষৎ হাস্যপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ওহে! জান ত কাল জামাই-ষষ্ঠী; তাতেও কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না আমি যাচ্ছি কোথায়?" এত বড় "সম্ভাবনা"টা যে এ পর্য্যন্ত আমার মাথায় উপস্থিত হয় নাই, সে-জন্য মনে মনে নিজের বুদ্ধিকে তিরস্কার করিলাম; ক্রমে বাবুটীর সঙ্গে একথা-সেকথা বহুকথাই আরম্ভ হইল। বাবুটীর নাম শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র কর্ম্মকার,—ফুলতলার ডাক্তারবাবু কাশীনাথ কর্ম্মকার,—ইদানীং বাবু কাশীনাথ রায়, V. L. M. S.,—সে অনেক কথার কথা, সুবিধা হয় ত সে-সব কথা আর একদিন বলিব,—ভূষণবাবুর শ্বশুর। গত মাঘমাসে কাশীনাথবাবুর কন্যা মাধবীলতার সঙ্গে ভূষণবাবুর শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। জীবনের প্রথম আজ এই তিনি ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে চলিয়াছেন। সঙ্গে আর লোক-জন নাই। ফুলতলার রেল-ষ্টেশনের নিকটেই কাশীনাথবাবুর বাড়ী; কাজেই সঙ্গে লোক নিবার কোন প্রয়োজনও নাই।

কাশীনাথবাবুকে আমিও চিনিতাম। চিকিৎসা-ব্যপদেশে তাঁহার দ্বারস্থ না হইলেও, পথে-ঘাটে সময় সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। আমি সে কথা গোপন করিয়া বলিলাম,—

* রস-পিপাসু পাঠক-পাঠিকাকে একখানা E. B. S Ryএর Time Table, অথবা অগত্যা একখানা গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা খুলিয়া Central Sectionএর ষ্টেশন-সমূহের তালিকা সম্মুখে রাখিয়া এই "চাট্‌নি" আস্বাদ করিতে অনুরোধ করি। লেখক

"আজ্ঞে, কাশীনাথবাবুর জামাই আপ্‌নি!—আহা! তাঁর মত ডাক্তার আর হবে না, দু'বার তিনি আমাকে মরণের দুয়ার থেকে ফিরিয়ে এনেছেন, আপ্‌নি তাঁরই জামাই, বড় খুসী হলেম আপ্‌নাকে দেখে!" আমার বিনীত ভাব দর্শনে এবং আমার মুখে তাঁহার শ্বশুরের গুণানুকীর্ত্তন-শ্রবণে ভূষণবাবু আমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খুলনায় যাচ্ছ কেন হে? কি কর তুমি সেখানে? নাম কি তোমার? কি লোক তোমরা?" আমি বলিলাম, "আজ্ঞে আমার নাম প্রসন্ন, মিত্তির আমরা, জাতে কায়েত! মুখ্যু-সুক্ষু মানুষ, কোনমতে খেটে-পিটে খাই, মনিবেরই একটু কাজে কল্‌কেতায় আস্‌তে হয়েছিল, তা কল্‌কেতায় শুনেছি টিকিট করা ভারি ফ্যাসাদ, সেজন্য কিছু বেশী পয়সা দিয়েই খুলনা থেকে একেবারে একখানা যাওয়া-আসার টিকিট করে এসেছিলেম, তা না হলে কি আর আমরা আপনাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে যেতে পারি?" ভূষণবাবু আপ্‌শোষের সঙ্গে বলিলেন, "আর বাপু বল'না ওসব কথা, দেশের দশা যা হয়েছে, তাতে ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম রাখা এখন দায়! ছোট-বড়র প্রভেদ এখন উঠে গেছে বল্লেই হয়! তুমি ত যা হোক্‌, তবু কায়েত,—জল-আচরণীয় জাত! রেলে ষ্টীমারে, ট্রামগাড়ীতে এখন যে-সে লোক—চাঁড়াল, বাগ্‌দী, মুচি, মুদ্দফরাস পর্য্যন্ত আমাদের গা ঘেঁসে বস্‌তে আসে! পরিষ্কার একখানা ধুতি, আর ইস্ত্রী-করা একটা 'শার্ট' গায়ে দিলেই ভদ্রাভদ্র চিনে উঠা দায় হয়! আর চিন্‌লেই বা তুমি কার কি কর্‌বে? সবাই যখন সমান পয়সা দিয়ে উঠেছে, তখন তুমি ভদ্রলোক বলে ত আর কাউকে ঠেলে ফেলে দিতে পার না! ইংরেজের যে আইন খারাপ,—তা না হলে এতদিন আমি কত বেটার যে মাথা গুঁড়ো করে দিতাম, তার আর সীমা-সংখ্যা নাই, এক এক সময় এম্‌নি রাগ ধরে,—"

আমি তাড়াতাড়ি আরও খানিকটা পিছনে সরিয়া গিয়া বলিলাম, "আমি আপনার সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসেছি বলে কি আপনার অসন্তোষ হচ্ছে? তা আজ্ঞা করেন ত আমি না হয় আমার শতরঞ্জিখানা পেতে নীচেই বস্‌চি!" আমার প্রস্তাবে ভূষণবাবুর যে কোন আপত্তি হইত, তেমন বোধ হল না; কিন্তু আমার শতরঞ্জিখানা তুলিয়া লইলে তাঁহার উপাধানের অভাব হইবে ভাবিয়াই বোধ হয় তিনি আমাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "আরে না, না, থাক্‌ থাক্‌, নেমে বস্‌তে হবে না তোমাকে, তবে হাঁ, আর একটুখানি যদি সরে বস্‌তে পার, তাহলে মন্দ হয় না,—আমি পা-দুখানা লম্বা করে শুতে পাচ্চি না,—" আমি তৎক্ষণাৎ বেঞ্চির শেষপ্রান্তে সরিয়া গেলাম।

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে গাড়ী "হাবড়া" ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। "হাবড়া" নাম শুনিয়া যেন কেউ E. I. Ry-এর "হাওড়া" ষ্টেশন,—কলিকাতা থে'কে গঙ্গার পুল পার হইয়া যে খানে যাইতে হয়,—ব'লি যেন ভুল করিয়া না ফেলেন, সে হইল "হাওড়া" (Howrah) আর এ হইল "হাবড়া" (H. brah)। এটা হল E. B, S, Ry.-এর Central section এর একটী ছোট ষ্টেশন। হাবড়ায় আসিয়া ভূষণবাবু কেমন-যেন একটু উসুক্‌-খুসুক্‌ করিতে লাগিলেন,—যেন কি-একটা কথা বলি বলি করিয়াও বলিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে কিছুকাল ইতস্ততঃ করিবার পর বলিলেন, "দেখ প্রসন্ন, কিছু মনে কর'না ভাই, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তামাক, টিকে, কল্‌কে, দেশলাই, হুঁকো—সব আছে; যদি দয়া করে একটু তামাক সাজ্‌তে, তবে তুমিও খেতে পার্‌তে, আমিও খেতে পাত্তুম।" ভূষণবাবুর এই অপ্রত্যাশিত অনুরোধে আমার মনে একটী কৌতুককর মতলবের উদয় হইল,—যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি,—ওঃ, তবে কি মজাই না হয়—! প্রকাশ্যে বলিলাম, "আজ্ঞে, বেশ ত, দিন না সব বের করে, তামাক আপনাকে সেজে খাওয়াব একটু, এ আর একটা বেশী কথা কি!" ভূষণবাবু নিজে আর গাত্রোত্থান করিবার কষ্ট স্বীকার করিলেন না; শুইয়া শুইয়াই 'কোটে'র পকেট থেকে চাবির গোছাটী বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, নেও ত ভাই চাবিটা, 'ট্রাঙ্ক'টা একবার খোল, ওর ভিতরে সব আছে।" আমি চাবি দিয়া তোরঙ্গটী খুলিতে লাগিলাম, ভূষণবাবু আড়নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন. আমি কিছু চুরি করি কি না। বাক্স খুলিয়া দেখিলাম, বাবুটীর পরিধানে ধোপদোস্ত ধুতি, গায়ে 'ইংলিশ কোট', পকেটে রেশমী রুমাল, পায়ে ফুলদার 'ষ্টকিং' সবই আছে বটে—কিন্তু বাক্সের ভিতরের অবস্থা অতি শোচনীয়! সকলের উপরে একটা ময়লা গেঞ্জি, তার পাশে একটা 'এসেন্স' দেলখোসের শিশি,—তাও খালি, একটী ফোঁটা 'এসেন্স'ও আর তাতে নাই। গেঞ্জির নীচে একখানা অতি মলিন শতধাছিন্ন টার্কিশ তোয়ালে,—বোধ হয়, বিবাহের সময় শ্বশুরবাড়ী হইতে পাওয়া,—গামছার নীচে একটা পেটমোটা টিনের চুঙ্গা,—তা'তে তামাক, টিকে, কল্‌কে, দেশলাই, সব রহিয়াছে। একধারে একটা খোলো হুঁকা, তার পাশে একযোড়া চটিজুতা, তার গোড়ালি খেয়ে গিয়ে সুখতলা পর্য্যন্ত যায়-যায় হয়েছে, চটিজুতার নীচে একখানা ময়লা ধুতি, বহুদিনের মধ্যে যে তার সঙ্গে ধোপার দেখা হয়েছে, তেমন বোধ হয় না,—তলায় একখানা গোলাকার ছোট আয়না, একখানা দাঁতভাঙ্গা চিরুণি, আধখানা মোমবাতি, একটুকরা 'বারসোপ', একখানা থিয়েটার-সঙ্গীত, কয়েকটা সিগারেটের খালি বাক্স—এইরূপ আরও কত-কি রহিয়াছে!

আমি তামাক-টিকের চুঙ্গোটী এবং সেই খোলো হুঁকোটী বাক্সের বাহির করিয়া আবার যতদূর-সম্ভব সন্তর্পণে যেখানের-যা, গুছাইয়া বাক্সের তালা বন্ধ করিলাম, ও চাবিগুলি ভূষণবাবুর হাতে দিলাম। জীবনে আর কখন আমি যে কাহাকেও তামাক সাজিয়া দিয়াছি, এমন মনে হয় না। আমাদের পরিবারে কেহই ধূমপানে অভ্যস্ত নহেন। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও যাঁহারা তাম্রকূটপ্রিয়, তাঁহারাও দয়া করিয়া কখনও এই অধমকে ও-কাজে নিযুক্ত করেন নাই; কাজেই ব্যাপারটা আমার পক্ষে অভিনব। Practical Knowledg না থাকিলেও দেখে দেখে যতটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহারই সাহায্যে কোন মতে দুটী টিকে ধরাইয়া গাড়ীর মেজেতে রাখিলাম, এবং কল্‌কেয় তামাক সাজিয়া টিকা দুইটি তার উপর চাপাইলাম। তারপর ডানহাতে হুকোটী ধরিয়া কল্‌কেটী তাহার মস্তকে স্থাপন করিয়া ফু দিতে দিতে ভূষণবাবুর হাতে তুলিয়া দিলাম। হুকোতে জল ছিল না, কাজেই "খুড়ো" "খুড়ো" শব্দটা শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু তার পরিবর্ত্তে কেমন যেন একটা "পিশে" "পিশে" শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, হুকোর খোল বা নল্‌চেটা কোনখানে ফাটিয়া গিয়াছে, এবং টানের সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাটা পথে বাতাস প্রবেশ করিয়া ঐ রকম শব্দ জন্মাইতেছে। কয়েকবার বেশ মনোযোগের সহিত টানিয়াও ভূষণবাবু তামাকে তেমন ধূঁয়া বাহির করিতে না পারিয়া হুকোটী আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "আমি পে'রে উঠ্‌লুম না হে, তুমি আগে খাও, ধর্‌লে পর আমাকে দিও।"

আমি সবিনয়ে বল্‌লাম, "আজ্ঞে, আমি ত তামাক খাইনে!"

ভূষণবাবু মুখখানা একটু বক্র করিয়া বলিলেন,—"তামাক খাও না তুমি, তবে ত নেহাৎ আনাড়ি দেখচি! যাক্‌, না খাও ত আর কি করা যায়, তাহ'লে কল্‌কেটায় ভাল ক'রে আরও কয়টা ফু-দিয়ে দেও।"

আমি পুনরায় কিছুকাল ফু-দিয়া কল্‌কেটী হুকোর উপর বসাইয়া ভূষণবাবুর হাতে দিলাম। তিনি বেশ উৎসাহের সহিত টানিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তবুও ধূম ভাল করিয়া বাহির হইল না। তখন হুকোটী আবার আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখত হে, নল্‌চের মধ্যে কিছু ঢুকেছে নাকি, ধূঁয়া বের-হচ্ছে না কেন?"

আমি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম, নল্‌চের কোনখানে ফাটেও নাই, রন্ধ্রও বেশ পরিষ্কার আছে। কাজেই তামাকের ধূঁয়া বাহির না হইবার কোন হেতুই আমি নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ভূষণবাবু হুকোটী হাতে নিয়া উল্টা দিকে এক ফু-দিলে কতকগুলো কালো কালো কয়লার গুঁড়ার মত বাহির হইয়া গেল, কিন্তু ইহাতেও ধূঁয়া বাহির হইবার পক্ষে কোন সুবিধা হইল না। তখন ভূষণবাবু রাগ করিয়া কল্‌কেটী উল্‌টাইয়া বেঞ্চের নীচে সব তামাক টিকে ঢালিয়া ফেলিয়া বলিলেন "ওহো! বেজায় অকর্ম্মা তুমি, এক কল্‌কে তামাকও ঠিক্‌ মত সাজ্‌তে পার না—অত চাপ দিলে কি কখনও তামাকের ধূঁয়া বের হয়! ধর নেও, আবার ভাল ক'রে এক কল্‌কে সাজ।"

আমি আমার এই বিনামাইনের চাকুরী সাধিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম, কাজেই এই ধমকটাও নিঃশব্দে হজম করিয়া আবার নূতন করিয়া তামাক সাজিয়া দিলাম। এবার আর অত চাপ দিলাম না, কাজেই দুই চারিটান দিবামাত্রই অজস্র ধূম বাহির হইতে লাগিল। ভূষণবাবু পরম আরামের সঙ্গে ধূমপান করিতে লাগিলেন, আর প্রত্যেক টানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত "পিশে" "পিশে" শব্দ হইতে লাগিল। প্রায় দশ মিনিট কাল আয়েসের সহিত ধূম পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার পর ভূষণবাবু হুকোটী আমাকে নামাইয়া রাখিতে দিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী বনগ্রাম ষ্টেশনে হাজির হইল। আমাদের কথাবার্ত্তা তখনও বেশ চলিতেছে। বনগ্রাম জংশন ষ্টেশন, এখান থেকে একটা লাইন রাণাঘাটের দিকে গিয়াছে। এখানে গাড়ী প্রায় কুড়ি মিনিট দাঁড়ায়। যাত্রীদের অনেকে এখানে নামিয়া জলযোগ করিতে লাগিল, কেহ কেহ প্লাটফরমে পায়চারি করিতে থাকিল, কেহ কেহ বা গাড়ীতে বসিয়াই জানালা দিয়া গলা বাহির করিয়া লোকের উঠা-নামা দেখিতে লাগিল। আমার বড় পিপাসা হইয়াছিল, সেজন্য গাড়ী হইতে নামিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় ভূষণবাবু বলিলেন, "প্রসন্ন, নীচে যাচ্ছ না কি? তা ভাই, দয়া ক'রে আমার হুকোটা হাতে ক'রে নিয়ে যাও না, একটু জল ভ'রে আন্‌বে এখন।"

আমি বিনা আপত্তিতে এই আদেশও প্রতিপালন করিলাম। গাড়ী ছাড়িবার আগেই ভূষণবাবু আবার "তামাক ইচ্ছে" করিলেন, আমিও তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম। এবার ভূষণবাবু বসিয়া বসিয়াই তামাক খাইতেছিলেন। হুকোতে জল থাকায় এবার বেশ "খুড়ো" "খুড়ো বোল উঠিল, কিন্তু আগেকার সেই "পিশে" "পিশে" ডাকটীও বন্ধ হইল না। একসঙ্গে "খুড়ো ও "পিশে" এই দুইটি সম্পর্ক-বিরুদ্ধ ডাক শুনিয়া উহার কারণ-নির্ণয়ে আমার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, হুকোতে টান দিবার সময় ভূষণবাবুর ওষ্ঠ ও অধরের ডান দিকে ঈষৎ একটু ফাঁক হইয়া যায়, এবং সেই সূক্ষ্ম রন্ধ্র-পথে আকর্ষিত বায়ুই ঐ পাশে "পিশে" "পিশে" ডাকের কারণ! এতদ্দর্শনে আমার প্রবল হাস্য সঞ্চার হইলেও উদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটিবে ভাবিয়া বহুকষ্টে সে হাস্য সংবরণ করিয়া লইলাম।

তামাক-খাওয়া শেষ হইলেও ভূষণবাবু কিন্তু বসিয়াই রহিলেন। আমার মতলব ফাঁসিয়া যায় ভাবিয়া আমি নিতান্ত বিনয়ের সহিত বলিলাম, "ব'সে থাক্‌লেন কেন বাবু? আরাম করুন না।"

ভূষণবাবু বলিলেন, "কি জান প্রসন্ন, আমার শ্বশুরবাড়ী যাবার কথা ছিল তিন-চার দিন আগে, কিন্তু একটা জরুরী কাজের জন্য এ কয় দিন বাড়ীতে আট্‌কে থাক্‌তে হল, কাল ষষ্ঠী আছে মোটে নয় দণ্ড, যদি গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়ি, আর গাড়ী ফুলতলা ছে'ড়ে চলে যায়, তবে কি মনস্তাপের কারণই না হবে! শ্বশুরবাড়ীর লোক বোধ হয় এই কয়দিন ষ্টেশনে ঘুরে ঘুরে নিরাশ হ'য়ে এখন ষ্টেশনে আসা বন্ধই করেছে, আমি কবে রওনা হ'তে পার্‌ব, তা ঠিক্‌ কর্‌তে না পারায় আগে কোন চিঠি-পত্রও দেওয়া হয় নাই,—আজ যে আমি যাব, সেকথা শ্বশুরবাড়ীর কেউ জানে না। ঘুম আমার পাচ্ছে খুবই, কিন্তু উপায় কি? তুমি যদি ভাই, দয়া ক'রে একটু বস্‌তে পার, তাহ'লে আমি একটু শু'তেম, কিন্তু ফুলতলায় গাড়ী থাম্‌বার আগেই যেন আমায় তুলে দিতে ভুলোনা।" আমি বলিলাম, "তা আর কথা কি? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শু'য়ে পড়ুন, আমি প্রথম রাত্রিতে বেশ ভাল ক'রে ঘুমিয়েছি, আমার এখন আর মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। গাড়ী নপাড়া (ফুলতলার আগের ষ্টেশন) ছাড়িবামাত্র আমি আপ্‌নাকে তু'লে দিব এখন।"

ভূষণবাবু তবু বসিয়াই থাকিলেন। গাড়ী ক্রমে বেনাপোল ছাড়াইয়া নাভারণের নিকট আসিল। তখন, ছোট ছোট পুঁটিমাছ বড়শীর ফাৎনাকে যেমন একবার ডুবায়, একবার ভাসায়, ভূষণবাবুর মাথাটী ও ঘুমের আবেশে তেমনই উঠা-নামা করিতেছিল। সময় বুঝিয়া আমি তাড়াতাড়ি আর এক কল্‌কে তামাক সাজিয়া ভূষণবাবুর হাতে দিলাম, তিনি অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া সেই কলিকাটীরও সৎকার করিলেন। তারপর আবার তেমনি বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিলেন। ঝিকারগাছাঘাটে আসিয়া ভূষণবাবু যখন আর এক কল্‌কে তামাক শেষ করিলেন, তখন আর তাঁহার বসিয়া থাকিবার মত শক্তি ছিল না! আমাকে জড়িতকণ্ঠে "দেখো ভাই, ভুলোনা যেন, ফুলতলায় যেন আমায় অবিশ্যি অবিশ্যি তু'লে দিও,"—বলিয়াই তিনি শয়নে পদ্মনাভ করিলেন। যশোহরে আসিবার আগেই আমি আর এক কল্‌কে তামাক সাজিয়া দিলাম, ভূষণবাবু শুইয়া শুইয়া তাহাও পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিলেন। যশোহরে নামিয়া আমি ফেরিওয়ালার নিকট হইতে এক পয়সার সুগন্ধি অম্বুরি তামাক ক্রয় করিলাম।

গাড়ী যখন রূপদিয়া ছাড়িয়াছে, ভূষণবাবুর নাসিকায় তখন দর্দ্দুরের সঙ্গীত আরম্ভ হইয়াছে। আমি অমনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মিঠেকড়া গোছের একটী ঠেলা দিলাম। ভূষণবাবু ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি, কি? ফুলতলায় গাড়ী এসেছে নাকি?"

আমি বলিলাম, "রাম বল, কোথায় ফুলতলা? সে যে এখনও ঢের দূর। আমি যশোর থেকে এক পয়সার অম্বুরি

তামাক আপনার জন্যে কিনেছি, এখন তা খাবেন কিনা, তাই জান্‌বার জন্যেই আপ্‌নাকে ডাক্‌লাম।

ভূষণবাবু বড়ই তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আহা! প্রসন্ন, বড় ভাল মানুষ তুমি, এর মধ্যেই তোমার উপর আমার কেমন একটা মমতা ব'সে গেছে, আজ গাড়ীতে তোমাকে না পেলে আমার বড়ই কষ্ট হত। জানত ভাই, ঠিকাদারী কাজ আমার, কত বড় বড় কণ্ট্রা-ক্টার, ওভারসিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে হামেসা আমাকে বেড়া'তে হয়,—দু'পয়সা রোজগারও তাতে আছে মন্দ নয়,—তাই শরীরটা এখন কেমন যেন আল্‌সের মত হয়ে যাচ্ছে। তোমার মত একজন লোক পেলে আমার বড়ই সুবিধা হয়। তা' অম্বুরি তামাক যদি কিনেই থাক, তবে সাজ এক কল্‌কে, কিন্তু তুমি গরীব মানুষ, কেন আমার জন্যে মিছিমিছি একটা পয়সা খরচ কর্‌লে বল দেখি? তা যা ক'রে ফেলেছ, তার আর কোন চাড়া নেই! আমি শু'য়ে শু'য়েই তোমার অম্বুরি তামাকটা খাই, তুমি একটু বস। ফুলতলায় যেন আমাকে নামিয়ে দিতে ভুলো না। আচ্ছা, আর এক কাজ কর্‌লে কেমন হয় প্রসন্ন,—তুমিও আমার সঙ্গে ফুলতলায় নেমে পড় না কেন? আমার শ্বশুরবাড়ীতে তোমাকেও নিয়ে যাব এখন। আমার শ্বশুরবাড়ীর লোকও তা' হ'লে মনে করবেন যে, আমি নেহাৎ একলা আসিনি, বেশ ভদ্রলোকের মতই সঙ্গে একজন চাক—অর্থাৎ বুঝ্‌লে কিনা, একজন লোক নিয়ে এসেছি, তোমারও বেশ ভালমত দুই এক বেলা আহারাদি হ'য়ে যাবে—ভাগ্যে থাকে ত চাই কি একখানা নূতন কাপড়ও পেতে পার। জানইত, লোকে কথায় বলে, 'জামাইএর সঙ্গে যায় বেটা, সেও পায় বড়া পিঠা!' হাঃ! হাঃ! কি বল প্রসন্ন? যাবে?"

আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইবার ভাণ করিয়া বলিলাম, "আহা! বাবু আপনার বড় দয়ার শরীর! যদি রাখেন ত আমি আপনার সঙ্গেই থে'কে যাই। আমি যে মনিবের কাজ করি, সে বড় খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক। তার মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার, কথায় কথায় জরিমানা করে, কথায় কথায় তাড়িয়ে দিতে চায়।" (কথা গুলো কিন্তু নেহাৎ মিথ্যা ছিল না। আমার পুলিশ সাহেবের ব্যবহারগুলোকে, রবিবাবুর ভাষায়,—কোন মতেই "মধুমত্ত মধুকরের মত" বলা যায় না) ভূষণবাবু হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন।"

অম্বুরি তামাক সাজা শেষ হইতে না হইতেই ভূষণবাবু গাড়ীর জানালার দিকে মুখ করিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহার হাতে হুকাটী দিবার পর দুই চারিটান দিতে-না-দিতেই ঘুমের ঘোর যেন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল। "খুড়ো" "খুড়ো" শব্দ আর তেমন তালে তালে উঠিতেছিল না, "পিশে" "পিশে" শব্দও মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল। অল্প সময় মধ্যেই হুকা একবারে নীরব হইয়া গেল, কল্‌কে কাঁপিতে লাগিল।—ব্যাপার বুঝিরা আমি আগেই তফাতে সরিয়া দাঁড়াইলাম। মুহূর্ত্ত অতীত হইতে না হইতেই হুকাটা ভূষণবাবুর হস্তচ্যুত হইয়া পপাত,—ধরণীতলে নহে,—বেঞ্চির উপর,—একবারে ভূষণবাবুর গা ঘেঁসিয়া!—বিছানায় কল্‌কের আগুন ছড়াইয়া পড়িবামাত্র ভূষণ বাবু যেমন হাউমাউ করিয়া লাফাইয়া উঠিতে গিয়াছেন, অমনি তাঁহার কনুয়ের গুঁতো লাগিয়া হুকার খোলটী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল,—আর তার সবটুকু জল ভূষণবাবুর জামায় কাপড়ে, চোখে মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল,—কল্‌কের আগুনে কাছা-কোছা অনেক জায়গায় পুড়িয়া গেল! সেই চিত্রবিচিত্র কাঁথা-খানার অবস্থাই হইল সব চেয়ে শোচনীয়! ক্রমাগত ৫।৬ কল্‌কে তামাক টানাতে হুকার জলের গন্ধ চুণাগলির পচা নর্দ্দমার চেয়েও চমৎকার হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং তাহার সংস্পর্শে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই এসেন্স দেলখোসের গন্ধ যেন লজ্জায় সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। হুকার জলের সৌরভে চারিদিক ভরপূর হইয়া উঠিল।

ভূষণবাবুত চটিয়া লাল,—আমাকে মারেন আর কি! "বেটা আহাম্মুখ কোথাকার,—বার বার তামাক দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত করা হচ্ছে।—দেখতে পাচ্ছে যে ঘুমে আমার চোখ ভেঙ্গে আস্‌চে, তবু আদর ক'রে ঘন ঘন 'তামাক ইচ্ছে করুন মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন মশা'য়" বলে ডাকা হচ্ছে,—কি আমার শুভানুধ্যায়ী রে! কি সর্ব্বনাশটাই কর্‌লে দেখ দেখি,—কাপড় জামা, বিছানাপত্র সব পয়মাল হ'য়ে গেল! এখন আমি উপায় করি কি? বাক্সেও ত আর ধোওয়া কাপড় জামা নাই,—এসেন্স-টুকুওত শেষ হ'য়ে গিয়েছে, এখন শ্বশুরবাড়ী আমি যাই কেমন ক'রে!" ভূষণবাবুর চীৎকারে অন্য বেঞ্চে শায়িত ভদ্রলোক-দুজনও উঠিয়া বসিলেন। ভূষণবাবুর দুরবস্থায় তাঁহাদের মুখে সহানুভূতির চেয়ে বিদ্রূপের ভাবটাই যেন অধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ভূষণবাবু তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে সাহস না করিয়া "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গাকূলো" আমার উপরেই সব ঝাল ঝাড়িতে লাগিলেন। ক্রোধের বশে একবার একথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল যে, তিনি আমার মত বেইমান, অসতর্ক, বেকুব লোককে কিছুতেই তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে লইয়া যাইবেন না, এবং আমাকে তাঁহার নিজের কাজেও নিযুক্ত করিবেন না।

আমি রাম গঙ্গা কিছুই না বলিয়া কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলাম, কাজেই ইন্ধন অভাবে ভূষণবাবুর ক্রোধ-হুতাশন ক্রমে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল। অন্য ভদ্রলোক-দুজন বরিশালের যাত্রী, তাঁহারা খুলনায় রেল হইতে নামিয়া ষ্টীমারে চাপিবেন, সুতরাং তাঁহারা পুনরায় নিশ্চিন্তে শয়ন করিলেন। তাঁহারা নিদ্রাগত হইলে আমি ভূষণবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বাবু, আপনি রাগ করলে আমি যাই কোথায়? আমার যা ঘাটচুক হ'য়েছে, তা ক্ষমা ঘেন্না করে নিতে হবে। মূখ্যু, সুখ্যু মানুষ আমি, আমার উপর কি আপ্‌নার রাগ করা শোভা পায়? যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে, তা'ত আর আমাকে ধ'রে মার্‌লেও ফির্‌বে না। আমি দিব্যি ক'রে বল্‌ছি, আপ্‌নাকে আর তামাক সেজে দিব না, এবারের মত' আমাকে মাপ করুন। চাবিটা দিন্, আমি যত অনর্থের গোড়া এই হুকা কল্‌কে তামাক্, টিকে, সব তুলে রাখছি; আর আপনি এক কাজ করুন,—বাক্সে দেখেছি একটা গেঞ্জি আর একখানা ধুতি আছে, উপস্থিত তাই বে'র ক'রে পরুন, আর এই সব জামা কাপড় গাড়ীতে ঝুলিয়ে দেওয়া যাক্—বাতাসে ও-গুলো শুকিয়েও উঠবে, আর হুকার জলের গন্ধটাও অনেক কমে যাবে। ফুলতলায় নেমে না হয় আবার এই সব কাপড় জামা পরবেন। কাঁথাখানাও তুলে ফেলে দিন্, আপনি আমার এই শতরঞ্জিখানার উপর শু'য়ে আরাম করুন, আমি যেমন ব'সে আছি, তেম্‌নি ব'সেই থাকি।" ভূষণবাবু উপায়ান্তর অভাবে আমার পরামর্শই গ্রহণ করিতে

বাধ্য হইলেন। হুকোর খোলটা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ভূষণবাবু শুধু নল্‌চেটাই বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন, এবং সাত পয়সা দামের খোলটা গেল ব'লিয়া তিনি অনেক আপ্‌শোষ করিতে লাগিলেন।

গাড়ী যখন ন'পাড়া ছাড়িয়াছে, ভূষণবাবু তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, আমি আমার উড়ানিখানা দিয়া তাঁহার মাথার কাছে আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিলাম, ইহাতে তাঁহার সুষুপ্তি আরও গাঢ়তর হইয়া আসিল! ক্রমে ফুলতলা ও দৌলতপুর ছাড়িয়া গাড়ী খুলনা-ষ্টেশনে সমাগত হইল। ফুলতলায় গাড়ী থামিলে আমার মনে বড়ই ভয় হইয়াছিল, কি জানি, কাশীনাথবাবুর বাড়ীহইতে যদি কেহ আসিয়া জামাই-বাবুর সন্ধান করে? সৌভাগ্যবশতঃ সেরূপ কোন ব্যাপার ঘটিল না। খুলনায় গাড়ী ভিড়িবামাত্র আমি দেয়ালে মাথা রাখিয়া নিদ্রিতের মত বসিয়া থাকিলাম। অন্য বেঞ্চের সেই ভদ্রলোকদুটী নিজেদের বাক্স-পেটারা, বিছানাপত্র নিয়া ষ্টীমার-ঘাটায় চলিয়া গেলেন, কিন্তু তখনও ভূষণবাবুর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। ক্রমে লণ্ঠনহস্তে টিকিট-কালেক্টার বাবু আসিয়া "উঠুন মশায়, টিকিট দেখান," বলিয়া কর্কশ কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন, এবং হাতের পাঞ্চ্ করিবার যন্ত্রটীদ্বারা গাড়ীতে ঠকাঠক্ ঘা মারিতে লাগিলেন। টিকিট-কালেক্টারের ডাকে হাঁকে ভূষণবাবু জাগরিত হইলেও আমার নিদ্রা (?) বিদূরিত হইল না! ভূষণবাবু গাড়ীর বাহিরে মুখ বাহির করিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত টিকিট-কালেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তুললেন কেন মশায়? আমিত এখানে নাম্‌ব না,—আমি যাব ফুল-তলায়। আপনাদের রেলের কাণ্ডকারখানাই সব বেয়াড়া, মিছামিছি দিলেন আমার কাঁচাঘুমটা ভেঙ্গে—।"

টিকিটবাবু উভয়পংক্তির সবগুলি দন্ত বিকসিত করিয়া বলিলেন, "হাঃ, হাঃ, হাঃ, আপনি ফুলতলায় যাবেন? তবে ত আমার বড্ডই অন্যায় হয়েছে! কিন্তু ফুলতলায় যে'তে এখানে যে গাড়ী বদল কর্ত্তে হবে,—তা জানেন না বুঝি? ঝট্ ক'রে নেমে আসুন দেখি, এরপর তেরটা পয়সা দিয়ে আবার একখানা টিকিট কিন্‌লেই ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যে ফুল-তলায় পৌঁছিয়ে দিবে!"

ভূষণবাবু ব্যাপার কিছু উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া আমাকে জাগাইয়া বলিলেন, "কেমনতর বেআক্কেল হে তুমি? কুম্ভকর্ণের মত ব'সে ব'সেই নিদ্রা দিচ্ছ! এ কোথায় আস্‌লাম দেখ দেখি, এখানে নাকি গাড়ী বদল কর্ত্তে হবে? এর আগে আরও ত দু'তিন বার আমি ফুলতলায় এসেছি, কই তখন-ত গাড়ী বদল কর্‌তে হয়নি!"

আমি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বলিলাম, "অ্যাঁ? কোথায়? যশোর নাকি? যশোরই বা কেমন ক'রে হবে? যশোরে ত এর আগে আর একবার যেন গাড়ী থেমেছিল!"

টিকিটবাবু বাহির হইতে তালুতে জিভ ঠেকাইয়া একটা অদ্ভুত আওয়াজ করিয়া বলিলেন, "হাঁ হাঁ হাঁ ঠিক ধরেছেন মশায়, যশোরই বটে, গাড়ীর কল খারাপ হ'য়ে গেছে,—এ গাড়ী আর যাবেনা, আপ্‌নারা নেমে আসুন ঝাঁ করে!"

এমন সময় ষ্টীমারের বাঁশী শুনিয়া আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া বলিলাম, "হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এযে দেখ্‌ছি খুলনায় এসে পড়েছি! ফুলতলাত তবে অনেকক্ষণ ছেড়ে আসা গেছে! হায়রে পোড়া অদেষ্ট, বাবুর সঙ্গে তবে আর দেখছি আমার জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণখেতে যাওয়া হ'য়ে উঠল না! কপালে না থাক্‌লে ঘি, ঠক্-ঠকালে হবে কি?"

আমার কথা শুনিয়া ভূষণবাবু পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"কি?—কি?—কি? কি বল্লে তুমি? খুলনা? ফুলতলা ফেলে এসেছি? এখন উপায়?"

টিকিট-কালেক্টার বাবু আর বিলম্ব না করিয়া ভূষণবাবুর নিকট হইতে excess fare তেরপয়সা আদায় করিয়া মন্থর-গমনে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন। ভূষণবাবু রসিদ চাহিলে টিকিট-বাবু বলিলেন, "এতরাত্রিতে কি আর রসিদ পাওয়া যায় মশায়? কাল দিনের বেলায় একবার ফুরসুৎ মত এসে রসিদ নিয়ে যাবেন এখন! তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

রাত্রি তখন সাড়ে তিনটা, ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার, ষ্টেশনে দুই-তিনটী স্তিমিত আলোক সে অন্ধকার দূর করিতে পারিতেছিল না। আকাশে যেরূপ মেঘসঞ্চার হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। খুলনায় যাঁহারা কখনও গিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য জানেন যে, খুলনায় রেলষ্টেশনে কুলীর কত অভাব; ষ্টেশনে যে দুই-চারিজন কুলী থাকে, তাহারা ষ্টীমার-ঘাটা ভিন্ন আর কোনখানেই মোট লইয়া যাইতে চায় না। ভূষণবাবু অত-রাত্রিতে তাঁহার বাক্স লইয়া যে কোথায় যাইবেন, কিছুই ঠাহর করিতে পারিলেন না। আমার মনের মতলব সুসিদ্ধ হওয়াতে আমি আর বাড়াবাড়ি না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু "কম্‌লি' আমাকে ছাড়িতে প্রস্তুত হইল না। ভূষণবাবুর বচন-ভঙ্গী ক্রমে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইল। তাঁহাকে ফুলতলায় নামাইয়া দিই নাই বলিয়া তিনি আমার নামে চুক্তিভঙ্গ করার মোকদ্দমা আনিবেন বলিয়া শাসাইতে আরম্ভ করিলেন!

এবার আমার মনে বড়ই ক্রোধসঞ্চার হইল। এততেও লোকটার শিক্ষা হয়নাই দেখিয়া, আরও একটু "জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা"র আঘাতে তাহার অন্ধনেত্র উন্মীলিত করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। কাজেই অত কঠোর বাক্য শ্রবণেও মৌখিক কোন-প্রকার কোপপ্রকাশ না করিয়া বিনীত ভাবেই বলিলাম, "তা বাবু, আমাকে ধম্‌কালে ত আর গাড়ী আপ্‌নাকে নিয়ে ফুলতলায় আবার ফিরে যাবে না, তবে আর মিছে চেঁচামেচি ক'রে লাভ কি? তার চেয়ে এখন অন্য পথ দেখুন। বেলা আটটার সময় একখানা গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে গেলে বোধ হয় ষষ্ঠী ছাড়বার আগেই ফুলতলায় গিয়ে পৌঁছিতে পার্‌বেন; এখন ইচ্ছা করেন ত আমার সঙ্গে চলুন, খুলনার কাশীনাথবাবুর ভাই পো জগন্নাথবাবুর বাসা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি; বাকী রাতটুকু সেইখানে কাটিয়ে সকালে যা'-হয় করবেন।"

কাশীনাথবাবুর সাতপুরুষের মধ্যে কখন কাহারও কোন ভাইপো ছিল কি না, তাহা আমি জানিতাম না, মুখে প্রথমে যাহা আসিল, তাহাই বলিয়া ফেলিলাম!

ভূষণবাবু অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বলিলেন, "দেখ দেখি প্রসন্ন, তুমি আমার কি লোকসানটাই কর্‌লে! তা এখন আর উপায় কি বল,—যা হবার তা'ত হ'য়ে গেছেই! এখন তোমার পরামর্শমতই কাজ করা যাক্। চল যাই, তুমি জগন্নাথবাবুর বাসাটাই তবে দেখিয়ে দাও, আমি আপাততঃ সেইখানে গিয়ে বাকী রাতটুকুর জন্যে উঠি। জগন্নাথ-বাবু যে কাশীনাথবাবুর ভাইপো, তা তুমি ঠিক্ জান ত?

আমি কিন্তু তাঁকে দেখিও নি, তাঁর বিষয় কিছু জানিও না। কি করেন তিনি এখানে?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে জগন্নাথবাবুকে আবার চিনি না? কাশীনাথবাবুকে যে কতবার তাঁর বাসায় আস্‌তে-যেতে দেখেছি। জগন্নাথবাবু এখানে কয়লার কারবার করেন, কতবড় দোতালা বাড়ী তাঁর। আপ্‌নি গেলে আপনাকে তিনি কত যত্ন করে রাথবেন! বড় ভাল লোক জগন্নাথ-বাবু!"

ভূষণবাবু নিজের ধোওয়া কাপড়-জামায় হাত দিয়া দেখিলেন, তথনও সেগুলি শুকায় নাই, এবং হুকার জলের গন্ধও যেমন তেমনই আছে। কাজেই আর বস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া ঐ সব ভিজে কাপড়-জামা ট্রাঙ্কের ভিতর তুলিলেন। তারপর "কুলী", "কুলী", বলিয়া অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু কাহারও সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। তিনি দুই-একবার আমার দিকেও তাকাইলেন, মনের ভাবটা এই যে, আমি তাঁহার ট্রাঙ্কটা ঘাড়ে তুলিয়া নেই। কিন্তু অতটা করিতে আমার প্রবৃত্তিও ছিল না, সামর্থ্যেও কুলাইত কিনা সন্দেহ। মুখ ফুটিয়া অতবড় অনুরোধটা করিতে ভূষণবাবুও ভরসা করিলেন না, কাজেই অগত্যা তাঁহাকে স্বয়ংই বাক্সটা কাঁধে তুলিয়া আমার পশ্চাদ্‌গামী হইতে হইল! বাক্সটা নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না, ভিতরে থাকা মালের একটা তালিকাত আগেই দেওয়া হইয়াছে। কাজেই উহা বহিয়া লইয়া যাইতে ভূষণবাবুকে বেশ হিমশিম থাইতে হইল।

আমি ভূষণবাবুকে লইয়া বেণেখামার, টুটপাড়া, কয়লাঘাটা, প্রভৃতি ঘুরিয়া পোষ্টাফিসের দালানের দিকে অগ্রসর হইলাম। সোজাপথে গেলে পোষ্টাফিস রেল-ষ্টেশন হইতে ১।৪ মাইলের কম ভিন্ন বেশী হইবে না,—কিন্তু ভূষণবাবুকে লইয়া আমি প্রায় আড়াই মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া আসিলাম! পথে অন্ততঃ একশ-' বার ভূষণবাবু আমাকে, "ও প্রসন্ন, আর কতদূর? কাঁধ যে আমার ফেটে গেল হে! তুমি পথ ভুল কর নাই ত?"—বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন! আমি প্রত্যেক বারই, "এই যে বাবু, আর বড় বেশীদূর নাই, ঐ যে দেখা যাচ্ছে! পথ ভুল কি আমার হ'তে পারে? এ হ'ল আমার নিজের দেশ," বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতেছিলাম। জেলা-স্কুলের কাছে আসিয়া ভূষণবাবু আর পারিয়া উঠিলেন না,—বাক্সটী কাঁধের উপর হইতে "দড়াম্‌" করিয়া মাটীতে ফেলিয়া বলিলেন, "দেথ প্রসন্ন, তোমারই আহাম্মুকির জন্য আমার আজ এত বিড়ম্বনা, কোথায় শ্বশুরবাড়ী গিয়ে আরামে রাত্রি কাটাব,—তা' না, তোমার পাল্লায় প'ড়ে আমাকে তোমার পাছে পাছে মু'টের মত বাক্স ঘাড়ে ক'রে পথে পথে ঘুরে মর্‌তে হচ্ছে! কি কুক্ষণেই যে তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তুমি দেখ্‌চি আমার প্রাণটা না বের করে ছাড়্‌বে না।"

এইবার আমি একটু গরম হইয়া বলিলাম, "তবে থাক বাপু, তুমি এইখানে,—কি এমন দাসখত লিখে দিয়েছি তোমাকে? তোমার দুপণ দুকড়া খেয়েছি নাকি যে, অত চোটপাট ক'রে বল্‌চ? অত চেটাং চেটাং কথার কোন তোয়াক্কা রাখি না আমি! কলিকালের লোকের ভাল কর্‌লে তার এইরকম পুরস্কারই হয় বটে! কোথায় তোমাকে জগন্নাথবাবুর বাসায় নিয়ে যাব ব'লে আমি সোজা রাস্তা ছে'ড়ে এত পথ ঘুরে এলাম, তার কি এই ফল হল? আমি হলুম "মিত্র" কায়েত, তবু সারারাত তুমি কামারের ছেলে, তোমাকে যে সারারাত এত ক'রে তামাক সেজে খাওয়া-লেম,-সেটাকি অম্‌নি নাকি? গাড়ীতে উঠেই যে গুঁতোটা মেরে ছিলে, সে কথা তুমি ভু'লে যে'তে পার, কিন্তু আমি এত শীঘ্র তা ভুল্‌তে পারি নাই। জান ত বাবা, কায়েতের রাগ,—বার বছর সমভাবে থাকে! এখন যে'তে হয় চল, না যে'তে হয়, ব'সে ব'সে আকাশের তারা গুণ্‌তে থাক, আমি তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পার্‌ব না।"

অকস্মাৎ "আপনি," "মহাশয়," "বাবু" প্রভৃতি সম্মানের ডাক-হইতে একেবারে "তুমি", "কামারের ছেলে" প্রভৃতি বুলি আমার মুখ হইতে বাহির হইতেছে শুনিয়া শ্রীমান্ ভূষণচন্দ্র একদম যেন হতভম্ব হইয়া গেল! সে আর দ্বিরুক্তি করিতে সাহস না করিয়া আবার বাক্সটী তুলিয়া,—এবার আর ঘাড়ে নহে,—একেবারে উত্তমাঙ্গে, আমার অনুসরণ করিল!

তখন একজন কৃষ্ণকায়:মান্দ্রাজী খৃষ্টান খুলনার পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী শ্বেতাঙ্গী, পুত্রকন্যাকয়টী না-শ্যাম, না—রাধা,—তবে চাল-চল্‌তি, পোষাক-পরিচ্ছদ সকলেরই সাহেবের মত! খুলনা পোষ্ট-আফিসের বাড়ীটী দ্বিতল, অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত, চারিদিকে উন্মুক্ত ভূমি,—অদূরে কলনাদী ভৈরব প্রবাহিত, দুইদিকে দুই প্রশস্ত রাজপথ। একতলায় আফিস, দ্বিতলে পোষ্টমাষ্টার সপরিবারে অবস্থিতি করেন। আমি পোষ্ট-আফিসের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া ভূষণবাবুকে "উহাই জগন্নাথবাবুর বাসা" বলিয়া দেখাইয়াদিয়া ত্বরিত-পদে থানার দিকে অগ্রসর হইলাম। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড আফিসের সম্মুখে আম্রবৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া শুনিলাম, ভূষণচন্দ্র ঘন ঘন দুয়ারে ঘা মারিতেছে, এবং উপর হইতে পোষ্ট-মাষ্টার সাহেব "কোন হ্যায় তোম্‌, ক্যা মাঙ্গ্‌তা হ্যায় এত্‌নি রাত কো?" বলিয়া হাঁক দিতেছেন! ভূষণচন্দ্র তদুত্তরে "ওগো! আমি ভূষণ গো! কাশীনাথবাবুর জামাই, তোমার ভগ্নীপতি গো!" বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল। পোষ্ট-মাষ্টার সাহেব দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা বেশ ভালই বুঝিতেন, কাজেই ভূষণচন্দ্রের কথা বুঝিতে তাঁহার কোন কষ্ট বা বিলম্ব হইল না। তিনি সক্রোধে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ হ্যায়রে বাউরা, ভাগো হিয়াঁসে—"! ভূষণ কিন্তু ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া বলিল, "ওগো! একবার দুয়ারটা খু'লে আমায় ভিতরে নাও, বৃষ্টিতে আমার কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেল! (তখন ঘন ধারার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল)। জামাইষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ খে'তে এসে যে এত যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হবে, আগে তা জান্‌লে কে এই বাঙ্গালের দেশে আস্‌ত!"

বৃষ্টির বেগ এই সময় আরও বাড়িয়া উঠাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আরম্ভ হওয়াতে, আমি আর আমগাছ-তলে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না,দৌড়িয়া গিয়া নিজ বাসায় উপস্থিত হইলাম। তারপর যে ভূষণের কি দশা ঘটিল, তাহা আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িতে না ছাড়িতেই পূর্ব্বদিক্ ফর্‌সা হইয়া গেল,—কাজেই বিশ্রামের আশা ত্যাগকরিয়া কিয়ৎকাল পরেই থানার আফিসঘরে হাজির হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি, ভূষণচন্দ্র দুইজন ডাক-হরকরা ও একজন টাউন-চৌকিদারের জেম্মায় ম্লানমুখে থানার বারান্দায় বসিয়া আছে। সে আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, কারণ তথন আমার ধড়া-চূড়া পরা,—অবশ্য ভূষণ আমাকে চিনিতে না পারাতে আমি সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইলাম না।

ভূষণচন্দ্রকে আর কষ্ট না দিয়া তথনই এক জন মুটে ডাকিয়া তার সঙ্গে তাহাকে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিলাম। আশা করি, সে ষষ্ঠী শেষ হইবার আগেই তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিল!

শ্রীমহীন্দ্রমোহন চন্দ

তুমি ও আমি

আমি— শুষ্ক মরুর উষর ক্ষেত্র,
তপ্ত বালুর রাশি;
তুমি— তার মাঝখানে ক্ষীণকায়া নদী
ধীরে ধীরে যাও ভাসি।

আমি— রজনীর কালো আবছায়া মাখা
সুনিবিড় ধরাতল;
তুমি— শরৎকালের রজত চাঁদিমা,
চৌদিকে তারাদল।

আমি— বনানীর মাঝে ঘন ঝোপে ঘেরা
পঙ্কিল সরোবর;
তুমি— কমলিনী হ'য়ে ফুটিয়া রয়েছ
সেই সে সরসী 'পর।

আমি— নিঠুর, কঠিন মানবের দুটী
শুষ্ক নয়নতল;
তুমি— সেই সে আমার অশ্রু-পাতার
তরল নয়ন জল।

আমি— অস্থি, চর্ম্ম, শিরা ক্লেদ ময়
নারীর অসার দেহ;
তুমি— তার মাঝখানে, স্বরগের নিধি
অতুল মাতৃস্নেহ।

আমি— এলোমেলো বায়ু বহুদূর হতে
আমি ধীরে ধীরে ভাসি;
তুমি— সেফালি যূথিকা কেতকী বনের—
ফুলের সুবাস রাশি।

আমি— বড়ই কুরূপ, বড়ই কঠোর,
কিছু নাই মোর মাঝ;
তুমি— তোমার রূপেতে করেছ সুরূপ
হে মোর হৃদয়রাজ!

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম ও শিল্প

বৌদ্ধধর্ম্মের একটি তরঙ্গ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশের উপকূল-খণ্ডে গিয়া প্রহত হয়, একথা ঐতিহাসিক পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন; কিন্তু কি করিয়া তাহা তথায় পুষ্ট ও উন্নত হয়, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস এখনও সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক-সম্প্রদায়ের নিকট সুপরিচিত নহে। আমরা বর্ত্ত-মান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

অনেক ঐতিহাসিক পূর্ব্বে মনে করিতেন যে, অশোকের সময়েই চীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়; কিন্তু অধুনা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অশোক সিংহল ও পারস্য প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন এবং সম্রাট্ কনিষ্ককর্তৃকই প্রকৃত প্রস্তাবে চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণাদ্বারা এই মতই নানা কারণে যথার্থ বলিয়া প্রতীত হয়।—চীন দেশের সাহিত্যের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ৫৯ অব্দের পূর্ব্বে তথায় কোন ভারতীয় বৌদ্ধ প্রচারকের আগমনের কথা লিপিবদ্ধ নাই। ঐ সময়ে সম্রাট্ কনিষ্কের চেষ্টায় চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ব্যতীত, তৎপ্রতি চীনবাসীর অনুরাগ বর্দ্ধিত করিবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম-মূলক গ্রন্থ অনূদিত হইয়া চীন সাম্রাজ্যে প্রচারিত হয়; কিন্তু ইহার ফলাফলের কথাও বিস্তারিতভাবে অবগত হইবার পক্ষে এখনও ঐতিহাসিক উপাদানের অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। ইহার পর আবার ৬৪ অব্দে চীনে আর এক প্রচারক প্রেরণের সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ সময়ে মেটাই (Meiti) নামক এক-জন চীন সম্রাট্ স্বপ্নে একটি স্বর্ণ-প্রতিমা দেখিয়া অমাত্যবর্গকে তাঁহার স্বপ্নের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে আদেশ করেন। সিন্ (Sai-n) নামক এক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি তৎকালে সমগ্র দেশে একজন গুণী ও জ্ঞানী লোকরূপে পরিচিত ছিলেন। অমাত্যবর্গ ইহার কোন উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া

তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনিই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, ইহা লোক-পরিত্রাতা ভগবান্ বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি। বৌদ্ধধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে, নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের পবিত্র সমীরণে, পাপ-তপ্ত চীনবাসীর চিত্ত স্নিগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবান্ স্বয়ং সম্রাট্‌কে উদ্বুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার আগ্রহ ও উত্তেজনায় সম্রাট্ তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্যই ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি ভারতের নানাস্থানে তিনবৎসর ধরিয়া ভ্রমণ করিয়া ৬৭ অব্দে একটী বুদ্ধমূর্ত্তি, অষ্টাদশ জন অনুচর ও মাতঙ্গ ও হোরান নামধেয় দুই ভারতীয়-প্রচারক সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। মাতঙ্গ ও হোরানের বিষয় ভারতীয় সাহিত্য হইতে কিছুই জানিতে পারা যায় না। এমন কি, তাঁহারা কোথাকার লোক এবং চীন-অভিযানে তাঁহাদের কতটুকু সাফল্যলাভ হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও কোন নিশ্চয়তা নাই। তবে চীন-ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহারা মধ্য-ভারতের লোক। তাঁহারা তৎকালীন চৈনিক রাজধানী লোয়ান্ (Loyang) নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদিগের আবাসস্থল একটি মঠে পরিণত হয়। এই মঠ "শ্বেত অশ্বের মন্দির" (Temple of the white horse) নামে পরিচিত। এই মঠের ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। বহু দূরাগত পর্য্যাটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই মঠের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়।

মাতঙ্গের বিষয় যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা নিতান্ত অল্প। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তাহাতে তৃপ্তি হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা সংক্ষেপতঃ এই ঃ—"মাতঙ্গ চীন-দেশে শীঘ্রই সুপরিচিত হইয়া উঠেন। তাঁহার চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম তথায় শীঘ্রই বিস্তৃতিলাভ করে। বৌদ্ধ শিল্পের পরিচয় দিবার জন্য তিনি স্বয়ং বাসস্থানের প্রাচীর-গাত্রে রথ ও রথি-সমাবৃত বৌদ্ধ স্তূপ আঁকিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, ইহা সাঁচী ও অমরাবতী স্তূপেরই অনুকরণমাত্র। বুদ্ধ-মূর্ত্তির সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না।"

ইহার পর বহুদিবস পর্য্যন্ত আর কোন ভারতীয় প্রচারকের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৫৯ খৃষ্টাব্দে কোচিন চীনের ভিতর দিয়া চীনে আগত পারস্যদেশীয় একজন শক-প্রচারকের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। চীন-সাহিত্যে ইনি অনসী (Ansei) নামে পরিচিত। মধ্য-ভারত হইতে আরও কতিপয় বৌদ্ধ প্রচারক তাঁহার সহিত চীনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ বহুকাল চীন-রাজ্যে বাস করেন, কারণ, তাঁহারা বহু ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ চীন-ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর হইতেই চীনে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার হইতে থাকে। তাহার পর রাজনৈতিক বিপ্লবে চীন-সাম্রাজ্য আন্দোলিত হইয়া উঠে। হূনগণ চীন আক্রমণ করিয়া প্রাচীন বংশ ধ্বংস করিয়া আপনাদিগের শাসন-দণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাদিগের শাসন-কাল হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তাহার কারণ হূণগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম রাজধর্ম্মে (State Relegion) পরিণত হওয়ায় অত্যল্পকাল মধ্যে তাহা সমগ্র চীনে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

বুট্টাচু (Buttocho) নামক একজন বৌদ্ধ প্রচারকের অসীম প্রভুত্বের কথা শুনা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, তিনি একজন ভারতেরই লোক; কিন্তু তিনি কোন্ সূত্রে চীন-রাজ্যে উপনীত হন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তিনি দৈব-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা এতই বলবতী ছিল যে, তাঁহার সম্মুখে কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেও সাহস করিত না। তিনি চীন-রাজ্যে পশুহত্যাজনিত রক্তপাত অনেক পরিমাণে নিবারিত করেন। তাঁহার শিষ্যগণ চীনের দক্ষিণে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য গমন করেন।

কুমারজীব নামক একজন ভারত-নৃপতির নাম চীন-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্য তিনি তৎকালে সমগ্র এসিয়াখণ্ডে সুপরিচিত ছিলেন। ৪০১ খৃষ্টাব্দে জনৈক চীন-সম্রাট্ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি চীন-রাজ্যে সমুপস্থিত হন। তিনি বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধমতের যে সবিশেষ অনুশীলনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, কুমার-জীব হইতেই তাহার সূত্রপাত হয়। কুমারজীবের নাম ভারত-বাসীর নিকট সুপরিচিত।

ইহার পর ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে। উভয় দেশের গতায়াত-পথ সুগম না হইলেও, পর্য্যটকগণ প্রায়ই ভারত হইতে চীনে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ভারত হইতে চীনে যাইবার প্রধানতঃ তিনটি পথ বর্ত্তমান ছিল। বঙ্গদেশ হইতে সিংহল হইয়া সমুদ্র দিয়া চীনে যাওয়া যাইত। টোকিও হইতে গোবী মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পদব্রজে সিন্ধুর উপকূলে উপনীত হইবার আর একটি পথ ছিল। যাত্রিগণ প্রায়ই সমুদ্র-পথে যাতায়াত করিত। এই সময়ে ভারতের সহিত চীনের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তদ্বিষয়ে জাপানী শিল্পী Kakuzo Okakurr বলেন, "The history of the long succes ion of important teachers, implying the constant flow of a stream of wandering Thinkers from India to China throughout the period, raises the interesting question of the means of intercourse." * ° We have here the clue to a great era, when the North-Western India was a central point between two empires and through a living world of communication. travellers, pilgrims and traders carried the common Cult back and forth."
সুতরাং উভয় দেশের ইতিহাস যে কত ঘনিষ্ঠ সূত্রে গ্রথিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

এইখানে আর এক বৌদ্ধ প্রচারকের নাম না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইঁহার নাম অমোঘবজ্র। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। অমোঘবজ্রের জন্মস্থান লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে, বহু ঐতিহাসিক ইঁহাকে উত্তর-ভারতের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু Mayers প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন, ইঁহার জন্মস্থান সিংহল। সে যাহা হউক, তাঁহার চীনে গমন সম্বন্ধে যাহা অবগত হওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে পারি ইঁহার গুরু বজ্রবোধি তথায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করায় তিনি চীনে যাইবার জন্য উৎসুক হন। ইনিও চীনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চীন-সম্রাটকর্ত্তৃক ইনি সিংহলে বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হন। গ্রন্থসংগ্রহ করিয়া ইনি ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে চীন রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহাতে চীন সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "প্রজ্ঞা কোষ" এই উপাধি প্রদান করেন। তিনি দক্ষিণ-চীনেও কয়েক

বৎসর অতিবাহিত করেন। ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নব সম্রাটের নিকট হইতে "ত্রিপিটক-ভদন্ত" এই উপাধি লাভ করেন। অমোঘবজ্র ২৫ বৎসরকাল ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; তিনি ৭৭ খানি সংস্কৃত পুস্তক চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় চীন দেশের সর্ব্বত্র তান্ত্রিক মত প্রচারিত হয়। চীন 'ত্রিপিটকে' তাঁহার অনূদিত ১০৮ পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়কর্ত্তৃক লিখিত "আমোঘবজ্র" নামক প্রবন্ধে বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই পুস্তকগুলির নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে দীর্ঘ তালিকা শোভনীয় নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে ১৩১২ সালের "ভারতী"র ৩৯—৪০ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করি।

জ্ঞানালোক বিতরণ করাই বৌদ্ধ প্রচারকগণের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সত্য। এই লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহারা উদ্যান, খোটান, খাসগড়, তুরস্ক, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, আমেরিকা, গ্রীস, রোম, স্কান্দেনেভিয়া প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিয়াছেন, ইহা কুমারজীব, বুদ্ধঘোষ, অনুরুদ্ধ, স্থবির, রামচন্দ্র, ভারতী প্রভৃতি প্রচারকগণের জীবনী হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভারতীয় সভ্যতা শিল্প প্রভৃতিও এই সব দেশে বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্প চীনে কিরূপ আদৃত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

চীনের নানা স্থানে এখনও সহস্র সহস্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ স্তূপের অনুকরণে নির্ম্মিত বহু গৃহ অদ্যাপি কালের সর্ব্ববিধ্বংসী হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অতীতের সাক্ষিস্বরূপ দণ্ডায়মান। ইহা হইতেই চীনের উপর ভারতীয় শিল্পের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নাই। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথম হইতেই ভারত হইতে চীনে গমনাগমনের চতুর্থ পথ উদ্ভাবিত হয়। তিব্বতের মধ্য দিয়া উভয় দেশে যাতায়াত আরম্ভ হয়। এই সময়ে চীন হইতে বহু পর্য্যাটক ভারতে উপস্থিত হন। সুপরিচিত হুয়েন সাং ও ইৎসিং মাত্র দুইজন চৈনিক পর্য্যাটক নহেন; তাঁহারা বহু পর্য্যাটকের মধ্যে অন্যতম মাত্র। যাতায়াতের মধ্য দিয়া ভাবেরও আদান-প্রদান চলিত।

একসময়ে লোয়াং নামক স্থানে প্রায় তিন সহস্র ভিক্ষু ও দশ সহস্র হিন্দু-পরিবার চীনবাসীকে বৌদ্ধশিল্পও শিক্ষা দিবার জন্য বাস করিতেন, ইতিহাস একথা অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া থাকে। ইঁহারাই এক হিসাবে জাপান-সাহিত্যের অক্ষর-উদ্ভাবক। যশোবর্দ্ধনের শিষ্য মিত্র সেনের নিকট হইতে হুয়েনসাং দীক্ষাগ্রহণ করেন। চীনবাসীর চিন্তাশক্তি ভারতীয় চিন্তা ও সভ্যতাভিমুখী হওয়ায়, চীনে অতি সহজে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহাতে বিস্ময় বা সন্দেহের কোন কারণই থাকিতে পারে না। চীনের বহুস্থানেই এই সময়ে "বিরোচন" বুদ্ধ-মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও স্থাপিত হয়। আজও চীনে সেরূপ মূর্ত্তির অভাব নাই। উদাহরণস্বরূপ Riumonsonএর বুদ্ধ-মূর্ত্তির উল্লেখ করিতে পারা যায়;—ইহা ইলোরার গিরি-গুহায়-প্রাপ্ত বুদ্ধ-মূর্ত্তির হুবহু নকল। ইহা ঊর্দ্ধে প্রায় ৩০ 'ফুট' হইবে। ইয়াংসির নিম্নে তাক্রুর নিকটে আর একটি বিরোচন-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিটির বৃহদাকৃতি-সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার মস্তকের এক পার্শ্ব দিয়া একটি বৃহৎ পাইন-বৃক্ষ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং এই বৃক্ষকে মূর্ত্তির একাংশ বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলেও মূর্ত্তির কোন অংশকে অসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না। ইহা একটি পদ্মের উপর আসীন; ইহার পাদমূল ধৌত করিয়া ইয়াংসিকিয়াংয়ের বিপুল জলরাশি ধাবমান।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

গোকুল ও নদীয়া

একি নবরূপে সাজি' এলে আজি বঙ্গে।
প্রেমগোরা, মাতোয়ারা, ধূলি সারা অঙ্গে॥
ছাড়ি নারীসঙ্কোচ তব পদপঙ্কজ,
বিকসিল দেশভরা শতদল বঙ্গে॥

দূরে গেছে আজি সব ভয় দ্বিধা লজ্জা,
আজি মন মোহিবার নাহি চারু সজ্জা,
দূরে গেছে কুলমান দু'দেহের ব্যবধান,
পূর্ণ এসেছ আজি ধ্রুববাণী সঙ্গে।
একি নবরূপে সাজি' এলে আজি বঙ্গে।

পাগল নাচিছ একি অপরূপ দৃশ্য,
আপনি মজিয়া আর মজায়ে এ বিশ্ব,
পাপতাপ নিরাশায় নূপুর করিয়া পায়,
নাচাইয়া সাথে সাথে অযুত অনঙ্গে।
একি নবরূপে সাজি' এলে আজি বঙ্গে।

গোকুলের প্রেমঘট হাটে করি চূর্ণ,
নিখিলেরে বিলাইয়া করিলে হে পূর্ণ,
নীলশাড়ী আজি উড়ে জয়কেতু প্রেমপুরে
দেশময় প্রেমজয় ঘোষিত মৃদঙ্গে।
একি নবরূপে সাজি' এলে আজি বঙ্গে॥

শ্রীকালিদাস রায়

প্রসঙ্গ

Kakuzo O Kakura একজন জাপানবাসী। প্রতীচ্য শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার অদ্বিতীয় বুৎপত্তি। The Ideals of the East নামক পুস্তকে তিনি ভারতবর্ষীয় কলা-বিগ্যার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। য়ূরোপীয় ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের স্থাপত্যের মধ্যে গ্রীসের আদর্শ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। ফারগুসন প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রমাণ করিতে চান যে, ভারতের সহিত গ্রীসের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায়, ভারতবাসিগণ গ্রীসের নিকট হইতে এই বিগ্যা লাভ করেন। ভারতবাসীর মধ্যে বোধ হয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ই ইহার প্রথম প্রতিবাদ করেন। তিনি রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নানা শ্লোকের সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে চান যে, ভারতে গ্রীকগণের আগমনের পূর্ব্বে এ বিগ্যার প্রচলন ছিল। জাপানী শিল্পবিৎ তাঁহার আলোচ্য পুস্তকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গ্রীক-আগমনের বহুপূর্ব্বে, এমন কি, বৌদ্ধযুগের শিল্পের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও সমস্ত এসিয়াখণ্ড প্লাবিত করিয়া এক মহতী শিল্পধারা প্রবাহিত হইত। তাহার শেষ চিহ্ন এখনও চীনে, মেসোপোটামিয়ায়, পারস্যে ও প্রাচীন ভারতের শিল্প-প্রসঙ্গে বিগ্যমান। এই সভ্যতা কিরূপ বিপুলা ছিল, তাহার ধারণা করিবার উপায় নাই। বৌদ্ধযুগের শিল্প বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সেই প্রাচীন শিল্পের সহিত মঙ্গোলিয়ার নবশিল্পের অপরূপ সংমিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি এই প্রসঙ্গে ইহাও প্রতিপন্ন করিতে চান যে, শাক্যবংশীয় ব্যক্তিগণ মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী—অন্ততঃ, মঙ্গোলিয় শোণিত যে তাহাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে বিগ্যমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। গান্ধার-শিল্পের মধ্যে এই মঙ্গোলিয় শিল্পের চিহ্ন সমধিক বিগ্যমান। ইলোরার শিল্পের মধ্যে চীনের প্রভাব সমধিক পরিস্ফুট। গ্রন্থের একস্থলে তিনি বলিয়াছেন,

"Budhlsm—that great ocean of idealism in which merge all the river-systems of Eastern Asiatic thought—is not coloured only with the pure water of the Ganges, for the Tantaric nations that joined it, made thier genius also tributary, bringing new symbolism, new organisation, new powers of devotion, to add to the treasures of the Faith."

আমরা প্রায়ই দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে পাঠকের সংখ্যা বড়ই কম। Mark Pattison ইংলণ্ডের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের বৎসরে এক হাজার 'পাউণ্ড' আয় আছে, তাঁহারা মাসে ৪ পাউণ্ড বা বৎসরে ৪৮ পাউণ্ড মূল্যের পুস্তক-মাত্র ক্রয় করেন!" জন মর্লি তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, ইহাই যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তাহা হইলে ইহা আরও কত আক্ষেপের বিষয় যে, অনেক সময়ে যে পুস্তক ক্রয় করা হয়, তাহাও পাঠ করিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় না। কত সম্ভ্রান্ত-গৃহে একখানি মানচিত্র বা একখানি সামান্য অভিধানের একান্ত অভাব! যাঁহারা দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জীবনে অভিধানের আশ্রয় গ্রহণ করেন না। বেশী আশা করা বিড়ম্বনা। যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যহ অন্ততঃ ১৫ মিনিটকাল কোন সদ্‌গ্রন্থ-পাঠে অতিবাহিত করেন, তাহা হইলেও যথেষ্ট হয়। ইহাতে দেখিতেছি, সকলেরই একই স্থানে ব্যথা।"

আজকাল বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনী লইয়া একটা বেশ সোরগোল উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, ইতিহাস-শাখার সভাপতিকে লইয়া একটা বেশ মনোমালিন্য ক্রমশঃ পাকাইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে অক্ষম। ইহা দেখিয়া আজ পরিষদের জন্মদিনের কথা মনে পড়িতেছে। য়ূরোপের Academy of Literatureএর অনুকরণে আমাদের পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, ইহার নামেও সেই অনুকরণের গন্ধ রহিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে সাহিত্যের বিচার করিয়া, উপযুক্ত সাহিত্যিকের প্রতি যথাসম্মান প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এ উদ্দেশ্য ইহার নিজস্ব নয়—ইহাও অনুকরণ মাত্র; কিন্তু তাহাতে দুঃখ নাই। দুঃখ এই, বিধাতার অভিসম্পাতে অনুকরণ মূলের অনুরূপ না হইয়া সর্ব্বথা "ব্যাষ্টার্ড"রূপে পরিণত হয়। নতুবা একদিন য়ূরোপে এই সাহিত্য-পরিষৎ কি উপকারই না সাধন করিয়াছে! নিরপেক্ষতার তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া ইহা কত অজ্ঞাত ও বিস্মৃত লেখককে শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছে! দেশবাসী ভক্তি-নম্রস্বরে তাহার মতামত নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছে! পরিশেষে এমন ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে যে, ইহার প্রশংসাপত্র না পাইলে, কোন লেখকই আপনাকে লেখকরূপে পরিচিত করিতে পারে নাই। এরূপ সাফল্যের একমাত্র কারণ, কর্ত্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হওয়া এবং একান্ত নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়া দেশবাসিগণের চিত্ত আকর্ষণ করা। আর আমাদের পরিষদের অবস্থা কিরূপ? অনেকে ইহার সহিত সম্পর্ক পর্য্যন্ত রাখিতে সঙ্কুচিত। তোমার-আমার কথার যে মূল্য আছে, পরিষদের মতামতের সে মূল্য নাই; দেশবাসী ইহার সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে স্বার্থের চিহ্ন দেখিতে পান। ইহা সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে যে সুধু অগৌরবের কথা, তাহা নহে; নিতান্ত শঙ্কার কথাও বটে। এখনও যদি ইহার পরিচালকগণ সতর্ক না হন, তাহা হইলে পরিষৎ যে কোনদিন তাহার স্বীয় উদ্দেশ্য-সাধনে সফলকাম হইবে, তাহা আশা করিতে পারা যায় না। সে দিন আবার জৈন-সাহিত্য-পরিষৎ যে সদ্দৃষ্টান্ত এখানকার সাহিত্য-পরিষৎকে দেখাইয়াছে, তাহা কি অনুকরণীয় নয়? আমাদের পরিষৎ যে শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছে তাহাতে যদি শক্তির এরূপে অপব্যবহার না হয়, তবে কালে পরিষৎও মহদনুষ্ঠান করিতে পারিবে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন পরিষৎ আপনার ব্রত না ভুলিয়া উদ্দেশ্য-সাধনে অগ্রসর হইতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের কানু

তোমরা কি বল অর্থ পাইনা খুঁজি'
আমরা গোয়াল অবোধ সরল এ'র বেশী নাহি বুঝি।
কানু হ'ল রাজা তোমরা কিযে গো বল,
আমরা বুঝিনা কেমন করিয়া হ'ল,
বেণু বাজাইল ধেনু চরাইল,—রেণু উড়াইয়া মাঠে,
নীপতরু হ'তে ঝাঁপায়ে' পড়িল যমুনার ঘাটে ঘাটে;—
রাজার বুদ্ধি কোথা হ'তে তা'র হ'বে
গোয়ালের ছেলে মুকুট ধরেছে কবে?
আবার বলিছ যুদ্ধ করেছে সে,
এবার কিন্তু কথা শুনে' হায় বড় হাসি পায় যে।
ননীর পুতুল করে তুল-তুল দেহ,
কেঁদে ফেলে সে যে বলিলে কিছুবা কেহ;
গোঠের রৌদ্রে পাঁচনি বাঁশরী আলসে খসিয়া পড়ে,
রাগ সে জানে না, দোষ করিলে যে আমাদেরি পায়ে ধরে।
ধনুক ধরিয়া যুদ্ধ করিবে সে,
একথা গোকুলে বিশ্বাস করে কে?
বলিতেছ সে গো ধর্ম্মের অবতার!
এ'কথা শুনে'ও আমাদের হ'ল হাসি চেপে রাখা ভার।
চোর নটবর কপটের চূড়ামণি
ধার্ম্মিক হ'ল চাটু শঠতার খনি,
অতি দুরন্ত, সামাল-সামাল তা'র ভয়ে ঘরদ্বার
কদমতলার যমুনা-ঘাটের তা'র সেই ব্যবহার!
সে যদি তোমার ধর্ম্মের ধ্বজা ধরে,
কি বিপদ তবে হবে বল ঘরে ঘরে!
জ্ঞানী বলে' খ্যাতি লাভিয়াছে বুঝি সে
গোয়ালের ছেলে হ'ল জ্ঞানবান বিশ্বাস করে কে?
গোয়ালের দেশে লেখা পড়া কেবা জানে?
বিদ্যে যা কিছু মোহন বেণুর গানে!
সারাদিন মাঠে, বৈকালে ঘাটে সন্ধ্যায় বাটে বাটে!
জানি না কখন্ গোপনন্দন নিয়োজিল মন পাঠে!
দু'পলের লাগি' ভাবিতেও নাহি জানে,
সে আবার জ্ঞানী, শুনিনু শুধুই কানে।

শ্রীকালিদাস রায়

কাণের প্রসঙ্গ

আমরা জগতের প্রায় সমুদয় চেতন পদার্থের শরীর অনুযায়ী দুইটি করিয়া কাণ (১) দেখিতে পাই। কোন কোন অচেতন পদার্থেরও দুই-একটী বা ততোধিক কাণ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন,—বেহালা, এস্‌রাজ্, তামপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও 'জাগ্', 'ট্রে', চায়ের 'কাপ্' প্রভৃতি আহার্য্য এবং পানীয় পাত্র। ইহাদের কাণের সার্থকতা আছে; যেহেতু, প্রথমতঃ কাণগুলি ইহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে; দ্বিতীয়তঃ আমরা ব্যবহারকালে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি; কিন্তু মানবজাতির কাণ থাকায়, তাহাদের সুন্দর কি বিশ্রী দেখিতে হয় বলিতে পারি না; কারণ, "কাণকাটা" লোক কখনও দেখি নাই। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয় ত এ বিষয়ে মন্তব্যপ্রকাশ করিতে পারেন। কেহ যেন মনে না করেন যে, "কাণকাটা" অর্থ লজ্জা-সম্মানহীন ব্যক্তি; যেহেতু, সে প্রকৃতির বহু লোক দেখিয়াছি। তবে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনেক পরিচালক বলিয়া থাকেন যে, কাণের কোনও সৌন্দর্য্য নাই। আবার George Black সাহেব বলেন যে মনুষ্যের ক্ষুদ্র কাণ থাকিলে, ইহা সুধু সৌন্দর্য্যের কারণ, তাহা নহে। ইহা হইতে তাহার বংশ-পরিচয়ও পাওয়া যায়; যেমন,—বৃহৎ এবং দীর্ঘ কাণ নীচতার এবং দীনতার পরিচায়ক।

ব্রিটনেশ্বর প্রথম চার্লসের শাসনকালে কাণের সম্বন্ধে সাধারণের বিরুদ্ধ অভিমত থাকায়, তৎকালীন সে দেশের অনেক ব্যক্তি কাণ কর্ত্তন করিয়া ফেলিতেন। অধুনা আর সে প্রথা প্রচলিত নাই। তৎকালে অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আবার এই "কাণকাটা"-প্রথা সমর্থন করিতেন না। আজ এই পরিণত সভ্যতার দিনে তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে এই শিক্ষিত সমাজে নিশ্চয়ই তাঁহারা সভ্যতার পরিচালক ও বর্ব্বর প্রথার সংস্কারক বলিয়া যশস্বী এবং লোকপ্রিয় হইতে পারিতেন।

বিলাতে এক সময় ছিল, যখন কোন ভদ্রলোক অথবা ভদ্র-মহিলা কাণবিশিষ্ট কুকুর পুষিতে অসম্মান বোধ করিতেন। এখনও অনেকে গৃহপালিত কুকুরের লাঙ্গুলের সহিত কাণেরও কিয়দংশ কাটিয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে নাকি ঐ শ্বাপদ প্রাণীটির বল-বীর্য্য অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়।

সে আজ বহুদিনের কথা। তখন আমাদের দেশে নাকি দর্পণের প্রচলন ছিল না। সেই অতীতের এক বিস্মৃত দিনে নারী-জাতি, তাহাদের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত অবয়বে দেখিল যে, মস্তকের ঈষৎ নিম্নদেশে দুইটী কাণ বলিয়া পদার্থ আছে এবং তাহাদের কোনরূপ ব্যবহারে নিযুক্ত করা আবশ্যক, ইহাও বুঝিল। সেদিন হইতে তাহারা কাণের ব্যবহার-মানসে "ঝুম্‌কো, ঢেড়ি, মাকড়ি" প্রভৃতি বিচিত্র গঠনের অলঙ্কার পরিধান করিতে লাগিল। পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাগণ কাণে বহুবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। সচরাচর তাহারা একটীর পর একটী করিয়া প্রায় চৌদ্দটী উজ্জ্বল ধাতু-নির্ম্মিত মাকড়ি পরিধান করিয়া থাকে। বিলাতের মহিলাগণও সকলেই দুইকাণে একটী করিয়া 'ইয়ারিং' প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে এবং নগ্নকর্ণে পথে কখনও বাহির হয় না।

সাধারণে বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর শ্রবণের জন্য মনুষ্যের কাণ সৃজন করিয়াছেন; কিন্তু কথাটা প্রকৃত নহে। আমরা যাহা কিছু শ্রবণ করি, তাহা কাণের সাহায্যে নহে; তবে কর্ণমধ্যস্থ গহ্বরে 'মেলিয়াস্' (Malleus) 'ইন্‌কাস্' (Incus) এবং 'ষ্টেপ্‌স্' (Stapes) নামক কতিপয় যন্ত্র আছে, তাহাদেরই সাহায্যে। ইহাদের গঠন-প্রণালী বিচিত্র রকমের,—মেলিয়াস্‌টী ঠিক

(১) শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপরিস্থিত বিস্তৃত আবরণ!—বহিকাণ (Auricle)!

হাতুড়ীর মত, ইন্‌কাসটী প্রায় কর্ম্মকারের হাপরের মত এবং ষ্টেপ্‌স্‌টী ঠিক রেকাবের (Stirrup) ন্যায় দেখিতে। ইহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ এক ইঞ্চির ১.৮ ভাগ। যদি কেহ বলেন যে, কাণ শব্দ ধরিবার reflector, অর্থাৎ শব্দ আসিয়া কাণে প্রতিহত হইয়া প্রতিধ্বনিত হয় এবং তবে ইহা ভিতরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমার উত্তর যে, পশ্চাদ্দিক্ হইতে শব্দ কেন শুনিতে পাওয়া যায়? এবং কাণই যদি শব্দ ধরিবার reflector, তাহা হইলে আমরা ভাল করিয়া শব্দ শুনিতে কাণে হস্ত সংলগ্ন করিয়া থাকি কেন? এতদ্ভিন্ন ইহার গঠন-প্রণালী এরূপ যে, তাহা দ্বারা সে উদ্দেশ্য সফল হয় না; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, কাণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন সাহায্যেই আসে না। একজন মূক—তাহার হস্ত, পদ, চক্ষু প্রভৃতি প্রায় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে; কিন্তু কাণের দ্বারা কোনও ভাব প্রকাশ করিতে পারে কি?

আমাদের অন্তরে প্রকৃতির যতটা দাবী, শরীরের উপরেও ততটা দাবী। যেমন পর্ব্বতসঙ্কুল অরণ্যভূমির বর্ব্বর জাতির হৃদয় আমাদের অপেক্ষা শুধু সরল নয়, তাহারা আমাদের অপেক্ষা শারীরিক ক্ষমতায়ও বলীয়ান্,—সেইরূপ দেশের প্রকৃতি-অনুসারে জাতির প্রকৃতিও গঠিত হয়। দেশ-ভেদে যেমন মনুষ্যের ভাষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সেইরূপ শারীরিক পরিবর্ত্তনও দেখা যায়; যেমন,—চীন, নেপাল, ভূটান প্রভৃতি কতিপয় দেশস্থ জাতির নাসিকা অন্য জাতির অপেক্ষা ক্ষুদ্র (খাঁদা); আবার ইজিপ্‌ট্ দেশের লোকের কাণ আমাদের অপেক্ষা মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে স্থাপিত।

২

যদি আমাদের সহিত বুদ্ধি-বিবেকবিহীন প্রাণীর কাণের ব্যবহারের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহাদের কাণের ব্যবহার আমাদের ঠিক বিপরীত; যেমন, একটা মৃগশিশু কাণের সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র তাহার সুন্দর এবং উজ্জ্বল উপলখণ্ডবৎ চক্ষুদ্বারা কোনও ভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। কৌতূহল, সন্দেহ, ভীতি, ক্রোধ, আনুগত্য, সৌহৃদ্য প্রভৃতি তাহার ত্বরিতানুভবক্ষম হৃদয়ের সমুদয় ভাব সে তাহার কাণের দ্বারাই প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদের জীবনের সকল মধুময় গীতি তাহাদের কাণের উপরই ধ্বনিত হইয়া থাকে। কাণ যেন ইহাদের পার্থিব জীবনের অদৃশ্য এবং নীরব বৈদ্যুতিক প্রবাহপূরিত বার্ত্তাবহ তার!

পক্ষী, কুম্ভীর, ভেক, সর্প প্রভৃতির কাণ নাই। কাণ বোধ হয় কেবল শ্বাপদকুলের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে; তবে সকলের জন্য নহে; যেমন,—শীল জাতীয় জলজন্তু। ইহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—প্রথম, যাহারা কাণবিশিষ্ট, তাহাদিগকে Ato i·dœ বলা হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়, যাহাদের কাণ নাই, তাহাদিগকে Phoci loe বলা হয়। উপরোক্ত প্রাণীর কাণ তাহার শরীরের পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র। এইখানেই তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাহার বৃহৎ শরীর হইলেও, তাহাকে জলে বাস করিতে হয় এবং কাণের মধ্যে জলপ্রবেশের সম্ভাবনা অধিক; সুতরাং তাহার কাণের গঠন ক্ষুদ্র হওয়াই উচিত।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা সাধারণতঃ প্রাণীকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন; যথা,—পীড়িত ও পীড়ক বা খাদ্য ও খাদক। প্রথমোক্ত প্রাণীর কাণ পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ হেলিয়া থাকে এবং খাদকজাতির কাণ সম্মুখের দিকে থাকে। অনেকেই বোধ হয় দেখিয়া থাকিবেন যে, একটা বিড়াল যখন মুষিকের পশ্চাতে ধাবমান হয়, তখন তাহার কাণ দুইটী সম্মুখের দিকে খাড়া হইয়া উঠে। বিড়াল, তাহার কাণ সাধারণতঃ পশ্চাদ্ভাগে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। পশ্চাৎ হইতে কোনও শব্দ শুনিতে হইলে, সে শব্দের দিকে সম্মুখীন হয়; কিন্তু যখন সে কুকুর অথবা তাহার অপেক্ষা কোনও বলবান্ জন্তুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় এবং যখন রক্ষার কোনও উপায় থাকে না, তখন তাহার কাণ দুইটী পশ্চাতে টানিয়া লইয়া ধাবমান হয়; কিন্তু শশকের প্রকৃতি সেরূপ নহে। তাহারা নিজের ইচ্ছামত কাণকে স্বাধীনভাবে ঘুরাইতে-ফিরাইতে পারে। তাহাদের বিশ্রামকালে কাণ দুইটী দুইজন সতর্ক প্রহরীর ন্যায় একটী পশ্চাতে এবং অপরটি সম্মুখভাগে থাকে। যখন কোনও শত্রু তাহাকে আক্রমণ করে, তখন পশ্চাদ্দিকে সমানভাবে খাড়া হইয়া উঠে।

অশ্বের প্রকৃতি আবার অন্যরূপ। প্রায়ই দেখা যায়, একটী অশ্ব যখন কোনপ্রকার শব্দে অথবা কোন দ্রব্যদর্শনে ভীত হয়, তখন তাহার বাম পার্শ্বস্থিত কাণটী ঈষৎ স্পন্দিত হইতে থাকে এবং অগ্রবর্ত্তী হয়। যখন কোন ব্যক্তি তাহার পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া আদরের ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, তখন তাহার কাণ দুইটী পশ্চাতে হেলিয়া থাকে।

"আকারসদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ" এই প্রবাদ-বাক্যটী সকল স্থলে প্রযোজ্য হয় না। শরীর স্থূল হইলেই যে বুদ্ধিও স্থূল হইবে, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। কাণের আকার এবং গুণবিশেষে প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক শক্তি বুঝিতে পারা যায়। হস্তীর ন্যায় বৃহৎ শরীর বোধ হয় জগতে আর কোনও প্রাণীর নাই এবং শরীরবিশেষে তাহার কাণটীও আকারে বৃহৎ; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার বুদ্ধি স্থূল নহে। হস্তীর ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রাণী অতি বিরল। তাহার উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় অনাবশ্যক। হস্তীর কাণের গহ্বর (D·um-cavity) অতি ক্ষুদ্র। হস্তী, তাহার কাণ সর্ব্বদাই পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে এবং সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্দিকে নাড়াইতে থাকে। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, হস্তীকে গজরাজ বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, তাহার এই উপাধির সার্থকতা আছে। এতদ্দেশীয় রাজগণের যেমন একজন ছত্রধর, একজন ব্যজনকারী, একজন চামরধারী ইত্যাদি পার্শ্বচর থাকে, গজরাজ সেইরূপ তাবৎ সকল বস্তুরই অধিকারী,—তাহার কাণ আছে, তাহার লেজ আছে, এবং অশ্বত্থের পল্লবিত শাখার সুস্নিগ্ধ ছায়াতল আছে।

এইবার আমাদের দেশের আর একটী অদ্ভুত প্রাণীর কথা বলিব। ইহারা দেখিতে অনেকটা দক্ষিণ-আমেরিকার 'রক্ত-শোষক' (Vanjas) বাদুড়ের ন্যায়। তবে ইহারা নর-রক্ত-পিপাসু নহে। ইহারা চড়াই পাখী, ব্যাঙ্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর রক্ত পান করিয়া থাকে। ইহাদের দুই জোড়া করিয়া কাণ আছে। উপরস্থিত প্রথম কাণ দুইটী তাহার মস্তক অপেক্ষা দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম; দ্বিতীয় কাণ দুইটী উপরস্থিত কাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহার শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোজিত। ইহাদের ঘ্রাণ-শক্তি ও শ্রবণ-শক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ।

বুদ্ধি-বিবেকহীন প্রাণীদিগের মধ্যেও যে আপনাদের উদর

পূর্ত্তি করা এবং মৃত্যুর গ্রাস হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা নহে। তাহাদের মধ্যেও স্নেহ, প্রীতি, মমতা, প্রভৃতি মানসিক সৎ-প্রবৃত্তির অভাব নাই। যদিও মনুষ্যের ন্যায় সে ভাবসকল তাহারা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, তথাপি তাহাদের অস্ফুট ধ্বনি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিদ্বারা তাহা অনেকটা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

উষ্ট্রের কর্ণ তাহার শরীরের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে পরিমিত দীর্ঘ নয়। গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের কাণের গঠন প্রায় একরূপ; তবে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। আমার বোধ হয়, ইহাদের কাণের বিশেষ কোনও প্রয়োজনীতা নাই;—যেহেতু তাহাদের আবাসস্থল জন-মানবশূন্য অনন্ত বালুকা-প্রান্তর—সে স্থানে বাতাসের একঘেয়ে সোঁ-সোঁ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং তথায় তাহার অপেক্ষা কোনও বলশালী শত্রুও নাই। তাহাকে শিকার করিয়া নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয় না; কাজেই কাণের কোন প্রয়োজনীয়তা দেখি না।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্ এট্‌কিন্ সাহেব বলেন, আরও একটী প্রাণী আছে, যাহার কাণের বিশেষ আবশ্যকতা হয় না—সেটী বানর। তিনি বলেন, "বানরজাতি স্বভাবতঃ বৃক্ষের উপর বাস করিয়া থাকে এবং পক্ষীর ন্যায় চঞ্চল-প্রকৃতি হওয়ায়, ইহাদের কাণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই।" ডারউইনের বিবর্ত্তন-বাদ (Evolution Theory) অনুসারে যদি স্বীকার করা যায় যে, বানর-জন্মের পরই নর-জন্ম লাভ হয়, তাহা হইলে বানরের কাণের সমস্যাও এইখানে সমাধান হইবে। বানরের কাণের আকার প্রায় আমাদেরই মত; তবে কিছু পার্থক্য আছে—আমাদের কাণের ধার ঈষৎ কুঞ্চিত, রন্ধ্রটী ঠিক সম্মুখেই, গঠন ঈষৎ স্থূল এবং আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

বিলাতে একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় কুকুর (L·ppor mather's dulig) দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কাণের একটু বিশেষত্ব আছে—দুই ধারে কাণ দুইটী দীর্ঘ কেশভারে ঝুলিয়া থাকে। অন্য কুকুরের ন্যায় ইহাদের কাণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কাণের দ্বারা কোন ভাব প্রকাশিত হয় না;—এটী প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু কেহ কেহ হয় ত দেখিয়া থাকিবেন যে এরূপ দুই একজন লোক আছেন, যাঁহারা কাণকে ইচ্ছামত ঘুরাইতে ফিরাইতে পারেন। ইহা বিশেষ কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। আমাদের কাণেরও এক প্রকার মাংসপেশী—(Muscles) আছে। সেগুলিকে অলসভাবে ফেলিয়া রাখায় প্রকৃতির নিয়মে কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু যদি মাংসপেশীগুলিকে প্রতিদিন কার্য্যে (Exercise) অভ্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে সেও কার্য্যক্ষম হইবে।

এখন দেখিতেছি মনুষ্যের অপেক্ষা শ্বাপদকুলে কাণের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ইহাদের কাণের গঠন Trumpetএর মতন হাওয়ায় শব্দসংগ্রহ (collector of sounds) করিতে সমর্থ হয়। মাংসভোজী প্রাণীদিগের কাণ প্রায় পশ্চাৎ অপেক্ষা সম্মুখেই হেলিয়া থাকে। তৃণভোজী প্রাণীর কাণ আবার উভয় দিকেই থাকে। জলচর প্রাণীদিগের মধ্যে কাণ নাই বলিলেও হয়; কিন্তু কতকগুলি জলচর প্রাণীর কাণ আছে; তাহাও ক্ষুদ্র। এখন হয়ত অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন যে মনুষ্যের কাণের যদি কোন আবশ্যকতা না থাকে তবে জগদীশ্বর কাণের সৃষ্টি করিয়াছেন কেন? বাস্তবিক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটী ধূলি-কণাও বিফলে যায় না। সকলেই বোধ হয় জানেন যে আমাদের কাণের গহ্বরের মধ্যে সূক্ষ্ম জালের ন্যায় একটা চর্ম্মাবরণ (The Drum head or the membrona syaom Pani) আছে। সেটী বিশেষ কোমল এবং সূক্ষ্ম,—একটু অধিক উচ্চ শব্দের আঘাতেই ছিন্ন হইয়া যায়। সেইজন্য গোলন্দাজ সৈনিকগণ কামান ছুঁড়িবার সময়ে মুখ খুলিয়া থাকে। কারণ উভয়দিক হইতে শব্দের ঢেউ একরূপ হইলে, এবং কোনরূপ বাধা না পাইলে বিপদের সম্ভাবনা কম। আমার বোধ হয় পরমেশ্বরের কাণের সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য এই,—কাণে প্রতিহত হইয়া শব্দের বেগ অনেক কমিয়া আসে; কিন্তু বিশেষরূপ উচ্চশব্দে আমাদের সেই পটাহ বা পর্দ্দা ছিঁড়িয়া যায় এবং সেইজন্য অনেকে বধির হইয়া যায়! ইহা ব্যতীত কাণের আরও দুই একটী ব্যবহার আছে। সে গুলি

Two American medical men have observed bire cases of ruiptured Drum produced by an exploding gas-bag in lecture. (H anc H i)

উল্লেখযোগ্য নয়। স্রষ্টার সৃষ্টি কখনও ব্যর্থ হয় না! কবি সত্যই গায়িয়াছেন;

"এই বিশ্ব মাঝে
যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি
সাজায়ে রেখেছ।—"

শ্রীহরিচরণ মিত্র

বঁধুর প্রতি

১

মোহিনি, তোমার মধুর মূরতি নিয়ত মরমে জাগে!
নয়নের তারা হেরে না নয়ন, দাঁড়াও নয়ন আগে!
ভাল করে শুধু দেখিব তোমায়, মিটাব মনের সাধ;
রয়েছি একেলা—এস বঁধু এস, কেহ না সাধিবে বাদ!

চেয়ে দেখো ঘোর আঁধার আকাশ, মিটি-মিটি জ্বলে তারা;
তোমারি সরস পরশ লভিতে নয়ন নিদ্রাহারা।
শোনো গো পরাণ-বঁধু,
কেবলি কাঁদন কাঁদিতে পারিনে, জীবনে দাও গো মধু!

২

তুমি যে আমারে চাও বঁধু, তার লভিয়াছি পরিচয় !
জানিনে সে কথা রটালো কবে কে সারাটা হৃদয়ময় ।
ক্ষণিক পরশে আনন্দে কত ঝরেছে নয়নজল ;
সাক্ষী তাহার দিতে পারে শুধু কোমল কপোলতল ।
বড় অশোভন মলিন জীবন, তবু তো করনি ঘৃণা ;
কেঁদেছি তা ভেবে কত রাতে কেউ জানে না শয়ন বিনা !
সকলি রয়েছে গাঁথা,
ভুলিতে চাহিলে ফুটে ওঠে আরো, লাজে নত হয় মাথা ।

৩

জীবনে তোমায় পাব না একথা বিশ্বাস নাহি হয় ;
আমার শুভ্র নির্ম্মল প্রেম তোমারে করিবে জয় ।
যদি কভু তুমি হওগো বিমুখ তাহাতে ভাবিনে আমি ;
এখনো যেমন পূজি ও-চরণ, পূজিব দিবসযামি !
একদিন কভু হবে গো মিলন হৃদয় হৃদয়ে দিয়ে ।
সব হাহাকার সেদিন আমার জুড়াবে অমিয় পিয়ে !
জেনেছি সুনিশ্চয়,
তাই তো আমারে ফুটায়ে তুলিতে নাহি সন্দেহ ভয় ।

৪

রূপের মাঝারে হেরেছি তোমারে, তুমি সেথা অপরূপ ।
স্বরূপ আমার করেছি তোমার পূজা-আরতির ধূপ ।
হৃদয় নিয়ত নির্ম্মল রাখি বসাতে হৃদয়তলে ;
ধরার কালিমা লাগিলে কাঁদিয়া ধোয়াই নয়নজলে ।
ধরণীর ধার ধারিনে বলিয়া সবে দুর্নাম করে ;
সে সব কোথায় তলায়ে যায় গো বিপুল পুলক ভরে !
নিয়ত ধেয়ানে ভোর,
দেখে আনমন কহে কতজন 'কিছুই হবে না ওর' ।

৫

কড়ি সঞ্চয় কভু বড় নয় জেনেছি জীবনে সার;
তাতে যদি ধরা চেপে বসে বুকে লব সে বোঝার ভার ।
জীবনের মহা মূলধন তুমি, তাই তো তোমারে চাই ;
বিশ্বজগৎ বরণ করিবে যদি গো তোমারে পাই !
ভ্রুকুটী হেরিলে ভ্রূক্ষেপ নাই, কাহারো কথা না শুনি ;
জগতের হাটে দিবা-নিশি শুধু মিলনের দিন গুণি !
নাহি জানি পরকাল,
ভবে এ জীবনে মিলিব দুজনে, কভু ছাড়িব না হাল ।

৬

তোমারে কখনো পাইনি একথা কেমনে কহিব আজ !
পেয়েছি তোমায় কত জ্যোৎস্নায়, কত আঁধারের মাঝ !
চপল চোখের চকিত চাহনি চাহিয়া গিয়াছ চলি' ;
সজনে বিজনে কেঁদেছি অমনি কাহারে কিছু না বলি' !
বৌ-কথা-কও পাখীর সঙ্গে ডেকেছি রঙ্গ করি ;
অমনি অঙ্গ কেঁপেছে পুলকে, সব গেছি বিস্মরি ।
এ ব্যথা কাহারে কব !
অটুট গভীর নিবিড় সঙ্গ আজিও পাইনি তব !

৭

গোলাপে তোমার গোলাপী হাসিটি হেরিতে হয়নি ভুল ;
দন্ত-পাঁতির কান্তি দেখিতে দেখেছি কুন্দফুল !
তোমার দিঠির সুষমা বিরাজে শুক-তারকার গায় ;
চম্পক ফুল দেহের বরণ হরণ করেছে, হায় !
সজল কাজল মেঘের মাঝারে কেশের মাধুরী ফোটে ;
প্রভাতে প্রদোষে অথির বাতাসে দেহের সুবাস ছোটে !
শাড়ী লুটিতেছে ঘাসে,
তারে আলো করি দেহের বরণ ওই তো বাহিরে আসে !

৮

নিবিড় সঙ্গ পাইনি বলিয়া কাঁদিব কি অভিমানে !
যেটুকু পেয়েছি বলিতে সে কথা ভাষা আজি হার মানে ।
আমার বিকাশে তোমার প্রকাশ সে কথা যাব না ভুলে ;
আমায় তোমারি করিয়া তুলিব বলিনু হৃদয় খুলে ।
সকল কর্ম্ম-চিন্তা-মাঝারে তোমারে লক্ষ্য করি ;
তাই মলা-ধূলা লাগিলে অঙ্গে কেবলি কাঁদিয়া মরি !
আর তো কিছু না জানি—
সকল পাওয়ার শেষ পাওয়া বলে সঁপেছি হৃদয়খানি ।

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

বনবিভাগীয় বিদ্যালয়-সমূহ

সমগ্র ভারত-সাম্রাজ্যে ২১৭৫০০ বর্গ মাইল বনভূমি দৃষ্ট হয় । ইহাই হইল খাস ইংরাজ-রাজের অধিকারভুক্ত । এতদ্ভিন্ন ভারতীয় করদ ও সামন্ত রাজগণের অধীনে বহু বনভূমি বিদ্যমান রহিয়াছে । আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সমুদয় স্থানের উল্লেখ করিব না । ইংরাজ-রাজের খাস দখলে যে সমুদয় বনভূমি লক্ষিত হয়, তন্মধ্যে ৮৯০০০ বর্গ মাইল বনভূমি কেবল ভারতীয় বনবিভাগীয় বিদ্যালয়সমূহের জন্যই নির্ব্বাচিত হইয়াছে । ঐ সকল বনের বৃক্ষাদি ছেদিত বা কর্ত্তিত হয় না এবং উক্ত বনমধ্যে কাহাকেও কোন পশু-হত্যা করিবার অনুমতিও প্রদান করা হয় না । অতএব উক্ত বনমধ্যে মৃগয়া-ব্যপদেশে গমনাগমন

নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে । ভারত-সাম্রাজ্যের বনবিভাগে নিম্নলিখিত বিদ্যালয়গুলি পরিদৃষ্ট হয় ঃ—(১) মধ্যভারত,(২) ব্রহ্মদেশ,(৩)মান্দ্রাজ, (৪)মুম্বই এবং (৫) দেরাদূন বনবিভাগীয় বিদ্যালয় ।

দেরাদূন-বনবিভাগীয় বিদ্যালয় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় । আমরা অধুনা তৎ-সম্বন্ধেই দুই-চারিটি কথা বলিব । দেরাদূন পার্ব্বত্য স্থান, তাহা সকলেই অবগত আছেন । উক্ত স্থানের জলবায়ু উত্তম । বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য অনেকে দেরাদূনে গমন করেন । সেই দেরাদূন-বিদ্যালয়ে ছয়টি বক্তৃতা-গৃহ আছে । তথায় অধ্যাপকেরা শিক্ষার্থিগণকে প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে উপদেশ দান করেন । তথায় একটি পুস্তকালয় (Library), যাদুঘর (Museum), বিভিন্নদেশীয় লতা-তৃণাদির গৃহ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার (Laboratory), রজনের ভাটিখানা (Rasindistillery), বৃক্ষত্বকের কাথ-প্রস্তুতের যন্ত্রাগার, সূত্রধরের কারখানা এবং একটি আবাদের কারখানা আছে । এই বিদ্যালয়, Inspector General of Forestryদ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হয় । তন্মধ্যে Board of Centres এবং শিক্ষাবিভাগ আছে । নিম্নলিখিত পদধারী ব্যক্তিগণ দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালিত হয় ঃ—(১)ডিরেক্টর, ডেপুটী ডিরেক্টর, দুইজন উপদেষ্টা, তাঁহাদিগকে ইংরাজীতে Instructor বলে ; অধিকন্তু দুইজন দেশীয় উপদেষ্টা । তাঁহারা ছাত্রগণকে মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদান করেন । এতদ্ভিন্ন একজন সহকারী উপদেশক আছেন । বনবিভাগীয় গভর্ণমেণ্টদ্বারা নিয়োজিত একজন সদস্যও উক্ত শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যে নিযুক্ত হইবেন ।

উক্ত বিদ্যালয়ে দুইটি শ্রেণী আছে । তাহাকে আমরা বিভাগ বলিয়াই গণ্য করিব । (১) একটি উচ্চবিভাগ, (২) অপররটি নিম্ন বিভাগ । উচ্চবিভাগে ইংরাজিতে শিক্ষাপ্রদান করা হয় ; সুতরাং তাহাদিগকে ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিয়া শিক্ষা করিতে হয় । এই বিভাগের ছাত্রগণই বনবিভাগীয় পরিদর্শকের 'সার্টিফিকেট' পাইয়া থাকে । ইংরাজীতে উহাকে ranger বলে । নিম্নবিভাগে হিন্দুস্থানী ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করা হয় । উক্ত শ্রেণীর ছাত্রগণও বনবিভাগীয় 'সার্টিফিকেট' পাইয়া থাকে । প্রায়ই হিন্দুস্থানিগণই এই বিভাগে প্রবিষ্ট হয় । উচ্চবিভাগে প্রতিবর্ষে ৪০ চল্লিশটি ছাত্র গ্রহণ করা হয় এবং নিম্নবিভাগে কেবল দশটি মাত্র । উক্ত শ্রেণীদ্বয়ে তিনপ্রকারের ছাত্র প্রবিষ্ট হয় ঃ—(১) প্রাইভেট ছাত্র, (২) গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিয়োজিত ছাত্র এবং (৩) দেশীয় করদ ও সামন্ত-রাজগণের প্রেরিত ছাত্র ।

প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকিউলেসান পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ভিন্ন এখানে উচ্চবিভাগে কেহ প্রবেশলাভ করিতে পারে না । ছাত্রের বয়স ১৮ হইতে ২৫ বৎসরের কম বা বেশী হইলে চলিবে না । নিম্নশ্রেণীতে মধ্যবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক । প্রতি বিভাগে পাঠ সমাপ্ত করিতে দুই বৎসর আবশ্যক হয় ।

প্রথমবর্ষে ঃ—১৫ই এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত দেরাদূন বা অপর কোন স্থলে তাঁবুতে বাস করিতে হয় ।

বর্ষাকালে অর্থাৎ ১লা জুলাই হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত দেরাদূনে বাস করিতে হয় ।

শীত-ঋতুতে অর্থাৎ ১লা নভেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁবুতে বসতি করিতে হয় ।

বড় দিনের অবকাশ ঃ—২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ।

বসন্ত-ঋতুতে অর্থাৎ ৬ই জানুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত তাঁবুতে বাস নির্দ্ধারিত ।

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ—পর্ব্বত-ভ্রমণ । ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত তাঁবুতে বসবাস ।

অবকাশ—১লা জুন হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ।

বর্ষাঋতু—১লা জুলাই হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত দেরাদূনে অবস্থিতি ।

শীতঋতু—১লা নভেম্বর হইতে ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাঁবুতে অবস্থান ।

বড় দিনের ছুটী—২৩শে ডিসেম্বর হইতে ৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত । বসন্তঋতু ; ৬ই জানুয়ারী হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাঁবুতে স্থিতি ।

পরীক্ষা (জরিপ প্রভৃতির সহিত) ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ।

এই বিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগে সাধারণ ভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম্ম পাইবার প্রত্যাশা করা যায় ; কিন্তু সম্মানের (with Honours) সহিত উত্তীর্ণ হইলে প্রথম হইতেই ৮০৲ টাকা বেতনে কার্য্য আরম্ভ করা যায় । পরিশ্রমী ব্যক্তি এই বিভাগে অধ্যয়ন করিয়া কেবলমাত্র দুই বৎসর কালের মধ্যে উত্তমরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া জীবিকার্জ্জন করিতে সমর্থ হয় । পরন্তু, শ্রমকাতর ব্যক্তিগণের এই বিভাগে প্রবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে । এই বিদ্যালয়ের বালকগণকে যথেষ্ট কায়িক পরিশ্রম করিতে হয় । কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিগণ এই বনবিভাগে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

শ্রীগণপতি রায় বিদ্যাবিনোদ

সন্ধ্যায়

আজি এ বিজন সন্ধ্যায় মোর
হৃদি-মন্দির মাঝে,
ঝিল্লীর কল কণ্ঠস্বরে
আরতির শাঁখ বাজে ।

উথলে অদূর শেফালি-বনের
সৌরভে মৃদু মন্দ
অন্তরে মোর ধূপের ধোঁয়ার
স্নিগ্ধ বিমল গন্ধ ।

তারার আলোকে নিষ্ফলে হায়
'পঞ্চ-প্রদীপ' জ্বলে,
দেবতা আমার গোপন রহিলে
কোন্ ধেয়ানের তলে ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ইব্‌সেনের "প্রেত" নাটকের দার্শনিক ভিত্তি

প্রেত বলিতে যাহা বুঝায়, ইব্‌সেন এই নাটকে ঠিক তেমনটির অবতারণা করেন নাই। ইব্‌সেনের ভূত একটু অদ্ভুত-রকমের। তিনি এই জীবন এবং জগতের সর্ব্বত্রই ভূতের সমাবেশ দেখিয়াছিলেন। আমাদের অস্তিত্বটাই ভূতের উপর সংস্থাপিত। Hidden within us dwells all that we inherit from our parents, all their old and seemingly dead beliefs and ideas" Mrs. Alvingএর এই উক্তিটির প্রমাণিকতা ইব্‌সেন এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে দেখাইয়া গিয়াছেন।

ইব্‌সেনের প্রত্যেক নাটকই এক একটী গভীর সমস্যা পূরণকল্পে রচিত। আমরা "নোরা" নাটকে কর্ম্মফলরূপ সমস্যার পূরণ হইতে দেখিয়াছি। এইবার এই 'প্রেত' নাটকে পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারিত্বরূপ সমস্যার মীমাংসা হইতে দেখিব। 'নোরা'র শেষ দৃশ্যে অনেক দর্শক ইব্‌সেনের প্রতি ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন; কারণ, উক্ত নাটকে মাতা, স্বাধীনতার জন্য আপন সন্তানদিগকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই; সেইজন্য 'গোষ্ট' নাটকে ইব্‌সেন তাহারই এক সন্তোষজনক জবাবদিহি দিয়া গিয়াছেন। পিতার পাপে এবং অপরাধে সন্তানের কি ভয়াবহ পরিণাম ঘটিতে পারে, এই নাটকের আদ্যোপান্ত তাহারই কাহিনীতে পূর্ণ।

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে এই উত্তরাধিকার-তত্ত্ব (Heredity) একটী গভীরতর গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র নাটকখানি আলোচনা করিয়া আমরা তিনটী মন্তব্যে উপনীত হই—(১), উত্তরাধিকারিত্ব মানব-জীবনের বজ্রদণ্ডস্বরূপ। (২), আধুনিক লোকেরা ইহার প্রভাবে বিশেষভাবে জর্জ্জরিত। (৩), এই উত্তরাধিকারিত্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র জীবনের সদ্ব্যবহারই প্রকৃষ্ট উপায়। মনোবৃত্তিগুলিকে সংযত করা ব্যতীত পূর্ব্বপুরুষ বা পিতামাতার পাপ হইতে সন্তানের নিস্তার পাওয়া বড়ই কঠিন। (৪), যেখানে ব্যাধি এবং প্রবৃত্তি একেবারেই দুরারোগ্য ও অসংশোধনীয় হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে প্রত্যেক নরনারীর জনকত্ব ও জননীত্ব হইতে বিরত থাকা অর্থাৎ কি পুরুষ, কি নারী, সকলেই যেন বিবাহ করিয়া নিরীহ সন্তান-সন্ততির সন্তাপের কারণ না হন।

উত্তরাধিকারিত্ব-হিসাবে Oswald Alving তাহার পিতার নিকট হইতে নৈতিক অবনতি ও মস্তিষ্ক-বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং Resinaও তাহার পিতামাতার কুচরিত্রবশতঃ তাঁহাদিগের নৈতিক শৈথিল্যের ও আত্ম-সুখ-পরায়ণতার উত্তরাধিকারিনী হইয়াছিল।

এই নাটকে আরও কয়েকটী জানিবার বিষয় আছে;—যথা, Mrs. Alving অর্থের লালসায় বিবাহ করিয়াছিলেন। Caht Alvingকে বিবাহ করিয়া তাঁহার অর্থের খাতিরে Mrs. Helen Alving স্বামীর দোষগুলিকে গোপন করিভে চেষ্টা করিতেন এবং স্বামীর অসৎকার্য্যে কিছুমাত্র বাধা দিতেন না। তাই Mrs. Alving, তাঁহার পুত্রের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া অতি দুঃখে বলিয়াছিলেন—"I saw only the one thing, that your father was a broken-down man before you were born," স্বামীর পাপাচরণের প্রতি তাঁহার এই মার্জ্জনা অবশেষে সুধুই যে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুরই কারণমাত্র হইয়াছিল, তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার সন্তানেরও ভয়াবহ পরিণাম ঘটাইয়াছিল।

যাজক Manders-চরিত্রে ইব্‌সেন দেখাইতেছেন যে, সত্য স্বীকারে কাপুরুষের মত ভীত ও পশ্চাৎপদ হইলে, অতি উচ্চদরের মানুষকেও হাস্যাস্পদ হইতে হয় এবং Engstrandএর ন্যায় অধীনস্থ ব্যক্তিরও ক্ষমতাধীন হইতে হয়।

এই নাটকের সমালোচনা করিতে গিয়া Frances Lord মহোদয়া এক অদ্ভুত দার্শনিক রহস্যে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, স্ত্রীজাতিতেও পুরুষের ভাব বিদ্যমান আছে এবং পুরুষজাতির মধ্যেও স্ত্রী-স্বভাব বর্ত্তমান আছে; আবার কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীর ভিতর যুগ্মাত্মাও (twin souls) নিহিত আছে। এই যে জীবের যন্ত্রণা এবং বৈষম্য ইহার একমাত্র কারণ,—কেবল অপরিচয় ও ছদ্মবেশ। (Travesty of sex) Lord মহোদয়া বলিতেছেন—Our sense of pain and disorder arises from so many characters having travestied their sex" ইনি প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, স্বয়ং ইব্‌সেন, পুরুষের আত্মা হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি নারীর আত্মা—কেবল কর্ম্মের জন্য পুরুষরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "Ibsen himself being a woman-soul, who has taken man's form for work's sake." ইহাই তাঁহার বিশ্বাস।

একদিকে অজানিত এবং ছদ্মবেশী বলিয়া আমরা যেমন দুঃখ ভোগ করি, অন্যদিকে তেমনই আমাদিগের সমধিক পরিচয়ে বা অন্তরের দ্বার উদ্‌ঘাটনে সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইব্‌সেন, এই নাটকে নানাবিধ মোহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানবজীবনের যথার্থ স্বরূপ কি, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন। জ্ঞান-সংস্কার-ভ্রান্ত Mandersএর চৈতন্য উৎপাদন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। পাদ্রী Manders আজীবন একটা ভ্রমের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন; Mrs. Alving, তাঁহার দূরদর্শিতার দ্বারা Mandersএর চোখের ঠুলি খুলিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, এই নাটকে ইব্‌সেনের নিজস্ব অনেক পরিমাণে থাকিলেও এবং ইহার উপাদান তাঁহার বহু অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ হইলেও, তিনি যে আমাদিগের হিন্দু দর্শনের নিকট উত্তরাধিকার-তত্ত্ব ও কর্ম্মফল-বিশ্বাসের জন্য একপ্রকার ঋণী, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা পাঠক মহোদয়গণকে Lord মহোদয়ার উক্ত নাটকের সমালোচনা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার নিজস্ব মত এই—"The doctrine Karma or the harved during spiritual evolution is not useless, because to state it is also to state the spiritual power of every soul and to open the way for comprehengion of our spiritual Healing Power for body and mind.

ইব্‌সেনও Oswaldএর উক্তিদ্বারা সমর্থন করিতেছেন:—"Work is a curse and a punishment for sin, and that life is some thing miserable."

আমাদিগের জন্ম এবং জীবন দুঃখময়, জীবনে কর্ম্ম করিতেই হইবে। একমাত্র কর্ম্মদ্বারাই আমাদিগের কর্ম্মক্ষয় ও আত্মার মলিনতা নষ্ট হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃই আমাদিগের মোহের বন্ধন খুলিয়া গিয়া সত্য এবং জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়া থাকে। জগতের দুঃখ-কষ্টেরও একটা সার্থকতা আছে। দুঃখ-কষ্টের নিষ্পেষণে না পড়িলে জীবনের মোহ কাটে না।

ইব্‌সেন কেবলমাত্র ইহজন্মের কর্ম্মফল ও উত্তরাধিকারিত্ব পর্য্যন্ত গিয়াছেন; কিন্তু হিন্দুর জন্মান্তর-বাদ এবং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। দৃশ্য এবং অদৃশ্যের সম্বন্ধ চিরকালই আছে। পাশ্চাত্য দর্শন এখনও সেই অদৃশ্যের মর্ম্ম সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে নাই—কেবল তাহার আভাষ মাত্র পাইয়াছে।

"গোষ্ট"—নাটকের বিশিষ্ট সমালোচনা

নাটকটি ইব্‌সেনের একটী বিষাদময় অথচ শক্তিসম্পন্ন নাটক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা ইব্‌সেনের 'পুতুল ঘর' নামক সমস্যাপূর্ণ নাটকটীর একটী উপযুক্ত কৈফিয়ৎ মাত্র।

সাধারণের পক্ষ হইতে এই নাটকে ইব্‌সেন যাজক Manders-চরিত্রটীকে প্রতিনিধিস্বরূপ দণ্ডায়মান করাইয়াছেন। Manders একজন উচ্চচেতা সম্মানার্হ বিশুদ্ধস্বভাব ব্যক্তি; অথচ সংসার-সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা কেবল কতকগুলি পুঁথিগত নিয়ম ও ধারণার মধ্যেই আবদ্ধ। 'বাইবেলের' আদেশ-উপদেশ, আচার-ব্যবহারের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি। স্বাধীনতা ও নৈতিক পবিত্রতার দোহাই দিয়া Capt Alvingকে পরিত্যাগ করিবার জন্য তিনি Mrs. Alvingকে মহা অপরাধিনী বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু হেলেন আলভিং পুনরায় Mandersএর তীব্র প্রতিবাদে সমাজ মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইয়া সংসারে প্রর্ত্যাবর্ত্তন করিলেন। নৈতিক উপদেষ্টারা Noraর নিকট হইতে যাহা চাহিয়াছিলেন এ ক্ষেত্রে Mrs. Alving সামাজিকগণের সেই দাবী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রক্ষা করিলেন। কাহারও কিছুই আর বলিবার রহিল না। তিনি তাঁহার অবশিষ্ট জীবন মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তাঁহার মৃত স্বামীর অসৎ চরিত্রের কথা ভুলিয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমাজকে সন্তুষ্ট করিতে স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থ একটী সুবৃহৎ অনাথাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন। যাজক প্রবর Manders এই হিতানুষ্ঠানের ভারগ্রহণ করিলেন। তিনি পারিবারিক উৎসবের মধ্যে হেলেন আল্‌ভিংএর বিগত জীবনের গর্হিত এবং অন্যায় কার্য্য সমূহের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং তাঁহাকে অনুতাপে দগ্ধ করিতে ছাড়িলেন না এবং খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্র যে কত সহিষ্ণুতা, বাধ্যতা, এবং ত্যাগ-মূলক তাহা বিশেষরূপে আলভিং মহোদয়াকে বুঝাইয়া দিলেন। Manders নানা বক্তৃতার দ্বারা Mrs Alvingকে নানারূপ সংসার-শুভ-বিধায়ক কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তিনিই যে আল্‌ভিং-পত্নীর একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। তিনি নিম্নলিখিত sermonটী আলভিং মহোদয়াকে শুনাইয়া তাহাকে অনুতপ্ত করিবার চেষ্টা করিলেন।

"All your life you have been guided by a spirit of self-will and insubordination, All your aims have been directed to that which was unlawful, to that which would bind you down by ordinary chains. You have always desired to break away from every path. Everything that so much as bored you in life, you cast away unscrupulously and inconsideratey as an unneccessary load, Marriage did not please you, so you left your hasband. The caress of a mother weighed upon you, and so you gave away your son to other people to tend"

অর্থাৎ "তোমার সমস্ত জীবনটা তুমি যথেচ্ছাচারিতায় ও অবাধ্যতার দ্বারা চালিত হইয়াছ। তোমার সকল লক্ষ্যই অনিয়ম এবং অন্যায়ের দিকেই প্রধাবিত হইয়াছে, কেহই তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তুমি প্রত্যেক পথ হইতেই ভ্রষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছ। যাহা তোমার জীবনে ভাল বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই তুমি অনাবশ্যক বোঝা বলিয়া বিচার না করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছ। বিবাহ তোমাকে আনন্দিত করিতে পারে নাই; তজ্জন্য তুমি স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছ। সন্তান-পালন তোমার পক্ষে ভার বলিয়া বোধ হইয়াছিল; তজ্জন্য তোমার পুত্রকেও তুমি অপরের কাছে মানুষ করিতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলে।"

শিক্ষকের ন্যায় Manders, আরও গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বলিতে কি, আলভিং-পত্নী, তুমি একজন বড়ই নিষ্ঠুরা জননী!" সমালোচকগণও নোরার ব্যবহার দেখিয়া এইরূপ প্রতিবাদই উত্থাপন করিয়াছিলেন।

তখন হেলেন আর নীরব হইয়া রহিলেন না। তিনি মৃত স্বামীর সকল গুণপণাই বাহির করিয়া একে একে Mandersকে শুনাইতে লাগিলেন। Capt Alving সমাজের ভিতর একজন প্রতিপত্তিশালী ও সম্মানযোগ্য ব্যক্তি হইলেও, তিনি যে একজন মহামদ্যপায়ী ছিলেন; এবং তাঁহরই জন্য যে তাঁহাদের গার্হস্থ্য জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল এতদ্দ্বারা তিনি Mandersএর নিকট মৃত কাপ্তেনের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ উপস্থিত করিতে লগিলেন। গৃহমধ্যে পাচিকার সঙ্গে Capt Alvingএর অবৈধ কীর্ত্তির কথাও যাজকপ্রবরকে শুনাইতে ছাড়িলেন না।

Manders ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,"And all that happened in this house? In this house! এই গৃহেই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে? এই গৃহেই!"

Alving মহোদয়া বলিলেন—"I have suffered a great deal in this house. In order to keep him here in the evening and at night, too, I was forced to become his boon-companion in his cups and listen alone to his drunken ravings I had to sit, drink and listen to his trivial senselss talk, and to strive with all the strength I had to drag him finally to bed"

"আমি এই গৃহেই অনেক সহ্য করিয়াছি। তাঁহাকে সন্ধ্যায় ও রাত্রিকালে হেথায় ধরিয়া রাখিতে, তাঁহার মাতলামির কথা শুনিতে ও তাঁহার মদ্যপাত্রে যোগদান করিতেও বাধ্য হইয়াছি। তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিতে হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে মদ্যপান করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার নানারূপ বিকৃত কথা শুনিতে হইয়াছে। অবশেষে তাঁহাকে জোর করিয়া শয্যায় টানিয়া লইয়া যাইতেও হইয়াছে।"

যাজক Manders ত শুনিয়া অবাক্। Manders এতাবৎ কাল কেবল ত্যাগ ও কর্ত্তব্যের পুঁথিগত বিদ্যাতেই অভ্যস্ত ছিল, সংসারের বাস্তবতা তাঁহাকে জীবনে কখনও অনুভব করিতে হয় নাই। Manders বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

My head is simply whirling round. And so, the your marriage, all your long years of married life with your husband have been only a great chasm, concealed from the eyes of strangers?

"তোমার কথা শুনিয়া আমার মাথার ভিতরটা যেন চক্রের

ন্যায় ঘুরিতেছে! তাহা হইলে এতাবৎ কাল তোমার বিবাহিত জীবন মানব-চক্ষুর অন্তরালে একটা সুগভীর রহস্যমাত্র ছিল?"

"একথা কেবল আজই আপনাকে নিবেদিত করিলাম, আর কেহই ইহার বিন্দুমাত্রও জানে না।"

Manders তবুও বিশ্বাস করিতে চাহেন না, বলিলেন, "কিন্তু এ কি, আমি ইহা বুঝিতে পারি না। ইহা অসম্ভব!"

Mrs Alvingএর গৃহে তাঁহার স্বামীর ঔরসে পাচিকার গর্ভজাত কন্যা রেজিনা প্রতিপালিত হইয়াছিল। এল্‌ভিং মহোদয়ার পুত্র Oswald এতদিন ইটালীতে বাস করিতেছিল। জন্মভূমি নরওয়ের নিরানন্দ প্রকৃতি তাঁহার ভাল লাগিত না। অত্যধিক বৃষ্টিপাতে Oswald স্বদেশে বড়ই বিষাদ অনুভব করিত। Oswald চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল; তাই সে ইটালীর আকাশ এবং বাতাসের পরিচ্ছন্নতায় থাকিতে ভালবাসিত। এক্ষণে জন্মভূমিতে পদার্পণ করিয়া সে বড়ই (ইব্‌সেন এখানে আপনারই মানসিক প্রকৃতির পরিচয় দিতেছেন। তিনিও নরওয়ের জল বায়ু আদৌ পচ্ছন্দ করিতেন না।) অস্থির হইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পৈতৃক ব্যাধির প্রকোপ স্বদেশে ফিরিয়া আরও বাড়িয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার পিতারই ন্যায় সে মদ্যপায়ী হইয়া উঠিয়াছিল এবং ক্রমশঃই পৈতৃক দোষগুলি তাহার মনোরাজ্যকে এক এক করিয়া অধিকার করিয়াছিল। তাহার কোনরূপ আত্মসংযম ছিল না এবং মাঝে-মাঝে স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যবশতঃ অচৈতন্য হইয়া পড়িত। নরওয়ের প্রকৃতির নির্দ্দয়তাবশতঃ তাহার মদ্যপানেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল এবং রেজিনার প্রতি তাহার মানসিক কুপ্রবৃত্তিগুলিও জাগিয়া উঠিল। এই নাটকের প্রথমাঙ্কেই কবি, উত্তরাধিকারতত্ত্ব অর্থাৎ পিতার কর্ম্মাপরাধ কেমন করিয়া পুত্রে বর্ত্তে, তাহা বিশদভাবে প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইব্‌সেন, প্রথমাঙ্কের সমস্ত ঘটনাগুলিকেই বর্ষার ঘনীভূত আকাশের নিষ্প্রভ প্রভাতালোকেই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির কতটা সম্বন্ধ, ইব্‌সেন অতি নিপুণতার সহিত এই নাটকে তাহাও যেন মাপিয়া দেখাইয়াছেন!

মাণ্ডার্স এবং এল্‌ভিং মহোদয়া যখন বাক্যালাপ করিতেছেন, তখন অপর কক্ষ হইতে হঠাৎ তাঁহাদের কর্ণে গেল—

"অসোয়াল্ড্‌, তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে না কি? তুমি আমায় ছাড়—ছাড়।"

Mrs Alving অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, অসোয়াল্ড্‌ অপর কক্ষে মদের বোতলের ছিপি খুলিতেছে, Manders ছিপি-খোলার শব্দ শুনিতে পাইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আল্‌ভিং মহোদয়া বলিলেন--"'ভূত'। উভয়ে উহারা পুষ্প লইয়া খেলা করিতেছে। ছুঁড়ী আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।"

মাণ্ডার্স—"কে···রেজিনা? না না, সে আসিতে পারে না, তার আসা কি সম্ভব?"

আল্‌ভিং মহোদয়া মাণ্ডার্সের হাত ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আসোয়াল্ড-রেজিনার প্রণয়ালাপ দেখাইলেন।

আলভিং মাণ্ডার্সকে বলিলেন যে, এঘটনা প্রথম নয়; এইরূপ বহুদিন যাবৎ তিনি পরিচারিকা রেজিনার উপর অসোয়াল্ডের আসক্তি লক্ষ্য করিতেছেন। এইরূপ 'ভূত' তিনি অনেকদিন ধরিয়া দেখিতেছেন।

পাঠকগণ এইবার ইব্‌সেনের Ghostএর মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছেন কি? আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

আমাদের জীবনের সকল ঘটনাই অদ্ভুত ভূত-তত্ত্বে পূর্ণ—সবই ছায়াবাজী। এ সংসার নয়,—প্রেতের শ্মশানে যেন আমরা বাস করিতেছি! ইহার আগাগোড়াই ভূত ও ছায়ার উপর রচিত; মনে হয় এ সংসার পাষাণের ন্যায়ই অটল, অচল—ইহার সামাজিক নিয়ম-প্রণালী বজ্রের অনুশাসনেই ব্যবস্থিত; কিন্তু ইহাদের অস্তিত্ব বাস্তবিকই ভূতের মত অস্থায়ী। মাণ্ডার্সের ওই কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ত্যাগের আদর্শ ও উপদেশ কি ভ্রান্তিপূর্ণ—প্রেতেরই মত ভিত্তিহীন—স্বপ্নেরই মত অলীক!

আলভিং মহোদয়া Mandersকে বলিতেছেন:—"When you praised as equitable all that which wrung my soul by its hideousness, I became seized with a desire to accept naively all your teaching. I touched one mouth, but hardly had I raised it than the whole net fell to bits. And there I saw that the work was all machine-made."

এই উক্তিগুলিতে বেশ বুঝা যায় যে আলভিং মহোদয়ার আত্মানুসন্ধিৎসা ও আত্ম-জিজ্ঞাসা কিরূপ প্রবল ছিল। ইব্‌সেনের ব্যক্তিত্ববাদ এই আত্মশক্তি বা স্বানুভূতিকেই বিশেষভাবে ধরিয়াছে। বাস্তবিক আত্মজিজ্ঞাসাও আমাদিগের হিন্দু-দর্শনের ও ধর্ম্মের মূলভিত্তি। নারীজাতির ভিতর দিয়া এইরূপ আত্মজিজ্ঞাসা ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই ইব্‌সেন লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নারীজাতির অজ্ঞানতাই নারীজাতির অধঃপতনের একমাত্র কারণ।

Mrs Alving এই machine made mesh, এই মিথ্যার ঊর্ণনাভ-জাল হইতে মুক্তি পাইতেই তাঁহার মনকে আত্মানুসন্ধিৎসু করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনকালই অপরিহার্য্যভাবে এই ঊর্ণনাভ-জালে আচ্ছাদিত ছিল। তাই তিনি মাণ্ডার্সের সহিষ্ণুতা ও বাধ্যতারূপ আদর্শের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিলেন। সমাজের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলিকে তিনি ghosts বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। "All around one, these apparitions from the tomb, innumerable as the sands of the sea." "সমুদ্রের অসংখ্য বালুকণার ন্যায় সংসারের চতুর্দ্দিকস্থ সকল দ্রব্যই শ্মশানের প্রেত ভিন্ন আর কিছুই নহে" ইহাই ওই আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্না নারী সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

যখন অসোয়াল্ড্‌ তাহার জননীকে বলিল যে, তাহার উন্মাদরোগ তাহার মৃত পিতার ব্যভিচার ও মদ্যপান-প্রবৃত্তি হইতেই সে অধিকার লাভ করিয়াছে এবং প্যারিসের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও এইমর্ম্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যখন তাহার জননী বুঝিলেন যে, অসোয়াল্ড্‌ পরিচারিকা রেজিনা ব্যতীত অপর কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহে না এবং এই অবৈধ প্রণয়ানুরাগই তাঁহার পুত্রের উন্মাদ-রোগের একমাত্র কারণ, তখন তিনি স্বয়ং রেজিনাকে অসোয়াল্ড্‌-করে সমর্পণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন।

ধর্ম্মভীরু Manders কিন্তু ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং ধর্ম্মের দোহাই দিতে লাগিলেন; কিন্তু আলভিং মহোদয়া দৃঢ়তার সহিত মাণ্ডার্সের মুখের উপর বলিলেন—"You had no right to do it, I have every right for I desire it.

আলভিং মহোদয়ার স্বানুভূতির নিকট মাণ্ডার্স হার মানিলেন। মাণ্ডার্সের মূল্যহীন উপদেশ অপেক্ষা তিনি তাঁহার উপস্থিত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকেই চূড়ান্ত বলিয়া মনে করিলেন।

এমন সময় জানালার ফাঁক দিয়া আকাশ রক্তিমাভ বলিয়া প্রকটিত হইল। Capt. Alvingএর উন্নত আশ্রমে (asylum) হঠাৎ

আগুন লাগিয়া গেল। সেই আলোকের রশ্মিচ্ছটার অনতিদূরে অসোয়াল্ড এবং রেজিনা দাঁড়াইয়াছিল। স্থিরনেত্রা Mrs Alving ও বিহ্বলচিত্ত Pastor Mandersও স্তম্ভিত হইয়া অগ্নির সেই লেলিহান রসনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। বৃহৎ মিথ্যার দ্বারা সঞ্চিত এবং সৃষ্ট অসদুপায়ে লব্ধ সেই অচলায়তনটী দেখিতে দেখিতে ভস্মসাৎ ও ধূলিসাৎ হইয়া গেল। Capt. Alvingএর কোনরূপ স্মরণ-চিহ্নই আর রহিল না। অদৃষ্টের ক্রম-পরিহাসে, বিধাতার অভিসম্পাতে মৃত আলভিংএর যাহা-কিছু, সব ছায়াবাজীর ন্যায় শেষ হইয়া গেল। এই অগ্নিদাহ দ্বারা ইব্‌সেন দেখাইতেছেন যে, যাহা অসত্য ও অধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। বিধাতার অভিশাপ তথায় কোনদিন-না-কোনদিন প্রতিশোধ লইবে-ই। ইব্‌সেন অদৃষ্টবাদী ছিলেন। আমাদিগের কর্ম্মফলময় জীবন-যাত্রার পশ্চাতে অদৃষ্টের নীরব সঙ্কেত তিনি অনুভব করিতে পারিতেন। অদৃষ্ট-শক্তির দ্বারা যে আমরা সকলেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছি, তিনি তাহা এই নাটকে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। মিথ্যা হইতে মুক্তিলাভ করিতে আলভিং মহোদয়া বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। নানারূপ প্রেত এবং প্রতিবন্ধক আসিয়া তাঁহাকে বিঘ্নপ্রদান করিয়াছিল। অবশেষে এই সব প্রেতই Mrs. Alvingএর স্বেচ্ছাকৃত অপরাধগুলির প্রতিশোধ লইয়াছিল। তাঁহার স্বামীর স্মৃতি-মন্দির, যাহার প্রত্যেক ইষ্টক-খণ্ডে তাঁহার স্বামীর পূর্ব্ব-অপরাধ বিজড়িত, নিয়তির অলঙ্ঘ্য নিয়মে তাহা প্রতিষ্ঠা পাইল না। Capt. Alving পাপের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহার ফল একে একে ফলিতে বসিয়াছে।

Capt. Alvingএর পাপের ফল পুত্র Oswaldএর যন্ত্রণাময় জীবন দেখিয়া কার না মনে পাপ-সংসারের প্রতি একটা ঘৃণা আসে? পিতামাতার ব্যভিচারে সন্তানের কি ভীষণ পরিণাম ঘটিতেছে, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই উদাস হইয়া উঠিতে হয়।

এই নাটকের শেষাঙ্ক কি ভয়ানক ও মর্ম্মন্তুদ দৃশ্যসমূহে পূর্ণ—কর্ম্মের কি ভীষণ প্রতিশোধ! বংশ-পরম্পরাগত পাপের প্রভাবে উত্তরকালের মানব-জীবনের নৈতিক ও মানসিক অবস্থা কিরূপ বিকৃত ভাব ধারণ করে, অসোয়াল্ডের জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পৈতৃক কর্ম্মফলভুক্ অসোয়াল্ডের জীবনধারণ অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড় প্রার্থনা করিতেছিল।

"It does not usually end in a sudden death. the doctor declares. He said, it would be softening of the brain or some disease of that nature. "Softening of the brain" The ailment has a pretty name, has it not?" এইরূপ মর্ম্মন্তুদ বাক্যদ্বারা নিজ দুরারোগ্য পিতৃদত্ত ব্যাধির ভবিষ্যৎ জননীকে বুঝাইতে বুঝাইতেই অসোয়াল্ড সেই বিকৃত উন্মাদরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ অসোয়াল্ড চেয়ার হইতে উঠিয়া পাগলের ন্যায় তাহার প্রশস্ত গৃহকক্ষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া, অসোয়াল্ড তাহার পকেট হইতে একশিশি 'মরফিয়া' বাহির করিয়া জননীকে সেই বিষ প্রয়োগ করিতে অনুনয় করিতে লাগিল।

অসোয়াল্ড্‌ বলিল—'Yes mamma, you must do me this one more service (হাঁ মা, এই কাজটি করিয়া তুমি আর একবার আমায় বাধিত কর)।"

জননী বলিলেন,—"I-your mother! Am I to take your life from you, who gave it to you! (আমি তোমার মা!—আমি মা হইয়া তোমার জীবন গ্রহণ করিব! আমিই না তোমায় জীবন দান করিয়াছি!)"

অসোয়াল্ড্‌ বলিল—"I never asked you for life. And what sort of a life have you given me as it is I do not want it. Take it back? again. (আমি ত এ জীবন তোমার নিকট চাহি নাই ও কিরূপ জীবন তুমি আমাকে দিয়াছ? আমি জীবন চাই না, তুমি ফিরাইয়া লও!)"

অসোয়াল্ডের এই হৃদয়-বিদারী কথায় মাতার প্রাণ একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার স্নেহ ও মায়ার শেষ ভরসা ফুরাইল—শেষ 'ভূত'টাও ছাড়িয়া গেল। মাতার পবিত্র পুত্র-স্নেহ-পরায়ণতা আলভিং মহোদয়ার চক্ষে তখন বিষবৎ প্রতীয়মান হইল। এইজন্যই কি তিনি মাতার পবিত্র আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন! তাঁহার স্নেহের সামগ্রী আজ তাঁহারই হস্তে বিষপান করিতে চায়।

হেলেন আলভিং বুঝিলেন যে, একমাত্র বিষদান ছাড়া তাঁহার প্রাণসম পুত্রকে আর এ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিবার অন্য উপায় নাই। তাই হেলেন আল্‌ভিং মহোদয়া পুত্রের মস্তকে হাত দিয়া বিষ দিবেন বলিয়াই দিব্য করিলেন। অতঃপর তিনি অসোয়াল্ডের মাথায় হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিলেন এবং নিম্নলিখিত সান্ত্বনা বাক্যে সুধাইতে লাগিলেন—

"There, now, you see the access is over. you are better. I know you would be. And the day is dawning, Oswald. See how blinding the sun's rays are! See how transfigured everything around us has become.

তখন প্রভাত হইয়া আসিতেছে। সারারাত্র ধরিয়া ওসোয়াল্ডের চক্ষে নিদ্রা নাই; নিদ্রা তাহার জীবনে দুর্লভ সামগ্রী! তাহার জননীও টেবিলের সম্মুখে গিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিলেন। তখন কক্ষের পশ্চাদ্‌ভাগে পর্ব্বত-চূড়া ও বরফ-স্তূপসকল ঈষৎ দেখা যাইতেছিল। হঠাৎ পূর্ব্ব-গগন আলোকিত করিয়া সূর্য্যদেব কিরণধারা ঢালিতে লাগিল।

তদ্দর্শনে অসোয়াল্ড্‌ বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিল—"Mamma, give me the sun" নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ যেমন একবার দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া নিবিয়া যায়, অসোয়াল্ড্‌ও তেমনই এই কথা বলিতে অসাড় হইয়া পড়িল। তাহার মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হইয়া গেল, মুখ-শ্রী ম্লান হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় নিষ্পন্দ ভাব ধারণ করিল। অসোয়াল্ড্‌ আর তাহার জননীকে চিনিতে সমর্থ হইল না, বিকারের ঝোঁকে বলিতে লাগিল—"The sun! The sun!

Alving মহোদয়ার হস্তে তখনও 'মরফিয়ার' শিশিটী ছিল—তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভয়ে সেই শিশি হস্তে পুত্রের সম্মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

Oswald "The sun, the sun" বলিতে বলিতে অনন্ত ঘুমঘোরে লীন হইয়া গেল।

ইব্‌সেন এইরূপে নোরার অসম্পূর্ণতা Mrs. Alvingএর চরিত্র-চিত্রণের সফলতাদ্বারা সম্পূর্ণ করিলেন। দাম্পত্য-জীবনের বিভীষিকা-দর্শনে নোরা আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই; কিন্তু Mrs. Alving গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই ভীষণ পরিণাম সন্দর্শনপূর্ব্বক জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন।

স্বাভাবিকতা (naturalism) উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। ইব্‌সেনের সকল নাটকগুলির প্রকৃতিই ধ্বংসমূলক। তিনি বুঝিতেন ধ্বংসের অব্যবহিতকাল পরেই আবার সৃজনের (construction) পালা আসে। নূতন সৃষ্টির জন্য তাই তিনি পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এত পক্ষপাতী; কিন্তু ব্যক্তিত্বপ্রধান য়ুরোপে যাহা বাঞ্ছনীয় সংহতিপ্রাণ ভারতবর্ষে তাহা অদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। Ibsenএর মত ভারতবর্ষে যিনি চালাইতে যাইবেন, তিনিই ঠকিবেন। য়ুরোপের পক্ষে পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক; কারণ, তাহাদের আত্ম-তৃপ্তি-মূলক সভ্যতা এখনও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহু পশ্চাতে। য়ুরোপের আদর্শ এবং প্রাচীন ভারতের আদর্শ এক নহে। য়ুরোপের সভ্যতা ভোগমূলক, চলচ্ছায়া—Ghostএর ন্যায় তাহার ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপাপবিদ্ধ, স্বচ্ছ আত্মার উৎকর্ষের উপরই প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মচর্য্য ও সদাচার তাহার ভিত্তি,—Ghostএর মলিনতা বা আবরণ সেই সুমহান্ আদর্শকে বিপথে আনিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট করে নাই। বর্ত্তমান সময়ে সেই সনাতন প্রতিষ্ঠার উপর বহির্দ্দেশ হইতে সহস্র গ্লানি আসিয়া জমিলেও শুভ শরৎকালের অনুরূপ আব্‌হাওয়ায় পড়িলে আবার সেই প্রাচীন সভ্যতা সুনির্ম্মল দেহ ধারণ করিবে; তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা যথার্থ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার স্বরূপ দেখিতে চান, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে বহির্দ্দেশ হইতে আগত গ্লানি-গুলিকে দূর করিতে যত্নবান্ হউন। এতদ্ভিন্ন 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

শ্রীঅকিঞ্চন দাস

দুই যাত্রী

চলেছে বিবাহ-যাত্রী, বাজিছে বাঁশরী,
পুষ্পিত মালঞ্চে কা'র নবীন মুকুল ?
যায় রে শ্মশান-যাত্রী শব স্কন্ধে করি,
প্রাচীন জীবন-বৃন্তে খসে' গেছে ফুল!
একদিকে হিন্দোলিত চন্দ্রমার তরী,—
অন্যদিকে অমাবস্যা এলায়েছে চুল;
একদিকে মুক্তস্বর, প্রীতি, গীতি, নরী,—
অন্যদিকে বদ্ধকণ্ঠ, যাতনার শূল।

হে প্রকৃতি, হে জননি! উৎসঙ্গে তোমার
আনন্দ-সরকে কভু দিতেছি চুমুক্,
ধরায় লুণ্ঠিত কভু, প্রাণে হাহাকার,
দেহ-পাত্র চূর্‌মার্, চিরস্তব্ধ বুক।

বিচিত্র—বিচিত্র এই আলোক-আঁধার,
আবর্ত্তনে—বিবর্ত্তনে সারা বিশ্ব মূক!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সাহিত্য সংবাদ

আগামী ৩রা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হইবে।

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার পর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষতের পঞ্চম মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হইল :—(১) শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয়-প্রদত্ত সোলার পুথি, মহামোহ-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহাশয়-কর্তৃক নেপাল হইতে সংগৃহীত বাঙ্গালা পুথি এবং শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, মহাশয়কর্ত্তৃক নালন্দায় প্রাপ্ত রাজ্যপালের ও উদ্দণ্ডপুরে প্রাপ্ত নারায়ণ পালের মুদ্রা ও শিলালিপি সংক্ষেপে ব্যাখ্যার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছিল। (২) উক্ত মুদ্রা ও শিলালিপি-সম্বন্ধে রাখালবাবু একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইয়াছিলেন। (৩) তৎপরে কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, জানকীনাথ গুপ্ত এম, এ, বি, এল, শিবনাথ গুপ্ত বি, এ, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, বিহারীলাল পাল বি, এল এবং ত্রৈলোক্যমোহন গুহ নিয়োগী মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ করা হইয়াছিল।

বর্ত্তমান ১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকর্ত্তৃক নিম্নোক্ত বিষয়-সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে ;—

পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। হেমচন্দ্র রৌপ্যপদক—	হেমচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের কাব্য-শক্তির সমালোচনা
২। হরেন্দ্রনারায়ণ স্বর্ণপদক (১ম)—	কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গীত
৩। " " " (২য়)—	গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক
৪। কেদারনাথ দয় রৌপ্যপদক—	রূপকথা-সংগ্রহ (লেখকের আপন জেলায় প্রচলিত রূপ-কথা-সংগ্রহ)
৫। দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার—	বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য ও দীনবন্ধু
৬। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি—	টেনিসনের কবিতায় কি শিক্ষা করা যায়
৭। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার—	শ্রীনিবাসের জীবন-চরিত্র
৮। প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী পুরস্কার—	জীবন ও জীবনের ধর্ম্ম*

* এই প্রবন্ধ-সম্বন্ধে পুরস্কারদাতৃগণ প্রবন্ধ-লেখকগণকে এইরূপ ইঙ্গিতটুকুরও উল্লেখ করিতে বলেন,—"যে চৈতন্য ঘটে ঘটে ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান, যাহার সংযোগে জীব জীবপদবাচ্য—যাহার বিকাশ মানবাধারে পরিস্ফুটতর, সেই জীবনের স্ব-রূপ, প্রকৃতি, লক্ষ্য, গতি ও পরিণতি পর্য্যালোচনাদ্বারা উহার স্বভাব বা ধর্ম্ম নিরূপণ।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রথম:প্রবন্ধ স্কুল, কলেজ, চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসার ছাত্রগণ ব্যতীত:অন্য কেহ লিখিতে পারিবেন না। অন্যান্য প্রবন্ধ যে-কেহ লিখিতে পারিবেন। প্রবন্ধগুলি বর্ত্তমান বর্ষের ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

মর্ম্মবাণী—

শিশুর খেলা

চিত্রশিল্পী—শ্রীনৃপেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ {১ম খণ্ড, ২০শ সংখ্যা

ওঙ্কারের শিল্প

ওঙ্কারের শিল্প-কলা লইয়া য়ুরোপে একটা মস্ত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ইতিহাসের পাঠকেরা জানেন, ইটালিতে যে শিল্প-চাতুর্য্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই শিল্পচাতুরী তাহারা গ্রীসের নিকট পাইয়াছে। গ্রীসীয় শিল্পী রোমে নিমন্ত্রিত হইয়া অথবা রোমের ক্রীতদাসরূপে বাস করিয়া রোম-সম্রাটের প্রাসাদ যে সমস্ত প্রাণারাম মনোমদ চিত্র-শিল্পে ও স্থাপত্যে সমলঙ্কৃত করিয়াছিল, রোম তাহারই অনুকরণ করিয়া স্বীয় শিল্পের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। নেপ্‌ল্‌সে হারকিউলিসের মূর্ত্তি, রোমে মেরোপ্‌ ও ইলিটাসের মূর্ত্তি, মুমূর্ষু গ্ল্যাডিয়েটরের মূর্ত্তি প্রভৃতি গ্রীসের অযোগ্য অনুকরণ মাত্র।

সেদিন * স্যর্‌ জর্জ্জ বার্ড্‌উড্‌ সাহেব শিল্পকলার আলোচনায় বলিয়াছেন যে, ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শ অনেক সময়ে রোম ও গ্রীস হইতে গৃহীত; উদাহরণস্বরূপ, তিনি ওঙ্কারের কয়েকটী শিল্পের নমুনা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সম্প্রতি ওঙ্কারের "শীকার-যাত্রা"র যে চিত্র ভৌগোলিক পত্রে (January 1912) প্রদত্ত হইয়াছে,তাহার অঙ্কন-পদ্ধতি রোমীয় অঙ্কন-পদ্ধতির অবিকল অনুকরণ। তিনি দেখাইয়াছেন, বৃত্ত, বৃত্তবৃন্ত, চত্বর প্রভৃতি অঙ্কনে ইটালি যে ডোরিক ধারার অনুসরণ করিয়াছিল, ইহা তাহারই হুবহু নকল। ওঙ্কারের শিল্পে, বার্ড্‌উড্‌ সাহেব কোথাও ভারতের স্বাধীন হস্তের পরিচয় পান নাই।

স্তম্ভ

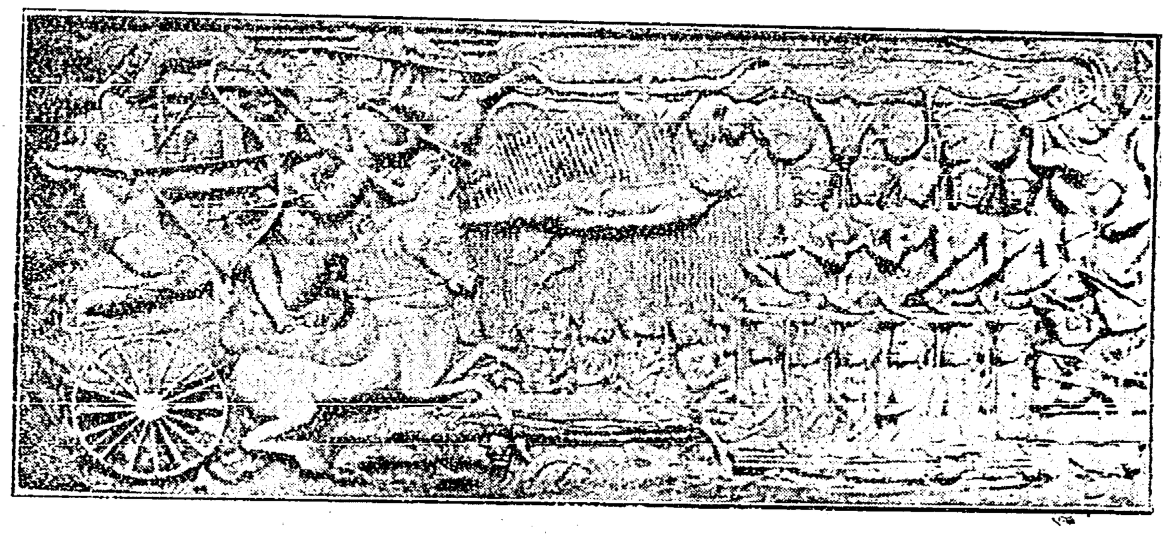

ভীষ্মের শরশয্যা

যেখানে বিশেষত্ব,বৈচিত্র্য বা সৌন্দর্য্য স্থাপত্যের মধ্য দিয়া ফলাইতে ভারতবাসী চেষ্টা করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাকে বিদেশীর নিকট অবনতমস্তকে সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে—এ বেশ কথা! শুভ-সিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই! গ্রীসীয় শিল্প, রোমীয় শিল্প, মিসরীয় শিল্প উন্নতির চরম-সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, একথা কেহ অস্বীকার করে না। ভারতবর্ষেও যে শিল্পের চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, ইহাও প্রতীচী মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছে; কিন্তু নিতান্ত দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে,যেখানে প্রতীচ্য গবেষণাকারিগণ প্রাচ্য শিল্পের তুলনার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেইখানেই প্রাচ্যকে প্রতীচ্যের নিকট ঋণী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া-

* Academic Nationale July. 1914, p.p. 381--397.

ছেন। প্রাচ্য এ বিষয়ে প্রতীচ্যের অনুগামী হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু যখন এক শিল্পকে আর এক শিল্পের অনুবর্ত্তী বলিতে হইবে, তখন কি দেখাইতে হইবে না যে কোন্ অংশে, কি প্রকারে, এক শিল্পের ধারা আর এক শিল্পের পদ্ধতি হইতে গৃহীত? এক-খানি প্রতীচ্য শিল্প ও আর একখানি প্রাচ্য শিল্প পাশাপাশি রাখিয়া

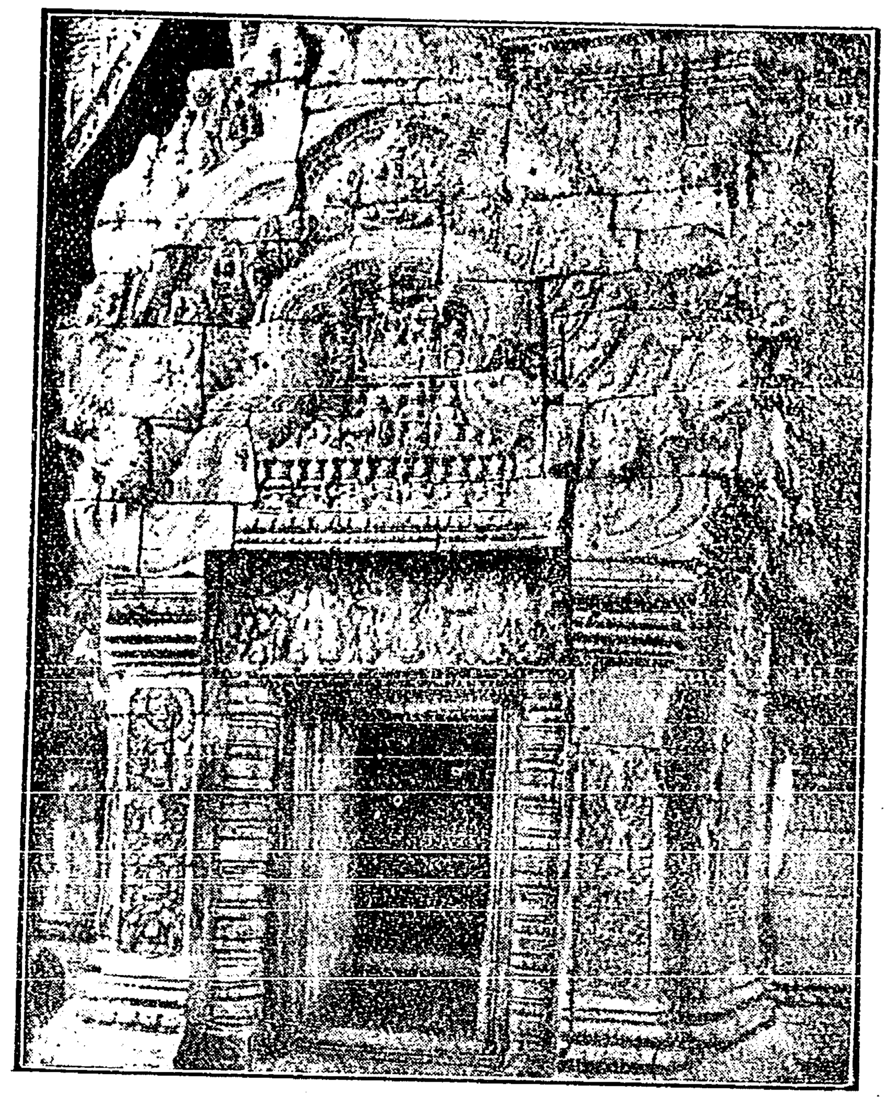

বহির্দ্বারের উপরিভাগের কারুকার্য্য

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, কোথায় তাহাদের সামঞ্জস্য এবং কোন্ অংশে তাহাদের পার্থক্য। য়ুরোপীয় পণ্ডিত-গণ অনেক বক্তৃতাদ্বারা অনেক বাজে কথার অবতারণা করিয়া ভারতীয় শিল্পের খর্ব্বতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন; অথচ তাঁহারা কোথাও বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই, ভারতীয় শিল্প কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রতীচ্য শিল্পের অনুকারী। আমরা "মর্ম্মবাণী"র পাঠকবর্গের

গৃহাভ্যন্তরের প্রাচীরের শিল্প

নিকটে ওঙ্কারের কয়েকখানি স্থাপত্যের নমুনা প্রদান করিলাম। গ্রীক ও রোমীয় স্থাপত্যের সহিত কোথায় তাহাদের সামঞ্জস্য বর্ত্তমান, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

মৃত্যু-বিহার

(DEATH'S VALLEY)

By Walt Whitman.

তমিস্রের কল্পনায় চিত্ত আর নাই;
তুলি আঁকিয়াছে তারে যাহা চাই লভিবারে
চরণে পরাণ আমি সঁপিয়াছি তাই!

নিবিড় আঁধার-ঘেরা মৃত্যু-মরুভূমি;
তা'রি মাঝে অতি ক্ষীণ মুক্তি আছে হ'য়ে লীন
অন্ধকার চারিদিকে রহিয়াছে চুমি'!

ভেদিয়াছি এই তম, নিশাচর বিহঙ্গম
চিত্ত মোর ঘুরেছিল, আঁধারে পাগল!
ছাড়ায়ে আঁধার-রাশি চক্ষে মোর উঠে ভাসি'
মুক্তির তরুণ আলো, বিমল-উজ্জ্বল!

হেরিয়াছি সেনানীরা আহত ও মৃত;
অসহ্য সহিয়া বুকে; নিজে ডাকিয়াছে দুখে
হাস্যমুখে মরণেরে বরিল জীবিত!

হেরিয়াছি মৃত্যু-রূপ বৃদ্ধ-ভগ্ন-দেহে;
কোমল শিশুর পাশে কেমন মরণ আসে
কাড়ি' লয় নবজন্ম শূন্য করি' গেহে!

ভিষক্ ও পরিজন সেবাদাস-সহ;
কেমনে ধনীর প্রাণ, ছাড়িয়াছে দেহখান্
তা'ও দেখিয়াছি কিন্তু নহে ক' দুর্ব্বহ!

দরিদ্র কাঁথায় থাকি' দীনতায় দুঃখ ঢাকি'
দেখেছি মৃত্যুর মাঝে হয়েছে মগন;
আমারো হৃদয়-তলে, ওরে মৃত্যু! পলে পলে
তোর সাথে মোর কথা হয় আলাপন!

মরণেরি গান আমি রচিয়াছি আজি;
নহে বেদনায়-ভরা শোক-ভারে জীর্ণ করা,
মৃত্যুর বিজয় বাদ্য কর্ণে উঠে বাজি'!

এই যে অরুণ-আলো ধরাতলে নামে;
এই বায়ু সচঞ্চল নাচায় জোয়ার-জল,
সাজিয়াছে ধরাতল পত্র-পুষ্পদামে!

এ'রি মাঝে অমৃতের ধারা ঝরে যায়;
প্রসন্ন দক্ষিণ-পাণি হেরিয়াছি আমি জানি
পরম পিতার সে যে,—নন্দন-বিভায়!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

ভুল

(গল্প)

১

কবি বলিয়া পরেশের বেশ একটা খ্যাতি ছিল। মাসিক পত্রে ও বন্ধুমহলে তাহার প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছিল। অধিকন্তু যখন সে তাহার কবি-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও পর পর চারিটা পাশ করিয়া ফেলিল, তখন আর তাহার ভক্তবৃন্দের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না।

বাড়ীতে বিবাহের কথাবার্ত্তা অনেকদিন হইতেই চলিতেছিল; কিন্তু পড়াশুনার অছিলায় পরেশ এতদিন সেটাকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। আসল কথাটা অবশ্য অন্যরকম। ভাবী স্ত্রীর সম্বন্ধে সে এমন একটা আদর্শ গড়িয়া রাখিয়াছিল যে, তাহার পিতামাতার পছন্দের সহিত তাহার মিল থাকার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। বিশেষতঃ, 'রোমান্স্'-গন্ধবিহীন চিরপুরাতন বিবাহ-প্রথার প্রতি তাহার একটা আন্তরিক বিরাগ ছিল। বিবাহ—সে একটা সামাজিক বন্ধনমাত্র নহে—অন্তরের মিলনের নামই প্রকৃত বিবাহ; কিন্তু যেখানে প্রেমের পূর্ব্বরাগ নাই, বিবাহের পূর্ব্বে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রণয়-সঞ্চারের সুযোগ নাই, সেখানে প্রকৃত বিবাহ একটা অলীক কল্পনামাত্র। সে তাহার কবি-চিত্তের মানস-লোকে যে অপরূপ ধ্যান-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কতক-গুলি চিরাগত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুতেই তাহা সে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। কেমন করিয়া সে তাহার বিকসিত হৃদয়কুঞ্জের বিচিত্র অর্ঘ্যভার একটি সদ্যঃ মাতৃক্রোড়বিচ্ছিন্না ক্ষুদ্রা বালিকার পায়ে নিঃশেষে ছড়াইয়া দিবে!—অসম্ভব এ কল্পনা! তাহার প্রেয়সী—সে এই দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের নিরুপমা বা সুভাষিণী নহে; সে ইন্দুমতীর মত একাধারে 'গৃহিণী সচিবঃ-সখীমিথ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ',—সে কমলপত্রে শ্লোক-রচনশীলা, প্রেমের মাধুর্য্যে রমণীয়া শকুন্তলার মত—সে রোজালিণ্ড্ ও মিরাণ্ডা, ইন্দিরা ও মৃণ্ময়ীর মত রমণীর অপরূপ কল্পনায় পরিকল্পিতা!—কিন্তু সে যে ঠিক কাহার মত, তাহা এ পর্য্যন্ত কখনও পরেশের নিকট সুস্পষ্ট কল্পিত হইয়া উঠে নাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় যখন সে উত্তীর্ণ হইল, তখন আর তাহার পিতামাতা কোনপ্রকার ওজর-আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। পূর্ণবেগে পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। 'মেসে' থাকিয়াও পরেশ গোপনে সকল খবরই পাইতে লাগিল। সম্মুখে পূজার ছুটি; 'ল'-কলেজ বন্ধ হইলেই তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে; বাড়ী গেলে হয় ত আবার কি বিভ্রাটে পড়িতে হইবে; এই সকল ভাবিয়া পরেশ আকুল হইয়া উঠিল। আর কিছু উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বাড়ীতে লিখিল যে, তাহার শরীরটা ক্রমেই খারাপ হইতেছে, ছুটির সময় দিনকয়েক কলি-কাতায় থাকিয়া কয়েকজন ডাক্তারের ব্যবস্থা লইয়া সে বাড়ী যাইবে। বলা বাহুল্য, ইহাতে আপত্তির আদৌ সম্ভাবনা ছিল না। পরেশ মনে করিল, এ কয়দিনে একটা-কিছু উপায় স্থির করিয়া লইবে।

২

একটা মস্ত উপায় জুটিয়া গেল। পরেশের একজন পুরাতন সহপাঠী পশ্চিমে কাজ করে। তাহার নিকট হইতে সে পূজাবকাশ-যাপনের নিমন্ত্রণ পাইল। পরেশ ভাবিল, পরিত্রাণের এ একটা ভারী সুন্দর উপায়। তখনই মা'কে লিখিল যে, ডাক্তারের উপদেশে হাওয়া-পরিবর্ত্তনের জন্য সে পশ্চিমে যাইতেছে, একটু ভাল বোধ করিলেই বাড়ী ফিরিবে।

পরেশের বন্ধু অতুলকৃষ্ণ পশ্চিমের একটা বড়দরের উচ্চ ইংরাজী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার। যথাসম্ভব মোটা মাহিনা ও খানকয়েক স্কুলপাঠ্য পুস্তকের আয়ে সে বেশ সচ্ছল অবস্থাতেই ছিল। পরিবারও ছোট—মা, ছোট ভাই, স্ত্রী ও একটী নবজাত পুত্র।

একদিনের মধ্যেই পরেশ সে পরিবারের সকলের আপনার হইয়া গেল। বঙ্গের বাহিরে এই তাহার প্রথম পদার্পণ। কলিকাতার ধূম ও ধূলি ছাড়িয়া প্রকৃতির স্বভাবসুন্দর দৃশ্যাবলীর মধ্যে তাহার কবিকল্পনা নবজীবন লাভ করিল। একটা পাহাড়ের টিলার উপর অতুলের ছোট 'বাঙ্গলো', চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড়ের ঢেউ, মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে শাদা শাদা বাড়ীগুলি উৎক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জের মতই দেখা যায়।

পরেশ দেখিল যে, তাহার পশ্চিম-আগমনের গৌণ উদ্দেশ্য, অন্ততঃ যে উদ্দেশ্য বন্ধুমহলে প্রচারিত, তাহা এখানে সিদ্ধ হইবার সমূহ সম্ভাবনা। কলিকাতার বন্ধুগণ সকলেই শুনিয়াছিল যে, উদীয়মান্ কবি পরেশচন্দ্র পশ্চিমের নিসর্গ-শোভার মধ্যে কল্পনার খোরাক সংগ্রহ করিয়া একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। দলে দলে বন্ধুরা আসিয়া তাহাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিল এবং ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার সময় কেহ কেহ ভাব-গদ-গদ স্বরে বলিয়াছিল—'যাও কবি! বিশ্বজগৎ তোমাকে আহ্বান করিতেছে; বিশ্বের যশোমাল্যে কণ্ঠ ভূষিত করিয়া ফিরিয়া আইস!'

'বাঙ্গলো'র খোলা বারান্দায় ছোট একখানি টেবিল টানিয়া লইয়া পরেশ যথেষ্ট আড়ম্বরের সহিত কাগজ-কলম লইয়া বসিত। কাব্যখানার নামকরণ পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছিল—'অভিমন্যুবধ মহাকাব্য'। পরেশ স্থির করিয়াছিল, সে এমনই করিয়া সেই বিশ্রুতকীর্ত্তি বীর-বালকের কাহিনী বর্ণনা করিবে যে, এই খেলো প্রেম-কবিতার দিনে তাহা দেশের সাহিত্যে একটা বিরাট্ যুগান্তর আনয়ন করিবে। সে কল্পনাচক্ষে দেখিত, সেদিন অদূর-বর্ত্তী, যখন তাহার অপরূপ যশঃ-প্রভা দেশের বিস্মিত দৃষ্টি ঝলসিত করিয়া দিবে এবং ক্রমে তাহা বিস্তৃত হইয়া সমগ্র জগৎকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে। তারপর তাহার স্তুতিগান, তাহার অভিনন্দন, তাহার সম্বর্দ্ধনার পালা!—বিপুল আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে পরেশ তাহার কল্পনার 'খেই' হারাইয়া ফেলিত।

সম্মুখে একটা উচ্চ ভূমিতে সুন্দর একখানা বাড়ী,—তাহার প্রকাণ্ড বাগান, ফুলে-ফলে-ভরা। পরেশ তাহার কাব্যের প্রথম সর্গের বাণী-বন্দনার জন্য বাছা বাছা শব্দ ঠিক করিতেছিল। শরৎ-প্রভাতের সূর্য্যালোকে চারিদিক ঝলমল করিতেছিল। আকাশ নীল ও উজ্জ্বল; শাল ও মহুয়াগাছের শাখায় নানা-রকমের পাখীর সুধাস্বরে চারিদিক প্লাবিত। পরেশচন্দ্রের বাছাই শব্দগুলি ক্রমাগতই গোলমাল হইয়া যাইতেছিল।

এমন সময়ে হঠাৎ বাগানের ভিতর পরেশের চোখ পড়িল। কয়েকটি যুবতী ও কিশোরী সেখানে বেড়াইতেছিল; সকলেই জুতা-মোজা ও জামা-কাপড়ে সম্পূর্ণ আধুনিক বেশে সজ্জিতা। পরেশ যেন একটা বিদ্যুতের ধাক্কা খাইল! কেমন সহজ গতি-ভঙ্গী, কেমন সুন্দর বেশ-ভূষা! পরেশ দেখিল, শিক্ষার উজ্জ্বলতা যেন তাহাদের চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

মেয়েরা এদিক-ওদিক একটু বেড়াইয়া,রোদ বাড়িয়া উঠিলে ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। যতক্ষণ দেখা গেল, পরেশ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল,যখন আর দেখা গেল না; একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া একটা 'ইজিচেয়ারে' ধপাস্ করিয়া শুইয়া পড়িল।

৩

সেদিন অপরাহ্ণে দুইবন্ধুতে মিলিয়া চা খাইতে খাইতে গল্প-গুজব করিতেছিল। একথা-সেকথার পর পরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ সাম্‌নের বাড়ীটায় কে থাকে হে?"

"ওটা মিষ্টার রায়ের বাড়ী। মিষ্টার রায় এখানকার বড় 'ইঞ্জিনীয়ার'—বেশ ভদ্রলোক। চল না তোমাকে 'ইণ্ট্রডিউস্' করে দিব এখন।"

"উনি কি এখানে সপরিবারে আছেন?"

"হাঁ। তিন তিনটে আইবুড়ো মেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মেয়েরা একটু অতিরিক্ত-রকম 'আলোক' পেয়েছে কিনা! আর ও সকল পাশ-করা মেয়েদের বর মেলাও খুব সহজ নয়।"

পরেশের বুকটা যেন দুরু-দুরু করিয়া উঠিল!

বেলা পড়িয়া আসিলে, সাজগোজ করিয়া দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল। মিষ্টার রায়ের ফটক পার হইয়া ভিতরে ঢুকিতেই দেখিল, খোলা রোয়াকের উপর চৌকী ফেলিয়া মিষ্টার ও মিসেস্ রায় কন্যাদিগকে লইয়া গল্প করিতেছেন। মিষ্টার রায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন,—"আসুন অতুলবাবু!—ওরে দু'খানা চেয়ার দে!"

মেয়ে তিনটি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। অতুল ও পরেশ আসন গ্রহণ করিলে, অতুল পরেশকে মিঃ রায়ের নিকট পরিচিত করিয়া দিল,—"ইনি আমার বন্ধু পরেশচন্দ্র চৌধুরী; গতবছর এম্-এ পাশ করেছেন। এঁর নাম শুনে থাক্‌বেন, ইনি একজন কবি।"

মিষ্টার রায় উঠিয়া সজোরে পরেশের হাত নাড়িয়া দিলেন ও বলিলেন,—"আপনি আস্‌বার অনেকদিন আগেই আপনার নাম এখানে এসে পৌঁছেচে।"—বলিয়া সরল উচ্চহাস্যে বাড়ী মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

মিসেস্ রায়কে পরেশ হাত তুলিয়া নমস্কার করিতেই তিনি প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ত 'মঞ্জরী'র নিয়মিত লেখক? আপনার অনেক কবিতাই আমার মেয়েদের মুখস্থ আছে।"

পরেশের এই প্রথম শিক্ষিতা নারীসান্নিধ্যে আগমন; সুতরাং প্রথম হইতেই সে ভারী একটা সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল। মিসেস্ রায়ের কথায় লজ্জা ও আনন্দে তাহার ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ খরতর হইয়া উঠিল।

মিসেস্ রায় কন্যাদিগকে ডাকিলেন। তাহারা আসিলে, জ্যেষ্ঠা কন্যাকে বলিলেন,—"ইনিই পরেশবাবু, যাঁর কবিতার তোরা এত প্রশংসা করিস্। এঁদের জন্য চা নিয়ে আয় ত মা!"

ছোট-খাট একটি নমস্কার করিয়া সে চলিয়া গেল। তাড়াতাড়িতে পরেশের আর প্রতিনমস্কার করা হইল না।

চা, ফল ও মিষ্টান্ন লইয়া মিসেস্ রায়ের জ্যৈষ্ঠা কন্যা ফিরিয়া আসিল ও বিশেষ নিপুণতাসহকারে সকলকে পরিবেশন করিল। একটা অব্যক্ত সম্ভ্রমে ও আনন্দে পরেশের অন্তর ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাব্যচর্চ্চায় ও নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় রাত্রি হইয়া গেল; মেয়েরাও মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিল। অতুল মিসেস্ রায়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার মেয়েদের গান শেখা কেমন হচ্ছে?"

"আপনার সেই লোকটিকে রাখা অবধি বেশ ভালই হচ্ছে। লোকটি বেশ ওস্তাদ আর খুব ভদ্রলোক। অমি! 'হার্ম্মোনিয়ম'টা নিয়ে এস না।"

অমি ওরফে অমিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম। সে 'হার্ম্মোনিয়ম' লইয়া আসিলে মিঃ রায় ফরমায়েস্ করিলেন,—'তুমি সন্ধ্যার মেঘ।'

অমিয়া গাহিতে লাগিল,—

'তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত, সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,—
মম শূন্য জীবন বিহারী;
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা;
তুমি আমারি, তুমি আমারি!'

গান থামিলে সকলেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। একটু পরে অতুল উঠিয়া বলিল,—"আজ তবে আসি, অনেক রাত হয়ে গেছে।"

মিঃ ও মিসেস্ রায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন। মিসেস্ রায় অতুলকে বলিলেন,—"আপনাকে আর কি বল্‌ব? আপনি ত ঘরের লোক। পরেশবাবু যে কয়দিন থাকেন, মাঝে মাঝে এলে ভারী সুখী হব।"

পরেশ ও অতুল বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল। বাগানের প্রস্ফুটিত কুসুমের সুগন্ধে বাতাস ভরপূর। অতুল একথা-সেকথা বলিতেছিল, পরেশ নিঃশব্দে তাহার অনুগমন করিয়া গৃহে ফিরিল।

৪

পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যেই পরেশ রায়-পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল যে,দিবসের অধিকাংশ সময়ই সে সেখানে কাটাইতে লাগিল। স্বপ্নের মধ্য দিয়া তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

অতুল একদিন হাসিয়া বলিল,—"কি হে, ব্যাপার কি? প্রেমে পড়্‌লে না ত?"—পরেশ একটু হাসিল মাত্র।

অমিয়ার সহিত পরেশের প্রত্যহই কাব্যালোচনা হইত। সে এবার বেথুন কলেজ হইতে এফ্-এ পাশ করিয়াছে, আর কলেজে পড়িবে না। তাহার মেজো বোন কমল ও ছোট ইন্দু স্কুলে পড়ে।

মিসেস্ রায় পরেশকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন সে অনুগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে অমিয়ার পড়া বলিয়া দেয়। পরেশ অতিরিক্ত উৎসাহের সহিত এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিত।

প্রায়ই তর্ক হইত—খণ্ড-কবিতা ও মহাকাব্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া। পরেশ জানা-আজানা, দেশী-অদেশী নানালোকের মতের দোহাই দিয়া মহাকাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে মহোৎসবে

মাতিয়া যাইত। অমিয়া কোন কোনদিন হঠাৎ মাঝখানে বলিয়া ফেলিত,—"আপনি যা'ই বলুন না কেন, অন্ততঃ আমার কথা বল্‌তে পারি, ছোট কবিতাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।"—বেচারা পরেশের চোখা যুক্তিগুলি গোলমাল হইয়া যাইত, আর সে মাঝখানেই 'হাঁ—না—তা ত বটেই' এই রকমের দু'-এক কথা বলিয়া অগত্যা থামিয়া যাইত।

সেদিন তর্ক চলিতেছিল—কাব্যের সহিত কবির সম্পর্ক লইয়া। অপরাহ্ণের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর কখন যে রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। ভৃত্য ঘরে আলো রাখিয়া গেল, পরেশ ও অমিয়া তর্কে এমনই মাতিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা তাহা লক্ষ্যই করিল না। পরেশের দার্শনিক যুক্তিগুলি যখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া একেবারে হাওয়ায় মিশিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল, এমন সময় ইন্দু একটা দম্‌কা হাওয়ার মত প্রবেশ করিয়া একমুহূর্ত্তে সেই হাল্‌কা তর্করাশি ঝড়ের মুখে শুক্‌না পাতার মত নিঃশেষে উড়াইয়া দিল। একেবারে পরেশের কামিজ ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল,—"চলুন চলুন—এক্ষুণি।"

এই অতর্কিত আক্রমণে একটু হতবুদ্ধির মত চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পরেশ বলিল,—"কোথায় যাব? কেন?"

"ছাতে চলুন, ছাতে। দেখুন ত বাইরে কেমন জোচ্ছানা উঠেছে!—আর আপনারা দুজনে বসে কেবলই ছাই-পাঁশ বক্‌ছেন! চল না দিদি, একটা গান গাইবে।"

তর্কক্লান্ত পরেশ ও অমিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল, শরতের পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।—উভয়েই যেন একটা স্বস্তির আরাম অনুভব করিল!

পরেশ, অমিয়া ও ইন্দু ছাতে আসিল। কমল একটু অসুস্থ; মিসেস্ রায় তাহাকে বাহির হইতে নিষেধ করিলেন।

শরতের মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশে তরল জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। চারিপাশে পাহাড়ের পর পাহাড় যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত গুম্ হইয়া পড়িয়াছিল! শুভ্র চন্দ্রালোকে দূরে দূরে ছোট ছোট বাড়ীগুলি পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ—মাঝে মাঝে শেফালিকার গন্ধবাহী মৃদু হাওয়ায় সঙ্গীতের দু'-একটা ক্ষীণ রেশ কোনও সুদূর গৃহ হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল।

একখানা মাদুর বিছাইয়া তাহারা বসিয়াছিল। অমিয়া নীরবে প্রকৃতির অপরূপ সজ্জা বিস্মিত নেত্রে দেখিতেছিল। পরেশ দেখিতেছিল অমিয়াকে।—সে শুভ্র জ্যোৎস্নার নির্ঝরে পরিস্নাত অমিয়ার পরিপূর্ণ যৌবনের সুকুমার লাবণ্য পরেশের চক্ষে একটা স্বপ্নের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাহার আয়ত নয়নদ্বয়ে, নিটোল মুখমণ্ডলে, কল্যাণমণ্ডিত কোমল করপল্লবে স্নিগ্ধ কিরণ-দীপ্তি যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল! মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে অমিয়ার শাড়ীর প্রান্ত উড়িয়া পরেশকে স্পর্শ করিতেছিল, তাহার চুলের মৃদু সুগন্ধ পরেশের সারা চিত্তে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আবেশ ঢালিয়া দিতেছিল!

উভয়কেই নীরব দেখিয়া ইন্দু 'হার্ম্মোনিয়মটা'র উপর যথেচ্ছ হাত চালাইতে লাগিল। জ্বালাতন হইয়া অমিয়া অগত্যা গান আরম্ভ করিল,—

'সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুল-হার,
তুমি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে আমার;
নীল অম্বর চুম্বন-নত,
চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অঞ্চল ঘেরি সঙ্গীত কত গুঞ্জরে শতবার।'—

৫

পরদিন চা খাইয়াই পরেশ মিঃ রায়ের বাড়ীর দিকে ছুটিল। অতুল দুষ্টহাসির সহিত বলিল,—"ভায়া যে একেবারে বেহাল হয়ে পড়্‌লে! বাড়ীতে লিখ্‌ব নাকি?—দরজার আড়ালে ঠুন্ করিয়া একটু চুড়ীর শব্দ ও একটু চাপাহাসির গুঞ্জন শোনা গেল।

পরেশ প্রতিদিনকার মত সরাসর অমিয়ার পড়ার ঘরে যাইয়া প্রবেশ করিল। অমিয়া সেখানে ছিল না। পরেশ অন্যমনে টেবিলের উপরকার বইগুলি উল্টাইতেছিল। হঠাৎ একখানা বই খুলিতেই পাতার ভাঁজে অর্দ্ধেক-লেখা একখানা চিঠির কাগজ পরেশের চক্ষে পড়িল। তাহার উপর চোখ বুলাইতেই একটা অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ও দীপ্তি তাহার চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিল। চিঠিখানি অসম্পূর্ণ, অমিয়ার হস্তাক্ষর; লেখা এইরূপ,—

"প্রাণের পরেশ,

আজ আর তোমাকে কিছু লুকাইব না। যাহা শুনিবার নিমিত্ত অধীর আগ্রহে এতদিন ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছ, আজ মুক্তকণ্ঠে তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিব। নারী-প্রকৃতির স্বাভাবিক লজ্জাদ্বারা আজ আর উন্মুখ অন্তরের পরিপূর্ণ আগ্রহকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব না। যদি এই চিঠি পড়িয়া আমাকে প্রগল্‌ভা মনে কর, তবে ক্ষমা করিও; কিন্তু আমার এই অতর্কিত আত্মপ্রকাশকে দ্বিধার চক্ষে দেখিও না, ইহাই আমার অনুরোধ।

"আজ তবে বলিব—জীবনে এই প্রথমবার মুখে বলিব—আমি তোমাকে ভালবাসি।—সুধু 'ভালবাসি' বলিলে আমার বলা সম্পূর্ণ হয় না,—এমন ভাষা নাই, যাহার দ্বারা আমার অন্তরের কথা তোমাকে বুঝাইতে পারি।"—

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইহাতে চিঠিখানা বুকে চাপিয়া ধরিয়া একটা বিপুল আবেগের উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া বাসায় আসিল।

তাহার মনে হইল, যেন বিশ্বজগৎ একটা আনন্দের প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণ-ধারা, বিহঙ্গকুলের কলসঙ্গীত—সকলই যেন একটা ভবিষ্য কল্পলোকের আনন্দ-নির্দ্দেশ! সে সম্পূর্ণরূপে নিজকে আয়ত্ব করিতে পারিতেছিল না,—অধীরের মত বারান্দায় পায়চারী করিতে লাগিল। আর সঙ্কোচ নাই, আর কুণ্ঠা নাই! এবার সুধুই আনন্দের মহোৎসব—অবাধ, মুক্ত, অন্তহীন! পরেশ স্থির করিল, সেইদিনই সে মিষ্টার রায়কে সব খুলিয়া বলিবে।

সমস্তদিন কল্পনার মায়াপুরী-সৃজনেই অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যার সময় সে বিজয়ী বীরের মত দৃপ্ত পদবিক্ষেপে মিঃ রায়ের বাড়ীর দিকে চলিল। তাহার কবিচিত্ত তখন ভাবের বিচিত্র লীলায় ভরপূর।

অমিয়ার ঘরে পৌঁছিয়া দেখিল, জানালার ধারে চৌকি টানিয়া ম্লান সন্ধ্যালোকে সে কি একখানা বই পড়িতেছে। পরেশের সর্ব্বশরীরে একটা আবেশের হিল্লোল খেলিয়া গেল।

পরেশকে দেখিয়া অমিয়া বই রাখিয়া উঠিল। পরেশ ধীরে ধীরে তাহার নিকটে যাইয়া নীরবে দাঁড়াইল। একমুহূর্ত্ত-কাল নীরব থাকিয়া পরেশ আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল,—

"অমিয়া—অমিয়া! ধন্য করেছ আজ আমাকে! আমি সব বুঝেছি, সব জান্‌তে পেরেছি। আমার আর কিছু বল্‌বার নেই। এস অমিয়া! এই দিন ও রাতের মিলন-মুহূর্ত্ত আমাদের মিলনের প্রথম সাক্ষী থাকুক।"

অমিয়া অবাক্ হইয়া চিত্রার্পিতের মত পরেশের কথাগুলি শুনিতেছিল, হঠাৎ সে চকিতের মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল,—"আপনি এতদূর নীচ, তা জান্‌তুম না। বেরিয়ে যান এ বাড়ী থেকে।" বলিয়াই সে দ্রুতপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরেশের কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, তাহার মনে হইল, যেন সে একটা ঘোরতর দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে! কিসে কি হইল, বুঝিতে না পারিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় শুনিতে পাইল, বাহিরের ঘরে উচ্চকণ্ঠে, উত্তেজিত স্বরে বাদানুবাদ হইতেছে।

বাসায় ফিরিয়া পরেশ দুইহাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ পরেই মিঃ রায়ের বেহারা তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। আশা, আশঙ্কা, লজ্জা ও উদ্বেগের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রদীপের আলোকে দেখিল—মিসেস্ রায়ের চিঠি, তাহারই নামে। মাত্র তিন-চার লাইন লেখা ঃ—

"অমিয়ার সহিত আজ আপনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা আমরা শুনিয়াছি। আপনাকে শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মার্জ্জিত-রুচি মনে করিয়াই আমার মেয়েদের সহিত মিশিতে দিয়াছিলাম। যাহা হউক, ইহার পর আর আমাদের বাড়ী না আসেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।"

চিঠিখানা পড়িয়া পরেশ টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। লজ্জায় ও অনুশোচনায় তাহার যেন মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল! কিন্তু কেমন করিয়া যে কি ঘটিল, তাহা ভাবিতে যাইয়া তাহার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল।

৬

সান্ধ্যভ্রমণ হইতে ফিরিয়া অতুল একখানি 'টেলিগ্রাম'-হস্তে পরেশের ঘরে প্রবেশ করিল। পরেশকে তদবস্থ দেখিয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—"একি, ওরকম করে রয়েছ কেন? কোন অসুখ-বিসুখ হয়নি ত?"

তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া অতুলকে দেখিতেই পরেশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল,—"না, তা' এমন কিছু নয়। এই মথাটা একটু ধরেছিল মাত্র। এখন সেরে গেছে।"

অতুল দূর হইতে 'টেলিগ্রাম'খানা দেখাইয়া বলিল,—"কি খাওয়াবে বল?"

পরেশ ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন, কেন, এতে কি আছে?"

"এতে মিস্ রায়েদের মুণ্ডুপাতের ব্যবস্থা আছে। আহা, বেচারীরা!"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে অতুল 'টেলিগ্রাম'খানা পরেশকে দিল।

পরেশের পিতার 'টেলিগ্রাম'। তিনি লিখিয়াছেন,—"তোমার সম্বন্ধ সুশীলার সহিত সুস্থির হইল। বিবাহ ৪ঠা অগ্রহায়ণ। শীঘ্র আসিবে। আশা করি অবাধ্য হইবে না।"

পরেশ যেন একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল! অতীতের সহস্র-স্মৃতি-বিজড়িত একটি নোলক-পরা ছোট্ট টল্‌টলে মুখ তাহার মনের ভিতর ভাসিয়া উঠিল।

অতুল তাহাকে ঠেলিয়া বলিল,—"কি, চুপ করে রইলে যে? মিস্ অমিয়া রায় Versus শ্রীমতী সুশীলা দেবী—কোন্ পক্ষ জিত্‌ল?"

পরেশ একটু হাসিয়া বলিল,—"আমরা সব শ্রীমান্ কিনা, তাই শ্রীমতীদের একটু পক্ষপাতী। আমি তা হলে কাল ভোরের গাড়ীতেই দেশে ফির্‌ব।"

"কালই? কেন, বিয়ের ত এখন ঢের বাকী।"

"না ভাই, কালই যাব। ছুটিতে দু'চার দিন বাড়ী না থাক্‌লে মা'র মনে কষ্ট হবে।" পরেশ ভাবিতেছিল, কতক্ষণে সে রায়-পরিবারের সান্নিধ্য হইতে দূরে পলায়ন করিতে পারিবে!

অনেক বাদানুবাদ অভিমানাদির পর পরেশের কথাই বজায় রহিল। সমস্ত রাত্রি তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তায়ই কাটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, অমিয়ার এই প্রত্যাখ্যান তাহার অতিরিক্তরকম কল্পনাপ্রবণতার উপযুক্ত শাস্তি। অমিয়ার উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইল। সে তাহাকে নিশ্চয়ই ভালবাসে; নচেৎ ওরকম চিঠি লিখিবার অর্থ কি? কিন্তু সে তাহাকে এরূপ অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস পাইল কি প্রকারে? নিশ্চয়ই সে ভাবিয়াছে যে, পরেশ একেবারে নাচার হইয়া পড়িয়াছে, আবার সাধিতে যাইবেই। এত অহঙ্কার তার! বেশ বেশ, দেখা যাবে! যখন সে শুনিবে যে, পরেশ চলিয়া গিয়াছে এবং অমনই চলিয়া যায় নাই, একেবারে বিবাহ করিতে গিয়াছে, তখন দেখা যাবে, এ অহঙ্কার কোথায় থাকে!

সুশীলার কথা তাহার মনে পড়িল। সে তাহাদেরই প্রতিবেশী রমানাথবাবুর একমাত্র আদরের কন্যা। রমানাথবাবু অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সুশীলাকে তিনি নিজের মনোমত সযত্নে শিক্ষা দিয়াছেন। 'বায়োস্কোপে'র সচল চিত্রের মত পরেশের অতীত পল্লীজীবনের স্মৃতিগুলি, সুশীলার কোমল মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সুন্দরী সে; কিন্তু অমিয়ার মত শিক্ষিতা নয়। সে সরলা গ্রাম্যবালিকা; আর অমিয়া বুদ্ধিমতী ও তাহার চরিত্র সম্পূর্ণ আধুনিকভাবে গঠিত; কিন্তু তবু পরেশের মনে হইতে লাগিল যে, সুশীলার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অমিয়াতে নাই।

এইরূপ ভাবনায় রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে রওনা হইবার পূর্ব্বে পরেশ অমিয়ার চুরি-করা চিঠিখানা একটা লেফাফায় ভরিয়া উপরে তাহার নাম লিখিয়া অতুলকে দিল, বলিল, সে যেন উহা অমিয়াকে দিয়া আসে।

নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অতুল বন্ধুকে বিদায় দিল। তাহার মা চোখের জল ফেলিলেন স্ত্রীও একটু বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

* * * *

বাড়ী পৌঁছিবার দুইদিন পরে পরেশের নামে একটা ছোট 'পার্শেল' ও একখানা চিঠি আসিল। চিঠিখানার খামের উপর মিসেস্ রায়ের হস্তাক্ষর। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা ও ক্ষীণ আশার সহিত পরেশ চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। মিসেস্ রায় লিখিয়াছেন ঃ—

"স্নেহাস্পদেষু,

পরেশবাবু! একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছে। যে চিঠিখানা এই অনর্থ ঘটাইয়াছে, তাহা অমিয়ার ভাবী স্বামী

শ্রীমান্ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা। অনেকদিন যাবৎই উহাদের বিবাহ একরূপ স্থির হইয়া আছে। পরেশ একজন নব্য ব্যারিষ্টার।

"যাহা হউক, ভুল হইয়াছে উভয় পক্ষের। ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা গোলমাল রহিয়াছে, তাহা আমরা কেহই তলাইয়া দেখি নাই। সেদিন আপনাকে চিঠি লেখার জন্য আমি বড়ই লজ্জিত আছি, ক্ষমা করিবেন। যাহা হইবার হইয়াছে—আশা করি এখন সে সব ভুলিয়া যাইবেন। অমিয়া বলিল যে, আপনি তাহাকে ক্ষমা না করা পর্য্যন্ত সে আপনাকে চিঠি লিখিতে সাহস পাইবে না। আপনার নববধূর জন্য যৎসামান্য উপহার পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিবেন। মিঃ রায় আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট আছেন, আপনি ব্যাপারটা তাঁহাকে খুলিয়া লিখিবেন। বড়দিনের সময় যদি একবার সস্ত্রীক এখানে বেড়াইতে আসেন তবে আমরা সকলেই অত্যন্ত সুখী হইব। এজন্য কমল ও ইন্দু আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছে।

"ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আপনার দাম্পত্য-জীবন মধুময় হউক!" ইতি

"শুভাকাঙ্ক্ষিণী
অমিয়ার মাতা।"

এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ব্যাপারটা পরেশের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল। নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া সে যেন লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতে লাগিল! 'পার্শেল'টা খুলিয়া দেখিল, তাহাতে সুদৃশ্য একটি ছোট চামড়ার বাক্সের মধ্যে একটি সুন্দর সোণার 'ব্রুচ্,' সঙ্গে একখণ্ড হলুদ রঙ্গের কাগজ, তাহাতে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা—'শ্রীযুক্তা সুশীলা দেবীকে।—অমিয়া।'

পরেশ যখন চিঠি ও 'পার্শেল' লইয়া তন্ময় হইয়াছিল, তখন এদিকে একটা গোপন ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল। পরেশের বৌদিদি ও দশমবর্ষীয়া ছোট ভগ্নী কোথা হইতে লজ্জাবিনম্রা সুশীলাকে পাকড়াও করিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া হঠাৎ একেবারে পরেশের কোলের উপর ফেলিয়া দিল। সেই মুহূর্ত্তে দরজার আড়াল হইতে একসঙ্গে তিন-চারিটা শাঁখ বাজিয়া উঠিল ও সঙ্গে সঙ্গে বৌদিদি মধুর কলহাস্যে পরেশকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিলেন।

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ

চট্টগ্রামের মুসলমান *

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ।)

চট্টগ্রামের মুসলমানগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই যে আরব বণিকদিগের বা তাঁহাদের সংস্রবে সমাগত আরবদিগের বংশজাত, পূর্ব্ব-প্রবন্ধে আমরা সে কথা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক যে গৌড় হইতেই এখানে আগমন করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা সে কথারও উল্লেখ করিয়াছি। চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশগুলির আদি বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আমাদের উক্তরূপ সিদ্ধান্তের সমীচীনতায় কেহই সন্দিহান হইতে পারিবেন না। সে সকল বিবরণ সংগৃহীত হইলে কেবল চট্টগ্রামের মুসলমানগণেরই ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে, এমন নহে; তাহা দ্বারা চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনেরও বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রাদেশিক ইতিহাস সঙ্কলিত না হইলে কোন দেশের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলা যাইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা চট্টগ্রামের বড় বড় মুসলমান বংশগুলির বিবরণ-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই সব বিবরণের মধ্যে যে অনেকটা কল্পনার লীলা, অতিরঞ্জনের ঘটা ও অসত্যের সংমিশ্রণ আছে, তাহা কিছুতে অস্বীকার করা যায় না। তাহা হইলেও, তন্মধ্যে কতটা সত্য ও কতটা মিথ্যা বিজড়িত রহিয়াছে, এই সুদীর্ঘ স্মরণাতীত কাল পরে তাহা বাছিয়া লইবার উপায় নাই। তথাপি একটা বিষয়ে আমাদের পথ পরিষ্কার প্রতিভাত হইবে অর্থাৎ যাহা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা এই সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতেছি, আর কিছু না হউক, অন্ততঃ তাহা প্রতিপন্ন হইতে কোন বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। আজ আমরা ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত নানুপুর (Nanu[illegible]r) গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ আ[illegible] শাহের বংশের বিবরণ প্রদান করিব।

মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের একতম সহচর মহাত্মা হজরত আবুবকর ছিদ্দিক মক্কা নগরীতে জন্মপরিগ্রহ করেন। হজরতের তিরোধানের পর তিনিই মোস্লেম জগতের খলিফা-পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার একমাত্র পুত্র গাজী আব্দুর রহমান ছিদ্দিকীকে রাখিয়া তিনি অমরধামে প্রস্থান করেন। কথিত আছে, মোহাম্মদ ছিদ্দিকী নামক জনৈক পুরুষ উক্ত গাজী সাহেবেরই বংশে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে আবির্ভূত হন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বীয় অনুচর ও শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে মক্কানগরী পরিত্যাগ করিয়া তিনি ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে গৌড় বা জিন্নত নগরে পদার্পণ করেন। সম্ভবতঃ ধর্ম্মপ্রচারার্থই তিনি ঐখানে আগমন করিয়াছিলেন। এ দেশের উৎকৃষ্ট জলবায়ু ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া ঐস্থানেই স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার অসাধারণ গুণ-গরিমার পরিচয় পাইয়া গৌড়ের তৎকালীন বাদশাহ নবাব মুনায়েম খাঁ বাহাদুরের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। কথিত আছে, উক্ত নবাব মোহাম্মদ ছিদ্দিকীর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ১৫৭- খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ও মহামারিতে গৌড় নগর ধ্বংসমুখে পতিত হইলে, উক্ত ছিদ্দিকী সাহেব সপরিবারে গৌড় নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক চট্টগ্রামে আগমন করিয়া পটীয়া থানার অন্তর্গত সারোয়াতলী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। আবু সৈয়দ তাঁহার একমাত্র পুত্র। আবু সৈয়দের পুত্র শাহ আবু জায়েদ। তাঁহার পুত্র মোহাম্মদ ইমামুল হক ছিদ্দিকী অতিশয় শিক্ষিত ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং নবাব সায়েস্তা খাঁর পীর বা ধর্ম্মগুরু ছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ হইতে তিনি বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি জায়গীর লাভ করিয়াছিলেন।

* "মর্ম্মবাণী"র ১৪শ সংখ্যায় প্রকাশিত এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে অনবধানতাবশতঃ একটা গুরুতর ভ্রম সঙ্ঘটিত হইয়া গিয়াছে। উহার একস্থানে "সোণার গাঁ'র উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা "সোণার গাঁও" না হইয়া "সপ্তগ্রাম বা সাত গাঁও" হইবে। ইতিহাসাভিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীকে তাহা বলিয়া না দিলেও বোধ হয় চলিত। মুদ্রাকর-প্রমাদে আর একস্থলে 'আদমের সমাধি" স্থলে "আমের সমাধি" ছাপা হইয়াছে। লেখক।

শাহ ইমামুল হক ছিদ্দিকীর দুই পুত্র—গরিব উল্লা খাঁ ছিদ্দিকী ও মোহাম্মদ আলি খাঁ ছিদ্দিকী। গরিব উল্লা খাঁর তিন পুত্র—মোহাম্মদ দৌলত, জমসের চৌধুরী এবং আহাম্মদ বক্শ্ চৌধুরী। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গরিব উল্লা খাঁর ১ম পুত্র দৌলত ও ২য় পুত্র জমসের চৌধুরী কোন কার্য্যোপলক্ষে কুমিল্লায় গমন করিয়া তথায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। এদিকে গরিব উল্লা খাঁ ও মোহাম্মদ আলি খাঁর মৃত্যু হয়। শাহ ইমামুল হক ছিদ্দিকী, তাঁহার পৌত্র আহামদ বক্শ্ ও আবদুল নবিকে সঙ্গে লইয়া ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত কেফায়েত নগর ও কৃষ্ণনগর গ্রামে আপনার দানপ্রাপ্ত জমিদারীতে গমন করেন। তাঁহার তথায় থাকিবার ইচ্ছা হওয়ায়, উক্ত গ্রামদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটি ছোট পাহাড়ে তিনি আপন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তথায় সাধন-ভজনে নিরত হইলেন। তদীয় পৌত্রদ্বয়ও তথায় তাঁহার সাহচর্য্যে ও পরিচর্য্যায় রহিয়া গেলেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে শাহ ইমামুল হক পরলোকপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত পাহাড়েই সমাধিস্থ হন।

ইহার কিছুদিন পরে আবদুল নবি ছিদ্দিকীও ফকির হইয়া যান এবং লোক-সমাজে আজগবি শাহ নামে পরিচিত হন। আহামদ বক্শ্ চৌধুরী জমিদারীর শাসন সংরক্ষণ করিতেন। আজগবি শাহ অকৃতদার; সুতরাং নিঃসন্তান ছিলেন। আজগবি শাহ ও আহামদ বক্শ্ চৌধুরী পরলোকগত হইলে, শেষোক্ত চৌধুরীর পুত্র মোহাম্মদ আনওয়ার চৌধুরী সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি শাহ ইমামুল হকের দরগাহ ছাড়িয়া তাঁহার ১০।১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র শাহ মোহাম্মদ চৌধুরীকে সঙ্গে করিয়া নিকটবর্ত্তী নানুপুর গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। শাহ ইমামুল হক ও আজগবি শাহের সমাধি ও মস্‌জিদ্ আজও প্রাগুক্ত পাহাড়ে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মোহাম্মদ আনোয়ারের পুত্র শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী অতি বিজ্ঞ ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর পরিত্যক্ত মস্‌জিদের খয়রাত ও অপর জমিদারী ব্যতীত তিনি নানুপুর গ্রামে আরও অনেক ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মোহাম্মদ শাহের আমলে শাহ ইমামুল হক ও আজগবি শাহের দরগাহ ও মস্‌জিদের জন্য ৯৯নং জিম্মা আজগবি শাহ নামকরণে এক জায়গীর বা খয়রাত প্রদত্ত হয়। শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী উক্ত সম্পত্তির মতোয়াল্লী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মৌলবী দেওয়ানত আলী ছিদ্দিকী মতোয়াল্লী ছিলেন।

এইরূপে শাহ মোহাম্মদ চৌধুরীর বংশধরগণ জায়গীরের উপস্বত্বদ্বারা বহুদিন পর্য্যন্ত বেশ স্বচ্ছল অবস্থায় ছিলেন। কালের কুটিল গতিতে এখন সে সকল সম্পত্তি তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব রেজা খাঁ চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসিয়া বহু জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ চার্‌ল্‌টন সাহেব কেফায়েত নগরে অবস্থিত মহাল আজগবি শাহ-সম্বন্ধে-প্রদত্ত সনদের বৈধতা স্বীকার করেন। আজগবি শাহকে প্রদত্ত জায়গীর-সম্বন্ধে আরও একখানি সনদ লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময়ে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়। উক্ত সনদসমূহ এখন চট্টগ্রামের 'কালেক্টরী'তে সংরক্ষিত আছে।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে নবাব রেজা খাঁ প্রায় সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করিলেও উপযুক্ত রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিয়া তৎসমূহ পুনরায় উক্ত বংশীয়দিগকে প্রদান করিয়াছেন। মৌলবী দেওয়ানত আলীর দুই পুত্র, মৌলবী আমান আলী ও মৌলবী কলিম উল্লার মধ্যে সদ্ভাব না থাকায়, মামলা-মোকদ্দমায় তাঁহারা ঋণজালে বিজড়িত হইয়া পড়েন। তাহাতে মহাল আজগবি শাহ ব্যতীত আর সমস্ত সম্পত্তিই তাঁহাদের অধিকারচ্যুত হইয়া যায়। এই সামান্য সম্পত্তির বার্ষিক আয় হইতেই বর্ত্তমানে উক্ত মস্‌জিদ্ ও সমাধির যাবতীয় ব্যয় ও মালীকদিগের সংসারযাত্রা কোনরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। এই বংশেরই একজন মিঞা আমিনুর রহমান ছিদ্দিকী সাহেব এখন চট্টগ্রাম সদর মুন্‌সেফী আদালতের সেরেস্তাদার। তাঁহার ভ্রাতা মৌলবী মফজ্জলর রহমান সব্‌রেজিষ্টার-পদে এবং মৌলবী হাফিজুর রহমান ছিদ্দিকী সাহেব হাটহাজারী থানার কাজীর পদে নিযুক্ত আছেন। নিম্নে ইহাঁদের বংশ-তালিকা প্রদত্ত হইল।

আবদুল করিম

মোহাম্মদ ছিদ্দিকী
- শাহ আবু ছৈয়দ
  - শাহ আবু জায়েদ
    - শাহ ইমামুল হক
      - গরিব উল্লা খাঁ
        - মোহাম্মদ দৌলত চৌধুরী — ইহাঁর বংশ কুমিল্লা বটগ্রাম প্রকাশ শুয়াগাজি গ্রামে বিদ্যমান আছে। মৌলবী তপজ্জল আহামদ চৌধুরী ওরফে আনু মিঞা সাহেব বর্ত্তমানে বিখ্যাত জমিদার।
        - মোহাম্মদ জমসের চৌধুরী — ইহাঁর বংশ কুমিল্লা বাশগাট্টা গ্রামে বর্ত্তমান আছে।
        - আহামদ বক্শ্ চৌধুরী
          - মোহাম্মদ আনওয়ার চৌধুরী
            - শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী
              - মৌলবী দেওয়ানত আলী (জজের উকীল ছিলেন)
                - মৌলবী আমান উল্লা
                  - মুন্সী আহামদ রহমান
                  - মৌলবী হাফিজুর রহমান
                  - মুন্সী মখলেছর রহমান
                - মৌলবী কলিম উল্লা (মুন্সেফীর উকীল ছিলেন)
                  - মিঞা আমিনুর রহমান (সেরেস্তাদার)
                  - মুন্সী আজিজর রহমান
                  - মৌলবী মফজ্জলুর রহমান (সব্‌রেজিষ্টার)
      - মোহাম্মদ আলি খাঁ
        - আবদুল নবি ওরফে আজগবি শাহ

চিরবন্দী

চিরবন্দী শ্যাম,
আজ কোথা গোষ্ঠযাত্রা, কোথা ব্রজধাম?
ধরা দিলে একদিন মুঢ় গোপ-গোপীগণ মাঝে,
বন্দী হ'লে বৃন্দাবনে মন'চোরা ননীচোরা সাজে
নিলর্জ্জ কপট চৌর বারবার একই অপরাধ,
সাধ করে' দোষী সাজা; কহি তারে কেমনে প্রমাদ?
র'লে চিত্ত-কারাগারে সেই হ'তে তুমি অবিরাম;
চিরবন্দী হ'য়ে আছ শ্যাম!

শতেক বাঁধন,
সেই হ'তে আর তব নাহি পলায়ন।
রাখালেরা ফুল-হারে গোপগণ উত্তরীয়-বাসে,
মা যশোদা উদুখলে—গোপগণ বাহু-বল্লী-পাশে,
বাঁধিল শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীলতায়,
বন্দী তুমি পত্রে-পুষ্পে, জলে-স্থলে, যথায়-তথায়,
চোখে-চোখে, বুকে-বুকে আছ বাঁধা হে নন্দ-নন্দন!
লভি বন্ধু শতেক বন্ধন।

শ্রীকালিদাস রায়

বিবাহ-বিপ্লব

(নক্‌সা)

ক

নিমাই খুড়ো 'ওস্তাদ' উপাধি যে কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, সে ইতিহাস কেহ রাখে না; তবে, যখনই কেহ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিত, তখনই তিনি গালভরা হাসিয়া উত্তর দিতেন, "আমার নাম ওস্তাদ শ্রীনিমাইচরণ রায়, আপনার দাসানুদাস।"

তাঁহার ওস্তাদীর প্রধান উপকরণ ছিল, একটি তাম্‌পুরা। যন্ত্রটির 'মান্‌কা' ভাঙ্গিয়া আধ্‌খানা হইয়া আছে, 'মুদারা খরজে'র তারটি নাই, 'সোয়ারি'গুলি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে এবং 'তুম্বী'র উপরে ইঁদুরের উপদ্রবে ছোট-বড় অনেকগুলি ছেঁদা হইয়াছে। তাম্‌পুরার ভিতরে সপরিবারে পরম সুখে আর্স্‌লারা বাসা বাঁধিয়া নিরাপদে ঘর-কন্না করিত। রোজ সকালে কাক-চিল ডাকিবার আগেই নিমাই খুড়ো তম্বুরার 'তব্‌লি'তে তাল রাখিতে রাখিতে 'সা, রে, গা, মা,—মা, গা, রে, সা' বলিয়া দু-চোখ বুজিয়া প্রাণপণে হাঁ করিয়া গলা সাধিতে বসিতেন এবং সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-শ্রবণে আর্স্‌লাদের নিদ্রাভঙ্গ হইত; তাহারা পালে পালে শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে বাহিরে আসিয়া তাম্‌পুরার গা-ময় 'মর্ণিং ওয়াক্' করিয়া বেড়াইত।

নিমাই খুড়োর সঙ্গীত-পটুতা পাড়ার ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সবারই জানা ছিল। কথিত আছে, 'একদা বর্ষাকালে নিমাই খুড়োর শ্রোতাদের ভিতরে মুড়ি ও ফুলুরি খাইতে খাইতে তর্ক সুরু হইয়াছিল যে, ওস্তাদ-জী মেঘমল্লার গায়িতে পারেন কি না। তর্ক শুনিয়া খুড়ো সবজান্তার মত ঈষৎ হাসিয়া এবং ঈষৎ কাসিয়া তখনই তাম্‌পুরা লইয়া বসিয়া গেলেন। মেঘমল্লারের অপূর্ব্ব মহিমায় খুড়োর গায়ে দর-দর ধারে ঘর্ম্ম ঝরিয়া তাঁহার লোল চর্ম্ম সিক্ত করিতে লাগিল। অবশেষে গান শেষ হইলে, খুড়ো যখন তাম্‌পুরা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন- শুন্‌লে ত?"—তখন তাঁহার একজন মুখর ভক্ত করযোড়ে নিবেদন করিল, "কিন্তু ওস্তাদ-জী, কই আকাশে বৃষ্টি হল না ত?"

খুড়ো মুরুব্বিয়ানা চালে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হবে বাবা, হবে। কি—ন বিদ্যেং সঙ্গীতং পরং—কিনা, গানের মত বিদ্যে পরে আর হবে না—বল্‌ব কি, লাখ্‌টাকার কথা! দাঁড়াও, পৃথিবীতে বসে গান গাচ্চি,—সুরটাকে আগে আকাশে গিয়ে পৌছতে দাও, পৃথিবী থেকে আকাশ ত দু-চার মিনিটের—বল্‌ব কি—পথ নয়! আমি গাইলাম মেঘমল্লার—বৃষ্টি হবে না?—বল্‌ব কি—আলবৎ হবে।"

কথাগুলো খুব জোরের সঙ্গেই খুড়ো বলিলেন বটে, কিন্তু শ্রোতাদের মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, খুড়োর কথায় মনের ভিতর হইতে তাঁরা তেমন জোর পাইলেন না। খুড়ো মনে মনে চটিলেন; কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না।

বর্ষাকাল। শেষরাতে একপশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। পাড়ার গঙ্গাধর ভট্টাচায্যি পাশ ফিরিয়া শুইয়া আফিংএর ঘোরে বোধ করি পরমানন্দে স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ সদর দরজার কড়া ঘন ঘন নড়িতে লাগিল। ভট্টাচায্যির নেশা ও ঘুম যুগপৎ চটিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া তিনি আপন মনে বলিলেন, "এত রাতে কোন্ 'শা—'আবার জ্বালাতন কর্‌তে এল রে? 'শা—'রা জানে না যে, নেশা কর্‌তে যথেষ্ট পয়সা খরচ হয়!"

রাস্তা হইতে ডাক আসিল, "ও ভট্‌চায্যি, বাড়ী আছ হে?"

ভট্। (স্বগতঃ—চটিয়া) বাড়ী থাক্‌ব না ত, এত রাতে থাক্‌ব কোথায়? নেশা করি আর যাই করি, চরিত্তির বাবা ঠিক্ রেখেছি—হুঁ-হুঁ, সে দিকে ভট্‌চায্ সেয়ানা ছেলে!"

আগন্তুক। ভট্‌চায্—ও ভট্‌চায্!

ভট্। কে হে?

আগ। আমি খুড়ো।

ভট্। (তাড়াতাড়ি জানালায় মুখ বাড়াইয়া) খুড়ো! ব্যাপার কি? এত রাতে, এই বৃষ্টিতে!

খুড়ো। বল্‌ব কি,—আর চাই?

ভট্। কি?

খুড়ো। বাদ্‌লা ?—মেঘমল্লারের—বল্‌ব কি—ফল দেখ্‌চ ত ?

গঙ্গাধর ভট্‌চায্যি এতক্ষণে ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিলেন। তিনি কি উত্তর দিবেন ভাবিতে লাগিলেন। খুড়ো কিন্তু তাঁহার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন না, হন্ হন্ করিয়া পাশের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে গিয়া আবার কড়া নাড়িতে নাড়িতে চীৎকার করিলেন, "ওহে, জল্‌-টল্ আর চাই নাকি ?"

পরদিন শুনা গেল, গত রাত্রে খুড়োর চীৎকারে পাড়ার সকল-কার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল।

খ

মাস-ছয় হইল, খুড়োর ঘর অন্ধকার করিয়া তাঁহার তৃতীয় পত্নী পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রতি-রাত্রে ঘুমাইবার আগে অত্যন্ত দুঃখিত-ভাবে একবার করিয়া তিনি বেহাগ-রাগিণীর আলাপ করিতেন। যখন যাহার সঙ্গে দেখা হইত, তাহাকেই বলিতেন, "তিন-তিনবার সংসার পাত্‌লাম, হায় হায়—বল্‌ব কি—তবু বংশরক্ষা হল না !"

খুড়োর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর হইয়াছে। দাঁতগুলি প্রায় পড়িয়া গিয়াছে—দেহখানি এমনই বাঁকা যে, তাঁহার পায়ে ও মাথায় যদি কেহ ছিলা বাঁধিয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই চমৎকার জীবন্ত ধনুকে পরিণত হন।

হঠাৎ পাড়ায় জনরব শোনা গেল, বংশরক্ষার জন্য খুড়ো আবার বিবাহ করিবেন। একটু কৌতূহলী হইয়া খুড়োর বাড়ীর দিকে গুটি-গুটি চলিলাম।

তাঁহার বাড়ীতে গিয়া শুনিলাম, আজ খুড়োর আশীর্ব্বাদ।

বাহিরের ঘরে তিনজন লোক বসিয়া রহিয়াছেন, চেহারা দেখিয়াই আন্দাজ করিলাম, তাঁহাদের একজন পুরোহিত, একজন ঘটক ও আর একজন কন্যাপক্ষের অভিভাবক।

অল্পক্ষণ পরেই পাড়ার দুটি বৃদ্ধের সঙ্গে দ্বারপথে খুড়োর মূর্ত্তি দেখা গেল। খুড়োর দিকে তাকাইয়া আমি একেবারে 'থ' হইয়া গেলাম।

খুড়োর শাদা চুল কলপের মহিমায় কুচ্‌কুচে কালো হইয়া উঠিয়াছে। মাথার মাঝখানে লম্বা টেড়ি। দুই কাণে দুইটী আতর-মাথানো তুলার দুটি গোঁজা। মুখে পাউডার। পাণে কি আল্‌তায়—ভগবান্ জানেন,—ঠোঁটদুটী তাঁর রাঙ্গা টুক্‌টুকে। খুড়ো যখন হাসিতেছেন, তখন তাঁর ঠোঁটের ফাঁক্ দিয়া পরিষ্কার দুই সারি দাঁত দেখা যাইতেছে ; বুঝিলাম, খুড়ো দাঁত বাঁধাইয়া-ছেন। তাঁহার গায়ে একটি ডোরা-কাটা রঙ্গিল পিরাণ—তার উপর কোঁচান' কালাপেড়ে চাদর। পরণেও একখানি চওড়া কালাপেড়ে কাপড়। ডান হাতে একখানি সিল্কের রুমাল ঝুলি-তেছে। পায়ে রাঙ্গা রঙ্গের 'ফুল'মোজা ও বেগুণি ভেল্‌ভেটের পম্প্‌-সু।

খুড়ো দরজার কাছ থেকেই সাম্‌নে হেঁট হইয়া সাতিশয় বিনয়ের সহিত প্রণাম করিতে করিতে আসিয়া বসিলেন ;—ফলে, তাঁহার বাঁকা দেহ আগন্তুকদের চোখে ঠেকিল না।

নিরাপদে আশীর্ব্বাদ [illegible] গেল।

সকলে চলিয়া গেলে পর আমি খুড়োর কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিলাম, "তারপর, খুড়ো !"

খুড়ো বলিলেন, কি জান নিমাই, বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে আমার আদোপেই ছিল না ; তবে বংশটা—বল্‌ব কি—লোপ পেয়ে যাবে, সেই জন্যেই—"

"তোমার বিয়ে করা ! তা বুঝেচি। একখানা ভৈরবী গাও ত খুড়ো !"

খুড়ো হাসিমুখে তামপুরা লইয়া বসিলেন।

গ

মণিরামপুরের কাছে খুড়োর শ্বশুরবাড়ী। আজ রাত্রির লগ্নে বিবাহ। আমরা বরযাত্রী।

বৈকালে খুড়োকে লইয়া আমরা ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশন-সুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া বরের দিকে চাহিয়া রহিল। খুড়োর কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই ; তিনি হাসি-হাসি মুখে সোজা ট্রেণে গিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওরে গদা, আমার তাম্‌পুরোটা দে ত !"

গদা তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা তামপুরাটি খুড়োর হাতে তুলিয়া দিল। বাসর-ঘরে গান গাহিবেন বলিয়া খুড়ো তামপুরাটী সঙ্গে লইয়াছেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গঙ্গাধর ভট্‌চায্ বলিলেন, "তোমার বউকে দেখেচ খুড়ো ?"

গদ্‌গদ কণ্ঠে খুড়ো বলিলেন, "দেখিনি বটে, কিন্তু শুনেছি নাকি পরমাসুন্দরী ! ঘটক ত বল্‌লে, একেবারে ডানাকাটা পরী,—রংটি কেবল একটু কালো।"

ভট্‌চায্ মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "পরীটীর বাপ কি করেন খুড়ো ?"

খুড়ো বলিলেন, "আমার শ্বশুরের কথা বল্‌চ বুঝি ? আহা, তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন ! শাশুড়ী-ঠাক্‌রোণ কন্যাদায়ে পড়ে—বল্‌ব কি—আহার-নিদ্রা একরকম ভুলে গিয়েছিলেন বল্‌লেই হয়, আমি না হলে এ গরীব বিধবার আর উপায় ছিল না। বুঝেছ ভট্‌চায্ ! পয়সা-কড়ির লোভে আমি এ বিবাহ কর্‌ছি না—এ সুধু পরোপকার করা, পরোপকার !"

ভট্‌চায্ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই এ বাজারে কন্যাপণ না নিয়ে বিবাহ করা পরোপকার নয় ত নিজের উপকার নাকি ? তা খুড়ো, মেয়েটির বয়স কত ?"

—"কি জান, বয়স একটু হয়েছে। বছর ষোল সতের—বল্‌ব কি—হয়েছে !—ওরে গদা, এসেন্সের শিশিটা নিয়েছিস ত ?"

গদাই পোট্‌লা-পুট্‌লি খুঁজিয়া বলিল, "কৈ, না ত !"

খুড়ো চোক কপালে তুলিয়া বলিলেন, "না ত কি রে বেটা ! রাত্তিরে আমি মাখ্‌ব কি ? অ্যাঁ—বল্‌ব কি—"

খুড়োর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

গদাই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

খুড়ো ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "হায় হায়, মুখ্যু বেটা, বেয়াকুব বেটা, আমার—বল্‌ব কি—সর্ব্বনাশ কর্‌লে দেখ্‌চি ! অমন দামী এসেন্সটা—গাঁট থেকে কর্‌করে ছ-গণ্ডা পয়সা বার করে কেনা গেল,—(বলিতে বলিতে খুড়ো হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন) —হারামজাদা বেটা ! আজ তোকে গাড়ী থেকে ঝুপ্ করে—বল্‌ব কি—ফেলে দেবই দেব !"

গদাই কাঁদিতে কাঁদিতে কামরার এককোণে সরিয়া গিয়া বলিল,—"এঁজ্ঞে, তা হলে মরে যাব কর্ত্তা !"

আমরা অনেক কষ্টে খুড়োকে আবার ঠাণ্ডা করিলাম।

খুড়ো গজ্‌রাইতে গজ্‌রাইতে খানিকক্ষণ বসিয়া বসিয়া তামাক টানিলেন। তাহার পর বলিলেন, "গাড়ীখানা চল্‌চে যেন গরুর গাড়ী ! ঠিক সময়ে পৌঁছুতে না পারলে আবার লগ্নভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এই গদা—পাজী বেটা ! আমার সুমুখ থেকে তুই সরে যা বল্‌চি ! তোকে দেখ্‌লেও—বল্‌ব কি—আমার ভয়ানক রাগ হচ্চে ! হায়, হায়, ছ-ছ-আনা পয়সা দিয়ে কেনা,—অমন দামী এসেন্সটা !"

ঘ

যথাসময়ে বিবাহ-বাড়ীতে গিয়া হাজির হইলাম।

খুড়োর শ্বশুরবাড়ীটি পাকা বটে, কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের ভিতরে বোধ হয় তাহা আর মেরামত করা হয় নাই। তার একদিকটা পড়িয়া গিয়াছে, আর একদিকও পড়-পড়।

গাঁ-সুদ্ধ লোক বর দেখিতে ছুটিয়া আসিল—কিন্তু বর দেখিয়া সকলে রীতিমত হতভম্ব হইয়া গেল।

স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যে যে-সকল চোখা-চোখা সমালোচনা করিতে লাগিল, তাহা শিষ্টও নয়, মিষ্টও নয়।

একজন বলিল, "আ ম'ল, এরা কি এটা মড়া-পোড়ানো ঘাট পেয়েছে যে, এই বাহাত্তুরে মিন্সেকে কাঁধে করে এখানে এনেছে !"

আর একজন বলিল, "মরি, মরি ! বর নয় ত নটবর ! আহা, খোকা-বরের মুখ দেখেচ গা—মুখ দেখ্‌লে যেন 'নুড়ো' জেলে দিতে সাধ যায় !"

আর একজন বলিল, "মরে যাই, কাঁলাচাঁদের আবার সখ্‌টুক্ আছে ষোল-আনা ! গালে আবার আল্‌তা মেখেচেন—অমাবস্যায় চাঁদের আলো, রূপ যেন ফেটে পড়্‌চে !"

এই সব অপ্রত্যাশিত সমালোচনা শুনিয়া খুড়ো দস্তুরমত চমকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমাদেরও কেমন লজ্জা-বোধ হইতে লাগিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে হঠাৎ এক স্ত্রী-কণ্ঠের বিষম চীৎকার উঠিল। কে চেঁচাইয়া বলিতেছে, "হ্যাঁরে মুকুন্দ, তুই কি একে-বারে চোখের মাথা খেয়েছিস ? এই ঘাটের মড়াটাকে কি বলে তুই আশীর্ব্বাদ করে এলি ?"

তথাকথিত চক্ষু-মস্তক-ভক্ষণকারী ভয়ে ভয়ে কি উত্তর দিল আমরা শুনিতে পাইলাম না ; কিন্তু তাহার উত্তর শুনিয়া স্ত্রীলোকটি একেবারে তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "হ্যাঁরে পোড়ারমুখো, হ্যাঁ ! গরীব হয়েছি বলে মেয়ের গলায় দড়ী-কলসী বেঁধে জলে ফেলে দেব,—না ?"

এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, স্ত্রীলোকটি হইতেছেন আমাদের খুড়োরই হবু-শ্বাশুড়ী, আর যাঁহার উপরে এতটা 'তম্বী' করা হইতেছে, তিনিই সেদিন খুড়োকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে গিয়াছিলেন।

বিবাহের আরম্ভটা বড় আশাপ্রদ ও উজ্জ্বল বলিয়া মনে হইল না। খুড়োর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তিনিও যেন একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া পড়িয়াছেন।

* * * *

খুড়ো বাসর-ঘরে গিয়াছেন।

সে রাত্রে কলিকাতায় ফেরা অসম্ভব বলিয়া আমরা সকলে বৈঠকখানার এক কোণে গিয়া শুইয়া পড়িলাম ; কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে ? আমাদিগকে স্তব্ধ হইতে দেখিয়া ব্যাঙ্গ ও মশার দল এমনই উৎসাহের সহিত ভেঁপু ও বেহালা বাজাইতে সুরু করিল যে, সে রাত আর নিদ্রাদেবীর আরাধনা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হইল। এক-একটা ব্যাঙ্গ্ আবার এতদূর মানুষ-ঘেঁসা যে, আমাদের গায়ের উপরে অনায়াসে অসঙ্কোচে লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিতে লাগিল। অনেক রাতে, অনেক কষ্টে, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের নাকের ডগায় উপবিষ্ট একটি সঙ্গীতপটু কোলা ব্যাঙ্গকে স্তিমিত নেত্রে দেখিতে দেখিতে আমি ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঙ

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, ব্যাঙ্গের রাজা খুড়োকে তাঁহার ওস্তাদের পদে বরণ করিয়াছেন। তাঁহার দরবারে উর্দ্ধমুখ অসংখ্য ব্যাঙ্গ, ব্যাঙ্গ-বউ (ব্যাঙ্গরা স্ত্রী-স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী), ও ব্যাঙ্গাচিদের মাঝখানে বসিয়া, কাঁধে ভাঙ্গা তামপুরাটি লইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে খুড়ো বলিতেছেন, ব্যাঙ্গের ডাক্‌ই ত হল আসল—বল্‌ব কি—ধ্রুপদের সুর। গলা থেকে অমন আওয়াজ বার কর্‌তে পারে কটা গাইয়ে, মহারাজ ?"

ব্যাঙ্গ-মহারাজ কিন্তু খুড়োর কথা শুনিতেছিলেন না। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুড়োর তাম্‌-পুরাটি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

তিনি ডাকিলেন, "ওস্তাদ-জী !"

খুড়ো যোড়হাতে বলিলেন, "হুকুম করুন মহারাজ !"

"তোমার কাঁধে ওটা কি ?"

"তাম্‌পুরো হুজুর !"

"ওটি আমাকে ভাড়া দিতে হবে—ওর ভেতরে আমি আমার প্রাসাদ তৈরি কর্‌ব।"

মনে মনে প্রমাদ গণিয়া খুড়া কহিলেন, "আজ্ঞে মহারাজ, এটি যে আগে থাক্‌তেই—বল্‌ব কি—ভাড়া হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেছে ! ভাড়া নিলে কে ?"

—"আজ্ঞে, আরসুলারা।"

—"বেটাদের উঠিয়ে দাও।"

—"আজ্ঞে, আরসুলাদের সঙ্গে—বল্‌ব কি—এগ্রিমেণ্টো হয়ে গেছে যে !"

—"এগ্রিমেণ্টো আবার কি ? জোর যার মুল্লুক তার।"

খুড়ো ক্ষীণস্বরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।—আমার গা ধরিয়া কে ঘন ঘন নাড়া দিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া দেখি, খুড়োর চাকর গদাই।

"কিরে গদা ?"

গদাই কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "বাবুর বউ বাসর থেকে কখন্ উঠে পালিয়ে গেছে।"

"বউ পালিয়েছে কি রে বেটা !"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ ! কনের মা বাবুকে ধরে ঝাঁটা মার্‌ছে, বাবুও বোধ হয় এতক্ষণে চম্পট্ দিয়েছে।"

আমি হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলাম। হঠাৎ বাহিরে বিষম

গোলোযোগ শুনা গেল—কাহারা চেঁচাইয়া বলিতেছে, "ওরে লাঠি-সোঁটা যা-কিছু আছে, নিয়ে চট্‌পট্ চলে আয়। বরযাত্রী-গুলোকে মেরে-ধরে হাড়্‌গোড়্ সব গুঁড়ো করে দিতে হবে।

এ রকম বেয়াড়া কথা শুনিলে কোন ভদ্রলোকই স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না,—আমিও তড়াক্ করিয়া এক লাফে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য তখনও গভীর-ভাবে নিদ্রিত এবং তাঁহার নাকের উপরে তখনও সেই কোলা ব্যাঙটি চিত্রার্পিতের মত বসিয়া বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া একমনে নাসা-গর্জ্জন শ্রবণ করিতেছে।

ভট্‌চায্‌কে অনেক কষ্টে জাগাইয়া সংক্ষেপে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। ভট্‌চাযের ঘুমের ও আফিমের নেশা আশ্চর্য্যরূপে এক লহমায় ছুটিয়া গেল। তিনি তখনই "আঁ" বলিয়া সুদীর্ঘস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ভয়ে তাঁহার কাচা ও কোঁচা দুই-ই খুলিয়া গেল; কিন্তু সেই অবস্থাতেই তিনি চক্ষু না পালটিতে ভোজবাজীর মত ঘরের ভিতর হইতে এক দৌড়ে অদৃশ্য হইলেন।

আমি ডাকিলাম, "ভট্‌চায্, তোমার জুতো হে, জুতো!"

ভট্‌চায্ পলাইতে পলাইতে বলিলেন, "প্রাণ থাক্‌লে ঢের জুতো হবে!"

অগত্যা আমি ভট্‌চাযের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলাম। গদাই ও অন্যান্য সকলে আগেই চম্পট্ দিয়াছিল।

বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় শুনিলাম, খুড়োর শাশুড়ী চীৎকার করিতেছেন, "ওরে, মিন্সেগুলো পালায় যে! হতভাগারা এমন বর নিয়ে এসেচে যে, ভয়ে আমার পেটের মেয়ে কোথা পালাল! আয়—আয়—শীগ্‌গির আয়, ধরে আন্ সবগুলোকে, আমি নিজের হাতে ঝাঁটাপেটা কর্‌ব—তবে আমার রাগ যাবে।"

পিছনে দ্রুত পদধ্বনি শুনিলাম এবং আমিও আমার পদ-যুগলকে যথাসাধ্য দ্রুততর বেগে চালাইয়া দিলাম।

বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ভট্‌চায্ যে কোন্‌দিকে মরিয়া হইয়া দৌড় মারিয়াছে, কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না। স্থূলকায় ভট্‌চাযের যে রকম আজানুলম্বিত দোদুল্যমান কুমড়ার মত ভুঁড়ি, তাহাতে সে যে অমন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটিতে পারে, আগে আমার সে খেয়াল আদোপেই ছিল না।

অন্ধকারে গাছে গাছে ধাক্কা, ইঁট-পাট্‌কেলের ঠোক্কর এবং খানা-ডোবায় হোঁচট্ খাইয়া, একপাটি জুতা ও চশ্‌মাখানা হারাইয়া কোন গতিকে গ্রাম পার হইয়া মাঠের উপর আসিয়া পড়িলাম। হতভাগারা গাঁয়ের শেষ পর্য্যন্ত আমার পিছনে পিছনে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল।

মাঠের উপরে বসিয়া আগে খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়িয়া লইলাম। তখন অগ্রহায়ণের শেষ—কন্‌কনে শীত পড়িয়াছে। তাহার উপরে শেষরাত, খোলা মাঠ আর ঠাণ্ডা হাওয়া। আমার সর্ব্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল,—দাঁতে দাঁত লগিয়া যায় আর কি! দুঃখের উপর দুঃখ,—আলোয়ানখানাও বিয়ে-বাড়ীতে ফেলিয়া আসিয়াছি। খুড়োর উপর ভয়ানক রাগ হইল; কিন্তু মনের রাগ মনেই চাপিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

মাঠের ওপারে—অনেক তফাতে, গোটাকতক আলো চোখে পড়িল। বুঝিলাম, ষ্টেশনের আলো। সেই আলো লক্ষ্য করিয়া হাড়্‌ভাঙ্গা লাঠি এড়াইয়া ও হাড়্‌ভাঙ্গা শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে চলিতে লাগিলাম। আমার দু-ধারে জলভরা ধানের ক্ষেত,—মাঝখানে আল।

কিন্তু বিষের গেলাস বুঝি এখনও ভর্‌তি হয় নাই!—পায়ের কাছে হঠাৎ সাপের মত কি একটা ফোঁস্ করিয়া উঠিল! ভয়ে আঁৎকাইয়া দিলাম এক লাফ—পড়িলাম একেবারে জলের ভিতরে! উঃ! সে যে কি-রকম বিপরীত আরাম, ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝিবেন না।

বিপদের উপরে বিপদ! জলের ভিতরে আমি পড়িতে আর একটা কি প্রকাণ্ড জানোয়ার ঝপ্‌ঝপ্ করিয়া তফাতে সরিয়া গেল। ও বাবা, বাঘ নাকি? ডাঙ্গায় সাপ, জলে বাঘ—যাব কোথা! আমার দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল, প্রাণের মায়া একেবারে ছাড়িয়া দিলাম।

প্রাণ ত গিয়াছেই! তবু একবার শেষ চেষ্টা করা যাক্! জানোয়ারটাকে ভয় দেখাইবার জন্য যতটা বিকট স্বরে পারা যায়—চীৎকার করিয়া উঠিলাম।

উত্তরে শুনিলাম, "আও না, আও! কাছে এসেচ কি টুঁটি চেপে ধরেছি—খবর্দ্দার! আমার গায়ে ভয়ানক জোর—জলে চুবিয়ে মার্‌ব, চুবিয়ে মার্‌ব।"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "কেও, ভট্‌চায্ নাকি?"

ভট্‌চায্‌ও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কে—তুমি?"

"ব্যাপার কি ভট্‌চায্?"

"গুরুতর। ছুট্‌তে ছুট্‌তে পতন।"

"চ্যাচাচ্ছিলে কেন?"

"ভয়ে দাদা, ভয়ে। তুমিও ত চ্যাঁচানোতে কম যাও না!"

"আমি ঠাউরেছিলাম, তুমি বাঘ।"

"আর আমি ভেবেছিলাম তুমি খুড়োর শ্বশুরবাড়ীর কেউ। আমাকে ধর্‌তে তুমি জলে নেমেছ। তাই নিজে ভয় পেয়েও তোমাকে ভয় দেখাচ্ছিলাম।

—"বোঝা গেছে ভট্‌চায্, বোঝা গেছে। আমরা দুজনে একই কারণে চেঁচাচ্ছিলাম। উপায় না থাক্‌লে কাপুরুষও সাহসী হয়। এখন ওঠ। ষ্টেশনে গিয়ে বসে থাকা যাক্ গে।"

৮

কলিকাতায় আসিয়া, বৈকালে খুড়োর দেখা পাইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খুড়ো, বউ দেখাবে না?"

খুড়ো হতাশভাবে বলিলেন, "মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা—বল্‌ব কি—আর দিও না। খাণ্ডারণীর হাতে পড়ে আর একটু হলেই প্রাণটা গিয়েছিল আর কি!"

"বউ পালাল কেন খুড়ো?"

খুড়ো অধোবদনে বলিলেন, "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—বল্‌ব কি—আর দিও না। গেলুম বিয়ে কর্‌তে, ফিরে এলুম ঝাঁটা খেয়ে। হায়, হায়, বংশটা আর রইল না দেখ্‌চি! কপাল দাদা, কপাল!"

আমি বলিলাম, "কেন খুড়ো, ভাব্‌চ কেন, এবার আমি নিজে তোমার জন্যে মেয়ে দেখ্‌ব। তবে, তোমার বিয়েতে আর বরযাত্রী হতে পার্‌ব না খুড়ো!"

—"মাপ কর বাবা, বংশরক্ষার দরকার নেই; এখনও পিঠ্-খানা ফুলে—বল্‌ব কি—ঢাক হয়ে আছে। আর দু-এক ঘা পড়্‌লে তোমরা বাবা, খুড়োকে আর চোকে দেখ্‌তে পেতে না।"

খুড়ো তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। বংশ-যষ্টির ভয়ে বংশরক্ষার জন্য খুড়ো আর কখনও আগ্রহপ্রকাশ করেন নাই। তবে, আজকাল তাঁহার নৈশ সঙ্গীতে বেহাগ-রাগিণীর অতিশয় বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

চণ্ডীদাসের প্রতি

কবে কোন্ অতীতের মহেন্দ্র লগনে হে প্রেমের কবি।
প্রাণে তব পশেছিল কানুর পিরীতি কথা; প্রেমের সে ছবি
উঠিল রাঙ্গিয়া তব হৃদয়-পরতে শোভন উজ্জ্বল—
ভাবের তুলির টানে; বহিল প্রেমের নদী কল্ কল্ কল্
সেই দিন হতে; প্লাবিত করিয়া ধরা ছুটিল সে নদী
কত মরু উর্ব্বরিয়া; কত গিরি, বন মুখরিত তদবধি
সে মধুর তানে; প্রেমের জটিল রাজ্য, সীমানা কোথায় তার
জানিত না নর-নারী; আগল খুলিয়া তুমি দেখাইলে দ্বার
সে স্বপ্ন-রাজ্যের; সেইদিন হতে আজিও যাত্রীর দল
প্রবেশয়ে অবিরত সে রাজ্যের মাঝে; তুলে কোলাহল;
ফিরে আসে পুনঃ; শুনায় জগৎ-জনে প্রেমের বারতা
সুমধুর সুরে; প্রেমের নিগুঢ় তত্ত্ব সুমধুর গাথা।
হে প্রেমের কবি! কানুর পিরীতি কথা পশেছিল তব মরমের মাঝে
কানের ভিতর দিয়া; হৃদয়-বীণার তারে উঠিল তা বেজে
রাগিণীর সনে; নাহি তাহে বাক্য-ছটা; শব্দের ঝঙ্কার
নাহি সে সঙ্গীতে; আছে সুধু অনাবিল প্রেম-পারাবার।
কত যুগ বহে গেছে, কত দিনমান; সে প্রেমের ধারা তবু
থামে নাই; বাঙ্গালার শ্যাম-কুঞ্জে সে প্রেমের ধ্বনি থামিবে না কভু।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

নবাবী আমলের গল্প *

(১)

একব্যক্তি একটী কাকাতুয়া পাখী কিনিয়া তাহাকে পারস্য ভাষা শিক্ষা দিতে লাগিল। পাখীটি প্রত্যেক কথার উত্তরে বলিত, "এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে!"

একদিন উক্ত ব্যক্তিটী পাখীটিকে বিক্রয় করিবার মানসে বাজারে লইয়া গেল। একজন আমীর আসিয়া পাখীটির মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে বিক্রয়কারী বলিল, "একশত মুদ্রা।"

আমীর পাখীটিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মূল্য কি একশত মুদ্রা?" পাখীটি বলিল, "এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে!" আমীর অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাখীটিকে ক্রয় করিয়া গৃহে লইয়া গেল। গৃহে লইয়া গিয়া আমীর দেখিল, পাখীটির সকল কথায় সেই একই উত্তর "এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে!" আমীর নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখ করিয়া বলিল, "আমি কি মূর্খ যে, পাখীটির একটি কথায় ভুলিয়া যাইলাম!" পাখীটি বলিয়া উঠিল, "এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে!" আমীর খুসি হইয়া পাখীটিকে পিঞ্জর হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

(২)

একদিন একব্যক্তি এক চিকিৎসকের নিকট গিয়া বলিল, "মহাশয়! আমার পেটের মধ্যে কাল রাত্রি হইতে একটা যন্ত্রণা হইতেছে; ইহার যদি উপযুক্ত ঔষধ থাকে ত দিন।" চিকিৎসক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে কি আহার করিয়াছিলেন?"

লোকটি বলিল, "আধপোড়া দুইখানি রুটী।" চিকিৎসক রোগীর জন্য একটা চক্ষু-রোগের ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে রোগী বলিল, "সে কি মহাশয়! আমার পেটের মধ্যে অসুখ, আর আপনি দিলেন চক্ষুর ঔষধ!"

চিকিৎসক হাসিয়া বলিলেন, "প্রথম তোমার চক্ষুর ঔষধই প্রয়োজন; কারণ, তোমার চক্ষুর অবস্থা যদি ভাল হইত, তাহা হইলে দগ্ধ রুটী ভক্ষণ করিতে না।"

(৩)

একদিন প্রত্যূষে বাজারের রাস্তায় একটী সুন্দরী ইরাণী রমণী যাইতেছিল। একটী যুবক তাহাকে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিল। রমণী বলিল, "তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ কেন?" সেই লোকটী বলিল, "আমি তোমায় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—তোমায় পাইতে ইচ্ছা করি।" রমণী উত্তর করিল, "কেন তুমি আমায় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ? আমার ভগিনী আমা অপেক্ষা সুন্দরী, তিনি পশ্চাতে আসিতেছেন। তাঁহার নিকট যাও।" এই কথায় লোকটী ফিরিল এবং কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটী কুৎসিত রমণীকে দেখিতে পাইল। লোকটী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পুনরায় সেই স্ত্রীলোকটীর নিকট গিয়া বলিল, "তুমি মিথ্যা বলিলে কেন? তোমার পশ্চাতে কোন সুন্দরীকে ত দেখিলাম না।" রমণী উত্তর করিল, "তুমিও সত্য বল নাই; কারণ, তুমি যদি আমায় ভালবাসিতে, তবে অন্য রমণীর আশায় যাইতে না।"

(৪)

এক ভিক্ষুক এক গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। দুই-তিন বার চাহিবার পর ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—"গৃহস্বামিনী গৃহে নাই।" ভিক্ষুক যাইবার সময় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়া গেল, "আমি একমুষ্টি অন্নের আশায় আসিয়াছি মাত্র, গৃহস্বামিনীর আশায় আসি নাই।"

শ্রীহরিচরণ মিত্র

* পারস্য গল্পের অনুবাদ।

প্রাচীন ভারতের সমর-নীতি

ক্ষত্রিয় জাতির উদ্ভব।—আর্য্যগণ চিরদিন শান্তিপ্রিয় হইলেও, যুদ্ধে তাঁহাদের অসীম অনুরাগ ছিল, কোন সন্দেহ নাই। এই ভারতভূমি জ্ঞান-গরিমায় ও উচ্চ সভ্যতালোকে দীপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল—অসংখ্য শত্রু সংহার করিতে হইয়াছিল। ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে দেশয্যুগণ বিনাযুদ্ধে তাহাদের জন্মভূমি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে ছাড়িয়া দেয় নাই এবং পরে তাহাদের মধ্যে অনেকে আর্য্যদিগের উন্নত আচার-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ও অনেকস্থলে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকারপূর্ব্বক একত্রে বাস করিতে লাগিল বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সকলে দুর্গম পর্ব্বত বা অরণ্যানী-বেষ্টিত স্থানে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বদা আক্রমণকারীদিগকে দূরীভূত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিত। এ কারণ, যুদ্ধ আর্য্যদিগের দৈনন্দিন কার্য্যমধ্যে গণ্য হইত। প্রাচীন গ্রন্থে এইসকল দেশয্যুদিগকে রাক্ষস বা পিশাচ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে দেখা যায় যে, এইসকল দস্যুদিগের কবল হইতে নিজ ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য আর্য্যগণ একদল যোদ্ধার সৃষ্টি করিলেন।—ইহারাই পরে ক্ষত্রিয় নাম পাইয়াছিল।

বীরপূজা।—আর্য্যদিগের দেবতা মাত্রেই যোদ্ধা। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, শক্তিস্বরূপিণী দুর্গা, এমন কি, দেবভিষক অশ্বিনিকুমারদ্বয় পর্য্যন্ত যোদ্ধা। যুদ্ধে প্রধান বীররূপে গণ্য হওয়াই আর্য্যগণের শ্রেষ্ঠ কামনা ছিল। সেইজন্যই তাঁহারা বীরের পূজা করিয়া গিয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতির উপাসনা-কালে সকলে প্রার্থনা করিতেন যে, **বীর** আর্য্যদিগের মধ্যে যেন সর্ব্বদা **বীর**-পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

ধর্ম্ম ও কূট যুদ্ধ।—আর্য্যগণ বর্ম্ম পরিধান করিয়া রথ, অশ্ব বা গজে আরোহণপূর্ব্বক তীর, ধনু, তরবারি, বর্ষা, গদা, মূষল, মুদ্গর, পরশু প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিতেন। যুদ্ধ সমানে সমানে হইত অর্থাৎ পদাতীর সহিত পদাতী, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহী ও রথারোহীর সহিত রথারোহীর যুদ্ধ হইত। ইহাকেই ধর্ম্মযুদ্ধ বলিত; কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ সর্ব্বদা প্রচলিত থাকিলেও, অন্যায় যুদ্ধের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এমন কি, দেবগণ পর্য্যন্ত অনেক সময়ে অন্যায় যুদ্ধের আশ্রয় লইতে দ্বিধা করিতেন না। বেদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মায়াযুদ্ধে দেবতারা পর্য্যন্ত শত্রুর নিধন করিতেন। প্রবল পরাক্রান্ত বৃত্রাসুরকে ন্যায়যুদ্ধে পরাজিত করিতে অক্ষম হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র সন্ধিস্থলে—সাগর ও ঊর্ম্মিমধ্যে বজ্রনিয়োগপূর্ব্বক তাহাকে বধ করেন। আবার দিতির গর্ভে ইন্দ্রের এক প্রবল শত্রুর জন্ম হইবে জানিতে পারিয়া, তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় অস্ত্রপ্রয়োগে দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে আছে যে, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মায়াবলে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

স্মৃতি ও অর্থশাস্ত্র।—ক্রমে আর্য্যগণ জাতীয় জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-নীতিরও উন্নতি হইল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু ইত্যাদি স্মৃতিকারগণ যুদ্ধ-সম্বন্ধে নীতি প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ইঁহারা ধর্ম্মযুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন ও রাজধর্ম্মমধ্যে যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। ক্রমে অর্থশাস্ত্রকার শুক্রাচার্য্যের সমর-নীতি দেখা দিল। তাঁহার মতে দেশজয় ও ক্ষমতাবিস্তারের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন। ইঁহার শিষ্য কৌটিল্য ও কামন্দক অর্থশাস্ত্র প্রণয়নপূর্ব্বক অতি বিশদভাবে যুদ্ধের স্থান, কাল, পাত্র, শত্রু ও মিত্র এবং যুদ্ধ-সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বৃহস্পতি, বিশালাক্ষ, কাব্য, প্রাচেতস মনু, ভরদ্বাজ ও দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত অর্থশাস্ত্রকাররূপে অভিহিত করা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাই এ শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক।

মনু ও শুক্রাচার্য্য।—শুক্রাচার্য্য দেবগণের চিরশত্রু অসুরদিগের গুরু ছিলেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার যুদ্ধ-নীতি মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের ধর্ম্মযুদ্ধের নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে নাই। শুক্রের মতে যুদ্ধ দুই প্রকার—ধর্ম্ম ও কূট। যদিও মনু ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিকারগণ অতি তীব্রভাবে অন্যায় যুদ্ধের নিন্দা করিয়া গিয়াছেন, তথাপি শুক্রের মতে কূটযুদ্ধে ধর্ম্মানুমোদিত পক্ষ ত্যাগ করা যাইতে পারে; কারণ, প্রবল শত্রুর নিধনকালে কূটযুদ্ধ ব্যতীত গতি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাগণ রণস্থলে অন্যায় যুদ্ধের প্রশ্রয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, "উদ্দেশ্যসাধনার্থ, কপটতা, চাটুবাদ, বশ্যতা, এমন কি, শত্রুহস্তে-অপমান পর্য্যন্ত সহ্য করা বিধেয়। নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করা মূর্খতা; অতএব বুদ্ধিমান্ স্বকার্য্য-সিদ্ধির জন্য অখ্যাতিকে সম্মুখে রাখিয়া ও সম্মানকে পশ্চাতে ফেলিয়া কার্য্য করিবে।" ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কিন্তু ভারতের "ম্যাকিয়াভেলি"র মত সাদরে মাথায় তুলিয়া লইতে পারে নাই—ন্যায়ের ও নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া সংসারে উন্নতিলাভ করিতে ইহারা চিরদিন অক্ষম—পরকাল হারাইয়া ইহকাল রাখিতে মোটেই ইচ্ছুক নহে; তাই বোধ হয় ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা।

কামন্দক ও কৌটিল্য।—অর্থশাস্ত্রে শুক্রাচার্য্যের পরেই কৌটিল্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ইনিই ভারত-বিখ্যাত চাণক্য পণ্ডিত। ইনিই ভারত-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের বন্ধু ও মন্ত্রী ছিলেন। 'পদ্মপুরাণে' ও 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে এই কূট, বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের ইতিহাস পাওয়া যায়। জানা যায়, কি কৌশলে—শুধু প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া তিনি নন্দ-বংশের ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ করিয়াছিলেন—পৃথিবী-পতি সেকেন্দারের প্রধান সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন ভারতের গৌরবের বিজয়-নিশান উড়াইয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্য কামন্দক "কামন্দকীয় নীতিসার" প্রণয়ন করেন। ইনি অতি সুন্দরভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দৃষ্টান্তসহ কূটযুদ্ধের উপকারিতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার মতে স্থলবিশেষে নিদ্রিত ও অস্ত্রহীন শত্রুকে বধ করাও নিন্দনীয় নহে।

আর্য্যজাতির শৌর্য্য।—আর্য্যদিগের নিকট যুদ্ধে শত্রুকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন যোদ্ধার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গ্লানিজনক কার্য্য ছিল। তাঁহাদের নিকট পলায়ন অপেক্ষা যুদ্ধে-মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। মনু বলেন—"ক্ষত্রিয়-আচার স্মরণপূর্ব্বক কোন রাজা কখনও দুর্ব্বল, তুল্যবল বা প্রবল শত্রুকৃত অপমান সহ্য করিবে না। * * যে সকল রাজা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিহত করিতে চেষ্টা করে—যুদ্ধে পলায়ন করে না, তাহারা অন্তে স্বর্গ

প্রাপ্ত হয়" (৭ম অধ্যায় ৮৭।৮৯)। শুক্রাচার্য্য বলেন,—"একমাত্র তপস্বী ও সম্মুখ যুদ্ধে নিহত সৈনিকই সবিতৃমণ্ডলের ঊর্দ্ধে স্থানপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধার্থ সম্মুখীন্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকেও বধ করা যাইতে পারে।...যে মূর্খ প্রাণভয়ে যুদ্ধ হইতে পলায়ন করে, সে জীবিত থাকিলেও মৃত—সর্ব্বজীবের পাপভার তাহার মস্তকে নিপতিত হয়।" পুনশ্চ—"নারীর প্রতি অত্যাচার হইলে ব্রাহ্মণ, ও গোহত্যা হইলে পুরোহিত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবে। যে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, সে দেবগণকর্ত্তৃক নিহত হয়। শয্যায় মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাপ; যুদ্ধে-নিহত বীরের জন্য খেদ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা যুদ্ধে পলায়ন করে না, তাহারা চারি আশ্রমের কর্ত্তব্য একত্রে সম্পন্ন করে।"

রাজধর্ম্ম।—স্মৃতিকারদিগের মতে শত্রু ও মিত্র তিন প্রকারের—আজন্ম (Born), প্রকৃতিজাত (Natural) ও কৃত (Artifici l)। নিজরাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী রাজা অন্যের শত্রু; তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজা তাহার শত্রুর শত্রু; সুতরাং তাহার মিত্র। তৎপরে আবার শত্রু আবার মিত্র; এই প্রকারে শত্রু ও মিত্র গণনা করিতে হয়। বহুদূরবর্ত্তী রাজা উদাসীন নামে কথিত। শুক্রের মতে রাজায় রাজায় বন্ধুত্ব কখনও সম্ভব নহে। সাহসী, প্রবল ও আক্রমণ-সক্ষম রাজা মাত্রেই পরস্পরের শত্রু। তাহারা গোপনে পরস্পরকে ঘৃণা করে—সর্ব্বদা অন্যকে আক্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করে। বন্ধুত্বরক্ষণ ও শত্রুদমনে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড-নীতির প্রয়োগ আবশ্যক। কামন্দক ইহাদের সহিত মায়া, ঔদাসীন্য ও কৌশল প্রয়োগ করিতে বলেন; কিন্তু ন্যায়পরায়ণ মনুর মতে সাম, দান ও ভেদ-নীতির সাহায্যে রাজ্যপালন কর্ত্তব্য। আর নিরুপায় হইলে দণ্ড-নীতি প্রয়োগ করিবে; কারণ, যুদ্ধে জয় অনিশ্চিত; কিন্তু পরাজয় বিরল নহে; সুতরাং যে স্থলে পরাজয় নিশ্চিত, সেস্থলে পলায়ন সঙ্গত। বন্ধুত্বলাভ, দেশজয় ও ধনলাভ যুদ্ধের উদ্দেশ্য হইলেও, মনুর মতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপেক্ষা প্রথমই অধিক বাঞ্ছনীয়।

চরম প্রস্তাব (Ultimatum)।—যদিও বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধের ন্যায়, চরম প্রস্তাব পাঠাইয়া তৎপরে যুদ্ধারম্ভের কথা কোথাও পাওয়া যায় না, তথাপি প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে এই ধরণের একটা-কিছু নিয়ম ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র সৈন্যসজ্জা করিয়া অঙ্গদকে রাবণের সভায় পাঠাইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরও সন্ধির শেষ প্রস্তাবের ছলে ধৃতরাষ্ট্রের সভায় শ্রীকৃষ্ণকে পাঠাইয়াছিলেন। দূত যে অবধ্য ও পূজনীয় ছিল, একথা আমরা বিভীষণ ও ভীষ্মের মুখে শুনিতে পাই।

যুদ্ধ-প্রণালী।—আর্য্যগণ শত্রুর সহিত ন্যায়ানুমোদিত প্রণালীতে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। মনু, বুদ্ধায়ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে গুপ্ত, বিষাক্ত, বক্র ও অগ্নি-শলাকাযুক্ত অস্ত্র লইয়া যুদ্ধ অকর্ত্তব্য। ন-পুংসককে, বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক আশ্রয়-প্রার্থীকে, মুক্তকুন্তল অবস্থায় পলায়িত শত্রুকে, যুদ্ধক্লান্ত, উচ্চস্থানারূঢ় ও আশ্রয়-প্রার্থী শত্রুকে বধ করা কখনও উচিত নহে। আর, "নিদ্রিত, অস্ত্রহীন, যুদ্ধবিরত, অপরের সহিত যুদ্ধরত, ভগ্নাস্ত্র, দুঃখিত, সাংঘাতিকভাবে আহত, ভীত বা পলায়িত শত্রুকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে।"

(মনু, ৭ম অধ্যায়, ৯০।৯৩)

কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শুক্রাচার্য্যের নীতি অতীব নির্ম্মম। শত্রুকে দয়া দেখাইতে তিনি মোটেই ইচ্ছুক নহেন। তিনি বলেন, ছলে, বলে বা কৌশলে শত্রুর নিধন কর্ত্তব্য। সংবাদ-প্রদানের পর রাজ্য-আক্রমণ মূর্খতা। লুক্কায়িত দস্যুর ন্যায় সহসা শত্রুকে আক্রমণ করিবে; কারণ, মন্ত্রগুপ্তিই যুদ্ধ-জয়ের প্রধান অঙ্গ।

রুষোর নীতি ও তাহার ব্যতিক্রম।—ফরাসীদেশের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী, ক্ষণজন্মা বাগ্মী রুষো বলেন, "যুদ্ধে শত্রুর সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোন বিবাদ নাই। রাজ্য লইয়া রাজায় রাজায় বিবাদ; সুতরাং যুদ্ধজয়ের পর নিরীহ প্রজার সম্পত্তি-গ্রহণ কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।" বর্ত্তমান যুগের অনেক ইংরাজ মনীষীর মতে যুদ্ধকালে এ নীতির অনুসরণ কার্য্যতঃ অসম্ভব; কিন্তু প্রাচীন ভারতের অসংখ্য যুদ্ধকলে আমরা দেখিতে পাই যে, পুরাকালে, এমন কি, মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশের সমস্ত যুদ্ধে প্রজার সম্পত্তিতে রাজা কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং শত্রু-রাজ্যের প্রজাদিগকে কখনও উৎপীড়িত করা হয় নাই। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ যদি লোকালয় হইতে বহুদূরে না ঘটিয়া, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ঘটিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ উত্তর-ভারত হইতে সমস্ত প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইত—সোণার ভারত শ্মশানে পরিণত হইত। মনু বলেন,—"তবে শত্রু যদি নগরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহা হইলে বিজিগীষু রাজা নগরের চতুর্দ্দিকে শিবির স্থাপন করিয়া পুনঃপুনঃ ঐ রাজ্য আক্রমণ করিবে। তাহাদের জন্য খাদ্য, পানীয়, তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া দিবে—পুষ্করিণী, দুর্গপ্রাকার, পরিখা ইত্যাদি ধ্বংস করিবে এবং শত্রুর অজ্ঞাতে নিশাযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে।

(৭ম অধ্যায়—১৯৪।১৯৬)

গুপ্তচর।—সমস্ত নীতি-শাস্ত্রেই গুপ্তচর-নিয়োগ-প্রথার উল্লেখ আছে। স্বরাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও শত্রুর প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্যই রাজন্যগণ ইহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। চরের মুখে সমস্ত অবগত হইতেন বলিয়া রাজাকে "চরচক্ষু" বলা হইত; কারণ, চরই তাঁহাদের চক্ষু ছিল। এইসকল গুপ্তচর স্বরাজ্যে অতি সম্মানের সহিত বাস করিলেও, ইহাদিগকে শত্রুর হস্তে পড়িয়া বিলক্ষণ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইত। সময় সময় অপর পক্ষের সংবাদ জানিবার জন্য শত্রু চরের প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে কুণ্ঠাবোধ করিত না। এইজন্যই ভারবী বলিয়াছেন যে, চরের মন্ত্রগুপ্তি, বিনয়, সত্যবাদিতা, সাহস, কার্য্য-কুশলতা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভৃতি নানা গুণ থাকা আবশ্যক। রামায়ণের দুর্ম্মুখ-চরিত্র চরের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

রামায়ণ ও মহাভারত হইতে কূটযুদ্ধের দৃষ্টান্ত।—রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তকরূপে পূজিত হইলেও, অন্যায় কূটযুদ্ধের দৃষ্টান্ত ইহাদের মধ্যে বিরল নহে। নীতি-শাস্ত্রে স্ত্রী-হত্যা অকর্ত্তব্য বলিয়া কথিত আছে; কিন্তু বিষ্ণু-অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি এই নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে ইতস্তত করাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, মায়াবিনী, পাপিষ্ঠা স্ত্রী-বধে পাপ নাই; বিশেষতঃ, যে রমণী হইয়াও যজ্ঞকার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহাকে বিনাশ করা অবশ্য উচিত। যৌবনে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধরত কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীকে বৃক্ষান্তরাল হইতে শরনিক্ষেপদ্বারা নিতান্ত অক্ষত্রিয়ের ন্যায় বধ করিলেন। বলা বাহুল্য, রামচন্দ্রের এ অন্যায় কার্য্যের সমর্থন দুঃসাধ্য। শুধু এই বলা যাইতে পারে যে, তিনি মিত্র

সুগ্রীবের প্রাণরক্ষার জন্য এ কার্য্য করেন; কিন্তু ইহাও সন্তোষজনক উত্তর নহে।

রাবণ-তনয় ইন্দ্রজিৎ মায়াযুদ্ধে রাম ও লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া পরে লক্ষ্মণ পূজারত শত্রুকে অন্যায়ভাবে বধ করিতে দ্বিধা করে নাই। উত্তরাকাণ্ডে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র নিরস্ত্র, তপস্যারত শূদ্রককে বধ করিয়াছিলেন। তবে শূদ্রকের বিপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সে আশ্রমবিরুদ্ধ আচারের অনুষ্ঠানদ্বারা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। আবার এই কাণ্ডের অষ্টম সর্গে বিষ্ণুর সহিত রাক্ষস মাল্যবানের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণু পলায়িত রাক্ষস সৈন্য নিধন করিতেছেন দেখিয়া মাল্যবান তাঁহাকে যুদ্ধ-নীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, বিষ্ণু উত্তর দিলেন যে, তিনি রাক্ষস-বংশকে সমূলে নিধন করিতে ইন্দ্রের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; সুতরাং যে প্রকারেই হউক, তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় প্রাচীন সমর-নীতির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। যোদ্ধারা বহুস্থলে সনাতন নীতিমার্গ ত্যাগ করিয়া কূটযুদ্ধে বিপক্ষকে পরাজিত করিয়াছে। কামন্দক প্রভৃতি পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ এসকল নীতির সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কুরুগণই যে অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা নহে; পাণ্ডবগণ পর্য্যন্ত বহুস্থলে ন্যায় ও নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া শত্রুর নিধন করিয়াছে। কৌরবগণ যেমন অন্যায় যুদ্ধে বালক অভিমন্যুকে হত্যা করিয়াছিল, তদ্রূপ পাণ্ডবগণও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে অধর্ম্ম যুদ্ধে বধ করে।

ভারতের ধর্ম্মযুদ্ধ।—ভারতের সমর-নীতি আমাদের চির-গৌরবের সামগ্রী। যে অগাধ পাণ্ডিত্যবলে ও দূরদর্শিতার দ্বারা আমাদের শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্মযুদ্ধের প্রণালীসমূহের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে, বর্ত্তমান য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের কর্ণধারগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইবে—বুঝিবে যে যুদ্ধবিদ্যায় ভারত কখনও কোন জাতি অপেক্ষা হীন ছিল না; বরং এক বিষয়ে তাহারা সমস্ত সভ্যজাতির শীর্ষস্থানীয়। তাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে ভারতে স্বাধীনতার বিজয়-কেতন উড়াইয়াছিল আর ধর্ম্মযুদ্ধেই তাহারা সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। স্বদেশ-স্বজন, এমন কি, ইহকাল পর্য্যন্ত তাহারা ধর্ম্মের চরণে উৎসর্গ করিয়াছে; কারণ, ধর্ম্ম যে তাহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়! তাই মহাভারতে সতীকুলরাণী গান্ধারী অন্যায়-যুদ্ধলিপ্ত পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়।" মাতার স্নেহ, রাণীর কর্ত্তব্য, পুত্রের ভাবী পরিণাম সমস্ত ভুলিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "যেখানে ধর্ম্ম, সেখানেই জয়।" ধর্ম্ম তাঁহার এত আদরের—এত আপনার! তাই হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিলেন—হিন্দুমাত্রকে শিখাইলেন—"হে পার্থ! ধর্ম্মযুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র কর্ত্তব্য। সেই ক্ষত্রিয়ই ভাগ্যবান্, যে অযাচিতমুক্ত স্বর্গদ্বারের ন্যায় এইপ্রকার যুদ্ধ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল

চিরশ্যাম

তুমি শ্যাম, তাই তোমার ধরণী এত শ্যামে শ্যামে ভরা;
নয়নাভিরাম তুমি, তাই আঁখি জুড়ায় শ্যামল ধরা।

বাজাইলে বাঁশী তাই কাণ দিয়া
এই নিখিলের মরমে পশিয়া
কূজনে, গুঞ্জে, কলতানে আজো মানবের মনোহরা।

ভাগে ভাগে তুমি খেলেছিলে দোল,
ফাগুনের বনে তাই হিল্লোল,
বাগে বাগে তাই অশোক-পলাশে শোভা লালে-লাল-করা।
গোকুলের হৃদি করিলে হরণ,
তাই দেহে দেহে চুরি যায় মন,
তাই গেহে গেহে ঐ পায়ে পায়ে প্রেমের শিকলি-পরা।

শ্রীকালিদাস রায়

আর্য্যদিগের আদি-জন্মভূমি

সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক্ ও জেন্দ্ ভাষাসমূহ একটী ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যে জাতিসমূহ পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলি ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা একটী বংশেরই বিভিন্ন শাখা; অতএব পূর্ব্বোক্ত জাতিগুলির পূর্ব্বপুরুষেরা **একই দেশে, একটী জাতিরূপে একত্র** বাস করিতেন। এক্ষণে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, সেটী কোন্ দেশ। এ-সম্বন্ধে দুইটী প্রশ্ন হইতে পারে। প্রথমতঃ, ভারতই Indo-Germanic জাতিসমূহের আদি-বাসস্থান কি না এবং সেই বৃহৎ জাতির কতকগুলি শাখা হিন্দুস্থান হইতে পশ্চিমাভিমুখে অভিযান করিয়াছিলেন কি না এবং ইণ্ডো-এরিয়ানগণ ভারতেই থাকিয়া গিয়াছিলেন কি না; দ্বিতীয়তঃ, Indo-Germanic জাতির আদি-বাসস্থান ভারত না হইয়া অন্য কোন দেশে হইতে পারে কি না এবং সেই দেশ হইতে এই জাতির কতকগুলি শাখা বিভিন্ন দিকে প্রস্থান করিয়া বিভিন্ন দেশ অধিকার করিয়াছিলেন কি না।

সুপণ্ডিত এ, কর্জ্জনের মতে প্রথম অনুমানই সত্য। তিনি বলেন যে, ভারতই আর্য্যদিগের আদি-বাসস্থান এবং এখান হইতেই তাঁহাদের শাখাসমূহ বিভিন্ন দিকে গমন করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ অন্যদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও তত্রস্থ অসভ্যদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের উপর নিজেদের আধিপত্য-বিস্তার ও ধর্ম্ম-প্রচার করেন বলিয়া যে মত চলিত আছে, তাহা কর্জ্জন পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইহার প্রমাণ খুব অল্প ও ইহার কোন বিশেষ ঐতিহাসিক কারণও নাই। তাঁহার বিবেচনার অসভ্য, ধর্ম্মবিহীন, বর্ব্বর জাতিসমূহ, শিক্ষিত ও উন্নত সভ্যতাপ্রাপ্ত আর্য্যদিগের অপেক্ষা কখনও প্রাচীন হইতে

পারে না। তিনি বলেন যে, এই বর্ব্বর জাতিগুলি ভারত-আক্রমণকারী হূণ ও সক জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আর্য্যগণ কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তৎসম্বন্ধে কর্জ্জন নিম্নলিখিত কয়েকটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

(১) আর্য্যগণ পশ্চিমদিক দিয়া কখনই ভারতে প্রবেশ করেন নাই; কারণ, তদ্দেশস্থ অধিবাসিগণ ইঁহাদেরই বংশধর। প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহাদের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাণাদির কিয়দংশও ইণ্ডো-এরিয়ানদের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে।

২। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমদিক দিয়াও তাঁহারা ভারতে আসেন নাই; কারণ, ইতিহাস বা ভাষাতত্ত্ব হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা অনুমিত হইতে পারে যে, ঐ প্রদেশে একটী সভ্য জাতি বাস করিতেন এবং তাঁহারাই পরে এস্থান ত্যাগ করিয়া ভারতে আসেন ও সেখানে Indo-Aryan সভ্যতার সৃষ্টি করেন।

৩। পূর্ব্বদিক হইতেও আর্য্যদের ভারতে আসা অসম্ভব; কারণ, ঐদিকস্থ দেশসমূহে চীনজাতি বাস করিত এবং ভারতবাসীদিগের সহিত ইহাদের আচার-ব্যবহার, ভাষা, ধর্ম্ম ও দৈহিক গঠনের কোন সাদৃশ্য নাই।

৪। আর্য্যগণ উত্তর-পূর্ব্বস্থ Tibetএর সমুচ্চ ভূমি হইতেও ভারতে প্রবেশ করেন নাই; কারণ, প্রথমতঃ বিশাল হিমালয় পর্ব্বতমালা ইহার একটী প্রধান অন্তরায়; দ্বিতীয়তঃ, তিব্বতীয়দিগের সহিত ভারতবাসীদের কোন জাতি বা ধর্ম্মগত সাদৃশ্য নাই।

৫। ভারতবাসিগণ সেমেটীক্ বা ইজিপ্সীয়ান বংশসম্ভূত নন; কারণ, Semetic ভাষা হইতে উৎপন্ন কোন সংস্কৃত শব্দ নাই এবং সংস্কৃত-ভাষার গঠন-প্রণালীও Semetic (সমেটীক্) হইতে ভিন্ন।

৬। হিমালয় পর্ব্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ সমতলভূমি ব্যতীত আর কোন স্থানে আর্য্যগণ বাস করিতেন কি না, তাহার কোন প্রবাদ, লিখিত ইতিহাস বা কোন স্মৃতিস্তম্ভ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না।

৭। কর্জ্জন বলেন যে, আর্য্যগণ অতি শীঘ্রই ভারতের দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া যে, তাঁহারা অন্যদেশ হইতে ভারতবর্ষ জয় করিবার জন্যই বহির্গত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তিনি এস্থলে মনুর অনুসরণ করিয়া বলেন যে, ব্রহ্মবর্ত্তই আর্য্য-সভ্যতার আদিম স্থান। সামাজিক উন্নতি ও সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া প্রথমে মধ্যদেশ ও পরে আর্য্যাবর্ত্তে বাস করেন। হিমালয় ও বিন্ধ্যগিরির মধ্যস্থ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত প্রদেশই আর্য্যাবর্ত্ত। কর্জ্জন এক্ষণে দুইটী সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন।

(১) সংস্কৃত হইতে যে সমস্ত জাতির ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারা ভারতস্থ আর্য্যগণের বংশধর। রাজনৈতিক বা ধর্ম্মগত বৈষম্যের জন্য তাঁহারা প্রদেশ ত্যাগ করিয়া অনধিকৃত দেশসমূহে যাইয়া বসবাস আরম্ভ করিলেন এবং এইরূপে তাঁহারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন।

(২) আর্য্যগণ প্রথমে ভারতের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমস্থ দেশ-সমূহ আক্রমণ করেন ও সেখানকার ইতর জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের আধিপত্য ও ধর্ম্ম বিস্তার করেন।

কর্জ্জনের মতে উল্লিখিত দুইটী সিদ্ধান্তের মধ্যে দ্বিতীয়টীই বেশী সম্ভবপর। এরিয়ানগণ কোন্ সময়ে পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হয়েন, এ-সম্বন্ধে Mr. Curzon বলেন যে, তাঁহাদের দক্ষিণাত্যে বিস্তার এবং উক্ত প্রদেশ অধিকার করার পর ইহা ঘটিয়াছিল। সে সময়ে আর্য্য-সভ্যতা অনেক উচ্চে উঠিয়াছিল। বেদসমূহ রচিত, জাতীয় ধর্ম্ম স্থাপিত, আর্য্য-ভাষার চর্চ্চা হইতেছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন রাজার শাসনে ছিল।

কর্জ্জনের মত উল্লিখিত হইল। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন মত দিয়া যান নাই। হিন্দুগণ হিন্দুস্থানের বহির্ভাগ হইতে আসিয়াছিলেন বা তাঁহারা সেই প্রদেশরই অধিবাসী, এ-সম্বন্ধে কোন মীমাংসা তিনি করিয়া যান নাই। তিনি আমাদিগকে উভয় দিকই দেখাইয়া গিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, মনুর গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য লইয়াই পূর্ব্বে সমাজ গঠিত হইয়াছিল। শূদ্রেরা দাসত্ব বা তদপেক্ষা হীন অবস্থায় থাকিত। ইহা হইতে সহজেই বোধ হয় যে, উপরোক্ত তিনটী জাতি জেতৃদিগের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ও শূদ্রগণকে তাঁহারা বশ্যতা স্বীকার করান। হিন্দুগণ প্রথমে হিন্দুস্থানেই বাস করেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশই তাঁহাদের আক্রমণ বা ধর্ম্ম হইতে মুক্ত ছিল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, উক্ত প্রদেশ যাঁহারা জয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা একটী বৈদেশিক জাতি, কি তৎ-প্রদেশস্থই কোন জাতি,—জ্ঞান ও সভ্যতায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উন্নত হইয়া এদেশ জয় করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের কোন নিশ্চিৎ মীমাংসা করা যায় না।

সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ভাষাসমূহ একই ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এজন্য নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত ভাষাসমূহ যে সকল জাতিকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বে একটা সম্বন্ধ ছিল; কিন্তু কোন্ স্থানে বা কোন্ সময়ে তাহাদের এরূপ সংযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি না। অনেকে বলেন যে, কোন মধ্যস্থান হইতে এইরূপ হইয়াছে; কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। সেই মধ্যস্থান কোথায়, তাহার কিছুই ঠিক হয় নাই।

মধ্য-এসিয়াই আর্য্যদের আদি-বাসস্থান

শ্লেগেল্, লাসেন, বেন্‌ফি, মূলর, স্পীগেল রেণান্ এবং পিক্‌টেটের অভিমত।

কর্জ্জনের অভিমত য়ুরোপীয় সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মত-বিরুদ্ধ। উল্লিখিত পণ্ডিতসমূহের অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন যে, ভারতবাসী ও ইণ্ডো-জার্ম্মানিকে জাতির শাখাদির আদি-বাসস্থান ভারতের বহির্ভাগস্থ কোন দেশে অন্বেষণ করিতে হইবে।

নিম্নে ফোন্ শ্লেগেলের মত দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার অনুসন্ধানের ফল এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—"যদিও আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, যেহেতু ইণ্ডো-য়ুরোপীয়ান্ ভাষাগুলি একটী ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে-এবং সেইজন্য যে সমস্ত জাতি ঐ সকল ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারাও একটী জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়া সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তত্রাচ এই প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠিতে পারে যে, সেই আদি-জাতির প্রাচীন বাসস্থান কোথায় ছিল? ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে, পৃথিবীর **দক্ষিণ-দিকস্থ** একটী দেশ হইতে

ক্রমাগতঃ লোক আসিয়া ইহার অধিকাংশ স্থলে বসবাস করিবে। ইহা অপেক্ষা পৃথিবীর মধ্যস্থ কোন প্রদেশ হইতেই জনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত; কারণ, এইস্থান হইতে উপনিবেশকারিগণের ভ্রমণের দূরত্ব অনেকটা কম হয় এবং জলবায়ুর বিভিন্নতাও তাহারা হঠাৎ বোধ করিতে পারে না। এক্ষণে এসিয়া-মহাদেশের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ (অর্থাৎ কাস্পীয় সমুদ্রের পূর্ব্ব এবং নিকটস্থ প্রদেশ) ভিন্ন এই স্থল আর কোথায় হইতে পারে? অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, উক্ত দেশ এক্ষণে একটী ভিন্ন জাতিদ্বারা অধ্যুষিত হইতেছে। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এমন কত দেশ আছে, যাহাদের অধিবাসীদের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ, যে দেশ হইতে জনসংখ্যা এত অধিকভাবে বহির্গত হয়, তাহা যে মরুভূমিতে পরিণত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

আমার মতে পারসীক হিন্দুদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের আদি-বাসস্থান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন এবং য়ুরোপীয় জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তর ও পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিলেন। য়ুরোপের দিকে যে জাতিসমূহ অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহারা দুইটী প্রধান পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। একটী কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূল ধরিয়া ও অপরটী এসিয়া-মাইনর, ইজিয়ান সমুদ্র, থ্রেস, ইলিনা ও এড্রেটিকের মধ্য দিয়া। অধ্যাপক লাসেনও স্বীকার করেন না যে, ভারতবর্ষ ইণ্ডো-য়ুরোপীয়ান জাতিসমূহের জন্মস্থান।

তিনি বলেন যে, প্রাচীন ভারতের ভাষা ও অন্যান্য Indo-Germanic জাতিসমূহের ভাষার মধ্যে খুব নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, উপরোক্ত জাতি ও ভাষাসমূহ সর্ব্বপ্রথমে এক ছিল। এক্ষণে দুইটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। প্রথম—ভারতবাসিগণ অন্য কোন স্থান হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না; দ্বিতীয়—Indo-Germanic জাতিসমূহের উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ কি না। নিম্নলিখিত কারণগুলির দ্বারা প্রথমটীরই সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

(১) পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত জাতিসমূহ কোন এক সুদূর দক্ষিণ প্রদেশ হইতে আসিয়াছে, ইহা অনুমান করা একেবারে অসম্ভব। তাহাদের আদি-বাসস্থান মধ্যস্থলে না হউক, এমন কোন স্থলে অনুসন্ধান করা আবশ্যক, যেখান হইতে তাহাদের চতুর্দ্দিকে বিস্তার সহজসাধ্য হইয়াছিল। ভারতবর্ষ এরূপ উপযুক্ত স্থান কখনও হইতে পারে না।

(২) উপরোক্ত জাতিসমূহের ভাষা ও আচার-ব্যবহার হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, ভারতই তাহাদের জন্মস্থান।

(৩) আর্য্যদিগের দক্ষিণ প্রদেশে বিস্তৃতিরূপ ঘটনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহারা বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তরস্থ কোন প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বদিকে বিস্তৃতি হইতেও উক্ত ধারণা প্রমাণিত হয়।

(৪) আর্য্যগণই যে ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন এবং অনার্য্যকর্ত্তৃক তাঁহারা বিতাড়িত হইয়া বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান কখনই করা যাইতে পারে না; কারণ, ইতিহাস হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনার্য্যেরা দুর্ব্বল জাতি ছিল এবং আর্য্যেরা শৃঙ্খলাবদ্ধ, সাহসী এবং বুদ্ধিমান্ ছিলেন।

(৫) এই দুইটী জাতির পরস্পর সম্বন্ধ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, আর্য্যেরা বিজয়ী হইয়া অনার্য্যদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—তিনটী উচ্চ জাতিই আর্য্যদিগের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং অনার্য্যগণ হইতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য আপনাদিগকে "আর্য্য" ও "দ্বিজ" (অর্থাৎ যাঁহাদের দুইবার সংস্কার হয়) অভিহিত করিতেন। সংস্কৃত "বর্ণ" শব্দের প্রাচীন অর্থ "রং"—পূর্ব্বকালে বর্ণদ্বারাই জাতিসমূহের পার্থক্য নিরূপিত হইত; কিন্তু আমরা জানি যে, আর্য্যগণ সুন্দর ছিলেন ও অনার্য্যগণ কৃষ্ণকায় ছিল। ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, শ্বেতকায় আর্য্যগণ কোন উত্তর-প্রদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের মতে আর্য্যগণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন না।

তিনি বলেন যে, প্রাচীন কালের ইতিহাসের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যগণ হিমালয়ের তুষাররাশি ভেদ করিয়া দক্ষিণস্থ সিন্ধুনদীর (Indus পাঞ্জাব প্রদেশের পঞ্চনদী ও সরস্বতী) দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা আর কোনও উত্তর-প্রদেশের আধুনিক য়ুরোপীয় জাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষদের সহিত একত্রে বাস করিতেন।

আর্য্যেরা হিন্দুকুশ উত্তীর্ণ হইয়া তদ্দেশস্থ অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করেন ও উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান নদীসমূহের অনুসরণ করিয়া নিম্ন-প্রদেশস্থ সুন্দর ও উর্ব্বর উপত্যকায় তাঁহাদের প্রথম আবাস স্থাপন করেন। এক্ষণে সকলেই স্বীকার করেন যে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যস্থ পবিত্র ভুমি মনুর পুত্রদের জন্মস্থান নহে; আর্য্যগণ এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। তাঁহারা কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। উত্তর-দেশই সুখকর স্থান বলিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে প্রবাদ চলিত আছে, তাহা বোধ হয়, তাঁহাদের উত্তরদিক হইতে আসিবার ঘটনাই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান নদীর পার্শ্বস্থিত প্রাচীন রাজধানী ও পবিত্র স্থানসমূহ আর্য্যদের উত্তরদিক হইতে অগ্রসরের যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে।

অধ্যাপক বেন্‌ফি বলেন যে, ভারতবর্ষ হিন্দুদের আদি-বাসস্থান নহে। তিনি ইহার কতকগুলি কারণ দেখাইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, দাক্ষিণাত্যে এখন যে সমস্ত জাতি বাস করিতেছে, তাহারা পূর্ব্বে একটি জাতিরই অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং ইহাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক ছিল; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে সংস্কৃত-ভাষিগণ অনেক পরে এ-প্রদেশে আসিয়াছিলেন এবং ইহা কদাচিৎ সম্ভব যে, ভারতীয় আর্য্যগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি যৎকালে চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই সময়ে অনার্য্যগণ তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সময়েই আমরা অনার্য্য জাতিদের উল্লেখ দেখিতে পাই। অতএব আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই অসভ্য জাতিসমূহই দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন অধিবাসী। পরে তাহারা সংস্কৃত-ভাষীদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া অনেকে তাঁহাদের দাসরূপে পরিগণিত হইয়াছিল ও অনেকে পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিয়াছিল।

অধ্যাপক বেন্‌ফি আরও বলেন যে, সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যগণ অন্যস্থান হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন। আধুনিক য়ুরোপের

জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ ও তাঁহারা একটি জাতির অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে একই ভাষা ও একই প্রকার সভ্যতা প্রচলিত ছিল।

কর্জ্জনসাহেব বলেন যে, পারসীকদিগের ভাষা ও পুরাণসমূহ ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক স্পীগেল তদুত্তরে বলেন যে, সকলেই স্বীকার করেন যে, আর্য্যগণ সর্ব্বপ্রথমে একটী জাতিরূপে কোন প্রাচীন দেশে বাস করিতেন এবং ইহা সম্ভবপর যে, ভারতবর্ষস্থ আর্য্যগণ ও ইরানীয়ানগণ অনেককাল একত্রে একস্থানে ছিলেন; কিন্তু সেটী কোন্ প্রদেশ, তাহার সঠিক নির্ণয় এখনও হয় নাই। কর্জ্জন সাহেবের মতে ভারতবর্ষই ইণ্ডো-জার্ম্মানিক জাতিসমূহের প্রাচীন আবাসস্থল। এই দেশ হইতেই উঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন দল নানা দেশে অভিযান করিয়াছিলেন; কিন্তু ইরানীয়ানগণ শেষ পর্য্যন্ত ভারতবাসীদের নিকটেই ছিলেন। এই অনুমান-অনুসারে বৈদিক সংস্কৃতই ইণ্ডো-জার্ম্মানিক জাতিসমূহের মাতৃভাষা এবং ভারতবাসীদের ও ইরানীয়ানদের মধ্যে ভাষার ও ভাবের যদি কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার কারণ এই যে, ইরানীয়ানগণ সর্ব্বশেষে ভারত হইতে যাত্রা করেন ও সেইজন্য ভারতবাসীদের চরিত্র তাঁহাদের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উপরোক্ত মতানুসারে, পালি ও প্রাকৃত ভাষার সহিত পরবর্ত্তী সংস্কৃতের যে সম্বন্ধ, ইরানিয়ান সাহিত্যের সহিত বৈদিক সংস্কৃতেরও সেইরূপ সম্বন্ধ হওয়া উচিত। অধ্যাপক লাসেন অস্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতই ইণ্ডো-জার্ম্মানিক জাতিসমূহের সর্ব্বপ্রথম আবাসস্থল। কর্জ্জন সাহেব অধ্যাপক লাসেনের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই এবং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাচীন ইরানীয়ান ভাষার সহিত বৈদিক সংস্কৃতের পূর্ব্বকথিত সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। এজন্য ভারতবর্ষ ইণ্ডো-জার্ম্মানিক জাতির আদি-বাসস্থান হইতে পারে না। Oxus এবং Jaxartes নদীর উৎপত্তি-স্থলই ঐ জাতির আবাসস্থান হওয়া সম্ভব।

কিন্তু ভাষা-সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্নটীর এখনও মীমাংসা হইল না; কারণ, ইহা অনুমান করা সম্ভবপর যে, ভারতবাসিগণ ও ইরানীয়ানগণ একত্রে Indus নদীর উপকূলস্থ প্রদেশে আসিয়াছিলেন এবং পরে ধর্ম্মগত বৈষম্যের জন্য ইরানীয়ানগণ পশ্চিমদিকে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এবং বাক্‌ত্রীয়-ভাষাদ্বয়ের সাদৃশ্য এবং বেদোল্লিখিত কতকগুলি ঘটনার সহিত Avestaর ঐক্যতা হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইরানীয়ানগণ বৈদিক যুগের অধিকাংশ ভাগই ভারতবাসীদিগের সহিত একত্রে ছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার পূর্ব্বোক্ত মত সমর্থন করেন।

কিন্তু অধ্যাপক স্পীগেল উক্ত মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, উক্ত মতের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। জোরোয়াস্ত্র ও তাঁহার ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, জোরোয়াস্ত্র একজন বাক্‌ত্রীয় ছিলেন না এবং বাক্‌ত্রীয়দিগের ধর্ম্মও ভারত হইতে আসে নাই; পরন্তু তাহাদের ধর্ম্ম প্রথমতঃ মিড়িয়া হইতেই যে আসিয়াছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি বলেন যে, সংস্কৃত-ভাষা ইণ্ডো-জার্ম্মানিক জাতিসমূহের আদি-ভাষা ছিল না; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে প্রচলিত ভাষার সহিত সংস্কৃত-ভাষারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় এবং প্রাচীন বাক্‌ত্রীয় ভাষার সহিতও উপরোক্ত আদি-ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য থাকা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সংস্কৃত ও প্রাচীন বাক্‌ত্রীয় ভাষাদ্বয় একটী প্রাচীন ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়া স্বাধীনভাবে বিকাশ পাইয়াছিল। প্রাচীন বাক্‌ত্রীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়া আসে নাই; বেদোল্লিখিত আচার-ব্যবহার ও ঘটনাবলীর সহিত আবেস্তার কোন কোন স্থলে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই সাদৃশ্যের সংখ্যা অপেক্ষা অসাদৃশ্যের সংখ্যাই অনেক বেশী। গ্রীকদিগের পুরাণোল্লিখিত ঘটনার সহিত বেদের কোন কোন স্থলে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু গ্রীকগণ যে বেদে বিশ্বাস করিতেন, ইহা কেহই অনুমান করেন না।

অতএব আমরা অনুমান করিতে পারি যে, ভারতবাসীদিগের এবং ইরানীয়ানদিগের সাহিত্যের বিকাশ স্বাধীনভাবেই হইয়াছিল। যদি উহাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তবে তাহার সময় বৈদিক যুগের পূর্ব্বেই নিরূপিত করিতে হইবে। ইণ্ডো-এরিয়ানদের সহিত বাক্‌ত্রীয়গণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় একত্রে ছিলেন। এজন্য উভয়ের ভাবের কিছু সাদৃশ্য হওয়া সম্ভব; কিন্তু উহা বৈদিক যুগের পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যে সকল সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে, ইণ্ডাস্ নদীর উপকূলস্থ প্রদেশই তাঁহাদের উৎপত্তি-স্থল।

অধ্যাপক বেবের বলেন, এক্ষণে এমন কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই, যদ্দারা আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের আদি-বাসস্থান নির্ণয় করিতে পারি। তবে এসিয়ার কোন একটী প্রদেশই যে উক্ত স্থান হইবে, এটী একটী ঐতিহাসিক সত্য। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, যে দেশে তাঁহারা ছিলেন, তথাকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ছিল এবং এই অনুমান-অনুসারে মধ্যএসিয়ার উক্ত ভূমিই উক্ত স্থান হইতে পারে।

পিক্‌টে, ঐতিহাসিক ভৌগোলিক প্রভৃতি নানাবিধ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইণ্ডো-য়ুরোপীয় জাতিসমূহের আদি-আবাসস্থান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহারা যে প্রদেশে প্রথমে বাস করিতেন, বাক্‌ত্রীয় তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই কেন্দ্রস্থল হইতে যে সমস্ত জলস্রোত নানাদিকে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাদের তুলনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

উপরোক্ত অনুমান-অনুসারে, প্রাচীন আর্য্যগণ যখন সমধিক বিস্তৃত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা হিন্দুকুশ, বেলুরতাগ, অক্সস্ নদী ও কাস্পীয় উপসাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। অবশ্য সে সময়ে তাঁহারা একটী জাতি ছিলেন না। তাঁহারা তখন বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন; তবে তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাস একই ছিল।

আর্য্য জাতির আদি-আবাসস্থলের বাক্‌ত্রীয় কেন্দ্র হইলে, ইরানীয়ানগণ ইহার উত্তর-পূর্ব্ব অর্থাৎ সগ্দিয়ানার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। পরে তাঁহারা এখান হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া ইরানপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইণ্ডো-এরিয়ানগণ বাক্‌ত্রীয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অর্থাৎ বাদকশনের উর্ব্বর প্রদেশেই বাস করেন এবং পরে তাঁহারা হিন্দুকুশের সানু প্রদেশ অধিকার করিয়া কাবুলে প্রবেশ করেন ও সেখান হইতে উত্তর-ভারতে আগমন করেন। পেলাসগো-এরিয়ানগণ (গ্রীক ও লাটিনগণ) বাক্‌ত্রীয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিতেন এবং এখান হইতে তাঁহারা হিরাটের দিকে অগ্রসর হন ও খোরাসান এবং ম্যাজেণ্ডিরাণের মধ্য দিয়া এসিয়া-মাইনর এবং হেলেস্পণ্টে

উপনীত হন। পিকুটে বলেন যে, খৃষ্টীয় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা হইয়াছিল।

ইণ্ডো-এরিয়ানগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী নহেন; পরন্তু তাঁহারা মধ্য-এসিয়া হইতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাদের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক।

কর্জ্জন সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষই সমস্ত জাতির আদি-বাসস্থান। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন যে, ঐ সকল জাতির ভাষা ও পুরাণসমূহের অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, গ্রীক্ ও লাটিন ভাষাসমূহের সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব। গ্রীক, ইটালীয়ান এবং ভারতের পুরাণ-সমূহের মধ্যে যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা এত অল্প যে, ইহা হইতে ভারতেই উহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল, এমন অনুমান কোনক্রমে করা যায় না। কর্জ্জন বলেন যে, ইরানীয়ানদের ভাষা এবং পুরাণ-সমূহ ভারত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু এই মতের বিরুদ্ধে আমরা অধ্যাপক স্পীগেলের যুক্তির উল্লেখ করিয়াছি।

কর্জ্জন আর্য্যদিগের পশ্চিমাভিমুখে গমনের যে সময় নিরূপিত করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। তিনি বলেন যে, আর্য্যগণ দাক্ষিণাত্য অধিকার করিবার পর এবং যখন তাঁহাদের সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহারা Indus নদীর পশ্চিমস্থ দেশ অধিকার করেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আর্য্যদের তৎকালীন সাহিত্যে বা য়ুরোপীয়গণের সাহিত্যেও ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না এবং পারস্য, গ্রীস্, রোম বা জার্ম্মানীর ধর্ম্ম ও রাজনীতির উপর কোনরকম ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

আর্য্য-ভাষাগুলির পরস্পর সাদৃশ্যে প্রমাণিত হয় যে, তাহারা একটী প্রাচীন ভাষা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায়, যে জাতি সকল উক্ত ভাষাসমূহ ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা একটী প্রধান জাতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। এক্ষণে এই জাতির উৎপত্তিস্থল অনুসন্ধান করিতে হইলে, এমন একটী প্রদেশ অনুমান করা আবশ্যক, যেখান হইতে ইণ্ডিয়ান, ইরানিয়ান, গ্রীক, রোমান, জার্ম্মান এবং স্লাভোনিয়ান জাতিগণ অতি সহজেই স্বীয় গন্তব্য প্রদেশসমূহে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। বড় বড় পণ্ডিতেরা মধ্য-এসিয়াস্থিত ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ একটী প্রদেশকে উক্ত স্থান বলিয়া নিরূপিত করিয়াছেন। অতএব আমরা আর্য্যদিগের উৎপত্তি-স্থান বাক্ট্রীয়া বা ইহার নিকটস্থ প্রদেশই নিরূপিত করিতে পারি।

ভারতবাসীদের আদি-বাসস্থান-সম্বন্ধে-প্রচলিত জাতীয় প্রবাদসমূহ।

আমরা পূর্ব্বে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহা ভারত-বাসীদের বা পারসীকদের মধ্যে প্রচলিত কোন প্রবাদ হইতে প্রমাণিত করিতে পারা যায় কি না, দেখা যাউক। আমরা প্রথমে স্বীকার করিতে বাধ্য যে, কোন প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে ভারতবাসীদের বৈদেশিক উৎপত্তির প্রকৃত উল্লেখ নাই। তবে আমরা এমন কতকগুলি বাক্যের উল্লেখ পাই, যদ্দ্বারা ভারতবাসীদিগের বৈদেশিক উৎপত্তি অনুমিত হইতে পারে—

প্রথমতঃ, ঋগ্বেদের কতকগুলি স্থল হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতবাসিগণ একসময়ে কোন শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন। নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহে শীত-ঋতুর উল্লেখ হইয়াছে—R. V. 64, 14. "তোকাম্ পুষ্যেম তনয়াম্ শতং হিমাঃ অর্থাৎ আমরা সন্তান-সন্ততি লইয়া যেন শত শীত-ঋতু অতি-বাহিত করি!"

ঋগ্বেদ (৫৪।১৫)—"ইদং স্থ মে, মরুতো হর্য্যত বাচো যস্ত তরেম তারস শতং হিমাঃ। হে মরুৎগণ, আমার উপাসনায় সন্তুষ্ট হউন এবং ইহার প্রভাবে আমরা যেন শত শীত-ঋতু অতিবাহিত করিতে পারি! Vi. 4. 8. মদেম শত হিমাঃ-সুবীরাঃ। আমরা বলিষ্ঠ সন্ততি লইয়া শত শীত-ঋতু যেন আনন্দে কাটাইতে পারি!"

৬।৪৮।৮—"পাহি অংহসঃ সমেদ্ধারাং শতং হিমাঃ স্তোতৃভ্যোঃ যে চ দদতি।" ইহা অগ্নির উদ্দেশে বলা হইতেছে। "হে অগ্নি, যে তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে, তাহাকে শত শীত-ঋতু বিষাদ হইতে রক্ষা কর এবং তোমার উপাসনাকারীদিগকে যাহারা দান করে, তাহাদিগকেও রক্ষা কর।" ইত্যাদি

দ্বিতীয়তঃ, "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" হিমালয়ের উত্তরস্থ দেশসমূহের উল্লেখ আছে। একস্থলে আছে—"তস্মাৎ এতস্যাম্ উদিষ্যাম্ দিশি যে কে সা পরেন হিমবন্তং জনপদাঃ উত্তর কুরভঃ উত্তর মদ্রাঃ ইতি বৈরাজ্যয়া তে বিশিষ্যন্তে বিরলঃ ইতি ব্রতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষ্যতে।"

এই পুস্তকের ৮ম সংখ্যার ২৩ পৃষ্ঠায় আছে :—

"এতম্ হ বৈ ঐন্দ্রম্ মহাবিষেকম্ বাশিষ্ঠঃ সত্যহভ্যোঃ ত্যরাতয়ে জনান্তপয়ে প্রভাচ। তস্মাৎ উ অত্যারাতির জানন্তাপর অরাজা সন্ বিথয়া সমন্তং সর্ব্বতঃ জয়ান্ পরিযাতাং। স হ উবাচ বাশিষ্ঠঃ সত্যহভ্যঃ অতৈশির বৈঃ-সমন্তং সর্ব্বতঃ পৃথিবীং। মহন্ মা গময়া—ইতি। স হ উবাচ অত্যারাতির জনান্তাপর যদা ব্রাহ্মণ উত্তরকুরুম জয়েয়ম্ অথ ত্বং উ হ এব পৃথিব্যৈঃ রাজা স্যা সেনাপতিরেব তেহহং স্যম্—ইতি। স হ উবাচ বাশিষ্ঠঃ সাত্যহব্যঃ দেবক্ষেত্রম্ বৈঃ তদ্ ন বৈঃ তদ্ মর্ত্ত্যোঃ যেতুম্ অর্হতি অদ্রুক্ষে। বৈঃ মে আ'তাঃ ইদং দদে—ইতি। ততো অত্যা-রাতম্ জানন্তপিম্ আত্মবীর্য্যাং নিশুক্রম্ অমিত্র তাপনো শুষমিনঃ শৈব্যে জঘান। তস্মাৎ এবম্বিদুষে ব্রাহ্মণয়া এবম্‌চক্রষে ন ক্ষত্রিয়ো দ্রুহেৎ ন ইদ রাস্ত্রাৎ অভপদহেয়েৎ ন ইদ তামপ্রণো জহৎ।" এস্থলেও উত্তরকুরুর উল্লেখ হইয়াছে।—

রামায়ণেও উত্তরকুরুর উল্লেখ আছে। ইহাতে উত্তর-প্রদেশের বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটী পাই—

"তান্ গচ্ছতঃ হরিশ্রেষ্ঠ বিশালান্ উত্তরান্ কুরুন্। দানশীলান্ মহাভাগান্ নিত্যতুষ্টান্ গত জরনি। ন তত্র শীতম্ উষ্ণম্ বা ন জরা নাময়স্তথা। ন শোকো ন ভয়ম্ বা'পি ন বর্ষং না'পি ভাস্করঃ।"

উপরোক্ত শ্লোকে উত্তরকুরুর অনেক প্রশংসা করা হইয়াছে।

মহাভারতেও উত্তরকুরুর উল্লেখ আছে।—অর্জ্জুন যখন দিগ্বিজয় করিতে হরিবর্ষস্থ উত্তরকুরু-প্রদেশে উপস্থিত হন, তখন সেখানকার প্রহরীরা তাঁহাকে এইরূপে সম্বোধন করিতেছে,—

"পার্থ নেদম্ ত্বয়া শক্যম্ পুরম্ যেতুং কথঞ্চন। ইদং পুরং যঃ প্রবিশেৎ ধ্রুবং ন স ভবেৎ নরঃ। ন চাত্র কিঞ্চিম্ জেতব্যম্ অর্জ্জুনাত্র প্রদৃশ্যতে। উত্তরকুরবো হি এতে নাত্র যুদ্ধম্ প্রবর্ত্ততে। প্রবিষ্টোঽপি কৌন্তেয় নেহ দ্রক্ষসি কিঞ্চন। নহি মনুষ্যদেহেন শক্যম্ অত্রাবিভিক্ষিতম্।"

অধ্যাপক লাসেন বলেন যে, উত্তরকুরু বলিয়া বাস্তবিকই একটী দেশ ছিল। ইহা হিন্দুদিগের কল্পনা-প্রসূত নহে; কারণ, বেদে ও পুরাণসমূহে যেভাবে ঐ প্রদেশের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাতে ঐ প্রদেশ অলীক কল্পনাসম্ভূত বলিয়া কোনমতে বিশ্বাস হয় না।

তিনি আরও বলেন যে, টলেমী ঐ প্রদেশ জানিতেন। তিনি Ottorokorna নামক একটী দেশের পর্ব্বত ও জাতির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক লাসেনের মতে টলেমীর উল্লিখিত Ottorokorra কাসগার-প্রদেশের পূর্ব্ব হইতে পারে।

চতুর্থতঃ অথর্ব্ব-বেদে উল্লেখ আছে যে, কুষ্ঠ নামক একপ্রকার উপকারী লতা হিমালয়ের অপর দিকে জন্মায়—"উদান্ যাতো হিমবতঃ প্রাচ্যাম্ নীরসে জনম্।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই সময়ের জনগণ হিমালয়ের অপর পারের পরিচয় জানিতেন।

পঞ্চমতঃ, 'সংখ্যায়ণ' গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, সে সময়ে ভাষা-শিক্ষার্থ লোকে উত্তর-প্রদেশে গমন করিতেন—"পঠ্যা স্বস্তির উদিচিম্ দিশম্ প্রাজানাৎ। ভাগ বৈঃ পঠ্যা স্বস্তি। তস্মাৎ উদিচ্যাম্ দিশি প্রজ্ঞানততরা ভাগ উদেতি। উদঞ্চে উ এব যান্তি বাচম্ শিক্ষিতম্। যো বা ততঃ আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে 'ইতি স্ম আহ'। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাত।"

উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বহুপূর্ব্বে উত্তর-দেশ ভারতবাসীদিগের পরিচিত ছিল।

বেন্দিদাদের প্রথম ফর্গর্দে প্রাচীন আর্য্যজাতির আদি-বাসস্থান-সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না, এক্ষণে তাহারই আলোচনা হইবে। নিম্নলিখিত কয়েকটি স্থান প্রথম ফর্গর্দ হইতে উদ্ধৃত হইল।

১-৪। অহুর মজদ জরথুষ্ট্রদিগকে বলিলেন, পূর্ব্বে যেস্থান কোনকালে অধ্যুষিত ছিল না, আমি তাহাকে একটী সুন্দর প্রদেশে পরিণত করিয়াছি। আমি যদি এইরূপ না করিতাম, তবে সমস্ত প্রাণী ঐর্য্যণবেজো প্রদেশে প্রস্থান করিত।

৫-৯। আমি সর্ব্বপ্রথমে ঐর্য্যাণবেজো প্রদেশ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করি। তারপর অঙ্গর মঞ্জু (Angra mainyus) ইহাকে নষ্ট করিবার জন্য একটী বৃহৎ সর্প ও তুষারের সৃষ্টি করে। এখন সেখানে দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম।

১৩-১৪। আমি অহুর মজদা গাউ নামক দ্বিতীয় সুন্দর স্থানের সৃষ্টি করি, এখানে সুগ্ধ (Sughdha) প্রদেশ অবস্থিত।

১৭-১৮। আমি তারপর মউরু (Mouru) নামক তৃতীয় সুন্দর স্থল সৃষ্টি করি।

২১-২২। আমি তারপর বখ্ধি (Bakhdhi) নামক চতুর্থ সুন্দর স্থল সৃষ্টি করি।

২৫-২৬। আমি তৎপরে নিশাই (Nisai) পঞ্চম সুন্দর স্থলের রচনা করি।

২৯-৩০। আমি পরে হরজু নামক ষষ্ঠ সুন্দর স্থলের রচনা করি।

৩৩-৩৬। আমি Vaekereta নামক সুন্দর স্থলের সৃষ্টি করি। এখানে ডুজাক্ (Dujak) প্রদেশ অবস্থিত। অঙ্গর-মঞ্জু ইহা নষ্ট করিবার জন্য Pairika khnathaitir সৃষ্টি করিল।

৩৭-৩৮। আমি তৃণপূর্ণ উর্ভ নামক অষ্টম সুন্দর স্থলের রচনা করি।

৪১-৪২। আমি Khnenta নামক নবম সুন্দর স্থানের রচনা করি। Vehekana এখানে অবস্থিত।

৪৫-৪৬। আমি হরকইতি নামক দশম সুন্দর স্থানের রচনা করি।

৪৯-৫০। হেতুমৎ (Haetumat) নামক একাদশ সংখ্যক সুন্দর প্রদেশের রচনা করি।

৫৯-৬০। আমি রাঘ (Ragha) নামক দ্বাদশ সংখ্যক (Twelfth) সুন্দর স্থানের রচনা করি। ইহা তিনটী দুর্গযুক্ত ছিল।

৬৩-৬৪। আমি চাখ্র (Chakhra) নামক ত্রয়োদশ সংখ্যক (Thirteenth) সুন্দর সুদৃঢ় স্থানের রচনা করি।

৬৭-৬৮। আমি বরেন (Varena) নামক চতুষ্কোণবিশিষ্ট চতুর্দ্দশ সংখ্যক (Fourteenth) সুন্দর স্থানের রচনা করি। এখানে Thraetaono জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং ডাহক (Dahaka) নামক সর্পকে বধ করিয়াছিল।

৭২-৭৩। আমি হপ্তহেন্দু (Haptahendu) নামক পঞ্চদশ সংখ্যক সুন্দর স্থানের রচনা করি; কিন্তু অঙ্গ্রমঞ্জু এখানে পাপ এবং ব্যাধির সৃষ্টি করিয়াছিল।

৭৬-৭৭। আমি ষোড়শ বারে সমুদ্রকূলস্থিত শাসনকর্ত্তা-বিহীন সুন্দর জাতির সৃষ্টি করি।

৮১। ইহা ব্যতীত আরও সুন্দর, সমুচ্চ, জনপরিপূর্ণ, বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী অনেক প্রদেশ আছে।

এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকারের উপরোক্ত উদ্ধৃত স্থানসমূহের ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

হৌগ বলেন যে, Airyana-vaejo প্রদেশে দশমাস শীতের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, উক্ত প্রদেশ অনেক উত্তর দিকে অবস্থিত ছিল; কিন্তু সে স্থান যথার্থরূপে নিরূপিত করিতে পারা যায় না। ইরানীয়ানগণ যে সুদূর উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, ইহা কোনমতে অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

অধ্যাপক স্পীগেন বলেন যে, Airyana-vaejo প্রদেশ Oxus ও Jaxartes নদীর উৎপত্তি স্থলের নিকটেই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। দ্বিতীয় প্রদেশ Sogdiema, তৃতীয় মার্ভ্ (প্রাচীন Margiana), চতুর্থ বাক্ষ্ (প্রাচীন Bactria), পঞ্চম নিশা (Nisa) বা প্রাচীন (Nisaea), ষষ্ঠ হিরাট (প্রাচীন Asia)। স্পীগেলের মতে সপ্তম প্রদেশ কাবুল (Kabul) ও Burnouf, Lassen এবং Haugএর মতে উহা Sejestan. স্পীগেলের মতে নবম প্রদেশ Gurgan এবং Haugএর মতে উহা Kandahar; দশম প্রদেশ Arachosia, একাদশ সংখ্যক প্রদেশ Hilmend নদীর উপত্যকা, Rai দ্বাদশ সংখ্যক প্রদেশ। ইহা Mediaতে অবস্থিত। ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সংখ্যক প্রদেশদ্বয়ের নির্ণয় হয় নাই। পাঞ্জাব পঞ্চদশ সংখ্যক প্রদেশ; কারণ, এখানে সাতটী নদী আছে এবং Haugএর মতে ষোড়শ সংখ্যক প্রদেশ Caspian Seaর উপকূলে হইতে পারে।

হৌগ বলেন, বেন্দদাদের প্রথম ফর্গর্দ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহা বহু প্রাচীন কালে রচিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক স্পীগেন বলেন যে, প্রথম ফর্গর্দ হইতে আমরা ইণ্ডো-জার্ম্মানিক ও বিশেষতঃ পারস্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস কিছু কিছু জানিতে পারি।

রোড্ বলেন যে, ইহা হইতেই ইরানীয়ানজাতির ক্রমবিস্তার জানিতে পারা যায়। প্রথমোল্লিখিত প্রদেশই এই জাতির আদি-বাসস্থান এবং ইহার পরবর্ত্তী দেশসমূহে তাঁহারা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছিলেন। যেভাবে উক্ত দেশ সমূহের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসিতে পারা যায়। অধ্যাপক স্পীগেন এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ মত দেন না। তিনি বলেন যে, উদ্ধৃত দেশসমূহের তালিকা হইতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে, ইরানীয়নগণ ঐ প্রদেশ-সমূহে ক্রমশঃ গমন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে ইরানীয়ণ-গণের সেই সময়কার ভৌগোলিক জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পিকুটে বলেন যে, উপরোক্ত দেশসমূহের তালিকা হইতে আমরা ইরানিয়ান জাতির ক্রম-বিস্তারের পরিচয় পাই। Ormuzd প্রথমে যে সুন্দর প্রদেশের সৃষ্টি করেন, তাহা Airyana-vajeo বলিয়া খ্যাত। Pitter এবং Lassen বলেন যে, দশমাস শীত ও দুইমাস গ্রীষ্ম ইরানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণস্থ Belurtagh এবং Mus tagh নামক সমুচ্চ উপত্যাকাদ্বয়েই হইতে পারে; কিন্তু এখানে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্থান থাকিতে হইলে, জলবায়ুর অসম্ভবরকমের পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। এরূপ অসভ্য ও ক্ষুদ্র প্রদেশ কিরূপে বিশাল আর্য্যজাতির আদি-বাসস্থান হইতে পারে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায় না। অতএব আমরা এই প্রদেশের ঐতিহাসিক সত্য হইতে পৌরাণিক অংশ পরিত্যাগ করিব।

Ai:yana-vaejo প্রদেশ বোধ হয় আর্য্য জাতির প্রাচীন আবাসস্থল ছিল। আর্য্যগণের সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত পারসিক-আর্য্যগণ উহাঁদের দ্বারা তাড়িত হইয়া Belurtagh ও উচ্চ উপত্যকার দিকে অগ্রসর হন এবং পরে এখান হইতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বেনিদাদে উল্লিখিত প্রদেশসমূহে গমন করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ কোন্ পথ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন ?

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, Bactria প্রদেশই ইণ্ডো-য়ুরোপীয়ন জাতির আদি-বাসস্থান ছিল। এক্ষণে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন ?

শ্লেগেলের মতে আর্য্যগণ পশ্চিম দিক হইতেই এদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি, দক্ষিণ দিক হইতে জলপথে ভারতে প্রবেশ বা উত্তর দিক হইতে হিমালয় পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসা কতদূর আয়াসসাধ্য, তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন, ভারতবর্ষের পশ্চিম দিক অনেকটা উন্মুক্ত ; কারণ, কাশ্মীর প্রদেশ হইতে ইণ্ডাসের ‘ডেল্টা’ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থানটী নদীর দ্বারা বেষ্টিত।

স্রোতের তীব্রতা হেতু ইণ্ডাস নদীর উত্তরদিক হইতে আসা যায় না। ইহা ব্যতীত ইহার দক্ষিণ উপকূল পর্ব্বতবেষ্টিত। দক্ষিণে সমুদ্র-সঙ্গমের নিকট ইহা জলাভূমির দ্বারা বেষ্টিত। আরও অন্তর প্রদেশে এবং এমন কি, পূর্ব্বকথিত পঞ্চনদীর সঙ্গমস্থলের উপরেও ইহা বালুকাময় মরুভূমিদ্বারা বেষ্টিত। এস্থল ও Attockএর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অনায়াসগম্য এবং এই কারণেই Alexander, Semiramis, Selucus, Mahmud of Ghazniপ্রভৃতি আক্রমণকারিগণ এই পথ দিয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন এবং এইজন্যই হিন্দুদেরও উক্ত পথ দিয়া ভারতে আসা সম্ভব।

Lassenও উপরোক্ত মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, আর্য্যগণ একটিমাত্র পথ দিয়াই ভারতে আসিতে পারেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন এবং পশ্চিম কাবুলিস্তান হইতেই তাঁহারা পাঞ্জাবে আসিয়াছিলেন। Oxus নদীতীরস্থ প্রদেশ হইতে পূর্ব্ব কাবুলিস্তান, এস্থান হইতে Gilgit ও Gilgit হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যে সমস্ত পথ গিয়াছে, তাহার সবগুলিই অত্যন্ত বন্ধুর ও বিপদসঙ্কুল এবং এসমস্ত পথ যে বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও মনে হয় না। বিশালআর্য্য-বাহিনী যে এ পথ দিয়া ভারতে আসিবেন, তাহা কথনই মনে হয় না। পূর্ব্বে যে সমস্ত জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার পশ্চিম দিকস্থ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়াই আসিয়াছিলেন এবং যদি Bactria হইতেই আর্য্যগণ ভারতে আসেন, তবে ইহাই এদেশে আসিবার একটীমাত্র পথ।

অধ্যাপক রোট, তাঁহার Literature and History of the Veda নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বৈদিক যুগের অধিকাংশ পরিবারই যমুনা অপেক্ষা ইণ্ডাস্ নদীর নিকটস্থ প্রদেশে বাস করিতেন এবং স্তোত্রসমূহে যে যুদ্ধের উল্লেখ আছে, তাহা উত্তরদিক হইতে আগমনকারী জাতিসমূহ যখন দক্ষিণস্থ জাতিসমূহকে আক্রমণ করেন, তখনই ঘটিয়াছিল। ঋগ্বেদের স্তোত্রসমূহে প্রায়ই সিন্ধু নদীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে ; গঙ্গার উল্লেখ কেবল এক-স্থলে হইয়াছে।

অধ্যাপক বেবের তাঁহার Recent Investigation on Ancient India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বেদের প্রাচীন স্তোত্রগুলি হইতে প্রমাণিত হয় যে, সে সময়ে আর্য্যগণ ভারতের বাহিরে না হইলেও, ইহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিতেন অর্থাৎ পাঞ্জাব ও কাবুল এবং Indus নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে। তাঁহাদের এই প্রদেশ হইতে আগমন ও ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তার, তাঁহাদের সাহিত্য হইতে বেশ জানা যায়। মারওয়াড় মরুভূমির উত্তরে শতদ্রু হইতে স্বরস্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত পথই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সরস্বতী নদীর নিকটেই তাঁহারা অনেকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন ; কারণ, দেখা যায় যে, ঐ প্রদেশকে পরে তাঁহারা অত্যন্ত পবিত্র বলিয়া গণ্য করিতেন।

মুসোলাঙলোয়াও উপরোক্ত মতের সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, আর্য্যাবর্ত্তে যে সমস্ত আর্য্যগণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহারা Indus নদীর পশ্চিম দিকস্থ প্রদেশসমূহ হইতেই আসিয়াছিলেন।

বৈদিক স্তোত্রসমূহে ইণ্ডো-এরিয়ানদের উত্তর-পশ্চিমদিক্ হইতে আগমনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্তোত্রগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায়, সে সময়ে লোকেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-দিকস্থ এবং ইণ্ডাস্ ও তাহার পরপারস্থিত দেশসমূহ ভালরকমই জানিতেন ; কিন্তু ভারতের পূর্ব্বদিকস্থ ও মধ্যস্থ দেশসমূহের বিষয় তাঁহারা অল্পই আনিতেন ; কারণ, ইহাদের উল্লেখ মাত্র দুই-একস্থানে আছে।

অধ্যাপক রোট, তাঁহার Literature and History of the Veda নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ঋগ্বেদের অনেকস্থলে সিন্ধু (ইণ্ডাস্) নদীর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গার উল্লেখ কেবল-মাত্র একটী স্তোত্রে দেখা যায়। ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত স্তোত্রটীতে ইণ্ডাস্ নদীর উল্লেখ আছে।

“অমদান্ স্তোমান্ প্রভবে মনিষা সিন্ধব অদ্ধি ক্ষিয়তে ভাব্যাখ্যা। যো মে সহস্রম্ অমিমীত সভান্ অতুর্ত্তো রাজা শ্রভা ইচ্ছমানাঃ।”

এই স্তোত্রের সপ্তম শ্লোকে গান্ধার দেশের উল্লেখ আছে —“সর্ব্বা’হস্ অস্মি রোমশা গান্ধারি- নাম্ ইবাবিক।” লাসেনের মতে গান্ধার প্রদেশ ইণ্ডাস্ নদীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

ঋগ্বেদে আরও কতকগুলি নদীর উল্লেখ আছে, যথা—তৃষ্ণা, রসা, শ্বেতি, কুভা, গোমতী, ইত্যাদি। অধ্যাপক রোট-এর মতে কুভা নদী কোফেন বা কাবুল নদীরই অপর একটী নাম। ঋগ্বেদে পাঞ্জাব প্রদেশের নদীগুলির পর্য্যায়ক্রমে উল্লেখ আছে ; যথা—পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ইণ্ডাস্, তিস্তা, অসিক্নি বা চীনাব, পরুষ্ণীরা, ইরাবতী, বিপাস্ বা বিয়া ও স্বতুদ্রি বা সাট্‌লেজ।

স্বরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা নদীত্রয়েরও উল্লেখ আছে। নিম্ন-লিখিত শ্লোকগুলিতে স্বরস্বতীর গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে—“নি, ত্বা দধে বারে আ পৃথিভ্যাঃ ঈলায়াষ্পদে স্বজিনত্তে অহ্লাম। দৃষদ্বত্যাম্ মানুযে আপায়াং সরস্বত্যাম্ রেভর্ অগ্নি দিদিহি।”

অন্য একস্থলে আছে। ঋগ্বেদ, (৬।৬১।২) “ইয়ম্ মুশ্মেভির্ বিশখা ইবারুজৎ সানুগিরিনাং তবিশেভির্ ভির্ম্মিভিঃ। পারাবত-ঘ্নীং অবমে মুভকতিভিঃ সরস্বতীম্ বিশাশেম্ ধিতিভিঃ।”

ঋগ্বেদের সপ্তম খণ্ডের ৯৫ ও ৯৬ সংখ্যাক স্তোত্রদ্বয়ে সরস্বতীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইয়াছে। প্রথম স্তোত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকগুলি এই ঃ—

“প্র ক্ষোদযো ধায়সা যস্ত্রে এষা সরস্বতী ধরুণম্ আয়সি পুঃ। প্র বাবধানা রথি এব যাতি বিশ্বাঃ অপো মহিনা সিন্ধুর অন্যাঃ। একা অচেতৎ সরস্বতী নদীনাম্ সুচির যাতি গিরিভ্যাঃ আ সমুদ্রাৎ।”

ঋগ্বেদে দুই-তিনস্থলে যমুনার উল্লেখ আছে—(ঋগ্বেদ, ৫।৬২।১৭)

যমুন্যাম্ অদ্ধি শ্রুতম্ উদ্ রাধো গব্যম্ মৃতো নি রাধো অশ্বম্ মৃতো।”

ঋগ্বেদে (৭।১৮।১৯) লিখিত আছে যে, ইন্দ্রকে যমুনা তুষ্ট করিয়াছিল। ঋগ্বেদে গঙ্গার উল্লেখ দুই-একস্থানে আছে ; কিন্তু সিন্ধু ও সরস্বতীর যেরূপভাবে উল্লেখ হইয়াছে, গঙ্গার উদ্দেশে সেরূপ কোন স্তোত্র লিখিত হয় নাই।

ঋগ্বেদে তিন স্থানে সরযূর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ—৫।৪।৩০, ১৮ ; ৫।৫৩।৯ ; ৩।১০।৬১।৯।

প্রথম শ্লোক এইরূপ—“উতত্যা সদ্যাঃ আর্য্য। সরযোর ইন্দ্র পারতাঃ। অর্ণা-চিত্ররথা অবধীঃ।”

অধ্যাপক লাসেন বলেন যে, ঋগ্বেদের স্তোত্রসমূহ হইতে, ভারতবর্ষস্থ আর্য্যগণ সে সময়ে কোন্ স্থানে বাস করিতেন, তাহা আমরা জানিতে পারি।

ঋগ্বেদের দশম ভাগে গঙ্গা ও যমুনার একবারমাত্র উল্লেখ আছে। সরস্বতী ও সিন্ধু নদীরই উল্লেখ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আছে। সরযূর তিনবারমাত্র উল্লেখ আছে। এই সকল হইতে বুঝা যায় যে, ঋগ্বেদের রচনাকালে ইণ্ডো-এরিয়ানগণ পূর্ব্ব-কাবুলিস্তান ও পাঞ্জাবের সরস্বতী পর্য্যন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের দশম স্তোত্রগুলির যখন রচনা হইয়াছিল, তখন আর্য্যগণ পূর্ব্বে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

অথর্ব্ব বেদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আর্য্যগণ সে সময়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন।

শ্রীরাম শর্ম্মা

“চোপ্‌রও”

মিচেল কর্ত্তৃক গৃহীত আলোক চিত্র হইতে।

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ১৪ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ {১ম খণ্ড, ২১শ সংখ্যা

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন শুনিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষের নৌ-তত্ত্ব (Indian shipping) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া, ভারতে ও য়ূরোপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই আলোচনার ফলেই তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট হইতে 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত Indian shipping নামক পুস্তক সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইঁহার ইংরাজী রচনার সহজ সরলভঙ্গী ও প্রসাদগুণ সর্ব্বথা প্রশংসার্হ। ইংরাজি-সাহিত্যে এরূপ ব্যুৎপত্তিসত্ত্বেও তিনি দীনা বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না। "প্রবাসী," গৃহস্থ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ এবং হুগলী-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধ ও কলিকাতার সাহিত্য-সম্মিলনীতে আলোচনা তাঁহাকে দেশবাসীর নিকট বঙ্গ-সাহিত্যের অকপট সুহৃদ্‌রূপে পরিচিত করিয়াছে। তাঁহার নিকট আমরা Indian shipping পুস্তকের বঙ্গানুবাদ আশা করিতে পারি না কি ? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ শরীরে দেশের ও সাহিত্যের সেবা করিয়া অমর হউন।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যাপক, শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম্, এ, বি, এল্। ইংরাজি, ইতিহাস ও ধন বিজ্ঞানে এম্, এ, পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি "প্লুটার্কের" বঙ্গানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহার অনূদিত "সিজার" বাহির হইয়াছে। মূলকে কোনরূপে বিকৃত না করিয়া তিনি যে অনুবাদে এত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। পঞ্চাননবাবু বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া যশোলাভ করুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা। অন্যত্র এই পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হইল।

Sir Henry Roscoeর নাম ইংরাজি-শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সুপরিচিত। ইনি একজন বিখ্যাত রসায়নবিৎ ছিলেন। গত ২০শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কোন মহাপুরুষ কোন দেশ বা জাতির সম্পত্তি নহেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত জগতের ক্ষতি হইয়া থাকে। তাঁহার মৃত্যুতে সুধু ইংলণ্ডের নয়, সমস্ত জগতের যে ক্ষতি হইল, তাহা শীঘ্র পূর্ণ হইবার নয়। রস্‌কো লিভারপুলের হাই স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। লণ্ডন সহরের য়ুনিভারসিটি কলেজ হইতে তিনি বি, এ, উপাধি লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার মহতী প্রতিভা শীঘ্রই তাঁহাকে যশস্বী করিয়া তুলে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি Heipelbergএর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ্, ডি উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি অনরারী এম্, ডি উপাধি পান। তিনি মানচেস্‌টারে Owens কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার পর তিনি য়ূরোপের নানা বৈজ্ঞানিক সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার গভীর গবেষণার জন্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজকীয় সুবর্ণপদক উপহার দেওয়া হয়। ইংলণ্ডে বিশেষ পারদর্শিতা না দেখাইয়া কেহ Royal Medalist পাইতে পারেন না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি Society of Chemical Instituteএর অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। ইহা ব্যতীত তিনি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য ছিলেন। তিনি রসায়ন-সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একজন সর্ব্বজনবিদিত মহাপুরুষের তিরোভাবে সমস্ত জগতের উপর শোকের গাঢ় ছায়া পতিত হইয়াছে; ইংলণ্ডের জ্যোতির্ম্ময় নভোমণ্ডল হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িয়াছে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতি সমগ্র জগতের পৃষ্ঠ হইতে অপসারিত হওয়ায়, আমরা আজ রস্‌কোর প্রতিভা ও উপকারিতা যে পরিমাণে উপলব্ধি করিতেছি, বুঝি-বা এমনভাবে কোনদিন বুঝিবার সুযোগ পাই নাই।

আমরা প্রিয়দর্শন,বিখ্যাত শিল্পী শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত হইয়াছি। ইউ, রায় যে বাঙ্গালার কতকটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সে কথা আজ কাহাকেও বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী কেহ নাই, যিনি তাঁহার কার্য্যের পরিচয় কোন-না-কোন সূত্রে পাইয়াছেন। গত ২২এ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রায় ৩০ বৎসর কাল ধরিয়া, শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট শিশু-সাহিত্য তিনিই রচনা করেন। শিশুগণের শিক্ষার জন্য তিনি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনেও, সময় ও অর্থব্যয় করিতে কোনদিন পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার সম্পাদিত "সন্দেশ" নামক শিশু-পাঠ্য পত্র সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বালকগণ প্রকৃতই "সন্দেশ"কে সন্দেশের ন্যায় বা ততোধিক লোভনীয় বলিয়া মনে করে। "সেকালের কথা" তাঁহার প্রথম রচনা। সঙ্গীতেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা তিনি বহুদিন মনোনিবেশ-সহকারে চর্চ্চা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইহা প্রচারের জন্য তাঁহার চেষ্টার কথা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার রচিত "স্বরলিপি" ও কতিপয় ব্রহ্ম-সঙ্গীত তাঁহার এ বিষয়ে পটুতার পরিচায়ক; কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরব শিল্প-রচনায়। যতদূর মনে হয়, তাহাতে বোধ হয় বঙ্গবাসীই প্রথমে আমাদের দেশে চিত্র-প্রচলনের ব্যবস্থা করেন; কিন্তু তখন 'ইলেক্‌ট্রো ব্লকে'র সৃষ্টি হয় নাই। কাঠের ছাঁচ কাঁটিয়া ছবি ছাপান হইত। উপেন্দ্রবাবুই আমাদের দেশে 'হাফ্‌টোন' চিত্রের প্রচলন করেন। দেশে তখন কাহারও নিকট হইতে কোন শিক্ষা বা সাহায্যলাভের আশা ছিলনা, কেহ শিল্পের আদরও তখন বুঝিত না; এরূপ অবস্থায় এ‌কক কোন কর্ম্মে সফলতালাভ করা কত বড় প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি এই বিষয়ে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এই সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আজ য়ূরোপও তাঁহাকে শিল্পী বলিয়া আদর করিতে ও শিল্প-সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সম্ভ্রমের সহিত শ্রবণ করিতে পশ্চাৎপদ নহে। প্রতিভা ব্যতীত ভগবান্ তাঁহাকে চরিত্রে বরণীয় করিয়াছিলেন। অতি-বড় শত্রুও তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারে না। তাঁহার প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি ও হৃদয়গ্রাহী আলাপ সকলেরই চিত্ত হরণ করিত। আজ তাঁহাকে হারাইয়া আমরা সকলেই সন্তপ্ত।

"ঝরা ফুল" ও "শান্তিজলে"র কবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন কাব্য "সন্ধ্যামণি" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

"উজানী" ও "বন-তুলসী"র কবি শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নূতন কাব্য "বীথি" যন্ত্রস্থ।

ইউনিভার্সিটি-ল-কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগ্‌চি মহাশয় মূল ফরাসী ভাষা হইতে কয়েকটি ছোট গল্পের অনুবাদ করিয়া "ফরাসী গল্প" প্রকাশিত করিয়াছেন।

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(ঝ)

সিন্ধুনদের মূর্ত্তি

খৃঃ পূর্ব্ব ২৫০ বৎসর হইতে প্রায় ৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। দুর্গম গিরিমালা, দুর্ভেদ্য বনশ্রেণী কিংবা দুরতিক্রম্য সাগর পর্য্যন্ত সে ধর্ম্মের গতি-রোধ করিতে পারে নাই। সেই প্রাচীনকালে, বৌদ্ধধর্ম্মের সেই প্রভাবের যুগে ভারতবর্ষের বণিক্‌গণ যে আলেকজেন্দ্রিয়ায় গমন করিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সময়ে একজন বণিক্ আলেকজেন্দ্রিয়ায় সিন্ধুনদের একটি মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিল। Ancient Commerce of India নামক গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক গাস্‌টাভ ওপার্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের মূর্ত্তিটী জনৈক গ্রীককর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় দাসের মূল্য

পর্ত্তুগীজগণ এদেশে আসিয়া যখন ভারতের বাণিজ্যপথ অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, তখন তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা-মন্দির সুদৃঢ় হইয়াছে। তাহাদিগের রণতরী হইতে তখন যে কামান-গর্জ্জন হইত, তাহা শুনিয়া অন্যান্য বৈদেশিক বণিক্‌গণ ভীত ও চমকিত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ ছলে, বলে, কৌশলে এদেশের নর-নারীদিগকে ধৃত করিয়া প্রতিদিন গৃহপালিত পশুর ন্যায় বিক্রয় করিত। সেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৭॥০ টাকায় বাঙ্গালার বাজারে দাস বিক্রীত হইত। সুন্দরী যুবতী দাসীও সেই মূল্যেই পাওয়া যাইত। ছয় মুদ্রায় দাস ক্রয় করিয়া জনৈক পর্ত্তুগীজ স্বদেশে সে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল।

ক্যালিকো বস্ত্র

আমরা যে ছত্র ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই ক্যালিকো নামক বস্ত্রে নির্ম্মিত। ইহা এককালে ভারতবর্ষেরই নিজস্ব ছিল। মছলিপত্তন হইতে ক্যালিকো ক্রয় করিয়া ইংরাজ বণিক্‌গণ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উহা ব্যান্‌টাম এবং শ্যাম দেশে বিক্রয় করিত।

কোম্পানীর কুঠিতে তাস-ক্রীড়া

সে আজ বহুদিনের কথা। তখনও কোম্পানী-বাহাদুর এ দেশে তেমন প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। যে সকল ইংরাজ-বণিক্ তখন এ দেশে বাণিজ্যব্যপদেশে বাস করিত, কোম্পানীর কর্ত্তৃগণ তাহাদিগের নৈতিক উন্নতির জন্য নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদেশে কোম্পানীর কুঠিতে তাস-ক্রীড়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কেহ জুয়া খেলিতে পাইত না; অতিরিক্ত মদ্যপান বা সমারোহের সহিত প্রীতিভোজ প্রভৃতিও কুক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হইত।

কোম্পানী ও ভারতবাসী

কোম্পানীর প্রথম যুগে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) বিলাতের কর্ত্তারা আদেশ পাঠাইয়াছিলেন—"Trust none of the Indians, for their bodies and souls be wholly treation." কোন ভারতবাসীকেই বিশ্বাস করিও না; কারণ, তাহাদের দেহ ও মন রাজদ্রোহের আকর:। ইহা ১৬০৩ খৃঃ অব্দের কথা।

ফিরিঙ্গি

পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণ এ দেশে আসিয়া যে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা শোণিতের অক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত রহিয়াছে। ভারতবাসিগণ তাহাদিগকে দৈত্যের ন্যায় ভয় করিত এবং খ্রীষ্টানমাত্রকেই পর্ত্তুগীজ মনে করিয়া সকলকেই 'ফিরিঙ্গি' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিল। বর্গীর নামে যেমন একদিন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার নর-নারী ভয়-বিচলিত হইত, ফিরিঙ্গির নামেও সেকালে সেইরূপই হইত। [The Portugals which they call by the name of Fringis. W. Burton in Hakluyt, V. 32]

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

রহস্য-বিভ্রাট্

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সোমবার দ্বিপ্রহরে ব্যারিষ্টার মিষ্টার বোসের প্রাসাদতুল্য ভবনের এক সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে মেয়েদের হাট বসিয়াছিল। বাড়ীর পুরুষেরা কর্ম্মোপলক্ষে যার যার কর্ম্মস্থলে গিয়াছিল। সেই সুযোগে আশ-পাশের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া এই বাড়ীটাকে একটা মেয়ে-সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল।

মিঃ বোসের পত্নী সুহাসিনী—যুবতী, রসিকা, মিষ্টহাসিনী এবং মধুরভাষিণী; তাই সমবয়স্কা মেয়েরা তাঁহার সংসর্গে বড়ই প্রীতি অনুভব করিতেন এবং অবসর সময় তাঁহার নিকট আসিতেন। সুহাসিনীও তাঁহার ফুল্ল কমলতুল্য আননে ও ইন্দীবর লোচনদ্বয়ে মধুর হাসি ফুটাইয়া, তাঁহাদের প্রত্যেকের হাত ধরিয়া আবার আসিবার জন্য এমনই করিয়া অনুরোধ করিতেন যে, সে অনুরোধ এড়াইবার কাহারও সাধ্য থাকিত না। অবসর পাইলেই, ইঁহার নিকট আসিবার জন্য তাঁহাদের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত।

সমাগতা রমণীদের ভিতর সকলেই সুশিক্ষিতা ও সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্ভূতা। তাঁহারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য-বিষয়ক অনেক গবেষণা (যাহা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিলে, বর্ত্তমান সমাজে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে) করিলেন, নিজেদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিলেন এবং পুরুষদের নানাকার্য্যে ভুল ধরিয়া ফেলিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে লর্ড কিচনার ও এস্‌কুইথ্ কি কি ভুল করিতেছেন, মিস্ বোনার্জ্জী, বি, এ, (পলিটিক্যাল ইকনমীতে অনার ম্যান) তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন; 'এস্পিয়েটিং গ্যাস' কি কি দ্রব্য-সংযোগে তৈয়ারি হয়, মিসেস্ দাস (বিজ্ঞানাধ্যাপক মিষ্টার দাসের পত্নী) তাহা চুপি চুপি বলিলেন এবং আমেরিকা এই যুদ্ধে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে, মিস্ চকার্‌বর্ত্তী (ফিলজফির অধ্যাপক মিষ্টার গাঙ্গুলীর মাস্‌তুত বোন) তাহা নিশ্চিতভাবে বলিয়া দিলেন। তৎপরে বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা, অধঃপতন ও পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতার বিষয় আলোচিত হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, দু-এক বৎসরের ভিতর এই হিন্দু-সমাজ লুপ্ত হইয়া যাইবে।

অবশেষে সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ হইল। পরপারবাসী বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, টেকচাঁদ হইতে সুরু করিয়া বর্ত্তমান ছোট-বড় লেখক কেহই তাঁহাদের তীব্র সমালোচনার হাত এড়াইতে পারিলেন না। কেবল লেখিকাগণের কোমল অঙ্গ উক্ত সমালোচনা-রূপ ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইল না।—ইহারই নাম স্বজাতি-প্রীতি।

আলাপ খুব জমিয়াছিল। সুরসিকাগণ মাঝে মাঝে আলাপে 'রসান' দিতেছিলেন এবং কল-কল হাস্য-নিনাদে সমস্ত বাড়ীখানা মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

এইরূপে জটিল বিষয়ের তীব্র আলোচনায় শ্রান্ত হইয়া অবশেষে রমণীরা কোনও প্রকার হাল্‌কা আমোদের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। সিভিলিয়ান মিষ্টার দত্তের ভগ্নী মিস্ দত্ত সুগায়িকা। মাঝে মাঝে ব্রাহ্ম-সমাজে ও সাপ্তাহিক সম্মিলনীতে গায়িয়া তাঁহার যশঃ খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকলের উপরোধে-অনুরোধে তাঁহাকে উঠিয়া 'অর্গানে'র নিকট বসিতে হইল। দু-তিনটি গানের পর সেদিনকার মত সভাসঙ্গ হইল। সুহাসিনী হাসিমুখে সকলের সহিত কর মর্দ্দন করিয়া যার যার গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। তখন বাড়ীতে রহিল সুধু গৃহকর্ত্রী সুহাসিনী বা মিসেস্ বোস্, তাঁহার ননদ লীলা বা মিস্ বোস্, লীলার সহপাঠী সুগায়িকা মিস্ দত্ত ও তাঁহার ভ্রাতা সুকুমার এবং মিসেস্ বোসের বন্ধু মিসেস্ রায় (সেসন্-জজ্) মিঃ রায়ের পত্নী। সর্ব্বদা পরস্পর আসা-যাওয়া থাকাতে, ইঁহাদের বন্ধুত্ব খুব পাকিয়া গিয়াছিল। সুহাসিনীকে মিস্ দত্ত বৌদিদি এবং মিসেস রায় দিদি বলিয়া ডাকিতেন।

সমাগতা রমণীদিগকে বিদায় করিয়া ফিরিলে পর মিস্ দত্ত সুহাসিনীকে বলিলেন, "আমি খুব এক মজার ফন্দী এঁটেছি বৌদিদি! এঁরা সব আজ আস্‌বেন জান্‌তুম না, তাই মোটর গাড়ী আর সুকুকে নিয়ে এসেছি। এঁরা আসাতে ত খুবই আমোদ হয়েছে, তবে না এলে আরও আমোদ হত। ওঃ! কি মজাটাই যে এতক্ষণে হত, তা মনে হলেও পেট-ফাটা হাসি পায়। ওঃ-হোঃ-হোঃ-হিঃ-হিঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—মিস্ দত্ত হাসিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

সকলে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "কি রে, কি ফন্দী এঁটেছিস্?"

"ওঃ কি আর বল্‌ব,—কি আমোদটাই যে হত!—হোঃ-হোঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ হিঃ—"

সকলে অধিকতর আগ্রহসহকারে বলিলেন, "কি বল্ না রে! পাগলের মত অত হাসিস্ কেন?" মিস্ দত্ত হাসিতে হাসিতে পেট-ব্যথায় কাতর হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "ওঃ, আমি বল্‌তে পার্‌ব না। সুকুকে জিজ্ঞাসা কর। বল্ ত সুকু! হা-হা—"

সুকুমার বিজ্ঞের মত মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল। সকলে তখন সুকুমারকে ধরিয়া বসিল। সে দু-একবার কাসিয়া বলিল, "কথাটা হচ্ছে কি,—আজ ভোরে 'ড্রইং রুমে' বসে দিদি আর আমি 'বেঙ্গলী'তে টালিগঞ্জের ডাকাতির কথা পড়্‌ছিলাম।—'ডাকাতেরা মোটর চেপে এসে, রিভল্‌ভার-হাতে, চোক রাঙ্গিয়ে এতগুলো লোকের মাঝখান থেকে টাকা লুটে নিয়ে গেল' পড়ে দিদি কি-একটু ভাব্‌লে; তারপর হঠাৎ হোঃ-হোঃ করে হেসে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। আমি ত অবাক্। দিদি বল্লে 'ভারি এক মজার ফন্দী এঁটেছি সুকু,—তুমি যদি আমার সহায় হও।' আমি সোৎসাহে বল্লাম, 'কি ফন্দী?' দিদি বল্লে, 'দেখ, লীলার বৌদিদির ভাই পুলিশে কাজ করে। তার ভারি অহঙ্কার—পুলিশের চাকুরেদের ভেতর তার মত বুদ্ধি, সাহস কারুর নেই। পুলিশের বড় সাহেব তাকে সবচেয়ে ভালবাসেন। আয়, তাকে একটু জব্দ করে আসা যাক্।' আমি সাগ্রহে বল্লাম, 'কি করে জব্দ কর্‌বে?' দিদি বল্লে, 'চল্, মোটর নিয়ে লীলাদের বাড়ী যাই। দাদার রিভল্‌বার তিনটা সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি, লীলা পুরুষের পোষাক পরে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে, মুখটা রুমাল দিয়ে ঢেকে রিভলবার-হাতে

বৌদিদির দাদার বাড়ী গিয়ে সরাসর একেবারে তার ঘরে ঢুকে পড়্ব। তারপর রিভল্‌বার বাগিয়ে, ফাঁকা আওয়াজে ভয় দেখিয়ে, তার টাকা-কড়ি, স্ত্রীর গহনা-পত্তর সব নিয়ে লম্বা দেওয়া যাবে। তুই আমাদের মোটর চালাবি। এর ভেতর আর কাকেও নেওয়া চলে না। দেখিস্ না—কেমন রগড় হবে! বৌদিদির দাদার দেমাকটা একদম ভেঙ্গে ত যাবেই, তা’ ছাড়া এ কথা নিয়ে আমাদের বন্ধু-মহলেও বেশ একটা আমোদ হবে।’—তাই আমি ও দিদি মোটর নিয়ে এসেছি।”

এই প্রস্তাব সকলেই উৎসাহের সহিত অনুমোদন করিল। লীলা বলিল—“আমি নিজে বন্দুকটা বৌদিদির দাদার নাকের উপর ধরে বল্‌ব—‘তোমার স্ত্রীর গহনা দাও।’ বেচারার মুখ-খানা ভয়ে চুণ হয়ে যাবে। এবারে তার জারিজুরি ভাঙ্গ্‌বে!”

মিসেস্ রায় বলিলেন—“মিসেস্ মিত্রকে জব্দ কর্‌বার ভার আমি নিলুম। চল, আর দেরী নয়। মোটে তুটো বেজেছে বাড়ীর পুরুষেরা ফিরবার এখনও দেরী আছে। এর পরে হলে মিসেস্ বোসের দাদাও বেরিয়ে যেতে পারেন। তিনি তুপুরে তিনটে অবধি বাড়ী থাকেন। তুমিও চল সুহাস!”

মিস্ দত্ত বলিলেন, “না না তা হয় না। তা হলে ত আমরা ধরা পড়ে যাব। উনি থাকুন। এখনি কাজ সেরে ওঁর হাতে ওঁর বৌদিদির গহনা-পত্তর এনে দেব। উনি ওঁর বৌদিদিকে নিয়ে একটু মজা কর্‌বেন।”

মিসেস্ বোস্ একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—“আমার কিন্তু এটা ভাল বোধ হচ্ছেনা; তারপর কিসে কি হয়ে পড়্‌বে, কে জানে?”

মিসেস্ দত্ত লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—“বৌদিদির যেমন কথা! কে ধর্‌বে আমাদের? তোমার দাদার মূর্চ্ছা ভাঙ্গ্‌বার আগেই আমরা মোটর হাঁকিয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌ব। কি বল লীলা!”

লীলা মাথা নাড়িয়া বলিল, “নিশ্চয়। না বৌদিদি, তুমি আমাদের আমোদটা নষ্ট ক’র’ না।” অগত্যা মিসেস্ বোস্ চুপ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মনটা যেন কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করিতে লাগিল।

লীলা, মিস্ দত্ত ও মিসেস্ রায় পুরুষের মত মালকোঁচা দিয়া, আঁটিয়া-সাটিয়া কাপড় পরিয়া, পাগড়ীতে ভ্রমরকৃষ্ণ:চিকুর-দাম ঢাকিয়া, পকেটে রিভল্‌বার ফেলিয়া মোটরে গিয়া উঠিলেন। সুকুমার ভোঁ ভোঁ করিয়া মোটর হাঁকাইয়া দিল।

তাহারা চলিয়া গেলে পর মিসেস্ বোসের মনে এক অমূলক আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল—‘যদি দাদা হঠাৎ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইহাদের কাকেও গুলি করিয়া বসেন!—তবে? সর্ব্বনাশ! এ কথাটা যদি আর তুমিনিট পূর্ব্বেও মনে আসিত! এখন উপায়?’ তিনি ‘টেলিফোনে’র ঘণ্টা নাড়িলেন; কিন্তু কল বিগড়াইয়া গিয়া-ছিল। বাড়ীতে আর মোটরও ছিল না। লোক-জন সব বাহির হইয়া গিয়াছিল। অগত্যা তিনি স্পন্দিত হৃদয়ে কক্ষের মেঝেয় বসিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মিসেস্ বোসের দাদা মিষ্টার মিত্র পুলিশ-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। তাঁহার সাহস অসীম, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং দৈহিক শক্তি অপরিমিত; তাই খোদ বড় সাহেবও তাঁহাকে বড় ভালবাসেন। কোনও জটিল ও মারাত্মক ঘটনা ঘটিলে, অমনই তাঁহার নিকট বুদ্ধি ও পরামর্শের জন্য ছুটিয়া আসেন; সেইজন্য মিষ্টার মিত্র মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করেন এবং বন্ধু-মহলে সর্ব্বদাই নিজের শৌর্য্য-বীর্য্যের বড়াই করিয়া বেড়ান।

সেদিন দ্বিপ্রহরে মিঃ মিত্র তাঁহার বহুবাজারস্থিত ভবনের দ্বিতল কক্ষে আরামকেদারায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। তাহার বামহস্তে একখানা ‘ষ্টেট্‌শ্‌ম্যান্’, দক্ষিণপার্শ্বে পত্নী দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন।

মিঃ মিত্র গুড়্‌গুড়ির নলটা মুখ হইতে নামাইয়া, পত্নীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—“আবার এক ফ্যাসাদে পড়া গেছে। দেশময় আজকাল কি যে অরাজকতা আরম্ভ হয়েছে,—এমন সহরের বুকের উপর, এতগুলো লোকের মাঝখানে ডাকাতেরা মোটর চেপে এসে টাকা লুটে নেয়,—আমরা ঘুরে ঘুরে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ! একটা ঘটনারও কিনারা করে উঠ্‌তে পাচ্ছি না! যে রকম দেখ্‌ছি নাম-যশ রক্ষা করা মুস্কিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

পত্নী তাঁহার অপ্রসন্ন মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—“তা এখন একটু বয়স হয়েছে ত। আর আগেকার মত উৎসাহ, উদ্যম, সাহসও নেই। বয়সের সঙ্গে”—মিঃ মিত্র অধৈর্য্য হইয়া, মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—“হুঁ, তা নয় তরু! সাহস, উদ্যম যথেষ্ট আছে; বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়্‌চেই। তবে কি জান, এ ডাকাতিগুলো ভিন্ন ধাতের। এ যে কারা করে, কেন করে, নিমেষের ভেতর কোথায় লুকিয়ে যায়, কিছুই বুঝা যায় না। এ যেন এক মস্ত প্রহেলিকা! বাড়ীর ভেতর ঢুকে স্ত্রীলোকদের মা বলে ডাকা, বাধা না দিলে খুন জখমী না করা, একাধারে এমন সাত্ত্বিক ও তামসিক বৃত্তির সম্মিলন এ বয়স পর্য্যন্ত আর দেখি নি, তরু! ব্যাপারটা যে কি, ভেবে ভেবে আমাদের এক এক জনের বিশ বছরের আয়ু কমে যাচ্ছে।”

পত্নী কি উত্তর দিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া, চুপ করিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

মিঃ মিত্র বলিতে লাগিলেন, “কিন্তু সমস্ত দোষ—যাদের টাকা ডাকাতি করে, তাদের। কাপুরুষ, ভীরুর দল,—পুরুষ হয়ে জন্মেছে, তবু নিজের টাকা রক্ষা কর্‌বার সাহসটুকু নেই। চারজন ছোক্‌রা রিভলবার-হাতে এসে অম্‌নি অম্‌নি টাকাগুলো লুটে নেয়—আর তারি আশ-পাশে তু’শ’ তিনশ’ লোক—কেউ চক্ষু বুজে ভয়ে অজ্ঞান, কেউ শেয়ালের মত পলায়নতৎপর—ছিঃ ছিঃ, এমন অধঃপতন!”

পত্নী একটু হাসিয়া বলিলেন,—“কিন্তু তাদের কি দোষ? কে টাকার জন্য মিছিমিছি মহামূল্য প্রাণটা দিতে যাবে? তারা সব নিরস্ত্র, দস্যুরা সশস্ত্র। আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে লোকসংখ্যা বা দৈহিক বল কি কত্তে পারে? কোন উপায় নেই বলেই ত তারা পালায়! আচ্ছা, এমন অবস্থায় তুমি কি কর?”

“আমি?” মিঃ মিত্র সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া বলিলেন, “আমার টাকা, প্রাণ থাকতে এম্‌নিভাবে ডাকাতদের নিতে দেব না। (হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া) এই হাতে কি বল নাই, (বক্ষঃস্থলে হাত দিয়া) এই বুকে কি সাহস নাই? সবাইকে না পারি, অন্ততঃ একজনকেও ত মার্‌তে পার্‌ব? তবে বিনা বাধায় আমার কষ্টের টাকা অন্যকে কেড়ে নিতে দেব কেন? এখনো বুকে এটুকু সাহস আছে।” পত্নী স্বামীর কথার ভঙ্গী শুনিয়া মৃত্ব মৃত্ব হাসিতে লাগিলেন। মিঃ মিত্র বলিতে লাগিলেন,

“শুন্‌বে, আমি কি বুদ্ধি ঠাউরেছি?—আমি সমস্ত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেব—‘বহুবাজার ষ্ট্রীটে অমুক নম্বর বাড়ীতে চুণি-পান্না-জহরতের দোকান খোলা হবে। সেখানে সুধু বহুমূল্য পাথর ও মণি-মরকত ছাড়া আর কিছু রাখা হবে না। আর লক্ষাধিক টাকা কর্জ্জ লইবার যাদের প্রয়োজন হবে তাঁরা সুবিধামত এখান থেকে নিতে পার্ব্বেন। সুবিখ্যাত হীরালাল মতিলাল এই জুয়েলারী ফার্ম্মের স্বত্বাধিকারী।’ তা হলে একদিন-না-একদিন ডাকাতেরা এখানে আস্‌বেই,—তখন দেখ্‌বে—হাঁ, আমার কথার মূল্য আছে কি না।”

স্বামীর উক্তপ্রকার প্রস্তাবে পত্নী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ডাকাতের ভীষণ মূর্ত্তিও বিভীষিকার মত তাঁহার চোখের সাম্‌নে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি ভীতিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, “না না, অত সাহসে কাজ নেই। তারপর সত্যি সত্যি ডাকাতেরা এসে বাড়ী-চড়াও হবে।”

মিঃ মিত্র চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া সগর্ব্বে বলিলেন, “তাই ত চাই। চাঁদেরা একবার এলেই হয়। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। এবার চিনিয়ে দেব। টেলিফোনে’র যন্ত্র ঠিক আছে, ডাকাত এলেই থানায় খবর দেব। আত্মরক্ষার জন্য দেরাজে রিভলবারও আছে। আমার নাম-যশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাইনেরও যথেষ্ট উন্নতি হবে। আঃ একবার যদি ডাকাতগুলো”—সহসা পাশের দরজাটা ধড়াস্ করিয়া খুলিয়া গেল। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—দ্বারে তিনটি যুবক দাঁড়াইয়া। প্রত্যেকের গায়ে সাদা কোট, আঁটা-সাটা কাপড়-পরা, পায়ে বুট জুতা, গলায় নীল ফিতা-ঝুলান রিভলবার। ক্ষণেকের জন্য তাঁহাদের মনে টালিগঞ্জের ডাকাতির কথা মনে পড়িয়া গেল। ডাকাতেরা সকলে এক বয়সী, এবং পরিচ্ছদ ও আকৃতিও এক প্রকার।

প্রথম যুবক রিভলবার বাগাইয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল,—“চাবি দাও—শিগ্‌গির,—তা নইলে দেখ্‌চ ত’। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দস্যু রিভলবার হাতে দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইল। মিঃ মিত্র বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, “এটা পুলিশের বাড়ী জান ছোক্‌রা? যে-সে হেজি-পেজি লোকের বাড়ী নয় যে, চোখ রাঙ্গিয়ে লুট কর্‌বে। আমারই নাম জে মিত্র, জান? ডি, এস্, পি (D. S. P.) আমি। দাঁড়াও তোমাদের মজা দেখাচ্ছি।” তিনি পকেটে হাত পূরিলেন; কিন্তু সেখানে রিভলবার ছিল না। নিজের গৃহে পত্নী-সম্ভাষণে রত ছিলেন; কে জানিত, এ সময়ে ডাকাতেরা তাঁহার অন্দরে চড়াও হইবে? তিনি ত্বরিতপদে ‘টেলিফোনে’র দিকে অগ্রসর হইলেন।

দস্যুরা ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল,—“সাবধান। খুন জখম করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; কিন্তু যদি বাধা দাও, তবে গুলি কর্‌ব। দাও, শীঘ্র চাবি দাও।” মিঃ মিত্র দন্তে অধর চাপিলেন; কিন্তু অগ্রসর হইলেন না। সহসা তাঁহার কর্ণ বধির করিয়া যুগপৎ তু-তিনটা রিভলবার গর্জ্জিয়া উঠিল। তরু এতক্ষণ ভয়ে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে বসিয়াছিলেন; এবার ডাকাতেরা স্বামীকে গুলি করিয়াছে ভাবিয়া অস্ফুট চীৎকারসহ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত্তের ভিতর মিঃ মিত্র কেমন ভড়্‌কাইয়া গেলেন,—শিহরিয়া তিনি তু-তিন পদ পশ্চাতে পিছাইয়া আসিলেন। একবার মৃত্তিকাবলুণ্ঠিতা পত্নীর প্রস্ফুটিত পদ্ম-কলিকার মত মুখখানির দিকে চাহিলেন,—কে জানে, তাহাতে প্রাণ আছে কি না,—একবার দস্যুহস্তধৃত রিভলবারগুলির কুৎসিত মুখের দিকে চাহিলেন। একদিকে পত্নীর প্রাণরক্ষা করা এবং আজীবন অক্ষয় স্বর্গ ও অপার্থিব সুখভোগ করা,—অন্যদিকে দস্যুহস্তে হত হওয়া, জীবনের প্রথম বসন্তে বৃন্তচ্যুত কুসুম-কলি-কার মত শুকাইয়া যাওয়া, যাক্ যাক্ নাম, যশ, সব ডুবিয়া যাক্, তবু মূর্চ্ছিতা পত্নীকে রক্ষা করা চাই। আর—আর একা নিরস্ত্র হইয়া এতগুলো সশস্ত্র দস্যুর সঙ্গেই বা কি করিয়া যুঝিবে? অ্যাঁ—হ্যাঁ তাইত! মিঃ মিত্র পরাজিত হইলেন। দস্যুদের দিকে চাবি ছুঁড়িয়া দিয়া পত্নীর পার্শ্বে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ধড়িলেন। দস্যুরা সিন্ধুক খুলিয়া টাকা-কড়ি, অলঙ্কার লুঠিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। তিনি নিরুপায়ভাবে বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। সমস্ত ঘটনাটা যেন স্বপ্নের মত তাঁহার চোখের উপর সংঘটিত হইল! তাঁহার সাহস, দৈহিক বল যেন কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে লুপ্ত হইয়াছিল—রসনা অবশ হইয়া গিয়াছিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বহুমূল্য হীরক ও স্বর্ণখচিত অলঙ্কারগুলি লুটিয়া দস্যুরা যখন মোটরে উঠিল, তখন তাহাদের ভিতর একটা হাসির হর্‌রা পড়িয়া গেল। তাহারা মোটরে চাপিয়া ডাকাতি করিতে আসিয়া-ছিল, চালক মোটর লইয়া মিঃ মিত্রের বাড়ীর ‘গেটে’র কাছে অপেক্ষা করিয়াছিল।

প্রথম দস্যু বলিল, “মাইরি ভাই, মিসেস্ মিত্রের অবস্থাটা দেখে আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে। আহা, বেচারি সত্যি সত্যি মূর্চ্ছা গেছে!”

দ্বিতীয় দস্যু। “আর মিঃ মিত্রের অবস্থাই বা কম কি? তার ওরকম হতাশ ভাব দেখে আমার কিন্তু পেট ফেটে হাসি বেরিয়ে পড়্‌ছিল। ভাগ্যিস্, বেচারা তখন চোখ বুজে ছিল, নইলে হয় ত ধরে ফেল্‌ত।”

তৃতীয় দস্যু। “যাক্, ওর দর্প একেবারে চূর্ণ হ’য়েছে! বড়াই কর্ত্ত। এবারে আর বন্ধু-মহলে বড়াই করা খাট্‌বে না। যখন সবাই ঘটনাটা জান্‌বে, তখন কি মজাটাই না হবে—হাঃ-হাঃ-হাঃ।”

প্রথম দস্যু। “আচ্ছা, ডাকাতের এমন টল্‌টলে মুখ, হরিণ-নয়ন, রাঙ্গা ঠোঁট আর কোকিলের কণ্ঠ—তবু ওরা ধর্ত্তে পাল্লে না?”

দ্বিতীয় দস্যু। “একে এই সেদিন সত্যি সত্যিই ডাকাতি হয়ে গেছে, আর তার উপর রিভলবারের আওয়াজে বেচারারা একেবারে ভেব্‌ড়ে গিয়েছিল।”

চালক ততক্ষণ মোটর চালাইয়া দিয়াছিল।

প্রথম দস্যু বলিল, “আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে। এইবেলা ওদের গহনা-পত্তরগুলো ফিরিয়ে দিয়ে ভয় ভেঙ্গে দিই। বেচারিরা বড্ড ভয় পেয়েছে।”

অন্য দস্যুদ্বয় বলিয়া উঠিল, “না না, তা হতেই পারে না! বৌদিদি তা হলে বিশ্বাস কর্ব্বে না। বৌদিদিকে আমাদের বাহাতুরী দেখান চাই, আর দাদাকেও দেখাব। সুকু, হাঁকাও মোটর জোরসে।”

রাস্তার ধূলি উড়াইয়া, ভোঁ ভোঁ শব্দ করিতে করিতে মোটর ছুটিল।

মোটর যখন সুকিয়াষ্ট্রীটের কাছে আসিয়া মোড় ঘুরিবে তখন

চালকের অসাবধানতা বশতঃ সহসা মোটর একটা লোকের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িল। লোকটা পড়িয়া গেল,—হায় হায় করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে লোক জমিয়া গেল। ফুট্‌পাথে পুলিশ পাহারা ছিল, পুলিশও আসিয়া জুটিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে টালীগঞ্জে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে,—পুলিশ ও নাগরিকগণ সকলেই শশঙ্কিত। মোটরের আরোহী এরূপ অল্পবয়স্ক যুবক চতুষ্টয় দেখিয়া তাহাদের সন্দেহ জন্মিল। তাহারা মোটর ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পুলিশ খানা-তল্লাস করিয়া রিভলবার ও অলঙ্কার প্রাপ্ত হইল। তখন রাজপথ-ময় একটা ভয়ঙ্কর হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। "ডাকাত, ডাকাত,—বাবারে,—মারে বলিয়া নাগরিকগণ প্রাণ লইয়া চতুর্দ্দিকে ছুটিতে লাগিল, দোকানীরা দোকানপাট বন্ধ করিতে লাগিল।

মোটরের আরোহিবর্গ চক্ষে অন্ধকার দেখিল। অবশেষে এই-রূপ ঘটনা সংঘটিত হইবে তাহারা একবারও কল্পনা করে নাই। ডাকাতি করিয়া নিরাপদে গৃহে ফিরিবে তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে হুজুগে মাতিয়া তখন তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। এখন ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়াইল। ভয়ে তাহাদের সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। সকলের হাসি, স্ফূর্ত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হইল। ভীতি-জড়িত কণ্ঠে তাহারা পুলিশকে সকল কথা বলিল, কেবল নিজেরা যে পুরুষ নয় একথাটা লজ্জায় বলিতে পারিল না। পুলিশেরা কাঁচা লোক নহে,—তাহারা এরূপ কথা আদৌ বিশ্বাস করিল না। দেখিতে দেখিতে সেস্থানে শতাধিক পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। চারি পাঁচ থানা পুলিশের মোটরও আসিয়া জুটিল। ইতোমধ্যে মিঃ মিত্রের বাড়ীর ডাকাতির কথা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তড়াক্ করিয়া ক'জন সশস্ত্র পুলিশ দস্যুদের মোটরে চড়িয়া বসিল। দস্যুদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইল। তারপর বন্দুকধারী প্রহরী দস্যুদের মোটর ঘিরিয়া থানায় রওনা হইল। তখন পলায়নতৎপর নাগরিকগণ সাহস পাইয়া নানাপ্রকার আস্ফালন পূর্ব্বক স্ব স্ব শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

বন্দী দস্যুদের মুখ ভয়ে ও লজ্জায় মৃতের ন্যায় ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ব্যারিষ্টার বোস ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ দত্তের নিকট খবর পাঠাইতে বলিল, কিন্তু ডাকাতের কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। আনন্দে বগল বাজাইতে বাজাইতে বন্দী সহ পুলিশেরা থানার দিকে প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দস্যুরা প্রস্থান করিলে পর মিঃ মিত্র চাকরবাকরদের ডাকিয়া পত্নীর সেবায় নিযুক্ত করিলেন। টেলিফোনের যন্ত্রের নিকট গিয়া সহরের সমস্ত থানায় ডাকাতির সংবাদ দিলেন এবং অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে মোটরে চাপিয়া বাহির হইতে আদেশ দিলেন। স্বয়ং দেরাজ হইতে রিভলবার ও গুলি লইয়া মোটরে চাপিয়া বাহির হইলেন। সশস্ত্র পুলিশ কর্ম্মচারিগণ ভোঁ ভোঁ রবে রাজপথ কাঁপাইয়া মোটরে করিয়া দস্যুদের অন্বেষণে ছুটিল। মুহূর্ত্তের ভিতর এই ভয়ঙ্কর ডাকাতির কথা সহরময় প্রচারিত হইল। সাহসী, সুচতুর পুলিশ কর্ম্মচারীর গৃহে দিনের বেলা ডাকাতি করা যে সে ডাকাতের কার্য্য নয়! আর ক'দিন পূর্ব্বে এরূপ আরও ডাকাতি হইয়াছে। এ যে অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে! যে প্রকারেই হউক দস্যু দমন করা চাই। ফোর্ট উইলিয়ম হইতেও সশস্ত্র সৈন্য চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইয়াছিল।

সহসা দস্যুদের ধৃত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হইল। পুলিশ ও নাগরিকগণের মনের ভিতর দিয়া একটা আনন্দের তুফান বহিল। মিঃ মিত্র তখন আপার সার্কুলার রোডে ছিলেন, তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থানার দিকে ছুটিলেন। তাহার তৎকালীন মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। আবার মনে একটু একটু কষ্টও হইল,—হায় যশের মুকুটটা স্বীয় মস্তকে ধারণ করিতে পারিলেন না। হর্ষ ও বিষাদ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে তিনি থানার দিকে মোটর ছুটাইলেন।

এদিকে যখন এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইল অন্য দিকে তখন মিসেস্ বোস লীলা প্রভৃতির বিলম্ব দেখিয়া অত্যন্ত শঙ্কান্বিতা হইয়া পড়িলেন। কুঘটনাটাই আগে মনে জাগে,—তাহার মনে হইলে নিশ্চয়ই একটা খুন জখ্‌মী হইয়াছে। হায়, কেন তিনি উহাদের যাইতে দিলেন! উহারা হুজুগে মাতিয়া কিছু চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই,—কিন্তু তাহার কেন এরূপ দুর্ম্মতি হইল! তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

সৌভাগ্যক্রমে মিঃ বোস সে দিন শীঘ্র ফিরিলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা রহস্য কর্‌বার বড় সাংঘাতিক ফন্দী এঁটেছ। বিভ্রাট্ একটা ঘট্‌বেই। মিঃ মিত্র বোধ হয় হঠাৎ কিছু কত্তে পার্ত্তেন না। কিন্তু আজকাল পুলিশ সতর্ক,—ওরা রাস্তায় ধরা পড়্‌বেই। রহস্যটা দুদিকেই মজ্‌বে ভাল। যাক্, চল এখন মিঃ মিত্রের বাড়ী যাই।" উভয়ে মোটরে চাপিয়া বহুবাজার গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন লোকে লোকারণ্য। লাল পাগ্‌ড়ী ও শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত নানাবর্ণের মানুষে বাড়ীর চতুর্দ্দিক ভরিয়া গিয়াছে।—তাহারা উপরে উঠিলেন।

মিসেস্ মিত্রের ভয় তখনও সম্পূর্ণ ভাঙ্গে নাই। তিনি কম্পিত-কণ্ঠে বলিলেন, "শুনেছ ঠাকুরঝি, আমাদের এখানে ডা—কা—তি হয়েছে। সব লুটে নিয়েছে। তা নিক্, কিন্তু যে আওয়াজ করে-ছিল,—মাগো এখনো বুকটা কাঁপ্‌ছে! ভাগ্যি ওঁর গায়ে লাগেনি। আঃ কি যে সর্ব্বনাশ আজ হ'ত! ভগবান্ রক্ষা ক'রেছেন।"

ইহার কথা শুনিয়া এই উদ্বেগের ভিতরও মিঃ বোস ও সুহাসিনী হাসিয়া ফেলিলেন। মিসেস্ মিত্র বলিলেন—"তোমরা হাস্‌ছ! কিন্তু তখন কি যে অবস্থা হয়েছিল তোমরা কল্পনাও কত্তে পার না। চার পাঁচটা ডাকাত—মোটা সোটা—ইয়া পালোয়ানি চেহারা, আগুনের মত চাহনি, বজ্রের মত কণ্ঠস্বর, হাতে রিভল-বার—মা-গো! তোমরা হ'লে ভয়েই মরে যেতে।"

মিঃ বোস্ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মিসেস্ মিত্র অপ্রতিভ ও একটু বিরক্ত হইলেন। এরূপ বিপদের সময়ও ইনি পরিহাস করেন,—আশ্চর্য্য! সুহাসিনী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "যাক্ সে সব কথা। এখন ডাকাতদের ভিতর কেউ দাদার হাতে খুন টুন হয় নি ত?"

মিসেস্ মিত্র অবাক্ হইয়া বলিলেন, "না।"

সুহাসিনী আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "যাক্, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বাপ্‌রে এতক্ষণ কি ভাবনাই ছিল!"

মিসেস্ মিত্র বিস্মিতভাবে ইহাদের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ডাকাতদের প্রতি ইহাদের এত সহানুভূতি কেন ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। সুহাসিনী তাহার ভাব দেখিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, তারপর বহুকষ্টে হাসির বেগ থামাইয়া সকল ঘটনা বিস্তারিতভাবে বলিলেন। শুনিয়া মিসেস্

মিত্র অবিশ্বাসভরে বলিলেন, "সত্যি ঠাকুরঝি? না ঠাট্টা কচ্ছ। অমন পালোয়ানী চেহারা, আর ভাব-ভঙ্গী,—তা মেয়েমানুষের হ'তেই পারে না। আর লীলা, মিস্ দত্ত, মিসেস্ রায় হরদম্ এদের দেখ্‌ছি—এরা কি ক'রে আমাদের চোখে ধূলো দেবে। আমি না হয় ভয়ে ভেব্‌ড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু উনি ত একজন পাকা পুলিশের কর্ম্মচারী। ওঁর চোখে ধূলো দেওয়া অসম্ভব!"

মিঃ বোস হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "শ্বেতদ্বীপের আমদানী রিভলবার-বাঈজীর কণ্ঠস্বর এমনই জাদু জানে! যাক্, এসব নিয়ে রগড় কর্‌বার যথেষ্ট সময় আছে। এখন ডাকাতদের খবর কি? এখনো তারা বাড়ী ফেরে নি। নিশ্চয় পুলিশ তাদের ধরে ফেলেছে।"

মিসেস্ মিত্র বলিলেন, "হা ডাকাতেরা ধরা পড়েছে। লাল-বাজার থানায় ওদের পাঠান হয়েছে।"

মিঃ বোস্ নীচে নাবিয়া লালবাজার থানার দিকে মোটর ছুটাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পুলিশ-প্রহরি-বেষ্টিত ডাকাতের মোটর লালবাজার থানায় পৌঁছিলে পর খোদ বড় সাহেব গুলিভরা রিভলবার হাতে আফিস-রুমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার আদেশ মত দস্যুদের হাতে মোটা মোটা লৌহশৃঙ্খল বাঁধা হইল। শৃঙ্খল বাঁধিবার সময় দস্যুদের কুসুমপেলব করস্পর্শে পুলিশ-কর্ম্মচারীরা অবাক্ হইয়া গেল,—ডাকাতের এমন ফুলের মত নরম হাত! সাহেব বড় আশা করিয়াছিলেন, দস্যুরা সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা জঙ্গী জোয়ান হইবে,—লোহার মত শক্ত দেহ, বিশাল বক্ষ, বিরাট্ বপু। লাথির চোটে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। কিন্তু এখন দস্যুদের চেহারা দেখিয়া অবাক্ হইলেন। একি কাণ্ড! এমন টল্‌টলে লাবণ্য-মাখা মুখ,—আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নে এমন স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টি, চম্পক-গৌর দেহের বর্ণ, আর চাল চলন এমন সুন্দর নম্রতা-মাখা!—

তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "Where are the dacoits ডাকাত কাঁহা?"

সব্‌ইন্‌স্‌পেক্‌টর সেলাম করিয়া কহিল, "হুজুর ইহারাই ডাকাত।"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন, "Hold your tongue.—How dare you! you meen to play tricks with me? হামার সঙ্গে তামাসা কর তোমারা ডর না আছে।"

সব্‌ইন্সপেক্‌টর ধমক খাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "হুজুর আজকাল ইহারাই ডাকাতি করে। ইহারা বাহিরে দেখিতে বড়ই সুন্দর কিন্তু ইহাদের হৃদয় কালকূটে ভরা। ইহারা বিড়াল-তপস্বী। বিশ্বাস না করেন ত প্রমাণ দিতেছি—ইহাদের প্রত্যেকের নিকট রিভলবার পাওয়া গিয়াছে এবং মিত্র সাহেবের বাড়ীর লুণ্ঠিত অলঙ্কারও ইহাদের নিকট মিলিয়াছে।"

সাহেব অবিশ্বাসের সহিত বলিলেন, "সাচ বাৎ? দেখ্‌লাও হাম্‌কো।"

সব্‌ইন্সপেক্‌টর ছুটাছুটি করিয়া মোটর হইতে রিভলবার ও অলঙ্কার আনিয়া সাহেবের নিকট রাখিল। সাহেব বহুক্ষণ যাবৎ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুঁ। মিঃ মিত্র কোথায় আছে?" চারি-দিকে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। প্রায় দুতিন গণ্ডা লোক মিঃ মিত্রের বাসার দিকে ছুটিল।

সাহেব কোমলস্বরে দস্যুদের বলিল "Well boys, টোমরা ডাকাতি করিয়াছে হামার বিশ্বাস হইতেছে না। কিন্তু এই রিভল-বার; অলঙ্কার টোমরা কোথায় পাইয়াছে?" উপস্থিত পুলিশ-কর্ম্ম-চারিবৃন্দ সাহেবের এইরূপ করুণা দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল—রূপের এমনি গুণ।

প্রথম দস্যু মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ মিত্র আসিলে সকল কথা বল্‌ব। আমরা দস্যু নই।"

সাহেব স্বহস্তে দস্যুদের শৃঙ্খল মোচন করিয়া বলিলেন, "টোমা-দের চেহারাতে হামি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি,—কিন্তু টোমাদের বিরুদ্ধে বড় মারাত্মক প্রমাণ আছে। অতএব টোমাদের কিছুকাল আটক রাখিটে হইটেছে,—টোমরা মনে কিছু করিও না।" দস্যুরা সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল।

এমন সময় মিঃ মিত্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উত্তেজনায় ও লজ্জায় তাহার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া-ছিল। ক্রোধ-কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসিলেন "Where are the rascals?"

সাহেব মৃদু হাসিয়া দস্যুদের দিকে অঙ্গুলি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "Here are the dacoits Mr. Mitter. Do you think that such a daring dacoity can be committed by these beautiful chaps? I think even the queen of the fairy-land would fall in love with them. Ha ha ha.—"

দস্যুদের গণ্ডস্থল লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

মিঃ মিত্রও দস্যুদের দিকে তাকাইয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌-কাইতে বলিলেন "Indeed!"—সাহেব। "How lovely and charming figures! I think I would fall in love with them had they been—Ha ha ha ha!"

দস্যুরা এইরূপ প্রসঙ্গে ক্রমশঃই অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিল। প্রথমদস্যু একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "Mr. Mitter!" মিঃ মিত্র চমকিত হইয়া দস্যুর দিকে চাহিলেন। কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলিয়া মনে হইল, তিনি নীরবে দস্যুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দস্যু বলিল "মিঃ মিত্র,—আমরা নির্দ্দোষ। আপনার সঙ্গে নিভৃতে দুটা কথা কহিতে চাই। আপত্তি নেই ত?" মিঃ মিত্র সাহেবের দিকে তাকাইলেন।

সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "On yes. The story must have a tragic end! But take care Mr. Mitter you are married—Ho ho ho!"

মিঃ মিত্র দস্যুদের সঙ্গে করিয়া একটা কক্ষে প্রবেশ করিলেন,—অন্যান্য পুলিশ কর্ম্মচারীরা হতাশ হইল। হায় পুরস্কারের টাকা ও মেডেল বুঝি হাতছাড়া হইল!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কক্ষে ঢুকিয়া দস্যুরা মাথার পাগ্‌ড়ী খুলিয়া ফেলিয়া, খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারেন মিঃ মিত্র?" মিঃ মিত্র বিস্ময়ে ভয়ে কয়েকপদ পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। এ কি ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড! নিমেষের ভিতর কয়েকটী বালক এরূপ রূপসী, ষোড়শী মূর্ত্তিতে পরিণত হইল!—কৃষ্ণ কুঞ্চিত এলায়িত চিকুরদাম পৃষ্ঠ কপোল ও গণ্ড বহিয়া নামিয়াছে। তাহার ভিতর চম্পক-আননখানি মেঘের পার্শ্বে বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে—নিটোল কপোল-দেশ, তীক্ষ্ণ নাসিকা, আর ডাগর

ডাগর টানা টানা চক্ষু ছুটিতে—আ মরি মরি কি ভুবন-ভুলান দৃষ্টি ! মিঃ মিত্র মুগ্ধভাবে দেখিতে লাগিলেন।

দস্যুরা হাসিয়া বলিল, "চিন্‌তে পাচ্ছেন কি' মিঃ মিত্র ?"

মিঃ মিত্রের চমক ভাঙ্গিল, অপ্রভিত হইয়া বলিলেন "য়্যাঁ—য়্যাঁ—এ কি ! এ যে আপনারা ! তা-তা—আপনারা এখানে কেন ?"

"কেন আর কেন ? আপনাকে ডাকাত সেজে জব্দ কর্ত্তে গিয়েছিলুম। জব্দ করেছি তা' সে যাক্। কিন্তু এখন নিজেরাও যে জব্দ হচ্ছি। একটা উপায় করুন।"

"য়্যাঁ ! আপনারাই আমার বাড়ী ডাকাতি করেছেন ?"

"হাঁ গো হাঁ। এখন আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করুন। সাহেবকে সব ভেঙ্গে বলুন। তিনি লোক ভাল। কিন্তু হুসিয়ার আর কেউ যেন এ কথা না জানে ?"

মিঃ মিত্র হাসিয়া ফেলিলেন। "আগে বুঝি এ কথাটা মনে ছিল না। এমন ভাবে কি কেউ কাকেও জব্দ করে। আমি যদি তখন গুলি ক'রে ফেল্‌তুম।"

"আর গতস্য শোচনা নাস্তি। যান সাহেবের কাছে এক-বার।"

সমস্ত শুনিয়া সাহেব হাসিয়া লুটাইতে লাগিলেন। এমন সময় মিঃ বোসও আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। সাহেব বলিলেন—"মিঃ বোস, আপনার ভগ্নী মিঃ মিট্রকে বড্ড জব্দ করিয়াছিল। আঃ Bengali ladies—টাহাদের পুরুষ সাজিয়া, বন্দুক লইয়া একজন Police officerএর বাড়ী লুট করিতে যাওয়া—ইহা ট' কম সাহসের কঠা আছে না। And how nicely done ! বাঙ্গালী মেয়ের এরূপ সাহসের কঠা হামি আর কোঠাও শুনিতে পাইয়াছে না। আর মিঃ মিত্র, আপনি এমন সাহসীলোক, আপনার বাড়ী ইহারা লুট করিল আশ্চর্য্য ! আমার মনে হয় রিভলবারের গুলি অপেক্ষা চোখের গুলিতে আপনি বেশী কাবু হইয়াছিলেন। ha ha ha ! সাহেব দস্যুদের মুক্তির আদেশ দিলেন।

দস্যুরা সাহেবের সহিত একটু আলাপ করিয়া, তাঁহার সদ্ ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া মিঃ বোস ও মিঃ মিত্রের সহিত প্রস্থান করিলেন।

* * *

তাহারা বাড়ী ফিরিলে পর এক হাসির ফোয়ারা ছুটিল। হাসিতে হাসিতে সকলের পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। সকলে মিঃ মিত্রকে ক্ষেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিল। মিঃ মিত্রের তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনাতীত। তিনি মনে মনে ধরণীকে দ্বিধা হইবার নিমিত্ত মিনতি করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন চারিমাস পর্য্যন্ত বন্ধুমহলে এই মজার কথা আলোচিত হইল। * * * মিঃ মিত্র স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি যথাসময়ে ফেরৎ পাইলেন, কিন্তু মূল্য স্বরূপ তাহাকে ৩০২৲ টাকা দিতে হইল। তদ্দ্বারা বন্ধুমহলে এক বিরাট্ ভোজের অনুষ্ঠান হইল।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু

মানভঞ্জন

(জয়দেব হইতে)

যদি—বচন ছুটী
কহ—উঠিবে ফুটি
ঘোর—ধ্বান্ত বিনাশি' তব দন্ত ভাতি।
ছুটে—আশার আঁখি
ছুটী—চকোর পাখী
মুখ—বিধুর অধর-সিধু-পিয়াসে মাতি'।
ত্যজ—আমার প্রতি
হয়ে—করুণাবতী
ওগো—অনিদান অভিমান মানসহরা !
স্মর—অনল প্রিয়া
মম—দহিছে হিয়া
মুখ—অম্বুজ মধু মোরে পিয়াও ত্বরা।
অয়ি—সুদতী সতী
যদি—কোপিনী অতি
তবে—আঁখি-শর-বরষণ কর গো খর।
তবে—বাহুর পাশে
করি—বন্দী দাসে
তনু—দশনে খণ্ডি' মোর দণ্ড কর।
নীল—নলিন প্রভ
লোল—লোচন তব
কিবা—কোকনদ রূপ ধরে কোপের ঘোরে।
কাল—বরণ মম
হবে—তাহারি সম
যদি—স্মর ফুলশর ভাবে রঞ্জ মোরে।

দেহ—হৃদয়-রমা
মম—জীবনসমা
মম—ভব-জলধির তুমি রত্ন মণি।
চাহ—অধীন জনে
প্রেম—নয়ন-কোণে
আমি—তাহা হতে বড় ধন কিছু না গণি।
কুচ—কুম্ভ 'পরি
ঘন—নৃত্য করি
মণি—মঞ্জরী রঞ্জিত করুক্ হিয়া।
পীন—জঘন ধামে
রুত—রসনা দামে
কাম—নিদেশ-ঘোষণা ঘন হউক প্রিয়া !
মম—আহ্লাদিনি !
থল—কমল জিনি'
পদ—সুরত রঙ্গ রসে রম্য জাগে।
কহ—আদেশ-বাণী
তারে—অঙ্কে টানি'
আহা—উজ্জ্বল করি আরো লাক্ষারাগে।
স্মর—তপন খর
মোরে—তাপিছে বড়
দাহ—জনিত বিকার হবি দাসেরে ক্ষম'।
আর—এ শির 'পর
স্মর—গরল হর,
তব—পদ-পল্লব রাখ ভূষণ সম॥

শ্রীকালিদাস রায়

অরুণা

(পঞ্চাঙ্ক নাটক)

চরিত্র।

পুরুষ।

সম্পৎরাও	...	রাঠোর সর্দ্দার (সিংহগড়)
গঙ্গাধর, রঘুবীর	...	ঐ পুত্রদ্বয়।
অর্জ্জুন সিংহ	...	ঐ দাওয়ানজী।
শম্ভু সিংহ	...	ঐ সেনাপতি।
ধনবীর সিংহ	...	নির্ব্বাসিত চৌহান সর্দ্দার (রায়গড়)
শোভা সিংহ	...	ঐ পুত্র।
রণজিৎ	...	ঐ পূর্ব্বতন দেওয়ান।
মহাদেও	...	ঐ বিশ্বস্ত অনুচর।
সংগ্রাম সিংহ	...	বৈদলার সর্দ্দার (মিবারের ষোড়শ সর্দ্দারের অন্যতম)
সন্ন্যাসী	...	ভবানী দেবীর পূর্ব্ব-পুরোহিত।

দুর্গরক্ষক, মহারাষ্ট্র সেনাপতি, ভীল সর্দ্দার, গ্রামবাসিগণ, রায়গড়বাসী দূতগণ, সৈনিকগণ, সেনানায়কগণ, রক্ষিগণ, প্রধানগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

তারাবাঈ	...	সম্পৎরাওয়ের স্ত্রী।
লক্ষ্মীবাঈ	...	ঐ কন্যা।
অরুণা	...	ধনবীরের কন্যা।

পুরনারীগণ, পরিচারিকাগণ, চারণীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

(সিংহগড় দুর্গ)

রঘুবীর ও গঙ্গাধর।

রঘুবীর—অদ্ভুত এই দস্যুর সাহস ! বার বার আমাদের হস্তে লাঞ্ছিত হয়েও—

গঙ্গাধর—লাঞ্ছিত কি বল্‌ছ রঘুবীর ! আমরা বার বার তার লুণ্ঠন-কার্য্যে বাধা দিয়েছি বটে, কিন্তু শত চেষ্টাতেও তাকে বন্দী কর্ত্তে সমর্থ হই নি, সুযোগ পেলেই সে উল্কার মত এসে যথেচ্ছা গ্রামবাসীদের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে।

রঘুবীর—ধনবীর দুরাত্মা বটে, কিন্তু ধনবীর বীর। আমরা যে শত চেষ্টাতেও তাকে এখনও পর্য্যন্ত বন্দী কর্ত্তে পার্লেম না, এই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

গঙ্গাধর—সুন্দর তোমার যুক্তি। সে যে এখনও সিংহদুর্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়, তার কারণ কেবল তোমার নির্ব্বুদ্ধিতা। তুমি তাকে সদল-বলে বন্দী কর্ত্তে গিয়ে কেবল রমণীর কাতরতা দেখে ফিরে এলে ; কিন্তু তোমার উচিত ছিল যে, কন্যার সঙ্গে তা'কে বন্দী করে নিয়ে আসা। তা হলেই পাষণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি হত। এরূপ অযথা দয়া প্রকাশ করা তোমাদের ভাল হয় নি রঘুবীর।

রঘু—দাদা, তোমার কি অভিপ্রায় যে, আমি রমণীর উপর উৎপীড়ন করি ?

গঙ্গা—যে নরাধম দস্যু কি আমাদের সমাজে উৎপীড়ন কিছু কম করেছে যে, তাকে আমাদের এ দয়া দেখাতে হবে? ভীরুতা !

[সম্পৎরাওয়ের প্রবেশ]

সম্পৎ—বৎস গঙ্গাধর ! রমণীর উপর উৎপীড়ন না করা কেবল দয়া প্রদর্শন নয়,—কর্ত্তব্য-পালন,—ভীরুতা নয়। তুমি ত জান, সেদিন যদি রঘুবীর দস্যুকে বন্দী কর্ত্তে কৃতসঙ্কল্প হ'ত তা হলে বোধ হয়, ধনবীরের কন্যারও প্রাণহানি হত। এরূপ অবস্থায় রঘুবীর তাদের ছেড়ে দিয়ে রাজপুত জাতির কর্ত্তব্য পালন করেছে মাত্র, তার প্রতি এ অনুযোগ তোমার সাজে না, বৎস !

গঙ্গাধর—পিতঃ ! আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় মার্জ্জনা করুন ; রঘুবীর, আমায় মার্জ্জনা কর ভাই !

[অর্জ্জুন সিংহের প্রবেশ]

সম্পৎ—এস ভাই অর্জ্জুন ! সব কুশল ত ?

অর্জ্জুন—সর্দ্দার সাহেব, আভীরা গ্রাম হতে ধনবীরের লুণ্ঠন-সংবাদ দিতে এক গ্রামবাসী উপস্থিত।

সম্পৎ—আবার লুণ্ঠন ! কারও প্রাণহানি হয় নি ত ?

অর্জ্জুন—ধনবীর তথাকার এক ধনী মহাজনকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল ; কিন্তু ধনবীরের কন্যা সাক্ষাৎ দেবী। সে কোথা হতে এসে তাকে উদ্ধার করে। গ্রামবাসীরা বলে যে, ধনবীরের কন্যা কেবল এই একবারমাত্র নয়—বার বার নিঃসহায়কে তার পিতার কবল হতে মুক্ত করেছে। তাদের বিশ্বাস, যদি কন্যা নিকটে থাকে, তা হলে ধনবীরের লুণ্ঠন-কার্য্যে হত্যার সংস্রব থাকে না।

সম্পৎ—আশ্চর্য্য ! এরূপ দেবীরূপ কন্যালাভেও ধনবীরের মতির পরিবর্ত্তন ঘটে নি ? যাই হ'ক্ অর্জ্জুন, ধনবীর সিংহের অত্যাচার দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠ্‌ছে, শীঘ্রই এর একটা প্রতিকার করা আবশ্যক ; তুমি আর রঘুবীর আজই পাঁচশ সৈন্য নিয়ে তার সন্ধানে যাত্রা কর। যেমন করে হ'ক্, দেশকে ধনবীরের অত্যাচার হতে মুক্ত কর্ত্তেই হবে।—গঙ্গাধর, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। তুমি আমার সঙ্গে এস।

[রঘুবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

রঘুবীর—বাস্তবিকই সে দেবী। একবার—নিমেষের তরে তার চক্ষুদুটী দেখেছি মাত্র !! আহা কি সে চক্ষু! দেবী-ভাবাপন্না রমণী ভিন্ন চক্ষের সে কমনীয় সরলতা অসম্ভব। দুর্ব্বিনীত পিতার রক্ষার নিমিত্ত সে ব্যাকুল হয়েছিল—আমার উপর একবারমাত্র চকিতে তার কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে তার অন্তরের বেদনা জানিয়েছিল ; কিন্তু আমি তার কথা ভাবি কেন ? সে চিরশত্রুর আত্মজা তার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ?

তবুও আজ তিনমাস ক্রমাগত চেষ্টা করেও তাকে ভুল্‌তে পাচ্ছিনি কেন? আমি নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌চি—কে জানে, কেন আমার কোষনিবদ্ধ অসি ধনবীরের নাম তুলে আর আস্ফালন করে না—আমার দস্যু-দমনে আর তেমন আগ্রহ আসে না! আবার ধনবীরের সঙ্গে দেখা হবে—যদি আর একবারমাত্র সে দেবীকে দেখ্‌তে পাই! আর একটীবারমাত্র তাকে দেখ্‌ব। তারপর—তারপর ভবিতব্য যা হয় হবে।

২য় দৃশ্য।

সম্পৎরাওয়ের কক্ষ।

তারাবাঈ ও লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী।—মা, দাদারা কি কেবল দস্যু-দমনেই ব্যস্ত থাক্‌বে? তারা কি বাড়ীতে থাক্‌বার একটুও অবকাশ পাবে না? আমি কেবল একলাটী বাড়ীতে থাক্‌তে বড় ভালবাসি না।

তারা।—লক্ষ্মী, তোর দাদারা ত মানুষ, কেমন করে প্রজাদের এত অত্যাচার সহ্য কর্‌বে বল্‌। আর এবার ত গঙ্গাধর বাড়ীতেই রয়েছে।

লক্ষ্মী।—বড়দাদা যেন একরকম। একটুতেই বড় রাগ করেন। এই সেদিন রঘুদাদা স্ত্রী-হত্যার ভয়ে ধনবীরকে ধর্ত্তে পারেন নি বলে, তিনি তাকে যা ইচ্ছা তাই বল্লেন। রঘুদাদা বাই ভাল মানুষ, তাই ঝগড়া হল না।

তারা—ছি, মা! ভায়ে ভায়ে বিবাদ হবে কেন? গঙ্গাধরকে তোর পিতা সেদিন বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, স্ত্রীলোক যেই হ'ক্ না কেন, তাকে উৎপীড়ন করা রাজপুতের কখনই কর্ত্তব্য নয়।

[সম্পৎরাও, অরুণা ও গঙ্গাধরের প্রবেশ]

সম্পৎ।—তারা, লক্ষ্মীর সঙ্গিনী এনেছি দেখ!

তারা।—তাই ত! বেশ সুন্দর মেয়েটি, একে কোথায় পেলে, সর্দ্দার সাহেব?

সম্পৎ।—দুর্গ হতে ফিরে আস্‌ছিলাম। গৃহদ্বারে বালিকা নিজেকে নিরাশ্রয়া, বিপদ্‌গ্রস্তা বলে আমার আশ্রয় চাইলে। লক্ষ্মীর একটী সহচরীর প্রয়োজন; তাই আমি একে তোমার কাছে নিয়ে এলেম। তারা, তুমি বালিকার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর।

তারা।—তোমার নাম কি মা?

অরুণা।—অরুণা। মা, আমায় তোমার গৃহে একটু স্থান দাও। আমি অভাগিনী পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়ে; তোমার নিকট আশ্রয় নিতে এসেছি—তুমি আমায় আশ্রয় দাও মা!

তারা।—তোমার পিতার নাম কি মা? তোমার মত সুবর্ণ ললিনীকে কেমন করে তিনি প্রপীড়িত করেন তা আমাদের ধারণাতীত। যাই হ'ক মা—তুমি তোমার পিতার নাম বল, আমরা তাঁকে বুঝিয়ে বলব, তিনি আবার তোমায় বুকে তুলে নেবেন। তোমার মা আছেন?

অরুণা। না মা।

তারা। আহা, অভাগিনী মাতৃহীনা। যাই হ'ক মা,—পিতার উপর অভিমান করা কি পুত্র কন্যার উচিত? তোমাকে দেখে' ত বোধ হয় না যে তুমি অবাধ্য তোমার চক্ষু সরলতা-মাখা। তুমি আমার কন্যার মত আমার গৃহেই থাক। ইতিমধ্যে আমরা তোমার পিতার সহিত—

অরুণা। আমায় বিশ্বাস করুন মা—আমি নির্দ্দোষ। আমার চরিত্র নির্ম্মল। আমায় আপনার গৃহে স্থান দিন।—আমি বড় অভাগিনী। মা আমি চৌহান-বংশীয়া—কিন্তু উপস্থিত আর কোনও পরিচয়-প্রদানে অক্ষম। পিতামাতার প্রতি অভিমানের কথা বলচেন? না, মা তাঁদের উপর আমার অভিমান নাই। যে পিতামাতার যত্নে লালিত হয়ে আমি আজ পৃথিবীর বক্ষে—সে পিতামাতার মূল্য আমি ভুলি নি মা, আমায় ক্ষমা করুন আমি আর কিছু বলতে পারব না।

সম্পৎ। সুন্দর! তারা আমি লক্ষ্মীর সহচরী হবার উপযুক্ত একটী মেয়ে অনুসন্ধান করছিলাম। আমি অরুণাকে কিছু মাত্র অবিশ্বাস করি না। তোমার কি মত গঙ্গাধর।

গঙ্গা। আপনার মতেই আমার মত।

লক্ষ্মী। মা, অরুণা কে ছেড়ে দিও না মা। অরুণা তুমি আমায় ভাল বাস্‌বে?

অরুণা। লক্ষ্মী তুমি আমার ছোট বোন্ হবে।

লক্ষ্মী। হবে? হলে বল! মা, তুমি অরুণাকে বল না মা।

তারা। এস মা অরুণা আমার এক মেয়ে ছিল, আজ তুমি এসে আমায় দুই মেয়ের মা করে দাও। তোমার যখন ইচ্ছা তখন পরিচয় দিও—তোমার পরিচয় তোমার চক্ষুতেই পেয়েছি, এখন আর কোনও পরিচয়ে প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মী। অরুণা, এস ভাই, বাড়ীর ভিতর যাই।

[তারা, অরুণা ও লক্ষ্মীর প্রস্থান]

সম্পৎ। গঙ্গাধর আভীর গ্রাম হ'তে সংবাদ এসেছে। ধনবীর আহত হয়ে ফিরে গেছে—বোধ হয় কিছু দিনের জন্য তার উপদ্রব নিবারিত হ'ল।

[সম্পৎরাওয়ের প্রস্থান)

গঙ্গা। [স্বগত] কে এ রমণী! অনাথা, অসহায়া, পিতার আশ্রয় লয়েছে, কিন্তু অবয়বের কি অপরূপ গঠন, দেখে মনে হয় নিশ্চয় কোন উচ্চকুল-সম্ভবা। সুন্দর চক্ষু। অসামান্য সৌন্দর্য্য সম্পন্না—কমনীয়তা প্রতি অঙ্গে বিরাজমান! একাধারে এত রূপ এত মাধুরী আমি কখনও দেখিনি—যেমন শান্ত—তেমনি তেজস্বিনী!

[ক্রমশঃ]

শ্রী—

অসারতা

হেথায় সবি' মুহূর্ত্তেকের
ছায়াবাজীর ছবি;—
মন ভুলান সবি'।
হর্ষে হাসি, দুঃখে বিষাদ,
সুধুই কেবল ভ্রান্ত-প্রমাদ;
সত্য সে ওই স্বর্গ-পুরীর
পুণ্য-মধুর ছবি;
(আর) মন-ভুলান সবি'।
অস্ত রবির দীপ্তি-সম
কীর্ত্তি-কিরণ-মালা,
সুধুই স্বপন-আলা।
রূপ-সায়রের সোনার স্বপন
করবে রচন শেষের শয়ন,
স্বর্গ সুধুই বিলায় উজল
দীপ্ত কিরণ মালা
(আর) সবই স্বপন-আলা।

ঝঞ্ঝা-বাতের যাত্রী মোরা,
উর্ম্মি-মুখে ভেসে'
যাচ্ছি নিরুদ্দেশে।
কল্পনা আর যুক্তি-পাঁতি
দুখের পথেই জ্বালায় বাতি;
শান্তি সুধু হোথায় মিলে
ওই স্বরগের দেশে।
(মোরা) যাচ্ছি নিরুদ্দেশে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুর মিলান'

"বেসুর বাজেরে—
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন-মাঝেরে!"
'গীতিমাল্য!'

সুর বেজে বেজে যাচ্ছে—তাতে যোগদান করতে পারিনে বলে ওস্তাদের দোষ দেওয়া ত চলে না। সে দোষ আমার এই ভগ্ন কণ্ঠের। তালে-তালে পর্দ্দায়-পর্দ্দায় যে রাগিণীর মূর্চ্ছনা আকাশ এবং পৃথিবীকে কম্পিত করে দিয়ে, কোন্ অনাদিকালের প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত নিত্যধ্বনিত, সে গানে যোগ দেবার মত কণ্ঠ না পেলে মানব-জন্ম ব্যর্থ হয়ে যায়। মানুষ কি কেবল সংসারের জীব, সংসারকে সে যে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চায়। কারণ তার জন্যে সংসার, সে সংসারের জন্যে নয়। মহাপ্রাণকে পূর্ণ করে সেই মননাতীতকে সে মনন করবার ধ্যান করে। আলোক যেখানে জ্যোতিতে বিচ্ছুরিত, অন্ধকার যেখানে নির্ব্বাক্ এবং প্রাণ যেখানে নূতন রসের জন্য কাঙ্গাল সেইখানে মানুষের যাবার জায়গা। হৃদয় যেন শুষ্ক না হয়। কারণ শুষ্ক হওয়া না-হওয়া ত হৃদয়ের উপর নির্ভর করছে। হৃদয়ের ধর্ম্ম প্রকৃতির ধর্ম্ম থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মাটী নিজের ইচ্ছায় শুষ্ক বা সরস হতে পারে না। এ দুয়েরই জন্য তাকে আকাশের গতিকের উপর নির্ভর করতে হয় কিন্তু হৃদয়ের আনন্দ বা সরসতা বাইরের উপর কোন অংশে নির্ভর করে না, নির্ভর করে নিজের শক্তির উপর। বাহিরই যদি হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পার্‌বে তবে বুদ্ধদেব কেন রাজার ছেলে হয়ে বাহিরের রাজসম্পদ ফেলে বনে গেলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে কেনই বা বাহিরের ধনসম্পদের প্রভাব তুচ্ছবোধ হয়েছিল? জগতের যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, মহাপুরুষগণের হৃদয়ের এই উর্ব্বরতা যে বাহিরের প্রভাবসাপেক্ষ নয়, এ কথার প্রমাণ দেখ্‌তে পাই।

সবই আমাদের মনে। মন যদি শান্ত হয় ত সব শান্ত, জগৎ শান্ত! মন যদি ভাল না থাকে ত সব মন্দ; আলো মন্দ, হাওয়া মন্দ, পৃথিবী মন্দ। এই মন বা হৃদয় জিনিষটাকে সেইজন্যই অত পবিত্র রাখার আবশ্যক। চোখ যদি খারাপ হয়, তবে তাতে লক্ষ টাকার দামের কৃত্রিম চক্ষুও আসল চোখের অভাব ভরাট্ করতে পারে না। সুতরাং আসল দৃষ্টি ভাল হওয়া চাই। এই দৃষ্টি,—মননের দৃষ্টি, হৃদয়ের দৃষ্টি, বিশ্বের প্রতি মধুর দৃষ্টি!

আমাদের দেহমন ঠিক এক-একটা গ্রহের মত। কারণ অনন্ত আকাশকে ডুবাইয়া দিয়া সততই ত সূর্য্যের দারুণ দীপ্তি উদ্ভাসিত হচ্ছে, কিন্তু সে দীপ্তির অধিকাংশই শূন্যের ফাঁকা জায়গায় নষ্ট হচ্ছে।

সেই শূন্যপথে উচ্ছ্বসিত আলোক-স্রোতকে যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আপনাদের দেহ দ্বারা গ্রহণ এবং ধারণ করতে পারে তাহারাই সন্ধ্যার সময় আমাদের কাছে দীপ্যমান্ হয়ে উঠ্‌ছে। যাহারা সেই অনন্ত আলোক পথে থাকিতেছে না তাহারা নিজেরাই বঞ্চিত। তাহারা নিজেরাই অস্তিত্ববিহীন হয়ে আছে। এই নিখিলের দানকে অগ্রাহ্য করে যাহারা আকাশের অদৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ব্বাসিত তারকার ন্যায় জীবনযাপন করে তাহারাও অস্তিত্ব-বিহীন। নিজে যে আছি—এই "আছি"ই যেন একজন বড় "আছের" সূচনা করিয়া দেয়। চাঁদের দিকে তাকিয়ে লোকে বুঝতে পারে চাঁদ ত সুন্দরই, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মনে এই কথাটাও জাগে, যে এই শোভা সূর্য্যের রশ্মিপাত ব্যতীত সম্ভব হ'ত না। তেমনি আমাদের প্রতি লোকে তাকিয়ে যেন বল্‌তে পারে, আমরা সব দিকেই সুন্দর—কিন্তু আমাদের এই সৌন্দর্য্য যেন সেই চিরসুন্দর, সেই নিত্য-জ্যোতিষ্মান্, সমগ্র সৌন্দর্য্যের মনিকে নির্দ্দেশ করে দেয়।

আমাদের মন, আমাদের প্রাণ যেন বাঁশির মত হয়! অর্থাৎ হাওয়া ত সর্ব্বত্র আছেই কিন্তু সেই হাওয়া যখন উপযুক্ত ক্ষেত্রে বাঁশির নলে ফুৎকাররূপে যায় তখনই বাঁশির স্বর বেজে ওঠে। অন্য জায়গায় হাজার হাওয়া বইলেও তা' বাজে না। বাঁশির মুখের এই বিশেষ আয়োজন বা বিশেষ অবস্থা তার অনুকূল। বিধাতার দয়া ত ঝরছেই, তার সীমা নেই, বাধা নেই, কিন্তু সেই অযাচিত দয়া আমাদের মনের ক্ষেত্রে বর্ষিত হয়ে আমাদের গানে, সুরে, বেজে উঠে কই? তাই বল্‌ছিলাম বাঁশির মত অনুকূল মন হওয়া চাই। হৃদয়ের এই বাঁশি বাজানো বড় কঠিন, যে এ

বাঁশিতে একবার স্বর তুল্‌তে পেরেছে সে অভয় হয়েছে, সে রক্ষা পেয়েছে। সেই বাঁশীর স্বরে শুধু যে তিনি মাতেন তা নয় সমস্ত পৃথিবীকে মাতিয়ে তুলেন। তাই এই বাঁশির স্বর শুনে রমণী স্নানের কলস ডুবাতে ভুলে যায়, পৃথিবীর রাখালেরা যারা কেবল রৌদ্রে বিদগ্ধ হচ্ছিল তারা ছুটে এসে ছায়ায় শীতল হয়। কিন্তু এ বাঁশি বাজান' সাধনার কাজ। ইহা "ন নেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন।" যার মন তৈরি হয়ে গেল সে শান্ত হয়েছে।

এ তপস্যা করে বাঁশি বাজান'। শিব যেমন তপস্যা দ্বারা জটাতে গঙ্গাকে আহ্বান করেছিলেন আমরা যদি সেই পরমসুন্দরের দীপ্তি হৃদয়ে আন্‌তে চাই তবে ধ্যানে বস্‌তে হবে। জানি তোমার অনেক বাধা, অনেক দুর্ব্বলতা আছে কিন্তু সহায় নিয়ে সম্বল নিয়ে অগ্রসর হও! দুর্ব্বলতা যে সব জায়গায়, অসম্পূর্ণতা নিয়েই যে পৃথিবীর সৃষ্টি। যে চাঁদের উপর সূর্য্যের আলো পড়ে চাঁদকে অমন সুন্দর করে তোলে, সে চাঁদ কখন ঠিক্ নিটোল, সম্পূর্ণ সরল নয় এবং সমতল নয়; ঐ উজ্জ্বল দীপ্তিময় চন্দ্রপৃষ্ঠে অনেক গুহাগহ্বর আছে কিন্তু সেজন্য চাঁদের দীপ্তি ত একটুও খাট হয় নি। সূর্য্যের আলো, চাঁদের সমস্ত অন্ধকারময় গুহাগহ্বরকে ডুবিয়ে দিয়েই ত চিরকাল তাকে অন্ধকার গগনে উদ্ভাসিত করে তোলে।

রূপের এই আশ্চর্য্য বিকাশ, সৌন্দর্য্যের এই অনিন্দ্য জ্যোতি, হৃদয়ের এই অননুভূত হর্ষধারায়, আমরা যেন সেই বড় সৌন্দর্যাকে, বড় রূপকে এবং বড় চৈতন্যকে স্বীকার করি। তা হলেই আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার গুহাগহ্বরের তামস বিভীষিকা আপনিই সেই চির-উজ্জ্বল আলোক-দাতার জ্যোতির্ম্ময় প্রসাদপ্লাবনে অপসারিত হবে।

জগতের এই পাপপুণ্যের মহান্ তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সমুদ্রে, যিনি আপনার শান্তকিরণসম্পাত দ্বারা নব নব নীলা এবং অঘটন-ঘটন সাধিত করছেন, তিনিই মানুষের হৃদয়, মন এবং আত্মাকে বিশ্বের নিত্য নব নব রস দ্বারা স্পর্শ করে এই সীমার মধ্যে অসীমের আস্বাদন দান করে মানুষকে অতৃপ্ত করে তুলেন। মানবের জন্মমৃত্যুর চিরআশ্চর্য্য দুর্গম রহস্যের গহ্বরে তিনিই আপনার ডম্বরু-শব্দে বিশ্বকে চিরদিন সঙ্গীতে, লয়ে এবং উত্থান-পতনের ঘোর নর্ত্তনে নন্দিত করছেন। মানুষ যদি একবার মাত্রও তা অনুভব করে জীবনের সমস্ত বাধা এবং বিপত্তিকে তুচ্ছ করে সেই চিরসুন্দরের জন্য চিত্তকে দ্বিধাশূন্য, স্বার্থশূন্য কর্‌তে প্রয়াস পায়, তবে লোকসমাজে এত বিচিত্র বহুল মতাদি এবং অশেষ প্রভেদ সমূহ নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে প্রসন্নতায় হৃদয় ভরে উঠে।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

সার্থকতা

তোমায় হেরিতে সদা পেয়েছি নয়ন;
হেরিতেছি দূরে কাছে হিয়ার হিয়ায়!
নাসিকা পেয়েছি ওগো, দিবস নিশায়
তোমার কেশের বাসে পুলকিত মন!
তোমারি মুখের কথা শুনিতে শ্রবণ,
লভিয়াছি কত পুণ্যে কত সাধনায়!
রসনা লভেছি শুধু রূপ-সুষমায়
মাতিয়া গায়িতে গান যাবৎ জীবন!

বাহু দুটি লভিয়াছি রাখিতে সরল,
বিপদ আপদ হতে বাঁচাতে তোমায়!
চরণ পেয়েছি শুধু পবিত্র নির্ম্মল
খুঁজে এনে দিতে যেথা যাহা পাওয়া যায়!
হৃদয় পেয়েছি—কেন? আঁকিতে কেবল
সেথায় তোমারি মূর্ত্তি প্রেম-তুলিকায়!

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

প্রসঙ্গ

"Confession of a Fo... ষ্টিনড বার্গের একখানি উপন্যাস। ইহাকে কতকটা তাঁহার আত্মরচিত বলিতে পারা যায়। ইহাতে তিনি তাঁহার জীবনের অনেক কথা খুলিয়া বলিয়াছেন।—পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া দেখিলাম যে, য়ুরোপে এককালে তাঁহার এই পুস্তকখানি অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহারই সমালোচনায় আবার দেখিতে পাই ঃ—It is impossible. that any attorney general can now doubt the high morality of this blook" মনুষ্য-জীবনকে এরূপভাবে সমাজের নিকট উপস্থিত করা সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহার আলোচনা রুচিবাগীশদিগের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া আমরা শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, মনুষ্য-জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই যদি সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে। আলোক ও আঁধারে মনুষ্য-জীবন জড়িত; সেখানে স্বর্গের নন্দনকাননও আছে, সেখানে আবার পূতিগন্ধময় নরকও আছে। অস্‌কার ওয়াইল্ড বলেন, সাহিত্যে এ দুয়েরই চিত্র দিতে হইবে, কারণ সাহিত্য "Perfect expression of life" ব্যতীত আর কিছুই নয়। তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "The most perfect artist that which most fully mirrors man in all his infinite va·iety," এ ত বড় শক্ত সমস্যা; রুচিবাগীশগণ ইহার সমাধা করুন!

———

ইবসেনের Pil'ars of Society পড়িলে একটা কথা বার বার মনে উঠে; সে কথাটা এই—এ সংসারে রুচি বা নীতি যাহাকে বলি, তাহা অধিকাংশ স্থলেই কতকগুলি প্রাণহীন আচার মাত্র। প্রকৃত moralityর আদর মানুষ করিতে পারে না। বাহিরের শিখা ও চন্দন-ফোঁটা অন্তরের দুর্ব্বল মানুষটিকে লুকাইবার পক্ষে যথেষ্ট; কিন্তু সে মানুষটি যখন সুস্থ ও সবল হইয়া উঠে, তখন সে দেখিতে পায়, যে, যে সামাজিক বাধাগুলি মানুষে প্রাণপণে মানিয়া চলে তাহার পরিপুষ্টতার পক্ষে তাহারাই প্রধান অন্তরায়। তখন সে চঞ্চল হইয়া উঠে, নিয়মের নিগড় দূরে ছুড়িয়া ফেলিতে চায়;—তখন সে Lonaর ন্যায় হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে throw the doors out, l·fe in fresh air," এই জন্যই মরিস বলেন "যথার্থ চরিত্রবান্ ব্যক্তি শিষ্ট ও শান্ত ব্যক্তি নন, তাঁহারা তাঁহাদিগের বিরাট চরিত্রের মধ্যে আকাশের অশনি ও প্রভঞ্জনের মত্ততা বহন করেন। তাঁহাদিগের আবির্ভাবে

সমাজ প্রলয়কালীন ভূমিকম্পের ন্যায় ঘন ঘন আন্দোলিত হয়; আকাশের কড় কড়িতে ও বিদ্যুতের হানা হানিতে শান্তিপ্রিয় লোকের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।"

———

The Death of Tintagles মরিস মেটারলিঙ্গের একখানি নাটিকা। এই পুস্তিকাখানি রূপক। ইহার অর্থ উদ্‌ঘাটন করা সহজ নয়। কিন্তু বোধ হয় ললাট-লিপির অপ্রতিহত প্রভাব দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকখানি রচিত। অদৃষ্ট-লিখন কেহ খণ্ডাইতে পারে না। সতর্কতা, সুযোগ ও ক্ষমতা সমস্তই ইহার নিকট পণ্ড হয়। Ygrain তাঁহার ভ্রাতাকে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন চেষ্টাই ফলবতী হয় নাই। অনুনয় ও অশ্রুও নিস্ফল হইয়াছিল। অবশেষে সে গভীর শেষে ইহার পরিতাপের সহিত বলিয়াছিল, "Monster! Monster! Cur·e you! Curse you! I spit on you!" কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয়গণ আমাদিকে "ফেটালিষ্ট" বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন; Sir Alfred Lyall এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন জীব বলিয়া বিদ্রুপ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অপেক্ষা য়ুরোপীয়েরাও কম কুসংস্কারাপন্ন নহেন! একদৃষ্টে বিশ্বাস করা যদি কুসংস্কার হয়, তাহা হইলে বলিতে হয়, সুসভ্য ইংরাজ জাতি ভাগ্য খুব মানেন। Bad star, প্রভৃতি শব্দ তাহার পরিচায়ক; এতদ্ব্যতীত ভাগ্য জিনিস্‌টা যে অলীক নয়, য়ুরোপে এ বিশ্বাস ক্রমশঃই বদ্ধমূল হইতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

সমাজ-বন্ধন

গ্রীক দার্শনিক বলেন, "মানব সামাজিক জীব (Man is a social animal)। গৃহদ্বারাদি শূন্য প্রকৃতির উদ্দাম বক্ষে লালিত উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধমুক্ত মানবসৃষ্টির কোন্ প্রভাতে আপনাকে সমাজ-বন্ধনের কঠিন গণ্ডীর মধ্যে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষমতা, স্বেচ্ছাচার ও উদ্দামতা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, তাহার সন তারিখ ঐতিহাসিক পুরাণ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া বলিতে পারেন; তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক এবং বহু সহস্র বৎসর ধরিরা সে এই অবস্থায় বাস করিতেছে! এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সমাজ কথার অর্থ কি এবং কি করিয়াই বা ইহার উৎপত্তি হইল। নরমাংস-ভোজী যে সব অসভ্য মানব আজিও আদিম অবস্থায় বাস করিতেছে, তাহাদের কোন সমাজ নাই; আত্মীয় স্বজন নাই—বাধা বন্ধনহীন উদ্দাম সেই মানব-সম্প্রদায় উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন করিবার জন্য জীবিত থাকে; সুতরাং যদি তাহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য থাকে, তবে তাহা এই দগ্ধ উদর পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আর আজ যে দলবদ্ধ আমরা এই উদর-সর্ব্বস্ব সম্প্রদায়কে হেয় মনে করিতেছি, আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহগণের পরিচয় লইতে গেলেই দেখিতে পাইবে যে, তাঁহারাও এককালে ইহাদিগেরই ন্যায় নগ্নগাত্রে বনে জঙ্গলে অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন; তখন তাঁহারাও "সমাজ" বলিয়া কোন একটা পদার্থের কল্পনা করিতে পারিতেন না! সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে আমাদের এই অবস্থা আসিল কোথা হইতে?

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে, মানব নানা কারণে পুত্র-কন্যা ও পরিবার লইয়া যাযাবর অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া একস্থানে স্থায়িভাবে বাস করিতে বাধ্য হয়। এই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার অভ্যাস হইতেই সমাজের উৎপত্তি! ক্রমে পুত্রকন্যা হইতে আত্মীয়-স্বজন, এবং আত্মীয়-স্বজন হইতে প্রতিবাসিগণ, তাহার পর গ্রামবাসিগণ, পরে সমগ্র জগতের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন ও আদান প্রদানের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এই কথাটা খুলিয়া বলিতেছি।

যখন আমরা বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তখন আমাদের অভাব বলিয়া কোন একটা পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিতাম না;—গাছের সুমিষ্ট ফলে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত, স্রোতস্বতীর সুবিমল জলে আমাদের তৃষ্ণা দূর হইত, বৃক্ষের ছায়া আমাদিগকে আতপ-তাপ হইতে রক্ষা করিত। কিন্তু যে দিন বন ছাড়িয়া গ্রামে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি, সেইদিন হইতেই অভাবের সূত্রপাত হইয়াছে। এখন আর ক্ষুধা পাইলে স্বচ্ছন্দজাত ফল-মূল অনায়াসে বা অল্পায়াসে পাওয়া যায় না, আতপতাপ নিবারণের জন্য বৃক্ষ-কোটর আশ্রয় করা চলে না, আপনার উদর কোনরূপে পূর্ণ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। এইরূপে শত শত অভাব অভিযোগ নবযুগের সূচনা করিয়াছে। নিত্য নূতন অভাব ও ভোগ্য বস্তুর প্রয়োজনীয়তা হইতেই মানব আপনার দৌর্ব্বল্য উপলব্ধি করে। তখন সে দেখিতে পায় যে, জগতে সে আর একাকী থাকিতে পারে না। সে একেলা সারাদিন পরিশ্রম করিয়াও, আপনার সমস্ত অভাবের ক্ষুদ্রতম অংশও পূর্ণ করিতে পারে না। তাহাকে যদি আপনার খাদ্য উৎপাদনের জন্য ক্ষেত চষিতে হয় ও লাঙ্গল গড়িতে হয়, আর বাসের জন্য ইষ্টকাদি সংগ্রহ করিয়া গৃহনির্ম্মাণ করিতে হয়, পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিবার সুতা কাটিতে হয় ও বস্ত্রবয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার যে অবস্থা ঘটে তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার কতক অভাব পূরণ করিবার জন্য তাহাকে অপরের মুখাপেক্ষী হইতেই হইবে। ইহারই ফলে Division of Labour বা শ্রম বিভাগের উৎপত্তি। আমি শিল্পী, সুতরাং আমি বস্ত্র বয়ন করিব; আমার প্রয়োজনীয় বস্ত্র আপনার ব্যবহারের জন্য রাখিয়া উদ্বৃত্ত বস্ত্র আমি তোমায় প্রদান করিব। ইহার বিনিময়ে তুমি আমাকে তোমার উদ্বৃত্ত শস্য প্রদান করিবে। এইরূপে যখন কর্ম্মকার, স্বর্ণকার প্রভৃতি শিল্পিগণ স্ব স্ব শিল্পে নিবিষ্ট থাকিয়া, সমাজের প্রয়োজন পূর্ণ করিয়া দিয়া, তাহার বিনিময়ে তাহারা সমাজের নিকট হইতে আপনাদিগের প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ করে, তখন তাহারা দেখিতে পায় যে তাহাদিগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইলেই বিশ্বের সহিত যোগ সংস্থাপন করা অপরিহার্য্য;—ইহা হইতেই সমাজের উৎপত্তি। এখন হইতেই স্বাধীন ও দুর্দ্ধর্ষ মানব স্বেচ্ছায় আপনাকে ধরা দেয়। তখন আর সে অবাধ-মুক্ত বিহঙ্গমের ন্যায় স্বেচ্ছায়, বাধাহীন লক্ষ্যহীন ভাবে বিচরণ করিতে পারে না। তখন হইতে সে সংযমী হইতে শিক্ষা করে, আপনার বাধা আপনি সৃষ্টি করিয়া থাকে। এইজন্যই হার্ব্বার্ট

স্পেন্সার বলেন, সমাজ গঠনের প্রথম সূত্র Division of labour ও racial contest.

Racial Contest বা আন্তর্জাতিক বিপ্লব বলিতে আবার কি বুঝায় এইবার তাহারই আলোচনা করা যাক। মনে করুন, হিমালয়ের পাদ-দেশে আম-মাংসভোজী একদল লোক বাস করে। তাহারা প্রত্যেকে স্বাধীন, স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু হঠাৎ একদিন হিমগিরির বক্ষভেদ করিয়া, মুক্তকৃপাণহস্তে তিব্বতীয়েরা তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল। বিভিন্নস্থানে অসম্বদ্ধভাবে অবস্থিত হিমালয়ের স্ব স্ব প্রধান অসভ্য অধিবাসিগণ, একতার অভাবে আততায়ীর শানিত কৃপাণ মুখে ক্ষুদ্র পশুর ন্যায় অত্মবলি দিতে লাগিল। বহু রক্তপাতের পর তাহারা দেখিল, শত্রু হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে যুদ্ধের প্রয়োজন, এবং যুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমেই একতার আবশ্যক! ক্রমশঃ তাহারা আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। ইহা হইতেই তাহাদের সমাজের উৎপত্তি। হার্ব্বাট স্পেনসার বলেন, এই দুই উপায়েই পৃথিবীতে সর্ব্বত্র সমাজ গঠিত হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলে তাহা আমরা দেখিতে পাই; জগতে যে কোন কালে যে কোনদেশে সমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহার মূলে হয় Division of Labour না হয় raci.l contest কোন-না-কোন আকারে বিদ্যমান। ইতিহাসের আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অবান্তর, সন্দেহ নাই। তথাপি উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, 'এই দুইটি বিষয়ই আমাদিগের প্রাচীন আর্য্যসমাজ-গঠনের পক্ষে তুল্য ভাবে কার্য্য করিয়াছে। গরীয়ান আর্য্যগণ যখন প্রথমে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন আনার্য্যগণ তাহাদিগকে পদে পদে বাধা দিয়াছিল। আর্য্যগণ দলবদ্ধ হইয়া, তাহাদিগের সেই সব বাধা-বিপত্তি উলঙ্ঘন করিয়া আপনাদিগের অভাব অভিযোগ সহজে পূর্ণ করিবার জন্য চারিবর্ণে বিভক্ত হন। তখন হইতেই এক এক শ্রেণী সমাজের উন্নতি-কল্পে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনোনিবেশ করে। কালে এই আর্য্য-সমাজই একদিন জগতের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়! জগতের ইতিহাসে এই ভাবে সমাজ গঠনের এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রোমকগণের আক্রমণ হইতেই অসভ্য ব্রিটনগণ দলবদ্ধ হইয়া উঠে। পারসিকগণের আক্রমণ সমস্ত গ্রীকজাতির মধ্যে একতা আনয়ন করে। নিকটবর্ত্তী জাতিগণ কর্ত্তৃক বার বার আক্রান্ত হইয়াই রোমকগণ দলবদ্ধ হইয়া প্রথমে সমুদয় ইতালী—পরে সমস্ত সভ্যদেশ জয় করে। আজ আমরা যে সমস্ত অসভ্য জাতির পরিচয় পাই, তাহাদিগের অসভ্য অবস্থা না ঘুচিবার প্রধান কারণ, তাহাদিগের মধ্যে উক্ত পদার্থদ্বয়ের উপলব্ধির অভাব। এস্কুইমো নামক জাতির নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। ইহারা গ্রীনলণ্ড নামক দ্বীপে বাস করে। সমুদ্র-বেষ্টিত দ্বীপে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রায় অসম্ভব। সুতরাং racial contest নামক পদার্থ তাহাদিগের নিকট অজ্ঞাত। তাহার পর গ্রীনলণ্ড দ্বীপটি পর্ব্বতাকীর্ণ, একপ্রান্তে গমনাগমন দুঃসাধ্য। ফলে জগতের সহিত তাহাদের যোগস্থাপন করাও সম্ভবপর নহে। এইজন্যই এই জাতীয় লোকদিগকে বিছিন্নাবস্থায় বাস করিতে হয়। এরূপ দেশে Division of labour প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব। ইহার ফলেই তাহারা আজও অসভ্য,—ইহারা সমাজ কাহাকে বলে জানে না।

সুতরাং এই দুইটি সমাজ-গঠনের প্রথম সূত্র। সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইলে ইহাদের মধ্য দিয়াই সমাজ গড়িয়া তুলিতে হয়। এখন এই দুইটির Potentialityর বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, raci.l contest প্রথমে সমস্ত সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। অসভ্য মানবে মানবে বা বহিঃশত্রুর সহিত যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখন সর্ব্বত্র দল বাঁধিবার প্রয়োজন হয় সত্য; কিন্তু যতক্ষণ বিপদের হেতু বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ এই সমাজও স্থায়ী হইতে পারে। শত্রুর নিধন বা তাহার নিষ্ক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আবার এই সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। তবে স্থায়ী সমাজ কি করিয়া গঠিত হয়?

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, বার বার বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিলে, মানব-সম্প্রদায়কে বহুবার দলবদ্ধ হইতে হয়, সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইলে, অন্যান্য কার্য্যের নানা বিঘ্ন ঘটিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণেরও অভাব হয় না। তখন বাধ্য হইয়া লোকেরা আপনাদিগের মধ্য হইতে বলশালী ব্যক্তিগণকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করে, তাহাদিগের নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া তাহাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। এই আজ্ঞানুবর্ত্তিতা হইতেই রাজার উৎপত্তি। রাজ্য ও রাজার বিষয় পরে আলোচনা করিব। এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, রাজা ও রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে।

Division of labour হইতে ক্রমশঃ রাজা ও রাজ্যের উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু এখানে আমরা দেখিতে চাই যে, সমাজ গঠনের পক্ষে racial cont·st বা division of labourই যথেষ্ট কি না। আলোচনার ফলে দেখা গিয়াছে যে racial contestএর ফলে যে রাজ্য গঠিত হয় সে রাজ্য সাধারণতঃ অটোক্রাটিক গভর্মেণ্টের দ্বারাই শাসিত হইয়া থাকে। এইরূপ রাজ্যে নেতৃগণই প্রজাপুঞ্জের সমস্ত শক্তি আয়ত্ত করিয়া দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। তখন আর যোগ্যতার (efficiency) কোন আদর থাকে না, বংশগত মর্য্যাদাই (Heridit) সর্ব্বময় বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং বুঝিতেই পারা যাইতেছে, এরূপ সমাজ স্থায়ী হইলেও উৎকৃষ্টতর সমাজ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

কেবল মাত্র division of labourএর ভিতর দিয়া যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে সম্প্রদায়-বিশেষের যথেচ্ছাচার দৃষ্ট হয় না,—যে কেহ যে কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এরূপ ভাবে যদি কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা জন-তন্ত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ সমাজও সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ নহে। এখানে মানবগণ পরস্পরের মুখাপেক্ষী বলিয়া, কেহ কাহারও নিকট মাথা নত করে না। বহিঃশত্রুর আক্রমণে বা আভ্যন্তরিক বিপ্লবে এ সমাজ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। Co-operationএর অভাবই ইহার পতনের প্রধান কারণ।

তবে সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুশাসিত করিতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করা উচিত? আলোচনা দ্বারা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, এই কার্য্যের জন্য পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের শক্তিরই প্রয়োজন। Racial contest মানবকে সবল ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলে, তাহার পর যদি division of labour প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে প্রতিভাকেও অনাদৃত হইতে হয় না। এই জন্যই অনেকে বলেন division of labour জ্ঞানানুশীলন ও সুশাসনের বিকাশ মাত্র। মানুষ যখন প্রকৃতই সভ্য হইয়া উঠে, তখন নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজে উৎপন্ন করিবার জন্য division of la·ourএর আশ্রয় গ্রহণ করিবেই করিবে। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত সভ্য জনপদের মধ্যেই ইহা কোন-না-কোন আকারে বিদ্যমান; সুতরাং সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, racial contestএর ভিতর দিয়া তাহার ঐক্য সংস্থাপন করিয়া সমাজস্থ লোকপুঞ্জকে সবল ও কষ্টক্ষম করিয়া তুলাই প্রথমে বাঞ্ছনীয়। তারপর যদি তথায় division of labour প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই সেই সমাজ সভ্য জগতে আদৃত হইয়া থাকে। সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ সমাজকেই উৎকৃষ্ট সমাজ বলিয়া থাকেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

মেঘ

সীমাহীন, অন্তহীন গগনের পথে—
হে পথিক দল!
কোথা যাও, কোন্ তীর্থে, কিসের সন্ধানে
আপনা বিহ্বল?
শিরে উড়ে রুক্ষ জটা, অঙ্গ ভস্মে মাখা;
গভীর ওঙ্কার—
ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছ কাঁপিয়া কাঁপিয়া—
তুলিয়া ঝঙ্কার।

তাম্র-কমণ্ডলু হতে ধীরে ধীরে কত—
মন্ত্র-পূত বারি—
পড়িতেছে, ঝরিতেছে ধরণীর' পরে—
বিন্দু বিন্দু করি।
হে মহান্! হে গম্ভীর! হে রুদ্র সন্ন্যাসী—
তব তেজঃশিখা—
প্রকটিত করিতেছে গগনের পথে—
অনলের রেখা।

চলিতেছ অবিরাম আপনার মনে—
হইয়া চঞ্চল;
কোথা যাও, কোন্ তীর্থে, বলে যাও মোরে
হে পথিক দল!

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

সমালোচনা

জুলিয়াস সীজার। শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম্, এ, বি, এল্ প্রণীত ও সেন-রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ।/০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি প্লুটার্কের বঙ্গানুবাদ। য়ুরোপীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সাহিত্য-প্রবাহ জগতের বিস্ময় আকর্ষণ করিয়া, য়ুরোপবাসীর চিত্ত সিক্ত ও শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার এই অদ্ভুত পরিপুষ্টির প্রধান কারণ য়ুরোপীয় বাণী-সাধকগণ তপঃনিষ্ঠ ভগীরথের ন্যায় ঐকান্তিকী সাধনা বলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হইতে ভাবের ধারা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন;—য়ুরোপীয় সাহিত্য পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠভাবে ভূষিত হইয়া জগতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন সিংহ মহাশয় একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তাঁহার এই সাধু চেষ্টা প্রশংসনীয়। তিনি বৈদেশিক সাহিত্য হইতে যে রত্ন আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আলোচ্য পুস্তকখানির ছাপাও সুন্দর। ষোল পেজী ৬ ফর্ম্মার পুস্তকের মূল্যও সামান্য। এতদ্ব্যতীত, এই কর্ম্মকুশল বীরের জীবনী অদ্ভুত কার্য্য-পরম্পরায় একদিকে যেমন উপন্যাসের ন্যায় কৌতুককর, অপর দিকে তেমনই বহু শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। পঞ্চাননবাবু সেই বীরপুরুষের জীবনচরিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া আমাদের উপকারসাধন করিয়াছেন। জীবনচরিত-পাঠের উপকারিতা-সম্বন্ধে একবার একজন বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যিক বলিয়াছিলেন, মহাপুরুষগণ মানব-সমাজে শ্রেষ্ঠ পদবীর অধিকারী; সেই জন্য তাঁহারা মনুষ্য সমাজের প্রতিনিধি। তাঁহাদের জীবনচরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক্ষুদ্র মানবের মধ্যে যে সকল গুণ খণ্ডাকারে দেখা যায় এবং নানা কর্ম্মের মধ্যে যে বিরাট্ চরিত্র আংশিকভাবে প্রকটিত, মহাপুরুষগণের মধ্যে তাহাই সমভাবে বা অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট; এই জন্যই তাঁহারা মনুষ্য-সমাজের নেতা ও প্রতিনিধি। আমরা একথা জোর করিয়া বলিতে পারি, পাঠকগণ সিজারের এই ক্ষুদ্র জীবনচরিত পাঠ করিলে, তাঁহার রহস্যময় জীবনে এমন অনেক তথ্য দেখিতে পাইবেন, যাহার দ্বারা উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকিবে না। আর এ কথা যদি সত্য হয়, যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসের উদ্দেশ্য মানব-চরিত্রের রহস্য অবগত হওয়া, তাহা হইলে এ পুস্তকের পাঠশ্রম পণ্ডশ্রম হইবে না।

পরিশেষে ভাষার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। কোথায় পড়িয়াছিলাম, "পরিশ্রুত জল ও পরিশ্রুত (অনূদিত) পুস্তক উভয়েই তুল্য বিস্বাদকর।" কথাটা কতদূর সত্য বলিতে পারি না; তবে একথা সত্য যে, শক্তি থাকিলে অনুবাদও সহজ ও সরল ও প্রাণস্পর্শী করা যাইতে পারে। পঞ্চাননবাবুর ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট সেই শক্তির প্রত্যাশা করি; ভবিষ্যতে তিনি ভাষার দিকে একটু অবহিত হইলে অধিকতর সুখী হইব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

জৈন-মূর্ত্তি

(সঙ্কলন)

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত মাহিকণ্ঠ এজেন্সির প্রধান নগর দন্ত হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে কুম্ভরিয়া (Kumbharia) নামক স্থানে, একটী জৈন মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এই শিলালিপি-গুলি মন্দিরের একটী রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত এবং ইহাদের মধ্যে একখানি শিলালিপি জৈনদিগের বিশেষ পূজার্হ।

এই শিলালিপিখানির দক্ষিণ পার্শ্বে একটী নদী এবং বাম পার্শ্বে একটী বৃক্ষ খোদিত; এই বৃক্ষের নিম্নে একপার্শ্বে একটী লোক ও অপর পার্শ্বে তিনটী লোক দণ্ডায়মান। প্রথমোক্ত ব্যক্তিটী বৃক্ষস্থিত একটী পক্ষীর প্রতি তীর লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই শিলালিপিখানির নিম্নে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে।—

"শ্রীমুনিস্থবর্দ স্বামিবিম্বমস্ববোধসমলিকবিহারতীর্থোদ্ধর সহিতং"।

এই খোদিত কথাগুলি পাঠ করিয়া এই প্রস্তর-লিপির সমস্ত ইতিহাস উদ্ধার করা অসম্ভব; তবে "মুনি স্থবর্দ" এই নামটী পড়িয়া ও তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হয়, তাঁহারই জীবনের কোন ঘটনা লইয়া এই প্রস্তর খোদিত হইয়াছে। এখানে বলা উচিত, শ্রীমুনি স্থবর্দ জৈনদিগের বিংশ তীর্থঙ্কর ছিলেন। এই শিলা-লিপিতে নদীর প্রতিমূর্ত্তি ও নিম্নে "তীর্থ" (অর্থাৎ নদী) এই কথাটী খোদিত দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু নদীর প্রকৃত ইতিহাস ও এই শিলালিপিতে ইহার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনেকদিন হইতে এই শিলালিপির প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁহা-দের প্রয়াস বিফল হয়। সুখের বিষয়, অনেক পরিশ্রমের পর এতদিনে তাঁহারা এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে কেবলমাত্র যে ঐতিহাসিকের চেষ্টা সফল হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু এতদিন পরে এই শিলালিপি জৈন সমাজ ও ধর্ম্মেরও অনেক অপরিজ্ঞাত তত্ত্ব বিস্মৃতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

Mr. Cousins নামক একজন সুদক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই শিলা-লিপির ঐতিহাসিকতা-আবিষ্কারে নিযুক্ত হন। তাঁহার নিকট তেজপাল মন্দিরস্থিত একখানি শিলালিপির ছবি ছিল। এই শিলালিপি উপরে-বর্ণিত শিলালিপির প্রায় অনুরূপ।

এই শিলালিপি দেখিয়া Mr Cousins বলেন, "This is interesting, as it depicts a deliberate instance of the taking of life so abhorrant to the Jains." অর্থাৎ শিলালিপির প্রধান উৎকর্ষ এই যে, ইহা হইতে আমরা প্রাণনাশের এমন একটী চিত্র দেখিতে পাই, যাহা জৈন ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার বিষয়। তিনি আরও বলেন, এই তীর্থে (অর্থাৎ নদীতে) যে সকল নৌকা ভাসিতেছে, তাহা তৎসময়ের অনুরূপ নহে—ইহা হয় ত ভাস্করের মনঃপ্রসূত।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই আলোচ্য শিলালিপির অনুরূপ আর একখানি তেজপাল-মন্দিরের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত আছে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রকোষ্ঠটী শ্রীমুনি সুবর্দ স্বামীর নামে উৎসর্গীকৃত। অতএব আমাদের আলোচ্য শিলালিপির সহিত যে ইহার যোগ আছে এবং উভয়ই যে তীর্থঙ্করের জীবনী লইয়া খোদিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই পর্য্যন্তই অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। পরে প্রধান প্রধান জৈন পণ্ডিতগণের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়; কিন্তু তাঁহারা এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না; তবে অশ্ববোধ বিহার ও এবং শাকুনিক সমলিক বিহার উভয়ই যে তীর্থ, তাহাই জ্ঞাত হওয়া গেল এবং এই তীর্থ দুইটীর উৎপত্তি ও প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে, শিলালিপি-পঠনের আর বাধা থাকে না। "তীর্থকল্প তরু" নামক একখানি প্রাচীন জৈন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলে আমরা সমলিক শাকুনিক বিহারের প্রকৃত ইতিহাস পাই এবং Ind. Ant. (Vol, 30 P 293) তে "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য" নামক প্রবন্ধে অশ্ববোধ তীর্থের উৎপত্তি ও ইতিহাস সংগ্রহ করা যায়।

এই শিলালিপিখানি তিনটী বস্তুর সমষ্টি লইয়া গঠিত—(১) শ্রীমুনি স্থবর্দ স্বামীর বিম্ব অর্থাৎ প্রতিমূর্ত্তি, (২) অশ্ববোধ (৩) সমলিক বা শাকুনিক তীর্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রীমুনি সুবর্দ স্বামী জৈনদিগের বিংশ তীর্থঙ্কর এবং সমলিক বিহার-সম্বন্ধে Ind. Antiquaryতে লিখিত আছে,—"শ্রাবণ নক্ষত্রের ১০ ফাল্গুন শুদ্ধে তীর্থঙ্কর শ্রীমুনি সুবর্দ স্বামী আপ-নার পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, একসহস্র রাজার সহিত দীক্ষা গ্রহণ করেন। তৎপরে পৃথিবীর চারিদিকে ধর্ম্মোপদেশ-প্রচার-মানসে পদব্রজে বাহির হইয়া মুনি সুবর্দ স্বামী প্রতিষ্ঠান নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তিনি জানিতে পারিলেন যে, ভরুকুচ্ছ নামক স্থানে এক অশ্বমেধ যজ্ঞ হইবে এবং এই যজ্ঞে যে অশ্বটীর প্রাণ বধ করা হইবে, সে পূর্ব্বজন্মে তাঁহারই একজন প্রকৃত বন্ধু ছিল। পথিমধ্যে সময় নষ্ট না করিয়া অতি প্রত্যুষে তিনি ৬০ যোজন দূরে অবস্থিত সেই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোরন্তক নামক বনে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সেই স্থানের রাজা জিতশত্রু সসৈন্যে সেই অশ্বটীকে লইয়া তাঁহার পূজা ও সেবা করিবার জন্য বনে উপস্থিত হইলেন। মুনি তাঁহাদের উপদেশ দিতে লাগিলেন—'এই পৃথিবী কেবলমাত্র ভীষণ জন্তু-পরিবৃত অরণ্য ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আজ একজন নিরাশ্রয় প্রবাসী, ভীষণ জন্তু-পরিবৃত কতক-গুলি দৈত্যকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইতেছে; সত্যের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে সে আজ একটী ব্যাধের জালে পতিত হইয়া কষ্ট পাইবে; একজন সাধু ও সম্মানিত পুরুষ তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়াই ধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ ও হৃদয়ের প্রকৃত আনন্দ।' মুনি সুবর্দ স্বামীর উপদেশ শেষ হইলে, জিতশত্রু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'প্রভু, আপনার এই উপদেশ কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত করিয়াছে? মুনি সুবর্দ বলিলেন, 'কেবলমাত্র এই অশ্বটীকে।' আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, এই অশ্বটীকে! পশু হইয়াও সে এমন কি সৎকার্য্য করিয়াছে, যাহার জন্য আপনি তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছেন?'

"মুনি সুবদ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—'পূর্ব্বজন্মে যখন আমি চম্পা দেশের রাজা ছিলাম, তখন এই বন্ধুটী (অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া) আমার মন্ত্রী ছিলেন; কিন্তু সর্ব্বদা কুকর্ম্মে রত থাকায়, তাঁহার অসময়ে মৃত্যু হয় এবং অনেকবার দেহান্তরের পর তিনি পুনরায় পদ্মিনীকান্ত সহরে একজন সাধু পশারীরূপে (সকলে তাঁহাকে সাগর দত্ত বলিয়া ডাকিত) জন্মগ্রহণ করেন এবং জিনধর্ম্ম নামক এক সর্ব্বকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি কোন জৈন ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট জ্ঞাত হইলেন যে, যদি এই সময়ে স্বর্ণ কিংবা অন্য কোন বহুমূল্য দ্রব্যের একটী অর্হৎ মন্দির নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে পুনর্জ্জন্মের তৎকৃত সমস্ত পাপ স্খলিত হইয়া যাইবে। এই কথা-অনুসারে সাগর দত্ত নগরের এক প্রান্তে একটী সুন্দর জিন-মন্দির ও অত্যুচ্চ শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং উভয়ের মধ্যে মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাও করা হইয়াছিল। একদিন তিনি গ্রীষ্মের প্রভাতে শিব-মন্দিরে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন যে, উপাসকেরা একটী ঘৃতপাত্রস্থিত কতকগুলি উইপোকাকে পদদ্বারা পেষণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মনে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করিলেন এবং আপনার সুন্দর বস্ত্রদ্বারা সেই স্থানটী পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। মন্দিরের প্রধান উপাসক তখনও উইপোকা-পেষণে নিবিষ্ট। সাগর দত্তের এই কার্য্য দেখিয়া তিনি বলিলেন যে, নিজের বস্ত্রের দ্বারা এই সকল উইপোকাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি কেবল কতকগুলি ছদ্মবেশী বিধর্ম্মী উই-পোকাকে আশ্রয় দিতেছেন। সাগর দত্ত মনে মনে ভাবিলেন, এই সকল সম্মানিত অথচ নীচ পুরুষগুলি তাঁহার ও নিজেদের ইহ-পরকাল বিনষ্ট করিবে।

'একটী গভীর দুঃখের ছায়া তাঁহার সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং এই দুঃখই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। পরে তিনি অশ্বরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বজন্মে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তিনি যে পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যবলে আমি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি।'

মুনি সুবর্দ স্বামীর নিকট এই আখ্যান শুনিয়া অশ্বের পূর্ব্বজন্ম-কথা মনে পড়িয়া গেল এবং সাতদিন উপবাসে থাকিয়া সে দেহ-ত্যাগ করিল। দেহত্যাগ করিবার পর সে অষ্টম স্বর্গের দেবতারূপে পরিগণিত হইল। একদিন দেবতার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পুনরায় পূর্ব্বজন্ম কথা মনে পড়িল ও এই দেবত্বের জন্য তিনি যে শ্রীমুনি সুবর্দ স্বামীর নিকট অশেষ ঋণী, তাহা ভাবিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করিলেন। পৃথিবীতে আসিয়া চম্পার স্বর্ণমন্দিরে শ্রীমুনি সুবর্দ স্বামীর একটী প্রতিমূর্ত্তি ও একটী অশ্বমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। সেই সময় হইতেই ভরুকচ্ছ 'অশ্ববোধ' নামে একটি পবিত্র তীর্থে পরিণত হইল।"

Ind. Antiquaryতে অশ্ববোধ তীর্থ সম্বন্ধে উপরোক্ত যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ও 'তীর্থকল্পতরুতে' প্রদত্ত বিবরণে যে প্রভেদ আছে, তাহাও এই স্থানে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। Ind. Ant, বলিতেছেন, চম্পার স্বর্ণমন্দিরে সাগরদত্তকর্ত্তৃক শ্রীমুনি সুবর্দ স্বামীর একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হয়; কিন্তু 'তীর্থকল্পতরু'র অশ্ববোধ উপাখ্যানে লিখিত আছে, ভরুকচ্ছের যে স্থানে তীর্থঙ্কর মুনি সুবর্দ 'সমবসরণ' প্রাপ্ত হন, ঠিক সেই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার (সাগর দত্তের) অশ্বজন্ম সার্থক করিবার জন্য একটী অশ্বমূর্ত্তিও স্থাপন করা হয়। 'তীর্থকল্পতরু'র মতে সেই স্থান 'ভরুকচ্ছ অশ্ববোধ' তীর্থ নামে খ্যাতি লাভ করিল। পরে তাহা 'শাকুনিক বিহার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পুনরায় এই স্থান যে কেন শাকুনিক বিহাররূপে পরিণত হইল, সে বিষয়ে 'তীর্থকল্পতরু' বলিতেছে—

"এই সিংহল দ্বীপের শ্রীপুর সহরে, চন্দ্রগুপ্ত নামক এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম চন্দ্রলেখা। পর পর সাতটী পুত্র জন্মগ্রহণ করায়, চন্দ্রলেখার দুঃখের সীমা ছিল না; এই জন্য দেবী নরদত্তাকে পূজা করিতে লাগিলেন এবং দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া পরমা সুন্দরী কন্যা সুদর্শনাকে প্রাপ্ত হন।

"অনেকদিন পরে সুদর্শনা যৌবনে পদার্পণ করিলে, একদিন রাজা প্রিয়তমা কন্যা সুদর্শনাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ভরুকচ্ছ হইতে ধনেশ্বর নামক একজন বণিক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার পার্শ্বে কতকগুলি পিপুল, গোলমরিচ ও আদা পড়িয়াছিল—এই জিনিষের গন্ধে বণিকের হাঁচি পাইল। হাঁচিতে হাঁচিতে যেই তিনি হঠাৎ "নমঃ অর্হন্তান" এই কথা উচ্চারণ করিলেন, অমনই সুদর্শনা পিতার ক্রোড়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইতোমধ্যে রাজ্যের লোকেরা বণিককে বন্দী করিয়া রাখিল। জ্ঞানলাভ হইবামাত্র, সুদর্শনার পূর্ব্বজন্মকথা মনে পড়িয়া গেল এবং বণিককে মুক্তিদান করিয়া বলিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে একধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। রাজা তখন সুদর্শনাকে হঠাৎ অজ্ঞান হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কন্যা বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'পূর্ব্বজন্মে আমি শকুনিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভরুকচ্ছের নর্ম্মদা নদীতীরে একটী বটবৃক্ষের শাখায় বাস করিতাম। একবার বর্ষাকালে ক্রমান্বয়ে সাত দিন ধরিয়া বৃষ্টি হয়; অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করিয়া অষ্টম দিনে আমি সহরের মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে একজন শিকারীর গৃহপ্রাঙ্গন হইতে একখণ্ড মাংস চুরি করিয়া বনের মধ্যে পলাইয়া গেলাম। একটী বৃক্ষডালে বসিয়া আছি, এমন সময় সেই শিকারীটী আমাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। শরীরে তীর বিদ্ধ হইবামাত্র আমার মুখ হইতে মাংস মাটিতে পড়িয়া গেল। মাংসখণ্ডটী কুড়াইয়া লইয়া শিকারী আপন গৃহে চলিয়া গেল।

'যাহা হউক, আমার এই দুরবস্থা ও কাতর ক্রন্দনধ্বনি একজন দয়ালু শূরির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে আমার নিকট আসিয়া তাহার জলপাত্র হইতে কয়েক বিন্দু জল আমার ক্ষত শরীরে ছিটাইয়া দিল। ইহার পর সে আমাকে 'পথনতি' বিষয় শিক্ষা দিল। তাহার এই সকল বিষয়ে আমি বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং এই পুণ্যফলে মৃত্যুর পর আপনার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।'

"ইহার পর সুদর্শনার জীবনে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। পৃথিবীর সুখ-সৌন্দর্য্যে বিতৃষ্ণা হওয়ায়, তিনি তাঁহার পিতার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সেই বণিকের সহিত ভরুকচ্ছ অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে রহিল সাতশত অর্ণবযান; এই সকল যান, বস্ত্র, বহুমূল্য দ্রব্য, চন্দনকাষ্ঠ, কয়লা, শষ্য, ফল, মিষ্টান্ন, জল ও সৈন্যে পরিপূর্ণ ছিল। যখন এই সাত শত জাহাজ ভরুকচ্ছের সমুদ্র-উপকূলে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন স্থানীয় রাজা মনে করিলেন যে, সিংহলের রাজা যুদ্ধের দ্বারা আপনার দেশ কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে; এইজন্য তিনিও সমুদ্র-

উপকূলে সৈন্য সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। সমস্ত দেশবাসীর এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য বণিক তীরে নামিয়া রাজাকে সুদর্শনার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া রাজা সুদর্শনাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য তীরে গমন করিলেন। সুদর্শনা রাজাকে নানাপ্রকার উপহার দান করিয়া প্রণাম করিলেন; নগর-প্রবেশ-সময়ে সুদর্শনা সমগ্র নগরবাসীর নিকট বিরাট্ অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন। নগরে প্রবেশমাত্র তিনি প্রথমে মন্দিরে গমন করিয়া প্রচলিত প্রথা-অনুসারে পূজা করিয়া একদিন উপবাসিনী রহিলেন। রাজা তাঁহাকে নিজের প্রাসাদে আশ্রয়দান করিলেন এবং উপহারস্বরূপ তাঁহাকে ৮টী বন্দর, আটশত গ্রাম, আটশত দুর্গ এবং আটশত সহর দান করিলেন। ইহা ব্যতীত, রাজ্যের পূর্ব্বদিকে একটী দ্রুতগামী অশ্ব একদিনে যতটা পরিমাণ স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারে এবং পশ্চিম দিকে একটী হস্তী একদিনে যতটা পরিমাণ স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারে, ততটা পরিমাণ স্থান তিনি সুদর্শনাকে দান করিলেন।

"কিছুদিন পরে একদিন সুদর্শনা বণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, কি কর্ম্মফলে আমি শকুনি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং কেনই বা সেই শিকারীর দ্বারা আহত হইলাম?'

"তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'কল্যাণি, বেতাঢ্য পর্ব্বতের নিকট 'সুরম্য' নামক একটী সহর ছিল। এই সহরের রাজা শঙ্খের তুমি কন্যা ছিলে। বিজয়া বলিয়া সকলে তোমাকে ডাকিত। একদিন নদীর ধারে ভ্রমণ করিতে করিতে তুমি একটী কুক্কুট-সর্প দেখিতে পাইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেল। তৎপরে তুমি সেই নদীতীরে একটী জিন-মন্দির দেখিতে পাও এবং মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তুমি দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে ভক্তির সহিত পূজা কর।

'পূজায় আনন্দলাভ করিয়া যখন তুমি মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলে, তখন একটী জৈন সন্ন্যাসিনীকে দেখিতে পাইলে। পরিশ্রমে ও ক্ষুধায় তিনি নিতান্ত অবসন্ন ও চলৎশক্তিহীন। তাহার সুচিতা ও নিজের অকর্ম্মণ্যতা ভাবিয়া তুমি তাহার পদতলে গিয়া পড়িলে; তিনি তোমাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং তুমিও তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া নীরোগ করিলে।

'তারপর তোমার মৃত্যু হইলে বলে তুমি শকুনি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে এবং সেই কুক্কুট-সর্পটীও নিহত হইবার পর ব্যাধ (শিকারী)-জন্মগ্রহণ করিল। পূর্ব্বজন্মের শত্রুতাহেতু ব্যাধ তোমাকে তীরদ্বারা আহত করিল; কিন্তু জিনের প্রতি অচলা ভক্তিহেতু এবং সেই জৈন সন্ন্যাসিনীর সেবাহেতু তুমি 'নির্ব্বাণ' লাভ করিলে'।

"এই কথা শুনিবামাত্র তিনি সমস্ত ধন-রত্ন চারিদিকে বিতরণ করিয়া দিলেন। সেই মন্দিরটী ভাল করিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া আরও ২৪টী ছোট ছোট মন্দির তথায় নির্ম্মাণ করিলেন। পরে একটী অন্নসত্র ও বিদ্যালয়ও স্থাপন করিলেন। এই স্থানটী পরে তাঁহার শকুনি-জন্ম হইতে—'শাকুনিক বিহার-তীর্থে' পরিণত হইল। অনেক বৎসর পরে এক বৈশাখী পূর্ণিমায় দেহত্যাগ করিয়া তিনি সপ্তস্বর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।" উপরোক্ত বিবরণটী শাকুনিক-বিহার-তীর্থের একমাত্র ইতিহাস।

শাকুনিক বিহার-তীর্থের পরবর্ত্তী ইতিহাস এবং সংস্কার-সম্বন্ধে লিখিত আছে—"চালুক্যরাজ কুমারপালের উদয়ন নামক এক মন্ত্রী ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের রাজার সহিত যুদ্ধে যখন তিনি আহত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার দুইপুত্র—অম্ভদ ও বহদকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বৎসগণ, আমার আত্মার মঙ্গলের জন্য তোমরা শত্রুঞ্জয়ের আদিশ্বর-মন্দির ও ভরুকচ্ছের শাকুনিক বিহার সম্পূর্ণরূপে (জীর্ণ) সংস্কার করিবে।' "

"কুমার পাল" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি, কুমারপাল, হেমঞ্জয় ও সমগ্র জৈন-ধর্ম্মমণ্ডলী মুনি সুবর্দ-মন্দিরে ধ্বজা-স্থাপনের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং রাজার (হেমাচার্য্যের) আদেশে মন্দিরের দেবমূর্ত্তির সম্মুখে সর্ব্বপ্রথমে অর্চ্চনা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল কার্য্য সমাধা হইবার পর হেমাচার্য্য অম্ভদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়া দেখেন যে, অম্ভদ মন্দিরের ছাদে সানন্দে নৃত্য করিতেছেন। ঠিক সেই সময়েই দেবী সৈন্দবী তাঁহার অত্যন্ত বিরক্তি-উৎপাদনে নিযুক্ত থাকেন। প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া হেমাচার্য্য তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গেলেন। এইস্থানে সেই দেবী বাস করিতেন। দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হেমাচার্য্য কয়েকটী চাল ছিটাইয়া দিলেন এবং অন্য একজন মুষলদ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তিকে আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রথম আঘাতে সমস্ত মন্দিরটী কাঁপিয়া উঠিল এবং দ্বিতীয় আঘাতে দেবী আপনার স্থান ত্যাগ করিয়া হেমাচার্য্যের পায়ের উপর পড়িয়া গেলেন এবং ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এইরূপে কৃতকার্য্য হইয়া হেমাচার্য্য শ্রীসুবর্দ-মন্দিরে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

যাহা হউক, এক্ষণে কুন্তররিয়ায় প্রাপ্ত শিলালিপির নিম্নে যাহা লিখিত আছে, সে সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাক্। ইহাতে তিনটী বস্তুর উল্লেখ আছে—

(১) শ্রীমুনি সুবর্দ স্বামীর মূর্ত্তি

(২) অশ্ববোধ তীর্থ

(৩) শাকুনিক বিহার-তীর্থ।

এই তীর্থ দুটির উদ্ধার বা সংস্কার-সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। এই দুইটি তীর্থের উৎপত্তি, ইতিহাস ও সংস্কার সম্বন্ধে উপরেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার

প্রাচীন গৌড়

ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড় নগর প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশের রাজধানী ছিল। ইহার আর একটী নাম লক্ষ্মণাবতী। নগরটী গঙ্গানদীর খালের উপর অবস্থিত। ইহার প্রতিষ্ঠা কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলা যায় না এবং প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত ইহার যাবতীয় ইতিহাস কেবলই আনুমানিক —তাহাতে ঐতিহাসিক কোন ভিত্তিই নাই বলিলে চলে। গৌড়ের নির্দ্ধারিত ইতিহাসের প্রারম্ভ ১২০৪ খৃঃ অঃ হইতে; অর্থাৎ মুসলমানগণকর্ত্তৃক বঙ্গদেশ আক্রান্ত হইবার পর হইতেই গৌড়ের সত্য ইতিহাস-সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়; কিন্তু তাহাও সকল স্থানে সম্পূর্ণ সত্য নহে। যাহা হউক, গৌড় নগর যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই শোভা, সম্পদ ও সৌষ্ঠবে বঙ্গের সকল দেশকেই পরাজিত করিয়া শীর্ষস্থান-অধিকারে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়; কারণ মুসলমানগণ বঙ্গদেশ জয় করিয়া গৌড়ের শোভা-সম্পদে মুগ্ধ হইয়া গৌড়েই তাঁহাদের রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মুসলমান-আগমনের পূর্ব্বেও গৌড়ের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। আবার কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে, বল্লাল সেন, আদিশূর ও লক্ষ্মণ সেন প্রমুখ রাজগণের সহিত এই নগরের ধ্বংসাবশেষের সংস্রব রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৌড়ের আর একটি নাম লক্ষ্মণাবতী। লক্ষ্মণাবতী ও লক্ষ্মণ সেন—নগরের নাম ও রাজার নাম—উভয়ের মধ্যে বেশ একটা সৌসাদৃশ্য ও পরিলক্ষিত হয়। এই সৌসাদৃশ্য হইতে, প্রাচীন গৌড় যে মহারাজা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তাঁহারই নামানুসারে 'লক্ষ্মণাবতী' নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ ধারণা করা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

মুসলমানগণ বঙ্গদেশ জয় করিয়া গৌড় নগরেই তাঁহাদের রাজধানী স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিনটী পূর্ণ শতাব্দী ধরিয়া গৌড়ই একক্রমে তাঁহাদের রাজধানী হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানগণ চিরদিনই আয়েসী ও বিলাসপ্রিয়। এতদনুসারে রাজধানী গৌড় নগরকেও বঙ্গের তাবৎ নগরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দিবার জন্য তাঁহারা দেশ-বিদেশ হইতে তৎকালীন প্রখ্যাতনামা শিল্পিগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া, সুদীর্ঘ তিনশত বৎসর ধরিয়া নানা মস্‌জিদ্, অট্টালিকা ও দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিয়া নগরটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি এখনও বেশ ভাল অবস্থায়ই রহিয়াছে। নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির চিত্রসহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গেল।

দাখিল-দরওয়াজা হইতে কিছুদূর দক্ষিণে গড়বন্দী রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। এই প্রাসাদের অতি নিকটেই সুলতান হোসেন শাহ ও তৎপুত্র নস্‌রৎ শাহের সমাধি উন্মুক্তভাবে বিরাজমান। দাখিল-দরওয়াজার দক্ষিণে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে গৌড়-স্তম্ভ বা মিনার উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। আশ্-পাশের লোকেরা ইহাকে 'ত্রিশূল-মন্দির' বলিয়া থাকে। কেহ কেহ আবার ইহাকে 'পীরুসা' বা 'ফিরোজ মিনার' নামেও অভিহিত করেন।

এই মিনারের আরও দক্ষিণে একটী জঙ্গলে-পূর্ণ প্রাচীর দেখা যায়। ইহার নাম 'বাইশগজী' বা 'ঘোড়-দৌড়' প্রাচীর। এই প্রাচীরটী উচ্চতায় প্রায় ৬৬ ফুট হইবে। ইহার নির্ম্মাতা বারবক শাহ (১৪৬০ খৃঃ অঃ)। প্রাচীরের আরও দক্ষিণে কতকগুলি বাঁধ আছে। প্রত্যেক বাঁধের উপর একটী করিয়া দরজা বসান'। ইহাদিগের মধ্যে একটি বিশেষ দরজা 'চাঁদ-দরজা' নামে খ্যাত। ইহাই প্রাসাদ-প্রবেশের বিজয়-দ্বার।

প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত কদম-রসুল মস্‌জিদ্ ৯৩৭ হিজিরায় (১৫৩০খৃঃ অঃ) নস্‌রৎ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র মিনার ও শিরোদেশে একটীমাত্র গম্বুজ পরিদৃষ্ট হয়। এই মস্‌জিদে একটী পদচিহ্ন আছে। পদচিহ্নটী একাধারে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই ভক্তি ও পূজা পাইয়া থাকে। মুসলমানগণ এটীকে হজ্‌রৎ মহম্মদের ও হিন্দুগণ শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের পদচিহ্ন বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।

মস্‌জিদের দ্বার-পৃষ্ঠ-সংলগ্ন শিলালিপি-পাঠে ইহার নির্ম্মাতা ও নির্ম্মাণকালের তারিখ অবগত হওয়া যায়। উক্ত শিলালিপি-অনুসারে ইহার নির্ম্মাণকাল—১০ই রমজান, ৮৮৫ হিজ্‌রি (১৪৮০ খৃঃ অঃ); নির্ম্মাতা—বরবাক্ শাহ-পুত্র নবাব শামসুদ্দিন আবুল মোজাফর য়ুসুক শাহ।

নগরের দক্ষিণ প্রাচীরে একটী অতি সুন্দর ফটক সংলগ্ন

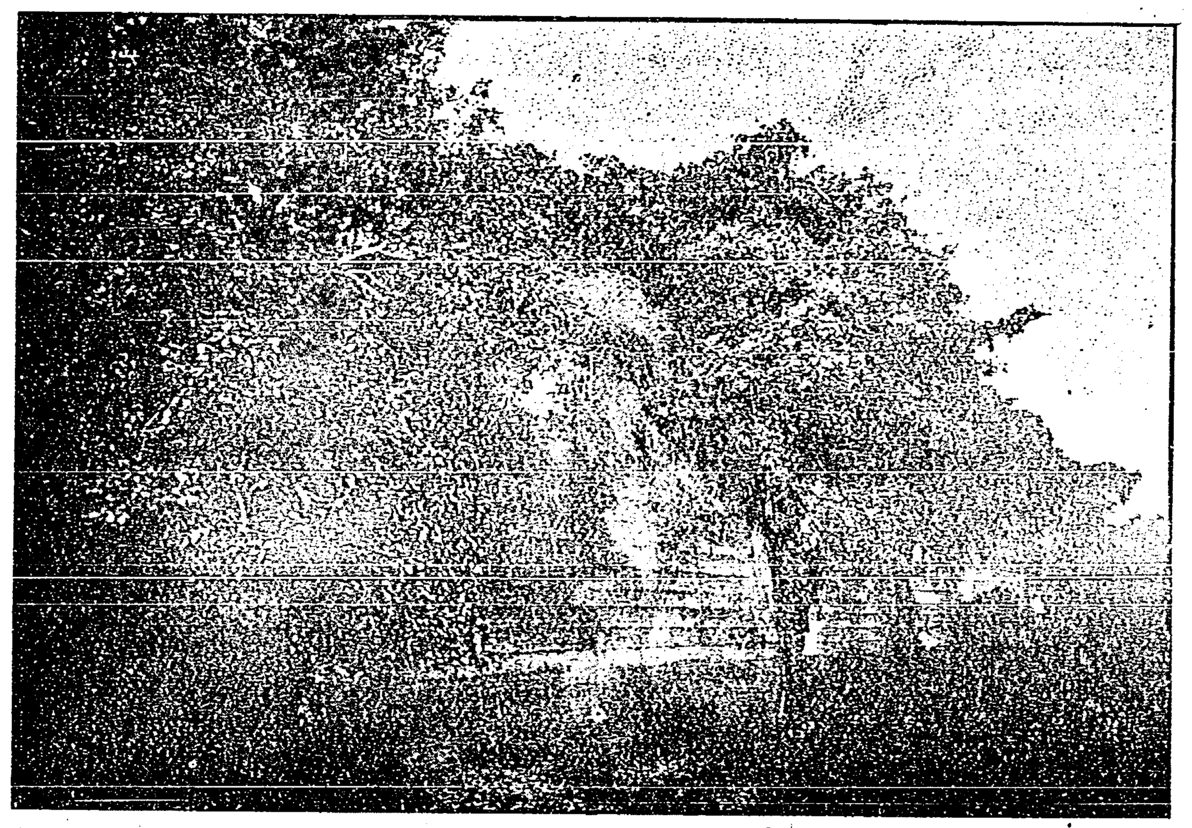

বাইশগজি প্রাচীর

আছে। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী অতি বিচিত্র। ফটকটীর নাম 'কোতোয়ালী-দরওয়াজা'। খুব সম্ভব, সহর-কোতোয়াল এই-স্থানে অবস্থিতি করিতেন বলিয়াই ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে; ইহার অবস্থা এখনও বেশ ভাল আছে বলিয়াই বোধ হয়। এই প্রাচীরের ভিতর দিয়া একটী খিলান বসান' ছিল; এক্ষণে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। খিলানটি ৩০ ফুট উচ্চ।

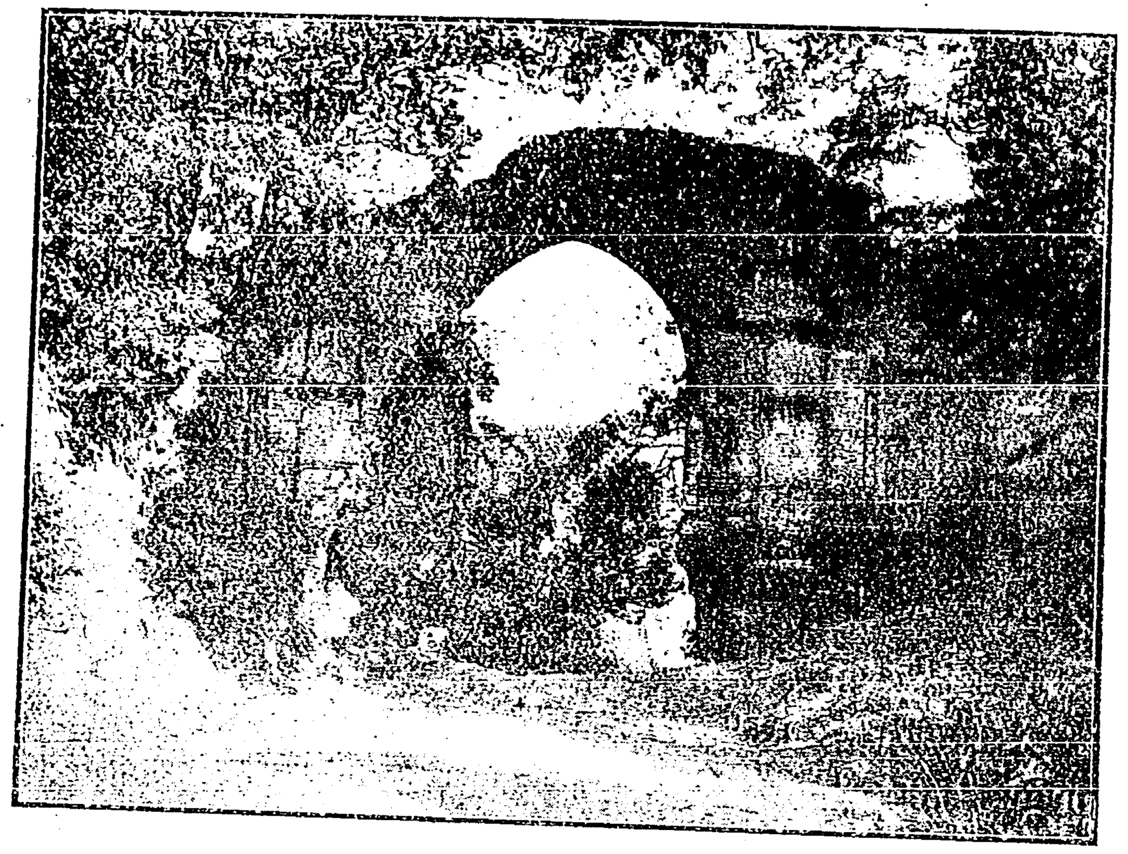

কোতোয়ালি দরওয়াজা

ইহার নিম্ন দিয়া একটী ১৭ ফুট ৪ইঞ্চি রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ফটকের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে কতকগুলি গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বোধ হয়, কামান ও বন্দুক ছুঁড়িবার গর্ত্ত। খ্রীষ্টীয় ১৪৫৭ অব্দে ইহা সুলতান মহম্মদ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার আর একটি নাম 'সেলামী-দরজা'।

ফিরোজপুর গেট দরওয়াজা

কোতোয়ালী-দরওয়াজার দক্ষিণে পুখরিয়া পর্য্যন্ত প্রায় ৩৷৷ ক্রোশ বিস্তৃত একটী সহরতলী আছে। নাম ফিরোজপুর। বঙ্গদেশে ফিরোজ শাহ নামক দুইজন রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে শেষোক্তের নামানুসারে এই সহরতলী 'ফিরোজপুর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও, একসময়ে বহু লোকে পরিপূর্ণ ছিল। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে একটী বাঁধ ও খাত দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, এটী বন্যার গতিরোধের জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে উহা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, অনেকস্থলে বড় বড় জলাভূমির সৃষ্টি হইয়াছে।

নগরের দক্ষিণদিকস্থ এই সহরতলীতে অনেকগুলি সাধারণ সৌধ ও মস্জিদ্ পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে ছোট সোণা-মস্জিদ্ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। ডাক্তার বুকানন হামিল্টন বলেন যে, সমগ্র নগরের মধ্যে এরূপ পরিষ্কার ও চমৎকার স্থাপত্য আর দ্বিতীয় একটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই মস্জিদ্টীর আরও দুইটী নাম আছে—১। 'জাম-ই-মস্জিদ্' এবং ২। 'খোজা-কি-মস্জিদ্'। এই মস্জিদের দ্বারপৃষ্ঠে একখানি লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহার অনেকস্থল বিকৃত হইয়া গেলেও, উহা যে ১৪৯৪ খৃঃ অঃ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে সুলতান হোসেন মহম্মদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার উপায় এখনও উহাতে স্পষ্ট পরিস্ফুট রহিয়াছে। মস্জিদের অনেকস্থলই ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সদাশয় ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট সেগুলির অনেকটা সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

সুসমৃদ্ধ গৌড় নগরের যেদিকে চক্ষু ফিরান' যায়, সেই

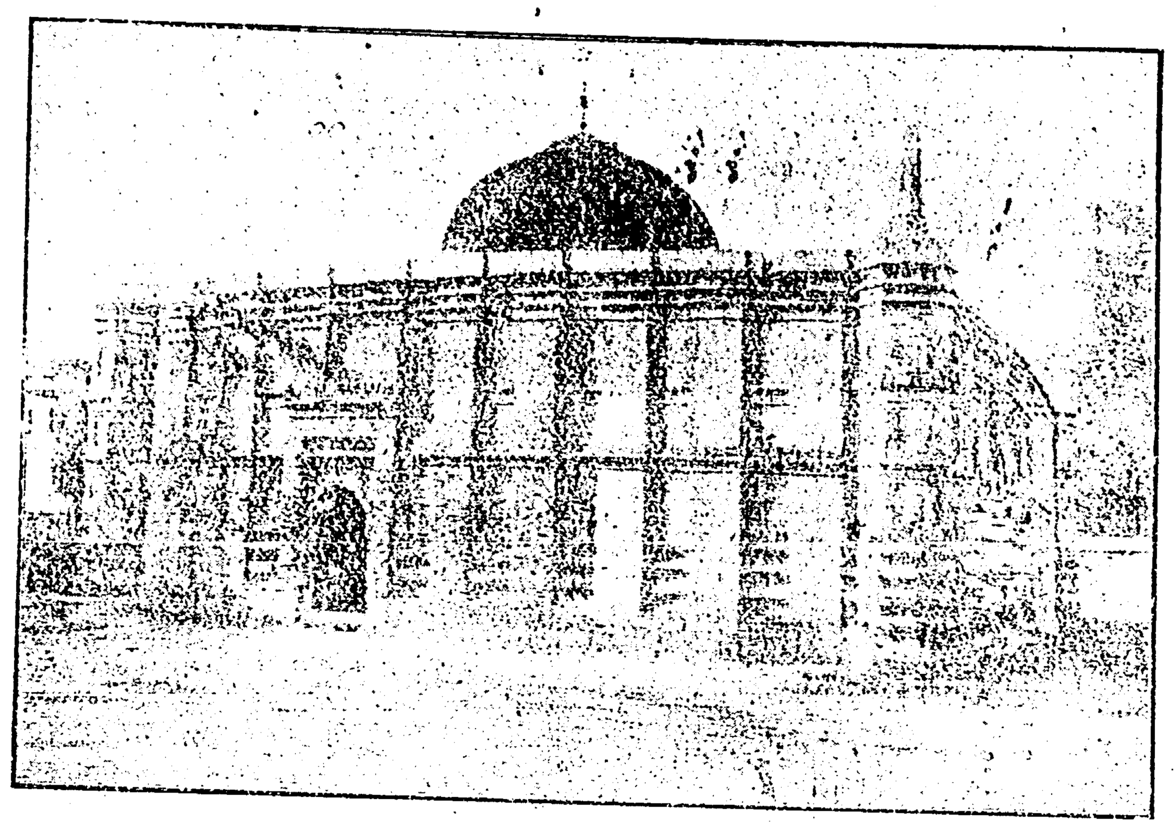

সংস্কারের পরে কদম রসুল

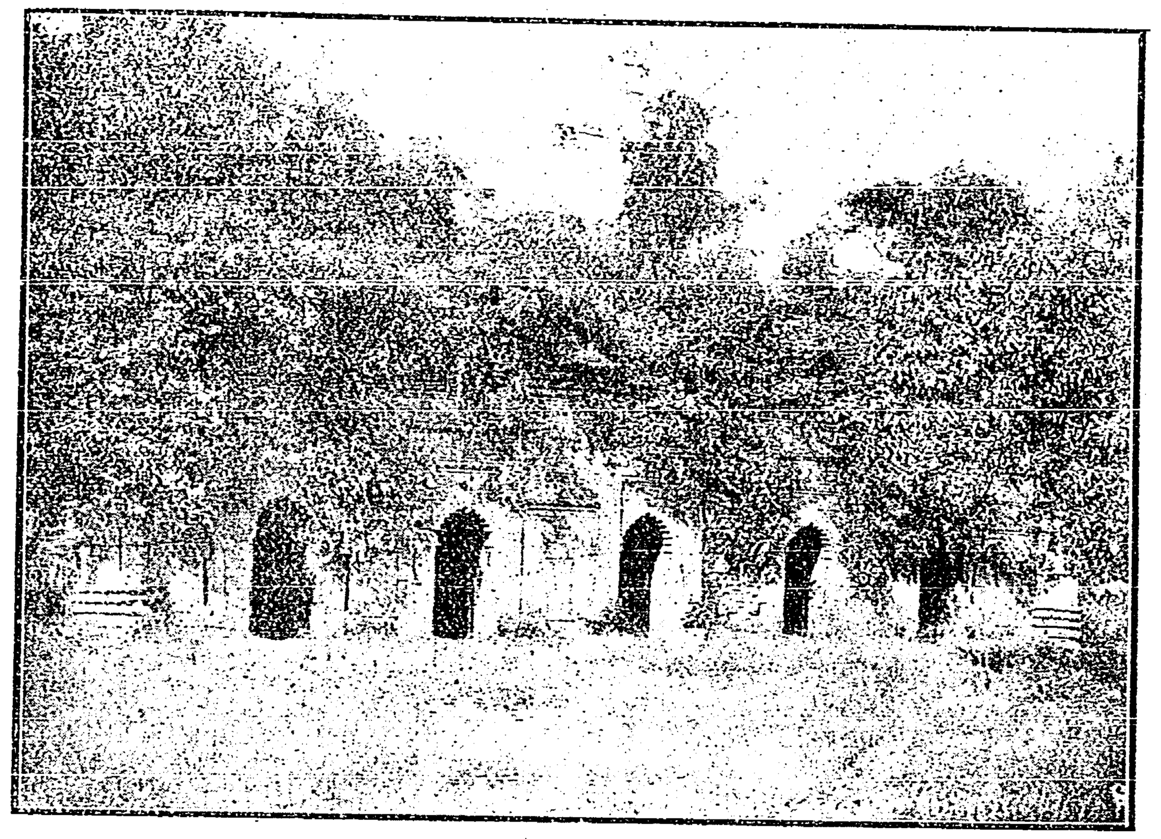

ছোট সোণা মস্জিদ্

দিকেই মস্জিদ্—সুধু মস্জিদ্—মস্জিদে মস্জিদে একাকার। এটা যে মুসলমানদিগের ধর্ম্মপ্রাণতার প্রকৃষ্ট পরিচয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে পক্ষান্তরে হিন্দুর দেব-দেবী-মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া সেই সকল প্রস্তর মস্জিদ্-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহার করিয়া এবং এই উপায়ে তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতার স্মৃতি-চিহ্নগুলি বিস্মৃতির অগাধ সলিলে ডুবাইয়া দিয়া যে ধর্ম্মের নামে প্রভূত কলঙ্ক লেপন করা হইয়াছে, এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য।

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ মিত্র

প্রভাতে

পূজিতে তোমারে, সুপ্ত ধরণী
হরষে উঠিছে জাগিয়া;
পূজিতে তোমারে কুসুম-কলিকা
হরষে উঠিছে ফুটিয়া।

পূরব-গগনে সিন্দূর সহিতে
সোণার বরণে মিশিয়া;
প্রকৃতি কেমন শোভিছে প্রভাতে—
অভিনব বেশে সাজিয়া।

দেখাতে তোমার অপরূপ রূপ,
মানব-মানস মোহিয়া,
বিমল প্রভাতে, পূরব গগনে,
উদিতেছে রবি হাসিয়া।

তোমারি আদেশে বহিছে অনিল,
মধুর সুরভি বহিয়া,
তোমারি বিধানে দুলিছে লতিকা,
কুসুম কোরকে সাজিয়া।

তোমার মহিমা গায়িছে বিহগ,
তরুবর-শাখে বসিয়া;
নানা রব ধ'রে, ডাকিছে তোমারে,
সুনীল গগনে উড়িয়া।

গাছের পাতায় মুকুতার প্রায়
রয়েছে শিশির ঝুলিয়া;
সমীরণ সনে তোমার চরণে,
বিন্দু যেতেছে ঝরিয়া।

শ্রী সুবোধকুমার পাঠক

বিবিধ

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম এই বিংশ শতাব্দীতে জানিতে বোধ হয় কাহারও বাকী নাই। সুধু ভারতবর্ষ বলি কেন, সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকার সহস্র সহস্র অধিবাসিগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা,ভক্তিও এমন কি, নিত্য পূজাও করিয়া থাকেন। ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম্মের সকল মতে নিজে সাধনা করিয়া যে মীমাংসা করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে সমগ্র দেশবাসীর সকল জাতির, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সেই সর্ব্বজনপূজনীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাস্থি কলিকাতার কাঁকুড়গাছী যোগোদ্যানে সমাহিত হইয়াছে। আজ অষ্টাবিংশ বর্ষ হইল, শ্রীযোগোদ্যানে তাঁহার নিত্যপূজা ও মহোৎসবাদি হইয়া আসিতেছে। সেই সমাধিস্থলে যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সামান্য ও অতি ক্ষুদ্র গৃহমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের উদ্যোগে তাহার সম্মুখে যে নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে সে সামান্য, ভগ্নোন্মুখ গৃহ আদৌ শোভা পায় না। সেইস্থানে একটী মন্দির-নির্ম্মাণ যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা দর্শকমাত্রেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধিস্থান পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এই তীর্থে জন্মাষ্টমীর দিনে সহস্র সহস্র ভক্ত সমবেত হইয়া কীর্ত্তনানন্দে ও বহুসহস্র অভ্যাগতদিগকে মহাপ্রসাদ দিয়া আনন্দের হাট বসাইয়া আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকেন। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে লীলা করিয়াছিলেন, সেইস্থান—বৃন্দাবন মহাতীর্থস্থানে পরিগণিত হইয়া হিন্দুদিগের আদরণীয় ও পূজনীয় হইয়াছে। সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রকর্ত্তৃক খণ্ডিত হইয়া যে ৫২টী স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহাই ৫২ পীঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বুদ্ধের সমাধিস্থান এবং লীলাস্থানের অন্বেষণ করিয়াও কত কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যেস্থানে তাঁহার দেহাস্থি রক্ষিত, সম্প্রতি সেইস্থানে সুন্দররূপে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই মহাপুরুষের কীর্ত্তি-স্থাপনের সাহায্য-কল্পে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনও জাতিবিশেষের, কোনও ধর্ম্মবিশেষের বা কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নহেন এবং ভারতবর্ষও চিরদিন মহাত্মার কীর্ত্তিস্থাপনে পরাঙ্মুখ নহেন।

মাণিকতলা শ্রমজীবি-বিদ্যালয়

কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ, "এই বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রমজীবীরই স্থান আছে; জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ছাত্রকেই সমান যত্নে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতিদিন নিয়মিত পাঠ-শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন প্রত্যেক শনিবারে ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি ও চরিত্র-গঠনের জন্য উপদেশপূর্ণ ভাল ভাল গল্প, মহৎ লোকের জীবনচরিত, ভিন্ন ভিন্ন দেশের ইতিহাস ইত্যাদি বলিয়া জীবনের একটা উচ্চ আদর্শ তাহাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধনকল্পে প্রতি বৎসরই মধ্যে মধ্যে ছাত্রদিগকে একসঙ্গে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হয়। ছাত্রদের কেহ কখনও কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে,তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকেরা সকলেই স্বেচ্ছাকর্ম্মী। তন্মধ্যে কেবলমাত্র একজনকে সামান্যরূপে মাসিক কিছু অর্থ-সাহায্য করা হয়। কর্ম্মীদের মধ্যে অধিকাংশই কলেজের ছাত্র।"

আমরা দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করিতেছি। শ্রবজীবি-বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যে উচ্চ ও মহান্, তাহাতে সন্দেহ নাই; পরন্তু, এরূপ বিদ্যালয়ের সার্থকতাও বড় অল্প নহে। বঙ্গদেশ শ্রমজীবীরই দেশ; কিন্তু এই কোটি কোটি শ্রমজীবী বিদ্যা ও শিক্ষার অভাবে মানুষ হইয়াও পশুর জীবন যাপন করিতেছে। উচ্চবংশীয় কয়েক লক্ষ শিক্ষিত চাকুরীজীবী ভদ্রলোক লইয়াই স্বদেশের উন্নতি সাধিত হইবে না। দেশে ও সমাজে যাহারা এখন শিক্ষার অভাবে পিছাইয়া আছে, তাহাদিগকেও হাতে ধরিয়া আগাইয়া আনিতে হইবে,—নিম্নজাতীয় বলিয়া অবহেলা করিলে দেশের এমন একটা বিরাট্ শক্তি চিরকালই অকারণে নষ্ট হইতে থাকিবে। আমাদের কোন আন্দোলনই যে স্থায়ী ও ফলদায়ক হয় না, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, সে আন্দোলন কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সম্প্রদায়েরই মধ্যে আবদ্ধ থাকে—সমগ্র দেশের, সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির সাড়া তাহাতে পাওয়া যায় না।

যাঁহারা "মাণিকতলা-শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ে"র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই সকল আত্মত্যাগী কর্ম্মবীরকে আমরা আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এরূপ কার্য্যে দেশবাসী, দেশহিতৈষী সকল লোকেরই সহানুভূতি ও সাহায্য আবশ্যক। যাঁহারা দেশের একটী পুণ্যকার্য্যে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতে চান, তাঁহারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য প্রেরণ করিতে পারেন—

"মাণিকতলা-শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহ ১নং সরকার বাই লেন কলিকাতা।"

সংপ্রতি "মাণিকতলা-শ্রবজীবি-বিদ্যালয়ের সপ্তম বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণ-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, পি, এচ্, ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় প্রথমতঃ ছাত্রগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তাহার পর শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ মহাশয় একটি সুন্দর বক্তৃতায় বলেন, "শ্রমজীবীকে-শিক্ষাদান করিয়া আমরা একটি পবিত্র কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছি। বাস্তবিক পক্ষে আমরা এতদিন যাহাদিগকে অবহেলা করিয়া অন্যায় করিয়াছি, আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।" অতঃপর ডাঃ ডি, এন, মল্লিক, Sc. Dr F. R. S. E, মহাশয় এই মহৎ কার্য্যে জনসাধরেণের নিকট হইতে কায়িক ও আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার পরে মহাবোধি-সমাজের ধর্ম্মপাল মহাশয় ভারতীয় শ্রমজীবিগণের সহিত পাশ্চাত্য শ্রমজীবিগণের তুলনা করিয়া দেখান যে, ভারতীয় শ্রমজীবিগণের শোচনীয় দুরবস্থার প্রধান কারণ, তাহাদের শিক্ষার অভাব।

সভাভঙ্গের পর ছাত্রগণের বাৎসরিক ভোজের অনুষ্ঠান হয়।

আমরা মাণিকতলা-শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ের একখানি সপ্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী পাইয়াছি। বিদ্যালয়ের কার্য্যফল যে সন্তোষজনক হইয়াছে,কার্য্য-বিবরণী-পাঠে তাহা জানা যায়। আমরা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কয়েকটি কথা এখানে তুলিয়া দিলাম ঃ—

"দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়—শিক্ষার অভাবই ইহার মূল কারণ। জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার-উদ্দেশ্যে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ রায় চৌধুরী মহাশয় ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত সোদপুরের নিকটবর্ত্তী তেঘরা গ্রামে শ্রমজীবীদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁহারই আদর্শে প্রোৎসাহিত কয়েকটি যুবকের উদ্যমে, অধ্যবসায়ে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আমাদের এই মাণিকতলা শ্রমজীবি-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই অনুষ্ঠানের আদর্শে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে।"

মর্ম্মবাণী

"স্বর্গ কোথা, মা ?"

(জি, হিলিয়ার্ড সুইনষ্টেড, R. B. A. অঙ্কিত)

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ২১এ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ {১ম খণ্ড, ২২শ সংখ্যা

সমালোচনা

অভাগী গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীজলধর সেন প্রণীত ও শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ফুলস্কেপ, ষোল পেজি, ৩১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তকখানিতে একখানি চিত্র আছে। সুন্দর সিল্কের কাপড়ে বাঁধান'। মূল্য ॥০ আনা। প্রকাশক মহাশয় নিবেদনে লিখিয়াছেন, য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে ছয়-পেনি সংস্করণ, সাত-পেনি-সংস্করণ, শিলিং-সংস্করণ প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সুখপাঠ্য অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি কি এরূপ সুলভ মূল্যে দেওয়া যায় না? তাই তিনি আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালা-প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছেন। "অভাগী" সেই গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ। প্রকাশক মহাশয় আরও লিখিয়াছেন, "সুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে এ উদ্যম এই প্রথম।" আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, তিনি একরূপ অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন। এতবড় সুন্দর পুস্তক ভাল কাগজে ছাপাইয়া ও বাঁধাইয়া কি প্রকারে এত সস্তায় দিতেছেন? বিলাতে যে এইরূপ পুস্তকের প্রচলন আছে, তাহার কারণ, ইংরাজী ভাষা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত। ইংরাজী ভাষার পাঠক-সংখ্যাও অত্যধিক; বাঙ্গালাদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা পাঠক-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে সত্য; কিন্তু আমরা এখনও ভাবিয়া পাইতেছি না, খরচ-খরচা বাদে পুস্তকখানি হইতে প্রকাশক মহাশয়ের ও লেখক মহাশয়ের লভ্যাংশ কি হইবে? যাহা হউক, তাঁহাদের এই স্বার্থত্যাগ কখনও নিষ্ফল হইবে না।

লেখক মহাশয় প্রাচীন সাহিত্যিক। তাঁহার লেখার সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় নাই, এরূপ বাঙ্গালী বোধ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথা সাহিত্যে করুণ-রসাত্মক চিত্র অঙ্কিত করিয়া তিনি যশস্বী হইয়াছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানিও করুণরসে পূর্ণ। যে সামাজিক সমস্যা লইয়া তিনি তাঁহার "বিশুদাদা" প্রণয়ন করিয়াছিলেন ও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এখানেও তিনি সেই সমস্যা অন্যদিক হইতে আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু এখানে যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা যে সময়োপযোগী হইয়াছে, তাহা ত বলিতে পারি না; ঠিক হইয়াছে কিনা, তাহা সামাজিক সংস্কারকেরা বলিবেন। সমস্যাটা এই, যে সকল স্ত্রীলোক কোন কারণে ঘরের বাহির হইয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় ঘরে লওয়া উচিত কি না? ইতঃপূর্ব্বে গ্রন্থকার মহাশয় "মানসী" পত্রিকায় গল্পচ্ছলে সামাজিক অপর একটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন—যাহাদিগকে আমাদের রক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে যদ্যপি আমরা রক্ষা না করিতে পারি—আমাদের অক্ষমতার জন্য আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা যদ্যপি লাঞ্ছিতা হন, তবে তাঁহাদিগকে গৃহে লওয়া উচিত কি না; কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সমাজের নেতারা এ প্রশ্নেরও কেহ সদুত্তর দেন নাই বা সেরূপ স্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহাও নির্দ্ধারণ করেন নাই। বিশুদাদার 'সুমতি'কে তিনি ঘরে লইয়া যে সহানুভূতি ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, আমাদের বহুপুরাতন জড়ভরত সমাজকে সচেতন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি পূর্ব্বে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এখানে সমাজের মুখ চাহিয়া 'সুশীলা'র সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড দিয়া সমাজে তাহাকে না লইয়া কলাবিৎ শিল্পীর ন্যায় মৃত্যুর যবনিকা টানিয়া দিয়া শেষ পরিচ্ছেদে যে করুণ-রসের অবতরণা করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মভেদী, প্রাণস্পর্শী হইলেও, সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন যে, সমাজ-সংস্কারে জলধরবাবু যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এক্ষেত্রে ততদূর পশ্চাতে ফিরিয়াছেন। অবশ্য কলার দিক হইতে বলিব, পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে। আর এ কথাটা যে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না; তাই "একটী কথা"য় তিনি লিখিয়াছেন, "ইতঃপূর্ব্বে 'বিশুদাদা' পুস্তকে একটি কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম, আমার অক্ষমতাবশতঃ কথাটা যেমন করিয়া বলিলে হইত, তেমন করিয়া বলা হয় নাই; তাই পুনরায় চেষ্টা করিলাম; কিন্তু এবারেও কথাটা ঠিকমত বলা হইল কি না, বুঝিতে পারিতেছি না;—আমার ত মনে হয়, আমি কথাগুলি গুছাইয়া বলিতে পারি নাই।" আমরা এখানে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না, 'বিশুদাদা' পুস্তকে তিনি যে কথা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সুন্দরভাবেই বলিয়াছিলেন—প্রত্যেক কুল-কলঙ্কিনী গৃহত্যাগিনীকে যে গৃহে লইতে হইবে, তাহা কেহ বলিবে না; কিন্তু গৃহত্যাগিনীকে—তাঁহার কথায় বলিতে গেলে—'ক্ষণিকের মোহে', 'সামান্য ভুলে' যাহারা গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে দেশ, কাল ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া সমাজের কল্যাণ-কামনায় গৃহে লওয়া কি উচিত নয়? তাই আমাদের মনে হয়, তথাকথিত

সমাজ-সংস্কারকগণের গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসান দিয়া পুরাতন-পন্থীগণের আন্দোলনের সহায়তা করিয়া জলধরবাবু ভাল কাজ করেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান সমাজের দিকে চাহিয়া এ পুস্তকখানির শেষ পরিচ্ছেদ অন্যরূপে অঙ্কিত করিলে শোভন হইত। অবশ্য তিনি আমাদিগকে ভুল বুঝিবেন না—আমরা তাঁহাকে শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা রাখি না, তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া অনেক শিক্ষা করিয়াছি ও করিব। 'আর্টে'র দিক হইতেও কোন কথা বলি না। বাঙ্গালার জল-হাওয়ায় সামাজিক গার্হস্থ্য উপন্যাস ভাল জন্মে না—অন্ততঃ আজ পর্য্যন্ত খুব বেশী জন্মায় নাই; হয়, আমরা পাই ৫০ বৎসরের পুরাতন বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর চিত্র—না হয় পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে বিদেশী চিত্র। তাঁহার নিকট হইতে নূতন ও পুরাতনের অপূর্ব্ব সমবায়ে যে অভিনব সমাজ গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার আদর্শ চাই। সেই আদর্শের প্রতীক্ষায় আমরা পথ চাহিয়া রহিলাম—আর তিনি স্বয়ংও আমাদের আশ্বাস দিয়াছেন, "যদি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া যাই, তাহা হইলে আর একবার চেষ্টা করিব।" ভগবান্ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন!

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে আমরা দেখিতে পাই, দীনেশচন্দ্র রায় আফিসের টাকা ভাঙ্গিয়া জেলে যান। তাঁহার স্ত্রী মনোরমা অষ্টাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা সুশীলাকে লইয়া স্বামীর পরিচিত হরিশবাবুর বাড়ীর অন্দরের দুইটী ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। দীনেশের বাল্যবন্ধু সতীশবাবু তাঁহাদের সমুদায় ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। কলিকাতার মত স্থানে অভিভাবকহীন স্ত্রীলোকদিগকে রাখা কর্ত্তব্য নয় ভাবিয়া সতীশবাবু বারংবার পত্র লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু সুশীলার মাতা তাহাতে সম্মত হইলেন না। সুশীলার মাতার এই সৎ প্রস্তাবে অসম্মত হইবার বিশিষ্ট কারণ আমরা খুজিয়া পাই নাই—তবে একটা কারণ, 'এতকাল কলিকাতায় থাকিবার পর পাড়াগাঁয়ে বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক—একেবারে অসম্ভব বলিলেও হয়'। অসুবিধাজনক, তাহা আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু অসম্ভব কিসে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। নারী-চরিত্র সকল সময় বুঝিয়া উঠাও সহজসাধ্য নহে। যাক্, হরিশবাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায় তাঁহার শ্যালক তিনকড়ি ও পুত্র, পাড়ার বয়াটে ছেলে লইয়া 'কনসার্ট পার্টী'র মহলা ও এমন সকল গান গায় যে, ভদ্রলোকের মজ্‌লিসে কেন, অনেক থিয়াটারেও শুনিতে পাওয়া যায় না।' এই আখ্‌ড়া-ঘরের পাশের ঘরে বসিয়া সুশীলা উহাদের জন্য চা প্রস্তুত করে ও 'অশ্রাব্য রসিকতা ও রহস্য-পরিহাস-হলাহল আকণ্ঠ পান করে।' আর এই দৃশ্য দেখিয়াও সুশীলার মাতার চক্ষু খুলে নাই; তিনি মনে করিতেন, 'অন্ধকার গৃহে চুপ করিয়া থাকা অপেক্ষা ইহাতে তাঁহার কন্যার মন সুস্থ হইবে।' এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া মনে হইল, এইবার বুঝি বাস্তবতার দোহাই দিয়া যেরূপ ন্যক্কারজনক চিত্র অঙ্কিত হইতেছে, তাহারই কতকটা পুনরভিনয় দেখিব; পরক্ষণেই মনে হইল, জলধরবাবু কখনই সেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া হস্তকে কলুষিত করিতে পারেন না। বাস্তবিকই তাহাই হইল; বালিকা-সুলভ চাপল্যবশতঃ সতীশবাবুর বাটী শাজাহানপুরে যাইতে হইবে না ভাবিয়া সুশীলা গোপনে যোগেশ নামক এক ছোক্‌রার সাহায্যে গৃহত্যাগ করিল। সংযমে অনভ্যস্তা, স্বচ্ছলতায় প্রতিপালিতা, আদরে বর্দ্ধিতা প্রকৃত শিক্ষায় অশিক্ষিতা যুবতীর চিত্তে মাতার অসাবধানতার ফলে বয়সগুণে স্বভাবের ধর্ম্মে যদ্যপি চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহার জন্য দায়ী কে? নর-নারী শরীরী। দেহের ধর্ম্মের উপর—প্রবৃত্তির উত্তেজনার উপর কেবলমাত্র সুশিক্ষা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। মানবের পশুত্বকে (animality) দমন করিতে পারে কেবল ধর্ম্ম ও শিক্ষা; তাই হিন্দু-বিধবার জন্য এত কঠোরতা—ব্রহ্মচর্য্য-পালন। সুখের বিষয়, নানারূপ বিপদের মধ্যে পড়িয়া সুশীলা কোনদিন ধর্ম্ম নষ্ট করে নাই। জলধরবাবু 'অভাগী'তে আদর্শ বিধবার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—'তাহার মনে যদি একটু কলঙ্কের দাগ পড়ে, তা' হ'লে ত তাহার ইহকাল-পরকাল সব গেল'! অন্যত্র তিনি আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, 'তাহার (সুশীলার) হৃদয়ে বাসনার অগ্নি একটুমাত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল; সে, সময়ে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল; সে প্রলোভন সবলে দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিয়াছিল'। 'যদি এ কথাই সত্য হয়, তবে সুশীলার পাপ কিসের হইল? পাশ্চাত্য চারিত্রিকদিগের মতে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না হইলে, পাপ স্পর্শ করে না; কিন্তু হিন্দুর নিকট দুষ্ট চিন্তনও পাপ। আর সেদিন ষ্ট্রাইনবার্গের "There are crimes & crimes" পুস্তকেও এই প্রাচ্য আদর্শ গৃহীত হইয়াছে, দেখিলাম। সুশীলার মনে যে বিশেষ কোন অসচ্চিন্তার উদয় হইয়াছিল, তাহা তাহার কার্য্যাবলী হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। তাহার হৃদয়ে সামান্য একটু পাপ প্রবেশ করিলেও, তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও সাজা দেখিয়া, লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়—অশ্রু রোধ করা যায় না। গ্রন্থকার মহাশয় একস্থলে বলিয়াছেন; —"কিন্তু—কিন্তু সেই যে গৃহত্যাগ—ক্ষণিক গৃহত্যাগ—হিন্দু-বিধবার পক্ষে যে তাহা অমার্জ্জনীয় অপরাধ—মহাপাপ! সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি সহজে হয়?" তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই কারণেই কি তিনি এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন? কুলে জলাঞ্জলি দিবার জন্য ত সুশীলা পরপুরুষের সহিত পরামর্শ করিয়া গৃহত্যাগ করে নাই! কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিবে না বলিয়া দুইদিন অন্যত্র থাকিয়া আবার বাটীতে আসিবার বাসনা তাহার মনের মধ্যে উদয় হইয়াছিল। অবশ্য উপন্যাসখানি উদ্দেশ্যমূলক না হইলে, এত কথা বলিতাম না। ঘটনামূলক (Realis ic) হইলে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উপর কিছুই বলিবার ছিল না। তিনি ত কেবল ঘটনার পরিদর্শক নন—তিনি আদর্শের স্রষ্টা। এক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে ত চলিবে না! আর এক কথা, 'মানসী'র গ্রন্থকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, যে পাপিষ্ঠ দুষ্ট মতলব লইয়া সুশীলাকে পাপ-পথে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিল—মনে যাহার পাপ পূরামাত্রায় ছিল—কার্য্যও হাসিল করিবার জন্য যে বিধিমতে চেষ্টা করিল, সেই যোগেশের কোনরূপ সাজা ত দেখিতে পাইলাম না! 'সংসারে এরূপ ঘটনা ত বহুল দেখিতে পাওয়া যায়'! এইরূপ সাফাই গায়িলে ত চলিবে না। তাহা হইলে Idealistic উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ হইতে দূরে ছিটাইয়া পড়িতে হইবে।

উপন্যাসখানিতে সতীশের অনন্যদুর্ল্লভ বন্ধু-প্রণীত যে মনোরম চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা আজকালকার দিনের প্রেম-প্লাবিত বাঙ্গালা-সাহিত্যে বড় বিরল। তিনকড়ির বড় দিদির চিত্রও সুন্দর; তবে তাহাতে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র আনন্দময়ী চিত্রের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে। ঘটনাসমাবেশেও গ্রন্থকার বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, পুস্তকখানিতে বর্ণনা-শুদ্ধির ছড়াছড়ি দেখিলাম; একস্থলে অসাবধানতার চিহ্নও দেখিলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

শুষ্কপত্র

(গল্প)

ছেলেবেলা হইতেই প্রতাপের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া কলেজের সেকেণ্ড ইয়ার পর্য্যন্ত সে আমার সহপাঠী ছিল। প্রথম যেদিন সে আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি হইল, সে দিনটি আমার বেশ মনে আছে। পণ্ডিত মহাশয় তখন সংস্কৃত পড়াইতেছিলেন। একে সংস্কৃতের ঘণ্টা, তার উপর আবার সেদিন ব্যাকরণের পড়া। আমার ত সেদিন প্রাণ হাতে করিয়া থাকিবার কথা; কারণ, লট্-লোট্ ধরিয়া ধাতুরূপ করিতে বলিলেই আমার ধাত ছাড়িয়া যাইত। তার উপর পণ্ডিত মহাশয়ও বিলক্ষণ কড়া-মেজাজের লোক ছিলেন। সুধু ধাতুরূপ মুখস্থ আওড়াইয়া তাঁহাকে খুসী করিবার উপায় ছিল না। এক একজন ছাত্রকে বোর্ডের নিকট দাঁড় করাইয়া সূত্র আবৃত্তি করাইতে করাইতে তিনি ধাতুগুলির রূপ সিদ্ধ করাইতেন। সেদিন আমারই উপর পণ্ডিত মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছিল। বোর্ডের নিকট দাঁড়াইয়া খড়ি হাতে লইয়া ব্যাকরণ কৌমুদীর সূত্রগুলি স্মরণ করিতে বিফল-মনোরথ হইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের ধমক শুনিতেছি ও শীঘ্র অব্যাহতিলাভের জন্য মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় হেড্‌মাষ্টার মহাশয় প্রতাপকে লইয়া আমাদের ক্লাসে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত মহাশয় বুদ্ধিতে অপরাজেয় ছিলেন। পাছে আমার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া হেড্‌মাষ্টার মহাশয় অনুমান করেন যে, আমাদের ক্লাসে সংস্কৃত ভাল পড়ান হইতেছে না, সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় হেড্‌মাষ্টার আসিবামাত্রই আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন ও একজন ভাল ছাত্রকে বোর্ডের নিকট গিয়া ধাতুরূপ করিতে বলিলেন। হেড্‌মাষ্টার কিন্তু পড়া শুনিলেন না। পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলেন, "এই একজন নূতন ছেলে আপনার ক্লাসে ভর্ত্তি হল।" এই বলিয়া আমার পার্শ্বেই প্রতাপকে বসাইয়া দিয়া হেড্‌মাষ্টার চলিয়া গেলেন।

তখন আমরা স্কুলের ছাত্র, রঘুনাথ সরকার কে, তাহা জানিতাম না। পরে শুনিয়াছিলাম তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল, অগাধ অর্থ উপার্জ্জন করেন। যাক্, সে সকল ভাবনা তখন আমাদের কিছুই ছিল না। নূতন ছেলে স্কুলে আসিয়া একটু থতমত খায়, দু-চার দিন চুপচাপ করিয়া থাকে। প্রতাপের কিন্তু সে লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। প্রথমেই সে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ক্লাসের সকল ছাত্রের নাম জানিয়া লইল। তারপর এক এক ঘণ্টা অন্তর যখন পাঁচ মিনিট করিয়া ছুটি হইতে লাগিল, তখন ছাত্রদের সকল কথাবার্ত্তায়ই সে নিঃসঙ্কোচে যোগদান করিতে লাগিল। জলখাবারের আধঘণ্টা ছুটির সময় সে স্ফুর্ত্তির সহিত 'কপাটি' খেলায় যোগ দিয়া প্রতিপন্ন করিল যে, ক্লাসের মধ্যে সেই 'কপাটি'খেলায় সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ। একদিনের মধ্যেই সে এইরূপে সকলের পরিচিত হইয়া পড়িল। ভাল, মন্দ, ধনী, গরীব সকল রকমের ছাত্রের সঙ্গেই সে অনায়াসে বন্ধুত্ব করিয়া লইল।

প্রতাপ বড়লোকের ছেলে। গাড়ী চড়িয়া স্কুলে আসিত, গাড়ী চড়িয়া বাড়ী যাইত। 'টিফিনে'র সময় চাকরে রূপার গ্লাসে দুধ ও রূপার থালায় জলখাবার সাজাইয়া আনিত। বেশভূষার পারিপাট্যও তাহার খুবই ছিল। আমার বাবা কলিকাতার এক সদাগরের অফিসে সামান্য বেতনের চাকুরী করিতেন; সুতরাং আমার সঙ্গে প্রতাপের ভাব হওয়া একটু আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও প্রতাপ ক্লাসের মধ্যে আমাকেই তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া বসিল। প্রায়ই আমাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া যাইত ও বিবিধ প্রকার মিষ্টান্নাদি খাওয়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িত। আমি "না, না" করিলেও জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিত।

প্রতাপের দুষ্টামি করিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল। একদিন রবিবারে দুপুরবেলা আমি তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখি, প্রতাপ এক গামলা জলে একটা পয়সা ফেলিয়া তাহাদের 'ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারি'র তার জলে ডুবাইয়া দিয়াছে ও জলে তাড়িৎ-চালনা করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কচ্ছ?" সে বলিল, "একটা মজা দেখাচ্ছি, দাঁড়াও।" খানিকক্ষণ তাড়িৎ-চালনার পর সে একবার ছুটিয়া রাস্তায় গেল। খানিক পরে দেখি, সে এক ভিখারীকে ডাকিয়া আনিয়াছে। ভিখারীকে আনিয়া বলিল, "ঐ জলের ভিতর হইতে পয়সাটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাও।" বৃদ্ধ ভিক্ষুক কোনও সন্দেহ না করিয়া যেমন ঐ জলে হাত দিল, অমনই এক প্রবল বৈদ্যুতিক ধাক্কায় সে পিছনদিকে ঝুঁকিয়া পড়িল ও চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর অপরাপর লোক আসিতেছে দেখিয়া প্রতাপ আমাকে লইয়া এক লম্ফে বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িল ও রাস্তায় আসিয়া দশ-পনের মিনিট ধরিয়া খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

আর একদিন প্রতাপের মামা আসিয়াছেন। দুপুরবেলা তিনি প্রতাপকে বলিলেন, "ওহে, একজন নাপিত ডাক্‌তে বলে দাও ত; তোমাদের কি মাহিনা-করা নাপিত আছে?" প্রতাপদের বাড়ীতে জীবন নাপিত কামাইত। জীবন নাপিত মাসিক মাহিনা পাইত। শুনিয়াছিলাম, তাহার মত নাপিত বাঙ্গালীপাড়ায় আর ছিল না। একবার চুল ছাঁটিতে ডাকিলে, সে চার আনা লইত। প্রতাপ মামাকে সে কথা না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি নিজে কামাতে পারেন? বাবার নিজের ক্ষুর আছে।" তাহার মামা জীবনে নিজ হাতে কখনও কামান নাই। তবু বলিলেন, "আচ্ছা, নিয়ে এস দেখি। আমি নিজেই কামাইব।" প্রতাপ সাবান আনিয়া দিয়া বলিল, "আপনি দাড়ীতে সাবান মাখান, আমি ক্ষুর আনিয়া দিতেছি।" প্রতাপের মামা উত্তমরূপে গালে, দাড়ীতে সাবান মাখাইতে লাগিলেন। প্রতাপ খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানি ভোঁতা অব্যবহার্য্য ক্ষুর আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার মামা সেইখানি লইয়া দাড়ীতে দিয়া টানিবামাত্র গাল চড়্ চড়্ করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মামা ব্যাপার কি বুঝেন নাই। দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত আবার ক্ষুর চালাইতে চেষ্টা করিলেন। তখন গাল আঁচড়াইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। "উঃ, উঃ" করিয়া প্রতাপের মামা উঠিয়া পড়িলেন ও সাবান-মাখা মুখ ধুইতে গেলেন। ধুইয়া দেখেন, একপার্শ্বের আধখানা কতক কতক অংশ কামান' হইয়াছে। প্রতাপ তখন পাশের ঘরে হাসিতে হাসিতে মেঝেতে লুটোপুটি খাইতেছে। শুনিয়াছিলাম, সেদিন এই কাণ্ডের জন্য প্রতাপকে পিতার নিকট প্রহার খাইতে হইয়াছিল। আর একদিন প্রতাপদের বাড়ীর রকে একজন অন্ধ ঘুমাইতেছিল। তাহার আগের

দিন দোল গিয়াছে; প্রতাপ দোলের জন্য বহুপ্রকার রং সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই রং গুলিয়া একটি পিচ্‌কারী লইয়া ঘরের ভিতর হইতে খড়খড়ির মধ্য দিয়া অন্ধের গায়ে সেই বিবিধ প্রকার রং দিতে লাগিল। অন্ধের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাহার দুইহাত রক ও দেওয়ালে বুলাইয়া কোথা হইতে জল পড়িতেছে বুঝিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সেই বিচিত্র-রঙে-রঞ্জিত বেশে লাঠি ধরিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। প্রতাপের তখন আহ্লাদে দম আটকাইবার উপক্রম হইয়াছে।

আমি অনেকবার তাহাকে এই সকল দুষ্টামি হইতে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলাম; কিন্তু কোনবারই সফলকাম হইতে পারি নাই। আমি তাহার এই প্রকার কোনও দুষ্টামির উল্লেখ করিলেই, সে অজস্র হাসিতে থাকিত ও আমার সকল তিরস্কার সেই হাসির প্লাবনে ভাসিয়া যাইত।

প্রতাপ অতি অল্প বয়স হইতেই সুন্দর ছবি আঁকিতে শিখিয়াছিল। তাহার ছবি-আঁকার দিকে ঝোঁক দেখিয়া, তাহার পিতা তাহার জন্য এক চিত্র-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষকের সহায়তায় তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা আরও স্ফুরিত হইয়াছিল। সে তাহার খাতায় 'রয়েল রীডারে'র ছবিগুলির এরূপ সুন্দর অনুকরণ করিত যে, আমরা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম।

প্রতাপ পড়া-শুনাতেও নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাহার স্মরণশক্তি অতীব তীক্ষ্ণ ছিল ও তাহার বুদ্ধির মতন বুদ্ধি আমাদের ক্লাসে আর কাহারও ছিল না; কিন্তু সে স্বভাবতঃই শ্রমবিমুখ ছিল। কোনও কোনও দিন পড়া করিয়া ক্লাসের প্রথম স্থল অধিকার করিত, আবার কোনও কোনও দিন কোনও বিষয়েরই পড়া না করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে নামিয়া যাইত; কিন্তু তাহার প্রতিভার কথা মাষ্টাররা সকলেই স্বীকার করিতেন। দুই-এক-জন আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "প্রতাপ যদি একটু খাটে, তাহা হইলে ও প্রতি বিষয়ে 'ফার্ষ্ট' হইতে পারে; কিন্তু ও কিছু করে না।" বার্ষিক পরীক্ষাগুলিতে কোনও রকমে সে উত্তীর্ণ হইত।

কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়া প্রতাপ আমার সঙ্গে আর ততটা মাখামাখি করিত না। এক-একদিন স্কুল-পালাইত। শুনিতাম, সে আমাদের ক্লাসের আর দুইজন ছাত্রের সহিত গোলদীঘিতে বসিয়া সিগারেট খায়। গাড়ী আসিয়া নিয়মিত দশটার সময় তাহাকে স্কুলের সাম্‌নে নামাইয়া দিত। সেও বই হাতে করিয়া স্কুলে ঢুকিয়া পড়িত। গাড়ী ফিরিয়া গেলেই, সে বই লইয়া আর দুই-তিনজন ছাত্রের সঙ্গে বাহির হইয়া যাইত। সমস্তদিন কোথায় ঘুরিত, জানি না। ছুটির সময়ের পূর্ব্বেই স্কুলের 'গেটে'র কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। গাড়ী আসিলে, তাহাতে চড়িয়া বাড়ী চলিয়া যাইত।

আমার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে প্রতাপের দেখা হইত, কথাবার্ত্তাও হইত; কিন্তু সেরূপ মেশামিশি আর ছিল না। সেকেণ্ড ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতাপ 'ফেল' হইল। অনেক অনুরোধের পর হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তাহাকে শেষে ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু সকলেরই তখন বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে যে, প্রতাপের আর লেখাপড়া কিছু হইবে না। সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। বদ ছেলেদের সঙ্গে মেশে। লেখাপড়ায় আদৌ মনোযোগ নাই। স্কুলের 'গেটে'র সাম্‌নে দাঁড়াইয়াই সিগারেট টানিতে থাকে। টেরি ও বেশভূষার পারিপাট্যও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়া ফেলিয়াছে।

(২)

এণ্ট্রান্‌স্ পরীক্ষার ছয়মাস পূর্ব্বে হঠাৎ একদিন প্রতাপের পিতার হৃদ্রোগে মৃত্যু হইল। অশৌচান্তে প্রতাপ যেদিন প্রথম স্কুলে আসিল, সেদিন তাহার প্রকৃতি একেবারে অন্যরূপ দেখিলাম। মলিন মুখে গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "পরীক্ষার আর কত দিন আছে?"

প্রতাপের কি পরিবর্ত্তন হইল, জানি না; কিন্তু দেখিলাম, সে তাহার পূর্ব্ব-বন্ধুদের সঙ্গ একেবারে ত্যাগ করিল। রোজ নিয়মিত স্কুলে আসিত। ক্লাসে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনও অপারগ হইত না। ধূমপানও পরিত্যাগ করিয়াছিল। 'টেষ্ট' পরীক্ষায় সে স্কুলের মধ্যে প্রথম হইল ও এণ্ট্রান্‌স্ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

এই কয়মাস প্রতাপ আবার আমার সঙ্গে খুব মেশামিশি করিয়াছিল। বলিত, "ভাই আমি পড়িয়াছিলাম, কিন্তু আবার উঠিয়াছি। তোমার সাহায্য ভিন্ন আমার এ উন্নতি স্থায়ী হইবে না। তুমি আমায় আগ্‌লাইয়া রাখ।" আমি যতদূর সাধ্য তাহাকে সদুপদেশ দিতাম। তাহার পাঠে সহায়তা করিতাম। তাহার প্রাণে কুসংসর্গের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতাম। আমার চেষ্টা সফল হইয়াছিল।

এণ্ট্রান্‌স্ পাশ করিয়া আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। সেখানে অনেক বড়লোকের ছেলে পড়িত। প্রতাপ তাহাদের সহিত অল্পদিনের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িল। আবার তাহার পূর্ব্বের কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। পড়া-শুনা আর করে না। ফুটবল, ক্রিকেট খেলে। কলেজের থিয়েটারে 'পার্ট' লয়। ক্লাসে কেবল নামটি ডাকিবার সময় হাজির থাকিত। আমার সঙ্গে কথা বলা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছিল। আমাকে দেখিলেই পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িত। বোধ হয়, ভয় হইত, পাছে আমি তিরস্কার করি।

একদিন রাত্রে নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ী ফিরিতেছি। রাত্রি তখন প্রায় বারোটা। আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীটের মাঝামাঝি একটা গলির ভিতর হইতে টলিতে টলিতে কে একজন বাহির হইয়া স্খলিত-কণ্ঠে ডাকিল, "নগেন!" আমি চমকিয়া দেখিলাম প্রতাপ। সে তখন সুরার প্রভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এমন সমস্ত কথা বলিতে লাগিল ও এমন পাশব আচরণ করিতে লাগিল যে, আমি নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিলাম, সে অধঃপতনের চরম সীমায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে: আমি একখানা গাড়ী ডাকিয়া তাহাতে জোর করিয়া তাহাকে তুলিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে তাহার বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিলাম। ভাড়া অগ্রিম না লইয়া গাড়োয়ান যাইতে চাহে না। আমার পকেটে একটি টাকা ছিল, তাহা গাড়োয়ানকে দিলাম। তখন সে প্রতাপকে লইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

তাহার তিন-চার দিন পরে একদিন বৈকালবেলা বৈঠকখানায় বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, "নগেন!" বাহিরে গিয়া দেখি প্রতাপ। বলিলাম, "কি দরকার?" সে অতি কাতরভাবে বলিল, "আমি তোমাকে দুটো কথা বলিতে চাই। অনুগ্রহ করিয়া শুনিবে কি?" অগত্যা তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইলাম। সে সেই রাত্রের ঘটনার উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল, তাহার তিন-চারজন বন্ধু জোর করিয়া তাহাকে সেদিন

লইয়া গিয়াছিল ও মদ খাইতে বাধ্য করিয়াছিল। আমি তাহার কথা আদৌ বিশ্বাস করিলাম না; চুপ করিয়া রহিলাম। দেখিলাম, কুসংসর্গে পড়িয়া তাহার কথাবার্ত্তার ভাষাও বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। প্রথম খানিকটা অতি সংযতভাবে কথা কহিতেছিল, ততটা ধরিতে পারি নাই; কিন্তু শেষে সে বিবাহের কথা পাড়িল। আমায় বলিল, "নগেন, তোমরা ত ব্রাহ্ম। নিজে দেখিয়া-শুনিয়া বিবাহ করিবে। আমারই মুস্কিল।"

আমি। তুমি কি শীঘ্র বিবাহ করিবে নাকি?

প্র। অনেক ঘটক-ঘটকী ত লাগাইয়াছি। রোজই প্রায় এক-জায়গা-না-এক-জায়গায় মেয়ে দেখিতে যাই। বেশ মজায় আছি।

আমি। বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি?

প্র। কিছুমাত্র না। বেশ স্ফুর্ত্তিতে আছি।

আমি। তবে মেয়ে দেখার প্রয়োজন?

প্র। আমার সেই সাবেক দুষ্টামি; মজা বেশ হয় হে, চল না, তোমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাই। হরেকরকম দেখে আস্‌বে এখন।

আমার রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। বলিলাম, "দেখ, তুমি অধঃপাতে গিয়াছ। ভদ্রলোকের বাড়ীতে এ প্রবৃত্তি নিয়ে যেতে তোমার সাহস হয়?"

প্রতাপ সেই বাল্যকালেই দুষ্টামি করিয়া ধমক খাইলে যেরূপ হাসিত, সেইরূপ হা-হা করিয়া হাসিল; কিন্তু হাসির সে সরলতা আর ছিল না। এ যেন রঙ্গ-বিদ্রূপ-টিটকারীর হাসি!

(৩)

প্রতাপ চলিয়া গেল।

এফ্, এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, 'গেজেটে' প্রতাপের নাম দেখা গেল না। শুনিলাম, সে নাকি তাহার বাপের সম্পত্তি সব উড়াইয়া দিয়াছে। তাহার পর দুই বৎসর প্রতাপের আর কোনও সংবাদ পাই নাই।

আমি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্, এ পড়িতেছিলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা এক পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা ছিল, "পত্রপাঠ আসিবে; নহিলে আত্মহত্যা করিব।—প্রতাপ।"

পত্র পাইয়া আর থাকিতে পারিলাম না। প্রতাপের বাড়ী গেলাম। তাহাদের সুবৃহৎ বাড়ীর সকল জানালা বন্ধ। সদর-দরজাও ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। বাড়ীখানি বহুদিন সংস্কৃত হয় নাই। বালি, চূণ খসিয়া পড়িতেছে। সদর-দরজার কড়া নাড়িতে নাড়িতে "প্রতাপ, প্রতাপ" করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। প্রতাপ নিজেই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার মুর্ত্তি দেখিয়া আমি পিছাইয়া আসিলাম। একমাথা রুক্ষকেশ, থান কাপড় পরিধান, কোঁচার খুঁট গায়ে-দেওয়া, খালি পা। আমার বিস্ময় বুঝিয়া প্রতাপ আমার হাত ধরিয়া বাড়ীর ভিতর টানিয়া লইল ও দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। পরে সিঁড়ি দিয়া আমাকে দোতলার এক ঘরে লইয়া গেল; ঘরে আসবাব-পত্র কিছুই নাই। মেঝেতে এক মাদুর ও একটা বালিশ। দেওয়ালের গায়ে এক বৃহৎ লোহার সিন্দুক। প্রতাপ সেই মাদুরে আমাকে বসিতে বলিয়া নিজে মাটিতে বসিয়া পড়িল। বলিল, "নগেন! আমি কেন তোমাকে ডাকিয়াছি, তা জান? আমার কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক বন্ধুরা আজ আমার দারিদ্র্য দেখিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। কলুষিত জীবনের পূর্ণ আস্বাদ পাইয়াছি; বুঝিয়াছি, ইহাতে সুখ নাই; কিন্তু জ্ঞানটা বড় শেষাশেষি হইল; বাড়ীখানা অনেক-দিন আগেই বন্ধক দিয়াছি। কাল এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গে আমিও পৃথিবী ছাড়িয়া চলিলাম।"

আমি বলিলাম, "শান্ত হও। যদি পাপপথের পরিণাম বুঝিয়া থাক, তবে চরিত্র সংশোধন কর। আবার মানুষ হও। কিছু কি তোমার সম্বল নেই?"

প্রতাপ। সম্বল আছে। এই দেখ।

এই বলিয়া প্রতাপ চাবি লইয়া লোহার সিন্দুক খুলিল। তাহার ভিতর হইতে এক ক্যাশবাক্স বাহির করিল। বাক্সের ডালা তুলিলে দেখিলাম, তাহা অলঙ্কারে পূর্ণ। সবিস্ময়ে প্রতাপের মুখের দিকে চাহিলাম। প্রতাপ বলিল, "আশ্চর্য্য হচ্ছ? এগুলি আমার মায়ের অলঙ্কার। আমার মা আমার চূড়ান্ত অধঃপতন দেখিয়া গিয়াছেন। মরিবার সময় আমাকে তাঁর পায়ে হাত দিয়া শপথ করান যে, তাঁর অঙ্গের অলঙ্কার যেন বেশ্যার গায়ে না উঠে। আর সকল অর্থ, সকল বিষয় তিনি বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নগেন, আমি নরাধম, কলুষিত-চরিত্র; কিন্তু মায়ের এ অলঙ্কার স্পর্শ করিতে পারি নাই। এই আমার সম্বল। বেচিলে এর মূল্য দশহাজার টাকার উপর হইবে। ইচ্ছা করিলে, আমি এই টাকা লইয়া আবার নূতন জীবন আরম্ভ করিতে পারি; কিন্তু ভাই—ভাই বলিলে যদি তোমার অপমান না হয়—আমার নিজের উপর আর বিশ্বাস নাই। ছেলেবেলায় একবার তুমি আমার সহায় হয়ে আমার চরিত্র সংশোধন করে-ছিলে, সে চরিত্র আমি রাখ্‌তে পারি নি। অধঃপতনের শেষ সোপানে নামিয়াছি। আর ফেরা যায় না। এ কলঙ্ক যাইবার নয়। কয়লা ধুলে কখনও শাদা হয় না। আমার অনুরোধ, তুমি এই অলঙ্কারগুলি লও। যদি কখনও বিবাহ কর, তোমার পত্নীকে দিও। এ জীবনে একমাত্র তুমিই আমায় সৎপরামর্শ দিয়াছ। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার মত বন্ধু পেয়েও আমার এই অবস্থা! যাক্, আক্ষেপের প্রয়োজন নাই। এই বাক্সটি নাও—আর একবার—এই শেষবার—আমায় আলিঙ্গন কর।"

আমার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বলিলাম, "তুমি কি সংকল্প করিয়াছ?"

প্র। সংকল্প আর কি? আত্মহত্যা। তা ভিন্ন আর আমার কোনও উপায় নাই।

আমি বলিলাম, "ও সংকল্প করিও না। কয়লা ধুলে শাদা হয় না বটে, কিন্তু আগুনে পড়্‌লে সেই কয়লাই আবার রাঙ্গা হয়। দুঃখের অনুতাপের আগুনে তোমার কলঙ্ক-কালিমা মুছে গেছে। তুমি আবার ওঠ্‌বার চেষ্টা কর—আবার মানুষ হও।"

প্র। এ দেশে আর আমি মুখ দেখাতে পার্‌ব না। যেখানে সদর্পে জুড়িগাড়ী করে পথে চলেছি, সেখানে ছাতি মাথায় দিয়ে কেরাণী হয়ে পথে হাঁট্‌তে পার্‌ব না। লজ্জা হতে আমায় এড়াতে হবে। মৃত্যু ভিন্ন আমার অন্য পথ নাই।

আমি। তুমি যে বিলেত যাবে বল্‌তে! তোমার ছবি আঁকবার ত অসাধারণ ক্ষমতা! এই দশহাজার টাকা নিয়ে বিলেত যাও না কেন? চিত্রবিদ্যা শিখে আস্‌তে পার্‌লে মানুষের মত হতে পার্‌বে।

আমার মনে মনে তখনও আশঙ্কা হইতেছিল, এ অনুতাপ স্থায়ী হইবে কি না। প্রতাপের ভাবপ্রবণ হৃদয় যখন-তখন

এক-একটা ঝোঁকে উচ্ছ্বসিত হইত। এখানে থাকিলে আবার অধঃপতন হইতে পারে। আর আপাততঃ তাহার মন ফিরাইবার জন্য একটা ভবিষ্যতের চিত্র না দেখাইলেই নয়।

প্রতাপ বলিল, "আর হয় না। কতবার আর শোধ্রাবার চেষ্টা কর্ব ?"

আমি ক্রমাগত তাহাকে বুঝাইতে লাগিলাম। সে চুপ করিয়া রহিল। সেদিন রাত্রি বারোটার সময় তাহার অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিলাম। প্রতাপ বলিল, 'যা হয় কাল বল্‌ব।'

(৪)

পরদিন ভোর হইতে-না-হইতে প্রতাপ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। বলিল, "ভাই নগেন, তাই স্থির। বিলেতই যাব। সমস্ত রাত ঘুমোই নি। খালি ভেবেছি। মায়ের অলঙ্কার বেচে যাচ্ছি। এক পয়সাও অপব্যয় হবে না, এ কথা নিশ্চয়। দেখি, আবার একবার চেষ্টা করে, কয়লার কালি ওঠে কি না।" এই বলিয়া সে ম্লান হাসি হাসিল।

দুইজনে মিলিয়া প্রতাপের বিলেত-যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। অলঙ্কারগুলি এগারহাজার টাকায় বিক্রয় হইল। জাহাজ-ভাড়া, পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয় বাদে সামান্য কিছু অর্থ লইয়া প্রতাপ বাকি সব আমার নিকট রাখিয়া দিল। বলিল, 'মাসে মাসে পাঠাইয়া দিও।' আমিও বুঝিলাম, তাহাই ভাল।

শেষে একদিন সাহেবী বেশে সজ্জিত হইয়া প্রতাপ বোম্বাই মেলে আরোহণ করিয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিল। আমি 'প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে' দাঁড়াইয়া। যতক্ষণ দেখা গেল, প্রতাপ অশ্রুপূর্ণ নয়নে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমারও চক্ষু সজল হইয়াছিল। ভাবিতেছিলাম, 'এ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি সংযত হইবে কি ?"

প্রতাপ তিনবৎসর বিলাতে রহিল। তাহার স্বভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। বিলাতের চিত্র-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিল। আমি নিয়মিত টাকা পাঠাইতাম। তিনবৎসর পরে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া প্রতাপ দেশে ফিরিল। আমার সেদিন কি আনন্দ! দেখিলাম, প্রতাপ বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে। স্বাস্থ্যোজ্জল বদন—স্বাধীন দেশে বাস করিয়া এক অভিনব তেজ ও সাহস লাভ করিয়া আসিয়াছে। আমার গলা জড়াইয়া বলিল, "ভাই, তোমার অনুগ্রহেই আজ আমি মানুষ হইয়াছি।"

প্রতাপ নিজে সাহেবটোলার দিকে এক চিত্রশালা খুলিল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রভূত আয় হইতে লাগিল। প্রতিকৃতি-অঙ্কনে তাহার বিশেষ দক্ষতা দেখিয়া বহু সাহেব, মেম তাহার দোকান ভিন্ন অন্যত্র যাইতেন না। তাহার স্বহস্তে-অঙ্কিত মৌলিক চিত্রাবলীও উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল।

আমি তখন বি, এল্ পাশ করিয়া কিছুদিন আলিপুর, কিছুদিন শিয়ালদহ, কিছুদিন-বা হাবড়া-কোর্টে যাতায়াত করিতেছিলাম। কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া শেষে আরায় চলিয়া গেলাম। আরায় আসিয়া আমার পশার একটু জমিল। মধ্যে মধ্যে প্রতাপের পত্র পাইতাম। তাহার ব্যবসা বেশ জমিয়াছে। হাতে কিছু টাকাও হইয়াছে।

বৎসর দুই এইরূপে কাটিয়া গেল। প্রতাপের পত্রাদি আর পাই না। তাহার দোকানের বিজ্ঞাপন প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে দেখিতাম। দোকানের নামও খুব হইয়াছিল। শুনিতাম, মাসে সে প্রায় হাজার টাকা উপার্জ্জন করে।

দুই বৎসর পরে একবার আমার একটা বড় মোকর্দ্দমার হাইকোর্টে 'আপীল' হইল। যে পক্ষ 'আপীল' করিল,তাহারা কলিকাতায় গিয়া ব্যারিষ্টারকে মোকর্দ্দমাটি বুঝাইয়া দিবার জন্য আমায় কলিকাতায় প্রেরণ করিল।

তখন জানুয়ারি মাস। আমি যেদিন কলিকাতায় পৌঁছিলাম, সেইদিনই হাইকোর্টে গিয়া মোকর্দ্দমাটীর বন্দোবস্ত করিলাম। বৈকালে মনে করিলাম, একবার চৌরঙ্গীতে প্রতাপের চিত্রশালাটি দেখিয়া আসি, প্রতাপের সঙ্গে দেখাও করিয়া আসি।

চৌরঙ্গীর উপরেই প্রতাপের প্রকাণ্ড দোকান। সাহেবী 'ফ্যাসনে' সজ্জিত। দোকানে সন্ধান লইয়া জানিলাম, প্রতাপ বাসায় চলিয়া গিয়াছে। বাসার ঠিকানা জানিয়া লইয়া, সেখানে গেলাম, সাহেবপাড়ায় সুন্দর বাড়ী। চাপরাসী বলিল, "সাহেবের শরীর ভাল নাই। দেখা হইবে না।" চলিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় 'হলে'র দরজা সশব্দে খুলিয়া গেল ও মদমত্ত অবস্থায় প্রতাপ বাহির হইয়া আসিল। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "By Jove! This is a pleasure indeed. Nagen!" বলিয়াই সজোরে আমার হাতখানা ধরিয়া ঝাঁকি দিতে দিতে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল।

ঘরের মধ্যে দেখি,আসবাব-পত্র এদিকে-ওদিকে পড়িয়া আছে। মদের বোতল গ্লাস ও কিছু খাদ্য টেবিলের উপর রহিয়াছে। একটা গ্লাস বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কাঁচের টুক্‌রা কার্পেটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। প্রতাপ ইংরাজীতে বলিল, "বড় একলা-একলা বোধ কচ্ছিলুম। জন্ কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে। নাও না নগেন, এক গ্লাস নাও।" এই বলিয়া গ্লাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে স্খলিত কণ্ঠে গায়িল—

"Nagen and I went out for a walk,
Ta-ra-ra-ra-boom—de-ay."

আমি প্রতাপের এই অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। বুঝিলাম, অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার মনে কুপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। আমি গ্লাস ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, "আমি মদ খাই না, জান। তুমি খাও। আমি আসি।"

এই বলিয়া চেয়ার হইতে উঠিতেই প্রতাপ দুইহাতে আমার হাত চাপিয়া ধরিল। জড়িতকণ্ঠে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মর্ম্ম এই বুঝিলাম,ঘোড়দৌড়ে বাজি ধরিয়া প্রতাপ বিস্তর টাকা লোকসান করিয়াছে। একজন সাহেবের কাছে তাহার দোকান বিক্রয় করিয়া ফেলিবার উদ্যোগ হইতেছে; নহিলে দেনা মিটিবে না। তাই ভবিষ্যৎ-চিন্তা ডুবাইবার জন্য মদ খাইতেছে।

আমি বুঝিলাম, আবার তাহার অধঃপতন হইয়াছে। এতদিনের সংযম এক মুহূর্ত্তে ভাসিয়া গিয়াছে!

বহু কষ্টে সেদিন প্রতাপের হাত ছাড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম। তাহার পরদিনই আমি আরায় চলিয়া গেলাম। প্রতাপের কি হইল, বলিতে পারি না।

(৫)

আমার জীবনে এই সময় যে মহাপরিবর্ত্তন হইতেছিল, তাহার বিস্তৃত উল্লেখের এ অবসর নয়। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি এই সময় হেমলতাকে দেখিলাম। হেমলতা আরার

ডাক্তার রাজেন্দ্রবাবুর কন্যা। রাজেন্দ্রবাবুর সহিত আমার পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল, হেমলতার কমনীয় অন্তরের অপরূপ সৌন্দর্য্যও তত দেখিতে লাগিলাম। তখন নিজের কাজ ও হেমলতা এই দুই ভিন্ন আমার অন্য চিন্তা ছিল না। ওকালতীতে বেশ পশার জমিতেছিল। খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে নব-উন্মেষিত প্রেমে আমার চিত্ত তখন আনন্দে ভরপূর হইয়াছিল।

হেমলতাকে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলি নাই। সেও আমার প্রতি অনুরাগের কোনও লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। তবু কি জানি কেন, আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে, আমি হেমলতার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিলে কখনও বিফল-মনোরথ হইব না।

বড় আনন্দেই দিনগুলি কাটিতেছিল। নিত্যই রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ী যাইতাম। নিত্যই হেমলতার সহিত দেখা হইত; কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হইল না। হেমলতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্তা হইয়া শয্যাশায়ী হইল। মানুষের চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, রাজেন্দ্রবাবু হেমলতার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। শেষে পীড়ার কিছুমাত্র উপশম হয় না দেখিয়া হেমলতাকে লইয়া কলিকাতায় যাইবার প্রস্তাব করিলেন। আমার অন্তর হেমলতাকে ছাড়িতে অনিচ্ছুক হইলেও, তাহার মঙ্গলের জন্য আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না। রাজেন্দ্রবাবু কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা হইতে রাজেন্দ্রবাবুর পত্র পাইলাম। কলিকাতায় তিনি ভাল বাসা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। জেঙ্কিন্‌স্ সাহেবের দ্বারা হেমলতার চিকিৎসা করাইতেছিলেন। জেঙ্কিন্‌সের এক প্রিয়বন্ধু রাজেন্দ্রবাবুর বিপদ দেখিয়া সাহেবীটোলায় নিজ সুবৃহৎ বাড়ীর একাংশ রাজেন্দ্রবাবুর বাসের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। চিঠিতে জানিলাম, এই বন্ধুটি একজন বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী। তাঁহার উদার হৃদয়ের পরিচয় তাঁহার ব্যবহার হইতে পাইলাম। হেমলতাকে দেখিবার জন্য মন অস্থির হইলেও, কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে পারিলাম না। পত্র লিখিয়া জানিতাম, হেমলতা কেমন আছে।

চার-পাঁচ মাস রোগভোগের পর হেমলতা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। তখন গ্রীষ্মকাল। ডাক্তার জেঙ্কিন্‌স্ দার্জ্জিলিং যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রবাবুকেও বলিলেন, এ সময় হেমলতাকে দার্জ্জিলিংএ লইয়া গেলেই ভাল হয়। পত্রে জানিলাম, জেঙ্কিন্সের বন্ধু সেই বিলাত-ফেরত ভদ্রলোকটিও ক্ষয়রোগগ্রস্ত, তিনিও চিকিৎসার্থ উঁহাদের সহিত দার্জ্জিলিং যাইবেন।

এতদিন 'ঈর্ষ্যা' কাহাকে বলে জানিতাম না; কিন্তু এখন,কেন জানি না, এই অপরিচিত বিলাত-ফেরত ভদ্রলোকটির উপর মন বিরূপ হইয়া উঠিল। এযাবৎ পত্রে তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে উদার-হৃদয় বলিয়াই বোধ হয়; কিন্তু মন এমনই অবোধ যে, এই অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কল্পনা করিয়া লইল ও দার্জ্জিলিংএ হেমলতার নিকট যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল।

অবশেষে মাসখানেকের জন্য দার্জ্জিলিং যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলাম। রাজেন্দ্রবাবুকে জানাইয়া আমি রওনা হইলাম।

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনে নামিয়া রাজেন্দ্রবাবুকে দেখিলাম। তিনি আমাকে কিছুতেই পৃথক্ বাসায় যাইতে দিলেন না। জোর করিয়া তাঁহার বাসাতেই লইয়া গেলেন। সুন্দর বাড়ীখানি। হেমলতা একখানি 'ইজি-চেয়ারে' শুইয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তাহার মুখে যে আনন্দের আভা ফুটিয়া উঠিল, তাহা যতদিন বাঁচিব কখনও ভুলিব না। হেমলতার সহিত তাহার পর কত কথাই হইতে লাগিল। শুনিলাম, ডাক্তার জেঙ্কিন্‌স্ ও সেই বিলাত-ফেরত ভদ্রলোকটি পৃথক্ বাসায় থাকেন। ভদ্রলোকটির নাম না কি বিমলবাবু।

অপরাহ্ণে বেড়াইতে বাহির হইলাম। বহুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি প্রতাপ। প্রতাপ ধীরে ধীরে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গে একটা চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আমায় টানিয়া লইয়া সে এক নির্জ্জন জায়গায় বসাইল। বলিল, "ব্যাপার কি? তুমি এখানে যে!"

আমি তখন আর থাকিতে পারিলাম না। কাহাকেও আমার প্রণয়ের কথা প্রকাশ করি নাই; কিন্তু প্রতাপকে দেখিয়া, তাহার প্রশ্ন শুনিয়া মনের কবাট আর বন্ধ রাখিতে পারিলাম না। এক নিঃশ্বাসে আমার সমস্ত কাহিনী বলিয়া ফেলিলাম। হৃদয় যেন লঘু হইল!

দেখিলাম, প্রতাপ হাঁপাইতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অমন করিতেছ কেন? মুখ অত ফ্যাকাসে হইয়া গেছে কেন?"

প্রতাপ বলিল, "আমার আর বেশী দিন নয়। সাজ্যাতিক রোগে ভুগিতেছি। দোকান এক সাহেবকে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়া দেনা সব শোধ করিয়াছি। সাহেব আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে মাসিক দুইশত টাকা করিয়া দিবে; কিন্তু এ টাকা আর বেশী দিন উপার্জ্জন করিতে হইবে না। মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।" বলিতে বলিতে প্রতাপ প্রবলবেগে কাসিতে লাগিল। রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিল, দেখিলাম রুমালে রক্তের দাগ।

আমি প্রতাপকে বলিলাম, "দেখ, তুমি ও সব কাজ ছাড়িয়া দাও। আমার সঙ্গে আরায় চল। আমার এখন বেশ দুপয়সা রোজগার হইতেছে। দুজনে বেশ থাকিব।" মনে মনে বলিলাম, 'তোমাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে না রাখিলে তুমি সংযত থাকিতে পারিবে না।'

প্রতাপ একটু হাসিল। বলিল, "তোমার পত্নী কি আমার মত লক্ষ্মীছাড়াকে বাড়ীতে থাকিতে দিবেন?"

আমি জোর করিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়। তুমি হেমলতাকে চেন না। সে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা! সে তোমায়—"

প্রতাপ আবার হাসিল। বলিল, "আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। আচ্ছা, ভেবে দেখি। কাল একবার সন্ধ্যার সময় এইখানে এস।"

বাসায় ফিরিয়া দেখিলাম, হেমলতার 'ফিট্' হইয়াছে। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, "আকস্মিক উত্তেজনাতেই মূর্চ্ছা ঘটিয়াছে।" আমার মন বলিতে লাগিল, "তবে কি হেমলতা আমায় ভালবাসে? আমার আগমনের আনন্দেই কি তাহার এত উত্তেজনা?"

অনেক শুশ্রূষার পর হেমলতার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল; কিন্তু তাহার দৌর্ব্বল্য ঘুচিল না। রাত্রিতে এক ভৃত্য সংবাদ দিয়া গেল, বিমলবাবু বিশেষ কার্য্যে সেইদিনই কলিকাতা-যাত্রা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত। কলিকাতায় গিয়া পত্র দিবেন।

সেদিন রাত্রিতে হেমলতার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। দৌর্ব্বল্যের উপর প্রবলবেগে জ্বর আসিল। প্রলাপ বকিতে লাগিল।

দুই-তিন দিন সমভাবে জ্বর রহিল। প্রলাপও বকিতে লাগিল। কেবল বলিত, "আমি আর বাঁচ্‌ব না—আমি আর বাঁচ্‌ব না।"

হেমলতার শয়ন-কক্ষের জানালা খুলিলে, কিছুদূরে আর একখানি বাড়ী দেখা যাইত। সেই বাড়ীর দেয়াল বাহিয়া একটী লতা উঠিয়াছিল। কি জানি কেন, সেই লতাটি শুকাইয়া যাইতেছিল। পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছিল। অল্প কয়েকটি পাতা ছিল। হেমলতা সেই লতাটির দিকে চাহিয়া বলিত, "ঐ লতাটি যেমন শুকাইতেছে, আমিও তেমনই শুকাইতেছি। ওর শেষ পাতাটি যেদিন ঝরিয়া পড়িবে, আমিও সেদিন মরিব।" রাজেন্দ্রবাবু অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাকে বুকে ধরিয়া বলিতেন, "ছি মা! ও কথা কি বল্‌তে আছে?" হেমলতা বলিত, "হ্যাঁ বাবা! সত্যি মর্‌ব। তুমি দেখো।"

ক্রমশঃ তাহার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে লাগিল। আমরা শেষে ডাক্তার জেঙ্কিন্‌স্‌কে একথা বলিলাম; তিনি শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "এ বিশেষ ভয়ের কথা। এ রকম রোগ অতি বিরল। আমেরিকার চিকিৎসাবিষয়ক মাসিকপত্রে এরূপ এক রোগের বিবরণ পড়িয়াছি। শরীরের উপর মনের প্রভাব খুবই বেশী। মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইলে শরীরও যাইবে। ফ্রান্সে একবার এক প্রাণদণ্ডে-দণ্ডিত আসামীকে লইয়া ডাক্তাররা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহার চোখ বাঁধিয়া দিয়া বলিলেন যে, তাহার শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া লইয়া তাহার প্রাণ বাহির করা হইবে। চোখ বাঁধিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া তাহার দেহের সামান্য একটু কাটিয়া গরম জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া তাহার গায়ে ফেলিতে লাগিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'এই দেখ, রক্ত বাহির হইয়া যাইতেছে।' বাস্তবিকই তাহার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গেল ও ক্রমশঃই সে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে তাহার মনের এই বিশ্বাস হইতেই তাহার মৃত্যু হইল।"

আমি বলিলাম, "ইহা কি সম্ভব?"

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "নিশ্চয়। একজন লোককে যদি সকলে মিলিয়া বলে, 'তোমার রোগ হইয়াছে, তুমি ক্ষীণ হইয়া যাইতেছ' ও তাহার মনেও যদি সেই বিশ্বাস হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার দেহে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইবে। এইরূপে রোগীকে যদি বিশ্বাস করান যায় যে,সে আরোগ্যলাভ করিতেছে,তাহা হইলে এই বিশ্বাসেও প্রচুর ফল হয়। ইহাকে ডাক্তারী-শাস্ত্রে Auto-suggestion বলে।"

আমরা এই কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম ও হেমলতাকে বার বার বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, সে যাহা বিশ্বাস করিতেছে, তাহা কখনও হইতে পারে না; কিন্তু তাহার কি মানসিক বিপ্লব হইয়াছিল জানি না, সে কিছুতেই আমাদের কথা বিশ্বাস করিত না। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া সে পাতাগুলি গণিত। বলিত, "আর দশটা পাতা আছে। আর নয়টা পাতা আছে। আর আটটা পাতা আছে।" বাস্তবিকই তাহার দেহও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। জানালা বন্ধ করিয়া রাখিতেও দেয় না; মহা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। সে লতাটি সে দেখিবেই। অবশেষে লতাটীর সব পাতাগুলি ঝরিয়া একদিন একটিমাত্র পাতা অবশিষ্ট রহিল।

সেদিন অপরাহ্ণে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাতর-কণ্ঠে হেমলতার নিকট আমার অনুরাগের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। হেমলতা বুঝিবে কি না একবারও তাহা ভাবিলাম না। হেমলতা স্থির হইয়া শুনিল। পরে হতাশকণ্ঠে বলিল, "আমি ত বাঁচিব না। কাল ঐ পাতাটি ঝরিয়া যাইবে। উহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যাইব।"

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। 'ওভারকোট'টা গায়ে দিয়া ছুটিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। যেখানে একদিন প্রতাপের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, সেইখানে হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িলাম। চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় ছিলাম, জানি না। কে যেন আমার কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল, 'নগেন!' চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম—প্রতাপ। প্রতাপ আমায় অনেকদিন আগে দেখা করিতে বলিয়াছিল। হেমলতার পীড়ার জন্য আমি বাহির হইতে পারি নাই; কিন্তু এই কয়দিনে প্রতাপের কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! যেন সে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে! দেহ কুব্জের ন্যায় অবনত। মুখ পাংশুবর্ণ; কিন্তু গণ্ডদ্বয়ে রক্তিম আভা। প্রতাপকে দেখিয়া আমি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলাম না। হেমলতার পীড়া, আমার প্রণয়-প্রকাশ সমস্তই বলিয়া ফেলিলাম। তখন আমার মনের সংযম কোথায় চলিয়া গিয়াছিল!

প্রতাপ—সেই উচ্ছৃঙ্খল অসংযত প্রতাপ, মাতা যেমন বেদনা-কাতর সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া সান্ত্বনা দেয়, সেইরূপ সযত্নে আমায় বুকে ধরিয়া আশ্বাস দিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "কোন ভয় নাই। ভগবান্ কখনও এমন ঘটিতে দিবেন না।" তাহার আশ্বাসে, তাহার সান্ত্বনায় আমিও যেন হৃদয়ে বল পাইলাম! সেই প্রতাপ—স্নেহ-মায়া-মমতা যাহার নিকট উপহাসের সামগ্রী ছিল—সেই প্রতাপ আমায় সান্ত্বনা দিতেছে, আর আমি শিশুর মত তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছি, ব্যাপার বিচিত্র বটে!

আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মেঘে গগন ছাইয়া গিয়াছে। ঝড় উঠিল। আমরা যে যার বাসায় ফিরিলাম। পথেই বৃষ্টি নামিল।

সে কি মুষলধারে বৃষ্টি! সেদিন সমস্ত রাত্রি প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল। রাত্রি কত জানি না, অকস্মাৎ "চোর, চোর" চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেলাম। দেখি, রাজেন্দ্রবাবুও উঠিয়াছেন। তখনও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। রাজেন্দ্রবাবুর চাকর ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমণির ঘরের জানালায় কে মই লাগাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিল। মইখানা পড়িয়া যায়। আমার ঘরের জানালায় জোরে পড়াতে শব্দ হয়, আমি চীৎকার করিয়া উঠিতেই লোকটা পলাইয়া যায়। মইখানা এখনও পড়িয়া রহিয়াছে।" আমরা বাহিরে গিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই একখানা মই পড়িয়া রহিয়াছে।

সে রাত্রিতে আর ঘুম হইল না। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইলাম। সকালে হেমলতাকে দেখিতে গেলাম। আমাকে দেখিয়াই উত্তেজিত স্বরে হেমলতা বলিল, "জানালা খুলুন। আজ আমার শেষ দিন। শেষ পাতাটি ঝরিয়া গিয়াছে।"

আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কাল রাত্রিতে সেই ঝড়-বৃষ্টি—শুষ্ক পত্রটি কি আর আছে? হেমলতার নেত্র বিস্ফারিত, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ; বিছানার উপর উত্তেজনার আবেগে উঠিয়া বসিয়াছে। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন,"শেষ পাতাটি খসিলেই বিপদ।" আমি জানালা খুলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম।

হেমলতা চীৎকার করিয়া বলিল, "খুল্‌লেন না? এখনও খুল্‌লেন না? আমি নিজে উঠে খুলে দেখ্‌ছি।"

এই বলিয়া সে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "কর কি? কর কি? আমি খুলিয়া দিতেছি।"

কম্পিতহৃদয়ে, রুদ্ধশ্বাসে জানালাটি খুলিয়া ফেলিলাম। সাগ্রহ দৃষ্টিতে লতাটির দিকে চাহিলাম।

জয় ভগবান্! পাতাটি তখনও রহিয়াছে!

হেমলতাও বিস্ফারিত, পলকহীন নয়নে পত্রটির দিকে চাহিয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। রাজেন্দ্রবাবু তাহাকে ধরিয়া শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। সে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি বাঁচ্‌ব—আমি বাঁচ্‌ব।"

তাহার বিশ্বাস টলিয়া গিয়াছে; আনন্দে আত্মহারা হইয়া আমি বাহিরে চলিয়া গেলাম।

দুই-তিন দিন কাটিয়া গেল। পাতাটি আর ঝরিল না। হেমলতা সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার তখন কি আনন্দ। হেমলতার সলজ্জ দৃষ্টি আমার হৃদয়ে পুলক-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিত।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় একজন বেহারা একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। তাহাতে লেখা ছিল, "একবার এস। প্রতাপ।"

আমি পত্রপ্রাপ্তিমাত্র বেহারার সঙ্গে ছুটিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—'প্রতাপকে হেমলতার আরোগ্যের সংবাদ দিব। শুনিয়া সে কতই না সুখী হইবে!'

প্রতাপের বাসায় পৌঁছিলে, বেহারা দ্বিতলের একটি কক্ষে আমায় লইয়া গেল। প্রতাপ শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল। তাহার মুখ প্রসন্ন। প্রশান্ত হাস্যের সহিত আমায় বসিতে বলিল। আমি বলিলাম, "তোমার কি হয়েছে?"

প্র। হবে আবার কি? তোমার খবর কি বল?

আমি রুদ্ধকণ্ঠে আমার সৌভাগ্যের কথা—হেমলতার আরোগ্য-লাভের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলাম। প্রতাপ একাগ্রচিত্তে তাহা শুনিতে লাগিল। একটা অনির্ব্বচনীয় সুখ ও শান্তির আভা তাহার আননে ফুটিয়া উঠিল। আমার কথা শেষ হইলে বলিল, "নগেন! আমি আজ জীবনের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম 'সুখ' কাকে বলে, অনুভব কর্‌লুম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা চিরসুখী হও। এ অভাগাকে এক একবার স্মরণ ক'র।"

আমি। কি হয়েছে তোমার? অমন কথা বল্‌ছ কেন?

প্র। কিছু হয় নি। বড় ঘুম পাচ্ছে। অনেক কষ্ট সহ্য করেছি। বড় ক্লান্তি হয়েছে। এবার একটু ঘুমুব। তোমায় মিনতি করি, আমায় জাগিও না। ঘুমুতে দাও।

আমি। সে কি? তোমার কি অসুখ হয়েছে? আমায় বল, আমি ডাক্তার ডাকি।

প্র। ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে। নগেন, ভাই, তোমার কাছে চুপি চুপি বলি, হেমলতাকে বোলো না, আমি হেমলতাকে ভালবেসে ফেলেছি। কল্‌কেতায় তাকে আমার বাড়ীতেই রেখেছিলুম।

আমার আসল নাম বল্‌তে সাহসী হই নাই। 'বিমলবাবু' নামে তার কাছে পরিচিত হয়েছিলুম। তার ভালবাসার টানেই দার্জ্জিলিংএ এসে পড়েছিলুম। মনে করেছিলুম, আর একবার শোধ্‌রাব। হেমলতাকে পেলে বুঝি আর অধঃপতন হবে না! সেই আমায় রক্ষা করবে! নগেন, তুমি ত জান, সর্ব্বদা রক্ষা কর্‌বার জন্য একজন না থাক্‌লে আমি সংযম রাখ্‌তে পারি না। তুমি সাক্ষী আছ, কতবার ওঠ্‌বার চেষ্টা করেছি, উঠেওছি; কিন্তু আবার পড়ে গেছি। হেমলতাকে দেখে আবার ওঠ্‌বার চেষ্টা মনে জেগে উঠ্‌ল। এ প্রলোভন দমন কর্‌তে পার্‌লুম না। মনে করেছিলুম, আমার পূর্ব্বজীবনের কাহিনী লুকিয়ে রেখে হেমলতাকে বিবাহ করে সুখী হব; কিন্তু ভগবান্ যা করেন, তা ভালর জন্যেই করেন। এই সময় তুমি আমায় মূর্ত্তিমান্ সুমতি হয়ে দেখা দিলে। তুমি হেমলতাকে ভালবাস—আমি কে? এই মৃতকল্প দেহে ভালবাসার উত্তেজনায় যে শক্তি জেগে উঠেছিল, তা আবার নিবে গেল। নগেন, আমি ভাল হবার প্রবৃত্তি দমন কর্‌তে পারিনি বলেই হেমলতাকে বিবাহ কর্‌তে গিয়েছিলুম। মৃত্যু-শয্যায় মিথ্যা বল্‌ব না। আমায় বিশ্বাস কর—আমার কোনও কু-অভিসন্ধি ছিল না; কিন্তু তা হল না নগেন! ভগবানের তা অভিপ্রায় নয়। তোমার পথে আমি দাঁড়াতে পার্‌লুম না। ভালবাসা কি, যেদিন বুঝ্‌লাম, সেদিন আমার নূতন জীবনের উন্মেষ হল। এ যদি আগে হ'ত! যাক্। নগেন, আর বেশীক্ষণ তোমায় ধরে রাখ্‌ব না। তুমি হেমলতার পীড়ার কথা যেদিন বল্‌লে, সেদিন আমার ভয় হল—ভগবান্ কি তোমাকেও অসুখী কর্‌বেন? নগেন, একটা দৌর্ব্বল্য—শেষ দৌর্ব্বল্যের কথা বল্‌তে যাচ্ছি,আমায় মাপ কর। এ কথা আর কেউ জানে না। সেই বৃষ্টির রাতে তোমাদের বাসার কাছে গেলুম। সাম্‌নের বাড়ীতে দেয়ালে লতার দিকে চেয়ে দেখি, শেষ পাতাটি ঝরে গেছে। তখন আমার মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর—তারপর, নগেন কিছু মনে ক'র না, আমি আমার রংয়ের বাক্স, তুলি আর একখানা মই নিয়ে গিয়ে লতার গায়ে একটা পাতা আঁক্‌লুম। টীনের ছাদ খানিকটা বেরিয়েছিল। দেওয়ালে তাই জলের ঝাপ্‌টা লাগেনি। আমার চিত্রবিদ্যার এই শেষ ফল। নগেন, সেই আঁকা পাতা দেখেই হেমলতা বেঁচেছে। এই সুখটুকু নিয়ে আমায় মর্‌তে দাও। আমার এ সুখের হিংসা ক'র' না। আর একটা কথা—সে রাত্রিতে আস্‌বার সময় একবার হেমলতাকে দেখ্‌বার বড় ইচ্ছে হল। মই লাগিয়ে তার জানালায় উঠ্‌ছিলুম। মইখানা চাকরদের ঘরের জানালায় পড়ে গেল। তারা চীৎকার করে উঠ্‌ল। আমি পালিয়ে এলুম। আগে থেকেই 'নিউমোনিয়া'য় ভুগ্‌ছিলুম। তখন হেমলতার জন্য শরীরের যত্ন কর্ত্তুম। ভাব্‌তুম আবার ভাল হব; কিন্তু তোমার ভালবাসার কথা শুনে সে চেষ্টা ছেড়ে দিলুম। সেদিন অর্দ্ধেক রাত জলে ভিজে আমার বড় উপকার হয়ে গেল। নগেন, ভাই, কয়লা যতক্ষণ আগুনের ভেতর থাকে, ততক্ষণই রাঙ্গা—যতক্ষণ তোমাদের সৎসঙ্গে ছিলুম, ততক্ষণই ভাল ছিলুম। তারপর যে প্রতাপ, সেই প্রতাপ। নগেন, নগেন, ভাই, ছেলেবেলায় অনেক দুষ্টুমির জন্য তিরস্কার করেছ; শেষে মাপও করেছ। আজও শেষ দুষ্টুমির জন্য তিরস্কার কর্‌তে চাও, কর; কিন্তু, ভাই, এই মৃত্যুশয্যায় তোমার অভাগা বন্ধুর শেষ দুষ্টুমি ক্ষমা কর্‌তে হবে।"

আমি প্রতাপের বুকের উপর পড়িয়া বলিলাম, "ভাই, ভাই, তুমি সেরে উঠ্‌বে। আমি ডাক্তার ডাকি। আমরা আমার সংসারে তোমায় মাথায় করে রাখ্‌ব।"

প্রতাপ একবার হাসিল। বাল্যকালের সেই সরল-মধুর হাসি। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আর কেন ভাই প্রলোভন দেখাও? আমার সব ফুরিয়েছে, জীবনও ফুরাল।"

প্রতাপ আর কথা কহিল না। কেবল বাহিরের প্রবল বায়ু জানালার খড়খড়িগুলি কাঁপাইয়া দিল ও জানালার ফাঁক দিয়া ব্যাকুল হইয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল

অনুশোচনা

(জয়দেব হইতে)

(আশা ভৈরবী)

মনে পড়ে তারে, যেবা মধুর রাসে,
পরিহাসে হাসে তুষে মনোভিলাষে।
অধর-সুধার রস সঞ্চার সুমধুর
মোহন মুরলী তার বাজে সঘনে,
চলবায়ে চঞ্চল আঁখি,—চূড়া,—অঞ্চল
লোল কুণ্ডল দুটি দুলে শ্রবণে।
চারু— চাঁচর চিকুর 'পর চন্দ্রক মনোহর
যেন— ইন্দ্রধনু শোভা সঘনাকাশে!
ডেকে আন তারে, যেবা মধুর রাসে,
পরিহাসে হাসে তুষে মনোভিলাষে।

গোপবল্লভাগণ দিয়ে ঘন চুম্বন
বাড়ায়ে দিয়েছে তার চুমার লোভে,
বাঁকুলীর মত রাঙ্গা সুধাধর পল্লবে
মধুর হাসিটি তার কেমন শোভে!
বাঁধে— ভুজ-বল্লরী দিয়া বল্লভ-নারী-হিয়া
তার— কর-পদ-উরোমণি আঁধার নাশে;
প্রাণ কাঁদে তারি লাগি, মধুর রাসে,
পরিহাসে যেবা তুষে মনোভিলাষে।

জলদ-পটলগত ইন্দুরে নিন্দিয়া
চন্দন-ললাটিকা শোভে ললাটে,
উরসিজ পরিসর করে সে যে নিপীড়িত
নিরদয়ে প্রসারিত হৃদি-কবাটে।

নিখিলে সকল ভুলে নতশির নীপমূলে
সুরাসুর মুনি তার চরণ-পাশে।
পায়ে পড়ি ডাক সখি, মধুর রাসে,
হাসরাসে যেবা তুষে মনোভিলাষে।

কাতরে ধরিয়া পায় সে যে চলে গেছে হায়,
অনাদরে ছল ছল দীন নয়নে,
মরি অনুশোচনায় কথাটি কহিনি তায়,
ডেকে আন, লুটি তার রাঙ্গা চরণে।
ওরে— সে যে চিরক্ষমাময় রাগ তার নাহি হয়,
তবু— প্রাণ মোর শিহরয় কাঁদন আসে।
পায়ে পড়ি, ডাক সখি, মধুর রাসে,
পরিহাসে যেবা তুষে মনোভিলাষে।

সে যখন কাছে আসে মানে মুখ ঢাকি বাসে,
চলে গেলে হাহাকারে লুটি ভূতলে;
যদি আর নাহি ফিরে ভেবে ভাসি আঁখি-নীরে,
কাঁকন আঘাত করি ভালে সবলে।
ওরে— আর নাহি হবে ভুল প্রাণ বড় বিয়াকুল;
তারে— চিরতরে রেখে দিব বাহুর পাশে;
মাথা খাস্, ডাক্ তারে মধুর রাসে,
সুধারসে তুষে যেবা মনোভিলাষে।

শ্রীকালিদাস রায়

পায়ের ধূলি

আমি মাটিতে থাক্‌তে বড় ভালবাসি; তাই পথের ধারেই পড়ে থাকি; কিন্তু জগতে চিরদিন কে ছোট হয়ে থাক্‌তে চায়? তাই মাঝে মাঝে বাতাসে ভর করে মাটি ছেড়ে উপরে উঠে যাই—মানুষের কাপড়-চোপড়, হ্যাট-কোটে গিয়ে বসি; কিন্তু সেখানে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারি না,—আমাকে জোর করে আবার পায়ের তলে ফেলে দেয়। মানুষের জুতার উপরও আমার স্থান হয় না, জুতার নীচে গিয়ে থাকি। মানুষের পায়ের তলে থাকাই আমার অভ্যাস—তাতেই বড় সুখ পাই—বড় শান্তি পাই। নীচে থাক্‌লে আমাকে কেউ বিরক্ত করে না, উপরে গেলেই যত গণ্ডগোল! আমাকে কেউ ভালবাসে না—তা নাই বাসুক্—পরের ভালবাসা পেয়ে কে কবে সুখী হয়েছে? ভালবাসা পেতে গেলেই কাঁদ্‌তে হয়; ভালবেসেই সুখ, ভালবাসা পাওয়ার আশা কল্লেই অশান্তি। কেউ ছোট আশা করে না, আশাটা সবারই খুব বড়—খুব উচু। জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে যখন একই অনাদি, অনন্ত, অক্ষয় শক্তির বীজ নিহিত, তখন অবশ্যই স্বীকার কর্‌তে হবে যে, এ জগতে যাহাকে বাহিরে দেখ্‌তে রেণুর রেণুকা সম ক্ষুদ্র, তার অন্তর্নিহিত শক্তি তত ক্ষুদ্র নয়;—তার ঐ ক্ষুদ্র আকারের মধ্যে অনন্তের বীজ নিহিত আছে। বীজ কখনও একভাবে থাক্‌তে চায় না; সে ফুটে উঠ্‌তে চায়, তার শক্তিকে প্রকাশ কর্ত্তে চায়। কিন্তু তার উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই, উপযুক্ত জল-হাওয়া চাই; নইলে তার আভ্যন্তরীণ অব্যক্ত শক্তির বিকাশ হতে পারে না। এই বীজ অর্থাৎ অব্যক্ত, অনন্ত শক্তির ব্যক্ত হওয়ার ইচ্ছাকেই "আশা" বলি। সে আশা অনন্ত—তাই বলি ভালবাসার আশাও অনন্ত,—সে আশা মিটিবার নয়—সে আশা চিরদিনই অতৃপ্ত

থাক্‌বে—সেই অতৃপ্ত আশা বুকে করে বিশ্ব-চরাচর অনন্তকালের জন্য আকুল প্রাণে ছুটেছে! এ ছুটাছুটির শেষ নাই—এ গতির বিরাম নাই। ভীমবেগে বিশ্বচক্র ছুটিয়াছে—এ বেগ রোধ করিবে কে? এ বিশাল বিশ্বের প্রত্যেক অণু-পরমাণু ছুটিয়াছে। এ ব্রহ্মাণ্ডে দাঁড়াইয়া কে—দাঁড়াইবার শক্তি কাহার—দাঁড়াইবার অধিকার কাহার? কোন্ অতৃপ্ত বাসনার তীব্র তাড়নায় এমন আকুল প্রাণে ছুটিয়াছে? সবারই প্রাণে এক বাসনা—সবারই হৃদয়ে এক আশা। সে আশার লক্ষ্য অনন্তের দিকে। অনন্তের আশা কে পূরাবে? কে তাহার অপূর্ণ প্রাণে পূর্ণ প্রাণ ঢেলে দিবে? ভালবাসার আশা অনন্ত—সে অনন্ত প্রেম এ জগতে কোথায়? জগতের ভালবাসার একটা অন্ত আছে, একটা সীমা আছে,—অনন্ত, অসীম প্রেম এ জগতের নয়। অনন্তের আশা সান্তে মিটিবে কেন? অসীমের আশা সসীমে পূরিবে কেন? তাই বলি, এ জগতে ভালবাসা পাওয়ায় সুখ নাই—তাহাতে তৃষ্ণা মিটে না—অশান্তি বাড়িয়া যায়।

কেউ আমাকে ভালবাসে না; কিন্তু আমি সবাইকে বড় ভালবাসি। আমি ভাল না বেসে পারি না, ভালবাসাই আমার অভ্যাস, ভালবাসাতেই আমার শান্তি, তাতেই আমার আনন্দ, তাতেই আমার জীবন; তাই আমি সকলের পায়ের নীচে থাকি। ভালবাসার অর্থই পায়ের নীচে থাকা। পায়ের তলে না থাক্‌লে কি ভালবাসা যায়? ভালবাস্‌তে গেলেই "পায়ের ধূলি" হতে হয়—আমার আমিত্ব ভুলে যেতে হয়—তার প্রাণে নিজের প্রাণ ঢেলে দিতে হয়—তার সত্বায় নিজের অস্তিত্ব যোগ কর্ত্তে হয়—তার সুখ-দুঃখে নিজের সুখ-দুঃখ, মান-অপমান সব মিশিয়ে দিতে হয়। ভালবাসা অর্থ "সেবা"—অর্থাৎ পায়ের নীচে থাকা। ভালবাস্‌তে হলে "পায়ের ধূলি" হতে হবে। যে সবার "পায়ের ধূলি" হতে পারে, সে বিশ্বপ্রেমিক। আমি সবাইকে ভালবাসি—তাই সবার পায়ের নীচে থাকি।

আমি স্বেচ্ছায় সকলের পায়ের তলে থাকি,—নৈলে জোর করে কি কেউ আমাকে পায়ের তলে রাখ্‌তে পারে? আমি আকারে অতীব ক্ষুদ্র; কিন্তু এ বিশ্বে সকলেরই সমান অধিকার—সবাই সমান—"কেউ উচু, কেউ নীচু"—এ ধারণা মিথ্যা। আমি অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু তাই বলে মনে করিও না, আমাকে বাদ দিয়া এ ব্রহ্মাণ্ড এক মুহূর্ত্তও স্থির থাক্‌তে পারে। আমি অকারণে আসি নাই,—আমার সৃষ্টিরও একটু উদ্দেশ্য আছে। বিনা উদ্দেশ্যে একটী রেণুও আসে নাই। এ ব্রহ্মাণ্ডে উচু-নীচু নাই—আকাশের তারা আর পাতালের বালি—সবাই সমান। আদিতে সবই "এক" ছিল, অন্তেও "এক" হবে, সুধু এই আদি ও অন্তের মাঝখানে "বহু"রূপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সবারই মূল এক; সুতরাং সবাই সমান—অন্তে সবাই "একে" পরিণত হবে।

তাই বলি, আমি কার চেয়ে ছোট? কে আমার চেয়ে বড়? স্বর্ণ-সিংহাসনাধিষ্ঠিত মহারাজাধিরাজ কি আমার চেয়ে বড়? ঐ যে অশ্বক্ষুরাঘাতে রাজপথ বিকম্পিত করে রাজা-মহারাজা, আমীর-ওমরাহ ছুটেছে, উহারা কি আমার চেয়ে বড়? বহিরিন্দ্রিয়ের নিকট বড় বটে, কিন্তু জ্ঞানচক্ষুর নিকট তারা আমারই সমান। অচিরে তারা আমারই আকারে পরিণত হবে! তারাও আমাতে মিশে যাবে—আর কোথাও তাদের খুঁজে পাবে না; কিন্তু আমি বলে দিতে পারি তারা কোথায়। তাই বলি, এ জগতে বড় কেউ নয়। যাকে ছোট দেখ্‌তে পাও—সে নিজের ইচ্ছায় ছোট হ'য়েছে—নইলে কার সাধ্য তাকে ছোট করে? যখন প্রলয় প্রভঞ্জন সমস্ত বিশ্বখানিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে, তখন সব উচু-নীচু ভেঙ্গে যাবে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা অনন্ত শূন্যে বিলীন হবে, ব্যক্ত আবার অব্যক্তে পরিণত হবে, "বহু" আবার "এক" হবে, সব আবার সমান হবে। তাই আবার বলি, ছোট কে আর বড়ই বা কে? আমি যদি সবার সমান হই, তবে সবার পায়ের তলে থাকি কেন? সবাইকে বড় "ভালবাসি", তাই সবার পায়ের নীচে থাকি।

শ্রীবিজয়গোপাল ঘোষ

সমর্পণ

তোমার আমি সব জেনেছি,
এবার আমায় জান্‌তে দেব;
প্রাণের মাঝে লুকিয়ে তোমায়
এইবারেতে কথা কব।
ভোরের বেলায় সোণার আলো
আজ আমারে তাই ছাপালো
তাই কাঁপালো প্রাণের ধারা
মুছিয়ে দিয়ে আঁধার ভব।

যাদের লাগি চোখের ধারা,
তারা হ'য়ে ফুট্‌ল তা'রা;
তোমার কাছে মুখর তা
আমার কাছে যা' নীরব।
সাঁঝের আলোয় আঁচল পেতে
ভিক্ষা চাহ পথে যেতে
পূর্ব্বদ্বারে রোজ প্রভাতে
এ কি এ দান নিত্য নব!

তোমার হাসি লুকিয়ে থাকে
অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে
সেই হাসিরে হাসিয়ে কবে
জীবনমাঝে ধন্য হব।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

গুলিস্তানের গল্প *

(অনুবাদ)

পঞ্চবিংশ গল্প

যুযুন দেশের রাজার একজন পরম দয়ালু ও উদারস্বভাব মন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষে সকলের সহিত শিষ্টাচার ও পরোক্ষে তাহাদের প্রশংসা করিতেন। দৈববৈগুণ্যে একদা কোন কর্ম্মের জন্য তিনি রাজার বিরাগভাজন হইলেন। সুলতান তাঁহার অর্থদণ্ডের ও অর্থদণ্ড না দিতে পারিলে, কারাদণ্ডের আদেশ করিলেন। কারাগারের প্রহরীরা তদীয় পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হয় নাই; এখন তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার অবসর পাইল। যতদিন মন্ত্রী তাহাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তাহারা তাঁহাকে কোন কষ্ট দিল না কিম্বা কোন কটু কথা বলিল না।

অসাক্ষাতে শত্রু যদি তব নিন্দা করে,
প্রশংসা করিবে তার মুখের উপরে;
নিন্দুকের কটু কথা না শুনিতে চাও,
পূর্ব্ব হতে মুখ তার মিষ্টান্নে ভরাও।

মন্ত্রী কিয়ৎ পরিমাণে অর্থদণ্ড দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট অর্থের জন্য কারাগারে বদ্ধ ছিলেন। ইত্যবসরে নিকটবর্ত্তী কোন রাজা বিশ্বস্ত দূত-হস্তে তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন:—“আপনি যে উন্নত স্বভাবের লোক, আপনার রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই; সেজন্য তিনি আপনার এত অপমান করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন, আপনি শীঘ্র কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করুন! যদি আপনি দয়া করিয়া আমাদের রাজ্যে আসেন, আমরা পরম আপ্যায়িত হইব ও আপনার মনোবাঞ্ছা যথাসাধ্য পূরণ করিতে চেষ্টা করিব। দেশের অমাত্যগণ আপনার প্রত্যুত্তর-প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া আছেন।” পত্র পাঠ করিয়া মন্ত্রীর বিপদের আশঙ্কা হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পত্রের পৃষ্ঠে এমনভাবে উত্তর লিখিলেন যে, উহা প্রকাশ হইলেও, তাঁহার কোন বিপদ ঘটিতে না পারে। রাজার একজন কর্ম্মচারী এই কথা শুনিতে পাইয়া রাজাকে বলিল:—“আপনি যাহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছেন, সে এখন নিকটবর্ত্তী অপর রাজার সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছে।” রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া এই ঘটনার প্রমাণ চাহিলেন। কর্ম্মচারীরা দূতকে ধরিয়া আনিল ও তাহার নিকট যে পত্র ছিল, তাহা পাঠ করিল। পত্রের মর্ম্ম এই:—“আপনি যে সকল গুণের কথা বলিয়াছেন, তাহা এ দাসের কিছুই নাই। আমাকে যে উচ্চপদ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি স্বীকার করিতে নিতান্ত অক্ষম; কারণ আমি যে রাজ-সংসারে এতদিন প্রতিপালিত হইয়াছি, এখন সামান্য মনোমালিন্য হইয়াছে বলিয়া সেই হিতকারী রাজার কৃতঘ্ন হইতে পারিব না; যেহেতু লোকে বলে:—

যে তোমার দিন দিন করে উপকার,
ক্ষম তারে যদি করে মন্দ একবার।”

রাজা মন্ত্রীর কৃতজ্ঞতায় বড় প্রীত হইলেন। তাঁহাকে বহু অর্থ ও সম্মানসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন এবং এই বলিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন:—“আমি অন্যায় করিয়াছি ও অকারণে আপনাকে দণ্ড দিয়াছি।” মন্ত্রী বলিলেন:—“সুলতান! এ দাসের চক্ষে আপনার কোন অপরাধ নাই। ভগবানের ইচ্ছায় আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। আমার সৌভাগ্য যে, বহুকাল আপনার প্রসন্নতা ও অনুগ্রহ ভোগ করিয়া আপনারই হস্তে এ দণ্ড পাইয়াছি। পণ্ডিতেরা বলেন:—

কষ্ট যদি পাও, দুখ কর না কখন;
জীব হতে সুখ-দুখ না হয় ঘটন।
ঈশ্বর সকল হৃদে সদা বর্ত্তমান,
ইচ্ছামত শুভাশুভ করেন বিধান।
ধনু হতে বাণ হয় যদিও মোচন,
ধনুর্দ্ধর একমাত্র তাহার কারণ।”

ষড়্‌বিংশ গল্প

আরব দেশের কোন রাজা স্বীয় কোষাধ্যক্ষকে কোন কর্ম্মচারীর বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিতে আদেশ করিয়া বলিলেন:—“দেখ, এই ব্যক্তি সর্ব্বদা সভায় উপস্থিত থাকে এবং যখন যে আজ্ঞা পায়, তদ্দণ্ডে তাহা পালন করে; অন্য ভৃত্যেরা আমোদ-আহ্লাদে রত থাকে ও নিজ নিজ কর্ম্ম অবহেলা করে।” একজন বিজ্ঞ লোক ইহা শুনিয়া বলিলেন:—“ঈশ্বরের দরবারে এইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে;—

ভৃত্য যদি রাজসেবা করয়ে যতনে,
অতি শীঘ্র সে রাজার পড়ে সুনয়নে।
সেরূপ ঈশ্বরে ডাকে কাতরে যে জন,
তাঁর দ্বারে সে হতাশ হয় না কখন।

সে সুখী, ঈশ্বর আজ্ঞা যে করে পালন,
অবাধ্য হইলে দুখী—ত্যাজ্য সর্ব্বক্ষণ।
যাহার সর্ব্বাঙ্গে আছে সাধুর লক্ষণ,
সে করে ঈশ্বর-দ্বারে মস্তক স্থাপন।”

সপ্তবিংশ গল্প

একজন, দরিদ্রের নিকট বলপূর্ব্বক অল্পমূল্যে রন্ধনের কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া ধনীদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া একজন সাধু বলিলেন:—

সর্পের স্বভাব তব আছে বিলক্ষণ,
যারে পাও তারে কর অমনি দংশন।
না হয় পেচক হবে; তার সর্ব্বনাশ,
যার ঘরে তুমি কর ক্ষণমাত্র বাস।

লোকের উপর তব জোর-জারি চলে,
সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ স’বে না ত্যা বলে’।
পীড়িতের আর্ত্তনাদ বিরুদ্ধে তোমার
স্বরসে উঠিলে আর নাহিক নিস্তার।

অত্যাচারী এই কথায় কুপিত হইল এবং সাধুর কথা না

* ১ম হইতে ২৪টী গল্প “ভারতবর্ষে” প্রকাশিত হইয়াছে।

মানিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাসূচক ভ্রুকুটি করিল। দৈবযোগে একদিন রাত্রিতে অত্যাচারীর রন্ধনশালায় কাষ্ঠের স্তূপে অগ্নি লাগিয়া সব দগ্ধ হইল; এমন কি, তাহার কোমল শয্যা পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ হইল। সেই পথ দিয়া সেই সাধু যাইতে যাইতে শুনিলেন, অত্যাচারী তাহার বন্ধুদিগকে বলিতেছে যে, অগ্নি কোথা হইতে লাগিল, তাহা সে জানে না। সাধু বলিলেন:—“দরিদ্রের দীর্ঘনিঃশ্বাস হইতে।”

অন্তরে আঘাত কভু দিওনা কাহার,
দেখ, যেন কেহ নাহি করে হাহাকার।
অন্তরের ব্যথা সদা অন্তরেই রয়,
একটী নিঃশ্বাস কিন্তু ঘটায় প্রলয়।

কায়খুসরুর রাজপ্রাসাদে এই নীতিগর্ভ কবিতাটি লেখা ছিল:—

পুরুষানুক্রমে রাজ্য চলিয়া আসিছে,
পর পর কত হাত সদাই ফিরিছে;
এইরূপে রাজ্যলাভ হইল আমার,
আমি গেলে অন্য রাজা হইবে আবার।
কালে কেহ চিনিবে না আমার কবর,
চলিবে সকলে শেষে উহার উপর।

অষ্টাবিংশ গল্প

একব্যক্তি মল্লযুদ্ধে অতিশয় উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। সে তিনশত ষাইট প্রকার কৌশল জানিত ও তাহার বিস্তার নিত্য নূতন নূতন পরিচয় দিত। তাহার একটী ছাত্রের রূপে সে বড় মুগ্ধ হইয়াছিল; তাহাকে সে তিন শত উনষাইট কৌশল শিখাইল; কিন্তু একটী শিখাইল না। ছাত্রের বল ও নিপুণতা এত অধিক হইল যে, কেহ তাহার সমকক্ষ হইতে পারিল না। সেই ছাত্র একদিন রাজার নিকট বলিল:—“আমার গুরুর কাছে আমি বলে, কি কৌশলে কোন অংশেই কম নই; তবে তিনি আমার শিক্ষাদাতা ও বয়োজ্যেষ্ঠ; এইজন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমাকে মানিতে হয়।” রাজা যুবকের এই আস্ফালনে অসন্তুষ্ট হইলেন ও তাহাদিগের দুইজনকে তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে রঙ্গভূমি প্রস্তুত হইল ও তথায় মন্ত্রী ও সভাসদ্‌সহ রাজা উপস্থিত হইলেন। যুবক মত্ত হস্তীর ন্যায় এত বেগে ধাবমান হইল যে, দর্শকবৃন্দের মনে হইল যে, সম্মুখে লৌহের পর্ব্বত থাকিলেও সে সমূলে উৎপাটন করিতে পারে। গুরু জানিত যে, যুবক তাহা অপেক্ষা অধিক বলশালী ও কৌশলে তাহার তুল্য; কিন্তু যে কৌশলটী তাহাকে শিখায় নাই, তাহারই আজি প্রয়োগ করিল। যুবক তাহার প্রতিরোধ করিতে জানিত না। শিক্ষক সেই কৌশলের গুণে যুবককে দুই হস্তে উত্তোলন করিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। দর্শকমণ্ডলী আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিল। রাজা শিক্ষককে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ ও অর্থ-পুরস্কার দিতে আজ্ঞা করিলেন ও যুবককে তিরস্কার করিয়া বলিলেন:—“তুমি শিক্ষাগুরুর সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করিয়াছিলে, শেষে তাহার নিকট পরাভূত হইলে।” যুবক বলিল, “মহারাজ! তিনি বলে আমাকে পরাজিত করেন নাই, একটী কৌশল আমাকে শিখান নাই, সেই কৌশলের গুণে তিনি জয়লাভ করিয়াছেন।” শিক্ষক বলিল:—“আমি এমন দিনের জন্যই সে কৌশল পূর্ব্বে প্রকাশ করি নাই। পণ্ডিতেরা বলেন যে, বন্ধুকে সহস্র বার বিশ্বাস করিলেও, এমন ক্ষমতা দেওয়া উচিত নহে যে, সে কোন কারণে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে তুমি আর তার প্রতিবিধান করিতে না পার। একজন শিক্ষক তাহার ছাত্রের কাছে কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিল, তাহা কি শুন নাই?

শরবিদ্যা শিখাইনু দিন দিন যারে,
সেই শেষে শরাঘাতে মারিল আমারে।
কৃতজ্ঞতা এ সংসারে বুঝি নাই আর,
থাকিলেও নাহি দেখি তাহার বিস্তার।”

উনত্রিংশ গল্প।

এক দরবেশ কোন মরুভূমির প্রান্তভাগে নির্জ্জনে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট দিয়া একদিন কোন রাজা গমন করিতেছিলেন। দরবেশ ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া পরম শান্তি-সুখ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ছিল না; সুতরাং তিনি রাজাকে দেখেন নাই ও অভিবাদন করেন নাই। তাহাতে কিন্তু রাজার অভিমান হইল; তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “এই চীরধারী ফকিরগুলা বন্যপশুর মত, ইহারা সৌষ্ঠব ও সর্ব্বপ্রকার শিষ্টাচারবিহীন।” মন্ত্রী দরবেশের কাছে গিয়া বলিলেন,—“মহাশয়! আপনার নিকট দিয়া সসাগরা পৃথিবীর রাজা গমন করিলেন, আপনি তাঁহাকে কোন সম্মানপ্রদর্শন করেন নাই কেন?” দরবেশ বলিলেন—“রাজাকে বলিও, যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট কোন কায-কর্ম্মের প্রত্যাশা করে, সেই তাঁহার বন্দনা করিবে, আর তাঁহার যেন মনে থাকে যে, ঈশ্বর রাজাকে প্রজা-রক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহাদের উপর আধিপত্য করিবার জন্য নহে—

ধন মান, আধিপত্য সকলি রাজার,
তথাপি রক্ষক তিনি কেবল প্রজার।
যেমন চরায় মেষ, মেষের পালক,
অধিকার কিছু নাই, কেবল রক্ষক।

কোন ভাগ্যবান্ হর্ষে হয় পুলকিত,
কষ্ট পেয়ে পেয়ে কেহ হয় সন্তাপিত।
আকাশ-কুসুম সম নানা কল্পনায়,
আবার কেহ-বা দেখ জীবন হারায়।

সাঙ্গ হলে নরলীলা, আসিলে শমন,
রাজায় প্রজায় ভেদ না থাকে তখন।
পরিণত হলে দেহ কবরে ধূলায়,
কে ধনী, নির্ধন কেবা চেনা নাহি যায়।”

এই কথা শুনিয়া রাজার দরবেশের প্রতি বড় ভক্তি হইল। তিনি তাঁহার কাছে দরবেশকে কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। দরবেশ বলিলেন—“আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে আর বিরক্ত না করেন।” রাজা বলিলেন—“তবে আমাকে একটী উপদেশ দান করুন।” তিনি বলিলেন—

“মনে রেখ ধন মান যা আছে তোমার,
হস্ত থেকে হস্তান্তর হবে সে আবার।”

ত্রিংশ গল্প

একদা কোন রাজমন্ত্রী ইজিপ্তদেশীয় জুন্নুন নামক একজন বিখ্যাত সাধুর কাছে গিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—

"দেখুন, আমি দিবারাত্রি রাজসেবায় অতিবাহিত করি। মনে যেমন তাঁহার অনুগ্রহের আশা হয়, তেমনই তাঁহার ক্রোধের ভয়ে মরি।" জুন্নুন অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন—"আপনি যেমন রাজাকে ভয় করেন, আমি যদি জগদীশ্বরকে সেইরূপ ভয় করিতাম, তাহা হইলে আমি সাধুদিগের মধ্যে একজন গণ্য হইতাম।

সুখ, দুঃখ—এ দুয়ের হইলে অতীত,
এ ফকির হ'ত স্বর্গ-দ্বারে উপনীত।
রাজার মতন ভয়, করিলে ঈশ্বরে,
তুমিও দেবতাকল্প হইতে পারিতে।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

খোদার মিনার

পাহাড়, তুমি খোদার-গড়া মিনার,
তোমার গম্বুজ বইছে মাথায় আশ্‌মানের এক কিনার।
যায় কুয়াশার আড়াল থেকে, রবি শশী প্রহর হেঁকে,
হুকুম পেলে বেরিয়ে এসে করে কভু সেলাম,
আলোর চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খোলে তোমার হেরাম।

বরফ-পানি তোমার মাথায়, ধারা দিয়ে গোসল করায়,
হাজার ঝরণা হামাম তোমার রাখ্‌ছে গুল্‌জার,
বাজায় কভু জলতরঙ্গ কভু সুরবাহার।
তোমার জুম্মা-ঘরে গিয়ে ঊষা আসে নমাজ দিয়ে
ঝিল্লী-মোল্লা সাঁঝের কোরাণ পাইন-মস্‌জিদে পড়ে
রংমহলে দোয়েল-শ্যামা হুরীর স্বপন গড়ে।

দুনিয়া বসে' পায়ের তলায় তোমার দরগায় সিন্নী চড়ায়,
পালা করে' চেরাগ জ্বালে নিশা-দিবা এসে,
মাথা পেতে দোয়া নেয় মস্‌গুল হ'য়ে শেষে।
ডায়মণ্ড-কাটা তাজটী মাথায়, শৈবাল-মখ্‌মল-জোব্বা গায়
তাতে রেশমী পশমী ফুল প্যাস্‌জি মিগ্‌নোসেটের;
শাদা মেঘ খাটায় তোমার মশারিটী নেটের।
চাঁদনী এসে ফোয়ারা খোলে হাওয়া কুঞ্জ-দোলায় দোলে,
তারা-জরীর নীল চাঁদোয়া আশ্‌মান টাঙ্গায় রাতে,
দুনিয়া ঘাসের নরম গাল্‌চে বিছায় আঙ্গিনাতে।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী

নবাবী আমলের গল্প *

(১)

একব্যক্তি এক ফকিরের নিকট আসিয়া তিনটী প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিল।

প্রথম—"ঈশ্বরকে যখন আমরা দেখিতে পাই না, তখন কেন তাঁহাকে বিশ্বব্যাপী বলি?" দ্বিতীয়—"আমাদের কর্ম্ম যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন, তবে মনুষ্য তাহার পাপের জন্য শাস্তি পায় কেন?" তৃতীয়—"শুনিতে পাই, ঈশ্বর নাকি পাপীদের নরকের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া শাস্তিপ্রদান করেন; কিন্তু ইহা কি সম্ভব? অগ্নির উপর অগ্নি কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে না; মনুষ্য সেই পদার্থে গঠিত।"

ফকির প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া ভূমি হইতে একটা মাটীর ঢিল লইয়া প্রশ্নকারীর মস্তকে আঘাত করিল। প্রশ্নকারী ফকিরকে কিছু না বলিয়া কাজির নিকট গিয়া সকল ঘটনা নিবেদন করিল। কাজিকর্ত্তৃক আহুত হইলে ফকির আসিয়া বলিল, "প্রভু! ঐ মৃত্তিকার ঢিলই উহার প্রশ্নের উত্তর। উহাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আমার আঘাতে উহার মস্তকে যে বেদনা অনুভূত হইতেছে, সেটা কোন্ স্থানে? তাহা হইলেই সে ঈশ্বরকে বিশ্বব্যাপী বলিয়া বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীনে কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে আপনার নিকট আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনিয়াছে কেন? এবং তাহার শেষ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে যখন এই মৃণ্ময় দেহ ধারণ করিয়া আছে, তখন সেই মৃত্তিকায় কিরূপে আঘাত পাইবে?"

কাজি ফকিরের এই উত্তরে পরম পরিতোষ লাভ করিল।

(২)

এক কৃপণের এক বন্ধু ছিল। বন্ধুটী একদিন তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "বন্ধু! অদ্য আমাকে কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে যাত্রা করিতে হইবে। কতদিনে ফিরিব, তাহার ঠিক নাই; সেইজন্য বলিতেছি যে, স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তোমার ঐ আংটীটি আমায় দাও।" কৃপণ উত্তর করিল, "ভাই, যদি তুমি বিদেশে আমাকে বন্ধু বলিয়া স্মরণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যখনই তুমি তোমার নগ্ন অঙ্গুলিগুলি দেখিবে, আমার কথা স্মরণ করিতে পারিবে। আংটীর কি প্রয়োজন?"

(৩)

এক বণিক বিদেশ হইতে কতকগুলি বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য আনাইতেছিলেন। তিনি ভৃত্যকে, জাহাজ বন্দরে আসিয়াছে কি না, জানিয়া আসিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য তথায় গিয়া শুনিল যে, জাহাজ পথিমধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে; কিন্তু সে প্রভুর নিকট আসিয়া বলিল যে, উক্ত জাহাজ কল্যই বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইবে। বণিক্ এই শুভ সংবাদে বিশেষ আনন্দিত হইলেন; কিন্তু পরদিন যখন তিনি সত্য সংবাদ পাইলেন, তখন ভৃত্যকে মিথ্যা বলার অপরাধে প্রহার করিতে লাগিলেন। ভৃত্য কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "প্রভু! কল্য আমি যদি আপনাকে সত্য সংবাদ গোপন না করিতাম, তাহা হইলে কল্য হইতেই আপনাকে এই মর্ম্ম-বেদনা পাইতে হইত এবং একদিনের জন্যও যখন আপনাকে সুখী করিয়াছি, তখন আমাকে এরূপভাবে প্রহার করা কি উচিত?" বণিক্

* পারস্য গল্পের অনুবাদ।

তাঁহার ভৃত্যের এই কথা শুনিয়া এরূপ বিপদেও না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

(৪)

একজন অশ্ব-বিক্রেতা একস্থানে অশ্ব বিক্রয় করিতে আসিয়া শুনিল যে, সে স্থানে অত্যন্ত চোরের উপদ্রব। সে রাত্রিকালে ভৃত্যকে বলিল, "তুমি নিদ্রা যাও, আমি জাগিয়া থাকিয়া পাহারা দিব; কারণ, তোমার উপর সেরূপ বিশ্বাস হয় না।" ভৃত্য বলিল, "হায় প্রভু, এ কি বলিতেছেন! আমি নিদ্রা যাইব, আর আপনি জাগিয়া থাকিবেন? তাহা কখনই হইতে পারে না। আপনি শয়ন করিতে যান।" অশ্ববিক্রেতা ভৃত্যের এই উত্তরে শয়ন করিতে গমন করিল এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে তাহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "আকবর! তুমি কি করিতেছ?" ভৃত্য উত্তর করিল, "আমি ভাবিতেছি যে, ঈশ্বর পৃথিবীকে জলের উপর কিরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন?" অশ্ব-বিক্রেতা বলিল, "সাবধান! যেন আমার একটীও অশ্ব চুরি না যায়!" মধ্যরাত্রে নিদ্রাভঙ্গে অশ্ব-বিক্রেতা আবার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "আকবর! কি করিতেছ?" ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে! আমি ভাবিতেছিলাম যে, আকাশের নিচে কোনও থাম নাই, অথচ কিরূপে উপরে রহিয়াছে?" প্রভু উত্তর করিল, "তোমার এই চিন্তা বড় নিরাপদ বলিয়া বোধ হইতেছে না, ইহাতে চুরির সম্ভাবনা অধিক। তুমি শয়ন করিতে যাইতে পার।" ভৃত্য বলিল, "আমার নিদ্রা যাইবার আর ইচ্ছা নাই।" অশ্ব-বিক্রেতা পুনরায় শেষরাত্রে আসিয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর করিল, "আপনার অশ্বগুলি চুরি যাওয়া অবধি আমি ভাবিতেছি যে, কল্য জিন্‌গুলি আপনি বহন করিবেন, কি আমি বহন করিব?" অশ্ব-বিক্রেতা তাহার এই ভাবুক ভৃত্যকে পুরস্কারস্বরূপ গণ্ডদেশে দুইটী চপেটাঘাত প্রদান করিল।

শ্রীহরিচরণ মিত্র

ললিতকলায় মাতৃমূর্ত্তি

(১)

মা-নামে জগৎ সাড়া দেয়। মায়ের ভালবাসা, মায়ের স্নেহ, মায়ের কথা মানুষের প্রাণে প্রাণে রক্তের আখরে লেখা আছে। পৃথিবীতে সকলের চেয়ে দুর্দ্দম যে রিপুর উত্তেজনা, এক মা-নামের কাছে তাহারও পরাজয়।—মাতৃভাব সকলেই বুঝে; সুতরাং মায়ের নাম-মাহাত্ম্য বুঝাইবার জন্য মিছে কাগজ-কালি খরচ করিবার কোন দরকার নাই।

'আর্টে' মানুষ, মানস-ভাবের মূর্ত্তি গড়ে। আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে নিয়ত যে ভাবের গঙ্গা—কখনও অবিরাম ধারায়, কখনও রুদ্ধ আবেগে, কখনও শান্ত গতিতে, কখনও রুদ্র তেজে, কখনও ফল্গুর মত গুপ্ত হইয়া, আবার কখনও-বা প্রাণের দুটি তট উপ্‌ছাইয়া, কখনও বিষাদ-ভারে গুমরিয়া গুমরিয়া, আবার কখনও-বা বিপুল পুলকে উচ্ছ্বসিত হইয়া—আপন বেগে আপনিই বহিয়া চলিয়াছে, নর-সৃষ্ট ললিতকলায়,—চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে—পটের পরে বর্ণে বর্ণে, পাথরের পরে রেখায় রেখায় ফুলের মত, কবিতার মত ফুটিয়া উঠে। ভাবকে আমরা মনে মনে অনুভব করি; কিন্তু কেবল অনুভূতিতে আমরা তুষ্ট নই—শরীরী ভাবকে আমরা বাহিরে দেখিতে চাহি। শিল্পের প্রয়োজন এইখানে। কলাবিদ্‌ও তাই হৃদয়-ভাবকে মানসতলের গহন-বনের অন্ধকার হইতে বাহিরের প্রমুক্ত সূর্য্যকরে আনিয়া তুলির নিপুণ লিখনে মূর্ত্ত করিয়া তুলেন।

এখানে ললিতকলায় কত বড় একটা শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে! শিল্পী যদি শক্তিধর হন, মানুষের মনকে তবে তিনি কলের পুতুলের মত যেদিকে-খুসি চালাইতে পারেন। যিনি ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া আছেন, হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া শিল্পী তাঁহাকে হাসাইবেন, নাচাইবেন। প্রেমবিনা জীবন যাঁহার শ্মশান, প্রেমের ছবি আঁকিয়া শিল্পী ক্ষণিকের তরেও তাঁহার শ্মশানের চিতা নিবাইয়া দিবেন। পাপের পঙ্কিলতায় হৃদয় যাহার নরক, পবিত্র ভাবরূপ গড়িয়া শিল্পী সেই নরকেও স্বর্গের পারিজাত ফুটাইতে পারেন।

আর, এইজন্যই ত 'আর্টে'র সার্থকতা! কাব্যকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য-কলা মানুষকে শোকে সান্ত্বনা দেয়, দুঃখে তৃপ্তি দেয়, বিপদে ভরসা দেয়, অবসরে আনন্দ দেয়। বাহিরে, হাতে-নাতে 'আর্ট' কোন কাজ করে না বটে, কিন্তু সকলের অগোচরে, মনের ভিতরে সে ধীরে ধীরে আপন কাজ আপনি করিয়া যায়। 'আর্টে'র এই অসীম শক্তি সকল সময়ে সকল দেশের লোকেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে। মনকে পবিত্র রাখিবার জন্য লোকে তাই ধর্ম্মকাব্য পড়ে, দেওয়ালে দেবতা বা সাধুর ছবি টাঙ্গায়।

শিল্পীকে অনেক বুঝিয়া, অনেক ভাবিয়া বিষয়-নির্ব্বাচন করিতে হয়। মানব-চিত্তে রসসঞ্চার করাই যখন কলাবিদের কাজ, তখন কোন্ রসের কতটা শক্তি, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কাব্য-রচনা বা চিত্র-লেখা দুই-ই ব্যর্থ হইয়া যায়। মাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব, প্রেমভাব—সকল ভাবের সমান কাজ নয়। মায়ের নামে আমাদের মনে যে ভাবের ধারা বহে, ভাইয়ের নামে ঠিক সেই ভাবটা পাই না।

এমনই সকল রসেরই কম-বেশী একটা নিজস্ব ভাব আছে। এই নিজস্ব ভাবের তারতম্যে ললিতকলার উপভোগেও তারতম্য হয়। কেহ হাস্যরস বেশী ভালবাসেন, কেহ করুণ-রস বেশী ভালবাসেন। অতএব হাস্যরসের রসিক কলায় হাসি ফুটিলে যতটা তুষ্ট হইবেন, করুণ-রসের ভক্ত ততটা হইবেন না। আবার, এক-একটি এমন বিশেষ রস আছে, যাহাতে সকল মানুষের মন সমানভাবেই সাড়া দেয়। কলাবিদেরা যখন সকলকার হৃদয় জয় করিতে চান, তখন তাঁহারা এমনই কোন-একটি বিশেষ রসের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

মা-নামে রুচি নাই, এমন লোক ত পৃথিবীতে দেখি না। শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই মা-নামের মহিমা বুঝে। অতএব, কলাবিদেরাও এ সুযোগ ছাড়েন না; সেইজন্যই আমরা সকল দেশের ললিতকলাতেই এত বেশী মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাই।

রস বুঝাইয়া দিবার জন্য নিপুণ রসবিদ্ অর্থাৎ সমালোচকের

প্রয়োজন। রসতত্ত্ব না জানিয়াও বৈষ্ণব কবিদের কাব্য পড়িয়া কতকটা সৌন্দর্য্যবোধ হয় বটে, কিন্তু রসতত্ত্বে আগে অভিজ্ঞ হইয়া তাহার পরে বৈষ্ণব কাব্য পাঠ করিলে, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ-রূপকে একেবারে মূর্ত্তিমান্ দেখা যাইবে। এইরূপ অনেক ছবি আছে, প্রথম দর্শনে বা সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা তাহাদের যে অর্থ বুঝি, তাহাই আসল ও সম্পূর্ণ অর্থ নহে। এখানে রস এত সূক্ষ্ম যে, একজন ব্যাখ্যাকারী না থাকিলে চিত্রকারীর সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে।

স্বর্গীয় জননী

কিন্তু মায়ের চেহারা ত চিনিতে দেরি হয় না! পটে-আঁকা মায়ের ও চোখ-ছুটি যে কোন্ ভাবে ঢল-ঢল, ওই ঠোঁটছুখানি যে কোন্ মৌনবাণী প্রকাশ করিতে চায়, ঐ বুকখানির আড়ালে যে কোন্ রসের ঝরণা ঝরিতেছে, সে কথা বুঝিতে কি একটি পলক লাগে?—না, তিনি যে মা! শিল্পী মাতৃমূর্ত্তিকে যতই তুর্ব্বোধ করুন,—সন্তানের কাছে তিনি ধরা পড়িবেনই পড়িবেন! যিনি মা, তিনি কখনও সন্তানের কাছ হইতে আপন বাৎসল্য-রসকে গোপন রাখিতে পারেন না। মাকে ত আমরা স্বধু বাহিরের রূপ দিয়া দেখি না,—স্তন্যের অমৃত-রসের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সকল প্রাণ-মন যে তরল হইয়া আশৈশব আমাদের মাংস-অস্থি-মজ্জায় আমাদের দেহের পরতে পরতে মিশিয়া আছে!

(২)

'আর্টিষ্ট্'মাত্রেই জানেন, যে-সকল রসের প্রতি সাধারণের সহ-মর্ম্মিতা আছে, যে-সকল রসের সহিত সাধারণের সুপরিচয় আছে, সে-সকল রসের ছবি আঁকিয়া সহজেই ফল পাওয়া যায়। অনেক ভাল ভাল কলাবিদ্ তুর্ব্বোধ রস লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বসাধারণের সমাদর পান নাই। এই সত্যটি সাহিত্যে ও শিল্পে খুব স্পষ্ট। রেনল্ড্সের নভেলের পাঠক আছে জগৎ-জোড়া; কারণ, নিম্নস্তরের সহজবোধ্য রস লইয়াই তাঁহার কারবার; কিন্তু সাধারণের ভিতরে রুষ-ঔপ-ন্যাসিক ম্যাক্শিম্ গোর্কির পাঠক যদি খুঁজা যায়, তবে "কোটিকে গোটিক" মেলা ভার হইয়া উঠিবে। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের ছোট গল্পের কথাও ধরা যাইতে পারে। লেখকদের ভিতরে দুটি দল আছে। একদল গল্প লেখেন বাঙ্গালীর বৈচিত্র্যহীন, সহজ-সরল সুপরিচিত ঘরোয়া কথা লইয়া। গার্হস্থ্য জীবন আমাদের সকল পরিবারের ভিতরেই প্রায় এক-রকমের। পরের মেয়ে বিয়ে করিয়া সেই ভায়ে ভায়ে ঝগড়া, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সেই সপত্নী-পুত্র-বিদ্বেষ, দুর্মুখ শ্বাশুড়ীর সেই বৌকে যন্ত্রণা দেওয়া —বাঙ্গালীর সংসারে এ ধরণের দৃশ্য ঘরে ঘরে। এ-শ্রেণীর ঘরোয়া ব্যাপার হইতে গল্পের 'প্লট' সংগ্রহ করা খুব সহজ। আবার এই ধাঁজের গল্প লিখিয়া ফলও পাওয়া যায় বেশী; কারণ, পাঠকদের সংসারেও হয়ত ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, দ্বিতীয় পক্ষের হিস্‌কুটে স্ত্রী, ঝগড়াটে শ্বাশুড়ী বা অননই কোন ব্যাপার আছে; সুতরাং উহাদের প্রতি পাঠকদের মন আগে থাকিতেই বাঁকিয়া থাকে। ফলে, ঐ শ্রেণীর ঘরোয়া কথা লইয়া যাঁহারা গল্প লেখেন, তাঁহাদের শক্তি খুব কম হইলেও, নিম্নশ্রেণীর পাঠকদের মন তাঁহারা সহজেই আকর্ষণ করিতে পারেন; কারণ, পাঠকদের মনকে তিনি একেবারেই প্রস্তুত অবস্থায় পান।

দ্বিতীয় দলের গল্পলেখকেরা বাঙ্গালীর সংসার হইতে গল্পের আখ্যান-বস্তু সংগ্রহ না করিয়া সাধারণ মানব-জীবনকে অবলম্বন করেন। তাঁহাদের গল্পবর্ণিত ঘটনার মত ঘটনা পৃথিবীর সব দেশেই ঘটিতে পারে। তাঁহারা মানুষের সূক্ষ্ম হৃদয়-বৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্র ফুটাইয়া তুলেন। এ-শ্রেণীর লেখকেরা বড় 'আর্টিষ্ট' বটে, কিন্তু সর্ব্বজনপ্রিয় নন; কারণ, তাঁহারা যে রসদান করেন, সে রসের সঙ্গে সকলের পরিচয় নাই। কোন-একটি নূতন ও অপরিচিত চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, পাঠকদের মনকে সেই চরিত্রের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে লইয়া যাইতে হইলে 'আর্টে' গভীর জ্ঞান, মানব-চরিত্রে প্রচুর অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট লিপি-কুশলতার প্রয়োজন।

লিওনার্ডো ডা ভিন্সির অঙ্কিত ভার্জ্জিন ও শিশু

শিল্পরাজ্যেও এইরূপ। মাতৃমূর্ত্তি গড়েন নাই, এমন শিল্পী দেখা যায় না; কিন্তু ফরাসী ভাস্কর রোঁদার গঠিত "ভগবানের হস্ত" প্রভৃতির মত অপূর্ব্ব পরিকল্পনা কয়জন শিল্পীর মাথায় আসে?

মায়ের রূপ যিনিই একটু ভাল করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন, তিনিই আদর পাইয়াছেন; কিন্তু কিছুদিন আগেও আগষ্ট্ রোঁদা সকলকার কাছে উপহাসের ভাগী ছিলেন। তিনি শিল্পের ভিতরেই গভীর রসের সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, সাধারণের লঘু প্রকৃতির ভিতরে পারেন নাই।

মা ও ছেলে
(ডাচ্ চিত্রকর গেরি মেল্চার-অঙ্কিত)

মাতৃমূর্ত্তির যে গৌরব নাই বা মায়ের রূপ আঁকা যে নিন্দনীয়, আমি এমন কোন কথা বলিতেছি না। মাতৃত্বের গৌরব হিসাবে মাতৃমূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাহাতে শিল্পীর পরিকল্পনার বিশেষ কিছু বাহাদুরি থাকে না।

তবে, যাঁহাদের ভিতরে প্রতিভার আগুন আছে, তাঁহারা সর্ব্বত্রই আপনাদের বিশেষত্বের পরিচয় দেন। মাতৃমূর্ত্তি আঁকিবার চেষ্টা কি বড় কম হইয়াছে? প্রতীচ্যে জননীকে আঁকিবার জন্য শিল্পীরা যেমন উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তেমন আর কোন বিষয়ে নয়। পাশ্চাত্য চিত্রকলায় মাতৃমূর্ত্তির সংখ্যা হয় না; কিন্তু র‍্যাফেল প্রভৃতির মত কয়জন শিল্পী মাকে দেখার মত দেখিয়াছেন?

(৩)

জগতের নানা দেশের নানা শিল্পী জননীকে নানা রূপে দেখিয়া-ছেন। জননীর এই নানা রূপের ভিতরে প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু মূলভাবের ভিতরে বড় বেশী প্রভেদ নাই। প্রগাঢ় বাৎসল্য-রসেই জননীর জননীত্ব পরিস্ফুট; সুতরাং জননীর আসল ভাবের বিকাশ করিতে গেলে বাৎসল্য-রসকে অবলম্বন করা ভিন্ন উপায়া-ন্তর নাই। তাই খৃষ্টানের 'ম্যাডোনা' ও হিন্দুর যশোদা একই ভাব-বৃন্তে দুটি ফুটন্ত ফুল। যশোদার কোলে কৃষ্ণ, আর 'ম্যাডোনা'র কোলে খৃষ্ট। এই দুটি মা ও ছেলে নামে ভিন্ন, ভাবে এক। 'ম্যাডোনা'কে দেখিলে খৃষ্টানের মনে যে ভাবের সঞ্চার হয়, যশোদাকে দেখিলে হিন্দুর মনে ঠিক সেই ভাবেরই সঞ্চার হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, বৌদ্ধ, জৈন বা মহম্মদীয় ধর্ম্মে 'ম্যাডোনা' বা যশোদার মত কোন মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাই না। বুদ্ধের জননীর কথা আছে বটে, কিন্তু তাঁহার ভিতরে বাৎসল্য-রসের পূর্ণ প্রকাশ আছে কি?

হিন্দু স্বধু যশোদার মূর্ত্তি গড়িয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভক্ত শিল্পী, মাকে যেমন নানা রূপে নানা বেশে দেখিতে পারিয়া-ছেন, তেমন আর কেহ না। মা আমাদের কেবল স্নেহবতী কোমলা রমণীমাত্র নন—তিনি কখনও বজ্রের মত কঠোর, কখনও পদ্মের চেয়ে পেলব। কখনও পরমেশ্বরী, ধারণাতীত; কখনও মানবী, যাঁহাকে আমরা ঘরে ঘরে দেখি। কখনও মহা-কালিকারূপে খর তরবারি-করে উলঙ্গ হইয়া অসুর-নিধনে রণাঙ্গনে ছুটিয়া যান; কখনও জগদ্ধাত্রী-বেশে অটল গাম্ভীর্য্যে সৃষ্টিরক্ষা করেন। কখনও ঐশ্বর্য্যময়ী গৃহিণী,—অন্নপূর্ণা হইয়া অন্ন-বিতরণে মন দেন; কখনও ভিখারিণী, হরের ঘরনী উমা-মূর্ত্তিতে মেঘচুম্বী কৈলাশের গিরিগুহায় বসিয়া ধেয়ানমগ্ন ধূর্জ্জটীর অস্থিপাত্রে সিদ্ধি ভরিয়া দেন—মায়ের এমন বিচিত্র রূপ আর কোথায় দেখিব, আর কোথায় আছে?

আর, বাঙ্গালীর এই দুর্গামূর্ত্তি! "দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণ-প্রহা-রিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠ-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ!"—স্বধু কি তাই?—দুর্গামূর্ত্তির ভাব-বৈচিত্র্য অপূর্ব্বমধুর! নারীর যত রূপ সম্ভব, এই এক মূর্ত্তিতে তাহার সমাবেশ আছে। দুর্গা আমাদের কাছে কেবল পূজনীয়া দেবী নন; লজ্জাবতী বধূরূপে পতি মহাদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্নেহপাত্রী কন্যাবেশে বাঙ্গালীর ঘরে তিনি পিতার কোলে আসেন —সঙ্গে কার্ত্তিক,গণেশ, সেখানে তাঁহার জননীত্বের মহিমা! জায়া, কন্যা, মাতা—এই ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয়ে তাঁহার জননীত্ব পরিস্ফুট!—

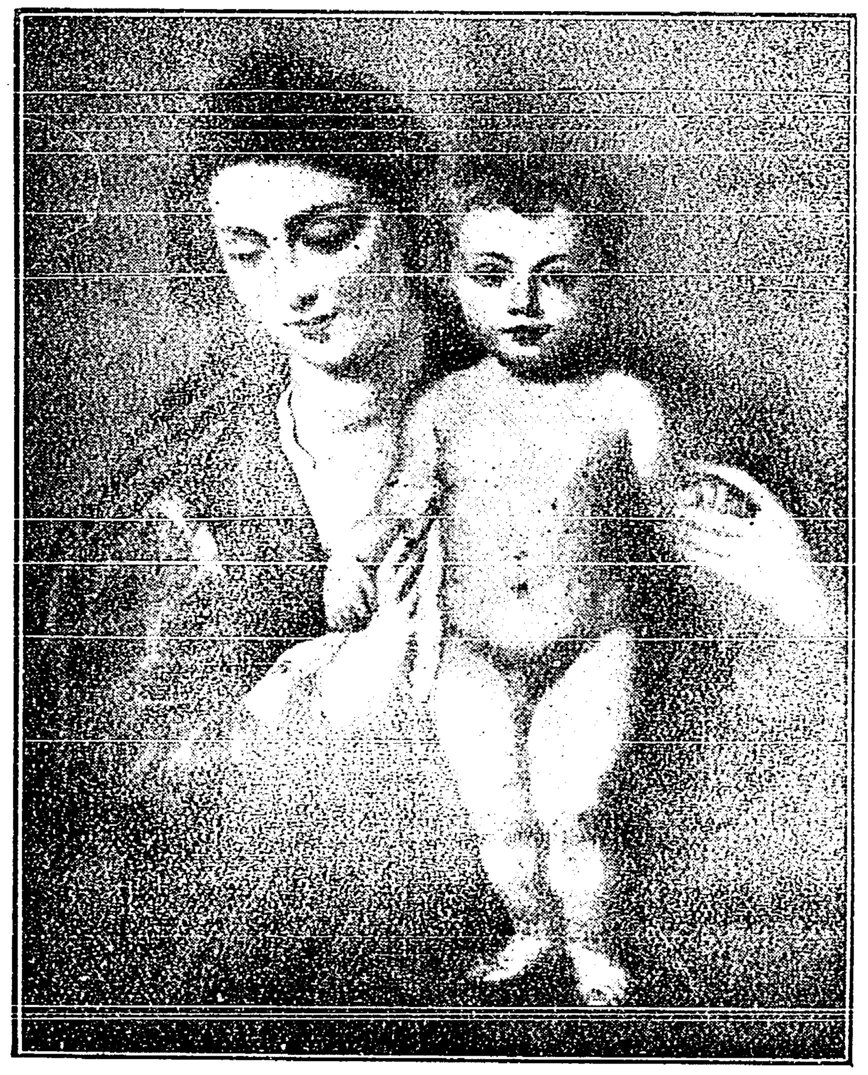

ভার্জিন ও শিশু খৃষ্ট

বাঙ্গালী শিল্পীর এই অতুলনীয় মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে জগতের আর কোন শিল্পীর মাতৃমূর্ত্তি দাঁড়াইতে পারে না! মায়ের পূজায় হিন্দু শিল্পী সকলের সেরা; আবার হিন্দুর ভিতরে পূর্ণমাতৃত্বের মূর্ত্তি গড়িয়াছে, এই বাঙ্গালী জাতি। একথা ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়!

(৪)

এখানে প্রসঙ্গসূত্রে একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক মনে করিতেছি।

ভার্জিন ও শিশু খৃষ্ট

'ভারতবর্ষ' নামক মাসিকপত্রের প্রথম বৎসরে কিছুদিন ধরিয়া 'জননী এসিয়া'র একটি মূর্ত্তি প্রচ্ছাদনীর উপরে মুদ্রিত হইত। চারিপাশে চারিটি প্রাচ্য সন্তান লইয়া 'জননী এসিয়া' মাঝখানে বসিয়া আছেন। মূর্ত্তিটি একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ভাস্করের হাতে-গড়া। শিল্পী এসিয়া-মাতাকে সন্তানগর্ব্বিতা ঐশ্বর্য্যময়ী সুন্দরী যুবতীর বেশে দেখিয়াছেন;—পাশ্চাত্যের লোকেরা প্রাচ্যকে সাধারণতঃ ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ দেশরূপেই দেখেন; পাশ্চাত্য কাব্য ও সাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। শিল্পীও এই অনুভূতি লইয়া মূর্ত্তিগঠন করিয়াছেন। 'জননী এসিয়া'র বক্ষ উন্মুক্ত,—সন্তানের সাম্‌নে মায়ের লজ্জা কি?

মূর্ত্তিটি কাহার, তাহা না জানিয়াই এক অপোগণ্ড অকালপক্ক সম্পাদক-সমালোচক, এই ভাস্কর্য্যের উপরে অশ্লীলতার আরোপ করিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেন। আমি প্রকাশ্যভাবে এই সমালোচকের ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম; কিন্তু বাঙ্গালী-সমালোচক প্রাণ গেলেও নিজের ভ্রমের কথা মানে না; অতএব প্রতিবাদের উত্তরে তথাকথিত সমালোচক, যুক্তির ধার না মাড়াইয়া বলেন, "বাৎসল্য-রসের চিহ্ন পর্য্যন্ত এ মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই না। এ 'এসিয়া' যেন বলিতেছে—এস, এস, বিদেশী বঁধু, আমার কাছে এস! কুন্তীর মত চিরযৌবনা আমি! আমার চারিদিকে চারিটা ছেলে আছে বটে, কিন্তু তাহারা অপোগণ্ড। তাহাদের হাতে না আছে ঢাল না আছে তলওয়ার—সম্বলমাত্র দুই-চারিখানা পুথি! তোমার ভয় নাই—নির্ভয়ে চলিয়া এস।"

বাৎসল্য-রসই জননীত্বের শ্রেষ্ঠ রস—এ কথা অস্বীকার করিতেছি না;—কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য চিত্রকর এখানে সমৃদ্ধিশালিনী বিপুল ঐশ্বর্য্যময়ী এসিয়াভূমিকে পূর্ণ গৌরবের মধ্যে দেখিয়াছেন বলিয়া 'জননী এসিয়া' সুন্দরী যুবতীরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন; সেইজন্য কেবল বাৎসল্য-রসকে অবলম্বন করিয়া এই মাতৃমূর্ত্তি পরিস্ফুট হয় নাই। অতএব, এস্থলে বাৎসল্য-রসকে প্রাধান্য দিতে যাওয়াই নির্ব্বোধের কার্য্য। শিল্প-সমালোচনার প্রথম ভাগও যদি সমালোচকের পড়া থাকিত, তাহা হইলে তিনি বুঝিতেন যে, শিল্পী যাহা ফুটাইতে চাহিয়াছেন, তাহা লইয়াই আলোচনা করিতে হয়—তিনি যে রস লইয়া নাড়াচাড়া করেন নাই, তাঁহার কার্য্যের ভিতর সে রসের সন্ধান করিতে যাওয়া বালকতা মাত্র। শাক সব্জীতে কেন মাংসের স্বাদ পাওয়া যায় না বলিয়া যে অভিযোগ করিতে বসে, সে সমালোচক নয়—সে শিশু।

এই অপূর্ব্ব কলারসজ্ঞ সমালোচকটি বলিতেছেন, "ভারতবর্ষে যে যুবতীর ছবি ছাপা হইতেছে, সে যুবতীর মুখে শৃঙ্গার-রসই ফুটিয়া উঠিয়াছে।"—কাব্য-সমালোচনায় অনেক সময়ে গোঁজামিল চলে; কিন্তু শিল্প সমালোচনায় সে সুযোগ নাই; কারণ, শিল্পের মূর্ত্তি শরীরী; সুতরাং সমালোচকের বিদ্যা এখানে ধরা পড়িয়াছে। শিল্পীর কার্য্য-প্রণালী বিধিবদ্ধ; 'আনাটমী'তে তাঁহাকে অভিজ্ঞ হইতে হয়। 'জননী এসিয়া'র শিল্পী সুনিপুণ ও সুশিক্ষিত; মুখের কোন্ মাংস-পেশী, কোন্ শিরা-উপশিরা কিরূপভাবে আকুঞ্চিত-বিকুঞ্চিত হইলে কোন্ রস ফুটিয়া উঠিবে, শিক্ষিত শিল্পীমাত্রেই তাহা জানেন। শৃঙ্গার-রস বিকাশ করিতে হইলে মুখের কোথায় কি পরিবর্ত্তন হইবে, তথাকথিত সমালোচক যদি সে কথা জানিতেন, তাহা হইলে এমন বেফাঁশ কথা বলিয়া ধরা পড়িয়া যাইতেন না; কারণ, 'জননী এসিয়া'র মুখে শিল্পী একেবারেই

ভার্জিন ও শিশু খৃষ্ট

শৃঙ্গার-রস ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই; তাই চিত্রেও তাহা ফুটে নাই। যে-কোন শিল্পী বা কলারসজ্ঞ ছবিখানি দেখিলেই তাহা বলিতে পারিবেন।

সমালোচক বরং একটা কথা বলিতে পারিতেন। এই মূর্ত্তির ভাব-ভঙ্গী ঠিক আমাদের দেশীয় রুচিসঙ্গত নয়—তিনি যদি এমন কোন কথা বলিতেন, তবে তাঁহার কথার উপরে আর কথা বলা চলিত না; কিন্তু তাহা হইলেও, প্রাচ্য রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া আমরা

কোন পাশ্চাত্য শিল্পকার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে পারি না; কারণ, সমালোচক বুদ্ধিমান হইলে, কোন দেশের শিল্পকর্ম্মকে সেই দেশের, সেই সমাজের ভিতর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে যান না। প্রতি জাতির শিল্পকর্ম্মই আপনার সামাজিক ও জাতীয় আদর্শের আওতায় বিকাশলাভ করে। সেই আদর্শ-হিসাবেই তাহার বিচার; নহিলে ললিত-কলার রসবোধ অসম্ভব।

সমালোচক, 'জননী এসিয়া'র উন্মুক্ত বক্ষ ও স্তনের প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করিতেও লজ্জা পান নাই। বাঙ্গালীর ভিতর—বিশেষ সাহিত্য-সমাজে—এমন নীচতা থাকিতে পারে বলিয়া আমরা জানিতাম না; এই জঘন্য ইঙ্গিতের উত্তর ভদ্রভাবে দেওয়া যায় না—ভদ্রলোকের দেওয়া উচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের চাবুকই এখানে কাজে লাগিবে:—"সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক।"

(৫)

মায়ের ভালবাসা, প্রাণের ভালবাসা; সুতরাং তাহা মনের জিনিষ; সেইজন্য দেশভেদ বা জাতিভেদের জন্য মাকে বুঝিতে দেরি হয় না। বাহিরে যতই তফাৎ থাক্—ভিতরে ইংরাজের মা ও বাঙ্গালীর মা, খৃষ্ট-জননী ও কৃষ্ণ-জননী এক—একেবারে এক। ভার্জিনকে দেখিলে আমরাও মা বলিব, যশোদাকে দেখিয়া খৃষ্টানেও মা বলিবে। এখানে দেবীজ্ঞানে মায়ের পূজা নয়,—মা বলিয়াই তাঁহার পূজা। এখানে 'জর্ডনে'র জল বা গঙ্গাজলের বিরোধ নাই— অমৃতোপম মাতৃস্তন্যের অপূর্ব্ব আস্বাদ আছে। প্রাণ যেখানে ভাবের ঘরে সাড়া দেয়, ধর্ম্মে ধর্ম্মে সেখানে ভেদ থাকে না।

মাতৃমূর্ত্তি আছে দু-রকম। এক, মায়ের দেবী-মূর্ত্তি; আর এক, মায়ের মানবী-মূর্ত্তি। গণেশ-জননী, কৃষ্ণ-জননী, খৃষ্ট-জননী—এগুলি মায়ের দেবী-মূর্ত্তি! এ মূর্ত্তিতে সার্ব্বজনীনতা বড় অধিক—এখানে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধুর সংযোগ! এই যে মা,—ইনি যে-কোন একটি শিশুর মা নন,—ইঁনি বিশ্বজননী; এবং ইঁহার স্নেহপেলব নতদৃষ্টির তলে, দুখানি সতর্ক বাহুর আড়ালে, প্রেমতপ্ত দুগ্ধস্নিগ্ধ স্তনের উপরে ঐ যে ননী-নিঙ্‌ড়ানো নধর নরম আনন্দ-দুলালটি নিষ্পাপ পুলকে হাসিয়া-দুলিয়া সারা হইয়া যাইতেছে—ও শিশুটি বিশ্ব-শিশুরই অদ্বিতীয় প্রতিমূর্ত্তি।

আগেই বলিয়াছি, খৃষ্ট-জননীর বা স্বর্গীয় কুমারীর বা 'ম্যাডোনা'র মূর্ত্তি প্রতীচ্যে এত-বেশী আছে যে, তাহার সংখ্যা কেহ করিয়া উঠিতে পারে না। একালের প্রতীচ্য কলাতেও 'ম্যাডোনা'-মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতেছে বটে, কিন্তু সেকালকার য়ুরোপীয় শিল্পে ইহার একান্ত বাহুল্য ছিল। আগেকার এমন ওস্তাদ্-চিত্রকরের নাম করা যায় না, যিনি 'ম্যাডোনা'-মূর্ত্তি একাধিকবার আঁকেন নাই। ইহার প্রধান কারণ, জাগতিক শিল্পমাত্রই পূর্ব্বযুগে ধর্ম্মানুগামী ছিল। ধর্ম্মহীন ললিতকলা তখন কেহ চাহিত না, শিল্পীরাও আঁকিত না। আর ধর্ম্মপ্রবণ না হইয়া সে যুগের শিল্পীদের উপায়ান্তরও ছিল না। খ্রীষ্টীয় গির্জ্জাগুলি তখন শিল্পীদের প্রধান আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। যাঁহারা ভাল ছবি আঁকিতে পারিতেন, ভাল মূর্ত্তি গড়িতে পারিতেন, ভাল বাড়ী তৈয়ারি করিতে পারিতেন, গির্জ্জা-গঠন করিতে, ভিত্তি-গাত্র চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করিতে ধর্ম্মযাজকগণ তখন তাঁহাদের আহ্বান করিতেন; তাই ধর্ম্মভবন গঠন ও শোভন করিতে আহুত হইয়া শিল্পিগণও ধর্ম্মানুগামী ললিতকলাতেই প্রাণ-মন ঢালিয়া দিতেন। এইরূপে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে য়ুরোপের 'চার্চ্চ'গুলি এমনভাবে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল যে, ঐ সকল ললিতকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি দেখিতে হইলে, দর্শকগণকে আজিও নানাদেশীয় ধর্ম্মভবনে গমন করিতে হয়।

আমরা এখানে জননীর "দেবী-মূর্ত্তি"র পাঁচখানি প্রতিলিপি দিলাম। এই ছবিগুলি য়ুরোপের ওস্তাদ-চিত্রকরগণ অঙ্কন করিয়াছেন। সকল ছবিতেই শিশু খৃষ্ট ও তাঁহার মাতা আছেন। "স্বর্গীয় মাতা" নামে ছবিখানির মূল প্রতিলিপি এখন বিলাতের বাকিংহাম-প্রাসাদে রাজকীয় সংগ্রহালয়ে আছে। এ ছবিখানি অতিশয় প্রাচীন,—ইহার চিত্রকর কে, তাহা জানা যায় নাই। এই ছবিখানি "ফ্রাঙ্কো-ফ্লেমিশ-অঙ্কন-পদ্ধতি"-অনুসারে অঙ্কিত। য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানের চিত্রালয়ে ইহার কয়েকখানি নকল ছবি আছে। অন্যান্য মাতৃমূর্ত্তিগুলির উপরে কিছু বলা বাহুল্য; কারণ তাহাদের সৌন্দর্য্য সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

মানবী-মূর্ত্তিতে যে-সকল জননীকে আঁকা হইয়াছে, আমরা ঘরে ঘরে পথে ঘাটে তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে পাই। এ-সকল মাতৃমূর্ত্তিতে জননীর দেবীত্ব বা সার্ব্বজনীনত্ব পরিস্ফুট হয় না। সন্তান হইলেই রমণী, যে মাতৃত্ব-গৌরবের অধিকারিনী হন, এই শ্রেণীর চিত্রে সেই সঙ্কীর্ণ মাতৃত্ব আছে। ইঁহারা রামের মা, শ্যামের মা বা জন বুলের মা,—জগতের মা হইতে গেলে চোখে-মুখে যে বিশাল ভাবের ছায়াপাত হওয়া দরকার, ইঁহাদের চোখে-মুখে সে ভাবাবেশ দেখিতে পাই না।

মেল্‌চারের আঁকা ছবিতে এমনই এক মা, তাঁহার বুকের মাণিক খোকাকে কোলে করিয়া আছেন। এ মা ধনীর ঘরণী নন, সাধারণ দরিদ্র রমণী। ইঁহার মুখে জীবন-সংগ্রামের কঠোর চিহ্ন থাকিলেও, মাতৃত্বের অভাব নাই। চিত্রকরের তুলিকাঘাতে এই দরিদ্রা জননীর আত্মা জাগিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু মায়ের চোখদুটি যেন জাগ্রৎ সুষুপ্তিতে স্বপ্নাভিরাম!

"স্বর্গ কোথা, মা?"—নামে ছবিখানিও গার্হস্থ্য জননী-মূর্ত্তির। শৈশবসুলভ কৌতূহলে বালিকা কন্যা জিজ্ঞাসা করিতেছে, "স্বর্গ কোথা, মা?"—মাতা একহাতে মেয়েকে কোলে টানিয়া আনিয়া আর একহাতে তাহার কোঁকড়া-কোঁকড়া কালো চুলের রাশি নাড়িতে নাড়িতে মেয়ের দিকে সস্নেহ মৌন দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

অরুণা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

(গ্রাম্য পথ)

(গ্রাম্য ব্যক্তিগণ)

১ম ব্যক্তি—শুন্‌ছ, আজ রঘুবীর রাও ফিরে আস্‌চেন। ধনবীর এবার খুব জব্দ হয়ে গেছে।

২য় ব্যক্তি—আচ্ছা, শুন্‌লাম যে, রঘুবীর রাও নাকি এবারও ধনবীরকে হাতে পেয়ে স্থধু আহত করে ছেড়ে দিয়েছেন? তিনি যদি একটু মনোযোগ দিতেন, তা হলে ধনবীরকে আর ফির্‌তে হত না; হয় বন্দী, না হয় হত হতেই হ'ত।

১ম—ওহে, ধনবীরকে এখনও বেশ ভালরকম করে জান না কিনা, তাই এমন কথা বল্‌ছ। ধনবীর বড় কেও-কেটা নয়। সেও রায়গড়ের সর্দ্দারের ছেলে। যৌবনে স্থখের সময় তার শরীরে অসীম বল ছিল।

৩য়—বলেন কি খুড়ো-মশাই, ধনবীর রায়গড়-সর্দ্দারের ছেলে!

২য়—সর্দ্দারের ছেলে ডাকাত!

২য়—ওহে, গ্রহের ফেরে সকলকেই সব হতে হয়। সে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসরের কথা। তখন আমাদের সর্দ্দার সাহেবের বয়স সবে আঠার বৎসর। তখনও রায়গড়ের সর্দ্দার স্বাধীন ছিলেন। তাঁর ছেলে ধনবীর আমাদের সর্দ্দারের সমবয়স্ক। ধনবীরের বাপের সঙ্গে আমাদের গত সর্দ্দারের একটা তুচ্ছ কারণে বিবাদ বাধে, সেই বিবাদ ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ল। দুই দলে ক্রমাগত ছোট ছোট যুদ্ধ হতে লাগ্‌ল। ক্রমে কথাটা রাণার কাণে গেল। রায়গড়-সর্দ্দার রাণার বড় প্রিয় ছিলেন না; কাজেই তিনি সর্দ্দারি হতে বরখাস্ত হলেন, আর আমাদের স্বর্গগত সর্দ্দার সিংহগড় ও রায়গড় দখল কর্ল্লেন।

৩য়—তারপর খুড়ো-মশাই, তারপর?

২য়—তুচ্ছ কারণটা কি, তা ত কৈ বল্‌লেন না খুড়ো-মশাই!

১ম—আহা, ব্যস্ত হও কেন? ধীরে ধীরে বলি, শুনে যাও। কারণটা তুচ্ছ বই আর কি! স্বর্গগত সর্দ্দার আর ধনবীরের পিতা দুজনেই আহেরিয়ায় গিয়েছিলেন। মৃগ কে আগে বিদ্ধ করেছে, এই নিয়ে তর্ক; ক্রমে সেই তর্কে বিবাদ, আর তার ফলে এই হল যে, সর্দ্দার-পুত্র আজ দস্যু।

৩য় ব্যক্তি—আচ্ছা, ধনবীর দস্যু হল কেন?

২য় ব্যক্তি—তাই ত, ডাকাত হতে গেল কেন?

১ম ব্যক্তি—গ্রহের ফের আর কি, গ্রহের ফের! রায়গড় যাবার কিছুদিন পরেই তার পিতার মৃত্যু হল—ধনবীর তখন দূর-দেশে। তারপর আর কিছুদিন পরেই, আমাদের সর্দ্দার-সাহেবের পিতাও স্বর্গগত হলেন। সম্পৎরাও সাহেব যখন গদীতে আরোহণ কর্ল্লেন, তখন ধনবীরের বড় দুরবস্থা। তিনি স্বভাবতই দয়ালু। তাকে তার সম্পত্তির কতক ফিরিয়ে দিতে চাইলেন; কিন্তু ধনবীর অহঙ্কারী, তাঁর কথায় কর্ণপাতও কর্‌লে না। তার কতকগুলা অনুগত অনুচর লয়ে সে কোথায় চলে গেল; তারপর আজ ত তিন বৎসর হল, এসে দস্যুতা আরম্ভ করেছে। তার অভিপ্রায়, এইরূপভাবে অর্থ সঞ্চয় করে, তার হৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্‌বে।

৩য় ব্যক্তি—হাঁ, তা আর কর্ত্তে হয় না!

২য় ব্যক্তি—আচ্ছা, তখন কি ধনবীরের বিবাহ হয়েছিল?

১ম ব্যক্তি—হাঁ, তখন তার সবে বিবাহ হয়েছিল, আর এখন একটী পুত্র ও একটী কন্যা।

২য় ব্যক্তি—কন্যাটী ত দেবী বল্লেই হয়!

৩য়—রঘুবীর সাহেব আস্‌ছেন না? হাঁ তিনিই ত!

(রঘুবীর, অর্জ্জুনরাও ও শম্ভুসিংহের প্রবেশ)

রঘুবীর—বন্ধুগণ! ধনবীর পরাজিত, দেশে বোধ হয় শান্তি স্থাপিত হল।

সকলে—জয়, সর্দ্দারজীর জয়! রঘুবীর রাও দীর্ঘজীবী হোন।

অর্জ্জুনরাও—গ্রামবাসিগণ, আজ সর্দ্দারের অনুগ্রহে তোমরা বিপদ হতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ পেয়েছ। আমার অনুরোধ, তোমরা সকলে ভবানী-পূজার আয়োজন কর। মার দয়ায় দেশে শান্তি-স্রোত প্রবাহিত হবে।

১ম ব্যক্তি—দাওয়ানজি, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য, আগামী অমাবস্যায় আমরা মার পূজা দেব।

২য় ব্যক্তি—খুড়ো চল, আমরা সকলকে এই শুভ সংবাদ দিইগে যাই।

১ম ব্যক্তি—হাঁ, তা বৈ কি, শুভস্য শীঘ্রম্। তবে আসি দাওয়ানজি, প্রণাম রাওজী।

(রঘুবীর, অর্জ্জুনরাও ও শম্ভুসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

অর্জ্জুনরাও—রঘুবীর, সেনাপতির সহিত তুমি দুর্গে এস, আমি নগরে একটু কার্য্য শেষ করে শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হব।

(প্রস্থান)

রঘুবীর— দারুণ সন্দেহ।
দস্যুকন্যা পতিতা কি
বিপদ-সাগরে? অথবা
সহিতে না পারি আর
পিতৃ অত্যাচার, পলায়েছে
পিঞ্জর ছাড়িয়া পাখী?
শুন সখা!
ভীম তেজে আক্রমিনু ধনবীরে যবে
পৃষ্ঠ দিল অনুচরগণে;
ধনবীর নিজে আসি
রোধি মোর পথ, দাঁড়াইল
সিংহপ্রায়। বৃদ্ধ, তবু
অদ্ভুত সাহস; কিন্তু
পুত্রমুখে অকস্মাৎ
শুনি তার কন্যা নিরুদ্দেশ—
বিচলিত হ'ল বৃদ্ধ।

আহত হইল বীর মম
অস্ত্রাঘাতে, ভঙ্গ দিল রণে,
নারিনু রোধিতে তারে, মন্ত্রমুগ্ধ
আমি শুনি তার কন্যার সংবাদ।

শম্ভুসিংহ—সখা!
দেখেছ কি তুমি তারে?
শুনেছ কি নাম তার?

রঘুবীর— শুনি নাই নাম; কিন্তু
চকিতের তরে দেখিয়াছি
তারে,—অপূর্ব্ব স্থন্দরী।

শম্ভুসিংহ— তবু সে ত অরি-কন্যা,
কেন তারে ভাব বার বার?
ধনবীর স্থধু নহে অরি;
দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর আকার তার।
কন্যাসহ তার, তোমার
মিলন অসম্ভব।

রঘুবীর— জান সখা, বংশ-মর্য্যাদায়
ধনবীর মোর পিতা হ'তে
কোনও অংশে নহে
কভু হীন, কন্যা তার
দেবীরূপা।
অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে
ধনবীর দস্যু আজ।
কে নির্ণীতে পারে বল
নির্ব্বন্ধ বিধির?
একদিন ধনবীর পারে
পুনঃ লভিতে সম্মান।

শম্ভুসিংহ— আশা দুরাশা বলি
লয় মোর মনে।
যাই হোক্ তুমি সখা
ভেব নাক' স্থধু।
ভবানীর ইচ্ছা যদি হয়—
হবে তব পূর্ণ মনস্কাম;
চল এবে, গৃহপানে
যাই। অস্তগামী রবি;
তব কার্য্যে দুর্গে শুন
পড়ে গেছে আনন্দের রোল।

(উভয়ের প্রস্থান)

(গান গায়িতে গায়িতে বৈরাগী ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভকতি বলেতে ওহে পরমেশ, তব কৃপা মোরা লভিব।
বেদনা-কাতর হৃদয় মোদের অর্ঘ্যতরে দানিব ॥
শকতি মোদের যদিও গো নাই, তব নামে বল পাইব।
কুমতিরে দিয়া তব পদে বলি, স্থমতিরে ধরি রাখিব ॥
মধুর তোমার ও রূপমাঝারে চিরদিন ডুবে রহিব।
দয়াময় পিতা তব দয়া বিনা কিবা আছে আর চাহিব ॥

(প্রস্থান।)

ক্রমশঃ

শ্রী—

জাপানে বাণিজ্য-শিক্ষা

প্রশান্ত মহাসাগর-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র জাপান আজ সভ্যজাতির মধ্যে সম্মানের আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সভ্যতার আলোক-রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া জাপান প্রতিনিয়তই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে না পারিলে, দেশ কখনও উন্নত হইতে পারে না।

বহির্জগতের সহিত সম্পূর্ণভাবে সমকক্ষতা লাভ করিতে হইলে, বাণিজ্যের উন্নতিসাধনে যে বিশেষরূপ তৎপর হওয়া আবশ্যক —এই অভ্রান্ত সত্যটি জাপান প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে স্থন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য কোন প্রকারেই চলিতে পারে না বলিয়াই জাপানকে প্রথমে বৈদেশিকগণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইয়াছিল এবং এই কারণে বৈদেশিকগণও লাভের অধিকাংশ গ্রহণ করিত। ফলে জাপানকে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। পরের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিলে তাহা স্থচারুরূপে সম্পন্ন হয় না বলিয়াই জাপান স্বীয় স্বদেশবাসীকে বাণিজ্য-শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করে। এই মহানুষ্ঠানের ফলে জাপান আজ বাণিজ্য-ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রতীচ্য দেশসমূহ বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফলে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন, আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান তাহা আয়ত্তীভূত করিয়া সমগ্র জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। এই জন্যই কর্ম্মক্ষেত্রে স্থদূর প্রাচ্য দেশসমূহে জাপান আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বণিক্‌জাতি বলিয়া পরিগণিত। 'ব্যাঙ্ক্' বাণিজ্য ও বর্দ্ধনশীল পণ্য প্রভৃতিতে যে ভাবে জাপান আজ সমগ্র জগতের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উচ্চস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে জাপান যে কত শীঘ্র প্রতীচ্য বাণিজ্যের নিয়মাবলী সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

মিষ্টার ইয়ারে ইয়ানোই জাপানে বাণিজ্য-শিক্ষার অগ্রদূত। সমগ্র দেশের তুলনায় 'নাগোয়া'ই সে সময়ে বাণিজ্য-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছিল। সেই জন্যই তিনি বলিতেন যে, বাণিজ্য-বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে জাপানী বালককে 'নাগোয়ায়' প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। এই স্থানেই তিনি সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের হিতসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। প্রায় চতুঃসহস্র জাপানী তাঁহার নিকট হইতে বাণিজ্য-শিক্ষালাভ করিয়াছে এবং আধুনিক জাপানী বণিক্‌গণ তাঁহারই ছাত্র। এই বাণিজ্যশিক্ষার প্রবর্ত্তক সহৃদয় মহাত্মা ইয়ানো, প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে পরলোকে গমন করিয়াছেন এবং মিষ্টার ইকিমুরা তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন। যে সকল যুবক দেশের উন্নতিসাধনার্থ উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, তাহাদিগকে স্থপথে চালিত করিবার জন্য, মৃত মহাত্মার আত্মা

সর্ব্বদা বিত্থালয়ে অবস্থান করিতেছে—এই ধারণা সকলের মনে অত্থাবধি বদ্ধমূল রহিয়াছে। নাগোয়া-বাণিজ্য-বিত্থালয় কৈশোর সীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে; তাহার কার্য্য-কলাপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত বিত্থালয় উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

অন্যূন চল্লিশ বৎসর যাবৎ জাপানে যথারীতি বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে এবং এই সময়ের মধ্যেই প্রায় শতাধিক বাণিজ্য-বিত্থালয় দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অত্থাবধি প্রায় দ্বাত্রিংশ সহস্র যুবক এই সকল বিত্থালয় হইতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া দেশের বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতেছে; তন্মধ্যে অন্যূন ত্রিসহস্র যুবক নাগোয়া-বাণিজ্য-বিত্থালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। সেণ্ট্ লুই-প্রদর্শনীতে শাসনকর্ত্তার আদেশানুসারে নাগোয়ার বাণিজ্য-বিত্থালয়ের ছাত্রগণ স্ব স্ব কৃতিত্ব, দেখাইয়া বাণিজ্য-সম্বন্ধে জাপানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন কি, লণ্ডনের এ্যাংলো-জাপানী-প্রদর্শনীতে তাহারা কার্য্য-তৎপরতার জন্য একটি প্রধান পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র সভ্যজগৎকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। সমগ্র নাগোয়া-বাসী বিত্থালয়ের এই গৌরবে গৌরবান্বিত এবং আচার্য্য ইকিমুরার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

এই "বিশাল পৃথিবী আমাদিগের বাণিজ্যক্ষেত্র"—ইহাই নাগোয়া-বাণিজ্য-বিত্থালয়ের মূলমন্ত্র। এই উচ্চাশা মানসনেত্রের সম্মুখে অঙ্কিত রাখিয়া ছাত্রগণ সুবিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অনায়াসে সর্ব্বস্থানেই সাফল্যলাভ করিতেছে। এই বিত্থালয়ের প্রায় দেড় শত ছাত্র বিভিন্নদেশে বিভিন্ন প্রকারের বাণিজ্য করিয়া দেশের উন্নতিসাধন করিতেছে। অধুনা প্রায় দেড় হাজার ছাত্র নাগোয়ায় বাণিজ্য শিক্ষা করিতেছে।

Sprit-de corps—ইহাই নাগোয়া-বিত্থালয়ের উন্নতির গুপ্ত-মন্ত্র এবং ইহাই বিচক্ষণতা ও তৎপরতার নামান্তর মাত্র। ভবিষ্যৎ 'ব্যাঙ্কার' বণিক্ ও শিল্পী জাপানী যুবকগণ উক্ত বিত্থালয়ে Spriit of com e'arie শিক্ষা করে এবং মান্যবর ও সদাশয় বণিক্-গণের অন্তরে এই ভাবটি সর্ব্বদা জাগরুক থাকে বলিয়াই তাহারা বাণিজ্যে এত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যান্য স্থানে যেরূপ কর্ত্তব্যের আদর্শ ও শিল্পকলার আদর্শ এই উভয়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, নাগোয়ায় সেরূপ কখনও ঘটিতে পারে না।

বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসব-উপলক্ষে ছাত্রগণ বিবিধ আশ্চর্য্য বিষয় দেখাইয়াছিল। তাহাতে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার পণ্য-দ্রব্য একত্রে সমাবেশ করিয়া এরূপভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল যে, তাহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারেন, বিত্থালয়ের উৎপন্ন দ্রব্য পৃথিবীর শিল্প-ভাণ্ডারে কোন্ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। বৎসরান্তে শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী একত্র হইয়া পবিত্র মন্দিরে গমন করিয়া 'আইসি' দেবীর রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে গমন করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে কোনও পার্থক্য উপলব্ধি করে না। ছাত্রগণও যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহাই ভগবৎ-প্রেরিত বলিয়া মনে করে। ধর্ম্ম, স্বদেশ-প্রীতি, ব্যবসায় ও কর্ত্তব্যকে সকলেই জীবনাধিক প্রিয় বলিয়া ভাবে। এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া তাঁহারা বিধাতার আশীর্ব্বাদলাভে বঞ্চিত হন নাই।

ছাত্রগণ নাগোয়ায় যে, কেবল অর্থকরী বিদ্যালাভ করেন, তাহা নহে—তাঁহারা নৈতিক ও পারমার্থিক জ্ঞানও লাভ করিয়া থাকেন। ইহারই বলে বলীয়ান্ হইয়া তাঁহারা কার্য্যে সাফল্য লাভ করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পরেও তাঁহারা শিক্ষকের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বাণিজ্যে সফলমনোরথ হন। মহাত্মা ইকিমুরা এই বিত্থালয়কে এত স্নেহ করেন যে, তাঁহাকে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর করিলেও তিনি বিত্থালয়ের অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করিতে সম্মত নহেন।

খৃষ্টান্গণের নিকট মিশনারী কলেজ যেরূপ প্রিয়, হিন্দুগণের নিকট দেবমন্দির যেরূপ পূজ্য, মুসলমানগণের নিকট পবিত্র তীর্থ-স্থান মক্কা যেরূপ প্রিয়, জাপানিগণের নিকট নাগোয়া-বাণিজ্য-বিত্থালয় ততোধিক আদরের জিনিষ। নাগোয়ার আদর্শ ব্যক্তি-গত বা স্থানগত না হইয়া সার্ব্বজনীনভাবে বিত্থমান রহিয়াছে। বিত্থালয়ের সম্মুখস্থ উত্থানে একটি স্বচ্ছ, সুন্দর জলাশয় বর্ত্তমান; ছাত্রগণ ইহাকে "world pond" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। গোলকটির উপর একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যক্ষেত্রগুলি নয়ন-পথে পতিত হয়।

বিত্থালয়ের তিনটি প্রধান নৈতিক নিয়ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

১। রাজার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

২। মাতাপিতা, শিক্ষক ও ভদ্র বণিক্গণের প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শন।

৩। "সমগ্র পৃথিবী আমাদের বাণিজ্যক্ষেত্র"—বিত্থালয়ের এই মূলমন্ত্রটির প্রতি ভক্তি-প্রকাশ।

প্রায় সমুদয় জাপানী বিত্থালয়ে বিভিন্নশ্রেণীর বালকগণ বিভিন্ন গৃহে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু আচার্য্য ইকিমুরা এই সনাতন নিয়ম মানিয়া চলেন না। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদুপযোগী যন্ত্রসমূহও তথায় রক্ষা করিতেন; এবং অপর একটি গৃহে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

সাহিত্য-সংবাদ

আগামী ১৬ই জানুয়ারী রবিবার চুঁচুড়া ফ্রেণ্ডস্ ডিবেটিং ক্লাবের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন ও পারিতোষিক বিতরণ হইবে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গোয়াবাগান সারস্বত সম্মিলন "সত্য-মিথ্যা" নামক প্রবন্ধের যোগ্য লেখককে একটি সুবর্ণ-পদক ও মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আগামী ৩০শে জুন তারিখের মধ্যে সারস্বত সম্মিলনের সেক্রেটারীর নামে, ৩নং গোয়াবাগান লেন কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রবন্ধটি প্রেরণ করিতে হইবে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয় প্রবন্ধগুলির পরীক্ষার ভার লইতে সম্মত হইয়াছেন। দীনা বঙ্গভাষা ও হতভাগ্য দেশের উন্নতিসাধনে সারস্বত সম্মিলনকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছি।

মর্ম্মবাণী

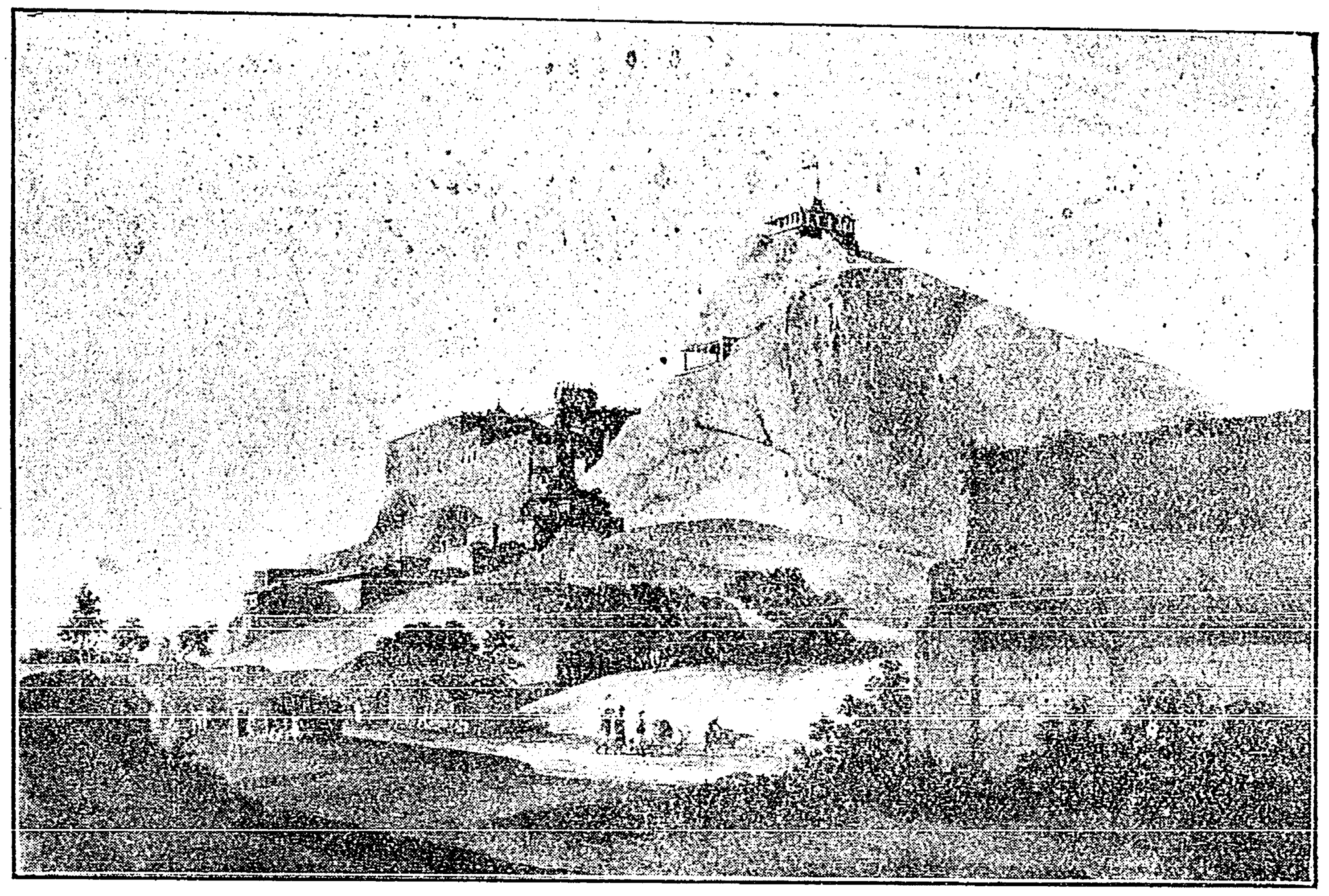

ত্রিচিনোপলির একটী দৃশ্য

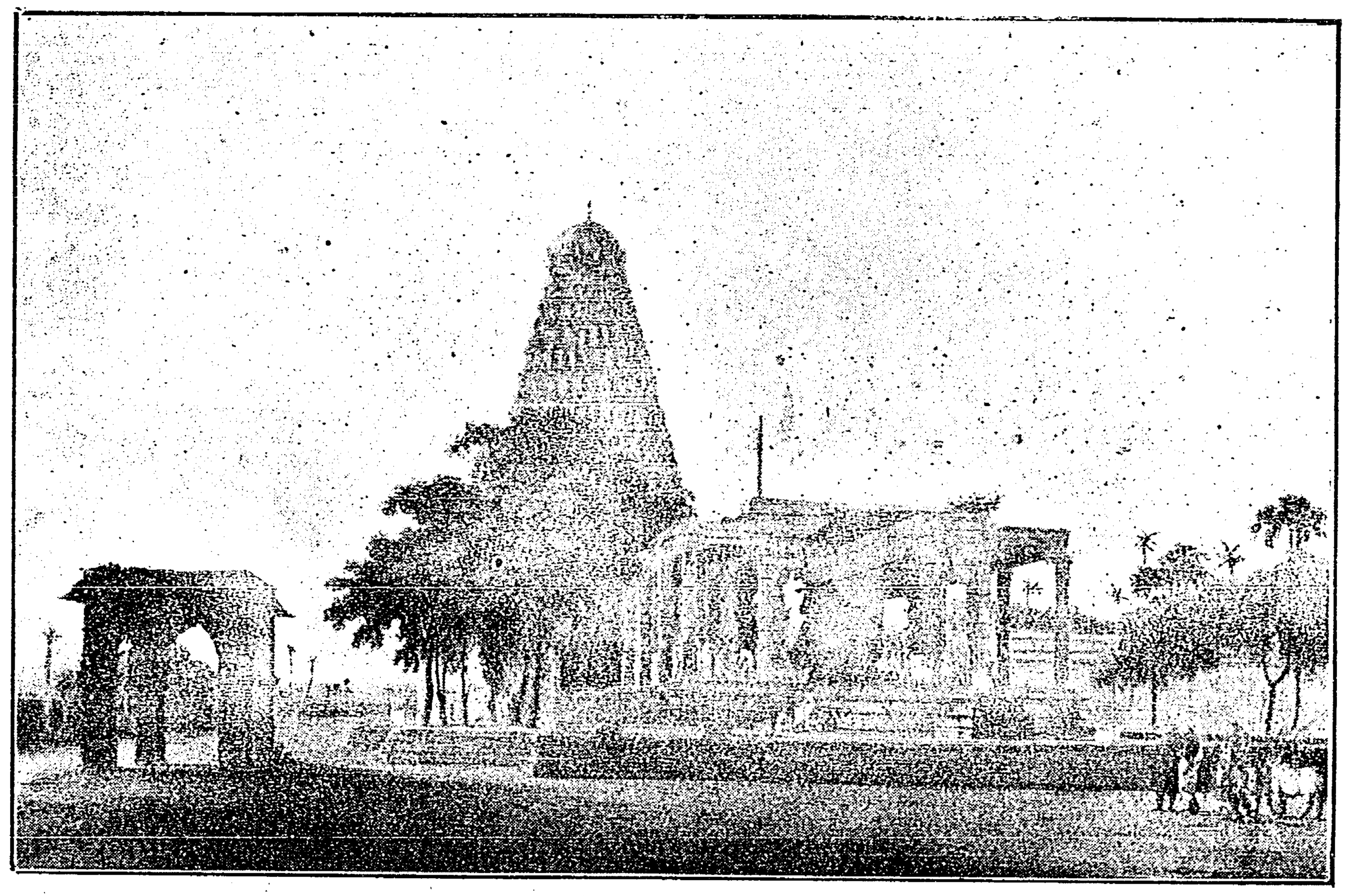

তাঞ্জোরে মহাবৃষ দেবমন্দির

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ২৮-এ পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ২৩শ সংখ্যা

জার্ম্মানীর বীরপূজা

আজ য়ূরোপখণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। য়ূরোপের শ্রেষ্ঠ বীরগণ আজ দলে দলে এই ভীষণ জীবন-যজ্ঞে নিজকে আহুতিপ্রদান করিয়া নশ্বর জীবনের বিনিময়ে শমন-জয় করিতে ছুটিয়াছে। কেহ একবার পশ্চাতে চাহিতেছে না, একবার দাঁড়াইয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতেছে না যে, কাহার দোষে, কোন্ জাতির অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে, আজি তাহারা আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করিয়া, তাহাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকূল পাথারে জীবন-তরণী ভাসাইতেছে! তাহারা কর্ত্তব্যের আহ্বানকে এমনই কঠোর, এমনই অলঙ্ঘনীয় জ্ঞান করে!

পৃথিবীর সমস্ত মনীষীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি কিন্তু আজ একমাত্র জার্ম্মানীর উপর পড়িয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে জার্ম্মানীর ক্ষমতা—তাহার তীব্র আকাঙ্ক্ষার আভাষ পাইয়া সকলেই প্রশ্ন করিতেছে, জার্ম্মানীতে এমন নির্ম্মম যোদ্ধৃবৃন্দের সৃষ্টি কে করিল—তাহার দেশে বীর-পূজার প্রচার কে করিল?" অনেক ইংরাজের মতে জার্ম্মান মনীষিদ্বয় নীট্‌শে (Nietzsche) ও ট্রিট্‌শ্‌কে (Treitsehke) তাহাদের দেশে এই নবীন ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছে; কিন্তু 'লণ্ডন ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক পত্রিকায় সিড্‌নে লো বলেন যে, একথা মিথ্যা। কয়েকজন দার্শনিক ও সাহিত্যিক মিলিত হইয়া দেশমধ্যে এ নবীন ভাবের তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে পারে নাই; কারণ, গতবৎসর পর্য্যন্ত জার্ম্মানীর জনসাধারণ নীট্‌শে ও ট্রিট্‌শ্‌কের নাম পর্য্যন্ত অবগত ছিল কি না সন্দেহ। আর তাহাদের সমাজের নেতৃবৃন্দ, সমর-সভার সদস্যগণ ও প্রধান ব্যবসায়িগণ—যাহারা শ্লাভ জাতিকে চিরদিন ঘৃণা করে ও যাহারা আজ পৃথিবীমধ্যে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠজাতিরূপে পরিগণিত করিবার আশায় এবং সর্ব্বত্র অবাধ বাণিজ্যের প্রসার-কল্পে সতত নব নব উপায়-উদ্ভাবনে রত রহিয়াছে, তাহারা কখনও দর্শন বা ইতিহাস পাঠ করে কি না সন্দেহ। সুধু দেশের শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীমধ্যে ইহাদের সমাদর আবদ্ধ থাকে।

শ্রেষ্ঠ মানব (Super-man) ও শ্রেষ্ঠ জাতি (Super-race) সৃষ্টির কল্পনা জার্ম্মানীতে প্রথম জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহার প্রথম উন্মেষ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীতে হয়। তৎপরে জার্ম্মানী ইহাকে নিজধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লয়; রাজনীতিক্ষেত্র হইতেই ইহার প্রথম জন্ম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীতে যখন প্রজাতন্ত্রের সহিত রাজতন্ত্রের তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছিল, তখন দেশের কলাবিদ্যা, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও জাতীয় উন্নতি সাম্যবাদের ফলে অধঃপতিত হইবে, এই চিন্তায় অনেকে ব্যাকুল হইয়া উঠেন। ইঁহাদের মধ্যে কারলাইল, রাস্‌কিন, টেনিসন, এমারসন, মাথু আর্ণল্ড প্রভৃতি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অভিজাত-তন্ত্রের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। রাস্‌কিন, ধনীদিগের নিন্দা করিয়া সাম্যবাদের প্রচার করিলেও, তাঁহার আদর্শ অভিজাত-সম্প্রদায়মধ্যে আবদ্ধ ছিল। তিনি চাহিতেন যে, সাধারণ মানবজাতি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজেদের উন্নতিসাধন করুক্—ঈশ্বরের মহিমা ধারণায় আনয়ন করিতে শিক্ষা করুক্।

আর্ণল্ড ও এমারসন ইংরাজদিগের "বর্ব্বরের ন্যায়" শাসন-প্রণালী পছন্দ করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারা চাহিতেন যে, একজন উচ্চবংশোদ্ভূত, সুশিক্ষিত ও সুসভ্য ব্যক্তিদ্বারা দেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হউক্। ইংলণ্ডের দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক বিভিন্ন আকারে এই নীতিরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, আর ইঁহারাই জার্ম্মানীতে এই নীতি-প্রচারের জন্য দায়ী। ভাবুকশ্রেষ্ঠ কারলাইল ও বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত দারবিন তাহাদের মধ্যে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করিয়াছেন। কারলাইলের মতে, "Every nation and Society being composed of persons who were 'mostly fools' the only salvation was that they should be controlled, guided, taught, if need be, thwacked, dragooned and drummed into sense and good behaviour by the Greet man, to whom, as by divine illammiaation the eternal varieties were revealed."

অর্থাৎ, প্রত্যেক জাতি ও সমাজের জনসাধারণ প্রায়ই মূর্খ হয়; সুতরাং তাহাদিগকে মার্জ্জিত ও শিক্ষিত করিতে হইলে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদ্বারা তাহাদিগকে শাসন ও শিক্ষাপ্রদান করা একান্ত আবশ্যক। এই শ্রেষ্ঠ মানবেই নানা সদ্গুণ আজন্মকাল হইতে নিহিত থাকে ও কার্য্যক্ষেত্রে ইহাদের ক্রমশঃ বিকাশ হয়। প্রকৃত পক্ষে কারলাইল দৈহিক শক্তিশালী ব্যক্তির বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; এইজন্যই তিনি হোহেনজুলার্ণ বংশীয় সাহসী বীর সৈনিক ফ্রেড্‌রিককে আদর্শ চরিত্ররূপে গ্রহণ করেন। আর জার্ম্মানবাসীকে, বিশেষতঃ প্রুসিয়ানদিগকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করিতেন; একারণ, জার্ম্মানজাতিমধ্যে তাঁহার পুস্তকের বিশেষ সমাদর আছে। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত বীরপূজা—দৈহিক ক্ষমতাশালী শ্রেষ্ঠ মানবের পূজা তাহাদের সমস্ত শিক্ষিত সমাজ সাদরে গ্রহণ করিয়াছে।

মনীষিশ্রেষ্ঠ চার্লস্ দারবিন যে অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার-দ্বারা সমস্ত সভ্যজগৎকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করেন, সে তত্ত্ব জার্ম্মানীর মহৎ উপকার করিয়াছে। "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"—এই আদর্শানুযায়ী তাহারা সমস্ত জাতিকে গঠিত করিয়াছে। হিকেল ও অন্যান্য জার্ম্মান দার্শনিক এই বাণীরই বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জড়বাদিগণ বলেন যে, অবিশ্রাম জীবন-সংগ্রামের সমষ্টিমাত্র লইয়া এই জীবন গঠিত হইয়াছে। এ জীবন-যুদ্ধে যাহারা জয়লাভ করিতে সমর্থ, তাহারাই থাকিবে—এ পৃথিবীতে দুর্ব্বলের স্থান নাই।

জার্ম্মান মনীষী নীট্‌শের বাণী দেশমধ্যে প্রচার করিয়াছে যে, প্রকৃতি করালমূর্ত্তি পরিগ্রহণপূর্ব্বক জীব-জগতের ক্রমাগত ধ্বংস-সাধন করিতে করিতে তাহাদের মৃতদেহ লইয়া তাণ্ডব নৃত্য

করিতেছে; তাই তিনি বলিয়াছেন যে, "অগ্রে শক্তিসঞ্চার কর—নতুবা জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। ন্যায়, অন্যায় যে-কোন উপায়ে এই শক্তির সঞ্চার ও বৃদ্ধিসাধন কর। দুর্ব্বলকে নিজ-পদতলে নিষ্পেষিত করিতে হইবে; নতুবা নিজ মঙ্গল কখনও সিদ্ধ হইবে না; কারণ, দুর্ব্বলতা সুধু পাপাচারের চিহ্ন নহে; ইহা অসারতা, ক্ষয় ও ধ্বংসের পরিচায়ক। এ পৃথিবীতে সকলের স্থান নাই; সুতরাং যাহারা সাধারণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও শক্তিসম্পন্ন, তাহারা অবশিষ্টকে দূরীভূত করিয়া এখানে বাস করুক্। একারণ, অসার, দুর্ব্বল সকলকে পীড়ন করিয়া বলবান্ নিজশক্তির বহুল বিস্তারসাধন করুক্। এই আদর্শে জাতি শ্রেষ্ঠত্বলাভ করে, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব জন্মগ্রহণ করে।"

ঐতিহাসিক লেখকদ্বয় ফি্ম্যান ও ষ্টাব্স্ বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিত একবাক্যে জার্ম্মানজাতির প্রশংসা করিয়া তাহাদের মধ্যে অহঙ্কারের, আত্মভিমানের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ইতালীর কাউণ্ট্ গোবিনু ও ফরাসীর ভেচার ডি লেপ্জ্ বলিয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যজাতির সভ্যতা ও শিক্ষা সমগ্র য়ুরোপখণ্ডমধ্যে সুধু টিউটন ও স্কাণ্ডিনেভিয়ান জাতির মধ্যে বর্ত্তমান আছে। রিচার্ড্ হার্ড্সন চেম্বারলেনও এই দলের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি জার্ম্মানজাতির এমন অতিরঞ্জিতভাবে প্রশংসা করিয়াছেন যে, উহারা অতি অল্পকালমধ্যে তাঁহার ষাটহাজার পুস্তক ক্রয় করে।

উপসংহারে আমরা বলিতে বাধ্য যে, পূর্ব্বোক্ত জার্ম্মান-অনুরক্ত লেখকগণের মতে, সম্রাট্ ডেভিড্ হইতে সম্রাট্ পিটার, হোমার হইতে দান্তে, এক্রোপলিস হইতে বিথোভেন, আলেক্জান্দার হইতে নেপোলিয়ন—প্রমুখ সকলেই জার্ম্মানীর সভ্যতালোকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়াছে, বলিতে হইবে; সুতরাং কেল্ট, আইওনিয়ান, ইহুদী; শ্লাভ, আলপাইন জাতি প্রভৃতি সকলেই জার্ম্মানীর পদলেহন করিতে বাধ্য; কেন না—পূর্ব্বোক্ত লেখকগণের মতে জার্ম্মানীই পৃথিবীমধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি। অন্ততঃ তাহার দেশের মনীষিগণের ধারণাই এই; সেইজন্যই দম্ভের অবতার কৈসার আজ হিমাদ্রির ন্যায় বিরাট্ উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া বিষাক্ত বাষ্প, বিমানপোত ও বজ্রনাদী কামানসকলের সাহায্যে সমস্ত য়ুরোপকে নিজ পদানত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল

"প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত"

গত অগ্রহায়ণ মাসের "ভারতবর্ষে" "প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত" নামক একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি।

(১) এই প্রবন্ধের শেষাংশে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় রচিত "Indian shipping and Maritime Activity" নামক গ্রন্থের প্রতি কয়েকটি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। যদি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে না করিয়া স্পষ্টতঃ করিলেই ভাল হইত। অবশ্য, প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোত-সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ লিখিতে গেলে রাধাকুমুদবাবুর গ্রন্থোক্ত কোন মতের সমালোচনা করা আবশ্যক হইতে পারে এবং এরূপ সমালোচনা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। "ভারতবর্ষে"র প্রবন্ধ-লেখক কিন্তু এইরূপ সমালোচনা করেন নাই। তিনি বিশেষভাবে এই কথাটিই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাধাকুমুদবাবু অপরের লেখা চুরি করিয়া স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তিনি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত এ বিষয়ের কোন সম্বন্ধই নাই। এইরূপ অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিয়া রাধাকুমুদবাবুর নামে চুরির অভিযোগ আরোপ করায় অনুমান হয় যে, প্রবন্ধ-লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রাধাকুমুদবাবুর প্রতি বিদ্বেষবোধেই লিখিয়াছেন—সাহিত্যিকের কর্ত্তব্যবোধে লেখেন নাই।

(২) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদবাবুর বিরুদ্ধে প্রবন্ধ-লেখকের অভিযোগ এই যে, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (তৃতীয় ভাগ, ৭৮ সংখ্যা, ১৭৭১ শক) হইতে তিনি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন; অথচ কোথাও ঐ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই।" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'তত্ত্ববোধিনী'র কয়েকটি পংক্তি তুলিয়া দিয়াছেন এবং রাধাকুমুদবাবুর গ্রন্থের কয়েকটি পংক্তি যে ইহার অনুবাদমাত্র, তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী'র যে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটি শ্লোকের সাহায্যে প্রাচীন ভারতে সমুদ্র-যাত্রার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এখন তর্কচ্ছলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, রাধাকুমুদবাবু উক্ত পত্রিকা পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও উক্ত পত্রিকার নামোল্লেখ না করায় গুরুতর দোষ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না; কারণ, রামায়ণ, মহাভারত সাধারণের সম্পত্তি—সকলেই উহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন। যদি ইহার কয়েকটি শ্লোক কোন লেখক একবার উদ্ধৃত করিয়া কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, তবে অনুরূপ সিদ্ধান্ত-প্রতিধ্বনির জন্য অপরাপর শ্লোকের সহিত ঐ শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিবার আবশ্যকতা হইলে, লেখক ইচ্ছা করিলে মূল রামায়ণ বা মহাভারতের উল্লেখ করিতে পারেন অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরও উল্লেখ করিতে পারেন; কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত অথবা টলেমি, আলবেরূণীর ন্যায় সুপরিচিত গ্রন্থ হইতে এত অধিক সংখ্যক লেখক এ-যাবত মাল-মশলা সংগ্রহ করিয়াছেন যে, এই সকল গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে গেলে ঐ সমুদয় লেখকের নামোল্লেখ অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। টলেমি "Tiastenes" বা চষ্টন নামক উজ্জয়িনীর রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকমাত্রেই চষ্টনের কাল-নিরূপণ করিতে হইলে টলেমির দোহাই দেন—পূর্ব্ববর্ত্তী যে ঐতিহাসিক বা যে সমুদয় ঐতিহাসিকগণ টলেমির গ্রন্থের সাহায্যে চষ্টনের কাল-নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উল্লেখ করেন না এবং করিতে পারেন না। অনেক সময় যে এইরূপ মূল পুস্তকের উল্লেখ করা আবশ্যক হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী যে লেখক মূল পুস্তকের আলোচ্য অংশ লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহার উল্লেখ সম্ভবপর হয় না, "ভারতবর্ষে"র আলোচ্য প্রবন্ধই তাহার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আমরা দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

ফা-হিয়ানের সম্বন্ধে "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির Journal, পঞ্চম ভাগে" যাহা আছে, লেগ (Legge), বিল (Beal) প্রভৃতির গ্রন্থেও তাহা আছে—অথচ এই সমুদয় গ্রন্থের তিনি নামোল্লেখ করেন নাই। মারকি-কৃত ট্যাসিটাসের অনুবাদের যে অংশ তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা 'সফ্' (Schoff) কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'পেরিপ্লাস' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; অথচ তিনি দুষ্প্রাপ্য মারকির গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক কলেজ-পাঠ্যরূপে-নির্ব্বাচিত সুপরিচিত 'সফে'র গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই।

সুতরাং "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় যদি সুপরিচিত রামায়ণ, মহাভারত এবং টলেমি, আলবেরূণীর গ্রন্থ প্রভৃতির অংশবিশেষের আলোচনা হইয়া থাকে, তবে রাধাকুমুদবাবু তাহার পুনরালোচনা করিতে গিয়া "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার নামোল্লেখ না করায় "ভারতবর্ষে"র প্রবন্ধলেখক অপেক্ষা গুরুতর দোষে দোষী হন নাই। বস্তুতঃ, আমাদের বিবেচনায়, এরূপ উল্লেখ সর্ব্বত্র সম্ভবপর নহে।

(৩) প্রবন্ধ-লেখকের মতে "কথা সরিৎ-সাগর……গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত। সাধারণে কিন্তু ঐ গ্রন্থের লেখক সোমদেবকে একাদশ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াই জানে। অ

(৪) প্রবন্ধে যে চিত্রাবলী দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রথম চিত্রের নিম্নে লেখা আছে, "ভারতীয় প্রাচীন অর্ণবপোত, চিত্র নং ১"।

গ্রন্থকার কিন্তু অন্যত্র লিখিয়াছেন যে, এগুলি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর জাহাজের চিত্র। খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীকে আর কেহ ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

অরুণা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

সম্পৎরাওয়ের প্রাসাদ

অন্তঃপুরস্থ উদ্যান—অরুণা

অরুণা—রঘুবীর ফিরে এসেছে। একবার তার দেবমূর্ত্তি আমার চক্ষে পড়েছিল—সেই অবধি আমি তাকে ভুল্‌তে পারি নাই। অসীম করুণা তার; তাই পাছে আমার কোন অনিষ্ট হয়, সেই ভয়ে বাবাকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও সে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমি আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেম; যখন জ্ঞান হল, তখন তার চক্ষু আমার মুখের উপর সন্নিবিষ্ট। আজ সে ফিরে এসেছে। আমারই পিতাকে আহত করে, জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে; তবুও তাকে দেখ্‌তে পাব বলে আমার আনন্দ হচ্চে। আনন্দ! কিসের জন্যই বা আমার আনন্দ? আজ যদি সে আমায় চিন্‌তে পারে, শত্রুকন্যা—দস্যুকন্যা বলে ঘৃণায় তার মুখ ফিরিয়ে নেবে। পুরীমধ্যে সকলেই আমার পরিচয় পাবে, হয় ত শত্রুর চর বলে' সকলে আমায় অপমান কর্‌বে! মহা বিপদ সম্মুখে! তুমি এ সময় কোথায়, হে সন্ন্যাসী, তোমার বদনে ভবানীর জ্যোতি দেখ্‌ছি, তোমার বাক্য ভবানীর বাক্য ব'লে বিশ্বাস কর্‌ছি, সেই বিশ্বাসে আজ আমি এখানে। আজ এ মহাবিপদ হ'তে আমায় ত্রাণ কর প্রভু! আমার বিশ্বাসে শক্তি দাও।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী—আচ্ছা অরুণা, আজ তিনমাস তুমি এসেছ, কই তোমাকে ত বেশ হাসি-হাসি মুখে একদিনও দেখিনি। তুমি একলাটী থাক্‌লেই কি যেন ভাব! তাতে আজ আবার তুমি বড়ই ভাব্‌ছ; তোমার মা-বাপের জন্যে মন কেমন কর্‌ছে বুঝি?

অরুণা। হ্যাঁ ভাই, যদি মা-বাপের জন্যে মাঝে মাঝে ভাবি, তা হলে কি কিছু অন্যায় করি?

লক্ষ্মী। দূর, তা কি আমি বল্‌ছি! তা ভাই, তুমি আমায় ভালবাস না; তা না হলে আমায় তোমার মনের কথা সব বল না কেন?

অরুণা। লক্ষ্মী, ভাই, আর কিছুদিন অপেক্ষা কর, তোমায় সব বল্‌ব। আমার উপর রাগ ক'র না বোন! আচ্ছা লক্ষ্মী, তোমার রঘুদাদা তোমায় খুব ভালবাসেন—না? কাল তিনি ফিরে এসে তোমায় কি বল্লেন?

লক্ষ্মী। কি আর বল্‌বে? তার লড়ায়ের কথা সব বল্‌তে লাগ্‌ল। আর এক বেশ মজার কথা আছে! রঘুদাদা ধনবীরের মেয়েকে মোটে একটিবার দেখেছে; কিন্তু তার রূপ-গুণের প্রশংসা আর তার মুখে ধরে না। আমি কিন্তু তাকে বলেছি ধনবীরের মেয়ে যেমনই হ'ক, তোমার মত কিছুতেই নয়।

অরুণা। বেশ যা হ'ক, কেন তুমি তা বল্‌তে গেলে?

লক্ষ্মী। কেনই বা না বল্‌ব? আর আজ ত রঘুদাদা তোমায় দেখ্‌তেই পাবে, তা হলেই বুঝ্‌ব, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা।

অরুণা। ওসব কথা ছেড়ে দাও, কাল যে গানটা গেয়েছিলে, সেই গানটা গাও দেখি।

লক্ষ্মী। কিন্তু তোমাকেও একটা গান গাইতে হবে।

অরুণা। না ভাই, আজ নয়।

লক্ষ্মী। না, তা হবে না। তুমি রোজই বল, আজ নয়—কাল।

অরুণা। আচ্ছা, তুমি আগে গাও।

লক্ষ্মী। নূতন গানটী গাই শোন।

গীত।

রাজপুত-নারী বিশ্বপূজিতা,
কে চেনে না তারে জগৎমাঝে।
রাজপুত-নারী পাঠায়ে যে দেয়
স্বামীরে সাজায়ে রণের সাজে॥
রাজপুত-মাতা পাঠায় তনয়,
শমন-সদনে নাহি কোন ভয়,
পতি পরাজিত ফিরিলে গৃহেতে
আবরে বদন দারুণ লাজে।
বীরবালা নারী দেশের তরে,
ধরে খর অসি নিজ বাম করে,
সতীত্বের তরে জহর-ব্রতে
ঝাঁপ দেয় হেসে আগুন মাঝে॥

অরুণা। লক্ষ্মী, রাজপুত-রমণী দেশ-গৌরবে গরবিণী বটে, কিন্তু রাজপুত-রমণী ত রমণী! তার অন্য কাজও আছে।

লক্ষ্মী। কি কাজ?

অরুণা। সেবা, সংসারে শান্তিদান করা, ভগবানের নিকট পরের জন্য প্রার্থনা করা।

লক্ষ্মী। সে কি রকম?

অরুণা। তবে শোন,—

গীত।

তৃষ্ণাকাতর প্রাণী যবে
পাগলের সম ভ্রমে এ ভবে,
কে দেয় শীতল বারি
আনি তারে—সে যে নারী।
আনে শান্তি-সুখ কেবা,
জানে কে করিতে নরের সেবা,
পরের দুঃখে ফেলে কে এমন
নিজের নয়ন বারি
তিতি ধরা—সে যে নারী।
বিশ্ব কাহার সংসার হয়,
কাহার তনয় এ ভুবনময়,
কে ছুটে ভুলাতে সংসার-ক্লেশ

নিজ দুখ পাসরি—
কৃপা ভরে—সে যে নারী।

(রঘুবীরের প্রবেশ)

রঘুবীর। অরুণা, আজ মার নিকট হতে তোমার কথা সব শুন্‌লাম। তোমার সঙ্গীতে তোমার হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছি। তুমি আমাকে লজ্জা করো না অরুণা! আমাকে তোমার—

(সহসা ভাল করিয়া অরুণাকে দেখিয়া)

(স্বগত) একি, ধনবীর-দুহিতা!
সম্ভব কি এ?
ভ্রম কি হয়েছে মম?
না না, সেই চক্ষু,
সেই সরলতা, সেই নম্রতা,
কাতরতা, দৃষ্টিতে
নেহারি। একি প্রহেলিকা!

লক্ষ্মী। রঘুদাদা, কথা কইতে কইতে চুপ কর্‌লে কেন? অরুণা, তুমিই বা ভাই অমন কর্‌ছ কেন?

অরুণা। কই, কি করছি? রঘুবীর রাও, আমি অভাগিনী, আপনার পিতৃগৃহে স্থান পেয়েছি। আপনার মাতা আমায় কন্যার মত যত্ন করেন। আমি তার জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

লক্ষ্মী। বেশ, তোমায় আর কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। রঘুদাদা, দস্যুকন্যা কি এর চেয়েও সুন্দরী?

অরুণা। (একান্তে) লক্ষ্মী, তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি, চুপ কর ভাই!

রঘুবীর। না লক্ষ্মী, সে এর চেয়ে সুন্দরী নয়।

(নেপথ্যে—'লক্ষ্মী!')

লক্ষ্মী। যাই মা! অরুণা, আমি আস্‌ছি, তুমি ততক্ষণ রঘুদাদার সঙ্গে কথা কও।

(প্রস্থান)

অরুণা। রঘুবীর রাও, আমার ছলনার জন্য আমায় মার্জ্জনা করুন!

রঘুবীর। অরুণা, অরুণা, কে তুমি? আমার চক্ষু, আমার মন, সকলেই কি আমায় ছলনা কর্‌ছে? বল অরুণা, আজ ছয় মাস যার মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে অঙ্কিত, তুমি কি সেই?

অরুণা। রঘুবীর রাও, আমায় লজ্জা দেবেন না। আমিই ধনবীর সিংহের কন্যা। আপনি আমায় বিশ্বাস করুন, আমি কোনও দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য আপনার পিতৃগৃহে আসিনি। আমার উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু অভাগিনী আমি, স্বাধীনভাবে কার্য্য কর্‌বার আমার অধিকার নাই। আমায় ক্ষমা করুন, রঘুবীর রাও!

রঘুবীর। তোমার ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌বার প্রয়োজন নাই। অরুণা, তুমি কি জান যে, আমি তোমার পিতাকে আহত করেছি?

অরুণা। আপনার কর্ত্তব্য আপনি করেছেন, তার জন্য কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নাই।

রঘুবীর। আশ্চর্য্য! তুমি কি তোমার পিতাকে কিছুমাত্র ভালবাস না? তবুও আমার মনে হয়, তোমার পিতা হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বিশেষ-কিছু অন্যায় করেন নি।

অরুণা। পিতাকে ভালবাসি না? তবে কার জন্য—কার মঙ্গলের জন্য অরুণা আজ পরগৃহবাসী? না, রাওজী, আমি পিতাকে ভালবাসি, কিন্তু পিতার অত্যাচার ভালবাসিনা। আমি পিতাকে ভালবাসি; সেইজন্যই তাঁকে ধ্বংস হতে পরিত্রাণ কর্‌বার জন্য আমার এই যত্ন। সদুপায়ে যদি তিনি তাঁর পিতৃ-অধিকার লাভ কর্‌তে যত্ন করতেন, তা হলে আজ অরুণা তার পিতার শত্রুর গৃহে বাস কর্‌ত না।

রঘুবীর। অরুণা, আমার রূঢ় বাক্যে আমি অনুতপ্ত। তোমার মনে ব্যথা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তোমায় ক্ষণিকের জন্য যেদিন দেখেছি, সে দিন হতেই তোমার সৌন্দর্য্য আমার হৃদয়ে গাঁথা। তারপর দিন দিন তোমার শত্রুর মুখে তোমার প্রশংসার কথা শুনে আস্‌ছি। আজ ছ'মাস তোমার চিন্তা আমার একমাত্র ধ্যান হয়েছে—অরুণা, তোমার কাছে আমার হৃদয় উন্মুক্ত করেছি বলে আমায় ঘৃণা ক'র' না। আমায় তোমার মহৎ উদ্দেশ্যের সফলতার সহায় কর। তোমার রহস্য চিরকাল তোমারই থাক্‌বে। দেবী, তুমি একবারমাত্র বল যে, আমায় ঘৃণা কর্‌বে না! এর অধিক ভিক্ষা কর্‌তে আমার অধিকার নাই।

অরুণা। রঘুবীর! শত্রুকন্যার প্রতি এত দয়া তোমার! এত উচ্চ হৃদয় তোমার! কে জানে, কোন্ দেবতার কৃপায় তোমায় প্রথম নিমেষের জন্য দেখেছিলাম। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি যে, যতদিন আমার উদ্দেশ্য সফল না হয়, ততদিন আমি বিবাহ কর্ব্ব না, তারপর যাদ আমি কখনও বিবাহ করি—রঘুবীর রাওই আমার স্বামী হবে।

রঘুবীর। অরুণা,—দেবী,—এত সৌভাগ্য আমার! ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ কর্‌ছি, এ জীবনে আজ হ'তে অরুণা ভিন্ন আর সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরূপা। অরুণা, জানি না, বিধাতার মনে কি আছে; জানি না, তোমায় কখন পাব কি না, কিন্তু তবুও আমার হৃদয়ে আজ এক অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোত প্রবাহিত!

অরুণা। রঘুবীর, আমার আর এক অনুরোধ, আমার পরিচয় বা আমাদের উভয়ের প্রতিজ্ঞার কথা এখন যেন সকলের কর্ণগোচর না হয়!

রঘুবীর। বেশ, তাই হবে।

(গঙ্গাধরের প্রবেশ)

গঙ্গাধর। কেও, রঘুবীর! অরুণা, রঘুবীরকে বোধ হয় তুমি এই প্রথম দেখ্‌লে? রঘুবীর যুদ্ধ-হাঙ্গামা নিয়েই থাকে ভাল। যা হোক্, ধনবীর এবার খুব শিক্ষা পেয়েছে।

রঘুবীর। দাদা, ও কথা যেতে দাও।

গঙ্গাধর। সে কি! আমি মনে করেছিলাম যে, তুমি দস্যুর কথাই বল্‌ছিলে অরুণাকে।

রঘুবীর। না, আমি বনের দৃশ্য বর্ণনা কর্‌ছিলাম, আমার মতে উদ্যান অপেক্ষা বন অনেক ভাল।

গঙ্গাধর। কিন্তু বনফুল অপেক্ষা উদ্যানের ফুলের শোভা অধিক, আদরও অধিক।

রঘুবীর। যার যা ভাল লাগে।—বোধ হয় শম্ভুসিংহ বেড়াতে যাবার জন্য আমার অপেক্ষায় আছে, আমি চল্লেম।

(প্রস্থান)

গঙ্গাধর। অরুণা, লক্ষ্মী কোথায় গেল?

অরুণা। মা'র কাছে গেছে, ডেকে দেব কি?

গঙ্গাধর। না, আমার কোন প্রয়োজন নাই,—আমাদের বাড়ীতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত?

অরুণা। আজ্ঞা না।

গঙ্গাধর। তুমি আমার সঙ্গে ওরকম ক'রে কথা কইলে আমার বড় লজ্জা করে।

অরুণা। আপনি লক্ষ্মীর দাদা, সুতরাং আমারও দাদা।

গঙ্গাধর: হতে পারে; কিন্তু আমার এত ভাল লাগে না।

অরুণা। আপনার যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, আমি লক্ষ্মীর নিকট যাই।

গঙ্গাধর। প্রয়োজন? হাঁ একটা কথা—থাক্—না থাক্—আজ থাক্—তুমি যাবে, তা যাও।

(অরুণার প্রস্থান)

প্রয়োজন! হায় নারী,
বুঝিতে না পার তুমি
কিবা মোর প্রয়োজন!
একদিন, দুইদিন করি, তিন মাস
হইল অতীত। কি দারুণ
চিন্তা-বিষে দহিতেছে
মোরে; কে বুঝিবে?
অরুণা, কে সে আমার?
কোথা ছিল, কোন্ দূরে
অজানা বিদেশে, সহসা
আসিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল
মম, কেন সে করিল
অধিকার? নাহি সুখ-
শান্তি মনে, অপার চিন্তার
স্রোত বয়ে যায়
সুধু।
অরুণা কি ভালবাসে
মোরে? মাগি যদি
প্রেম-ভিক্ষা, প্রতিদানে
জুড়াবে কি হৃদয়ের
তৃষা? বার বার মনে
করি, জানাব
তাহারে হৃদয়ের ব্যথা;
কিন্তু,
হেরিলে তাহারে, ভাষা
না জুয়ায় মম।
যা হবার হবে, ভবানী-মন্দিরে
অদৃষ্ট পরীক্ষা মোর করিব
নিশ্চয়; হৃদয় উন্মুক্ত
করি দেখাব তাহারে,
অরুণাই আছে সুধু
এ প্রাণ জুড়িয়া।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির দ্বার

(পুরনারীগণের গায়িতে গায়িতে প্রবেশ)

শিবরাণী আজি পূজিবি চল্,
চল্ লো চল্, লয়ে জবা-দল।
রক্তজবায় মা তুষ্ট হবে,
ঘুচে যাবে ভয় এ ভবে
ভক্তিতে বাঁধিতে মায়েরে আজি
(মায়ের) পদতলে দে লো জবা-দল।

(গায়িতে গায়িতে প্রস্থান)

পট-পরিবর্ত্তন।

(মন্দির অভ্যন্তর)

(সম্পৎরাও ও গঙ্গাধরের প্রবেশ)

সম্পৎরাও। মা ভবানীর কৃপায় যদি দেশে শান্তি স্থাপিত দেখে আমি জীবন ত্যাগ কর্‌তে পারি, ত সে আমার সৌভাগ্য। গঙ্গাধর, এদের সকলের পূজা হয়ে গেছে, সুধু অরুণা আর লক্ষ্মীর পূজা বাকি। তুমি তাদের সঙ্গে নিয়ে এস, আমি অন্য সকলকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি।

(সম্পৎরাওয়ের প্রস্থান)

গঙ্গাধর। যদি বুঝি, সে আমাকে ভালবাসে না, তা হলে? তা হলে প্রাণ দিয়ে তাকে ভালবেসে ভালবাস্‌তে শিখ্‌ব। অরুণা যদি আমার না হয় ত এ জীবনই বৃথা। আমি যে তাকে ভালবাসি, পিতা কি তা বুঝ্‌তে পেরেছেন? অরুণা যদি আমায় ভালবাসে ত আমি তাকে বিবাহ কর্‌ব। পিতা নিশ্চয়ই সম্মত হবেন।

(অরুণা ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। পিতা সকলকে নিয়ে গেছেন, তোমরা পূজা কর, আমি তোমাদের নিয়ে যাব।

(উভয়ের দেবমূর্ত্তি-প্রণাম)

অরুণা। (স্বগত) মা সর্ব্বমঙ্গলে, আমার পিতার মঙ্গল কর মা! আমার আশ্রয়দাতার মঙ্গল কর। মাগো, তোমায় আমি কি দিয়ে পূজা কর্‌ব, আমার হৃদয়ের ভক্তি নাও মা! আমায় কৃপা কর। জন্মাবধি দুর্ভাগিনী আমি, পিতার দুঃখে-কষ্টে তাঁকে শান্তি দিতে পারিনি, তাঁকে শান্তি দাও মা, তাঁকে সুমতি দাও। বরাভয়করা, তোমার রাজ্যে পিতা অত্যাচারী। অভয় দাও মা! তিনি তোমার সন্তান, সন্তানের শিরে শান্তি-সলিল সেচন কর মা!

লক্ষ্মী। অই যাঃ, অরুণা, আমি সাজি ফেলে এসেছি, সাজি নিয়ে আমি এখনই আস্‌চি, তুমি ততক্ষণ পূজা সেরে নাও।

অরুণা। অভয়া, হৃদয়ে বল্ দাও মা, আশীর্ব্বাদ কর, যেন আবার পিতার মুখে হাসি দেখ্‌তে পাই!

(ধ্যান)

গঙ্গাধর। (স্বগত) কি সুন্দর! কবি এ হতে অধিক সৌন্দর্য্য কল্পনায়ও আন্‌তে পারে না। ধ্যানমগ্না রূপসী কায়-মনোবাক্যে মার পূজা কর্‌ছে, আহা, কি সুন্দর!

অরুণা। (উত্থানপূর্ব্বক) কুমার, লক্ষ্মীকে আমি ডেকে আনি, অকারণ বিলম্ব করে ফল কি?

গঙ্গাধর। অরুণা, লক্ষ্মী আস্‌ছে, তাড়াতাড়ি কর্‌বারই বা প্রয়োজন কি? তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, আজ সুযোগ পেয়েছি, তুমি যদি আমায় সাহস দাও ত বল্‌তে পারি।

অরুণা। এমন কি কথা আছে, যা বল্‌তে আপনি কুণ্ঠিত হচ্চেন? সুযোগের কথাই বা কি বল্‌ছেন? আমার সহিত আপনার গোপনীয় কথা কি থাকৃতে পারে?

গঙ্গাধর। (জানু পাতিয়া) অরুণা—অরুণা—আমি তোমায় ভালবাসি! তুমি সত্যই কি আজও তা জান্‌তে পার নি? আজ তিনমাস শয়নে-স্বপনে তোমায় দেখ্‌ছি। এই তিনমাস কেবল-মাত্র তুমি আমার হৃদয় অধিকার করে আছ; তা কি তুমি জান না অরুণা?

অরুণা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! হতভাগিনী আমি, যেখানেই যাব, সেইখানেই কি প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠ্‌বে? মা তারা! আমায় এ বিপদ হতে উদ্ধার কর মা! হৃদয়ে বল দাও মা।

গঙ্গাধর। অরুণা, নীরব কেন? একটী কথা সুধু শুন্‌তে চাই, আমায় আশা দাও অরুণা!

অরুণা। সর্দ্দারকুমার! এ উত্তম। আমি অসহায়া, আপনার পিতৃগৃহে স্থান পেয়েছি; কিন্তু এ ব্যঙ্গ বা অপমানের পাত্রী আমায় হতে হবে, তা জান্‌তাম না। আমি আপনার রহস্যের পাত্রী নই।

গঙ্গাধর। ব্যঙ্গ, অপমান! কি বল্‌ছ অরুণা? ভবানীর শপথ, আমি তোমার সঙ্গে রহস্য করি নি। হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তোমার মূর্ত্তি আমায় জীবিত রেখেছে। আমি তোমায় যত ভালবাসি, মানুষে এত ভালবাস্‌তে পারে, পূর্ব্বে তা জান্‌তেম না।

অরুণা। আমার কঠোর ভাষা-প্রয়োগ অন্যায় হয়েছে; কিন্তু কুমার, আপনার এ অভিব্যক্তি আকস্মিক। আমি বিবেচনা-রহিত হয়েছি, আমায় বিবেচনার সময় দিন।

গঙ্গাধর। অরুণা—তোমায়—

অরুণা। ক্ষমা করুন কুমার, মায়ের পূজা কর্‌তে এখানে আসা হয়েছে; আপনাকে অনুরোধ কর্‌ছি, আপনি গৃহে অগ্রসর হ'ন, আমি লক্ষ্মীকে নিয়ে পূজাশেষে যাচ্ছি।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। এস ভাই, আমরা পূজা করে নিই, কুমারের বিশেষ প্রয়োজন, উনি গৃহে যাচ্চেন, তোমাতে আমাতে পরে যাব।

গঙ্গাধর। (স্বগত) অদ্ভুত রমণী!

(প্রস্থান)

লক্ষ্মী। এস ভাই, আমরা মায়ের চরণে জবা দিই। তোমার মুখ শুক্‌নো কেন অরুণা?

অরুণা। ও কিছু নয়, এস তবে জবাদল দিয়ে মা'র পূজা করি।

উভয়ে — সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্তুতে॥

গীত

লক্ষ্মী— মঙ্গলময়ী, মঙ্গল কর মঙ্গল কর মা!
অরুণা— অভয়া শিবে, তনয়া যাচে অভয় দান' মা॥
লক্ষ্মী— শরণাগত মা তোমারই দেশ,
পরাও মা তারে শান্তি-বেশ,
অরুণা— শান্তিময়ী, শান্তি দান' মা,
মুছে লও মাতঃ, যাতনার লেশ॥
উভয়ে— দুর্গতিহারিণী দুর্গে, দুর্গতি নাশ' মা॥

(প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত) ক্রমশঃ

শ্রী—

পাখী

(রূপক)

তুমিও ত করনি বারণ!
নিতান্ত করুণা মানি' সে দিন যখন
বুকে লইলাম টানি' তোমারি সে সোহাগের ধন;
বাহুমূলে মুখখানি রাখি'
শ্রান্ত ভীত পাখী,
উঠিল সে ডাকি'—
বসন্তে ফিরিয়া-পাওয়া আনন্দের ডাক—
পূর্ণ করি এক পলে হৃদয়ের সব শূন্য ফাঁক!
তাই তা'রে ক্ষণেকের তরে,
বুঝি মোহভরে—
কুড়ায়ে লইনু তুলি' ব্যথাভরা এ বুকের 'পরে;
হয় ত বা মনে মনে
ভেবেছিনু একান্ত গোপনে,
ঝড়ে-উড়ে-আসা ওরে, থাক্ তুই থাক্!
তুমিও কহনি কথা—হাসিমুখ ছিল রুদ্ধবাক্।

সেদিন তখন
দিনান্তে আঁধার হয়ে এসেছে গগন—
ভিজে-চোখে চাহিছে শ্রাবণ;
অশ্রুবাষ্পে বেদনা-বিহ্বল
আসে-আসে জল—
থেকে-থেকে শ্বসিছে পবন।
মালঞ্চে আমার
নেমেছে আঁধার,
যূথীকুঞ্জে পুষ্প চেনা ভার।
নিভৃত কুটীরে
বসি আনমনে একা চেয়েছিনু ধীরে—
হাতে কিছু নাই করিবার!
ক্ষণে-ক্ষণে বুঝি-বা সে চেয়েছিনু ফিরে
অরুণ-কিরণে-আঁকা অতীতের তীরে—
বিরহীর শেষ অধিকার;
যবে হায় ফিরিবার সাধ্য নাই, নাই ফিরাবার!
সহসা সে উঠিনু চমকি,
চাহিনু থমকি'
পদতলে দেখিলাম লখি'

তোমারি সে পোষা হীরামণ—
ধুক্-ধুক্ ছোট বুক ধারাসিক্ত কাতর নয়ন।
হেন কালে রথে
শ্রাবণের স্নেহাঙ্কিত অশ্রুসিক্ত মালঞ্চের পথে
তুমি এলে—
হারান'-পাখীর তরে তপ্ত বুক ব্যগ্র বাহু মেলে।
বারেক চাহিয়া মুখে
নিরখি তাহারে বুঝি আমারি এ বুকে,
হাসিলে কৌতুকে সুখে;
বারণ ত করনি তখন!
আমিও কেমন—
ভোলা মন,
ভাবি নাই তোমার বুকের ধনে
রাণীর আপন হীরামণে
বুকে রাখা উচিত কি অনুচিত, বুঝিনিক হায়!
ছায়ার মায়ার মোহে আবেশে ব্যথায়—
ধারাসিক্ত শ্রাবণ-সন্ধ্যায়।

কেন, সে কি জানি!
সেই হতে রাণী,
বক্ষমাঝে লই টানি তোমারি সে বুকের রতন,
যখন তখন—
গোপনে উড়িয়া-আসা—পুষি তারে আশারই মতন।
ইঙ্গিতে আভাসে ভাষে তুমিও ত করনি বারণ!
তাই সে গোপনে,
জানি না কেমনে—
করিল বক্ষের মাঝে অযথা সঞ্চয়
মোহমুগ্ধ দরিদ্র হৃদয়—
উচ্চ আশা ভালবাসা নাহি বুদ্ধি নাই যার ভয়।
তাই আজি মনে হয়
নিতান্ত তোমারি যাহা—সে কি মোর একেবারে নয়?
ঐশ্বর্য্যের আনন্দ-দুলাল
দরিদ্রের ভাঙ্গা বুকে মাঝে মাঝে এমনি সে কাটাইল কাল,
বজ্রদগ্ধ বাবলায় বায়ুভরে-খসা বীজে সহকার ডাল!

তোমার প্রাসাদ-পাশে আমার এ দীনের কুটীর,
জানি চিরস্থির—
আনন্দ-উৎসব মাঝে বাজে যেন ব্যথা সুগভীর!
তবু বিহঙ্গের মন,
কেন অকারণ
উড়িয়া আসিল ভুলে' গৃহ ছাড়ি কণ্টক-কানন!
প্রাসাদ-বিহারী
সুদুর্লভ ফল-শস্যাহারী
বিচিত্র মখ্‌মল্-মোড়া স্বর্ণময় পিঞ্জরের সারী—
তারও বুঝি সাধ যায়
মেলিতে মোহন পাখা স্বভাবের শ্যাম নগ্নতায়!
বারমাস
ভয়ে ভয়ে যেথা বাস,
বারিধারা ঝরে—
তপন তাতায় নীড়, উড়ায় তা বৈশাখীর ঝড়ে;
কোথা খাদ্য-জল
পতঙ্গ পালায় উড়ে', থাবা মুড়ে বায়স সে উদ্যত কেবল!
হায়, তবু আদিম স্বভাব—
আয়োজনে নাহি মিটে প্রকৃতির প্রাণের অভাব!
প্রাণ চায় সুধু প্রাণ, মুক্তা হেমে প্রেমের কি লাভ?
তাই যদি হয়—
তৃষ্ণার সলিল যদি তৃপ্তি লাভে প্রধান সঞ্চয়;
প্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীর,
ধনের মানের বেড়া, উচ্চ বাধা সমুন্নত শির—
কেমনে করিবে দূর প্রাণের বেদনা সুগভীর?
সত্যই সে তাই যদি হয়,
তবে রাণী, আজ তুমি মিছা মোরে দেখাইছ ভয়!
ক্ষুদ্র পাখী কি করেছে—কি করেছি দোষ
কেন তবে তীব্র অসন্তোষ—
পিঞ্জরের রুধি দ্বার তার প্রতি কেন এই রোষ?
কেন মোর যতনে বারণ—
একান্ত হৃদয়হীন এ আইন সুধু অকারণ!
তোমারি সে জানি
নয়নের, যতনের গোপনের মানি,
তবু সেই সাথে জেনো আমারো ব্যথিত হিয়াখানি
জড়িত তাহারি সাথে রাণী;
কেন তবে এ রূঢ়তা হায়,
সহ্য তার যদি নাহি হয়—ম'রে যদি যায়!
তোমারি কি কোন ব্যথা বাজিবেনা তায়?
মোর কথা—মোর কথা তুলিব না—সে আজি বৃথায়!

হায়, অন্ধ গর্ব্ব মানবের!
নিতান্ত নিজেরও পরে অধিকার নাহি পীড়নের—
নাই নাই নাই—
গভীর নিশীথ রাত্রে তাই
নিদ্রায় স্বপনমাঝে নিজেই সে নিজেরে হারাই—
দেবতা কাঁদিয়া উঠে নিজেরি সে মৃত্যু-যন্ত্রণায়!

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পিউ-পিউ ও কুহু-কুহু

নব মধুমাসে কুঞ্জ-নিবাসে শ্যাম মিলে রাধাসনে,
দুহুঁ চেয়ে রয় দুহুঁ মুখ-পানে অনিমিষ দরশনে।
রাধার লাজুক নীরব অধরে সুধা ঢলে লোভনীয়,
বকুলের শাখে পাপিয়াটি ডাকে "ওগো পিয়, পিও পিও।"
কুসুম-শয়নে অলস নয়নে রাধা-শ্যাম বাহু-পাশে,
পরিরম্ভন চুম্বন-ব্যথা সহিয়া পিয়ারী হাসে।
লজ্জানীরবা, নখর-দংশন-ক্ষত সহে মুহুমুহু,
কিংশুক-শাখে পিকবধূ ডাকে "কুহু, কুহু, উহু, উহু।"

শ্রীকালিদাস রায়

মাতৃমূর্ত্তি

(গল্প)

(১)

"এমন হতচ্ছাড়া মেয়ে আমার বয়সে দেখি নি। বিয়ের বছর ঘুর্‌তে-না-ঘুর্‌তেই স্বামীকে খেয়েছে; আমাদের সংসারে পা দিতে-না-দিতেই খোকা আমাদের জন্মের মত ছেড়ে চলে গেল; সংসারে নানারকম অশান্তি লেগেই আছে। হাড়হাবাতে লক্ষ্মী-ছাড়া মেয়েকে জেনে-শুনেই শ্বশুরবাড়ী হতে একবারও খোঁজ নেয় না। মাকে খেয়েছে, শেষ অবলম্বন বাপকেও খেয়েছে। রাক্ষসী মেয়ে এখন আমাদের খেতে এসেছে। এত লোক মর্‌ছে, কিন্তু একে যমেও চোখে দেখে না।"

"এসব কথা বলা তোমার একেবারেই ভাল নয়। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। কেউ ইচ্ছে করে কি কাউকে মার্‌তে পারে? কালপূর্ণ হলে সবাইকেই সংসার ছেড়ে যেতে হয়; কেউ আজ যায়, কেউ কাল যায়। কারও মরণ-কামনা কর্‌তে নেই, পাপ হয়। অন্নপূর্ণার বাপের এখনও যথেষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, দশজনে খেয়েও ছাড়াতে পারে না। বাপ-মা মরে গেছে, নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে, তাই আমাদের বাড়ীতে এসেছে; সেও ইচ্ছে করে আসে নি; আমি অনেক সাধ্য-সাধনা করে এনেছি। এসব কথা আর যেন তোমার মুখে কোনদিন না শুনি; বল ত, ওরা শুন্‌লে ওদের মনে কত কষ্ট হবে!"

"কষ্ট হল ত বয়ে গেল। রাক্ষসী আস্‌তে-না-আস্‌তেই আমার সোণারচাঁদকে খেলে; আর চল্‌বে না।" গৃহিণী এই কথা বলিয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

"ধর, অন্নপূর্ণা যদি তোমার পেটের মেয়ে হত তা' হলে কি তুমি এরূপ কখনও বল্‌তে?"

"আমার মেয়ে এমন অলক্ষণে কখনই হবে না; হলে বিষ খাইয়ে মেরে ফেল্‌ব।"

"যাও, তুমি একেবারেই ছেলেমানুষের মত কথা কইছ। তিন তিনটে সন্তানের মা হলে, এখনও তোমার বুদ্ধি হল না!"

গৃহিণী অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেলেন। আফিসে যাইবার অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া রামসুন্দর-বাবু বিমর্ষভাবে স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

কলিকাতা বাগবাজারের একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর নীচের তলায় কোন এক কক্ষে স্বামী-স্ত্রীতে পূর্ব্ববর্ণিত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ভাগিনেয়ী অন্নপূর্ণাকে লক্ষ্য করিয়াই গৃহিণী ঐরূপ বলিতেছিলেন।

ঐ কক্ষের কিছু ব্যবধানে রোয়াকের গাত্রসংলগ্ন একটি জলের কল আছে। একটু মনোযোগী হইলেই এই রোয়াক হইতে ঘরের ভিতরের কথাবার্ত্তা একরূপ শুনা যায়।

দন্তধাবনের জন্য হৃষীকেশ কল খুলিতে যাইবে, এমন সময় স্বামী-স্ত্রীর বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। অন্নপূর্ণাই এই কথাবার্ত্তার লক্ষ্যস্থল বুঝিতে পারিয়া হৃষীকেশ উৎকর্ণ হইয়া সব শুনিল; ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে তাড়াতাড়ি মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ফিরিয়া গেল।

বাটির ভিতর প্রবেশ করিবার পথে দুইদিকে দুইটি কক্ষ। দক্ষিণদিকের কক্ষটি বৈঠকখানা, বাম দিকের কক্ষটি হৃষীকেশের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই কক্ষটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আসবাব বেশী-কিছু নয়, দেওয়াল-গাত্রে রামকৃষ্ণদেব, বিজয় গোস্বামী প্রভৃতি মহাত্মাগণের চার-পাঁচখানি ছবি ঝুলান' রহিয়াছে। এক-খানা বড় চৌকির উপর সর্ব্বদা বিছানা পাতা থাকে। চৌকির একদিকে কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া আছে।

হৃষীকেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুইয়া পড়িল। মাতুলানীর তীব্র কথাগুলি একে একে তাহার মনে পূর্ব্বশোকগুলি জাগাইয়া দিয়া তাহার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উদাস নয়নে রাম-কৃষ্ণদেবের প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে কত-কি ভাবিতে লাগিল—চক্ষুর্দ্বয় সজল হইয়া দৃষ্টিশক্তি রোধ করিল।

অন্নপূর্ণা গঙ্গাস্নান করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া ভ্রাতার কক্ষে প্রবেশ করিল। দাদা অসময়ে শুইয়া আছে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল,—"দাদা, তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে?" এই প্রশ্নে হৃষীকেশের চিন্তা বাধাপ্রাপ্ত হইল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিতেই কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ডদেশ বহিয়া পতিত হইল।

সদানন্দ ভ্রাতার চক্ষে জল দেখিয়া অন্নপূর্ণা কিছু বিচলিত হইয়া পড়িল। প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই পুনরায় প্রশ্ন করিল—"কি হয়েছে দাদা? তুমি কাঁদ্‌ছ কেন?"

আত্মসম্বরণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে হৃষীকেশ উত্তরে বলিল—"কাল রাত্রে বাবাকে স্বপ্নে দেখেছি, মনটা সেইজন্য কিছু খারাপ আছে। আজ আমার শরীরও তত ভাল নাই।"

"বাবার কাল পূর্ণ হয়েছিল, তিনি স্বর্গে চলে গেছেন। মন বোঝে না, সেইজন্য আমরা সময় সময় হা-হুতাশ না করে থাকৃতে পারি না; কিন্তু এতে ফল কি? আমরা শোক করে ত আর তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌ব না।" এই জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি অন্নপূর্ণা বলিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার চোখদুটিও অশ্রুপূর্ণ হইল; স্বর্গীয় পিতা-মাতার চরণোদ্দেশে ভ্রাতা-ভগ্নী ক্ষণকাল নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিল।

ভগ্নীর প্রাণে পুরাতন স্মৃতি জাগাইয়া দেওয়া ভাল কায হয় নাই বলিয়া হৃষীকেশ বুঝিল। এই স্মৃতির সহিত যে তাহার হৃদয়ের এক সুতীব্র বেদনা জড়িত আছে, আর সেই বেদনা যে তিল তিল করিয়া তুষানলের ন্যায় দিবানিশি তাহাকে দগ্ধ করিতেছে এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত এইরূপই দগ্ধ করিবে। তজ্জন্যই অন্য কথার অবতারণা করিয়া হৃষীকেশ প্রকারান্তরে ভগ্নীকে বুঝাইয়া দিল যে মাতুলালয়ে আর অধিক দিন থাকা তাহাদের কর্ত্তব্য নয়।

(২)

বিবাহের বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই চিরকালের জন্য স্বামি-সুখে বঞ্চিতা হইয়া অন্নপূর্ণা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। অশ্রুজলের সহিত বড় আদরের কন্যাকে বিধবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্যক্‌রূপে শিক্ষা দেওয়ার কিছু পূর্ব্বেই আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হরকুমার ভট্টা-চার্য্যকে চিত্রগুপ্ত তলব করিলেন। নদীয়া জিলার বড় বড় বৈদ্য-গণের কোন কৈফিয়ৎই যমরাজা গ্রাহ্য করিলেন না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে একমাত্র পুত্র হৃষীকেশের উপর যুবতী কন্যা অন্নপূর্ণার ভারার্পণ করিয়া হরকুমার ভট্টাচার্য্য যমরাজার আদালতে

চলিয়া গেলেন। অনেক পূর্ব্বেই লক্ষ্মীস্বরূপা পত্নী তথায় যাইয়া অপেক্ষা করিতেছে, ইহাই বুঝি ব্রাহ্মণের একমাত্র সান্ত্বনা।

* * * *

মাতুলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও আগ্রহ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ভ্রাতা-ভগ্নী মাতুলালয়ে আগমন করে। কয়েক দিবস পরেই মাতুলের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছয় মাসের পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হয়। মাতুলানী অত্যধিক কুসংস্কারাপন্না। বিধবা অন্নপূর্ণার আগমনই পুত্রের অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ বলিয়া তিনি ধরিয়া লইলেন। পুত্রশোকাতুরা জননী মনের কথা স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর বাদানুবাদ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

(৩)

দুই বৎসর অতীতপ্রায়। হৃষীকেশ ভগ্নীকে লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইংরাজি-শিক্ষিত যুবক প্রায়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে না। চেষ্টা করিয়া স্থানীয় উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের তিনি শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন।

সংসারের সব কাজই অন্নপূর্ণা স্বহস্তে করে; কেবল বাহিরের কাজ করিবার জন্য একজন ভৃত্য আছে। নিজের পূজা-অর্চ্চনা করিতেও কিছু সময় লাগে; অবশিষ্ট সময় ধর্ম্মগ্রন্থাদি-পাঠে অতি-বাহিত হয়।

পিতার নিকট অন্নপূর্ণা সংস্কৃত ব্যাকরণের কতকাংশ এবং দুই-একখানি ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়াছিল। এই জ্ঞানের সাহায্যে সে এখন দুরূহ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মপুস্তকাবলী বেশ বুঝিতে পারে।

দুই-একখানি করিয়া প্রায় সব ধর্ম্মপুস্তকই সে পড়িয়া ফেলিল; কিন্তু জ্ঞান-পিপাসার শান্তি হইল না; কিছুতেই আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে পারিল না; যাহা খুঁজিতেছে, তাহা যেন সে পাইয়াও পাইতেছে না! প্রায় সব শাস্ত্রেরই অনুশাসন, স্তব, কবচ, প্রার্থনা তাহার কাছে অপূর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পশু-পক্ষী ইতর প্রাণীরাও ত আকাঙ্ক্ষা করে! জগৎ-পিতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট জীবও যদি ইতর প্রাণীর ন্যায় ধর্ম্মের নাম করিয়া স্বকীয় সুখান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তবে বিবেকবান্ মনুষ্য হইতে ইতর প্রাণীর পার্থক্য কোথায়? কিছুতেই সে এই সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কেবল 'গীতা'র অমৃতময়ী বাণীই অন্যান্য ধর্ম্মোপদেশ হইতে পৃথক্ এবং নূতন বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া সে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই আত্মতুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণার উপর প্রভাব বিস্তার করিল।

অন্নপূর্ণার মনে হইল, মনুষ্যমাত্রই জগৎপিতা জগদীশ্বরের অংশ। মানবের সেবা করিলেই তাঁহার সেবা করা হয়। আত্ম-সংযম এই সেবাকার্য্যের প্রধান সহায়। ব্রত, উপবাস, নিয়মাদি আমাদিগকে 'আত্মদমন' শিক্ষা দিয়া থাকে।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বে কচিৎ গৃহের বাহির হইত। যখন সে বুঝিল, বিশ্বপ্রেমই প্রকৃত ধর্ম্ম, তখন সে সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতির অনেক বাহিরে গিয়া পড়িল; নীচ জাতিকেও অস্পৃশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাহার মন চাহিল না। "ব্রাহ্মণ, শূদ্র এবং অন্যান্য সকল জাতিই জগৎপিতা জগদীশ্বরের সৃষ্ট; আচার-ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃই সমাজে ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে" এই যুক্তিদ্বারা সে মনকে বশে আনিল এবং ধীরে ধীরে নিজেকে জগৎ-সেবায় উৎসর্গ করিল।

এখন অন্নপূর্ণা প্রায়ই গৃহের বাহির হইয়া রোগীর শুশ্রূষা, শোকীর সান্ত্বনা, সাধ্যানুসারে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে আর্থিক বা অন্যরূপ সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল। হৃষীকেশ ভগ্নীর এই সৎকার্য্যের বিশেষ অনুমোদনও করিল না, কোনরূপ বাধাও দিল না।

এইভাবে কিছুদিন কাটিল এবং ক্রমে ক্রমে অন্নপূর্ণার কার্য্য-স্থলের পরিচয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এইরূপ করায় গ্রামে অন্নপূর্ণার নানারকম কুৎসা রটিল; কিন্তু প্রত্যক্ষে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না।

একদিন পিতৃবন্ধু, জ্ঞাতি কালিদাস স্মৃতিরত্ন হৃষীকেশকে বলিলেন—"হৃষীকেশ, তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু ছিলেন। আমার পরামর্শ না নিয়ে তিনি কখনও কোন কাযে হাত দিতেন না। আমিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করে কখনও কোন কায করেছি বলে মনে হয় না। জ্ঞাতি-সম্পর্কেও তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তোমাদের কার্য্য-কলাপ দেখে-শুনে যদি গ্রামবাসীরা তোমাদের উপর দোষ আরোপ করে, তা হলে আমি মনে বড় ব্যথা পাই। এইজন্যই তোমার ভগ্নী-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বল্‌ব বলে তোমাকে ডাকিয়ে এনেছি।"

হৃষীকেশ বলিল,—"বেশ, বলুন, আমি মনোযোগের সহিত শুন্‌ছি।"

স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"অন্নপূর্ণা ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা; বিধবার আচার-ব্যবহার সম্যক্‌রূপে পালন করাই তাহার কর্ত্তব্য।"

"আপনি কি বল্‌তে চান, অন্নপূর্ণা বিধবার আচার-ব্যবহার মেনে চলে না?"

"ঠিক তা বল্‌তে চাই না; তবে তাহার গতিবিধি সমাজের চোখে ভাল দেখায় না।"

"আপনি আমার পিতৃতুল্য, সমাজের নেতা এবং জ্ঞানবৃদ্ধ। আপনার নিকট জান্‌তে চাই, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে কি রোগীর সেবা, শোকীর সান্ত্বনা, দুঃস্থের দুঃখ-মোচন করার কোন নিষেধ আছে? এই সব কায কি বিধবার আচার-ব্যবহারের বহির্ভূত?"

"হিন্দু-বিধবার আহ্নিক-পূজাদিতেই কালক্ষেপ করা বর্ত্তব্য। ঘরের বাইরে গিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করা শাস্ত্রের বিধি নয়।"

"আর্ত্তের সেবা-শুশ্রূষা করা যে শাস্ত্রের বিধিবিরুদ্ধ, সেই শাস্ত্রের অনুশাসন অমান্য কর্‌লে কোন পাপস্পর্শ কর্‌তে পারে বলে আমার মনে হয় না।"

"দেখ্‌ছি, দুইপাতা ইংরাজী পড়ে, তুমি একেবারে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়ে পড়েছ—কলির শেষের অধিক বিলম্ব নাই। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, অপরিপক্কবুদ্ধি। তোমার সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা নিষ্ফল। তোমরা আমার বিশেষ আত্মীয় বলেই সাবধান করে দিচ্ছি। তোমার ভগ্নী-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বল্‌ছে। অন্নপূর্ণা যদি এইরূপ যার-তার বাড়ী যাতায়াত করে, তা'হলে তোমাদের একঘ'রে হবার সম্ভাবনা। এখনও ফের্‌বার সময় আছে, পরে আমাকে দুষ্‌তে পারবে না। তোমাকে আবার বল্‌ছি, সমাজে থাকৃতে হলে ভগ্নীর গতি-বিধি সংযত কর্‌তে হবে; অন্যথা, সমাজ তোমাদের বোধ হয় গ্রহণ করবে না।"

"আমার বিবেক-বুদ্ধিদ্বারা যে কাযকে ভাল বলে বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আমি কিছুতেই সেই সৎকাযে বাধা দিতে পার্‌ব না; এইজন্য ইচ্ছা হলে সমাজ আমাদের গ্রহণ কর্‌বে, না হয় না কর্‌বে।" একটু উত্তেজিত হইয়াই হৃষীকেশ এই কথাগুলি বলিয়া স্বগৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। দুই-একবার পাদচারণা করিয়া তিনি হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন; ক্ষণকাল পরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"ওঃ! এত গর্ব্ব! এই অহঙ্কার চূর্ণ কর্‌তে আমার একদিনও লাগ্‌বে না। কেবল আমার ভয়ে গ্রামবাসীরা এখনও মুখ ফুটে কোন কথা বল্‌তে পার্‌ছে না। এখন আমার মুখের একটিমাত্র কথা পেলেই সকলে মিলে হৃষীকেশকে একঘরে' কর্‌বে।

(৪)

স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্ররোচনায় গ্রামবাসীরা হৃষীকেশকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন। হৃষীকেশ কিন্তু ইহাতে একটুও দমিল না; বরং পরসেবা-ব্রতে ভগ্নীর সহায় হইল।

পৌষমাস। খুব শীত পড়িয়াছে। শীতবস্ত্রাভাবে গরীব-দুঃখীদের কষ্টের সীমা নাই।

গ্রামের পূর্ব্বদিকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে কৃষকেরা বাস করে। তথায় ৪।৫টি ছোট ছোট জলাশয় আছে; তাহাও শুষ্কপ্রায়, তলদেশে সামান্য-কিছু কর্দ্দমাক্ত জল আছে মাত্র। ইহা দ্বারাই পিপাসাতুর কোনরকমে পিপাসার শান্তি করিয়া থাকে।

নূতন চাল দেখা দিয়াছে। চাষা এবং অনেক মধ্যবিত্তেরা এই নব তণ্ডুলের দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে।

কয়েকমাস পূর্ব্ব হইতেই কৃষকগণ শরতের হিম-রৌদ্র অগ্রাহ্য করিয়া বৎসরের ধান্য-সংগ্রহে মনোযোগী হইয়াছিল। এই "হাড়-ভাঙ্গা" পরিশ্রমে তাহাদের শরীর একরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু বৎসরের শস্য-সংগ্রহ-জনিত আত্মতুষ্টিতে তাহাদের মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত। হায়, এই আত্মসন্তুষ্টি অধিকদিন স্থায়ী হইল না! মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে। একে বিশুদ্ধ পানীয় জলাভাব, তাহাতে আবার নব তণ্ডুলের দ্বারা উদরানলের আহুতি! মানুষের শরীরে আর কত সহ্য হইবে! হঠাৎ ওলাউঠার ন্যায় প্রাণনাশী একপ্রকার রোগ ইহাদের মধ্যে দেখা দিল। রাত্রে আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করিবার দণ্ডদুই পরেই বমন হইতে আরম্ভ হয়; কয়েকবার বমন করিয়াই রোগী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে; গ্রামের লক্ষমারী "হাতুড়ে" বৈদ্য ডাকিবারও সময় থাকে না।

গ্রামের প্রান্তদেশে মহামারী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বালক-বৃদ্ধ-যুবা-নির্ব্বিশেষে প্রায় সকলকেই শমন-সদনে প্রেরণ করিতেছে, শুনিয়া অন্নপূর্ণার হৃদয় অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। কাল-বিলম্ব না করিয়া মূর্ত্তিমতী দয়া অন্নপূর্ণা, মহামারী-প্রপীড়িত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। প্রায় সকল বাড়ীতেই দুই-একটি মৃত-দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরে ঘরে রোগ-যাতনাক্লিষ্ট মৃতপ্রায় দুই-একজন লোক জড়িত কণ্ঠে "জল, জল" বলিয়া মৃদু আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই জীবননাশী মহাব্যাধি, পুত্রশোকাতুরা জননী কি স্বামী-শোকে-পাগলিনীকে শোক করিবার কোনরূপ অবসর না দিয়াই মৃত স্বজনের নিকট লইয়া যাইয়া চিরশান্তি প্রদান করিতেছে। স্বজন-বিরহিত যে দুই-একজন আর্ত্ত এখনও ব্যাধির করাল কবলে পতিত হয় নাই, তাহাদের হাহাকারে গ্রাম মুখরিত হইতেছে!

অন্নপূর্ণা দুইহাতে বক্ষ চাপিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কোন-এক গৃহের খোলা "দাওয়া"য় ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসিয়া রহিল; কি উপায়ে এতগুলি প্রাণীর জীবন রক্ষা করা যায়, সে যেন তখন তাহাই চিন্তা করিতেছিল।

সেইস্থান দিয়া এক বলিষ্ঠ যুবক "হন্ হন্" করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রমণীমূর্ত্তি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। চলৎ-বেগ সংযত করিয়া যুবক ধীরে ধীরে অন্নপূর্ণার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তুমি এইখানে এই অবস্থায় বসে আছ কেন?" যুবক সবডিভিসনের ২য় মুনসেফের আর্দ্দালী। গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া সে কিছুদিনের ছুটি লইয়া পূর্ব্বদিন গ্রামে পৌঁছিয়াছে। তাহার একমাত্র পুত্র রোগাক্রান্ত; তাই চিকিৎসক ডাকিতে যাইতেছিল।

অন্নপূর্ণার চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইল। স্থিরদৃষ্টিতে যুবককে দুই-একবার অবলোকন করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি বোধ হয় এই জায়গারই লোক? তুমি কি বল্‌তে পার, এই গ্রামের আজকাল "মোড়ল" কে?"

যুবক—"নদেরচাঁদ মণ্ডলকেই আমরা সকলে সম্মান করে থাকি। তিনি এখন গ্রামের ভিতর প্রায় সবচেয়ে বয়সে বড় ও বুদ্ধিমান্। লোকও খুব ভাল। তাঁর কথা মেনেই আজকাল আমরা চলে থাকি।

অন্নপূর্ণা—"তার বাড়ী এখান থেকে কতদূর?":

যুবক—"প্রায় একরশি দূরে; ঐ ত দেখা যাচ্ছে! কিন্তু কয়েকদিন পূর্ব্বে তার স্ত্রী আর একটি মেয়ে মারা গেছে। শুন্‌লাম, বুড়োর "অন্ধের নড়ী" যে এক মেয়ে এখনও বেঁচে আছে, তারও নাকি ব্যায়রাম হয়েছে।"

অন্নপূর্ণা—"তুমি কি আমার সঙ্গে নদেরচাঁদ মণ্ডলের বাড়ী যেতে পার?" এই কথা শুনিয়া যুবক কাঁদিয়া ফেলিল; একটু স্থির হইয়া বলিল—"মা, আমার একমাত্র ছেলের এই সর্ব্বনেশে রোগ হয়েছে, তাই আমি কবিরাজ-বাড়ী যাচ্ছিলাম। আমাদের গ্রামের এই শেষদিকেও আপনার সুখ্যাতি শুনেছি; কিন্তু আপনাকে কখনও চোখে দেখি নি। আপনাকে দেখ্‌তেই আমার মন ব'লে দিল—"এই তোদের মা; মা যখন এসে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন, তখন তোদের আর কোন ভয় নাই।"

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অন্নপূর্ণার-মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। আর কোন কথা না বলিয়া, সেস্থান ছাড়িয়া সে নদেরচাঁদ মণ্ডলের গৃহের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, বৃদ্ধ পীড়িত কন্যার শয্যা-পার্শ্বে উপবেশন করিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে এবং মাঝে মাঝে ঝিনুকে করিয়া মৃতপ্রায় কন্যার মুখে এক এক বিন্দু জল দিতেছে।

জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেও, রমণী স্বভাবতই কোমল-প্রকৃতি। রমণীর রমণীত্ব কোথায় যাইবে? বৃদ্ধকে তদবস্থায় দেখিয়া অন্নপূর্ণা বড়ই অধীর হইয়া পড়িল; তাহার মাতৃস্নেহ উথলিয়া উঠিল। অধীর হইলে রোগের কোনই প্রতিকার হইবে না; বরং অপকারই হইবে। অন্নপূর্ণা ইহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া আত্মসংবরণ করিল; পরে বৃদ্ধকে বলিল—"আপনি আমার পিতৃতুল্য"—

অন্নপূর্ণাকে বৃদ্ধ লক্ষ্যই করে নাই। হঠাৎ বীণাবিনিন্দিত স্বর তাহার চমক ভাঙ্গিয়া দিল; অন্নপূর্ণার দিকে একবার তাকা-ইল। এই করুণাময়ী মূর্ত্তি পূর্ব্বে সে আরও কয়েকবার দেখিয়াছে। প্রথমে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; বৃদ্ধ কিছু হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা বৃদ্ধের মানসিক ভাব উপলব্ধি করিয়া পুনরায় বলিল,—"আপনি জ্ঞানী ও বহুদর্শী। আপনাকে উপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিপদের সময় অধীর হলে বিপদ আরও ঘনিয়ে আসে।"

এই স্নেহপূর্ণ কথাগুলি বৃদ্ধকে যেন একটু প্রকৃতিস্থ করিল! অন্নপূর্ণার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিল—"মা, তোমার দয়ার পরিচয় আগেই পেয়েছি। এই সর্ব্বনেশে রোগ যেদিন হতে গ্রামের এই দিকটায় দেখা দিয়েছে, সেইদিন হতে কোন ভদ্রলোকই এদিক মাড়ায় না।"

তাহার প্রশংসাসূচক কিছু বলিবে বলিয়াই বৃদ্ধ এই ভূমিকার অবতারণা করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া অন্নপূর্ণা তাহাকে বাধা দিয়া পুনরায় বলিল—"আপনার কন্যা রোগশয্যায় পড়ে আছে। অনুসন্ধান করে জেনেছি, প্রায় সব বাড়ীতেই দুই-তিনটি রোগী এই অবস্থায়ই পড়ে আছে। রোগের কারণ নির্দ্দেশ কর্‌তে না পার্‌লে রোগ উপশম করা দুরূহ।"

বৃদ্ধ—"মা, আমরা সব চাষালোক। ক্ষেতের ধানের দিকেই আমাদের লক্ষ্য। গত সন ভাল ধান হয় নি; তিন-চার মাস খেতে না খেতেই নিঃশেষ হয়ে গেল। মজুরী করে কোনরকমে কায়ক্লেশে আরও দুই-তিন মাস কেটে গেল। চাষারা জমি-জমা, থালা-ঘটি যা-কিছু ছিল, বন্ধক দিয়ে হাল-গরু, বীজধান কিনে ক্ষেতে নাম্‌ল। আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে এই কয়েকমাস ধরে মাথার ঘাম পায় ফেলে মা লক্ষ্মীকে আমরা ঘরে এনেছি। আমাদের এই দিকটায় যে এবার জল নেই, তা একবার কেউ মনেও আন্‌ল না। আমি কিন্তু ওদের একথা বলেছিলাম। টাকা নেই, বলেই বা কি কর্‌ব! হাড়ভাঙ্গা খাটুনীতে শরীর তেতে ছিল। এই নতুন চাল আর কাদাজল পেটে পড়্‌তে-না-পড়্‌তেই এই সর্ব্বনেশে রোগ দেখা দিল। যারা ক্ষেতে কায করেছিল, তাদের অনেকে আগে গেল। রোগ শেষে গ্রামে ছড়িয়ে পড়্‌ল।"

অন্নপূর্ণা—"জমিদার-বাড়ী কেউ গিয়েছিল?"

বৃদ্ধ কয়েকবিন্দু অশ্রু মুছিয়া উত্তরে বলিল—"মা, সে কথা আর বল্‌বেন না। আমার এই বাড়ীর উত্তর দিকটায় প্রথম যেদিন ৯।১০ জন লোক মারা যায়, আমার ঘরে বুঁচীর মারও (বুঁচী বৃদ্ধের কন্যা) সেই দিন ব্যায়রাম হয়। গ্রামের ৮।১০ জন লোক নিয়ে আমি জমিদার-বাড়ী যাই। জানেনই ত, আমাদের বুড়ো মনিবের গত সন কাল হয়েছে। এখন তার ছেলেই আমাদের মনিব। আমরা তার দেউড়ীতে যেয়ে বরকন্দাজকে দিয়ে খবর পাঠাই। খবর পেয়েই মনিব বাইরে আস্‌লেন। ভাব্‌লাম, আমাদের কথা শুন্‌বেন; কিন্তু বাইরে এসেই মুখখানা লাল করে উচুগলায় চীৎকার করে তিনি বল্‌লেন—'বেটারা, আমার বাড়ী লুট কর্‌তে এসেছিস নাকি? খাজনা-পত্র কিছু দেবে না,—এসেছে ভাল হয়েছে।' এই কথা বলে আমাদের গারদখানায় আটক করে রাখ্‌তে হুকুম দিলেন। আমার সঙ্গীরা কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি হাত জোড় করে বল্‌লাম, 'হুজুর, মনিব প্রজার মা-বাপ। আমরা বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। মড়ক লেগে গ্রাম একরকম লোকশূন্য হতে চলেছে। রোজই ৫।৭ জন আপনার জনকে ফাঁকি দিয়ে চিরকালের জন্য চলে যাচ্ছে; কবিরাজ ডাক্‌বারও তর সইছে না। কে কাকে দেখে, সকলেরই প্রায় এক দশা। আমাদের এই দুঃসময়ে আপনি বিরূপ হলে কোথায় যাব?'

'তোদের মতলব এখন ভালরকম বুঝ্‌তে পেরেছি। তোদের গায় সব মড়কের বীজ লেগে আছে। আমার বাড়ীতে মড়কের বীজ ছড়িয়ে আমাদের মার্‌তে তোরা এসেছিস্।' জমিদার এই কথা বলে রাগে গস্‌গস্ কর্‌তে লাগ্‌ল। তারপর বরকন্দাজকে হুকুম দিয়ে আমাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। আমরা একটু দূরে আস্‌তেই আপনার নাম করে কি ব'ল্‌ল, ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।" বৃদ্ধ একপ্রকার আত্মহারা হইয়া তাহাদের পরদুঃখকাতরা স্নেহময়ী জননীকল্প অন্নপূর্ণার নিকট নিজদুঃখ নিবেদন করিল। ক্ষণকালের জন্য রোগশয্যা-শায়িতা কন্যাকেও বুঝি বৃদ্ধ ভুলিয়া গিয়াছিল! অস্ফুটস্বরে কন্যা কি বলিতেছে, বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি কন্যার নিকট-বর্ত্তী হইল এবং ঝিনুকে করিয়া মুখবিবরে একটু দুধ দিল।

অন্নপূর্ণা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া জমিদার-পুত্রের কথাই ভাবিতেছিল; কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, মানুষ এত নির্ম্মম হইতে পারে।

বৃদ্ধের চক্ষু পুনরায় সজল হইয়া উঠিল; কাতর কণ্ঠে অন্নপূর্ণাকে পুনরায় বলিল—"মা, দেখে-শুনে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি।"

অন্নপূর্ণা—"শরীরমাত্রই ব্যাধির অধীন, এত অধীর হলে চল্‌বে কেন?"

এই কথা বলিয়া অন্নপূর্ণা সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

(৫)

হৃষীকেশের সহিত পরামর্শ করিয়া অন্নপূর্ণা সব্‌ডিভিসন হইতে দুইজন ভাল ডাক্তার আনাইয়াছে। গ্রামের ব্যাধিক্লিষ্ট অংশে বড় বড় দুই-তিনটি কূপ খনন করাইয়াছে। স্থানীয় কৃষকবৃন্দ এই সব কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়াছে।

যথাসময়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভ্রাতার উপদেশ লইয়া অন্নপূর্ণা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। পরসেবা-কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীই অধিকতর পটু, অধিকতর দক্ষ; পরের ব্যথা স্বভাবতঃ কোমলহৃদয়া নারী যেমন বুঝিতে পারে, পুরুষ তেমন পারে না। অন্নপূর্ণা বালবিধবা; মাতৃত্বের সুখে বঞ্চিতা। এই পরসেবাব্রতে সে মাতৃত্বের সুখ আস্বাদন করিতে পারিল—ইহাতেই তাহার নারীত্ব, তাহার মাতৃত্ব সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইল।

তাহার সেবা-শুশ্রূষায়, তাহার মধুর বচনে রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলিল, তাহার সান্ত্বনাবাক্যে শোকাতুরা জননী শোক ভুলিল।

অন্নপূর্ণার ঐকান্তিক সেবা-শুশ্রূষায়, রোগানুরূপ ঔষধ-পথ্যের সুব্যবস্থায় গ্রামখানি কথঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিল। কৃষকবৃন্দ অন্নপূর্ণাকে শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা বলিয়া ঠিক করিয়া লইল। সে এখন আবাল-বৃদ্ধ সকলেরই—"মা"। কৃষকেরা সকলেই এখন তাহার বাধ্য; প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য তাহারা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নয়।

মানুষ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানান্ধ; মুহূর্ত্তপরে কি ঘটিবে, কে বলিতে পারে? চাষাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা একদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে গৃহে ফিরিতেছিল। এখান হইতে প্রায়

অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে হৃষীকেশের গৃহ অবস্থিত। মাঠের মধ্য দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নাতিপ্রশস্ত সরকারী রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয়। এই পথের উভয় পার্শ্বেই অনেক বড় বড় বৃক্ষ আছে। আরও অনেকদিন রাত্রিকালে হৃষীকেশের সহিত অন্নপূর্ণা এই রাস্তা দিয়াই গৃহে ফিরিয়াছে। হৃষীকেশ আজ আসিতে পারে নাই; তাই দুইজন লোক তাহার সহিত চলিল। অন্নপূর্ণার একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল। ভ্রাতার অনুপস্থিতিই কি এই ভীতির কারণ? মাঠ অতিক্রম করিয়া রাস্তায় উঠিলে অন্নপূর্ণা বারবার অনুরোধ করিয়া সঙ্গিদ্বয়কে বিদায় দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উহারা ফিরিল।

পঞ্চমীর চাঁদের আলোকে অন্নপূর্ণা অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদূর যাইতে-না-যাইতেই কোন বৃক্ষান্তরাল হইতে ৪।৫ জন লোক বাহির হইয়া আসিয়া, অন্নপূর্ণার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—"সুন্দরি, এস, আমরা তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

পথে হঠাৎ সর্প দেখিলে লোক যেমন পশ্চাৎপদ হয়, অন্নপূর্ণাও সেইরূপ তাড়াতাড়ি কয়েকপদ পশ্চাতে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আগন্তুকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ইহাদের সকলেই ভদ্রবেশধারী। একজন তাহারই প্রতিবেশী,—পূর্ব্ববর্ণিত জমিদার-পুত্র,যোগেশবাবু। যোগেশবাবুকে অন্নপূর্ণা চিনিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"যোগেশবাবু আপনাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকি; এ সব আপনার কি কায বলুন দেখি?"

যোগেশ—"এ আর কিছু নয়। তবে হৃষে আজ আস্‌তে পারে নি জেনে আমরা তোমাকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দিতে এসেছি; আমাদের সঙ্গে এস।"

যোগেশের এই বিদ্রূপ অন্নপূর্ণা বুঝিতে পারিল। এই ইতর লোকগুলার সহিত আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া অন্নপূর্ণা দ্রুতপদে পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হইয়া রাস্তার প্রায় প্রান্তদেশে আসিয়া পড়িল। এইস্থান হইতে মাঠের অপর সীমা পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়।

অনুচরবর্গের সহিত যোগেশ ক্ষণকাল কি পরামর্শ করিল; পরে অন্নপূর্ণার পিছনে পিছনে ছুটিল। পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়া অন্নপূর্ণা স্থির হইয়া দাঁড়াইল এবং সুবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, তাহার সঙ্গিদ্বয় অধিকদূর যায় নাই।

সানুচর যোগেশ ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণার নিকটবর্ত্তী হইল এবং দানবোচিত অট্টহাস্যে দিগন্ত মুখরিত করিয়া বলিল,—"কোথায় পালাবে? সুন্দরি! এখন তুমি আমাদের সম্পূর্ণ হাতের ভিতর। আমাদের কথা শোন ভালই; না শুন্‌লে আমরা জোর করে শোনাতে বাধ্য হব। এখন বিনা আপত্তিতে আমাদের সঙ্গে এলেই আমরা খুব খুসী হব।" এই বলিয়া যোগেশ অন্নপূর্ণার হাত ধরিতে অগ্রসর হইল।

অন্নপূর্ণার চক্ষু দিয়া ক্রোধে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল! যোগেশ আরও অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ক্রোধে কম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল—"পিশাচ, আর এক পা এগোলেই তোর সর্ব্বনাশ হবে। ভেবেছিস্ আমি নিঃসহায়। ভগবান্ অবলার মান সব সময়েই রক্ষে করেন। কুলাঙ্গার, আমি তোর ছোট বোনের মত; তুই—"

অন্নপূর্ণার লগুড়হস্ত সঙ্গিদ্বয় অধিকদূর যায় নাই। অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর ইহাদের সুপরিচিত; কিন্তু "মা"য়ের এপ্রকার ভীতিজনক স্বর পূর্ব্বে তাহারা আর শোনে নাই। পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র তারা তাদের "মা"কে চিনিল; "মা" বিপদাপন্ন বলিয়া বুঝিল। একজন গ্রামের দিকে ছুটিল; অন্যব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া অন্নপূর্ণার সমীপে উপস্থিত হইল। অবলা নারীর প্রতি মনিব-পুত্রের দৌরাত্ম্যের কথা পূর্ব্বেই সে শুনিয়াছিল। এখন উপগ্রহবর্গসহ যোগেশকে দেখিয়া তাহার মাথার ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। এই "ছোটলোক"টা তাদের কার্য্যে বাধা দিতে আসিয়াছে দেখিয়া যোগেশ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং বলপ্রয়োগ ভিন্ন কার্য্যসিদ্ধির উপায়ান্তর নাই বুঝিতে পারিয়া "ছোটলোক"টাকে সজোরে পদাঘাত করিল। কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল বলিয়া নসীরাম সামান্য একটু ব্যথা পাইল; কিন্তু অন্যমনস্ক থাকায় ভূমিতে পড়িয়া গেল। তৎপরে ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া যোগেশ যেই অন্নপূর্ণাকে ধরিতে গেল, অমনই অন্নপূর্ণা এক পদাঘাতে তাহাকে ভূতলশায়ী করিল।

নসীরাম উঠিয়াই হুঙ্কার করিয়া, লগুড়খানা মস্তকোপরি দুই-একবার ঘুরাইয়া, যোগেশকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া অন্নপূর্ণা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"চল, আমরা গ্রামে ফিরে যাই।"

যোগেশের পার্শ্বচরবর্গ অদূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কোনরূপ সহায়তা করিতে সাহস পাইতেছিল না। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যষ্টিহস্তে অনেক লোক এই দিকেই আসিতেছে দেখিতে পাইয়া একজন ভিন্ন সকলেই "যঃ পলায়তি স জীবতি" ঋষি-বচনের সার্থকতা দেখাইল।

পথিমধ্যে অন্নপূর্ণা দুষ্টলোককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়া গ্রামের কৃষকদল যে যেরূপ পারিল, হাতিয়ার সংগ্রহ করিয়া ঘটনাস্থলের দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইয়া অনতিবিলম্বে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পার্শ্বচরবর্গ ছুটিয়া গিয়া জমিদার-বাড়ী পৌঁছিল এবং সিপাই-শাস্ত্রী,দ্বারবান-বরকন্দাজ প্রভৃতি সকলকেই বুঝাইয়া দিল—তাহারা যোগেশকে লইয়া সরকারী রাস্তায় বেড়াইতেছিল, কতকগুলি দুষ্ট লোক—সবাই যোগেশের প্রজা—পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করে; কিন্তু অবশেষে একব্যক্তির লগুড়াঘাতে যোগেশকে ভূতলশায়ী হইতে হইয়াছে। তাই তাহারা সংবাদ দিতে আসিয়াছে।

কালবিলম্ব না করিয়া নায়েবের নেতৃত্বে দ্বারবান-বরকন্দাজ প্রভৃতি সকলেই বড় বড় তৈলপক্ক লাঠি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া "কুরুক্ষেত্রে"র অবতারণা করিল।

পদাঘাতে যোগেশ ভূতলে পড়িয়া মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। অদূরস্থিত বটবৃক্ষতলে যোগেশকে আনিয়া "বন্ধুপ্রবর" বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা তাহার মস্তকে ব্যজন করিতে থাকে। লোকজনসহ নায়েব মহাশয়ের আগমনের পূর্ব্বেই যোগেশের জ্ঞানসঞ্চার হয়। নায়েব ঘটনাস্থলে আসিয়াই কয়েকজন লোকদ্বারা যোগেশকে গৃহে পাঠাইলেন।

তাহাদের "মা"কে রক্ষা করিতেই চাষারা প্রথমে প্রাণপণে চেষ্টা করিল; কিন্তু শিক্ষিত হস্তের লাঠির সহিত অধিকক্ষণ পারিয়া উঠিল না। অশ্রুসিক্তনয়নে অন্নপূর্ণা দুই পক্ষকেই বিরত করিতে অনেকবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এই "রণ"-কোলাহল তাহার

ক্ষীণস্বরকে "ডুবাইয়া" দিল; দুই-একজন চাষা ব্যতীত কেহই তাহা শুনিতে পাইল না।

দৃঢ়শরীর ৭।৮ জন চাষা অন্নপূর্ণার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াছিল। কোনক্রমে ইহাদের বেষ্টনীর বাহিরে আসিয়া,যে স্থানে দুইদলে ঘোরতর লাঠালাঠি হইতেছিল, অন্নপূর্ণা সেইস্থানে গিয়া পড়িল। কৃষকবৃন্দ "হায়, হায়" করিয়া উঠিল: মুহূর্ত্তকাল পরেই লাঠি ঘুরাইয়া তাহারা অন্নপূর্ণার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। হস্তদ্বয় উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া অন্নপূর্ণা উহাদিগকে বিরত হইতে ইঙ্গিত করিল। সাপের মাথায় যেন "ধুলো-পড়া" পড়িল; লাঠির অগ্রভাগ মাটিতে রাখিয়া যে যেস্থানে ছিল, সে সেইস্থানেই চিত্রপুত্তলীর ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই অবসরে জমিদারের লোকেরা লাঠি চালাইয়া চাষাদিগের অধিকাংশকেই জখম করিল; অবশিষ্ট ১০।১২ জনকে "পাকড়া" করিল। জমিদার-পক্ষের কেহই অন্নপূর্ণার কোন কথাই গ্রাহ্য করিল না।

"রণজয়" করিয়া "বন্দী"গণসহ নায়েব মহাশয় জমিদার-গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। অর্দ্ধপথে হৃষীকেশকে আসিতে দেখিয়া, জনৈক পার্শ্বচরের বিশেষ অনুরোধে তাহাকেও বন্দিশ্রেণীভুক্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

জগৎ অর্থের বশ। অর্থ সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিতে পারে। পরদিবস স্থানীয় দারোগা রিপোর্ট করিয়া পুলিশ-সাহেবকে জানাইল—"যোগেশচন্দ্র রায়—গ্রামের বড় জমিদার। জমিদারী ভিন্ন মহাজনীতেও ইঁহার বাৎসরিক আয় প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। এই গ্রামের হৃষীকেশ নামক কোন যুবক, তাহার ভগ্নীদ্বারা জমিদার-গৃহের ধন-রত্নের সন্ধান লইয়া বিগত রাত্রে ৩০।৪০ জন চাষার সহিত ধন-রত্নাদি লুঠ করিবার জন্য সদর দ্বার ভগ্ন করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে যায়। জমিদার-বাড়ীর দ্বারবান-বরকন্দাজ প্রভৃতি বাধা দিতে যাইয়া অল্পাধিক পরিমাণে আহত হইয়াছে। যোগেশবাবু শয়ন-গৃহ হইতে বাহিরে আসিতেই হৃষীকেশের হুকুমে একব্যক্তি তাঁহার মস্তকদেশে লগুড়ের দ্বারা ভীষণ আঘাত করে; কিন্তু দ্বারদেশে যষ্টি ঠেকিয়া যাওয়াতে, হৃষীকেশ স্বয়ং পদাঘাতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে। মস্তকের উপরে গুরুতর আঘাত লাগাতে যোগেশবাবুর সংজ্ঞালোপ হয়। সোরগোল শুনিয়া গ্রামের সব ভদ্রলোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জমিদার-বাড়ীর লোক-জনের সহায়তায় ১৫।১৬ জন ডাকাত ধরিয়া আমাকে সংবাদ দেন। আমি তদন্তে ঘটনা সত্য জানিয়া হুজুরের নিকট এই রিপোর্ট করিলাম। আসামিগণকে অদ্যই মহকুমায় চালান দিতেছি।"

সেসন আদালতের বিচারে হৃষীকেশ এবং অন্যান্য আসামীদিগের প্রত্যেকের ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল। অন্নপূর্ণার বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া গেল না; অতএব সে বেকসুর খালাস পাইল।

(৬)

হৃষীকেশ এবং চাষাদের অনেকে বিনা দোষে তাহার জন্যই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে অন্নপূর্ণা দিনকতক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল; তিন-চারি দিবস গৃহের বাহির হইল না। এই আকস্মিক বিপৎপাতে কৃষকবৃন্দেরও মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাহার উপর জমিদারের উৎপীড়নে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কয়েকদিনের মধ্যেই অন্নপূর্ণা চিত্তস্থির করিয়া কারাগারে-নিক্ষিপ্ত হতভাগ্য কৃষকদের পরিবারবর্গের বিষয় চিন্তা করিল; তাহাদের গ্রামে গিয়া প্রিয়জন-বিশ্লিষ্ট পরিজন-বর্গকে স্নেহবচনে সান্ত্বনা-প্রদান করিল।

জমিদারের অত্যাচারে চাষারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া অন্নপূর্ণা তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিল—"সকলই জগৎপিতা জগদীশ্বরের অংশ; কেহ কাহারও শত্রু নয়; জন্মজন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্যই আসা যাওয়া; অত্যাচারীকে জগৎপিতাই সুমতিপ্রদান করিবেন; আমাদের কিছুই করিতে হইবে না।"

অন্নপূর্ণাকে কৃষকেরা মাতার অধিক ভক্তি করে, তাহার কথা শুনিবে না কেন? অন্নপূর্ণার উপদেশে তাহারা শান্তভাব ধারণ করিল।

বৈজ্ঞানিকদের মতে প্রাকৃতিক জগতে কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্ভব নয়; কিন্তু অনেক সময় কারণ-নির্দ্ধারণে সর্ব্বপ্রধান বৈজ্ঞানিকের শাস্ত্রজ্ঞানও হার মানিয়া যায়; ভগবানের গূঢ় রহস্য মানব-শক্তি ভেদ করিতে পারে না। গ্রামের যে অংশে ভদ্রমণ্ডলী বাস করেন, সেই অংশে হঠাৎ একপ্রকার মড়ক দেখা দিল। কয়েকমাস পূর্ব্বে যে রোগ কৃষক-পল্লীকে জনশূন্য করিয়াছে সেই জীবননাশী ব্যাধিরই পুনরভিনয় আরম্ভ হইল। যোগেশের জ্ঞানকৃত পাপের জন্যই যেন রোগ ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিল; একবার যাহাকে আক্রমণ করে, দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেই তাহাকে পরজগতে লইয়া যায়। ১০।১২ দিনের মধ্যে গ্রামখানি শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। জিলা হইতে সিবিল সার্জ্জন আসিলেন; কিন্তু রোগের বিশেষ কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন—"কৃষক-পল্লীর রোগ-বীজ বায়ু-প্রবাহে গ্রামের এই অংশে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহাই মড়কের একমাত্র কারণ বলিয়া বোধ হয়।"

প্রথম কয়েকদিন সামাজিক লোকের বাড়ী যাইতে অন্নপূর্ণা একটু দ্বিধা বোধ করিল; কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, স্বজন-বিরহিত আর্ত্তজনের ক্রন্দনধ্বনি গ্রামখানিকে ততই মুখরিত করিয়া তুলিল। অন্নপূর্ণার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; সে আর স্থির থাকিতে পারিল না; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পর-সেবায় আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া গেল।

যোগেশবাবু যেদিন অন্নপূর্ণাকে স্বহস্তে তাঁহারই ব্যাধিক্লিষ্ট দ্বারবান ও চাকরের মল-মূত্র পরিষ্কার করিতে এবং স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সেবা-শুশ্রূষা করিতে দেখিলেন, সেদিন হইতেই তাঁহার পশুভাব তিরোহিত হইল; দৈবশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই যেন অন্নপূর্ণার পায়ে ধরিয়া পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন! পশু দেবতা হইল।

সেবারতা অন্নপূর্ণার কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া কালিদাস স্মৃতি-রত্নের ধারণা উল্টাইয়া গেল; সেবাই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল। শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে পরসেবায় যিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিতে একটুও কুণ্ঠিত নন, তিনি দেবী—মানবী নন। এই ধারণাই তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

প্রশ্রয়

কোন একদিন যবে মধুর লগনে,
গায়িবে প্রভাতী গান পিক তরুশিরে ;
অথবা হাসিবে চাঁদ সুনীল গগনে,
ফুটিবে কুসুমপুঞ্জ তটিনীর তীরে।

তখন হে প্রিয়তম ! ধীরে ধীরে আসি,
আনমনা আধভোলা পরাণেতে মোর,
মুক্ত-দ্বার দিয়া সখা চুপি চুপি পশি—
চুরি করে নিও সব হে হৃদয়-চোর !

তারপর যবে আমি ধরিব তোমায়,
বাঁধিব বাহুর পাশে মধুর আবেশে ;
কোনরূপ বাধা সখা দিওনা আমায়,
হৃদয়ের কারাগারে ধরা দিও এসে।

নহে দণ্ড, মাস কিম্বা বরষের তরে ;
চিরদিন রবে বন্ধ হে হৃদয়-চোর !
অনন্ত কালের তরে যুগ যুগ ধরে—
রহিবে আবদ্ধ হয়ে হৃদয়েতে মোর।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

গুলিস্তানের গল্প

একত্রিংশ গল্প

কোন রাজা একজন নিরপরাধ লোকের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দেওয়াতে সে বলিল,—"ক্রোধের বশীভূত হইয়া একার্য্য করিলে শেষে আপনার অনিষ্ট হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কিরূপ ?" সে ব্যক্তি বলিল, "এই দণ্ডের কষ্ট আমি এক মুহূর্ত্তমাত্র অনুভব করিব ; কিন্তু এই পাপের জন্য আপনাকে চিরকাল ভুগিতে হইবে।

সুতপ্ত মরুতে যথা শীতল পবন,
সেই মত ক্ষণস্থায়ী মনুষ্য-জীবন।
পৃথিবীর সুখ, দুখ, মান, অপমান,
ক্ষণেকে ফুরায়, দশা—সবার সমান।
পরদ্রোহী মনে করে পীড়া দেয় মোরে,
কিন্তু ফাঁসি তার গলে লাগে চিরতরে।"

এই কথায় রাজার চৈতন্য হইল ; সেই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইতে বিরত হইয়া তাহার নিকট রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

দ্বাত্রিংশ গল্প

নুসিরাণের মন্ত্রিগণ কোন গুরুতর রাজকার্য্য লইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনা-অনুসারে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন ; রাজাও নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বুজরজ্‌মির নামক একজন মন্ত্রী রাজার মত অনুমোদন করিলেন। অপরাপর মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত বিজ্ঞ লোক থাকিতে আপনি কেন রাজার মত শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন ?" তিনি বলিলেন,—"আমি ভাবিলাম, এ বিষয় শেষে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ভাল-মন্দ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ; সুতরাং রাজার মতের পোষকতা করাই ভাল ; কারণ যদিও ভবিষ্যতে বিপরীত ঘটে, তথাপি আমি রাজার পক্ষে ছিলাম বলিয়া তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। পণ্ডিতেরা বলেন ঃ—

রাজার বিরুদ্ধে মত করিলে পোষণ,
নিজরক্তে নিজহস্ত করিবে ক্ষালন।
দিনকে রজনী যদি নরপতি কয়,
বলিবে যথার্থ প্রভো ! দেখ চন্দ্রোদয়।

ত্রয়স্ত্রিংশ গল্প

হিজাজ হইতে প্রত্যাগত যাত্রিগণের সহিত একজন লোক জটা নাড়িতে নাড়িতে নগরে প্রবেশ করিল। সে বলিল,—"আমি আলির বংশজাত ও মক্কা হইতে আসিতেছি।" নিজের রচিত বলিয়া সে রাজাকে একটী কবিতা উপহার দিল। সভাসদের মধ্যে একজন বলিলেন,—"আমি ইহাকে ইদের সময়ে বস্রায় দেখিয়াছি, এ কেমন করিয়া হাজি হইবে ?" আর একজন বলিলেন,—"আমি ইহাকে চিনিতে পারিয়াছি, ইহার বাপ একজন আরমাণি দেশীয় খৃষ্টান, এ কেমন করিয়া আলির বংশে জন্মাইতে পারে ?" শেষে যে কবিতা রাজাকে উপহার দিয়াছিল, সেটী আরবদেশীয় একজন বিখ্যাত কবির কৃত বলিয়া স্থির হইল। রাজা তাহাকে প্রহারপূর্ব্বক দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আদেশ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কেমন করিয়া এত মিথ্যা কথা বলিল ? সে বলিল,—"মহারাজ ! আমি আর একটী কথা বলিব, যদি সেটী সত্য না হয়, আমাকে আপনার যেমন ইচ্ছা, সেইরূপ দণ্ড দিবেন।" রাজা বলিলেন,—"কি কথা, বল।" সে বলিল ঃ—

"দরিদ্র যে দধি বেচে পেটের জ্বালায়,
জান প্রভু ! কত জল সে তা'তে মিশায়।
ভ্রমণকারীর কথা কে বিশ্বাস করে,
মিথ্যা যদি বলে থাকি, ক্ষমহ পামরে।"

রাজা শুনিয়া হাসিলেন ও বলিলেন,—"তোমার জীবনে এরূপ সত্যকথা আর কখন বল নাই।" অতঃপর তাহাকে তাহার আশানুরূপ পুরস্কার দিতে আদেশ করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ গল্প

এক রাজার মন্ত্রী অধীন কর্ম্মচারীদিগের প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রকাশ করিতেন ও যাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয়, সেই চেষ্টা করিতেন। দৈবযোগে তিনি রাজার বিরাগভাজন হইলেন।

সকল কর্ম্মচারী তাঁহার কারামোচনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, প্রহরীরা তাঁহার দণ্ডভোগ যত কম হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিল ও দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁহার গুণের কথা চারিদিকে এত রাষ্ট্র করিল যে, রাজা শেষে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া একজন সাধু বলিলেন ঃ—

"মঙ্গল কামনা করে যাহারা তোমার,
যতনে তাদের দিবে আশ্রয়, আহার ;
বিক্রয় করিতে হয় পৈতৃক বিষয়,
সেও ভাল, যদি পাও বন্ধুর প্রণয়।
শত্রুরও প্রতি সদা হইবে সদয়,
কুকুর আহার পেলে চুপ করে রয়।"

পঞ্চত্রিংশ গল্প

হারাণ-উর-রসিদের এক পুত্র একদিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বলিল,—"অমুক সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র আমার মাতাকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে গালি দিয়াছে।" হারাণ অমাত্যবর্গকে কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করিলে, কেহ বলিল, "তাহার প্রাণদণ্ড করুন", কেহ বলিল, "তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলুন," আবার কেহ বলিল, "তাহার সর্ব্বস্ব লইয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিন।" হারাণ বলিলেন, "বৎস ! যদি তুমি অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পার, তাহা সর্ব্বোত্তম ; যদি তোমার সে ক্ষমতা না থাকে, তুমিও তাহার মাতাকে গালি দিতে পার ; কিন্তু সাবধান, প্রতিশোধের সীমার অতিক্রম না হয়, তাহা হইলে তোমার অনিষ্ট হইবে ও লোকে তোমারই দোষ দিবে।

সমরে যে মত্ত করী করে পরাজয়,
বীর বলি বিজ্ঞ লোকে তারে নাহি কয় ;
সেই বীর, যেই করে ক্রোধ সম্বরণ,
রাগের মাথায় নাহি বলে কুবচন।

গালি খেয়ে একজন শান্তভাবে কয়,
'মঙ্গল হউক তব শুন মহাশয় !
সব দোষ মম তুমি নহ অবগত,
দিলেও অধিক গালি হইত সঙ্গত।' "

ষট্‌ত্রিংশ গল্প।

একদিন আমি কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত নৌকারোহণ করিয়া যাইতেছিলাম। আমাদের অগ্রে আর একখানি ছোট নৌকা যাইতেছিল। দৈবযোগে সেই নৌকাখানি আবর্ত্তে পড়িয়া জলমগ্ন হইল। তাহাতে দুই ভ্রাতা ছিল। আমাদের একজন সঙ্গী সেই নৌকার মাঝিকে ডাকিয়া বলিল,—"যদি তুমি এই দুই জনকে বাঁচাইতে পার, তোমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দিব।" মাঝি একজনকে বাঁচাইল, আর একজন প্রাণ হারাইল। আমি বলিলাম,—"ইহার নিয়তি উপস্থিত হইয়াছিল ; সেজন্য তুমি উহাকে ধরিতে পারিলে না।" মাঝি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—"আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই সত্য ; তথাপি আমি এই ব্যক্তিকে অন্তরের ইচ্ছার সহিত বাঁচাইয়াছি ; কারণ, এ আমাকে এক সময়ে মরুভূমিতে পথশ্রান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া নিজের উষ্ট্রের উপর তুলিয়া লইয়াছিল ; অপর ব্যক্তি আমাকে একদা বিনা অপরাধে কশাঘাত করিয়াছিল।" আমি বলিলাম ঃ—ঈশ্বর সত্যই বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরের মঙ্গল করে, শেষে তাহার মঙ্গল হয়, যে অনিষ্ট করে তাহার অনিষ্টই হয়।"

কত জ্বালা, কত কাঁটা আছে এ সংসারে,
তাহার উপরে ব্যথা, দিও না কাহারে ;
পরের অভাব কর নিয়ত মোচন,
তোমার সাহায্য তারা করিবে কখন।

সপ্তত্রিংশ গল্প

দুই ভ্রাতার মধ্যে একজন সুলতানের অধীনে কর্ম্ম করিত, আর একজন কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। একদিন ধনী ভ্রাতা দরিদ্র ভ্রাতাকে বলিল ঃ—"তুমি কেন রাজার চাকুরি স্বীকার কর না ; তাহা হইলে আর তোমাকে এত কষ্ট করিতে হইবে না।" সে বলিল ঃ—"তুমি কেন খাটিয়া খাও না ; তাহা হইলে তোমাকে দাসত্ব করিতে হইবে না। পণ্ডিতেরা বলেন, 'সোণার কোমরবন্ধ বাঁধিয়া প্রভুর আজ্ঞার আশায় দণ্ডায়মান থাকা অপেক্ষা সামান্য চাপাটি খাইয়া ভূমিতে উপবেশন করা ভাল।

কুলি, মজুরের কাজ করো দুই হাতে,
করজোড়ে নাহি থেক ধনীর সেবাতে।

কি খাইব গ্রীষ্মে আর কি পরিব শীতে,
অমূল্য জনম গেল, তাহাই ভাবিতে ;
এক মুষ্টি অন্নে তুষ্ট হও দগ্ধোদর,
নত করিও না পৃষ্ঠ দাসত্বে তোমার।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী।

তিলোত্তমা

এই বিশ্বের সব পরিজন
তোমারে করিতে পরম আপন
মনের মতন গড়িল—
তোমায়—নিভৃত অন্তরে।
হৃদয়ের রস রক্তে গড়িয়া,
গুণ্যে অন্নে মানুষ করিয়া
প্রাণের স্পন্দ দিল গো—
—তোমায়—জীবন-মন্তরে।
বারিদ দিল গো আপন বর্ণ,
ভূতল দিল গো নূপুর বর্ণ,
ভূষিল ভূধর আদরে—
—তোমায়—বিশদ-চন্দনে।

অধর রচিল বিম্ব-লতিকা,
দশন রচিল কুন্দ-যূথিকা,
ভূষিল কানন, বাঁধিয়া—
—তোমায়—মালিকা-বন্ধনে।
কণ্ঠ তোমার গড়িল শঙ্খ
ললিত বংশী-বাদন-বঙ্ক,
দিল শিখীচূড়া পাখীরা—
—তোমায়—বিপুল গৌরবে।
সরসী-পদ্মে বিরচিল আঁখি,
কুঞ্জ রচিল গুঞ্জার রাখী,
দিল মৃগমদ মৃগীরা—
—তোমায়—মাতায়ে সৌরভে।
সিন্ধু আপন প্রাণের যত্নে
এনে দিল নিজ শ্রেষ্ঠ রত্নে,
দিল দোলাইয়া, ভূষিল—
—তোমার—শ্রবণ-কুণ্ডলে।
তপন তাহার কিরণ-নিকরে
বন্দী করিয়া রেখেছে নখরে,
বিধু সুধা-ভাতি গড়িল—
—তোমার—বদনমণ্ডলে।
কোকনদ তার পদ হয়ে রাজে,
অলিকুল পশে মঞ্জীর-মাঝে,
ঘেরিয়া ঘেরিয়া চরণ—
—তোমার—সতত গুঞ্জরে।
শ্যাম ধরা তার মধুময় হিয়া
দেছে তার করে বাঁশরী করিয়া,
রচিল যমুনা চিকুর—
—তোমার—লহরীপুঞ্জরে।
সব কোমলতা সব মধুরিমা,
সব রুচিরতা অখিল-গরিমা,
নিখিল তাহার বিতরি—
তোমায়—সকল সম্পদে।
হৃদয়-বৃন্তে অশেষ যতন
ফুটায়ে তুলিল ফুলের মতন,
চির-উজ্জ্বল রাখিল—
তোমায়—প্রাণের সংসদে।
বিশ্ব অতীত বিশ্বের হলে'
দ্যুলোকে-ভূলোকে অনন্ত দোলে
চিরযোগে তনু দুলিল—
—তোমার—প্রেমের নন্দনে।
রূপে রসে এলে ভাবময় ছিলে,
গোলক-দেবতা গোকুলে নামিলে,
হল বন্দনা মগ্ন—
—তোমার—বদন-চুম্বনে।

সমালোচনা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্য-সংহিতা"য় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে "উদ্ভট-সাগর" মহাশয় সমালোচনা-সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সমালোচনা নামক কোন বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না; ইহার উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতাই অধিক। এ কথাটা নূতন নয়, য়ুরোপীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে ঠিক এই ভাবের কথা বহু প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। লর্ড বেকন সমালোচনা সম্বন্ধে তীব্র মতামত প্রচার করিয়াছেন। সেদিন রালে-কর্ত্তৃক মিলটনের জীবনী পাঠ করিতেছিলাম; দেখিলাম, ভূমিকায় তিনি সমালোচনা-বিদ্বেষী সমালোচকগণের উদ্দেশে যে দু-চারিটি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার যুক্তির অসারতা দেখাইতে পারেন নাই; বরং অনেকটা compromise করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। Oscar wilde সমালোচনা-সম্বন্ধে Evnestএর মুখ দিয়া এই জাতীয় ব্যক্তিগণের চরম মতামত প্রচার করিয়াছেন; Evnest বলিয়াছেন, অন্যের গ্রন্থের সমালোচনা করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই; ইহার কোন প্রয়োজনীয়তাও দেখা যায় না। তাঁহার উক্তির একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

"Why should the artist be troubled by the shrill clamour of Criticism? Why should those who cannot create, take upon themselves to estimate the value of creative work? What can they know about it? If a man's work is easy to understand, an explanation is uu-necessary". * * "In the best days of art there were no art-critics."

এই ত গেল সমালোচনার উপকারিতা লইয়া মতভেদ। ইহার পর সমালোচনা কি ও তাহা কিরূপে লিখিত হওয়া উচিত এবং প্রকৃত সমালোচকই বা কে, এই সব প্রসঙ্গে বিস্তর মনান্তর ও মতান্তরের সম্ভাবনা। সমালোচনার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া ম্যাথু আর্ণল্ড্ বলিয়াছেন, "To see a thing as it is"—গ্রন্থকারের ভাব, উদ্দেশ্য যথাযথরূপে বর্ণনা করার নামই সমালোচনা। গ্রন্থকারের শক্তি প্রভৃতির আলোচনা না করিয়া, তাঁহার দোষ বাহির করা মাত্রকে এই জাতীয় লেখকগণ সমালোচনা নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছুক নন; ইহা গালাগালি ও দলাদলির নামান্তর মাত্র; কিন্তু ইহা একেবারে স্তাবকতাও নহে। মানব-প্রকৃতি ও সামাজিক গতি ও সভ্যতার আদর্শের সহিত মিলাইয়া গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাকেই ইঁহারা সমালোচনা নাম দিয়া থাকেন। জন মর্লি এই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "To set people thinking" গ্রন্থের উদ্দেশ্য সরল করিয়া মানবজাতিকে মনুষ্য-জীবনের রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার নামই সমালোচনা। ফ্রেডারিক হ্যারিসন, তাঁহার একখানি গ্রন্থে এই কথাগুলি অবিকল তুলিয়াছেন; সুতরাং তিনিও এই মতের পক্ষপাতী, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে আরও অনেক মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু অনর্থক quotationএ প্রবন্ধ কণ্টকিত করিয়া কোন লাভ নাই।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখিতে চাই, সাহিত্যের পুষ্টির জন্য সমালোচনার কোন প্রয়োজন আছে কি না।

য়ুরোপীয় সাহিত্য ও গ্রীক্ সাহিত্য আলোচনা করিলে, স্বীকার করিতেই হইবে যে, সমালোচনাদ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তাহার কোন নিদর্শন এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে সমালোচনামূলক কোন সাহিত্য বর্ত্তমান আকারে অনুশীলিত হইলে, আজ কোন-না-কোন সূত্রে তাহা আমাদের হস্তগত হইত, এ-কথাও অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু তথাপি একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই যে, কোন উচ্চজাতীয় সাহিত্য সমালোচনার কষ্টি-পাথরে কষিত না হইয়া আদৃত হইতে পারে—তাহার পরিপুষ্টি ত দূরের কথা। এই কথা আলোচনা করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। এইবার সেই কথারই আলোচনা করা যাউক।

'সমালোচনা' সংজ্ঞা যিনিই যেভাবে নির্দ্ধারণ করুন না কেন, ইহার উদ্দেশ্য লইয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রচলিত সাহিত্যের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহার গন্তব্য নিরূপণ করিবার নামই সমালোচনা। ইংরাজিতে criticism বলিতেও ইহার অধিক আর কিছুই বুঝায় না। সাহিত্য ও শিল্পের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার চরম পরিণতি তখনই সম্ভব, যখন শিল্পী ও সাহিত্যিকগণে criticising faculty সম্পূর্ণরূপে বিকসিত। ভারতীয় সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতবাসীর এই বৃত্তি কিরূপে অনুশীলিত হইয়াছিল। তাহাদিগের এই বৃত্তির চরম উৎকর্ষের নিদর্শন ব্যাকরণ ও অলঙ্কার। কোন্ ভাবে কোন্ কথাটি বসাইলে, তাহা একেবারে মানব-মনে আঘাত করিতে পারে, এই বিষয় লইয়া তাঁহারা যথেষ্ট Critical আলোচনার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রীক-শিল্পিগণের শিল্প আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীকগণও এ বিষয়ে পশ্চাৎবর্ত্তী ছিলেন না। গ্রীক ভাস্করগণ একটি প্রতিমূর্ত্তিকে একেবারে মানুষের মত করিবার জন্য কতই না পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহার কোথাও একতিল ব্যতিক্রম নাই, সামান্য অসামঞ্জস্য নাই। Critical faculty ব্যতীত এরূপটি সম্ভবপর নয়।

"Poets are not made but born" প্রকৃত প্রতিভা কোন শিক্ষার মুখাপেক্ষা করে না, স্বর্গীয় প্রেরণায় আপনার গন্তব্য পথ নির্ব্বাচন করিয়া লয়, প্রভৃতি উক্তির দ্বারা সাধারণ লোকের মনে একটা বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে যে, প্রতিভাবান্ ব্যক্তি সাহিত্য বা শিল্প হঠাৎ প্রচার করিয়া বসেন; কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, তাঁহাদিগের সেই সহসা-প্রকাশিত সাধনার মধ্যেও বিষয়-নির্ব্বাচন, শব্দ-প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট বিচার-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচনা, বিচার-শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইভাবে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আকস্মিক বলিয়া জগতে কোন পদার্থ নাই, শিল্প ও সাহিত্য যথেষ্ট বিচার-শক্তি, শিক্ষা, সংযম ও আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস ব্যতীত জগতে প্রচারিত হইতে পারে না। আমাদিগের সময়ে সময়ে যেমন আপনা হইতে নিদ্রা আসে, সেইরূপ কোন অনিবার্য্য কারণে কবিতা লিখিবার জন্য কোন কবির কোন প্রেরণা আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া দেয় নাই। তোমার আমার ন্যায় তাঁহাকেও, চেষ্টা করিব, লিখিব বলিয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া কবিতা লিখিতে হয়। তাঁহার ও আমার মধ্যে প্রভেদ সেখানে নয়। বিষয়-নির্ব্বাচন, মানব-চরিত্রে অভিজ্ঞতা, রচনাপটুতা এক কথায় বিচার-শক্তির দ্বারাই এই পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এই বিচার-শক্তি ব্যতীত সাহিত্য বা শিল্প একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত লেখক বলেন, "An age that has no Criticism is either an age in which art is impossible, hieratic and confined to the reproduction of formal types or an age that possesses no art at all" এবং ইহার কারণস্বরূপে তিনি বলেন, "For it is the critical faculty that invents fresh forms."

ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্য-চর্চ্চা ও উন্নতির জন্য কোন-না-কোন আকারে সমালোচনা থাকা সুধু প্রয়োজনীয় নয়, থাকিবেই থাকিবে। হইতে পারে, আজ আমরা যেভাবে মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য-সম্বন্ধীয় পুস্তক ও প্রবন্ধাদির সমালোচনা করিয়া থাকি, পূর্ব্বকালে সে ভাবের সমালোচনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সমালোচনা ছিল না বা সমালোচনার উপকারিতা নাই, একথা বলা চলে না। তবে এই প্রসঙ্গে আমি একথাও স্বীকার করি, প্রকৃত সমালোচনা বড়ই কঠিন কার্য্য। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন পুস্তক রচনা করা অপেক্ষা, সেই পুস্তক সমালোচনা করা অধিকতর দুরূহ। একটি সুবৃহৎ উপন্যাস অনেকেই লিখিতে পারেন; কিন্তু উপন্যাসের ইতিহাস ও তাহার গতির সহিত মিলাইয়া তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। তবে অবশ্য একথা স্বীকার করি, আমি যেরূপ সমালোচনার কথা বলিতেছি, বর্ত্তমান সময়ে তাহা বঙ্গ-সাহিত্যে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। আজকাল সংবাদ-পত্রে ও মাসিক-পত্রে যে ভাবের সমালোচনা প্রকাশ পায়, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী-করা মাল,—খাঁটি য়ুরোপীয় জিনিস। তবে শিক্ষিত লোক সেখানে ইহার মূল্য বুঝেন; তাই তাঁহারা মাসিক-পত্রিকার রচনাকে "লিটারারি গারবেজ" এবং এই জাতীয় সমালোচনাকে reports of the police-court of literature নামে অভিহিত করেন; কিন্তু মাসিক-পত্রিকা-লেখকগণের "হস্ত-কণ্ডুয়ন" দূর করিবার পক্ষে একমাত্র উপায় এবং এই জাতীয় সমালোচনাই একমাত্র কষ্টিপাথর। এই প্রকৃত সমালোচনার অভাবেই বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। বর্ত্তমান যুগে সমালোচক অর্থে নিন্দুক বুঝায়; ফলে, সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে দিন দিন বিচার-শক্তি নির্ব্বাসিত হইয়া পড়িতেছে। আর তাহারই ফলে বৈচিত্র্য লোপ পাইতে বসিয়াছে; গতানুগতিকতা বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরূপ অবস্থা যদি শীঘ্র পরিবর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে কি আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে, বঙ্গসাহিত্যের ভবিষ্যৎ একেবারেই আশাপ্রদ নয়? এই জন্য আমরা সমালোচনা চাই—সাঁচ্চা; প্রকৃত সমালোচনাকে আমরা মৌলিক রচনা অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় বলিয়া মনে করি। প্রকৃত সমালোচককে আমরা শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিকেরও ঊর্দ্ধে বসাইতে চাই। তিনি বিদ্রূপের পাত্র নন, আমাদের শত্রু নন, সকলের বন্ধু—সাহিত্যের উদ্ধারকর্ত্তা।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(ঞ)

ভারতবর্ষে রোমের মন্দির

খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমক বণিকগণ মালাবার-তীরে বাণিজ্য করিত। সেই রোমক বাণিজ্য-রক্ষার্থ রোমের সৈন্যগণ ফ্রাঙ্গানোরে থানা করিয়াছিল। তথায় অগস্টসের উদ্দেশে একটী মন্দির পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ফ্রাঙ্গানোর চেরা-রাজ্যের রাজধানী ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের অধিনায়ক লোপো সোয়ারেজ ত্রয়োদশখানি বৃহৎ বাণিজ্য-পোত লইয়া আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার রোষানলে পড়িয়া সমগ্র ফ্রাঙ্গানোর ভস্মীভূত হইয়াছিল।

ইংরাজ-কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্য

বিলাত হইতে যাত্রার তারিখ		মূলধন	জাহাজের সংখ্যা	শতকরা লাভ
প্রথম	১৬০১ খৃঃঅঃ	৬৮৩৭৩ পৌণ্ড	৪	৯৫ পৌণ্ড
দ্বিতীয়	১৬০৪ "	৬০৪৮০ "	৪	৯৫ "
তৃতীয়	১৬০৭ "	৫৩৫০০ "	৩	২৩৪ "
চতুর্থ	১৬০৮ "	৩৩০০০ "	২	জাহাজডুবি
পঞ্চম	১৬০৯ "	১৩৭০০ "	১	২৩৪ "
ষষ্ঠ	১৬১০ "	৮২০০০ "	৩	১২১ "
সপ্তম	১৬১১ "	৭১৫৮১ "	৪	২১৮ "
অষ্টম	১৬১২ "	৭৬৩৭৫ "	৪	২১১২/৩ "
নবম	১৬১২ "	৭২০০ "	১	১৬০ "

ভারতের পণ্য-বিক্রয়

সেকালে ইংরাজ-কোম্পানী-বাহাদুরের অর্ণবপোত ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডন নগরে প্রত্যাগমন করিবামাত্র পণ্যসম্ভার নিলামে বিক্রীত হইত। রয়াল-এক্স্‌চেঞ্জ-গৃহে একখানি টেবিলের উপর এক ইঞ্চিমাত্র দীর্ঘ একটী মোমের বাতি জ্বালাইয়া বিক্রেতা ডাকিত, "আচ্ছা মাল যাতা হায়।" সেই ক্ষুদ্র বর্ত্তিকাটুকু নিঃশেষে পুড়িবার পূর্ব্বেই ক্রেতাকে পণ্য ক্রয় করিতে হইত। এই নিলামে পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রার রেশম, নীল বা মসল্লা এক 'লাটে' বিক্রয় হইয়া যাইত। এই নিলামে যে সকলেই ডাকিতে পারিত, তাহা নহে; যাহারা কোনদিন কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে অথবা যাহারা অংশ ক্রয় করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ কড়ায়-গণ্ডায় বুঝাইয়া দেয় নাই, নিলামে ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিবার অধিকার তাহাদের আদৌ ছিল না। এই সকল লোকের নামের তালিকা এক্স্‌চেঞ্জ-গৃহে রক্ষিত হইত। তাহার নাম ছিল Black list.

পর্ত্তুগীজ বণিক ও ভারতের রণতরী

পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার কালে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, রণতরী ভিন্ন বাণিজ্য-পথ রক্ষিত হইবে না। কালিকট এবং গুজরাটে তখন যেরূপ সুন্দর রণতরীসকল নির্ম্মিত হইত, তাহা দেখিয়া চতুর বণিকজাতি সহজেই বুঝিল যে, ইহা বন্ধ করিতেই হইবে; নতুবা মালাবার-উপকূলের রাজন্যবর্গ বা আরব বণিক প্রভৃতিকে মুষ্টিমধ্যে রাখা যাইবে না। দিউ উপনিবেশে পর্ত্তুগীজদিগের সহিত কালিকট ও গুজরাটের যে যুদ্ধ ঘটিল, তাহাতেই স্থির হইল, কালিকটে রণতরী রক্ষিত হইবে না। বৃহৎ রণতরী দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র রণতরী রাখা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়া গেল। গুজরাটের রাজা পর্ত্তুগীজদিগের সহিত ১৫৩৪ খৃঃ অব্দে যে সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহাতেই স্থির হইয়াছিল, গুজরাটে অথবা তাহার অধীনস্থ দোনের বন্দরে আর অর্ণবপোত প্রস্তুত হইবে না। ভারতের উপকূলে যে নৌ-শক্তি ধীরে ধীরে গঠিত হইতেছিল, সেই সময় হইতেই তাহার মূলচ্ছেদ হইয়া গেল।

ভারতের বাণিজ্য

প্লিনি বড় দুঃখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের পণ্য-সম্ভার ক্রয় করিবার জন্য য়ুরোপ হইতে প্রতি বৎসর ৬৮৭০০০০ মুদ্রার স্বর্ণ ও রৌপ্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়।

ভারতের ঔপনিবেশিক পর্ত্তুগীজ বণিকদিগের প্রতি
পর্ত্তুগীজ নরপতির আদেশ (১৫০০ খৃঃ অব্দ)

"মুসলমান ও পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজকদিগকে নিযুক্ত করিও। তাঁহারা ধর্ম্মমতের শাণিত খড়্গ লইয়া উহাদিগকে প্রথমে আক্রমণ করিবেন। যদি উহারা খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ না করে এবং তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতে না দেয়, তাহা হইলে উহাদিগকে কামানের আগুনে দগ্ধ করিও, কৃপাণের আঘাতে হত্যা করিও—উহাদের সহিত ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইও।"

ভারতীয় বাণিজ্যে পর্ত্তুগীজ-নীতি

পর্ত্তুগীজগণ যখন ক্রমে ক্রমে ভারতের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, তখন তাহারা দেখিল, মুষ্টিমেয় পর্ত্তুগীজ সৈন্য লইয়া মুসলমান ও পৌত্তলিক বণিকদিগকে দমন করা অসম্ভব। তাহারা তখন এক নিষ্ঠুর নীতি অবলম্বন করিল। সে কাহিনী পর্ত্তুগীজ-ইতিহাসের পৃষ্ঠা কালিমালিপ্ত করিয়াছে! ভাস্ক-ডা-গামা ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার আসিবার পর হইতেই এই নীতি অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তখন আরব-বাণিজ্যপোতের বিজিত নাবিকদিগকে পোতের পাল দিয়া জড়াইয়া সেলাই করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতেও পর্ত্তুগীজেরা কুণ্ঠিত হইল না, নগর-প্রবেশের সময় ক্যানানোরের হতভাগ্য বন্দীদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিয়া, তাহাদের বিক্ষিপ্ত, বিচূর্ণিত অস্থিরাশি নগরমধ্যে নিক্ষেপ করিল—কোথাও আবার লুণ্ঠন করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া রমণীদিগের নাসা, কর্ণ, বাহুচ্ছেদনপূর্ব্বক রত্নাভরণ লইয়া গেল! তাহারা দিউ বন্দরের সন্নিকটবর্ত্তী মিটি নামক একটী দ্বীপ আবিষ্কার করিল। তখন তথাকার বালক, যুবক, বৃদ্ধ, রমণী কাহাকেও জীবিত রাখিল না। একজন অধিবাসীও ক্ষমার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। তাহাদের তপ্তশোণিতে অনুরঞ্জিত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ মিটি দ্বীপের নূতন নামকরণ করিল—মৃতের দ্বীপ! ইংরাজ-ঐতিহাসিক তাই বলিয়াছেন—"The Portugeese cruelties were deliberate rather than vindictive."

অর্ম্মাজে পর্ত্তুগীজ-নীতি

পর্ত্তুগীজ ক্রমে ক্রমে পারস্য উপসাগরের কর্ত্তা হইয়া উঠিল। পর্ত্তুগীজ-কর্ত্তা আল্‌বুকার্ক ১৫১৫ খৃঃ অব্দে অর্ম্মাজে দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। আট বৎসর মধ্যেই পর্ত্তুগীজ-শক্তি এত প্রবল হইল যে, তাহারা রপ্তানি ভিন্ন আমদানীর উপর আর কর দিল না। অর্ম্মাজের অধিবাসিগণ স্বীকার করিল, পর্ত্তুগীজ-নরপতি আদেশ দিলেই তাহারা তাঁহার চরণে মস্তক লুটাইবে। পর্ত্তুগীজ-নরপতি তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতি বৎসর বহু সহস্র মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ, রৌপ্য ও মুক্তা নজরস্বরূপ আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন।

যে সকল খৃষ্টান অর্ম্মাজ-শাসনাধীনে আশ্রয় লইয়াছিল, পর্ত্তুগীজ-সেনাপতির আদেশে তাহারা পর্ত্তুগীজ-দুর্গে প্রেরিত হইল।

সেনাপতি ঘোষণা করিলেন যে, অর্ম্মাজ-নৃপতির পার্শ্বচর এবং বিচারকগণ ভিন্ন অর্ম্মাজে আর কেহই অস্ত্র রাখিতে পারিবে না। কোন মুসলমানের নিকট অস্ত্র দেখিলেই, প্রথমবারে ক্ষমা, দ্বিতীয়বারে বেত্রদণ্ড এবং তৃতীয়ে প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা হইল।

মুসলমান-বণিকগণ বাণিজ্যের উপর কর দিতে বাধ্য হইল। পর্ত্তুগীজ-বণিক করমুক্ত হইল। স্থির হইল, অর্ম্মাজের শান্তি-রক্ষকদিগের কর্ত্তা মুসলমান থাকিতে পারিবে না—একজন খৃষ্টান সেই পদে সমাসীন হইবেন। বিংশ সংখ্যক খৃষ্টান তাঁহার পার্শ্বচর থাকিবে।

ইহার পর প্রায় বিংশবর্ষ মধ্যেই পর্ত্তুগীজগণ কতকাংশে অর্ম্মাজের করগ্রাহী হইল। ইংরাজ-ঐতিহাসিক কহিতেছেন— "In payment of tributes, says the king of Ormuz, no w pathos, "which I am obliged to pay."

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

বুদ্ধের মৃত্যু

(সঙ্কলন)

আমরা ইতিহাসের আলোচনা করি। কি হইলে ইতিহাস হয়, তাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করি। প্রস্তর-ফলক, তাম্রশাসন না হইলে খাঁটি ইতিহাস রচনা করা একেবারে অসম্ভব না হইলেও অন্ততঃ সুকঠিন বলিয়া মনে করি। যে যুগের তাম্রশাসন নাই, সে যুগের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা বোধ হয় নিরাপদ নয়। আপৎসঙ্কুল হইলেও, ঐতিহাসিকদলের মধ্যে পৌরাণিক (?) শ্রেণীর কেহ কেহ প্রাক্-তাম্রফলক-যুগের তথ্যের অবতারণা করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্য 'সু' কি 'কু' তাহা বিচার করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত নাই—সুতরাং আমি সে বিষয়ে কোনই কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখি না। সেদিন বহুপুরাতন একটা বিষয় লইয়া একজন দক্ষিণ-ভারতের পণ্ডিত অনেক তর্ক করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দু'-একটা সার কথা থাকিলেও থাকিতে পারে, এই বিশ্বাসে আজ যথাজ্ঞাত বিষয়টির অবতারণা পাঠকগণের নিকট করিতেছি। বুদ্ধ জ্ঞানী ও পুণ্যবান্ ছিলেন, তিনি জীবের দুঃখ-নিবারণের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি জগতের উপকারের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষ্য—তাঁহার ধর্ম্ম। যতদিন বৌদ্ধধর্ম্মের নাম জগতে থাকিবে, ততদিন বুদ্ধের নাম লোকে ভুলিবে না। মহাপুরুষদিগের জীবন-কাহিনী জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়; তাই তথাগত বুদ্ধেরও জীবন-বৃত্তান্তের মূলানুসন্ধানে অনেকে আনন্দ অনুভব করে। তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল-নির্ণয় তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্তের সহিত জড়িত। ভগবান্ বুদ্ধ কবে অপ্রকট হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় লইয়া অনেক বাদানুবাদ আছে। 'দীপবংশে' (৬।১) লিখিত আছে,

দ্বে সতানি চ বস্‌সানি অট্‌ঠারস বস্‌সানি চ।
সম্বুদ্ধে পরিনিব্বুতে অভিসিত্তো পিয়দস্‌সনো।

অর্থাৎ সম্বুদ্ধের 'নির্ব্বাণে'র ২১৮ বৎসর পরে পিয়দস্‌সন (অশোক) রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

'মহাবংশ' (৫।২১) বলে—

জিননিব্বাণতো পচ্ছা পুরা তস্‌সাভিসেকতো
সট্‌ঠারসং বস্‌সসতদ্বয়ং এবং বিজানিয়ং।

অর্থাৎ—

জিন-'নির্ব্বাণে'র পর এবং (অশোকের) অভিষেকের পূর্ব্বে ২১৮ বৎসর হইয়াছিল; ইহাই বুঝিতে হইবে।

ইহা হইতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ২১৮ বৎসর পরে অর্থাৎ বুদ্ধের তিরোভাবের পর ২১৯শ বর্ষের কোন এক সময়ে অশোকের অভিষেক হইয়াছিল।

অশোক কিন্তু অভিষেকের পূর্ব্বে চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। * সিংহলীয় প্রবন্ধ-অনুসারে অশোকের পূর্ব্বে বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজত্ব করেন এবং চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ রাজ্য করেন (মহাবংশ ৫।১৮; দীপবংশ ৫।১০)। অতএব দেখা যাইতেছে যে 'নির্ব্বাণে'র ১৬২ (২১৪—২৮+২৪ বর্ষ) বর্ষ পরে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ-কাল। † এখন প্রাচীন ভারতেতিহাস-ব্যাপারে এই ঘটনাটি হইতে সত্য-নির্ণয়ে অনেকটা সাহায্য হইতে পারিবে। এই ঘটনা খৃঃ পূঃ ৩২১ অব্দে অথবা ভুল-ভ্রান্তি মানিয়া লইলেও ইহার দুই বৎসরের মধ্যে পড়িতেছে।

অতএব বুদ্ধের অপ্রকটের কাল অনূন (৩২১+১৬২) =৪৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দ। আর তিনি অশীতি বর্ষে দেহত্যাগ করায় তাঁহার জন্মাব্দ হইতেছে, ৫৬৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে। আমরা এ মত নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। ইহা হইতে আমরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছি না। অধিকন্তু, সিংহলের ইতিহাসে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বচনই দেখিতে পাওয়া যায়।

* দীপবংশ, ৬।২১—২২। মহাবংশ ৫।২২। Norman সাহেব (J. R. A. S. 1908) লিখিয়াছেন যে, মহাবংশ-অনুসারে রাজ্যাভিষেক ২১৮শ বর্ষে এবং অভিষেক ২২২শ বর্ষে। এটী ভুল।

† ইহার সহিত Fleet, J. R. A. S. ১৯০৬ পৃঃ ৯৮৪-৯৮৬ ও ১৯০৯, পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য। Wickeremasinghe, Epigraphia Zeylanica, i. p. 142. n. 7.

প্রথমতঃ, সমস্ত গণনাই অশোকের অভিষেকের সময়ের উপর নির্ভর করিতেছে। ২১৮শ বর্ষকে মানিয়া লইতেই হইতেছে। আমাদের মনে হয়, এই সময়টী ঠিক কি না, তাহাই বিশেষ বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। Oldenburg প্রভৃতি পণ্ডিতগণ একবাক্যে একথা স্বীকার করিয়াছেন।

তথাগত বুদ্ধ

সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে বুদ্ধ-নির্ব্বাণ ৫৪৪ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দের মাঝা-মাঝি হইতে ধরা হইয়া থাকে।* এই তারিখটি যে ভুল এবং মোটামুটি ৬০ বৎসরের গোলমাল ইহাতে আছে, একথা সকলেই স্বীকার করে। বিশেষতঃ, ফ্লীট প্রমাণিত করিয়াছেন যে, এই গণনা কখনই পরম্পরাগত প্রবন্ধ হইতে সমাগত নয়। তিনি দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই প্রবাদের সূচনা হইয়াছিল। ৬০ বৎসরের গোলমাল সহসা কিরূপে ইহাতে স্থান পাইল, তাহা বিচারসাপেক্ষ। ম্যাক্স্‌মূলর ও ক্যানিঙ্‌হম্ বুদ্ধের তিরোভাবের কাল দিয়াছেন ৪৭৭খৃঃ পূর্ব্বাব্দ। তাঁহারা ৩১৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক মানিয়া লইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।‡ তাঁহাদের প্রদত্ত হিসাব যে ভুল, তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। ভিন্সেণ্ট্ এ, স্মিথ (E. H, I. p 4143) ৪৮৭ বা ৪৮৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দকে বুদ্ধ-নির্ব্বাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। গোপাল আয়ার (Ind, Ant 47 Vol, p 341) ২৬৯ বর্ষে অশোকের রাজ্যাভিষেক ধরিয়া লইয়া, ৪৮৬ পূর্ব্ব খৃঃ নির্ব্বাণ স্বীকার করেন। ইঁহারা উভয়েই ৪৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাণ্টনে-প্রচলিত চৈনিকদিগের "Dotted Record"এর (Takakusu, J. R. A. S. 1896, p 36 ; 1897. p 113 ; Fleet, ঐ, 1909 p. 4) উপর একটু বেশী আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। চীনাগণ বুদ্ধের সময় হইতে প্রতি বৎসর একটী করিয়া dot বা বিন্দু বসাইয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় ৪৮৯ অব্দে ৯৭৫টী dot হইয়াছিল। ইহা হইতেই ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ ও আয়ারের ৪৮৬পূঃ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণ-কল্পনা। "Dotted Record"এর উপর আমরা বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে

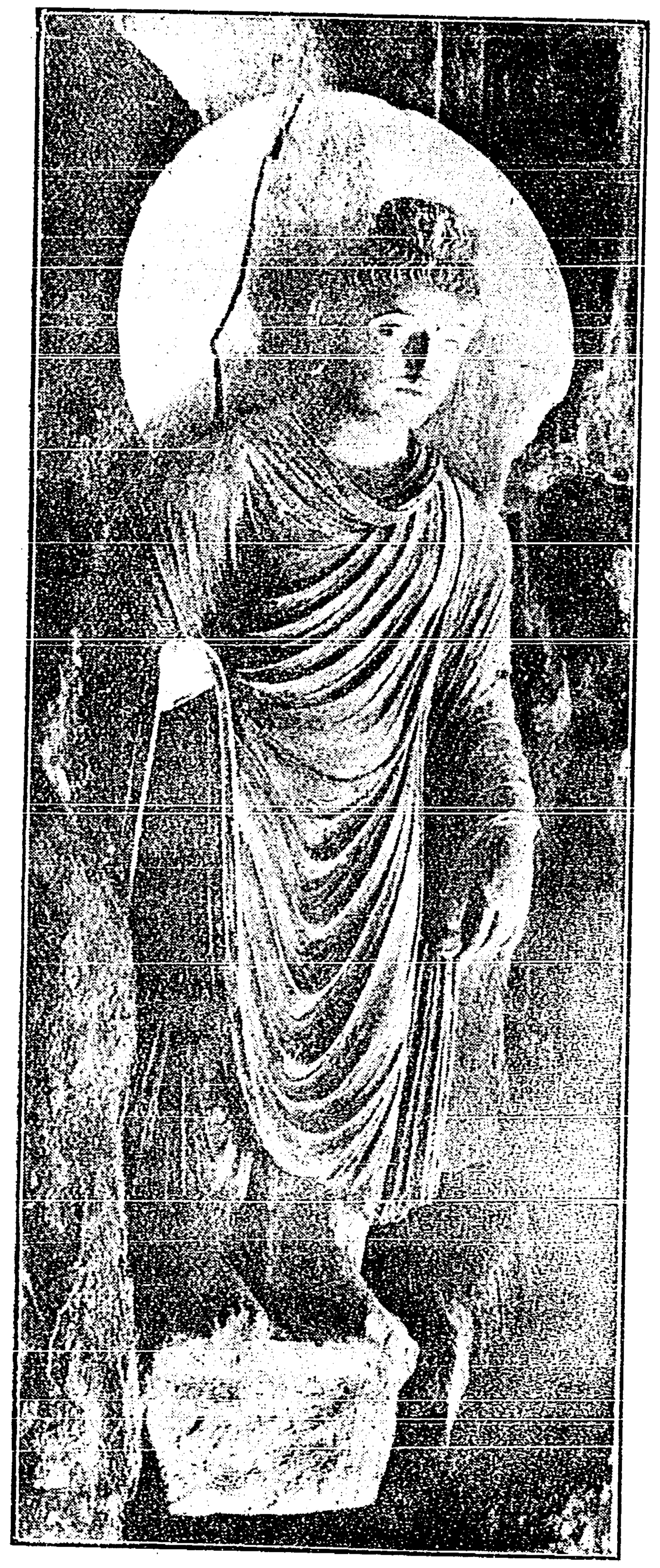

পরিব্রাজক বুদ্ধ

পারি না। সহস্র বৎসরের মধ্যে যে একটী বিন্দুরও গোলযোগ হইবে না, ইহা অসম্ভব। বিভিন্ন গণনায় অদ্যাবধি ৩।৪ বৎসরের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ সিংহলের প্রবাদ প্রকৃতির সহিত তুলনা করিয়াও অন্ততঃ একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন।

বুদ্ধের নির্ব্বাণের সময় লইয়া যে সমস্ত মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কতকগুলির সহিত পুরাণের মতের ঐক্য আছে। পুরাণ-মতে বিন্দুসার ২৫ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু

* ৫৪৩ নয় Wickremasinghe Epigraphia zeylunica i, p 122 দ্রষ্টব্য। বুদ্ধবর্ষ ২৪৪৪—১৩ই মে, ১৯০০ তারিখে আরব্ধ হইয়াছিল।

† J. R. A. S. 1909, p 323. and 332.

‡ S. B. E. x. 1908, p 43-47.

মহাবংশ-মতে বিন্দুসার-রাজ্যকাল ২৮ বৎসর। প্রথম হিসাবে আমরা ৪৮৬শ বর্ষকে নির্ব্বাণের কাল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, দ্বিতীয় হিসাবে ৪৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাণ আসিয়া পড়ে। যদি আমরা নির্ব্বাণের পর ২১৯শ বর্ষকে অশোকের অভিষেক কাল মানিয়া লই, তাহা হইলে পুরাণ-হিসাবে ২৬৮।৫৭ পূঃ খৃঃ এবং মহাবংশ-মতে ২৬৫।৬৪ পূঃ খৃঃ হয়।

'Minor Rock-Edict'এর শেষে তারিখ বলিয়া যে ২৫৬ আছে, ইহার সহিত যদি নির্ব্বাণের পর হইতে এই অনুশাসনের সময় পর্য্যন্ত যত বর্ষ অতীত হইয়াছে, তাহা মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে একটা সত্যে উপনীত হইতে পারা যায়। Buhler ও Fleet এতৎ সম্পর্কে অনেক আলোচনা করিয়াছেন (Epigraphia Indica, iii. 138 ; Fleet, the last Edict of Asoka,' J.R.A.S. 1908. p 84.)

সম্প্রতি অনুশাসনটীর ব্যাখ্যা একরকম স্থিরীকৃত হইয়াছে। F. W. Thomas ইহার জন্য সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম দেখান যে, 'বিবুথেন' এবং 'বিবাসা' (বিবুথা) এই দুইটী শব্দ ২৫৬ সংখ্যার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুইটী শব্দই 'বি+ বস্‌ধাতু' হইতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে; অর্থ হইবে, 'গৃহ হইতে দূরে অবস্থিতি করা, গৃহে না থাকা'। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় প্রবন্ধে সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ২৫৬ সংখ্যা বর্ষ হিসাবে বসে নাই, রাত্রি (দিবা ও রাত্রি) হিসাবেই বসিয়াছে। সহস্রাম-পাঠে তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন যে 'ছুবে সপংনালাতিসতা'র 'লাতি' শব্দ 'রাত্রি' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পদটীর 'সংস্কৃত ষট্‌পঞ্চাসরাত্রিসতে'।

Fleet ও Hultzsch উভয়েই Thomasএর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। টমাস্ বলেন যে, যখন অশোক পরিভ্রমণে নিরত ছিলেন, তখনই এই শাসন প্রচারিত হয়। '২৫৬' তাঁবু-পরিবর্ত্তনের সংখ্যা—বর্ষ নয়।

কিন্তু Fleet 'বিবুথ' ও 'বিবাস' শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এ দুইটী শব্দ 'প্রব্রজ্যা' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি বলেন, অশোক ৩৭ বৎসর রাজ্য করিয়া সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক 'প্রব্রজ্যা' গ্রহণ করেন। মগধে গিরিব্রজের নিকট সুবর্ণগিরিতে তিনি অবস্থিতি করেন। মহীশূরে উল্লিখিত অনুশাসনের পূর্ব্বাভাসে সুবর্ণগিরিই লিখিত আছে—পাটলিপুত্র নাই। সুবর্ণগিরিতেই তাঁহার শেষ উক্তি প্রকটিত হয়। এ ছাড়া '২৫৬' সংখ্যাটি Fleetএর মতে বিশেষ অর্থদ্যোতক। কোন কারণ নাই, হঠাৎ অশোক কখনই তাঁহার প্রব্রজ্যার ২৫৬শ দিবসে অনুশাসন প্রচার করেন নাই। ঠিক এই সময়ে বুদ্ধ-নির্ব্বাণ হইতে ২৫৬শ বর্ষ পূর্ণ হয়। অশোক বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর হইতে প্রতিবর্ষে একদিন করিয়া ব্রহ্মচারিরূপে ধর্ম্মধ্যানে অতিবাহিত করিতেন।

শ্রীরাম শাস্ত্রী

সম্রাজী বনাম সম্রাজ্ঞী

সম্প্রতি একখানি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্র, কোন মাসিক-পত্র-লেখকের রচনায় "সম্রাজী" শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, উক্ত লেখককে অপপ্রয়োগ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া, তৎস্থলে "সম্রাজ্ঞী" প্রয়োগের পরামর্শ দিয়াছেন। একজন পত্র-প্রেরকও সমালোচকের উক্তি বেদবাক্য স্থির করিয়া এবং ব্যাকরণের দোহাই তুলিয়া 'সম্রাজী'র এইরূপ জাতি-চ্যুতিতে রাজী হইয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহারা উভয়েই ব্যাকরণের বিভীষিকা দেখাইয়া, ঐশ্বর্য্যময়ী হইলেও, 'সম্রাজী'কে সাহিত্য-সাম্রাজ্য হইতে পরিবর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প। এক্ষেত্রে ব্যাকরণের কথাটা যখন উঠিয়াছে, তখন উক্ত শব্দদ্বয়ের শুদ্ধি ও অশুদ্ধি-সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথমতঃ, 'সম্রাজ্' এই প্রাতিপদিকটীর অর্থ ধরিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা যাক্। "অমরকোষ"-কার, 'সম্রাট্' কাহাকে বলে, তাহা নিম্ন শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—"যেনেষ্টং রাজসূয়েন মণ্ডলেশ্বরশ্চ যঃ। শাস্তি যশ্চাজ্ঞয়া রাজ্ঞঃ স সম্রাট্।" রাজসূয় যাগকর্ত্তা, মণ্ডলেশ্বর ও সর্ব্বশাসক রাজাকেই 'সম্রাজ্' বলে। 'সম্রাজ্' শব্দটী পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এই উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হইতে পারে। আবার, এই 'সম্রাজ্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে, সম্রাটের স্ত্রী বা কন্যা এই অর্থে, "পুংযোগাদাখ্যায়াম্" পা ৪।১।৪৮, পাণিনির এই সূত্রানুসারে [এই সূত্রের ভট্টোজীকৃত বৃত্তি এইরূপ ঃ—"যা পুমাখ্যা পুংযোগাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্ততে ততো'ঙীষ' স্যাৎ"] "ঙীষ্" প্রত্যয়যোগে "সম্রাজী" শব্দটীও নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, "সম্রাজী" ব্যাকরণ-বিগর্হিতা কিংবা অশিষ্টা নহেন; পরন্তু সর্ব্বথা ব্যাকরণ-রীতি-পরিশুদ্ধা। এইভাবে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "সম্রাজী" নহেন—সম্রাট্; কিন্তু মহারাণী মেরী সম্রাজী। পাঠান-বংশীয়া শাসনকর্ত্রী রিজিয়া সম্রাট্ বলিয়া আখ্যাত হইতে পারিতেন; কিন্তু হিন্দু-রাণী-শিরোমণি মহারাণী সংযুক্তা 'সম্রাজী'-কুল উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এইভাবে ব্যাকরণের কষ্টিপাথরে কষিয়াও 'সম্রাজী'র ঔজ্জ্বল্য ক্ষুণ্ণ হয় না; কিন্তু যাহাকে আজকাল লেখক-সমাজ-শুদ্ধ বলিয়া চালাইতেছেন, সেই মনোজ্ঞা 'সম্রাজ্ঞী'র বেলায় বেজায় ব্যভিচার দেখা যায়; ব্যাকরণের কোন নজিরই ইহার পংক্তিভুক্ত হইবার পক্ষপাতিত্ব করে না; পরন্তু প্রকাশ্যভাবে পাতিত্যই সপ্রমাণ করিতে চাহে। ফলতঃ "সম্রাজ্ঞী" শব্দটী সুপরিচিত হইলেও, ব্যাকরণানুসারে শুদ্ধ নহে। "সম্মতা রাজ্ঞী" এই ব্যাস-বাক্যে প্রাদিতৎপুরুষ সমাস করিয়াও যদি "সম্রাজ্ঞী" সম্পন্ন করিয়া তুলিতে চাই, তবে "মোঽনুস্বারঃ" এই পাণিনির সূত্রটী উহার প্রবল পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। এই সূত্রের প্রেরণায় "সম্-রাজ্ঞী" এই বিগ্রহে সন্ধি করিলে, "সম্রাজ্ঞী" পাওয়া যায় না, হইয়া যায় "সংরাজ্ঞী"। প্রশ্ন উঠিতে পারে, "সম্রাটের বেলায়ও, উক্ত সূত্রানুসারে এইভাবে "সংরাট" হইয়া যাউক না কেন? সম্রাটের আবশ্যকতা কি?" বৈয়াকরণ কেশরী পাণিনি দেব "মোরাজি সমঃ ক্বৌ" এই বিশেষ সূত্রটী সূত্রিত করিয়া এই সমস্যার সরল সমাধান করিয়া রাখিয়াছেন; সূত্রটীর অর্থ এই যে,

"ক্বিবন্ত রাজশব্দ পরে থাকিলে, 'সম' উপসর্গের 'ম্' 'মোহনুস্বারঃ' সূত্রানুসারে অনুস্বার হইবে না।" কাযেই "সম্রাটে"র বেলায় "সংরাট" হইতেই পারে না। অনেকে বলিবেন, তবে যে বিবাহ-বাসরে নববধুর তরফ হইতে মন্ত্র আওড়ান হয়—"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী চ ননন্দরি"—উহার তারিফ করিব কোন্ নজিরে? স্মরণ রাখিতে হইবে, ঐটী 'আর্য' প্রয়োগ এবং ওখানে সম্রাজ্ঞীর অর্থও স্বতন্ত্র; কাযেই ব্যাকরণ-দুষ্ট হইলেও, উহা চলিতে পারে শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যাকরণ-বিভীষিকায়—"রাজ্ঞী"র দেখাদেখি সম্রাজ্ঞী"রও অভ্যুদয় হইয়াছে:—"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী চ ননন্দরি" বৈদিক প্রয়োগ আছে; কিন্তু বৈদিক প্রয়োগ লৌকিক ভাষায় চলিবে কেন?—আর এইস্থলে "সম্রাজ্ঞী"র অর্থ "বিরাজমানা"—"সম্রাট্-মহিষী নহে। ("ব্যাকরণ-বিভীষিকা", ৩৮ পৃঃ)

এইভাবে ব্যাকরণের দিক্ হইতে স্থূল বিচারে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, "সম্রাজ্ঞী" পদটী অশিষ্ট এবং 'সম্রাজী'ই ব্যাকরণ-সম্মত; সুতরাং শিষ্টা। পক্ষান্তরে, "সম্রাজ্ঞী" যদি একটু ভোল ফিরাইয়া "সংরাজ্ঞী"স্বরূপে প্রকটিত হন, তাহা হইলে, বাণীর মন্দিরে স্থান পাইলেও পাইতে পারেন; কিন্তু সমজদার সাহিত্য-সেবিগণ উঁহাকে দুইহাতে তফাৎ করিয়া দিতে চাহিবেন, তাহার সম্ভাবনাই প্রবল। এখন প্রশ্ন এই, বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? বঙ্গ-সাহিত্যে "সম্রাজী", "সংরাজ্ঞী" কিংবা খোদ "সম্রাজ্ঞী"ই চলিবে কি? এই বিষয়ে একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম-প্রণয়নের দিকে সুনিপুণ শাব্দিক ও সাহিত্য-সুহৃদ্গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ললিতবাবু "সম্রাট্-মহিষী" লিখিয়া ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুধীমণ্ডলী কথাটী ভাবিয়া দেখিবেন। আমরাও সঙ্কোচের সহিত একটা প্রস্তাব উঠাইতে চাই; পণ্ডিতেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভাবিয়া দেখিলে অনুগৃহীত হইব। 'পাণিনি' প্রভৃতি ব্যাকরণানুসারে 'নিন্দুক' শব্দটী অসিদ্ধ; সুতরাং অশুদ্ধ। পাণিনির "নিন্দ-হিংস-ক্লিশ-খাদ-বিনাশ-পরিক্ষিপ-পরিরট-পরিবাদি-ব্যাভাষাঃ-সূয়োবুঞ্" ৩।২।১৪৬ এই সূত্র-বলে 'নিন্দ্' ধাতুর উত্তর 'বুঞ্' (অক্) প্রত্যয়-যোগে 'নিন্দক' পদটী সিদ্ধ হয়; কিন্তু 'নিন্দুক' হইতে পারে না। ব্যাকরণের এই নিষেধ-সত্ত্বেও 'নিন্দুক' কথাটী বাঙ্গালা-ভাষায় বহুল প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ও "প্রভাত চিন্তায়" নিন্দুকের এত নিন্দা কেন?" প্রবন্ধে প্রাচীন "সাহিত্যে পরিগৃহীত এবং বহুদিন-প্রচলিত এই নজিরের বলে ব্যাকরণ-নিন্দিত "নিন্দুকে"র পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। 'সম্রাজ্ঞী' শব্দটী রমাই পণ্ডিত, চণ্ডীদাস কি বিদ্যাপতি, ঘনরাম কিংবা মুকুন্দরাম অথবা অন্যান্য কোনও প্রাচীন সাহিত্য-পণ্ডিতের রচনায় স্থান পাইয়াছে কি না, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া তাহা বলিতে সমর্থ নহি। প্রাচীন সাহিত্যের অকিঞ্চিৎকর ও অপরিপক্ক জ্ঞান লইয়া সে বিষয়ে কোন কথা না বলাই সঙ্গত মনে হয়; কিন্তু বিবাহ-সংক্রান্ত বৈদিক মন্ত্র-সংস্পৃষ্ট-"সম্রাজ্ঞী" শব্দটী হিন্দুসজ্জন-মাত্রেরই এত পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহার মধুরতার মায়া কাটান কঠিন। বিশেষতঃ, বাঙ্গালার নবীন সাহিত্য-সেবীরা এমনইভাবে "সম্রাজ্ঞী" শব্দটীকে বাড়াইয়া তুলিতেছেন যে, ইনি শস্ত্রপাণি বৈয়াকরণের চোখ-রাঙ্গানি কিংবা শুদ্ধিপ্রিয়, শ্লেষ-সর্ব্বস্ব সাহিত্য-বিশারদের "দন্তরুচিকৌমুদী"-প্রদর্শনেও ভয় পাইয়া স্বস্থান ত্যাগ করিবেন, এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না; কাযেই, "সম্রাজী" অথবা 'সংরাজী' প্রভৃতি শ্রুতিকটু ও অপরিচিত শব্দগুলি ব্যাকরণসম্মত হইলেও, উহাদের পরিবর্ত্তে 'সম্রাজ্ঞী'কেই 'নিন্দুকে'র ন্যায়, বাণীর মন্দিরে বরণ করিয়া লইলেই সর্ব্বাংশে উত্তম হইবে না কি? আশা করি, ভাষাতত্ত্ব-বিৎ সাহিত্য-পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের একটা সুচিন্তিত সমাধান করিয়া ও সেই সঙ্গে বঙ্গীয় লেখক ও সমালোচকগণের মনের আঁধার ঘুচাইয়া, সাহিত্যের শব্দ-সম্পদ্ বিভাগের শৃঙ্খলা-সম্পাদন এবং সৌষ্ঠব-বিধান করিতে অগ্রসর হইবেন।

শ্রীভূপতিচরণ চক্রবর্ত্তী

সাহিত্য-সংবাদ

'উপাসনা'-সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'দরিদ্রের ক্রন্দন' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে তিনি 'বার্ত্তাশাস্ত্রে'র ব্যবহারিক আলোচনা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। পাশ্চাত্য 'বার্ত্তাশাস্ত্রে'র (Economics) অধিরোহ-প্রণালী অনুসরণ করিয়াতিনি প্রভূত পরিশ্রমসহকারে এই পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছেন। যেখানে তিনি পাশ্চাত্য-মতের বিরোধী হইয়াছেন, সেইখানে তিনি যুক্তির অবতারণা করিয়া আমাদের প্রাচীন মতের প্রাধান্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই মহতী চেষ্টায় তিনি ক্রন্দনের যে মর্ম্মস্পর্শী সুর তুলিয়াছেন, তাহা সকলেরই সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারিবে। এই দরিদ্র জাতির সংরক্ষণের জন্য যাঁহারা উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাধাকমলবাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। 'বার্ত্তা-শাস্ত্রে'র এরূপ ধারাবাহিক আলোচনা পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বারান্তরে গ্রন্থের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় "সাহিত্য-পঞ্জিকা" নামক এক পুস্তক প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই বাৎসরিক পুস্তকে জীবিত বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত, বঙ্গভাষায় প্রচলিত সাময়িক পত্রাদি, সাময়িক পত্রসমূহের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও বঙ্গদেশীয় পাঠাগারসমূহের তালিকা থাকিবে। আবশ্যক চিত্রাদিও দেওয়া হইবে। পুস্তকের লভ্যাংশ সাধারণ হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। আমাদের বিশেষ ভরসা আছে যে, বঙ্গীয় লেখকগণ স্ব স্ব পুস্তকাদির বৃত্তান্তসহ যথাসম্ভব সত্বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, "সমসাময়িক ভারত" কার্য্যালয়, মোরাদপুর (পাটনা) ঠিকানায় পাঠাইবেন ও এই সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবেন।

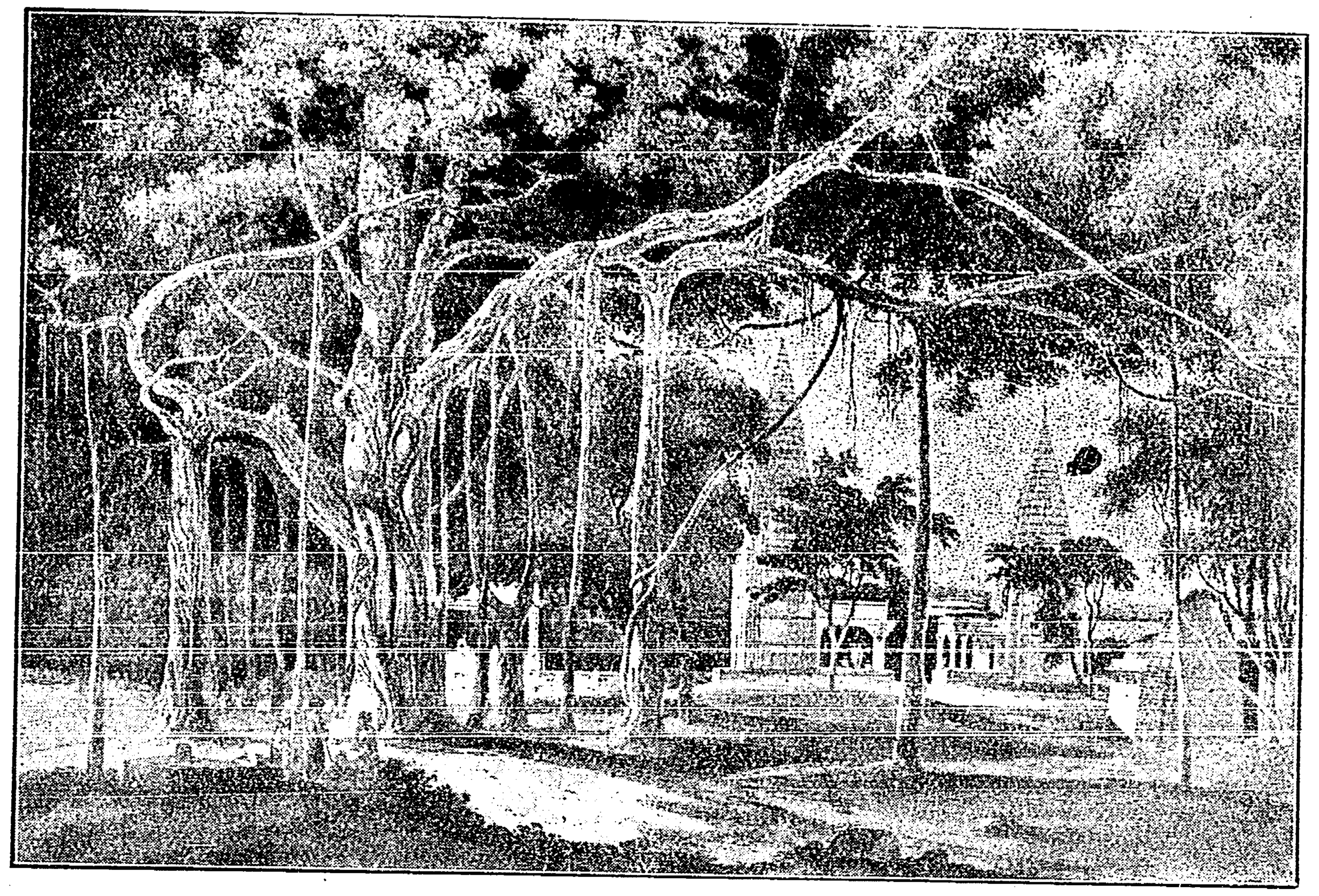

শোণনদের তীরে প্রাচীন হিন্দুমন্দির।

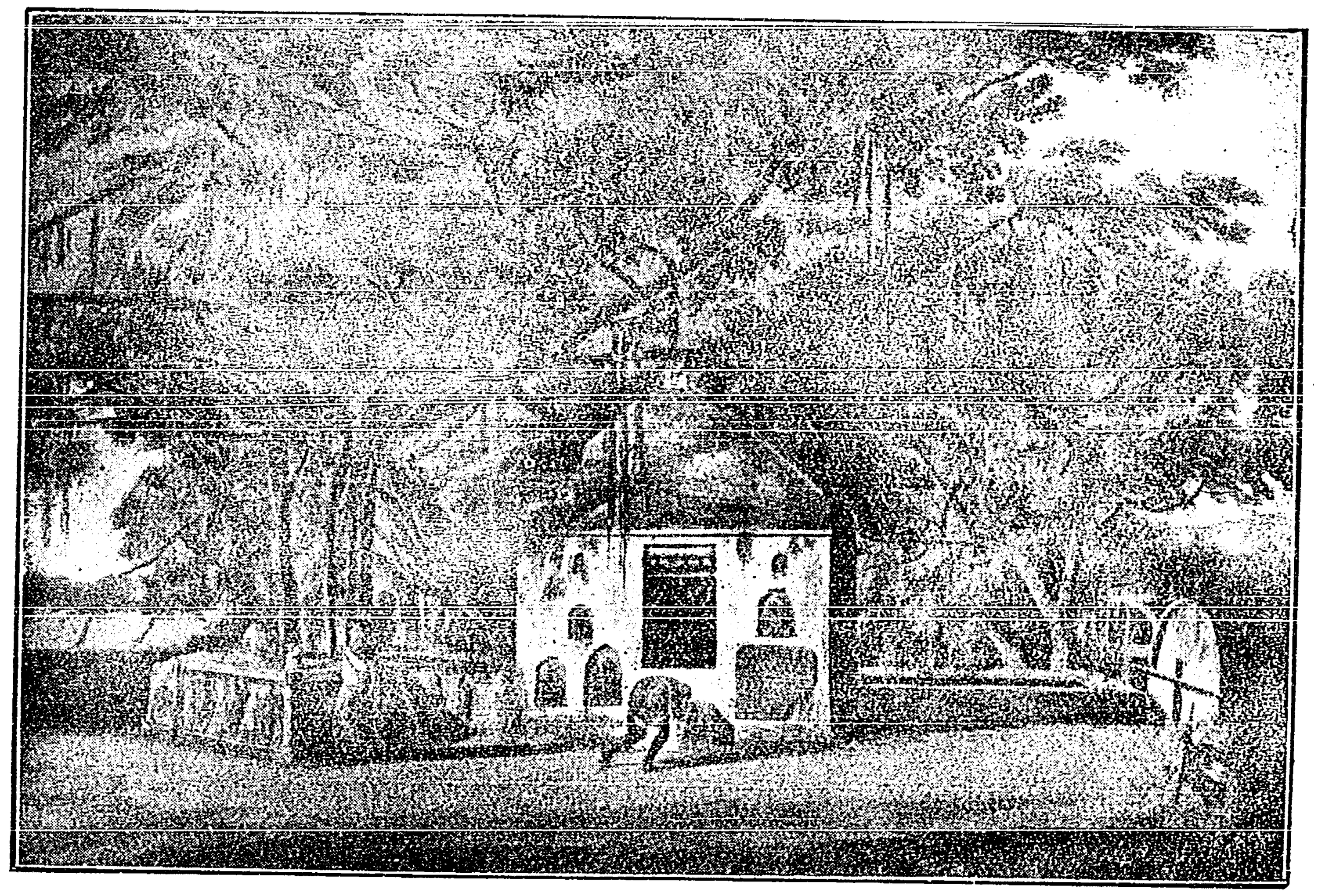

অক্ষয় বট, গয়া।

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ | ৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ | ১ম খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা

ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া

(১)

হরেন্দ্রবাবু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন—"আপনার আর কোন কথা শুনতে চাই না; আপনার মত ছোটলোকের সঙ্গে আর অধিক বাক্য ব্যয় কর্ত্তে ইচ্ছা করি না।"

কথাটা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্ষে শেলসম বাজিল, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "রাগছেন কেন—বেয়াই মশায়! আমার সাধ্য থাকলে কি আর দিতাম না? নিজের মেয়ে জামাইকে দিতে কার অসাধ? তবে আমার অবস্থাতো সমস্তই জানেন!"

হরেন্দ্রবাবু আরক্ত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন, "কেন বেশী বকছেন? যদি আপনি পূজোর তত্ত্ব বাবদ ৩০০৲ তিনশো টাকা দেন তবেই আপনার কন্যাকে পাঠান হ'বে নতুবা কখনও সে আশা ক'রবেন না।"

শিবনাথ বাবু কয়েক মুহূর্ত্ত মাথাটি হেঁট করিয়া কি ভাবিলেন। পরে বলিলেন—"আমাকে মাপ করুন তিনশো টাকা দিয়ে তত্ত্ব করবার সাধ্য আমার নাই।"

হরেন্দ্র। বেশ উত্তম কথা। তাহলে কখনও তোমার মেয়ের মুখ দেখতে ইচ্ছা করো না, এই আমার সাফ্ কথা।

"আচ্ছা তারই চেষ্টা দেখিগে, নমস্কার" এই বলিয়া শিবনাথবাবু চাদর ছাতি লইয়া উঠিলেন। তারপর একবার হরেন্দ্রবাবুর বিরাট সৌধমালার দিকে সোৎসুক ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন দ্বিতলের গবাক্ষ দিয়া তাঁহার স্নেহের কন্যা কমলা ম্লান মুখে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শিবনাথবাবুর শোক সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া বক্ষ দেশ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অধিকক্ষণ তিনি এভাবে থাকিতে পারিলেন না, একটী সুগভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সেই দ্বিপ্রহর বেলায় অনাহারে হরেন্দ্রবাবুর বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরেন্দ্রবাবু বৈবাহিককে একবার থাকিবার জন্য অনুরোধও করিলেন না।

(২)

সাধনপুরে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। তাঁহার সাংসারিক ও আর্থিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ, গৃহে তাঁহার স্ত্রী ও একটী পুত্র ও একটী কন্যা আছেন। পুত্রটির নাম "সুধীর কুমার" কন্যাটির নাম "কমলাবালা"। সুধীর কমলার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট।

যখন কমলা বিবাহযোগ্য হইল তখন শিবনাথ বাবু নানা স্থানে কন্যার বিবাহের জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন যে পলাশডাঙ্গা গ্রামের হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নগেন্দ্রনাথ নামক একটী পুত্র আছে, পুত্রটি বিবাহ যোগ্য! কিছুদিন হইল নগেন্দ্রনাথ এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। হরেন্দ্রবাবু নগদ পাঁচ হাজার টাকা এবং বরের বি, এ, পড়িবার খরচ বাবদ এক হাজার টাকা চাহিলেন।

কন্যা জমিদারের পুত্রবধূ হইবে স্মরণ করিয়া শিবনাথ আশার প্রলোভনে মুগ্ধ হইলেন। জমিজমা ২।৪ বিঘা যাহা ছিল এবং বাগান পুষ্করিণী বিক্রয় করিয়া পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। নিজ বাসস্থান খানি বন্ধক দিয়া বাকী হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া হরেন্দ্রবাবুর নিকট সম্মতি সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

শুভক্ষণে কমলার সহিত নগেন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়া গেল। পত্নীর যাহা ২।১ খানি অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া শিবনাথ "ফুল শয্যার" তত্ত্ব পাঠাইলেন। জমিদার হরেন্দ্রবাবু তত্ত্ব দেখিয়া গালে হাত দিলেন। গৃহিণী সরোষে কহিলেন, "তখনি তো বলেছিলাম গরীব ছোট লোকের মেয়েকে ঘরে এনো না, দেখ দেখি তত্ত্বের ছিরিটা।" হরেন্দ্রবাবু আর বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া তত্ত্বগুলি ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন এবং লোকদিগকে বলিয়া দিলেন, বেয়াইকে বলিও, তিনি যেন আর তাঁহার কন্যাকে লইতে না আসেন, তাহা হইলে তিনি অপমানিত হইয়া ফিরিবেন আমরা আর কখনও বৌমাকে পাঠাইব না।

দিনকতক পরে একদিন শিবনাথ বৈবাহিক সমীপে উপনীত হইলেন ও নানাপ্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু বৃথা আশা। কিছুতেই হরেন্দ্রবাবুর মন নরম হইল না বরং মিষ্ট কথায়-আরও গরম হইয়া কিছুতেই নববধূকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না।

তখন অগত্যা কাঁদিতে কাঁদিতে শিবনাথ ক্ষুণ্ণমনে বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন।

(৩)

কমলা তাহার ছোট ভাই সুধীরটিকে বড়ই ভালবাসিত; প্রাণের অপেক্ষাও ভালবাসিত। ছেলে বেলা হইতে তাহাকে

লইয়া কমলা খেলা ধূলা করিত, তাহাকে পিঠে লইয়া বেড়াইত, সুধীর কমলার বড়ই প্রিয়পাত্র ছিল। সুধীরকে একদণ্ড না দেখিতে পাইলে কমলা অস্থির হইয়া পড়িত আজ প্রায় দুই তিন মাস হইল তাহার সেই বড় আদরের বড় সোহাগের সুধীরকে কমলা দেখিতে পায় নাই, বিবাহের পর যখন বর বিদায় লয় তখন সেই শেষ দেখা একবার মাত্র হইয়াছিল, তারপর এই দীর্ঘ দুইতিন মাসের মধ্যে একদিনও আর তাহার দেখা পায় নাই। কমলা সে দুঃখ যে কিরূপ কষ্টে কিরূপ যাতনায় সহিয়া থাকিত তাহা সেই জানিত। সুধীরের চিন্তাতেই কমলা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহের পর আবার শীঘ্রই তাহার প্রাণের সুধীরের সহিত দেখা হইবে সেই আশাতেই সরলা বালিকা দিন-কতক কাটাইয়া ছিল কিন্তু যখন শুনিল যে তাহার পিত্রালয় গমন বন্ধ হইল তখন যেন সরলা বালিকা মস্তকে বজ্রাঘাত অনুভব করিল, সেই দিন হইতে রোদন তাহার চির সঙ্গী হইল, নির্জ্জন স্থানে একা থাকিলেই কমলার সুধীরের জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত আর হু হু শব্দে চক্ষু দিয়া অশ্রু নির্গত হইত। দিন দিন ভাবনায় তাহার দেহ বিশীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল, তেমন সুবর্ণ প্রতিমা দিন দিন কালিমা মণ্ডিত হইয়া যাইতে লাগিল, শুক্ল পক্ষের বর্দ্ধমান চন্দ্রকে সহসা যেন করাল রাহুতে গ্রাস করিতে লাগিল। এইরূপে কমলা একটা অনন্ত অশান্তি একটা শোকের অনন্ত তাড়না লইয়া দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করিতে লাগিল! পূজার পর কমলা ভাবিল এইবার শ্যামাপূজা আসিতেছে, শ্যামাপূজার পরেই ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। নিশ্চয়ই সেদিন আমার সুধীরের সাক্ষাৎ মিলিবে। এই ভাবিয়া দোয়াত কলম কাগজ লইয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিতে অন্য কথা কিছুই না কেবল ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণ লিখিল এবং সুধীরকে আসিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিল। আরও কত কথা লিখিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু লিখিতে কমলার সাহস হইল না কারণ পিত্রালয়ে পত্রাদি দেওয়া হরেন্দ্রবাবুর বিশেষ নিষেধ ছিল। আজ বড় আবেগে বড় বুক-ফাটা যাতনায় এই পত্রখানি লিখিল কিন্তু পাঠাইবার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বিষণ্ণ হইল। অবশেষে নানা চিন্তার পর কমলা স্বামীকে পত্রখানি দেখাইয়া তাঁহার দ্বারা ডাকযোগে পাঠাইবে ইহা স্থির করিল।

(৪)

দিদিকে ছাড়িয়া অবধি সুধীর বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। যেদিন কমলা বিবাহের পর পাল্কিতে উঠিল সেদিন সুধীর ছল ছল নেত্রে তাহা নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর যখন পাল্কি রওনা হইল তখন বালক কঁদিবার উপক্রম করিয়া উঠিল, সেই সময় সুধীরের মাতা সুধীরের এই ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন কারণ তৎকালে কাঁদিলে অকল্যাণ হইবে।

ক্রমে ক্রমে আপনা আপনি তাহার রোদন বন্ধ হইল কিন্তু তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাহার সে আব্দার সহসা দূর হইল, তাহার সে ধূলা খেলা সহসা বন্ধ হইল, এমন কি তাহার ভয় ভাবনা আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত সমস্তই তিরোহিত হইল। সে কেবল গম্ভীর মুখে নির্জ্জনে বসিয়া থাকিত আর তন্ময় চিত্তে কি চিন্তা করিতে করিতে সুবিস্তীর্ণ মাঠের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে দিন কটাইয়া দিত।

সুধীরের এ ভাব লক্ষ্য করিয়া শিবনাথ ও তাঁহার স্ত্রী চিন্তিত হইলেন, কমলাকে আনিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, অর্থলোলুপ হরেন্দ্র বাবুর কিছুতেই মন নরম হইল না। সুধীরের সে ভাব আর ঘুচিল না, যতদিন যাইতে লাগিল ততই যেন সে ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

(৫)

আজি দ্বিতীয়া। শুধু দ্বিতীয়া বলি কেন? দ্বিতীয়াতো প্রতি মাসের প্রতি পক্ষেই আছে, কিন্তু এটি সে দ্বিতীয়া নহে, আর সমস্ত দ্বিতীয়াগুলি অপেক্ষা পৃথক, আর সমস্ত দ্বিতীয়াগুলির অপেক্ষা উন্নত, এটি শুধু দ্বিতীয়া নহে—ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া। কমলা আজ প্রাতঃকালে উঠিল, আজ তাহার প্রাণে বড়ই আনন্দ, বড়ই আলোক। আজ নিশ্চয়ই তাহার প্রাণের ভাই সুধীরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কি আনন্দ। অস্থির হইয়া কমলা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ক্রমে অনেকটা বেলা হইল একটু একটু করিয়া রৌদ্রের তাপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কমলার প্রাণে আশার জোতিও একটু একটু উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আর একটু—আর একটু পরেই সাধের সুধীর আসিবে, হাঁ আসিবে, নিশ্চয়ই আসিবে, পত্রে ত আমি আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছি তবে না আসিবে কেন?

ক্রমে ক্রমে বেলা এক প্রহর অতীত হইল তথাপি কই এখনতো সুধীর আসিল না। কমলা উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া ছাদে উঠিল, যতদূর দৃষ্টি চলে প্রাণপণে বিশাল মাঠের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল, কিন্তু কই কোথাওতো মনুষ্য-চিহ্ন গোচর হইতেছে না, ঐ তো বিশাল প্রান্তর ধু ধু করিতেছে, মাঝে মাঝে দুই একবার একটা উদাস বায়ু উন্মুক্ত প্রান্তরের বুকের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। চাহিয়া চাহিয়া কমলা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, মাঠের সেই নির্জ্জনতায়, সেই উদাসভাবে কমলার অগোচরে চোখ ফাটিয়া কোথা হইতে দুই একবিন্দু অশ্রু মাটিতে আসিয়া পড়িল;—চমকাইয়া উঠিল, একি আমি কাঁদিতেছি, আজ যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ভ্রাতার অকল্যাণ হইবে। ক্রমে বেলা দ্বিপ্রহর হইল, চারিদিকে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল, কমলা তখন ছাদ হইতে নামিয়া আসিল। দেখিল দ্বারে একখানি পত্র হস্তে বিষণ্ণমুখে নগেন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া। কমলা আর অগ্রসর হইতে পারিল না, হতাশভাবে মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

নগেন্দ্র কিছুক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল তারপর কি চিন্তা করিয়া হস্তস্থিত সেই পত্রখানি মেজের উপর ফেলিয়া দিল।

কমলা ম্লান দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল শিরোনামে তাহারই নাম লেখা রহিয়াছে, তাড়াতাড়ি চঞ্চল হস্তে তখন কমলা পত্রখানি তুলিয়া লইল। তারপর তাড়াতাড়ি পত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিল মাত্র দুই তিন ছত্র লেখা রহিয়াছে নিম্নে তাহার পিতার নাম সাক্ষরিত। দেখিয়া কমলা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই কয় ছত্র পাঠ করিয়া ফেলিল, তাহাতে লেখাছিল—

"কমলা মা আমার! গত পরশু তোমার বড় সাধের সুধীর তোমার অদর্শন যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অকস্মাৎ মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে, মূর্চ্ছাগত হইবার পূর্ব্বে তোমার নিমন্ত্রণ ও কয়েকবার তোমার নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার পরেই মূর্চ্ছিত হইয়া বালক সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তোমার নিমন্ত্রণ সে শুনিয়া গিয়াছে কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে সে তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে পারে নাই। এইবার তোমার শ্বশুর মহাশয়ের মনোবাসনা পূর্ণ হইল।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে কমলার মুখমণ্ডল ভয়ানক বিকৃত হইয়া উঠিল। নাসিকা হইতে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহির্গত হইতে লাগিল তারপর সহসা "সুধীর ভাই আমার।" বলিয়া অভাগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটিতে লুটিয়া পড়িল।

নগেন্দ্র ভীতভাবে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কমলার মূর্চ্ছিত দেহ ধরিল, নগেন্দ্র দেহ স্পর্শ করিয়া শিহরিয়া উঠিল। এ কি, দেহ যে শীতল, সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দহীন! তাড়াতাড়ি বুকে হাত দিয়া দেখিল নীরব—বক্ষ স্পন্দন কিছুমাত্র নাই; নাসিকায় নিঃশ্বাস নাই তখন নগেন্দ্র বুঝিল কমলা আজ পরলোকে তাহার ভ্রাতার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া করিতে যাত্রা করিয়াছে।

শ্রীপ্রভাকর চক্রবর্ত্তী

জ্যোতিষ-তত্ত্ব-বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

রাশি-বিজ্ঞান।

জাতকের লগ্ন হ'তে দ্বাদশ রাশিতে।
শিরাদি দ্বাদশ রাশি ক্রমে স্থিত তাতে॥ ১
শিরঃ, মুখ, বাহুদ্বয়, হৃদয়, উদর,
কটি, বস্তি, লিঙ্গ, গুহ্য, উরু অতঃপর
জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, চরণ উভয়,
লগ্ন হ'তে জানিবেক ক্রমশঃ তা রয়॥ ২-৩

ক্রূর-সৌম্যাদি রাশি।

ক্রূর, সৌম্য, নর, নারী, ওজ, যুগ্মাত্মক
বিসম ও সম, চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মক,
ইত্যাদি সংজ্ঞায় ক্রমে হবে অভিহিত।
মেষাদি দ্বাদশ রাশি জানিবে নিশ্চিত॥ ৪
মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ আর।
ক্রূর, নর, ওজ ও বিষম সংজ্ঞা তার॥
বৃষ, কর্ক, কন্যা, বিছা, মকর ও মীন।
সৌম্য নারী যুগ্ম সম সংজ্ঞক প্রবীণ॥ ৫
মিথুন, কন্যা ও ধনু মীন দ্বিস্বভাব।
স্ত্রী-পুরুষ ভেদে মৃদু-তেজস্বিতা ভাব॥ ৬

দ্বিপদ ও চতুষ্পদাদি রাশি।

মিথুন, তুলা ও কুম্ভ, কন্যা ধনুরাগ,
ইহারা দ্বিপদ রাশি; মকর পূর্ব্বভাগ,
ধনুর শেষার্দ্ধ, বৃষ, মেষ, সিংহচয়।
চতুষ্পদ রাশি এরা জানিবে নিশ্চয়॥ ৭
কর্কট, বৃশ্চিক দুটী রাশি বহুপদ।
কুম্ভ, মীন রাশি দুটী জানিবে অপদ॥ ৮

অগ্নি, ভূমি, বায়ু ও জলরাশি।

মেষ, সিংহ, ধনুঃ তিন অগ্নিরাশি হয়।
ভূমিরাশি—বৃষ, কন্যা, মকর এ ত্রয়॥ ৯
মিথুন, তুলা ও কুম্ভ, বায়ুরাশি তিন।
জলরাশি—কর্কট ও বিছা আর মীন॥ ১০

অর্দ্ধরব, নীরব ও অতিরব রাশি।

মকর কুম্ভ ও কন্যারাশি অর্দ্ধরব।
বৃশ্চিক, কর্কট, তুলা, মীনাদি নীরব॥
মেষ, বৃষ, সিংহ, ধনু, মিথুন এসব।
খ্যাত হয় জ্যোতিষেতে বলি অতিরব॥ ১১
কর্কট, বৃশ্চিক, মীন বহু প্রজা হয়।
বৃষ ও মিথুন, কুম্ভ মধ্য প্রজাত্রয়॥
সিংহ, কন্যা, মেষ, তুলা, ধনু ও মকর।
এই ছয় অল্পপ্রজা জানিবে অপর॥ ১২

বিষম সমোদয় রাশি।

মকরাদি হ'তে শেষ মিথুন এ ছয়।
কাল মান অল্পবলি বিষম উদয়॥
কর্কট হইতে ধনুঃ শেষ রাশি ছয়।
কাল, মান দীর্ঘ হেতু সমোদয় হয়॥ ১৩

পৃষ্ঠোদয়, শীর্ষোদয় উভয়োদয় রাশি।

বৃষ, মেষ, ধনু, কর্ক, মিথুন, মকর,
নিশা, সংজ্ঞা পৃষ্ঠোদয়, মিথুন অন্তর।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, কুম্ভ দিবাবলি,
মিথুন এ শীর্ষোদয়; মীন উভবলি॥ ১৪

কীট ও সরীসৃপ রাশি।

কর্কট, বৃশ্চিক, মীন, মকরের শেষ।
কীটরাশি; সরীসৃপ বৃশ্চিক বিশেষ॥ ১৫

গ্রাম্য, বন্য ও জলজ রাশি।

মিথুন, তুলা ও কন্যা, ধনু, কুম্ভচয়
গ্রাম্য রাশি; মেষ, বৃষ, রাত্রে যদি হয়।
মকরের প্রথমার্দ্ধ, সিংহ রাশি আর
দিবসে মেষ ও বৃষ বন্য সংজ্ঞা তার॥ ১৬
জলজ কর্কট, মীন, মকরের শেষ।
শিব মতে কুম্ভ রাশি জানিবে বিশেষ॥
মার্কণ্ডেয় আদি করি যত মুনিগণ।
রাশির স্বরূপ ইহা করিলা বর্ণন॥ ১৭

রাশির বলাবল।

পতি মিত্র শুভ; উচ্চ-যুক্ত:দৃষ্ট হয়।
তবে বলবান্ তাহা হইবে নিশ্চয়॥
বিপর্যায়ে অল্পবলী; মিশ্রে মধ্যবল;
যুক্তাদৃষ্টে হীনবল হইবে সকল॥ ১৮

রাশির কালবল।

দিবায় দ্বিপদ রাশি, রাত্রে চতুষ্পদ;
সন্ধ্যায় জলজ কীট সংযোগে প্রবল। ১৯

রাশির স্থানবল।

কেন্দ্রপূর্ণ ফরাশ্রিতে, পূর্ণ মধ্যবল;
আপোক্লিম গতরাশি হয় হীনবল॥ ২০

রাশির দিগ্বল।

নর রাশি পূর্ব্বে বলী, দক্ষিণেতে জল,
পশ্চিমে বৃশ্চিক বলী, শূন্যে পশুদল॥ ২১

লগ্ন-বল।

লগ্নপতি, গুরু, বুধ, এর অন্যতর,
যুক্ত-দৃষ্ট হ'লে হয় লগ্ন বৃহত্তর। ২২

রাশির অন্ধ সময়।

মেষ, বৃষ, সিংহ, অন্ধ মহতী নিশায়।
কর্কট, মিথুন, কন্যা, মধ্যাহ্নে না চায়॥
পূর্ব্বাহ্নে বৃশ্চিক, তুলা ; ধনু ও মকর
অপরাহ্নে ; কুম্ভ, মীন সন্ধ্যান্ধ অপর॥

রাশির বিশেষ সংজ্ঞা।

মেষ, অজ, বস্ত, ক্রিয়, প্রথম, মেষের।
বৃষ, ওক্ষ, গো, তাবুরি, শুক্রভ, 'বৃষে'র॥
নৃযুগ্ম, জিমুত, বৌধ, মিথুন-সংজ্ঞক।
কুলীর, কর্কট, চন্দ্রে একার্থ বোধক॥
লেয় আর কণ্ঠীরব, সিংহ সংজ্ঞা হয়।
পাথোন, অবলা, যষ্ঠী, তন্বী-কন্যাচয়॥
বণিক, সপ্তম, তেলী, জুকচিদ-তুলায়।
কৌপ্যাষ্টম, কৌজ, অপি, বৃশ্চিক আবার
জৈব ; ধনু, তৌক্ষিক ও চাপ একার্থক।
আকেকর, দশ-চক্র মকর সংজ্ঞক।
হৃদ্রোগ, কুম্ভ ও ঘট-কুম্ভ সংজ্ঞা হয়।
অন্তিম, অন্তভ, ঋষ, বিপ্‌ফ্‌, মীনে কয়॥

রাশির পুণ্যাদি সংজ্ঞা।

কর্কট, মকর, মেষ, তুলা—চর হয়।
বৃষ, সিংহ, বিছা, কুম্ভ—স্থির চতুষ্টয়॥
কন্যা, ধনু, মীন আর মিথুন, দ্ব্যাত্মক।
ক্রমে পুণ্য-পুষ্কর-আধান সংজ্ঞক॥

রাশির পর্য্যায়।

রাশি, নাম, ক্ষেত্র, ঋক্ষভ, গৃহ-বাচক।
মেষাদি পর্য্যায় হয় লোক-প্রকাশক॥

রাশির দ্রব্য-নিরূপণ।

বস্ত্র, ধান্য, বনফল, কলা মুখ্য ধান,
ত্বকসার, শস্য, ইক্ষু, লৌহাদি প্রধান।
অস্ত্রাশ্ব, কাঞ্চন, জল-পুষ্প-দ্রব্যচয়।
বলাবল অনুসারে শুভাশুভ হয়।

রাশির বশ্যত্বাদি।

সিংহ ভিন্ন চতুষ্পদী দ্বিপদের বশ।
জলজ-দ্বিপদ,ভক্ষ্য, বিছা-কীট বশ॥
ইহা ভিন্ন সমুদয় সিংহ বশীভূত।
অন্য বশ্যাবশ্য সব লোকে ব্যবহৃত॥

হ্রস্ব, দীর্ঘ সমতাদি।

মীন, বৃষ, মেষ, কুম্ভ, হ্রস্বরাশি হয়।
মিথুন, মকর, ধনু, কর্কে সম কয়॥
বিছা, কন্যা, সিংহ, তুলা, দীর্ঘরাশি খ্যাত।
লগ্ন অনুসারে হবে জাতকে তা জ্ঞাত॥

মেষাদি রাশির বর্ণ।

রক্ত, শুভ্র, হরিৎ ও পাটল বরণ,
পাণ্ডু, নানাবর্ণ, কৃষ্ণ, সুবর্ণ মতন,
পীত, শ্বেত, রক্তবর্ণ, নকুলের মত,
মলিন ক্রমশঃ বর্ণ মেষাদির যত॥

দিপাধিপ রাশি।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণোদিচ্চ উত্তরাধিপতি,
মেষ, সিংহ, ধনু আদি ক্রমে ত্রিরাবৃত্তি।

রাশির জাতি।

কর্কট, বৃশ্চিক, মীন, বিপ্রজাতি হয়।
ক্ষত্রিয়—সিংহ ও তুলা ধনুরাশি ত্রয়॥
বৈশ্য কুম্ভ, মেষ আর মিথুন ; অপর
শূদ্রজাতি হয় বৃষ, কন্যা ও মকর॥

রাশির ধাতুনির্ণয়।

পিত্ত, বায়ু, সম আর কফ ধাতু হয়।
মেষাদি ক্রমশঃ করি প্রতি চতুষ্টয়॥
সেরূপ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ।
রাশি অনুসারে ফল সর্ব্বত্র জ্ঞাপন॥

রাশির অধিপতি।

মেষ-বিছা-অধিপতি মঙ্গল জানিবে।
বৃষ-তুলা-অধিপতি শুক্রই বুঝিবে॥
মিথুন কন্যার হয় বুধ অধিপতি।
কর্কটের চন্দ্র ; ধনু, মীনে বৃহস্পতি॥
মকর কুম্ভের হয় অধিপতি শনি।
সিংহরাশি অধিপতি ভাস্কর আপনি॥

রাশিদিগের মিত্র ও শত্রু।

পৃথ্বী-জল, অগ্নি-বায়ু মিত্র পরস্পর।
বিপরীতে শত্রুভাব জানিবে অপর॥

দ্বাদশ রাশির স্বরূপ।

মেষ। পুরুষ, চরাগ্নি, দৃঢ়, চতুষ্পদ আর
রক্ত, উষ্ণ, পিত্ত ধাতু, মহাশব্দ তার,
শৈল, ক্রূর, শীত, দিন, প্রাগ্বিষমোদয়,
অন্ধ-সঙ্গ-প্রজা-কান্তি, বিষমোজ হয়।

বৃষ। বৃষ-স্থির, নারী, ভূমি, শীত, রুক্ষঃ হয়।
দক্ষিণেশ, ভূমি, বায়ু, রাত্রি, পশু কয়॥
শুভ্র ও বিষমোদয়, হয় শব্দ অতি।
মধ্যপ্রজা-নারীসঙ্গ, সৌম্য, বৈশ্যজাতি॥

মিথুন। পশ্চিমেশ, হরিদ্বায়ু ; দ্বিপদ-স্বভাব।
পুরুষ, বিষমোদয়, তদুষ্ণ স্বভাব॥
মধ্যপ্রজা-নারীসঙ্গ, শূদ্র বনচারী।
মহাশব্দ, স্নিগ্ধ, ক্রূর, দিবা বল তারি॥

কর্কট। বহুপদ প্রজা-সঙ্গ, স্ত্রীরাশি ও চর।
শ্বেত-রক্তবর্ণ, সৌম্য নিঃশব্দ অপর॥
কফ ধাতু, স্নিগ্ধ, জলচারী, সমোদয়।
উত্তরেশ, বিপ্রবর্ণ, রাত্রে বলী হয়॥

সিংহ। নর, স্থির, অগ্নি, দিন, পীত, রুক্ষ হয়।
পিত্তোষত, পূর্ব্বেশ, দৃঢ়, পাদ চতুষ্টয়॥
সমোদয়, মহাশব্দ অন্ধ সঙ্গ-প্রজা।
শৈলচারী, ধূম্রবর্ণ, উগ্র সিংহ রাজা॥

কন্যা। দ্বিপদ-স্বভাব, পাণ্ডু, স্ত্রী, দক্ষিণেশ্বর,
শীত, বায়ু, সমোদয়, ভূ, নিশা অপর।

অর্দ্ধরব, শুভভূমি, বৈশ্য কান্তিহীন,
অন্ধ-সঙ্গ-প্রসবাদি ; সৌম্য কন্যাধীন॥

তুলা। পুংচর, নানাবর্ণ, উষ্ণ, সমোদয়,
পশ্চিমেশ, বায়ু, স্নিগ্ধ, নিঃশব্দ, নিশ্চয়।
বন্য, অন্ধ-প্রজাসঙ্গ, উগ্র,শূদ্র আর
দিবাবলী, সমধাতু, দ্বিপদ তুলার॥

বৃশ্চিক। স্থির, শুভ্র, নারী, জল, উত্তরে ঈশ্বর,
রজনী, নিঃশব্দ, কফধাতু, জলচর,
সমোদয় বহু-প্রজা, স্ত্রী, সঙ্গ, চরণ।
সৌম্য, শিথিলাঙ্গ, বিপ্র, শরীর চিক্কণ॥

ধনু। পুরুষ, স্বর্ণাভ, শৈলচারী, সমোদয়,
মহাশব্দ, দিন, পূর্ব্ব, দৃঢ়, উগ্র হয়,
পীতোষ্ণ, পিত্তপ্রকৃতি, অন্ধ-সঙ্গপ্রজা।
দ্বিস্বভাব-পদ ক্রূর, অগ্নিরাশি, রাজা॥

মকর। চর, ভূমি, অর্দ্ধশব্দ, স্ত্রী, দক্ষিণেশ্বর,
পিঙ্গল, শীতল, রুক্ষ, সৌম্য, ভূমিচর,
অন্ধ-প্রজা-সঙ্গ, বায়ু, রাত্রে বলী হয়,
পূর্ব্ব-পশু, শ্লথ, বৈশ্য, বিষম উদয়।

কুম্ভ। অপদ, পুরুষ, দিবা, মধ্য সঙ্গ-প্রজা,
স্থির, বায়ু, বনচারী, নানাবর্ণে সাজা,
স্নিগ্ধ, উষ্ণ, অর্দ্ধরব, সমধাতু হয়।
পশ্চিমেশ, শূদ্র, উগ্র, বিষম উদয়॥

মীন। মীন—স্ত্রী, অপদ, কফ, জল, শব্দহীন,
পিঙ্গল, দ্বিভাব, নিশা, জলস্থ প্রবীণ,
স্নিগ্ধ,বহু-সঙ্গ-প্রজা, বিপ্রবর্ণ হয়।
শুভ, উত্তরেশ, মীন, বিষম উদয়॥

শ্রীরাসবিহারী রায়, কবিকঙ্কন।

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(ট)

ডাক-হরকরা

সুলতান ফিরোজ শাহ যখন যুদ্ধার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতেন, তখনই তাহাদিগের সংবাদ পাইবার জন্য হরকরার ব্যবস্থা করিতেন। স্থানে স্থানে সম্রাটের কর্ম্মচারিগণ অশ্ব লইয়া অবস্থান করিত এবং আবশ্যকমত সংবাদ লিখিয়া প্রেরণ করিত। প্রত্যেক এক ক্রোশ পর পর একজন করিয়া হরকরা বা পত্র-বাহক অপেক্ষা করিত। তাহারা পত্র লইয়া যাতায়াত করিত। সুলতান এইরূপে দুই-তিন দিন পর পরই সৈন্যদিগের সংবাদ পাইতেন। তাঁহার আদেশ ও উপদেশও সৈন্যগণ প্রাপ্ত হইত।

(তারিখ-ই-ফিরোজশাহী)

সাম্রাজ্যের কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সুলতান মহম্মদ তোঘলক সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার সংবাদ-প্রেরকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একদল সৈন্যদিগের সহিত গমন করিত এবং প্রজা-সাধারণের সংবাদ লইত। তাহারা যাহা জানিতে পাইত, তাহা আপন আপন ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে অবিলম্বে জানাইত। তাঁহারা ঐ সকল সংবাদমধ্যে সুলতানের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তাঁহার সমীপে নিবেদন করিতেন। নগরে নগরে সম্রাটের কর্ম্মচারিগণ এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত থাকিতেন। অল্প দূরে দূরে ডাকের ঘাঁটি ছিল। প্রত্যেক ঘাঁটিতে দশজন হরকরা থাকিত। তাহারা পত্র পাইবামাত্র দৌড়াইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী ঘাঁটিতে উপস্থিত হইত। তথাকার হরকরা আবার অন্য ঘাঁটিতে পত্র পৌঁছাইয়া দিত। এইরূপে পত্রাদি প্রেরণ করিতে কর্ম্মচারীদিগের বিলম্ব হইত না। জনসাধারণ সম্ভবতঃ এ সুযোগ প্রাপ্ত হইত না। প্রত্যেক ঘাঁটিতে মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সকল স্থানে সুন্দর পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। নবগঠিত বিপণীসমূহে আবশ্যক খাদ্য-সামগ্রী ক্রয় করিতে পাওয়া যাইত।

পর্য্যটক ইবন বতুতা বলিয়াছেন, ভারতের 'বরিদ্' বা ডাকের ব্যবস্থা দুই প্রকার। ডাক অশ্বে যায় ও মনুষ্যে বহন করে। প্রত্যেক দুই ক্রোশ অন্তর ডাক বহিবার জন্য অশ্বের ব্যবস্থা আছে।

ডাক বহনের জন্য প্রত্যেক ক্রোশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সুলতান তাহার এক এক ভাগকে 'দাওয়া' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যেক দাওয়ায় একটী করিয়া গ্রাম আছে। গ্রাম জনপূর্ণ। গ্রাম-প্রান্তে ৩টী করিয়া পটাবাস আছে। সেই সকল পটাবাসে পত্র পাইবামাত্র বাহক কোমর বাঁধিয়া হস্তে একগাছি বেত্রদণ্ড লইয়া পরবর্ত্তী দাওয়ায় যাইবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ায়। তাহাদিগের বেত্রদণ্ডের অগ্রভাগে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকে। ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র দাওয়া হইতে বাহক বাহির হইয়া পত্র লইয়া পরবর্ত্তী দাওয়া-অভিমুখে যাত্রা করে।

সরাই

সম্রাট্ শেরশাহ পর্য্যটকদিগের সুবিধার জন্য রাজ্যমধ্যে বহু সরাই বা পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজপথেই প্রতি দুই ক্রোশ অন্তর একটী করিয়া সরাই নির্ম্মিত হইয়াছিল। পঞ্জাব হইতে বাঙ্গালার সুবর্ণগ্রাম পর্য্যন্ত যে সুদীর্ঘ রাজপথ তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বেও বহু সরাই ছিল। আগ্রা হইতে দাক্ষিণাত্যে বুরহান্পুর এবং আগ্রা হইতে চিতোর ও যোধপুর, লাহোর হইতে মুলতান, যে সকল সুগঠিত রাজপথ তৎকালে বর্ত্তমান ছিল, তৎসমুদায়ই শেরশাহের কীর্ত্তি। এই সকল রাজপথে প্রতি দুই ক্রোশ অন্তর পান্থনিবাস ছিল। নিবাসগুলি এরূপভাবে গঠিত হইয়াছিল যে, পর্য্যটকদিগের কোনরূপ অসুবিধা ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ ছিল। সরাইয়ের দ্বারদেশেই প্রত্যহ পাত্র-পরিপূর্ণ সুপেয় বারি পথিকদিগের জন্য রক্ষিত হইত। হিন্দুদিগের জন্য প্রতি নিবাসে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। উষ্ণ এবং শীতল বারি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করিয়া, সুন্দর শয্যা ও আহার্য্যাদি প্রাপ্ত হইয়া পর্য্যটকগণ পরম পরিতোষের সহিত পান্থনিবাসে বিশ্রাম করিত। তাহাদের অশ্বগুলির খাদ্য পর্য্যন্ত পান্থনিবাসেই থাকিত। শেরশাহের আদেশ

ছিল যে, পান্থনিবাসে আসিলেই পর্য্যটকের পদমর্য্যাদা-অনুসারে অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পান্থনিবাস ঘিরিয়া গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। নিবাসের কেন্দ্রস্থলে ইষ্টকনির্ম্মিত মসজেদ শোভা পাইত। প্রত্যেক মসজেদে ইমাম, মুয়াজিল্, শাহনা এবং অন্যান্য ভৃত্য ও চৌকিদার প্রভৃতি সর্ব্বদা থাকিত। পান্থনিবাসের নিকটবর্ত্তী ভূমির শস্যাদি হইতে এ সকলের ব্যয়-ভার বহন করা হইত। ডাক-বহনের জন্য প্রত্যেক পান্থনিবাসে দুইটী করিয়া অশ্বও রক্ষিত হইত।

(তারিখ-ই-শেরশাহী)

ভারতের উপকূল-পতি পর্ত্তুগীজ-বণিক

পর্ত্তুগীজদিগের এসিয়ায় আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ইন্দো-য়ুরোপীয় বাণিজ্যের একাধিপত্য। কিরূপে সে উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে একখানি বিপুল গ্রন্থ-রচনার আবশ্যক। একটী উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন ঃ—

ভারতের পশ্চিম উপকূলে সেকালে কালিকট একটী প্রধান বন্দর ছিল। ভাস্ক-ডা-গামা প্রথমে এইখানেই পোত হইতে অবতরণ করিয়া কালিকট-পতির সহিত সসম্ভ্রমে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য দেখিয়া মূকের ন্যায় স্তব্ধ হইয়াছিলেন। জামোরিণ তখন মনে করিয়াছিলেন, ভালই হইল, বাণিজ্য-কর বাড়িবে।

কালিকটে তখন আরব দেশের বণিকগণ বাণিজ্য করিত। তাহারা চতুর বণিকজাতি। অবিলম্বে বুঝিল, সূচনা ভাল নহে। এ নূতন অতিথিকে স্থান দিয়া কাজ নাই। তাহারা গোপনে ষড়্-যন্ত্র আরম্ভ করিল। রাজকর্ম্মচারীদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিল। ভাস্ক-ডা-গামা কোনক্রমে নিহত না হইয়া বাঁচিয়া গেলেন। তিনি যখন পর্ত্তুগালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন জামোরিণ তাঁহাকে বহু বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিলেন। তাঁহার আশা তখন বলবতী। তিনি পর্ত্তুগীজ-পতিকে আমন্ত্রণ করিলেন। লিখি-লেন, উভয় রাজ্যের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক সংস্থাপিত হইলে ভালই হয়। ভাস্ক-ডা-গামা তাঁহার পত্রবাহক হইয়া সগৌরবে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহা ১৪৯৮ খৃঃ অব্দের কথা।

আয়োজন

দুই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পর্ত্তুগীজ-পতি তেরখানি বাণিজ্য-পোত প্রেরণ করিলেন। উহারা নামে বাণিজ্য-পোত ছিল মাত্র। পোতে সুসজ্জিত কামানের অভাব ছিল না, অপরি-মিত গোলা-বারুদ যথাস্থানে সজ্জিত ছিল। নাবিকগণ প্রত্যেকেই পর্ত্তুগালের সাহসী বীর সৈনিক—পোতাধ্যক্ষ তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাবিক। এইরূপ আয়োজন করিয়া পর্ত্তুগাল-পতি ত্রয়োদশ-খানি বাণিজ্য-তরণী প্রেরণ করিলেন।

আচমন

পোতগুলি আসিয়া বন্দরে লাগিল। নৌ-বহরের প্রধান কর্ত্তা ক্যাবরেল কালিকট-রাজদরবারে যথারীতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রবেশলাভ করিলেন। জামোরিণ তুষ্ট হইয়া আদেশ দিলেন—"আচ্ছা, তোমরা সমুদ্রোপকূলে একটী কুঠী নির্ম্মাণ কর; সেখানে কিন্তু সুধু মসল্লা-ক্রয় ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবে না।"

আরম্ভ

ক্যাবরেল দেখিলেন, দূরে সমুদ্র-বক্ষে একখানি আরব বাণিজ্য-তরণী ভাসিতেছে। ভাবিলেন, "উহা কেন না দখল করি! নিজে লইব না—রাজপুত্রকে উপঢৌকন দিব।" আরব-পোত ধৃত হইল।

ক্যাবরেল দেখিলেন, অনেক সময় গিয়াছে, অথচ মসল্লা সংগ্রহ হইতেছে না। কালিকটের বন্দরে মুসলমানদিগের বাণিজ্য-তরী ছিল। তরণীগুলি নানাবিধ মসল্লায় পরিপূর্ণ ছিল। ক্যাবরেল ভাবিলেন, হাতের কাছে এত মসল্লা থাকিতে কোথায় ঘুরিয়া মরিব! তিনি মুসলমান-তরণীগুলি লুণ্ঠন করিলেন!

চতুরে চতুরে

মুসলমানগণ দেখিল, ক্রুসের বাণিজ্য-নীতি নবীন। তাহারা বুঝিল, পর্ত্তুগীজদিগের সহিত জীবন-মরণ পণে যুদ্ধ করিতে হইবে। তাহারা অবিলম্বে কালিকটের পর্ত্তুগীজ-কুঠী লুণ্ঠন করিল। কুঠীর প্রধান কর্ত্তা ও তাঁহার ৫৩জন পার্শ্বচর ধূলি-শয্যায় শয়ন করিল! ক্যাবরেল ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি দশখানি আরব পোত ধ্বংশ করিলেন। আর দুইখানি অনল-সংযোগে দগ্ধ করিতে করিতে নিজের পোতে পাল তুলিয়া একেবারে কোচিনের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন

কোচিনে-কালিকটে তখন বিবাদ চলিতেছিল। কোচিন-রাজ ভাবিলেন, বৈদেশিক বাণিজ্য আয়ত্ত করিবার এ সুযোগ ছাড়িব না। তিনি উদ্যোগ করিয়া নানাবিধ মসল্লা সংগ্রহ-পূর্ব্বক ক্যাবরেলের পোত পূর্ণ করিয়া দিলেন। মূল্যও যথোপযুক্ত দিতে হইল দেখিয়া ক্যাবরেল তুষ্ট হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কোচিন-পতির সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি যখন সহায় হইয়াছি, তখন সত্বরই কালিকটের রাজমুকুট আপনার শিরে শোভা পাইবে।"

কালিকট-পতি আশায় ও আনন্দে অধীর হইলেন। আবার সমুদ্রতীরে পর্ত্তুগীজ-কুঠী নির্ম্মিত হইল। ক্যাবরেল বুঝাইলেন, পর্ত্তুগাল হইতে যে সকল বাণিজ্য-পোত আসিবার সময় হইয়াছে, তাহাদের জন্য মসল্লা ত ক্রয় করিয়া রাখিতে হইবে।

কোচিনে মাথা লুকাইবার স্থান করিয়াই ক্যাবরেল কুইলন এবং কানানোর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, মালাবার উপকূলে কালিকট ছাড়াও বাণিজ্য করিবার অনেক স্থান আছে। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া কোচিনের কুঠীতে একজন কর্ত্তা ও তাঁহার ছয়জন সহকর্ম্মী মাত্র রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে দেখা গেল, কোচিন-রাজ-সম্পর্কিত একব্যক্তি তাঁহার পোত দর্শন করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু তিনি অজ্ঞাতে তাহাকে লইয়াই দেশে গিয়াছেন। যাহারা বুঝিল, তাহারা কহিল, "কোচিন-কুঠীর কুঠীয়ালদিগের প্রাণ সম্পত্তির প্রতিভূ সঙ্গে লইয়া ক্যাবরেল দেশে ফিরিলেন।"

ঐতিহাসিক কহিতেছেন—"ভারতবর্ষীয়ের দয়া অসামান্য। কোচিন-রাজ নিঃসহায় পর্ত্তুগীজ-কুঠীয়ালদিগকে হাতে পাইয়াও ইহার প্রতিশোধ লইলেন না।

[To the honour of Indian clemency be it reco·ded that the Raja took no repridals against the def nceless Partugese facto·s left in his pow r]

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

সৃষ্টির কেন্দ্র

পরিধি না থাকিলে তাহার কেন্দ্রের খবর অন্বেষণ করা পণ্ড-শ্রম। বিশ্বসৃষ্টির সীমান্ত-রেখা বা পরিধি কেহ কোনদিন আবিষ্কার করিতে পারে কি না জানি না এবং তাহার অস্তিত্ব-বিষয়েও সন্দিহান হইতে হয়; কারণ, 'টেলিস্কোপে'র কাচ যেখানে আর গ্রহ-নক্ষত্রের রূপ ধারণ করিতে না পারিয়া শুভ্র ধোঁয়ার আকার দেখাইয়া দেয়, কে বলিতে পারে যে, সেস্থানে এবং তাহার যোজন যোজন আকাশ জুড়িয়া সৃষ্টির অগণ্য চন্দ্র-সূর্য্য আলোকে উদ্ভাসিত না হইতেছে? মানুষ যেখানে নিজের ইন্দ্রিয় দিয়া বাহিরের তত্ত্ব আর খুঁজিয়া পাইল না, সৃষ্টির ধারাও যে সেখানে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া আছে, একথা বলিতে গেলে অন্যায় হইবে। বিজ্ঞান কদাপি দুঃসাহসী হইয়া এমন কথা বলে নাই এবং বলিতে পারিবেও না। বিজ্ঞানে চতুর্দ্দিকেই দেখিতে পাই, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ"—"আছে, আছে, আছে।" চোখে দেখিতে পাইলাম না বলিয়াই যে নাই, এমন অবৈজ্ঞানিক কথা বিজ্ঞান কোন কালে বলে নাই।

কিন্তু মানুষ যখন সমগ্র সৃষ্টির (কেবলমাত্র বিশ্বসৃষ্টির নহে) কেন্দ্র খুঁজিতে যায়, তখন বলিতে হয়, সেই-ই সৃষ্টিকে অনাসৃষ্টি পরিধি দিয়া আবদ্ধ করিয়া তাহার মাঝে কাল্পনিক কেন্দ্রস্বরূপ কলমের আগা দিয়া একটি কৃষ্ণ বিন্দুপাৎ করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ আছে। কোপার্ণিকাসের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ যখন ঘরে বসিয়া বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র খুঁজিতে বসিয়াছিলেন, তখন পৃথিবী, যাহা সমগ্র সৌরমণ্ডলের একটা পরমাণু, তাহাকেই সৌরসৃষ্টির কেন্দ্র বলিয়া ঠিক্ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে কোপার্ণিকাসের পূর্ব্ব-বর্ত্তী পণ্ডিতগণের দোষ দেওয়া চলে না; কারণ, নিজকে সমগ্র স্বার্থের কেন্দ্র করিয়া দেখাটা মানুষের একটা দোষ; কিন্তু সেই দোষ যখন প্রশ্রয় পাইয়া, সূর্য্যকে উড়াইয়া দিয়া পৃথিবীকে "বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র" বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হয়, তখন অপরাধের মাত্রাটা কিছু গুরুতর। মানুষ এমন মূঢ়, যে কোপার্ণি-কস্ যখন আসিয়া বলিলেন, "না, বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র হইতেছে সূর্য্য, পৃথিবী নহে; তাহার কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি", তখন মানুষ লাঠি-হাতে তাঁহাকে মারিতে উঠিল। তাহারা ভাবিল, "পৃথিবী, যেখানে আমরা বাস করিতেছি, তাহাকে অস্বীকার করিয়া লোকটা বলে কি না সূর্য্য সৃষ্টির কেন্দ্র; অতএব দাও উহাকে কারাগারে।" কোপার্ণিকস্ কি শুভক্ষণেই সত্য কথা বলিয়াছিলেন, তাই মানুষের জ্যোতি-বিজ্ঞান আজ এত উন্নত! এখন সে বুঝিয়াছে, যে পৃথিবীটাতে আমরা বাস করি, সেটা নেহাৎ ছোট। সমগ্র সৃষ্টি পৃথিবীর কেন্দ্র, একথা বলিতেও এখন লজ্জা হয়।

সৃষ্টির কেন্দ্র খুঁজিতে যাইবার অনেকগুলি বাধা আছে। সৃষ্টি বলিতে ঐ কথাটার সঙ্গে স্রষ্টার নামটা মনে আসে। স্রষ্টা কে? ভগবান্। সুতরাং ভগবৎ-সৃষ্ট অনন্ত বিশ্বজগতের কেন্দ্রটা খুঁজিতে গেলে ভগবানে ব্যক্তিত্বের আরোপ করা ছাড়া উপায় নাই। কেন্দ্র বলিলে মনে হয়, যেন ভগবান্ একটা কোন বিশেষ সূর্য্যে বা বিশেষ গ্রহে বসিয়া তাঁহার চতুষ্পার্শে অনন্ত সৃষ্টির জ্যোতিষ্ক ধারাকে বিচ্ছুরিত করিয়া দিয়াছেন। মানুষ জ্ঞান দিয়া, বীক্ষণাগারে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া কথাটাকে কিছুদূর সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। চোখে দেখিতেছি যে, সৃষ্টির কেন্দ্র রহিয়াছে। সে কেন্দ্র ভুল হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চক্ষুর পরিদৃশ্যমান্ খণ্ড আকাশটুকুর মধ্যেও যে সৃষ্টির একটা কেন্দ্র আছে, সমগ্র গ্রহ-নক্ষত্র, সূর্য্য-চন্দ্র যেন সেই কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে বিশেষ নিয়মে দৈনন্দিন এবং বাৎসরিক আবর্ত্তন শেষ করিতেছে! ইহা প্রামাণিক সত্য; সুতরাং কবিত্ব নয় এবং হাসিয়া উড়াইবারও যো নাই।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, কলিকাতার "ভারতবর্ষের জ্যোতিষ-সঙ্ঘ"(Astronomic·l Soceity in India) নামক সভার অধিবেশনে মাননীয় ডব্লু, এ, লি (Hon. W. A. Lee) যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অনন্ত সৃষ্টির কেন্দ্রের কথার অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। আমরা পাঠক-পাঠিকাগণকে উক্ত প্রবন্ধের সার মর্ম্ম দিতে প্রয়াস পাইব।

প্রাচীন কাল হইতেই এই অনন্ত আকাশের দিকে মানুষ চাহিয়া আসিয়াছে। যাঁহারা পর্য্যবেক্ষণশীল, তাঁহারা চিরকালই এই আকাশের একটা আকার ও অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্রের একটা পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিত কোপার্ণিকাস্ (Co·ernicus) তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষের গ্রন্থ "De revolutionibus"এর একস্থানে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র বিশ্বজগতের আকার বৃত্তাকার; কারণ, বৃত্তই হইতেছে সমগ্র আকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ। তা'ছাড়া কোন নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ লইয়া জ্যামিতিতে যতগুলি ফিগার (figure) করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে বৃত্তই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান জুড়িয়া থাকে। সূর্য্য, গ্রহ-চন্দ্র সকলই বৃত্তাকার। পৃথিবীর মধ্যে যে-কোন জিনিষকে যদি মুক্তভাবে কোন আকার-গ্রহণে স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তবে জিনিষটা বৃত্তাকার পছন্দ করে। যেমন মনে করুন,—জলবিম্ব, জলবিন্দু, তৈলবিন্দু ইত্যাদি।

কোপার্ণিকাসের পূর্ব্বের ধারণা ছিল এইরূপ। কোপার্ণি-কাস্ আসিয়া যখন বলিলেন যে, সৌরজগতের কেন্দ্র সূর্য্য, পৃথিবী নহে, তখন চতুর্দ্দিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কোপার্ণি-কাসের সমসমায়িক তথাকথিত মহাজ্ঞানীরা বলিতে লাগিলেন, পৃথিবী বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্র হইতে পারে না; কারণ, তাহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে হাজার হাজার মাইল দূরত্বযুক্ত orbit বা অক্ষরেখায় নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে ইহাও সত্য যে, আকাশের মধ্যে পৃথিবী আমাদের লইয়া বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া নাই। তাহাই যদি হয়, তবে আমরা কেন সহস্র বৎসর ধরিয়া আকাশের নির্দ্দিষ্ট গ্রহ-তারকাময় খণ্ড আকাশটুকু দেখিতে পাইতেছি? পৃথিবীর ভ্রমণ-পথে আকাশের নূতন নূতন অংশ আমাদের চক্ষুগোচর হওয়া উচিত ছিল। কোপার্ণিকাস্‌কে এই প্রশ্ন করিলে তিনি যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা খুব সোজা এবং খুবই সত্য। তিনি বলিলেন, "পৃথিবী হইতে গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব এত অধিক যে, সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর অক্ষরেখার (rbit) ব্যাস তাহার কাছে:নগণ্য; সুতরাং পৃথিবী তাহার অক্ষরেখায় এক বৎসর ভ্রমণ সম্পূর্ণ করিয়া আসিলেও আমাদের চোখে আকাশের কোন নূতনত্বই ধরা পড়ে না; সুতরাং পৃথিবীর গতি সমগ্র সৌরজগতের

তুলনায় গতিহীন।" কোপার্ণিকাসের সমসাময়িক পণ্ডিতগণ মনের ভিতর এই কথাতে খুব একটা বড় ধাক্কা খাইয়া বলিলেন, "সবুর কর, সবুর কর। তুমি যে ভয়ানক কথা বলিতেছ! অতবড় জগৎ কল্পনা করিতে যে আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ু চঞ্চল হইয়া উঠে!" পণ্ডিতগণ প্রথমে কোপার্ণিকাসের এই মহান্ সত্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই; গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিলে ঠিক্ হয় না—মস্তিষ্কে ধারণ করিতে পারেন নাই। ইহার পর কোপার্ণিকাসের উল্টা মতের একটা দল জাঁকিয়া উঠিল; কিন্তু সে দলের আয়ু বেশীদিন ছিল না। গ্যালিলিও জ্যোতিষী ছিলেন এবং সত্যদ্রষ্টা ছিলেন; তিনি কোপার্ণিকাসের মহান্ আবিষ্কারের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন যে, "আমি দূর-বীক্ষণ যন্ত্রযোগে কোপার্ণিকাসের কথার সত্যতার প্রমাণ দর্শাইব। পৃথিবীর ভ্রমণপথে আকাশের নূতন অংশ যে আমরা দেখিতে পাই, সেগুলি খালি চোখে দেখা যায় না; আমি দূর-বীক্ষণ দিয়া নূতন খণ্ড আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিব।" এই বলিয়া তিনি ঠিক্ করিলেন যে, যদি যুগল নক্ষত্রগুলির মধ্যে একটীকে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তবে বৎসরের মধ্যে কোন-না কোন সময়ে তাহাদের উভয়ের মধ্যে আকাশের বিচ্ছেদ অংশটুকুর নিশ্চয়ই হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষিত হইবে; কিন্তু গ্যালিলিও এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, বৎসরের মধ্যে যুগল নক্ষত্রের পরস্পরের বিচ্ছেদ অংশের খণ্ড আকাশ অপরিবর্ত্তিত থাকে। গ্যালিলিও হয় ত বুঝিতে পারেন নাই যে, তৎদৃষ্ট যুগল নক্ষত্র কত সুবৃহৎ, তাহাদের মধ্যস্থিত অন্তরই বা কত যোজন যোজনব্যাপী। বহুদূর হইতে ক্ষুদ্রতর পৃথিবীতে বসিয়া, তাহাতে আবার ক্ষুদ্রতম দূরবীক্ষণ যন্ত্রযোগে পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য, সেই যোজন যোজনব্যাপী আকাশের বিচ্ছেদের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করার সুদূর সম্ভাবনাও যে কতদূর অসম্ভব, তাহা গ্যালিলিওর মনে হয় নাই; কোপার্ণি-কাস্ হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহার মনে হইত।

গ্যালিলিওর অনুসরণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ স্যর উইলিয়ম্ সার্হেন্স্ সাহেব অই একই পরীক্ষায় নিযুক্ত হন; কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি পরীক্ষালব্ধ যে সত্য পাইয়াছিলেন, তাহাই পরন্তু তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়টির উল্টা কথার প্রমাণ দিল। তিনি পরীক্ষাদ্বারা জানিলেন যে, যুগ্ম নক্ষত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী আকাশ কদাপি পরিবর্ত্তিত হয় না এবং তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে দেশ, কাল ও পাত্র-নির্ব্বিশেষে সমান আকারেই লক্ষিত হইয়া থাকে।

ব্যাপারটা যে সত্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; অথচ কেমন করিয়া তাহাকে পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করা যাইতে পারে, ইহাই বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতিষিগণ ইহার সুপ্রমাণ ও সুপ্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিতে না পারিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই ব্যাপারটিকে সত্যসত্যই বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতিষিগণ যথারীতি পরীক্ষাদ্বারা ভিত্তিদান করিয়াছিলেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এতৎবিষয়ে পরীক্ষার সুযোগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরীক্ষাদ্বারা যদি আমরা দূরত্ব জানিতে পারি, তাহা হইলে নক্ষত্রটির আকার ও অনুমানও সহজ হইবে; কারণ, নক্ষত্রের আলোকের হ্রাস-বৃদ্ধি পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্বের উপর নির্ভর করে; সুতরাং প্রত্যেক নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের দূরত্ব ও আকার জানিলে আমরা অনায়াসেই এই প্রত্যক্ষ বিশ্ব-জগতের একটা আকার ও আকাশে তাহার ব্যাপ্তির ছবি ঘরে বসিয়াই আঁকিতে পারি।

এখন পাঠকগণ প্রশ্ন করিতে পারেন, "গ্রহ-নক্ষত্র ও চন্দ্র-সূর্য্য কি আকাশে সমান অন্তরালে সমঘন করিয়া একটা বিশেষ নিয়ম-অনুসারে সজ্জিত অথবা বিশৃঙ্খলভাবে বিরাজমান?" এই প্রশ্নের উত্তরের কথা সর্ব্বাগ্রে সুবিজ্ঞ দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্ক-লোক বিশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত নহে; তাহাদের অবস্থানের ভিতর একটা নিয়ম আছে। ইহা প্লেটোর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা; সুতরাং ইহা পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না।

এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ইহার নিকটতম নক্ষত্রটির দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া যদি আকাশে একটা বৃত্ত অঙ্কিত করিতে পারা যায়, তবে এই নিরেট বৃত্তের (sphere) উপরিভাগে সম-দূরবর্ত্তী করিয়া কেবলমাত্র বারোটা নক্ষত্রের স্থান সঙ্কুলান হয় মাত্র। এইক্ষণে পৃথিবীকে পুনর্ব্বার কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের (radius) দ্বিগুণ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া যদি আর একটি নিরেট বৃত্ত (sphere) পৃথিবীকে ঘেরিয়া আকাশের মধ্যে অঙ্কিত করা যায়, তবে এই বৃত্তের উপরিভাগের আয়তন পরবর্ত্তী বৃত্ত অপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক হইবে, ইহা জানা কথা; সুতরাং এই নিরেট্ বৃত্তের উপরিভাগে সমদূরবর্ত্তী নক্ষত্রের সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্ত-সজ্জিত নক্ষত্র-সংখ্যা হইতে চতুর্গুণ হইবে, নিঃসন্দেহ। এইরূপে আবার মনে করা যাউক্, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধের (radius) তিনগুণ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া আর একটি বৃত্তের নিরেট বৃত্ত (sphere) অঙ্কিত করা গেল। এই শেষোক্ত বৃত্ত-দেহের সম-অন্তরযুক্ত নক্ষত্রের সংখ্যা প্রথম বৃত্তের নক্ষত্র-সংখ্যা হইতে নয়গুণ অধিক হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়; কারণ, ইহার বৃত্তায়তন (area) প্রথম বৃত্তের আয়তন অপেক্ষা নয়গুণ অধিক। এইরূপে মনে করা যাউক্, অসংখ্য বৃত্ত অঙ্কিত করিলাম।

এই বৃত্তগুলির ব্যাসার্দ্ধ ও ইহার উপরের নক্ষত্র-সংখ্যার তালিকা করিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—

বৃত্তের সংখ্যা	পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ইহার কেন্দ্রের দূরত্ব	ইহার উপরিভাগের নক্ষত্র-সংখ্যা
(১)	১,	১×১=১,
(২)	২,	২×২=৪,
(৩)	৩,	৩×৩=৯,
(৪)	৪,	৪×৪=১৬,
(৫)	৫,	৫×৫=২৫,
(৬)	৬,	৬×৬=৩৬,
(৭)	৭,	৭×৭=৪৯,

এই তালিকা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বিশেষ কোনও বৃত্তের উপরিভাগের নক্ষত্র-সংখ্যার পরিমাণ, পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ঐ বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্বের square অনুযায়ী বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে; যেমন মনে করা যাউক্, তৃতীয় বৃত্তের দূরত্ব; ইহার দূরত্ব তিন; অর্থাৎ তিন মাইল ক্রোশ যাহাই ধরা যাউক্ না কেন, ইহার উপরিভাগের সমদূরবর্ত্তী নক্ষত্র-সংখ্যা ৩×৩=৯ হইবে; সুতরাং পৃথিবী হইতে বৃত্তের কেন্দ্রের দূরত্বের square অনুযায়ী ঐ বৃত্তের উপরিভাগের নক্ষত্র-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

নক্ষত্রের অবস্থান-বিষয়ে এই নিয়মটি বিশেষভাবে সত্য এবং পরীক্ষালব্ধ ধ্রুব সিদ্ধান্ত।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া অগণ্য বৃত্তের দূরত্বের গুণিতক অনুযায়ী নক্ষত্রের সংখ্যা বাড়িয়া চলে, তবে ত আকাশের তিলমাত্র স্থানও নক্ষত্রশূন্য থাকিবার কথা নয়; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ত তাহা দেখিতে পাই না। এমনই নগ্ন চক্ষের কথা ছাড়িয়া দিয়া খুব জোরাল' দূরবীক্ষণ দিয়াও ত আমরা আকাশকে একেবারে অন্তরশূন্য, আকাশবিচ্ছেদহীন নক্ষত্রপুঞ্জে ঠাসা দেখিতে পাই না! ইহার কারণ কি?—বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উত্তরে চারিটি সুযুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন।

১ম। এই বৃত্তের সংখ্যা সীমাহীন নহে; কাজেই কিছুদূর গিয়া তাহাদের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

২য়। খুব দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের আলোক আকাশপথে আসিবার সময় বায়ু ও নানা কারণে লুপ্ত হইয়া যায়।

৩য়। পথিমধ্যে যে অসংখ্য আলোকশূন্য নির্ব্বাণ নক্ষত্রেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাও জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোক-রেখা-পথে আসিয়া ঐ আলোক-রেখাকে পৃথিবীতে আসিতে বাধা দান করিয়া থাকে; সুতরাং আকাশের সর্ব্বস্থানই নক্ষত্রখচিতরূপে প্রতিভাত হয় না।

৪র্থ বা শেষ কারণ। আকাশের দূরবর্ত্তী অংশে নক্ষত্র না থাকিতেও পারে।

তৃতীয় কারণটি, আমাদের মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত; কারণ, প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, আকাশে নির্ব্বাণ নক্ষত্রের পরিমাণ বড় অল্প নহে। এই আলোকহীন নক্ষত্রেরা অনন্ত আকাশের শ্মশানে চিরদিন নির্ব্বাণ রহিয়াছে। দিনে দিনে এই "শ্মশান-নক্ষত্রে"র সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে; কারণ, নক্ষত্রের মৃত্যু-হার বৎসরে কম নহে। এই ব্যাপারে আর একটি জানিবার বিষয় এই যে, আলোকহীন নক্ষত্র জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোকের রেখাপথে অবস্থিত না করিলে যে, জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোক আমাদের নয়নগোচর হইবে না, এমন কোন কথা নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে তাহাদের অসামঞ্জস্য অবস্থান দূরবর্ত্তী নক্ষত্রের আলোক-অপহরণের পক্ষে যথেষ্ট; কারণ, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রমাণ আছে যে, সামান্য ধূলিকণা ভাসমান্ অবস্থায় আকাশে অবস্থান করিলে, তাহাদের দ্বারা সূর্য্যালোকের কিয়দংশ অপহৃত হইয়া থাকে। ঠিক্ এই কারণেই সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রের ক্ষীণালোক আকাশপথে পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মৃত নক্ষত্রগণের অন্ধকার দেহদ্বারা নিঃশেষে অপহৃত হইয়া যায় এবং আমরা পৃথিবীতে বসিয়া খুব বড় দূরবক্ষীণ যন্ত্রযোগেও সে নক্ষত্রের আলোক-বিষয়ে একটুও খবর পাই না। এইরূপে কত যে নক্ষত্রের আলোক আমাদের চক্ষু হইতে অপহৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না; কিন্তু হঠাৎ আকাশের বিশেষ বিশেষ অংশে নক্ষত্রের পুঞ্জের ও নীহারিকামণ্ডলীর (Nebulous) ক্ষণিক আবির্ভাব ও পুনর্ব্বার তাহাদের নির্ব্বাণ পূর্ব্বোক্ত মতের সাহায্যে প্রতিপাদ্য নহে; সুতরাং এই বিষয়ে কোন্‌টি যে সত্য এবং কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা বলা দুষ্কর; তবে সত্য জিনিষ সর্ব্বত্রই সত্য বলিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

অতএব দেখা যাউক্, কি জন্য জ্বলন্ত নক্ষত্রের আলোক আমাদের চক্ষুগোচর হয় না।

আকাশে এমন আর কি দ্রব্য থাকিতে পারে, যাহা উদ্দীপ্ত নক্ষত্রের সুস্পষ্ট ক্ষীণালোককে নিঃশেষে দূরীভূত করিয়া বা অপহৃত করিয়া দেয়? পণ্ডিতগণ পরিশেষে "ঈথার" (Ether) নামক পদার্থটাকে টানিয়া আনিয়া তাহাকেই আলোক-অপহরণের অপবাদে (?) জ্যোতিষিগণের বিচারশালার কাঠ্‌গড়ায় দাঁড় করাইয়াছেন। ইঁহারা বলেন, "ঈথার" পদার্থটা সর্ব্বব্যাপী; সুতরাং তাহা আকাশ জুড়িয়া সৃষ্টির সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। যেস্থানকে আমরা শূন্য বলিয়া থাকি, তাহাও "ঈথারে" পরিপূর্ণ। এই "ঈথার" জিনিষটা কাচের মত একেবারে অতিস্বচ্ছ নহে। কুয়াসার মধ্য দিয়া সূর্য্যালোক আসিলে যেমন তাহার কিয়দংশ কুয়াসাকর্ত্তৃক শোষিত (absorbed) বা অপহৃত হয়, তেমনই "ঈথারের" মধ্য দিয়া দূরবর্ত্তী নক্ষত্রগণের ক্ষীণ আলোক পৃথিবীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই একেবারে শোষিত হইয়া যায়। যোজন যোজন দূরবর্ত্তী একটি বৃহৎ নক্ষত্র তাহার আলোক-রেখাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু পথিমধ্যে সে আলোক-রেখা বেচারী নিজকে অপরের নিকট দান করিতে করিতে একেবারে ফতুর হইয়া, যেটুকু অবশিষ্ট আলোকের ক্ষীণরশ্মি লইয়া এই হতভাগ্য মর্ত্ত্যবাসিগণের চক্ষে আনিবে বলিয়া ঠিক্ করিয়াছিল সেইটুকু অবশিষ্ট ক্ষীণরশ্মির জন্যও যখন "ঈথারে" জিনিষটা কুয়াসার পর্দ্দার ভিতর হইতে "আমায় কিছু দাও" বলিয়া হাত বাড়াইল, তখন সে ক্ষীণরশ্মি নিজকে দান করিয়া অভিশপ্ত মর্ত্ত্যবাসিগণের জন্য কেবল ঘনান্ধকার বহন করিয়া আনিল। হায়! বেচারী নক্ষত্রের রশ্মি! আর আমরা মানমন্দিরের ভিতর বসিয়া বড় বড় দূরবীণ লইয়া সেই আলোক দেখিব বলিয়া বসিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা যখন হইল না, তখন "ঈথারের" চৌর্য্য-বৃত্তিটা ধরা পড়িয়া গেল: সুতরাং অতিদূরে যে সকল নক্ষত্র থাকে, তাহাদের আলো আমরা "ঈথারে" শোষণ-শক্তির জন্য দেখিতে পাই-ই না এবং নিকটে যে সকল অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, তাহাদের আলোকও ক্ষীণতর হইয়া আমা-দের দূরবীক্ষণে বা ঈক্ষণে ধরা পড়ে; সুতরাং বলিতে গেলে, ধরণীর হতভাগ্য জীবেরা কোনকালেই গ্রহ-নক্ষত্রের সত্য মূর্ত্তি দেখিতে পায় না। সবগুলিই তাহাদের আদৎ মূর্ত্তির ছায়া লইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়। তাহার উপর আবার 'ফটো-গ্রাফ্,' লইলে ত কথাই নাই। যেটুকু ঔজ্জ্বল্য ছিল, চোখে তাহা ধরা পড়িলেও 'ফটোগ্রাফে'র 'প্লেটে' তাহাদের অস্তিত্ব মোটেই পাওয়া যায় না; সুতরাং চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র কেহই তাহাদের যথার্থ মূর্ত্তিতে আমাদের চোখে দেখা দেয় না এবং তাহাদের যথার্থ মূর্ত্তি দেখার দুঃসাহস, যতদিন মর্ত্ত্যে থাকা যায়, ততদিন অসম্ভব।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

গুলিস্তানের গল্প

অষ্টাত্রিংশ গল্প

একব্যক্তি নুসিরাণকে বলিল,—"সর্ব্বশক্তিমান, মহিমাশালী ঈশ্বর আপনার একজন শত্রুকে অপসারিত করিয়াছেন।" নুসিরাণ কহিলেন ঃ—"তুমি কি শুনিয়াছ, ভগবান্ আমাকে ক্ষমা করিবেন ?"

শত্রুর মরণে নাহি হর্ষের কারণ,
চিরদিন নাহি রবে আমার জীবন।

ঊনচত্বারিংশ গল্প

নুসিরাণের সভার কতকগুলি বিজ্ঞলোক কোন রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। বুজুর মিহির চুপ করিয়া ছিলেন। সভাসদ্‌গণ জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"আপনি কেন কোন মতামত প্রকাশ করিতেছেন না ?" তিনি বলিলেন ঃ—"মন্ত্রীদিগের স্বভাব বৈদ্যদিগের ন্যায় ; পীড়িত ব্যক্তি ব্যতিরেকে বৈদ্য অপর কাহাকেও ঔষধ দেন না ; যখন আমি দেখিতেছি যে, আপনার মত নির্ভুল, তখন আর আমার পক্ষে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।"

বিনা হস্তক্ষেপে কার্য্য সিদ্ধ যদি হয়,
সে বিষয়ে আর বলা বৃথা বাক্যব্যয় ;
কূপের নিকটে অন্ধ:করিছে গমন,
নীরবে রহিলে দোষ হইবে তখন।

চত্বারিংশৎ গল্প

হারাণ-উর-রসিদ ইজিপ্ত জয় করিয়া বলিলেন—"সেই অধার্ম্মিক প্রজাপীড়ক ফারোয়া যে ইজিপ্ত রাজ্য পাইয়া মনে করিত যে, সে ঈশ্বরসম্ভূত, সেই রাজ্য আমি আমার সর্ব্বাধম ক্রীত-দাসকে দান করিব।" তাঁহার খুসাইব নামক একজন কাফ্রি ভৃত্য ছিল ; তিনি তাঁহাকেই ইজিপ্তের রাজ্য-শাসনের ভার দিলেন। সে ব্যক্তির বিদ্যা-বুদ্ধি এত কম যে, একদা কতকগুলি কৃষক তাহার নিকট আসিয়া "আমরা নাইল নদীর উপকূলে তুলার চাষ করিয়াছিলাম ; কিন্তু অতিবৃষ্টি হওয়াতে সে সমস্ত নষ্ট হইয়াছে" এই কথা বলাতে সে বলিল ঃ—"তোমরা কেন পশমের চাষ কর নাই, তাহা হইলে ত উহা নষ্ট হইত না।" এই কথা শুনিয়া একজন সাধু হাস্য করিয়া বলিলেন ঃ—

"বিদ্যা অনুরূপ ধন হইত সবার,
তা' হ'লে মূর্খের হ'ত প্রাণে বাঁচা ভার।
কিন্তু মূর্খে এত ধন দেন ভগবান্,
বিদ্বান্ দেখিয়া তাহা হ'ন হতজ্ঞান।

নাহি হয় ধন-মান কেবল বিদ্যায় ;
সে পায় কেবল যার ঈশ্বর সহায়।
অসদৃশ সংসারের নিয়ত ঘটন,
পণ্ডিতের অমর্য্যাদা, মূর্খের পূজন।
খেটে খেটে বৈজ্ঞানিক সারা হয়ে যায়,
ভগ্ন প্রাচীরের তলে মূর্খ ধন পায়।

একচত্বারিংশৎ গল্প।

কোন রাজা ক্রোধভরে চীনদেশীয়া এক পরমা সুন্দরী নারীকে এক কুৎসিত বিকটাকার কাফ্রির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরদিন তাহার অন্বেষণ করাতে রাজা জানিতে পারিলেন যে, কাফ্রি তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। তচ্ছ্রবণে রাজা অত্যন্ত কুপিত হইয়া কাফ্রিকে দুর্গের শৃঙ্গ হইতে নিম্নের পরিখায় প্রক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী মস্তক অবনত করিয়া জোড়করে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন ও বলিলেন, "মহা-রাজ কি জানেন না—

তৃষায় কাতর কেহ পেলে জলাশয়,
তখন সে নাহি করে মত্ত-হস্তি-ভয় ;
নাস্তিক একাকী যদি পায় মাংসাহার,
রোমজাত বলি নাহি করে সে বিচার।"

দ্বিচত্বারিংশৎ গল্প।

মহাবীর আলেক্‌জান্দারকে একজন জিজ্ঞাসা করিল ঃ—"আপনি কেমন করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে এত দেশ জয় করিয়াছেন ? আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক সম্রাট্, যাঁহারা সকলেই আপনার অপেক্ষা বয়সে বড় এবং অধিক ধনশালী ও বীর্য্যবান্ ছিলেন, তাঁহারা এত সহজে ত জয়লাভ করিতে পারেন নাই ?" আলেক্‌জান্দার বলিলেন ঃ—"আমি ঈশ্বরের প্রসাদে যে সকল দেশ জয় করিয়াছি, তত্রত্য প্রজাগণকে কখনও পীড়ন করি নাই এবং বিশেষ কারণ না থাকিলে তাহাদের রাজবংশের নাম লোপ করি নাই।"

মহতের নিন্দাবাদ যার মুখে সরে,
সে জন মহৎ নয়, বিজ্ঞ মনে করে।

বিষয়, বৈভব কিম্বা রাজ-সিংহাসন,
কিছুই কিছুই নয়, নিশার স্বপন।
চাও যদি নিজ যশ রাখিতে অক্ষত,
অন্যের সুনাম-নাশে হইও না রত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধুদিগের নীতি

প্রথম গল্প

একজন সম্ভ্রান্ত লোক এক সাধুকে বলিলেন ঃ—"দেখুন, অমুক সাধুর সম্বন্ধে অনেকে নানা কথা বলে ; সে বিষয়ে আপনার মত কি ?" সাধু বলিলেন ঃ—"আমি বাহ্য ব্যবহারে কিছু বিসদৃশ দেখি না ; তাহার মনের ভিতর কি আছে, আমি তাহা জানি না।"

সাধুর বেশেও যারে করিবে দর্শন,
সাধু বলি তুমি তারে করিবে গণন।
কি আছে কাহার মনে যদিও না জানে,
* মোতাসিব তবে কেন যাইবে প্রাঙ্গনে।

* মুসলমানদিগের নগর-রক্ষক—এই কর্ম্মচারীর নগরমধ্যে সুরা-পানাধিক্য ও পাশাক্রীড়া নিবারণের ক্ষমতা ছিল। তিনি লোকের বাটীর ভিতর যাইতে পারিতেন।

দ্বিতীয় গল্প

একদিন মক্কায় দেখিলাম, সেখানকার বিখ্যাত মস্‌জিদের দ্বারদেশে এক ফকির মস্তক রাখিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন ঃ—"হে করুণাময় ঈশ্বর ! তুমি ত জান, এই মহাপাপী ও অজ্ঞ সন্তানের তোমাকে দিবার যোগ্য এমন কিছুই নাই যে, তাহার দ্বারা আমার পাপ ক্ষালন করিতে পারি।

অধম সন্তান তব করেনি কখন,
কোন প্রিয় কার্য্য প্রভো ! তোমার সাধন।
নাহি কোন জোর তার উপরে তোমার,
নিজগুণে ক্ষম পাপ সকল আমার।
কি করিতে পারে পাপী ? আছে কি উপায়,
অনুতাপ-দগ্ধ মন তোমাকে দেখায়।
সদা মগ্ন যারা থাকে তোমার চিন্তায়,
তারাও তোমার কাছে নিত্য ক্ষমা চায়।

বণিকেরা যেমন তাহাদের দ্রব্যের বিনিময়ে মূল্য চায়, সেইরূপ যাহারা ঈশ্বরারাধনা করে, তাহারা ঈশ্বরের প্রসাদ প্রত্যাশা করে। আমি কখন তোমার পূজা করি নাই, আমি কেবল কৃপার আশায় আসিয়াছি। আমি ভিক্ষার্থী, আমার পণ্যবৃত্তি নাই। আমার কোন গুণ নাই বলিয়া সময়োচিত দণ্ডবিধান করিও না, তোমার দয়াল নামের উপযুক্ত দণ্ড দাও।

মার, কাট, ক্ষমা কর যে বা ইচ্ছা যায়,
তব দ্বারে আছি পড়ে:লুটায়ে ধূলায়।
কি শক্তি দাসের আছে বলিবে তোমায়,
যে আজ্ঞা করিবে দাস বহিবে মাথায়।
দেখেছি কাবার দ্বারে বসি একজন,
কেঁদে কেঁদে বলিতেছে কাতর বচন,
'বলি না আমার সেবা করিতে গ্রহণ,
কৃপা করি পাপ মোর কর হে ক্ষালন।'"

তৃতীয় গল্প

বোগ্‌দাদ নগরের আব্‌দুল কাদির গিলানি নামক একজন বিখ্যাত সুফি একদিন মক্কার :পবিত্র মস্‌জিদে গিয়া প্রস্তর-খণ্ড-বিকীর্ণ ভূমিতলে মস্তক রাখিয়া এই বলিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন ঃ—"হে ঈশ্বর ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে ক্ষমা কর ! যদি আমি তোমার বিচারে দণ্ডণীয় হই, তবে বিচারের দিনে আমার চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিও—সাধুগণের সম্মুখে আমি যেন পাপের জন্য লজ্জিত না হই।

প্রতিদিন প্রাতে আমি ছাড়িয়া শয়ন,
ভূমে পড়ি যবে করি তোমাকে স্মরণ,
এই নিবেদন করি বিভু তব পায়,
'আমি ত কখন নাথ ! ভুলিনে তোমায়,
তুমি কি কখন ওহে দয়ার সাগর !
ক্ষণমাত্র এ দাসের দশা মনে কর ?'"

চতুর্থ গল্প

একদা কোন চোর এক ফকিরের গৃহে প্রবেশ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া কোন দ্রব্য না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ফকির তাহা দেখিয়া নিজে যে কম্বলখানির উপর বসিয়াছিলেন, তাহা এমন করিয়া চোরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন যে, চোর সহজে দেখিতে পায় ও নিরাশ না হইয়া তাহা লইয়া যায়।

ঈশ্বরের পথে যারা করে বিচরণ,
শত্রুকেও তারা কষ্ট দেয় না কখন।
হেন উচ্চপদ তুমি লভিবে কেমনে,
যখন বিবাদ তব বন্ধুগণ সনে ?

সাধুদিগের ব্যবহার, কি প্রত্যক্ষে কি পরোক্ষে, সকল অবস্থাতেই সমান। তাঁহারা তোমার পশ্চাতে তোমার নিন্দা করেন না, কিম্বা তোমার সম্মুখে এত ভালবাসা দেখান না যে, তোমার জন্য যেন প্রাণত্যাগ করিতেও প্রস্তুত।

মেষ-শিশু সম শান্ত কাছে যে তোমার
নরভোজী ব্যাঘ্র সেই পশ্চাতে আবার।
যে করে পরের নিন্দা তোমার নিকটে,
অপরের কাছে নিন্দা সে তোমার রটে।

পঞ্চম গল্প

পথে সুখ ও দুঃখের সমভাগী হইবেন বলিয়া কতকগুলি ঈশ্বরপরায়ণ সাধু ভ্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলে, আমি তাঁহাদিগের সঙ্গী হইতে চাহিলাম। তাঁহারা কিন্তু আমাকে তাঁহাদের দলে লইতে স্বীকার করিলেন না। আমি বলিলাম ঃ—"আপনাদিগের মত সাধুগণের চিত্ত সর্ব্বদা দয়ার্দ্র ; আপনাদের মাদৃশ দীন-দুঃখীকে প্রত্যাখ্যান করা কি উচিত ? আমি আপনাদের যথাসাধ্য সেবা-সাহায্য করিব, আপনাদিগের মনে কখন' কষ্ট দিব না।"

চড়িবার নাহি কোন আমার বাহন,
তবু তোমাদের মোট করিব বহন।

তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন ঃ—"মহাশয় ! আমাদের কথাতে দুঃখিত হইবেন না, আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। কিছু-দিন পূর্ব্বে একজন চোর, ফকিরের বেশ ধরিয়া আমাদের সহিত মিলিত হয়। ফকিরগণ নিরপরাধ ; সেইজন্য সে ব্যক্তির চারিত্র-সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ হয় নাই ও আমরা তাহাকে দল-ভুক্ত করিয়াছিলাম।

পরিচ্ছদ:দেখে লোক কে চিনিতে পারে ?
কি আছে লেখক জানে পত্রের ভিতরে।
ছিন্ন কন্থা, জীর্ণ বস্ত্র, ফকিরের বেশ,
ইহা দেখি লোকে করে ফকির নির্দ্দেশ।
মাথায় মুকুট ধর, অঙ্গে পট্ট বস্ত্র পর,
বেশে কিছু নাহি আসে-যায়,
সাধিতে পরের হিত, সদা রত কর চিত
মন যেন থাকে তুষ্ট তায়।
কাম আদি রিপু ছয়, করিলে তাদের জয়,
আর না সংসার-মায়া রয় ;
তবে ত হইবে পূত, ঘুচিবে জঞ্জাল যত,
সুধু কি কৌপীনে সাধু হয় ?
সাঁজোয়া পরিবে বার, সে ধরিবে ধনু তীর,
ভীরুর সমর-বেশ নয়।

ফকির-বেশধারী লোকটীকে সঙ্গে লইয়া একদিন আমরা বহু পর্য্যটনের পর একটী দুর্গ-প্রাচীরের নিম্নদেশে রাত্রিযাপন করিবার মানসে সমবেত হইলাম। সকলে নিদ্রা যাইবার উপক্রম

করিতেছি, এমন সময়ে সেই ব্যক্তি একটী জলপাত্র চাহিয়া লইয়া হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করিবে বলিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল; কিন্তু আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইবামাত্র সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ হইতে মহামূল্য রত্নপূর্ণ পেটিকা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। দুর্গবাসীরা প্রাতে, আমরাই চুরি করিয়াছি, এই সিদ্ধান্ত করিয়া আমাদিগকে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিল; সেই দিবস হইতে আমরা কোন লোককে আমাদের দলে গ্রহণ করি না আর নির্জ্জনে বাস করি; কারণ, আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সমাজের বাহিরে থাকিলেই আমরা নিরাপদ!

দলমধ্যে একজন যদি দোষী হয়,
ছোট-বড় সকলেরে লোকে দোষ দেয়;
একটীও দুষ্ট গাভী রহে যদি দলে,
তার সঙ্গে হয় দুষ্ট অপর সকলে।"

আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম:—"আমি যে আশা করিয়া আপনাদিগের কাছে আসিয়াছিলাম, সে আশায় বঞ্চিত হই নাই। যদিও আমি আপনাদের দলভুক্ত হই নাই, তথাপি আমি আজি যে শিক্ষা পাইলাম, তাহা যাবজ্জীবন আমার কার্য্যে আসিবে।"

দুষ্ট জন সাধুসনে করিলে গমন,
নানা কষ্ট পায় সাধু তাহার কারণ।
গোলাপের জল কেহ কলসে পূরিলে,
কলুষিত হয় স্পর্শ কুকুর করিলে।

ষষ্ঠ গল্প

একদা এক ফকির সুলতানের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। আহার করিতে বসিয়া তিনি ক্ষুধাসত্বেও অল্পাহার করিলেন; কিন্তু প্রার্থনা করিবার সময়ে, লোকে তাঁহার সাধুতার অধিক প্রশংসা করিবে, এই মনে করিয়া অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলেন।

আরব! মক্কায় তুমি যাইবে কেমনে?
যে পথ ধরেছ সে যে যায় তুর্কিস্থানে।

ফকির গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আহারের স্থান প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তাঁহার এক তীক্ষ্ণবুদ্ধি পুত্র ছিল। সে বলিল:—"আপনার না সুলতানের প্রাসাদে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল? সেখানে আপনি কি কিছু আহার করেন নাই?" তিনি বলিলেন:—"কোন অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য আমি তাহাদের সমক্ষে আহারের মত আহার করি নাই।" পুত্র বলিল:—"তবে এখন প্রার্থনার মত প্রার্থনা করুন; কারণ পরকালে আপনার কার্য্যে লাগিবে। আপনি এখনও তাহার কিছুই করেন নাই।"

অন্তরে সকল পাপ করিয়া গোপন,
বাহিরে দেখান ধর্ম্ম কিবা প্রয়োজন?
মেকি টাকা চলিবে না বিচারের দিনে,
তখন কি হবে দশা ভেবে দেখ মনে।

সপ্তম গল্প

বাল্যকালে আমার বড় ধর্ম্মের ভাব ছিল। আমি রাত্রি-জাগরণ এবং আগ্রহসহকারে জপ, তপ ও উপবাসাদি করিতাম। একদিন পিতার কাছে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিলাম, চক্ষের পাতা একবারও পড়ে নাই; কোরাণখানি খুলিয়া আমার ক্রোড়দেশে রাখিয়াছিলাম। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অন্যান্য লোকেরা নিদ্রা যাইতেছিল। আমি পিতাকে বলিলাম:—"ইহাদের মধ্যে একজনও মাথা তুলিয়া প্রার্থনা করিতেছে না; নিদ্রায় এত অবসন্ন যে দেখিলে মনে হয়, যেন মৃতপ্রায়!" পিতা বলিলেন:—"বৎস! এরূপ লোকের নিন্দা না করিয়া তুমিও নিদ্রা যাইলে ভাল ছিল।"

দম্ভভরে অহংকারী করে বিচরণ,
সুধু আপনার গুণ করে বিলোকন।
সমদৃষ্টি হবে বৎস! ঈশ্বর যেমন,
আপনাকে লঘুতম করিবে দর্শন।

অষ্টম গল্প

কতিপয় লোক একবার একজন সাধুর অশেষ গুণের বহু প্রশংসা করিতেছিল। সাধু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মস্তকোত্তোলন-পূর্ব্বক বলিলেন:—"আমার বিষয় আমি ভাল জানি।"

বহির্ভাব দেখি মম করিছ বিচার,
জান না কি আছে ভাই! অন্তরে আমার।
সকলের কাছে আমি দেখিতে সুন্দর,
কিন্তু বড় লজ্জা, মম কুৎসিত অন্তর।
ময়ূরের পুচ্ছ দেখে মুগ্ধ চরাচর,
কদাকার পদ বলে ময়ূর কাতর।

নবম গল্প

লেবানন হইতে একজন ফকির একবার দামাস্কাস নগরের প্রধান মস্‌জিদে উপাসনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ ও অলৌকিক কার্য্য-কলাপের খ্যাতি সমস্ত আরব-দেশে ব্যাপ্ত ছিল। তিনি উপাসনার পূর্ব্বে হস্ত-পদাদি-প্রক্ষালনের জন্য নিকটবর্ত্তী কোন কূপের সংলগ্ন চতুষ্কোণ জলাধারে যেমন নামিবার উপক্রম করিলেন, অমনই পা পিছ্‌লাইয়া তন্মধ্যে নিপতিত হইলেন ও মহাকষ্টে তাহা হইতে পুনরুত্থান করিলেন। উপাসনা শেষ হইলে তাঁহার একজন সঙ্গী তাঁহাকে বলিলেন:—"মহাশয়! আমার একটী প্রশ্ন আছে।" ফকির বলিলেন:—"বল, কি?" তিনি বলিলেন:—"আমি আপনাকে মহাসাগরের উপর পাদচারণ করিতে দেখিয়াছি; তখন ত আপনার পায়ে জল লাগে নাই; আজি এই সামান্য জলাশয়ে পড়িয়া আপনার প্রাণ সংশয়াপন্ন হইয়াছিল, ইহার গূঢ় রহস্য কি?" সাধু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন:—"মহাত্মা মহম্মদ কি বলিয়াছেন, তুমি কি শুন নাই? তিনি বলিতেন, "আমি যখন ঈশ্বর-চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাই, তখন সাধু ধর্ম্ম-প্রচারকগণ, এমন কি, স্বর্গের দেবতারাও আমার সৌভাগ্যের ঈর্ষ্যা করেন।" এই ভাব মহম্মদের চিরস্থায়ী ছিল কি না, সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই; কিন্তু তাঁহার প্রেমাবেশের সময় গারবিয়ল ও মাইকেলের সহিতও কোন সংশ্রব রাখিতেন না। আবার কখন কখন তাঁহার দুই পত্নী হাফ্‌সা ও জৈনাবকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। সাধুদিগের দৃষ্টি আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে ব্যাপ্ত। ভগবান্ কখনও দেখা দেন আবার কখনও লুক্কায়িত হন।"

এই দেখা দিলে প্রভো! আবার লুকালে,
প্রেমের পিপাসা তব অধিক বাড়ালে।
নিমেষ বিহীনে দেখি তোমাকে যখন
দিশেহারা হয়ে যাই, মুগ্ধ হয় মন;
প্রেমানল ক্ষণকাল কর উদ্দীপন,
আবার দুরাশা-হ্রদে করাও মগন,

দশার স্থিরতা নাই, প্রভো, সে কারণ
কভু হর্ষে, কভু দুঃখে কাটাই জীবন।

দশম গল্প

কাননে লুকায়ে পুত্র রাখিল যখন,
জানিতে তখন তব পারিল না মন।
মিসরের দূর দেশে সে পত্র আনিলে,
কেমনে বস্ত্রের ঘ্রাণে তখন জানিলে।
সে বলিল, মম দশা বিদ্যুতের মত
ক্ষণ আলোকিত, পরে আঁধারে আবৃত।
কভু বিদ্যা-বুদ্ধি মম দপ্ করে জ্বলে,
পরক্ষণে জানি না কি আছে পদতলে।
যে সাধু ঈশ্বরে হয় একেবারে লয়,
ইহকাল, পরকাল তার তুচ্ছ হয়।

একাদশ গল্প

আমি একবার ব্যালবাকের মস্‌জিদে ধর্ম্ম-বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছিলাম; কিন্তু সমাগত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহই মন দিয়া শুনিতেছিল না, তাহাদের অন্তঃকরণ কাষ্ঠের ন্যায় কঠিন, সকলেই বিষয়াসক্ত, আধ্যাত্মিক পথে যাইতে কাহারও ইচ্ছা ছিল না। অন্ধের সম্মুখে দর্পণ ধরা ও এরূপ পশুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তথাপি ধর্ম্মালোচনার দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত, এই মনে করিয়া আমি উপদেশ দিতে বিরত হই নাই। আমি তখন কোরাণ হইতে একস্থলের ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। সে স্থলটী এই:—"ভগবান্ যত মানবের কাছে কাছে, তাঁহার গ্রীবার শিরাসকলও তাঁহার তত কাছে।"

প্রেমময় যত কাছে, দেহ নয় তত
তাঁহা হতে আমি হায়, আছি দূরে কত!
কি করিব, কারে কিছু নাহি বলিবার,
আমি তাঁকে ছাড়া—তিনি ক্রোড়েতে আমার।

এই প্রকার চিন্তায় আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলাম, তখন আমার বলিবারও কিছু বাকি ছিল, এমন সময়ে একজন সাধু আমাদের কাছ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমার শেষ কথা শুনিয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার আনন্দধ্বনি ও উৎসাহে সেই সকল মূর্খও যোগ দিল। আমি বলিলাম, "প্রভো! তোমার কি মহিমা! যাহারা তোমাকে জানে, তাহারা দূরে থাকিলেও তোমার নিকটে; আর যাহারা না জানে, তাহারা তোমার নিকটে থাকিলেও বহুদূরে।"

শ্রোতা না বুঝিলে বক্তা কি করিতে পারে?
শত চেষ্টা নাহি পারে বুঝাতে তাহারে।
মন খুলে যদি শ্রোতা আসে সভাস্থলে,
তবে শিক্ষালাভ করে বক্তৃতার বলে।

দ্বাদশ গল্প

মক্কার পথে মরুভূমির উপর দিয়া যাইতে যাইতে একদিন রাত্রিতে নিদ্রাভারে এত শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম যে, আমার চলচ্ছক্তি রহিল না। আমি ভূতলে পড়িয়া উষ্ট্রচালককে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলাম।

যে পথে উষ্ট্রের গতি হল অতি ভার,
পর্য্যটক পায়ে হেঁটে যাবে কত আর?
যতদিনে হৃষ্ট-পুষ্ট হয় কৃশকায়,
ততদিনে জীর্ণ-শীর্ণ জীবন হারায়।

সে বলিল:—"ভাই! সম্মুখে মক্কা, পশ্চাতে তস্কর; যদি আর কিছুক্ষণ চলিতে পার, তাহা হইলে জীবনরক্ষা করিতে পারিবে। যদি নিদ্রা যাও, নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হইবে। তুমি কি শুন নাই—

'যাত্রিগণ দলবদ্ধ হয়ে মরুস্থলে,
নিশীথে মক্কার পথে সবে যায় চলে;
পথশ্রান্ত হয়ে কেহ যদি নিদ্রা যায়,
প্রাণের সকল আশা তাহার ফুরায়।'"

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

শ্যামের বাঁশী

কবিবর টেনিসন্ তাঁহার Idylls of th· king নামক কাব্যে সুন্দর একটী আধ্যাত্মিক তত্বের আলোচনা করিয়াছেন। কাব্যের সৌন্দর্য্যটুকুই সেই তত্বের পরিস্ফুটনে। সেইটুকু বাদ দিলে কাব্যখানির সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। এক কথায় বলিতে গেলে কাব্যখানিকে একটী "রূপক" বলিতে পারি। আমাদের রাধা-কৃষ্ণের উপাখ্যানটীও সেই কাব্যে দেখিতে ইচ্ছা হয়। রাধা ও কৃষ্ণ নামে যে কোন প্রকৃত লোক আছে এবং তাঁহারা যে ব্যাস্তবিকই ঐরূপ প্রেমলীলার অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং আমরা কৃষ্ণলীলাকে একটী রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। কোনও রসিক ভক্ত কবি উক্ত আখ্যায়িকা রচনা করিয়া একটী অ্যধ্যাত্মিক তত্ব প্রচার করিয়াছেন মাত্র। আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা সাধারণ লোকের নিকট প্রায়ই নীরস বলিয়া বোধ হয়। দার্শনিক আলোচনা কয়জনের কাণে মিষ্ট লাগে? কয়জন দার্শনিক পণ্ডিতের তর্ক-বিতর্ক শুনিতে যান? মহামহোপাধ্যায়, তর্কালঙ্কার, স্মৃতিরত্ন, তর্কভূষণ প্রভৃতি খেতাবধারী বড় বড় পণ্ডিতের বাক্-বিতণ্ডাপূর্ণ সভায় কয়জন যোগদান করিয়া থাকেন? কিন্তু যাত্রা-থিয়েটারে অনেকেই গিয়া থাকেন। যাত্রা থিয়েটারেও ত উপদেশ আছে; তবে সে উপদেশ চক্ষু কর্ণের তৃপ্তিকর আবরণে আবৃত থাকে বলিয়াই তাহা সাধারণের নিকট এত আদরের! আমরা কাহারও নিকট উপদেশ শুনিতে বড় ভালবাসি না; কিন্তু উপদেশটুকু যদি কোন ঘটনার ভিতর দিয়া পাওয়া যায়, তবেই তাহা আমাদের মনে অঙ্কিত হইয়া থাকে। আমরা কৃষ্ণলীলার মধ্যেও একটী দার্শনিক তত্ব দেখিতে পাই। দার্শনিক তত্ব আমাদের নিকট নীরস। এই নীরস তত্বকে সাধারণের নিকট সরস করিবার জন্যই রসিক ভক্ত এই

রসপূর্ণ কৃষ্ণলীলার অবতারণা করিয়াছেন। আমরা সে নিগূঢ় তত্ত্বটুকু বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণলীলাকে অতীব নিকৃষ্টভাবে দেখিয়া থাকি এবং খৃষ্টান পাদরীদের সুরে কৃষ্ণকে একটা লম্পট বলিয়া ধারণা করিয়া থাকি; এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে যে, 'উপযুক্ত গুরুর নিকট ভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না।

এস্থানে কৃষ্ণলীলার আমূল আলোচনা না করিয়া কেবলমাত্র 'শ্যামের বাঁশী'র কথাই তুলিব। হয়.ত কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, সব ছাড়িয়া 'শ্যামের বাঁশী' ধরিয়া টানাটানি কেন? তাহার উত্তরে এই বলিতে চাই যে, 'শ্যামের বাঁশী' সকলের মূল। 'শ্যামের বাঁশী' না হইলে কি কৃষ্ণলীলার অভিনয় হইত? বাঁশী না হইলে কি গোপাঙ্গনাগণ কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়া শ্যামের অনুগামিনী হইত? বাঁশীর সুরই তাহাদের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিত, তাহারা আর একদণ্ড ঘরে থাকিতে পারিত না। সে বাঁশী যে শুনিয়াছে, সেই মজিয়াছে; সে বাঁশীর সুর যাহার কাণে বাজিয়াছে, সেই পাগল হইয়াছে। সে বাঁশী আজও বাজিতেছে এবং চিরদিনই বাজিবে! যে শুনিতে চায়, সে শুনিতে পায়; অপরে শুনিবে কিরূপে? সে বাঁশী চিরদিন সমানভাবে বাজিতেছে; কিন্তু সংসারের কোলাহলের মধ্যে তাহার সুর বড়-একটা কাণে আসে না। যাহার কাণে সে সুর বাজিয়া উঠে, সে কি আর ঘরে থাকিতে পারে—তাহার প্রাণ কি আর ঘরে থাকিতে চায়? সে বাঁশীর সুর একদিন কপিলবস্তুর রাজভবনে বাজিয়া উঠিয়াছিল! গৌতম বুদ্ধ নানাবিধ ভোগ-বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও সেই মোহন বাঁশীর সুর শুনিতে পান এবং পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া, রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, বনে প্রাবশ করেন। নিমাই একদিন সেই সুর শুনিয়া স্নেহময়ী মাতা ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়েন। রামকৃষ্ণের কাণে একদিন সেই সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল! আর তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখে কে? কেশব সেন, রামমোহন, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কাণেও সে বাঁশীর সুর বাজিয়াছিল! আরও কত মহাত্মা যে সে বাঁশীর সুরে পাগল হইয়া বনে-জঙ্গলে, গিরিগুহায় অবস্থান করিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে? সুধু ভারতভূমিতে নয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই সে বাঁশী বাজিয়া থাকে। সে বাঁশীর সুর শ্রীমতী আনি বেসান্তের হৃদয়ও স্পর্শ করিয়াছে; তাই আজ তাঁহার এরূপ বেশ!

সে বাঁশী সব সময় সব জায়গায় একই সুরে বাজিতেছে, সে সুরের বিরাম নাই; কিন্তু শুনিবে কে? শুনিবার ইচ্ছা কাহার? জড় জগৎ ক্রিয়াকলাপে এতই ব্যাপৃত, বিষয়-সুখে এতই উন্মত্ত যে, সে মোহন বাঁশীর সুর শুনিবার অবকাশই পায় না! সব সময়ে সে সুর কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিতে পারে না। এত কোলাহলের মধ্যেও হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে হঠাৎ সে সুর বাজিয়া উঠে; কিন্তু বেশীক্ষণ বাজে না, একটু পরেই যেন আবার নীরব হইয়া যায়! সে সুর যেন হঠাৎ বাজিয়া উঠিয়া হঠাৎ নীরব হইয়া পড়ে—ভাল করিয়া বুঝিবারও সময় হয় না! জনাকীর্ণ রাজপথে চলিতে চলিতে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় অকস্মাৎ প্রাণের মাঝে কি কখনও সেই সুর একবার বাজিয়া উঠে নাই? অত জনতার মধ্যেও কি একবার নির্জ্জনতা বোধ কর নাই? কিন্তু বেশীক্ষণ ত থাকে না; মুহূর্ত্তের মধ্যেই যে আবার নীরব হইয়া যায়; তাই আমিও সেই কোলাহলের মধ্যে যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি! যখনই বাজিয়া উঠে, তখনই যদি হৃদয়-বীণাটী সেই বাঁশীর সুরে বাঁধিয়া লওয়া যায়, তবেই চিরদিন প্রাণের মাঝে সেই মধুর ঝঙ্কার হইতে থাকে। হৃদয়-বীণার সুর বাঁশীর সুরে বাঁধা চাই; নতুবা বেসুরে বাজিয়া উঠে। যখন এই দুই সুর এক হইবে, তখনই বাঁশীর সুর মন, প্রাণ পাগল করিয়া তুলিবে—সংসার-কর্ম্মে আর মন লাগিবে না—সুধু শ্যামের জন্য প্রাণ আকুল হইবে; কিন্তু মানুষের হৃদয় সব সময় বেসুরে বাজিতেছে—কখনও কামের সুরে, কখনও ক্রোধের সুরে, কখনও নানাসুরে। এই দুই সুরকে চিরদিন এক করিয়া রাখা বড় সহজ নহে। যখন দুইএর সুর এক হইবে, তখন সর্ব্বদাই মনে হইবে—

"অই বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি মনোমাঝে"

কোলাহলের মধ্যেও বাঁশীর সুর শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা যেন নিমেষে নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে! কোলাহল হইতে দূরে গিয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে একবার বসিতে পারিলে বাঁশীর সুর আরও স্পষ্ট, আরও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। যখন সান্ধ্য গগনে দুই-একটী তারা ফুটিয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে দিগন্তের কোলে অন্ধকার আসিয়া দেখা দেয়, তখন লোকালয়ের কোলাহল হইতে দূরস্থিত কোন নির্জ্জন প্রান্তর কিম্বা শ্মশানভূমিতে একাকী বসিয়া অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কি জানি কোন্ অজানা সুরে হৃদয়-বীণা বাজিয়া উঠে! রাত্রে যখন চাঁদের আলোতে দিগন্ত হাসিতে থাকে, নদীর জল টল টল করিতে থাকে এবং পরপারে হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া বাতাস বহিতে থাকে, তখন কে না সেই বাঁশীর সুর শুনিতে পায়—কাহার হৃদয় না নাচিয়া উঠে? প্রকৃতির ঐ শোভার মধ্যে যে বসিয়া আছে, সেই বুঝিয়াছে বাঁশীর সুর কত স্পষ্ট! সে সুর প্রাণে কি যেন এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলে! জানি না, সে কি সুর—বুঝি না, সে কেমন সুর! সুধু জানি, সে বড় প্রাণ-মাতান' সুর—সুধু বুঝি, সে যেন বিরহের সুর! সে সুরের মধ্যে কি যেন একটা আকৃতি, একটা অভাব, একটা বিরহ সদাই জাগরুক রহিয়াছে।

কিসের অতৃপ্তি জানি না, কাহার অভাব, কাহার বিরহ বুঝি না; সুধু বুঝি প্রাণে অতৃপ্তি, হৃদয়ে বিরহ। কাহার জন্য, কিসের জন্য, প্রাণ তখন আকুল হইয়া উঠে! সে আকুলতা কি মিটিবার নয়; সে বিরহ কি দূর হইবার নয়? সীমার মধ্যে থাকিতে প্রাণ চায় না, সব গণ্ডি ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া একবার সীমার বাহির হইয়া পড়িতে চায়! সীমার মধ্যে থাকিয়া প্রাণে তৃপ্তি আসে না, আকাঙ্ক্ষা মিটে না, বিরহ দূর হয় না। বাঁশীর সুরে প্রাণে যে বিরহ জাগিয়া উঠে, সে বিরহের কারণ সসীমের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, জগতের কোন বস্তুই সে বিরহ দূর করিতে পারে না। সে বাঁশীর সুর একেবারে ঘরের বাহিরে—সকল সীমার বাহিরে লইয়া যায়; কিছুতেই আর সীমার মধ্যে থাকিতে দেয় না। সে বাঁশীর সুর সান্তকে অনন্তের দিকে সসীমকে অসীমের দিকে টানিয়া লয়। এই জন্যই বিরহ। যতক্ষণ সসীম অসীমের কোলে যাইতে না পারে, ততক্ষণ তাহার প্রাণে দারুণ বিরহ জাগিয়া থাকে। সসীম ও অসীমের মিলনে শান্তি, প্রেম, আনন্দ!

"শ্যামের বাঁশী" সেই সান্তের প্রতি অনন্তের, জীবাত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান। ভগবান্ চিরদিনই জীবকে শান্তির পথে আহ্বান করিতেছেন। জড় জগতের কোন বস্তুতেই চিরশান্তি নাই। "অসৎ"এর সংসর্গে শান্তি নাই; এইজন্যই "সৎ"এর সংসর্গে যাইবার জন্য এমন মধুর আহ্বান! সে আহ্বান শুনিলে কে স্থির থাকিতে পারে? জাতি, কুল, মান, লজ্জা, ভয় অর্থাৎ সকল সীমাই ভাঙ্গিয়া যায়; সসীম তখন অসীমের দিকে ছুটিয়া যায়; কোন বাধাই মানে না।

শ্রীবিজয়গোপাল ঘোষ

অভিসার

জীবন-যমুনাতীরে হে প্রেমিকরাজ,
জানি না কখন্ তুমি গেয়ে গেলে গান!
লিপ্ত ছিনু সংসারের কাজে; দূর হ'তে
শুনি' সে সঙ্গীত মম অধীর পরাণ।
চারিদিক্ শাসনেতে রেখেছে রুধিয়া,
তবু ওগো, সব বিঘ্ন ঠেলিয়া চরণে,
তোমার মিলন-আশে যেতে চায় ছুটি'
এ আত্মা বালিকা-বধূ। আসি' জনে জনে,
চারিদিক্ হ'তে দেয় গঞ্জনার গালি;
ধরার সাজান' স্বামী সদা রোষভরে
বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। এ পাগল মন
তবু যে কাঁদিছে ছুটি' যাইতে কাতরে!
মন-চোরা! জানি নাক' কবে অভিসার,
বাঁধিবে মিলন-গ্রন্থি তোমার আমার!

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মোহভঙ্গ

বয়স চলিয়া যায় ছুটি' অতিদ্রুত চঞ্চল চরণে,
হেনকালে দৈববাণী এক বহুদূরে পশিল শ্রবণে।
দৈববাণী কহে নরে ডাকি,'—"হে মানব, ভ্রান্ত মোহ-মাঝে;
দিন যে চলিয়া যায় তব, জান না এসেছ কোন্ কাজে?"
সহসা চমকি' উঠি' নর মহাভীত কম্পিত ভাষায়,
আকুল আবেগে কাঁদি' ডাকে—"রে বয়স, ফিরে আয় আয়!
এতদিন চিনি নাই তোরে ভ্রান্ত আমি ছিনু অচেতন,
আজি যেন কার বাণী শুনি' ঘুচে গেছে সে মোহ-স্বপন!
রে বয়স, ফিরে আয় ভাই, হৃদয়ের সব ধন দিয়া
এবার পূজিব তোরে, সদা বুকে বুকে রাখিব মাখিয়া।"
ভগ্নকণ্ঠে কহিল বয়স,—"ওই কাল ডাকিতেছে ভাই,
বহুদূর যেতে হবে মোরে, মাঝখানে কেমনে দাঁড়াই?"

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অরুণা

পঞ্চাঙ্ক নাটক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অরণ্য—পর্ব্বতগুহা

রণজিৎসিংহ, মহাদেও ও জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। যাই বলুন দাওয়ান-জি, সর্দ্দার বৃদ্ধ; প্রাণপণ চেষ্টাতেও যখন এই তিন বৎসরেও কিছু কর্ত্তে পারলাম না, তখন আমার বোধ হয়, আশা খুব কম।

রণজিৎ। কেন বল দেখি?

মহাদেও। তোমার বুঝি আর কষ্ট সহ্য হচ্চে না?

সৈনিক। কষ্টের কথা কি বল্ছ? সহ্যগুণ না থাক্‌লে কি আজ তিন বৎসর, যেদিন সর্দ্দার দেশে দেখা দিয়েছেন, সেইদিন হতে তাঁর পিছু পিছু বিপদ মাথায় করে ঘুরি? রায়গড়ের সৈনিক কষ্ট সহ্য কর্ত্তে খুব পারে।

রণজিৎ। তোমাদের মত বিশ্বাসী বন্ধুদের সংখ্যা যদি বেশী হ'ত, তা'হলে ধনবীর সিংহ বহুদিন পূর্ব্বে রায়গড় দুর্গ অধিকার কর্ত্তে পার্ত্তেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রায়গড়-অধিবাসী স্বর্গগত সর্দ্দারকে বিস্মৃত হয়েছে।

সৈনিক। না দেওয়ান-জি, তারা সর্দ্দার-জির পিতাকে বিস্মৃত হয় নি। আপনার কাছে বল্‌লে দোষ হবে না, তাই বল্‌ছি, তাদের অনেকের ধারণা, আমাদের সর্দ্দার সুধু দস্যুতা কর্‌তেই এসেছেন; পিতৃ-অধিকার পুনরুদ্ধারে তাঁহার বিশেষ যত্ন নাই।

রণজিৎ। মূর্খ তারা। এটা বোঝেনা যে, লোক-বল না হ'লে সম্মুখ-যুদ্ধ সম্ভবপর নয়? আর তাদেরও বিশেষ দোষ নাই। সম্পৎরাওয়ের অনুচরগণ, আমাদের সর্দ্দারকে দস্যু ব'লেই সাধারণের নিকট পরিচিত কর্‌তে ব্যস্ত।

সৈনিক। তাদের দোষ কি? সর্দ্দার-কন্যাই যখন পিতার কার্য্য অনুমোদন না করে গৃহত্যাগিনী, তখন অপরের দোষ কি?

মহাদেও। তাদের দোষ নাই? তারা কি রায়গড়ের অধিবাসী নয়? কিন্তু, আজ সর্দ্দার প্রায় চারি মাসের পর আমাদের আহ্বান করেছেন, আজ আমাদের এরূপভাবে তাঁহার কার্য্য আলোচনা করা উচিত নয়। ধনবীর সিংহ আমাদের সর্দ্দার; তিনি যেরূপ আদেশ কর্‌বেন, আমরা সেইরূপই কর্‌বো। হিতাহিত বিবেচনা কর্‌বার অবসর আমাদের নাই।

(শোভাসিংহের প্রবেশ)

রণজিৎ। কুমার, সর্দ্দার-জি কি গাত্রোত্থান করেছেন?

শোভাসিংহ। হাঁ সিংহ-জি, আমি আপনাদিগকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতেই এসেছি। সিংহ-জি, আপনি আমাকে 'কুমার' বলে সম্বোধন করেন কেন?

রণজিৎ। কেন শোভাসিংহ, তুমি রায়গড়-সর্দ্দারের পুত্র, তোমায় 'কুমার' বলে সম্বোধন করা আমাদের উচিত।

শোভা। (স্বগত)

অদৃষ্টের পরিহাস!
কোথা রায়গড়
কে তাহার অধিপতি!
পিতা মম করে নাই
একদিন তরে,
রায়গড়ে প্রজার পালন;

কিন্তু রায়গড় তাঁর
পিতৃ-অধিকার ; তাই তিনি
উদ্ধারিতে সেই অধিকার
নিজ প্রাণ করেছেন পণ।
না শুনেন কারও কথা।
বলে বা কৌশলে রায়গড়ে
হব অধিষ্ঠিত,
এই তাঁর পণ।
অভাগিনী ভগ্নী মোর
অত্যাচারে বাধা দিয়ে তাঁর,
অসন্তুষ্ট করেছিল তাঁরে।
তারপরে গৃহত্যাগী, কোথা
গেছে চলে, চারি মাস
সংবাদ না পেলেম তাহার !

রণজিৎ। কুমার, অরুণার কোন সংবাদ পেয়েছ কি ? আমি ত কোন সংবাদই পাই নাই।

শোভাসিংহ। সিংহ-জি,
জীবিতা কি মৃতা ভগ্নী,
চারি মাসে না হল নির্ণয় !
আহত পিতারে ফেলি,
নিজে আমি পারি নাই
সন্ধান লইতে তার !
এইবার
খুঁজিব তাহারে নিজে।
যদি সে জীবিতা থাকে
ফিরায়ে আনিব তারে
পিতৃ-সন্নিধানে।

রণজিৎ। শোভাসিংহ,
তোমারে ও অরুণারে
আমি নিজ হস্তে করেছি
পালন। অরুণার নিরুদ্দেশে
কাতর হতেছে হৃদি ;
কিন্তু
যদি সে পতিতা আজি
শত্রুর কবলে,
নাহি জানি কি আছে
অদৃষ্টে তার !

শোভাসিংহ। ভগ্নীর কেশাগ্র-হানি
যে পাপিষ্ঠ করিবে সাধন,
তার রক্তে স্নাত হবে
পিতৃদত্ত এ অসি আমার।

রণজিৎ। বৎস !
উত্তেজিত হ'ওনা সত্বর।
আগু-পাছু বিবেচনা করি
নিজকার্য্য করিও সাধন,
পশ্চাতে সুফল পাবে।

২য় সৈনিক। কুমার বেলা অধিক হল। আপনি আমাদিগকে সর্দ্দার-সন্নিধানে লয়ে চলুন। আজ প্রায় চার মাস আমরা সর্দ্দারকে না দেখে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি।

শোভাসিংহ। সৈনিক, তোমরা জনে জনে পিতার বিশ্বস্ত বীর অনুচর ; নিরুৎসাহ হলে পিতাও নিরুৎসাহ হবেন। তোমরাই তাঁর ভরসা। আমি তোমাদের এখনি তাঁর কাছে নিয়ে যাব, তিনি তোমাদের দেখে যার-পর-নাই আহ্লাদিত হবেন। যদি তোমাদের ন্যায় আর ৫০০ শত বীর পিতার থাকৃত, তা হলে আমরা সম্মুখ-যুদ্ধে রাঠোরকে পরাজিত করতে পার্‌তাম্ ; কিন্তু তোমাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ; সুতরাং পিতাও সম্মুখ-যুদ্ধে দুর্গ-আক্রমণে অক্ষম। (স্বগত) যদি আজ আমাদের লোক বল থাকৃত, তা হলে আমাদের হীন দস্যুর মত গহ্বরে গহ্বরে লুকিয়ে বেড়াতে হত না। আর অরুণাকেও হারাতে হত না !

২য় সৈনিক। কুমার ! যতদিন দেহে প্রাণ থাক্‌বে, ততদিন সর্দ্দারের কার্য্যে এদেহ নিয়োজিত থাক্‌বে। একদিনের জন্যও কার্য্যকালে আমাদিগকে নিরুৎসাহ দেখ্‌তে পাবেন না।

রণজিৎ। শোভাসিংহ, তবে চল বৎস, আমরা তোমার পিতার নিকট যাই।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

শয্যাশায়িত ধনবীর, মহাদেও, রণজিৎ,
শোভাসিংহ ও অন্যান্য সৈনিকগণ।

ধনবীর। রণজিৎ !
রায়গড় হতে
নূতন সংবাদ কিছু পাইয়াছ
তুমি ? এখনও কি নিশ্চিন্ত
রয়েছে তারা ?

রণজিৎ। তিনমাস শয্যাগত ছিলে
ধনবীর, এখনও ফিরেনি
স্বাস্থ্য তব। বিশ্রাম লভ হে
কিছুদিন, রাঠোর-বিদ্বেষী
আছে বহুরাজা।
অগ্রে তাহাদের সাহায্য লভিতে, চেষ্টা—
করা উচিত মোদের ;
তারপর, পুনঃ
নবীন বিক্রমে, সম্পতেরে
কর আক্রমণ।

ধনবীর। বিশ্রাম !
বিশ্রামে দিয়েছি বিসর্জ্জন
রণজিৎ !
রণজিৎ ! রায়গড়ে পিতার
আসনে, হয় লভিব বিরাম,
নহে স্বকার্য্য-সাধনে
চির-বিশ্রামের পথে হব
অগ্রসর। রণজিৎ, জান তুমি,
করিয়াছি পণ
অপরের সাহায্য না লব ;
কৌশলে অথবা বলে
হৃত-অধিকার মম করিব
উদ্ধার। এ কার্য্য-সাধনে
প্রতিবাদী যেবা মম হবে,

শত্রু সেই—আত্মীয় নহেক মম।
মুষ্টিমেয় অনুচর লয়ে
উদ্যম আমার—তাই
দস্যু বলি ঘৃণা করে
দস্যুর অধম সে সম্পতরাও।
রণজিৎ ! ছদ্মবেশে নিজে
তুমি যাও রায়গড়। জান
এবে, প্রধানগণের মত কিবা।
বৃদ্ধ প্রধানেরা সতাই কি
ভুলিয়াছে পিতারে আমার ?

(জনৈক অনুচরের প্রবেশ)

রণজিৎ। সর্দ্দার, এই ব্যক্তিকে আমি রায়গড়ে চর প্রেরণ করেছিলাম। অগ্রে এর মুখে সমাচার শুনুন, তারপর যা উচিত হয়, কর্‌বেন। অনুচর, তোমার সংবাদ কি ?

অনুচর। প্রভু, রায়গড়ে আজকাল সিংহগড়ের অনেকে এসে বসবাস কচ্চে। তাদের প্ররোচনায় রায়গড়ের অনেকেই আপনাকে আর প্রভু বলে স্বীকার কর্ত্তে চায় না ; অধিকন্তু, বল্‌তে ভয় হয়, তাহারা আপনাকে দস্যু নামে অভিহিত কর্ত্তেও দ্বিধা বোধ করে না।

ধনবীর। (শয্যা হইতে উঠিয়া)
ভণ্ড অবিশ্বাসী—
কুক্কুরের দল, সর্দ্দার-তনয়ে
দস্যু অভিধানে করে অভিহিত !
তাই হ'ক তবে।
এতদিন রায়গড়ে অত্যাচার-স্রোত
আমি করি নাই প্রবাহিত।
এইবার—এইবার শাস্তি দিয়া
মূর্খগণে দেখাইব,
একা ধনবীর সিংহ
কি করিতে পারে দস্যুরূপে !
রণজিৎ !
শীঘ্র তুমি কর আয়োজন,
রায়গড় লুণ্ঠন করিয়া—
লুণ্ঠিত ধনের দ্বারা রায়গড়
করিব উদ্ধার।
রায়গড়-অধিবাসী
দস্যু ধনবীর ! দস্যু ! দস্যু !

রণজিৎ। ধনবীর সিংহ, সর্দ্দার, স্থির হও। উত্তেজনায় কিছু ফল হবে না। দশদিন সময় দাও, এই দশদিনের মধ্যে আমি নিজে গিয়ে একবার রায়গড়ের অবস্থা দেখে আসি, তারপর যা বিবেচনায় হয়, করা যাবে।

ধনবীর। বিবেচনার সময় আর নাই রণজিৎ ! বিবেচনায় অনেক সময় হারিয়েছি—বিবেচনায় জীবনের শেষ সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছি—আর অবসর আমার নাই। বিবেচনার প্ররোচনায় দূরদেশে অপরের সাহায্য-আশায় গিয়াছি, পিতৃদেবের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত হতে পারি নি। দেশে দেশে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছি—কোথাও শক্তিলাভ কর্‌তে পারি নি। পিতার অপমানের—চৌহান-বংশের অবমাননা—প্রতিশোধ দিতে পারি নি। এইবার বিবেচনার কবল হতে মুক্ত হয়েছি, কথঞ্চিৎ প্রতিশোধের উপায় পেয়েছি। আর বিবেচনা নয়। এইবার—কার্য্য—কার্য্য।

শোভাসিংহ। পিতা প্রকৃতিস্থ হ'ন, সিংহ-জীর আবেদনে কর্ণপাত করুন, তারপর আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য আমরা, আমাদের যা আদেশ কর্ব্বেন, আমরা তাই পালন কর্ব্ব।

ধনবীর। তাই হোক্। কিন্তু রণজিৎ, এই শেষবার।

শোভাসিংহ। পিতা, আমার এক ভিক্ষা আছে।

ধনবীর। কি বৎস ?

শোভাসিংহ। পিতা, আদেশ দিন, আমি অরুণার সন্ধানে যাই।

ধনবীর। শোভা,
দস্যুগৃহ বলি
ঘৃণায় যে ত্যজিয়াছে
পিতৃগৃহ তার—হেন
কন্যা-সন্দর্শনে স্পৃহা
নাহি মোর। আমি যাই
স্বকার্য্য-সাধনে, বাধা দিতে
তায় চাহে যেই,
তারে কন্যা বলি দিতে
পরিচয় ঘৃণা হয় মোর।

শোভাসিংহ। পিতা, দয়া করুন। অরুণা বাস্তবিকই আমাদের ত্যাগ করেছে কি না, জানি না। যদি সে কোনও দুর্বৃত্তের হাতে পড়ে থাকে, তবে তাকে উদ্ধার করা কি আমাদের উচিত নয় ?

ধনবীর। সত্য ! এও ত সম্ভব ! যদি তাই হয়—শোভা, তুমি এই দণ্ডেই যাও, অরুণাকে নিয়ে এস। যদি কোন দুর্বৃত্ত তা'র উপর অত্যাচার করে—তাকে যথোচিত শাস্তিপ্রদান ক'র। এ কথা ত আগে ভাবি নাই !

শোভাসিংহ। পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন সফল হয়ে ফির্‌তে পারি।

ধনবীর। এস বৎস ! খুব সাবধান, শত্রু চারিদিকে।

(শোভাসিংহের প্রস্থান)

সৈনিকগণ ! তোমরাই আমার ভরসা। যদি রণজিৎ সিংহ সফল হয়, তবে আর কিছুদিন পরেই রায়গড়ের সর্দ্দার তার কৃতজ্ঞতা জানাবার অবসর পাবে।

মহাদেও। সর্দ্দার, আপনার এই অনুগ্রহই যথেষ্ট, আমরা এর অধিক প্রত্যাশা করি না। আপনি আবার সুস্থ হয়ে আমাদের চালনা করুন,—জগদীশ্বরের নিকট এই আমাদের প্রার্থনা।

রণজিৎ। ধনবীর, আমি তোমার পিতার অধীনে কার্য্য করেছি। আমার একটী অনুরোধ, তোমার দুর্ব্বল শরীর, সহসা উত্তেজিত হ'ও না।

ধনবীর। রণজিৎ ! তুমি কেবল পুরাতন কর্ম্মচারী নও, তুমি আমার আবাল্য বন্ধু। আমি যতদূর সম্ভব চেষ্টা কর্‌ব, যাতে উত্তেজনা না আসে।

রণজিৎ। তবে আমরা নিজ নিজ কার্য্যে যাই, তুমি একটু সুস্থির হও।

১ম সৈনিক। আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন সর্দ্দার—

ধনবীর। এস বন্ধুগণ !

(ধনবীর ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

অরুণার উপর উৎপীড়ন করে ভাল করি নি। তাকে দেখে তার মাকে মনে পড়ে। অরুণা আমার কার্য্যে অনুমোদন করে না—এই তার দোষ ; কিন্তু আমি কি কর্‌ব ? যদি রণজিৎ সফল না হয়—তা হলে প্রকৃত দস্যুতাই কর্‌ব। যেমন করেই হোক্ রায়গড় চাই।

ক্রমশঃ

শ্রী—

শিল্প সম্পদে রাজপুতানা

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাংশে একলক্ষ বত্রিশ হাজার বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া আর্য্যগণের বীরত্বনিকেতন রাজপুতানা অবস্থিতা। তুষার-মণ্ডিতা আরাবল্লী পর্ব্বতমালা বীরভূমি রাজপুতানাকে-উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশদ্বয়ে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছে। পরলোকগত সুবিখ্যাত বায়ুবিজ্ঞানবিৎ স্যর জন ইলিয়ট্ বলেন যে, রাজপুতানার উত্তর-পশ্চিমাংশ বালুভূমিপরিপূর্ণ এবং ঐ স্থানের মৃত্তিকা একরকম রসহীন বলিলে অত্যুক্তি হয়; পশ্চিমাংশের সুবিশাল সাহারা মরুভূমির তুলনায় ঐ স্থানটি অপেক্ষাকৃত উত্তম। উত্তর-পূর্ব্ব রাজপুতানার যে যে অংশ আরাবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে ও বীরপ্রসূ পাঞ্জাবের সীমান্তে অবস্থিত, সেই সেই অংশ অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর; কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ উত্তর-পশ্চিমাংশ অপেক্ষা উচ্চভূমিতে অবস্থিত ও উর্ব্বর এবং তথায় কত বিচিত্র কীর্ত্তি-কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, কত অসামান্য শিল্পনৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যগণের প্রাচীন ব্যক্তিগণের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া কেহই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। অসংখ্য পর্ব্বতশ্রেণী, অসংখ্য বনভূমি ও অসংখ্য নদীদ্বারা বীরশ্রেষ্ঠ রাঠোর, চৌহান ও শিশোদীয়গণের আবাসভূমি পরিপূর্ণ। তুষার-শুভ্র আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্বপার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পার্ব্বত্য দেশ, গভীর উপত্যকা ও প্রস্তর-সমাকীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া একটি পথ গমন করিয়াছে এবং তাহা একেবারে পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে—এমন কি দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের নগরসমূহ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে ও সেই স্থানের উপত্যকাসকল বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। হায়, কালের কি অপ্রতিহত প্রভাব! পঞ্জাব, যুক্ত-রাজ্য, মধ্য-ভারতবর্ষের করদরাজ্যসমূহ এবং বোম্বাই প্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশ রাজপুতানার ভৌগোলিক সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ব্রিটীশ-শাসনে যে আজমীর এখন একটি প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত, পূর্ব্বে মুসলমান-রাজত্বকালে সেই আজমীর ভারতের রাজধানী ছিল এবং অধিক সময়ই নবাবগণ তথায় অবস্থান করিতেন।

উত্তর-ভারতে কোন্ জাতির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে তাহা লইয়া চতুর্দ্দিকে যখন ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়েই রাজপুতানার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ধর্ম্মমত পরিচালনা করিবার জন্য কালসদৃশ সমর-সাগরে ঝম্পপ্রদান করায়, আজ ভারতের ইতিহাস অন্যভাব ধারণ করিয়াছে। সুধাপানে দৈত্যগণের অমরত্বলাভ করা যেরূপ অসম্ভব, হেমমৃগের জন্মও যেরূপ অস্বাভাবিক, রাজস্থানের ইতিহাস আলোচনা করিতে যাওয়াও আমার ন্যায় অনৈতিহাসিকের সেইরূপ ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না; তবে রাজপুতানার কলা-কৌশল, কারুকার্য্য ও শিল্প-চাতুর্য্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সমস্ত কার্য্যেই ধর্ম্মের আধিপত্য নীরবে বিরাজ করিতেছে। আমার বোধ হয় যে, যে সকল শিল্পে সুন্দর গঠনের চিত্রাঙ্কন বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে সজীবতা প্রদান করিতে হইলে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় চিত্রসমূহ অঙ্কন করাই যুক্তিযুক্ত। রাজপুতানার সমস্ত শিল্পকার্য্যেই ধর্ম্মভাব বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজপুতানার শিল্প-চাতুর্য্য বর্ণনা করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; অতএব ভীল, ও রাজপুতানার আদিম অধিবাসিবৃন্দের এবং মধ্য-এসিয়ার প্রাচীন আক্রমণকারিগণের বিবরণ বর্ণনা করা একরূপ অনাবশ্যক বলিলেই হয়। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্য দিয়া বৈদিক আর্য্যগণ শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য—এমন কি, রাজপুতানা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্পিগণের উপরও একটা স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন—তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। গজনী-অধিপতি সুলতান মামুদ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজপুতানার পশ্চিমাংশ আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে মোগলাধিপত্যকাল পর্য্যন্ত রাজপুতানার শিল্পের উপর মুসলমান-প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সেই সময়ে এক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় চিত্র ব্যতীত অন্যান্য শিল্পকার্য্যে রাজপুতানা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মামুদের প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মহম্মদ ঘোরী রাজপুতানা আক্রমণ করেন। তিনি ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক রাঠোর-কুল-কলঙ্ক জয়চাঁদের সহায়তায় দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি চৌহান-কুল-প্রদীপ পৃথ্বীরাজকে তিরৌরীর যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত করিয়া হিন্দুগণের স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত করিয়া দেন্। ইহার ফলে রাঠোরকুলের পূর্ব্বপুরুষগণ নিজেদের চির-আবাসভূমি কান্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গা-তীরবর্ত্তী আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্তরাজ্য হইতে যোধপুর পর্য্যন্ত নবরাজ্য স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় ১২১১ অব্দ হইতে ১২৩৬ অব্দ পর্য্যন্ত সুলতান আলতামাস দিল্লীতে রাজত্ব করেন। আজমীরে তিনি "আড়াই-দিন-কা-ঝম্প্রা" নামে একটি বিখ্যাত মসজিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ধ্বংসাবশেষ জৈন-মন্দিরের মধ্যে তাহার অট্টালিকার প্রাঙ্গণে অবস্থিত অত্যুৎকৃষ্ট যবনিকাখানি মুসলমানকর্ত্তৃক অঙ্কিত। রাজপুতানার স্থপতি-বিদ্যায় মুসলমান-প্রভাব যে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল, তাহা এই ব্যাপার হইতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রত্ন-অম্বর একটি সুদৃঢ় দুর্গ, উহা এক্ষণে পার্ব্বত্য মিবারভূমি ও জয়পুর-রাজ্যের অন্তর্গত। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমান-সম্রাট্ আলা-উদ্দিন খিল্‌জী রত্নাম্বর অবরোধ করিয়া রাজপুত-শিল্পের উপর স্বীয় প্রভাব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কালের অব্যাহত প্রতাপের নিকট সে প্রভাব আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। যে মিবার-ভূমি একদিন রাণা প্রতাপসিংহের যশোগাথায়, শৌর্য্যে, বীরত্বে মোগল-ব্যাঘ্রের শাসনদণ্ড কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বীর-প্রসবিনী মিবারভূমি অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির কবল হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতে পারে নাই! মোগল-গৌরব সম্রাট্ আকবর শাহের রাজত্বের পূর্ব্বে সাহসী রাজপুতগণ অন্ততঃপক্ষে কিছুকালের জন্য শান্তির সুখ আস্বাদন করিতে পারেন নাই। তবে ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে রাজপুতানার অবস্থা কিরূপ ছিল, এই বিষয় চিন্তা করিতে হইলে, আমার বোধ হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে স্থপতি-বিদ্যা ও ভাস্কর-শিল্পের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। ডাক্তার বুহলার বলেন যে, ভারতীয় শিল্প-কলা কোনও সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পত্তি নহে; তবে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তৎকাল-প্রচলিত প্রতিরূপক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় চিত্রগুলি শিল্পের মধ্য দিয়া স্ব স্ব দেশে প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা তাঁহার বাক্যের যাথার্থ্য স্বীকার করি। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম হইতেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। রাজপুতগণ জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত! তাহাদিগের ধ্বংসাবশেষ ভাস্কর্য্যের অতীত গৌরব স্মৃতি এখনও মথুরার চিত্রশালায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং তথায় আরও এত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য আছে যাহা দেখিলে

স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজপুতানার শিল্পে প্রাচীন সুসভ্য গ্রীকগণও যথাসম্ভব নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

জয়পুর-অলওয়ারের নিকটবর্ত্তী বৈরাট নামক স্থানে প্রস্তরে খোদিত অশোক-অনুশাসন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ কীর্ত্তি রাজপুতানায় বড় দেখা যায় না, তবে সম্বর হ্রদের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ২০ ফিট নিম্নে খনন করিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ কীর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ঐ স্থানে পূর্ব্বে যে বৌদ্ধগণের আবাস-ভূমি ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে একটি St.atite বাক্স, কতকগুলি মোহর ও একটি মৃৎপিণ্ডের উপর অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য বিশিষ্ট ব্যাঘ্র মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। নারেন একটি প্রাচীন বৌদ্ধনগর। তথায় যে সকল খোদিত প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সেইগুলি চৌহান সর্দ্দারগণের অধিকারে ছিল। জৈনগণ তাঁহাদিগের অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। রাজপুতানার শিল্পের উপর তাঁহাদিগের প্রভাব বহুদিন যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল এইজন্য তাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ ইতিহাস বর্ণনা করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার "History of Fine Art in Indi. and C.ylon" নামক পুস্তকে জৈনগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুকুমার বিদ্যার উল্লেখের সময় এই প্রদেশের কোনও মূর্ত্তির বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেন নাই। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে "বিমলাসা"র মন্দির ও ১২৩০ খৃষ্টাব্দে "তেজপালে"র মন্দির আবুপর্ব্বতের শিখর প্রদেশে স্থাপিত হয়। এই সকল মন্দিরে যেভাবে কারুকার্য্য সকল খোদিত হইয়াছে তাহা বর্ণনার বিষয় নহে—তাহা উপলব্ধির বিষয়। যাঁহারা এই সকল মন্দির ও অট্টালিকার লম্বমান অংশ, অসামান্য স্তম্ভ ও অশেষ কারুকার্য্যযুক্ত ছাদ দর্শন করিয়াছেন তাহারা ইহার উদ্ভোক্তা, নির্ম্মাতা ও অঙ্কণকারীর ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। প্রামারা রাজপুত বংশের রাজধানী চন্দ্রাবতী-অধিবাসী জৈন বণিকগণ এই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই স্থানের

আকবর

খোদিত প্রস্তর দ্বারা আমেদাবাদের জৈন মন্দির ও অট্টালিকা-সমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং আবুপর্ব্বতের পাদদেশে রেল সেতু ও বাঁধ বাঁধিবার জন্য এই স্থান হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড গৃহীত হইয়াছে—ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে?

রাজপুতানায় জৈন কীর্ত্তির মধ্যে চিতোরের রাণা আল্লুজীর (ও শ্রীআল্লতের) দুর্গই সর্ব্ব প্রাচীন এবং এই দুর্গ আনুমানিক খৃষ্টীয় ৮৯৬ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইহার পার্শ্বেই অপেক্ষাকৃত বর্ত্তমান সময়ে একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উভয়ের কারুকার্য্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, প্রথমটি যদিও জৈন নির্ম্মিত এবং দ্বিতীয়টি গোঁড়া হিন্দুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তথাপি উভয়ের মধ্যে স্থাপত্য সম্বন্ধে অতি সামান্য পরিবর্ত্তন বা পার্থক্য লক্ষিত হয়। ইহার তথ্য অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, হিন্দু ও জৈন সুবিধা পাইলেই পরস্পর পরস্পরকে উৎপীড়ন করিতেন এবং সময়ে সময়ে প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলের প্রতি স্বীয় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া স্ব স্ব দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অট্টালিকার দ্বারোপরি স্থাপন করিয়া হর্ম্ম্যরাজি বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইতেন। মালবরাজ্যে জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরও এইরূপ ঘটনা কিছুকাল পূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে। মেবারের বর্ত্তমান রাণার পূর্ব্বপুরুষগণ গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। তিনি অন্তরে জৈনভাব পোষণ না করিলেও বাহিরে জৈনভাবাপন্ন এবং যোধপুরের ধনী জৈনগণ রাঠোরবংশ সমুদ্ভূত বলিয়া কথিত হয়। ইহা হইতে ডাক্তার বুহ্‌লারের উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণিত হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় চিত্র অঙ্কনে ক্রমে ক্রমে একটা পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে; কিন্তু রাজপুতানার শিল্পে মুসলমান প্রভাব প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অট্টালিকাসমূহে একই ভাবের কারুকার্য্য খোদিত হইত। গুজরাটের দক্ষিণ অংশে গমন করিলে প্রাচীন জৈন ও ব্রহ্মণ্য সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রামারা রাজ ও মিবারের রাণাদিগের আদিম বাসভূমি গুজরাট। গুজরাটের বাণিজ্য পরায়ণ নগর সমূহ হইতে অসংখ্য যাত্রী রাজপুতানায় জৈন ও হিন্দুগণের মন্দির দেখিতে আসেন বলিয়া রাজপুতানার শিল্পে এমন কি স্থাপত্যে পর্য্যন্ত গুজরাটের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। যাহাতে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, রাজ্যের ধনী ব্যবসায়িগণ নয়নানন্দদায়ক অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মাণ করেন, তজ্জন্য রাজপুত রাজগণ সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব-কাল আলোচনা করিলে, বিশেষতঃ আরাবল্লী পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্বস্থ বালুপূর্ণ মরু প্রদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে আমার উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। যোধপুর, বিকানীর, জয়পুরের পশ্চিমাংশ এবং দুরধিগম্য মরুপ্রদেশে বহুসংখ্যক ধনী বণিক, গোঁড়া বৈশ্য (বিষ্ণু উপাসক) এবং 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায়ের জৈনগণ অবস্থান করিয়া তেজারতির ব্যবসায় চালাইয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লোক অথবা প্রতিনিধি দ্বারা এই ব্যবসায় চালাইতেন এবং নিজে সপুত্র-পরিবারে রাজপুতানার সুদৃশ্য মনোমোহকর অট্টালিকায় অবস্থান করিয়া সুখ ভোগ করিতেন।

এই ব্যবসায়ের জন্য তাঁহাদিগকে রাণাগণের নিকট প্রভূত কর প্রদান করিতে হইত, কিন্তু উভয় পক্ষকেই পরস্পর পরস্পরের নিকট বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ থাকিতে হইত। মাড়বারের পোকারন ও নাগোর এবং সিকার, রামগড়, নলগড়, ফতেগড়, উত্তর-জয়পুর, মাড়বার ও জয়পুরের রাজধানী এবং বিকানীর ও যশল্মীর প্রভৃতি স্থানে এই সকল শ্রেষ্ঠী বসবাস করিতেন। উল্লিখিত স্থান সমূহে অসংখ্য নয়নান্দদায়ক, কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি, মন্দির ও প্রাসাদ এখনও বিরাজমান।

হিন্দুস্থান ও সিন্ধুপ্রদেশ হইতে উত্তর-রাজপুতানায় এবং গুজরাট হইতে দক্ষিণ-রাজপুতানার অন্তর্গত মিবার ও যোধপুরের দক্ষিণাংশে গমনাগমন করিবার বিশেষ সুবিধা বলিয়া রাজপুতানা শিল্পনৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রাজপুতানার স্থাপত্য ও শিল্পকার্য্য দুইটি কারণে উন্নতিলাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ ধনশালী শ্রেষ্ঠিবর্গ ও দ্বিতীয়তঃ রাণা ও সামন্ত রাজগণের সহায়তা। মৃত্যু ও বিবাহোৎসব ব্যতীত ধনকুবের শ্রেষ্ঠিগণ যখন স্ব স্ব গৃহের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য বিলাসদ্রব্য ক্রয় করিতে উদ্যত হইতেন, তখনই তাঁহারা স্ব স্ব পুত্র পরিবারবর্গ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেই সঙ্কল্প হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইতেন এবং তখন বিচিত্র কারুকার্য্যময় মন্দির ও সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। অলঙ্কার ক্রয় ও জানালা দরজার সৌকর্য্যসাধনার্থে কাষ্ঠের উপর নানাবিধ কারুকার্য্য খোদিত করাই তাঁহাদিগের প্রধান ব্যয় ছিল। শিল্পিগণের উপর ধর্ম্মের প্রভাব যথেষ্টই পরিলক্ষিত হইত। সমরাবসানে বিশ্রামের সময় রাজন্যগণের মন বিলাসিতায় ও শিল্পসৌকর্য্যাথে ঝুঁকিয়া পড়িত।

এইরূপ এক একটা ইচ্ছার প্রভাব প্রত্যেক রাজপুতের চরিত্রে দেখা যায়। সব রাজপুত পরিবারের ইতিহাস যেন একই

শাজহান

প্রকারের বলিয়া বোধ হয়। স্বীয় অনুচরবৃন্দের সহায়তায় পরের দেশ আক্রমণ করিয়া স্বীয় অধিকারে আনয়ন করাই যেন, তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য। এইজন্য সকলেই সুদৃঢ় স্থান সমূহ স্বাধিকারে রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। যতদিন নবাবিষ্কৃত যুদ্ধাস্ত্র প্রচার না হইয়াছিল ততদিন রাজপুতানার উত্তর-দক্ষিণাংশে দুর্গম ও সুদৃঢ় পাহাড়ের উপর দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইত এবং রাজপুত রাজগণ তথায় অবস্থান করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থিত জনপদ সমূহের উপর আধিপত্য করিতেন। রাজপুতানার সর্ব্বত্রই সর্দ্দার ও শাসনকর্ত্তৃবৃন্দের বাসস্থান উচ্চস্থানে এবং তন্নিম্নে প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে অনুচর, বণিক ও প্রজাবৃন্দের বাসভূমি লক্ষিত হয়, এবং বিপদের সময় যাহাতে সর্দ্দারগণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন, সেই জন্য দুর্গম স্থলে কতকগুলি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত আছে।

পূর্ব্বকালে রাজাসমূহ অরাজকতায় পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া যুবরাজগণ অর্থ কিংবা আশ্চর্য্য দ্রব্য সমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না। কিন্তু অনেক সময়েই এই সমস্ত শিল্পের উন্নতির জন্য তাঁহাদিগকে অনিচ্ছাকৃত সাহায্য প্রদান করিতে হইত। তৎকালে সম্রাটের সহিত দরবারে সাক্ষাৎ করিতে হইলে প্রথমে "নজরাণা" স্বরূপ অর্থ প্রদান করিতে হইত। তৎপরিবর্ত্তে সম্রাটও তাঁহাদিগকে নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার, হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি প্রদান করিতেন শিল্পিগণ স্ব স্ব প্রণীত দ্রব্যসমূহ ও দেশভ্রমণকারিগণ বিদেশ হইতে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া সম্রাটকে উপঢৌকন প্রদান করিতেন।

রাজ্য-জয় করিয়া সর্দ্দারগণ নানাবিধ বহুমূল্য শিল্প দ্রব্য আহরণ করিতেন। বিবাহাদি ব্যাপারে যৌতুক স্বরূপ ও অধীন কর্ম্মচারিবৃন্দ ও প্রজাবর্গের নিকট হইতে এই সকল দ্রব্য তাঁহারা উপহারস্বরূপ পাইতেন। রাজসন্দর্শনে গমন করিলেই নজর প্রদান করা তৎকালের প্রচলিত প্রথা ছিল। অদ্যাবধি এ প্রথা সর্ব্বস্থানেই প্রচলিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মোগলব্যাঘ্র, তীক্ষ্ণমতি সম্রাট আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে সর্দ্দার, ওমরাহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিকট শিল্প কার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে আদরলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কারণ সে সময়ে শিল্প কার্য্য অধিক উন্নতিলাভ করে নাই।

এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে বহুকাল যাবৎ কোনও একচ্ছত্রী সম্রাট রাজত্ব করেন নাই। পূর্ব্বে যে সকল ছত্রপতি মহারাজা এই শস্যশ্যামল ভারতবর্ষ শাসন করিয়া গিয়াছেন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, রাজকবি চারণ, ভট্ট কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের সভা পরিপূর্ণ ছিল। রাজকবি বংশের পূর্ব্বকাহিনী কবিতায় রচনা করিয়া বংশের গৌরব রাজার মনে সর্ব্বদা জাগরূক করিয়া রাখিতেন, চারণ কবি পূর্ব্বপুরুষের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাহসিকতার কাহিনী কবিতায় রচনা করিয়া সকলের মনে বীরত্ব ও সাহসিকতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া রাখিতেন! উজ্জয়িনীর অমর কবি কালিদাসের মেঘদূত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যের মধুস্বাদ কেহ কখনও ভুলিতে পারিবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের চারণ কবির গীতাবলী আজ সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া দেশে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে।

রাজশক্তির প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলা উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। পাল, চৌহান ও গোহিলা রাজগণের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুতানায় অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিল্পকার্য্যের উন্নতির প্রমাণ দিতেছে। নিরক্ষর শিল্পিগণ পরের কার্য্যের অনুকরণ করিয়া যে সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে আজ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে সুশিক্ষিত শিল্পিগণ তাহার কণামাত্র শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন প্রদান করিতে সক্ষম নহেন।

ভারতের পূর্ব্ব রাজধানী দিল্লী নগরীতে সর্ব্ব প্রথম শিল্প-প্রিয়তার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহার পর হইতে চতুর্দ্দিকে পুস্তকাগার, অস্ত্রাগার ও যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধ ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য যদিও ইহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে তথাপি অদ্যাবধি বিভিন্ন স্থানে যে সকল প্রাচীন দ্রব্য রক্ষিত আছে তাহাতে পূর্ব্বকালের শিল্প নৈপুণ্যের নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। দিল্লীর সম্রাটগণের নিকট যে সকল বহুমূল্য প্রাচীন দ্রব্য ছিল, তাহার কতক অংশ রাজপুত, মহারাষ্ট্র ও মুসলমান রাজগণের হস্তগত হইয়াছিল এবং সম্প্রতি কতকগুলি য়ুরোপের বিভিন্ন যাদুঘরে সংগৃহীত আছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আকবরের সভাকবি সেখ ফৈজী কর্ত্তৃক রামায়ণ ও মহাভারতের পারস্য ভাষায় অনুবাদ 'রাজম্-নামা'ই প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। সম্রাট আকবরের দেহাবসানের পরে শিল্পপ্রিয় সুশিক্ষিত কোন হিন্দুই দেশ শাসন করেন নাই। আধুনিক জয়পুরের রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয়, সাই জয়সিংহ ১৭০০ হইতে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ, প্রথম মাধোসিংহ ১৭৫১ হইতে ১৭৬৮

খৃষ্টাব্দ ও দ্বিতীয় রামসিংহ ১৮৩৫ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়পুরে রাজত্ব করেন। নিরক্ষর আলোয়াররাজ বনাই সিংহ ১৮১৫ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ, যোধপুররাজ প্রথম যশোবন্তসিংহ ১৬৩৫ হইতে ১৬৭৮ এবং উদয়পুরের মহারাণা রায়সিংহ ১৬৬১ হইতে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দ ও জয়সিংহ ১৬৮১ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। চিতোরের ভুবনপ্রসিদ্ধ মোকালজী দেবীর মন্দির খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ও রাণা কুম্ভের "কিরাত স্তম্ভ" খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত হইয়াছিল, জয় প্রাসাদ ও জয়পুরের দক্ষিণাংশে অবস্থিত কতকগুলি মন্দিরের অসামান্য কারু-কার্য্য পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পিগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। শিরোহি রাজ্যের নিকটবর্ত্তী স্থানে এইরূপ একটি মন্দির দেখা যায়। এই সমস্ত মন্দির খৃষ্টীয় অষ্ট শতাব্দীতে নির্ম্মিত। মালবের ছতরপুর রাজ্যের অন্তর্গত খাজারাওর চন্দেল রাজ-গণের বিখ্যাত মন্দির তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রাচীন সময়ে মন্দিরে যে সকল কারুকার্য্য খোদিত হইয়াছিল তাহা আধুনিক ভাস্কর্য্য অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। জয়পুরের নিকট-বর্ত্তী "সেনগানির" নামক স্থানের জৈন মন্দির, অম্বরের "জগৎ শরণে"র মন্দির ও উদয়পুরের জগন্নাথদেবের মন্দির দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ ভাস্কর্য্যে কত উন্নত ছিল। আধুনিক শিল্পিগণ প্রাচীন কার্য্যাবলী আদর্শ স্বরূপ

মমতাজ

লইয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। ভাস্কর্য্যে আজ ভারতবর্ষ কেন অবনতিলাভ করিতেছে তাহা একটি চিন্তনীয় বিষয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাস্কর্য্যের সংঘর্ষণ ও সংমিশ্রনই এই অবনতির কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সেই সকল প্রাচীন কার্য্যাবলী আজ কালের কঠোর প্রতাপে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

চিতোরের সুন্দর নয়নবিমোহন অতুলনীয় "জয় স্তম্ভ" ১২০ ফিট উচ্চ এবং ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর অসামান্য জৈন স্তম্ভের অনুকরণেই এই স্তম্ভ নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এই স্তম্ভের অন্তভাগ ও বহির্ভাগে হিন্দুদিগের পৌরাণিককাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

অসংখ্য সুন্দর সমৃদ্ধিশালী হর্ম্ম্যরাজি জগৎসমীপে রাজপুতানার স্থাপত্যের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতেছে। এই সমস্ত দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, রাজপুতানার শিল্পিগণ যে ভাবে প্রস্তর কাষ্ঠ ও ধাতুর তক্ষণ কার্য্য করিতে নিপুণ কোনও দেশের কোনও

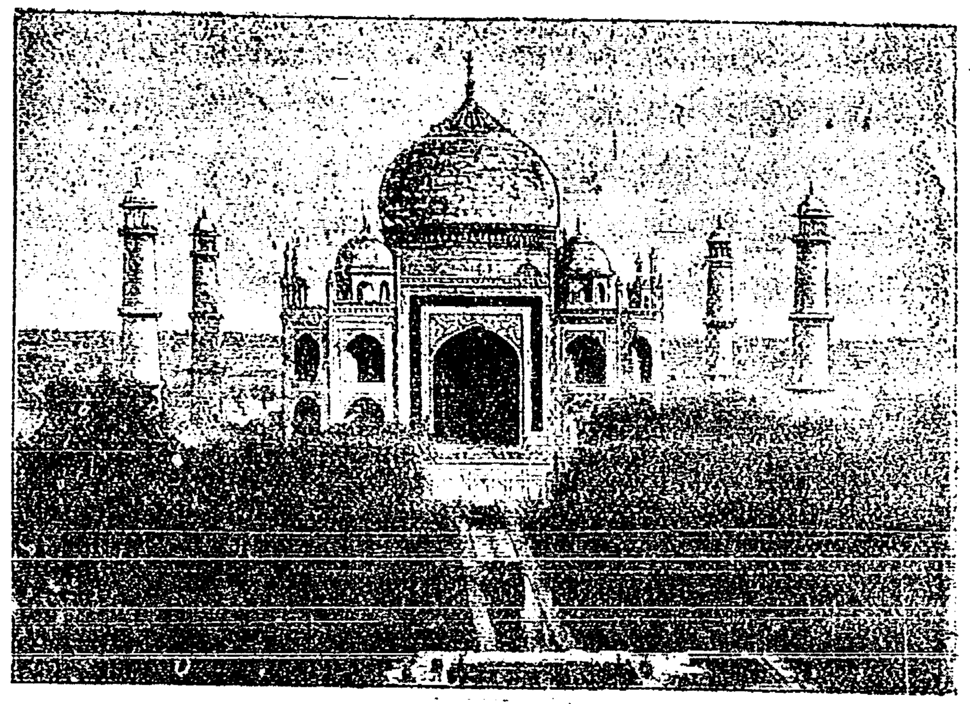

তাজমহল

শিল্পি সে ভাবে কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন। রাজপুতানার অধিবাসিবৃন্দের কার্য্য হইতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা কেবলমাত্র ধর্ম্ম-কার্য্যে অর্থ ব্যয় করেন না, সুসময়ে তাঁহারা শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

জয়পুর-উলারের সন্নিকটবর্ত্তী ও সম্বর হ্রদের তীরবর্ত্তী মাড়-বারের অন্তর্গত মাক্রানার দেশপ্রসিদ্ধ শ্বেত মর্ম্মরের জন্যই মোগল সম্রাট সাজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের স্মৃতিচিহ্ন তাজ-মহল আজ ভুবনপ্রসিদ্ধ ও অতুলনীয়। কৃষ্ণ, সবুজ ও রক্তমর্ম্মরই আজকাল গির্জ্জা প্রতিমূর্ত্তি ও সামান্য সামান্য দ্রব্য নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দুদিগের পবিত্র পাত্র পাথরের থালা, বাটি, গেলাস প্রভৃতি জয়পুরের চল্লিশ মাইল পূর্ব্ববর্ত্তী দূর 'দৌশ' নামক স্থান হইতে সরবরাহ করা হয়। দেব পূজার অন্যান্য ধাতব পাত্র অপেক্ষা প্রস্তরের পাত্রই অধিক পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। আমেদাবাদের সিদি সৈইদের দেশবিখ্যাত মসজিদ শিল্প ও স্থাপত্যের ঔৎকর্ষ জগৎসমক্ষে প্রচার করিতেছে। জয়পুর, যোধপুর ও বিকানীরে গৃহের সম্মুখভাগ রক্তপ্রস্তরে নির্ম্মিত এবং নানাবিধ কারুকার্য্যে ভূষিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

প্রতীক্ষা

১

সারাটি রাত জেগে আছি—
দীপটি জেলে পাশে,
বুঝি, এই আসে এই আসে।
আঁধার ঘেরা পথের পরে,
ঝন্ ঝনে ঐ বাতাস ভরে—
শুক্‌নো পাতা পড়ছে ঝরে—
কাল ঝোপের পাশে ;
শব্দেতে তার হচ্ছে মনে—
ঐ আসে ঐ আসে !

২

বনের পথে কে গো পথিক—
অফুট স্বরে গায়,
যেন, ঐ না শুনা যায়।
কে গেয়ে যায় চেনা সুরে—
বনের পথে, অনেক দূরে ;
সুরটি তাহার ঘুরে মরে—
আমার আঙ্গিনায়—
বনের পথে কে গো পথিক—
অফুট সুরে গায়।

৩

ওগো, মূর্চ্ছনা যে মিলিয়ে এল,
হচ্ছে মনে ভয়,—
বুঝি, আমার পথিক নয়।
বনের পথে কুটীর পাশে—
সুর যে গো ঐ মিলিয়ে আসে ;
নিরাশ ক'রে চলে গেল—
পথিক নিরদয় ;
এখন হচ্ছে মনে, এত তবে—
আমার পথিক নয়।

৪

ঐ না কে গো অধীর হয়ে—
ডাক দিল মোর দ্বারে ;
ওরে, প্রদীপ নিয়ে যারে।
কাজল-কাল নিঝুম রাতে,
সঙ্গী যে তার নাইক সাথে ;
আঁধার-ঘেরা বনের পথে—
ভয় ত হতে পারে।
ওরে, আঁধার-ঘেরা পথের ধারে—
প্রদীপ নিয়ে যারে।

৫

ওগো, এই যে আমি যাচ্ছি ছুটে,
দীপটি নিয়ে করে ;
সখা, আন্‌ব তোমায় ঘরে,
দীপটি রেখে দ্বারের পরে—
খুল্‌নু আগল আপন করে ;
বিজন কাল মাঠের ধারে—
আঁধার থরে থরে ;
ঘুমিয়ে আছে শিশুর মত—
বিজন মাঠের পরে।

৬

কে তবে গো আধেক রাতে—
ডাক দিল মোর দ্বারে ;
কই দেখ্‌নু না ত তারে।
দেখ্‌নু শুধু একটু দূরে—
গাঁয়ের শিয়াল মরছে ঘুরে,
হয়ত তারাই যা দিয়াছে—
জীর্ণ আমার দ্বারে ;
কে যে আমায় ডেকে গেল—
দেখ্‌নু না ত তারে।

৭

সারাটি রাত জেগে আছি—
দীপটি জেলে পাশে ;
ওগো, ভোর হয়ে যে আসে ;
ঊষার আলো উঠছে ফুটে'—
আঁধার কাল প্রাচীর টুটে' ;
মলয় মারুত পড়ছে লুটে'—
বেণু বনের পাশে ;
নিরাশ প্রাণে বসে আছি—
ভোর হয়ে যে আসে।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

মর্ম্মবাণী

১ম বর্ষ } ১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩২২ {১ম খণ্ড, ২৫শ সংখ্যা

দরিদ্রের ক্রন্দন

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ধন-বিজ্ঞান অধ্যাপক শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত বার্ত্তা (Economies) বিষয়ক গ্রন্থ। বর্ত্তমান দারিদ্র্য-সমস্যা এই পুস্তকে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় আমাদের বৈষয়িক উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থাগুলিও নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার রোদন অরণ্যে রোদন হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। মনে হয় এদেশে এখন প্রাণের অভাব। তাঁহার ন্যায় যদি আমাদের প্রাণ থাকিত তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতাম দেশের সুদিন অদূরাগত। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বচনগুলি পাঠ করিয়া যদ্যপি আমাদের অসাড় প্রাণে একটু চেতনা আসে—যদ্যপি আমরা তাঁহার ন্যায় ভারতের শাশ্বত ভিখারীর চিরন্তন ক্রন্দনে সহানুভূতি দেখাইতে পারি—যদি দরিদ্রের সুখ দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে পারি—যদি দরিদ্রের সহমর্ম্মী হইতে পারি, তাহা হইলে ক্রন্দনের স্থলে আবার হাসি দেখিতে পাইব। জানি না ভারতের সে গৌরবের দিন কবে আসিবে, সুজলা-সুফলা ভারতভূমি আবার কবে ধন-ধান্যে পূর্ণ হইবে। রাধাকমল বাবুর তাজা প্রাণ আছে—দরিদ্রের ক্রন্দন তাঁহার মর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়াছে—সে ক্রন্দন তিনি হৃদয়ের পরতে পরতে অনুভব করিয়াছেন—ব্যথীর সহিত তিনি কাঁদিয়াছেন এবং তাহাদের ক্রন্দনের লাঘব করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। দরিদ্র নারায়ণের বিধিমতে সেবাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পুস্তকখানি তাহাদিগকেই তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন ; উৎসর্গপত্রে তিনি লিখিয়াছেন,—"রোগ শোক ভয়, অভাব দৈন্য কত রকমেই না মানুষ কাঁদ্‌ছে। কিন্তু সব চাইতে বুকফাটা অশ্রুজল কাদের ? তাদের—যাদের দুবেলা দুমুটা জোটে না ব'লে সমস্ত দেহটা, সমস্ত অস্তিত্বটা কোন রকমে শুধু টিকে থাকার জন্য কাঁদ্‌ছে, যাদের শীতবস্ত্র দূরে থাক, লজ্জাবস্ত্রেরও অভাব,—আর যাদের মাথা ঢাকবার জায়গা গাছের ছায়া বা আকাশ ছাড়া আর কিছুই নেই, ***—আমার এই দরিদ্র দেশের বুকফাটা অশ্রুর এই এক-কণা তাঁদের চরণেই উৎসর্গ করলাম।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আবার বলি পুস্তকখানিও রাধাকমল বাবুর ক্রন্দন। ক্রন্দনের সমালোচনা হয় না। ক্রন্দনের সহিত সহানুভূতি দেখান যায়। আর মানুষ যদ্যপি পরের জন্য কাঁদিতে পারে তাহা হইলে পরের দুঃখ-মোচনে যত্নবান হইবেই হইবে—অন্ততঃ চেষ্টাও করিবে। ক্রন্দন জিনিষটা অনেক সময় সংক্রামক হইতে দেখা যায়। সেই আশায় পুস্তকখানির একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে চাই।

প্রথমেই বলিয়া রাখি বাঙ্গালা ভাষায় বার্ত্তাশাস্ত্রের পুস্তক বড় বিরল। যে দুএকখানি আছে তাহা ইংরাজী Economicsএর বঙ্গানুবাদ মাত্র। রাধাকমলবাবুর পুস্তক সে শ্রেণীর নহে। তিনি স্বাধীনভাবে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া যে তথ্য-সংগ্রহ করিয়াছেন তাহারই উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়া গবেষণা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সকল সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত তাহা আমরা বলিতে পারি না—আমরা চাই তাঁহার মীমাংসা গুলির সম্যক আলোচনা ; এবং বহুল আলোচনার ফলে যেগুলি সুমীমাংসিত বলিয়া গৃহীত হইবে ব্যবহারিক-জীবনে সেগুলির অনুসরণ।

এখন তাঁহার একটী সিদ্ধান্ত ধরুন, "ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র পল্লীগ্রাম।" এ যুক্তির অনুকুলে তিনি ঐতিহাসিক কোনরূপ প্রমাণের অবতারণা করেন নাই। তিনি ভাবের দিক হইতে দেখিয়াছেন। তাঁহার ভাব প্রবাহে আমরা ভাসমান হইলেও তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিকের নিকট আমরা প্রকৃষ্ট প্রমাণ দাবী করিতে পারি না কি ? তিনি লিখিয়াছেন, "পাশ্চাত্য-জগতে সহরগুলি যেরূপ বাণিজ্য-ব্যবসার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, আমাদের দেশের গ্রামগুলি সেরূপ কৃষিকার্য্যের উন্নতির দ্বারা বিশেষ পুষ্টিলাভ করিয়াছে। এজন্য ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশলাভ করিয়াছে—সহরে রাজধানীতে নহে।" আমরা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষের সভ্যতা কি কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যের উন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত ? এই প্রসঙ্গে লিখিত তাঁহার "ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ"টা যে কি পদার্থ তাহা একটু বিশদভাবে বুঝান উচিত ছিল। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষের জাতীয় প্রাণধারা এখনও পল্লীগ্রামে প্রবাহিত হইতেছে ;" কিন্তু সে ধারাটি যে কি তাহাও তিনি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই। অবশ্য একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, তাঁহার সিদ্ধান্তটী অপ-সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহার নিকট আরও প্রমাণ চাই। আমরা চাই সিদ্ধান্তটিকে সুদৃঢ় করিতে।

পাশ্চাত্য জগতে যে সকল আবিষ্কার দ্বারা কৃষকদিগের দারিদ্র্য-হ্রাস ও ধনবৃদ্ধির উপায় স্থির করিয়াছে, অধ্যাপক মহাশয় সেগুলির আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের দেশে সেগুলির প্রচলন

হইলে সুফল অনায়াসে পাইতে পারা যায়। সেগুলি হইতেছে,—'সমবায় আন্দোলন' বা কৃষিকার্য্যে যৌথ কারবার প্রচলন,—'যৌথ ঋণ-দান মণ্ডলী' স্থাপন ও 'যৌথ বিক্রয়-মণ্ডলী' এবং 'যৌথ শস্য ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠা। পরিশেষে তিনি বলিয়াছেন, "কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধানের জন্য যৌথ ঋণ দান সমিতি, শস্য ভাণ্ডার এবং বিক্রয় সমিতি যেরূপ প্রয়োজনীয়, যৌথ ক্রয় সমিতিও সেরূপ আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পাদনের জন্য অভিনব যন্ত্র ও কৃত্রিম সারাদির ব্যবহার আবশ্যক। ইহাদিগের মূল্য অধিক বলিয়া পরস্পরের সহায়তা ভিন্ন ঐগুলি ক্রয় করা অসাধ্য। যৌথ-ক্রয় সমিতি স্থাপন করিলে পরস্পরের সাহায্যে পাইকারী দরে উপযুক্ত কৃষিযন্ত্র এবং সার ক্রয় এবং বীজ শস্য সংগ্রহ করা খুব সুবিধাজনক হইবে।" সুখের বিষয় সদাশয় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে কৃষকগণকে কর্জ্জ দিবার জন্য ১৯০৪ সাল হইতে ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া কৃষকদিগের কতক অভিযোগ দূর করিয়াছে।

পল্লীগ্রামের সংরক্ষণ ও উন্নতিকল্পে রাধাকমল বাবু যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সকলেরই অবহিত হইয়া শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। পল্লীবাসী সুস্থ ও সবল না হইলে সমাজ কত-দিন টিকিবে ?

আর একটী অত্যাবশ্যকীয় কাজের কথা তিনি বলিয়াছেন,—জাতীয় শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে বড় বড় কল কারখানা করিলে চলিবে না, কারণ সকলগুলি কার্য্যকর করিতে হইলে যে ব্যবসা বুদ্ধি, শিক্ষা ও অর্থের প্রয়োজন তাহা আমাদের নাই। স্বদেশী আন্দোলন ফলে প্রতিষ্ঠিত কল-কারখানা গুলির অকৃত-কার্য্যতা ইহা প্রমাণ করিতেছে। আমাদের এখন কুটীর শিল্প ও ক্ষুদ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি বলিয়াছেন,—"যে ক্ষেত্রে একই প্রকার দ্রব্য অনেক পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হইবে, সেখানে মনুষ্য-শক্তি তড়িৎ অথবা ষ্টীম এঞ্জিনের শক্তির নিকট হার মানিবে। কিন্তু যেখানে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, সেখানে শিল্পীর কর্ম্মকুশলতাকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। দ্রব্য ক্রয় ব্যাপারে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি প্রকটিত হয়, সে ক্ষেত্রে দ্রব্যোৎপাদনে শিল্পীর বিদ্যা ও চাতুরী কলের শক্তি অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হইবে। বাস্তবিক আমাদের দেশে যতদিন রুচির বৈচিত্র্য আছে, ততদিন শিল্পীর ব্যবসা কখনও মন্দা হইবে না।" আর অধ্যাপক মহাশয় পাশ্চাত্য জগতের ইতিহাস হইতে দেখাইয়াছেন, কুটীর-শিল্প কল-কারখানার দেশেও বেশ সুপ্রচলিত। জার্ম্মানিতে ১৪°৩ ক্রোর শ্রমজীবিদের মধ্যে ৫°৪ ক্রোর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে।

অধ্যাপক মহাশয় আর একটা প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন "বাণিজ্য সংরক্ষণ।" দেশের উৎপন্নদ্রব্য যদি বিক্রয় করিতে না পারা যায় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহা ক্রয় করিয়া দুঃস্থ প্রজাদিগকে রক্ষা করা উচিত। অধ্যাপক মহাশয়ের কথায় বলি,—"পাট ও তুলা গবর্ণমেণ্ট নিজে ক্রয় করিয়া লইলে অথবা দেশীয় কোন ব্যবসার অনুষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করিয়া ক্রয় করিতে উৎসাহ প্রদান করিলে কৃষকেরা রক্ষা পাইবে।"

স্থানাভাবে এই পুস্তকের অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলি আলোচনা করিতে পারিলাম না। পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ঃ—(১) বর্ত্তমান দারিদ্র্য সমস্যা (২) পারিবারিক আয় ব্যয় (৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা (৪) মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর অন্নসংস্থান (৫) শিল্প ও ব্যবসা প্রচার (৬) পল্লীচর্য্যা বিধান (৭) কৃষি ও শিল্প কর্ম্মে সমবায় (৮) বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্যে বণিকের আধিপত্য ও প্রতিকার (৯) পল্লী সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা (১০) পল্লীসেবক (১১) পল্লী সভ্যতার পুনরুত্থান ও (১২) পরিশিষ্ট—বর্ত্তমান যুদ্ধ ও বৈষয়িক সমস্যা।

এক্ষণে আমরা পুস্তকের পরিশিষ্ট হইতে বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে কি শিক্ষালাভ করা যায় অধ্যাপক মহাশয়ের ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

(ক) কখনও কোন দেশের পক্ষে খাদ্যশস্য চাষের পরিবর্ত্তে বিদেশীয় বাণিজ্যোপযোগী উপকরণ-শস্যের চাষ বাঞ্ছনীয় নহে; কৃষকগণ সাময়িক স্বার্থের জন্য উপকরণ শস্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন করিলে অবাধ উপকরণ শস্যচাষ সংযত ও খাদ্য শস্য-চাষকে সংরক্ষিত করিতে হইবে।

(খ) শুধু কৃষিকে সংরক্ষিত করিতে হইবে তাহা নহে; শিশু শিল্পের পুষ্টি সাধনের একমাত্র উপায় সংরক্ষণ। ইংলণ্ড ও তদধীন ভারতবর্ষ ব্যতীত প্রত্যেক দেশই শিল্প-সংরক্ষণের দ্বারা শিল্পসমূহের উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইংলণ্ডও এক্ষণে শিল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছে।

(গ) বাণিজ্যকেও সংরক্ষিত করিতে হইবে। ব্যব-সায়ের জন্য মূলধন জোগাইয়া এবং বিদেশ রপ্তানির জন্য অর্থ সাহায্য (boonti s) করিয়া দেশীয় বাণিজ্য ও বিদেশে বাণিজ্যের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য, এই সুচিন্তিত সময়োপযোগী পুস্তকখানি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। এই নিরন্ন বাঙ্গালী-জাতির অন্নসংস্থানের জন্য গ্রন্থকার যে গভীর চিন্তা করিয়া পন্থাগুলি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে শত-সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। উদাহরণস্বরূপ একটা পন্থার কথা এখানে তাহার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি,—"আমাদের আধুনিক অবস্থায় দালাল বণিক প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়া জীবিকার্জ্জন করা শিক্ষিত সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য এবং আশু ফলপ্রসূ হইবে। বাংলা দেশে প্রায় ৩০ কোটী টাকার পাট ক্রয় বিক্রয় হইতেছে, ইহাতে বাঙালী যে সম্পূর্ণ উদাসীন তাহা অতীব দুঃখের বিষয়। পাট ক্রয় বিক্রয় করিয়া বিদেশী দালাল বণিকগণ বৎসর বৎসর ৩০ লক্ষের অধিক টাকা লাভ করিয়া থাকে। বিদেশী বণিকগণ আমাদের দেশে আসিয়া আমাদের কৃষকগণ উৎপন্ন খাদ্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধনী হইতেছে। আর আমরা এক মুঠা অন্নের জন্য চাকুরী খুঁজিতেছি।"

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র

শিল্প-সম্পদে রাজপুতানা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তর যশল্মীরে গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল প্রস্তর-খণ্ড পূর্ব্বে উষ্ট্রের সাহায্যে সুদূর ভূস্বর্গ কাশ্মীর ও হিন্দুস্থানের যবনাধিকৃত নগরসমূহে মোগল-পাঠানের গৃহ-সজ্জার জন্য লইয়া যাওয়া হইত এবং এখনও লইয়া যাওয়া হয়। যদিও রাজপুত-সর্দ্দারগণ স্বদেশের স্থাপত্যে মুসলমান-প্রভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তথাপি এই প্রবন্ধে মুসলমান-পদ্ধতিতে গৃহ-নির্ম্মাণ ও তক্ষণকার্য্যের আলোচনা করা স্থানোপযোগী নহে বলিয়াই মনে হয়। এই সকল কারণসত্ত্বেও আজমীরের শ্বেত-মর্ম্মনির্ম্মিত বিশ্ববিখ্যাত দরগা, ও 'অনাসাগর হ্রদে'র তীরবর্ত্তী বিরাট্ রাজপ্রাসাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভরতপুরের রাজধানী 'ডিগ' ও অম্বরের অতুলনীয় রাজপ্রাসাদ, জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী ও উদয়পুরের 'পেশোলা' হ্রদের জল-প্রপাতের তুলনা সমগ্র জগতে খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অম্বরের বিভিন্ন অট্টালিকার তক্ষণকার্য্য রাজপুতানায় স্থাপত্যের প্রাধান্য জগৎ-সমক্ষে প্রচার করিতেছে। এই সকল তক্ষণকার্য্যের মধ্যে তাজমহলের অনুকরণে নির্ম্মিত "পুষ্পগুচ্ছের উপর প্রজাপতি ও কীট-পতঙ্গের অবস্থান"—স্থাপত্যের এই সুন্দর আদর্শটি জগতে রাজপুতানার শিল্পের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই তক্ষণকার্য্যের মধ্যে একটা সজীবতার লক্ষণ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই রাজপুতানার শিল্প লোকের নিকট এত প্রিয়।

রাজপুতানার গৃহ-সজ্জায় তক্ষণকার্য্যের সহিত নানাবিধ শিল্প-নৈপুণ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি বৈদেশিক আদর্শ হইতে গৃহীত বলিয়াই বোধ হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে জয়পুর ও অম্বরে এই সকল বিবিধ শিল্পকার্য্য আরম্ভ হয়।

রাজপুতানার প্রায় অধিকাংশ লোকই দর্পণদ্বারা অট্টালিকা সজ্জিত করিয়া থাকেন। দর্পণ-খণ্ডগুলি দেবদারু বৃক্ষের আকারে প্রাচীরে সন্নিবেশিত হইয়া অট্টালিকার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত করে। উদয়পুরের অধিবাসিবৃন্দ দর্পণখণ্ডদ্বারা গৃহ-প্রাচীরে মনুষ্য ও ময়ূরের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। এই সমস্ত শিল্প-নৈপুণ্য জগতে অতি বিরল।

জয়পুরের অসামান্য সৌন্দর্য্যবিভূষিত 'চন্দ্র মহল' ও "ছবি নেওয়া"র গৃহ-প্রাচীরস্থ প্রস্তরের উপর বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত তাম্রের শম্বুকাকৃতি খোল সংলগ্ন আছে এবং প্রতি খোলের সম্মুখে এক এক খণ্ড দর্পণ থাকায় গৃহের সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এতক্ষণ প্রস্তরের উপর খোদিত কারুকার্য্যের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে; এক্ষণে Plasterএর বিভিন্ন কার্য্যের আলোচনা করা আবশ্যক। এই সকল কারুকার্য্য Plaquerএর উপর নির্ম্মিত হইত ও Plaquerগুলি গৃহ-প্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া গৃহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইত। কখনও কখনও প্লাষ্টারের কার্য্যগুলির উপর অভ্রখণ্ড সংলগ্ন করা হইত বলিয়াই সমস্ত কারুকার্য্য হইতে একটা চাকৃচিক্যময়ী আভা বাহির হইয়া গৃহ-শ্রী শতগুণে বর্দ্ধিত হইত।

কখনও কখনও Plasterএর পুষ্পগুচ্ছ নির্ম্মাণ করিয়া রঙ্গিন্ কাচ-খণ্ডের মধ্যে রক্ষিত হইত এবং সূর্য্যালোক কাচের উপর প্রতিফলিত হইয়া পুষ্পগুচ্ছটিকে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লোকের মন মুগ্ধ করিত। শিল্প-সম্পদে রাজপুতানা যে জগতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, সকলেই তাহা এই সকল প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

কোনও কোনও স্থলে Plaster এবং ফুলগুলি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া প্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। ছাদ ও গৃহ-প্রাচীর Plaster ও দর্পণদ্বারা বিভূষিত; গৃহতল মাক্রানার শ্বেত-মর্ম্মর, বৈশ্লানার কৃষ্ণমর্ম্মর, বলদেওগড়ের রক্তমর্ম্মর কিংবা যশল্মীরের বিচিত্র বর্ণের প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায়, গৃহের সৌন্দর্য্য অত্যধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। যদিও এই সকল কারুকার্য্যে মুসলমান-প্রভাব সমধিক পরিলক্ষিত হয়, তথাপি বর্ত্তমান যুগের কোনও শিল্পী এইরূপ শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ নহেন।

কেবলমাত্র প্রস্তর ও প্লাষ্টারে যে শিল্প-নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হইত, তাহা নহে; জয়পুরের 'ছবি নেওয়ার' ছাদে নীল বর্ণের টালি পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত এবং প্রত্যেক টালির মধ্যস্থলে Plaster কিংবা প্রস্তরের পুষ্পগুচ্ছ সংলগ্ন থাকিত। 'ছবি নেওয়ার অলিন্দ'-প্রাচীরস্থ সবুজ বর্ণের টালিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদেবের জীবনের বিভিন্ন লীলাখেলা অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়পুর ও ডাঙ্গারপুরের রাজপ্রাসাদে ডাচ্গণের শিল্প-নৈপুণ্যের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। জয়পুরের বিভিন্ন অট্টালিকার গৃহ-প্রাচীরে এইসকল বিচিত্র বর্ণের টালিদ্বারা বিভিন্ন মূর্ত্তির সমাবেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সুকুমার শিল্প-সমাবেশের জন্য বিকানীরের রাজপ্রাসাদ শিল্প-জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

জয়পুরের রাজান্তঃপুরের প্রাচীরে ক্রীড়মান শিশুবৃন্দের প্রতিমূর্ত্তি এত সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে যে, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব এবং জানালা-দরজার উপর খোদিত কারুকার্য্যগুলির তুলনা এই সমগ্র ভারতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অম্বর-রাজের অন্তঃপুরস্থ গৃহগুলির শিশুকাষ্ঠের দরজায় যে সকল চিত্র খোদিত আছে, সেইরূপ চিত্র আধুনিক কালে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতে শিল্পকলার এইরূপ অবনতির কারণ, আমাদিগের দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? রাজ-গৃহের জানালা ও দরজায় যে হস্তিদন্তের কারুকার্য্য সন্নিবেশিত আছে, আধুনিক শিল্পিগণের মধ্যে কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন।

রাজপুতানার শিল্পিগণ কাষ্ঠের উপর এত সুন্দরভাবে খোদাই করিতে পারিতেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহারা যে কোন পদার্থের সাহায্যে সৌন্দর্য্য-সম্পাদক দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম ছিলেন বলিয়াই রাজপুতানার প্রাচীন শিল্পিগণের কীর্ত্তিসমূহের প্রতি বিশ্ববাসী সকলেই প্রশংসমান নেত্রে চাহিয়া থাকেন।

আধুনিক সভ্যযুগে ইহা দেখা যায় যে, যাঁহারা প্রস্তর খোদাই করিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা কেহই কাষ্ঠের উপর কারুকার্য্য খোদিতে পারেন না; কিন্তু পূর্ব্বে রাজপুতানায় যে ব্যক্তি প্রস্তরের সুন্দর মূর্ত্তি অথবা প্রস্তরের উপর কারুকার্য্য খোদাই করিতেন, তিনিই সময়ান্তরে কাষ্ঠের উপর অসামান্য সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট কারু-

কার্য্য খোদিত করিয়া রাজপুতানার শিল্পীর প্রাধান্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

পাঞ্জাবে কাষ্ঠের উপর পিঞ্জরাকৃতি কারুকার্য্য খোদিত হইয়া থাকে এবং ইহা মিশরের ‘মশারাবিয়’র মত দেখিতে। শিখাবতীর অধিবাসিবৃন্দ এই কার্য্যে অত্যন্ত নিপুণ বলিয়া জগতে অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে জয়পুরের শিল্পিগণ এত অসামান্য সূক্ষ্ম কাষ্ঠের কারুকার্য্য দেখাইয়াছেন যে, অদ্যাবধি কেহই সেরূপ কার্য্য দেখাইতে সক্ষম হন নাই। জয়পুরের বিখ্যাত যাদুঘর এই সকল শিল্পী-দ্বারাই নির্ম্মিত। রাজপুতানার প্রাচীন শিল্পিগণ আধুনিক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পিগণ অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ. তাহা তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী হইতেই প্রমাণিত হয়। সর্ব্বান্তঃকরণে শিল্পের উন্নতিসাধনে তৎপর না হইলে, শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় না। শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে শিল্পীর উদ্ভাবনী শক্তি থাকা আবশ্যক;—রাজপুতানার শিল্পিগণের সেই শক্তিটি ছিল বলিয়া রাজপুতানা শিল্প-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রস্তর ও কাষ্ঠের উপর তক্ষণকার্য্যে রাজপুত-শিল্পিগণ যেরূপ দক্ষ ছিলেন, মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণেও তাঁহারা সেইভাবেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রাজপুতানার ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রতিমূর্ত্তিতেই শিল্পের চরমোৎকর্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিতে যেরূপ অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দু বা জৈনগণের দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে ততটা শিল্পকৌশল দেখিতে পাওয়া যায় না।

অস্ত্র শস্ত্র, তরবারি প্রভৃতি নির্ম্মাণেও তাঁহারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তরবারির হাতলের উপর অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য খোদিত করিতেন; কিন্তু এই কারুকার্য্যের উপর বৈদেশিক প্রভাবের ছায়াপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

জয়পুর, স্বর্ণের উপর enamel করিবার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। সুদূর য়ুরোপ যখন এই ব্যাপার জানিতে পারেন, তখন সমগ্র য়ুরোপে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল এবং ভারতীয় শিল্পিগণের নিকট য়ুরোপীয় শিল্পিগণকে অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

প্রতাপগড়ের quasi enamel রাজপুতানার শিল্পনৈপুণ্যের অন্যতম প্রমাণ। কোটারাজ্যের অন্তর্গত এটোয়ার মণি-মুক্তাখচিত মহিষ-শৃঙ্গ, ইন্দোরগড়ের অসামান্য মৃন্ময় পাত্র ও শিওয়াই মাধোপুরের আশ্চর্য্যজনক তাস রাজপুতানার শিল্পকে জগতে চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

আজ এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে আমরা “নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ড”বৃক্ষের ন্যায় বিদেশী শিল্পের তুচ্ছ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে শিল্পরাজ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিতেছি; কিন্তু আমরা যদি স্বদেশের প্রাচীন শিল্পের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তাহা হইলে প্রাচীন শিল্প আধুনিক শিল্প হইতে কত শ্রেষ্ঠ, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য বলিয়াই আমাদিগের দেশের শিল্পের আজ এতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে। যে রাজপুতানা একদিন শিল্প-সম্পদে সমগ্র পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকারে সক্ষম হইয়াছিল, সেই রাজপুতানার শিল্পের আজ কি শোচনীয় অধঃপতন! বিলাসিতার জন্য আমাদিগের পূর্ব্ব-গৌরব দিন দিন লোপ পাইতেছে; তাই আজ আমরা ঘরের জিনিষ থাকিতেও পরের দ্বারে ভিখারী। ইহা কি কম দুঃখের বিষয়?

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

আমারি সে বাড়ীখানি

দুঃখে দৈন্যে কাহার মেঝেয় পাই সান্ত্বনা সুখ,
বিয়োগে নিরাশে মিলন বিলাসে জাগে কার স্মৃতিটুক্,
প্রবাসের দূর নিকট করিয়া কে রেখেছে ধরে’ টানি,
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে, আমারি সে বাড়ীখানি।

দেওয়ালের পাটে যুগের বারতা পাটে পাটে কার গাঁথা,
চালের মট্‌কা ছাউনি বাতায় কত গত হাসা-কাঁদা,
দাওয়ায় দেওয়ালে বসুধারা গুলি কহে উৎসব বাণী,
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে আমারি সে বাড়ীখানি।

কে কহে মধুর পিতামহদের কৈশোর খেলা কথা,
রোপিত কাঁঠাল তরুতে তাঁদের বালকের তরুলতা,
কে পারে এমন বাঁধিতে চিত্ত প্রসারিয়া শতপাণি,
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে আমারি সে বাড়ীখানি!

সারা ধরণীর শ্রেষ্ঠ হর্ম্ম্য যে কুটীর কাছে ম্লান,
জগতের সেরা সঙ্গীতে বাজে কার স্তব পূজা গান,
কোন্ সে প্রাচীর পরিখার মাঝে আমি রাজা, আমি রাণী,
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে আমারি সে বাড়ীখানি।

কোথা অবসর থাকিতে বাসনা, অসময়ে কোথা ঠাঁই,
কোথা রাখি সবে মাথা থুয়ে শেষ মরিতে বা আমি চাই,
কোথায় মরণে করি প্রতীক্ষা কোন্ সেই রাজধানী,
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে আমারি সে বাড়ীখানি।

কার পরিচয়ে প্রচারিত চির, কার দ্বারে বাঁধা আমি,
মায়ের মতন কে সে স্নেহবতী, ভগ্নী কে হিতকামী,
প্রিয়া সে যে মোর বিরহে যাহার প্রাণ করে কানাকানি,
আমার ছোট্ট বাড়ীখানি সে যে আমারি সে বাড়ীখানি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গভাষায় বিশেষণ

লেখ্য বঙ্গভাষায় অনেক প্রকার বিশেষণ দৃষ্ট হয়; সেগুলির উল্লেখ এ প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন; কারণ, চলিত গ্রাম্য যে সকল বিশেষণ আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইগুলির বিশ্লেষণই আমার উদ্দেশ্য। যতগুলি শব্দ আমার জানা আছে, সেইগুলিই এ প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়া প্রকরণ নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছি; তবে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ও ভিন্ন ভিন্ন জেলায় আরও বহুসংখ্যক শব্দ যে রহিয়া গেল, সেগুলিও যে এই কয়েকটি সূত্রের অন্তর্গত হইবেই, তাহাই স্থির জানিয়া সকল গ্রামের শব্দ-সংগ্রহ হইতে বিরত হইলাম।

কথিত আছে, বিশেষণগুলি রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও অবস্থা, এই ষড়্‌বিধ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়; এইজন্য আমরা প্রধানতঃ ইহাদিগকে রূপ-বিশেষণ, রস-বিশেষণ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিব। এই শব্দগুলির আরও একটু বিশেষত্ব আছে; ইহারা প্রায়ই একাকী ব্যবহৃত হয় না; হইলে; প্রকৃত অর্থ-বোধে একটু কেমন গোলযোগ উপস্থিত হয়; এইজন্য ইহারা দুইটী পর পর একই স্থানে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন স্থলে ঈষৎ দুইটীর রূপ ঠিক একই থাকে এবং কোন কোন স্থলে ঈষৎ ভিন্ন রূপেও ব্যবহৃত হয়; এইজন্য এই ষড়্‌বিধ বিশেষণকে আমরা “দ্বিত্বরূপ-বিশেষণ” বলিব।

অনেকে এত গোলমালে না আসিয়া, ইহাদিগকে লইয়াই একটি স্বতন্ত্র ক্রিয়া ফাঁদিয়া বসেন; কিন্তু “শোঁ শোঁ করে বাতাস বইচে”, বাতাস বহার বিশেষণ “শোঁ শোঁ করে” বুঝিলে ক্ষতি কি? “কাপড়খানা ধপ্ ধপ্ কর্‌চে” অর্থাৎ কাপড়খানা যে আছে, সেখানার বিশেষত্ব কি? না, ‘ধপ্ ধপ্ করা’। ‘কাপড় আছে’ এই একটা বাক্য; কিন্তু তাহার বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে ঐ ‘ধপ্ ধপ্ করা’তে; তখন এগুলিকে বিশেষণ বুঝিলে কি অন্যায় হইবে?

এগুলি প্রায় ক্রিয়ার বিশেষণরূপেই অধিকতর প্রযোজ্য। এই শব্দগুলির পরে যে “করে”, যেমন ‘মিট্ করে’, ‘শোঁ শোঁ করে’ এই শব্দটি বসে, এটি ঠিক ইংরাজী “Ly” প্রয়োগের মত। বাঙ্গালা ভাষায় “ভাবে” বা “মত” অর্থবাচক। অনেক স্থলে “করে” প্রয়োগ না করিয়া “ইয়ে” প্রত্যয় করিলেও ঠিক সমার্থ-প্রকাশক হয়;—যেমন, “সট্ সট্ করে চলে গেল” আর “সটসটিয়ে চলে গেল”—অর্থ এ দুয়ের একই; তবে যখন বিশেষ্যের বিশেষণ হয়, তখন শেষ শব্দে একটি “এ” প্রত্যয় হয়,—যেমন, ‘কাপড়খানা ধপ্ ধপ্ কর্‌ছে’ স্থানে ‘ধপ্‌ধপে কাপড়’ বলিতে হইবে। বিশেষণের বিশষণকালেও ঠিক শেষোক্ত নিয়মই খাটে—যেমন, “মেয়েটি সুন্দর ফুট্ ফুট্ কর্‌ছে” আর “মেয়েটি ফুট্‌ফুটে সুন্দর”, দুই-ই এক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই দ্বিত্বরূপ-বিশেষণে কোন কোন স্থলে দ্বিতীয় শব্দটি ঈষৎ ভিন্নরূপেও ব্যবহৃত হয়; যেমন, “ফিট্‌ফিটে।” তবে, শ্রুতি-সমতা প্রায় একই বলিয়া এগুলিকেও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল না। যখন দ্বিতীয় শব্দটি এরূপ ঈষৎ বিভিন্ন হইবে, তখন কি ক্রিয়ার বিশেষণ, কি বিশেষ্যের বিশেষণ, কি বিশেষণের বিশেষণ, কোনটিরই পরিবর্ত্তন হইবে না; যেমন—“ঘরটি ফিট্‌ফাট্ সাজান হয়েছে”, “ছেলেটি খুব ফিট্‌ফাট্”, “ফিট্‌ফাট্ সুন্দর।”

এইবার আমরা ষড়্‌বিধ বিশেষণের সূত্র-নির্দ্দেশে অগ্রসর হইতেছি।

রূপ-বিশেষণ—যাহাদ্বারা আকার বা রূপ প্রকাশ করে; যেমন—ফিট্‌ফাট্ লোক।

রস-বিশেষণ—যাহাদ্বারা রস বা স্বাদ বিজ্ঞাপন করা যায়; যেমন—মুখ ড়িড়ি করা অর্থাৎ কটু বস্তুর আস্বাদন বিজ্ঞাপন-কল্পে ‘ড়িড়ি’ শব্দের প্রয়োগ হইল।

শব্দ-বিশেষণ—যাহাদ্বারা শব্দ বুঝায়; যেমন—শোঁ শোঁ করে বাতাস বইচে। অত্যন্ত বেগে বাতাস বহিতেছে, সেই গতিতে যে অত্যন্ত শোঁ শোঁ শব্দ উত্থিত হইতেছে, তাহারই ব্যাখ্যা-কল্পে চলিত কথায় “শোঁ শোঁ করে বাতাস বইচে” বলা হয়।

গন্ধ-বিশেষণ—যাহারা গন্ধ-প্রকাশক; যেমন, “গন্ধে ঘরটা ভুর্‌ভুর্ কর্‌ছে” অর্থাৎ গন্ধে আমোদিত কর্‌ছে।

স্পর্শ-বিশেষণ—যাহাদ্বারা স্পর্শ বা অনুভূতি বুঝায়; যেমন, “গা সুর্ সুর্ করা” এবং “কাণ ঝাঁ ঝাঁ করা”। “গা সুর্ সুর্ করা”তে একটা কণ্ডূয়নের ইচ্ছা এবং সে ইচ্ছা স্পর্শ-জাতীয়; কিন্তু “কাণ ঝাঁ ঝাঁ করা” সুধুই অনুভূতি।

অবস্থা-বিশেষণ—সাধারণতঃ যাহাদ্বারা বিশিষ্টের ভিন্ন অবস্থা ও ভাব বুঝায়, তাহাকেই আমরা অবস্থা-বিশেষণ বলিব; যেমন, “পচে থস্ থস্ কর্‌চে” বলিলে পচার একটি অবস্থা স্বভাবতঃই মনে উদয় হয় যে, সে বস্তুটা এত পচিয়াছে যে, আর ব্যবহারের উপযুক্তই নয়; ব্যবহার্য্য বস্তুর যেমন অবস্থা হওয়া উচিত, থস্ থসে পচা যে জিনিষ, তার সে অবস্থা নাই; কিন্তু জিনিষটা পচেছে বলিলে থস্ থসে পচা অর্থ কখনই বোধ হয় না। “পট্ পট্ করে বলা” শীঘ্রত্বব্যঞ্জক—এগুলি ভাবপ্রকাশক। কিরূপভাবে বলা? না, শীঘ্র শীঘ্র বলা।

“আনি” প্রত্যয় করিলে এ বিশেষণগুলি আবার বিশেষ্যের রূপ ধারণ করে; যেমন—ছট্‌ফটানি, শোঁশোঁয়ানি, মড়্‌মড়ানি। ক্বচিৎ “ইনি” প্রত্যয়ও হয়; যেমন—তিড়্‌বিড়িনি। “উনি” প্রত্যয়ও হয়; যেমন—সুর্‌সুরুনি। একাক্ষরসম্পন্ন হ্রস্ব স্বরান্ত শব্দগুলির বিশেষ্য পদে এরূপ কোনই প্রত্যয় ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। সে স্থলে ক্রিয়াযোগে বিশেষ্য পদই দেখিতে পাই। যেমন—ড়িড়ি করাটা গেল না ত। দীর্ঘ-স্বরান্ত শব্দে “আনি” প্রত্যয়ই অধিক দৃষ্ট হয়। ব্যঞ্জনান্ত শব্দে “আনি”, “ইনি” ও “উনি” সব প্রয়োগই দৃষ্ট হয়।

এইবার আমরা উক্ত ষড়্‌বিধ বিশেষণের কয়েকটি উদাহরণ দিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) রূপ-বিশেষণ:—

ঝক্‌ঝকে আলো, ঝক্‌ঝকে ঘর, টক্‌টকে লাল।
মিশ্‌মিশে অন্ধকার, ফিট্‌ফিটে পরিষ্কার, ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না।
“ফিট্‌ফাট্ সাজান” সাজান’র পারিপাট্যকে বুঝাইতেছে।
“দগ্ দগ্ করে জ্বলা,” পূর্ণ-প্রজ্জ্বলনের মূর্ত্তিই মনে পড়ে।
তক্‌তকে ঘর, ধপ্‌ধপে শাদা, টুক্‌টুকে লাল।
থস্‌থসে = অমসৃণ।
নাদুস্ নেদুস্ লোকটি = বেশ মোটা-সোটা লোকটি।

(২) রস-বিশেষণ:—

জিব্ সক্-সক্ করা = কোনও দ্রব্য খাইতে প্রবল ইচ্ছা হইলে বলিয়া থাকে 'জিব্ সক্ সক্ কর্‌চে নাকি' ?

মুখ ড়িড়ি করা।

টেসো টেসো লাগা = অপক্কতার স্বাদ।

ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করা = ফ্যাঁস্ ফেঁসে লাগা = জলীয় স্বাদ।

টুক্ টুক্ করা = কটু রসস্বাদ।

(৩) শব্দ-বিশেষণ :—

(ক) চট্ করে চাপড় মারা, মট্ করে ভেঙ্গে যাওয়া।

ঠাস্ করে চাপড় মারা। শোঁ করে ঝট্‌কা আসা।

কোঁৎ করে ভাত খাওয়া = ভোজনকালীন্ কণ্ঠনালীর শব্দ।

গপ্ করে গিলে ফেলা = ঐ

ঢক্ করে খাওয়া = পানীয় বস্তুর ভোজনকালীন্ কণ্ঠনালীর শব্দ

ঢক্ করে খাওয়া = ঐ ঐ

কোঁ করা = অব্যক্ত শব্দ।

খক্ করে কাসা। বোঁ করে উড়ে যাওয়া।

ভ্যাঁক্ করে লাথি মারা, ভুস্ করে ডুব দেওয়া।

দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠা = নির্ব্বাপিতপ্রায় আগুন যখন বাতাসে জ্বলিয়া উঠে, তখন আগুন জ্বলার সঙ্গে সঙ্গেই দপ্ করিয়া একটি শব্দ উত্থিত হয়।

ভস্ করে বালিতে পা ঢুকে যাওয়া = (বালির শব্দ)

ভ্যাঁস্ করে বসিয়ে দেওয়া = সহজ-কাট্য বস্তুতে অস্ত্রচালন-কালীন্ যে শব্দ হয়।

ওয়াক্ করা = উদ্বমন-প্রারম্ভের শব্দ।

ব্যাখ্যা।—উপরোক্ত শব্দগুলির একক ব্যবহার হইয়া থাকে। একক ব্যবহার বা দ্বিত্ব ব্যবহার উভয়ই প্রায় সমান অর্থ-বাচক ; কিন্তু একক ব্যবহারের একটি কারণও নির্দ্দিষ্ট করিতে পারা যায়। উপরে যে সকল ক্রিয়ার সঙ্গেও বিশেষণ-গুলি বসিয়াছে, সে ক্রিয়াগুলির গতি বা স্থায়িত্ব নাই। তাহাদের উদ্ভব ও বিলয় একবারেই সম্পন্ন হয় এবং সম্পূর্ণ ; কাজেই প্রত্যেকবার তাহারা নূতন ; যেমন, "চাপড় মারা" একবারও হয়, বহুবারও হয় ; কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহারা নূতন। বাতাস বহা বা চলিয়া যাওয়া বা আসা বা খাওয়া, তাহাদের কিছু কালসাপেক্ষ গতি বা স্থায়িত্ব আছে ; কাজেই আমরা "শোঁ করে বাতাস বইচে" না বলিয়া "শোঁ শোঁ" করে বলি ; "বন্ করে আস্‌চে" না বলিয়া "বন্ বন্ করে" বলি ; কিন্তু "টক্ করে বেরিয়ে গেল" বলি ; কেন না, বেরিয়ে যাওয়া একবারেই সম্পন্ন হয় এবং সম্পূর্ণ। অতএব একক রূপ এক সংখ্যা অর্থে এবং দ্বিত্বরূপ একাধিকবার বা গতি ও স্থায়িত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিতে পারা যায়।

(খ) গল্ গল্ করে বমি করা, মাছি ভন্ ভন্ করা, দর্ দর্ করে জল পড়া, ফর্ ফর্ করে উড়া, কড়্ কড়্ করে মেঘ ডাকা, পৎ পৎ করে উড়া, হুড়্ হুড়্ করে জল ঢালা।

বন্ বন্ করে ঘোরা, বালি কর্ কর্ কর্‌ছে, বোঁ বোঁ করে ঘোরা, মড়্ মড়্ করে ভেঙ্গে যাওয়া, হোঁস্ হোঁস্ করে কোদাল পাড়া, হোঁক্ হোঁক্ করে জল খাওয়া, ফুস্ ফুস্ করে কথা বলা, ফেটে খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ কর্‌ছে, গুন্ গুন্ করে গান করা।

চপ্ চপ্ করে খাওয়া = সরীসৃপাদির ভোজন বা লেহন শব্দ।

পচ্ পচ্ করা = কর্দ্দমাক্ত পথে চলিতে যে শব্দ উত্থিত হয়।

শন্ শন্ করে বাতাস বওয়া।

ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করা = কর্কশ শব্দ ; ক্রমে "ক্যাঁচ্ কেঁচে লোক" অর্থাৎ ঝগড়াটে লোক।

ঠক্ ঠক্ করে যাওয়া = (যষ্টির শব্দ করিতে করিতে যাওয়া)

কুড়্ কুড়্ করে খাওয়া = ভর্জ্জিত দ্রব্য ভোজনের শব্দ।

ঠুক্ ঠুক্ করে কাজ করা = অতিমৃদু শব্দ করিয়া কোনও কাজ করা ; ক্রমে ধীর ও অলস অর্থে "ঠুক্ ঠুকে লোক" ব্যবহার হয় ; কিন্তু ঠুক্ ঠুকে স্বভাব অর্থে বিবাদপ্রিয়তা বুঝায়।

কিড়্ কিড়্ করা = দন্ত-শব্দ। ক্রমে "কিড়্ কিড়ে লোক" অর্থে বিবাদপ্রিয় বুঝায়।

পেট ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ কর্‌চে = উদরে বায়ু বদ্ধ হইলে ঐরূপ শব্দ হয়।

ঘড় ঘড় করা = শকট-শব্দ, গলার শব্দ অথবা অন্য কিছুর উচ্চ কর্কশ শব্দ। (ঘর্ঘর, সাধু ভাষায় চলিত)

মিন্ মিন্ করে বলা = হো-হো করে হাসা।

খিল্ খিল্ করে হাসা = উচ্চ হাস্য অর্থে।

কল্ কল্ কর্‌চে জল = জল-কল্লোলের শব্দ।

কল্ কল্ কর্‌চে লোক = জনতা হইতে যে একপ্রকার মিশ্রিত অব্যক্ত কলরব উত্থিত হয় ; ক্রমে অসংখ্য লোক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

গাঁ গাঁ করে চেচান = উচ্চ কর্কশ শব্দ করা।

(খ) উপরোক্ত শব্দগুলির আবার একক ব্যবহার হয় না। ঠিক (ক) ব্যাখ্যার বিপরীত। এখানে যে ক্রিয়ার সহিত বিশেষণগুলির যোগ হইয়াছে, সেগুলি একেবারে সম্পূর্ণ হয় না ; ইহাদের একটু স্থায়িত্ব বা ব্যাপ্তি আছে ; কাজেই এই স্থায়িত্ব নির্দ্দেশ-কল্পে দ্বিত্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

এক কথায় ইংরাজীর Porgessive tense হইলে দ্বিত্বরূপ এবং Past বা perfect tense হইলে একক রূপ ব্যবহৃত হয় বুঝিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

(গ) ঠুক্ ঠাক্ করে কাজ করা = (ধীরে ধীরে) ; দমাদ্দম মারা ; পটা পট মারা ; ফটা ফট্ চাপড় মারা = অনেকগুলি চাপড় মারা।

লটা পট্ করা = শিথিল অর্থে। টগ্ বগ্ করা = (ভাতের বা অশ্বক্ষুরের শব্দ) ; খটা খট্ করে দৌড়ান ; খটা খট্ করে যাওয়া।

হাঁস্ ফাঁস্ = (সর্দ্দিতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় বন্ধ হওয়ায়, অসুস্থতা-হেতু চাঞ্চল্যপ্রকাশ এবং তজ্জনিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।)

চড়্ চড়্ করা = (বাদ্য-শব্দ—এই শব্দ উত্থিত হয় বলিয়া এই শব্দকারী বাদ্যযন্ত্রের নাম পর্য্যন্ত চড়্ চড়ে। কোনও বস্তু শুকাইয়া গেলে বলে যে, জায়গাটা চড়্ বড়্ কর্‌ছে (অবস্থাবিং) কিচ্ মিচ্ শব্দ করা ; টিপ্ টাপ্ করে জল পড়া ; টুপ্ টাপ্ করে পড়া।

ব্যাখ্যা :—উপরোক্ত শব্দগুলি দ্বিত্বরূপ বিশেষণ বটে, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দের ঈষৎ পরিবর্ত্তন আছে।

(৪) গন্ধ-বিশেষণ :—

গন্ধে ভরপুর করেছে = আমোদিত অর্থ।

গন্ধে মৌ মৌ করছে = ঐ

গন্ধে ভুর্ ভুর্ কর্‌ছে = ঐ

স্যাঁৎ স্যাঁতে = সিক্ততার জন্য যে একপ্রকার গন্ধ, তাহাই।

সোঁদা সোঁদা গন্ধ = মৃত্তিকা হইতে একপ্রকার যে মৃদু গন্ধ উঠে, তাহাকেই 'সোঁদা সোঁদা গন্ধ' বলে।

(৫) স্পর্শ-বিশেষণ :—

গা সুড়্ সুড়্ করা ; গা পিশ্ পিশ্ করা ; টন্ টন্ করা ; কাতু কুতু দেওয়া ; কন্ কনে শীত।

গা শির্ শির্ করা = গাত্র-শিহরণ ; মুখ সুর সুর করা।

বুক ধড়্ ফড়্ কর্‌ছে = ঐ। গা ছপ্ ছপ্ করা, গা ছম্ ছম্ করা—বিপদ ও আশঙ্কা হেতু ভীতি অনুভব করা।

চড়্ চড়্ = বেদনা-অনুভূতি ; ইহা হইতেই "বুক চড়্ চড়ানি—পরশ্রীকাতরতা।

চোখ কর্ কর্ করা = চক্ষু দিয়া জল নিঃসরণ ও অসুস্থতা অনুভব করা।

গলা সাঁই সাঁই করা = কাসি বা সর্দ্দির প্রাক্কালে কণ্ঠনালীতে একপ্রকার কণ্ডূয়নেচ্ছাজনিত অসুস্থতা অনুভব করা।

রোদ্ চিন্ চিন্ কর্‌ছে = প্রচণ্ড রৌদ্রজনিত গাত্রজ্বালা অনুভব করা।

ঝিন্ ঝিন্ ধরা = রক্তচালনা বন্ধ হইলে যে অসুস্থতা অনুভূত হয়।

ক্ষুক্ ক্ষুক্ করা = প্রবলেচ্ছা-বিজ্ঞপ্তি।

(৬) অবস্থা-বিশেষণ :—

সট্ করে যাওয়া = শীঘ্রগতি।

ঝট্ করে যাওয়া = ঐ। সংস্কৃত 'ঝটিতি' শব্দ হইতে উৎপন্ন ; হিন্দিতেও ঝট্ শব্দের ব্যবহার আছে। ঝপ্, ফট্, পট্, চট্ শব্দগুলিও বোধ হয় উচ্চারণ-তারতম্যে এরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বোঁ করে যাও, ঝাঁ করে খাও, সোঁ করে চলে এস ; টক্ করে বলা, টপ্ করে গিলে ফেলা = (অনায়াস সাধ্য), ফস্ করে গিট খোলা ; টপ্ বা টপাৎ করে পাঁচিল লাফান' = (বিনায়াসে) ; কপ্ করে বা কপাৎ করে কুড়িয়ে নেওয়া (শীঘ্রগতি) ; খেই করে তেড়ে আসা = অকস্মাৎ বেগে পশ্চাদ্ধাবন করা।

উপরোক্ত শব্দগুলিতেও ৩ (ক) নিয়ম খাটে এবং সেইজন্য একক ব্যবহার।

টিপি টিপি জল পড়া = অল্পার্থে। গন্ গনে আগুন = আগুনের পূর্ণ প্রজ্বলিত অবস্থা ; ভোঁ ভোঁ করে যাওয়া = দ্রুতগতি, আসর গম্ গম্ কর্‌ছে = (জমকাল অর্থে) ; নিটিস্ পিটিস্ মানুষ = অলস (ধীর) ; কপ্ কপ্ করে খাওয়া = দ্রুতগ্রাসে।

হাম্ হাম্ করে খাওয়া = (ঐ) ; রেগে মট্ মট্ করা—অত্যন্ত ক্রুদ্ধাবস্থা।

নিট্ পিট্ করা = ধীর ও অলস অর্থে ; যেমন 'নিট্ পিটে মানুষ'।

পেকে টস্ টস্ করা = সুপক্কাবস্থা ; টো টো করে ঘোরা (উদ্দেশ্যবিহীনভাবে)। গা আই ঢাই করা = অসুস্থতা অনুভব করা।

সর্দ্দিতে ঢোঁ ঢোঁ করা = অত্যন্ত সর্দ্দিযুক্ত অবস্থা।

ফুলে দল্ দল্ করা = অত্যন্ত স্ফীতাবস্থা।

চড়্ চড়্ করে ফেঁপে ওঠা = ঐ।

সুড়্ সুড়্ করে চলে যাওয়া = ধীরে ধীরে।

ফুর্ ফুর্ করে বাতাস বওয়া ; পট্ পট্ বলা = শীঘ্রার্থে।

ফট্ ফট্ করা—যেমন, "বেশী ফট্ ফট্ কর' না" অর্থাৎ বাচালতা। বোধ হয় ফট্ ফটানির রূপান্তরে 'ফুটানি' হইয়াছে।

চোখ ছল্ ছল্ করা = রোদনোন্মুখ ভাব। নড়্ বড়্ করা = শিথিলার্থে।

ড্যাং ড্যাং করে যাওয়া = নির্ভীক ও গর্ব্বিতভাবে যাওয়া।

খদ্ খদ্ করে হাসা = সাধারণতঃ শিশুর হাসিকেই বলে।

হাপুস্ হাপুস্ কাঁদা = দরবিগলিত ধারে ক্রন্দন ; হাপুস্ নয়নেও দেখা যায় ; হিড়্ হিড়্ করে টানা = বেগে টানা।

লক্ লক্ করা = নমনশীল অর্থে। সাধারণতঃ বাঁশের সহিতই ব্যবহৃত হয় ; যেমন "কঞ্চির মত লক্-লক্ কর্‌ছে" ; "বেতখানা লক্ লক্ কর্‌ছে"ও শুনা যায়।

পথটা কাদায় দল দল কর্‌ছে = অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত।

পচে ভস্ ভস্ বা ভট্ ভট্ কর্‌ছে ; পচে থুস্ থুস্ বা থস্ থস্ কর্‌ছে।

বুড়ো হয়ে ঠুস্ ঠুস্ কর্‌ছে = অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা।

ছেলেটা টুল্ টুল্ কর্‌ছে = অত্যন্ত শীর্ণাবস্থা ; কপ্ কপ্ করে = শীঘ্র।

গুড়্ গুড়্ করে = ধীরে ধীরে ; শীতে হি হি করে কাঁপা = শৈত্যাধিক্যে কম্পন।

প্রদীপটা মিট্ মিট্ কর্‌ছে = দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ।

মিটি মিটি চাওয়া = অল্প অল্প চাওয়া।

গুটি গুটি যাওয়া = ধীরে ধীরে যাওয়া। সাধারণতঃ বৃদ্ধের চলাকেই বলে।

লটা পটি খাওয়া = পরাজিত অবস্থায় প্রয়োগ হয়। যেমন, কুস্তিতে লটা পটি খাইয়ে দিল, কাদায় লটা পটি খেয়ে এল।

প্যাঁৎ প্যাঁৎ করে পালান = অপ্রতিভ হইয়া পলায়ন।

গিজে গিজে খাওয়া = চেপে চেপে খাওয়া—গুরু ভোজনার্থে।

জল থই থই কর্‌ছে = জলপ্লাবিতার্থে।

রেগে তিড়্ বিড়্ বা তিড়্ তিড়্ করা = অত্যন্ত ক্রুদ্ধাবস্থা।

তিড়িং বিড়িং করে লাফান = লম্ফ ঝম্প হেতু চঞ্চলতা।

কিল কিল বা কিল বিল কর্‌ছে লোক বা পোকা = অধিকারার্থে।

ধেই ধেই করে নাচা = তাণ্ডব নৃত্য।

হুড়্ মুড়্ করে বেরিয়ে আসা = সদলে, বেগে।

হুটো পাটি করে বা হুট্ পুট্ করে = ঐ।

নরম তুল্ তুল্ কর্‌ছে = অত্যন্ত কোমলাবস্থা।

ধড়্ ফড়্ করা = অশান্তাবস্থা।

ফড়্ ফড়্ করা = বাচালতা প্রকাশ।

ক্ষিদেয় ধস্ ধস্ করা, তাঁ তাঁ করা, টাঁ টাঁ করা = অত্যন্ত ক্ষুধিতাবস্থা।

আল্লা ফস্ ফস্ কর্‌চে = শিথিলাবস্থা।

ফুক্ ফুক্ করে আসা-যাওয়া = বারংবার।

ফিক্ ফিকে = বাচাল।

অহঙ্কারে মট্ মট্ করা = অত্যন্ত গর্ব্বিতাবস্থা।

লোককে খিচ্ খিচ্ করা = বিরক্তিপ্রকাশ করা।

ফিক্ ফিক্ করে হাসা = বারংবার অল্প অল্প করিয়া হাসা।

বকর বকর করা = বাচালতা প্রকাশ করা।

হ্যাঁকোচ্ প্যাঁকোচ্ করা = অশান্ত ভাব।

এলো মেলো, এলো থেলো = অযত্ন বা অসাবধান অবস্থা।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

তোমরা

১

তোমরা ছিলে ভক্ত সাধক,
ছিল নাক যশের তৃষা ;
পূজার ঘরে জেলে প্রদীপ
থাক্‌তে জাগি দিবস-নিশা ।

২

ভাবের দ্বারে ভিক্ষা মাগি'
অভীষ্টেরি চরণতলে
এনে দিতে ;—ভাস্‌ত কপোল
ভক্তির পূত অশ্রুজলে ।

৩

যখন যে গান উঠ্‌ত জেগে—
গেয়ে যেতে আপনহারা,
ভাষার দিকে নাইক' দৃষ্টি,—
কেবল ভাবে মাতোয়ারা !

৪

কর্‌তে নাক' কায়ার পূজা,
প্রাণের পূজা কর্‌তে সোজা ;
পরিচ্ছদের অন্তরালে
থাকৃত নাক' ক্ষতের বোঝা !

৫

তোমরা রাখ্‌তে নাক' বাহির শাদা,
ভিতর ভরা কালো দাগে ;
বল্‌তে যাহা, লিখ্‌তে যাহা—
কর্‌তে তাহা সবার আগে !

৬

তুচ্ছ নামের তরে—ভুলেও
কর্‌তে নাক' ছুটাছুটি—
আপনারে ভাব্‌তে ধন্য
পূজে মায়ের চরণ দুটী !

৭

ইহার চেয়ে অধিক কিছু
চাইতে না আর নিজের তরে,
আপন মনের হ'য়ে রাজা
ধর্‌তে শাসন সবার 'পরে !

৮

প্রাণ দিয়ে মান রাখ্‌তে সদা,
তুচ্ছ কর্‌তে রাজার দান ;
—আতপান্ন আর তেঁতুল পাতা
তাতেই পেতে সুধার ঘ্রাণ !

৯

নিত্য 'অহং' শূন্য হ'য়ে
গ্রন্থ রচি' কর্‌তে বাহির—
সুদ্ধ তাহা বিশ্বহিতে
নয় তা—নিজে কর্‌তে জাহির !

১০

মনে পড়ে—ভক্ত গৌর
—নদীয়ার সে প্রেমিকপ্রধান,
মুছে নিলেন নিজের কীর্ত্তি
রাখ্‌তে রঘুনাথের মান ।

১১

তোমরা আবার গ্রন্থ লিখে
(ভাব্‌তে এমন বেশী না—)
গুরুর নামে করে' প্রচার
দিতে গুরু-দক্ষিণা ।

১২

ভক্ত, পূজা করেই তুষ্ট—
চায় না যে তার পূজার দাম,
তবে বাঞ্ছাকল্পতরু
পূরান্ তাহার মনস্কাম !

১৩

শুনিয়াছি—রামপ্রসাদের
ডাকের জোরে মহামায়া—
এসে বেঁধে দিলেন বেড়া—
কন্যারূপে—ধরি কায়া !

১৪

তোমরা ছিলে ভক্ত সাধক,
আমরা মহা স্বার্থপর—
কাজের চেয়ে শৌ বুঝি
আস্ফালন ও আড়ম্বর !

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন প্রসঙ্গ

(ছ)

শের সাহের রন্ধনশালা

শের শাহের রন্ধনসালা একটী বিরাট্ যজ্ঞভুমির ন্যায় ছিল। বহুশত সৈনিক ও দাস-দাসী তথায় প্রত্যহ আহার পাইত। তাঁহার আদেশ ছিল যে, যে-কোন সৈনিক অথবা দরবেশ, ফকির প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী, এমন কি, সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত আহারের সংস্থান করিতে না পারিলেই সম্রাটের রন্ধনশালায় উপযুক্ত আহার্য্য পাইবে। সম্রাট্ যখনই সসৈন্যে কোন অভিযানে নিযুক্ত হইতেন, তখনই এইরূপ ব্যবস্থা হইত। এই কারণে প্রতিদিন পাঁচশত আস্‌রফি ব্যয়িত হইত।

[তারিখ-ই-শেরশাহী]

চৌর্য্য, লুণ্ঠন, হত্যা

যাহাতে চৌর্য্য, লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতি না ঘটে, সেইজন্য শের-শাহ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ঃ—

সাম্রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে শাসনকর্ত্তা ও আমিলগণ নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের আপন আপন অধিকার-মধ্যস্থিত কোন গ্রামে চৌর্য্য বা লুণ্ঠন ঘটিলে, যদি অপরাধী ধৃত না হইত, তাহা হইলে তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রধান ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্য আদায় করিয়া লইয়া নিপীড়িত গৃহস্বামীকে প্রদান করিতেন। যদি 'প্রধানগণ' অপরাধীকে বাহির করিয়া দিতে পারিত কিংবা কে কোথায় লুক্কায়িত রহিয়াছে, সে সন্ধান বলিতে পারিত, তাহা হইলে অপরাধী যে গ্রামে ধৃত হইত, সেই গ্রামের প্রধানকে চৌর্য্য বা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণ করিতে হইত। এই অর্থ পূর্ব্ববর্ণিত প্রধানগণ প্রাপ্ত হইত। অপরাধীর তখন যথানির্দ্দিষ্ট দণ্ড হইত।

কোনস্থানে নরহত্যা সংঘটিত হইলে পর, যদি হত্যাকারী ধৃত না হইত, তাহা হইলে আমিলগণ গ্রামের প্রধানদিগকে ধৃত করিতেন। উহারা তৎক্ষণাৎ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত। অপরাধীর সন্ধান করিবার জন্য উহাদিগকে কয়েকদিন সময় দেওয়া হইত। অপরাধী ধৃত হইলে বা তাহার সন্ধান পাওয়া গেলে প্রধানগণ মুক্তিলাভ করিত। অপরাধী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইত ; কিন্তু যে গ্রামে হত্যা হইয়াছে, সে গ্রামের প্রধানগণ যদি অপরাধীকে ধৃত করিতে বা তাহার সন্ধান দিতে না পারিত, তাহা হইলে হত্যাকারীর পরিবর্ত্তে উহাদিগকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত।

শের শাহ বলিতেন, এই সকল প্রধানদিগের সাহায্যেই চৌর্য্য, দস্যুতা, হত্যা প্রভৃতি সংঘটিত হয়।

একথা যে অনেকাংশে সত্য, তাহা এখনও সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

[তারিখ-ই-শের শাহী]

তক্কভি

অধুনা কোন কারণে কোনস্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে সরকার বাহাদুর তথায় সহস্র সহস্র মুদ্রা ঋণ দিয়া থাকেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ইহার নাম তক্কভি। এই তক্কভি যে কত উপকার সাধন করে, উহা যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা ঠিক বুঝিবেন না। তক্কভির ব্যবস্থা এ দেশে ইংরাজকর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পৌরাণিক কালেও এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়া কেহ কেহ বলেন। মুসলমান সম্রাট্‌দিগের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সুলতান মহম্মদ (ইনি খৃঃ পূঃ ১৩২০ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) দিল্লীর দুর্ভিক্ষ-দমন-কালে কৃষকদিগকে ঋণপ্রদান করিয়াছিলেন। সে সময় দিল্লীতে মানুষ মানুষকে কামড়াইয়া খাইতেছিল।

আজকাল যখন অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়, তখন কার্য্যক্ষম লোক-দিগের জন্য সরকার বাহাদুর কার্য্যের সংস্থান করিয়া দেন। এই ব্যাপারে যাঁহাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা বলিবেন যে কষ্টের সংস্থান করিয়া দিলেও সকল লোকে তাহাতে লিপ্ত হইতে চাহে না। ভারতবাসীর এই স্বভাব যে সুধু এখনই দেখা যাইতেছে, তাহা নহে, উক্ত দিল্লীর দুর্ভিক্ষকালেও এইরূপই দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "Men did not apply to work……They continued inactive."

দণ্ড না দয়া ?

সুলতান ফিরোজ শাহ স্বয়ং একখানি ক্ষুদ্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহার একস্থানে লিখিত আছে ঃ—

পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে অনেক মুসলমানের রুধিরে ধরণীতল রঞ্জিত হইত। দণ্ড ও নির্যাতনের বহু পন্থা সেকালে অবলম্বিত হইত। কাহারও হস্ত-পদ ছেদন করা হইত, কাহারও নাসিকা কর্ত্তিত হইত, নয়ন উৎপাটিত করিয়া কাহাকেও বা অন্ধ করা হইত। কাহারও কণ্ঠমধ্যে উত্তপ্ত গলিত শীষক-স্রোত ঢালিয়া, কাহারও দেহের অস্থি ভীষণ পেষণে চূর্ণীকৃত করিয়া, কাহারও দেহে প্রজ্বলিত অগ্নি ধরিয়া নির্যাতিত করা হইত ; কোন হতভাগ্যের হস্তে, পদে, বক্ষে লৌহ-শলাকা প্রবিষ্ট করান হইত, কাহারও দেহের শিরা কাটিয়া দেওয়া হইত, কাহাকেও বা করাতে চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত করা হইত ! নির্যাতনের যে এইরূপ কত উপায় বর্ত্তমান ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।…ভগবানের কৃপায় আমি এ সকল উপায় অবলম্বন না করিয়া নির্যাতনের পরিবর্ত্তে স্নেহ, দয়া ও কোমলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। দেখিতেছি, ইহাতে রাজার প্রতি ভক্তি অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে—প্রজার হৃদয়ে ভয়ও আসিয়াছে। নির্যাতনের কালে এত ভক্তি ও এত ভয় ছিল না।

[ফুতুহাৎ-ই-ফিরোজশাহী]

তাম্র-মুদ্রা

সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘ্‌লিক শাহ খৃঃ পূঃ ১৩২৫ সালে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যখন তাঁহার রাজকোষে অর্থের অভাব হইল, তখন তিনি আদেশ দিলেন, যাহার ইচ্ছা তাম্র-মুদ্রা প্রস্তুত কর।" তাম্র-মুদ্রায় সকল কার্য্য হইতে লাগিল। প্রত্যেক হিন্দু আপন গৃহে লক্ষ লক্ষ তাম্র-মুদ্রা প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহারা তাম্র-মুদ্রায় রাজকর দিতে লাগিল, তাম্র-মুদ্রায় অশ্ব ও

যুদ্ধোপকরণাদি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ফলে হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ ক্রমেই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলেন। রাজকোষ যেমন অর্থশূন্য ছিল, তেমনই থাকিল!

[তারিখ-ই-ফিরোজশাহী]

গুপ্তচর

জর্ম্মান-সম্রাটের গুপ্তচরদিগের অনেক কাণ্ড আমরা এখন সংবাদ-পত্রে পাঠ করিতেছি। রুষদেশেও গুপ্তচর। সম্রাটের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সুলতান আলাউদ্দীনের কালে গুপ্তচরদিগের প্রভাব এরূপ হইয়াছিল যে, আমির-ওমরাহগণ পর্য্যন্ত আপনার কক্ষমধ্যেও নিশ্চিন্তে উচ্চকণ্ঠে কথোপকথন করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহাদের কোন পরামর্শ থাকিলে, তাহা ইঙ্গিতে প্রকাশ করিতেন।

[ঐ]

সুরা

সুলতান আলাউদ্দীনের আদেশে কোনস্থানেই সুরা বা তত্তুল্য কোন পানীয় বিক্রীত হইতে পারিত না। শৌণ্ডিকগণ একে একে নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া গেল। সুরা-কর বন্ধ হইল। সুলতান সে অভাবও সহ্য করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র প্রাসাদের প্রমোদ-কক্ষ হইতে শত শত মূল্যবান্ স্ফটিক পাত্র রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। প্রাসাদের গুপ্তকক্ষ হইতে কলসী কলসী উৎকৃষ্ট সুরা আনাইয়া সুলতান রাজপথে ঢালিয়া দিলেন। বদাউন তোরণ-সম্মুখে সুরার স্রোত বহিল, রাজপথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিল।

তখন মালিকগণ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দিল্লীর রাজপথ-সমূহে, জনপূর্ণ বিপণীতে এবং সর্ব্বস্থানে ঘোষণা প্রচার করিয়া দিল—"সুরা-পান রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ হইল। কেহ উহা বিক্রয় করিতেও পারিবে না, প্রস্তুত করিতেও পারিবে না।"

যাহাদের আত্মসম্মান বোধ ছিল, তাহারা তদ্দণ্ডেই সুরা পরিহার করিল; কিন্তু দুষ্টচরিত্রের লোকগণ তখন গোপনে সুরা সংগ্রহ ও পান করিতে লাগিল। এদিকে দুষ্ট-দমনের জন্য সুলতানের গুপ্তচরগণও দিবানিশি জাগ্রত সচেতন হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

গোপনে যাহারা সুরার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইতে লাগিল—তাহাদিগের সযত্নে-প্রস্তুত সুরারাশি হস্তিশালায় হস্তিগণের পানের জন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। অপরাধীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি পাইল যে, রাজ-কারাগারে তাহাদের আর স্থান সঙ্কুলান হইল না। সুলতান তখন বদাউন তোরণের বহির্ভাগে ভূগর্ভে কূপ খনন করিয়া সুরাপায়ী ও সুরা-ব্যবসায়ীদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যাহারা মরিল না, তাহারা দণ্ডকালের শেষে মৃতবৎ হইয়া উঠিল।

এত দণ্ডেও মদ্যপদিগের চৈতন্য হইল না। তাহারা দলে দলে যমুনা অতিক্রম করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিল এবং তথা হইতে ১০।১২ ক্রোশ করিয়া দূরে ঘিয়াসপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, ফিলুঘড়ী প্রভৃতি গ্রামে গিয়া গোপনে সুরাপান ও উহা প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সুলতান শেষে বুঝিলেন, সুরাপান একেবারে বন্ধ করা অসাধ্য। তখন আদেশ দিলেন, যদি কেহ আপন গৃহে গোপনে সুরা প্রস্তুত করে ও গৃহে বসিয়াই আপন আত্মীয় স্বজনের সহিত উহা পান করে, তাহা হইলে রাজানুচর তাহাকে অপরাধী বলিয়া ধৃত করিবে না; কিন্তু দশজনে মিলিয়া দলবদ্ধ হইয়া সুরাপান করিলে, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

[ঐ]

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

আড়ি

তোর সনে ভাই করেছি যে আমি আড়ি,
দেখিলে যে তোরে মুখখানি করি ভারি,
অন্যপথে যে যাই চলে তাড়াতাড়ি,
পাছে তোর সনে দেখা হয় মুখোমুখি,
যাই নাক' আর যশোদা মায়ের ঘরে,
প্রভাতে ডাকিতে গোষ্ঠে যাবার তরে,
দেই নাক' যোগরাগ অভিমান ভরে,
গোঠের খেলায় দূর হতে দেই উঁকি।
তোর বেণু শুনে যাই নাক' তোর পাশে
যমুনায় জল-বিহারের অভিলাষে,
কথা কহিয়াছ কতবার পরিহাসে,
জবাব না দিয়ে ফিরায়ে নিয়েছি আঁখি,
ফেটে যায় বুক মুখে কিছু নাহি বলি,
গুমরি' গুমরি মনের আগুনে জ্বলি,
থাকি থাকি ক্ষোভে আঁখি উঠে ছলছলি,
দোল এল আর কেমন করিয়া থাকি?

দেখিলাম আমি তুই ছাড়া একপল,
এ জীবন হয় যুগব্যাপী দাবানল,
শয়ন, ভোজন, বন, মাঠ গৃহতল,
কোনখানে নাই সুখবিন্দুটি ভাই!
আপনার-গড়া নিগড়ে চরণ বাঁধা,
আপনার-চারে কারাগারে বসে কাঁদা,
আপনার 'পরে বহু হল বাদ সাধা,
এমন কাঙ্গাল সংসারে কেহ নাই!
একা একা আড়ি কত করি, প্রাণ যায়,
ফাগুনের দিন শেষ হয়ে যায় হায়,
কথা নাহি হোক্, বুকে তুই ফিরে আয়,
বুকে না ধরিয়া থাকিতে যে আর নারি!
যমুনার কূলে রহিলাম বসে আজ,
আসিবি যেমন পরি হোরী-লীলা-সাজ,
বক্ষে ছুটিয়া ধরিব রাখাল-রাজ,
চক্ষের জলে ভাসাইব সব আড়ি।

শ্রীকালিদাস রায়

গুলিস্তানের গল্প

দ্বাদশ গল্প

আমি একদিন দেখিলাম, এক ফকির ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক ক্ষত-বিক্ষত হইয়া সমুদ্রতীরে পড়িয়া রহিয়াছেন। কোন ঔষধেই তাঁহার কিছু-মাত্র উপকার হয় নাই। ফকিরের যন্ত্রণার শেষ ছিল না; তথাপি তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কেন এত কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিতেছেন?" তিনি বলিলেন:—"আমি পাপে না পড়িয়া কষ্টে পড়িয়াছি, এই আমার সৌভাগ্য এবং এইজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি।"

প্রেমময় যদি মোর সংহারে জীবন,
কিছুমাত্র নাহি ভীত হব সে কারণ;
জিজ্ঞাসিব:—"প্রাণনাথ দোষী কি চরণে?
কুপিত হইলে তুমি কি সুখ জীবনে।

ত্রয়োদশ গল্প

বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে কোন ফকির তাঁহার বন্ধুর গৃহ হইতে একখানি কম্বল অপহরণ করিয়াছিলেন। কাজি বিচার করিয়া তাঁহার হস্ত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া যাঁহার কম্বল, তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া বিচারককে ক্ষমা করিতে বলিলেন। কাজি বলিলেন:—"আমি তোমার অনুরোধে আইনের বিপরীত কার্য্য করিতে পারিব না।" তচ্ছ্রবণে সে ব্যক্তি বলিলেন:—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য; তথাপি যদি কেহ ভিক্ষালব্ধ বস্তু অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার হস্তচ্ছেদন করা উচিত নয়; কারণ ফকিরের কোন বস্তুর উপরই অধিকার নাই; তাঁহাদের যাহা-কিছু থাকে, তাহা দরিদ্রের প্রাপ্য।" এই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া কাজির মনে হইল; তিনি সে ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে বিরত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন:—"এমন বন্ধুর গৃহ ভিন্ন পৃথিবীতে আপনার চুরি করিবার কি আর স্থান ছিল না?" তিনি বলিলেন:—"আপনি কি নীতি-শাস্ত্রের কথা শুনেন নাই?—'বন্ধুর যথাসর্ব্বস্ব লইবে; তথাপি শত্রুর দ্বার মাড়াইবে না।"'

শঙ্কটে পড়িয়া কভু না হবে হতাশ।
লইবে শত্রুর চর্ম্ম, বান্ধবের বাস॥

চতুর্দ্দশ গল্প

কোন রাজা একজন সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আপনি কি কখনও আমার বিষয় ভাবিয়া থাকেন?" তিনি বলিলেন:—"হাঁ, যখন আমি সর্ব্বশক্তিমান, মহিমার্ণব ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকি, তখন আপনার কথা ভাবি।"

রাখেন ঈশ্বর যারে তাঁহা হ'তে দূরে,
সে জন সকল স্থানে মরে ঘুরে ঘুরে;
ঈশ্বরের দ্বারে আছে যার অধিকার,
অন্যের দ্বারস্থ কভু হয় না সে আর।

পঞ্চদশ গল্প

একজন ধার্ম্মিক লোক স্বপ্নে দেখিলেন, রাজা স্বর্গে গিয়াছেন ও সাধু নরকে গিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, ইহার অর্থ কি? রাজার উন্নতি ও সাধুর অবনতি কেন হইল; আমি মনে করিতাম, ইহার বিপরীত হইবে। এমন সময়ে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হইল:—"রাজা সাধুদিগকে ভালবাসিতেন ও সাধু রাজার প্রতি আসক্ত ছিলেন; সেইজন্য রাজার স্বর্গলাভ ও সাধুর নিরয় বাস।"

কন্থা বা জপের মালা কি করিতে পারে;
কলুষিত নাহি কর' পাপে আপনারে;
সুধু ফকিরের টুপি দেখে লোক হাসে,
কাজে সাধু হলে দোষ নাহি রাজ-বেশে।

ষোড়ষ গল্প

কতকগুলি যাত্রীর সহিত আমি কুফা হইতে মক্কায় যাইতে-ছিলাম। আমাদের সহিত একজন দরবেশ ছিলেন। তাঁহার পাদুকা কি বস্ত্র কিছুই ছিল না; এমন কি, একটী কপর্দ্দকও ছিল না; তথাপি তিনি মহানন্দে ও সজোরে যাইতেছিলেন।

চড়িবার নাহি উষ্ট্র, নাহি বহি ভার,
না আছে রাজত্ব, নহি কিঙ্কর রাজার,
ভাবিবার নাহি কিছু আছে বর্ত্তমানে,
ভূত, ভবিষ্যৎ জন্য দুঃখ নাহি প্রাণে;
সন্তোষে নিঃশ্বাস ফেলি, কামনাবিহীন,
হৃদয়ে বিরাজে শান্তি মম চিরদিন।

একজন উষ্ট্র চড়িয়া যাইতেছিল, সে বলিল:—"ওহে দরবেশ! কোথায় যাইতেছ? ফিরিয়া যাও, নচেৎ মারা পড়িবে।" এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া দরবেশ মরুভূমির উপর দিয়া যাইতে লাগিল। যখন আমরা বেনি-মামুদের তাল-বনে পৌঁছিলাম, তখন দেখিলাম, সেই উষ্ট্রারোহী ধনীর মৃত্যু হইয়াছে। দরবেশ তাহার মৃত্যু-শয্যার নিকট গিয়া বলিলেন:—"আমি কষ্টে মরি নাই, কিন্তু তুমি বল-শালী উষ্ট্রের উপর প্রাণ ত্যাগ করিয়াছ!"

রোগীর শয্যার পাশে বসি একজন,
সারা রাতি অবিরত করিল ক্রন্দন;
নিশা অবসান হলে সে জন মরিল,
মুমূর্ষু নীরোগ হয়ে বাঁচিয়া উঠিল।
দ্রুতগামী অশ্ব, প্রাণ যে পথে হারায়,
সেই পথে খোঁড়া গাধা অনায়াসে যায়;
হৃষ্টপুষ্ট বলশালী কত লোক মরে,
মৃতকল্প হইয়াও কেহ প্রাণ ধরে।

সপ্তদশ গল্প

কোনও রাজা একজন মূর্খ ফকিরকে ডাকিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। ফকির মনে করিল, আমি এমন কোন ঔষধ খাইয়া যাই, যাহার গুণে আমাকে দুর্ব্বল দেখাইবে ও সে জন্য আমার নাম ও যশের বৃদ্ধি হইবে। ফকির ভুলক্রমে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

শাঁসভরা পেস্তা সম দেখাত যে জন,
কে জানে সে খোলা সার, পলাণ্ডু যেমন;

বিষয়ে আসক্ত হয় যে সাধুর মন,
মক্কাকে পশ্চাতে রেখে সে করে ভজন।

সংসারের দাস হয়ে থাকিলে কপট,
তাঁর দয়া আসিবে না তোমার নিকট ;
তাঁর দাস বলে চাও করিতে ঘোষণা,
অপর কিছুর আর কর' না বাসনা।

অষ্টাদশ গল্প

পথিমধ্যে চোরে কতকগুলি বণিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে, তাহারা "হা ! হতোহস্মি" বলিয়া মহা ক্রন্দন করিতে লাগিল ও অপহৃত দ্রব্যগুলির পুনঃপ্রাপ্তির অভিলাষে তস্করদিগের অনেক স্তব স্তুতি করিল, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

নিষ্ঠুর তস্করে দ্রব্য করিলে হরণ,
আর কি তাহারা শুনে কাহারো রোদন।

সেই বণিকদিগের সঙ্গে লোকমান্ নামক একজন বিখ্যাত নীতিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। একজন বণিক্ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল :—"মহাশয়, যদি উহাদিগকে কিছু সুনীতি শুনান, হয় ত উহারা আমাদের দ্রব্য ছাড়িয়া দিবে' নচেৎ বহুমূল্য সামগ্রীগুলি নষ্ট হইবে।" পণ্ডিত বলিলেন :—"উহাদিগকে নীতি-শাস্ত্রের কথা বলা বৃথা।"

লোহায় মরিচা যদি ধরে একবার,
ঘষিলে-মাজিলে দোষ যায় না তাহার ;
কি বুঝিবে নীতিকথা এসব সয়তান্ ?
লৌহ-শলাকায় ভেদ হয় না পাষাণ।

সুসময়ে মনে রেখ যারা দুখে মরে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি অশুভ নিবারে ;
ভিক্ষুকের মনোবাঞ্ছা করিও পূরণ,
না হলে লইবে জোরে চোরে সব ধন।

ঊনবিংশ গল্প

আমার পরমারাধ্য গুরু আবুল্ ফোরাজ শামসুদ্দিন বিন জাউজি আমাকে সর্ব্বদা গান শুনিতে নিষেধ করিতেন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিতে পরামর্শ দিতেন; কিন্তু যৌবন-সুলভ উন্মত্ততা ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লালসা উভয়ই বলবতী; সুতরাং বহুচেষ্টাসত্ত্বেও আমাকে গুরুর উপদেশের বিপরীতাচরণ করিতে হইত। আমি দরবেশদিগের দলে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতাম ও তাহাদের সঙ্গীত-শ্রবণে আমার মহা আনন্দ হইত। যখন গুরুর উপদেশ মনে পড়িত, তখন ভাবিতাম :—

কাজি আমাদের সহ করিতেন বাস,
নৃত্য করি তাঁহারও হইত উল্লাস।
মোতাসিব যদি পান স্বাদ মদিরার,
মাতালের দোষ তবে নাহি দেন আর।

এই রূপে কিছুকাল যায়। একদিন রাত্রিতে কতকগুলি লোক আমোদ-আহ্লাদ করিতেছিল; তাহাদের মধ্যে একটি গায়ক দেখিলাম।

এমন বেতালে বীণা বাজায় সে জন,
শুনি ছিঁড়ে যায় দেহে শিরার বন্ধন ;
তাহার গলার কথা কি বলিব আর,
মা বাপ মরিলে কান্না তারে মানে হার।

তাহার গান শুনিয়া কেহ কর্ণে, কেহ ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া তাহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিল।

মধুরতা-গুণে গান মুগ্ধ করে মন ;
তুমি না গায়িলে কিন্তু জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার সঙ্গীতে মন যে আমোদ পায়,
সে কেবল তুমি হও যখন বিদায়।

সেই গায়ক আবার সুর ধরিলে, আমি বাটীর কর্ত্তাকে বলিলাম :—

কাণে তুলা দাও মোর—ঈশ্বর দোহাই !
ন হয় কবাট খুল, বাহিরে পলাই।

কিন্তু দরবেশদিগের মনস্তুষ্টির জন্য আমাকে তথায় থাকিতে হইল; মহাকষ্টে সেই রাত্রি যাপন করিলাম।

মাঝে মাঝে মুয়াজ্জিন করিল চীৎকার,
কত রাত্রি হ'ল, জ্ঞান ছিল না তাহার ;
সে বিষয় জানে ভাল আমার নয়ন,
নিদ্রায় যাহার পাতা পড়ে নাই ক্ষণ।

প্রাতে আমার উষ্ণীষ ও একটী সুবর্ণ-মুদ্রা সেই গায়কের অগ্রে রাখিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম ও তাহাকে বহু ধন্যবাদ দিলাম। এই ব্যবহার দেখিয়া আমার বন্ধুগণ বিস্মিত হইলেন এবং আমি পাগল হইয়াছি মনে করিয়া হাসিতে লাগিলেন। একজন আমাকে বহু তিরস্কার করিয়া বলিলেন :—"তুমি বিজ্ঞের মত কাজ কর নাই ; কারণ তুমি, সাধুর উপযোগী এই পুরস্কার এমন একজন গায়ককে দান করিলে,যে জীবনে স্বর্ণের কথা দূরে থাকুক, একটী রৌপ্য-মুদ্রাও দেখে নাই।"

এ বাটী হইতে দূর হ'ক এ বালাই,
দু'বার কোথাও কেহ এরে দেখে নাই ;
গলা ছাড়ি উঠে যবে ইহার সঙ্গীত,
সকল লোকের দেহ হয় প্রকম্পিত।
পাখীরা উহার ভয়ে পলায়ন করে,
আমরা হারাই জ্ঞান,—

আমি বলিলাম :—"ভাই ! এ ব্যক্তিকে আর তিরস্কার করিও না ! আমি ইহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা বুঝিতে পারিয়াছি।" বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন :—"তবে ক্ষমতাটী কি আমাকে বুঝাইয়া দাও, যাহাতে আমি উহার কৃপাদৃষ্টিতে পড়ি, আর যে উপহাস করিয়াছি, তাহার জন্য উহার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি !" আমি বলিলাম :—"আমার পরমারাধ্য গুরুদেব আমাকে বারবার সঙ্গীত শ্রবণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং এ-সম্বন্ধে কত উপদেশ প্রদান করেন; কিন্তু সে সকলে আমি কর্ণপাত করি নাই। আজি কিন্তু কি শুভক্ষণে আমি এখানে আসিয়াছিলাম, আমার বড় সৌভাগ্য ! এই গায়ক আমার বড় উপকার করিয়াছে ! ইহার গান শুনিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এ জীবনে গায়ক কি সঙ্গীতের ত্রিসীমায় যাইব না।

সুকণ্ঠ যাহার আছে, মূর্ত্তি সুশোভন,
সে না গাহিলেও মুগ্ধ করে সর্ব্বজন।
জানিলেও ঔষাকাদি ভাল ভাল তান,
কর্কশ যাহার স্বর, বৃথা তার গান।

বিংশ গল্প

একজন লোকমান পণ্ডিতকে একদিন জিজ্ঞাসা করিল :—"আপনি এরূপ শিষ্টাচার কাহার কাছে শিক্ষা করিয়াছেন ?" তিনি বলিলেন :—"আমি সদাচার শিষ্টাচার-বিরোধী অবিচারী লোক-দিগের নিকট শিখিয়াছি। তাহাদের আচরণে যাহা-কিছু দোষাবহ দেখি, তাহা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে চেষ্টা করি।"

বিদ্রূপ করিয়া লোক কোন কথা কয়,
বিবেকীর তাতে হয় জ্ঞানের সঞ্চয়।
মূর্খের নিকটে কর সদালাপ শত,
বিদ্রূপ বলিয়া তার হবে কর্ণগত।

একবিংশ গল্প

একজন ধর্ম্মপরায়ণ লোক রাত্রিতে সাত-আট সের মাংস আহার করিতেন। তাহার পর দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃকালের পূর্ব্বে সমস্ত 'কোরাণ' পড়িয়া ফেলিতেন। কোন সাধু এই কথা শুনিয়া বলিলেন :—"সে যদি আধখানি রুটী খাইয়া নিদ্রা যাইত, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অনেক ভাল হইত।"

জ্ঞানালোক যদি চাও করিতে অর্জ্জন,
সাবধানে পরিমিত করিবে ভোজন।
গলায় গলায় ঠেসে করিলে আহার,
কোন জ্ঞান হইবে না সঞ্চয় তোমার।

দ্বাবিংশ গল্প

একব্যক্তি পাপাসক্ত ও কু-চরিত্র ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় সুফি-সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, তাহাদের সহবাসে, সদাচারে ও সুদৃষ্টান্তে তাহার পূর্ব্ব-স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল এবং ক্রমে সে সৎপথে আসিল ; দুরভিসন্ধিসকল বর্জ্জন করিয়া, ইন্দ্রিয় দমন করিতে সক্ষম হইল ; তথাপি নিন্দকেরা বলিতে লাগিল :—"এ ব্যক্তির পূর্ব্ব-স্বভাব এখনও আছে ; এ যে পাপ-কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়াছে কিম্বা সৎপথে আসিয়াছে, তাহা বিশ্বাস হয় না।"

অনুতাপে ঈশ্বরের ক্রোধ নাহি রয়,
নিন্দকের গ্লানি কিন্তু এড়াবার নয়।

সে ব্যক্তি লোকের কথার যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের নিকট অভিযোগ করিয়া বলিল :—"লোকের অযথা নিন্দা আমার আর সহ্য হয় না।" অধ্যক্ষ অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন :—"তাহারা যাহা মনে করে, তদপেক্ষা তুমি অনেক ভাল ; তোমার প্রতি এই যে ঈশ্বরের কৃপা তজ্জন্য তোমার তাহাদিগকে কত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত !"

বার বার বলিতেছ তব শত্রুগণ,
করিবে তোমার দোষ সবে অন্বেষণ।
উঠুক তাহারা সবে তোমাকে বধিতে,
বসুক অথবা নিন্দা তোমার করিতে ;

না মানিয়া নিন্দাবাদ কয় সদাচার,
কিছু নাহি আসে যাবে নিন্দায় তোমার ;
সাধু হইলেও যদি লোকে মন্দ বলে,
সে ভাল,—মন্দকে সাধু বলিবার স্থলে।

দেখ ! লোকে আমি সাধু ও আমার চরিত্র উৎকৃষ্ট, এই বলিয়া আমার কত প্রশংসা করে ; কিন্তু তাহারা জানে না যে আমার কত দোষ আছে—আমাকে নিকৃষ্টের আদর্শ বলিলেও হয়।"

করিতাম সব কাজ সাধুর মতন,
সার্থক হইত সাধু নামের গ্রহণ।

লোকালয়ে রাখি গুপ্ত কি আছে অন্তরে,
কি আছে জানেন ঈশ বাহিরে, ভিতরে।

পাছে লোকে দেয় দোষ এই ভেবে মরি,
মনের কপাট তাই রাখি রুদ্ধ করি' ;
কিন্তু এ বঞ্চনা করে নাহি কোন ফল,
কারণ হৃদয়-স্বামী জানেন সকল।

ত্রয়োবিংশ গল্প

আমার চরিত্র-সম্বন্ধে কোন ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ায়, আমি একজন ধর্ম্মাচার্য্য-সন্নিধানে সে বিষয়ে অভিযোগ করিলাম। তিনি বলিলেন :—"তুমি সৎকার্য্য ও সদালাপ করিয়া তাহাকে লজ্জিত কর।"

ধর্ম্মপথে বিচরণ কর সর্ব্বক্ষণ,
নিন্দক পাবে না তবে দোষের কারণ।
যতক্ষণ তানপুরা থাকে ঠিক স্বরে,
গায়ক তাহার কাণ পরশ না করে।

চতুর্বিংশ গল্প

দামাস্কাস্ নগরের একজন ধর্ম্মাচার্য্যকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল :—"সুফি-সম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বভাব কি ?" তিনি বলি-লেন :—"পূর্ব্বে উহাদিগকে দেখিলে মনে হইত যে, উহাদের সাংসারিক কষ্ট থাকিলেও, মনে শান্তি আছে, কিন্তু এখন তাহার বিপরীত ; এখন বাহ্য সুখ-স্বচ্ছন্দতা আছে, কিন্তু অন্তরে শান্তি নাই, সর্ব্বদাই যেন উহাদিগকে সংসার-চিন্তায় মগ্ন দেখি !"

যখন তোমার মন সদাই চঞ্চল,
শান্তি-আশে বন-বাস তখন বিফল।
থাকিলেও ধন-মান, ভূমি, পরিজন,
যোগী হবে, যদি থাকে ভগবানে মন।

পঞ্চবিংশ গল্প

আমি একদিন একদল যাত্রীর সহিত সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া নিশাবসানে কোন অরণ্যের প্রান্তভাগে আসিয়া পৌছিলাম ও তদ্দণ্ডে আমরা সকলে নিদ্রাগত হইলাম। আমাদের সঙ্গে এক-জন ক্ষিপ্তপ্রায় লোক ছিল ; সে ব্যক্তি ক্ষণমাত্র বিশ্রাম না করিয়া চীৎকারপূর্ব্বক বনাভিমুখে গমন করিল। পরদিন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, সে এরূপ ব্যবহার কেন করিয়া-ছিল। সে বলিল :—"আমি কুঞ্জবন ও পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে বিহঙ্গম-কুলের কল-নিনাদ, জলাশয় হইতে ভেককুলের আনন্দধ্বনি এবং

গভীর অরণ্য হইতে নানা জাতীয় হিংস্র জন্তুর তজ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া মনে করিলাম যখন সকল প্রাণী নিজ নিজ স্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, তখন আমি সেই সঙ্গীতে যোগদান না করিয়া নিদ্রিত থাকিলে, আমার মানব নামের কলঙ্ক হইবে।"

প্রভাতে পাখীর গান, শুনে মুগ্ধ মন-প্রাণ,
হইলাম আত্মহারা, কি জানি কেমনে!
ডাকি বন্ধু মোরে কয়, এ নাহি বিশ্বাস হয়,
এত মত্ত হয় লোক পাখীদের গানে!
আমি বলিলাম ভাই, কিছু অসম্ভব নাই,
পাখী হয়ে ঈশ্বরের যদি গুণ গায়,
কেমনে মানব তবে, শুনিয়া নীরবে রবে,
মাতিয়া উঠিয়া যোগ দিবে নাহি তায়।

ষড়্‌বিংশ গল্প

আমি একদা কতিপয় সাত্ত্বিক লোকের সহিত হিজাজ যাইতেছিলাম। তাহারা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম গাহিতেছিল। একজন ফকিরের তাহ' ভাল লাগিল না; যে ব্যক্তি দরবেশদিগের স্বভাব সম্যক্ বুঝিত না; তাহারা ঈশ্বরে তন্ময় হইবার জন্য যে কত উৎসুক, সে ধারণা তাহার ছিল না। ক্রমে আমরা একটি তালবনে প্রবেশ করিলাম। সেখানে কৃষ্ণবর্ণ একটি আরব যুবক উপস্থিত হইয়া এমন মধুর স্বরে গাহিতে লাগিল যে, উড্ডীয়মান বিহঙ্গম মুগ্ধ হইয়া সেই বনের বৃক্ষ-শাখায় আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম, সেই ফকিরের উষ্ট্র পর্য্যন্ত উন্মত্ত হইয়া এরূপ নৃত্য করিতে লাগিল যে, ফকির ভূতলে পড়িয়া গেল। আমি বলিলাম:—"সেখ্‌জি! ভগবানের নামে পশু-পক্ষী বিহ্বল, হইল কিন্তু তোমার ত কোন ভাবান্তর হইল না।

জানি কি প্রভাতে পাখী কি গান গায়িল,
কি সুধা আমার কাণে আসিয়া ঢালিল?
কিরূপ মানব তুমি বুঝিতে না পারি,
এতকালে নাহি হলে প্রেমের ভিখারী;
গান শুনি হল হর্ষ উষ্ট্রের পরম,
কিন্তু নিরানন্দ তুমি—পশুর অধম।
লবঙ্গ-লতিকা দোলে পবন-হিল্লোলে,
কঠিন পাষাণ কিন্তু তাহাতে না টলে।

যে দিকে নয়ন যায়, সবে বিভু গুণ গায়,
প্রাণে যার সুর বাঁধা সে বুঝিতে পারে;
গোলাপে বুল্‌বুল্ বসে, সুধু কি মহিমা ঘোষে
কাঁটায় কাঁটায় লতা, পূজে প্রেমভরে।

সপ্তবিংশ গল্প

আরবদেশীয় কোনও রাজার সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে তিনি মন্ত্রীদিগকে পরদিবস প্রত্যূষে যে ব্যক্তি প্রথমে নগর মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই রাজমুকুট ও রাজ্য শাসনের ভার দিতে বলিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই আদেশ অনুসারে মন্ত্রী ও অমাত্যগণ পরদিন প্রাতে একজন ফকিরকে নগর প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার হস্তে কোষাগার ও দুর্গ অর্পণ করিলেন। তিনি যাবজ্জীবন ভিক্ষান্নে উদর পূরণ ও শত গ্রন্থি কন্থায় দেহাবরণ করিতেন; এখন রাজ্য লাভ করিয়া পরম সুখে কিছুদিন অতিবাহিত করিলেন; ঐ সৌভাগ্য কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল না। অচিরে সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও দেশের আমির ওমরাও তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে রণে পরাজিত করিয়া তাঁহার শাসন হইতে অনেক প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজে নিজে অধিকার করিলেন। এই ঘটনায় ফকিরের মনে বড় কষ্ট হইল; এমন সময়ে তাঁহার একজন পুরাতন বন্ধু যিনি তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গী ছিলেন তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহার অবস্থা উন্নত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার অভ্যুদয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন ও বলিলেন:—"ভাই আর তোমার চরণ কণ্টকে বিদ্ধ হইবে না, কণ্টকের স্থলে তোমার সৌভাগ্যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তুমি এখন রাজ্যেশ্বর; সত্য সত্যই দুঃখের পর সুখ হয়।"

কভু কলি উঠে ফুটে, কভু বা শুকায়,
পত্রহীন তরু পুনঃ শোভি পত্রিকায়।

ফকির বলিলেন:—"প্রিয় বন্ধু! এ অভিনন্দনের সময় নয়, আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ কর। যখন তুমি আমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে তখন আমি কেবল এক মুষ্টি অন্নের জন্য চিন্তা করিতাম, এখন আমার এই রাজ্যের সমস্ত ভার ও ভাবনা পড়িয়াছে।

সম্পদ না হলে কষ্ট কত হয় মনে,
সম্পদ হ'লেও জ্বালা তাহার বন্ধনে;
এমন অদ্ভুত বস্তু দেখি নাই আর,
অভাবে, সদ্ভাবে, কষ্ট দু'য়ে অনিবার।
সন্তোষের সম নাই আর কিছু ধন,
চাও ধন, কর তবে সন্তোষ অর্জ্জন।
কেহ যদি তব করে স্বর্ণ দেয় ঢেলে,
দেখ' না তাহার প্রতি দিও তারে ঠেলে,
শুনিয়াছি পণ্ডিতের মুখে বার বার,
ধন দান হ'তে ধৈর্য্য হয় প্রশংসার।
মহরমের ভোজে বন্য গাধা বলিদাম,
নহে পিপীলিকা লব্ধ তণ্ডুল সমান।

অষ্টবিংশ গল্প

এক ব্যক্তির এক বন্ধু রাজার কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। সে ব্যক্তি তাঁহার সহিত অনেক দিন দেখা করেন নাই। কোন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল:—"আপনি কোষাধ্যক্ষের সহিত এখন আর দেখা করেন না কেন?" তিনি বলিলেন:—"এখন আর আমার দেখা করিবার ইচ্ছা হয় না।" কোষাধ্যক্ষের একজন কর্ম্মচারী সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিল:—"কেন তিনি কি কোন অপরাধ করিয়াছেন যে, সে জন্য তাঁহার প্রতি আপনি বীতরাগ হইয়াছেন।" তিনি বলিলেন:—"না, তাঁহার কোন দোষ নাই, যখন তিনি কর্ম্মচ্যুত হইবেন তখন তাঁহার সহিত দেখা করিবার উপযুক্ত সময় হইবে।"

পদ মহিমায় লোক যবে ভুলে রয়,
বন্ধুদের কোন চিন্তা তখন না হয়,
কর্ম্মচ্যুত হয়ে যবে সে পড়ে সঙ্কটে,
জানাইতে আসে দুখ বন্ধুর নিকটে।

ঊনত্রিংশ গল্প

আবুহুরেয়া নামক মহম্মদের একজন প্রিয় শিষ্য প্রতি দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। মহম্মদ তাহাকে বলিলেন তুমি একদিন অন্তর আমার কাছে আসিবে। তাহা হইলে তোমার প্রতি আমার অনুরাগ আরও বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ "প্রতিদিন আসিও না,—তাহা হইলে তোমার সহিত আমার বন্ধুত্ব বাড়িবে।" একজন সাধু একবার বলিয়াছিলেন:—সূর্য্যের এত গুণ থাকিলেও আমি কাহারও মুখে তাহার প্রশংসা শ্রবণ করি নাই, কারণ আমরা প্রতিদিন সূর্য্যকে দেখিতে পাই; শীতকালে যখন সূর্য্য মেঘাবৃত থাকে তখন লোকে তাহাকে কত ভালবাসে।"

প্রত্যহ বন্ধুকে দেখা করি না বারণ,
কিন্তু যেন বন্ধু নাহি হয় জ্বালাতন।
অতৃপ্তি হবার আগে যেও নাক আর,
তাহা হ'লে কেহ দোষ দিবে না তোমার।

ত্রিংশ গল্প

বন্ধুদিগের প্রতি বীতরাগ হইয়া আমি কোন সময়ে ডামাস্‌কাস্ হইতে যারুসালেমের অরণ্যে পলায়ন করিয়া বন্য পশুর সহিত বাস করিতেছিলাম। এই সময়ে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের সহিত বিষম সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল। খৃষ্টানদিগের হস্তে আমি পতিত হইলাম। তাহারা আমাকে বন্দী করিয়া ত্রিপলি নগরীর পরিখা-খননের কার্য্যে নিযুক্ত করিল। দৈবযোগে আমার পূর্ব্বপরিচিত কোনও বন্ধু আমাকে ঈদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন দেখিয়া বলিলেন:—"এ কি? আপনার এমন অবস্থা কেমন করিয়া হইল।" আমি বলিলাম—

মানবের সঙ্গ ছাড়ি পর্ব্বতে প্রান্তরে,
আসিলাম ভগবানে পূজিবার তরে;
কি দশা এখন মোর ভেবে দেখ ভাই,
অসভ্য বর্ব্বর সহ সময় কাটাই।
লোহার শৃঙ্খলে পদ বদ্ধ যদি হয়,
সেও সহা যায় যদি বন্ধু কাছে রয়।
অচেনা লোকের সহ কিন্তু ফুল বনে,
ভ্রমণ করিয়া সুখ নাহি হয় মনে।

বন্ধু আমার শোচনীয় দশা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন ও দশটি সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে আমার দাসত্ব মোচন করিয়া আমাকে আলেপো নগরে লইয়া যাইলেন। তাঁহার একটি কন্যা ছিল। ঐ কন্যার সহিত একশত সুবর্ণ মুদ্রা যৌতুক দিয়া আমার সহিত বিবাহ দিলেন। অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলাম যে আমার ভার্য্যা অত্যন্ত মুখরা ও কলহপ্রিয়া। তাহার দৌরাত্ম্যে আমি উত্যক্ত হইলাম। আমার কোনও সুখ রহিল না। লোকে বলে:—

সজ্জনের ভার্য্যা যদি হয় দুষ্টমতি,
ইহলোকে হয় তার নরকে বসতি।
এমন সঙ্গিনী যেন কার নাহি হয়,
সে নরক হ'তে রক্ষা ক'রো দয়াময়!

একদিন আমার স্ত্রী আমাকে উপহাস করিয়া বলিল:—"তোমাকেই না আমার পিতা খৃষ্টানদের হস্ত হইতে দশটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া দাসত্ব হইতে মোচন করেন।" তদুত্তরে আমি বলিলাম:—হাঁ! আমাকে দশ মুদ্রায় মুক্ত করিয়া শত মুদ্রায় তোমার ক্রীতদাস করিয়াছেন।

একদিন দিবা ভাগে, বাঘ আসি ধরে ছাগে
ভদ্রলোক তারে এক তখন বাঁচায়,
কিন্তু হলে বিভাবরী, বিলম্ব নাহিক করি,
অকাতরে দিল ছুরি সে তার গলায়।
চক্ষে শত ধারা ঝরে, অতীব কাতর স্বরে,
মরিতে মরিতে ছাগ বলিল তাহারে,
ব্যাঘ্র মুখ হ'তে হায়! বাঁচাইলে অভাগায়,
শেষে নিজে বাঘ হয়ে বধিলে আমারে।

একত্রিংশ গল্প

এক রাজা কোনও সাধুকে জিজ্ঞাসা করেন। আপনি কিরূপে স্বীয় মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত করেন। সাধু বলিলেন:—"আমি সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করি; প্রাতে ভরণপোষণের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি এবং দিবসে আহারের জন্য ভিক্ষা করি। রাজা সাধুর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সাধুর দৈনিক সংসার নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ দিতে আদেশ করিলেন যাহাতে তাঁহার মন আর সংসারের জন্য বিচলিত না হয়।

সংসার শৃঙ্খলে বদ্ধ হও যদি তাই!
তবে আর নিস্তারের কোন আশা নাই।
কি খাইবে, কি পরিবে, সন্তান সন্ততি,
এই ভেবে ক্রমে হবে তব অধোগতি।
দিনে মনে করি পূজা করিব নিশায়,
পূজায় বসিয়া ভাবি ছেলেরা কি খায়।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী

"প্রাচীন মুদ্রা"র পরিচয় *

আধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার রুচি-অনুসারে সময় কাটাইবার উপযোগী লঘু বিষয়ের পুস্তক ও মাসিকে আজকাল ছাইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়টি সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রতীকারের উপায়-নির্দ্ধারণে তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পথ কেবলমাত্র উপেক্ষারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। যাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা অধিকাংশের মনোরঞ্জনের জন্যই পুস্তকাদি লিখিতেছেন, আর যাঁহারা ব্যবসাদারিকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে অযোগ্য মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন পথে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া নিয়তই ইতস্ততঃ করিতেছেন, দেখা যায়। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম বা খেলাধূলার উপযোগিতা আছে, শিক্ষনীয় গভীর বিষয়ের অনুশীলনের পর লঘু বিষয়ের উপযোগিতাও আছে, একথা একবাক্যে স্বীকার

* শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "প্রাচীন মুদ্রা" প্রথম ভাগ, প্রকাশক শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা, মূল্য ২৲ টাকা।

করি; কিন্তু প্রথম অবস্থাটাকে বাদ দিয়া অথবা একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া দ্বিতীয়টাকে সুধু বাড়াইলে, শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়কে অযথা প্রশ্রয় দিলে, ফল যে কতদূর বিষময় হয়, তাহা আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজকাল দেশের পাঠক-পাঠিকাগণ একেবারে ছোট খোকা-খুকীর ন্যায় "কেচ্ছা" গল্প শুনিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, আহার-নিদ্রা ছাড়িয়াছে, প্রায় পড়াশুনাও ত্যাগ করিয়াছে। ইহার পরিণাম যাহা হইয়াছে, তাহার জন্য সম্মিলনের সভাপতিগণ বক্তৃতায় নিয়তই দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন, এ ক্ষুদ্র প্রসঙ্গে তাহার পুনরুক্তির অবসর নাই। এই লঘু সাহিত্যের অযথা প্রাধান্যের জন্য একদিকে যেরূপ "চমকপ্রদ" দার্শনিক উপন্যাসের বিজ্ঞাপনদাতৃগণ দায়ী, অপরদিকে এবং বিশেষভাবে শক্তিশালী লেখকগণও সেইরূপ দায়ী। মানুষের দুর্ব্বল অংশকে উত্তেজিত করিলে মানুষকে হাত করা সহজ হয়, বিজ্ঞাপনে এ কার্য্যোদ্ধার হয় বটে, কিন্তু সে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দেখিবার জন্য সমগ্র জগৎ নির্ণিমেষে চাহিয়া আছে, তাহার প্রতি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য লোপ করা যে অতিশয় কাপুরুষতার লক্ষণ, একথা বুঝাইবার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। তাই এইরূপ পুস্তকের বাজারে, সাহিত্যের অবস্থায় (যিনি ইহাকে Renaissance বলেন, তিনি কৃপার পাত্র)। একখানি বইয়ের মত বই প্রকাশ হইতে দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়, গ্রন্থকার ও প্রকাশকের কর্ত্তব্যের সমুচিত সাধুবাদ করিতে ইচ্ছা হয়। সম্প্রতি দেশে ও বিদেশে খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "প্রাচীন মুদ্রা" নামে একখানি মূল্যবান্ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। যেদিন তাঁহার মুখে এই পুস্তকখানি রচনার কথা শুনি, সেই দিনই আশা ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছিলাম; কারণ, যে মুদ্রাতত্ত্বে তিনি বিশেষজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছেন, যে মুদ্রাতত্ত্বের অবিরত আলোচনায় তাঁহার প্রত্নতাত্ত্বিক জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে, সে মুদ্রাতত্ত্বে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবীণগণের মধ্যে এক মিঃ বার্ণস্, ডাঃ ভিনিস্ ও মিঃ ব্রাউন ব্যতীত তাঁহার আর সমকক্ষ নাই, সেই মুদ্রাতত্ত্বে তিনি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহা কি কম আনন্দের শুভ সংবাদ। আজ বঙ্গভাষার একটি সুখের দিন বলিতে ইচ্ছা হয়; কারণ, আজ একজন বিশেষজ্ঞ তাঁহার জীবনের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ একখানি পুস্তক বঙ্গ-সরস্বতীকে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন।

অন্যান্য গভীর বিদ্যার ন্যায় ভারতীয় প্রত্নবিদ্যাও যে হাতে-কলমে শিখিতে হয়, শুধু বিদেশীয় লেখকগণের রচনার রাশি রাশি অনুবাদ করিলেই যে দেশের প্রকৃত কাজ হয় না, একথা এখন আর লেখকগণ বুঝিতে ইচ্ছা করেন না। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-আলোচনায় অগ্রসর হইতে হইলে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষায় হাতে-খড়ি করিয়া প্রথমেই প্রাচীন লিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে হয়। তাই কোনও বিশ্রুতকীর্ত্তি প্রবীণ ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে মুদ্রাতত্ত্ব-বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই অনুরোধ শুধু ঐতিহাসিক প্রবরের একেলার নহে—সে অনুরোধ সমগ্র দেশের অনুরোধ, তাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা অসুস্থ শরীরেও যথাযোগ্যভাবে প্রতিপালন করিয়াছেন।

"প্রাচীন মুদ্রা" বিষয়ে বঙ্গভাষায় ইতঃপূর্ব্বে আর কোন পুস্তক ছিল না। ইংরাজীতেও "প্রাচীন মুদ্রা"-সম্বন্ধে বহু পুস্তক থাকিলেও, মুদ্রাতত্ত্ব-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তক লিখিত হয় নাই। যদিও প্রাচীন মুদ্রার সাহায্যে একদিন প্রাচীন লিপিতত্ত্বের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয় এবং মুদ্রাতত্ত্ব প্রাচীন লিপিতত্ত্বেরই একটি প্রধান শাখা বলিয়া পরিগণিত, তথাপি ইংরাজীতেও কেহ আজ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। অতএব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "প্রাচীন মুদ্রা" ইংরাজীতে অনূদিত হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানের এবং বিদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহল নানাভাবে চরিতার্থ করিবে। পাঠকগণের নিকট এ পুস্তকের দুই-একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করি।

প্রথমতঃ, এ পুস্তকখানিতে প্রাচীন মুদ্রার কালক্রমানুসারে বিভাগ করিয়া বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণাবলী (Characteristics) প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এ পুস্তকে প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্বের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের আগাগোড়া অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। সুধু দুই-একটি বিষয়ের আলোচনা ইহাতে দেখিতে পাইতেছি না। ভিন্সেন্ট স্মিথ্ (Imperial Gazetteer vol. p. 135) অশোকের বা অন্যান্য নৃপতিগণের রাজকীয় মুদ্রার অভাবের ভালরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থে ইহা অবশ্যই আশা করিতেছিলাম। যে নৃপতি চন্দ্রগুপ্তের সময়ে মিউনিসিপালিটীর অত খুঁটি-নাটি বন্দোবস্ত ছিল, অর্থশাস্ত্রানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা চলিত, তাঁহার বা তাঁহার সুযোগ্য পৌত্রের সময়ে রাজকীয় মুদ্রা বা Royal Currency ছিল না, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। তৃতীয়তঃ, এই গ্রন্থে মুদ্রার সাহায্যে যে কত ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারা যায়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। চতুর্থতঃ, ইহাতে এমন কতকগুলি মুদ্রার বিষয় আলোচিত হইয়াছে, যাহা ইংরাজী কোন মুদ্রার "ক্যাটালগে" দেখিতে পাওয়া যায় না; যথা, রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুরের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বহুমূল্য প্রাচীন মুদ্রাগুলি কেবল তিনিই পরীক্ষা করিবার ও বিবরণ লিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পঞ্চমতঃ, গ্রন্থের শেষ-ভাগে বিভিন্ন যুগের মুদ্রার বহুচিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। যদিও চিত্রগুলি তত স্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয় নাই, তথাপি এগুলি অনুসন্ধান-কারিগণের যথেষ্ট সহায়তা করিবে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ ভিনিস্ এই পুস্তকের চিত্রগুলি পুনঃ পুনঃ দেখিয়া থাকেন। চিত্রে-প্রদর্শিত প্রাচীন মুদ্রাগুলির দুই পৃষ্ঠার পাঠ (Legend) গ্রন্থকার পৃথক্‌ভাগে লিপিবিদ্ধ করেন নাই। করিলে শিক্ষার্থীর চিত্রের সহিত সেগুলি বিলাইবার ও অক্ষর শিখিবার সুবিধা থাকিত, আমরা আশা করি, গ্রন্থকার দ্বিতীয় সংস্করণে এই অসুবিধাটি দূর করিবেন।

উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, এই অমূল্য পুস্তকখানি প্রত্নতত্ত্বের কি নবীন, কি প্রবীণ সকল জিজ্ঞাসুগণেরই নানাভাবে উপকারে আসিবে। আমরা মনে করি, এই পুস্তকখানি শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে Imperial Gazetteer পুস্তকে **Mr. V. A. Shmeit** লিখিত Numasmatics প্রবন্ধটি পড়িলে সম্ভবতঃ পাঠকগণের পক্ষে একটী প্রবেশিকার কাজ করা হইবে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সন্ধ্যা

৮ই অগ্রহায়ণ।

আমার সাম্‌নেই জান্‌লটা খোলা রয়েছে। আজ মেঘ্‌লা মত করে আছে, কাল পূর্ণিমা হবে। আজ চাঁদখানা ঐ মেঘাবরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে বাহির হচ্ছে। জান্‌লা দিয়ে কাণ পেতে শুন্‌তে পাচ্ছি, দূরে ক্ল্যারিয়নেট্ বাঁশীর অস্পষ্ট সুর এবং ব্যাঙের শব্দ আস্‌ছে। নীচেই একতলায় কলতলাতে ঝর্ঝর করে জল ঝরে যাচ্ছে। কাছে কোন শব্দ নাই, কেবল ঘড়ীটা টিক্‌টিক্ করছে এবং এই জান্‌লা দিয়ে সমস্ত সহরের ম্রিয়মান্ কোলাহলের একটা করুণ সুর বাজ্‌ছে। আজ আমার এই ধূম্রাবৃত কোলাহলময় সহরের জনতা ভেদ করে সমস্ত মানব-হৃদয়ের একটি করুণ অথচ বিদায়ের অশ্রুভারে নম্র মূর্ত্তি ফুটে উঠেছে। সবই যেন যাচ্ছে—ভাল হক্, মন্দ হক্ সবই চলে যাচ্ছে! কেউ কিছুই থামিয়ে রাখ্‌তে পারে না। দাঁড়িয়ে আর কারো থাকার জো নেই। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ, আলোক-অন্ধকার নিয়ে এই পৃথিবী আপনার অখণ্ড গতিপথে নিয়ত ধাববান্। সমস্তই সুন্দর—সমস্তই আলোকে, আনন্দে, আশায় পরিপূর্ণ।

পৃথিবীতে লাভ হোক্, ক্ষতি হোক্, আমাকে যেন কিছুতে আট্‌কে রাখে না! ঐ যে দূরে দেবালয়ে,—চঞ্চল সময়ের পায়ের নুপূর-ধ্বনির মত শেষ শব্দ বেজে দিনের দোকান-পাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে! কিন্তু সে যাক্—সমস্তকেই যেতে দাও, সমস্তকেই প্রাণে সঞ্জীবিত হতে দাও। আজকের মত আশা ও আনন্দে হৃদয়ে যেন সমস্তকে স্পর্শ কর্‌তে পারে! ঐ মেঘে-ঢাকা আকাশের মত হৃদয় ব্যথিত হলেও, তার মাঝে ঐ চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের মত আশার আলোক, কল্যাণের শুভ রশ্মিময় আমার হৃদয়ে একটি করুণা রয়েছে। মানুষের দেহ লাভ করে যেন অন্তরেও মানুষ হতে পারি; নইলে আর এমন সুন্দর পৃথিবীতে এলাম কেন?—আকাশ্ এত বড়, এত তারায় উজ্জ্বল, মানুষের এত প্রেম, এত কল্যাণ, এত মঙ্গল ইচ্ছা কিসের দরকার? হৃদয়ের আনন্দ জাগ্রত কর্‌বার আবশ্যকতা আছে। মঙ্গলের স্নেহ-রস-ধারা হৃদয়ে বর্ষিত হোক্। আমি ত এ জগতে এক্‌লা নই—আমার দুঃখ, আমার সুখ কি কেবল আমিই জানি? না, তা' ত নয়! আর একজন আমার চিরজীবনের সঙ্গী আমার সমস্ত দেখ্‌ছেন! নিঃসহায় ত আমি নই! যাকে বলে লোকে দুঃখ, যাকে বলে ক্ষতি, সে কি কেবল লোকেই বলে, সে কি কেবল আমার বুকেই বাজে, তার ওপর কি আর কেউ চোখ রাখেন নি, আর কেউ কি বুক দিয়ে সে বেদনা বহন কর্‌ছেন না? তাঁর নামটা মনের ভিতর কি একটা শান্তি-স্থাপনার জন্য? তার কোন সত্য কি জীবনে পাই নি? আমি যে তাঁরও প্রিয়,—আমি যে তাঁর কল্যাণের দ্বারা মণ্ডিত, একথা ত অস্বীকার করতে পারব না! কত দয়া যে তিনি কর্‌লেন, তা ত ভুলে গেলে ভুল করাই হয়! কিন্তু সে দয়া মানুষের দয়া নয়। সে দয়ায় আঘাত আছে, আনন্দও আছে। জীবনে বারংবার তাহারই স্নেহস্পর্শ লাভ কর্‌বার সুযোগ খুব কমই আসে বল্‌লে মিথ্যা বলা হয়। ঈশ্বর আছেন, মানি বটে, কিন্তু তেমনতর মানার মত কাজ করি কি?

৯ই অগ্রহায়ণ।

আজ রাসের দিন! অর্থাৎ আজ রাস-পূর্ণিমা। আজকের পূর্ণিমা আমার কাছে সুন্দর হয়ে উঠেছে। আজ এবং কাল আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, এখনও রয়েছে। মাঝে মাঝে পূর্ণচন্দ্র মেঘে ঢাকা পড়্‌ছে, আবার মাঝে মাঝে বার হয়ে আসছে। মেঘগুলা কালো কালো। এই আলোক-অন্ধকারের খেলা আমার কাছে সুন্দর ঠেক্‌ছে। আজ্‌কের পূর্ণিমা এতেই পূর্ণতর।

আজ কালো মেঘে আকাশ ভর্ত্তি; তবুও ত পূর্ণিমার চন্দ্র উঠেছে! তবুও ত মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আনন্দ কর্‌ছে! মানুষের জীবনের দিকে একবার তাকাও, সেখানেও কি আলোকে অন্ধকারের খেলা নাই? তবুও তা সুন্দর! কল্‌কাতার পূর্ণিমা-রাত্রি পল্লীগ্রামের পূর্ণিমা-রাত্রির মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। নির্জ্জনে পূর্ণিমার শুভ্র বিস্তার বেশী করে নিজের মনের দিকেই তাকাতে বলে; সেইজন্য সেখানে চুপ করে, বসে থাকৃতে ইচ্ছে হয়। এই তার আনন্দ ও সম্ভোগ; কিন্তু এ ব্যক্তিগত। কলকাতায় এ রাত্রি তেমন করে নিজের ভাবে কেউ ভোগ কর্‌তে পারে বলে বোধ হয় না; বিশেষতঃ, যারা কাজের লোক। সহরের চারদিকে ত জনতা; কেবল্ জন-সংখ্যার বৃদ্ধির দিকেই মন ঠেলে নিয়ে যায়! পূর্ণিমা হয়েছে, আনন্দ কর্‌তে; হবে—অতএব খুব গান-বাজনা করিয়া তার শোধ তুলিব, এখানকার ব্যাপার কতকটা এই রকম। তাই সহরের পূর্ণিমা তেমন করিয়া নিজের ভাবিয়া কেহ ভোগ করিতে পারে না বলিয়াই, তাহা কাহারো ব্যক্তিগত ভেদের গণ্ডী দিয়ে সঙ্কীর্ণ নয় কিন্তু সমগ্রতার দ্বারা তাহার একটা ব্যাপ্তি আছে। ভোগ যদি করে ত সকলেই করে এবং না করিলে, অল্প লোকেই দলে ভিড়ে। হয় ত এটা লোকের সংখ্যা জেয়াদা বলিয়া।

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়।

বীণার কথা

আমি বীণা; তোমরা ভাব্‌ছ, আমার কথা—সে না জানি কত সুখের স্মৃতিই ফুটিয়ে তুল্‌বে, তার অক্ষরে অক্ষরে কত রাগ-রাগিণীর মধুর ঝঙ্কার মুখর হয়ে উঠ্‌বে, কত প্রেমের গীতি, কত বিলাস বাসনা রঙ্গিন হয়ে উঠবে কিন্তু তা নয় গো তা নয়। আমি বীণা; বাদশাজাদীর কোমল হাতের সোহাগ বীণা নই, রঙ্গমহালের রেশমী কাপড়ে মোড়া বিলাস-বীণা নই; মাঝ-দরিয়ার দুকূল-হারা বীণা, ছিন্নতার বেসুর বীণা ভাসতে ভাসতে চলেছি না জানি কিসের খেয়ালে! বোধ হয় একজায়গায় থির্ হয়ে থাকৃতে পারছি না বলেই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি, বোধ হয় ভেসে ভেসে বেড়ান বই আর উপায় নেই বলেই এমন করে ভাস্‌তে ভাস্‌তে চলেছি। তোমরা আশ্চর্য্য হ'চ্ছ না? ভাবছ, কোন্ তরণীর সোহাগ বাঁধন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তার সাধের বীণাকে কে এমন করে মাঝ-দরিয়ায় ভাসালে গো! কোন্ বিরহিণীর বেদনাকাতর, রোদনমুখর প্রাণের বীণাটি মাঝদরিয়ার বুকের উপর দিয়া লক্ষ্যহারা, পথহারা দিশেহারা হয়ে অমন করে ভেসে বেড়াচ্ছে গো! কেমন ঠিক্ কি না? কিন্তু তা নয় গো তা নয়! আমি কার বীণা জান? এই, কবির বীণা গো, কবির বীণা! আমাকে এইখানে ভাস্‌তে দেখে, ঐ যে পদ্ম-বঁধুর ঢেউয়ের তালে

তালে দুলে দুলে জলের উপর ঢলে পড়ছে, ওরা সব হাসছে। কি নিষ্ঠুর ওরা! কি নির্ম্মম ওরা, ওদের প্রাণে কি এতটুকুও দয়ামায়া নেই গা! ওরে, আমারি প্রাণের কবি যখন তোদের ঐ প্রাণ জোড়ান, মন ভোলান খেলা দেখে আর তোদের ঐ ফুট্ ফুটে চাঁদপানা হাসিভরা মুখগুলো দেখে বিভোর হয়ে যেত তখন তার সেই চঞ্চল তর্জ্জনী ধীরে ধীরে আমার এই তন্ত্রীগুলোর উপর এসে পড়ত আর অমনই আমি ঝঙ্কার দিয়ে গেয়ে উঠতাম। আর গাইতাম? তোদেরই গান, তোদেরই সোহাগের গাথা! আর তোরা আমাকে দেখে আজ হাস্‌ছিস! তা, হাস্।

দূর কর ছাই; কি বলতে কি বলছি! তারগুলো সব ছিঁড়ে গেছে কিনা, তন্ত্রীগুলো সব বেসুর হয়ে গেছে কিনা, তাই সুরগুলোও বেসুর বেসুর ঠেক্‌ছে, তাই কথাগুলো সব ঠিক গুছিয়ে বলতে পারছি না; যেন খাপছাড়া খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে! ঠিক্ ঠিক্। কি বলছিলাম, 'আমি বীণা, কার বীণা জান? কবির বীণা। আমার এই বুকখানার ভিতর একটি স্বচ্ছ-প্রাণের করুণ সুর এখনও গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে উঠ্‌ছে; সে কান্না থাম্‌বে না গো থাম্‌বে না।

সে ছিল কবি, আর আমি ছিলাম তার সাধের বীণা। সে তার প্রাণের আবেগে চোখ্ দুটী বুজে গান গেয়ে যেত আর আমি ছায়ার মত তার সুরের সঙ্গে আমার সুরটি মিলিয়ে দিয়ে যেতাম। সে থাকৃত, ঐ যে বনের মাঝখানে ঐ সরু পথটা যেখানে একটা বাঁশঝাড়ের গায়ে মিলিয়ে এসেছে, ঐ খানটায় একটা ছোট কুটীরে। সেই কুটীরখানির চারিপাশে রোজ কত ফুলই ফুট্‌ত! সকাল হলে কত কোকিল বকুলের ডালে সাড়া দিয়ে যেত, কবি মুগ্ধ হয়ে বসে বসে তাই শুন্‌ত, আর আমি তার কোলটির উপর শান্ত শিশুর মত শুয়ে থাকৃতাম।

এক এক দিন প্রভাতকালে কবি আমাকে নিয়ে এই নদীর তীরে এসে বস্‌ত, বসে বসে কত কি ভাব্‌ত! আমি চুপ্ করে বসে বসে মুগ্ধ নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃতাম; তার পর হঠাৎ যখন কবির চমক্ ভাঙ্গত, তখন সে আমাকে তুলে নিয়ে তার সেই কোমল তর্জ্জনী ধীরে ধীরে আমার এই তন্ত্রীগুলোর উপর বুলিয়ে যেত আর আমি আনন্দে বিভোর হয়ে কত কি ছাই গেয়ে যেতাম! সে সুর মিষ্ট হ'ত কিনা জানি না, কবি কিন্তু মুগ্ধ হয়ে আমার সেই গান শুনত, আর মাঝে মাঝে আনন্দে বিভোর হয়ে আমাকে তার সেই কোমল বুকখানির মাঝখানে জড়িয়ে ধরে নীরবে বসে থাকত।

এক এক দিন রাত্রি বেলায় কবি আমাকে নিয়ে নদীর তীরে, বকুল তলায় এসে বসত। চাঁদের কিরণ এসে নদীর চঞ্চল ঢেউগুলোর সঙ্গে কত খেলাই না খেলত আর কুমুদিনীর নিটোল মুখখানির উপর ধীরে ধীরে তার সোহাগের চুমুটি বুলিয়ে দিয়ে যেত আর কুমুদিনী সেই সোহাগের ভরে নদীর ঢেউগুলোর উপর ঢলে ঢলে পড়ত। জোছনার ধব্‌ধবে শাদা জরির ওড়না বকুলের মুখের উপর এসে একটা আস্তরণ ফেলে দিয়ে যেত আর সেই পাৎলা ওড়নার ফাঁকে ফাঁকে তার হাসিটুকু লজ্জালস কামিনীর রঙ্গিন অধরের মৃদুহাস্য রেখার মত অস্পষ্ট হয়ে ফুটে ফুটে উঠত। নদীর সেই ধীর-শান্ত, রজত ধবল জোছনাময় বুকখানির উপর দিয়ে দূরে অদূরে ছোট্ট পানসীগুলি কুহেলীমাখা খেয়ালের মত ধীরে ধীরে বহে যেত, আর নৌকাযাত্রী কোন্ উদাসীর প্রাণের করুণ রাগিণী নিয়ে প্রকৃতি-রাণীর নীরব বুকখানির উপর গিয়ে আছ্‌ড়ে পড়ত; কবি বসে বসে মুগ্ধ হয়ে এই সব দেখত, এই সব শুনত আর তার প্রাণটা যখন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠত তখন সে, আমার নীরব তন্ত্রীগুলোর ভিতর দিয়া তার অন্তরের সমস্ত মাধুরী সেই নিজন নিশীথিনীর বুকখানির উপর নিঝর ধারে ছড়িয়ে দিত! এমনই সুখে আমরা থাকতাম, এমনই প্রাণে প্রাণে মিলে আমরা একই গান গাইতাম, একই সুর ভাঁজতাম, একই রাগিণী ছড়িয়ে দিতাম।

তারপর একদিন; রাত্রিটা তখন খুব জমে এসেছে, সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি। সুনীল গগনে চাঁদের হাসি একেবারে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ছে, আকাশ-গাঙ্গে জোছনার বান ডেকে গেছে, আর সেই বানের ধারা চারিদিকে যেন উছ্‌লে উছ্‌লে পড়ছে! গাছের ডালে, নদীর জলে, নদীসৈকতে, যূথীর বনে, বীথির মাথার উপরে কে যেন তার ধব্‌ধবে-সাদা ওড়নাখানি এলিয়ে দিয়ে গেছে! মাথার উপরে বকুল-শাখা হতে একটি একটি করে বকুল-ফুলগুলি তৃণশয্যার উপর টপ্ টপ্ করে, একটি একটি করে খসে খসে পড়ছে আর তাদের গন্ধটুকু নেশার ঝোঁকের মত সমস্ত বাতাসটাকে একেবারে আকুল করে তুলছে—এমনি মধুর-যামিনী, এমনি মধুর-প্রকৃতি, এমনি আবেশ মধুর লগ্ন আর এমনি জোছনা-মাখা নদীসৈকতে বসে কবি আর তার কোলের উপর মাথাটি রেখে শুয়ে, তার সাধের বীণা আমি। কতক্ষণ এইভাবে বসে বসে কবি কত কি ভাবতে লাগল, কত কি দেখতে লাগল, কত কি শুনতে লাগলো আর আমি তার সেই ভাবমাখা মুখখানির পানে পলকহারা নয়নে চেয়ে শুয়ে রইলাম। এইভাবে দুজনে আছি, দুজনেই মুগ্ধ, দুজনেই স্তব্ধ, এমন সময় সহসা দূরে অদূরে কার করুণস্বর বাতাসের বুকখানাকে একেবারে ছেয়ে ফেল্লে! বড় মধুর, বড় করুণ সে সুর! নদীর ঢেউগুলো সেই মধুর গান শোন্‌বার জন্যে যেন আরও নীরব হয়ে গেল; বকুলের শাখা থেকে ফুলগুলো তাদের অফুরাণ ঝরে-পড়া যেন বন্ধ করে দিল! ধীর নৈশ বাতাস সেই গানের সুরটাকে তার বুকখানার ভিতর আঁকড়ে ধরে রাখতে না পেরে যেন চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে লাগ্‌ল, আর নদীর তীরে বসে কবি আর আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই গান শুনতে লাগলাম! সেই গানের সুর দেখতে দেখতে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল; সমস্ত বন জুড়ে নদীর সবখানি বুক জুড়ে দিকে দিকে সে গানের মূর্চ্ছনা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্রমে আরো কাছে, আরো কাছে। কবি চঞ্চল হয়ে উঠল। তার কোল থেকে আমার মাথাটি ধীরে ধীরে তৃণশয্যার উপর খসে পড়ল; কবির হাত থেকে তার সাধের বকুল ফুলগুলো তৃণ শয্যার উপর ঝরে পড়ল আর আমি তেমনি নিস্তব্ধ, তেমনি নীরব হয়ে তৃণশয্যার উপর সেই বিক্ষিপ্ত বকুল ফুলগুলোর পাশে চুপটি করে শুয়ে শুয়ে সেই গান শুনতে লাগলাম। এবার আরো কাছে, আরো কাছে। আমরা চকিতের মত চারিদিকে চাইলাম,—কে এ গান গায়, কার মিঠে গলার অমর গীতি ঝঙ্কার এ! কে সে তরুণী, যার মিঠে গলার মিহি সুর কোকিলের কূজন-রোলকেও ছাপিয়ে উঠে? কে সে বনদেবী যার অফুট গানের করুণ-সুর স্তব্ধ রজনীর মধুর বীণার করুণ রাগিণীর চেয়েও মধুর? গান আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। তখন আমরা দেখতে পেলাম দূরে অদূরে নদীর সেই শান্ত বুকখানির উপর ছায়ার মত একখানি ছোট তরণী ভেসে আসছে আর তারই উপর থেকে দূরাগত তটিনী কল্লোলের মধুর ঝঙ্কারের মত মধুর এবং তারই মতন নিরন্তর-ধারায়, সুর-লহরী চারিধারে ছড়িয়ে পড়ছে! তরী ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হয়ে আসতে লাগল। কবি পাগলের মত উঠে দাঁড়াল, তারপর পাগলেরই মত চীৎকার করে উঠ্‌ল, "এস! এস আমার মানসী কল্পনা এস! এস এস আমার প্রাণের নিভৃত বাসনা এস, আমার চির-বাঞ্ছিতা এস, আমার চির-ঈপ্সিতা এস! তরী ক্রমে আরও নিকট হয়ে আসতে লাগল; তার রেশমী পালের ধারে ধারে সব সোণালী ঘুমুর ঝোলান ছিল, তাদের ঠিন্ ঠিন্ আওয়াজ কাণে এসে বাজতে লাগল; আর সেই তরীর উপর বসে কে এক অপরূপা তরুণী গান গাইছে তাকেও অস্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিবা তার রূপ! কিবা তার মধুর সুর! তার সেই সুন্দর নির্ম্মল মুখখানির উপর জোছনা এসে পড়েছিল, তার সেই পাত্‌লা ওড়নার চারিপাশে আর সেই কাল চুলের রাশের উপর চাঁদের কিরণ আস্তে আস্তে চুপে চুপে হাত বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

কবি আবার চীৎকার করে উঠল, "এসো! এসো! আমার সাধের প্রতিমা এসো, আমার প্রাণের নিভৃত বাসনা এসো!"

তরী তীরে এসে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে কে মধুর কণ্ঠে বলে উঠল, "কবি আমার তরী'পরে এসে বস; দূরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো এসো! কবি তরীর উপরে গিয়ে উঠলো, আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না। আমি নীরবে সেইখানে পড়ে রইলাম—ছড়ান বকুল ফুলগুলো আমার দুর্দ্দশা দেখে হাসতে লাগল, বকুলের ডাল থেকে ফুলগুলো-সব আমাকে টিট্‌কিরি দিয়ে খসে খসে পড়তে লাগল আর আমি মরমে মরে সেইখানে পড়ে রইলাম!

কবি তরীর উপর গিয়ে উঠল; তরুণী তাকে তার সেই কোমল ভুজ-লতা দিয়ে বেঁধে ফেল্লে। তারপর, হঠাৎ, কি ভেবে জানি না, কবিকে নিজের বাহু-পাশ থেকে মুক্ত করে বলে উঠ্‌ল, "ওকি! তোমার বীণা কই? যার বীণা নেই, তাকে ত আমি আমার তরীতে উঠতে দিই না! আমাকে ত পেলে কিন্তু আমাকে পাওয়ার খবরটাই যদি কেউ টের না পেলে ত এমন পাওয়ায় লাভ? তোমায় আমায় কত কথাই হবে, কত সোহাগ হবে, কত কি হবে সে কথা নদীর কাণে তুলবে কে? সে কথা বকুলগাছের ঝরা-ফুলগুলোর কাণে কাণে পৌছে দেবে কে? সে কথা বাতাসের বুকের উপর ছড়িয়ে দেবে কে? বীণা নিয়ে এসো কবি! তোমার বীণা নিয়ে এসো!" কবি মুগ্ধনয়নে সুন্দরীর দিকে চেয়ে থেকে থেকে বলে উঠলো "তুমি কে? তোমার নাম কি তরুণী," সে হেসে বল্লে, "আমার নাম? আমার নাম কল্পনা; আমি প্রকৃতির প্রাণ। আমাকে সকলে দেখতে পায় না, যারা প্রকৃতিকে ভালবাসে তারাই কেবল আমাকে দেখতে পায়, তারাই কেবল আমার গান শুনতে পায়। কিন্তু আমাকে দেখতে পেলেই ত আর হল না; আমাকে দেখতে পাওয়ার খবরটা কে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেবে? তাই বলি, আর দেরি ক'র না, বীণা নিয়ে এস।" তখন কবি তরণী থেকে নেমে এসে আমাকে বুকে তুলে নিয়ে আবার তরীতে গিয়ে উঠল, তখন তরী মৃদুল বাতাসভরে ধীরে ধীরে পাল তুলে দরিয়ায় ভেসে যেতে লাগলো; তরুণী তার মধুর কণ্ঠ নৈশ বায়ুর স্তরে স্তরে ছড়িয়ে দিতে লাগল, আর কবি আমাকে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে আমার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তার সেই চঞ্চল তর্জ্জনী খেলিয়ে যেতে লাগল, আমি মুগ্ধ হয়ে তরুণীর সেই মিঠে গলার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর মিশিয়ে যেতে লাগলাম। তরী ধীরে ধীরে বহে যেতে লাগলো। বাতাস এসে আমাদের পালের উপর এলিয়ে এলিয়ে পড়তে লাগল। চাঁদের মৃদু-কিরণ এসে তার অলস দেহ তরুণীর কাজল-কাল চুলের রাশির উপর শিথিল করে দিতে লাগলো আর নদীর ছোট ছোট ঢেউ-গুলো আমাদের সেই একসুরে বাঁধা গানের তালে তালে চঞ্চল শিশুর মত ছল্ ছল্ কল্ কল্ করে নেচে নেচে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল। আমাদের তরীখানি বাতাস ভরে, ধীরে ধীরে, হেলে দুলে বহে যেতে লাগল; ক্রমে নদীর তীরে, গাছের সারি, বকুল-বনের মসিরেখা সবই যেন কোন্ স্বপ্ন-রাজ্যের কুহেলিকার মধ্যে মিলিয়ে যেতে লাগল! এমনি করে সমস্ত রাত নদীর বুকের উপর ঘুরে-ফিরে ভোরের বেলায় আমাদের তরীখানি আবার তীরে ফিরে এল, আবার আমরা তীরে নেমে এলাম। একটি চুমো দিয়ে তরুণী কবিকে সেদিনকার মত বিদায় দিল; কবি আমাকে নিয়ে নেমে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে তরী আবার মাঝ-দরিয়ার আবছায়ার মাঝে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল!

এমনি করে রোজ রাত্তিরে সেই তরীখানি তীরে এসে লাগত আর কবি আমাকে নিয়ে তরীতে গিয়ে উঠে বস্‌ত; তরী নদীর বুকের উপর দিয়ে খেয়ালের মত ভেসে যেত। তরুণী তার সেই মিঠেগলার মিহিসুর নদীর চঞ্চল বুকখানার উপর ছড়িয়ে দিয়ে যেত আর কবি সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমার তারে তারে তর্জ্জনী বুলিয়ে যেত; আমি মুগ্ধ হয়ে খেয়ালের মাথায় যা-তা কত কি ছাই বকে যেতাম, তার ঠিক্ নেই। গাইতে গাইতে তরুণী তার কবরী থেকে বকুলের মালাগাছটি খুলে নিয়ে আমার গায়ে জড়িয়ে দিত; আমি মুগ্ধ হয়ে তার সেই কোমল বাহু-বন্ধনের ভিতর নিসাড় হয়ে পড়ে থাকতাম! কতদিন তরুণী আমাকে তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলত, "বীণা, আমি ভাব, তুই ভাষা—আমি গান তুই সুর; তুই না থাকলে আমি কিছুই নই বীণা, কিছুই নই।" এই কথা বলে সে আমাকে সোহাগভরে কত চুমো খেত! তার কোমল গাল দুটো যখন আমার বুকে এসে ঠেকৃত তখন আমার বুকখানা নেচে নেচে উঠত; তাকে কত আপনার বলে মনে হত! কবি তরুণীর হাত থেকে আমাকে নিজের কোলের উপর তুলে নিত, তার সুরগুলো বাতাসের গায়ে ছড়িয়ে দিত, আর আমি সেই সঙ্গে আমার গলা মিলিয়ে দিতাম। এমনই করে সমস্ত রাত প্রকৃতির বুকের উপর আমাদের এই আনন্দোৎসব চলত, আর ভোরের আলো যখন একটু একটু করে ফুটে উঠত, তখন আমরা তীরে ফিরে আস-তাম। এমনই করে দিন যায়, দিন আসে। রোজই কবি আমাকে নিয়ে নদীর তীরে তরণীর প্রতীক্ষায় বকুল তলে গিয়া বসে। রোজই তরী আসে, আমাদের নিয়ে সারারাত নদীর বুকের উপর ঘুরে বেড়ায়, আবার ভোরের বেলায় তীরে এসে আমাদের নাবিয়ে দিয়ে যায়! এমনি দিন যায়, দিন আসে, মাস যায়, মাস আসে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বছর কেটে গেল। বসন্ত গেল গ্রীষ্ম এল, গ্রীষ্ম গেল বর্ষা এল, বর্ষা গেল শরৎ এল, শরতের পর হেমন্ত এল, হেমন্তের পর শীত এল, এমনি করে একটির পর একটি করে ঋতুগুলি পট-পরিবর্ত্তনের মত একটি একটি করে প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চের উপর থেকে সরে সরে যেতে লাগলো।

তারপর একদিন, রাত্রি তখন খুব গভীর, আকাশ মেঘে ঢাকা, চারিদিকে অন্ধকার ছম্ ছম্ করছে! প্রকৃতি নীরব

নিঝুম হয়ে রয়েছে, নদীর কাল জল, ছল্ ছল্ কল্ কল্ করে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে; সেই নিঝুম প্রকৃতির কোলের উপর নদীর তীরে বসে কবি, আর তার বুকের উপর শুয়ে আমি। দুজনেই নীরব, নিস্তব্ধ, প্রাণটা যেন শুকিয়ে গেছে, আনন্দ যেন কোথায় চলে গেছে! কবি চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে রইল, আর আমি তার পাশে তেমনি নীরব প্রকৃতির সেই বিষাদমাখা মুখখানার দিকে চেয়ে শুয়ে রইলাম।

রাত ক্রমেই বাড়তে লাগলো। কবি অস্থির হয়ে উঠল; কিন্তু কৈ তরী ত এল না। কবি আরও চঞ্চল হয়ে উঠল, নদীর তীরে পাগলের মত ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল আর আমি সেইখানে সেই তৃণ শয্যার উপর নীরবে পড়ে রইলাম। ক্রমে ভোর হয়ে এল, প্রকৃতির বুক জুড়ে জাগরণের সাড়া মুখর হয়ে উঠল তবুও তরী এসে কূলে ভিড়ল না! কবি নিরাশ হয়ে আমাকে নিয়ে কুটীরে ফিরে গেল। সেদিন সারদিন সে একটু জলও মুখে দিলে না; আমাকে ঘরের এক কোনে ফেলে রেখে দিয়ে শয্যার উপর গিয়ে শুয়ে পড়লো। সমস্ত দিন সে উঠলো না কিছু খেলে না। তারপর রাত্রি যখন তার কালো আঁচলখানি বনের উপর ধীরে ধীরে বুলিয়ে যেতে লাগলো—তখন কবি শয্যা ছেড়ে উঠে আমাকে তুলে নিয়ে নদী তীরে গিয়ে বস্‌লো; সে দিনও তরী এসে কুলে লাগলো না; সেদিমও আমরা ঘরে ফিরে এলাম। এমনি ক'রে প্রায় পাঁচ, সাতদিন কেটে গেল তবুও তরীর দেখা নাই। কবি পাগলের মত বনময় ছুটে ছুটে বেড়তে লাগলো। তারপর একদিন সে আমাকে নিয়ে নদীর তীরে বসে বসে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো, "তবে কি সত্যি সত্যিই তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে? তবে এ সাধের বীণা রেখেই বা কি ফল আর আমারি বা বেঁচে লাভ কি?" এই কথা বলেই কবি আমাকে তৃণশয্যার উপর থেকে তুলে নিল। তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলে উঠলো, "আমার সাধের বীণা! তোমাকে আজ বিসর্জ্জন দিই এসো, তুমি আর কার গানের সঙ্গে স্থর মিলিয়ে গান গাইবে বীণা? আর আমিই বা কার গানের সঙ্গে তোমার ঝঙ্কার মিলিয়ে দেবো বীণা? এস! আমিও ডুবি তোমাকেও ডুবিয়ে যাই।" এই ব'লে কবি নদীর সেই চঞ্চল ক্ষুব্ধ বুকখানার উপর আমাকে ভাসিয়ে দিলে। তারপর নিজে নদীর সেই চঞ্চল বুকখানাকে আরো চঞ্চল করে দরিয়ার বুকে লাফিয়ে পড়লো। নদী ধীরে ধীরে চুপি চুপি তাকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেল্লে তা সেই জানে। আমি কিন্তু ডুবলাম না; ডোব্‌বার যো কি? আমার যে ডোব্‌বার উপায় নেই, আমাকে যে ভাসতে হবে;—যদি ডুবতেই পারতাম তা হলে ত সকল জ্বালাই জুড়োতো। তা হলে আর সাজা হয় কৈ? তাই দুকুলহারা হয়ে কেবল ভেসেই চলেছি।

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

আমাদের কথা।

"মর্ম্মবাণী"র ছয়মাস পূর্ণ হইল।

অতঃপর নানা কারণে, আমাদের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "মানসী" মাসিক পত্রিকার সহিত "মর্ম্মবাণী"কে একত্র করিয়া দেওয়া আমরা স্থবিধাবোধ করিলাম। ফাল্গুন হইতে সম্মিলিত পত্রিকা "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নামে মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে।

যুক্ত পত্রের সম্পাদক—মাননীয় মহারাজ শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। আকার প্রতিমাসে ডবল ক্রাউন ৮ পেজি ১৫ ফর্ম্মা। প্রতি সংখ্যায় দুই খানি বহুবর্ণ ও দুই খানি একবর্ণ পূর্ণপৃষ্ঠা ছবি থাকিবে। তাহা ছাড়া প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ফর্ম্মার ভিতরও অনেকগুলি ছোট বড় চিত্র থাকিবে।

মূল্যাদি।

যে সকল গ্রাহক এক বৎসরের মূল্য দিয়া "মর্ম্মবাণী"র গ্রাহক হইয়াছিলেন, এই ছয় মাসের "মর্ম্মবাণী" দিয়া প্রত্যেকের টাকার অর্দ্ধাংশ আমরা পরিশোধ করিলাম। বাকী অর্দ্ধাংশ "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র হিসাবে জমা করিয়া লইলাম। প্রথম ছয়মাস অর্থাৎ ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত "মর্ম্মবাণী"র প্রত্যেক গ্রাহককে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পাঠাইব।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র মূল্য ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ৪৲ এবং ষাণ্মাসিক ২৲ ধার্য্য হইল। —যাঁহারা ৩৲ অথবা ৪৲ দিয়া "মর্ম্মবাণী"র গ্রাহক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের টাকার বাকী অর্দ্ধাংশ আমরা এইরূপে পরিশোধ করিব। ভাদ্র হইতে মাঘ অবধি শেষ ছয় মাসের "মানসী ও মর্ম্মবাণী" যদি তাঁহারা লইতে ইচ্ছা করেন তবে আগামী ভাদ্র মাসে তাঁহাদিকে ষাণ্মাসিক মূল্য ২৲ দিতে হইবে। "মর্ম্মবাণী"র যে সকল গ্রাহক ৫৲ মূল্য জমা দিয়াছিলেন, ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ১॥০ দিলেই তাঁহারা পাইবেন। এই ১॥০ ভাদ্রমাসে দিতে হইবে।

"মর্ম্মবাণী"র যে সকল গ্রাহক উক্ত প্রণালীতে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" লইতে সম্মত নহেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ২৫শে মাঘের মধ্যে সে কথা আমাকে জানাইবেন, আমি তাঁহাদের টাকার প্রাপ্য অর্দ্ধাংশ নিজব্যয়ে মণিঅর্ডার করিয়া তাঁহাদিকে ফেরৎ পাঠাইব।

নূতন "মানসী ও মর্ম্মবাণী"র ফাল্গুন সংখ্যায় যে সকল প্রবন্ধাদি থাকিবে, তাহা বিজ্ঞাপনী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"মানসী ও মর্ম্মবাণী" কার্য্যালয়
৪ নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

শ্রীসুবোধচন্দ্র দত্ত,
কার্য্যাধ্যক্ষ।